"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম

(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

প্রথম বর্ষ **প্রথম সংখ্যা**

৮ই জুন ১৯৬৯ : ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৮৯১

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে, পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আম উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০

টেলিগ্রাফের ঠিকানা—যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

ভুলি নাই

প্রস্ফুটিত গোলাপের আঘ্রাণ যে নিতে চায়, কাঁটাকে তার স্বীকার করে নিতে হবে। রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রভাতের সৌন্দর্য যে উপভোগ করতে চায় তাকে রাত্রির তমসা অতিক্রম করে আসতে হবে। স্বাধীনতার সুখ ও মুক্তির আনন্দ যে অর্জন করতে চায় তাকে তার মূল্য দিতে হবে। আর সেই মূল্য দেওয়া যায় ত্যাগ ও দুঃখকে স্বীকার করে।

—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

এই সংখ্যায়

পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর অভিনন্দন বার্তা

সত্যমেব জয়তে

মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ
কলিকাতা

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে ভারত সরকারের প্রকাশন বিভাগ থেকে ইংরেজী ও হিন্দি ভাষায় যোজনা নামে যে পাক্ষিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়, তার একটি বাংলা সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত হলাম। আমি এই আসন্ন প্রকাশ বাংলা পাক্ষিকের সাফল্য কামনা করি এবং এই পত্রিকার সম্পাদক ও কর্মীবৃন্দকে আমার শুভকামনা জানাই।

পরিকল্পনার পথে জনমতকে উদ্বুদ্ধ করে তোলাই যোজনা পত্রিকার উদ্দেশ্য। একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে জনমতের পূর্ণ সমর্থন ও জনগণের পূর্ণ সহযোগিতা ব্যতীত কোন পরিকল্পনাই পূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে পারেনা। পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে আমরা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে চলতে পারিনি বলেই আমাদের পরিকল্পনাগুলি এ পর্য্যন্ত আংশিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সেই ত্রুটি সংশোধন করতে না পারলে একটির পর একটি পরিকল্পনা রূপায়ণ করেও আমরা জনজীবনের অভাব মোচন করতে পারবনা। আমি আশা করি প্রকাশিতব্য যোজনা পত্রিকায় পরিকল্পনা সম্পর্কিত সকল তথ্য নির্ভুলভাবে পরিবেশন করে সাধারণ মানুষকে সচেতন ও আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা করা হবে।

অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়
অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকীয়

আমাদের কথা

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে ইংরেজী ও হিন্দীতে প্রকাশিত 'যোজনা' পাক্ষিক পত্রটি সকলেরই সুপরিচিত। শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতের মত একটা স্বল্পোন্নত গণতান্ত্রিক দেশের অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটানোর প্রয়াস অসফল থেকে যেত, যদি না দেশের জনগণ পরিকল্পনার সার্থকতা সম্বন্ধে ক্রমশঃ সচেতন হয়ে উঠতেন। কারণ কোনোও পরিকল্পনার রূপায়ণই জনসাধারণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ব্যতিরেকে সার্থক হতে পারে না। আর এর পরিপ্রেক্ষিতে যোজনার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পরিকল্পনার বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে, অর্থনীতিক, শিক্ষাগত ও কারিগরী ক্ষেত্রে দেশের বহুমুখী অগ্রগতির খবরাখবর জনসাধারণের গোচরে আনার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় একটি সাময়িকী প্রকাশের জন্যে অর্থ সংস্থান করা হয়েছিল। সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা হয়েছিল প্রায় ১৩ বছর আগে—১৯৫৭ সালের ২৬শে জানুয়ারী, যেদিন পরিকল্পনা কমিশনের মুখপত্র 'যোজনা' আত্মপ্রকাশ করে।

'যোজনা' প্রকাশের প্রস্তাবটিকে স্বাগত জানিয়ে জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, ভারতে বহু পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী বেরোয় বটে, কিন্তু তার কোনোটিতে সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও তার বহুল প্রচারের বিষয়টিকে কোনোও গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয় না। শ্রী নেহরু যথার্থই বলেছিলেন যে, 'যোজনা'র নামেই তার কাজের পরিচয়।

প্রথম সম্পাদকীয়তে 'যোজনা'র লক্ষ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছিল যে, পরিকল্পনাগুলির মত এই পত্রটিও অর্থনীতিক, শিক্ষানীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকসহ উন্নয়নের সমগ্র ক্ষেত্রকে নিজের কর্মক্ষেত্রের আওতায় আনবে এবং এতে বিভিন্ন রাজ্যের খবরাখবরের জন্যে বিশেষ স্থান থাকবে। গত ১৩ বছরে 'যোজনা' এই প্রতিশ্রুতি রাখার চেষ্টা করেছে সর্বতোভাবে।

যোজনা, সাধারণ সরকারী পত্র-পত্রিকা থেকে পৃথক। পরিকল্পনা কমিশনের উদ্যোগে প্রকাশিত হলেও 'যোজনা' শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই পরিবেশন করে না। এই পত্রটি সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে মতবিনিময়ের যোগসূত্র হিসেবে কাজ করছে। পরিকল্পনার মুখপত্র এবং দেশের অগ্রগতির পরিচয়বাহী এই পাক্ষিকটির ইতিহাসে আজ এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। পরিকল্পনার বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে আঞ্চলিক ভাষায় তার প্রচার দরকার। আর সেই উদ্দেশ্য নিয়ে যোজনার বাংলা সংস্করণ 'ধনধান্যে' তার শুভযাত্রা শুরু করল।

এই পত্রটিতে যেমন জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টার খবর দেওয়া হবে তেমনি সেই প্রচেষ্টার শরিক হিসেবে পশ্চিমবাংলা, জাতীয় বা আঞ্চলিক উন্নয়নে কতটা সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারছে তাও দেখানো হবে অর্থাৎ বাংলাদেশের কৃষি, শিল্প, সংস্কৃতি এবং আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন এমন কি হাল আমলের পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পরিবেশনই হ'ল আমাদের লক্ষ্য, তবে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের খবরও আমরা উপেক্ষা করবো না। আর একটা কথা, যোজনায় কেবলমাত্র সরকারি দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করাই আমাদের উদ্দেশ্য নয়; পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দেশবাসীকে অবহিত করা এবং পরিকল্পনার রূপায়ণে জনগণের সক্রিয় ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা ও মতবিনিময়ের সুযোগ করে দেওয়াই হ'ল যোজনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

আমরা বিশ্বাস করি যে, পরিকল্পনার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন সার্থক করে তুলতে হলে এমন একটা ব্যাপক প্রয়াস দরকার যাতে দেশের প্রত্যেক অধিবাসীকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে কারণ জনগণের সমবেত প্রয়াস ব্যতিরেকে ভারত সমৃদ্ধতর, সুখময় ও শান্তিপূর্ণ প্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারে না। 'ধনধান্যে' এই লক্ষ্য সামনে রেখে চলবে। পাঠক ও লেখক গোষ্ঠীর অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও পরামর্শ ব্যতিরেকে এই দায়িত্ব নির্বাহ করা আমাদের পক্ষে কঠিন। যাঁরা আমাদের এই মহান দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন, তাঁদের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা হবে আমাদের পাথেয়।

পরিকল্পনা ঃ লক্ষ্য ও উপায়

অসিত ভট্টাচার্য্য

পথে নামার আগে কোথায় যাবো সেটা স্থির করে নেওয়া দরকার। লক্ষ্য স্থির হলে, তবেই কোন্ পথ নেব, সেটা নির্ণয় করার সমস্যা আসে। আর লক্ষ্য যদি স্থির না করা থাকে, তাহলে, হয় আমাদের গতি হবে এলোমেলো, নয়তো আমাদের কোনো গতিই থাকবে না। আমরা এক-ই জায়গায় দাঁড়িয়ে পা ফেলব। এতে আমাদের পরিশ্রম হবে ঠিক-ই কিন্তু আমরা কোথাও পৌঁছুতে পারব না।

ওপরে যে কথা বলা হলো সেটা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে খাটে। পরিকল্পনার লক্ষ্য স্থির হলে, তখনই কি উপায়ে লক্ষ্যে পৌঁছুব এই প্রশ্নটি উঠতে পারে। এ ক্ষেত্রে উপায় নির্বাচনের সমস্যাটি প্রাথমিক নয়। প্রাথমিক সমস্যা হ'লো—লক্ষ্য স্থির করা। বস্তুতঃ পরিকল্পনার লক্ষ্য যে রকম স্থির হবে, তদনুযায়ী, লক্ষ্য সিদ্ধির উপায় বা কৌশলও স্থির করতে হয় ; কার্যত উদ্ভাবন করতে হয়। এ ক্ষেত্রে একটা আর একটার উপর নির্ভরশীল। লক্ষ্যের প্রশ্ন উহ্য রেখে কোনো আদর্শ উপায় বা 'টেকনিক'-এর কথা বলার অর্থ হয় না—কারণ বিভিন্ন লক্ষ্য অনুযায়ী বিভিন্ন উপায় বা কৌশল আদর্শ ব'লে বিবেচিত হয়ে থাকে।

এ ক্ষেত্রে আমাদের দেশে—ভারতে বা আরো কাছে তাকালে পশ্চিমবাংলায় পরিকল্পনার লক্ষ্য ও লক্ষ্যসিদ্ধির উপায় বা পদ্ধতি কি ভাবে স্থির করা যায়? একমাত্র এখানকার আর্থিক জীবনের বাস্তব কাঠামোর তথ্যনিষ্ঠ বিচার থেকেই আমরা এ বিষয়ে সুষ্ঠু নির্দেশ পেতে পারি বলে মনে হয়। অতএব সর্বাগ্রে তার-ই একটা প্রাথমিক চিত্র দেওয়া যেতে পারে।

পরিকল্পনা ও পশ্চিমবঙ্গ

এ রাজ্যে মোট জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র কর্মে নিযুক্ত। যাঁরা, অর্থকরী কর্মে নিযুক্ত তাঁদের মধ্যে অর্ধেকের কিছু বেশী (শতকরা ৫৪-৫৫ জন) কৃষির ওপর নির্ভরশীল এবং এঁদের অনেকের পক্ষেই কৃষি, লাভজনক জীবিকা নয়। অন্য কোনো জীবিকা নেই বলেই অনেকে কৃষিতে নিযুক্ত রয়েছেন। কৃষি লাভজনক না হবার একটা প্রধান কারণ পশ্চিমবঙ্গে দো-ফসলী জমির স্বল্পতা। দ্বিতীয় এগ্রিকালচারাল লেবার এনকোয়ারি কমিশনের (১৯৫৬) রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, যদিও পশ্চিম বঙ্গের মোট এলাকার শতকরা ৬৯ ভাগ জমিতে চাষাবাদ হয়, তবু এখানে দো-ফসলী জমির অনুপাত হ'লো নীট চাষের এলাকার ১/৬ ভাগ মাত্র। এক ফসলী জমিতে যারা চাষাবাদ করেন বছরের অনেকটা সময়ে (শীতের মাঝামাঝি থেকে গ্রীষ্মের শেষ পর্যন্ত এবং ভাদ্র মাসে) তাঁদের হাতে কোনো কাজ থাকে না।

কর্মহীনতার এই সমস্যা বিশেষ ক'রে তীব্র হয়ে দেখা হীন খেত মজুরদের কাছে। কারণ অন্যেরা চাষের তাঁদের নিয়োগ করলে তবেই তাঁদের আয় নইলে চাষের থেকে তাঁদের অন্য কোনো লাভ নেই।

কৃষি শ্রমিক ও বেকার সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গে খেত মজুরদের সংখ্যা ও মোট কর্মী সংখ্যার মধ্যে তাঁদের আনুপাতিক হার বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই রাজ্যের মোট কর্মীর শতকরা ১৭ জন ভূমি-হীন খেতমজুর। বিভিন্ন জেলায় অবশ্য এই হারের অনেক তারতম্য রয়েছে। বাঁকুড়ায় মোট কর্মী সংখ্যার শতকরা ২৫ জন খেতমজুর আর বীরভূমে এই হার শতকরা ৩০ থেকে ৩১। এমন কি ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী বর্ধমান প্রভৃতি শিল্পসমৃদ্ধ জেলাগুলিতেও দেখা যায় যে, জেলার শিল্পসমৃদ্ধ মহকুমা বা থানাগুলিতে খেতমজুরদের হার কম হলেও অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর মহকুমা বা থানাগুলিতে খেতমজুরদের হার পশ্চিমবঙ্গের গড়-পড়তা হারের অনুরূপ বা তার চেয়েও বেশী।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ২৪-পরগণার বারাকপুর মহ-কুমায়, খেতমজুরদের হার যদিও মোট কর্মীসংখ্যার শতকরা ১.৪ ভাগ, ডায়মণ্ডহারবার মহকুমায় খেতমজুররা হলেন মোট কর্মীসংখ্যার শতকরা ৭ ভাগ, কিন্তু বর্ধমান সদর মহকুমায় ও কাটোয়া মহকুমায় তাঁদের আনুপাতিকহার যথাক্রমে শতকরা ২৮ ও ১২ ভাগ। হুগলী জেলায় গোটা শ্রীরামপুর মহকুমার হিসেব নিলে দেখা যাবে যে, খেতমজুররা মোট কর্মী সংখ্যার শতকরা মাত্র ১০ ভাগ, কিন্তু ঐ মহকুমার ভিতরেই জঙ্গীপাড়া থানায় মোট কর্মী সংখ্যার শতকরা ২৪ জন হলেন খেত মজুর। হাওড়া জেলাতেও দেখা যায় জেলার সদর মহকুমায় খেত মজুরদের হার যখন মোট কর্মীসংখ্যার শতকরা মাত্র ৫ জন তখন অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর উলুবেড়িয়া মহকুমায় সেই হার হলো শতকরা ১৭ জন।

উপরে যে সংখ্যাগুলি দেওয়া হল তার তাৎপর্য কি? তাৎপর্য সংক্ষেপে এইটুকু বলা যায় যে, এ দেশে যে শিল্পায়ন হয়েছে এবং যেভাবে হয়েছে তাতে কৃষি থেকে শিল্পে জনসংখ্যা আকৃষ্ট হয় নি। শিল্প বিস্তারের দ্বারা কৃষিতে কোনো আকর্ষণীয় প্রভাব সঞ্চারিত হয় নি। শিল্পায়ন আরো কত গুণ বেশী হলে এবং কত দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হলে এই রকম আকর্ষণী প্রভাব সৃষ্ট হতে পারে তাও জানা নেই। সুতরাং কৃষিতে কর্মহীন জনসমষ্টির কর্ম সংস্থানের বিষয়ে চিন্তা করলে শিল্পায়নের পরিবর্তে আপাতত গ্রামীণ অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যেই সমাধানের কথা আমাদের ভাবতে হবে।

কর্মহীনতার সমস্যা, গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান সমস্যা—ছোট চাষী, ভাগচাষী ও বিশেষত খেত মজুর কাজ করেন এক ফসলী জমিতে। এ রাজ্যের নীট কৃষি জমির শতকরা ৮০ ভাগের বেশী জমিতে, জানুয়ারী থেকে জুন মাসের অন্তত দ্বিতীয় সপ্তাহ

পর্যন্ত প্রায় কোনো কাজ থাকে না। আবার জুলাই আগষ্টে ধান রোয়ার কাজ শেষ হবার পর অন্তত এক দেড় মাস কোনো কাজ থাকে না। ফলে, এই সময়ে খেতমজুরদের ভাগচাষীদের এবং কিছু কিছু ছোট চাষীদের খেয়ে বেঁচে থাকার জন্যে ঋণগ্রস্ত হতে হয়। যে হেতু প্রতি বছরে এই একই অবস্থা, সেই হেতু বছরের পর বছর এঁদের একই অবস্থায় কাটাতে হয়।

কৃষি শ্রমিকের সাময়িক কর্মহীনতা

কৃষিতে এই কর্মহীনতাকে অনেকে প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা বলেন। কিন্তু কর্মহীনতা-কর্মহীনতা-ই। শহর থেকে দেখলে এটাকে প্রচ্ছন্ন মনে হলেও গ্রাম জীবনের ক্ষেত্রে এটা নিতান্তই প্রকট। এই তথাকথিত প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতাই কৃষির উৎপাদন তথা আয় এবং সঞ্চয়ের হার নিম্নমানে রেখে দেয়। অধিকাংশের আয় ও সঞ্চয় নিম্নমানের হওয়ার ফলে দেশে লগ্নীর উপযুক্ত পুঁজির স্বল্পতা ঘটে এবং লগ্নীর হার নিচু মানের হয়। তার ফলে অর্থনৈতিক বিকাশের হার কম হয়ে গতি হয় মন্থর। সংক্ষেপে কৃষি-প্রধান দেশে কৃষির মান যদি নিচু হয় তাহলে গোটা আর্থিক জীবনের মান নিচু হয়ে পড়ে।

এই অবস্থায় পরিকল্পনার লক্ষ্য কি হতে পারে? নিশ্চয়ই পরিকল্পনার লক্ষ্য এমন হওয়া উচিত যাতে দেশে কর্মসংস্থান বাড়ে। এর অর্থ, প্রথমত, যারা কোনো কাজ করতে চায় অথচ পায়না, তাদের কাজের ব্যবস্থা করা, দ্বিতীয়ত যাদের এখন কর্ম-নিযুক্ত বলা হয়, অথচ বছরের অনেকটা সময়ে যাদের কাজ নেই, তাদের সারা বছরের মতো কাজের ব্যবস্থা করা। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কাজটি আগে করলে, তবেই প্রথমটি সম্পন্ন হতে পারে। এর কারণ এই যে, কৃষিতে নিযুক্ত বিপুল জনসমষ্টির সারা বছরের মতো কর্ম সংস্থান করে, তাদের আয় এবং সঞ্চয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করলে, তবেই দেশে বর্ধিত লগ্নীর উপযুক্ত বর্ধিত সম্পদ সৃষ্ট হবে, তা ছাড়া বর্ধিত লগ্নীর উপযুক্ত আর্থিক ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্ট হবে।

বিরাট জনসমষ্টির আয় বৃদ্ধি পেলে ভোগ্যপণ্যের বাজার বিস্তৃত হবে। অন্যদিকে উন্নয়নশীল কৃষির প্রয়োজনে উন্নত যন্ত্রপাতি, সার ও সিমেন্টের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে ভারি ও এঞ্জি-নীয়ারিং শিল্পের ও উৎপন্ন পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে, কৃষি পণ্যের সরবরাহ বেড়ে মূল্য বৃদ্ধির প্রবণতা কমবে এবং মজুরী ও মূল্যবৃদ্ধির ক্রমিক ঊর্ধ গতি থামলে শিল্পে লগ্নী বাড়তে পারবে। এই সমস্ত কারণেই আমাদের দেশে কৃষি সমস্যার সমাধানকে গোটা অর্থনৈতিক জীবন-উন্নয়নের চাবি কাঠি বলা যায়।

খেত মজুর ও ছোটচাষীর কর্মসংস্থান

উপরে যা বলা হলো, পরিকল্পনার লক্ষ্য যদি সেইভাবে স্থির করা হয়, তাহলে পরিকল্পনার পদ্ধতি বা কৌশল সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি কি হবে তা সহজেই বোঝা যায়। সংক্ষেপে আমাদের পদ্ধতি হবে, জনসংখ্যার ব্যাপকতম ও দরিদ্রতম অংশকে, অর্থাৎ খেতমজুর ও গরীব চাষীকে বছরের কর্মহীন মাসগুলিতে কর্মে নিযুক্ত রাখা যাতে তাদের আয় ও কৃষির উৎপাদন বাড়তে পারে। কর্মনির্বাচনের সময়ে এমন কাজ বেছে নিতে হবে যা সম্পন্ন করলে, কৃষিতে সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন বাড়ে। এর একটা উদাহরণ দিই। খেতের মধ্যে সেচের নালা কাটা হয়নি বলে, ভারতে নানা জায়গায় বৃহৎ বাঁধ গড়ে যে সেচ ক্ষমতা সৃষ্টি করা হয়েছে তার অনেকটাই এখন নষ্ট হচ্ছে। এরফলে, একদিকে লগ্নী সম্পদ থেকে আয় হচ্ছে না, অন্যদিকে এ দেশ, প্রাপ্য খাদ্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে—আমদানির ওপর নির্ভর-শীল হয়ে পড়ছে। তার ফলে দেশের শিল্পায়নও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। একমাত্র ময়ূরাক্ষী সেচ এলাকাতে এইভাবে (ও লিফট্ ইরিগে-শনের অভাবে) সেচ ক্ষমতার অর্ধেক নষ্ট হচ্ছে বলে কোনো কোনো সূত্রে জানা যায়। নিশ্চয় গ্রামের বেকার ও দরিদ্র জনসমষ্টিকে এই ধরণের সেচ খাত কাটা ও সেই সঙ্গে মাঠকুয়াও পুকুর কাটা ও সংস্কারের কাজে গ্রীষ্মের ও অন্য সময়ের কর্মহীন মাসগুলিতে নিযুক্ত রাখা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কাজ হওয়া উচিৎ। কিন্তু এও এটা উদাহরণ। অঞ্চল ভেদে পথ তৈরি থেকে বনবিস্তার পর্যন্ত গ্রামীণ অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রে গ্রামের কর্মহীন জনসমষ্টিকে নিয়মিত নিযুক্ত রাখা পরিকল্পনার অঙ্গভূক্ত হওয়া দরকার।

অনেকে এমন আশংকা প্রকাশ করেন যে গ্রামের গরীবদের হাতে মজুরী বাবদ হঠাৎ কিছু অর্থাগম হলেও খাদ্যশস্যের বাজারে আকস্মিক অতিরিক্ত চাহিদার সৃষ্টি হবে ও খাদ্যশস্যের মূল্য ঊর্ধগামী হবে। এতে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা বাড়বে। এ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা যায়। প্রথমত মজুরী সবটা টাকায় না দিয়ে অংশত খাদ্যশস্য দিয়ে দেওয়া যায়। যতদিন খাদ্য ঘাটতি থাকবে ততদিন এটা করা উচিৎ মনে হয়। দ্বিতীয়ত খাদ্যশস্যের বাজারে যে চাপটা অনুমান করা হয়েছে সেটা অনেকটা অবাস্তব। সারা বছর কাজ না থাকলেও মানুষ সারা বছর খেয়ে-ই বেঁচে থাকে। এ ক্ষেত্রে আয় না থাকলে মানুষ ঋণ করে খাদ্য শস্য কেনে। সুতরাং আয় বাড়লে খাদ্যশস্যের বাজারে সবটাই একটা আকস্মিক ও অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করবে এটা মনে করা ভুল হবে। ঋণের মাধ্যমে খাদ্য শস্যের বাজারে মোট যে ব্যয় করা হয়, আয়ের মাধ্যমে শস্যের বাজারে তারচেয়ে ব্যয় কতটুকু বাড়বে তার ওপরেই নির্ভর করছে শস্যের বাজারে কতটা অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হবে তার পরিমাণ। এটা অসহ্য হবে সেই অনুমানের ভিত্তি কি? আর যদি তা হবার উপক্রম হয় তাহলে মজুরী অংশতঃ শস্যের মাধ্যমে দিলে সমস্যার সমাধান হতে পারে। তা ছাড়া প্রথম মরশুমে না হলেও কৃষিতে লগ্নী বেড়ে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পাবার পর শস্যের বাজারে অতিরিক্ত আর্থিক. চাহিদা কৃষিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করবে না। বরং তা কৃষি পণ্যের মূল্যহ্রাস রোধ করতে পারবে। তারও যে দরকার আছে আজকে ভারতে গমের বাজার দেখলেই তা স্পষ্টত বোঝা যায়।

যোজনা ও জনতা

ধীরেশ ভট্টাচার্য্য

জনতার দাবী থেকেই যোজনার জন্ম।

চারিদিকের বাঁচবার দাবীর প্রতি নিস্পৃহ থাকা কোনো জনদরদী ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব নয়। তবু প্রশ্ন জাগে, এই দাবী কি সৃষ্টির পথে আমাদের নিয়ে যাবে, না সংহারের পথে? একের দাবী যখন অন্যের অধিকার হরণ করতে উদ্যত হয় তখন সংহারলীলার মনোভাব জেগে ওঠা বিচিত্র নয়। যোজনার অর্থ—বিভিন্ন দাবীগুলিকে সংহারের অভিমুখী হতে না দিয়ে সেগুলিকে নিয়ে সৃজনের পরিবেশ গড়ে তোলা। এই পরিবেশের মধ্যে সব দাবী পুরোপুরি মেনে নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, যুক্তিসঙ্গত দাবীকে দাবিয়ে রাখা আবার এই পরিবেশ সৃষ্টির প্রতিকূল।

যেহেতু দাবীগুলির পরস্পরের মধ্যে অসংলগ্নতা আছে, যেহেতু একের দাবীকে স্বীকৃতি দিতে গেলে অন্যের চাহিদা কিছু পরিমাণে খর্ব হতে বাধ্য, সেই হেতু 'জনতার রায়' নিয়ে যোজনা গড়ে তোলা চলে না। যাঁরা বলেন, জনসাধারণের অভাব-অভিযোগের ফিরিস্তি নিয়ে তার উপর ভিত্তি করেই যোজনা প্রণয়ন করা যায়, তারা গোঁড়া গণতান্ত্রিক হতে পারেন, কিন্তু আর্থিক জগতের ঘাত প্রতিঘাতের কথা তাঁরা বিস্মৃত হন। যোজনার প্রস্তুতি-পর্বেই প্রয়োজন এমন কিছু অনুশাসনের, যার ফলে, স্বার্থের সংঘাত কিছু পরিমাণে শান্ত হয়ে আসে, যার গোড়ার কথাই হ'ল জনতার বিভিন্নমুখী দাবীকে এক মুখী করে করে তোলা।

সাফল্যের জন্য জনসমর্থন প্রয়োজন

যোজনার সাফল্যের জন্য জনসমর্থন প্রয়োজন, এই কথা বারবার আমাদের বলা হয়। বাস্তবিক পক্ষে সর্বজনের সম্পূর্ণ সমর্থন লাভ করা কোনো উৎকৃষ্ট যোজনার পক্ষেও সম্ভবতঃ সম্ভব নয়। এক শ্রেণীর বা এক অঞ্চলের লোকের পুরোপুরি সমর্থন পেয়ে যে যোজনা জন্মগ্রহণ করল, অন্য শ্রেণী বা অন্য অঞ্চলের লোক তার উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং আজকের জনমত কোন দিকে হেলে পড়ল তার দিকে সর্বক্ষণ দৃষ্টি রাখতে গেলে যোজনার পথে সবল পদক্ষেপ প্রায় অসম্ভব। বিভিন্ন স্বার্থের ক্ষুদ্র বাধা অতিক্রম করে বিরাট কোনো লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে যোজনাকে বেঁধে দিতে না পারলে যোজনার অগ্রগতি পদে পদেই বিঘ্নিত হবে। যোজনাকে সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে হলে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন এমন কিছু প্রযোজকের প্রয়োজন যাঁদের স্থির দৃষ্টি দূরের কোনো ধ্রুব লক্ষ্যের উপর স্থাপিত, সাময়িক স্বার্থের বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে যাঁরা যোজনাকে সেই লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করতে পারবেন।

জনতার দাবী নিয়েই যোজনার সূচনা, কিন্তু জনমতকে কিছুটা উপেক্ষা না করে কোনো সুসঙ্গত যোজনার সৃষ্টি হতে পারে এমন উদাহরণ পাওয়া শক্ত। কিন্তু এই উপেক্ষা করার কৌশল একটা অসাধারণ কৌশল, রাজনীতিজ্ঞেরা যার হদিশ অনেক সময়েই রাখেন না। কিন্তু পাকা রাজনৈতিক আসনে যাঁদের* প্রতিষ্ঠা, তাঁরা নিজেদের মর্যাদা দিয়েই নিজেদের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত রাখতে জানেন, তার জন্যে বারবার অন্যের দাবীর কাছে মাথা নোয়ানোর প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করেন না। অবশ্য এই ধরণের রাজনীতিক সত্তা কালেভদ্রেই শুধু জন্মায় এবং তাঁদের হাতে পড়লেই যোজনার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এঁদের সহায়তা না পেলে গোড়াতে যোজনার প্রতি জনতার সমর্থন যতই প্রবল থাকুক না কেন, মাঝপথে এসে সেই সমর্থন শিথিল হয়ে পড়ে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, জনসমর্থিত যোজনার কল্পনা এক অর্থে আকাশকুসুমের মতো, কেন না জনতার ধর্মই হ'ল, সে সৃষ্টির প্রশ্নে বিচ্ছিন্ন এবং বিভ্রান্ত। সুতরাং জনতার সমর্থনও খণ্ডিত এবং আংশিক হতে বাধ্য। পক্ষান্তরে নেতৃত্বের দ্বারা উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি হলে জনতার ঐক্য এক নূতন অভিব্যক্তি নিয়ে দেখা দেয় এবং সেই ঐক্যবোধই জাতীয় যোজনার সাফল্যের মূলে গিয়ে কাজ করতে থাকে। এ কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয় যে জনতাকে উপেক্ষা করে যোজনার কাজ চলতে পারে, কিন্তু জনতাকে অপেক্ষা করে থাকতে হয় কবে আসবে সবল নেতৃত্বের উদাত্ত আহ্বান। সেই আহ্বান যখন আসে তখন সাময়িক স্বার্থের মোহ আর জনতার বিভিন্ন শ্রেণীকে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে না, তখন সামগ্রিক স্বার্থে সৃষ্টিধর্মী হয়ে ওঠে সেই জনতা।

স্বীকার করতে বাধা নেই যে যোজনার ফলভাগী হবার আকাঙ্খা সকলেরই মনে জেগেছে। নিজের ভাগ্য নিজেই রচনা করবার শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে এই যোজনা। বাইরের কোন্ বিধাতা কবে অকৃপণ বা বদান্য হবেন তা নিয়ে অন্তহীন দীনতা প্রকাশ করার অভিরুচি প্রায় অন্তর্হিত। বহু দূরবর্তী নিভৃত গ্রামেও পাড়া পড়শীর পরস্পরের প্রতি জিজ্ঞাসা: বিজলী আসবে কবে? কিন্তু এই আকাঙ্খা, এই স্বনির্ভরতার মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করে এক ধরণের দৈন্য। অন্যের উপর বরাত দিয়ে নিজের ভাগ্য গঠন করা যায় না, যোজনা কি এই সচেতনতা আমাদের মধ্যে জাগাতে পেরেছে? আমরা ভোগ করতে চাই, কিন্তু ভোগের জন্য প্রয়োজনীয় ত্যাগ স্বীকারে কুণ্ঠিত। যেন সমাজের কর্তব্য আমাদের দুধে-ভাতে রাখা, যেন আমাদের উপর সমাজের দাবীকে যে কোনো উপায়ে ঠেকিয়ে রাখতেই আমাদের চরম কৃতিত্বের পরিচয়। জনতা যদি শুধু প্রার্থীরূপে এসে দাঁড়ায় তবে তার শক্তির পরিচয় পাওয়া যাবে কোথায়? তাকে যদি সৃষ্টির উৎসরূপে ব্যবহার করাই না গেল, তবে সংঘশক্তির আর কী-ই বা দাম?

* ধনধান্যে ৮ই জুন ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৫

সংখ্যার বাহুল্যই শক্তি নয়, বিশেষ করে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে। জনতার আকার দেখে তার ক্ষমতা বা সৃষ্টিশীলতা সম্বন্ধে কোনো ধারণা করা অযৌক্তিক। ভারতবর্ষের জনতা প্রায় অগণন। তাদের মধ্যে কত ভাষা, কত ধর্ম, কত আচারের বিসংবাদ। এই বিভিন্নমুখী জনতাকে আর্থিক উন্নতির হাতিয়াররূপে ব্যবহার করতে পারেন এমন নেতার সন্ধান পাওয়া না গেলে যোজনা হয়তো এদের সমষ্টিগত চাপেই ভেঙে পড়তে পারে। মনে রাখা দরকার যে এই জনতা ক্রমবর্ধমান। প্রতি বৎসর প্রায় দেড় কোটি অতিরিক্ত মানুষ এই জনতার অঙ্গীভূত হচ্ছে। কিন্তু যারা নূতন করে এই জনতার দলভুক্ত হচ্ছে তাদের স্বাস্থ্য শিক্ষা, সমাজচেতনা সবই আগের তুলনায় অপরিপুষ্ট। জনতার চাপ যত বাড়বে, পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা ততই হ্রাস পাবে, একমুখী হবার প্রবৃত্তি ততই দুর্বল হবে। স্বার্থবুদ্ধি অতিমাত্রায় মারাত্মক হয়ে উঠবার আগে যদি জনতাকে যোজনার গঠনাত্মক কাজে লাগানোর উপায় বার করা যায়, তবেই জনতার অতিবৃদ্ধিতে আমাদের ক্ষতির সম্ভাবনা কম। অন্যথায় জনতার বাহুল্যই হবে যোজনার দুর্বলতার অন্যতম প্রধান হেতু।

যোজনার আকার নিয়ে আমাদের দেশে বহুবার বাদানুবাদ হয়েছে। কেউ বলেছেন, যোজনাকে আকারে বড়ো করতে হবে যাতে দেশের অগ্রগতি দ্রুত লয়ে চলতে পারে। আবার কেউ বলেছেন, যোজনাকে কাটছাঁট করে এমন এক পর্যায়ে আনতে হবে যাতে তা আমাদের নাগালের বাইরে না চলে যায়। কিন্তু এই সব বাদানুবাদের আড়ালে একটা কথা চাপা পড়ে গেছে: তা হ'ল, জনতার শক্তিকে যোজনার কাজে যথাযথ ব্যবহারের চেষ্টা। যে কোনো অনুন্নত অথচ জনসংখ্যাবহুল দেশে জনতাই সবচেয়ে সহজলভ্য সম্পদ। তার উদ্যম ও আগ্রহকে কী করে যোজনার প্রসারের জন্য ব্যবহার করা যায় যোজনা-বিধায়কদের তাই নিয়ে প্রচুর চিন্তা করা প্রয়োজন। জনতার বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টা যাতে নঙর্থক না হয়, যাতে সকলের সমবেত উদ্যমে সৃষ্টির পথ সুগম হয়, সেই ভাবনারই আর এক নাম যোজনা।

দুই বিঘা জমি

যাঁরা গ্রামে বাস করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই দেখেছেন যে জমিতে চাষীরা লাঙ্গল দিচ্ছেন, মই দিয়ে মাটির ডেলা ভেঙে সার দিয়ে তারপর বীজ লাগাচ্ছেন এবং ধান, পাট ইত্যাদি ফসল হচ্ছে। কিন্তু কোন পাটের কি নাম বা কোন ধানের কি নাম, অথবা কোন বীজে ফসল ভালো হয় তা জানার আগ্রহ হয়তো অনেকেরই এমন কি অনেক চাষীরও ছিলো না। কিন্তু বতমান যুগে স্বল্পতম সময়ে, স্বল্পতম স্থানে বেশী উৎপাদনের যে চেষ্টা চলেছে তাতে দূরতম গ্রামের চাষীকেও অল্প জায়গায় অল্প সময়ে বেশী ফসল পাওয়ার কথা ভাবতে হচ্ছে। এমনি একজন চাষী হলেন পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার আখানা গ্রামের শ্রীদুলাল ভক্ত। তিনি বলেন যে 'তাইচুং নেটিভ ১ এবং আই আর-এর মতো বেশী ফলনের ধানের বীজ না থাকলে, বর্তমান যুগে আমার মতো স্বল্পবিত্ত চাষী পরিবারের বেঁচে থাকাই মুস্কিল হতো।'

৫৪ বছর বয়স্ক শ্রীদুলাল ভক্তের দুই বিঘা (২/৩ একর) জমি আছে এবং আটটি ছেলেমেয়ের মুখে অন্ন জোগাতে হয়।

তিনি বলেন যে, ''আমার পরিবারের দশ জনের জন্য অন্ততঃপক্ষে ১৪০০ কিলো চাউল প্রয়োজন। আমার দুই বিঘা জমিতে তাইচুং নেটিভ—১ এবং আই আর—৮ ধান চাষ করে ঠিক ঐ পরিমাণ চাউল পাওয়া যায়। স্থানীয় ধানের বীজ লাগালে এর অধেক ফসলও পেতাম না।''

বাড়ীর অন্যান্য খরচ চালাবার জন্য তিনি খাজনা দিয়ে আরও দশ বিঘা (৩.৩ একর) জমি চাষ করেন। এ ছাড়া আরও এক বিঘার খাজনা জমিতে তিনি ফল উৎপাদন করেন।

শ্রীভক্ত বলেন যে, যথেষ্ট সার ও জলসেচ না দিলে তাইচুং নেটিভ—১ এবং আই আর—৮ এর মতো বেশী ফলনের ধান থেকে ভালো ফসল পাওয়া যায় না। তা ছাড়া কীটাদি এগুলিকে সহজেই আক্রমণ করতে পারে সেইজন্য এই ধান চাষ করতে হলে বেশ যত্ন নিতে হয়।

যে ৩/৪ বিঘা জমিতে তিনি ধানের চারা তৈরি করেন সেখানে তিনি ২০ পাউণ্ড (৭৪০ কিলো) পচা সার দেন। জমিতে যথেষ্ট গোবর সার এবং প্রতি একরে ২:১:১ হারে ১১৪ কিলো মিশ্রসার ব্যবহার করেন। ধানের চারাগুলি যদি যথেষ্ট সতেজ না হয়ে ওঠে তা হলে তিনি প্রতি একরে আবার ১৮ কিলো করে মিশ্র সার ছড়িয়ে দেন।

শ্রীভক্ত বলেন 'আমার বাগানে যে আম ও লেবু হয়, তার আয়টা আমি সঞ্চয় করি। যে বছরে ফলন খুব ভালো হয় সেই বছরগুলিতে হয়তো ১২০০ টাকার মতো সঞ্চয় করতে পারি। খাজনা হিসেবে অন্যের জমি নিয়ে চাষ করাটা খুব লাভজনক হয় না বলে আমিও কিছু জমি কিনবো বলে ভাবছি। যাঁর জমি তিনি স্বভাবতঃই নিজের দিকে টেনে কথা বলেন। এটা খুব স্বাভাবিক নয় কি?'

সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের পথে

গত ২১শে এপ্রিল চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৬৯-১৯৭৪) নতুন খসড়া সংসদে পেশ করা হয়। ১৯৬৬ সালের ২৯শে আগষ্ট সংসদে যে পরিকল্পনা দাখিল করা হয়েছিল তার পরিবর্ত্তে এই খসড়াটি উপস্থিত করা হয়। উন্নয়নের গতি অব্যাহত রেখে আত্মনির্ভরতা অর্জন করার জন্যে, এই পরিকল্পনায়, কাজের মাত্রা যথাসম্ভব বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। দেশে যে সম্পদ রয়েছে এবং আরও যা পাওয়া যেতে পারে, সেগুলিকে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হ'ল জনসাধারণের জীবন ধারণের মান উন্নীত করার জন্য এমন কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যা সমান অধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। অর্থাৎ আপামর জনসাধারণ, বিশেষ করে, অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত গোষ্ঠীর কল্যাণ-সাধনের ওপরেই এই পরিকল্পনায় জোর দেওয়া হয়েছে। এই বৃহত্তর লক্ষ্যগুলি পূর্ণ করার জন্যে যেসব দিক নির্দ্দেশ করা হয়েছে তা হ'ল এই রকম :—

ক। পরিকল্পনার মাধ্যমে আয় ও সম্পদের পরিমাণের মধ্যে সমতা আনা ;

খ। যে আয়, সম্পদ এবং আর্থিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কয়েকজন নিয়ন্ত্রণ করছেন তা তাঁদের হাত থেকে ক্রমে ক্রমে সরিয়ে আনা।

গ। সমাজের স্বল্পোন্নত শ্রেণীগুলি, বিশেষ ক'রে তপশীলি জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠী, যাঁদের অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত প্রয়োজনের দিকে সযত্ন দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন, তাঁরা যাতে উন্নয়নী প্রকল্পগুলির সুফল ক্রমশঃ অধিকতর মাত্রায় ভোগ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা।

খসড়া পরিকল্পনায় সামাজিক ন্যায়-বিচার ও অর্থনৈতিক সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া গণতন্ত্রের সরিক হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্রহণে দেশের সাধারণ নরনারী প্রত্যেককে উৎসাহিত ক'রে গণতন্ত্রের আদর্শ সুদৃঢ় করা, স্বল্পোন্নত গোষ্ঠীর মধ্যে কাজের প্রেরণা জাগিয়ে তোলা এবং সর্ব্বস্তরে সামাজিক ব্যবস্থার আমূল রূপান্তর ঘটানোর কাজে এগিয়ে যাওয়ার একটা মনোভাব গড়ে তোলাই হ'ল পরিকল্পনার অভীষ্ট।

পরিকল্পনার ● রূপরেখা

চতুর্থ পরিকল্পনায় বিনিয়োগের মোট পরিমাণ ধরা হয়েছে ২৪,৩৯৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হ'বে ১৪,৩৯৮ কোটি, বাকীটা অর্থাৎ ১০,০০০ কোটি টাকা থাকবে বেসরকারী ক্ষেত্রের জন্যে।

সরকারী ক্ষেত্রে মোট সংস্থানের মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির জন্যে ৭,২০৭ কোটি, কেন্দ্রানুমোদিত প্রকল্পগুলির জন্যে ৭২৭ কোটি, রাজ্যগুলির জন্যে ৬০৬৬ কোটি এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির জন্যে ৩,৯৮ কোটি টাকা থাকবে। উৎপাদনক্ষম সম্পদ সৃষ্টির জন্যে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ধরা হয়েছে ২২,২৫২ কোটি টাকা।

অর্থবরাদ্দ এবং কেন্দ্রীয় সাহায্য মঞ্জুরীর পদ্ধতিতে অনেক পরিবর্ত্তন করা হয়েছে। স্থির হয়েছে যে, চতুর্থ পরিকল্পনাকালে আসাম, নাগাল্যাণ্ড এবং জম্মু ও কাশ্মীরের প্রয়োজন পূরণ করার পর বাকী রাজ্যগুলিকে এই ভাবে কেন্দ্রীয় সাহায্য দেওয়া হ'বে ; যথা—জনসংখ্যার ভিত্তিতে ৬০ শতাংশ, জাতীয় আয়ের অনুপাতে মাথাপিছু আয় কম হলে জনপ্রতি আয়ের ১০ শতাংশ, মাথাপিছু আয়ের অনুপাতে ধার্য্য কর ব্যবস্থাগুলির ভিত্তিতে ১০ শতাংশ এবং যেসব বড় বড় সেচ ও বিদ্যুৎ শক্তি প্রকল্প রূপায়ণের কাজ শুরু হয়েছে তার জন্যে মোট আর্থিক প্রতিশ্রুতির ১০ শতাংশ। বন্যা, খরা ও উপজাতীয় এলাকা সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ সমস্যার সমাধানে সাহায্য হিসেবে বাকী ১০ শতাংশ, সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা ক'রে দেওয়া হবে। ভবিষ্যতে প্রকল্পের ভিত্তিতে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা থাকবে না। তার পরিবর্ত্তে মোট এককালীন মঞ্জুরী ও ঋণের আকারে এই সাহায্য দেওয়া হবে।

এখন থেকে বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্য্যসূচী প্রণয়নে রাজ্যগুলিকে অধিকতর উদ্যোগী হ'তে হবে। কারণ কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ পূর্ব্বাহ্নে নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হবে বলে, এখন প্রত্যেক রাজ্য, নিজেদের পরিকল্পনাভুক্ত কার্য্যসূচীর জন্যে কী পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে, তার ওপর প্রত্যেক রাজ্যের চতুর্থ পরিকল্পনার আকার আয়তন নির্ভর করবে।

চতুর্থ পরিকল্পনায় বার্ষিক উন্নয়নের মোটামুটি হার হবে ৫.৫ শতাংশ।

সমগ্রভাবে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ বছরে ৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে।

জাতীয় সঞ্চয়ের হার ১৯৬৭-৬৮ সালের হিসেবে শতকরা ৮ ভাগ থেকে বেড়ে পরিকল্পনার শেষ বছর নাগাদ শতকরা ১২.৬ ভাগে দাঁড়াবে।

পরিকল্পনার শেষ বছরে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা এখনকার তুলনায় অর্দ্ধেক কমে যাবে।

সম্পদ

চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য আরও প্রায় ২৭০০ কোটি টাকার সংস্থান করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারগুলি জানিয়েছেন যে তাঁরা এর মধ্যে প্রায় ১,১০০ কোটি টাকার সংস্থান করতে পারবেন বলে আশা করছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ১,৬০০ কোটি টাকার সংস্থান করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। অতিরিক্ত কর ব্যবস্থায় কেন্দ্রের প্রায় ২০০ কোটি টাকা আয় হতে পারে। এ থেকে রাজ্যগুলি যে অংশ পাবে তা রাজ্যগুলির দেয় টাকার মধ্যে ধরা হয়নি।

বেসরকারি সঞ্চয়

একটা মোটামুটি হিসেবে দেখা যায় যে চতুর্থ পরিকল্পনার সময়ে বেসরকারি তরফে সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৩,৯০০ কোটি টাকা দাঁড়াবে বলে আশা করা যায়। সরকারি তরফের পরিকল্পনাগুলির জন্য ৩,৯৩০ কোটি রেখে, এই সঞ্চয় থেকে বেসরকারি তরফে ৯,৯৭০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা যাবে। বেসরকারি তরফ সোজাসুজি যে সব বৈদেশিক সাহায্য পায় তাতে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ মোটামুটি ১০,০০০ কোটি টাকায় গিয়ে দাঁড়াবে।

ঋণ

আনুমানিক মোট ২,২৮০ কোটি টাকা ঋণ (সুদসহ বৈদেশিক ঋণ) পরিশোধ করতে হবে। এ ছাড়া চতুর্থ পরিকল্পনার সময়ে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে যে অর্থ দিতে হবে তার পরিমাণ হ'ল ২৮০ কোটি টাকা।

বৈদেশিক মুদ্রা

চতুর্থ পরিকল্পনার সময়ে মোট ১০,০৫০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হবে।

পরিকল্পনার প্রথম দুই বছরে বেশী পরিমাণ সাহায্যের প্রয়োজন হবে। বৈদেশিক যে সাহায্য পাওয়া যাবে এবং রপ্তানি বাণিজ্য থেকে যে আয় হবে তা দিয়েই এই প্রয়োজন মেটাতে হবে। এই পরিকল্পনায় মোট ২৫১৪ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাবে।

রাজ্যগুলির আনুমানিক বিনিয়োগ

(টাকা কোটিতে)

রাজ্য	টাকা
অন্ধ্র প্রদেশ	৩৬০.৫
আসাম	২২৫.৫
বিহার	৪৪১.৬
গুজরাট	৪৫০.২
হরিয়ানা	১৯০.৫
জম্মু ও কাশ্মীর	১৪৫.০
কেরালা	২৫৮.৪
মধ্য প্রদেশ	৩৫৬.০
মহারাষ্ট্র	৮১১ ৮
মহীশূর	৩২৭.১
নাগাল্যাণ্ড	৩৫.০
ওড়িষ্যা	১৮০.৫
পাঞ্জাব	২৭১.৪
রাজস্থান	২৩৯.০
তামিল নাডু	৫০২.০
উত্তর প্রদেশ	৯৫১.০
পশ্চিম বঙ্গ	৩২০.৫
মোট	৬০৬৬.০

সঞ্চয় এবং লগ্নি

চতুর্থ পরিকল্পনার সময়ে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৯,৭০০ কোটি টাকা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এর মধ্যে ১৩,৯০০ কোটি টাকা হবে বেসরকারি সঞ্চয় এবং সরকারি তরফে ৫,৮০০ কোটি টাকা। এই পরিমাণ আভ্যন্তরীন সঞ্চয় করতে হ'লে, দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় সঞ্চয়ের মোটামুটি হার ১৯৬৮-৬৯ সালে শতকরা যে ৯ ভাগ ছিলো, তা বাড়িয়ে চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ পর্যান্ত শতকরা ১২.৬ ভাগে আনতে হবে।

চতুর্থ পরিকল্পনা

সরকারি তরফে বিনিয়োগের পরিমাণ

কেন্দ্রের তরফে

রূপায়ণপর্ব্ব

বার্ষিক পরিকল্পনা

যদিও জাতীয় উন্নয়ন তৎপরতার মূল ভিত্তি হ'বে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি, তথাপি প্রত্যেক বছরের জন্যে পৃথকভাবে এক একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা রচনা করা প্রয়োজন যেটি প্রকৃতপক্ষে কার্য্যকরী পরিকল্পনা হয়ে দাঁড়াবে। প্রত্যেক বার্ষিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হ'বে পঞ্চবর্ষীয় পরিকল্পনার নির্দেশিত পথে সেই বছরের উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। কার্য্যক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে, অগ্রাধিকার নির্দ্ধারিত ক'রে এবং প্রয়োজন হলে একাধিক বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখাও বার্ষিক পরিকল্পনাগুলির অন্যতম উদ্দেশ্য হবে। মোট কথা, সদ্য যেসব প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে তার মূল্যায়ণ, কার্য্যত: সহায়সম্পদ কী পরিমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব এবং আর্থিক সামর্থ্য এই তিনটি বিষয়ের ভিত্তিতে প্রত্যেক বার্ষিক পরিকল্পনার সারা বছরের কাজকর্মের বিস্তারিত কার্য্যসূচী নির্ধারণ করে দেওয়া হবে।

আয় ব্যয়ের হিসেব

তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনা

তৃতীয় পরিকল্পনার সময়ে ১৯৬০-৬১ সালের মূল্যমান অনুসারে প্রথম চার বছরে জাতীয় আয় শতকরা ২০ ভাগ বেড়ে যায় এবং শেষ বছরে শতকরা ৫.৭ ভাগ কমে যায়। ১৯৬৬-৬৭ সালে ভীষণ খরার ফলে, জাতীয় আয় শতকরা নামমাত্র ১.১ ভাগ বাড়ে। তবে ১৯৬৭-৬৮ সালে ফসল খুব ভালো হওয়ায় ঐ বছরে জাতীয় আয় শতকরা ৯ ভাগ বেড়ে যায়। ১৯৬৮-৬৯ সালে জাতীয় আয় পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ৩ ভাগ বেশী হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

জনপ্রতি আয় ১৯৬০-৬১ সালে যা ছিলো ১৯৬৫ সালেও প্রায় তাই ছিলো। জাতীয় আয় সামান্য যেটুকু বেড়েছিলো, জনসংখ্যা শতকরা ২.৫ হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় তার সুফল পাওয়া যায়নি।

কৃষি উৎপাদন

তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরে কৃষি উৎপাদন সন্তোষজনক ভাবে বাড়েনি। ১৯৬৪-৬৫ সালে প্রচুর ফসল হয় কিন্তু পরবর্ত্তী দুই বছরে ব্যাপক খরার ফলে উৎপাদন অনেক হ্রাস পায়। তবে ১৯৬৭-৬৮ সালে অবশ্য কৃষি উৎপাদন সর্ব্ব সময়ের রেকর্ড হয়। ১৯৬৮-৬৯ সালে উৎপাদন পূর্ব্ব বছরের তুলনায় সামান্য বেশী হতে পারে।

সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাস থেকে শিল্পগুলিও সব দিক দিয়ে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠছে বলে মনে হচ্ছে।

বিলম্ব এবং অসাফল্য

বিনিয়োগের পরিমাণ অধিকতর হলেও প্রকৃত উন্নয়ন কোন সময়েই লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারেনি। এটা বেশ ভাববার বিষয়। অনেক মূল বিভাগে সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং নির্মাণে অযৌক্তিক বিলম্ব, আনুমানিক ব্যয়ের বার বার সংশোধন এবং ক্ষমতা পূর্ণভাবে ব্যবহৃত না হওয়ার ঘটনা এতো বেশী স্পষ্ট যে সেগুলি অবহেলা করা যায় না। ব্যয় হ্রাস করে যে গতিতে কাজ হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি।

ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে

কৃষিতে অগ্রগতি, শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন সামর্থ্যের আংশিক প্রয়োগ এবং রপ্তানীর পরিমাণবৃদ্ধি প্রভৃতির সঙ্গে বিনিয়োগের প্রস্তাবিত কার্য্যসূচী সব মিলিয়ে দেখলে চতুর্থ পরিকল্পনাকালের কার্য্যসূচীগুলির রূপায়ন তৃতীয় পরিকল্পনার তুলনায় আরও ভালো হ'বে ব'লে আশা রাখা চলে। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মোট উৎপাদনের পরিমাণ বছরে গড়ে ৫.৫ শতাংশ বেশী হ'বে ব'লে আশা করা যায়।

সাম্প্রতিক কালে যেসব ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ঘটেছে এবং পরবর্ত্তী ৫ বছরের অপেক্ষাকৃত অল্প অগ্রগতি এই দুটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে বলা যায় যে পঞ্চম পরিকল্পনাকালে এবং ১৯৮০-৮১ সাল পর্য্যন্ত অগ্রগতির মাত্রা বছরে ৬ শতাংশ ধরা খুব অসঙ্গত হ'বে না।

তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রকৃত আয়ের (মূল্যানুপাতিক ক্রয়ক্ষমতা) যে লক্ষ্য ছিল তা'তে পৌঁছুতে আরও ৩/৪ বছর লাগবে। সেই হিসেবে ১৯৮০-৮১তে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ১৯৬৭-৬৮র চেয়ে শতকরা ৫৫ ভাগ বেশী হ'বে।

রপ্তানীর পরিমাণ বছরে ৭ শতাংশ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পেলে এবং খাদ্য বাদে অন্যান্য সামগ্রীর আমদানী বছরে ৫ শতাংশ হলে, বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার প্রয়োজন আপনিই **কমে যাবে।**

চতুর্থ পরিকল্পনার মত পঞ্চম পরিকল্পনারও লক্ষ্য হবে উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা-লাভ। সমগ্রভাবে সমস্ত ভোগ্যবস্তুর মূল্যমান স্থিতিশীল রাখার প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। চাষযোগ্য জমির পরিমাণবৃদ্ধির অন্যতম ও অপরিহার্য্য ব্যবস্থা হিসেবে সেচের সুযোগসুবিধা বাড়াতে হবে।

সবদিক ভেবেচিন্তে দেখলে কৃষি-উৎপাদনের সামগ্রিক হা'র বছরে ৪.৫ শতাংশ ধার্য্য করা অবাস্তব গণ্য হ'বে না।

শিল্পোন্নয়ন

দেশে স্থলভে বিভিন্ন ধরণের জিনিষ তৈরী ক'রে এবং সেইসব জিনিষের বাজার সৃষ্টি ক'রে শিল্প সম্প্রসারণের যে রীতি মেনে চলা হয়েছে তার কোনও রদবদল হবেনা।

উৎপাদনের পরিমাণের দিক থেকে দেখতে গেলে, সার তৈরী, সার তৈরীর কাঁচা উপকরণ, ধাতু ও পেট্রোলিয়ামজাত সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি শিল্পের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

বৃক্ষরোপণ

৩,৪০,০০০ হেক্টারে, খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে এই ধরণের গাছ লাগানো হবে, শিল্প ও বাণিজ্যে ব্যবহারযোগ্য বৃক্ষাদি ৩,০০,০০০ হেক্টারে এবং, ৭৫,০০০ হেক্টারে জ্বালানি ও অন্যান্য বৃক্ষ রোপণ করা হবে।

কৃষি

চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়ন সম্পর্কে দুটি প্রধান উদ্দেশ্য রয়েছে। আগামী দশ বছরের মধ্যে কৃষি উৎপাদন যাতে অব্যাহত গতিতে প্রতি বছর শতকরা ৫ ভাগ হারে বেড়ে চলে সেজন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা হল একটি উদ্দেশ্য।

তারপর, ছোট ছোট চাষী এবং জলের যথেষ্ট ব্যবস্থাহীন শুষ্ক অঞ্চলের অধিবাসীগণসহ পল্লী অঞ্চলের যথাসম্ভব বেশীর ভাগ অধিবাসীই যাতে উন্নয়ন কর্মসূচীগুলিতে অংশ গ্রহণ করতে পারেন এবং সুফল ভোগ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করাই হল দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। কাজেই কৃষির উন্নয়ন কর্মসূচীগুলি দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। একটা কর্মসূচীর লক্ষ্য হল উৎপাদন বৃদ্ধি, অন্যটির লক্ষ্য হল অসাম্য হ্রাস।

কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির হার দিয়ে চতুর্থ পরিকল্পনার সাফল্য নির্ণয় করা যাবে। সেজন্যই কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধিকে, কৃষি কর্মসূচীর প্রধান ভিত্তি রাখা হয়েছে।

যাঁদের জমির পরিমাণ অল্প সেইরকম ছোট ছোট কৃষকগণও যাতে কৃষি উন্নয়নে অংশ গ্রহণ ক'রে লাভবান হতে পারেন সেই জন্য ঋণ দেওয়ার সাধারণ নীতিগুলি এবং সমবায় সমিতির ঋণ দেওয়ার নীতিগুলি এমন ভাবে সংশোধন করা হবে যাতে এঁরাও উপকৃত হতে পারেন।

গবেষণা

চতুর্থ পরিকল্পনার কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচীতে কৃষি বিষয়ক গবেষণা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

কৃষি সম্পর্কিত শিক্ষা প্রসারের জন্য যে নয়টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যেই স্থাপন করা হয়েছে সেগুলি আরও সম্প্রসারিত করা হবে এবং চতুর্থ পরিকল্পনায় আরও ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

কৃষকগণ যাতে কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম যথাসময়ে উপযুক্ত পরিমাণে পেতে পারেন সেজন্য প্রয়োজন হলে বিদেশ থেকেও এগুলি আমদানী করা হবে এবং তাঁরা যাতে সহজে এগুলি পেতে পারেন সেজন্য বণ্টন ব্যবস্থাও সম্প্রসারিত করা হবে।

খাদ্যশস্য উৎপাদন
(লক্ষ টনে)

১৯৬০-৬১ ৬৫-৬৬ ৬৮-৬৯ ৭৩-৭৪

রাসায়নিক সারের চাহিদা প্রায় তিনগুণ বাড়বে। অনুমান করা হচ্ছে ৮ কোটি হেক্টার জমি বিভিন্ন শস্যরক্ষামূলক কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

কৃষিমূলক শিল্প কর্পোরেশনগুলি ভাড়া—ভিত্তিক ক্রয় প্রথায় কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করবে এবং কারিগরি ও অন্যান্য সাহায্য দেবে। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ পর্য্যন্ত ট্র্যাক্টারের চাহিদা ৯০,০০০ পর্য্যন্ত উঠতে পারে বলে ট্র্যাক্টার উৎপাদক শিল্পগুলিকে উৎপাদন বাড়াবার অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

কৃষি জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য আরও কুয়ো কাটা হবে নলকূপ ও পাম্পসেট বসানো হবে। ভূমি সংরক্ষণ ব্যবস্থাগুলি আরও সম্প্রসারিত করা হবে এবং যে সব অঞ্চলে ভূমিক্ষয় খুব বেশী হয় সেগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

চতুর্থ পরিকল্পনায় ২ কোটি ৪১ লক্ষ হেক্টার জমি বেশী ফলনের কর্মসূচীর অধীনে আনা হবে এবং তাতে দুই তৃতীয়াংশ অধিক খাদ্যশস্য পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। ফলের উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ৪৪০,০০০ হেক্টার জমিতে ফলের চাষ করা হবে।

চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ পর্য্যন্ত যাতে ৭৫০ কোটি টাকা পর্য্যন্ত স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদী ঋণ দেওয়া যায় সেজন্য সরকার থেকে সোজাসুজি ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে সমবায়গুলিকে আরও শক্তিশালী করা হবে।

শস্যাদি বিক্রয়ের সময় মূল উৎপাদকগণ যাতে বেশী উপকৃত হতে পারেন সেজন্য খাদ্য কর্পোরেশন, ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন এবং বাজার-জাতকারী সমবায় সংস্থাগুলিকে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করা হবে।

শস্যাদি সংরক্ষণ ও গুদামজাত করার সুযোগ সুবিধেগুলি আরও বাড়ানো হবে। যাতে আরও ৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করা যায় সেজন্য গুদাম ইত্যাদি তৈরী করার জন্য ৪৫ কোটি টাকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

পশুপালন

যে সব জায়গায় ২০,০০০ লীটার বা তারও বেশী পরিমাণ দুধের ডেয়ারি কারখানা রয়েছে সেখানে গো মহিষাদির উন্নয়নমূলক প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই রকম প্রকল্পের সংখ্যা ৩১ থেকে বাড়িয়ে ৪৬ করা হবে। যে সব অঞ্চলের ডেয়ারি কারখানাগুলির ক্ষমতা ১৫,০০০ লীটার পর্য্যন্ত, এই রকম অঞ্চলে ২০টি গো মহিষাদির উন্নয়নমূলক প্রকল্প চালু করা হবে।

তিনটি কেন্দ্রীয় গোমহিষাদি প্রজনন ফার্ম এবং আটটি, ষাঁড় পালনকারী ফার্ম

চতুর্থ যোজনার প্রারম্ভে

ডাঃ শান্তি কুমার ঘোষ

চতুর্থ যোজনার প্রারম্ভে দেশের আর্থিক অবস্থা আরও ভালো হয়ে ওঠার স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কৃষি ও বহির্বাণিজ্য এই দুই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অগ্রগতির সম্ভাবনা পূর্বের তুলনায় আশাপ্রদ। চাষবাসের ক্ষেত্রে নিবিড় উন্নয়নপন্থা প্রযুক্ত হওয়ায় কৃষি উৎপাদন যথেষ্ট বাড়বে বলে মনে হচ্ছে। সেই সঙ্গে রপ্তানি বাড়ানোর চেষ্টাও এতদিনে সফল হতে চলেছে।

স্বাবলম্বন হচ্ছে চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য। অর্থাৎ বৈষয়িক উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের উপর দেশের নির্ভরশীলতা কমিয়ে ফেলতে হবে। কৃষি উৎপাদন উত্তরোত্তর অনুকূল হয়ে উঠলে খাদ্যশস্য আমদানীর জন্য বিদেশ থেকে সাহায্য নেওয়ার আর দরকার হবে না। তবে তার জন্য অবশ্য রাসায়নিক সার উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের প্রয়োজন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনার বেশীর ভাগ সময়ে জিনিসপত্রের দাম অনবরত বেড়ে চলেছিল। গত দুই এক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় যে মূল্যের সেই ঊর্ধগতি সম্ভবত রুদ্ধ হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনার সমাপ্তি ও চতুর্থ পরিকল্পনার আরম্ভের মাঝখানে উন্নয়নখাতে মূলধন নিয়োগে যে দুই তিন বছরের বিরতি ছিল তার ফলেই হয়তো এই মূল্যস্থিতি অর্জিত হয়েছে। কষ্টে উপার্জিত এই মূল্য স্থিতিকে রক্ষা করা প্রয়োজন। কৃষিজাত খাদ্যশস্য ও কাঁচা মালের মূল্যের ওঠা নামা বন্ধ করতে পারলে সমস্যার সমাধান অনেক সহজ হবে।

আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য অতীতের মতো আর দুর্বল নয়। সেদিকে অগ্রগতির অবকাশ আছে। আমাদের চিরাচরিত রপ্তানি বাণিজ্যে এই ক্ষেত্রে, লৌহ আকর, লৌহ ও ইস্পাত, ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রী ও রাসায়নিক দ্রব্যাদিকে নতুন সংযোজন বলা যেতে পারে। কারখানা শিল্পের উজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতি এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য রাসায়নিক সার আমদানির ব্যবস্থাও রাখতে হবে। স্বাবলম্বন অর্জন করতে হলে একদিকে যেমন রপ্তানির পরিমাণ বাড়াতে হবে অন্যদিকে তেমনি বিদেশ থেকে যে সব জিনিষ আমদানি করতে হয় সেগুলি দেশেই উৎপাদন করতে হবে। আভ্যন্তরীণ মূল্যস্থিতি রপ্তানি বাড়িয়ে তোলার কাজে সহায়ক হবে।

যেখানে লোকসংখ্যা এবং কর্ষণযোগ্য জমির অনুপাত প্রতিকূল সেখানে কৃষি ভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থায় সম্পদ নির্মাণ বেশী দূর এগিয়ে যেতে পারে না। একটা সীমার পর তাই শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধি বাড়ানোর চেষ্টা করতে হয়। যে শিল্প ব্যবস্থা এখন গড়ে উঠেছে তা অতীতের তুলনায় বৈচিত্র্যময় সন্দেহ নেই। ইস্পাত এ্যালুমিনিয়ম, ইঞ্জিনীয়ারিং ও রাসায়নিক শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে। কার্পাস, তুলো, পাট ও চিনির মতো চিরাচরিত শিল্পের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে শিল্প উৎপাদনের সরকারী সূচীতে সেটা পুরোপুরি প্রতিফলিত হয় না। শিল্পের অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতাকে কাজে লাগানো হচ্ছে আর একটা জরুরী প্রশ্ন।

জনশিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা

ভারতের জনসংখ্যা বছরে শতকরা ২.৫ হারে বাড়ছে। ফলে জনপ্রতি আয় এবং জনগণের ভোগের মানের আশানুরূপ বৃদ্ধি সম্ভব হয় নি। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থাগুলির উন্নতির ফলে মৃত্যুর হার স্বাভাবিকভাবেই কমে এসেছে কিন্তু জন্মের হার মোটামুটি অপরিবর্তিত থেকে গেছে। পরিবার পরিকল্পনার পথে দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা প্রধান প্রতিবন্ধক। শিল্পাদির প্রসার এবং মূল্য বোধের বিবর্তন, উচ্চ জন্মহারকে প্রভাবান্বিত করে। কাজেই অল্প সময়ের মধ্যে ফল পাওয়ার জন্য জনশিক্ষার সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

দেশে উৎপাদন ও বন্টনের মধ্যে একটা বিরোধ আছে বলে মনে হয়। আয় ও সম্পদ বিভাজনের মধ্যে অসাম্য কমিয়ে আনার প্রধান দুটো উপায় হ'ল: প্রগতিশীল হারে কর আরোপ এবং সরকারী ব্যবস্থাদির প্রসার। পুনরুৎপাদন করা যায় দেশের এমন মোট ধন সম্পদের ভেতর সরকারী ব্যবস্থার অংশ ১৯৫০-৫১ সালে ছিল শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ। তা বেড়ে ১৯৬৫-৬৬ সালে শতকরা ৩৫ ভাগ হয়েছে। অর্থ সংস্থানের অন্যতম উৎস হিসাবে, কর থেকে প্রাপ্ত আয় ১৯৫০-৫১ সালে জাতীয় আয়ের শতকরা ৬.৬ ভাগ থেকে বেড়ে ১৯৬০-৬১ সালে শতকরা ৯.৬ ভাগ এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে ১৪ ভাগ হয়েছে। সরকারী প্রশাসন ও সরকারী উপযোগগুলির সঙ্গে সাধারণ মানুষের যে সম্পর্ক তার উন্নতি সাধন হচ্ছে এখনকার অসাম্য সংশোধনের আরেকটা বড়ো দিক। প্রশাসন-ব্যবস্থায় যদি সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য হিসেবে রাখা যায় এবং তাঁদের সুখ সুবিধা বাড়িয়ে তোলা সরকারী উপযোগগুলির নীতি হয় তাহলে বর্তমান অভাব অভিযোগের অনেকখানি দূর হবে।

সেই রকম, উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়েছে। বস্তুতঃ বেকার সমস্যা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে অগ্রগতি হয়েছে সব চাইতে কম। অন্যান্য উৎপাদকের মতো, দেশের শ্রম সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার বৈষয়িক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে।

(২০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

(১০ পৃষ্ঠার পর)

দুধ, ডিম ও পশম

দুধের উৎপাদন ২ কোটি ১২ লক্ষ টন থেকে বাড়িয়ে ২ কোটি ৫০ লক্ষ টন করা হবে।

ডিমের উৎপাদন ৫৩০ কোটি থেকে বাড়িয়ে ৮০০ কোটি করা হবে।

পশমের উৎপাদন ৩ কোটি ৫৬ লক্ষ কি: গ্রাম থেকে বাড়িয়ে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ কি: গ্রাম করা হবে।

স্থাপন করা হবে।

চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ পর্য্যন্ত দুধের উৎপাদন ২ কোটি ৫০ লক্ষ টনে দাঁড়াবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

এক একটা পালে ৫,০০০ থেকে ১৫,০০০ পর্য্যন্ত ভেড়ার ৮টি বড় বড় ভেড়া প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

হাঁস মুরগী ও ডিম উৎপাদন এবং বাজারজাত করার উদ্দেশ্যে ১০০টি কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। কলিকাতায় একটি বড় স্বয়ংক্রিয় হাঁস মুরগীর প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে।

১০,০০০ পরিবারকে হ্রাসমূল্যে শূকর বন্টন করা হবে। শূকর মাংসের জন্য সরকারি তরফে ২টি এবং বেসরকারি তরফে ২টি কারখানা স্থাপন করা হবে। ২৫টি শূকর পালন সম্পর্কিত উন্নয়ন ব্লক স্থাপন করা হবে।

২০০টি নতুন পশু হাসপাতাল, ১০০০টি চিকিৎসালয়, ২০০০টি গোপালন কেন্দ্র এবং ৬০টি ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয় স্থাপন করা হবে। বর্ত্তমানে যে ৫০০টি চিকিৎসালয় আছে সেগুলির উন্নয়ন করে হাসপাতালে পরিণত করা হবে।

১৯৬১-১৯৬৯ সাল পর্য্যন্ত এক লক্ষ বা তার বেশী লোকসংখ্যাবিশিষ্ট সহর এবং শিল্পনগরীগুলিতে, সমবায় সমিতির ১২টি সংস্থাসহ ২৬টি নতুন দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনায় এই সুযোগ সুবিধেগুলি ছোট ছোট সহরেও সম্প্রসারিত করা হবে।

ছোট ছোট দুগ্ধ উৎপাদনকারীগণকে সমবায় সমিতিতে সঙ্ঘবদ্ধ করা হবে। দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে আধুনিক পরিচালনা ব্যবস্থা চালু করা হবে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে ছোট ছোট দুগ্ধ উৎপাদনকারীগণকে সরকারি ডেয়ারিগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে।

মৎস্যচাষ

দেশের প্রোটিনের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি যাতে আরও বাড়ানো যায়, মাছের উৎপাদন ততখানি বাড়ানোই হ'ল চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য। সামুদ্রিক মৎস্যের উৎপাদন আরও প্রায় ৩৩,০০০ টন বাড়ানো হবে।

৭ কোটি সাড়ে ২০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের ভারত মহাসাগরে মাছ পাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু সে সম্পর্কে বিশেষ কোন অনুসন্ধানই চালানো হয়নি। চতুর্থ পরিকল্পনায় সেজন্য সামুদ্রিক মৎস্য, বিশেষ করে গভীর সমুদ্রের মৎস্যের ওপরেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার কর্মসূচী অনুযায়ী আরও ৫৫০০ যন্ত্রচালিত মাছ ধরার বোট, মৎস্য-শিকারে নিযুক্ত করা হবে। প্রধানতঃ বেসরকারি তরফে ৩০০ মাঝারি আকারের ট্রলারও এই বহরের সঙ্গে যুক্ত হবে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য মীনপোষ কর্পোরেশনগুলি আরও সম্প্রসারিত করা হবে এবং মাছের বাজার নিয়মিত করা হবে।

বনসম্পদ

কৃষি এবং শিল্পের জন্য যে সব বনজাত জিনিসের আশু প্রয়োজন সেগুলি মেটানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। তাড়াতাড়ি বাড়ে এই ধরণের মূল্যবান বৃক্ষাদির উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে বৃক্ষাদি রোপন করা হবে। বর্ত্তমানে দেশে যে বনসম্পদ রয়েছে তা যুক্তিসঙ্গতভাবে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করা হবে।

কাগজের মণ্ড, কাগজ, সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ, কাঠ এবং দেশলাই ইত্যাদির মতো প্রধান প্রধান কতকগুলি জিনিসের উৎপাদন বৃদ্ধি বনসম্পদের ওপর নির্ভরশীল। কাজেই যত শিগ্‌গীর সম্ভব বনজাত সামগ্রীতে আত্মনির্ভরশীল হওয়াই হ'ল প্রধান উদ্দেশ্য।

সমবায়

সমবায়ের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষি সমবায় সমিতিগুলিই প্রধান স্থান অধিকার করবে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে ঋণ ব্যবস্থার একটা প্রধান কাজ হ'ল প্রাথমিক পর্য্যায়ে সমবায়ের কাঠামোকে আধুনিক প্রয়োজন অনুযায়ী পুনর্গঠন করা। সমবায় ব্যাঙ্কগুলি যাতে পল্লী অঞ্চলে আরও শাখা খুলতে পারে সেজন্য সেগুলিকে সাহায্য করা হবে।

১৯৭৩-১৯৭৪ সালে যাতে ব্যাঙ্কগুলি ৭৫০ কোটি টাকার স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদের ঋণ সরবরাহ করতে পারে তাই হবে এই পুনর্গঠনের লক্ষ্য।

সমবায় ঋণদান সমিতি এবং ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলি যাতে ছোট চাষীগণের উপকারে আসতে পারে সেজন্য এগুলির নীতি ও কর্মপদ্ধতি সংশোধন করাও হবে চতুর্থ পরিকল্পনার একটা প্রধান উদ্দেশ্য।

৯০ কোটি টাকারও বেশী মূলধন নিয়োগ করে কাণ্ডলায় একটি এবং মহারাষ্ট্রে একটি সমবায় সার উৎপাদন কারখানা স্থাপন করা হচ্ছে।

ছোট চাষীগণকে সাহায্য করার জন্য ঋণ

১৯৭৩-৭৪ সাল পর্য্যন্ত সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে ৬৫০ কোটি টাকার সার, ৫০ কোটি টাকা মূলের উন্নতধরণের বীজ, ৫০ কোটি টাকা মূল্যের কীটনাশক এবং ১৫ কোটি টাকার অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বর্ত্তমানে যে ৩৫৫টি কেন্দ্রীয় ব্যবহারকারী সমবায় সমিতি এবং ৭৪০০টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি আছে সেগুলিকে আরও সংহত করার চেষ্টা করা হবে।

কৃষি এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পগুলিকে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে পাঁচটি রাজ্যে পরীক্ষামূলক বিদ্যুৎশক্তি সমবায়

মিতি স্থাপন করা হবে। সমবায় সম্পর্কে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কর্মসূচীগুলি আরও সংহত করা হবে।

সমষ্টি উন্নয়ন

কতকগুলি অসুবিধে স্বত্বেও সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচী এবং পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলি পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে এবং জেলা প্রসাশনের কাঠামো পরিবর্তনে খানিকটা সাফল্য অর্জন করেছে।

পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে কর এবং অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদ সংগঠিত করতে হবে। জেলা, ব্লক এবং গ্রাম পর্য্যায়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলিকে সংহত ও শক্তিশালী করা হবে।

খাদ্য

উচিত মূল্যের দোকানগুলির পরিবর্তে, ব্যবহারকারীগণের সমবায় ষ্টোর, বা বহু উদ্দেশ্যমূলক সমবায় সমিতির দোকানগুলিই যাতে খাদ্যশস্য বন্টনের প্রধান সংস্থা হয়ে উঠতে পারে সেজন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

যে কোন বছরে খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্য ৮০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টনের কম করা হবেনা।

খাদ্য কর্পোরেশনকে ক্রমশঃ আরও বেশী মাত্রায় খোলা বাজারে যেতে হবে এবং এর কাজে আরও সুযোগ. স্বাধীনতা দিতে হবে।

মূল্যের স্থিতিশীলতা সুনিশ্চিত করার জন্য ৫০ লক্ষ টন মজুত রাখা হবে

বর্ত্তমানে প্রতিবছরে, যে ২৬,৫০০ টন খাদ্যশস্য বাল আহার (শিশুদের আহার্য্য বন্টন) হিসেবে বন্টন করা হচ্ছে তার পরিমাণ বাড়িয়ে ৬০,০০০ টন করা হবে। এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত স্কুলের শিশুদের সংখ্যা ১ কোটি থেকে বেড়ে দেড় কোটি হয়ে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

জলসেচযুক্ত এলাকা

চতুর্থ পরিকল্পনায় জলসেচযুক্ত এলাকাগুলিতে যতখানি সম্ভব বেশী খাদ্যশস্য উৎপাদন করার ওপরেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হবে।

পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ কর্মসূচীতে, গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করার চাইতে, বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে জলের পাম্পগুলিকে সচল করে তোলার ওপরেই বেশী জোর দেওয়া হবে।

যে সব প্রধান প্রকল্পের কাজ বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে সেগুলির কাজ এবং মাঝারি প্রকল্পগুলির কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় ৬০৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর থেকে ৯১ কোটি টাকার কাজ পঞ্চম পরিকল্পনা পর্য্যন্ত চলবে।

মাঝারি প্রকল্পগুলির সমস্ত কাজ চতুর্থ পরিকল্পনায় সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

চতুর্থ পরিকল্পনার শেষভাগে আণুমানিক ৬৫০ কোটি টাকার নতুন প্রকল্পের কাজ সুরু করা হবে।

জলসেচের জন্য মোট যে ৮৫৭ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে তার মধ্যে, পূর্ব্বের প্রকল্পগুলির কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য ৭১৭.৪ কোটি টাকা রাখা হয়েছে।

জলসেচযুক্ত জমির পরিমাণ প্রায় ৫৭ লক্ষ হেক্টারে দাঁড়াবে। এর মধ্যে ৪২ লক্ষ হেক্টার জমি চাষের উপযুক্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বাজারজাতকারী সমবায় সমিতি

চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ বছরে সমবায় সমিতিগুলি যাতে ৮০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য, ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টন আখ, ১০ হাজার টন ফল ও শাকসব্জি এবং ১৮ লক্ষ গাঁট তুলো ক্রয় বিক্রয় করতে পারে তাই হবে তাদের লক্ষ্য। চতুর্থ-পরিকল্পনার শেষ বছরে, বাজারজাতকারী ও অন্যান্য জিনিস উৎপাদনকারী সমবায় সমিতিগুলি ৯০০ কোটি টাকা মূল্যের কৃষিজাত দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করতে পারবে বলে আশা করা যাচ্ছে।
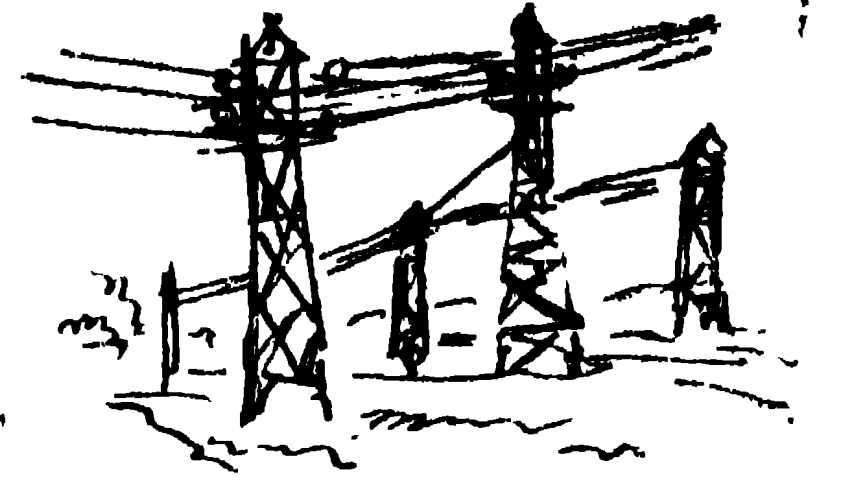
সর্ব্ব ভারতীয় গ্রিড বিদ্যুৎশক্তি

চতুর্থ পরিকল্পনায় সরকারি তরফে বিনিয়োগের পরিমাণ হ'ল ২,০৮৫ কোটি টাকা। ২ কোটি ২০ লক্ষ কিঃ ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা দেশে রয়েছে এবং আরও ৭৯ লক্ষ কিঃ ওয়াট শক্তি উৎপাদন করার মতো ক্ষমতা বাড়ানো হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পর্কিত যে প্রকল্পগুলি বর্ত্তমানে চালু রয়েছে তার জন্য যে ৯০৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে তাতে রাজ্যগুলি আরও ৬০ লক্ষ কিঃ ওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করতে পারবে।

চতুর্থ পরিকল্পনার সময়েই যাতে একটা সর্ব্ব ভারতীয় গ্রিড গঠন করা যায় সেজন্য আঞ্চলিক বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাগুলি সংযুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এর জন্য ১৪ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।

পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করার কর্মসূচীর জন্য ৩১৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। জল তোলার জন্য ৭,৪০,০০০ পাম্পে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা হবে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন শক্তি বাড়ানোর জন্য যে অর্থ বিনিয়োগ করা হচ্ছে তার ভিত্তিতে, পুরনো বা অকেজো জেনারেটারগুলির কাজ যদি বন্ধ হয়ে যায় এবং তার ফলে ৪ লক্ষ কিঃ ওয়াট বিদ্যুৎশক্তি কম উৎপাদিত হবে বলে ধরে নিলেও ২ কোটি ২০ লক্ষ কিঃ ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব হবে।

শিল্প

দ্রুত আত্মনির্ভরশীলতা

চতুর্থ পরিকল্পনায় সংগঠিত শিল্পগুলিতে এবং খনি শিল্পে মোট ৫২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সরকারি তরফে বিনিয়োগের পরিমাণ হ'ল ৩০৯০ কোটি টাকা (বেসরকারি খাতে হস্তান্তর যোগ্য ২৫০ কোটি এবং চা-বাগান ইত্যাদির কর্মসূচীগুলিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সমবায় খাতে ৪০ কোটি টাকা সহ)।

বেসরকারি এবং সমবায় বিভাগগুলির তরফে ২,৪০০ কোটি টাকা (আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে সরকারি তরফ থেকে হস্তান্তরিত ২৫০ কোটি টাকা সহ)।

শিল্পগুলির উৎপাদন প্রতি বছর শতকরা ৮ থেকে ১০ ভাগ বাড়ানো হবে।

চতুর্থ পরিকল্পনায় উচ্চ অগ্রাধিকার-সম্পন্ন নির্দিষ্ট কয়েকটি শিল্পে সঠিক লক্ষ্য স্থির করে দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। এই লক্ষ্যগুলি যাতে পূর্ণ করা যায় সেজন্য অর্থাদি সাহায্যসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধে পুরো মাত্রায় দেওয়া হবে।

যে সব ক্ষুদ্রায়তন শিল্প আধুনিক প্রথায় উৎপাদনে রত আছে সেগুলির উন্নয়ন বজায় রাখা হবে। কতকগুলি শিল্পের উন্নয়ন কেবলমাত্র ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মাধ্যমে করা হবে বলে স্থির করা হয়েছে। তবে বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র উভয় ধরণের শিল্পের সংহত উন্নয়নকে উৎসাহিত করা হবে।

অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে শিল্পোন্নয়নের কাজ সুরু করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

দেশের ডিজাইন, ইঞ্জিনিয়ারীং কুশলতা এবং দেশের কারিগরি জ্ঞানের উন্নয়নের ওপরেই বেশী মনযোগ দেওয়া হবে।

উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ

- ভবিষ্যত উন্নয়নের জন্য একটা বেশ নির্ভরযোগ্য ভিত্তি গড়ে তোলা হয়েছে।
- অনেক নতুন ক্ষেত্রে যথেষ্ট ক্ষমতা অর্জন করা হয়েছে।
- লৌহ, ইস্পাত, খনি শিল্প এবং বিদ্যুৎ শক্তির মতো প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলিতে, বেশীর ভাগ আভ্যন্তরীন প্রচেষ্টায়, উৎপাদন ক্ষমতা অনেকখানি বেড়েছে।
- রেলওয়ে, অন্যান্য যানবাহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম, যাত্রী ও মালবাহী বগী সরবরাহের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়েছে।
- রাসায়নিক সার এবং রেয়ন উৎপাদন সম্পর্কে কারিগরি জ্ঞানে দেশ আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করেছে।
- ইস্পাত, লৌহ ছাড়া অন্যান্য ধাতু, পেট্রোলিয়াম, সার এবং পেট্রোলজাত শিল্পাদিতে উৎপাদন ক্ষমতা যথেষ্ট বেড়েছে।

পল্লী এবং ক্ষুদ্র শিল্পে

মোট বিনিয়োগ : ৮০০ কোটি টাকা

পল্লী এবং ক্ষুদ্রশিল্পগুলির উন্নয়নের জন্য সরকারি তরফে ২৯৫ কোটি টাকা সহ এই পরিকল্পনায় মোট ৮০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ছাড়াও বেসরকারি তরফ থেকে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্যগুলি হল : (১) ছোট শিল্পগুলির উৎপাদন-কৌশল ক্রমশ উন্নততর করা ; (২) বিকেন্দ্রীকরণে এবং শিল্পগুলিকে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থায় উৎসাহ দেওয়া, (৩) কৃষি ভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলায় উৎসাহ দেওয়া।

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে শিল্প ও খনিজশিল্প কর্মসূচীতে বিনিয়োগের পরিমাণ

কোটি টাকায়

শিল্প	২১৩১.৯৭
ধাতু দ্রব্যাদি	৯৮৬.৪৭
মেসিন এবং ইঞ্জিনিয়ারীং শিল্প	১৫৩.০২
সার এবং কীটনাশক	৪৮৩.৪৬
মধ্যবর্ত্তী দ্রব্যাদি	১৮৪.৮২
নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি	৩৬.৯৯
অন্যান্য প্রকল্প	২৮৭.২১
খনিজ পদার্থ	৭১৭.১৪
পারমাণবিকশক্তি	৬০.৯০
মোট (১+৮+৯)	২৯১০.০১

অনুন্নত শ্রেণীর কল্যাণ

অনুন্নত শ্রেণীর কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্যে বিনিয়োগের পরিমাণ—১৩৪.৩৭ কোটি টাকা।

যে উপজাতীয় উন্নয়ন ব্লকগুলিতে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে, সেগুলির জন্যে তৃতীয় পর্য্যায়ের কাজ শুরু হ'বে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে। তাছাড়া এই ব্লকগুলিকে আরও ৫ বছরের জন্যে ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হ'বে। তাছাড়া স্থির হয়েছে, যে, বর্ত্তমানে যে ক'টি ব্লক রয়েছে সেগুলি ঠিকমত চালু না হওয়া পর্য্যন্ত এই কার্য্যসূচী আর সম্প্রসারিত করা হবে না।

পুনর্বাসন

বর্মা ও সিংহলে বাস্তুচ্যুত ভারত প্রত্যাগতদের জন্যে এবং পূর্ব্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের পুণর্বাসনের জন্যে ৬৬ কোটি টাকা বিনিয়োগের সংস্থান রয়েছে।

পরিবহন ও যোগাযোগ

পরিবহন

অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিবহনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে পরিবহন খাতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৩,১৭৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় খাতে হল ৬৫০ কোটি এবং রাজ্য পরিকল্পনাগুলির জন্যে ৫২৩ কোটি টাকা।

বিভিন্ন কার্য্যসূচী বা প্রকল্পের জন্যে চতুর্থ পরিকল্পনায় যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তার পরিমাণ নীচে দেখানো হ'ল। বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, তৃতীয় পরিকল্পনায় ব্যয়ের হিসেব।

	চতুর্থ পরিকল্পনায় বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	(তৃতীয় পরিকল্পনায় যা খরচ করা হয়েছে।) (কোটি টাকায়)
রেলপথ	১,০৫০	১,৩২৫
সড়ক	৮২৯	৪৪০
সড়ক পরিবহন	৮৫	২৭
বন্দর	১৯৫	৯৩
বিমান পরিবহন	২০৩	৪৯
পর্য্যটন	৩৪	৫
যোগাযোগ	৫২০	১১৭
বেতার প্রচার	৪০	৮

যোগাযোগ

চতুর্থ পরিকল্পনায় অর্থ বরাদ্দ ৫২০ কোটি টাকা।

এই পরিকল্পনাকালে আরও ৭,৬০,০০০ টেলিফোন লাইন খোলা হ'বে। বর্তমানে ১১ লক্ষ লাইন আছে।

বেতার প্রচার ব্যবস্থা

চতুর্থ পরিকল্পনায় বরাদ্দ ৪৫ কোটি টাকা

পরিকল্পনাকালের শেষ নাগাদ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগকে মিডিয়াম ওয়েভ বেতার প্রচারের আওতায় আনা হ'বে।

আঞ্চলিক উন্নয়ন

গৃহনির্মাণ ও নগর উন্নয়নের জন্যে বিনিয়োগের পরিমাণ—

১৭০.৭০ কোটি টাকা।

বর্ত্তমানের ছবি

রেলপথ	৫৯,৫৬০ কিলোমীটার
সড়ক	৩১৭,০০০ ,,
পরিবহণকারী	ট্রাক্ ৩০০,০০০
	বাস ৮০,০০০

সড়ক পরিবহন

যাত্রী ও মাল চলাচল

মাল—৪০০০ কোটি টন

যাত্রী—৯২০০ ,, জন

বন্দর—মাল চলাচলের মাত্রা—৫ কোটি ৫০ লক্ষ টন

জাহাজ চলাচল—সাগর পারাপার—

১৮,১০,০০০ জি. আর. টি.

উপকূল অঞ্চলে—

৩৩০,০০০ জি. আর. টি.

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স

ক্ষমতা—২২ কোটি ৪০ লক্ষ টন

এয়ার ইণ্ডিয়া: ক্ষমতা—৪৩ কোটি ৭০ লক্ষ টন

টেলিফোন	১১ লক্ষ
ডাকঘর	১ লক্ষ, ২ হাজার
রেডিও ট্রান্সমীটার	১২৭

স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগের পরিমাণ ৪৩৭.৫০ কোটি টাকা। এই পরিমাণ তৃতীয় পরিকল্পনাকালীন বরাদ্দের প্রায় দ্বিগুণ। মোট বিনিয়োগের মধ্যে ১২৭.০১ কোটি টাকা সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের জন্যে বরাদ্দ করা হয়েছে।

পল্লী অঞ্চলে, একটি মূল স্বাস্থ্য সূচী প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হ'বে। সংক্রামক রোগ দূর করার জন্যে সর্ব্বাত্মক অভিযান চালাবার ব্যবস্থাও এই সূচীর অঙ্গ হবে

পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা

বিনিয়োগের পরিমাণ ৩০০ কোটি টাকা।

লক্ষ্য—জন্মের বর্ত্তমান হার হাজারে ৩৯-থেকে কমিয়ে ১৯৭৩-৭৪ সালে ৩২এ আনতে হ'বে।

পরিকল্পনায় পরিবার-নিয়ন্ত্রণ-সূচীটিকে সর্ব্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

আগামী দশ বছর পর্য্যন্ত পরিবার নিয়ন্ত্রণের কার্য্যসূচীগুলি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের তালিকায় থাকবে। এই ক্ষেত্রে সমগ্র ব্যয় বহন করবেন কেন্দ্রীয় সরকার। ১৯৭৩-৭৪ সাল নাগাদ হাজার প্রতি জন্মের হার ৩২ পর্য্যন্ত কমিয়ে আনার জন্যে নির্বীজকরণ, লুপ পরানো, জন্ম-নিরোধ মূলক বড়ী, ওষুধ ও ইন্‌জেকশান্ প্রভৃতি ব্যবহারের লক্ষ্য বাড়াবার প্রস্তাব রয়েছে অর্থাৎ পুরো পরিকল্পনাকালে ১,৮০ লক্ষ জন্ম রোধ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

জলসরবরাহ ও স্বাস্থ্যরক্ষাবিধি

বিনিয়োগের পরিমাণ ৩৩৯ কোটি টাকা।

১৯৬৮-৬৯ সাল নাগাদ ১২ লক্ষ কূপ নির্ম্মাণ বা মেরামত করা হ'বে বলে আশা করা যায়।

হাসপাতালে শয্যা-সংখ্যা

(হাজারে)

৬৫-৬৬

৭৩-৭৪

শিক্ষা
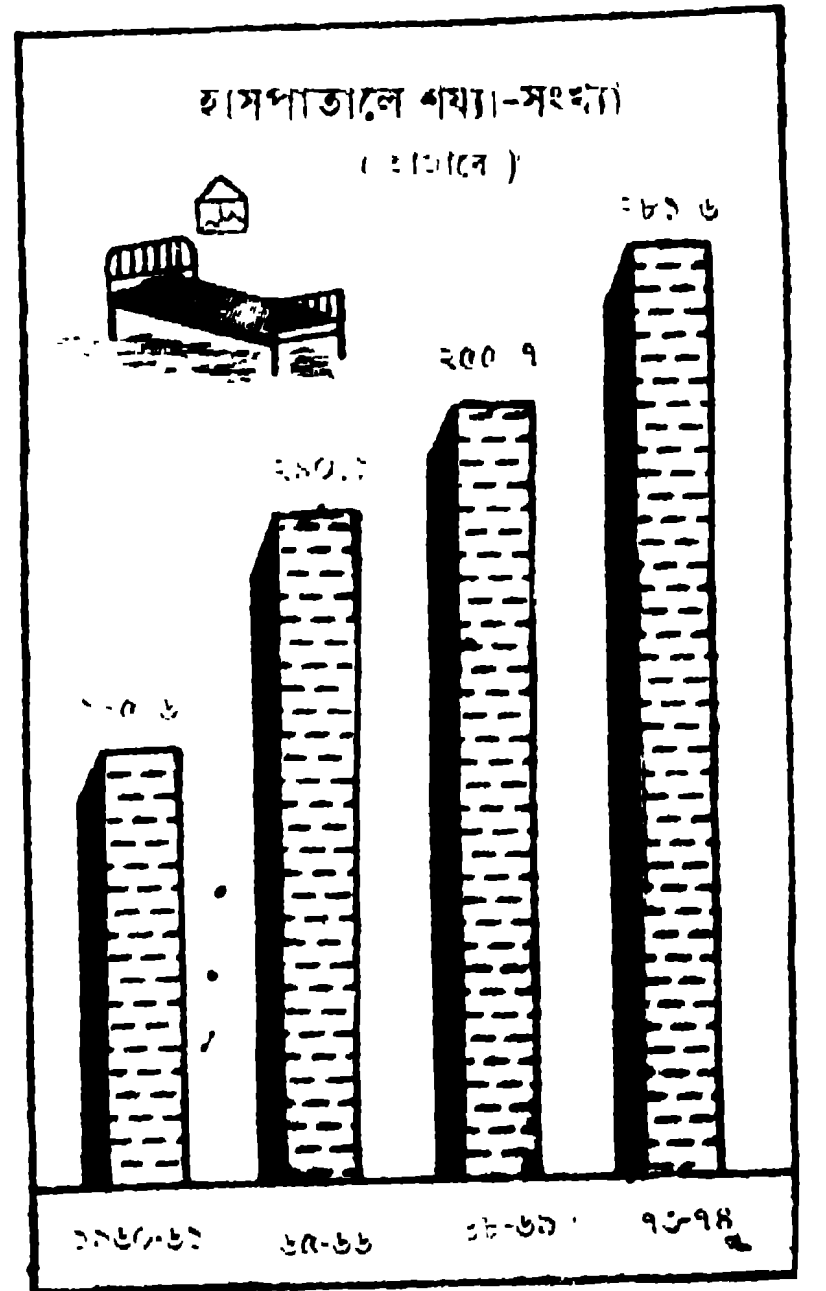
প্রাথমিক শিক্ষা—ভর্তির লক্ষ্য

মোট——৮ কোটি ৬৮ লক্ষ (এর মধ্যে ৩ কোটি ৪২ লক্ষ ছাত্রী) ।

মাধ্যমিক স্কুলে মোট ৩৮ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে। ফলে সারা দেশে মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীর মোট সংখ্যা দাঁড়াবে ১ কোটি ৪ লক্ষ। এর মধ্যে ২৯ লক্ষ ৬০ হাজার হ'বে ছাত্রী।

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে, প্রাথমিক স্কুল-গুলির জন্যে আনুমানিক ৬ লক্ষ ৪৪ হাজার শিক্ষক এবং মাধ্যমিক স্কুলগুলির জন্যে আরও ১ লক্ষ ৫৩ হাজার শিক্ষক শিক্ষিকা প্রয়োজন হ'বে।

মেডিকেল কলেজের সংখ্যা বাড়িয়ে ১০৩ করা হ'বে এবং বছরে ১৩ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হ'বে।

অনগ্রসর গোষ্ঠীর ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা

এঁদের ক্ষেত্রে প্রাকস্কুল পর্যায়ের সময়ে শিক্ষার বিষয় ও শিক্ষণ পদ্ধতির ওপর বেশী জোর দেওয়া হ'বে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্যে চতুর্থ পরিকল্পনার ভর্ত্তির লক্ষ্য হ'ল ৫ কোটি ৮২ লক্ষ ৮০ হাজার ছাত্রী নিয়ে মোট ১৭ কোটি ৩৬ লক্ষ ছাত্রছাত্রী। মাধ্যমিক পর্যায়ে আরও ৩৮ লক্ষ ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তিই করাই হ'ল পরিকল্পনার লক্ষ্য।

তাছাড়া প্রাথমিক স্কুলের জন্যে ৬ লক্ষ ৪৪ হাজার এবং মাধ্যমিক স্কুলের জন্যে ১ লক্ষ ৫৩ হাজার শিক্ষকশিক্ষিকার প্রয়োজন হ'বে ব'লে অনুমান।

উচ্চতর পর্যায়ে আরও ১০ লক্ষ ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করার প্রস্তাব রয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য নানা বিষয়ে করেসপন-ডেন্স কোর্সের ব্যবস্থা করা হ'বে।

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষার নির্দেশনা আভ্যন্তরীন শৃঙ্খলা 'রক্ষা' সম্পর্কে গবেষণা এবং ঐ পর্যায়ে শিক্ষার উন্নতিবিধানই হ'বে শিক্ষা সংক্রান্ত উন্নয়ন সূচীর প্রধান উদ্দেশ্য।

বর্তমানে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে যে সব বৃত্তি দেওয়া হয় তা ছাড়াও রাজ্যসরকারগণ বিশেষ বৃত্তি ও ছাত্রবৃত্তি দেবেন। অন-গ্রসর গোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীদের জন্যে ম্যাট্রি-কোত্তর বৃত্তির সংখ্যা ১৯৬৮-৬৯ সালের ১ লক্ষ ৪৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১৯৭৩-৭৪ সালে ২ লক্ষ করা হ'বে।

প্রচুর ফলনের এলাকাগুলির চাষীদের জন্যে কাজ-চালাবার মত অক্ষর পরিচয় করাবার যে কার্যসূচী আছে তা'র আও-তায় ১০০টি জেলার ১০ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক চাষীদের আনা হ'বে।

জনশক্তি

চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ নাগাদ, মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ১০৩ দাঁড়াবে ব'লে আশা করা যায়। এই সব কলেজে মোট ১১,০০০ ছাত্রছাত্রী নেওয়া যাবে। ঐ সময় নাগাদ ডাক্তারদের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার। নার্স ও প্রাক মেডিকেল কর্মীদের সংখ্যা ১৯৬৮-৬৯ সালের ১৭০,৫০০ থেকে বেড়ে গিয়ে চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ নাগাদ দাঁড়াবে ২৫৯,৯০০ ॥
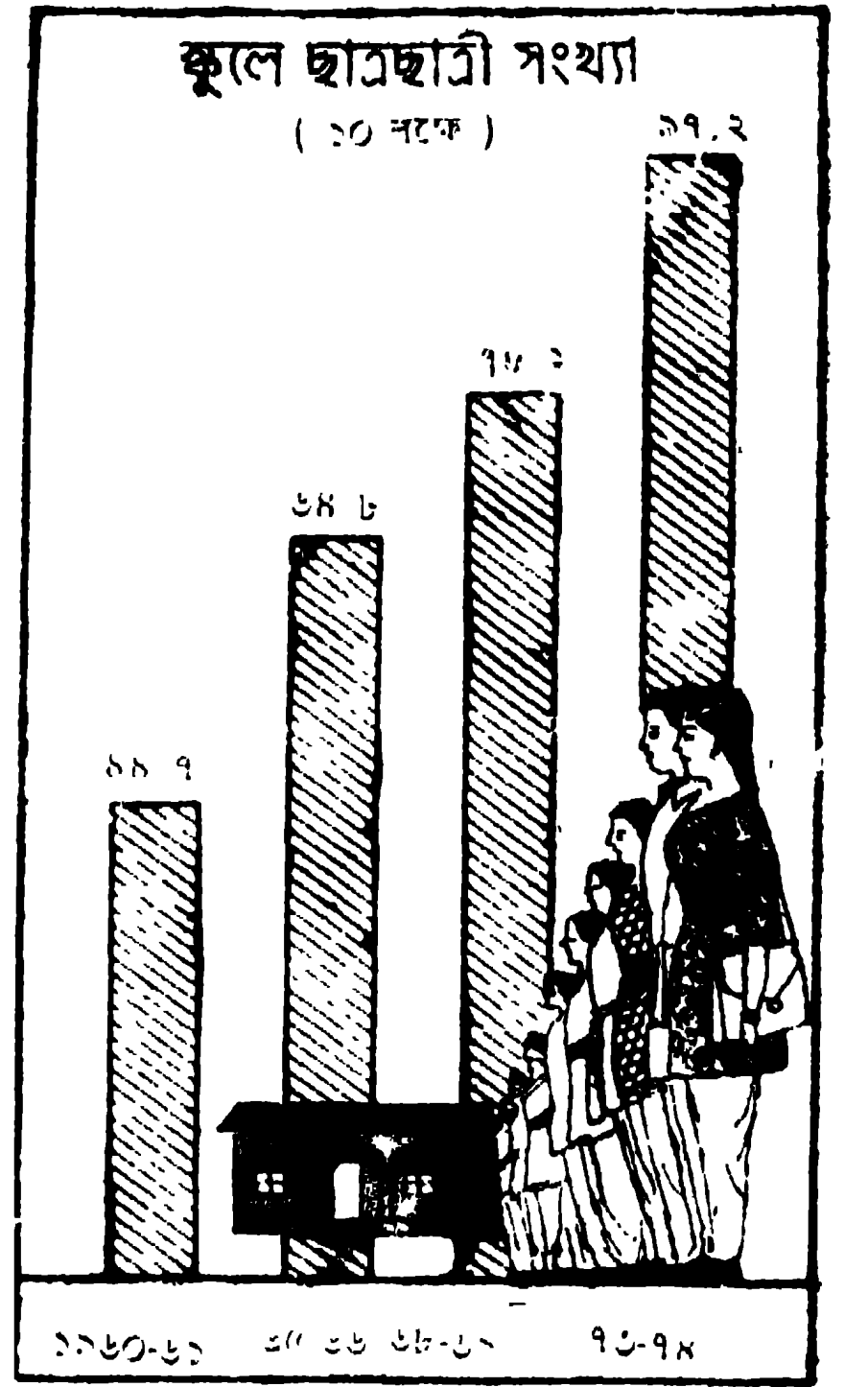
স্কুলে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা

(১০ লক্ষে)

বৈজ্ঞানিক গবেষণা

বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পরিষদের জন্যে বিনিয়োগের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৫০ কোটি টাকা। এ ছাড়া পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতের জন্যে অতিরিক্ত ৭৪.০৬ কোটি টাকার বিনিয়োগ ধরা হয়েছে ॥

নিয়োগ

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে শ্রম-কল্যাণ সূচীর জন্যে ৩৭.১১ কোটি টাকার সংস্থান করা হয়েছে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় পরি-কল্পনার জন্যে ৯.২০ কোটি টাকা, রাজ্য পরিকল্পনাগুলির জন্যে ২৫.১২ কোটি টাকা এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির পরিকল্পনা-গুলির জন্যে হ'ল ২.৭৯ কোটি টাকা।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন, প্রকল্পগুলি রূপায়-ণের সময় কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।
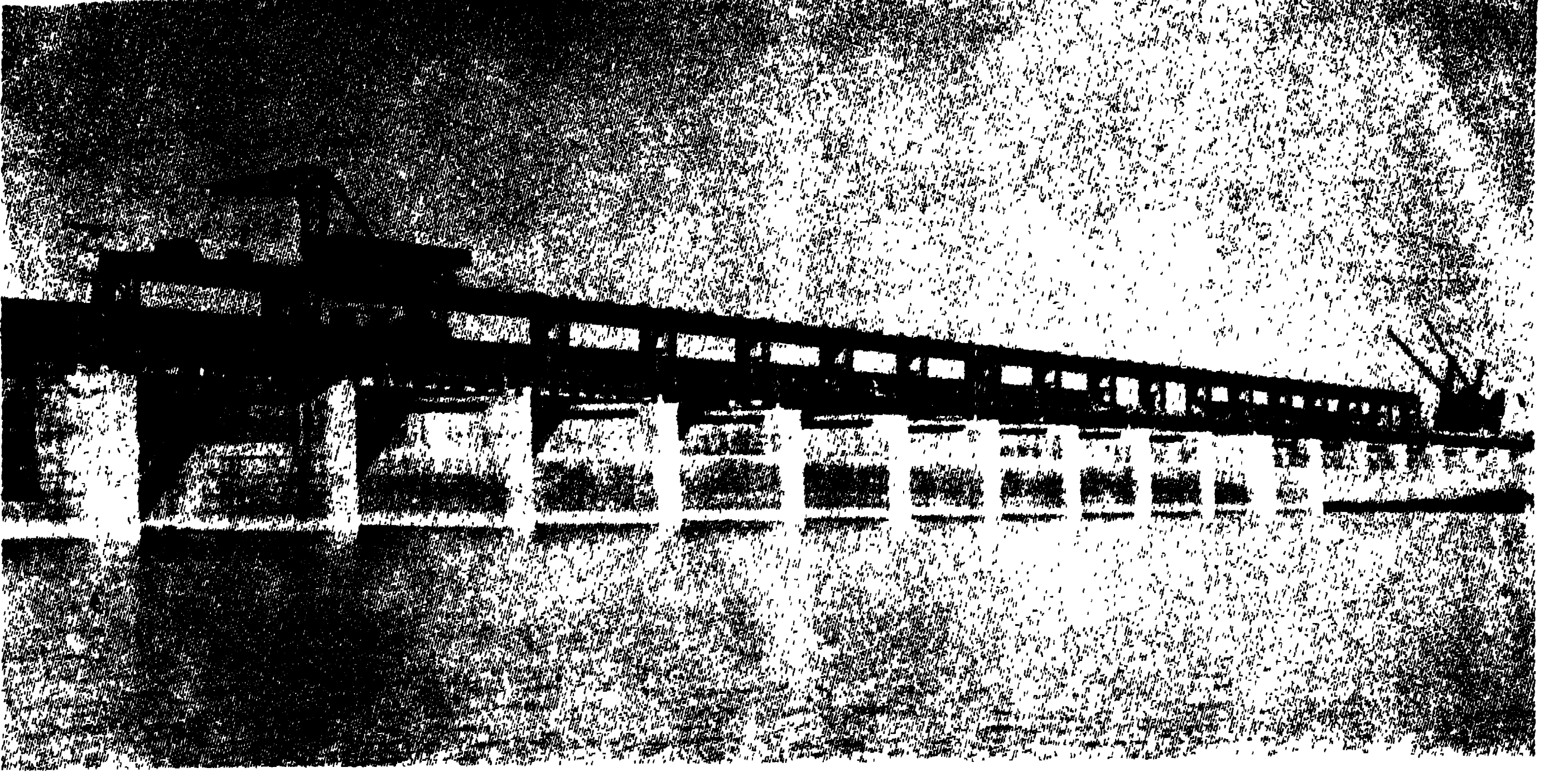
ফারাক্কা

রূপায়ণ পর্ব্ব সম্পূর্ণ-প্রায়

শ্রীবিবেকানন্দ রায়

(আমাদের কলকাতার নিজস্ব সংবাদদাতা)

ফারাক্কা !

বাংলা দেশের একটা অখ্যাত গ্রাম, দশ বছর আগেও বহুলোক হয়তো এর নাম জানতেন না। অথচ আজ সেখানে বিশ্বের বৃহত্তম বাঁধ সম্পূর্ণ হতে চলেছে। হাজার হাজার নারীপুরুষের কর্মব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে রূপায়িত হচ্ছে অনেকদিনের এক স্বপ্ন। ৭৷৷ মীটার উঁচু ২,২১০ মিটার দীর্ঘ এই বাঁধ তৈরি হয়ে গেলে জাহ্নবী থেকে হুগলীতে জল প্রবাহিত হবে সারা বছর। গঙ্গা থেকে হুগলীতে যে জল যাবে তার পরিমাণ হবে ৪৫ হাজার কিউসেক। ফারাক্কা ভারতের অন্যতম বড় একটি বন্দরে প্রাণ সঞ্চার করবে। আর তখন কলকাতা বন্দরে বড় বড় জাহাজগুলিও ভিড়তে সুরু করবে। নির্ধারিত সময়ের দু'বছর আগেই অর্থাৎ আগামী বছরের জুন মাসের মধ্যে এই পরিকল্পনার কাজ শেষ হয়ে যাবে, যার রূপায়ণে ব্যয় হচ্ছে ১৫৬ কোটি টাকা।

ফারাক্কা হ'ল কলকাতা বন্দরের মুশকিল আসান। কলকাতার সমস্যা একটা বড় সমস্যা যার মূলে রয়েছে প্রধান দুটি কারণ। প্রথম হুগলী যার আর এক নাম ভাগিরথী এবং বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। এই নদীটি হ'ল কলকাতায় বড় বড় জাহাজ প্রবেশের সিংহদ্বার কিন্তু পলিমাটা জমে এই নদীর মোহনা ক্রমশঃ গভীরতা হারাচ্ছে। আর দ্বিতীয় হ'ল, আধুনিক জাহাজগুলির আকার আয়তন। জাহাজের যে অংশটি জলের তলায় ডুবে থাকে তাকে বলা হয় 'ড্রাফট্'। এই অংশটি যত গভীর হবে, স্বচ্ছন্দগতির জন্যে তার প্রয়োজন হবে গভীরতর জলপথ

১৮৩৫ সালে কলকাতায় যে সব জাহাজ ভিড়ত সেগুলির বহত্তমগুলির ওজন হ'ত ১,৮১৭ টন এবং ড্রাফটের গভীরতা ২৷৷ মীটার। কিন্তু এ যুগের তৈলবাহী জাহাজের ওজন হয় ৮০,০০০ থেকে ১০০,০০০ টন এবং ড্রাফ্টের গভীরতা ৯.৪ থেকে প্রায় ১১ মীটর। একশ' বছর আগে কলকাতা বন্দরে খুব বেশী হলে ৪/৫টি ছোট জাহাজ ভিড়ত। ১৯৬৪-৬৫ সালে এর সংখ্যা দাঁড়ায় ১,৮০৭।

কলকাতা বন্দরে যত মাল পেঁৗছয় তার অর্ধেক আসে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল, আসাম, বিহার, ওড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ এমন কি মধ্যপ্রদেশের কিছু এলাকা থেকেও (সব মিলিয়ে এই অঞ্চলগুলির আয়তন হবে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের দ্বিগুণ)। তাই কলকাতা বন্দরের বিভিন্ন সমস্যা নিরসন করার জন্য বন্দর সংস্কারের কাজ জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিছুদিন আগে ফারাক্কায় গিয়েছিলাম কাজ দেখতে। সেখানে অহোরাত্র কাজ চলছে। বিরাট যন্ত্রদানবগুলির পাশে দাঁড়িয়ে অনলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন হাজার হাজার নারী ও

পুরুষ। এঁদের মধ্যে ১৫ হাজার ওখানেই থাকেন। তা ছাড়া দিনের বেলা আশেপাশের গ্রামগুলি থেকে শত শত শ্রমিক আসেন কাজ করতে।

অগভীর জলপথ
জাহাজ যাতায়াতের পথ প্রায় অবরুদ্ধ

ডায়মণ্ডহারবার, যেখানে হুগলী গিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে, কলকাতা থেকে তার দূরত্ব ৪৩ মাইল। এই জায়গায় পলি পড়ে জলের মধ্যে দশটা পলিমাটির প্রাচীরের মত সৃষ্টি হয়েছে। এইগুলির জন্যে গঙ্গায় জোয়ার ভাঁটার প্রবাহ ও গতি বদলে গেছে। তাছাড়াও পলিমাটি ও বালির চাপে জলপথ অপ্রশস্ত হয়ে যাচ্ছে বলে জাহাজ চলাচল করতে পারে না। যতক্ষণ না ড্রেজারের সাহায্যে মাটী কেটে ফেলা হয় ততক্ষণ জাহাজগুলি দূরে নোঙর ফেলে অপেক্ষা করে। ১৯৫৬-৫৭ সালে এইভাবে ১৬০টি জাহাজ আটকা পড়ে ছিল। পেট্রোলিয়াম, তৈলজাত সামগ্রী, কয়লা প্রভৃতি ও খাদ্যবাহী বড় জাহাজগুলি তো বন্দরে এখন ভিড়তেই পারে না।

এখন জাহাজ চলাচলের যেটুকু পথ খোলা আছে সেখানে বছরের অধিকাংশ সময় ৪॥-৫ মীটারের বেশী ড্রাফ্‌ট-এর জাহাজ যেতে পারে না। এতদিনে মাটী ও বালির যে স্তর পড়েছে তার পরিমাণ হবে ৮০ লক্ষ টনের মত। দশটিরও বেশী ড্রেজার ক্রমাগত মাটী তোলার কাজে লেগে আছে। এর জন্যে বছরে খরচ হচ্ছে ৭:৩ কোটি টাকা।

১৯৩৫ সালে গঙ্গায় জলের যে গভীরতা ছিলো এখন তার মাত্রা অর্ধেক দাঁড়িয়েছে। বর্ষায় গঙ্গার জলের গভীরতা বাড়ে ৩.৫ মিটারের মত আর ৪০ হাজার কিউসেক জল ভাগিরথী হয়ে হুগলীতে বয়ে যায়। কিন্তু এই প্রবাহ থাকে মাত্র ৪৫ দিন। বছরের ৮ মাস হুগলীতে এক ফোঁটা জলও যায় না। এই তারতম্যের জন্যে কলকাতা বন্দরে জোয়ারের জল আগের তুলনায় অর্ধেক সময় থাকে, স্রোতের বেগ কমে যাওয়ায় বালি ও মাটী ধুয়ে বেরিয়ে যেতে পারে না। ফলে জাহাজ চলাচলের পথ বন্ধ হয়ে আসে। ওদিকে আবার বন্যার তোড় প্রবল হলে পাড় ভেঙে নদীর বুকে মাটির স্তর জমতে থাকে। সেও আর এক সমস্যা।

বন্দরের অপমৃত্যু রোধ করা দরকার

এই অবস্থা চলতে দিলে নদী-মোহনার গভীরতা কমে গিয়ে জাহাজ চলাচলে ব্যাঘাত হবে এবং কলকাতা বন্দরের অপমৃত্যু ঘটবে। শুধু তাই নয় হলদিয়ার গভীর-জলের-বন্দরের অবস্থাও তাই দাঁড়াবে। তাই আজ নয়, সেই ১৯৩০ সাল থেকে সার উইলিয়াম উইলকক্স, মিঃ টি. এম. ওগ, মিঃ এ. ওয়েবষ্টার এবং ডাঃ ওয়ালটার হেনসেন্ গঙ্গার ওপর একটা বাঁধ তৈরির কথা বলে এসেছেন।

(২১ পৃষ্ঠায় দেখুন)
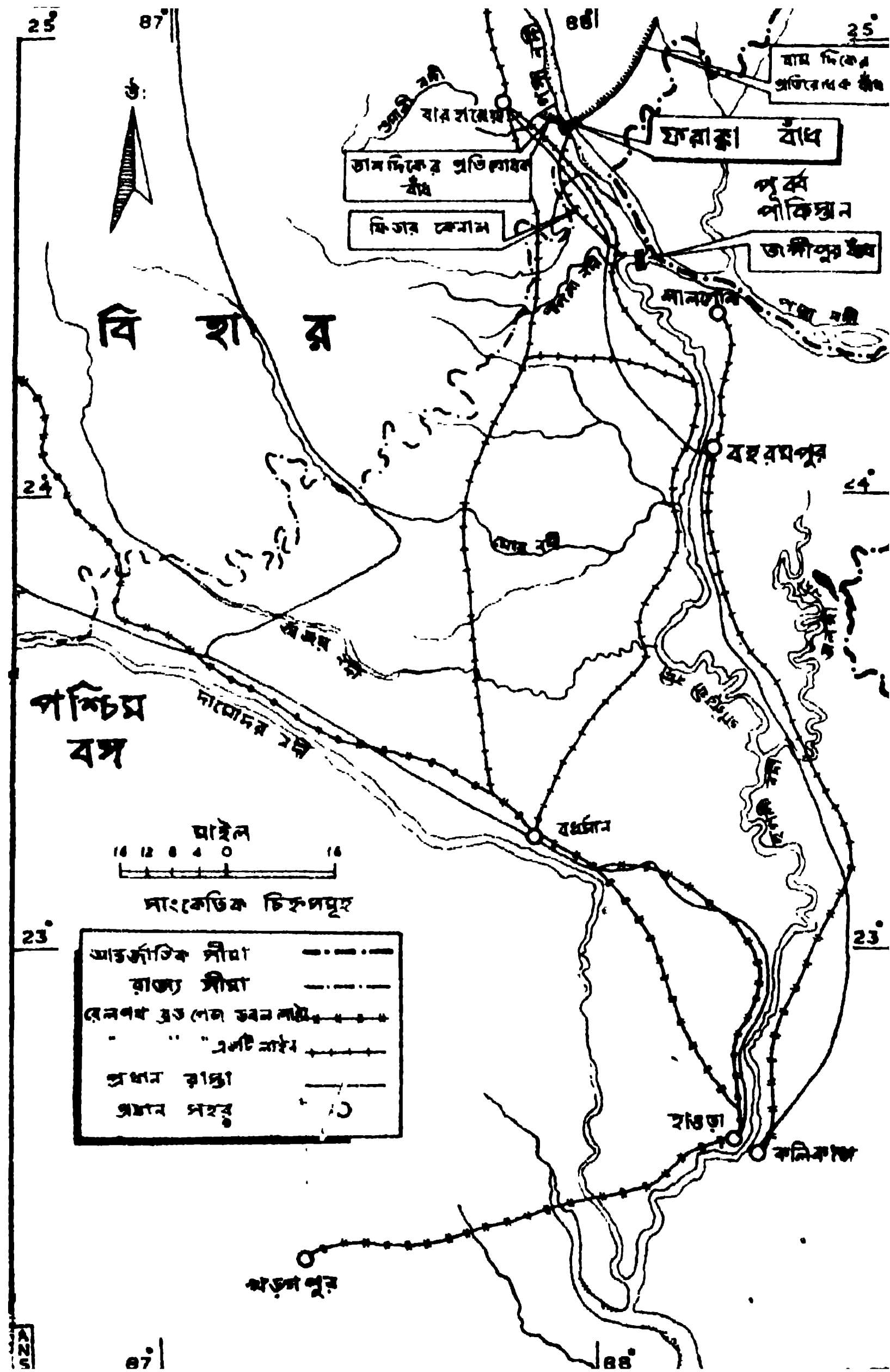
ছোট জমির চাষী

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান সহায়

আমাদের দেশে বর্তমানে কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বাড়াবার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রয়োজন অনুযায়ী সার ও জলসেচ দিয়ে বেশী ফলনের বীজ ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন বাড়াবার জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলি যেমন একদিকে উৎসাহ দেন, তেমনি এগুলি কৃষকদের পক্ষে সহজলভ্য করে তোলার জন্য সাহায্যও করেন। বেশী ফলনের বীজ ব্যবহার করে পশ্চিম বঙ্গে কৃষি উৎপাদন বাড়াবার জন্য যে চেষ্টা করা হচ্ছে তাতে বীরভূম জেলা একটা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করছে।

ময়ূরাক্ষী প্রকল্পটি রূপায়িত করার ফলে এখানকার আবহাওয়ায়, ভূমির উৎপাদিকা শক্তিতে ও অন্যান্য বিষয়ে যে পরিবর্তন এসেছে তার ফলে এখানে বেশী ফলনের ধান চাষ করার মতো উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এই জেলার প্রধান উৎপন্ন শস্য হল ধান এবং শতকরা ৯০ ভাগ জমিতেই ধান চাষ করা হয়। ১৯৬৫-৬৬ সালের রবি খন্দে, বেশী ফলনের ধান চাষ করার কর্মসূচী, গ্রহণ করা হয়, এবং প্রথমে ৩০ একর জমিতে এই ধানের চাষ করা হয়। তারপর থেকে জেলায় বেশী ফলনের ধান চাষের জমির পরিমাণ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে।

এরপর ১৯৬৭-৬৮ সালে খারিফ মরশুমে ৫০,০০০ একরে এই ধানের চাষ করা হবে বলে স্থির করা হয় এবং কার্যতঃ ২৮,১৬৩ একর জমিতে বেশী ফলনের ধান চাষ করা হয়। ঐ বছরে বীরভূম জেলার মোট ধানের জমির শতকরা প্রায় ১৪ অংশে বেশী ফলনের ধানের চাষ করা হয়।

১৯৬৮-৬৯ সালের খারিফ মরশুমে, ২ লক্ষ একর জমিতে বেশী ফলনের ধান চাষ করা হবে বলে স্থির করা হয়েছে। তার অর্থ হ'ল বীরভূম জেলার মোট ধান চাষের জমির শতকরা প্রায় ২৭ ভাগ অংশে এই ধরণের ধান চাষ করা হবে। বেশী ফলনের ধান চাষ করা সম্পর্কে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে এটা হ'ল তার শতকরা ২০ ভাগ।

তবে এখানে একটা কথা উঠতে পারে যে, এই বেশী ফলনের ধান চাষ করতে গ্রামের কৃষকরা কেমন উৎসাহ দেখাচ্ছেন? এঁরা পরিমাণ মত রাসায়নিক সার ব্যবহার করছেন কি না, উন্নত ধরণের কৃষি পদ্ধতি অবলম্বন করছেন কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশ্বভারতীর কৃষি-অর্থনীতি গবেষণা কেন্দ্রটি একটা পরীক্ষা চালান। ১৯৬৭-৬৮ সালে খারিফ মরশুমে এই জেলার চারটি গ্রাম থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয় এবং বিস্তারিত ভাবে পরীক্ষা করার জন্য প্রত্যেকটি গ্রামের ১৫টি খামার পরীক্ষা করা হয়। এগুলি থেকে যে তথ্যাদি পাওয়া যায় তা বেশ উৎসাহজনক।

বীরভূমে বেশীর ভাগ কৃষকের যে জমি আছে সেগুলিকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একটা হ'ল '০১ থেকে ৫ একর, অন্যটা ৫ থেকে ১০ একর। এই দুই শ্রেণীর কৃষকের হাতে রয়েছে জেলার মোট জমির শতকরা ৯০ ভাগ এবং এর মধ্যে শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ হ'ল কৃষি জমি। যে সব তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে অনেক কৃষক অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৫৯ জন কৃষক বেশী ফলনের বীজ ধান ব্যবহার করেছেন।

তবে বেশী ফলনের ধান চাষ করে খাদ্য শস্যের উৎপাদন বাড়াতে হলে যে আধুনিক কৃষি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়, উপযুক্ত জলসেচ ও সার ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়, এই জেলার কৃষকরা সেগুলি কতখানি মেনে চলেছেন তাও দেখা দরকার।

(ক) জলসেচ: অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে, যে জমিতে যে পরিমাণ জলসেচ অত্যন্ত প্রয়োজন, তার জন্য সবগুলি গ্রামকেই বৃষ্টির জলের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। গ্রামগুলির ভৌগোলিক অবস্থান এক রকম বলে, পাহাড়ে বৃষ্টি হয়ে খালগুলি দিয়ে যখন জমিতে জল এসেছে তখন গ্রামের জমিগুলিও বৃষ্টির জল পেয়েছে। ফলে জমিগুলিতে বেশী জল জমে গিয়েছিল। তা ছাড়া খারিফ মরশুমের সাময়িক খরার সময়েও জমিতে নিয়মিত জলসেচ দেওয়া যায় নি।

(খ) সার: বেশী ফলনের ধানের চাষ করে সুফল পেতে হলে জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে ও মাত্রায় এন. পি. কে সার দেওয়া প্রয়োজন এবং তাহলেই শুধু বাঞ্ছনীয় ফল পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু তথ্যাদি সংগ্রহ করে দেখা গেছে যে, প্রতি একর জমিতে যে পরিমাণ সার ব্যবহার করা উচিত ছিল, প্রকৃতপক্ষে তার চাইতে অনেক কম ব্যবহার করা হয়েছে। যেখানে প্রতি একর জমিতে ১২০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন, ৬০ পাউণ্ড ফসফেট এবং ৬০ পাউণ্ড পটাশ ব্যবহার করা উচিত ছিল সেই তুলনায় যথাক্রমে ৮১ পাউণ্ড, ৪৫ পাউণ্ড ও ৩৮ পাউণ্ড ব্যবহার করা হয়েছে। তবে যাঁদের জমির পরিমাণ কম তাঁরা অবশ্য মোটামুটি একটু বেশী সার ব্যবহার করেছেন।

(গ) সার প্রয়োগের সময় ও পদ্ধতি: নির্দিষ্ট সময় অন্তর ৩।৪ বার সার প্রয়োগের যে প্রচলিত নিয়ম রয়েছে, কোন কৃষকই সেই নিয়মগুলি মেনে

* ধনধান্যে ৮ই জুন ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৯

চলেননি। শতকরা ৬১ জন কৃষক তাঁদের জমিতে দু'বার সার প্রয়োগ করেছেন এবং শতকরা ১৫ জন মাত্র একবার সার দিয়েছেন। যে কৃষকদের জমির পরিমাণ সব চাইতে কম তাঁদের মধ্যে শতকরা ৬৯ জন জমিতে দু'বার সার দিয়েছেন এবং যাঁদের জমির পরিমাণ সব চাইতে বেশী তাঁদের মধ্যে শতকরা ৫৫ জন দু'বার সার প্রয়োগ করেছেন।

(ঘ) ধান গাছ রক্ষা করার ব্যবস্থাদি ;
ধানগাছের উপযুক্ত যত্ন না নেওয়া হলে ভালো ফসল পাওয়া যায় না। এগুলিতে তিনবার তরল কীটানুনাশক স্প্রে করতে হয় এবং দু'বার পাউডার ছড়াতে হয়। কিন্তু খবর নিয়ে দেখা গেছে যে এই গ্রামগুলির কৃষকরা কেউই পুরোপুরিভাবে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেন নি। মোটামুটি শতকরা ১০ জন দু'বার, শতকরা ৪২ জন একবার স্প্রে করেছেন এবং শতকরা ২৮ জন একবারও স্প্রে করেন নি। এই ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে যাদের জমির পরিমাণ কম তাঁরাই বরং আধুনিক পদ্ধতিগুলি বেশী অনুসরণ করেছেন।

(ঙ) সার করে বীজ বোনা : বেশী ফলনের বীজ থেকে বেশী ফসল পেতে হলে বীজ জমিতে ছড়িয়ে না দিয়ে সার করে বোনা উচিৎ। অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, ৬০ জন কৃষকের মধ্যে ৩৭ জন (অর্থাৎ শতকরা ৬২ জন) এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন।

আরও দেখা গেছে যে, বেশী ফলনের বীজ ব্যবহার করা সম্পর্কে যে গ্রামগুলি নির্বাচিত করা হয়, সেখানকার কৃষকরা এই ধরণের চাষে বেশ উৎসাহ দেখান। তবে দেখা গেছে যে তাঁরা সার ও কীটনাশক দ্রব্যাদি নির্দিষ্ট সময়ে উপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহার করেন নি। জলের অভাব না থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ করেন নি। বেশী সার ব্যবহার করার ফলে ফসল যদি ভালো না হয় এই আশঙ্কাতেই ওঁরা সার ব্যবহার করেন নি। তবে এই নতুন কৃষি পদ্ধতির সুফল হাতে কলমে দেখাতে পারলে এবং প্রচারের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারলে আরও ভালো ফল পাওয়া যাবে।

★

(১১ পৃষ্ঠার পর)

১৯৫০-৫১ সালে জাতীয় আয়ের শতকরা সাড়ে পাঁচ ভাগ মূলধন হিসেবে নিয়োগ করা হয়। আভ্যন্তরিন সঞ্চয় থেকেই তার সংস্থান সম্ভব হয়েছে। তৃতীয় যোজনার শেষে জাতীয় আয়ে মূলধন নিয়োগের অনুপাত বেড়ে শতকরা প্রায় ১০ ভাগ দাঁড়িয়েছে। আভ্যন্তরিন সঞ্চয়ের গড় হার ছিল শতকরা প্রায় ৮ ভাগ। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের এই স্পষ্ট বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও দেশে অধিক মূলধন খাটানো গেছে প্রধানত বৈদেশিক মূলধনের সাহায্যে। মূলধন খাটানোর ব্যাপারে যেমন নির্বাচনমূলক নীতি অবলম্বন বাঞ্ছনীয় সেই রকম অর্থ সংগ্রহের জন্য কর ছাড়া আভ্যন্তরিন ঋণ ও সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের লাভের উপর উত্তরোত্তর বেশী নির্ভর করতে হবে।

(ফারাক্কা ১৮ পৃষ্ঠার পর)

পরিকল্পনা অনুযায়ী ফারাক্কা, আকার ও আয়তনে হবে পৃথিবীর বৃহত্তম। এই বিরাট বাঁধ থেকে যখন জল ছাড়া হবে তখন তা একটি খালের মধ্যে দিয়ে গিয়ে পড়বে ভাগিরথীতে। ৩৮·৫ কিলোমিটার লম্বা, সুয়েজের চেয়ে দেড়গুণ চওড়া এই খালের তিনভাগের একভাগ তৈরি হয়ে গেছে।

বাঁধ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, সারা বছরে হুগলীতে জল ছাড়া হবে ৪০ হাজার কিউসেকের মত। খালে জল বইতে সুরু করলে স্রোতের জলে পলিমাটি ধুয়ে বেরিয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে ড্রেজার চালু রাখার খরচও অনেক কমে যাবে। বড় কথা এই, যে ৮ মীটার ড্রাফ্‌ট্‌-এর জাহাজও বছরের যে কোনোও সময়ে বন্দরে ঢুকতে পারে।

জোয়ারের সময়ে এমন কি প্রায় ১০ মীটার ড্রাফ্‌ট-এর জাহাজ যাতায়াতেও অসুবিধা হবে না। ভারত সরকারের ন্যাশনাল প্রজেক্টস্ কনস্ট্রাকশান কমিটি ও বেসরকারী হিন্দুস্থান কনস্ট্রাকশান কোম্পানীর যৌথ প্রচেষ্টায় ফারাক্কার কাজ হচ্ছে।

পরিকল্পনাটি কত বড় তার একটা আভাস দেওয়া যাক। বাঁধ তৈরীর কাজে এ পর্যন্ত যে কংক্রীট লেগেছে তা দিয়ে ৬০ সেন্টিমিটার চওড়া ১৫ সেন্টিমিটার উঁচু একটা পথ পৃথিবীকে বেষ্টন করতে পারে। যে পরিমাণ মাটি তোলা হয়েছে তা দিয়ে পৃথিবী থেকে চাঁদ পর্য্যন্ত লম্বা ৪৫ সেন্টিমিটার চওড়া ৩০ সেন্টিমিটার উঁচু একটি বাঁধ তৈরি করা যেতে পারে। ফারাক্কা বাঁধের বড় বড় অংশ তৈরি করার জন্যে এ পর্যন্ত তিন লক্ষ টন সিমেন্ট ও দেড় লক্ষ টন ইস্পাত লেগেছে। এর জন্যে ১৫ হাজার টিউবওয়েল বসানো হয়েছে।

বাঁধের উপরে ৭·২ মিটার চওড়া কংক্রীটের রাস্তা ও ব্রডগেজ লাইন পাতা হবে। এই পথটি উত্তর বাংলা, উত্তর বিহার ও আসামের সঙ্গে বাংলার দক্ষিণাঞ্চলকে যুক্ত করবে। আনুষঙ্গিক সুফল হিসেবে বৃহত্তর কলকাতায় পরিশ্রুত জলের সরবরাহ বাড়বে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে।

সবচেয়ে আশার কথা এই যে, বাঁধের রূপ-পরিকল্পনা থেকে রূপায়ণ পর্ব—সবটাতেই আমাদের দেশের ইঞ্জিনীয়ারদের কৃতিত্ব। এর জন্যে বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞদের আনতে হয়নি। ইতিমধ্যে পরিকল্পনার শতকরা ৭৭ ভাগ কাজ শেষ হয়েছে অর্থাৎ বাঁধের শতকরা ৬৬ ভাগ তৈরি হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত যে ৭০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে তার মধ্যে যন্ত্রাদির জন্যে লেগেছে ৪·৫ কোটি টাকা। অন্যান্য সাজসরঞ্জাম কেনার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়েছে মাত্র ১২ কোটি টাকার মত।

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত
পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

প্রথম বর্ষ **দ্বিতীয় সংখ্যা**

২২শে জুন ১৯৬৯ : ১লা আষাঢ় ১৮৯১

Vol 1 : No 2 : June 22, 1969

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য. তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

প্রধান সম্পাদক
কে. জি. রামাকৃষ্ণণ

সহ সম্পাদক
নীরদ মুখোপাধ্যায়

সহকারিণী (সম্পাদনা)
গায়ত্রী দেবী

সংবাদদাতা (কলিকাতা)
বিবেকানন্দ রায়

সংবাদদাতা (মাদ্রাজ)
এস. ভি. রাঘবন

ফোটো অফিসার
টি. এস. নাগরাজন

প্রচ্ছদপট শিল্পী
আর. সারঙ্গন

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০

টেলিগ্রাফের ঠিকানা—যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা. প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

ভুলি নাই

কোন গণতন্ত্রই, অভাব, দারিদ্র্য ও অসাম্যের মধ্যে বেশী দিন টিকে থাকতে পারেনা।

— জওহরলাল নেহেরু

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়

আমাদের কথা

রাজনীতির ক্ষেত্রে যাঁদের মতামতের বিশেষ মূল্য আছে, এই রকম দু'জন প্রখ্যাত নেতা সম্প্রতি যে দুটি বিবৃতি দিয়েছেন, তা হয়তো নকশাল বাড়ী আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ অবস্থাটা বিচার করতে সাহায্য করবে।

কয়েক সপ্তাহ আগে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ এবিষয়ে স্পষ্ট ক'রে কয়েকটি কথা বলেছেন। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীও এই বিক্ষোভকে প্রজাসত্ত্ব সমস্যার মত কয়েকটি অমীমাংসিত প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত করেছেন

এই আন্দোলনকে যদি উত্তেজনা ক্ষুব্ধ মনের বাহ্যিক একটা প্রকাশ ব'লে উপেক্ষা করা না হয় অথবা রাজ্যে রাজ্যে পুলিশী-ক্ষমতা প্রয়োগের অজুহাত ব'লে গণ্য করা না হয় এবং এই বিক্ষোভের মূলে কী কারণ আছে তা' যদি উপলব্ধির চেষ্টা থাকে তাহলেই কেবল ভারতীয় নেতৃবৃন্দ গান্ধী শতবার্ষিকীকে একটা নিষ্প্রাণ অনুষ্ঠানে পর্য্যবসিত না করে, তা যথার্থভাবে কার্য্যকর করতে পারবেন।

একমাত্র সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ ক'রে গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করা সম্ভব এই ছিল মহাত্মা গান্ধীর বিশ্বাস। ভারতীয় ও বিশ্ব-রাজনীতির ক্ষেত্রে এই ছিল তাঁর অবদান। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন না যে, প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা গণতন্ত্রের শেষ কথা। তিনি প্রায়ই বলতেন শীর্ষস্থলে ২০ জন লোক বসে থাকলেই তা' গণতন্ত্র নয়। যদি লক্ষ লক্ষ মানুষ কর্তৃত্বের ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধ করার শক্তি রাখতে পারেন তাহলেই গণতন্ত্র সার্থক। এমনকি এই অবস্থাটিও গান্ধীজীর কাছে, তাঁর আদর্শ রামরাজ্য অর্জ্জনের পথে একটা পর্য্যায়মাত্র ছিল। তাঁর আদর্শের রামরাজ্যে কর্তৃত্ব নেই, অতএব রাষ্ট্রব্যবস্থাও নেই।

সর্ব্বকালের সব রকম অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যই গান্ধীজী অসহযোগিতা, আইন অমান্যের মতো অস্ত্রের উদ্ভাবন করেছিলেন কেবলমাত্র বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য নয় কারণ অত্যাচার উৎপীড়ণ কোন না কোন রূপে চলতেই থাকে।

বর্ত্তমানে দেশে যে পরিস্থিতি তাতে ব্যাপক আকারে বা সীমাবদ্ধভাবে এই অত্যাচার উৎপীড়ণ রয়েছে কিনা সেইটেই হ'ল প্রধান প্রশ্ন। প্রধানমন্ত্রী এবং শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণের বিবৃতিতে মনে হয় যে এগুলি রয়েছে। সেই ক্ষেত্রে, অত্যাচার প্রতিরোধ করা সম্পর্কে গান্ধীজী প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা যুক্তিসঙ্গত নয় কি ?

এই সিদ্ধান্ত যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে, এগুলি প্রতিরোধের উপযুক্ত পন্থা কী কেবলমাত্র সেইটুকুর মধ্যেই আমাদের বিচার সীমাবদ্ধ করা যায়। এই প্রতিরোধ সহিংস হওয়া সঙ্গত কিনা অথবা তা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনযায়ী পরিচালিত করা সমীচীন কিনা সেইটুকুই শুধু আমাদের বিবেচ্য বিষয় হবে। সমাজে যে অত্যাচার ও উৎপীড়ন চলতে থাকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেগুলি সব দূর করার অবকাশ অতি অল্প।

সে যাই হোক সব রকম গণ আন্দোলনই, গণতান্ত্রিক সরকারের সমর্থক নয়। তারপর, যখন গণতান্ত্রিক সরকারের অর্থ হয় বিচক্ষণ সরকার এবং পরিকল্পনাকে বিচক্ষণ কিছুসংখ্যক ব্যক্তির অধিকার বলে মনে করা হয় তখন দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে, এবং নিজেদের অভিমত প্রকাশে দেশের বেশীর ভাগ লোক বঞ্চিত হন। এই প্রশ্নটি সম্পর্কে গান্ধীজীর উত্তর ছিলো যে, ছোট ছোট সরকার বা প্রশাসনব্যবস্থা থাকবে যেখানে জনগণের সকলেই অংশ গ্রহণ করতে পারবে। তা যদি সম্ভব না হয় ভারতীয় গণতন্ত্রকে এমন একটা উপায় স্থির করতে হবে, যেখানে সাধারণ মানুষ তাঁদের নিজেদের অভিমত প্রকাশ করার সুযোগ পাবে এমন কি রাষ্ট্রের পরিচালনা ব্যবস্থা ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁরা তাঁদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে।

পরিকল্পনা রূপায়নে প্রয়োজন জনগণের সহযোগিতা

(গত ৬ই জুন সন্ধ্যে ৬টার সময় কলিকাতার এ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্ট্সে "ধনধান্যের" উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পঠিত মুখ্যমন্ত্রীর ইংরেজী ভাষণের অনুবাদ)

পরিকল্পনা সম্পর্কিত পাক্ষিকপত্র "যোজনার" বাংলা সংস্করণের প্রথম সংখ্যাটির প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে আমি খুসী হয়েছি। বাংলা সংস্করণটির নাম অবশ্য "ধনধান্যে"। আমরা আরও শুনেছি যে যোজনার তামিল সংস্করণ "থিট্টম" পাক্ষিক পত্রটিও শিগগীরই প্রকাশিত হবে।

পরিকল্পিত আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রনয়ণকারী, পরিকল্পনা সম্পর্কিত কার্য্যপরিচালনাকারী ও জনগণের মধ্যে এই পত্রটি যোগসূত্র হিসেবে কাজ করবে, কারণ পরিকল্পনা হ'ল একটা জাতীয় প্রচেষ্টা, যার সঙ্গে দেশের সমগ্র অংশ এবং সমাজের প্রত্যেক স্তরের সম্পর্ক রয়েছে।

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে নূতন দিল্লীতে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে আমি বলেছিলাম যে আর্থিক উন্নয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে গত ১৮ বছর যাবৎ যে সব পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে সেগুলি, আমাদের সেইসব লক্ষ্যের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারেনি। অবশ্য ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে "যোজনা" যে সেবা করে আসছে, আমার এই উক্তির মাধ্যমে তার ওপর সামান্যতম ছায়াপাত করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে আমরা এ পর্য্যন্ত যা অর্জ্জন করেছি তা গান্ধীজীর স্বপ্নের ভারতও নয় অথবা জওহরলালের কল্পনার ভারতও নয়। পরিকল্পনায় কোন খুঁত অথবা কর্মদক্ষতার অভাব কিংবা জনগণের কাছ থেকে যথেষ্ট সাড়ার অভাব—এগুলির মধ্যে যে কোন কারণেই হোক, গত দুই দশকে, দেশে মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে, কতিপয় ব্যক্তির হাতে আর্থিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছে এবং দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা বেড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে আমি জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে বলেছিলাম যে আর্থিক ও সংগঠনমূলক উভয় ব্যবস্থার দিক থেকেই আমাদের পরিকল্পনা নতুন ক'রে রচনা করা উচিত, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্ম্মপদ্ধতিতে একটা পরিবর্ত্তন আনা উচিত, যাতে, যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করা যায়, যেখানে জনগণ সামাজিক নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার পাবেন এবং যাঁরা কাজ করতে ইচ্ছুক তাঁরা উপযুক্ত কাজ পাবেন এবং কয়েকজনের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত না হয়ে সকলের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়বে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকার যে সত্যিকারের অগ্রগতি সুনিশ্চিত করতে অসমর্থ হয়েছেন তার প্রমাণ ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পরিকল্পনা রূপায়িত করা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে একটা সত্যিকারের সাড়া জাগিয়ে তোলায় ব্যর্থতা, অথবা এই জাতীয় প্রচেষ্টায় তাঁরাও যে অংশীদার, জনগণের মধ্যে এই মনোভাব গড়ে তোলার অক্ষমতাই সম্ভবতঃ এই বিফলতার কারণ। যাঁরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছেন তাঁদের নিরুৎসাহিত করা আমার অভিপ্রায় নয় বরং যাঁদের আরও সচেষ্ট হওয়া উচিত ছিলো তাঁদের আরও উৎসাহিত করাই আমার উদ্দেশ্য।

আমরা প্রত্যেকের মধ্যে ভারতের ভবিষ্যত সম্পর্কে একটা আস্থার মনোভাব গড়ে তুলতে চাই এবং আরও চাই যে সর্ব্বাধিক সুফল পাওয়ার জন্য প্রত্যেকেই আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠুন। এই বিষয়ে নিরুৎসাহিত বা হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। বরং আমাদের কি লাভ হয়েছে বা কি ক্ষতি হয়েছে তা নিয়ে গভীরভাবে বিবেচনা ক'রে দেখা দরকার। সেই হিসেব ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে নতুন ক'রে পরিকল্পনা তৈরী করার, কোন কাজগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত তা নতুন করে স্থির করার এবং আমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করা সম্পর্কে নতুন ক'রে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করার কারণ রয়েছে।

আমি আবারও বলবো যে আমাদের কর্ত্তব্য স্থির করতে হবে। অর্থাৎ দেশের প্রতিটি অধিবাসীর মধ্যে কি করে উৎসাহের সৃষ্টি করা যায় এবং তাঁদের নিয়ে কি ভাবে একটা নতুন ধরণের সমবেত জীবন গড়ে তোলা যায়, যা সমাজের দিক থেকে হবে ফলপ্রসূ এবং জাতীয় জীবনের দিক থেকে হবে লাভজনক তার উপায় স্থির করতে হবে। আমরা চাই যে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মহান অভিযানে যুবকগণ তাঁদের সাহস ও কল্পনা নিয়ে এবং বয়োবৃদ্ধগণ তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিন। কৃষক ও কারখানার কর্ম্মী, কর্ম্মচারী ও নিয়োগকারী, ছাত্র, শিক্ষক এবং যাঁরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ, যোগাযোগ, বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের মতো সমাজসেবামূলক কর্ত্তব্যে রত আছেন এবং যাঁরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে কাজ করছেন—এটা হবে তাঁদের কাছে একটা জাতীয় আহ্বানের মতো।

ভারতের ভবিষ্যত সম্পর্কে এবং এই দেশের জনগণের কাছে আমাদের এই আশা ও আস্থার বাণী পৌঁছে দিতে আপনারা এবং এই পত্রিকাটী সফল হোন একমাত্র সেই উদ্দেশ্যে নিয়েই আমি এই কথাগুলি বললাম।

জয়হিন্দ।

'দেশের ডাকে সদাই আগুয়াণ এরাই নওজওয়ান

জাতীয় প্রতিরক্ষা এ্যাকাডেমীর কথা

শরদিন্দু সান্যাল

বোম্বাইএর ১২০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে ড়াকভাসলা হ্রদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছে জাতীয় প্রতিরক্ষা এ্যাকাডেমী, এই াকাডেমীকে কেন্দ্র ক'রে ৭,০০০ একর মি জুড়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উপনগরী গড়ে ঠেছে। আবাসিক ব্যারাক, অফিস-ন, লেকচার হল, তালিম নেবার নির্দিষ্ট য়গা, ল্যাবরেটরী, ওয়ার্কশপ্, স্টেডি-ম, খেলার মাঠ, হাসপাতাল, লাইব্রেরী, জিয়াম, মুক্তাঙ্গন সিনেমা হল, বাজার, গান, পার্ক, ঘাসের সবুজ গালিচা মোড়া নিজেদের জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ স্থা, ক্যান্টিন্, কো-অপারেটিভ ডাকঘর নেই ? এছাড়া একটা কল্যাণ কেন্দ্রও ছে। কষ্টি পাথরে, সততা বিশুদ্ধতা, নিষ্ঠা তা নৈতিক মনোবল যাচাই ক'রে একটি একটি করে বেছে নেওয়া হয়েছে কয়েকশো কিশোরকে যারা আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর মেরুদণ্ড হয়ে গড়ে উঠবে। এরাই একদিন ভবিষ্যতে দেশের নেতৃত্ব নেবে।

এইখানে দেখা হ'ল সেই ছেলেটির সঙ্গে, কড়া ইস্ত্রীকরা ইউনিফর্ম্ম পরা, চটপটে। নাম মাদপ্পা। কে বলবে, মহীশূরের একটি গণ্ডগ্রাম থেকে এসেছে, যেখানে আজও মেয়েরা মাটির ঘড়ায় করে জল বয়ে নিয়ে আসে, যেখানে আজও বৃদ্ধ বটগাছের নীচে বসে গ্রামের প্রাচীন মানুষরা তামাক টানতে টানতে সুখ দুঃখের কথা বলেন। মাদপ্পার বাবা স্যাকরা। মাথায় পাগড়ী বাঁধা খাঁটি গ্রাম্য মানুষটির এত সঙ্গতি ছিল না যে, ছেলেকে কলেজে পড়ার খরচ দেন, মাদপ্পাও ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে। সে তখন সবে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। সারা গ্রামের মধ্যে সেই সবচেয়ে বেশী লিখিয়ে পড়িয়ে লোক। অথচ তার বাবা কথায় কথায় বলবেন ভাগ্যে যা আছে তাই হবে, ভেবে কি করবে ? কিন্তু ক্ষেতের আল দিয়ে, মাঠের ওপর দিয়ে পথ চলার সময়ে মাদপ্পা চোখ তুলে আকাশের বুকে বিমান দেখে ভাবতো সত্যিই কি জীবন ভাগ্যের সুতোয় বাঁধা না পুরুষকারই পৌরুষ ?

ইতিমধ্যে ব্যাঙ্গালোরে বেড়াতে গিয়ে একটা কান্নাড় পত্রিকায় সে বিজ্ঞাপন দেখলে—প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্যে সুস্থ, সবল, ম্যাট্রিক পাশ তরুণরা আবেদন করতে পারে। মাদপ্পা নিজের অবস্থার কথা চিন্তা না ক'রে আবেদনপত্র পাঠিয়ে বসল। সফল পরীক্ষার্থীদের নামের তালিকায় নিজের নাম দেখে সে ছুটল বাপের কাছে। একমাত্র ছেলেকে ছাড়বার বেদনার ওপর আর এক দুঃখ, সে দুঃখ দারিদ্র্যের। বিষন্ন বাপ জানালেন, শুধু পুণা পর্য্যন্ত যাবার ভাড়া

দিতে পারবেন। মাদপ্পার চোখে তখন দিগন্তের স্বপ্ন ; সে বিমানবাহিনীতে নাম লিখিয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, একমাত্র ছেলে হয়ে বাবাকে ফেলে রেখে যাবে ? মাটিকে ছাড়বে অজানা আকাশের টানে ? শেষ পর্য্যন্ত আকাশ কি আপন হ'বে ?' শেষ পর্য্যন্ত বিচ্ছেদকেই স্বীকার ক'রে নিতে হ'ল।

খাড়াকভাসলায় যখন এল তখন মাদপ্পা ১৬ বছরের ছেলে। অবিন্যস্ত কাপড়জামা ভীরু, সন্ত্রস্ত, দ্বিধাগ্রস্ত। এ কোথায় এল্ সে ? গ্রাম ছেড়ে কত যুগ পেরিয়ে এল ? কোথায় সেই অন্ধকার ঘেরা ঘিঞ্জী ঘর, যেখানে আলোবাতাস আসার পথ রুদ্ধ, যেখানে ভূমিই শয্যা ? কোথায় গেল গ্রামের সেই পুকুর যেখানে গোরু মোষের পাশে গা ডুবিয়ে সে স্নান করত ?

আজ মাদাপ্পা থাকে ছিমছাম পরিষ্কার, আলাদা একটা ঘরে। স্মার্ট ড্রেস পরে। পালিশের জোরে মুখ দেখার মত চকচকে জুতো পরে দৃঢ়পদক্ষেপে সে যখন অন্যদের সঙ্গে পা মিলিয়ে কুচকাওয়াজ ক'রে তখন গ্রামের সেই ছেলেটি কোথায় হারিয়ে যায়। যে ঘরে সে আর পাঁচজনের সঙ্গে বসে খায় সেই খাবার ঘরটি দেশের মধ্যে বৃহত্তম। সেখানে ৩,000 জন একত্রে বসে খেতে পারে। সুন্দরভাবে সাজানো ঘরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঝকঝক তক্‌তক্ করছে। রান্নাবান্নার যাবতীয় সরঞ্জাম বৈদ্যুতিক।

(২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মাস্তুলে আরোহণ

তাঁবুতে বসবাস

অশ্বারোহণ, শিক্ষাসূচীর অন্যতম অংশ

অধিক ফলন ও তার সমস্যা

নিরঞ্জন হালদার (সাংবাদিক)

খাদ্য সমস্যা নিয়ে এতদিন যে দুশ্চিন্তা ছিল, তা আমরা মোটামুটি কাটিয়ে উঠেছি। ত দুই বছরে খাদ্য শস্যের উৎপাদন যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে ঐ বৃদ্ধির হার বজায় রাখতে পারলে ১৯৭০ সালে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা যাবে বলে সরকারী মহল আশা করছেন। ১৯৬৬-৬৭ সালে আমাদের দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ৭ কোটি ৪২ লক্ষ টন, ১৯৬৭-৬৮ সালে তা বেড়ে ৯ কোটি ৫৬ লক্ষ টন হয়েছিল, বর্তমান আর্থিক বৎসরে কমপক্ষে ৯ কোটি ৩ লক্ষ টন হবে আশা করা গিয়েছিল। ধান, , বাজরা ভুট্টা জোয়ার প্রতিটি খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়লেও গমের ক্ষেত্রেই উৎপাদনের হার সবচেয়ে বেশী। ১৯৬৫-৬৬ সালে গমের উৎপাদন হয়েছিল কোটি ৪ লক্ষ টন, ১৯৬৬-৬৭ ও ৬৭-৬৮ সালে তা দাঁড়ায় যথাক্রমে ১ কোটি ৪ লক্ষ টন ও ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টন।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির এই পরিবেশ এমনি সৃষ্টি হয়নি। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত খসড়া চতুর্থ পরিকল্পনায় সরকারের নূতন কৃষি-নীতির কথা ঘোষিত হয়। স্থির হয়, যে সব এলাকায় সেচের ব্যবস্থা হয়েছে, সেই সব অঞ্চলে অধিক ফলনশীল বীজের ব্যবহার বাড়াতে হবে। উৎসাহটা সর্বত্র ছড়িয়ে না দিয়ে কয়েকটি এলাকায় কেন্দ্রীভূত করার কথা হয়। কারণ তখন দেশের কয়েকটি জায়গায় কৃষি উৎপাদন বাড়লে যেমন খাদ্য সমস্যার তীব্রতা হ্রাস করবে তেমনই ঐ সব এলাকার চাষীদের দেখাদেখি অন্যান্য অঞ্চলের কৃষকেরাও নতুন কৃষি পদ্ধতি কাজে লাগাতে উৎসাহিত কৃষকেরা অপর কৃষকের জমিতে সাফল্যের সঙ্গে ফসল হতে না দেখলে সরকারী কৃষি খামার দেখে বা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর উপদেশে নূতন পদ্ধতিতে চাষ কোন উৎসাহ বোধ করেন না। উৎপাদন বৃদ্ধির এই নূতন কৌশল কার্যকর করার জন্য একদিকে সেচ এলাকার দ্রুত সম্প্রসারণের কাজ আরম্ভ হল এবং অপরদিকে সার অধিক ফলশালী বীজ, কীটনাশক দ্রব্যাদি ও ঋণ সরবরাহ বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া হল। ১৯৬৭-৬৮ সালে ৬০.৩ লক্ষ হেক্টার জমিতে অধিক ফলনশীল বীজ ব্যবহার করা হয়েছিল ও ১৯৬৮-৬৯ সালে ৮৫ লক্ষ হেক্টর জমি অধিক ফলনশীল বীজ ব্যবহারের আওতায় আনার পরিকল্পনা করা হয়। এ বছর পাঞ্জাবে ২৫ লক্ষ একর জমিতে নূতন গমের চাষের পরিকল্পনা নেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত ২৭ লক্ষ একর জমিতে ঐ নূতন গমের চাষ হয়েছে। গত এক বছরে পাঞ্জাবে ৫ হাজার সেচকূপে বিদ্যুৎ সংযোগ ও ২ হাজার কিলোমিটার নূতন রাস্তার জন্য অধিক ফলনশীল গমের চাষ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। অধিক ফলনশীল বীজের ব্যবহার কেবল খাদ্য শস্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নেই, পাট, আখ, তুলা, আলুর ক্ষেত্রেও প্রসার লাভ করেছে। তবে পণ্যশস্যের ক্ষেত্রে অধিক ফলনশীল বীজের ব্যবহার এখনও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি।

গমের ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে মেক্সিকোর গম গবেষণা কেন্দ্রে উদ্ভাবিত অধিক ফলনশীল গম এবং ধানচাষের ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে ফিলিপিনের লাস বানোসে আন্তর্জাতিক চাল গবেষণা কেন্দ্রে উদ্ভাবিত আই. আর ৮। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এতদিন সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, সারের প্রয়োগ, কৃষি জমি বা ধান বোনা কিংবা রোয়ার ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং নূতন জাতের বীজ ব্যবহারের দিকেই নজর দেওয়া হয়েছে। ফিলিপিনের আন্তর্জাতিক গবেষণাকেন্দ্রে এক ধানের ফুলের রেণু অন্য ধানের রেণুর সঙ্গে মিশিয়ে নূতন জাতের ধান তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। সেখানে ১০ হাজার জাতের ধান নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। তাইওয়ানের টি দি-গিও-উ-গেন জাতের ধানের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের পেটা ধানের মিশ্রণে তৈরী হয়েছে ঐ আই আর ৮। এই নূতন জাতের ধান হতে ১২০ দিন লাগে, আগে লাগত ১৪০ থেকে ১৬০ দিন। ফলে আই আর ৮ অনায়াসেই বছরে তিন বার ফলানো যায়। নাইট্রোজেন সারকে এতদিন গাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হত। কিন্তু আই আর ৮ এ নাইট্রোজেন সারের প্রয়োগে ধানের গাছ বড় হয় না, কণার বৃদ্ধি ঘটিয়ে থাকে। এ জন্য সার কম দিলে আই আর ৮ এ ধান ভাল হয় না। এই নূতন জাতের ধান গাছও কিছুটা উঁচু হয় বলে অতি সহজেই ধানে পোকা লাগতে পারে। এজন্য আই আর ৮ চাষের সময় বীজের সঙ্গে এক ধরণের কীট নাশক ব্যবহার করতে হয়। ফিলিপিনের ধান গবেষণা কেন্দ্রে কীটের হাত থেকে আই আর ৮কে বাঁচাতে গিয়ে আর এক নতুন জাতের ধান আই আর ৫ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ইন্দোনেশিয়ায় এখন এই আই আর ৫ ব্যাপকভাবে ব্যবহারের চেষ্টা হচ্ছে। ধানের ক্ষেত্রে আই আর ৮ এবং তাই চুং, তাইনান প্রভৃতি বিদেশী জাত ছাড়া বিভিন্ন দেশী জাতের সংমিশ্রণে নূতন জাতের ধান তৈরীর চেষ্টা হচ্ছে। কোথাও বা আমন ধানকে বোরো বা আউস হিসাবে ব্যবহারের চেষ্টা চলছে। হাজার হাজার কৃষকেরা যেভাবে ধান গম অন্যান্য পণ্যশস্য চাষ করে এসেছে বর্তমানে তার পরিবর্তন ঘটছে। অধিক ফলনশীল বীজ ব্যবহার করতে গিয়েও অজস্র সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। সেই সমস্যা ও প্রতিকারের দিকে কৃষক ও সরকার সর্বদা সজাগ না থাকলে খাদ্যে স্বয়ম্ভর হওয়ার পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দেওয়া খুবই কঠিন হবে।

কৃষিও যে একটি শিল্প সে কথা আজও এদেশে পুরোপুরি স্বীকৃতি পায় নি.

ফলে কোন কারখানা স্থাপনের সময় কারখানা বা বাড়ি তৈরির মালমশলা, মিস্ত্রি বা দক্ষ কর্মীর সহজপ্রাপ্যতা, জল বিদ্যুৎ কাঁচা মালের সরবরাহ, পরিবহন ও উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার, কর্মীদের বাসস্থান ইত্যাদি সমস্যার কথা প্রথমেই ভেবে থাকি। কিন্তু এই ধরণের প্রশাসনিক দৃষ্টি ভঙ্গী থেকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্যাকে সচরাচর বিচার করা হয় না। অধিক ফলনশীল বীজ ব্যবহারের সময় বীজের সঙ্গে সেচের ব্যবস্থা, সার, কীট-নাশক দ্রব্য ও ঋণ সরবরাহের কথা ভাবতে হয় উৎপাদিত ফসল মজুত ও বিক্রীর দিকেও সরকারকে নজর দিতে হয়। কারণ নূতন জাতের বীজ চাষ করতে গিয়ে কৃষকের উৎপাদন খরচ বেড়ে যায় এবং ফসলের উপযুক্ত দাম না পেলে সে পরের বছর আর ফসল বাড়াবার চেষ্টা করবে না। ঠিক এই কারণে পাঞ্জাবের রাজ্য সরকার গমের উৎপাদন বাড়াবার জন্য সর্ব রকমের সাহায্য ছাড়া ফসল মজুত ও সরকার নির্ধারিত দামে খাদ্য কর্পোরেশন কর্তৃক বাজারে বিক্রীর জন্য আনীত সব গম কিনে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ফসলের উপযুক্ত দাম দেওয়ার ব্যাপারে এই ধরণের প্রচেষ্টা অন্য রাজ্যে দেখা যায়নি।

নূতন জাতের বীজ ব্যবহার করায় এখন একই জমিতে দুই বা তিনটি ফসল ফলানো হলে বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করলে চলে না, বিভিন্ন ধরণের ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের ব্যবস্থা রাখতে হয়। কিন্তু জলের ব্যবস্থা থাকলেই চলে না, জল ব্যবহারের চাবি কাঠিও জানতে হয়। নতুন জাতের ধানে ও গমে জল অনেক বেশী লাগে তবে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিমাণ জল লাগে। পুরানো জাতের গমে পাঁচবার জল দিতে হত, নূতন জাতের গমে বারো বারের মত জল দেওয়ার দরকার হয়। প্রায়ই দেখাযায় এই জল দেওয়ার ক্ষেত্রে একদিকে জলের অপচয় হয় এবং অপর-দিকে বেশী জলের জন্য ফসলেরও ক্ষতি হয়। মাটি থেকে শিকড়ের মাধ্যমে গাছের খাদ্য সংগ্রহের জন্য জলের দরকার। জমিতে সার যত বেশী দেওয়া হবে, মাটির সঙ্গে সারের মিশণের জন্য জলের প্রয়োজনও তত বেড়ে যাবে। শিকড়ের ঠিক নীচের স্তরের মাটি ভিজবার মত জল দরকার। বেশী জল দিলে তা নীচে চলে যাবে এবং মাটির উপরের স্তরও শক্ত হয়ে রোদ্রে মাটি ফেটে যাবে। তখন গাছের শিকড়ের নীচে না গিয়ে ফাকা দিয়ে সব জল নীচে চলে যাবে। এ ছাড়া মাটি থেকে গাছ যে জল গ্রহণ করে, তার অনেকটা বাইরের উত্তাপে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে বাতাসের সঙ্গে মিশে যাবে। গাছ যত বড় হবে ও বাইরের উত্তাপ যত বাড়বে। বাষ্পী ভবনের জন্য জলের চাহিদাও তত বেড়ে যাবে। এ জন্য বর্ষাকালে বা শীতকালে ধান চাষের জন্য যে পরিমাণ জল দরকার হয়, গ্রীষ্মকালে আই আর ৮ বা তাই চুং চাষ করতে গেলে তার চেয়ে অনেক বেশী জলের প্রয়োজন হবে--কাজেই ফলন বাড়াবার জন্য পর্যাপ্ত জল নয়, প্রয়োজনীয় জলের নিয়মিত সরবরাহ দরকার। অধিক ফলনশীল বীজের চারায় দুটি কারণে কীটের প্রকোপ সবচেয়ে বেশী। এতদিন এদেশে যে সব বীজ ব্যবহার করা হত। সেগুলি দেশী কীটের আক্রমণ প্রতিরোধে সক্ষম ছিল। নূতন জাতের বীজে কীটের আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা খুবই কম। তা ছাড়া আগে জমিতে একটা ফসল হত বলে জমি শুকিয়ে যাওয়ার সময় কীটগুলি ও মারা যেত। এখন অধিক ফলনশীল বীজের জন্য একই জমিতে বছরে দুটি বা তিনটি ফসল হচ্ছে এবং মাটিও আর্দ্র থাকছে। ফলে কীটগুলিও আর মরছে না। রোগ জীবাণুর মত কৃষি জমিতে কীটগুলিও পাকাপোক্ত হয়ে বংশ বৃদ্ধি করছে। প্রতি বছর ধান গাছে পোকার তাণ্ডব কেন বাড়ছে, কৃষকেরা তা বুঝতে পারেন না। ব্যাপারটি কৃষকদের নিকট পরিস্কার হলে, জমি চাষের সময় এবং পরে গাছে কীট-নাশক দ্রব্যের ব্যবহার অনেক বেড়ে যাবে।

সারের ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে অতিরিক্ত সার প্রয়োগের ফলে জমির উর্বরতা না বেড়ে তা হ্রাস পেতে পারে। গোবর বা কম্পোষ্ট মাটির সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু রাসায়নিক সার পুরো-পুরি মেশে না, জমিতে কিছুটা অবশিষ্ট পড়ে থাকে। ফলে প্রথম বছরে একটি জমিতে বিভিন্ন ধরণের সার যে পরিমাণে লাগার কথা। পরের বছর সেই পরিমাণ সারের দরকার হয় না। কোন জমিতে কোন সার কতটা প্রয়োজন। তা মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করেই জানতে হয়। দুঃখের বিষয় এ ব্যাপারে জন-সাধারণ বা সরকার কেউই সচেতন নন। যে সব এলাকায় অধিক ফলনশীল বীজের ব্যবহার বাড়ানো হচ্ছে, সেই সব এলাকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে কৃষি বিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থা করতে পারলে ঐ সব বিদ্যালয়-এর গবেষণাগারেই জমির মাটির গুণাগুণ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কারখানায় শ্রমিককে যেমন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কলা কৌশল শেখাতে হয় কৃষক-দেরও তেমনি অধিক ফলনের বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গে পরিচিত করানোর দরকার।

প্রোটীন-খাদ্য হিসেবে মাছের গুরুত্ব

সাধারণ হিসেবে দেখতে গেলে, খাদ্যের সমস্যা বিশ্ব জোড়া। তাই শস্য ও কৃষি-জাত অন্যান্য খাদ্য ছাড়াও আমিষ খাদ্যের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে। শুধু মাছ খাওয়ার বহর দেখলেই এর আন্দাজ পাওয়া যায়। এখন সারা বিশ্বে বছরে ৬ কোটী টন মাছ খাওয়া হয়। ১৯৮৫ সাল নাগাদ এই পরিমাণ ১০ কোটী টনে দাঁড়াবে বলে অনুমান। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক পরিকল্পনার আভাসে নির্ভর যোগ্য যে সব তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে, তাই হল এ অনুমানের ভিত্তি। অনুসন্ধানমূলক বিবরণীতে এই ধারণা প্রকাশ করা হয়েছে যে, মাছ খাওয়ার পরিমাণ ১৯৭৫ সালে ৭ কোটী টন এবং ১৯৮৫ সালে ১০ কোটী টনে দাঁড়াবে। এর তিনভাগের এক ভাগ অবশ্য পশু পক্ষীর খাদ্য 'ফীশমীল' হিসেবে কাজে লাগবে।

জালিয়ানওয়ালাবাগ

ডাঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে কিন্তু ভারতের আভ্যন্তরিক গোলমাল শেষ হয়নি। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন প্রথমে বঙ্গ ভঙ্গ উপলক্ষে সুরু হয় ক্রমে তা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে একটি বিপ্লবী দলও গড়ে ওঠে। অনেক গুপ্ত সমিতি দেশময় ছড়িয়ে পড়ে—এবং বোমা তৈরি, অস্ত্র সংগ্রহ, গেরিলা যুদ্ধপ্রণালী শেখা প্রভৃতির বন্দোবস্ত হতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই বিপ্লবীদল নানা রকমে ইংরেজ সরকারকে অতিষ্ঠ করে তোলে।

এই আন্দোলন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার প্রথম থেকেই নতুন নতুন অনেক আইন কানুন প্রনয়ণ করেন। যুদ্ধের সময় ভারত রক্ষা আইন নামে এক আইন তৈরি করা হয়। তাতে ভারতীয়দের ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই হস্তক্ষেপ করা হয়। এই নতুন আইন যুদ্ধশেষ হবার পর মাত্র ছয় মাস পর্যন্ত চালু থাকবে এরূপ স্পষ্ট নির্দেশ ছিল। কিন্তু যখন যুদ্ধ শেষ হ'ল তখন ভারত সরকার মনে করলেন যে এ আইন উঠে গেলে বিপ্লবীরা হয়ত আবার গোলমাল করবে। এই জন্য সরকার ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে বিপ্লবের অবস্থা কি এবং তা দমনের জন্য কোন নতুন বিধি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার কি না এ বিষয়ে তদন্ত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করলেন। এই কমিটির সভাপতি হলেন সার সিডনী রাওলাট নামে ইংলণ্ডের একজন বিচারপতি। আর অন্যান্য সভ্যদের মধ্যে ছিলেন দুজন ভারতীয় এবং দুজন ইংরেজ। সরকার এই কমিটির রিপোর্টের ওপর নির্ভর করে নতুন দুটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করলেন। এই দুইটি ১নং ও ২নং রাওলাট বিল নামে বিখ্যাত অথবা কুখ্যাত।

এই দুটি বিলের স্বরূপ দেখে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কিন্তু দেখা গেল যে ভারতরক্ষা আইনে জনগণের স্বাধীনতা যে পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল এই দুই বিলে তার চেয়েও অনেক বেশী খর্ব করা হয়েছে।

বলা বাহুল্য যে, এর বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবর্ষের সব রাজনৈতিক দল ও সকল শ্রেণীর অধিবাসীই তীব্র প্রতিবাদ ও আন্দোলন করেছিলেন। কিন্তু সরকার কর্ণপাত করেননি।

এই সময়ে মহাত্মা গান্ধী এই প্রতিবাদে যোগ দেওয়ায় এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'ল।

গান্ধীজী সত্যাগ্রহ ঘোষণা করার পূর্ব্বে বড়লাটের কাছে এই বিষয়ে চিঠি লিখলেন এবং শেষবারের মত তাঁকে অনুরোধ করলেন যাতে এই বিল আইনে পরিণত করা না হয়। কিন্তু বড়লাট তাতে কর্ণপাত করলেন না; বিলটি আইন সভায় পাশ হওয়া মাত্রই তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন করে, এটিকে তিনি আইনে পরিণত করলেন।

গান্ধীজী সত্যাগ্রহ সুরু করবার পূর্বে ঘোষণা করলেন যে এর সূচনার জন্য ৬ই এপ্রিল সারা দেশে 'হরতাল' প্রতিপালিত হবে। আগেকার এক ঘোষণা অনুযায়ী দিল্লীতে ৩১শে মার্চ এই হরতাল হয় এবং পুলিশের সঙ্গে ছোট খাটো সংঘর্ষও হয় এবং পুলিশ গুলি চালায়। ৬ই এপ্রিল সারা ভারতবর্ষে হরতাল অনুষ্ঠিত হয়—কিন্তু কোন স্থানেই কোন রকমে শান্তি ভঙ্গ হয় নি।

খুব সম্ভব গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী শান্তিপূর্ণভাবেই অনুষ্ঠিত হত কিন্তু সরকার তাতে বাদ সাধলেন। ৯ই এপ্রিল পাঞ্জাব সরকার অমৃতসরের দুইজন জনপ্রিয় নায়ক ডঃ সত্যপাল ও ডঃ কিচলুকে গ্রেপ্তার ও অন্তরীণ করেন। এতে পরদিন জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে ডেপুটি কমিশনারের বাংলোর দিকে অগ্রসর হয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ঐ দুই জননায়কের মুক্তির জন্য আবেদন করা। কিন্তু একদল সৈন্য হল-গেট-পুলের কাছে তাদের পথরোধ করে এবং নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালায়—তাতে কয়েকজন হত ও আহত হয়। এর ফলে জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে আসে এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে নানা নিষ্ঠুর আচরণ করে। তারা পাঁচ জন ইউরোপীয়কে হত্যা করে, কয়েকটি বাড়ী পুড়িয়ে দেয়, মিস শেরউড নামে একটি মিশনারী মেম সাহেবকে প্রহার করে ও অজ্ঞান অবস্থায় পথে ফেলে রেখে চলে যায়। কয়েকজন ভারতবাসী তাঁর সেবা শুশ্রুষা করে ও জ্ঞান ফিরে এলে তাঁর বন্ধুদের নিকট পাঠিয়ে দেয়। ওদিকে জনতা আবার হল-গেট-পুলের কাছে পৌঁছায় এবং সৈন্যরা আবার গুলি করায় ২০।৩০ জন নিহত হয়। জনতা টেলিগ্রামের তার কাটে এবং শহরের বাইরের দুটি রেল ষ্টেশন আক্রমণ করে।

১১ই এপ্রিল সহরের অবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল। সৈন্যদের গুলিতে নিহত ব্যক্তিদের মৃতদেহ নিয়ে যে মিছিল বের করা হয় তারা কোন রকম শান্তিভঙ্গ করে নি। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় সেনাপতি ডায়ার সসৈন্যে অমৃতসরে পৌঁছান এবং ডেপুটি কমিশনার তাঁর হাতে অমৃতসরে শান্তিরক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন।

পরের দিন থেকে সামরিক আইন ঘোষণা না করা হলেও সেনাপতি ডায়ার তদনুযায়ী কাজ আরম্ভ করলেন। তিনি নির্বিচারে বহুলোককে গ্রেপ্তার করলেন এবং এক আদেশ জারী করে কোন রকম সভা বা সমাবেশ নিষিদ্ধ করলেন। কিন্তু এই আদেশ ভালোভাবে চারিদিকে প্রচার না হওয়াতে অনেকেই এই নিষেধের কথা জানত না। একথা ডায়ার নিজেই পরে স্বীকার করেছিলেন। ১২ই এপ্রিল সন্ধ্যাবেলা জনসাধারণের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে পরের দিন জালিয়ানওয়ালা-বাগে একটি জনসভা হবে।

জালিয়ানওয়ালা বাগ নামক যে স্থানে সভা হয় সেটি বাড়ী দিয়ে ঘেরা একটি জায়গা এবং একদিকে তার একটাই ঢোকবার বা বেরোবার রাস্তা। ১৩ই এপ্রিল, বৈশাখী অর্থাৎ নববর্ষের দিন। বিকেলে যখন সভা আরম্ভ হয়েছে তখন একদল বন্দুকধারী সৈন্য ও কয়েকটি সাঁজোয়া গাড়ী নিয়ে জেনারেল ডায়ার সভাস্থলে পৌঁছলেন। এই প্রবেশ পথে একটি উঁচু জায়গায় ডায়ার সৈন্য সমাবেশ করলেন। সভার লোকসংখ্যা দশ হাজারের ওপর, এর মধ্যে অনেক নারী শিশু ও বালক ছিল—সকলেই নিরস্ত্র। তথাপি ডায়ার প্রবেশ পথে সৈন্য সমাবেশ করেই গুলি চালাতে আদেশ দিলেন। যেখানে লোকের ভীড় বেশী সেই দিকেই তিনি গুলি চালাবার আদেশ দিলেন। প্রায় দশ মিনিট ধরে ১৬৫০টি গুলি ছোঁড়া হয়। গুলি চালানো আরম্ভ হওয়া মাত্রই সভা ভেঙ্গে যায় কিছু লোক শুয়ে পড়ে, কিছু পাঁচিল বেয়ে পালাতে বৃথা চেষ্টা করে, কিছু দরজা দিয়ে বাইরে বেরুবার উদ্দেশ্যে সেই দিকে ছুটে আসে কিন্তু ডায়ারের সৈন্যেরা গুলি চালাতেই থাকে—যতক্ষণ না গুলি ফুরিয়ে যায়। সহস্রাধিক হতাহতের কোন ব্যবস্থা করাও তিনি দরকার মনে করলেন না। ফিরে গিয়েই তিনি আর এক আইন জারী করলেন সন্ধ্যার পরে কেউ বাড়ী থেকে বেরুতে পারবে না—বেরুলেই গুলি করা হবে। যে সব হতভাগ্য হতাহত হয়ে পড়েছিল তাদের আত্মীয়স্বজন যে তাদের কোন খোঁজ খবর করবে সে সম্ভাবনাও রইল না।

সভ্য জগতের ইতিহাসে গবর্ণমেন্ট, অধিকৃত দেশের জনগণের উপর এরূপ নির্মম ব্যবহার করেছে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

গভর্ণমেন্ট প্রথমে মৃতের সংখ্যা বলেছিলেন ২৫০, ঘটনার চার মাস পরে অনুসন্ধানের ফলে এই সংখ্যা দ্বিগুণ করা হয়। কিন্তু ঘটনার অব্যবহিত পরে যাঁরা অনুসন্ধান করেন তাঁদের মতে মৃতের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। আহতের সংখ্যা ছিল দু' তিন হাজার। এরা সারা রাত্রি এবং পরের দিনও অনেকক্ষণ বিনা

সাধারণ অসাধারণ

দেশের নানা প্রান্তে যে সব দেশদরদী নরনারী লোকচক্ষুর অন্তরালে দেশগড়ার কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন এখানে তাঁদের কাহিনী থাকবে।

মুর্শিদাবাদ জেলায় আলু উৎপাদনে রেকর্ড

মুর্শিদাবাদ জেলার সালুযাডাঙ্গার মোঃ নাসিরুদ্দীন মোল্লা এতদিন চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী চাষবাস করে আসছিলেন। জমিতে ভালো ফসল পেলে খুসী হতেন, ফসল ভালো না হলে নিজের ভাগ্যের দোষ দিতেন। কিন্তু ২৬ বছরের এই যুবকটি এই বছরে আলুর চাষ করে আশাতিরিক্ত ফসল পেয়েছেন। তাঁর এই সাফল্যে মুর্শিদাবাদ জেলার অনেক চাষীই অবাক হয়ে গেছেন। অবশ্য তিনি নিজেও কম অবাক হন নি।

মোঃ নাসিরুদ্দীন মোল্লা তাঁর ১০ কাঠা জমি ভাগ করে, তাতে বেশী ফলনের আলুর চাষ করেন। তিনি কুফরি চন্দ্রমুখী এবং কুফরি সুন্দরী এই দুই জাতের আলুর বীজ লাগান।

এই বেশী ফলনের আলুর চাষ করা সম্পর্কে কৃষি-বিভাগ তাঁকে যে সব পদ্ধতি অনুসরণ করতে বলেন, তিনি সেগুলি সব মেনে চলেন। তিনি যে সব সার ও কীটনাশক ব্যবহার করেন সেগুলি হ'ল —প্রথম বারে।—

(ক) এ্যামোনিয়া সালফেট—২৫.৫কি: গ্রাম
(খ) সুপার ফসফেট—৪৭.৫০ কি. গ্রাম
(গ) এম. পটাস—১৫ কি: গ্রাম।

দ্বিতীয় বারে—

(ক) ইউরিয়া—৬ কি: গ্রাম।
(খ) কীটনাশক—ব্রাইটেক্স—১ কি. গ্রাম
(গ) ডিডিটি—৬০০ গ্রাম

তাঁর নিজের নলকূপ থেকেই প্রতি ১৬ দিনে ৬ বার করে জলসেচ দিতেন। তাঁর মোট আলুর বীজ লেগেছিলো ৬০০ গ্রাম।

এই চাষ সম্পূর্ণ করার জন্য তাঁর মোট ব্যয় হয়েছিলো ২৪৭ টাকা ৯ পয়সা।

যে পাঁচ কাঠা জমিতে তিনি কুফরি চন্দ্রমুখী চাষ করেন তাতে মোট ফসল হয় ৯.৮৭ কুইন্টাল অর্থাৎ ২৬ মণ। অন্য যে পাঁচ কাঠায় কুফরি সুন্দরী আলু লাগান, তাতে মোট ফলন হয় ১৪.৪৮ কুইন্টাল অর্থাৎ ৩৮ মণ ৩৫ সের। সব চাইতে বড আলুটির ওজন ছিলো ৬৫০ গ্রাম।

এই একই জমি থেকে গত বছর তিনি প্রতি কাঠায় ৭ মণ আলু পেয়েছিলেন।

বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী তাঁর এই আলুর ফসলের মোট মূল্য হ'ল ৬৮৭ টাকা ৮৮ পয়সা।

আধুনিক কৃষি পদ্ধতি প্রয়োগ করে তিনি তাঁর সামান্য এই দশ কাঠা জমি থেকে যথেষ্ট লাভ করতে সক্ষম হন। তিনি দুটি কৃষি প্রদর্শনীতে পুরস্কার পান। তা ছাড়া ১৯৬৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা সব চাইতে বেশী পাট উৎপাদন করেন তিনি তাঁদের অন্যতম ছিলেন।

রাজারহাট-ব্লকে দো-ফসলী চাষ পদ্ধতি প্রবর্তন

২৪ পরগণার রাজারহাট ব্লক এলাকায় যিনি প্রথম প্রচুর-ফলনের ধানের চাষ সুরু করেন এবং বছরে দুটো করে ফসল তোলেন তাঁর নাম হল কাত্তিক চন্দ্র পাল।

গত খারিফ মরসুমে, তিনি আই আর —৮ (আমন) বীজ বুনেছিলেন এবং একর প্রতি ৭৫ মণ ধান গোলায় তুলেছিলেন। আমনের ফসল ঘরে তোলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বোরো চাষের জন্যে তাইচুং-নেটিভ-১ বোনেন। ১৯৬৮-র মে মাসের শেষ নাগাদই সে ফসল কাটবার উপযুক্ত হয়ে গেল। অর্থাৎ তিনি এক বছরে দুটো ফসল পেলেন।

চিরাচরিত পদ্ধতিতে চাষবাস করে বছরে তিনি যে ফসল পেতেন, নতুন ধারা প্রবর্তনে এখন তিনি সেই পরিমাণের তিনগুণ ফসল ঘরে তুলছেন॥

শ্রীকাত্তিক পালের উদাহ অন্যান্য কৃষকদেরও নতুন নতুন পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত করছে॥

চার একর জমিতে আট একরের ফসল

পশ্চিম বাংলার ২৪ পরগণার গোয়ালবাথানে শ্রীগোপীকৃষ্ণ মজুমদারের চার একর জমি আছে। এই জমির উপর বছরের পর বছর খরচের মাত্রা বেড়েছে অথচ ফসলের পরিমাণ কমেছে বই বাড়েনি। অবশেষে তাঁদের ঐ অঞ্চলে প্রচুর ফলন বীজের চল হওয়ায় মজুমদার মশাই আশার আলো দেখতে পেলেন।

জমিটুকু থেকে যে কোনোও প্রকারে আয় বাড়াতে মনস্থ তিনি করলেন। তাই তিনি তাইচুং নেটিভ—১ এবং আই আর ও দুলারী ধানের বীজ বুনলেন। তাঁর আশা বিফল হ'ল না। অচিরে এই জমি থেকেই তিনি একর প্রতি ৭০ মণ ধান ঘরে তুললেন। জমিতে জলসেচের জন্য একটা অগভীর কূপ খুঁড়ে তার সঙ্গে তিনি একটা ডিজেল ইঞ্জিন জুড়ে দিলেন।

মজুমদার মশাই এখন বছরে দুটো ফসল তুলছেন। শুধু ধানের চাষেই তিনি সন্তুষ্ট নন। গত মরসুমে এই জমিতে মেক্সিকান গমের বীজ ব্যবহার ক'রে তিনি ৪৫ মণ গম পেয়েছেন।

এই পরীক্ষার সাফল্যে উৎসাহিত শ্রীমজুমদার ফলের চাষেও হাত পাকাবার চেষ্টা করেছেন। সে পরীক্ষাতেও মজুমদার মশাই সফল হয়েছেন। গত বছরে গাইঘাটা ব্লক অফিসে যে কৃষি-মেলার আয়োজন করা হয় তাতে তাঁর বাগানের পেঁপে ও কলা প্রশংসা পত্র পেয়েছে।

শ্রীমজুমদারের এই সাফল্য ও তাঁর উদ্যম, ঐ অঞ্চলের অন্যান্য চাষীদেরও কৃষি উন্নয়নে উৎসাহিত করেছে এবং তাঁরাও চাষবাসের উন্নতি ক'রে আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন করার চেষ্টা করছেন।

ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে নতুন জীবনের সাড়া

নেফা কন্যা—পিঠে বোঝা মুখে হাসি

সুদূর কেরালার কয়েকটি ফল হিমালয়ের এই পার্ব্বত্য অঞ্চলে ফলানো হচ্ছে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে এক নতুন জীবন গড়ে উঠছে, চারিদিকে পরিবর্তনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। চীনা আক্রমণের পর নূতন যে সব রাস্তা তৈরি করা হয়েছে সেগুলি এই দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। এই অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনও খুব দ্রুত গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে।

কামেং জেলার সদর বমডিলা চীনা আক্রমণের সময় খুব বিখ্যাত হয়ে পড়ে। এই পার্বত্য সহরটীর পাশে, সেরা গ্রামটাতে এলে, এই পরিবর্তনটা অত্যন্ত সহজে বুঝতে পারা যায়। মাত্র দুই বছর পূর্বে এই গ্রামটির পত্তন হয়। গ্রামটির লোক-সংখ্যা হল ৩০০। ৯২টি মোন্‌পা ও শেরডু কপেন পরিবারকে, তাদের যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করে, এই গ্রামটির পত্তন করা হয়।

এরা চিরকাল ঝুম চাষ করতো। পাহাড়ে খানিকটা জায়গায় আগুন লাগিয়ে পরিষ্কার করে মাটিটাকে অল্প একটু খুঁড়ে ওরা সেখানে শস্যের বীজ বুনে দেয়। এই রকম চাষে প্রথম দুই এক বছর খুব ভালো ফসল হয়। তারপর ফসলের পরিমাণ কমে এলেই ওরা সেই জায়গা

যাযাবর জীবন এঁরা পরিত্যাগ করেছেন

শিক্ষারত নেফার শিশু

তাঁতের সামনে

ছেড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে আবার এই পদ্ধতিতে ফসল ফলাতে সুরু করে। এদের স্থায়ীভাবে বাস করিয়ে নতুন নতুন কৃষি পদ্ধতি শেখানো হয়। এই রকম জায়গায় কফির চাষও ভালো হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বমডিলার কাছে একটি কৃষি খামারে কফি গাছ লাগিয়ে ভালো ফল পাওয়া গেছে। এই গ্রামটিতে এখন দুটি হাঁস মুরগী পালন কেন্দ্র, একটি শূকর পালন কেন্দ্র ও একটি দুগ্ধ কেন্দ্র আছে।

এই গ্রামের একজন অধিবাসী দুই বছর পূর্বে কুটির শিল্প হিসেবে কাগজ তৈরী করতে সুরু করেন। বার্চ গাছের মতো এক রকম গাছের ছাল দিয়ে তিনি এই কাগজ তৈরী করেন। শাস্ত্রাদি লেখার জন্য শত শত বছর ধরে হালকা বাদামী রঙের যে কাগজ ব্যবহৃত হয়ে আসছে এগুলি সেই রকম কাগজ। ভুটানেও এই ধরণের কাগজ তৈরী করা হয়। গত বছর এই সেরা গ্রামের দুটি পরিবার প্রায় ১৮০০০ টাকার কাগজ তৈরী করে। এই কাগজের কিছুটা স্থানীয় অধিবাসীদের ব্যবহারে লাগে, কিছুটা রপ্তানি করা হয়।

গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে বেশীর ভাগই ফলের চাষ করেন। সিকিম থেকে আপেল গাছের চারা এনে, উত্তর পূর্ব প্রান্তের এই অঞ্চলে লাগানো হয়েছে এবং সেগুলি বেশ বড় হয়ে উঠেছে। তাছাড়া নানা ধরণের শাক সব্জিও উৎপাদন করা

হচ্ছে। গত বছর একমাত্র কামেং মহকুমা ২৬০০০ টাকার শাক সবজি উৎপাদন করছে। এর ফলে গ্রামের অধিবাসীরা বেশ কিছু বাড়তি টাকা পেয়েছেন।

কামেং জেলায় মোট গ্রামের সংখ্যা হল ৩৩৯ এবং লোক সংখ্যা ৭০,০০০। এই জেলায় উন্নয়নমূলক যে সব কাজ হচ্ছে তার নিদর্শন হিসেবে সেরা গ্রামের উল্লেখ করা হল।

প্রকৃত পক্ষে বমডিলা গ্রামটী ১৯৫৩ সালেই মাত্র মানচিত্রে স্থান পায়। তখনও এখানে স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা খুবই কম ছিলো। বর্ত্তমানে এটি ৪০০০ লোকসংখ্যা বিশিষ্ট একটি শহর। এখানে এখন একটি হাই স্কুল, একটি হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল এবং বহির্বিভাগ ও অস্ত্রোপচার কক্ষসহ ২০টি শয্যার একটি হাসপাতাল রয়েছে।

তা ছাড়া এখানে একটি প্রশিক্ষণ তথা উৎপাদন কেন্দ্রও স্থাপন করা হয়েছে। এই কেন্দ্রে কার্পেট ও বস্ত্র বয়ন, ছুতোর ও কামারের কাজ শেখানো হয়। এই সব সুযোগ সুবিধে এখানকার অধিবাসীদের জীবনে অনেক বৈচিত্র্য এনেছে।

কামেং জেলার পশ্চিমে সিয়াং জেলাটি অবশ্য এই অঞ্চলে সব চাইতে বেশী অগ্রগামী। এই জেলার পাশিঘাটে নেফার প্রথম ডিগ্রী কলেজ স্থাপিত হয়। জেলা-সদর আলঙ্গে একটি হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে এবং সেটিতে প্রায় ২০০ ছাত্র পড়াশুনা করে। এই স্কুলটি আদি ও গালং উপজাতিদের মধ্যে এতো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যে অন্যান্য জায়গাতেও এই রকম স্কুল স্থাপনের জন্য বেশ কিছুদিন ধরে দাবি জানানো হচ্ছে। আলং সহরে বিদ্যুৎ শক্তি ও কলের জল আছে এবং ৪০টি শয্যার সুসজ্জিত একটি হাসপাতাল রয়েছে।

আলঙ্গে শিগ্‌গীরই "ডোনী-পোলো" বা সূর্য্যচন্দ্রের একটি মন্দির স্থাপন করা হবে। একেবারে উত্তরতম অঞ্চল ছাড়া আর সর্বত্রই সূর্য্যচন্দ্রের পূজা করা হয়। উত্তরতম অঞ্চলে লামা ধর্ম অনুসরণ করা হয়। সিয়াং, সুবনসিরি এবং লোহিত জেলায় সম্প্রতি প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়ে বৈষ্ণব মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। তাতে মনে হয় অতি প্রাচীনকালেও এই অঞ্চলে চন্দ্র সূর্য্যের পূজা প্রচলিত ছিল।

গালং এবং মিনিয়ং উপজাতিসহ আদি উপজাতিরাও ঝুম চাষের অভ্যাস পরিত্যাগ করছে। বর্ত্তমানে ১৪,৯৭৫ একর জমিতে স্থায়ী-চাষ করা হচ্ছে এবং জেলার প্রায় ৪৫০০০ অধিবাসীর দানাশস্যের চাহিদা মেটানো হচ্ছে। এই জেলায় ২৫টি ছোট জলসেচ ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হয়েছে। পচা সার এবং বেশী ফলনের দানও কৃষক-গণের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

আধুনিকতার নিদর্শন বিদ্যুৎ শক্তিও এখানে এসে গেছে। ৮টি গ্রামে বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করা হচ্ছে। ১০০ কিলো-ওয়াটের একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রও তৈরী করা হচ্ছে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত এজেন্সীর কিছু অঞ্চলের আবহাওয়ার সঙ্গে কেরালার আবহাওয়ার মিল থাকায় কিছু লোক, গোল মরিচের চাষ করতে উৎসাহী হন এবং তাতে সফল হন। এখানে দারচিনি আনারস এবং কমলালেবুও ভালো হয়। কলার চাষ ক্রমশঃ বাড়ছে। কেরালা থেকে কয়েক ধরণের কলা এনে এখানে লাগানো হয় এবং এখানকার মাটিতে সেগুলি বেশ ভালো হয়ে উঠছে। একজন তো প্রতি একরে ৫ হাজার টাকার কলা ফলিয়েছেন। সুদূর কেরালার কয়েক রকমের ফল হিমালয়ের কোলে নতুন আসন পেয়েছে।

ফসল তোলায় যন্ত্রের ব্যবহার

দেশে সবুজ বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে সাফল্য লাভ করার পর এবং একই ক্ষেতে একাধিক ফসল তোলার পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করার পর ফসল কাটা, মাড়াই ও ঝাড়াই-এর কাজে যন্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশই বেশী করে অনুভব করা যাচ্ছে। সম্প্রতি পাঞ্জাবে, শতদ্রু তীরে ফিরোজের কাছে একটি খামারে জন্ ডীয়ারী স্বয়ং-ক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে কীভাবে ফসল তোলার সমস্ত কাজ আপনা আপনি হতে পারে তা দেখানো হয়।

যন্ত্রটি ক্রমানুয়ে ফসল কেটে, মেড়ে বেছে ছাঁটা শস্য থলিতে ভরে দেয়। খানিকক্ষণ পরে যন্ত্রটি আপনা আপনি শস্যের থলিগুলি একটা ট্রেলারে বসিয়ে দেয়। অল্প খরচে এই কাজ দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে সুসম্পন্ন হয়।

গম বাজরা ও জোয়ারের ফসল তোলার এই যন্ত্রটি খুবই উপযোগী। এর সঙ্গে অন্য যন্ত্রাংশ জুড়ে ধান ও ভুট্টাও অমনি ক'রে কেটে ঝেড়ে নেওয়া যেতে পারে।

একটি বৃটিশ ফার্ম সার ভালো করে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ৯ মীটার পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়ার একটা যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে।

ক্ষেতখামারে যত রকমের সার ব্যবহার করা হয় তার সবগুলিই জমিতে ছড়িয়ে দেওয়া যাবে এই যন্ত্রের সাহায্যে।

যন্ত্রের আকার আধখানা চোঙার মত। সামনের দিকে তার একটি মোটর লাগানো আছে। তারই গায়ে লাগানো থাকে দুটো বড় ঘাস কাটার তরোয়ালের মত অংশ আর দুটো প্রক্ষেপক।

যন্ত্রটি গঠনে ও আকারে ভারী। চট করে এর মেরামতির দরকার না পড়ে সেইভাবে এটি তৈরি। মোটর (চালকযন্ত্র) লাগানো অংশগুলি সামনের ফলকটার সঙ্গে সংযুক্ত নয় এবং এটা এমনভাবে তৈরি যে কোনোও যন্ত্রাংশের গায়ে সার লাগে না। সার ভাঙবার বা ছড়িয়ে দেওয়ার যন্ত্রাংশ-গুলো খুলে বদলে নেওয়া যেতে পারে। তা ছাড়া যে কোনোও দিক থেকে এর খোলের মধ্যে সার ভরা চলে এবং এক সঙ্গে অনেকখানি সার ভর্ত্তি ক'রে দিলেও যন্ত্রের কাজ ব্যাহত হয় না।

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের কৃষি সমস্যা

গৌরাঙ্গ চন্দ্র মোহান্ত

পর পর তিনটি যোজনার কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় কৃষির ক্ষেত্রে তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। এর অন্যতম কারণ হল আজও আমরা কৃষকদের মধ্যে এমন অনুপ্রেরণা সঞ্চার করতে পারি নি যা তাঁদের কৃষির উন্নয়ন সম্বন্ধে আরও বেশী সচেতন করে তুলতে পারে।

কৃষির ক্ষেত্রে এই অনগ্রসরতার কারণগুলি আলোচনা করা যাক। কৃষির উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট অর্থের সংস্থান করা হয় না। শতকরা প্রায় ৯০ জন কৃষকই উৎপন্ন শস্যের মূল্যের শতকরা ১০ ভাগও কৃষির উন্নতির জন্যে ব্যয় করেন না বা করতে পারেন না।

রাসায়নিক সার ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় না। এই রাজ্যে শতকরা মাত্র দুজন কৃষক রাসায়নিক সার ব্যবহার করেন। অনেকে অজ্ঞতাহেতু সার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না। অনেকের আবার কুসংস্কার যে রাসায়নিক সার ব্যবহারে জমি নষ্ট হয়। জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায়। কুসংস্কার কারুর কারুর ক্ষেত্রে এত দৃঢ়মূল যে তারা রাসায়নিক সার ব্যবহারের নামে শিউরে উঠেন।

কৃষির উন্নয়নের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করা হয় না। অধিকাংশ কৃষকই মান্ধাতার আমলের সেই ভোঁতা লাঙল আর বলদ চাষের কাজে ব্যবহার করেন। ফলে জমি সুষ্ঠুভাবে কর্ষিত হয় না, শস্যের গোড়ায় প্রচুর পরিমাণে আলো বাতাস লাগে না এবং চারাগুলি বাড়তে পারে না, সতেজ হয় না এবং ফলনও ভাল হয় না। এ রাজ্যে শতকরা বোধহয় একজন কৃষকও ট্রাকটর, থ্রেশার ইত্যাদি ব্যবহার করেন না। জলসেচের অভাবে এ রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চলেই সেচের কোন রকম সুযোগ সুবিধা নেই। পুকুর, খাল, বিল এবং নদীর কাছাকাছি জমিগুলোতেই কেবল সেচ দেওয়া যায়। অথচ ভাগিরথী, মহানদী, আত্রেয়ী, যমুনা, দামোদর, তিস্তা ইত্যাদির মতো অনেকগুলি ছোট বড় নদনদী এ রাজ্যের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে।

যোজনাগুলিতে সেচের উন্নয়ন সম্পর্কে অনেক প্রকল্প থাকলেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়নি। ফলে এই রাজ্য জলসেচের ব্যাপারে অনেকখানি পিছিয়ে আছে। সরকারি ফার্মগুলোতে অবশ্য জলসেচের ব্যবস্থা রয়েছে। জনসাধারণ সেই রকম কোন সুযোগ সুবিধা পান না। ফলে এ রাজ্যের পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে এক বছর অনাবৃষ্টি হলে কৃষকদের মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকতে হয়।

উন্নত ধরণের বীজ ব্যবহৃত হয় না। যে সব বীজের ফলন খুব বেশী হয় অধিকাংশ কৃষকই তা ব্যবহার করেন না। যেমন উন্নত ধরনের ধানের বীজ হিসাবে আমরা জয়া পদ্মা ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারি।

রোগ বীজাণুর হাত থেকে শস্য বাঁচানোর বিশেষ কোনোও প্রচেষ্টা নেই। শস্য রোপণের পর কৃষকরা ভাবেন তাঁদের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে। তখন তাঁরা দিন গুনতে থাকেন কবে ফসল পাকবে এবং তাঁরা তা ঘরে তুলে আনবেন। ইতিমধ্যে নানা রকমের কীট পতঙ্গ বা রোগ বীজাণু চারাগুলিকে আক্রমণ করলেও সে বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ ছাড়া সাধারণত তাঁরা বিশেষ কিছু করেন না। বরং তাঁদের ভূমিকা যেন দর্শকের মত। শস্যের এই সমুহ ক্ষতিকে তাঁরা নিজেদের দুর্ভাগ্য বলে মেনে নেন। এ রাজ্যের শতকরা ৫ জন কৃষকও যদি রোগ বীজাণুর হাত থেকে শস্য রক্ষার চেষ্টা করেন তো যথেষ্ট। এ ছাড়া শস্য ঘরে তুলে আনবার পর আর এক নতুন উপদ্রবের আবির্ভাব ঘটে। সেটি হল ইঁদুর। শস্য ভালভাবে গুদামজাত করবার ব্যবস্থা না থাকায় শস্যের প্রায় দশ ভাগই ইঁদুরের পেটে যায়। অথচ কৃষকদের ইঁদুর মারবার উৎসাহ নেই। অনেকে মনে করেন ইঁদুর মারা পাপ।

প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণ ঋণ দেবার সুষ্ঠু ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। সরকার যে পরিমাণ ঋণ দেন তা কৃষকের প্রয়োজনের পাঁচ শতাংশও নয়। ফলে জনসাধারণ বাদ বাকি প্রয়োজনীয় ঋণ গ্রামের মহাজনদের কাছ থেকে অনেক বেশী সুদে সংগ্রহ করেন। তারপর ফসল পাকবার পর সুদ সহ ঋণ শোধ ক'রে যা ঘরে ওঠে তার পরিমাণ দাঁড়ায় অতি সামান্য। এমতাবস্থায় সংসার চলে না। এ ছাড়া সরকারি কৃষি ঋণ সাধারণত উচচ বিত্ত ও মধ্যবিত্ত কৃষকরাই পান। অথচ এঁদের মধ্যে হয়তো বেশীর ভাগের কৃষি ঋণের কোন প্রয়োজনই নেই এবং তারা ঐ ঋণ নেবার পর চড়া সুদে আবার ঐ টাকা নিম্নবিত্ত কৃষকদের মধ্যেই বিলি করেন। নিম্ন বিত্ত কৃষকরা ঋণ সংক্রান্ত জটিল তত্ব বোঝেন না, বোঝবার চেষ্টাও করেন না। অন্যদিকে সরকারি উদ্যোগে ঋণ দেবার বিভিন্ন উৎসের কথা জনসাধারণকে বুঝিয়েও বলা হয় না। অর্থাৎ নানা কারণে অধিকাংশ কৃষকই ঋণ থেকে বঞ্চিত হন।

সরকারের প্রচার বিভাগও কৃষির ব্যাপারে জনসাধারণের মনে তেমন সাড়া জাগাতে পারেন নি। বছরে হয়ত একআধবার দু একটি গ্রামে কৃষি ছবি দেখানো হয় কিন্তু তাতে যে কৃষকদের উৎসাহ বাড়ে তা মনে হয় না। বরং ছবিগুলি কৃষকদের কাছে আনন্দ লাভের একটা উপকরণ মাত্র হয়ে থাকে।

এই আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে কৃষকদের নিরক্ষরতাও কৃষি সমস্যার একটা অন্যতম কারণ। বস্তুত বয়স্কগণের শিক্ষার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্গে সারা দেশে এমন অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে যাতে কৃষকরা উন্নততর বীজ, রাসায়নিক সার এবং উন্নততর ও বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রণালী প্রয়োগ করেন। রাজ্যের সর্বত্র জল-

সেচের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনাসূচী গ্রহণ করতে হবে। নিম্নবিত্ত কৃষকদের প্রয়োজনীয় ঋণ কম সুদে দিতে হবে। রাসায়নিক সার, উন্নততর বীজ, পোকার হাত থেকে শস্যকে রক্ষার জন্য ব্যবহৃত স্প্রে প্রভৃতি প্রয়োজনবোধে বিনামূল্যে সরবরাহ করতে হবে। কৃষকরা যাতে উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য মূল্য পান সেদিকে নজর রাখতে হবে। একই জমিতে দুই বা তদধিক ফসল ফলানোর ব্যাপারে কৃষকদের উৎসাহিত করতে হবে। সর্বোপরি নজর রাখতে হবে কোন জমি অনাবাদী অবস্থায় পড়ে না থাকে।

এ ছাড়া সরকারের কৃষি প্রচার বিভাগকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। এই সমিতিতে কৃষি বিশেষজ্ঞ, ইঞ্জিনীয়ার এবং বর্তমান কৃষি প্রণালীতে শিক্ষিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দুঃখের বিষয় দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের অধিকাংশই চাষবাসকে অসম্মানকর ভেবে দূরে সরে থাকেন। তাঁদের উপলব্ধি করা দরকার যে কৃষি বিপ্লব ঘটাতে গেলে তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে কৃষি কার্য অন্যান্য কাজের মতই সম মর্যাদা সম্পন্ন। যদি আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে পারি তবেই পশ্চিম বাংলা তথা ভারতের কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটতে পারে।

সারা বিশ্বে প্রোটীনযুক্ত খাদ্যের চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে। মানুষের খাদ্য তালিকায় যে সব জল স্থল ও উভচর জীবের নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তাদের মোট সংখ্যা অনেক।

নদী, পুকুর, খাল-বিল ও সমুদ্রের মাছ, চিংড়ী, কাঁকড়া পুরোপরি ধরা পড়ে না। ধরা পড়লে বছরে সেগুলির মোট পরিমাণ দাঁড়াতো ১৪ কোটী টন। বিভিন্ন কারণে বহু মাছ আহার্য তালিকার বাইরে রাখা হয়েছে; তা না হলে আহার্য হিসেবে ধরবার উপযুক্ত মাছের গড়পড়তা পরিমাণ বছরে দাঁড়াত ২০ কোটী টন।

জনগণের চেষ্টায় দ্বিগুণ সেচের জল

জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় রাজস্থানের ডুঙ্গারপুরের পাথুরে অঞ্চলে সবুজের সমারোহ দেখা দিয়েছে। এই জেলায় কুয়োর বা জলের অভাব কোন দিনই ছিল না, কিন্তু সেই জল তুলে জমিতে দিতে হলে যে সব ব্যবস্থার প্রয়োজন তারই ছিল অভাব, জেলার উপজাতীয় অধিবাসীরা গরীব কাজেই অর্থের অভাবটাই ছিল ওদের বড় অভাব। পারশিক চক্রের (অর্থাৎ যে চাকা দিয়ে কুয়ো থেকে জল তুলে জমিতে দেওয়া যায়) সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ১৯৬৮-৬৯ সালে যে অভিযান চালানো হয় তাতে এগুলির সংখ্যা এক বছরে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। এর ফলে সেচের ক্ষমতাও শতকরা ৪০ ভাগ বেড়ে গেছে। এতে আরও ৮০০০ টন বেশী খাদ্য শস্য ফলানো যাবে। এই ৮০০০ টন খাদ্যশস্য ৫০,০০০ লোকের এক বছরের খাদ্যের সংস্থান করবে। এই অভিযানে ব্যয় হয়েছে ২৪.০৫ লক্ষ টাকা, এর মধ্যে জনসাধারণ, দৈহিক পরিশ্রম করে যে সহযোগিতা করেছেন তার মূল্য হ'ল ১০ লক্ষ টাকা।

এই অভিযানের সাফল্য, একটি স্বপ্নকে সফল করে তুলেছে। একটি উপজাতীয়ের বাসভূমি এই জেলাটির চতুর্দিকেই এখন কর্মচাঞ্চল্য, প্রত্যেকের চোখে মুখেই যেন একটা নতুন বিশ্বাস।

১৯৬৮ সালের ২৩শে মার্চ যখন একদল সরকারী কর্মচারী এবং কিছু সংখ্যক বেসরকারী ব্যক্তি ১৫০০ পারশিক চক্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত করলেন তখন থেকেই প্রকৃতপক্ষে এই অভিযান সুরু হয়। প্রাথমিক প্রয়োজন গুলি সম্পূর্ণ করার পর, স্থির হয় যে উপজাতীয় কৃষকগণকে ৪০০ টাকা করে সাহায্য দেওয়া হবে এবং বাকি টাকাটা ঋণ হিসেবে দেওয়া হবে। তবে নাম মাত্র চাঁদা হিসেবে কৃষকগণের কাছ থেকে ৫০ টাকা নেওয়া হবে। নগদ টাকায় সাহায্য না দিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেওয়া হবে, এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় অভিযানের সাফল্য আরও সুনিশ্চিত করা হল। অনেক বেশী সংখ্যায় চাকা তৈরি করা হবে বলে সেখানেও ব্যয়ের মাত্রা কিছুটা কমে গিয়ে সেচ দেওয়ার এই পারশিক চক্রের মূল্য ৮৫০ টাকা থেকে ক'মে ৭০০ টাকায় দাঁড়ালো। সরকারী কৃষি কারখানায় মাত্র ৫ মাসে ৩১০০ পারশিক চক্র তৈরি করা হ'ল। বাকীটা তৈরি করলেন স্থানীয় ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদকগণ।

সেচের এই চক্র পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েত সমিতিগুলোতে নিজেদের নাম রেজেষ্ট্রী করানোর জন্য গ্রামবাসীর সংখ্যা বাড়তে থাকায় উৎপাদনের পরিমাণ আরও বাড়ানো প্রয়োজনীয় হয়ে পড়লো।

১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে ঐ অঞ্চলে পারশিক চক্রের প্রথম চালান এসে পৌঁছুলো। ট্রাকে করে জয়পুর থেকে এগুলিকে পঞ্চায়েত সমিতির সদর দপ্তরে পৌঁছানোতে খরচ একটু বেশী পড়তে লাগলো, কিন্তু তাড়াতাড়ি পৌঁছানোর জন্য এই অতিরিক্ত ব্যয়কে আমল দেওয়া হ'ল না। প্রত্যেক স্তরে বিলম্ব যথা সম্ভব হ্রাস করা হয়। রাজস্ব পাটোয়ারি এবং গ্রামসেবকগণের সহযোগিতায় ঋণ ও সাহায্যের জন্য ৬০০০ আবেদনপত্র তৈরি করা হ'ল। তারপর কয়েকদিনের মধ্যেই গরুর গাড়ীতে এই পারশিক চক্র বোঝাই করে একটার পর একটা গাড়ী গ্রাম থেকে পঞ্চায়েত সমিতি এবং পঞ্চায়েত সমিতি থেকে গ্রামে যাতায়াত সুরু করলো।

উৎপাদনের লক্ষ্য বাড়ানোর ফলে এগুলি তৈরি করার টাকা সংগ্রহ করাটা একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। যতগুলি চাকার জন্য আবেদন করা হয়েছে সেগুলি সব তৈরি করতে হলে মোট ২১ লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

এই সমস্যার সমাধান করার জন্য কৃষি বিভাগ ৪.০৫ লক্ষ টাকার ঋণ মঞ্জুর করলেন। দুর্ভিক্ষ ত্রাণ বিভাগ দিলেন ৭ লক্ষ টাকা। উপজাতি উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ১০ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করা হ'ল। অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে, সমাজ কল্যাণ বিভাগ ২ লক্ষ টাকা দেন।

এই অভিযানের সাফল্যকে, স্থায়ী ভিত্তিতে দুর্ভিক্ষাবস্থা প্রতিরোধ করা সম্পর্কে জনগণের দৃঢ়তার প্রতীক বলা যায়। একে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য সংগ্রামের নিদর্শনও বলা যায়।

রাউরকেলা

রাউরকেলার ইস্পাত কারখানার সম্প্রসারিত অংশের নাম রাখা হয়েছে রাউরকেলা-২। সম্প্রসারণের পর লৌহপিণ্ড উৎপাদনের মাত্রা দাঁড়িয়েছে ১·৮ মিলিয়ন টন অর্থাৎ ১,২৪০,০০০ টন ইস্পাত। এই ইস্পাত দেশের নতুন নতুন শিল্পের চাহিদা মেটাবে। এই ইস্পাত হবে নানা ধরনের যা—জাহাজ তৈরি থেকে সুরু করে নানা রকমের আধার, বয়লার, মোটরগাড়ীর খোল, রেফ্রিজারেটার, এয়ার কণ্ডিশনার তৈরির কাজে লাগবে।

বিভিন্ন শিল্পের প্রয়োজনে বড় বড় যন্ত্রাংশ তৈরির ব্যাপারে স্বাবলম্বী হবার চেষ্টায় ভারত কতটা অগ্রসর হচ্ছে এই পরিকল্পনা তারই পরিচয় বহন করছে।

১৯৫৩ সালে সরকার পশ্চিম জার্মাণীর দুটি ফার্ম দেমাগ ও ক্রুপস্‌কে একটি ইস্পাত কারখানার পরিকল্পনা তৈরি করতে বলেছিলেন। সেই কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা ধার্য করা হয়েছিল পাঁচ লক্ষ টন। গোড়ায় বিনিয়োগের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচনা সুরু হ'লেও, সরকার পরে কারখানাটির লক্ষ্য ১০ লক্ষ টন ধার্য করতে এবং এটি সরকারী উদ্যোগ হিসেবে রূপায়িত করতে মনস্থ করলেন। অবশেষে ১৯৫৪ সালের গোড়ার দিকে হিন্দুস্থান ষ্টীল লিমিটেডের নাম রেজিষ্ট্রী হ'ল। অবশ্য পূর্বের চুক্তিমত ডেমাগ ও ক্রুপস্‌-এর পরামর্শদাতার ভূমিকা বহাল রইল। আর পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্যে স্থান বেছে নেওয়া হ'ল ওড়িষার রাউরকেলা।

এই কারখানার জন্যে পশ্চিম জার্মানী থেকে ৩,৬৬,০০০ টন যন্ত্রোপকরণ এল। বিভিন্ন বন্দরে, বিশেষ করে কলকাতায় ঐ মাল নামিয়ে ট্রেণে চালান করা হ'ল রাউরকেলায়। পশ্চিম জার্মাণীর ৩০টি বড় ফার্ম ৬০টিরও বেশী সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী পরিকল্পনা রূপায়ণে অংশ নেয়। কাজ যখন পুরো দমে চলছিল তখন ইঞ্জিনীয়ার ও যন্ত্রকুশলী নিয়ে প্রায় দেড় হাজার লোক কাজ করেছেন। আজ থেকে ১০ বছর আগে ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে উৎপাদন সুরু হয়।

গোড়াতেই বড় কাজে হাত দিলে যা হয়—সমন্বয়ের অভাবে অনেক অংশের কাজ

শেষ হতে দেরী হয়ে যায়। এখানেও এই ব্যাপার ঘটল, ফলে পুরোদমে কাজ করে, লক্ষ্যে পৌঁছুতে সেই ১৯৬১-৬২ সাল এসে গেলো। কিন্তু তখন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে উৎপাদনের মাত্রা দাঁড়িয়েছে মাত্র ১৮৬,০০০ টন যেখানে লক্ষ্যই ধরা হয়েছে ৭২০,০০০ টন। পরের বছর এই পরিমাণ দাঁড়াল ৪৮৬,০০০ টন। তারপর থেকে অবশ্য কাজে আর ঢিল পড়েনি, কাজ এগিয়েই গিয়েছে—১৯৬৩-৬৪তে ৫৬৫,০০০ টন, ১৯৬৪-৬৫তে ৬৯৬,০০০ টন এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে উৎপাদনের পরিমাণ লক্ষ্য ছাড়িয়েছে এবং শতকরা ৯ ভাগ বেশী হয়েছে।

উড়িষ্যার রত্ন

ক্রমশ: লোকে রাউরকেলা সম্বন্ধে গোড়ার দিকের সংশয়ের কথা ভুলে গেল—বরং নতুন করে রাউরকেলার নাম হল 'ওড়িষ্যার রত্ন'। ১৯৬৪-৬৫তে এই কারখানার মুনাফার পরিমাণ দাঁড়াল ১ ৫ কোটি টাকা এবং ১৯৬৫-৬৬তে ৫ ৭ কোটি।

রাউরকেলায় আর একটি জিনিস আছে, সার তৈরির কারখানা। সারা বিশ্বে আর কোথাও ইস্পাত কারখানার সঙ্গে এতো বড় সারের কারখানা বোধ হয় নেই। রাউরকেলা হয়ে এমন কতকগুলি ইউনিট আছে যা শুধু ভারতেই নয় সমগ্র এশিয়ায় অভিনব। উদাহরণ স্বরূপ নাম করা চলে ট্যান্ডেম মিল, ইলেক্‌ট্রোলিটিক টিনিং লাইন এবং দুটি কন্টিনিউয়াস গ্যালভানাইজিং লাইন ইত্যাদির।

পরিকল্পনার রূপায়ণে খরচ হয়েছে ৩৭০ কোটি টাকা। অবশ্য এর মধ্যে খনির কাজ, উপনগরী স্থাপন ও পরিকল্পনা রূপায়ণের সব রকম প্রস্তুতির কাজ ধরা হয়েছে। এর জন্যে বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার চাহিদা পূরণ হয়েছে পশ্চিম জার্মানীর ঋণ দিয়ে। পশ্চিম জার্মাণী সরকার প্রথম ১৩২ কোটি টাকার সমান বিনিময় মুদ্রা দিয়ে ও দ্বিতীয় কিস্তীতে ৮০ কোটি টাকার সমান ঋণ দিয়ে আমাদের কাজে সাহায্য করেছেন। মনে রাখতে হবে যে, এই সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় প্রচুর পরিমাণ দেশীয় উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। তার সঙ্গে নক্সা তৈরি ও নির্মাণ পরিকল্পনায় ভারতীয়দের হাত আছে অনেকখানি। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উৎকল মেশিনারী সংস্থা রাউরকেলার একটি ব্লাস্ট ফারনেসের ৪,০০০ টন যন্ত্রাংশ ও প্লেটের মধ্যে ৩,০০০ টন সরবরাহ করেছে।
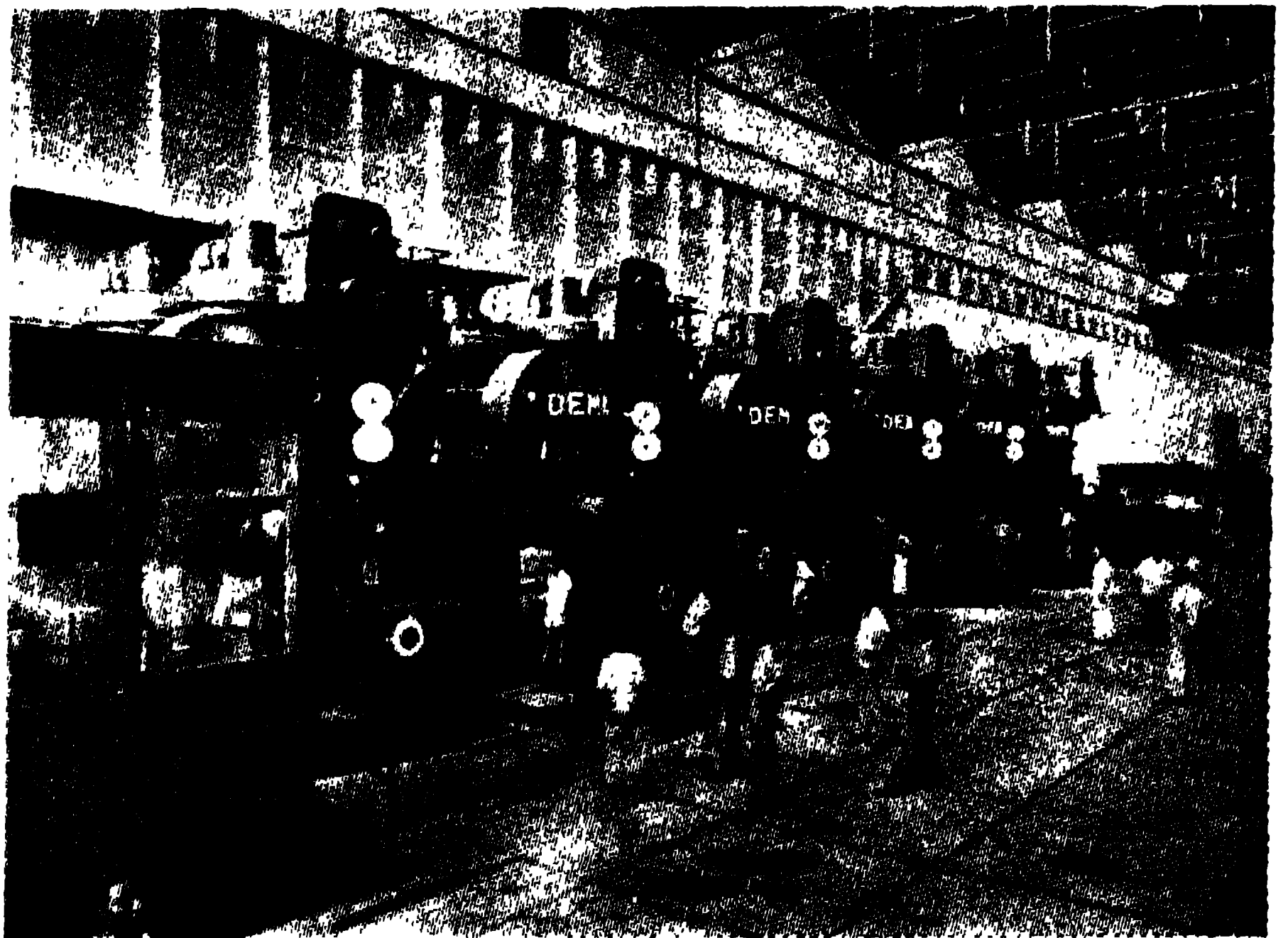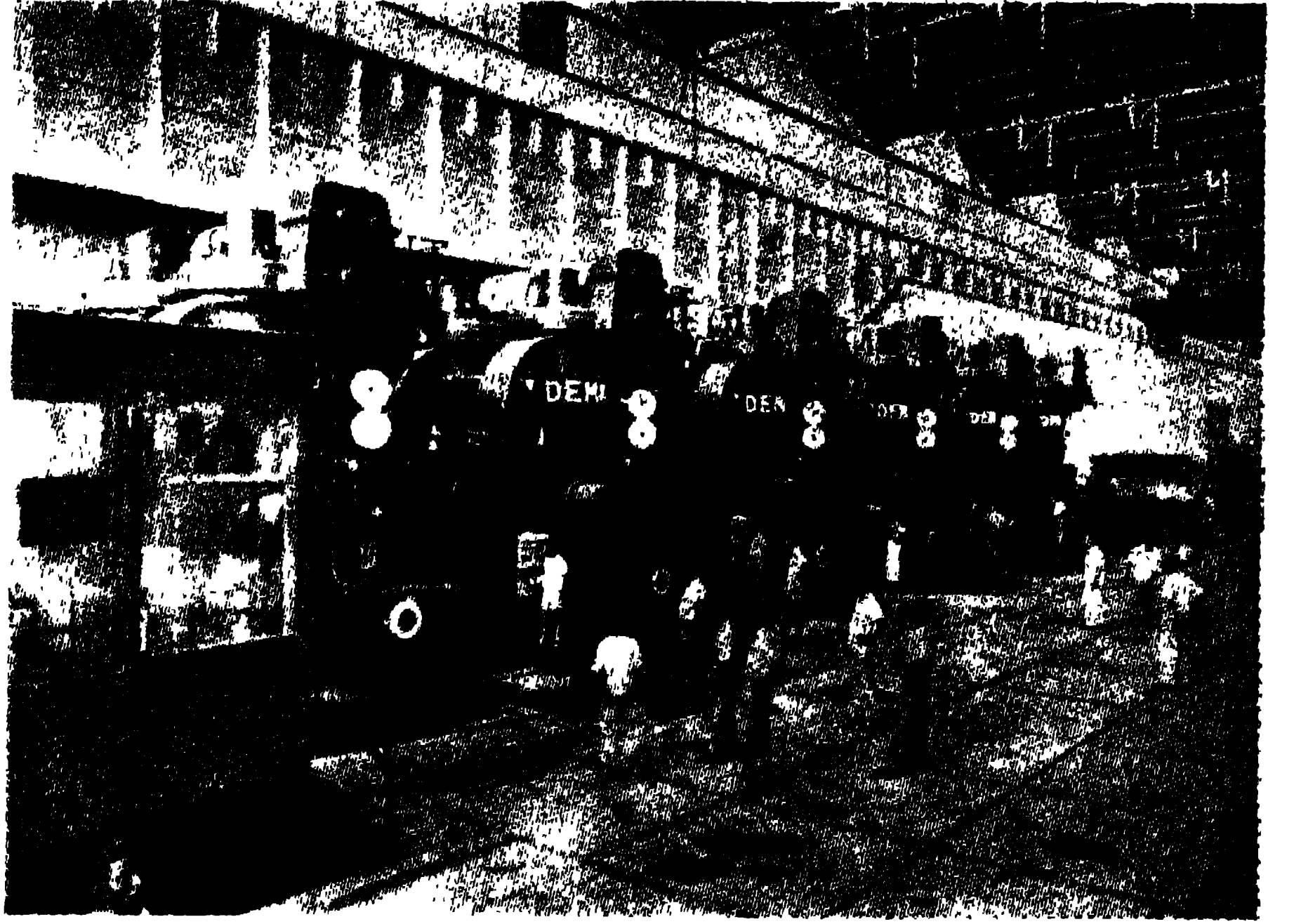
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রূপান্তর

দেশে ইঞ্জিনীয়ারিং ও নির্মাণ শিল্পের বিকাশে সাহায্য করা ছাড়াও, রাউরকেলা পরিকল্পনা দেশের অনুন্নত অঞ্চলগুলির উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। তা ছাড়া এই এলাকায় যে সব উপজাতীয় বসবাস করছেন তাঁরাও উপকৃত হয়েছেন। শিল্পাঞ্চলের আবাসিক এলাকা অর্থাৎ উপনগরীটি ১৩,৬৫৬ একর ভূমি জুড়ে গড়ে উঠেছে। এখানকার বাসিন্দাদের সংখ্যা হবে ১,০০,০০০। এঁদের মধ্যে ৩১,০০০কে সরাসরি ইস্পাত কারখানায় বা অন্যান্য কারখানায় কাজ দেওয়া হয়েছে।

বিদেশের বাজারে রাউরকেলায় তৈরি জিনিসের চাহিদা বাড়ছে এবং এই সব জিনিস রপ্তানী করার ফলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী করা হয়েছে হট্‌রোল্‌ড্ কয়েল, নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে পাইপ ও জাপানে লৌহ পিণ্ড।

সম্প্রতি ক্রিসেন্ট তৈরির জন্যে একটি নতুন ধরণের ইস্পাত তৈরি হয়েছে রাউরকেলায়। আবগারী ও আগম শুল্ক খাতে এক রাউরকেলাই ২০ কোটি টাকা জমা দেয়।

(৮ পৃষ্ঠার পর)

চিকিৎসায় ও শুশ্রূষায় মাঠেই পড়ে ছিল—মৃতদেহগুলি পশুদের ভক্ষ্য হয়েছিল।

জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মন্তুদ হত্যাকাণ্ড ও তার পরবর্তী ঘটনাগুলি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এক নতুন পথে পরিচালিত করল। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে পাঞ্জাবের নৃশংস ও বর্ব্বরোচিত ঘটনাটির তীব্র নিন্দা ক'রে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'ল। প্রস্তাবে বলা হ'ল... "স্বরাজ না পাওয়া পর্য্যন্ত গান্ধীজীর নির্দ্দেশিত অহিংস অসহযোগনীতি সমর্থন ও পালন ব্যতিরেকে দেশবাসীর সামনে আর কোনোও পথ খোলা নেই।..."

পরিমাণ জ্ঞাপক ন্যূনতম নির্দিষ্ট মাপ

ডঃ বি. বি. ঘোষ
(গবেষণা বিভাগ, আকাশবাণী)

ইতিহাস আলোচনাকালে দেখা যায়, গোড়ার দিকে প্রায় সমস্ত দেশে সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই একক মাপের নির্দেশ ছিল, মানব শরীরেরই কোনও অংশ বিশেষে। রৈখিক মাপের একক হিসাবে 'হাত' বা 'পদের' (ফুট) প্রচলন হয়েছিল এই কারণে। কিন্তু সকল দেশের এমন কি একই দেশের যে কোনও দুই ব্যক্তির শরীর, কি দৈর্ঘ্যে, কি প্রস্থে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক নয়। তাই বিভিন্ন দেশে এই এককের মাপও ছিল বিভিন্ন। গ্রীক জাতির কাছে এই 'ফুটের' মাপ ছিল হারকিউলিসের পায়ের মাপে।

ভার বা ওজনের মাপের এককাবলীও সহজবোধ্য ছিল না। তরল পদার্থের মাপের বেলাতে যে সের, মণ, ছটাক, ওজনের বেলাতেও সেই কাঁচচা, ছটাক, সের ও মণ। কিন্তু রৈখিক মাপ, ফুট ইঞ্চি ইয়ার্ডের সঙ্গে—গ্যালনের কোনও একটা সহজ সম্বন্ধ নাই। ভারতীয় 'সের' ছটাক' বা মণের' সঙ্গে 'হাত' বা বিঘত' বা অঙ্গুলি'রও এই রকম কোনও সহজ যোগাযোগ নেই। 'সময়ের মাপ সম্বন্ধে সুখের কথা এই যে একটা যুক্তিযুক্ত এককাবলী বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষে কোনও কোনও ক্ষেত্রে, বিশেষ করে জ্যোতিষী গণনায় এরও ব্যতিক্রম দেখা যায়। এখানে ঘন্টা, মিনিট ও সেকেণ্ডের পরিবর্তে দণ্ড, পল, বিপল প্রভৃতি একক তাঁরা নিজেদের গণনার কাজে ব্যবহার করে থাকেন এখনও।

মেট্রিক প্রণালীর জন্মকথা

ফরাসী বিপ্লবের আগে, ফরাসী দেশের প্রতি পল্লীতে পল্লীতে প্রায় এই রকম অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন মাপ প্রণালীর প্রচলন ছিল। ফরাসী বিপ্লবের পর ফরাসী গবর্ণমেন্ট এই অসুবিধা দূর করতে বদ্ধপরিকর হন এবং ফ্রান্সের জাতীয় মহাসভার নির্দেশে এবং সবিশেষ চেষ্টায় ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে মেট্রিক এককাবলীর সৃষ্টি হয়। পরে এই প্রথা আইনবলে দেশের সর্বত্র প্রচলিত করা হয়। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত ফরাসী দেশে এই প্রথা মাপের আইনানুমোদিত একমাত্র এককাবলী হিসেবে চলে আসছে। পরে অনেক দেশ, এই প্রণালীতে ছোট বড় এককের মধ্যে যুক্তিযুক্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি সহজ সম্বন্ধ দেখে, আপন আপনদেশে আইন করে এর প্রচলন করেছে।

মেট্রিক প্রণালী

এই প্রণালী অনুযায়ী 'মিটার' রৈখিক মাপের মূল মান। কতকগুলি ল্যাটিন ও ও গ্রীক শব্দ, নির্দিষ্ট মাপের এককের পূর্বে যোগ করে, এদের গুণিতক এবং অংশবোধক পরিমাণের মাপ ঠিক করা হয়েছে। যে কোনও গণিত পুস্তকে এদের পরস্পরের সম্বন্ধ প্রাঞ্জলভাবে লেখা আছে।

গুণিতকবোধক শব্দ (গ্রীক)

১০	১০০	১০০০	১০,০০০
ডেকা	হেক্টো	কিলো	মিরিয়া

অংশবোধক শব্দ (ল্যাটিন)

১/১০	১/১০০	১/১০০০
ডেসি	সেন্টি	মিলি

এই সমস্ত উপসর্গের সঙ্গে দৈর্ঘ্যের জন্য 'মিটার' বর্গের জন্য 'এর' এবং ঘনত্বের জন্য স্টার বা 'লিটার' যোগ করে দিলেই সমস্ত রৈখিক, বার্গিক ও ঘনত্ববোধক মূল মাপের এককাবলীর জাতি সম্বন্ধ পাওয়া যায়। এদের একই সম্বন্ধ একই নাম। কেবল প্রয়োজন মতো, একক যোগ করে নিলেই হ'ল।

মূল মাপের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

এই রৈখিক মাপের মূল একক—মিটারের দৈর্ঘ্য নির্ণয়েরও গোড়াতে একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। দুজন বিখ্যাত ফরাসী গণিতবিদ্, দিলাম্বর ও মিসেঁ, ডানকার্ক থেকে বার্সিলোনা পর্যন্ত দুইটি জায়গার দূরত্ব মাপলেন। ইউরোপের নানান দেশ থেকে আরও বাইশজন মনীষী এসে এঁদের মাপ জোকের ফলাফল আলোচনা করে স্থির করলেন যে, উত্তরমেরু থেকে বিষুবরেখা পর্যন্ত স্থানের দূরত্বের ১/১০০০,০০০,০০০ অংশের সমান হবে এই মিটারের দৈর্ঘ্য। কিন্তু পৃথিবীর শরীরের আয়তন অপরিবর্তনীয় নয়। পদার্থ বিজ্ঞানীরা এক সন্ধান দিলেন, যে কোনও আলোকরশ্মির বর্ণচ্ছটার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য—এই মিটারের মাপে তুলনা করা যেতে পারে। তখন ঠিক করা হয়েছিল খুব বেশী উত্তপ্ত ক্যাডমিয়াম্ ধাতু থেকে যে আলোকরশ্মি বেরোয়, তার বর্ণচ্ছটায় যে লাল রশ্মি আছে তার আলোক তরঙ্গের দৈর্ঘের ১,৫৫৩,১৬৩·৫ গুণ হবে এই মিটারের দৈর্ঘ্য। সুতরাং প্রয়োজন হ'লে, কেবল আলোর দ্বারাই এই মিটারের দৈর্ঘ্য ঠিক করা চলতে পারে।

রৈখিক মাপের মত ভার নির্ণয়ও যে এই একই প্রকার শব্দগুলি দিয়ে শুধু গুণিতক ও আংশিক মাপ ঠিক করা যায় তাই নয়, এর একটা যুক্তি সঙ্গত ভিত্তিও আছে। এক সেন্টিমিটার ঘন আয়তন বিশিষ্ট একটি পাত্রে চার সেন্টিগ্রেড উত্তপ্ত জল যতটা ধরে তার ওজন যা হয় তার নাম গ্রাম এবং এই গ্রাম, ভার বা ওজনের একক মূল মাপ।

গুণিতক বা অংশবোধক শব্দগুলি গ্রীক এবং ল্যাটিন বলে, শৈশব কালে, স্কুলে পড়বার সময় আমাদের গণিতের শিক্ষক এদের মনে রাখবার এক সহজ উপায় বলে দিয়েছিলেন। সেটা এইরকম:-

ডেকে হেঁকে কিলিয়ে মেরে
দেশী শান্তি মিল

এক সময়ে যখন এই মাপ প্রণালীর প্রচলন ছিল না—তখন ছাত্ররা বিদ্যারম্ভ করতো কাঠা, বিঘা, সের, ছটাক বা পাউণ্ড, শিলিং, পেন্স, গ্যালন ইত্যাদি দিয়ে। কিন্তু প্রকৃত জীবনে এদের ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন হ'ত বলে অনেক সময় প্রায় দিশাহারা হ'য়ে যেত।

মেট্রিক মাপ প্রণালী বর্তমানে দশমিক প্রণালীতে শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়ায়, হিসেবের

ক্ষেত্রে গণিতের যোগ, গুণ, বিয়োগ প্রভৃতি খুবই সহজ সাধ্য হয়ে উঠেছে।

১৯৫৬ সালে ভারত সরকার আইন ক'রে এই মেট্রিক প্রণালী বলবৎ করেছেন। গোড়ায় নতুন ব্যবস্থায় অনভ্যস্ত থাকায় কিছু অসুবিধা ঘটলেও, এখন জনসাধারণ এই পদ্ধতির কার্যকারিতা ও উপকারীতা উপলব্ধি করছেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির দশ বছরের মধ্যেই মাপ পদ্ধতির আমূল সংস্কার করে ও মুদ্রার ক্ষেত্রে দশমিক প্রথা প্রবর্তন করে সরকার সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

দেশের মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে

ভারতবর্ষে, ১৯৬৫ সালের আগে, নানান পদ্ধতিতে মুদ্রা বিনিময়ের কাজ চলতো। টাকা আর আনার মধ্যে মোটামুটি একটা বাঁধা ধরা সম্বন্ধ ছিল প্রায় সব জায়গাতেই। কিন্তু এ ছাড়াও ছিল 'পাই, পয়সা, কড়ি' ইত্যাদি। মেট্রিক প্রণালীতে মাপজোকের আইনের সঙ্গে সঙ্গে এদিক দিয়েও একটা মস্ত বড় উপকার হয়েছে। জনসাধারণ হিসাব নিকাশের ক্ষেত্রে বা দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় দশমিক প্রণালীর উপকারিতা সম্বন্ধে ক্রমশ: সজাগ হয়ে উঠছেন।

বিভিন্ন দেশে মেট্রিক প্রণালীর প্রচলন

ফরাসী দেশে আইনের বলে মেট্রিক প্রণালীর প্রচলন হওয়ার পর অন্যান্য অনেক দেশ, বৈজ্ঞানিক যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই মাপ প্রণালীর নানা রকম সুখ-সুবিধা অনুভব করে নিজ নিজ দেশে আইনানুসারে এই পদ্ধতির প্রচলন করেছিল।

যে সব দেশে মেট্রিক মাপ প্রণালী আইনানুগ নয়, এই পদ্ধতি অনুসরণ না করা দণ্ডনীয় নয় কিংবা ব্যবসায়ী বা সাধারণের মধ্যে বিশেষ চালু নয়—তাদের মধ্যে গ্রেট বৃটেন এবং ইউনাইটেড স্টেটস্-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে এঁরা এবং অন্যান্য যে দু'চারটি দেশ এখনও বাকি আছে সকলেই এই প্রণালী নিজেদের দেশে প্রচলিত করার জন্য আইন তৈরী করছেন।

★ভাষা হিসেবে ইংরেজীর স্থান

আজকাল এ দেশে ইংরেজী পড়া বা শেখার ওপর তেমন শ্রদ্ধা নেই অথবা চাকরীর জন্যেও ঐ ভাষা শেখা সর্বক্ষেত্রে অপরিহার্য নয়। বরং অনেকেই প্রাক্তন শাসকগোষ্ঠীর ভাষা বলে ইংরাজী ভাষাকে দাসত্বের ভাষা বলে গণ্য করেন। ইংরাজীর প্রতি [illegible] কাদের ? অথবা অন্য [illegible] দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজীর কদর কোথায় ও কী রকম ?

ডঃ বালকৃষ্ণ করুণাকর নায়ার এই বিষয়ে অনুসন্ধান ক'রে কতকগুলি বিচিত্র তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন। যথা :—

১৯৬৫ সালে মোট ৬৪১ জন ছাত্র-ছাত্রী ইংরাজীতে এম.এ. পাশ করেন। এঁদের মধ্যে দক্ষিণীদের সংখ্যা ছিল ২৩৫, বাকী সব অন্যান্য রাজ্যের।

তাঁর এই অনুসন্ধান থেকে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যে সব রাজ্যে ইংরাজীর বিরোধিতা বেশী প্রকট সেইসব রাজ্যে শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে ইংরাজী বেশী জনপ্রিয়। এইসব রাজ্যের পরিসংখ্যান : দিল্লী—৭৮, রাজস্থান—১১৮, বিহার—২৯৮, পাঞ্জাব ও হরিয়ানা—৩০৩, মধ্যপ্রদেশ—৪১৯, উত্তর প্রদেশ—৭৭৪, মোট ২,২১৪।

১৯৬৫ সালে যে ৩০৭০ জন পরীক্ষার্থী ইংরেজীতে এম.এ. পাশ করেন তারমধ্যে উত্তরপ্রদেশে, মধ্যপ্রদেশে ও বিহারের পরীক্ষার্থীদের মোট সংখ্যা ছিল ১৭০০।

প্রত্যেক রাজ্যে প্রতি কোটীতে ইংরেজী এম.এর আনুপাতিক সংখ্যা বিশ্লেষণ করলে আরও কিছু অপ্রত্যাশিত তথ্য জানা যায়। ১৯৬৫ সালে অন্ধ্র প্রদেশ, তামিলনাড, মহীশুর, আসাম ও ওড়িষ্যায় প্রতি কোটিতে ২০ জনেরও কম ইংরাজীতে এম.এ. পাশ করেন। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ছিল ২০-৩০ এর মধ্যে এবং কেরালায় ৪৫।

পশ্চিমবাংলা (৯২) এবং জম্মু ও কাশ্মীর (১০০) ছাড়া বাকী অ-হিন্দী ভাষী রাজ্যে প্রতি কোটীতে ৫০ জনেরও কম এম. এ. দেন। অন্যদিকে হিন্দী ভাষী রাজ্যগুলির মধ্যে কোটীর হিসাবে বিহার ও রাজস্থানে ৫০-৬০ এর মধ্যে, মধ্যপ্রদেশে ১১৩, উত্তর প্রদেশে ১২২ পাঞ্জাব-হরিয়ানায় ১২৬ এবং দিল্লীতে ২২৯ জন ইংরাজীতে এম.এ. দেন।

ডঃ বালকৃষ্ণ করুণাকর নায়ার,
সেন্ট্রাল সাইন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ সংস্থায় গবেষণা করছেন।

খাদ্যের অপচয়জনিত খাদ্যাভাব

• সারা বিশ্বে বছরে ২৪০০ থেকে ৪৮০০ কোটি ডলার মূল্যের খাদ্যের অপচয় হয়। ক্ষেত খামার প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে গুদামজাত করার মধ্যে অনেক অপচয় হয়। এ ছাড়া গুদামজাত করবার সময়,—থলি বা কাঠের বাক্সে ভরে জাহাজে চালান দেওয়ার সময়, প্রচুর খাদ্য চারধারে ছড়িয়ে পড়ে যা একত্র করলে পরিমাণে প্রচুর দাঁড়ায়। যেমন ক্ষেতে শস্যের বীজ বোনার সময় থেকে ফসল না পাকা পর্যন্ত শস্যের শত্রু অনেক। আগাছার উৎপাত তো আছেই তারপর আছে পোকা মাকড়। এরপর গাছের যদি কোন রোগ হয় তো কথাই নেই। পাখীরাও কম শত্রু নয়। হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে, ফসল রক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা না থাকলে পাখীর জন্যে শতকরা ৭০ ভাগ ফসল একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। এ ছাড়া গুদামজাত করার সময় মেঝে শুকনো কিনা ঘরটি কীট পতঙ্গ থেকে মুক্ত কিনা এবং ইঁদুর ঢুকতে না পারে তার ব্যবস্থা আছে কিনা এই সবগুলোও নজরে না রাখলে বহু খাদ্য পোকা মাকড় ও ইঁদুরের পেটে যায়। এই সমস্যা শুধু আমাদের দেশেই নয় সব দেশেই কম বেশী রয়েছে। তাই আমাদের দেশে এখন খাদ্যের অপচয় রোধ করার জন্য নানা প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

পণ্ডিচেরী

আধুনিক জাপানের ধারায় গড়ে উঠবে

কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে আকারে ক্ষুদ্রতম পণ্ডিচেরী ১৯৫৪ সালে ভারত রাষ্ট্রের অঙ্গ হয়ে যায়। ৪৮৪ বর্গ কিলোমীটার আয়তনের এই অঞ্চলটি প্রথম পঞ্চবর্ষীয় পরিকল্পনার সুফল পুরোপুরি ভোগ করতে পারেনি। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পণ্ডিচেরী শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নয়নের ক্ষেত্রে যে রকম অগ্রগতি করে তা' সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

পণ্ডিচেরী কৃষিপ্রধান কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালেও এদিকে তেমন দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। তবে বার্ষিক পরিকল্পনাকালে এ বিষয়ে যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয় এবং তারই ফলস্বরূপ পণ্ডিচেরী ইতিমধ্যে খাদ্যের ব্যাপারে স্বনির্ভর তো হয়েছেই, বরং সাধ্য অনুযায়ী অন্যান্য ঘাটতি রাজ্যগুলিকেও সাহায্য করছে। যেমন গত বছরে পণ্ডিচেরী কেরালাকে ২৫০০ টন চাল দিয়েছিল।

এখানে শিল্পের জন্যে যে অর্থের সংস্থান করা হয়, জাতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ মাপকাঠিতে তার বিচার করা যাবে না কারণ এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণতর নিয়োগ যেমন এখনও সম্ভব হয়নি তেমনি ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সম্ভাবনাও পরোপুরি কার্যকরী করা যায়নি।

বৃহৎ শিল্পক্ষেত্রে ৫টি কাপড়ের কল ও একটী চিনির কল আছে। প্রাক্তন ফরাসী সরকার অন্যান্যের তুলনায় বেশী সুযোগ সুবিধা দেওয়ায় এবং ফরাসী ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলির বাজার পাবার সুনিশ্চিত আশ্বাস থাকায় এখানেই সুতী. ও বস্ত্রের কল স্থাপন করা হয়েছিল। বাজারজাত করার সমস্যা ছিল না বলেই হয়তো ঐসব কলে ১,২০'০০০ মাকু ও ২,২০০ তাঁত আছে। ভাবতেও ভালো লাগে, যে, ১৪০ বছর আগে, সেই ১৮২৯ সালেও বিদ্যুৎশক্তি ও যন্ত্র সজ্জিত কারখানা এ দেশে চালু হয়েছিল।

আজকের দিনে সর্বাধিক কর্মী, অর্থাৎ পণ্ডিচেরীর শতকরা ২০ জন অধিবাসী এই শিল্পে নিযুক্ত। এই শিল্পের কল্যাণে বৈদেশিক মুদ্রাও আসছে। তবে বর্তমানে বস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে, পণ্ডিচেরীর কলকারখানাগুলি তার আওতা থেকে মুক্ত নয়।

এই অঞ্চলে আখের উৎপাদন প্রচুর।, সারা দেশের হিসেবে একর প্রতি আখের উৎপাদন এখানেই সর্বাধিক। এর অনুপাতে চিনির উৎপাদন হ'ল শতকরা ৮ ভাগ। পণ্ডিচেরীর চিনিকলের দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা হ'ল ১,৫০০ টন। তা ছাড়া সরকারী ডিসটিলারীতে আরক তৈরির জন্যে গুড় ব্যবহার করা হয়।.

যন্ত্রপাতি চালাবার জন্যে জ্বালানী হিসেবে নির্ভেজাল সুরাসার ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে, এমন কি সম্ভব হলে, পানীয় সুরা উৎপাদনের আশায় এই অঞ্চলের সরকার আধুনিক যন্ত্রপাতি বসাতে এবং চিনি কলটী সম্প্রসারিত করতে মনস্থ করেছেন।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পক্ষেত্রে ২৫০টি বিভিন্ন শিল্প আছে যার মধ্যে অনেকগুলি নিজের পায়ে দাঁড়াতে অক্ষম। পণ্ডিচেরীতে যেটুকু সহায় সম্পদ ও কাঁচা উপাদান পাবার সম্ভাবনা আছে তার পুরো সদ্ব্যবহারের জন্যে আরও যত্নবান হতে হবে।

আতানচাবাড়ী শিল্পাঞ্চল আধা-শহর। এখানে ১৮টি ক্ষুদ্র শিল্প আছে। তা ছাড়া কারাইকাল ও পণ্ডিচেরীতে গ্রামীণ, শিল্পাঞ্চল স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া চতুর্থ পরিকল্পনাকালে নেইভেলীর কাঁচা মাল কাজে লাগিয়ে আরও একটী শিল্পাঞ্চল স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে অবশ্য যদি উদ্যোগী ব্যবসায়ীরা এগিয়ে আসেন তবেই। শিল্প সম্বন্ধে উৎসাহী ও উদ্যোগী ব্যক্তিগণ এগিয়ে এলে ছোট ছোট শিল্প স্থাপনে সহায়তা পাওয়া যাবে। এই শিল্পাঞ্চলের মধ্যে দুটী সরকারী ইউনিট আছে চামড়ার জিনিস ও কাঠের জিনিস তৈরির জন্যে।

রাজ্য সরকার বছরে শতকরা ৩ টাকা সুদে ঋণ দেন। বর্তমানে ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ হ'ল ৫০,০০০ টাকা। এই মাত্রা বাড়িয়ে ২,০০,০০০ করবার প্রস্তাব রয়েছে। এর বেশী অর্থ ঋণ পেতে হলে মাদ্রাজ শিল্প বিনিয়োগ কর্পোরেশনের কাছ থেকে পাওয়া যাবে। এই কর্পোরেশনে সরকারের শেয়ার আছে।

পণ্ডিচেরীতে বন্দরের এবং পরিবহনের অন্যান্য সুবিধা প্রচুর। বিদ্যুৎশক্তির সরবরাহও যথেষ্ট।

শিল্পোৎসাহী ও উদ্যোগী ব্যক্তিগণকে সাহায্য করতে সরকার সর্বদাই প্রস্তুত। একজন ব্যবসায়ী এই অঞ্চলে নারকেলের ছোবড়া নিয়ে ব্যবসায়ে নেমেছেন। এখানকার চুণাপাথরের ভরসায় অরবিন্দ আশ্রমের তরফ থেকে সিমেন্টের একটা কারখানা খোলা হয়েছে।

উদ্যোগী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা এগিয়ে এলে এই অঞ্চলটি কালক্রমে যে আধুনিক জাপানের ধারায় গড়ে উঠবে এ বিষয়ে কোনোও সন্দেহ নেই।

(৪ পৃষ্ঠার পর)

আলুর খোসা ছাড়ানো থেকে খাবার ডিশ ধোওয়া পর্য্যন্ত যাবতীয় কাজ হয় যন্ত্রে।

ও এখন সম্পূর্ণ অন্য ধরণের লোক। ও প্রথম যখন এই এ্যাকাডেমিতে আসে তখন ওর যে ফটো নেওয়া হয় তার সঙ্গে এখনকার চেহারার তুলনা করলেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। লাজুক ছেলেটি যে ভবিষ্যতে একজন নির্ভরযোগ্য অফিসার হয়ে উঠবে তার ছাপ ওর চোখে মুখে দেখতে পাওয়া যায়।

আমরা ওকে জিজ্ঞেস করলাম "তুমি এখানে কি কি জিনিস শিখছো?"

একদিন যে হয়তো ভারতের প্রধান সেনাপতি হবে সেই জেন্টল্ম্যান কেডেট বলে উঠলো "সবকিছু"। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আরও শত শত শিক্ষার্থীর মতো মাদপ্পাও প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই শিখছে। ও আমাদের বললো যে ওরা যদিও স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর জন্য পৃথক পৃথক ভাবে নির্ব্বাচিত হয়েছে, তবুও ওরা একই ইউনিফর্ম্ম পরে, একসঙ্গে থাকে এবং একই সঙ্গে পড়াশুনা করে। স্থলবাহিনীর শিক্ষার্থী গ্লাইডিং এবং এরোপ্লেনের মডেল তৈরী করতে শেখে, নৌবাহিনীর শিক্ষার্থীকে মার্চ্চ করা শেখানো হয় আর বিমানবাহিনীর শিক্ষার্থী দড়িতে গাঁট দেয় আর হ্রদে সাঁতার কাটে।

প্রতিষ্ঠানের কমাণ্ডান্ট রিয়ার এডমিরাল আর, এন, বাটরা আমাদের বললেন যে "আমরা এদের সর্ব্বকর্ম্মে পারদর্শী করে তুলতে চেষ্টা করি। প্রশিক্ষণের সময় তিন বছর হলেও, শিক্ষাসূচীর তৃতীয় বা শেষ বছরে তাঁদের নির্ব্বাচিত বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং সুসংহত শিক্ষণের সঙ্গেই সেটা চলতে থাকে। এর মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ হ'ল শিক্ষামূলক সাধারণ পড়াশুনা এবং শতকরা ২৫ ভাগ মাত্র প্রতিরক্ষামূলক। মৌলিক শিক্ষা, ড্রিল, শারীরিক শিক্ষা, বিজ্ঞান, অঙ্ক, ইতিহাস, ভাষা, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী, খেলাধূলা ইত্যাদি শিক্ষাসূচীর অন্তর্ভুক্ত। ঘোড়ায় চড়া, নৌকা বাওয়া, পর্ব্বতারোহণ, তাঁবুতে বাস করা ইত্যাদি বিষয়গুলি শিখতেও উৎসাহ দেওয়া হয়। ফাউণ্ড্রি ও সার্ভের কাজও শেখানো হয়। পরীক্ষায় পাশ করার ওপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়না বরং সবদিক থেকে কি রকম কর্ম্মক্ষম তা প্রত্যেকদিনই বিবেচনা ক'রে দেখা হয়। কমাণ্ডার বাটরা আমাদের বললেন যে "শৃঙ্খলা রক্ষা সম্পর্কে আমরা খুব কঠোর হলেও, এদের বয়সোচিত চাপল্যকে আমরা একট ক্ষমার চোখে দেখি।"

মাদপ্পা এবং অন্যান্য প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর দিনের কাজ সুরু হয় সাড়ে পাঁচটার বিউগল রাজার সঙ্গে সঙ্গে এবং ভবিষ্যতে যাঁদের সিদ্ধান্তের ওপর জীবন, মৃত্যু, জয়, পরাজয় নির্ভর করবে, তাঁদের সারাদিনের সৈনিক বৃত্তির শিক্ষা সুরু হয়।

ওদের অবশ্য বেশ একটা সামাজিক জীবনও আছে। আমরা যখন ওখানে গিয়েছিলাম তখন ঘানার ১১ জন নৌ-শিক্ষার্থী এবং ইথিওপিয়ার ৫ জন স্থলসেনা শিক্ষার্থী ছিলেন। কাজেই আন্তর্জাতিক সহাবস্থানের একটা অভিজ্ঞতাও হয়। বিদেশের এই শিক্ষার্থীগণকে পৃথকভাবে রাখা হয়নি, বিভিন্ন বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ১২৫ জন শিক্ষার্থীর এক একটি বাহিনীর নেতৃত্ব করে সেই বাহিনীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী।

আমরা ওকে প্রশ্ন করলাম "এখানকার শিক্ষা শেষ হলে তারপর ও কোথায় যাবে।"

ও বললো "এখান থেকে আমি যোধপুরের বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ কলেজে চলে যাবো, আমার নৌশিক্ষার্থী বন্ধুরা চলে যাবে আই. এন. এস "কৃষ্ণার" এবং স্থলবাহিনীর শিক্ষার্থীরা চলে যাবে ডেরাডুনের ভারতীয় সামরিক প্রতিষ্ঠানে।

"এখানকার এ্যাকাডেমি, ডেরাডুনের মতো একই জিনিস নয় কি?"

আমাদের বন্ধুটি উত্তর করলো "না"।

প্রথমে, ১৯২২ সালে তখনকার প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল স্যার ফিলিপ চেটউড ডেরাডুনে ভারতীয় সামরিক এ্যাকাডেমি স্থাপন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪১ সালে এটিকে অফিসার্স ট্রেইনিং স্কুলে পরিণত করা হয় এবং স্বাধীনতা লাভের পর এর নতুন নাম রাখা হয় আর্মড ফোর্সেস এ্যাকাডেমি। পরে ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠানটির বর্ত্তমান নাম হয়।

পাঠকদের প্রতি

পরিকল্পনার রূপ ও রূপায়ণ, দেশের উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা এবং পরিকল্পনা কমিশনের কর্মপ্রণালী দেখানোই হল আমাদের লক্ষ্য। এই পত্রটিতে যেমন জাতীয় প্রচেষ্টার খবর দেওয়া হবে তেমনি সেই প্রচেষ্টার অংশীদার হিসেবে পশ্চিম বাংলা, জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রচেষ্টায় কতটা সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারছে তাও দেখানো হবে।
এই বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য রেখে মৌলিক রচনা পাঠাবার জন্য পাঠকগণকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। প্রকাশিত রচনার জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হবে।

উন্নয়ন বার্তা

ভারতীয় নৌবহরের জন্য তৈরী 'অ্যাভকাট' তৈলবাহী একটি জাহাজ মাজাগাঁও ডকে জলে ভাসানো হয়েছে। বন্দরে বিভিন্ন জাহাজে অ্যাভক্যাট জ্বালানী সরবরাহ করার জন্যে এই জাহাজটি কাজে লাগানো হবে। এই ধরণের জাহাজ এই প্রথম আমাদের দেশে তৈরী করা হল।

★

যুগোস্লাভিয়ার স্প্লিটে ভারতের বৃহত্তম তৈলবাহী জাহাজটিকে জলে ভাসানো হয়েছে। জাহাজটির ওজন ৮৮,০০০ টন। শিপিং কর্পোরেশনের জন্যে তৈরী এই জাহাজটির নামকরণ হয়েছে স্বর্গত: জহরলাল নেহরুর নামে। এই জাহাজে করে মাদ্রাজ শোধনাগারে অশোধিত তেল পাঠানো হবে। বর্তমানে শিপিং কর্পোরেশনের জাহাজ সংখ্যা হ'ল ৬৬।

★

ভারতের সর্বপ্রথম সমুদ্রগামী 'টাগ' তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে কলকাতার রাষ্ট্রায়ত্ত গার্ডেন রীচ কারখানায়। এই জাহাজটি সর্বাধুনিক ও সূক্ষ্ম ইলেকট্রোনিক সরঞ্জামে সজ্জিত করা হবে। এই টাগ্ ২০ টন পর্যন্ত ওজনের জাহাজ টেনে আনতে পারবে।

★

ক্যানাডার একটি ফার্ম হিন্দুস্থান মেশিন টুলস্ সংস্থাকে ৫ কোটি টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি তৈরী করার বরাত দিয়েছে। এই যন্ত্রপাতি ৫ বছরের মধ্যে জোগান দিতে হবে।

★

১৯৬৮-৬৯ সালের শেষে ভারতের বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার সঞ্চিত পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৬.৯০ কোটি ডলার : এই পরিমাণ গত ১০ বছরের পরিমাণের চেয়ে ৫.১০ কোটি ডলার বেশী। ইন্টার ন্যাশানাল মনিটারী ফাণ্ড-এর ৭.৮০ কোটি ডলার ফেরৎ দিয়ে এবং ঋণ পরিশোধ চুক্তি অনুযায়ী ১.৫০ কোটি ডলার ধারশোধ করেও ঐ অর্থ জমে।

★

কারুশিল্প ও হাতে চালানো তাঁত বস্ত্র রপ্তানী কর্পোরেশন লিবিয়া থেকে ৮৫ হাজার টাকার বরাত পেয়েছে।

★

খনি ও ধাতু সংক্রান্ত কর্পোরেশন গত তিন বছরে ২০ লক্ষ টনেরও বেশী আকরিক লোহা পারাদীপ বন্দর থেকে রপ্তানী করেছে।

★

জাতীয় কয়লা উন্নয়ন কর্পোরেশন ১৯৬৮-৬৯ সালে ১ কোটি ২৬ লক্ষ টন কয়লা উৎপাদন করেছে। গত বছরের তুলনায় এই পরিমাণ ২.২৭ শতাংশ বেশী। ১৯৬৮-৬৯ সালে কর্পোরেশন ১.২৫ কোটি টাকা মুনাফা করেছে।

★

১৯৬৮-৬৯ সালে কাজু রপ্তানীর পরিমাণ রেকর্ড মাত্রায় পৌঁছায় অর্থাৎ ৬৩ কোটি টাকার অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় ১৯ কোটি টাকার বেশী কাজু রপ্তানী হয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী করে এই আয় বেড়েছে।

★

কলিকাতার একটি কারখানা তাইওয়ান থেকে ১ কোটি টাকা মূল্যের ওয়াগন তৈরির একটি অর্ডার পেয়েছে।

★

বোম্বাইএর একটি তেলকল, সম্প্রসারণের এক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এর জন্য এই তেল কলটিকে মূলধন বাবদ ২.৫৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে হবে। সম্প্রসারণের কাজ ১৯৭০-৭১ আর্থিক বছরের শেষভাগে সম্পূর্ণ হবে।

★

মহারাষ্ট্রের বনসম্পদের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য ৩.৭৫ কোটি টাকা মূল্যের একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এর ফলে বিশেষ করে অনুন্নত ও জনজাতি অঞ্চলের প্রায় ৪০০০ অধিবাসী সারা বছরের জন্য কাজ পাবেন।

★

কলিকাতা বন্দর থেকে ভারতে তৈরি বহু পরিমাণ স্বচ্ছ কাগজ সিরিয়ায় রপ্তানি করা হয়েছে। শিল্পোন্নত দেশগুলির সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা করে ভারত এই অর্ডার সংগ্রহ করে।

★

ব্যাঙ্গালোরে অবস্থিত ভারতীয় টেলিফোন শিল্প, বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতির আমদানি শতকরা ২৫ থেকে ১৭.৬ ভাগ কমিয়ে দেওয়ায়, বৈদেশিক মুদ্রায় ভারত গত তিন বছর যাবৎ প্রতি বছর ২.০৬ কোটি টাকা সঞ্চয় করছে।

★

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলা, বেশী ফলনের গমের চাষে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে। বর্তমান মরশুমে যে ৮৫০০০ একর জমিতে গম চাষ করা হয়েছে তার মধ্যে ৭২০০০ একর জমিতেই বেশী ফলনের গমের চাষ করা হয়েছে।

★

স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের সঙ্গে একটি চুক্তি অনুযায়ী সোভিয়েট ইউনিয়ন, আগামী বছর প্রায় দশ কোটি টাকা মূল্যের ২.৫ লক্ষ টন নাইট্রোজেন সার সরবরাহ করবে।

★

গত ২০ বছরে রাজস্থানে বহু উদ্দেশ্যমূলক, ছোট, বড় ও মাঝারি সেচ প্রকল্পের জন্য ১৫২ কোটি টাকারও বেশী ব্যয় করা হয়েছে। এই সব প্রকল্প রূপায়িত করার ফলে ১৯৫০-৫১ সালে যেখানে ২৭ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিলো সেখানে এখন ৫৭ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ দেওয়া যাচ্ছে।

★

১৯৬৭-৬৮ সালে প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ভারতীয় আতর বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে।

মেসিনের বিরুদ্ধে আমার মতবাদ সম্পর্কে অনেকেই ভুল ধারণা পোষণ করেন। যে যন্ত্রসজ্জা শ্রমিকের অন্ন কেড়ে নিয়ে তাকে কর্মহীন করে তোলে আমি সেই রকম যন্ত্রসজ্জার বিরোধী।

★

আমি বুঝি যে কতকগুলি মূল শিল্পের প্রয়োজন রয়েছে। আরাম কেদারা বা সশস্ত্র সমাজতন্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই। সমগ্রভাবে পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা না করে, কাজ করে যাওয়ার ওপরেই আমি বিশ্বাস করি। কাজেই মূল শিল্পগুলির নাম উল্লেখ না করে আমি বলতে পারি যে, যে শিল্পগুলিতে অনেক লোকের এক সঙ্গে কাজ করতে হবে সেগুলি রাষ্ট্রাধীন হওয়া উচিত। তাঁদের শ্রমে যে সব জিনিস উৎপাদিত হবে—তা তাঁরা কুশলী বা অকুশলী যে রকম কর্মীই হোন না কেন—সেগুলির মালিকানা রাষ্ট্রের মাধ্যমে তাঁদের ওপরেই বর্তাবে।

★

মেসিনের আপাতজয়ে আমি সম্মোহিত হতে রাজি নই। যে মেসিন ধ্বংস আনে আমি সব সময়েই সেই রকম মেসিনের বিরোধী। কিন্তু সাধারণ যন্ত্রপাতি এবং যে সব মেসিন ব্যক্তিগত শ্রম লাঘব করে এবং কুটীরবাসী লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর কাজের বোঝা হাল্কা করে সেই রকম মেসিন সর্বত্র চালু হোক তাই আমি চাই। সাধারণভাবে আমি মেসিনের বিরোধী নই কিন্তু এই নিয়ে পাগলামি করার বিরোধী।

যে মেসিনে শ্রমিকের প্রয়োজন কম হয়ে যায় সেই রকম মেসিন কেন বসানো হবে না তাই নিয়ে চিৎকার করা হয়। শ্রমিকের প্রয়োজন হ্রাস করার জন্য আধুনিক মেসিন বসালে হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়বে এবং অনাহারে মারা পড়বে। মানব জাতির সামান্য ভগ্নাংশের জন্য আমি সময় ও শ্রম বাঁচাতে চাই না, সকলের জন্য সময় ও শ্রম বাঁচাতে চাই। আমি চাই সকলের হাতেই সম্পদ কেন্দ্রীভূত হোক, সামান্য কয়েকজনের হাতে নয়।

★

ভারতের পুঁজিপতিরা যদি জনগণের কল্যাণের জন্য নিজেদের নিয়োজিত না করেন এবং নিজেদের জন্য সম্পদ সংগ্রহে তাঁদের জ্ঞান বুদ্ধি নিয়োগ না করে জনগণের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত না করেন তাহলে পরিণামে জনগণের ধ্বংস ডেকে এনে নিজেদেরও ধ্বংস করবেন অথবা তাঁদের হাতে নিজেরা ধ্বংস হবেন।

★

প্রেমার বাণী

★

সম্পদ সংগ্রহের এই পাগলামি বন্ধ করতে হবে এবং শ্রমিকগণকে কেবলমাত্র জীবন ধারণের মতো মজুরি সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিলেই হবে না, তাদের জন্য প্রতিদিন এমন কাজের ব্যবস্থা করতে হবে যা শুধুমাত্র গতানুগতিক না হয়ে দাঁড়ায়। এই রকম অবস্থায় যিনি কাজ করবেন মেসিন যেমন তাঁকে সাহায্য করবে তেমনি রাষ্ট্র এবং মেসিনের মালিককেও সাহায্য করবে। বর্তমানের এই পাগলামি বন্ধ হবে এবং শ্রমিকরা একটা চিত্তাকর্ষক ও উপযুক্ত পরিবেশে কাজ করবেন।

★

একটা কথা আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই। মানুষের কথাটাই সর্বপ্রথমে ভাবতে হবে। মেসিন যেন মানুষের হাতকে অলস করে না দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য আমি মেসিনের বিরোধী নই। দৃষ্টান্ত হিসেবে সেলাইয়ের কলের উল্লেখ করা যায়। যতগুলি প্রয়োজনীয় মেসিন আবিষ্কৃত হয়েছে এটা হ'ল সেই রকম কয়েকটার মধ্যে অন্যতম। এই মেসিনের আবিষ্কর্তা দেখতেন যে তাঁর স্ত্রী কি বিপুল ধৈর্যে নিজের হাতে একটির পর একটি ফোঁড় দিয়ে সেলাই করছেন এবং কেবলমাত্র স্ত্রীর এই কষ্ট লাঘব করার জন্য তাঁর প্রতি স্নেহ প্রীতির নিদর্শন হিসেবেই তিনি সেলাইর কল উদ্ভাবন করেন। তবে তিনি যে শুধু নিজের স্ত্রীর শ্রম ও কষ্টের লাঘব করেছেন তাই নয়, যাঁরা সেলাইর কল কিনতে সক্ষম সেই রকম প্রত্যেকেরই পরিশ্রম বাঁচিয়েছেন।

★

আমাদের কর্মশক্তি বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান থাকা দরকার, যাতে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরী করে নিতে পারি। পাশ্চাত্যের যান্ত্রিক সভ্যতার দাস সুলভ অনুকরণ আমাদের নিজস্ব বিদ্যাবুদ্ধি বা কুশলতা নষ্ট করে দিতে পারে এমন কি জীবন ধারণের ব্যবস্থাও বিপন্ন ক'রে তুলতে পারে।

★

ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সোসাইটি লিঃ—করোলবাগ, দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত এবং ডাইরেক্টার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত।

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা
২২শে জুন ১৯৬৯ : ৭ই আষাঢ় ১৮৯১
Vol 1 : No 2 : June 22, 1969

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০

টেলিগ্রাফের ঠিকানা—যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

ভুলি নাই

কোন গণতন্ত্রই, অভাব, দারিদ্র্য ও অসাম্যের মধ্যে বেশী দিন টিকে থাকতে পারেনা।

—জওহরলাল নেহেরু

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়

আমাদের কথা

রাজনীতির ক্ষেত্রে যাঁদের মতামতের বিশেষ মূল্য আছে, এই রকম দু'জন প্রখ্যাত নেতা সম্প্রতি যে দুটি বিবৃতি দিয়েছেন, তা হয়তো নকশাল বাড়ী আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ অবস্থাটা বিচার করতে সাহায্য করবে।

কয়েক সপ্তাহ আগে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ এবিষয়ে স্পষ্ট ক'রে কয়েকটি কথা বলেছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীও এই বিক্ষোভকে প্রজাসত্ব সমস্যার মত কয়েকটি অমীমাংসিত প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত করেছেন

এই আন্দোলনকে যদি উত্তেজনা ক্ষুব্ধ মনের বাহ্যিক একটা প্রকাশ ব'লে উপেক্ষা করা না হয় অথবা রাজ্যে রাজ্যে পুলিশী-ক্ষমতা প্রয়োগের অজুহাত ব'লে গণ্য করা না হয় এবং এই বিক্ষোভের মূলে কী কারণ আছে তা' যদি উপলব্ধির চেষ্টা থাকে তাহলেই কেবল ভারতীয় নেতৃবৃন্দ গান্ধী শতবার্ষিকীকে একটা নিষ্প্রাণ অনুষ্ঠানে পর্যবসিত না করে, তা যথার্থভাবে কার্য্যকর করতে পারবেন।

একমাত্র সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ ক'রে গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করা সম্ভব এই ছিল মহাত্মা গান্ধীর বিশ্বাস। ভারতীয় ও বিশ্ব-রাজনীতির ক্ষেত্রে এই ছিল তাঁর অবদান। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন না যে, প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা গণতন্ত্রের শেষ কথা। তিনি প্রায়ই বলতেন শীর্ষস্থলে ২০ জন লোক বসে থাকলেই তা' গণতন্ত্র নয়। যদি লক্ষ লক্ষ মানুষ কর্তৃত্বের ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধ করার শক্তি 'রাখতে পারেন তাহলেই গণতন্ত্র সার্থক। এমনকি এই অবস্থাটিও গান্ধীজীর কাছে, তাঁর আদর্শ রামরাজ্য অর্জ্জনের পথে একটা পর্য্যায়মাত্র ছিল।' তাঁর আদর্শের রামরাজ্যে কর্তৃত্ব নেই, অতএব রাষ্ট্রব্যবস্থাও নেই।

সর্ব্বকালের সব রকম অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যই গান্ধীজী অসহযোগিতা, আইন অমান্যের মতো অস্ত্রের উদ্ভাবন করেছিলেন কেবলমাত্র বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য নয় কারণ অত্যাচার উৎপীড়ণ কোন না কোন রূপে চলতেই থাকে।

বর্ত্তমানে দেশে যে পরিস্থিতি তাতে ব্যাপক আকারে বা সীমাবদ্ধভাবে এই অত্যাচার উৎপীড়ণ রয়েছে কিনা সেইটেই হ'ল প্রধান প্রশ্ন। প্রধানমন্ত্রী এবং শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণের বিবৃতিতে মনে হয় যে এগুলি রয়েছে। সেই ক্ষেত্রে, অত্যাচার প্রতিরোধ করা সম্পর্কে গান্ধীজী প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা যুক্তিসঙ্গত নয় কি ?

এই সিদ্ধান্ত যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে, এগুলি প্রতিরোধের উপযুক্ত পন্থা কী কেবলমাত্র সেইটুকুর মধ্যেই আমাদের বিচার সীমাবদ্ধ করা যায়। এই প্রতিরোধ সহিংস হওয়া সঙ্গত কিনা অথবা তা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনযায়ী পরিচালিত করা সমীচীন কিনা সেইটুকুই শুধু আমাদের বিবেচ্য বিষয় হবে। সমাজে যে অত্যাচার ও উৎপীড়ন চলতে থাকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেগুলি সব দূর করার অবকাশ অতি অল্প।

সে যাই হোক সব রকম গণ আন্দোলনই, গণতান্ত্রিক সরকারের সমর্থক নয়। তারপর, যখন গণতান্ত্রিক সরকারের অর্থ হয় বিচক্ষণ সরকার এবং পরিকল্পনাকে বিচক্ষণ কিছুসংখ্যক ব্যক্তির অধিকার বলে মনে করা হয় তখন দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে, এবং নিজেদের অভিমত প্রকাশে দেশের বেশীর ভাগ লোক বঞ্চিত হন। এই প্রশ্নটি সম্পর্কে গান্ধীজীর উত্তর ছিলো যে, ছোট ছোট সরকার বা প্রশাসনব্যবস্থা থাকবে যেখানে জনগণের সকলেই অংশ গ্রহণ করতে পারবে। তা যদি সম্ভব না হয় ভারতীয় গণতন্ত্রকে এমন একটা উপায় স্থির করতে হবে, যেখানে সাধারণ মানুষ তাঁদের নিজেদের অভিমত প্রকাশ করার সুযোগ পাবে এমন কি রাষ্ট্রের পরিচালনা ব্যবস্থা ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁরা তাঁদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে।

পরিকল্পনা রূপায়নে প্রয়োজন জনগণের সহযোগিতা

(গত ৬ই জুন সন্ধ্যে ৬টার সময় কলিকাতার এ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্ট্‌সে "ধনধান্যের" উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পঠিত মুখ্যমন্ত্রীর ইংরেজী ভাষণের অনুবাদ)

"পরিকল্পনা সম্পর্কিত পাক্ষিকপত্র 'যোজনার' বাংলা সংস্করণের প্রথম সংখ্যাটির প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে আমি খুশী হয়েছি। বাংলা সংস্করণটির নাম অবশ্য "ধনধান্যে"। আমরা আরও শুনেছি যে যোজনার তামিল সংস্করণ "থিট্টম" পাক্ষিক পত্রটিও শিগগীরই প্রকাশিত হবে।

পরিকল্পিত আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রনয়ণকারী, পরিকল্পনা সম্পর্কিত কার্য্যপরিচালনাকারী ও জনগণের মধ্যে এই পত্রটি যোগসূত্র হিসেবে কাজ করবে, কারণ পরিকল্পনা হ'ল একটা জাতীয় প্রচেষ্টা, যার সঙ্গে দেশের সমগ্র অংশ এবং সমাজের প্রত্যেক স্তরের সম্পর্ক রয়েছে।

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে নূতন দিল্লীতে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে আমি বলেছিলাম যে আর্থিক উন্নয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে গত ১৮ বছর যাবৎ যে সব পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে সেগুলি, আমাদের সেইসব লক্ষ্যের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারেনি। অবশ্য ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে "যোজনা" যে সেবা করে আসছে, আমার এই উক্তির মাধ্যমে তার ওপর সামান্যতম ছায়াপাত করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে আমরা এ পর্য্যন্ত যা অর্জ্জন করেছি তা গান্ধীজীর স্বপ্নের ভারতও নয় অথবা জওহরলালের কল্পনার ভারতও নয়। পরিকল্পনায় কোন খুঁত অথবা কর্মদক্ষতার অভাব কিংবা জনগণের কাছ থেকে যথেষ্ট সাড়ার অভাব—এগুলির মধ্যে যে কোন কারণেই হোক, গত দুই দশকে, দেশে মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে, কতিপয় ব্যক্তির হাতে আর্থিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছে এবং দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা বেড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে আমি জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে বলেছিলাম যে আর্থিক ও সংগঠনমূলক উভয় ব্যবস্থার দিক থেকেই আমাদের পরিকল্পনা নতুন ক'রে রচনা করা উচিত, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্ম্মপদ্ধতিতে একটা পরিবর্ত্তন আনা উচিত, যাতে, যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করা যায়, যেখানে জনগণ সামাজিক নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার পাবেন এবং যাঁরা কাজ করতে ইচ্ছুক তাঁরা উপযুক্ত কাজ পাবেন এবং কয়েকজনের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত না হয়ে সকলের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়বে।

দুর্ভাগ্যবশত: অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকার যে সত্যিকারের অগ্রগতি সুনিশ্চিত করতে অসমর্থ হয়েছেন তার প্রমাণ ক্রমশ: স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পরিকল্পনা রূপায়িত করা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে একটা সত্যিকারের সাড়া জাগিয়ে তোলায় ব্যর্থতা, অথবা এই জাতীয় প্রচেষ্টায় তাঁরাও যে অংশীদার, জনগণের মধ্যে এই মনোভাব গড়ে তোলার অক্ষমতাই সম্ভবত: এই বিফলতার কারণ। যাঁরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছেন তাঁদের নিরুৎসাহিত করা আমার অভিপ্রায় নয় বরং যাঁদের আরও সচেষ্ট হওয়া উচিত ছিলো তাঁদের আরও উৎসাহিত করাই আমার উদ্দেশ্য।

আমরা প্রত্যেকের মধ্যে ভারতের ভবিষ্যত সম্পর্কে একটা আস্থার মনোভাব গড়ে তুলতে চাই এবং আরও চাই যে সর্ব্বাধিক সুফল পাওয়ার জন্য প্রত্যেকেই আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠুন। এই বিষয়ে নিরুৎসাহিত বা হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। বরং আমাদের কি লাভ হয়েছে বা কি ক্ষতি হয়েছে তা নিয়ে গভীরভাবে বিবেচনা ক'রে দেখা দরকার। সেই হিসেব ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে নতুন ক'রে পরিকল্পনা তৈরী করার, কোন কাজগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত তা নতুন করে স্থির করার এবং আমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করা সম্পর্কে নতুন ক'রে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করার কারণ রয়েছে।

আমি আবারও বলবো যে আমাদের কর্ত্তব্য স্থির করতে হবে। অর্থাৎ দেশের প্রতিটি অধিবাসীর মধ্যে কি করে উৎসাহের সৃষ্টি করা যায় এবং তাঁদের নিয়ে কি ভাবে একটা নতুন ধরণের সমবেত জীবন গড়ে তোলা যায়, যা সমাজের দিক থেকে হবে ফলপ্রসূ এবং জাতীয় জীবনের দিক থেকে হবে লাভজনক তার উপায় স্থির করতে হবে। আমরা চাই যে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মহান অভিযানে যুবকগণ তাঁদের সাহস ও কল্পনা নিয়ে এবং বয়োবৃদ্ধগণ তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিন। কৃষক ও কারখানার কর্ম্মী, কর্ম্মচারী ও নিয়োগকারী, ছাত্র, শিক্ষক এবং যাঁরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ, যোগাযোগ, বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের মতো সমাজসেবামূলক কর্ত্তব্যে রত আছেন এবং যাঁরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে কাজ করছেন—এটা হবে তাঁদের কাছে একটা জাতীয় আহ্বানের মতো।

ভারতের ভবিষ্যত সম্পর্কে এবং এই দেশের জনগণের কাছে আমাদের এই আশা ও আস্থার বাণী পৌঁছে দিতে আপনারা এবং এই পত্রিকাটী সফল হোন একমাত্র সেই উদ্দেশ্যে নিয়েই আমি এই কথাগুলি বললাম।

জয়হিন্দ।

দেশের ডাকে সদাই আগুয়াণ এরাই নওজওয়ান

জাতীয় প্রতিরক্ষা এ্যাকাডেমীর কথা

শরদিন্দু সান্যাল

বোম্বাইএর ১২০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে খাড়াকভাসলা হ্রদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে জাতীয় প্রতিরক্ষা এ্যাকাডেমী, এই এ্যাকাডেমীকে কেন্দ্র ক'রে ৭,০০০ একর জমি জুড়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উপনগরী গড়ে উঠেছে। আবাসিক ব্যারাক, অফিস-ভবন, লেকচার হল, তালিম নেবার নির্দ্দিষ্ট জায়গা, ল্যাবরেটরী, ওয়ার্কশপ্, স্টেডিয়াম, খেলার মাঠ, হাসপাতাল, লাইব্রেরী, মিউজিয়াম, মুক্তাঙ্গন সিনেমা হল, বাজার, বাগান, পার্ক, ঘাসের সবুজ গালিচা মোড়া মাঠ, নিজেদের জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা, ক্যান্টিন্, কো-অপারেটিভ ডাকঘর কী নেই? এছাড়া একটা কল্যাণ কেন্দ্রও আছে। কষ্টি পাথরে, সততা বিশুদ্ধতা, নিষ্ঠা নির্ভীকতা নৈতিক মনোবল যাচাই ক'রে একটি একটি করে বেছে নেওয়া হয়েছে কয়েকশো কিশোরকে যারা আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর মেরুদণ্ড হয়ে গড়ে উঠবে। এরাই একদিন ভবিষ্যতে দেশের নেতৃত্ব নেবে।

এইখানে দেখা হ'ল সেই ছেলেটির সঙ্গে, কড়া ইস্ত্রীকরা ইউনিফর্ম্ম পরা, চটপটে। নাম মাদপ্পা। •কে বলবে, মহীশূরের একটি গণ্ডগ্রাম থেকে এসেছে, যেখানে আজও মেয়েরা মাটীর ঘড়ায় করে জল বয়ে নিয়ে আসে, যেখানে আজও বৃদ্ধ বটগাছের নীচে বসে গ্রামের প্রাচীন মানুষরা তামাক টানতে টানতে সুখ দুঃখের কথা বলেন। মাদপ্পার বাবা ন্যাকরা। মাথায় পাগড়ী বাঁধা খাঁটি গ্রাম্য মানুষটির এত সঙ্গতি ছিল না যে, ছেলেকে কলেজে পড়ার খরচ দেন, মাদপ্পাও ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে। সে তখন সবে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। সারা গ্রামের মধ্যে সেই সবচেয়ে বেশী লিখিয়ে পড়িয়ে লোক। অথচ তার বাবা কথায় কথায় বলবেন ভাগ্যে যা আছে তাই হবে, ভেবে কি করবে? কিন্তু ক্ষেতের আল দিয়ে, মাঠের ওপর দিয়ে পথ চলার সময়ে মাদপ্পা চোখ তুলে আকাশের বুকে বিমান দেখে ভাবতো সত্যিই কি জীবন ভাগ্যের সুতোয় বাঁধা না পুরুষকারই পৌরুষ?

ইতিমধ্যে ব্যাঙ্গালোরে বেড়াতে গিয়ে একটা কান্নাড় পত্রিকায় সে বিজ্ঞাপন দেখলে—প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্যে সুস্থ. সবল, ম্যাট্রিক পাশ তরুণরা আবেদন করতে পারে। মাদপ্পা নিজের অবস্থার কথা চিন্তা না ক'রে আবেদনপত্র পাঠিয়ে বসল। সফল পরীক্ষার্থীদের নামের তালিকায় নিজের নাম দেখে সে ছুটল বাপের কাছে। একমাত্র ছেলেকে ছাড়বার বেদনার ওপর আর এক দুঃখ, সে দুঃখ দারিদ্র্যের। বিষণ্ণ বাপ জানালেন, শুধু পুণা পর্য্যন্ত যাবার ভাড়া

দিতে পারবেন। মাদপ্পার চোখে তখন দিগন্তের স্বপ্ন; সে বিমানবাহিনীতে নাম লিখিয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, একমাত্র ছেলে হয়ে বাবাকে ফেলে রেখে যাবে? মাটিকে ছাড়বে অজানা আকাশের টানে? শেষ পর্য্যন্ত আকাশ কি আপন হ'বে?' শেষ পর্য্যন্ত বিচ্ছেদকেই স্বীকার ক'রে নিতে হ'ল।

খাড়াকভাসলায় যখন এল তখন মাদপ্পা ১৬ বছরের ছেলে। অবিন্যস্ত কাপড়জামা ভীরু, সন্ত্রস্ত, দ্বিধাগ্রস্ত। এ কোথায় 'এল সে? গ্রাম ছেড়ে কত যুগ পেরিয়ে এল? কোথায় সেই অন্ধকার ঘেরা ঘিঞ্জী ঘর, যেখানে আলোবাতাস আসার পথ রুদ্ধ, যেখানে ভূমিই শয্যা? কোথায় গেল গ্রামের সেই পুকুর যেখানে গোরু মোষের পাশে গা ডুবিয়ে সে স্নান করত?

আজ মাদাপ্পা থাকে ছিমছাম পরিস্কার, আলাদা একটা ঘরে। স্মার্ট ড্রেস পরে। পালিশের জোরে মুখ দেখার মত চকচকে জুতো পরে দৃঢ়পদক্ষেপে সে যখন অন্যদের সঙ্গে পা মিলিয়ে কুচকাওয়াজ ক'রে তখন গ্রামের সেই ছেলেটি কোথায় হারিয়ে যায়। যে ঘরে সে আর পাঁচজনের সঙ্গে বসে খায় সেই খাবার ঘরটি দেশের মধ্যে বৃহত্তম। সেখানে ৩,০০০ জন একত্রে বসে খেতে পারে। সুন্দরভাবে সাজানো ঘরটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, ঝকঝক তক্‌তক্ করছে। রান্নাবান্নার যাবতীয় সরঞ্জাম বৈদ্যুতিক।

(২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মাস্তলে আরোহণ

তাঁবুতে বসবাস

অশ্বারোহণ, শিক্ষাসূচীর অন্যতম অংশ

অধিক ফলন ও তার সমস্যা

নিরঞ্জন হালদার (সাংবাদিক)

খাদ্য সমস্যা নিয়ে এতদিন যে দুশ্চিন্তা ছিল, তা আমরা মোটামুটি কাটিয়ে উঠেছি। গত দুই বছরে খাদ্য শস্যের উৎপাদন যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে ঐ বৃদ্ধির হার বজায় রাখতে পারলে ১৯৭০ সালে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা যাবে বলে সরকারী আশা করছেন। ১৯৬৬-৬৭ সালে দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ৭ কোটি ৪২ লক্ষ টন, ১৯৬৭-৬৮ সালে তা বেড়ে ৯ কোটি ৫৬ লক্ষ টন হয়েছিল, বর্তমান আর্থিক বৎসরে কমপক্ষে ৯ কোটি ... লক্ষ টন হবে আশা করা গিয়েছিল। ... , বাজরা ভুট্টা, জোয়ার প্রভৃতি শস্যের উৎপাদন বাড়লেও গমের ক্ষেত্রেই উৎপাদনের হার সবচেয়ে বেশী। ১৯৬৫-৬৬ সালে গমের উৎপাদন হয়েছিল ... কোটি ৪ লক্ষ টন, ১৯৬৬-৬৭ ও ১৯৬৭-৬৮ সালে তা দাঁড়ায় যথাক্রমে ১ কোটি ... লক্ষ টন ও ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টন।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির এই পরিবেশ ... সৃষ্টি হয়নি। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত ... চতুর্থ পরিকল্পনায় সরকারের নূতন ...-নীতির কথা ঘোষিত হয়। স্থির হয়, ... সব এলাকায় সেচের ব্যবস্থা হয়েছে, ... সব অঞ্চলে অধিক ফলনশীল বীজের ... বাড়াতে হবে। উৎসাহটা সর্বত্র ...ড়িয়ে না দিয়ে কয়েকটি এলাকায় কেন্দ্রী-...ত করার কথা হয়। কারণ তখন দেশের ...একটি জায়গায় কৃষি উৎপাদন বাড়লে ... যেমন খাদ্য সমস্যার তীব্রতা হ্রাস করবে ...তেমনই ঐ সব এলাকার চাষীদের দেখা-...দেখি অন্যান্য অঞ্চলের কৃষকেরাও নতুন ...ষি পদ্ধতি কাজে লাগাতে উৎসাহিত ...বে। কৃষকেরা অপর কৃষকের জমিতে ...ফলোর সঙ্গে ফসল হতে না দেখলে ...সরকারী কৃষি খামার দেখে বা কৃষি সম্প্র-...সারণ কর্মীর উপদেশে নূতন পদ্ধতিতে চাষ ...করতে কোন উৎসাহ বোধ করেন না। ...উৎপাদন বৃদ্ধির এই নূতন কৌশল কার্যকর করার জন্য একদিকে সেচ এলাকার দ্রুত সম্প্রসারণের কাজ আরম্ভ হল এবং অপর-দিকে সার অধিক ফলশালী বীজ, কীটনাশক দ্রব্যাদি ও ঋণ সরবরাহ বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া হল। ১৯৬৭-৬৮ সালে ৬০.৩ লক্ষ হেক্টার জমিতে অধিক ফলন-শীল বীজ ব্যবহার করা হয়েছিল ও ১৯৬৮-৬৯ সালে ৮৫ লক্ষ হেক্টর জমি অধিক ফলনশীল বীজ ব্যবহারের আওতায় আনার পরিকল্পনা করা হয়। এ বছর পাঞ্জাবে ২৫ লক্ষ একর জমিতে নূতন গমের চাষের পরিকল্পনা নেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত ২৭ লক্ষ একর জমিতে ঐ নূতন গমের চাষ হয়েছে। গত এক বছরে পাঞ্জাবে ৫ হাজার সেচকূপে বিদ্যুৎ সংযোগ ও ২ হাজার কিলোমিটার নূতন রাস্তার জন্য অধিক ফলনশীল গমের চাষ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। অধিক ফলনশীল বীজের ব্যবহার কেবল খাদ্য শস্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নেই, পাট, আখ, তুলা, আলুর ক্ষেত্রেও প্রসার লাভ করেছে। তবে পণ্যশস্যের ক্ষেত্রে অধিক ফলনশীল বীজের ব্যবহার এখনও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি।

গমের ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে মেক্সিকোর গম গবেষণা কেন্দ্রে উদ্ভাবিত অধিক ফলন-শীল গম এবং ধানচাষের ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে ফিলিপিনের লাস বানোসে আন্ত-র্জাতিক চাল গবেষণা কেন্দ্রে উদ্ভাবিত আই. আর ৮। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এতদিন সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, সারের প্রয়োগ, কৃষি জমি বা ধান বোনা কিংবা রোয়ার ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং নূতন জাতের বীজ ব্যবহারের দিকেই নজর দেওয়া হয়েছে। ফিলিপিনের আন্তর্জাতিক গবেষণাকেন্দ্রে এক ধানের ফুলের রেণু অন্য ধানের রেণুর সঙ্গে মিশিয়ে নূতন জাতের ধান তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। সেখানে ১০ হাজার জাতের ধান নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। তাইওয়ানের ডি দি-গিও-উ-গেন জাতের ধানের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের পেটা ধানের মিশ্রণে তৈরী হয়েছে ঐ আই আর ৮। এই নূতন জাতের ধান হতে ১২০ দিন লাগে, আগে লাগত ১৪০ থেকে ১৬০ দিন। ফলে আই আর ৮ অনায়াসেই বছরে তিন বার ফলানো যায়। নাইট্রো-জেন সারকে এতদিন গাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হত। কিন্তু আই আর ৮ এ নাইট্রোজেন সারের প্রয়োগে ধানের গাছ বড় হয় না, কণার বৃদ্ধি ঘটিয়ে থাকে। এ জন্য সার কম দিলে আই আর ৮ এ ধান ভাল হয় না। এই নূতন জাতের ধান গাছও কিছুটা উঁচু হয় বলে অতি সহজেই ধানে পোকা লাগতে পারে। এজন্য আই আর ৮ চাষের সময় বীজের সঙ্গে এক ধরণের কীট নাশক ব্যবহার করতে হয়। ফিলিপিনের ধান গবেষণা কেন্দ্রে কীটের হাত থেকে আই আর ৮কে বাঁচাতে গিয়ে আর এক নতুন জাতের ধান আই আর ৫ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ইন্দোনেশিয়ায় এখন এই আই আর ৫ ব্যাপকভাবে ব্যবহারের চেষ্টা হচ্ছে। ধানের ক্ষেত্রে আই আর ৮ এবং তাই চুং, তাইনান প্রভৃতি বিদেশী জাত ছাড়া বিভিন্ন দেশী জাতের সংমিশ্রণে নূতন জাতের ধান তৈরীর চেষ্টা হচ্ছে। কোথাও বা আমন ধানকে বোরো বা আউস হিসাবে ব্যবহারের চেষ্টা চলছে। হাজার হাজার কৃষকেরা যেভাবে ধান গম অন্যান্য পণ্যশস্য চাষ করে এসেছে বর্তমানে তার পরিবর্তন ঘটছে। অধিক ফলনশীল বীজ ব্যবহার করতে গিয়েও অজস্র সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। সেই সমস্যা ও প্রতিকারের দিকে কৃষক ও সরকার সর্বদা সজাগ না থাকলে খাদ্যে স্বয়ম্ভর হওয়ার পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দেওয়া খুবই কঠিন হবে।

কৃষিও যে একটি শিল্প সে কথা আজও এদেশে পুরোপুরি স্বীকৃতি পায় নি।

ফলে কোন কারখানা স্থাপনের সময় কারখানা বা বাড়ি তৈরির মালমশলা, মিস্ত্রি বা দক্ষ কর্মীর সহজপ্রাপ্যতা, জল বিদ্যুৎ কাঁচা মালের সরবরাহ, পরিবহন ও উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার, কর্মীদের বাসস্থান ইত্যাদি সমস্যার কথা প্রথমেই ভেবে থাকি। কিন্তু এই ধরণের প্রশাসনিক দৃষ্টি ভঙ্গী থেকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্যাকে সচরাচর বিচার করা হয় না। অধিক ফলনশীল বীজ ব্যবহারের সময় বীজের সঙ্গে সেচের ব্যবস্থা, সার, কীট-নাশক দ্রব্য ও ঋণ সরবরাহের কথা ভাবতে হয় উৎপাদিত ফসল মজুত ও বিক্রীর দিকেও সরকারকে নজর দিতে হয়। কারণ নূতন জাতের বীজ চাষ করতে গিয়ে কৃষকের উৎপাদন খরচ বেড়ে যায় এবং ফসলের উপযুক্ত দাম না পেলে সে পরের বছর আর ফসল বাড়াবার চেষ্টা করবে না। ঠিক এই কারণে পাঞ্জাবের রাজ্য সরকার গমের উৎপাদন বাড়াবার জন্য সর্ব রকমের সাহায্য ছাড়া ফসল মজুত ও সরকার নির্ধারিত দামে খাদ্য কর্পোরেশন কর্তৃক বাজারে বিক্রীর জন্য আনীত সব গম কিনে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ফসলের উপযুক্ত দাম দেওয়ার ব্যাপারে এই ধরণের প্রচেষ্টা অন্য রাজ্যে দেখা যায়নি।

নূতন জাতের বীজ ব্যবহার করায় এখন একই জমিতে দুই বা তিনটি ফসল ফলানো হলে বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করলে চলে না, বিভিন্ন ধরণের ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের ব্যবস্থা রাখতে হয়। কিন্তু জলের ব্যবস্থা থাকলেই চলে না, জল ব্যবহারের চাবি কাঠিও জানতে হয়। নতুন জাতের ধানে ও গমে জল অনেক বেশী লাগে তবে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিমাণ জল লাগে। পুরানো জাতের গমে পাঁচবার জল দিতে হত, নূতন জাতেয় গমে বারো বারের মত জল দেওয়ার দরকার হয়। প্রায়ই দেখাযায় এই জল দেওয়ার ক্ষেত্রে একদিকে জলের অপচয় হয় এবং অপর-দিকে বেশী জলের জন্য ফসলেরও ক্ষতি হয়। মাটি থেকে শিকড়ের মাধ্যমে গাছের খাদ্য সংগ্রহের জন্য জলের দরকার। জমিতে সার যত বেশী দেওয়া হবে, মাটির সঙ্গে সারের মিশণের জন্য জলের প্রয়োজনও তত বেড়ে যাবে। শিকড়ের ঠিক নীচের স্তরের মাটি ভিজবার মত জল দরকার। বেশী জল দিলে তা নীচে চলে যাবে এবং মাটির উপরের স্তরও শক্ত হয়ে রোদ্রে মাটি ফেটে যাবে। তখন গাছের শিকড়ের নীচে না গিয়ে ফাঁক দিয়ে সব জল নীচে চলে যাবে। এ ছাড়া মাটি থেকে গাছ যে জল গ্রহণ করে, তার অনেকটা বাইরের উত্তাপে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়। গাছ যত বড় হবে ও বাইরের উত্তাপ যত বাড়বে। বাষ্পী ভবনের জন্য জলের চাহিদাও তত বেড়ে যাবে। এ জন্য বর্ষাকালে বা শীতকালে ধান চাষের জন্য যে পরিমাণ জল দরকার হয়, গ্রীষ্মকালে আই আর ৮ বা তাই চুং চাষ করতে গেলে তার চেয়ে অনেক বেশী জলের প্রয়োজন হবে—কাজেই ফলন বাড়াবার জন্য পর্যাপ্ত জল নয়, প্রয়োজনীয় জলের নিয়মিত সরবরাহ দরকার। অধিক ফলনশীল বীজের চারায় দুটি কারণে কীটের প্রকোপ সবচেয়ে বেশী। এতদিন এদেশে যে সব বীজ ব্যবহার করা হত। সেগুলি দেশী কীটের আক্রমণ প্রতিরোধে সক্ষম ছিল। নূতন জাতের বীজে কীটের আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা খুবই কম। তা ছাড়া আগে জমিতে একটা ফসল হত বলে জমি শুকিয়ে যাওয়ার সময় কীটগুলি ও মারা যেত। এখন অধিক ফলনশীল বীজের জন্য একই জমিতে বছরে দুটি বা তিনটি ফসল হচ্ছে এবং মাটিও আর্দ্র থাকছে। ফলে কীটগুলিও আর মরছে না। রোগ জীবাণুর মত কৃষি জমিতে কীটগুলিও পাকাপোক্ত হয়ে বংশ বৃদ্ধি করছে। প্রতি বছর ধান গাছে পোকার তাণ্ডব কেন বাড়ছে, কৃষকেরা তা বুঝতে পারেন না। ব্যাপারটি কৃষকদের নিকট পরিস্কার হলে, জমি চাষের সময় এবং পরে গাছে কীট-নাশক দ্রব্যের ব্যবহার অনেক বেড়ে যাবে।

সারের ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে 'অতিরিক্ত সার প্রয়োগের ফলে জমির উর্বরতা না বেড়ে তা হ্রাস পেতে পারে। গোবর বা কম্পোষ্ট মাটির সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু রাসায়নিক সার পুরো-পুরি মেশে না, জমিতে কিছুটা অবশিষ্ট পড়ে থাকে। ফলে প্রথম বছরে একটি জমিতে বিভিন্ন ধরণের সার যে পরিমাণে লাগার কথা। পরের বছর সেই পরিমাণ সারের দরকার হয় না কোন জমিতে কোন সার কতটা প্রয়োজন তা মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করেই জানতে হয়। দুঃখের বিষয় এ ব্যাপারে জন-সাধারণ বা সরকার কেউই সচেতন নন। যে সব এলাকায় অধিক ফলনশীল বীজের ব্যবহার বাড়ানো হচ্ছে, সেই সব এলাকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে কৃষি বিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থা করতে পারলে ঐ সব বিদ্যালয়-এর গবেষণাগারেই জমির মাটির গুণাগুণ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কারখানায় শ্রমিককে যেমন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কলা কৌশল শেখাতে হয় কৃষকদেরও তেমনি অধিক ফলনের বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গে পরিচিত করানোর দরকার।

প্রোটীন-খাদ্য হিসেবে মাছের গুরুত্ব

সাধারণ হিসেবে দেখতে গেলে, খাদ্যের সমস্যা বিশ্ব জোড়া। তাই শস্য ও কৃষিজাত অন্যান্য খাদ্য ছাড়াও আমিষ খাদ্যের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে। শুধু মাছ খাওয়ার বহর দেখলেই এর আন্দাজ পাওয়া যায়। এখন সারা বিশ্বে বছরে ৬ কোটি টন মাছ খাওয়া হয়। ১৯৮৫ সাল নাগাদ এই পরিমাণ ১০ কোটি টনে দাঁড়াবে বলে অনুমান। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক পরিকল্পনার আভাসে নির্ভর যোগ্য যে সব তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে, তাই হল এ অনুমানের ভিত্তি। অনুসন্ধানমূলক বিবরণীতে এই ধারণা প্রকাশ করা হয়েছে যে, মাছ খাওয়ার পরিমাণ ১৯৭৫ সালে ৭ কোটি টন এবং ১৯৮৫ সালে ১০ কোটি টনে দাঁড়াবে। এর তিনভাগের এক ভাগ অবশ্য পশু পক্ষীর খাদ্য 'ফীশমীল' হিসেবে কাজে লাগবে।

জালিয়ানওয়ালাবাগ

ডাঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে কিন্তু ভারতের আভ্যন্তরিক ালমাল শেষ হয়নি। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে ইংরেজ াসনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন প্রথমে বঙ্গ ভঙ্গ উপলক্ষে সুরু হয় মে তা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে একটি প্লবী দলও গড়ে ওঠে। অনেক গুপ্ত সমিতি দেশময় ছড়িয়ে ড়ে—এবং বোমা তৈরি, অস্ত্র সংগ্রহ, গেরিলা যুদ্ধপ্রণালী শেখা ভৃতির বন্দোবস্ত হতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই প্লবীদল নানা রকমে ইংরেজ সরকারকে অতিষ্ঠ করে তোলে।

এই আন্দোলন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার প্রথম াকেই নতুন নতুন অনেক আইন কানুন প্রনয়ণ করেন। দ্ধের সময় ভারত রক্ষা আইন নামে এক আইন তৈরি রা হয়। তাতে ভারতীয়দের ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই হস্তক্ষেপ করা হয়। এই নতুন আইন যুদ্ধশেষ হবার ন মাত্র ছয় মাস পর্যন্ত চালু থাকবে এরূপ স্পষ্ট নির্দেশ ছিল। কিন্তু যখন যুদ্ধ শেষ হ'ল তখন ভারত সরকার মনে করলেন যে আইন উঠে গেলে বিপ্লবীরা হয়ত আবার গোলমাল করবে। ই জন্য সরকার ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে বিপ্লবের অবস্থা কি এবং া দমনের জন্য কোন নতুন বিধি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার ক না এ বিষয়ে তদন্ত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করলেন। ই কমিটির সভাপতি হলেন সার সিডনী রাওলাট নামে ইংলণ্ডের একজন বিচারপতি। আর অন্যান্য সভ্যদের মধ্যে ছিলেন দুজন ভারতীয় এবং দুজন ইংরেজ। সরকার এই কমিটির রিপোর্টের ওপর নির্ভর করে নতুন দুটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করলেন। এই দুইটি ১নং ও ২নং রাওলাট বিল নামে বিখ্যাত অথবা কুখ্যাত।

এই দুটি বিলের স্বরূপ দেখে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কিন্তু দেখা গেল যে ভারতরক্ষা আইনে জনগণের স্বাধীনতা যে পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল এই দুই বিলে তার চেয়েও অনেক বেশী খর্ব করা হয়েছে।

বলা বাহুল্য যে, এর বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবর্ষের সব রাজনৈতিক দল ও সকল শ্রেণীর অধিবাসীই তীব্র প্রতিবাদ ও আন্দোলন করেছিলেন। কিন্তু সরকার কর্ণপাত করেননি।

এই সময়ে মহাত্মা গান্ধী এই প্রতিবাদে যোগ দেওয়ায় এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'ল।

গান্ধীজী সত্যাগ্রহ ঘোষণা করার পূর্ব্বে বড়লাটের কাছে এই বিষয়ে চিঠি লিখলেন এবং শেষবারের মত তাঁকে অনুরোধ করলেন যাতে এই বিল আইনে পরিণত করা না হয়। কিন্তু বড়লাট তাতে কর্ণপাত করলেন না ; বিলটি আইন সভায় পাশ হওয়া মাত্রই তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন করে, এটিকে তিনি আইনে পরিণত করলেন।

গান্ধীজী সত্যাগ্রহ সুরু করবার পূর্ব্বে ঘোষণা করলেন যে এর সূচনার জন্য ৬ই এপ্রিল সারা দেশে 'হরতাল' প্রতিপালিত হবে। আগেকার এক ঘোষণা অনুযায়ী দিল্লীতে ৩১শে মার্চ্চ এই হরতাল হয় এবং পুলিশের সঙ্গে ছোট খাটো সংঘর্ষও হয় এবং পুলিশ গুলি চালায়। ৬ই এপ্রিল সারা ভারতবর্ষে হরতাল অনুষ্ঠিত হয়—কিন্তু কোন স্থানেই কোন রকমে শান্তি ভঙ্গ হয় নি।

খুব সম্ভব গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন তাঁর নির্দ্দেশ অনুযায়ী শান্তিপূর্ণভাবেই অনুষ্ঠিত হত কিন্তু সরকার তাতে বাদ সাধলেন। ৯ই এপ্রিল পাঞ্জাব সরকার অমৃতসরের দুইজন জনপ্রিয় নায়ক ডঃ সত্যপাল ও ডঃ কিচলুকে গ্রেপ্তার ও অন্তরীণ করেন। এতে পরদিন জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে ডেপুটি কমিশনারের বাংলোর দিকে অগ্রসর হয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ঐ দুই জননায়কের মুক্তির জন্য আবেদন করা। কিন্তু একদল সৈন্য হল-গেট-পুলের কাছে তাদের পথরোধ করে এবং নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালায়—তাতে কয়েকজন হত ও আহত হয়। এর ফলে জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে আসে এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে নানা নিষ্ঠুর আচরণ করে। তারা পাঁচ জন ইউরোপীয়কে হত্যা করে, কয়েকটি বাড়ী পুড়িয়ে দেয়, মিস শেরউড নামে একটি মিশনারী মেম সাহেবকে প্রহার করে ও অজ্ঞান অবস্থায় পথে ফেলে রেখে চলে যায়। কয়েকজন ভারতবাসী তাঁর সেবা শুশ্রূষা করে ও জ্ঞান ফিরে এলে তাঁর বন্ধুদের নিকট পাঠিয়ে দেয়। ওদিকে জনতা আবার হল-গেট-পুলের কাছে পৌঁছায় এবং সৈন্যরা আবার গুলি করায় ২০।৩০ জন নিহত হয়। জনতা টেলিগ্রামের তার কাটে এবং শহরের বাইরের দুটি রেল ষ্টেশন আক্রমণ করে।

১১ই এপ্রিল সহরের অবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল। সৈন্যদের গুলিতে নিহত ব্যক্তিদের মৃতদেহ নিয়ে যে মিছিল বের করা হয় তারা কোন রকম শান্তিভঙ্গ করে নি। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় সেনাপতি ডায়ার সসৈন্যে অমৃতসরে পৌঁছান এবং ডেপুটি কমিশনার তাঁর হাতে অমৃতসরে শান্তিরক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন।

পরের দিন থেকে সামরিক আইন ঘোষণা না করা হলেও সেনাপতি ডায়ার তদনুযায়ী কাজ আরম্ভ করলেন। তিনি নির্বিচারে বহুলোককে গ্রেপ্তার করলেন এবং এক আদেশ জারী করে কোন রকম সভা বা সমাবেশ নিষিদ্ধ করলেন। কিন্তু এই আদেশ ভালোভাবে চারিদিকে প্রচার না হওয়াতে অনেকেই এই নিষেধের কথা জানত না। একথা ডায়ার নিজেই পরে স্বীকার করেছিলেন। ১২ই এপ্রিল সন্ধ্যাবেলা জনসাধারণের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে পরের দিন জালিয়ানওয়ালা-বাগে একটি জনসভা হবে।

জালিয়ানওয়ালা বাগ নামক যে স্থানে সভা হয় সেটি বাড়ী দিয়ে ঘেরা একটি জায়গা এবং একদিকে তার একটাই ঢোকবার বা বেরোবার রাস্তা। ১৩ই এপ্রিল, বৈশাখী অর্থাৎ নববর্ষের দিন। বিকেলে যখন সভা আরম্ভ হয়েছে তখন একদল বন্দুকধারী সৈন্য ও কয়েকটি সাঁজোয়া গাড়ী নিয়ে জেনারেল ডায়ার সভাস্থলে পৌঁছলেন। এই প্রবেশ পথে একটি উঁচু জায়গায় ডায়ার সৈন্য সমাবেশ করলেন। সভার লোকসংখ্যা দশ হাজারের ওপর, এর মধ্যে অনেক নারী শিশু ও বালক ছিল—সকলেই নিরস্ত্র। তথাপি ডায়ার প্রবেশ পথে সৈন্য সমাবেশ করেই গুলি চালাতে আদেশ দিলেন। যেখানে লোকের ভীড় বেশী সেই দিকেই তিনি গুলি চালাবার আদেশ দিলেন। প্রায় দশ মিনিট ধরে ১৬৫০টি গুলি ছোঁড়া হয়। গুলি চালানো আরম্ভ হওয়া মাত্রই সভা ভেঙ্গে যায় কিছু লোক শুয়ে পড়ে, কিছু পাঁচিল বেয়ে পালাতে বৃথা চেষ্টা করে, কিছু দরজা দিয়ে বাইরে বেরুবার উদ্দেশ্যে সেই দিকে ছুটে আসে কিন্তু ডায়ারের সৈন্যেরা গুলি চালাতেই থাকে—যতক্ষণ না গুলি ফুরিয়ে যায়। সহস্রাধিক হতাহতের কোন ব্যবস্থা করাও তিনি দরকার মনে করলেন না। ফিরে গিয়েই তিনি আর এক আইন জারী করলেন সন্ধ্যার পরে কেউ বাড়ী থেকে বেরুতে পারবে না—বেরুলেই গুলি করা হবে। যে সব হতভাগ্য হতাহত হয়ে পড়েছিল তাদের আত্মীয়স্বজন যে তাদের কোন খোঁজ খবর করবে সে সম্ভাবনাও রইল না।

সভ্য জগতের ইতিহাসে গবর্ণমেন্ট, অধিকৃত দেশের জনগণের উপর এরূপ নির্মম ব্যবহার করেছে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

গভর্ণমেন্ট প্রথমে মৃতের সংখ্যা বলেছিলেন ২৫০, ঘটনার চার মাস পরে অনুসন্ধানের ফলে এই সংখ্যা দ্বিগুণ করা হয়। কিন্তু ঘটনার অব্যবহিত পরে যাঁরা অনুসন্ধান করেন তাঁদের মতে মৃতের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। আহতের সংখ্যা ছিল দু' তিন হাজার। এরা সারা রাত্রি এবং পরের দিনও অনেকক্ষণ বিনা

সাধারণ অসাধারণ

দেশের নানা প্রান্তে যে সব দেশদরদী নরনারী লোকচক্ষুর অন্তরালে দেশগড়ার কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন এখানে তাঁদের কাহিনী থাকবে।

মুর্শিদাবাদ জেলায় আলু উৎপাদনে রেকর্ড

মুর্শিদাবাদ জেলার সালুয়াডাঙ্গার মো: নাসিরুদ্দীন মোল্লা এতদিন চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী চাষবাস করে আসছিলেন। জমিতে ভালো ফসল পেলে খুসী হতেন, ফসল ভালো না হলে নিজের ভাগ্যের দোষ দিতেন। কিন্তু ২৬ বছরের এই যুবকটি এই বছরে আলুর চাষ করে আশাতিরিক্ত ফসল পেয়েছেন। তাঁর এই সাফল্যে মুর্শিদাবাদ জেলার অনেক চাষীই অবাক হয়ে গেছেন। অবশ্য তিনি নিজেও কম অবাক হন নি।

মো: নাসিরুদ্দীন মোল্লা তাঁর ১০ কাঠা জমি ভাগ করে, তাতে বেশী ফলনের আলুর চাষ করেন। তিনি কুফরি চন্দ্রমুখী এবং কুফরি সুন্দরী এই দুই জাতের আলুর বীজ লাগান।

এই বেশী ফলনের আলুর চাষ করা সম্পর্কে কৃষি-বিভাগ তাঁকে যে সব পদ্ধতি অনুসরণ করতে বলেন, তিনি সেগুলি সব মেনে চলেন। তিনি যে সব সার ও কীটনাশক ব্যবহার করেন সেগুলি হ'ল —প্রথম বারে।—

(ক) এ্যামোনিয়া সালফেট—২৫.৫কি: গ্রাম
(খ) সুপার ফসফেট—৪৭.৫০ কি. গ্রাম
(গ) এম. পটাস—১৫ কি: গ্রাম।

দ্বিতীয় বারে—

(ক) ইণ্ডিয়া—৬ কি: গ্রাম।
(খ) কীটনাশক—ব্রাইটেক্স—১ কি. গ্রাম
(গ) ডিডিটি—৬০০ গ্রাম

তাঁর নিজের নলকূপ থেকেই প্রতি ১৬ দিনে ৬ বার করে জলসেচ দিতেন। তাঁর মোট আলুর বীজ লেগেছিলো ৬০০ গ্রাম।

এই চাষ সম্পূর্ণ করার জন্য তাঁর মোট ব্যয় হয়েছিলো ২৪৭ টাকা ৯ পয়সা।

যে পাঁচ কাঠা জমিতে তিনি কুফরি চন্দ্রমুখী চাষ করেন তাতে মোট ফসল হয় ৯.৮৭ কুইন্টাল অর্থাৎ ২৬ মণ। অন্য যে পাঁচ কাঠায় কুফরি সুন্দরী আলু লাগান, তাতে মোট ফলন হয় ১৪.৪৮ কুইন্টাল অর্থাৎ ৩৮ মণ ৩৫ সের। সব চাইতে বড় আলুটির ওজন ছিলো ৬৫০ গ্রাম।

এই একই জমি থেকে গত বছর তিনি প্রতি কাঠায় ৭ মণ আলু পেয়েছিলেন।

বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী তাঁর এই আলুর ফসলের মোট মূল্য হ'ল ৬৮৭ টাকা ৮৮ পয়সা।

আধুনিক কৃষি পদ্ধতি প্রয়োগ করে তিনি তাঁর সামান্য এই দশ কাঠা জমি থেকে যথেষ্ট লাভ করতে সক্ষম হন। তিনি দুটি কৃষি প্রদর্শনীতে পুরস্কার পান। তা ছাড়া ১৯৬৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা সব চাইতে বেশী পাট উৎপাদন করেন তিনি তাঁদের অন্যতম ছিলেন।

রাজারহাট-ব্লকে দো-ফসলী চাষ পদ্ধতি প্রবর্তন

২৪ পরগণার রাজারহাট ব্লক এলাকায় যিনি প্রথম প্রচুর-ফলনের ধানের চাষ সুরু করেন এবং বছরে দুটো করে ফসল তোলেন তাঁর নাম হল কার্ত্তিক চন্দ্র পাল।

গত খারিফ মরসুমে, তিনি আই আর—৮ (আমন) বীজ বুনেছিলেন এবং একর প্রতি ৭৫ মণ ধান গোলায় তুলেছিলেন। আমনের ফসল ঘরে তোলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বোরো চাষের জন্যে তাইচুং-নেটিভ-১ বোনেন। ১৯৬৮-র মে মাসের শেষ নাগাদই সে ফসল কাটবার উপযুক্ত হয়ে গেল। অর্থাৎ তিনি এক বছরে দুটো ফসল পেলেন।

চিরাচরিত পদ্ধতিতে চাষবাস করে বছরে তিনি যে ফসল পেতেন, নতুন ধারা প্রবর্তনে এখন তিনি সেই পরিমাণের তিনগুণ ফসল ঘরে তুলছেন।।

শ্রীকার্ত্তিক পালের উদ্যম অন্যান্য কৃষকদেরও নতুন নতুন পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত করছে।।

চার একর জমিতে আট একরের ফসল

পশ্চিম বাংলার ২৪ পরগণার গোয়ালবাথানে শ্রীগোপীকৃষ্ণ মজুমদারের চার একর জমি আছে। এই জমির ওপর বছরের পর বছর খরচের মাত্রা বেড়েছে অথচ ফসলের পরিমাণ কমেছে বই বাড়েনি। অবশেষে তাঁদের ঐ অঞ্চলে প্রচুর ফলন বীজের চল হওয়ায় মজুমদার মশাই আশার আলো দেখতে পেলেন।

জমিটুকু থেকে যে কোনোও প্রকারে আয় বাড়াতে মনস্থ তিনি করলেন। তাই তিনি তাইচুং নেটিভ—১ এবং আই আর ও দুলারী ধানের বীজ বুনলেন। তাঁর আশা বিফল হ'ল না। অচিরে এই জমি থেকেই তিনি একর প্রতি ৭০ মণ ধান ঘরে তুললেন। জমিতে জলসেচের জন্য একটা অগভীর কূপ খুঁড়ে তার সঙ্গে তিনি একটা ডিজেল ইঞ্জিন জুড়ে দিলেন।

মজুমদার মশাই এখন বছরে দুটো ফসল তুলছেন। শুধু ধানের চাষেই তিনি সন্তুষ্ট নন। গত মরসুমে এই জমিতে মেক্সিকান গমের বীজ ব্যবহার ক'রে তিনি ৪৫ মণ গম পেয়েছেন।

এই পরীক্ষার সাফল্যে উৎসাহিত শ্রীমজুমদার ফলের চাষেও হাত পাকাবার চেষ্টা করেছেন। সে পরীক্ষাতেও মজুমদার মশাই সফল হয়েছেন। গত বছরে গাইঘাটা ব্লক অফিসে যে কৃষি-মেলার আয়োজন করা হয় তাতে তাঁর বাগানের পেঁপে ও কলা প্রশংসা পত্র পেয়েছে।

শ্রীমজুমদারের এই সাফল্য ও তাঁর উদ্যম, ঐ অঞ্চলের অন্যান্য চাষীদেরও কৃষি উন্নয়নে উৎসাহিত করেছে এবং তাঁরাও চাষবাসের উন্নতি ক'রে আর্থিক স্বাচ্ছলতা অর্জন করার চেষ্টা করছেন।

ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে নতুন জীবনের সাড়া

নেফা কন্যা—পিঠে বোঝা মুখে হাসি

সুদূর কেরালার কয়েকটি ফল হিমালয়ের এই পার্ব্বত্য অঞ্চলে ফলানো হচ্ছে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে এক নতুন জীবন গড়ে উঠছে, চারিদিকে পরিবর্তনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। চীনা আক্রমণের পর নূতন যে সব রাস্তা তৈরি করা হয়েছে সেগুলি এই দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। এই অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনও খুব দ্রুত গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে।

কামেং জেলার সদর বমডিলা চীনা আক্রমণের সময় খুব বিখ্যাত হয়ে পড়ে। এই পার্বত্য সহরটীর পাশে, সেরা গ্রামটীতে এলে, এই পরিবর্তনটা অত্যন্ত সহজে বুঝতে পারা যায়। মাত্র দুই বছর পূর্বে এই গ্রামটির পত্তন হয়। গ্রামটির লোক-সংখ্যা হল ৩০০। ৯২টি মোনুপা ও শেরডু কপেন পরিবারকে, তাদের যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করে, এই গ্রামটির পত্তন করা হয়।

এরা চিরকাল ঝুম চাষ করতো। পাহাড়ে খানিকটা জায়গায় আগুন লাগিয়ে পরিষ্কার করে মাটিটাকে অল্প একটু খুঁড়ে ওরা সেখানে শস্যের বীজ বুনে দেয়। এই রকম চাষে প্রথম দুই এক বছর খুব ভালো ফসল হয়। তারপর পরিমাণ কমে এলেই ওরা সেই

যাযাবর জীবন এঁরা পরিত্যাগ করেছেন

শিক্ষারত নেফার শিশু

তাঁতের সামনে

ছেড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে আবার এই পদ্ধতিতে ফসল ফলাতে সুরু করে। এদের স্থায়ীভাবে বাস করিয়ে নতুন নতুন কৃষি পদ্ধতি শেখানো হয়। এই রকম জায়গায় কফির চাষও ভালো হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বমডিলার কাছে একটি কৃষি খামারে কফি গাছ লাগিয়ে ভালো ফল পাওয়া গেছে। এই গ্রামটিতে এখন দুটি হাঁস মুরগী পালন কেন্দ্র, একটি শূকর পালন কেন্দ্র ও একটি দুগ্ধ কেন্দ্র আছে।

এই গ্রামের একজন অধিবাসী দুই বছর পূর্বে কুটির শিল্প হিসেবে কাগজ তৈরী করতে সুরু করেন। বার্চ গাছের মতো এক রকম গাছের ছাল দিয়ে তিনি এই কাগজ তৈরী করেন। শাস্ত্রাদি লেখার জন্য শত শত বছর ধরে হালকা বাদামী রঙের যে কাগজ ব্যবহৃত হয়ে আসছে এগুলি সেই রকম কাগজ। ভুটানেও এই ধরণের কাগজ তৈরী করা হয়। গত বছর এই সেরা গ্রামের দুটি পরিবার প্রায় ১৮০০০ টাকার কাগজ তৈরী করে। এই কাগজের কিছুটা স্থানীয় অধিবাসীদের ব্যবহারে লাগে, কিছুটা রপ্তানি করা হয়।

গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে বেশীর ভাগই ফলের চাষ করেন। সিকিম থেকে আপেল গাছের চারা এনে, উত্তর পূর্ব প্রান্তের এই অঞ্চলে লাগানো হয়েছে এবং সেগুলি বেশ বড় হয়ে উঠেছে। তাছাড়া নানা ধরণের শাক সব্জিও উৎপাদন করা

হচ্ছে। গত বছর একমাত্র কামেং মহকুমা ২৬০০০ টাকার শাক সব্জি উৎপাদন করছে। এর ফলে গ্রামের অধিবাসীরা বেশ কিছু বাড়তি টাকা পেয়েছেন।

কামেং জেলায় মোট গ্রামের সংখ্যা হল ৩৩৯ এবং লোক সংখ্যা ৭০,০০০। এই জেলায় উন্নয়নমূলক যে সব কাজ হচ্ছে তার নিদর্শন হিসেবে সেরা গ্রামের উল্লেখ করা হল।

প্রকৃত পক্ষে বমডিলা গ্রামটি ১৯৫৩ সালেই মাত্র মানচিত্রে স্থান পায়। তখনও এখানে স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা খুবই কম ছিলো। বর্ত্তমানে এটি ৪০০০ লোকসংখ্যা বিশিষ্ট একটি শহর। এখানে এখন একটি হাই স্কুল, একটি হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল এবং বহির্বিভাগ ও অস্ত্রোপচার কক্ষসহ ২০টি শয্যার একটি হাসপাতাল রয়েছে।

তা ছাড়া এখানে একটি প্রশিক্ষণ তথা উৎপাদন কেন্দ্রও স্থাপন করা হয়েছে। এই কেন্দ্রে কার্পেট ও বস্ত্র বয়ন, ছুতোর ও কামারের কাজ শেখানো হয়। এই সব সুযোগ সুবিধে এখানকার অধিবাসীদের জীবনে অনেক বৈচিত্র্য এনেছে।

কামেং জেলার পশ্চিমে সিয়াং জেলাটি অবশ্য এই অঞ্চলে সব চাইতে বেশী অগ্রগামী। এই জেলার পাশিঘাটে নেফার প্রথম ডিগ্রী কলেজ স্থাপিত হয়। জেলা-সদর আলঙে একটি হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে এবং সেটিতে প্রায় ২০০ ছাত্র পড়াশুনা করে। এই স্কুলটি আদি ও গালং উপজাতিদের মধ্যে এতো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যে অন্যান্য জায়গাতেও এই রকম স্কুল স্থাপনের জন্য বেশ কিছুদিন ধরে দাবি জানানো হচ্ছে। আলং সহরে বিদ্যুৎ শক্তি ও কলের জল আছে এবং ৪০টি শয্যার সুসজ্জিত একটি হাসপাতাল রয়েছে।

আলঙে শিগ্‌গীরই "ডোনী-পোলো" বা সূর্য্যচন্দ্রের একটি মন্দির স্থাপন করা হবে। একেবারে উত্তরতম অঞ্চল ছাড়া আর সর্বত্রই সূর্য্যচন্দ্রের পূজা করা হয়। উত্তরতম অঞ্চলে লামা ধর্ম অনুসরণ করা হয়। সিয়াং, সুবনসিরি এবং লোহিত জেলায় সম্প্রতি প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়ে বৈষ্ণব মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। তাতে মনে হয় অতি প্রাচীনকালেও এই অঞ্চলে চন্দ্র সূর্য্যের পূজা প্রচলিত ছিল।

গালং এবং মিনিয়ং উপজাতিসহ আদি উপজাতিরাও ঝুম চাষের অভ্যাস পরিত্যাগ করছে। বর্ত্তমানে ১৪,৯৭৫ একর জমিতে স্থায়ী-চাষ করা হচ্ছে এবং জেলার প্রায় ৪৫০০০ অধিবাসীর দানাশস্যের চাহিদা মেটানো হচ্ছে। এই জেলায় ২৫টি ছোট জলসেচ ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হয়েছে। পচা সার এবং বেশী ফলনের ধানও কৃষকগণের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

আধুনিকতার নিদর্শন বিদ্যুৎ শক্তিও এখানে এসে গেছে। ৮টি গ্রামে বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করা হচ্ছে। ১০০ কিলো-ওয়াটের একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রও তৈরী করা হচ্ছে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত এজেন্সীর কিছু অঞ্চলের আবহাওয়ার সঙ্গে কেরালার আবহাওয়ার মিল থাকায় কিছু লোক, গোল মরিচের চাষ করতে উৎসাহী হন এবং তাতে সফল হন। এখানে দারচিনি আনারস এবং কমলালেবুও ভালো হয়। কলার চাষ ক্রমশঃ বাড়ছে। কেরালা থেকে কয়েক ধরণের কলা এনে এখানে লাগানো হয় এবং এখানকার মাটিতে সেগুলি বেশ ভালো হয়ে উঠছে। একজন তো প্রতি একরে ৫ হাজার টাকার কলা ফলিয়েছেন। সুদূর কেরালার কয়েক রকমের ফল হিমালয়ের কোলে নতুন আসন পেয়েছে।

ফসল তোলায় যন্ত্রের ব্যবহার

দেশে সবুজ বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে সাফল্য লাভ করার পর এবং একই ক্ষেতে একাধিক ফসল তোলার পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করার পর ফসল কাটা, মাড়াই ও ঝাড়াই-এর কাজে যন্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশই বেশী করে অনুভব করা যাচ্ছে। সম্প্রতি পাঞ্জাবে, শতদ্রু তীরে ফিল্লোরের কাছে একটি খামারে জন্ ডীয়ারী স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে কীভাবে ফসল তোলার সমস্ত কাজ আপনা আপনি হতে পারে তা দেখানো হয়।

যন্ত্রটি ক্রমানুয়ে ফসল কেটে, মেড়ে বেছে ছাঁটা শস্য থলিতে ভরে দেয়। খানিকক্ষণ পরে যন্ত্রটি আপনা আপনি শস্যের থলিগুলি একটা ট্রেলারে বসিয়ে দেয়। অল্প খরচে এই কাজ দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে সুসম্পন্ন হয়।

গম বাজরা ও জোয়ারের ফসল তোলায় এই যন্ত্রটি খুবই উপযোগী। এর সঙ্গে অন্য যন্ত্রাংশ জুড়ে ধান ও ভুট্টাও অমনি ক'রে কেটে ঝেড়ে নেওয়া যেতে পারে।

একটি বৃটিশ ফার্ম সার ভালো করে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ৯ মীটার পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়ার একটা যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে।

ক্ষেতখামারে যত রকমের সার ব্যবহার করা হয় তার সবগুলিই জমিতে ছড়িয়ে দেওয়া যাবে এই যন্ত্রের সাহায্যে।

যন্ত্রের আকার আধখানা চোঙার মত। সামনের দিকে তার একটি মোটর লাগানো আছে। তারই গায়ে লাগানো থাকে দুটো বড় ঘাস কাটার তরোয়ালের মত অংশ আর দুটো প্রক্ষেপক।

যন্ত্রটি গঠনে ও আকারে ভারী। চট করে এর মেরামতির দরকার না পড়ে সেইভাবে এটি তৈরি। মোটর (চালকযন্ত্র) লাগানো অংশগুলি সামনের ফলকটার সঙ্গে সংযুক্ত নয় এবং এটা এমনভাবে তৈরি যে কোনোও যন্ত্রাংশের গায়ে সার লাগে না। সার ভাঙবার বা ছড়িয়ে দেওয়ার যন্ত্রাংশগুলো খুলে বদলে নেওয়া যেতে পারে। তা ছাড়া যে কোনোও দিক থেকে এর খোলের মধ্যে সার ভরা চলে এবং এক সঙ্গে অনেকখানি সার ভর্ত্তি ক'রে দিলেও যন্ত্রের কাজ ব্যাহত হয় না।

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের কৃষি সমস্যা

গৌরাঙ্গ চন্দ্র মোহান্ত

পর পর তিনটি যোজনার কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় কৃষির ক্ষেত্রে তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। এর অন্যতম কারণ হল আজও আমরা কৃষকদের মধ্যে এমন অনুপ্রেরণা সঞ্চার করতে পারি নি যা তাঁদের কৃষির উন্নয়ন সম্বন্ধে আরও বেশী সচেতন করে তুলতে পারে।

কৃষির ক্ষেত্রে এই অনগ্রসরতার কারণগুলি আলোচনা করা যাক। কৃষির উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট অর্থের সংস্থান করা হয় না। শতকরা প্রায় ৯০ জন কৃষকই উৎপন্ন শস্যের মূল্যের শতকরা ১০ ভাগও কষির উন্নতির জন্যে ব্যয় করেন না বা করতে পারেন না।

রাসায়নিক সার ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় না। এই রাজ্যে শতকরা মাত্র দুজন কৃষক রাসায়নিক সার ব্যবহার করেন। অনেকে অজ্ঞতাহেতু সার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না। অনেকের আবার কুসংস্কার যে রাসায়নিক সার ব্যবহারে জমি নষ্ট হয়। জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায়। কুসংস্কার কারুর কারুর ক্ষেত্রে এত দৃঢ়মূল যে তারা রাসায়নিক সার ব্যবহারের নামে শিউরে উঠেন।

কৃষির উন্নয়নের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করা হয় না। অধিকাংশ কৃষকই মান্ধাতার আমলের সেই ভোঁতা লাঙল আর বলদ চাষের কাজে ব্যবহার করেন। ফলে জমি সুষ্ঠুভাবে কর্ষিত হয় না, শস্যের গোড়ায় প্রচুর পরিমাণে আলো বাতাস লাগে না এবং চারাগুলি বাড়তে পারে না, সতেজ হয় না এবং ফলনও ভাল হয় না। এ রাজ্যে শতকরা বোধহয় একজন কৃষকও ট্রাকটর, থ্রেশার ইত্যাদি ব্যবহার করেন না। জলসেচের অভাবে এ রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চলেই সেচের কোন রকম সুযোগ সুবিধা নেই। পুকুর, খাল, বিল এবং নদীর কাছাকাছি জমিগুলোতেই কেবল সেচ দেওয়া যায়। অথচ ভাগিরথী, মহানদী, আত্রেয়ী, যমুনা, দামোদর, তিস্তা ইত্যাদির মতো অনেকগুলি ছোট বড় নদনদী এ রাজ্যের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে।

যোজনাগুলিতে সেচের উন্নয়ন সম্পর্কে অনেক প্রকল্প থাকলেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়নি। ফলে এই রাজ্য জলসেচের ব্যাপারে অনেকখানি পিছিয়ে আছে। সরকারি ফার্মগুলোতে অবশ্য জলসেচের ব্যবস্থা রয়েছে। জনসাধারণ সেই রকম কোন সুযোগ সুবিধা পান না। ফলে এ রাজ্যের পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে এক বছর অনাবৃষ্টি হলে কৃষকদের মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকতে হয়।

উন্নত ধরণের বীজ ব্যবহৃত হয় না। যে সব বীজের ফলন খুব বেশী হয় অধিকাংশ কৃষকই তা ব্যবহার করেন না। যেমন উন্নত ধরনের ধানের বীজ হিসাবে আমরা জয়া পদ্মা ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারি।

রোগ বীজাণুর হাত থেকে শস্য বাঁচানোর বিশেষ কোনোও প্রচেষ্টা নেই। শস্য রোপণের পর কৃষকরা ভাবেন তাঁদের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে। তখন তাঁরা দিন গুনতে থাকেন কবে ফসল পাকবে এবং তাঁরা তা ঘরে তুলে আনবেন। ইতিমধ্যে নানা রকমের কীট পতঙ্গ বা রোগ বীজাণু চারাগুলিকে আক্রমণ করলেও সে বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ ছাড়া সাধারণত তাঁরা বিশেষ কিছু করেন না। বরং তাঁদের ভূমিকা যেন দর্শকের মত। শস্যের এই সমূহ ক্ষতিকে তাঁরা নিজেদের দুর্ভাগ্য বলে মেনে নেন। এ রাজ্যের শতকরা ৫ জন কৃষকও যদি রোগ বীজাণুর হাত থেকে শস্য রক্ষার চেষ্টা করেন তো যথেষ্ট। এ ছাড়া শস্য ঘরে তুলে আনবার পর আর এক নতুন উপদ্রবের আবির্ভাব ঘটে। সেটি হল ইঁদুর। শস্য ভালভাবে গুদামজাত করবার ব্যবস্থা না থাকায় শস্যের প্রায় দশ ভাগই ইঁদুরের পেটে যায়। অথচ কৃষকদের ইঁদুর মারবার উৎসাহ নেই। অনেকে মনে করেন ইঁদুর মারা পাপ।

প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণ ঋণ দেবার সুষ্ঠু ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। সরকার যে পরিমাণ ঋণ দেন তা কৃষকের প্রয়োজনের পাঁচ শতাংশও নয়। ফলে জনসাধারণ বাদ বাকি প্রয়োজনীয় ঋণ গ্রামের মহাজনদের কাছ থেকে অনেক বেশী সুদে সংগ্রহ করেন। তারপর ফসল পাকবার পর সুদ সহ ঋণ শোধ ক'রে যা ঘরে ওঠে তার পরিমাণ দাঁড়ায় অতি সামান্য। এমতাবস্থায় সংসার চলে না। এ ছাড়া সরকারি কৃষি ঋণ সাধারণত উচ্চ বিত্ত ও মধ্যবিত্ত কৃষকরাই পান। অথচ এঁদের মধ্যে হয়তো বেশীর ভাগের কৃষি ঋণের কোন প্রয়োজনই নেই এবং তারা ঐ ঋণ নেবার পর চড়া সুদে আবার ঐ টাকা নিম্নবিত্ত কৃষকদের মধ্যেই বিলি করেন। নিম্ন বিত্ত কৃষকরা ঋণ সংক্রান্ত জটিল তত্ত্ব বোঝেন না, বোঝবার চেষ্টাও করেন না। অন্যদিকে সরকারি উদ্যোগে ঋণ দেবার বিভিন্ন উৎসের কথা জনসাধারণকে বুঝিয়েও বলা হয় না। অর্থাৎ নানা কারণে অধিকাংশ কৃষকই ঋণ থেকে বঞ্চিত হন।

সরকারের প্রচার বিভাগও কৃষির ব্যাপারে জনসাধারণের মনে তেমন সাড়া জাগাতে পারেন নি। বছরে হয়ত একআধবার দু একটি গ্রামে কৃষি ছবি দেখানো হয় কিন্তু তাতে যে কৃষকদের উৎসাহ বাড়ে তা মনে হয় না। বরং ছবিগুলি কৃষকদের কাছে আনন্দ লাভের একটা উপকরণ মাত্র হয়ে থাকে।

এই আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে কৃষকদের নিরক্ষরতাও কৃষি সমস্যার একটা অন্যতম কারণ। বস্তুত বয়স্কগণের শিক্ষার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্গে সারা দেশে এমন অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে যাতে কৃষকরা উন্নততর বীজ, রাসায়নিক সার এবং উন্নততর ও বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রণালী প্রয়োগ করেন। রাজ্যের সর্বত্র জল-

সেচের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনাসূচী গ্রহণ করতে হবে। নিম্নবিত্ত কৃষকদের প্রয়োজনীয় ঋণ কম সুদে দিতে হবে। রাসায়নিক সার, উন্নততর বীজ, পোকার হাত থেকে শস্যকে রক্ষার জন্য ব্যবহৃত স্প্রে প্রভৃতি প্রয়োজনবোধে বিনামূল্যে সরবরাহ করতে হবে। কৃষকরা যাতে উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য মূল্য পান সেদিকে নজর রাখতে হবে। একই জমিতে দুই বা তদধিক ফসল ফলানোর ব্যাপারে কৃষকদের উৎসাহিত করতে হবে। সর্বোপরি নজর রাখতে হবে কোন জমি অনাবাদী অবস্থায় পড়ে না থাকে।

এ ছাড়া সরকারের কৃষি প্রচার বিভাগকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। এই সমিতিতে কৃষি বিশেষজ্ঞ, ইঞ্জিনীয়ার এবং বর্তমান কৃষি প্রণালীতে শিক্ষিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দুঃখের বিষয় দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের অধিকাংশই চাষবাসকে অসম্মানকর ভেবে দূরে সরে থাকেন। তাঁদের উপলব্ধি করা দরকার যে কৃষি বিপ্লব ঘটাতে গেলে তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে কৃষি কার্য অন্যান্য কাজের মতই সম মর্যাদা সম্পন্ন। যদি আমরা আমাদের বদলাতে পারি তবেই পশ্চিম বাংলা তথা ভারতের কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটতে পারে।

●

সারা বিশ্বে প্রোটীনযুক্ত খাদ্যের চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে। মানুষের খাদ্য তালিকায় যে সব জল স্থল ও উভচর জীবের নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তাদের মোট সংখ্যা অনেক।

নদী, পুকুর, খাল-বিল ও সমুদ্রের মাছ, চিঙড়ী, কাঁকড়া পুরোপরি ধরা পড়ে না। ধরা পড়লে বছরে সেগুলির মোট পরিমাণ দাঁড়াতো ১৪ কোটি টন। বিভিন্ন কারণে বহু মাছ আহার্য তালিকার বাইরে রাখা হয়েছে; তা না হলে আহার্য হিসেবে ধরবার উপযুক্ত মাছের গড়পড়তা পরিমাণ বছরে দাঁড়াত ২০ কোটি টন।

জনগণের চেষ্টায় দ্বিগুণ সেচের জল

জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় রাজস্থানের ডুঙ্গারপুরের পাথুরে অঞ্চলে সবুজের সমারোহ দেখা দিয়েছে। এই জেলায় কুয়োর বা জলের অভাব কোন দিনই ছিল না, কিন্তু সেই জল তুলে জমিতে দিতে হলে যে সব ব্যবস্থার প্রয়োজন তারই ছিল অভাব. জেলার উপজাতীয় অধিবাসীরা গরীব কাজেই অর্থের অভাবটাই ছিল ওদের বড় অভাব। পারশিক চক্রের (অর্থাৎ যে চাকা দিয়ে কুয়ো থেকে জল তুলে জমিতে দেওয়া যায়) সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ১৯৬৮-৬৯ সালে যে অভিযান চালানো হয় তাতে এগুলির সংখ্যা এক বছরে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। এর ফলে সেচের ক্ষমতাও শতকরা ৪০ ভাগ বেড়ে গেছে। এতে আরও ৮০০০ টন বেশী খাদ্য শস্য ফলানো যাবে। এই ৮০০০ টন খাদ্যশস্য ৫০,০০০ লোকের এক বছরের খাদ্যের সংস্থান করবে। এই অভিযানে ব্যয় হয়েছে ২৪.০৫ লক্ষ টাকা, এর মধ্যে জনসাধারণ, দৈহিক পরিশ্রম করে যে সহযোগিতা করেছেন তার মূল্য হ'ল ১০ লক্ষ টাকা।

এই অভিযানের সাফল্য, একটি স্বপ্নকে সফল করে তুলেছে। একটি উপজাতীয়ের বাসভূমি এই জেলাটির চতুর্দিকেই এখন কর্মচাঞ্চল্য, প্রত্যেকের চোখে মুখেই যেন একটা নতুন বিশ্বাস।

১৯৬৮ সালের ২৩শে মার্চ যখন একদল সরকারী কর্মচারী এবং কিছু সংখ্যক বেসরকারী ব্যক্তি ১৫০০ পারশিক চক্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত করলেন তখন থেকেই প্রকৃতপক্ষে এই অভিযান সুরু হয়। প্রাথমিক প্রয়োজন গুলি সম্পূর্ণ করার পর, স্থির হয় যে উপজাতীয় কৃষকগণকে ৪০০ টাকা করে সাহায্য দেওয়া হবে এবং বাকি টাকাটা ঋণ হিসেবে দেওয়া হবে। তবে নাম মাত্র চাঁদা হিসেবে কৃষকগণের কাছ থেকে ৫০ টাকা নেওয়া হবে। নগদ টাকায় সাহায্য না দিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেওয়া হবে. এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় অভিযানের সাফল্য আরও সুনিশ্চিত করা হল। অনেক বেশী সংখ্যায় চাকা তৈরি করা হবে বলে সেখানেও ব্যয়ের মাত্রা কিছুটা কমে গিয়ে সেচ দেওয়ার এই পারশিক চক্রের মূল্য ৮৫০ টাকা থেকে ক'মে ৭০০ টাকায় দাঁড়ালো। সরকারী কৃষি কারখানায় মাত্র ৫ মাসে ৩১০০ পারশিক চক্র তৈরি করা হ'ল। বাকীটা তৈরি করলেন স্থানীয় ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদকগণ।

সেচের এই চক্র পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েত সমিতিগুলোতে নিজেদের নাম রেজেষ্ট্রী করানোর জন্য গ্রামবাসীর সংখ্যা বাড়তে থাকায় উৎপাদনের পরিমাণ আরও বাড়ানো প্রয়োজনীয় হয়ে পড়লো।

১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে ঐ অঞ্চলে পারশিক চক্রের প্রথম চালান এসে পৌঁছুলো। ট্রাকে করে জয়পুর থেকে এগুলিকে পঞ্চায়েত সমিতির সদর দপ্তরে পৌঁছানোতে খরচ একটু বেশী পড়তে লাগলো, কিন্তু তাড়াতাড়ি পৌঁছানোর জন্য এই অতিরিক্ত ব্যয়কে আমল দেওয়া হ'ল না। প্রত্যেক স্তরে বিলম্ব যথা সম্ভব হ্রাস করা হয়। রাজস্ব পাটোয়ারি এবং গ্রামসেবকগণের সহযোগিতায় ঋণ ও সাহায্যের জন্য ৬০০০ আবেদনপত্র তৈরি করা হ'ল। তারপর কয়েকদিনের মধ্যেই গরুর গাড়ীতে এই পারশিক চক্র বোঝাই করে একটার পর একটা গাড়ী গ্রাম থেকে পঞ্চায়েত সমিতি এবং পঞ্চায়েত সমিতি থেকে গ্রামে যাতায়াত সুরু করলো।

উৎপাদনের লক্ষ্য বাড়ানোর ফলে এগুলি তৈরি করার টাকা সংগ্রহ করাটা একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। যতগুলি চাকার জন্য আবেদন করা হয়েছে সেগুলি সব তৈরি করতে হলে মোট ২১ লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

এই সমস্যার সমাধান করার জন্য কৃষি বিভাগ ৪.০৫ লক্ষ টাকার ঋণ মঞ্জুর করলেন। দুর্ভিক্ষ ত্রাণ বিভাগ দিলেন ৭ লক্ষ টাকা। উপজাতি উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ১০ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করা হ'ল। অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে, সমাজ কল্যাণ বিভাগ ২ লক্ষ টাকা দেন।

এই অভিযানের সাফল্যকে, স্থায়ী ভিত্তিতে দুর্ভিক্ষাবস্থা প্রতিরোধ করা সম্পর্কে জনগণের দৃঢ়তার প্রতীক বলা যায়। একে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য সংগ্রামের নিদর্শনও বলা যায়।

রাউরকেলা

রাউরকেলার ইস্পাত কারখানার সম্প্রসারিত অংশের নাম রাখা হয়েছে রাউরকেলা-২। সম্প্রসারণের পর লৌহপিণ্ড উৎপাদনের মাত্রা দাঁড়িয়েছে ১'৮ মিলিয়ন টন অর্থাৎ ১,২৪০,০০০ টন ইস্পাত। এই ইস্পাত দেশের নতুন নতুন শিল্পের চাহিদা মেটাবে। এই ইস্পাত হবে নানা ধরনের যা—জাহাজ তৈরি থেকে সুরু করে নানা রকমের আধার, বয়লার, মোটরগাড়ীর খোল, রেফ্রিজারেটার, এয়ার কণ্ডিশনার তৈরির কাজে লাগবে।

বিভিন্ন শিল্পের প্রয়োজনে বড় বড় যন্ত্রাংশ তৈরির ব্যাপারে স্বাবলম্বী হবার চেষ্টায় ভারত কতটা অগ্রসর হচ্ছে এই পরিকল্পনা তারই পরিচয় বহন করছে।

১৯৫৩ সালে সরকার পশ্চিম জার্মাণীর দুটি ফার্ম দেমাগ ও ক্রুপস্‌কে একটি ইস্পাত কারখানার পরিকল্পনা তৈরি করতে বলেছিলেন। সেই কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা ধার্য করা হয়েছিল পাঁচ লক্ষ টন। গোড়ায় বিনিয়োগের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচনা সুরু হ'লেও, সরকার পরে কারখানাটির লক্ষ্য ১০ লক্ষ টন ধার্য করতে এবং এটি সরকারী উদ্যোগ হিসেবে রূপায়িত করতে মনস্থ করলেন। অবশেষে ১৯৫৪ সালের গোড়ার দিকে হিন্দুস্থান ষ্টীল লিমিটেডের নাম রেজিষ্ট্রী হ'ল। অবশ্য পূর্বের চুক্তিমত ডেমাগ ও ক্রুপস্-এর পরামর্শদাতার ভূমিকা বহাল রইল। আর পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্যে স্থান বেছে নেওয়া হ'ল ওড়িষ্যার রাউরকেলা।

এই কারখানার জন্যে পশ্চিম জার্মানী থেকে ৩,৬৬,০০০ টন যন্ত্রোপকরণ এল। বিভিন্ন বন্দরে, বিশেষ করে কলকাতায় ঐ মাল নামিয়ে ট্রেণে চালান করা হ'ল রাউরকেলায়। পশ্চিম জার্মাণীর ৩০টি বড় ফার্ম ৬০টিরও বেশী সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী পরিকল্পনা রূপায়ণে অংশ নেয়। কাজ যখন পুরো দমে চলছিল তখন ইঞ্জিনীয়ার ও যন্ত্রকুশলী নিয়ে প্রায় দেড় হাজার লোক কাজ করেছেন। আজ থেকে ১০ বছর আগে ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে উৎপাদন সুরু হয়।

গোড়াতেই বড় কাজে হাত দিলে যা হয়—সমন্বয়ের অভাবে অনেক অংশের কাজ

শেষ হতে দেরী হয়ে যায়। এখানেও এই ব্যাপার ঘটল, ফলে পুরোদমে কাজ করে, লক্ষ্যে পৌছুতে সেই ১৯৬১-৬২ সাল এসে গেলো। কিন্তু তখন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে উৎপাদনের মাত্রা বাড়িয়েছে মাত্র ১৮৬,০০০ টন যেখানে লক্ষ্যই ধরা হয়েছে ৭২০,০০০ টন। পরের বছর এই পরিমাণ দাড়ান ৪৮৬,০০০ টন। তারপর থেকে অবশ্য কাজে আর ঢিল পড়েনি, কাজ এগিয়েই গিয়েছে—১৯৬৩-৬৪তে ৫৫৫,০০০ টন, ১৯৬৪-৬৫তে ৬১৬,০০০ টন এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে উৎপাদনের পরিমাণ লক্ষ্য ছাড়িয়েছে এবং শতকরা ৯ ভাগ বেশী হয়েছে।

উড়িষ্যার রত্ন

ক্রমশঃ লোকে রাউরকেলা সম্বন্ধে গোড়ার দিকের সংশয়ের কথা ভুলে গেল—বরং নতুন করে রাউরকেলার নাম হল 'উড়িষ্যার রত্ন'। ১৯৬৪-৬৫তে এই কারখানার মুনাফার পরিমাণ দাড়াল ১৫ কোটি টাকা এবং ১৯৬৫-৬৬তে ৫৭ কোটি।

রাউরকেলায় আর একটি জিনিস আছে সার তৈরির কারখানা। সারা বিশ্বে আর কোথাও ইস্পাত কারখানার সঙ্গে এতো বড় সারের কারখানা বোধ হয় নেই। রাউরকেলা হলো এমন কতকগুলি ইউনিট আছে যা শুধু ভারতেই নয় সমগ্র এশিয়ায় অভিনব। উদাহরণ স্বরূপ নাম করা চলে টানডেম মিল, ইলেকট্রোলিটিক টিনিং লাইন এবং দুটি কন্টিনিউয়াস গ্যালভা-নাইজিং লাইন ইত্যাদির।

পরিকল্পনার রূপায়ণে খরচ হয়েছে ৩৭০ কোটি টাকা। অবশ্য এর মধ্যে খনির কাজ, উপনগরী স্থাপন ও পরিকল্পনা রূপায়ণের সব রকম প্রস্তুতির কাজ ধরা হয়েছে। এর জন্যে বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার চাহিদা পূরণ হয়েছে পশ্চিম জার্মা-নীর ঋণ দিয়ে। পশ্চিম জার্মাণী সরকার প্রথম ১৭২ কোটি টাকার সমান বিনিময় মুদ্রা দিয়ে ও দ্বিতীয় কিস্তীতে ৮০ কোটি টাকার সমান ঋণ দিয়ে আমাদের কাজে সাহায্য করেছেন। মনে রাখতে হবে যে, এই সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় প্রচুর পরিমাণ দেশীয় উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। তার সঙ্গে নক্সা তৈরি ও নির্মাণ পরিকল্প-নায় ভারতীয়দের হাত আছে অনেকখানি। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উৎকল মেশিনারী সংস্থা রাউরকেলার একটি ব্লাস্ট ফার্নেসের ৪,০০০ টন যন্ত্রাংশ ও প্লেটের মধ্যে ৩,০০০ টন সরবরাহ করেছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রূপান্তর

দেশে ইঞ্জিনীয়ারিং ও নির্মাণ শিল্পের বিকাশে সাহায্য করা ছাড়াও, রাউরকেলা পরিকল্পনা দেশের অনুন্নত অঞ্চলগুলির উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। তা ছাড়া এই এলাকায় যে সব উপজাতীয় বসবাস করছেন তাঁরাও উপকৃত হয়েছেন। শিল্পা-ঞ্চলের আবাসিক এলাকা অর্থাৎ উপনগরীটি ১১,৬৫৬ একর ভূমি জুড়ে গড়ে উঠেছে। এখানকার বাসিন্দাদের সংখ্যা হবে ১,০০,০০০। এঁদের মধ্যে ৩১,০০০কে সরাসরি ইস্পাত কারখানায় বা অন্যান্য কারখানায় কাজ দেওয়া হয়েছে।

বিদেশের বাজারে রাউরকেলায় তৈরি জিনিসের চাহিদা বাড়ছে এবং এই সব জিনিস রপ্তানী করার ফলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী করা হয়েছে হট্‌রোলড্ কয়েল, নিউজি-ল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে পাইপ ও জাপানে লৌহ পিণ্ড।

সম্প্রতি ক্রিসেন্ট তৈরির জন্যে একটি নতুন ধরণের ইস্পাত তৈরি হয়েছে রাউরকেলায়। আবগারী ও আগম শুল্ক খাতে এক রাউরকেলাই ২০ কোটী টাকা জমা দেয়।

(৮ পৃষ্ঠার পর)

চিকিৎসায় ও শুশ্রূষায় মাঠেই পড়ে ছিল—মৃতদেহগুলি পশুদের ভক্ষ্য হয়েছিল।

জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মন্তুদ হত্যাকাণ্ড ও তার পরবর্তী ঘটনাগুলি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এক নতুন পথে পরিচালিত করল। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে পাঞ্জাবের নৃশংস ও বর্বরোচিত ঘটনাটির তীব্র নিন্দা ক'রে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'ল। প্রস্তাবে বলা হ'ল... "স্বরাজ না পাওয়া পর্য্যন্ত গান্ধীজীর নির্দ্দেশিত অহিংস অসহযোগনীতি সমর্থন ও পালন ব্যতিরেকে দেশবাসীর সামনে আর কোনোও পথ খোলা নেই।..."

পরিমাণ জ্ঞাপক ন্যূনতম নির্দিষ্ট মাপ

ডঃ বি. বি. ঘোষ
(গবেষণা বিভাগ, আকাশবাণী)

ইতিহাস আলোচনাকালে দেখা যায়, গোড়ার দিকে প্রায় সমস্ত দেশে সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই একক মাপের নির্দেশ ছিল, মানব শরীরেরই কোনও অংশ বিশেষে। রৈখিক মাপের একক হিসাবে 'হাত' বা 'পদের' (ফুট) প্রচলন হয়েছিল এই কারণে। কিন্তু সকল দেশের এমন কি একই দেশের যে কোনও দুই ব্যক্তির শরীর, কি দৈর্ঘ্যে, কি প্রস্থে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক নয়। তাই বিভিন্ন দেশে এই এককের মাপও ছিল বিভিন্ন। গ্রীক জাতির কাছে এই 'ফুটের' মাপ ছিল হারকিউলিসের পায়ের মাপে।

ভার বা ওজনের মাপের এককাবলীও সহজবোধ্য ছিল না। তরল পদার্থের মাপের বেলাতে যে সের, মণ, ছটাক, ওজনের বেলাতেও সেই কাঁচচা, ছটাক, সের ও মণ। কিন্তু রৈখিক মাপ, ফুট ইঞ্চি ইয়ার্ডের সঙ্গে—গ্যালনের কোনও একটা সহজ সম্বন্ধ নাই। ভারতীয় 'সের' ছটাক'.বা মণের' সঙ্গে 'হাত' বা বিঘত' বা অঙ্গুলি'রও এই রকম কোনও সহজ যোগাযোগ নেই। 'সময়ের মাপ সম্বন্ধে সুখের কথা এই যে একটা যুক্তিযুক্ত এককাবলী বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষে কোনও কোনও ক্ষেত্রে, বিশেষ করে জ্যোতিষী গণনায় এরও ব্যতিক্রম দেখা যায়। এখানে ঘন্টা, মিনিট ও সেকেণ্ডের পরিবর্তে দণ্ড, পল, বিপল প্রভৃতি একক তাঁরা নিজেদের গণনার কাজে ব্যবহার করে থাকেন এখনও।

মেট্রিক প্রণালীর জন্মকথা

ফরাসী বিপ্লবের আগে, ফরাসী দেশের প্রতি পল্লীতে পল্লীতে প্রায় এই রকম অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন মাপ প্রণালীর প্রচলন ছিল। ফরাসী বিপ্লবের পর ফরাসী গবর্ণমেন্ট এই অসুবিধা দূর করতে বদ্ধপরিকর হন এবং ফ্রান্সের জাতীয় মহাসভার নির্দেশে এবং সবিশেষ চেষ্টায় ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে মেট্রিক এককাবলীর সৃষ্টি হয়। পরে এই প্রথা আইনবলে দেশের সর্বত্র প্রচলিত করা হয়। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত ফরাসী দেশে এই প্রথা মাপের আইনানুমোদিত একমাত্র এককাবলী হিসেবে চলে আসছে। পরে অনেক দেশ, এই প্রণালীতে ছোট বড় এককের মধ্যে যুক্তিযুক্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি সহজ সম্বন্ধ দেখে, আপন আপনদেশে আইন করে এর প্রচলন করেছে।

মেট্রিক প্রণালী

এই প্রণালী অনুযায়ী 'মিটার' রৈখিক মাপের মূল মান। কতকগুলি ল্যাটিন ও ও গ্রীক শব্দ, নির্দিষ্ট মাপের এককের পূর্বে যোগ করে, এদের গুণিতক এবং অংশবোধক পরিমাণের মাপ ঠিক করা হয়েছে। যে কোনও গণিত পুস্তকে এদের পরস্পরের সম্বন্ধ প্রাঞ্জলভাবে লেখা আছে।

গুণিতকবোধক শব্দ (গ্রীক)

১০	১০০	১০০০	১০,০০০
ডেকা	হেক্টো	কিলো	মিরিয়া

অংশবোধক শব্দ (ল্যাটিন)

১/১০	১/১০০	১/১০০০
ডেসি	সেন্টি	মিলি

এই সমস্ত উপসর্গের সঙ্গে দৈর্ঘ্যের জন্য 'মিটার' বর্গের জন্য 'এর' এবং ঘনত্বের জন্য স্টার বা 'লিটার' যোগ করে দিলেই সমস্ত রৈখিক, বর্গিক ও ঘনত্ববোধক মূল মাপের এককাবলীর জাতি সম্বন্ধ পাওয়া যায়। এদের একই সম্বন্ধ একই নাম। কেবল প্রয়োজন মতো, একক যোগ করে হ'ল।

মূল মাপের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

এই রৈখিক মাপের মূল একক—মিটারের দৈর্ঘ্য নির্ণয়েরও গোড়াতে একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। দুজন বিখ্যাত ফরাসী গণিতবিদ্, দ্যিলাম্বর ও মিশেঁ, ডানকার্ক থেকে বার্সিলোনা পর্যন্ত দুইটি জায়গার দূরত্ব মাপলেন। ইউরোপের নানান দেশ থেকে আরও বাইশজন মনীষী এসে এঁদের মাপ জোকের ফলাফল আলোচনা করে স্থির করলেন যে, উত্তরমেরু থেকে বিষুবরেখা পর্যন্ত স্থানের দূরত্বের ১/১০০০,০০০,০০০ অংশের সমান হবে এই মিটারের দৈর্ঘ্য। কিন্তু পৃথিবীর শরীরের আয়তন অপরিবর্তনীয় নয়। পদার্থ বিজ্ঞানীরা এক সন্ধান দিলেন। যে কোনও আলোকরশ্মির বর্ণচ্ছটার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য—এই মিটারের মাপে তুলনা করা যেতে পারে। তখন ঠিক করা হয়েছিল খুব বেশী উত্তপ্ত ক্যাডমিয়াম্ ধাতু থেকে যে আলোকরশ্মি বেরোয়, তার বর্ণচ্ছটায় যে লাল রশ্মি আছে তার আলোক তরঙ্গের দৈর্ঘের ১,৫৫৩,১৬৩.৫ গুণ হবে এই মিটারের দৈর্ঘ্য। সুতরাং প্রয়োজন হ'লে, কেবল আলোর দ্বারাই এই মিটারের দৈর্ঘ্য ঠিক করা চলতে পারে।

রৈখিক মাপের মত ভার নির্ণয়ও যে এই একই প্রকার শব্দগুলি দিয়ে শুধু গুণিতক ও আংশিক মাপ ঠিক করা যায় তাই নয়, এর একটা যুক্তি সঙ্গত ভিত্তিও আছে। এক সেন্টিমিটার ঘন আয়তন বিশিষ্ট একটি পাত্রে চার সেন্টিগ্রেড উত্তপ্ত জল যতটা ধরে তার ওজন যা হয় তার নাম গ্রাম এবং এই গ্রাম, ভার বা ওজনের একক মূল মাপ।

গুণিতক বা অংশবোধক শব্দগুলি গ্রীক এবং ল্যাটিন বলে, শৈশব কালে, স্কুলে পড়বার সময় আমাদের গণিতের শিক্ষক এদের মনে রাখবার এক সহজ উপায় বলে দিয়েছিলেন। সেটা এইরকম:-

ডেকে হেঁকে কিলিয়ে মেরে
দেশী শান্তি মিল

এক সময়ে যখন এই মাপ প্রণালীর প্রচলন ছিল না—তখন ছাত্ররা বিদ্যারম্ভ করতো কাঠা, বিঘা, সের, ছটাক বা পাউণ্ড, শিলিং, পেন্স, গ্যালন ইত্যাদি দিয়ে। কিন্তু প্রকৃত জীবনে এদের ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন হ'ত বলে অনেক সময় প্রায় দিশাহারা হ'য়ে যেত।

মেট্রিক মাপ প্রণালী বর্তমানে দশমিক প্রণালীতে শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়ায়, হিসেবের

ক্ষেত্রে গণিতের যোগ, গুণ, বিয়োগ প্রভৃতি খুবই সহজ সাধ্য হয়ে উঠেছে।

১৯৫৬ সালে ভারত সরকার আইন ক'রে এই মেট্রিক প্রণালী বলবৎ করেছেন। গোড়ায় নতুন ব্যবস্থায় অনভ্যস্ত থাকায় কিছু অসুবিধা ঘটলেও, এখন জনসাধারণ এই পদ্ধতির কার্যকারিতা ও উপকারীতা উপলব্ধি করছেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির দশ বছরের মধ্যেই মাপ পদ্ধতির আমূল সংস্কার করে ও মুদ্রার ক্ষেত্রে দশমিক প্রথা প্রবর্তন করে সরকার সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

দেশের মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে

ভারতবর্ষে, ১৯৬৫ সালের আগে, নানান পদ্ধতিতে মুদ্রা বিনিময়ের কাজ চলতো। টাকা আর আনার মধ্যে মোটামুটি একটা বাঁধা ধরা সম্বন্ধ ছিল প্রায় সব জায়গাতেই। কিন্তু এ ছাড়াও ছিল 'পাই, পয়সা, কড়ি' ইত্যাদি। মেট্রিক প্রণালীতে মাপজোকের আইনের সঙ্গে সঙ্গে এদিক দিয়েও একটা মস্ত বড় উপকার হয়েছে। জনসাধারণ হিসাব নিকাশের ক্ষেত্রে বা দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় দশমিক প্রণালীর উপকারিতা সম্বন্ধে ক্রমশঃ সজাগ হয়ে উঠছেন।

বিভিন্ন দেশে মেট্রিক প্রণালীর প্রচলন

ফরাসী দেশে আইনের বলে মেট্রিক প্রণালীর প্রচলন হওয়ার পর অন্যান্য অনেক দেশ, বৈজ্ঞানিক যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই মাপ প্রণালীর নানা রকম সুখ-সুবিধা অনুভব করে নিজ নিজ দেশে আইনানুসারে এই পদ্ধতির প্রচলন করেছিল।

যে সব দেশে মেট্রিক মাপ প্রণালী আইনানুগ নয়, এই পদ্ধতি অনুসরণ না করা দণ্ডনীয় নয় কিংবা ব্যবসায়ী বা সাধারণের মধ্যে বিশেষ চালু নয়—তাদের মধ্যে গ্রেট বৃটেন এবং ইউনাইটেড স্টেটস্-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে এঁরা এবং অন্যান্য যে দু'চারটি দেশ এখনও বাকি আছে সকলেই এই প্রণালী নিজেদের দেশে প্রচলিত করার জন্য আইন তৈরী করছেন।

★ ভাষা হিসেবে ★ ইংরেজীর স্থান

আজকাল এ দেশে ইংরেজী পড়া বা শেখার ওপর তেমন শ্রদ্ধা নেই অথবা চাকরীর জন্যেও ঐ ভাষা শেখা সর্বক্ষেত্রে অপরিহার্য নয়। বরং অনেকেই প্রাক্তন শাসকগোষ্ঠীর ভাষা বলে ইংরাজী ভাষাকে দাসত্বের ভাষা বলে গণ্য করেন। ইংরাজীর প্রতি এত বীতরাগ কাদের? অথবা অন্য ভাষায় বলতে গেলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজীর কদর কোথায় ও কী রকম?

ডঃ বালকৃষ্ণ করুণাকর নায়ার এই বিষয়ে অনুসন্ধান ক'রে কতকগুলি বিচিত্র তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন। যথা :—

১৯৬৫ সালে মোট ৬৪১ জন ছাত্র-ছাত্রী ইংরাজীতে এম.এ. পাশ করেন। এঁদের মধ্যে দক্ষিণীদের সংখ্যা ছিল ২৩৫, বাকী সব অন্যান্য রাজ্যের।

তাঁর এই অনুসন্ধান থেকে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যে সব রাজ্যে ইংরাজীর বিরোধিতা বেশী প্রকট সেইসব রাজ্যে শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে ইংরাজী বেশী জনপ্রিয়। এইসব রাজ্যের পরিসংখ্যান : দিল্লী—৭৮, রাজস্থান—১১৮, বিহার—২৯৮, পাঞ্জাব ও হরিয়ানা—৩০৩, মধ্যপ্রদেশ—৪১৯, উত্তর প্রদেশ—৭৭৪, মোট ২,২১৪।

১৯৬৫ সালে যে ৩০৭০ জন পরীক্ষার্থী ইংরেজীতে এম.এ. পাশ করেন তারমধ্যে উত্তরপ্রদেশে, মধ্যপ্রদেশে ও বিহারের পরীক্ষার্থীদের মোট সংখ্যা ছিল ১৭০০।

প্রত্যেক রাজ্যে প্রতি কোটিতে ইংরেজী এম.এর আনুপাতিক সংখ্যা বিশ্লেষণ করলে আরও কিছু অপ্রত্যাশিত তথ্য জানা যায়। ১৯৬৫ সালে অন্ধ্র প্রদেশ, তামিলনাড, মহীশুর, আসাম ও ওড়িষ্যায় প্রতি কোটিতে ২০ জনেরও কম ইংরাজীতে এম.এ. পাশ করেন। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ছিল ২০-৩০ এর মধ্যে এবং কেরালায় ৪৫।

পশ্চিমবাংলা (৯২) এবং জম্মু ও কাশ্মীর (১০০) ছাড়া বাদবাকী অ-হিন্দী ভাষী রাজ্যে প্রতি কোটীতে ৫০ জনেরও কম এম. এ. দেন। অন্যদিকে হিন্দী ভাষী রাজ্যগুলির মধ্যে কোটার হিসাবে বিহার ও রাজস্থানে ৫০-৬০ এর মধ্যে, মধ্যপ্রদেশে ১১৩, উত্তর প্রদেশে ১২২ পাঞ্জাব-হরিয়ানায় ১২৬ এবং দিল্লীতে ২২৯ জন ইংরাজীতে এম.এ. দেন।

ডঃ বালকৃষ্ণ করুণাকর নায়ার,
সেন্ট্রাল সাইন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ সংস্থায় গবেষণা করছেন।

খাদ্যের অপচয়জনিত খাদ্যাভাব

সারা বিশ্বে বছরে ২৪০০ থেকে ৪৮০০ কোটি ডলার মূল্যের খাদ্যের অপচয় হয়। ক্ষেত খামার প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে গুদামজাত করার মধ্যে অনেক অপচয় হয়। এ ছাড়া গুদামজাত করবার সময়,—থলি বা কাঠের বাক্সে ভরে জাহাজে চালান দেওয়ার সময়, প্রচুর খাদ্য চারধারে ছড়িয়ে পড়ে যা একত্র করলে পরিমাণে প্রচুর দাঁড়ায়। যেমন ক্ষেতে শস্যের বীজ বোনার সময় থেকে ফসল না পাকা পর্যন্ত শস্যের শত্রু অনেক। আগাছার উৎপাত তো আছেই তারপর আছে পোকা মাকড়। এরপর গাছের যদি কোন রোগ হয় তো কথাই নেই। পাখীরাও কম শত্রু নয়। হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে, ফসল রক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা না থাকলে পাখীর জন্যে শতকরা ৭০ ভাগ ফসল একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। এ ছাড়া গুদামজাত করার সময় মেঝে শুকনো কিনা ঘরটি কীট পতঙ্গ থেকে মুক্ত কিনা এবং ইঁদুর ঢুকতে না পারে তার ব্যবস্থা আছে কিনা এই সব-গুলোও নজরে না রাখলে বহু খাদ্য পোকা মাকড় ও ইঁদুরের পেটে যায়। এই সমস্যা শুধু আমাদের দেশেই নয় সব দেশেই কম বেশী রয়েছে। তাই আমাদের দেশে এখন খাদ্যের অপচয় রোধ করার জন্য নানা প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

পণ্ডিচেরী

আধুনিক জাপানের ধারায় গড়ে উঠবে

কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে আকারে ক্ষুদ্রতম পণ্ডিচেরী ১৯৫৪ সালে ভারত রাষ্ট্রের অঙ্গ হয়ে যায়। ৪৮৪ বর্গ কিলোমীটার আয়তনের এই অঞ্চলটি প্রথম পঞ্চবর্ষীয় পরিকল্পনার সুফল পুরোপুরি ভোগ করতে পারেনি। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পণ্ডিচেরী শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নয়নের ক্ষেত্রে যে রকম অগ্রগতি করে তা' সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

পণ্ডিচেরী কৃষিপ্রধান কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালেও এদিকে তেমন দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। তবে বার্ষিক পরিকল্পনাকালে এ বিষয়ে যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয় এবং তারই ফলস্বরূপ পণ্ডিচেরী ইতিমধ্যে খাদ্যের ব্যাপারে স্বনির্ভর তো হয়েছেই, বরং সাধ্য অনুযায়ী অন্যান্য ঘাটতি রাজ্যগুলিকেও সাহায্য করছে। যেমন গত বছরে পণ্ডিচেরী কেরালাকে ২৫০০ টন চাল দিয়েছিল।

এখানে শিল্পের জন্যে যে অর্থের সংস্থান করা হয়, জাতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ মাপকাঠিতে তার বিচার করা যাবে না কারণ এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণতর নিয়োগ যেমন এখনও সম্ভব হয়নি তেমনি ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সম্ভাবনাও পরোপুরি কার্যকরী করা যায়নি।

বৃহৎ শিল্পক্ষেত্রে ৫টি কাপড়ের কল ও একটা চিনির কল আছে। প্রাক্তন ফরাসী সরকার অন্যান্যের তুলনায় বেশী সুযোগ সুবিধা দেওয়ায় এবং ফরাসী ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলির বাজার পাবার সুনিশ্চিত আশ্বাস থাকায় এখানেই সুতী. ও বস্ত্রের কল স্থাপন করা হয়েছিল। বাজারজাত করার সমস্যা ছিল না বলেই হয়তো ঐসব কলে ১,২০'০০০. মাকু ও ২,২০০ তাঁত আছে। ভাবতেও ভালো লাগে, যে, ১৪০ বছর আগে, সেই ১৮২৯.সালেও বিদ্যুৎশক্তি ও যন্ত্র সজ্জিত কারখানা এ দেশে চালু হয়েছিল।

আজকের দিনে সর্বাধিক কর্মী, অর্থাৎ পণ্ডিচেরীর শতকরা ২০ জন অধিবাসী এই শিল্পে নিযুক্ত। এই শিল্পের কল্যাণে বৈদেশিক মুদ্রাও আসছে। তবে বর্তমানে বস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে, পণ্ডিচেরীর কলকারখানাগুলি তার আওতা থেকে মুক্ত নয়।

এই অঞ্চলে আখের উৎপাদন প্রচুর। সারা দেশের হিসেবে একর প্রতি আখের উৎপাদন এখানেই সর্বাধিক। এর অনুপাতে চিনির উৎপাদন হ'ল শতকরা ৮ ভাগ। পণ্ডিচেরীর চিনিকলের দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা হ'ল ১,৫০০ টন। তা ছাড়া সরকারী ডিসটিলারীতে আরক তৈরির জন্যে গুড় ব্যবহার করা হয়।

যন্ত্রপাতি চালাবার জন্যে জ্বালানী হিসেবে নির্ভেজাল সুরাসার ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে, এমন কি সম্ভব হলে, পানীয় সুরা উৎপাদনের আশায় এই অঞ্চলের সরকার আধুনিক যন্ত্রপাতি বসাতে এবং চিনি কলটা সম্প্রসারিত করতে মনস্থ করেছেন।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পক্ষেত্রে ২৫০টি বিভিন্ন শিল্প আছে যার মধ্যে অনেকগুলি নিজের পায়ে দাঁড়াতে অক্ষম। পণ্ডিচেরীতে যেটুকু সহায় সম্পদ ও কাঁচা উপাদান পাবার সম্ভাবনা আছে তার পুরো সদ্ব্যবহারের জন্যে আরও যত্নবান হতে হবে।

আতানচাবাড়ী শিল্পাঞ্চল আধা-শহর। এখানে ১৮টি ক্ষুদ্র শিল্প আছে। তা ছাড়া কারাইকাল ও পণ্ডিচেরীতে গ্রামীণ, শিল্পাঞ্চল স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া চতুর্থ পরিকল্পনাকালে নেইভেলীর কাঁচা মাল কাজে লাগিয়ে আরও একটা শিল্পাঞ্চল স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে অবশ্য যদি উদ্যোগী ব্যবসায়ীরা এগিয়ে আসেন তবেই। শিল্প সম্বন্ধে উৎসাহী ও উদ্যোগী ব্যক্তিগণ এগিয়ে এলে ছোট ছোট শিল্প স্থাপনে সহায়তা পাওয়া যাবে। এই শিল্পাঞ্চলের মধ্যে দুটী সরকারী ইউনিট আছে চামড়ার জিনিস ও কাঠের জিনিস তৈরির জন্যে।

রাজ্য সরকার বছরে শতকরা ৩ টাকা সুদে ঋণ দেন। বর্তমানে ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ হ'ল ৫০,০০০ টাকা। এই মাত্রা বাড়িয়ে ২,০০,০০০ করবার প্রস্তাব রয়েছে। এর বেশী অর্থ ঋণ পেতে হলে মাদ্রাজ শিল্প বিনিয়োগ কর্পোরেশনের কাছ থেকে পাওয়া যাবে। এই কর্পোরেশনে সরকারের শেয়ার আছে।

পণ্ডিচেরীতে বন্দরের এবং পরিবহনের অন্যান্য সুবিধা প্রচুর। বিদ্যুৎশক্তির সরবরাহও যথেষ্ট।

শিল্পোৎসাহী ও উদ্যোগী ব্যক্তিগণকে সাহায্য করতে সরকার সর্বদাই প্রস্তুত। একজন ব্যবসায়ী এই অঞ্চলে নারকেলের ছোবড়া নিয়ে ব্যবসায়ে নেমেছেন। এখানকার চুণাপাথরের ভরসায় অরবিন্দ আশ্রমের তরফ থেকে সিমেন্টের একটা কারখানা খোলা হয়েছে।

উদ্যোগী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা এগিয়ে এলে এই অঞ্চলটি কালক্রমে যে আধুনিক জাপানের ধারায় গড়ে উঠবে এ বিষয়ে কোনোও সন্দেহ নেই।

ব পর)

নো থেকে খাবার ডিশ ও যাবতীয় কাজ হয় যন্ত্রে।

ও এখন সম্পূর্ণ অন্য ধরণের লোক। ও প্রথম যখন এই এ্যাকাডেমিতে আসে তখন ওর যে ফটো নেওয়া হয় তার সঙ্গে এখনকার চেহারার তুলনা করলেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। লাজুক ছেলেটি যে ভবিষ্যতে একজন নির্ভরযোগ্য অফিসার হয়ে উঠবে তার ছাপ ওর চোখে মুখে দেখতে পাওয়া যায়।

আমরা ওকে জিজ্ঞেস করলাম "তুমি এখানে কি কি জিনিস শিখছো ?"

একদিন যে হয়তো ভারতের প্রধান সেনাপতি হবে সেই জেন্টল্‌ম্যান কেডেট বলে উঠলো "সবকিছু"। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আরও শত শত শিক্ষার্থীর মতো মাদপ্পাও প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই শিখছে। ও আমাদের বললো যে ওরা যদিও স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর জন্য পৃথক পৃথক ভাবে নির্ব্বাচিত হয়েছে, তবুও ওরা একই ইউহিফর্ম্ম পরে, একসঙ্গে থাকে এবং একই সঙ্গে পড়াশুনা করে। স্থলবাহিনীর শিক্ষার্থী গ্লাইডিং এবং এরোপ্লেনের মডেল তৈরী করতে শেখে, নৌবাহিনীর শিক্ষার্থীকে মার্চ করা শেখানো হয় আর বিমানবাহিনীর শিক্ষার্থী দড়িতে গাঁট দেয় আর হ্রদে সাঁতার কাটে।

প্রতিষ্ঠানের কমাণ্ডান্ট রিয়ার এড-মিরাল আর, এন, বাটরা আমাদের বললেন যে "আমরা এদের সর্ব্বকর্ম্মে পারদর্শী করে তুলতে চেষ্টা করি। প্রশিক্ষণের সময় তিন বছর হলেও, শিক্ষাসূচীর তৃতীয় বা শেষ বছরে তাঁদের নির্ব্বাচিত বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং সুসংহত শিক্ষণের সঙ্গেই সেটা চলতে থাকে। এর মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ হ'ল শিক্ষামূলক সাধারণ পড়াশুনা এবং শতকরা ২৫ ভাগ মাত্র প্রতিরক্ষামূলক। মৌলিক শিক্ষা, ড্রিল, শারীরিক শিক্ষা, বিজ্ঞান, অঙ্ক, ইতিহাস, ভাষা, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী, খেলাধূলা ইত্যাদি শিক্ষাসূচীর অন্তর্ভুক্ত। ঘোড়ায় চড়া, নৌকা বাওয়া, পর্ব্বতারোহণ, তাঁবুতে বাস করা ইত্যাদি বিষয়গুলি শিখতেও উৎসাহ দেওয়া হয়। ফাউণ্ড্রি ও সার্ভের কাজও শেখানো হয়। পরীক্ষায় পাশ করার ওপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়না বরং সবদিক থেকে কি রকম কর্ম্মক্ষম তা প্রত্যেকদিনই বিবেচনা ক'রে দেখা হয়। কমাণ্ডার বাটরা আমাদের বললেন যে "শৃঙ্খলা রক্ষা সম্পর্কে আমরা খুব কঠোর হলেও, এদের বয়সোচিত চাপল্যকে আমরা একট ক্ষমার চোখে দেখি।"

মাদপ্পা এবং অন্যান্য প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর দিনের কাজ সুরু হয় সাড়ে পাঁচটার বিউগল বাজার সঙ্গে সঙ্গে এবং ভবিষ্যতে যাঁদের সিদ্ধান্তের ওপর জীবন, মৃত্যু, জয়, পরাজয় নির্ভর করবে, তাঁদের সারাদিনের সৈনিক বৃত্তির শিক্ষা সুরু হয়।

ওদের অবশ্য বেশ একটা সামাজিক জীবনও আছে। আমরা যখন ওখানে গিয়েছিলাম তখন ঘানার ১১ জন নৌ-শিক্ষার্থী এবং ইথিওপিয়ার ৫ জন স্থলসেনা শিক্ষার্থী ছিলেন। কাজেই আন্তর্জাতিক সহাবস্থানের একটা অভিজ্ঞতাও হয়। বিদেশের এই শিক্ষার্থীগণকে পৃথকভাবে রাখা হয়নি, বিভিন্ন বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ১২৫ জন শিক্ষার্থীর এক একটি বাহিনীর নেতৃত্ব করে সেই বাহিনীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী।

আমরা ওকে প্রশ্ন করলাম "এখানকার শিক্ষা শেষ হলে তারপর ও কোথায় যাবে।"

ও বললো "এখান থেকে আমি যোধপুরের বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ কলেজে চলে যাবো, আমার নৌশিক্ষার্থী বন্ধুরা চলে যাবে আই. এন. এস "কৃষ্ণায়" এবং স্থলবাহিনীর শিক্ষার্থীরা চলে যাবে ডেরাডুনের ভারতীয় সামরিক প্রতিষ্ঠানে।

"এখানকার এ্যাকাডেমি, ডেরাডুনের মতো একই জিনিস নয় কি ?"

আমাদের বন্ধুটি উত্তর করলো "না"।

প্রথমে, ১৯২২ সালে তখনকার প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল স্যার ফিলিপ চেটউড ডেরাডুনে ভারতীয় সামরিক এ্যাকাডেমি স্থাপন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪১ সালে এটিকে অফিসার্স ট্রেইনিং স্কুলে পরিণত করা হয় এবং স্বাধীনতা লাভের পর এর নতুন নাম রাখা হয় আর্মড ফোর্সেস এ্যাকাডেমি। পরে ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠানটির বর্ত্তমান নাম হয়।

পাঠকদের প্রতি

পরিকল্পনার রূপ ও রূপায়ণ, দেশের উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা এবং পরিকল্পনা কমিশনের কর্মপ্রণালী দেখানোই হল আমাদের লক্ষ্য। এই পত্রটিতে যেমন জাতীয় প্রচেষ্টার খবর দেওয়া হবে তেমনি সেই প্রচেষ্টার অংশীদার হিসেবে পশ্চিম বাংলা, জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রচেষ্টায় কতটা সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারছে তাও দেখানো হবে।
এই বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য রেখে মৌলিক রচনা পাঠাবার জন্য পাঠকগণকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। প্রকাশিত রচনার জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হবে।

উন্নয়ন বার্তা

ভারতীয় নৌবহরের জন্য তৈরী 'অ্যাভকাট' তৈলবাহী একটি জাহাজ মাজাগাঁও ডকে জলে ভাসানো হয়েছে। বন্দরে বিভিন্ন জাহাজে অ্যাভক্যাট জ্বালানী সরবরাহ করার জন্যে এই জাহাজটি কাজে লাগানো হবে। এই ধরণের জাহাজ এই প্রথম আমাদের দেশে তৈরী করা হল।

★

যুগোস্লাভিয়ার স্প্লিটে ভারতের বৃহত্তম তৈলবাহী জাহাজটিকে জলে ভাসানো হয়েছে। জাহাজটির ওজন ৮৮,০০০ টন। শিপিং কর্পোরেশনের জন্যে তৈরী এই জাহাজটির নামকরণ হয়েছে স্বর্গত: জহরলাল নেহরুর নামে। এই জাহাজে করে মাদ্রাজ শোধনাগারে অশোধিত তেল পাঠানো হবে। বর্ত্তমানে শিপিং কর্পোরেশনের জাহাজ সংখ্যা হ'ল ৬৬।

★

ভারতের সর্বপ্রথম সমুদ্রগামী 'টাগ' তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে কলকাতার রাষ্ট্রায়ত্ব গার্ডেন রীচ কারখানায়। এই জাহাজটি সর্বাধুনিক ও সূক্ষ্ম ইলেকট্রোনিক সরঞ্জামে সজ্জিত করা হবে। এই টাগ্ ২০ টন পর্যন্ত ওজনের জাহাজ টেনে আনতে পারবে।

★

ক্যানাডার একটি ফার্ম হিন্দুস্থান মেশিন টুলস্ সংস্থাকে ৫ কোটি টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি তৈরী করার বরাত দিয়েছে। এই যন্ত্রপাতি ৫ বছরের মধ্যে জোগান দিতে হবে।

★

১৯৬৮-৬৯ সালের শেষে ভারতের বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার সঞ্চিত পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৬.৯০ কোটি ডলার: এই পরিমাণ গত ১০ বছরের পরিমাণের চেয়ে ৫.১০ কোটি ডলার বেশী। ইন্টার ন্যাশানাল মনিটারী ফাণ্ড-এর ৭.৮০ কোটি ডলার ফেরৎ দিয়ে এবং ঋণ পরিশোধ চুক্তি অনুযায়ী ১.৫০ কোটি ডলার ধারশোধ করেও ঐ অর্থ জমে।

★

কারুশিল্প ও হাতে চালানো তাঁত বস্ত্র রপ্তানী কর্পোরেশন লিবিয়া থেকে ৮৫ হাজার টাকার বরাত পেয়েছে।

★

খনি ও ধাতু সংক্রান্ত কর্পোরেশন গত তিন বছরে ২০ লক্ষ টনেরও বেশী আকরিক লোহা পারাদীপ বন্দর থেকে রপ্তানী করেছে।

★

জাতীয় কয়লা উন্নয়ন কর্পোরেশন ১৯৬৮-৬৯ সালে ১ কোটি ২৬ লক্ষ টন কয়লা উৎপাদন করেছে। গত বছরের তুলনায় এই পরিমাণ ২.২৭ শতাংশ বেশী। ১৯৬৮-৬৯ সালে কর্পোরেশন ১.২৫ কোটি টাকা মুনাফা করেছে।

★

১৯৬৮-৬৯ সালে কাজু রপ্তানীর পরিমাণ রেকর্ড মাত্রায় পৌঁছায় অর্থাৎ ৬৩ কোটি টাকার অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় ১৯ কোটি টাকার বেশী কাজু রপ্তানী হয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী করে এই আয় বেড়েছে।

★

কলিকাতার একটি কারখানা তাইওয়ান থেকে ১ কোটি টাকা মূল্যের ওয়াগন তৈরির একটি অর্ডার পেয়েছে।

★

বোম্বাই-এর একটি তেলকল, সম্প্রসারণের এক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এর জন্য এই তেল কলটিকে মূলধন বাবদ ২.৫৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে হবে। সম্প্রসারণের কাজ ১৯৭০-৭১ আর্থিক বছরের শেষভাগে সম্পূর্ণ হবে।

★

মহারাষ্ট্রের বনসম্পদের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য ৩.৭৫ কোটি টাকা মূল্যের একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এর ফলে বিশেষ করে অনুন্নত ও জনজাতি অঞ্চলের প্রায় ৪০০০ অধিবাসী সারা বছরের জন্য কাজ পাবেন।

★

কলিকাতা বন্দর থেকে ভারতে তৈরি বহু পরিমাণ স্বচ্ছ কাগজ সিরিয়ায় রপ্তানি করা হয়েছে। শিল্পোন্নত দেশগুলির সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা করে ভারত এই অর্ডার সংগ্রহ করে।

★

ব্যাঙ্গালোরে অবস্থিত ভারতীয় টেলিফোন শিল্প, বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতির আমদানি শতকরা ২৫ থেকে ১৭.৬ ভাগ কমিয়ে দেওয়ায়, বৈদেশিক মুদ্রায় ভারত গত তিন বছর যাবৎ প্রতি বছর ২.০৬ কোটি টাকা সঞ্চয় করছে।

★

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলা, বেশী ফলনের গমের চাষে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে। বর্তমান মরশুমে যে ৮৫০০০ একর জমিতে গম চাষ করা হয়েছে তার মধ্যে ৭২০০০ একর জমিতেই বেশী ফলনের গমের চাষ করা হয়েছে।

★

স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের সঙ্গে একটি চুক্তি অনুযায়ী সোভিয়েট ইউনিয়ন, আগামী বছর প্রায় দশ কোটি টাকা মূল্যের ২.৫ লক্ষ টন নাইট্রোজেন সার সরবরাহ করবে।

★

গত ২০ বছরে রাজস্থানে বহু উদ্দেশ্যমূলক, ছোট, বড় ও মাঝারি সেচ প্রকল্পের জন্য ১৫২ কোটি টাকারও বেশী ব্যয় করা হয়েছে। এই সব প্রকল্প রূপায়িত করার ফলে ১৯৫০-৫১ সালে যেখানে ২৭ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিলো সেখানে এখন ৫৭ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ দেওয়া যাচ্ছে।

★

১৯৬৭-৬৮ সালে প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ভারতীয় আতর বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে।

মেসিনের বিরুদ্ধে আমার মতবাদ সম্পর্কে অনেকেই ভুল ধারণা পোষণ করেন। যে যন্ত্রসজ্জা শ্রমিকের অন্ন কেড়ে নিয়ে তাকে কর্মহীন করে তোলে আমি সেই রকম যন্ত্রসজ্জার বিরোধী।

★

আমি বুঝি যে কতকগুলি মূল শিল্পের প্রয়োজন রয়েছে। আরাম কেদারা বা সশস্ত্র সমাজতন্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই। সমগ্রভাবে পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা না করে, কাজ করে যাওয়ার ওপরেই আমি বিশ্বাস করি। কাজেই মূল শিল্পগুলির নাম উল্লেখ না করে আমি বলতে পারি যে, যে শিল্পগুলিতে অনেক লোকের এক সঙ্গে কাজ করতে হবে সেগুলি রাষ্ট্রাধীন হওয়া উচিত। তাঁদের শ্রমে যে সব জিনিস উৎপাদিত হবে—তা তাঁরা কুশলী বা অকুশলী যে রকম কর্মীই হোন না কেন—সেগুলির মালিকানা রাষ্ট্রের মাধ্যমে তাঁদের ওপরেই বর্তাবে।

★

মেসিনের আপাতজয়ে আমি সম্মোহিত হতে রাজি নই। যে মেসিন ধ্বংস আনে আমি সব সময়েই সেই রকম মেসিনের বিরোধী। কিন্তু সাধারণ যন্ত্রপাতি এবং যে সব মেসিন ব্যক্তিগত শ্রম লাঘব করে এবং কুটীরবাসী লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর কাজের বোঝা হাল্কা করে সেই রকম মেসিন সর্বত্র চালু হোক তাই আমি চাই। সাধারণভাবে আমি মেসিনের বিরোধী নই কিন্তু এই নিয়ে পাগলামি করার বিরোধী।

যে মেসিনে শ্রমিকের প্রয়োজন কম হয়ে যায় সেই রকম মেসিন কেন বসানো হবে না তাই নিয়ে চিৎকার করা হয়। শ্রমিকের প্রয়োজন হ্রাস করার জন্য আধুনিক মেসিন বসালে হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়বে এবং অনাহারে মারা পড়বে। মানব জাতির সামান্য ভগ্নাংশের জন্য আমি সময় ও শ্রম বাঁচাতে চাই না, সকলের জন্য সময় ও শ্রম বাঁচাতে চাই। আমি চাই সকলের হাতেই সম্পদ কেন্দ্রীভূত হোক, সামান্য কয়েকজনের হাতে নয়।

★

ভারতের পুঁজিপতিরা যদি জনগণের কল্যাণের জন্য নিজেদের নিয়োজিত না করেন এবং নিজেদের জন্য সম্পদ সংগ্রহে তাঁদের জ্ঞান বুদ্ধি নিয়োগ না করে জনগণের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত না করেন তাহলে পরিণামে জনগণের ধ্বংস ডেকে এনে নিজেদেরও ধ্বংস করবেন অথবা তাঁদের হাতে নিজেরা ধ্বংস হবেন।

★

প্রেরণার কণা

সম্পদ সংগ্রহের এই পাগলামি বন্ধ করতে হবে এবং শ্রমিকগণকে কেবলমাত্র জীবন ধারণের মতো মজুরি সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিলেই হবে না, তাদের জন্য প্রতিদিন এমন কাজের ব্যবস্থা করতে হবে যা শুধুমাত্র গতানুগতিক না হয়ে দাঁড়ায়। এই রকম অবস্থায় যিনি কাজ করবেন মেসিন যেমন তাঁকে সাহায্য করবে তেমনি রাষ্ট্র এবং মেসিনের মালিককেও সাহায্য করবে। বর্তমানের এই পাগলামি বন্ধ হবে এবং শ্রমিকও একটা চিত্তাকর্ষক ও উপযুক্ত পরিবেশে কাজ করবেন।

★

একটা কথা আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই। মানুষের কথাটাই সর্বপ্রথমে ভাবতে হবে। মেসিন যেন মানুষের হাতকে অলস করে না দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য আমি মেসিনের বিরোধী নই। দৃষ্টান্ত হিসেবে সেলাইয়ের কলের উল্লেখ করা যায়। যতগুলি প্রয়োজনীয় মেসিন আবিষ্কৃত হয়েছে এটা হ'ল সেই রকম কয়েকটার মধ্যে অন্যতম। এই মেসিনের আবিষ্কর্তা দেখতেন যে তাঁর স্ত্রী কি বিপুল ধৈর্যে নিজের হাতে একটির পর একটি ফোঁড় দিয়ে সেলাই করছেন এবং কেবলমাত্র স্ত্রীর এই কষ্ট লাঘব করার জন্য তাঁর প্রতি স্নেহ প্রীতির নিদর্শন হিসেবেই তিনি সেলাইর কল উদ্ভাবন করেন। তবে তিনি যে শুধু নিজের স্ত্রীর শ্রম ও কষ্টের লাঘব করেছেন তাই নয়, যাঁরা সেলাইর কল কিনতে সক্ষম সেই রকম প্রত্যেকেরই পরিশ্রম বাঁচিয়েছেন।

★

আমাদের কর্মশক্তি বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান থাকা দরকার, যাতে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরী করে নিতে পারি। পাশ্চাত্যের যান্ত্রিক সভ্যতার দাস সুলভ অনুকরণ আমাদের নিজস্ব বিদ্যাবুদ্ধি বা কুশলতা নষ্ট করে দিতে পারে এমন কি জীবন ধারণের ব্যবস্থাও বিপন্ন ক'রে তুলতে পারে।

★

ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সোসাইটি লিঃ—করোলবাগ, দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত এবং ডাইরেক্টার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত।

ধন ধান্য

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা

৬ই জুলাই ১৯৬৯ : ১৫ই আষাঢ় ১৮৯১

Vol 1 : No 3 : July 6, 1969

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০

টেলিগ্রাফের ঠিকানা—যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

ভুলি নাই

পরিকল্পনাকে, অন্য কথায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা সংগ্রাম বলা যেতে পারে-আর তা স্বাধীনতা সংগ্রামের চাইতেও অনেক বেশী কঠোর। এই সংগ্রামে, সমগ্র জাতির যোগ দেওয়া উচিত।

—শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়

ক্ষমতার সমস্যা

ভারতীয় গণতন্ত্রকে যে কেবলমাত্র একটা প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পর্যবসিত করতে চাওয়া হচ্ছে তা কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সম্পর্ক সম্বন্ধে উচ্চ মহলে যে সব যুক্তি দেওয়া হয় তাতে প্রতিফলিত হচ্ছে। বর্তমানের যে যুক্তির দ্বারা ইতিমধ্যেই পরিকল্পনাসহ প্রতিটি জাতীয় সমস্যাকে দক্ষতা ও সংবিধানগত প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলা হচ্ছে সেই যুক্তিকে প্রশাসন সংস্কার কমিশন স্পষ্টত: উপেক্ষা করতে পারেন নি।

গণতন্ত্রকে কেবল দক্ষতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না এবং তা প্রায়ই সংবিধানের সীমাও অতিক্রম করে। কাজেই যা সম্পূর্ণ দক্ষ নয় এমন কি সংবিধান সম্মতও হয়তো নয়, গণতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গীতে তা গ্রহণীয় হতে পারে।

গান্ধীজীর জন্মশতবার্ষিকীতে এটা স্মরণ করা বিশেষ করে সঙ্গত হবে। প্রতিনিধিমূলক সরকার গণতান্ত্রিক মনোভাব প্রকাশ করার একটা সুবিধেজনক উপায় মাত্র নয় এবং তা গণতন্ত্রকেই অস্বীকার করার একটা উপায় বা হাতিয়ারও হতে পারে না। জনগণের ইচ্ছা এবং উচ্চাশার ডাকে আমরা কতখানি সাড়া দিতে পারি তাই হ'ল গণতন্ত্রে আমাদের আস্থা নিরূপণের শেষ উপায়।

গান্ধীজী হলেন গণবাদী যুক্তির প্রতিনিধি। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও ঐক্যের ক্ষেত্রে তাঁর অনন্য অবদান হ'ল, তিনি গণবাদী আদর্শকে সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনিক ধারণা থেকে জনগণের আকাঙ্খায় মুক্তি দিয়েছেন।

দুর্ভাগ্যবশত: বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সম্পর্ক সম্বন্ধে বাদানুবাদের ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব, দক্ষতা, জাতীয় শক্তি, রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলসূত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে যে যুক্তি দেখানো হয় তাতে মনে হয়, যে প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভারতীয় ঐক্যের কথা ভাবা হয় সেইদিকে আবার ফিরে যাওয়ার একটা চেষ্টা করা হচ্ছে এবং জনগণের অনুমোদন ও অংশগ্রহণের ভূমিকাটি উপেক্ষা করার চেষ্টা চলেছে।

বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সম্পর্ক নীতিগত ছকে বাঁধা নয় তবে, এগুলির কথা পরেও ভাবা যেতে পারে। আপাতত যা স্বীকার করে নিতে হবে তা হ'ল, যে সূত্রগুলি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূল নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় সেগুলি যুক্তি হিসেবে উচ্চাঙ্গের হতে পারে কিন্তু তাতে কাজ হবে না। অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধান যেমন শুধু আইন বিশেষজ্ঞগণের হাতেই ছেড়ে দেওয়া যায়নি তেমনি ভারতীয় ঐক্য ও সংহতির ভার কেবলমাত্র প্রশাসনের হাতে ফেলে রাখা যেতে পারে না। ব্যাপক অর্থে এটা হ'ল একটা রাজনৈতিক সমস্যা, প্রশাসন ব্যবস্থা সংস্কারের সমস্যা নয়।

এখন প্রশ্ন হ'ল: আমাদের কি ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে কোন জীবনদর্শন আছে? আমাদের যদি তা থাকতো তাহলে আমরা পুলিশ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয় প্রশাসনের দায়িত্ব প্রভৃতির মতো অযৌক্তিক তর্কের ঘূর্ণিপাকে এই রকম শোচনীয়ভাবে জড়িয়ে পড়তাম না।

ভারতীয় ঐক্যকে যদি আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নে সীমিত করা না যায়, তাহলে একে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা সুবিধেজনক পদ্ধতি, বলেও স্বীকার করা যায় না। কেবলমাত্র সমৃদ্ধি বা শক্তিই একটা জাতিকে গঠন করতে পারে না। জাতীয়তাবাদের সব রকম অভিব্যক্তিতে, ভারতের জনসাধারণকে আরও গভীরভাবে সংযুক্ত করে ভারতীয় জাতীয়বাদকে তার যোগ্যআসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

গান্ধীজীর প্রদর্শিত পথেই কেবল ভারতীয় ঐক্য একটা দৃঢ়মূল ভিত্তি পেতে পারে, কারণ গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে জাতীয় আন্দোলনের বন্যা সব রকম প্রশাসনিক, আঞ্চলিক, ধর্মীয় ও ভাষাগত বাধা ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তাঁর পূর্বে ধর্মের বিপুল শক্তি অথবা সর্বাত্মক কর্তৃত্বও তা সম্ভব করে তুলতে পারেনি।

তাঁকে যদি ভারতীয় স্বাধীনতা ও ঐক্যের জনক বলে গণ্য করা হয় তা হলে সেই স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের মাধ্যমে কি করে আরও সজীব হয়ে উঠতে পারে এবং জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করলে সেই ঐক্য কি করে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে সেই সম্পর্কে তাঁর মতবাদকেও আমরা উপেক্ষা করতে পারি না।

তিনি বলেছেন যে, একনায়কত্বের পরিবর্তে ২০ জনের হাতে ক্ষমতা থাকলেই তা গণতন্ত্র হয় না। ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করাটা হ'ল দুর্বলচিত্তের উচ্চাকাঙ্খার প্রকাশ। ভারতীয় গণতন্ত্র সংবিধান থেকে শক্তি আহরণ করে না। জনসাধারণই হ'ল তার শক্তির উৎস এবং প্রশাসনকে জনগণের কাছাকাছি নিয়ে আসাই সর্বক্ষণের চেষ্টা হওয়া উচিত।

গান্ধীজীর গ্রাম পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে সাংবিধানিক কাঠামোর ওপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। এটা ছিল একটা আদর্শ মাত্র কিন্তু দু:খের বিষয় বর্তমানে ভারতের চিন্তাধারায় আদর্শ ও মতবাদ, সংঘাত সৃষ্টি করছে।

কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্কের সমস্যার মূল কথা হ'ল, জনগণের হাতে কতটুকু ক্ষমতা অর্পণ করা হবে? এই দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক কোনদিনই শেষ হয় না। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর উক্তিই মেনে নিতে হবে—কোন ক্ষমতা নেই, কাজেই কোন রাষ্ট্র নেই।

যে কোন অবস্থাতেই হোক এটা হ'ল রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রশ্ন, প্রশাসনিক ভোজবাজির নয়।

পশ্চিমবঙ্গে কারিগরী জনবল এবং কারিগরী উচ্চশিক্ষাক্রম

ডঃ সুব্রতেশ ঘোষ—
(যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

যে কোনোও উন্নতিকামী দেশে কারিগরী উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনা ও তা কার্যকরী করার সূচী জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে স্থির করা উচিত। দেশের কারিগরী লোকবলের চাহিদা মেটাবার উপযোগী একটা কার্যসূচী নির্দিষ্ট করা বর্তমান বৈষয়িক অবস্থার বিচারে কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাসূচীর মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলায় কতটা কাজ হয়েছে তাই নিয়ে আমরা আজ আলোচনা করব।

রাজ্যপর্য্যায়ে বেকার সমস্যা

বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যাকে এক কথায় আমরা কারিগরীবিদ্যা বলে অভিহিত করছি, আলোচনার সুবিধার জন্যে। যাই হোক, প্রথমে দেখা যাক পশ্চিমবাংলায় কারিগরী লোকবলের সমস্যা কী রকম। এই রাজ্যের কর্ম নিয়োগ কেন্দ্রগুলিতে কারিগরী বিষয়ে স্নাতকোত্তর কর্ম প্রার্থীদের যে নাম পঞ্জী আছে তাতে উল্লিখিত পরিসংখ্যান হ'ল এই রকম :—

	স্নাতক মানযুক্ত প্রার্থী		স্নাতকোত্তর মানযুক্ত কর্মপ্রার্থী
	বিজ্ঞান বিষয়ে	কারিগরী বিষয়ে	বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়গুলিতে
জুন, ১৯৬৬	৫,৩৫০	৬৪৮	২৩৭
জুন, ১৯৬৭	৪,৫৬৭	৭৯৫	২৭২
জুন, ১৯৬৮	৪,৩৬৪	১,১৪৬	৪১১

(সূত্র : জাতীয় কর্মনিয়োগ কৃত্যকের পশ্চিমবঙ্গস্থ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদনসমূহ)

এই পরিসংখ্যান দেখে এ কথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এ রাজ্যে কারিগরী স্নাতকদের মধ্যে বেকার সমস্যা ক্রমশ: বেড়ে চলেছে। বিজ্ঞান স্নাতকদের মধ্যে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বেশী না হ'লেও সমগ্রভাবে দেখলে কারিগরী বিদ্যায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কর্মপ্রার্থীদের বিপুল সংখ্যা সমস্যার তীব্রতার ইঙ্গিত দেয়। সাধারণত উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পর্যায়ে এই জাতীয় শিক্ষিত বিজ্ঞানবিদ ও যন্ত্রবিদদের অভাবটাই বড় হয়ে ওঠে। আমাদের দেশেও তিনটি পরিকল্পনা পর্যন্ত শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে সেই রকম অবস্থা ছিল। সেই কারণে দেশে বহু কারিগরী শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এবং প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনগুলিতে আসন সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল। এ অবস্থায় এ রকম সমস্যার উদ্ভব হওয়ার কারণ কী? সম্ভবত: আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষাসূচী, জনবল সংক্রান্ত কার্যসূচী এবং যন্ত্র ও বিজ্ঞানবিদ্ লোকবল নিয়োগের কর্মসূচীর মধ্যে কোনোও সমন্বয় স্থাপন করা হয়নি বলে কারিগরী বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বেকার সমস্যা তীব্র হয়ে উঠছে।

স্বল্পমেয়াদী কার্য্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা

এই সমস্যার নিরসনের জন্যে কারিগরী উচ্চশিক্ষা পরিকল্পনা ও লোকবল নিয়োগ পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে প্রণীত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে পরিকল্পনার গলদের জন্যেই হোক বা রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে মন্দার জন্যেই হোক, কারিগরী বিষয়ে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে বেকার সমস্যা সমাধানের সূত্রপাত হিসেবে একটি স্বল্প মেয়াদী কার্যক্রম থাকা উচিত। তবে এ বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া উচিত রাজ্যসরকারের। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরী শিক্ষায়তনগুলিও কিছু কিছু সহায়ক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন।

গত ৩০ বছরে সারা ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও গুণগতভাবে বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদিকা শক্তি সমগ্রভাবে ধরতে গেলে, প্রাক স্বাধীনতা যুগের তুলনায় বিশেষ বাড়েনি।

স্ট্যাখানোভাইট আন্দোলন

এই প্রসঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ায় স্ট্যাখানোভাইট আন্দোলনের সাফল্যের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক। ব্যয়বহুল শ্রমলাঘবকারী যন্ত্র না বসিয়ে, শ্রমিক ছাঁটাই না ক'রে, শুধু শ্রেষ্ঠতর শ্রম বিভাগ পদ্ধতি প্রবর্তন করে কী করে ঐ আন্দোলন সফল করা হয়েছে তা বিবেচনার যোগ্য। উন্নততর নক্সা ও উন্নততর 'লে-আউট' গ্রহণ করে কাঁচা মাল ও উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের অপচয় রোধ করে, উন্নততর উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবনে ও প্রবর্তনে শ্রমিক কর্মীদের উৎসাহ দিয়ে এবং তাঁদের যথাযথ শিক্ষণের ব্যবস্থার মাধ্যমে কী করে উৎপাদিকা শক্তি যথাসম্ভব বাড়ানো সম্ভব, স্ট্যাখানোভাইট আন্দোলনের সাফল্য এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকেই তা প্রমাণ করেছে। ভারতে ১৯৫২ ও ১৯৫৪ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা যে 'প্রোডাক্টিভিটি মিশন' পাঠায় সেই মিশন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে নানা সহজ পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগের উদাহরণ স্থাপন করে।

উৎপাদিকা শক্তি গবেষণা কোষ

রাজ্য সরকার যদি প্রত্যেকটি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিকাশক্তি বর্ধনের পক্ষে উপযোগী পন্থাগুলি অনুসন্ধান করেন এবং প্রতিষ্ঠানের স্তরে সেগুলির প্রয়োগ সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য একটি করে 'উৎপাদিকা শক্তি গবেষণা কোষ' স্থাপনের জন্য বেসরকারী মালিকদের অনুরোধ মারফৎ সম্মত করাতে এবং সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিতে পারেন, তবে অবিলম্বে এই কোষগুলিতে কিছু যন্ত্রবিদ্ ও বিজ্ঞানীদের কর্মসংস্থান হতে পারে, এবং সেই প্রতিষ্ঠানগুলি স্বল্প উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদিকা শক্তি বিকাশের বিভিন্ন পদ্ধতি নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের

পরিবেশ অনুযায়ী প্রয়োগ করে লাভবান হতে পারে। এই কোষগুলিতে কর্মরত যন্ত্রবিদ্ ও বৈজ্ঞানিকরা শুধু যে বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভাব্যতা বিচার করবেন এবং বাস্তবে প্রয়োগের ব্যবস্থা করবেন তাই নয়, তারা সেই সঙ্গে শ্রমিক কারিগরদের উৎপাদিকা শক্তি বাড়াবার জন্য কারখানার কাজের সময়ের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সময়ে এক এক দল শ্রমিককে পর্যায়ক্রমে উন্নততর উৎপাদন কৌশল সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেবেন। এ সব কাজের জন্য উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত যন্ত্রবিদ্ ও বিজ্ঞানী প্রয়োজন। রাজ্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি প্রত্যেকে যদি এই বিষয়ে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেন, তবে এ ধরণের উৎপাদিকা শক্তি গবেষণা ও শ্রমিক শিক্ষণের মধ্য দিয়ে, সর্ব শ্রেণীর কারিগরী স্নাতক এবং অন্ততঃ ফলিত রসায়ন ও ফলিত পদার্থ বিদ্যার স্নাতকদের পক্ষে নতুন এক কর্মক্ষেত্র তৈরি হবে।

বেকার কারিগরী স্নাতকদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বাস্তুকারদের কর্মসংস্থান সমস্যার তীব্রতা পশ্চিমবঙ্গে বেশী অনুভূত হচ্ছে। বেকার সমস্যার তীব্রতা উপশমে সরকারী নির্মাণকার্যের উপযোগিতা আজ ধনবিজ্ঞানে বহুল স্বীকৃত। রাজ্যের সামগ্রিক বেকার সমস্যার তীব্রতা হ্রাসের জন্য এবং উন্নয়নী কাজের অঙ্গ হিসেবে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের বা সেচ প্রকল্পের অধীনে যে সব নির্মাণমূলক কাজ হাতে নেওয়া হবে (যেমন পথ নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র বা বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ, সেচের জন্য খাল কাটা ও কূপ খনন ইত্যাদি) সেগুলি যদি বেসরকারী ঠিকাদারদের দিয়ে না করিয়ে, এই সব কাজের জন্য গ্রামাঞ্চলে একটি স্থায়ী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ 'নির্মাণবাহিনী' গঠন করা হয় তবে প্রয়োজন মত সেই 'নির্মাণ বাহিনী'র বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে নিকটবর্তী অঞ্চলগুলির সর্বত্র এই শিক্ষিত ও স্থায়ী নির্মাণ কর্মীদের পাঠানো যাবে। এ রকম একটি নির্মাণ বাহিনীর তত্ত্বাবধানের কাজে প্রচুর সংখ্যক স্নাতক বাস্তুকার ও বাস্তু বিদ্যা ডিপ্লোমাধারী তত্ত্বাবধায়কের কর্ম সংস্থান হবে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও কারিগরী ফ্যাকাল্টি এবং কারিগরী শিক্ষায়তনগুলিতে ছাত্রগ্রহণের যে ব্যবস্থা বর্তমানে প্রচলিত আছে, তার পরিবর্তে সমগ্র রাজ্যে এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলিতে পাঁচ বছর পরে (ডিপ্লোমা কোর্সের ক্ষেত্রে তদুপযুক্ত সময় সীমায়) যন্ত্রবিদ্ ও বিজ্ঞান স্নাতকদের সম্ভাব্য চাহিদার ভিত্তিতে (রাজ্যের লোকবল পরিকল্পনা মারফৎ এই সম্ভাব্য চাহিদা নিরূপণ করতে হবে) প্রত্যেক ফ্যাকাল্টিতে ও তার অন্তর্ভুক্ত বিভাগগুলিতে ছাত্র ভর্তির হার নিয়মিতভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। অর্থাৎ এই ব্যবস্থা অনুযায়ী রাজ্যের লোক বল পরিকল্পনা থেকে উপযুক্ত তথ্য আহরণ করে প্রত্যেকটি বিভাগের জন্য ছাত্র ভর্তির বার্ষিক সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে। এর ফলে কোন কোন কাজ বা কারিগরী পেশায় শিক্ষিত কর্মীর অভাবের পাশাপাশি যে রকম কারিগরী বেকার সমস্যা এখন দেখা যায়, তার পুনরাবৃত্তি রোধ করা যাবে। আমাদের দেশে প্রথম দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় লোকবল পরিকল্পনার নানা অসম্পূর্ণতা ছিল। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের লোকবল পরিকল্পনা বিভাগ এ বিষয়ে কিছু প্রয়াস অবশ্য করেছিলেন। কিন্তু ভারতের মত অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর দেশে উন্নয়নকালীন লোকবল পরিকল্পনা যে ধরণের বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ এবং তাত্ত্বিক উপকরণ প্রয়োগের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে, সে সম্বন্ধে উপযুক্ত কাজ যথেষ্ট পরিমাণে প্রথম দুটি পরিকল্পনাকালে হয় নি। তৃতীয় পরিকল্পনার সময় থেকেই এ সম্বন্ধে প্রায়োগিক গবেষণার কাজ সুরু হয়। ১৯৬২ সালে নয়া দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত ইনষ্টিটিউট অব অ্যাপ্লায়েড ম্যান পাওয়ার রিসার্চে—লোকবল পরিকল্পনার নানা দিক সম্বন্ধে গবেষণা চলছে। পরিকল্পনা কমিশনে এবং কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়েও এ সম্বন্ধে গবেষণার মাধ্যমে নানা তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে।

তবে ভারতে লোকবল পরিকল্পনার একটা প্রধান ত্রুটি হচ্ছে এই যে, এ ধরণের পরিকল্পনার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর লোকবলের চাহিদা নির্ধারণ এখন পর্যন্ত বিজ্ঞান সম্মত ভিত্তিতে করা হয় নি।

সারা ভারতের জন্য সম্ভাব্য লোকবল চাহিদা নির্ধারণ করা গেলেও এবং তার ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যের এবং অঞ্চলের লোকবল চাহিদা নির্ধারণ অসম্ভব না হলেও নিম্নস্তরে সংগৃহীত তথ্যাদির সংযোজনে প্রণীত আঞ্চলিক ও রাজ্যস্তরের লোকবল পরিকল্পনা যতটা বাস্তববাদী ও নিখুঁত হতে পারে, তা হচ্ছে না। ভারতের মত উন্নয়নশীল অর্থনীতিক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়নের পর্যায়ে উৎপাদন কৌশল ও উপকরণ সন্নিবেশ সুনিশ্চিতভাবে পরিবর্তিত হতে থাকবে। বিশেষতঃ অর্থনৈতিক উন্নয়ন বহুলাংশে শ্রমিকের এবং পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক মণ্ডলীর কর্মদক্ষতা ও কুশলতা বৃদ্ধির ওপর নির্ভরশীল বলে আমাদের উন্নততর উৎপাদন কৌশলে কুশলী যন্ত্রবিদ্ ও তত্ত্বাবধায়ক লাগবে। সুতরাং উৎপাদনবৃদ্ধির হারের সঙ্গে যন্ত্রবিদ্‌চাহিদা বৃদ্ধির হার সমানুপাতিকভাবে বাড়বে এমন সম্ভাবনা কম, এবং পূর্বে যে হারে যন্ত্রবিদ্ ও বিজ্ঞানীদের নিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই হারের ভিত্তিতেই এদের ভবিষ্যৎ চাহিদা নির্ধারণ করা যাবে, এ ধারণাও ভ্রমাত্মক।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যন্ত্রবিদ ও বিজ্ঞানীদের সম্ভাব্য চাহিদা নির্ধারণের পরে, সমষ্টিকরণের দ্বারা রাজ্যের যন্ত্রবিদ্ ও বিজ্ঞানীদের মোট সম্ভাব্য চাহিদা নির্ধারণ করে লোকবল পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এর পর সেই একই সময় সীমায় এই সব বিশেষজ্ঞের সম্ভাব্য মোট যোগান নির্ধারণ করা উচিত।

দণ্ডকারণ্য

রামায়ণের বিস্মৃতপ্রায় স্থান

... হয়ে উঠছে

দণ্ডকারণ্যের আবহাওয়া ভারতের অন্যান্য অংশের মত নয়। এখানে বর্ষা-কাল খুব ক্ষণস্থায়ী। জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে ১০০ দিনের মতো এর স্থায়িত্ব, তবে, ঐ সময়টায় ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় বৃষ্টিটা কিছু বেশী হয়। বছরের বাকি সময়টা একেবারে শুকনো। এই অঞ্চলের কৃষকরা লাভজনক কোন ব্যবস্থা চালু করতে এইজন্যই অসুবিধে বোধ করছেন।

দণ্ডকারণ্যে যাঁরা নতুন করে বসবাস করতে আসেন, তাঁদের, এই বৃষ্টির খাম-খেয়ালি ছাড়াও কতকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এখানকার জমি তেমন উর্বরা নয় তা ছাড়া মাটিও বিভিন্ন ধরণের। মাটির নীচের জলের স্তর ও তার অবস্থান বদলায়। সারা বছর ধরে জল থাকে, এই রকম নদী খাল, যথেষ্ট সংখ্যায় থাকলে, তবেই সারা বছর ধরে কৃষির কাজ চলতে পারে; কিন্তু সেই রকম নদী, খালের সংখ্যা এখানে খুব কম। কেবলমাত্র বৃষ্টির জলে ভরে ওঠা নদী, খাল, বিল থাকায় এবং মাটির নীচেও জলের পরিমাণ যথেষ্ট না থাকায়, দণ্ডকারণ্যে দুটি ফসলের চাষ প্রথম দিকে সম্ভবপর হয় নি।

সেচ প্রকল্পের কল্যাণে পারালকোটে ফলের প্রাচুর্য্য

নতুন কোন উপনিবেশ গড়ে তুলতে হলে সর্বক্ষেত্রেই যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়, আর তখনই শুধু প্রকৃতিকে বশীভূত করা যায়। প্রকৃতি যেখানে অকৃপণ হস্তে দান করতে নারাজ হয়, মানুষ সেখানে বুদ্ধি ও কৌশল প্রয়োগ ক'রে তার প্রাপ্য আদায় করে। কাজেই ক্ষণস্থায়ী বর্ষায় যে জল পাওয়া যায় তা সংরক্ষণ করার ওপরেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ডোঙায় ক'রে জল তুলে ক্ষেতে সেচ দেওয়া হচ্ছে

বছরের প্রধান শস্য, এই বর্ষার সময়েই বোনা হয়। এই সময়েও আবার বৃষ্টিটা সব সময়ে চাষের উপযোগী হয় না। কয়েকদিন হয়তো খুব বেশী বৃষ্টি হল আবার কিছুদিন হয়তো এক ফোঁটা বৃষ্টি হ'ল না। এই রকম বৃষ্টির ওপর নির্ভর ক'রে যদি চাষ করতে হয় তাহলে কৃষক-দের বিরাট ঝুঁকি নিতে হয়। সেইজন্যই দণ্ড-কারণ্যের কার্যনির্বাহকরা বাঁধ, বিল, পুকুর ইত্যাদি তৈরি করে বর্ষার এই বৃষ্টি সংরক্ষণ করার ওপরেই গুরুত্ব দিচ্ছেন। এতে চাষের জন্য নিয়মিতভাবে সেচের জল সরবরাহ করা যাবে; অনিশ্চিত বর্ষার ওপর নির্ভর করতে হবে না। খারিফ মরসুমে অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী বর্ষায় অনিশ্চিত বৃষ্টির সময়ে যাতে সেচের জল সরবরাহ করা যায় সেই উদ্দেশ্যেই এই সব বাঁধ ইত্যাদির পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে। বর্ষার অনিশ্চিত বৃষ্টির সময়ে ছাড়াও রবি মরসুমে যখন এক ফোঁটা বৃষ্টি হয় না তখনও চাষের জল সরবরাহ করা হচ্ছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৬৫ সালে, মাঝারি আকারের ভাস্কাল বাঁধটি এবং একটি ছোট আকারের জলসেচ প্রকল্প যেমন পাখানজোড় জলাধার-টির কাজ সম্পূর্ণ করা হয়। বর্তমানে পারালকোট ও সতীগুড়া নামের দুটি মাঝারি আকারের বাঁধ তৈরি করা হচ্ছে। এই চারটি বাঁধ থেকে স্বাভাবিক বৃষ্টির বছরে রবি মরসুমে ৮০,০০০ একরে অর্থাৎ ঐ অঞ্চলের এক তৃতীয়াংশ জমিতে জলসেচ দেওয়া যাবে।

উপরে উক্ত এই চারটি জলসেচ প্রকল্প ছাড়াও দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষ ছোট ছোট জলসেচ প্রকল্পের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। কারণ এই অঞ্চলের সর্বত্র যদি এই রকম

ছোট ছোট জলসেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় তাহলে খারিফ মরসুমে বৃষ্টি বেশী না হলেও জমিতে সেচ দেওয়া যাবে আর রবি মরসুমেও সেচের জলের অভাব হবে না। সেজন্য ২৯টি এই রকম ছোট ছোট জলসেচ প্রকল্প সম্পূর্ণ করা হয়েছে, ৯টি তৈরি করা হচ্ছে এবং আরও ৯টি পরীক্ষা ক'রে দেখা হচ্ছে।

এই সব ছোট ছোট জলসেচ প্রকল্প ছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রামের পুকুর, কুয়ো ও নলকূপ থেকেও জলসেচ দেওয়া হয়

নবজীবনের সঞ্চার

এই পর্য্যন্ত আমরা দণ্ডকারণ্যকে রামায়ণের একটা পর্ব বলে জানতাম। কিন্তু সেই বিস্মৃত প্রায় দণ্ডকারণ্যে এখন জলসেচের ব্যবস্থা ক'রে রবি মরসুমে চাষ করা হচ্ছে। এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। উমরকোট ও পারালকোট এলাকায় ১৯৬৫-৬৬ সালেই সর্ব প্রথম রবি মরসুমে চাষের কাজ সুরু করা হয়। যদিও সামান্য ৮০ একর জমিতে প্রথমে চাষ করা হয় তবুও এই রকম একটা অভিযান ঐ এলাকায় বিপুল সাড়া জাগায়। ১৯৬৬-৬৭ সালে চাষের জমির পরিমাণ বাড়িয়ে ৬৫০ একর করা হয় এবং ২ লক্ষ টাকারও বেশী শস্য উৎপাদন করা হয়। ১৯৬৭-৬৮ সালে চাষের জমির পরিমাণ আরও বাড়িয়ে ৮০০ একর করা হয়। ১৯৬৮-৬৯ সালে ১৫০০ একরে চাষ করা হবে। এখানে চাষের জমির যে পরিমাণ দেওয়া হল তার মধ্যে আদিবাসীগণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ওরা যে পরিমাণ জমিতে চাষবাস করছে তা যদি এই হিসেবের মধ্যে ধরা হয় তাহলে বর্তমান বছরে রবি শস্যের চাষের জমির পরিমাণ ২০০০ একরে দাঁড়াবে।

এত তিন বছরে রবি মরসুমে সাধারণতঃ ধান, গম, ভুট্টা, সরষে ইত্যাদির চাষ করা হয়েছে। তবে এতে এ কথা বলা যায় না যে দণ্ডকারণ্যে রবি মরসুমের চাষ একেবারে সর্বোচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে।

এ কথা ঠিক যে রবি মরসুমে যখন বৃষ্টির জল পাওয়া যায় না, তখন যদি জলসেচের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে এখানে যাঁদের পনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, তাঁরা যে বছরে দুটো এমন কি তিনটে ফসল তুলতে পারবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এঁরাও ভারতের যে কোন অঞ্চলের কৃষকদের মতো সমান পরিশ্রমী ও কর্মঠ।

উমরকোটে আলুর ক্ষেত ফসলে ভরে উঠেছে

গত সংখ্যাগুলিতে যাঁরা লিখেছেন

শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য্য
অর্থনীতি বিভাগের প্রধান
গোয়েঙ্কা কলেজ অব কমার্স

শ্রীঅসিত ভট্টাচার্য্য
অর্থনীতির লেকচারার
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ডঃ শান্তি কুমার ঘোষ
অর্থনীতির লেকচারার
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ডঃ বি বি ঘোষ
গবেষণা বিভাগ, আকাশবাণী

ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার
প্রখ্যাত ঐতিহাসিক

ভারতে ক্রেতা সমবায়

বিশ্বনাথ লাহিড়ী (হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়)

ভারতের মতো বিকাশশীল দেশের পক্ষে সমবায় একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের দেশের আর্থিক উন্নয়ন, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে রূপায়িত হয় যার উদ্দেশ্য হ'ল সমাজ তান্ত্রিক ধরনের রাষ্ট্র গঠন করা। এই রকম ক্ষেত্রে বিতরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থার মূল্য যথেষ্ট, যা বাস্তবিকপক্ষে, সমাজতন্ত্রের অর্থকে সার্থক করে তুলতে পারে। ক্রেতা সমবায়ই হ'ল একমাত্র সক্রিয় ব্যবস্থা যার মাধ্যমে অত্যাবশ্যক ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি যথোচিতভাবে বন্টন ক'রে বিতরণের ক্ষেত্রে একটা নতুন অধ্যায় রচনা করা যেতে পারে।

সমবায় আন্দোলনের গুরুত্বের ওপর বিভিন্ন রকমের মত প্রচলিত। এক শ্রেণীর সমালোচকের মতে সমবায় প্রকৃতপক্ষে তেমন একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা নয়। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, সমবায় আন্দোলন বিশেষ করে ক্রেতা সমবায়, বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। কিন্তু এ কথাও সত্য যে ক্রেতা সমবায়সহ সম্পূর্ণ সমবায় আন্দোলনের উদ্ভবই হয় মূলত: আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থা থেকে দুর্নীতি বা দোষযুক্ত প্রথাগুলি দূর করে একটা নির্দোষ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। এর কার্যপ্রণালীর লক্ষ্য হ'ল ক্রেতা বা বিক্রেতা কেউ যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হন।

ক্রেতা সমবায় গঠনের মধ্যে একটা বড় ব্যাপার হ'ল, এই রকম সমবায়ের মাধ্যমে ক্রেতাগণ ও তাঁদের মতামত প্রকাশ করতে পারেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ক্রেতাগণের মতামত প্রকাশ বা অন্যায়ের প্রতিবাদের জন্য কোন সংগঠন ছিল না। সর্ব প্রথম সম্ভবত: আমেরিকাতেই, ক্রেতাগণের মতামতের ওপরেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় ক্রেতাগণের মতামতেরও যে একটা মূল্য আছে, ক্রেতা সমবায়ই তা প্রমাণ করেছে। বিশ্বের নানা দেশে বিশেষ করে ইংল্যাণ্ড ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলিতে ক্রেতাসমবায়ের প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটা সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে দেশের আর্থিক ক্ষেত্রেও স্থিরতা আনা যায়। ক্রেতা সমবায় দেশের বিভিন্ন পরিস্থিতিও বন্টনের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করতে পারে, দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ও প্রতিরোধ করতে পারে। দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদির সময়ে সরকার অবশ্য কন্ট্রোল বা রেশনিং ব্যবস্থা চালু করে অবস্থা আয়ত্বে রাখার চেষ্টা করেন।

কিন্তু সেই রকম অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ছাড়া অন্য সময়ে ক্রেতা সমবায় সাধারণের সেবা করতে পারে। এই রকম সমবায়, মধ্যবর্তীদের অর্থাৎ দালাল ইত্যাদিগণকে সরিয়ে দিয়ে সোজাসুজি উৎপাদক ও ক্রেতাগণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, সকলকে সমান অধিকার ও সুযোগ দিতে পারে।

আমাদের দেশে অবশ্য ক্রেতা সমবায়ের সংখ্যা ক্রমশ: বাড়ছে। শিল্পাঞ্চলের সংখ্যা বাড়লে এবং সহরের সম্প্রসারণ হতে থাকলে, সুষ্ঠু বন্টনের দাবি ক্রমশ: বাড়তে থাকবে, এ ছাড়াও মুদ্রাস্ফীতি, ক্রেতাগণের ক্রয়শক্তির বৃদ্ধি এবং প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি দেশের আর্থিক পরিস্থিতিতে একটা পরিবর্তন এনেছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার শেষার্ধ থেকে ক্রেতা সমবায়ের গুরুত্ব ক্রমশ: বাড়ছে। ১৯৬১-৬২ সালে যেখানে ৭৫টি পাইকারী সমবায়, ৭০৫৮টি প্রাথমিক ক্রেতা সমবায় তথা ৪৪.৩৭ কোটি টাকার ব্যবসা ছিল সেই তুলনায় ১৯৬৬-৬৭ সালে ৩৪৫টি পাইকারী সমবায়, ৯৪৭১টি প্রাথমিক ক্রেতা সমবায় তথা ১৭৪.০৭ কোটি টাকার ব্যবসা হয়। এ পর্যন্ত ২৫ লক্ষ পরিবার এই সমবায়গুলির সদস্যভুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ সহরাঞ্চলের শতকরা ১৪ জন ক্রেতা সমবায়ের সদস্য।

উপরে উক্ত সংখ্যাগুলি থেকে অনুমান করা যায় যে, দেশে ক্রেতাসমবায়ের উন্নতি উল্লেখযোগ্য হলেও সন্তোষজনক নয়। কারণ এতে শতকরা মাত্র ৭ জন সম্পূর্ণ খুচরা বিক্রীর সুবিধে নিতে সমর্থ হয়েছেন। এর তুলনায় ইংল্যাণ্ড বা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলিতে শতকরা ১০ থেকে ২০ জন, ক্রেতা সমবায়ের সুযোগ গ্রহণ করেন।

চায়ের কাপ

জাপানীরা ভীষণ চায়ের ভক্ত। সাধারণত: তারা কাপের পর কাপ চা খায়, হালকা সবুজ চা। এমন কি মধ্যাহ্ন বা নৈশ আহারের সঙ্গে চা খেতেও তাদের আপত্তি নেই।

কিন্তু কিছুদিন থেকে সবুজ চা-এ তাদের তেমন রুচি নেই। এখন কালো চা অর্থাৎ চা বলতে আমরা যা বুঝি তার ওপর জাপানীদের ঝোঁক হয়েছে। এই চা ভারতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। গত বছরে জাপানীরা মোট যে ৮৮,০০০ টন চা খেয়েছিল। এর মধ্যে ভারতীয় চায়ের পরিমাণ হবে ১৩,২০০ টন।

নিখিল-জাপান-কালো-চা-সমিতির একটি প্রতিনিধি দলের নেতার মতে জাপানে কালো চায়ের চাহিদা ক্রমশ: বাড়ছে। ভদ্রলোক সম্প্রতি আমাদের দেশে এসেছিলেন। তিনি আরও বলেছেন যে, ভারত যদি সবুজ চায়ের চাষ করে তাহ'লে আমদানীর ওপর শতকরা ৩৫ ভাগ প্রোটেকটিভ ডিউটি থাকা সত্বেও আমদানীকারকরা বরাত দিতে পারেন।

গত বছরে চায়ের উৎপাদন রেকর্ডমাত্রায় পৌঁছয় মোট ৩৮ কোটি ২৫ লক্ষ কিলোগ্রাম। ১৯৫৬-র রেকর্ডমাত্রার তুলনায় এই পরিমাণ ৬৫ লক্ষ কিলোগ্রাম বেশী।

রপ্তানীর ক্ষেত্রে গত বছরের অবস্থা বেশ উৎসাহজনক ছিল। গত বছরে ১৯৬৫ সালের চেয়ে ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ কিলোগ্রাম বেশী চা রপ্তানী করা হয়েছিল।

লক্ষ্মণরাও কির্লোসকার জন্ম শতবার্ষিকা ঃ ২০শে জুন ১৯৬৯

'কাজই আনন্দ স্বরূপ'

তাঁর বাণীই তাঁর স্মারক

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

রসকট কৃষ্ণ পিল্লে

চিত্র

তা. সু. নাগরাজন

অনেকে হয়তো বিশ্বাসই করবেন না যে, স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যা নিয়ে গ্রামের একজন বৃদ্ধ, ঢালাই ইত্যাদি করার জন্য প্রত্যেকদিন ২ টন করে লোহা গলানো যায় এই রকম একটি আধুনিক কিউপোলা, নিজের নক্সায় তৈরি করেছেন। কিন্তু ঘটনাটা সত্যি।

মহারাষ্ট্রের সাংলি জেলার পালুস গ্রামের মোঃ দাদা শিকালগার (৫৫) কোন সুদক্ষ ইঞ্জিনীয়ারের কাছ থেকে কোন রকম সাহায্য না নিয়েই এই কিউপোলাটি তৈরি করেন। গ্রামে যে বিকাশ শিল্প সমবায় সংস্থাটি রয়েছে, তিনি তার সদস্য এবং সংস্থাটির অন্যান্য সদস্য মোঃ শিকালগারের জন্য গর্ব বোধ করেন।

প্রায় নিরক্ষর এই বৃদ্ধকে যখন জিজ্ঞেস করা হল যে, তিনি কি করে এই দুঃসাধ্য কাজ করলেন, উত্তরে তিনি বললেন যে 'দূরে ঐ যে শিল্প সহরটা দেখা যাচ্ছে সেখানকার বৃদ্ধ লোকটিই আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছেন। দুই কিলোমীটার দূরের ঐ কারখানায় আমি নানান ধরনের মেসিনে ৩০ বছর ধরে কাজ করেছি। ঐখানে কাজ করার সময় প্রতিটি মেসিনের অংশ আমি যে শুধু নেড়েচেড়ে দেখছি তাই নয় নক্সা তৈরি করে মেসিনের অংশও ঢালাই করতে শিখেছি। ঐখানকার বৃদ্ধ লোকটি যে শুধু আমাকেই কাজ শিখতে উৎসাহিত করেছেন তাই নয়, যাঁরাই কাজ শিখতে চেয়েছেন তাঁদের প্রত্যেককেই কাজ করতে উৎসাহ দিয়েছেন। আমি যখন বলতাম যে আমার তো বিদ্যেবুদ্ধি নেই আমি কি এ সব পারবো ? উনি তখন বলতেন, লেখাপড়ার কথা নিয়ে চিন্তা ক'রো না, চেষ্টা করো তাহলেই পারবে।'

ঐ গ্রামে মোহাম্মদের সহকর্মীদের সকলের কাছ থেকেই প্রায় একই কথা শোনা যায়। এঁরা প্রতি বছর প্রায় ৫০ হাজার টাকা মূল্যের যন্ত্রাংশ ঢালাই করেন। রাজা রাম সাওয়াত (৬৫), আন্নাভাপ্পা সুতার (৭০) এবং আরও অনেক কর্মী মিলে যে সমবায় সমিতি গড়ে তুলেছেন তাতে মূলধনের অংশ হিসেবে নিজেরা

ঢালাই বিভাগের এই সব কর্মী আশপাশের গ্রামের মানুষ   কির্লোস্করওয়াড়ী শিল্প কেন্দ্র, গ্রামবাসীদের, যন্ত্রপাতি চালনায়, পরিপূরক শিল্প স্থাপনে, খামার যন্ত্র সজ্জিত করায় ও আয় বৃদ্ধিতে, সাহায্য করেছে।

দিয়েছেন ৬০,০০০ টাকা আর সরকারের কাছ থেকে এক কালীন সাহায্য ও ঋণ হিসেবে পেয়েছেন ৩.৫ লক্ষ টাকারও বেশী। ওঁরা সকলেই কিছু দূরের শিল্প-নগরীর 'বৃদ্ধ লোকটির' কথা উল্লেখ করতে থাকেন এবং বলেন যে, ওঁরই উৎসাহে গড়ে উঠেছে এই সমবায় সমিতি। ওঁদের মধ্যে বেশীরভাগই কোন না কোন সময়ে ঐখানে কাজ করেছেন। সাংলি জেলার প্রায় সব খামারে কৃষিক্ষেত্রে' ছোট খাটো শিল্পে বা সমবায় চিনি কারখানায় ঐ বৃদ্ধ লোকটির নাম মুখে মুখে ফেরে, পল্লী জীবনে শিল্পের মাধ্যমে রূপান্তর ঘটানোয় তাঁর অবদান, তাঁর অদম্য উৎসাহ ও উদ্যম ও শিল্পোন্নয়ন সার্থক করার জন্যে তাঁর সংগ্রামের প্রশস্তি।

এই বৃদ্ধ লোকটি যাঁর নামানুসারে গড়ে ওঠা এই শিল্প নগরটি ভারতের শিল্প বিপ্লবের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার নাম হ'ল লক্ষণরাও কির্লোসকর। তাঁর গড়া কির্লোস্কারওয়াড়ী শিল্পকেন্দ্রে গত ২০শে জুন তাঁর জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হয়। মহারাষ্ট্রের কৃষি, শিল্প, সমাজ কল্যাণ গ্রাম সংস্কার ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রে তার নাম জড়িত। দেশের ঐ অংশে অগ্রগতির যে কোন নিদর্শনের, তা সে লোহার লাঙল, জল দেওয়ার জন্য বিদ্যুৎশক্তি চালিত পাম্প বা আখ মাড়াই কল যাই হোক না না কেন, সেগুলির প্রত্যেকটির সঙ্গে লক্ষণরাও কির্লোসকার ও তার প্রতিষ্ঠানের কোন না কোন সম্পর্ক রয়েছে। লক্ষ্মণরাও কির্লোসকার ১৩ বছর পূর্বে পরলোকগমন করেছেন কিন্তু কির্লোস্কারওয়াড়ীর চতুর্দিকের গ্রামগুলির চেহারা পরিবর্তনে তাঁর অবদান অসামান্য।

কির্লোস্কারওয়াড়ীতে আধুনিক ধরনের যে সব কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন লোহার লাঙল এবং খড় কাটার কল তৈরি হয় তা ভারতের বহু খামারে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভাড়া ভিত্তিক ক্রয় প্রথায় যে আখ মাড়াই কল সরবরাহ করা হয় সেগুলি সমবায়ের ভিত্তিতে গঠিত চিনির কারখানা স্থাপনে উৎসাহ দিচ্ছে। বিদ্যুৎশক্তি চালিত পাম্প তৈরি করার ক্ষেত্রে কির্লোস্কারওয়াড়ী হ'ল

নিজের নক্সায় তৈরি কিউপোলা যন্ত্রের পাশে দাঁড়িয়ে মোহাম্মদ দাদু শিকালগর। বর্তমানে তাঁর বয়স ৫৫ বছর।

অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। জলসেচের মাত্রা বাড়াতে এগুলি যথেষ্ট সাহায্য করেছে। প্রকৃতপক্ষে এই পাম্পগুলিই সাংলি জেলাকে সবুজ করে তুলেছে।

কির্লোস্কারওয়াড়ী অতি সামান্য অবস্থা থেকে এই বিপুল উন্নতি করেছে। ৫৯ বছর পূর্বে লক্ষ্মণরাও যে জনহীন, কাঁটা ও পাথর ভরা প্রান্তরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সেই প্রান্তর বর্তমানের কির্লোসকারওয়াড়ীর আড়ালে হারিয়ে গেছে। বর্তমানে এটি ভারতের অন্যান্য শিল্পনগরীর মতোই কর্মচঞ্চল। রাস্তার দুই পাশে গাছের সারি, সুন্দর ঝকঝকে রাস্তা শত শত কর্মী কাজ শেষ করে বাড়ী ফিরছেন বা কাজ করতে চলেছেন। বিপুল আকারের সব মেসিনে ২৪ ঘন্টা কাজ চলছে। ১৯৪ একর আয়তনের কির্লোসকারওয়াড়ীর লোক সংখ্যা হ'ল প্রায় দুই হাজার। এখানে একটি হাই স্কুল, একটি ডিস্পেন্সারি একটি ব্যাঙ্ক এবং আধুনিক সুযোগ সুবিধাগুলির প্রায় সবই রয়েছে।

কিন্তু ১৯১০ সালে কেউ এই জায়গাটির কাছাকাছিও আসতো না। কাছাকাছি, নামে মাত্র যে রেলস্টেশনটি ছিল তার নাম কুণ্ডল রোড। দিনে এক আধবার একটি ট্রেণ হুইসিল বাজিয়ে এই জায়গাটার পাশ দিয়ে চলে যেতো। চতুর্দিকে কয়েক মাইলের মধ্যে কোন ইলেক্ট্রিক লাইট বা জল ছিল না। ইস্পাত দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও প্রেরণা না থাকলে কেউ এই রকম একটা মরুভূমির মতো জায়গায় শিল্প নগরী গড়ে তোলার কল্পনাও করতে পারেন না। লক্ষ্মণরাও যখন এখানে এলেন তখন তাঁর বয়স ৪২ বছর। সমস্ত বাধা অতিক্রম করার দৃঢ় মনোভাব নিয়ে তিনি কাজে অগ্রসর হলেন।

বি. ভি. দেশপাণ্ডে একদিন যিনি কারখানার সাধারণ এক কর্মী ছিলেন আজ তিনি সেই কারখানার উন্নয়ন বিভাগের প্রধান হিসেবে জটিল যন্ত্রপাতির নক্সা তৈরি করছেন।

বেলগামের একটি গ্রামে ছিল তাঁর বাড়ী। ছোট বেলাতেই স্কুলের পড়াশুনা ছেড়ে বোম্বাইতে গিয়ে চাকরির চেষ্টা করতে থাকেন। যন্ত্রপাতি সম্পর্কে তাঁর একটা বিশেষ ঔৎসুক্য ছিল। তিনি বোম্বাইর জে. জে. আর্ট স্কুলে মেসিন ড্রইং করতে শেখেন। ভিক্টোরিয়া জুবিলি টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে লেকচারারের পদ পেয়েও তিনি তা ছেড়ে গ্রামে চলে এলেন। গ্রামে এসে তিনি বোতাম ইত্যাদি তৈরি করতে সুরু করলেন তারপর সাইকেল বিক্রী ও মেরামতের একটি দোকান দিলেন। এর পর তিনি ও তাঁর ভাই বেলগামে চলে এসে সাইকেলের একটি দোকান খুললেন এবং তখনই কির্লোস্কার ব্রাদার্স প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হ'ল।

গ্রামের কৃষকরা মান্ধাতার আমলের সাজ সরঞ্জাম দিয়ে চাষ করছে, তাদের পূর্ব পুরুষরা যে প্রথায় চাষ করতো এখনও তারা সেই প্রথাই অনুসরণ করছে। এদের কি করে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতিতে অভ্যস্ত করানো যায় তিনি সেই কথাই ভাবতে লাগলেন। তখন তিনি এক অশ্বশক্তির একটা ইঞ্জিন, একটা লেদ, একটা এমেরি গ্রাইণ্ডার এবং দুটো ড্রিলিং মেসিন নিয়ে একটা ছোট খাটো কারখানা খুললেন। উদ্দেশ্য ছিল হাত দিয়ে চালানো যায় এই রকম খড় কাটার মেসিন তৈরি করা। আর এইভাবেই সূত্রপাত হ'ল ভারতের বৃহত্তম কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানার।

কিন্তু লোহার লাঙল আর খড় কাটার মেসিন তৈরি করেই তিনি কাজ শেষ করেন নি। গ্রামে গ্রামে ঘুরে সেগুলির সুবিধে অসুবিধে কৃষকগণকে বুঝিয়ে সেগুলি চালু করতে চেষ্টা করেন। মা বসুমতীর গায়ে লোহার ঘা লাগানো পাপ বলে কৃষকরা প্রথমে তা ব্যবহার করতে রাজি হয়নি। দুই বছর পর্যন্ত লাঙলগুলি কারখানায় পড়ে রইলো, একটিও বিক্রী হ'ল না। লক্ষ্মণরাও তারপর প্রথম কয়েকটি লাঙল বিনামূল্যে বিলি করলেন এবং নিজে মাঠে গিয়ে সেগুলি চালানো শেখাতে লাগলেন। এরপর আস্তে আস্তে

আক্কালখোপ গ্রামে মোটর সাইকেলকে এখন আর সমৃদ্ধির চিহ্ন বলে ধরা হয় না, গ্রামের অনেকেরই ঐ যান্ত্রিক বাহন আছে। পোষাক পরিচ্ছদে, টালি দেওয়া ঘরবাড়িতে, পাকা রাস্তায় ও বৈদ্যুতিক আলোয় সমৃদ্ধির ছাপ সুস্পষ্ট।

আশেপাশের গ্রামগুলিতে এগুলির প্রচলন বাড়তে লাগলো।

লক্ষ্মণরাও এবং তাঁর ভাই সব রকম বাধাবিপত্তি দূরে ঠেলে রেখে তাঁদের কারখানাটি গড়ে তুলছিলেন কিন্তু বেলগাম মিউনিসিপ্যালিটি তাঁদের জানালেন নতুন করে সহরের যে পরিকল্পনা করা হচ্ছে তাতে তাঁদের ঐ কারখানাটির জায়গা নেই। এটিকে অন্য কোথাও সরিয়ে নিতে হবে। এর ফলে আউন্ধের একটি অখ্যাত গ্রামের ভাগ্য ফিরে গেল। ঐ এলাকার জমিদার বালাসাহেব পন্থ কারখানা স্থাপন করার জন্য ৩২ একর জমি ও ১০ হাজার টাকা দিলেন। কির্লোস্কার ভাইরা ১৯১১ সালে খড়কাটা মেসিন ও লোহার লাঙ্গল তৈরি করতে সুরু করেন। ১০/১২ বছরের মধ্যেই এগুলি এতো জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে ১৯২৪ সালেই এই কারখানা ৪০,০০০ লাঙ্গল বিক্রী করে।

লক্ষ্মণরাও তাঁর প্রথম দিকের ৫০ জন কর্মীকে নিয়ে যে জনহীন উষর স্থানটিতে এসে উপস্থিত হন সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে এখনকার কির্লোস্কারওয়াড়ী। বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলির শিল্পপতিরাও এখন নানা কাজে বিমান পথে এখানে আসেন। এই শিল্পটি এখন এতো বিস্তৃত এবং এখানে এতো বিভিন্ন ধরনের কাজ হয় যে, ভারতে এমন কি বিদেশেও এখন এর ১১টি কোম্পানি ও সহকারি অফিস আছে। এদের অয়েল ইঞ্জিন যেমন ভারতের ক্ষেত খামারে জনপ্রিয় তেমনি ৬০টি দেশে রপ্তানি করা হয়। এদের এখানে তৈরি অতি জটিল মেশিন টুলের সাহায্যে শত শত কারখানায় যন্ত্রাংশ তৈরি হচ্ছে। এদের ইলেকট্রিক মোটর—ভারতের মোট উৎপাদনের শতকরা ৩৬ ভাগ—পাম্প—দেশের মোট উৎপাদনের ৪০% দেশের শিল্পে, কৃষিতে, জলসেচ এবং বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের নানা ক্ষেত্রে নানা কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এতোখানি সম্প্রসারণের ফলে এই সব কোম্পানিতে কর্মীর সংখ্যা ৫০ থেকে বেড়ে এখন ৩০ হাজারে দাঁড়িয়েছে।

কির্লোস্কারওয়াড়ীর এই ব্যাপ্তিটাই বড় কথা নয় কিন্তু এই সংস্থাটি চতুর্দিকের গ্রামগুলিতে যে পরিবর্তন নিয়ে এসেছে সেইটেই হ'ল বড় কথা। প্রায় ঘুমন্ত গ্রামের অধিবাসীরা কেউ বা এখন সুনিপুণ কারিগর, কেউ বা সমবায় সমিতির সংগঠক, কেউ বা সমাজকর্মী। কির্লোস্কারওয়াড়ীর প্রায় ১৫০০ কর্মী চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা ২৫টি গ্রাম থেকে আসেন। এই সব গ্রামের প্রায় প্রত্যেক পরিবারের একজন বা দুইজন কির্লোস্কারওয়াড়ীতে কাজ করেন। প্রত্যেক পরিবারের আর্থিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় ভালো। ঋণগ্রস্ততা চলে যাচ্ছে, ঋণ দাতাদের শ্রেণী ক্রমশঃ বিলীয়মান।

আয়ুর্বেদ, সিদ্ধ, য়ূনানি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে মৌলিক ও ফলিত গবেষণা সুরু করার জন্যে, ঐ ধরণের গবেষণার পরিচালনা ও বিকাশের জন্যে এবং গবেষণার মধ্যে সমন্বয় বিধানের জন্যে ভারত সরকার একটি স্বশাসিত সংস্থা স্থাপন করেছেন। এর নাম হ'ল কেন্দ্রীয় ভারতীয় চিকিৎসা বিধি ও হোমিওপ্যাথি গবেষণা পরিষদ।

সাধারণ অসাধারণ

দেশের নানা প্রান্তে যে সব দেশদরদী নরনারী লোকচক্ষুর অন্তরালে দেশগড়ার কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন এখানে সেইসব সাধারণ মানুষের অ-সাধারণ কাহিনী বলা হবে

সেচের ফল্গুধারা

আমাদের দেশ কৃষিনির্ভর। কৃষি আমাদের প্রাণ, কৃষি আমাদের জীবন। আমাদের দেশগড়ার প্রয়াসে কৃষি উন্নয়নের তাই প্রাধান্য ও গুরুত্ব তাই এত বেশী। আজকের যুগের মানুষ প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের অপেক্ষী না হবার জন্যে কত না নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে কৃষিকে সর্বভাবে উন্নত ক'রে তোলায় ব্যাপৃত। এই পরীক্ষা নিরীক্ষা ফলপ্রসূ করতে প্রয়োজন আর্থিক সামর্থ্য যা আমাদের দেশে সব সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে না। এমতাবস্থায় উদ্যোগী পুরুষরা নিজেদের প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করেন। যা আছে তাই যথাসম্ভব কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন। কৃষি প্রয়াসে সেচের গুরুত্ব অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে কম নয়। এ ক্ষেত্রে সহজ কোনোও পন্থা আবিষ্কৃত হলে আমাদের দেশের রুক্ষ খরা-অঞ্চলগুলির অনেক উপকার হয়। এমন একটি আবিষ্কারের মালিক হলেন কেরালার পালঘাট জেলার ওট্টাপালাম এলাকার বাসিন্দা, মাধবন নায়ার। তাঁর উদ্যম ও ভাবিকা শক্তির সহায়তায় এযাবৎ ঊষর একটা এলাকাকে শস্য শ্যামল ক'রে তোলার কৃতিত্ব দেশ বিদেশের অনেক বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁর সেচ পদ্ধতি হ'ল এই রকম।

ভূগর্ভে মাটির একাধিক স্তর আছে। ভূ-স্তরের গভীরে প্রস্তরময় স্তরের ওপর দিয়ে জলের যে ক্ষীণ-ধারা নিত্যপ্রবহমান শ্রীনায়ার সেই স্তর পর্যন্ত পাকা গাঁথুনীর প্রাচীর তৈরি করে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার গতিরোধ করে সেই জল সঞ্চয় করেন সেচের জন্য। তাঁর এলাকায় জলের অভাব তীব্র অতএব সেচের জন্য প্রচুর জল সরবরাহ পাবার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এ সবে দমে না গিয়ে শ্রীনায়ার সকলের জানা পুঁথিগত একটা তত্ত্ব হাতে নাতে পরীক্ষা করতে চেষ্টা করলেন এবং তাঁর সে প্রচেষ্টা সফল হ'ল। তাঁর এই কৃতিত্ব দেশ বিদেশে এত লোকের মনে কৌতূহল জাগিয়েছে যে তাঁর খামার দেখার জন্যে লোকের আসার বিরাম নেই। তাই শ্রীনায়ার একটা অতিথিশালাও তৈরি করে ফেলেছেন। রাজ্য সরকার একটা অন্তঃসলিলা-জলের বাঁধ তৈরির একটি পরীক্ষামূলক কার্যসূচী রূপায়ণে শ্রীনায়ারের সহযোগিতা নেবার কথা চিন্তা করে দেখছেন। ইতিমধ্যে সিংহল সরকার শ্রীনায়ারের বাঁধ তৈরীর পদ্ধতি সম্বন্ধে খোঁজ খবর করছেন।

প্রাচীন কৃষি পদ্ধতিকে বিদায়

যথাসময়ে পরিমাণমত সার প্রয়োগ ক'রে ভালো জাতের বীজ বুনে এবং প্রয়োজন মত সেচ দিয়ে যে প্রচুর পরিমাণ ফসল তোলা যায়, তা গোসাই গ্রামের শ্রীসত্যনারায়ণ সিং প্রমাণ করেছেন। বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কীর্তিআনন্দ ব্লকের গোসাই গ্রামের বাসিন্দা শ্রীসত্যনারায়ণ চাষবাস নিয়ে থাকেন।

তাঁর জমির পরিমাণ আধ একর। প্রচুর পরিশ্রম স্বীকার করে এবং সাধ্যের অতিরিক্ত খরচ করেও তিনি আশানুরূপ ফসল পেতেন না। তিনি এলাকার অন্যান্য প্রগতিশীল চাষীদের সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ করলেন তাঁরা তাঁকে পরামর্শ দিলেন সাবেকী আমলের চাষ পদ্ধতি বর্জন ক'রে বৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ করতে।

শ্রীসত্যনারায়ণ ২০০ টাকার উৎকৃষ্ট বীজ ও রাসায়নিক সার কিনলেন। জমিটায় ভালো ক'রে হাল চালিয়ে তিনি গুল্লা বেঁধে 'এ্যাগ্রোসাইন' মাখানো ১৫ কেজি মেক্সিকোর গমের বীজ বুনে দিলেন। বীজ বোনার আগে তিনি জমিতে ২৬ কেজি ডেমোফসফেট ও ১২ কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট মিশিয়ে নিয়েছিলেন।

বীজ বোনার ২০ দিন পর তিনি জমিতে আবার ৪৪ কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট ছড়িয়ে দিয়ে ভালোভাবে সেচ দিলেন। ফসল পেকে ওঠার পর যখন কাটা ফসল ওজন করা হ'ল তখন শুধু শ্রীসত্যনারায়ণ-ই নন তাঁর প্রতিবেশীরাও হতবাক হলেন। আধ একরে ৪৫ মণ অর্থাৎ এক একরে ৯০ মণ কম কথা নয়।

এই গমের জন্যে তিনি অতিরিক্ত মোট খরচ করেছিলেন ১০০ টাকা আর এর থেকে তাঁর লাভ হ'ল ১,৪০০ টাকা।

প্রায় মরুভূমি এক অঞ্চলে ফসলের প্রাচুর্য

সার, সেচ ও বীজের যথাবিধি প্রয়োগের আর এক সাফল্য-কাহিনী। গুজরাটের হারিজ-এর কাছে, মোটা মাক্কা নামের একটি জায়গায় শ্রীবারাণসীভাই নাগরদাস প্যাটেল প্রায় মরুভূমির মত শুকনো একটি অঞ্চলে গমের চাষ করে প্রচুর ফসল ফলিয়েছেন। রাজ্য পর্যায়ে যে গমের চাষ প্রতিযোগিতা হয়, তাতে তিনি তৃতীয় স্থান পেয়েছিলেন। তাঁর জমিতে প্রতি একরে ২,৮৫৮.১৩০ কেজি ক'রে গম হয়।

পেশায় ব্যবসায়ী হলেও শ্রীপ্যাটেলের আগ্রহ ছিল চাষবাসের প্রতি। পত্র পত্রিকায় ও খবরের কাগজে আধুনিক কৃষি পদ্ধতির নানা কাহিনী পড়ে তাঁরও হাতে কলমে পরীক্ষা ক'রে দেখার ইচ্ছে হয়। স্থানীয় ব্লক-এক্সটেনশান অফিসারদের পরামর্শে ও সহায়তায় তিনি কৃষির ব্যাপারে উৎসাহজনক ফল পেয়েছেন।

শ্রীপ্যাটেল কথায় কথায় বলেন যে, প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাওয়া বড় কথা নয়। আমার সাফল্যে যে ডিভিশন, কৃষকরা উৎসাহিত হচ্ছেন এইটিই তৃপ্তির বিষয়।

কৃষিক্ষেত্রে সহযোগিতার সাফল্য

এক্সটেন্সান অফিসারদের ভূমিকা

বর্ধমান থেকে ৮ মাইল দূরে সোনাকুড় গ্রাম। দেশের আর হাজারটা গ্রামের মত এই গ্রামটিও অখ্যাত ও দরিদ্র ছিল এই বছর তিনেক আগেও। ফসল হত যৎ-সামান্য ফলে চাষীদের সারা বছরে পর্য্যাপ্ত খাবারের সংস্থান হ'ত না। কিন্তু ১৯৬৫-র শেষের দিকে ব্লক কর্মীরা প্রচুর ফলনের বীজ সম্পর্কে খবর আনলেন। গোড়ায় যাঁরা এই বীজ বুনে হাতে নাতে ফল দেখতে চাইলেন তাঁদের মধ্যে তারক সাঁই, রাজনারায়ণ কোঙার, এম. সামন্ত ও আবু তায়েবের নাম উল্লেখযোগ্য। স্থির হ'ল তাইনান্-৩ আর তাইচুং নেটিভ-১ বীজ বোনা হবে। কিন্তু সমস্যা হ'ল সেচের ব্যাপার নিয়ে। এই বীজের জন্যে পর্যাপ্ত জলের দরকার। অতএব বর্ধমান ব্লকের কৃষি সম্প্রসারণ অফিসারের পরামর্শ চাওয়া হ'ল। পরামর্শ করে তাঁরা স্থির করলেন যে দামোদরের জল নিষ্কাষণের জন্যে তৈরি 'বাঁকা' খালের গায়ে একটা বাঁধ তৈরি করবেন। বাঁধ তৈরি হলে সকলেরই উপকার হবে এই আস্থা নিয়ে গ্রামের ৮০টি পরিবারের প্রত্যেকে এই বাঁধ তৈরির কাজে হাত লাগালেন। বাঁধ শেষ হয়ে গেল যথা সময়ে।

একস্টেনসান অফিসারের তদারকীতে গ্রামের কৃষকরা যথাযথ সার ব্যবহার ক'রে তাইনান ৩ ও তাইচুং নেটি-১এর বীজ বুনে প্রতি একরে ৫০-৫৫ মণ ধানপেলেন। তাছাড়া খড় পেলেন ৬০ মণ। এরপর প্রত্যয় না হওয়ার কোনোও কথা নেই। বোরো মরসুমে সোনাকুড়ের অধিকাংশ চাষী ৪৫০ একর জমিতে আই আর-৮ এবং যথেষ্ট ফসল পেলেন। সোনাকুড়ের ঐশ্বর্য্য দেখে গ্রাম গ্রামান্তরের চাষীরাও উৎসাহিত হয়েছেন।

পশ্চিম বাংলার একটি গ্রাম পঞ্চায়েৎ

পর্যালোচনা

ডি. আর. সরকার
এস. এন. নন্দা

পশ্চিমবাংলায় পঞ্চায়েতী রাজ আইন পাশ হয়, ১৯৫৭ সালে কিন্তু রাজ্যে পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপন করা হয় ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে।

বর্তমান পর্যালোচনার দুই লেখক ২৪ পরগণা জেলার ব্যারাকপুর মহকুমার পলাসী গ্রামে ১৯৬৭ সালে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ-কর্ম সম্বন্ধে স্থানীয় অধিবাসীদের প্রতিক্রিয়া নিরূপণ করার চেষ্টা করেন। তাঁদের সমীক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হ'ল।

তাঁরা ২৭৫টি পরিবারের প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের মতামত লিপিবদ্ধ করেন। সংগৃহীত তথ্য থেকে কতকগুলি ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন শতকরা ৮০ জনের মতে গ্রামে খাদ্যোৎ-পাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া গ্রাম পঞ্চায়েৎগুলির প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাঁদের মতে এর পর গুরুত্বের বিচারে আসে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজ।

গ্রামের প্রত্যেকটি পরিবারের কর্তাদের ধারণা কৃষি এবং পল্লী শিল্পগুলির ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েৎগুলির অবদান তেমন বিশেষ কিছু নয়। ১০ জনের মধ্যে ৮ জন বলেছেন, সেচের ব্যবস্থায়, সার ও উন্নততর বীজ সরবরাহে, শস্য রক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগে, গুদামজাত করার এবং ঋণের সুযোগ সুবিধা আদায়ে পঞ্চায়েৎগুলির আরও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত। দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রমে, শস্যাদি উৎ-পাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য দিক, যেমন, ছোট জমিগুলিকে একত্রীকরণ, জ্বালানী এবং গো মহিষের খাদ্য হিসেবে বিশেষ ধরনের ঘাস উৎপাদনে হাত দেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া পল্লী শিল্পগুলির উন্নতির ব্যবস্থা করা এবং স্থানীয় কুটীর শিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা দরকার বলে তাঁরা মনে করেন।

এটা করতে পারলে বহু লোকের কর্মের সংস্থান করাও সম্ভব হবে।

নতুন গঠন ব্যবস্থা

পঞ্চায়েৎ হ'ল প্রতিনিধিত্বমূলক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। অতএব শতকরা ৮০ জন চান যে পঞ্চায়েৎগুলির গ্রাম অধ্যক্ষ ও অঞ্চল প্রধানের অধীনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করা উচিত। সর্বোপরি তাঁদের মতে সংগঠনের এবং কার্যক্ষমতার দিক দিয়ে পঞ্চায়েতগুলি যাতে আরও ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে সেজন্য এগুলিকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

পঞ্চায়েতী নির্বাচনের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে, একটা নতুন ধারার নেতৃত্ব এসেছে। কিন্তু পলাসীর শতকরা ৫০ জন বাসিন্দা মনে করেন যে, আগেকার আমলের জেলা ও ইউনিয়ন বোর্ডের নেতাদের চেয়ে এঁরা এমন কিছু ভালো নন। নেতৃস্থানীয়দের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত পরিবারের। তাঁরা প্রায় ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্যগণের কাজ করেন। অনুসন্ধানের ফলে পর্যালোচনা-কারীগণ দেখেছেন যে পলাসীর গ্রাম পঞ্চায়েৎ প্রায় কোণঠাশা হয়ে কাজ করছেন। গ্রাম সমবায় সমিতি অথবা গ্রামের স্কুল বা ক্লাবের সঙ্গে এদের প্রায় কোনোও সম্পর্ক নেই বা এগুলির ওপর বিশেষ কোন প্রভাবও নেই। অর্থাৎ অন্য কথায় বলতে গেলে গ্রামের অন্যান্য উন্নয়নী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এদের কোনোও সংযোগ নেই। গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে গ্রাম সেবককে ঠিকমত কাজে লাগানো হয় না।

গ্রাম পঞ্চায়েৎগুলির পক্ষে ভালোভাবে কাজ করা সম্ভব নয়—কারণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দলগতভাবে ক্ষমতাশালী হওয়ার জন্যে পঞ্চায়েৎগুলির সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করে। এই ধারণা প্রকাশ করেন ১০ জনের মধ্যে ৯ জন। এঁরা

ঘুটঘোরিয়ার তাঁতি কামার লাক্ষা শিল্পী

দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা থেকে এক মাইল দূরে ঘুটঘোরিয়া গ্রামে অনেক তাঁতি কামার ও গালার কারিগর বাস করেন। গ্রামটির মোট জনসংখ্যা হ'ল ৩০০০, তার মধ্যে ২৫০০ জনই কোন না কোন ধরণের হাতের কাজ জানেন। ইস্পাত কারখানার কাজ যখন সুরু হ'ল, এঁরা কিন্তু সেখানে কোন কাজের জন্য ঘোরাঘুরি না ক'রে, দুর্গাপুরে যে বাজার গড়ে উঠছিলো তারই সুযোগ নিলেন।

দুর্গাপুর প্রকল্প থেকে ঋণ গ্রহণ করে এঁরা এঁদের উৎপাদন শতকরা ২৫ ভাগ বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। এখানে যে ১৫০০ কামার আছেন তাঁরা এক ধরণের কোদাল তৈরিতে অত্যন্ত সফল হয়েছেন এবং তাঁদের বার্ষিক উৎপাদনের মূল্য হ'ল প্রায় ১০ লক্ষ টাকা।

এই গ্রামের শিল্পীরা যে বঁড়শী ও গালার চুড়ি তৈরি করেন সেগুলি রপ্তানি ক'রে, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। গালার চুড়ি শিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হ'ল প্রায় ১ লক্ষ টাকা এবং ৫০০ জন কারিগর এই শিল্পে নিযুক্ত আছেন।

সম্প্রতি প্রকল্পের কর্মীদের উৎসাহে এঁদের মধ্যে অনেকে শিল্প সমবায় সমিতি গঠন করেছেন। সমবায় সমিতি কাঁচামাল সংগ্রহ করতে এবং উৎপাদিত জিনিসগুলি বাজারজাত করতে এঁদের সাহায্য করে। এঁদের তৈরি জিনিসপত্র বিদেশের বাজারেও যাতে প্রতিযোগিতা করতে পারে সেজন্য দুর্গাপুর প্রকল্প বিভাগীয় ডিজাইন কেন্দ্র থেকে এঁদের জন্য নানা রকমের নতুন ধরণের ডিজাইন সংগ্রহ করে দিয়েছেন এবং এঁদের তৈরি জিনিসপত্র যাতে সোজাসুজি রপ্তানি করা যায় তার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছেন। এ পর্যন্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিই এঁদের গালার তৈরি জিনিসপত্র কিছু কিছু রপ্তানি করতেন।

ঘুটঘোরিয়ার কারিগররা খুব ভালো বঁড়শীও তৈরি করেন এবং এগুলি বিদেশ থেকে আমদানী করা বঁড়শীর তুলনায় একটুও খারাপ নয়। এই শিল্পের মাধ্যমে ২৫০ জন কারিগর তাঁদের জীবিকা অর্জন করেন। তবে মরশুমের সময়ে এঁদের সংখ্যা বেড়ে এক হাজারেরও বেশী হয়ে যায়। লোহা এবং ইস্পাত নিয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত কামাররাও তখন এই কাজে লেগে যান। এই বঁড়শী উৎপাদন শিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হ'ল ৫ লক্ষ টাকা। রপ্তানি উন্নয়ন পরিষদের মাধ্যমে এই বঁড়শী বিদেশে পাঠাবার প্রস্তাব করা হয়েছে।

দুর্গাপুর প্রকল্প এঁদের জন্য কাঁচা মাল সংগ্রহ করতে, এঁদের মূলধন সরবরাহ করতে, মাল বাজারজাত করতে এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরামর্শ করে নতুন কর্মসূচী তৈরি করতে সাহায্য করেন। এই গ্রামটিতে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ সুরু হলে আরও নতুন নতুন শিল্প গ'ড়ে উঠবে ব'লে আশা করা যাচ্ছে।

(১৪ পৃষ্ঠার পর)

আরও বলেন যে গ্রাম পঞ্চায়েৎ গুলির অধিবেশনে তর্কাতর্কি ও ঝগড়াঝাঁটিই বেশী হয়, ফলে কাজের চেয়ে কথাই হয় বেশী।

গ্রামে পঞ্চায়েতী কার্যসূচীর অঙ্গ হিসেবে কোনোও উৎপাদন সূচী বা উন্নয়ন সূচী আছে কি না জিজ্ঞাসা করা হ'লে প্রত্যেক পরিবার প্রধান জানালেন এমন কোনোও কার্যক্রমের কথা তাঁরা জানেন না।

এইসব দেখে শুনে পর্যালোচক দুজন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, যে কৃষির ব্যাপারে এবং গ্রামের শিল্পগুলির উন্নয়নে গ্রাম পঞ্চায়েতকে আরও উদ্যোগী হতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যগণকে নিজেদের রাজনৈতিক মতবাদ ভুলে গিয়ে একই লক্ষ্য নিয়ে গ্রামের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যে কাজ করতে হবে।

ধনধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে এবং তথ্য ও বেতার মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত হ'লেও 'ধনধান্যে' শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করে না। পরিকল্পনার বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী ক্ষেত্রে, উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতটা অগ্রগতি হচ্ছে তার খবর দেওয়াই হ'ল ধনধান্যেয় লক্ষ্য। সুতরাং 'ধনধান্যে' পড়ুন, দেশকে জানুন।

'ধনধান্যে' প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

নিয়মাবলী

- উন্নয়নী কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়।
- অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পুনঃ প্রকাশকালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার করা হয়।
- প্রত্যেক রচনা মনোনয়নের জন্যে আনুমানিক দেড় মাস সময়ের প্রয়োজন হয়।
- মনোনীত রচনা সম্পাদক মণ্ডলীর বিবেচনা অনুযায়ী প্রকাশ করা হয়।
- তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয়। কোনোও রচনার প্রাপ্তি স্বীকৃতি পত্র মারফৎ জানানো হয় না।
- নাম ঠিকানা লেখা ডাকটিকিট লাগানো খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা তিন মাস পরে আর রাখা হয়না।
- শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাবেন।
- গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেস ম্যানেজার, পাব্লিকেশন ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী। এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

প্রতিরক্ষা সামগ্রী সরবরাহে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির ভূমিকা

ভি. নাথ

সাম্প্রতিক কালে যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পূর্ণভাবে বদলে গেছে। অতি দূরের লক্ষ্যও সঠিকভাবে ভেদ করা যায় এই রকম রাইফেল ও কামান, সঠিকভাবে কার্যকরী সঙ্কেত প্রদান এবং টেলিফোন ও বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি উন্নত ধরণের সামরিক সাজ সরঞ্জাম বর্তমানে কার্যকরীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ভারত যদিও অনেক পরে প্রবেশ করেছে, তবুও এখানে এই সব আধুনিক অস্ত্র শস্ত্র তৈরি হচ্ছে। কাজেই এই সব যুদ্ধ সামগ্রী তৈরি করার জন্য দেশের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করা প্রয়োজন কিনা তা ভেবে দেখা উচিত। এই উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি এই প্রয়োজন কতখানি মেটাতে পারে সেগুলির উৎপাদন ক্ষমতা কতখানি ইত্যাদি বিষয়গুলি অনুসন্ধান করা উচিত। এই সম্পর্কে সঠিক তথ্যাদি সম্ভবত: সম্পূর্ণভাবে সংগৃহীত হয়নি। কাজেই এগুলির ক্ষমতা নির্ধারণ করা সম্পর্কে অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

এই সম্পর্কে একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার চেষ্টা অবশ্য করা হয়েছিল, কিন্তু সেটা স্বেচ্ছাধীন ছিল বলে খুব সফল হয়নি। কাজেই এই ক্ষেত্রে একটা আইনগত এবং বাধ্যতামূলক রেজিষ্ট্রেসন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়তো প্রয়োজন হবে। একবার এটা করা হয়ে গেলে, কোন কোন ব্যাপারে কি পরিমাণ সাহায্য পাওয়া যেতে পারে সরকার তখন তা বুঝতে পারবেন।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির মধ্যে অত্যন্ত সক্ষম এবং অপেক্ষাকৃত কম সক্ষম দুই ধরনের শিল্পই রয়েছে বলে এর সংজ্ঞাও অত্যন্ত ব্যাপক। কাজেই এইগুলিকে এই রকমভাবেই হয় তো শ্রেণীবিভক্ত করা প্রয়োজনীয় হতে পারে। দুই শ্রেণীর এই শিল্পগুলিকেই আবার মেকানিক্যাল, অটোমোবাইল ইঞ্জিনীয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং, কেমিক্যালস, ইত্যাদির মতো প্রধান প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। সরকারও তেমনি প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রীগুলিকে ঐ ধরণের মোটামুটি কয়েকটা শ্রেণীতে বিভক্ত করে ফেলতে পারেন। যদি দেখা যায় যে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিও পুরোপুরি কাজ সামলে উঠতে পারছে না তাহলে অল্প সক্ষম শিল্প সংস্থাগুলিকেও উৎপাদনের ভার দেওয়া যেতে পারে। হয়তো এমন বহু জিনিস থাকতে পারে, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, যেগুলি এ পর্যন্ত উৎপাদন করেনি, কিন্তু সামান্য কিছু যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করে বা উৎপাদনে কিছুটা পরিবর্তন এনে সেগুলি তারা উৎপাদন করতে সক্ষম হবে।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির ক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে একটি ক্ষুদ্রতর যুদ্ধ প্ল্যান্ট কর্পোরেশন গঠন করা হয়। এই ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি নিজেরা যে সব যুদ্ধ সামগ্রী উৎপাদনে সক্ষম, অথবা ক্ষুদ্রতর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করে যে সব জিনিস উৎপাদন করতে সক্ষম সেগুলির জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করার ক্ষমতা এই কর্পোরেশনকে দেওয়া হয়। এই কর্পোরেশন গঠন এবং ক্ষুদ্রতর কাজের আইন পাশ হওয়ার পর, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করা সম্ভবপর হয় এবং যুদ্ধ সামগ্রীর উৎপাদন বেড়ে যায়। বর্তমানে আমাদের দেশে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে যে রকম সুযোগ সুবিধে দেওয়া হয়ে থাকে সেইগুলিকেও সেই রকম কতকগুলি সুযোগ সুবিধে দেওয়া হতো।

এমন কি বৃটেনেও ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করার জন্য ৭০ জন ক্যাপাসিটি অফিসার নিয়োগ করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল যত ছোট প্রতিষ্ঠানই হোক আর যত দূরেই সেগুলি অবস্থিত হোক, জরুরি প্রয়োজনের সময় অথবা চাহিদা বেড়ে গেলে, সেগুলির সাহায্য পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয়ার্ধে যখন যন্ত্রাংশের চাহিদা খুব বেড়ে যায় তখন এই ব্যবস্থা খুবই কার্যকরী হয়।

প্রতিরক্ষার প্রয়োজন অবশ্য বিভিন্ন ধরনের। অস্ত্রশস্ত্র গোলা বারুদ থেকে আরম্ভ করে পোষাক, ওষুধপত্র এমন কি জলের বোতলও প্রয়োজনীয়। এগুলির মধ্যে কতকগুলি জিনিস অসামরিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাদন করতে পারে। কতকগুলি জিনিসের জন্য আবার বিশেষ ধরনের শিল্পের প্রয়োজন। এমন কতকগুলি সামরিক সম্ভার আছে যেগুলি কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সম্পূর্ণভাবে উৎপাদন করা সম্ভব নয়।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির, পরীক্ষা নিরীক্ষা করার মতো, নক্সা তৈরি করা বা উন্নয়ন করার মতো যথেষ্ট সুযোগ সুবিধে নেই। যদিও কতকগুলি প্রতিষ্ঠান যে কোন স্থানের এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের মতোই কার্যক্ষম, সেগুলির মধ্যে আবার অনেকগুলি ইঞ্জিনীয়ারিং ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে তেমন উৎসুক নন।

সামরিক সাজসরঞ্জাম উৎপাদন ব্যবস্থাকে দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে— যেমন যন্ত্রাংশ এবং অংশ উৎপাদন এবং অংশাদি দিয়ে সম্পূর্ণ জিনিসটি উৎপাদন। ক্ষুদ্রায়তন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান হয়তো সম্পূর্ণ কোন জিনিস উৎপাদনের দায়িত্ব গ্রহণ না করতে পারে, সেই ক্ষেত্রে সেই কাজের ভার কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া যেতে পারে।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে, সামরিক সম্ভার উৎপাদন করার দ্বিতীয় উপায়টা হ'ল, কয়েকটি প্রতিষ্ঠান 'প্রধান উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান' হিসেবে কাজ করবে এবং অংশগুলি সংগ্রহ করে সম্পূর্ণ জিনিস তৈরি করবে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি শুধুমাত্র অংশগুলি তৈরি করবে।

পরিকল্পনা ও সমীক্ষা

পরিকল্পনার কার্যকারিতা ও তার অগ্রগতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে সারা দেশের কলেজগুলিতে 'প্ল্যানিং ফোরাম' খোলা হয়েছে। কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এই 'ফোরামের' সভ্য হিসেবে পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁরা মাঝে মাঝে দল বেঁধে বেরিয়ে পড়েন বিভিন্ন গ্রামের বর্তমান অবস্থা কী এবং সেইসব গ্রামে পরিকল্পনার কোন প্রভাব পড়েছে কিনা কিংবা সে সব জায়গায় পরিকল্পনার সাড়া পেঁাচেছে কি না তার সম্যক ধারণার জন্যে। এই স্তম্ভে বিভিন্ন অঞ্চল সম্বন্ধে এইসব 'ফোরামের' সমীক্ষার বিবরণ দেওয়া হবে।

আকবরপুর

আসামের আকবরপুর গ্রাম থেকে হেঁটেই করিমগঞ্জ শহরে যাওয়া যায়। পূর্ব পাকিস্থানের সীমান্ত থেকে এই এলাকার দূরত্ব এক কিলোমীটারও নয়। পল্লী ভারতের উন্নয়নের প্রশ্ন ছাড়াও পাকিস্তান সীমান্তবর্তী এলাকা হিসেবে এই অঞ্চলটির উন্নয়নের বেশ গুরুত্ব আছে।

সম্প্রতি করিমগঞ্জ কলেজের 'প্ল্যানিং ফোরাম' অর্থাৎ পরিকল্পনা আলোচনাচক্রের তরফ থেকে এই অঞ্চলের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল। এই গোষ্ঠী যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন এই সমীক্ষায় তার আভাস পাওয়া যাবে।

আকবরপুরের অবস্থা বিশেষ উৎসাহজনক নয়। গ্রামে নামে মাত্র চারটি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। সে সব স্কুলে না লেখাপড়া হয়. না স্কুল বাড়ীর তত্বাবধানের ব্যবস্থা আছে। শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হয় কালেভদ্রে। দেখা হলেই যে যথারীতি পড়াশুনা হয় তাও বলা যায় না। গ্রামের লোক এতেই খুশী। করিমগঞ্জের স্কুল কলেজ হাতের নাগালের মধ্যে হলেও কেউই তাঁদের ছেলেমেয়েদের সেখানে পাঠায় না। প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে অক্ষর পরিচয় নামমাত্র। ফলে এই অঞ্চলের লোকদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার অত্যন্ত অভাব।

এককালে গ্রামের শতকরা দশটি পরিবার একান্নবর্তী ছিল। কিন্তু সে সব পরিবার ক্রমশ: ভেঙে যাচ্ছে। শতকরা ৭০ জন লোক হয় পরিবার পরিকল্পনার নাম শোনেনি আর নয় তো শুনলেও সে সম্বন্ধে আগ্রহী নয়। বরং ক্ষেত খামারের কাজে সাহায্যের জন্যে সন্তান সংখ্যা বাড়ানোর দিকেই তাদের ঝোঁক। এমন কি কিছু লোক তো পরিবার পরিকল্পনার নাম শুনলে তেড়ে আসে। গত ১০ বছর জন্মের হার একই রকম আছে ১ : ০ : ৪০৮১।

আয়ের প্রধান অবলম্বন যদিও কৃষি, তবু শতকরা ৯০ জন লোকের আয়ের অন্য সূত্র আছে যার মধ্যে প্রধান হ'ল মাছ ধরা কিম্বা অন্যের কাজ করা। আকবরপুরে মুসলমান জেলেদের প্রাধান্য বেশী। এরা মাইমাল নামে পরিচিত। এখানে জীবন ধারণের মান খুব নীচু। মাথাপিছু আয়ের বার্ষিক হারে ভয়ানক বৈষম্য, সর্বনিম্ন মাত্রা যেখানে ৪০ টাকা সর্বোচ্চমাত্রা সেখানে ১৫০০ টাকা। অধিকাংশ লোক থাকে কাঁচা বাড়ীতে। সারা গ্রামে রেডিওর সংখ্যা মাত্র দু'টি। সাধারণভাবে দেখতে গেলে গ্রামের লোকজনের স্বাস্থ্য খুব খারাপ নয়, যদিও পুষ্টির অভাবজনিত অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়।

সারা দেশের সঙ্গে এই গ্রামটির যেন কোনোও সম্পর্ক নেই। এই গ্রামের মানুষগুলি পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার ঘোরতর বিরোধী। তারা এই প্রকল্পের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দিহান। শুধু এই নয়, আজ যেখানে সারা দেশে কৃষির ক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটাবার এত রকম চেষ্টা চলেছে, সেখানে আকবরপুরের মানুষগুলো রাসায়নিক সারের মর্ম বোঝে না, বুঝতেও চায় না। রাসায়নিক সার সম্বন্ধে তাদের অদ্ভুত কতকগুলো ধারণা আর ভয় আছে। যেমন তারা মনে করে এই সার ব্যবহার করলে জমির গুণ নষ্ট হয়ে যাবে, ফসলেরও ক্ষতি হবে।

পল্লী সমবায় সমিতিগুলোকে তারা সন্দেহের চোখে দেখে। তাদের মতে এই সমিতিগুলো শুধু বড় জমির কৃষকদের উপকারে লাগে, নিম্নবিত্ত কৃষকরা কোনোও সুবিধা পায় না। শতকরা ৮৩টি পরিবার ঋণগ্রস্ত অথচ সমবায়ের ক্ষেত্রে কোনোও কাজ হয়নি। পারিপার্শ্বিক ও প্রগতি সম্বন্ধে এদের উপেক্ষার মনোভাব তাদের অর্থনৈতিক জীবনে যেমন প্রতিফলিত তেমনই কৃষি ও শিক্ষার ক্ষেত্রেও তার প্রভাব সুস্পষ্ট। এদের এই মনোভাব বদলাবার জন্যে বেশ ভালো প্রচার দরকার।

তবে একটা সুখের বিষয় হ'ল এই যে, সাধারণ আর ৫টা গ্রামের মত আকবরপুরে মামলা মোকদ্দমা প্রায় নেই বললেই চলে। পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই গ্রামটিকে সক্রিয় ক'রে তোলার প্রচুর অবকাশ আছে।

বালিতে ধানের চাষ

বালিতেও যে ধানের চাষ হ'তে পারে কৃষিবিজ্ঞানীরা তা' প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন। উক্রেইনের একটা জেলাতে ৫০,০০০ হেক্টর জমিতে এই পরীক্ষা চালানো হয়েছে। সেখানে প্রতি হেক্টরে ৫০ মেট্রিক সেন্টনার চাল উৎপন্ন হয়েছে।

বালিতে ধানের চাষ করার জন্যে প্রথমে জমি তৈরি করতে হয়। জমি তৈরি করার জন্যে প্রথমে বালির ওপরের স্তর সরিয়ে ফেলা হয়। তারপর রান্নায় ব্যবহার্য সাধারণ নুন মিশিয়ে দিয়ে ওপরে আবার বালি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর জলসেচ দিলে জলটা বালির তলায় জমতে থাকে এবং ভিজে কাদার মত হয়ে যায়। সেই স্তরটার জল চুঁইয়ে তলায় চলে যেতে পারে না এবং বালির নীচে ঐ নকল জলাভূমি ওপরের বালিকে সরস রাখে। এই অবস্থায় ধান রোয়া হয়।

পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, এই পদ্ধতিতেও বেশ ভালোরকম ফসল তোলা যায়।

'ধনধান্যে' পাঠরত
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী
শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পরিকল্পনাগুলির মধ্যে সমন্বয় অত্যন্ত প্রয়োজন

পরিকল্পনা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্ক কি রকম হবে তা নিয়ে সম্প্রতি যে বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছে, সেই সম্বন্ধে এখানে শ্রী এস. পি. মেহরা এবং ভি. এ. বাসুদেবরাজু এই দুই জন লেখকের মতামত প্রকাশিত হ'ল।

এপ্রিল মাসে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হন, এবং সংখ্যাধিক ভোটে চতুর্থ পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়। এটা একটা নতুন ব্যাপার এবং দেশে যে একটা নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে তার প্রতিফলন এতে দেখতে পাওয়া যায়।

১৯৬৭ সালের নির্ব্বাচনেই রাজ্যগুলির জন্য আরও বেশী ক্ষমতার দাবি তোলা হয়। এই দাবি যে পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হবে তা মনে হয়েছিলো। সম্প্রতি মোট বিনিয়োগের শতকরা ৪৫ ভাগ রাজ্যগুলিকে দেওয়ার জন্য এবং সম্পদের বরাদ্দও বাড়ানোর জন্য দাবি করা হচ্ছিলো। রাজ্যগুলির যুক্তি ছিলো যে ঘাটতি বাজেট ক'রে এই উদ্দেশ্যে আরও ৫০০ কোটি টাকা—তোলা যায়। ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থাদিও বদলানো প্রয়োজন বলে রাজ্যগুলি দাবি জানায়।

পরিকল্পনা কমিশন অবশ্য রাজ্যগুলির ভূমিকা স্বীকার করে। জনপ্রতি আয় অনুসারে যে কর আদায় হবে সেই অনুপাতে রাজ্যগুলিকে যে শতকরা ১০ ভাগ সাহায্য দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে তাতেই স্বীকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। বিস্তারিত-ভাবে সমন্বয় করে জেলা পর্য্যায়ে পরিকল্পনা তৈরী করার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃত হয়েছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় যদি রাজ্যগুলি আরও ভালো ফল দেখাতে পারতো তাহলে তাঁরা আরও বেশী অংশ পাওয়ার আশা করতে পারতো। অপরপক্ষে কর প্রচেষ্টা সম্পর্কে ইতস্তত: মনোভাব এবং বরাদ্দের বেশী টাকা ব্যয় করার ফলে, কেন্দ্রের ওপর রাজ্যগুলির নির্ভরতা ক্রমশ: বেড়েই চলে এবং অর্থসাহায্যটা পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রায় একটা সর্ত হয়ে দাঁড়ায়। পর পর কয়েকটি অর্থ কমিশন রাজ্যগুলিকে আরও বেশী অর্থ বরাদ্দ করেন।

এই অবস্থাটা এখনও চলছে। অনেক রাজ্যের বাজেটেই ঘাটতিটা কি ক'রে পূরণ করা হবে তার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ করার জন্য কৃষি আয় এবং সহরাঞ্চলের সম্পত্তির মূল্যের ওপর কর নির্দ্ধারণ করার যে প্রস্তাব পরিকল্পনায় করা হয়েছে, তা রাজ্যগুলির কাছে বিশেষ রুচিকর হবে বলে মনে হয়না। অনেক রাজ্য ইতিমধ্যে ভূমি রাজস্ব ছেড়ে দিচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ হ'ল কোন রকম গণ্ডগোলের সৃষ্টি হতে পারে এই রকম কোন সিদ্ধান্ত তারা এড়িয়ে যেতে চান। রাজ্যগুলি নিজেরা অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ না ক'রে সেটা তারা কেন্দ্রের কাছে চান, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যখন কর বসিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে চান তখন রাজ্যের তার সমালোচনা করতে ইতস্ততঃ করেন না।

৩০০ কোটি টাকার যে অতিরিক্ত ঘাটতি বাজেটের কথা উল্লেখ করা হ'ল (পরিকল্পনায় যে ৮৫০ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট তৈরী করার কথা বলা হয়েছে তা ছাড়াও) সেটারও যে খুব যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি আছে তা মনে হয়না। দেশের আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতেই ঘাটতি বাজেট করা যায়। ঘাটতি বাজেটের সঙ্গে সঙ্গে যদি সরবরাহের ক্রমোন্নতি না হয় তাহলে মূল্যের স্থিরতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। এই বিপদের জন্যই কমিশন সরকারি বিনিয়োগে ঘাটতির অংশ তৃতীয় পরিকল্পনায় শতকরা ১৩.২ ভাগ থেকে হ্রাস করে বর্ত্তমানে শতকরা ৫ ৯ ভাগে এনেছেন।

রাজ্যগুলির বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং ঋণ পরিশোধ ব্যবস্থার পুনর্গঠনের প্রশ্ন পঞ্চম আর্থিক কমিশনের সুপারিশ না পাওয়া পর্য্যন্ত স্থির করা যাবেনা। এই কমিশনের সুপারিশ বর্ত্তমান পরিকল্পনাকালের মধ্যেই প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এ ছাড়াও রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে।

বড় একটা কেন্দ্রীয় তরফের উদ্দেশ্যও বুঝতে হবে। কেন্দ্রের বেশীর ভাগ অর্থ দুটি তরফে ব্যয় করা হয়। তা হ'ল সংগঠিত শিল্প এবং পরিবহন ও যোগাযোগ। শিল্পের ক্ষেত্রে, ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারীং, পেট্রো রসায়ন এবং খনিজ শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান প্রকল্পগুলির কাজ সম্পূর্ণ করা বা চালিয়ে যাওয়ার ওপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরিবহণ ও যোগাযোগ অন্যান্য শিল্প গড়ে তুলতে সাহায্য করে। কাজেই কেন্দ্রীয় তরফের কাজের ধারাই এমন যে তা অন্যান্য ক্ষেত্রের উৎপাদনেও সাহায্য করে।

প্রধানমন্ত্রী এই প্রশ্নটিকে উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ করেছেন। কেন্দ্রীয় বনাম রাজ্য পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করা অনুচিত। আসল প্রশ্ন হ'ল বিনিয়োগের হার বাড়াতে হবে আর্থিক অবস্থা ভালো করতে হবে। রাজ্য বা কেন্দ্রীয় যে পরিকল্পনার মাধ্যমেই হোক সাধারণ ভারত-বাসী, তাঁদের অবস্থার উন্নতি চান এবং তা হলেই তাঁরা সন্তুষ্ট। কাজেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পরিকল্পনাগুলির মধ্যে যদি সামঞ্জস্য থাকে তাহলেই তাঁরা সবচাইতে বেশী উপকৃত হবেন।

রাজ্যগুলিতে, নিম্নস্তরের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকল্পনা তৈরী করা হয়নি

দেশের লোকসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ কার্য্যকরীভাবে সংহত করে দ্রুতগতিতে উন্নতি সাধন করা এবং জনগণের ক্রমবর্ধমান সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মেটানোই হ'ল অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য। অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সফল করে তোলার ক্ষেত্রে জনগণের ভূমিকাই যে প্রধান তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁরা কত তাড়াতাড়ি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা-গুলির লক্ষ্য পূরণ করতে পারেন তার ওপরেই যে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূর করার উপায় নিহিত রয়েছে, জনসাধারণের তা শুধু বুঝলেই হবেনা তা অনুভবও করা চাই।

পরিকল্পনাগুলি তৈরী করা ও সেগুলিকে কার্য্যকরী করা এই উভয় ক্ষেত্রেই যদি জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করেন তাহলে তাতে বোঝা যায় যে, পরিকল্পনাগুলি সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরী করা হয়েছে এবং সেগুলি নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ করা হবে। সেইজন্যই গান্ধীজী নিম্ন স্তর থেকে পরিকল্পনা করার ওপরেই গুরুত্ব দিতেন। আমাদের মত দেশে নিম্ন স্তর থেকে পরিকল্পনার অর্থই হ'ল গ্রাম পর্য্যায়ের পরিকল্পনা।

জনসাধারণের কল্যাণের জন্য রাজ্য সরকারসমূহ যে সব প্রকল্প তৈরী করেন, চতুর্থ পরিকল্পনা হ'ল মূলতঃ সেগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধনকারী একটি দলিলপত্র। বর্তমান পরিকল্পনা গঠনে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বের তিনটি পরিকল্পনার ক্ষেত্রেই প্রথমে পরিকল্পনার খসড়া তৈরী ক'রে রাজ্যগুলিকে দেওয়া হতো এবং খসড়ার সামঞ্জস্য রেখে রাজ্য পরিকল্পনাগুলির বিস্তারিত কর্ম্মসূচী তৈরী করা হতো। চতুর্থ পরিকল্পনায় যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তা মূলতঃ একেবারে ভিন্ন। নিম্নস্তর থেকে পরিকল্পনা তৈরী করার নীতি অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার ও পরিকল্পনা কমিশন রাজ্য-গুলিকে তাদের পরিকল্পনা প্রথমে তৈরী করতে বলেন। পরিকল্পনা কমিশন এবং মুখ্যমন্ত্রীগণ তারপর রাজ্য পরিকল্পনা-গুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্ত্তনের পর রাজ্য পরিকল্পনাগুলি তারপর জাতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কাজেই জাতীয় পরিকল্পনা হ'ল, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণের তৈরী—পরিকল্পনাসমূহের সংহত রূপ।

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে চতুর্থ পরিকল্পনার প্রস্তুতি অনুমোদন করেন। পরিকল্পনা কমিশনের মুখপত্র "যোজনার" মাধ্যমে চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া সম্পর্কে মন্তব্য ইত্যাদি প্রকাশিত ক'রে, পরিকল্পনা কমিশন, ভারতের নাগরিকগণের জন্যও একটা আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করেন। এই রকম ভাবেই চতুর্থ পরিকল্পনাটির কার্য্যসূচী তৈরী করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারসমূহ এবং জনসাধারণকে সংযুক্ত করা হয়।

রাজ্য পরিকল্পনাসমূহ

তবে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে এবং লোকসভায় যে সব আলোচনা হয়, তাতে চতুর্থ পরিকল্পনা তৈরীতে কেন্দ্র ও পরিকল্পনা কমিশন এই যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করলেন তা বিশেষ কোন প্রশংসা পেলোনা। বরং কেন্দ্র ও পরিকল্পনা কমিশন যে কাজ করেছেন তাতে ত্রুটি দেখানোতেই, মুখ্যমন্ত্রী-গণ ও সংসদ সদস্যগণ এই আলোচনার সুযোগ গ্রহণ করলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় হ'ল, রাজ্যগুলি তাদের পরিকল্পনা তৈরী করার সময় যে দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতি গ্রহণ করেন সে সম্পর্কে কেউই, এমন কি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণও কোন রকম মন্তব্য করেন নি।

রাজ্যগুলি, তাদের পরিকল্পনা তৈরী করার জন্য মোটা-মুটি পুরো এক বছর সময় পেয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্যগুলিও "নিম্ন থেকে পরিকল্পনা" তৈরী করার নীতি পালন করেননি। রাজ্য সরকারগুলি থেকে নিম্ন পর্য্যায়ে জনগণের প্রতিনিধি স্বরূপ যে সব প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন আছে, সেগুলিকে পরিকল্পনা তৈরীর কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হয়নি। পরিকল্পনা তৈরী করার কাজে গ্রাম পঞ্চায়েৎ, পঞ্চায়েৎ সমিতি, জেলা পরিষদ, বিদ্বান ব্যক্তিগণ, রাজনৈতিক দলসমূহ এবং জনসেবাকারী ব্যক্তিগণকে সংশ্লিষ্ট করার গুরুত্ব রাজ্যগুলি বুঝতে পারেনি বলে মনে হয়। রাজ্য পরিকল্পনাগুলি নিয়ে প্রকাশ্য আলো-চনারও ব্যবস্থা করা হয়নি। রাজ্য সরকারগুলির পক্ষে এটা একটা বড় ভুল। পরিকল্পনা তৈরী করার কাজে জনসাধা-রণের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের বিভিন্ন রের ব্যক্তিগণ যোগ দেননি বলে, রাজ্যগুলির বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন ও আকাঙ্খা কতখানি পূর্ণ হবে তা জানা যায়না।

অন্য দেশের খবর

সিরিয়ায় ভূমি পুনরুদ্ধার

সিরিয়া, ওরোনটাস নদীর তীরবর্তী 'ঘাব' উপত্যকাটিকে উর্বরা ও শস্যশ্যামলা করার একটি পরিকল্পনায় হাত দিয়েছে। ১,৮০,০০০ একরের এই উপত্যকাকে পুনরুজ্জীবিত করার কাজে সহযোগিতা করছে আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ; রাষ্ট্র-সঙ্ঘের উন্নয়ন কার্যসূচীর কর্মীরাও সহায়তা করছেন।

আনসারিয়েহ্ ও জাউইয়েহ্—এই দু'টি সমান্তরাল পর্বত-শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে ঘাব উপত্যকা. সিরিয়ার প্রধান শহরগুলির অন্যতম আলেপ্পো শহরের দক্ষিণে।

১৯৪৯ সালের কথা। ভূমি বিশেষজ্ঞরা হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে, ঘাব উপত্যকায় যে হ্রদটি রয়েছে সেটি আসলে হ্রদ নয়। তাঁরা দেখলেন যে, উপত্যকার উত্তর প্রান্তে মাটি ও পাহা-ড়ের যে প্রাচীর হ্রদের জলধারাকে একদিক থেকে বেঁধে রেখেছে তা' একটা বিরাট ধ্বসের ফলে সৃষ্টি হয়েছে।

১৯৫৬ সালে একটি ওলন্দাজ কোম্পানী বিস্ফোরক দিয়ে ঐ প্রাচীরটা উড়িয়ে দিলে ওরোনটাস নদীর জল আবার প্রবাহিত হল।

তারপর ওরোনটাসের প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে মাহারদেহ ও আশারনেহ-তে দুটি বাঁধ তৈরি করা হল। হ্রদটি শুকিয়ে যাবার পর দেখা গেল, সেখানকার জমি চাষের উপযোগী এবং উর্ব্বরা।

১৯৬৩ সালে আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বিশেষজ্ঞদের একটি দল এই জমির প্রাণশক্তি বৃদ্ধির কাজে এগিয়ে এলেন। চার বছর কেটে গেল। ধীরে ধীরে তুলো, ভুট্টা ও বার্লির ক্ষেতে ভরে গেল এলাকাটা। কোনোও কোনোও জমি গম চাষের উপযুক্ত বলেও গণ্য করা হ'ল। ধীরে ধীরে এধারে ওধারে ছোট ছোট বসতি মাথা তুললো।

নতুন নতুন পদ্ধতি পরীক্ষা

উপত্যকার উত্তর পশ্চিম অংশে ২৫০ হেক্টার জমি বেছে নেওয়া হ'ল পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্যে। এই জমিতে সমবায় ভিত্তিতে একটা খামার স্থাপনের ব্যবস্থা করা হ'ল। পালা করে শস্য চাষের পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে সমবায় ভিত্তিতে কৃষিযন্ত্র ও অন্যান্য যান্ত্রিক সরঞ্জাম প্রবর্তন করার এবং সমবায় রীতিতে জলসেচের সুবিধা অসুবিধা নিরূপণ করা হ'ল। তারপর জলসেচের জন্যে খাল ও নালা তৈরি করা হয়।

উন্নয়ন বার্তা

★ রাজস্থানের রাণাপ্রতাপ সাগর বাঁধের চতুর্থ বা শেষ জেনারেটরটি চালু করা হয়েছে। এর ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মোট ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ১৭২ মেগাওয়াট।

★ দক্ষিণ কোরিয়ার জন্যে ভিলাই ইস্পাত কারখানায় যে রেল তৈরি হয়েছে তার ৭,৫০০ টনের প্রথম কিস্তি বিশাখাপত্নম বন্দর থেকে জাহাজে করে চালান দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া হিন্দুস্থান ইস্পাত লিমিটেডকে ৪.৫ কোটি টাকার রেল তৈরির বরাত দিয়েছে।

★ পশ্চিমবাংলায়, কোচবিহার জেলার ২২টি গ্রামে অক্ষর পরিচয়হীন বলতে এখন কেউই প্রায় নেই। প্রত্যেকটি গ্রামে ১০-১৫টি অক্ষর পরিচয় কেন্দ্র খুলে গত ছ'মাসের মধ্যে নিরক্ষরতা নির্মূল করা হয়েছে।

★ ভারত হেভি ইলেক্ট্রিক্যালস্-এর তিরুচিরপল্লীর কারখানা চার লক্ষ টাকার ভালভ রপ্তানী করার জন্যে পোল্যাণ্ডের কাছ থেকে বরাত পেয়েছে। পোল্যাণ্ড কৃত্রিম সার, রাসায়নিক জিনিস ও অন্যান্য শিল্পে ব্যবহারের জন্যে এই সব ভালভ আমদানী করছে।

★ ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এমন একটা নতুন জাতের ভুট্টা উদ্ভাবন করেছে যার প্রোটীন অংশ দুধের প্রোটীন অংশের চেয়েও বেশী।

★ দুর্গাপুর মিশ্র ইস্পাত কারখানা, পারমাণবিক শক্তি পরিকল্পনাগুলির জন্যে, একটি বিশেষ ধরনের ক্রোমিয়ামযুক্ত ইস্পাত তৈরি করতে সুরু করেছে। এ পর্যন্ত এ জিনিস প্রধানত: ক্যানাডা থেকে আমদানী করা হত। এই কারখানা রাজস্থান পারমাণবিক শক্তি পরিকল্পনার জন্যে ইতিমধ্যে এই নতুন ইস্পাত ৭ টন পাঠিয়েছে।

★ আমাদের দেশে, তৈলক্ষেত্রগুলি থেকে পাইপ লাইনের মধ্যে দিয়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের চালান সুরু হচ্ছে। এর প্রথম গ্রাহক হ'ল বরোদা শহর। আঙ্কলেশ্বর তৈলক্ষেত্র থেকে এই গ্যাস পাঠানো হবে। গ্যাসের জন্যে পাইপ লাইন বসাবার কাজ সুরু হবে আসছে মাসে।

★ বরোদার কাছে গুজরাট রাষ্ট্রীয় সার কারখানা সম্প্রসারিত করে দুটি নতুন জিনিস তৈরির প্রস্তুতি পর্বে হাত দেওয়া হয়েছে। ইউরিয়া ও এ্যামোনিয়া তৈরির কাজ সুরু হয়েছে। ইউরিয়া কারখানায় দৈনিক ৮শো টন ইউরিয়া উৎপন্ন হবার কথা। চালু হয়ে গেলে এটি হবে বিশ্বের বৃহত্তম।

★ ১৯৬৮-৬৯ সালে চন্দন তেল রপ্তানী করে মহীশূর চন্দন তেলের কারখানা ১.৭০ কোটি টাকার সমান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে।

★ উত্তর বোম্বাই এর 'আরে' দুগ্ধ কেন্দ্রে গবাদির খাদ্য উৎপাদনের জন্যে একটি আধুনিক কারখানা চালু করা হয়েছে। ২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি এই কারখানার দৈনিক উৎপাদনের পরিমাণ হবে প্রায় ১০০ টন।

★ আসামের দেরগাঁওতে তৈরি প্রথম ডিসটিলারীতে কাজ সুরু হয়ে গেছে। সমবায় ক্ষেত্রে ১২ লক্ষ টাকার ওপর ব্যয় করে এই ডিসটিলারী স্থাপন করা হয়েছে। পুরোপুরি চালু হয়ে গেলে এই কারখানায় শিল্পে ব্যবহার্য এলকোহল্ প্রতিদিন ২ হাজার গ্যালন হিসেবে তৈরি হতে থাকবে।

★ এ বছরের প্রথম চার মাসে সোভিয়েট ইউনিয়নে কাজু বাদামের রপ্তানীর ঊর্ধগতি বজায় ছিল। গত বছরের এই ক'মাসের তুলনায় এ বছরের পরিমাণ ছিল প্রায় দ্বিগুণ। এ বছরের জানুয়ারী মাস থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারত থেকে ১০ হাজার টনের ওপর কাজু আমদানী করেছে।

★ দিল্লীর কাছে মোহন নগরে ভারতের প্রথম চলচ্চিত্র বা ছায়াচিত্র নগরীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। ২৫০ একর জমির ওপর এই নগরী স্থাপন করা হবে। দেশের ও বিদেশের চিত্র প্রযোজক গোষ্ঠীরা আউটডোর শুটিং ও স্টুডিও সুটিং-এর ব্যবস্থার সঙ্গে ছায়াচিত্র প্রোসেসিং-এর সুযোগ সুবিধা পাবেন। এই চিত্রনগরী স্থাপনের কাজ শেষ হবে ১৯৭১ সালে।

★ দেরাদুনের আরণ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা দেশীয় উপকরণ দিয়ে ব্রেল কাগজ তৈরির একটা প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছেন। এই আবিষ্কারের ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ঘটবে।

★ জাতীয় বীজ কর্পোরেশন বীজ রপ্তানী করতে সুরু করেছে। কর্পোরেশন এ পর্যন্ত সিংহল, মালয়েশিয়া ও ঘানায় ভুট্টা, জোয়ার ও শাক সব্জীর বীজ কিছু কিছু রপ্তানী করেছে।

★ ভারত ১৯৬৮-৬৯ সালে লৌহ আকর রপ্তানী ক'রে ৮৩ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। ১৯৬৭-৬৮ সালের রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৭১ কোটি টাকা।

★ ১৯৬৮-৬৯ সালে ভারতের রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

★ হায়দ্রাবাদের বেগমপেট বিমান বন্দরে ভারতে তৈরি প্রথম রেডার যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছে। এই যন্ত্রটির সাহায্যে আবহাওয়ার খবরাখবর জানা যাবে। মাঝারি শক্তির এই রেডার যন্ত্রটি ভারত ইলেক্ট্রোনিক্সে তৈরি করা হয়েছে। এঁরা নতুন দিল্লীর পালাম বিমান বন্দরের জন্য আর একটি রেডার যন্ত্র তৈরি করছেন। এই রেডারটি বসানো হলে প্রধান প্রধান ১০টি বিমানবন্দরে ঝড়ের পূর্বাভাষ জানানোর জন্য ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগের হাতে ১০টি রেডার যন্ত্র থাকবে।

★ তরল প্যারাফীন তৈরীর একটি নতুন যন্ত্র বোম্বাই-এ চালু করা হয়েছে। এতে উৎপাদন শুরু হ'লে ২৫ লক্ষ টাকার সমান বিদেশী মুদ্রার আশ্রয় হ'বে।

REGD. NO. D-233

প্রেরণার বাণী

আমরা নিজেদের খৃষ্টান, হিন্দু বা মুসলমান বলে ঘোষণা করতে পারি বটে কিন্তু এই বাইরের পরিচয়ের অন্তরালে আমরা যে এক ও অভিন্ন এ বিষয়ে সংশয় নেই। আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যে জীবনের বহু ক্ষেত্রে মুসলমান, খৃষ্টান ও হিন্দুর মধ্যে অমিলের চাইতে মিলই বেশী।

এখনই আমাদের এক ও অভিন্ন কোনোও ধর্মের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন পরস্পরের ধর্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা। আমরা এমন একটা লক্ষ্য স্থির করতে চাই না যেখানে সকলেই এক হয়ে যাবে। আমরা চাই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য।

যাদের জন্ম এ দেশে, যারা বড় হয়ে উঠেছে এই দেশে, যাদের অন্য দেশ নেই —ভারত তাদেরই। অতএব ভারত শুধু হিন্দুদেরই নয়—ভারত, পার্সী, ভারতীয় খৃষ্টান, মুসলীম ও অন্যান্য সকলের।

মানুষ ও তার কর্ম দুটি সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। অতএব শুভ কাজের প্রশস্তি ও অন্যায় কাজের নিন্দা করা প্রয়োজন।

'পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে নয়'—এই নীতিবাক্য উপলব্ধি করা যত সহজ সেই অনুযায়ী এই নীতি আচরণে প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন; তাই বিদ্বেষের বিষ আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

বয়স ও পারিবারিক পরিবেশ যাই হ'ক না কেন—প্রত্যেককেই নৈতিক শিক্ষা দেওয়া উচিত।

সত্যের পূজারী তাঁর কর্মক্ষেত্রে চিরাচরিত রীতি নীতি সবদা অনুসরণ নাও করতে পারেন। তাই আত্মসংস্কারের জন্যে তাঁকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। কখনও কোনো ভুল করলে তা স্বীকার করে নিজেকে তাঁর সংশোধন করতে হবে।

প্রেম দাবী করে না, প্রেম দিয়েই সুখী। প্রেম চিরকাল দুঃখকে বরণ করে নেয় কখনও বিদ্বেষ পোষণ করে না কিংবা প্রতিশোধ নিতেও উদ্যত হয় না।

ক্রোধ এক ধরনের উন্মত্ততা। বহু মহৎ কাজের স্রষ্টা এই সাময়িক মত্ততার বশবর্তী হয়ে শুভকাজের সমস্ত সুফল ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

আলো আলোর বাণী বয়ে আনে, অন্ধকারের নয়। যে কোনো শুভ উদ্দেশ্য প্রণোদিত মহৎ কাজ পুরস্কৃত হবেই।

যাঁরা সমাজের দোষ ক্রটি সংস্কারের কাজে প্রবৃত্ত রয়েছেন, তাঁদের একটা নির্দিষ্ট কর্মধারা অনুসরণ করে চলতে হবে এবং আশু সাফল্য যদি লাভ নাও করেন তাহলেও তাঁদের হতাশ হওয়া সঙ্গত নয়।

ঈশ্বরের কাছে সকল নরনারী সমান। কেউ অন্য ধর্মে বিশ্বাসী হলেই তাকে ঘৃণা করা পাপ। এই ঘৃণার মনোভাবই হ'ল অস্পৃশ্যতা।

কৃষ্টি বা সংস্কৃতির ইতিহাস সন্ধান করতে গিয়ে আমার এই উপলব্ধি হয়েছে যে, সনাতন হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে যা কিছু শাশ্বত তার প্রত্যেকটি যীশু, বুদ্ধ, মোহাম্মদ ও জোরাথুস্ট্রের বাণীতে নিহিত আছে।

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, এমন দিন একদিন আসবে যেদিন বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী মানুষরা স্বধর্মের মত একে অন্যের ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হবে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান শ্রেয়। আমরা ঈশ্বরের সন্তান অতএব আমাদের মধ্যে ভেদাভেদ নেই, আমরা সমান, আমরা এক।

মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টির জন্যে ধর্ম নয়। তার উদ্দেশ্য হ'ল ঐক্যের প্রতিষ্ঠা।

প্রাচীনকালে যে ঋষিরা হিংসার মধ্যেও অহিংসার আদর্শ আবিষ্কার করেছিলেন তাঁরা নিউটনের চেয়েও মহৎ প্রতিভার অধিকারী এবং ওয়েলিংটনের চেয়েও বড় যোদ্ধা ছিলেন।

অন্যের প্রতি আচরণে যে ব্যক্তি অহিংসার আদর্শ অনুসরণ না করে মনে করেন আরও বড় কোনোও ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করবেন তিনি ভীষণ ভুল করবেন। অন্যের প্রতি সদ্ব্যবহারের মত অহিংসাও পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রথম প্রযোজ্য।

যে ব্যক্তির জীবন সত্য ও অহিংসার ওপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর কাছে পরাজয় বা নৈরাশ্য শব্দগুলি অর্থহীন।

সত্যকার প্রেম সমুদ্রের মত অনন্ত, উত্তাল, উদ্বেল। তা সমুদ্রের মত নিজেকে ছড়িয়ে দেয়, দেশ জাতি ধর্মের সমস্ত প্রাচীর ছাপিয়ে সারা বিশ্বকে আলিঙ্গন করে।

যে জাতি অসীম ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত সেই জাতি পরম শ্রেষ্ঠত্বে উপনীত হতে পারে। ত্যাগ যত পবিত্র, ততই দ্রুত তার উর্ধ্বগতি।

অন্যের চেয়ে নিজেকে ছোট বা বড় মনে করলে সাম্যের মনোভাব আসতে পারে না। যেখানে সকলে সমান সেখানে একের অন্যের প্রতি আনুকূল্য বা দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের প্রশ্ন ওঠে না।

ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সোসাইটি লিঃ—করোলবাগ, দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত এবং ডাইরেক্টার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত।

ধন ধান্যে

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত
পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

প্রথম বর্ষ . তৃতীয় সংখ্যা
৬ই জুলাই ১৯৬৯ : ১৫ই আষাঢ় ১৮৯১
Vol 1 : No 3 : July 6, 1969

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০

টেলিগ্রাফের ঠিকানা—যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

ভুলি নাই

পরিকল্পনাকে, অন্য কথায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা সংগ্রাম বলা যেতে পারে-আর তা স্বাধীনতা সংগ্রামের চাইতেও অনেক বেশী কঠোর। এই সংগ্রামে, সমগ্র জাতির যোগ দেওয়া উচিত।

—শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়

ক্ষমতার সমস্যা

ভারতীয় গণতন্ত্রকে যে কেবলমাত্র একটা প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পর্যবসিত করতে চাওয়া হচ্ছে তা কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সম্পর্ক সম্বন্ধে উচ্চ মহলে যে সব যুক্তি দেওয়া হয় তাতে প্রতিফলিত হচ্ছে। বর্তমানের যে যুক্তির দ্বারা ইতিমধ্যেই পরিকল্পনাসহ প্রতিটি জাতীয় সমস্যাকে দক্ষতা ও সংবিধানগত প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলা হচ্ছে সেই যুক্তিকে প্রশাসন সংস্কার কমিশন স্পষ্টতঃ উপেক্ষা করতে পারেন নি।

গণতন্ত্রকে কেবল দক্ষতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না এবং তা প্রায়ই সংবিধানের সীমাও অতিক্রম করে। কাজেই যা সম্পূর্ণ দক্ষ নয় এমন কি সংবিধান সম্মতও হয়তো নয়, গণতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গীতে তা গ্রহণীয় হতে পারে।

গান্ধীজীর জন্মশতবার্ষিকীতে এটা স্মরণ করা বিশেষ করে সঙ্গত হবে। প্রতিনিধিমূলক সরকার গণতান্ত্রিক মনোভাব প্রকাশ করার একটা সুবিধেজনক উপায় মাত্র নয় এবং তা গণতন্ত্রকেই অস্বীকার করার একটা উপায় বা হাতিয়ারও হতে পারে না। জনগণের ইচ্ছা এবং উচ্চাশার ডাকে আমরা কতখানি সাড়া দিতে পারি তাই হ'ল গণতন্ত্রে আমাদের আস্থা নিরূপণের শেষ উপায়।

গান্ধীজী হলেন গণবাদী যুক্তির প্রতিনিধি। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও ঐক্যের ক্ষেত্রে তাঁর অনন্য অবদান হ'ল, তিনি গণবাদী আদর্শকে সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনিক ধারণা থেকে জনগণের আকাঙ্খায় মুক্তি দিয়েছেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সম্পর্ক সম্বন্ধে বাদানুবাদের ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব, দক্ষতা, জাতীয় শক্তি, রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলসূত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে যে যুক্তি দেখানো হয় তাতে মনে হয়, যে প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভারতীয় ঐক্যের কথা ভাবা হয় সেইদিকে আবার ফিরে যাওয়ার একটা চেষ্টা করা হচ্ছে এবং জনগণের অনুমোদন ও অংশগ্রহণের ভূমিকাটি উপেক্ষা করার চেষ্টা চলেছে।

বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সম্পক নীতিগত ছকে বাঁধা নয় তবে, এগুলির কথা পরেও ভাবা যেতে পারে। আপাতত যা স্বীকার করে নিতে হবে তা হ'ল, যে সূত্রগুলি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূল নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় সেগুলি যুক্তি হিসেবে উচ্চাঙ্গের হতে পারে কিন্তু তাতে কাজ হবে না। অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধান যেমন শুধু আইন বিশেষজ্ঞগণের হাতেই ছেড়ে দেওয়া যায়নি তেমনি ভারতীয় ঐক্য ও সংহতির ভার কেবলমাত্র প্রশাসনের হাতে ফেলে রাখা যেতে পারে না। ব্যাপক অর্থে এটা হ'ল একটা রাজনৈতিক সমস্যা, প্রশাসন ব্যবস্থা সংস্কারের সমস্যা নয়।

এখন প্রশ্ন হ'ল : আমাদের কি ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পকে কোন জীবনদর্শন আছে ? আমাদের যদি তা থাকতো তাহলে আমরা পুলিশ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয় প্রশাসনের দায়িত্ব প্রভৃতির মতো অযৌক্তিক তর্কের ঘূর্ণিপাকে এই রকম শোচনীয়ভাবে জড়িয়ে পড়তাম না।

ভারতীয় ঐক্যকে যদি আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নে সীমিত করা না যায়, তাহলে একে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা সুবিধেজনক পদ্ধতি, বলেও স্বীকার করা যায় না। কেবলমাত্র সমৃদ্ধি বা শক্তিই একটা জাতিকে গঠন করতে পারে না। জাতীয়তাবাদের সব রকম অভিব্যক্তিতে, ভারতের জনসাধারণকে আরও গভীরভাবে সংযুক্ত করে ভারতীয় জাতীয়বাদকে তার যোগ্যআসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

গান্ধীজীর প্রদর্শিত পথেই কেবল ভারতীয় ঐক্য একটা দৃঢ়মূল ভিত্তি পেতে পারে, কারণ গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে জাতীয় আন্দোলনের বন্যা সব রকম প্রশাসনিক, আঞ্চলিক, ধর্মীয় ও ভাষাগত বাধা ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তাঁর পূর্বে ধর্মের বিপুল শক্তি অথবা সর্বাত্মক কর্তৃত্বও তা সম্ভব করে তুলতে পারেনি।

তাঁকে যদি ভারতীয় স্বাধীনতা ও ঐক্যের জনক বলে গণ্য করা হয় তা হলে সেই স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের মাধ্যমে কি করে আরও সজীব হয়ে উঠতে পারে এবং জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করলে সেই ঐক্য কি করে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে সেই সম্পর্কে তাঁর মতবাদকেও আমরা উপেক্ষা করতে পারি না।

তিনি বলেছেন যে, একনায়কত্বের পরিবর্তে ২০ জনের হাতে ক্ষমতা থাকলেই তা গণতন্ত্র হয় না। ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করাটা হ'ল দুর্বলচিত্তের উচ্চাকাঙ্খার প্রকাশ। ভারতীয় গণতন্ত্র সংবিধান থেকে শক্তি আহরণ করে না। জনসাধারণই হ'ল তার শক্তির উৎস এবং প্রশাসনকে জনগণের কাছাকাছি নিয়ে আসাই সর্বক্ষণের চেষ্টা হওয়া উচিত।

গান্ধীজীর গ্রাম পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে সাংবিধানিক কাঠামোর ওপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। এটা ছিল একটা আদর্শ মাত্র কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে ভারতের চিন্তাধারায় আদর্শ ও মতবাদ, সংঘাত সৃষ্টি করছে।

কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্কের সমস্যার মূল কথা হ'ল, জনগণের হাতে কতটুকু ক্ষমতা অর্পণ করা হবে ? এই দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক কোনদিনই শেষ হয় না। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর উক্তিই মেনে নিতে হবে—কোন ক্ষমতা নেই, কাজেই কোন রাষ্ট্র নেই।

যে কোন অবস্থাতেই হোক এটা হ'ল রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রশ্ন, প্রশাসনিক ভোজবাজির নয়।

পশ্চিমবঙ্গে কারিগরী জনবল এবং কারিগরী উচ্চশিক্ষাক্রম

ডঃ সুব্রতেশ ঘোষ—
(যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

যে কোনোও উন্নতিকামী দেশে কারিগরী উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনা ও তা কার্যকরী করার সূচী জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে স্থির করা উচিত। দেশের কারিগরী লোকবলের চাহিদা মেটাবার উপযোগী একটা কার্যসূচী নির্দিষ্ট করা বর্তমান বৈষয়িক অবস্থার বিচারে কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাসূচীর মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলায় কতটা কাজ হয়েছে তাই নিয়ে আমরা আজ আলোচনা করব।

রাজ্যপর্য্যায়ে বেকার সমস্যা

বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যাকে এক কথায় আমরা কারিগরীবিদ্যা বলে অভিহিত করছি, আলোচনার সুবিধার জন্যে। যাই হোক, প্রথমে দেখা যাক পশ্চিমবাংলায় কারিগরী লোকবলের সমস্যা কী রকম। এই রাজ্যের কর্ম নিয়োগ কেন্দ্রগুলিতে কারিগরী বিষয়ে স্নাতকোত্তর কর্ম প্রার্থীদের যে নাম পঞ্জী আছে তাতে উল্লিখিত পরিসংখ্যান হ'ল এই রকম :—

	স্নাতক মানযুক্ত প্রার্থী বিজ্ঞান বিষয়ে	কারিগরী বিষয়ে	স্নাতকোত্তর মানযুক্ত কর্মপ্রার্থী বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়গুলিতে
জুন, ১৯৬৬	৫,৩৫০	৬৪৮	২৩৭
জুন, ১৯৬৭	৪,৫৬৭	৭৯৫	২৭২
জুন, ১৯৬৮	৪,৩৬৪	১,১৪৬	৪১১

(সূত্র : জাতীয় কর্মনিয়োগ কৃত্যকের পশ্চিমবঙ্গস্থ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদনসমূহ)

এই পরিসংখ্যান দেখে এ কথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এ রাজ্যে কারিগরী স্নাতকদের মধ্যে বেকার সমস্যা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। বিজ্ঞান স্নাতকদের মধ্যে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বেশী না হ'লেও সমগ্রভাবে দেখলে কারিগরী বিদ্যায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কর্মপ্রার্থীদের বিপুল সংখ্যা সমস্যার তীব্রতর ইঙ্গিত দেয়। সাধারণত উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পর্যায়ে এই জাতীয় শিক্ষিত বিজ্ঞানবিদ ও যন্ত্রবিদদের অভাবটাই বড় হয়ে ওঠে। আমাদের দেশেও তিনটি পরিকল্পনা পর্যন্ত শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে সেই রকম অবস্থা ছিল। সেই কারণে দেশে বহু কারিগরী শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এবং প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনগুলিতে আসন সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল। এ অবস্থায় এ রকম সমস্যার উদ্ভব হওয়ার কারণ কী? সম্ভবতঃ আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষাসূচী, জনবল সংক্রান্ত কার্যসূচী এবং যন্ত্র ও বিজ্ঞানবিদ্ লোকবল নিয়োগের কর্মসূচীর মধ্যে কোনোও সমন্বয় স্থাপন করা হয়নি বলে কারিগরী বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বেকার সমস্যা তীব্র হয়ে উঠছে।

স্বল্পমেয়াদী কার্য্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা

এই সমস্যার নিরসনের জন্যে কারিগরী উচ্চশিক্ষা পরিকল্পনা ও লোকবল নিয়োগ পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে প্রণীত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে পরিকল্পনার গলদের জন্যেই হোক বা রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে মন্দার জন্যেই হোক, কারিগরী বিষয়ে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে বেকার সমস্যা সমাধানের সূত্রপাত হিসেবে একটি স্বল্প মেয়াদী কার্যক্রম থাকা উচিত। তবে এ বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া উচিত রাজ্যসরকারের। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরী শিক্ষায়তনগুলিও কিছু কিছু সহায়ক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন।

গত ৩০ বছরে সারা ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও গুণগতভাবে বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদিকা শক্তি সমগ্রভাবে ধরতে গেলে, প্রাক স্বাধীনতা যুগের তুলনায় বিশেষ বাড়েনি।

স্ট্যাখানোভাইট আন্দোলন

এই প্রসঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ায় স্ট্যাখানোভাইট আন্দোলনের সাফল্যের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক। ব্যয়বহুল শ্রমলাঘবকারী যন্ত্র না বসিয়ে, শ্রমিক ছাঁটাই না ক'রে, শুধু শ্রেষ্ঠতর শ্রম বিভাগ পদ্ধতি প্রবর্তন করে কী করে ঐ আন্দোলন সফল করা হয়েছে তা বিবেচনার যোগ্য। উন্নততর নক্সা ও উন্নততর 'লে-আউট' গ্রহণ করে কাঁচা মাল ও উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের অপচয় রোধ করে, উন্নততর উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবনে ও প্রবর্তনে শ্রমিক কর্মীদের উৎসাহ দিয়ে এবং তাঁদের যথাযথ শিক্ষণের ব্যবস্থার মাধ্যমে কী করে উৎপাদিকা শক্তি যথাসম্ভব বাড়ানো সম্ভব, স্ট্যাখানোভাইট আন্দোলনের সাফল্য এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকেই তা প্রমাণ করেছে। ভারতে ১৯৫২ ও ১৯৫৪ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা যে 'প্রোডাক্টিভিটি মিশন' পাঠায় সেই মিশন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে নানা সহজ পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগের উদাহরণ স্থাপন করে।

উৎপাদিকা শক্তি গবেষণা কোষ

রাজ্য সরকার যদি প্রত্যেকটি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিকাশক্তি বর্ধনের পক্ষে উপযোগী পন্থাগুলি অনুসন্ধান করেন এবং প্রতিষ্ঠানের স্তরে সেগুলির প্রয়োগ সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য একটি করে 'উৎপাদিকা শক্তি গবেষণা কোষ' স্থাপনের জন্য বেসরকারী মালিকদের অনুরোধ মারফৎ সম্মত করাতে এবং সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিতে পারেন, তবে অবিলম্বে এই কোষগুলিতে কিছু যন্ত্রবিদ্ ও বিজ্ঞানীদের কর্মসংস্থান হতে পারে, এবং সেই প্রতিষ্ঠানগুলি স্বল্প উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদিকা শক্তি বিকাশের বিভিন্ন পদ্ধতি নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের

পরিবেশ অনুযায়ী প্রয়োগ করে লাভবান হতে পারে। এই কোষগুলিতে কর্মরত যন্ত্রবিদ্ ও বৈজ্ঞানিকরা শুধু যে বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভাব্যতা বিচার করবেন এবং বাস্তবে প্রয়োগের ব্যবস্থা করবেন তাই নয়, তারা সেই সঙ্গে শ্রমিক কারিগরদের উৎপাদিকা শক্তি বাড়াবার জন্য কারখানার কাজের সময়ের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সময়ে এক এক দল শ্রমিককে পর্যায়ক্রমে উন্নততর উৎপাদন কৌশল সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেবেন। এ সব কাজের জন্য উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত যন্ত্রবিদ্ ও বিজ্ঞানী প্রয়োজন। রাজ্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি প্রত্যেকে যদি এই বিষয়ে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেন, তবে এ ধরণের উৎপাদিকা শক্তি গবেষণা ও শ্রমিক শিক্ষণের মধ্য দিয়ে, সর্ব শ্রেণীর কারিগরী স্নাতক এবং অন্ততঃ ফলিত রসায়ন ও ফলিত পদার্থ বিদ্যার স্নাতকদের পক্ষে নতুন এক কর্মক্ষেত্র তৈরি হবে।

বেকার কারিগরী স্নাতকদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বাস্তুকারদের কর্মসংস্থান সমস্যার তীব্রতা পশ্চিমবঙ্গে বেশী অনুভূত হচ্ছে। বেকার সমস্যার তীব্রতা উপশমে সরকারী নির্মাণকার্যের উপযোগিতা আজ ধনবিজ্ঞানে বহুল স্বীকৃত। রাজ্যের সামগ্রিক বেকার সমস্যার তীব্রতা হ্রাসের জন্য এবং উন্নয়নী কাজের অঙ্গ হিসেবে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের বা সেচ প্রকল্পের অধীনে যে সব নির্মাণমূলক কাজ হাতে নেওয়া হবে (যেমন পথ নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র বা বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ, সেচের জন্য খাল কাটা ও কূপ খনন ইত্যাদি) সেগুলি যদি বেসরকারী ঠিকাদারদের দিয়ে না করিয়ে, এই সব কাজের জন্য গ্রামাঞ্চলে একটি স্থায়ী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ 'নির্মাণবাহিনী' গঠন করা হয় তবে প্রয়োজন মত সেই 'নির্মাণ বাহিনী'র বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে নিকটবর্তী অঞ্চলগুলির সর্বত্র এই শিক্ষিত ও স্থায়ী নির্মাণ কর্মীদের পাঠানো যাবে। এ রকম একটি নির্মাণ বাহিনীর তত্ত্বাবধানের কাজে প্রচুর সংখ্যক স্নাতক বাস্তুকার ও বাস্তু বিদ্যা ডিপ্লোমাধারী তত্ত্বাবধায়কের কর্ম সংস্থান হবে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও কারিগরী ফ্যাকাল্টি এবং কারিগরী শিক্ষায়তনগুলিতে ছাত্রগ্রহণের যে ব্যবস্থা বর্তমানে প্রচলিত আছে, তার পরিবর্তে সমগ্র রাজ্যে এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলিতে পাঁচ বছর পরে (ডিপ্লোমা কোর্সের ক্ষেত্রে তদুপযুক্ত সময় সীমায়) যন্ত্রবিদ্ ও বিজ্ঞান স্নাতকদের সম্ভাব্য চাহিদার ভিত্তিতে (রাজ্যের লোকবল পরিকল্পনা মারফৎ এই সম্ভাব্য চাহিদা নিরূপণ করতে হবে) প্রত্যেক ফ্যাকাল্টিতে ও তার অন্তর্ভুক্ত বিভাগগুলিতে ছাত্র ভর্তির হার নিয়মিতভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। অর্থাৎ এই ব্যবস্থা অনুযায়ী রাজ্যের লোক বল পরিকল্পনা থেকে উপযুক্ত তথ্য আহরণ করে প্রত্যেকটি বিভাগের জন্য ছাত্র ভর্তির বার্ষিক সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে। এর ফলে কোন কোন কাজ বা কারিগরী পেশায় শিক্ষিত কর্মীর অভাবের পাশাপাশি যে রকম কারিগরী বেকার সমস্যা এখন দেখা যায়, তার পুনরাবৃত্তি রোধ করা যাবে। আমাদের দেশে প্রথম দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় লোকবল পরিকল্পনার নানা অসম্পূর্ণতা ছিল। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের লোকবল পরিকল্পনা বিভাগ এ বিষয়ে কিছু প্রয়াস অবশ্য করেছিলেন। কিন্তু ভারতের মত অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর দেশে উন্নয়নকালীন লোকবল পরিকল্পনা যে ধরণের বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ এবং তাত্ত্বিক উপকরণ প্রয়োগের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে, সে সম্বন্ধে উপযুক্ত কাজ যথেষ্ট পরিমাণে প্রথম দুটি পরিকল্পনাকালে হয় নি। তৃতীয় পরিকল্পনার সময় থেকেই এ সম্বন্ধে প্রায়োগিক গবেষণার কাজ সুরু হয়। ১৯৬২ সালে নয়া দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত ইনষ্টিটিউট অব অ্যাপ্লায়েড ম্যান পাওয়ার রিসার্চে—লোকবল পরিকল্পনার নানা দিক সম্বন্ধে গবেষণা চলছে। পরিকল্পনা কমিশনে এবং কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়েও এ সম্বন্ধে গবেষণার মাধ্যমে নানা তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে।

তবে ভারতে লোকবল পরিকল্পনার একটা প্রধান ত্রুটি হচ্ছে এই যে, এ ধরণের পরিকল্পনার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর লোকবলের চাহিদা নির্ধারণ এখন পর্যন্ত বিজ্ঞান সম্মত ভিত্তিতে করা হয় নি।

সারা ভারতের জন্য সম্ভাব্য লোকবল চাহিদা নির্ধারণ করা গেলেও এবং তার ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যের এবং অঞ্চলের লোকবল চাহিদা নির্ধারণ অসম্ভব না হলেও নিম্নস্তরে সংগৃহীত তথ্যাদির সংযোজনে প্রণীত আঞ্চলিক ও রাজ্যস্তরের লোকবল পরিকল্পনা যতটা বাস্তববাদী ও নিখুঁত হতে পারে, তা হচ্ছে না। ভারতের মত উন্নয়নশীল অর্থনীতিক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়নের পর্যায়ে উৎপাদন কৌশল ও উপকরণ সন্নিবেশ সুনিশ্চিতভাবে পরিবর্তিত হতে থাকবে। বিশেষতঃ অর্থনৈতিক উন্নয়ন বহুলাংশে শ্রমিকের এবং পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক মণ্ডলীর কর্মদক্ষতা ও কুশলতা বৃদ্ধির ওপর নির্ভরশীল বলে আমাদের উন্নততর উৎপাদন কৌশলে কুশলী যন্ত্রবিদ্ ও তত্ত্বাবধায়ক লাগবে। সুতরাং উৎপাদনবৃদ্ধির হারের সঙ্গে যন্ত্রবিদ্চাহিদা বৃদ্ধির হার সমানুপাতিকভাবে বাড়বে এমন সম্ভাবনা কম, এবং পূর্বে যে হারে যন্ত্রবিদ্ ও বিজ্ঞানীদের নিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই হারের ভিত্তিতেই এদের ভবিষ্যৎ চাহিদা নির্ধারণ করা যাবে, এ ধারণাও ভ্রমাত্মক।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যন্ত্রবিদ ও বিজ্ঞানীদের সম্ভাব্য চাহিদা নির্ধারণের পরে, সমষ্টিকরণের দ্বারা রাজ্যের যন্ত্রবিদ্ ও বিজ্ঞানীদের মোট সম্ভাব্য চাহিদা নির্ধারণ করে লোকবল পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এর পর সেই একই সময় সীমায় এই সব বিশেষজ্ঞের সম্ভাব্য মোট যোগান নির্ধারণ করা উচিত।

দণ্ডকারণ্য

রামায়নের বিস্মৃতপ্রায় স্বপ্ন আবার

দণ্ডকারণ্যের আবহাওয়া ভারতের অন্যান্য অংশের মত নয়। এখানে বর্ষা-কাল খুব ক্ষণস্থায়ী। জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে ১০০ দিনের মতো এর স্থায়িত্ব, তবে, ঐ সময়টায় ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় বৃষ্টিটা কিছু বেশী হয়। বছরের বাকি সময়টা একেবারে শুকনো। এই অঞ্চলের কৃষকরা লাভজনক কোন ব্যবস্থা চালু করতে এইজন্যই অসুবিধে বোধ করছেন।

দণ্ডকারণ্যে যাঁরা নতুন করে বসবাস করতে আসেন, তাঁদের, এই বৃষ্টির খাম-খেয়ালি ছাড়াও কতকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এখানকার জমি তেমন উর্বরা নয় তা ছাড়া মাটিও বিভিন্ন ধরণের। মাটির নীচের জলের স্তর ও তার অবস্থান বদলায়। সারা বছর ধরে জল থাকে, এই রকম নদী খাল, যথেষ্ট সংখ্যায় থাকলে, তবেই সারা বছর ধরে কৃষির কাজ চলতে পারে; কিন্তু সেই রকম নদী, খালের সংখ্যা এখানে খুব কম। কেবলমাত্র বৃষ্টির জলে ভরে ওঠা নদী, খাল, বিল থাকায় এবং মাটির নীচেও জলের পরিমাণ যথেষ্ট না থাকায়, দণ্ডকারণ্যে দুটি ফসলের চাষ প্রথম দিকে সম্ভবপর হয় নি।

সেচ প্রকল্পের কল্যাণে পারালকোটে ফলের প্রাচুর্য্য

নতুন কোন উপনিবেশ গড়ে তুলতে হলে সর্বক্ষেত্রেই যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়, আর তখনই শুধু প্রকৃতিকে বশীভূত করা যায়। প্রকৃতি যেখানে অকৃপণ হস্তে দান করতে নারাজ হয়, মানুষ সেখানে বুদ্ধি ও কৌশল প্রয়োগ ক'রে তার প্রাপ্য আদায় করে। কাজেই ক্ষণস্থায়ী বর্ষায় যে জল পাওয়া যায় তা সংরক্ষণ করার ওপরেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বছরের প্রধান শস্য, এই বর্ষার সময়েই বোনা হয়। এই সময়েও আবার বৃষ্টিটা সব সময়ে চাষের উপযোগী হয় না। কয়েকদিন হয়তো খুব বেশী বৃষ্টি হল আবার কিছুদিন হয়তো এক ফোঁটা বৃষ্টি হ'ল না। এই রকম বৃষ্টির ওপর নির্ভর ক'রে যদি চাষ করতে হয় তাহলে কৃষকদের বিরাট ঝুঁকি নিতে হয়। সেইজন্যই দণ্ডকারণ্যের কার্যনির্বাহকরা বাঁধ, বিল, পুকুর ইত্যাদি তৈরি করে বর্ষার এই বৃষ্টি সংরক্ষণ করার ওপরেই গুরুত্ব দিচ্ছেন। এতে চাষের জন্য নিয়মিতভাবে সেচের জল সরবরাহ করা যাবে; অনিশ্চিত বর্ষার ওপর নির্ভর করতে হবে না। খারিফ মরসুমে অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী বর্ষায় অনিশ্চিত বৃষ্টির সময়ে যাতে সেচের জল সরবরাহ করা যায়

ডোঙায় ক'রে জল তুলে
ক্ষেতে সেচ দেওয়া হচ্ছে

সেই উদ্দেশ্যেই এই সব বাঁধ ইত্যাদির পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে। বর্ষার অনিশ্চিত বৃষ্টির সময়ে ছাড়াও রবি মরসুমে যখন এক ফোঁটা বৃষ্টি হয় না তখনও চাষের জল সরবরাহ করা হচ্ছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৬৫ সালে, মাঝারি আকারের ভাস্কাল বাঁধটি এবং একটি ছোট আকারের জলসেচ প্রকল্প যেমন পাখানজোড় জলাধারটির কাজ সম্পূর্ণ করা হয়। বর্তমানে পারালকোট ও সতীগুড়া নামের দুটি মাঝারি আকারের বাঁধ তৈরি করা হচ্ছে। এই চারটি বাঁধ থেকে স্বাভাবিক বৃষ্টির বছরে রবি মরসুমে ৮০,০০০ একরে অর্থাৎ ঐ অঞ্চলের এক তৃতীয়াংশ জমিতে জলসেচ দেওয়া যাবে।

উপরে উক্ত এই চারটি জলসেচ প্রকল্প ছাড়াও দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষ ছোট ছোট জলসেচ প্রকল্পের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। কারণ এই অঞ্চলের সর্বত্র যদি এই রকম

ছোট ছোট জলসেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় তাহলে খারিফ মরসুমে বৃষ্টি বেশী না হলেও জমিতে সেচ দেওয়া যাবে আর রবি মরসুমেও সেচের জলের অভাব হবে না। সেজন্য ২৯টি এই রকম ছোট ছোট জলসেচ প্রকল্প সম্পূর্ণ করা হয়েছে, ৯টি তৈরি করা হচ্ছে এবং আরও ৯টি পরীক্ষা ক'রে দেখা হচ্ছে।

এই সব ছোট ছোট জলসেচ প্রকল্প ছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রামের পুকুর, কুয়ো ও নলকূপ থেকেও জলসেচ দেওয়া হয়।

নবজীবনের সঞ্চার

এই পর্য্যন্ত আমরা দণ্ডকারণ্যকে রামায়ণের একটা পর্ব বলে জানতাম। কিন্তু সেই বিস্তৃত প্রায় দণ্ডকারণ্যে এখন জলসেচের ব্যবস্থা ক'রে রবি মরসুমে চাষ করা হচ্ছে। এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। উমরকোট ও পারালকোট এলাকায় ১৯৬৫-৬৬ সালেই সর্ব প্রথম রবি মরসুমে চাষের কাজ সুরু করা হয়। যদিও সামান্য ৮০ একর জমিতে প্রথমে চাষ করা হয় তবুও এই রকম একটা অভিযান ঐ এলাকায় বিপুল সাড়া জাগায়। ১৯৬৬-৬৭ সালে চাষের জমির পরিমাণ বাড়িয়ে ৬৫০ একর করা হয় এবং ২ লক্ষ টাকারও বেশী শস্য উৎপাদন করা হয়। ১৯৬৭-৬৮ সালে চাষের জমির পরিমাণ আরও বাড়িয়ে ৮০০ একর করা হয়। ১৯৬৮-৬৯ সালে ১৫০০ একরে চাষ করা হবে। এখানে চাষের জমির যে পরিমাণ দেওয়া হল তার মধ্যে আদিবাসীগণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ওরা যে পরিমাণ জমিতে চাষবাস করছে তা যদি এই হিসেবের মধ্যে ধরা হয় তাহলে বর্তমান বছরে রবি শস্যের চাষের জমির পরিমাণ ২০০০ একরে দাঁড়াবে।

উমরকোটে আলুর ক্ষেত ফসলে ভরে উঠেছে

গত তিন বছরে রবি মরসুমে সাধারণতঃ ধান, গম, ভুট্টা, সরষে ইত্যাদির চাষ করা হয়েছে। তবে এতে এ কথা বলা যায় না যে দণ্ডকারণ্যে রবি মরসুমের চাষ একেবারে সর্বোচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে।

এ কথা ঠিক যে রবি মরসুমে যখন বৃষ্টির জল পাওয়া যায় না, তখন যদি জলসেচের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে এখানে যাঁদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, তাঁরা যে বছরে দুটো এমন কি তিনটে ফসল তুলতে পারবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এঁরাও ভারতের যে কোন অঞ্চলের কৃষকদের মতো সমান পরিশ্রমী ও কর্মঠ।

গত সংখ্যাগুলিতে যাঁরা লিখেছেন

শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য্য
অর্থনীতি বিভাগের প্রধান
গোয়েঙ্কা কলেজ অব কমার্স

শ্রীঅসিত ভট্টাচার্য্য
অর্থনীতির লেকচারার
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ডঃ শান্তি কুমার ঘোষ
অর্থনীতির লেকচারার
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ডঃ বি বি ঘোষ
গবেষণা বিভাগ, আকাশবাণী

ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার
প্রখ্যাত ঐতিহাসিক

ভারতে ক্রেতা সমবায়

বিশ্বনাথ লাহিড়ী (হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়)

ভারতের মতো বিকাশশীল দেশের পক্ষে সমবায় একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের দেশের আর্থিক উন্নয়ন, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে রূপায়িত হয় যার উদ্দেশ্য হ'ল সমাজ তান্ত্রিক ধরনের রাষ্ট্র গঠন করা। এই রকম ক্ষেত্রে বিতরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থার মূল্য যথেষ্ট, যা বাস্তবিকপক্ষে, সমাজতন্ত্রের অর্থকে সার্থক করে তুলতে পারে। ক্রেতা সমবায়ই হ'ল একমাত্র সক্রিয় ব্যবস্থা যার মাধ্যমে অত্যাবশ্যক ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি যথোচিতভাবে বন্টন ক'রে বিতরণের ক্ষেত্রে একটা নতুন অধ্যায় রচনা করা যেতে পারে।

সমবায় আন্দোলনের গুরুত্বের ওপর বিভিন্ন রকমের মত প্রচলিত। এক শ্রেণীর সমালোচকের মতে সমবায় প্রকৃতপক্ষে তেমন একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা নয়। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, সমবায় আন্দোলন বিশেষ করে ক্রেতা সমবায়, বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। কিন্তু এ কথাও সত্য যে ক্রেতা সমবায়সহ সম্পূর্ণ সমবায় আন্দোলনের উদ্ভবই হয় মূলতঃ আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থা থেকে দুর্নীতি বা দোষযুক্ত প্রথাগুলি দূর করে একটা নির্দোষ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। এর কার্যপ্রণালীর লক্ষ্য হ'ল ক্রেতা বা বিক্রেতা কেউ যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হন।

ক্রেতা সমবায় গঠনের মধ্যে একটা বড় ব্যাপার হ'ল, এই রকম সমবায়ের মাধ্যমে ক্রেতাগণ ও তাঁদের মতামত প্রকাশ করতে পারেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ক্রেতাগণের মতামত প্রকাশ বা অন্যায়ের প্রতিবাদের জন্য কোন সংগঠন ছিল না। সর্ব প্রথম সম্ভবতঃ আমেরিকাতেই, ক্রেতাগণের চিন্তামতের ওপরেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় ক্রেতাগণের মতামতেরও যে একটা মূল্য আছে, ক্রেতা সমবায়ই তা প্রমাণ করেছে। বিশ্বের নানা দেশে বিশেষ করে ইংল্যাণ্ড ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলিতে ক্রেতাসমবায়ের প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটা সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে দেশের আর্থিক ক্ষেত্রেও স্থিরতা আনা যায়। ক্রেতা সমবায় দেশের বিভিন্ন পরিস্থিতিও বন্টনের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করতে পারে, দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ও প্রতিরোধ করতে পারে। দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদির সময়ে সরকার অবশ্য কন্ট্রোল বা রেশনিং ব্যবস্থা চালু করে অবস্থা আয়ত্বে রাখার চেষ্টা করেন।

কিন্তু সেই রকম অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ছাড়া অন্য সময়ে ক্রেতা সমবায় সাধারণের সেবা করতে পারে। এই রকম সমবায়, মধ্যবর্তীদের অর্থাৎ দালাল ইত্যাদিগণকে সরিয়ে দিয়ে সোজাসুজি উৎপাদক ও ক্রেতাগণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, সকলকে সমান অধিকার ও সুযোগ দিতে পারে।

আমাদের দেশে অবশ্য ক্রেতা সমবায়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে। শিল্পাঞ্চলের সংখ্যা বাড়লে এবং সহরের সম্প্রসারণ হতে থাকলে, সুষ্ঠু বন্টনের দাবি ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে, এ ছাড়াও মুদ্রাস্ফীতি, ক্রেতাগণের ক্রয়শক্তির বৃদ্ধি এবং প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি দেশের আর্থিক পরিস্থিতিতে একটা পরিবর্তন এনেছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার শেষার্ধ থেকে ক্রেতা সমবায়ের গুরুত্ব ক্রমশঃ বাড়ছে। ১৯৬১-৬২ সালে যেখানে ৭৫টি পাইকারী সমবায়, ৭০৫৮টি প্রাথমিক ক্রেতা সমবায় তথা ৪৪.৩৭ কোটি টাকার ব্যবসা ছিল সেই তুলনায় ১৯৬৬-৬৭ সালে ৩৪৫টি পাইকারী সমবায়, ৯৪৭১টি প্রাথমিক ক্রেতা সমবায় তথা ১৭৪.০৭ কোটি টাকার ব্যবসা হয়। ...এ পর্যন্ত ২৫ লক্ষ পরিবার এই সমবায়গুলির সদস্যভুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ সহরাঞ্চলের শতকরা ১৪ জন ক্রেতা সমবায়ের সদস্য।

উপরে উক্ত সংখ্যাগুলি থেকে অনুমান করা যায় যে, দেশে ক্রেতাসমবায়ের উন্নতি উল্লেখযোগ্য হলেও সন্তোষজনক নয়। কারণ এতে শতকরা মাত্র ৭ জন সম্পূর্ণ খুচরা বিক্রীর সুবিধে নিতে সমর্থ হয়েছেন। এর তুলনায় ইংল্যাণ্ড বা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলিতে শতকরা ১০ থেকে ২০ জন, ক্রেতা সমবায়ের সুযোগ গ্রহণ করেন।

চায়ের কাপ

জাপানীরা ভীষণ চায়ের ভক্ত। সাধারণতঃ তারা কাপের পর কাপ চা খান, হালকা সবুজ চা। এমন কি মধ্যাহ্ন বা নৈশ আহারের সঙ্গে চা খেতেও তাদের আপত্তি নেই।

কিন্তু কিছুদিন থেকে সবুজ চা-এ তাদের তেমন রুচি নেই। এখন কালো চা অর্থাৎ চা বলতে আমরা যা বুঝি তার ওপর জাপানীদের ঝোঁক হয়েছে। এই চা ভারতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। গত বছরে জাপানীরা মোট যে ৮৮,০০০ টন চা খেয়েছিল। এর মধ্যে ভারতীয় চায়ের পরিমাণ হবে ১৩,২০০ টন।

নিখিল-জাপান-কালো-চা-সমিতির একটি প্রতিনিধি দলের নেতার মতে জাপানে কালো চায়ের চাহিদা ক্রমশঃ বাড়ছে। ভদ্রলোক সম্প্রতি আমাদের দেশে এসেছিলেন। তিনি আরও বলেছেন যে, ভারত যদি সবুজ চায়ের চাষ করে তাহ'লে আমদানীর ওপর শতকরা ৩৫ ভাগ প্রোটেকটিভ ডিউটি থাকা সত্বেও আমদানীকারকরা বরাত দিতে পারেন।

গত বছরে চায়ের উৎপাদন রেকর্ডমাত্রায় পৌছয় মোট ৩৮ কোটি ২৫ লক্ষ কিলোগ্রাম। ১৯৫৬-র রেকর্ডমাত্রার তুলনায় এই পরিমাণ ৬৫ লক্ষ কিলোগ্রাম বেশী।

রপ্তানীর ক্ষেত্রে গত বছরের অবস্থা বেশ উৎসাহজনক ছিল। গত বছরে ১৯৬৫ সালের চেয়ে ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ কিলোগ্রাম বেশী চা রপ্তানী করা হয়েছিল।

লক্ষ্মণরাও কির্লোসকার জন্ম শতবার্ষিকী ঃ ২০শে জুন ১৯৬৯

'কাজই আনন্দ স্বরূপ'

তাঁর বাণীই তাঁর স্মারক

অনেকে হয়তো বিশ্বাসই করবেন না যে, স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যা নিয়ে গ্রামের একজন বৃদ্ধ, ঢালাই ইত্যাদি করার জন্য প্রত্যেকদিন ২ টন করে লোহা গলানো যায় এই রকম একটি আধুনিক কিউপোলা, নিজের নক্সায় তৈরি করেছেন। কিন্তু ঘটনাটা সত্যি।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

রসকট কৃষ্ণ পিল্লে

চিত্র

তা. সু. নাগরাজন

মহারাষ্ট্রের সাংলি জেলার পালুস গ্রামের মোঃ দাদা শিকালগার (৫৫) কোন সুদক্ষ ইঞ্জিনীয়ারের কাছ থেকে কোন রকম সাহায্য না নিয়েই এই কিউপোলাটি তৈরি করেন। গ্রামে যে বিকাশ শিল্প সমবায় সংস্থাটি রয়েছে, তিনি তার সদস্য এবং সংস্থাটির অন্যান্য সদস্য মোঃ শিকালগারের জন্য গর্ব বোধ করেন।

প্রায় নিরক্ষর এই বৃদ্ধকে যখন জিজ্ঞেস করা হল যে, তিনি কি করে এই দুঃসাধ্য কাজ করলেন, উত্তরে তিনি বললেন যে 'দূরে ঐ যে শিল্প সহরটা দেখা যাচ্ছে সেখানকার বৃদ্ধ লোকটিই আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছেন। দুই কিলোমীটার দূরের ঐ কারখানায় আমি নানান ধরনের মেসিনে ৩০ বছর ধরে কাজ করেছি। ঐখানে কাজ করার সময় প্রতিটি মেসিনের অংশ আমি যে শুধু নেড়েচেড়ে দেখছি তাই নয় নক্সা তৈরি করে মেসিনের অংশও ঢালাই করতে শিখেছি। ঐখানকার বৃদ্ধ লোকটি যে শুধু আমাকেই কাজ শিখতে উৎসাহিত করেছেন তাই নয়, যাঁরাই কাজ শিখতে চেয়েছেন তাঁদের প্রত্যেককেই কাজ করতে উৎসাহ দিয়েছেন। আমি যখন বলতাম যে আমার তো বিদ্যেবুদ্ধি নেই আমি কি এ সব পারবো ? উনি তখন বলতেন, লেখাপড়ার কথা নিয়ে চিন্তা ক'রো না, চেষ্টা করো তাহলেই পারবে।'

ঐ গ্রামে মোহাম্মদের সহকর্মীদের সকলের কাছ থেকেই প্রায় একই কথা শোনা যায়। এঁরা প্রতি বছর প্রায় ৫০ হাজার টাকা মূল্যের যন্ত্রাংশ ঢালাই করেন। রাজা রাম সাওয়াত (৬৫), আল্লাভাগ্য সুতার (৭০) এবং আরও অনেক কর্মী মিলে যে সমবায় সমিতি গড়ে তুলেছেন তাতে মূলধনের অংশ হিসেবে নিজেরা

ঢালাই বিভাগের এই সব কর্মী আশপাশের গ্রামের মানুষ

কির্লোস্করওয়াড়ী শিল্প কেন্দ্র, গ্রামবাসীদের, যন্ত্রপাতি চালনায়, পরিপূরক শিল্প স্থাপনে, খামার যন্ত্র সজ্জিত করায় ও আয় বৃদ্ধিতে, সাহায্য করেছে।

দিয়েছেন ৬০,০০০ টাকা আর সরকারের কাছ থেকে এক কালীন সাহায্য ও ঋণ হিসেবে পেয়েছেন ৩.৫ লক্ষ টাকারও বেশী। ওঁরা সকলেই কিছু দূরের শিল্প-নগরীর 'বৃদ্ধ লোকটির' কথা উল্লেখ করতে থাকেন এবং বলেন যে, ওঁরই উৎসাহে গড়ে উঠেছে এই সমবায় সমিতি। ওঁদের মধ্যে বেশীরভাগই কোন না কোন সময়ে ঐখানে কাজ করেছেন। সাংলি জেলার প্রায় সব খামারে কৃষিক্ষেত্রে' ছোট খাটো শিল্পে বা সমবায় চিনি কারখানায় ঐ বৃদ্ধ লোকটির নাম মুখে মুখে ফেরে, পল্লী জীবনে শিল্পের মাধ্যমে রূপান্তর ঘটানোয় তাঁর অবদান, তাঁর অদম্য উৎসাহ ও উদ্যম ও শিল্পোন্নয়ন সার্থক করার জন্যে তাঁর সংগ্রামের প্রশস্তি।

এই বৃদ্ধ লোকটি যাঁর নামানুসারে গড়ে ওঠা এই শিল্প নগরটি ভারতের শিল্প বিপ্লবের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার নাম হ'ল লক্ষণরাও কির্লোসকর। তাঁর গড়া কির্লোস্কারওয়াড়ী শিল্পকেন্দ্রে গত ২০শে জুন তাঁর জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হয়। মহারাষ্ট্রের কৃষি, শিল্প, সমাজ কল্যাণ গ্রাম সংস্কার ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রে তার নাম জড়িত। দেশের ঐ অংশে অগ্রগাতর যে কোন নিদর্শনের, তা সে লোহার লাঙল, জল দেওয়ার জন্য বিদ্যুৎশক্তি চালিত পাম্প বা আখ মাড়াই কল যাই হোক না না কেন, সেগুলির প্রত্যেকটির সঙ্গে লক্ষণরাও কির্লোসকার ও তার প্রতিষ্ঠানের কোন না কোন সম্পর্ক রয়েছে। লক্ষ্মণরাও কির্লোসকার ১৩ বছর পূর্বে পরলোকগমন করেছেন কিন্তু কির্লোস্কারওয়াড়ীর চতুর্দিকের গ্রামগুলির চেহারা পরিবর্তনে তাঁর অবদান অসামান্য।

কির্লোস্কারওয়াড়ীতে আধুনিক ধরনের যে সব কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন লোহার লাঙ্গল এবং খড় কাটার কল তৈরি হয় তা ভারতের বহু খামারে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভাড়া ভিত্তিক ক্রয় প্রথায় যে আখ মাড়াই কল সরবরাহ করা হয় সেগুলি সমবায়ের ভিত্তিতে গঠিত চিনির কারখানা স্থাপনে উৎসাহ দিচ্ছে। বিদ্যুৎশক্তি চালিত পাম্প তৈরি করার ক্ষেত্রে কির্লোস্কারওয়াড়ী হ'ল

নিজের নক্সায় তৈরি কিউপোলা যন্ত্রের পাশে দাঁড়িয়ে মোহাম্মদ দাদু শিকালগর। বর্তমানে তাঁর বয়স ৫৫ বছর।

অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। জলসেচের মাত্রা বাড়াতে এগুলি যথেষ্ট সাহায্য করেছে। প্রকৃতপক্ষে এই পাম্পগুলিই সাংলি জেলাকে সবুজ করে তুলেছে।

কির্লোস্কারওয়াড়ী অতি সামান্য অবস্থা থেকে এই বিপুল উন্নতি করেছে। ৫৯ বছর পূর্বে লক্ষ্মণরাও যে জনহীন, কাঁটা ও পাথর ভরা প্রান্তরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সেই প্রান্তর বর্তমানের কির্লোসকারওয়াড়ীর আড়ালে হারিয়ে গেছে। বর্তমানে এটি ভারতের অন্যান্য শিল্পনগরীর মতোই কর্মচঞ্চল। রাস্তার দুই পাশে গাছের সারি, সুন্দর ঝকঝকে রাস্তা শত শত কর্মী কাজ শেষ করে বাড়ী ফিরছেন বা কাজ করতে চলেছেন। বিপুল আকারের সব মেসিনে ২৪ ঘন্টা কাজ চলছে। ১৯৪ একর আয়তনের কির্লোসকারওয়াড়ীর লোক সংখ্যা হ'ল প্রায় দুই হাজার। এখানে একটি হাই স্কুল, একটি ডিস্পেন্সারি একটি ব্যাঙ্ক এবং আধুনিক সুযোগ সুবিধাগুলির প্রায় সবই রয়েছে।

কিন্তু ১৯১০ সালে কেউ এই জায়গাটির কাছাকাছিও আসতো না। কাছাকাছি, নামে মাত্র যে রেলস্টেশনটি ছিল তার নাম কুণ্ডাল রোড। দিনে এক আধবার একটি ট্রেণ হুইসিল বাজিয়ে এই জায়গাটার পাশ দিয়ে চলে যেতো। চতুর্দিকে কয়েক মাইলের মধ্যে কোন ইলেক্ট্রিক লাইট বা জল ছিল না। ইস্পাত দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও প্রেরণা না থাকলে কেউ এই রকম একটা মরুভূমির মতো জায়গায় শিল্প নগরী গড়ে তোলার কল্পনাও করতে পারেন না। লক্ষ্মণরাও যখন এখানে এলেন তখন তাঁর বয়স ৪২ বছর। সমস্ত বাধা অতিক্রম করার দৃঢ় মনোভাব নিয়ে তিনি কাজে অগ্রসর হলেন।

বি. ভি. দেশপাণ্ডে একদিন যিনি কারখানার সাধারণ এক কর্মী ছিলেন আজ তিনি সেই কারখানার উন্নয়ন বিভাগের প্রধান হিসেবে জটিল যন্ত্রপাতির নক্সা তৈরি করছেন।

বেলগামের একটি গ্রামে ছিল তাঁর বাড়ী। ছোট বেলাতেই স্কুলের পড়াশুনা ছেড়ে বোম্বাইতে গিয়ে চাকরির চেষ্টা করতে থাকেন। যন্ত্রপাতি সম্পর্কে তাঁর একটা বিশেষ ঔৎসুক্য ছিল। তিনি বোম্বাইর জে. জে. আর্ট স্কুলে মেসিন ড্রইং করতে শেখেন। ভিক্টোরিয়া জুবিলি টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে লেকচারারের পদ পেয়েও তিনি তা ছেড়ে গ্রামে চলে এলেন। গ্রামে এসে তিনি বোতাম ইত্যাদি তৈরি করতে সুরু করলেন তারপর সাইকেল বিক্রী ও মেরামতের একটি দোকান দিলেন। এর পর তিনি ও তাঁর ভাই বেলগামে চলে এসে সাইকেলের একটি দোকান খুললেন এবং তখনই কির্লোস্কার ব্রাদার্স প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হ'ল।

গ্রামের কৃষকরা মান্ধাতার আমলের সাজ সরঞ্জাম দিয়ে চাষ করছে, তাদের পূর্ব পুরুষরা যে প্রথায় চাষ করতো এখনও তারা সেই প্রথাই অনুসরণ করছে। এদের কি করে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতিতে অভ্যস্ত করানো যায় তিনি সেই কথাই ভাবতে লাগলেন। তখন তিনি এক অশ্বশক্তির একটা ইঞ্জিন, একটা লেদ, একটা এমেরি গ্রাইণ্ডার এবং দুটো ড্রিলিং মেসিন নিয়ে একটা ছোট খাটো কারখানা খুললেন। উদ্দেশ্য ছিল হাত দিয়ে চালানো যায় এই রকম খড় কাটার মেসিন তৈরি করা। আর এইভাবেই সূত্রপাত হ'ল ভারতের বৃহত্তম কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানার।

কিন্তু লোহার লাঙল আর খড় কাটার মেসিন তৈরি করেই তিনি কাজ শেষ করেন নি। গ্রামে গ্রামে ঘুরে সেগুলির সুবিধে অসুবিধে কৃষকগণকে বুঝিয়ে সেগুলি চালু করতে চেষ্টা করেন। মা বসুমতীর গায়ে লোহার ঘা লাগানো পাপ বলে কৃষকরা প্রথমে তা ব্যবহার করতে রাজি হয়নি। দুই বছর পর্যন্ত লাঙলগুলি কারখানায় পড়ে রইলো, একটিও বিক্রী হ'ল না। লক্ষ্মণরাও তারপর প্রথম কয়েকটি লাঙল বিনামূল্যে বিলি করলেন এবং নিজে মাঠে গিয়ে সেগুলি চালানো শেখাতে লাগলেন। এরপর আস্তে আস্তে

আক্কালখোপ গ্রামে মোটর সাইকেলকে এখন আর সমৃদ্ধির চিহ্ন বলে ধরা হয় না, গ্রামের অনেকেরই ঐ যান্ত্রিক বাহন আছে। পোষাক পরিচ্ছদে, টালি দেওয়া ঘরবাড়িতে, পাকা রাস্তায় ও বৈদ্যুতিক আলোয় সমৃদ্ধির ছাপ সুস্পষ্ট।

আশেপাশের গ্রামগুলিতে এগুলির প্রচলন বাড়তে লাগলো।

লক্ষ্মণরাও এবং তাঁর ভাই সব রকম বাধাবিপত্তি দূরে ঠেলে রেখে তাঁদের কারখানাটি গড়ে তুলছিলেন কিন্তু বেলগাম মিউনিসিপ্যালিটি তাঁদের জানালেন নতুন করে সহরের যে পরিকল্পনা করা হচ্ছে তাতে তাঁদের ঐ কারখানাটির জায়গা নেই। এটিকে অন্য কোথাও সরিয়ে নিতে হবে। এর ফলে আউন্ধের একটি অখ্যাত গ্রামের ভাগ্য ফিরে গেল। ঐ এলাকার জমিদার বালাসাহেব পন্থ কারখানা স্থাপন করার জন্য ৩২ একর জমি ও ১০ হাজার টাকা দিলেন। কির্লোস্কার ভাইরা ১৯১১ সালে খড়কাটা মেসিন ও লোহার লাঙ্গল তৈরি করতে সুরু করেন। ১০/১২ বছরের মধ্যেই এগুলি এতো জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে ১৯২৪ সালেই এই কারখানা ৪০,০০০ লাঙ্গল বিক্রী করে।

লক্ষ্মণরাও তাঁর প্রথম দিকের ৫০ জন কর্মীকে নিয়ে যে জনহীন উষর স্থানটিতে এসে উপস্থিত হন সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে এখনকার কির্লোস্কারওয়াড়ী। বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলির শিল্পপতিরাও এখন নানা কাজে বিমান পথে এখানে আসেন। এই শিল্পটি এখন এতো বিস্তৃত এবং এখানে এতো বিভিন্ন ধরনের কাজ হয় যে, ভারতে এমন কি বিদেশেও এখন এর ১১টি কোম্পানি ও সহকারি অফিস আছে। এদের অয়েল ইঞ্জিন যেমন ভারতের ক্ষেত খামারে জনপ্রিয় তেমনি ৬০টি দেশে রপ্তানি করা হয়। এদের এখানে তৈরি অতি জটিল মেশিন টুলের সাহায্যে শত শত কারখানায় যন্ত্রাংশ তৈরি হচ্ছে। এদের ইলেক্ট্রিক মোটর—ভারতের মোট উৎপাদনের শতকরা ৩৬ ভাগ—পাম্প—দেশের মোট উৎপাদনের ৪০% দেশের শিল্পে, কৃষিতে, জলসেচ এবং বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের নানা ক্ষেত্রে নানা কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এতোখানি সম্প্রসারণের ফলে এই সব কোম্পানিতে কর্মীর সংখ্যা ৫০ থেকে বেড়ে এখন ৩০ হাজারে দাঁড়িয়েছে।

কির্লোস্কারওয়াড়ীর এই ব্যাপ্তিটাই বড় কথা নয় কিন্তু এই সংস্থাটি চতুর্দিকের গ্রামগুলিতে যে পরিবর্তন নিয়ে এসেছে সেইটেই হ'ল বড় কথা। প্রায় ঘুমন্ত গ্রামের অধিবাসীরা কেউ বা এখন সুনিপুণ কারিগর, কেউ বা সমবায় সমিতির সংগঠক, কেউ বা সমাজকর্মী। কির্লোস্কারওয়াড়ীর প্রায় ১৫০০ কর্মী চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা ২৫টি গ্রাম থেকে আসেন। এই সব গ্রামের প্রায় প্রত্যেক পরিবারের একজন বা দুইজন কির্লোস্কারওয়াড়ীতে কাজ করেন। প্রত্যেক পরিবারের আর্থিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় ভালো। ঋণগ্রস্ততা চলে যাচ্ছে, ঋণ দাতাদের শ্রেণী ক্রমশঃ বিলীয়মান।

আয়ুর্বেদ, সিদ্ধ, য়ুনানি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে মৌলিক ও ফলিত গবেষণা সুরু করার জন্যে, ঐ ধরণের গবেষণার পরিচালনা ও বিকাশের জন্যে এবং গবেষণার মধ্যে সমন্বয় বিধানের জন্যে ভারত সরকার একটি স্বশাসিত সংস্থা স্থাপন করেছেন। এর নাম হ'ল কেন্দ্রীয় ভারতীয় চিকিৎসা বিধি ও হোমিওপ্যাথি গবেষণা পরিষদ।

সাধারণ অসাধারণ

দেশের নানা প্রান্তে যে সব দেশদরদী দনারী লোকচক্ষুর অন্তরালে দেশগড়ার কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন এখানে সেইসব সাধারণ মানুষের অ-সাধারণ কাহিনী বলা হবে

সেচের ফল্গুধারা

আমাদের দেশ কৃষিনির্ভর। কৃষি আমাদের প্রাণ, কৃষি আমাদের জীবন। আমাদের দেশগড়ার প্রয়াসে কৃষি উন্নয়নের প্রাধান্য ও গুরুত্ব তাই এত বেশী। আজকের যুগের মানুষ প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের মুখাপেক্ষী না হবার জন্যে কত না নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে কৃষিকে সর্বভাবে উন্নত ক'রে তোলায় ব্যাপৃত। এই পরীক্ষা নিরীক্ষা ফলপ্রসূ করতে প্রয়োজন আর্থিক সামর্থ্য যা আমাদের দেশে সব সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে না। এমতাবস্থায় উদ্যোগী পুরুষরা নিজেদের প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করেন। যা আছে তাই যথাসম্ভব কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন। কৃষি প্রয়াসে সেচের গুরুত্ব অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে কম নয়। এ ক্ষেত্রে সহজ কোনোও পন্থা আবিষ্কৃত হ'লে আমাদের দেশের রুক্ষ খরা-অঞ্চলগুলির অনেক উপকার হয়। এমন একটি আবিষ্কারের মালিক হলেন কেরালার পালঘাট জেলার ওট্টাপালাম এলাকার বাসিন্দা, মাধবন নায়ার। তাঁর উদ্যম ও উদ্ভাবিকা শক্তির সহায়তায় এযাবৎ ঊষর একটা এলাকাকে শস্য শ্যামল ক'রে তোলার কৃতিত্ব দেশ বিদেশের অনেক বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁর সেচ পদ্ধতি হ'ল এই রকম।

ভূগর্ভে মাটীর একাধিক স্তর আছে। ভূস্তরের গভীরে প্রস্তরময় স্তরের ওপর দিয়ে জলের যে ক্ষীণ-ধারা নিত্যপ্রবহমান শ্রীনায়ার সেই স্তর পর্যন্ত পাকা গাঁথুনীর প্রাচীর তৈরি করে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার গতিরোধ করে সেই জল সঞ্চয় করেন সেচের জন্য। তাঁর এলাকায় জলের অভাব তীব্র অতএব সেচের জন্য প্রচুর জল সরবরাহ পাবার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এ সবে দমে না গিয়ে শ্রীনায়ার সকলের জানা পুঁথিগত একটা তত্ত্ব হাতে নাতে পরীক্ষা করতে চেষ্টা করলেন এবং তাঁর সে প্রচেষ্টা সফল হ'ল। তাঁর এই কৃতিত্ব দেশ বিদেশে এত লোকের মনে কৌতূহল জাগিয়েছে যে তাঁর খামার দেখার জন্যে লোকের আসার বিরাম নেই। তাই শ্রীনায়ার একটা অতিথিশালাও তৈরি করে ফেলেছেন। রাজ্য সরকার একটা অন্তঃসলিলা-জলের বাঁধ তৈরির একটি পরীক্ষামূলক কার্যসূচী রূপায়ণে শ্রীনায়ারের সহযোগিতা নেবার কথা চিন্তা করে দেখছেন। ইতিমধ্যে সিংহল সরকার শ্রীনায়ারের বাঁধ তৈরীর পদ্ধতি সম্বন্ধে খোঁজ খবর করছেন।

প্রাচীন কৃষি পদ্ধতিকে বিদায়

যথাসময়ে পরিমাণমত সার প্রয়োগ ক'রে ভালো জাতের বীজ বুনে এবং প্রয়োজন মত সেচ দিয়ে যে প্রচুর পরিমাণ ফসল তোলা যায়, তা গোসাই গ্রামের শ্রীসত্যনারায়ণ সিং প্রমাণ করেছেন। বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কীর্তিআনন্দ ব্লকের গোসাই গ্রামের বাসিন্দা শ্রীসত্যনারায়ণ চাষবাস নিয়ে থাকেন।

তাঁর জমির পরিমাণ আধ একর। প্রচুর পরিশ্রম স্বীকার করে এবং সাধ্যের অতিরিক্ত খরচ করেও তিনি আশানুরূপ ফসল পেতেন না। তিনি এলাকার অন্যান্য প্রগতিশীল চাষীদের সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ করলেন তাঁরা তাঁকে পরামর্শ দিলেন মান্ধাতার আমলের চাষ পদ্ধতি বর্জন ক'রে বৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ করতে।

শ্রীসত্যনারায়ণ ২০০ টাকার উৎকৃষ্ট বীজ ও রাসায়নিক সার কিনলেন। জমিটায় ভালো ক'রে হাল চালিয়ে তিনি সারি বেঁধে 'এ্যাগ্রোসাইন' মাখানো ১৫ কেজি মেক্সিকোর গমের বীজ বুনে দিলেন। বীজ বোনার আগে তিনি জমিতে ২৬ কেজি ডেমোফসফেট ও ১২ কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট মিশিয়ে নিয়েছিলেন।

বীজ বোনার ২০ দিন পর তিনি জমিতে আবার ৪৪ কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট ছড়িয়ে দিয়ে ভালোভাবে সেচ দিলেন। ফসল পেকে ওঠার পর যখন কাটা ফসল ওজন করা হ'ল তখন শুধু শ্রীসত্যনারায়ণ-ই নন্ তাঁর প্রতিবেশীরাও হতবাক হলেন। আধ একরে ৪৫ মণ অর্থাৎ এক একরে ৯০ মণ কম কথা নয়।

এই গমের জন্যে তিনি অতিরিক্ত মোট খরচ করেছিলেন ১০০ টাকা আর এর থেকে তাঁর লাভ হ'ল ১,৪০০ টাকা।

প্রায় মরুভুমি এক অঞ্চলে ফসলের প্রাচুর্য

সার, সেচ ও বীজের যথাবিধি প্রয়োগের আর এক সাফল্য-কাহিনী। গুজরাটের হারিজ-এর কাছে, মোটা মাঙ্কা নামের একটি জায়গায় শ্রীবারাণসীভাই নাগরদাস প্যাটেল প্রায় মরুভূমির মত শুকনো একটি অঞ্চলে গমের চাষ করে প্রচুর ফসল ফলিয়েছেন। রাজ্য পর্যায়ে যে গমের চাষ প্রতিযোগিতা হয়, তাতে তিনি তৃতীয় স্থান পেয়েছিলেন। তাঁর জমিতে প্রতি একরে ২,৮৫৮.১৩০ কেজি ক'রে গম হয়।

পেশায় ব্যবসায়ী হলেও শ্রীপ্যাটেলের আগ্রহ ছিল চাষবাসের প্রতি। পত্র পত্রিকায় ও খবরের কাগজে আধুনিক কৃষি পদ্ধতির নানা কাহিনী পড়ে তাঁরও হাতে কলমে পরীক্ষা ক'রে দেখার ইচ্ছে হয়। স্থানীয় ব্লক-এক্সটেনশান অফিসারদের পরামর্শে ও সহায়তায় তিনি কৃষির ব্যাপারে উৎসাহজনক ফল পেয়েছেন।

শ্রীপ্যাটেল কথায় কথায় বলেন যে, প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাওয়া বড় কথা নয়। আমার সাফল্যে যে অন্যান্য কৃষকরা উৎসাহিত হচ্ছেন এইটিই তৃপ্তির বিষয়।

কৃষিক্ষেত্রে সহযোগিতার সাফল্য

এক্সটেন্সান অফিসারদের ভূমিকা

বর্ধমান থেকে ৮ মাইল দূরে সোনাকুড় গ্রাম। দেশের আর হাজারটা গ্রামের মত এই গ্রামটিও অখ্যাত ও দরিদ্র ছিল এই বছর তিনেক আগেও। ফসল হত যৎ-সামান্য ফলে চাষীদের সারা বছরে পর্য্যাপ্ত খাবারের সংস্থান হ'ত না। কিন্তু ১৯৬৫-র শেষের দিকে ব্লক কর্মীরা প্রচুর ফলনের বীজ সম্পর্কে খবর আনলেন। গোড়ায় যাঁরা এই বীজ বুনে হাতে নাতে ফল দেখতে চাইলেন তাঁদের মধ্যে তারক সাঁই, রাজনারায়ণ কোঙার, এম. সামন্ত ও আবু তায়েবের নাম উল্লেখযোগ্য। স্থির হ'ল তাইনান্-৩ আর তাইচুং নেটিভ-১ বীজ বোনা হবে। কিন্তু সমস্যা হ'ল সেচের ব্যাপার নিয়ে। এই বীজের জন্যে পর্যাপ্ত জলের দরকার। অতএব বর্ধমান ব্লকের কৃষি সম্প্রসারণ অফিসারের পরামর্শ চাওয়া হ'ল। পরামর্শ করে তাঁরা স্থির করলেন যে দামোদরের জল নিষ্কাষণের জন্যে তৈরি 'বাঁকা' খালের গায়ে একটা বাঁধ তৈরি করবেন। বাঁধ তৈরি হলে সকলেরই উপকার হবে এই আস্থা নিয়ে গ্রামের ৮০টি পরিবারের প্রত্যেকে এই বাঁধ তৈরির কাজে হাত লাগালেন। বাঁধ শেষ হয়ে গেল যথা সময়ে।

একস্টেনসান অফিসারের তদারকীতে গ্রামের কৃষকরা যথাযথ সার ব্যবহার ক'রে তাইনান ৩ ও তাইচুং নেটি-১এর বীজ বুনে প্রতি একরে ৫০-৫৫ মণ ধানপেলেন। তাছাড়া খড় পেলেন ৬০ মণ। এরপর প্রত্যয় না হওয়ার কোনোও কথা নেই। বোরো মরসুমে সোনাকুড়ের অধিকাংশ চাষী ৪৫০ একর জমিতে আই আর-৮ বুনলেন এবং যথেষ্ট ফসল পেলেন। সোনাকুড়ের ঐশ্বর্য্য দেখে গ্রাম গ্রামান্তরের চাষীরাও উৎসাহিত হয়েছেন।

পশ্চিম বাংলার একটি গ্রাম পঞ্চায়েৎ

পর্যালোচনা ডি. আর. সরকার
এস. এন. নন্দা

পশ্চিমবাংলায় পঞ্চায়েতী রাজ আইন পাশ হয়, ১৯৫৭ সালে কিন্তু রাজ্যে পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপন করা হয় ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে।

বর্তমান পর্যালোচনার দুই লেখক ২৪ পরগণা জেলার ব্যারাকপুর মহকুমার পলাসী গ্রামে ১৯৬৭ সালে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ-কর্ম সম্বন্ধে স্থানীয় অধিবাসীদের প্রতিক্রিয়া নিরূপণ করার চেষ্টা করেন। তাঁদের সমীক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হ'ল।

তাঁরা ২৭৫টি পরিবারের প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের মতামত লিপিবদ্ধ করেন। সংগৃহীত তথ্য থেকে কতক-গুলি ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন শতকরা ৮০ জনের মতে গ্রামে খাদ্যোৎ-পাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া গ্রাম পঞ্চায়েৎগুলির প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাঁদের মতে এর পর গুরুত্বের বিচারে আসে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজ।

গ্রামের প্রত্যেকটি পরিবারের কর্তাদের ধারণা কৃষি এবং পল্লী শিল্পগুলির ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েৎগুলির অবদান তেমন বিশেষ কিছু নয়। ১০ জনের মধ্যে ৮ জন বলেছেন, সেচের ব্যবস্থায়, সার ও উন্নততর বীজ সরবরাহে, শস্য রক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগে, গুদামজাত করার এবং ঋণের সুযোগ' সুবিধা আদায়ে পঞ্চায়েৎগুলির আরও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত। দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রমে, শস্যাদি উৎ-পাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য দিক, যেমন, ছোট জমিগুলিকে একত্রীকরণ, জ্বালানী এবং গো মহিষের খাদ্য হিসেবে বিশেষ ধরনের ঘাস উৎপাদনে হাত দেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া পল্লী শিল্পগুলির উন্নতির ব্যবস্থা করা এবং স্থানীয় কুটীর শিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা দরকার বলে তাঁরা মনে করেন।

এটা করতে পারলে বহু লোকের কর্মের সংস্থান করাও সম্ভব হবে।

নতুন গঠন ব্যবস্থা

পঞ্চায়েৎ হ'ল প্রতিনিধিত্বমূলক বেসর-কারী প্রতিষ্ঠান। অতএব শতকরা ৮০ জন চান যে পঞ্চায়েৎগুলির গ্রাম অধ্যক্ষ ও অঞ্চল প্রধানের অধীনে গণতান্ত্রিক পদ্ধ-তিতে কাজ করা উচিত। সর্বোপরি তাঁদের মতে সংগঠনের এবং কার্যক্ষমতার দিক দিয়ে পঞ্চায়েতগুলি যাতে আরও ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে সেজন্য এগুলি-কে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

পঞ্চায়েতী নির্বাচনের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে, একটা নতুন ধারার নেতৃত্ব এসেছে। কিন্তু পলাসীর শতকরা ৫০ জন বাসিন্দা মনে করেন যে আগেকার আমলের জেলা ও ইউনিয়ন বোর্ডের নেতাদের চেয়ে এঁরা এমন কিছু ভালো নন। নেতৃস্থানীয়দের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত পরিবারের। তাঁরা প্রায় ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্যগণের কাজ করেন। অনুসন্ধানের ফলে পর্যালোচনা-কারীগণ দেখেছেন যে পলাসীর গ্রাম পঞ্চায়েৎ প্রায় কোণঠাশা হয়ে কাজ করছেন। গ্রাম সমবায় সমিতি অথবা গ্রামের স্কুল বা ক্লাবের সঙ্গে এদের প্রায় কোনোও সম্পর্ক নেই বা এগুলির ওপর বিশেষ কোন প্রভাবও নেই। অর্থাৎ অন্য কথায় বলতে গেলে গ্রামের অন্যান্য উন্নয়নী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এদের কোনোও সংযোগ নেই। গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে গ্রাম সেবককে ঠিকমত কাজে লাগানো হয় না।

গ্রাম পঞ্চায়েৎগুলির পক্ষে ভালোভাবে কাজ করা সম্ভব নয়—কারণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দলগতভাবে ক্ষমতাশালী হওয়ার জন্যে পঞ্চায়েৎগুলির সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করে। এই ধারণা প্রকাশ করেন ১০ জনের মধ্যে ৯ জন। এঁরা

ঘুটঘোরিয়ার তাঁতি কামার লাক্ষা শিল্পী

দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা থেকে এক মাইল দূরে ঘুটঘোরিয়া গ্রামে অনেক তাঁতি কামার ও গালার কারিগর বাস করেন। গ্রামটির মোট জনসংখ্যা হ'ল ৩০০০, তার মধ্যে ২৫০০ জনই কোন না কোন ধরণের হাতের কাজ জানেন। ইস্পাত কারখানার কাজ যখন সুরু হ'ল, এঁরা কিন্তু সেখানে কোন কাজের জন্য ঘোরাঘুরি না ক'রে, দুর্গাপুরে যে বাজার গড়ে উঠছিলো তারই সুযোগ নিলেন।

দুর্গাপুর প্রকল্প থেকে ঋণ গ্রহণ করে এঁরা এঁদের উৎপাদন শতকরা ২৫ ভাগ বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। এখানে যে ১৫০০ কামার আছেন তাঁরা এক ধরণের কোদাল তৈরিতে অত্যন্ত সফল হয়েছেন এবং তাদের বার্ষিক উৎপাদনের মূল্য হ'ল প্রায় ১০ লক্ষ টাকা।

এই গ্রামের শিল্পীরা যে বঁড়শী ও গালার চুড়ি তৈরি করেন সেগুলি রপ্তানি ক'রে, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। গালার চুড়ি শিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হ'ল প্রায় ১ লক্ষ টাকা এবং ৫০০ জন কারিগর এই শিল্পে নিযুক্ত আছেন।

সম্প্রতি প্রকল্পের কর্মীদের উৎসাহে এঁদের মধ্যে অনেকে শিল্প সমবায় সমিতি গঠন করেছেন। সমবায় সমিতি কাঁচামাল সংগ্রহ করতে এবং উৎপাদিত জিনিসগুলি বাজারজাত করতে এঁদের সাহায্য করে। এঁদের তৈরি জিনিসপত্র বিদেশের বাজারেও যাতে প্রতিযোগিতা করতে পারে সেজন্য দুর্গাপুর প্রকল্প বিভাগীয় ডিজাইন কেন্দ্র থেকে এঁদের জন্য নানা রকমের নতুন ধরণের ডিজাইন সংগ্রহ করে দিয়েছেন এবং এঁদের তৈরি জিনিসপত্র যাতে সোজাসুজি রপ্তানি করা যায় তার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছেন। এ পর্যন্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিই এঁদের গালার তৈরি জিনিসপত্র কিছু কিছু রপ্তানি করতেন।

ঘুটঘোরিয়ার কারিগররা খুব ভালো বঁড়শীও তৈরি করেন এবং এগুলি বিদেশ থেকে আমদানী করা বঁড়শীর তুলনায় একটুও খারাপ নয়। এই শিল্পের মাধ্যমে ২৫০ জন কারিগর তাঁদের জীবিকা অর্জন করেন। তবে মরশুমের সময়ে এঁদের সংখ্যা বেড়ে এক হাজারেরও বেশী হয়ে যায়। লোহা এবং ইস্পাত নিয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত কামাররাও তখন এই কাজে লেগে যান। এই বঁড়শী উৎপাদন শিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হ'ল ৫ লক্ষ টাকা। রপ্তানি উন্নয়ন পরিষদের মাধ্যমে এই বঁড়শী বিদেশে পাঠাবার প্রস্তাব করা হয়েছে।

দুর্গাপুর প্রকল্প এঁদের জন্য কাঁচা মাল সংগ্রহ করতে, এঁদের মূলধন সরবরাহ করতে, মাল বাজারজাত করতে এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরামর্শ করে নতুন কর্মসূচী তৈরি করতে সাহায্য করেন। এই গ্রামটিতে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ সুরু হলে আরও নতুন নতুন শিল্প গ'ড়ে উঠবে ব'লে আশা করা যাচ্ছে।

(১৪ পৃষ্ঠার পর)

আরও বলেন যে গ্রাম পঞ্চায়েৎ গুলির অধিবেশনে তর্কাতর্কি ও ঝগড়াঝাঁটিই বেশী হয়, ফলে কাজের চেয়ে কথাই হয় বেশী।

গ্রামে পঞ্চায়েতী কার্যসূচীর অঙ্গ হিসেবে কোনোও উৎপাদন সূচী বা উন্নয়ন সূচী আছে কি না জিজ্ঞাসা করা হ'লে প্রত্যেক পরিবার প্রধান জানালেন এমন কোনোও কার্যক্রমের কথা তাঁরা জানেন না।

এইসব দেখে শুনে পর্যালোচক দুজন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, যে কৃষির ব্যাপারে এবং গ্রামের শিল্পগুলির উন্নয়নে গ্রাম পঞ্চায়েতকে আরও উদ্যোগী হতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যগণকে নিজেদের রাজনৈতিক মতবাদ ভুলে গিয়ে একই লক্ষ্য নিয়ে গ্রামের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যে কাজ করতে হবে।

ধনধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে এবং তথ্য ও বেতার মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত হ'লেও 'ধনধান্যে' শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করে না। পরিকল্পনার বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী ক্ষেত্রে, উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতটা অগ্রগতি হচ্ছে তার খবর দেওয়াই হ'ল ধনধান্যের লক্ষ্য। সুতরাং 'ধনধান্যে' পড়ুন, দেশকে জানুন।

'ধনধান্যে' প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

নিয়মাবলী

- উন্নয়নী কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়।
- অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পুনঃ প্রকাশকালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার করা হয়।
- প্রত্যেক রচনা মনোনয়নের জন্যে আনুমানিক দেড় মাস সময়ের প্রয়োজন হয়।
- মনোনীত রচনা সম্পাদক মণ্ডলীর বিবেচনা অনুযায়ী প্রকাশ করা হয়।
- তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয়। কোনোও রচনার প্রাপ্তি স্বীকৃতি পত্র মারফৎ জানানো হয় না।
- নাম ঠিকানা লেখা ডাকটিকিট লাগানো খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা তিন মাস পরে আর রাখা হয়না।
- শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাবেন।
- গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেস ম্যানেজার, পাব্লিকেশন ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী। এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

প্রতিরক্ষা সামগ্রী সরবরাহে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির ভূমিকা

ভি. নাথ

সাম্প্রতিক কালে যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পূর্ণভাবে বদলে গেছে। অতি দূরের লক্ষ্যও সঠিকভাবে ভেদ করা যায় এই রকম রাইফেল ও কামান, সঠিকভাবে কার্যকরী সঙ্কেত প্রদান এবং টেলিফোন ও বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি উন্নত ধরণের সামরিক সাজ সরঞ্জাম বর্তমানে কার্যকরীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ভারত যদিও অনেক পরে প্রবেশ করেছে, তবুও এখানে এই সব আধুনিক অস্ত্র শস্ত্র তৈরি হচ্ছে। কাজেই এই সব যুদ্ধ সামগ্রী তৈরি করার জন্য দেশের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করা প্রয়োজন কিনা তা ভেবে দেখা উচিত। এই উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি এই প্রয়োজন কতখানি মেটাতে পারে সেগুলির উৎপাদন ক্ষমতা কতখানি ইত্যাদি বিষয়গুলি অনুসন্ধান করা উচিত। এই সম্পর্কে সঠিক তথ্যাদি সম্ভবত: সম্পূর্ণভাবে সংগৃহীত হয়নি। কাজেই এগুলির ক্ষমতা নির্ধারণ করা সম্পর্কে অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

এই সম্পর্কে একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার চেষ্টা অবশ্য করা হয়েছিল, কিন্তু সেটা স্বেচ্ছাধীন ছিল বলে খুব সফল হয়নি। কাজেই এই ক্ষেত্রে একটা আইনগত এবং বাধ্যতামূলক রেজিষ্ট্রেসন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়তো প্রয়োজন হবে। একবার এটা করা হয়ে গেলে, কোন কোন ব্যাপারে কি পরিমাণ সাহায্য পাওয়া যেতে পারে সরকার তখন তা বুঝতে পারবেন।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির মধ্যে অত্যন্ত সক্ষম এবং অপেক্ষাকৃত কম সক্ষম দুই ধরনের শিল্পই রয়েছে বলে এর সংজ্ঞাও অত্যন্ত ব্যাপক। কাজেই এইগুলিকে এই রকমভাবেই হয় তো শ্রেণীবিভক্ত করা প্রয়োজনীয় হতে পারে। দুই শ্রেণীর এই শিল্পগুলিকেই আবার মেকানিক্যাল, অটোমোবাইল ইঞ্জিনীয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং, কেমিক্যালস, ইত্যাদির মতো প্রধান প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। সরকারও তেমনি প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রীগুলিকে ঐ ধরণের মোটামুটি কয়েকটা শ্রেণীতে বিভক্ত করে ফেলতে পারেন। যদি দেখা যায় যে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিও পুরোপুরি কাজ সামলে উঠতে পারছে না তাহলে অল্প সক্ষম শিল্প সংস্থাগুলিকেও উৎপাদনের ভার দেওয়া যেতে পারে। হয়তো এমন বহু জিনিস থাকতে পারে, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, যেগুলি এ পর্যন্ত উৎপাদন করেনি, কিন্তু সামান্য কিছু যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করে বা উৎপাদনে কিছুটা পরিবর্তন এনে সেগুলি তারা উৎপাদন করতে সক্ষম হবে।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির ক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে একটি ক্ষুদ্রতর যুদ্ধ প্ল্যান্ট কর্পোরেশন গঠন করা হয়। এই ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি নিজেরা যে সব যুদ্ধ সামগ্রী উৎপাদনে সক্ষম, অথবা ক্ষুদ্রতর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করে যে সব জিনিস উৎপাদন করতে সক্ষম সেগুলির জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করার ক্ষমতা এই কর্পোরেশনকে দেওয়া হয়। এই কর্পোরেশন গঠন এবং ক্ষুদ্রতর কাজের আইন পাশ হওয়ার পর, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করা সম্ভবপর হয় এবং যুদ্ধ সামগ্রীর উৎপাদন বেড়ে যায়। বর্তমানে আমাদের দেশে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে যে রকম সুযোগ সুবিধে দেওয়া হয়ে থাকে সেইগুলিকেও সেই রকম কতকগুলি সুযোগ সুবিধে দেওয়া হচ্ছে।

এমন কি বৃটেনেও ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করার জন্য ৭০ জন ক্যাপাসিটি অফিসার নিয়োগ করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল যত ছোট প্রতিষ্ঠানই হোক আর যত দূরেই সেগুলি অবস্থিত হোক, জরুরি প্রয়োজনের সময় অথবা চাহিদা বেড়ে গেলে, সেগুলির সাহায্য পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয়ার্ধে যখন যন্ত্রাংশের চাহিদা খুব বেড়ে যায় তখন এই ব্যবস্থা খুবই কার্যকরী হয়।

প্রতিরক্ষার প্রয়োজন অবশ্য বিভিন্ন ধরনের। অস্ত্রশস্ত্র গোলা বারুদ থেকে আরম্ভ করে পোষাক, ওষুধপত্র এমন কি জলের বোতলও প্রয়োজনীয়। এগুলির মধ্যে কতকগুলি জিনিস অসামরিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাদন করতে পারে। কতকগুলি জিনিসের জন্য আবার বিশেষ ধরনের শিল্পের প্রয়োজন। এমন কতকগুলি সামরিক সম্ভার আছে যেগুলি কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সম্পূর্ণভাবে উৎপাদন করা সম্ভব নয়।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির, পরীক্ষা নিরীক্ষা করার মতো, নক্সা তৈরি করা বা উন্নয়ন করার মতো যথেষ্ট সুযোগ সুবিধে নেই। যদিও কতকগুলি প্রতিষ্ঠান যে কোন স্থানের এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের মতোই কার্যক্ষম, সেগুলির মধ্যে আবার অনেকগুলি ইঞ্জিনীয়ারিং ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে তেমন উৎসুক নন।

সামরিক সাজসরঞ্জাম উৎপাদন ব্যবস্থাকে দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে— যেমন যন্ত্রাংশ এবং অংশ উৎপাদন এবং অংশাদি দিয়ে সম্পূর্ণ জিনিসটি উৎপাদন। ক্ষুদ্রায়তন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান হয়তো সম্পূর্ণ কোন জিনিস উৎপাদনের দায়িত্ব গ্রহণ না করতে পারে, সেই ক্ষেত্রে সেই কাজের ভার কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া যেতে পারে।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে, সামরিক সম্ভার উৎপাদন করার দ্বিতীয় উপায়টা হ'ল, কয়েকটি প্রতিষ্ঠান 'প্রধান উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান' হিসেবে কাজ করবে এবং অংশগুলি সংগ্রহ করে সম্পূর্ণ জিনিস তৈরি করবে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি শুধুমাত্র অংশগুলি তৈরি করবে।

পরিকল্পনা ও সমীক্ষা

পরিকল্পনার কার্যকারিতা ও তার অগ্রগতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে সারা দেশের কলেজগুলিতে 'প্ল্যানিং ফোরাম' খোলা হয়েছে। কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এই 'ফোরামের' সভ্য হিসেবে পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁরা মাঝে মাঝে দল বেঁধে বেরিয়ে পড়েন বিভিন্ন গ্রামের বর্তমান অবস্থা কী এবং সেইসব গ্রামে পরিকল্পনার কোন প্রভাব পড়েছে কিনা কিংবা সে সব জায়গায় পরিকল্পনার সাড়া পৌঁচেছে কি না তার সম্যক ধারণার জন্যে। এই স্তম্ভে বিভিন্ন অঞ্চল সম্বন্ধে এইসব 'ফোরামের' সমীক্ষার বিবরণ দেওয়া হবে।

আকবরপুর

আসামের আকবরপুর গ্রাম থেকে হেঁটেই করিমগঞ্জ শহরে যাওয়া যায়। পূর্ব পাকিস্থানের সীমান্ত থেকে এই এলাকার দূরত্ব এক কিলোমীটারও নয়। পল্লী ভারতের উন্নয়নের প্রশ্ন ছাড়াও পাকিস্তান সীমান্তবর্তী এলাকা হিসেবে এই অঞ্চলটির উন্নয়নের বেশ গুরুত্ব আছে।

সম্প্রতি করিমগঞ্জ কলেজের 'প্ল্যানিং ফোরাম' অর্থাৎ পরিকল্পনা আলোচনাচক্রের তরফ থেকে এই অঞ্চলের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল। এই গোষ্ঠী যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন এই সমীক্ষায় তার আভাস পাওয়া যাবে।

আকবরপুরের অবস্থা বিশেষ উৎসাহজনক নয়। গ্রামে নামে মাত্র চারটি নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। সে সব স্কুলে না লেখাপড়া হয়, না স্কুল বাড়ীর তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা আছে। শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হয় কালেভদ্রে। দেখা হলেই যে যথারীতি পড়াশুনা হয় তাও বলা যায় না। গ্রামের লোক এতেই খুশী। করিমগঞ্জের স্কুল কলেজ হাতের নাগালের মধ্যে হলেও কেউই তাঁদের ছেলেমেয়েদের সেখানে পাঠায় না। প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে অক্ষর পরিচয় নামমাত্র। ফলে এই অঞ্চলের লোকদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার অত্যন্ত অভাব।

এককালে গ্রামের শতকরা দশটি পরিবার একান্নবর্তী ছিল। কিন্তু সে সব পরিবার ক্রমশঃ ভেঙে যাচ্ছে। শতকরা ৭০ জন লোক হয় পরিবার পরিকল্পনার নাম শোনেনি আর নয় তো শুনলেও সে সম্বন্ধে আগ্রহী নয়। বরং ক্ষেত খামারের কাজে সাহায্যের জন্যে সন্তান সংখ্যা বাড়ানোর দিকেই তাদের ঝোঁক। এমন কি কিছু লোক তো পরিবার পরিকল্পনার নাম শুনলে তেড়ে আসে। গত ১০ বছর জন্মের হার একই রকম আছে ১ : ০ : ৪০৮১।

আয়ের প্রধান অবলম্বন যদিও কৃষি, তবু শতকরা ৯০ জন লোকের আয়ের অন্য সূত্র আছে যার মধ্যে প্রধান হ'ল মাছ ধরা কিম্বা অন্যের কাজ করা। আকবরপুরে মুসলমান জেলেদের প্রাধান্য বেশী। এরা মাইমাল নামে পরিচিত। এখানে জীবন ধারণের মান খুব নীচু। মাথাপিছু আয়ের বার্ষিক হারে ভয়ানক বৈষম্য, সর্বনিম্ন মাত্রা যেখানে ৪০ টাকা সর্বোচ্চমাত্রা সেখানে ১৫০০ টাকা। অধিকাংশ লোক থাকে কাঁচা বাড়ীতে। সারা গ্রামে রেডিওর সংখ্যা মাত্র দু'টি। সাধারণভাবে দেখতে গেলে গ্রামের লোকজনের স্বাস্থ্য খুব খারাপ নয়, যদিও পুষ্টির অভাবজনিত অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়।

সারা দেশের সঙ্গে এই গ্রামটির যেন কোনোও সম্পর্ক নেই। এই গ্রামের মানুষগুলি পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার ঘোরতর বিরোধী। তারা এই প্রকল্পের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দিহান। শুধু এই নয়, আজ যেখানে সারা দেশে কৃষির ক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটাবার এত রকম চেষ্টা চলেছে, সেখানে আকবরপুরের মানুষগুলো রাসায়নিক সারের মর্ম বোঝে না, বুঝতেও চায় না। রাসায়নিক সার সম্বন্ধে তাদের অদ্ভুত কতকগুলো ধারণা আর ভয় আছে। যেমন তারা মনে করে এই সার ব্যবহার করলে জমির গুণ নষ্ট হয়ে যাবে, ফসলেরও ক্ষতি হবে।

পল্লী সমবায় সমিতিগুলোকে তারা সন্দেহের চোখে দেখে। তাদের মতে এই সমিতিগুলো শুধু বড় জমির কৃষকদের উপকারে লাগে, নিম্নবিত্ত কৃষকরা কোনোও সুবিধা পায় না। শতকরা ৮৩টি পরিবার ঋণগ্রস্ত অথচ সমবায়ের ক্ষেত্রে কোনোও কাজ হয়নি। পারিপার্শ্বিক ও প্রগতি সম্বন্ধে এদের উপেক্ষার মনোভাব তাদের অর্থনৈতিক জীবনে যেমন প্রতিফলিত তেমনই কৃষি ও শিক্ষাব ক্ষেত্রেও তার প্রভাব সুস্পষ্ট। এদের এই মনোভাব বদলাবার জন্যে বেশ ভালো প্রচার দরকার।

তবে একটা সুখের বিষয় হ'ল এই যে, সাধারণ আর ৫টা গ্রামের মত আকবরপুরে মামলা মোকদ্দমা প্রায় নেই বললেই চলে। পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই গ্রামটিকে সক্রিয় ক'রে তোলার প্রচুর অবকাশ আছে।

বালিতে ধানের চাষ

বালিতেও যে ধানের চাষ হ'তে পারে কৃষিবিজ্ঞানীরা তা' প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন। উক্রেইনের একটা জেলাতে ৫০,০০০ হেক্টর জমিতে এই পরীক্ষা চালানো হয়েছে। সেখানে প্রতি হেক্টরে ৫০ মেট্রিক সেন্টনার চাল উৎপন্ন হয়েছে।

বালিতে ধানের চাষ করার জন্যে প্রথমে জমি তৈরি করতে হয়। জমি তৈরি করার জন্যে প্রথমে বালির ওপরের স্তর সরিয়ে ফেলা হয়। তারপর রান্নায় ব্যবহার্য সাধারণ নুন মিশিয়ে দিয়ে ওপরে আবার বালি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর জলসেচ দিলে জলটা বালির তলায় জমতে থাকে এবং ভিজে কাদার মত হয়ে যায়। সেই স্তরটার জল চুঁইয়ে তলায় চলে যেতে পারে না এবং বালির নীচে ঐ নকল জলাভূমি ওপরের বালিকে সরস রাখে। এই অবস্থায় ধান রোয়া হয়।

পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, এই পদ্ধতিতেও বেশ ভালোরকম ফসল তোলা যায়।

'ধনধান্যে' পাঠরত
পশ্চিমবঙ্গের মখ্যমন্ত্রী
শ্রীঅজয় কুমার মখোপাধ্যায়

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পরিকল্পনাগুলির মধ্যে সমন্বয় অত্যন্ত প্রয়োজন

পরিকল্পনা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্ক কি রকম হবে তা নিয়ে সম্প্রতি যে বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছে, সেই সম্বন্ধে এখানে শ্রী এস. পি. মেহরা এবং ভি. এ. বাসুদেবরাজু এই দুই জন লেখকের মতামত প্রকাশিত হ'ল।

এপ্রিল মাসে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হন, এবং সংখ্যাধিক ভোটে চতুর্থ পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়। এটা একটা নতুন ব্যাপার এবং দেশে যে একটা নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিব সৃষ্টি হচ্ছে তার প্রতিফলন এতে দেখতে পাওয়া যায়।

১৯৬৭ সালের নির্ব্বাচনেই রাজ্যগুলির জন্য আরও বেশী ক্ষমতার দাবি তোলা হয়। এই দাবি যে পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হবে তা মনে হয়েছিলো। সম্প্রতি মোট বিনিয়োগের শতকরা ৪৫ ভাগ রাজ্যগুলিকে দেওয়ার জন্য এবং সম্পদের বরাদ্দও বাড়ানোর জন্য দাবি করা হচ্ছিলো। রাজ্যগুলির যুক্তি ছিলো যে ঘাটতি বাজেট ক'রে এই উদ্দেশ্যে আরও ৫০০ কোটি টাকা—তোলা যায়। ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থাদিও বদলানো প্রয়োজন বলে রাজ্যগুলি দাবি জানায়।

পরিকল্পনা কমিশন অবশ্য রাজ্যগুলির ভূমিকা স্বীকার করে। জনপ্রতি আয় অনুসারে যে কর আদায় হবে সেই অনুপাতে রাজ্যগুলিকে যে শতকরা ১০ ভাগ সাহায্য দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে তাতেই স্বীকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। বিস্তারিত-ভাবে সমন্বয় করে জেলা পর্য্যায়ে পরিকল্পনা তৈরী করার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃত হয়েছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় যদি রাজ্যগুলি আরও ভালো ফল দেখাতে পারতো তাহলে তাঁরা আরও বেশী অংশ পাওয়ার আশা করতে পারতো। অপরপক্ষে কর প্রচেষ্টা সম্পর্কে ইতস্তত: মনোভাব এবং বরাদ্দের বেশী টাকা ব্যয় করার ফলে, কেন্দ্রের ওপর রাজ্যগুলির নির্ভরতা ক্রমশ: বেড়েই চলে এবং অর্থসাহায্যটা পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রায় একটা সর্ত্ত হয়ে দাঁড়ায়। পর পর কয়েকটি অর্থ কমিশন রাজ্যগুলিকে আরও বেশী অর্থ বরাদ্দ করেন।

এই অবস্থাটা এখনও চলছে। অনেক রাজ্যের বাজেটেই ঘাটতিটা কি ক'রে পূরণ করা হবে তার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ করার জন্য কৃষি আয় এবং সহরাঞ্চলের সম্পত্তির মূল্যের ওপর কর নির্দ্ধারণ করার যে প্রস্তাব পরিকল্পনায় করা হয়েছে, তা রাজ্যগুলির কাছে বিশেষ রুচিকর হবে বলে মনে হয়না। অনেক রাজ্য ইতিমধ্যে ভূমি রাজস্ব ছেড়ে দিচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ হ'ল কোন রকম গণ্ডগোলের সৃষ্টি হতে পারে এই রকম কোন সিদ্ধান্ত তারা এড়িয়ে যেতে চান। রাজ্যগুলি নিজেরা অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ না ক'রে সেটা তারা কেন্দ্রের কাছে চান, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যখন কর বসিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে চান তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ তার সমালোচনা করতে ইতস্ততঃ করেন না।

৩০০ কোটি টাকার যে অতিরিক্ত ঘাটতি বাজেটের কথা উল্লেখ করা হ'ল (পরিকল্পনায় যে ৮৫০ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট তৈরী করার কথা বলা হয়েছে তা ছাড়াও) সেটারও যে খুব যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি আছে তা মনে হয়না। দেশের আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতেই ঘাটতি বাজেট করা যায়। ঘাটতি বাজেটের সঙ্গে সঙ্গে যদি সরবরাহের ক্রমোন্নতি না হয় তাহলে মূল্যের স্থিরতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। এই বিপদের জন্যই কমিশন সরকারি বিনিয়োগে ঘাটতির অংশ তৃতীয় পরিকল্পনায় শতকরা ১৩.২ ভাগ থেকে হ্রাস করে বর্ত্তমানে শতকরা ৫.৯ ভাগে এনেছেন।

রাজ্যগুলির বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং ঋণ পরিশোধ ব্যবস্থার পুনর্গঠনের প্রশ্ন পঞ্চম আর্থিক কমিশনের সুপারিশ না পাওয়া পর্য্যন্ত স্থির করা যাবেনা। এই কমিশনের সুপারিশ বর্ত্তমান পরিকল্পনাকালের মধ্যেই প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এ ছাড়াও রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে।

বড় একটা কেন্দ্রীয় তরফের উদ্দেশ্যও বুঝতে হবে। কেন্দ্রের বেশীর ভাগ অর্থ দুটি তরফে ব্যয় করা হয়। তা হ'ল সংগঠিত শিল্প এবং পরিবহন ও যোগাযোগ। শিল্পের ক্ষেত্রে, ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারীং, পেট্রো রসায়ন এবং খনিজ শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান প্রকল্পগুলির কাজ সম্পূর্ণ করা বা চালিয়ে যাওয়ার ওপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরিবহণ ও যোগাযোগ অন্যান্য শিল্প গড়ে তুলতে সাহায্য করে। কাজেই কেন্দ্রীয় তরফের কাজের ধারাই এমন যে তা অন্যান্য ক্ষেত্রের উৎপাদনেও সাহায্য করে।

প্রধানমন্ত্রী এই প্রশ্নটিকে উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ করেছেন। কেন্দ্রীয় বনাম রাজ্য পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করা অনুচিত। আসল প্রশ্ন হ'ল বিনিয়োগের হার বাড়াতে হবে আর্থিক অবস্থা ভালো করতে হবে। রাজ্য বা কেন্দ্রীয় যে পরিকল্পনার মাধ্যমেই হোক সাধারণ ভারতবাসী, তাঁদের অবস্থার উন্নতি চান এবং তা হলেই তাঁরা সন্তুষ্ট। কাজেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পরিকল্পনাগুলির মধ্যে যদি সামঞ্জস্য থাকে তাহলেই তাঁরা সবচাইতে বেশী উপকৃত হবেন।

রাজ্যগুলিতে, নিম্নস্তরের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকল্পনা তৈরী করা হয়নি

দেশের লোকসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ কার্য্যকরীভাবে সংহত করে দ্রুতগতিতে উন্নতি সাধন করা এবং জনগণের ক্রমবর্ধমান সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মেটানোই হ'ল অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য। অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সফল করে তোলার ক্ষেত্রে জনগণের ভূমিকাই যে প্রধান তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁরা কত তাড়াতাড়ি অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলির লক্ষ্য পূরণ করতে পারেন তার ওপরেই যে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূর করার উপায় নিহিত রয়েছে, জনসাধারণের তা শুধু বুঝলেই হবেনা তা অনুভবও করা চাই।

পরিকল্পনাগুলি তৈরী করা ও সেগুলিকে কার্য্যকরী করা এই উভয় ক্ষেত্রেই যদি জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করেন তাহলে তাতে বোঝা যায় যে, পরিকল্পনাগুলি সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরী করা হয়েছে এবং সেগুলি নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ করা হবে। সেইজন্যই গান্ধীজী নিম্ন স্তর থেকে পরিকল্পনা করার ওপরেই গুরুত্ব দিতেন। আমাদের মত দেশে নিম্ন স্তর থেকে পরিকল্পনার অর্থই হ'ল গ্রাম পর্য্যায়ের পরিকল্পনা।

জনসাধারণের কল্যাণের জন্য রাজ্য সরকারসমূহ যে সব প্রকল্প তৈরী করেন, চতুর্থ পরিকল্পনা হ'ল মূলতঃ সেগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধনকারী একটি দলিলপত্র। বর্ত্তমান পরিকল্পনা গঠনে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বের তিনটি পরিকল্পনার ক্ষেত্রেই প্রথমে পরিকল্পনার খসড়া তৈরী ক'রে রাজ্যগুলিকে দেওয়া হতো এবং খসড়ার সামঞ্জস্য রেখে রাজ্য পরিকল্পনাগুলির বিস্তারিত কর্ম্মসূচী তৈরী করা হতো। চতুর্থ পরিকল্পনায় যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তা মূলতঃ একেবারে ভিন্ন। নিম্নস্তর থেকে পরিকল্পনা তৈরী করার নীতি অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার ও পরিকল্পনা কমিশন রাজ্যগুলিকে তাদের পরিকল্পনা প্রথমে তৈরী করতে বলেন। পরিকল্পনা কমিশন এবং মুখ্যমন্ত্রীগণ তারপর রাজ্য পরিকল্পনাগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্ত্তনের পর রাজ্য পরিকল্পনাগুলি তারপর জাতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কাজেই জাতীয় পরিকল্পনা হ'ল রাজ্য ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণের তৈরী—পরিকল্পনাসমূহের সংহত রূপ।

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে চতুর্থ পরিকল্পনার প্রস্তুতি অনুমোদন করেন। পরিকল্পনা কমিশনের মুখপত্র "যোজনার" মাধ্যমে চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া সম্পর্কে মন্তব্য ইত্যাদি প্রকাশিত ক'রে, পরিকল্পনা কমিশন ভারতের নাগরিকগণের জন্যও একটা আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করেন। এই রকম ভাবেই চতুর্থ পরিকল্পনাটির কার্য্যসূচী তৈরী করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারসমূহ এবং জনসাধারণকে সংযুক্ত করা হয়।

রাজ্য পরিকল্পনাসমূহ

তবে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে এবং লোকসভায় যে সব আলোচনা হয়, তাতে চতুর্থ পরিকল্পনা তৈরীতে কেন্দ্র ও পরিকল্পনা কমিশন এই যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করলেন তা বিশেষ কোন প্রশংসা পেলোনা। বরং কেন্দ্র ও পরিকল্পনা কমিশন যে কাজ করেছেন তাতে ত্রুটি দেখানোতেই, মুখ্যমন্ত্রীগণ ও সংসদ সদস্যগণ এই আলোচনার সুযোগ গ্রহণ করলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় হ'ল, রাজ্যগুলি তাদের পরিকল্পনা তৈরী করার সময় যে দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতি গ্রহণ করেন সে সম্পর্কে কেউই, এমন কি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণও কোন রকম মন্তব্য করেন নি।

রাজ্যগুলি, তাদের পরিকল্পনা তৈরী করার জন্য মোটামুটি পুরো এক বছর সময় পেয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্যগুলিও "নিম্ন থেকে পরিকল্পনা" তৈরী করার নীতি পালন করেননি। রাজ্য সরকাগুলি থেকে নিম্ন পর্য্যায়ে জনগণের প্রতিনিধি স্বরূপ যে সব প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন আছে, সেগুলিকে পরিকল্পনা তৈরীর কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হয়নি। পরিকল্পনা তৈরী করার কাজে গ্রাম পঞ্চায়েৎ, পঞ্চায়েৎ সমিতি, জেলা পরিষদ, বিদ্বান ব্যক্তিগণ, রাজনৈতিক দলসমূহ এবং জনসেবাকারী ব্যক্তিগণকে সংশ্লিষ্ট করার গুরুত্ব রাজ্যগুলি বুঝতে পারেনি বলে মনে হয়। রাজ্য পরিকল্পনাগুলি নিয়ে প্রকাশ্য আলোচনারও ব্যবস্থা করা হয়নি। রাজ্য সরকারগুলির পক্ষে এটা একটা বড় ভুল। পরিকল্পনা তৈরী করার কাজে জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিগণ যোগ দেননি বলে, রাজ্যগুলির বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন ও আকাঙ্খা কতখানি পূর্ণ হবে তা জানা যায়না।

অন্য দেশের খবর

সিরিয়ায় ভূমি পুনরুদ্ধার

সিরিয়া, ওরোনটীস নদীর তীরবর্তী 'ঘাব' উপত্যকাটিকে উর্বরা ও শস্যশ্যামলা করার একটি পরিকল্পনায় হাত দিয়েছে। ১,৮০,০০০ একরের এই উপত্যকাকে পুনরুজ্জীবিত করার কাজে সহযোগিতা করছে আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থা; রাষ্ট্রসঙ্ঘের উন্নয়ন কার্যসূচীর কর্মীরাও সহায়তা করছেন।

আনসারিয়েহ্ ও জাউইয়েহ্—এই দু'টি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণীর মধ্যে রয়েছে ঘাব উপত্যকা, সিরিয়ার প্রধান শহরগুলির অন্যতম আলেপ্পো শহরের দক্ষিণে।

১৯৪৯ সালের কথা। ভূমি বিশেষজ্ঞরা হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে, ঘাব উপত্যকায় যে হ্রদটি রয়েছে সেটি আসলে হ্রদ নয়। তাঁরা দেখলেন যে, উপত্যকার উত্তর প্রান্তে মাটি ও পাহাড়ের যে প্রাচীর হ্রদের জলধারাকে একদিক থেকে বেঁধে রেখেছে তা' একটা বিরাট ধ্বসের ফলে সৃষ্টি হয়েছে।

১৯৫৬ সালে একটি ওলন্দাজ কোম্পানী বিস্ফোরক দিয়ে ঐ প্রাচীরটা উড়িয়ে দিলে ওরোনটীস নদীর জল আবার প্রবাহিত হল।

তারপর ওরোনটীসের প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে মাহারদেহ ও আশারনেহ-তে দুটি বাঁধ তৈরি করা হল। হ্রদটি শুকিয়ে যাবার পর দেখা গেল, সেখানকার জমি চাষের উপযোগী এবং উর্বরা।

১৯৬৩ সালে আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বিশেষজ্ঞদের একটি দল এই জমির প্রাণশক্তি বৃদ্ধির কাজে এগিয়ে এলেন। চার বছর কেটে গেল। ধীরে ধীরে তুলো, ভুট্টা ও বালির ক্ষেতে ভরে গেল এলাকাটা। কোনোও কোনোও জমি গম চাষের উপযুক্ত বলেও গণ্য করা হ'ল। ধীরে ধীরে এধারে ওধারে ছোট ছোট বসতি মাথা তুললো।

নতুন নতুন পদ্ধতি পরীক্ষা

উপত্যকার উত্তর পশ্চিম অংশে ২৫০ হেক্টার জমি বেছে নেওয়া হ'ল পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্যে। এই জমিতে সমবায় ভিত্তিতে একটা খামার স্থাপনের ব্যবস্থা করা হ'ল। পালা করে শস্য চাষের পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে সমবায় ভিত্তিতে কৃষিযন্ত্র ও অন্যান্য যান্ত্রিক সরঞ্জাম প্রবর্তন করার এবং সমবায় রীতিতে জলসেচের সুবিধা অসুবিধা নিরূপণ করা হ'ল। তারপর জলসেচের জন্যে খাল ও নালা তৈরি করা হয়।

উন্নয়ন বার্তা

★ রাজস্থানের রাণাপ্রতাপ সাগর বাঁধের চতুর্থ বা শেষ জেনারেটরটি চালু করা হয়েছে। এর ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মোট ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ১৭২ মেগাওয়াট।

★ দক্ষিণ কোরিয়ার জন্যে ভিলাই ইস্পাত কারখানায় যে রেল তৈরি হয়েছে তার ৭,৫০০ টনের প্রথম কিস্তি বিশাখাপত্তনম বন্দর থেকে জাহাজে করে চালান দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া হিন্দুস্থান ইস্পাত লিমিটেডকে ৪.৫ কোটি টাকার রেল তৈরির বরাত দিয়েছে।

★ পশ্চিমবাংলায়, কোচবিহার জেলার ২২টি গ্রামে অক্ষর পরিচয়হীন বলতে এখন কেউই প্রায় নেই। প্রত্যেকটি গ্রামে ১০-১৫টি অক্ষর পরিচয় কেন্দ্র খুলে গত ছ'মাসের মধ্যে নিরক্ষরতা নির্মূল করা হয়েছে।

★ ভারত হেভি ইলেক্‌ট্রিক্যালস্-এর তিরুচিরপল্লীর কারখানা চার লক্ষ টাকার ভ্যালভ রপ্তানী করার জন্যে পোল্যাণ্ডের কাছ থেকে বরাত পেয়েছে। পোল্যাণ্ড কৃত্রিম সার, রাসায়নিক জিনিস ও অন্যান্য শিল্পে ব্যবহারের জন্যে এই সব ভ্যালভ আমদানী করছে।

★ ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এমন একটা নতুন জাতের ভুট্টা উদ্ভাবন করেছে যার প্রোটীন অংশ দুধের প্রোটীন অংশের চেয়েও বেশী।

★ দুর্গাপুর মিশ্র ইস্পাত কারখানা, পারমাণবিক শক্তি পরিকল্পনাগুলির জন্যে, একটি বিশেষ ধরনের ক্রোমিয়ামযুক্ত ইস্পাত তৈরি করতে সুরু করেছে। এ পর্যন্ত এ জিনিস প্রধানতঃ ক্যানাডা থেকে আমদানী করা হত। এই কারখানা রাজস্থান পারমাণবিক শক্তি পরিকল্পনার জন্যে ইতিমধ্যে এই নতুন ইস্পাত ৭ টন পাঠিয়েছে।

★ আমাদের দেশে, তৈলক্ষেত্রগুলি থেকে পাইপ লাইনের মধ্যে দিয়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের চালান সুরু হচ্ছে। এর প্রথম গ্রাহক হ'ল বরোদা শহর। আঙ্কলেশ্বর তৈলক্ষেত্র থেকে এই গ্যাস পাঠানো হবে। গ্যাসের জন্যে পাইপ লাইন বসাবার কাজ সুরু হবে আগছে মাসে।

★ বরোদার কাছে গুজরাট রাষ্ট্রীয় সার কারখানা সম্প্রসারিত করে দুটি নতুন জিনিস তৈরির প্রস্তুতি পর্বে হাত দেওয়া হয়েছে। ইউরিয়া ও এ্যামোনিয়া তৈরির কাজ সুরু হয়েছে। ইউরিয়া কারখানায় দৈনিক ৮শো টন ইউরিয়া উৎপন্ন হবার কথা। চালু হয়ে গেলে এটি হবে বিশ্বের বৃহত্তম।

★ ১৯৬৮-৬৯ সালে চন্দন তেল রপ্তানী করে মহীশূর চন্দন তেলের কারখানা ১.৭০ কোটি টাকার সমান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে।

★ উত্তর বোম্বাই এর 'আরে' দুগ্ধ কেন্দ্রে গবাদির খাদ্য উৎপাদনের জন্যে একটি আধুনিক কারখানা চালু করা হয়েছে। ২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি এই কারখানার দৈনিক উৎপাদনের পরিমাণ হবে প্রায় ১০০ টন।

★ আসামের দেরগাঁওতে তৈরি প্রথম ডিসটিলারীতে কাজ সুরু হয়ে গেছে। সমবায় ক্ষেত্রে ১২ লক্ষ টাকার ওপর ব্যয় করে এই ডিসটিলারী স্থাপন করা হয়েছে। পুরোপুরি চালু হয়ে গেলে এই কারখানায় শিল্পে ব্যবহার্য এলকোহল্ প্রতিদিন ২ হাজার গ্যালন হিসেবে তৈরি হতে থাকবে।

★ এ বছরের প্রথম চার মাসে সোভিয়েট ইউনিয়নে কাজু বাদামের রপ্তানীর উর্ধগতি বজায় ছিল। গত বছরের এই ক'মাসের তুলনায় এ বছরের পরিমাণ ছিল প্রায় দ্বিগুণ। এ বছরের জানুয়ারী মাস থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারত থেকে ১০ হাজার টনের ওপর কাজু আমদানী করেছে।

★ দিল্লীর কাছে মোহন নগরে ভারতের প্রথম চলচ্চিত্র বা ছায়াচিত্র নগরীর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। ২৫০ একর জমির ওপর এই নগরী স্থাপন করা হবে। দেশের ও বিদেশের চিত্র প্রযোজক গোষ্ঠিরা আউটডোর শুটিং ও স্টুডিও সুটিং-এর ব্যবস্থার সঙ্গে ছায়াচিত্র প্রোসেসিং-এর সুযোগ সুবিধা পাবেন। এই চিত্রনগরী স্থাপনের কাজ শেষ হবে ১৯৭১ সালে।

★ দেরাদুনের আরণ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা দেশীয় উপকরণ দিয়ে ব্রেল কাগজ তৈরির একটি প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছেন। এই আবিষ্কারের ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ঘটবে।

★ জাতীয় বীজ কর্পোরেশন বীজ রপ্তানী করতে সুরু করেছে। কর্পোরেশন এ পর্যন্ত সিংহল, মালয়েশিয়া ও ঘানায় ভুট্টা, জোয়ার ও শাক সব্জীর বীজ কিছু কিছু রপ্তানী করেছে।

★ ভারত ১৯৬৮-৬৯ সালে লৌহ আকর রপ্তানী ক'রে ৮৩ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। ১৯৬৭-৬৮ সালের রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৭১ কোটি টাকা।

★ ১৯৬৮-৬৯ সালে ভারতের রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

★ হায়দ্রাবাদের বেগমপেট বিমান বন্দরে ভারতে তৈরি প্রথম রেডার যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছে। এই যন্ত্রটির সাহায্যে আবহাওয়ার খবরাখবর জানা যাবে। মাঝারি শক্তির এই রেডার যন্ত্রটি ভারত ইলেক্‌ট্রোনিক্সে তৈরি করা হয়েছে। এঁরা নতুন দিল্লীর পালাম বিমান বন্দরের জন্য আর একটি রেডার যন্ত্র তৈরি করছেন। এই রেডারটি বসানো হলে প্রধান প্রধান ১০টি বিমানবন্দরে ঝড়ের পূর্বাভাষ জানানোর জন্য ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগের হাতে ১০টি রেডার যন্ত্র থাকবে।

★ তরল প্যারাফীন তৈরীর একটি নতুন যন্ত্র বোম্বাই-এ চালু করা হয়েছে। এতে উৎপাদন শুরু হ'লে ২৫ লক্ষ টাকার সমান বিদেশী মুদ্রার আশ্রয় হ'বে।

REGD. NO. D-233

'প্রেরণার বাণী'

আমরা নিজেদের খৃষ্টান, হিন্দু বা মুসলমান বলে ঘোষণা করতে পারি বটে কিন্তু এই বাইরের পরিচয়ের অন্তরালে আমরা যে এক ও অভিন্ন এ বিষয়ে সংশয় নেই। আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যে জীবনের বহু ক্ষেত্রে মুসলমান, খৃষ্টান ও হিন্দুর মধ্যে অমিলের চাইতে মিলই বেশী।

এখনই আমাদের এক ও অভিন্ন কোনোও ধর্মের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন পরস্পরের ধর্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা। আমরা এমন একটা লক্ষ্য স্থির করতে চাই না যেখানে সকলেই এক হয়ে যাবে। আমরা চাই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য।

যাদের জন্ম এ দেশে, যারা বড় হয়ে উঠেছে এই দেশে, যাদের অন্য দেশ নেই —ভারত তাদেরই। অতএব ভারত শুধু হিন্দুদেরই নয়—ভারত, পার্সী, ভারতীয় খৃষ্টান, মুসলীম ও অন্যান্য সকলের।

মানুষ ও তার কর্ম দুটি সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। অতএব শুভ কাজের প্রশস্তি ও অন্যায় কাজের নিন্দা করা প্রয়োজন।

'পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে নয়'—এই নীতিবাক্য উপলব্ধি করা যত সহজ সেই অনুযায়ী এই নীতি আচরণে প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন; তাই বিদ্বেষের বিষ আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

বয়স ও পারিবারিক পরিবেশ যাই হ'ক না কেন—প্রত্যেককেই নৈতিক শিক্ষা দেওয়া উচিত।

সত্যের পূজারী তাঁর কর্মক্ষেত্রে চিরাচরিত রীতি নীতি সবদা অনুসরণ নাও করতে পারেন। তাই আত্মসংস্কারের জন্যে তাঁকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। কখনও কোনো ভুল করলে তা স্বীকার করে নিজেকে তাঁর সংশোধন করতে হবে।

প্রেম দাবী করে না, প্রেম দিয়েই সুখী। প্রেম চিরকাল দুঃখকে বরণ করে নেয় কখনও বিদ্বেষ পোষণ করে না কিংবা প্রতিশোধ নিতেও উদ্যত হয় না।

ক্রোধ এক ধরনের উন্মত্ততা। বহু মহৎ কাজের স্রষ্টা এই সাময়িক মত্ততার বশবর্তী হয়ে শুভকাজের সমস্ত সুফল ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

আলো আলোর বাণী বয়ে আনে, অন্ধকারের নয়। যে কোনো শুভ উদ্দেশ্য প্রণোদিত মহৎ কাজ পুরস্কৃত হবেই।

যাঁরা সমাজের দোষ ত্রুটি সংস্কারের কাজে প্রবৃত্ত রয়েছেন, তাঁদের একটা নির্দিষ্ট কর্মধারা অনুসরণ করে চলতে হবে এবং আশু সাফল্য যদি লাভ নাও করেন তাহলেও তাঁদের হতাশ হওয়া সঙ্গত নয়।

ঈশ্বরের কাছে সকল নরনারী সমান। কেউ অন্য ধর্মে বিশ্বাসী হলেই তাকে ঘৃণা করা পাপ। এই ঘৃণার মনোভাবই হ'ল অস্পৃশ্যতা।

কৃষ্টি বা সংস্কৃতির ইতিহাস সন্ধান করতে গিয়ে আমার এই উপলব্ধি হয়েছে যে, সনাতন হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে যা কিছু শাশ্বত তার প্রত্যেকটি যীশু, বুদ্ধ, মোহাম্মদ ও জোরায়াস্টারের বাণীতে নিহিত আছে।

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে এমন দিন একদিন আসবে যেদিন বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী মানুষরা স্বধর্মের মতই অপরকে অন্যের ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হবে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান শ্রেয়। আমরা ঈশ্বরের সন্তান অতএব আমাদের মধ্যে ভেদাভেদ নেই, আমরা সমান, আমরা এক।

মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টির জন্যে ধর্ম নয়। তার উদ্দেশ্য হ'ল ঐক্যের প্রতিষ্ঠা।

প্রাচীনকালে যে ঋষিরা হিংসার মধ্যেও অহিংসার আদর্শ আবিষ্কার করেছিলেন তাঁরা নিউটনের চেয়েও মহৎ প্রতিভার অধিকারী এবং ওয়েলিংটনের চেয়েও বড় যোদ্ধা ছিলেন।

অন্যের প্রতি আচরণে যে ব্যক্তি অহিংসার আদর্শ অনুসরণ না করে মনে করেন আরও বড় কোনোও ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করবেন তিনি ভীষণ ভুল করবেন। অন্যের প্রতি সদ্ব্যবহারের মত অহিংসাও পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রথম প্রযোজ্য।

যে ব্যক্তির জীবন সত্য ও অহিংসার ওপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর কাছে পরাজয় বা নৈরাশ্য শব্দগুলি অর্থহীন।

সত্যকার প্রেম সমুদ্রের মত অনন্ত, উত্তাল, উদ্বেল। তা' সমুদ্রের মত নিজেকে ছড়িয়ে দেয়, দেশ জাতি, ধর্মের সমস্ত প্রাচীর ছাপিয়ে সারা বিশ্বকে আলিঙ্গন করে।

যে জাতি অসীম ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত সেই জাতি পরম শ্রেষ্ঠত্বে উপনীত হতে পারে। ত্যাগ যত পবিত্র, ততই দ্রুত তার ঊর্ধ্বগতি।

অন্যের চেয়ে নিজেকে ছোট বা বড় মনে করলে সাম্যের মনোভাব আসতে পারে না। যেখানে সকলে সমান সেখানে একের অন্যের প্রতি আনুকূল্য বা দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের প্রশ্ন ওঠে না।

ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সোসাইটি লিঃ—করোলবাগ, দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত এবং ডাইরেক্টার, পাবলিকেশন্‌স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত।

ধন ধান্যে

প্রথম বর্ষ : ৪ : ২০শে জুলাই, ১৯৬৯

২৫ পয়সা

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত
পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা

২০শে জুলাই ১৯৬৯ : ২৯শে আষাঢ় ১৮৯১
Vol 1 : No 4 : July 20, 1969

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০

টেলিগ্রাফের ঠিকানা—যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

ভুলি নাই

ক্ষুধার্তের কাছে খাদ্যই ভগবান

—মহাত্মা গান্ধী

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়

বেকার সমস্যা

কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোই পরিকল্পনাগুলির অন্যতম লক্ষ্য এ কথা এতবার বলা হয়েছে এবং এখনও বলা হচ্ছে যে জনসাধারণ যদি এই দাবিগুলি সম্পর্কে একটু সন্দিহান হয়ে পড়েন তাহলে তাঁদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

বেকার সমস্যার গুরুত্ব প্রমাণ করার জন্য পরিসংখ্যানের প্রয়োজন হয় না। এ কথা সত্য যে, এই সমস্যাটি ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠছে এবং এর সমাধানের জন্য কোন চেষ্টা না করা হলে এবং অবিলম্বে কিছু না করা হলে তা যে ভয়াবহ হয়ে উঠবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। জনসাধারণের সর্বশ্রেণীর মধ্যে এই বেকার সমস্যা যে হতাশার সৃষ্টি করছে, আমাদের পরিসংখ্যানের সব সংখ্যাও সেই তুলনায় বেশী নয়।

পল্লীগুলিতে শিল্প স্থাপন, স্কুলে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু হাতের কাজ শেখানো, ব্যাপক ও সম্প্রসারিত প্রশিক্ষণ-সূচী ইত্যাদির মতো সমাধানগুলি সবই উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং সবই সমস্যা সমাধানে সহায়ক হতে পারে।

প্রায় প্রত্যেকেই এই প্রশ্নটি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন, কিন্তু কেউই সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এটা বিবেচনা করতে পারছেন বলে মনে হয় না। তা নাহলে পূর্বে যে সব পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং এখনও দেওয়া হচ্ছে সেগুলি কার্যকরী করার জন্য আবার চেষ্টা করা হচ্ছে না কেন আর করলেও কেনইবা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে তার সামান্য কিছু অদলবদল করা হচ্ছে।

যদি কেউ সম্পূর্ণ পরিবর্তন চান তাহলে তাঁর নিজেকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে হবে যে আমাদের পরিকল্পনার সঙ্গে গান্ধীজীর আদর্শের কোন মিল আছে কিনা। দৃষ্টিভঙ্গী যত সূক্ষ্মই হোক, তা সমাজের সূক্ষ্মতর সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারে না। বেকার সমস্যার প্রশ্নটিও, এই বৃহত্তর সমস্যার একটা অংশ মাত্র। হাসপাতালে চিকিৎসার সমস্ত রকম সাজসরঞ্জাম থাকলেও গ্রাম বা সহরের অশিক্ষিত পুরুষ বা নারী অনেক সময়েই হয়তো জানেন না যে, এক্স-রে ফটো কোথায় তোলা হয়। কারণ হাসপাতাল তৈরি করার সময় হয়তো অনুসন্ধানের উত্তর দেওয়ার কক্ষের কথা ভাবা হয়নি অথবা সেটা হয়তো ভুল জায়গায় তৈরি করা হয়েছে।

কারণ কেউ যদি কেবলমাত্র চিকিৎসার সুযোগ সুবিধের অপ্রতুলতা লক্ষ্য করেন, এবং ডাক্তার ও নার্সদের কাজের বোঝা দেখেন, তাহলে তিনি ভাববেন যে এই ক্ষেত্রে অবিলম্বে কিছু করা প্রয়োজন।

দেশের এতো যুবক যুবতী যখন তাঁদের উদ্দেশ্য সফল করে তোলার জন্য একটা উপায় খুঁজছেন, তখন মৌলিক সুযোগ সুবিধেগুলির সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের প্রশ্ন কিংবা সম্পদের প্রতুলতা অপ্রতুলতার যুক্তি বুঝে ওঠা একটু কঠিন হয়ে পড়ে। এখানে সমস্যা হ'ল আশু উদ্দেশ্য এবং ভবিষ্যত প্রয়োজনের সঙ্গে প্রতিটি প্রকল্পের যোগ রক্ষা করা। অনেক সময়েই উদ্দেশ্যের ওপর জোর দেওয়া হয় এবং আশু প্রয়োজনগুলি মেটাবার ব্যবস্থা করা হয় না।

আমাদের এই দেশে যেখানে বাসগৃহ, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, স্কুল ইত্যাদি নানা জিনিসের বিপুল অভাব রয়েছে, সেখানে আমাদের দেশের নারী পুরুষদের জন্য যথেষ্ট কাজ নেই এই কথাই কি আমাদের বুঝতে হবে?

এই সব হাসপাতাল বা স্কুলই যে সমস্যার সমাধান করতে পারবে তা নয়, কিন্তু জনসাধারণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এমন ভাবে কাজ সুরু করা যেতে পারে—যাতে জনসাধারণের চিন্তাধারায় পরিবর্তন আসবে এবং আমরা বিরাট কর্মসূচীগুলির প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে ক্ষুদ্র প্রয়োজনগুলিকে উপেক্ষা করবো না।

যে সরকারের সঙ্গে জনগণের ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে, সেই সরকার যতটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁদের সমস্যার সমাধান করবেন, দূরস্থিত সরকারের পক্ষে তা' সম্ভবপর নয়। দূরের সরকারের আর্থিক ক্ষমতা সফলভাবে প্রযুক্ত না হয়ে অনেক সময়েই তা সহরের কয়েকজনের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে এবং মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত পরগাছা শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। অপরপক্ষে ক্ষুদ্রতর সরকারগণের হয়তো ব্যাপক আর্থিক ক্ষমতা না থাকতে পারে অথবা কয়েকটি সরকার ঐক্যবদ্ধ হয়ে তা অর্জন করতে পারে, কিন্তু তবুও সেগুলি সমাজকে পরগাছা থেকে মুক্ত করতে পারে, কারণ আমলাতন্ত্র এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাগুলি থেকেই পরগাছা শ্রেণীর সৃষ্টি হয়।

বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে ভারতের সমস্যাগুলির সমাধান করা সম্ভব নয়। বিশেষজ্ঞগণের একটা যুক্তিসঙ্গত স্থান আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু যতই বিজ্ঞোচিত সমাধান হোক না কেন তাকে শেষ সমাধান বলা যায় না। তা না হলে যে দেশে উন্নয়নের এতো অবকাশ, এতো কাজ রয়েছে সেখানে ইঞ্জিনীয়ারগণের মধ্যে কর্মহীনতার সমস্যার সৃষ্টি হতো না। এটা এসেছে তার কারণ হ'ল মূলধন এবং অর্থ সম্পদের মতো কথাগুলি খুব চতুরতার সঙ্গে বলা হয়েছে কিন্তু জনসাধারণের মৌলিক জীবন দর্শনের সম্ভাবনাগুলির কথা ভাবা হয়নি।

কেবলমাত্র প্রশাসন ব্যবস্থাই আমাদের সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারবে কিনা এই প্রশ্নটি বিবেচনা ক'রে দেখার যোগ্য। বড় বড় কথা ভাবা ভালো তবে তা যেন আমাদের আধুনিকতা প্রকাশের একটা উপায় হয়ে না দাঁড়ায়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারের চিন্তা করাটাও খারাপ নয়।

পারমাণবিক বিদ্যুৎশক্তির প্রাণকেন্দ্র

তারাপুর

মহারাষ্ট্রের তারাপুরে দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়েছে। পাঁচ বছর পূর্বেও এটি ছিল দেশের একটি অনুন্নত অঞ্চলের অতি নগণ্য একটি গ্রাম, কিন্তু বর্তমানে এটি হ'ল ভারতের একটি বিখ্যাত স্থান। পরমাণু শক্তির সাহায্যে উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তি এখান থেকে পশ্চিম ভারতের দু'টি শিল্পোন্নত রাজ্য গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে পাঠানো হচ্ছে।

ভারতে এই প্রথম ২০০ মেগা ওয়াটের দু'টি টারবাইনের একটি বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন কেন্দ্র কাজ সুরু করছে। দু এক মাসের মধ্যেই এখান থেকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বোম্বাই থেকে ১০০ কিঃ মীঃ দূরে অবস্থিত তারাপুরে কয়েক বছর পূর্বেও ইতস্ততঃ ছড়ানো দুই একটি কুঁড়ে ঘর ছাড়া আর কিছু ছিল না। এখন সেখানে ৪৫ মীটার উঁচু বিরাট আকারের একটি কন্‌ক্রিটের বাড়ী, কুতুব মীনারের মতো একটা মীনার এবং বিপুল আকারের সারি সারি

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

রসকট কৃষ্ণ পিল্লে

চিত্র

তা. সু. নাগরাজন

সুইচ। এটায় আছে পারমাণবিক রি-এ্যাক্টার। এখানে এলে মনে হয় দেশ যেন গরুর গাড়ীর যুগ ছাড়িয়ে হঠাৎ পারমাণবিক যুগে পৌঁছে গেছে। তারাপুরের কাছাকাছি রেলষ্টেশনটির নাম হ'ল বয়সার। বয়সার স্টেশনে এলেও মনে হয় না যে ১৫ মাইল দূরেই রয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম নিদর্শণ পারমাণবিক কেন্দ্রটি। তবে যখন কোনও বিদেশী অতিথিকে নিয়ে বিরাট মোটর গাড়ী এই অখ্যাত সহরটির মধ্যে দিয়ে চলে যায় তখন যেন আধুনিকতার খানিকটা সাড়া পাওয়া যায়।

বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য এখানে ৪০০ মেগা ওয়াট শক্তির যে কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছে, ভারতের অন্য কোথাও বোধ হয় এতো অল্প সময়ের মধ্যে এই রকম কোন কেন্দ্র নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। তবে বিদেশী কন্ট্রাক্টাররা যে সব যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেন সেগুলির কোন কোনটায় অল্প স্বল্প ত্রুটি থাকায়, কেন্দ্রটিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ সুরু হতে কিছুটা দেরী হয়।

উত্তাপ সৃষ্টির জন্য রিএ্যাক্টারে জ্বালানি দেওয়ার আগে প্রথমতঃ নানা রকম পরীক্ষার সময় কয়েকটা স্টেইনলেস্ স্টীল দিয়ে তৈরি যন্ত্রে চিড় খাওয়ার সামান্য চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। চুলের মতো অতি সামান্য ফাটা হলেও তা উপেক্ষা করা হয়নি।

এই সব যন্ত্রাদি সরবরাহ করার প্রধান কন্ট্রাক্টার ছিলেন আমেরিকার ইন্টারন্যাশনাল জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানী। এঁরা তখন নিজেদের ব্যয়ে, স্টেইনলেস স্টীলের সব যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখেন। ফলে এঁরা স্টেইনলেস স্টীলে তৈরি যে ১৭০০ টিউব সরবরাহ করেছিলেন সেগুলি সমস্ত ফিরিয়ে দিয়ে গিয়ে নতুন টিউব দেন। কন্ট্রাক্টাররা যখন বুঝতে পারলেন যে এগুলিতে ত্রুটি আছে তখন তাঁরা বিমান যোগে আবার নতুন টিউব পাঠিয়ে দেন।

প্রতিটি যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ অত্যন্ত সাবধানে পরীক্ষা করে নিতে হয় বলে এবং কোন রকম গোলমাল যাতে না হয় সেজন্য অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানী করতে হয় বলে, কেন্দ্রটিতে কাজ সুরু করতে প্রায় আট মাস দেরী হয়।

একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করতে সাধারণতঃ ৬।৭ বছর লাগে। তারাপুরের পারমাণবিক বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন কেন্দ্রটির কাজ ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে সুরু হয়। ৪৮ মাসের মধ্যেই এখানে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন সুরু করা যাবে বলে প্রথমে স্থির করা হয়। পারমাণবিক বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন কেন্দ্র

রি-এ্যাক্টারের মৌচাকের মতো টিউবসমূহ

কোন জরুরী পরিস্থিতিতে রি-এ্যাক্টার বন্ধ করার জন্য স্ক্র্যাম এ্যাকুমুলেটার। খুব দ্রুতগতিতে নিয়ন্ত্রণকারী রড বসাবার জন্য এগুলি ব্যবহার করা হয়।

তৈরি করাটা আমাদের দেশের পক্ষে একেবারে নতুন ছিল এবং এই রকম একটা জটিল কাজে পদে পদে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

কেন্দ্রটিতে কাজ সুরু হলেও এখনও পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়। ফেব্রুয়ারি মাসেই রিএ্যাক্টারে জ্বালানি দিয়ে দেওয়া হয়। এখানে যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা হয় তা পরীক্ষামূলকভাবে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে সরবরাহ করা হয়। বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে একেবারে শূন্য থেকে ওপরের দিক পর্যন্ত নানা রকম পরীক্ষা চালানো হয়। রিএ্যাক্টার যখন ১৫০ মেগা ওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করছিল তখন হঠাৎ তা বন্ধ করে দিয়ে সমস্ত যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ পরীক্ষা করে দেখা হয়। যখন বেশী বা কম পরিমাণে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা হতে থাকে তখন সব যন্ত্রগুলি একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সঠিকভাবে কাজ করে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। এমন কি যন্ত্রে ত্রুটি ঘটিয়ে সেগুলির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে আবার সংশোধন করে তার ফল লক্ষ্য করা হয়েছে। কন্ট্রাক্টারের ব্যয়েই এই পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে এবং ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা সম্পর্কে কেন্দ্রটি এখন প্রায় তৈরি। পরীক্ষা নিরীক্ষার সময়েও দুই কোটি ২০ লক্ষ ইউনিট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করে মহারাষ্ট্রে, গুজরাটের লাইনে দেওয়া হয়েছে।

যাদুকরের কাঠির ছোঁয়ায় যেন সব বদলে গেছে

গত কয়েক মাসে তারাপুরে যে পরিবর্তন এসেছে তা যেন যাদুর খেলা। প্রায় ২০ মাস আগে শত শত কর্মী বিপুল আকারের সব যন্ত্রপাতি নিয়ে অবিরাম কাজ করেছেন। দৈত্যের মতো এক একটা ক্রেনের ঘর্ঘর শব্দ, শ্রমিক ও কর্মীদের কোলাহল দিনের সর্বক্ষণ জায়গাটাকে মুখর করে রাখতো। রিএ্যাক্টার বসাবার জন্য কনক্রিটের বাড়ীটি তৈরি করে তাতে

২৭০ টন ওজনের যন্ত্রটি বসানো হয়েছে। এই বাড়ীটির চতুর্দিকে ছিল শ্রমিকদের কুটির।

এখন কিন্তু তারাপুর শান্ত ও সুশৃঙ্খল। বাইরের শান্ত পরিবেশ দেখে বোঝা যায় না বাড়ীটির ভেতরে কি ভীষণ কর্মব্যস্ততা। এখানকার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটিতে কিন্তু প্রধান ইঞ্জিনীয়ার থেকে নতুন শিক্ষার্থী পর্যন্ত সকলেই যুবক।

বিশ্বে সর্বপ্রথম

একই বাড়ীতে এই রকম দুটি রিএ্যাক্টার বিশ্বের অন্য কোন দেশে স্থাপন করা হয়নি। তবে দুটি রিএ্যাক্টারের জন্য অভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যায় বলে যথেষ্ট ব্যয় সঙ্কোচ করতে পারা গেছে। পাঁচ তলা বাড়ীটির সর্বোচ্চ তলায় উঠেও অবশ্য রিএ্যাক্টারের কাজ দেখতে পাওয়া যায় না।

কয়লা বা তৈল খনিতে সাধারণত যে বয়লার ব্যবহার করা হয়, এগুলির কাজও মূলত: একই। এই রিএ্যাক্টারের কাজ হ'ল বাষ্প তৈরিকরা। যে বাষ্পের জোরে টারবাইন চালিয়ে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা হয়। বিশ্বের নানা দেশে নানা রকমের রিএ্যাক্টার ব্যবহার করা হয়, তবে যেটি বসানো হয়েছে সেটি হ'ল 'বয়লিং ওয়াটার' রিএ্যাক্টার। পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং অতিরিক্ত উত্তাপ গ্রহণ করার জন্য এতে সাধারণ জল ব্যবহার করা হয়।

তারাপুরের রিএ্যাক্টারে যে জ্বালানী ব্যবহৃত হয় তা হ'ল উচ্চ শক্তিতে পুষ্ট ইউরেনিয়াম। তারাপুরের প্রত্যেকটি রিএ্যাক্টারে উচ্চশক্তি সম্পন্ন ৪০ টন ইউরেনিয়াম আছে, এগুলি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা হয়েছে। ট্রম্বের ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে এগুলিতে জিঙ্কএলয় লাগিয়ে জ্বালানি রড বানানো হয়। এই রকম ৩৬টি জ্বালানি রড এক সঙ্গে বেঁধে ২৮৪টা এই রকম বাণ্ডিল তৈরি করা হয়। বিদেশ থেকে যে জ্বালানি আমদানি করা হয়েছে এবং রিএ্যাক্টারে দেওয়া হয়েছে তাতে আড়াই বছর চলে যাবে। এরপর এই জ্বালানির শতকরা ২০ ভাগ, প্রতি ৯ মাস বা এক বছর পরে বদলাতে হবে। একটা চলমান ক্রেনের সাহায্যে চিমটের মতো জিনিস দিয়ে এই জ্বালানি রডগুলি রিএ্যাক্টারে বসিয়ে দেওয়া হয় বা তুলে নেওয়া হয়।

রিএ্যাক্টারের মধ্যে যেখানে রডগুলি দেওয়া হয় সেটা স্টেইনলেস স্টীলের ফ্লাস্কের মতো একটা আধার। এর ব্যাস হ'ল ১৮.৬ মিটার (৬৬ ফিট) এবং ৩০ মিটার (১০০ ফিট) উঁচু। এ আধারটিতে যে বিপুল উত্তাপ সৃষ্টি হয় তা থেকে আধারটাকে রক্ষা করার জন্য এতে একটা উত্তাপ প্রতিরোধক আবরণ থাকে। সমগ্র রিএ্যাক্টারটি কন্‌ক্রিটের মধ্যে বসানো।

রিএ্যাক্টারে যখন জ্বালানি রডগুলিতে পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া হতে থাকে তখন অসহ্য উত্তাপের সৃষ্টি হয়। সেই উত্তাপে জল ফুটে, বাষ্পের সৃষ্টি হয় এবং সেই বাষ্প একটি টারবাইনকে প্রতি মিনিটে ১,৫০০ বার ঘূর্ণনের গতিতে ঘোরাতে থাকে। টারবাইনের সঙ্গে যুক্ত একটি জেনারেটার বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করে। রিএ্যাক্টারের অতিরিক্ত উত্তাপ, আরব সাগরের জল পাম্প করে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এই কেন্দ্রের ইঞ্জিনীয়ারগণ, আরব সাগরের জল পাম্প করা বা বের করে দেওয়ার জন্য অত্যন্ত কার্যকরী কতকগুলি খাল কেটে নিয়েছেন।

কণ্ট্রোল রুম

তারাপুরের দুটি রিএ্যাক্টারের সমগ্র ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া একটা দূর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সব সময়ে সতর্ক দৃষ্টির মধ্যে রাখা হয়। উচ্চ শিক্ষিত অতি সতর্ক ইঞ্জিনীয়ারগণ, লাল সবুজ হলদে আলোর সামনে বসে সর্বক্ষণ রিএ্যাক্টারের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য ও নিয়ন্ত্রণ করেন। কন্ট্রোল রুমের অতি আধুনিক যন্ত্রপাতিগুলি ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের ইলেক্‌ট্রোনিক শাখায় ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হয়েছে।

তারাপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান ট্রান্সফর্মারের ষ্টেপ আপ ইউনিট

অষ্ট্রেলিয়ায় বিমানের সাহায্যে সারের প্রয়োগ

চাষবাসের জন্যে বিমানের ব্যবহারে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের পরেই অস্ট্রেলিয়ার নাম করা যেতে পারে। ১৯৫১ সালে বিমান থেকে এক হাজার টনের কিছু কম পরিমাণ সার ছড়িয়ে দেবার জন্যে কয়েকজনকে মাত্র কাজে লাগানো হয়েছিল। এখন ঐ পদ্ধতিতে বছরে ১,৭০,০০০ হেক্টার জমিতে সার দেওয়া হয়। এর মধ্যে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ হ'ল ঘাস জমি।

এক সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ সার প্রয়োগ করার কাজ সহজ করার জন্যে সার উৎপাদনকারী বড় বড় প্রতিষ্ঠান, চুক্তিতে কাজ করবার জন্যে যে 'গ্রুপ প্ল্যান' প্রবর্তন করেছে তারই ফলে কৃষির উন্নয়নে বিমানের ব্যবহার বেড়ে গিয়েছে। প্রচুর পরিমাণ সার বোঝাই করা, এবং অন্যত্র বিলি করার জন্যে রেলপথে চালান দেওয়া এবং বিমান যোগে নির্দিষ্ট জমির ওপর ছড়িয়ে দেওয়ার কাজগুলো যাতে সহজে সুষ্ঠুভাবে হয় তারই জন্যে এই রকম চুক্তি ব্যবস্থা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই গ্রুপ প্ল্যানের আওতার বাইরে খুব কম সংখ্যক বিমান কাজে প্রয়োগ করা হয়।

ব্যাঙ্কস্টাউন বিমান বন্দরে এই ধরণের বিমান চালাবার জন্যে একটি উড্ডয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। বিমান যোগে সার প্রয়োগ পদ্ধতি শেখানোর জন্যে এবং এই ধরণের বিমানের জন্য চালকদের যাতে অভাব না ঘটে তার জন্যে এই স্কুলে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

কর্মসংস্থানে শিক্ষার ভূমিকা

শিশির কুমার হালদার

পৃথিবীর যে সব দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা যথেষ্ট উন্নত, সেখানেও শিক্ষিত বেকার বিরল নয় সত্য, কিন্তু ব্যাপকতা ও ভয়াবহতার দিক থেকে ভারতের শিক্ষিত-বেকার সমস্যার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, এমন দেশের সংখ্যা বেশি নয়। সীমিত তথ্য ও নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের সহায়তায় আমাদের দেশের পল্লী ও শহর অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত বেকার সমস্যার সামগ্রিক চেহারাটা ফুটিয়ে তোলা দুষ্কর। আমাদের পরিকল্পনা প্রণেতারা অনুমানের ভিত্তিতে এমন কতকগুলি গাণিতিক মডেল তৈরি করতে ব্যস্ত, যার সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার যোগসূত্র নিতান্তই ক্ষীণ। দেশে নিয়োগ করা যায় এমন কর্মক্ষম সকলের, যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব, এমন কোনো জাতীয় উন্নয়ন খসড়া প্রণয়নে, তাঁরা একাধিক কারণে, এখনো সমর্থ হননি।

সমস্যার খতিয়ান

কয়েকটি সঙ্গত কারণেই দেশে শিক্ষিত বেকার অবাঞ্ছিত। প্রথমত: লোকে সচরাচর শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন নিছক শিক্ষার সামাজিক উপযোগিতা ও কৌলিন্যের খাতিরেই নয়, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নিজেদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্যও বটে। দ্বিতীয়ত: শিক্ষিতদের অধিকাংশই সমাজের এমন একটা স্তর থেকে আসেন যাঁদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধা স্বভাবতই সমাজের অন্যান্য স্তরের ব্যক্তিদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি। • তৃতীয়ত: কোনো না কোনো কাজে নিয়োগ করা সম্ভব এমন দক্ষতাহীন সাধারণ ব্যক্তিদের তুলনায় শিক্ষিত দক্ষ ব্যক্তিদের বাজার চাহিদা অনেক বেশি।

কিন্তু ভারতে শিক্ষিত বেকার সমস্যা আজকের নয়। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে ভাবতে পারা যায় না, যে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের এই সমস্যাটির সুরাহা হবে। একটি হিসেবে, আমাদের দেশে সেকেণ্ডারী স্কুল থেকে যাঁরা বের হচ্ছেন, তাঁদের শতকরা ১৫ জনই বেকার থাকেন, যখন দেশে সাধারণ বেকারের হার শতকরা ৯ জন। কর্মনিয়োগ কেন্দ্রের রেজিষ্ট্রার থেকে জানা যায় যে, ভারতে ১৯৬৭-৬৮ সালে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৫.৬। কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে মেট্রিকুলেট-এর সংখ্যা শতকরা ১৩.২ জন। আণ্ডার গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা শতকরা ২২.৬ জন, আর গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা শতকরা ৩১.৩ জন। ডিরেক্টর জেনারেল অব এমপ্লয়মেন্টের ১৯৬০ সালের 'সার্ভেতে' দেখা যায় যে শিক্ষিত বেকারদের শতকরা ৪০ জন আর্টস গ্র্যাজুয়েট, শতকরা ১৭.৫ জন সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট, শতকরা ৮.২ জন কমার্স গ্র্যাজুয়েট, এবং শতকরা ৭.২ জন ল গ্র্যাজুয়েট। অবশিষ্টদের মধ্যে রয়েছেন এই সব বিষয়ে এম. এ. ডিগ্রীধারী ও বৃত্তিমূলক বিষয়ে ডিগ্রীধারী। আমাদের তৃতীয় পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দাঁড়াবে ১৫ লক্ষ। ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনোলজির গ্র্যাজুয়েট এই হিসেবের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৭০ সালের মধ্যে কর্মপ্রার্থী গ্র্যাজুয়েটদের সংখ্যা দাঁড়াবে কম পক্ষে ১৭ লক্ষ। সমস্যাটির গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়।

শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার বনাম নিয়োগ সম্ভাবনা

শিক্ষিত বেকার সমস্যার জন্য প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে মুখ্যত: দায়ী সাব্যস্ত করতে অনেকেই বেশ তৎপর। এই সমস্যার অপরাপর কারণ অনুসন্ধানে এঁরা তেমন আগ্রহী নন।

সেকেণ্ডারী শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কর্ম সংস্থানের সুযোগ সুবিধা প্রশস্ত হবে এবং অর্থকরী লক্ষ্য সিদ্ধির সম্ভাবনাও দেখা দেবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি উন্নত দেশগুলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্যও দেশের জনশক্তি সদ্ব্যহারের জন্য সংস্কারের অত্যুগ্র এই উৎসাহ অনুমেয় কিন্তু স্বীকার্য নয়। স্কুল কলেজীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস, বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায়, শিক্ষিতের কর্ম সংস্থানের পথ কতটা উন্মুক্ত করতে সক্ষম, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। যাঁরা ভাবেন যে উন্নতমানের সুসমঞ্জস শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত বেকার বলে কেউ থাকবেন না তাঁরা স্বত:সিদ্ধ হিসেবে ধরে নেন যে, আমাদের বর্তমান অর্থনীতিতে পূর্ণ কর্মনিয়োগ জনিত ভারসাম্য সম্ভব। তাঁদের মতে শিক্ষিত বেকারের বর্তমান সমস্যা মূলত: কর্মান্তরগত বেকার সমসা এবং পাঠ্যসূচী ও শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিবর্তন ও শিক্ষা ব্যবস্থা বৃত্তিমুখী করার মধ্যেই এ সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান নিহিত। বলা বাহুল্য এই ধারণাগুলি সত্য হলে শিক্ষিত বেকার সমস্যা আজ মারাত্মক রূপ ধারণ করতো না, অনায়াসেই তার সমাধান করা যেত। সুতরাং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষায়তনগুলি এই ব্যাপারে সব অনর্থের মূল—এমন সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্তের সামিল।

শিক্ষা ব্যবস্থা বৃত্তিমূলক করবার আগে চিন্তা করে দেখতে হবে যে বৃত্তি নির্বাচনের ব্যাপারে ছাত্ররা শিক্ষণীয় বিষয়ের দ্বারা কিভাবে কতটা প্রভাবিত হয়ে থাকেন। এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয় যেখানে, কারিগরি বা কৃষি বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা সংশ্লিষ্ট বৃত্তি অবলম্বন না করে, অধিকতর সুযোগ সুবিধা

এবং অর্থ ও ক্ষমতা দিতে পারে, এমন কাজের সন্ধান করে থাকেন। এই বিপত্তির অন্যতম প্রধান কারণ অবশ্য সরকারী বেতন নীতি। অধিক অর্থ ও ক্ষমতার প্রলোভনে বিশেষজ্ঞরাও অনেক সময় স্ব স্ব ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে অন্য কর্মক্ষেত্র বেছে নেন। অপেক্ষাকৃত কম বেতনের সরকারী চাকরির প্রতি সাধারণের মোহ, দীর্ঘ পরাধীনতা ভোগের একটা অপ্রীতিকর পরিণাম। প্রকৃতপক্ষে ছাত্রদের বৃত্তি বা পেশাগত উচ্চাকাঙ্খা এবং উত্তরকালে তাঁরা কে কোন বৃত্তি অবলম্বন করবেন, তার মূলে যে সব কারণ আছে সেগুলির সঙ্গে স্কুল কলেজের শিক্ষণীয় বিষয়গুলির সম্পর্ক যৎসামান্য। স্কুল কলেজের শিক্ষা নয়, সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাগুলিই ছাত্রদের বৃত্তিগত আশা আকাঙ্খার যথার্থ নিয়ামক ও নির্ধারক। তাই মনে হয় শিক্ষিতের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে আমাদের শিক্ষায়তনগুলি অনেকদিন থেকেই অকারণে তীব্র বিরূপ সমালোচনার লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। যে সব ক্ষেত্রে উন্নয়ন লক্ষণ সুস্পষ্ট এবং যে যে ক্ষেত্রে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত দক্ষ ব্যক্তিদের চাহিদা যথেষ্ট পরিমাণে অনুভূত হচ্ছে সেই সব ক্ষেত্রের সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি ও শিক্ষা প্রণালীর ঘনিষ্ঠ যোগ থাকা উচিত। নিম্নমানের কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা বিদ্যায়তনগুলির বাইরে, কারখানাগুলিতে করতে পারলেই ভাল। এ ছাড়া কর্মরত অবস্থায় শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রসার প্রয়োজন। আমাদের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থাকেই শিক্ষিত বেকার সমস্যার জন্য দোষী করে, আমরা যেন সমস্যাটিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা না করি, প্রস্তাবিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করার সময়ে আমাদের সমাজ জীবন ও অর্থনৈতিক কাঠামোর সম্ভাব্য পরিবর্তনকে বাস্তব অভিজ্ঞতার নিকষে যাচাই করে দেখতে আমরা যেন ভুলে না যাই।

মনগড়া মূল্য, সমাধানের প্রতিবন্ধক

অনেককে বলতে শোনা যায় যে, আমাদের দেশের শিক্ষিত বেকারদের অবস্থা সেই সব, রূপসী কুমারী মেয়েদের মতো যাঁরা নিজেদের উপর মন গড়া, একটা মূল্য আরোপ করে বিয়ে করতে অনিচ্ছুক। শিক্ষিত বেকার সমস্যা অংশত দেখা দেয় নিজেদের আয় সম্পর্কে শিক্ষিতদের অবাস্তব প্রত্যাশার ফলে। এই প্রত্যাশিত আয়ের আশাই হ'ল শিক্ষিতদের মন গড়া সংরক্ষিত মূল্য। যতদিন পর্যন্ত শিক্ষিতদের আয়ের প্রত্যাশা বাস্তবানুগ না হচ্ছে, ততদিন বেকার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না, এবং এই সমস্যা প্রসূত রাজনৈতিক ও সামাজিক অসন্তোষও দূর করা সম্ভব হবে না। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের আয়ের ব্যবধান হ্রাস করার চেষ্টা ইংল্যাণ্ডে করা হয় ১৯৩০ সালে যখন ও দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তখন সেখানে সামান্য বেতনের কাজও শিক্ষিতেরা গ্রহণ করতে সম্মত হন।

উন্নয়নকামী দরিদ্র দেশের শিক্ষিতদের কর্ম সংস্থান সমস্যা সম্পর্কে ডব্লিউ. এ. লুইস বলেছেন যে, শিক্ষিত বেকার 'সমস্যাটি পর্যন্ত বা মূলত ভারসাম্যের সমস্যা নয়। শিক্ষিতদের কর্ম সংস্থানের পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদনের হারের তুলনায় তাদের উচ্চ মূল্য। গরীব দেশের একজন গ্র্যাজুয়েট কয়লা খনির একজন শ্রমিকের চেয়ে পাঁচ গুণ বেশী বেতন পান। ফলে উৎপাদনের জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাজে লাগানো, জাতীয় আয়ের তুলনায় বিশেষ ব্যয় সাপেক্ষ।...... পরিশেষে অবশ্য এই পরিস্থিতি আপনা থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। কেননা, শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার অতিরিক্ত মূল্য হ্রাস পেতে সুরু করে। যে সব কাজে আগে স্বল্প শিক্ষিতদের নিয়োগ করা হতো সে সব কাজে এখন নিয়োগ করা হয় অপেক্ষাকৃত বেশী শিক্ষিতদের। তাঁরা আয়ের প্রত্যাশা ক্রমশ কমিয়ে আনতে থাকেন এবং নিয়োগকারীরা তাঁদের চাকরি বা কাজের আবশ্যকীয় শর্তাদির মাত্রা বাড়াতে থাকেন' লুইসের এই উক্তির সত্যতা ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে ক্রমশ প্রতিভাত হয়ে উঠছে।

হাতের কাজ বা কায়িক শ্রমের প্রতি আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধাকে এক সময় প্রথাগত উদার শিক্ষার অনিবার্য ফলশ্রুতি বলে গণ্য করা হত। এ কালে শিক্ষার ক্ষেত্রে গণতন্ত্রীকরণের ফলে ও শিক্ষাকে অংশত: বৃত্তিমূলক করার ফলে, শিক্ষিত সম্প্রদায় কায়িক শ্রম বা হাতের কাজের প্রতি অবজ্ঞা যে দ্রুত কাটিয়ে উঠছেন এটা লক্ষণীয়।

সমস্যা নিরসনের বাস্তবানুগ প্রয়াস

দেশে এখন শিক্ষিত বেকার সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন প্রয়াস চলেছে। পল্লী অঞ্চলের কর্মপ্রার্থী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে উদ্ভাবিত উন্নয়নমূলক ব্যাপক কর্মসূচী এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় অধিবাসীদের কর্ম প্রচেষ্টা, শ্রম এই সব পরিকল্পনা রূপায়ণে সহায়তা করবে—এমন আশা প্রকাশ করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল সরকারী আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। ন্যূনতম প্রয়োজনের ভিত্তিতে এই কর্মসূচী রূপায়ণের সময়ে আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট এবং যাঁরা স্কুলের শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছেন এমন ব্যক্তিদের চাহিদা হবে সর্বাধিক। বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য তাঁদের স্বল্প মেয়াদি শিক্ষণের ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু গ্রামবাসীদের তরফ থেকে আশানুরূপ সাড়া না পাওয়ার ফলে এই সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে চলেছে। পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজে যে সব যুবকদের পল্লী অঞ্চলে পাঠানো হয়, তাঁদের অধিকাংশই ৬ মাসের মধ্যে শহরে ফিরে আসার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেন। এ সব কাজে যে ধরণের নেতৃত্ব দরকার তা এঁরা দিতে অসমর্থ, গ্রামবাসীদের অনুপ্রাণিত করতে এঁরা অক্ষম হন। বস্তুত মূলধন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা চলে এমন ব্যক্তিদের কাজে লাগানোর প্রয়াস একটি বিরাট সাংগঠনিক সমস্যা বিশেষ। হয়তো বা আমাদের দেশে মূলধনের চেয়েও দুষ্প্রাপ্য বস্তু হল এই সাংগঠনিক ক্ষমতা অর্জন। সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কার্যকরী ও সার্থক করতে হলে যে ধরণের বাধ্য বাধকতা ও জোর জবরদস্তির প্রয়োজন আমাদের রাজনৈতিক মতাদর্শের খাতিরে তা অকল্পনীয়।

(২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নব পর্যায়ে কৃষি

অজয় বসু

'আজ শুধু একলা চাষীর চাষ করিবার দিন নাই, আজ তাহার সঙ্গে বিদ্বানকে, বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হইবে। আজ শুধু চাষীর লাঙ্গলের ফলার সঙ্গে আমাদের দেশের মাটির সংযোগ যথেষ্ট নয়—সমস্ত দেশের বুদ্ধির সঙ্গে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাহার সংযোগ হওয়া চাই।' কথাগুলি অবশ্য আজকের নয়। যে সময়ের কথা তখন থেকে আজ প্রায় ৫০ বছর অতীত হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ হয়তো আশা করেছিলেন, অদূর ভবিষ্যতে দেশের মানুষ তাঁর এই কথাগুলির গুরুত্ব আরও গভীরভাবে অনুভব করতে পারবে। রবীন্দ্রনাথ সেদিন আমাদের দেশের মাটিতে এই যে বিশেষ সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করেছিলেন পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতে তার বাস্তব রূপদানে এক নতুন কর্মতৎপরতা যুক্ত হয়ে গেছে।

গতানুগতিক কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক কৃষিকর্মের প্রবর্তনই এই কর্মতৎপরতার মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য রূপায়ণে কৃষকের একক ভূমিকাই আজ আর যথেষ্ট নয়, যদিও তাঁর দায়িত্বই সব চেয়ে বেশী। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ, বিশেষত: বুদ্ধিজীবীদের সক্রিয় সহযোগিতাও আজ একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। কৃষকের সঙ্গে সমাজের বৃহত্তর অংশের যে সম্পর্ক এতোকাল চিরাচরিত ধারায় আবর্তিত হয়ে আসছিল তাও এক অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে এবং এই পরিবর্তন ইতিমধ্যেই সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষকের সঙ্গে সমাজের বৃহত্তর অংশের পরস্পর নির্ভর এক নতুন মেলবন্ধন সূচীত করছে।

কৃষি উৎপাদন এখন সমাজের কোনো এক শ্রেণীর বহুকালের বংশানুক্রমিক বৃত্তি ও প্রচলিত ধ্যান-ধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তার দিগন্ত ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে এবং সমগ্র সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক হিসেবে কৃষি দাবী করছে এক নতুন মর্যাদা। বস্তুত কৃষিই বর্তমানে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অন্যতম বৃহৎ ক্ষেত্র এবং প্রকৃতপক্ষে কৃষি উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে যাঁরা আজ সংশ্লিষ্ট তাঁদের একটি বিশেষ অংশ কৃষি বিষয়ে আধুনিক চিন্তাধারা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত। গ্রামের অভিজ্ঞ কৃষকও এই নতুন চিন্তার চর্চায় এবং নতুন নতুন নিয়ম পদ্ধতি গ্রহণে ক্রমেই উৎসাহী হয়ে উঠছেন। বিশেষ লক্ষণীয় যে, সম্প্রতি দেশের শিক্ষিত যুবকরাও কৃষি কাজে এগিয়ে আসছেন এবং তাঁদের নতুন অভিজ্ঞতা ও বিদ্যাবুদ্ধি প্রয়োগের সাফল্য তাঁদের মনে আরও বেশী আগ্রহ জাগিয়ে তুলছে।

প্রশ্ন হল, কৃষিজীবীর কাছে আধুনিক বা বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ কথাটির অর্থ কি? প্রকৃত পক্ষে এতোদিন যে ধারায় চাষ আবাদ চলে আসছিল তার থেকে স্বতন্ত্র এবং উন্নত পদ্ধতিতে চাষের কথাই এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবশ্য চাষের প্রাথমিক নিয়মকানুনগুলি প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। এক কথায় বলা যেতে পারে, যে চাষ পদ্ধতি গ্রহণ করে (ক) আগের তুলনায় অধিক উৎপাদন সম্ভব হয় এবং (খ) একই পরিচিত জমি থেকে এ যাবৎ উৎপন্ন নির্দিষ্ট ফসলের বেশী ফসল উৎপাদন করা যায়, তাকেই বর্তমানে উন্নত বা পরিবর্তিত চাষ পদ্ধতি বলা যেতে পারে। একটি জমি থেকে বছরে অধিক ফলন এবং একাধিক ফসল পেতে হলে চাষের ব্যাপারে যে যে বিষয়ের ওপর আমাদের নির্ভর করতে হয় সেগুলির প্রত্যেকটি নতুন শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল।

আমাদের জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। কিছুকাল আগেও জমির এই সীমাবদ্ধতা এখনকার মত একটা বিশেষ সমস্যা হয়ে দেখা দেয় নি। এ ছাড়া লোক সংখ্যার দ্রুতহারে বৃদ্ধি কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের খাদ্য উৎপাদনের ওপরে স্বভাবতই একটা চাপ সৃষ্টি করেছে। প্রধানত এই দুটি সমস্যা সম্প্রতি এ দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনকে আরও বেশী তীব্র করে তুলেছে এবং বাস্তব অবস্থার বিচারে কৃষিই পেয়েছে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার।

অধিক উৎপাদন এবং জমিকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীদেয় প্রচেষ্টায় অধিক ফলনশীল এবং প্রায় সারা বছর চাষের উপযোগী নতুন নতুন বীজের উদ্ভাবন আমাদের শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রচুর ফলনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে। ধান ও গম আমাদের প্রধান দুটি খাদ্যশস্য। বর্তমানে অধিক ফলনশীল ধানের বীজ হিসেবে আই আর ৮ নামের এক ধরণের নতুন ধানের চাষ পশ্চিম বাংলায় বিশেষ প্রচলিত হয়েছে। এর আগে তাইচুং নেটিভ-১, তাইনান-৩, কালিম্পং-১ ইত্যাদি আরও কয়েকটি উন্নত জাতের ধানের বীজ ব্যবহার করে কৃষকরা প্রথম বেশী ফলনের আশায় নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষায় নেমেছিলেন। এই বীজগুলির সবই প্রায় বিদেশ থেকে আনা অধিক ফলনশীল বীজ। আমাদের দেশের জল হাওয়া ও মাটির উপযোগী করে নেওয়া হয়েছে। এই সব জাতের ধান সাধারণত: ফরমোজা দ্বীপে প্রচুর জন্মায়। আই আর ৮ হল আমাদের দেশের জল হাওয়া ও মাটির উপযোগী আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা কেন্দ্রের উদ্ভাবিত ধান। এই জাতের ধান ফরমোজা জাতীয় ধানের চেয়েও বেশী ফলনশীল এবং প্রায় সারা বছরই চাষ করা চলে। আকারে ও স্বাদে আমাদের সাধারণ দেশী ধানের প্রায় সমশ্রেণীর। কিছুটা বেটে জাতের হয় বলে এই ধানগুলির শীষ মাটিতে সহজে নুয়ে পড়ে না। এই ধানের চাষ করে পশ্চিম বাংলায় কোনো কোনো চাষী দেশী ধানের চেয়ে প্রায় তিন চার গুণ বেশী ফসল পেয়েছেন। কিছুদিন হ'ল জয়া আর পদ্মা

নামে আরও দুটি নতুনতর ধানের দ্রুত ফলনের প্রতিশ্রুতি আমাদের কৃষকদের মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে।

গমের উৎপাদন যে আমাদের দেশে আগের চেয়ে বহুগুণ বেড়ে গেছে তা আজ আর কারুর অজানা নেই। পাঞ্জাবের চাষীরাই গম উৎপাদনে অভূতপূর্ব সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। পশ্চিম বাংলাতেও গমের উৎপাদন কোনো কোনো জায়গায় আশাতীতভাবে বেড়েছে। গম চাষের এই বিরাট সার্থকতা সম্ভব হয়েছে অধিক ফলনের বীজের বৈশিষ্ট্যে ও যথাযথ ব্যবহারের ফলে। সোনোরা-৬৪ আর লারমা-রো এই দুটি গম বীজ নিয়েই মাত্র কয়েক বছর আগে আমাদের গম উৎপাদনে প্রথম এক নতুন প্রচেষ্টা সুরু হয়। মেক্সিকো দেশে এই জাতীয় গমের প্রচুর ফলনের দৃষ্টান্তই প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং আমরা আমাদের দেশের মাটিতে এ জাতীয় গমের আবাদকে জল হাওয়ার অনুকূলে সার্থক করে তুলতে চেষ্টা করি। তার ফলে, সোনালিকা, কল্যাণ সোনা, সরবতী সোনোরা ইত্যাদি একে একে নানা নামে নতুন গম বীজের প্রচলন স্বল্পকালের মধ্যে আমাদের গম চাষে এক অসামান্য সাড়া জাগিয়ে তুলেছে।

এই সব নতুন অধিক উৎপাদনশীল বীজের আশানুরূপ ফলন নির্ভর করে বিশেষত অধিক সার প্রয়োগের ওপর। বেশী সার এবং বেশী ফলন, এক কথায় অধিক উৎপাদনশীল বীজের এই রীতি। এতোকাল আমরা শস্য চাষে, পচা গোবর, আবর্জনা বা পাতার কমপোস্ট সার, ছাই, হাড়ের গুঁড়ো ইত্যাদি সহজলভ্য জৈব সার দিয়েই কাজ চালিয়ে এসেছি। কিন্তু বর্তমানে সারের চাহিদা অনেক বেড়েছে অথচ জৈব সারের অনিশ্চিত এবং অপরিমিত প্রয়োগে পূর্ণ সুফল পাওয়ার আশাও কম। যে কোনো ফসলের পক্ষে বিশেষ একটি জৈবসারের মধ্যে সেই ফসলের প্রয়োজনীয় খাদ্য ছাড়াও এমন অন্যান্য অনেক জিনিস থাকে যা ফসলের পক্ষে শুধু অনাবশ্যক নয়, অনিষ্টকর হতে পারে। তা ছাড়া জৈব সার প্রয়োগ করে ফসলের উপযোগী বিভিন্ন সারের যথোচিত পরিমাপের সামঞ্জস্য রক্ষা করাও প্রায়ই সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই জন্য জৈবসারের সঙ্গে পরিমিত মাত্রায় অন্যান্য সারের সুষম প্রয়োগের গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে। আজকাল জমির গঠন অনুযায়ী ফসলের উপযোগী সার জমিতে যথাযথ পরিমাণে এবং সরাসরি পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাসায়নিক সারের প্রচলন সুরু হয়েছে। কৃষকরা বিশেষ করে অধিক ফলনশীল বীজের চাষে রাসায়নিক সারের ব্যবহারে যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করছেন। রাসায়নিক সারে ফসলের প্রয়োজনীয় একাধিক খাদ্যের মিশ্রণের তারতম্য ঘটিয়ে বিভিন্ন সুষম সার প্রস্তুত করা হচ্ছে।

অধিক উৎপাদনশীল ফসলের চাষে যেমন ফলন বেশী পাওয়া যায় তেমনি এই জাতীয় ফসলে রোগ ও পোকার উপদ্রবও বেশী হয়। এই কারণে কৃষকদের আগের চেয়ে অনেক বেশী সচেতন হয়ে কাজ করতে হয় এবং ফসল রক্ষার জন্য শেষ পর্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। শস্য-বীজকে রোগমুক্ত করার জন্য প্রথম থেকেই বীজ শোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে পরিণামে শস্য হানির সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্য সম্প্রতি বীজ শোধক ওষুধের প্রচলন বেড়েছে। এ ছাড়া ফসলের মারাত্মক রোগ ও কীটাদির আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে নানা রাসায়নিক ওষুধের উপকারিতা ও ব্যবহারবিধি সম্পর্কেও কৃষকরা ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠছেন।

কৃষি উৎপাদনে আরও একটি লক্ষণীয় বিষয়, কৃষি ও শিল্পের পরস্পর সম্বন্ধ। আগেই বলেছি, আমাদের জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। কাজেই একই জমিতে অধিক উৎপাদনের নীতি গ্রহণ করতে হলে এবং সীমাবদ্ধ জমিতে চাষের কাজকে আরও সংহত ও নিবিড় করে তুলতে হলে কৃষি ব্যবস্থাকে কিছুটা শিল্পায়িত করার প্রয়োজন রয়েছে। বস্তুত: আজকাল কৃষিকে শিল্প সংজ্ঞায় চিহ্নিত করার কথাও কেউ কেউ ভাবছেন। কৃষি কাজের সময় ত্বরান্বিত করার জন্য ট্র্যাক্টার, পাওয়ার টিলার, সীড ড্রিল, থ্রেসার ইত্যাদি যন্ত্রপাতির সাহায্যে জমিতে চাষ দেওয়া বীজ বোনা থেকে সুরু করে পাকা ফসল কাটাই ঝাড়াই ইত্যাদি বিবিধ কাজকে সংক্ষিপ্ত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা একালে খুবই সঙ্গত এবং অবস্থা বিশেষে অবশ্যই গ্রহণীয়। এ ব্যাপারে পশ্চিম বাংলায় সরকারী সহযোগিতার ক্ষেত্রও প্রসারিত হচ্ছে এবং এ্যাগ্রো ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন বা কৃষি শিল্প কর্পোরেশন নামে ভারত সরকারের উদ্যোগে এবং রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান কৃষকদের নানাভাবে সাহায্য করার ব্যবস্থা করছেন। সেচ ব্যবস্থার সুবিধার জন্য এই প্রতিষ্ঠান কৃষকদের কাছে ইতিমধ্যেই সহজ কিস্তিতে অথবা ভাড়া প্রথায় পাম্প সেট সরবরাহের ব্যাপক আয়োজন করেছেন। কৃষিতে এই শিল্প প্রবণতা নতুন হলেও যথেষ্ট আশাপ্রদ, বিশেষত যখন কৃষিকর্মের সহায়ক উন্নত যন্ত্রপাতির প্রবর্তন এখন আর নিতান্ত বিরল নয়, বরং একথাই বলা চলে যে, বিদ্যুৎশক্তি চালিত সাজ সরঞ্জামে, পুরাতন চাষ ও সেচ ব্যবস্থার রূপান্তরের আভাস শোনা যাচ্ছে।

ক'জন জানেন যে, ৭০ লক্ষ কিউবিক মাইল বিস্তৃত যে তুষার মণ্ডল কুমেরু নামে পরিচিত সেখানে যুগ যুগান্তে সঞ্চিত তুষার রাশি সারা বিশ্বের মোট শতকরা ৯০ ভাগ? ওহিও রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়ের ডা: কোলিন বুল তাঁর ব্যাপক অনুসন্ধানের ভিত্তিতে যে প্রাথমিক রিপোর্ট লিখেছেন তাতে তিনি বলেছেন যে, কুমেরুর এই মুকুটের ওপর বছরে আন্দাজ ২.৫. সেন্টিমীটার হিসেবে তুষার জমছে। এ যাবৎ কিন্তু কেউই সঠিক জানতেন না যে, এই বিরাট তুষার পিণ্ডের ওপর বরফ জমছে না তুষার গলে বেরিয়ে যাচ্ছে।

✶

চীনা বৈজ্ঞানিকরা একটা নতুন এবং অত্যন্ত শক্তিশালী এ্যান্টিবায়োটিক বার করেছেন। এই জিনিসের নাম দেওয়া হয়েছে কুয়িংডামাইসিন। শ্বাস নালীর ফোলা, মূত্রাশয়ের ওপর জীবাণুর আক্রমণ, সেপটিসিমিয়া এবং মেনিনজাইটিস সারাবার ব্যাপারে এই ওষুধটি নাকি মন্ত্রৌষধির সমান।

গ্রামগুলিতেও বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞানের প্রভাব পড়ছে

এস. এন. ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গের বারুইপুরে প্রচুর শাক-সব্‌জি হয়। এখানকার বনহুগলীর একজন চাষী আকবর আলী সেদিন খুব উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন যে, 'আমাদের মনে হচ্ছে জ্যৈষ্ঠ মাসে, পৌষ এসে গেছে।' গ্রামের সবাই আনন্দে মত্ত, প্রচুর ধান পাওয়া গেছে।

উচ্চ ফলনের বোরো ধান অর্থাৎ আই আর ৮ আর আধুনিক পদ্ধতির চাষে, প্রচুর ফসল পাওয়া গেছে বলেই গ্রামে এই আনন্দ উৎসব। এই অভাবিত ফসল গ্রামবাসীদের এতো উৎসাহিত করেছে যে শাকসব্‌জির চাষই চিরকাল যাঁদের প্রধান জীবিকা ছিল তার পরিবর্তে তাঁরা এখন ধানের চাষ সুরু করেছেন।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন গ্রাম সেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যে সব গ্রামে উন্নয়নের কাজ সুরু করেছেন, বনহুগলী হ'ল সেগুলির মধ্যে অন্যতম। এই কেন্দ্রের পরীক্ষা-মূলক খামারে প্রথমে উন্নততর বীজ নিয়ে পরীক্ষা ক'রে, সেগুলির উৎপাদন পদ্ধতি গ্রামবাসীদের শেখানো হয়। গ্রামবাসীদের অবশ্য বেশী বোঝাতে হয়নি। উচ্চ ফলনের এই ধানের কথা তারা শুনেছে এবং স্বাভাবিকভাবেই তাতে সাড়া দিয়েছে। এই পৃথিবীতে কে না তার ভাগ্যোন্নতি চায়।

আরব্য রজনীর গল্পের মতো অদ্ভুত

আই আর ৮ ধান চাষ করে আর একজন কৃষক, আবেদ আলী খুব ভালো ফসল পেয়েছেন। তিনি বলেন যে 'এটা যেন আরব্য রজনীর গল্পের মতো অবিশ্বাস্য।' সাফল্যের গর্বে এবং ভবিষ্যতের আশায় উৎসাহিত ৬৮ বছরের এই কৃষকটি বললেন 'মাত্র দুই বছর আগেও আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না যে এক বিঘা জমি থেকে ৩৬ মণ ধান পাওয়া যেতে পারে। এখন এটা মার পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য। আমি নিজে এই পরিমাণ ফসল পেয়েছি, আমার ভাই পেয়েছে, গ্রামের অন্যান্যরাও পেয়েছেন।'

বনহুগলীতে প্রায় ৬০০ আবাদি বা পরিবার আছে। এখানে প্রচুর জল পাওয়াটা বড় সমস্যা হলেও ওরা বছরে তিনটি ফসল বোরো, আউস আর আমন ধানের ফসল পান। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসেই সাধারণতঃ বোরো ধানের চারা লাগানো হয়। ঐ সময়ে সূর্যের আলো যথেষ্ট পাওয়া যায় বলে চারাগুলিও তাড়া-তাড়ি বাড়ে। বর্ষা সুরু হওয়ার অনেক আগে মে মাসেই এর ফসল উঠে যায়। এই ধান অন্যান্যগুলির চাইতে অল্প সময়ে পাওয়া যায় বলে কৃষকরা এটা খুব পছন্দ করেন।

নতুন ধরনের বীজধান এবং নতুন পদ্ধতির চাষী

আবেদ আলী, আকবর আলীর মতো গ্রামের অনেকেই নরেন্দ্রপুরে আই আর আটের ফসল দেখেছেন। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সম্প্রসারণ সংস্থা থেকে ধানের বীজ দেওয়া হ'ত। এই গ্রামটি, সোনার-পুর সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের অন্তর্ভুক্ত। ব্লকের কর্মীগণ নতুন উৎপাদনকারীদের সব রকম সাহায্য ও পরামর্শ দেন। এই নতুন ধরনের চাষে উৎসাহী প্রায় ৩০টি পরিবার স্বেচ্ছায় এই নতুন পরীক্ষা করতে রাজি হন এবং জলসেচের কিছুটা সুবিধে আছে এই ধরনের কিছু জমি বেছে নেন। তখন আবেদ আলী ও আকবর আলীর মাথায় নতুন একটা বুদ্ধি এলো। গ্রামের আশে পাশে অনেক ইঁটের ভাঁটা আছে। ওঁরা ভাঁটার মালিকদের কাছে গিয়ে যে সব জায়গা বৃষ্টির জলে ডুবে গেছে সেগুলি অস্থায়ীভাবে লীজ নিয়ে নিলেন। এই জায়গাগুলিতে লাঙ্গল চালিয়ে ধানের চারা লাগিয়ে দেওয়া হল।

ওখানকার কৃষকরা তাঁদের এই সাফল্যের কথা হয়তো সরকারী কর্মচারীগণের সঙ্গে আলোচনা করতে চাইবেন না। কিন্তু নরেন্দ্রপুর আশ্রমের স্বামীজির কাছে তাঁদের কিছুই গোপন নেই। তবে সব চাইতে বড় কথা হ'ল, সামান্য ২।৩ বছরের মধ্যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস সম্পর্কে এখানকার কৃষকরা যে জ্ঞান অর্জন করেছে তা আশ্চর্যজনক।

চায়ের দোকানের মাধ্যমে গবেষণাগার থেকে ধানের ক্ষেত পর্যন্ত

'রিসার্চ' এই ইংরেজি শব্দটি ইচ্ছে করে ব্যবহার করে আকবর আলী বলেন যে, 'আমরা আমাদের চাষের জমিতে রিসার্চ করছি। আমরা আমাদের জমিতে ইউরিয়া, পটাশ এবং সুপার ফসফেট ছাড়াও গোবর ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন সারের গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখছি।'

সন্ধ্যেবেলায় এবং প্রায় প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলাতেই কৃষকরা গ্রামের চায়ের দোকানে আসেন এবং এই সব সার ব্যবহার করে কে কি রকম ফল পাচ্ছেন তা নিয়ে আলোচনা করেন। ব্লক এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সার ব্যবহারের নিয়ম ইত্যাদি লেখা একখানা করে বই এঁদের দিয়েছেন। কিন্তু ওঁরা একটুও ইতস্তত না করে সোজাসুজি বলেন যে, জমিতে হাতে কলমে পরীক্ষা করে তাঁরা এই বইগুলি থেকেও বেশী জেনেছেন। ওঁদের এই আলোচনা শোনাও আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। ওঁদের মুখে কৃষি বিজ্ঞানের অনেক ইংরেজি শব্দ অনায়াসে উচ্চারিত হয়। সার সংগ্রহ করাটা ওঁদের পক্ষে একটুও কঠিন নয়। দোকানদারদের সঙ্গে ওঁদের যথেষ্ট পরিচয় আছে। তা ছাড়া কতটুকু জলে কি পরিমাণ সার মেশাতে হবে তা এখন আর বলে দিতে হয় না। মাটি পরীক্ষা করানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ওঁরা এখন খুব সচেতন এবং প্রায়ই দেখা যায় ওঁরা মাটি পরীক্ষা করানোর জন্য ব্লক অফিসে যাচ্ছেন।

ওঁদের এই উৎসাহ দেখে, গ্রাম সেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মাটি পরীক্ষা এবং পর্যায়

ক্রমিক শস্য বপন সম্পর্কে স্বল্পকালীন শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন বলে ভাবছেন।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কৃষকগণের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ধানের চারা লাগানোর জন্য জলের মধ্যে যখন চাষ করা হয় তখন কি পরিমাণ সার দিতে হবে তা তাঁরা জানেন। দেড় মাসের মধ্যেই আবার রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাঁরা তৈরি থাকেন। ধানের ছড়া বেরুনোর সময় তৃতীয় অর্থাৎ শেষবারে কখন কি পরিমাণ সার দিতে হবে তা তাঁরা জানেন।

কীটনাশক সম্পর্কেও বনহুগলীর কৃষকরা বৈজ্ঞানিকের মতো কথা বলেন। সরকারী বা বেসরকারী কোম্পানীগুলি সর্বশেষ কি কীটনাশক তৈরি করেছে তা তাঁরা জানেন। গ্যামাক্সিন তো সকলের কাছেই অতি পরিচিত নাম। আই আর ৮ ধানের চারা লাগানোর পর চারাগাছে পোকা লাগলে ওঁরা ট্যাফাড্রিন ছিটিয়ে দেন। কীটনাশক ছড়াবার অতি আধুনিক যন্ত্র এনডেক্স বি. এইচ. সিও ওঁদের কাছে রয়েছে। অর্থাৎ যা ছিল গবেষণাগারের কক্ষে, তা সত্যি সত্যিই কৃষিক্ষেত্রে চলে এসেছে।

অর্থ বদলে যাচ্ছে

কৃষি সম্পর্কিত জ্ঞান তাঁদের কাছে এখন আর অজানা নয়। যাই হোক তাঁরা এটাও জানেন যে জ্ঞানের কোন সীমা নেই। তাঁরা আধুনিকতম কৃষি পদ্ধতি ও কৌশলগুলি গ্রহণ করে স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছেন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বর্তমান পদ্ধতিগুলোর উন্নতি করছেন। গ্রামের চায়ের দোকান এখন আর শুধুমাত্র আড্ডা দেওয়ার স্থান নয়, সেটা এঁদের জন্য একটা স্কুলের মতোও কাজ করে। গ্রামের দলাদলির আলোচনার জায়গায় এখন বৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতিগুলি নিয়ে আলোচনা হয়।

লাইন করে বীজ বোনা এখন আর একটা অপরিচিত বিষয় নয়, ছোট ট্র্যাক্টার ও বীজ ছড়াবার যন্ত্রের মতো কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার এখন আর ওঁদের কাছে অজানা নয়। জলের সমস্যা অবশ্য এখনও থেকে গেছে। আধুনিক কৃষি সম্পর্কে এঁরা যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং নিজেদের অবস্থা ভাল করার জন্য উদ্‌গ্রীব, কাজেই সেচের এই সমস্যা সমাধান করার জন্যও তাঁরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বোরো ধানের যে ফসল তাঁরা পেয়েছেন তা থেকে তাঁরা টাকার ব্যবস্থা করতে পারবেন। নিজেদের মধ্যে তাড়াতাড়ি আলোচনা করে, অগভীর নলকূপ বসাতে ইচ্ছুক এই রকম ৩০ জন কৃষকের নাম ঠিক করে ফেলেছেন। তবে অন্য যে কোন দেশের কৃষি তথ্যাভিজ্ঞ কৃষকের মতোই তাঁরা ভূনিম্নের জলসম্পদ সম্পর্কে পুরোপুরি একটা পরীক্ষা করাতে চান।

নতুন গঙ্গা

লোকেরা যাকে আদি গঙ্গা বলেন, যা এখন খানিকটা নীচু জায়গা ছাড়া আর কিছু নয়, সেটি এই গ্রামের বাঁ পাশে রয়েছে। বেহুলা এবং লখীন্দরের কাহিনী, গ্রামের হিন্দু মুসলমানকে এখনও মোহিত করে। ওঁরা ভাবেন যে, গ্রামের পাশে গঙ্গা থাকলে মন্দ হ'তো না তবে তাঁরা অলস কল্পনায় সময় কাটাচ্ছেন না। ঐখানে তাঁরা ছোট ছোট পুকুর বা ডোবা কেটে জলের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছেন। অল্প কাটলেই অবশ্য জল পাওয়া যায় তবে পরিমাণ খুব অল্প। ডোবাগুলিতে যে কাদা জমে তা সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এক ফোঁটা জলেরও অপচয় হতে দেওয়া হয় না। যাঁদের আর্থিক সঙ্গতি আছে তাঁরা ডিজেল পাম্প বসিয়ে জমিতে সেচ দিচ্ছেন। তবে এখন অগভীর নলকূপের চাহিদাই বেশী।

কৃষকরা আরও কতকগুলি জিনিস শিখেছেন। বোরো ধানের জন্য জমিতে যে সার দেওয়া হয়, আউস ধানের চাষ করে সেই সুবিধা কাজে লাগানো হচ্ছে। জুলাই-আগষ্টে আউস ধান কাটার সময় হয়ে যায়, আর এগুলি বোরোর মতোই তাড়াতাড়ি পাকে। প্রচুর ফলনের বোরো আর আউস পেয়ে কৃষকরা আমন ধানের চাষ করতে আর তেমন উৎসাহ বোধ করছেন না। আমনের ফসল পেতে দেরী হয় বলে তাঁরা ঐ সময়টায় শাক সবজি লাগান। নিবিড় চাষ পদ্ধতি প্রয়োগ করলে, বর্তমানে দুই বিঘা থেকে পাঁচ জনের একটি পরিবারের ভরণপোষণ হয়ে যায়। অন্য কথায় বলতে গেলে এখন সামান্য জমি থেকেও যথেষ্ট আয় হচ্ছে।

প্রচুর ফলনের বোরো ধানের বীজকে ঐখানে ধূলিমুঠি বলা হয়। এই 'ধূলিমুঠি' অত্যন্ত দ্রুতগতিতে 'সোণামুঠি' হয়ে যাচ্ছে। কাজেই বনহুগলীর কৃষকরা যে জ্যৈষ্ঠ মাসে পৌষপার্বণ করবেন এতে আর আশ্চর্যের কি আছে।

বৃটেনে ভারতীয় ছাত্র

১৯৬৭-৬৮ সালে বৃটেনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্র সংখ্যা ছিল ১,৪২৯।

কমনওয়েলথ দেশগুলির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভারতীয়রা সংখ্যায় সর্বাধিক। তা ছাড়া পৃথিবীর সব দেশের হিসেবে দেখতে গেলে সংখ্যার দিক থেকে এঁরা দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী।

মোট ছাত্রের মধ্যে ১,০১৭ জন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট হিসেবে এবং ৪১২ জন আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট হিসেবে পড়াশুনা করছেন।

যুক্তরাজ্যে, বিভিন্ন দেশের প্রায় ১৬,০০০ ছাত্রছাত্রী নিয়মিত ছাত্র হিসেবে ক্লাস করছেন। এর মধ্যে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৫৫ জন, ম্যানচেস্টারে ৯৬ জন, লীডস্‌-এ ৮২ জন ও কেমব্রীজে ৬৮ জন পড়ছেন।

জানা গেছে যে, ৪০৮ জন ছাত্রছাত্রী টেকনিক্যাল কলেজগুলিতে উচ্চতর শিক্ষা নিচ্ছেন এবং ৪৫৪ জন এ সব বিষয়ে সাধারণ শিক্ষালাভ করছেন।

ইন্‌স্ অফ কোর্টে ১৫০ জন, কলেজেস অফ এডুকেশনে ১০ জন ও নার্সিং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে ২৭১ জন ভারতীয় ছাত্রছাত্রী শিক্ষা গ্রহণ করছেন। এ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বাইরে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩,৩৭৩ জন ভারতীয় ছাত্রছাত্রী আছেন। শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন শিক্ষাক্রমে হাতে কলমে তালিম নিচ্ছেন ২২৫ জন, বৃত্তিমূলক বিষয়ে শিক্ষা নিচ্ছেন ২১১ জন এবং অন্যান্য বিষয়ে পড়শোনা করছেন ৫২ জন। প্রাইভেট কলেজ সমেত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে অন্ততঃ পক্ষে ১৫০ জন ভারতীয় ছাত্রছাত্রী রয়েছেন।

পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য সম্পদ সংহতিকরণ

রাজ্যগুলি কি করতে পারে

এম. সুন্দর রাজন্

চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়ায়, প্রায় ২৭০০ কোটি টাকার মত অতিরিক্ত সম্পদ পাওয়া যাবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে রাজ্যগুলি ১১০০ কোটি টাকার সম্পদ সংগ্রহ করতে পারবে বলে আশা প্রকাশ করেছে। অতিরিক্ত করের অংশ হিসেবে রাজ্যগুলির যে ২০০ কোটি টাকা পাওনা হবে তা ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারকে ১৬০০ কোটি টাকার সম্পদ সংগ্রহ করতে হবে। বর্তমানের কর হার অনুযায়ী, রাজস্ব খাতে কেন্দ্রের আয় থেকে ২৩৫৫ কোটি টাকা এবং রাজ্যগুলির আয় থেকে মাত্র ২০০ কোটি টাকা, পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য পাওয়া যাবে। খসড়ায় বলা হয়েছে যে রাজ্যগুলি হয়তো এই পরিমাণ টাকাও দিতে পারবে না।

কেবলমাত্র রাজস্বকেই সম্পদের মধ্যে ধরা ঠিক হবে না, সরকারী অত্যাবশ্যকীয় সেবা এবং সংস্থা, স্বল্প সঞ্চয় এবং অন্যান্য ফী ইত্যাদি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কয়েকটি ক্ষেত্র থেকে আরও বেশী অর্থাগম হতে পারে বলে পরিকল্পনা কমিশন আভাস দিয়েছেন। তবে এই পরামর্শগুলি কার্যকরী করার পথে যে সব সমস্যা রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হচ্ছে।

জলসেচ এবং বিদ্যুৎশক্তির উন্নয়নের জন্যই রাজ্যগুলির খাতে শতকরা ৫২ ভাগ বিনিয়োগ করা হবে। তার মধ্যে আবার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণ রাজস্ব থেকে এই বিনিয়োগ করা হবে। ভেঙ্কটরমণ কমিটি সুপারিশ করেছিলেন যে, বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের জন্য যে মূলধন বিনিয়োগ করা হবে পর্যায়ক্রমিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে তা থেকে যাতে বছরে শতকরা ১১ টাকা লভ্যাংশ পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু কতকগুলি রাজ্যে বেশীর ভাগ ব্যবহারকারীকে উৎপাদনী ব্যয়ের চাইতেও কম মূল্যে বিদ্যুৎশক্তি বিক্রী করা হয়। বিদ্যুৎশক্তির মূল্যের হার বাড়ানোটা কয়েকটা রাজ্যের পক্ষে বেশ অসুবিধে-জনক কারণ তাদের প্রতিবেশী রাজ্যই হয়তো শিল্পগুলিকে অনেক কম মূল্যে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করতে ইচ্ছুক। বেশী পরিমাণে বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার-কারীরা ছাড়া অন্যান্য শিল্পগুলির পক্ষে বিদ্যুৎশক্তি একটা বড় রকমের ব্যয় কিনা তা এখনও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। তবে একটা নিরপেক্ষ অখিল ভারতীয় সংস্থা যদি বিদ্যুৎশক্তি চালিত শিল্পগুলির জন্য একটা যুক্তিসঙ্গত বৈদ্যুতিক কর হার স্থির ক'রে দেন তাহলে ভালো হয়। তবে পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করাটাই হ'ল বড় সমস্যা।

জলসেচ

বিদ্যুৎশক্তির পরই আসে জলসেচের ব্যয়ের প্রশ্নটি। ব্যবসামূলক জলসেচ ব্যবস্থা-গুলির খাতে রাজ্যগুলির এখন প্রতি বছরে ৮১ কোটি টাকা ঘাটতি দিতে হচ্ছে। নিজলিঙ্গাপ্পা কমিটি সুপারিশ করেছিলেন যে, সেচের জল পাওয়ার ফলে কৃষকদের শস্য বাবদ অতিরিক্ত যে লাভ হবে তার শতকরা ২৫ থেকে ৪০ ভাগ জলসেচের কর হিসেবে আদায় করা উচিত।

এখানেও কিছুটা অসুবিধে আছে এবং সেটা বোধ হয় মনস্তাত্বিক। প্রতিবেশী রাজ্য যদি উন্নয়ন কর চালু না করে তাহলে কোন রাজ্যই এই কর আরোপ করতে চায় না যদিও উন্নয়ন কর আরোপ করা হ'লে কৃষকের পক্ষে তার জমি অন্য রাজ্যে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে এ কথাটা মনে রাখতে হবে যে কতকগুলি অঞ্চলে জলসেচের সুবিধে এখন পর্যন্ত সব কৃষকের পক্ষে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই জলসেচ প্রকল্পগুলির ব্যয় নির্বাহ ব্যবস্থায় একটা পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। জল-সেচ প্রকল্পের ব্যয় বিভিন্ন দিকে বন্টন করা যেতে পারে; যেমন, বন্যা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে যে সাধারণ উপকার পাওয়া যায় তার জন্য ব্যয়ের কিছুটা অংশ সমগ্রভাবে সমষ্টিকে বহন করতে হবে আর যাঁরা সেচের জল পাওয়ার ফলে সোজাসুজি উপকৃত হচ্ছেন তাঁদের কাছ থেকে কর হিসেবে ব্যয়ের কিছুটা অংশ সংগ্রহ করা যেতে পারে। জলসেচ প্রকল্প কোথায় স্থাপন করা হবে সে সম্পর্কে রাজনৈতিক প্রভাব কাজে না লাগিয়ে, যাঁরা আংশিক ব্যয় বহন করতে রাজি আছেন এবং সেচের জল থেকে প্রাপ্য অতিরিক্ত আয়ের কিছুটা অংশ কর হিসেবে দিতে রাজি আছেন, সেচ প্রকল্প স্থাপনের স্থান নির্বাচনে তাঁদেরই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। তবে যে সব অঞ্চলের জনগণ সত্যিই গরীব তাঁদের জন্য কতকগুলি রক্ষাকবচ থাকা উচিত।

ন'টি রাজ্যে কৃষি আয়কর আদায় করা হয়। কিন্তু মোট আদায়ের পরিমাণ হ'ল মাত্র ১১ কোটি টাকা এবং আয়ের শতকরা ৮৫ ভাগ আসে চা বাগান ইত্যাদি থেকে। এই আয় একদিকে যেমন সামান্য অন্যদিকে অনেক রাজ্যেই এই আয় কমে যাচ্ছে। তা ছাড়া এই আয় আদায় করার ক্ষেত্রেও অনেক সমস্যা রয়েছে।

বর্তমানে যখন আমাদের দেশে কৃষিকাজ একটা লাভজনক বৃত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন ব্যয় সম্পর্কিত করের ওপর বেশী গুরুত্ব না দিয়ে আয় ও সম্পদের ওপরেই বেশী দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কারণ বিক্রয় কর কোন সময়েই আলাদীনের প্রদীপ হয়ে উঠবে না যা' থেকে সব কিছু পাওয়া যেতে পারে। চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়ায় অবশ্য বলা হয়েছে যে, সমস্ত রাজ্যগুলিতে বিক্রয় করের বিভিন্ন হারের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকা উচিত। কতকগুলি রাজ্যে ব্যবসা বাণিজ্য বাড়াবার উদ্দেশ্যে বিক্রয় করের

হার কম রাখা হয়েছে। এর ফলে যে রাজ্যগুলি অপেক্ষাকৃত গরীব, সেগুলি বিক্রয় করের হার বাড়াতে পারে না। কাজেই এ ক্ষেত্রেও একটা পূর্ব নির্দিষ্ট জাতীয় নীতি থাকা উচিত।

১৯৫৭-৫৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার যখন অতিরিক্ত আবগারি কর ধার্য করলেন তখন থেকেই রাজ্যগুলি বস্ত্র, তামাক এবং চিনির ওপর বিক্রয় কর আদায় করা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে। বিক্রয় কর এবং আবগারি কর মিলিয়ে দেওয়ায় ব্যবসায়ীগণ সুখী হলেও রাজ্যগুলি সন্তুষ্ট হয়নি। পঞ্চম আর্থিক কমিশন এই ব্যাপারটাও বিবেচনা করে দেখছেন।

বিক্রয় কর সম্পর্কে এই সব অসুবিধে থাকায়, আরও কিছু আয় বাড়াবার উদ্দেশ্যে রাজ্যগুলির মনযোগ স্বাভাবিকভাবেই সহর ও গ্রামাঞ্চলের সম্পদ এবং ভূমির ওপর গিয়ে পড়ে। বর্তমানকালে যখন আয় ক্রমশ বাড়ছে এবং ব্যবসায়ীর সংখ্যা বাড়ছে তখন সংবিধানের ২৭৬ নং ধারাটি রাজ্যগুলির কাছে একটা 'বর'-এর সামিল হয়ে উঠতে পারে। এই ধারা অনুযায়ী রাজ্যগুলি, ব্যবসা বা চাকুরি ইত্যাদিতে নিযুক্ত প্রতিটি ব্যক্তির ওপর ২৫০ টাকা পর্যন্ত কর ধার্য করতে পারেন। প্রমোদ করও অনেকখানি বাড়াতে পারা যায়। আয় বাড়াবার উদ্দেশ্যে রাজ্যগুলি অন্যান্য উপায়ের কথাও ভেবে দেখতে পারেন।

(১৮ পৃষ্ঠার পর)

অনুকূল সম্ভাবনার ইঙ্গিতই দেয়।

বছরে আমরা প্রায় ৬ কোটি টাকার পশম বিদেশে রপ্তানি করি। এর মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ যদি কার্পেট তৈরির যন্ত্রপাতি আমদানী করার জন্যে পৃথক করে রাখি, তাহলে কলে তৈরি কার্পেট রপ্তানী করে বছরে ১৫ কোটি টাকার মত বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। তা ছাড়া আমাদের চিরাচরিত রপ্তানী পণ্যের তালিকার কলে তৈরি কার্পেট এখনও স্থান পায়নি। কিন্তু একবার ভালোমত কাজ সুরু হয়ে গেলে রপ্তানি পণ্য হিসেবে এই নতুন শিল্পের গুরুত্ব ক্রমশঃই বাড়বে। আমাদের দেশে এই শিল্পের বিকাশে কোনোও রকম বাধা বিঘ্নের অবকাশ নেই। এই শিল্পের যথাযথ বিকাশের জন্যে প্রয়োজনীয় কারিগরী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এদেশে যথেষ্ট আছে। কুশলী কারিগরেরও কোনোও অভাব নেই।

দেশে বিদেশে এখনও অনেক লোক হাতে তৈরি কার্পেট পছন্দ করেন। তার প্রধান কারণ হ'ল নক্সা, বুনন ও রঙের সংমিশ্রণে প্রত্যেকটি কার্পেটের বৈশিষ্ট্য নিজস্ব। হাতে তৈরি কার্পেট সাধারণ ও একঘেয়ে বলে কলে তৈরি কার্পেটেরভিড়ে হারিয়ে যাবে না। কার্পেট শুধু সমৃদ্ধির চিহ্ন বহন করে না, তা আভিজাত্যেরও প্রতীক। কিন্তু এ ধরণের বিলাসকে প্রশ্রয় দেবার সঙ্গতি অল্প লোকেরই আছে। কলে বোনা কার্পেট তাঁদের জন্যে নয়। তাছাড়া হাতে তৈরি বলেই এ ধরণের কার্পেটের উৎপাদন সীমিত এবং এগুলি সাধারণের নাগালে পৌঁছয় না। অতএব কলে বোনা কার্পেটকে কেন্দ্র করে কোনোও শিল্প গড়ে উঠলে এই শিল্পে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হবে না। কারণ হাতে বোনা কার্পেটের চাহিদা কোনো দিনই কমবে না।

রবারের উৎপাদন বৃদ্ধিতে রাসায়নিক উপাদান

মালয়েশিয়ায় গবেষণারত বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, যে, একটা বিশেষ রাসায়নিক বস্তু প্রয়োগে রবারের উৎপাদন শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। রাসায়নিক উপাদানটির নাম হ'ল 'ইথরেল্'।

বাজারে যেসব কৃত্রিম 'হরমোন্' পাওয়া যায়, ইথরেল তার 'অন্যতম। 'ইথরেল' গাছের কোষগুলিতে এথিলিন গ্যাস ছেড়ে দেয়। দেখা গেছে যে, অন্যান্য কৃত্রিম হরমোনের মত ইথরেল-এর ব্যবহারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না।

তবে মালয়েশিয়ার রবার রিসার্চ্ ইনস্টিটিউটে এই জিনিষ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি। যদিও রবার চাষ সম্বন্ধে সাধারণ গবেষণা শুরু হয় ১০ বছর আগে, এই বিশেষ কার্যসূচীটি মাত্র এক বছর আগে হাতে নেওয়া হয়েছে।

ভারতে ট্র্যাক্টারের চাহিদা

ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে

ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, আফগানিস্তান ও নেপালে এখন মোট ১২৫,০০০ ট্র্যাক্টার ব্যবহৃত হচ্ছে। ৭ বছর আগে এর তিন ভাগের এক ভাগও ব্যবহৃত হতো না। চাষের কাজ অনেক সময়ে, বেশ রাত পর্যন্ত চলে।

সার, প্রচুর ফলনের বীজ ও কীট নাশক প্রভৃতি উপাদানের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় ট্র্যাক্টারের চাহিদা ক্রমশ: বেড়ে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি বিভাগের অর্থনৈতিক গবেষণার সাম্প্রতিক একটি বিবরণীতে এই খবর দেওয়া হয়েছে।

ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ভারতে গত দু বছরে ট্র্যাক্টারের উৎপাদন দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। ১৯৬৯ সালে ১৪,০০০/১৫,০০০ ট্র্যাক্টার তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসবে।

দিল্লীর সহরতলীর একটি শিল্পাঞ্চলে ট্র্যাক্টারের সবচেয়ে বড় যে কারখানাটি আছে সেটি কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন। উপস্থিত এই কারখানায় বছরে ৭০০০ ট্র্যাক্টার তৈরি হ'তে পারে। এ ছাড়া আরও যে সব কারখানা আছে, সেগুলির মধ্যে সর্বশেষে নির্মিত কারখানাটি চালাচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল হারভেস্টার নামক একটি মার্কিণ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। এই কারখানার উৎপাদন ১৯৭০ সাল নাগাদ ৭,০০০ এ দাঁড়াবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তুলো, চিনেবাদাম ও ধান চাষীরা ছোট ট্র্যাক্টার পছন্দ করেন।

ভারত ১৯৬৭ সালে ৭,৩০০ ট্র্যাক্টার (১৯৬২ সালের তিনগুণ) আমদানী করে। ট্র্যাক্টার আমদানী-রপ্তানী সম্পর্কে সম্প্রতি যে বিবরণী প্রকাশ করা হয়েছে, ত'তে বলা হয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬৮ সালে ভারতকে ৪০ লক্ষ ডলার মূল্যের ট্র্যাক্টার রপ্তানী করে। বড় বড় সেচ ও সড়ক সংক্রান্ত কাজের জন্যে তখন বড় বড় ট্র্যাক্টারের প্রয়োজন হয়।

তৈল শিল্পে ভারত

প্রেমচাঁদ (সংবাদিক)

গুজরাটের তিন বছর আগেকার অতি নগণ্য গ্রাম কোয়ালীর আজ এতটা পরিবর্তন হয়েছে যে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। গুজরাট তৈল শোধনাগারের জন্য কোয়ালীর খাতিরও বেড়েছে। শোধনাগারটিকে কেন্দ্র ক'রে এখানে যে উপনগরীটি গড়ে উঠেছে জওহরলাল নেহরু তার উদ্বোধন করেছিলেন ১৯৬৩ সালে। তাঁর স্মৃতি স্বরূপ উপনগরীর নাম রাখা হয়েছে জওহরনগর। বিজলী বাতির আলোয় সেই গণ্ডগ্রামের কোনোও ছায়া নেই। কিন্তু এটা হ'ল পরের কথা। আগে হ'ল শোধনাগার। এটি কবে স্থাপন করা হ'ল, কেমন ক'রে বড় হ'ল ও এর ভবিষ্যৎ কী এই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

তৈল শিল্পের ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভর হবার প্রয়াসে এই শোধনাগারের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। এটির উদ্বোধন করা হয়েছিল ১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাসে। তারপরে ১৯৬৬ সালে এর দ্বিতীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণের কাজ হাতে নেওয়া হয়। এখন তৃতীয় পর্যায়ে, সম্প্রসারণের কাজ চলেছে।

তেল শোধন একটা জটিল প্রক্রিয়া যা বিশেষ ধরণের বৈজ্ঞানিক দক্ষতার ওপর নির্ভর করে। শোধনাগারটি তৈরি করতে আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনীয়ার শোধনাগার স্থাপন ও পরিচালনার ব্যাপারে যে রকম দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসার দাবী রাখে। বছরে ২০ লক্ষ টন তেল শোধনের ক্ষমতা বিশিষ্ট এই শোধনাগারের শতকরা ৪০ ভাগ নক্সা তৈরি করেছেন আমাদের ইঞ্জিনীয়াররা। শতকরা ৬০ ভাগ যন্ত্রপাতিও এ দেশেই তৈরি হয়েছে। এখন সম্প্রসারণের যে কাজ চলেছে তা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে এখানে বছরে ৩০ লক্ষ টন তেল শোধন করা যাবে এবং বছরে ১৬ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ঘটবে। এই তৃতীয় পর্যায়ের কার্যসূচীর জন্যে নক্সা তৈরি করেছেন বরোদার 'কেন্দ্রীয় ডিজাইন সংগঠনের' ভারতীয় ইঞ্জিনীয়াররা এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির শতকরা ৭৫ ভাগ দেশের বিভিন্ন কারখানায় তৈরি হচ্ছে।

আঙ্কলেশ্বর থেকে অশোধিত তেল ৯৮ কিলো মিটার লম্বা ও ৩৫০ মিলি মিটার চওড়া পাইপ দিয়ে কারখানাতে আনা হয় এবং ৫০ লক্ষ লিটার ক্ষমতা বিশিষ্ট ১৬টা ট্যাঙ্কে প্রথমে এই তেল মজুদ করা হয় এবং পরে পাম্পের সাহায্যে নিয়ে যাওয়া হয় পরিশোধনের জন্য। আঙ্কলেশ্বরের খনিজ তেল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খনিজ তেলগুলির অন্যতম বলা যেতে পারে কারণ এই তেলে গন্ধকের মাত্রা খুবই কম অন্যদিকে কেরোসিন, ডিজেল জাতীয় পদার্থ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। এই তেলে তলানি (সেডিমেন্ট) খুব কম পরিমাণে থাকে। এই কারখানায় খনিজ তেল থেকে যে কেরোসিন তেল বা ডিজেল নিষ্কাশিত করা হয় তা এতই উৎকৃষ্ট ধরণের যে দ্বিতীয়বার শোধনের আর প্রয়োজন হয় না। এ ছাড়া তেল শোধনের পর যে অবশিষ্ট পড়ে থাকে সেটাও ধুবরান এবং সবরমতীর বিদ্যুৎ কারখানায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

'ন্যাপথা' (এক প্রকারের অপরিশ্রুত পেট্রল) থেকে বিশেষ রকম প্রক্রিয়ায় পেট্রোলিয়াম, ইথার, গ্যাসোলীন, বেনজীন, টোলীন, জাইলীন ইত্যাদি তৈরি হয়। এই সব পদার্থ বড় বড় শিল্পে বিশেষ রসায়ন হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং রবার, কৃত্রিম সুতো, ঔষধ, রঙ ও বিস্ফোরক পদার্থের কারখানাতেও প্রয়োজন হয়। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় এই যে, এই সব পদার্থ দেশেই তৈরি করার উদ্দেশ্যে ২ কোটি টাকা ব্যয়ে 'উডেক্স' নামক একটা যন্ত্র তৈরি করা হচ্ছে।

এ ছাড়া এই কারখানার যন্ত্রপাতি মেরামতের কাজও এখানকার যন্ত্রশালায় হচ্ছে যা সম্পূর্ণ ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারদেরই হাতে তৈরি। বিভিন্ন যন্ত্রপাতির উৎপাদনশক্তির মান বাড়াবার ব্যাপারে পরীক্ষা চালানোর জন্য এখানে একটি বিশেষ শাখাও খোলা হয়েছে। এই কারখানার প্রায় সমস্ত যন্ত্রপাতিই স্বয়ংচালিত এবং কার্যকুশলতা বা উৎপাদনের দিক থেকে এই কারখানাকে আধুনিকতম বলা যেতে পারে। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ১৫০০ ইঞ্জিনীয়ার ও কারিগর এখানে এসে কাজ করছেন।

এই শোধনাগারের নিজস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এখানকার জ্বালানি তেলই ব্যবহৃত হয় যা থেকে ২৪ মেগাটন পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে পারে। এই কারখানায় এবং কর্মীগণের বাসস্থানে বর্তমানে জল সরবরাহ করা হচ্ছে এক নতুন পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী, কারখানার পাশ দিয়ে যে নদী বয়ে গিয়েছে সেই বাহী নদীর তীরে

	উৎপাদনের পরিমাণ (বর্তমান ক্ষমতা অনুযায়ী)	উৎপাদনের পরিমাণ (৩০ লক্ষ টনের ক্ষমতা অর্জনের পর)
মোটর স্পিরিট	৩,৮৮,০০০	৬,০২,০০০
মিশ্রিত তেল	২৫,০০০	২৫,০০০
কেরোসিন তেল	৩,৮২,০০০	৫,৮৯,০০০
উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ডিজেল	৫,২৩,০০০	৭,৩৪,০০০
রান্নার জন্য ব্যবহৃত গ্যাস	২০,০০০	১০,০০০
জ্বালানি তেল	৩,১৪,০০০	৬,২৪,০০০
	১৬,৫২,০০০	২৫,৮৪,০০০

উৎপাদন সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করে নেবার জন্য উপরে একটা হিসেব দেওয়া হ'ল :

দুটি নলকূপ খনন করা হয়েছে। এই নলকূপের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, নদীর পাশের জমির নীচে যে জল আছে তাতে বিশেষ ধরণের নলের জাল বিছিয়ে জল উপরে টেনে তোলা হয়। সাধারণ ১৭টা কুয়ো থেকে যতটা জল পাওয়া সম্ভব এই দুটো কুয়ো থেকে ততটা পরিশ্রুত জল পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিদিন ২ কোটি গ্যালন জল এই কুয়ো দুটি থেকে পাওয়া সম্ভব। গুজরাটের শিল্পোন্নয়নে এই শোধনাগারের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। ধুবরান ও ও সবরমতীর বিদ্যুৎ কারখানায় জ্বালানি তেল সরবরাহ করা ছাড়াও আগামী বছর থেকে আমেদাবাদের বিদ্যুৎ কারখানাতেও এখান থেকে জ্বালানি সরবরাহ করা হবে। এই জ্বালানি পাওয়াতে বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে সারা বছর সমানভাবে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে পারবে। এখন কোয়েলীতে নাইলন, পলিষ্টার ইত্যাদি কৃত্রিম সুতো তৈরির জন্য তিনটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কারখানা স্থাপনের তোড় জোর চলছে যা থেকে বছরে ১৯,৫০০ টন সুতো তৈরি হতে পারবে। এই কারখানাগুলি স্থাপিত হলে এখানে শত শত লোকের অন্নের সংস্থান হবে।

আমাদের দেশে কেরোসিন তেল ও ডিজেল আগে বাইরে থেকেও আমদানী করতে হত। গুজরাটের এই কারখানা বর্তমানে আমাদের সেই চাহিদা বহুলাংশে মেটাচ্ছে কারণ এখানে উৎকৃষ্ট কেরোসিন তেল ও ডিজেল প্রচুর পরিমাণে তৈরি হচ্ছে। জেট প্লেন চালাবার উপযোগী ডিজেলও এই প্রথম এখানে তৈরি হচ্ছে। এখন এখানে প্রধানত মোটরের জন্যে পেট্রল, কেরোসিন, উচ্চ গতির জন্য ডিজেল ও জ্বালানির জন্য তেল উৎপন্ন হচ্ছে। এই শোধনাগার, দিল্লী ও রাজস্থানের প্রয়োজন এবং মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবের চাহিদা কিছু কিছু মেটাচ্ছে। এই কারখানায় দ্রবীভূত পেট্রল গ্যাসও তৈরি হচ্ছে।

গুজরাটের এই শোধনাগার শুধু যে, ডিজেল ও কেরোসিন তেল প্রভৃতির আমদানী কমিয়ে বিদেশী মুদ্রার সাশ্রয় ঘটাচ্ছে তাই নয় উপরন্তু এই শোধনাগার ভবিষ্যতে নিজের ক্ষমতাতেই আরও তেল শোধনাগার স্থাপন করতে সমর্থ হবে।

প্রচুর-ফলন বীজের প্রচারে অভিযান

রাজস্থানে কৃষি ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটাবার জন্যে সম্প্রতি এক কার্যসূচী প্রবর্তন করা হয়। তারই অঙ্গ হিসেবে একটা বিশেষ অভিযান সুরু করা হচ্ছে—অভিযানের নাম হ'ল খারিফ আন্দোলন। একমাত্র চির-দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জয়সালমীর ছাড়া রাজ্যের সমস্ত অঞ্চলকে এই অভিযানের আওতায় আনা হবে। যে ১৪ একর জমিতে প্রচুর ফলনের বীজ বোনা হবে তার অর্ধেক জমিতে বীজ বোনা হবে খারিফ মরসুমেই।

রাজ্যে ধানের চাষ হয় শুধু ৬টি জেলাতে। অতএব নতুন জাতের বীজ লাগানো হবে ভরতপুর, গঙ্গানগর, বুঁদি, কোটা, বানসোয়ারা ও ডুঙ্গারপুরে।

রাজ্যের ১৬টি জেলার ৫.৫০ লক্ষ একর জমিতে অবশ্য দো-আঁশলা বাজরা বোনা হবে। এই জমির মধ্যে ৯০,০০০ একর জমি আছে গঙ্গা নগরে ও ৮৫,০০০ একর আলোয়ারে।

এইভাবে ১৬টি জেলায় এক লক্ষ একর জমিতে দো আঁশলা ভূট্টার বীজ বোনা হবে।

১৪টি জেলার ৩০,০০০ একর জমিতে দো আঁশলা জোয়ার লাগানো হবে। এর মধ্যে টঙ্ক জেলায় জমির পরিমাণ সবচেয়ে বেশী—৪,০০০ একর।

স্থানীয় বাজরার বীজে, যেখানে ফসল পাওয়া যায় ৯৩ কেজি থেকে ১১২ কেজি সেখানে যথোপযুক্ত সার ও উদ্ভিদ রক্ষার জন্যে কীটনাশক ব্যবহার করে ফলনের পরিমাণ দাঁড়ায় একর প্রতি ৬.৪৬ থেকে ৯.৩৩ কুইন্টাল পর্যন্ত। সেচ যুক্ত এলাকায় দো-আঁশলা জাতের জোয়ারের ফলনের গড়পড়তা পরিমাণ হ'ল ১১.১৯ থেকে ১৪.৯২ কুইন্টাল (প্রতি একরে)। কয়েকজন প্রগতিশীল কৃষক আবার ২২.৩৯ থেকে ২৪.২৫ কুইন্টাল ফসল তুলেছেন। ঠিক তেমনি দো-আঁশলা ভুট্টার ফলন স্থানীয় জাতের ভুট্টার শতকরা দেড় থেকে ২ ভাগ বেশী।

এ যাবৎ উদয়পুর, দুর্গাপুর (জয়পুর) ও কোটার কৃষি শিক্ষণ কেন্দ্রে, প্রচুর ফলনের বীজের চাষ সম্বন্ধে ৫০০০ কৃষককে, প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। জেলা, ব্লক, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পর্যায়ে শিক্ষণ শিবির খোলা হয়েছে।

রাজ্যে আলোক চিত্র, ছায়াচিত্র ও বেতার প্রভৃতির মতো যে সব সুবিধা আছে এই আন্দোলন সফল করার জন্যে তার সবগুলিই কাজে লাগানো হচ্ছে।

নতুন জাতের ফসল

রাজস্থানের দুর্গাপুরাতে কৃষি গবেষণা খামারে নতুন প্রজাতির ফল সৃষ্টির জন্যে পরীক্ষা চালানো হয়। এবারে ঐ খামারে দুটি নতুন জাতের তরমুজ ও একটি নতুন জাতের খরমুজ ফলানো হয়েছে। দো-আঁশলা ঐ তিনটি বীজেরই ফলন প্রচুর।

গবেষণা কর্মীরা ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের একটি কার্যসূচী অনুযায়ী পরীক্ষায় হাত দেন ও সাফল্য লাভ করেন। গত তিন বছর ধরে তাঁরা এই নতুন বীজ ব্যবহার করছেন। তাঁদের মতে নতুন ধরণের অন্যান্য কয়েকটা দো-আঁশলা জাতের তুলনায় এই তিনটি গুণাগুণে ঢের ভালো। ভালো জাতের সাধারণ তরমুজের ফলন যেখানে একরে ৭৫ থেকে ১৩০ কুইন্টাল, সেখানে দো-আঁশলা জাতের ফলন প্রতি একরে ৩৭০ থেকে ৪৪৫ কুইন্টাল। দ্বিতীয়তঃ স্থানীয় বীজ থেকে ফলানো তরমুজ পাকতে ১১০-১২০ দিন নেয় আর দো-আঁশলা তরমুজ পাকতে সময় লাগে ৯০-১০০ দিন। ফলে যাঁরা এই নতুন জাতের ফলের চাষ করবেন তাঁরা অন্যের তুলনায় অনেক আগেই বাজারে মাল পাঠাতে ও অধিক আয় করতে (ফলনের পরিমাণ বেশী হওয়ায়) পারবেন।

এ বছরে আগ্রহী চাষীদের হাতে নতুন বীজের কয়েকটি প্যাকেট দেওয়া হয়। তাঁরা বীজের ফলন দেখে খুবই সন্তুষ্ট হয়েছেন।

উত্তর বাংলায় নদী শাসন

বিবেকানন্দ রায়
(আমাদের সংবাদদাতা)

গত বছরে, অক্টোবর মাসে উত্তর বাংলার ওপর দিয়ে ধ্বংসের যে ঢেউ বয়ে যায় সে কথা সহজে কারুর ভোলার কথা নয়। প্রবল বন্যার ফলে যে ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি ঘটে তার স্মৃতি বিভীষিকাময়। গত বছরের ঐ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি এড়াবার জন্যে, এ বছরে ইতিমধ্যেই, বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে।

উত্তর বাংলার নদীগুলির ওপর যে সব বাঁধ আছে এবং নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে যে সব পাথর ও কনক্রিটের টুকরো বসানো হয়েছিল সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতি প্রভৃতির জন্যে বন্যা সংক্রান্ত 'টেকনিক্যাল কমিটি' এবং কেন্দ্রীয় সরকারের একটি অনুশীলনী কমিটি যৌথভাবে কাজ করছেন। কিন্তু এই ধরণের কাজ হচ্ছে স্বল্প মেয়াদী। নদীর সম্পূর্ণ গতিপথ চিহ্নিত ও নিয়ন্ত্রিত করার মত দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পগুলির কাজ এখনও সুরু হয়নি, তা ছাড়া এ সব কাজ সুরু করলেও এ শেষ হতে বেশ সময় লাগবে। ইতিমধ্যে বাঁধ মেরামত, ও নদীর পার রক্ষা করার জন্য পাথর বসানোর কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কয়েকটি নতুন বাঁধ তৈরি করারও পরিকল্পনা আছে। সেগুলি বর্ষা সুরু হওয়ার আগেই শেষ করে ফেলা হবে। টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার এই সমস্ত প্রকল্প রূপায়ণের ব্যয় বহন করবেন।

বর্তমানে তিস্তার জলধারাকে শাসন করে তিস্তাকে তার নিজস্ব পথে প্রবাহিত করার জন্যে ৬টি ব্যবস্থা গ্রহণ করার সঙ্কল্প করা হয়েছে। তার মধ্যে আছে নদীর জল নিয়ন্ত্রণকারী বাঁধের ভাঙন ও ফাটল মেরামত, খাল কেটে নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা, পার রক্ষাকারী বাঁধ মেরামত ও তৈরি এবং আপালচাঁদ নদীর জলরোধ প্রভৃতি। এ সবের জন্যে আনুমানিক ব্যয়ের হিসেব হ'ল ৪১ লক্ষ টাকার ওপর।

সিধাবাড়ী চেঙমারী বাঁধ

তিস্তার জল যাতে কূল ছাপিয়ে আশপাশের এলাকা প্লাবিত না করে তার জন্যে ১৯৬২ সালে এই বাঁধ তৈরি করা হয়েছিল। গত অক্টোবরে তিস্তার গতিপথ সিধাবাড়ীর কাছ বরাবর এসে বদলে যায় এবং নদীর জল কাঠামবাড়ী এলাকার শীর্ণকায়া আলাপচাঁদ নদীর সঙ্গে মিশে যায়। ফলে দুকূল ছাপানো জলের তোড়ে আশপাশের সুসমৃদ্ধ গ্রামগুলির সঙ্গে কৃষি জমিরও খুব ক্ষতি হয়। এরপর তিস্তার জল খুলনাই ও ধারালী নদীর মধ্যে দিয়ে বয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত বাসুসুবার কাছে তিস্তা আবার নিজের পথ ধরে।

জলপাইগুড়ি শহর

জলপাইগুড়ি শহর রক্ষার জন্যে ১৯৫৫ সালে এই বাঁধ তৈরি করা হয়েছিল। বাঁধের দৈর্ঘ্য হবে ১৯ কিলো মিটারের মত। গত বছরে বন্যার জল বাঁধের ৯টি জায়গা ভেঙে ছাপিয়ে পড়ে। কারালা নদীর ওপর তৈরি সড়ক সেতুর কাছে যেখানে এই বাঁধ গিয়ে ঠেকেছে সেইখানে আরও দুটি জায়গায় ভাঙন ধরে। প্রবল প্লাবনে জলের তোড়ে ভেসে আসা গাছ পাথরের ধাক্কায় বাঁধের আরও ক্ষতি হয়। সঙ্গে সঙ্গে রেলপথের সেতুর নীচে ও অন্যত্র তৈরি স্রোত প্রতিরোধকারী ব্যবস্থাগুলি খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শহরটি রক্ষা করার জন্যে নতুন করে এই বাঁধ প্রভৃতি তৈরি করতে ৪৪ লক্ষ টাকার'মত খরচ হবে বলে ধারণা।

কোচবিহার শহরটি রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বাঁধ তৈরি ও মেরামতি প্রভৃতির জন্যে ৩৫ লক্ষ টাকার মত খরচ হবে। বাঁধটি প্রস্থে হবে ৭.৫ মিটারের মত যেখানে জায়গা বেশী নেই সেখানে ৪.৫ মিটারের মত। মরাতোরসা নদীর পার ভেঙে পড়ছে। এটা বন্ধ করার জন্যে ছোট ছোট প্রাচীরের মত তৈরি করা হবে। পারের যেটুকু অংশ অরক্ষিত অবস্থায় আছে তা রক্ষার জন্যে ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শিলতোরসা নদী

দেওভাঙার কাছে শিলতোরসা যাতে গতি না বদলায় তার ব্যবস্থা করার জন্যে গোড়ায় ১৮.৩৫ লক্ষ টাকার সংস্থান করে একটি প্রকল্প তৈরি করা হয়েছিল। বিষয়টি বিবেচনার জন্যে কার্যসূচীটি যখন টেকনিক্যাল কমিটির কাছে দেওয়া হ'ল তখন কমিটি সংশোধনের জন্যে কতকগুলি প্রস্তাব দেন। তাঁদের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যয়ের হিসেব দাঁড়ায় ২০ লক্ষ টাকা।

টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুরোনো বাঁধের জায়গায় আবার নতুন করে বাঁধ তৈরি করা হচ্ছে। এই কার্যসূচীতে নদীর উপকূল থেকে ১৫০ মিটারেরও বেশী দূরে, নদীর কূল ছাপানো জল শাসন করার জন্যে আর একটি বাঁধ তৈরি করা হচ্ছে।

বারনেস দোমোহানী বাঁধ

জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা দুটিতে, তিস্তা নদীর বাঁ দিকের তীরের কিছু জমি রক্ষা করার জন্যে এই বাঁধ প্রথম তৈরি করা হয়।

বাঁধটি দৈর্ঘ্যে ১১ কিলো মিটার এবং দোমোহানী রেলওয়ে স্টেশনের আন্দাজ তিন কিলোমিটার উত্তরে মাল-চেংরাবাঁধা মীটার গেজ রেলপথ পর্যন্ত গিয়েছে।

গত বছরে ব্রড গেজ রেলপথের গোড়ার দিকে পুরো বারনেস দোমোহানী বাঁধ প্লাবিত হয়। বন্যার জল রেলপথের ওপর যাতে এসে না পড়ে তার জন্যে যে বাঁধ তৈরি করা হয়েছিল সেটি জলের তোড়ে ভেসে যায়। ঐ অঞ্চলটা পুরোই বন্যার দরুন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বারনেস-দোমোহনী বাঁধ নতুন করে তৈরি করা হবে বলে স্থির হয়েছে।

হেলাপাকরি বাঁধ

তিস্তার বাঁ তীর বরাবর, ১৮ কিলো মিটার লম্বা, হেলাপাকরি বাঁধ তৈরি করা হয় ১৯৫৯ সালে। উদ্দেশ্য ছিল প্রধান প্রধান সড়ক, রেলপথ যোগাযোগ ব্যবস্থা, চাষের জমি এবং হেলাপাকরি ও মেখলীগঞ্জকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা। গত বছরের বন্যায় বাঁধে ভাঙন ধরে এবং বন্যারোধের জন্যে তৈরি অন্যান্য ব্যবস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গ্রামাঞ্চল ও নদী কূলবর্তী এলাকাগুলিও খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পরিকল্পনা ও সমীক্ষা

পরিকল্পনার কার্যকারিতা ও তার অগ্রগতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে সারা দেশের কলেজগুলিতে 'প্ল্যানিং ফোরাম' খোলা হয়েছে। কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এই 'ফোরামের' সভ্য হিসেবে পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁরা মাঝে মাঝে দল বেঁধে বেরিয়ে পড়েন বিভিন্ন গ্রামের বর্তমান অবস্থা কী এবং সেইসব গ্রামে পরিকল্পনার কোন প্রভাব পড়েছে কিনা কিংবা সে সব জায়গায় পরিকল্পনার সাড়া আদৌ পৌঁচেছে কি না তার সম্যক ধারণার জন্যে। এই স্তম্ভে বিভিন্ন অঞ্চল সম্বন্ধে এইসব 'ফোরামের' সমীক্ষার বিবরণ দেওয়া হয়।

পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা— শিক্ষিত সমাজ কী ভাবেন ?

শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে পরিবার পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলির সংযোগ কতটা কিংবা এগুলির ওপর উচ্চশিক্ষা ও আর্থিক অবস্থার প্রতিক্রিয়া কিরকম তা নিরূপণ করার জন্যে আহমেদাবাদের সিটি কমার্স কলেজের 'প্ল্যানিং ফোরাম', কলেজের শিক্ষকদের মনোভাব যাচাই করার উদ্দেশ্যে একটা সমীক্ষা নেন।

অর্থনৈতিক দিক থেকে এই গোষ্ঠীকে মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল ব'লে গণ্য করা হয়। তাছাড়া শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করায় তরুণদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রভাবিত করার অবকাশ এঁদের প্রচুর। অতএব উচ্চশিক্ষিত এবং স্বতন্ত্র একটি গোষ্ঠি হিসেবে আহমেদাবাদ শহরের মোট ৬০০ জন শিক্ষকের মধ্যে ৬০ জনকে এই সমীক্ষার জন্যে বেছে নেওয়া হয়।

সমীক্ষার ফলে দেখা গেছে, যে, এঁদের মধ্যে শতকরা ৯১ জন পরিবার পরিকল্পনা সমর্থন করেন। অবশিষ্ট ৯ শতাংশের মধ্যে ৭ শতাংশ এই কার্য্যসূচীর বিরোধী এবং শতকরা ২ জন এ সম্বন্ধে কোনোও রকম মতামত প্রকাশ করতে অসম্মত হ'ন। এর থেকে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যে, উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যেও শতকরা ৯ জন এই পরিকল্পনার বিরোধী।

এই পরিকল্পনা সমর্থনের প্রধান যুক্তি হ'ল অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার আশ্বাস। শতকরা ৭৭ জন বলেন পরিবার সীমিত থাকলে আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় থাকে। এছাড়াও এঁদের মধ্যে শতকরা ২৬ জন পরিবার পরিকল্পনাকে স্বাস্থ্যরক্ষার সহায়ক ব'লে গণ্য করেন এবং শতকরা ২০ জন এই পরিকল্পনা অনুমোদন করেন জাতীয় স্বার্থে। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ভবিষ্যতে, পরিবার নিয়ন্ত্রণ অভিযান পরিচালনার কার্য্যসূচী নির্দ্ধারণে বিবেচিত হ'তে পারে।

কার্য্যক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত নয়

কথায় ও কাজের মধ্যে সাধারণত: বেশ বড় রকমের ব্যবধান থাকে। এ ক্ষেত্রেও তা'র অন্যথা হয়নি। শতকরা ৯১ জন পরিবার পরিকল্পনার প্রশস্তি গাইলেও কার্য্যত: শতকরা ৬০ জন জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পন্থা কার্য্যকরভাবে গ্রহণ করেছেন। যাঁরা করেননি তাঁদের কৈফিয়ৎ হ'ল জন্ম নিরোধের উপায়গুলি অনুসরণ করা যায় না কারণ এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সুযোগ সুবিধাগুলির এখনও যথেষ্ট অভাব রয়েছে। যাঁরা পরিকল্পনাটির সক্রিয় সমর্থক তাঁদের মধ্যে, বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হ'ল 'কন্ট্রাসেপটিভ্' ও'রিং'। শতকরা ৩৩.৩ জন এই পদ্ধতি অনুসরণ করেন। শতকরা ২৪ জন 'সেফ্ পিরিয়ড বা নিরাপদ সময়টি' মেনে চলেন এবং শতকরা ২২ জন 'ট্যাবলেট' বা 'জেলী' ব্যবহারের পক্ষপাতী। একটা আশ্চর্য্যের কথা হ'ল এই যে, নিরাপদ, কার্য্যকর ও সুলভ ব'লে 'লুপের' ব্যাপক প্রচার সত্ত্বেও, সমীক্ষার জন্যে নির্ব্বাচিত দলটির কেউই লুপ ব্যবহার করেন না। 'লুপ' ব্যবহার করলে মেয়েদের স্বাস্থ্য ভেঙে যাবে, এইটিই হ'ল তাঁদের অধিকাংশের প্রধান আশঙ্কা।

জন্মনিরোধ পদ্ধতিগুলির ব্যর্থতা

আর একটা বিষয়ও সমীক্ষার ফলাফলে লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছে। সেটি হ'ল এই, যে জন্ম নিয়ন্ত্রণের সক্রিয় সমর্থকদের মধ্যে শতকরা ২৬ জন, জন্মনিরোধ পদ্ধতিগুলির ব্যর্থতার উল্লেখ করেন। এ সম্বন্ধে অজ্ঞরা নানান্ কথা বলতে পারেন। কিন্তু এঁরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করা বা ডাক্তারদের পরামর্শ নেওয়া আদৌ কঠিন নয়। এঁদের সংখ্যাও বেশ অনেক।

গর্ভপাত আইনসম্মত করা উচিত কি না?

গর্ভপাত আইনসিদ্ধ করা সঙ্গত কি না জিজ্ঞাসা করা হ'লে শতকরা ৬০ জন বলেন তাঁরা এই কার্য্যসূচীকে আইনের স্বীকৃতি দিতে অসম্মত। অবশিষ্ট ৪০ শতাংশ এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। বিরোধীরা বলেন,—প্রথম এই কার্য্যসূচী স্বাস্থ্যের দিক থেকে হানিকর। দ্বিতীয়, মায়ের মনের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। তৃতীয়, গর্ভপাত আইনানুগ করার ফলে সামাজিক সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং চতুর্থ ও সবচেয়ে প্রধান প্রশ্ন হ'ল নৈতিক দিক থেকে এই প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য কি না ?

সর্ব্বশেষে এঁদের জিজ্ঞাসা করা হয়, যে, একটি আদর্শ পরিবারে বাঞ্ছিত সন্তান সংখ্যা কত হওয়া উচিত। তাঁরা এক-বাক্যে বললেন 'দো ইয়া তিন, বাস্।'

ট্র্যাক্টারের ব্যাপক ব্যবহার কবে সম্ভব হবে ?

ভারতে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি বিধান করতে হ'লে যান্ত্রিক সরঞ্জামের ব্যবহার আরও ব্যাপক করা দরকার। তবে সেচের পর্য্যাপ্ত সুবিধা না থাকলে এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণে সার ও উৎকৃষ্ট বীজ পাওয়া না গেলে কৃষি ব্যবস্থার যান্ত্রিকীকরণ ফলপ্রসূ হ'বে না। এই প্রসঙ্গে দেখা যাক্ দেশে ও বিদেশে ট্র্যাক্টারের ব্যবহার কিরকম। আমাদের দেশে, গড়পড়তা হিসেবমত, ১২,৫০০ একর জমির জন্যে একটিমাত্র ট্র্যাক্টর পাওয়া যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে জাপানে একটা ট্র্যাক্টারের জন্যে ৯.৬ শতাংশ জমি থাকে। পশ্চিম জার্ম্মাণীতে একটা ট্র্যাক্টারের জন্যে ৩৩.৩ একর জমি, যুক্তরাজ্যে ১০৬.৪ একর, ডেনমার্ক-এ ৫৭.১ একর, ফ্রান্সে ১০৪.২ একর ও যুক্তরাষ্ট্রে ২১৭.৪ একর জমি দেওয়া যায়। অন্যান্য কৃষিতে, যন্ত্র ব্যবহার করার পরিসংখ্যানও অনুরূপ।

কার্পেট রপ্তানীর বাজার

ভারতে ৪,১০,০০০০০ ভেড়া থেকে বছরে ৩,৪৬,৬০০০০ কিলোগ্রাম কাঁচা পশম উৎপাদিত হয়। অর্থাৎ বছরে একটা ভেড়া থেকে গড়ে এক কিলোরও কম পশম পাওয়া যায়। অন্যান্য দেশের তুলনায় এই পরিমাণ হ'ল সবচেয়ে কম। যেখানে ভারতের একটা ভেড়া বছরে এক কিলো পশমও দেয়না সেখানে অষ্ট্রেলিয়ার একটি মেরিনো থেকে বছরে গড়পড়তা ৫ কিলোর মত এবং নিউজিল্যাণ্ড-এর একটি মেরিনো থেকে ৬ কিলোর মত পশম পাওয়া যায়। অতএব প্রথম সমস্যা হ'ল এ দেশের ভেড়ার পশমের পরিমাণ কি উপায়ে বাড়ানো যায়। পশমের উৎপাদন ইপ্সিত পরিমাণে বাড়াতে হলে বেশী পশম উৎপাদনে সক্ষম এই রকম বিদেশী ভেড়ার প্রয়োজন। ভারতীয় ও বিদেশী দুটি জাতের সংমিশ্রণে যে প্রজাতির ভেড়া পাওয়া যাবে সেগুলি থেকে বেশী পরিমাণে পশম পাওয়া যেতে পারে। এখন এদিক দিয়েও চিন্তা করা হচ্ছে। যেমন হরিয়ানায়, হিসারের কাছে, একটি বিরাট মেষপালন কেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে সহযোগিতা করতে ভারত ও অষ্ট্রেলিয়া সম্মত হয়েছে। ভালো জাতের মেষ উৎপাদনের একটি প্রকল্প রূপায়ণে দুটি দেশ সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে। হরিয়ানার ঐ কেন্দ্রে অষ্ট্রেলিয়া, 'কোরিয়েডেল ভেড়া' সরবরাহ করবে। দেশীয় ভেড়ার সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার কোরিয়েডেল ভেড়ার সংমিশ্রণে যে নতুন জাতের ভেড়া জন্মাবে, তা' পশমের পরিমাণ ও মাংসের দিক থেকে দেশীয় ভেড়ার তুলনায় অনেক ভালো হবে ব'লে আশা করা যাচ্ছে।

মেষপালন সম্পর্কে এই কেন্দ্রে বিশেষ শিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। মেষপালকরা যাতে এই প্রকল্প থেকে সবচেয়ে বেশী উপকৃত হন তারই জন্যে কোরিয়েডেল ভেড়া বেছে নেওয়া হয়েছে। কারণ মাংসের গুণাগুণে ও পশমের প্রাচুর্যে কোরিয়েডেল প্রথম শ্রেণীর। হিসারের এই কেন্দ্রটির জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার ৭০০০ একর জমি দিচ্ছেন। জমি, বাড়ী, যন্ত্রপাতি, সাজ সরঞ্জাম ও কর্মীদের জন্যে ৭ বছরে যে খরচ হবে তাতে ভারতের অংশের পরিমাণ হবে ১০৪ লক্ষ টাকা। অষ্ট্রেলিয়া ৫০০০ স্ত্রীমেষ ও ১১০টি মেষ সহ যন্ত্রপাতি ও কারিগরী বিশেষজ্ঞদের জন্যে খরচ করবে ৮০ লক্ষ টাকা।

অষ্ট্রেলিয়ার কোরিয়েডেল মেষ

তবে এ তো দীর্ঘ মেয়াদী সমস্যার কথা। আশু সমস্যা হ'ল, আপাততঃ যে পশম পাওয়া যাচ্ছে কী ভাবে তার সদ্ব্যবহার করা যায়। আমাদের দেশে উৎপন্ন পশম মোটা ও শক্ত। এই পশম কার্পেট তৈরির উপযুক্ত। ভারতে তৈরি কার্পেটের শতকরা ৯০ ভাগ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। তা ছাড়া কাঁচা পশমও রপ্তানি করা হয়। তবে টাকার মূল্য হ্রাসের পর পশম রপ্তানীর পরিমাণ ৩২ শতাংশ (১৯৬৫-৬৬) থেকে কমে ২৬ শতাংশে (১৯৬৭-৬৮) দাঁড়ায়। এতে অবশ্য আশঙ্কিত হবার কোনোও কারণ নেই। কারণ কাঁচা পশম রপ্তানি না করে আমরা এখন তৈরি জিনিস অর্থাৎ হাতে তৈরি কার্পেট বিদেশে পাঠাচ্ছি। অতএব এটা খুশী হবারই কথা। কারণ ভারতীয় কারুশিল্পীদের শিল্প চাতুর্য প্রচার করা ছাড়াও এর ফলে বহু লোকের জন্যে কাজের সংস্থান হচ্ছে এবং বিদেশী বিনিময় মুদ্রাও অর্জিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে বিদেশী বিনিময় মুদ্রা অর্জন অত্যাবশ্যক এবং এরজন্যে সম্ভাব্য সমস্ত সূত্র ভালো করে দেখা দরকার। এর একটি হ'ল মেশিনে কার্পেট তৈরির সম্ভাবনা। পাট প্রভৃতি উদ্ভিদ থেকে যে আঁশ পাওয়া যায় তার সঙ্গে কৃত্রিম আঁশ মিশিয়ে বা পশমের সঙ্গে কৃত্রিম আঁশ প্রভৃতি মিলিয়ে মেশিনে বোনা কার্পেটের চাহিদা দেশ বিদেশে ক্রমশঃই বাড়ছে। যেমন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মেশিনে বোনা কার্পেটের চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে। মেশিনে কার্পেট তৈরির প্রস্তাবটি প্রণিধানযোগ্য, কারণ, একমাত্র মেশিনের সাহায্যেই যে কোনোও জিনিস ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব। বিশেষ করে কাঁচা পশমের পরিমাণ পর্যাপ্ত না হলেও কৃত্রিম আঁশ বা সুতো মিশিয়ে তাই দিয়ে বড় কার্পেট বোনা অসম্ভব নয়। সহজে কাঁচা মাল পাওয়া গেলে এবং মেশিনে তৈরির ফলে উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম হলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের চাহিদা পূরণের জন্যে উপযুক্ত সংখ্যায় কার্পেট তৈরি সম্ভব। এমন দিনও একদিন আসতে পারে যখন অতি সাধারণ অবস্থার লোকও নিজেদের ঘরবাড়ী সুন্দর ছিমছাম করার জন্যে কলে তৈরি কার্পেট কিনে সুরুচির পরিচয় দিতে পারেন। কারণ কলে তৈরি কার্পেট হাতে তৈরি কার্পেটের চেয়ে সুলভ হবেই। তবে শুধু এইদিক দিয়ে চিন্তা করলেই চলবে না, এই জিনিসটির রপ্তানীর সম্ভাবনা কতটা তাও নিরূপণ করা দরকার। বাজারের গতি প্রকৃতি তো এ ব্যাপারে

(১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সাধারণ অসাধারণ

দেশের নানা প্রান্তে যে সব দেশদরদী নরনারী লোকচক্ষুর অন্তরালে দেশগড়ার কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন, এখানে সেইসব সাধারণ মানুষের অ-সাধারণ কাহিনী বলা হয়।

একটি আদর্শ বিদ্যালয়

মহারাষ্ট্রের বাপুগাঁও-এ কোনোও স্কুল ছিল না। জায়গাটি ছিল জঙ্গলাকীর্ণ এবং কেউ এই জায়গাটির দিকে নজর দেয়নি গোড়ায়। আশপাশের গ্রামগুলিতেও কোনো স্কুল ছিল না। গান্ধীজীর শিষ্য দাদা সেবক ভোজবাজ বহুকাল ধরে শিশু-কল্যাণব্রতে লিপ্ত ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন সরকারী অনুমোদনের জন্যে অপেক্ষা করতে গেলে এই জায়গা-টির উন্নতি কোনোকালে হবে না। তিনি গ্রামের ছেলেমেয়েদের জন্যে একটি আবাসিক স্কুল তৈরীর কাজ হাতে নিলেন। এখন ঐ স্কুলে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী ৬০টি ছেলেমেয়ে পড়াশুনা করে।

স্কুলটি আশ্রমের মত চালানো হয়। এই স্কুলের সীমানার মধ্যে দুটি বড় হল ঘর আছে, শিক্ষকদের থাকার জন্যে বাড়ী, একটা টিউবওয়েল ও একটি পাম্পসেট আছে, আশ্রমের বালক বালিকাদের সমস্ত প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা আছে।

সাধারণ বিষয়ক্রম ছাড়াও বালক-বালিকাদের নানারকম হাতের কাজ শেখানো হয়। যেমন, সুতোকাটা, সেলাই, বোনা, এমব্রয়ডারী, বাগানের পরিচর্যা কাঠের কাজ ও ঘরের কাজ ইত্যাদি। শিশুদের চরিত্রগঠন ও আদর্শ নাগরিক গঠনের মত দায়িত্বশীল বিষয়ের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয়। আশ্রমের জন্যে ছেলে-মেয়েরা নিজের থেকে কাজ করে। শুধু আদিবাসীরাই নয়, আশপাশের গ্রামগুলি থেকেও ছাত্রছাত্রী আসে। দাদা সেবক ও তাঁর স্ত্রী কোনোও পারিশ্রমিক নেন না তিনি ও তাঁর স্ত্রী স্বেচ্ছায় কাজ ক'রে যাচ্ছেন।

হরিয়ানার শ্রেষ্ঠ চাষী

নাজার সিং ৫ বছর আগে যখন পুলি-শের চাকরী করতেন তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে, সবচেয়ে বেশী ফসল ফলিয়ে তিনি প্রথম পুরস্কার পেতে পারবেন। ১৯৬৪ সালে জিন্দ জেলার এই প্রগতিশীল চাষীটি পুলিশের চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে বসলেন। উদ্দেশ্য ১৯৫৭ সালে কেনা ৩৮ একর জমিতে নিজেই চাষবাস কর-বেন। সেদিন কতটা আস্থা ছিল তাঁর তা হয়তো তিনি নিজেই বলতে পারবেন না। কিন্তু আজ তিনটি টিউবওয়েল, একটি ট্র্যাক্টর ও কৃষির বিভিন্ন যান্ত্রিক সরঞ্জাম তাঁর আস্থা ও সামর্থ্যের পরিচয় বহন করছে।

এ বছরে প্রতি একরে ৩৩.৫৬ কুই-ন্টাল গম ফলিয়ে তিনি রাজ্যের কৃষি প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন। হরিয়ানা সরকার এঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ নগদ ৩,০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।

নাজার সিংএর ছেলে প্রতি একরে ৩১.৩৬ কুইন্টাল গম ফলিয়ে জেলা প্রতি-যোগিতায় প্রথম হয়েছেন। নাজার সিংকে জিজ্ঞেস করা হয় এই সাফল্যের কারণ কী? তিনি বলেন কঠোর শ্রম ও আধু-নিক কৃষি পদ্ধতির জন্যেই তিনি এই সাফল্য লাভ করেছেন।

আদর্শ কৃষক

মহীশূরের কাসারাহাড়লী গ্রামে কে. রামকৃষ্ণ রাও হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী এক কৃষক। তিনি তাঁর খামারে একটি যন্ত্র বসিয়েছেন যাতে গোবর থেকে গ্যাস তৈরি হয়। তির্থাহাড়লীর ব্লক কর্তৃপক্ষ একটা গ্যাস প্ল্যান্ট-এর জন্যে সরকারী অর্থ সাহায্য হিসেবে ৫০০ টাকা নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন টাকাটা শ্রী রামকৃষ্ণ রাও-এর পাওয়ার কথা এবং তিনি পেতেও পারতেন। কিন্তু ব্লক কর্তৃপক্ষ যখন যেচে এই অর্থসাহায্য নেবার কথা বলতে গেলেন তখন ভদ্রলোক চাষী তা নিতে অস্বীকৃত হলেন। তাঁর মতে যার অবস্থা স্বচ্ছল তার সরকারী সাহায্য চাওয়া বা নেওয়া উচিত নয়। আরও কতলোক আছেন, এই অর্থসাহায্য যাঁদের কাজে লাগবে। ব্লক কর্মীরা বললেন টাকাটা না দিতে পারলে ওটা তামাদি হয়ে যাবে। তার উত্তরে রাম-কৃষ্ণ রাও বলেন, অজায়গায় না দিয়ে টাকাটা তামাদি হতে দেওয়াও ভালো। এ সাহায্য যার সত্যিকার দরকার তাকেই দেওয়া উচিত।

★

নতুন দিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থায় একটি বিশেষ ধরণের ভূট্টা উৎ-পাদিত হয়েছে, যার সাহায্যে শিশু ও বালক বালিকাদের শরীরে প্রোটিনের অভাব দূর করা সম্ভব হতে পারে। এটা খাইয়ে পরীক্ষা করার সময়ে দেখা গেছে যে, নব উদ্ভাবিত হলদে দানার ভূট্টায় প্রোটীনের অংশ হ'ল ৩.৩৮ শতাংশ। ছানায় প্রোটীনের মাত্রা হ'ল শতকরা ২.০৪ ভাগ এবং দো আঁশলা জাতের ভূট্টা গঙ্গা-৩ এর দানায় ১.২ ভাগ।

★

ভারতের সার কর্পোরেশনের নাঙ্গাল ইউনিট তাদের ৬৮-৬৯ সালের 'হেভী ওয়াটার' ও সার উৎপাদনের লক্ষ্য ছাড়িয়ে গেছে। এশিয়ায় এটি হ'ল একমাত্র কারখানা, যেখানে 'হেভী ওয়াটার' তৈরী হয়। ১৯৬৮-৬৯ সালে এই কারখানায় ১৩,৫০০ কে. জির লক্ষ্য ছাড়িয়ে ১৪,০০০ কে. জি. 'হেভী ওয়াটার' উৎপন্ন হয়েছে। এই কারখানায় ক্যালসিয়াম এমোনিয়াম নাইট্রেট তৈরির লক্ষ্যও অতিক্রান্ত হয়েছে।

★

সুতীবস্ত্র রপ্তানী উন্নয়ন পরিষদ ১৯৬৯ সাল থেকে বছরে ১৫.৫০ কোটি টাকার সুতা ও বস্ত্র রপ্তানীর বরাত পেয়েছে বর্মা সিংহল, সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র ও পূর্ব য়ুরোপের দেশগুলি থেকে।

(৭ পৃষ্ঠার পর)

মূলধনের অভাব উপেক্ষণীয় নয়

সত্যি বলতে কি, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সামর্থ্য ও ধারণ ক্ষমতা আজ অতিক্রান্ত, কেবলমাত্র শিক্ষা লাভেচ্ছু ক্রমবর্ধমান ছাত্র সংখ্যার দিক থেকেই নয়, শ্রমের বাজারে কর্ম সংস্থানের দিক থেকেও। তাই এ সম্পর্কে বর্তমান আলোচনা প্রয়োজন ভিত্তিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শিক্ষিতের সংখ্যা যে হারে বাড়তে থাকে, চাকরির সংখ্যা সে হারে বাড়ে না, বাড়তে পাবে না। ভারতের শিক্ষিত বেকার সমস্যার মূল কারণের আর একটি হ'ল সম্ভব'ত বিনিয়োগ করার মত মূলধনের আত্যন্তিক অভাব। জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থে অধিক পরিমাণে মূলধন বিনিয়োগ করে কি ভাবে আরো বেশি কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারা যায় সেইটেই আসল সমস্যা. শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার তার জন্য খুব বেশি জরুরি বলে মনে হয় না। শিক্ষিতের কর্ম সংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনেকখানি। আমাদের অর্থনীতির উন্নয়ন মূলধন-নির্ভর হবে না শ্রম-নির্ভর হবে, মূলধনের প্রতিকল্প হিসেবে শিক্ষার ব্যবহার কতটা সম্ভব ও সঙ্গত তা খতিয়ে দেখতে হবে। জাতীয় উন্নয়ন মন্থর গতিতে চলতে থাকলে শিক্ষিত বেকার সমস্যার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। ভারতে মাথা পিছু বার্ষিক জাতীয় আয়ের হার শতকরা ১.৫। উন্নয়নকামী অন্যান্য অনেক দেশে মাথা পিছু বার্ষিক জাতীয় আয়ের হার শতকরা ২.২, দক্ষিণ কোরিয়া ও মেক্সিকোতে এই আয়ের পরিমাণ ৩%।

অর্থনীতির অন্যান্য দুর্বলতার দিকে নজর না দিয়ে, কেবলমাত্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে বৃত্তিমুখী করতে পারলেই শিক্ষিতের কর্মসংস্থানের পথ রাতারাতি প্রশস্ত হবে এমন আশা. করা অন্যায়। শিক্ষা ব্যবস্থা সহজে সুবিধানুযায়ী পরিবর্তন সাধ্য নয়। শিক্ষায়তনগুলিকে ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অঙ্গীভূত করা, উন্নয়নের অতি আবশ্যক শর্ত বলে যাঁরা ভাবেন, তাঁরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে এমন কিছু প্রত্যাশা করেন যা আপাত সম্ভাব্যতার বাইরে এবং অন্যান্য উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশেও যা কখনো আশা করা হয়নি।

★ দুর্গাপুর মিশ্র ইস্পাত কারখানায় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির জন্যে ক্রোমিয়ামযুক্ত ইস্পাত তৈরি হ'তে সুরু করেছে। এ পর্যন্ত প্রধানতঃ ক্যানাডা থেকে এই জিনিস আমদানী করা হ'ত। এই কারখানা রাজস্থান পারমাণবিক শক্তি পরিকল্পনা কেন্দ্রকে ইতিমধ্যেই ৭ টন ঐ বিশেষ ধরণের ইস্পাত সরবরাহ করেছে।

★ ভারত, বুলগেরিয়া ও টিউনিসিয়া বাণিজ্যিক লেনদেনে একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। বিশ্বের কোথাও এই ধরণের অভিনব চুক্তি এর আগে হয়নি বলা যায়। টাকায় মোট লেনদেনের পরিমাণ দাঁড়াবে ৩.৬ কোটির মত। যেমন ভারত যত ইউরিয়া আমদানী করবে তার সমান মূল্যের চা ও অন্যান্য নতুন পণ্য রপ্তানী করবে।

উন্নয়ন বার্তা

● সার কর্পোরেশনের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ এমন কয়েকটি নিজস্ব নক্সা, পদ্ধতি ও রাসায়নিক সামগ্রী উদ্ভাবন করেছে যার ফলে কর্পোরেশন বিদেশী মুদ্রায় ১৭ কোটি টাকার ওপর সাশ্রয় করেছে।

● ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের জীবন বীমা কর্পোরেশন ৩৪৩,৩৩২টি বীমার ওপর মোট ২২.২৮ কোটি টাকা ব্যবসায়ে খাটিয়েছে। এর মধ্যে বৈদেশিক লেন-দেনের পরিমাণ হ'ল ৩১ লক্ষ টাকা।

● হিন্দুস্তান অর্গ্যানিক কেমিকেলস্-এর এ্যাসিটেনাইলাইড কারখানায় পরীক্ষামূলক-ভাবে কাজ সুরু হয়ে গেছে।

● সাদিহাল-এর তুলা গবেষণা কেন্দ্রে দোআঁশলা তিনটি নতুন জাতের বীজ তৈরি করা হয়েছে। এই বীজের ফলন প্রচুর ও ভালো এবং আঁশগুলোও লম্বা।

● রাজস্থানের রাণা প্রতাপ সাগর বাঁধের চতুর্থ ও শেষ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি চালু করা হয়েছে। এর ফলে সেখান থেকে মোট ১৭২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে।

● গাজিয়াবাদে মোহন নগর শিল্পাঞ্চলে ২৫০টি শয্যার একটি হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। নার্সদের জন্যে একটি প্রশিক্ষণ কলেজ ছাড়াও মূত্রাশয় ও হৃদযন্ত্র সম্পর্কে গবেষণার জন্যে একটি কেন্দ্র খোলা হবে। পুরো প্রক-ল্পটার জন্যে খরচ হবে ৫০ লক্ষ টাকা।

● কারনালে জাতীয় দুগ্ধ শালা প্রতি-ষ্ঠানে স্নেহবিহীন দুধ থেকে একটা নতুন ধরণের পানীয় উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ দেশে এই জিনিস এই প্রথম তৈরি হ'ল। এই পানীয় বেশ কিছুদিন অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়।

● ১৯৬৮-৬৯ সালে সংরক্ষিত-খাদ্য রপ্তানী করে ১০ কোটি টাকার সমান অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় শতকরা ৬০ ভাগ বেশী বিদেশী বিনিময় মুদ্রা অর্জিত হয়েছে।

● পুণার একটি প্রতিষ্ঠান সাধারণ মাটির তলায় এমন কি পাথুরে মাটার তলায় জলের অস্তিত্ব নিরূপণের একটা নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে।

● গুড়গাঁও জেলায় গোঞ্চি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। এর জন্যে খরচ হয়েছে ৫৪ লক্ষ টাকা।

● এ বছরে প্রথম চার মাসে যুগো-স্লোভিয়ায় নানান জিনিস রপ্তানী করে ৩.৮৪ কোটি টাকা আয় হয়েছে—এই আয় গত বছরের ঐ ক' মাসের তুলনায় শতকরা ৩১ ভাগ বেশী।

● আসামের অক্ষর পরিচয় সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা শতকরা ১৩ (১৯৪৭) থেকে বেড়ে এখন ৩৮এ দাঁড়িয়েছে। সেখানে ৬ থেকে ১১ বছর বয়সীদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন স্কুলে যায়।

● ১৯৬৮-৬৯ সালে লৌহ আকরের রপ্তানী মারফৎ বৈদেশিক মুদ্রায় আয় হয়েছে ৮৩ কোটি টাকার সমান। ১৯৬৭-৬৮ সালের আয় ছিল ৭১ কোটি টাকার সমান।

● রেল দপ্তর, রেলপথ-পর্ষৎ-এর সঙ্গে সমস্ত 'জোনাল' সদর দপ্তর যুক্ত করার জন্য এবং সমস্ত জোন্যাল সদর দপ্তরের সঙ্গে সমস্ত ডিভিশনাল সদর কার্যালয় যুক্ত করার জন্যে বহুমুখী মাইক্রোওয়েভ টেলিকমিউ-নিকেশান ব্যবস্থা প্রবর্তনের একটা কার্য সূচী হাতে নিয়েছে। এর জন্যে খরচ পড়বে ১৭ কোটি টাকা।

● ভারতের ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের রাজস্থান শাখায় এই বছর ৫.৫ লক্ষ টন জিপসাম উৎপন্ন হয়। ১৯৬৩ সালের তুলনায় এ বছরে আড়াইগুণ বেশী জিপসাম সার উৎপাদিত হয়েছে। ভারতের এই জিপসাম কেনার জন্য সিংহল, বর্মা, সিঙ্গা-পুর এবং মালয়েশিয়া আলাপ আলোচনা চালাচ্ছে। কর্পোরেশন এখন এই দেশ-গুলিতে ১ কোটি টাকারও বেশী জিপসাম রপ্তানি করতে সক্ষম।

● গোয়ায়, পাণাজীতে, আগের ট্রান্স-মিটারের জায়গায় একটা নতুন ১০ কিলোওয়াট শক্তির মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটার বসানো হয়েছে।

● নাগা-ল্যাণ্ডের দূরন্ত টিজু নদীর ওপর ৭ লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি সেতুটি যান বাহনের জন্যে খুলে দেওয়া হয়েছে। যে রাজপথের ওপর এই সেতুটি পড়ে সেটি রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ।

● এখন থেকে বোম্বাই ও সুরাটের মধ্যে ট্রাঙ্ক টেলিফোনে সরাসরি কথা বলা যাবে। অর্থাৎ বোম্বাই, পুণা, আহমেদাবাদ ও সুরাটের মধ্যে ট্রাঙ্ক ডায়ালিং পদ্ধতি চালু হয়ে গেল।

● ১৯৬৮ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে হাতে তৈরি জিনিসের রপ্তানি ৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর আগের বছরে যেখানে ৪২ কোটি টাকার জিনিস রপ্তানী করা হয়েছে, ১৯৬৮ সালের এই ক' মাসে রপ্তানী করা হয়েছে ৫৬.৪৩ কোটি টাকার।

● হিন্দুস্তান ইনসেকটিসাইড্স প্রতি-ষ্ঠানের দিল্লী কারখানায় পরীক্ষামূলকভাবে উৎপাদন সুরু হয়েছে। এই কারখানাটি বছরে ১,৪০০ টন কীট নাশক ওষুধ তৈরি করতে সক্ষম।

● হিন্দুস্তান এ্যালিউমিনিয়াম কর্পোরেশন গত বছরে ১৮টি দেশে ১৩ হাজার টন এ্যালিউমিনিয়াম রপ্তানী করেছে। এ্যালু-মিনিয়াম রপ্তানীর ক্ষেত্রে একে রেকর্ড বলা যায়।

● এখন দেশে রেডিওর লাইসেন্সের সংখ্যা প্রাক স্বাধীনতা যুগের তুলনায় ৩৩ গুণ বেশী। ১৯৬৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর এই সংখ্যা ছিল ৯২ লক্ষের ওপর। আর স্বাধীনতার আগে লাইসে-ন্সের মোট সংখ্যা ছিল ২.৭৫ লক্ষ।

● ভিলাই ইস্পাত কারখানায় দক্ষিণ কোরিয়ার জন্যে যে রেল তৈরি হয়েছে, তার প্রথম কিস্তী হিসেবে, ৭,৫০০ টন রেল বিশাখাপতনম বন্দর থেকে চালান দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া মোট ৪.৫ কোটি টাকার বরাত দিয়েছে।

REGD. NO. D-233

ধন ধান্যে

প্রেরণার বাণী

ভারতের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলতে আমি এই বুঝি যে দেশের প্রত্যেকটি নর-নারী নিজের চেষ্টায় আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করুন। তাহলেই দেশের প্রত্যেকটি মানুষ পরিধানের বস্ত্র বলতে যা বোঝায়, তাই পাবে এবং যে দুধ ও মাখন থেকে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক বঞ্চিত, সেই দুধ মাখনের সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যও পাবে।

★

প্রকৃত সমাজতন্ত্রবাদের শিক্ষা পূর্ব-পুরুষরা আমাদের দিয়ে গেছেন। তাঁরা বলে গেছেন 'সবই গোপালের' অতএব তার সীমা নির্ধারণ কী করে সম্ভব। জমিকে সীমানার প্রাচীর তুলে ভাগ করেছে মানুষ; সেই তা ভাঙতে পারে।..... গোপালের শব্দার্থ হ'ল রাষ্ট্র অর্থাৎ জনসাধারণ। আজকের দিনে সেই জমির মালিক যে জনসাধারণ নয়, এতো দেখাই যাচ্ছে। কিন্তু, সেটা আমাদের পূর্বপুরুষদের শিক্ষার ত্রুটি নয়। ত্রুটি হ'ল আমাদের; আমরা সেই শিক্ষানুযায়ী কাজ করতে পারিনি।

আমার স্বরাজের আদর্শ সম্বন্ধে কারুর যেন ভুল ধারণা না থাকে। স্বরাজের অর্থ হ'ল বিদেশী শাসন থেকে পূর্ণ মুক্তিলাভ ও পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা। অর্থাৎ স্বরাজ বলতে একদিকে রাজনৈতিক মুক্তি আর অন্যদিকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বোঝায়।

★

আমি চাই চরকাকে ভিত্তি করে গ্রামের অর্থনৈতিক জীবন গড়ে উঠুক আর এই চরকাকে কেন্দ্র করে সমস্ত কাজকর্ম চলুক।

★

আমাদের নিত্য প্রয়োজনের সামগ্রী যাতে গ্রাম থেকে আসে, পল্লী শিল্প সংক্রান্ত কার্যসূচীর উদ্দেশ্য হ'ল তাই। এমন কি গ্রাম থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর কিছু কিছু যদি পাওয়া নাও যায় তাহলে একটু কষ্ট স্বীকার করে দেখতে হবে যে গ্রামগুলিতে সেগুলি তৈরি হতে পারে কি না।

গ্রামগুলি হ'ল ভারতের প্রাণ অথচ দেশের লেখাপড়া জানা লোকেরা সেটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করছেন। আমি চাই গ্রাম-জীবন যেন শহুরে জীবনের প্রতিচ্ছবি বা উপাঙ্গের মত হয়ে না দাঁড়ায়। শহরগুলিকে গ্রামীণ জীবনের ধারা অনুসরণ করতে হবে বুঝতে হবে যে তাদের অস্তিত্ব গ্রামগুলির ওপর নির্ভর করছে। বর্তমানে শহরগুলি গ্রামগুলির ওপর আধিপত্য করে এবং নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে গ্রামগুলিকে শোষণ করে। আমার খাদি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমি বলতে চাই যে, শহরগুলি গ্রামগুলির পরিপূরক হয়ে উঠুক।

ধৈর্য হারালে কিংবা যা কিছু পুরোনো তা' পুরোনো ব'লে বর্জন করলে জনসাধারণের কষ্ট লাঘব করা যাবে না। যে সব স্বপ্ন আজ আমাদের প্রেরণা দিচ্ছে আমাদের পূর্ব পুরুষরাও সেই সব স্বপ্নই দেখতেন—তা সেগুলি অস্পষ্ট হ'লেও।

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে এবং তথ্য ও বেতার মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত হ'লেও 'ধনধান্যে' শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করে না। পরিকল্পনার বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী ক্ষেত্রে উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতটা অগ্রগতি হচ্ছে তার খবর দেওয়াই হ'ল 'ধনধান্যে'র লক্ষ্য।

'ধনধান্যে' প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে প্রকাশিত হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

নিয়মাবলী

দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়।

অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পুনঃ প্রকাশকালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার করা হয়।

রচনা মনোনয়নের জন্যে আনুমানিক দেড় মাস সময়ের প্রয়োজন হয়।

মনোনীত রচনা সম্পাদক মণ্ডলীর অনুমোদনক্রমে প্রকাশ করা হয়।

তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয়। কোনোও রচনার প্রাপ্তি-স্বীকৃতি, পত্র মারফৎ জানানো হয় না।

নাম ঠিকানা লেখা ডাকটিকিট লাগানো খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

কোনো রচনা তিন মাসের বেশী রাখা হয়না।

শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাবেন।

গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেস ম্যানেজার, পাব্লিকেশন ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী। এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

"ধনধান্যে" পড়ুন
দেশকে জানুন

ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাস্ট্রিয়েল সোসাইটি লিঃ—করোলবাগ, দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত এবং ডাইরেক্টার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত।

ধন ধান্যে

প্রথম বর্ষ ঃ ৪ ঃ ২০শে জুলাই, ১৯৬৯

২৫ পয়সা

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত
পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা
২০শে জুলাই ১৯৬৯ : ২৯শে আষাঢ় ১৮৯১
Vol 1 : No 4 : July 20, 1969

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০

টেলিগ্রাফের ঠিকানা—যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

ভুলি নাই

ক্ষুধার্তের কাছে খাদ্যই ভগবান

-মহাত্মা গান্ধী

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়

বেকার সমস্যা

কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোই পরিকল্পনাগুলির অন্যতম লক্ষ্য এ 'কথা এতবার বলা হয়েছে এবং এখনও বলা হচ্ছে যে জনসাধারণ যদি এই দাবিগুলি সম্পর্কে একটু সন্দিহান হয়ে পড়েন তাহলে তাঁদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

বেকার সমস্যার গুরুত্ব প্রমাণ করার জন্য পরিসংখ্যানের প্রয়োজন হয় না। এ কথা সত্য যে, এই সমস্যাটি ক্রমশ: জটিল হয়ে উঠছে এবং এর সমাধানের জন্য কোন চেষ্টা না করা হলে এবং অবিলম্বে কিছু না করা হলে তা যে ভয়াবহ হয়ে উঠবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। জনসাধারণের সর্বশ্রেণীর মধ্যে এই বেকার সমস্যা যে হতাশার সৃষ্টি করছে, আমাদের পরিসংখ্যানের সব সংখ্যাও সেই তুলনায় বেশী নয়।

পল্লীগুলিতে শিল্প স্থাপন, স্কুলে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু হাতের কাজ শেখানো, ব্যাপক ও সম্প্রসারিত প্রশিক্ষণ-সূচী ইত্যাদির মতো সমাধানগুলি সবই উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং সবই সমস্যা সমাধানে সহায়ক হতে পারে।

প্রায় প্রত্যেকেই এই প্রশ্নটি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন, কিন্তু কেউই সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এটা বিবেচনা করতে পারছেন বলে মনে হয় না। তা নাহলে পূর্বে যে সব পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং এখনও দেওয়া হচ্ছে সেগুলি কার্যকরী করার জন্য আবার চেষ্টা করা হচ্ছে না কেন আর করলেও কেনইবা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে তার সামান্য কিছু অদলবদল করা হচ্ছে।

যদি কেউ সম্পূর্ণ পরিবর্তন চান তাহলে তাঁর নিজেকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে হবে যে আমাদের পরিকল্পনার সঙ্গে গান্ধীজীর আদর্শের কোন মিল আছে কিনা। দৃষ্টিভঙ্গী যত সূক্ষ্মই হোক, তা সমাজের সূক্ষ্মতর সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারে না। বেকার সমস্যার প্রশ্নটিও, এই বৃহত্তর সমস্যার একটা অংশ মাত্র। হাসপাতালে চিকিৎসার সমস্ত রকম সাজসরঞ্জাম থাকলেও গ্রাম বা সহরের অশিক্ষিত পুরুষ বা নারী অনেক সময়েই হয়তো জানেন না যে, এক্স-রে ফটো কোথায় তোলা হয়। কারণ হাসপাতাল তৈরি করার সময় হয়তো অনুসন্ধানের উত্তর দেওয়ার কক্ষের কথা ভাবা হয়নি অথবা সেটা হয়তো ভুল জায়গায় তৈরি করা হয়েছে।

কারণ কেউ যদি কেবলমাত্র চিকিৎসার সুযোগ সুবিধের অপ্রতুলতা লক্ষ্য করেন, এবং ডাক্তার ও নার্সদের কাজের বোঝা দেখেন, তাহলে তিনি ভাববেন যে এই ক্ষেত্রে অবিলম্বে কিছু করা প্রয়োজন।

দেশের এতো যুবক যুবতী যখন তাঁদের উদ্দেশ্য সফল করে তোলার জন্য একটা উপায় খুঁজছেন, তখন মৌলিক সুযোগ সুবিধেগুলির সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের প্রশ্ন কিংবা সম্পদের প্রতুলতা অপ্রতুলতার যুক্তি বুঝে ওঠা একটু কঠিন হয়ে পড়ে। এখানে সমস্যা হ'ল আশু উদ্দেশ্য এবং ভবিষ্যত প্রয়োজনের সঙ্গে প্রতিটি প্রকল্পের যোগ রক্ষা করা। অনেক সময়েই উদ্দেশ্যের ওপর জোর দেওয়া হয় এবং আশু প্রয়োজনগুলি মেটাবার ব্যবস্থা করা হয় না।

আমাদের এই দেশে যেখানে বাসগৃহ, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, স্কুল ইত্যাদি নানা জিনিসের বিপুল অভাব রয়েছে, সেখানে আমাদের দেশের নারী পুরুষদের জন্য যথেষ্ট কাজ নেই এই কথাই কি আমাদের বুঝতে হবে?

এই সব হাসপাতাল বা স্কুলই যে সমস্যার সমাধান করতে পারবে তা নয়, কিন্তু জনসাধারণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এমন ভাবে কাজ সুরু করা যেতে পারে—যাতে জনসাধারণের চিন্তাধারায় পরিবর্তন আসবে এবং আমরা বিরাট কর্মসূচীগুলির প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে ক্ষুদ্র প্রয়োজনগুলিকে উপেক্ষা করবো না।

যে সরকারের সঙ্গে জনগণের ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে, সেই সরকার যতটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁদের সমস্যার সমাধান করবেন, দূরস্থিত সরকারের পক্ষে তা' সম্ভবপর নয়। দূরের সরকারের আর্থিক ক্ষমতা সফলভাবে প্রযুক্ত না হয়ে অনেক সময়েই তা সহরের কয়েকজনের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে এবং মধ্যবিত্ত ও উচচ মধ্যবিত্ত পরগাছা শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। অপরপক্ষে ক্ষুদ্রতর সরকারগণের হয়তো ব্যাপক আর্থিক ক্ষমতা না থাকতে পারে অথবা কয়েকটি সরকার ঐক্যবদ্ধ হয়ে তা অর্জন করতে পারে, কিন্তু তবুও সেগুলি সমাজকে পরগাছা থেকে মুক্ত করতে পারে, কারণ আমলাতন্ত্র এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাগুলি থেকেই পরগাছা শ্রেণীর সৃষ্টি হয়।

বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে ভারতের সমস্যাগুলির সমাধান করা সম্ভব নয়। বিশেষজ্ঞগণের একটা যুক্তিসঙ্গত স্থান আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু যতই বিজ্ঞোচিত সমাধান হোক না কেন তাকে শেষ সমাধান বলা যায় না। তা না হলে যে দেশে উন্নয়নের এতো অবকাশ, এতো কাজ রয়েছে সেখানে ইঞ্জিনীয়ারগণের মধ্যে কর্মহীনতার সমস্যার সৃষ্টি হতো না। এটা এসেছে তার কারণ হ'ল মূলধন এবং অর্থ সম্পদের মতো কথাগুলি খুব চতুরতার সঙ্গে বলা হয়েছে কিন্তু জনসাধারণের মৌলিক জীবন দর্শনের সম্ভাবনাগুলির কথা ভাবা হয়নি।

কেবলমাত্র প্রশাসন ব্যবস্থাই আমাদের সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারবে কিনা এই প্রশ্নটি বিবেচনা ক'রে দেখার যোগ্য। বড় বড় কথা ভাবা ভালো তবে তা যেন আমাদের আধুনিকতা প্রকাশের একটা উপায় হয়ে না দাঁড়ায়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারের চিন্তা করাটাও খারাপ নয়।

পারমাণবিক বিদ্যুৎশক্তির প্রাণকেন্দ্র

তারাপুর

মহারাষ্ট্রের তারাপুরে দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়েছে। পাঁচ বছর পূর্বেও এটি ছিল দেশের একটি অনুন্নত অঞ্চলের অতি নগণ্য একটি গ্রাম, কিন্তু বর্তমানে এটি হ'ল ভারতের একটি বিখ্যাত স্থান। পরমাণু শক্তির সাহায্যে উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তি এখান থেকে পশ্চিম ভারতের দুটি শিল্পোন্নত রাজ্য গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে পাঠানো হচ্ছে।

ভারতে এই প্রথম ২০০ মেগা ওয়াটের দুটি টারবাইনের একটি বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন কেন্দ্র কাজ সুরু করছে। দুই এক মাসের মধ্যেই এখান থেকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বোম্বাই থেকে ১০০ কিঃ মীঃ দূরে অবস্থিত তারাপুরে কয়েক বছর পূর্বেও ইতস্ততঃ ছড়ানো দুই একটি কুঁড়ে ঘর ছাড়া আর কিছু ছিল না। এখন সেখানে ৪৫ মীটার উঁচু বিরাট আকারের একটি কন্‌ক্রিটের বাড়ী, কুতুব মীনারের মতো একটা মীনার এবং বিপুল আকারের সারি সারি

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

রসকট কৃষ্ণ পিল্লে

চিত্র

তা. সু. নাগরাজন

সুইচ। এটায় আছে পারমাণবিক রি-এ্যাক্টার। এখানে এলে মনে হয় দেশ যেন গরুর গাড়ীর যুগ ছাড়িয়ে হঠাৎ পারমাণবিক যুগে পৌঁছে গেছে। তারাপুরের কাছাকাছি রেলষ্টেশনটির নাম হ'ল বয়সার। বয়সার স্টেশনে এলেও মনে হয় না যে ১৫ মাইল দূরেই রয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম নিদর্শণ পারমাণবিক কেন্দ্রটি। তবে যখন কোনও বিদেশী অতিথিকে নিয়ে বিরাট মোটর গাড়ী এই অখ্যাত সহরটির মধ্যে দিয়ে চলে যায় তখন যেন আধুনিকতার খানিকটা সাড়া পাওয়া যায়।

বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য এখানে ৪০০ মেগা ওয়াট শক্তির যে কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছে, ভারতের অন্য কোথাও বোধ হয় এতো অল্প সময়ের মধ্যে এই রকম কোন কেন্দ্র নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। তবে বিদেশী কন্ট্রাক্টাররা যে সব যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেন সেগুলির কোন কোনটায় অল্প স্বল্প ত্রুটি থাকায়, কেন্দ্রটিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ সুরু হতে কিছুটা দেরী হয়।

উত্তাপ সৃষ্টির জন্য রিএ্যাক্টারে জ্বালানি দেওয়ার আগে প্রথমতঃ নানা রকম পরীক্ষার সময় কয়েকটা স্টেইনলেস্ স্টীল দিয়ে তৈরি যন্ত্রে চিড় খাওয়ার সামান্য চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। চুলের মতো অতি সামান্য ফাটা হলেও তা উপেক্ষা করা হয়নি।

এই সব যন্ত্রাদি সরবরাহ করার প্রধান কন্ট্রাক্টার ছিলেন আমেরিকার ইন্টারন্যাশনাল জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানী। এঁরা তখন নিজেদের ব্যয়ে, স্টেইনলেস স্টীলের সব যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখেন। ফলে এঁরা স্টেইনলেস স্টীলে তৈরি যে ১৭০০ টিউব সরবরাহ করেছিলেন সেগুলি সমস্ত ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে নতুন টিউব দেন। কন্ট্রাক্টাররা যখন বুঝতে পারলেন যে এগুলিতে ত্রুটি আছে তখন তাঁরা বিমান যোগে আবার নতুন টিউব পাঠিয়ে দেন।

প্রতিটি যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ অত্যন্ত সাবধানে পরীক্ষা করে নিতে হয় বলে এবং কোন রকম গোলমাল যাতে না হয় সেজন্য অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানী করতে হয় বলে, কেন্দ্রটিতে কাজ সুরু করতে প্রায় আট মাস দেরী হয়।

একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করতে সাধারণতঃ ৬।৭ বছর লাগে। তারাপুরের পারমাণবিক বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন কেন্দ্রটির কাজ ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে সুরু হয়। ৪৮ মাসের মধ্যেই এখানে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন সুরু করা যাবে বলে প্রথমে স্থির করা হয়। পারমাণবিক বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন কেন্দ্র

রি-এ্যাক্টারের মৌচাকের মতো টিউবসমূহ

কোন জরুরী পরিস্থিতিতে রি-এ্যাক্টার বন্ধ করার জন্য স্ক্র্যাম এ্যাকুমুলেটার। খুব দ্রুতগতিতে নিয়ন্ত্রণকারী রড বসাবার জন্য এগুলি ব্যবহার করা হয়।

তৈরি করাটা আমাদের দেশের পক্ষে একেবারে নতুন ছিল এবং এই রকম একটা জটিল কাজে পদে পদে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

কেন্দ্রটিতে কাজ স্রুরু হলেও এখনও পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়। ফেব্রুয়ারি মাসেই রিএ্যাক্টারে জ্বালানি দিয়ে দেওয়া হয়। এখানে যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা হয় তা পরীক্ষামূলকভাবে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে সরবরাহ করা হয়। বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে একেবারে শূন্য থেকে ওপরের দিক পর্যন্ত নানা রকম পরীক্ষা চালানো হয়। রিএ্যাক্টার যখন ১৫০ মেগা ওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করছিল তখন হঠাৎ তা বন্ধ করে দিয়ে

সমস্ত যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ পরীক্ষা করে দেখা হয়। যখন বেশী বা কম পরিমাণে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা হতে থাকে তখন সব যন্ত্রগুলি একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সঠিকভাবে কাজ করে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। এমন কি যন্ত্রে ত্রুটি ঘটিয়ে সেগুলির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে আবার সংশোধন করে তার ফল লক্ষ্য করা হয়েছে। কন্ট্রাক্টারের ব্যয়েই এই পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে এবং ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা সম্পর্কে কেন্দ্রটি এখন প্রায় তৈরি। পরীক্ষা নিরীক্ষার সময়েও দুই

কোটি ২০ লক্ষ ইউনিট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করে মহারাষ্ট্রে, গুজরাটের লাইনে দেওয়া হয়েছে।

যাদুকরের কাঠির ছোঁয়ায় যেন সব বদলে গেছে

গত কয়েক মাসে তারাপুরে যে পরিবর্তন এসেছে তা যেন যাদুর খেলা। প্রায় ২০ মাস আগে শত শত কর্মী বিপুল আকারের সব যন্ত্রপাতি নিয়ে অবিশ্রাম কাজ করেছেন। দৈত্যের মতো এক একটা ক্রেনের ঘর্ঘর শব্দ, শ্রমিক ও কর্মীদের কোলাহল দিনের সর্বক্ষণ জায়গাটাকে মুখর করে রাখতো। রিএ্যাক্টার বসাবার জন্য কন্‌ক্রিটের বাড়ীটি তৈরি করে তাতে

২৭০ টন ওজনের যন্ত্রটি বসানো হয়েছে। এই বাড়ীটির চতুর্দিকে ছিল শ্রমিকদের কুটির।

এখন কিন্তু তারাপুর শান্ত ও সুশৃঙ্খল। বাইরের শান্ত পরিবেশ দেখে বোঝা যায় না বাড়ীটির ভেতরে কি ভীষণ কর্মব্যস্ততা। এখানকার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটিতে কিন্তু প্রধান ইঞ্জিনীয়ার থেকে নতুন শিক্ষার্থী পর্যন্ত সকলেই যুবক।

বিশ্বে সর্বপ্রথম

একই বাড়ীতে এই রকম দুটি রিএ্যাক্টার বিশ্বের অন্য কোন দেশে স্থাপন করা হয়নি। তবে দুটি রিএ্যাক্টারের জন্য অভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যায় বলে যথেষ্ট ব্যয় সঙ্কোচ করতে পারা গেছে। পাঁচ তলা বাড়ীটির সর্বোচ্চ তলায় উঠেও অবশ্য রিএ্যাক্টারের কাজ দেখতে পাওয়া যায় না।

কয়লা বা তৈল খনিতে সাধারণত যে বয়লার ব্যবহার করা হয়, এগুলির কাজও মূলতঃ একই। এই রিএ্যাক্টারের কাজ হ'ল বাষ্প তৈরিকরা। যে বাষ্পের জোরে টার-বাইন চালিয়ে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা হয়। বিশ্বের নানা দেশে নানা রকমের রিএ্যাক্টার ব্যবহার করা হয়, তবে যেটি বসানো হয়েছে সেটি হ'ল 'বয়লিং ওয়াটার' ধরণের রিএ্যাক্টার। পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং অতিরিক্ত উত্তাপ গ্রহণ করার জন্য এতে সাধারণ জল ব্যবহার করা হয়।

তারাপুরের রিএ্যাক্টারে যে জ্বালানী ব্যবহৃত হয় তা হ'ল উচ্চ শক্তিতে পুষ্ট ইউরেনিয়াম। তারাপুরের প্রত্যেকটি রিএ্যাক্টারে উচ্চশক্তি সম্পন্ন ৪০ টন ইউ-রেনিয়াম আছে, এগুলি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা হয়েছে। ট্রম্বের ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে এগুলিতে জিঙ্কএলয় লাগিয়ে জ্বালানি রড বানানো হয়। এই রকম ৩৬টি জ্বালানি রড এক সঙ্গে বেঁধে ২৮৪টা এই রকম বাণ্ডিল তৈরি করা হয়। বিদেশ থেকে যে জ্বালানি আমদানি করা হয়েছে এবং রিএ্যাক্টারে দেওয়া হয়েছে তাতে আড়াই বছর চলে যাবে। এরপর এই জ্বালানির শতকরা ২০ ভাগ, প্রতি ৯ মাস বা এক বছর পরে বদলাতে হবে। একটা চলমান ক্রেনের সাহায্যে চিমটের মতো জিনিস দিয়ে এই জ্বালানি রডগুলি রিএ্যাক্টারে বসিয়ে দেওয়া হয় বা তুলে নেওয়া হয়।

রিএ্যাক্টারের মধ্যে যেখানে রডগুলি দেওয়া হয় সেটা স্টেইনলেস স্টীলের ফ্লাস্কের মতো একটা আধার। এর ব্যাস হ'ল ১৮.৬ মিটার (৬৬ ফিট) এবং ৩০ মিটার (১০০ ফিট) উঁচু। এ আধারটিতে যে বিপুল উত্তাপ সৃষ্টি হয় তা থেকে আধারটীকে রক্ষা করার জন্য এতে একটা উত্তাপ প্রতিরোধক আবরণ থাকে। সমগ্র রিএ্যাক্টারটি কন্‌ক্রিটের মধ্যে বসানো।

রিএ্যাক্টারে যখন জ্বালানি রডগুলিতে পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া হতে থাকে তখন অসহ্য উত্তাপের সৃষ্টি হয়। সেই উত্তাপে জল ফুটে, বাষ্পের সৃষ্টি হয় এবং সেই বাষ্প একটি টারবাইনকে প্রতি মিনিটে ১,৫০০ বার ঘূর্ণনের গতিতে ঘোরাতে থাকে। টারবাইনের সঙ্গে যুক্ত একটি জেনারেটার বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করে। রিএ্যাক্টারের অতিরিক্ত উত্তাপ, আরব সাগরের জল পাম্প করে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এই কেন্দ্রের ইঞ্জিনীয়ারগণ, আরব সাগরের জল পাম্প করা বা বের করে দেওয়ার জন্য অত্যন্ত কার্যকরী কতকগুলি খাল কেটে নিয়েছেন।

কণ্ট্রোল রুম

তারাপুরের দুটি রিএ্যাক্টারের সমগ্র ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া একটা দূর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সব সময়ে সতর্ক দৃষ্টির মধ্যে রাখা হয়। উচ্চ শিক্ষিত অতি সতর্ক ইঞ্জি-নীয়ারগণ, লাল সবুজ হলদে আলোর সামনে বসে সর্বক্ষণ রিএ্যাক্টারের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য ও নিয়ন্ত্রণ করেন। কন্ট্রোল রুমের অতি আধুনিক যন্ত্রপাতিগুলি ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের ইলেক্‌ট্রো-নিক শাখায় ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হয়েছে।

তারাপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান ট্রান্সফর্মারের ষ্টেপ আপ ইউনিট

অষ্ট্রেলিয়ায় বিমানের সাহায্যে সারের প্রয়োগ

চাষবাসের জন্যে বিমানের ব্যবহারে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের পরেই অস্ট্রেলিয়ার নাম করা যেতে পারে। ১৯৫১ সালে বিমান থেকে এক হাজার টনের কিছু কম পরিমাণ সার ছড়িয়ে দেবার জন্যে কয়েকজনকে মাত্র কাজে লাগানো হয়েছিল। এখন ঐ পদ্ধতিতে বছরে ১,৭০,০০০ হেক্টার জমিতে সার দেওয়া হয়। এর মধ্যে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ হ'ল ঘাস জমি।

এক সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ সার প্রয়োগ করার কাজ সহজ করার জন্যে সার উৎপাদনকারী বড় বড় প্রতিষ্ঠান, চুক্তিতে কাজ করবার জন্যে যে 'গ্রুপ প্ল্যান' প্রবর্তন করেছে তারই ফলে কৃষির উন্নয়নে বিমানের ব্যবহার বেড়ে গিয়েছে। প্রচুর পরিমাণ সার বোঝাই করা, এবং অন্যত্র বিলি করার জন্যে রেলপথে চালান দেওয়া এবং বিমান যোগে নির্দিষ্ট জমির ওপর ছড়িয়ে দেওয়ার কাজগুলো যাতে সহজে সুষ্ঠুভাবে হয় তারই জন্যে এই রকম চুক্তি ব্যবস্থা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই গ্রুপ প্ল্যানের আওতার বাইরে খুব কম সংখ্যক বিমান কাজে প্রয়োগ করা হয়।

ব্যাঙ্কস্টাউন বিমান বন্দরে এই ধরণের বিমান চালাবার জন্যে একটি উড্ডয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। বিমান যোগে সার প্রয়োগ পদ্ধতি শেখা-নোর জন্যে এবং এই ধরণের বিমানের জন্য চালকদের যাতে অভাব না ঘটে তার জন্যে এই স্কুলে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

কর্মসংস্থানে শিক্ষার ভূমিকা

শিশির কুমার হালদার

পৃথিবীর যে সব দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা যথেষ্ট উন্নত, সেখানেও শিক্ষিত বেকার বিরল নয় সত্য, কিন্তু ব্যাপকতা ও ভয়াবহতার দিক থেকে ভারতের শিক্ষিত-বেকার সমস্যার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, এমন দেশের সংখ্যা বেশি নয়। সীমিত তথ্য ও নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের সহায়তায় আমাদের দেশের পল্লী ও শহর অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত বেকার সমস্যার সামগ্রিক চেহারাটা ফুটিয়ে তোলা দুষ্কর। আমাদের পরিকল্পনা প্রণেতারা অনুমানের ভিত্তিতে এমন কতকগুলি গাণিতিক মডেল তৈরি করতে ব্যস্ত, যার সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার যোগসূত্র নিতান্তই ক্ষীণ। দেশে নিয়োগ করা যায় এমন কর্মক্ষম সকলের, যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব, এমন কোনো জাতীয় উন্নয়ন খসড়া প্রণয়নে, তাঁরা একাধিক কারণে, এখনো সমর্থ হননি।

সমস্যার খতিয়ান

কয়েকটি সঙ্গত কারণেই দেশে শিক্ষিত বেকার অবাঞ্ছিত। প্রথমত: লোকে সচরাচর শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন নিছক শিক্ষার সামাজিক উপযোগিতা ও কৌলিন্যের খাতিরেই নয়, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নিজেদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্যও বটে। দ্বিতীয়ত: শিক্ষিতদের অধিকাংশই সমাজের এমন একটা স্তর থেকে আসেন যাঁদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধা স্বভাবতই সমাজের অন্যান্য স্তরের ব্যক্তিদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি। তৃতীয়ত: কোনো না কোনো কাজে নিয়োগ করা সম্ভব এমন দক্ষতাহীন সাধারণ ব্যক্তিদের তুলনায় শিক্ষিত দক্ষ ব্যক্তিদের বাজার চাহিদা অনেক বেশি।

কিন্তু ভারতে শিক্ষিত বেকার সমস্যা আজকের নয়। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে ভাবতে পারা যায় না, যে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের এই সমস্যাটির সুরাহা হবে। একটি হিসেবে, আমাদের দেশে সেকেণ্ডারী স্কুল থেকে যাঁরা বের হচ্ছেন, তাঁদের শতকরা ১৫ জনই বেকার থাকেন, যখন দেশে সাধারণ বেকারের হার শতকরা ৯ জন। কর্মনিয়োগ কেন্দ্রের রেজিষ্ট্রার থেকে জানা যায় যে, ভারতে ১৯৬৭-৬৮ সালে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৫.৬। কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে মেট্রিকুলেট-এর সংখ্যা শতকরা ১৩.২ জন। আণ্ডার গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা শতকরা ২২.৬ জন, আর গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা শতকরা ৩১.৩ জন। ডিরেক্টর জেনারেল অব এমপ্লয়মেন্টের ১৯৬০ সালের 'সার্ভেতে' দেখা যায় যে শিক্ষিত বেকারদের শতকরা ৪০ জন আর্টস গ্র্যাজুয়েট, শতকরা ১৭.৫ জন সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট, শতকরা ৮.২ জন কমার্স গ্র্যাজুয়েট, এবং শতকরা ৭.২ জন ল গ্র্যাজুয়েট। অবশিষ্টদের মধ্যে রয়েছেন এই সব বিষয়ে এম. এ. ডিগ্রীধারী ও বৃত্তিমূলক বিষয়ে ডিগ্রীধারী। আমাদের তৃতীয় পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দাঁড়াবে ১৫ লক্ষ। ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনোলজির গ্র্যাজুয়েট এই হিসেবের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৭০ সালের মধ্যে কর্মপ্রার্থী গ্র্যাজুয়েটদের সংখ্যা দাঁড়াবে কম পক্ষে ১৭ লক্ষ। সমস্যাটির গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়।

শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার বনাম নিয়োগ সম্ভাবনা

শিক্ষিত বেকার সমস্যার জন্য প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে মুখ্যত: দায়ী সাব্যস্ত করতে অনেকেই বেশ তৎপর। এই সমস্যার অপরাপর কারণ অনুসন্ধানে এঁরা তেমন আগ্রহী নন।

সেকেণ্ডারী শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কর্ম সংস্থানের সুযোগ সুবিধা প্রশস্ত হবে এবং অর্থকরী লক্ষ্য সিদ্ধির সম্ভাবনাও দেখা দেবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি উন্নত দেশগুলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্যও দেশের জনশক্তি সদ্ব্যহারের জন্য সংস্কারের অত্যুগ্র এই উৎসাহ অনুমেয় কিন্তু স্বীকার্য নয়। স্কুল কলেজীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস, বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায়, শিক্ষিতের কর্ম সংস্থানের পথ কতটা উন্মুক্ত করতে সক্ষম, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। যাঁরা ভাবেন যে উন্নতমানের সুসমঞ্জস শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত বেকার বলে কেউ থাকবেন না তাঁরা স্বত:সিদ্ধ হিসেবে ধরে নেন যে, আমাদের বর্তমান অর্থনীতিতে পূর্ণ কর্মনিয়োগ জনিত ভারসাম্য সম্ভব। তাঁদের মতে শিক্ষিত বেকারের বর্তমান সমস্যা মূলত: কর্মান্তরগত বেকার সমস্যা এবং পাঠ্যসূচী ও শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিবর্তন ও শিক্ষা ব্যবস্থা বৃত্তিমুখী করার মধ্যেই এ সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান নিহিত। বলা বাহুল্য এই ধারণাগুলি সত্য হলে শিক্ষিত বেকার সমস্যা আজ মারাত্মক রূপ ধারণ করতো না, অনায়াসেই তার সমাধান করা যেত। সুতরাং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষায়তনগুলি এই ব্যাপারে সব অনর্থের মূল—এমন সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্তের সামিল।

শিক্ষা ব্যবস্থা বৃত্তিমূলক করবার আগে চিন্তা করে দেখতে হবে যে বৃত্তি নির্বাচনের ব্যাপারে ছাত্ররা শিক্ষণীয় বিষয়ের দ্বারা কিভাবে কতটা প্রভাবিত হয়ে থাকেন। এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয় যেখানে, কারিগরি বা কৃষি বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা সংশ্লিষ্ট বৃত্তি অবলম্বন না করে, অধিকতর সুযোগ সুবিধা

এবং অর্থ ও ক্ষমতা দিতে পারে, এমন কাজের সন্ধান করে থাকেন। এই বিপত্তির অন্যতম প্রধান কারণ অবশ্য সরকারী বেতন নীতি। অধিক অর্থ ও ক্ষমতার প্রলোভনে বিশেষজ্ঞরাও অনেক সময় স্ব স্ব ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে অন্য কর্মক্ষেত্র বেছে নেন। অপেক্ষাকৃত কম বেতনের সরকারী চাকরির প্রতি সাধারণের মোহ, দীর্ঘ পরাধীনতা ভোগের একটা অপ্রীতিকর পরিণাম। প্রকৃতপক্ষে ছাত্রদের বৃত্তি বা পেশাগত উচ্চাকাঙ্খা এবং উত্তরকালে তাঁরা কে কোন বৃত্তি অবলম্বন করবেন, তার মূলে যে সব কারণ আছে সেগুলির সঙ্গে স্কুল কলেজের শিক্ষণীয় বিষয়গুলির সম্পর্ক যৎসামান্য। স্কুল কলেজের শিক্ষা নয়, সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাগুলিই ছাত্রদের বৃত্তিগত আশা আকাঙ্খার যথার্থ নিয়ামক ও নির্ধারক। তাই মনে হয় শিক্ষিতের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে আমাদের শিক্ষায়তনগুলি অনেকদিন থেকেই অকারণে তীব্র বিরূপ সমালোচনার লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। যে সব ক্ষেত্রে উন্নয়ন লক্ষণ সুস্পষ্ট এবং যে যে ক্ষেত্রে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত দক্ষ ব্যক্তিদের চাহিদা যথেষ্ট পরিমাণে অনুভূত হচ্ছে সেই সব ক্ষেত্রের সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি ও শিক্ষা প্রণালীর ঘনিষ্ঠ যোগ থাকা উচিত। নিম্নমানের কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা বিদ্যায়তনগুলির বাইরে, কারখানাগুলিতে করতে পারলেই ভাল। এ ছাড়া কর্মরত অবস্থায় শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রসার প্রয়োজন। আমাদের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থাকেই শিক্ষিত বেকার সমস্যার জন্য দোষী করে, আমরা যেন সমস্যাটিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা না করি, প্রস্তাবিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করার সময়ে আমাদের সমাজ জীবন ও অর্থনৈতিক কাঠামোর সম্ভাব্য পরিবর্তনকে বাস্তব অভিজ্ঞতার নিকষে যাচাই করে দেখতে আমরা যেন ভুলে না যাই।

মনগড়া মূল্য, সমাধানের প্রতিবন্ধক

অনেককে বলতে শোনা যায় যে, আমাদের দেশের শিক্ষিত বেকারদের অবস্থা সেই সব, রূপসী কুমারী মেয়েদের মতো যাঁরা নিজেদের উপর মন গড়া, একটা মূল্য আরোপ করে বিয়ে করতে অনিচ্ছুক। শিক্ষিত বেকার সমস্যা অংশত দেখা দেয় নিজেদের আয় সম্পর্কে শিক্ষিতদের অবাস্তব প্রত্যাশার ফলে। এই প্রত্যাশিত আয়ের আশাই হ'ল শিক্ষিতদের মন গড়া সংরক্ষিত মূল্য। যতদিন পর্যন্ত শিক্ষিতদের আয়ের প্রত্যাশা বাস্তবানুগ না হচ্ছে, ততদিন বেকার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না, এবং এই সমস্যা প্রসূত রাজনৈতিক ও সামাজিক অসন্তোষও দূর করা সম্ভব হবে না। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের আয়ের ব্যবধান হ্রাস করার চেষ্টা ইংল্যাণ্ডে করা হয় ১৯৩০ সালে যখন ও দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তখন সেখানে সামান্য বেতনের কাজও শিক্ষিতেরা গ্রহণ করতে সম্মত হন।

উন্নয়নকামী দরিদ্র দেশের শিক্ষিতদের কর্ম সংস্থান সমস্যা সম্পর্কে ডব্লিউ. এ. লুইস বলেছেন যে, শিক্ষিত বেকার 'সমস্যাটি পূর্ণত বা মূলত ভারসাম্যের সমস্যা নয়। শিক্ষিতদের কর্ম সংস্থানের পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদনের হারের তুলনায় তাদের উচ্চ মূল্য। গরীব দেশের একজন গ্র্যাজুয়েট কয়লা খনির একজন শ্রমিকের চেয়ে পাঁচ গুণ বেশী বেতন পান। ফলে উৎপাদনের জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাজে লাগানো, জাতীয় আয়ের তুলনায় বিশেষ ব্যয় সাপেক্ষ।...... পরিশেষে অবশ্য এই পরিস্থিতি আপনা থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। কেননা, শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার অতিরিক্ত মূল্য হ্রাস পেতে সুরু করে। যে সব কাজে আগে স্বল্প শিক্ষিতদের নিয়োগ করা হতো সে সব কাজে এখন নিয়োগ করা হয় অপেক্ষাকৃত বেশী শিক্ষিতদের। তাঁরা আয়ের প্রত্যাশা ক্রমশ কমিয়ে আনতে থাকেন এবং নিয়োগকারীরা তাঁদের চাকরি বা কাজের আবশ্যকীয় শর্তাদির মাত্রা বাড়াতে থাকেন' লুইসের এই উক্তির সত্যতা ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে ক্রমশ প্রতিভাত হয়ে উঠছে।

হাতের কাজ বা কায়িক শ্রমের প্রতি আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধাকে এক সময় প্রথাগত উদার শিক্ষার অনিবার্য ফলশ্রুতি বলে গণ্য করা হত। এ কালে শিক্ষার ক্ষেত্রে গণতন্ত্রীকরণের ফলে ও শিক্ষাকে অংশতঃ বৃত্তিমূলক করার ফলে, শিক্ষিত সম্প্রদায় কায়িক শ্রম বা হাতের কাজের প্রতি অবজ্ঞা যে দ্রুত কাটিয়ে উঠছেন এটা লক্ষণীয়।

সমস্যা নিরসনের বাস্তবানুগ প্রয়াস

দেশে এখন শিক্ষিত বেকার সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন প্রয়াস চলেছে। পল্লী অঞ্চলের কর্মপ্রার্থী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে উদ্ভাবিত উন্নয়নমূলক ব্যাপক কর্মসূচী এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় অধিবাসীদের কর্ম প্রচেষ্টা, শ্রম এই সব পরিকল্পনা রূপায়ণে সহায়তা করবে—এমন আশা প্রকাশ করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল সরকারী আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। ন্যূনতম প্রয়োজনের ভিত্তিতে এই কর্মসূচী রূপায়ণের সময়ে আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট এবং যাঁরা স্কুলের শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছেন এমন ব্যক্তিদের চাহিদা হবে সর্বাধিক। বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য তাঁদের স্বল্প মেয়াদি শিক্ষণের ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু গ্রামবাসীদের তরফ থেকে আশানুরূপ সাড়া না পাওয়ার ফলে এই সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে চলেছে। পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজে যে সব যুবকদের পল্লী অঞ্চলে পাঠানো হয়, তাঁদের অধিকাংশই ৬ মাসের মধ্যে শহরে ফিরে আসার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেন। এ সব কাজে যে ধরণের নেতৃত্ব দরকার তা এঁরা দিতে অসমর্থ, গ্রামবাসীদের অনুপ্রাণিত করতে এঁরা অক্ষম হন। বস্তুত মূলধন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা চলে এমন ব্যক্তিদের কাজে লাগানোর প্রয়াস একটি বিরাট সাংগঠনিক সমস্যা বিশেষ। হয়তো বা আমাদের দেশে মূলধনের চেয়েও দুষ্প্রাপ্য বস্তু হল এই সাংগঠনিক ক্ষমতা অর্জন। সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কার্যকরী ও সার্থক করতে হলে যে ধরণের বাধ্য বাধকতা ও জোর জবরদস্তির প্রয়োজন আমাদের রাজনৈতিক মতাদর্শের খাতিরে তা অকল্পনীয়।

(২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নব পর্যায়ে কৃষি

অজয় বসু

'আজ শুধু একলা চাষীর চাষ করিবার দিন নাই, আজ তাহার সঙ্গে বিদ্বানকে, বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হইবে। আজ শুধু চাষীর লাঙ্গলের ফলার সঙ্গে আমাদের দেশের মাটির সংযোগ যথেষ্ট নয়—সমস্ত দেশের বুদ্ধির সঙ্গে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাহার সংযোগ হওয়া চাই।' কথাগুলি অবশ্য আজকের নয়। যে সময়ের কথা তখন থেকে আজ প্রায় ৫০ বছর অতীত হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ হয়তো আশা করেছিলেন, অদূর ভবিষ্যতে দেশের মানুষ তাঁর এই কথাগুলির গুরুত্ব আরও গভীর-ভাবে অনুভব করতে পারবে। রবীন্দ্রনাথ সেদিন আমাদের দেশের মাটিতে এই যে বিশেষ সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করেছিলেন পরবর্তীকালে স্বাধীন ভাবতে তার বাস্তব রূপদানে এক নতুন কর্মতৎপরতা যুক্ত হয়ে গেছে।

গতানুগতিক কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক কৃষিকর্মের প্রবর্তনই এই কর্মতৎপরতার মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য রূপায়ণে কৃষকের একক ভূমিকাই আজ আর যথেষ্ট নয়, যদিও তাঁর দায়িত্বই সব চেয়ে বেশী। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ, বিশেষত: বুদ্ধিজীবীদের সক্রিয় সহযোগিতাও আজ একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। কৃষকের সঙ্গে সমাজের বৃহত্তর অংশের যে সম্পর্ক এতোকাল চিরাচরিত ধারায় আবর্তিত হয়ে আসছিল তাও এক অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে এবং এই পরিবর্তন ইতিমধ্যেই সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষকের সঙ্গে সমাজের বৃহত্তর অংশের পরস্পর নির্ভর এক নতুন মেলবন্ধন সূচীত করছে।

কৃষি উৎপাদন এখন সমাজের কোনো এক শ্রেণীর বহুকালের বংশানুক্রমিক বৃত্তি ও প্রচলিত ধ্যান-ধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তার দিগন্ত ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে এবং সমগ্র সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক হিসেবে কৃষি দাবী করছে এক নতুন মর্যাদা। বস্তুত কৃষিই বর্তমানে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অন্যতম বৃহৎ ক্ষেত্র এবং প্রকৃতপক্ষে কৃষি উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে যাঁরা আজ সংশ্লিষ্ট তাঁদের একটি বিশেষ অংশ কৃষি বিষয়ে আধুনিক চিন্তাধারা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত। গ্রামের অভিজ্ঞ কৃষকও এই নতুন চিন্তার চর্চায় এবং নতুন নতুন নিয়ম পদ্ধতি গ্রহণে ক্রমেই উৎসাহী হয়ে উঠছেন। বিশেষ লক্ষণীয় যে, সম্প্রতি দেশের শিক্ষিত যুবকরাও কৃষি কাজে এগিয়ে আসছেন এবং তাঁদের নতুন অভি-জ্ঞতা ও বিদ্যাবুদ্ধি প্রয়োগের সাফল্য তাঁদের মনে আরও বেশী আগ্রহ জাগিয়ে তুলছে।

প্রশ্ন হল, কৃষিজীবীর কাছে আধুনিক বা বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ কথাটির অর্থ কি? প্রকৃত পক্ষে এতোদিন যে ধারায় চাষ আবাদ চলে আসছিল তার থেকে স্বতন্ত্র এবং উন্নত পদ্ধতিতে চাষের কথাই এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবশ্য চাষের প্রাথমিক নিয়মকানুনগুলি প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। এক কথায় বলা যেতে পারে, যে চাষ পদ্ধতি গ্রহণ করে (ক) আগের তুলনায় অধিক উৎপাদন সম্ভব হয় এবং (খ) একই পরিচিত জমি থেকে এ যাবৎ উৎপন্ন নির্দিষ্ট ফসলের বেশী ফসল উৎপাদন করা যায়, তাকেই বর্তমানে উন্নত বা পরিবর্তিত চাষ পদ্ধতি বলা যেতে পারে। একটি জমি থেকে বছরে অধিক ফলন এবং একাধিক ফসল পেতে হলে চাষের ব্যাপারে যে যে বিষয়ের ওপর আমাদের নির্ভর করতে হয় সেগুলির প্রত্যেকটি নতুন শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল।

আমাদের জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। কিছুকাল আগেও জমির এই সীমাবদ্ধতা এখনকার মত একটা বিশেষ সমস্যা হয়ে দেখা দেয় নি। এ ছাড়া লোক সংখ্যার দ্রুতহারে বৃদ্ধি কয়েক বছরের মধ্যে আমা-দের খাদ্য উৎপাদনের ওপরে স্বভাবতই একটা চাপ সৃষ্টি করেছে। প্রধানত এই দুটি সমস্যা সম্প্রতি এ দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনকে আরও বেশী তীব্র করে তুলেছে এবং বাস্তব অবস্থার বিচারে কৃষিই পেয়েছে আমাদের দেশের অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার।

অধিক উৎপাদন এবং জমিকে পুরো-পুরি কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীদেয় প্রচেষ্টায় অধিক ফলনশীল এবং প্রায় সারা বছর চাষের উপযোগী নতুন নতুন বীজের উদ্ভাবন আমাদের শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রচুর ফলনের প্রতি-শ্রুতি নিয়ে এসেছে। ধান ও গম আমাদের প্রধান দুটি খাদ্যশস্য। বর্তমানে অধিক ফলনশীল ধানের বীজ হিসেবে আই আর ৮ নামের এক ধরণের নতুন ধানের চাষ পশ্চিম বাংলায় বিশেষ প্রচলিত হয়েছে। এর আগে তাইচুং নেটিভ-১, তাইনান-৩, কালিম্পং-১ ইত্যাদি আরও কয়েকটি উন্নত জাতের ধানের বীজ ব্যবহার করে কৃষকরা প্রথম বেশী ফলনের আশায় নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষায় নেমেছিলেন। এই বীজগুলির সবই প্রায় বিদেশ থেকে আনা অধিক ফলনশীল বীজ। আমাদের দেশের জল হাওয়া ও মাটির উপযোগী করে নেওয়া হয়েছে। এই সব জাতের ধান সাধারণতঃ ফরমোজা দ্বীপে প্রচুর জন্মায়। আই আর ৮ হল আমাদের দেশের জল হাওয়া ও মাটির উপযোগী আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা কেন্দ্রের উদ্ভাবিত ধান। এই জাতের ধান ফরমোজা জাতীয় ধানের চেয়েও বেশী ফলনশীল এবং প্রায় সারা বছরই চাষ করা চলে। আকারে ও স্বাদে আমাদের সাধারণ দেশী ধানের প্রায় সম-শ্রেণীর। কিছুটা বেটে জাতের হয় বলে এই ধানগুলির শীষ মাটিতে সহজে নুয়ে পড়ে না। এই ধানের চাষ করে পশ্চিম বাংলায় কোনো কোনো চাষী দেশী ধানের চেয়ে প্রায় তিন চার গুণ বেশী ফসল পেয়েছেন। কিছুদিন হ'ল জয়া আর পদ্মা

নামে আরও দুটি নতুনতর ধানের দ্রুত ফলনের প্রতিশ্রুতি আমাদের কৃষকদের মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে।

গমের উৎপাদন যে আমাদের দেশে আগের চেয়ে বহুগুণ বেড়ে গেছে তা আজ আর কারুর অজানা নেই। পাঞ্জাবের চাষীরাই গম উৎপাদনে অভূতপূর্ব সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। পশ্চিম বাংলাতেও গমের উৎপাদন কোনো কোনো জায়গায় আশাতীতভাবে বেড়েছে। গম চাষের এই বিরাট সার্থকতা সম্ভব হয়েছে অধিক ফলনের বীজের বৈশিষ্ট্যে ও যথাযথ ব্যবহারের ফলে। সোনোরা-৬৪ আর লারমা-রো এই দুটি গম বীজ নিয়েই মাত্র কয়েক বছর আগে আমাদের গম উৎপাদনে প্রথম এক নতুন প্রচেষ্টা সুরু হয়। মেক্সিকো দেশে এই জাতীয় গমের প্রচুর ফলনের দৃষ্টান্তই প্রথম আমাদেব দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং আমরা আমাদের দেশের মাটিতে এ জাতীয় গমের আবাদকে জল হাওয়ার অনুকূলে সার্থক করে তুলতে চেষ্টা করি। তার ফলে, সোনালিকা, কল্যাণ সোনা, সরবর্তী সোনোরা ইত্যাদি একে একে নানা নামে নতুন গম বীজের প্রচলন স্বল্পকালের মধ্যে আমাদের গম চাষে এক অসামান্য সাড়া জাগিয়ে তুলেছে।

এই সব নতুন অধিক উৎপাদনশীল বীজের আশানুরূপ ফলন নির্ভর করে বিশেষত অধিক সার প্রয়োগের ওপর। বেশী সার এবং বেশী ফলন, এক কথায় অধিক উৎপাদনশীল বীজের এই রীতি। এতোকাল আমরা শস্য চাষে, পচা গোবর, আবর্জনা বা পাতার কমপোস্ট সার, ছাই, হাড়ের গুঁড়ো ইত্যাদি সহজলভ্য জৈব সার দিয়েই কাজ চালিয়ে এসেছি। কিন্তু বর্তমানে সারের চাহিদা অনেক বেড়েছে অথচ জৈব সারের অনিশ্চিত এবং অপরিমিত প্রয়োগে পূর্ণ সুফল পাওয়ার আশাও কম। যে কোনো ফসলের পক্ষে বিশেষ একটি জৈবসারের মধ্যে সেই ফসলের প্রয়োজনীয় খাদ্য ছাড়াও এমন অন্যান্য অনেক জিনিস থাকে যা ফসলের পক্ষে শুধু অনাবশ্যক নয়, অনিষ্টকর হতে পারে। তা ছাড়া জৈব সার প্রয়োগ করে ফসলের উপযোগী বিভিন্ন সারের যথোচিত পরিমাপের সামঞ্জস্য রক্ষা করাও প্রায়ই সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই জন্য জৈব-সারের সঙ্গে পরিমিত মাত্রায় অন্যান্য সারের সুষম প্রয়োগের গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে। আজকাল জমির গঠন অনুযায়ী ফসলের উপযোগী সার জমিতে যথাযথ পরিমাণে এবং সরাসরি পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাসায়নিক সারের প্রচলন সুরু হয়েছে। কৃষকরা বিশেষ করে অধিক ফলনশীল বীজের চাষে রাসায়নিক সারের ব্যবহারে যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করছেন। রাসায়নিক সারে ফসলের প্রয়োজনীয় একাধিক খাদ্যের মিশ্রণের তারতম্য ঘটিয়ে বিভিন্ন সুষম সার প্রস্তুত করা হচ্ছে।

অধিক উৎপাদনশীল ফসলের চাষে যেমন ফলন বেশী পাওয়া যায় তেমনি এই জাতীয় ফসলে রোগ ও পোকার উপদ্রবও বেশী হয়। এই কারণে কৃষকদের আগের চেয়ে অনেক বেশী সচেতন হয়ে কাজ করতে হয় এবং ফসল রক্ষার জন্য শেষ পর্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। শস্য-বীজকে রোগমুক্ত করার জন্য প্রথম থেকেই বীজ শোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে পরিণামে শস্য হানির সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্য সম্প্রতি বীজ শোধক ওষুধের প্রচলন বেড়েছে। এ ছাড়া ফসলের মারাত্মক রোগ ও কীটাদির আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে নানা রাসায়নিক ওষুধের উপকারিতা ও ব্যবহারবিধি সম্পর্কেও কৃষকরা ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠছেন।

কৃষি উৎপাদনে আরও একটি লক্ষণীয় বিষয়, কৃষি ও শিল্পের পরস্পর সম্বন্ধ। আগেই বলেছি, আমাদের জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। কাজেই একই জমিতে অধিক উৎপাদনের নীতি গ্রহণ করতে হলে এবং সীমাবদ্ধ জমিতে চাষের কাজকে আরও সংহত ও নিবিড় করে তুলতে হলে কৃষি ব্যবস্থাকে কিছুটা শিল্পায়িত করার প্রয়োজন রয়েছে। বস্তুত: আজকাল কৃষিকে শিল্প সজ্ঞায় চিহ্নিত করার কথাও কেউ কেউ ভাবছেন। কৃষি কাজের সময় ত্বরান্বিত করার জন্য ট্র্যাক্টার, পাওয়ার টিলার, সীড ড্রিল, থ্রেসার ইত্যাদি যন্ত্রপাতির সাহায্যে জমিতে চাষ দেওয়া বীজ বোনা থেকে সুরু করে পাকা ফসল কাটাই ঝাড়াই ইত্যাদি বিবিধ কাজকে সংক্ষিপ্ত ও সুষ্ঠু-ভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা একালে খুবই সঙ্গত এবং অবস্থা বিশেষে অবশ্যই গ্রহণীয়। এ ব্যাপারে পশ্চিম বাংলায় সরকারী সহযোগিতার ক্ষেত্রেও প্রসারিত হচ্ছে এবং এ্যাগ্রো ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন বা কৃষি শিল্প কর্পোরেশন নামে ভারত সরকারের উদ্যোগে এবং রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান কৃষকদের নানাভাবে সাহায্য করার ব্যবস্থা করছেন। সেচ ব্যবস্থার সুবিধার জন্য এই প্রতিষ্ঠান কৃষকদের কাছে ইতিমধ্যেই সহজ কিস্তিতে অথবা ভাড়া প্রথায় পাম্প সেট সরবরাহের ব্যাপক আয়োজন করেছেন। কৃষিতে এই শিল্প প্রবণতা নতুন হলেও যথেষ্ট আশাপ্রদ, বিশেষত যখন কৃষিকর্মের সহায়ক উন্নত যন্ত্রপাতির প্রবর্তন এখন আর নিতান্ত বিরল নয়, বরং একথাই বলা চলে যে, বিদ্যুৎশক্তি চালিত সাজ সরঞ্জামে, পুরাতন চাষ ও সেচ ব্যবস্থার রূপান্তরের আভাস শোনা যাচ্ছে।

ক'জন জানেন যে, ৭০ লক্ষ কিউবিক মাইল বিস্তৃত যে তুষার মণ্ডল কুমেরু নামে পরিচিত সেখানে যুগ যুগান্তে সঞ্চিত তুষার রাশি সারা বিশ্বের মোট শতকরা ৯০ ভাগ? ওহিও রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়ের ডা: কোলিন বুল তাঁর ব্যাপক অনুসন্ধানের ভিত্তিতে যে প্রাথমিক রিপোর্ট লিখেছেন তাতে তিনি বলেছেন যে, কুমেরুর এই মুকুটের ওপর বছরে আন্দাজ ২.৫. সেন্টি-মীটার হিসেবে তুষার জমছে। এ যাবৎ কিন্তু কেউই সঠিক জানতেন না যে, এই বিরাট তুষার পিণ্ডের ওপর বরফ জমছে না তুষার গলে বেরিয়ে যাচ্ছে।

✶

চীনা বৈজ্ঞানিকরা একটা নতুন এবং অত্যন্ত শক্তিশালী এ্যান্টিবায়োটিক বার করেছেন। এই জিনিসের নাম দেওয়া হয়েছে কুয়িংডামাইসিন। শ্বাস নালীর ফোলা, মূত্রাশয়ের ওপর জীবাণুর আক্রমণ, সেপটিসিমিয়া এবং মেনিনজাইটিস সারাবার ব্যাপারে এই ওষুধটি নাকি মন্ত্রৌষধির সমান।

গ্রামগুলিতেও বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞানের প্রভাব পড়ছে

এস. এন. ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গের বারুইপুরে প্রচুর শাকসব্জি হয়। এখানকার বনহুগলীর একজন চাষী আকবর আলী সেদিন খুব উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন যে, 'আমাদের মনে হচ্ছে জ্যৈষ্ঠ মাসে, পৌষ এসে গেছে।' গ্রামের সবাই আনন্দে মত্ত, প্রচুর ধান পাওয়া গেছে।

উচ্চ ফলনের বোরো ধান অর্থাৎ আই আর ৮ আর আধুনিক পদ্ধতির চাষে, প্রচুর ফসল পাওয়া গেছে বলেই গ্রামে এই আনন্দ উৎসব। এই অভাবিত ফসল গ্রামবাসীদের এতো উৎসাহিত করেছে যে শাকসব্‌জির চাষই চিরকাল যাঁদের প্রধান জীবিকা ছিল তার পরিবর্তে তাঁরা এখন ধানের চাষ সুরু করেছেন।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন গ্রাম সেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যে সব গ্রামে উন্নয়নের কাজ সুরু করেছেন, বনহুগলী হ'ল সেগুলির মধ্যে অন্যতম। এই কেন্দ্রের পরীক্ষামূলক খামারে প্রথমে উন্নততর বীজ নিয়ে পরীক্ষা ক'রে, সেগুলির উৎপাদন পদ্ধতি গ্রামবাসীদের শেখানো হয়। গ্রামবাসীদের অবশ্য বেশী বোঝাতে হয়নি। উচ্চ ফলনের এই ধানের কথা তারা শুনেছে এবং স্বাভাবিকভাবেই তাতে সাড়া দিয়েছে। এই পৃথিবীতে কে না তার ভাগ্যোন্নতি চায়।

আরব্য রজনীর গল্পের মতো অদ্ভুত

আই আর ৮ ধান চাষ করে আর একজন কৃষক, আবেদ আলী খুব ভালো ফসল পেয়েছেন। তিনি বলেন যে 'এটা যেন আরব্য রজনীর গল্পের মতো অবিশ্বাস্য।' সাফল্যের গর্বে এবং ভবিষ্যতের আশায় উৎসাহিত ৬৮ বছরের এই কৃষকটি বললেন 'মাত্র দুই বছর আগেও আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না যে এক বিঘা জমি থেকে ৩৬ মণ ধান পাওয়া যেতে পারে। এখন এটা আমার পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য। আমি নিজে এই পরিমাণ ফসল পেয়েছি, আমার ভাই পেয়েছে, গ্রামের অন্যান্যরাও পেয়েছেন।'

বনহুগলীতে প্রায় ৬০০ আবাদি বা পরিবার আছে। এখানে প্রচুর জল পাওয়াটা বড় সমস্যা হলেও ওরা বছরে তিনটি ফসল বোরো, আউস আর আমন ধানের ফসল পান। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসেই সাধারণতঃ বোরো ধানের চারা লাগানো হয়। ঐ সময়ে সূর্যের আলো যথেষ্ট পাওয়া যায় বলে চারাগুলিও তাড়াতাড়ি বাড়ে। বর্ষা সুরু হওয়ার অনেক আগে মে মাসেই এর ফসল উঠে যায়। এই ধান অন্যান্যগুলির চাইতে অল্প সময়ে পাওয়া যায় বলে কৃষকরা এটা খুব পছন্দ করেন।

নতুন ধরনের বীজধান এবং নতুন পদ্ধতির চাষী

আবেদ আলী, আকবর আলীর মতো গ্রামের অনেকেই নরেন্দ্রপুরে আই আর আটের ফসল দেখেছেন। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সম্প্রসারণ সংস্থা থেকে ধানের বীজ দেওয়া হ'ত। এই গ্রামটি, সোনারপুর সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের অন্তর্ভুক্ত। ব্লকের কর্মীগণ নতুন উৎপাদনকারীদের সব রকম সাহায্য ও পরামর্শ দেন। এই নতুন ধরনের চাষে উৎসাহী প্রায় ৩০টি পরিবার স্বেচ্ছায় এই নতুন পরীক্ষা করতে রাজি হন এবং জলসেচের কিছুটা সুবিধে আছে এই ধরনের কিছু জমি বেছে নেন। তখন আবেদ আলী ও আকবর আলীর মাথায় নতুন একটা বুদ্ধি এলো। গ্রামের আশে পাশে অনেক ইঁটের ভাঁটা আছে। ওঁরা ভাঁটার মালিকদের কাছে গিয়ে যে সব জায়গা বৃষ্টির জলে ডুবে গেছে সেগুলি অস্থায়ীভাবে লীজ নিয়ে নিলেন। এই জায়গাগুলিতে লাঙ্গল চালিয়ে ধানের চারা লাগিয়ে দেওয়া হল।

ওখানকার কৃষকরা তাঁদের এই সাফল্যের কথা হয়তো সরকারী কর্মচারীগণের সঙ্গে আলোচনা করতে চাইবেন না। কিন্তু নরেন্দ্রপুর আশ্রমের স্বামীজির কাছে তাঁদের কিছুই গোপন নেই। তবে সব চাইতে বড় কথা হ'ল, সামান্য ২।৩ বছরের মধ্যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস সম্পর্কে এখানকার কৃষকরা যে জ্ঞান অর্জন করেছে তা আশ্চর্যজনক।

চায়ের দোকানের মাধ্যমে গবেষণাগার থেকে ধানের ক্ষেত পর্যন্ত

'রিসার্চ' এই ইংরেজি শব্দটি ইচ্ছে করে ব্যবহার করে আকবর আলী বলেন যে, 'আমরা আমাদের চাষের জমিতে রিসার্চ করছি। আমরা আমাদের জমিতে ইউরিয়া, পটাশ এবং সুপার ফসফেট ছাড়াও গোবর ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন সারের গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখছি।'

সন্ধ্যেবেলায় এবং প্রায় প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলাতেই কৃষকরা গ্রামের চায়ের দোকানে আসেন এবং এই সব সার ব্যবহার করে কে কি রকম ফল পাচ্ছেন তা নিয়ে আলোচনা করেন। ব্লক এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সার ব্যবহারের নিয়ম ইত্যাদি লেখা একখানা করে বই এঁদের দিয়েছেন। কিন্তু ওঁরা একটুও ইতস্তত না করে সোজাসুজি বলেন যে, জমিতে হাতে কলমে পরীক্ষা করে তাঁরা এই বইগুলি থেকেও বেশী জেনেছেন। ওঁদের এই আলোচনা শোনাও আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। ওঁদের মুখে কৃষি বিজ্ঞানের অনেক ইংরেজি শব্দ অনায়াসে উচ্চারিত হয়। সার সংগ্রহ করাটা ওঁদের পক্ষে একটুও কঠিন নয়। দোকানদারদের সঙ্গে ওঁদের যথেষ্ট পরিচয় আছে। তা ছাড়া কতটুকু জলে কি পরিমাণ সার মেশাতে হবে তা এখন আর বলে দিতে হয় না। মাটি পরীক্ষা করানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ওঁরা এখন খুব সচেতন এবং প্রায়ই দেখা যায় ওঁরা মাটি পরীক্ষা করানোর জন্য ব্লক অফিসে যাচ্ছেন।

ওঁদের এই উৎসাহ দেখে, গ্রাম সেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মাটি পরীক্ষা এবং পর্যায়

ক্রমিক শস্য বপন সম্পর্কে স্বল্পকালীন শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন বলে ভাবছেন

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কৃষকগণের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ধানের চারা লাগানোর জন্য জলের মধ্যে যখন চাষ করা হয় তখন কি পরিমাণ সার দিতে হবে তা তাঁরা জানেন। দেড় মাসের মধ্যেই আবার রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাঁরা তৈরি থাকেন। ধানের ছড়া বেরুনোর সময় তৃতীয় অর্থাৎ শেষবারে কখন কি পরিমাণ সার দিতে হবে তা তাঁরা জানেন।

কীটনাশক সম্পর্কেও বনহুগলীর কৃষকরা বৈজ্ঞানিকের মতো কথা বলেন। সরকারী বা বেসরকারী কোম্পানীগুলি সর্বশেষ কি কীটনাশক তৈরি করেছে তা তাঁরা জানেন। গ্যামাক্সিন তো সকলের কাছেই অতি পরিচিত নাম। আই আর ৮ ধানের চারা লাগানোর পর চারাগাছে পোকা লাগলে ওঁরা ট্যাফাড্রিন ছিটিয়ে দেন। কীটনাশক ছড়াবার অতি আধুনিক যন্ত্র এনডেক্স বি. এইচ. সি ও ওঁদের কাছে রয়েছে। অর্থাৎ যা ছিল গবেষণাগারের কক্ষে, তা সত্যি সত্যিই কৃষিক্ষেত্রে চলে এসেছে।

অর্থ বদলে যাচ্ছে

কৃষি সম্পর্কিত জ্ঞান তাঁদের কাছে এখন আর অজানা নয়। যাই হোক তাঁরা এটাও জানেন যে জ্ঞানের কোন সীমা নেই। তাঁরা আধুনিকতম কৃষি পদ্ধতি ও কৌশলগুলি গ্রহণ করে স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছেন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বর্তমান পদ্ধতিগুলোর উন্নতি করছেন। গ্রামের চায়ের দোকান এখন আর শুধুমাত্র আড্ডা দেওয়ার স্থান নয়, সেটা এঁদের জন্য একটা স্কুলের মতোও কাজ করে। গ্রামের দলাদলির আলোচনার জায়গায় এখন বৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতিগুলি নিয়ে আলোচনা হয়।

লাইন করে বীজ বোনা এখন আর একটা অপরিচিত বিষয় নয়, ছোট ট্র্যাক্টার বা বীজ ছড়াবার যন্ত্রের মতো কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার এখন আর ওঁদের কাছে অজানা নয়। জলের সমস্যা অবশ্য এখনও থেকে গেছে। আধুনিক কৃষি সম্পর্কে এঁরা যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং নিজেদের অবস্থা ভাল করার জন্য উদ্‌গ্রীব, কাজেই সেচের এই সমস্যা সমাধান করার জন্যও তাঁরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বোরো ধানের যে ফসল তাঁরা পেয়েছেন তা থেকে তাঁরা টাকার ব্যবস্থা করতে পারবেন। নিজেদের মধ্যে তাড়াতাড়ি আলোচনা করে, অগভীর নলকূপ বসাতে ইচ্ছুক এই রকম ১০ জন কৃষকের নাম ঠিক করে ফেলেছেন। তবে অন্য যে কোন দেশের কৃষি তথ্যাভিজ্ঞ কৃষকের মতোই তাঁরা ভূনিম্নের জলসম্পদ সম্পর্কে পুরোপুরি একটা পরীক্ষা করাতে চান।

নতুন গঙ্গা

লোকেরা যাকে আদি গঙ্গা বলেন, যা এখন খানিকটা নীচু জায়গা ছাড়া আর কিছু নয়, সেটি এই গ্রামের বাঁ পাশে রয়েছে। বেহুলা এবং লখীন্দরের কাহিনী, গ্রামের হিন্দু মুসলমানকে এখনও মোহিত করে। ওঁরা ভাবেন যে, গ্রামের পাশে গঙ্গা থাকলে মন্দ হ'তো না তবে তাঁরা অলস কল্পনায় সময় কাটাচ্ছেন না। ঐখানে তাঁরা ছোট ছোট পুকুর বা ডোবা কেটে জলের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছেন। অল্প কাটলেই অবশ্য জল পাওয়া যায় তবে পরিমাণ খুব অল্প। ডোবাগুলিতে যে কাদা জমে তা সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এক ফোঁটা জলেরও অপচয় হতে দেওয়া হয় না। যাঁদের আর্থিক সঙ্গতি আছে তাঁরা ডিজেল পাম্প বসিয়ে জমিতে সেচ দিচ্ছেন। তবে এখন অগভীর নলকূপের চাহিদাই বেশী।

কৃষকরা আরও কতকগুলি জিনিস শিখেছেন। বোরো ধানের জন্য জমিতে যে সার দেওয়া হয়, আউস ধানের চাষ করে সেই সুবিধা কাজে লাগানো হচ্ছে। জুলাই-আগষ্টে আউস ধান কাটার সময় হয়ে যায়, আর এগুলি বোরোর মতোই তাড়াতাড়ি পাকে। প্রচুর ফলনের বোরো আর আউস পেয়ে কৃষকরা আমন ধানের চাষ করতে আর তেমন উৎসাহ বোধ করছেন না। আমনের ফসল পেতে দেরী হয় বলে তাঁরা ঐ সময়টায় শাক সব্জি লাগান। নিবিড় চাষ পদ্ধতি প্রয়োগ করলে, বর্তমানে দুই বিঘা থেকে পাঁচ জনের একটি পরিবারের ভরণপোষণ হয়ে যায়। অন্য কথায় বলতে গেলে এখন সামান্য জমি থেকেও যথেষ্ট আয় হচ্ছে।

প্রচুর ফলনের বোরো ধানের বীজকে ঐখানে ধূলিমুঠি বলা হয়। এই 'ধূলিমুঠি' অত্যন্ত দ্রুতগতিতে 'সোণামুঠি' হয়ে যাচ্ছে। কাজেই বনহুগলীর কৃষকরা যে জ্যৈষ্ঠ মাসে পৌষপার্বণ করবেন এতে আর আশ্চর্যের কি আছে।

বৃটেনে ভারতীয় ছাত্র

১৯৬৭-৬৮ সালে বৃটেনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্র সংখ্যা ছিল ১,৪২৯।

কমনওয়েলথ দেশগুলির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভারতীয়রা সংখ্যায় সর্বাধিক। তা ছাড়া পৃথিবীর সব দেশের হিসেবে দেখতে গেলে সংখ্যার দিক থেকে এঁরা দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী।

মোট ছাত্রের মধ্যে ১,০১৭ জন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট হিসেবে এবং ৪১২ জন আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট হিসেবে পড়াশুনা করছেন।

যুক্তরাজ্যে, বিভিন্ন দেশের প্রায় ১৬,০০০ ছাত্রছাত্রী নিয়মিত ছাত্র হিসেবে ক্লাস করছেন। এর মধ্যে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৫৫ জন, ম্যানচেস্টারে ৯৬ জন, লীডস্-এ ৮২ জন ও কেমব্রীজে ৬৮ জন পড়ছেন।

জানা গেছে যে, ৪০৮ জন ছাত্রছাত্রী টেকনিক্যাল কলেজগুলিতে উচ্চতর শিক্ষা নিচ্ছেন এবং ৪৫৪ জন এ সব বিষয়ে সাধারণ শিক্ষালাভ করছেন।

ইন্‌স্ অফ কোর্টে ১৫০ জন, কলেজেস অফ এডুকেশনে ১০ জন ও নার্সিং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে ২৭১ জন ভারতীয় ছাত্রছাত্রী শিক্ষা গ্রহণ করছেন। এ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বাইরে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩,৩৭৩ জন ভারতীয় ছাত্রছাত্রী আছেন। শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন শিক্ষাক্রমে হাতে কলমে তালিম নিচ্ছেন ২২৫ জন, বৃত্তিমূলক বিষয়ে শিক্ষা নিচ্ছেন ২১১ জন এবং অন্যান্য বিষয়ে পড়শোনা করছেন ৫২ জন। প্রাইভেট কলেজ সমেত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে অন্ততঃ পক্ষে ১৫০ জন ভারতীয় ছাত্রছাত্রী রয়েছেন।

পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য সম্পদ সংহতিকরণ

রাজ্যগুলি কি করতে পারে

এম. সুন্দর রাজন্

চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়ায়, প্রায় ২৭০০ কোটি টাকার মত অতিরিক্ত সম্পদ পাওয়া যাবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে রাজ্যগুলি ১১০০ কোটি টাকার সম্পদ সংগ্রহ করতে পারবে বলে আশা প্রকাশ করেছে। অতিরিক্ত করের অংশ হিসেবে রাজ্যগুলির যে ২০০ কোটি টাকা পাওনা হবে তা ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারকে ১৬০০ কোটি টাকার সম্পদ সংগ্রহ করতে হবে। বর্তমানের কর হার অনুযায়ী, রাজস্ব খাতে কেন্দ্রের আয় থেকে ২৩৫৫ কোটি টাকা এবং রাজ্যগুলির আয় থেকে মাত্র ১০০ কোটি টাকা, পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য পাওয়া যাবে। খসড়ায় বলা হয়েছে যে রাজ্যগুলি হয়তো এই পরিমাণ টাকাও দিতে পারবে না।

কেবলমাত্র রাজস্বকেই সম্পদের মধ্যে ধরা ঠিক হবে না, সরকারী অত্যাবশ্যকীয় সেবা এবং সংস্থা, স্বল্প সঞ্চয় এবং অন্যান্য ফী ইত্যাদি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কয়েকটি ক্ষেত্র থেকে আরও বেশী অর্থাগম হতে পারে বলে পরিকল্পনা কমিশন আভাস দিয়েছেন। তবে এই পরামর্শগুলি কার্যকরী করার পথে যে সব সমস্যা রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হচ্ছে।

জলসেচ এবং বিদ্যুৎশক্তির উন্নয়নের জন্যই রাজ্যগুলির খাতে শতকরা ৫২ ভাগ বিনিয়োগ করা হবে। তার মধ্যে আবার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণ রাজস্ব থেকে এই বিনিয়োগ করা হবে। ভেঙ্কটরমণ কমিটি সুপারিশ করেছিলেন যে, বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের জন্য যে মূলধন বিনিয়োগ করা হবে পর্যায়ক্রমিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে তা থেকে যাতে বছরে শতকরা ১১ টাকা লভ্যাংশ পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু কতকগুলি রাজ্যে বেশীর ভাগ ব্যবহারকারীকে উৎপাদনী ব্যয়ের চাইতেও কম মূল্যে বিদ্যুৎশক্তি বিক্রী করা হয়। বিদ্যুৎশক্তির মূল্যের হার বাড়ানোটা কয়েকটা রাজ্যের পক্ষে বেশ অসুবিধেজনক কারণ তাদের প্রতিবেশী রাজ্যই হয়তো শিল্পগুলিকে অনেক কম মূল্যে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করতে ইচ্ছুক। বেশী পরিমাণে বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারকারীরা ছাড়া অন্যান্য শিল্পগুলির পক্ষে বিদ্যুৎশক্তি একটা বড় রকমের ব্যয় কিনা তা এখনও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। তবে একটা নিরপেক্ষ অখিল ভারতীয় সংস্থা যদি বিদ্যুৎশক্তি চালিত শিল্পগুলির জন্য একটা যুক্তিসঙ্গত বৈদ্যুতিক কর হার স্থির ক'রে দেন তাহলে ভালো হয়। তবে পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করাটাই হ'ল বড় সমস্যা।

জলসেচ

বিদ্যুৎশক্তির পরই আসে জলসেচের ব্যয়ের প্রশ্নটি। ব্যবসামূলক জলসেচ ব্যবস্থাগুলির খাতে রাজ্যগুলির এখন প্রতি বছরে ৮১ কোটি টাকা ঘাটতি দিতে হচ্ছে। নিজলিঙ্গাপ্পা কমিটি সুপারিশ করেছিলেন যে, সেচের জল পাওয়ার ফলে কৃষকদের শস্য বাবদ অতিরিক্ত যে লাভ হবে তার শতকরা ২৫ থেকে ৪০ ভাগ জলসেচের কর হিসেবে আদায় করা উচিত।

এখানেও কিছুটা অসুবিধে আছে এবং সেটা বোধ হয় মনস্তাত্ত্বিক। প্রতিবেশী রাজ্য যদি উন্নয়ন কর চালু না করে তাহলে কোন রাজ্যই এই কর আরোপ করতে চায় না যদিও উন্নয়ন কর আরোপ করা হ'লে কৃষকের পক্ষে তার জমি অন্য রাজ্যে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে এ কথাটা মনে রাখতে হবে যে কতকগুলি অঞ্চলে জলসেচের সুবিধে এখন পর্যন্ত সব কৃষকের পক্ষে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই জলসেচ প্রকল্পগুলির ব্যয় নির্বাহ ব্যবস্থায় একটা পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। জলসেচ প্রকল্পের ব্যয় বিভিন্ন দিকে বন্টন করা যেতে পারে; যেমন, বন্যা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে যে সাধারণ উপকার পাওয়া যায় তার জন্য ব্যয়ের কিছুটা অংশ সমগ্রভাবে সমষ্টিকে বহন করতে হবে আর যাঁরা সেচের জল পাওয়ার ফলে সোজাসুজি উপকৃত হচ্ছেন তাঁদের কাছ থেকে কর হিসেবে ব্যয়ের কিছুটা অংশ সংগ্রহ করা যেতে পারে। জলসেচ প্রকল্প কোথায় স্থাপন করা হবে সে সম্পর্কে রাজনৈতিক প্রভাব কাজে না লাগিয়ে, যাঁরা আংশিক ব্যয় বহন করতে রাজি আছেন এবং সেচের জল থেকে প্রাপ্য অতিরিক্ত আয়ের কিছুটা অংশ কর হিসেবে দিতে রাজি আছেন, সেচ প্রকল্প স্থাপনের স্থান নির্বাচনে তাঁদেরই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। তবে যে সব অঞ্চলের জনগণ সত্যিই গরীব তাঁদের জন্য কতকগুলি রক্ষাকবচ থাকা উচিত।

ন'টি রাজ্যে কৃষি আয়কর আদায় করা হয়। কিন্তু মোট আদায়ের পরিমাণ হ'ল মাত্র ১১ কোটি টাকা এবং আয়ের শতকরা ৮৫ ভাগ আসে চা বাগান ইত্যাদি থেকে। এই আয় একদিকে যেমন সামান্য অন্যদিকে অনেক রাজ্যেই এই আয় কমে যাচ্ছে। তা ছাড়া এই আয় আদায় করার ক্ষেত্রেও অনেক সমস্যা রয়েছে।

বর্তমানে যখন আমাদের দেশে কৃষিকাজ একটা লাভজনক বৃত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন ব্যয় সম্পর্কিত করের ওপর বেশী গুরুত্ব না দিয়ে আয় ও সম্পদের ওপরেই বেশী দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কারণ বিক্রয় কর কোন সময়েই আলাদীনের প্রদীপ হয়ে উঠবে না যা' থেকে সব কিছু পাওয়া যেতে পারে। চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়ায় অবশ্য বলা হয়েছে যে, সমস্ত রাজ্যগুলিতে বিক্রয় করের বিভিন্ন হারের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকা উচিত। কতকগুলি রাজ্যে ব্যবসা বাণিজ্য বাড়াবার উদ্দেশ্যে বিক্রয় করের

হার কম রাখা হয়েছে। এর ফলে যে রাজ্যগুলি অপেক্ষাকৃত গরীব, সেগুলি বিক্রয় করের হার বাড়াতে পারে না। কাজেই এ ক্ষেত্রেও একটা পূর্ব নির্দিষ্ট জাতীয় নীতি থাকা উচিত।

১৯৫৭-৫৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার যখন অতিরিক্ত আবগারি কর ধার্য করলেন তখন থেকেই রাজ্যগুলি বস্ত্র, তামাক এবং চিনির ওপর বিক্রয় কর আদায় করা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে। বিক্রয় কর এবং আবগারি কর মিলিয়ে দেওয়ায় ব্যবসায়ীগণ সুখী হলেও রাজ্যগুলি সন্তুষ্ট হয়নি। পঞ্চম আর্থিক কমিশন এই ব্যাপারটাও বিবেচনা করে দেখছেন।

বিক্রয় কর সম্পর্কে এই সব অসুবিধে থাকায়, আরও কিছু আয় বাড়াবার উদ্দেশ্যে রাজ্যগুলির মনযোগ স্বাভাবিকভাবেই সহর ও গ্রামাঞ্চলের সম্পদ এবং ভূমির ওপর গিয়ে পড়ে। বর্তমানকালে যখন আয় ক্রমশ বাড়ছে এবং ব্যবসায়ীর সংখ্যা বাড়ছে তখন সংবিধানের ২৭৬ নং ধারাটি রাজ্যগুলির কাছে একটা 'বর'-এর সামিল হয়ে উঠতে পারে। এই ধারা অনুযায়ী রাজ্যগুলি, ব্যবসা বা চাকুরি ইত্যাদিতে নিযুক্ত প্রতিটি ব্যক্তির ওপর ২৫০ টাকা পর্যন্ত কর ধার্য করতে পারেন। প্রমোদ করও অনেকখানি বাড়াতে পারা যায়। আয় বাড়াবার উদ্দেশ্যে রাজ্যগুলি অন্যান্য উপায়ের কথাও ভেবে দেখতে পারেন।

(১৮ পৃষ্ঠার পর)

অনুকূল সম্ভাবনার ইঙ্গিতই দেয়।

বছরে আমরা প্রায় ৬ কোটি টাকার পশম বিদেশে রপ্তানি করি। এর মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ যদি কার্পেট তৈরির যন্ত্রপাতি আমদানী করার জন্যে পৃথক করে রাখি, তাহলে কলে তৈরি কার্পেট রপ্তানী করে বছরে ১৫ কোটি টাকার মত বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। তা ছাড়া আমাদের চিরাচরিত রপ্তানী পণ্যের তালিকায় কলে তৈরি কার্পেট এখনও স্থান পায়নি। কিন্তু একবার ভালোমত কাজ সুরু হয়ে গেলে রপ্তানি পণ্য হিসেবে এই নতুন শিল্পের গুরুত্ব ক্রমশঃই বাড়বে। আমাদের দেশে এই শিল্পের বিকাশে কোনোও রকম বাধা বিঘ্নের অবকাশ নেই। এই শিল্পের যথাযথ বিকাশের জন্যে প্রয়োজনীয় কারিগরী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এদেশে যথেষ্ট আছে। কুশলী কারিগরেরও কোনোও অভাব নেই।

দেশে বিদেশে এখনও অনেক লোক হাতে তৈরি কার্পেট পছন্দ করেন। তার প্রধান কারণ হ'ল নক্সা, বুনন ও রঙের সংমিশ্রণে প্রত্যেকটি কার্পেটের বৈশিষ্ট্য নিজস্ব। হাতে তৈরি কার্পেট সাধারণ ও একঘেয়ে বলে কলে তৈরি কার্পেটেরভিড়ে হারিয়ে যাবে না। কার্পেট শুধু সমৃদ্ধির চিহ্ন বহন করে না, তা আভিজাত্যেরও প্রতীক। কিন্তু এ ধরণের বিলাসকে প্রশ্রয় দেবার সঙ্গতি অল্প লোকেরই আছে। কলে বোনা কার্পেট তাঁদের জন্যে নয়। তাছাড়া হাতে তৈরি বলেই এ ধরণের কার্পেটের উৎপাদন সীমিত এবং এগুলি সাধারণের নাগালে পৌঁছয় না। অতএব কলে বোনা কার্পেটকে কেন্দ্র করে কোনোও শিল্প গড়ে উঠলে এই শিল্পে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হবে না। কারণ হাতে বোনা কার্পেটের চাহিদা কোনো দিনই কমবে না।

রবারের উৎপাদন বৃদ্ধিতে রাসায়নিক উপাদান

মালয়েশিয়ায় গবেষণারত বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, যে, একটা বিশেষ রাসায়নিক বস্তু প্রয়োগে রবারের উৎপাদন শতকরা ৩০০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। রাসায়নিক উপাদানটির নাম হ'ল 'ইথরেল্'।

বাজারে যেসব কৃত্রিম 'হরমোন্' পাওয়া যায়, ইথরেল তার অন্যতম। 'ইথরেল' গাছের কোষগুলিতে এথিলিন গ্যাস ছেড়ে দেয়। দেখা গেছে যে, অন্যান্য কৃত্রিম হরমোনের মত ইথরেল-এর ব্যবহারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না।

তবে মালয়েশিয়ার রবার রিসার্চ্ ইন্সটিটিউটে এই জিনিষ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি। যদিও রবার চাষ সম্বন্ধে সাধারণ গবেষণা শুরু হয় ১০ বছর আগে, এই বিশেষ কার্যসূচীটি মাত্র এক বছর আগে হাতে নেওয়া হয়েছে।

ভারতে ট্র্যাক্টারের চাহিদা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে

ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, আফগানিস্তান ও নেপালে এখন মোট ১২৫,০০০ ট্র্যাক্টার ব্যবহৃত হচ্ছে। ৭ বছর আগে এর তিন ভাগের এক ভাগও ব্যবহৃত হতো না। চাষের কাজ অনেক সময়ে বেশ রাত পর্যন্ত চলে।

সার, প্রচুর ফলনের বীজ ও কীট নাশক প্রভৃতি উপাদানের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় ট্র্যাক্টারের চাহিদা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি বিভাগের অর্থনৈতিক গবেষণার সাম্প্রতিক একটি বিবরণীতে এই খবর দেওয়া হয়েছে।

ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ভারতে গত দু বছরে ট্র্যাক্টারের উৎপাদন দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। ১৯৬৯ সালে ১৪,০০০/১৫,০০০ ট্র্যাক্টার তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসবে।

দিল্লীর সহরতলীর একটি শিল্পাঞ্চলে ট্র্যাক্টারের সবচেয়ে বড় যে কারখানাটি আছে সেটি কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন। উপস্থিত এই কারখানায় বছরে ৭০০০ ট্র্যাক্টার তৈরি হ'তে পারে। এ ছাড়া আরও যে সব কারখানা আছে, সেগুলির মধ্যে সর্বশেষে নির্মিত কারখানাটি চালাচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল হারভেস্টার নামক একটি মার্কিণ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। এই কারখানার উৎপাদন ১৯৭০ সাল নাগাদ ৭,০০০ এ দাঁড়াবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তুলো, চিনেবাদাম ও ধান চাষীরা ছোট ট্র্যাক্টার পছন্দ করেন।

ভারত ১৯৬৭ সালে ৭,৩০০ ট্র্যাক্টার (১৯৬২ সালের তিনগুণ) আমদানী করে। ট্র্যাক্টার আমদানী-রপ্তানী সম্পর্কে সম্প্রতি যে বিবরণী প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬৮ সালে ভারতকে ৪০ লক্ষ ডলার মূল্যের ট্র্যাক্টার রপ্তানী করে। বড় বড় সেচ ও সড়ক সংক্রান্ত কাজের জন্যে তখন বড় বড় ট্র্যাক্টারের প্রয়োজন হয়।

তৈল শিল্পে ভারত

প্রেমচাঁদ (সংবাদিক)

গুজরাটের তিন বছর আগেকার অতি নগণ্য গ্রাম কোয়ালীর আজ এতটা পরিবর্তন হয়েছে যে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। গুজরাট তৈল শোধনাগারের জন্য কোয়ালীর খাতিরও বেড়েছে। শোধনাগারটিকে কেন্দ্র ক'রে এখানে যে উপনগরীটি গড়ে উঠেছে জওহরলাল নেহরু তার উদ্বোধন করেছিলেন ১৯৬৩ সালে। তাঁর স্মৃতি স্বরূপ উপনগরীর নাম রাখা হয়েছে জওহরনগর। বিজলী বাতির আলোয় সেই গণ্ডগ্রামের কোনোও ছায়া নেই। কিন্তু এটা হ'ল পরের কথা। আগে হ'ল শোধনাগার। এটি কবে স্থাপন করা হ'ল, কেমন ক'রে বড় হ'ল ও এর ভবিষ্যৎ কী এই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

তৈল শিল্পের ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভর হবার প্রয়াসে এই শোধনাগারের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। এটির উদ্বোধন করা হয়েছিল ১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাসে। তারপরে ১৯৬৬ সালে এর দ্বিতীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণের কাজ হাতে নেওয়া হয়। এখন তৃতীয় পর্যায়ে, সম্প্রসারণের কাজ চলেছে।

তেল শোধন একটা জটিল প্রক্রিয়া যা বিশেষ ধরণের বৈজ্ঞানিক দক্ষতার ওপর নির্ভর করে। শোধনাগারটি তৈরি করতে আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনীয়ার শোধনাগার স্থাপন ও পরিচালনার ব্যাপারে যে রকম দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসার দাবী রাখে। বছরে ২০ লক্ষ টন তেল শোধনের ক্ষমতা বিশিষ্ট এই শোধনাগারের শতকরা ৪০ ভাগ নক্সা তৈরি করেছেন আমাদের ইঞ্জিনীয়াররা। শতকরা ৬০ ভাগ যন্ত্রপাতিও এ দেশেই তৈরি হয়েছে। এখন সম্প্রসারণের যে কাজ চলেছে তা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে এখানে বছরে ৩০ লক্ষ টন তেল শোধন করা যাবে এবং বছরে ১৬ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ঘটবে। এই তৃতীয় পর্যায়ের কার্যসূচীর জন্যে নক্সা তৈরি করেছেন বরোদার 'কেন্দ্রীয় ডিজাইন সংগঠনের' ভারতীয় ইঞ্জিনীয়াররা এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির শতকরা ৭৫ ভাগ দেশের বিভিন্ন কারখানায় তৈরি হচ্ছে।

আঙ্কলেশ্বর থেকে অশোধিত তেল ৯৮ কিলো মিটার লম্বা ও ৩৫০ মিলি মিটার চওড়া পাইপ দিয়ে কারখানাতে আনা হয় এবং ৫০ লক্ষ লিটার ক্ষমতা বিশিষ্ট ১৬টা ট্যাঙ্কে প্রথমে এই তেল মজুদ করা হয় এবং পরে পাম্পের সাহায্যে নিয়ে যাওয়া হয় পরিশোধনের জন্য। আঙ্কলেশ্বরের খনিজ তেল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খনিজ তেলগুলির অন্যতম বলা যেতে পারে কারণ এই তেলে গন্ধকের মাত্রা খুবই কম অন্যদিকে কেরোসিন, ডিজেল জাতীয় পদার্থ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। এই তেলে তলানি (সেডিমেন্ট) খুব কম পরিমাণে থাকে। এই কারখানায় খনিজ তেল থেকে যে কেরোসিন তেল বা ডিজেল নিষ্কাশিত করা হয় তা এতই উৎকৃষ্ট ধরণের যে দ্বিতীয়বার শোধনের আর প্রয়োজন হয় না। এ ছাড়া তেল শোধনের পর যে অবশিষ্ট পড়ে থাকে সেটাও ধুবরান এবং সবরমতীর বিদ্যুৎ কারখানায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

'ন্যাপথা' (এক প্রকারের অপরিশ্রুত পেট্রল) থেকে বিশেষ রকম প্রক্রিয়ায় পেট্রোলিয়াম, ইথার, গ্যাসোলীন, বেনজীন, টোলীন, জাইলীন ইত্যাদি তৈরি হয়। এই সব পদার্থ বড় বড় শিল্পে বিশেষ রসায়ন হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং রবার, কৃত্রিম সুতো, ঔষধ, রঙ ও বিস্ফোরক পদার্থের কারখানাতেও প্রয়োজন হয়। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় এই যে, এই সব পদার্থ দেশেই তৈরি করার উদ্দেশ্যে ২ কোটি টাকা ব্যয়ে 'উডেক্স' নামক একটা যন্ত্র তৈরি করা হচ্ছে।

এ ছাড়া এই কারখানার যন্ত্রপাতি মেরামতের কাজও এখানকার যন্ত্রশালায় হচ্ছে যা সম্পূর্ণ ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারদেরই হাতে তৈরি। বিভিন্ন যন্ত্রপাতির উৎপাদনশক্তির মান বাড়াবার ব্যাপারে পরীক্ষা চালানোর জন্য এখানে একটি বিশেষ শাখাও খোলা হয়েছে। এই কারখানার প্রায় সমস্ত যন্ত্রপাতিই স্বয়ংচালিত এবং কার্যকুশলতা বা উৎপাদনের দিক থেকে এই কারখানাকে আধুনিকতম বলা যেতে পারে। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ১৫০০ ইঞ্জিনীয়ার ও কারিগর এখানে এসে কাজ করছেন।

এই শোধনাগারের নিজস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এখানকার জ্বালানি তেলই ব্যবহৃত হয় যা থেকে ২৪ মেগাটন পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে পারে। এই কারখানায় এবং কর্মীগণের বাসস্থানে বর্তমানে জল সরবরাহ করা হচ্ছে এক নতুন পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী, কারখানার পাশ দিয়ে যে নদী বয়ে গিয়েছে সেই মাহী নদীর তীরে

	উৎপাদনের পরিমাণ (বর্তমান ক্ষমতা অনুযায়ী)	উৎপাদনের পরিমাণ (৩০ লক্ষ টনের ক্ষমতা অর্জনের পর)
মোটর স্পিরিট	৩.৮৮,০০০	৬,০২,০০০
মিশ্রিত তেল	২৫,০০০	২৫,০০০
কেরোসিন তেল	৩,৮২,০০০	৫,৮৯,০০০
উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ডিজেল	৫,২৩,০০০	৭,৩৪,০০০
রান্নার জন্য ব্যবহৃত গ্যাস	২০,০০০	১০,০০০
জ্বালানি তেল	৩,১৪,০০০	৬,২৪,০০০
	১৬,৫২,০০০	২৫,৮৪,০০০

উৎপাদন সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করে নেবার জন্য উপরে একটা হিসেব দেওয়া হ'ল :

দুটি নলকূপ খনন করা হয়েছে। এই নলকূপের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, নদীর পাশের জমির নীচে যে জল আছে তাতে বিশেষ ধরণের নলের জাল বিছিয়ে জল উপরে টেনে তোলা হয়। সাধারণ ১৭টা কূয়ো থেকে যতটা জল পাওয়া সম্ভব এই দুটো কূয়ো থেকে ততটা পরিশ্রুত জল পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিদিন ২ কোটি গ্যালন জল এই কূয়ো দুটি থেকে পাওয়া সম্ভব। গুজ-রাটের শিল্পোন্নয়নে এই শোধনাগারের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। ধুবরান ও ও সবরমতীর বিদ্যুৎ কারখানায় জ্বালানি তেল সরবরাহ করা ছাড়াও আগামী বছর থেকে আমেদাবাদের বিদ্যুৎ কার-খানাতেও এখান থেকে জ্বালানি সরবরাহ করা হবে। এই জ্বালানি পাওয়াতে বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও বিদ্যুৎ কেন্দ্র-গুলিতে সারা বছর সমানভাবে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে পারবে। এখন কোয়েলীতে নাইলন, পলিষ্টার ইত্যাদি কৃত্রিম সুতো তৈরির জন্য তিনটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কারখানা স্থাপনের তোড় জোর চলছে যা থেকে বছরে ১৯,৫০০ টন সুতো তৈরি হতে পারবে। এই কারখানাগুলি স্থাপিত হলে এখানে শত শত লোকের অন্নের সংস্থান হবে।

আমাদের দেশে কেরোসিন তেল ও ডিজেল আগে বাইরে থেকেও আমদানী করতে হত। গুজরাটের এই কারখানা বর্তমানে আমাদের সেই চাহিদা বহুলাংশে মেটাচ্ছে কারণ এখানে উৎকৃষ্ট কোরোসিন তেল ও ডিজেল প্রচুর পরিমাণে তৈরি হচ্ছে। জেট প্লেন চালাবার উপযোগী ডিজেলও এই প্রথম এখানে তৈরি হচ্ছে। এখন এখানে প্রধানত মোটরের জন্যে পেট্রল, কেরোসিন, উচ্চ গতির জন্য ডিজেল ও জ্বালানির জন্য তেল উৎপন্ন হচ্ছে। এই শোধনাগার, দিল্লী ও রাজস্থানের প্রয়োজন এবং মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবের চাহিদা কিছু কিছু মেটাচ্ছে। এই কারখানায় দ্রবীভূত পেট্রল গ্যাসও তৈরি হচ্ছে।

গুজরাটের এই শোধনাগার শুধু যে, ডিজেল ও কেরোসিন তেল প্রভৃতির আমদানী কমিয়ে বিদেশী মুদ্রার সাশ্রয় ঘটাচ্ছে তাই নয় উপরন্তু এই শোধনাগার ভবিষ্যতে নিজের ক্ষমতাতেই আরও তেল শোধনাগার স্থাপন করতে সমর্থ হবে।

প্রচুর-ফলন বীজের প্রচারে অভিযান

রাজস্থানে কৃষি ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটাবার জন্যে সম্প্রতি এক কার্যসূচী প্রবর্তন করা হয়। তারই অঙ্গ হিসেবে একটা বিশেষ অভিযান সুরু করা হচ্ছে—অভি-যানের নাম হ'ল খারিফ আন্দোলন। একমাত্র চির-দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জয়সালমীর ছাড়া রাজ্যের সমস্ত অঞ্চলকে এই অভি-যানের আওতায় আনা হবে। যে ১৪ একর জমিতে প্রচুর ফলনের বীজ বোনা হবে তার অর্ধেক জমিতে বীজ বোনা হবে খারিফ মরসুমেই।

রাজ্যে ধানের চাষ হয় শুধু ৬টি জেলাতে। অতএব নতুন জাতের বীজ লাগানো হবে ভরতপুর, গঙ্গানগর, বুঁদি, কোটা, বানসোয়ারা ও ডুঙ্গারপুরে।

রাজ্যের ১৬টি জেলার ৫.৫০ লক্ষ একর জমিতে অবশ্য দো-আঁশলা বাজরা বোনা হবে। এই জমির মধ্যে ৯০,০০০ একর জমি আছে গঙ্গা নগরে ও ৮৫,০০০ একর আলোয়ারে।

এইভাবে ১৬টি জেলায় এক লক্ষ একর জমিতে দো আঁশলা ভুট্টার বীজ বোনা হবে।

১৪টি জেলার ৩০,০০০ একর জমিতে দো আঁশলা জোয়ার লাগানো হবে। এর মধ্যে টঙ্ক জেলায় জমির পরিমাণ সবচেয়ে বেশী—৪,০০০ একর।

স্থানীয় বাজরার বীজে, যেখানে ফসল পাওয়া যায় ৯৩ কেজি থেকে ১১২ কেজি সেখানে যথোপযুক্ত সার ও উদ্ভিদ রক্ষার জন্যে কীটনাশক ব্যবহার করে ফলনের পরিমাণ দাঁড়ায় একর প্রতি ৬.৪৬ থেকে ৯.৩৩ কুইন্টাল পর্যন্ত। সেচ যুক্ত এলাকায় দো-আঁশলা জাতের জোয়ারের ফলনের গড়পড়তা পরিমাণ হ'ল ১১.১৯ থেকে ১৪.৯২ কুইন্টাল (প্রতি একরে)। কয়েকজন প্রগতিশীল কৃষক আবার ২২.৩৯ থেকে ২৪.২৫ কুইন্টাল ফসল তুলেছেন। ঠিক তেমনি দো-আঁশলা ভুট্টার ফলন স্থানীয় জাতের ভুট্টার শতকরা দেড় থেকে ২ ভাগ বেশী।

এ যাবৎ উদয়পুর, দুর্গাপুর (জয়পুর) ও কোটার কৃষি শিক্ষণ কেন্দ্রে, প্রচুর ফলনের বীজের চাষ সম্বন্ধে ৫০০০ কৃষককে, প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। জেলা, ব্লক, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পর্যায়ে শিক্ষণ শিবির খোলা হয়েছে।

রাজ্যে আলোক চিত্র, ছায়াচিত্র ও বেতার প্রভৃতির মতো যে সব সুবিধা আছে এই আন্দোলন সফল করার জন্যে তার সবগুলিই কাজে লাগানো হচ্ছে।

নতুন

রাজস্থানের দুর্গাপুরাতে কৃষি গবেষণা খামারে নতুন প্রজাতির ফল সৃষ্টির জন্যে পরীক্ষা চালানো হয়। এবারে ঐ খামারে দুটি নতুন জাতের তরমুজ ও একটি নতুন জাতের খরমুজ ফলানো হয়েছে। দো-আঁশলা ঐ তিনটি বীজেরই ফলন প্রচুর।

গবেষণা কর্মীরা ভারতীয় কৃষি গবে-ষণা পরিষদের একটি কার্যসূচী অনুযায়ী পরীক্ষায় হাত দেন ও সাফল্য লাভ করেন। গত তিন বছর ধরে তাঁরা এই নতুন বীজ ব্যবহার করছেন। তাঁদের মতে নতুন ধরণের অন্যান্য কয়েকটা দো-আঁশলা জাতের তুলনায় এই তিনটি গুণাগুণে ঢের ভালো। ভালো জাতের সাধারণ তর-মুজের ফলন যেখানে একরে ৭৫ থেকে ১৩০ কুইন্টাল, সেখানে দো-আঁশলা জাতের ফলন প্রতি একরে ৩৭০ থেকে ৪৪৫ কুইন্টাল। দ্বিতীয়তঃ স্থানীয় বীজ থেকে ফলানো তরমুজ পাকতে ১১০-১২০ দিন নেয় আর দো-আঁশলা তরমুজ পাকতে সময় লাগে ৯০-১০০ দিন। ফলে যাঁরা এই নতুন জাতের ফলের চাষ করবেন তাঁরা অন্যের তুলনায় অনেক আগেই বাজারে মাল পাঠাতে ও অধিক আয় করতে (ফলনের পরিমাণ বেশী হওয়ায়) পারবেন।

এ বছরে আগ্রহী চাষীদের হাতে নতুন বীজের কয়েকটি প্যাকেট দেওয়া হয়। তাঁরা বীজের ফলন দেখে খুবই সন্তুষ্ট হয়েছেন।

উত্তর বাংলায় নদী শাসন

বিবেকানন্দ রায়
(আমাদের সংবাদদাতা)

গত বছরে, অক্টোবর মাসে উত্তর বাংলার ওপর দিয়ে ধ্বংসের যে ঢেউ বয়ে যায় সে কথা সহজে কারুর ভোলার কথা নয়। প্রবল বন্যার ফলে যে ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি ঘটে তার স্মৃতি বিভীষিকাময়। গত বছরের ঐ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি এড়াবার জন্যে, এ বছরে ইতিমধ্যেই, বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে।

উত্তর বাংলার নদীগুলির ওপর যে সব বাঁধ আছে এবং নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে যে সব পাথর ও কনক্রিটের টুকরো বসানো হয়েছিল সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতি প্রভৃতির জন্যে বন্যা সংক্রান্ত 'টেকনিক্যাল কমিটি' এবং কেন্দ্রীয় সরকারের একটি অনুশীলনী কমিটি যৌথভাবে কাজ করছেন। কিন্তু এই ধরণের কাজ হচ্ছে স্বল্প মেয়াদী। নদীর সম্পূর্ণ গতিপথ চিহ্নিত ও নিয়ন্ত্রিত করার মত দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পগুলির কাজ এখন ও সুরু হয়নি, তা ছাড়া এ সব কাজ সুরু করলেও এ শেষ হতে বেশ সময় লাগবে। ইতিমধ্যে বাঁধ মেরামত ও নদীর পার রক্ষা করার জন্য পাথর বসানোর কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কয়েকটি নতুন বাঁধ তৈরি করারও পরিকল্পনা আছে। সেগুলি বর্ষা সুরু হওয়ার আগেই শেষ করে ফেলা হবে। টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার এই সমস্ত প্রকল্প রূপায়ণের ব্যয় বহন করবেন।

বর্তমানে তিস্তার জলধারাকে শাসন করে তিস্তাকে তার নিজস্ব পথে প্রবাহিত করার জন্যে ৬টি ব্যবস্থা গ্রহণ করার সঙ্কল্প করা হয়েছে। তার মধ্যে আছে নদীর জল নিয়ন্ত্রণকারী বাঁধের ভাঙন ও ফাটল মেরামত, খাল কেটে নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা, পার রক্ষাকারী বাঁধ মেরামত ও তৈরি এবং আপালচাঁদ নদীর জলরোধ প্রভৃতি। এ সবের জন্যে আনুমানিক ব্যয়ের হিসেব হ'ল ৪১ লক্ষ টাকার ওপর।

সিধাবাড়ী চেঙমারী বাঁধ

তিস্তার জল যাতে কূল ছাপিয়ে আশপাশের এলাকা প্লাবিত না করে তার জন্যে ১৯৬২ সালে এই বাঁধ তৈরি করা হয়েছিল। গত অক্টোবরে তিস্তার গতিপথ সিধাবাড়ীর কাছ বরাবর এসে বদলে যায় এবং নদীর জল কাঠামবাড়ী এলাকার শীর্ণকায়া আলাপচাঁদ নদীর সঙ্গে মিশে যায়। ফলে দুকূল ছাপানো জলের তোড়ে আশপাশের সুসমৃদ্ধ গ্রামগুলির সঙ্গে কৃষি জমিরও খুব ক্ষতি হয়। এরপর তিস্তার জল খুলনাই ও ধারালী নদীর মধ্যে দিয়ে বয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত বাম্নসুবার কাছে তিস্তা আবার নিজের পথ ধরে।

জলপাইগুড়ি শহর

জলপাইগুড়ি শহর রক্ষার জন্যে ১৯৫৫ সালে এই বাঁধ তৈরি করা হয়েছিল। বাঁধের দৈর্ঘ্য হবে ১৯ কিলো মিটারের মত। গত বছরে বন্যার জল বাঁধের ৯টি জায়গা ভেঙে ছাপিয়ে পড়ে। কারালা নদীর ওপর তৈরি সড়ক সেতুর কাছে যেখানে এই বাঁধ গিয়ে ঠেকেছে সেইখানে আরও দুটি জায়গায় ভাঙ্গন ধরে। প্রবল প্লাবনে জলের তোড়ে ভেসে আসা গাছ পাথরের ধাক্কায় বাঁধের আরও ক্ষতি হয়। সঙ্গে সঙ্গে রেলপথের সেতুর নীচে ও অন্যত্র তৈরি স্রোত প্রতিরোধকারী ব্যবস্থাগুলি খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শহরটি রক্ষা করার জন্যে নতুন করে এই বাঁধ প্রভৃতি তৈরি করতে ৪৪ লক্ষ টাকার মত খরচ হবে বলে ধারণা।

কোচবিহার শহরটি রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বাঁধ তৈরি ও মেরামতি প্রভৃতির জন্যে ৩৫ লক্ষ টাকার মত খরচ হবে। বাঁধটি প্রস্থে হবে ৭.৫ মিটারের মত যেখানে জায়গা বেশী নেই সেখানে ৪.৫ মিটারের মত। মরাতোরসা নদীর পার ভেঙে পড়ছে। এটা বন্ধ করার জন্যে ছোট ছোট প্রাচীরের মত তৈরি করা হবে। পারের যেটুকু অংশ অরক্ষিত অবস্থায় আছে তা রক্ষার জন্যে ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শিলতোরসা নদী

দেওডাঙার কাছে শিলতোরসা যাতে গতি না বদলায় তার ব্যবস্থা করার জন্যে গোড়ায় ১৮.৩৫ লক্ষ টাকার সংস্থান করে একটি প্রকল্প তৈরি করা হয়েছিল। বিষয়টি বিবেচনার জন্যে কার্যসূচীটি যখন টেকনিক্যাল কমিটির কাছে দেওয়া হ'ল তখন কমিটি সংশোধনের জন্যে কতকগুলি প্রস্তাব দেন। তাঁদের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যয়ের হিসেব দাঁড়ায় ২০ লক্ষ টাকা।

টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুরোনো বাঁধের জায়গায় আবার নতুন করে বাঁধ তৈরি করা হচ্ছে। এই কার্যসূচীতে নদীর উপকূল থেকে ১৫০ মিটারেরও বেশী দূরে, নদীর কূল ছাপানো জল শাসন করার জন্যে আর একটি বাঁধ তৈরি করা হচ্ছে।

বারনেস দোমোহানী বাঁধ

জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা দুটিতে, তিস্তা নদীর বাঁ দিকের তীরের কিছু জমি রক্ষা করার জন্যে এই বাঁধ প্রথম তৈরি করা হয়।

বাঁধটি দৈর্ঘ্যে ১১ কিলো মিটার এবং দোমোহানী রেলওয়ে স্টেশনের আন্দাজ তিন কিলোমিটার উত্তরে মাল-চেংগ্রাবাঁধা মীটার গেজ রেলপথ পর্যন্ত গিয়েছে।

গত বছরে ব্রড গেজ রেলপথের গোড়ার দিকে পুরো বারনেস দোমোহানী বাঁধ প্লাবিত হয়। বন্যার জল রেলপথের ওপর যাতে এসে না পড়ে তার জন্যে যে বাঁধ তৈরি করা হয়েছিল সেটি জলের তোড়ে ভেসে যায়। ঐ অঞ্চলটা পুরোই বন্যার দরুন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বারনেস-দোমোহনী বাঁধ নতুন করে তৈরি করা হবে বলে স্থির হয়েছে।

হেলাপাকরি বাঁধ

তিস্তার বাঁ তীর বরাবর, ১৮ কিলো মিটার লম্বা, হেলাপাকরি বাঁধ তৈরি করা হয় ১৯৫৯ সালে। উদ্দেশ্য ছিল প্রধান প্রধান সড়ক, রেলপথ যোগাযোগ ব্যবস্থা, চাষের জমি এবং হেলাপাকরি ও মেখলীগঞ্জকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা। গত বছরের বন্যায় বাঁধে ভাঙন ধরে এবং বন্যারোধের জন্যে তৈরি অন্যান্য ব্যবস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গ্রামাঞ্চল ও নদী কূলবর্তী এলাকাগুলিও খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পরিকল্পনা সমীক্ষা

পরিকল্পনার কার্যকারিতা ও তার অগ্রগতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে সারা দেশের কলেজগুলিতে 'প্ল্যানিং ফোরাম' খোলা হয়েছে। কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এই 'ফোরামের' সভ্য হিসেবে পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁরা মাঝে মাঝে দল বেঁধে বেরিয়ে পড়েন বিভিন্ন গ্রামের বর্তমান অবস্থা কী এবং সেইসব গ্রামে পরিকল্পনার কোন প্রভাব পড়েছে কিনা কিংবা সে সব জায়গায় পরিকল্পনার সাড়া আদৌ পৌঁচেছে কি না তার সম্যক ধারণার জন্যে। এই স্তম্ভে বিভিন্ন অঞ্চল সম্বন্ধে এইসব 'ফোরামের' সমীক্ষার বিবরণ দেওয়া হয়।

পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা—শিক্ষিত সমাজ কী ভাবেন ?

শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে পরিবার পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলির সংযোগ কতটা কিংবা এগুলির ওপর উচ্চশিক্ষা ও আর্থিক অবস্থার প্রতিক্রিয়া কিরকম তা নিরূপণ করার জন্যে আহমেদাবাদের সিটি কমার্স কলেজের 'প্ল্যানিং ফোরাম', কলেজের শিক্ষকদের মনোভাব যাচাই করার উদ্দেশ্যে একটা সমীক্ষা নেন।

অর্থনৈতিক দিক থেকে এই গোষ্ঠীকে মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল ব'লে গণ্য করা হয়। তাছাড়া শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করায় তরুণদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রভাবিত করার অবকাশ এঁদের প্রচুর। অতএব উচ্চশিক্ষিত এবং স্বতন্ত্র একটি গোষ্ঠী হিসেবে আহমেদাবাদ শহরের মোট ৬০০ জন শিক্ষকের মধ্যে ৬০ জনকে এই সমীক্ষার জন্যে বেছে নেওয়া হয়।

সমীক্ষার ফলে দেখা গেছে, যে, এঁদের মধ্যে শতকরা ৯১ জন পরিবার পরিকল্পনা সমর্থন করেন। অবশিষ্ট ৯ শতাংশের মধ্যে ৭ শতাংশ এই কার্য্যসূচীর বিরোধী এবং শতকরা ২ জন এ সম্বন্ধে কোনোও রকম মতামত প্রকাশ করতে অসম্মত হ'ন। এর থেকে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যে, উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যেও শতকরা ৯ জন এই পরিকল্পনার বিরোধী।

এই পরিকল্পনা সমর্থনের প্রধান যুক্তি হ'ল অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার আশ্বাস। শতকরা ৭৭ জন বলেন পরিবার সীমিত থাকলে আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় থাকে। এছাড়াও এঁদের মধ্যে শতকরা ২৬ জন, পরিবার পরিকল্পনাকে স্বাস্থ্যরক্ষার সহায়ক ব'লে গণ্য করেন এবং শতকরা ২০ জন এই পরিকল্পনা অনুমোদন করেন জাতীয় স্বার্থে। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ভবিষ্যতে, পরিবার নিয়ন্ত্রণ অভিযান পরিচালনার কার্য্যসূচী নির্দ্ধারণে বিবেচিত হ'তে পারে।

কার্য্যক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত নয়

কথায় ও কাজের মধ্যে সাধারণতঃ বেশ বড় রকমের ব্যবধান থাকে। এ ক্ষেত্রেও তা'র অন্যথা হয়নি। শতকরা ৯১ জন পরিবার পরিকল্পনার প্রশস্তি গাইলেও কার্য্যতঃ শতকরা ৬০ জন জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পন্থা কার্য্যকরভাবে গ্রহণ করেছেন। যাঁরা করেননি তাঁদের কৈফিয়ৎ হ'ল জন্ম নিরোধের উপায়গুলি অনুসরণ করা যায় না কারণ এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সুযোগ সুবিধাগুলির এখনও যথেষ্ট অভাব রয়েছে। যাঁরা পরিকল্পনাটির সক্রিয় সমর্থক তাঁদের মধ্যে, বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হ'ল 'কন্‌ট্রাসেপটিভ্' ও'রিং'। শতকরা ৩৩.৩ জন এই পদ্ধতি অনুসরণ করেন। শতকরা ২৪ জন 'সেফ্ পিরিয়ড বা নিরাপদ সময়টি' মেনে চলেন এবং শতকরা ২২ জন 'ট্যাবলেট' বা 'জেলী' ব্যবহারের পক্ষপাতী। একটা আশ্চর্য্যের কথা হ'ল এই যে, নিরাপদ, কার্য্যকর ও সুলভ ব'লে 'লুপের' ব্যাপক প্রচার সত্ত্বেও, সমীক্ষার জন্যে নির্ব্বাচিত দলটির কেউই লুপ ব্যবহার করেন না। 'লুপ' ব্যবহার করলে মেয়েদের স্বাস্থ্য ভেঙে যাবে, এইটিই হ'ল তাঁদের অধিকাংশের প্রধান আশঙ্কা।

জন্মনিরোধ পদ্ধতিগুলির ব্যর্থতা

আর একটা বিষয়ও সমীক্ষার ফলাফলে লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছে। সেটি হ'ল এই, যে জন্ম নিয়ন্ত্রণের সক্রিয় সমর্থকদের মধ্যে শতকরা ২৬ জন, জন্মনিরোধ পদ্ধতিগুলির ব্যর্থতার উল্লেখ করেছেন। এ সম্বন্ধে অজস্র নানান্ কথা বলতে পারেন। কিন্তু এঁরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করা বা ডাক্তারদের পরামর্শ নেওয়া আদৌ কঠিন নয়। এঁদের সংখ্যাও বেশ অনেক।

গর্ভপাত আইনসম্মত করা উচিত কি না ?

গর্ভপাত আইনসিদ্ধ করা সঙ্গত কি না জিজ্ঞাসা করা হ'লে শতকরা ৬০ জন বলেন তাঁরা এই কার্য্যসূচীকে আইনের স্বীকৃতি দিতে অসম্মত। অবশিষ্ট ৪০ শতাংশ এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। বিরোধীরা বলেন,—প্রথম এই কার্য্যসূচী স্বাস্থ্যের দিক থেকে হানিকর। দ্বিতীয়, মায়ের মনের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। তৃতীয়, গর্ভপাত আইনানুগ করার ফলে সামাজিক সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং চতুর্থ ও সবচেয়ে প্রধান প্রশ্ন হ'ল নৈতিক দিক থেকে এই প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য কি না ?

সর্ব্বশেষে এঁদের জিজ্ঞাসা করা হয়, যে, একটি আদর্শ পরিবারে বাঞ্ছিত সন্তান সংখ্যা কত হওয়া উচিত। তাঁরা একবাক্যে বললেন 'দো ইয়া তিন, বাস্।'

ট্র্যাক্টারের ব্যাপক ব্যবহার কবে সম্ভব হবে ?

ভারতে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি বিধান করতে হ'লে যান্ত্রিক সরঞ্জামের ব্যবহার আরও ব্যাপক করা দরকার। তবে সেচের পর্য্যাপ্ত সুবিধা না থাকলে এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণে সার ও উৎকৃষ্ট বীজ পাওয়া না গেলে কৃষি ব্যবস্থার যান্ত্রিকীকরণ ফলপ্রসূ হ'বে না। এই প্রসঙ্গে দেখা যাক্ দেশে ও বিদেশে ট্র্যাক্টারের ব্যবহার কিরকম। আমাদের দেশে, গড়পড়তা হিসেবমত, ১২,৫০০ একর জমির জন্যে একটিমাত্র ট্র্যাক্টর পাওয়া যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে জাপানে একটা ট্র্যাক্টারের জন্যে ৯.৬ শতাংশ জমি থাকে। পশ্চিম জার্ম্মাণীতে একটা ট্র্যাক্টারের জন্যে ৩৩.৩ একর জমি, যুক্তরাজ্যে ১০৬.৪ একর, ডেনমার্ক-এ ৫৭.১ একর, ফ্রান্সে ১০৪.২ একর ও যুক্তরাষ্ট্রে ২১৭.৪ একর জমি দেওয়া যায়। অন্যান্য কৃষিতে, যন্ত্র ব্যবহার করার পরিসংখ্যানও অনুরূপ।

কার্পেট রপ্তানীর বাজার

ভারতে ৪.১০.০০০০০ ভেড়া থেকে বছরে ৩.৪৬.৬০০০০ কিলোগ্রাম কাঁচা পশম উৎপাদিত হয়। অর্থাৎ বছরে একটা ভেড়া থেকে গড়ে এক কিলোরও কম পশম পাওয়া যায়। অন্যান্য দেশের তুলনায় এই পরিমাণ হ'ল সবচেয়ে কম। যেখানে ভারতের একনি ভেড়া বছরে এক কিলো পশমও দেয়না সেখানে অষ্ট্রেলিয়ার একটি মেরিনো থেকে বছরে গড়পড়তা ৫ কিলোর মত এবং নিউজিল্যাণ্ড-এর একটি মেরিনো থেকে ৬ কিলোর মত পশম পাওয়া যায়। অতএব প্রথম সমস্যা হ'ল এ দেশের ভেড়ার পশমের পরিমাণ কি উপায়ে বাড়ানো যায়। পশমের উৎপাদন ইপ্সিত পরিমাণে বাড়াতে হলে বেশী পশম উৎপাদনে সক্ষম এই রকম বিদেশী ভেড়ার প্রয়োজন। ভারতীয় ও বিদেশী দুটি জাতের সংমিশ্রণে যে প্রজাতির ভেড়া পাওয়া যাবে সেগুলি থেকে বেশী পরিমাণে পশম পাওয়া যেতে পারে। এখন এদিক দিয়েও চিন্তা করা হচ্ছে। যেমন হরিয়ানায়, হিসারের কাছে, একটি বিরাট মেষপালন কেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে সহযোগিতা করতে ভারত ও অষ্ট্রেলিয়া সম্মত হয়েছে। ভালো জাতের মেষ উৎপাদনের একটি প্রকল্প রূপায়ণে দুটি দেশ সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে। হরিয়ানার ঐ কেন্দ্রে অষ্ট্রেলিয়া, 'কোরিয়েডেল ভেড়া' সরবরাহ করবে। দেশীয় ভেড়ার সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার কোরিয়েডেল ভেড়ার সংমিশ্রনে যে নতুন জাতের ভেড়া জন্মাবে, তা' পশমের পরিমাণ ও মাংসের দিক থেকে দেশীয় ভেড়ার তুলনায় অনেক ভালো হবে ব'লে আশা করা যাচ্ছে।

মেষপালন সম্পর্কে এই কেন্দ্রে বিশেষ শিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। মেষপালকরা যাতে এই প্রকল্প থেকে সবচেয়ে বেশী উপকৃত হন তারই জন্যে কোরিয়েডেল ভেড়া বেছে নেওয়া হয়েছে। কারণ মাংসের গুণাগুণে ও পশমের প্রাচুর্যে কোরিয়েডেল প্রথম শ্রেণীর। হিসারের এই কেন্দ্রটির জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার ৭০০০ একর জমি দিচ্ছেন। জমি, বাড়ী, যন্ত্রপাতি, সাজ সরঞ্জাম ও কর্মীদের জন্যে ৭ বছরে যে খরচ হবে তাতে ভারতের অংশের পরিমাণ হবে ১০৪ লক্ষ টাকা। অষ্ট্রেলিয়া ৫০০০ স্ত্রীমেষ ও ১১০টি মেষ সহ যন্ত্রপাতি ও কারিগরী বিশেষজ্ঞদের জন্যে খরচ করবে ৮০ লক্ষ টাকা।

অষ্ট্রেলিয়ার কোরিয়েডেল মেষ

তবে এ তো দীর্ঘ মেয়াদী সমস্যার কথা। আশু সমস্যা হ'ল, আপাততঃ যে পশম পাওয়া যাচ্ছে কী ভাবে তার সদ্ব্যবহার করা যায়। আমাদের দেশে উৎপন্ন পশম মোটা ও শক্ত। এই পশম কার্পেট তৈরির উপযুক্ত। ভারতে তৈরি কার্পেটের শতকরা ৯০ ভাগ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। তা ছাড়া কাঁচা পশমও রপ্তানি করা হয়। তবে টাকার মূল্য হ্রাসের পর পশম রপ্তানীর পরিমাণ ৩২ শতাংশ (১৯৬৫-৬৬) থেকে কমে ২৬ শতাংশে (১৯৬৭-৬৮) দাঁড়ায়। এতে অবশ্য আশঙ্কিত হবার কোনোও কারণ নেই। কারণ কাঁচা পশম রপ্তানি না করে আমরা এখন তৈরি জিনিস অর্থাৎ হাতে তৈরি কার্পেট বিদেশে পাঠাচ্ছি। অতএব এটা খুশী হবারই কথা। কারণ ভারতীয় কারুশিল্পীদের শিল্প চাতুর্য প্রচার করা ছাড়াও এর ফলে বহু লোকের জন্যে কাজের সংস্থান হচ্ছে এবং বিদেশী বিনিময় মুদ্রাও অর্জিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে বিদেশী বিনিময় মুদ্রা অর্জন অত্যাবশ্যক এবং এরজন্যে সম্ভাব্য সমস্ত সূত্র ভালো করে দেখা দরকার এর একটি হ'ল মেশিনে কার্পেট তৈরির সম্ভাবনা। পাট প্রভৃতি উদ্ভিদ থেকে যে আঁশ পাওয়া যায় তার সঙ্গে কৃত্রিম আঁশ মিশিয়ে বা পশমের সঙ্গে কৃত্রিম আঁশ প্রভৃতি মিলিয়ে মেশিনে বোনা কার্পেটের চাহিদা দেশ বিদেশে ক্রমশঃই বাড়ছে। যেমন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মেশিনে বোনা কার্পেটের চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে। মেশিনে কার্পেট তৈরির প্রস্তাবটি প্রণিধানযোগ্য, কারণ, একমাত্র মেশিনের সাহায্যেই যে কোনোও জিনিস ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব। বিশেষ করে কাঁচা পশমের পরিমাণ পর্যাপ্ত না হলেও কৃত্রিম আঁশ বা সুতো মিশিয়ে তাই দিয়ে বহু কার্পেট বোনা অসম্ভব নয়। সহজে কাঁচা মাল পাওয়া গেলে এবং মেশিনে তৈরির ফলে উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম হলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের চাহিদা পূরণের জন্যে উপযুক্ত সংখ্যায় কার্পেট তৈরি সম্ভব। এমন দিনও একদিন আসতে পারে যখন অতি সাধারণ অবস্থার লোকও নিজেদের ঘরবাড়ী সুন্দর ছিমছাম করার জন্যে কলে তৈরি কার্পেট কিনে সুরুচির পরিচয় দিতে পারেন। কারণ কলে তৈরি কার্পেট হাতে তৈরি কার্পেটের চেয়ে সুলভ হবেই। তবে শুধু এইদিক দিয়ে চিন্তা করলেই চলবে না, এই জিনিসটির রপ্তানীর সম্ভাবনা কতটা তাও নিরূপণ করা দরকার। বাজারের গতি প্রকৃতি তো এ ব্যাপারে

(১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সাধারণ অসাধারণ

দেশের নানা প্রান্তে যে সব দেশদরদী নরনারী লোকচক্ষুর অন্তরালে দেশগড়ার কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন, এখানে সেইসব সাধারণ মানুষের অ-সাধারণ কাহিনী বলা হয়।

একটি আদর্শ বিদ্যালয়

মহারাষ্ট্রের বাপুগাঁও-এ কোনোও স্কুল ছিল না। জায়গাটি ছিল জঙ্গলাকীর্ণ এবং কেউ এই জায়গাটির দিকে নজর দেয়নি গোড়ায়। আশপাশের গ্রামগুলিতেও কোনো স্কুল ছিল না। গান্ধীজীর শিষ্য দাদা সেবক ভোজরাজ বহুকাল ধরে শিশু-কল্যাণব্রতে লিপ্ত ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন সরকারী অনুমোদনের জন্যে অপেক্ষা করতে গেলে এই জায়গাটির উন্নতি কোনোকালে হ'বে না। তিনি গ্রামের ছেলেমেয়েদের জন্যে একটি আবাসিক স্কুল তৈরীর কাজ হাতে নিলেন। এখন ঐ স্কুলে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী ৬০টি ছেলেমেয়ে পড়াশুনা করে।

স্কুলটি আশ্রমের মত চালানো হয়। এই স্কুলের সীমানার মধ্যে দুটি বড় হল ঘর আছে, শিক্ষকদের থাকার জন্যে বাড়ী, একটা টিউবওয়েল ও একটি পাম্পসেট আছে, আশ্রমের বালক বালিকাদের সমস্ত প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা আছে।

সাধারণ বিষয়ক্রম ছাড়াও বালক-বালিকাদের নানারকম হাতের কাজ শেখানো হয়। যেমন, সুতোকাটা, সেলাই, বোনা, এমব্রয়ডারী, বাগানের পরিচর্যা কাঠের কাজ ও ঘরের কাজ ইত্যাদি। শিশুদের চরিত্রগঠন ও আদর্শ নাগরিক গঠনের মত দায়িত্বশীল বিষয়ের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয়। আশ্রমের জন্যে ছেলে-মেয়েরা নিজের থেকে কাজ করে। শুধু আদিবাসীরাই নয়, আশপাশের গ্রামগুলি থেকেও ছাত্রছাত্রী আসে। দাদা সেবক ও তাঁর স্ত্রী কোনোও পারিশ্রমিক নেন না তিনি ও তাঁর স্ত্রী স্বেচ্ছায় কাজ ক'রে যাচ্ছেন।

হরিয়ানার শ্রেষ্ঠ চাষী

নাজার সিং ৫ বছর আগে যখন পুলিশের চাকরী করতেন তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে, সবচেয়ে বেশী ফসল ফলিয়ে তিনি প্রথম পুরস্কার পেতে পারবেন। ১৯৬৪ সালে জিন্দ জেলার এই প্রগতিশীল চাষীটি পুলিশের চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে বসলেন। উদ্দেশ্য ১৯৫৭ সালে কেনা ৩৮ একর জমিতে নিজেই চাষবাস করবেন। সেদিন কতটা আস্থা ছিল তাঁর তা হয়তো তিনি নিজেই বলতে পারবেন না। কিন্তু আজ তিনটি টিউবওয়েল, একটি ট্র্যাক্টর ও কৃষির বিভিন্ন যান্ত্রিক সরঞ্জাম তাঁর আস্থা ও সামর্থ্যের পরিচয় বহন করছে।

এ বছরে প্রতি একরে ৩৩.৫৬ কুইন্টাল গম ফলিয়ে তিনি রাজ্যের কৃষি প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন। হরিয়ানা সরকার এঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ নগদ ৩,০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।

নাজার সিংএর ছেলে প্রতি একরে ৩১.৩৬ কুইন্টাল গম ফলিয়ে জেলা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন। নাজার সিংকে জিজ্ঞেস করা হয় এই সাফল্যের কারণ কী? তিনি বলেন কঠোর শ্রম ও আধুনিক কৃষি পদ্ধতির জন্যেই তিনি এই সাফল্য লাভ করেছেন।

আদর্শ কৃষক

মহীশূরের কাসারাহাড়লী গ্রামে কে. রামকৃষ্ণ রাও হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী এক কৃষক। তিনি তাঁর খামারে একটি যন্ত্র বসিয়েছেন যাতে গোবর থেকে গ্যাস তৈরি হয়। তির্থাহাড়লীর ব্লক কর্তৃপক্ষ একটা গ্যাস প্ল্যান্ট-এর জন্যে সরকারী অর্থ সাহায্য হিসেবে ৫০০ টাকা নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন টাকাটা ঐ রামকৃষ্ণ রাও-এর পাওয়ার কথা এবং তিনি পেতেও পারতেন। কিন্তু ব্লক কর্তৃপক্ষ যখন যেচে এই অর্থসাহায্য নেবার কথা বলতে গেলেন তখন ভদ্রলোক চাষী তা নিতে অস্বীকৃত হলেন। তাঁর মতে যার অবস্থা স্বচ্ছল তার সরকারী সাহায্য চাওয়া বা নেওয়া উচিত নয়। আরও কতলোক আছেন, এই অর্থসাহায্য যাঁদের কাজে লাগবে। ব্লক কর্মীরা বললেন টাকাটা না দিতে পারলে ওটা তামাদি হয়ে যাবে। তার উত্তরে রামকৃষ্ণ রাও বলেন, অজায়গায় না দিয়ে টাকাটা তামাদি হতে দেওয়াও ভালো। এ সাহায্য যার সত্যিকার দরকার তাকেই দেওয়া উচিত।

★

নতুন দিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থায় একটি বিশেষ ধরণের ভুট্টা উৎপাদিত হয়েছে, যার সাহায্যে শিশু ও বালক বালিকাদের শরীরে প্রোটীনের অভাব দূর করা সম্ভব হতে পারে। এটা খাইয়ে পরীক্ষা করার সময়ে দেখা গেছে যে, নব উদ্ভাবিত হলদে দানার ভুট্টায় প্রোটীনের অংশ হ'ল ৩.৩৮ শতাংশ। ছানায় প্রোটীনের মাত্রা হ'ল শতকরা ২.০৮ ভাগ এবং দো আঁশলা জাতের ভুট্টা গঙ্গা-৩ এর দানায় ১.২ ভাগ।

★

ভারতের সার কর্পোরেশনের নাঙ্গাল ইউনিট তাদের ৬৮-৬৯ সালের 'হেভী ওয়াটার' ও সার উৎপাদনের লক্ষ্য ছাড়িয়ে গেছে। এশিয়ায় এটি হ'ল একমাত্র কারখানা, যেখানে 'হেভী ওয়াটার' তৈরী হয়। ১৯৬৮-৬৯ সালে এই কারখানায় ১৩,৫০০ কে. জির লক্ষ্য ছাড়িয়ে ১৪,০০০ কে. জি. 'হেভী ওয়াটার' উৎপন্ন হয়েছে। এই কারখানায় ক্যালসিয়াম্ এমোনিয়াম নালফেট তৈরির লক্ষ্যও অতিক্রান্ত হয়েছে।

★

সুতীবস্ত্র রপ্তানী উন্নয়ন পরিষদ ১৯৬৯ সাল থেকে বছরে ১৫.৫০ কোটি টাকার সুতা ও বস্ত্র রপ্তানীর বরাত পেয়েছে বর্মা সিংহল, সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র ও পূর্ব য়ুরোপের দেশগুলি থেকে।

(৭ পৃষ্ঠার পর)

মূলধনের অভাব উপেক্ষণীয় নয়

সত্যি বলতে কি, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সামর্থ্য ও ধারণ ক্ষমতা আজ অতিক্রান্ত, কেবলমাত্র শিক্ষা লাভেচ্ছু ক্রমবর্ধমান ছাত্র সংখ্যার দিক থেকেই নয়, শ্রমের বাজারে কর্ম সংস্থানের দিক থেকেও। তাই এ সম্পর্কে বর্তমান আলোচনা প্রয়োজন ভিত্তিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শিক্ষিতের সংখ্যা যে হারে বাড়তে থাকে, চাকরির সংখ্যা সে হারে বাড়ে না, বাড়তে পারে না। ভারতের শিক্ষিত বেকার সমস্যার মূল কারণের আর একটি হ'ল সম্ভবত বিনিয়োগ করার মত মূলধনের আত্যন্তিক অভাব। জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থে অধিক পরিমাণে মূলধন বিনিয়োগ করে কি ভাবে আরো বেশি কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারা যায় সেইটেই আসল সমস্যা, শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার তার জন্য খুব বেশি জরুরি বলে মনে হয় না। শিক্ষিতের কর্ম সংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনেকখানি। আমাদের অর্থনীতির উন্নয়ন মূলধন-নির্ভর হবে না শ্রম-নির্ভর হবে, মূলধনের প্রতিকল্প হিসেবে শিক্ষার ব্যবহার কতটা সম্ভব ও সঙ্গত তা খতিয়ে দেখতে হবে। জাতীয় উন্নয়ন মন্থর গতিতে চলতে থাকলে শিক্ষিত বেকার সমস্যার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। ভারতে মাথা পিছু বার্ষিক জাতীয় আয়ের হার শতকরা ১.৫। উন্নয়নকামী অন্যান্য অনেক দেশে মাথা পিছু বার্ষিক জাতীয় আয়ের হার শতকরা ২.২, দক্ষিণ কোরিয়া ও মেক্সিকোতে এই আয়ের পরিমাণ ৩%।

অর্থনীতির অন্যান্য দুর্বলতার দিকে নজর না দিয়ে, কেবলমাত্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে বৃত্তিমুখী করতে পারলেই শিক্ষিতের কর্মসংস্থানের পথ রাতারাতি প্রশস্ত হবে এমন আশা করা অন্যায়। শিক্ষা ব্যবস্থা সহজে সুবিধানুযায়ী পরিবর্তন সাধ্য নয়। শিক্ষায়তনগুলিকে ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অঙ্গীভূত করা, উন্নয়নের অতি আবশ্যক শর্ত বলে যাঁরা ভাবেন, তাঁরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে এমন কিছু প্রত্যাশা করেন যা আপাত সম্ভাব্যতার বাইরে এবং অন্যান্য উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশেও যা কখনো আশা করা হয়নি।

★ দুর্গাপুর মিশ্র ইস্পাত কারখানায় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির জন্যে ক্রোমিয়ামযুক্ত ইস্পাত তৈরি হ'তে সুরু করেছে। এ পর্যন্ত প্রধানত: ক্যানাডা থেকে এই জিনিস আমদানী করা হ'ত। এই কারখানা রাজস্থান পারমাণবিক শক্তি পরিকল্পনা কেন্দ্রকে ইতিমধ্যেই ৭ টন ঐ বিশেষ ধরণের ইস্পাত সরবরাহ করেছে।

★ ভারত, বুলগেরিয়া ও টিউনিসিয়া বাণিজ্যিক লেনদেনের একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। বিশ্বের কোথাও এই ধরণের অভিনব চুক্তি এর আগে হয়নি বলা যায়। টাকায় মোট লেনদেনের পরিমাণ দাঁড়াবে ৩.৬ কোটির মত। যেমন ভারত যত ইউরিয়া আমদানী করবে তার সমান মূল্যের চা ও অন্যান্য নতুন পণ্য রপ্তানী করবে।

উন্নয়ন বার্তা

● সার কর্পোরেশনের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ এমন কয়েকটি নিজস্ব নক্সা, পদ্ধতি ও রাসায়নিক সামগ্রী উদ্ভাবন করেছে যার ফলে কর্পোরেশন বিদেশী মুদ্রায় ১৭ কোটি টাকার ওপর সাশ্রয় করেছে।

● ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের জীবন বীমা কর্পোরেশন ৩৪১,৩৩২টি বীমার ওপর মোট ২২.২৮ কোটি টাকা ব্যবসায়ে খাটিয়েছে। এর মধ্যে বৈদেশিক লেন-দেনের পরিমাণ হ'ল ৩১ লক্ষ টাকা।

● হিন্দুস্তান অর্গ্যানিক কেমিকেলস্-এর এ্যাসিটোনাইলাইড কারখানায় পরীক্ষামূলক-ভাবে কাজ সুরু হয়ে গেছে।

● সাদিহাল-এর তুলা গবেষণা কেন্দ্রে দোআঁশলা তিনটি নতুন জাতের বীজ তৈরি করা হয়েছে। এই বীজের ফলন প্রচুর ও ভালো এবং আঁশগুলোও লম্বা।

● রাজস্থানের রাণা প্রতাপ সাগর বাঁধের চতুর্থ ও শেষ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি চালু করা হয়েছে। এর ফলে সেখান থেকে মোট ১৭২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে।

● গাজিয়াবাদে মোহন নগর শিল্পাঞ্চলে ২০০টি শয্যার একটি হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। নার্সদের জন্যে একটি প্রশিক্ষণ কলেজ ছাড়াও মূত্রাশয় ও হৃদযন্ত্র সম্পর্কে গবেষণার জন্যে একটি কেন্দ্র খোলা হবে। পুরো প্রকল্পটির জন্যে খরচ হবে ৫০ লক্ষ টাকা।

● কারনালে জাতীয় দুগ্ধ শালা প্রতিষ্ঠানে স্নেহবিহীন দুধ থেকে একটা নতুন ধরণের পানীয় উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ দেশে এই জিনিস এই প্রথম তৈরি হ'ল। এই পানীয় বেশ কিছুদিন অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়।

● ১৯৬৮-৬৯ সালে সংরক্ষিত-খাদ্য রপ্তানী করে ১০ কোটি টাকার সমান অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় শতকরা ৬০ ভাগ বেশী বিদেশী বিনিময় মুদ্রা অর্জিত হয়েছে।

● পুণার একটি প্রতিষ্ঠান সাধারণ মাটির তলায় এমন কি পাথুরে মাটির তলায় জলের অস্তিত্ব নিরূপণের একটা নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে।

● গুড়গাঁও জেলায় গোচ্চি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। এর জন্যে খরচ হয়েছে ৫৪ লক্ষ টাকা।

● এ বছরে প্রথম চার মাসে যুগোস্লোভিয়ায় নানান জিনিস রপ্তানী করে ৩.৮৪ কোটি টাকা আয় হয়েছে—এই আয় গত বছরের ঐ ক' মাসের তুলনায় শতকরা ৩১ ভাগ বেশী।

● আসামের অক্ষর পরিচয় সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা শতকরা ১৩ (১৯৪৭) থেকে বেড়ে এখন ৩৮এ দাঁড়িয়েছে। সেখানে ৬ থেকে ১১ বছর বয়সীদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন স্কুলে যায়।

● ১৯৬৮-৬৯ সালে লৌহ আকরের রপ্তানী মারফৎ বৈদেশিক মুদ্রায় আয় হয়েছে ৮৩ কোটি টাকার সমান। ১৯৬৭-৬৮ সালের আয় ছিল ৭১ কোটি টাকার সমান।

● রেল দপ্তর, রেলপথ-পর্ষৎ-এর সঙ্গে সমস্ত 'জোনাল' সদর দপ্তর যুক্ত করার জন্য এবং সমস্ত জোন্যাল সদর দপ্তরের সঙ্গে সমস্ত ডিভিশনাল সদর কার্যালয় যুক্ত করার জন্যে বহুমুখী মাইক্রোওয়েভ টেলিকমিউনিকেশান ব্যবস্থা প্রবর্তনের একটা কার্য সূচী হাতে নিয়েছে। এর জন্যে খরচ পড়বে ১৭ কোটি টাকা।

● ভারতের ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের রাজস্থান শাখায় এই বছর ৫.৫ লক্ষ টন জিপসাম উৎপন্ন হয়। ১৯৬৩ সালের তুলনায় এ বছরে আড়াইগুণ বেশী জিপসাম সার উৎপাদিত হয়েছে। ভারতের এই জিপসাম কেনার জন্য সিংহল, বর্মা, সিঙ্গাপুর এবং মালয়েশিয়া আলাপ আলোচনা চালাচ্ছে। কর্পোরেশন এখন এই দেশগুলিতে ১ কোটি টাকারও বেশী জিপসাম রপ্তানি করতে সক্ষম।

● গোয়ায়, পাণাজীতে, আগের ট্রান্সমিটারের জায়গায় একটা নতুন ১০ কিলোওয়াট শক্তির মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটার বসানো হয়েছে।

● নাগা-ল্যাণ্ডের দুরন্ত টিজু নদীর ওপর ৭ লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি সেতুটি যান বাহনের জন্যে খুলে দেওয়া হয়েছে। যে রাজপথের ওপর এই সেতুটি পড়ে সেটি রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ।

● এখন থেকে বোম্বাই ও সুরাটের মধ্যে ট্রাঙ্ক টেলিফোনে সরাসরি কথা বলা যাবে। অর্থাৎ বোম্বাই, পুণা, আহমেদাবাদ ও সুরাটের মধ্যে ট্রাঙ্ক ডায়ালিং পদ্ধতি চালু হয়ে গেল।

● ১৯৬৮ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে হাতে তৈরি জিনিসের রপ্তানি ৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর আগের বছরে যেখানে ৪২ কোটি টাকার জিনিস রপ্তানী করা হয়েছে, ১৯৬৮ সালের এই ক' মাসে রপ্তানী করা হয়েছে ৫৬.৪১ কোটি টাকার।

● হিন্দুস্তান ইনসেকটিসাইড্স প্রতিষ্ঠানের দিল্লী কারখানায় পরীক্ষামূলকভাবে উৎপাদন সুরু হয়েছে। এই কারখানাটি বছরে ১,৪০০ টন কীট নাশক ওষুধ তৈরি করতে সক্ষম।

● হিন্দুস্তান এ্যালিউমিনিয়াম কর্পোরেশন গত বছরে ১৮টি দেশে ১৩ হাজার টন এ্যালিউমিনিয়াম রপ্তানী করেছে। এ্যালুমিনিয়াম রপ্তানীর ক্ষেত্রে একে রেকর্ড বলা যায়।

● এখন দেশে রেডিওর লাইসেন্সের সংখ্যা প্রাক স্বাধীনতা যুগের তুলনায় ৩৩ গুণ বেশী। ১৯৬৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর এই সংখ্যা ছিল ৯২ লক্ষের ওপর। আর স্বাধীনতার আগে লাইসেন্সের মোট সংখ্যা ছিল ২.৭৫ লক্ষ।

● ভিলাই ইস্পাত কারখানায় দক্ষিণ কোরিয়ার জন্যে যে রেল তৈরি হয়েছে, তার প্রথম কিস্তী হিসেবে, ৭,৫০০ টন রেল বিশাখাপতনম বন্দর থেকে চালান দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া মোট ৪.৫ কোটি টাকার বরাত দিয়েছে।

REGD. NO. D-233

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে এবং তথ্য ও বেতার মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত হ'লেও 'ধনধান্যে' শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করে না। পরিকল্পনার বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী ক্ষেত্রে উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতটা অগ্রগতি হচ্ছে তার খবর দেওয়াই হ'ল 'ধনধান্যে'র লক্ষ্য।

'ধনধান্যে' প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে প্রকাশিত হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

নিয়মাবলী

দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়।

অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পুনঃ প্রকাশকালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার করা হয়।

রচনা মনোনয়নের জন্যে আনুমানিক দেড় মাস সময়ের প্রয়োজন হয়।

মনোনীত রচনা সম্পাদক মণ্ডলীর অনুমোদনক্রমে প্রকাশ করা হয়।

তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয়। কোনোও রচনার প্রাপ্তি-স্বীকৃতি, পত্র মারফৎ জানানো হয় না।

নাম ঠিকানা লেখা ডাকটিকিট লাগানো খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

কোনো রচনা তিন মাসের বেশী রাখা হয়না।

শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাবেন।

গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেস ম্যানেজার, পাব্লিকেশন ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী। এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

"ধনধান্যে" পড়ুন
দেশকে জানুন

প্রেরণার বাণী

ভারতের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলতে আমি এই বুঝি যে দেশের প্রত্যেকটি নরনারী নিজের চেষ্টায় আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করুন। তাহলেই দেশের প্রত্যেকটি মানুষ পরিধানের বস্ত্র বলতে যা বোঝায়, তাই পাবে এবং যে দুধ ও মাখন থেকে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক বঞ্চিত, সেই দুধ মাখনের সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যও পাবে।

★

প্রকৃত সমাজতন্ত্রবাদের শিক্ষা পূর্বপুরুষরা আমাদের দিয়ে গেছেন। ..তাঁরা বলে গেছেন 'মাটি গোপালের' অতএব তার সীমা নির্ধারণ কী করে সম্ভব। জমিকে সীমানার প্রাচীর তুলে ভাগ করেছে মানুষ; সেই তা ভাঙতে পারে।..... গোপালের শব্দার্থ হ'ল রাষ্ট্র অর্থাৎ জনসাধারণ। আজকের দিনে সেই জমির মালিক যে জনসাধারণ নন, এতো দেখাই যাচ্ছে। কিন্তু, সেটা আমাদের পূর্বপুরুষদের শিক্ষার ত্রুটি নয়। ত্রুটি হ'ল আমাদের; আমরা সেই শিক্ষানুযায়ী কাজ করতে পারিনি।

★

আমার স্বরাজের আদর্শ সম্বন্ধে কারুর যেন ভুল ধারণা না থাকে। স্বরাজের অর্থ হ'ল বিদেশী শাসন থেকে পূর্ণ মুক্তিলাভ ও পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা। অর্থাৎ স্বরাজ বলতে একদিকে রাজনৈতিক মুক্তি আর অন্যদিকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বোঝায়।

★

আমি চাই চরকাকে ভিত্তি করে গ্রামের অর্থনৈতিক জীবন গড়ে উঠুক আর এই চরকাকে কেন্দ্র করে সমস্ত কাজকর্ম চলুক।

★

আমাদের নিত্য প্রয়োজনের সামগ্রী যাতে গ্রাম থেকে আসে, পল্লী শিল্প সংক্রান্ত কার্যসূচীর উদ্দেশ্য হ'ল তাই। এমন কি গ্রাম থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর কিছু কিছু যদি পাওয়া নাও যায় তাহলে একটু কষ্ট স্বীকার করে দেখতে হবে যে গ্রামগুলিতে সেগুলি তৈরি হতে পারে কি না।

★

গ্রামগুলি হ'ল ভারতের প্রাণ অথচ দেশের লেখাপড়া জানা লোকেরা সেটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করছেন। আমি চাই গ্রামজীবন যেন শহুরে জীবনের প্রতিচ্ছবি বা উপাঙ্গের মত হয়ে না দাঁড়ায়। শহরগুলিকে গ্রামীণ জীবনের ধারা অনুসরণ করতে হবে বুঝতে হবে যে তাদের অস্তিত্ব গ্রামগুলির ওপর নির্ভর করছে। বর্তমানে শহরগুলি গ্রামগুলির ওপর আধিপত্য করে এবং নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে গ্রামগুলিকে শোষণ করে। আমার খাদি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমি বলতে চাই যে, শহরগুলি গ্রামগুলির পরিপূরক হয়ে উঠুক।

ধৈর্য হারালে কিংবা যা কিছু পুরোনো তা পুরোনো ব'লে বর্জন করলে জনসাধারণের কষ্ট লাঘব করা যাবে না। যে সব স্বপ্ন আজ আমাদের প্রেরণা দিচ্ছে আমাদের পূর্বপুরুষরাও সেই সব স্বপ্নই দেখতেন—তা সেগুলি অস্পষ্ট হ'লেও।

ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাস্ট্রিয়েল সোসাইটি লিঃ—করোলবাগ, দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত এবং ডাইরেক্টার, পাবলিকেশনস্ ডিভিশন,

ধনধান্য

২৫ পয়সা

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত
পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

প্রথম বর্ষ **পঞ্চম সংখ্যা**

৩রা আগষ্ট ১৯৬৯ : ১২ই শ্রাবণ ১৮৯১
Vol I : No 5 : August 3, 1969

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০

টেলিগ্রাফের ঠিকানা—যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫

ভুলি নাই

একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে জীবন গড়ে উঠতে পারেনা, আর সেই দিক থেকে বিচার করলে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নয়ন সম্ভবপর হয়না। বর্ত্তমানের সমস্যাগুলির সমাধান করতে হলে নানা ধরণের কর্ম্মপ্রচেষ্টার প্রয়োজন। কাজেই আমাদের মতাদির বিনিময়ে, অভিজ্ঞতা ও তথ্যাদির বিনিময়ে এবং বিভিন্ন পন্থার সমন্বয়ে উৎসাহ দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

—ইন্দিরা গান্ধী

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়

চাঁদে অভিসার

১৯৬৯ সালের ২০শে জুলাই রাত্রি ৮টা ১৮ মিনিটে চাঁদের শান্তি সাগর থেকে এপোলো-১১র অধ্যক্ষ নীল আর্মষ্ট্রং বেতার যোগে আমাদের পৃথিবীতে সংবাদ পাঠালেন মহাকাশযান 'ঈগল চাঁদে নেমেছে'। প্রায় ১০ বছর পূর্ব থেকে বৈজ্ঞানিকগণ যে ভবিষ্যৎবাণী করছিলেন এবং স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ যে স্বপ্ন দেখছিল, ঐ দিনটিতে তা সফল হল। চাঁদে পৌঁছবার সম্পূর্ণ যাত্রাটি যে পূর্ব থেকে স্থির করে দেওয়া একেবারে মিনিট সেকেণ্ডের হিসেবে সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে তার জন্য প্রায় দশ বছর ব্যাপি মহাকাশ বিজ্ঞানের সাধনা অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি করতে পারে। মহাকাশ বিজ্ঞানের একটা প্রচেষ্টা হিসেবে এপোলো-১১ মহাকাশ যানটি চাঁদে পাড়ি দেয়। একে মহাকাশে আরও ব্যাপক ও বিপুল অভিযানের সম্ভাবনার ইঙ্গিত বলা যায়। মানুষ এখন পৃথিবীর বাইরে এক নতুন জীবন ও নতুন সভ্যতা গড়ে তোলার মুখে। ঈগল যানটি থেকে যখন নীল আর্মষ্ট্রং এবং এডুইন অলড্রিন মই দিয়ে নেমে চাঁদে প্রথম অনিশ্চিত পা ফেল-লেন এবং সেখান থেকে কলার বেগে প্রধান মহাকাশ যানটিতে আবার ফিরে আসতে সক্ষম হলেন তখনই তাঁরা চাঁদের বায়ুহীন আবহাওয়াতেও মানুষের চলাফেরার ক্ষমতার প্রমাণ দিলেন।

চাঁদে অবতরণ করার যানটির কার্যকারিতা, মহাকাশে যাও-য়ার পোষাক, জীবনরক্ষী ব্যবস্থা এবং অবতরণ সম্পর্কে নির্দেশদান-কারী যন্ত্রাদির কুশলতা, মহাকাশ ভ্রমণের বিভিন্ন যন্ত্রাদিকে সঠিকভাবে তৈরি করতে যে অনেকখানি সাহায্য করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পৃথিবীর মানুষের কাছে এই অভিযানের তাৎপর্য সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে, নির্জন চাঁদের বুকে যখন তাঁরা দুজন, প্রথম মানব হিসেবে ছিলেন, তখন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা একা ছিলেন না। তাঁদের সঙ্গে ছিল ৭৩টি জাতির শুভেচ্ছা। তাঁদের এই মহাকাশ অভিযানে টেলিভিশন ও বেতারের মাধ্যমে প্রায় ৫০ কোটি লোক, মানব জাতির প্রায় এক ষষ্ঠাংশ, সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তা ছাড়া সংবাদপত্রের মাধ্যমে, একমাত্র চীন ছাড়া প্রায় সমগ্র বিশ্বের শুভেচ্ছা তাঁদের পেছনে ছিল। অপরদিকে সোভিয়েট দেশগুলির স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা প্রমাণ করে যে, এই মহাকাশ অভি-যান মানব জাতির মধ্যে সৌহার্দ্য বাড়াতে সাহায্য করছে এবং সমগ্র বিশ্ব ক্রমশঃ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। চাঁদে আমেরিকার এই দুজন মহাকাশচারীর যুগান্তকারী পদচারণার স্মারক হিসেবে চেকোশ্লো-ভাকিয়া যে ডাক টিকিট ছাপিয়েছে, এই ঐক্যের নিদর্শন হিসেবে, এর চাইতে বেশী আর কি প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে তা কল্পনা করা কঠিন।

মহাকাশ সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও আমেরিকার মধ্যে সহযোগিতার সম্ভাবনাকে একেবারে অসম্ভব ব'লে মনে হয় না। তার কারণ হ'ল লুনা ১৫র মহাকাশ যাত্রা সম্পর্কে আমেরিকার মহাকাশ সম্পর্কিত সংস্থাকে সোভিয়েট ইউনিয়ন তথ্যাদি সরবরাহ করে। কাজেই এটা পৃথিবীর ও মহাকাশের মানুষের পক্ষে রাজনৈতিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখন মহাকাশসহ সমগ্র পৃথিবীতে কি করে শান্তি বজায় রাখা যায় সে সম্পর্কে মহা-কাশ অভিযাত্রীগণের কতকগুলি মূলনীতি স্থির করা উচিত এবং এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসঙ্ঘেরই প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

এপোলো-১১র এই যুগান্তকারী অভিযান আমাদের একটা শিক্ষণীয় বিষয়। যে সব দেশে টেলিভিশন আছে, সেগুলির প্রায় সবাই তাঁদের টেলিভিশনের পর্দায়, চাঁদের বুকে মানুষের প্রথম পদক্ষেপ দেখেছেন কিন্তু আমাদের এই দেশে আমরা সেই অপূর্ব আনন্দ থেকে বঞ্চিত থেকেছি। কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে বিশ্ব-ব্যাপি যোগসূত্রের মধ্যে যে ফাঁক রয়েছে এটা হ'ল তার একটা অন্যতম দৃষ্টান্ত এবং সেই ফাঁকগুলি পূর্ণ করার প্রয়োজন যে কত জরুরী তা এতেই বোঝা যায়। ভারতের কারিগরী উন্নয়নের এই ক্ষেত্রটি সম্পর্কে আর বেশী বিলম্ব করা যুক্তিসঙ্গত হবে না।

এবারে যে দুঃসাহসী মহাকাশযাত্রীরা চাঁদের বুকে প্রথম পা ফেললেন তাঁদের কথায় ফিরে আসা যাক। মানুষের বর্তমান কাল পর্যন্ত ইতিহাসে যাকে সর্ববৃহৎ ঘটনা বলা যেতে পারে, সেই ঘটনার প্রধান নায়কদের, সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে আমরাও অভিনন্দন জানাচ্ছি। বর্তমানে আমরা যেমন তাঁদের এই জয়োৎসবে অংশ গ্রহণ করছি তেমনি মানুষের ভবিষ্যৎ ইতিহাসেও তাঁরা চিরকাল গৌরবান্বিত হয়ে থাকবেন। নীল এ. আর্মষ্ট্রং চাঁদে প্রথম পা ফেলে যখন বলেছিলেন 'মানুষের সামান্য একটু পদক্ষেপ মানব জাতির জন্য বিপুল একটা সম্ভাবনা' তখন তিনি সত্যি কথাই বলেছিলেন। চাঁদের আলকাতরার মতো মাটিতে আর্মষ্ট্রং এবং অলড্রিন যে পায়ের চিহ্ন রেখে এসেছেন তা মহাকালের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে। চাঁদের মাটিতে মানুষের এই প্রথম পদক্ষেপের পর আরও হাজার হাজার মানুষের পদচিহ্ন হয়তো চাঁদে পড়বে আর শুধু সেখানেই কেন আমাদের ছায়াপথের মধ্যে ও বাইরে—নভোমণ্ডলের সুদূর গ্রহ নক্ষত্রেও হয়তো পড়বে। চীনের জ্ঞানযোগী লাও সে, সত্যিই বলেছিলেন যে, 'একটি পদক্ষেপের মাধ্যমেই হাজার হাজার মাইলের যাত্রা সুরু হয়।'

ট্রম্বের সার তৈরির কারখানা

(বিশেষ সংবাদদাতা)
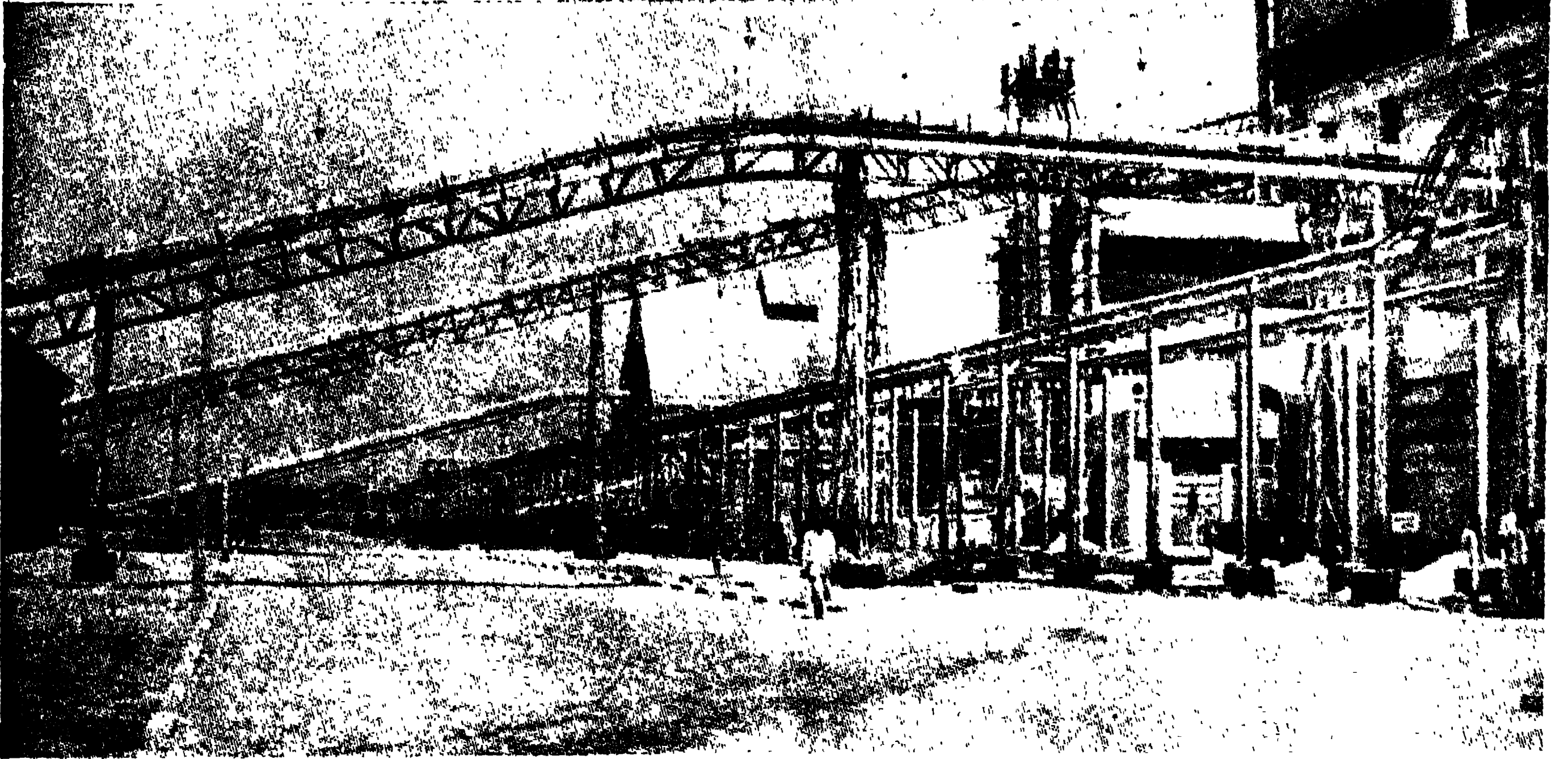
ট্রম্বের সার তৈরির কারখানাটি এখনই ভারতের অন্যতম বৃহৎ কারখানা। এটিকে সম্প্রসারিত করার জন্য যে কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তা ১৯৭২ সালে সম্পূর্ণ হবে। সম্প্রসারণের পর এটি ভারতের বৃহত্তম হবে এবং বিশ্বের যে কোন দেশের বৃহত্তম সার তৈরির কারখানার সঙ্গে এটিকে তুলনা করা যাবে।

বোম্বাইর সহরতলী ট্রম্বেতে এটি স্থাপন করা হয়েছে। ভারত সরকারের একটি কোম্পানী (ভারতের সার কর্পোরেশন) এটি পরিচালনা করেন। এখানে বছরে ৯০,০০০ টন নাইট্রোজেন এবং ৪০,০০০ টন ফসফেট উৎপাদিত হয়। ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাস থেকে এই কারখানার উৎপাদন সুরু হয়েছে।

দুটি বিদেশী তৈল শোধনাগারের খুব কাছে ৫৩৭ একর জমির ওপর এই কারখানাটি স্থাপন করা হয়েছে। কারখানাটি চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় মূল উপাদান ন্যাপথা এবং গ্যাস ঐ তৈল শোধনাগার দুটি সরবরাহ করে। সার উৎপাদনের এই সংস্থাটিতে পাঁচটি পৃথক পৃথক কারখানা রয়েছে। যেমন, এ্যামোনিয়াম প্ল্যান্ট। এখানে প্রতিদিন ৩৫০ টন এ্যামোনিয়া তৈরি হয়। সালফিউরিক এ্যাসিড প্ল্যান্টে প্রতিদিন ২০০ টন সালফিউরিক এ্যাসিড তৈরি হয়, নাইট্রোফসফেট প্ল্যান্টে প্রতিদিন ১১০০ টন নাইট্রোফসফেট উৎপাদিত হয়। মেথানল প্ল্যান্টের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা হ'ল ৩০,০০০ টন। এই মূল রাসায়নিক পদার্থটি সর্ব প্রথম ভারতের এই কারখানাটিতেই তৈরি হচ্ছে।

আমেরিকার দুটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান এখানকার প্রধান কারখানাগুলির নক্সা তৈরি ক'রে, যন্ত্রাদি সংগ্রহ ক'রে, সেগুলি নির্মাণ করে।

পরিপূরক কারখানা, যেমন, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, বাষ্প উৎপাদনকারী প্ল্যান্ট, বস্তায় বোঝাই করার প্ল্যান্ট, কাজ করার অন্যান্য ব্যবস্থা, ইয়ার্ড পাইপিং পাওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদির নক্সা তৈরি ক'রে এগুলি নির্মাণ করার ভার নেন ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারগণ।

সম্প্রসারণের যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ হলে এই কারখানার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা চার গুণ বেড়ে যাবে অর্থাৎ বর্তমানে সার তৈরির জন্য যে ১৩৫,০০০ টন বিভিন্ন উপাদান তৈরি হয় সেগুলির পরিমাণ তখন দাঁড়াবে ৫ লক্ষ টনেরও বেশী। সার উৎপাদন সম্পর্কে অতি আধুনিক যে সব কারিগরী উন্নয়ন হয়েছে সম্প্রসারণ কর্মসূচীতে সেগুলিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নতুন যে এ্যামোনিয়া প্ল্যান্ট তৈরি হচ্ছে সেটি হবে ভারতের বৃহত্তম এবং দৈনিক ১০০০ টন এ্যামোনিয়া উৎপাদিত হবে। এতে সর্বাধুনিক নক্সার সেন্ট্রিফুগাল কম্প্রেসার ব্যবহৃত হবে। এইসব আধুনিক ব্যবস্থা উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করতে সাহায্য করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

এখানে যে এ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপাদিত হবে তা দিয়ে প্রধানত নাইট্রোজেন-যুক্ত ইউরিয়া এবং ডায়ামোনিয়াম ফসফেট তৈরি করা হবে। ডায়ামোনিয়াম ফসফেটে

নাইট্রোজেন এবং ফসফেট দুইই বেশী মাত্রায় থাকে। এই দুটিই শস্যাদির খাদ্য। আর ভারতের মাটিতে শস্যাদির এই দুটি খাদ্যেরই খুব অভাব।

ভারতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ট্রম্বের এই সম্প্রসারণ একটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনবে। যে নতুন ধরণের উচ্চ ফলনের বীজ ব্যবহার ক'রে ভারতের খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াবার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, সেই রকম বীজ বপন ক'রে যদি এই সারগুলি ব্যবহার করা যায় তাহলে প্রতি এক টন সারে ১৩.৫ টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা যায়। কাজেই একমাত্র ট্রম্বেতে যে সার উৎপাদিত হবে তা দিয়ে প্রায় ৭০ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করা যাবে। এই পরিমাণ খাদ্যশস্য ৪ কোটি ১০ লক্ষ জনের পক্ষে যথেষ্ট অথবা মহারাষ্ট্রের প্রায় সমগ্র অধিবাসীর পক্ষে যথেষ্ট।

ট্রম্বের নতুন কারখানায় যে এ্যামোনিয়া উৎপাদিত হবে তার কিছুটা অংশ সোজাসুজি কৃষকগণের কাছে বিক্রী করার জন্য সংরক্ষণ করা হবে। বিশ্বের অনেক দেশেই শস্যের নাইট্রোজেনের চাহিদা পূরণের জন্য ইউরিয়ার মতো সার না দিয়ে, কৃষকগণ তাঁদের জমিতে নাইট্রোজেন সোজাসুজি ব্যবহার করেন। কিন্তু এই পদ্ধতিটা ভারতে এখনও ব্যাপক আকারে অনুসৃত হচ্ছে না।

ভারতে এই পদ্ধতিটা গ্রহণ করার সম্ভাবনা কতখানি সে সম্পর্কে একটা পরীক্ষামূলক কর্মসূচীতে ট্রম্বের এই কারখানাটি, মহারাষ্ট্র সরকার এবং কৃষি গবেষণা সম্পর্কিত ভারতীয় পরিষদের সঙ্গে এক যোগে কাজ করবে। এই কর্মসূচী যদি সফল হয়, তাহলে তা ভারতের কৃষকগণের আয় বাড়াবার একটা পথ খুলে দিতে পারে।

ট্রম্বের এই সম্প্রসারণসূচীতে ভারতের কৃষিই শুধু উপকৃত হবে না। এখানে সম্প্রতি যে মেথানল তৈরি হচ্ছে তা প্ল্যাষ্টিক, ওষুধ, কৃত্রিম সুতো এবং রং তৈরি করার একটা প্রধান রাসায়নিক উপাদান। আর আরগণ গ্যাস প্রধানত আর্ক ওয়েল্ডিং করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

কতকগুলি মূল ও অন্তর্বর্ত্তি উপাদান তৈরি করার জন্য শিল্পগুলিও যাতে এ্যামোনিয়া পেতে পারে তার ব্যবস্থাও সম্প্রসারণ সূচীতে রাখা হয়েছে। ট্রম্বের এই সংস্থাটি রুটি তৈরি করার জন্য খাদ্যশ্রেণীর এ্যামোনিয়াম বাই কার্বোনেট, কীট নাশক তৈরি করার জন্য নাইট্রিক এ্যাসিড, মেথিলেমাইনস এবং খনিতে ব্যবহারযোগ্য বিস্ফোরক এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট তৈরি করার জন্য এ্যামোনিয়া ব্যবহার করবে।

ট্রম্বের সার তৈরীর কারখানায়, নাইট্রোজেনযুক্ত ইউরিয়া ব্যাগে বোঝাই করা হচ্ছে

(প্ল্যান্টার্স জার্নাল এ্যান্ড এগ্রিকালচারিষ্ট পত্রিকার সৌজন্যে)
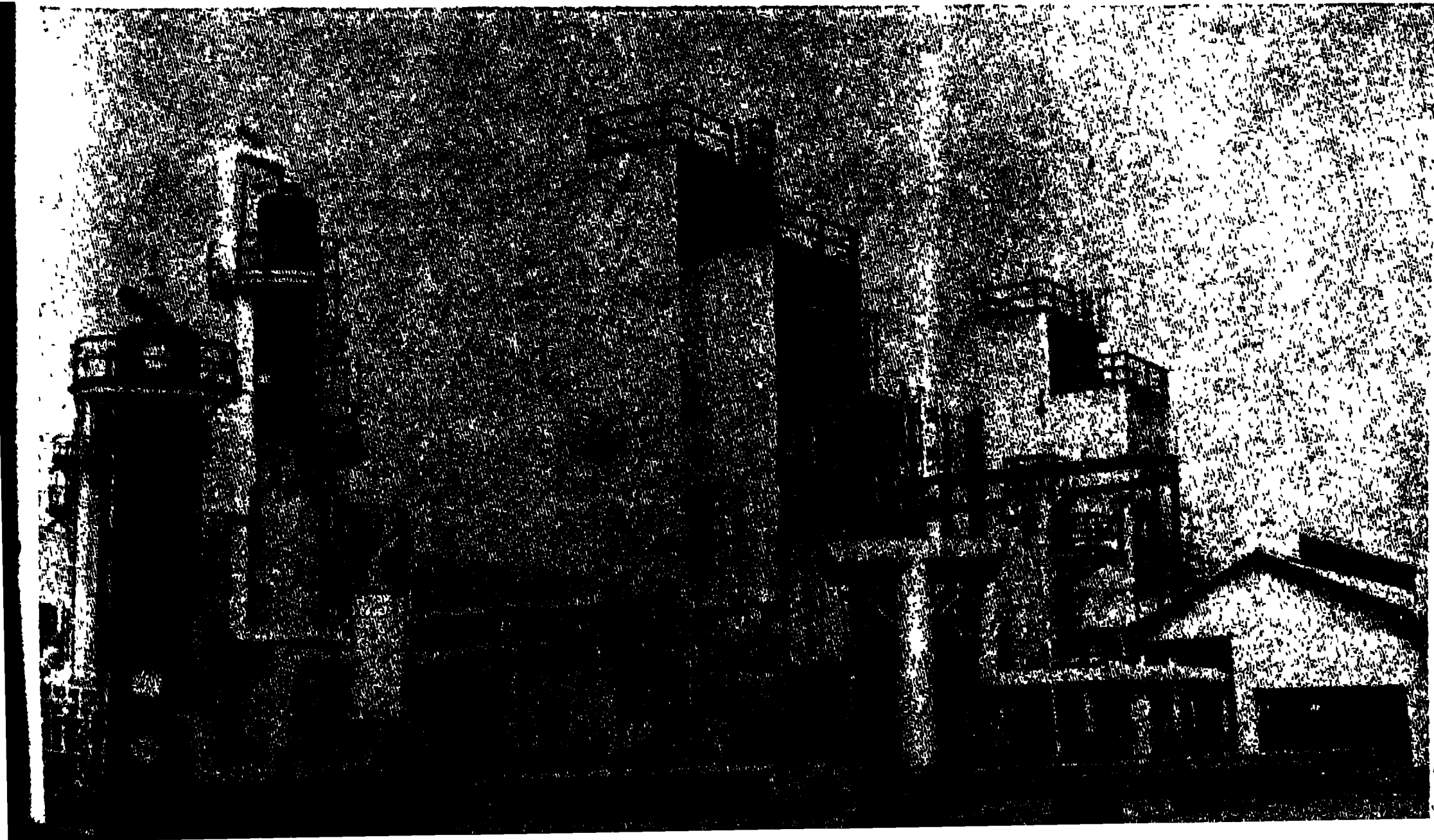
সারের অন্যতম উপাদান এ্যামোনিয়া তৈরীর কারখানা

শিক্ষা খাতে সরকারী ব্যয়

শিশির কুমার হালদার

শিক্ষার চাহিদা মেটানোর জন্য ব্যয়ের মাত্রা ক্রমশঃ যে পরিমাণে বাড়ছে তাতে শিক্ষাও একটা ব্যয়বহুল বিভাগ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলির পরিকল্পনা রচয়িতাগণ 'আর্থিক উন্নয়নের ইঞ্জিন' হিসেবে জনশক্তি গড়ে তোলার ওপরেই বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন।

বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য আমাদের সীমিত সম্পদকে কি ক'রে সব চাইতে ভালো উপায়ে কাজে লাগানো যায় সেইটেই হ'ল একটা বড় সমস্যা এবং চাহিদার গুরুত্ব অনুযায়ী বরাদ্দ স্থির করাটাই হ'ল অর্থনীতির ভিত্তি। শিক্ষা খাতে সরকারী ব্যয়ের হার কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ একমত নন ব'লে এই ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করা সম্ভব হয়নি। তবে একটি শিশুর কি পরিমাণ শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত সে সিদ্ধান্তের ভার এখন আর বাবা মার বিবেচনার ওপর ফেলে রাখা হয় না। এখানে রাষ্ট্র অনেক ক্ষেত্রেই তার ক্ষমতার হস্ত প্রসারিত করে। রাষ্ট্রের শিক্ষা নীতিগুলি পিতামাতার পছন্দকেও এখন প্রভাবিত করে। এ ছাড়াও, শিক্ষা খাতে তাঁদের ব্যয়ের হার দিয়ে সরকারী কর্তৃপক্ষ শিক্ষাকে সোজাসুজি প্রভাবিত করেন।

শিক্ষা খাতে ব্যয়ের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে। শিক্ষার জন্য যে ব্যয় করা হয় তার ফল পেতে অনেক দেরী হয় ব'লে, এর উপকারগুলিও খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় না। এই ক্ষেত্রে একবার যে সব সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হয় তা সহজে বদলানো যায় না কারণ তা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হয়ে পড়ে এবং নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। শিক্ষাখাতে পৌণঃপুণিক ব্যয় অনেক সময়েই দেশের বাজেটে একটা চাপের সৃষ্টি করে।

যে সব ক্ষেত্রে উৎপাদনটা অপেক্ষাকৃত সোজাসুজি পাওয়া যায় সেখানে হয়তো নির্দিষ্ট কতকগুলি নীতি ও লক্ষ্য স্থির ক'রে দেওয়া যায়, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন সহজ ও সঠিক সূত্র দিয়ে নীতি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এই ক্ষেত্রে যে সব ফল পাওয়া যায় তার মধ্যে অনেকগুলিই অস্পষ্ট এবং তা সঠিকভাবে নিরূপণও করা যায় না।

শিক্ষা খাতে ব্যয়ের উদ্দেশ্যগুলি বহুমুখী এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক লক্ষ্যের বৈপরীত্য জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। ভারতে সাধারণ কর্মীর কোন অভাব নেই কিন্তু কুশলী কর্মীর অথবা মাঝারি এবং উচ্চ পর্যায়ের জনশক্তির অত্যন্ত অভাব রয়েছে। আর্থিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে ব'লে বর্তমান ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য যে সব কুশলী কর্মীর প্রয়োজন, সেই রকম কর্মী যাতে তৈরি হয়, তা সুনিশ্চিত করাই আমাদের সরকারী শিক্ষা নীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমাদের যদি সর্বোচ্চ সংখ্যায় মাঝারি ও উচ্চ পর্যায়ের জনশক্তি তৈরি করাই লক্ষ্য হয় তাহলে এই অবস্থায় ব্যক্তিগত ও সামাজিক উদ্দেশ্য প্রায় অভিন্ন হয়ে যায়। একবার যদি নীতি ও লক্ষ্য স্থির হয়ে যায় তখন যে সমস্যাটা অবশিষ্ট থাকে তা হ'ল, ব্যয় এবং লাভ কি ক'রে পরিমাপ করা যায় বা বরাদ্দ করা যায় এবং অন্যান্য শাখার ব্যয় ও উৎপাদনের সঙ্গে সেগুলির অনুপাত স্থির করে শ্রেণী বিভক্ত করা যায়।

সরকারী এবং বেসরকারী খাতে প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে যে ব্যয় হয় এবং ছাত্র ছাত্রীদের স্কুলের মাইনে ইত্যাদির জন্য যে ব্যয় হয় তাই হ'ল শিক্ষাখাতে প্রত্যক্ষ ব্যয়। তা ছাড়া ছাত্রছাত্রীরা যতদিন স্কুলে পড়াশুনা করছে অথবা অন্য কোন শিক্ষা গ্রহণ করছে সেই সময়টায় তারা যদি রোজগার করতো তাহলে একটা আয় হতো। কাজেই সেই আয়টাকেও শিক্ষাখাতে অপ্রত্যক্ষ ব্যয় হিসেবে ধরা যায়। শিক্ষা খাতে এই ব্যয় করার ফলে, যারা উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করতে পারেন নি তাদের তুলনায় শিক্ষিতরা বেশী আয় করতে পারেন। তবে কোন নির্দিষ্ট সময়ে, বিশেষভাবে শিক্ষিতের চাহিদা ও যোগানের অবস্থাটাও বিবেচনা করতে হবে। যাই হোক এই ক্ষেত্রে যে বিনিয়োগ করা হয় এবং তা থেকে যে লাভ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তার সঙ্গে অন্যান্য ক্ষেত্রের বিনিয়োগের তুলনা করা চলে না এবং যতদিন পর্যন্ত অন্য কোন ক্ষেত্রের তুলনায় শিক্ষা ক্ষেত্রের বিনিয়োগ থেকে বেশী লাভ পাওয়া যাবে ততদিন পর্যন্ত শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ যুক্তিসঙ্গত বলে ধরা হবে। এগুলি সবই শিক্ষা গ্রহণকারীগণের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বলা হচ্ছে। শিক্ষার সুযোগ সুবিধের ব্যবস্থা যাঁরা করেন তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্য বাড়ী ও কারখানা তৈরি করার জন্য, সাজ সরঞ্জাম কেনার জন্য, রক্ষণাবেক্ষণ এবং শিক্ষক ও অফিসের জন্য যে মূলধন বিনিয়োগ করা হয় সেটাও শিক্ষাখাতে ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। তবে সমগ্রভাবে সমাজের দিক থেকে বিবেচনা করলে অন্য কোন উৎপাদনমূলক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ না ক'রে শিক্ষা খাতে অর্থ বিনিয়োগ করার ফলে বর্তমান ও ভবিষ্যতের যে আয় থেকে সমাজ বঞ্চিত হচ্ছে সেটাও শিক্ষা খাতে ব্যয় হিসেবে ধরা উচিত।

সামাজিক ব্যয়ের হিসেব করতে গিয়ে টি. ডব্লিউ সুল্‌জ অবশ্য বলেছেন যে 'স্কুলে বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করার সময়টায় কাজ করলে ছাত্রছাত্রীরা যে আয় করতে পারতো সেটাও ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। যেখানে পূর্ণ নিয়োগের সুযোগ আছে সেখানে অবশ্য নীতিগতভাবে এর যৌক্তিকতা মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা অনুযায়ী ব্যবহারিকভাবে এইরকম হিসেব করাটা যে যুক্তিসঙ্গত হবে না তার কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ বেশীরভাগ ভারতীয় ছাত্রের ক্ষেত্রে স্কুল কলেজে পড়াশুনা না করা বা কোন হাতের কাজ না শেখার বিকল্প হল কর্মহীন আলস্যে সময় কাটানো। কর্মহীনতা এবং পুরোপুরি কাজ না পাওয়ার সময়ে ছাত্রছাত্রীরা যে আয় করতে পারতো, কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে যে আয় করতে পারেনি, সেটাকে শিক্ষাদানের ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক হবে না। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার ব্যয় সম্পর্কিত হিসেব লাভের হিসেবের চাইতে কঠিন। মোট কথা শিক্ষাখাতে ব্যয় করে কি কি উপকার পাওয়া যাচ্ছে তার পরিমাপ করা বেশ কঠিন।

তাপ পুনরুদ্ধার

সারাদিনে আমাদের শরীর থেকে যে তাপটা বেরিয়ে যায় তা কোনোও কাজে লাগে কিনা বা লাগতে পারে কি না তা অনেকেরই জানবার কৌতূহল হতে পারে। এই তাপ কোনোও রকমে সঞ্চিত করলে কত দাঁড়াতে পারে আন্দাজ করা সম্ভব কি? আর শুধু দেহের তাপই বা কেন? ঘর-বাড়ীর মধ্যেকার তাপ, রান্নাঘরে উনুনের তাপ, সূর্যকিরণের তাপ এবং বৈদ্যুতিক বাতির তাপ ইত্যাদি সবই তো হাওয়ায় মিশে যায়। কিন্তু এই সব তাপ সঞ্চিত ক'রে আবার কাজে লাগানো সম্ভব। কবির ভাষায় বলতে গেলে

'যে নদী মরুপথে হারালো ধারা
জানি হে জানি তা-ও হয়নি হারা।'

একটি সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে আধার করে এই ব্যাপারটা সম্ভব করে তোলা হয়েছে। তত্ত্বটি অতি সাধারণ, তা হ'ল ঠাণ্ডা জল তাপ আকৃষ্ট করে এবং এই নৈসর্গিক সত্যটি ভিত্তি করেই এয়ার কণ্ডিশানিং-এর প্রবর্তন। পিটস্‌বার্গ বিশ্বিদ্যালয়ের চতুঃসীমার মধ্যে যে ১০টি স্কুলবাড়ী আছে সেগুলি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। এর জন্যে 'হীট পাম্পের' কিংবা এয়ার কন্ডিশানিং-এর জন্যে প্রচলিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অথচ স্কুল বাড়ীগুলির সব কটিই গরমকালে ঠান্ডা রাখা হয় এবং শীতকালে গরম রাখা হয়। এটা কি করে হয়?

এর জন্যে যে প্রক্রিয়া কাজে লাগানো হচ্ছে তা শুনতে নতুন না হ'লেও প্রয়োগের দিক থেকে অভিনব। গ্রীষ্মকালে প্রত্যেকটি বাড়ীর ভেতরকার সমস্ত তাপ (অর্থাৎ শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের দেহের তাপ, হাওয়ার তাপ, আগুনের, বিজলী আলো প্রভৃতির তাপ) ছাতের কোণে তৈরি ঘুলঘুলি দিয়ে বেরিয়ে যায়। ঘুলঘুলি-গুলোর মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় এই তাপ, দেওয়ালের মধ্যে বসানো বরফ ঠান্ডা জলের পাইপগুলোকে তাপিত করে।
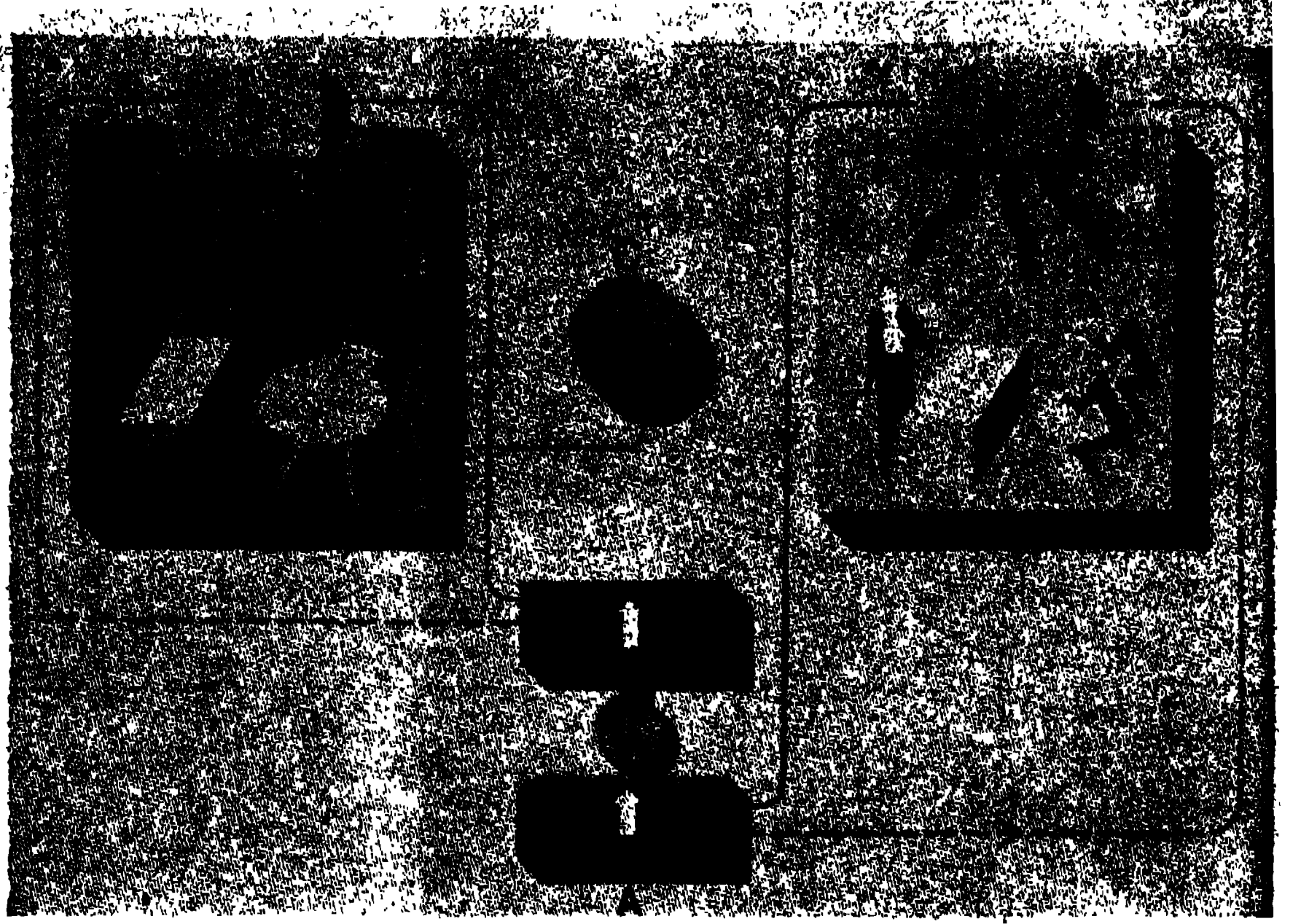
উত্তাপ পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা—উত্তাপ কি করে পুনরুদ্ধার করা হয় তার আভাস এই ছবিতে দেওয়া হয়েছে। নীচে 'এ'তে জল ঠান্ডা করার মেসিন থেকে জল, পাঠকক্ষ (বি) তে চলে যায়, সেখানে ছাত্রছাত্রীদের শরীরের এবং আলোর উত্তাপ সংগ্রহ করে। গরম বাতাস 'এ'র উপরিস্থিত কনডেন্সার মেসিনে পাঠিয়ে আরও চাপ দিয়ে উত্তপ্ত করে, সংরক্ষণ ইউনিট 'সি'তে বা ছাত্রাবাসের কক্ষ 'ডি'তে পাঠানো হয়।

মাটির তলায় তৈরি একটা ঘরের মধ্যে রাখা একটা বিশেষ আধারের মধ্যে এই জল পড়তে থাকে। সেইখানে একটা সেন্ট্রিফিউগাল (কেন্দ্র বিন্যাসী) পাখার ঘূর্ণনে তাপের মাত্রা বাড়িয়ে তা চালান করে দেওয়া হয় ঘনীভূত তাপ রাখবার আধারে। শীতকালে এই তাপ-ভান্ডার থেকে তাপ ছেড়ে দেওয়া হয় হট ওয়াটার রেডিয়েটর সিষ্টেমের মাধ্যমে। গ্রীষ্ম-কালে বা অন্য মরসুমে কলেজ যখন খোলা থাকে তখন কর্মরত শিক্ষক ছাত্রদের শরীর থেকে প্রচুর তাপ পাওয়া যায়। শীত-কালের প্রয়োজন মেটাবার পর উদ্বৃত্ত তাপ জমিয়ে রাখা হয় একটা ইনসুলেটেড্ হট ওয়াটার ট্যাঙ্কে।

সাপ্তাহান্তিক ছুটি বা বড় ছুটির দিনে, ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষকদের অনুপস্থিতির জন্যে যখন পর্যাপ্ত তাপ সঞ্চয় করা যায় না তখন তাপ ভান্ডার থেকে তাপ ছেড়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে তাপ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

এই তাপ পুনরুদ্ধারের ব্যাপারটা খব নতুন নয়। ১৮৫২ সালে প্রথম এর উল্লেখ শোনা যায় এবং ১৯৩২ সালে প্রথম কার্যকর 'হীট' পাম্প আবিষ্কৃত হয়।

অনেকখানি জমি জুড়ে যে সব ঘর-বাড়ী তৈরি করা হয়, তার ঘরগুলো গ্রীষ্মকালে ঠান্ডা রাখা ও শীতকালে গরম রাখার প্রয়োজন খুব জরুরী হয়ে পড়ে। এ যাবৎ পৃথকভাবে এক একটা বাড়ীর শীততাপ নিয়ন্ত্রণের জন্যে এই পদ্ধতি কাজে লাগানো হয়েছে কিন্তু একত্রে ১০/১২টা বাড়ীর জন্যে এর সার্থক প্রয়োগ এই প্রথম সম্ভব করে তোলা হয়েছে। প্রচলিত অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় এই পদ্ধতি অল্প ব্যয় সাপেক্ষ এবং আমাদের দেশের মত গ্রীষ্ম প্রধান দেশে এই পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন খুবই বাঞ্ছনীয়। প্রাথমিক খরচ খরচার প্রশ্নটার যদি নিষ্পত্তি করা যায় তাহলে এই ব্যবস্থা বেশ কিছুকালের মত চালু রাখা ব্যয় সাপেক্ষ হবে না।

ভারতের হস্ত শিল্প

বর্ত্তমানে হাতে তৈরী রেশম, কাপড়, কার্পেট, কাঠের কাজ ও ধাতব সামগ্রী রপ্তানী ক'রে বছরে চল্লিশ কোটী থেকে পঞ্চাশ কোটী টাকা আয় হচ্ছে

বহু প্রাচীন কাল থেকেই ভারতের বহুমুখী কারিগরী ঐতিহ্য পল্লী সমাজকে ভিত্তি করে প্রকাশ পেয়েছে। আজ তার সংশোধিত রূপ বেঁচে রয়েছে। পল্লী জীবন, গ্রামীণ পরিবেশ এবং প্রকৃতির সঙ্গে তার যোগ, সোজা সরলভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে এই শিল্পে।

যুগ যুগ ধরে আমাদের নক্সা সচেতনতা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে রয়েছে। এই নক্সায় পাওয়া যায় সমকালীন সমাজ চিত্র: আশা, আকাঙ্খা, আনন্দ ও দুঃখ। এই আবহমান ঐতিহ্যে কিন্তু শিল্পীর নাম খুঁজে পাওয়া যাবে না। হাতী, ঘোড়ার মাটির মূর্তি আংগিকের দিক দিয়ে নিখুঁত। এগুলি তৈরি হয়েছে, ব্যবহার করা হয়েছে, আবার ভাঙ্গা অবস্থায় রাস্তার পাশে অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। আবার প্রাচীর চিত্রের প্রচলনও ছিল ব্যাপক। কোন মাংগলিক অনুষ্ঠানে বাড়ীর মেয়েরা ঘরের দেওয়ালে দেবদেবীর কাহিনী চিত্রায়িত করতো। সেগুলো পরে চুনকাম করে ঢেকে দেওয়া হতো। বর্তমানে পল্লী জীবনে নতুন বিষয় ও আংগিকের ব্যবহারও দেখা যাচ্ছে। তাতে গ্রামোফোন ও এয়ারোপ্লেনের নক্সা দেখা যাচ্ছে।

উপজাতিদের জীবন ও ঐতিহ্য গ্রামীণ শিল্পে স্থান পেয়েছে। প্রাচীনকালে কাঠের, ধাতুর বা মাটির কাজ ছাড়া অন্য কিছু প্রায় হতোই না। কারিগররা কাঠের, কাঁসার বা মাটির কাজ করতো। মানুষ কিম্বা ঘোড়ার মাটির মূর্তি করে গাছের নীচে কিম্বা গ্রামের প্রবেশ পথে রেখে দেওয়া হতো। প্রকৃতি, দেবতা বা গৃহ দেব দেবীর মূর্তি তৈরি কিন্তু উপজাতি ঐতিহ্য ছিল। উপজাতিরা চুলের বাঁকানো কাঁটা, হুকো, রং বেরঙের পরিধেয় বস্ত্র, রঙ্গীন পুঁতি প্রভৃতি বানাতে ভালোবাসতো। নক্সা ছিল জ্যামিতিক।

আরেকটি শিল্প ধারা দেখা যায় এবং সেটাও সুপ্রাচীন। রাজা, রাজসভা এবং ভগবানের গুণকীর্তনে মন্দির তৈরির বহু নিদর্শন আজও বর্তমান। সিন্ধু উপত্যকার সঙ্গে আর্য সভ্যতার সংমিশ্রন শিল্পে প্রতিফলিত হয়েছে।

কারিগরদের ছেলে মেয়েরা তাদের বংশানুক্রমিক শিল্প ঐতিহ্যের পরিবেশে বড় হতো। ফলে তারা আঙ্গিক, প্রতীক ও কারিগরী পদ্ধতির সঙ্গে খুবই পরিচিত থাকতো। এ সময়ে কারু শিল্প ও হস্তশিল্পের মধ্যে কোন পার্থক্যই ছিল না। তবে গঠন প্রকৃতি বংশ পরম্পরায় কিন্তু এক রকম হতো না। অনুকরণের মনোবৃত্তি কারও ছিল না।

মোগল যুগে কারিগরী প্রতিভার বিকাশ উল্লেখযোগ্য। গহনা, পাথরের কাজ, জেড ও হাতীর দাঁতের কাজ, রূপান্তর কাজ, ব্রোকেডের কাজ অভিজাত্য ও সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে অতুলনীয় ছিল। কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের পতন এবং রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা হারিয়ে কারিগররাও ম্রিয়মান হয়ে যায়।

তিন হাজার বছর আগে বিখ্যাত মসলিন, রং করা তুলো, কারুকার্যখচিত কাঠের থাম এবং হাতীর দাঁতের সুন্দর জিনিস ভারত থেকে জাহাজে করে বিদেশে পাঠানো হতো। ব্যাবিলনের রাজা সলোমনের দরবারে পর্যন্ত এই সব জিনিস পৌঁছোতো। চীন, পূর্ব ও মধ্য এশিয়ায় এবং সেখান থেকে সিংহল, ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীনে এই সব জিনিস যেতো। কুষাণ যুগের কারুকার্যখচিত হাতীর দাঁতের বাক্স আফগানিস্থানে পাওয়া গিয়েছে।

ভারতে রপ্তানির জন্য নতুন হস্তশিল্প কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। পাশ্চাত্যে ভারতীয় নক্সার বদলে পাশ্চাত্যের নক্সার চাহিদা থাকায় ক্রমশঃ ভারতীয় নক্সার চল নষ্ট হতে আরম্ভ করে। শিল্প বিপ্লবের প্রভাব এবং নকল জিনিসের ব্যাপক উৎপাদনের মনোভাব ভারতেও ছড়িয়ে যায়। এতে ক্ষতি হয়।

১৯৪৭ সালের পরে জাতীয় অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে এই সব গ্রামীণ কারিগরদের গুরুত্ব এবং তাদের সমস্যা সম্পর্কে উপলব্ধি ক্রমশ বাড়তে আরম্ভ করে। এইজন্যই নিখিল ভারত তাঁত পর্ষত, হস্তশিল্প পর্ষত এবং খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন গঠিত হয়। এরা গ্রামীণ কারিগরদের অর্থ সাহায্য, উৎপন্ন দ্রব্যের বিপণি, আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি, নক্সা সম্পর্কে গবেষণা প্রভৃতি ব্যাপারে সাহায্য করছেন। এতে কারিগরদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে এসেছে। আজকাল হাতে তৈরি রেশম, সুতোর কাপড়, কার্পেট, কাঠের কাজ ও ধাতব দ্রব্যাদি রপ্তানি করে বছরে ৪০০ থেকে ৫০০ কোটি টাকা আয় হচ্ছে। বর্তমানে ৩০ লক্ষ তাঁতে বছরে ২ হাজার মিলিয়ান গজ কাপড় তৈরি হচ্ছে। এমব্রয়ডারীর কাজও খুব বিখ্যাত। কাঁসা ও পেতলের বহু জিনিস আজ রপ্তানি করা হচ্ছে। সোনা ও রূপার গহনা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এর ঐতিহ্যও রয়েছে অবিচ্ছিন্ন।

জাপানের সঙ্গে ভারতের আলোচনা হচ্ছে। জাপানের কারিগরী ঐতিহ্যকে ভারত শ্রদ্ধা করে। পুরাতন ঐতিহ্যে উভয়ের প্রচুর মিল থাকলেও শিল্পের অগ্রগতির ফলে জাপানের সমসাময়িক জীবনে প্রাচীন ঐতিহ্যের রেশ মাত্র রয়েছে। তাই ভারত এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে।

চা শিল্পের ইতিহাস

১৯৬৮ উৎপাদন—৩৯৮২ লক্ষ কিঃ গ্রাঃ
রপ্তানি থেকে আয়—২০৯৩ লক্ষ কিঃ গ্রাঃ
(মোট ১১০·৮৫ কোটি টাকা)

কল্যাণী মুখোপাধ্যায়

ভারতের অর্থনীতিতে চা শিল্পের একটা বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। এই শিল্পে যেমন বহু লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে তেমনি এটি থেকে বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জিত হচ্ছে। এই শিল্পটির ইতিহাস একদিক দিয়ে মানুষের সাহস ও সহিষ্ণুতার ইতিহাস।

নানা রকম প্রাকৃতিক বাধা বিপত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে যে ইংরেজরা এই শিল্পটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এই প্রসঙ্গে তাঁদের কথা উল্লেখ করা উচিত। তাঁদের এই সংগ্রামের পেছনে ব্যবসায়গত লাভের প্রশ্ন থাকলেও আমরা তাঁদের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমকে উপেক্ষা করতে পারি না। প্রথমতঃ চা সম্পর্কে তাঁদের কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। যে দেশে কাজ করতে হবে সেই দেশই তাঁরা চিনতেন না। দিনের বেলাতেও সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না এই রকম গভীর বন কেটে, রাস্তা তৈরি ক'রে কাজ সুরু করতে হয়েছে। রোগ, বন্যজন্তু, কীট পতঙ্গের আক্রমণ এবং স্থানীয় অধিবাসীদের বৈরী মনোভাবের বিরুদ্ধে তাঁদের কাজ করতে হয়েছে। শ্রমিক সংগ্রহ করা এবং তাঁদের নিযুক্ত রাখাও ছিল একটা বড় সমস্যা। স্থানীয় অধিবাসীরা চা বাগানের লোকদের কোন সময়েই ভাল চোখে দেখতেন না। কিন্তু প্রবল আত্মবিশ্বাস, সরকারী সহযোগিতা এবং ইংলন্ডের চায়ের বাজার তাঁদের সব সময়েই উৎসাহিত করেছে।

ঐ সময়ে চায়ের রপ্তানি-বাজারে চীনের একাধিপত্য ছিল। সপ্তম এবং অষ্টম শতাব্দিতেও চীনে পানীয় হিসেবে চা প্রিয় ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও চায়ের ব্যবহারে এবং চা উৎপাদনে ভারত যে অগ্রগতি করেছে সেই তুলনায় চীন অনেক পিছিয়ে আছে। চা পানের অভ্যাস চীন থেকে জাপানে এবং তারপর এশিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে ভারতের স্বচ্ছল পরিবারে যথেষ্ট পরিমাণে চা ব্যবহৃত হয়। তবে ভারতে কবে থেকে চা পানের অভ্যাস জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তা বলা কঠিন।
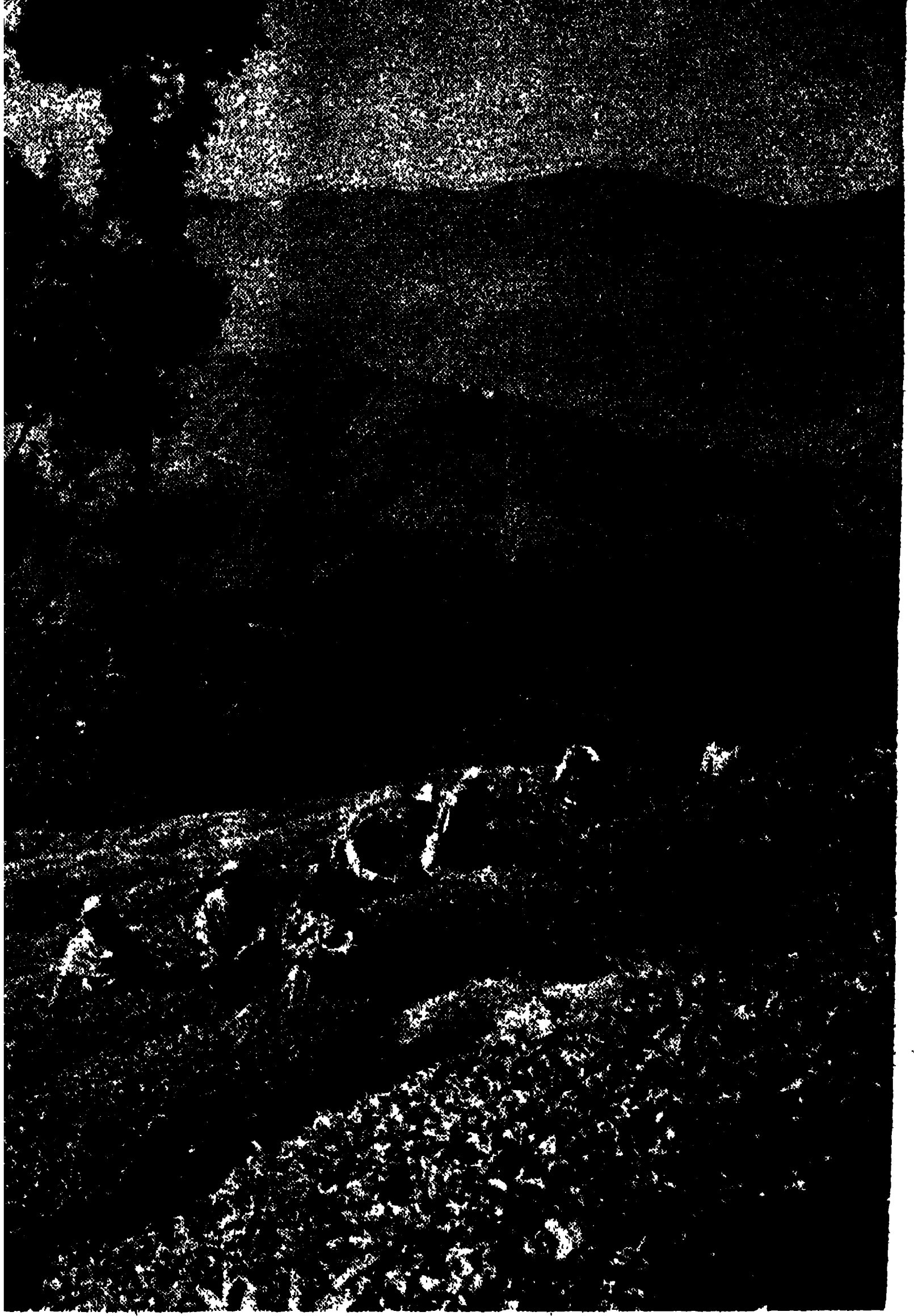
দার্জিলিঙের একটি চা বাগান

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যাতে আরও লাভ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ওয়ারেন হেষ্টিংস বাংলা দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠা করার এবং তিব্বত ও ভুটানের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য বাড়াবার উদ্দেশ্যে চীন থেকে চায়ের কিছু বীজ আনিয়ে ভারতে চায়ের চাষ করতে চেষ্টা করেন। আসামের জঙ্গলে চা গাছ থাকলেও সেগুলি তখনও আবিষ্কৃত হয় নি।

সেই সময়ে চীনের সঙ্গে বৃটেনের বাণিজ্য সম্পর্ক ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাচ্ছিলো। অন্যদিকে চায়ের ব্যবহার বেড়ে যাচ্ছিল। চা পান করাটা ইংলন্ডে তখন আর ফ্যাশন ছিল না কারণ সাধারণ লোকেরাও চা পান করতে সুরু করেছে। চা রপ্তানি চীনের একচেটিয়া ব্যবসায় ছিল এবং এই একাধিপত্য নষ্ট করার জন্য বৃটেন ভারতে চা উৎপাদন করার

দুটি পাতা একটি কুঁড়ি

কথা ভাবতে লাগল।

চা বাগান গড়ে তোলায় আসামের কয়েকজন প্রধান ভূস্বামী, যেমন, রাজা পুরিন্দ্র সিং, মনিরাম দেওয়ান প্রভৃতি যথেষ্ট সাহায্য করেন। এঁদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া ভারতে চা শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ। এই সম্পর্কে আরও অনেকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন কিন্তু তাঁরা ভারতীয় এবং পরাধীন বলে তাঁদের নাম এই শিল্প বিস্তারের ইতিহাসে উল্লিখিত হয়নি।

যাই হোক, ভারতে কোন্ ধরনের চা গাছের চাষ করা হবে তা নিয়ে গোড়ায় মতভেদ দেখা দেয়। কেউ বলেছিলেন চীনা চায়ের বীজ লাগানো হোক আবার কেউ ছিলেন আসামের চায়ের পক্ষে। সরকার তখন এই বাদানুবাদের মধ্যে এগিয়ে এসে স্থির করলেন যে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন মাটিতে বিভিন্ন উচ্চতায় ও আবহাওয়ায় সব রকম চায়ের বীজ লাগিয়ে কোন জায়গায় কোন চা গাছ ভাল হয় তা পরীক্ষা করে দেখা হবে। কাজেই হিমালয়ের পাদদেশের অঞ্চলগুলিতে, আসামে ও দক্ষিণ ভারতে চায়ের গাছ লাগানো হবে বলে স্থির করা হয়। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আসামের জয়পুর ও চাবুয়াতে প্রথম চা বাগান স্থাপন করা হয়। ১৮৩৯ সালের ১০ই জানুয়ারি সর্বপ্রথম ১২ বাক্স আসামের চা বিক্রীর জন্য লন্ডনে পাঠানো হয়।

প্রথম দিকে চায়ের বাগান তৈরি এবং চা উৎপাদনের কৌশল শেখানোর জন্য কিছু চীনা শ্রমিক ও চা উৎপাদনকারীকে ভারতে নিয়ে আসা হয়। তখন চা বাগানে কাজ করার জন্য লোক পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল। বাগানে কাজ করার জন্য অন্যান্য প্রদেশ থেকে শ্রমিক আমদানী করতে হত। তারপর আস্তে আস্তে আমাদের দেশে ভাল চায়ের উৎপাদন বাড়তে লাগলো। এবং অন্ততঃপক্ষে এই ক্ষেত্রে চীনের গৌরব নষ্ট হয়ে গেল।

১৮৩৯ সালে কলিকাতায় বেঙ্গল টি এসোসিয়েসন গঠিত হ'ল এবং ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ম্যাকেঞ্জিলায়াল এন্ড কোং কলিকাতায় প্রথম চায়ের অকসন করেন।

১৮৪২ সালে বেশ অনেকটা জায়গায় চা গাছ লাগানো হয়, তবে শ্রমিকের অভাব তখনও ছিল ব'লে, বেশী জায়গায় চায়ের চাষ করা সম্ভবপর হয়নি। যাঁরা সর্বপ্রথম চা বাগানের কাজ সুরু করেন তাঁরা যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই! এমন ঘন জঙ্গলের মধ্যে তাঁরা কাজ করেছেন যে জঙ্গল প্রকৃতপক্ষে মানুষকেই গ্রাস করে ফেলতে পারে। রোদ ঝড় বৃষ্টি, বন্য জন্তুর আক্রমণ এবং স্থানীয় অধিবাসীদের বিরোধী মনোভাবের বিরুদ্ধে তাঁদের অবিরাম সংগ্রাম করতে হয়েছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, এমন কি মাসের পর মাস অবিরাম বৃষ্টি হয়েছে, সূর্যের মুখ দেখা যায়নি। তখন কোন রাস্তা, রেলপথ ছিল না, জীপ গাড়ী ট্র্যাক্টার ছিল না। গরুর গাড়ী, ঘোড়া বা হাতিতে চড়ে এবং পরবর্তীকালে নৌকা বা স্টিমারে ক'রে গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নদী, নালা, জলা জায়গা পেরিয়ে যাতায়াত করতে হ'তো। এই সব জায়গা ছিল সাপ, মশা, মাছি আর বন্য জন্তুর আড্ডা। কোনও লোকজন ছিল না, টেলিফোন ছিল না অথবা প্রয়োজনীয় কোন জিনিস তাড়াতাড়ি আনার জন্য এরোপ্লেন ছিল না। এই সব অসুবিধে ছাড়াও সব চাইতে বড় অসুবিধে ছিল তাঁরা স্থানীয় কোন ভাষাই জানতেন না।

এই সব বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও চা বাগানের কাজ এগিয়ে চলছিল। চা বাগানের এই উদ্যোক্তারা প্রথমদিকে যে দুর্ভাবনার সম্মুখীন হন তা হ'ল অত্যন্ত ব্যয়ে অপেক্ষাকৃত কম উৎপাদন। কাজেই অংশীদারদের বিশ্বাসও কমে আসতে লাগলো। প্রথম কয়েক বছর কোম্পানীগুলি কোন লভ্যাংশ দিতে পারেনি। ১৮৫০ সাল পর্যন্ত আসাম কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। তারপর যখন কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা ভাল হতে সুরু করল, তখন স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি এবং ইংরেজরা নতুন নতুন চা বাগান স্থাপনে উৎসাহী হয়ে উঠলেন।

ঐ সময়ে শ্রমিকগণের মজুরি ছিল মাসিক ৪ টাকা। কিন্তু শ্রমিক সংগ্রহ করা খুব কঠিন ছিল বলে চা-করগণ ১৮৬১ সালে এই মজুরি বাড়িয়ে মাসিক ৫ টাকা এমন কি ৬ টাকা পর্যন্ত করা যায় কিনা তা ভেবে দেখছিলেন। চা পাঠাবার উপযোগী কাঠের বাক্স তৈরি করার জন্য তখন কোন কাঠের কারখানা ছিল না। ফলে চা বাগানেই কাঠের বাক্স তৈরি করতে হ'ত। একেই তো চা বাগানে কাজ করার জন্য লোকের অভাব ছিল তার ওপরে আবার বাক্স তৈরি করার কারখানার জন্য অনেক লোকের প্রয়োজন হ'ত। যাই হোক এই সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে আসামে আস্তে আস্তে চা শিল্প গড়ে উঠতে থাকে।

দার্জিলিং এবং তরাই

ইংরেজরা দার্জিলিংকে একটা ভাল স্বাস্থ্যনিবাস বলে মনে করত। দার্জিলিঙে চা বাগান করা যায় কিনা তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে ১৮৫৬ সালে সর্বপ্রথম দুটি চা বাগান স্থাপন করা হয়। তরাইতে ১৮৬০ থেকে ১৮৬২ সালের মধ্যে প্রথম চা বাগানটি স্থাপন করা হয়। জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সের আবহাওয়া এতো অস্বাস্থ্যকর ছিল যে ঐ অঞ্চলকে তখন কেবলমাত্র শয়তান বা সাধুর বাসযোগ্য জায়গা বলে মনে করা হত। ওখানে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের প্রকোপ এতো বেশী ছিল যে কেউ সেখানে যেতে চাইতেন না। সেখানেও ১৮৭৬ সালের মধ্যে ১৩টি চা বাগান স্থাপিত হয়। ১৮৭২ সালের মধ্যে কাছাড়ে প্রায় ৮০টি চা বাগান গড়ে ওঠে।

দণ্ডকারণ্যে খারিফ মরশুম

দণ্ডকারণ্যের কৃষির কাহিনী নানা রকম সমস্যার কাহিনী। পূর্ব বঙ্গের যে শরণার্থীরা এখানে এসে বসবাস করতে সুরু করেছেন তাঁরা এসেছেন ব-দ্বীপ অঞ্চল থেকে। সেখানে প্রতি বর্ষায় পলিমাটি প'ড়ে জমি হ'ত উর্বরা আর তাতে ধান ও পাটের চাষ করতেই তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু দণ্ডকারণ্যে এসে তাঁরা সম্পূর্ণ অন্য এক অবস্থার মধ্যে পড়লেন। এখানকার কৃষি বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল এবং সব সময়েই সার ইত্যাদি দিয়ে জমির উর্বরতা রক্ষা করতে হয়। মানুষ যেখানেই নতুন উপনিবেশ স্থাপন করেছে সেখানেই সাধারণতঃ অকরুণ প্রকৃতির বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম ক'রে তবে জয়ী হতে পেরেছে। এখানেও অবিরাম পরিশ্রম ক'রে এবং বৈজ্ঞানিক প্রথা প্রয়োগ করে তবে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এখানে বর্ষার খামখেয়ালির সঙ্গে সব সময়েই সংগ্রাম করতে হচ্ছে।

এই রকম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি ব্যবস্থাকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে। দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার কাজ সুরু হওয়ার আগে ওখানে প্রকৃতপক্ষে কোন রকম জলসেচ ব্যবস্থাই ছিল না সেইজন্য জলসেচকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। দুটি মাঝারি আকারের জলসেচ প্রকল্প ভাস্কাল বাঁধ এবং পাখানজোর জলাধারের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং আরও দুটি মাঝারি আকারের প্রকল্প পারালকোট ও সতীগুড়া বাঁধের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে প্রথমোক্ত বাঁধটির কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেছে এবং দ্বিতীয়টির কাজও সুরু হয়ে গেছে।

যে জলসেচ প্রকল্পগুলির কাজ শেষ হয়ে গেছে সেগুলি ইতিমধ্যেই চতুর্দিকের চেহারা অনেকখানি বদলে দিয়েছে এবং অবশিষ্ট দুটি প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হলে পরিবেশ আরও বদলাবে। এ ছাড়াও কয়েকটি ছোট ছোট জলসেচ প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে, কয়েকটির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং আরও কয়েকটি সম্পর্কে পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে। খারিফ শস্যই এখন দণ্ডকারণ্যের প্রধান ফসল আর ভবিষ্যতেও তাই থাকবে এবং দণ্ডকারণ্যের অর্থনীতিও তাই তার ওপরেই নির্ভরশীল।

এ পর্যন্ত যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে মনে হয় রবি ফসল খারিফের স্থান নিতে পারবে না।

কাজেই এখানে কৃষিব্যবস্থা সফল ক'রে তোলার জন্য যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করা হবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। ভূমি সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রে বাঁধ তৈরি ক'রে, পুকুর কেটে, বর্ষার জলস্রোত নিয়ন্ত্রণ ক'রে মাটি এবং জলসম্পদ অত্যন্ত সতর্কভাবে রক্ষা করতে হয়। প্রত্যেকবার ফসল তোলার পর ঐখানকার মাটির উপযোগী সার দিয়ে পর্যায়ক্রমিক চাষ ক'রে উর্বরাশক্তি বজায় রাখতে হয়। কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতিকে শক্তিশালী ক'রে তোলার জন্য শস্য বাজারজাত করা, মূল্য সংরক্ষণ এবং সমবায় সমিতি গঠন করার মতো নানা রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

কৃষি সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা তৈরি করতে সর্বপ্রথমে পর্যায়ক্রমিক চাষ অর্থাৎ কোন শস্যের পর কোন শস্যের চাষ করলে ভূমির উর্বরা শক্তি বজায় থাকতে পারে তা খুব সতর্কভাবে স্থির করতে হয়। দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষের পরীক্ষামূলক আবাদে গত কয়েক বছর যাবৎ বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন রকম শস্যের চাষ করে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সেই অনুযায়ী স্থির করা হয়েছে যে ১৯৬৯ সালের খারিফ মরশুমে, ওখানে পুনর্বাসন প্রাপ্ত এক একটি পরিবার, প্রায় দুই একর জমিতে ধানের চাষ, ০.৫ থেকে এক একর জমিতে সঙ্কর ভুট্টা, ০.৭৫১ একর জমিতে মেস্তা এবং প্রায় এক একর জমিতে সর্ষে ইত্যাদির চাষ করবেন। গত খারিফ মরশুমে, ৬৪,০০০ একর জমিতে বিভিন্ন শস্যের চাষ করা হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে গত বছরগুলিতে প্রায় সব রকম শস্যের বীজ বাইরে থেকে আনতে হ'ত। কিন্তু পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ এখন এই সম্পর্কে স্বয়ম্ভর হয়েছেন এমন কি ধান ভুট্টার বীজও অনেক সময়ে বাড়তি থেকে যায়। সর্ষে ইত্যাদি তৈলবীজও যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করা হচ্ছে।

১৯৬৪ সাল থেকে রাসায়নিক সারের চাহিদা ভীষণ বেড়ে গেছে। ১৯৬৪ সালে যেখানে ২৬ মেট্রিক টন সার ব্যবহৃত হয়েছিল ১৯৬৮ সালে সেখানে ২,৪০০ মেট্রিক টন ব্যবহৃত হয়েছে।

অতি প্রাচীনকালের বনভূমি থেকে কৃষি জমি তৈরি করা হয়েছে বলে এই এলাকায় পোকা মাকড়ের উপদ্রব খুব বেশী। কীট পতঙ্গাদির আক্রমণ থেকে শস্য রক্ষা করার ব্যবস্থাও রাখতে হয়েছে। এখানে যাঁরা এসে বসবাস সুরু করেছেন, প্রথম দিকে কয়েক বছর, তাঁদের শস্যাদি কীট পতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিনামূল্যে কীটনাশক দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হত। কিন্তু এখন মনে করা হচ্ছে যে যাঁরা কয়েক বছর যাবৎ বসবাস করছেন এবং নিজেদের অবস্থা অনেকটা ভালো করে তুলেছেন তাঁদের এখন আর কীট নাশক দ্রব্যাদি বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে না। শস্য রক্ষার জন্য তাঁদের এখন থেকে কীট নাশক দ্রব্যাদির জন্য মূল্য দিতে হবে।

কৃষির উন্নয়নের জন্য যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তাতে খুব ভাল ফল পাওয়া গেছে। দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা এলাকায় ১৯৬৫ সালে খুব কম বৃষ্টি হয়। ঐ বছরে কৃষি থেকে প্রতি পরিবারের আয় হয় ৪২৪ টাকা। ১৯৬৮ সালে এই আয় ২০০০ টাকায় দাঁড়াবে বলে আশা করা যাচ্ছে। গত কয়েক বছরে কৃষির উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করার ফলে দণ্ডকারণ্য, খাদ্যশস্যের ব্যাপারে স্বয়ম্ভর হয়েছে এবং পণ্যশস্যের উৎপাদন উদ্বৃত্ত হয়েছে।

বর্তমানে দণ্ডকারণ্যের কৃষকরা, খারিফ শস্যের চাষ নিয়ে ব্যস্ত। এবারে বর্ষা কেমন হবে তারই ভাবনায় এই এলাকার অধিবাসীরা এখন উদ্বিগ্ন।

(১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ধরার মানুষ চাঁদে

মানুষের অতি গৌরবজনক মুহূর্ত্ত

১৯৬৯ সালের ২১শে জুলাই, ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময় সকাল ৮-২৬ মিনিট—ঐ দিন ঐ মুহূর্ত্তটি ছিলো মানুষের অতি বড় জয়ের মুহূর্ত্ত। ঐ সময়ে পৃথিবীর মানুষ চাঁদের বুকে প্রথম পা ফেলে। আমেরিকার নির্ব্বাচিত নীল আর্মষ্ট্রং (৩৯), বর্ত্তমান শতাব্দির এই শ্রেষ্ঠতম সাফল্য অর্জ্জন করেছেন। আর্মষ্ট্রং প্রথমে চাঁদের ওপরে নেমে ২০ মিনিট ধ'রে চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করার পর তাঁর সঙ্গী মহাকাশচারী অলড্রিন (৩৯) চাঁদে অবতরণ করেন। চাঁদের ওপরে প্রথম মানুষের মুখ থেকে প্রথম যে কথা উচ্চারিত হয়েছিলো তা ছিলো "মানুষের ছোট একটি পদক্ষেপ মানবজাতির পক্ষে বিপুল সম্ভাবনা।"

দু'জন মহাকাশচারীকে নিয়ে চন্দ্রযান "ঈগল" চাঁদে অবতরণ করার ৬ ঘন্টা ৩৯ মিনিট পর এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত্তটি আসে। এই দু'জন মহাকাশচারী ও তাঁদের সঙ্গী মাইকেল কলিন্সকে যখন ১৬ই জুলাই ৫০ টন ওজনের ১৬.৮ মীটার ব্যাসের এপোলো-১১ মহাকাশ যানে ক'রে মহাশূন্যে উঠিয়ে দেওয়া হ'ল তার ৪ দিন ১৮ ঘন্টা ২৬ মিনিট পর এই মুহূর্ত্তটি আসে। কেপ কেনেডি থেকে ১০৯ মীটার উঁচু (৩৬ তলা) বিশ্বের প্রবলতম যান স্যাটার্ন-৫ রকেটের ওপরে মহাকাশযানটি বসিয়ে তারপর মহাশূন্যে প্রক্ষেপ করা হয়।

প্রক্ষেপ করার পর প্রায় দু ঘন্টা পর রকেটের প্রথম দুটি পর্য্যায় পুড়ে গিয়ে পড়ে যায় তৃতীয় পর্য্যায়ের ইঞ্জিনটি কয়েক সেকেণ্ড জ্বলে মহাকাশ যানটিকে ঘন্টায় ৩৯,২০০ কিলোমীটার গতি দিয়ে দেয়। গতির ইতিহাসে, আর্মষ্ট্রং এবং তাঁর সঙ্গীরা হলেন সপ্তম, অষ্টম ও নবম মানুষ যাঁরা এই গতিতে মহাকাশে বিচরণ করেছেন। এর আগে এপোলো-৮ এবং এপোলো-১০ মহাকাশ যানে দুটি দল এই গতিতে ভ্রমণ করেছেন। এই গতি তাঁদের পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বাইরে ৩২৫,০০০ কিলোমীটার দূরে নিয়ে যায়। প্রক্ষিপ্ত হওয়ার তিন দিন পর তাঁরা চাঁদ থেকে ১১২ কিলোমীটার উচ্চে চাঁদের চতুর্দ্দিকে ঘুরতে থাকেন। তখন অবশ্য এপোলো-১১ কে "চাঁদের চাঁদ" বলা যেতো।

এপোলো-১১ যানটির যে অংশ আর্মষ্ট্রং ও অলড্রিনকে চাঁদের গতিপথে নিয়ে যায় পরে তাঁদের আবার নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনে, তাঁরা ছোট একটা সুরঙ্গ পথ দিয়ে প্রধান যানটি থেকে সেই চন্দ্রযানটিতে প্রবেশ করেন। কলিন্স, কলাম্বিয়া নামক প্রধান যানটিতে থেকে যান। চন্দ্রযান 'ঈগলকে' কলাম্বিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে এই দুজন মহাকাশচারী একটি রকেট ইঞ্জিন ব্যবহার করে চন্দ্রযানের গতিপথ, চক্রাকার থেকে বদলে ডিম্বাকার করে নেন। তারপর তাঁরা অবতরণ করার ইঞ্জিনটি চালিয়ে দেন যাতে আস্তে আস্তে চাঁদের দিকে যেতে পারেন। তাঁদের চন্দ্রযানের সামনের দিকে ত্রিকোণ যে দুটি জানালা ছিলো তা দিয়ে তাঁরা চন্দ্রের শান্ত সমুদ্রের কোন্ জায়গাটায় নামবেন তা খুঁজতে থাকেন। তাঁরা ঐখানে কয়েক সেকেণ্ড ঘুরে গহ্বরবিহীন যথাসম্ভব সমতল একটা জায়গা নির্ব্বাচিত করে নেন। শেষ ২২ মীটার চন্দ্রযান প্রায় সোজাসুজি নীচে নামে। চন্দ্রযানের এক মীটার দীর্ঘ পাগুলি, যখন চাঁদকে স্পর্শ করলো তখনই একটা আলো জ্বলে উঠলো। প্রক্ষিপ্ত হওয়ার ৪ দিন ১১ ঘন্টা ২২ সেকেন্ড পর ২১শে জুলাই ভারতীয় ষ্ট্যান্ডার্ড সময় রাত্রি ১-২৫ মিনিটে মানুষ যাত্রী নিয়ে সর্ব্বপ্রথম যানটি চাঁদের ওপর অবতরণ করে।

রসকট কৃষ্ণ পিল্লে

মহাকাশ ভ্রমণসূচী অনুযায়ী ভারতীয় ষ্ট্যান্ডার্ড সময় সকাল ১১-৪২ মিনিটে চন্দ্রে পদচারণা করার কথা ছিলো কিন্তু তার তিন ঘন্টা ১৬ মিনিট পূর্ব্বেই তাঁরা পদচারণা করেন। পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে অনুমতি পেয়ে আর্মষ্ট্রং, চন্দ্রযানের দরজা খুলে, যানের সঙ্গে সংযুক্ত একটি মই দিয়ে দুই ধাপ নীচে নামেন। সেইখানে থেকে তিনি একটি টেলিভিশন ক্যামেরার সুইচ অন করে দেন যাতে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর চাঁদে অবতরণ দেখতে পায়। তারপর তিনি মইয়ের শেষ ধাপ পর্য্যন্ত নেমে আসেন। সেখানে একটু সময় থেকে একটি পা বাড়িয়ে দিয়ে আশে পাশে চাঁদের মাটি পরীক্ষা করে দেখেন যে, মাটা

সম্ভব কিনা, তারপর এক লাফে নীচে নেমে পড়েন।

তারপর অলড্রিন এসে ওঁর সঙ্গে যোগ দিলে দুজনে মিলে ২ ঘন্টা, ১৩ মিনিট এবং ১২ সেকেন্ড ধ'রে চাঁদে ঘোরাফেরা করেন। তাঁরা সেখানে আমেরিকার পতাকা প্রোথিত ক'রে তারপর ৩৮৪,০০০ কিলোমীটার দূরে বেতার টেলিফোনে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেনও তাঁরা প্লাষ্টিকের ব্যাগে নানা ধরণের পাথর সংগ্রহ করেন। আর্মষ্ট্রং বলেন যে, মাটির নমুনা তোলার জন্য নীচু হতে তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে।

চাঁদের ভূমিকম্প মাপার জন্য একটি সীসমোমীটার, পৃথিবী ও চাঁদের দূরত্ব মাপবার জন্য একটি লেজার রশ্মি প্রতিফলক এবং সূর্যমন্ডলের বায়ুর কণা সংগ্রহ করার জন্য একটি যন্ত্র তাঁরা চাঁদে বসিয়ে এসেছেন।

আর্মষ্ট্রং, চন্দ্রযানের অবতরণ অংশের একটি পদে স্থাপিত একটি ফলকেরও আবরণ উন্মোচন করেন এবং তাতে লেখা শব্দগুলি জোরে জোরে পড়েন। সেগুলি হল '১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে পৃথিবী গ্রহের মানুষ এখানে চাঁদের ওপরে পদক্ষেপ করে। আমরা সমগ্র মানব জাতির পক্ষে শান্তির জন্য এসেছিলাম।'

মহাকাশচারীগণের চলাফেরা ক্যাঙ্গারুর আস্তে আস্তে লাফানোর মতো মনে হচ্ছিলো। চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ হলেও তাঁদের কাছে তা সমস্যা বলে মনে হয়নি। আমষ্ট্রং বলেন যে হাঁটতে কোন অসুবিধে হচ্ছেনা।

মহাকাশচারীগণকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিলো এবং সূর্য্যের আলোতে তাঁদের পোষাক চোখে ধাঁধাঁ লাগাচ্ছিলো।

চন্দ্রপৃষ্ঠ তাঁদের কাছে খুব নরম মনে হয়েছে তবে একটু নীচে শক্ত মনে হচ্ছিলো। মাটির রং কোকোর মতো এবং ভিজে। আর্মষ্ট্রং বলেন যে চাঁদের মাটি আমেরিকার উত্তর ভাগের মরুভূমির মতো মনে হচ্ছিলো। তবে তিনি বলেন যে 'এখানকার মাটিরও একটা নিজস্ব সৌন্দর্য্য আছে।'

চন্দ্রযানে ফিরে এসে তাঁরা কয়েক ঘন্টা ঘুমিয়ে নেন। চন্দ্রপৃষ্ঠে ২১ ঘন্টা, ৩৫ মিনিট থেকে "ঈগল", ভারতীয় ষ্ট্যান্ডার্ড সময় ১১-২৩ মিনিটে আবার প্রধান যানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। প্রত্যাবর্ত্তনের সময় কোন রকম অসুবিধে

বিপুল আকারের রকেট 'স্যাটার্ণের' ওপরে এপোলো রকেট মহাশূন্যে যাত্রা শুরু করলো।

হয়নি। যদি কোন গন্ডগোল হোত তাহলে ওঁরা দুজন বাতাসের অভাবে মারা যেতেন।

সাত মিনিটের মধ্যেই "ঈগল" আবার চাঁদের চতুর্দ্দিকে ঘুরতে শুরু করলো।

অবতরণের জন্য চন্দ্রযানের যে অংশটি ব্যবহার করা হয় সেইটেই আবার ওপরে ওঠার জন্য কাজে লাগানো হয় এবং আমেরিকার পতাকা, অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং বিশ্বের বহু নেতার শুভেচ্ছা বাণীর মাইক্রোফিল্মসহ সেই অংশটিও চাঁদে রেখে আসা হয়েছে।

সাড়ে তিন ঘন্টা পর চন্দ্রযানটি, প্রধান যান "কলাম্বিয়া"র অনুসরণ করতে থাকে এবং ভারতীয় ষ্ট্যান্ডার্ড সময় ৩.১৫ মিনিটে সেটির সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করে। চন্দ্রযানটি চাঁদ থেকে উঠে চাঁদের চতুর্দ্দিকে দুইবার ঘোরার পর এবং "কলাম্বিয়া" ২৭ বার ঘোরার পর দুটি যান আবার মিলিত হয়।

আমষ্ট্রং এবং অলড্রিন মহাকাশচারী দুজন চন্দ্রযান থেকে কলাম্বিয়ায় ঢুকে ঈগলকে পরিত্যাগ করে অর্থাৎ ঠিক ৬ ঘন্টা পূর্ব্বে যে যানটি ওঁদের চাঁদ থেকে নিরাপদে প্রধান যানে নিয়ে এলো সেটি মহাশূন্যে ঘুরতে থাকলো।

চাঁদের চতুর্দ্দিকে ৪৯ ঘন্টা ৩০ মিনিট ঘোরার পর প্রধান যান "কলাম্বিয়া" তিনজন মহাকাশচারীকে নিয়ে পৃথিবীর দিকে রওয়ানা হ'ল। তারপর ওরা তিনজন প্রায় ১০ ঘন্টা ঘুমিয়ে নেন। ২২শে জুলাই ভারতীয় ষ্ট্যান্ডার্ড সময় রাত্রি ১১-২৩ মিনিটে ঘুম থেকে জেগে ওঠার ৪০ মিনিট পর "কলাম্বিয়া", পৃথিবী ও চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ যেখানে প্রায় সমান বলে ধরে নেওয়া হয়েছে সেই জায়গাটি অতিক্রম করে।

প্রধান যানটি ২৪শে জুলাই রাত্রি ১০-২২ মিনিটে প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ করে।

প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত এপোলো-১১-র যাত্রাকে মহাকাশ বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব্ব সাফল্য বলা যেতে পারে। একে, এপোলো পরিকল্পনার অধীনে যে ৩৫০,০০০ বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনীয়ার ইত্যাদি কাজ করেন তাঁদের, সর্ব্বোপরি আমেরিকা ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মহাকাশচারীগণের অনন্য সাফল্য বলা যেতে পারে।

ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগ

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসারে উৎসাহ দেওয়াই হ'ল অধিক কর্মসংস্থান করা। তাই আমাদের অর্থনীতিতে এর স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ১৯৬৮ সালে রেজিষ্ট্রীকৃত শিল্প ইউনিটগুলির হিসাবে দেখা যায় ৯১.৬ শতাংশই ক্ষুদ্রায়তন শিল্প। বড় শিল্পের সংখ্যা মাত্র ৮.৪ শতাংশ। ক্ষুদ্রায়তন ইউনিটের সংখ্যা হচ্ছে ২৭ হাজার এবং বৃহৎ শিল্পের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র ২ হাজার। আবার রেজিষ্ট্রী করা হয়নি এ রকম ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ইউনিটের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় তিন লক্ষ।

১৯৬৫-৬৬ সালে অর্থাৎ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছরে আধুনিক ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৪০০ কোটি টাকা। এগুলিতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩৯০ কোটি টাকা এবং শ্রমিক সংখ্যা ২৭ লক্ষ। এগুলির মধ্যে রেজিষ্ট্রীকৃত কারখানাগুলির মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১১০০ কোটি টাকা, মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ২০০ কোটি টাকা এবং শ্রমিক সংখ্যা ১০ লক্ষ।

১৯৬০-৬১ সাল থেকে ১৯৬৪-৬৫ সাল পর্যন্ত রেজিষ্ট্রীকৃত ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংখ্যা ২৮ শতাংশ বেড়েছে এবং এগুলির প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন সংস্থার সাহায্য পাবার যোগ্য। এগুলির সাহায্যে মূলধনের পরিমাণ ৬২ শতাংশ, কর্মসংস্থান ২০ শতাংশ এবং মোট উৎপাদন ৭০ শতাংশ বেড়েছে।

সরকারের শিল্প নীতিতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারখানা ও যন্ত্রপাতি নিয়ে মোট মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ সাড়ে ৭ লক্ষ টাকার বেশী না হলে তাকেই ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বলা হয়।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে দেশের শিল্প কাঠামোর একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলে মনে করা হয়। যন্ত্রপাতি, ডিজেল ইঞ্জিন, মৌলিক রাসায়নিক দ্রব্য এবং কিছু কিছু ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি উৎপাদন করে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি দ্রব্য উৎপাদন শিল্প বলে গণ্য হবার যোগ্য হচ্ছে। এগুলি ক্রেতা এবং উৎপাদক উভয়ের সেবা সমানভাবে করে যাচ্ছে।

সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে যে সব বৃহৎ শিল্প গড়ে উঠেছে, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি তার প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে পরিপূরক হচ্ছে। এগুলি কন্ট্রাকটারদের কাজ করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ক্ষুদ্র ইউনিটগুলিকে দিয়ে অংশ তৈরি করিয়ে বৃহৎ শিল্পগুলি কেবলমাত্র সংযোজনের কাজ করছে। এতে উৎপাদন ব্যয় কম হয় এবং কর্মদক্ষতা অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব হয়।

বৃহৎ শিল্পগুলির মত ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিও রপ্তানি বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছে। রপ্তানি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রথমদিকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি আভ্যন্তরীন চাহিদা মেটাবার কাজে নিজেদের শক্তি সীমাবদ্ধ রেখেছিল। পরে উন্নত যন্ত্রপাতি, সর্বাধুনিক কারিগরী জ্ঞান ও কারখানা স্থাপনের সুবিধাজনক ব্যবস্থার ফলে উৎপাদন বহুমুখী হয়েছে এবং উৎপাদিত জিনিসগুলিও ভালো হচ্ছে।

ইতিমধ্যে কয়েক শ্রেণীর শিল্পকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হলে বৃহৎ শিল্পগুলি ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রয়োজনীয় মৌলিক দ্রব্যাদি উৎপাদন ক'রে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে সরবরাহ করতে সক্ষম হ'বে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সেগুলি প্রসেস ক'রে হয় বৃহৎ শিল্পগুলিকে দেবে কিম্বা নিজেরাই বিক্রীর ব্যবস্থা করবে।

আমদানীর পরিপূরক

আজকাল আমদানীর পরিপূরক উদ্ভাবনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। চেষ্টা হচ্ছে যাতে দেশজ উপকরণে এগুলি তৈরি করা সম্ভব হয়। এগুলি উৎপাদনের সময়ে আভ্যন্তরীন বাজার এবং বিদেশের বাজারের চাহিদা ও মান বিবেচনা করা হবে। বর্তমানে অ্যালুমিনিয়ামের বৈদ্যুতিক তারের বদলে তামার তার সাফল্যের সঙ্গে উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এইভাবে বহু জিনিস উদ্ভাবিত হচ্ছে।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সাফল্য খুবই উৎসাহ ব্যঞ্জক। তবে সব জিনিসই এই শিল্পের মাধ্যমে করা সম্ভব এ ধারণা ভুল। কাজের ধরন দেখে বিচার করতে হবে কোনটা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের আওতায় আসবে আর কোনটা বৃহৎ শিল্পের দায়িত্বে থাকবে।

পশ্চিম জার্মাণী থেকে খাদ্য সাহায্য

ভারতকে খাদ্য সাহায্য দান সম্পর্কে ভারত ও ফেডারেল জার্মাণ প্রজাতন্ত্রের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী পশ্চিম জার্মাণী ১৯৬৯ সালের মধ্যে ভারতকে ৬৪ হাজার টন গম দেবে। তা ছাড়া ইওরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ভারতের জন্য তৈরী সাহায্য ভাণ্ডারে পশ্চিম জার্মাণী আরও ২৬ হাজার টন খাদ্যশস্য দেবে। এই খাদ্য সাহায্যের মোট মূল্য দাঁড়াবে আনুমানিক ৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা।

ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের আর্থিক সীমা বর্ধিত

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রনালয় ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের সর্বোচ্চ আর্থিক সীমা সমভূমি অঞ্চলে ১৫ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫ লক্ষ টাকা এবং পার্বত্য অঞ্চলে সর্বাধিক ৩০ লক্ষ টাকা করতে রাজী হয়েছেন।

পাঠকগণের প্রতি আহ্বান

পূর্বের সংখ্যাগুলিতে আমরা খসড়া চতুর্থ পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করেছি। আমরা এখন আমাদের পাঠকগণের কাছ থেকে খসড়া পরিকল্পনার যে কোন বিষয় সম্পর্কে তাঁদের মন্তব্য আহ্বান করছি। প্রবন্ধাদি অনধিক ২০০ শব্দের হওয়া উচিত। প্রকাশিত রচনার জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হবে।

সাধারণ অসাধারণ

শুধু বুদ্ধিবলে

১৮ বছর আগে,, পাঞ্জাবের জালন্ধার জেলার আলওয়ালপুরের শ্রীঅমরনাথকে দেখলে একথা ভাবা আশ্চর্য্য ছিল না, যে, লোকটার জীবনে হতাশা এসেছে, এ আর কাজ করতে পারবে না। বিরাট এক পরিবারের কর্ত্তা, সঙ্গতি শুধু ৪৫ একরের একটি খামার। যা কিছু হয় সেখানে তা পেটের গহ্বরে হারিয়ে যায়। তবু প্রয়োজন মেটে না। দুদ্দিন বেশীদিন চললে মানুষ আবার উঠে দাঁড়িয়ে তা'র বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে উদ্যত হয়। এক্ষেত্রেও তাই হ'ল—অবস্থার চাপে পড়ে উপায় খুঁজতে গিয়ে তিনি একদিন হাতে নিলেন উন্নত চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে লেখা একটা বই। ১৯৫২ সালে প্রথম তিনি তাঁর জমিতে একটা নলকূপ বসালেন। পর্য্যাপ্ত জলসেচের দরুণ সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফল পেলেন। আগে একরে যেখানে ৩ কুইন্টাল ফসল হ'ত তা দাঁড়াল ৭॥ কুইন্টালে। ফলে সেবারে শ্রীঅমরনাথের লাভ হ'ল ২০,০০০ টাকা। এরপর আর তাঁকে পায় কে? স্বাচ্ছলতা এমন কি সমৃদ্ধির চাবিকাঠি তাঁর হাতে। পরের বছরই তিনি ঐ জমিতে আর একটা নলকূপ বসালেন। লাভের অঙ্ক লাফিয়ে চলল। '৫৬ সালে কিনলেন ট্র্যাক্টার, ফলে ৪৫ একর জমি চাষ আর সমস্যা রইল না। ট্র্যাক্টারটা ভালো ক'রে কাজে লাগাবার জন্যে তিনি আরও ৪৫ একর জমি কিনলেন এবং আরও কয়েকটা নলকূপ বসালেন। ইতিমধ্যে মুখে মুখে তিনি প্রচুর ফলন বীজের কথা জানলেন। সদ্যলব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করায় একর প্রতি ফসলের পরিমাণ দাঁড়ালো ১৩ কুইন্টালে।

শ্রীঅমরনাথ এখন একজন প্রগতিশীলও প্রতিষ্ঠিত সুদক্ষ চাষী।

নিঃস্বার্থ সেবা

মহারাষ্ট্রের ভাটকুলি ব্লকের গ্রামসেবক শ্রী জি. এ. খান যখন 'শ্রেষ্ঠ গ্রামসেবক' নির্ব্বাচিত হ'লেন তখন ব্লকের সমস্ত লোক যে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন তা' বলাই বাহুল্য। শ্রী খানকে ব্লকের সকলে খাতির ক'রে ডাকেন 'ডক্টার সাব' বা 'পান্ডে বুয়া' ব'লে।

১৯৫৩ সালে এম.এস্-সি পরীক্ষায় পাশ করার পর শ্রীখান নিযাদ জেলার জাতীয় ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে ভর্ত্তি হয়ে গেলেন। কিন্তু এই কাজে তাঁর মন লাগল না। তিনি জনসাধারণের সেবায় আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে চাইলেন।

১৯৫৫ সালে এই কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি উন্নয়ন বিভাগে কাজ নিলেন। বালোঘাট জেলার ওয়ারা সেওয়ানি ও নাগপুর জেলার আরসাতে তিনি 'বেসিক্' ও 'এক্সটেনশান'-এ তালিম নিলেন। তারপর তিনি সাস্‌লিতে নতুন কাজ নিয়ে গেলেন। সেখানে তাঁর নিঃস্বার্থ জনসেবার গুণগান তাঁর নিজের জেলা অমরাবতীতে গিয়েও পৌঁছল এবং তাঁকে অমরাবতীতে ফেরৎ পাঠাবার জন্যে তাগাদার পর তাগাদা আসতে লাগল। শ্রীখান অমরাবতীতে ফিরে গেলেন এবং জনসেবাব্রতে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে দিলেন। পশু চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য, কৃষি, সমবায়, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি যেভাবে কাজ করেছেন তা সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে। বিশেষ ক'রে সমবায় ব্যবস্থা গ্রহণে এবং প্রচুর ফলন বীজ ব্যবহারের ব্যাপারে কৃষকদের যেভাবে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সম্মত করিয়েছেন, এবং এসব বিষয়ে উৎসাহী ক'রে তুলেছেন তা শুধু উল্লেখযোগ্য নয় তা' উচ্চ প্রশংসা লাভের যোগ্য।
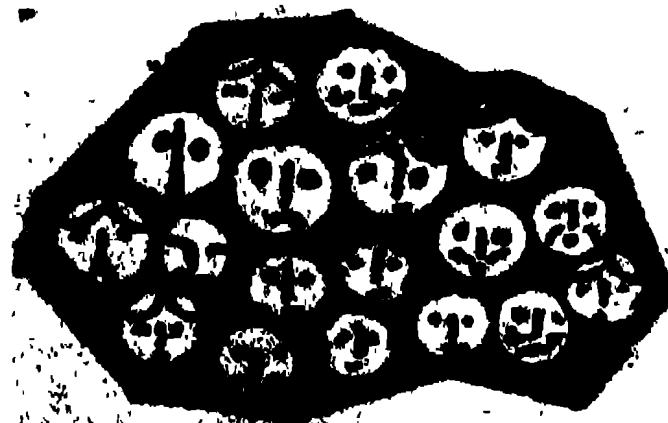
বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিদ্যায় শিক্ষিত

এ বছরে দেশে বিজ্ঞান ও যন্ত্র বিদ্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ১০ লক্ষের মাত্রা ছাড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশে বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষিতের মোট সংখ্যা ছিল ৯৮৪ ৮০০ জন। এঁদের মধ্যে শতকরা ৫৪ ভাগ ছিলেন পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান ও পশু চিকিৎসা বিদ্যায় শিক্ষিত। ১৯৫০ সালে দেশে বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল ১৮৮,০০০ মাত্র।

গত বছরে স্নাতকোত্তর বিজ্ঞানীদের মধ্যে ৯.২ শতাংশ ছিলেন রসায়নের ১৮.৪ শতাংশ গণিতের, ১৩.৬ শতাংশ পদার্থবিদ্যার, ৮.২ শতাংশ কৃষি বিজ্ঞানের ১৪.৫ শতাংশ উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞানের এবং ১৮ শতাংশ সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র বা ছাত্রী।

ইঞ্জিনীয়ারিং বিজ্ঞানের ছাত্রদের মধ্যে পৌর ইঞ্জিনীয়ার ছাত্রদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক এবং তারপরেই স্থান ছিল মেকানিক্যাল ও বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ছাত্রদের। রাসায়নিক ইলেক্‌ট্রোনিক ইঞ্জিনীয়ারগণের সংখ্যা ৫ শতাংশেরও কম ছিল।

যে বোতল ভাঙে না

সুইডেনে কাঁচ ও ধাতুর একজন বিশিষ্ট উৎপাদনকারী একটি নতুন ধরনের কাঁচের বোতল তৈরি করেছেন যা ভেঙেও ভাঙে না। বিজ্ঞাপনে ঘোষণা করা হয় 'কাজ হয়ে গেলে ফেলে দিন।'

২৮ সেন্টি লিটার মাপের এই বোতলটি উদ্ভাবন করতে ১৮ মাস সময় লেগেছে গবেষণায়। তার জন্যে খরচ হয়েছে ২.০০০০০ ডলার। ঐ একই মাপের সাধারণ বোতলের ওজন যেখানে ১৭৫ গ্রাম সেখানে এই নতুন ধরণের বোতলের ওজন হ'ল ১৪৫ গ্রাম। কাঁচের বোতল অথচ ছুঁড়ে ফেললে ভাঙে না তার কারণ হ'ল নতুন বোতলের কাঁচের গায়ে প্লাস্টিকের একটা আস্তরণ লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই প্লাস্টিক তিন বছরেও নষ্ট হয় না। উৎপাদনের প্রাথমিক লক্ষ্য মাত্রা হ'ল দিনে ৫ কোটি বোতল।

বে শতকরা ৪৫ এর মত। বছরে ঐ গ্রামের মোট আয়ের রিমাণ হচ্ছে ১৫.৮৩৬টা এর মধ্যে কৃষির সূত্রে আসে শতকরা ৫ ভাগ।

বাজাগ ও চারাতে সপ্তাহে সপ্তাহে যখন হাট বসে তখন বগারা কেনা বেচা করে। যাই হক ওজন মাপ প্রভৃতির মান ম্বন্ধে তাদের কোনোও ধারণাই নেই।

শিক্ষার অগ্রগতি একেবারেই হয়নি। নিরক্ষরতা ব্যাপক। ৯৫৪ সালে যে উপজাতি কল্যাণ বিভাগ খোলা হয়েছিল, সেই বভাগের স্থাপিত আদিবাসী বালক আশ্রমের খাতায় সর্বসাকুল্যে ০টি ছেলে মেয়ের নাম ছিল।

এই স্কুলটি সম্বন্ধে খোঁজ খবর করে দেখা গেছে যে, গ্রামের অধিবাসীদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করতে স্কুলটি ব্যর্থ হয়েছে। বরং গ্রামের লোকেরা মনে করেন এতে সময় ষ্ট হয়। যে সব ছেলেমেয়ে স্কুলে যায় তারা স্কুলের দেওয়া াবার খেতে যায়, পড়তে নয়।

১৯৬১ সালে উন্নয়ন ব্লক ন্যায্যদামে নিত্য প্রয়োজনের জনিস যোগাবার উদ্দেশ্যে একটি বহু উদ্দেশ্যমূলক সমবায় সমিতি াপন করে। কিন্তু এটির ভাগ্যও স্কুলের মত দাঁড়ায়। গ্রামের ানুষগুলির বীতরাগের কারণ আছে। যেমন তাঁরা বলেন থমত প্রয়োজনীয় সব জিনিস পাওয়া যায় না, দ্বিতীয়ত যে সব জনিস বিক্রী করা হয় তার দর ন্যায্য নয়। এ ছাড়াও সমবায় মিতির পরিচালন ব্যবস্থায় শিলপুরীর কোনোও লোক না থাকার ন্যেও এঁরা বিরক্ত।

সরকারী প্রতিনিধিদল এবং উচ্চবর্ণের হিন্দু জাতির সংস্পর্শে এসে এদের মনোভাবের অল্প কিছু পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু নজেদের চিরাচরিত জীবন ধারা তারা আঁকড়ে ধরে রাখতে ায়। শিলপুরীর গতানুগতিক জীবনে যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে তার কৃতিত্ব আরণ্য বিভাগের।

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে এবং জমি চাষের ব্যাপারে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। যেমন বৈগারা এখন আগের মত 'আমরাই সবস্ব' গোছে ভাব করে না। অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে তারা মিলে মিশে থাকতে শিখেছে এবং চারা ও বাজাগের বাজারে তারা বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ পায় বলে পরস্পরের সঙ্গে আদান প্রদানে অভ্যস্ত হয়েছে।

সামগ্রী বিনিময় প্রথায় প্রয়োজন মেটাবার নিয়ম ক্রমশঃ উঠে যাচ্ছে। তারা টাকা দিয়ে জিনিসপত্র কিনছে। বাজারেও দোকায় লেনদেন হচ্ছে। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে শিলপুরীর শতকরা ৪৭.৫ ভাগ লোক পুরোনো মুদ্রা চেনে ও শতকরা ২৩.৬ ভাগ নতুন মুদ্রার সঙ্গে পরিচিত।

সা: বহু বিবাহ তুলে দেওয়া, হিন্দু ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি, সমাজে কোরীদের উচ্চস্থান দেওয়া এবং গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি গুরুত্ব পরিবর্তন এখন ধীরে ধীরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

পথচারীদের অসর্কতা

(১৪ পৃষ্ঠার পর)

যা কিছু শেখে তা বাবা, মা, বড় ভাইবোনেদের কাছ থেকেই শেখে।

বৃদ্ধ পথচারীগণও আর একটা সমস্যা। বহু পূর্ব্বে যখন বর্ত্তমানের তুলনায় রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা ছিলো অত্যন্ত কম তখন তাঁরা রাস্তায় চলাফেরা সম্পর্কে কতকগুলো যে ধারণা করে রেখেছেন, সেই অনুযায়ী এখনও রাস্তায় চলেন ফলে তার জন্য যথেষ্ট মূল্য দেন।

বর্ত্তমানে রাস্তায় চলাচলকারী বাইসাইকেলের সংখ্যা ভীষণ বেড়ে গেছে। অসতর্কভাবে বাইসাইকেল চালানোর ফলে দুর্ঘটনায় পতিত সাইকেল আরোহীর সংখ্যাও বেড়ে গেছে।

মোটর চালকের সমস্যা

রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটবার মূল কারণগুলি নির্ণয় করা সম্পর্কে সম্প্রতি কয়েক বছর যাবৎ পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। খারাপভাবে গাড়ী চালালে দুর্ঘটনার সংখ্যা যে বাড়ে এবং নিরাপত্তামূলক নিয়মগুলি মেনে চললে দুর্ঘটনার সংখ্যা কমে যায়, মোটর চালকগণকে তা বোঝানোর কোন একটা কার্য্যকরী উপায় পাওয়া গেলে রাস্তার দুর্ঘটনা অনেকখানি কমে যাবে।

প্রায় সকলেই জানেন যে, দুশ্চিন্তা, তাড়াতাড়ি পৌঁছুনোর তাগিদ, অবসাদ ইত্যাদি অবস্থাগুলি দুর্ঘটনার মূল কারণ। মোটরচালক যখন ষ্টিয়ারিং হাতে নিয়ে বসেন তখন এইসব দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা তাঁর সঙ্গেই থাকে। কাজেই তাঁর শারীরিক মানসিক অবস্থাও মোটর চালনাকে প্রভাবিত করে। মোটর চালক যদি এগুলি বুঝতে পারেন তাহলে সেই অনুযায়ী গাড়ী চালানোও সংশোধন করে নিতে পারেন। কেউ কেউ তা করেন কেউ আবার তা করেন না।

শতকরা যে ৩২টি মোটর দুর্ঘটনায় পথচারীরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সেগুলির মধ্যে ২৫টির ক্ষেত্রে মোটর চালকের ভুলে দুর্ঘটনা হয় বাকিগুলির জন্য পথচারীরা দোষী।

নিজের গাড়ীর গতি বাড়িয়ে অন্য গাড়ীকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জেদ, ভুল দিক দিয়ে অন্য গাড়ীকে ছাড়িয়ে যাওয়া, দাঁড়িয়ে থাকা কোন গাড়ীর পাশ দিয়ে অসতর্কভাবে যাওয়া এবং রাস্তার অন্যান্য যানবাহন বা পথচারীদের সম্পর্কে অসতর্ক মনোভাব ইত্যাদি, মোটর দুর্ঘটনার প্রধান কারণ।

(ডানলপ পত্রে শ্রী আর.এন. মিত্রের সমীক্ষার আধারে)

ব্যাণ্ডেল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

এ.কে. গাঙ্গুলী

পশ্চিমবঙ্গে উচ্চ ভোল্টে বিদ্যুৎ পরিবহন ব্যবস্থা প্রথম (হাইভোল্টেজ গ্রীড) সুরু হয় ব্যান্ডেল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে। ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড এই কারখানার নির্মাতা ও পরিচালক।

১৯৬২ সালের ২০শে এপ্রিল তৎকালীন মার্কিণ রাষ্ট্রদূত জন কেনেথ গ্যালব্রেথ আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রকল্পের নির্মাণ কার্যের উদ্বোধন করেন। এই কারখানার মোট ৪টি ইউনিটের প্রতিটির বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৮৮.৯ মেগাওয়াট। মোট ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম আরও দুইটি ইউনিট বসাবার ব্যবস্থা আছে। এই দুইটি ইউনিট চালু হলে এই কারখানা মোট ৬০০ মেগাওয়াটের বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে।

ব্যান্ডেলের কারখানা বৃহত্তর কলকাতা এলাকায় বিদ্যুতের অভাব পূরণে সহায়তা করা ছাড়াও, রেলপথে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। এ ছাড়া কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন, বিভিন্ন শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানও ব্যাণ্ডেল থেকে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করে। যে সব অঞ্চলে কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন বিদ্যুৎ সরবরাহ করে না এবং ভবিষ্যতেও করবে না, ব্যাণ্ডেল থেকে সে সব অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।

পশ্চিম বাংলায় রাসায়নিক, ভারী এবং হাল্কা ধরনের শ্রম শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে ব্যাণ্ডেল প্রকল্প অনেক সাহায্য করেছে। এই রাজ্যে পাম্পের সাহায্যে সেচের জল সরবরাহে ব্যাণ্ডেল প্রকল্প সাহায্য করে।

কলকাতা থেকে ৪০ মাইল উত্তর পশ্চিমে এবং ব্যান্ডেল থেকে ৭ মাইল উত্তরে এই কারখানাটি অবস্থিত।

এই প্রকল্পের বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা থেকে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার (সাড়ে ২৮ কোটি টাকা) ঋণ দেওয়া হয় এবং স্থানীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য পি. এল ৪৮০ তহবিল থেকে ৮ কোটি ২০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়।

বর্তমান আর্থিক বছরে ভারতে আরও প্রায় ২০ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়বে। লক্ষ্য করবার বিষয়, যে ১৯৫০ সালে ভারতে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণই ছিল ২০ লক্ষ কিলোওয়াটের মতন। ১৯৬৮-৬৯ সালের আর্থিক বছরে ভারতে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াবে দেড় কোটি কিলোওয়াট।

এই দেড় কোটি কিলোওয়াটের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশের উৎপাদন হবে আমেরিকার সাহায্যে স্থাপিত ১০টি কারখানার।

অন্যান্য দেশের চাইতে আমেরিকার কাছ থেকেই ভারত বিদ্যুৎ শক্তির ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য বেশী সাহায্য পেয়েছে। বিদ্যুতের অভাব পূরণে ভারত আমেরিকার কাছ থেকে বিদেশী মুদ্রায় ৪ কোটি ৫৭ লক্ষ ডলার (৩৪২.২৮ কোটি টাকা) পেয়েছে, অপরদিকে স্থানীয় মুদ্রায় পেয়েছে ৩৪৬ কোটি টাকা। পি. এল. ৪৮০ কর্মসূচী অনুযায়ী ভারতে মার্কিণ কৃষি পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে এই অর্থ দেওয়া হয়। এই অর্থ সাহায্য ভারতে বিদ্যুৎ শক্তি প্রসারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

আমেরিকার সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির নির্মাণ কার্য শেষ হলে এ থেকেই সাকুল্যে কম বেশী ৬৫ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। তখন ১০টি প্রকল্পের মোট উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়াবে ৪০ লক্ষ কিলোওয়াটের মতো। এর মধ্যে তারাপুরে ভারতের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ভারতের বৃহত্তম তাপ বিদ্যুৎ-কেন্দ্র চন্দ্রপুরা এবং দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র শরাবতীর নাম উল্লেখযোগ্য।

আমেরিকার সাহায্য প্রাপ্ত ১০টি কেন্দ্র থেকে পাওয়া যাবে ২৫ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ। এই ১০টি কেন্দ্রকে ভারতে মার্কিণ কৃষিপণ্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভান্ডার থেকে সাহায্য করা হয়েছে।

ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রায় ২০০০ কিলোমীটার রেলপথে বিদ্যুতের সাহায্যে রেলগাড়ী চালানো সম্ভব হচ্ছে, শ্রমশিল্পের প্রসার ঘটেছে এবং লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, ভারতে বিদ্যুতের শতকরা ৭০ ভাগ ব্যবহৃত হচ্ছে নানা শ্রমশিল্পে।

(৯ পৃষ্ঠার পর)

সব সমস্যে আলোচনা করছেন। সকলেই আশা করছেন যে যথেষ্ট ফসল ঘরে তুলতে পারবেন। গত তিনটি মরশুমে ফসল ভাল হওয়ায় এবারে তাদের উৎসাহ ও আশা অনেক বেড়ে গেছে। তবে যদি উপযুক্ত পরিমাণে বৃষ্টি হয় তাহলে দণ্ডকারণ্যের অর্থনীতি যে নতুন এক পর্যায়ে পৌঁছবে সেটা আশা করা অন্যায় হবে না।

১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯ এই দুই বছরের রবি মরশুমে পরীক্ষামূলকভাবে যে গমের চাষ করা হয় তাতে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে দণ্ডকারণ্যের কর্তৃপক্ষের আবাদে এবং পুনর্বাসিতদের জমিতে গমের চাষ করা যেতে পারে। এই দুই বছরে প্রত্যেক রবি মরশুমে ২০০ একর জমিতে গমের চাষ করা হয়। এর ফলে এখানে চাষের উপযোগী নানা ধরণের যথেষ্ট পরিমাণ গমের বীজ পাওয়া গেছে। গম চাষের জন্য কি রকমভাবে জমি তৈরি করতে হবে, কি কি সারের প্রয়োজন হবে, স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী কি পরিমাণ জলসেচের প্রয়োজন, এই শস্য বিক্রী করলে কি পরিমাণ লাভ পাওয়া যেতে পারে ইত্যাদি বিষয়গুলি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। আদিবাসীসহ এখানকার অধিবাসীরা সকলেই আশা করছেন যে তারা এখানে গমেরও ভাল ফসল পাবেন।

এই ক' বছরে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা কাজে লাগালে এবং জলসেচের জন্য যথেষ্ট জল পাওয়া গেলে, অদূর ভবিষ্যতে দণ্ডকারণ্যে গমের চাষও লাভজনক হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

নতুন পর্যায়ের এক টাকার নোট

কেন্দ্রীয় সরকার শীঘ্রিই এক নতুন পর্যায়ের এক টাকার কারেন্সী নোট বাজারে ছাড়বেন। নক্সা অপরিবর্তিত থাকলেও এই নতুন নোটগুলোর গায়ে ক্রমিক সংখ্যার পাশে ইংরেজী বড় অক্ষর 'বি'-র বদলে 'সি' থাকবে। নতুন নোটগুলোর ক্রমিক সংখ্যার আগে এ/ও লেখা থাকবে।

জলজ গুল্ম থেকে খাদ্য

স্থির জলে আকাশের রং ছায়া ফেলে। ভোর বেলায় ও সন্ধ্যায় তাই জলের রং হয় লাল এবং গ্রীষ্মকালে নির্মেঘ দিনে জলের রং হয়ে ওঠে গাঢ় নীল। কিন্তু প্রতিবিম্বনের ফলে জলের সবুজ রং খুব কমই হয়। প্রচুর সংখ্যক ঝাঁঝি জাতীয় জলজ গুল্ম থকবার জন্যেই প্রধানত জলের রং সবুজ হয়ে থাকে।

অন্য এক ধরণের ঝাঁঝি বা জলজ গুল্ম আছে যার ইংরেজী নাম ক্লোরেলা। এগুলো এদেশে প্রচুর হয়।

সম্প্রতি পত্রপত্রিকায় এই ধরণের জলজ গুল্মের (ক্লোরেলা) নাম খুব দেখা যাচ্ছে। এর কারণ মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা। দীর্ঘ মহাকাশ যাত্রায় এই হাল্কা ওজনের গুল্মগুলো মহাকাশ যানের বাতাসকে বিশুদ্ধ রাখে। প্রধানত: অল্প জলে এগুলো ভাসমান অবস্থায় থাকে। মহাকাশ যাত্রার ক্ষেত্রে এই গুল্মগুলো ভাসমান অবস্থায় থাকে।

মহাকাশ যাত্রার ক্ষেত্রে এই গুল্মগুলো ব্যবহার করতে হয়তো এখনো দেরী আছে। কিন্তু নিকট ভবিষ্যতে এগুলো অন্যভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অনেক রকমের পরিষ্কার জলের মাছ এগুলো থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। কিন্তু সরাসরিভাবে এই শ্যাওলা-জাতীয় গুল্ম খেয়ে বেঁচে থাকে এক ধরণের কীটানু। আর মাছের পক্ষে প্রথম দিকে এই কীটানুগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য, তাই মাছের খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে ঝাঁঝি বা জলজ গুল্মের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এ ছাড়া এটা প্রমাণিত হয়েছে, মাছের মধ্যে যে কটি ভিটামিন মেলে তার কয়েকটি আসে এই জলজ গুল্ম থেকে।

সম্প্রতি ঝাঁঝিকে শিল্পে কাঁচামাল ও খাদ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা সম্পর্কে সারা বিশ্বে গবেষণা হচ্ছে। ক্লোরেলার মধ্যে রয়েছে ক্লোরোফিল যা দুর্গন্ধনাশক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু খাদ্য হিসেবে ব্যবহারেরও এর মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে। ক্লোরেলায় যে পরিমাণ অ্যামিনো অ্যাসিড আছে তার প্রায় সমান অংশ রয়েছে সাদা ময়দায়। এর মধ্যে আছে ভিটামিন এ, সি, কে এবং বি-১। একজন বিজ্ঞানীর মতে, লেবুর রসে যে পরিমাণ বি-১ ভিটামিন থাকে তার প্রায় সমান পরিমাণ রয়েছে ক্লোরেলা ধরণের জলজ গুল্মে। জাপানে সবুজ চায়ে কিংবা মুরগীর ঝোলে গুঁড়ো মিশিয়ে দেওয়া হয়।

ক্লোরেলায় এতটা খাদ্যমূল্য থাকায় মহীশূরের কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রযুক্তিবিদ্যা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ক্লোরেলা নিয়ে গবেষণা চলছে। নয়া দিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানেও ক্লোরেলা সহ অন্যান্য ধরণের জলজ গুল্ম নিয়ে গবেষণার একটি প্রকল্প রয়েছে।

মশলা থেকে আয় বাড়ছে

বিশ্বে যত রকমের মশলাপাতি আছে তার সমস্তই আমাদের দেশে উৎপন্ন হয়। একমাত্র ভারতই সমস্ত রকম মশলাপাতি রপ্তানী করে। গত কয়েক বছর বিদেশের বাজারে ভারতীয় মশলা, বিশেষ করে কালো মরীচ, আদা, বড় এলাচ ও হলুদের চাহিদা খুব বেড়ে গেছে এবং আমাদের আয়ও যথেষ্ট বেড়েছে।

১৯৬৪-৬৫ থেকে ৬৭-৬৮ পর্যন্ত মশলার রপ্তানী বেড়েছে। ১৯৬৪-৬৫ সালে ১৬.৫৪ কোটি টাকার মশলা (৫২,৮৫৪ টন) বিদেশে রপ্তানী করা হয়েছিল। ১৯৬৭-৬৮ সালে এর পরিমাণ ওজনে ও মূল্যে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫১,৯৭৮ টন ও ২৭.০৫ কোটি টাকা। এই আয়ের শতকরা ৯০ ভাগ হ'ল কালো মরীচ, আদা, বড় এলাচ ও হলুদ বাবদ।

পরিকল্পনার ভূমিকা ও সার্থকতা

নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায়

যে কোন দেশের অর্থনীতির সুষম বিকাশের জন্য পরিকল্পনা এক অপরিহার্য অঙ্গ তা সেই দেশ সমাজতান্ত্রিক, আধা সমাজতান্ত্রিক, ধনবাদী বা যে কোন অর্থনীতির অনুসারী হোক না কেন। বিশেষতঃ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অনুন্নত দেশগুলিকে এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হচ্ছে। প্রথম কথা উন্নত দেশগুলির আর্থিক স্তর এই সব দেশের পক্ষে উন্নীত হওয়ার সময়সীমা অতি সংক্ষিপ্ত। এদের প্রাপ্য সম্পদের সীমিত পরিমাণও ঔপনিবেশিক বা সামন্ততন্ত্রের শোষণের ফলে এই সব দেশের আর্থিক ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল এবং বিপুল দারিদ্র্য ও জনসংখ্যার ভারে বিপর্যস্ত। এই সব দেশের সামাজিক অসাম্য দূর করা প্রধানতঃ অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলির ওপর নির্ভর করে। স্বাধীনতা লাভ করার সময়ে আমাদের দেশকে অনুন্নত দেশ হিসাবে গণ্য করা হত। কিন্তু তিনটি পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হওয়ার পর আজ ভারতকে উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে জাতীয় সংগ্রামের নেতৃবৃন্দ সম্যক অবহিত ছিলেন। সেইজন্যই স্বাধীনতা লাভ করার বহুপূর্বে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যখন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি তখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল জাতীয় পরিকল্পনা পর্ষদ। বস্তুত ভারতের অর্থনীতির রূপরেখা তৈরি হয়েছিল তখন থেকেই। আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ সেই সময়েই স্থাপন করা হ'ল।

পরবর্তীকালে স্বাধীনোত্তর ভারতে, পরিকল্পনার এই ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়ে স্থাপিত হ'ল জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন। প্রথম পরিকল্পনায় নদী, সেচ, বিদ্যুৎ ও কৃষি ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হ'ল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার পেল ভারী শিল্প। দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দিকে দিকে গড়ে উঠলো কলকারখানা। ইস্পাত, লোহা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে স্বয়ম্ভর হবে ওঠার প্রচেষ্টা সুরু হ'ল। কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়ল। তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি শিল্প দুটোই সমান অগ্রাধিকার লাভ করল। বর্তমানে চলছে চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ। এবারে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে খাদ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে। আশা করা যায় বর্তমান পরিকল্পনার শেষে দেশে নিরক্ষরতা থাকবে না।

আমাদের দেশের পরিকল্পনাগুলির সাফল্য সম্বন্ধে দু ধরণের মত বেশ সোচ্চার। এক যাঁরা এর বিরোধী আর যাঁরা এর ব্যাপক প্রচার কামনা করেন। যাঁরা বিরুদ্ধতা করেন তাঁদের যুক্তি হচ্ছে সরকারী উদ্যোগে সবদাই লোকসান হয়, উৎসাহ ও উদ্যম কমে যায় ইত্যাদি। অবশ্য একথা ঠিক যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি থেকে ঈপ্সিত ফল লাভ সম্ভব হয় নি। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অগ্রগতি নৈরাশ্যজনক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও কি ঠিক নয় যে পরিকল্পনা রূপায়িত না হলে ভারত আজও অনুন্নত পর্যায়েই থেকে যেত, ভারত বিদেশী ও স্বদেশী ধনবাদীদের অবাধ শোষণের স্বর্গক্ষেত্রে পরিণত হত এবং দারিদ্র্য হ'ত অপরিসীম। জাতীয় আয়-বৃদ্ধির সুযোগ ভোগ করত মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনপতি। শিল্পে, বহুকাল পর্যন্ত দেশ থাকতো পিছিয়ে। ফলে দেশের স্বাধীনতার অবলুপ্তি সম্বন্ধে আশঙ্কাও অমূলক হ'ত না। যাঁরা এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার চান তাঁরা ভারতের অর্থনীতি সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখেন না। ভারতের মত যে দেশ শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ সে দেশের পক্ষে পরিকল্পনাগুলি ব্যাপক করার অর্থ সাধ্যাতিরিক্ত অবাস্তব পন্থাগ্রহণ।

যে দিক থেকেই বিচার করা যাক না কেন পরিকল্পনার সার্থকতা স্বীকার করতেই হবে। ভারতে অর্থনীতির প্রধানতম সমস্যা মূলধনের সমস্যা। এই মূলধন সংগ্রহ করা পরিকল্পনার মাধ্যমে ছাড়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত সদিচ্ছা বা উদ্যোগের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হলে সমস্ত অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়তে পারে। দ্বিতীয় যে সমস্যা, তা হ'ল, ব্যক্তিগত সূত্রে সম্পদ সঞ্চয়ের এবং একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্রমবর্ধমান চেষ্টা। অনুন্নত ও উন্নত দেশগুলির দিকে একটু দৃষ্টিপাত করলেই এ সমস্যা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। একচেটিয়া শোষণের সর্বগ্রাসী হাত থেকে বড়, মাঝারি বা ছোট কোন শিল্পেরই রেহাই থাকে না। ফলে জাতীয় জীবনে শোষণ চিরস্থায়ী হয়ে দাঁড়ায়। তখন পরনির্ভরতা হয় এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

কাজেই ভারতের মত স্বল্পবিত্ত দেশের পক্ষে পরিকল্পনার ভূমিকা ও সার্থকতা নিয়ে তর্কের সূত্রপাত করা অবান্তর। যতদিন সম্পূর্ণরূপে নিজের পায়ে না দাঁড়ানো যাবে ততদিন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব কমবে না বরং ক্রমশঃ বেড়ে যাবে।

কয়লা খনিতে কাজের হিসাব

আমাদের দেশে গত জানুয়ারী মাসে ৭৫৩টি কয়লা খনি চালু ছিল। তার আগের মাসে চালু কয়লা খনির সংখ্যা ছিল ৭৫৯ এবং গত বছর জানুয়ারী মাসে চালু কয়লা খনির সংখ্যা ছিল ৮৭০। আলোচিত ঐ তিন মাসে খনিগুলোতে গড়ে দৈনিক কর্ম সংস্থানের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৭৮৫৯৮, ৩৭৭২২৫ ও ৩৯২৬৩২ এবং অনুপস্থিতির হার ছিল যথাক্রমে ১১.৯৫, ১১.৮৯ এবং ১১.৩০ শতাংশ।

আলোচ্য সময়ে প্রতি কর্মী শিফটে উৎপাদন হয় মাইনার ও লোডারদের ক্ষেত্রে ১.৮৩ টন, ভূগর্ভে কর্মরত কর্মীদের ক্ষেত্রে ০.৯৫ টন ও অন্যান্য কর্মীদের ক্ষেত্রে ০.৬৮ টন।

এই সময় কয়লাখনি শ্রমিকদের সর্বভারতীয় সাপ্তাহিক নগদ আয় ছিল ৫০ টাকা ২২ পয়সা এবং ঝরিয়া ও রানীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলে এই আয় ছিল যথাক্রমে ৪৮ টাকা ৪২ পয়সা ও ৪৯ টাকা ২১ পয়সা।

প্লাস্টিক উৎপাদনে ভারত

আজ আর প্লাস্টিক সামগ্রী বিলাসিতার বস্তু নয়। সর্বত্রই আজ আমরা এর ব্যবহার দেখতে পাই। এর শ্রেণীবিভাগও হয়েছে এখন প্রচুর।

বিশ্বের প্লাস্টিক উৎপাদন ইতি-মধ্যেই ১৬ মিলিয়ন টন ছাড়িয়ে গিয়েছে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ভারতের উৎপাদন মাত্র ৫৩,০০০ টন। তবে, ১৯৫৬ সালের মাত্র ৯৮৪ টন উৎপাদনের সঙ্গে তুলনা করলে এটা ভালই বলতে হবে। মাথা প্রতি নিম্নতম প্লাস্টিক উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে ভারত অন্যতম অর্থাৎ এর উৎপাদন মাথাপ্রতি ০.১ কে. জি। জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রে এই সংখ্যা যথাক্রমে ১৮ কে. জি. ও ৩০ কে. জি।

তবে, এখন ভারত এ ব্যাপারে উন্নতির পথে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। ইতি-মধ্যেই অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ করবার জন্য দু'টি পেট্রোকেমি ক্যাল প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে এবং আরও অনেকগুলি প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। পরিকল্পনার প্রথম ধাপ শেষ হয়েছে এবং কিছু সংখ্যক 'রেসিন' এখন উদ্বৃত্ত থাকে। ১৯৬৯ সালের শেষে 'পলিস্টি-রিনও' উদ্বৃত্ত হবে। ১৯৭৪-৭৫ সালের শেষে পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায় শেষ হবে। তখন ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য পলিথিলিন, পলিপ্রপাইলিন ও স্টাইরিন কপোলাইমার-সও সরবরাহ করা যাবে। ঐ সময়ে বর্তমানের উৎপাদন ৫৩,০০০ টনের চেয়ে আরও ২ লক্ষ টন বেশী হবে।

কারিগরী বৃত্তিতে নিযুক্ত বহু ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীগণ দেশের বহু অঞ্চলে প্লাস্টিক শিল্পের সব পর্যায়ের অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চান। কিন্তু তারা এ বিষয়ে সমস্ত খবর পান না। সুতরাং এই শিল্পের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল, শ্রমিক, স্থান, বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা প্রভৃতি বিষয়ে পরিপূর্ণ তথ্যাদি প্রচার করা উচিত।

গ্রামাঞ্চলে প্লাস্টিক শিল্পের বাজার বাড়াতে হবে। ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে গুজরাট সরকার গ্রামীণ বাজারের একটি সমীক্ষা নিয়েছিলেন। সম্প্রতি এ ব্যাপারে ফেডারেশনও উৎসাহ দেখাতে পারেন বলে প্লাস্টিক শিল্প গড়ে তোলার আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক আছে। ভারত বছরে লৌহ বর্জিত ধাতুর আমদানীর জন্য প্রায় ১৫০ কোটি টাকা ব্যয় করে। কার্যতঃ গত বছর ভারত ৪৩,০০০ টন তামা, ৭৭,০০০ টন দস্তা ও ৩৫,০০০ টন সীসা আমদানী করেছিল। যেহেতু প্লাস্টিক একটা পরিবর্ত সামগ্রী সুতরাং এর ব্যাপক ব্যবহারের ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কুলান হবে। বৈজ্ঞানিক পন্থা ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা দরকার প্লাস্টিক শিল্প এখন আমাদের দেশের আর্থিক উন্নয়নের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। যদিও শিল্পটি সাম্প্র-তিক কালের তবুও এটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সমর্থ হয়েছে। গত বছর ৩.৭৭ কোটি টাকা মূল্যের প্লাস্টিক দ্রব্যাদি রপ্তানী করা হয়েছিল। প্লাস্টিক শিল্পের লিনো-লিয়াম পর্ষদ ১৯৭৩-৭৪ সালে এই সংখ্যাকে ৭.৫ কোটি টাকায় নিয়ে যাবার সুপারিশ করেছেন বলে জানা গেছে। ক্রমবর্ধমান হারে এর উন্নয়নকে সাহায্য করলে এই পরিমাণ ১৫ কোটি টাকাও হতে পারে বলে ধারণা করা যেতে পারে। সরকারী বা বেসরকারী যে কোন ক্ষেত্রেই এই সম্পর্কে প্রকল্প তৈরি করতে হলে প্রধান কন্ট্রাক্টর হিসেবে ভারতীয় ইঞ্জি-নীয়ারিং ডিজাইন কোম্পানীকে নিয়োগ করতে হবে এবং যথাসম্ভব কম বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে দেশীয় ইঞ্জিনীয়ার ইত্যাদির ব্যবহার সম্প্রসারিত হবে।

ফেডারেশনের প্রস্তাবিত উচ্চ আবগারী কর যদি জনগণের সুবিধের জন্য হয় কেবলমাত্র ব্যবসায়ের লাভের জন্য না হয় তাহলে সরকার এই প্রস্তাব সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে দেখবেন বলে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও কেমিকেল এবং খনি ও ধাতু সংক্রান্ত দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী ত্রিগুণা সেন সম্প্রতি ভারতের প্লাস্টিক সম্মেলনকে আশ্বাস দেন।

রেলওয়ের বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় ক্রমশঃ কমছে

১৯৬২ সাল থেকে রেলওয়ের বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যয় ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৬৮৬ কোটি টাকা। এ সময়ে ২৪০ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যয় হয়েছে। এটা মোট ব্যয়ের ১৪.২ শতাংশ।

চতুর্থ পরিকল্পনার আগের তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনাকালে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৭৯৪ কোটি টাকা। তার মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ছিল ১০৭ কোটি টাকা। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে মোট ব্যয়ের পরিমাণ হবে ১৫২৫ কোটি টাকা। তার মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যয় হবে ১৮০ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট ব্যয়ের ১১.৮ শতাংশ।

রেলওয়ে বিশ্ব ব্যাংকের কাছ থেকে [illegible] কোটি ডলার ঋণ চেয়েছে।

পুসা বিন

রাজধানীর ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের এন্টোমলজি ডিভিশান গ্রামা-ঞ্চলে ফসল জমিয়ে রাখার জন্যে একটি অতি সহজ উপায় উদ্ভাবন করেছে। না পোড়ানো ইঁট, কাদা, পাঁচ ও পলিথিনের মোটা প্রলেপের সাহায্যে এমন একটা আধার তৈরি করা হয়েছে, যাতে শস্য ভরে রাখলে, স্যাঁতস্যাঁতে হাওয়া লাগবে না এবং ইঁদুর পোকা-মাকড় বা ছাতা ধরা প্রভৃতির হাত থেকেও ফসল রক্ষা পাবে।
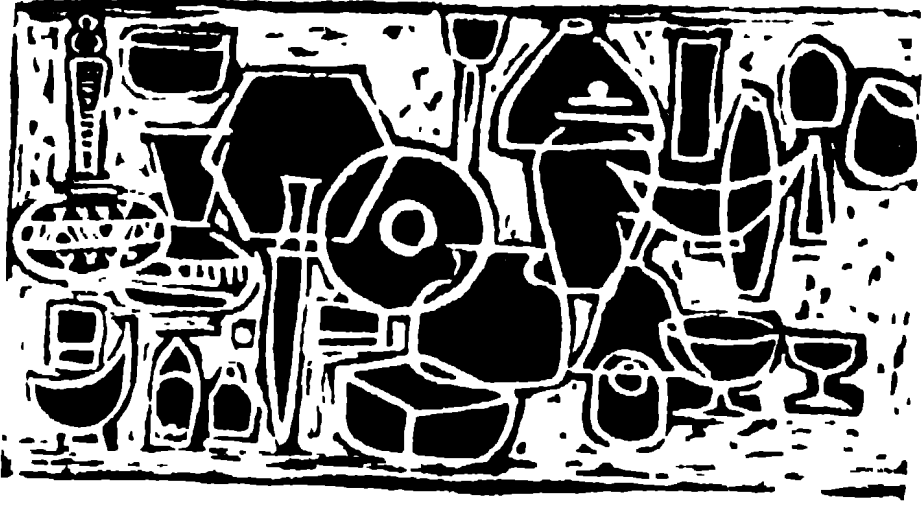
উন্নয়ন বার্তা

★ ভদ্রাবতীর মাইশোর আয়রণ এ্যান্ড স্টীল লিমিটেড ১৯৬৮ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৬৯ সালের মার্চ পর্যন্ত—এই আর্থিক বছরে এক কোটি টাকার সমান বিদেশী মুদ্রা আয় করেছে। এই কারখানা যুক্ত-রাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, মালয়েশিয়া ও ফিলিপিনে নিজেদের তৈরি জিনিস রপ্তানী করেছে।

★ পশ্চিম বাংলার কোচবিহার জেলার ২২টি গ্রামে গত ৬ মাসের মধ্যে নিরক্ষরতা নির্মূল করা হয়েছে। প্রত্যেক গ্রামে ১০ থেকে ১৫টি অক্ষর শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়।

★ তিরুচীতে ভারত হেভী ইলেক্ট্রি-ক্যালস-এর যে কারখানা আছে, সেটি ৪ লক্ষ টাকার ভ্যালভ রপ্তানী করার জন্যে পোল্যাণ্ডের কাছ থেকে বরাত পেয়েছে। সার, রাসায়নিক ও অন্যান্য শিল্পে ব্যব-হারের জন্যে পোল্যাণ্ড এই প্রথম এই ভ্যালভ আমদানী করছে।

★ একটি ভারতীয় ফার্ম সুদানের কাছ থেকে ৭৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ২২০টা ঢাকা ওয়াগন সরবরাহের বরাত পেয়েছে।

★ মহীশূরে ৩৫ লক্ষ টাকা খরচ ক'রে ময়দা তৈরির একটি কল স্থাপন করা হয়েছে। এই কলে দৈনিক ১৩০ টন ময়দা তৈরি হবে। কলটি চালু করা হয়েছে।

★ ভদ্রাবতীর মাইশোর আয়রন এ্যাণ্ড স্টীল লিমিটেডের রোলিং মিলস্-এ পরীক্ষা-মূলকভাবে কাজ সুরু হয়েছে। মিশ্রিত ইস্পাত পরিকল্পনার শেষ ইউনিটটিতেও পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেলে মহীশূরের ঐ কারখানাটিকে মিশ্রিত ইস্পাত কারখানায় পরিণত করার কাজ শেষ হয়ে যাবে। এই কারখানায় ইতিমধ্যেই বহু প্রকারের উন্নত শ্রেণীর ও বিশেষ ধরণের মিশ্রিত ইস্পাত তৈরী হ'তে শুরু করেছে।

★ রাজস্থানে দুর্গাপুর গবেষণা কেন্দ্রে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর একটা নতুন জাতের মুগ উৎপাদন করা গিয়েছে যা ৬৫-৭০ দিনের মধ্যে পেকে যায় এবং সেগুলি তোলার উপযুক্ত হয়ে যায়। এই নতুন মুগের নামকরণ হয়েছে দুর্গাপুরা ৬৬-২৬ এবং এর ফলন হয়েছে প্রতি-হেক্টারে ৪৬০ কে.জি.র মত। নিবিড় কৃষি সূচীভুক্ত ফসলের তালিকায় এই মুগটির নামও ধরা হয়েছে কারণ এই নতুন মুগের বীজ জুন মাসের মাঝামাঝি নাগাদ পেকে যায়। এরপর খারিফ ফসল বোনার আগে জমি তৈরী করার অনেক অবসর পাওয়া যায়।

★ রাউরকেলা ইস্পাত কারখানার বার্ষিক ক্ষতির হার প্রায় ৫ কোটি টাকার মত কমেছে। ১৯৬৭-৬৮তে ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৭.২ কোটি টাকা এবং '৬৮-৬৯ সালে তা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ২.৫ কোটি টাকায়। এখন '৬৯-৭০ সালে ক্ষতির পরিবর্তে লাভ করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বর্তমানে এই কারখানায় ১২ লক্ষ টন লোহপিণ্ড তৈরি হয়। বছরের শেষে এই পরিমাণ ১৮ লক্ষ টন পর্যন্ত বাড়বে বলে মনে হচ্ছে।

এই কারখানায় উৎপাদিত জিনিসের একটা সুবিধা হচ্ছে এই যে, এগুলির বাজার তৈরিই আছে এবং এগুলির চাহি-দাও বাড়ছে। এই কারখানায় ১,৬০,০০০ টন জিঙ্কের জল করা ইস্পাতের চাদর, ১,৫০,০০০ টন ইলেকট্রোলিটিক টিনের পাত, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির জন্য ৩০,০০০ টন উচ্চ পরিমাণ সিলিকন যুক্ত ইস্পাত এবং আণ্ডার্দার ভারি গাড়ী তৈরীর কার-খানার জন্যে বিশেষ ধরণের ইস্পাতের পাত তৈরি হয়।

★ হায়দ্রাবাদের বেগামপেট বিমানবন্দরে ঝড়ের সংকেত দেবার জন্যে একটি রেডার বসানো হয়েছে। এর নক্সা থেকে সমস্ত

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে এবং তথ্য ও বেতার মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত হ'লেও 'ধনধান্যে' শুধ সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করে না। পরিকল্পনার বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী ক্ষেত্রে উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতটা অগ্র-গতি হচ্ছে তার খবর দেওয়াই হ'ল 'ধনধান্যে'র লক্ষ্য।

'ধনধান্যে' প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে প্রকাশিত হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

নিয়মাবলী

দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মতৎ-পরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়।

অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পুনঃ প্রকাশ-কালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার করা হয়।

রচনা মনোনয়নের জন্যে আনুমানিক দেড় মাস সময়ের প্রয়োজন হয়।

মনোনীত রচনা সম্পাদক মণ্ডলীর অনুমোদনক্রমে প্রকাশ করা হয়।

তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয়। কোনোও রচনার প্রাপ্তি-স্বীকৃতি, পত্র মারফৎ জানানো হয় না।

নাম ঠিকানা লেখা ডাকটিকিট লাগানো খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

কোনো রচনা তিন মাসের বেশী রাখা হয়না।

শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাবেন।

গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেস ম্যানেজার, পাব্লিকেশন ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী-১। এই ঠিকানায় যোগাযোগ

"ধনধান্যে" পড়ুন

প্রেরণার বাণী
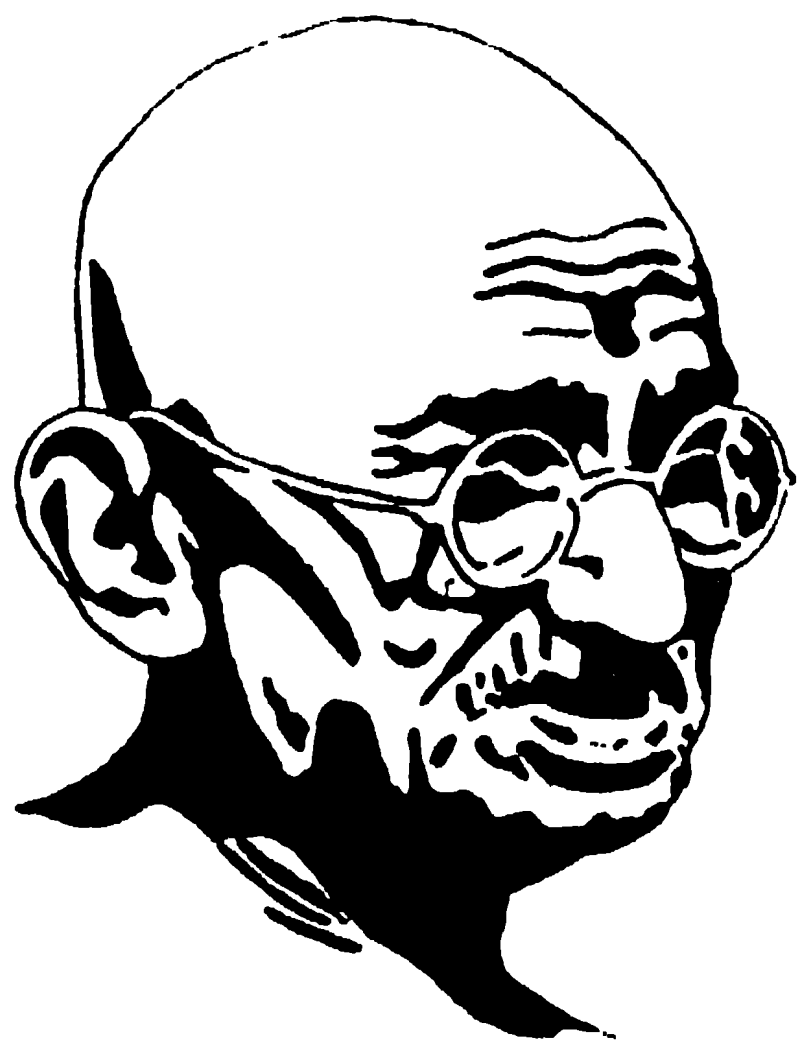
আমি সহরগুলির সম্প্রসারণকে একটা অশুভ জিনিস বলে মনে করি। এই বৃদ্ধিটা মানব জাতির পক্ষে অশুভকর, সম্প্রসারণ ভারতের পক্ষে অশুভজনক।

★

গ্রামগুলির রক্ত দিয়ে সহরের ইমারত-গুলি তৈরি করা হয়। আমি চাই, যে রক্ত এখন সহরের ধমনীগুলিকে ফাঁপিয়ে তুলছে, তা আবার গ্রামের রক্ত-কোষগুলিকেই শক্তিশালী করুক।

★

সহরগুলি নিজেরাই নিজেদের রক্ষণা-বেক্ষণ করতে সক্ষম। এখন আমাদের গ্রামগুলিকেই রক্ষা করতে হবে। গ্রাম-বাসীদের তাঁদের অন্ধ বিশ্বাস ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মুক্ত করতে হবে। আর আমাদের যদি তা করতে হয় তাহলে তাঁদের সঙ্গে বাস ক'রে, তাঁদের আশা আকাঙ্খা, সুখ দুঃখের সরিক হয়ে, তাঁদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ক'রে, বাইরের জগতের খবর তাঁদের মধ্যে প্রচার করতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

★

ভারতের গ্রামবাসীদের ক্ষেত্রে, অতি প্রাচীন সংস্কৃতি একটা ভস্মের নীচে যেন চাপা পড়ে আছে। এই ভস্মটাকে সরিয়ে নিলে, তাঁদের অজ্ঞতা ও চিরদারিদ্র্য দূর করতে পারলে, একজন রুচিবান, ভদ্র ও স্বাধীন নাগরিক বলতে যা বোঝায় তার সুন্দরতম নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাবে।

★

পল্লীর যে অধিবাসীরা প্রখর রৌদ্রে ঘাড় গুঁজে পরিশ্রম করছে তাদের সঙ্গে কাজ ক'রে, গ্রামের যে পুকুরে তারা স্নান করে, কাপড় কাচে, বাসনপত্র ধোয়, তাদের গরু মহিষ জল পান করে আবার হয়তো সেই জলেই গড়াগড়ি দেয়, তাদের সঙ্গে সেই পুকুরেরই জল পান ক'রে, তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে হবে। একমাত্র তখনই আমরা জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধি হতে পারব এবং আমার এই লেখার মতোই সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে তাহলে তারা প্রতিটি আহ্বানে সাড়া দেবে।

★

স্বাধীনতা বলতে আমি যা বুঝি তার মূল ভিত্তি হবে গ্রাম ও সেখানকার অধি-বাসীগণ। গ্রামগুলির রক্ত শোষণ করে স্বাধীনতার সৌধ গড়ে তোলা উচিত নয়; সেই সৌধের চাপে হয়তো ভারতের গ্রাম-গুলির ৪০ কোটি অধিবাসী চূর্ণ হয়ে যাবে।

★

যাঁরা শিক্ষালাভ করার সুযোগ পেয়ে-ছেন তাঁদের উপেক্ষার ফলে গ্রামগুলি দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। শিক্ষিতগণ সহরের জীবনকেই বেছে নিয়েছেন। যাঁরা সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রামে গিয়ে বাস করতে চান এবং গ্রামবাসীদের সেবাই যাঁদের লক্ষ্য তাঁরা যাতে পল্লীবাসীদের সঙ্গে সুস্থ সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহী হন, তাই হ'ল গ্রাম আন্দোলনের লক্ষ্য।

★

পল্লীবাসীদের মধ্যে থেকে, তাঁদের সঙ্গে সত্যিকারের পল্লী জীবন যাপন করলে তাঁদের মধ্যে এর একটা প্রভাব পড়ে। শিক্ষিত যুবকরা যখন গ্রামে গিয়ে থাকেন তখন তাঁরা সম্ভবতঃ একমাত্র জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রামে যান, গ্রামে বাস করার পেছনে সেবার কোন উদ্দেশ্য থাকে না।

REGD. NO. D-233

ধন ধান্যে

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ সম্পর্কে বিশেষ সংখ্যা ৩১শে আগষ্ট

এই সংখ্যায় গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মতামত প্রকাশ করা হবে।

দেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিক, অধ্যাপক, গবেষক, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, এবং ট্রেড ইউনিয়নের নেতাগণ এই প্রশ্নটির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে তাঁদের মতামত প্রকাশ করবেন।

বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং বিশেষজ্ঞগণের বিশেষ প্রবন্ধাদি হবে সংখ্যাটির অন্যতম আকর্ষণ।

৩২ পৃষ্ঠা ২৫ পয়সা

পাঠকগণের প্রতি

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ সম্পর্কে 'ধনধান্যে' তাঁদের পাঠকগণের কাছ থেকে মন্তব্য আহ্বান করছে। এই সম্পর্কে ২০০ শব্দের অনধিক আলোচনা প্রবন্ধাদি ১৯[illegible] সালের ১০ই আগষ্টের মধ্যে প্রধান সম্পাদকের কাছে পৌঁছানো প্রয়োজন। যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হবে সেগুলির জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হবে।

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

প্রথম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা

১৭ই আগষ্ট ১৯৬৯ : ২৬শে শ্রাবণ ১৮৯১

Vol 1 : No 6 : August 17, 1969

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

প্রধান সম্পাদক
শরদিন্দু সান্যাল

সহ সম্পাদক
নীরদ মুখোপাধ্যায়

সহকারিণী (সম্পাদনা)
গায়ত্রী দেবী

সংবাদদাতা (কলিকাতা)
বিবেকানন্দ রায়

সংবাদদাতা (মাদ্রাজ)
এস. ভি. রাঘবন

সংবাদদাতা (দিল্লী)
পুস্করনাথ কৌল

ফোটো অফিসার
টি. এস. নাগরাজন

প্রচ্ছদপট শিল্পী
আর. সারঙ্গন

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০

টেলিগ্রাফের ঠিকানা—যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

ভুলি নাই

কোনোও সরকার জনসাধারণের আশা আকাঙ্খা উপেক্ষা করতে পারেন না। বস্তুতঃ জনগণের আশা আকাঙ্খা পূরণ গণতন্ত্রকে দৃঢ় মূল করে। যে সরকার এটা উপেক্ষা করে সেই সরকারকে আসন চ্যুত হতেই হয় এবং সেই স্থান অধিকার করে অন্য কোনোও সরকার।

—জওহরলাল নেহরু

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়

মহাকাশ মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা

আজকের পৃথিবী অনেক ছোট হয়ে গেছে অর্থাৎ যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসারের সঙ্গে বিপুলা বসুন্ধরা ক্রমশঃ ধরা ছোঁয়ার গণ্ডীর মধ্যে এসে পড়েছে। আর এই দিক থেকে কমিউনিকেশান্ স্যাটেলাইট বা যোগাযোগ রক্ষাকারী উপগ্রহের দান অসীম সম্ভাবনাময়। আন্তঃ-মহাদেশীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নয়নে বিশেষ করে, এই উপগ্রহগুলির প্রয়োগ একদা কবির কল্পনামাত্র ছিল।

ভারত মহাসাগরের ওপর, মহাকাশে 'ইন্টেলস্যাট ৩' নামের উপগ্রহ স্থাপনের পর আরভিতে মহাকাশ-সংযোগ কেন্দ্রের আসন্ন উদ্বোধন-পর্ব্ব সুসম্পন্ন হ'লেই ~~উপগ্রহ মারফৎ~~ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিশ্বের ৬৩টি দেশের সঙ্গে ভারতও সক্রিয় অংশ নেবে।

অতি ক্ষোভের বিষয় যে, 'বহুবিধ কারণে আরভি কেন্দ্র স্থাপনে এত বিলম্ব ঘটার দরুণ বিশ্বের অন্যান্য সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের মত ভারতবাসী এক যুগান্তকারী 'ঘটনার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা' হ'তে পারল না, পারল না দেখতে বিজ্ঞানের চরম সাফল্য'— সুদূরের চাঁদের মাটিতে ধরার মানুষের প্রথম পদচারণা। অথচ এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশ জাপান, থাইল্যাণ্ড ও ফিলিপাইন অনেক আগেই নিজেদের দেশে মহাকাশ সংযোগ-কেন্দ্র স্থাপন করে এই ঐতিহাসিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করল।

টেলিকমিউনিকেশান্ অর্থাৎ দূর—সংযোগ—ব্যবস্থা, বিশেষ ক'রে, টেলিভিশনের মত যোগাযোগের একটি শক্তিশালী মাধ্যমের যে বিপুল সম্ভাবনা ও ক্ষমতা' আছে একথা বলাই বাহুল্য। তাই এর পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক ভারতে গণসংযোগের কার্য্যকর মাধ্যম হিসাবে টেলিভিশনের যথাযথ ও ব্যাপক প্রয়োগ অত্যন্ত আবশ্যিক। একথা অনস্বীকার্য্য যে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার উন্মেষ, বিকাশ ও সার্থকতায় সুশিক্ষিত ও তথ্যজ্ঞ নাগরিকের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। যুগান্তব্যাপী কুসংস্কারের গহ্বর থেকে এবং গতানুগতিক জীবনধারা থেকে জোর ক'রে সরিয়ে এনে দেশের নাগরিকদের এক নতুন দিগন্তের মুখোমুখি দাঁড় করাতে হ'লে চাই এমন একটা সুসংহত ও সুসমঞ্জস শিক্ষা ব্যবস্থা যার সহায়তায় জনসাধারণকে বিজ্ঞানের বার্ত্তা ও বিশ্বের নিত্যনতুন পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পরিচিত করানো যেতে পারে। দেশের সাধারণ নরনারীর মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের এই দায়িত্ব অবহেলা বা উপেক্ষা করা সঙ্গত নয়। এই প্রয়োজন যদি অপরিহার্য্য বলে স্বীকার ক'রে নেওয়া হয় তাহলে গণসংযোগের সর্ব্বাধুনিক মাধ্যমটিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার যৌক্তিকতা কেউ অস্বীকার করবে না। কারণ তা'হলে দেশের ও আন্তর্জাতিক প্রযুক্তিবিদ্যার নব নব চিন্তাধারার উন্মেষ, নব নব [illegible] [illegible] নব নব [illegible] [illegible] আমরা চোখ বন্ধ ক'রে থাকতে পারি না। নতুনের সঙ্গে এই পরিচয় এবং সেই পরিচয়লব্ধ জ্ঞান প্রত্যেক নরনারীর বুদ্ধিবৃত্তি, নৈতিকতা ও নাগরিকতাবোধের বিকাশে সহায়ক হ'বে। এই কারণেই আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতির উদ্দেশ্যে মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহের স্থাপনা এবং গ্রামবাসীদের শিক্ষনীয় সর্ব্ব বিষয় টেলিভিশনে দেখাবার জন্যে সারা দেশে, বিভিন্ন এলাকায়, মহাকাশ সংযোগ কেন্দ্র স্থাপন করা এত জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি গ্রামাঞ্চলে সার্ব্বজনীন টি. ভি. সেট বসানো হয় তাহ'লে কৃত্রিম উপগ্রহ মারফৎ রীলে করা টেলিভিশন অনুষ্ঠান শহরাঞ্চলের তুলনায় অনেক আগেই গ্রামবাসীরা দেখতে ও শুনতে পাবেন। আধুনিক যুগের যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যান্য পরিচিত মাধ্যমগুলির সুবিধা শহরবাসীরা পান অতএব উপগ্রহমারফৎ যোগাযোগের এই ব্যবস্থাটি যদি গ্রামাঞ্চলের সেবায় সর্ব্বাগ্রে নিয়োজিত হয় তাতে শহরবাসীদের ক্ষুব্ধ হওয়া সমীচীন হ'বে না।

একটি 'সিনক্রোনাস স্যাটেলাইটে'র সাহায্যে ৫,০০০ টেলিফোন চ্যানেলের মাধ্যমে ১২টি ভাষায় যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব। এই উপগ্রহটির বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, পৃথিবীর আহ্নিক গতির সঙ্গে সমগতি সম্পন্ন হওয়ার ফলে উপগ্রহটিকে মহাকাশে নিশ্চল ব'লে মনে হ'বে—এবং অভিন্ন গতির দরুণ পৃথিবীর সঙ্গে উপগ্রহের সংযোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন ও অব্যাহত থাকবে। টেলিফোন চ্যানেলগুলি সপ্তাহে ৩৬ ঘন্টা খোলা থাকবে।

যাই হোক যোগাযোগ-উপগ্রহ স্থাপনার এই প্রস্তাবটির খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় অতি সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা ক'রে দেখতে হ'বে। এর ব্যয়ের দিকটার কথা—যা' বিপুল পরিমাণ হবার সম্ভাবনা—পরেও আলোচনা করা যেতে পারে কিন্তু তা'র চেয়েও জরুরী হ'ল এই মাধ্যমটির বিশেষ ও ব্যাপক সদ্ব্যবহারের যথোপযুক্ত প্রস্তুতি।

আমাদের দেশ বহুভাষী। এখানে বিভিন্ন অঞ্চলের জন্যে বিভিন্ন ভাষায় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার জন্যে একটি সর্ব্ব-ভারতীয় উপগ্রহ-যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিশেষ ক'রে টেলিকাষ্টিং ব্যবস্থা থাকা জরুরী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনার সময়ে উদ্দিষ্ট অঞ্চলের আঞ্চলিক ও পারিবেশিক বৈশিষ্ট্য এবং স্থানীয় অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ধারা স্মরণে রাখা প্রয়োজন। সমস্যার বিপুলতা যেন এই অতি কার্য্যকর ও লাভজনক প্রকল্প রূপায়ণের অন্তরায় না হয়। এর জন্যে বিপুল অর্থ ব্যয় হ'বে সত্য কিন্তু সেই তুলনায় সুফলের পরিমাণ হ'বে অনেক বেশী।

(পরবর্ত্তী অংশ ১১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

কংসাবতী প্রকল্প
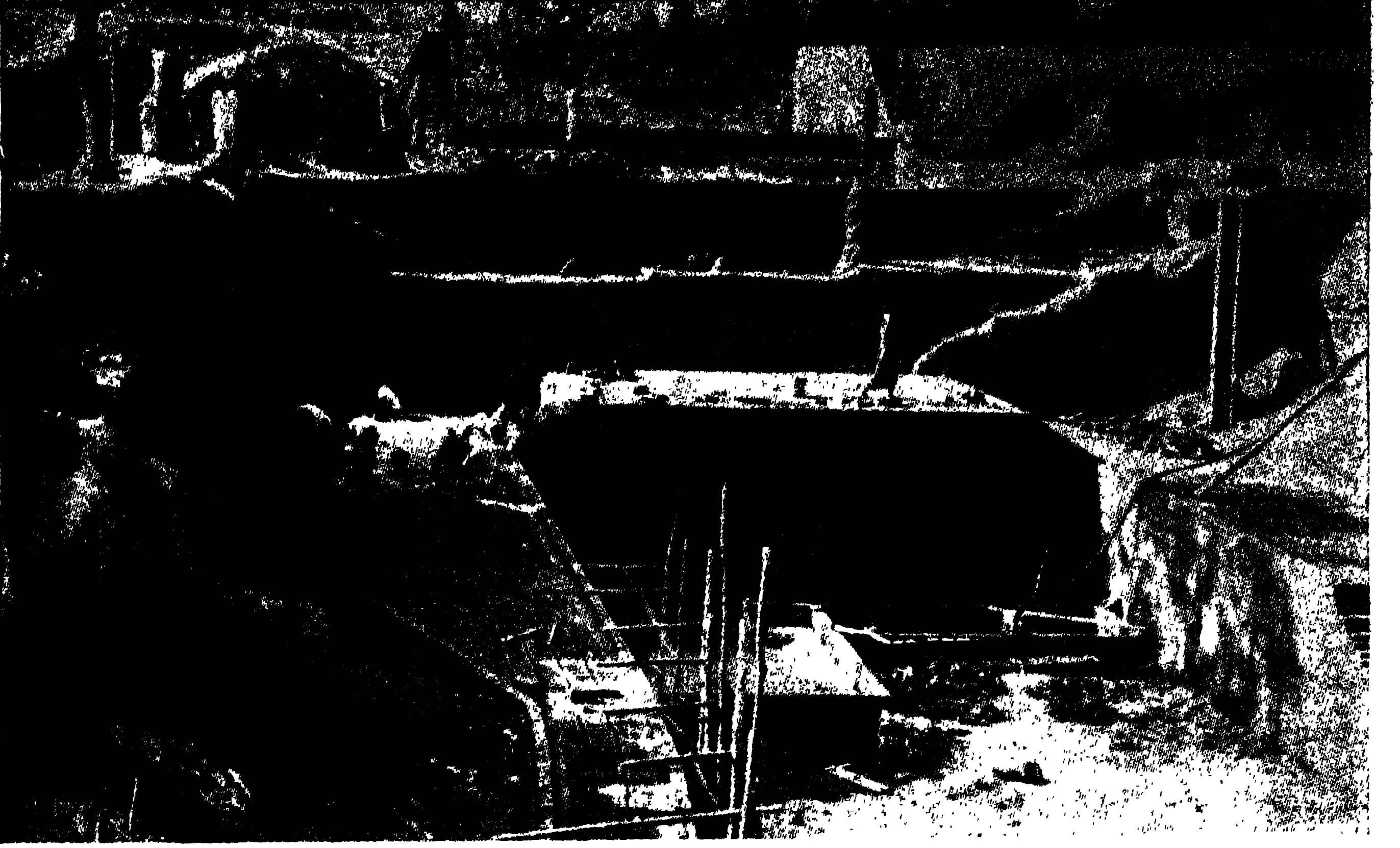
বাঁকুড়ার একটি পাকা খাল তৈরীর কাজ চলেছে

বিবেকানন্দ রায়
(আমাদের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলা থেকে অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্য ৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প ক্রমশঃ রূপ পরিগ্রহ করছে। ১৯৭২ সালে যখন এই প্রকল্পটির কাজ সম্পূর্ণ হবে তখন বিপুল আকারের একটি পাথরের দেওয়াল এমন একটা জলাধার গড়ে তুলবে, যাতে আট লক্ষ একর ফিট জল সঞ্চিত ক'রে রাখা যাবে এবং ১১.১০ লক্ষ একর জমিতে সেচের জল সরবরাহ করা যাবে। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলাটির ওপর যেন চিরদারিদ্র্যের অভিশাপ রয়েছে। এখানকার বেশীর ভাগ অধিবাসী কৃষির ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু প্রকৃতির খামখেয়ালীতে কোথাও বা ছিটে ফোঁটা বৃষ্টি হয়, কোথাও একেবারেই হয় না। বছরে বৃষ্টির পরিমাণ হ'ল ৫৫ ইঞ্চি। একমাত্র আমন ধান ছাড়া অন্য কোন প্রধান শস্য নেই বলেই খরা, খাদ্যাভাব আর দুর্ভিক্ষ দেয় যথানিয়মে। এই জেলার অধিবাসীদের মধ্যে কুষ্ঠ এবং শ্বেত কুষ্ঠের প্রাদুর্ভাব বেশী। ১৯৭২ সালে কংসাবতী প্রকল্পটির কাজ সম্পূর্ণ হ'লে এই দুঃখ দুর্দশার পরিবর্তে আসবে সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য।

বর্ষাকালের বৃষ্টিতে কংসাবতীতে যে বন্যা হয়, তা তখনকার মতো যথেষ্ট পরিমাণ সেচের জল সরবরাহ করতে পারে

বাঁকুড়া জেলায় খরা ও দুর্ভিক্ষ নির্ম্মূল করার জন্যে কংসাবতী বাঁধ প্রকল্প রূপায়িত করা হচ্ছে; রূপায়ণের ব্যয় আনুমানিক ৪৫ কোটী টাকা। ১৯৭২ সালে বাঁধ তৈরী হয়ে গেলে ৮ লক্ষ একর ফুট পর্য্যন্ত জল ধরে রাখা যাবে এবং ১১·১০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ দেওয়া যাবে।

কিন্তু গ্রীষ্মকালে নদীটি প্রায় শুকিয়ে যায়। স্বাধীনতা লাভ করার বহু পূর্বে নদীটির নীচের দিকে খড়গপুর—মেদিনীপুর বিভাগে একটি খাল কাটা হয় এবং সেচের জন্য প্রয়োজনীয় জল তা থেকে পাওয়া যেত। এই নদীটি থেকে যথেষ্ট পরিমাণ সেচের জল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে দেখে, এর উজানের দিকে একটা বাঁধ তৈরি করার কথা রাজ্য সরকার ভাবছিলেন। ওপরের দিকে একটা বাঁধ তৈরি ক'রে যদি একটা জলাধার গড়ে তুলতে পারা যায় তাহলে খারিফ মরশুমে এবং কিছু পরিমাণে রবি মরশুমেও সেচের জল সরবরাহ করা যাবে। মেদিনীপুর জেলার পুরানো খালটি

যাতে এই জলাধার থেকে ৫০০ কিউসেক জল সরবরাহ পায় তারও ব্যবস্থা রাখা হয়। (যদি জলের অভাব দেখা দেয় তাহলে)

১৯৪৬-৪৭ সালে এই সম্ভাবনাগুলি সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু হয় এবং ১৯৫৩ সালে খসড়া প্রকল্পটি তৈরি করা হয়। নদীর ভাটিপথে অম্বিকানগর থেকে প্রায় ৯ মাইল দূরে, নদীর দুই তীরের দুটি গ্রামকে বেষ্টন করে একটি বাঁধ তৈরি করার প্রস্তাব করা হয়। প্রকল্পটি ১৯৫৬ সালে অনুমোদিত হলেও, সীমা নির্ধারক কমিশনের রায় অনুযায়ী পুরুলিয়া জেলার ঐ অংশটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, দুটি নদীর সঙ্গমস্থলে উজানের দিকে বর্তমান জায়গাটি নির্বাচন করা হয়।

জলসেচের সম্ভাবনা

এই প্রকল্প থেকে মোট যতখানি জায়গায় সেচের জল সরবরাহ করা যেতে পারে তা হ'ল বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং হুগলী জেলার কিছু অংশে ৯.৬০ লক্ষ একর খারিফ শস্যের জমিতে এবং ১.৫০ লক্ষ একর রবি শস্যের জমিতে। এর ফলে বছরে ৪০ লক্ষ কুইন্টাল অতিরিক্ত ধান পাওয়া যাবে।

১৯৬৪-৬৫ সালে যে কাজ হয় তাতে কংসাবতী জলাধারের কাজ আংশিকভাবে সম্পূর্ণ হয় এবং ১৯৬৪-৬৫ সালের খারিফ

কংসাবতী জলাধার প্রকল্পের মানচিত্র
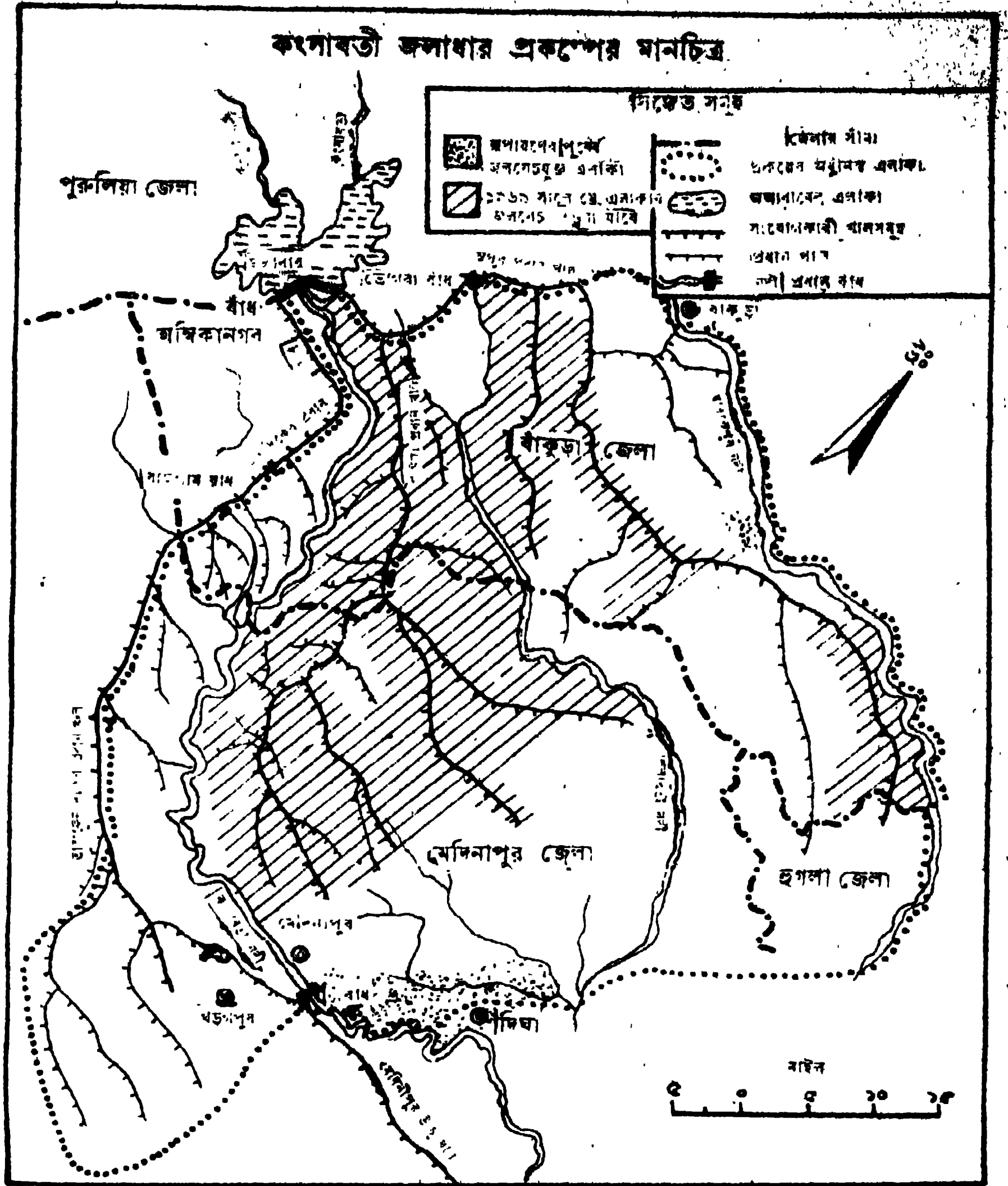
খাল তৈরীর জন্য মাটি খোঁড়া হচ্ছে

মরশুমের জন্য সেচের জলও সরবরাহ করা হয়। প্রথম দিকে প্রায় ৬০,০০০ একর জমিতে জলসেচ দেওয়া হয়। খাল কাটার কাজ যেমন এগিয়ে যাচ্ছে সেচের জমির পরিমাণও তেমনি বেড়ে যাচ্ছে। গত খারিফ মরশুমে ১,৮০,০০০ একর জমিতে জলসেচ দেওয়া হয় এবং বর্তমান বছরে খারিফ শস্যের ২.৫ লক্ষ একর জমিতে সেচের জল সরবরাহ করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

এই প্রকল্পের সিঞ্চন এলাকা হ'ল কুমারী ও কংসাবতী নদী দুইটির দুই তীরের ১,৪০০ বর্গমাইল। বাঁধটিতে আট লক্ষ একর ফিট জল ধরা যাবে এবং জুলাই-আগষ্ট মাসে নদীতে যখন বন্যা হবে তখন জলাধারটিতে ২ লক্ষ একর ফিট জল সঞ্চয় করা যাবে। এরপর সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাতে প্রায় এক লক্ষ একর ফিট জল থাকবে। এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণভাবে জলসেচ প্রকল্প, এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কোন লক্ষ্য নেই। সেচ দেওয়ার জন্য যেসব খাল কাটা হয়েছে সেগুলির মোট দৈর্ঘ্য হ'ল ৩০০০ কিলোমিটার এবং সেগুলি বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার অনেকখানি অংশ এবং হুগলী জেলার কিছু অংশ জুড়ে বিস্তৃত। একমাত্র বাঁকুড়াতেই এই প্রকল্প থেকে খারিফ শস্যের প্রায় ৮৫,০০০ একর জমিতে সেচের জল দেওয়া যাবে। আনুমানিক ১১,৪০০ একর জমিতে প্রচুর ফলনের গমের চাষ করা হবে। এই প্রকল্প এই অঞ্চলের শস্য উৎপাদনের পদ্ধাপদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে বদলে দেবে। পর পর তিন বছরও যদি খরা হয় তাহলেও এই জলাধার থেকে সেচের জল সরবরাহ করা যাবে আর তার ফলে চাষের জন্য বর্ষার জলের ওপর নির্ভর করতে হবে না।

ঐ এলাকায় এই প্রকল্পটির গুরুত্ব ইতিমধ্যেই বেশ অনুভূত হচ্ছে। পূর্বে যেখানে শিক্ষার কোন সুযোগ সুবিধেই ছিল না এখন সেখানে ইতিমধ্যেই শিক্ষার সুযোগ সুবিধেগুলি যথেষ্ট সম্প্রসারিত হয়েছে। যেখানে বছরে একটিমাত্র শস্যের চাষ হতো সেখানে এখন নানা রকম শস্যের চাষ হতে সুরু করেছে এবং স্থানীয় অধিবাসীরা বছরের প্রায় সব সময়েই কৃষি কাজে ব্যস্ত থাকেন।

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

এই প্রকল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল—(১) একটি মাটির বাঁধ, (২) একটি জলাধার, (৩) একটি জল নির্গমন পথ এবং (৪) বহু সংখ্যক খাল।

দেশের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম এই মাটির বাঁধটির দৈর্ঘ্য হবে ১০ কি: মী: এবং উচ্চতা ৫৫ মীটার, বাঁধটির ওপর দিকে প্রস্থে হবে ৪০ মিটার। বাঁধটির ওপরে দু' দিকে যাতায়াত করার জন্য দুটি কংক্রিটের রাস্তা থাকবে এবং মাঝখানে থাকবে তৃণাচ্ছাদিত স্থান। বাঁধের ভেতরের দিকে আছে সূক্ষ্ম কণার মাটি এবং দু'পাশে থাকবে এমন মাটি যার ভেতর দিয়ে জল সহজে বেরিয়ে যেতে পারে। বাঁধটি যাতে ধ্বসে না যায় এবং এর মধ্যে দিয়ে সহজে জলকণা বেরিয়ে যেতে পারে সেজন্য নদীর উজান ও ভাটিপথে বাঁধের মুখভাগে পাথর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। নদীর উজানপথে যে পাথর দেওয়া হয়েছে সেগুলি জলাধারের দিকে মাটির বাঁধটির সম্ভাব্য ধ্বস এবং জলের ঢেউয়ের ফলে ভাঙ্গন প্রতিরোধ করবে।

দুটি ছোট পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে সিঁড়ির ধাপের মতো পাশাপাশি ১১টি স্লুইস গেট দিয়ে জলধারের জল নির্গত হবে।

জুলাই-আগষ্ট মাসে, সাধারণতঃ যখন বেশী বৃষ্টি হয়, তখন জলাধারে দুই লক্ষ একর ফিট জল থাকে। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এক লক্ষ একর ফিট জল থাকে। এই বিপুল জলরাশিতে মাছের চাষও করা যায়।

ডান এবং বাঁ তীরে যে দুটি প্রধান খাল কাটা হয়েছে সেগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে তা দিয়ে বেশী জলও যেতে পারে। খালগুলির দুই ধার সিমেন্ট ও কংক্রিট দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য পূণ করা সম্ভব হবে। এই প্রকল্পে এটাই হ'ল একটা অপূর্ব ব্যবস্থা এবং পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম এ রকম খাল তৈরি করা হ'ল। খালের ধার কংক্রিট দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়ার ফলে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে লাভ হয়েছে তা হ'ল, এর জন্য জমি অধিকার করার ব্যয় খুব হ্রাস করা সম্ভবপর হয়েছে এবং কৃষি জমি বাঁচানো গেছে। খালগুলির মোট দৈর্ঘ্য হ'ল ৩০০০ কি: মী:। কৃষি জমিতে সেচ দেওয়ার জন্যে জলের গতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টায় খালগুলির মধ্যেও তিনটি ছোট ছোট বাঁধ তৈরি করা হচ্ছে। শীলাবতী নদীতে একটি বাঁধ ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে এবং তা থেকে প্রায় সাত আট হাজার একর জমিতে জলসেচ দেওয়া হচ্ছে। তারাফেনি নদীতে দ্বিতীয় বাঁধটির কাজও প্রায় সম্পূর্ণ হতে চলেছে এবং তিন থেকে পাঁচ হাজার একর জমিতে সেচের জল দেওয়া যাবে। ভৈরব বাঁকি নদীর বাঁধটির কাজ আগামী বছরে সুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে এবং কুমারীর বাঁধের সঙ্গে সঙ্গেই এর কাজও সম্পূর্ণ হবে।

পাথরের বিরাট দেওয়াল

প্রকৃতিকে বশ ক'রে মানুষের উপকার করার জন্য প্রায় ৫০ জন ইঞ্জিনীয়ার (এঁরা সকলেই ভারতীয়) ও ১০,০০০ শ্রমিক এক বিরাট পাথরের দেওয়াল তৈরি করতে ব্যস্ত আছেন। এর কাজ নির্দিষ্ট কর্মসূচীর চাইতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। সেখানে নানা জায়গায় পাথর ভাঙ্গার কাজ অবিরাম গতিতে চলেছে। কর্মী ও শ্রমিকদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে রাত্রে পাথর ভাঙ্গার কাজ করা হচ্ছে না।

এই পরিকল্পনাটির জন্য ইতিমধ্যে ২৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ১৯৭২ সালের জুন মাস নাগাদ যখন প্রকল্পটির কাজ সম্পুণ হবে তখন মোট ব্যয় দাঁড়াবে ৪৫ কোটি টাকা। ইতিমধ্যেই সেচের জন্য জল সরবরাহ সুরু হয়েছে এবং খারিফ শস্যের চাষের জন্য যে লক্ষ্য স্থির করা আছে তার শতকরা ২৫ ভাগ বর্তমান বছরেই পূর্ণ করা যাবে।

মাটি কাটার ভারি ভারি যন্ত্রপাতিগুলি ছাড়া প্রকল্পের সমস্ত কাজ শারীরিক শ্রমে করা হচ্ছে এবং এর ফলে বহু লোকের কর্ম সংস্থান হয়েছে। বেশীর ভাগ কর্মীই হলেন স্থানীয় অধিবাসী এবং এই বিপুল কাজটাকে তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের কাজ ব'লে মনে করছেন।

গ্রামাঞ্চলের কথা

সুভাষ রায়চৌধুরী

জাপানী অধ্যাপক আকিও নিশিগুচির নেতৃত্বে দু'জন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল কিছুদিন আগে পশ্চিম বাংলায় কৃষির অগ্রগতি সম্বন্ধে সমীক্ষা করে গেলেন। তাঁরা মাত্র দশ দিনের মধ্যে পশ্চিম বাংলার অনেকগুলো জেলা ঘুরে দেখলেন। কলকাতা ছেড়ে যাবার আগে, এখানকার চাষ আবাদ সম্বন্ধে তাঁদের কী ধারণা হয়েছে এক সাক্ষাৎকারে তা জানতে চেয়েছিলাম। উত্তরে অধ্যাপক নিশিগুচি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন, বাংলাদেশে না এলে এখানে যা অগ্রগতি হয়েছে সে সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা সম্ভব হ'ত না। চাষের কাজে প্রভূত অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও সামগ্রিক উন্নতি হতে এখনও দেরী আছে। কারণস্বরূপ তিনি জানালেন, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই উন্নতির ফল ভোগ করছেন মুষ্টিমেয় বড় বড় জোতদার অথবা কিছু কৃষক যাঁরা চাষাবাদের কাজে পুঁজি নিয়োগ করতে সক্ষম। ছোট জোতের মালিক যাঁরা, আধুনিক চাষ আবাদের সুযোগ তাঁরা পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন নি—এমন কি আংশিকভাবেও না। আরও একটা বিষয় তাঁর নজর এড়ায় নি যা হ'ল খণ্ড খণ্ড জমি। কথায় কথায়, তিনি বললেন চাষের জমির মালিকের এক টুকরো জমি এখানে, আর এক টুকরো জমি আধ মাইল দূরে এমন তাঁরা কোথায়ও দেখেন নি।

আধুনিককালে বিজ্ঞান সম্মত ও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষ আবাদ করার ফলে জাপানে যে অগ্রগতি হয়েছে পশ্চিম বাংলায় সেভাবে সমস্যার সমাধান করতে গেলে, বিপুল সংখ্যক লোক বেকার হবার সম্ভাবনা থাকায়, সমাধানের কোনো ইঙ্গিত তিনি দিতে অক্ষম।

অধ্যাপক নিশিগুচির সঙ্গে অনেকেই হয়তো একমত হবেন। কারণ কিছুদিন আগে পর্যন্ত সরকারী তরফ থেকে কৃষির উন্নতির জন্য যত রকম সুযোগ সুবিধা কৃষকদের দেওয়া হয়েছে তার বড় অংশই সম্পত্তিপন্ন বড় বড় জোতদারের হাতে গিয়ে পড়েছে। সাধারণ কৃষক এ ব্যাপারে বঞ্চিত হয়েছেন। সেচের জন্য পুকুর কাটা থেকে শুরু করে খাল বা গভীর নলকূপ বসানো প্রভৃতি সাহায্য ছোট কৃষকদের কাছে বড় একটা পৌঁছোয় নি।

কৃষি বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাঁরা, তাঁরা সকলেই এ কথা জানেন যে, প্রথম দিকে যে সব যন্ত্রপাতি বিনামূল্যে বা নাম মাত্রমূল্যে সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল সেগুলোও পেয়েছিলেন বড় জোতদাররা। বীজ, সার প্রভৃতির ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা। ঋণ দেবার পরিকল্পনাও বড় ও চেনাশুনা লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রাম সেবকগণও ছোট কৃষকদের কাছে গ্রাম শোষক রূপেই বিবেচিত হতেন।

দেরী করে হলেও প্রয়োজনের তাগিদে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। উচ্চপদস্থ আমলা থেকে শুরু করে সাধারণ সরকারী কর্মচারীরা সবাই এখন চেষ্টা করছেন কিভাবে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের কর্মযজ্ঞে ছোট ছোট কৃষকদেরও হোতা করা যায়। বাস্তব ক্ষেত্রে তার ফল পাওয়া যাচ্ছে হাতে হাতে। বেকার সমস্যার তীব্রতা এবং যান্ত্রিক চাষের সফলতা ক্রমশঃ শিক্ষিত তরুণদের চাষের কাজে আকৃষ্ট করছে। তাই দেখা যায় অধিক ফলনশীল শস্য ও ফসলের চাষে যাঁরা সাফল্য লাভ করেছেন তাঁদের বেশীরভাগই বয়সে তরুণ, শিক্ষিত এবং ছোট জোতের মালিক। এ সব শস্য ও ফসলের চাষে খুব বেশী রকম যত্ন পরিচর্য্যার দরকার হয়। বেশী জমিতে চাষ করতে হলে তদ্বির তদারক করা যেমন অসুবিধাজনক তেমনি ব্যয় সাপেক্ষ।

একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে খুব বেশী অর্থ বিনিয়োগ করতেও অনেকে উৎসাহ পান না।

অগভীর নলকূপ বসাবার কার্যক্রম গ্রহণ করার পর থেকে অবস্থার পরিবর্তন হতে সুরু করেছে। উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়া, গাইঘাটা, হুগলীর পোলবা, আরামবাগ, নদীয়ার কৃষ্ণনগর, ১নং, ২নং কালিগঞ্জ, মুর্শিদাবাদের বহরমপুর, বেলডাঙ্গা, বীরভূমের সাঁইথিয়া, বর্ধমানের জামালপুর, বাঁকুড়ার সোনামুখী প্রভৃতি ব্লক ঘুরে দেখলে বোঝা যাবে কী বিপুল সম্ভাবনার ইঙ্গিত নিয়ে এসেছে এই অগভীর নলকূপের কার্যসূচী। এমন দেখা গেছে মাত্র ৯ বিঘা জমি চাষ করে তিন বছরের মধ্যে পাকা বাড়ী তৈরি করেছেন খুব সাধারণ একজন কৃষক। ১৯৬৮ সালের মে মাসে পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল সবপ্রথম যে কৃষকের বাড়ীতে পদার্পণ করেন তিনি মাত্র ১১ বিঘা জমির মালিক।

এখানে যে সব ব্লকের নাম করা হ'ল, এ ছাড়াও অনেক ব্লকে কৃষকরা অগভীর নলকূপের সাহায্যে বছরে বার মাস ফসল ফলাচ্ছেন। ঐ সব অঞ্চলের কৃষকরা অধিক ফলনশীল ধান চাষে যেমন উৎসাহী, ঠিক একই রকম উৎসাহ নিয়ে গম, আলু, পাট ও শাকসব্জির চাষ করছেন। উল্লিখিত ব্লকগুলির একটি থেকে আই-আর-৮ ধান চাষে এ বছর অভূতপূর্ব সাফল্যের খবর পাওয়া গেছে। গম চাষেও ঠিক তাই। তেমনি খবর আছে আলু চাষে। নতুন জাতের আলু কুফরি সিঁদুরী চাষ করে কাঠাপ্রতি ৭ মণ ৩০ সের ফসল পেয়েছেন একজন তরুণ কৃষক। এ সব ব্লকের কৃষকরা বিঘা প্রতি ২০।২৫ মণ ধান ফলানোকে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় বলে মনে করছেন না আজকাল। অনুরূপভাবে বিঘা প্রতি ৮-১০ মণ গমের উৎপাদনকে তাঁরা ঠিক পর্যাপ্ত বলে মনে করেন না। সব্জি, পাট প্রভৃতি চাষেও অভাবনীয় সাফল্য লাভ করতে দেখা গেছে। এ ব্যাপারে অগভীর নলকূপের কার্যকারিতা অনেকখানি।

এটা আশার কথা সন্দেহ নেই যে অধিক ফলনশীল শস্যের চাষে রাসায়নিক সারের ব্যবহার বেড়ে গেছে অনেক বেশী।

যতটা ব্যাপকভাবে হওয়া উচিত ছিল, ঠিক ততখানি প্রসার লাভ করতে পারেনি অধিক ফলনশীল শস্য চাষের কর্মসূচী। যাঁরা এর সুফল পেয়েছেন তাঁদের দেখাদেখি অন্যান্য কৃষকরাও ক্রমশঃ উৎসাহিত হয়ে এই বিপুল কর্মযজ্ঞে অংশ নিচ্ছেন। আজ সব চেয়ে বেশী দরকার চাষীকে সেচের সুযোগ করে দেওয়ার, সার, বীজ, কীট নাশক ওষুধ ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতি তাঁর নাগালের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার। সম্প্রসারণ কর্মীদের আরও সক্রিয়ভাবে এ কাজে অংশ গ্রহণ করা উচিত।

আরভি কেন্দ্রে, এই চূড়াকৃতি স্তম্ভের উপর বিরাট আকারের 'এ্যান্টেনা' (২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) বসানো হবে

উপগ্রহের মাধ্যমে আন্তঃমহাদেশীয় যোগাযোগ স্থাপন করছে পুণার রভি কেন্দ্র

রসকট কৃষ্ণ পিল্লে

চিত্র টি. সি. জৈন

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

আর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই পুণার ৮০ কিলোমিটার উত্তরে আরভি-তে ভারতের প্রথম উপগ্রহ-সংযোগ-কেন্দ্রটি চালু হবে। এটি চালু হয়ে গেলে সাগর মহাসাগর পেরিয়ে ভারত অন্যান্য দেশের সঙ্গে এই উপগ্রহ মারফৎ যোগাযোগ সংস্থাপন করতে পারবে। এই কেন্দ্রটি তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে এটি থেকে, ভারত মহাসাগরের ঠিক উপরে স্থাপিত ইনটেলস্যাট-৩ উপগ্রহের মাধ্যমে, ৮০০ টেলিফোন লাইনের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর দূরতম প্রান্তের সঙ্গেও ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে টেলিফোনে যোগাযোগ স্থাপন করা যাবে।

অবশ্য মহাকাশে স্থাপিত ঐ পর্য্যায়ের তিনটি উপগ্রহের মধ্যে যে কোনোও একটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উপগ্রহের সংযোগ কেন্দ্রটির যোগসূত্র থাকলেই হ'ল। বর্ত্তমানে এক দেশ থেকে আর এক দেশে টেলিফোনে কথা বলতে গেলে, যোগাযোগ করতে, দীর্ঘ সময় লাগে।

মহাকাশ সংযোগ কেন্দ্রটির মাধ্যমে শুধু টেলিফোনের সুবিধাই নয়, টেলেক্স', 'টেলিগ্রাফ', যে কোনোও তথ্য, রেডিও ফটো বা অনুষ্ঠানাদি, কথা ও গান, স্থানীয় বেতার অনুষ্ঠানের মত স্পষ্ট শোনা যাবে। যেমন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রচারিত কোনোও টেলিভিশন অনুষ্ঠান এদেশে টিভির পর্দায় ধরতে এক সেকেণ্ডও দেরি হবে না। উপগ্রহের মাধ্যমে যোগসূত্র স্থাপনের তত্ত্ব আবিষ্কারের আগে মহাসাগরের এপার ওপারের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের কল্পনা স্বপ্ন মাত্র ছিল।

মাইক্রোওয়েভ হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র দ্রুত সঞ্চারিত তরঙ্গ প্রবাহ যা টেলিভিশনের ছবি বা গলার স্বর বহন করে। এই প্রবাহ সোজাসুজি চলে দৃষ্টিপথ বরাবর অর্থাৎ মাঝখানে বাধা থাকলে যেমন দৃষ্টি ব্যাহত হয় তেমনি এই তরঙ্গ প্রবাহের গতিপথে বাধা পড়লে যোগাযোগ সূত্র বিচ্ছিন্ন হয়। এই তরঙ্গ প্রবাহ ধরার জন্য উঁচু উঁচ টাওয়ার বা স্তম্ভ চাই যা সোজাসুজি দেখা যাবে এবং প্রতি ৫০ কিলোমিটার অন্তর এ্যাম্পলিফায়ার থাকবে। সাগর মহাসাগরের মধ্যিখানে এই ধরণের স্তম্ভ নির্ম্মাণ দুরূহ কাজ ব'লেই উপগ্রহ মারফৎ যোগাযোগের পরিকল্পনা বাস্তবে মূর্ত্ত করার কথা চিন্তা করা হয়।

পুণার কাছে দিঘিতে 'বীম্ ওয়্যারলেস ষ্টেশন'-এর ভেতরে : এখানে পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তের সঙ্গে ভারতের বার্তা আদান-প্রদান পরিচালিত হয়

উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুযায়ী বিষুব রেখার উপর ৩৬,০০০ কিলোমিটার উঁচুতে সম দূরত্বের ব্যবধানে তিনটি কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করতে পারলে সারা বিশ্বের সঙ্গে টেলিকমিউনিকেশন যোগসূত্র স্থাপন করা যাবে। এই উপগ্রহগুলির গতি পৃথিবীর আহ্নিক গতির সমান হওয়ায় উপগ্রহগুলিকে নিশ্চল বোধ হবে। যাই হোক পৃথিবীর কাছে এই উপগ্রহ হবে এক একটি টাওয়ারের মত, সাগর মহাসাগরের বাধা কিংবা পৃথিবীর গোলাকৃতির দরুণ কোনোও রকম বিঘ্ন সৃষ্টি হবে না।

এই উপগ্রহগুলিতে সংযুক্ত 'এ্যাম্পলিফায়ার' পৃথিবীর যে কোনও জায়গার মহাকাশ সংযোগ কেন্দ্র থেকে উৎক্ষিপ্ত

৩০ মীটার আয়তনের একটি 'প্যারাবোলিক এ্যান্টেনা'র ছবি (দূদিক থেকে তোলা) : আরভিতে অনুরূপ এ্যান্টেনা বসানো হবে।

ক্ষীণ 'মাইক্রোওয়েভ' সঙ্কেত ধরে সেগুলি জোরালো করে আবার ঐ কেন্দ্রে ফেরত পাঠাবে। পৃথিবীর যে কোনও অংশে যে কোনো মহাকাশ সংযোগ কেন্দ্রের 'এ্যান্টেনা' যদি যোগাযোগ উপগ্রহমুখী হয় তাহলে অবশ্য ঐ সংকেতও ধরা যাবে। সাধারণ যোগাযোগ ব্যবস্থার মত এই সংকেত আদান-প্রদান দুটি মাত্র কেন্দ্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না; এমন কি পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ এক একটি উপ-গ্রহের আওতায় আসতে পারে।

আন্তঃমহাদেশীয় উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থা যথাযথভাবে কার্যকর করতে হলে একাধিক দেশকে সহযোগিতা করতে হবে, এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই ভারতসহ ৬২টি দেশকে নিয়ে 'ইন্টার ন্যাশনাল টেলি-কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট' সংস্থার স্থাপনা। সংস্থাটি বে সরকারী। এই কন্সার্টিয়ামই আন্তঃমহাদেশীয় ভিত্তিতে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে যোগাযোগ উপগ্রহ তৈরী ও মহাকাশে তার স্থাপনার কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করবে। কমিউনিকেশান স্যাটেলাইট কর্পোরেশন বা কমস্যাটই (মার্কিন সংস্থা) এই ধরণের উপগ্রহের নক্সা তৈরি বা তার অদল বদল ক'রে উপগ্রহটি তৈরি করবে।

উপগ্রহ মারফৎ যোগাযোগ ব্যবস্থার অঙ্গ দুটি। প্রথম উপগ্রহ ও তার সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক যন্ত্রপাতি এবং দ্বিতীয় মহাকাশ সংযোগ কেন্দ্রগুলি। প্রথমটির স্বত্বাধিকারী হ'ল এই ব্যবস্থার অংশীদার সব কটি দেশ। এই কেন্দ্রগুলির ওপর অধিকার ও সেগুলি চালু রাখার দায়িত্ব তাদের। যে যে দেশে মহা-কাশ সংযোগ কেন্দ্র আছে, সেই সব দেশে এই ধরণের প্রথম উপগ্রহ মহাকাশে স্থাপন করা হয় ১৯৬৫ সালে। তারপর ১৯৬৭ সালে তিনটি উপগ্রহ মহাকাশে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে দুটি, প্রশান্ত মহাসাগরের ওপরে মহাকাশে আর তৃতীয়টি অতলান্তিক মহাসাগরের ওপর। এই সব উপগ্রহের সাহায্যেই য়ুরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন পর্দায় ক্রীড়ানুষ্ঠান দেখতে পেয়েছিল।

ইনটেলস্যাট-৩ পর্য্যায়ের একটি উপগ্রহ এ বছরের জুন মাসে ভারত মহাসাগরের ওপর মহাকাশে কক্ষপথে স্থাপন করা হয়।

উপগ্রহের মাধ্যমে সাগরপারের সঙ্গে যোগাযোগ

ইন্টেলস্যাট ৩
যোগাযোগ উপগ্রহ

মাইক্রো তরঙ্গের
লাইন

বোম্বাইয়ের বিদেশ সঞ্চার ভবন

যোগাযোগ কেন্দ্র
(পুণার নিকটে)

দিল্লিতে ও-সি. এস্-এর গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগে দূর সংযোগ ব্যবস্থার নানান্ যন্ত্রপাতির নক্সা তৈরী হয় ও যন্ত্রাংশ তৈরী হয়

এই উপগ্রহ এশিয়া, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়াকে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় সরিক করে দিয়েছে। এই উপগ্রহটি পাঁচ বছর চালু থাকবে। এতে ১২০০ টেলিফোন লাইন আছে। এই একটি উপগ্রহ তৈরির খরচ ১৫০ কোটি টাকার মত। এর মধ্যে ভারতের অংশ বৈদেশিক মুদ্রার দাঁড়াবে ৭৫ লক্ষ টাকার মত। বিভিন্ন দেশে ১০টি কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। এই উপগ্রহটিকে কাজে লাগাবার জন্যে ভারতের মহাকাশ সংযোগ কেন্দ্র আরভি, উপগ্রহ মারফৎ বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। এই কেন্দ্রে কংক্রীটের একটি স্তম্ভের ওপর একটি 'প্যারাবোলিক এ্যান্টেনা' লাগানো থাকবে। এই এ্যান্টেনাটি হবে এ্যালুমিনিয়ামের এবং ওজন হবে ৩০০ টনের মত। এটিকে তাড়াতাড়ি ওপরে বা নীচে নাড়ানো যাবে। এটি আপনা আপনি উপগ্রহের গতিপথ অনুসরণ করে ঘুরবে। উপগ্রহ মারফৎ যোগাযোগ রক্ষা কত দ্রুত নিষ্পন্ন হয় তার একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরুন যুক্তরাষ্ট্র থেকে একটা টেলিভিশন প্রোগ্রাম বা একটা টেলিফোন কল উপগ্রহ মারফৎ অতলান্তিক মহাসাগর পেরিয়ে যুক্তরাজ্যে পৌঁছাবে। যুক্তরাজ্য ও ভারত নির্দিষ্ট একটি যোগাযোগ উপগ্রহের দ্বারা সংযুক্ত থাকায়, যুক্তরাজ্য থেকে এই টেলিভিশন প্রোগ্রাম বা টেলিফোন কল আবার আর একটি উপগ্রহের মাধ্যমে আরভিতে পৌঁছুবে এবং সেখান থেকে আবার 'রিপিটার' ষ্টেশন হয়ে বোম্বাই পৌঁছুবে। এই বিরাট ব্যাপারটা ঘটবে মাত্র ২ সেকেণ্ডের মধ্যে।

বোম্বাই-এর ঠিক মধ্যিখানে শতের তলার বিদেশ সঞ্চার ভবনের ছাতে বসানো ৪৫ মিটার মাইক্রোওয়েভ টাওয়ারের ওপর তৈরি একটি প্যারাবোলিক এ্যান্টেনা আরভি কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবে পাহাড়ের ওপর তৈরী ৩টি রিপিটার ষ্টেশনের মাধ্যমে। এই ষ্টেশনগুলির কাজ হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ বা সূক্ষ্ম তরঙ্গগুলির প্রবাহ অব্যাহত রাখা।

বোম্বাইয়ে একটা টি. ভি. ষ্টেশন স্থাপন করা না হলে বোম্বাই, বিদেশের টেলিভিশন অনুষ্ঠান রীলে করতে পারবে না। দিল্লীর টিভি ষ্টেশন সেই কাজ করতে পারে মাইক্রোওয়েভ যোগসূত্র করার ব্যবস্থা করা হয় অথবা দিল্লীতে একটা কেন্দ্র সংস্থাপন করা হয়।

১৯৭২ সালের মধ্যে নতুন দিল্লীতে ভারতের দ্বিতীয় মহাকাশ সংযোগ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। বোম্বাই-এর বিদেশ সঞ্চার ভবনে আন্তঃমহাদেশীয় যোগাযোগের যাবতীয় ব্যবস্থা থাকবে। এই ভবনটি তৈরী করতে যে টাকা খরচ হয়েছে তার বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ হবে ৮ কোটি টাকার মত। এর মধ্যে বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার পরিমাণ
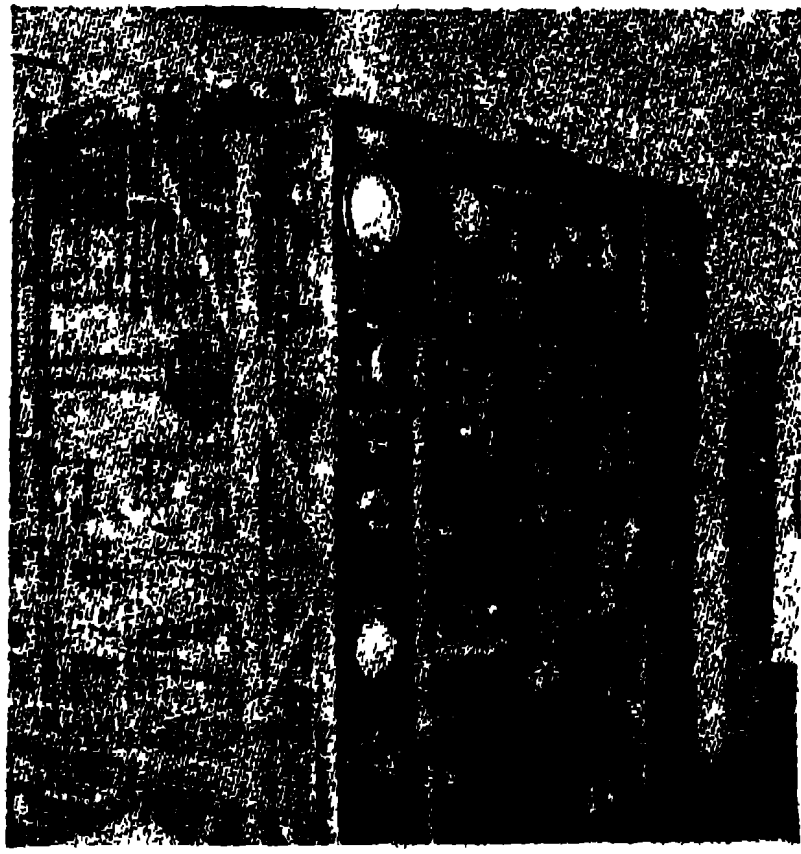
দিল্লির সবচেয়ে প্রাচীন ট্রান্সমীটার. ১৯২৭ সালে স্থাপিত

হবে ৩ কোটি টাকার সমান। আরভি কেন্দ্রে জোর কদমে কাজ চলেছে। টাওয়ারটি তৈরি হয়ে গেছে—এখন এ্যান্টেনা লাগানো বাকী। এটি যোগান দেবে ক্যানাডার আর সি এ ভিক্টর কোম্পানী। এর জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা দিচ্ছে ক্যানাডা।

আরভি কেন্দ্রের নক্সা, নির্মাণ কার্য্য এবং সার্বিক তদারকির দায়িত্ব নিয়েছে পারমাণবিক শক্তি সংস্থা। এই সংস্থায় আহমেদাবাদের পরীক্ষামূলক মহাকাশ যোগাযোগ কেন্দ্রে তালিম পাওয়া যন্ত্রবিদদের আরভিতে আনা হয়েছে। আহমেদাবাদের কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয় দু'বছর আগে। এই কেন্দ্র মার্কিণ উপগ্রহ মারফৎ জাপান ও অষ্ট্রেলিয়া থেকে রীলে করা টেলিভিশন ছবি ধরে।

নতুন মহাকাশ সংযোগ কেন্দ্র স্থাপনের কাজে ইঞ্জিনীয়ারদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার জটিল যন্ত্রপাতি চালনার দক্ষতা অর্জনের জন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য একমাত্র আহমেদাবাদের।" সাগর পারাপারে যোগাযোগ স্থাপন সংস্থার ৬০ জন ইঞ্জিনীয়ারকে এর জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

কথায় কথায় উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থার ডিরেক্টার শ্রীআর, পার্থসারথী বললেন, ১৯৭২ সালের মধ্যে টেলেক্স মারফৎ সরাসরি ডায়াল করে এদেশ ওদেশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের কল্পনা হয় তো কাজে পরিণত হতে পারে।

আমরা যখন আরভি কেন্দ্রের নির্ম্মাণ পর্ব দেখতে গিয়েছিলাম তখন গ্রামটিকে দেখে আশ্চর্য্য হয়েছিলাম ও একটু কৌতুক অনুভব করেছিলাম। যে আরভি সারা বিশ্বের নাড়ীর খবর জানাবে, সেই আরভিতে পরিবহন ও যোগাযোগ একটি সমস্যা বিশেষ। যদিও দেশের আধুনিকতম যোগাযোগ কেন্দ্র হিসাবে এবং আন্তঃমহাদেশীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে আরভি ইতিমধ্যেই সুপরিচিত হয়ে উঠেছে—তথাপি সেখানকার ইঞ্জিনীয়ারদের দেখলে মনে হবে তাঁরা এখনোও মান্ধাতার আমলেই আছেন। আরভিতে হাসপাতাল নেই, স্কুল নেই—অবসর কাটাবার জন্য সিনেমা হল নেই। নিকটতম রেলওয়ে ষ্টেশন ৫০ কিলোমিটার দূরে। একটা বাল্‌ব কিনতে হলে ছুটতে হয় পুণায়। তবু এই জায়গা বেছে নেওয়া হ'ল কেন? আমরা ওভারসীজ কমিউনিকেশনের ডিরেক্টার জেনারেলকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি যে উত্তর দিলেন তাতে অনেক কথা জানা গেল। তিনি বললেন বিদেশাগত বার্তাদির শতকরা ৪০-৪২ আসে বোম্বাইয়ে। ঐতিহাসিক কারণ ছাড়াও শিল্প সমৃদ্ধ নগরী হিসাবে বোম্বাই-র দাবী অনস্বীকার্য্য। আন্তর্জাতিক বার্তা বিনিময়ের শতকরা ২৬ ভাগ কলকাতা এবং বাকীটা মাদ্রাজ মারফৎ নিষ্পন্ন হয়।

(২০ পৃষ্ঠায় দেখুন)
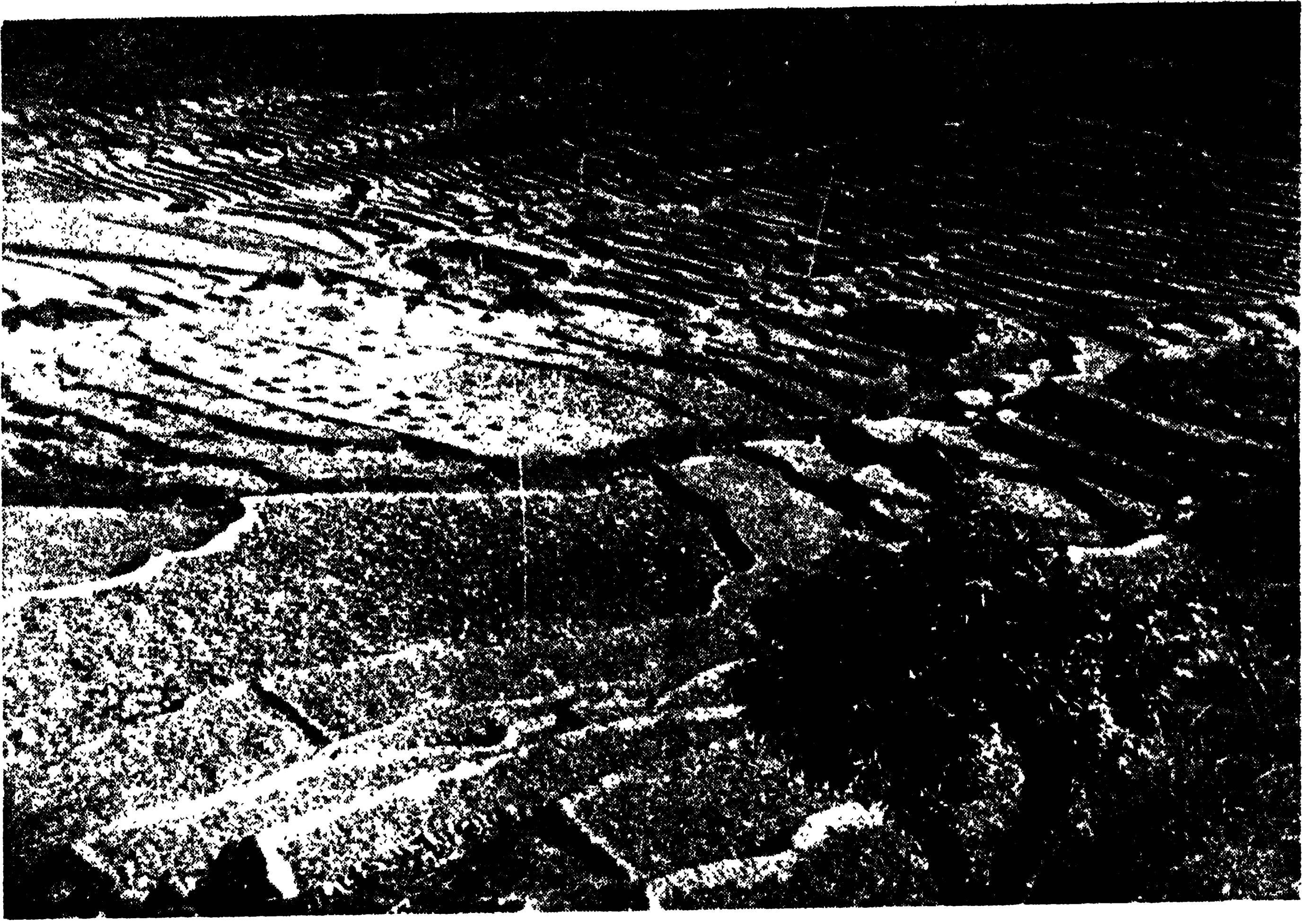
নাগাভূমিতে কৃষি উন্নয়ন

বি. এস. এস. রাও

নাগাভূমির পার্বত্যময় অঞ্চলে চাষবাসের জন্য সুবিস্তৃত সমতল ভূমি পাওয়া সমস্যা বিশেষ। সুতরাং সেখানকার অধিবাসীরা পরিবেশ ও আবহাওয়ার প্রভাব এবং কী ধরণের ফসলের জন্যে সেখানকার জমি উপযোগী তা বিবেচনা করে যে নিজস্ব চাষ পদ্ধতি স্থির করে নিয়েছিলেন সে আজকের কথা নয়। পাহাড়ের গায়ে খাঁজ কেটে কেটে তাঁরা ঝুম চাষ করতেন। সারা রাজ্যে প্রধানতঃ এই পদ্ধতিতেই চাষবাস হয়। কোন যুগে এর প্রচলন হয়েছে তা কেউ বলতে পারে না। তবে রাজ্যের শতকরা ২০ ভাগ জমি বাদ দিলে বাকী সবটায় ঝুম চাষ হয়। এই পদ্ধতি শুধু জীবিকা নির্বাহের উপায় মাত্রই নয়, এ তাঁদের জীবন ধারা, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের অঙ্গ। কিন্তু এই কৃষি পদ্ধতি অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক নয় এবং এর ফলে সর্বদাই ভূমিক্ষয়ের আশঙ্কা থাকে। ঝুম চাষের নিয়ম হ'ল, পাহাড়ের গায়ে খানিকটা সমতল জমি বেছে নিয়ে, আগুন লাগিয়ে সেখানকার ঝোপঝাড় ও আগাছা পুড়িয়ে দিয়ে সেখানে বীজ বুনে ফসল তোলা। পরের বার চাষের সময়, ঐ জমি ছেড়ে গিয়ে আর একটা নতুন জায়গায় গিয়ে ঝুম চাষ করা। তাই এই পদ্ধতির প্রতিক্রিয়াগুলি দূর করে উৎপাদন বাড়াবার অভিপ্রায়ে সরকার রাজ্যের অধিবাসীদের ঝুম চাষে নিরুৎসাহিত করতে উদ্যোগী হয়েছেন। স্থানীয় লোকেরা স্বভাবতই এর বিরোধী কারণ এতদিনকার জীবনধারা ও রীতিনীতির সঙ্গে এই প্রথার সংযোগ অতি ঘনিষ্ঠ। তথাপি সরকার এই সব ছোট ছোট জমিতে নিয়মিত চাষবাসের জন্যে যে সব কার্যসূচী প্রণয়ন করছেন সেগুলির লক্ষ্য হ'ল জমিগুলিকে স্থায়ীভাবে কৃষি জমিতে পরিণত করা এবং উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো। এটা যে করা সম্ভব তা রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের বাসিন্দাদের কাছে অন্ততঃ অজানা নয়। ঐ অঞ্চলের দুটি প্রধান উপজাতি আংগামী ও চাখেসাংরা পাহাড়ের গায়ে খাঁজ কেটে বাইরের দিক থেকে ঐ জমির ধারে ছোট ছোট আল তুলে দিয়ে ধান চাষ করেন। এঁদের সেচের সমস্যাও পোয়াতে হয় না কারণ এঁরা সাধারণতঃ নালা কেটে পাহাড়ী ঝর্ণার জলে জমিতে

সেচ দেন। ঝুম চাষের তুলনায় এই পদ্ধতি অনেক ভালো কারণ এতে জমির মাটি ক্ষয়ে যায় না, জমি পতিত থাকে না এবং এতে তাঁদের অন্নের সংস্থানও হয়ে যায়। 'টেরাস রাইস কালটিভেশান' বা টি আর সি নামে পরিচিত এই প্রথা কিন্তু তুয়েংসাং ও মোককচং অঞ্চলে বেশী জনপ্রিয় নয় কারণ সেখানে ঝুম চাষের প্রচলনই বেশি।

ধান চাষের প্রথা জনপ্রিয় করার জন্য রাজ্যের কৃষি বিভাগ ভূমি উন্নয়ন সূচী ও ও টি আর সি পরীক্ষামূলক কার্যসূচী প্রবর্তন করেছেন। ভূমি উন্নয়ন সূচী প্রকল্প অনুযায়ী যারা অকর্ষিত জমিতে চাষ করতে ইচ্ছুক তাদের সরকার এককালীন মঞ্জুরী বা সাহায্য হিসেবে অর্থ সাহায্য দেবেন। এই সাহায্যের পরিমাণ হবে হেক্টর প্রতি ৭,৫০০ টাকা অথবা জমি চাষের জন্যে মোট খরচের অর্ধেক। ১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৬৮-৬৯ সাল পর্যন্ত মোটামুটি ৭৪২০ হেক্টার জমির জন্য সরকারের খরচ হয়েছে ২৪.৯৫ লক্ষ টাকা।

এই প্রকল্প অনুযায়ী আংগামী ও চাখেসাং উপজাতীয় চাষীদের মাসিক ৩০০ টাকা মাইনে দিয়ে মোককচং ও তুয়েংসাং জেলার বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করতে পাঠানো হয়। ঐ দুটি জেলার এক একজন চাষীর সমস্ত জমি এঁদের চাষ করতে দেওয়া হয়। এই বিশেষজ্ঞরা এই জমিগুলিকে একত্রে সমতল করে নিয়ে, পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ক্ষেত তৈরি করে তাতে চাষ করেন। তিন বছর পরে এদের ঐ একই উদ্দেশ্যে অন্যান্য এলাকায় পাঠানো হয় এবং যার যার জমি তাকে তাকে ফেরৎ দেওয়া হয় এই সর্তে যে, নতুন শেখানো চাষ পদ্ধতি তারা কায়েম রাখবে, বর্জন করবে না।

তৃতীয় পরিকল্পনার সুরুতেই এই প্রকল্প প্রবর্তন করা হয় এবং এই ব্যবস্থার ফলে ক্রমশঃ সুফলও পাওয়া যাচ্ছে। এই বিষয়ে সরকার প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি দিয়ে উৎসাহ দেওয়ায় নতুন কৃষি পদ্ধতি তুয়েংসাং-এর ভেতরের দিকের গ্রামগুলিতে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই প্রকল্প যে বেশ কার্যকর ও ফলপ্রসূ তার প্রমাণ হচ্ছে টি আর সি'র আওতায় আসা জমির পরিমাণ বৃদ্ধি। যেমন ১৯৬০-৬১ সালে ১১০০০ হেক্টার থেকে ১৯৬৮-৬৯ সালের শেষে ঐ জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯০০০ হেক্টার।

এই নতুন ব্যবস্থা কার্যকর করার পথে দুটি প্রধান অন্তরায়ের একটি হ'ল চিরাচরিত সংরক্ষণশীলতা এবং দ্বিতীয় হ'ল ঐসব জমির উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব।

প্রচার ও শিক্ষার মাধ্যমে এবং হাতে কলমে দেখিয়ে প্রথম সমস্যার বিহিত করার চেষ্টা চলেছে। দ্বিতীয়টির জন্যে সরকার কৃষির যান্ত্রিক সরঞ্জাম ব্যবহার ক'রে, মজুর নিয়োগ ক'রে কাজ করানোর ব্যয় হ্রাস করার কথা ভাবছেন; কারণ তাহলে ভূমি উন্নয়নের ব্যয়ও অনেক কমে যাবে। শ্রমিকের অভাবের দরুন প্রতি হেক্টার জমির উন্নয়নে খরচ পড়ে ৩০০০ টাকার মত। ট্র্যাক্টার ও লেভেলার ব্যবহার করলে খরচ কমিয়ে ১৮০০ টাকা করা সম্ভব। শতকরা ৫০ টাকা হারে সরকারী সাহায্য পেলে যে কোনো স্বল্পবিত্ত চাষীর পক্ষে জমি সমতল করা ও চাষবাসের জমি তৈরী করা অসম্ভব হবে না। নব গঠিত ভূমি সংরক্ষণ বিভাগ চতুর্থ পরিকল্পনাকালে এই প্রকল্প চালু করতে মনস্থ করেছেন।

তাই ছোট খাটো সেচ প্রকল্প যেমন পাহাড়ী ঝর্ণা প্রভৃতির জল সেচের জন্য ব্যবহার করা, নালাকাটা, বিনামূল্যে অথবা পরিপূরক সরকারী সাহায্যে উন্নত ধরণের বীজ, সার, উদ্ভিদ সংরক্ষণ ব্যবস্থাও একই সঙ্গে কার্যকর করা হচ্ছে—যাতে মূল লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টায় কোথাও কোনো ফাঁক না থাকে। এই রকম সুসংহত প্রচেষ্টার দ্বারা সরকার দুটি প্রকল্পই সফল করতে পারবেন বলে আশা করছেন।

উপগ্রহের বিপুল সম্ভাবনা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ভারত আন্তর্জাতিক টি. ভি. ব্যবস্থার আওতায় এলেই নিরক্ষরতা নির্মূল করায়, পরিবার পরিকল্পনার প্রচারে, সমাজকল্যাণ এবং কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে উদ্দীপনা ও উৎসাহের সঞ্চার হবে। মনে রাখতে হবে চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষি সম্প্রসারণ সূচীকে সর্ব্বাগ্রগণ্য ধরা হয়েছে।

দিল্লীতে ছাত্রদের জন্যে প্রযোজিত টি. ভি. অনুষ্ঠানের বিপুল জনপ্রিয়তাকে মাপকাঠি ধরলে বোঝা যায় যে, বিশ্বব্যাপি টি. ভি. শিক্ষা অনুষ্ঠানে ভারত অংশ নিতে পারলে এ দেশের ছেলেমেয়েরা কত উপকৃত হবে।

কুশলী যন্ত্রবিৎ, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, গবেষণাগার ও প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান ক'রে এই ব্যবস্থা কার্য্যকরভাবে প্রবর্ত্তন করতে কয়েক বছর সময় লাগতে পারে কিন্তু সে অসুবিধা কাটিয়ে ওঠাও বোধ হয় খুব দুঃসাধ্য হবে না। বর্ত্তমানে দেশের অধিকাংশ স্কুলের পক্ষে বিজ্ঞান বিষয়ে ব্যয় বহুল পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়া সব সময় সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে সারা দেশে সমস্ত স্কুলের শিক্ষার অভিন্ন মাধ্যম হিসাবে, টি. ভি.র ছোট পর্দায় বিজ্ঞানের নানারকম পরীক্ষা দেখাতে পারলে শিক্ষার মান, বিশেষ ক'রে বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষার মান উন্নত হবে। সব স্কুলের ছাত্রছাত্রী একই অনুষ্ঠান দেখার অবকাশ পাওয়ায় সকলেই এক বিষয় একরকমভাবে শিখতে পারবে এমনকি এই অনুষ্ঠান পাঠ্য-পুস্তকেরও পরিপূরক হ'তে পারবে।

ভারতের একটিমাত্র শহরে টেলিভিশন আসার পর যদিও ১০ বছর কেটে গেছে তথাপি মহাকাশ-যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভারতের সক্রিয় অংশ গ্রহণ এক বিরাট পদক্ষেপ সন্দেহ নেই।

কৃষি ঋণ

প্রয়োজন সম্পর্কে পরীক্ষা

চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদনের যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে তা পূরণ করতে হলে, ভারতের কৃষির যে বিপুল পরিমাণ মূলধন ও ঋণের প্রয়োজন হবে তা আমাদের অতীতের সব অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে যাবে। কাজেই ভারতের কৃষকগণের আগামী কয়েক বছরে কি পরিমাণ ঋণের প্রয়োজন হতে পারে তার একটা প্রকৃত তথ্যভিত্তিক অনুসন্ধান অত্যন্ত প্রয়োজন। যে সংস্থাগুলি ঋণদানের ব্যবস্থা করে তাঁদের কর্মনীতি স্থির করে দেওয়ার জন্যও গবেষণা করা প্রয়োজন।

ভারতের কৃষকগণ মোট কত টাকা ঋণ করেছেন সে সম্পর্কে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৫১-৫২ এবং ১৯৬১-৬২ সালে পল্লী ঋণের এবং ঋণ ও লগ্নির পরিমাণ সম্বন্ধে যে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করেন তা ছাড়া, সর্ব ভারতীয় পর্যায়ে, কৃষকগণের কি পরিমাণ ঋণের প্রয়োজন হয় সে সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোন অনুসন্ধান করা হয়নি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়ায় যদিও বলা হয়েছে যে ১৯৭০-৭১ সালে ভারতের কৃষকগণের ঋণের প্রয়োজন ১৫০০ থেকে ১৬০০ কোটি টাকা পর্যন্ত দাঁড়াতে পারে। তবে পরিকল্পনা কমিশন কোন তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এই হিসেব দিয়েছেন তা জানা যায় নি। এই অনুমানের আদৌ কোন ভিত্তি আছে কিনা সে সম্পর্কে যদি কেউ প্রশ্ন তোলেন তাতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই।

গবেষণামূলক কাজের প্রয়োজনীয়তা

ভারতে যে কৃষি বিপ্লব ঘটছে তাতে আমাদের ওপর কতকগুলি নতুন দায়িত্ব এসে পড়ছে। ভারতের কৃষকগণের হাতে কোনদিনই এতো টাকা ছিল না যাকে যথেষ্ট বলা যায়। কাজেই উৎপাদন বাড়াবার জন্য অতিরিক্ত যে অর্থের প্রয়োজন তা সংগ্রহ করা তাঁদের পক্ষে কষ্টকর। কাজেই তাঁরা যাতে প্রয়োজনীয় ঋণ পান তার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। কাজেই প্রতি বছরে, কি উদ্দেশ্যে, রাজ্য ও জেলা অনুযায়ী ভারতের কৃষকগণের কি পরিমাণ ঋণ প্রয়োজন তা স্থির করা অত্যন্ত দরকার। তবে এটা যে একটা অত্যন্ত বিরাট কাজ এবং এর জন্য যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষতঃ এটা এমন একটা জরুরী কাজ যে অবিলম্বে এটা হাতে নেওয়া উচিত।

এ ক্ষেত্রে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইতিমধ্যেই কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন,

কে. কে. সরকার

তাঁরা, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, কৃষি বিষয়ক অর্থ কমিশন, কৃষি ভিত্তিক শিল্প কর্পোরেশন, কৃষি গবেষণা সম্পর্কিত ভারতীয় পরিষদ এবং সরকারি কৃষি বিভাগের সহযোগিতায় এই অনুসন্ধানের কাজ হাতে নিতে পারেন।

প্রথমতঃ কৃষিতে কি পরিমাণ মূলধন ও নগদ টাকা লগ্নি করা হয় বা কৃষির আয় ব্যয়িত হয় তা নিয়ে অনুসন্ধান করা যেতে পারে অর্থাৎ উত্তরাধিকার সূত্রে, কৃষি থেকে কি পরিমাণ মূলধন চলে যাচ্ছে এবং কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃষকগণ প্রকৃতপক্ষে কি পরিমাণ টাকা লগ্নি করেন তা নিয়ে অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

এ ছাড়াও উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষির কাঠামোতে কি কি পরিবর্তন প্রয়োজন, উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজাত সামগ্রীর মূল্যের ওপর তার কোন প্রতিক্রিয়া হবে কিনা, রাসায়নিক ও জৈব সার ইত্যাদির মতো জিনিসগুলির চাহিদা ও সরবরাহ এবং জলসেচের সম্ভাবনা কতটুকু ইত্যাদির মতো প্রশ্নগুলি সম্পর্কেও সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন রয়েছে।

এগুলি অবশ্য দীর্ঘ-মেয়াদী প্রকল্প এবং কৃষকগণের কি পরিমাণ ঋণের প্রয়োজন তা স্থির করার উদ্দেশ্যের সঙ্গে বাহ্যতঃ কোন সম্পর্কে আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু ভারতের কৃষির মূলধনের অবস্থা এবং কৃষির অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্যাদি সংগ্রহ না করে, ভারতের কৃষকগণের কি পরিমাণ ঋণের প্রয়োজন তা স্থির করতে যাওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হবে তাতে সন্দেহ নেই। এই প্রাথমিক কাজগুলি প্রথমে না করা হলে, দূর ভবিষ্যতে সমগ্র দেশের জন্য কি পরিমাণ কৃষি ঋণের প্রয়োজন তা নিয়ে আমরা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারবো না।

জরুরী প্রয়োজন

তবে প্রত্যেকের প্রয়োজন বিবেচনা করে যে সব ঋণ প্রদানকারী সংস্থা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করছিলেন, তাদের সেই কাজ এখন চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও কোন অঞ্চলের কৃষকগণের ঋণের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী, লগ্নির জন্য কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, লগ্নির জন্য কৃষকগণই বা কি পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা করতে পারেন, এবং কোন বিশেষ কৃষকের বা কৃষকগণের কি পরিমাণ ঋণের প্রয়োজন তাও অনুসন্ধান করা দরকার।

ঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা রোধ করার জন্য প্রথমেই প্রতিটি সংস্থার কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে, কোন সমবায় ঋণদান সমিতিতে বলে দেওয়া যায় যে, তাঁরা প্রধানতঃ ছোট ও মাঝারি কৃষকগণকে স্বল্প মেয়াদী ঋণ দেবেন। তেমনি বড় কৃষকদের, মাঝারি ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেওয়ার দায়িত্ব ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক এবং ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলিকে দেওয়া যায়। অন্যদিকে খালের ধার সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো, পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদির মতো দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা, যেগুলিতে যথেষ্ট মূলধনের প্রয়োজন, কৃষিতে অর্থ বিনিয়োগ সম্পর্কিত কমিশনকে কেবলমাত্র সেই কাজ করতে বলা যেতে পারে। পাম্প সেট বসানোর মতো বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করার ভার কৃষি ভিত্তিক শিল্প কর্পোরেশনগুলিকে দেওয়া যেতে পারে।

তবে, কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি উদ্দেশ্যে কত ঋণের প্রয়োজন তা স্থির করে এই ঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলির কাজের মধ্যে কার্যকরী সমন্বয় স্থাপন করতে হবে।

সাধারণ অসাধারণ

মনে প্রাণে কৃষক

যিনি মনে প্রাণে কৃষক, পেশা তাঁর যাই হোক না কেন, তাঁর মন পড়ে থাকে সেই ছোট্ট জমিটুকুতে। তিনি কেবল ভাবেন, একটু সময় পেলেই জমির আগাছাগুলো পরিষ্কার করে দিতে হবে, হয়তো আর একটু সার দিতে হবে। হংসরাজও এই রকম একজন খাঁটি কৃষক। মোটরগাড়ী চালানো তাঁর পেশা হলেও, তাঁর মন পড়ে থাকে চাষের জমিতে। তাঁর বাড়ী হ'ল জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের পুঞ্চের কাছে ভাঁইঞ্চ গ্রামে। উত্তরাধিকার সূত্রে সেই গ্রামে তাঁর যে জমি রয়েছে, সারাদিন ধ'রে লরী চালাতে ব্যস্ত থাকলেও গ্রামের সেই জমির কথা তিনি ভুলতে পারেন না। তিনি সারাদিন বাইরের কাজে ব্যস্ত থাকেন ব'লে তাঁর মা ও স্ত্রী দুই একজন মজুর নিয়ে চাষ আবাদের কাজ দেখেন, কিন্তু একটু সময় পেলেই তিনিও ওঁদের সঙ্গে এসে যোগ দেন।

চাষের কাজে তিনি যে সাফল্য লাভ করেছেন সেটা তিনি খুব জাঁক ক'রে প্রচার করতে চান না। হংসরাজকে যখন জিজ্ঞেস করা হ'ল যে, চাষের কাজে তিনি এত সফল হলেন কি ক'রে, তখন তিনি বললেন যে, রাসায়নিক সার আর বেশী ফলনের বীজ ব্যবহার ক'রে অনেকেই চমৎকার ফসল পাচ্ছেন দেখে, তিনিও স্থির করলেন যে, তাঁর জমিতেও তিনি এই রকম সার ও বীজ ব্যবহার ক'রে দেখবেন কেমন ফল পাওয়া যায়। সুতরাং গত বছর স্থানীয় কৃষি কর্ম্মচারীর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি তাঁর জমিতে গিজা-১৪ জাতের ধানের বীজ লাগিয়ে, কৃষি বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ী উপযুক্ত সার ও সেচ দিলেন। ফলে এতো ফসল পেলেন যা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। ফসল যখন তোলা হ'ল তখন দেখা গেল যে প্রতি একরে ৭০ কুইন্ট্যাল ধান হয়েছে। ঐ উৎপাদন জম্মু কাশ্মীর রাজ্যে একেবারে রেকর্ড হয়ে গেল। হিমালয়-১২৩ জাতের ভূট্টা লাগিয়েও তিনি প্রতি একরে ৪৯.২৭ কুইন্ট্যাল শস্য পেলেন।

ফলের চাষেও হংসরাজ পুঞ্চ জেলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলে ঘোষিত হয়েছেন। তিনিই একমাত্র কৃষক যিনি পুঞ্চ জেলায় কাগজি বাদাম ফলিয়েছেন। তাঁর পাঁচটি কাগজি বাদাম গাছ থেকে তিনি বছরে ৬০ কে. জি. বাদাম পান। তাছাড়া তিনি আপেল, কুল ও খুবানিও ফলিয়েছেন।

একজন আধুনিক কৃষক

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার কার-গ্রাম গ্রামের শ্রীজনস্ত বন্দোপাধ্যায় হলেন একজন আধুনিক কৃষক। তিনি বলেন যে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী জমি ভালো ক'রে তৈরী ক'রে ভালো বীজ, উপযুক্ত পরিমাণ সার, জলসেচ ও কীট-নাশক ব্যবহার করাই হল আধুনিক কৃষি পদ্ধতি।

গত বছর খারিফ মরসুমে শ্রীবন্দোপাধ্যায় স্থির করলেন যে তিনি আই আর-৮ ধানের বীজ নিয়ে পরীক্ষা করবেন। সেই অনুযায়ী তিনি এই ধানের বীজ এনে সেগুলি রাসায়নিক মিশ্রণে ভিজিয়ে ০.৬৬ একর জমিতে বুনে দেন। জমিতে তিনি প্রথমত ১২ গাড়ী গোবরের সার ভালো করে মিশিয়ে নেন। তার-পর ৭০ কে. জি. মিক্শ্চার গ্রেড, ১.৪৫ কে. জি. ইউরিয়া এবং ২৫ কে. জি. পটাস মিউরিয়েট জমিতে দিয়ে দিলেন।

ধানের চারা ওঠার ৪৫ দিন পর তিনি আবার ১২ কে. জি. ইউরিয়া ছড়িয়ে দেন। জমির কাছাকাছি একটা পুকুর থেকে তিনি পাম্প করে সেচের জল দেন। তাছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী সময়মতো কীটনাশক ছড়িয়ে দেন।

তাঁর এই এই চেষ্টা ও পরিশ্রম বিফলে গেলো না। তিনি উপযুক্ত পুরস্কার পেলেন। বীজ বোনার ১১৪ দিন পর তিনি যখন ফসল ঘরে তুললেন তখন দেখা গেল যে একর প্রতি ৮৭.৫ মন ধান ফলেছে। তাঁর সম্পূর্ণ ফসলটা ভারতের খাদ্য কর্পোরেশন প্রতি কুইন্ট্যাল ৬৪ টাকা দরে কিনে নেন। আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ ক'রে শ্রীবন্দোপাধ্যায় একর প্রতি ১৭১৫ টাকা লাভ করেন।

অধ্যবসায়ের পুরস্কার

আন্তরিক চেষ্টা ও অধ্যবসায় থাকলে যে অভীষ্ট ফল পাওয়া যায় তাতে কোন সন্দেহ নেই। শ্রীবান্দেরা শান্তারাম মানে, হলেন একজন অত্যন্ত অধ্যবসায়ী কৃষক। নিজের লক্ষ্য পূরণ করার জন্য তিনি কোন বাধাকেই বাধা ব'লে মানেননি। এঁর বাড়ী হ'ল মহারাষ্ট্রের কোলহাপুর জেলার মাডসিঙ্গি গ্রামে। তিনি আই আর ৮ ধানের কথা শুনে নিজের জমিতে এই ধান নিয়ে পরীক্ষা করবেন ব'লে স্থির করলেন। কিন্তু স্থানীয় কৃষি অফিসে বা কাছাকাছি কোথাও এই ধানের বীজ সংগ্রহ করতে পারলেন না। তবে এতে তিনি দমে গেলেন না। বীজের খোঁজে তিনি হায়দরাবাদে গিয়ে হাজির হলেন কিন্তু সেখানেও তিনি মাত্র এক কে. জি. ধান পেলেন।

এই নতুন ধান নিয়ে পরীক্ষা করার জন্য তিনি এত অধীর হয়ে উঠেছিলেন যে, সেই এক কে. জি. ধান নিজের জমিতে বুনে আরও বীজ ধান তৈরী করার জন্য বদ্ধ পরিকর হলেন। সুতরাং ১০ ফুট—আয়তনের ছোট্ট একটু জায়গায় তিনি সেই এক কে. জি. ধানই বুনে দিলেন। এক কে. জি. ধান থেকে যখন তিনি ১৬ কে. জি. বীজ ধান পেলেন, তখন যেন তাঁর নিজের চোখকেই বিশ্বাস হচ্ছিলোনা। এ থেকে তিনি ২৪ কে. জি. বীজ ধান দেড় একর জমিতে বুনে দিলেন, এবং তাঁর বন্ধু-বান্ধব যাঁরা এই ধানের চাষ করতে উৎসাহী ছিলেন তাঁদের মধ্যে বাকিটা ভাগ করে দিলেন।

স্থানীয় ধানের বীজে যেখানে ২৮ বস্তা ফসল পাওয়া যায় সেখানে শ্রী মানে উপযুক্ত পরিমাণ সার, কীটনাশক ও সেচ দিয়ে ৯৭ বস্তা ফসল ঘরে তোলেন।

পরিকল্পনা ও সমীক্ষা

দেশের মোটামুটি আয়ুসীমা ৫০ বছর হলেও আম্বালার একটি গ্রামের আয়ুসীমা হ'ল ৬০ বছরেরও ওপরে। একটি উন্নয়নশীল শহরের প্রান্তে কাউলা গ্রামের অধিবাসীদের অবস্থা যেমন ভালো তেমনি এঁরা সুখে স্বাচ্ছন্দে আছেন। কাজেই এঁরা বেশীদিন বাঁচবেন তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে।

কাউলা গ্রামের শতকরা ৯০ জনই কৃষির ওপর নির্ভরশীল এবং সেখানে ট্রাক্টর ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতির চাহিদা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। এই গ্রামে বর্তমানে ৮টি ট্রাক্টর আছে এবং উপযুক্ত দরে যদি ছোট ট্রাক্টর পাওয়া যায় তাহলে আরও অনেকে এগুলি কিনতে ইচ্ছুক।

আম্বালা শহরের এস. এ. জৈন কলেজের ছাত্রদের একটি দল ঐ গ্রামে অনুসন্ধানে যান এবং দেখেন যে ১০১১ একর জমির মধ্যে ৯৩২ একর জমিতেই চাষবাস করা হচ্ছে অর্থাৎ গ্রামটির শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ জমিতেই চাষ হচ্ছে। এই গ্রামে খণ্ড খণ্ড জমির পরিমাণ কম, তবুও ভারতের প্রতি কৃষি-পরিবারে মোটামুটি জমির পরিমাণ যেখানে ৫.৩৪ একর, সেই তুলনায় এঁদের জমির পরিমাণ হ'ল ৪ একর।

গাছের জল দেওয়ার জন্য এই গ্রামের কৃষকরা ইরাণীচক্র ও কুয়োর ওপর নির্ভর করেন। এই গ্রামটিতেও শিগগীরই বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করা হবে। ধনী চাষীরাই শুধু উন্নত ধরণের বীজ কিনতে পারেন। উৎপাদিত শস্যাদি খুব সহজেই বাজারে ও ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় বিক্রী হয়ে যায়। গ্রামের অধিবাসীরা শাক সব্জি বিক্রী ক'রে যথেষ্ট আয় করেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করায় গম, ছোলা, আখ, তৈলবীজ ও ডাল ইত্যাদির উৎপাদন ৩।৪ গুণ বেড়ে গেছে।

গ্রামে ৪০২টি গরু মহিষ আছে। ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বেশীর ভাগেরই ২১২টি মহিষ আছে। এঁরা আম্বালাতে দুধ সরবরাহ করেন।

কৃষকরা কোন সমবায় সমিতির মাধ্যমে উৎপাদন বাজারজাত করার পদ্ধতিতে উৎসাহী নন। যে কাজের সঙ্গে কোন সরকারী বা আধাসরকারী কর্মচারীর যোগ আছে সে রকম কোন কাজে যোগ দিতে তাঁরা ভয় পান ব'লে মনে হয়।

অর্থনীতির দিক থেকে বিচার করলে এই গ্রামের অধিবাসীদের মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়—যেমন, যারা নিজেদের জমি চাষ করেন, ভূমিহীন চাষী এবং অন্যান্য ভাবে জীবন যাপন করেন। ৫০০ পরিবারের মধ্যে ২৫০টি পরিবার নিজস্ব জমিতে চাষ করেন এবং ১৫০টি পরিবার ভূমিহীন চাষী। শেষোক্তদের মধ্যে বেশীর ভাগই হলেন অনিয়মিত কৃষি শ্রমিক। শস্য কাটার মরশুমে এঁরা গ্রামে কাজ করেন; অন্য সময়ে কাছাকাছি শহরগুলিতে করেন। পূর্ণবয়স্ক একজন শ্রমিকের দৈনিক মজুরি হ'ল পাঁচ টাকা। সম্পদ ও আয়ের বৈষম্য তেমন বেশী চোখে পড়ে না। চারটি ধনী পরিবার ছাড়া অন্য সব পরিবারগুলির আয় মাঝামাঝি।

গ্রামে প্রায় ২৭৫টি পাকা এবং ভালোভাবে তৈরী বাড়ী আছে। অনেক বাড়ীতেই চেয়ার টেবিলের মতো আসবাব রয়েছে। ট্রানজিস্টার, রেডিও, সেলাইর কল, সাইকেল এবং চীনামাটির বাসনপত্র প্রায় সকলের বাড়ীতেই রয়েছে।

গ্রামবাসীদের খাদ্য ও পোষাক-পরিচ্ছদ উন্নততর হয়েছে।

সম্প্রতি হরিজনরা যেন আরও সমৃদ্ধ ও আত্মবিশ্বাসী হয়েছেন। তবে গ্রামের অন্যান্যরা অবশ্য এখনও তাঁদের নিম্নস্তরের বলে মনে করেন। যুবক যুবতীদের মধ্যেও সাম্যের মনোভাব নেই।

এখনও বহু মহিলা পর্দাপ্রথা মেনে চলেন। তবে যুবতীরা দামী পোষাক পরিচ্ছদ, অঙ্গসজ্জার দ্রব্যাদি ও সৌখীন জিনিসপত্রের দিকে ঝুঁকছেন। এখন আর অল্প বয়সেই বিয়ে দেওয়া হয় না। তবে বিয়েতে পণ ও যৌতুকের রীতি এখনও রয়েছে। জাতি ও যৌথ পরিবার প্রথার বন্ধন ক্রমশঃ আলগা হচ্ছে। রাজনীতি, বিশেষ ক'রে পঞ্চায়েতের নির্ব্বাচন গ্রামের ও সমাজের শান্ত জীবন নষ্ট করছে বলে মনে হয়।

প্রায় সমস্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়াশুনা করে। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫০০ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। পুরুষদের তুলনায় নারীদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা অনেক বেশী জনপ্রিয়। তবে এই গ্রামে লুপের ব্যবহার নেই বল্লেই হয়।

গ্রামের পঞ্চায়েতের সদস্যদের মধ্যে একজন মহিলা এবং অনুন্নত শ্রেণীর দুইজন পুরুষ সদস্য রয়েছেন। এই গ্রামটি যদিও প্রায় ১৫ বছর আগে থেকেই সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীনে এসেছে, গ্রামবাসীরা কিন্তু এই কর্মসূচীর লক্ষ্য ও কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কে বিশেষ কোন খবর রাখেন ব'লে মনে হয় না। তাঁরা সমষ্টি উন্নয়ন ব্লককে বীজ ও সার সরবরাহকারী কেন্দ্র ব'লে মনে করেন।

স্বাদের শব্দ তরঙ্গ

ডেনমার্কের একজন মনঃস্তত্ত্ববিদ ডঃ ক্রিষ্টিয়ান হোল্‌ষ্টিয়ানসেন নানা রকম পরীক্ষার পর আভাষ পেয়েছেন যে, পানীয়ের স্বাদ গ্রহণে শব্দের গুরুত্ব মোটেও অস্বীকার করা চলে না। তাঁর মতে বীয়ার, হুইস্কি আদি মদ, কফি ও চা প্রত্যেকের স্বাদ যেমন আলাদা তেমনি প্রত্যেক পানীয়ের সঙ্গে তার স্বাদের অনুকূল শব্দপ্রবাহের নিগূঢ় সংযোগ আছে। হাতে কলমে পরীক্ষা করে একটি শব্দ ক্ষেপক যন্ত্রের সাহায্যে তিনি দেখিয়েছেন যে, বীয়ার খাবার সময়ে চা-এর অনুকূল শব্দ তরঙ্গ বাজালে বা চা খাবার সময়ে হুইস্কীর অনুকূল সুর বাজালে স্বাদে ও আস্বাদনে প্রচুর তারতম্য ঘটে। এমন কি প্রত্যেক পানীয়ের আস্বাদের শব্দ ছন্দ, গতি তরঙ্গ বাড়ানো কমানো হলেও স্বাদের তারতম্য ঘটে।

পরিকল্পনা ও মূল্যের ঊর্ধ্বগতি

কল্যাণ দত্ত

পরিকল্পনার ফলে দেশে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা হয়েছে, জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তীব্রহারে মূল্য বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশাও বেড়েছে। এখন প্রশ্ন হ'ল, দেশে উৎপাদন যদি বেড়ে থাকে, তাহলে মূল্যবৃদ্ধির ফলে জনসাধারণের দুর্দশা বাড়বে কেন? দেশে যেটুকু বাড়তি উৎপাদন হ'ল তা যদি প্রত্যেকেরই ভোগে কিছু না কিছু আসত তাহলে মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও আমাদের সকলেরই জীবন যাত্রার মান বাড়তো। আসল কথা হ'ল মূল্যবৃদ্ধি যে হারে ঘটছে, সকল লোকের আয় সে অনুপাতে বাড়ছে না। ধরা যাক জিনিসপত্রের দাম শতকরা ১০০ ভাগ বেড়েছে কিন্তু মজুরদের মজুরী বেড়েছে শতকরা ৭০ ভাগ, এ অবস্থায় মজুরদের জীবন যাত্রার মান শতকরা ৩০ ভাগ কমে যাবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, প্রতিটি লোকেরই জীবনযাত্রার মান কমে যাচ্ছে না। যেহেতু সামগ্রিকভাবে দেশের উৎপাদন বাড়ছে, তাই জনসাধারণের কোনো এক অংশের জীবন যাত্রার মান ও সম্পদ বাড়তে বাধ্য। মূল্য বৃদ্ধির ফলে যা ঘটে তা হ'ল ধন বন্টনের গুরুতর পরিবর্তন।

তিনটি পরিকল্পনায় প্রতিবছরে গড়পড়তা কি হারে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে, তার হিসাব নীচে দেওয়া হ'ল।

এই তালিকাটি বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কথা জানা যায়,

(১) পরিকল্পনার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধির মাত্রা বেড়ে চলেছে। জিনিসপত্রের দাম শুধু যে বাড়ছে তাই নয়, বৃদ্ধির হারও দ্রুততর হয়েছে। সমগ্রভাবে তিনটি পরিকল্পনায় মূল্যবৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল বছরে শতকরা ২.৭। তৃতীয় পরিকল্পনায় তা দাঁড়াল শতকরা ৫.৮ ভাগ এবং তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ দু বছরে তা শতকরা ৯ ভাগ পর্যন্ত বাড়ল।

(২) শিল্পজাত পণ্যের মূল্য যে হারে বেড়েছে, কাঁচা মাল ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বেড়েছে তার চেয়ে বেশী হারে। তৃতীয় পরিকল্পনায়, বিশেষ করে পরিকল্পনার শেষ দুই বছরে মূল্যবৃদ্ধির মাত্রায় এই পার্থক্যটা বিশেষ প্রকট হয়েছে। এই পার্থক্যের ফলাফল বিশেষ করে অনুধাবন করে দেখা যাক।

শিল্পজাত এক একটি পণ্যের দামকে আমরা দু ভাগে ভাগ করতে পারি। একটি ভাগ পায় কাঁচামালের বিক্রেতারা, অপর ভাগটি শ্রমিক ও মালিক নিজেদের মধ্যে মজুরি মুনাফা হিসেবে ভাগ করে নেয়। এখন যদি দেখা যায় যে শিল্প সামগ্রীর দামের চেয়ে কাঁচা মালের দাম বেশি হারে বাড়ছে, তাহলে বোঝা যাবে যে কাঁচামালের বিক্রেতাদের আয়, মজুরি ও মুনাফার যোগফলের চেয়ে বেশি বাড়ছে। ফলে দেশে কাঁচামালের যোগানদারদের আয় যে হারে বাড়ছে, শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ও মালিকদের আয় সে হারে বাড়ছে না।

কিন্তু এইটুকু বলা যথেষ্ট নয়। শিল্পের মালিকেরা দুভাবে নিজেদের মুনাফার হার বাড়াতে পারে। প্রথমত, শিল্পসামগ্রীর দাম যে হারে বাড়ছে, মজুরি যদি সেই হারে না বাড়ে তাহলে মুনাফার হার বেড়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, উৎপাদন পদ্ধতিতে এমন পরিবর্তন করা যেতে পারে (অটোমেশন, র‍্যাশানালাইজেশন ইত্যাদির দ্বারা) যার ফলে একই পরিমাণ জিনিস তৈরি করতে অনেক কম শ্রমিক দরকার হয়। এর ফলেও জিনিস পিছু মজুরি ও খরচ কমে যাবে এবং মুনাফার হার বাড়বে। ভারতে এই দুটি জিনিসই ঘটছে এবং তার ফলে একদিকে কাঁচা মালের যোগানদার ও অন্যদিকে শিল্প মালিক, এই দুই শ্রেণীর লোকই শ্রমিকদের আয়ের অংশ বিশেষ আত্মসাৎ করছে।

তিনটি পরিকল্পনায় যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে তার ফলাফল সংক্ষিপ্ত ভাবে এইভাবে বর্ণনা করা যায়:

(১) খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামালের যোগানদার (এদের মধ্যে ব্যবসাদার ছাড়াও সেই সব কৃষককে ধরতে হবে, যাদের হাতে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত ফসল আছে) সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে।

(২) যে সব শিল্পের মালিক নিজেদের ইচ্ছামতো শিল্পসামগ্রী ও কাঁচামালের দরদাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং উৎপাদন পদ্ধতিতে 'অটোমেশন' ইত্যাদি চালু করতে পারে তারাও শ্রমিক ও ক্রেতাদের ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের লাভের অঙ্ক

মূল্যবৃদ্ধির বাৎসরিক গড়পড়তা হার (শতকরা হিসাবে)

	তিনটি পরিকল্পনার ১৫ বছর	২য় ও ৩য় পরিকল্পনার ১০ বছর	৩য় পরিকল্পনার পাঁচ বছর ১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৬৫-৬৬)	৩য় পরিকল্পনার শেষ দুই বছর (১৯৬৩-৬৪ থেকে ১৯৬৫-৬৬)
সাধারণ মূল্যস্তর —	২.৭	৫.৯	৫.৮	৮.৯
খাদ্যদ্রব্যের মূল্য —	২.৮	৬.৯	৭.১	১০.৩
শিল্পে ব্যবহার্য কাঁচামালের মূল্য —	২.৫	৬.৭	৫.৪	১১.৫
শিল্প সামগ্রীর মূল্য —	২.৪	৪.১	৩.৮	৫.০

বাড়িয়ে চলেছে।

(৩) শ্রমিক শ্রেণী সাধারণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশেষ করে অসংগঠিত শ্রমিক গোষ্ঠী ছোট খাটো সম্পত্তির মালিক, ছোট ব্যবসাদার এবং গরীব কৃষক সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

মূল্যবৃদ্ধির ফলে ধনবন্টনে যে অসাম্য দেখা যাচ্ছে নানা কারণে তা আজ আমাদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। মূল্যবৃদ্ধির ফলে বড় বড় মজুতদার, ফাটকাবাজ, একচেটিয়া শিল্প পতি, গ্রামের জোতদার, ধনী কৃষক এরাই লাভবান হচ্ছে। এরা কিন্তু লাভের টাকা উৎপাদনে না খাটিয়ে নিজেদের একচেটিয়া অর্থনৈতিক ক্ষমতা বাড়াতেই বেশি ব্যস্ত এবং বাজার দামকে কিভাবে চড়া রাখা যায় তার জন্য উৎপাদন ক্ষমতারও তারা পূর্ণ ব্যবহার করে না। মূল্য বৃদ্ধির ফলে ছোট ছোট কল কারখানার মালিক ও গরীব মধ্যবিত্ত কৃষক যদি লাভবান হত তাহলে তারা উৎপাদন বাড়িয়ে নিজেদের লাভের অঙ্ক বাড়াতে চেষ্টা করত। ভারতের অর্থনীতিতে একচেটিয়া কারবারের আধিপত্যই এর কারণ।

অন্যদিকে মূল্যবৃদ্ধির ফলে শ্রমিক, গরীব কৃষক ও ছোটখাটো কারবারীদের মধ্যে যে হতাশা দেখা দিয়েছে তার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে নানা রকমের শ্রমবিরোধ ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা। এর পরিণতি হ'ল উৎপাদন হ্রাস ও জাতীয় অর্থনীতিতে মন্দা।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিকার করতে হলে প্রথমেই দেখতে হবে যে অর্থনীতির কোন ক্ষেত্র থেকে মূল্যমান বৃদ্ধির প্রবণতা সুরু হচ্ছে। আমরা দেখেছি যে খাদ্যদ্রব্য এবং কাঁচামালের দামটাই সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বাড়ছে। ভারতীয় অর্থনীতি এখনও কৃষি-প্রধান হওয়ার জন্য এই দুই ধরণের পণ্য মূল্যের উর্দ্ধগতি সাধারণ মূল্যস্তরকে ঠেলে উপরে নিয়ে যাচ্ছে। হিসাব করে দেখা গেছে যে তৃতীয় পরিকল্পনার সময়ে সাধারণ মূল্যস্তর যতখানি উঠেছিল তার শতকরা ৫৬ ভাগের কারণ ছিল কৃষিজ পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং শতকরা ৩১ ভাগের কারণ ছিল কৃষিভিত্তিক পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি। যেমন তুলা ও পাটজাত দ্রব্য, দুধ, ঘি, মাছ বা ডিম ইত্যাদি। এর মধ্যে অকৃষিজাত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল শতকরা ১৩ ভাগ।

অতএব কৃষিজাত পণ্যের চাহিদা ও যোগানের অসামঞ্জস্য দূর করতে না পারলে মূল্যবৃদ্ধির প্রতিরোধ অসম্ভব। পরিকল্পনার ফলে কৃষিজ পণ্যের চাহিদা বেড়ে গেছে এবং আমরা যদি জাতীয় উন্নতির হার বজায় রাখতে চাই তাহলে এই চাহিদা আরও বাড়বে। কারণ শিল্পবিস্তার ও শহর অঞ্চলের জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজাত কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বেড়েই চলবে। অন্যদিকে কৃষির উৎপাদিকা শক্তি যদি সেই হারে না বাড়ে তাহলে চাহিদা ও যোগানের অসামঞ্জস্য অনিবার্য।

চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদনের দিকে যে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে সেটা আশার কথা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা মনে রাখা বিশেষ দরকার। কৃষির উৎপাদিকা শক্তি বাড়ানোর জন্য সরকার খরচ করলেই যে সেই শক্তির পূর্ণ ব্যবহার হবে এবং উৎপাদন বাড়বে তার কোনও মানে নেই এবং উৎপাদন বাড়লেই যে বাজারে যোগান বাড়বে তাও ধরে নেওয়া যায় না। কৃষকদের হাতে মূলধন না থাকলে সেচ 'সার' যন্ত্রপাতি ইত্যাদির পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব নয়। আবার গ্রামীণ অর্থনীতিতে মজুতদার মহাজনদের আধিপত্য থাকলে বাজারে যোগান বাড়ারও কোন আশা নেই।

হিসাবে দেখা গিয়েছে যে, ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে বিক্রয় যোগ্য চালের শতকরা ১২ ভাগ বাজারে যোগান হিসাবে এসেছিল বাকিটা চোরাবাজারে এসেছিল (যার কোনও রেকর্ড নেই) এবং গ্রামাঞ্চলেই ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৯৬৫-৬৬ সালে বিক্রয়যোগ্য চালের শতকরা ৭ ভাগ মাত্র বাজারে আসে। ১৯৬০-৬১ সালে বিক্রয়যোগ্য গমের শতকরা ১১ ভাগ বাজারে আসে এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে এই অংশ কমে গিয়ে দাঁড়ায় শতকরা ৯ ভাগে। ঐ একই সময়ের মধ্যে বাজারে বিক্রয় যোগ্য জোয়ারের আমদানীর অংশ শতকরা ৯ ভাগ থেকে কমে ৫ ভাগে এসে দাঁড়ায়।

এই হিসাব থেকে দুটি জিনিস স্পষ্ট বোঝা যায় :—

(১) বিক্রয়যোগ্য খাদ্যশস্যের একটা বড় অংশ মজুতদার ও ধনী কৃষকদের হাতে থাকায় খোলা বাজারে যোগান বৃদ্ধি পায়নি, বরং কমে এসেছে।

(২) গ্রামাঞ্চলে গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্যশস্যের একটা বড় অংশ গ্রামেই দাদন হিসাবে দেওয়া হচ্ছে এবং তার ফলে শহরের বাজারে যোগানের পরিমাণ কমে যাচ্ছে।

সুতরাং একদিকে যেমন কৃষির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াতে হবে, অন্যদিকে কৃষকদের হাতে যথেষ্ট মূলধন যোগাতে হবে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে জোতদার, বড় ব্যাপারী ও ধনী কৃষকদের আধিপত্য চূর্ণ করতে হবে।

কৃষিপণ্যের মূল্য স্থিতিশীল হলে শিল্প সামগ্রীর মূল্যের স্থিতিশীলতা আনা কষ্টকর হবে না। ভারতের বেশির ভাগ শিল্পই এখনও কৃষি ভিত্তিক, অর্থাৎ কৃষিজাত কাঁচামালের মূল্য এই সকল শিল্পের পণ্যমূল্যকে বিশেষভাবে নির্ধারিত করে (যেমন চা, তুলা, পাটজাত দ্রব্য, তৈলবীজ জাত দ্রব্য, চিনি ইত্যাদি)। আবার খাদ্য শস্যের মূল্য স্থিতিশীল হলে মজুরিও স্থিতিশীল করা সম্ভব। কিন্তু এ সত্ত্বেও শিল্পে যে একচেটিয়া মালিকানা ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠছে তা খর্ব করা দরকার কারণ তা না হলে বাজার দর কমানো সম্ভব হবে না।

মূল্যের স্থিতিশীলতার জন্য ভারত সরকারের মুদ্রানীতি ও কর ব্যবস্থারও গুরুতর পরিবর্তন প্রয়োজন। পরিকল্পনার খরচের একটা বড় অংশই নতুন নোট ছাপিয়ে মেটানো হচ্ছে। উৎপাদনের সঙ্গে যদি নোট ছাপানোর সমতা না থাকে তাহলে মূল্যবৃদ্ধির ঝোঁক থাকবেই। ১৯৬০-৬১ সালের তুলনায় ১৯৬৬-৬৭ সালে ভারতের জাতীয় উৎপাদন বেড়েছে শতকরা ২৩ ভাগ আর এই সময়ের মধ্যেই লোকদের হাতে টাকা আর ব্যাঙ্কে আমানত প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। এই টাকাটা বাজারে চাহিদা বাড়িয়ে দিচ্ছে কিন্তু যোগান সেই পরিমাণে বাড়ছে না।

অতিরিক্ত চাহিদা বন্ধ করার জন্য কর ব্যবস্থা উন্নত করা প্রয়োজন। কিন্তু

সেখানে বিপদ এই যে করের হার বৃদ্ধি করলে উৎপাদনের ক্ষতি হতে পারে, ফলে অসন্তোষও বাড়তে পারে। এমন ধরণের কর ব্যবস্থা ভেবে বার করা খুবই কঠিন যার ফলে দেশের অনুৎপাদক শ্রেণীর লোকের (মজুতদার, ফাটকাবাজ ইত্যাদি) টাকাটা টেনে আনা যায়। এদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না।

ব্যাঙ্কের হাতে যে আমানত থাকে তার একটা বৃহৎ অংশ ব্যবসায়ীরা নিজেদের প্রয়োজনে খরচ করে। কিছু খরচ নিশ্চয় উৎপাদনের কাজেই করা হয় কিন্তু বেশ কিছু খরচ যে অপ্রয়োজনে এবং মজুতদারি ও ফাটকাবাজি চালু রাখতে করা হয় তাও জানা কথা। সরকার যদি পরিকল্পনার টাকার বৃহৎ অংশ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে দাদন হিসাবে নিতে পারেন, তাহলে দেশে মুদ্রাস্ফীতিও হয় না আর মজুতদার ফাটকাবাজের পুঁজিতেও টান ধরে। কিন্তু ব্যাঙ্কের দাদন নীতি অন্য রকম। ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি ১৯৬০-৬১ সালে তাদের আমানতের শতকরা ৩৪ ভাগ সরকারি ঋণ পত্রে নিয়োগ করত এবং বাকিটা ব্যবসায়ীদের ধার দিত। ১৯৬৮-৬৯ সালে সরকারি ঋণপত্রে নিয়োগের পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ২৪ ভাগে। পরিকল্পনার রূপায়ণে ব্যাঙ্কের সহযোগিতা নিশ্চয় অনেক বেশি বাড়ানো উচিত এবং তা করাও সম্ভব। সম্প্রতি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করার ফলে এদিক থেকে কিছু সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

একটার পর আর একটা সাফল্য

মহীশূরের হোসাহাল্লি গ্রামের একজন কৃষক এইচ. ভি. কৃষ্ণ রাওয়ের কাহিনী হল অগ্রগতি ও সাফল্যের কাহিনী। ১৯৬৭-৬৮ সালে তিনি তাঁর জেলা শিমোগার ধান উৎপাদন প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পান। গত বছর তিনি রাজ্য পর্য্যায়ে ধান উৎপাদন প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার ১০০০ টাকা পান। গত বছরে তিনি প্রতি একরে ৪৭৩৬ কে. জি. আই আর-৮ ধানের ফসল পান। মোট ১১৪৫ টাকা ব্যয় ক'রে—তিনি এই মরসুমে ২৬৯৫ টাকা লাভ করেন।

কৃষ্ণ রাও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে রক্ষণশীল হলেও চাষ আবাদের ক্ষেত্রে আধুনিক। তাঁর ২৫ একরের জলা জমি, ৫ একরের সুপুরি বাগান আর ৪ একরের শুকনো জমি আছে। চাষ আবাদের কাজ তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। শিমোগা কৃষক ফোরামের তিনি আজীবন সদস্য। তাঁর নিজের একটা ট্র্যাক্টার এবং উন্নতধরণের সবরকম কৃষি যন্ত্রপাতি আছে।

শিমোগা তালুকের কাছাকাছি গ্রামগুলিতে বেশী ফলনের ধানচাষের সাফল্যের কথা শুনে তিনি ১৯৬৬ সাল থেকেই আই আর-৮ ধানের চাষ করছেন।

গত বছর খারিফ মরসুমে তিনি প্রতি একরে তাইচুং নেটিভ-১ ধানের ৪০ কুইন্ট্যাল এবং এস ৭০১ ধানের ফসল পান প্রতি একরে ২৫ কুইন্ট্যাল। আই আর-৮ ধান প্রতি একরে ৪৪ কুইন্ট্যাল ক'রে ফলিয়ে তিনি জেলার প্রথম পুরস্কার পান।

কৃষ্ণ রাওয়ের এই সাফল্যের মূলে রয়েছে বৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতি এবং সার, সেচ ও কীটনাশকের উপযুক্ত প্রয়োগ।

মহীশূরের সেন্ট্রাল ফুড্ টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এ এক নতুন ধরনের মোমের প্রলেপ উদ্ভাবন করা হয়েছে। জিনিসটির জন্যে খরচ বেশী হবে না। এটি শাক সব্জী ও ফল সংরক্ষণের কাজে লাগবে। বর্তমানে গুদামজাত করে রাখার সময়ে কিংবা এখানে ওখানে চালান দেবার সময়ে তিন ভাগের এক ভাগ অন্তত: নষ্ট হয়ে যায়। মোমের এই প্রলেপ লাগিয়ে ফল বা সব্জী নষ্ট তো হবেই না—উপরন্তু জিনিসগুলি চকচকে ও সুন্দর দেখাবে।

মাটির তলার খবর

নিউ মেক্সিকোর স্যাণ্ডিয়া কর্পোরেশন ইস্পাত ও প্লাস্টিক দিয়ে এমন একটি জিনিস তৈরি করেছেন যেটিকে চালু করে দিলেই সেটি আপনা আপনি এগিয়ে যেতে সুরু করে—অবশ্য সামনের দিকে নয় বা ওপরে আকাশের দিকে নয়—যায় মাটির নীচে, গভীর থেকে গভীরে। ভূগর্ভে নানাবিধ বস্তুর খোঁজে এই অনুসন্ধানী যন্ত্রটি মাটির ওপর থেকে গভীরে চলতে সুরু করার সঙ্গে সঙ্গে মাটির ওপরে এই যন্ত্রের একটা 'এ্যান্টেনা' বেরিয়ে আসে। 'এ্যান্টেনা' নামে পরিচিত এই অংশটিকে 'শুঁড়' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। যন্ত্রটি এগিয়ে যেতে থাকে, আর শুঁড়টি বিভিন্ন জিনিসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে 'রেডিও মেসেজ' পাঠাতে থাকে। একজন অপারেটার এই মেসেজগুলি টুকে নেয়। যন্ত্রটি গড়ে ৬০ মীটার গভীর পর্যন্ত যেতে পারে। এটি লম্বায় ৩ মীটার এবং এর ওজন ৪৫০ কিলোগ্রাম। এটিকে বিমান বা হেলিকপ্টার থেকে বোমার মত অথবা কামানের গোলার মত নিক্ষেপ করা যায়।

যেভাবে এটিকে ছোঁড়া হয় তার ওপর এর গতি নির্ভর করে—গতি ঘন্টায় ৭০ থেকে ৩,২০০ কিলো মীটারের মধ্যে ওঠে নামে। মাটির মধ্য দিয়ে এটি চলে র‍্যাঁদার মত, এর গতির সঙ্কেত পাওয়া যায় আর একটি যন্ত্রে। গতির তারতম্য দেখে বোঝা যায় এটি কী রকম ধরণের ভূস্তরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। যেমন কাদা মাটি বা ভিজে মাটির মধ্যে এর গতি দ্রুত হয় এবং বেলে মাটির মধ্যে এর গতি তার তুলনায় কমে যায়। এ পর্যন্ত এই যন্ত্রটি শুকনো মাটি, পলিমাটি, কাদা, ভেজা মাটি, জল বা প্রস্তরের স্তর চিহ্নিত করতে পেরেছে।

হাঙ্গেরীতে কৃষকরা তাদের অনুর্বর জমি ফেলে রাখেনা, বরং নানা কাজে লাগায়। যেমন চাষবাসের বদলে তারা হয়তো সেই জমিতে কিছু কিছু জায়গা ছেড়ে কয়েক ফুট গভীর গর্ত খুঁড়ে সেগুলিতে জল ভর্তি করে মাছের চাষ করে অথবা সেই জমিতে মুরগী পালন করে কিংবা হয়তো অন্যান্য ফসলের চাষ করে।

আর্থিক উন্নয়নে সীমান্ত পথ

কে. শ্রীকান্ত

১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে চীনা আক্রমণের পর, সৈন্য ও যুদ্ধের সাজ সরঞ্জামাদি পাঠানোর জন্য সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে যথেষ্ট রাস্তাঘাট তৈরী করাটা আমাদের জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। উত্তর সীমান্তে নতুন নতুন রাস্তা তৈরী করা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ধ্বস ও বরফপাতের মধ্যেও সেগুলিকে, সারা বছর ধ'রে যানবাহন চলাচলের উপযোগী রাখার উদ্দেশ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের রাস্তার সংস্থা, প্রতি বছর কয়েক লক্ষ ক'রে টাকা ব্যয় করছেন।

যেহেতু আমাদের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে যে কোন মূল্যে সীমান্তের পথগুলি রক্ষা করতেই হবে, সেই জন্যে দেশের ঐ সুদূর অঞ্চলের সর্বাঙ্গীন আর্থিক উন্নয়নের জন্য এই রাস্তাগুলিকে পুরোপুরি কাজে লাগানো উচিত। সীমান্তের এই পথগুলির জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে তাতে ঐ এলাকাগুলির উন্নয়নের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ঐ পার্ব্বত্য অঞ্চলগুলিকে যদি পর্যটকগণের পক্ষে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারা যায়, তাহলে আমাদের দেশ আরও বেশী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন করতে পারে, অনেক লোকের কর্ম্মসংস্থান হতে পারে এবং অবশ্য নির্ভর শিল্পাদিও গড়ে তোলা যেতে পারে। এর ফলে পথগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে পৌনঃপুণিক ব্যয় হয়, এই সব আয় থেকে সেই ভারও কিছুটা হাল্কা হতে পারে। সবচাইতে বড় কথা হল ঐ অঞ্চলগুলি উন্নত ও সহজগম্য হলে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর নৈতিক বলও বাড়বে। ভবিষ্যতের এই প্রয়োজনগুলি যাতে মেটানো যায়, সেই রকমভাবে উপযুক্ত কর্ম্মসূচী তৈরী ক'রে এই পথগুলি নির্ম্মাণ করা প্রয়োজন।

গুলমার্গ, শ্রীনগর, সিমলা, মুসৌরী, নৈনিতাল এবং দার্জিলিং, এগুলি পর্য্যটকগণের পক্ষে আকর্ষণীয় স্থান এবং বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে এই সব সহরে বহু লোক যান। পার্ব্বত্য অঞ্চলে এই ধরণের সহর খুব বেশী নেই বলে এগুলিতে পর্য্যটকের খুব ভীড় হয় এবং সুযোগ সুবিধে সীমাবদ্ধ বলে ছুটি কাটানো ব্যয়সাধ্য হয়।

জম্মুকাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের, তাঁদের এলাকাস্থিত সীমান্তবর্তী পথগুলির সুযোগ নেওয়া উচিত। এই সব রাস্তার ধারে যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য রয়েছে সেখানে তাঁরা সুপরিকল্পিত ছোট ছোট সহর গড়ে তুলতে পারেন। এই রকম সহর গড়ে তোলার জন্য তাঁদের যদি যথেষ্ট আর্থিক সঙ্গতি না থাকে তাহলে তাঁরা অল্পমূল্যে জমি দিয়ে, বাড়ী তৈরীর জিনিসপত্র যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সরবরাহের ব্যবস্থা করে বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহের ব্যবস্থা করে, বেসরকারী ব্যক্তিগণকেও এখানে সহর গড়ে তুলতে উৎসাহিত করতে পারেন। প্রথমদিকে করে কিছু রেহাই দিয়েও এঁদের উৎসাহিত করা যায়। এই সব সুযোগ সুবিধের কথা যদি উপযুক্তভাবে প্রচার করা যায় তাহলে বেসরকারী ব্যক্তিগণের কাছ থেকে নিশ্চয়ই সাড়া পাওয়া যাবে।

প্রত্যেক বছর পর্য্যটকের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়ছে কাজেই এই সব জায়গার ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে রাজ্য সরকারগুলির কোন রকম দুর্ভাবনার প্রয়োজন হবেনা। ভবিষ্যতে এই সব জায়গা থেকেই হয়তো রাজ্য সরকারগুলি অনেক রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারবেন। কেন্দ্রীয় পর্য্যটন বিভাগ, নূতন গড়ে তোলা এইসব অঞ্চলগুলি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করে এবং তাঁদের অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীগণকে দিয়ে রাজ্য সরকারগুলিকে সাহায্য করে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির বোঝা খানিকটা হালকা করতে পারেন। তাছাড়া বর্ত্তমানে পর্য্যটকগণের কাছে আকর্ষণীয় যতগুলি পার্ব্বত্য সহর আছে সেগুলির মধ্যে বেশীরভাগেই ঋতু বিশেষে পর্য্যটক সমাগম হয়। কাজেই নতুন ক'রে যে সব সহর গড়ে তোলা হবে সেগুলি যাতে বছরের সব সময়েই পর্য্যটকগণের পক্ষে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এবং তাঁরা যাতে আধুনিক সুযোগ সুবিধেগুলি ভোগ করতে পারেন সেই রকম ভাবেই এগুলি তৈরী করা উচিত।

এই রকম প্রাকৃতিক পরিবেশে যদি নতুন নতুন পর্য্যটক কেন্দ্র গড়ে তোলা হয় তাহলে সেগুলিতে যে শুধু নতুন কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে তাই নয়, সেখানকার অধিবাসীদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য ব্যবসায়ীগণেরও সমাগম হবে। বাড়ী, পর্য্যটকগণের আবাস, হোটেল, দোকান, পোষ্ট অফিস, ব্যাঙ্ক, হাসপাতাল, সিনেমা ইত্যাদি তৈরী করার জন্য বহু ওভারসিয়ার, ইঞ্জিনীয়ার ও অন্যান্য কর্ম্মীর প্রয়োজন হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দেশে এমন অনেক স্নাতক ইঞ্জিনীয়ার আছেন যাঁরা বর্ডার রোড সংস্থায় চাকুরি করতে ইচ্ছুক নন, তাঁরা হয়তো দূর পার্ব্বত্য অঞ্চলে এইসব নতুন সহরে কাজ করতে এগিয়ে আসবেন।

প্রতিরক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদি মজুদ করার জন্যও এই সহরগুলি অনেকাংশে ব্যবহার করা যেতে পারবে। সবচাইতে বড় কথা হল সীমান্তের কাছাকাছি যদি সমস্ত রকম আধুনিক সুযোগ সুবিধেসহ মানুষের বসতি গড়ে ওঠে এবং প্রতিরক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যদি কাছাকাছি পাওয়া যায় তাহলে আমাদের জওয়ানদের নৈতিক বল বাড়বে, তাঁরা আনন্দে কাজ করতে পারবেন।

যদি রাস্তাঘাটের সুবিধে থাকে এবং হিমালয়ের এই অঞ্চলে নতুন নতুন সহর গড়ে ওঠে তাহলে কাঠের কারখানা,

(২০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

পরিপূরক সারের উপযোগিতা

গোবিন্দ চন্দ্র দাস

বর্তমানে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্যান্য রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও এক বলিষ্ঠ কৃষি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচী অনুযায়ী আমাদের খাদ্যশস্যের ঘাটতি ১৯৭০ সালের মধ্যে পূরণ করা যাবে। আমাদের লক্ষ্য এই রাজ্যে আরও বিশ লক্ষ টন খাদ্য উৎপাদন করা। সেজন্য চাই প্রচুর জলসেচের সুব্যবস্থা, রাসায়নিক সার, উন্নত জাতের বীজ, উন্নত ধরণের কৃষি যন্ত্রপাতি এবং রোগ ও পোকা দমনের ওষুধের। কেন্দ্রীয় সরকার কৃষিখাতে সংস্থানে রাজ্য সরকারকেও সাহায্য করবেন। বড় বড় ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে কৃষিকাজের জন্য ঋণ পাওয়া কিছুটা সহজ হবে বলে আশা করা যেতে পারে। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে কৃষিকাজে সাফল্য আনতে হলে সেচ, সার, ভাল বীজ, উন্নত যন্ত্রপাতি রোগ ও পোকার ওষুধ ইত্যাদির মধ্যে তুলনামূলকভাবে সেচের অব্যবস্থাই পশ্চিমবঙ্গে কৃষি কাজের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে সেচ বিষয়ে আলোচনার আগে রাসায়নিক ও জৈব-সারের কার্যকারিতা সম্বন্ধে দু চারটে কথা বলে রাখা ভাল।

সাধারণভাবে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ সার যে কোনোও ফসলের প্রধান খাদ্য। আবার কতকগুলি জৈব পদার্থ থেকেও পরোক্ষভাবে এই সারগুলি আংশিক পরিমাণ পাওয়া যায়। রাসায়নিক সারের গুণাগুণ ও কার্যাবলী এবং কোন কোন জৈবসারে তা' কী পরিমাণ পাওয়া যায় তা জানা থাকলে, চাষের কাজে বিকল্প সার হিসেবে সেগুলোর প্রয়োগ সহজ হবে। এখন পর্যন্ত আমাদের সরকার চাষের কাজে অতি প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন (এ্যামোনিয়াম সালফেট, ইউরিয়া ইত্যাদি), ফসফেট (সুপার ফসফেট) ও পটাশ (মিউরেট অফ পটাশ ইত্যাদি) প্রভৃতি রাসায়নিক সার প্রস্তুত ও সরবরাহের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেন নি। তা ছাড়া দেশের অধিকাংশ রাজ্যই গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চল। কাজেই এখানে রাসায়নিক সার প্রয়োগ ও তৎসহ উপযুক্ত জলসেচের সুব্যবস্থা অতি অবশ্য থাকা চাই। কিন্তু এখনও আমরা চাষের কাজে বৃষ্টির জলের উপর নির্ভরশীল। উন্নত প্রথায় চাষের কাজে একই জমিতে ঘন ঘন রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হলে পর্যাপ্ত সেচের অভাবে অদূর ভবিষ্যতে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে বলে অনেক কৃষি বিজ্ঞানী আশঙ্কা করেন। এ ক্ষেত্রে কোন জমিতে ঘন ঘন বেশী মাত্রায় রাসায়নিক সার ব্যবহার করার আগে সে জমির মাটি পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার। পরীক্ষা দ্বারা মাটির অম্ল, ক্ষার রাসায়নিক সারের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি ধরা পড়বে এবং সময়মত চূণ বা প্রতিষেধক ওষুধ দিয়ে জমি শোধন করা যাবে। আবার প্রয়োজন মত নির্দিষ্ট জাতের সার পরিমাণ মত প্রয়োগ করাও সম্ভব হবে। ঐ ভাবে অল্প ব্যয়ে ও কম পরিশ্রমে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

এবার প্রচলিত ও সহজ লভ্য কোন কোন জৈবসার থেকে কি ধরনের নাইট্রো-ফসফরাস ও পটাশ সার আমরা পেতে পারি তা আলোচনা করা যাক। গোবরের সার আমরা অতি প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহার করে আসছি। গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, শূকর, ঘোড়া ইত্যাদি জীবজন্তুর মল পচে সার হয়। মানুষের মলও গোবর সারের সামিল। এ ছাড়াও জীব-জন্তুর শুকনো রক্ত ও হাড়ের গুঁড়া, শুকনো মাছ ইত্যাদির মধ্যে তুলনামূলকভাবে ফসফেট ঘটিত রাসায়নিক সারের অংশ বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়।

আবার গৃহপালিত পায়রা, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি পাখীর মল, সব রকম তৈলবীজের খোসা বা খোল সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কেননা এ সব পাখীর মল ও খোল অনেকটা নাইট্রোজেন জাতীয় রাসায়নিক সারের মতই কাজ করে।

জ্বালানি কাঠের ছাঁই, ঘুঁটের ছাঁই ইত্যাদিতে থাকে পটাশের অংশ। বিশেষ করে মূলজ সবজী পটাশ ঘটিত সার বেশী পছন্দ করে। শুকনো তামাক পাতার ডাঁটা ও শিরগুলিতেও পটাশের ভাগ পাওয়া যায়। সার হিসেবে ছাড়াও শাক সবজী ও অন্যান্য গাছের রোগ ও পোকা দমনের জন্য ছাই এবং তামাকের ক্বাথ দেওয়া হয়।

আজকাল রাসায়নিক মিশ্রসারের মত আবর্জনার সারের ব্যবহার ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এ সব মিশ্র বা আবর্জনা সারের গড় ব্যয়ও খুব কম পড়ে। একটু চেষ্টা করলে আমরাও সুষম মিশ্র বা আবর্জনা সার তৈরি করতে পারি। অনেক সময় চূনের মত সবুজ সার, কিছুটা মাটির অম্ল, ক্ষার ইত্যাদির প্রতিক্রিয়া বিনাশ করে, জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। জমিতে শুঁটি জাতীয় সবুজসার চাষ করা হলে নাইট্রোজেন জাতীয় সারের পরিমাণ অনেক কম লাগে, ফসলও ফলে একর পিছু ২/৩ কুইন্টাল মাত্র।

অধিকাংশ জৈবসারের বিশেষত্ব হলো, মাটিতে রস সঞ্চার করা কড়া তাপের মধ্যেও মাটির আর্দ্রতা রক্ষা করা এবং মাটির ক্ষয় পূরণ করা। কিন্তু জৈবসার মাটি ও জলের সংস্পর্শে পচন ক্রিয়াদ্বারা বিশেষ সময় সাপেক্ষে মাটির সঙ্গে মিশে গাছের খাদ্যের উপযোগী হয়। রাসায়নিক সারের মধ্যে, সুপার ফসফেট বাদে অন্য সবগুলিই অনায়াসে জলে দ্রবীভূত হয়। কাজেই এই সারের ক্রিয়ায় শস্যের বৃদ্ধি এবং ফুল, ফল, দানা ইত্যাদির পরিপুষ্টি ত্বরান্বিত হয়। কিন্তু রাসায়নিক সারের অপর্যাপ্ত ব্যবহারের সঙ্গে উপযুক্ত সেচের জলের সুব্যবস্থা না থাকলে চাষের বেশী রকম ক্ষতি হয়।

জৈবসারের ভাগ বেশী দিয়ে জমি তৈরি ক'রে, তারপর রাসায়নিক সার, পরিপূরক সার (কমপ্লিমেন্টারী) হিসেবে ব্যবহার ক'রে ডালিয়া, কার্নেশন, প্যান্সী, ইত্যাদি ফুল, লাউ, কপি, ঢেঁড়শ ইত্যাদি সবজী এবং একই জমিতে পর পর উন্নত প্রথায় অধিক ফলনশীল আই আর-৮ ধান (বিঘা পিছু ১০ মণ) ও সোনোরা-৬৪ মেক্সিকান জাতের গম (বিঘা পিছু ১৭ মণ) চাষ করে নিজে অভিজ্ঞতা ও সাফল্য লাভ করেছি। আবার এ সব ফুল, সবজী ও শস্যের চাষে পুরোপুরি জৈবসার বা রাসায়নিক সার দিয়েও চাষ করে দেখেছি।

মোট কথা এই, খরা তাদের দেশে বিশেষ করে যেখানে উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা চাই, সেখানে বেশী পরিমাণ জৈবসার দিয়ে জমি তৈরি করে পরিপূরক সার হিসেবে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। কেন না বিভিন্ন জাতের শস্যের জন্যে বিভিন্ন মাত্রায় সার ও জলসেচ প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় সরকার চতুর্থ পরিকল্পনায় বিশেষ করে সেচের জন্যে প্রচুর অর্থ মঞ্জুর করেছেন। এই অর্থ কার্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলে বাংলার চাষী ভাইরা উপকৃত হবেন সকলের আগে। তা হলে রবিখন্দেও ধানের চাষ আমনের তুলনায় কম হবে না। আমরা জানি অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে জলের কোন অভাব না থাকা সত্ত্বেও শতকরা মাত্র ২৫/৩০ ভাগ জমিতে এখন সেচ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। প্রয়োজনের তুলনায় সেচের জন্যে ডি ভি সি'র জল সরবরাহ খুবই কম। তবে ফারাক্কা বাঁধ ও কংসাবতীর কাজ সম্পূর্ণ হলে এখানে আরও বেশী পরিমাণ জল পাওয়া যাবে।

পশ্চিমবঙ্গে উঁচু, নীচু ও মাঝারি সব রকমেরই চাষের জমি আছে। বিভিন্ন ধরনের জমিতে সেচের বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। যেমন ডি ভি সির গভীর খাল বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের যে গ্রামের পাশ দিয়ে চলে গেছে সেই সেলিমবাদ গ্রামের জমিগুলো এত উঁচু যে খালের জল সেখানকার অনেক মাঠে ওঠে না। কাজেই ওখানেও সেচের জন্য একর পিছু এক একটি হাতে চালানো নলকূপ বসাতে হয়েছে। আর অগভীর নলকূপ বসিয়েই গত রবিখন্দে বোরো চাষে মেদিনীপুর, বর্ধমান ও ২৪ পরগণায় হাতে নাতে ফল পাওয়া গেছে। কিছুদিন আগে এ সব জেলা থেকে অগভীর নলকূপ সম্বন্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করেছি তা হ'লো, ৬০/৭৫ ফুট গভীর এই ধরনের নলকূপ বসাতে ১২/১৩ শ টাকার মত খরচ পড়ে। আর একটি জলতোলা পাম্পের দাম ২৫০০ থেকে ৩৫০০ টাকার মধ্যে। নল বসাবার জন্যে সরকারের কাছ থেকে মাত্র ৫০০ টাকার মতো ঋণ পাওয়া যায়। প্রথম দশ শতাংশ ও বাকিটা সমান ৫ কিস্তিতে দিয়ে পাম্প কেনার সুযোগ পাওয়া যায়।

দেখা গিয়েছে, ঐ ধরনের অগভীর নলকূপ থেকে তোলা জলে পাশাপাশি ৮।১০ একর জমিতে ভালোভাবে সেচ দেওয়া চলে। অনেক চাষী তাই নিজের প্রয়োজন পূরণের অবসরে ঘন্টায় ৩ টাকা হারে অন্যান্যদের জল নেবার সুযোগ দিয়ে নিজের খরচ তুলে নেন।

সেচ বিশেষজ্ঞদের মতে দার্জিলিং, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া ইত্যাদি জেলার পাহাড়ী অঞ্চল বাদে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য এলাকাতেও নলকূপ বসিয়ে সেচ দিলে বছরের সব সময়ে শাক সব্জী উৎপাদন এবং শস্য ও ফসলের মান অনেক বাড়ানো সম্ভব হবে।

লাদাকে কৃত্রিম তাপে লেগহর্ণের ডিম ফুটেছে

লে-তে ডিফেন্স রিসার্চ এ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গ্যানাইজেশানের গবেষণাগারে সাদা লেগহর্ণ মুর্গীর ডিম ফোটানো হয়েছে। এতো বেশী উচ্চতায় এবং ঠান্ডা আবহাওয়ার মধ্যে ইনকিউবেটারের ডিম ফোটানো এই প্রথম।

সমতল এলাকা থেকে আনানো এই ডিমগুলি প্রথমে স্বাভাবিকভাবে তা দিয়ে ফোটানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। একে তো স্থানীয় পাখীগুলির দেহের তাপ প্রয়োজনের উপযুক্ত নয় তার ওপর ডিমের খোলাগুলো সছিদ্র হওয়ায় ঠান্ডায় ডিমের ভেতরটা শুকিয়ে যায়। কেরোসিন-ইনকিউবেটারে ডিমগুলি রেখে দেখা গেল, তেলের কালি ঝুলি পড়ে সব জায়গায় সমানভাবে তাপ লাগল না ফলে ডিম ফুটল না। বৈদ্যুতিক ইনকিউবেটার কাজে লাগানো গেল না কারণ তাপ সমান থাকলে বাক্সের মধ্যে আবহাওয়ার আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে ব্যয় সাপেক্ষ যন্ত্র কেনা সম্ভব ছিল না।

শেষকালে ডিম ফোটানোর বাক্স থেকে হাওয়া সম্পূর্ণ বার করে দিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইডের প্রতিক্রিয়া দূর করার জন্যে তাজা রেখে দেওয়া হয়। নিয়মিত সময় অন্তরে অক্সিজেন দেওয়া হতে থাকে। সমতলে ডিম ফুটতে ২১ দিন লাগে।

আরডি কেন্দ্র

(৯ পৃষ্ঠার পর)

অতএব সংযোগ রক্ষার সূত্রটি বোম্বাই-এর কাছ বরাবর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারিগরী প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে বোম্বাই এর কাছে, অথচ পাহাড় দিয়ে ঘেরা শান্ত ও নিরুপদ্রব, এই গণ্ডগ্রামটিকে সর্বাধিক উপযুক্ত গণ্য করে এখানেই মহাকাশ সংযোগ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বর্তমানে দেশে টেলিকমিউনিকেশানের যে ব্যবস্থা আছে তার প্রধান কর্মকেন্দ্র হ'ল পুণা থেকে ১৩ মাইল দূরে মফঃস্বল সহর দিঘির বীমওয়্যারলেস ষ্টেশন। ষ্টেশনের রিসিভিং অর্থাৎ গ্রহণ কেন্দ্রে বিশ্বের বড় বড় ২১টি শহরের সঙ্গে বার্তা বিনিময় দেখতে দেখতে মনে হ'ল আমরা যেন এক ছোট খাট বিশ্ব-সম্মেলনে হাজির রয়েছি। সহসা মনে হল সমগ্র বিশ্বকে যেন ঘরের আঙিনায় দেখতে পাচ্ছি।

(সীমান্ত পথ ও প্রতিরক্ষা)

(১৮ পৃষ্ঠার পর)

কাগজ ও কাগজের মণ্ড তৈরীর কারখানা এবং অরণ্যভিত্তিক অন্যান্য কারখানা স্থাপনের সুযোগ সুবিধেও বাড়বে। এগুলি আবার সীমান্ত অঞ্চলকে বিভিন্ন দিকে উন্নত করার সুযোগ এনে দেবে।

এইসব অঞ্চলে পর্যটকের সমাগম প্রতি বছর বাড়তে বাধ্য। কাজেই যান বাহনের ওপর একটা কর বসিয়ে সীমান্তবর্তী পথগুলি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ের কিছুটা বোঝা হাল্কা করা যায়।

সীমান্তের এই পথগুলি, সুদূর পার্বত্য অঞ্চলের আর্থিক অগ্রগতির নতুন নতুন পথ খুলে দিয়েছে। তাছাড়া সুদূর অঞ্চলগুলির উন্নয়ন, কেন্দ্রের ও রাজ্যের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিরও অন্যতম লক্ষ্য।

নাইরোবী কৃষি প্রদর্শনীতে

আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর নাইরোবীতে এক কৃষি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে। ভারত এতে অংশ গ্রহণ করছে। কেনিয়ার কৃষি সমিতি এটার আয়োজন করেছেন। এতে নির্বাচিত ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য থাকবে।

উন্নয়ন বার্তা
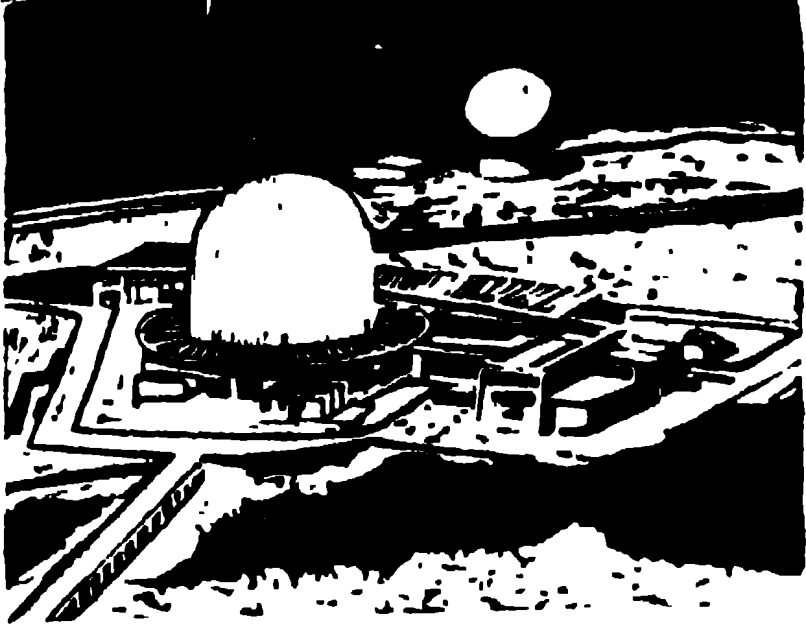
★ ভূপালের রাষ্ট্রায়ত্ত ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির কারখানায় ১১ কিলোভোল্টের একটা 'ইণ্ডাকশান মোটর' তৈরি হয়েছে। এটি ভারতের সার কর্পোরেশনকে সরবরাহ করা হবে, তাদের দুর্গাপুরের কারখানায় ব্যবহারের জন্য। আমাদের দেশে এই প্রথম এই যন্ত্র তৈরি হ'ল।

★ ভারত, সিঙ্গাপুরে একটি 'আর্ক ওয়েল্‌ডিং ইলেক্‌ট্রোড' কারখানা স্থাপন ও পরিচালনা করবে। অন্যান্য উন্নত দেশগুলিকে তীব্র প্রতিযোগিতায় হারিয়ে ভারত এই কাজ পেয়েছে। এর দ্বারা ভারত ২০ লক্ষ টাকার সমান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবে।

★ হায়দ্রাবাদের বেগমপেট বিমান বন্দরে ঝড়ের সঙ্কেত দেবার জন্য যে 'রেডার' বসানো হয়েছে তার নক্সা থেকে সব কিছুই তৈরি করেছে ভারত ইলেকট্রনিক্স।

★ট্রম্বের ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে একটা নতুন ধরণের 'লেজার' রশ্মি উদ্ভাবন করা হয়েছে, নাম 'রুবি লেজার'। এটি চোখের রোগ সহ বিভিন্ন ব্যাধির চিকিৎসায় বিশেষভাবে সহায়ক হবে। এ ছাড়া থার্মো-নিউক্লিয়ার ফিউশানে এই রশ্মির কার্যকারীতার সম্ভাবনা প্রচুর। হাইড্রোজেন বোমা তৈরির ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

★ গত ১০ বছরের মধ্যে ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম, ব্যবসায়িক লেন দেনের ক্ষেত্রে, ভারতের লাভ হয়েছে। ১৮.২ কোটি টাকার আমদানী কমিয়ে ও রপ্তানী বৃদ্ধি করে (১২৫.৮ কোটি) এই অর্থ উদ্বৃত্ত হয়েছে।

★ সিন্ত্রীতে ভারতের প্রথম সালফিউরিক এ্যাসিড কারখানায় নিয়মিতভাবে উৎপাদন সুরু হয়েছে। সিন্ত্রী সার তৈরিতে এই এ্যাসিড কাজে লাগবে।

★ ভবনগরের 'সেন্ট্রাল সল্ট এ্যাণ্ড মেরিন কেমিকেলস্‌ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটে' তৈরি একটি লবণ সংগ্রাহক যন্ত্র সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগানো গিয়েছে। এটি একটি ট্র্যাক্টরের সঙ্গে সংযুক্ত। ফলে নুন সংগ্রহের খরচ প্রতি টনে ১.২৫ টাকা থেকে কমে ৬২ পয়সায় দাঁড়াবে। এক একটা সংগ্রাহক যন্ত্রের দাম ৫,০০০ টাকার মত পড়বে।

★ সুদান ভারতের কাছ থেকে এক কোটি টাকার রেলওয়ে ওয়াগন ও 'আন্ডার ফ্রেম' কিনবে। এই চুক্তির সর্তাদি স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন চূড়ান্তভাবে স্থির করে দিয়েছে। এ ছাড়া, ভারত প্রতিযোগিতায় অন্য সব দেশকে হারিয়ে, সুদানকে ২৫ লক্ষ টাকার পাট সরবরাহ করার বরাত পেয়েছে।

★ উত্তর প্রদেশের গাজীপুরে এবং বারানসী জেলায় গঙ্গার উপকূলে দুটি বড় সেচ প্রকল্প থেকে জলসেচ দেওয়ার কাজ সুরু হয়েছে। দুটি প্রকল্পের রূপায়ণে খরচ হয়েছে ৩.৫ কোটি টাকা। বর্তমান খারিফ মরসুমে খরা প্রধান অঞ্চলের ৬০,০০০ হেক্টার জমিতে জলসেচ দেওয়া হবে।

★ কেরালায় তালিপারামবারে সরকারী গোল মরিচ গবেষণা কেন্দ্রের একজন বিজ্ঞানী গোল মরিচের এমন একটা দো-আঁশলা জাত উদ্ভাবন করেছেন যার লতায় দ্বিতীয় বছর থেকেই ফল ধরবে এবং উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ হবে। আগামী দু বছরের মধ্যে রাজ্যের গোল মরিচ চাষীদের ৫০,০০০ কলম সরবরাহ করার সঙ্কল্প করা হয়েছে।

★ ওড়িষ্যার হিরাকুদে 'হিরা কেবল্‌-ওয়ার্কস'এর তামা ও এনামেল করার কারখানা দুটিতে কাজ সুরু হয়েছে। রাজ্য শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশনের আনুকূল্যে এই দুটি কারখানা স্থাপন করা হয়েছে।

★ মাদ্রাজের 'সেন্ট্রাল লেদার রীসার্চ ইন্‌স্টিটিউট'এ জুতোর চামড়া, বিশেষ ক'রে 'সোল' তৈরির জন্যে একটা নতুন জিনিস উদ্ভাবন করা হয়েছে। এটির নাম হ'ল ট্যানিন নির্য্যাস।

★ নতুন দিল্লী, জয়পুর, লক্ষ্ণৌ ও পাটনার মধ্যে ভারতের প্রথম দেবনাগরী টেলেক্স সার্ভিস খোলা হয়েছে। এর ফলে গ্রাহকরা দেবনাগরী লিপিতে যে কোনোও ভারতীয় ভাষায় পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। তা ছাড়া গ্রাহকরা টেলিফোনের মত নম্বর ঘুরিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতেও পারবেন।

★ দুর্গাপুরের হিন্দুস্তান স্টীল লিমিটেডের মিশ্র-ইস্পাত কারখানায় এই প্রথম উচ্চ পরিমাণ ক্রোমিয়ামযুক্ত ইস্পাত তৈরি হয়েছে। এই ইস্পাত পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্যে ব্যবহার করা হয়।

★ উত্তর প্রদেশে বস্তী, গাজীপুর ও বারানসী জেলায় তিনটি নতুন বিদ্যুৎ সঞ্চারণ সাব-স্টেশন স্থাপনের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। একত্রে তিনটির ক্ষমতা হ'ল ২০,৫০০ কিলো ভোল্ট।

★ চম্বল জলবিদ্যুৎ 'গ্রীড' থেকে ১৩২ কিলো ভোল্টের একটা লাইন নিয়ে যাওয়া হয়েছে রাজস্থানের ভরতপুরে। এর জন্যে খরচ হয়েছে ১.৪৪ কোটি টাকা। এর ফলে আলওয়ার ও ভরতপুরে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করা যাবে।

★ ওড়িষ্যা মাইনিং কর্পোরেশনের দৈতারী' খনি থেকে দু লক্ষ টন আকরিক লোহা রুমানিয়াকে রপ্তানী করা হয়েছে। আরও দু লক্ষ টন জাহাজে ক'রে, আসছে মাসে রুমানিয়ায় চালান দেওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

★ ১৯৬৮-৬৯-এর আর্থিক বছরে ভারত ৭৬.৪৭ কোটি টাকার হস্ত-শিল্পজাত সামগ্রী রপ্তানী করেছে। আগের বছরের তুলনায় এই পরিমাণ ২২ কোটি টাকা বেশী।

★ স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন ও চারটি বেসরকারী জুতা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান সম্মিলিতভাবে মার্কিন আমদানী কারকদের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে তিন কোটি টাকার কাউ বয় জুতো রপ্তানী করতে হবে।

★ হরিয়ানা বিদ্যুৎ পর্ষৎ মাত্র এক মাসের মধ্যে ছাছরাউলী ব্লকের তেজাওয়ালা খিজরাবাদ এলাকার ১২টি গণ্ডগ্রামের বৈদ্যুতিককরণের কাজ শেষ করেছে।

REGD. NO. D-233

ধন ধান্যে

'প্রেরণার বাণী'
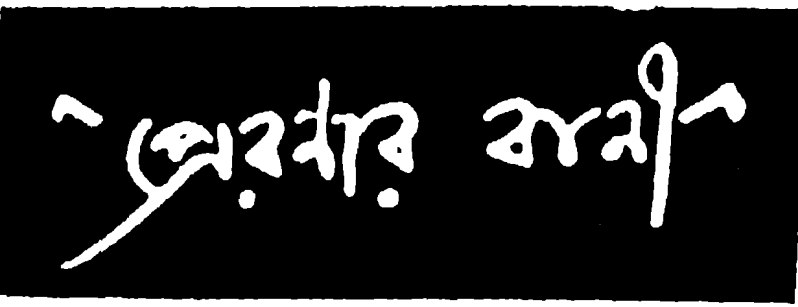
★ ...আমি বলতে চাই যে গ্রামগুলি যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে ভারতও ধ্বংস হবে। তখন ভারত আর এই ভারত থাকবে না। বিশ্বে তার যে নিজস্ব অবদান আছে তাও নষ্ট হয়ে যাবে। গ্রামগুলি যদি আর শোষিত না হয় তাহলেই শুধু গ্রামগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব। দেশকে ব্যাপকভাবে শিল্পায়িত করা হলে যখন প্রতিযোগিতা ও বাজারের সমস্যা দেখা দেবে, তখন তা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে গ্রামবাসীদের শোষণের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

★ আমি জানি যে ভারতকে যেমন আদর্শ দেশে পরিণত করা কঠিন তেমনি গ্রামগুলিকে আদর্শ গ্রামে পরিণত করাও কঠিন। কিন্তু একজন লোকের পক্ষে একটি গ্রামকে তাঁর আদর্শ অনুযায়ী তৈরি করা কোনদিন হয়তো সম্ভব হতে পারে, কিন্তু সমগ্র ভারতের পক্ষে একজন লোকের জীবনকাল অতি অল্প সময়। তবে একজন লোকও যদি আদর্শ গ্রাম গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে তিনি শুধু সমগ্র দেশের জন্য একটা গঠন ধারা গড়ে তুলবেন না, সম্ভবতঃ সমগ্র বিশ্বের জন্যই একটা আদর্শ স্থাপন করবেন। একজন ব্যক্তি এর চাইতে বেশী আর কি আশা করতে পারে।

★ সৎভাবে একটি পয়সা অর্জনের জন্যে যে কোনাও শ্রম স্বীকার লজ্জার বস্তু নয়।

★ সৃষ্টি করার সময়ে ভগবান চেয়েছেন যে মানুষ নিজে খেটে তার অন্নের সংস্থান করুক।

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আহারের সংস্থান করা প্রকৃতিগত ধর্ম। অতএব যে একআধ মুহূর্তও আলস্যে অতিবাহিত করে সে ঐ সময়টুকুর জন্যে অন্যের পরিশ্রমের ফলভোগী অর্থাৎ সে অন্যের দায়স্বরূপ। এই স্খলন অহিংসার অপলাপ কারণ অপ-রাপরের চিন্তা ও তাঁদের সম্বন্ধে সুবিবেচনাই হ'ল অহিংসার গোড়ার কথা। অলস ব্যক্তির এই বিবেচনার অভাব তাই প্রত্যবায় ছাড়া আর কিছু নয়।

★ আমার মতে জীবনের অধিকাংশ সময় যখন আহারের সংস্থানের জন্য ব্যয় করতে হয় তখন আমাদের সন্তানদের শিশুকাল থেকে শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা উচিত।

ছেলেমেয়েরা যেন পরিশ্রমের মর্যাদা অবহেলা করতে না শেখে। বুদ্ধির সঙ্গে, কায়িক শ্রম দিয়ে সম্পাদিত কোনোও কাজ বুদ্ধিবৃত্তি উন্মেষের প্রকৃষ্ট পন্থা। সামঞ্জস্যশীল বুদ্ধির মূলে আছে দেহ, মন ও আত্মার সুসম বিকাশ। সমাজ কল্যাণে ব্যয়িত কায়িক শ্রমের মধ্যে দিয়ে যে বুদ্ধি পরিণত হয় তা সমাজ সেবার পক্ষে প্রশস্ত হয়ে দাঁড়ায়, সে বুদ্ধি সহজে পথভ্রষ্ট বা বিপথগামী হয় না।

★ কায়িক শ্রম সম্বন্ধে দ্বিধা ও সঙ্কোচের যে মনোভাব আছে তা দূর করতে পারলে সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন তরুণতরুণীদের হাতে অনেক কাজের দায়িত্ব দেওয়া যায়।

★ পশ্চিমী জগতের হিংসা ও রক্তপাতের পথ ভারতের নয়। সে পথে চলায় ভারতের আজ ক্লান্তি এসেছে। সৎপথে থেকে সহজ জীবন যাপনে যে শান্তি সেই শান্তির পথই ভারতের নিজস্ব।

আমার স্বপ্নের স্বরাজে জাতি ধর্মগত বৈষম্যের কোনোও স্থান নাই। 'সহনশীলতা'—এই শব্দটিতে আমার অনীহা।

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ সম্পর্কে বিশেষ সংখ্যা! ৩১শে আগষ্ট

এই সংখ্যায় গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মতামত প্রকাশ করা হবে।

দেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিক, অধ্যাপক, গবেষক, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, এবং ট্রেড ইউনিয়নের নেতাগণ এই প্রশ্নটির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে তাঁদের মতামত প্রকাশ করবেন।

বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং বিশেষজ্ঞগণের বিশেষ প্রবন্ধাদি হবে সংখ্যাটির অন্যতম আকর্ষণ।

৩২ পৃষ্ঠা ২৫ পয়সা

পাঠকগণের প্রতি

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ সম্পর্কে 'ধনধান্যে' তাঁদের পাঠকগণের কাছ থেকে মন্তব্য আহ্বান করছে। এই সম্পর্কে ২০০ শব্দের অনধিক আলোচনা প্রবন্ধাদি ১৯৬৯ সালের ২৭শে আগষ্টের মধ্যে প্রধান সম্পাদকের কাছে পৌঁছুনো প্রয়োজন। যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হবে সেগুলির জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হবে।

ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সোসাইটি লিঃ—করোলবাগ, দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত এবং ডিরেক্টর, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত।

ধন ধান্যে

প্রথম বর্ষ : ৭
৩১শে আগষ্ট, ১৯৬৯

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত
পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

প্রথম বর্ষ সপ্তম সংখ্যা

৩১শে আগষ্ট ১৯৬৯ : ৯ই ভাদ্র ১৩৭৬
Vol I : No 7 : August 31, 1969

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮২০২৬, ৩৮৭৯১০

টেলিগ্রাফের ঠিকানা—যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার,'পাবলিকেশনস' ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

ভুলি নাই

আজকের পুঁজিবাদী জগতে প্রকৃত কর্তৃত্ব হ'ল ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের এবং 'শিল্প যুগের' পরই আমাদের এই যুগকে লোকে 'আর্থিক যুগ' বলে অভিহিত করেন।

—জওহরলাল নেহরু

এই সংখ্যায়

রাষ্ট্রীয়করণ—জাতীয় পরীক্ষা ?

সম্পাদকীয়

দেশের প্রধান প্রধান ১৪টি ব্যবসায়িক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের কথা প্রথম ঘোষণা করা হয় ১৯শে জুলাই এবং সেটি আইনে পরিণত হয় ৯ই আগষ্ট। দেশের অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণ ত্বরান্বিত করার এই সিদ্ধান্তটি হ'ল স্বাধীনতার ২২ বছরের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। একটি নিছক অর্থনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে রাজনীতি জড়িত করলেও এ ব্যবস্থা যে কালোপযোগী ও সঙ্গত এ-বিষয়ে কোনও সংশয় নেই।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা পরাধীন দেশের কাছে একাধিক কারণে শ্রেয় ও প্রেয়। কিন্তু সমষ্টির বৃহত্তর কল্যাণের পথ প্রশস্ত করতে না পারলে সে স্বাধীনতা শেষ পর্য্যন্ত অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। এই চিন্তায় উদ্বুদ্ধ এই দেশ সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। এই ব্যবস্থায় ধনী ও দরিদ্র,—'বিত্তবান' ও 'সর্বহারাদের' মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করে আনা সম্ভব হবে, এই সকলের আন্তরিক কামনা। জাতীয়করণ সেই অভীষ্ঠে পৌছে দেবার একটা পন্থা মাত্র।

তর্কাতর্কির ঘূর্ণীজালে পড়ে এ কথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে গ্রামে গ্রামান্তরে, শহরে নগরে লক্ষ লক্ষ নরনারীর দারিদ্র্য নিবারণের যে ব্রত আমরা নিয়েছি তা চরিতার্থ করার জন্যে, সমাজের শ্রেণী বিশেষের কাছে অপ্রীতিকর হ'লেও, সাধারণের কল্যাণে গৃহীত যে কোনোও ব্যবস্থা নৈতিকতার দিক থেকে সঙ্গত। এই অভীষ্ঠ সিদ্ধির জন্য অন্যতর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেত কি না এ তর্ক আজ অবান্তর। বস্তুতঃপক্ষে সবদিক থেকে সময়ের প্রশ্নটাই হচ্ছে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দেশের অগণিত নরনারী ও ভাবীকালের বংশধরদের জীবনের সঙ্গে যে প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছে সেই প্রশ্নের সমাধান স্থগিত রাখা কোনোও গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত নয়। দারিদ্র্য মোচনের জন্য একটা সমাধান সূত্রের আশায় আমরা দীর্ঘ কাল ধরে অপেক্ষা ক'রে আছি ; সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যবধান ও বৈষম্য আমরা দীর্ঘদিন সহ্য ক'রে চলেছি। তাই আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয় ; এই সমস্যা সমাধানে দীর্ঘসূত্রতা সরকারের পক্ষেই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা স্বাধীনতার জন্য যে কালক্ষয়ী সংগ্রামে অগণিত দেশ-প্রেমী অসীম যন্ত্রণা ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন, প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের সেই পরমদান যেন প্রহসন হয়ে না দাঁড়ায়। আত্মতুষ্টির আমেজ থেকে জাতিকে জাগ্রত করার জন্যে স্বাধীনতার প্রত্যূষে আমরা যে সব লক্ষ্য ধ্রুব বলে গ্রহণ করেছি সেই লক্ষ্যগুলির দিকে এগিয়ে যাবার জন্য একটা দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করা বহু পূর্বেই অত্যাবশ্যক ছিল। আজ সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, এখন আর পশ্চাৎপদ হবার প্রশ্ন নেই।

এ কথা সত্য যে, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ সুখ ও সমৃদ্ধি লাভের সোনার কাঠি নয়। এই ব্যবস্থা লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবার একটা সোপান মাত্র। যাঁরা এই ব্যবস্থা পরিচালনা করবেন তাঁদের ওপর এই ব্যবস্থার সার্থকতা নির্ভর করবে। অন্যান্য সরকারী সংস্থায় কর্মদক্ষতার অভাবের নজীর তুলে জাতীয়-করণকে ধিক্কার দেওয়া অথবা সরকারী ব্যাঙ্কগুলি দক্ষতার দিক থেকে বেসরকারী ব্যাঙ্কের সমকক্ষ হবে না ব'লে পূর্বাহ্নে সংশয় ব্যক্ত করা নিরর্থক। সরকারী প্রতিষ্ঠানাদিতে যদি ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটেই, মনে রাখতে হবে তা আমাদেরই বিচ্যুতি। জাতির ভবিষ্যৎ আমাদের হাতে। যাত্রাপথে অথবা অভীষ্ঠে পৌঁছুতে যদি কোথাও কোনোও স্খলন ঘটে তার দায় ও দায়িত্ব আমাদেরই। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ যদি অসফল প্রতিপন্ন হয় তাহলে এ দেশের সর্বসাধারণ, অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকে, সেই ব্যর্থতার শরিক হিসেবে ধিক্কৃত হবো।

তাই জাতীয়করণ শুধু কোনোও নীতিরই অগ্নিপরীক্ষা নয় এ অগ্নিপরীক্ষা সমগ্র জাতির।

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের সমালোচকদের মতে 'সামাজিক-নিয়ন্ত্রণের' কার্যকারিতার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পূর্ণ হবার আগেই রাষ্ট্রীয়করণ বলবৎ হ'ল। বলা হয়েছে যে, বড় বড় বেসরকারী ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করার আকস্মিক সিদ্ধান্ত দেখে বোঝা যায় যে, এই ব্যবস্থার ব্যাপকতর প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে ভালোভাবে চিন্তা করা হয়নি। আপাত দৃষ্টিতে এ সমালোচনা অন্যায় নয় কারণ অভিযোগ রাষ্ট্রীয়করণের বিরুদ্ধে নয়, অভিযোগ হ'ল এর সময়-নির্বাচনের বিপক্ষে। সরকার এই ব্যবস্থা-গ্রহণ আরও কিছুকাল স্থগিত রাখতে পারতেন হয়তো (যদিও বিগত দুই দশকের মধ্যে বহুবার রাষ্ট্রীয়করণের জন্যে দাবী জানানো হয়েছে)। কিন্তু ব্যষ্টির কল্যাণে যে ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য, তাতে বিলম্ব ঘটানো সরকারের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হ'ত কী ? অথবা অতি ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর স্বার্থের খাতিরে, অগণিত নর-নারীকে অনির্দিষ্টকালের জন্যে দারিদ্র্য ও ক্লেশে জর্জরিত হ'তে দেওয়া সঙ্গত হ'ত কী ?

তার পরিবর্তে যে ব্যবস্থা নিয়ে আজ দীর্ঘ কুড়ি বছর আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে, সমষ্টির স্বার্থে সরকার তা কার্যকর করলেন। কৃষক, শ্রমজীবী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও কারিগর সমেত লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের কল্যাণে ব্রতী এক গণতান্ত্রিক সরকারের সামনে এই একটি মাত্র পথ খোলা ছিল। জন-সাধারণের জীবনে নিষ্ক্রিয়তার স্বাচ্ছন্দ্য আনা রাষ্ট্রীয়করণের উদ্দেশ্য নয়, এর লক্ষ্য হ'ল আপামর জনসাধারণের সামনে এক পূর্ণতর ও উন্নততর জীবনের বাতায়ন উন্মুক্ত করা, উন্নতির পথে অগ্রগতি করার পথ সুগম করা।

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ কেন?

—ইন্দিরা গান্ধী

আমাদের দেশের কোটি কোটি মানুষের আশা আকাঙ্খা পূরণ সুনিশ্চিত করার জন্য আমরা যে আদর্শ অনুসরণ ক'রে এসেছি ও করছি তার পরিপ্রেক্ষিতে এবং নিছক অর্থনৈতিক দিক থেকে ১৪টি বড় বড় ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রীয়করণ সঙ্গত হয়েছে। ১৯৬৪ সালে সংসদে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার নীতি গৃহীত হয়েছিল। এর পরে সরকারী ক্ষেত্রে অর্থলগ্নীর পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়, যার ভিত্তিতে পরবর্তীকালে শিল্পোন্নয়নে অধিকতর অগ্রগতি করা সম্ভব হয়।

আমি একান্তভাবে বিশ্বাস করি যে, সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের দোষগুণের তুলনামূলক বিচার নিরর্থক। দেশের অর্থনীতিতে উভয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ কথা যেন কেউ না ভাবেন যে বেসরকারী ক্ষেত্রে সব কাজকর্মই নিখুঁত। বস্তুতঃপক্ষে বেসরকারী ক্ষেত্রের কাজকর্ম দেখে অনুপ্রাণিত বা উৎসাহিত বোধ করার মতো কোনো কারণ ঘটেনি। দেশের বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলিতে যেভাবে কাজ হচ্ছিল তা যতই বিচার করা যায় ততই মনে হয় ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ও অন্যান্য ব্যবসায়ের মধ্যে একটা বেশ বড় রকমের পার্থক্য রয়েছে। ব্যাঙ্কের অংশীদারদের আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা প্রায় নেই বললেই হয়। ১৯৬৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর, এই সব ব্যাঙ্কের মোট জমার পরিমাণ ছিল ২,৭৫০ কোটি টাকা যার মধ্যে আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল মাত্র ২৮.৫ কোটি টাকা অর্থাৎ শতকরা এক ভাগের সামান্য বেশী। সুতরাং স্পষ্টতই ব্যাঙ্ক পরিচালকরা বলতে গেলে প্রায় অন্যের টাকাতেই কাজ চালাচ্ছিলেন।

যে সব দেশ সমাজতন্ত্রী নয় সেই সব দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় এই দিকটা বরাবর উদ্বেগের কারণ হয়ে থেকেছে। বাস্তবিকপক্ষে যে সব দেশে পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রাধান্য রয়েছে, সে সব দেশে, হয় ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে অন্যথায় ব্যাঙ্কগুলির ওপর অত্যন্ত কঠোর দৃষ্টি রাখা হয়েছে। ফ্রান্সে বড় বড় ৬টি ব্যাঙ্কের মধ্যে ৪টির রাষ্ট্রীয়করণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বাকী দু'টির মোট আমানত ছিল দেশের সমস্ত ব্যাঙ্কের সর্বমোট জমা টাকার কুড়ি ভাগের এক ভাগ।

অনেক ব্যাঙ্কে যারা আগে কাজকর্মের নীতি নির্দ্ধারণ করতেন তাঁরা (যেমন ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান), কোনো না কোনো ভাবে পরেও, ব্যাঙ্কের নীতি প্রভাবিত করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলি এসব পরামর্শ মেনেছে আবার অনেক ব্যাঙ্ক এসব নির্দেশ পালনও করেনি। কিন্তু নিষ্ঠা ও উৎসাহ নিয়ে একটা নীতি অনুসরণ করা আর কারুর নির্দেশে তা পালন করার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। সুতরাং যাঁরা ব্যাঙ্কের সুযোগ সুবিধা লাভে বঞ্চিত হয়েছেন, সেই সব অধীর ও হতাশ মানুষগুলি নিজেদের শক্তিতে স্বাবলম্বী হবার আশায় আমাদের উন্নয়নী প্রয়াসের ভরসায় রয়েছেন; তাঁদের আমরা আর অবহেলা করতে পারি না।

এ প্রশ্নও আমাদের করা হয়েছে যে, বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিকে এই প্রস্তাবিত বিধিভুক্ত করা হয়নি কেন? বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার অংশ এবং তার দরুণ সেগুলি রপ্তানীকারক ও আমদানীকারকদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিতে সক্ষম। এই কাজের জন্য বিদেশে যত শাখা ব্যাঙ্ক থাকা দরকার ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির তা নেই। ভারতের ব্যবসায়ীরা বিদেশের যে সব ব্যবসায়ীর কাছে পণ্য রপ্তানী করেন তাঁদের সম্বন্ধে এই বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি খুঁটিয়ে খবর রাখে। অতএব বিদেশী ঐ ব্যাঙ্কগুলি মুদ্রায় ঋণ দিতে পারে, মূল দপ্তরের পক্ষ থেকে আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থার তদারক করতে পারে, পর্যটকদের সাহায্যে আসতে পারে এবং ভারতে কিংবা অন্যান্য যে সব দেশে তাদের শাখা আছে, সে সব দেশে ব্যবসায়ের সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে সমস্ত খবরাখবর দিতে পারে। তবে বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ম কানুনের কড়াকড়ির অধীনে রাখা হয়েছে। যেমন একটি নিয়ম অনুযায়ী বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিকে কেবল বন্দর নগরীর মধ্যে অফিস খুলতে দেওয়া হয়। যে সব ব্যাঙ্ক ইতিপূর্বেই এসব শহরের বাইরে অফিস খুলেছে সেগুলিকে অবশ্য বন্দর নগরীর বাইরে কাজ করতে দেওয়া হয়। তা ছাড়া বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে অথবা পর্যটনের সুবিধা ক'রে দেওয়ার বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি ভারতীয়দের ভালোভাবে সাহায্য করতে পারবে ব'লে যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুনিশ্চিত হন তাহলেই কেবল বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিকে সম্প্রসারণের অনুমতি দেওয়া হয়। ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে জাতীয় করণের আওতায় না আনার জন্যেও সমালোচনা করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয়করণের লক্ষ্য হ'ল, কৃষিক্ষেত্রে, ক্ষুদ্রশিল্পে ও রপ্তানীতে দ্রুত অগ্রগতি করা, নতুন নতুন উদ্যোগীদের উৎসাহিত করা এবং সমগ্র অনগ্রসর এলাকার উন্নতি করা।

যে সব ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ৫০ কোটি টাকা বা তার বেশী, বিভিন্ন রাজ্যে কেবল সেগুলিরই শাখা আছে। পক্ষান্তরে ছোট ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্ম বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। যে ১৪টি ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়পরিচালনাধীনে আনা হয়েছে, সেগুলির কার্যক্ষেত্র ব্যাপক হওয়ায় সেগুলির পক্ষে সরকারের উদ্দেশ্য কাজে পরিণত করা সহজসাধ্য হবে যেটা ছোট ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে সম্ভব নয়। ছোট ব্যাঙ্কগুলির ঋণ মঞ্জুরীর হিসেব পত্র থেকে দেখা যায় যে, এই ব্যাঙ্কগুলি শুধু ক্ষুদ্র ঋণ

* ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ বিল সংক্রান্ত বিতর্ককালে লোকসভায় প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের সংক্ষিপ্তসার।

গ্রহীতাদের চাহিদাই পূরণ করে। ব্যাঙ্কগুলি যাঁদের সাহায্য করে, সেই গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা কারবারীরা অন্তর্ভুক্ত। এমন কি, ঐসব ব্যাঙ্কের কার্যপরিচালনাতেও এঁরা মতামত দেন।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির কাজ চালাবার জন্যে কোনও একক কেন্দ্রীয় সংস্থা স্থাপনের অভিপ্রায় সরকারের নেই। কেন্দ্রের পরিচালন ব্যবস্থা সুদৃঢ় রাখলেও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রত্যেকটি ব্যাঙ্ক হবে স্বশাসিত এবং প্রত্যেকটি (পরিচালন) পর্ষৎ-এর দায়িত্ব ও ক্ষমতা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। আমরা যে নির্দেশ দেব তা হবে নীতি বা সাধারণ বিষয় সংক্রান্ত, বিশেষ কোন গ্রহীতাকে বিশেষ কী পরিমাণ ঋণ দেওয়া হবে সে সম্পর্কে আমরা কথা বলব না। রাজনৈতিক বা অন্য কোনোও উদ্দেশ্যে অত্যধিক হস্তক্ষেপের বিপদ সম্বন্ধেও আমরা সতর্ক থাকব।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে নিয়ম কানুনের জটিলতা থাকা উচিত নয়, এ বিষয়ে আমরা একমত। প্রত্যেক ব্যাঙ্কের স্বাতন্ত্র্য এবং কাজে উৎসাহ দেওয়া ও অগ্রণী হয়ে কাজ করার ধারা অক্ষুণ্ণ থাকবে। এটা আমরা এমনভাবে করতে চাই যাতে কাজে উন্নতি করার সুস্থ প্রতিযোগিতার মনোভাব নষ্ট না হয়ে যায়।

এই অবকাশে, অংশীদারদের আমি এই আশ্বাস দিতে চাই যে, আমরা যে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে চাই তা ন্যায্য। বলা হচ্ছে যে, সরকারী সিকিউরিটিতে ক্ষতিপূরণ দিলে অংশীদারদের অসুবিধা হবে। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে এই কথা খণ্ডন করছি। সম্প্রতি ভারত সরকার বাজারে বারো বছর মেয়াদের শতকরা সওয়া ৪ টাকা সুদের ঋণপত্র ছেড়েছেন। এই সিকিউরিটিগুলি বাজারে কিছু বেশী দামে বিক্রি হচ্ছে। শতকরা সাড়ে ৫ টাকা সুদে ২০ বছর মেয়াদী ঋণপত্রও বেশী দামে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এই নতুন সিকিউরিটিগুলি অংশীদারদের পক্ষে মূল্যহীন ক্ষতিস্বরূপ একথা বলা শুধু দায়িত্বজ্ঞানহীনতাই নয় তা বিপজ্জনকও বটে।

এই রকম ব্যাপারও ঘটে যখন অল্পবিত্ত শ্রেণীর মনে এই সব সিকিউরিটি সম্বন্ধে সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টি ক'রে ন্যায্য দামের চেয়ে কম দামে সেগুলি তাঁদের হাত ছাড়া করবার চেষ্টা করা হয়। আমি আশা করি যে, এই ধরনের শোষণ ঘটে এমন কোনোও উক্তি কেউ করবেন না। সিকিউরিটিগুলি হস্তান্তরযোগ্য ব'লে সেগুলি এমন দামে বিক্রি হওয়া উচিত যাতে এর জন্যে কাউকে ক্ষতি স্বীকার করতে না হয়।

ব্যাঙ্কগুলির পরিচালক ও অন্যান্য কর্মীদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ রক্ষার প্রতি আমরা সতর্ক দৃষ্টি রাখব। তাঁদের কাছ থেকে আমরা দায়িত্বজ্ঞান, সৌজন্য ও সহযোগিতা আশা করি। দেশ কিংবা ব্যাঙ্ক ব্যবসার স্বার্থ ভুলে কেউ যেন আন্দোলনের মনোভাব গ্রহণ না করেন। শিল্প, বাণিজ্য বা কৃষির প্রকৃত চাহিদার জন্য ব্যাঙ্ক ঋণ মঞ্জুর করা হবে। আমানতকারীদের গচ্ছিত টাকা সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করা হবে।

ভারতের জনসাধারণ জাতীয় ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে লেনদেনে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। স্টেট ব্যাঙ্ক ও তার সহকারী ব্যাঙ্কগুলি দেশের মোট পুঁজির এক-তৃতীয়াংশ নিয়ন্ত্রণ করে। কেউ বলতে পারবেন না যে আমানতকারীদের স্বার্থ কোনোও প্রকারে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। স্টেট ব্যাঙ্কের কাজকর্ম নিখুঁত এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় কিন্তু জনসেবার দিক থেকে, দক্ষতার প্রশ্নে কিংবা ঋণ বন্টনের ব্যাপারে, এই ব্যাঙ্ক বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। গণ্ডগ্রামগুলিতেও ব্যাঙ্কে টাকা রাখার অভ্যাস জনপ্রিয় করায় ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কগুলি ভালো কাজ করছে। ১৯৬৭ সালের শেষে ঐ সব ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ছিল ৭০০ কোটি টাকা এবং আমানতকারীর সংখ্যা ছিল দেড় কোটি। সরকারের কঠোর সমালোচকরাও বলতে পারবেন না এই সব ব্যাঙ্কের আমানতকারীরা নিজেদের গচ্ছিত টাকার নিরাপত্তা সম্বন্ধে কখনও সন্দিহান হয়েছেন।

জনসাধারণ যে উন্নততর কাজ পাবেন এবং ব্যাঙ্কের কাজ যে সম্প্রসারিত হবে—এই বিষয়ে তাঁদের আমি আশ্বাস দিতে চাই। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাঙ্কের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির ব্যাপারে গুরুতর তারতম্য থেকে গেছে। যে সব রাজ্যে ব্যাঙ্কের সংখ্যা যথেষ্ট নয় সেই সব রাজ্যে ব্যাঙ্ক খোলা প্রয়োজন। এমন কি উন্নত রাজ্যগুলিতেও ব্যাঙ্কের সুযোগ সুবিধা শুধু শহরাঞ্চলে বিশেষ করে বড় বড় শহরে সীমাবদ্ধ আছে এবং তার ফলে আধা শহর বা গ্রামাঞ্চলের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। বিভিন্ন রাজ্যে ব্যাঙ্ক আমানত ও লগ্নীর আনুপাতিক হিসেবে দেখা গেছে যে, অনেকগুলি রাজ্যে যেমন—আসাম, বিহার, রাজস্থান, ওড়িশা, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা ও পাঞ্জাব প্রভৃতিতে প্রচুর তারতম্য ঘটেছে। ফলে, অভিযোগ শোনা গেছে যে, ব্যাঙ্কগুলি কতকগুলি অঞ্চলের সম্পদ আমানত হিসেবে একত্রিত করে অন্যান্য অঞ্চলে ব্যয় ক'রে বৈষম্য বাড়িয়ে তুলেছে। এই ঝোঁকটা বন্ধ করতে হবে। সুসমন্বিত আঞ্চলিক উন্নয়নের যে নীতির ওপর একাধিকবার গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে তা কাজে পরিণত করা যাবে।

রাষ্ট্রীয়করণের স্বপক্ষে সরকার জনসাধারণের কাছ থেকে যে রকম ব্যাপক সমর্থন লাভ করেছেন, রাষ্ট্রীয়করণ কাজে পরিণত করার সময়ে তা আমরা স্মরণে রাখব। ঋণের ক্ষেত্র প্রসারের জন্যে শুধু এই ব্যবস্থা আমরা কার্যকরী করতে চাইছি না,—আমরা এই ব্যবস্থাকে একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় ক'রে তুলতে চাই।

এই ব্যবস্থার সার্থক রূপায়ণে যাঁরা আগ্রহী তাঁদের কাছে আমি আবেদন জানাতে চাই যে, তারা তাঁদের মতামত (যা অবশ্যই বিবেচনা করা হবে) নিয়ে এ কাজে আমাদের সাহায্য করুন। যাতে এই ব্যবস্থা এমনভাবে কার্যকর করা যায়, যা তাঁদের কিংবা সমগ্র দেশকে নিরাশ করবে না

ধনধান্যে ৩১শে আগষ্ট ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৩

অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিও কি রাষ্ট্রীকরণ করা হবে ?

পি. সি. যোশী

ইনস্টিটিউট অব ইকনমিক গ্রোথ, দিল্লী

প্রধান ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করার ফলে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তা সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণ হয়তো একে প্রধানতঃ একটা আর্থিক ব্যবস্থা ব'লে মনে করতে পারেন এবং এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে আশু কি ফল ফলতে পারে তার ওপর ভিত্তি ক'রেই এর মূল্যায়ন করতে চাইবেন। তবে বর্তমান অবস্থায় রাজনৈতিক শক্তির কাঠামোতে, অর্থনৈতিক শ্রেণীগুলির মধ্যে শক্তির অনুপাত সৃষ্টিতে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ ব্যবস্থার একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য রয়েছে। অর্থনৈতিক সম্ভাবনার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের প্রত্যক্ষ ফলাফল যাই হোক না কেন, এই ব্যবস্থা হয়তো কতকগুলি নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিকে মুক্তি দেবে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিষ্ঠানগত কাঠামোকে নতুন ক'রে রূপ দেবে।

ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তিনটি প্রধান ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।
সেগুলি হ'ল :

(১) জাতির উৎসাহ ও ঐক্যমত জাগ্রত করতে সমর্থ এই রকম একটা উন্নয়ন কর্মসূচী ;

(২) কর্মসূচীর প্রতি অনুকূল হয় এই রকমভাবে রাজনৈতিক শক্তিগুলির মধ্যে একটা ঐক্যমত আনার প্রচেষ্টা :

(৩) কায়েমী স্বার্থগুলির চাপ প্রতিহত করতে এবং এই কর্মসূচীর রূপায়ণ সুনিশ্চিত করার জন্য সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ওপর নৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব করতে সক্ষম এই রকম একটা রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং সামাজিক শক্তি সৃষ্টি।

নেহরুর যুগ বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো গঠনে যথেষ্ট অবদান যোগায় এবং কিছু সময়ের জন্য মনে হয়েছিল যে ভারতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠন সুনিশ্চিত করতে যতটা সময় লাগতে পারে এই উন্নয়নের গতি সেই সময় পর্যন্ত চলবে। কিন্তু তা চলেনি। নেহরু জীবিত থাকতেই, বিশেষ করে তাঁর মৃত্যুর পর জাতীয় ঐক্যমতে দ্রুত ভাঙ্গন ধরে, রাজনৈতিক শক্তিগুলির ভারসাম্য শক্তিশালী কায়েমি স্বার্থের দিকে যেতে থাকায় উন্নয়ন কর্মসূচীগুলির রূপায়ণের গতি মন্থর হয়ে যায়, সরকারী এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের অবনতি ঘটে এবং তার ফলে দেশের নানা জায়গায় সামাজিক ও রাজনৈতিক বিক্ষোভ দেখা দেয়।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণকে একটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলা যায়। এই ব্যবস্থা নতুন একটা নেতৃত্বকে সামনে নিয়ে এসেছে এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে, জাতীয় নেত্রী হিসেবে বিশেষ করে, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মর্যাদা বাড়িয়েছে।

সর্বোপরি এটাই হল বৃহৎ ব্যবসায়ীগণের স্বার্থ এবং তাঁদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে। স্বাধীন ভারতে যে আর্থিক বৈষম্যের ফলে সামাজিক অসন্তোষ এখনও থেকে গেছে, বা বাড়ছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে, সম্ভবতঃ স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রথম একটা অত্যন্ত সাহসিকতাপূর্ণ ব্যবস্থা। কাজেই এই ব্যবস্থাকে সমগ্র জাতি সমর্থন জানিয়েছে এবং সম্প্রতিকালে সরকারী ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিপুল ক্ষতি হচ্ছিল তা কিছুটা পরিমাণে পূরণ করতে পেরেছে। সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্খা এবং সরকারী কর্মসূচীর মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান ছিল এই ব্যবস্থা তাও খানিকটা হ্রাস করতে সমর্থ হয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এগুলি সবই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এর তাৎপর্য অপরিসীম।

এটা আরম্ভ মাত্র

তবে এটা কেবল আরম্ভ মাত্র এবং এই কার্যপন্থা সচল থাকবে কিনা এবং এর ফলে যে সব লাভ হবে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে নতুন পথে চালিত করবে কিনা সেটাই হল প্রধান প্রশ্ন। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের ফলে ভারতের সব শ্রেণীর নাগরিকের মধ্যে যে বিপুল আশার সঞ্চার হয়েছে এবং সকলেই এতে যে রকম উৎসাহিত হয়েছেন, তা বজায় রাখতে হলে এটা যাতে একটা খণ্ড ব্যবস্থা না হয়ে থাকে তা স্মরণে রাখা প্রয়োজন। বরং অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিকেও রাষ্ট্রাধীন করতে এই ব্যবস্থা যেন শক্তি যোগায়। অন্য কথায় বলতে গেলে, এটার একটা সংহত উন্নয়ন কর্মসূচীর অংশ হওয়া উচিত।

জনসাধারণ মনে করেন যে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ ব্যবস্থাটা, কয়েকজনের মধ্যে কেন্দ্রীভূত শক্তির বিরুদ্ধে একটা আক্রমণ। কাজেই পরবর্তী কর্মসূচীও এমনভাবে তৈরী করতে হবে, যাতে সমাজের অধিকাংশই এই উন্নয়নের কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারেন, এবং সাফল্যগুলিও অধিকাংশ ব্যক্তি ভোগ করতে পারেন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে নতুন যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে তা থেকেই বোঝা যাবে যে, নতুন যে রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা এবং নতুন যে নেতৃত্ব গড়ে উঠছে তা অর্থনৈতিক জাগরণকে সফল করে তুলতে পারবে কিনা। পরবর্তী ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যত বিরোধ দেখা দেবে সেগুলিতে মূলতঃ অর্থনৈতিক স্বার্থ বিশিষ্ট প্রধান প্রধান গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সংগ্রাম ও শক্তি পরীক্ষারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যাবে।

(২৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

কর্ম্মক্ষেত্র ও সংগঠন ব্যবস্থার রূপান্তর প্রয়োজন

টি. এ. পাই

কাস্টোডিয়ান, সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্ক মণিপাল

সরকার যে ১৪টি ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণভার শেষ পর্য্যন্ত হাতে নিলেন সেগুলির তহবিলের মোট পরিমাণ—সমস্ত বেসরকারী ব্যাঙ্কের সবমোট তহবিলের শতকরা ৫৮ ভাগ। অর্থাৎ ষ্টেট ব্যাঙ্ক ও তার শাখাগুলির আমানত সমেত দেশের মোট ব্যাঙ্ক-আমানতের শতকরা ৮৫ ভাগ প্রত্যক্ষভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণে এল।

যে কোনোও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের মুখ্য ভূমিকা তিনটি—(ক) দেশের সমগ্র সম্পদ সংহত করা, (খ) সুলভে ও সহজে টাকা আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা, এবং (গ) ঋণ দেবার এমন একটি পদ্ধতি গ্রহণ করা যাতে উন্নয়নের প্রত্যেক ক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতা সর্ব্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছুতে পারে।

ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে কড়া নিয়ম কানুনের ফলে এমন কতকগুলি অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে যার জন্য এই তিনটি উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সার্থক হতে পারেনি।

দেশের সর্বত্র ব্যাঙ্কের শাখা খোলা এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাজের সর্বশ্রেণীকে এর আওতায় আনার সমস্যা, সরকারী ব্যাঙ্ক হিসেবে ষ্টেট ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্যান্য বেসরকারী ব্যাঙ্কের ওপর একচেটিয়া মালিকানার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব রয়েছে ব'লে ধারণা এবং ঋণদান পদ্ধতি ব্যাপকভাবে কার্য্যকর করার ক্ষমতার দরুণই ব্যাঙ্ক ব্যবসায়কে উদ্দেশ্যমূলক ও আরও কার্য্যকর করার জন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অনিবার্য হয়ে পড়ে। বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্বাধীনে আনার ফলে এই উদ্দেশ্যগুলি পূর্ণ হওয়া সম্ভব।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে, বর্ত্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, দেশের অর্থনৈতিক পুনর্জ্জাগরণে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি গুরুত্বপূর্ণ ও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবে ব'লে আশা করা যায়। এখন আর্থিক ব্যবস্থার নিজস্ব ধারা বা বৈশিষ্ট বজায় রেখে, উন্নয়ন কার্যসূচী অনুসারে অগ্রাধিকারের মাত্রা বিচার ক'রে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণ স্বরূপ অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

তাছাড়া এ পর্য্যন্ত যে সব ক্ষেত্রে বাদ্দ-ঋণের আকারে পর্যাপ্ত পরিমাণ আর্থিক সাহায্য পৌঁছুয়নি সেইসব ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়া সম্ভবপর হ'বে। যেখানে আগে ব্যক্তিগত মুনাফালাভ ও অংশীদারদের স্বার্থের প্রশ্ন ব্যয়ের মাত্রা নির্দ্ধারণ করত এখন সেখানে বিবেচ্য হবে সামাজিক স্বার্থ।

ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের নিষ্ক্রিয় ও জড় মনোভাবের ফলে সারা দেশে সম্পদ সংহত করার ও ঋণ বণ্টনের কাজ বিঘ্নিত হয়েছে। গৃহনির্ম্মাণের মত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও ব্যাঙ্কের পুঁজী লগ্নী করা হয়নি।

বে-সরকারী ব্যাঙ্কগুলির শতকরা ৩১ ভাগ, অর্থাৎ তাদের মোট আমানতের ৬৮ ভাগ ও মোট অগ্রিমের শতকরা ৬২ ভাগ, মাত্র ৫০টি শহরে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

কৃষির জন্যে ঋণ বরাদ্দ বড় কথা নয়, পল্লীগুলির উন্নয়নের জন্যে উদ্দেশ্যমূলক ঋণদান হচ্ছে আজকের দিনে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।

জাতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সামনে এখন যা করণীয় তা মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়—যথা কর্ম্মক্ষেত্র ও সাংগঠনিক বিষয়। প্রথমটির ক্ষেত্রে ঋণ দেবার পদ্ধতির পরিবর্ত্তন এবং চাহিদা অনুযায়ী ঋণ বা আগামের মাত্রা নিরূপণ হ'ল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দেশের পরিবর্ত্তনশীল চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করা এবং অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে এই সংস্থার পুনর্বিন্যাস হল গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্ব। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি কতটা দক্ষতার সঙ্গে এই চাহিদাগুলি পূরণ করতে সক্ষম হবে সেইটে বড় কথা।

কার্যপদ্ধতিগত প্রশ্ন

সবাগ্রে যে সমস্যার প্রতি আশু দৃষ্টিপাত প্রয়োজন তা হ'ল কৃষি উন্নয়নে অর্থসাহায্য। ব্যাঙ্কার হিসেবে আমি বলতে পারি, যে, আমরা বহু ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছি। এ দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সূত্রপাত হয়েছে প্রায় ১০০ বছর আগে। নানা উন্নতিবিধান সত্ত্বেও এই ক্ষেত্রটি আজও 'অপরিণত' এবং এর মুখ্য কার্যক্ষেত্র শহরাঞ্চল।

দেশে পরিকল্পনার সূচনা থেকেই পরিকল্পনা প্রণেতারা বলে আসছেন যে, ভারতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের ভিত্তি হ'ল কৃষিক্ষেত্র। কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি করতে না পারলে এ দেশে প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে না। এই কৃষক গোষ্ঠীর আর্থিক স্বচ্ছলতা বাড়াতে হ'লে, কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি করতে হ'লে প্রচুর মূলধন দরকার।

এ পর্যন্ত সংগঠিত ব্যাঙ্ক ব্যবসার তহবিল থেকে অতি সামান্য পরিমাণ অর্থ গেছে কৃষি উন্নয়নে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এই ক্ষেত্রটির বিকাশে মনোনিবেশ করা হয়নি, এ অতি ক্ষোভের বিষয়।

কারণ তার ফলে, উন্নয়ন পরিকল্পনার দুই দশক পরেও আজও আমরা কৃষি ও খামার সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারিনি।

খামারের জন্য অর্থ সংস্থান

যে দেশে জাতীয় উৎপাদনের অর্ধেক আসে কৃষিসূত্রে সেখানে বন্টনযোগ্য মোট ঋণের শতকরা এক ভাগও বোধ হয় ঐ ক্ষেত্রে পৌঁছয় না। বিস্ময়ের কথা এই, যে, এই এক শতাংশের ভরসায় কৃষকরা কাজ কর্ম্ম বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার জন্য বিরাট পরিমাণ লগ্নি দরকার যা কৃষির যন্ত্রপাতি ও কৃষি সংক্রান্ত অন্যান্য আবশ্যকীয় সামগ্রীর আকারে দিতে হবে।

কৃষকদের সমৃদ্ধিতে দেশের সমৃদ্ধি এটা উপলব্ধি করা দরকার। সম্প্রতি কৃষিক্ষেত্রে ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে প্রকট হয়ে উঠেছিল। গ্রামাঞ্চলে অধলগ্নী আশু ফলপ্রসূ না হওয়ায় ব্যাঙ্কগুলি গ্রামাঞ্চলে কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত করার আগ্রহ দেখাতো না। তাই কৃষির চাহিদা পূরণে বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে, এ কথা বলা অসঙ্গত নয়।

এ পর্যন্ত কৃষিক্ষেত্রে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির আধিপত্য ছিল। কিন্তু এখন ৬০০০টি শাখার মাধ্যমে এইদিকে দৃষ্টি দেওয়া জাতীয় ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে সম্ভব হবে। কৃষি ছাড়া উৎপাদনের অন্যান্য যেসব ক্ষেত্রের ওপর বৃহত্তর সমাজের বৈষয়িক উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করছে তার মধ্যে আছে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও কুটির শিল্প।

তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশে উন্নয়নের যে ভিত্তি গড়ে তোলা হয়েছে জনসাধারণ যাতে তার সুবিধা নিতে পারেন তার সুযোগ ক'রে দেওয়া হয়নি। তাই বহু সৃজনী প্রতিভা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। আজ আমাদের জনশক্তির মত এত বড় একটা সম্পদ অপচয় হচ্ছে শুধু কর্মক্ষেত্র ও উৎসাহের অভাবে। দেশের সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তির কর্মসংস্থান করা যে কোনোও রাষ্ট্রের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু যোগ্য ব্যক্তি যাতে নিজেই নিজের কর্মক্ষেত্র তৈরি করতে পারেন তার সুযোগ আমাদের ক'রে দিতে হবে। এতে ব্যাঙ্ক ব্যবসা কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এমন কি তেমন প্রকল্প, গঠনমূলক বা কার্যকর ব'লে মনে হ'লে, ব্যাংকারের অর্থ লগ্নি করার মত বিবেচনা বুদ্ধি থাকা উচিত। মোট কথা ব্যাংকারের দৃষ্টিভঙ্গী গঠন মূলক হলে নতুন সম্পদ সৃষ্টিও সম্ভব হতে পারে।

এ যাবৎ ঋণ গ্রহণের যোগ্যতা-বিচারে যে মাপকাঠি চলত, আজ সে মাপকাঠি চলেনা। অর্থাৎ যোগ্যতার বিচার কর্মক্ষমতা ও সাফল্য প্রদর্শনের ভিত্তিতে করা উচিত এবং এই সব ক্ষেত্রে অল্প টাকা আগাম স্বরূপ দেওয়াই বিবেচনার কাজ। আমি বহু ক্ষেত্রে এই রকম সাহায্য দিয়ে দেখেছি যে, এঁরা শুধু নিজেদেরই সুপ্রতিষ্ঠিত করেন নি বরং এঁদের সামর্থ্য ও যোগ্যতা ব্যাঙ্কের শক্তি সামর্থ্যও বৃদ্ধি করেছে।

গৃহনির্মাণ সমস্যা

ভারতে খাদ্য সমস্যার পরই বোধ হয় অবহেলিত হ'ল গৃহনির্মাণের ক্ষেত্র যা ন্যূনতম প্রয়োজনের আওতায় পড়ে। গৃহ সমস্যার নিরসনের জন্যে পরিকল্পনাগুলিতেও তেমন কোনোও কথা বলা হয়নি।

এখন জাতীয়করণের পর ব্যাঙ্কগুলি ব্যাপকভাবে এই কার্যসূচী হাতে নিতে পারে। এই একটা প্রকল্পে জনকল্যাণ ও কর্ম সংস্থান ছাড়াও প্রয়োজনীয় উপকরণের চাহিদা সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলির প্রসারে সহায়ক হবে।

আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আর একটি অবহেলিত শ্রেণী হলেন খুচরো ব্যবসায়ী, যাঁদের যে কোনোও সূত্র থেকে টাকা যোগাড় ক'রে ব্যবসা চালাতে হয়। এঁরা সরাসরি যদি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নিতে পারেন তাহলে বড় বড় প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে দাদন নেবার তাগিদ কমে যাবে। এর ফলে গ্রামাঞ্চলের ছোট ব্যবসায়ীরা সৎ উপায়ে ব্যবসা চালাতে পারেন।

অতএব ঋণ দেবার নিয়ম কানুনের পরিসর বাড়িয়ে জাতীয় ব্যাঙ্কগুলি তাদের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত করতে পারে।

সাংগঠনিক করণীয়

সাংগঠনিক ক্ষেত্রে এই ব্যাঙ্কগুলির, ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ। যে সব রাজ্যের প্রতি তেমন মনযোগ দেওয়া হয়নি সেগুলি এবং সাধারণভাবে গ্রামাঞ্চলে, ব্যাঙ্কের কর্মক্ষেত্র বিস্তার আবশ্যক। ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসার অগ্রগতিতে ভারসাম্যের অভাবের প্রধান কারণ হ'ল শহরগুলির সম্প্রসারণ। বড় বড় বেসরকারী ব্যাঙ্কের আমানত ও অগ্রিমের শতকরা ৬০ ভাগ শহরাঞ্চলে সীমিত। ভারতের ৫০টী শহরে এই সব ব্যাঙ্কের শতকরা ৩১টি অফিস আছে এবং এগুলির আমানত দেশের মোট ব্যাঙ্ক তহবিলের শতকরা ৬৮ ভাগের মত। এই আগামের শতকরা ৬২ ভাগ শহরাঞ্চলেই নিয়োজিত হয়। দেখা গিয়েছে যে আধাশহর অঞ্চলে ব্যাঙ্কের শাখা খোলা হয় আমানত বাড়াবার জন্যে; আগামের অর্থ কিন্তু শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ। তাই বোম্বাই-এর মত 'মেট্রোপলিটান' শহরে, ব্যাঙ্ক আমানতের পরিমাণ ৭৮৪.৪৪ কোটি টাকা আর আগামের পরিমাণ ৮০১.৭২ কোটি টাকা। কলকাতার ক্ষেত্রে এই হিসেব হ'ল যথাক্রমে ৪৬৭.৪৬ কোটি এবং ৬০১.৯৫ কোটি টাকা।

সম্প্রসারণ

এখন দেশের সর্বত্র ব্যাঙ্কের শাখা খোলা দরকার। একটা নির্দিষ্ট কালের মধ্যে, ধরা যাক পাঁচ বছরের মধ্যে, দেশের সমস্ত তালুকের সদর দপ্তরে ব্যাঙ্কের শাখা খোলা উচিত, বিশেষ করে আসাম, ওড়িশা, বিহার এবং জম্মু কাশ্মীরের মত রাজ্যে, যেখানে ব্যাঙ্কের সুবিধা ভয়ানক কম। পৃথকভাবে প্রত্যেক শাখার আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রশ্ন যখন ওঠে না তখন গণ্ডগ্রামগুলিতেও ব্যাঙ্কের শাখা খোলা উচিত। ভবিষ্যতে আমানত সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে কোনোও ফলপ্রসূ প্রকল্পে অর্থবিনিয়োগ করার অনুকূল অবস্থা গড়ে তোলা উচিত। আগাম দেওয়ার পদ্ধতি সব রাজ্যেই সমান হবে এমন কোনোও কথা নেই।

শুধু আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধিই কোনোও শাখা ব্যাঙ্কের লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সর্ব প্রকারের উন্নয়নী তৎপরতার জন্যে ঋণ দেবার কার্য্যকর সূত্র হিসেবে এগুলির কাজ করা উচিত। যে গ্রাহকদের বদান্যতায় ব্যাঙ্কের সম্পদ বৃদ্ধি পায়, তাঁদের, উন্নয়নের অপরিহার্য

'সম্পদ' বলে আমরা কখনও গণ্য করিনি।

বহু কারণে, মুষ্টিমেয়র হাতে সম্পদ সঞ্চয়ে ব্যাঙ্কগুলিও অজ্ঞাতসারে সহায়ক হয়েছে এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলে নিজেদের কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ রেখে উন্নত ও অনগ্রসর অঞ্চলগুলির মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি করেছে। ফলে দারিদ্র, ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা ও নৈরাশ্যের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে নামতে হয়েছে।

নতুন পরিস্থিতিতে ব্যাঙ্ক মারফৎ লেনদেন সম্বন্ধে উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা আর একটি সাংগঠনিক সমস্যা। বহুকাল আগে গ্রামীণ ঋণ সংক্রান্ত এক সমীক্ষার রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছিল যে, ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি উদ্ভূত ব্যবস্থার পরিবর্তে গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন ও প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে ঋণ দেবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা দরকার। ব্যাঙ্কের সকল শ্রেণীর কর্মচারীর দৃষ্টিভঙ্গী এইদিকে পরিচালিত করতে হবে।

জাতীয় ব্যাঙ্কগুলির পরিচালন দায়িত্ব যাঁদের ওপর ন্যস্ত হবে তাঁদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর পুনর্গঠিত ব্যাঙ্ক ব্যবসার সাফল্য নির্ভর করবে। সরকারী সংস্থার কর্মচারীদের মধ্যে 'সরকারী' কিংবা বলা যায় 'নৈর্ব্যক্তিক' মনোভাব প্রকট এবং তাঁদের মধ্যে জনকল্যাণমূলক মনোবৃত্তির অভাব সম্বন্ধে অভিযোগ শোনা যায়। ব্যাঙ্ক ব্যবসা হচ্ছে এমন একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে আমানতকারীদের সঙ্গে সম্পর্করক্ষা ও ঋণ গ্রহণকারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করা অত্যাবশ্যক। ব্যাঙ্কাররা সাধারণত: আশাবাদী—তাই আমার বিশ্বাস যে ব্যাঙ্ক ব্যবসা উন্নতির পথে দৃঢ়পদক্ষেপে এগিয়ে যাবার শক্তি রাখে।

ব্যাঙ্ক থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণ মঞ্জুরির পরিমাণ

	১৯৫১		১৯৬৭	
	পরিমাণ (লক্ষে)	শতকরা ভাগ	পরিমাণ (লক্ষে)	শতকরা ভাগ
১। শিল্প				
তুলা, পাট, অন্যান্য বস্ত্রাদি লৌহ, ইস্পাত প্রভৃতি	১১৬.১৪	৩৩.৬	১,৭৪,১৯৬	৬৪.১
২। ব্যবসায় বাণিজ্য				
পাইকারি ব্যবসায়, কৃষি সামগ্রী অন্যান্য জিনিস, খুচরা ব্যবসায়	২৩,৬২৩	৪০.৪	৫২.৬৫২	১৯.৪
৩। অর্থনৈতিক				
সরকারী সিকিউরিটি ষ্টক, শেয়ার ইত্যাদি নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, স্বর্ণ, রৌপ্যের ব্যবসায়ী ইত্যাদি, ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান	৭,৩৯৮	১২.৬	৯,৬৬৬	৩.৫
৪। চা বাগান ইত্যাদি		•	৪,৭১২	১.৭
৫। কৃষি				
খাদ্যশস্য	৫৮	০.১	.৯৬	
অন্যান্য কৃষিজাত সামগ্রী	১,০৮৯	১.৯	.২৭	
তুলা, পাট, তামাক তৈল বীজ, অন্যান্য	৯২	০.২	৮৩০	০.৩
৬। ব্যক্তিগত ৭। ব্যবসায়গত ৮। অন্যান্য	৬৫৮১	১১.৩	২৯৫৪৭	১০.৮

ঋণ মঞ্জুরি বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক হওয়া উচিত

যে ১৪টি প্রধান প্রধান ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ব করা হয়েছে সেগুলির প্রত্যেকটিতে জমা টাকাব পবিমাণ ৫০ কোটি টাকারও বেশী। বিলেই অবশ্য এ কথা বলা হয়েছে। বিলে ব্যাঙ্ক-গুলি রাষ্ট্রায়ত্ব কবাব মূল উদ্দেশ্য হিসেবে যা বলা হয়েছে তা হ'ল 'দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনের সঙ্গে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার যোগ রয়েছে এবং ব্যাপকতর সামাজিক উদ্দেশ্য এবং জাতীয় লক্ষ্য ও অগ্রাধিকারগুলি—যেমন কৃষি, ছোট শিল্প ও রপ্তানীর দ্রুত উন্নতি, কর্মসংস্থানের মাত্রা বৃদ্ধি, যাঁরা নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে চান তাঁদের উৎসাহ দান এবং অনুন্নত অঞ্চলগুলির উন্নয়ন ইত্যাদি লক্ষ্যগুলি পূরণে অধিকতর উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে।' সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যগুলিই সফল করে তোলা যাবে ব'লে আশা করা হয়েছিল। তখন উদ্দেশ্য ছিল :—

(১) জাতীয় ঋণ পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যাঙ্কের ঋণ বণ্টন ব্যবস্থা উন্নততর করার জন্য সুনিশ্চিত ব্যবস্থা গ্রহণ ;

সেগুলিকে শাস্তি দেওয়া হবে। এই অবস্থায় ব্যাঙ্কগুলি সম্পূর্ণ-সরকারের নিয়ন্ত্রণে এসে যায় এবং প্রকৃতপক্ষে সরকারের প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে, প্রায় ৯ মাসের মধ্যে ২০টি প্রধান ব্যাঙ্কের কৃষি ঋণ মঞ্জুরির পরিমাণ ৩০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৯৭ কোটি হয়ে যায় এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির ক্ষেত্রে এই মঞ্জুরির পরিমাণ ১৬৭ কোটি টাকা হয় (১৯৬৮ সালের জুন মাস থেকে ১৯৬৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত)।

হঠাৎ গৃহীত সিদ্ধান্ত

সব রকম লক্ষণ থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে ব্যাঙ্কগুলি জনগণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই কাজ করছে এবং সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীগুলিকে সাহায্য করছে। এরা বাধ্য হয়ে এগুলি করছিল না বরং ভারতীয় ব্যাঙ্ক সমিতির মতে, নতুন নতুন সুযোগ সুবিধের সৃষ্টি হওয়ায় ব্যাঙ্কগুলি ইচ্ছে করেই তা করছিল।

রমানাথ এ. পোদ্দার

সভাপতি

ভারতীয় বণিকসভা

(২) এবং ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে পরিচালন ব্যবস্থা গড়ে তুলে ব্যাঙ্কের কাজকর্মের উন্নতি সাধন, পরিচালকবোর্ড পুনর্গঠিত করণ এবং কতিপয় ব্যক্তি ব্যাঙ্কগুলি থেকে যে অযথা সুবিধে পাচ্ছেন তা প্রতিরোধ করাণ।

এমন কি সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরী হওয়ার পূর্বেই ব্যাঙ্কগুলি, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ ম্যানেজারগণের হাতে, ব্যাঙ্কের পরিচালন ভার দিয়ে দেন। এঁদের নিয়োগ সম্পর্কে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদন প্রয়োজনীয় ছিল। কৃষি, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, অর্থনীতিবিদ, আইনজ্ঞ, হিসাব পরীক্ষক এবং অন্যান্যরা যাতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিনিধিত্ব পান, সেই রকমভাবে ব্যাঙ্ক-গুলির পরিচালক বোর্ড পুনর্গঠিত করা হয়। ব্যাঙ্কিং নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনীতেও বলা হয়েছে যে, ডিরেক্টাররা তাঁদের নিজেদের জন্য অথবা তাঁদের কোম্পানীগুলির জন্য, তাঁরা যে ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিত্ব করছেন, সেই ব্যাঙ্ক থেকে কোন ঋণ নিতে পারবেন না। তা ছাড়া ব্যাঙ্কগুলিকে সম্পূর্ণভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় যে, ব্যাঙ্কগুলি যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ না মেনে চলে তা'হলে

এই রকম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণভাবে অকল্পনীয় না হলেও আকস্মিক বলে মনে হয়। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করাটা প্রয়োজনীয় ছিল কিনা তা একটা বিতর্কের বিষয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কাজ যে বেশ ভালই চলছিল এবং যথেষ্ট সময় দেওয়া হলে, সরকারের ওপর বেশী দায়িত্ব না চাপিয়েও, জনস্বার্থ রক্ষার পক্ষে তা একটা শক্তিশালী মাধ্যম হতে পারতো তা'তে কোন সন্দেহ নেই। ব্যাঙ্কগুলি এখন রাষ্ট্রাধীন করা হয়ে গেছে এবং তা মেনে নিতে হবে ব'লে এখন আর সেই বিতর্কের প্রয়োজন নেই। এখন খুব সতর্কতার সঙ্গে যা বিচার করতে হবে তা হ'ল—ব্যাঙ্কগুলির মালিকানা যে সরকারের ওপর বর্তালো তাতে এই হস্তান্তর কি করে আরও ভালোভাবে উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে এবং ব্যাঙ্কগুলি যখন সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ছিল তার চাইতেও ভালোভাবে সমাজের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে।

ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্ব করার ফলে সরকারের ওপর বেশী দায়িত্ব এসে পড়লো। জমাকারীদের আইন সঙ্গত স্বার্থ যাতে রক্ষিত হয়, উৎপাদনমূলক উদ্দেশ্যে যাতে ব্যাঙ্কের ঋণ ব্যবহৃত হয় এবং ব্যাঙ্কগুলি সমাজের যে সেবা করতো তার অবনতি না ঘটে যা'তে আরও উন্নতি হয় সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই এই দায়িত্বগুলি

পালন করতে হবে। এ কথাটা নিশ্চয়ই মনে রাখতে হবে, কেবলমাত্র মালিকানা হাতে নিলেই সামাজিক উদ্দেশ্যগুলি সফল হয় না।

লিখিত নির্দেশ

কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাঙ্কগুলিকে যে সব কর্মনীতির নির্দেশ দেবেন তা লিখিতভাবে দেওয়া উচিত। যে জনস্বার্থের কথা বলা হয়েছে, সেই জনস্বার্থের দিকেই তাঁদের লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখা উচিত। এমন কি যখন ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত ক'রে তার নাম দেওয়া হয় ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া তখন সেই আইনে বিশেষভাবে বলা হয়েছিল যে 'ব্যাবসায়িক নীতির ভিত্তিতে' এবং জনস্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে, পরিচালক বোর্ড তাঁদের কর্মনীতি পরিচালনা করবেন। ব্যাঙ্কের কর্মনীতিতে এই দ্বৈত উদ্দেশ্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কারণ, ব্যবসায়িক নীতি অনুসরণ না করলে, যথেচ্ছভাবে ঋণ মঞ্জুর করার সম্ভাবনা থাকবে, ফলে এমন অনেক ঋণ দেওয়া হবে যেগুলি হয়তো আর পরিশোধ হবে না এবং ব্যাঙ্কের ভীষণ ক্ষতি হবে। একজন কৃষককে যদি শুধু কৃষক বলেই ঋণ মঞ্জুর করা হয় তাহলে তা যে অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ হবে তা বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না। যতক্ষণ না ব্যাঙ্ক বুঝতে পারবে যে কোন কৃষককে ঋণ মঞ্জুর করা হলে তিনি সময় মতো কোন কিস্তি বাদ না দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে পারবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর ঋণ মঞ্জুর করা হবে না। কাজেই দৈনন্দিন কাজে ব্যবসায়িক নীতিই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

সুযোগ্য পরিচালনা

ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে যাঁদের বহুদিনের অভিজ্ঞতা আছে এই রকম যোগ্য ব্যাঙ্কারদের হাতেই পরিচালনার ভার দিতে হবে। আমি মনে করি যে, ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানদের সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন অথবা কোন বিশেষ আদর্শের প্রতি আস্থাবান হওয়ার প্রয়োজন নেই। তাঁরা হলেন ব্যবসায়ে কুশলী এবং কুশলী হিসাবে তাঁদের কাজ হবে সরকারের নির্দেশিত নীতি অনুযায়ী লাভজনক ভিত্তিতে ব্যাঙ্কের কাজ পরিচালনা করা। তাঁরা যদি নিজেরাই রাজনৈতিক নেতা হন তাহ'লে তাঁরা হয়তো ব্যাঙ্কগুলিকে যুক্তিসঙ্গত সীমানার বাইরে বৃহত্তর কোন বিপদের মধ্যে ফেলে দেবেন। কাজেই আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসেবেই পরিচালিত হবে এবং সেগুলি আমানতকারীদের টাকার রক্ষাকারী হিসেবে কাজ করবে।

তাছাড়া রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি, ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির মতো একই ধরণের সেবা করতে পারবে না বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্থান অত্যন্ত উর্দ্ধে। আমানতকারী এবং পরিচালক অথবা পরিচালক ও ঋণ গ্রহীতার মধ্যে সম্পর্ক পারস্পরিক বিশ্বাস ও চেনা শোনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে, সরকারী সংস্থাগুলি সব সময়ে এই উচ্চমান বজায় রাখতে পারে না। যথানিয়মে প্রচলিত পদ্ধতিগুলি, লাল-ফিতের বেড়া জাল, বিলম্ব ও নির্লিপ্ততা সৃষ্টি করবে। এই রকম অবস্থা ঘটতে দেওয়া উচিত হবে না।

এটা সুনিশ্চিত করার একটা সহজ উপায় হল, কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না ক'রে ব্যাঙ্কগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় উৎসাহিত করা। ব্যাঙ্কের লাভ, আমানতের টাকা এবং জমাকারীদের কি হারে সুদ দেওয়া হচ্ছে এগুলিকেই ব্যাঙ্কের সাফল্যের মাপকাঠি করা ন্যায়সঙ্গত হবে। দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনার ব্যাপারে কোন কেন্দ্রীয় নির্দেশ অত্যন্ত মারাত্মক হবে এবং ব্যাঙ্কগুলির এখনও যেটুকু দক্ষতা আছে তাও নষ্ট হতে পারে। এমন কি নতুন কোন শাখা স্থাপনের ব্যাপারেও প্রত্যেকটি ব্যাঙ্কের স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার থাকা উচিত। শাখা বিস্তারের ক্ষেত্রে সমন্বয় নীতি যতটা সম্ভব ব্যাপক হওয়া উচিত।

কার্যকুশলতার সঙ্গে পারিশ্রমিককে সংযুক্তকরণ

কিন্তু একটা মুস্কিল আছে। ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানরা যদি যথারীতি মাইনে নিয়ে কাজ করেন এবং ব্যাঙ্কের কার্য্যকুশলতার সঙ্গে তাঁদের মাইনের কোন সম্পর্ক না থাকে তাহলে ব্যাঙ্কের পরিচালন ব্যবস্থাকে আরও সক্রিয় ও সতর্ক করে তোলার মতো তেমন উৎসাহ বা জোর তাগাদা হয়তো ওপর থেকে আসবে না। কাজেই উচ্চতম পর্য্যায়ে পরিচালকদের পারিশ্রমিকের অন্ততঃপক্ষে একটা অংশ যাতে ব্যাঙ্কের কার্য্যকুশলতার সঙ্গে সম্পর্কিত করা যায় তেমন কোন একটা পরিকল্পনা তৈরী করতে পারলে ভাল হয়। এই রকম একটা উৎসাহ বর্দ্ধক পরিকল্পনা হয়তো প্রতিযোগিতার মনোভাব এবং কার্য্যকুশলতা বাড়াবে। আর জনসেবার ক্ষেত্রে কোন অবনতি রোধ করার এইটেই হ'ল সব চাইতে ভালো উপায়। অন্যান্য সরকারী সংস্থাগুলিতেও অবশ্য এই রকম একটা নীতি সমানভাবেই প্রয়োজনীয়। মোট কথা উৎসাহবর্দ্ধক ব্যবস্থা যত বেশী থাকবে দক্ষতাও তত বাড়বে।

ঋণদানের নীতি

সংসদে এবং বাইরে যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ঋণদান নীতিতে যথেষ্ট পরিবর্তন আনা হবে। কিন্তু উন্নয়নশীল যে কোন দেশেরই উৎপাদনের প্রয়োজনের তুলনায় অর্থ থাকে না, কাজেই কি প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, সেই সম্পর্কে বিবেচনা করতে হয়।

কৃষির জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বীজ, সার এবং কীটনাশক ইত্যাদি কেনার জন্য কৃষির যেমন স্বল্প মেয়াদী ঋণের প্রয়োজন তেমনি ট্র্যাক্টারের মতো কৃষি যন্ত্রপাতি কেনার জন্য মাঝারি ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণেরও প্রয়োজন আছে। কাজেই ব্যাঙ্কগুলির কৃষকদের স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদী ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

তবে কৃষির ঋণের প্রয়োজন মেটাবার জন্য সমবায় ব্যাঙ্ক, জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের মতো অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও যে রয়েছে সেটাও স্বীকার করতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত: সমবায় ব্যাঙ্ক এবং জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি আশানুরূপ সাফল্যের সঙ্গে তাদের কাজ করতে পারেনি। এর ফলে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির ওপর বেশী দায়িত্ব এসে পড়েছে। কাজেই এগুলি যাতে তাদের কাজ সাফল্যের সঙ্গে করতে পারে সেইরকমভাবে এগুলিকে পুনর্গঠিত করা প্রয়োজন। এরা যদি কৃষির প্রয়োজন মেটাতে পারে তা'হলে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির ওপর চাপ অনেকটা হাল্কা হবে।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি ব্যাঙ্ক থেকে ক্রমশ: বেশী পরিমাণ সাহায্য পাচ্ছে। ব্যাঙ্কগুলি যে এদের শুধু কাজ চালাবার জন্য মূলধন যোগায় তাই নয়, মেসিন ও সাজ সরঞ্জাম কেনার জন্য মাঝারী মেয়াদীর মূলধনী ও ঋণ দেয়। কাজেই অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে ঋণের যে সুবিধে দেয়, ব্যাঙ্কগুলি তা কেন পারবে না আমি তার কোন কারণ দেখি না।

বৃহদায়তন শিল্পে

তবে অনেকে ভাবছেন যে, ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি যদি কৃষি ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে ঋণ মঞ্জুর করতে থাকে তাহলে বৃহদায়তন শিল্পে ও বাণিজ্যে ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ হয়তো কমে যাবে। তবে আমি মনে করি যে এই ক্ষেত্রে সে রকম কোন অবস্থা ঘটবে না। কারণ সাম্প্রতিককালে জমার হার অনেক বেড়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের সত্যিকারের প্রয়োজন মেটানো ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে সম্ভব হওয়া উচিত। শিল্পগুলির আর্থিক প্রয়োজন বেশী বলে এগুলির ঋণের প্রয়োজনও বেশী এবং দেশের অগ্রগতিতে এগুলির অবদান গুরুত্বপূর্ণ ব'লে এগুলির অর্থের প্রয়োজনও মেটাতে হবে। তা ছাড়া বাণিজ্যের ক্ষেত্রগুলিরও ঋণের প্রয়োজন রয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্যের জন্যে বছরে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত ঋণের প্রয়োজন হয়।

ব্যাঙ্কগুলিকে সমস্ত ক্ষেত্রের ঋণের প্রয়োজন মেটাতে হয়। ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করার ফলে সরকার এখন অগ্রাধিকারের কাজ এবং পরিকল্পনার প্রয়োজন বিচার ক'রে ঋণদানের নীতির নির্দেশ দিতে পারবেন।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণও অভীষ্টে পৌঁছে দিতো

কে. রঙ্গচারী
সম্পাদক, ষ্টেটস্‌ম্যান, কলিকাতা

শিল্প ও বাণিজ্যের পরিচালন ক্ষমতা রাষ্ট্রায়ত্ত করাই সমাজতন্ত্রবাদ নয়। জাতীয়করণ পরিশেষে চরম ক্ষতিকর নাও হতে পারে, কিন্তু এর সুফল সম্বন্ধে কতকগুলো ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে জাতীয়করণকে সমর্থন করা হয়েছে। সরকারের বা জনসাধারণের সম্পত্তি—যেমন রেলওয়েকে মূল্যবান জাতীয় সম্পত্তি হিসেবে গণ্য না ক'রে, একে বেওয়ারিশ সম্পত্তি মনে করা হয়। তাছাড়া এমন একটা মনোভাবও রয়েছে যে যখন খুশি তখনই যেন এর যে কোন ক্ষতি করা যায়।

১৯৬৫ সালে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রাধীনে এনে যখন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া স্থাপিত হ'ল তখন গ্রামীণ ঋণ সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি নির্ভরযোগ্য যুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয়করণের স্বপক্ষে বেশ একটা জোরালো বক্তব্য খাড়া করেছিল। এ ক্ষেত্রে সরকারের সামনে একটিমাত্র রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে (যা এখনও প্রকাশ করা হয়নি) এবং তাতে কেবল সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সমর্থন করা হয়েছে। সরকার সম্প্রতি ব্যাঙ্কিং কমিশন নিয়োগ করেছেন, তাঁরা সবে কাজ শুরু করেছেন। অতঃপর জাতীয়করণের স্বপক্ষে এখন যেসব যুক্তি দেখানো হচ্ছে সেগুলি বুদ্ধিমান নাগরিকরা যদি 'কৃতকর্মের' জবাবদিহি করার চেষ্টা বলে গণ্য করেন, তাঁদের তেমন দোষ দেওয়া যায় না। এ বিষয়ে বেশ আগে থাকতে জনমত প্রস্তুত না করার দরুণ এই সিদ্ধান্তকে উপযুক্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলা যেতে পারে না। এমন কি পক্ষকাল আগেও জাতীয়করণ হবে কি না, হ'লে কতগুলি ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীনে আনা হবে অথবা ব্যাঙ্কগুলি যাতে সরকারী ক্ষেত্রের প্রয়োজনে অধিকতর পরিমাণ অর্থ যোগাতে পারে, তার জন্যে উপস্থিত সরকারী সিকিউরিটীতে আরও বেশী অর্থ বিনিয়োগ বাধ্যতামূলক করাই যথেষ্ট কি না, এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে।

অপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসার অবস্থা মোটামুটি বেশ ভালই ছিল এবং জাতীয়করণের কোনোও প্রয়োজনই ছিল না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাইসেন্সিং ও ইনসপেশান্ ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং ব্যাঙ্ক একীকরণ বা যৌথকরণের ফলে বিগত কয়েক বছরে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলি আর্থিক স্বচ্ছলতা ও দক্ষতার দিক থেকে বেশ স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। ১৯৫১ সাল থেকে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ২,৫০০ শাখা খোলা হয়েছে এবং আমানতের পরিমাণ ৪ গুণ বেড়েছে। 'ডিপজিট ইনসিওরেন্সের' আওতায় মোট ১,৪০,০০০০০-এর মধ্যে প্রায় ১,৩০,০০০০০ ব্যক্তিগত এ্যাকাউন্ট আনার ফলে জমাকারীদের স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে। এদিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুসৃত আর্থিক নীতির ফলে ব্যাঙ্কের সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পে নিয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। আর এই রকমই হওয়া উচিত কারণ ভারতের মিশ্র অর্থনীতিতে বেসরকারী শিল্প ও ব্যবসার ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং নিজেদের কাজ চালাবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলির পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ প্রয়োজন। বেসরকারী ক্ষেত্রের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ কী ক'রে সংগ্রহ করা হ'বে অথবা কোথা থেকে অর্থ পাওয়া যাবে তাও বেসরকারী উদ্যোগের হাতে, অবশ্য কঠোর সামাজিক নিয়ন্ত্রণাধীনে, ছেড়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। এই নিয়ন্ত্রণ ক্রমশঃই আরও ব্যাপকভাবে চালু করা হচ্ছিল। একটা বেসরকারী উদ্যোগ প্রয়োজনীয় সম্পদের আশায় সরকারী সূত্রের ওপর নির্ভর করবে, এটা একটা বিসদৃশ ব্যাপার। যাঁরা বেসরকারী ক্ষেত্রের অস্তিত্ব বা বিকাশ একেবারেই অস্বীকার করতে চান কেবল তাঁরাই এই ব্যবস্থা সমর্থন করতে পারেন, কিন্তু তা হ'লে বলতে হবে যে ভারতীয় সংবিধানের ওপর তাঁদের কোনোও আস্থা নেই, কারণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে (জনগণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে) ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগী হবার মত প্রচুর আশ্বাস আছে সংবিধানে।

বর্তমানে শিল্প ও আমদানী সংক্রান্ত লাইসেন্স সংগ্রহের ব্যাপারে, বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা মঞ্জুর করাতে, বৈদেশিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করায় এবং অত্যাবশ্যক পণ্যের মূল্য নির্ধারণ প্রভৃতি নানা ব্যাপারে বেসরকারী শিল্পগুলিকে সরকারের ওপর নির্ভর করতেই হয়। এর ওপর কাজ কর্ম্ম চালাতে টাকার দরকারে ঋণ নেবার জন্যও যদি সরকারের মুখাপেক্ষী হতে হয় তাহলে বেসরকারী ক্ষেত্রে উদ্যোগীদের ক্ষীণ উৎসাহটুকুও নষ্ট হবে। শিল্প সংক্রান্ত লাইসেন্স ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে সব খবরাখবর কানে আসে তাতে মনে হয়, বেসরকারী ক্ষেত্রে দোষত্রুটির নিখুঁত সমাধান রাষ্ট্রীয়করণে নেই। এতে শুধু প্রশাসন বিভাগের হাতে বেশী ক্ষমতা চলে যায় এবং রাজনৈতিক নেতা বা সরকারী আমলাদের স্বজনবন্ধু তোষণের ফলে দুর্নীতির পথ প্রশস্ত হয়।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সরকারের হাতে যে ব্যাপক ক্ষমতা এসেছে (যে ক্ষমতার কার্যকারিতা দেখবার মত যথেষ্ট অবকাশ পাওয়া যায়নি) তাতে ব্যাঙ্কের মালিকানা হস্তান্তরিত না ক'রেও অগ্রাধিকারের বিভিন্ন বাঞ্ছনীয় ক্ষেত্রে (ঋণের আকারে) অর্থ বরাদ্দ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর ছিল। কারণ মালিকানা হস্তান্তরিত করে শুধু ক্ষতিপূরণই (প্রায় ৭০ কোটি টাকার সমান) দিতে হচ্ছে না, সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনার দায়ও নিজেদের হাতে নিতে হচ্ছে।

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ও জীবন বীমা

কর্পোরেশনের কাজের রেকর্ড দেখার পর রাষ্ট্রায়ত্ব ১৪টি ব্যাঙ্কের কাজকর্মের দক্ষতা হ্রাস পাবে বলে আশঙ্কা করা অমূলক হবে না। তাছাড়া সম্প্রতি ষ্টেট ব্যাঙ্কে যে রকম ধর্মঘট হয়ে গেল সেই রকম ধর্মঘট হ'লে দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পঙ্গু হয়ে যাবে। কর্মীরা ঠিক যেভাবে জীবন বীমা কর্পোরেশনে কম্পিউটার বসাবার বিরোধীতা করেছিলেন ঠিক তেমনি ক'রে জাতীয়করণ না-ব্যাঙ্কের কাজ কর্মের আধুনিকীকরণের বিরোধীতা করাও তাঁদের পক্ষে সম্ভব। ব্যক্তিগত আগ্রহ এবং অগ্রিম দেবার ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব যদি কমে যায় কিংবা পদস্থ কর্মচারীদের বিচার বিবেচনা যদি নিয়ম কানুনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তাহলে বর্তমান কর্মদক্ষতা খুব বেশী রকম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই দোষত্রুটিগুলোর কিছু কিছু ইতিমধ্যেই ষ্টেট ব্যাঙ্কে দেখা যাচ্ছে কিন্তু তবুও সুসংগঠিত বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয় ব'লে ষ্টেট ব্যাঙ্কের পক্ষে কর্মদক্ষতার একটা নির্দিষ্ট মান বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। এখন সেই দক্ষতা বজায় রাখার কারণটুকুও চলে যাবে।

নির্ভরযোগ্যতা

এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, জনসাধারণের আস্থাভঙ্গ হবে কিন্তু আমানতকারীদের বা ঋণগ্রহণকারীদের ব্যাঙ্কের সঙ্গে লেনদেন করার রীতি-নীতি বদলে যাবে। আমাদের এই দেশে দক্ষতার দিকে না হ'লেও নির্ভরশীলতার দিক থেকে সরকারের সুনাম ও মর্যাদা অনস্বীকার্য। গ্রামাঞ্চলে লোক ডাক ঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কগুলিতে পূর্ণ আস্থা রাখেন, ষ্টেট ব্যাঙ্কেও বহুলোক ব্যক্তিগত এ্যাকাউন্ট রেখেছেন। অতএব জাতীয়করণের ফলে জনগণের আস্থা নষ্ট হবে না, কিন্তু জমাকারী বা ব্যবসায়ীরা তাড়াতাড়ি লেনদেনের ব্যাপারে যদি ক্রমশঃই নানা রকম বাধা ও অসুবিধার সম্মুখীন হন, তা'হলে সাধারণ প্রয়োজনের খাতিরে, তাঁরা নগদ টাকা হয় নিজেদের হাতে রাখবেন আর নয়তো ব্যাঙ্ক এড়াবার জন্যে ব্যক্তিগত ভিত্তিতে টাকা যোগাড় করার পক্ষপাতী হয়ে পড়বেন।

অল্পবিত্ত ব্যবসায়ী বা কৃষকদের কথা ভেবে ১৪টি ব্যাঙ্ক জাতীকরণের কোনোও প্রয়োজন ছিল না। এই দায়িত্ব একলা নিজেদের হাতে নেবার মত সহায়, সম্পদ ও ক্ষমতা ষ্টেট ব্যাঙ্কের আছে। সম্পদের চাহিদা পরিপূরণের জন্যে পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কের হাতে ৮০০ কোটি টাকা আছে। এখন সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্ক বা কানাড়া ব্যাঙ্ক (এখন রাষ্ট্রায়ত্ব) কারুশিল্পী, ক্ষুদ্রশিল্প এবং নাঝারী ও ছোট কৃষকদের সঙ্গে যেভাবে সংযোগ স্থাপন করেছে, ষ্টেট ব্যাঙ্ক বা পোস্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়নি ব'লে তারা এ ক্ষেত্রে তেমন সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেনি। সমবায়মূলক ঋণ ব্যবস্থা দ্বারা এই প্রয়োজন পুরোপুরি মেটানো সম্ভব ছিল কিন্তু বর্তমানে এই ব্যবস্থার সাহায্যে কৃষি ঋণের মোট চাহিদার এক চতুর্থাংশ মাত্র মেটানো যাচ্ছে। সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সুসংগঠিত করার দৃঢ় সংকল্প বারবার ঘোষণা করবার পরও, যে সরকার এই ক্ষেত্রটিকে ভালোভাবে গড়ে তুলতে পারেন নি, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের দ্বারা তা' করা কী ক'রে তাঁদের পক্ষে সম্ভব? বরং ষ্টেট ব্যাঙ্ক যদি ক্ষুদ্র গ্রাহকদের প্রয়োজন পূরণের জন্য বিশেষ ধরণের কয়েকটি শাখা খুলতো তা'হলে হয়তো এতদিনে কিছু কাজ হত। অতএব শিল্পগুলির অত্যাবশ্যক চাহিদা পূরণের মত যথেষ্ট সম্পদ হাতে রাখতে ব্যাঙ্কগুলি সক্ষম হবে এটা অন্ধ বিশ্বাসের কথা, যুক্তিনির্ভর আশার কথা নয়।

যে সব বিদেশী ব্যাঙ্ক এদেশে শাখা রেখেছে সেগুলি প্রধানত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্যে টাকা দিচ্ছে। অতএব এগুলি থেকে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির কোনোও আশঙ্কা নেই। এখন ৫০ কোটি টাকার বা তার কম আমানত আছে যেসব ছোট ব্যাঙ্কের সেগুলি কি কোনোও সমস্যা বা বিঘ্ন সৃষ্টি করবে? বস্তুত পক্ষে ভারতের মত বিরাট একটা দেশে প্রত্যেক জেলায় সুপরিচালিত ও আত্মনির্ভরশীল ব্যাঙ্ক থাকা উচিত, যেগুলি স্থানীয় প্রয়োজন পূরণ করবে এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমানত আকৃষ্ট করতে পারবে এবং ঋণও দিতে পারবে। রাষ্ট্রায়ত্ব ১৪টি ব্যাঙ্ক ষ্টেট ব্যাঙ্কের কাজকর্ম বা বিকাশে যখন ১৪ বছরে কোনোও বিঘ্ন সৃষ্টি করেনি তখন ছোট ব্যাঙ্কগুলি সরকারী উদ্যোগগুলির কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে এ আশঙ্কা অমূলক। বরং এগুলি থাকলে ভারতের আর্থিক সম্পদ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একচেটিয়া মালিকাধীনে যেতে পারবে না।

কিছুকাল পরেও ষ্টেট ব্যাঙ্ক ও ১৪টি ব্যাঙ্ককে যদি জীবন বীমা কর্পোরেশনের মত কোনোও বৃহৎ সংস্থায় পরিণত করা হয় তাহলে এই আশঙ্কা আরও বাড়বে। পুনর্গঠনের যে কোনোও ব্যাপারে কর্মদক্ষতা ও জনসেবার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা থাকা বাঞ্ছনীয়। এই সব ব্যাঙ্ক এক ক'রে স্বশাসিত আঞ্চলিক ব্যাংকিং কর্পোরেশন গঠন করলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। কিন্তু জীবন বীমা কর্পোরেশনকে ভেঙে আঞ্চলিক স্বশাসিত সংস্থা গঠন করার প্রস্তাব সরকার গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি কারণ একটা বিরাট সংস্থা গড়ে সেটা আবার ভাঙলে নানারকম সমস্যা দেখা দিতে পারে! অতএব ব্যাঙ্কগুলি সম্বন্ধে এই ধরণের কোনোও প্রস্তাব কাজে পরিণত করার আগে বেশ করে ভেবে চিন্তে দেখা দরকার।

আমলাতন্ত্র সব দেশেই এক রকম, তাতে কাজের গতি মন্থর, দক্ষতার অভাব এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতার কোনোও স্থান নেই। তাই অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক দেশে, বেসরকারী উদ্যোগের দোষ ত্রুটি নির্মূল করার জন্য জাতীয়করণকেই একমাত্র সমাধান বলে গ্রহণ করা হয় না। তবে বিশেষ অবস্থায়, যেখানে, বেসরকারী উদ্যোগ অভীষ্ঠ সিদ্ধির পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না, সেখানে মন্দের ভালো বলে জাতীয়করণ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

অতএব ব্যবসা বাণিজ্যের পরিচালন ক্ষমতা রাষ্ট্রায়ত্ব করাই সমাজতন্ত্রবাদ নয়। নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব হাতে থাকায় রাষ্ট্র বেসরকারী শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির কাজকর্ম কার্যকরভাবে তদারক করতে পারে, বিশেষ ক'রে সংসদে ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত জনমতের প্রভাব থাকায়। পক্ষান্তরে সত্বাধিকার রাষ্ট্রের হাতে

(১৩ পৃষ্ঠার শেষে দেখুন)

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ ও সাধারণ মানুষ

নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায়

প্রাকৃতজনের কথা ছেড়ে দিলেও বহু তথাকথিত শিক্ষিত মানুষ প্রশ্ন ক'রে থাকেন—ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের ফলে সাধারণ মানুষের কি লাভ?

এর কারণ, অর্থনীতির মূল সমস্যা বোঝবার কষ্ট স্বীকারে অনীহা। সাধারণ মানুষের রুটি-রুজির সঙ্গে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার সম্যক অবকাশ রয়েছে।

সব দেশেই অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাঙ্ক, আমানতকারীদের কাছ থেকে যে অর্থ জমা নেয়, তা বিভিন্ন ব্যবসায় ও শিল্পে লগ্নী করে থাকে। ফলে ব্যবসা ও বাণিজ্য বেড়ে ওঠে, শিল্পের বিকাশ ঘটে, দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ হয় দৃঢ় এবং জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ক্ষোভের বিষয়, আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির এতদিন পরেও ব্যাঙ্কগুলি তাদের এই মূল উদ্দেশ্যগুলি থেকে শুধু বিচ্যুতই হয়নি, অধিকন্তু, ভারতে এক চেটিয়া পুঁজির বৃদ্ধিতে সেবাদাসের ভূমিকা পালন করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি। ফাটকা বাজারী এবং অন্যান্য অ-বাণিজ্যমূলক ব্যাপারে টাকা লগ্নী ক'রে ব্যাঙ্কগুলি দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটি ভয়াবহ অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে। মহলানবীশ কমিশন (মনোপলি কমিশন) তাঁদের রিপোর্টে স্পষ্ট ক'রে ব'লে দিয়েছেন, যে, কিভাবে ভারতের তাবৎ পুঁজির বৃহদাংশ, মাত্র ৭৫টি ধনিক পরিবারের কুক্ষিগত হয়েছে। ব্যাঙ্কের টাকা ফাটকায় বিনিয়োগের ফলস্বরূপ দেশব্যাপী খাদ্যশস্যের ফলাও চোরা কারবার ও মজুতদারীর সৃষ্টি করেছে।

ব্যাঙ্কগুলির দায়িত্বজ্ঞানহীন এই সব কার্যকলাপ এবং পরিকল্পনার জন্য অর্থাভাব সরকারকে রাষ্ট্রীয়করণে বাধ্য করেছে। আমরা দেখেছি পরিকল্পনার মন্থর গতির জন্য কিভাবে একের পর এক উন্নয়নমূলক কর্মতৎপরতা বন্ধ হয়ে গেল। দেশব্যাপী দেখা দিল মন্দা ও ভয়াবহ বেকার সমস্যা। কিন্তু আমরা জানি এ রকম হওয়া অনুচিত ছিল। কেন না ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা।

সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে সরকার একটি প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন তবে এ ব্যাপারে কয়েকটা কথা মনে রাখা দরকার। একচেটিয়া পুঁজির দোসর হিসাবে ব্যাঙ্কই একমাত্র দোষী নয়। বৈদেশিক বাণিজ্য, খাদ্যশস্যের ব্যবসা, চা ও পাট শিল্পগুলির জাতীয়করণ না হলে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের মূল উদ্দেশ্যগুলি, যথা—দেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, বেকারী দূর, কৃষির সমৃদ্ধি, খাদ্যে স্বয়ম্ভরতালাভ ইত্যাদিতে সফল হওয়ার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত হয়ে থাকবে। ব্যাঙ্কের টাকা লগ্নী করার নীতিও খোলনলচে সমেত পালটানো প্রয়োজন। নতুন বিনিয়োগ নীতির ফলে কৃষকরা যাতে মহাজনের হাত থেকে মুক্ত হতে পারেন এবং ছোট মাঝারি ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রসারে ব্যাঙ্কের অর্থ পেতে পারেন, তার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা দরকার।

যদি রাষ্ট্রীকৃত ব্যাঙ্কগুলির অর্থ এইভাবে সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করা যায় তবে নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায় যে দেশের বঞ্চিত সাধারণ মানুষ যাঁরা স্বাধীনতার কোন স্বাদই এতদিন পাননি, তাঁরা মুক্তির স্বাদ অনুভব করবেন। ক্ষুধা, বেকারী, দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও অপুষ্টি থেকে মুক্তি পেয়ে ভারতের সাধারণ মানুষ ৪/৫ বছরের মধ্যে স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে নিজেদের যোগ্য করে তুলতে পারবেন, প্রতিটি মানুষের মনে আজ এই প্রত্যয় জন্মেছে।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ
জওহরলাল নেহরু

আজকের বিশ্বে ব্যাঙ্কব্যবসায়ী এবং লগ্নীকারকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পপতিদের যুগ গিয়েছে, এ যুগ হচ্ছে বড় বড় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের, যাঁরা শিল্প, কৃষি, রেল ব্যবস্থা, পরিবহন ব্যবস্থা সব নিয়ন্ত্রণ করেন। বস্তুতঃপক্ষে এঁরা সর্বক্ষেত্র, এমন কি, সরকারকেও প্রভাবিত করেন।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ নয় কেন ?

(১২ পৃষ্ঠার পর)

ন্যস্ত করলে রাষ্ট্রকে নিজের অপটুতার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হয়। পরিকল্পনার ত্রুটি ও পরিচালনার বিচ্যুতির মূল্য দেবার জন্য করদাতাদের ঘাড়ে করের চাপ বাড়ে। সরকারী ক্ষেত্রে—ইস্পাৎ, ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং ও ওষুধ সংক্রান্ত শিল্প ক্রমাগত ক্ষতি দিয়েও চলতে পারে কারণ তাদের সুবিধা আছে, যে, সরকার জনসাধারণকে কর দিতে বাধ্য করতে পারেন।

শ্রমিক ও কর্মীরা সরকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ করার জন্যে এ পর্য্যন্ত তেমন উৎসাহ প্রকাশ করেন নি। রেল ব্যবস্থা বা সরকারী পরিবহন ব্যবস্থার সম্পত্তি প্রত্যেক নাগরিকের কাছে মূল্যবান জাতীয় সম্পত্তির সমান—এ কথাটা না ভেবে এগুলিকে বে-ওয়ারিশ গণ্য করে এগুলি নষ্ট করার প্রবণতা দেখা যায়। জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত পুরোপুরি রাজনৈতিক নয় ব'লে এই ব্যবস্থা চরম ক্ষতিকর বলে প্রতিপন্ন নাও হ'তে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর সুফল সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণার দোহাই দিয়ে জাতীয় করণের পক্ষ সমর্থন করা হয়েছে।

টাকা আর শোষণের মাধ্যম হয়ে থাকবে না

ইউ এন ঘোষ

এস. এন. দাসগুপ্ত কলেজ, নূতন দিল্লী

মুদ্রা ব্যবস্থার বিবর্তনের সেই গোড়া থেকেই টাকা ছিল ক্ষমতার প্রতীক এবং প্রকৃতিগত-ভাবে শোষণের হাতিয়ার... ...কাগজের টাকা হ'ল সোনার জলছবি এবং ঋণ হ'ল এমন একটা মায়া যার দরুণ মুদ্রার শোষণ ক্ষমতা জোরদার হয়ে ওঠে।.....জাতীয়করণের ফলে শেষ পর্যন্ত, কার্যপরিচালন পদ্ধতি এবং মুদ্রার প্রকৃত মূল্যের মান স্থির হয়ে যাবে, যার ফলে একটা কাল্পনিক মূল্য আরোপ ক'রে টাকার জন্যে কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না।

বড় বড় ১৪টি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে একদল যেমন আনন্দে উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন তেমনি আর এক দল ক্রুদ্ধ হয়ে হয়েছেন। উত্তেজনার কারণ তেমন স্পষ্ট নয় বটে তবে রাগের কারণ বোঝা যায় কারণ ক্রুদ্ধ ব্যক্তিরা এর মধ্যে রাজনৈতিক গন্ধ পেয়েছেন। অথচ ব্যাপারটার মোদ্দা কথা হ'ল কয়েকজন ব্যক্তি বা কোনোও গোষ্ঠীর একত্রিত বা সঞ্চিত তহবিল নিয়ন্ত্রণ ও সদ্ব্যবহারের ক্ষমতা সরকারের হাতে অর্পণ করা। এর মধ্যে নতুন কিছুই নেই। সরকার সরাসরি জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা নিয়ে থাকেন ও তা ব্যয় করেন, যদিও তা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে করা হয় না।

সরকার বিবিধ সামাজিক দায়িত্ব ক্রমে ক্রমে নিজেদের হাতে নিয়ে নেবেন এইটেই আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শেষ লক্ষ্য বলে মনে হয়। একক ব্যক্তি বিশেষ বা গোষ্ঠী বিশেষের ক্ষমতা ও সামর্থ্য সীমাবদ্ধ। কারণ যেভাবে সমষ্টিগত সামাজিক জীবনের দায় ও দায়িত্ব পালন করা দরকার তা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং সমষ্টির কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব নেবার মত যোগ্য কোনোও সামাজিক সংগঠন না থাকলে সে দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করতে হয়। বিংশ শতাব্দীতে উন্নতিকামী বা উন্নত প্রায় সব দেশেই কম বেশী এই দিক দিয়ে চিন্তা করা হয়েছে, অন্ততঃপক্ষে একাধিক দেশে সমাজতন্ত্রী কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এই রকমই আভাস দেয়।

প্রাচীনকালে মানুষ 'সামগ্রী'কেই মুদ্রা গণ্য করে কাজ চালাত অর্থাৎ জড় (যেমন খাদ্যশস্য প্রভৃতি) বা জীব (গৃহপালিত পশু প্রভৃতি) ছিল আদান প্রদানের 'মুদ্রা'স্বরূপ। তার পরের অধ্যায়ে দেশ বিদেশে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হওয়ায় ব্যবসায়ীরা পণ্য আদান প্রদানের মাধ্যম হিসেবে ধাতুর মুদ্রা প্রবর্তন করল। সঙ্গে সঙ্গে রাজা মহারাজাদের হাতে আর্থিক ক্ষমতা চলে গেল। এঁরা ও বড় বড় ব্যবসায়ীরা মিলে টাকা বা সমার্থক মুদ্রার সার্বজনীন বা 'সামাজিক' রূপটা নষ্ট ক'রে দিলেন। অতএব গোড়া থেকেই দেখা যায় যে, প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যেই অর্থ ক্ষমতা সৃষ্টিকারী ও শোষণের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাগজের মুদ্রার চল হওয়ায় এই বৈশিষ্ট্য আদৌ হ্রাস পায়নি।

ব্যাঙ্ক ব্যবসা একটা বিচিত্র ব্যবসা, (যদিও এটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত)। এই ব্যবসায়ে ব্যাঙ্ক অনেকের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ ক'রে কয়েকজনকে ধার দিতে পারে। কিন্তু অন্যের টাকায় কারবার করার যে একটা সামাজিক দায়িত্ব আছে এবং ব্যাঙ্কের ঋণ বা দাদন দেওয়ার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা দরকার এ কথাটা ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের বোঝাতে সরকারের দীর্ঘকাল লেগেছে। বেসরকারী ব্যবসায়িক ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের সীমিত সামর্থ্য ও ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হলেও সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করার জন্যে তথাকথিত কেন্দ্রীয় অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপন করতে হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (দায়িত্ব পালনে) কতটা সফল হয়েছে সে অন্য প্রশ্ন, কিন্তু মনে রাখবার কথা হচ্ছে এই যে, বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলির বহু অসুবিধা আছে এবং এই বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলির কাজকর্ম সতর্কতার সঙ্গে চালানো দরকার। এখন লগ্নিকারী ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক প্রভৃতি অন্যান্য ধরনের ব্যাঙ্কও হয়েছে কিন্তু, ব্যাঙ্ক ব্যবসার নীতি নিয়ম সব জায়গাতেই এক রকম আর তা হ'ল সাদা কথায় গচ্ছিত অর্থের নিরাপত্তা ও মুনাফার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান।

জাতীয়করণ এক অর্থে হ'ল সাধারণের হাতে 'প্রত্যর্পণের আশ্বাস'। অর্থাৎ অন্য কথায় বলতে গেলে 'টাকা' (তা সে নগদই হোক কিংবা ঋণের আকারেই হ'ক) হ'ল এমন এক ক্ষমতা যে ক্ষমতা, সমাজের সকলকার, অথচ যে ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কিছু-লোক দীর্ঘকাল কুক্ষিগত করে রেখেছে। তাই অনেককে যাতে শোষণ করা না যায় তাবজন্য এই অর্থ অল্প কয়েকজনের কবল থেকে ছাড়িয়ে সাধারণের হাতের নাগালে আনতে হবে।

পরিশেষে রাষ্ট্রীয়করণের ফলে কার্য পরিচালন ব্যবস্থা ও মুদ্রার প্রকৃত মূল্যের একটা সুনির্দিষ্ট মান স্থির হয়ে যাবে, যাতে একটা কাল্পনিক মূল্য আরোপ ক'রে টাকার কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না। কিন্তু তা যতদিন না হয় ততদিন নিরাপত্তা বা মুনাফার পরিবর্তে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুফল পেতে হলে এবং উৎপাদনের সাফল্যের জন্য অগ্রিম ঋণের আকারে অর্থ লগ্নির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা হবে কৃত্রিম

এম. আর. হাজারে
অর্থনীতি বিভাগের প্রধান, সিদ্ধার্থ কলেজ অফ আর্ট এ্যাণ্ড সায়েন্স, বোম্বাই

গোড়াতেই স্পষ্ট ক'রে বলে রাখা ভালো যে, কোনোও শিল্পের জাতীয়করণ নিছক ভালো বা মন্দ হতে পারে না। জাতীয়করণ উদ্দেশ্য সাধনের একটা পন্থা মাত্র। অবশ্য, শুধু জাতীয়করণের দ্বারা সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

স্মরণে রাখা দরকার যে, সমাজতন্ত্রী সকল দেশই ব্যাঙ্ক ব্যবসায় (যেটি প্রধান ব্যবসাগুলির অন্যতম ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ) রাষ্ট্রায়ত্ব করেনি। অবশ্য সরকারী ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রণের পরিসরও সম্প্রসারিত হয়েছে। এমন কি ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশও জাতীয়করণ ব্যতিরেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি করতে পারতো। কারণ কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র একদিকে জাতীয়করণের বিকল্প হিসেবে কার্যকর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও কার্যকর আর্থিক ও অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করতে পারেন। আবার অন্যদিকে জাতীয়করণ কার্যকর করছে কে, কী পন্থায়, কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে তা রূপায়িত করা হচ্ছে কাদের কথা ভেবে, বিশেষ করে, কাদের কল্যাণে এই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এগুলির সদুত্তরের ওপর জাতীয়করণের ফলশ্রুতি নির্ভর করছে। যে দরিদ্র জনগণের কথা ভেবে এই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তাঁদের শেষ পর্যন্ত উপকৃত হবার সম্ভাবনা আছে কি ?

এ কথা সত্য যে, গণতান্ত্রিক জীবনধারার সঙ্গে জাতীয়করণের অমিল নেই। উপযুক্ত বাতাবরণে নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যাঙ্ক ব্যবসার জাতীয়করণ যদি কাজে পরিণত করা হয় তাহলে হয়তো তা অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছে দেবে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কাজ হচ্ছিল বলে শোনা গিয়েছিল। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ সম্বন্ধে তাড়াহুড়ো ক'রে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তার তুলনায় সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ঢের বাঞ্ছনীয় ছিল। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা যাচাই করার অবকাশ দেওয়া হ'ল না এটা ক্ষোভের বিষয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত হ'ল যেন নবজাত মৃত শিশুর মত। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অতি অল্পকালের মধ্যেই ব্যর্থ হয়েছে ব'লে যদি যুক্তি দেখানো হয় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে জাতীয়করণ যে সার্থক হবেই তার প্রতিশ্রুতি আছে কি ?

ভারতীয়রা মনে মনে জাতীয়করণকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সমান বলে গণ্য করেন না বটে, কিন্তু জাতীয়করণ বলতে তাঁরা আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের প্রাধান্য বোঝেন এবং মনে করেন ঐ মনোভাবের ফলে কর্মদক্ষতার মান ক্ষুণ্ণ হয়। ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা জাতীয়করণের প্রস্তাবটিকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং বেতনের হার বাড়াবার ও দুর্মূল্য ভাতার হার স্থির করে দেবার জন্যে দাবী জানিয়েছেন। জাতীয়করণের ফলে তাঁদের চাকরীর নিরাপত্তা আরও সুদৃঢ় হ'ল।

অপেক্ষাকৃত স্বল্পবিত্তদের প্রতি আগে যে ব্যবহার করা হ'ত এখন তার পরিবর্তন ঘটবে এবং তাঁদের প্রতি তেমন মনোযোগ দেওয়া হবে না। পক্ষান্তরে তাঁদের জন্যে ব্যাঙ্ককে যে কাজ করতে হবে তার জন্য খরচের মাত্রা বাড়বে এবং আজ না হলেও কাল তাঁদের কাছ থেকে খরচ বাবদে সেই টাকা পুরোপুরি আদায় করা হবে, যেমন ডাকঘরে করা হয়। বস্তুতঃপক্ষে অধ্যাপক গলব্রেথের ভাষায় বলতে গেলে 'ডাকঘর মার্কা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের' নিদর্শন এ দেশেও দেখতে পাওয়া যাবে।

অধিকন্তু নিয়মিত আমানতকারী বা ঋণগ্রহীতা হিসেবে সাধারণ লোকেরা ভবিষ্যতে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের প্রতি আকৃষ্ট হবে কি ? এই সাধারণ মানুষটিকে আকৃষ্ট করতে হলে সুদের হার বাড়াতে হবে এমন কি হয়তো প্রচলিত হারের দ্বিগুণ দিতে হবে। ফলে ব্যাঙ্ক ব্যবসা চালাবার খরচ বেড়ে যাবে।

ব্যাঙ্কের সঙ্গে লেনদেনের অভ্যাসটা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে এবং অতি সতর্কতার সঙ্গে এই অভ্যাসটি গড়ে তুলতে হয়। অতএব আবারও প্রশ্ন ওঠে যে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক, গ্রাহকদের মনে যথেষ্ট আস্থা সঞ্চার করতে পারবে তো ? পারবে বলতে, চাইলেই টাকা ফেরৎ পাবেন কিংবা দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা রূপায়নে তাঁদের টাকা আটকে থাকবে না অথবা চরম কোনো পরিস্থিতিতেও তাঁদের টাকা আটক করা হবে না অথবা অর্থের পরিমাণ সম্বন্ধে গোপনতা বজায় রাখা হবে ?

ঋণ গ্রহীতার ঋণ পরিশোধের বর্তমান ক্ষমতা ভবিষ্যতে কতটা দাঁড়াবে তা যদি ধারণা করা যায় তাহলে আমাদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু সেই সাধারণ মানুষটি কি সত্যিই উপকৃত হবেন ? এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা যায় না। এর কারণ খুব সরল। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী ব'লেই ব্যাঙ্কের স্বার্থ মনে রেখে লেনদেনের ব্যাপারে মাথা গলাবেন এবং তাঁরা আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষা, আমানতের নিরাপত্তা এবং সহজে আর্থিক লেনদেনের সুবিধার দিকগুলি অগ্রাহ্য করতে পারবেন না। সরকার জেনে শুনে বিশেষ কোনোও নীতি অনুসরণ করার নির্দেশ না দিলে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা তো মরীচিকার পেছনে দৌড়তে পারেন না।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে ব্যবসায়িক ব্যাঙ্কগুলি দেশের সাধারণ মানুষের সমৃদ্ধি সাধনে আগ্রহ দেখাতে বাধ্য হ'ত, কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতির ফলশ্রুতি সম্বন্ধে সচেতন হ'ত এবং নিজেদের স্বার্থে তারা নিজেদের কর্মক্ষেত্র বিস্তার করত। নব গঠিত জাতীয় ঋণ পরিষদের নির্দেশানুযায়ী এবং ব্যাঙ্কিং কমিশনের সুপারিশ (যার প্রতীক্ষা এখনও করা হচ্ছে) অনুসারে ব্যাঙ্কগুলি এই কাজগুলি করতে পারতো এবং তার

(২৩ পৃষ্ঠা

ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির নৈরাশ্যজনক বিফলতা

আর. এল. সভরওয়াল
অর্থনীতির পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগ
গভর্ণমেন্ট কলেজ, হোসিয়ারপুর

দেশের এক সপ্তমাংশ ব্যাঙ্ক ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ায়, এই ব্যবস্থা, জনগণের মধ্যে আস্থার সৃষ্টি করবে এবং ব্যাঙ্কগুলিতে সঞ্চয় ও লগ্নির পরিমাণ বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

দেশের আর্থিক ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য সরকার ১৯৫১ সাল থেকে সব রকম ভাবে চেষ্টা করছেন কিন্তু আর্থিক ব্যবস্থার মৌলিক ও সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ায় বেলায় ব্যাঙ্কগুলি প্রায় নিস্পৃহ একটা মনোভাব অবলম্বন করে ছিল। সামাজিক উন্নয়নের দিক থেকে বাঞ্ছনীয় ক্ষেত্রগুলিতে, যেমন কৃষিতে, ব্যাঙ্কগুলির ঋণ মঞ্জুরির পরিমাণ এই সময়ে আনুপাতিক হারের দিক থেকে বরং কমে এসেছে। তপশীলভুক্ত ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির ঋণ মঞ্জুরির পরিমাণ ১৯৫১ সালের ৫৭৯.৭ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত যদিও ২৩৪৬.২ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছিল, কৃষির ক্ষেত্রে কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ঋণ মঞ্জুরির পরিমাণ শতকরা ২.২ টাকা থেকে ক'মে শতকরা ০.২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

অপরপক্ষে এ' সময়ের মধ্যে শিল্পের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ শতকরা ৩৩.৫ টাকা থেকে বেড়ে ৬৪.৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে। তিনটি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সময়ে, ব্যাঙ্কগুলি থেকে মোট যে ঋণ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে শিল্পগুলিকে ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে শতকরা হার অনুযায়ী ৪৪ ভাগ (প্রথম পরিকল্পনা), ৭৬ ভাগ (দ্বিতীয় পরিকল্পনা) এবং ৭৯.২ ভাগ (তৃতীয় পরিকল্পনা)। নীচের তালিকাটি দ্রষ্টব্য :

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির ক্ষেত্রে অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়। এই ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের ঋণ মঞ্জুরির পরিমাণ অবশ্য কিছুটা বেড়েছে, কিন্তু বড় শিল্পগুলিকে মোট যে অগ্রিম দেওয়া হয়েছে সেই তুলনায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির ক্ষেত্রে শতকরা বৃদ্ধি প্রায় কিছুই নয়। তা ছাড়া ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে যে ঋণ দেওয়া হয়েছে তার একটা বড় অংশ রাষ্ট্রাধীন ষ্টেট ব্যাঙ্ক এবং এর সাতটি সহযোগী ব্যাঙ্ক সরবরাহ করেছে। কাজেই কয়েকটি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল থেকে যে দাবি করা হচ্ছে সেই অনুযায়ী, অবশিষ্ট তালিকাভুক্ত ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির মোট অবদান তেমন উৎসাহজনক নয়। পাশের তালিকাটি দেখলেই তা বোঝা যাবে।

তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্র অনুযায়ী ঋণ মঞ্জুরির পরিমাণ (কোটি টাকায়) ৩১শে মার্চ বছর শেষ অনুসারে

	শিল্প		কৃষি	
১৯৬৫	১২৪৬.২০	(৫৯.৫ %)	৫৬ ২৬	(২.৮%)
১৯৬৬	১৪৭০.৯৭	(৬২.৭ %)	৫৬.৫৪	(২.৪ %)
১৯৬৭	১৭৪৭.২৫	(৬৪.৩ %)	৫৬.৬৪	(২.১%)

কৃষির প্রতি উপেক্ষা এবং শিল্পের প্রতি গুরুত্ব সহজেই বোঝা যায়। বছরের পর বছর তপশীলভুক্ত ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি বিপুল পরিমাণ ঋণ অনাদায়ী রেখেও মঞ্জুরী বাড়িয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় তালিকা দ্রষ্টব্য।

প্রথম তালিকাটির সঙ্গে তুলনা করলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিতে ব্যাঙ্কের অগ্রিম দাদন যে কত তুচ্ছ তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। কাজেই ১৯৬৫, ১৯৬৬ এবং ১৯৬৭ সালের মার্চ্চ মাসে যেখানে শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলির মোট অগ্রিমের শতকরা হার ছিল যথাক্রমে ৫৯.৫, ৬২.৭ এবং ৬৪.৩ সেখানে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি পেয়েছে যৎসামান্য ৩.৫, ৩.৯ এবং ৬.৬ ভাগ। (পর পৃষ্ঠার তালিকাটির দ্রষ্টব্য)

বছর	ব্যাঙ্কের ঋণ মঞ্জুরির পরিমাণ (কোটি টাকায়)	শতকরা বৃদ্ধি
১৯৬১	১৪৭.০	১৩.০
১৯৬২	১৪৪.৮	১১.৩
১৯৬৩	১৫৯.১	১১.২
১৯৬৪	২৩০.১	১৪.৬
১৯৬৫	২৯৪ ৬	১৬.৩
১৯৬৬	৩২৮.৬	১৫.৬
১৯৬৭	২৯৩.১	১২.২

ব্যাঙ্কের সাহায্য

বৃহদায়তন শিল্পগুলি ব্যাঙ্কের কাছ থেকে যে সাহায্য পেয়েছে সেই তুলনায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি পেয়েছে মাত্র ৫.৯, ৬.২ এবং ১০.২ ভাগ। এই বৈষম্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে ১৯৬৭ সালকেই ধরা যাক। এ'বছরে ব্যাঙ্কগুলি থেকে মোট ঋণ দেওয়া হয়েছে ২৭১৭.২৫ কোটি টাকা শিল্পগুলিকে দেওয়া হয়েছে ১৪৭.২৫ টাকা আর এই টাকা থেকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে দেওয়া হয়েছে মাত্র ১৭৮.৫৬ কোটি টাকা। যে কোন দিক থেকে বিচার করলেও একে যুক্তিসঙ্গত বলা যায় না। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকেই ভারতের শিল্পোদ্যোগের মূল বলা যায়, কারণ এগুলিই মূলধন পুষ্ট এবং শ্রমিকপুষ্ট শিল্পগুলির মধ্যে সমতা রক্ষা করে এবং দেশের মোট শিল্পোৎপাদনের শতকরা ৪০ ভাগ এগুলিতেই হয়। কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হয় তপশীলভুক্ত ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি এদের আর্থিক সাহায্য করতে মোটেই ইচ্ছুক ছিল না।

কৃষি বা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উন্নয়নের জন্য আর্থিক সাহায্য করা সম্পর্কে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির যে সামাজিক দায়িত্ব ছিল তা যে এরা পালন করেনি তা পরিষ্কার ভাবেই বোঝা যায়। জনসাধারণ এই সব সংস্থায় যে টাকা জমা রেখেছেন সেই সঞ্চিত অর্থে বরং শক্তি ও সম্পদ

সংহত করা হয়েছে এবং দেশে এক চেটিয়া অধিকার বাড়ানোর কাজে লাগানো হয়েছে। ব্যাঙ্কগুলি যদি রাষ্ট্রায়ত্ত করা না হ'ত তাহলে এই মনোভাব দেশের আর্থিক অবস্থাকে আরও খারাপ করে তুলতো।

ব্যাঙ্কের পোষকতা প্রাপ্ত শ্রেণী

ব্যাঙ্কে জমা টাকার সাম্প্রতিক কাঠামো বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, মোট জমা টাকার মধ্যে নির্দিষ্টকালীন জমার পরিমাণ এক চতুর্থাংশ থেকে বেড়ে অর্দ্ধাংশে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া মোট জমায় সঞ্চয়ের পরিমাণও এক ষষ্ঠাংশ থেকে বেড়ে এক চতুর্থাংশ হয়েছে। ব্যাঙ্কগুলির জমায় চলতি হিসেবের সংখ্যা ক্রমশঃ কমতে থাকলে এবং নির্দিষ্টকালীন জমার পরিমাণ বাড়তে থাকলে ব্যাঙ্কগুলির হাতে বেশী টাকা আসে এবং বহুমুখীন ঋণ সৃষ্টির মাধ্যমে, এই সব আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বড় বড় শিল্পপতিগণের ক্ষমতা আরও বাড়ায়। ব্যাঙ্কের পোষকতাপ্রাপ্ত এই শ্রেণীই জনসাধারণের জমা টাকার বেশীর ভাগ অংশ নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে আসছেন। এই শ্রেণী, মূলধনের শেয়ারের টাকার ওপর বেশী নির্ভর করেন না, মূলধনের শেয়ারের টাকা, ব্যাঙ্কের কাছে জমা দেওয়া মোট টাকার শতকরা ২ ভা।.বে কিনা সন্দেহ।

সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ

বিভিন্ন অনুসন্ধানকারী কমিশন বার বার সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে আমাদের আর্থিক ব্যবস্থায় কোথাও একটা গলদ আছে। এক চেটিয়া অধিকার সম্পর্কে অনুসন্ধানকারী কমিশন (ডিসেম্বর ১৯৬৫) বলেছিলেন যে মালিকানা নিয়ন্ত্রণের তুলনায় পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশী কেন্দ্রীভূত এবং ব্যাঙ্কগুলির অবাধ ঋণ ব্যবস্থা এই কেন্দ্রীকরণের ধারাকে শক্তিশালী করছে। জনসাধারণ সহজেই অনেক কথা ভুলে যান। কিন্তু একটু মনে করার চেষ্টা করলেই, কিছুদিন পূর্বে ভিভিয়ান বস্ত কমিশন যে সব তথ্য উদ্ঘাটিত করেছিলেন তাতে 'মুদ্রার অন্যায় ব্যবসায়, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় প্রথা লঙ্ঘন এবং আরও নানা রকম প্রতারণামূলক কাজকর্ম থেকে ব্যাঙ্কগুলির সমাজ বিরোধী কাজগুলি আমরা জানতে পারি। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি এই সব সমাজ বিরোধী কাজকর্মের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবে তাছাড়া জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থের উপযুক্ত রক্ষক হতে পারবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে ও সংহত করে, সমাজ কল্যাণমূলক কাজের গতি বাড়াতে হবে, ব্যাঙ্কে জমা টাকা দিয়ে যা এ পর্যন্ত প্রায় হয় নি। ব্যাঙ্কে জমা টাকার পরিমাণ বছরে যদিও প্রায় ৭০০ কোটি টাকা করে বাড়ছে, তবুও আমাদের দেশের সমগ্র ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাতে মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ১৫ ভাগের বেশী সঞ্চিত হয় না। সেই তুলনায় সুইজারল্যাণ্ডে শতকরা ২৯, জাপানে ৭০ থাইল্যাণ্ডে ২২ এবং মিশরে ১৯ ভাগ সঞ্চিত হয়। কাজেই সঞ্চয় সংহত করার ক্ষেত্রেও কোন বড় একটা অব্যবস্থা আছে। ১৯৫১ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ে ব্যাঙ্কগুলিতে বাৎসরিক জমার হার বেড়েছে গড়পড়তা শতকরা মাত্র ১০.০১ ভাগ। যে ১৪টি ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে সেগুলিতেই ভারতীয় তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির মোট জমার শতকরা ৭২ ভাগ রয়েছে (প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা) কাজেই জনসাধারণের কাছ থেকে সঞ্চয় সংহত করার পুরো দায়িত্ব এগুলির উপরেই ছিল। বর্তমানে যখন এগুলি সরকারী নিয়ন্ত্রণে এসে গেলো তখন ষ্টেট ব্যাঙ্ক এবং এর সহযোগী সাতটি ব্যাঙ্কসহ দেশের সমস্ত তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের জমা টাকার শতকরা ৮৪ ভাগ সরকারের হাতে এসে গেল। সমগ্র ব্যাঙ্কব্যবসার এক সপ্তাংশ বেসরকারী কর্তৃত্বাধীনে রেখে সরকার সাত ভাগের ছয় ভাগ রাষ্ট্রাধীন করে নিলেন। এই ব্যবস্থা জনসাধারণের আস্থা বাড়াতে সাহায্য করলো। এখন আরও সঞ্চয় সংহত করা সম্ভব হবে এবং অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সেগুলি বিনিয়োগ করতে এবং উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করবে।

ভুল পথ

আমাদের সম্পদের যে খুব অভাব তা নয়, তবে যে সম্পদ আছে তার উপযুক্ত ব্যবহার হচ্ছে না এবং তা ভুল দিকে ব্যবহৃত হচ্ছিল। এর ফলে সাধারণ মানুষের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, এখন তা শোধরানো সম্ভবপর হবে এবং সাধারণের স্বার্থ রক্ষিত হবে। দেশের অর্থনীতি যে জটিল চক্রে জড়িয়েছিল এই নতুন ব্যবস্থা অর্থনীতিকে তা থেকে মুক্তি দেবে এবং বাঞ্ছনীয় লক্ষ্যগুলি পূরণ করার সম্ভাবনা বাড়লো বলে, সাধারণ মানুষ, ব্যাঙ্ক কর্মচারী, চাকুরীজীবি, কৃষক এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের

(২৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ব্যাঙ্কগুলি মোট যে ঋণ মঞ্জুর করেছে এবং শিল্পগুলিকে মোট যে অগ্রিম দেওয়া হয়েছে তার শতকরা হার অনুযায়ী ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে যে অগ্রিম দেওয়া হয়েছে

নিম্নলিখিত তারিখগুলির শেষে যা ছিল		সমস্ত শিল্পগুলির তুলনায় শতকরা হার	ব্যাঙ্কের মোট ঋণ মঞ্জুরির তুলনায় শতকরা হার
ডিসেম্বর	১৯৬০	৫.১	২.৫
,,	১৯৬১	৫.০	২.৫
,,	১৯৬২	৪.৪	২.৪
,,	১৯৬৩	৪.৪	২.৬
মার্চ্চ	১৯৬৫	৫.৯	৩.৫
মার্চ্চ	১৯৬৬	৬.২	৩.৯
মার্চ্চ	১৯৬৭	১০.২	৬.৬

ঋণের কর্মসূচী ব্যাঙ্ক ও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয় রেখে করা উচিত

পি. জি. কে. পানিকার
কেরালা রাজ্য পরিকল্পনা বোর্ড, ত্রিবান্দ্রম

ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের রক্ষক এবং ঋণদাতা হিসেবে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি যে কোন আর্থিক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকে। যখনই বোঝা যায় যে এগুলির কাজকর্মে, আর্থিক উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা ব্যাহত হচ্ছে এবং সাধারণভাবে জনগণের কল্যাণ সাধিত হচ্ছে না, তখন সব দেশেই এগুলি, নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনা হয়। ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির ঋণের পরিমাণ এবং সেগুলির মঞ্জুরি একই সঙ্গে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন যদিও আর্থিক ব্যবস্থার অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের।

পরিকল্পিত অর্থনীতিতে, যে সব প্রতিষ্ঠান ঋণ সরবরাহ করে সেগুলির ওপর, অপরিকল্পিত অর্থনীতির তুলনায় কঠোরতম নিয়ন্ত্রণ দরকার, তবে দুটোর মধ্যে পার্থক্য হ'ল কঠোরতার তারতম্য। তা ছাড়া সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে, মূল অর্থনৈতিক লক্ষ্যগুলিকে ব্যাহত না করে বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলিকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া যায় না। কাজেই যে বেসরকারী ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থায় একটা বেশ বড় পরিমাণ সঞ্চয় ও ঋণের ওপর আধিপত্য করে সেগুলিকে এই আধিপত্য বজায় রাখতে দেওয়া অযৌক্তিক ছিল। সুতরাং ১৪টি তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ব করার জন্য যে বিক্ষোভের ধ্বনি উঠেছে তার কোন যুক্তি নেই।

তথাকথিত অগ্রাধিকার সম্পন্ন ক্ষেত্রগুলি অবহেলিত হচ্ছে, প্রধানতঃ এই যুক্তিতে ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্ব করা হয়েছে এবং ব্যাঙ্কগুলিকে রাষ্ট্রের মালিকানায় আনলে এই অবহেলার মনোভাব দূর করা সম্ভব হবে। ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ব করে এই দেশে আর যে যে উদ্দেশ্যই সফল করতে চাওয়া হোক, লেখক

কৃষি ঋণ সম্পর্কে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির চিরাচরিত মনোভাবের পরিবর্তন হয়নি। এই ক্ষেত্রে এমন কি স্টেট ব্যাঙ্কের অবদানও যথেষ্ট নয়। ব্যাঙ্কগুলি যদি কৃষির উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট ঋণ মঞ্জুর না করে তাহলে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা বিফল হবে।

মনে করেন যে, সরকারী বা বেসরকারী যে তরফেই হোক, ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি আমাদের দেশের চির দরিদ্র কৃষিজীবীদের কতখানি সাহায্য করতে পারে, পক্ষপাতবিহীন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সেই প্রশ্নটি বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

জয়েন্ট স্টক ব্যাঙ্কগুলি মোট যে ঋণ মঞ্জুর করে তার অতি সামান্য অংশই যে ভারতের দরিদ্র কৃষকের হাতে যায় তাতে কোন সন্দেহ নেই। অখিল ভারত পল্লী ঋণ অনুসন্ধানকারী কমিটি বলেছিলেন যে, পল্লী অঞ্চলে মোট যে ঋণ সরবরাহ করা হয়, তাতে ১৯৫১-৫২ সালে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির অবদান ছিল, শতকরা প্রায় ০.৯ ভাগ। ১৯৬১-৬২ সালে এর পরিমাণ ছিল আরও কম, অর্থাৎ শতকরা ০.৬ ভাগ মাত্র। অখিল ভারত পল্লী ঋণ ও লগ্নি অনুসন্ধানকারী কমিটি এই তথ্য প্রকাশ করেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের যে সম্পদ প্রবাহিত হয় সেইদিক থেকে বিচার করলেও একই ছবি দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ব্যাঙ্কগুলির মোট ঋণ মঞ্জুরির পরিমাণের মধ্যে শতকরা মাত্র ২.১ ভাগ, চা বাগান ইত্যাদিসহ কৃষিকে দেওয়া হয়। অপরপক্ষে শিল্পগুলি পায় শতকরা ৬৪.৩ ভাগ এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রগুলি পায় শতকরা ১৯.৪ ভাগ। (ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বুলেটিন, ডিসেম্বর ১৯৬৮)।

কৃষি উপজীবিকা

তবে এই তথ্যগুলি থেকে এ কথা ভাবা উচিত হবে না যে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি ইচ্ছে করে কৃষিকে অবহেলা করেছে। কৃষিঋণের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি এবং ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির সম্পদ, যা সকলেই প্রায় জানেন এবং এখানে যেগুলির পুনরুল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করে যে, ব্যাঙ্কগুলিকে অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় এই ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়ার নীতি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে স্থির করতে হয়। আমাদের দেশের কৃষির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন, কৃষির আকার ক্ষুদ্র ফলে ঋণও দেওয়া হয় কম, কৃষিতে আয় কম, কৃষক-গণের কাছ থেকে উপযুক্ত জামিন পাওয়া যায় না। কৃষি জমির দূরত্ব, সেগুলি সম্পর্কে ব্যাঙ্কগুলির জ্ঞানের অভাব এবং অনিশ্চিত আবহাওয়ার ওপর কৃষির নির্ভরশীলতা ইত্যাদি ব্যাপারগুলি ঝুঁকির পরিমাণ বাড়ায় এবং এই রকম কৃষকগণের ঋণ পরিশোধ করার সম্ভাবনাও কম থাকে।

ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি স্বল্প মেয়াদী অর্থ সম্পদ নিয়ে কাজ করে, কাজেই দেনা পরিশোধ করার ক্ষমতাকে ব্যাহত ক'রে তারা ঋণ দিতে পারেনা। তা ছাড়া এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হলে অন্যান্য যে সব ব্যয় রয়েছে সেগুলিও তাদের বিবেচনা করতে হয়। যেমন এই ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে ও লাভজনক উপায়ে কাজ করতে হলে, অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত কর্মচারী ও অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম গড়ে তুলতে হয়।

অন্যকথায় বলতে গেলে, জমাকারী ও অংশীদারগণের প্রতি ব্যাঙ্কগুলির যে দায়িত্ব রয়েছে, সেই দায়িত্বের কথা ভেবেই তারা এই ঝুঁকি নিতে সাহস করেনি। তাছাড়া এই দেশের অর্থ সম্পদের ওপর যাঁদের কর্তৃত্ব ছিলো তাঁরা সব সময়েই কৃষিতে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির ঋণ মঞ্জুর করাটা অপছন্দ করতেন এবং সেটা তাঁরা ঠিকই করতেন। ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির কৃষি ঋণ মঞ্জুর করার ক্ষমতা নেই, এইটে জেনে তার ওপর ভিত্তি করেই এই নীতি স্থির করা হয়। তাঁরা মনে করতেন যে সমবায়

সমিতিগুলিই এই ভূমিকা গ্রহণের পক্ষে উপযুক্ত সংস্থা। গত ডিসেম্বর মাসে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক আয়োজিত 'ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক অর্থ-সাহায্য' সম্পর্কে তিন দিন ব্যাপি একটি আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করার সময় শ্রী এল. কে. ঝা বলেছিলেন যে, 'ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি এ পর্য্যন্ত বিভিন্ন কারণে কৃষিতে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেনি। প্রকৃতপক্ষে এ পর্য্যন্ত যে নীতি অনুসরণ করা হচ্ছিলো তাতে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির পরিবর্তে সমবায় সমিতিগুলিকেই এই ক্ষেত্রে কাজ করতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছিল।' (ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক কৃষিতে অর্থসাহায্য, ১৯৬৯)

পূর্বপথ অনুসরণ

কৃষি ঋণ, তথা ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকা সম্পর্কে চিরাচরিত মনোভাব সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত চলে এসেছে। পল্লী ঋণের ক্ষেত্রে নতুন করে কাজ করার জন্য এমন কি যে ষ্টেট ব্যাঙ্ক গঠন করা হল, সেই ষ্টেট ব্যাঙ্কও, পূর্বপথ অনুসরণ করারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। ভারতের ষ্টেট ব্যাঙ্কের কর্মনীতি কি হওয়া উচিত তা স্থির করার জন্য ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৫৭ সালে যে এ্যাডহক কমিটি নিয়োগ করেছিলেন তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে এই ব্যাঙ্কের শুধু বাজারজাতকারী সমিতি ও নির্মাণকারী সমিতিগুলির ঋণের প্রয়োজন মেটানো উচিত। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহের ভার বর্তমানের মতো, সমবায় ঋণ দান। সমিতিগুলির হাতেই থাকা উচিত। ভি. এল. মেহতা কমিটি (১৯৬০) বাজারজাতকারী সমিতিগুলিকে আরও বেশী ঋণ দেওয়া সম্পর্কে ষ্টেট ব্যাঙ্ক যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল সেগুলিকে আরও একটু সরল করা সম্পর্কে মাত্র কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছিলেন।

কৃষি ঋণ সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানগত বিলি ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়ার জন্য ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর যে কমিটি গঠন করেছিলেন, তাঁরা পল্লী ও সমবায় ঋণের ক্ষেত্রে ষ্টেট ব্যাঙ্কের ভূমিকাও পর্যালোচনা করেন। তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে পল্লী ও সমবায়ের ক্ষেত্রে ঋণদাতা হিসেবে ষ্টেট ব্যাঙ্কের, খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে, কার্যকরী মূলধনের জন্য ঋণ সরবরাহ করার দিকেই মনযোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু কৃষির উৎপাদন বা উন্নয়নের জন্য কৃষকগণকে ঋণ দেওয়া সম্পর্কে কমিটি স্বীকার করেছিলেন যে সর্বসম্মত নীতির কাঠামো অনুযায়ী এই দায়িত্ব সমবায় ঋনদান ব্যবস্থার হাতেই থাকা উচিত। কাজেই কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ষ্টেট ব্যাঙ্কের, কৃষকগণকে সোজাসুজি ঋণ দেওয়ার কোন কর্মসূচীই ছিলো না। (ষ্টেট ব্যাঙ্ক কর্তৃক কৃষিসম্পর্কিত ক্ষেত্রে ঋণ সরবরাহ : এই গ্রন্থের ১২৮-১২৯ পৃষ্ঠা)।

এর ফলে যে ষ্টেট ব্যাঙ্ক এবং এর সাতটি সহযোগী ব্যাঙ্কে. ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির মোট জমার শতকরা প্রায় ২৮ ভাগ জমা ছিল—এই রকম বিপুল সম্পদ হাতে থাকা সত্ত্বেও, যে কৃষকগণের সমর্থনে এখন অনেকেই সোচ্চার, সেই কৃষকগণকে সাহায্য করার জন্য উল্লেখযোগ্য কিছু করেনি। ১৯৬৮ সালের জুন মাসের শেষ পর্যন্ত কৃষি ও সমবায় ক্ষেত্রের জন্য ষ্টেট ব্যাঙ্ক থেকে মোট যে টাকা মঞ্জুর করা হয়, তার মধ্যে অর্থাৎ ৩৩৫ কোটি টাকার মধ্যে কৃষকগণকে দেওয়া হয় মাত্র ৬ কোটি টাকা এবং বেশীর ভাগ ঋণ অর্থাৎ ২০১ কোটি টাকা দেওয়া হয় ভারতের খাদ্য কর্পোরেশনকে, খাদ্যশস্যের ব্যবসায় করার জন্য।

নতুন দৃষ্টিভঙ্গী

বর্তমানে বলা হয় যে ভারতের কৃষি, যন্ত্রসজ্জাদিতে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। কাজেই যদি উপযুক্ত পরিমাণ ঋণ না পাওয়া যায় তাহলে পল্লী অঞ্চলে কৃষিতে যে পরিবর্তন আসছে তা বিফল হবে। সমবায় ঋণ সমিতিগুলি একা নিজেরা এই বিপুল কাজের ভার নিতে অক্ষম, কারণ ঋণ দেওয়ার জন্য যে টাকার প্রয়োজন তা সরবরাহ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ১৯৬৫-৬৬ সালে কৃষির মোট ঋণের প্রয়োজন হয়েছিল আনুমানিক ১৪০০ কোটি টাকা। আগামী পাঁচ বছরে ঋণের এই পরিমাণ বেড়ে ২২০০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। সমবায় ক্ষেত্রগুলি যদি ১৯৬১-৬৫ সালের মতো অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সম্প্রসারিত করা যায়, তাহলেও তারা ৭৫০ কোটি টাকার বেশী সরবরাহ করতে পারবে না—আর ঐ রকম গতিতে সম্প্রসারণ বর্তমানে বোধ হয় সম্ভব নয়। কাজেই ঋণের গড়পড়তা প্রয়োজনীয়তা এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতার মধ্যে অসমতা বেড়ে চলেছে। কাজেই ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি ও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির সমন্বয়ে একটা সংহত ঋণদান কর্মসূচী গড়ে তোলার ওপরেই জোর দেওয়া হচ্ছে।

সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির কাজ একেবারে পুরোপুরি সফলতায় পূর্ণ এমন কথা বলা যায় না। সাফল্য অসাফল্য দুইই আছে। অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বিপুল হারে বাড়ছে এবং এর আনুমানিক পরিমাণ হ'ল ১৪৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ এই প্রতিষ্ঠানগুলি মোট যে ঋণ মঞ্জুর করেছে তার শতকরা প্রায় ২০ ভাগ হয়তো অনাদায়ীই থেকে যাবে। অপর পক্ষে ১৯৫১-৫২ সাল থেকে সমবায় ক্ষেত্রগুলি পূর্বের তুলনায় ১০ গুণ বেশী পল্লী ঋণ বন্টন করেছে, এবং এই প্রশংসাজনক কাজকে সাফল্যের দিকে ধরতে হবে। বর্তমানে পল্লী অঞ্চলের শতকরা ৪২ জন এই সমবায় ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। এই ক্ষেত্রটিকে গড়ে তুলতে নানা ধরণের সাহায্য হিসেবে যথেষ্ট ব্যয় হয়েছে। তবে এই ক্ষেত্রটিকে গড়ে তুলতে বহু ব্যয় হলেও, আমাদের এখন বহু অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মীর একটা বিরাট সংস্থা হয়েছে। বিভিন্ন দিক বিবেচনা করলে, পল্লী অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন ও সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য সমবায় ঋণদান প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর নির্ভর করে যাওয়াই খুব ভাল হবে বলে মনে হয়।

এই ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি তাদের চিরাচরিত মনোভাব পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক নয় বলে মনে হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী রক্ষণশীল, গতিহীন এবং নেতিবাচক। এদের একটা নতুন সামাজিক উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত করতে হবে। তাদের একটা নতুন বৈপ্লবিক, সক্রিয় ও যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে।

উচ্চাশার সঙ্গে কাজের মিল থাকা চাই

পি. সি. মালহোত্রা
হামিদা কলেজ অফ আর্টস ও কমার্স
ভূপাল

দুই হাজার বছরেরও পূর্বে এ্যারিস্টট্‌ল্ বলেছিলেন যে, সম্পদের মালিক কে সেইটেই বড় কথা নয়, সেই সম্পদ কি রকম ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেইটেই হ'ল আসল প্রশ্ন। তেমনি কোন সাধারণতন্ত্রে, উৎপাদনের উপায়-গুলির মালিক সরকার কিনা সেটা প্রধান প্রশ্ন নয়, দেশ শাসনের ভার কাদের হাতে রয়েছে সেটাই হ'ল আসল প্রশ্ন।

স্বাধীনতা লাভের পর দেশে যে রাষ্ট্রীয়করণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, ১৪টা প্রধান ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করা সেই ব্যবস্থারই অনুসৃতি। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে ভারতের ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ককে প্রথম রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক'রে রাষ্ট্রীয়করণ ব্যবস্থা সুরু করা হয়। ১৯৫৫ সালে এই ব্যাঙ্কটিকে ভারতের ষ্টেট ব্যাঙ্কে পরিণত করা হয়। এরপর জীবন বীমা ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করা হয় এবং গত বছরে ব্যাঙ্কগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

চতুর্থ পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ধরা হয়েছে ২৪.৩৯৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারী তরফে বিনিয়োগের পরিমাণ হবে ১৪,৩৯৮ টাকা এবং বেসরকারী তরফে বিনিয়োগের পরিমাণ ধরা হয়েছে ১০,০০০ কোটি টাকা। বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন ধরা হয়েছে ২৫১৪ কোটি টাকা, ঘাটতি বাজেটের পরিমাণ ৮৫০ কোটি টাকা। এখন ২৭০৯ কোটি টাকার অতিরিক্ত সম্পদ সংহত করতে হবে। রাষ্ট্রীয়করণের পর ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির জমা টাকার ওপর স্বভাবতঃই সরকারী তরফের দাবি হবে প্রথম। সেই হিসেবে বেসরকারী তরফকে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদের করতে হবে। ১৯৬৮-৬৯ সালে জাতীয় অর্থনীতিতে সঞ্চয়ের গড়পড়তা হার ছিল শতকরা ৯ ভাগ। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত যদি গড়পড়তা সঞ্চয়ের হার শতকরা ১২.৬ ভাগ পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে, তাহলে বিনিয়োগের জন্য যথেষ্ট অর্থ সরকারী ও বেসরকারী তরফ পেতে পারে। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলি পল্লী অঞ্চলে শাখা অফিস স্থাপন করবে তার ফলে হয়তো, এ পর্যন্ত যেখান থেকে ব্যাঙ্কে সঞ্চয়ের মারফৎ অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়নি, সেখান থেকে আরও অর্থ পাওয়া যাবে।

সরকারী মালিকানায় যাওয়ার ফলে সঞ্চয়কারীগণের টাকা অনেক বেশী নিরাপদে থাকবে এবং ব্যাঙ্কে সঞ্চয়ের পরিমাণ অনেক বাড়বে বলে আশা করা যায়। সরকারী সংস্থাগুলির উদ্বৃত্ত থেকে চতুর্থ পরিকল্পনায় ১৭৩০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে ব'লে আশা করা যায়। দেশের সরকারী সংস্থাগুলির কার্য্যকুশলতার দিক থেকে বিচার করলে অবশ্য টাকার এই সংখ্যাটা আনুমানিক ব'লে মনে হয়। ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা হলে সেগুলির লাভের মাত্রা কমে যেতে পারে। কারণ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলির দৃষ্টিভঙ্গী তখন ব্যয় বা লাভের দিকে না থেকে, কল্যাণমূলক হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই ব্যাঙ্ক থেকে যে উদ্বৃত্ত অর্থ আশা করা যাচ্ছে তা সরকারী তহবিলে নাও পাওয়া যেতে পারে।

ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করা হলো ব'লে এখনই অনেকে বলছেন চতুর্থ পরিকল্পনাকে আরও বড় করা হোক। কিন্তু এই আশা পূর্ণ নাও হতে পারে। তবে চতুর্থ পরিকল্পনার সম্পদ সম্পর্কে যে আশা প্রকট করা হয়েছে তার ফলে পরিকল্পনায় মোট যে বিনিয়োগ ধরা হয়েছে এবং যে ঘাটতি হতে পারে তা পূরণ হতে পারে। আশা করা যাচ্ছে যে ঘাটতি পূরণের জন্য এই যে অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা রাজ্যগুলির সম্পদ সংহতিকরণের প্রচেষ্টাকে শিথিল ক'রে তুলবে না। রাজ্যগুলির বর্তমান বছরে যেখানে ১২০ কোটি টাকা সংগ্রহ করার কথা ছিল, সেখানে তারা ৪০ কোটি টাকার বেশী তুলতে পারেনি। বেসরকারী ক্ষেত্রে ভারতের বাইরে বিদেশী মূলধনের অংশীদার হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার লোভ বাড়তে পারে বলেও, আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বিদেশী ব্যাঙ্ক

ভারতে যে সব বিদেশী ব্যাঙ্ক কাজ করছে সেগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করা উচিত হবে না। বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য অর্থ সরবরাহ করাই হ'ল এগুলির বিশেষত্ব। ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি বিদেশেও কাজ করুক তা যদি আমরা চাই, তাহলে বিদেশের ব্যাঙ্কগুলিকেও আমাদের দেশে কাজ করার সুবিধে দিতে হবে। কাজেই সেই অবস্থায় বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করা উচিত নয়। ভারতে, বিদেশী ও ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির কাজের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকলে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের কাজে অবনতির সম্ভাবনা কম থাকবে। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণাধীনে বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি যদি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে তাহলে এগুলির মাধ্যমে ভারতে বৈদেশিক মুদ্রা লগ্নির পরিমাণ বাড়তে পারে।

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলি, কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প এবং রপ্তানী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অর্থ সাহায্য করা সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি দেবে। রাষ্ট্রীয়করণের পূর্বে ব্যাঙ্কগুলি যখন সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ছিল তখন সেগুলি, কৃষির জন্য ২৪২ কোটি টাকা এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির জন্য ৪০৮ কোটি টাকা পর্য্যন্ত ঋণ দেবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৬৮ সালের জুলাই মাস থেকে ১৯৬৯ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত এই ঋণ বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু এই সময়ে কৃষির জন্য শতকরা ২৭ ভাগ এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির জন্য শতকরা ৫০ থেকে ৫৫ ভাগ ঋণ প্রকৃত পক্ষে ব্যবহৃত হয়।

পরিকল্পনার সমালোচনা ক'রে কেউ কেউ বলেন যে ব্যয়ের লক্ষ্যটা ভুল ভিত্তির উপর করা হয়। কৃষি ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব

ব্যাঙ্কগুলির, লাল ফিতের জালে জড়িয়ে পড়া উচিত হবে না। অধ্যাপক এ. এম. খুসরোর মতে 'সমবায় সমিতির মাধ্যমে ঋণ দানের ক্ষেত্রে গত ৫০ বছর ধরে যে বিতর্ক হচ্ছে তাতে ব্যয়, লাভ এবং কল্যাণের উৎস হিসেবে উদ্বৃত্ত ইত্যাদির মতো প্রাথমিক বিষয়গুলির পরিবর্তে অন্যান্য বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা চলেছে। সমবায় ঋণদান আন্দোলন একেবারে সুরু থেকেই আমলাতান্ত্রিক দৃটিভঙ্গীতে পরিচালিত হচ্ছে এবং সম্প্রতি তার মধ্যে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপও সুরু হয়েছে। এটা রাজ্য সরকারের একটা শাখা ব'লে কতকগুলি নিয়ম কানুনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে এবং এগুলি সকলের পক্ষেই সমানভাবে প্রযোজ্য। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলিও সমবায় ঋণের মতো নিয়ম কানুনের জালে যাতে জড়িয়ে না পড়ে সে দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। সমবায় ঋণের বেলায় ১৯৬৩-৬৪ সালে শতকরা ২২টি ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধ করা হয়নি। কাজেই এ রকম ভিত্তিতে কাজ করলে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলিও বিফল হবে।

অখিল ভারত পল্লী ঋণ পর্যালোচনাকারী কমিটি (১৯৫৪) সুপারিশ করেছিলেন যে সমগ্রদেশে সক্রিয়ভাবে কার্যকরী শাখাসহ, রাষ্ট্রীয় অংশীদারিত্বে একটা শক্তিশালী ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা উচিত।' ভারতের ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে যখন ভারতের ষ্টেট ব্যাঙ্কে পরিবর্তিত করা হয় তখন যেমন মূলধনের শতকরা ৪৫ ভাগ অংশ বেসরকারী ব্যক্তিগণকে রাখতে দেওয়া হয়েছিল, তেমনি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রেও সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা কি বাঞ্ছনীয় হবে? মূলধনের কিছু অংশ, জমাকারী ও ব্যাঙ্কের কর্ম্মীগণের জন্যও সংরক্ষিত রাখা উচিত। ব্যাঙ্কগুলির কাজ ও সেগুলির নীতি সম্পর্কে জমাকারী এবং ব্যাঙ্কের কর্মচারী এবং বেসরকারী তরফের প্রতিনিধিগণের মতামত সরকারের নেওয়া উচিত। রাষ্ট্রায়ত্ব করার ফলে সমাজের এক অংশে যে বিরক্তির মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে, এই ব্যবস্থা তা প্রভাবিত করবে এবং তাঁরাও নিজেদের ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্মে অংশীদার ব'লে মনে করতে পারবেন। কাজেই ব্যাঙ্কিং কমিশনের এই প্রশ্নটি বিবেচনা করে দেখা উচিত।

প্রাথমিক প্রশংসা

ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ব করার এই ব্যবস্থা প্রাথমিক যে প্রশংসা পেয়েছে এবং তার মূলে যে মনোভাব কাজ করেছে তা হ'ল এই যে, ব্যাঙ্কগুলি এতোদিন ধনিক শ্রেণীর কবলে ছিল এবং সেই কবল থেকে এবারে এগুলি মুক্তি পেল। ছোটরা এখন আশা করছেন যে তাঁরা তাঁদের উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য ঋণ পাবেন, বড় ব্যবসায়ীরা এখন আর আর্থিক শক্তি নিজেদের হাতে রাখতে পারবেন না, অথবা ব্যাঙ্কের জমা টাকায় ফাটকাবাজি করতে পারবেন না। ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীরা ভাবছেন যে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁদের চাকুরির সর্তাদি আরও ভালো হবে এবং ভাল কাজ করলে পদোন্নতির সম্ভাবনা বাড়বে।

বর্তমানে ব্যাঙ্কগুলির প্রত্যেকটির পৃথক সত্বা ও পৃথক পরিচালকমণ্ডলী রাখা হবে। এই সব ব্যাঙ্কের মাধ্যমে যাঁরা কাজকর্ম চালান, তাঁদের, এই পরিবর্তনের ধাক্কা থেকে রক্ষা করা হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির জন্য যখন পরামর্শদাতা বোর্ড গঠন করা হবে, তখন সেগুলি যাতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এবং দরিদ্রগণের নেতা দিয়েই শুধু গঠিত না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। ভবিষ্যতের সমাজ গড়ে তোলা সম্পর্কে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির যে ভূমিকা ছিল তা এখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ওপর এসে পড়লো। এই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই ব্যাঙ্কের নীতি ও প্রয়োজনীয়তা কার্য্যকরী করা হবে। কাজেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে তার কাজ কর্মে কোন রকমভাবে রাজনৈতিক প্রভাব না আসতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বেতার ভাষণে যে বৃদ্ধি অথবা বর্ধনশীল আত্ম-বিশ্বাসের সমস্যার কথা বলেছেন, সেটা কেবলমাত্র একটা বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে। অর্থাৎ বর্তমানে যে সম্পদ আছে তা পুর্নবন্টন না করে সম্পদ ও সুযোগ সুবিধে আরও বাড়াতে হবে। এই পদ্ধতির মাধ্যমেই ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির রাষ্ট্রায়করণ ব্যবস্থার উপযুক্ততা যাচাই করা যাবে। এই নতুন পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করতে হলে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির পরিচালকবর্গ ও কর্মচারীগণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা অত্যন্ত প্রয়োজন।

এটা অত্যন্ত সুখের কথা যে প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় জাতিকে আশ্বাস দিয়েছেন যে সরকার যে নিয়ম কানুন স্থির করে দেবেন তারই কাঠামোর মধ্যে স্বয়ংশাসিত বোর্ডের অধীনে ব্যাঙ্কগুলি কাজ করবে।

ঋণের ওপর প্রভুত্ব করাটাই বড় কথা নয়। উৎকৃষ্ট নীতিও যদি যোগ্যতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সব সময়ে প্রযুক্ত না হয় তাহলে তা অত্যন্ত খারাপ ফল নিয়ে আসতে পারে। সম্পদ সৃষ্টি করতে হবে, এবং তা মুদ্রণ করে নয় এই কঠোর সত্যটি উপেক্ষা করা চলবে না।

সমস্ত তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির * মোট আমানত অগ্রিমের তুলনায় রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানত ও অগ্রিমের শতকরা অংশ

আমানত

৬২ ৮%

ব্যাঙ্কের অগ্রিম

৬৩ ৫%
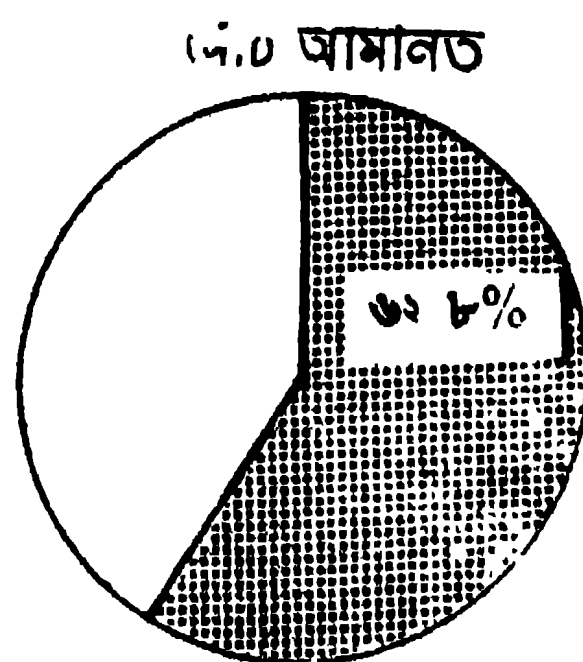
* ষ্টেট ব্যাঙ্ক এবং এর সহকারী ব্যাঙ্কগুলিসহ

গরীব চাষীরা বেশী ঋণ পেলে তবেই এই ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলা যাবে

সি. এইচ. হনুমন্ত রাও

ইন্‌ষ্টিটিউট অফ ইকনমিক গ্রোথ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়

বড় বড় ব্যবসায়িক ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণের ফলে ন্যায্য সর্তে ঋণ পাবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে কৃষকদের আশাবাদী মনোভাব যেন অনেক বেড়ে গিয়েছে ব'লে মনে হয়।

এ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হ'ল কৃষি ব্যবস্থা। কৃষির প্রয়োজনে কৃষকদের ঋণ সংগ্রহ করতে চিরকাল বেগ পেতে হয়েছে। সম্প্রতি কৃষি উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করায় কৃষিজীবীদের ঋণ গ্রহণের চাহিদা বহুলাংশে বেড়ে গেছে। কারণ উন্নততর বীজ, সার, সেচের জন্য পাম্প প্রভৃতির জন্য তাঁদের অর্থ প্রয়োজন।

সুদের হার অত্যন্ত চড়া হওয়া সত্ত্বেও (যা বছরে শতকরা ১২ থেকে নিয়ে ২৬ টাকা পর্যন্ত হ'তে পারে) এ পর্যন্ত চাষীদের স্থানীয় মহাজনদের ভরসাতেই থাকতে হয়েছে। গত ২০ বছর, পরিকল্পনার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজ হওয়া সত্ত্বেও, কৃষিজীবীদের ঋণের মোট চাহিদার শতকরা ২৫ ভাগের বেশী ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি ক'রে উঠতে পারেনি। ওদিকে ব্যবসায়িক ব্যাঙ্কগুলি এ ক্ষেত্রে যেটুকু করেছে তা নগণ্য বললেই হয়। সত্যি কথা বলতে কি এদের কৃষি ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ কমের দিকে গেছে। ১৯৫১ সালে শতকরা ২ ভাগ থেকে ১৯৬১ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছিল শতকরা ০.৬ ভাগে।

গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক খুললে, কাজ চালাবার খরচ খরচা বেড়ে যায়। তার ওপর কৃষির জন্য ঋণ মঞ্জুরীর ঝুঁকিও বেশী। সেই কারণে বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলি তাদের কর্মক্ষেত্র শহরাঞ্চলে সীমিত রেখেছে। গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কের কর্মক্ষেত্রের প্রসার প্রথম কয়েক বছর হয়ত তেমন ফলপ্রসূ নাও হতে পারে। কিন্তু এর ফলশ্রুতি হিসেবে খাদ্যশস্য ও চাষবাসের জন্য কাঁচামাল বেশী পরিমাণে পাওয়া যেতে পারে এবং রপ্তানীর উন্নতি হতে পারে। তা ছাড়া এর ফলে কৃষিজীবীদের আয় ও সঞ্চয় বাড়তে পারে। ফলতঃ শেষ পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক ব্যবসার প্রসার লাভজনক হয়ে দাঁড়াতে পারে।

গ্রামাঞ্চলে সঞ্চয় সংহিতকরণ

গ্রামাঞ্চলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির কার্যক্ষেত্র সম্প্রসারিত করলে, পল্লীবাসীদের সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসেবে আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে। দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধিশালী কৃষকদের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় পল্লী অঞ্চলের সঞ্চয়যোগ্য সম্পদ সংহত করা আরও প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং আমানত বাড়াবার চেষ্টায় অপেক্ষাকৃত উন্নত অঞ্চলগুলিতে ব্যাঙ্কের শাখা খোলা ভালো।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ঋণ, অগ্রিম বা দাদন থেকে সবচেয়ে বেশী লাভবান হবার সম্ভাবনা ধনবান কৃষক গোষ্ঠীর, যাঁদের রাজ্য পর্যায়ে প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক। এঁদের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা আছে এবং এঁরা নতুন কারবার বা প্রকল্পের কাজ সুরু করার ঝুঁকি নিতে পারেন এবং উদ্যোগী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসেবে আরও ঋণ নিতে পারেন।

দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত চাষীদের বন্ধক দেবার মত সম্পত্তি না থাকায়, এবং ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা না থাকায়, মহাজনদের কাছ থেকে তাঁরা প্রয়োজনমত ঋণ পান না। তা ছাড়া ধারের টাকার চড়া সুদও তাঁরা দিতে পারেন না। সুতরাং জাতীয় ব্যাঙ্ক থেকে কৃষি বাবদ নির্দিষ্ট ঋণ বা আগামের একটা বড় অংশ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত কৃষকদের জন্যে, বিশেষ ক'রে খরা ও সেচ-বঞ্চিত এলাকার স্বল্পবিত্ত কৃষিজীবীদের জন্যে পৃথক রাখা প্রয়োজন। এই সব গোষ্ঠীর জন্য ঋণের মোট পরিমাণ সংরক্ষিত রাখা সম্বন্ধে সর্বোচ্চ পর্যায়ে একটা সুদৃঢ় নীতি গ্রহণ না করলে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সুফল ভোগ করবেন কেবল বিত্তবান কৃষকরা।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির জাতীয়করণের সঙ্গে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের তুলনা করলে ভুল করা হবে। এটা জানা কথা যে, ব্যাঙ্কে জমার খাতে টাকা গচ্ছিত রাখেন বেশীর ভাগ সাধারণ মানুষ, যদিও সেই টাকা বড় বড় ব্যবসার প্রসারে কাজে লাগে। জাতীয়করণ ব্যবস্থায় সরকার তথা সংসদের মাধ্যমে গচ্ছিত অর্থ সমাজের কল্যাণে ব্যয় করার অধিকার সাধারণ মানুষরাই ফিরে পায়। সুতরাং ব্যক্তিগত মালিকানার প্রচারকরা জাতীয়করণের যে সমালোচনা করেন তা সত্য নয়। এই জন্যই যাঁরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর অধিকার বজায় রাখায় বিশ্বাসী তাঁরা জাতীয়করণ সমর্থন করেন।

যাই হোক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের গুরুত্ব আদৌ কম নয়। তর্কের খাতিরে কেউ কেউ বলতে পারেন যে, লাইসেন্স মঞ্জুরের প্রচলিত নিয়ম কানুন এবং সম্পদ বন্টনের প্রচলিত রীতির ভিত্তিতে ঋণ মঞ্জুর করা হয়। অতএব মুষ্টিমেয়র হাত থেকে অর্থনৈতিক ক্ষমতা সরিয়ে আনতে এ ব্যবস্থা ব্যর্থ হতে পারে। অতীতে লাইসেন্স মঞ্জুরের অভিজ্ঞতা এবং জীবনবীমা কর্পোরেশন প্রভৃতি অন্যান্য সরকারী সংস্থার অর্থ লগ্নীর রীতিনীতি দেখে এই মনোভাব ছড়িয়ে পড়া বিচিত্র নয়। কিন্তু এতে শুধু বোঝা যায় যে অতীতে সাধারণের সম্পদকে কী ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। উপযুক্ত নীতি নির্দ্ধারণ করে দৃঢ়তার সঙ্গে তা পালন করলে, ঋণ মঞ্জুরীর ধারা বদলানো কঠিন হ'বে এ কথা জোর করে বলা যায় না।

জাতীয় করণের ফলে ঋণ মঞ্জুর ও নিয়ন্ত্রণের সমস্ত ক্ষমতা সরকারের হাতে বর্তায়। ঋণের এই অর্থ কোথায় কি

ভাবে সদ্ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করবে ক্ষমতায় আসীন দলটির নীতি ও মতবাদের ওপর।

ক্ষমতা বণ্টন

"অর্থনৈতিক ক্ষমতা ব্যষ্টির কুক্ষি থেকে সমষ্টির সেবায় নিয়োজিত করার স্বপক্ষে জনমত জোরদার হয়েছে। বিগত দুই দশক গণতান্ত্রিক ধারায় অতিবাহিত করার পর সাধারণ মানুষ আগের তুলনায় নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক বেশী সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং অনেক বেশী দৃঢ়তা অর্জন করেছেন। অতএব বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সম্পদের তারতম্য সত্ত্বেও, ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে এঁদের উদ্যোগী ও উৎসাহী করে তোলায় জাতীয় ব্যাঙ্কগুলির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত কৃষকদের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানগুলি তথা প্রকৃত ক্ষুদ্র কারবারী, ব্যবসায়ী বা উদ্যোগীদের প্রচেষ্টা আর্থিক সাহায্য দিয়ে পুষ্ট করতে পারলে তাঁদেব জন্যে ঋণের মোটা অংশের ব্যবস্থা করতে পারলে তবেই জাতীয়করণকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলা যাবে এবং অভীষ্ট সিদ্ধির পথে অগ্রগতি করা সম্ভব হবে।

পরিচালনাই মূলকথা

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সমর্থনে সাধারণ মানুষের, উৎসাহের আনন্দে পরিচালন ব্যবস্থার দক্ষতা বজায় রাখার প্রশ্নটি উপেক্ষা করার আশঙ্কা রয়েছে। সরকারী ক্ষেত্রে কর্ম দক্ষতার অভাব সম্বন্ধে যে খেদোক্তি শোনা যায় তা থেকে জাতীয় ব্যাঙ্কগুলিকে মুক্ত করতে না পারলে রাষ্ট্রীয়করণের সুফল নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকবে।
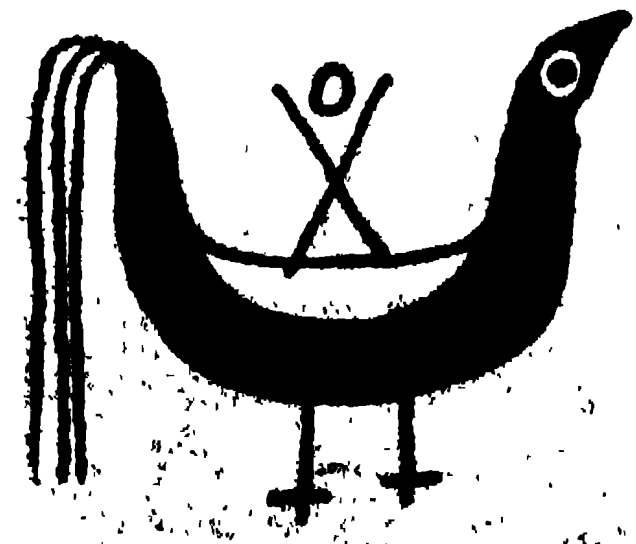
রাষ্ট্রীয়করণের ক্ষেত্র প্রসার

(৪ পৃষ্ঠা থেকে)

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ ব্যবস্থাটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ হলেও, শ্রেণীর ভিত্তিতে বড় ব্যবসায় থেকে, সহরাঞ্চলের নিম্ন মধ্যবিত্ত বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে যে ধনী কৃষক এবং জমিদার কৃষকগণের নতুন এবং বৃহৎ সংখ্যক শ্রেণী রয়েছে তাদের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে কিনা তা এখনও পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না। তাহলে এর অর্থ কি এই যে নেহরুর আমলে সরকারী সংস্থা এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির উন্নয়নের ফলে কৃষি ব্যতিত অন্যান্য ক্ষেত্রের বড় ব্যবসায় যেমন এর সুফল ভোগ করেছেন, তেমনি ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের ফলে পল্লী অঞ্চলের প্রধানতঃ নতুন ধনীরাই কি এবারে এর সুফলগুলি ভোগ করবেন?

রাজনৈতিক শক্তিগুলির মধ্যে বর্তমানে যে ভারসাম্য রয়েছে এবং গ্রাম পর্যায় থেকে ওপরের স্তর পর্যন্ত শক্তির কাঠামোতে ধনী কৃষক ও জমিদার কৃষকগণের বর্তমানে যে প্রাধান্য রয়েছে সেইদিক থেকে বিচার করলে এটা শুধু সম্ভব নয়, প্রায় সুনিশ্চিত। তবে রাজনৈতিক শক্তির শ্রেণীর ভিত্তিতে পল্লীর নতুন ধনিক শ্রেণী থেকে দেশের বহু জায়গায়, মাঝারি ও ক্ষুদ্র উৎপাদক এবং ভূমিহীন শ্রমিকের দিকে রাজনৈতিক শক্তি যে ঝুঁকছে এটাকে স্বীকৃতি দেওয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোন অর্থনৈতিক কর্মসূচী পল্লীর ধনশালীগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি খর্ব ক'রে, গ্রামাঞ্চলের দরিদ্রগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলতে চায় তাহলে পল্লীর জনসাধারণের মধ্যে তা বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি করবে।

পল্লী অঞ্চলে কতিপয় ব্যক্তির হাতে 'যে অর্থনৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হচ্ছে ভূমিস্বত্ব সংস্কারকে সেই পরিপ্রেক্ষিতে মূলতঃ একটা আক্রমণ বলা যায় এবং তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পল্লী অঞ্চলে যদি ব্যাপক ভিত্তিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে হয় তাহলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি যাঁদের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে তাঁদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে সংগ্রাম কেবলমাত্র সুরু হয়েছে, ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্ব হওয়াতেই তা শেষ হয়নি।

জাতীয়করণ ও প্রতিযোগীতা

(১৫ পৃষ্ঠার পর)

জন্য আর্থিক প্রশাসনিক দিক থেকে আমাদের কোনো অসুবিধায় পড়তে হ'ত না। সুতরাং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের আওতায় যেটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা সামান্য বলা চলে না।

তত্ত্বের দিক থেকে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে ব্যাঙ্কের ঋণ, সমাজ বিরোধী ফাটকাবাজীতে ব্যয় না করে সামাজিক স্বার্থ রক্ষা হবে, উৎপাদনের সব ক্ষেত্রে ব্যয় করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এর জন্যে একটা বড় রকমের নীতিগত পরিবর্ত্তন দরকার।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে ক্ষুদ্র কৃষক, ব্যবসায়ী, রপ্তানীকারক ও কারিগরদের সামনে উন্নতির পথ খুলে যাবে—এ যাবৎ এঁরা এ সুযোগে বঞ্চিত ছিলেন। কিন্তু এই সুযোগ তাঁরা ব্যাপকভাবে নেবেন, সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন এবং তাতে উপকৃত হবেন এটি আশা করা কঠিন।

বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার ব্যাঙ্কে রাষ্ট্রায় ব্যাঙ্কের টাকা চলে যাবে এমন সুস্পষ্ট সম্ভাবনা কিছু দেখি না। তবে ১৪টি বড় জাতীয় ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের ফলে, বিদেশী বেসরকারী লগ্নিকারীরা যদি আশঙ্কিত হয়ে পড়েন তাহলে ভারতের বিদেশী ব্যাঙ্ক মারফৎ টাকা লগ্নি করতে তাঁরা দ্বিধান্বিত হবেন।

জাতীয়করণের ফলে দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি করার মত প্রচুর টাকা আমাদের হাতে আসবে কিন্তু তাতে অদূর ভবিষ্যতে অন্ততঃ বৈদেশিক সাহায্য বর্জন করা সম্ভব হবে না। অতএব অচিরে বৈষয়িক উন্নতির জন্যে যে অর্থ প্রয়োজন তার জন্যে সর্বসূত্র থেকে সম্পদ আহরণ করা অত্যাবশ্যক।

জাতীয় ব্যাঙ্কগুলি কাজকর্মের দিকে কতটা সফল হবে তা বলা কঠিন। কারণ অন্যান্য সরকারী সংস্থায়—নিয়মকানুনের আমলাতান্ত্রিক কড়াকড়ি, স্বজন তোষণ, অনুগত পোষণ ও দুর্নীতি বেশ প্রকট। ১৪টি ব্যাঙ্কের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য যদি অক্ষুন্নও রাখা যায় তথাপি অভিন্ন নিয়ম কানুন প্রবর্তনের ফলে, সেগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা কৃত্রিম হয়ে দাঁড়াবে।

স্মরণীয় বিতর্ক

আর. চক্রপাণি

(সংসদের সংবাদদাতা)

ঐতিহাসিক বিলটি সংসদে পেশ করার মুহূর্ত থেকে আইন হিসেবে গৃহীত হবার সময় পর্য্যন্ত সংসদের উভয় সদনে যে আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে, ভাষার চমৎকারিত্বে, যুক্তির বলিষ্ঠতায়, বাগ্মীতার চাতুর্যে তা বহুকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সংসদে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ বিলের বিতর্ক একাধিক কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। গুরুত্ব ও গাম্ভীর্যের দিক থেকে এর সঙ্গে তুলনা করা চলে একমাত্র জীবনবীমা রাষ্ট্রীয়করণ সংক্রান্ত বিতর্কের।

বিলটি সংসদে উপস্থাপিত করার আগে যে অর্ডিন্যান্স জারী করা হয় তা সমগ্র দেশকে বিষয়টির গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। ফলে সরকার ও বিরুদ্ধবাদী—উভয় পক্ষের সদস্যদের ভাষণ যুক্তির তীক্ষ্ণতা ও ভাষার শৈলীতে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রী বিতর্ক-কালে যেভাবে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেন তা তাঁর সুদক্ষ বাগ্মীতার সাক্ষ্য বহন করে। বিলটি উপস্থাপিত করার ও তার পক্ষ সমর্থনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন আইনমন্ত্রী শ্রী পি. গোবিন্দ মেনন। চাতুর্যের সঙ্গে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে, সাবলীল ভাষায় নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত ক'রে তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন।

বিলের বিরোধিতা করে মুখ্যত: দুটি দল—স্বতন্ত্র ও জনসঙ্ঘ। অতএব তাঁদের যুক্তি ও তর্ক কেন্দ্র করেই বিতর্ক জমে ওঠে। কংগ্রেস বেঞ্চ থেকে স্বত:স্ফূর্ত সমর্থনের সামনে এই দুটি দলের অভিজ্ঞ নেতারা রাষ্ট্রীয়করণের বিরুদ্ধে তাঁদের বক্তব্য খুব বলিষ্ঠতার সঙ্গে পেশ করেন। সর্ব শ্রী এন. জি. রঙ্গ, এম. আর মাসানী ও এন. দাণ্ডেকার স্বতন্ত্র দলের পক্ষে এবং জনসঙ্ঘের প্রব.। অটল বিহারী বাজপেয়ী সমেত জনসঙ্ঘের অন্যান্য সদস্যদের ভাষণগুলি যেন অনেকটা আবেগে ভরপুর ছিল। এর সঙ্গে সমানে তাল রেখে ওজস্বিনী ভাষায় যুক্তি তর্কের জাল গড়ে তোলেন সর্বশ্রী গোবিন্দ. মেনন, এস. এ ডাঙ্গে, ভি. কে. কৃষ্ণ মেনন ও কংগ্রেসের প্রবীণ সদস্যরা।

স্বতন্ত্র দলের সদস্যরা বিতর্কের সূত্রপাত থেকে শেষ পর্যন্ত এই বিলের বিরোধীতা করেন। কিন্তু বিতর্কের শেষ পর্যায়ে জনসঙ্ঘের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে। বিলটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সময়ে জনসঙ্ঘের একজন সদস্য যখন বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে দাবী করেন তখন জনসঙ্ঘের যুক্তির বৈষম্য অভ্রান্তভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ব্যাঙ্ক অফ চায়নার অবাঞ্ছনীয় কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সমালোচনার সময়ে তিনি এই দাবী তোলেন। আইনমন্ত্রী ঐ সুযোগ ছাড়লেন না। 'জনসঙ্ঘের মনোভাব রাষ্ট্রীয়করণ বিলের বিরোধীতার আগে যেমন তীব্র ছিল এখন জনতাকে তুষ্ট করার জন্যে তাঁরা অনেকটা নরম হয়েছেন', শ্রী মেননের ঐ মন্তব্যে জনসঙ্ঘের সদস্যদের বেশ অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হয়।

সুপরিকল্পিত আক্রমণ

দেশের বড় বড় ১৪টি ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ব ক'রে অর্ডিন্যান্স জারী করার ৫ দিনের মধ্যেই লোকসভায় এই ঐতিহাসিক বিল নিয়ে আলোচনা সুরু হয়। স্বতন্ত্র ও জনসঙ্ঘ দল সরকারী নীতির ওপর সুপরিকল্পিত আক্রমণ চালান। তাঁরা, অর্ডিন্যান্স জারী করা সঙ্গত হয়েছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তারপর ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ বিল উপস্থাপিত করার সময় থেকে তার বিরুদ্ধতা সুরু করেন। বিতর্কের সময়ে রাষ্ট্রীয়করণের সমর্থনে সরকারের যুক্তি খণ্ডন করার চেষ্টা করেন এবং পরিশেষে বিলের ওপর ভোট নেওয়ার সময়ে নিজেদের তীব্র আপত্তি প্রকাশ করার জন্যে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। যখন বিলটির বিভিন্ন ধারা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা চলছিল, তখন তাঁরা জোরালো ভাষায় বিলটি বাতিল করাবার চেষ্টা করেন। তাঁরা নিজেদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করার কোনোও সুযোগ ছাড়েন নি। কিন্তু তা সত্বেও তাঁদের সমস্ত প্রয়াস বিফল হয়।

সংসদের অধিবেশনের প্রথম দিনে, প্রধানমন্ত্রী ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ সম্পর্কে ভাষণ দেবার পূর্বেই জনসঙ্ঘের শ্রীবাজপেয়ী প্রশ্ন তোলেন সংসদের আসন্ন অধিবেশনের প্রাক্কালে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের জন্যে অর্ডিন্যান্স জারী কী ভাবে সঙ্গত হয়েছে। কিন্তু উপাধ্যক্ষ শ্রীআর. কে. খাদিলকর সে প্রশ্ন অগ্রাহ্য করেন। এ ব্যাপার অধিবেশনের প্রথমার্ধে ঘটে। কিন্তু দুপুরে যখন জানা গেল যে, অর্ডিন্যান্সের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে, সুপ্রীম কোর্টে রীট পীটিশান দাখিল করা হয়েছে তখন 'বিষয়টি বিচারাধীন' বলে যুক্তি দেখিয়ে স্বতন্ত্রদলের প্রবীণ ও অভিজ্ঞ নেতারা বিলটির ওপর আলোচনা স্থগিত রাখবার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করেন। কারণ এবারেও উপাধ্যক্ষ তাঁদের আপত্তি অগ্রাহ্য করেন। বিলটির সমর্থকরাও চুপ করে বসে ছিলেন না। তাঁরাও এই দুটি দলের প্রকৃত মনোভাব বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে প্রশ্ন করেন। কম্যুনিস্ট পার্টির শ্রীভোগেন্দ্র ঝা বলে উঠেছিলেন, 'এই সভায় ব্যাঙ্কারদের সমর্থকদের স্থান নেই।' বিলটি উপস্থাপনের সময়ে প্রাথমিক ভোটের ফলাফল যখন সরকারের অনুকূলে গেল (পক্ষে ২৬০ ভোট—বিপক্ষে ৬০ ভোট) তখনই বোঝা গেল যে, এই বিল গৃহীত হবেই।

কিন্তু এতেও বিলের বিরোধীপক্ষ নিরুৎসাহিত না হয়ে তাঁদের বক্তব্য পেশ করতে থাকেন এবং বিলের সমর্থকরা আরও প্রগতিশীল ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলতে থাকেন। এই বিলটি সম্পর্কে বিতর্ক করার জন্য সংসদে প্রকৃতপক্ষে আট ঘন্টা সময় নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হয়েছিলো কিন্তু বিভিন্ন পর্য্যায় ঘুরে সংবিধানে স্থান পেতে এর তিনগুণ সময় লেগেছে। রাজ্যসভাতেও জনসঙ্ঘ এবং স্বতন্ত্র একই ধরণে বিলটির বিরোধিতা করেন। যাঁরা বিলটির বিরোধিতা করেন তাঁদের মধ্যে শ্রীলোকনাথ মিশ্রও ছিলেন কিন্তু সমর্থকদের শক্তি ছিলো তাঁদের তুলনায়

অপরিসীম। কংগ্রেস দলের শ্রী সি. ডি. পাণ্ডেসহ কয়েকজন সদস্য অত্যন্ত পরিস্কারভাবেই বিলটি সম্পর্কে তাঁদের নিরুৎসাহিতার পরিচয় দেন। কমিউনিষ্টদলের নেতা শ্রীভূপেশ গুপ্ত এবং কংগ্রেস দলের শ্রীচন্দ্রশেখর এবং শ্রীঅর্জ্জুন আরোরা এবং আরও অনেকে রাষ্ট্রীয়করণের স্বপক্ষে তীব্র ভাষায় সমর্থন জানান।

বিলটি নিয়ে যখন আলোচনা শেষ হ'ল তখন, সংজ্ঞা সংক্রান্ত ধারাগুলি নিয়ে এবং রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির অংশীদারগণকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্পর্কে যে সব ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে সেগুলি নিয়ে আলোচনা সুরু হয়। রাষ্ট্রায়ত্বকরণকে যাঁরা সমর্থন করেন তাঁরা নানা ধরণের সংশোধনী প্রস্তাব এনে বিদেশী ব্যাঙ্ক এবং অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলিকেও এই বিলের আওতায় নিয়ে আসতে চান। কমিউনিষ্ট, সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট এবং প্রজা সমাজতন্ত্রী দল এই সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন ক'রে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যান। এর পরিপ্রেক্ষিতে একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল কয়েকজন কংগ্রেস সদস্য যাঁরা ইতিপূর্ব্বে এই বিলটি সম্পর্কে তেমন মনে প্রাণে সমর্থন জানাননি তাঁরাও বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ব করার বিতর্ক সংগ্রামে যোগ দেন। সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট দলের নেতা শ্রীমধু লিমায়ের একটি সংশোধনী প্রস্তাব ১৯৮-৫৯ ভোটে বাতিল হয়ে যায় এবং তাতেই বিদেশী এবং ক্ষুদ্রতর ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির ভবিষ্যত নির্দ্ধারিত হয়ে যায়।

ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন সম্পর্কে বিলে বলা হয়েছিলো যে সরকারি সিকিউরিটিতে অংশীদারগণকে ৭৫ কোটি টাকা দেওয়া হবে। বিলের ব্যবস্থা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের হার স্থির রেখে সরকার শুধুমাত্র এইটুকু সুবিধে দিতে রাজী হয়েছেন যে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলির পরিবর্ত্তে সরকারই অংশীদারগণকে ক্ষতিপূরণ দেবেন। অংশীদারগণ তাঁদের শেয়ারের জন্য এমন কি বাজার দরের চাইতে বেশী মূল্য পাবেন।

একচেটিয়া অধিকার

বিতর্কের সময় উভয়সভাতেই কয়েকজনের ভাষণ খুব হৃদয়স্পর্শী হয়েছিলো। শ্রীমাসানীর বিরোধিতাকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুইই বলা যায়। অল্প কথায় বলতে গেলে তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে এই বিল, বিদেশী আমানতকারীগণের আস্থা নষ্ট করবে, আমানতকারীগণের একটা "হৃদয়হীন একচেটিয়া অধিকারের" ওপর অসহায়ভাবে নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায় থাকবে না। রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে তাঁর মতে এই ব্যবস্থা হ'ল, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার হাতে সমস্ত আর্থিক শক্তি কেন্দ্রীভূত করার একটা চেষ্টা যা হয়তো শেষ পর্যন্ত একটা স্বৈরশাসনের সৃষ্টি করবে।

জনসঙ্ঘের শ্রী এস. এস. কোঠারি এবং শ্রী কে. এল গুপ্ত বলেন যে, রাষ্ট্রীয়করণ ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে একটা "ভীষণ আস্থাহীনতার সঙ্কট" সৃষ্টি করেছে। তাঁরা মনে করেন যে কংগ্রেস দলের মধ্যে উপদলীয় রাজনীতির ফল হ'ল এই রাষ্ট্রীয়করণ ব্যবস্থা। তিনি সাবধান করে দেন যে এই সব রাজনৈতিক চাল বেশীদিনের জন্য চলবে না।

"রাজনৈতিক মতামতে পার্থক্য" রয়েছে বলেই এই সব আপত্তি তোলা হচ্ছে এই কথা বলে শ্রীগোবিন্দ মেনন তাঁর বক্তৃতায় এই সব যুক্তি নাকচ করে দেন। তিনি বলেন যে "যেহেতু আমরা ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্ব করেছি সেই হেতু আমাদের দেশে একনায়ত্ব এসে যাবে, এ কথা আমরা বিশ্বাস করিনা।" তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, "আমরা কি জীবন বীমা ব্যবসায়, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ব করিনি ?"

স্বতন্ত্র দলের সদস্যগণ যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দ্বিবেদী এবং কংগ্রেস দলের অনেকেই যে ক্রমশ: বেশী চঞ্চল হয়ে উঠছিলেন তা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো। প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের নেতা শ্রীদ্বিবেদী বলেন যে শ্রীমতী গান্ধী এবং কংগ্রেস সিণ্ডিকেটের সদস্যগণের মধ্যে বিরোধিতার ফল হ'ল এই বিল। সে যাই হোক তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে এটিকে সমর্থন করেন। তিনি বলেন 'অন্যান্য যেসব ব্যবস্থা এর মতোই জরুরি সেগুলি গ্রহণ করা না হলে শুধু এই ব্যবস্থাটাই দেশে সমাজতন্ত্র নিয়ে আসবে এ কথা আমি মানতে রাজি নই।'

প্রাক্তন সহকারী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই ইতিপূর্ব্বে যদিও একটি বিবৃতি দেন যে তিনি হালের অতি আলোচিত অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্যে পদত্যাগ করেন নি, তবুও কমিউনিষ্ট দলের নেতা শ্রী এস. এ. ডাঙ্গে, তাঁর সঙ্গেই বিরোধের মীমাংসা করতে চেষ্টা করেন।

এই বিলটি আনার জন্য শ্রীডাঙ্গে অবশ্য কংগ্রেস দলেরও প্রশংসা করেন এবং বলেন যে শ্রীদেশাই মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করাতেই বিলটি এতো তাড়াতাড়ি সংসদে উত্থাপন করা সম্ভবপর হয়েছে।

অনন্য ঐক্যমত

কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে শ্রীবেদব্রত বড়ুয়া বলেন যে, প্রধানমন্ত্রীর এই ব্যবস্থা সম্পর্কে দেশে যে অনন্য ঐক্যমত দেখা যাচ্ছে তাতে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছেন। তিনি বলেন যে "কেবল মধ্যপন্থীরাই নন, অন্যান্য দলও ঐ ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছেন"।

কমিউনিষ্টগণের প্রভাবেই ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্ব করা হয়েছে এই অভিযোগ করা হলে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে বেশ রেগে যান তা বোঝা যায়। রাজ্য সভায় একটি ভাষণে তিনি এই ধরণের অভিযোগ সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ ক'রে বলেন, যে ম্যাকার্থি নীতি তার জন্মস্থানেই নিশ্চিহ্ন হয়েছে সেই নীতি বহু সাগর ও বহু দেশ পেরিয়ে ভারতে এসে পৌঁচেছে।

দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় লক্ষ্যের দিক থেকেই যে রাষ্ট্রীয়করণ যুক্তিসঙ্গত তা সমর্থন করে শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে "আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির আশা আকাঙ্খা বলি দেওয়া হবেনা এই নীতিই আমরা অনুসরণ করছি এবং তাই ক'রে যাব।"

ভারতীয় ব্যাঙ্কের ইতিহাস

এন. পি. কুরুপ
পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক, নূতন দিল্লী
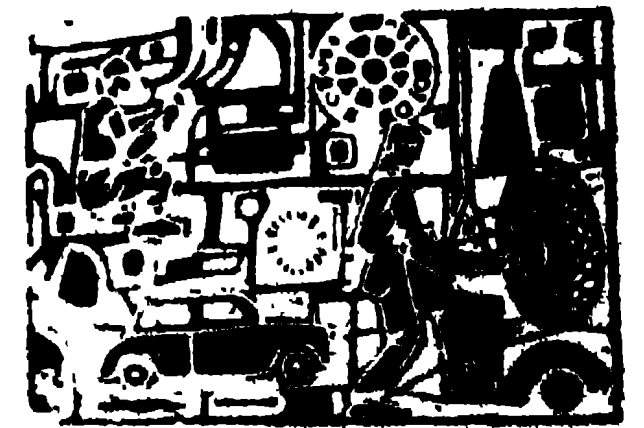
পাশ্চাত্যের ধারা অনুযায়ী সর্বপ্রথম ভারতীয় ব্যাঙ্ক ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে স্থাপিত হয়।

রাষ্ট্রের তরফে প্রথম ব্যাঙ্ক, দি ব্যাঙ্ক অফ ক্যালকাটা ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়।

ভারতীয় পরিচালনাধীনে প্রথম জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানি হিসেবে আউধ কর্মাশিয়েল ব্যাঙ্ক ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়।

কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইর তিনটি প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ককে সংযুক্ত করে ১৯২১ সালে ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া গঠিত হয়।

ব্যবসামূলক ব্যাঙ্কিং থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিংকে পৃথক করার উদ্দেশ্য ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া স্থাপিত হয় এবং ১৯৪৯ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়।

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রায়ত্ত করে ষ্টেট ব্যাঙ্কে পরিণত করা হয়।

১৯৬৯ সালের ১৯শে জুলাই, মোট ৩০৫১ কোটি টাকার সম্পদসহ ১৪টি তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়।

বিদেশীর সংস্পর্শে এসে ঘটনাক্রমে ভারতে আধুনিক ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং মধ্যযুগ থেকে এখানকার যে ব্যাঙ্ক ব্যবসা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল তার মধ্যে এগুলি পরগাছার মতো, প্রায় দৃষ্টির অগোচরে বেঁচে থাকে। ভারতের ব্যাঙ্কারগণের মধ্যে তখন সব চাইতে প্রসিদ্ধ ছিলেন জগৎ শেঠরা। তাঁরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যাঙ্কার ও রাজস্ব আদায়কারী ছিলেন এবং ঐ সময়ে তাঁদের অনন্য রাজনৈতিক প্রভাব ছিল। সেই সময়ে বিদেশীগণের নিজেদের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বেতনভোগী সৈন্যবাহিনী তৈরি করার জন্য জগৎশেঠদের এবং ব্যাঙ্কের মতো অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল তাদের ক্রমবর্ধমান ব্যবসায়িক লেনদেনের কাজ করা দেশীয় ব্যাঙ্কারগণের পক্ষে সম্ভব নয়। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণের বিনিময় মুদ্রার এবং টাকা পাঠানোর কাজ বেড়ে যাওয়ায় ঔপনিবেশিক বন্দর ও রাজনৈতিক কেন্দ্রগুলিতে ইউরোপীয় ব্যাঙ্কগুলির শাখা স্থাপন করা হতে থাকে। কোম্পানীর এবং ইউরোপীয়গণের আভ্যন্তরীন ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধের জন্য কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের এজেন্সীগুলি তাদের ব্যবসায় ছাড়াও ব্যাঙ্ক ব্যবসা আরম্ভ করলো।

পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে সর্বপ্রথম ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয় বলে মনে হয়। বোম্বাইর সরকারী ব্যাঙ্ক ১৭২৪ খৃষ্টাব্দ থেকে কাজ সুরু করে এবং তাদের নোট ছাপাবার অধিকারও দেওয়া হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিরোধিতা করায়, কলকাতায় পাশ্চাত্য পদ্ধতির ব্যাঙ্ক অনেক পরে স্থাপিত হয়। সর্ব-প্রথম ১৭৭০ সালে ব্যাঙ্ক অব হিন্দুস্থান স্থাপিত হয়। প্রায় ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক এবং জেনারেল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া স্থাপিত হয়। কিছুকাল পরে এই সব ব্যাঙ্ক উঠে গেলেও জনসাধারণের মধ্যে কাগজের নোট প্রচলনে এরা প্রভূত সাহায্য করে। জেনারেল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, ভারতে এইটিই ছিল যৌথ দায়িত্বের ভিত্তিতে গঠিত প্রথম ব্যাঙ্ক। আর এই যৌথ দায়িত্বের নীতি, এর প্রায় ১০০ বছর পর অর্থাৎ ১৮৬০ সালে আইন সঙ্গত স্বীকৃতি পায়।

প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কসমূহ

প্রধানতঃ যুক্তিসঙ্গত সর্তে সরকার যাতে ঋণ সংগ্রহ করতে পারেন এবং ঋণদান ব্যবস্থা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রূপ পায় ১৮০৬ সালে ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা স্থাপনের মাধ্যমে। রাষ্ট্রের উৎসাহে এই বেসরকারী ব্যাঙ্ক কোম্পানীটি গঠিত হয়। ১৮০৯ সালে এটি যখন সরকারী সনদ পেলো তখন তিনটি প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কের মধ্যে প্রথম হিসেবে ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল নাম গ্রহণ করলো। সরকার এর মূলধনের এক পঞ্চমাংশ সরবরাহ করলেন এবং ভোট দেওয়া ও পরিচালনা ব্যবস্থায় মতামত দেওয়ার অধিকার রাখলেন। ১৮২৩ সালে এই ব্যাঙ্ককে নোট প্রচলন করার অধিকার দেওয়া হয় এবং ১৮৩২ সালে শাখা অফিস স্থাপন করার এবং আভ্যন্তরীন বিনিময় সম্বন্ধে ব্যবস্থাদি করার অধিকার দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ বিনিময় ব্যাঙ্কগুলির স্বার্থ-বজায় রাখার জন্য, বৈদেশিক বিনিময়ের অধিকার দেওয়া হয়নি।

ব্যাঙ্ক অফ বোম্বে স্থাপিত হয় ১৮৪০ সালে এবং ব্যাঙ্ক অফ মাদ্রাজ ১৮৪৩ সালে। প্রত্যেকটিতে সরকার, মূলধন হিসেবে ৩ লক্ষ করে টাকা সরবরাহ করেন। ১৮৬২ সালে প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কগুলির নোট ছাপাবার অধিকার নিয়ে নেওয়া হয় এবং তাদের ব্যবসায়ের ওপর থেকে অনেক রকমের নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করা হয়। এই সব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলে নেওয়ায় ব্যাঙ্কগুলি ফাটকাবাজারী কার্যকলাপে অংশ নিতে সুরু করে, ফলে ব্যাঙ্ক অব বোম্বে, ১৮৬২-৬৫ সালের ফাটকাবাজারী সঙ্কটের সময়ে ভীষণ সঙ্কটের সম্মুখীন হয় এবং সরকার আবার পূর্বেকার নিয়ন্ত্রণগুলি আরোপ করতে বাধ্য হন। তা সত্ত্বেও ব্যাঙ্ক অফ বোম্বেকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

এবং ১৮৬৮ সালে এটি লিকুইডেশনে গেলে, একই নামে নতুন আর একটি ব্যাঙ্ক গঠিত হয়। ১৮৭৬ সালে সমস্ত প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক থেকে সরকার তাঁদের শেয়ার তুলে নেন, কাজেই ১৮৭৬ সালের আইনে ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ডে সরকারী কোন প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা করা হয়নি। এই রকমভাবেই ব্যাঙ্কের কাজকর্মে কার্য্য-করী সরকারী হস্তক্ষেপের প্রথম পর্য্যায় শেষ হয়। এর পরের ইতিহাসে, ১৯২১ সালে ব্যাঙ্কগুলির সংযুক্তির পূর্ব পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটনা ঘটেনি।

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ফাটকাবাজি যখন চরমে ওঠে তখন দেশে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বহু ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় কিন্তু সেগুলির মধ্যে মাত্র একটি ব্যাঙ্ক ১৮৬৫ সালে স্থাপিত এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক টিঁকে যায় এবং এটি এখনও আমাদের সেবা করছে। একেবারে সুরু থেকেই এই ব্যাঙ্কটি বিদেশীগণের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিলো এবং ১৯২২ সালে পি এণ্ড ও ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন যখন এর শেয়ারগুলি কিনে নেয় তখন এটি সম্পূর্ণভাবে বিদেশী নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। পি এণ্ড ও ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন আবার ১৯২৭ সালে চাটার্ড ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। ফলে একটি বিদেশী ব্যাঙ্ক দেশের অভ্যন্তরে স্থান পেয়ে যায়

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে ভারতীয়দের প্রবেশ

উনবিংশ শতকের শেষভাগে, আর্থিক ব্যবস্থাগুলিকে জাতীয়করণ করার কাজ শুরু হয়। এর ফলে ভারতীয়গণের পরিচালনায় ও নিয়ন্ত্রণে যৌথ দায়িত্ব সম্পন্ন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয়গণের পরিচালনায় সম্ভবতঃ প্রথম জয়েন্ট স্টক ব্যাঙ্ক হিসেবে ১৮৮১ সালে আউধ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়, এরপর ১৮৯৪ সালে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এবং ১৯০১ সালে লাহোরের পিপলস ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়।

১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময় ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি খুব উৎসাহ লাভ করে এবং স্বদেশীমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে বহু ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হ'ল :

ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (১৯০৬)
কানাড়া ব্যাঙ্ক (১৯০৬)
ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (১৯০৭)
ব্যাঙ্ক অব বরোদা (১৯০৮) এবং
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (১৯১১)।

১৯১৩ সালের মধ্যে, পাঁচ লক্ষ টাকা এবং তারও বেশী আদায়ীকৃত মূলধনসহ ৪৪টি ভারতীয় জয়েন্ট স্টক ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়।

ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলিকে তাদের শৈশব-কালেই ভীষণ সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়। ১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লাহোরের পিপলস ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে এবং এর সঙ্গে আরও অনেকগুলি ব্যাঙ্কের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ব্যাঙ্ক সম্পর্কে জনসাধারণের আস্থা পুনরুদ্ধার করার জন্য সরকার বিশেষ কিছু না করলেও, ঐ সঙ্কট সর্বপ্রথম সরকারকে তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুললো।

ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক

'ইংল্যাণ্ডের বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি শিগ্‌গীরই হয়তো কয়েকটি ভারতীয় ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নিয়ে নেবে বিশেষ করে, কয়েকটি ভারতীয় বিনিময় ব্যাঙ্কের পরিচালনা ভার নিবে নেবে এবং এর ফলে ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ওপর প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কগুলির নেতৃত্ব চলে যেতে পারে এই সম্ভাবনা এই ব্যাঙ্কগুলিকে সংযুক্ত হওয়ায় উৎসাহ যোগায়। তা ছাড়া তিনটি প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ককে সংযুক্ত করে ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক তৈরি করা সম্পর্কে জনসাধারণ যে দাবী জানাচ্ছিলেন তা পূরণ করতে ব্যর্থ হলে, সরকার হয়তো সম্পূর্ণভাবে সরকারী পদ্ধতিতে একটি ব্যাঙ্ক গঠনে বাধ্য হবেন এবং প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিন্ন করবেন এই সম্ভাবনা এবং একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গঠন করা সম্পর্কে সরকারী ইচ্ছার ফলে, তিনটি প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ককে সংযুক্ত করা হয় এবং ১৯২১ সালে ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া গঠিত হয়। ব্যাঙ্কের সঙ্গে রাষ্ট্রের নিকট সহযোগিতার এটাই ছিল দ্বিতীয় পর্যায়।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উন্নয়নের জন্য সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে, এর উদ্বোধনের পাঁচ বছরের মধ্যেই ১০০টি শাখা অফিস খোলা হয়। কিন্তু হিল্টন ইয়ং কমিশন যখন, তখনকার প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী সুপারিশ করলেন যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং এবং ব্যবসায়মূলক ব্যাঙ্কিং একই সঙ্গে চলতে পারে না এবং চলা উচিত না এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া নামে পৃথক একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের পরামর্শ দিলেন তখন কেন্দ্রীয় এবং ব্যবসায়-মূলক ব্যাঙ্ক হিসাবে ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের বৃদ্ধি ব্যাহত হ'ল।

তবে কমিশন অবশ্য, দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসার উন্নয়নে সাহায্য করা সম্পর্কে ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের বিপুল সম্ভাবনা বুঝতে পেরেছিলেন। কমিশন লিখেছিলেন 'ভারতের যে ধরণের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রয়োজন তার ভিত্তি, অন্যান্য দেশের মতো, একটি মাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ওপর হওয়া উচিত নয় বরং একটি খুব বড় ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক থাকা উচিত। সরকারী সহযোগিতায় স্থাপিত এই ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কে জনসাধারণেরও আস্থা থাকবে। ব্যাঙ্কের সুযোগ সুবিধেগুলি জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রসারিত করার জন্য এর যে সাহায্যের প্রয়োজন হবে সরকারের তরফ থেকে তা দেওয়া উচিত। কাজেই এই রকমভাবে ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহযোগী হয়ে পড়লো, তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গঠিত হওয়ার পর সরকার ঐ ব্যাঙ্কের পরিচালনা ব্যবস্থা থেকে নিজেদের মনোনীত প্রতিনিধিগণকে প্রত্যাহার করে নিলেন।

যুদ্ধোত্তর সংহতিকরণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যে মুদ্রাস্ফীতি হয় তা বেসরকারী ব্যাঙ্ক স্থাপনে উৎসাহ দেয় এবং কয়েকটি বিফলতা সত্বেও ভারতীয় ব্যাঙ্কের সংখ্যা ও আয়তন বাড়ছিল। যে ক'টি ব্যাঙ্ক ফেল হয় সেগুলি হ'ল টাটা ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ব্যাঙ্ক (১৯২৩), সিমলার এ্যালায়েন্স ব্যাঙ্ক (১৯১২) এবং ত্রিবাঙ্কুর ন্যাশনাল ও কুইলন ব্যাঙ্ক (১৯৩৮)। ১৯৩৯ সালের শেষে ৬৭৯টি ব্যাঙ্ক ছিল এবং সেগুলির মধ্যে ৪০০টির মূলধন ৫০,০০০ টাকারও নীচে ছিলো।

অন্ততঃপক্ষে ৫০,০০০ টাকার তহবিল ছাড়া নতুন ব্যাঙ্ক স্থাপন নিষিদ্ধ করায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন মুদ্রাস্ফীতি

হয় তখন অনুকূল পরিবেশ থাকলেও বেশী ছোট ছোট ব্যাঙ্ক স্থাপন সম্ভবপর হয়নি। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ সালের শেষে ৭২২টি ভারতীয় জয়েন্ট স্টক ব্যাঙ্ক এবং ১৫টি বিদেশী ব্যাঙ্ক ভারতে কাজ করছিল। দেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা খুব বেশী হয়ে গেছে মনে করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, নতুন কোন ব্যাঙ্ক স্থাপনে উৎসাহ না দেওয়ার নীতি গ্রহণ করলেন। বর্তমানে যতগুলি তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক আছে সেগুলির মধ্যে একমাত্র গোয়ালিয়রের কৃষ্ণরাম বলদেও ব্যাঙ্ক, ১৯৫০ সালের পর স্থাপিত হয়।

যুদ্ধোত্তর কালে ব্যাঙ্কের সঙ্গে শিল্পপতিগণের সম্পর্ক খুব নিকট হয়। বেশীর ভাগ শিল্প সংস্থা নিজেদের ব্যাঙ্ক গঠন করে অথবা যে সব ব্যাঙ্ক পূর্বেই স্থাপিত হয়েছিল সেগুলির পরিচালনা ভার নিয়ে নেয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একজন গভর্ণরের একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। 'ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের কাঠামোর একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল, কেন্দ্রীভূত শক্তি, কোন কোন ক্ষেত্রে এই শক্তি, প্রকৃতপক্ষে নিয়োজিত মূলধনের তুলনাতেও বিপুল বেশী। মধ্যে মধ্যে আমাদের হাতে এমন সব অভিযোগ আসে যেখানে দেখা যায় যে, কোন একটি পরিবার বা কয়েকটি পরিবারের হাতেই কোন কোন ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এসে গেছে এবং অবাঞ্ছনীয় উপায়ে এই ক্ষমতার ব্যবহার যাতে না হয় তা প্রতিরোধ করানোই একটা প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর একজন গভর্ণর বলেছেন যে, 'যুদ্ধের সময় যাঁরই নিজের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যবসায়ের জন্য অথবা ফাটকা বাজারি করার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়েছে তিনিই বহু শাখাসহ একটি করে ব্যাঙ্ক স্থাপন করে, উচ্চহারে সুদ ঘোষণা করে এবং বিপুল বিজ্ঞাপনের মারফৎ যথেষ্ট আমানত সংগ্রহ করেছেন।' টাকার জন্য প্রকৃতপক্ষে মারামারি করে অনেক ব্যাঙ্ক তাঁদের সম্পদের তুলনায়, ব্যবসায়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্কভাবে বিচার বিবেচনা না করেই বহু শাখা অফিস স্থাপন করেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে ১৯৪২ সালে স্থাপিত ভারত ব্যাঙ্ক, তাঁদের কাজ সুরু করার সাড়ে চার বছরের মধ্যেই ২৯২টি শাখা অফিস স্থাপন করে। অনেক ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে শাখা অফিসগুলি পরিদর্শনই করা হোত না অথবা পরিদর্শন করে কোন মতামত দিলে তা পালন করা হ'তো না। সেই সময়ে রাতারাতি গড়ে ওঠা ব্যাঙ্কগুলির আর একটা ব্যাপার ছিল এই যে, পরিচালকগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোম্পানীগুলির সঙ্গে ব্যাঙ্কের শেয়ারের যোগ থাকতো। ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের ধারাগুলি কঠোরভাবে প্রযুক্ত হওয়ার ফলে এবং দেশীয় রাজ্যগুলির আর্থিক ব্যবস্থা ভারতের সঙ্গে সংহত করার ফলে দুর্বল ব্যাঙ্কগুলির আয়ু শেষ হয়। ১৯৬০ সাল থেকে দুর্বল সংস্থাগুলির অবলুপ্তির গতি বাড়ে। পালাই সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার ফলে, যখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সমালোচনা করা হতে থাকে তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ, ব্যাঙ্কগুলিকে বাধ্যতামূলক ভাবে সংযুক্ত করার কর্তৃত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিজের হাতে নিয়ে নেন। এই ক্ষেত্রে তাঁরা সর্বশেষ যে ব্যবস্থা করেন তা হ'ল ব্যাঙ্ক অব বিহারকে, ভারতের ষ্টেট ব্যাঙ্কের সঙ্গে সংযুক্তি করণ। বাধ্যতামূলক সংযুক্তির এই ভয় স্বেচ্ছায় সংযুক্তিকরণের গতি বাড়িয়ে দেয়। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে ২০০টিরও বেশী ব্যাঙ্ক এই রকম ভাবে নিজেদের সংযুক্ত করে। এই সব ব্যাপারের জন্য ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে যেখানে ভারতীয় তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৭৪, ১৯৬৯ সালের মার্চে সেগুলির সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৮তে। ঐ সময়ে অতপশীলি ব্যাঙ্কের সংখ্যা ভীষণ দ্রুতগতিতে কমে গিয়ে ২৫৬ থেকে ১৭তে গিয়ে দাঁড়ায়। গত একশো বছরে ভারতে মোট যতগুলি ব্যাঙ্ক কাজ সুরু করে (প্রায় ১৬০০) বর্তমানে তার শতকরা মাত্র ৫ ভাগ (৮৫টি) বেঁচে আছে।

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে 'ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উন্নয়নের যন্ত্র হিসেবে ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক ছিল বিদেশীগণের নিয়ন্ত্রণে এবং জাতীয় ও রাজনৈতিক প্রভাব, ঋণদান নীতিকে প্রভাবিত করছে বলে সমালোচনা করা হতে থাকে। এই নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে প্রথমতঃ ব্যাঙ্কের কর্মচারীগণকে ভারতীয় করণের দাবি করা হয়। পরে ১৯৪০ সালে, বিশেষ করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ব করার পর, এই ব্যাঙ্কটিকেও জাতীয়করণের দাবি করা হয়। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে 'দি ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট' লেখে যে 'কর্মচারীগণের তথাকথিত ভারতীয়করণ একটা প্রহসনমাত্র, অংশীদারগণের সভাও একটা প্রহসন, তথাকথিত ভারতীয় ডিরেক্টরগণ সাক্ষী গোপাল না হলেও 'জো হুজুরের' দল। এই সব সমালোচনার ফলে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অর্থমন্ত্রী, ব্যাঙ্কটি রাষ্ট্রায়ত্ব করার নীতি গ্রহণে বাধ্য হন। যদিও পল্লী অঞ্চলে ব্যাঙ্কিং সম্পর্কিত কাজ অনুসন্ধানকারী কমিটির (১৯৫০) সুপারিশ অনুসারে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত একটি পরিকল্পনা নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৫৬ সালের জুন মাসের শেষ পর্যন্ত ব্যাঙ্কের ১১৪টি নতুন শাখা অফিস খোলার কথা ছিল। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বুঝিয়ে সুঝিয়ে নানা রকম চাপ দেওয়া সত্বেও ব্যাঙ্কটি, অংশতঃ লাভের দিক থেকে বিচার করে তার কর্তব্য পালন করতে পারেনি। অবস্থা যখন এই রকম দাঁড়ালো তখন তারই পরিপ্রেক্ষিতে গোরওয়ালা কমিটি, আরও বেশী সংখ্যক শাখা অফিস স্থাপনের সুপারিশ করেন, ফলে ব্যাঙ্কের বহু ক্ষতি হয়। এই সমস্যা সম্পর্কে কমিটি যে সমাধান দেন তা হ'ল রাষ্ট্রও ব্যাঙ্কের মূলধন জোগাবে এবং ব্যাঙ্কের যে শাখা অফিসগুলি আর্থিক ক্ষতির কারণ হচ্ছে সেগুলিকে সরকারের তরফ থেকে সাহায্য করা হবে। ফলে ব্যাঙ্কটিকে রাষ্ট্রায়ত্ব করা ছাড়া কোন উপায় রইলো না। ব্যাঙ্কগুলিকে একটা সংহত কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসার কর্মসূচীর অন্যতম অংশ হিসাবে, প্রাক্তন দেশীয় রাজ্যের সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত ৮টি ব্যাঙ্ক, যেগুলি প্রথমে ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসেবে স্থাপিত হয়, ভারতের ষ্টেট ব্যাঙ্কের সহকারী হয়ে গেল। কংগ্রেস দলের সর্বশেষ ইস্তাহারে এই দাবি করা হয়েছিলো :

'আমাদের দেশের মতো অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত একটি দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতার কাঠামো এবং আর্থিক সম্পদের সঙ্গে সংযুক্ত ক্ষমতার প্রভাব এমন যে, আর্থিক ব্যবস্থার পরিচালনভার বেসর-

কারী হাতে রাখা উচিত নয়। কারণ আর্থিক শক্তির চাবিকাঠি যাদের হাতে থাকবে তাঁরাই শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করবে।' ব্যাঙ্কিং সম্পর্কিত ইস্তাহারে বলা হয়, যে,......এখনও একটা বড় এলাকা রয়ে গিয়েছে যা ছোঁয়া হয়নি। অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর করার জন্য, আরও কার্যকরীভাবে আমাদের সামাজিক লক্ষ্যগুলি পূরণ করার জন্য এবং উৎপাদনের সর্বক্ষেত্রে যেখানে প্রয়োজন সেখানেই ঋণ দেওয়ার জন্য, বেশীরভাগ ব্যাঙ্কিং সংস্থাকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা প্রয়োজন। অর্থাৎ ব্যাঙ্কের নীতিগুলি পুনর্গঠিত করা, ব্যবসায় পদ্ধতিগুলি সংশোধন করা এবং এগুলির চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল প্রত্যেক স্তরে নিয়োজিত কর্মচারীগণের দৃষ্টিভঙ্গীতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল একটা পরিবর্তন আনা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে 'সামাজিক নিয়ন্ত্রণের' অর্থ, ভারতীয় ব্যাঙ্ক এসোসিয়েশন কর্তৃক গৃহীত কর্মনীতিতে পর্যবসিত হয়। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়কে যদি জাতীয় নীতির একটা উপায় হিসেবে ব্যবহার করতে হয়, ব্যাঙ্কগুলির মালিকানাও সরকারের হাতে থাকা উচিত।

জাতীয়করণ যুক্তিসঙ্গত

(১৭ পৃষ্ঠার পর)

মালিকরা খুব উৎফুল্ল হয়েছেন। দেশে যে সম্পদ আছে এবং আরও যে সম্পদ সংহত করা যেতে পারে তা এখন সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হবে এবং তা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত করবে।

এ পর্যন্ত ব্যবসা বাণিজ্যে যে অবাধ অর্থ সাহায্য করা হয়েছে তা ফাটকাবাজারি এবং গুপ্ত সঞ্চয়ে উৎসাহ দিয়েছে ও সাহায্য করেছে এবং মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়িয়েছে, এখন আর জনসাধারণকে সেই দুর্ভোগ ভুগতে হবে না। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি থেকে যে সুযোগ সুবিধে পাওয়া যাবে তাতে ভারত রপ্তানী বাণিজ্যে আরও বেশী অংশ গ্রহণ করতে পারবে। রপ্তানীর জন্য এ পর্য্যন্ত যে অর্থ সাহায্য পাওয়া যেতো তা কোন সময়েই ব্যাঙ্কের মোট ঋণের এক ষষ্ঠাংশের বেশী পাওয়া যায় নি। এবারে তার উন্নতি হবে এবং দেশ আরও বেশী পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে এবং বৈদেশিক বিনিময়ে ঘাটতির ক্রমবর্ধমান আশঙ্কা চলে যাবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচীগুলিতে এবারে একটা নতুন গতি সঞ্চারিত হবে। যে শ্রেণীগত ও আঞ্চলিক বৈষম্য বছরের পর বছর বেড়ে চলেছিল তা যে এখন দূর হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির দিকে অর্থনীতির গতি ত্বরান্বিত হবে। ব্যাঙ্কগুলির সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মতো সহজ পন্থা গ্রহণ করলে তা বাঞ্ছনীয় গতিতে ফল দিত না, অনেক সময় লাগতো। যে পরিবর্তন বহু পূর্বেই করা উচিত ছিল এই ব্যবস্থা গ্রহণ করায় একটা অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয়েছে।

আর্থিক ব্যবস্থায় কোন রকম ওলট পালট না করে যে ব্যাঙ্কগুলিকে বেসরকারী মালিকানা থেকে সরকারী মালিকানায় আনা হয়েছে এবং এই নতুন ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণের আস্থার যে সন্দেহাতীত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে তাতেই এই সাহসিক ব্যবস্থার যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়। এটা যে একটা উপযুক্ত ব্যবস্থা তাতে কোন সন্দেহ নেই। এতে সমাজের কল্যাণ সম্ভাবনা বাড়বে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সামাজিক ব্যয় কমবে।
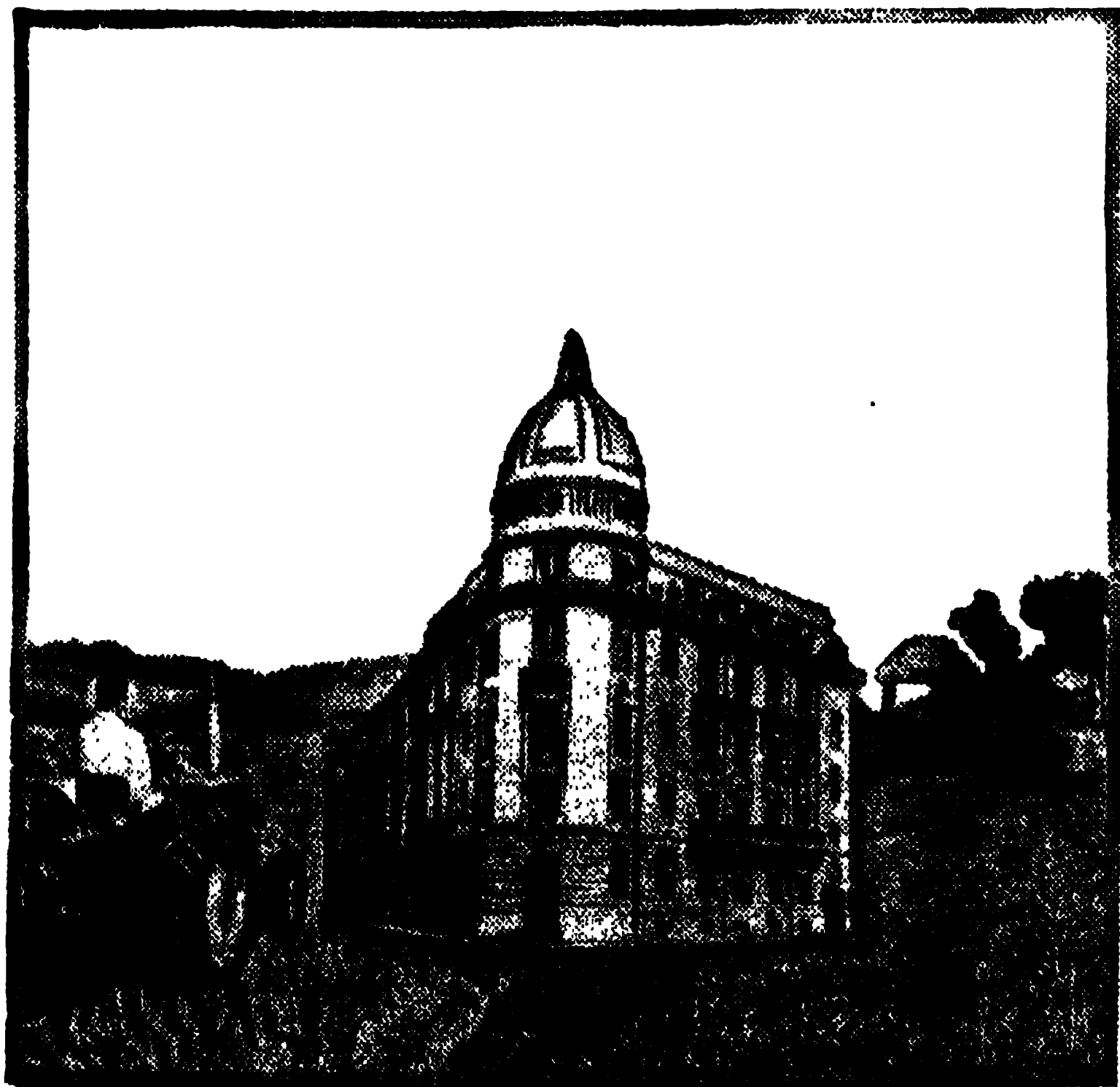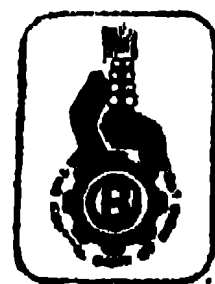
লগ্নীনীতি রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হওয়া উচিত

পি. সি. গোস্বামী

ডাইরেক্টার, উত্তর পূর্ব্ব ভারতের কৃষি অর্থনীতি গবেষণা কেন্দ্র, জোড়হাট

ব্যাঙ্কগুলি তাদের অর্থ-সংস্থান ও ঋণদানের ক্ষমতা নিয়ে যে কোন দেশের বিশেষ ক'রে অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত দেশে বিপুল প্রভাব বিস্তার করতে পারে। একথা সত্য যে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির ওপর বড় বড় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বেসরকারী ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার সৃষ্টিতে উৎসাহিত করেছে অর্থনৈতিক ক্ষমতা এই রকমভাবে কতকগুলি পরিবার বা গোষ্ঠীর হাতে যাতে কেন্দ্রীভূত হতে না পারে সেই জন্যই বড় বড় ব্যাঙ্কগুলির ঋণদান নীতির ওপর একটা নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিলো, যাতে ব্যাঙ্কের পরিচালনা ব্যবস্থার ওপর যাদের হাত আছে, তাঁরাই কেবল ঋণের সুযোগ না নিতে পারেন। এই উদ্দেশ্যেই ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি সামাজিক নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য গত বছরে ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন সংশোধন করা হয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিলো একটি জাতীয় ঋণ পরিষদ গঠন, পরিচালক বোর্ডের গঠনে পরিবর্ত্তন আনা এবং পরিচালবর্গ অথবা তাঁদের স্বার্থ আছে এমন কোন সংস্থাকে ঋণ দেওয়ার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করা।

১৪টি প্রধান ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ব করার ফলে ভারত সরকারের এখন ২৮০০ কোটি টাকার ওপর অর্থাৎ দেশের ব্যবসয়ী ব্যাঙ্কগুলিতে জমা টাকার শতকরা ৭০ ভাগের ওপর কর্ত্তৃত্ব এসে গেলো। ষ্টেট ব্যাঙ্কের (প্রায় ৮০০ কোটি টাকা), জীবন বীমা কর্পোরেশনের (প্রায় ৩০০০ কোটি), পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক ও সঞ্চয় সার্টিফিকেটের (৫০০ কোটি), কর্ম্মচারীগণের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও ঋণ হিসেবে কয়েক হাজার কোটি টাকার যে আমানত রয়েছে তার ফলে জনগণের সঞ্চিত অর্থের একটা মোটা অংশের ওপর সরকারী কর্ত্তৃত্ব এসে গেলো।

জনসাধারণের কাছ থেকে জমা টাকা হিসেবে, গ্র্যাচুইটি ফাণ্ডে জমা হিসেবে, এবং জীবন বীমার প্রিমিয়াম হিসেবে এই যে বিপুল অর্থের ওপর সরকারী কর্ত্তৃত্ব এলো সেটা সরকার কি রকমভাবে ব্যবহার করবেন সেটাই হল বিবেচ্য বিষয়।

বেসরকারী ক্ষেত্র, তাঁদের নিজস্ব ব্যবসায় বা শিল্প সংস্থাগুলির উপকারের জন্য ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির সম্পদ ব্যবহার করতেন বলে জানা গেছে। যাই হোক আমানতকারীগণের টাকা নিরাপদ ছিলো এবং ভালো সুদও পাওয়া যেতো।

রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির লগ্নী নীতি যদি রাজনৈতিক দিক থেকে প্রভাবিত হয়, তাহলে যে সব রাজ্য (বা অঞ্চল) এবং বা দল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করতে না পারবেন তাঁরা হয়তো ভবিষ্যতে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন।

ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেতে হলে, ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা সম্পর্কে সর্ব্ব ভারতীয় যে নীতি গৃহীত হবে তাতে কতকগুলি অঞ্চল হয়তো সেই যোগ্যতা অর্জ্জনই করতে পারবে না। ব্যক্তিগত ঋণের আবেদন সম্পর্কে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির শাখা ম্যানেজারগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিলো। এই স্বাধীনতার জন্য তাঁরা অনেক ছোট ও মাঝারি ধরণের শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সময়মতো ঋণ দিয়ে সাহায্য করতে পারতেন। আসামে অনেক ছোট ছোট চা-বাগান স্থানীয় ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি থেকে আর্থিক সাহায্য পাচ্ছিলো, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে আইনের দৃষ্টিতে দেখলে এগুলির মধ্যে অনেকেই হয়তো অর্থ-সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত নয়। একথাও সত্যি যে ষ্টেট ব্যাঙ্কের ঋণ গ্রহণের যোগ্যতার মান এতো উঁচু যে, এই সব ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের কোনটাই ষ্টেট ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পায়নি। যে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি এখন সরকারী কর্ত্তৃত্বে আনা হ'ল সেগুলিও যদি ষ্টেট ব্যাঙ্কের মতো যোগ্যতার মাপকাঠি একই রাখেন তাহলে অনেক স্থানীয় প্রতিষ্ঠানই সময়মতো আর্থিক সাহায্য পাবেন।

সরকার যখন একটা বিপুল পরিমাণ অর্থের ওপর কর্ত্তৃত্ব করেন তখন তাঁরা সমস্ত অঞ্চলকে সমানভাবে সাহায্য করবেন কিনা অথবা আমানতের অনুপাত অনুযায়ী বা অনুন্নতার অনুপাত অনুযায়ী অথবা কোন পরিকল্পনার ভবিষ্যত লাভের ভিত্তিতে অর্থ সাহায্য করবেন কিনা তার কোন নিশ্চয়তা নেই। রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভালো সার্টিফিকেট দেওয়ার আগে এইসব প্রশ্নগুলি উপযুক্তভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে।

উন্নততর দক্ষতা প্রয়োজন

ইংল্যাণ্ড বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কগুলি যে সব সুযোগ সুবিধে দেয় সেই তুলনায় আমাদের দেশের ব্যাঙ্ক থেকে সে রকম কোন সুবিধে পাওয়া যায় না। ইংল্যাণ্ডের কোন ব্যাঙ্কে ৫ মিনিটের মধ্যেই চেক ভাঙ্গানো যায় সেই তুলনায় ভারতীয় কোন ব্যাঙ্ক থেকে চেকের টাকা পেতে প্রায় ১ ঘন্টা সময় লাগে। বিশেষ করে লেনদেন যদি সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয় তাহলে ব্যাঙ্ক থেকে কাজ পেতে হ'লে দিনের অর্ধেক ভাগই লেগে যাবে। রাষ্ট্রায়ত্ব ষ্টেট ব্যাঙ্কের সঙ্গে যদি ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কের তুলনা করা যায় তাহলে বলতে হয় যে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কের কাজ অনেক ভালো এবং আমানতকারী ও গ্রাহকগণের সঙ্গে তাদের একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠতো। ঠিক এই কারণেই, ষ্টেট ব্যাঙ্কে ব্যক্তিগত হিসেব খোলাতে কোন বাধা না থাকলেও সাধারণ লোক ষ্টেট ব্যাঙ্কে হিসেব না খুলে বেসরকারী ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কে হিসেব খুলতেন। স্কুল, কলেজের

শিক্ষক অধ্যাপক, ছোট ব্যবসায়ী, কৃষক এমন কি আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি পর্যন্ত সাধারণতঃ ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কে হিসেব খোলেন। তাঁরা ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখলে সেই টাকাটা বড় বড় ব্যবসায়ীর স্বার্থে ব্যবহৃত হতে পারে এ কথা জেনেও এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে ষ্টেট ব্যাঙ্কের বহু শাখা থাকলেও সাধারণ লোক কেন বেসরকারী ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখেন? সাধারণ মানুষ যৎ সামান্য যে টাকা ব্যাঙ্কে সঞ্চয় করেন, সেই টাকাটা নিরাপদ থাকবে কিনা সেটাই শুধু দেখেন, সেই সঞ্চিত অর্থ কে কোথায় কি রকমভাবে ব্যবহার করছে তা নিয়ে মাথা ঘামান না। তিনি যদি যুক্তিসঙ্গত সুদ পান, সর্বোপরি সহানুভূতিশীল সাহায্য ও চটপট কাজ পান, তাহলেই তিনি সন্তুষ্ট। আমার মনে হয় যে, আমানতকারীগণ এই যে ব্যবহার পান, এইটে নিয়েই রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলিকে অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে। এই দিক দিয়ে ষ্টেট ব্যাঙ্ক বা জীবন বীমা কর্পোরেশন সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা খুব উৎসাহজনক নয়। কাজ-কর্ম্ম এবং ব্যবহার যদি ভালো না হয় (অথবা রাষ্ট্রায়ত্ব করার পূর্ব্বে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির কাজের যে মান ছিল অন্ততঃ-পক্ষে সেই মান যদি বজায় না রাখা হয়) তাহলে সাধারণ মানুষ যাঁদের সঞ্চয়ও সামান্য, তাঁরা হয়তো রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলিতে অর্থসঞ্চয় করতে ইতস্ততঃ করবেন।

সমগ্রভাবে বিচার করলে অবশ্য সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির সম্পদ থেকে উপকৃত হন না। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির সম্পদ যদি, কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ায় এবং আয় হয় এই ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়নে কাজে লাগানো হয় তাহলে সাধারণ মানুষ নিশ্চয়ই উপকৃত হবেন। এই ধরণের প্রকল্পগুলিতে অর্থ বিনিযোগ করাই সরকারের নীতি হবে বলে আশা করা যায়।

ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্ব করায় এর প্রভাব বেসরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ছোট কৃষক ও বৃত্তিজীবিগণের পক্ষে ভালো বা খারাপ হবে কিনা তা এই সব ব্যাঙ্কের লগ্নী নীতির ওপর নির্ভর করবে। তবে আশঙ্কা করা হচ্ছে যে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক দিক থেকে অপেক্ষাকৃত কম প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, নতুন সরকারী পরিচালক-বর্গের সঙ্গে খুব সহজে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন না বলে তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া কঠিন হবে। সরকারী তরফের সংস্থাগুলি স্বভাবতঃই রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলি থেকে বেশী আর্থিক সাহায্য পাবে এবং এর ফলে সমগ্রভাবে সরকারী তরফের সংস্থাগুলিই শেষ পর্য্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

আমানত স্থানান্তরকরণ

যে সব ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ব করা হয়নি সেগুলিতে স্বল্প সঞ্চয়কারীগণের জমা টাকা স্থানান্তরিত করার সম্ভাবনা খুব কম। তবে তাঁদের মধ্যে কিছু হয়তো রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের পরিবর্ত্তে পোষ্ট অফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে হিসেব খুলতে পারেন। কিন্তু সরকারের হাতে মোটামুটি যে আর্থিক ক্ষমতা থাকবে, তার ওপরে এরা কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবেনা। তবে বড় বড় শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি হয়তো বিদেশী ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলিতে তাঁদেব হিসেব স্থানান্তর করবেন। কারণ এগুলি, প্রাক্তন ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির মতোই ঋণ দেওয়া, আমানতের পরিমাণ গোপন রাখা, উচ্চতর হারে সুদ দেওয়া ইত্যাদির মতো সুবিধে-গুলি দেবে। বর্ত্তমানে দেশে এই ধরণের ১৫টি ব্যাঙ্ক রয়েছে এবং এগুলিতে মোট আমানতের পরিমাণ হ'ল প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা। এখনও যে ৪৫টি তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ব করা হয়নি, বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি সেদিকেও তাঁদের মনযোগ নিবদ্ধ করতে পারে। এগুলির সম্মিলিত আমানতের পরিমাণ হ'ল প্রায় ১০০০ কোটি টাকা। যে সব ব্যাঙ্ক তপশীলভুক্ত নয়, কোন কোন বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হয়তো সেগুলির বেশীর ভাগ শেয়ার কিনে নিয়ে সেগুলির নিয়ন্ত্রণ ভার নিজেদের হাতে নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। বর্ত্তমানে যে ১৭টি অতপশীলী ব্যাঙ্ক আছে যেগুলির আমানতের পরিমাণ প্রায় ২৭ কোটি টাকা, তাঁরা সেগুলিকে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করতে পারেন। এই সব ব্যাঙ্কের বেশী শাখা না থাকলেও তারা বড় বড় ব্যবসায়ীর আমানতের রক্ষক হিসেবে কাজ করতে পারে।

বিদেশী ব্যাঙ্ক এবং যে সব ভারতীয় ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ব করা হয়নি (তপশীলভুক্ত অথবা অতপশীলী) সেই সব ব্যাঙ্কের কাজকর্ম্ম আগামী দুই তিন বছর ধ'রে খুব সতর্কভাবে নিরীক্ষণ করতে হবে যাতে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলি থেকে বেশী পরিমাণে আমানত অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে থাকলে সময়মতো ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়। কাজেই সমস্ত ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ব করাই উচিত ছিলো আর তাতে সমগ্র ঋণ ব্যবস্থাটাই সরকারের নিয়ন্ত্রণে এসে যেতো। উপযুক্ত সংখ্যক পরিচালকের অভাব থাকাতেই হয়তো সরকার তা করেননি। কাজেই রাষ্ট্রায়ত্ব নতুন ব্যাঙ্কগুলির কাজ-কর্ম্মের ক্ষেত্রে গত বছরে গৃহীত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলি যাতে বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। একথা অবশ্য সত্যি যে এর পরেও আমাদের দেশীয় প্রথার হুণ্ডি ও বিল বিনিময়কারী ব্যাঙ্কাররা থাকবেন। তবে সমস্ত ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কের কাজকর্ম্ম যদি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এসে যায়, তাহলে এঁরা বেআইনী কাজ করার খুব বেশী সুযোগ পাবেন না, যদিও আইন প্রনয়ণ ক'রে এঁদের কাজকর্ম্ম নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন।

আমি যথোপযুক্ত সময়ে ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসায় এবং খনি-গুলি রাষ্ট্রায়ত্ব করার পক্ষ-পাতী। আমার এই পক্ষপাতী-ত্বের কারণ হল এই যে, এগুলি হচ্ছে (আর্থিক ব্যবস্থার) মূল ভিত্তি।

—জওহরলাল নেহরু
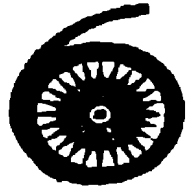
★ যে কোনোও দেশে বিশেষ করে যে দেশ দরিদ্র, সে দেশের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ করা এবং বিভিন্ন শ্রেণী ও অঞ্চলের মধ্যে অসাম্য দূর করা অত্যন্ত কঠিন বলে সেখানে অর্থনীতির মূল ক্ষেত্রগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন।

★ যে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যাঁদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ আছে, ব্যাঙ্কগুলি তাঁদের সঞ্চিত অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ করে দেশের লক্ষ লক্ষ অল্প-বিত্ত কৃষক, ব্যবসায়ী অথবা যাঁরা অন্য কোন বৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা অর্জন করেন, তাঁরা প্রয়োজনের সময়ে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেতে পারেন। এমন কি সুপ্রতিষ্ঠিত ছোট বড় শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি যদি উপযুক্ত সর্তে ব্যাঙ্ক থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ না পান, তাহলে তাদের কাজও চলতে পারে না, সেগুলির কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত হতে পারে না।

★ আমাদের দেশে শিক্ষিত যুবক যুবতীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে, ব্যাঙ্কগুলিতে তাদের অনেকের কর্ম সংস্থান হয় আর সেটা একদিক দিয়ে সমাজ সেবাও বলা যায়। যাদের নিজেদের কোন ব্যবসায় নেই, তারা ব্যাঙ্কগুলি থেকে ডাক বা সেল ব্যবস্থার মতোই দৈনন্দিন জীবনে কতকগুলি সুবিধে পান। ..

★ ব্যাঙ্ক হচ্ছে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, যার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির সংযোগ থাকে—এবং এই সংযোগ থাকাই উচিত, তার একটা বৃহত্তর সামাজিক লক্ষ্য থাকা বাঞ্ছনীয় এবং তা জাতীয় অগ্রাধিকার ও উদ্দেশ্যগুলির সহায়ক হওয়া আবশ্যক।

★ আমরা এখন যে ব্যবস্থা গ্রহণ করলাম তা আমাদের এ যাবৎ অনুসৃত নীতিরই একটি অঙ্গ। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে, এই ব্যবস্থা, আমাদের বিঘোষিত পরিকল্পনা ও নীতিগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে একটা নতুন উৎসাহব্যঞ্জক পরিবর্তন আনবে। তবে এটা ব্যাপক রাষ্ট্রীয়করণের সূচনা নয়। অথবা, যে সম্পদ পূর্বাহ্নেই অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হয়েছে তা অন্য কোনোও ক্ষেত্রে সরিয়ে আনার চেষ্টা নয়।

★ যে ক্ষেত্রগুলির অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত ছিল এবং যেগুলি এ পর্যন্ত কম বেশী উপেক্ষিত হয়েছে....সেই সব ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যাপক ব্যবহার এখনও সম্ভব হয়নি এবং এর জন্যে দীর্ঘকাল অবিরাম চেষ্টা করে যেতে হবে।

★ এই ক্ষেত্রগুলি হ'ল—

(১) মুষ্টিমেয়ের হাত থেকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন ক্ষমতা সরিয়ে আনা,

(২) কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প এবং রপ্তানীর জন্য যথেষ্ট ঋণের সংস্থান করা,

(৩) ব্যাঙ্কের পরিচালনা ব্যবস্থায় ব্যবসায়িক দক্ষতা আনা,

(৪) শিল্পাদি প্রতিষ্ঠায় নতুন শ্রেণীর উদ্যোগীগণকে উৎসাহিত করা,

(৫) ব্যাঙ্কের কর্মীদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং তাঁদের চাকরি সম্পর্কে ন্যায়সঙ্গত সর্তাদির ব্যবস্থা করা। এই লক্ষ্যগুলি তাড়াতাড়ি পূরণ করার জন্য রাষ্ট্রীয়করণ প্রয়োজন। তবে ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করলেই এই উদ্দেশ্যগুলি সফল হবে না

★ এখন আমরা কৃষিতে ও শিল্পে, রপ্তানীতে এবং আমদানীর বিকল্প দেশেই তৈরি করার ব্যাপারে বিরাট অগ্রগতি করার প্রাক মুহূর্তে উপনীত। আমাদের কৃষক শ্রমিক এবং শিল্পপতিদের উৎসাহ ও উদ্যমের ফলে, শিল্পগুলির যে উৎপাদন ক্ষমতা ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে, তার ফলে এবং সুশিক্ষণ প্রাপ্ত পরিচালক ও দক্ষকুশলী কর্মীগণের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা আমাদের যে সুযোগ এনে দিয়েছে আমরা তা সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে চাই।

★ সমস্ত সম্পদ সংহত করে উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা সুনিশ্চিতভাবে বিনিয়োগ করার জন্য আমাদের দৃঢ়তার সঙ্গে চেষ্টা করতে হবে। নতুন পরিকল্পনা কালের সূচনায় আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করলাম, তা' এই মহান দেশের জন্য আমাদের সকলের আশা আকাঙ্খা চরিতার্থ করার সহায়ক হবে

-ইন্দিরা গান্ধী

REGD. NO. D-233

১৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের মোট আমানত ও অগ্রিম (দাদন)

১৯৬৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত
(কোটি টাকায়)

সংকেত সমূহ

মোট আমানত

অফিস সংখ্যা

স্থাপনের বছর

400
300
200
100
0
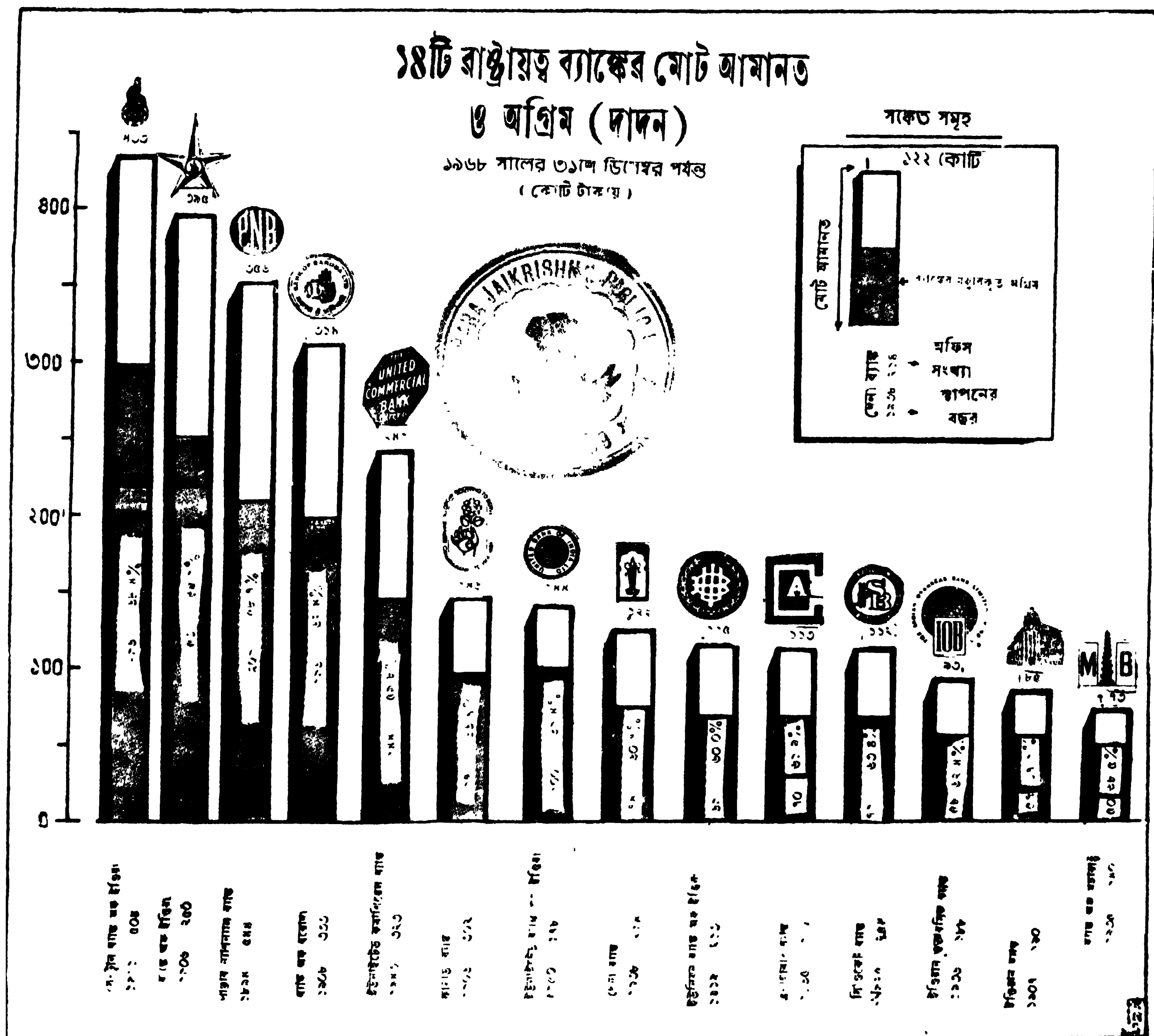
"ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের লক্ষ্য হ'ল কৃষিক্ষেত্রে, ক্ষুদ্র শিল্পে ও রপ্তানীতে দ্রুত অগ্রগতি করা, নতুন নতুন উদ্যোগী ব্যক্তিকে উৎসাহিত করা এবং সমগ্র অনগ্রসর এলাকার উন্নতি বিধান করা।"

—ইন্দিরা গান্ধী

ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সোসাইটি লিঃ—করোলবাগ, দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত এবং ডিরেক্টার, প্যাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত।
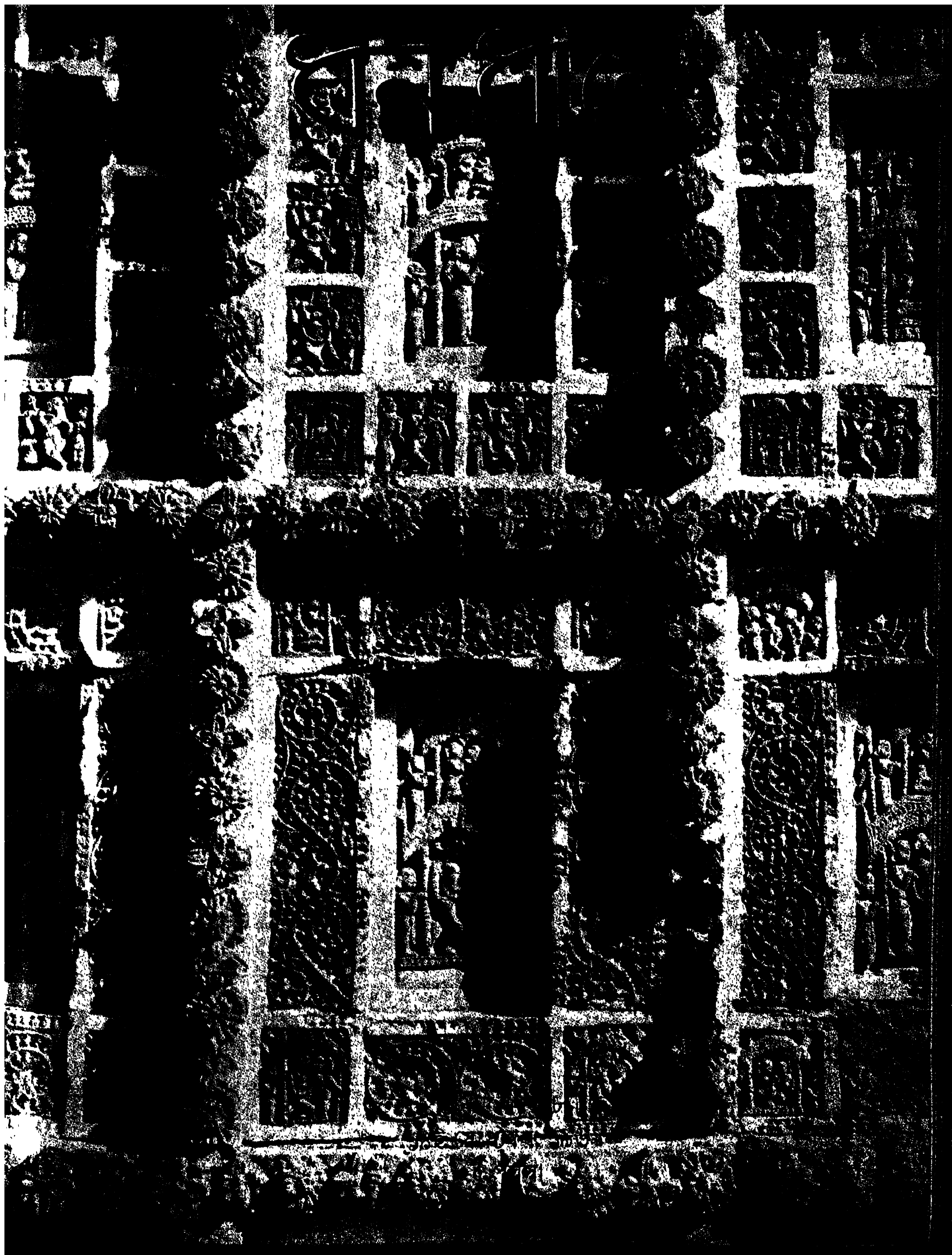
ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত
পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

প্রথম বর্ষ অষ্টম সংখ্যা

১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ : ২৩শে ভাদ্র ১৮৯১
Vol. I : No 8 : September 14, 1969

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

প্রধান সম্পাদক
শরদিন্দু সান্যাল

সহ সম্পাদক
নীরদ মুখোপাধ্যায়

সহকারিণী (সম্পাদনা)
গায়ত্রী দেবী

সংবাদদাতা (কলিকাতা)
বিবেকানন্দ রায়

সংবাদদাতা (মাদ্রাজ)
এস. ভি. রাঘবন

সংবাদদাতা (দিল্লী)
পুস্করনাথ কৌল

ফোটো অফিসার
টি. এস. নাগরাজন

প্রচ্ছদপট
ফটো ডিভিশন,
কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রক

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০

টেলিগ্রাফের ঠিকানা—যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

ভুলি নাই

কোনও সংগঠনের মধ্যে একাধিক গোষ্ঠী থাকলে এবং তারা যে কোন প্রকারে একে অন্যকে ভয় দেখিয়ে নিজেদের কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা ক'রে যেতে থাকলে সে সংগঠন কখনও ভালোভাবে চলতে পারেনা।

—মহাত্মা গান্ধী

সংখ্যায়

প্রচ্ছদ ঃ বিষ্ণুপুরের একটি মন্দিরের তোরণ

ধনধান্যে-তে কেবল অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। প্রবন্ধাদি অনধিক পনের শত শব্দের হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট ও গোটা গোটা অক্ষরে লিখলে ভালো।

সামাজিক নিরাপত্তার পথে
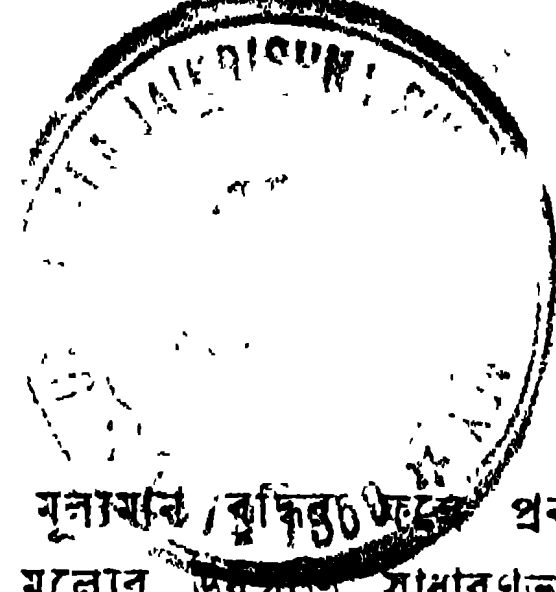
কেন্দ্রীয় সরকারের অবসরপ্রাপ্ত অগণিত কর্মচারীর অধিকাংশের কাছে অবসর জীবন হ'ল বিগত কর্মজীবনের স্মৃতিচারণ। গতকাল ও আগামীকালের সন্ধিক্ষণটুকুতে তাঁদের বর্তমান সীমিত ও বিড়ম্বিত। কিছু নারী সমেত এই অসংখ্য কর্মক্লান্ত পুরুষের সংখ্যা হবে ৬ লক্ষের মত। এঁরা সময় অন্তে রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ ক'রে বিস্মৃত নায়ক নায়িকার মত যবনিকার অন্তরালে চলে যান। এঁদের জীবন সায়াহ্ন কর্মতৃপ্ত দিনগুলির শেষে শান্তিপূর্ণ বিশ্রামের আশ্বাস বয়ে আনে না। দীর্ঘদিনের কর্মব্যস্ত জীবন ছেড়ে সহসা কর্মহীন অখণ্ড অবসরের সম্মুখীন হওয়ার বেদনাই শুধু নয়, পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে টাকার ক্রমশঃ-সঙ্কুচিত-মূল্যের যোগসূত্র বজায় রাখার অক্লান্ত প্রচেষ্টা এঁদের অবসরজীবনের একমাত্র বাস্তব ছবি।

এঁদের মধ্যে যে কজন সৌভাগ্যবান, যথাসময়ে, বার্দ্ধক্যের জন্যে কিছু সঞ্চয় ক'রে রাখতে পারেন কিংবা যাঁদের পাশে দাঁড়াবার কেউ আছে, অবসর জীবন তাঁদের কাছে চিন্তাহীন বিশ্রামের; শান্তির আশ্বাসে পরিতৃপ্ত। কিন্তু অধিকাংশের কাছে অবসরজীবন অনটনের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রামের নামান্তরমাত্র। বিশেষতঃ 'আমি অপ্রয়োজনীয়', 'সকলের মাঝে অপাঙক্তেয়'—এই ভাবনা তাঁদের জীবন আরও অসহনীয় করে তোলে। ক্ষোভের বিষয়, কিছু লোক পেন্সনকে অনুকম্পার দান ব'লে গণ্য করেন এমন কি আশা করেন যে, এই দানটুকুর জন্য পেন্সানাররা কৃতজ্ঞ ও বাধিত বোধ করবেন।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাসিক ২০০ টাকা বা তার কম মাহিনা যাঁদের, তাঁদের পেন্সনের হার ১০ টাকা বাড়ানো সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা নিঃসন্দেহে সুখের ও আনন্দের। তা ছাড়া সরকার যথাকালে এই বিস্মৃতপ্রায় গোষ্ঠীর সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন, এই ঘোষণায় তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কার্যকারিতার দিক থেকে ১০ টাকা বাড়ানোর গুরুত্ব সামান্য কিন্তু এই পর্যায়ভুক্ত অসংখ্য মানুষ যে সুদীর্ঘকাল পরে এতে খানিকটা সমবেদনার স্পর্শ পাবেন তার মূল্যও কম নয়। তা ছাড়া পেন্সানারদের আবেদন (বা দাবী) যে উপেক্ষা করা হয়নি এ তারও একটা স্বীকৃতি। স্মরণ থাকতে পারে যে, ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে সরকার পেন্সনের পরিমাণ ৫ থেকে ১০ টাকার মধ্যে বাড়িয়েছিলেন। এবারে ১০ টাকা ভাতা বাড়াবার প্রতিশ্রুতির অর্থ হ'ল এই খাতে সরকারের ব্যয় বছরে ৮ কোটি টাকার মত বাড়বে।

বছরের পর বছর জীবন ধারণের ব্যয়ের মাত্রা বেড়ে চলেছে। অতএব পেন্সনের পরিমাণ বাড়ানোর দাবী অযৌক্তিক নয় কারণ মূল্যমান বৃদ্ধির ফলে প্রকৃত আর্থিক মূল্য কমেই চলেছে। মূল্যের ঊর্ধ্বগতি সাধারণভাবে বাঁধা মাইনের সব লোকের জীবনেই জটিলতা সৃষ্টি করেছে কিন্তু পেন্সানারদের দুর্ভোগের তুলনায় তা কিছুই নয়।

একাধিক সংসদীয় কমিটি পেন্সানারদের অবস্থা বিচার বিবেচনা ক'রে পেন্সন বাড়াবার সুপারিশ করেছেন। এ কথাও সত্য যে, সরকারের সঙ্গতি, উন্নতিকামী দেশের সম্প্রসারণশীল অর্থনীতির নানা দাবী এবং অগ্রাধিকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান চাহিদার দরুণ যেরকম ক্লিষ্ট; তাতে পেন্সানারদের সমস্যার কথা পেছনে পড়ে যায়। অবস্থা যাই হোক পেন্সানারদের প্রয়োজন উপেক্ষা করা কিংবা তার গুরুত্ব অগ্রাহ্য করা অসঙ্গত ও অন্যায় হবে।

সরকারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের অপ্রয়োজনীয় ব'লে একেবারে কেটে বাদ দেওয়া চলে না। তাঁদের কর্মক্ষমতা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থেকে সমাজ আজও উপকৃত হতে পারে। নীরব দর্শকমাত্র না হয়ে তাঁদের মধ্যে অনেকেই সামাজিক জীবনে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেন। যাঁরা শারীরিক অক্ষমতা বা বার্ধক্যবশতঃ তেমন ভূমিকা নিতে অপারগ, তাঁদেরও অপাঙক্তেয় বা অপ্রয়োজনীয় গণ্য করার কারণ নেই। এই মানুষগুলি জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টুকু সরকারের সেবায়, অথবা অন্য কথায়, সমাজের কল্যাণে উৎসর্গ করেছেন। তাই সমাজ তাঁদের কাছে ঋণী। পেন্সন তাঁদের প্রাপ্য—বস্তুতঃ পক্ষে এটা তাঁদের ঋণ পরিশোধের সমতুল্য। এঁদের দিকে দৃষ্টি রাখাও সরকারের কর্তব্য এবং সরকার যে প্রকৃতই এই কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ এটা আনন্দের বিষয়।

এই সব ব্যবস্থা সরকারের মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়বাহী। কারণ সমাজের এই গোষ্ঠী যেমন সঙ্ঘবদ্ধ অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির মত নন, তেমনি সেই কারণেই সমাজ জীবনে তাঁদের দলগত প্রভাব প্রতিপত্তিও থাকে না। কর্মজীবন থেকে অবসর নিলেই এঁরা বিস্মৃত উপেক্ষিতের দলে পড়ে যান।

অবসরভাতা বৃদ্ধির এই ব্যবস্থা পেন্সানারদের সমস্যা সমাধানের পূর্ণ ব্যবস্থা নয় এ কথা সরকারেরও অজানা নয়। বিশেষ ক'রে, এঁরাই একমাত্র নন, যাঁদের প্রতি কল্যাণকামী রাষ্ট্রের কল্যাণ দৃষ্টি পড়া প্রয়োজন। স্পষ্টতঃই বৃদ্ধ বা অক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যে কোনোও কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের কর্তব্যের অঙ্গ। ইতিমধ্যে সামাজিক নিরাপত্তার জন্যে এই ধরনের আংশিক ব্যবস্থা গ্রহণে আগামী সুদিনের পূর্বাভাষ পাওয়া যাচ্ছে।

১৯৬৯-৭০ সালের বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য

জাতীয় আয়ের হার শতকরা ৫.৫ ভাগ বৃদ্ধি

১৯৬৯-৭০ সালের বার্ষিক পরিকল্পনায় বিনিয়োগের পরিমাণ ধরা হয়েছে ২২৭১ কোটি টাকা। এটা হ'ল চতুর্থ পরিকল্পনার মোট বিনিয়োগের শতকরা ১৫.৮ ভাগ। ১৯৬৯-৭০ সালের পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্যগুলি হল :

(১) গত বছরের শতকরা ১১.৩ ভাগের তুলনায়, এই বছরে বিনিয়োগের হার বাড়িয়ে, জাতীয় আয় শতকরা ১২ ভাগ করা।

(২) ১৯৬৮-৬৯ সালের তুলনায় এই বছরে সরকারী তরফে নির্দ্দিষ্ট লগ্নীর পরিমাণ শতকরা ১০ ভাগ বেশী করা।

(৩) কৃষি উৎপাদন শতকরা ৫ ভাগ এবং সংহত শিল্পের উৎপাদন শতকরা ৮ ভাগ বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় শতকরা ৫.৫ ভাগ হারে বাড়বে বলে আশা করা যাচ্ছে।

(৪) ১৯৬৮-৬৯ সালের পর্য্যায়ে দ্রব্য-মূল্য স্থিতিশীল করার চেষ্টা করা হবে।

(৫) রপ্তানীর পরিমাণ শতকরা আরও ৭ ভাগ বাড়িয়ে এবং দেশীয় দ্রব্যাদির ব্যবহার আরও বাড়িয়ে ১৯৬৮-৬৯ সালে নীট যে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া গেছে পরিশোধযোগ্য ঘাটতির পরিমাণ সেই সীমা পর্য্যন্ত রাখার চেষ্টা করা হবে।

লগ্নী এবং সঞ্চয়

যে বার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় লগ্নীর হার যেখানে ১৯৬৫-৬৬ সালে ছিলো শতকরা ১৩ ভাগ তা ১৯৬৮-৬৯ সালে কমে গিয়ে হয়েছে শতকরা ১১.৩ ভাগ। এই লগ্নীর হার শতকরা ১২ ভাগ করাই ছিলো লক্ষ্য। ১৯৬৯-৭০ সালে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধির সঙ্গে এই লক্ষ্যের যোগ ছিলো।

বৈদেশিক সাহায্যের (পরিশোধযোগ্য ঋণ ছাড়া) সঙ্গে জাতীয় আয়ের অনুপাত ১৯৬৭-৬৮ সালে শতকরা ৩.৫ ভাগ থেকে কমে গিয়ে ১৯৬৮-৬৯ সালে শতকরা ২.৫ ভাগে দাঁড়ায়। এটা আরও কমে গিয়ে ১৯৬৯-৭০ সালে শতকরা ২.৩ ভাগে দাঁড়াবে ব'লে অনুমান করা হয়েছিলো। আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার ১৯৬৭-৬৮ সালের শতকরা ৭.৮ থেকে বেড়ে ১৯৬৮-৬৯ সালে শতকরা ৮.৮ ভাগে দাঁড়ায় এবং ১৯৬৯-৭০ সালে তা আরও বেড়ে শতকরা ৯.৭ ভাগে দাঁড়াবে ব'লে আশা করা যাচ্ছে।

১৯৬৮-৬৯ সালের তুলনায় সরকারী তরফের প্রকল্পগুলিতে স্থায়ী লগ্নী হিসেবে ১৯৬৯-৭০ সালে আরও ১,৮৫ কোটি টাকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ১৯৬৯-৭০ সালে সরকারী তরফে আনুমানিক ব্যয় এবং লগ্নী নীচে দেওয়া হ'ল :

১৯৬৯-৭০ সালের বার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষিতে মোট উৎপাদন শতকরা ৫.৫ ভাগ বাড়বে ব'লে ধরা হয়েছে। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কৃষি সম্পর্কে নতুন ব্যবস্থা অনুসারে কৃষির উৎপাদন বাড়ানোর জন্য নিবিড় কৃষি কর্ম্মসূচী আরও সম্প্রসারিত করা হবে।

১৯৬৭-৬৮ সালের শেষের দিক থেকে শিল্পগুলিতে উৎপাদন বাড়তে শুরু করে এবং ১৯৬৮-৬৯ সালেও এই বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। ১৯৬৮-৬৯ সালের শতকরা ৬.২ ভাগ উন্নয়নের হার, ঐ বছরের পরিকল্পনার লক্ষ্যের প্রায় সমান। কৃষি ভিত্তিক শিল্পগুলি কাঁচা মাল বেশী পাওয়ায়, কৃষি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আয় বেশী হওয়ায়, নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায়, কয়েকটি ইঞ্জিনিয়ারীং দ্রব্যের রপ্তানী খুব বেড়ে যাওয়ায় এবং ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ঋণের সুযোগ সুবিধে বেশী দেওয়ায় মন্দা

প্রকল্প	১৯৬৮-৬৯ সালের আনুমানিক ব্যয় (কোটি টাকায়)	১৯৬৯-৭০ সালের বার্ষিক পরিকল্পনায় যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে (কোটি টাকায়)
বোকারো ইস্পাত	১১০.০	১৭০.০
কয়লা কোরবা এ্যালুমিনিয়াম	৩.০	৮.৮
হিন্দুস্তান তামা	৬.১	১৭.০
রাসায়নিক সার কর্পোরেশন	২৪.৩	৫০.০
গুজরাট পেট্রো-কেমিক্যালস্	১.১	৭.০
হিন্দুস্তান অর্গানিক কেমিক্যালস্	৪.০	৬.০
অয়েল এবং ন্যাচারেল গ্যাস কমিশন	২২.০	৫৮.০
জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানার উন্নয়ন	৪.৬	৬.৫
বন্দর উন্নয়ন	২৪.২	৩০.৩
জাহাজ চলাচল	১৭.৯	২০.৮
অন্যান্য প্রকল্প	১৫৬৭.৮	১৫৯৫.৬

কাটিয়ে ওঠা সম্ভবপর হয়। তবে প্রধানতঃ অন্তর্ব্বর্ত্তী এবং নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের শিল্পগুলিতেই উৎপাদন ক্ষমতা বেশী ব্যবহৃত হয়।

কাঁচামাল বিশেষ ক'রে পাট, তুলো, চীনাবাদামের মত কৃষিভিত্তিক শিল্পগুলির জন্য কাঁচামাল বেশী পাওয়াতে, অতিরিক্ত আয় হওয়ায়, নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায়, রপ্তানী বৃদ্ধি পাওয়ায়, শিল্প ইত্যাদির ক্ষেত্রে উৎসাহ বাড়ায়, সরকারী ও বেসরকারী তরফে লগ্নীর পরিমাণ বাড়ায়, ১৯৬৯-৭০ সালে শিল্পোৎপাদনের হার আরও বেড়ে শতকরা ৮ ভাগে দাঁড়াবে ব'লে আশা করা যাচ্ছে।

পাইকারি দর

বিবরণীতে বলা হয়েছে যে ১৯৬৮-৬৯ সালের বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিলো পাইকারি দরের সূচী ১৯৬৭-৬৮ সালের গড়পড়তা দরের পর্য্যায়ে স্থিতিশীল করা এবং সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। ১৯৬৮-৬৯ সালের গড়পড়তা হার ছিলো ২১০.২ এবং পূর্ব্ব বছরে গড়পড়তা হার ছিলো ২১২.৪। ১৯৬৮ সালের জুলাই মাস পর্য্যন্ত পাইকারি দরের সূচী ২০৫ এর কাছাকাছি স্থির ছিলো। তারপরই এই সূচী খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে গিয়ে ১৯৬৮ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর ২২২.১ পর্যান্ত ওঠে।

তারপর থেকে মরসুম অনুযায়ী পাইকারি দর নামতে থাকে এবং ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত দরের নিম্নগতি অব্যাহত থাকে। ফসল ওঠার পর, দর এতো কমে যায় যে পূর্ব্বের দরবৃদ্ধির প্রভাবও কেটে যায় এবং পূর্ব্ব বছরের তুলনায় এই বছরে সমগ্রভাবে পাইকারি দরসূচী শতকরা ১.১ ভাগ কম থাকে।

১৯৬৯-৭০ সালের প্রথমদিকে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের হাতে ৪৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য মজুদ ছিলো। মজুদ খাদ্যশস্যের পরিমাণ বেশ ভালো হওয়ার ফলে বাজারে কার্য্যকরীভাবে প্রভাব বিস্তার ক'রে খাদ্যশস্যের দর স্থির রাখা সম্ভব হবে।

বৈদেশিক বাণিজ্য

বর্ত্তমান বছরের বার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে ১৯৬৮-৬৯ সালে রপ্তানীর মূল্য শতকরা ১৩.৫ ভাগ বেড়ে ১৩৫০ কোটিতে দাঁড়ায়। যে সব দ্রব্যাদি সাধারণতঃ রপ্তানী করা হয় সেগুলির রপ্তানী যেমন বেড়েছে সেগুলি ছাড়া অন্যান্য জিনিষের রপ্তানী বেড়েছে শতকরা ৬০ ভাগ। অপরপক্ষে আমদানীর পরিমাণ ক্রমশঃ কমে আসছে। ১৯৬৮-৬৯ সালে আমদানীর মোট মূল্য ছিলো ১,৮৬২ কোটি টাকা আর ১৯৬৭-৬৮ সালে এই পরিমাণ ছিলো ২,০০৮ কোটি টাকা।

রপ্তানী বাড়ায় এবং আমদানী কমায় বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি অপেক্ষাকৃত কম হয়েছে। কাজেই বৈদেশিক সাহায্য কম নিয়ে এবং ঋণের জন্য উচ্চহারে সুদ দিয়েও লেনদেনে সমতা রাখা সম্ভবপর হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বরং আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের ৫৯ কোটি টাকার ঋণ পরিশোধ করা সম্ভবপর হয়েছে এবং বৈদেশিক বিনিময়ের সংরক্ষিত তহবিলে ৩৮ কোটি টাকা জমা দেওয়াও সম্ভব হয়েছে।

লগ্নী

বার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হয়েছে লগ্নীর দিক থেকে বলতে গেলে ১৯৬৮-৬৯ সালের আনুমানিক ব্যয়ের তুলনায় ১৯৬৯-৭০ সালে লগ্নীর পরিমাণ ১.৮৫ কোটি টাকা বেশী হবে। এই বছরের পরিকল্পনার জন্য যে ২,২৭১ কোটি বিনিয়োগ করা হবে তা ছাড়াও উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্ম্মসূচীগুলির জন্য প্রায় ২,১০ কোটি টাকা 'পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত ব্যয়' হিসেবে লগ্নী করা হবে। এই ব্যয়টাকেও যদি অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহ'লে মোটামুটিভাবে ১৯৬৮-৬৯ সালের জন্য উন্নয়ন কর্ম্মসূচীগুলির খাতে যে ব্যয় ধরা হয়েছিল সেই তুলনায় ১৯৬৯-৭০ সালে বেশী ব্যয় করা হবে।

বিবরণীতে অবশ্য এটাও দেখানো হয়েছে যে পূর্ব্ব বছরে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিলো ২,৩৫৬ কোটি টাকা অর্থাৎ বর্ত্তমান বছরের তুলনায় ৮৫ কোটি টাকা বেশী। এর কারণ হ'ল পর্ব্ব বছরের বার্ষিক পরিকল্পনায় নগদ ক্ষতি মেটানোর জন্য ৩৫ কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৬৯-৭০ সালের লগ্নীতে এর জন্য কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি যদিও অনুমান করা হচ্ছে যে এই খাতে প্রায় ৪৫ কোটি টাকা ব্যয় বাড়বে।

বার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে ১৯৬৯-৭০ সালের বার্ষিক পরিকল্পনায় প্রকল্প বা কর্ম্মসূচীগুলি অন্তর্ভুক্ত করার সময়ে পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত কর্ম্মসূচী এবং পূর্ব্ব বছরের অসমাপ্ত কাজের ব্যয় যেগুলি এ বছরেও চলবে, সেগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিল্পাদির যে উৎপাদন ক্ষমতা ইতিমধ্যে গড়ে তোলা হয়েছে, সেগুলি যাতে পূর্ণতরভাবে ব্যবহার করা যায় সেই ধরণের কর্ম্মসূচীগুলির ওপরেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যত উন্নয়ন অব্যাহত রাখার জন্য কয়েকটা নতুন প্রকল্প ও কর্ম্মসূচী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কয়েক রকমের কর্ম্মসূচী তৈরী করার সময়ে এবং নতুন প্রকল্প ও কর্ম্মসূচী স্থির করার সময়ে, উপকারগুলি অনেকেই যাতে ভোগ করতে পারেন সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলসমূহ

১৯৬৯-৭০ সালের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলির মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হ'ল ৮,৯৮ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় তরফের পরিকল্পনায় যে বিনিয়োগ করা হবে তা নিয়ে (জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এগুলির সম্পূর্ণ ব্যয় এখন থেকে কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবেন), রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলিতে যে বিনিয়োগ করা হবে, তা ১৯৬৯-৭০ সালের পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের শতকরা ৪৮ ভাগ দাঁড়াবে। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ যে মূলনীতি স্থির ক'রে দেন সেই অনুযায়ী রাজ্যে কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়াবে ৬,১৫ কোটি টাকা। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির প্রতিনিধিগণের সঙ্গে আলোচনা ক'রে পরিকল্পনা কমিশন কেন্দ্রীয় সাহায্যসহ (বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হয়েছে) বিভিন্ন রাজ্যের জন্য যে বিনিয়োগ অনুমোদন করেছেন তা (লক্ষ টাকার হিসেবে)

হল : অন্ধ্র প্রদেশ ৬,২০০ (৪,২৯০); আসাম ৩,৪২০ (৩,১১০), বিহার ৬,১৬০ (৬,০৪০); গুজরাট ৭,৫০০ (২,৮২০); হরিয়ানা ২,১২০, (১৪০০); জম্মু ও কাশ্মীর ২৩৫০ (২,১৫০); কেরালা ৩৪২০ (৩১১০); মধ্যপ্রদেশ ৪৯১১ (৪৬৭০); মহারাষ্ট্র ১১৫০০ (৪,৩৮০), মহীশূর ৫০৯০, (৩০৬০); নাগাভূমি ৬০০ (৬০০); ওড়িশা ১২২০, (২৮৪০); পাঞ্জাব ৪৪৯১ (১৭৯০); রাজস্থান ৯৩০০ (৩৮৯০); তামিলনাড়ু ৭২০০ (১৬০০), উত্তর প্রদেশ ১৬০০০ (৯৪০০); পশ্চিমবঙ্গ ৪১১৫ (৩৯৫০)। কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলির জন্য ১৯৬৯-৭০ সালে বিনিয়োগের পরিমাণ হ'ল (লক্ষ টাকায়) : আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ১৮১.৭০; চণ্ডীগড় ১৫৯; দাদরা নগরহাভেলি ৪০ ০৭; দিল্লী ২,৩৪০ ১২; গোয়া, দমন, দিউ ৬৬৮.৮৪; হিমাচল প্রদেশ ১,৫০০; লাক্ষাদিভি আমিনদিভি এবং মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জ ৪০ ০৮, মনিপুর ৪৭২; নেফা ৩৭২.৯১; পণ্ডিচেরী ২৩৭ এবং ত্রিপুরা ৫০০।

উন্নয়নের কয়েকটি প্রধান প্রধান খাতে ১৯৬৯-৭০ সালের বিনিয়োগ এবং ১৯৬৮-৬৯ সালের বিনিয়োগ ও ব্যয় দেওয়া হল :

	১৯৬৮-৬৯ সালের বার্ষিক পরিকল্পনা		১৯৬৯-৭০ সালের বার্ষিক পরিকল্পনা
	বিনিয়োগ	আনুমানিক ব্যয় (কোটি টাকায়)	বিনিয়োগ
কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট কর্ম্মসূচী *	৪৭০.৮	৪৫৫.৮	৩৩২.২
জলসেচ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ	১৫৫.৯	১৬৩.২	১৫৫.৬
বিদ্যুৎশক্তি	৩৪১.৭	৩৮৯.২	৩৬৭.১
শিল্প এবং খনিজ দ্রব্য	৫৩৯.৭	৪৯৪.৯	৫৭৯.৬
পল্লী এবং ক্ষুদ্র শিল্প	৪২.৪	৪৪.৪	৩৮.৫
পরিবহণ ও যোগাযোগ	৪২৮.০	৪২৮.৫	৪৪৭.৭
শিক্ষা	১২৫.৩	১২৯.১	৯৬.৮
বৈজ্ঞানিক গবেষণা	২২.০	২০.১	২১.৬
স্বাস্থ্য	৫৩.১	৫৫.০	৫৫.৩
পরিবার পরিকল্পনা	৩৭.০	৩৩.৪	৪১.৯
জল সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যরক্ষা	৩৫.৯	৩৮.২	৪৫.৭
গৃহ নির্ম্মাণ ও সহর উন্নয়ন	২৩.৫	২২.০	২৪.১
অনুন্নত শ্রেণীর কল্যাণ	২০.৯	২৫.৯	১৯.৩
সমাজ কল্যাণ	৪.৭	৪.৭	৪.৪
শ্রমিক কল্যাণ এবং কারুশিল্পী প্রশিক্ষণ	১৩.৭	১৩.৩	৬.৩
অন্যান্য কর্ম্মসূচী	৪১.৮	৪২.৮	৩৪.৪
মোট	২,৩৫৬.৪	২৩৬০.৫	২,২৭০.৫

* অতিরিক্ত মজুদসহ

প্রচুর ফলন বীজের যাদু

নাগা কৃষকদের কাছে তাইচুং-দিশী ১ ধানের বীজের নাম করাই যথেষ্ট। ওরা 'যাদুর বীজ' বলতে অজ্ঞান। হবে না কেন? অন্তত: কুকী ডাইলং গ্রামের মোড়ল হেনেবী সেমা এটিকে 'যাদুর বীজ' বলে মনে করেন। কারণ নির্দিষ্ট আয়তনের জমিতে সাধারণত: যে পরিমাণ ফসল হয় হেনেবী সেমার জমিতে তার চার গুণ ফসল হয়েছে, প্রতি একরে ১০০ মণ করে ধান।

নাগাভূমির কৃষি বিভাগ ও কোহিমার ভারত সরকারের ফীল্ড পাবলিসিটি বিভাগের মিলিত উদ্যোগে প্রচুর ফলন বীজ জনপ্রিয় করার অভিযান সুরু হয়। সেই সময় হেনেবী সেমা তাইচুং দিশী-১ বীজ ধানের কথা জানতে পারেন।

গোড়ায় ইতস্তত: করলেও (মনে মনে আদৌ বিশ্বাস হয়নি) সেমা এক টুকরো জমিতে এই বীজের চাষ করতে রাজী হলেন। সেমার জমির ফসলের ওপর নির্ভর করবে প্রচুর ফলন বীজের চাহিদা। অতএব কৃষিবিভাগ সার, কীটনাশক প্রভৃতি যোগালো এবং সেমাও সব নির্দেশ ঠিক ঠিক মেনে চাষ করলেন। সার প্রয়োগ, কীটনাশক ছড়ানো, জলসেচের পরিমাণ সব দেওয়া হ'ল নির্দেশমত। যথা সময়ে ফসল তুলে ওজন নেওয়া হ'ল—একরে ১০০ মণ কি তার কিছু বেশী।

এরপর আর কথা কী। সেমা নিজেই বলতে গেলে এই অভিযানের সাফল্য। সেমার ক্ষেতের ফসল দেখে গ্রামের অন্যান্যরাও এই নতুন বীজ বুনতে আগ্রহী হয়েছেন।

● হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড লিমিটেড, কেন্দ্রীয় পরিবহন দপ্তরের জন্য প্রশিক্ষণ জাহাজ টি. এস. ডাফরিন তৈরীর কাজে হাত দেবে। বর্তমান ডাফরিন জাহাজটির জায়গায় নতুন জাহাজটি নেওয়া হচ্ছে। এতে ২৫০ জন 'মার্চেন্ট নেভী ক্যাডেট'কে ট্রেনিং দেওয়া হবে।

হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড এ পর্যন্ত ৪১টি জাহাজ তৈরি করেছে। এই গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ভারতীয় নৌবহরের জন্য একটি 'নেভ্যাল ক্র্যাফট', একটি 'হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে জাহাজ', স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জন্যে একটি যাত্রী জাহাজ এবং সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশান, দি ভারত লাইন, দি গ্রেট ইষ্টার্ণ শিপিং কোম্পানী, দি নিউ ধোলেরা ষ্টীম শিপস্ এবং শিপিং কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের জন্য মালবাহী জাহাজ এবং কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগ ও মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাষ্টের জন্য ছোট জাহাজ।

ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণে অগ্রগতি সুনিশ্চিত

পরিকল্পনা কমিশন বলছেন "১৯৬৭-৬৮ সাল থেকেই অর্থনীতি ভালোর দিকে মোড় নেয়"

দেশের অর্থনীতি ১৯৬৭-৬৮ সাল থেকেই মোড় নিতে সুরু করে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ ভাগে যে চাপ পড়ে তাতে ঐ বছরের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত দেশের অর্থনীতিকে সেই চাপ সহ্য করতে হয় কিন্তু শেষ ছয় মাসে অগ্রগতির লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরিকল্পনা কমিশনের একটি বিবরণী অনুযায়ী ঐ বছরে জাতীয় আয় প্রকৃতপক্ষে শতকরা ৮.৯ ভাগ বেশী ছিল। এই তুলনায় ১৯৬৫-৬৬ সালে জাতীয় আয় শতকরা ৫.৬ ভাগ কমে গিয়েছিলো আর ১৯৬৬-৬৭ সালে তা সামান্য অর্থাৎ শতকরা ০.৯ ভাগ বেড়েছিলো। এই বছরে কৃষি উৎপাদন ১৬১.৮ পর্য্যন্ত বাড়ে অর্থাৎ পূর্ব্ব বছয়ের তুলনায় শতকরা ২২ ৬ ভাগ বেশী উৎপাদন হয়। শিল্পোৎপাদনের উন্নয়ন হার ছিলো ১৯৬৬-৬৭ সালের শতকরা ০.২ ভাগের তুলনায়, শতকরা ০.৫ ভাগ মাত্র। ১৯৬৪-৬৫ সাল থেকে শিল্পোৎপাদনে উন্নয়নের বার্ষিক হার যে রকমভাবে কমে আসছিলো সেটা প্রতিরোধ করে আবার যে অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে সেই হিসেবে এই সামান্য অগ্রগতিও বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। বিবরণীতে বলা হয়েছে যে ১৯৬৭-৬৮ সালে প্রথমত: মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ধরা হয়েছিলো ২২৪৬ কোটি টাকা। এর পরে কয়েকটি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অর্থ বিনিয়োগ সম্পর্কে পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করে বিনিয়োগের পরিমাণ ২২৪০ কোটি করা হয়।

কেন্দ্র, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলের মধ্যে পরিকল্পনা সম্পর্কে ২১১০ কোটি ব্যয় ভাগ করা হয়েছে এই রকমভাবে; কেন্দ্রের জন্য ১০৩০ কোটি, রাজ্যগুলির জন্য ১০২২ কোটি এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলির জন্য ৫৮ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ বছরে অর্থাৎ ১৯৬৫-৬৬ সালে পরিকল্পনার ব্যয় ছিলো ২৩২৯ কোটি টাকা, এই ব্যয় কমে ১৯৬৬-৬৭ সালে দাঁড়ায় ২১৬৫ কোটি টাকা। পরের বছরে পরিকল্পনা সম্পর্কিত প্রকৃত ব্যয় শতকরা আরও ৩.৫ ভাগ কমে যায়।

যে সব প্রকল্প নিয়ে কাজ চলছিলো, বিশেষ করে যেগুলি খুব তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ করা সম্ভব এবং যে সব কাজের জন্য ইতিমধ্যেই নানাধরণের শিল্পাদি স্থাপন করা হয়েছে, ১৯৬৭-৬৮ সালে সেগুলির জন্যই বেশীর ভাগ অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে। রপ্তানীযোগ্য দ্রব্যাদি বেশী উৎপাদন করা যায় এবং আমদানি না ক'রে দেশেই উৎপাদন করা সম্ভব এই ধরণের প্রকল্প ও কর্ম্মসূচীর ওপরেই প্রধানত: গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কৃষি উৎপাদন এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত কর্ম্মসূচী, সমাজসেবার ক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনা কর্ম্মসূচীর ওপরে সর্ব্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎশক্তি, পরিবহণ এবং যোগাযোগের মত সুযোগ সুবিধেগুলি সম্প্রসারিত করার ওপরেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিল্প এবং খনিজ দ্রব্যাদির ক্ষেত্রেও এগুলির ভিত্তি দৃঢ় করা সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

পরিকল্পনার জন্য অর্থের সংস্থান

প্রধান প্রধান ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে পরিকল্পনার ব্যয় এই রকমভাবে ধরা হয়: কৃষি সম্পর্কিত কর্ম্মসূচী ১১.৮৭; সমষ্টি উন্নয়ন এবং সমবায় ৩.৩৫; বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সহ প্রধান ও মাঝারি সেচ প্রকল্প ৬.৯২, বিদ্যুৎশক্তি ১৮.৭৪; শিল্প এবং খনি একক ২২.৬০; পল্লী এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ২.১০; পরিবহন এবং যোগাযোগ ১৮.৮৩; সমাজ সেবা ১৪.১০; এবং অন্যান্য কর্ম্মসূচী ১.৫০।

এই বছরে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির বাজেট থেকে প্রায় ৮৯৬ কোটি টাকার সংস্থান করা হয় অর্থাৎ পরিকল্পনার মোট বিনিয়োগের শতকরা ৪২.৯ ভাগের সংস্থান করা হয়। বৈদেশিক সাহায্য হিসেবে ৯৭০ কোটি টাকা অর্থাৎ বিনিয়োগের শতকরা ৪৬.৪ ভাগ পাওয়া যাবে বলে ধরা হয়। অবশিষ্ট ২২৪ কোটি টাকা অর্থাৎ শতকরা ১০.৭ ভাগ ঘাটতি রাখা হয়। অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান করার জন্য ১৯৬৬-৬৭ সালে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলি যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাতে ১৯৬৭-৬৮ সালে প্রায় ১৬৭ কোটি টাকা পাওয়া যায়। রাজ্যগুলি মোট যে অতিরিক্ত সম্পদ সংহত করেন তা হ'ল ১৯৬৭-৬৮ সালে ২২.৬ কোটি টাকা এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে ৪২.৬ কোটি টাকা।

রাজ্যের পরিকল্পনাগুলির জন্য ১৯৬৭-৬৮ সালে প্রথমত: ৫৯০ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় সাহায্য বরাদ্দ করা হয়, পরে তা বাড়িয়ে ৫৯৫ কোটি টাকা করা হয়। তবে প্রকৃতপক্ষে শেষ পর্য্যন্ত ৫৮০ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় সাহায্য বন্টন করা হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে রাজ্যগুলি যে অতিরিক্ত অর্থ নেয়, তা পরিশোধ করার জন্য ও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে সাময়িকভাবে ১১৮ কোটি টাকা ঋণ দেন।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি

দেশের প্রায় সমস্ত অঞ্চলে আবহাওয়ার অবস্থা ভালো থাকায় এবং প্রচুর ফলনের কর্ম্মসূচী অনুসারে গমের উৎপাদন বাড়ায় খাদ্য শস্যের উৎপাদন খুব বেশী হয়। পণ্যশস্যের উৎপাদনও যথেষ্ট বেড়ে যায়।

আলোচ্য বছরের শেষ ভাগে শিল্পোৎপাদনও বাড়তে সুরু করে। শেষ তিন মাসে উৎপাদন হারের মোটামুটি বৃদ্ধি ছিলো শতকরা ৫.৮ ভাগ।

কৃষি এবং কৃষি ভিত্তিক শিল্পগুলির জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যে সব শিল্পে উৎপাদিত হয় সেগুলিও তাদের উন্নয়নের হার বজায় রাখে। কতকগুলি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির উৎপাদন বাড়ার লক্ষণ সুস্পষ্ট হয় কিন্তু মূলধনী শিল্পগুলিতে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা দেয়নি।

কৃষি উৎপাদন

১৯৬৭-৬৮ সালে নিবিড় চাষের কর্ম্মসূচী অনুযায়ী কাজও সন্তোষজনক হয়। এই বছরে প্রায় ৬০ লক্ষ হেক্টার জমিতে প্রচুর ফলনের শস্যের চাষ হয়। এর পূর্ব্বের কৃষি বছরে ১৮ লক্ষ ৯০ হাজার হেক্টার জমি এই কর্ম্মসূচীর অধীনে আনা হয়েছিলো। তাছাড়া প্রায় ৩৬ লক্ষ হেক্টার জমি নিবিড় চাষের অধীনে আনা হয়। জলসেচযুক্ত জমির পরিমাণ বাড়ে ২০ লক্ষ হেক্টার। নাইট্রোজেনযুক্ত সারের ব্যবহার বাড়ে শতকরা ২৩ ভাগ এবং ফসফেটযুক্ত সারের ব্যবহার বাড়ে শতকরা ৩৪ ভাগ।

১৯৬৬-৬৭ সালে সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে ৩৬৬ কোটি টাকার স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদীর ঋণ দেওয়া হয়, সেই তুলনায় ১৯৬৭-৬৮ সালে দেওয়া হয় ৪০৫ কোটি টাকা। পূর্ব্বের দুই বছরের প্রায় ৫৮ কোটি টাকার তুলনায় ভূমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি থেকেও এই বছরে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ বেশী সরবরাহ করা হয় অর্থাৎ ৮৩ কোটি টাকা ঋণ সরবরাহ করা হয়। কৃষকগণও এই বছরে ট্র্যাক্টার, পাম্প ও অন্যান্য উন্নতধরণের কৃষি যন্ত্রপাতি কেনার জন্য বেশী অর্থ ব্যয় করেন।

এর ফলে কৃষি উৎপাদন যথেষ্ট বেড়ে যায়। এই বছরে ৯ কোটি ৫৬ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয় এবং তা হল পূর্ব্ব বছরের তুলনায় শতকরা ২৮.৮ ভাগ বেশী।

আমদানি এবং রপ্তানি

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেনের চাপ এ বছরেও চলতে থাকে তবে পূর্ব্ব বছরের তুলনায় তা অনেক ভালো হয়। ১৯৬৬-৬৭ সালে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ ছিলো ৯২১ কোটি টাকা সেই তুলনায় ১৯৬৭-৬৮ সালে ঘাটতির পরিমাণ ক'মে ৮০৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৬৬-৬৭ সালের ১১৫৭ কোটি টাকার রপ্তানির তুলনায় আলোচ্য বছরে তা ১১৯৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। কাজেই পূর্ব্ব বছরে যেখানে রপ্তানি শতকরা ৯ ভাগ কমে যায় সেই তুলনায় এই বছরে রপ্তানি শতকরা ৪ ভাগ বেড়ে যায়। অপরপক্ষে আমদানির পরিমাণ ৭০ কোটি টাকা কমে ২০০৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

দেশে উৎপাদন বেড়ে যাওয়ায়, মূল্যের দিক থেকে খাদ্য শস্যের আমদানি শতকরা ২০ ভাগ কমে যায়। কাঁচা পাটের আমদানিও যথেষ্ট কমে যায়। ১৯৬৬-৬৭ সালে যেখানে ২১ কোটি টাকার কাঁচা পাট আমদানি করা হয় সেখানে ১৯৬৭-৬৮ সালে ২ কোটি টাকার আমদানি করা হয়। ইলেক্‌ট্রিক্যাল ও অন্যান্য মেসিন বা সেগুলির যন্ত্রাংশের আমদানিও মূল্য হিসেবে শতকরা ১৮ ভাগ কমে যায়। তবে পরিবহণের সাজসরঞ্জাম এবং শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আমদানি শতকরা ২৩ ভাগ এবং শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও অন্তর্বর্তী দ্রব্যাদির আমদানি শতকরা ১৭ ভাগ বেড়েছে।

আভ্যন্তরীন সঞ্চয় ও লগ্নী

দেশের অর্থনীতিতে আভ্যন্তরীন সঞ্চয়ের হার বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে এই সঞ্চয় ১৯৬৬-৬৭ সালে শতকরা ৮.২ ভাগ এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে শতকরা ৭.৮ ভাগ হ্রাস পায়। এই হ্রাস সম্পূর্ণটাই ছিলো সরকারি সঞ্চয়ের হারের ক্ষেত্রে। ১৯৬৬-৬৭ সালে তা শতকরা ১.৮ ভাগ এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে শতকরা ১.৩ ভাগ কমে যায়। অপরপক্ষে জনসাধারণের সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে তা শতকরা ৬.৪ ভাগ থেকে শতকরা ৬.৫ ভাগ বাড়ে।

বিবরণীতে একথা বলা হয়েছে যে, মোট পরিমাণের দিক থেকে বৈদেশিক সাহায্য (পরিশোধযোগ্য অর্থ ছাড়া) বেশী হলেও, তা জাতীয় আয়ের শতকরা মাত্র ৩.৫ ভাগ। ১৯৬৬-৬৭ সালে তা ছিল শতকরা ৩.৬ ভাগ।

১৯৬৭-৬৮ সালে প্রায় ১৮ লক্ষ কি: ওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা সৃষ্টি করা হয়। এর ফলে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মোট ক্ষমতা দাঁড়ালো ১ কোটি ৩১ লক্ষ কি: ওয়াট। পরিকল্পনায় যে লক্ষ্য রাখা হয়েছিলো এটা অবশ্য তার থেকে ৩ লক্ষ কি: ওয়াট কম। গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। পরিবহণ ও যোগাযোগের উন্নয়নের ক্ষেত্রেও সবদিক দিয়ে অগ্রগতি হয়েছে।

কর্ম্মসংস্থান

বিবরণীতে বলা হয়েছে যে কর্ম্মসংস্থানের অবস্থা মোটামুটি একই রকম ছিলো। চাকুরি, ব্যবসা বাণিজ্য, বিদ্যুৎ, গ্যাস, জল ও স্বাস্থ্যরক্ষামূলক সংস্থাগুলিতে কর্ম্মসংস্থানের মাত্রা কিছু বাড়লেও, খনিও নির্ম্মাণের ক্ষেত্রে কর্ম্মসংস্থানের পরিমাণ কমে যাওয়ায় এই বৃদ্ধির ফল অনুভূত হয়নি।

দেশের নানা প্রান্তের সব খবরাখবর সকলে জানতে পারেন না। দেশের অগ্রগতি অথবা তার অভাবের পরিচয় পাওয়া যায় এমন ঘটনা সম্বন্ধে আপনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা লিখুন। রচনা অনধিক ২০০ শব্দের হ'লে ভালো।

ত্রুটি স্বীকার

আমাদের ১৭ই আগষ্ট সংখ্যায় ভুলবশত: "পরিপূরক সারের উপযোগিতা প্রবন্ধের লেখক হিসেবে শ্রীগোপাল চন্দ্র দাসের পরিবর্তে গোবিন্দ চন্দ্র দাসের নাম ছাপানো হয়েছে।

বর্ধমানে কৃষি সাফল্য

বিবেকানন্দ রায়
আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুরুতেই কৃষির উন্নয়ন সম্পর্কে যে নিবিড় কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তাতে পল্লী অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে এবং তা আরও পরিবর্তনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। যে পশ্চিমবঙ্গকে প্রায় সব সময়েই ঘাটতি এলাকা বলে মনে করা হয় সেই পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় ১৯৬২ সালে নিবিড় কৃষি কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ সুরু করা হয়। অন্যান্য জেলাতেও এই কর্মসূচী প্রয়োগ করার দৃষ্টান্ত হিসেবে বর্ধমান জেলা অতি দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সত্যি কথা বলতে গেলে এই কর্মসূচী অনুসারে কাজ সুরু করার আগে যাঁরা বর্ধমান জেলায় গিয়েছেন তাঁরা এখন আবার সেখানে গেলে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে নতুন আশা ও উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে তা দেখে অবাক হয়ে যাবেন। খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বর্ধমান এখন বাড়তি জেলা। এই জেলাটি যে শুধু কলিকাতাকে সাহায্য করছে তাই নয়, আসানসোল, রাণীগঞ্জ এবং দুর্গাপুরের মতো শিল্প নগরীগুলিকেও খাদ্যশস্য দিয়ে সাহায্য করছে।

১৯৬২ সালে যখন এই কর্মসূচী অনুসারে কাজ সুরু করা হয় তখন ছিল ১০টি সমষ্টি ব্লক আর এখন তা ২৪টি ব্লকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। দুর্গাপুর এবং আসানসোল মহকুমার শিল্পাঞ্চলের ৯টি অবশিষ্ট ব্লক এই নিবিড় কৃষি কর্মসূচীর বাইরে রাখা হয়েছে। নিবিড় কৃষি কর্মসূচী অনুযায়ী বর্ধমান জেলায় প্রধান যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে তা হ'ল:

(ক) অধিক ফলনশীল প্রধানত: অধিক ফলনশীল ধান ও গমের বীজ ব্যবহার,
(খ) রাসায়নিক সার ব্যবহার,
(গ) ঋণ পাওয়ার সুযোগ সুবিধে বৃদ্ধি,
(ঘ) শস্য রক্ষার ব্যবস্থাদির সম্প্রসারণ,
(ঙ) উন্নততর সেচ এবং জলের উপযুক্ত ব্যবহার,
(চ) দুটি বা বহুবার শস্য উৎপাদন
(ছ) আবাদ পরিকল্পনা,
(জ) কর্মচারী ও কৃষকগণের নিবিড় প্রশিক্ষণ,
(ঝ) প্রচার, এবং
(ঞ) উন্নততর কৃষি পদ্ধতি প্রচারের জন্য গণসংযোগের উপায়গুলির ব্যবহার।

উন্নত ধরনের বীজ ব্যবহার

কৃষিতে সাফল্য লাভ করতে হলে উন্নততর বিশেষ করে অধিক ফলনের ধান ও গমের বীজ ব্যবহার করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বর্ধমান এবং অন্যান্য জেলাতেও সেইজন্য অধিক ফলনের বীজ বন্টনের ওপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই অধিক ফলনের বীজের চাহিদা, ভীষণ বেড়ে গেছে। ১৯৬৬-৬৭ সালে যেখানে অধিক ফলনের ধানের বীজের চাহিদা ছিল ৭০৩ কুইন্টাল, ১৯৬৭-৬৮ সালে সেই চাহিদা ১০ গুণ বেড়ে ৭০৩৫.৬০ কুইন্টালে দাঁড়ায়। অধিক ফলনের গমের

ওপরে : ক্ষেতে কীটনাশক ছড়ানো হচ্ছে।
বাঁদিকে : ধানের ক্ষেত।
মাঝখানে : ক্ষেত সমতল করার জন্যে ট্র্যাক্টর
নীচে : শস্যভারে আনত।

বীজের চাহিদা বেড়েছে চার গুণ। ১৯৬৬-৬৭ সালে যেখানে মাত্র ৩০০০ একর জমিতে উন্নত ধরণের বীজ ব্যবহার করা হয়, ১৯৬৭-৬৮ সালে তা বেড়ে ৬৮০০০ একরে দাঁড়ায়। বর্তমান বছরের লক্ষ্য হ'ল ২,০০,০০০ একর, অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় তিন গুণেরও বেশী জমিতে উন্নত ধরনের বীজ ব্যবহার করা হবে।

রাসায়নিক সারের ব্যবহার

উন্নত ধরনের সার উপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহার করাটা হ'ল দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। এই ক্ষেত্রেও বর্ধমান জেলা যথেষ্ট অগ্রগতি করেছে। ১৯৬১-৬২ সালে যেখানে ১০,০৭১ টন সার ব্যবহৃত হ'ত সেখানে ১৯৬৫-৬৬ সালে সারের ব্যবহার তিন গুণেরও বেশী বেড়ে গিয়ে ৩৭,৪২০ টনে দাঁড়ায়। সব চাইতে বড় কথা হ'ল সারের প্রকৃত সরবরাহের তুলনায় চাহিদা ছিল অনেক বেশী। কৃষকগণ অনেক বেশী দাম দিয়ে খৈল এবং অন্যান্য ব্যবসায়ী-গণের কাছ থেকে রাসায়নিক সার কিনে এই ঘাটতি পূরণ করেন। রাসায়নিক সার মজুদ করা এবং সেগুলি সরবরাহ করার ব্যবস্থা এখনও তেমন সন্তোষজনক নয় তবুও চাহিদা ক্রমশ: বাড়ছে বলে, সরবরাহের ব্যবস্থা আরও ভাল করার জন্য সব রকমভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। বর্তমান বছরে সারের চাহিদা ৮৮,০০০ টনে দাঁড়াবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ১৯৬৮-৬৯ সালে সার বিক্রয় করার ৭০০টি কেন্দ্র ছিল বর্তমান বছরে এগুলির সংখ্যা বাড়িয়ে ১০০০টি করা হবে যাতে ২১৩টি গ্রামের জন্য একটি করে বিক্রয় কেন্দ্র থাকে। সারের উপযুক্ত ব্যবহার, জমির মাটি পরীক্ষা, চাষ আবাদের ক্ষেত্রে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী, শস্যাদি গুদামজাত করার উন্নততর উপায় এবং ঋণ হিসেবে সার সরবরাহ করার ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে যে প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শন সূচী চালু করা হয়েছে তার ফলে একদিকে যেমন উৎপাদন বেড়েছে অন্যদিকে যেমনি সারের চাহিদাও ভীষণ বেড়ে চলেছে।

ঋণের সুযোগ সুবিধে

কৃষকগণ যদি তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণ পান তাহলেই নিবিড় কৃষি কর্মসূচী সফল হয়ে উঠতে পারে। বর্তমানে এই কর্মসূচীর অধীনে যে ২০টি ব্লক আছে, সেগুলির মধ্যে ১৪টি ব্লকে কাজ করে বর্ধমান সেন্ট্রাল কো অপারেটিভ ব্যাঙ্ক। কালনা-কাটোয়া সেন্ট্রাল কো অপারেটিভ ব্যাঙ্ক বাকি ১০টি ব্লকে কাজ করে। এগুলির অধীনে যে সব সমবায় সমিতি আছে, ব্যাঙ্ক সেগুলিতে নিয়মিতভাবে অর্থ সরবরাহ করে। প্রাথমিক ঋণদান সমিতিগুলির সংখ্যা ১৯৬১-৬২ সালে ছিল ১২৫৪ আর ১৯৬৬-৬৭ সালে সেগুলির সংখ্যা ছিল ১৩১৭। এই সময়ের মধ্যে মোট সদস্য সংখ্যা ০.৭৯ লক্ষ থেকে বেড়ে ১.১৩ লক্ষে, আর শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ২২.৫৩ লক্ষ থেকে বেড়ে ৪৫.৮৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৬২-৬৩ সালে মোট ৮০.১২ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয় আর ১৯৬৪-৬৫ সালে দেওয়া হয় ১৪৫.৩৫ লক্ষ টাকা। রাসায়নিক সারের মতো, জিনিস হিসেবে যে ঋণ দেওয়া হয় তার পরিমাণ ১৯৬৩-৬৪ সালে ছিল শতকরা ২০ ভাগ অর্থাৎ প্রথমে যখন ঋণ দেওয়ার কাজ সুরু করা হয় তার তুলনায় শতকরা ১১ ভাগ বেশী। বাজারজাত করার সমবায় সমিতির সংখ্যা ১৯৬১-৬২ সালে ছিল ১৪টি আর ১৯৬৬-৬৭ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৩। এগুলির সদস্য সংখ্যা ৫৫৮০ থেকে বেড়ে ১৩১৬৫ হয়েছে আর শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ২.০৬ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে ১৩.৭২ লক্ষ টাকা হয়েছে। বাজারজাত করার সমবায় সতিমিগুলির উন্নয়নের জন্যও একটি পর্যায়ক্রমিক কার্যসূচী তৈরি করা হয়েছে।

শস্যরক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ

বেশী টাকা ব্যয় করে উন্নত ধরনের শস্য উৎপাদন করলে সেগুলিকে রোগ ও কীট পতঙ্গের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য বেশী যত্ন ও সতর্কতার প্রয়োজন হয়। ১৯৬২-৬৩ সালে মাত্র ৫২৪৬ হেক্টার জমিকে শস্য রক্ষামূলক ব্যবস্থার অধীনে আনা হয় আর ১৯৬৭-৬৮ সালে ৫২,০০০ হেক্টারের বেশী জমি এই ব্যবস্থার অধীনে আনা হয়। ১৯৬২-৬৩ সালে শস্য রক্ষামূলক রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহৃত হয় মাত্র ৩৭ টন আর ১৯৬৮-৬৯ সালে এই পরিমাণ বেড়ে ৪০১ টনে দাঁড়ায়। এই কর্মসূচী নিয়ে কাজ সুরু করার পর তিন বছরের মধ্যেই মাটির কীটাদি নষ্ট করার জন্য কীটনাশকের ব্যবহার শূন্য থেকে ৩০ টনে দাঁড়ায়। শস্যরক্ষাকারী সাজ সরঞ্জাম ব্যবহার সম্পর্কে সমগ্র জেলাতেই প্রদর্শনী ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই সব প্রদর্শনী ইত্যাদি কৃষকগণকে, সময়মতো প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থাদি অবলম্বনে, বীজ বোনার আগে সেগুলির পরিশোধনের উপযোগিতাও কীটনাশক ছড়িয়ে শস্যাদি রক্ষা করা সম্পর্কে সজাগ করে তুলছে। কিন্তু জনপ্রিয় রাসায়নিক দ্রব্যাদির সরবরাহ কম হওয়ায় এবং গবেষণাগারের সুযোগ সুবিধে না থাকায় এই জেলার অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। কীটনাশক ছড়াবার বিদ্যুৎশক্তি-চালিত যন্ত্র ব্যবহার করা, সাজ সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ করাও ইঁদুর নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কৃষক ও ছাত্রগণকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য, একটা ব্যাপক প্রশিক্ষণ-সূচী নিয়ে কাজ সুরু করা হয়েছে। বিভিন্ন শস্যের মরসুমে একটি করে শস্য রক্ষাকারী দল কৃষকগণকে শস্য উৎপাদন ও রক্ষা সম্পকে প্রশিক্ষণ দেবে। বর্তমানে ২২৫টি বিক্রয়কেন্দ্র থেকে কীটনাশক বিক্রী করা হয় এবং দোকানদারগণ যাতে এই সব কেন্দ্রেই কীটনাশক বিক্রী করেন সে সম্বন্ধে তাঁদের রাজি করিয়ে কেন্দ্রের সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে।

সেচ এবং জলের ব্যবহার

এই কর্মসূচীর জন্য প্রয়োজনীয় জল ডিভিসি থেকে দেওয়া হয়, তবে এই জল জমি ভাসিয়ে দেয় বলে বিপুল পরিমাণ জলের অপচয় হয়। এর ফলে, পাছে ধুয়ে নিয়ে যায় বলে কৃষকরা জমিতে সার দিতে খুব উৎসাহ দেখান না। ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ৩৬৫০ হেক্টারের চাইতেও বেশী জমি, খাল, নলকূপ, কুয়ো এবং পুকুরের মতো ছোট ছোট জলসেচের আওতায় আনা হয়েছে। ২০০টিরও বেশী গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে। ৯৫০টিরও বেশী নলকূপ এবং নদী থেকে জল পাম্প করার জন্য প্রায় ৭০টি মেসিন বসানোর কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে। সেচের জন্য অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধে সৃষ্টির উদ্দেশ্যে

(১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ব্যাঙ্ক কর্ম্মীদের দক্ষতাই সাফল্যের আশ্বাস

ডি· এস· নাগ

অর্থনীতির স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও
গবেষণা বিভাগের প্রধান,
জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির কর্ম্মদক্ষতা, অভিজ্ঞ ও শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের ওপর নির্ভরশীল। এই দক্ষতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কর্ম্মীসংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে যে কোন প্রকারে ব্যাঙ্কের কাজ-কর্ম্মের ওপর রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিরোধ করতে হবে।...... রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ঋণদান নীতির প্রতিক্রিয়া দুই এক বছরের মধ্যেই বোঝা যাবে।

অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিতে দু, এক বছর পরেই, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ঋণদান নীতির মৌলিক পরিবর্ত্তনের প্রভাব বুঝতে পারা যাবে। কারণ এই সব ব্যাঙ্কের ওপর পরিচালনা ক্ষমতা প্রয়োগ করতে এবং জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কিছুটা সময় লাগবে। কিন্তু সাধারণ আমানতকারী, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির কাজ-কর্ম্মের দক্ষতা দেখেই পরিবর্ত্তনের প্রভাব বিচার করবেন।

ব্যাঙ্কের মালিক কে, কারাই বা পরি-দর্শন বা পরিচালনা করছেন তা নিয়ে সাধারণ মানুষ মাথা ঘামান না। টাকা তোলা বা জমা দেওয়ার কাজটা তাড়াতাড়ি হবে কিনা, নাকি অনেক সময় লাগবে, নিয়ম কানুন সহজ হবে, না খুব বেশী কড়াকড়ি, ব্যাঙ্কের কর্ম্মীগণের ব্যবহার ভালো কিনা এগুলিই তাঁর প্রধান ভাবনা। জমা টাকা নিরাপদে থাকবে কিনা এটা অবশ্য তাঁর কাছে সর্ব্বপ্রধান কথা, তবে কি রকমভাবে, কোন প্রতিষ্ঠানে তাঁর সঞ্চিত অর্থ জমা রাখবেন সেটা স্থির করার কথা আগেই তিনি ভেবে নেন। একবার তিনি ব্যাঙ্কের গ্রাহক গোষ্ঠীর মধ্যে এসে গেলে তিনি ব্যাঙ্কের কাজকর্ম্ম থেকেই সেটির দক্ষতা বুঝতে পারবেন।

রাষ্ট্রায়ত্ত করার ফলে দক্ষতা যদি কমে যায় তাহলে যাঁরা এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করতে চান তাঁদের যুক্তি আরও শক্তিশালী হবে। এমন কি ব্যাঙ্কের কাজকর্ম্মের দক্ষতা যদি বর্ত্তমানের মতনও থাকে তাহলেও রাষ্ট্রায়করণের সমালোচকরা বলতে পারেন যে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করার তেমন কোন প্রয়োজন ছিলনা। কাজেই গ্রাহকদের তুষ্ট ক'রে দক্ষতার সঙ্গে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম্ম পরিচালনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

কায়েমি স্বার্থবাদীরা ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়করণ সম্পর্কে যে নৈরাশ্যজনক অভিমত প্রকাশ করছেন তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে সে সম্বন্ধে প্রথমেই বিবেচনা করা উচিত। এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় ঋণদান সম্পর্কে নতুন নীতি গ্রহণ করার ফলে যে শিল্পপতি ও উদ্যোক্তারা এতো-দিন ব্যাঙ্ক-ঋণের বৃহদংশ গ্রহণ করতেন, তা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হবেন এবং এই নীতি গ্রহণের ফলে অসন্তুষ্ট ব্যক্তিরা হয়তো এর বিফলতা প্রমাণ করার জন্য সচেষ্ট হবেন। কাজেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক-গুলির কর্ম্মদক্ষতা যাতে নষ্ট না হয়, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে যাতে আমলাতন্ত্রী মনোভাব না ঢুকতে পারে, এবং নিয়ম কানুন ও লাল ফিতের কঠোরতা দিয়ে বর্ত্তমানের নমনী-য়তা ও উৎসাহ যাতে ব্যাহত না হয় তা সুনিশ্চিত করা অত্যন্ত দরকার। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্ম্মের সমস্ত তথ্যাদিও সাধারণের গোচরে আনতে হবে। আমা-নত, অগ্রিম ঋণের পরিমাণ, গ্রাহক সংখ্যা, অতিরিক্ত সুবিধা, শাখা অফিসগুলির কাজ-কর্ম্ম, কৃষকদের এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ, নিয়ম পদ্ধতি সরলীকরণ, নতুন যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, প্রতি সপ্তাহের কাজের পরিমাণ ইত্যাদি সম্পর্কে যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত-ভাবে বিবরণী প্রকাশ করা হয় তাহলে রাষ্ট্রায়করণের বিরুদ্ধে যে কোন অপ-প্রচারের প্রভাব দূর করতে সেগুলি অনেক কাজ দেবে।

ব্যাঙ্কের সমস্ত স্তরের কর্ম্মীদেরও নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে এবং দায়িত্বের একটা নতুন মনোভাব নিয়ে নিজেদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করতে হবে। ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করার ফলে ব্যাঙ্ক কর্ম্মীগণের বহুদিনের একটা দাবি মিটলো ব'লে তাঁদেরই, নতুন উৎসাহে ও আন্তরিক-তার সঙ্গে, এই দায়িত্ব পালন করা উচিত। যে ব্যবস্থা এখন গ্রহণ করা হ'ল তার সঙ্গে যে সরকারের নতুন অর্থনীতির সাফল্য বা বিফলতা সংশ্লিষ্ট তা স্পষ্টই বোঝা যায়। রূপায়ণের বিষয়টিই হ'ল সরকারী তরফের দুর্ব্বল স্থান। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে তা হবে আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিও যে আমলাতান্ত্রিক অদক্ষ সরকারী সংস্থায় পরিণত হবে না তা ব্যাঙ্ক কর্ম্মীদের দক্ষতাই সুনিশ্চিত করতে পারবে।

আর একটা বিপদ হ'ল ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে রাজনীতির অনুপ্রবেশ। এটা যাতে না ঘটতে পারে তার জন্য সব সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীদের যদি নির্ভয়ে বা কোন রকম আনুকূল্যের আশা না ক'রে কাজ করতে হয় তাহলে রাজনীতির অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করতেই হবে। পল্লী ঋণ পর্য্যালোচনকারী কমিটি বলেছেন যে সমবায় ও অন্যান্য কৃষি সেবা সংস্থাগুলিতে রাজনীতি ইতিমধ্যেই স্থান ক'রে নিয়েছে। পল্লী অঞ্চলের স্থানীয় রাজনৈতিক কর্ম্মীরা, কোন বিশেষ

(২০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সাক্ষাৎকার

কলকাতায় আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা বিবেকানন্দ রায় বিশিষ্ট অর্থনীতিক, শিল্পপতি, ট্রেড ইউনিয়নের নেতা, অধ্যাপক ও গবেষকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ সম্বন্ধে তাঁদের মতামত জিজ্ঞাসা করেন। প্রশ্নাবলীর সঙ্গে তাঁদের উত্তর পর পর দেওয়া হ'ল :—

আমাদের প্রশ্ন ঃ

১। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রয়োজন ও যৌক্তিকতা কী ছিল? রাষ্ট্রীয়করণ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের তুলনায় বাঞ্ছনীয় ছিল কি?

২। রাষ্ট্রীয়করণের ফলে, গ্রাহকদের, বিশেষ ক'রে ছোট ছোট আমানতকারীদের সঙ্গে লেন-দেনের ব্যাপারে ব্যাঙ্কের কর্মদক্ষতা কি ক্ষুন্ন হবে?

৩। জনসাধারণের সমৃদ্ধিসাধনে রাষ্ট্রীয়করণ কতটা সহায়ক হবে?

৪। অথলগ্নী করার ব্যাপারে, রাষ্ট্রীয়করণ কী ভাবে অভীষ্ট সিদ্ধিতে সাহায্য করবে?

৫। রাষ্ট্রীয়করণের ফলে বেসরকারী ব্যবসায়িক উদ্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত হবে ব'লে কি আপনি মনে করেন?

৬। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলি ক্ষুদ্র কৃষক ও কারিগরদের চাহিদা মেটাতে কি সক্ষম হবে?

৭। আমানতকারীরা রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলি থেকে গচ্ছিত টাকা তুলে বেসরকারী ব্যাঙ্কে জমা দেবেন, এমন সম্ভাবনা আছে কী?

৮। বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির খাতায় রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের ঋণের টাকা চলে যাবে ব'লে আপনি আশঙ্কা করেন কী?

৯। সরকারী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে সাধারণতঃ নিয়ম কানুনের কড়াকড়ি এবং কর্মদক্ষতা ও ব্যবসায়িক মনোভাবের অভাব সম্বন্ধে যে অভিযোগ শোনা যায় তাতে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলি সম্বন্ধে পূর্বের ধারণা খারাপ হতে পারে কী?

১০। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করার প্রয়োজন আছে কী?

পি. সি. ব্যানার্জী

ডিরেক্টার, ইঞ্জিনীয়ারিং টাইমস্ পাব্লিকেশনস্ প্রাঃ লিঃ

অল্পবিত্ত গ্রাহকরা উপকৃত হবেন

১। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সময়েও বড় বড় শিল্প সংস্থাকে বেশী ঋণ দেওয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। এই ব্যাপারটা এড়ালে এবং সর্বশ্রেণীর গ্রাহকদের প্রতি সমান ব্যবহার করলে রাষ্ট্রীয়করণ সমর্থন করা যেতে পারে।

২। অল্পবিত্ত গ্রাহকের কোনোও আশঙ্কা নেই কারণ লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র লগ্নীকারকের কাছ থেকে সর্বাধিক পরিমাণ টাকা সংগ্রহ ও সংহত করাই সরকারের নীতি।

৩। ক্ষুদ্র আমানতকারীদের প্রয়োজনের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া এবং ব্যবসা শুরু বা শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁদের আগাম দেওয়া শুধু সম্ভবপরই নয় এর সম্ভাবনাও আছে।

৪। পুরোনো পরিচালন ব্যবস্থায় শুধু বড় বড় ব্যবসায়ী ও বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা পূরণের দিকেই ব্যাঙ্কগুলির বেশী নজর ছিল এবং ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতাদের অবহেলা করার ঝোঁক ছিল। রাষ্ট্রীয়করণের ফলে এই বৈষম্য দূর হওয়া উচিত।

৫। এত শীঘ্র বেসরকারী ব্যবসায়িক প্রয়াসের ওপর এর প্রতিক্রিয়া নিরূপণ করা সম্ভব নয়।

৬। ক্ষুদ্র কৃষক বা কারিগরদের ঋণ দেওয়া ভবিষ্যতে অতীব লাভজনক প্রতিপন্ন হতে পারে। এ পর্যন্ত ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা এদিকে একেবারেই প্রায় নজর দেননি কারণ এ সব ক্ষেত্রে আশু ফল লাভের সম্ভাবনা কম।

৭। এই প্রবণতা রোধ করার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে এটা হওয়া সম্ভব।

৮। এখানেও এক কথা। এই ধরনের প্রবণতা বন্ধ করতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

৯। ২নং উত্তর দেখুন।

১০। এটা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়

সুকোমল কান্তি ঘোষ

সম্পাদক, যুগান্তর (ভারতীয় বণিকসভার প্রাক্তন সভাপতি)

নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন

১। রাষ্ট্রীয়করণের সমালোচনার পরিবর্তে, এই ব্যবস্থা দেশের পক্ষে কী ভাবে কল্যাণকর হতে পারে সে সম্বন্ধে আমার মতামত জানাই। কোনোও তর্কের মধ্যে না গিয়ে আমি বলতে চাই, বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ প্রয়োজন ছিল।

২। বিভিন্ন ক্ষেত্রে, উপযুক্ত প্রার্থীদের অর্থ মঞ্জুর করা উচিত। তবে নিরাপত্তার মূল প্রশ্নটা এড়ানো কী করে সম্ভব ?

৩। জীবন বীমা কর্পোরেশনসহ বিভিন্ন সরকারী সংস্থার কাজকর্মের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্বন্ধে ভেবে চিন্তে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে দেশের ক্ষতি হবে। অভিজ্ঞ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা, স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার পেলে, অর্থ দপ্তর কিংবা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশানুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করতে পারবেন। (সরকারী দপ্তরের মত) লিখে লিখে কাজকর্ম করার অভ্যাস এড়াতে হবে এবং লেনদেন সম্পর্কে কঠোর গোপনতা রক্ষা করতে হবে। বিশেষ ক'রে ব্যবসায়ীরা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করায় এই গোপনতা রক্ষা করা দরকার। তা নয়তো প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসার মানসিক ভিত্তিটা নষ্ট হয়ে যাবে।

৪। ছোট খাটো উদ্যোগীরা টাকার অভাবে কাজ করতে পারেন না। অথচ কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের দেওয়া টাকা বা বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলির সঞ্চয় তহবিলের টাকা কখনই সদ্ব্যবহার করা হয়নি। টাকাটা বড় কথা নয়, উদ্যোগী লোকেরা ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত কিনা সেইটাই বড় কথা। সরকার শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের ভিত্তি যদি সম্প্রসারিত করতে চান, তাহ'লে ঝুঁকি নেবার ও সাফল্য লাভের সম্ভাবনা সম্বন্ধে কৃষক ও অন্যান্যদের প্রস্তুত করতে হবে। সাহস, আস্থা ও জ্ঞান অর্থসাহায্যের মতই জরুরী। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের গ্রাহকের অপেক্ষায় থাকলে চলবে না, তাঁদের গ্রাহক তৈরি ক'রে নিতে হবে। বেসরকারী ব্যাঙ্কাররা এই ব্যাপারে কাজ সুরু করেছেন ব'লে বিশ্বাস। বড় বড় ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে, জনসাধারণের অর্থের নিরাপত্তা রক্ষা করা হবে এবং এই অর্থ যথাযথভাবে কাজে লাগানো হবে ব'লে বিশ্বাস।

৫। লোকেরা জাতীয় ব্যাঙ্ক থেকে অন্যান্য ব্যাঙ্কে. টাকা সরিয়ে নেবেন ব'লে মনে হয় না। ছোট ব্যাঙ্ক ও বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিকে এই ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়নি, এটা ভাল কথা। এটা বেশ ভালো 'এক্সপেরিমেন্ট'।

এস্. সি. রায়

ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ইকনমিক এ্যাফেয়ার্স, কলিকাতা

দক্ষতা ক্ষুণ্ন হবে না

১। একটা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এখন দেশ এবং জনসাধারণের উপকারের জন্যে ব্যাঙ্কগুলি উপযুক্তভাবে চালানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

২। পরিচালকদের কর্মদক্ষতা যদি সুনিশ্চিত করা যায় তাহলে ছোট বড় সব গ্রাহকের সঙ্গেই সম্পর্ক অপরিবর্তিত থাকবে। শুধু রাষ্ট্রাধীন করলেই দক্ষতা নষ্ট হয় না। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অবশ্য দক্ষতার সাধারণ মান হ্রাস পেয়েছে।

৩। একটি রাষ্ট্রাধীন ব্যাঙ্ক অর্থাৎ স্টেট ব্যাঙ্ক সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে। এর কলিকাতাস্থ বোর্ডের সঙ্গে (অবশ্য এটি রাষ্ট্রাধীন হওয়ার তারিখ থেকেই) আমি ৬ বছর যুক্ত ছিলাম। ব্যাঙ্কের পরিচালকরা যদি জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করেন তাহলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেনই।

৪। যাঁরা পরিচালক নিযুক্ত হবেন তাঁরা যদি নিজেদের সরকারের অঙ্গ বলে মনে করেন, তাহলে বাঞ্ছনীয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলিই ঋণ পাবে। চরিত্র, সততা, কর্মক্ষমতা ও সামর্থ্য এগুলিই, জামিন রেখে ঋণ মঞ্জুর করার চাইতে, বেশী প্রয়োজনীয়। মোটামুটিভাবে নীতিগুলির দিকে দৃষ্টি রেখে যদি ছোট কৃষক বা কোনো শিল্পকে ঋণ মঞ্জুর করা হয় তাহলে বিশেষ কোন ঝুঁকি নিতে হবে না।

৫। বেসরকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির কোন অসুবিধে হবে ব'লে আমি মনে করি না। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে যথেষ্ট সাহায্য পায় এবং আমি মনে করি যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির স্টেট ব্যাঙ্ককেই অনুসরণ করা উচিত।

৬। ছোট কৃষক এবং কারিগরদের প্রয়োজন মেটাবার প্রশ্নটা, সরকারের নীতি এবং পরিচালকদের মনোভাবের ওপর নির্ভর করবে।

৭। এটা বোধ হয় হবে না। ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ককে যখন রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয় তখন আমানত প্রথমতঃ কিছু কমে যায়। কিন্তু কিছুদিন পরই আমানতের পরিমাণ সব চাইতে বেশী দাঁড়ায়। কাজেই যেসব ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়নি, সেগুলিতে আমানত চলে যাবে এই ধারণা ভুল।

৮। বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিতে আমানতের পরিমাণ বাড়বে ব'লে আমার মনে না। এই সব ব্যাঙ্কের সুনির্দিষ্ট গ্রাহক শ্রেণী রয়েছে। তা ছাড়া এগুলির কাজকর্ম খুব সম্প্রসারিত করা হবে ব'লেও আমার মনে হয় না। তবে আমার মনে হয় বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিও রাষ্ট্রায়ত্ত করার কথা ভেবে দেখা উচিত ছিল।

৯। আমিও মনে করি যে, সরকারী সংস্থাগুলির দক্ষতা কম। এগুলির পরিচালক সংস্থাগুলি যথোপযুক্ত নয় ব'লেই প্রধানতঃ এই অবস্থা ঘটছে। পরলোকগত ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের অনুরোধে (আমি যদিও একটি বেসরকারী সংস্থায় কাজ করছি) আমি একটি সরকারী সংস্থায়, একেবারে সুরু থেকে চেয়ারম্যান হিসেবে, পাঁচ বছর কাজ করেছি। আমি

সেই সংস্থাটিকে একটি লাভজনক সংস্থায় পরিণত করি। আমার পক্ষে যা সম্ভব অন্যের পক্ষেও তা সম্ভব হবে না কেন?

১০। একটা প্রতিযোগিতার মনোভাব থাকা ভালো এবং সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ে, পাঁচ ছ'টা কর্পোরেশন গঠন করা যেতে পারে।

বি. সি. সর্বাধিকারী

এ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, ইস্টার্ণ জোন, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ: চেয়ারম্যান, ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কস এ্যাসোসিয়েশন, কলকাতা

ক্ষুদ্র আমানতকারীর কাছ থেকে ঝুঁকির আশঙ্কা নেই

১। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পরবর্তী পর্যায় নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রীয়করণ। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ছিল এক অপূর্ণ ব্যবস্থার মতই। তাতে ক্রটি ছিল। যেমন একটি বড় ক্রটি ছিল, উচ্চ পর্যায়ে নীতি নির্ধারণের সঙ্গে কাজের ফলাফল দেখাবার দায়িত্বের কোনোও সম্পর্ক ছিল না।

২। গ্রাহকদের সঙ্গে লেন-দেনের ব্যাপারে ব্যাঙ্কগুলির কর্মদক্ষতা ক্ষুণ্ণ হবে না। ব্যাঙ্ক কর্মীরা যে রকম আনন্দের সঙ্গে রাষ্ট্রীয়করণের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন তাতে মনে হয় গ্রাহকদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো হওয়া উচিত, বিশেষ ক'রে ছোট ছোটো গ্রাহকদের সঙ্গে।

৩। ক্ষুদ্র কৃষক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারিগর, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্যোগী, স্বপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ও সাধারণ গৃহস্থের কল্যাণকামী এই নতুন ব্যবস্থায় উৎপাদনের জন্য ও ব্যক্তিগত বিভিন্ন উদ্দেশ্যে দেওয়া ঋণের মাত্রা বাড়বে। ঋণ দেওয়া নেওয়ার নিয়ম কানুন বদলাবে এবং ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের, সিকিউরিটির ভিত্তিতে, ঋণ দেওয়ার নীতি সংশোধন করতে হবে এবং তাঁদের প্রত্যেক গ্রাহকের প্রয়োজন খুঁটিয়ে দেখে, ঋণের সার্থক প্রয়োগের প্রশ্ন বিচার ক'রে যুক্তিসঙ্গত ঝুঁকি নিতে হবে। ছোট খাটো ব্যবসায়ী ও অন্যান্য গ্রাহকদের কাছ থেকে ঝুঁকি আসবেই এ রকম মনে করার সঙ্গত কোনোও কারণ নেই। পক্ষান্তরে তাঁরা সততার সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করতে প্রস্তুত হতে পারেন।

৪। বর্তমান নীতি হ'ল—এবং তা হওয়াই উচিত—এমনভাবে দেশের সম্পদ বাড়ানো যাতে জনসাধারণের প্রত্যেকে তার সুফল ভোগ করতে পারেন।

বাস্তব দৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয়করণ বললেই যেন মনে হয়, ব্যাপকতর অঞ্চলে জাতীয় ভিত্তিতে সর্বোচ্চ পরিমাণ সম্পদ সংগ্রহ করা। এর অর্থ হ'ল শহর, আধা-শহর ও গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য শাখা খোলা। দ্বিতীয়তঃ সুপরিকল্পিত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে, যেমন কৃষি, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও রপ্তানীর ক্ষেত্রে, সেই সম্পদ লগ্নী করা। তৃতীয়তঃ ঋণের বিপুল পরিমাণ অর্থ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কুক্ষিগত না হয়ে পড়ে তার জন্য জাতীয় ব্যাঙ্কগুলির সজাগ থাকা দরকার।

এই উদ্দেশ্যগুলি যাতে অচিরে পূর্ণ হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। মনে রাখতে হবে এই ব্যবস্থা মানুষকে নিয়ে অর্থাৎ কর্মীদের নিয়ে, কম্পিউটার নিয়ে নয়। এই ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করবে এর পরিচালকদের (অর্থাৎ নীতি প্রণেতা, ব্যাঙ্ক বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং ব্যাঙ্ক কর্মীদের) ওপর। এই ব্যবস্থা ফলপ্রসূ করার জন্যে প্রত্যেককে মনে প্রাণে চেষ্টা করতে হবে, লক্ষ্য স্থির করতে হবে এবং লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য উৎসাহিত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

বাংলা দেশের জনসাধারণের বেশী ক'রে আশা করার কারণ রয়েছে। 'বাংলা দেশে অর্থলগ্নী বিপজ্জনক' এই ধারণা দূর করা দরকার। অর্থ লগ্নীর কোনোও প্রস্তাব না এড়িয়ে দৃঢ়তা ও সাহসের সঙ্গে একটি বড় রকম কার্যসূচী হাতে নেওয়া উচিত।

৫। প্রগতিশীল ও উৎসাহী মধ্যবিত্ত উদ্যোগীদের একটা শ্রেণী গড়ে তোলা দরকার। বর্তমানে যে সব শিল্পে অর্থ দেওয়া হচ্ছে সেগুলিকে বঞ্চিত না ক'রে নতুন অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে টাকা লাগানোর জন্যে সম্পদ সংহত করাই হ'ল আমানত বাড়াবার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক।

৬। যুক্তিসম্মত সময়সীমার মধ্যে ঋণ গ্রহীতার প্রস্তাবের কার্যকারিতা দ্রুত নিরূপণ করা এবং কাজের সাফল্য সুনিশ্চিত করার জন্যে ব্যাঙ্কের যথেষ্ট সংখ্যক কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত।

৭। রাষ্ট্রীয়করণের এক সপ্তাহের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলিতে আমানতের পরিমাণ বেড়ে গেছে কারণ গচ্ছিত টাকার নিরাপত্তা সম্বন্ধে সরকার পুরো দায়িত্ব নিচ্ছেন।

৮। আমানতের কিছু অংশ, ভারতে, বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির বিভিন্ন শাখায় চলে যাবার সম্ভাবনা বাদ দেওয়া যায় না। ঐ শাখা ব্যাঙ্কগুলিতে গ্রাহকদের সঙ্গে ব্যবহার অত্যন্ত ভালো। আমরাও সেই রকম করতে পারলে এই ক্রটি দূর হবে।

ডঃ এস. কে. বসু

ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এ্যাণ্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বাঞ্ছনীয়

১। রাষ্ট্রীয়করণ অবিবেচনার কাজ হয়েছে। 'সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিং পলিসি' কিংবা 'ডিরেকশানাল কন্ট্রোল' প্রভৃতি ব্যবস্থার মাধ্যমেও রাষ্ট্রীয়করণের উদ্দেশ্য পূর্ণ হ'তে পারতো।

স্বল্পোন্নত সমস্ত দেশের মধ্যে ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসা সব চেয়ে দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত। রাষ্ট্রীয়করণের ফলে, এই ব্যবসা নষ্ট হওয়ার পথ সুগম হ'ল। দেশে ব্যাঙ্কিং-এ অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী, যাঁরা ভারতের অর্থনৈতিক প্রয়োজন ও অগ্রগতি সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সমস্ত খবর জানেন। যে কোন সময়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ অগ্রাহ্য করার ফলে অর্থনৈতিক বিকাশ বিঘ্নিত হ'তে পারে। রাষ্ট্রীয়করণের মূলে কোনোও অর্থনৈতিক যুক্তি নেই। আদর্শ হিসেবেও যদি এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল তা হ'লে বেসরকারী শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যবসায় রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীনে আনার পর ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্ব করা উচিত ছিল।

একদিক থেকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের চেয়ে রাষ্ট্রীয়করণ বাঞ্ছনীয় কারণ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ নীতির উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতাসীন দলের চরম বামপন্থী অংশকে এবং বে-

সরকারী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের বিভ্রান্ত করা। দ্বিতীয়ত: যে ফ্রান্সের অনুকরণে এই ব্যবস্থা নেওয়া হ'ল, সেই ফ্রান্সেই, জাতীয়করণের পর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করা হয়েছে।

২। এবং ৩। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার দক্ষতা, প্রতিযোগিতা ও প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীলতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। জাতীয় ব্যাঙ্কগুলিতে এর কোনোটাই থাকবে না।

৪। প্রথম প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছি তাই এর ফলশ্রুতি।

৫। এবং ৬। আমাদের মিশ্র অর্থনীতিতে সরকারী ও বেসরকারী শিল্পোদ্যোগ উভয়েরই স্থান আছে। অতএব ব্যাঙ্কগুলি বেসরকারী ব্যবসা বাণিজ্যের আর্থিক প্রয়োজন মেটাবে ব'লে অনুমান করা যেতে পারে। এদিকে আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে ভারি শিল্পের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ব্যাঙ্কগুলিকে বৃহৎ শিল্পগুলির চাহিদা মেটাতে হবে। কিন্তু হিসেব ক'রে দেখানো যেতে পারে মুনাফা রেখে, সংরক্ষিত তহবিলে জমা দিয়ে, কর্মচারীদের বেতন-বোনাস ও অংশীদারদের লভ্যাংশ প্রভৃতি দিয়ে এত অর্থ থাকবে না সরকারের হাতে যার থেকে সরকারী শিল্পক্ষেত্রে, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পক্ষেত্রে ও কৃষকদের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড়া যাবে। তা ছাড়া এই (১৪টি) ব্যাঙ্কগুলির অংশীদারদের ক্ষতিপূরণও তো দিতে হবে।

৭ এবং ৮। সে রকম আশঙ্কা থাকলে বিদেশী ও বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলিকে গচ্ছিত হিসেবে টাকা নিতে মানা করা যেতে পারে। বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্যে টাকা দেওয়ার অনুমতি বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিকে দেওয়া যেতে পারে। তবে এখন সরকারী পর্যায়ে ও সরকারী শিল্প সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে বৈদেশিক আমদানীর পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় বৈদেশিক বাণিজ্যের লগ্নীকার হিসেবে বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির গুরুত্ব খানিকটা কমে গেছে।

৯। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণই হ'ল সুদক্ষ ব্যাঙ্ক পরিচালন ব্যবস্থার মূলমন্ত্র। কিন্তু পরিচালন ব্যবস্থার সর্ব্বোচ্চ স্তরে সরকারী আমলারা থাকলে সে দক্ষতা থাকে না। যেমন এইচ. এস. এল (হিন্দুস্তান স্টীল লি:) ১৯৬০ সালের জুন মাসে স্টপ-ওয়াচ কেনার প্রস্তাব করে। ১৯৬১ সালের জুলাই পর্যন্ত প্রস্তাবটি (নিয়ম কানুনের) ৮৯টি জট কাটিয়ে ওঠার পরও স্টপ-ওয়াচ কেনা হয়নি।

১০। ২নং উত্তর দেখন।

ডঃ বি. বি. ঘোষ

সম্পাদক, ক্যাপিটাল, কলিকাতা

স্বাতন্ত্র্য ও গঠন

১। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ নীতি হিসেবে সমর্থনযোগ্য হলেও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার কার্যকুশলতা পরীক্ষা করার জন্য যতটুকু সময় দেওয়া উচিত ছিল তা যে দেওয়া হয়নি, তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

২। বর্তমানের কাঠামো যদি রক্ষা করা হয়, তাহলে গ্রাহকরা এই ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে আগে যে রকম ভাল কাজ পেতেন, এখনও তাই পাওয়া উচিত। প্রত্যেকটি ব্যাঙ্কের স্বাতন্ত্র্য যদি বজায় না রাখা হয় তাহলে একটা বিপুল সংস্থায় সাধারণ গ্রাহকরা অবহেলিত হতে পারেন।

৩। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি কী ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করবে তার ওপরেই সাধারণ মানুষের লাভ ক্ষতি নির্ভর করবে। প্রত্যেকটি ব্যাঙ্কে যদি বিশেষ একটা ক'রে শাখা গড়ে তোলা হয়, যেখানে সাধারণ মানুষ কি ক'রে তাঁদের পরিকল্পনা তৈরি করবেন, কাঁচা মাল সংগ্রহ করবেন এবং উৎপাদিত সামগ্রী বাজারজাত করবেন ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে তাঁদের সাহায্য করা হবে, তাহলে সাধারণ মানুষ লাভবান হতে পারেন। অতিরিক্ত আমানত যদি কৃষি, ছোট শিল্প এবং কোন বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহলে ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করার ফলে, আর্থিক ক্ষমতা কোথাও কেন্দ্রীভূত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

৪। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির, এই বিশেষ ক্ষেত্রগুলিতে, প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণ বন্টন করা উচিত। কেবল ঋণ বন্টনের ব্যবস্থা করলেই উদ্দেশ্য সফল হবে না। ঋণ বন্টন সম্পর্কে যদি কোন কঠোর নীতি গ্রহণ করা হয় তাহলে বেসরকারী উদ্যোগগুলির ক্ষতি হতে পারে। যদি অতিরিক্ত আমানতের ৮০% ভাগ কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প এবং কোন বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদেরও দেওয়া হয়, এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি অতিরিক্ত অর্থের ব্যবস্থা না করে তাহলে বেসরকারী সংস্থাগুলি হয়তো প্রয়োজনীয় ঋণ পাবে না।

৬। দুই এবং তিনের উত্তরের অনুরূপ।

৭ ও ৮। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্মের যদি উন্নতি হয় (অবশ্য কর্মচারীরা অধিকতর সহযোগিতা করবেন ব'লে যে আশ্বাস দিয়েছেন তাতে উন্নতিই হওয়া উচিত) তাহলে আমানতের পরিমাণ কমে না গিয়ে বরং বাড়বে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্মের উন্নতি প্রতিযোগিতামূলক হলে আমানত অন্যত্র সরে যাবে না। তা ছাড়া এই আমানতের জন্য সরকার জামিন থাকবেন। বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্ম উন্নততর ব'লেই যে ঐগুলিতে বেশী লোক টাকা জমা রাখেন এ কথাটা মনে রাখতে হবে।

৯। কাজকর্মে দক্ষতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির কাঠামো বজায় রাখা হবে ব'লে যখন আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, তখন এগুলিতেও সরকারী দপ্তরের অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হবে তা মনে করা ভুল। বর্তমানের ভিত্তিতে যদি এগুলি পরিচালিত হয় তাহলে আমলাতন্ত্রী ব্যবস্থা বা লাল ফিতের বেড়াজালের সমস্যা এড়ানো যাবে।

১০। তবে প্রতিযোগিতার ভাবটা বজায় রাখতেই হবে। কেবলমাত্র প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই আমানতকারী বা ঋণ গ্রহীতারা ভালো কাজ পেতে পারেন।

সি. এস. পাণ্ডে

সেক্রেটারী জেনারেল, ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স, কলিকাতা

প্রতিযোগিতা অত্যাবশ্যক

১। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য ছিল ব্যাঙ্কের ঋণের কিছু অংশ অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে লগ্নী করা। এই উদ্দেশ্য বহুলাংশে পূর্ণও হচ্ছিল। জানা গেছে ঋণের চাহিদা না থাকায় ব্যাঙ্কগুলি, রিজার্ভ

ব্যাঙ্কের নির্দেশানুযায়ী অগ্রিম দেওয়ার ব্যাপারে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল।

২। গ্রাহক সম্পর্কে ব্যাঙ্কের কাজ-কর্মের দক্ষতা নির্ভর করবে কর্মচারীদের ওপর। সম্প্রতি কয়েকটি ব্যাঙ্কে নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা হয়েছে। তার জন্যে এবং কাজের মাত্রা ও গতি কমে যাওয়ায় ব্যাঙ্কগুলির খরচ খরচা অনেক বেড়ে গেছে। কোনোও প্রগতিশীল ব্যাঙ্কের পক্ষে ছোট বা বড় গ্রাহকের মধ্যে তারতম্য করা সমীচীন নয়।

৩। বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখে যদি ব্যাঙ্কের আমানত বুঝে সুঝে লগ্নী করা হয় তা হ'লে জনসাধারণের কল্যাণই হবে। সাধারণ মানুষের সমৃদ্ধি সমগ্রভাবে দেশের বৈষয়িক অগ্রগতির ওপর নির্ভরশীল—যে অগ্রগতিতে ব্যাঙ্কের সঙ্গে সরকারী ও বেসরকারী শিল্পোদ্যোগের ভূমিকা সমান গুরুত্বপূর্ণ।

৪। এই ব্যবস্থা ভালোভাবে চালু করার আগে, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সময়ে আর্থিক দিক থেকে গৃহীত নীতিগুলির প্রতিক্রিয়া কী কী হয়েছিল তা যাচাই করাও ভালো। অগ্রিম বা দাদনের টাকা যাতে জলে না যায় এবং যথাযথক্ষেত্রে ঠিকমত লগ্নী করা হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য কর্মচারীদের শিক্ষিত ক'রে তুলতে হবে এবং উপযুক্ত নিয়ম কানুন প্রবর্তন করতে হবে।

৫। ব্যাঙ্কগুলির ওপর রাজনৈতিক বা অন্য ধরনের চাপ দেওয়া না হ'লে এটা হওয়া উচিত নয়।

৬। কার্যকর কোনোও প্রকল্প হাতে না নিয়ে ব্যাঙ্কের টাকা একে ওকে তাকে ধার দিয়ে কোনও কাজ হবে না। আমাদের দেশে ছোট চাষী বা কারিগরদের অধিকাংশই জানেন না উৎপাদন বাড়াবার জন্যে বা উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াবার কাজে কী ভাবে টাকা খাটানো যায়। সরকারের সামনে এটা একটা মস্ত বড় কাজ।

৭। ব্যাঙ্কের ব্যবহার ভালো হ'লে গ্রাহকরা খুশী থাকেন এবং যে ব্যাঙ্কের কাছে ভালো ব্যবহার পাওয়া যাবে তিনি সেখানেই যাবেন।

৮। আমানতের পরিমাণ না বাড়াবার জন্যে সরকার বোধ হয় বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিকে পরামর্শ দিয়েছেন। জাতীয় ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্ম আর পাঁচটা ব্যাঙ্কের সমান ভাল হ'লে, জাতীয় ব্যাঙ্কের টাকা অন্য ব্যাঙ্কে যাবে না।

৯। এই ধরনের সুনামের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হয়তো বাঞ্ছনীয় ছিল কারণ সেগুলির আগাম দেওয়ার নীতি ও নিয়মকানুন সম্পূর্ণভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল। অথচ সেই সঙ্গে ঐ ব্যাঙ্কগুলি প্রতিযোগিতা করতে পারত এবং সেই সঙ্গে আমানত বাড়াবার জন্য ঐ ব্যাঙ্কগুলিকে কঠোর পরিশ্রম করতে হত।

বর্ধমানের সাফল্য

(৮ পৃষ্ঠার পর)

৪৩ লক্ষেরও বেশী টাকা ব্যয় করা হয়েছে। আরও প্রায় ৫০,০০০ একর জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য আরও ছোট ছোট সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

সেচের সুযোগ সুবিধে বাড়ার ফলে দুটি বা তারও বেশী শস্যের চাষ করার পথও খুলে গেছে। এই কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ সুরু করার পর ১৯৬৮-৬৯ সালে প্রায় দুই লক্ষ একর জমিতে কয়েকটি শস্যের চাষ করা হয়। এর পূর্বে ১.১৮ লক্ষ একর জমিতে দুটির বেশী শস্য চাষ করা হ'ত। অর্থাৎ পূর্বের তুলনায় এই ধরনের চাষের জমির পরিমাণ শতকরা ৭০ ভাগ বেড়ে গেছে। বর্তমান বছরে ৩ লক্ষ একর জমিতে দুটির বেশী শস্যের চাষ করা হবে ব'লে ঠিক করা হয়েছে। আগামী রবি মরসুমে যখন ডি.ভি.সি থেকে আরও বেশী সেচের জল পাওয়া যাবে তখন ধানের ফসল উঠে যাওয়ার পরই আরও ৫০,০০০ একর জমিতে গমের চাষ করা হবে। প্রশিক্ষণ, রবি মরসুমে চাষ করার জন্য প্রচার কার্য, যে আমন ধানের ফসল তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় সেই আমনের চাষ এবং ডি.ভি.সি থেকে অতিরিক্ত সেচের জল সরবরাহ ইত্যাদি ব্যবস্থাগুলিই এই অপূর্ব সাফল্যের মূলে রয়েছে। গ্রাম পর্যায়ের কর্মী ও প্রত্যেক কৃষকের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাষ পরিকল্পনা কার্যসূচী অত্যন্ত কার্যকরী হয়েছে।

কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত প্রদর্শনমূলক কারিগরী প্রশিক্ষণ, জেলা ও গ্রাম পর্যায়ে কর্মচারী ও কৃষক উভয়কেই দেওয়া হয়। চাষের পরিকল্পনা তৈরি, সার এবং সেচের জলের ব্যবহার, বীজ পরীক্ষা, পাট পচানো এবং তোলা, শস্য রক্ষা, উন্নত ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার, প্রচার, শস্যের পরিসংখ্যান সংগ্রহ, মাটি ও জৈব সার, শস্য কাটা এবং বিবরণী ও আয় ব্যয়ের হিসেব তৈরি করা সম্পর্কেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বর্তমান বছরে নিবিড় কৃষি কর্মসূচী, অধিক ফলনের শস্যাদি এবং কৃষকগণের প্রশিক্ষণ সূচী অনুযায়ী ৬০,০০০ বেসরকারী ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনার জন্য জীপ

ভারতে পরিবার পরিকল্পনা কার্যসূচীর জন্য ইউ-এস্-এড-এর পক্ষে পাঞ্জাব সরকারকে ১৮খানা জীপ উপহার দেওয়া হয়েছে। ১০ কোটি দম্পতিকে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর অধীনে আনা খুবই কষ্টসাধ্য কারণ এঁরা দেশের ৫,৬০,০০০টি গ্রাম ও ৩,০০০টি শহরে ছড়িয়ে রয়েছেন। তাই গ্রামাঞ্চলে ৫০০০ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং শহরাঞ্চলে স্থাপিত হয়েছে ১৮০০টি কেন্দ্র। এই সব গ্রামীণ কেন্দ্রগুলি আবার ২০,০০০টি উপকেন্দ্রে বিভক্ত।

প্রতিটি নগরাঞ্চলের কেন্দ্রকে ৮২,০০০ এবং প্রতিটি গ্রামাঞ্চলের কেন্দ্রকে ৬১,০০০ লোকের তত্ত্বাবধান করতে হয়। আর প্রতিটি উপকেন্দ্রের অধীনে রয়েছে ১৭,৪০০ লোকের তত্ত্বাবধানের ভার। আঞ্চলিক বিস্তৃতি, জনসংখ্যার বিশালতা প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে পরিবার পরিকল্পনার প্রচার অভিযানে যানবাহনের কার্যকারিতা অনস্বীকার্য। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইউ-এস-এড-এর সঙ্গে ১৫৪০টি যান সরবরাহের চুক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের অধীনে মোট ২০০০টি যান আছে। আরও ১৫৪০টি যান পেলে মোট সংখ্যা দাঁড়াবে ৩৫৪০। কয়েক বছরের মধ্যেই এই সংখ্যা দাঁড়াবে ৮০০০। এগুলির তদারকী ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ একটি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিবহন সংস্থা তৈরি করেছেন।

ভারতের শিল্পোন্নয়ন

ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়নের দিকে শিল্পোন্নয়ন একটি অংশ মাত্র। ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে এ দেশে পরিকল্পিত উন্নয়নের কাজ আরম্ভ হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল পর্যায়ক্রমে বড় স্বার্থসাধক শিল্প ভিত্তি গড়ে ভারতকে উন্নত করা।

তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শেষ হয়েছে এবং চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনাকালে চালু শিল্পগুলির অর্থাৎ বস্ত্রশিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং অন্যান্য শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় লৌহ শিল্প গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয় এবং যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্পের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়। এ ব্যাপারে তৃতীয় পরিকল্পনায় বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে, এ পর্যন্ত যে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে তা সুসংহত করা এবং শিল্প সম্প্রসারণের একটি শক্ত ভিৎ গড়ে তোলা।

দ্রুত অগ্রগতি

প্রথম দশ বছরে সুসংগঠিত শিল্পগুলির সংখ্যা দ্বিগুণ করা হয়েছে। উৎপাদনের সূচক সংখ্যা ১৯৫০-৫১ সালের ১০০ থেকে বেড়ে ১৯৬০-৬১ সালে ১৯৪ হয়েছে। তারপরে ১৯৬০ সালকে মূল বছর ধরে উৎপাদনের সূচক সংখ্যা ১৯৬১-৬২ সালে ৮২ শতাংশ, ১৯৬২-৬৩ সালে ৯.৬ শতাংশ, ১৯৬৩-৬৪ সালে ৯.২ শতাংশ এবং ১৯৬৪-৬৫ সালে .৩ শতাংশ বেড়েছে। এর পরেই পর পর দু বছর চলে অস্বাভাবিক খরা বা অনাবৃষ্টি। ফলে কৃষি উৎপাদন অস্বাভাবিক রকম কমে যায়। সেই সঙ্গে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা, বিনিয়োগ ও সঞ্চয় সবই ব্যাহত হয়। উৎপাদনী ব্যয় বৃদ্ধি এবং চাহিদার অভাবের ফলে যে সব শিল্প অধিক উৎপাদনের ক্ষমতা অর্জন করেছিল সেগুলির ক্ষেত্রে হতাশার ভাব দেখা যায়। ফলে অগ্রগতির হার কমে ১৯৬৫-৬৬ সালে ৪.৩ শতাংশ, ১৯৬৬-৬৭ সালে ১.৭ শতাংশ এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে ০.৩ শতাংশ দাঁড়ায়।

ভারত সরকার এই সময়ে কয়েকটি প্রতিকার মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ক'রে বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদন এবং রপ্তানিতে উৎসাহ দিতে আরম্ভ করেন। শিল্পগুলির ক্ষেত্রে মন্দার ভাব কাটিয়ে ওঠবার জন্য দৃঢ়তার লক্ষণ দেখা যায়। পর পর দু বছর কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে ১৯৬৮ সাল থেকে সমগ্র পরিস্থিতিতে উন্নতির লক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ করে। শিল্পোৎপাদনের সূচক সংখ্যা ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ১৫৯.৩ এবং অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ১৬১ হয়। অর্থাৎ অগ্রগতির হার হয় ৬.৪ শতাংশ। ১৯৬৮-৬৯ সালে উৎপাদন ৬ শতাংশ হারে বেড়েছে।

১৯৫১ সালে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের দুটি মাত্র কারখানা ছিল। তারপরে তিনটি বড় কারখানা গড়ে তোলা হয়েছে। ইস্পাতের উৎপাদন বাড়াবার ফলে ব্লেড, স্ক্রু থেকে আরম্ভ করে রেডিয়াল ড্রিল, বস্ত্র শিল্পের যন্ত্রপাতি পর্যন্ত বহু ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য উৎপাদন বর্তমানে সম্ভব হচ্ছে। রঞ্জক শিল্প, ঔষধ শিল্প, টায়ার কর্ড, পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্য, ইস্পাতের কাষ্টিং, চিনির কল, বস্ত্র কল এবং লিউমিনাস কণ্ডাক্টার উৎপাদন শিল্প আজ সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবার সালফিউরিক এ্যাসিড, সুপার ফসফেট, অ্যামোনিয়াম সালফেট, এ্যালুমিনিয়াম, তামা, ডিজেল ইঞ্জিন, সেলাইয়ের কল, যন্ত্রপাতি, মোটর গাড়ী এবং বাইসাইকেল শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটেছে। এছাড়া সম্পূর্ণ ইস্পাত, মিশ্র ইস্পাত, শিল্প সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, সিমেন্ট, সার, পরিবহন যন্ত্রপাতি, প্লাস্টিক, সালফিউরিক এবং পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি অনুমোদন করা হয়েছে।

স্বয়ম্ভরতা

বস্ত্র শিল্পের যন্ত্রপাতি এবং চা শিল্পের যন্ত্রপাতি নির্মাণের ব্যাপারে ভারত আজ স্বয়ম্ভরতা লাভ করেছে। উন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলিতে আজ যে ধরনের যন্ত্রপাতি নির্মিত হচ্ছে তার তুলনায় ভারতে নির্মিত যন্ত্রপাতি প্রায় সম মানের। সেলাইয়ের কল এবং বাই-সাইকেল বিদেশের বাজারে খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। আজ ভারত বহু যন্ত্রাংশ এবং প্রায় সম্পূর্ণ যন্ত্রপাতি বিদেশে রপ্তানি করতে সক্ষম। আবার বিশ্বের বাজারে টেণ্ডারের প্রতিযোগিতায় ভারত অনেক সাফল্যলাভ করছে। ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং এবং যন্ত্রপাতি নির্মাণের কাজ ভালোভাবে এগিয়ে চলেছে। রেল ও সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার জন্যে প্রয়োজনীয় যান নির্মাণের কাজে ভারত প্রায় স্বয়ম্ভরতা অর্জন করেছে। চিনি ও সিমেন্ট কারখানার যন্ত্রপাতি নির্মাণের কাজে অগ্রগতি সন্তোষজনক হয়েছে।

১৯৬৮ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত বিভিন্ন দ্রব্য রপ্তানীর হিসাবে দেখা যায় অপ্রচলিত দ্রব্যগুলির রপ্তানী ৮৯ শতাংশ বেড়েছে। ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যের রপ্তানী ২৮,৪00000 টাকার মত বেড়েছে, লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্যের রপ্তানী ২০,১00000 টাকা, রাসায়নিক এবং সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের রপ্তানী ৩,৯00000 টাকা, খনিজ দ্রব্য, জ্বালানি ও লুব্রিক্যান্টের রপ্তানী ২,৯00000 টাকা, লৌহ ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যের রপ্তানী ২,৫00000 টাকা, এবং রবার দ্রব্যের ১,৪00000 টাকা বেড়েছে। রপ্তানী এশিয়া ও ওসেনিয়ায় ৬১ শতাংশ, পূর্ব ইউরোপে ২৮ শতাংশ এবং আমেরিকায় ১১ শতাংশ বেড়েছে। জাপানে রপ্তানীর পরিমাণ ১৫,৫00000 টাকা বেড়েছে।

সরকারী ও বে-সরকারী উদ্যোগ

ভারতের শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগগুলি বেশ সুন্দরভাবে কাজ করছে এবং এগুলির এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান শিল্পোন্নয়নকে সুনিশ্চিত এবং দ্রুত করছে। সরকারী উদ্যোগ সাধারণত ভারী শিল্পের ক্ষেত্রে (যেখানে প্রভূত বিনিয়োগ প্রয়োজন এবং যেখানে প্রকল্প দেরীতে ফলপ্রসূ হয়) সীমাবদ্ধ রয়েছে। বাকীটা বেসরকারী উদ্যোগের দায়িত্বে রয়েছে। এখানে নীতি বা আদর্শের কড়াকড়ি নেই। উদ্দেশ্য, দ্রুত উন্নয়নে সহায়ক হওয়া। যেমন সার কারখানা স্থাপনের দায়িত্ব প্রথম দিকে সরকারী উদ্যোগের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল কিন্তু এখন বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। তৈল শিল্পের সম্প্রসারণ

সরকারী দায়িত্ব হলেও যে সব উপজাত শিল্প গড়ে উঠছে সেগুলি বেসরকারী উদ্যোগেই পরিচালিত হচ্ছে।

বৈদেশিক সহযোগিতা

এদেশে বিদেশী কারিগরী জ্ঞান এবং আর্থিক সহযোগিতার জন্য নিয়মকানুন যথেষ্ট সহজ করা হয়েছে। এদেশের নীতি অনুযায়ী দেশী ও বিদেশী উদ্যোগের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। বিদেশী কোম্পানীগুলি লাভ করছে এবং দেশে লভ্যাংশ পাঠাতে পারছে। কর ব্যবস্থা চুক্তির মাধ্যমে পরিহার করা সম্ভব হয়েছে। বৃটিশ, মার্কিন, জাপানী, জার্মানী, সুইস্ ফরাসী এবং ইতালীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। বহু বিদেশী সরকার ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ভারতকে ঋণ দিয়েছেন।

বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সুবিধার জন্য শিল্পগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—

(১) যেখানে কারিগরী সহযোগিতার সর্তে কিম্বা তা ছাড়াই বিনিয়োগ করা যাবে।

(২) যেখানে কারিগরী সহযোগিতার অনুমতি দেওয়া হবে কিন্তু বিনিয়োগ করতে দেওয়া হবে না।

(৩) যেখানে কোন রকম সাহায্যেরই প্রয়োজন নেই। এ সব ক্ষেত্রে রয়েলটির সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

তা ছাড়া সরকার বৈদেশিক বিনিয়োগ পর্যত গঠন করেছেন। ভারত আজ উন্নতির এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যখন তার পক্ষে স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে কারিগরী ও উপদেষ্টার সুবিধা দেওয়া সম্ভব। শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি বা শ্রমিকের অভাবের দরুন বহু উন্নয়নশীল দেশই শ্রমিক কেন্দ্রিক শিল্পে প্রতিযোগিতা করতে অসুবিধা বোধ করছে। এমন বহু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে ভারত উন্নতিকামী দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করতে সক্ষম। এই সহযোগীতা উভয়ের পক্ষেই লাভজনক।

কাসদোল পঞ্চায়েৎ পথ দেখাচ্ছে

আদর্শ গ্রাম পঞ্চায়েৎ কাকে বলে কাসদোল পঞ্চায়েৎ দেখলে বোঝা যায়। মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার কাসদোল গ্রামের বাসিন্দার সংখ্যা হ'ল ৩১৭৩। ছত্তিশগড়ের আরও সব পঞ্চায়েতের মত এখানকার পঞ্চায়েৎ-ও একইভাবে গঠিত। এখানে একজন সারপঞ্চের অধীনে ২২ জন পঞ্চ আছেন। এঁরা তাঁদের সুযোগ্য সারপঞ্চের বিচক্ষণ নির্দেশনায় সারা গ্রামের মানুষকে শ্রমদানে উদ্বুদ্ধ ক'রে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, সমষ্টি উন্নয়নের কাজে সমষ্টিই হলেন হোতা।

পঞ্চায়েৎ মেলার সময়েও এই অঞ্চলটা জলাভাবে যেন নিষ্ফলা ছিল। ফলে গ্রাম জীবনেও তার ছাপ পড়ে ছিল। নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে তাই গ্রামের সবল মানুষগুলি এগিয়ে এলেন সহযোগিতার মনোভাবে বলীয়ান হয়ে। শ্রমদান ক'রে একটা পুকুর খুঁড়লেন যার জন্যে জনমজুর লাগালে খরচ পড়ত ২০০০ টাকা। সঙ্গে সঙ্গে দুটি পুরোনো পুকুরের সংস্কার ক'রে এই তিনটির জল লাগালেন সেচের কাজে। এই পুকুরগুলির জলে ১৪৩ একর জমিতে জলসেচ দেওয়া যায়। এ ছাড়া তাঁরা ২টি নতুন কুয়ো কাটিয়েছেন এবং ১১টি পুরোনো কুয়োর সংস্কার করেছেন। গ্রামের চাষীদের মধ্যে ৯ টন রাসায়নিক সার ও ১৪৪ বস্তা উন্নত শ্রেণীর বীজ বিলি করা হয়েছে। গ্রামের সব ক্ষেত এখন শস্যশ্যামলা। এখন কাসদোলে বছরে দুটো ফসল তোলা হয়। ধানের বীজ সযত্নে রক্ষা করার জন্যে যে গোলাবাড়ী তৈরি হয়েছে, তার নাম 'রামকোঠি'; এখানে ২,০০০ কে. জি ধানের বীজ গুদাম ক'রে রাখা যায়।

শুধু চাষ আবাদেই নয়, জীবনের মান উন্নত করার সব পন্থাই এঁরা একটু একটু ক'রে গ্রহণ করছেন। যেমন পরিবার পরিকল্পনার বাণী প্রচার ক'রে, লোকেদের এ বিষয়ে আগ্রহী করে তুলতে পারায়, গ্রামে ২৪ জন 'ভ্যাসেকটমি' করিয়েছেন এবং তিনজন মহিলা 'লুপ' নিয়েছেন। স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিচ্ছন্নতার জন্যে রাস্তাঘাট ছিমছাম ও পরিষ্কার রাখা হয়। গ্রামের ছেলে ছোকরারা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে একটা রাস্তা তৈরি করে ফেলেছে।

মাছের চাষও ওখানে সুরু হয়েছে। পঞ্চায়েৎ গত বছরে গ্রামের পুকুরগুলিতে ৩৪,০০০ মাছের চার ফেলে। তার থেকে এ বছরে তারা ৫০,০০০ টাকা লাভ করবে ব'লে আশা করছে। সম্ভাব্য লাভের এই মোটা টাকাটা তারা গ্রামের রাস্তা মেরামত ও কৃষি যন্ত্রপাতি খরিদ করার জন্যে খরচ করবে ব'লে আগে থেকে ঠিক করে রেখেছে। গ্রামটি প্রদীপের যুগ পেরিয়ে এসেছে, তাই বিদ্যুৎ সঞ্চার ব্যবস্থার উন্নতির জন্যও এই লাভের খানিকটা খরচ করা হবে।

সামাজিক শিক্ষা সম্বন্ধে এঁদের খুব আগ্রহ। এঁরা একটি মহিলা মণ্ডল স্থাপন করেছেন। এই মণ্ডল খুব সক্রিয়। মণ্ডলের সদস্যারা একটি বালওয়াড়ী (শিশু কল্যাণ কেন্দ্র) খুলেছেন, একটি পুস্তকাগার স্থাপন করেছেন এবং মহিলাদের জন্যে একটি প্রাপ্তবয়স্কা-শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। তা ছাড়া রামায়ণ পাঠ, কথকতা, খেলাধুলা বা অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজনও করে এই মহিলামণ্ডল।

গ্রামের তরুণদের সংগঠন 'নব-যুবক-মণ্ডল' নিয়মিত খেলাধূলা ও নাটক প্রভৃতির আয়োজন করে। রুরাল ফোরাম বা পল্লী আসরের সদস্যরা তো নিয়মিত বেতারে 'পল্লী অনুষ্ঠান' শোনেন।

পঞ্চায়েৎ ২,০০০ টাকা ব্যয় ক'রে নিজেদের বাড়ী তৈরী করেছে।

এই সব কৃতিত্বের উৎস হলেন সারপঞ্চ শ্রী কে. এল. শর্মা। তিনি বিধানসভার সদস্য। পেশায় ডাক্তার আবার ওদিকে প্রগতিশীল কৃষক। তাঁর মধ্যে পল্লী ও নগরের সদগুণগুলির সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে।

কাসদোল সারা ছত্তিশগড়কে প্রেরণা দিচ্ছে। জনবল একত্রিত ক'রে উন্নয়নের কাজে সেই জনশক্তিকে নিয়োজিত ক'রে নিজেদের ভাগ্য কীভাবে ফেরানো যায়, কাসদোল বারবার এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দেয়।

সাজাব যতনে

কুসুম মেহতা

কোন্ সেই বিস্মৃত অতীত থেকে আজ পর্যন্ত অঙ্গ সজ্জার প্রতি নরনারীর আকর্ষণ তেমনি তীব্র আছে। ইতিহাসের প্রবহমান ধারা মানুষের সমাজে কত না বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটিয়েছে। কিন্তু এই আদিম ও অকৃত্রিম মানবীয় আকাঙ্খাটি আজও অবিকৃত অবস্থায় রয়ে গেছে। তফাৎ হয়েছে কেবল উপকরণে, পরিবেশনে, আস্বাদনে। পথে যেতে যেতে বনফুল তুলে মাথায় বা কানে পরার আনন্দ আজ হয়তো বড় শহরের স্যাকরা বা জহুরীর হাত থেকে পেতে হয়। গাছের বল্কল বা পুষ্পিত তরুশাখা হয়তো সুতী বা সিল্ক কি টেরিলীনের রূপ নিয়েছে। এ সবেরই মূলে যে তাগিদ আছে সেই তাগিদই নিত্য নতুন উপকরণে চারুশোভন ও নয়ন লোভন হ'বার ইঙ্গিত দেয়।

বৈদিক যুগ কিংবা তা'রও আগে থেকে ভারতে অঙ্গসজ্জার রীতি চলে আসছে। অন্ততঃ বেদে এ বিষয়ে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে।

সাজবার এবং বিশেষ ক'রে মেয়েদের সুসজ্জিতা ও সুশোভিতা দেখার প্রলোভন মানুষের মানবীয় বৃত্তিমাত্র। সভ্যতার শিখরে উঠেছে যে প্রগতিশীল দেশ সেখানেও এর ব্যতিক্রম নেই।

সব মেয়েই প্রায় গহনা পরে তবে রাজস্থানের মেয়েরা গহনা পরতে ভালোবাসেন। স্বচ্ছলঘরের গৃহস্থ বধূর অঙ্গে ৫/৬ সের ওজনের সোনারুপোর গহনা থাকা সাধারণ ব্যাপার।

শহরাঞ্চলের সম্পন্ন ঘরের কন্যা ও বধূর অঙ্গে যেসব অলঙ্কার থাকে তা'র মধ্যে আছে সোনার বালা ও গোখুর (গোখরো সাপের আকৃতিবিশিষ্ট বলয় ?) : কতকগুলি গহনা এয়োতির পক্ষে অপরিহার্য্য। মাথায় সীমন্তের ওপরে তাঁরা পরেন 'কেরলা' বা 'বোর'। এছাড়া মাথার পরার অন্যান্য গহনার মধ্যে আছে 'বিন্দ্লী', 'আড়', 'ফিনি', 'সুট', 'টিকা' বা তিলক, 'টিড্ডি', 'ভালকা' ও সেলু 'ভালকা'। কানের পাটায় কর্ণফুল বা ফুলঝুমকো। ওপর কানের ধারে চারটি ক'রে ছ্যাঁদা থাকে তা'তে তাঁরা পরেন 'ওগনিদা' কিংবা 'পিপ্পল পাৎতা' (পিপুল পাতা ?)। আধুনিক ধারা প্রবর্ত্তনের ফলে কানের পাটায় টপ্ ও বল্ দেখতে পাওয়া যায়।

গ্রামের মেয়েদের গলায় রুপোর তৈরী 'হান্সিল' অর্থাৎ হাঁসুলী, হাতে হাতীর দাঁতের পাৎ চুড়ী, মাথায় 'বোর' ও পায়ে 'ক্যাড়িয়া' (কড়া), 'আমালা', 'নেভর্বা' প্রভৃতি থাকে।

অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েরা নাকেও গয়না পরেন। নাকের ডানপাটায় নথ (সাধারণত একটা রিং-এ দুটো মুক্তো ও একটা চুনী বা পান্না পরানো), 'লওঙ' (লং বা লবঙ্গ ?) বা 'ভোনরিয়া'। গলার গহনার মধ্যে আছে 'বজন্তী', 'তুস্সী', 'তুনিয়া কাঙ্কি', 'জোবা', 'পাঞ্চমানা', আড়িয়াগাল', 'সারি' ও নেকলেস। প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধারা 'হাউস' বা 'টিকাওয়ালা' পরেন। এ ছাড়া ৫।৬ নরী (সারি) হারের সঙ্গে (চন্দ্রহার নামে পরিচিত) সুপুরীর মত বড় একটি পেণ্ডেন্ট্ বা 'লকেট', বাহুতে বাজুবন্ধ কিংবা চূড়া। চূড়াকে 'খাঞ্চিও' বলে। এগুলি সাধারণত হাতীর দাঁত দিয়ে তৈরী হয় এবং এগুলি অবিবাহিতাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। এছাড়া আছে 'অন্যৎ' (অনন্ত ?), 'ব্যন ম্যডলিয়া', এবং 'খাঞ্চ টাড্ডা' 'টুকামা', 'জোমাল' বা 'ঝুনকা'। সামনের হাতে ৫ থেকে ১১টি ক'রে গালা বা রুপোর চুড়ী থাকে। ধনী বধূরা চুড়ীগুলি কখনও কখনও সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে নেন্।

(গ্রামের মেয়েরা হাঁসুলীর সঙ্গে 'ওখাদি হাঁসুলী' বা 'খুনগানি' পরে)। গালা বা রুপোর চুড়ীর সঙ্গে সোনা বা রুপোর তৈরী সরু সরু এক রকমের চুড়ীও তাঁরা পরেন, যার নাম হ'ল "চাল্লীস" (৪০ ?)। এই ধরণের চুড়ীর মধ্যে সোনার 'নুনচি, নোগরি', 'বঙ্ক', 'ক্যাড়া', 'গোখরু' ও কঙ্কনও পরা যায়। এগুলি অবস্থানুযায়ী সোনার বা রুপোর হয়। করপল্লবের গহনা হ'ল হাথফুল। পাঁচ আঙ্গুলে আংটী ও কব্জীতে চুড়ীর সঙ্গে বাঁধা এই সোনার ফুল (রতনচূড়া) বাংলাদেশেও আছে। এই অলঙ্কারের সঙ্গে জোড়া আংটিগুলির নাম 'বিনতি'।

হাতে দশ আঙ্গুলে দশটি আংটিও পরা হয়। কোমরে হয় সরু চেন নয় ২।৩ নরীর চেন্। 'কান্দোরা নামের এই গোট জাতীয় অলঙ্কারটির সঙ্গে তাঁরা আরও পরেন 'তাগড়ী' ও 'কামাংতী'।

এ যাবৎ সম্ভ্রান্ত ঘরের, বা সম্ভ্রমের অধিকারী না হ'লে পায়ে সোনা দেওয়ার রেওয়াজ ছিল না। সাধারণতঃ এগুলি রুপোর তৈরী হ'ত আর গরীব হ'লে পেতল বা দস্তার। তবে এখন সে

রেওয়াজ কেউ মানে না। পায়ের গহনা-গুলির নাম হ'ল 'কাড়া', 'তোড়া', 'লং', 'সানতি', 'টাঙ্কা', 'তোড়', 'পায়েল', 'ল্যাচ্ছা', 'চাগ্যল', 'আনওয়ালা', 'আনওয়ালা নিউরী', 'পাওয়ালি', 'বামিওয়া', 'ছাড়', 'মারেঠী' ও 'স্যন্থ'। আর পায়ের আঙ্গুলের জন্যে আছে 'গোল' ও 'রিং'। তার উপরে থাকে ফোলরি। বিবাহেদের কানে 'ওগানিয়া', হাতে 'পাংচুড়ী' ও পায়ে 'কাড়া' পরা নানা।

অবস্থা যাই হ'ক ও শহর বা গ্রামই হ'ক এবং গহনার উপাদান যা'ই হ'ক, আকারে ও নক্সার তেমন কোনোও তারতম্য নেই। মুসলীম মহিলারাও মোটামুটি ঐ ধরণের অলঙ্কার পরেন। তবে মাথায় 'খাঞ্চ' বা 'বোর' পরেন না এবং চুড়ী পরেন গালা বা কাঁচের।

শিক্ষিত পরিবারে এখন গহনার রেওয়াজ ক্রমশঃ কমে আসছে। ভারী গহনার চেয়ে হালকা গহনাই মেয়েরা পছন্দ করেন। সমৃদ্ধ ঘরের শিক্ষিতা মহিলারা এখন সাধারণতঃ পায়ে হালকা ল্যাচ্ছা, হাতে দু'গাছি ক'রে মুক্তো বা চুনী বা পান্না বসানো চুড়ী আর গলায় পাথর বসানো হার পরেন।

হরিয়ানায় মুর্গী পালন

দিল্লীতে বিক্রীর বেশ ভালো বাজার থাকায় হরিয়ানায় মুর্গী পালনের সম্ভাবনা অনেক।

১৯৬৭-৬৮ সালে হরিয়ানায় ১৫৫টি নতুন বেসরকারী মুর্গী পালন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। পরের বছর আরও ৫৫১টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। কৃষকরা যাতে মুর্গী পালন কেন্দ্র স্থাপন করতে পারেন তার জন্য সরকারী ও পঞ্চায়েৎ সমিতিগুলির মুর্গী পালন কেন্দ্রগুলি থেকে ১৩,১৬৬টি পাখী সরবরাহ করা হয়। এই সংখ্যা ১৯৬৮-৬৯ সালে দাঁড়ায় ৪৮.৯১৮তে।

১৮টি 'পোল্‌ট্রি এক্সটেনশান সেন্টারে', কৃষকদের, হাঁস মুর্গী পালন সম্বন্ধে তালিম দেওয়া হয়। ১৯৬৭-৬৮ সালে ৬৫৭ জন এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে ৯৯৭ জন তালিম নেন।

বিদেশে ভারতীয় ছাত্রছাত্রী

১৯৬৭-৬৮-সালের শীতের পাঠ্য মরসুমে জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্র বা পশ্চিম জার্মাণীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬৮৬ জন ভারতীয় ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করছিলেন। পশ্চিম জার্মানীতে যত বিদেশী ছাত্রছাত্রী আছেন তার মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যা শতকরা তিন ভাগের মত। বিভিন্ন বিষয়ে পড়ুয়াদের আনুপাতিক হিসেব হ'ল এই রকম :—

হিউম্যানিটিজ, ফাইন আর্টস্‌ ও সঙ্গীত ১৬২ (এর মধ্যে অর্থনীতি ও সমাজ বিজ্ঞানের ৪৭জন অন্তর্ভুক্ত); ম্যাথমেটিক্স ও ফিজিক্যাল সাইন্‌সেস-১৫২—(কেমিষ্ট্রি ৪৯); সাধারণ চিকিৎসা বিজ্ঞান, দাঁতের চিকিৎসা বিদ্যা ও পশু চিকিৎসা-বিধি ৯৫—(মানুষের চিকিৎসা বিধি-৮৬) এবং ইঞ্জিনীয়ারিং ২৭৭—(মেকানিক্যাল ইঞ্জি-নীয়ারিং ১০৭, মাইনিং ও মেটালা-র্জি—১১১)

শক্ত কং

মার্কিন গবেষকরা সাধারণ কংক্রীটের সঙ্গে প্লাস্টিক মিশিয়ে আরও শক্ত কংক্রীট তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। এই নতুন কংক্রীটের নাম দেওয়া হয়েছে কংক্রীট পলিমার, কংক্রীটের তুলনায় চারগুণ শক্ত। এই কংক্রীট ঘষ্টানি ও ঠোকর খেলে কিংবা হিম ও তাপের তারতম্যে চিড় খাবে না এবং ক্ষয় শতকরা ১০০ ভাগ রোধ করা যাবে।

একটা বায়ুশূন্য আধারে মেথিল মেথাক্রাইলেট দ্রবণে সাধারণ কংক্রীট ভিজিয়ে রেখে তারপর বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে তাতে কোবাল্‌ট ৬০ রশ্মি লাগানো হয়। সাধারণ কংক্রীটের মধ্যে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম যে সব ফাঁক থাকে সেগুলির মধ্যে দ্রবীভূত প্লাস্টিক প্রবেশ করার ফলে এই কংক্রীট এক রকম প্রায় নিশ্ছিদ্র হয়ে যায় আর এর মধ্যে জল নামমাত্র প্রবেশ করতে পারে কিনা সন্দেহ। সঙ্গে সঙ্গে এই কংক্রীট সাধারণ কংক্রীটের চেয়ে চারগুণ বেশী শক্ত হয়ে যায় এবং এর চীড় খাওয়ার আশঙ্কা রোধ করার ক্ষমতা ৪।৫ গুণ বেড়ে যায়।

সাধারণ অসাধারণ

প্রচুর ফলনের দ্বিগুণ ফসল

পশ্চিমবাংলার মালদহ জেলার হরিশচন্দ্রপুর ১নং ব্লকের চাষ-জমি লোকেরা অনুর্বর বলেই জানতেন। এই দু'বছর আগেও, একর প্রতি ২০-৩০ মণ ধান হ'লে লোকে তাই-ই যথেষ্ট মনে করতেন। কত কাল এই অবস্থা চলে এসেছে। তার পর এলো 'সবুজ বিপ্লব' বা কৃষি উন্নয়নের যুগ; উন্নত কৃষি পদ্ধতি, উন্নত বীজ ও রাসায়নিক সারের প্রয়োগ, সেচের প্রয়োজন উপলব্ধি ও কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির কার্যকারিতার আমল।

এই নতুন ধারা মালদাতে গিয়েও পৌঁচেছে। সেখানকার কৃষকরা আধুনিক কৃষি পদ্ধতির সঙ্গে কৃষির বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ ক'রে, নিজেদের ব্লকের চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছেন। এর মধ্যে একটা হ'ল প্রচুর ফলন বীজ। ব্লকের প্রগতিশীল কৃষকরা এখন বছরে তিনটি ফসল ঘরে তুলছেন — গম, আমন ও আউশ (বোরো)। এ ছাড়া তাঁরা শাক সবজীর চাষও করেন। তাঁরা নদী ও পুকুর-গুলিতে পাম্প বসিয়ে সেচের প্রয়োজন মেটান।

গত বছরে আমনের চাষে যাঁরা উল্লেখ-যোগ্য সাফল্য দেখিয়েছেন তাঁদের নাম ও ফসলের পরিমাণ হ'ল :-

(ক) বাঙ্গুরদুয়ার শ্রী আবদুল গফুর আই-আর ৮ ধান-৬৭ মণ।

(খ) ঐ গ্রামেরই শ্রীবৈদ্যনাথ দাস— ঐ জাতের ধান—৬০ মণ।

(গ) রামপুরের শ্রী আবদুল রেজাক— ঐ একই বীজ—৪৮ মণ।

যে সব জমিতে প্রতি একরে ১০ মণের বেশী ফলন হ'ত না, সে সব জমিতে লারমা, রাজো, সোনোরা—৬৪, কল্যাণ সোনা ও সরবতী সোনা প্রভৃতি প্রচুর ফলন গমের বীজ বুনে একরে ৪৫ মণ ফসল পাওয়া গেছে। যেমন:—

(ক) হাসারমানির দেবেন্দ্রনাথ দাস প্রতি একরে ৪৫ মণ ফলিয়েছেন;

(খ) রামপুরের জালালুদ্দীন আহমেদ তুলেছেন ৪১ মণ, এবং

(গ) বাঙ্গুরদুয়ার বৈদ্যনাথ দাস ফসল পেয়েছেন ৩৬ মণ।

ব্লকের ৬০০ একর জমিতে সেচের সুবিধা রয়েছে। ৫২টি অগভীর টিউবওয়েলের বৈদ্যুতিকীকরণের পর এ বছরে আরও ২৬০ একর জমিতে জলসেচ করা যাবে।

মেদিনীপুরে নতুন বীজের চল

পশ্চিম বাংলা সরকার আই-আর ৮ ও তাইচুং দিশী—১ শ্রেণীর ধান চাষ ব্যাপকভাবে প্রবর্তন করার পর মেদিনী-পুরের চাষীরা এই বীজের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন। এগুলো এত জনপ্রিয় হয়েছে যে, মামুলী ক্ষেতের তুলনায় প্রচুর ফলন বীজের অধীন ক্ষেতের পরিমাণ এখন ঢের বেশী দাঁড়িয়েছে।

যিনি এই নতুন বীজ চাষে সবচেয়ে বেশী আগ্রহ দেখান তিনি হলেন গোপী-বল্লভপুরে, পঞ্চায়েৎ সমিতি এলাকার কুশমার গ্রামের শ্রীমনোরঞ্জন মহাপাত্র। এ বছরে বোরো মরসুমে তাঁর মোট ৯ একর জমির মধ্যে এক একরে তিনি প্রচুর ফলন বীজের চাষ করতে মনস্থ করেন। তিনি জমিতে ভালো ক'রে সেচ দিয়ে, এক্সটেন-শান অফিসারদের পরামর্শ অনুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণ সার দিলেন। তাঁকে বলা হয়ে-ছিল পরামর্শ যথাযথভাবে মেনে চললে প্রতি একরে ১৩৬ মণের মত ধান পাওয়া যাবে। মরসুমের শেষে তিনি যখন ফসল ঘরে তুললেন, তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি সত্যিই অত পরিমাণ ফসল পাওয়া যাবে।

তেমনি মাশুরিয়া গ্রামে শ্রীজগদীন্দ্রনাথ মাইতিও অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ নিয়ে চাষ করলেন। ফসলের পরিমাণ দেখে তিনি হতবাক। তাঁর জমির প্রতি একরে ফসলের পরিমাণ ছিল ১১৫ মণ। স্থানীয় বীজে একর প্রতি ফলন হয় ২৩ মণের মত।

অন্ধকারে আলো

পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁদের কাছে লক্ষ্য সিদ্ধির পথে কোনোও বাধাই বাধা নয়। সোমাভাই গোবিন্দভাই প্যাটেল হচ্ছেন সেই দলেরই একজন। শিশুকালে দু'চোখের দৃষ্টি তাঁর গেছে। অন্ধ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ শেষ ক'রে, তিনি ব'লে বসলেন কারুর অনুকম্পা চাই না, নিজেই নিজের পায়ে দাঁড়াব। এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে তিনি বন্ধুদের সঙ্গে তাদের ক্ষেতখামারে গিয়ে নিজের হাতে ক্ষেতের কাজ করতে শুরু করলেন। বছর পাঁচেকের মধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করার মত আস্থা হ'ল তাঁর। আহমেদাবাদের কাছে কেরিয়া ভাগনা গ্রামে বাপ পিতা-মহের যে জমি ছিল তা ইজারা দেওয়া ছিল; গোবিন্দভাই সে জমি ছাড়িয়ে নিলেন ও চাষবাস শুরু করলেন।

স্বগ্রামে 'সুরদাস' নামে পরিচিত এই মানুষটির নিজের কথায় তাঁর মনোবল, কর্মক্ষমতা ও সাফল্যের কাহিনী শুনুন।

'চাষবাস থেকেই আমার ও আমার পরিবারের ভরণপোষণ হয়, এমন কি কিছু শস্য উদ্বৃত্ত-ও থাকে। আমি তো চোখে দেখি না, যা কিছু করি তা স্পর্শ ক'রে। ফসল তো দেখতে পাই না তবু শুধু ছুঁয়ে ব'লে দিতে পারি শস্যের ফলন কেমন হয়েছে, গাছগুলোর রোগ হয়েছে কি না, জলসেচের দরকার কিনা বা ফসলের অবস্থা কী? এমন কি পাম্প অকেজো হয়ে গেলে, আমিই মেরামৎ করি।'

তিনি তাঁর সাফল্যের জন্যে প্রচুর ফলন বীজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এ বছরে তাঁর জমিতে যা গম হয়েছে তা এক রেকর্ড বিশেষ। সাধারণত: যে পরিমাণ ফসল হয়, সোমাভাই-এর জমিতে তার দ্বিগুণ ফসল হয়েছে। জমির পরিমাণ হ'ল তিন একরের কিছু বেশী। এ বছরে তিনি এন. পি. ৮২৪ গমের বীজ বুনে ১৬৩ মণ ফসল পেয়েছেন। তাঁর পুরো জমির পরিমাণ হ'ল ১৫ একর। জলসেচ দেওয়া হয় পাম্পের সাহায্যে। গম ছাড়া তিনি আদা, শাক সব্জী, তুলো ও বাজরার চাষ করেন।

পরিকল্পনা ও শ্রম

মুন্নীর পাল্লামের নারী

মুন্নীরপাল্লাম হ'ল একটি বড় গ্রাম, যেখানকার বাসিন্দার সংখ্যা হবে ৪০০০। পরিবারের সংখ্যা হ'ল ১,০০০।

গ্রামে বিদ্যুৎ এসে গেছে কিন্তু কয়েকটি রাস্তা ও কিছু বাড়িতে কেবল বিজলীর আলো দেখা যায়। গ্রামটি একটা বড় রাস্তার গায়ে। পাশেই একটা বড় খাল থাকায় গ্রামের লোকেরা কলের জল ও কুয়োর জল ছাড়াও খালের জল ব্যবহার করেন। এখানে বাস যাওয়া আসা করে বড় রাস্তা দিয়ে। কাছেই একটা সরকারী হাসপাতাল আছে।

এ ছাড়া একটা প্রাইমারী স্কুল, একটা হাই স্কুল, একটি প্রসূতি সদন, একটি দুগ্ধশালা, একটি হাঁস মুরগী পালন কেন্দ্র, অনেকগুলি 'কিরানা' বা মুদীর দোকান এবং একটা হোটেল আছে। তা ছাড়া আছে একটি সমবায় দুগ্ধ সমিতি, একটি সমবায় কৃষি ব্যাঙ্ক, একটি পুলিশ চৌকী ও একটি ডাকঘর।

প্রধান পেশা কৃষি হলেও কিছুলোক কেরাণীর বা হিসেব পত্র রাখার কাজ করেন ও কিছুলোক শাকসব্জী বেচেন। তাঁরা অন্যান্য কাজও করেন যেমন কুমোরের কাজ; কাঠের জিনিসপত্র, তালপাতার পাখা, চাটাই প্রভৃতি তৈরি; মণ্ড ও কাগজ তৈরি। কেউবা ইঁটের খোলায় ও কলুর ঘানিতে কাজ করেন। পেতলের বাসনপত্র বা রং তৈরির কাজও করেন গ্রামেরই লোক। বহুলোক আবার এ গ্রাম ছেড়ে মাইল দেড়েক দূরে আর একটা গ্রামে যান চামড়া, বিড়ি ও দেশলাই-এর কারখানায় কিংবা তেলের কলে কাজ করতে।

এঁদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সমীক্ষার জন্যে তিরুনেলভেলীতে 'সারা টাকা'-র কলেজের 'প্ল্যানিং ফোরামে'র তরফ থেকে একটি দল ঐ গ্রামে যান। সমীক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের লোকদের, বিশেষ ক'রে মেয়েদের, কর্ম সংস্থান ও আয়ের সূত্র প্রভৃতি নির্ধারণ করা। সমীক্ষাকারীর দল সবশুদ্ধ ৭৯টি পরিবারের ৭৯ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এঁদের মধ্যে ৬৭ জন ছিলেন মহিলা ও ১২ জন পুরুষ। বয়স ১৫-৭৫ এর মধ্যে।

এই ৭৯ জনের মধ্যে শতকরা ১২.৫ জন হয় কেরাণী নয় হিসাবপত্র রাখার কাজ করেন। শতকরা ৪৩ জন বাঁধাধরা কাজকর্ম করেন না। অবশ্য এঁদের মধ্যে শতকরা ৬.৫ জন খামারের কাজে, শতকরা ৬ জন দিনমজুর হিসেবে, শতকরা ৩ জন স্কুলে টিচার হিসেবে, শতকরা ৪.৫ জন শাকসব্জী বেচার কাজে, শতকরা ৩ জন গরু মোষ দেখার জন্যে ও শতকরা ৩ জন কেরাণী হিসেবে কাজ করেন।

শতকরা ৩৮ জনের অক্ষর পরিচয় হয়নি। শতকরা ৩২ জন পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন। শতকরা ৪ জন এস. এস. এল. সি অথবা প্রবেশিকা পাশ করেছেন, তবু গ্রামের লোকেরা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন। ৭৯টি পরিবারের ৯৪ জন ছেলেমেয়ে স্কুলে যায় ও তিনজন কলেজে যায়। ঐ ৭৯টি পরিবারে কাজ কর্ম করার উপযুক্ত বয়সীদের সংখ্যা ২৬৫ কিন্তু এঁদের মধ্যে মাত্র ১২২ জন কাজ করেন। বেকারদের মধ্যে শতকরা ৭ ভাগ ছেলেমেয়ের বাপ, শতকরা ৪০ ভাগ ছেলেপিলের মা, শতকরা ২২.৫ ভাগ ছেলে, শতকরা ৩১.৫ ভাগ মেয়ে। এই হিসেব থেকেই বোঝা যায়, গ্রামে মেয়েদের উপযুক্ত অর্থকরী কাজের কী রকম অভাব। আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে গ্রামে জীবন ধারণের মান কত নীচু। ৭৯টি পরিবারের শতকরা ৭১ ভাগের আয় মাসিক ১৫-১০০ টাকার মধ্যে। শতকরা ২৯ ভাগের আয় ১০০-৫০০ টাকার মধ্যে। কেবল ৫ শতাংশ মাসে ৩০০ থেকে ৫০০র মধ্যে আয় করেন।

মাসের গড়পড়তা আয় নিরূপণ করার সময় দেখা গেছে যে, শতকরা ৬০ জন মহিলার উপার্জনের অন্য কোনোও উপায় না থাকায় তাঁদের আয় বৃদ্ধি নেই।

আয়ের হিসেবে আরও দেখা গেছে যে, এঁদের মধ্যে ৪২ শতাংশ (যাঁরা অন্যান্য সূত্র থেকেও উপার্জন করেন) নিয়ে মোট শতকরা ৮৬ জন তাঁদের মূল পেশা থেকে যেটুক আয় করেন সেইটুকুতেই সংসার চলে। শতকরা ১৪ জনের স্থায়ী কোনো কাজ নেই।

গ্রামে বাড়তি কাজ হিসেবে, শতকরা ২২টি পরিবার, গোরু মোষ পালনের কাজ করেন। এঁদের মাসিক আয় মাসে ১০-৫০০ টাকার মধ্যে। ১১টি পরিবার হাঁস মুরগী পালন করে।

একটা লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল এই যে শতকরা ৮১ ভাগের নিজস্ব বাড়ী আছে। আর শতকরা ১৯ ভাগ ভাড়া বাড়িতে থাকেন। অন্যদিকে শতকরা ২৯ জনের জমি তাঁদের নিজেদের; শতকরা ১০ ভাগ চাষী এবং শতকরা ৪৭ ভাগ দিনমজুর।

শতকরা প্রায় ৩০ জনের কাছে কৃষির সাজ সরঞ্জামে ও যন্ত্রপাতি আছে।

ব্যাঙ্ক কর্ম্মীদের দক্ষতা

(৯ পৃষ্ঠার পর)

দলকে ঋণ মঞ্জুর করানোর জন্য ম্যানেজারদের ওপর চাপ দিতে প্রলুব্ধ হতে পারেন। এই ধরণের চাপ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ব্যাঙ্কগুলির যাতে থাকে ও সত্যিকারের কর্ত্তৃত্ব থাকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। ঐধরণের চাপের ফলে চাকুরির দিক থেকে তাঁদের যাতে কোন রকম ক্ষতি স্বীকার না করতে হয় তার জন্যও যথেষ্ট 'রক্ষণ' ব্যবস্থা থাকা উচিত।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্ম্মীর সংখ্যা ও তাঁদের গুণের ওপরেই কাজকর্ম্মের দক্ষতা বহুলাংশে নির্ভর করে। রাষ্ট্রায়ত্ব করার ফলে ব্যাঙ্কের শাখার সংখ্যাই শুধু বাড়বেনা কাজকর্ম্মের ধারাও বদলাবে। এর ফলে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আরও বেশী কর্ম্মীর প্রয়োজন হতে পারে। কাজেই রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির হয়তো কিছুকালের মধ্যেই এই রকম কর্ম্মীর ঘাটতি পড়বে। সুতরাং ব্যবসায়ে যে লাভ হবে তার কিছুটা অংশ আঞ্চলিক ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার জন্য রেখে দেওয়া যেতে পারে। তাহলে বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানসম্পন্ন নতুন একদল কর্ম্মী তৈরী করা যেতে পারে। এতে তাঁরা আরও ভালোভাবে এবং বেশী দক্ষতার সঙ্গে তাঁদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করতে পারবেন।
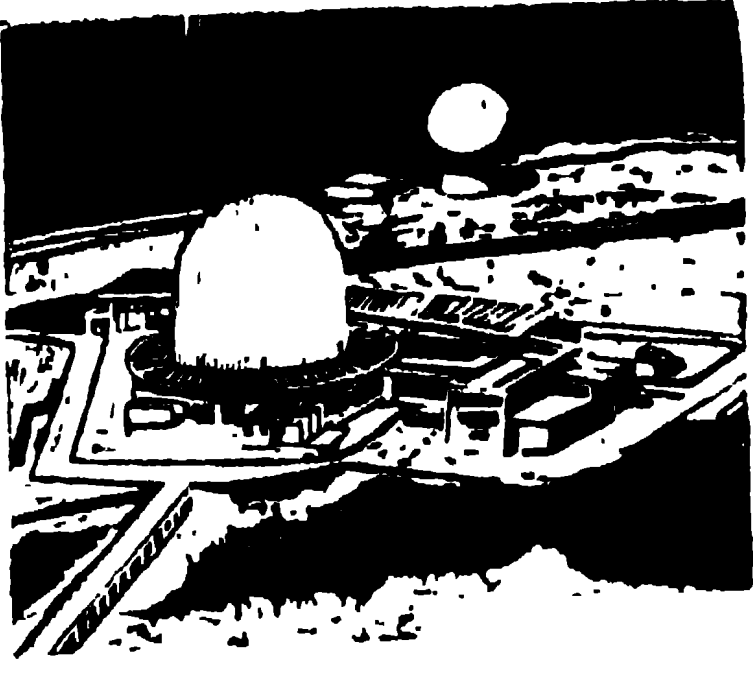
উন্নয়ন বার্তা

★ ভারত সুদানের সঙ্গে একটি নতুন বাণিজ্যিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। চুক্তির মেয়াদ ১২ মাস এবং এর মধ্যে ৩ কোটি পাউণ্ডের জিনিসপত্র লেনদেন হবে। এই চুক্তিতে ব্যবসায়ের পরিমাণ শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন চুক্তি অনুযায়ী সুদান থেকে ১.৮০ লক্ষ গাঁট তুলো পাওয়া যাবে।

★ বেলজিয়াম ভারতকে তিনটি অতি উন্নত ধরনের 'ড্রিলিং রিগ' অর্থাৎ মাটিতে গর্ত করার যন্ত্র উপহার দিয়েছে। রাজস্থান ও গুজরাটের শুষ্ক ও অর্ধ শুষ্ক অঞ্চলে নলকূপ খননে এগুলি খুব কাজে আসবে। প্রত্যেকটি 'রিগের' সাহায্যে বছরে একাধিক নলকূপ খনন করা যাবে। প্রত্যেকটি নলকূপের সাহায্যে প্রায় ৫০০ একর জমিতে সেচ দেওয়া যেতে পারবে।

★ ভারতের সহায়তায় মহেন্দ্র রাজ মার্গের পশ্চিম অংশ নির্মাণ সম্পর্কে ভারত ও নেপাল একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। এই অংশটি তৈরী হয়ে গেলে ভারত ১০২৪ কিলো মিটার দীর্ঘ রাজপথের প্রায় ৬৪০ কিলো মিটার অংশ তৈরি করার কৃতিত্ব দাবী করতে পারবে

★ এই কৃষি মরসুমে পশ্চিম বাংলার যে সব কৃষক প্রচুর ফলন ফসলের চাষে হাত দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সার বন্টনের জন্যে কেন্দ্র, রাজ্য সরকারকে ২.১৯ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুর করেছেন।

★ স্টেট ব্যাঙ্কের একটি নতুন ঋণ সূচীতে, সরকারী সংজ্ঞানুযায়ী ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের আওতায়ন পড়ে না, এমন সব খুচরো কারবারী ও বিভিন্ন বৃত্তিধারীদের জন্য পৃথকভাবে এবং ক্ষুদ্র শিল্প গুলির জন্যে, উদার সর্তে ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। নতুন প্রকল্প অনুসারে ডাক্তার, কারিগরী বিশেষজ্ঞ ও স্থপতি প্রভৃতিদের কিস্তী-বন্দীতে প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি কেনার জন্যে ধার দেওয়া হবে।

★ হিন্দুস্তান কেব্‌ল্‌স্ লিমিটেড ১৯৬৮-৬৯ সালে যে পরিমাণ টেলিফোনের কেব্‌ল্ তৈরি করেছে তা এক রেকর্ড বিশেষ। ঐ সময়ে, ঐ কোম্পানী নীট মুনাফা করেছে ১.৩ কোটি টাকা যা আর একটি রেকর্ড।

★ কলকাতার কাছে হলদিয়ায় একটি নতুন শোধনাগার স্থাপনের জন্যে কয়েকটি ফরাসী তৈল কোম্পানী ভারতীয় তৈল কর্পোরেশনের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। শোধনাগার স্থাপনে ব্যয় হবে ২২.৫ কোটি টাকা। প্রাথমিক শোধন ক্ষমতা হবে বছরে ২৫ লক্ষ টন; এবং পূর্ণ ক্ষমতা ধরা হয়েছে ৩৫ লক্ষ টন।

★ ইন্দোরে ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় ক'রে একটি ডেয়ারী প্রকল্প চালু করা হয়েছে। ১৩.৫ একরেরও বেশী জমিতে এই কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়েছে। এই দুগ্ধ কেন্দ্র থেকে ইন্দোরের ছয় লক্ষ নাগরিককে দুধ যোগানো হবে। যোগানের পরিমাণ হবে দিনে তিন হাজার লীটার দুধ।

★ এক সরকারী মুখপাত্রের খবর অনু-যায়ী জানা গেছে যে, মহীশূরে পরীক্ষা-মূলক খননের ফলে সন্ধান পাওয়া গেছে যে, চিত্রদুর্গ জেলায় ১০ লক্ষ টন প্রাকৃতিক তামা সঞ্চিত আছে।

★ ভারতের ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন গত আর্থিক বছরে ৪.৫ কোটি টাকা অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় আড়াই গুণ বেশী লাভ করেছে।

★ ভারত ও গ্রীসের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তির মেয়াদ এ বছরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। ভারত গ্রীসে ১,২৭০০০ টাকার কমপ্রেসার 'রক ড্রিল' রপ্তানী করবে এবং ২৫,০০০ মেট্রিক টন সার আমদানী করবে।

★ ভারত মরক্কোর সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি সম্প্রসারিত করেছে ১৯৬৯-৭০ সাল পর্যন্ত। ভারত মরক্কোর কাছ থেকে আমদানী করবে 'রক ফসফেট' এবং এক ধরনের কর্ক উড। মরক্কোয় রপ্তানী করা হবে সবুজ চা ও তামাক।

★ স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন সিংহল থেকে ২,২৫০ টন নারকেলের শুকনো শাঁস আমদানী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ৫০০ টনের প্রথম চালান ইতিমধ্যেই কোচিনে পৌঁচেছে।

★ দেরাদুনে আরণ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান উৎকৃষ্ট নিউজ প্রিন্ট তৈরির একটা নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। এই পদ্ধতিতে কাজ ক'রে গেলে নিউজ প্রিন্টের ব্যাপারে দেশ অচিরে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে।

এই প্রতিষ্ঠান অন্ধদের জন্যে ব্রেল কাগজ তৈরির একটা পরীক্ষামূলক প্রকল্পও গ্রহণ করেছে।

★ একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ও যুগোশ্লা-ভিয়ার রপ্তানী আমদানী সংস্থার মধ্যে নিষ্পন্ন একটি চুক্তি অনুযায়ী যুগোশ্লাভিয়া ভারতের কাছ থেকে আরও ৬০০টি জীপ আমদানী করবে।

★ এ বছরে ভারতে পাট ও ঐ জাতীয় জিনিষের উৎপাদনের পরিমাণ হবে ৭৮ লক্ষ গাঁটের মত। গত বছরে এর পরিমাণ হয়েছিল ৪২.৫ লক্ষ গাঁট।

★ ভারত অতিরিক্ত ২৫০০০ টন চাউল কিনবে ব'লে থাইল্যাণ্ডের সঙ্গে একটা চুক্তি করেছে।

★ ঝিলামে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কাশ্মীরের উত্তরে বারামুলার কাছে একটি সাকসান ড্রেজার চালু করা হয়েছে। এর ফলে চাষের জন্য আরও কিছু জমি ছাড়া যাবে।

REGD. NO. D-233

প্রেরণার বাণী

যাঁরা পরিশ্রম ক'রে সদুপায়ে জীবিকা অর্জন করতে চান তাঁদের জন্য ভারতে যথেষ্ট কাজ রয়েছে। ভগবান প্রত্যেককে কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং নিজের অন্ন সংস্থান করা ছাড়াও তাঁরা বেশী উপার্জন করতে পারেন। যাঁরা কাজ করার ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে প্রস্তুত তাঁরা নিশ্চয়ই কাজ পাবেন। যিনি সৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করেন তাঁর কাছে কোন কাজই ছোট নয়। ভগবান আমাদের যে হাত পা দিয়েছেন সেগুলি কাজে লাগানোই হ'ল প্রধান কথা।

কয়েকজন লক্ষপতিকে ধ্বংস করে দরিদ্রের শোষণ বন্ধ করা যায় না, দরিদ্র ব্যক্তিদের অজ্ঞতা দূর করে এবং তাঁদের, শোষণকারীগণের সঙ্গে অসহযোগিতা করতে শিখিয়ে, শোষণ বন্ধ করা যায়।

পুঁজিপতি এবং শ্রমিকের মধ্যে একটা সংঘর্ষের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। এঁরা একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। পুঁজিপতিদের শ্রমিকদের ওপর শাসন দন্ড ঘোরানো উচিত নয় এবং এইটেই বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজন। কল-কারখানায় যে শ্রমিকগণ কাজ করছেন, আমার মতে তাঁরাও কোম্পানীর অংশীদারগণের মতো সেই কারখানার মালিক এবং কারখানার মালিকগণ যেদিন বুঝতে পারবেন যে, কারখানার কর্মীগণও তাঁদেরই মতো মালিকানার সমান অংশীদার সেদিন থেকে তাঁদের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকবে না।

ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য কারখানার কর্মীগণের যে চির অধিকার রয়েছে তা আমি জানি কিন্তু পুঁজিপতিগণ যে মুহূর্তে সালিশের নীতি মেনে নেবে সেই মুহূর্ত থেকে ধর্মঘটকে প্রশ্রয় দেওয়াটাকে অপরাধ বলে মনে করতে হবে।

বর্তমানে ধর্মঘট করা একটা রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এগুলি হ'ল অস্থিরতার চিহ্ন। নানা জনের মুখে নানা ধরনের অস্পষ্ট মতবাদ শোনা যাচ্ছে। একটা অলীক আশা সকলকে উৎসাহিত করছে এবং সেই অলীক আশা যদি সুস্পষ্ট একটা আকার না নিতে পারে তাহলে হতাশাও হবে বিপুল। যাঁরা নিজেদের পরামর্শদাতা এবং পথপ্রদর্শক হিসেবে খাড়া করেছেন, অন্যান্য দেশের মতো ভারতের শ্রমিক জগৎও, তাঁদের হাতের পুতুল হয়ে আছে। এই পরামর্শদাতা ও পথপ্রদর্শকগণ সব সময়েই তাদের নীতিতে ঐকান্তিক বিশ্বাসী না হতে পারে অথবা হ'লেও খুব বিচক্ষণ না হতেও পারেন। শ্রমিকগণ সুখী নন এবং তাঁদের অসন্তুষ্টির বহু কারণ রয়েছে। কাজেই হাতুড়ি, বাটালি ছাড়িয়ে তাঁদের ধর্মঘটে যোগ দেওয়াতে বেশী চেষ্টা করতে হয় না। রাজনৈতিক পরিস্থিতিও, ভারতের শ্রমিকগণের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সুরু করেছে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মঘটকে কাজে লাগানোর মতো শ্রমিক নেতারও খুব বেশী অভাব নেই। আমার মতে এই রকম কোন উদ্দেশ্যে শ্রমিক ধর্মঘটকে কাজে লাগানো অত্যন্ত ভুল একটা উপায়।

শ্রমিকগণ যদি তাঁদের নিজেদের অবস্থা ভালো করতে পারেন, নিজেদের অধিকারগুলি জেনে সেগুলি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন এবং যে জিনিসগুলির উৎপাদনে তাঁদের হাত ছিল প্রধান, সেগুলির উপযুক্ত ব্যবহার সম্পর্কে মালিকগণের ওপর দাবি জানাতে পারেন তাহলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সেটা হবে শ্রমিকগণের একটা মহত্তম অবদান। কাজেই শ্রমিকগণ যদি নিজেদের অবস্থা আংশিকভাবে মালিকগণের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেন তাহলে সেইটেই হবে সত্যিকারের বিপ্লব। কাজেই বর্তমানে কেবলমাত্র শ্রমিকগণের অবস্থা উন্নত করার জন্যই এবং তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রীগুলির মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যেই ধর্মঘটের আশ্রয় নেওয়া উচিত।

মালিকগণের প্রতি আমার পরামর্শ হ'ল, তাঁরাই কল কারখানা স্থাপন করেছেন এবং তাঁরাই একমাত্র এর মালিক এই ধারণা পরিত্যাগ করে তাঁদের নিজেদেরই, শ্রমিকগণকে কারখানার মালিক ব'লে মনে করা উচিত। শ্রমিকগণের মধ্যে যে বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে, তাঁদের শিক্ষিত ক'রে তাঁদের সেই বুদ্ধি ও কর্মকুশলতাকে মুক্তি দেওয়া মালিকগণের কর্তব্য।

দুর্নীতি ও অন্যায়কে জয় করতে হলে তার থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ক'রে রাখা অর্থাৎ পূর্ণ সততার শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে অসৎ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।

অধিকারের দাবী না তুলে সকলেই যদি কর্তব্য করার চেষ্টা করে তাহলেই শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে।

আমি হিন্দু, তুমি মুসলমান কিংবা আমি গুজরাতী, তুমি মাদ্রাজী—এ সব ভুলে যাওয়া উচিত। 'আমি' আর 'আমার' এই দুটোকে জাতীয় ভাবনার মধ্যে মিশিয়ে দিতে হবে। আমাদের দেশের অনেক মানুষ যখন একত্রে সব সুখ ও দুঃখের অংশীদার হতে শিখবে তখনই আমরা নিজেদের প্রকৃত স্বাধীন বলতে পারব।

সাহসের অর্থ অন্যকে ভয় দেখানো নয়। গায়ের জোর দেখিয়ে অন্যকে যে ভয় দেখায় সে সাহসী নয়। যে শক্তিমান হয়েও অন্যকে ভয় না দেখিয়ে দুর্বলকে রক্ষা করে সেই প্রকৃত সাহসী।

আমাদের দেশের লোকের দুর্বলতাগুলি ঢেকে রাখা বা সেগুলিকে নীরবে প্রশ্রয় দেওয়া অথবা তাঁদের দোষগুলি দূর না করে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে কোনোও রকম চাপ দিতে আমার মন চায় না।

ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সোসাইটি লিঃ—করোলবাগ, দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত এবং ডিরেক্টার, পাবলিকেশান্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত।

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত
পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

প্রথম বর্ষ নবম সংখ্যা
২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ : ৬ই আশ্বিন ১৮৯১
Vol. 1 : No 9 : September 28, 1969

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

প্রধান সম্পাদক
শরদিন্দু সান্যাল

সহ সম্পাদক
নীরদ মুখোপাধ্যায়

সহকারিণী (সম্পাদনা)
গায়ত্রী দেবী

সংবাদদাতা (কলিকাতা)
বিবেকানন্দ রায়

সংবাদদাতা (মাদ্রাজ)
এস. ভি. রাঘবন

সংবাদদাতা (দিল্লী)
পুস্করনাথ কৌল

ফোটো অফিসার
টি. এস. নাগরাজন

প্রচ্ছদপট
জীবন আডালজা

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০

টেলিগ্রাফের ঠিকানা—যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

ভুলি নাই

আমাদের বর্ত্তমান চিন্তাধারা ও কর্ম্মনীতির ভিত্তিতে ভবিষ্যতের ভারত গড়ে উঠবে। আমরা সবাই রত্নগর্ভা ভারতমাতার সন্তান ; আমাদের মধ্যেই প্রতিফলিত হচ্ছে বর্ত্তমানের ভারত, আবার আমরাই ভবিষ্যত ভারতের জনক জননী।

—জওহরলাল নেহেরু

সংখ্যায়

ধনধান্যে-তে কেবল অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। প্রবন্ধাদি অনধিক পনের শত শব্দের হওয়াই বাঞ্চনীয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট ও গোটা গোটা অক্ষরে লিখলে ভালো।

শিল্পে শান্তি

ভারতের শিল্পক্ষেত্রে, শান্তির পরিবর্তে অশান্তির লক্ষণই বেশী দেখতে পাওয়া যায়। পরিকল্পিত উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কাজ সুরু করার প্রথম দিকে ১৯৫১ সালে ১,০৭১টি শিল্প বিরোধ ঘটে এবং তার ফলে ৩৮,১৯,০০০টি জন দিবস নষ্ট হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বছর ১৯৫৬ সালে, শিল্প বিরোধের সংখ্যা বেড়ে ১,২০৩টিতে দাঁড়ায় এবং ৬৯,৯২,০০০টি জন-দিবস নষ্ট হয়। এর পাঁচ বছর পর তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বছরে অবস্থা আরও খারাপ হয়, ফলে বিরোধের সংখ্যা দাঁড়ায়, ১,৩৫৭ এবং ৪৯,১৯,০০০ জন-দিবস নষ্ট হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে ১৯৬৬ সালে এই সংখ্যাগুলি আরও বেড়ে যায় এবং ২,৫৫৬টি বিরোধ ঘটে ১,৩৮,৪৬,০০০টি জন-দিবস নষ্ট হয়। শিল্প বিরোধের সংখ্যা ক্রমানুযে বাড়তে বাড়তে ১৯৬৭ সালে তা চরমে পৌঁছায় অর্থাৎ ২,৮১৫টি বিরোধ এবং তার ফলে ১,৭১,৪৮,০০০ জন-দিবসের ক্ষতি হয়। অন্যান্য যে সব কারণে কাজ বন্ধ থাকে তা এই হিসেবের মধ্যে ধরা হয়নি।

মাত্র গত মাসেই পশ্চিমবঙ্গের পাটের কলগুলিতে ধর্মঘটের ফলে, উৎপাদনের দিক থেকে ৮ কোটি টাকার ক্ষতি হয়, আর চা বাগানের কর্মীদের ধর্মঘটের ফলে মাত্র ১৬ দিনে ৪.৮ কোটি টাকার ক্ষতি হয়। বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার দিক থেকে ক্ষতির পরিমাণ হ'ল ৯ কোটি টাকা। শিল্পোৎপাদন বাড়া সত্ত্বেও, অর্থ ও জনদিবসের দিক থেকে এই সব ক্ষতি, সেই ঔজ্জ্বল্যকে অনেকখানি ম্লান করে দিয়েছে।

যে বিরাট দেশ উন্নয়নের নানা সমস্যার ভারে জর্জরিত, সেই দেশ কি ক্রমবর্ধমান শিল্প বিরোধের চাপ সহ্য করতে পারে? জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত কোন সরকার, শৃঙ্খলার কঠোর নাগপাশ দিয়ে কেবলমাত্র শিল্পগুলিকে রক্ষা করার জন্য এবং সমৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌঁছুনোর উদ্দেশ্যে এগুলিকে সচল রাখার জন্য ক্ষমতার চাবুক হাতে নিয়ে শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান দাবি, স্বাভাবিকভাবেই দমন করে রাখতে পারে না। এর চাইতেও বড় কথা হ'ল, শ্রমিক শ্রেণীর উদ্দেশ্যেও সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের একটা রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য এবং জনকল্যাণকামী একটা উন্নয়নশীল অর্থনীতির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় সুষম একটা শ্রমিক মালিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ইচ্ছায় সরকার ১৯৬৬ সালের ২৪শে ডিসেম্বর জাতীয় শ্রমিক কমিশন গঠন করেন। প্রায় তিন বছর ধরে কমিশন বিপুল পরিশ্রমে নানা রকম অনুসন্ধান করে, ২৫০০ জন ব্যক্তিকে প্রশ্নাদি করে এবং ৭৮৩টি প্রতিষ্ঠান এবং ৩৮টি সংস্থা বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করে তাঁদের বিবরণী তৈরি করেছেন। শ্রমিকগণ যাতে সম্পূর্ণ ন্যায় বিচার পান আবার শিল্পোন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখার উপযোগী, একটা আবহাওয়াও যাতে বজায় থাকে এই দুই আপাত বিরোধী লক্ষ্যের মধ্যে কমিশন একটা আপস রফা করতে চেয়েছেন।

কোন বিরোধের কারণ ঘটলে, সেই সম্পর্কে শ্রমিক ও পরিচালক পক্ষের মধ্যে যাতে একটা আপস মীমাংসায় পৌঁছনো সম্ভব হয় সেজন্য কমিশন ৩০ দিন সময় দিয়েছে। এই সুপারিশ দুই পক্ষের মধ্যেই একটা দায়িত্ববোধ এনে দেবে। শ্রমিকগণের মধ্যে অসন্তোষের মাত্রা ক্রমশঃ বেড়ে চলায়, বর্তমানে প্রচলিত ব্যবহার বিধি এবং শৃঙ্খলারক্ষা বিধিগুলি অকেজো হয়ে পড়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, আপস মীমাংসার অবাধ ক্ষমতাসহ কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে, কমিশন 'শিল্প সম্পর্ক কমিশন' গঠনের সুপারিশ করেছেন। এই সব কমিশন যে নির্দেশ দেবেন সেগুলি হবে অপরিবর্তণীয় ও চূড়ান্ত। পরিচালকপক্ষের কোন রকম হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে কমিশনগুলিই কোন ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব যাচাই করবেন এবং সেগুলি রেজিষ্টার করবেন। কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানে কোন বিরোধ উপস্থিত হলে সেই ট্রেড ইউনিয়ই রেজিস্টার্ড সংস্থা হিসেবে আলোচনা করার সম্পূর্ণ অধিকারী হবে।

একটি মাত্র ইউনিয়ন না থাকলে মীমাংসিত সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণভাবে মেনে নেওয়া ও সেগুলি কার্যকরী করা সহজ হবে না এবং তার ফলে আবার বিরোধ উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে বলে কমিশন যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে যে যুক্ত আলোচনা ব্যবস্থা আছে তাতে কোন বিরোধ সালিশীতে পাঠানো হবে কিনা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা সরকারের হাতে রয়েছে। অন্যদিকে সরকারী তরফে শিল্প ক্রমশঃ বিস্তৃত হচ্ছে বলে সরকার নিজেই ক্রমশঃ সর্ববৃহৎ নিয়োগকারী হয়ে পড়ছেন। কমিশন এই সব দিক বিবেচনা করেই শিল্প সম্পর্ক কমিশন গঠনের সুপারিশ করেছেন।

সরকারী তরফের শিল্পকর্মীগণের জন্য কমিশন অবিলম্বে একটি বেতন কমিশন গঠনের সুপারিশ করেছেন। কমিশন অন্যান্য যে সব সুপারিশ করেছেন তার মধ্যে মাতৃত্বকালীন সাহায্যের জন্য ও কর্মীগণকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য একটি কেন্দ্রীয় তহবিল গঠন, কাজের সময় আস্তে আস্তে কমিয়ে সপ্তাহে ৪০ ঘন্টা করা, চুক্তির ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ ব্যবস্থার বিলোপ করা এবং ১৯৬০ সালকে মূল বছর ধরে, জীবন ধারণের ব্যয় সূচীর শতকরা ৯৫ ভাগ মেটানোর ব্যবস্থা ইত্যাদি রয়েছে।

বিপুল পরিশ্রমে, পরীক্ষা ও অনুসন্ধান চালিয়ে কমিশন যে সব সুপারিশ করেছেন তা নিশ্চয়ই সরকারী দপ্তরে হারিয়ে যাবে না বলে আমরা আশা করতে পারি। যে সরকার সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করতে চাইছেন তাদের পক্ষে, এই সুপারিশগুলি গ্রহণ করে তাড়াতাড়ি সেগুলি কার্যকরী করার দায়িত্ব উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

সরকারী মালিকানায় ব্যাঙ্কের ভূমিকা জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ

এস. এন. ঘোষাল

একটা সাহসিকতাপূর্ণ ব্যবস্থাকে সফল করে তোলার জন্য সংগঠনের ক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন প্রয়োজন তা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে দেখা প্রয়োজন। বিচারে কোন রকম ভুল হলে তা রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিপুল অঘটনের সৃষ্টি করতে পারে।

১৯৬০ সাল থেকেই ভারতের ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে বহু চমকপ্রদ এবং প্রগতিশীল পরিবর্তন সুরু হয়েছে। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ হ'ল এই সব পরিবর্তনের চূড়ান্ত পর্যায় এবং তা হল ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ইতিহাসের একটা সন্ধিক্ষণ।

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ ব্যবস্থাটা সাম্প্রতিক নয় অথবা ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে তা অতর্কিত নয়। প্রায় ১৯৫০ সাল থেকেই মধ্যে মধ্যে ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করার জন্য দাবি জানানো হচ্ছিল। তার কারণ হ'ল অন্যান্য যে কোন উন্নয়নশীল দেশের মতো ভারতও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে অর্থের সংস্থানের জন্য আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় সংহত করতে চায়, কারণ অন্য কোন স্থান থেকে সাহায্য চাইতে গেলে হয়তো এমন জটিলতার সৃষ্টি করবে যে সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থাই হয়তো ভেঙ্গে পড়বে।

ব্যাঙ্কের ব্যবসা থেকেই কোন জাতির আর্থিক উন্নয়নের অবস্থা জানতে পারা যায়। জনগণের আশা আকাঙ্খা ও আদর্শের সঙ্গে ব্যাঙ্কগুলির কতখানি যোগ আছে এবং জনসাধারণের আশা আকাঙ্খা পূরণ করার জন্য ব্যাঙ্কগুলি কতখানি সাহায্য করছে তার ওপরেই অবশ্য এটা নির্ভর করবে।

গত ১৯শে জুলাই জাতির উদ্দেশ্যে একটি বেতার ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ঠিকই বলেছেন যে, 'ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মতো একটা প্রতিষ্ঠান যার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষের সম্পর্ক রয়েছে এবং যা থাকা উচিত—সেগুলির কাজকর্মের লক্ষ্য, সমাজের ব্যাপকতর কল্যাণের দিকেই হওয়া উচিত—এবং জাতীয় অগ্রাধিকার ও লক্ষ্যগুলিও পূরণ করা উচিত।' এই জন্যই ব্যাপকভাবে দাবি জানানো হচ্ছিল যে প্রধান প্রধান ব্যাঙ্কগুলির ওপর কেবল সামাজিক নিয়ন্ত্রণ থাকলেই চলবে না এগুলি সরকারী মালিকানায় নিয়ে আসা উচিত।

ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রের অধিকারে এলেই লক্ষ্য পূরণ হবে না এটা হল লক্ষ্য পূরণের উপায় মাত্র। শুধু রাষ্ট্রায়ত্ত করলেই পরিচালনা এবং কাজকর্মের সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে যায় না। ধরে নেওয়া হয়েছে যে সরকারী মালিকানায় থাকলে ব্যাঙ্কের ঋণ, ফাটকা বাজিতে বা অন্য কোন অলাভমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি এখন অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্রগুলিতে ঋণ বন্টনের পরিমাণ বাড়াতে পারবে বলেও আশা করা যাচ্ছে। শিল্পপতিগোষ্ঠী এবং ব্যাঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার ফলে ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ পরিচালনা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে কি না সেটাই এখন লক্ষ্য করার বিষয়।

বিরাট কর্তব্য

যে সব উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে সেগুলি রূপায়িত করতে হলে বেশ কিছু সময় পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের কাজ কর্মের ধারায় পরিবর্তন আনতে হবে। পরিবর্তন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত এবং কি গতিতে সেই পরিবর্তনগুলি সম্পূর্ণ করতে হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন উপদেষ্টা বোর্ড এবং পরিচালকগণ তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন। তবে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় বিভিন্ন রকম দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলির এখন কি পরিমাণ দক্ষ কর্মী আছেন অথবা অদূর ভবিষ্যতে কত সংখ্যক দক্ষ কর্মী তৈরি সম্ভব হবে তা এখন বলা সম্ভব নয়।

প্রকৃতপক্ষে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করায় প্রত্যেকেই ভাবছেন যে এবারে তাঁদের আশা পূর্ণ হবে। ছোট ছোট কৃষকরা ভাবছেন যে, সার, বীজের পরিবর্তে এবারে তারা নগদ টাকা ঋণ পাবেন। নগদ টাকা ঋণ দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রায়ই যুক্তি দেখানো হয় যে, ঋণ হিসেবে টাকা দিলে তার অপব্যবহার হয়। কিন্তু একটু গভীরভাবে বিবেচনা করলেই বোঝা যায় যে, ছোট কৃষকদের এই দাবি যুক্তিসঙ্গত। শিক্ষিত ব্যক্তিরা যা পারেন না অশিক্ষিত দরিদ্র কৃষকের কাছে তা আশা করা বৃথা। প্রকৃতপক্ষে যাঁদের মাসিক একটা আয় আছে তাঁরা পর্যন্ত এমন ক'টা টাকা সঞ্চয় করতে পারেন না যাতে মাসের শেষ কয়েকটা দিন নিশ্চিন্তে কাটানো যায়। কৃষকগণের দাবিও যেমন যুক্তিসঙ্গত তেমনি ব্যাঙ্কগুলি যদি লাভের আশাবিহীন ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ করতে রাজি না হয়ে থাকে তাহলে সেটাও একেবারে যুক্তি বিরুদ্ধ নয়। বর্তমানে রাষ্ট্রাধীন ব্যাঙ্কগুলি যেমন এই রকম দাবি উপেক্ষা করতে পারবেনা, তেমনি আয় এবং ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতার প্রশ্নও উপেক্ষা করতে পারবেনা।

ব্যাঙ্কগুলির, কৃষকদের, ব্যবসায়ীদের, ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে এবং রাষ্ট্র ও বড় শিল্পগুলিকে অর্থ সাহায্য করা উচিত। কিন্তু কি হারে, কি পরিমাণে এবং কি উদ্দেশ্যে কতদিনের জন্য এই ঋণ দেওয়া হবে, এই প্রশ্নগুলির উত্তর অবিলম্বে দেওয়া প্রয়োজন।

সম্প্রসারণ সূচীর লক্ষ্য

কে. কে. দাস

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

পর পর কতকগুলি কার্যসূচী হাতে নিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। সম্প্রসারণ-কার্যসূচী কৃষি উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই সূচীর অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল গ্রামাঞ্চলের কৃষকগোষ্ঠীকে কৃষি বিজ্ঞানও নতুন কৃষিপদ্ধতিতে শিক্ষিত ক'রে তাঁদের মনে আস্থা সঞ্চার করা। একটা গ্রামের দু'চারজন কৃষককেও যদি কৃষি উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন করা যায় তাহলেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ সূচীর একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হ'ল 'রেজাল্ট ডেমনস্ট্রেশান' অর্থাৎ হাতে কলমে কাজ ক'রে ফল দেখিয়ে দেওয়া। এই পদ্ধতিকে এক কথায় বলা যেতে পারে 'ক্ষেত্র সাফল্য'। এই 'ক্ষেত্র-সাফল্য-সূচী' হ'ল কৃষকদের সমস্যা সমাধানে সম্প্রসারণসূচী কতটা সহায়ক হবে তা প্রতিপন্ন করার একটা পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মোটামুটি পাঁচটি পর্যায় আছে, যথা:—(ক) প্রাক-পরিকল্পনা স্তর, (খ) পরিকল্পনা স্তর, (গ) কার্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পদ্ধতির কার্যকারীতা প্রমাণ (ঘ) মূল্যায়ন এবং (ঙ) স্বীকৃতি।

এই পদ্ধতির কার্য্যকারীতা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্য হরিণঘাটা সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে একটি সমীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। এই ব্লকটি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি-কলেজের সম্প্রসারণ শাখার সঙ্গে যুক্ত।

নির্ধারিত পদ্ধতির নির্দিষ্ট মানের সঙ্গে, কার্য্যক্ষেত্রে ফলাফলের তুলনা ক'রে দেখা যায় যে, প্রাক-পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা পর্যায়ের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সম্প্রসারণ-ক্ষেত্র-কর্ম্মীদের জ্ঞান অত্যন্ত অল্প।

যে সব কৃষক-শিক্ষার্থীকে ক্ষেত্র-কর্ম্মী হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে, তাঁরাও এ কথা সমর্থন করেছেন। কারণ তাঁরা কার্য্য ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ ক্ষেত্রকর্মীদের এই জ্ঞানের অভাব প্রত্যক্ষ করেছেন। যদিও 'ক্ষেত্র সাফল্য' পদ্ধতির গুরুত্ব সম্বন্ধে ক্ষেত্রকর্মীরা ও শিক্ষার্থী-কৃষকরা সচেতন তথাপি তাঁদের তরফে, এই পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কোনোও প্রচেষ্টা নজরে পড়েনি।

ক্ষেত্রে, হাতে কলমে ক'রে দেখানোর পর্যায়ে, শতকরা ৭০ জন ক্ষেত্র-কর্মী এবং শতকরা ৮৩ জন শিক্ষার্থী কৃষক সমস্ত নিয়ম খুঁটিয়ে মেনে চলেছেন।

মূল্যায়ণ স্তরে কাজকর্মের যে রকম বিবরণ পাওয়া গেছে, তাতে দেখা গেছে যে, শতকরা ৮০টি ক্ষেত্রে (শিক্ষার্থী কৃষকদের মতে) মূল্যায়ণ করা হয়েছে যথা সময়ে। শতকরা ৮৬ জন ক্ষেত্র-কর্মীও এই কথা বলেছেন। কৃষকদের মনে যখন নতুন নতুন পদ্ধতি সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায় তখনই মূল্যায়ণ করা হয়। সমীক্ষার সময়ে মূল্যায়ণের গুরুত্ব সম্বন্ধে কর্মীদের মধ্যে বেশ সচেতন ভাব দেখা গিয়েছে।

নতুন পদ্ধতি গ্রহণ সম্বন্ধে শিক্ষার্থী কৃষকদের মতামত প্রায় এক রকম। শতকরা ৫৩ জন নতুন পদ্ধতি গ্রহণে আগ্রহী।

কার্য্যক্ষেত্রে সাফল্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলিও পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়। এগুলির কার্যকারীতা যে অনস্বীকার্য এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সমীক্ষা শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে যে, যে কোনোও গোষ্ঠীর মধ্যে যে কোনোও নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুযোগ সুবিধা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য এবং স্থানীয় অধিবাসীদের মানসিকতার দিক থেকে তার উপযোগিতা, পূর্ণাঙ্গে নিরূপণ করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।
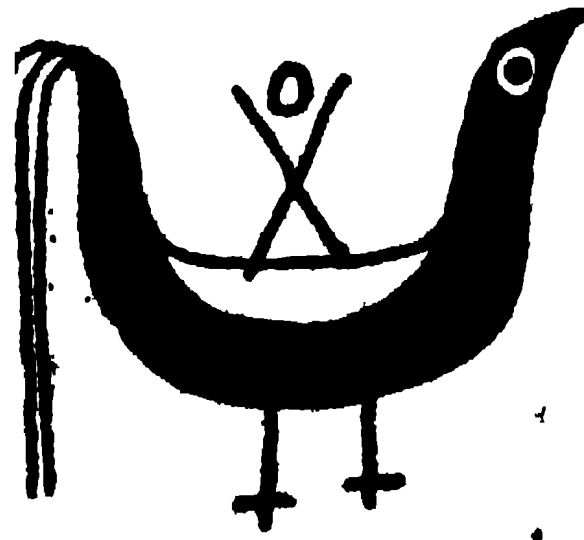
টেলিভিশনে কৃষি অনুষ্ঠান আগ্রহের সৃষ্টি করছে

সাম্প্রতিক একটি অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, আকাশবাণী থেকে কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে যে 'কৃষি দর্শন'-অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়, তার শতকরা ৬৮ ভাগ দর্শক স্বীকার করেছেন যে এই অনুষ্ঠানগুলি থেকে কৃষি সম্পর্কে তাঁরা প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জানতে পারেন। শতকরা ১৭ ভাগ বলেন যে তাঁদের পক্ষে এই, অতি প্রয়োজনীয় সংবাদাদি, এই সব অনুষ্ঠান ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায়না।

পরমানবিক শক্তি সংস্থা, আকাশবাণী, ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং দিল্লী প্রশাসনের মিলিত প্রচেষ্টায় ১৯৬৭ সালের ২৬শে জানুয়ারি থেকে এই অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে।

এই কর্মসূচী অনুযায়ী প্রতি বুধবার ও শুক্রবার সন্ধ্যাবেলায় হিন্দীতে ২০ মিনিটের একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কি কি কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত তা বলা হয়। দিল্লীর চতুর্দ্দিকে ৮০টি গ্রামে টেলিভিশন সেট বসানো হয়েছে।

দর্শকগণের মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ মনে করেন যে অনুষ্ঠানটির সময় সীমা আরও বাড়ানো উচিত। শতকরা ৮০ জন মনে করেন যে দু'ইজনের মধ্যে বার্ত্তালাপের ঢঙে তথ্যাদি পরিবেশন করলে ভালো হয়।

ভারতে টেলিভিশন

ডাঃ বি. বি. ঘোষ

অল ইণ্ডিয়া রেডিও, গবেষণা বিভাগ

১৯৫৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর অল ইণ্ডিয়া রেডিওর পরীক্ষাধীন টেলিভিশন সংস্থার উদ্বোধন করা হয়। এই ঘটনার প্রায় ৩০ বছর আগে (১৯২৪-৩০) ভারতে বেতার শব্দ-বিকীরণের (সাউণ্ড ব্রডকাস্টিং) প্রথম ব্যবস্থা বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজে বেসরকারীভাবে চালু করা হয়েছিল। কাজেই ভারতে টেলিভিশনে ছবি ও শব্দ পাঠানোর ব্যবস্থার সুরু বেশ একটু দেরী ক'রেই হয়েছে। তবু দেরীতে হ'লেও ভারতবর্ষের জনসাধারনের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে এই সংস্থার স্থাপনা একটি মূল্যবান দূরপ্রসার ব্যবস্থার সূত্রপাত স্বরূপ। সমগ্রভাবে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা, শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থা এবং রাজনীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে জনসাধারনের জন্য তথ্য পরিবেশন করার যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে (যেমন সংবাদপত্র, আকাশবানী, চলচ্চিত্র প্রভৃতি) তারমধ্যে টেলিভিশন হ'ল তথ্যপ্রচার ও শিক্ষাবিস্তারের সবচেয়ে সুষ্ঠু মাধ্যম। টেলিভিশন জনসাধারনের মনোভাব, ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী যেভাবে প্রভাবিত করে তা আর কোনও কিছুর মাধ্যমে হয় না। তাই অনেকের মতে, এই ব্যবস্থার উন্নতি ও বিস্তার এদেশে দ্রুততর হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন বানিজ্য, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি কতকগুলি অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রচেষ্টায় মোটামুটি অনেকটা অগ্রগতি হয়েছে। তাই সেসব দিকে দৃষ্টি দেওয়ার আবশ্যকতাও খানিকটা কমে এসেছে। সেইজন্য এখন টেলিভিশন ব্যবস্থার আরও বেশী উন্নতি ও প্রসারের দিকে সরকার নজর দিচ্ছেন।

ভারতে এখন মাত্র একটি টেলিভিশন কেন্দ্র আছে—নিউ দিল্লীতে। প্রতিদিন সন্ধ্যায়, কয়েকঘন্টা, হাল্কা অনুষ্ঠানের সঙ্গে তথ্য ও সংবাদ হিসাবে নানান বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শব্দসমেত ছবি, চলচ্চিত্র ইত্যাদি এই কেন্দ্র থেকে বেতারে পাঠান হয়। যে বেতার কম্পন সংখ্যায় (ট্রান্সমিটেড্ রেডিও ফ্রীকোয়েন্সি) সাধারনতঃ টেলিভিশনের শব্দ ছবি সকল দেশে পাঠান হয় তা সাধারণ শব্দ প্রচারের কম্পন সংখ্যার চাইতে অনেকগুণ বেশী। সেইজন্য টেলিভিশন অনুষ্ঠান বেশীদূর পর্য্যন্ত পাঠান যায় না। এ বিষয়ে সাধারণ আলোর মতই এর প্রসার এবং গতি। যেখানেই বাধা বা আড়াল তার পেছনেই 'ছায়া' এবং কোনও 'টেলিভিশন রিসিভার' এই আড়ালের ছায়ায় থাকলে—টেলিভিশন সিগ্ন্যাল্ ধরা কঠিন হয়ে উঠে। প্রায় প্রতি দেশেই এইজন্য—টেলিভিশনে শব্দ ও ছবি ধরার সীমা বাড়ানোর জন্য টেলিভিশন ট্রান্সমিটারের এরিয়াল খুব উঁচুতে, কোনও 'টাওয়ার' বা পাহাড়ের উপরে খুব উঁচু বাড়ীর উপর বসান হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক বিধান অনুযায়ী দিল্লী কেন্দ্র থেকে টেলিভিশনের ছবির তরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে ৬২২৫০০০০ বেতার কম্পনের আর তার সঙ্গে শব্দ ৬৭৭৫০০০০ বেতার তরঙ্গে পাঠান হয়। গড়পড়তা ২০ থেকে ২৫ মাইলের মধ্যে—দিল্লী কেন্দ্র থেকে প্রেরিত এই টেলিভিশন সিগ্ন্যাল্ ভালভাবে ধরা যায় টেলিভিশন 'রিসিভারে'। হালকা অনুষ্ঠান, সংবাদ, তথ্য ইত্যাদির প্রোগ্রাম ছাড়াও, প্রায় প্রতিদিন, বিশেষ ক'রে যে সকল দিনে স্কুলগুলি খোলা থাকে সেই সকল দিনে স্কুলের ছাত্রদের জন্য ইংরাজি, হিন্দী, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধেও পাঠ হিসাবে শিক্ষনীয় ছবি ও শব্দের প্রোগ্রাম পাঠান হয়।

দিল্লীতে ১৯৫৯ সালে যখন টেলিভিশন প্রথম চালু করা হয়, তখন যন্ত্রপাতি বিশেষ কিছু ছিল না বললেই হয়। সামান্য যা কিছু পাওয়া গিয়েছিল তা নিয়ে কিছু গবেষণা করা হয়। এই গবেষণার প্রয়োজন ছিল। আমাদের মত এত বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পন্ন বিরাট দেশের জনতার চাহিদা অন্যান্য দেশের চাইতে একেবারে বিভিন্ন। অদূর ভবিষ্যতে সেই চাহিদা মেটাতে হ'লে টেলিভিশনের গোড়াপত্তনেও যাতে কোন ত্রুটি না থাকে তার কথা ভেবেই এই গবেষণা। সাধারণভাবে যে কোন দেশে জাতীয় টেলিভিশন ব্যবস্থা স্থায়ী ভাবে চালু করার আগে সেই দেশে এই ব্যবস্থার জন্য কী কী কারিগরী মান (টেক্নিক্যাল ষ্ট্যাণ্ডার্ড) নির্দেশ করা হবে তার বিচারের জন্য প্রতি দেশেই টেলিভিশন প্রথমে পরীক্ষাধীন ভাবে চালু করা হয়। দেশের জনসাধারনের মতে শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ কারিগরী পরিমাপ অনুযায়ী টেলিভিশনের ছবি ও শব্দ গ্রহণযোগ্য মনে হ'লে-সেই কারিগরী পরিমাপ, নির্ধারন ক'রে দেওয়া হয় এবং পরে এই পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা স্থায়ী টেলিভিশন ব্যবস্থা হিসাবে চ'লে। ভারতেও এইজন্য প্রথমে পরীক্ষামূলক এবং পরে স্থায়ী ভাবে (দিল্লীতে) প্রথম টেলিভিশন কেন্দ্র চালু করা হয়।

টেলিভিশনে ছবি পাঠানর জন্য যে যে কারিগরী পরিমাপগুলি গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় তার মধ্যে 'স্ক্যানিং লাইন্স' সব চাইতে প্রধান। এই স্ক্যানিং লাইন্সের ভিত্তিতে, সমগ্র বিশ্বে টেলিভিশনের জন্য যে যে কারিগরী পরিমাপগুলি চালু আছে তার একটা তালিকা নীচে দেওয়া গেল। প্রতি সেকেণ্ডে কম্পন সংখ্যার নাম 'হার্জ' —আর প্রতি সেকেণ্ডে ১,০০০০০০ বার কম্পন সংখ্যার নাম—'মেগাহার্জ' বা 'মেগা সাইকল্স্ পার সেকেণ্ড'।

গ্রেট বৃটেনে ৪০৫ লাইনের (তালিকার ১নং স্তম্ভ দ্রষ্টব্য) পরিমাপগুলি

	১	২	৩	৪
প্রতিচ্ছবির ফ্রেমে স্ক্যানিং লাইনের সংখ্যা	৪০৫	৫২৫	৬২৫	৮১৯
সুষ্ঠু ছবির জন্য বেতার তরঙ্গের প্রসার	৩	৪	৫	১০.৪
ছবির তড়িৎ কম্পন সংখ্যা	৫০	৬০	৫০	৫০
ছবির ফ্রেমের সংখ্যা	২৫	৩০	২৫	২৫

অনেকদিন থেকে চালু আছে। স্ক্যানিং লাইন্স অপেক্ষাকৃত কম হলেও ছবি এবং দৃশ্যাবলীর মান ভাল। ছবির জন্য বেতার তরঙ্গের প্রসারও এতে অপেক্ষাকৃত কম। স্ক্যানিং লাইন্স বাড়ানর সঙ্গে সঙ্গে বেতার তরঙ্গের প্রসারও বাড়ে এবং তাতে যান্ত্রিক জটিলতা বাড়ে (অবশ্য তাতে ছবির উৎকর্ষ বাড়ে)। সেইজন্য অনেক দেশে এই দুটির একটা মাঝা মাঝি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আমেরিকার ৫২৫ লাইনের মাপ অনুযায়ী টেলিভিশনে দৃশ্যাবলী পাঠান হয়। ফ্রান্স এবং ইউরোপের অনেকদেশে ৮১৯ লাইনের ছবি পাঠানর ব্যবস্থা আছে। কোনও কোনও দেশে ৪৪১ লাইনও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ছবি বা দৃশ্যাবলীর চাঞ্চল্য (ফ্লিকার), ছবির তড়িৎ কম্পন সংখ্যার (ফীল্ড ফ্রিকোয়েন্সি) উপর নির্ভর করে। দেশে তড়িৎ সরবরাহের কম্পন সংখ্যা দিয়ে (ফ্রিকোয়েন্সি অফ্ এ.সি. ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই) এর সংখ্যা নির্দেশ করা হয় এবং দেখা গেছে এর সংখ্যা ৫০ বা ৬০ হ'লে ছবির চাঞ্চল্য তেমন বোঝা যায় না। যান্ত্রিক পরিমাপগুলি এই রকম দেশে দেশে বিভিন্ন হওয়ার জন্য—টেলিভিশন প্রোগ্রামের আদান প্রদান বা তথ্য বিনিময়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি হয়। বর্ত্তমানে সেইজন্য একটি বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থা (সি.সি. আই.আর অর্থাৎ কন্সালটেটিভ কমিটি অন্ ইন্টারন্যাশনাল রেডিও), যাতে পৃথিবীর সমস্ত দেশে একই রকম কারিগরী পরিমাপের ব্যবস্থা করে, তার জন্য ৬২৫ লাইনের ভিত্তি অনুযায়ী যান্ত্রিক পরিমাপের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন। রাশিয়া এবং আরও কতকগুলি দেশ এই ব্যবস্থা চালু করেছে। ভারতও এই নির্দেশ অনুযায়ী ৬২৫ লাইনের মাপ প্রণালী গ্রহণ করেছে। বর্ত্তমানে স্যাটিলাইট দিয়ে যে টেলিভিশন চলে তাও এই ৬২৫ লাইন অনুযায়ী। ভারতে ভবিষ্যতে টেলিভিশনের ব্যাপক প্রসারের জন্য এবং স্যাটিলাইটের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক টেলিভিশন ব্যবস্থার সঙ্গে আদান প্রদানের জন্য এই ৬২৫ লাইনের ভিত্তিতে কারিগরী পরিমাপগুলি গ্রহণের সিদ্ধান্ত খুবই সুবিধাজনক হবে। বর্ত্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতে অচিরে আরও কয়েকটা টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা হবে। প্রথম দফায় বোম্বাই, শ্রীনগর এবং পুণাতে একটি টেলিভিশন কেন্দ্র চালু করার বন্দোবস্ত চলছে। ভবিষ্যতে আরও কয়েকটা কেন্দ্র, অন্ততঃ কয়েকটা বড় বড় সহরেও যাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তার প্রকল্পও ভারত সরকারের বিবেচনাধীন আছে। যেহেতু টেলিভিশন সিগনাল দূরে যায় না তাই সাধারনতঃ অন্যান্য দেশে জায়গায় জায়গায় একটু দূরে দূরে অনেকগুলি টেলিভিশন কেন্দ্র এবং তার সঙ্গে কিছু 'মাইক্রোওয়েভ রিলে লিঙ্ক' লাগিয়ে সমগ্রদেশের সর্ব্বত্র টেলিভিশন সিগ্নাল যাতে ধরা যায় তার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। ভারত এত বড় দেশ এবং এ দেশে ভাষা এবং সংস্কৃতি এত বিভিন্ন যে সমগ্রভাবে সারা দেশের সর্ব্বত্র টেলি-ভিশনের ব্যবস্থা করা বহু ব্যয়সাধ্য এবং এর জটিলতাও অনেক। কিভাবে এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা যায় তাও সরকার এখন বিবেচনা করছেন।

উদ্ভাবনী শক্তি কখনও কখনও সত্যিই অর্থাগমের উপায় হয়ে দাঁড়ায়

আজকের শিল্পায়নের যুগে মৌলিক চিন্তা ও গবেষণা অর্থকরী ও লাভজনক হ'তে পারে। চিন্তার মৌলিকত্ব থাকলে তার দ্বারা আয় করা সম্ভব। টাটা আয়রন এ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী সৃজনী প্রতিভাও উদ্ভাবনী শক্তিকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রকল্প সুরু করেন। প্রকল্পটির সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে টাটা কোম্পানী ১৯৬৬ সালের আগষ্ট মাসে 'প্রস্তাব-মাস' পালন করে।' নতুন নতুন কার্যকরী প্রস্তাবের জন্যে ঐ কোম্পানী পুরস্কার প্রবর্তন করে। এর দরুণ গত বছরে ২৭,২৭৫ টাকা পুরস্কার হিসেবে বিতরণ করা হয়। তেমন তেমন প্রস্তাব এলে ৬,০০০ টাকাও দেওয়া হয় পুরস্কার হিসেবে আবার ছোটখাট প্রস্তাবের জন্যে ২৫ টাকা বা তার বেশী দেওয়া হয়।

এই প্রকল্প অনুযায়ী গত বছর পর্যন্ত ১৬,৭০৫টি প্রস্তাব আসে আর যে কটি পুরস্কার বিতরণ করা হয়—তার মোট পরিমাণ হবে ২,০৩,৪৬৫ টাকা।

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে এবং তথ্য ও বেতার মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত হ'লেও 'ধনধান্যে' শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করে না। পরিকল্পনার বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী ক্ষেত্রে উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতটা অগ্র-গতি হচ্ছে তার খবর দেওয়াই হ'ল 'ধনধান্যে'র লক্ষ্য।

'ধনধান্যে' প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে প্রকাশিত হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

নিয়মাবলী

দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়।

অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পুনঃ প্রকাশ-কালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার করা হয়।

রচনা মনোনয়নের জন্যে আনুমানিক দেড় মাস সময়ের প্রয়োজন হয়।

মনোনীত রচনা সম্পাদক মণ্ডলীর অনুমোদনক্রমে প্রকাশ করা হয়।

তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয়। কোনোও রচনার প্রাপ্তি-স্বীকৃতি, পত্র মারফৎ জানানো হয় না।

নাম ঠিকানা লেখা ডাকটিকিট লাগানো খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

কোনো রচনা তিন মাসের বেশী রাখা হয়না।

শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাবেন।

গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেস ম্যানেজার, পাব্লিকেশন ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী-১। এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

"ধনধান্যে" পড়ুন
দেশকে জানুন

বারৌনি শোধনাগার

এম. এম. শ্রীবাস্তব

[সরকারী মালিকানাধীন বারৌনি তৈলশোধনাগারটি বর্ত্তমান বছরের ১৪ই জুলাই পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করল]

এই অল্প সময়ের মধ্যেই শোধনাগারটি, তার কর্ম্মক্ষেত্রের সব দিকে অর্থাৎ নির্ম্মাণে, উৎপাদনে, উৎপাদিত সামগ্রী সরবরাহে, কর্ম্মীগণের কল্যাণ সাধনে এবং শ্রমিক পরিচালকের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যথেষ্ট এগিয়ে গিয়েছে।

ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের এই প্রকল্পটির জন্য ব্যয় হয়েছে ৫০ কোটি টাকা এবং ১৯৬৪ সালে এর কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে এর অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে।

এই বছরের জানুয়ারি মাসে তৃতীয় এ্যাট-মসফেরিক কর্ম্মসূচী সম্পূর্ণ হয়। এর ফলে শোধনাগারটির শোধন ক্ষমতা ৩০ লক্ষ টনে গিয়ে দাঁড়ালো। এই ক্ষেত্রে আনন্দের কথা হ'ল এই যে ভারতীয় কর্ম্মীগণই, ইউনিটটি তৈরী করার ও সেটি চালু করার সমস্ত ভার নেন। বারৌনি শোধনাগারে নানারকম যে সব জিনিস তৈরী হয় সেগুলির মধ্যে নতুন যে দুটি জিনিস যুক্ত হল তা হল, আরোমেক্স এবং ফেনল নির্য্যাস।

এই পাঁচ বছরে শোধনাগারটির উৎপাদন ক্ষমতা সাতগুণ বেড়েছে অর্থাৎ ১৯৬৪-৬৫ সালে যেখানে উৎপাদন ছিলো মাত্র ২ লক্ষ ৫০ হাজার টন, সেই ক্ষেত্রে তা হয়েছে ১৭ লক্ষ ৬৭ হাজার টন।

এই পাঁচ বছরের মধ্যে ১৯৬৮-৬৯এর আর্থিক বছরে, অশোধিত তেল কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে, বিভিন্ন জিনিস উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে শোধনাগারটি সব চাইতে বেশী ভালো ফল দেখায়। এই বছরের মে মাসে কয়েকটি মাসিক রেকর্ড স্থাপিত হয়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই মাসের প্রধান কয়েকটি সাফল্য হল : সর্ব্বাধিক পরিমাণ অশোধিত তেল শোধন করা হয়েছে, সর্ব্বাধিক পরিমাণে অন্যান্য জিনিস উৎপাদিত হয়েছে, কোকিং এবং কেরোসিন ইউনিটে সর্ব্বাধিক পরিমাণে কাজ হয়েছে এবং উৎপাদিত সামগ্রী সর্ব্বাধিক পরিমাণে পাঠানো হয়েছে।

১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসের প্রবল বন্যায় তিস্তা সেতুর কাছে পাইপ লাইন ভেঙ্গে যাওয়ায় অশোধিত তেল সরবরাহে বিশৃঙ্খলা ঘটা স্বত্বেও এই সাফল্য অর্জ্জন করা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ।

কোকিং ইউনিট

শোধনাগারের কোকিং ইউনিটটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটির যন্ত্রপাতি কোনরকমভাবে বিকল না করে সম্প্রতি এই ইউনিটটি ১৫০ দিন ধ'রে অবিরাম গতিতে কাজ করে। তারপর ৬ই এপ্রিল এটির কাজ বন্ধ ক'রে যন্ত্রপাতি যথানিয়মে পরিস্কার করা হয়। (এই প্রসঙ্গে উল্লেখ

(শেষাংশ ১৮ পৃষ্ঠায়)

ভারতে দুই দশকের শিল্পোন্নয়ন প্রতিফলিত করাই হবে

তেহরাণে ভারতীয় প্রদর্শনীর লক্ষ্য

বর্তমান বছরের ৫ই অক্টোবর তেহরাণে যে তিন সপ্তাহব্যাপি দ্বিতীয় এশিয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা সুরু হচ্ছে, ভারত তাতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করবে। 'ইকাফের' উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলায় মোট ৪৫টি দেশ অংশ গ্রহণ করবে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণই হ'ল এই বাণিজ্য মেলার লক্ষ্য। কাজেই এই মেলাটি বাণিজ্য সম্পর্কে তথ্যাদি আদান-প্রদানের একটা প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াবে। 'বাণিজ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে শান্তি ও সমৃদ্ধি'—এই প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে, মেলাটিতে শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এশিয়ার দেশগুলির অগ্রগতির আভাষ দেওয়া হ'বে।

আশা করা যাচ্ছে যে, সমগ্র বিশ্ব থেকে ২০ লক্ষেরও বেশী লোক এই মেলায় আসবেন। এই মেলায় ক্রেতা ও বিক্রেতারা পরস্পরের সঙ্গে সোজা-সুজি আলোচনা ক'রে কেনা বেচা করার একটা সুযোগ পাবেন। মেলার সময় তেহরাণে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য সম্মেলনেরও ব্যবস্থা করা হবে।

এই মেলায় ভারতের যে প্রদর্শনীটি থাকবে তাতে দেশের ব্যাপক পরিকল্পিত আর্থিক-উন্নয়ন এবং গত দুই দশকে যে অগ্রগতি হয়েছে তা দেখানো হবে। মেলায় আধুনিক যে সব সামগ্রী সাজানো থাকবে, সেগুলি শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে ভারত যে কতখানি এগিয়ে গিয়েছে, তার পরিচয় দেবে। ভারতে শিল্প, বাণিজ্য, অর্থনীতি, কৃষি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এখন কী পরিমাণ সুযোগ সুবিধে রয়েছে, মেলায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দেশগুলিকে এই মেলার মাধ্যমে তা বোঝানো যাবে।

প্রতিবেশী দেশগুলির উন্নয়নে ভারত কী ধরণের ভূমিকা গ্রহণ করছে, কারিগরী জ্ঞানের দিক থেকে এবং বিভিন্ন ধরণের আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কলকারখানা স্থাপনে ভারত কতখানি সাহায্য করতে পারছে ও পারে তাও এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেখানো হবে। ভারতে যে রপ্তানির জন্য বহু জিনিসপত্র উৎপাদিত হচ্ছে, তাও এই প্রদর্শনীতে দেখানো হবে।

কৃষি, এবং বিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, পরিবহণ ও যোগাযোগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ভারত যে বিপুল অগ্রগতি করেছে, এই মেলায় তা'র পরিচয় দেওয়া হবে।

ভারতীয় প্রদর্শনীতে, মডেল, মানচিত্র, ফটোগ্রাফ, চিত্র ও নক্সার মাধ্যমে শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে লক্ষ্য মাত্রা ও সাফল্য এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্ম-প্রচেষ্টার ছবি তুলে ধরা হবে। ভারতীয় মণ্ডপে এই ক'টি শ্রেণী থাকবে যথাঃ যন্ত্রাদি এবং ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রী, নানা ধরণের নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী, গৃহস্থের পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, বস্ত্রাদি, হস্তশিল্প, খাদ্য সামগ্রী এবং সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ওষুধপত্র এবং সংশ্লিষ্ট সামগ্রী, বই, পর্যটন ও বাণিজ্যমূলক তথ্যাদি, ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ভারতীয় জীবন এবং চারুকলা ও কারুশিল্পের নমুনা। •

এই মেলার পেট্রোরাসায়নিক শিল্প সামগ্রী প্রদর্শনীতেও ভারত অংশ গ্রহণ করবে। এই বিভাগটি সম্পূর্ণভাবে পেট্রো-রাসায়নিক সামগ্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তা ছাড়া এই ক্ষেত্রে যৌথ প্রচেষ্টার সম্ভাবনা এবং পেট্রোরাসায়নিক সামগ্রীগুলির বিক্রয়ের সম্ভাবনা নিয়েও পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হবে। এই মেলায় আর একটি বিশেষ বিভাগ থাকবে, সেটি হ'ল 'আন্তর্জাতিক বাজার'। এটিতে থাকবে কেবলমাত্র হস্তশিল্পজাত সামগ্রী, হাতে চালানো তাঁতের জিনিসপত্র ও অন্যান্য উপহার সামগ্রী। ভারত এতেও অংশ গ্রহণ করছে।

ভারতীয় প্রদর্শনীটিতে প্রায় ছয়দিন ব্যাপি একটি 'ফ্যাশন প্যারেডেরও' ব্যবস্থা করা হবে। বিখ্যাত ভারতীয় শিল্পীদের নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। মেলায় ভারতীয় তথ্যচিত্র ইত্যাদিও প্রদর্শিত হবে।

দেশের শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থাগুলি যাতে সক্রিয়ভাবে এই মেলায় অংশ গ্রহণ করে সেজন্য ভারত সরকার এগুলিকে অনুরোধ জানিয়েছেন। সরকারী এবং বেসরকারী ক্ষেত্রের ১০০টিরও বেশী সংস্থা এতে যোগ দেবে ব'লে আশা করা হচ্ছে। এই দিক দিয়ে বিশেষ ক'রে ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রী উৎপাদনকারী শিল্পগুলির কাছ থেকে বেশ ভালো সাড়া পাওয়া গেছে। মেলায় যোগদানে ইচ্ছুক সংস্থা-গুলির নির্ব্বাচিত জিনিসপত্র পাঠানোর জন্যে ইতিমধ্যেই বোম্বাইর শিপিং কর্পো-রেশন অফ ইণ্ডিয়ার সঙ্গে ব্যবস্থা করা হয়েছে। বোম্বাই থেকে তেহরাণ পর্য্যন্ত এই সব জিনিসপত্র পাঠাতে এবং অবিক্রীত জিনিসপত্র তেহরাণ থেকে বোম্বাই-এ ফেরৎ আনতে যে ব্যয় হবে, ভারত সরকার সেই ব্যয় বহন করবেন।

ভারত ও ইরাণের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ ব'লে এই মেলাটি ভারতের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শত শত বছর ধরে ভারত ও ইরাণের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের লেন দেন চলে আসছে। ১৯৬১ সালে প্রথম ভারত ইরাণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকেই বাণিজ্য আরও ব্যাপক ও নিয়মিত হয়েছে। পরস্পরকে সর্ব্বাধিক সুবিধা দেবার নীতির ভিত্তিতে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে এটির পরিবর্তে ৬ বছর মেয়াদী একটি চুক্তি কার্য্যকর হয়েছে।

ইরাণ থেকে ভারত যে সব জিনিস কেনে সেগুলির মধ্যে বেশীর ভাগই হ'ল পেট্রোলিয়ামজাত সামগ্রী। ভারত অবশ্য

(১০ পৃষ্ঠার দেখুন)

পরিকল্পনা ও প্রগতি

তরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়
কৃষি গবেষক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়,
হরিণঘাটা, নদীয়া

প্রগতির সঙ্গে পরিকল্পনার একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে। প্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে গেলে সুষ্ঠু পরিকল্পনা তাই অপরিহার্য এবং জাতির প্রগতির মূলে রয়েছে পরিকল্পনার সফল রূপায়ণ। এই প্রগতি প্রত্যেক নাগরিকের সহানুভূতি, সততা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে, দেশের সম্পদ ও দেশের জনসাধারণের সাচ্ছন্দ্যের বাহনরূপে জাতিকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

ভারত কৃষি প্রধান দেশ। দেশের শতকরা ৭০ জনেরও বেশী লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৪৫ ভাগেরও বেশীর মূলে আছে কৃষির উন্নয়ন। কিন্তু কৃষি নির্ভরশীল জনসাধারণের গড় আয় অন্যান্য দেশের তুলনায় যথেষ্ট কম (নীচের পরিসংখ্যান দ্রষ্টব্য) যদিও জনানুপাতিক কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশী। যথা:—

দেশ	জনপ্রতি কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ (হেক্টরে)	হেক্টর প্রতি জাতীয় আয় (ডলারে)
ভারত	০.৩৫	৯০.২৩
পাকিস্তান	০.২৬	১৬৪.০২
সিংহল	০.১৫	৪১৬.৭৩
ইজরায়েল	০.১৭	৫৬২.৫০
নেদারল্যাণ্ড	০.০৮	১১৭৪.৭২
জাপান	০.০৬	১০৫৫.২৮

একদিকে হেক্টরপ্রতি স্বল্প উৎপাদন, অন্যদিকে বর্ধিত জনসংখ্যা ও বেকার সমস্যা, দেশের অর্থনীতিতে একটা বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান উৎপাদন ও জনবৃদ্ধির পরিসংখ্যান করলে দেখা যাবে যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর খাদ্যোৎপাদন যদিও বৃদ্ধি পেয়েছিল, তবুও বিগত পরিকল্পনাতে কৃষিকে যথেষ্ট অগ্রাধিকার না দেওয়ায় উৎপাদন বৃদ্ধির মান সমান রাখা সম্ভব হয়নি। নীচের তালিকায় এর একটা আনপাতিক ছবি পাওয়া যায়।

কৃষির উৎপাদন বাড়াতে না পারলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য সরবরাহ করা একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা বিগত খরা ও বন্যার বছরগুলিতে প্রত্যক্ষ করেছি। বর্তমানে আনন্দের বিষয়, জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে কৃষিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

চাষের জমি বাড়িয়ে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব নয়, কেননা দেশের মোট জমির প্রায় শতকরা ৮৭ ভাগ কৃষির আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমানে তাই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নিবিড় চাষ একান্ত প্রয়োজন। নিবিড় চাষের অনেকগুলি ভাল দিক আছে। নিবিড় পদ্ধতিতে চাষ করলে বৎসরে একাধিক ফসল পাবার সম্ভাবনা থাকবে এবং বর্তমান খাদ্য সমস্যার মোকাবিলা ক'রেও উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য বাইরে রপ্তানি করা সম্ভব হতে পারে। কৃষি শ্রমিকদের বছরে ৬ মাস বেকার হয়ে থাকতে হবে না। বরং কৃষিকর্মে আরও বেশী কর্মী নিয়োগের সুযোগ থাকবে। দেশে কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রসারের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে। গ্রামীণ অর্থনীতি উজ্জীবিত ও উন্নত হয়ে একদিকে দেশজ পণ্যের বৃহৎ বাজার সৃষ্টি করবে, অন্যদিকে শিল্প ও বাণিজ্যে বিনিয়োগের সুযোগ বাড়াবে। পর পৃষ্ঠায় ২নং তালিকা থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

হেক্টর প্রতি অল্প আয়ের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এর মূলে রয়েছে:— (১) ভূমি সমস্যা, (২) অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা, (৩) উন্নত প্রণালীতে চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জামের অভাব এবং (৪) বিজ্ঞানসম্মত কৃষি পদ্ধতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা। ভূমি ও অর্থনৈতিক সমস্যা দুটি অত্যন্ত মৌলিক সমস্যা এবং এগুলির সমাধানের জন্য দরকার উন্নত কৃষি পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। কৃষি গবেষক হিসাবে, এখানে শেষের সমস্যা দুটি নিয়েই আলোচনা করব।

উন্নত প্রণালীতে চাষ আবাদ করতে গেলে উন্নত বীজ, প্রয়োজন মত জলসেচ, সার, উদ্ভিদের রোগ ও কীট পতঙ্গ দমনের ওষুধ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি প্রয়োজন।

উন্নত বীজ তৈরির ক্ষেত্রে তণ্ডুল-জাতীয় শস্য অন্য শস্যকে ছাড়িয়ে গেছে যদিও কলাই, তৈলবীজ, তুলা ও পাটের মোটামুটি উন্নতি হয়েছে। কিন্তু ফল ও সব্জীর ক্ষেত্রে তেমন কোন উন্নতি দেখা যায় না। উন্নত বীজ ব্যবহারের ফলে চাল, গম, ভুট্টা, বাজরা ও জোয়ারের উৎপাদন তিন থেকে চার গুণ বেড়ে গেছে। যদিও এ ব্যাপারে কৃষি বিজ্ঞানীদের অবদান সামান্য নয়, তবুও বিগত ষষ্ঠ দশকের প্রথম দিকে যে রকম উদ্যম ও ও সাফল্য দেখা গিয়েছিল শেষের দিকে সে রকম দেখা যাচ্ছে না। উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে আমাদের কৃতিত্ব ভুট্টা, বাজরা ও জোয়ারের শঙ্কর বীজ তৈরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গম ও ধানের উন্নত বীজ আমরা অন্য দেশ থেকে আমদানী করেছি এবং বর্তমানে উৎপাদনের পরিবর্তে গুণগত উৎকর্ষের জন্য যত্নশীল হয়েছি।

আমাদের দেশে কৃষি এখনও প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। পরিমিত বৃষ্টিপাতের

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৬-৬৭
মোট খাদ্য উৎপাদন (১০ লক্ষ টনে)	৫০.৮৩	৬৬.৮৫	৮২.০২	৭২.২৩	৭৫.০৫
জাতীয় আয় বৃদ্ধি (শতকরা হিসাবে)	—	৩.৪	৪.০	২.৯৬	
লোক সংখ্যা বৃদ্ধি (শতকরা হিসাবে)	১.২৫	—	১.৮৯	২.৩৮	

ওপরই শস্যের ফলন নির্ভর করে। অধিক বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি তাই আমাদের কৃষির অগ্রগতির প্রধান প্রতিবন্ধক। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পর্যন্ত দেশে অনেক নদী পরিকল্পনার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে ও গভীর নলকূপ খনন করা হয়েছে। কিন্তু এগুলির দ্বারা শতকরা ২০ ভাগের বেশী আবাদযোগ্য জমিতে সেচ দেওয়া যেতে পারে না। তা ছাড়া নদী পরিকল্পনাগুলিতে একদিকে যেমন চাষযোগ্য জমি নষ্ট হয়েছে, জমির অবক্ষয় হচ্ছে ও প্রভূত জল নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি দিনের পর দিন পলি জমার ফলে জলাধারগুলির আয়ু কমে যাচ্ছে। অবশ্য জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্যা প্রতিরোধের মত দুটো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান হয়েছে। গভীর নলকূপও খুব একটা কাজে লাগেনি। এর প্রধান কারণ গভীর নলকূপ অত্যন্ত ব্যয়বহুল, বিদ্যুৎ সংযোগের যথেষ্ট অসুবিধা রয়েছে ও গভীর নলকূপের জলের সাথে লোহা ইত্যাদি ধাতু দ্রবীভূত অবস্থায় অধিক পরিমাণে থাকার জন্য শস্যের ক্ষতি হচ্ছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অগভীর ও ক্ষুদ্রায়তন সেচ প্রকল্পগুলি হয়ত কিছুটা আশার সঞ্চার করতে পারে। কিন্তু এগুলির সামর্থ্য ও প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। এ ছাড়া অগভীর নলকূপ ও সেচের যন্ত্রগুলির স্থায়ীত্ব ও ভূগর্ভস্থ জলস্তরের পরিমাণ সম্বন্ধেও যথেষ্ট চিন্তার কারণ আছে। কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ব্যবস্থাও সময়োপযোগী হ'তে পারে কারণ তাতে প্রয়োজনমত জল সরবরাহ পাওয়া যেতে পারে। যদিও এই ব্যবস্থা বর্তমানে পরীক্ষাধীন, তবুও এর দ্বারা সুফল পাওয়া যাবে ব'লেই আশা করা যায়।

পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, আমাদের মাটিতে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস ঘটিত শস্যখাদ্যের অভাব রয়েছে, কিন্তু পটাস ঘটিত শস্যখাদ্য মোটামুটি প্রয়োজন মতই আছে। তা ছাড়া উচ্চ ফলনশীল উন্নত ধরণের শস্যগুলির প্রচুর পরিমাণ শস্যখাদ্য, বিশেষ ক'রে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাস জাতীয় সার দরকার হয়। সবদিক বিবেচনা ক'রে বর্তমান সারের চাহিদা ও সেগুলির উৎপাদন ক্ষমতার কথা চিন্তা করার সময় এসেছে। বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন সারের চাহিদা ও উৎপাদন ক্ষমতার হিসেব নীচে দেওয়া হ'ল।

(১০ লক্ষ টনে)

	নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাস
চাহিদা	২.০০-২.৬৫	১.০-১.৩০	০.৩৫-০.৭০
উৎপাদন	০.৭৮১	০.২৮৬	—

উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে গেলে হয় দেশের মধ্যেই সারের উৎপাদন বাড়াতে হবে, নতুবা অন্য দেশ থেকে সার আমদানী করতে হবে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় সার কারখানা স্থাপন ক'রে একদিকে যেমন স্বাবলম্বী হওয়া যাবে, অন্যদিকে তেমনি বেকার সমস্যার সমাধান করা যাবে। এ বিষয়ে সরকারী মালিকানায় সবগুলো সার কারখানা স্থাপন করা সম্ভবপর না হ'লে, যৌথ ও বেসরকারী মালিকানায় সার কারখানা স্থাপন করলেও প্রভূত উপকারের সম্ভাবনা আছে।

রোগ ও কীট পতঙ্গ কৃষি উন্নতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। রোগ ও কীট পতঙ্গ দমনের জন্য দরকার প্রতিষেধক, রোগ ও কীট দমনকারী ওষুধ ও 'মাধ্যমিক' পরিচর্যা। প্রতিষেধক ও ঔষধ মোটামুটি আমাদের দেশেই তৈরি হয়, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন কম হওয়ায় ও উৎপাদন-মূল্য বেশী হওয়ায় সেগুলি গরীব চাষীদের নাগালের বাইরেই থেকে যাচ্ছে। উপরন্তু এগুলির পরিমাণ ও প্রয়োগের কালনির্ধারণ-শস্যের অবস্থা ও শ্রেণীভেদ, রোগের প্রকার ভেদ ও ক্ষতির অবস্থার উপর নির্ভর করে, যা আমাদের চাষীদের পক্ষে আয়ত্ব করা এখনও সম্ভব হয়নি। সেইজন্য রোগ ও পোকা দমন ক'রে শস্যের উৎপাদন বাড়াতে গেলে, বর্তমান ব্যবস্থা ছাড়া, সরকারী ও বেসরকারী মালিকানায় উদ্ভিদ রোগ চিকিৎসার জন্য গবেষণায় উৎসাহ দেওয়া উচিত। উদ্ভিদ চিকিৎসকগণ প্রয়োজন হ'লে, চাষীদের প্রয়োজনে, পারিশ্রমিক নিয়ে চিকিৎসা করবেন যা অনেক উন্নত দেশে দেখা যায়। গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় ঠিক ঠিক সময়ে 'মাধ্যমিক' পরিচর্যা অর্থাৎ মধ্যবর্তীকালে উদ্ভিদের পরিচর্যা করলেও রোগ ও পোকার হাত থেকে শস্য অনেকটা রক্ষা করা যাবে। দেশের বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে কীট ও রোগ প্রতিরোধক শঙ্কর জাতীয় বীজ তৈরির চেষ্টা হচ্ছে কারণ শঙ্কর জাতীয় বীজ থেকেও রোগ ও কীট দমন করা যেতে পারে।

কামার শালার তৈরি যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের কথা ছেড়ে দিলেও ট্রাকটার ও পাওয়ার টিলার, সেচের জলের পাম্প, স্প্রেয়ার ও ডাসটার, কম্বাইণ্ড হারভেস্টার ইত্যাদি আমাদের গরীব চাষীদের নাগালের বাইরে। একদিকে এগুলির আকাশ ছোঁয়া দাম, অন্যদিকে সেগুলির দুষ্প্রাপ্যতা। যদিও

(২নং তালিকা)

কৃষিতে অধিক বিনিয়োগ
—উৎপাদন বৃদ্ধি-
—খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা
-খাদ্য রপ্তানি
—বেকার সমস্যার সমাধান
—গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি
—দেশজ পণ্যের বৃহত্তর বাজার সৃষ্টি
কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠা
—শিল্প ও বাণিজ্যে
—অধিকতর বিনিয়োগ
সামগ্রিক রপ্তানি বৃদ্ধি
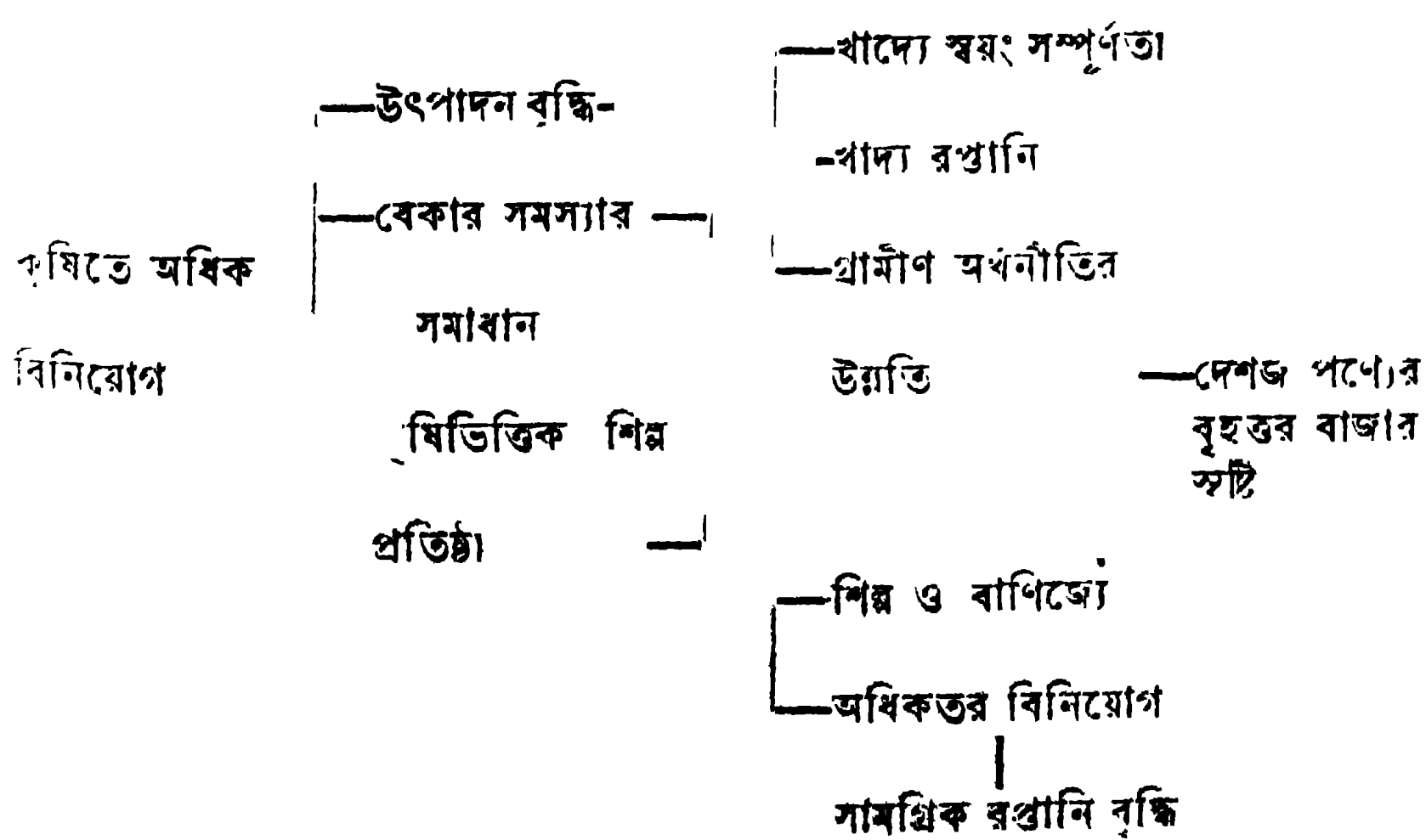
'এ্যাগ্রোইনডাসট্রিজ কর্পোরেশন' ও ব্যাঙ্কগুলি ভাড়াভিত্তিক যন্ত্র কেনার সুযোগ ও সুবিধে দিচ্ছে, তবুও প্রতিটি কৃষকের প্রয়োজন মত যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ সরবরাহ করা যেমন অসম্ভব, তেমনি প্রতিটি চাষীর পক্ষে সেগুলি কেনা ও তার রক্ষণাবেক্ষণ করাও সম্ভব নয়। তাই বর্তমান সুবিধাগুলি ছাড়াও আঞ্চলিক ভিত্তিতে যন্ত্র ভাড়া নেবার ও পাওয়ার ব্যবস্থা থাকলে অনেক চাষীই উপকৃত হবেন।

বর্তমানে অল্প শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত কৃষকদের বিজ্ঞান সম্মত কৃষিজ্ঞানের অভাব জাতির অগ্রগতি বিঘ্নিত করছে। এই বাধা দূর করার দুটি উপায় আছে:

(১) কৃষকদের বিজ্ঞান সম্মত কৃষি প্রথায় শিক্ষিত ক'রে তোলা ও

(২) সময় মত ও প্রয়োজন মত উন্নত প্রণালীতে চাষ করতে সাহায্য করা।

চাষীদের উন্নত কৃষি পদ্ধতিতে শিক্ষিত ক'রে তুলতে হলে প্রতিটি ব্লকে অন্ততঃ একটি ক'রে কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে, যেখানে কৃষকরা প্রয়োজনীয় পদ্ধতিগুলো সম্বন্ধে অল্প সময়ে কিছু পুঁথিগত শিক্ষা ও কিছু হাতে কলমে শিক্ষা পেতে পারেন। গ্রামের কিছু কিছু চাষীকে পর্যায়ক্রমে এই শিক্ষা দেওয়া যায় এবং সম্পূর্ণ গ্রামকে কৃষি বিপ্লবের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। অবশ্য যাঁরা একবার শিক্ষা নিয়েছেন কিছুদিন পরে তাঁদের পুনরায় শিক্ষা নেওয়ার দরকার পড়বে, কেননা কৃষি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে রকম উন্নতি হচ্ছে তাতে নবলব্ধ জ্ঞান সময়ান্তরে ঝালিয়ে নেওয়া অপরিহার্য ব'লে মনে হ'বে।

প্রয়োজন ও সময়মত উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করতে কৃষকদের সাহায্য করার ব্যবস্থা বর্তমানে দেশের সবত্র চালু হয়েছে। এই সাহায্য সাধারণত কৃষি বিভাগগুলির আধিকারিকদের কাছ থেকে ব্লক ও গ্রাম সেবকের মাধ্যমে চাষীদের কাছে পৌঁছয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অফিসারই এই ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন। এখন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রতিটি পঞ্চায়েতের অধীনে প্রায় দশ থেকে কুড়িটি গ্রাম থাকে। প্রতিটি ব্লক আবার ৮ থেকে ১২টি অঞ্চলে নিয়ে গঠিত। প্রতিটি অঞ্চল পঞ্চায়েতে মাত্র একজন করে গ্রামসেবক থাকেন (প্রতিটি অঞ্চলে গ্রাম সেবক আছেন ধরে নিয়ে)। একজন গ্রাম সেবকের পক্ষে ব্লক অফিস ও বিভিন্ন গ্রামের প্রত্যেকটি চাষীর সঙ্গে সংযোগ রেখে উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করতে সাহায্য করা এবং হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বীরভূমের দুনিগ্রাম অঞ্চলে যতটা উন্নত পদ্ধতি চালু করা গেছে, অঞ্চলের অন্যান্য গ্রামগুলোতে তার অর্ধেকও সম্ভব হয়নি। ব্লকের ক্ষেত্রেও একই চিত্র দেখা যায়। তাই মনে হয় দুই থেকে তিনটি গ্রামে একজন গ্রাম সেবক ও প্রতিটি অঞ্চলে একজন কৃষি সম্প্রসারক দেওয়া হ'লে শুধুমাত্র বর্তমান সম্পদের সাহায্যেও কৃষি উৎপাদন অন্তত দুই থেকে তিন গুণ বৃদ্ধি করা যেত। এখানে আর একটা কথা বলা দরকার কৃষি সম্প্রসারক ও গ্রামসেবকদের জন্যে কোন রিফ্রেসার্স কার্যক্রম চালু নেই, যা বিবর্তনশীল কৃষিবিজ্ঞানের সাঙ্গে তাল রেখে চলতে গেলে একান্ত দরকার।

তেহরাণে ভারত

(৭ পৃষ্ঠার পর)

শুকনো ফল, খেজুর ইত্যাদিও আমদানী করে। চিরাচরিত পাটজাত সামগ্রী, চা এবং মসলা ছাড়াও, ভারত ইরাণে, লোহা ও ইস্পাতের জিনিসপত্র এবং ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রী রপ্তানী করে।

শিল্প, পরিবহন এবং কারিগরী ক্ষেত্রেও ভারত ও ইরাণ পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে। যুক্ত প্রচেষ্টা এবং কারিগরী সাহায্যের ভিত্তিতে ইরাণের শিল্পোন্নতিতে সাহায্য ক'রেও ভারত ইরাণের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। এখনই ভারতের দুটি প্রধান ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠান, লৌহবর্জিত ধাতুর জিনিষ এবং ট্র্যাক্টারের অতিরিক্ত অংশ, মোটর কার ও লরী উৎপাদনে ইরাণকে সাহায্য করছে। পারস্য উপকূল অঞ্চলে তেলের অনুসন্ধান সম্পর্কে অয়েল এবং ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন ইরাণের সঙ্গে সহযোগিতা করছে।

কুয়ো খোঁড়ার স্বদেশী ড্রিল

মধ্য প্রদেশ সরকারের জলকূপ বিভাগকে WABCO '১৫০০' হোলমাস্টার শ্রেণীর প্রথম স্বদেশী জলকূপ ড্রিলটি সরবরাহ করা হয়েছে। নরম মাটিতে ৪৬০ মিটার পর্যন্ত গভীর কূপ কিংবা খনিজ পদার্থ অনুসন্ধানের জন্যে ১১০০ মিটার গভীর গর্ত খোঁড়ার উপযোগী ক'রে এটি তৈরি করা হয়েছে। মাঝারি বা বেশ শক্ত মাটিতে ২২০ মিটার পরিধির ২০০ মিটার গভীর গর্ত খোঁড়ার জন্য এই 'ড্রিল' বা 'রিগ' ব্যবহার করা যায়। গর্ত খোঁড়ার সময়ে রিগটা তুলতে হয় না কারণ গর্ত খোঁড়ার সময়ে কাটা মাটি সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসে। এই রিগ তৈরির খরচ খরচার শতকরা ৮০ ভাগ হ'ল দিশী যন্ত্রপাতির জন্য।

মধ্য প্রদেশ সরকার এই ধরনের আরও ৮টি রিগ-এর জন্যে বরাত দিয়েছেন। WABCO '১৫০০' ড্রিল নাকি সারা পৃথিবীতে জনপ্রিয়। ভারতে এই যন্ত্রটি তৈরি করে লারসেন টুবরো লিমিটেড কোম্পানীর সহকারী প্রতিষ্ঠান খৃষ্টেনসেন-লংইয়ার (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড।

আনন্দের বিষয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরীপ বিভাগ মঙ্গল গ্রহের মাটি কী ভাবে খুঁড়তে হবে সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থী মহাকাশচারীদের তালিম দিচ্ছে এই যন্ত্রটির সাহায্যে।

ভূগর্ভস্থ জল সদ্ব্যবহার সম্বন্ধীয় প্রকল্পগুলির জন্য এই রিগগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যদিও জলকূপ খননের জন্য এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়, তথাপি অন্য উদ্দেশ্যে মাটি খোঁড়ার কাজেও এটি সমান কার্যকর। পৃথিবীর সর্বত্র, সব রকম অবস্থার মধ্যে, এই রিগটি চমৎকার কাজ করেছে ব'লে নির্ভরশীলতা ও ত্রুটিহীনতার দিক থেকে এটিকে উচ্চ শ্রেণীর ব'লে গণ্য করা হয়।

ভারতে যত রিগ আমদানী করা হয় তার শতকরা ৯০টি হ'ল '১৫০০' মডেলের।

রিগ বা ড্রিলটিকে প্রয়োজন মত ট্রাকে বা ট্রেলারে বসানো যায়। রিগ-এর বিভিন্ন যন্ত্রাংশ পৃথকভাবে পাওয়া যায়। নতুন নতুন নিয়ম পদ্ধতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে যন্ত্রাংশ তৈরির ব্যাপারে WABCO নিজেদের দক্ষ ব'লে দাবী করে।

ইউকোপ্যান পদ্ধতির প্রচুর সম্ভাবনা

কম খরচে টেকসই বাড়ী

আমাদের কলকাতার সংবাদদাতা

ইউনিভার্সাল কন্‌ক্রিট প্যানেল বা 'ইউকোপ্যান' ভবিষ্যতে হয়তো ব্যাপক হারে বাড়ী তৈরি করার নতুন একটা পদ্ধতি হিসেবে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। ফলে কম খরচে টেকসই বাড়ী সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান চাহিদার একটা সুরাহা হয়ে যেতে পারে। এই চাহিদা যে কত বিরাট তার দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে, ১৯৬৬-৭১ সালের মধ্যে একমাত্র বৃহত্তর কলকাতাতেই ৩,৩৫,০০০ বাড়ী তৈরি করতে হবে। ইউকোপ্যান পদ্ধতিতে এই বিপুল সমস্যার খানিকটা সমাধান করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কলকাতা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং সংস্থার হাউসিং ডিজাইন এবং প্রোজেক্ট প্ল্যানিং ডিভিসন এই নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবক।

ইউকোপ্যান পদ্ধতির একটা সুবিধে হ'ল এই যে, নক্সা তৈরি করার সময়েই তা এমনভাবে করা হয় যাতে মূল উপাদানগুলির ব্যবহার যথাসম্ভব কমিয়ে বাড়ী তৈরির খরচ কম করা যায়। এই পদ্ধতিতে বাড়ী তৈরির জন্য রাজমিস্ত্রীদেরও খুব বেশী কিছু শেখার প্রয়োজন হয় না। একবার শুধু কাজ করার কৌশল দেখে নিলেই চলে, এবং যাঁরা সিমেন্টের কাজকর্ম জানেন, তাঁরা নিজেরাই বিভিন্ন অংশ তৈরি করে সেগুলি জুড়ে দিতে পারবেন। পূর্ব নির্মিত যে সব অংশ দিয়ে বাড়ী তৈরি করা হয়, সেগুলির আকারও বিশেষ কিছু বড় নয় এবং সাধারণ কপিকল বা লেভার দিয়েই সেগুলি ওঠানো, নামানো করা যায়। বাড়ী যেখানে তৈরি করা হবে সেখানেই এই সব অংশ তৈরি করা সম্ভব এরজন্য মূলধন বিনিয়োগ বা বিরাট কারখানা খোলার প্রয়োজন হয় না বা প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক সরঞ্জাম বাড়ী তৈরি করার জায়গায় নিয়ে যাওয়ারও খরচ নেই।

যাঁদের যে রকম আয় তাঁরা যাতে সেই অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের বাড়ী তৈরি করতে পারেন ইউকোপ্যান পদ্ধতিতে তার জন্য নানা রকম সংস্থান রয়েছে। একটা নির্দিষ্ট নক্সার মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ নয়, বরং অংশগুলিকে যে রকম ধরণে ইচ্ছা, পরিবর্তন করে নানা রকমে সেগুলো জোড়া যায়। যাঁদের আয় কম তাঁরা যদি একেবারে সম্পূর্ণ বাড়ী তৈরি করতে না পারেন খানিকটা তৈরি করে পরে আবার তা সম্পূর্ণ করতে পারেন।

ইউকোপ্যান পদ্ধতির মূল কথা হ'ল, ছাদ, দেওয়াল ও মেঝের জন্য আলাদা আলাদা কন্‌ক্রিটের অংশ তৈরি করে নেওয়া। একই ছাঁচে বিভিন্ন ধরনের অংশ তৈরি করা যায় বলে একে সেইদিক থেকে উন্নত পদ্ধতি বলা যায়।

এই পদ্ধতিতে বাড়ী তৈরি করার জন্য যে সব জিনিস ব্যবহৃত হয় তা হ'ল আগে থেকেই সিমেন্টের তৈরি কন্‌ক্রিট প্যানেল, যা এক তলা বা বহু তলবিশিষ্ট বাড়ী তৈরিতে ব্যবহার করা যায়। এই পদ্ধতিতে বাড়ী তৈরি করার জন্য মাচা বাঁধার দরকার হয় না, চূণ বালির আস্তরণ দিতে হয় না। দেওয়াল, ছাদ, দরজা,

(১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

অর্থকমিশন এবং তারপর

ঘাটতি এবং অসাম্য

কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্যগুলি মোট ৪,২৬৬ কোটি টাকা পাবে। তা স্বত্ত্বেও বেশীর ভাগ রাজ্য এই সুপারিশের ফলে খুসী হয়নি।

এম. সুন্দর রাজন

পঞ্চম অর্থ কমিশনের বিবরণীতে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরাট বৈষম্য, পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা যায়। কেন্দ্রের আর্থিক ব্যবস্থা বেশ ভালোভাবে অনুশীলন ক'রে কমিশন বলেছেন যে তাঁদের সুপারিশের ফলে সবগুলি রাজ্য আর্থিক সঙ্গতির দিক থেকে একটা সমান পর্যায়ে আসবে এটা আশা করা যায় না।

রাজ্যগুলিকে এককালীন মঞ্জুরী ও করের অংশ বন্টন করার সময় যাতে বৈষম্যটা খুব বেশী না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। কিন্তু সমস্যাটা এতো কঠিন যে কমিশনের একজন সদস্য বলেছেন, সাহায্য বন্টনের যে পরিকল্পনা তাঁরা তৈরী করেছেন তা বৈষম্য দূর করার পথে খুব বেশী কার্য্যকরী হবে না।

সব চাইতে সমৃদ্ধ রাজ্যে যেখানে জন প্রতি আয় হ'ল ৬১৯ টাকা, দরিদ্রতম রাজ্যে সেই আয় হল ২৯২ টাকা। সব চাইতে বেশী জনসংখ্যাবিশিষ্ট রাজ্যের তুলনায় তার এক চতুর্থাংশ জনসংখ্যাবিশিষ্ট রাজ্য সমাজকল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় করে।

কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কর বাবদ আয় থেকে এবং এককালীন মঞ্জুরী হিসেবে রাজ্যগুলি ৪,২৬৬ কোটি টাকা পাবে অর্থাৎ চতুর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্যগুলি যা পাচ্ছিল তার তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ এবার বেশী পাবে। তা স্বত্ত্বেও এই সুপারিশে বেশীর ভাগ রাজ্যই খুশী নয়। আসল কথা হ'ল, একদিকে কেন্দ্রীয় করগুলি থেকে আয়ের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়ছে অপরপক্ষে রাজ্যগুলি যে সব অতিরিক্ত কর ধার্য্য করে সেগুলি থেকে আয় ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। কর আরোপ করার কতটুকু ক্ষমতা রাজ্যগুলিকে হস্তান্তর করা হবে সে সম্পর্কে কমিশন কোন পরিষ্কার প্রস্তাব দেয়নি।

কমিশন অনুমান করেছে যে আগামী পাঁচ বছরে বাজেটের মোট ঘাটতি ৭৩৬৮ কোটি টাকার দাঁড়াবে। এই ঘাটতি সম্পূর্ণ মেটানো সম্ভব হবেনা তা এমনিতেই বোঝা যায়। যদি অর্থের সংস্থান করাও যায় তবুও এই ঘাটতিটা মেটানো সমীচীন হবে না। তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে এই যে, যে রাজ্যগুলি সুপরিকল্পিত উপায়ে তাদের আর্থিক নীতি পরিচালিত করেছে এবং যেগুলি তা করেনি, তারা সবাই একই ব্যবহার পাবে। এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কমিশন মনে করে যে, যে রাজ্যগুলির জনপ্রতি আয় বেশী, করের হার বেশী বা ঋণের দায়িত্বের তুলনায় সম্পদ বেশী তারা পরিকল্পনা বহির্ভূত রাজস্বখাতে অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থায় থাকবে। সেই তুলনায় যে রাজ্যগুলির করের হার কম, ঋণ-লগ্নীর তুলনায় লাভের মাত্রা কম এবং জনপ্রতি ব্যয়ের হার বেশী সেগুলির আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হবে না।

কর সম্পর্কিত প্রচেষ্টা

কমিশন বলেছে যেখানে গড়পড়তা হিসেবে ব্যয়ের হার বেশী, সেখানে সেই রাজ্যেরই ব্যয়ভার বহন করা উচিত। তবে যদি দেখা যায় যে কোন রাজ্য, জনপ্রতি আয় হিসেবে করদাতাদের পরিমাণ বৃদ্ধির চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই কিছু সুবিধেও দেওয়া যেতে পারে। যদি দেখা যায় যে কোন রাজ্য কর আরোপ ক'রে আয় বাড়াবার জন্য অন্য রাজ্যগুলির তুলনায় বেশী চেষ্টা করছে সেই ক্ষেত্রে সেই রাজ্যকে শাস্তি দেওয়ার কোন যুক্তি নেই। শিক্ষক, সরকারি কর্ম্মচারী এবং পুলিশের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন একটা ভালো নীতি।

রাজ্যগুলির আয় ব্যয়ের পূর্ব্বাভাষ থেকে কমিশন বুঝতে পেরেছে যে ৭টি রাজ্যের রাজস্বখাতে উদ্বৃত্ত থাকবে। কাজেই সেগুলির জন্য কোন রকম এককালীন সাহায্য সুপারিশ করা হয়নি। এই ৭টি রাজ্য হ'ল বিহার, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ।

তবে আমাদের একথাটাও ভোলা উচিত নয় যে বিহার এবং উত্তর প্রদেশ সমাজ-কল্যাণমূলক ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর জন্য সব চাইতে কম ব্যয় করে। তারা যদি স্থির করে যে শিক্ষা, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য ব্যয়ের হার বাড়ানো হবে তাহলে বাজেটে কতটা উদ্বৃত্ত থাকবে? পাঁচ বছরের মধ্যে কোন রাজ্য কি নীতি গ্রহণ করবে তা পূর্ব্বাহ্নেই ভেবে নেওয়া সম্ভব নয়।

অন্যদিকে আবার উত্তর প্রদেশ চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য সর্ব্বোচ্চ মাত্রায় অর্থাৎ ১৭৫ কোটি টাকার অতিরিক্ত সম্পদ সংস্থানে রাজি হয়েছে। এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান হল গুজরাট ও বিহারের। এরা হয়তো বলতে পারে যে পরিকল্পনার জন্য অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহের চেষ্টা ক'রে তারা অন্য কোন সূত্র থেকে সাহায্য পাবে না।

এককালীন সাহায্য

কমিশন দশটি রাজ্যকে বিভিন্ন পরিমাণ আর্থিক সাহায্য সুপারিশ করেছে।

রাজ্যগুলি হ'ল, অন্ধ্র প্রদেশ, আসাম, জম্মু ও কাশ্মীর, কেরালা, মহীশূর, নাগাভূমি, ওড়িশা, রাজস্থান, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গ। এই রাজ্যগুলি তাদের আর্থিক অবস্থা উন্নততর করার জন্য চেষ্টা করবে এই আশা ক'রেই সাহায্য বন্টন করা হচ্ছে। তবে তা তারা করবে কিনা তাতে সন্দেহ আছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে ১৯৬৯-৭০ থেকে পাঁচ বছরের জন্য কেরালা ১৯৬৬-৬৯ সালের ২২.৪ টাকার তুলনায় (গড়পড়তা জনপ্রতি বার্ষিক) ২২.৩ টাকা পাবে। কাজেই সুপারিশের ফলে এই রাজ্যটির বিশেষ কোন লাভই হয়নি। মহীশূর এখন যা পাচ্ছে তা থেকে বরং কমই পাবে।

কেউ কেউ মনে করেন যে যারা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই ভালোভাবে করেছে তাদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গ ৮০ কোটি টাকার অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ করতে রাজি হয়েছে এবং তামিল নাড়ু ৮৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গকে সাহায্য হিসেবে দেওয়া হচ্ছে ৭২ কোটি টাকা আর তামিলনাড়ুকে মাত্র ২২ কোটি টাকা। অন্যদিকে ওড়িশার যে জনপ্রতি করহার সবচাইতে কম সেই রাজ্যটিকে দেওয়া হয়েছে সবচাইতে বেশী সাহায্য অর্থাৎ ১০৪ কোটি টাকা।

ওড়িশার অবস্থা থেকেই বোঝা যায় যে এমন অনেক রাজ্য আছে এবং রাজ্যের মধ্যে এমন অনেক অঞ্চল আছে যেখানে সর্বতোভাবে চেষ্টা করলেও কর বাবদ আয় বাড়ানো সম্ভব নয়।

ঋণ পরিশোধ

কেন্দ্রের ঋণ পরিশোধ করাটাই হল রাজ্যগুলির পক্ষে প্রধান চিন্তার বিষয়। কোন কোন ঋণ দেওয়া হয়েছে সমাজ-কল্যাণমূলক কাজের জন্য, কাজেই সেই ক্ষেত্রে আয়ের এমন কোন ব্যবস্থা নেই যা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা যেতে পারে। রাজ্যগুলির কেন্দ্রকে যে সুদ দিতে হবে, তার পরিমাণ দেখলেই সমস্যার বিপুলতা বোঝা যাবে। কেবলমাত্র ১৯৬৮-৬৯ সালেই রাজ্যগুলি সুদ হিসেবে কেন্দ্রকে ৩৩৯ কোটি টাকা দেয়।

আয় আরও বাড়ানোর জন্য রাজ্যগুলি কি করতে পারে সে সম্পর্কেও কমিশন কতকগুলি পরামর্শ দিয়েছে। কমিশন বলেছে যে, কয়েকটি রাজ্য শিল্পগুলিকে বেশী সুযোগ সুবিধে ও রেহাই দেওয়ায়, পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিও তা করতে বাধ্য হয়; ফলে মোট আয় হ্রাস পায়। বিক্রয়-কর দিল্লীর সমান রাখার জন্য উত্তর প্রদেশ তাদের বিক্রয় কর হ্রাস করতে বাধ্য হন। কাজেই রাজ্যগুলির মধ্যে বিক্রয়কর সম্পর্কে একটা সামঞ্জস্যবিধান করা হ'লে তাতে সকলেরই লাভ হবে।

একমাত্র আর্থিক সাহায্যই বৈষম্য দূর করতে পারে না। উন্নততর লাইসেন্সিং নীতি, উদ্দেশ্যমূলক ব্যাঙ্ক ব্যবসায় এবং সুসমন্বিত আর্থিক ব্যবস্থাও সমানভাবেই প্রয়োজনীয়।

কল্পা-য় বীটের চাষ

১৯৬০ সালে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের পরামর্শে হিমাচল প্রদেশের কল্পা উপত্যকায় বীটের চাষ সুরু করা হয়। ইতিপূর্ব্বে অল্প উচ্চতায় বীটের চাষ করা হয়েছিল পরীক্ষামূলকভাবে; কিন্তু তাতে আশানুরূপ সুফল পাওয়া যায়নি। তাই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২,০০০/৩,০০০ মিটার ওপরে কল্পা উপত্যকা বেছে নেওয়া হ'ল। কল্পায় বৃষ্টিপাত হয় সামান্য, ১৫-২০ সেন্টীমিটারের মত, অথচ তুষারপাত হয় খুব বেশী। এর ফলে বীট চাষের জন্যে যে রকম জমি দরকার কল্পায় সেরকম জমির অভাব নেই। কারণ ওখানকার জমি আলগা ও আলগা যার ফলে জল দাঁড়ায় না। অথচ ফসলের জন্যে যতটুকু জল দরকার তা পাওয়া যায়।

কল্পার শাকসব্জী সংক্রান্ত গবেষণা কেন্দ্র এবং রিববার ছোট কেন্দ্রটি সম্প্রতি রোমানস্কায়া ও উরুস্ টাইপ-ঈ-র বীজ সরবরাহ করছে লখনৌএর ইক্ষু-গবেষণা-প্রতিষ্ঠানে এবং পাঞ্জাব, রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রের কয়েকটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে। সব কটি প্রতিষ্ঠানই ঐ বীজের প্রশংসা করেছে। প্রতিষ্ঠানগুলির মতে এই জাতের বীটে শর্করা উপাদানের মাত্রা অনেক এবং এর সাহায্যে সস্তায় চিনি পাওয়া যেতে পারে। বীটের ফলন ভালো হ'লে তা' ক্রমশঃ সাধারণ চিনির পরিপূরক হ'বে।

দেশের বিভিন্ন অংশে বিশেষ ক'রে পাঞ্জাব, রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রে এই বীজের চাহিদা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। এখন জাতীয়-বীজ-কর্পোরেশন কিন্নর জেলার ৪০ জন উৎপাদনকারীর সঙ্গে চুক্তি করেছে। এই ৪০ জন বীট ও শালগমের চাষ করেন। আশা করা যাচ্ছে, এঁদের কাছ থেকে ১৫ টন বীট (দু রকম জাতের) এবং ৬ টন লাল খোসাওলা শালগমের বীজ পাওয়া যাবে। এই বীজ ১৯৬৯-৭০ সালে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বন্টন করা হবে। এতে দু' লক্ষ টাকার লেনদেন হবে ব'লে অনুমান করা হচ্ছে।

বায়োস্কিয়াল সিস্টেম

সুইডেনের সুইডিশ কো অপ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত ক্যাম্রিকার কোম্পানী একটি 'ইলেকট্রনিক স্যুয়েজ পিউরিফায়ার' অর্থাৎ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে নিকাশীপথ সাফ করার একটা যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে।

এর নাম হল 'বায়োস্কিয়াল সিস্টেম'। ঢাকা নর্দমার ময়লা সাফের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ একটি ফাইবার গ্লাসের আধারের মধ্যে থাকে যেটির ওপরে একটি প্লাস্টিকের ঢাকা থাকে। এই যন্ত্রে দ্রুত কাজ হয়। নাইট্রোজেন ও ফসফেটের পরিমাণ কমে যায় এবং পাঁক নষ্ট হয়ে যায়। তা ছাড়া অক্সিজেন সঞ্চার করা যায় ও নোংরা জল থেকে ময়লা আলাদা করা যায়।

এই যন্ত্র ১১টি সাইজে পাওয়া যায়। সবচেয়ে ছোটটি একটি বাড়ির পক্ষে যথেষ্ট। প্রস্তুতকারকরা দাবী করেন যে, ১০ থেকে ২৫টি বাড়ির জন্যে উপযুক্ত সাইজের যন্ত্র বসালে যন্ত্র বসাবার খরচ কম পড়বে।

ময়ূরাক্ষী প্রকল্প

বিবেকানন্দ রায়
নিজস্ব সংবাদদাতা
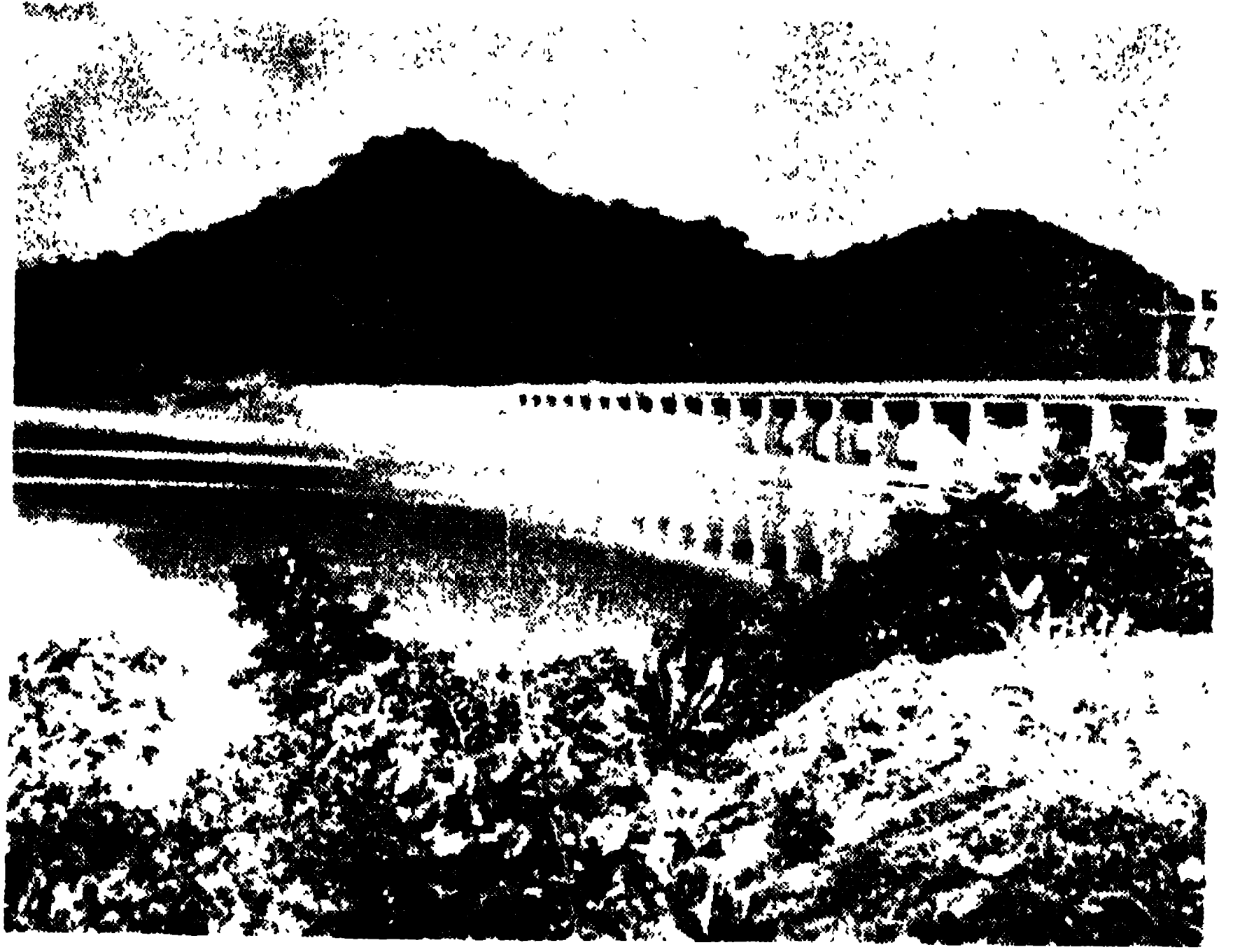
ক্যানাডা বাঁধ

গত ১৪ বছরে ময়ূরাক্ষী প্রকল্প, পশ্চিমবঙ্গের একটা বড় অংশের এবং বিহারের কিছুটা অংশের চেহারা একেবারে বদলে দিয়েছে। যে অঞ্চলে প্রায়ই অনাবৃষ্টির ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিতো, সেটি এখন সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে। বীরভূম জেলার এই প্রকল্পটি খাদ্য শস্যের উৎপাদনের অভূতপূর্ব্ব বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। প্রকল্পটি, উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত পরিমাণে যথেষ্ট জল সরবরাহ করছে ব'লে, এই জেলার প্রগতিশীল কৃষকরা আই আর-৮, তাইচুং দিশী-১, কালিম্পং এবং পদ্মার মতো উচ্চ ফলনের ধান চাষে আশ্চর্য্যরকম সাফল্য অর্জ্জন করেছেন। গম এই অঞ্চলটির প্রধান শস্য না হওয়া সত্ত্বেও, ময়ূরাক্ষী থেকে অব্যাহত ধারায় জল পাওয়া যাচ্ছে ব'লে, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, মালদা এবং নদীয়ার মতো গম উৎপাদনকারী জেলাগুলিকেও এই জেলাটি ছাড়িয়ে গেছে। এখন ৮৫,০০০ একর জমিতে গমের চাষ হচ্ছে। গত বছরে এই জেলাতে মোট প্রায় ১১৫,০০০ টন গম উৎপাদিত হয়। বীরভূম এবং এর পাশাপাশি জেলাগুলিতে চিরকাল যে সব শস্যের চাষ হয়েছে, এই প্রকল্পটি সেই চাষের ধারাও বদলে দিয়েছে।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন বিপুলভাবে বেড়ে যাওয়ায় এই জেলার অর্থনীতিতেও বিপুল পরিবর্ত্তন এসেছে এবং জনসাধারণের জীবন ধারণের মানও অত্যন্ত দ্রুতগতিতে উন্নততর হচ্ছে।

১৯৫১ সালে ময়ূরাক্ষী প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয় এবং চার বছরে তা সম্পূর্ণ করা হয়। এই প্রকল্পটিতে ময়ূরাক্ষী নদীর উৎপত্তিস্থল থেকে প্রায় ১০০ কি: মীটার দূরে মশানজোড়ে একটি বাঁধ, একটি জলাধার, জলনির্গমণের পথে একটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, প্রধান খাল ও শাখাখালে সাব ষ্টেশন এবং পাঁচটি ছোট বাঁধ আছে। ক্যানাডা সরকারের অর্থসাহায্যে প্রকল্পটির কাজ সম্পূর্ণ করা হয়। ক্যানাডা সরকারই যন্ত্রপাতি, সাজ সরঞ্জাম সরবরাহ করেন এবং বাঁধটি তৈরী করা ও জলবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন সম্পর্কে কারিগরী সাহায্য দেন। এই সাহায্যের স্বীকৃতি হিসেবে বাঁধটির নামাকরণ করা হয়েছে ক্যানাডা বাঁধ।

১৯২৭ সালে, তখনকার রাজ্যসরকার বক্রেশ্বর-জলসেচ-প্রকল্প নামে ছোট যে সেচ প্রকল্পটি তৈরী করেন, ময়ূরাক্ষী প্রকল্পের উৎপত্তি সেই প্রকল্পটি থেকেই। সেই কর্ম্মসূচী অনুযায়ী ১৮০০০ একর জমিতে জলসেচ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বক্রেশ্বর নদীতে একটি বাঁধ তৈরী করার পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু বাঁধটি তৈরী করার পর দেখা গেল, যে, সেচ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট জল পাওয়া যাচ্ছেনা। তারপর বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা ক'রে, তখনকার বাঁকুড়া সেচ বিভাগের 'এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীএস. সি. মজুমদার, বর্ত্তমান প্রকল্পটির সূত্রপাত ক'রে যান। সেই পরিকল্পনায়, মশানজোড়ে ময়ূরাক্ষীর ধারে একটি জলাধার করার কথা বলা হয় এবং শিউড়ী থেকে প্রায় ৮ কি: মীটার উজান পথে খাটাঙ্গায় নদীর মাঝখান দিয়ে একটা বাঁধ তৈরীর কথা বলা হয়।

১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পরলোকগত ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মশানজোড় বাঁধের ভিত্তি স্থাপন করেন। বিহারের সাঁওতাল পরগণায় দুমকার কাছে, বৃক্ষাচ্ছাদিত দুটি পাহাড়ের মাঝখানে, ভিত্তির নিম্নতম স্থান থেকে ৪৬.৫ মীটার উঁচু, ৪০৮ মীটার দীর্ঘ এবং ৫.৪ মীটার প্রস্থ এই বাঁধটি দূর থেকে ছবির মতো দেখায়। বাঁধের কাছে নদীতল থেকে এটি ৩৭ মীটার উঁচু।

দুইদিকে সবুজ পাহাড়ের মাঝখানে জলধারটির দৃশ্য অতি মনোরম। এতে ৫,০০,০০০ একর ফিট জল ধরে রাখা যায়।

জলাধারটি তৈরী করার জন্য, এই অঞ্চলের প্রায় ৯০টি গ্রামের ১৫০০০ অধিবাসীকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে, অন্য জায়গায় বসবাসের ব্যবস্থা ক'রে দিতে হয়েছে।

জলের পরিমাণ বেশী হয়ে গেলে তা যাতে বাঁধ ছাপিয়ে পড়ে বাঁধের ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য, অতিরিক্ত জল বের করে দেওয়ার জন্য ৭৪০ ফিট লম্বা
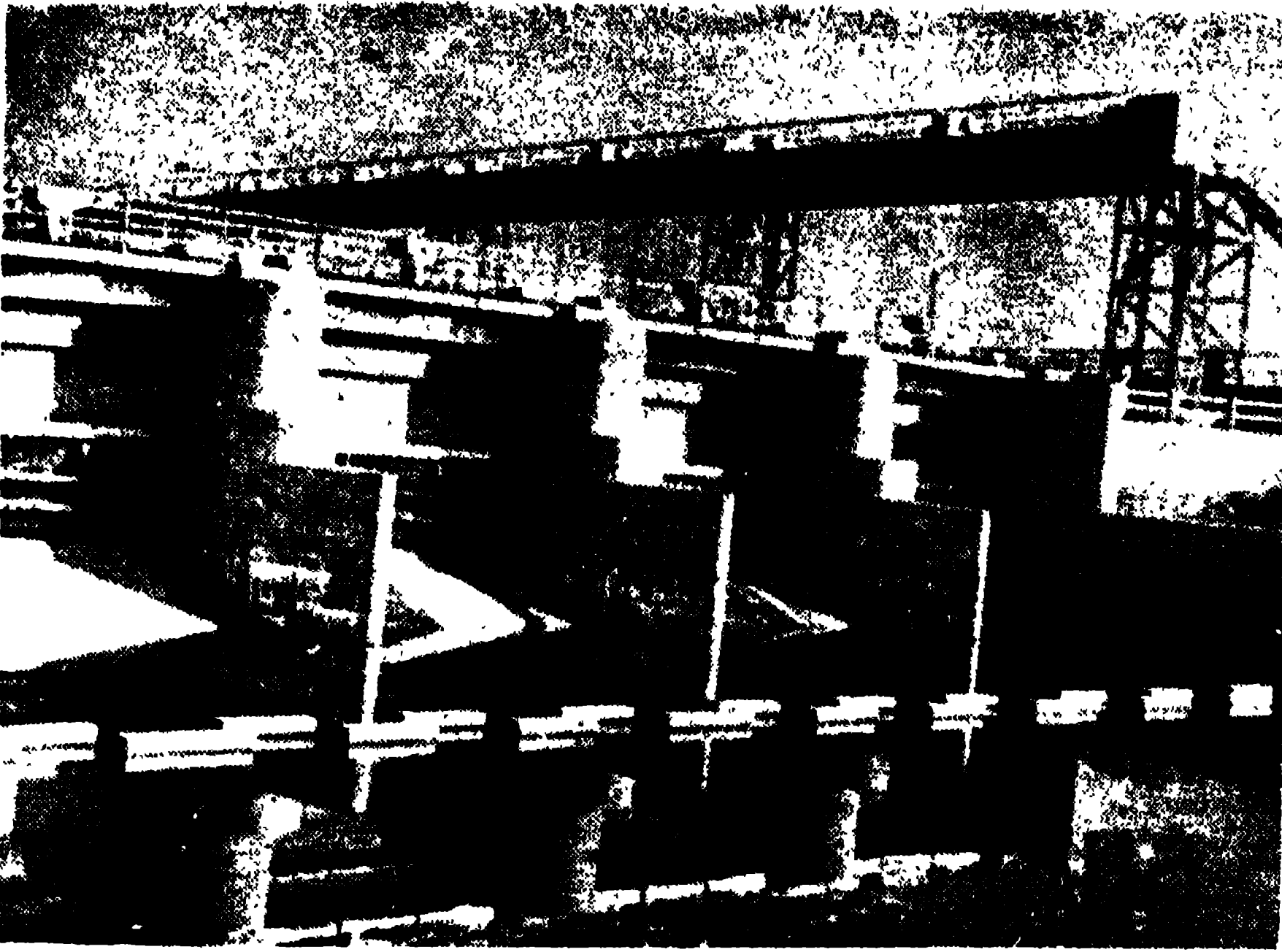
তিল পাড়া বাঁধ

একটি জলপথ রয়েছে। যাতে যন্ত্রাদি চালিয়ে অথবা বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে দূর থেকেও এটি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই জলপথটি দিয়ে দুর্ব্বার গতিতে জল বেরিয়ে গিয়ে যাতে নদীতলের কোন ক্ষতি করতে না পারে অথবা তার ফলে বাঁধের কোন ক্ষতি না হয় সেজন্য এই জলের বেগ খানিকটা রোধ করে চারদিকে ছড়িয়ে দেওযার ব্যবস্থা রয়েছে।

বাঁধের ভেতরেই দুটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে। এগুলির মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা হ'ল ১১,০০০ ভোল্ট। এগুলি থেকে পল্লী অঞ্চলে কম মূল্যে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া, শিউড়ী সাঁইথিয়া, রামপুরহাট, নলহাটি, আমেদপুর, গুসকারা, দুবরাজপুর এবং পাণ্ডবেশ্বর ইত্যাদি সহরগুলিতে, পশ্চিমবঙ্গে কয়লাখনি অঞ্চলে, বিহারের দুমকা অঞ্চলে এবং মশানজোড় বাঁধ এলাকায় বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা হয়। এই অঞ্চলে যে সব শিল্প গড়ে উঠছে সেখানেও বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা হয়। মশানজোড়ের বিদ্যুৎবাহী লাইনটি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে, পাণ্ডবেশ্বরে, দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশনের বিদ্যুৎবাহী লাইনের সঙ্গে সংযুক্ত করা যেতে পারে। যদি হঠাৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় অথবা পর পর কয়েকবছর অনাবৃষ্টির ফলে জলাধারে যদি সঞ্চিত জলের অভাব পড়ে যায় তাহলে ডি. ভি. সি থেকে অনায়াসেই বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা যায়।

বর্ত্তমানে প্রায় ২১২.৬৮ কি: মী: লম্বা দুটি প্রধান খাল আছে এবং শাখা খালগুলির দৈর্ঘ হ'ল প্রায় ১৪৭.২ কি: মী:। যে সব ছোট ছোট খাল এখনও কাটা হয়নি সেগুলিসহ ছোট ছোট খালের মোট দৈর্ঘ্য হ'ল প্রায় ১১৮০.৮ ব: মী:। বীরভূমের (২১৭৩.৬ ব: মী:). মুর্শিদাবাদের (৭৯৬.১ ব: মী:) এবং বর্ধমানের (১৯৪.৫৬ ব: মী:) এলাকায়, ছোট বড় খাল. নালা ইত্যাদির মাধ্যমে এই প্রকল্প থেকে সেচের জল সরবরাহ করা হয়।

যে পাঁচটি ছোট্ ছোট বাঁধ, সেচের জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলি হ'ল শিউড়ী থেকে ৩.২ কি: মী: দূরে ময়ূরাক্ষী নদীর তিলপাড়া বাঁধ এবং ময়ূরাক্ষীর প্রায় সমান্তরালে অবস্থিত বক্রেশ্বর, কোপাই, দ্বারকা এবং ব্রাহ্মণী নদীর বাঁধ। এগুলির দৈর্ঘ্য ৬০ থেকে ১৩৫ মীটার।

খারিফ শস্যের ৫,১৬,০০০ একর জমিতে এবং রবি শস্যের ৬১,০০০ একর

(১৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইউকোপান (১৯ পৃষ্ঠার পর)

জানালা এবং ভেন্টিলেটারের জন্য পাঁচ ধরনের প্যানেল আছে। এ পর্যন্ত যে তিনটি ছাঁদ তৈরি করা হয়েছে সেগুলিতে এই সব প্যানেল তৈরি করা যায়। কাঠ বা ইস্পাত দিয়ে এই ছাঁচ বানানো যায়। কোন প্যানেলের ওপরের দিকটা যদি ঢালাই করা না হয়, তাহলে ভেন্টিলেটার হয়ে যায়। মাঝখানটা ঢালাই করা না হলে জানালা হয়ে যায় এবং এই রকমভাবেই সহজে ঢালাইয়ের কাজ শেষ করা যায়। এই অংশগুলি ঢালাই করে ২১ দিন জলে ভিজিয়ে রাখার পরই সেগুলি সোজাসুজি জুড়ে দিয়ে বাড়ী তৈরির কাজ সুরু করা যায়। অংশগুলি ভারি হয় না কাজেই বহুতল বিশিষ্ট বাড়ী তৈরির কাজও সহজসাধ্য হয়।

সিমেন্ট কন্‌ক্রিটের ভিত্তি তৈরি করে তার ওপর দেওয়ালের অংশগুলি পাশাপাশি রেখে সিমেন্ট দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়। সিমেন্ট শুকিয়ে গেলেই সেগুলি মেঝের সঙ্গে খুব শক্ত হয়ে লেগে যায়। ছাদের অংশগুলিও তেমনি দেওয়ালের অংশগুলির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। বাড়ীটি তৈরি হয়ে গেলে বাক্সের মতো দেখায়। এর দেওয়ালগুলি পাতলা হলেও ভীষণ শক্ত হয়।

চিরাচরিত ইঁট সুড়কীর পাকা বাড়ীর তুলনায় ইউকোপ্যান পদ্ধতিতে বাড়ী তৈরি করার খরচ অনেক কম। এতে পাকা বাড়ীর সব রকম উপকারগুলি পাওয়া যায়, এগুলির রক্ষণাবেক্ষণের খরচও অনেক কম। তা ছাড়া ইউকোপ্যান পদ্ধতিতে তৈরি বাড়ী অনেক বেশীদিন টেঁকে দেখতে সুন্দর ও ছিমছাম হয়। এই পদ্ধতিতে তৈরি বাড়ী যে কোন আবহাওয়ার পক্ষে উপযোগী।

এই ঢঙের বাড়ীর ছাদের উচ্চতা হ'ল ২.৭৪ মিটার যা গরম আবহাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। উপযুক্ত নক্সা তৈরি করে বায়ু চলাচলের উপযুক্ত ব্যবস্থা যদি রাখা যায় তাহলে ঘরগুলি ঠাণ্ডা রাখা যায়। বিদ্যুৎবাহী তার, জলের ও ময়লার পাইপের মতো অতি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিও খুব সহজে ইউকোপ্যান পদ্ধতিতে তৈরি বাড়িতে সংযোজন করা চলে।

ছোটআন্দামান দ্বীপে বন্দরের সুবিধা

নতুন প্রকল্প অনুমোদিত

আন্দামান যতদিন কালাপানি নামে কুখ্যাত ছিল ততদিন ঐ অঞ্চলটি সম্বন্ধে লোকের মনে সর্বদাই একটা আতঙ্ক ও ভয়ের ছিলো ভাব। বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মৃতি বিজড়িত এই দ্বীপপুঞ্জে ১৯৪৩ সালে নেতাজী স্বাধীন ভারতের প্রথম সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ভারত ভূখণ্ড, স্বাধিকার ঘোষণার সেই গৌরবমুহূর্ত উপলব্ধি করেছিল তার অনেক পরে, ১৯৪৭ সালে

ছোট আন্দামান হ'ল এই দ্বীপপুঞ্জের অসংখ্য দ্বীপের একটি। মিলিতভাবে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের আয়তন হ'ল ২১২৩ ০৮ বর্গ কিলোমীটার। জন-সংখ্যা ৬৩ হাজারের কিছু বেশী। ছোট আন্দামানের আয়তন ৭৬৮ বর্গ কিলো-মীটার। এমনিতেই হাওয়ার দরুণ এই দ্বীপে নৌকো বা জাহাজ ভেড়ানো প্রায় অসম্ভব। কারণ এখানে জেটির সুবিধা নেই। আয়তনে দ্বীপটি বেশ বড়। কিন্তু দ্বীপের কোনোও অংশে সমুদ্রের খাঁড়ির মত না থাকায় ঢেউ-এর প্রাবল্যে জাহাজে মাল তোলা নামানো চলে না। তা ছাড়া আরব সাগরের দিক থেকে কিংবা বঙ্গোপ-সাগরের দিক থেকে মৌসুমী হাওয়া বইতে সুরু করলে হাওয়া, বৃষ্টি ও ঢেউ-এর মাতলামীতে সব কিছু বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন জাহাজ ভেড়াবার চেষ্টা করলে ঢেউ-এর ধাক্কায় জাহাজ ভেঙে যাবার আশঙ্কা থাকে।

এই সব কথা বিবেচনা ক'রে কেন্দ্রীয় সরকার ২২৮ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প মঞ্জুর করেছেন। সমুদ্রের প্রবল ঢেউ-এর তোড় ভাঙ্গার জন্যে এক বিশেষ ধরনের দেওয়াল তোলাই হ'ল এই প্রকল্পের মূল কথা। বন্দরের গায়ে যাতে জাহাজ ভিড়তে পারে এবং জেটির পাশে নোঙর ক'রে মাল তোলা খালাস করতে পারে তার জন্য বন্দরের প্রান্ত ছাড়িয়ে কিছু দূরে ঢেউ-ভাঙার দেওয়াল খাড়া করা হবে। একটি সঙ্কীর্ণ জলপথ দিয়ে জাহাজগুলি এই দেওয়ালের আড়ালে গিয়ে নোঙর ফেলবে। তাতে ঢেউ-এর প্রচণ্ড আঘাতে জেটির গায়ে ধাক্কা লেগে জাহাজের ক্ষতি হবার আশঙ্কাও থাকবে না কিংবা প্রয়োজন হ'লে দূরে নোঙর ফেলা জাহাজে নৌকো ক'রে মাল তোলা নামানোর হাঙ্গামা হবে না এবং খরচের দিক থেকেও সুবিধা হ'বে।

বন্দরের সুবিধা না থাকায় এবং সমুদ্রের অশান্ত ঢেউ-এর দরুণ এই দ্বীপটির সঙ্গে সহজে যোগাযোগ রাখা একটু কঠিন। তাই কেন্দ্রীয় সরকার ছোট আন্দামানের হাট-বে'তে (Hut Bay) ঢেউ ভাঙার প্রাচীরটি তৈরি করবেন। প্রকল্পটির ব্যয়ের মোট ২২৮ লক্ষ টাকার মধ্যে বিদেশী মুদ্রার পরিমাণ দাঁড়াবে ৮ লক্ষের সমান। এই প্রকল্পটি রূপায়িত হ'লে সারা বছর এখানে জাহাজ ভিড়তে পারবে।

এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে 'হাট-বে'তে নামবার জন্য, পন্টুন ভাসিয়ে সাময়িক একটা ব্যবস্থা ক'রে রাখা হবে। নতুন প্রকল্প অনুযায়ী বন্দরে একটা স্থায়ী ও পাকা জেটি করার কথা আছে। সেটি হ'লে এক-দিকে দ্বীপপুঞ্জের সংযোগরক্ষাকারী ছোট জাহাজগুলি ভিড়তে পারবে এবং ঢেউভাঙা দেওয়ালের ভেতর দিকে কাঠের গুঁড়িগুলি জাহাজে তোলা সহজ হবে। তা ছাড়া জেটির অদূরে জাহাজ নোঙর ফেললেও, গভীর জলে গাছের গুঁড়ী ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে, জাহাজে তোলাও সহজ হবে।

ডক্-ইয়ার্ডের দৃশ্য।

ঢেউ ভাঙা প্রাচীরের ভেতরের দিকে জলভাগের দৈর্ঘ্য হবে ১,৩০০ মীটার। প্রাচীরটি হবে সেতুবন্ধ আঙ্গিকের : যেন একরাশ নুড়ীর তৈরি প্রাকৃতিক প্রাচীর। জলভাগে প্রবেশের পথ প্রস্থে হবে ১৫০ মীটার। প্রাচীরের ভেতরে কাঠ-বাহী নৌকা প্রভৃতি ঘোরাবার জায়গাটার পরিধি হবে ৫০০ মীটার। এ ছাড়া বয়া ভাসানো, জাহাজ চালনা করার অন্যান্য ব্যবস্থা, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহেরও ব্যবস্থা রাখা হবে। তা ছাড়া থাকবে ট্রলি লাইন ও ক্রেন বসাবার সরঞ্জাম। আগামী বর্ষা পেরিয়ে আবহাওয়া ভালো হলেই কাজ সুরু করা হবে। প্রকল্পটির কাজ শেষ হতে চার বছর সময় লাগবে।

গোরু মহিষের খাদ্য

আমাদের দেশে গোরু, মোষ, ছাগল প্রভৃতির যত্ন নেই। প্রথমতঃ যাঁরা এই সব পশু পালন করেন তাঁরা যত্ন নিতে জানেন না এবং দ্বিতীয়তঃ তাদের জন্যে পুষ্টিকর খাদ্য যোগান ও অন্যান্য পরিচর্যা সম্বন্ধেও তাঁদের আগ্রহ নেই। ফলে পশুগুলির স্বাস্থ্যহানি ছাড়াও কার্যক্ষমতার দিক থেকে সেগুলি দুর্বল হয় এবং দুর্বল স্বাস্থ্যের প্রতিক্রিয়া দুধের পরিমাণের ওপর প্রতিফলিত হয়। এই অবস্থাটা বেশী দেখা যায় পশ্চিম বাংলায়।

যাই হোক ইদানীং পশ্চিম বাংলায় গো-খাদ্য হিসেবে একটি শুঁটী জাতীয় উদ্ভিদ (পোষাকী নাম রাইস বীন) বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সবুজ অবস্থায় কলাই-এ যে পরিমাণ প্রোটীন থাকে এই উদ্ভিদে প্রোটীনের অংশ তার চেয়ে অনেক বেশী। এতে ক্যালসিয়াম ও ফসফোরাসের ভাগও অনেক। এই উদ্ভিদটি জনপ্রিয় হবার আর একটা কারণ হ'ল খরায় এর ফলন নষ্ট হয় না এবং জমি ভাল না হ'লেও এর চাষ করা যায়।

জমিতে ২/৩ বার হাল চালিয়ে নেওয়ার পর মার্চ থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে এর বীজ বোনা যায়। প্রতি হেক্টরে সাধারণতঃ ৪০ থেকে ৫০ কে. জি. বীজ বোনা হয়। অল্প সময়ে অর্থাৎ ৫০/৬০ দিনের মধ্যে অনেকটা ফসল তোলার জন্যে বীজের পরিমাণ ৬০ থেকে ৭০ কে. জি.ও করা যায়।

এর জন্যে হেক্টর প্রতি ৫০ থেকে ৬০ কে. জি. ফসফোরিক এ্যাসিড দেওয়া দরকার। খারিফ মরসুমে সাধারণতঃ এতে জলসেচ দেওয়ার দরকার পড়ে না। তবে মার্চের গোড়ায় বীজ বুনতে হলে আগে কিছুটা জলসেচ দেওয়া দরকার হয়ে পড়ে। যে কোনও ধরণের জমিতে এর চাষ করা যায় তবে উর্বরা 'লোম' জাতীয় মাটিতে এর ফলন সবচেয়ে ভাল হয়।

ফসল ৭০ থেকে ৮০ দিনের মধ্যে তোলা যায়। সে সময়ে উৎপাদনের পরিমাণ থাকে ২০০ থেকে ২২০ কুইন্টাল। কিন্তু ১২০ থেকে ১৩০ দিন পরে ফসল কাটলে হেক্টর প্রতি ৩৫০ কুইন্টাল পর্যন্ত পাওয়া যায়।

তুলোর বীচি থেকে ময়দা

মানুষের খাদ্যের একটা উপাদান হ'ল প্রোটীন। তুলোর বীজের খোল থেকে প্রোটীনযুক্ত ময়দা তৈরি করা হচ্ছে। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এর উৎপাদনের সম্ভাবনাও খুব উজ্জ্বল। তুলোর বীজের ময়দায় প্রোটীনের ভাগ খুব বেশী এবং এতে লাইসিনের অংশও অনেক। এই বস্তুটি গুঁড়ো অবস্থায় পাওয়া যায় এবং পুরোপুরি এই দিয়ে অথবা এই গুঁড়ো মিশিয়ে খাবার জিনিষ তৈরি করা যায়। হায়দ্রাবাদের গবেষণা ও পরীক্ষাগারে তুলোর বীজের খাদ্য-মূল্য প্রথম নিরূপিত হয়েছিল। এখন এই জিনিসটি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তৈরী হচ্ছে।

(১৫ পৃষ্ঠার পর)

এই অঞ্চলের কৃষকদের প্রতি একরে বার্ষিক ১০ টাকা উন্নয়ন কর দিতে হয়। ১৯৬০ সাল পর্যান্ত এই প্রকল্পটির জন্য মোট ২০ কোটি টাকারও বেশী ব্যয় করা হয়েছে। ১৯৬৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ৩৭,৫৪,০০০ টাকা বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যয় হয়েছে।

জল সরবরাহ করার জন্য যে কর আদায় করা হয় তাতে এই প্রকল্পটির বার্ষিক ৩,৬৮,৪০০ টাকা আয় হয়।

লাডাকে সব্জীর চাষ

এককালে লাডাকে মোট জমির শতকরা ০.১ ভাগেও চাষবাস হ'ত কি না সন্দেহ। লাডাকীরা চাষ করলেও এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত শুধু বার্লির চাষ করত। কিন্তু আজ লাডাকীরা প্রতি বছর, সৈন্যবাহিনীকে লাখ লাখ টাকার শাকসব্জী যোগান দেয়।

এখন লাডাকে হেক্টর প্রতি ৪৮,০০০ কে. জি. বাঁধাকপি, ১৮,০০০ কে জি ফুলকপি. কিংবা ৪৩০০০ কে জি: আলু ফলানো সম্ভব। এগুলি কপোল কল্পনা নয়। পরীক্ষামূলকভাবে ঐ সব সব্জীর চাষ করে ঐ ফল পাওয়া গেছে।

আলমোড়ার প্রতিরক্ষা গবেষণাগারে এক দো-আঁশলা পেয়াজ উদ্ভাবন করা হয় এবং মরশুমের দ্বিতীয় ফলনের সময়ে ৭০,০০০ কে জি রও বেশী পেঁয়াজ হয়।

এখন ব্যাপারটা কী ভাবে সম্ভব হ'ল দেখা যাক। লাডাকে, সমতল ভূমির তুলনায়, সূর্য্যের তাপ পাওয়া যায় শতকরা ৭৫ ভাগ বেশি। তার ফলে যে কোনোও চারার জলের চাহিদা বেড়ে যায়। কিন্তু মাটি আল্গা হওয়ার দরুণ অল্প সেচে কাজ হয় না। তাই বার বার জলসেচ দেওয়া হয়। ফলে চারাগুলি তর তর করে বেড়ে ওঠে। ফলন এত দ্রুত হয় যে, মার্চ-এপ্রিলে বীজ বুনে, মে মাসে তা নতুন জমিতে বসিয়ে দেওয়া যায়। এই কারণে প্রতিরক্ষা বাহিনী শীত পড়ার আগে, ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই, আর একটি ফসল তুলতে আগ্রহী হয়েছে।

লেহ-তে যে ছোট কৃষি গবেষণা কেন্দ্র আছে, সেই কেন্দ্রটির উদ্দেশ্য হ'ল স্থানীয় ভাবে নিযুক্ত সৈন্য দলগুলিকে সারা বছর ধরে শাক সব্জী সরবরাহ করা।

লাডাকে শস্য ঝাড়াই হচ্ছে

লেহ্-তে ক্ষেতভরা ফসল।

বারৌনির পাঁচ বছর

(৬ পৃষ্ঠার পর)

করা যেতে পারে যে কোকিং ইউনিটটি যাতে অবিরাম গতিতে ২৬ দিন ধরে কাজ করতে পারে সেই রকমভাবেই এটি তৈরী করা হয়েছে।) এটা হল সর্ব্ব-ভারতীয় রেকর্ড এবং একে সমগ্র বিশ্বের অন্যতম রেকর্ডও বলা যায়। রক্ষণাবেক্ষণের কাজ উন্নততর ব'লেই এই রকম একটা সাফল্য অর্জ্জন করা সম্ভবপর হয়েছে।

শোধনাগারের লিউব অয়েল কমপ্লেক্সের ফেনল নির্য্যাস ইউনিটটি গত এপ্রিল মাসে তার মৌলিক কর্ম্মক্ষমতাও অতিক্রম করে। বারৌনি তৈল শোধনাগারটিকে কেন্দ্র ক'রে চতুর্দ্দিকে আরও অনেক সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার দিন আর বেশী দূরে নেই।

পরিকল্পনা ও সমীক্ষা

উদয়পুরে পরিবার পরিকল্পনার জনপ্রিয়তা

এস. এস. আচার্য্য ও চন্দ্র শর্ম্মা

সহরাঞ্চলে পরিবার পরিকল্পনা কর্ম্মসূচী কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে সে সম্পর্কে উদয়পুরে একটি সমীক্ষা চালানো হয়। এই সমীক্ষার দুটি লক্ষ্য ছিলো। প্রথম: এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসাধারণ কতখানি সজাগ, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জনগণের মনোভাব, এর পদ্ধতিগুলির প্রয়োগ ও ফলাফল এবং শিক্ষা ও আয়ের স্তর। বয়সের সঙ্গে এই অভিযানের সম্পর্ক স্থির করা ছিলো দ্বিতীয় লক্ষ্য।

উদয়পুর মিউনিসিপ্যালিটির ১৭নং ওয়ার্ডে (ব্রহ্মপুরী) ৩২ জনকে প্রশ্নাদি ক'রে এই সমীক্ষা চালানো হয়।

এই অনুসন্ধানের ফলে অন্যতম আশ্চর্য্য যে তথ্যটি উদঘাটিত হয়েছে তা হ'ল, উদয়পুর একটা সহর হলেও সকলে পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত নন। তবে এটাও উল্লেখযোগ্য যে এক তৃতীয়াংশ পরিবার পরিবার-পরিকল্পনার পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। তবে তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই অস্ত্রোপচার করিয়ে নিয়েছেন। প্রায় দুই তৃতীয়াংশ মনে করেন যে পরিবারের আকার সীমিত রাখা সম্পর্কে উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য আরও কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এমন কি এঁদের মধ্যে অর্দ্ধেকের মত হ'ল, এই সম্পর্কে আইন প্রনয়ণ করা উচিত। পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য করার ক্ষেত্রে পরিবারের আয় ও শিক্ষার স্তর সব চাইতে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে। আবার যেখানে বয়স যত বেশী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতার হার তত কম।

যতগুলি পরিবার সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে সেগুলির শতকরা ৬৮ ভাগ মাসিক বেতনভোগী এবং শতকরা ২২ ভাগের নিজেদের ব্যবসা আছে। এই পরিবারগুলির বার্ষিক আয় ১২00 টাকা থেকে ১২000 টাকা পর্য্যন্ত। এই পরিবারগুলিতে মহিলাদের বয়স ২৩ থেকে ৫৬ বছরের মধ্যে এবং পুরুষদের বয়স ২৫ থেকে ৬0 বছরের মধ্যে। দম্পতিদের বয়সের গড়পড়তা ব্যবধান হ'ল ৫ বছর। বিয়ের সময় শতকরা ৯0 জন মহিলার বয়স ছিলো ২0 বছরের কম।

শতকরা ২২টি পরিবারে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই নিরক্ষর। যত জন মহিলাকে প্রশ্ন করা হয় তাঁদের মধ্যে শতকরা ৪0 জন ছিলেন অশিক্ষিতা। জীবিত শিশুর সংখ্যা 0 থেকে ১১ অর্থাৎ মোটামুটি ৩টি। দুটি সন্তানের জন্মের মধ্যে ব্যবধান মোটামুটি তিন বছরের তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে এই ব্যবধান আবার ১২ বছরের।

পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে জ্ঞান এবং পদ্ধতিগুলি বা সে সম্পর্কে মনোভাব নিয়ে অনুসন্ধান ক'রে দেখা গেছে যে শতকরা ৮১ জন মহিলা পরিবার পরিকল্পনা কর্ম্মসূচী সম্বন্ধে জানতেন। এক চতুর্থাংশ মহিলার বিশ্বাস, জন্ম ভগবানের হাতে এবং কৃত্রিম উপায়ে তা প্রতিরোধ করা যায় না। যাঁদের প্রশ্ন করা হয় তাঁদের কারুর কারুর মতে আদর্শ পরিবারে ৩টি শিশু থাকা উচিত। আবার কারুর মত হ'ল পাঁচটি শিশু। শতকরা ৪৭ জন মহিলা সংযমের মাধ্যমে জন্ম নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতি এবং শতকরা ৩৪ জন, জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য কৃত্রিম পদ্ধতির পক্ষপাতি। তবে পুরুষদের কাছে অস্ত্রোপচারই হ'ল জন্ম নিয়ন্ত্রণের সব চাইতে জনপ্রিয় পদ্ধতি। শতকরা যে ২৫টি দম্পতি কোন রকম জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসরণ করেন না, তাঁরা বলেন যে, তাঁদের সময়ে, পরিবার সীমিত রাখার এই সব পদ্ধতির প্রচলন ছিল না। শতকরা ৩৭টি দম্পতি বলেন যে তাঁদের এই সবের প্রয়োজন নেই এবং শতকরা ১২.৫ ভাগ বলেন যে তাঁরা এই সব পদ্ধতি প্রয়োগ করতে চান না। শতকরা ৫0 ভাগ মহিলা যদিও বলেন যে পরিবার সীমিত রাখার জন্য সরকারের আইন প্রণয়ন করা উচিত—তথাপি তাঁরা কেউই গর্ভপাত আইন সঙ্গত করার পক্ষপাতি নন। শতকরা প্রায় ৭0 জন মহিলা বলেন যে আর্থিক বা অন্য কোন রকম সাহায্য দিয়ে সরকারের জনসাধারণকে পরিবার পরিকল্পনায় উৎসাহিত করা উচিত। পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সঠিক কোন মতামত পাওয়া যায়নি। শতকরা ১২.৫ ভাগ বিশ্বাস করেন যে এর কোন প্রয়োজন নেই. অবশিষ্টরা, পরিবারের জীবন ধারনের মান উন্নততর করার জন্য এবং সমাজের কল্যাণের জন্য পরিবার পরিকল্পনার পক্ষপাতি।

যাঁদের প্রশ্ন করা হয়, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব গঠনে শিক্ষা, আয় এবং বয়স অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছে। শিক্ষিতা মহিলারা এই কর্ম্মসূচী সম্পর্কে যথেষ্ট খবর রাখেন। অশিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে মাত্র ১৫ জন জন্ম-নিয়ন্ত্রণের কৃত্রিম পদ্ধতিগুলি সমর্থন করেন কিন্তু—শিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে বেশীর ভাগই এগুলির স্বপক্ষে মত দেন এবং বলেন যে এই ক্ষেত্রে সরকারের কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। যে অশিক্ষিতা নারীরা জন্ম নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতি তাঁদের মধ্যে শতকরা ১২ জন এই সব জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করছেন। যে সব নারী প্রাইমারি পরীক্ষা পাশ করেছেন তাঁদের মধ্যে শতকরা ৫0 জন এই সব পদ্ধতি অবলম্বন করছেন। যে নারীদের শিক্ষা ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত বা তার বেশী তাঁরা সকলেই এই সব পদ্ধতি অবলম্বন করছেন।

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারে শিশুর সংখ্যাও বেড়েছে। অপরদিকে পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা, পরিবার সীমিত রাখার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন এবং এই সম্পর্কে মনোভাব, পারিবারিক আয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।

সাধারণ অসাধারণ

তৈলবিজ্ঞানে স্নাতক কৃষিতেও সফল

গুজরাটের ক্যাম্বে জেলার দাভান নামের একটি এলাকা থেকে যে কৃষকটি ১৯৬৯ সালে রাজ্য-পর্যায়ে শস্য উৎপাদন প্রতিযোগীতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন তার নাম হ'ল শ্রীচান্দুভাই মণিভাই প্যাটেল। বিশ্বাস করুন ইনি প্রতি একরে ৪,২০১ ৬০০ কে. জি ধান ফলিয়েছেন। ধানের কোন বীজ বুনে-ছিলেন? আই. আর—৮ উৎপাদনের পরিমাণ হ'ল গুজরাটের গড়পড়তা পরি-মাণের ৭ গুণ বেশী। শ্রী প্যাটেল তৈলবিজ্ঞানে স্নাতক। বয়স ৩৬ বছর। তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ-বাস করার দিকে মন দিয়েছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস প্রচুর ফলন বীজের চল হলে কৃষিও অন্যান্য ব্যবসার মত লাভজনক হবে। তিনি বলেন, আমাদের অধিকাংশের আবাদী জমি ছোট। সুতরাং আয় বাড়াতে হলে প্রচুর ফলন বীজ বোনাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

শ্রী প্যাটেল চাষে কি ভাবে সাফল্য অর্জন করেন তার কথা বলতে গিয়ে বলেন যে, সমস্ত জমিটা প্রথমে তিনি ট্র্যাক্টরের সাহায্যে চষে নেন। তারপর ভালো করে দুবার হাল দিয়ে নেন। বীজ বোনার আগে তিনি একর প্রতি ১৮ গাড়ী পচা সার, ১৭০ কে. জি. য়ুরিয়া ও ২০ কে জি. পোট্যাশ ছড়িয়ে দেন। তারপর আই আর. ৮ ধানের চারা রোপন করেন। ফসল পাকবার আগে, মাঝে মাঝে তিনি জমিতে আবার ৩৫ কে. জি. য়ুরিয়া ও ৩৫ কে. জি এ্যামোনিয়াম সালফেট ছড়িয়ে দেন। ক্ষেতে ৯ বার সেচ দেওয়া হয় এবং দুবার কীট নাশক ওষুধ দেওয়া হয়। চাষের জন্যে তাঁর একর প্রতি খরচ হয় ১,০০০ টাকা এবং তাঁর আয় হয় ৪,২০০ টাকা। অর্থাৎ নীট ৩,২০০ টাকা লাভ। শ্রী প্যাটেল রবি মরসুমে গমের চাষ করে আরও ২,০০০ টাকা আয় করতে পারবেন বলে আশা করেন।

শ্রী প্যাটেল জানান যে, আই. আর ৮ তিনি এই প্রথম বুনলেন। তাঁর মতে এই বীজের চাষে কৃত্রিম সার প্রয়োগ অভাবনীয় সুফল দেয়। তা ছাড়া চারাগুলি মরে না এবং ফলনও হয় প্রচুর। তাঁর নিজের গ্রামে প্রায় ৪০ জন চাষী আই. আর—৮ চাষ করেছেন এবং প্রতি একরে কারুর ফলন ১,৭০০ কে. জি. র কম হয়নি। অর্থাৎ গুজরাটে একর প্রতি গড়পড়তা উৎপাদন যেখানে ৬৪৫ কে জি সেখানে ঐ ৪০ জনের প্রত্যেকে তিন গুণ বেশী ফসল পেয়েছেন।

সম্বলপুরের পুনরুজ্জীবন

সম্বলপুর জেলার আই. এ. ডি. পি. অঞ্চলের খ্যায়ের পালিগ্রামের স্যরপঞ্চ শ্রীগুণনিধি প্রধান অহঙ্কার ক'রে বলেন যে, গত চার বছরে তাঁদের এলাকায় কৃষির দারুন উন্নতি হয়েছে। আগে চাষবাসের উন্নতি সম্পর্কে কেউ মাথা ঘামাত না। 'চলছে চলুক আগের মত'—এই ছিল শতকরা ৯৯ জনের মনোভাব। বছরে একবার ধান তুলতে পারলেই তারা নিশ্চিন্ত হ'ত।

কিন্তু এখন হীরাকুদ খালগুলির কল্যাণে এবং আই.এ.ডি.পি.র নির্দেশনা ও সহায়তায় সেখানে কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটেছে'। শ্রীপ্রধান নিজে একজন প্রগতি-শীল কৃষক। তাঁর কথার দাম আছে। তিনি মনে করেন গ্রামবাসীরা নিজেরাই যে ২০০০ একর পরিমিত জমিতে সেচের জন্যে নালা খুঁড়েছেন এটা মস্ত কৃতিত্বের কথা। এই দু' হাজার একরের মধ্যে ১,২০০ একরে প্রচুর ফলন বীজ বোনা হয় যেমন তাইচুং দিশী-১, আই-আর-৮ পদ্মা ও জয়া প্রভৃতি।

সকলের চেষ্টা ও সহযোগিতায় সম্বল-পুরে একর প্রতি গড়পড়তা উৎপাদন তিনগুণ বেড়ে গিয়েছে। শ্রীপ্রধান একান্তে জানালেন, ফলন এত হয়েছে যে, অনেক কৃষক কর কর্তৃপক্ষের ভয়ে তাঁদের উৎপাদনের আসল পরিমাণ জানাতে চান না।

ছত্তিশ গড়ে ধানের অভুতপূর্ব ফলন

মধ্য প্রদেশে, রায়পুর জেলার ২৩টি ব্লকের ৮টিতে, নিবিড় কৃষি উন্নয়ন কার্য্যসূচী প্রবর্তনের ফলে স্থানীয় কৃষকদের দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে বদলে গিয়েছে। মান্ধাতার আমলের চাষবাসের ধারা বর্জন ক'রে তাঁরা নতুন পদ্ধতি অনুসরণে উৎসাহ দেখাবার ফলে এই অঞ্চলে উৎপাদনের মাত্রা শতকরা ৩১ ভাগের মত বেড়ে গিয়েছে।

দেখতে দেখতে তাঁদের অবস্থা ফিরে গিয়েছে। মহাজনদের কাছে ধার নেবার চিরাচরিত অভ্যাস তো গেছেই, এমন কি, সরকারী ঋণও তাঁরা চান না। কেউ কেউ পুরাণো ঋণ মিটিয়ে ফেলে চাষবাসের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জাম নিজেদের টাকায় কিনেছেন। অবস্থা কত ভালো হয়েছে তা বোঝা যায়, এঁদের অনেকের নিজের টাকায় কেনা সাইকেল, ঘড়ি, রেডিও বা অন্যান্য বিলাসের উপকরণ দেখলে।

এই অঞ্চলে প্রচুর ফলন বীজের মধ্যে আই.আর. ৮ই সবচেয়ে জনপ্রিয়। মোহাদা গ্রামের শিবচরণ লাল ভার্মা প্রতি একরে ১২৮ মণ ধান ফলিয়েছেন। ছত্তিশগড়ের ইতিহাসে এটা অভূতপূর্ব। বলা বাহুল্য এই কৃতিত্ব দেখিয়ে তিনি রাজ্যের ফসল প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

ঐ গ্রামেই আর এক প্রগতিশীল চাষী ভূপৎ রাও গত বছরে আই.আর. ৮এর চাষ ক'রে একরে ৯৮ মণ ধান ফলিয়ে জেলা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন। প্রতি একরে ৩০০ টাকা খরচ ক'রে তিনি ১,২০০ টাকা আয় করেন।

★
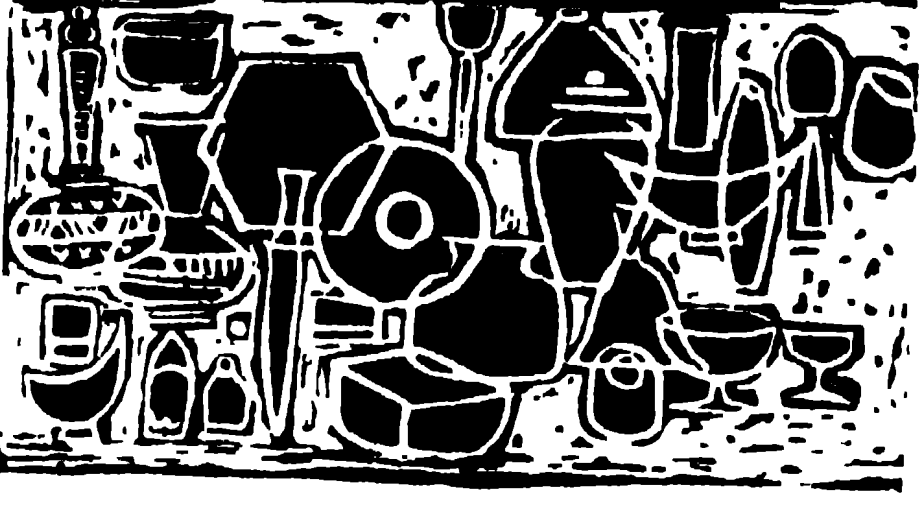
উন্নয়ন বার্তা

★ ব্যাঙ্গালোরের সেন্ট্রাল মেশিন টুলস্ ইনস্টিটিউট এই প্রথম এমন একটি যন্ত্র তৈরি করেছে যার দ্বারা কোনোও মেশিনের কাজ নিখুঁত করা ও মেশিনটির সর্বাধিক ক্ষমতার সার্থক প্রয়োগ সম্ভব হবে।

★ রুড়কীর সেন্ট্রাল বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট একটা নতুন ধরনের ইঁটের খোলা উদ্ভাবন করেছে যেটির তাপ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে এবং তাপের মাত্রা বাড়িয়ে ক্যালসিয়ামযুক্ত চূণ ও রাসায়নিক চূণও পোড়ানো যাবে। মামুলী 'ভাট্টি' জাতীয় চৌকোনা খোলার যে সব খুঁত থাকে, এতে তা থাকবে না।

★ একটি ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে, ১৭,৫০০ টন ইস্পাত সরবরাহ করার বরাত পেয়েছে। এর ফলে ডলারে ৭৫ লক্ষ টাকার সমান আয় হবে।

★ ক্যানাডার প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে টেলিফোনের সরঞ্জাম ও মাইক্রোওয়েভ কেব্‌ল্ কেনার জন্যে ক্যানাডিয়ান্ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সী ভারতকে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার (৩৩.৭৫ কোটি টাকা) দেবে ব'লে ঘোষণা করেছে। ভারতের টেলিকমিউনিকেশান (দূর সংযোগ) ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ৬০ কোটি ডলার অর্থাৎ ৪৫০ কোটি টাকার যে চতুর্বার্ষিকী পরিকল্পনা আছে, এই অর্থসাহায্য হ'ল তারই একটা অংশ। এই পরিকল্পনার জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক দেবে ৫ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার এবং বাকিটা খরচ করবে ভারত।

★ ক্যানাডার তিনটি বড় বড় গন্ধক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একটা চুক্তি অনুযায়ী, ভারত চলতি আর্থিক বছরের প্রথমার্ধে, ক্যানাডা থেকে, এক লক্ষ টন গন্ধক আমদানী করবে।

★ ভারত ১৯৬৯-৭০ সালে সংযুক্ত আরব সাধারণ তন্ত্রের সঙ্গে একটা চুক্তিতে সই করেছে। দুটি দেশের মধ্যে ৭৩ কোটি টাকার পণ্য লেনদেন হবে। ১৯৬৮-৬৯ সালে ব্যবসার পরিমাণ ছিল ৫০ কোটি টাকা।

★ সৌরাষ্ট্রে স্টেট ব্যাঙ্কের সহকারী (স্টেট্ ব্যাঙ্ক অফ সৌরাষ্ট্র) সৌরাষ্ট্রের ২,০০০ কৃষি স্নাতককে অর্থসাহায্য দেবার একটা নতুন কার্যসূচী গ্রহণ করেছে। এই কার্যসূচী অনুযায়ী কৃষি বিজ্ঞানে স্নাতক যে কোনোও ব্যক্তি নিজের জমিতে বা কোনোও জমি ইজারা নিয়ে তাতে হাঁস মুর্গী পালন, দুগ্ধ শালা স্থাপন, মৎস্যচাষ, শূকর পালন, আঙ্গুরের চাষ বা ফল ফুল সব্জীর বাগান করতে চাইলে তাঁকে অনধিক এক লক্ষ টাকার মধ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের পুরোটা ঋণ দেওয়া হবে।

★ ডিজেল ইঞ্জিনের উৎপাদন দ্বিগুণ হচ্ছে। ১৯৬৮-৬৯ সালে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ২.০৭ কোটি টাকা এবং ১৯৬৭-৬৮তে ১.২০ কোটি টাকা। আমদানীকারক দেশের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

★ ভারত ও পশ্চিম জার্মানী উত্তর প্রদেশের আলমোড়া জেলায় সুসংহত কৃষি উন্নয়নের একটা কার্যসূচীতে সহযোগীতা করার জন্য তিন বছর মেয়াদের একটা চুক্তিতে সই করেছে। এই কার্যসূচী হিমাচল প্রদেশের মণ্ডি ও কাংড়া জেলা এবং তামিলনাড়ুর নীলগিরি অঞ্চলের কার্যসূচীগুলির অনুরূপ। পশ্চিম জার্মানী মাটি পরীক্ষার-গবেষণাগারের জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দেবে, কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামতের সব সরঞ্জাম দেবে। তা ছাড়া পশ্চিম জার্মাণীতে ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করবে।

★ উত্তর ভারতে, হরিয়ানার পানিপথে, এই প্রথম সমবায় ভিত্তিতে একটি ডিস্টিলারী স্থাপন করা হ'ল। এখানে রবার, কৃত্রিম রবার বা অন্যান্য বস্তু এবং প্লাস্টিক শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় শিল্পে-ব্যবহার্য-সুরাসার তৈরি হবে।

★ বরোদার কাছে গুজরাট শোধনাগারে অশোধিত তেল থেকে প্রোটীন নির্যাস তৈরির জন্য একটি কারখানা চালু করা হয়েছে। ফ্রেঞ্চ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউটের সহযোগীতায় এটি স্থাপন করা হয়েছে।

★ রোলিং মিল ও ব্লাস্ট ফার্নেসে ব্যবহারের জন্য হেভী ইলেকট্রিক্যালস-এর হরিদ্বার শাখায় তৈরি ১৩টি সিনক্রোনাস মোটরের প্রথম কিস্তী বোকারো ইস্পাত কারখানায় পাঠানো হয়েছে।

★ গোদাবরীর জল বিশাখাপৎনম বন্দরে চালিত করার কার্যসূচী সম্বন্ধে অনুসন্ধানের কাজ শেষ হয়েছে। এই কার্যসূচীর জন্য ১২ থেকে ১৮ কোটি টাকার মত খরচ হতে পারে।

★ কলকাতার কাছে, হলদিয়ায়, একটা শোধনাগার স্থাপনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করা সম্পর্কে ভারতীয় অয়েল কর্পোরেশন একটি ফরাসী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। ২৫ লক্ষ টন ক্ষমতা-সম্পন্ন এই শোধনাগার তৈরির কাজ ১৯৭২ সাল নাগাদ শেষ হবে ব'লে আশা করা যায়। এর জন্যে ভারতীয় টাকার অংশটা পুরোপুরি দেবে কর্পোরেশন। এই কার্যসূচীতে রুমানিয়াও সাহায্য করবে।

★ কৃষি সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্যে একটি আণবিক শক্তি কেন্দ্র থেকে সুলভে আণবিক শক্তি ব্যবহারের সম্ভাব্যতা নিরূপণ করার জন্য, পারমাণবিক শক্তি কমিশন, উত্তর প্রদেশের সিন্ধু গাঙ্গেয় অঞ্চলে এবং গুজরাটের কচ্ছ-সৌরাষ্ট্র এলাকায় অনুসন্ধানের কাজ সুরু করেছে।

REGD. NO. D-233

'প্রেরণার বাণী'
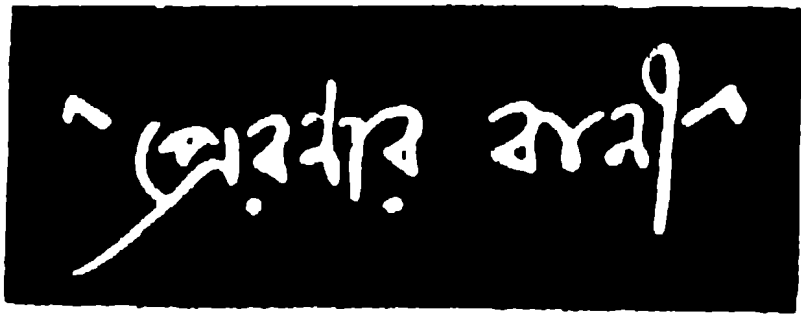
আমাদের শাসনব্যবস্থা আমাদের যোগ্যতানুযায়ী হবে। আমরা উন্নতি করলে শাসন ব্যবস্থার উন্নতি হতে বাধ্য।

অতএব শুধু তথাকথিত দায়িত্বশীল সরকারের ঠাটটুকু বজায় রাখতে গেলে প্রকাশ্য স্বৈরতন্ত্রী শাসনের চেয়েও তা খারাপ দাঁড়াতে পারে। কারণ স্বৈরতন্ত্রী সরকার কারুর ভোটের তোয়াক্কা না ক'রে সকলের প্রতি নিরপেক্ষতা দেখাতে পারেন। ঠাটসর্বস্ব সরকার তা করার সাহস পান না।

গণতান্ত্রিক সমাজের শাসন ব্যবস্থার মধ্যে, জনসাধারণের আশা আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয় এবং এইটেই সব সময়ে হওয়া উচিত।

সরকারের গঠনতন্ত্র যেমনই হোক না তা অভীষ্ট সিদ্ধির একটা মাধ্যম মাত্র। এমন কি স্বাধীনতাও তাই। কারণ চরম লক্ষ্য হল জনকল্যাণ, সমৃদ্ধিলাভ; দারিদ্র্য, ক্লেশ ও আধিব্যাধির মূলোৎপাটন করা এবং প্রত্যেককে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সুস্থ জীবন যাপনের সুযোগ দেওয়া।

যে প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের সমর্থন হারিয়েছে সে প্রতিষ্ঠানের 'বেঁচে' থাকার অধিকার নেই।

একমাত্র জনমতই যে কোনোও সমাজকে সুস্থ ও দুর্নীতিমুক্ত রাখতে সক্ষম।

আত্মনির্ভরশীলতার অর্থ হল অন্যের সাহায্য না নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানো। তার মানে এই নয় যে অন্যের সাহায্য উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করতেই হবে। অর্থাৎ যখন বাইরের সাহায্য আসছে না কিংবা চেয়েও সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না তখন আত্মমর্যাদা বজায় রেখে আত্মপ্রত্যয়ের ওপর নির্ভর করতে হবে।

বাগাড়ম্বর না ক'রে সমাজসেবা করাই যথার্থ সেবা। ডান হাত কী করছে বাঁ হাত জানবে না—এইভাবে সেবা করলে তবেই কাজ হয়।

অন্যান্যকে শোষণ না ক'রে ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে সম্পদ সঞ্চয় করা অসম্ভব। সমাজের অন্যান্যদের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার জন্যে সুবিধা ভোগ করার নৈতিক অধিকার কোনোও মানুষের নেই।

আজকের যুগে বৈষয়িক অবস্থার ক্ষেত্রে দারুণ বৈষম্য রয়েছে। সমাজতন্ত্রবাদের মূল নীতি তাঁদের কর্তব্য হ'ল অর্থনৈতিক সমতা রক্ষা। দু'চারজন ব্যক্তি টাকার গদীতে শুয়ে আছে অথচ লক্ষ লক্ষ মানুষের এক বেলার অন্নও জুটছে না—এই দারুন তারতম্যের মধ্যে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব।

আমরা আমাদের জাতীয় শক্তি ও সামর্থ্য সুসংগঠিত ক'রে তুলতে চাই। এর জন্যে উৎপাদনের শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করাই যথেষ্ট নয়; উৎপাদন এবং সুসম বন্টনের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি গ্রহণ করা দরকার।

বর্তমানে ভারতের প্রয়োজন হ'ল মুষ্টিমেয়র হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হতে না দিয়ে তা এমনভাবে বন্টন করা যাতে দেশের সাড়ে সাত লক্ষ গ্রাম উপকৃত হয়।

সুসম বন্টন বলতে বোঝায় যে, দেশের প্রত্যেকটি মানুষের হাতে, নিজের অত্যাবশ্যক প্রয়োজন মেটাবার মত পর্যাপ্ত অর্থ থাকবে। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে যে, কোনোও পেটরোগা লোকের যদি আধ পো' টাক চাল লাগে এবং আর একজনের যদি আধ সের চাল লাগে, তাহলে দুজনেরই যেন প্রয়োজন মেটাবার মত সামর্থ্য থাকে।

ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সোসাইটি লিঃ—করোলবাগ, দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত এবং ডিরেক্টার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত।
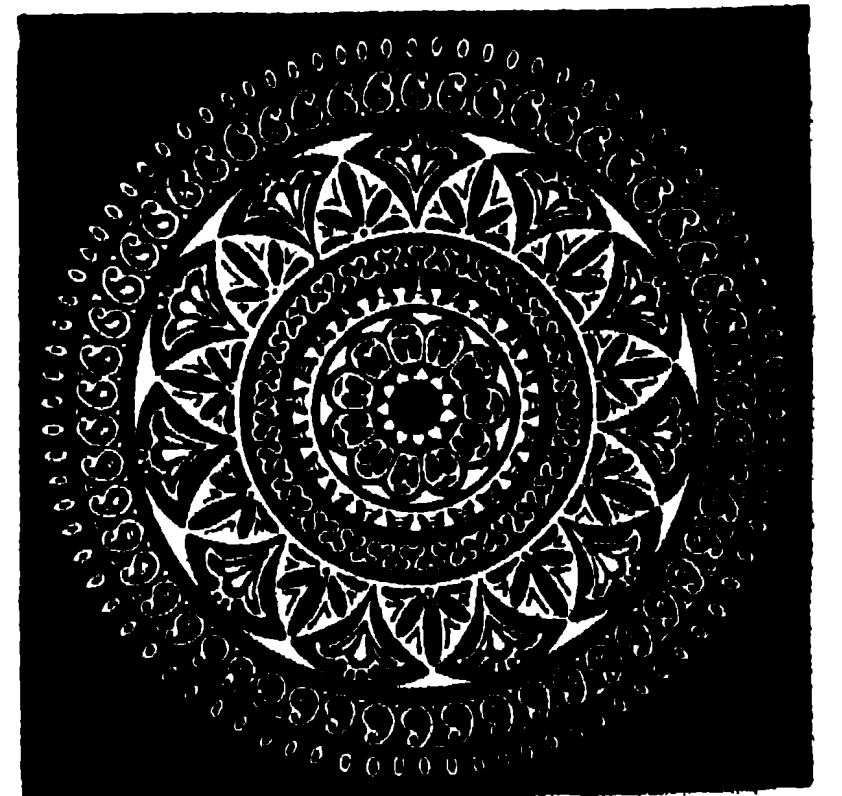
ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত
পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

প্রথম বর্ষ দশম সংখ্যা

১২ই অক্টোবর ১৯৬৯ : ২০শে আশ্বিন ১৮৯১

Vol. 1 : No 10 : October 12, 1969

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

প্রধান সম্পাদক
শরদিন্দু সান্যাল

সহ সম্পাদক
নীরদ মুখোপাধ্যায়

সহকারিণী (সম্পাদনা)
গায়ত্রী দেবী

সংবাদদাতা (কলিকাতা)
বিবেকানন্দ রায়

সংবাদদাতা (মাদ্রাজ)
এস. ভি. রাঘবন

সংবাদদাতা (দিল্লী)
পুষ্করনাথ কৌল

ফোটো অফিসার
টি. এস নাগরাজন

প্রচ্ছদপট
টি. এস. নাগরাজন

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০

টেলিগ্রাফের ঠিকানা—যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা।

ভুলি নাই

প্রকৃত নৈতিক মূল্যগুলি সুসমঞ্জস অর্থনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত তেমনি সত্য অর্থনীতি কখনও উচ্চতম নৈতিক মানগুলির বিরোধিতা করে না। যে অর্থনীতি কেবলমাত্র অর্থ সম্পদের পূজারী হয় এবং যে আর্থিক নীতি দুর্বলকে বঞ্চিত ক'রে বলবানকে সম্পদ সঞ্চয়ে সক্ষম ক'রে তোলে সেই অর্থনীতি অসত্য সেই বিজ্ঞান যুক্তি হীন। এর ফল মৃত্যু।

-মহাত্মা গান্ধী

এই সংখ্যায়

● **প্রচ্ছদ :** গান্ধী দর্শণীতে, পশ্চিমবঙ্গের মণ্ডপের একটি দৃশ্য। নোয়াখালীতে গান্ধীজী যে কুটীরে বাস করতেন, প্রাকৃতিক দৃশ্যসহ তারই নমুনা এখানে দেখানো হয়েছে।

ধনধান্যে-তে কেবল অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। প্রবন্ধাদি অনধিক পনের শত শব্দের হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট ও গোটা গোটা অক্ষরে লিখলে ভালো।

গান্ধীজীর পরম কথা

জন্মদিবস, জন্মবার্ষিকী বা জন্মশতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠান প্রায়ই আতিশয্যে ভরে ওঠে এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। এই রকম ক্ষেত্রে আমরা সাধারণতঃ অনুষ্ঠানগুলিকে প্রায় আড়ম্বরপূর্ণ ক'রে ফেলি। তবে কোন জাতি যখন তাদের জনকের স্মৃতি উৎসব পালন করে তখন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করাটা অসঙ্গত নয়। কিন্তু জাতির জনক যখন গান্ধীজীর মতো কোন মহামানব হন, যিনি সব রকম কৃত্রিমতা, আড়ম্বর বা বাহবার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, তখন সেই স্মৃতি অনুষ্ঠান, উৎসবের পরিবর্তে উৎসর্গ, আন্দোচ্ছ্বাসের পরিবর্তে স্মৃতিচারণের অনুষ্ঠান হওয়া উচিত।

গান্ধী জন্মশতবার্ষিকীর চরমক্ষণে আমরা তাই ভয়বিহ্বল হয়ে পড়েছি। আমরা এখন আর আমাদের জীবনে বা মনে তাঁর সেই কোমল ও সরল কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই না। তাঁর বাণী এখন আর আমাদের মন ও বিবেককে নাড়া দেয় না। আমরা তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী পালন করছি বটে, কিন্তু তাঁর বাণী আমরা যেন ভুলে গিয়েছি। নিজের জীবন ও কাজের মাধ্যমে তিনি যে আদর্শগুলিকে রূপায়িত ক'রে গেছেন আমরা যেন সেগুলি ভুলে গিয়েছি। তিনি আমাদের প্রেম ও সৌভ্রাতৃত্ব, অহিংসা ও আত্মত্যাগ শিখিয়ে গেছেন। কিন্তু সেই সব শিক্ষার প্রতি কোন রকম মর্যাদা না দিয়ে আমরা যেন পুরোপুরি হিংসার পথে এগিয়ে চলেছি। যে ভীতি প্রদর্শন এবং হিংসার পথকে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ধিকৃত ক'রে গেছেন, সেগুলিই যেন আমাদের জাতীয় প্রকৃতির অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। এমন কি সামান্য অভিযোগের প্রতিকারের জন্যও আমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে ভীতি-প্রদর্শনের উপায় গ্রহণ করি।

যতদিন হিংসা থাকবে এবং অভীষ্ট সিদ্ধির অন্যতম পন্থা হিসেবে তা ব্যবহৃত হবে ততদিন পর্যন্ত এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে সমাজের সর্বস্তরে শুধু বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করবে। এর ফলে জাতীয় উন্নয়নে অপুরণীয় ক্ষতি হবে।

যখন নিয়োগকারীর বিরুদ্ধে কর্মীরা, ছাত্রেরা অধ্যাপকের বিরুদ্ধে, একটি ভাষাভাষী অন্য ভাষাভাষী কিংবা একটি অঞ্চল অন্য অঞ্চলের বিরুদ্ধে এবং শেষ পর্যন্ত একটি সম্প্রদায় অন্য আর একটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মনোভাব নিয়ে সম্মুখীন হয়, তখন আর কোনও রাষ্ট্র, জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র থাকতে পারে না, সুসংহত এমন কি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রও থাকতে পারে না। এই রকম একটা অবস্থা ভারতের কোটি কোটি অধিবাসীকে, এক বিরাট সৌভ্রাতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ না ক'রে, তাঁদের পারস্পরিক ঘৃণা ও ভয়ের আবহাওয়ায় সদা সশঙ্ক জীবন যাপন করতে বাধ্য করবে।

যে কারখানাটি বন্ধ রাখা হয়, যে বাড়ীটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়, যে অঙ্গটি আহত হয় এবং যে প্রাণটি নষ্ট হয় তার প্রত্যেকটি শুধু জন্মভূমির বিরুদ্ধে এক একটি পাপ নয়, মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধেও সেগুলি মহাপাপ। বিভেদ সৃষ্টিকারী শক্তি যদি গান্ধীজীর শান্তি, প্রেম ও অহিংসার বাণী দিয়ে প্রতিহত করা না হয়, তাহলে সেগুলি এমন মনোমালিন্য ও উত্তেজনা সৃষ্টি করবে যা আমাদের রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক, ও অর্থনৈতিক ভিত্তিকেই ধ্বংস করবে। জ্ঞানকে বিচক্ষণতার সঙ্গে যুক্ত করার শক্তি ও ইচ্ছাই একটা জাতিকে মহৎ ক'রে তোলে। জ্ঞান ও বিচক্ষণতার পথ পরিত্যাগ করলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উচ্চ আদর্শ ক্ষুন্ন হবে।

মহৎ সংস্কৃতি বা মহান সমাজ যাদুমন্ত্রে একদিনের মধ্যেই গড়ে ওঠে না। মানব সমাজ যুগের পর যুগ ধরে, মহান নেতাদের আদর্শ অনুসরণ ক'রে একটা ঐতিহ্য গড়ে তোলে। ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে ভারতে বহু যুদ্ধ ও বিপ্লব ঘটেছে যার ফলে অনেক সময় প্রগতি রুদ্ধ হয়েছে। যে দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য দূর দুরান্তে স্থায়ী আসন ক'রে নিয়েছিল, কালের গতিতে সেই দেশই বিচ্ছিন্ন, আত্ম-সর্বস্ব হয়ে পড়ে। সামাজিক পাপ তাদের জীবন ধারাকে কলঙ্কিত এবং অনগ্রসরতা, অজ্ঞানতা ও দারিদ্র্য দেশের অধিবাসীদের হতশ্রী ক'রে তোলে। তাঁরা অনড়, অচল ও ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন।

দেশের এই রকম যখন অবস্থা, তখন যেন গান্ধীজীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সব বদলে গেল। তিনি জনগণের মনে একটা পরিবর্তন নিয়ে এলেন, নিজেদের শক্তি ও সততা সম্পর্কে তাদের সজাগ ক'রে তুললেন, তাদের আলো দেখালেন। তাদের শত শত বৎসরের নিষ্ক্রিয়তা ও অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে সক্রিয়তা ও জ্ঞানের পথে পরিচালিত করলেন, পশ্চাৎগতি থেকে প্রগতিতে, দাসত্ব থেকে স্বাধীনতার পথে নিয়ে গেলেন। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী তিনি যখন এক উন্মাদ হত্যাকারীর হাতে মৃত্যুবরণ করেন তখন ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে; রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রাথমিক প্রয়াস সফল হয়েছে। তাঁর স্বপ্নের রামরাজ্য, যেখানে মনুষ্যত্ব ও ন্যায়বিচারের স্থান সর্বোচ্চে, যেখানে দরিদ্রকে শোষণ ক'রে সমৃদ্ধি গড়ে ওঠে না, যেখানে হিন্দু ও মুসলমান, শিখ ও পার্সী, জৈন ও বৌদ্ধ, ইহুদী ও খৃষ্টান ভগবানের সন্তানের মত বাস করে, সেই রামরাজ্য তখনও অনেক দূরে। সেই স্বপ্নের দেশের অর্ধপথে, এই যাত্রার মধ্যপথে এবং গান্ধীজীর স্বপ্নকে সফল ক'রে তোলার পথে আমরা আমাদের পথ হারিয়ে ফেলেছি। আমরা অন্ধকার হাতড়ে আলো খুঁজে বেড়াচ্ছি অথচ সেই আলো আমাদেরই মধ্যে এখনও রয়েছে। মানুষের হৃদয়ে এই আলোর আবাস। সেই আলোর পথ উন্মুক্ত করলেই তা আমাদের বিবেক বুদ্ধির অন্ধকার স্থানগুলি আলোকিত ক'রে তুলবে। মানুষের মনের এই মুক্তি ও জাগরণই ছিল গান্ধীজীর সমগ্র জীবনের সাধনা আর সেই সাধনাই তাঁর পরমবাণী।

'অস্পৃশ্যতা পাপ ও পরিত্যাজ্য'—তার প্রতীক "মা"—শিল্পকৃতি গিরিশ ভাটের।

গান্ধী দর্শন

বিবরণ : হামীদুদ্দীন ম্যাহমুদ

চিত্র : টি. এস. নাগরাজন

একুশ বছর আগে, যেখানে একদিন গান্ধীজীর মরদেহ চিতানলে লীন হয়ে গিয়েছিল, তারই অদূরে তাঁর স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। একটু একটু ক'রে এক মহাজীবনের বিভিন্ন অধ্যায় মূর্ত করে তোলা হয়েছে। সে জীবন কর্ম, ধর্ম, দেশপ্রেম ও অবদানের এক 'আলপনা' যার নাম দেওয়া হয়েছে 'গান্ধীদর্শন'।

'গান্ধী দর্শন' শুধু একটি প্রদর্শনীমাত্র নয়। এই রূপায়ণ এত প্রাণবন্ত যে, তা যেন কৌতুহলী, অনুসন্ধিৎসু মানুষকে ভারতীয় ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়ের অঙ্গ ক'রে দেয়।

একুশ বছর আগে! জানুয়ারী মাসের এক বিষণ্ণ সন্ধ্যা! এই জায়গায় আমাদের চোখের সামনে থেকে সেদিন সমস্ত আলো মুছে গিয়েছিল। এই সেই জায়গা যার সন্নিকটে রাজঘাটের একান্তে ধীরে ধীরে রূপ পরিগ্রহ করেছে একটি মহৎ মানুষের জীবন দর্শন-বিশ্বমৈত্রী, প্রেম ও মমতা ময় সত্বা!

'গান্ধীদর্শনের' তোরণের সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরের দিকে তাকালে চোখে পড়বে বিভিন্ন স্থাপত্যধারা ও কারুশৈলীর অভিনব সন্নিবেশ যার প্রতি অংশ, কি এক অজ্ঞাত কারণে, গান্ধীজীর অনাড়ম্বরতার স্বাক্ষর বহন করছে। এক বিচিত্র তীর্থ পরিক্রমা!

প্রথম মণ্ডপটির নাম 'আমার জীবনই আমার বাণী।' মণ্ডপের প্রবেশপথে শিল্পী নন্দলাল বসুর আঁকা গান্ধী রেখাচিত্রের এক বিরাট অনুকৃতির পাশে প্রাচীরের গায়ে উৎকীর্ণ একটি চমৎকার ছবি, শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে গান্ধী প্রতিরোধ ও

প্রতিবাদের সোচ্চার প্রতীক। ঐ দেখতে দেখতে বারবার মনে জাগে উপনিষদের অমর বাণী—

'অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা
জ্যোতির্গময়
মৃত্যোঃ মা অমৃতংগময়।'

বাপুজীর আত্মজীবনী, তাঁর জীবন-স্মৃতিবাহী সহস্রাধিক আলোকচিত্র ও অন্যান্য সামগ্রী গান্ধী-দর্শনের উপজীব্য। মণ্ডপে গান্ধীজীর বাড়ী ও যারবেদা জেলে তাঁর সেলের অনুকৃতি সাজানো রয়েছে। বালু পাথরের প্যানেলে বিধৃত রয়েছে পল্লীভারতের পরিচিত দৃশ্যাবলী।

দ্বিতীয় মণ্ডপের নাম 'আমার স্বপ্নের ভারত'। প্রবেশ করতে হয় এক ছায়াচ্ছন্ন সুড়ঙ্গপথ দিয়ে। যেন যুগ যুগান্তের সঞ্চিত অজ্ঞানতা, পরাধীনতা, বেদনা ও নিঃস্বতা অতিক্রম ক'রে 'স্বপ্নের ভারতে' উত্তরণ। আলো আঁধারে ঘেরা এই সুড়ঙ্গপথের মধ্যেই দূর থেকে চোখে পড়ে আলোর ইশারা। এগিয়ে গেলাম আরও। ধীরে ধীরে চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠল একদিকে নবারুণ রাগে সিঞ্চিত হরিৎক্ষেত্র; যেন ভারতের, ভারতবাসীর আকাঙ্খার প্রেরণা। অন্যদিকে একটি কর্মঠ মানুষের একটি সবল বাহু, যেন ঐ আশা আকাঙ্খা পূর্তির নিশ্চিত আশ্বাস। আর একদিকে শিশুর মেলা—নবীন ভারতের ভবিষ্যৎ। ঐ মণ্ডপে বিভিন্ন রঙীন স্লাইডের মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে গ্রামের সাধারণ নরনারীর সুখ দুঃখের অংশীদার বাপুকে। দেখলাম কেমন ক'রে তিনি তাদের ভালভাবে বাঁচবার, ভালভাবে কাজ করবার শিক্ষা দিয়েছেন। শিখিয়েছেন ভয় ও হীনমন্যতাকে জয় করতে, সঞ্চার করেছেন আস্থা।

এরপর প্রবেশ করলাম শান্তিকাননে। এ যুগের প্রমত্ত বিক্ষুব্ধ জীবন প্রবাহের মধ্যে শান্তির আশ্বাস। স্থাপত্যের তিনটি অপূর্ব নিদর্শন সাজানো রয়েছে, যেন ডেকে বলছে এই হ'ল গান্ধীর কল্পনার শান্তিময়, শান্তিকামী ভারত—যে ভারতে ধর্ম হ'ল প্রেম, কর্ম হ'ল পূজা, জীবন হ'ল আশা। এইগুলির ঠিক মাঝখানে একটি প্রস্তর বেদী দুচোখের শ্রান্তি অপনোদন করে। শত শত আলোকচিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ভারতের শাশ্বত সত্তা-বৈচিত্র্যের
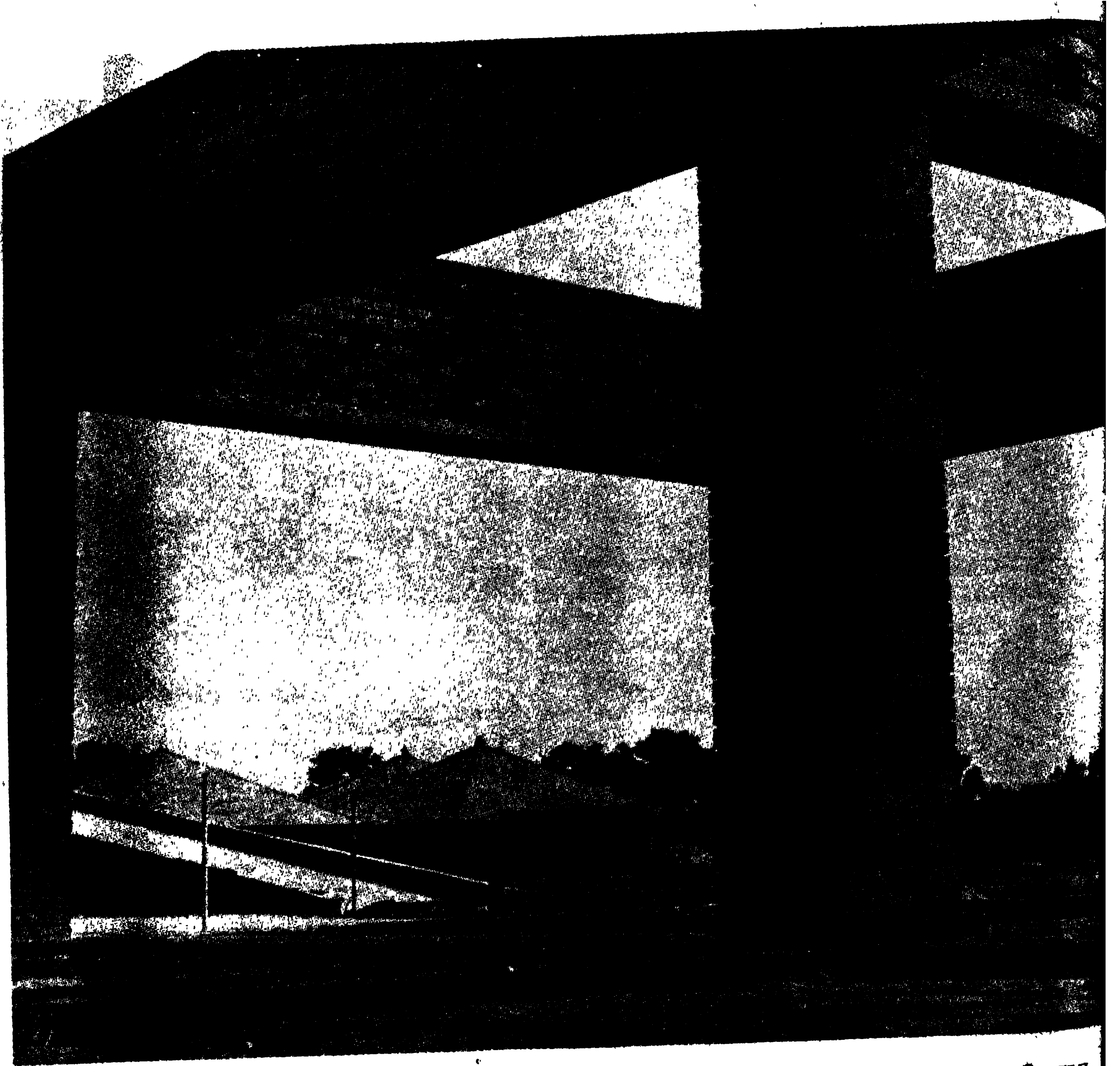
মাঝে ঐক্য। তারই সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে দেওয়াল ও ছাদে বিভিন্ন প্যানেলে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে গান্ধীজীর কল্পনার নবীন ভারতের ছবি।

এখান থেকে গেলাম ছোট্ট প্রেক্ষাগৃহে যেখানে মহাত্মার জীবন ও আদর্শের আধারে তৈরি একটি নাতিদীর্ঘ ছবি বিরতিহীনভাবে দেখানো হচ্ছে। গান্ধীজীর জীবন ও স্বপ্ন সম্বন্ধে দুটি মণ্ডপের যা কিছু দ্রষ্টব্য যেন সুসংহত রূপে প্রকাশিত এই চলচ্চিত্রটিতে। এরপর এসে দাঁড়ালাম পরের

নার্মাড কোনহ্ এর পরিকল্পিত মণ্ডপ 'গান্ধীজীর গঠন কর্মসূচীব' উন্মুক্ত অংশের মধ্যে দিয়ে অদূরে দেখা যাচ্ছে আর একটি মণ্ডপ 'আমার জীবন-ই আমার বাণী'—শিল্প রচয়িতা হচ্ছেন ডি. বি. সেন রাজা পোরেদি।

মণ্ডপে যেখানে গান্ধীজীর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় তুলে ধরা হয়েছে। সত্যাগ্রহ যে শুধু একটা আদর্শবাদ বা নীতি নয় এক কর্মপ্রণালী, তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে সত্যাগ্রহের সময়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিস, বিভিন্ন ঘটনা ও দৃশ্যের রূপ পরিকল্পনায় ও প্রখ্যাত সত্যাগ্রহীদের প্লাস্টার প্রতিমূর্তিতে। টেপ রেকর্ডারে নিরন্তর ধ্বনিত বিভিন্ন ভাষায় রচিত সত্যাগ্রহের গান এক অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি করছে। দেশের খ্যাতনামা শিল্পীদের দিয়ে তৈরি ৩০টি মিউর‍্যালে গান্ধী জীবনে রাজনীতির এই জটিল তত্ত্ব, তার অন্তর্নিহিত আদর্শ ও তার বিপুল প্রভাব দেখানো হয়েছে।

নৈরাশ্যের প্রান্তঃসীমায় নিজেদের

সত্তার অস্তিত্ব হারাবার ভয়ে মুমূর্ষু মানুষের ভাগ্য সম্বন্ধে গান্ধীজীর অপরিসীম উদ্বেগ তাঁর বিশ্বপ্রেমের বাণীতে, সর্ব ধর্মালম্বীকে আত্মীয়তার আলিঙ্গনে আবদ্ধ করায় ও বিশ্ব সৌভ্রাত্বে আস্থার মধ্যে প্রতিফলিত। এই কথাটি স্মরণ ক'রে প্রবেশ করলাম পরের মণ্ডপে 'মানুষ ও মানুষের প্রতি গান্ধীজীর আস্থা'। সুনির্বাচিত সঙ্গীত ও ইঙ্গিতবহ শব্দতরঙ্গের সঙ্গে মিউর‍্যাল, স্থাপত্য ও আলোকচিত্রের মাধ্যমে এ যুগের নানাবিধ উৎকট বৈষম্য বাস্তব ক'রে তোলা হয়েছে। যেমন, অনিশ্চয়তার মুখে বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত মানুষের জীবন ছবি। সেখানে সামরিক-বাদ, জাতিবিদ্বেষ, ধর্মীয় অসহনীয়তা ও আদর্শগত সংঘাত মানুষকে বিব্রত, বিড়ম্বিত ক'রে তুলেছে। কোথাও দেখলাম বিধ্বস্ত ধূলিসাৎ এক শহরের ধ্বংসাবশেষ, কোথাও নির্মম যুদ্ধের নিষ্পাপ বলি একটি শিশুর মৃত গলিত শব, কোথাও বা শবদেহের ওপর উপবিষ্ট ভোজনতৃপ্ত শকুন, আবার কোথাও বা নিরবচ্ছিন্ন গুলী বর্ষণ থেকে শিশু সন্তানের প্রাণ রক্ষায় ব্যাকুল বিহ্বল এক জননীর ছবি। এই নিষ্ঠুর, নিদারুণ, যন্ত্রণা, উৎপীড়ন ও বেদনার ছবির মধ্যে গান্ধী জীবন যেন আশা ও আস্থার আলোক শিখা। মানুষের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতা ও উন্মত্ততার ঊর্ধে শুনলাম গান্ধীর উদাত্ত কণ্ঠস্বর 'মৃত্যুর মাঝে অন্তর্নিহিত আছে জীবন, অন্ধকারের বুকে আলো আছে প্রচ্ছন্ন ও অসত্যকে অতিক্রম ক'রে প্রতিভাত হয় সত্য।'

গান্ধীজীর এই প্রেমের বাণীতে আপ্লুত-মন নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম শান্তি ও সৌভ্রাত্বের প্রতীক একটি শ্বেত চন্দ্রাতপের ছায়ায়। এই মণ্ডপটির পরিচয় 'সমগ্র বিশ্ব আমার পরিবার'। মণ্ডপের পূর্ণ আয়তন ১৫000 বর্গফুট। সমগ্র মণ্ডপটি আচ্ছাদন ক'রে আছে ঐ আয়তনের একটি অখণ্ড চন্দ্রাতপ, খাদির তৈরি। ৬৪টি জায়গায় টেপ রেকর্ডে বিধৃত গান্ধী-কণ্ঠস্বর যেন পলকের মধ্যে ২১ বছরের ব্যবধান অপসারিত করল। এক জায়গায় কানে এল গান্ধীজীর অস্ফুট কণ্ঠ, 'আমি দরিদ্র ভিখারী। আমার সম্বল বলতে ছ'টি চরকা, জেলেতে যে থালাবাটিতে খেতাম সেই কটি বাসন, এক পাত্র ছাগলের দুধ, নিজের হাতে তৈরি ছ'টি কৌপীন ও

ঐতিহাসিক ডাণ্ডী যাত্রার সময় গান্ধীজী এই নৌকাটিতে ক'রে ১৯৩০ সালে মাহী নদী পার হন।

গামছা আর আমার সুনাম যার মূল্যও নগণ্য।'

আর এক জায়গায় কানে এল তাঁর অকম্পিত ঘোষণা 'জীবনের অন্তিম মুহূর্তে আমার কোনোও আততায়ীর বিরুদ্ধে আমার রসনা যদি ক্রোধ বা ঘৃণার একটি শব্দও উচ্চারণ করে তাহলে আমায় প্রবঞ্চক ঘোষণা করলে আমার বলার কিছু থাকবে না।' আততায়ীর গুলীতে ধূলি-লুণ্ঠিত হবার কতকাল আগে সত্যদ্রষ্টা ঐ অমোঘ উক্তি করেছিলেন।

এর সঙ্গে শুনলাম অন্যান্যদের কণ্ঠে গান্ধীবার্তা। ফটো, খবর কাগজের কাটিং, কার্টুন, বই এবং বাপুজীর লেখা ও তাঁকে লেখা অসংখ্য চিঠির মধ্যে দিয়ে দেখতে পেলাম বিশ্ববাসী কী চোখে তাঁকে দেখেছেন, তিনি বিশ্বকে কোন চোখে দেখেছেন।

এর পরের মণ্ডপে দেখলাম দেশের জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে গান্ধীজীর প্রভাব। মহাত্মা গান্ধীর 'গঠনমূলক কার্যসূচীর' উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত এই মণ্ডপে

(১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

'আমার জীবনই আমার বাণী' মণ্ডপের বহিরাংশ। বিঠলভাই জাভেরীর আঁকা ছবির আধারে গোলাপী বেলে পাথরে উৎকীর্ণ রিলিফ—শিল্পী-সোমনাথের স্থপতি সোমপুরা।

গান্ধী শতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় সংহতি সম্পর্কে গত ২রা অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় ইংরাজীতে যে বেতার ভাষণ দেন, তার অনুবাদ দেওয়া হল।

আজ ভারতবর্ষে এবং সারা পৃথিবীতে এ যুগের অন্যতম বিপ্লবী চিন্তানায়ক এবং একাধারে বাস্তববাদী ও আদর্শবাদী জন-নায়ক মহাত্মা গান্ধীর জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছে। গান্ধীজী আজীবন মানব প্রকৃতিতে বড় রকমের পরিবর্তন আনার জন্য চেষ্টা ক'রে গেছেন এবং সত্য, প্রেম ও আত্মনিগ্রহের মাধ্যমে ভারতীয় জন সমাজকে নতুন পথের ইঙ্গিত দেবার সাধনা ক'রে গেছেন। শুধু নেতিবাচক অর্থে নয়, অস্তিবাচক অর্থে তিনি সহিষ্ণুতার নূতন ঐতিহ্য স্থাপন ক'রে গেছেন। তাঁর প্রবর্তিত সহিষ্ণুতার পিছনে উদাসীনতার কোন অবকাশ ছিল না, ছিল বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তি।

সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে মহত্ব সুপ্ত থাকে, মানুষ যা হ'তে পারে তারই মধ্যে তার মহত্ব নিহিত। জীবনের সৃষ্টিশীল প্রকাশে প্রতিটি নর নারীরই বিশেষ ভূমিকা আছে এবং বিবর্তনমূলক অগ্রগতির পথে সেই ভূমিকার বিশেষ গুরুত্ব আছে। আজ দেশের নরনারীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এই ভাষণে আমি এই কথাই বলতে চাই যে, নূতন ভারতবর্ষ গড়ে তোলায় এবং এক জাতি এক প্রাণ ও একতার ভাবধারা প্রচারে আপনাদেয় প্রত্যেকের বিশেষ ভূমিকা আছে।

কোন কোন সময় আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেও একথা অনস্বীকার্য যে ভারতবর্ষে পূর্বাপর একটি গভীর মৌলিক ঐক্য বিদ্যমান আছে। ভাষা, বর্ণ, ধর্ম, সংস্কৃতির যত বিভেদই থাক সকল কিছুর উর্ধে এই ঐক্যবোধ সুপ্রতিষ্ঠিত। ব্যবধানের মধ্যে ঐক্যের সূত্র উদ্ভাবনে ভারতীয় মনন চরম উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছে। বিভিন্ন জাতির, বহু ধর্মের নানা শ্রেণীর মানুষ বারবার দলে দলে ভারতবর্ষে এসেছে এবং তাঁদের সকলকে ঐক্যসূত্রে বাঁধা ভারতের ঐতিহাসিক দায়িত্বরূপে দেখা দিয়েছে। তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য বিনষ্ট ক'রে কৃত্রিম উপায়ে এই ঐক্য গড়ে তোলা হয়নি, সকলের সম্মিলিত সদিচ্ছায় সর্বজন গ্রাহ্য এই ঐক্য গড়ে উঠেছে। ভারতে সকল ধর্মমত সমান স্বীকৃতি পেয়েছে, সমাজের সকল স্তরে গুণের বিকাশকে মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে—এই খানেই ভারতের মহত্ব। এইভাবে আমরা বরাবর বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সাধনা ক'রে এসেছি।

আসুন, একবার আমরা নিজেদের ইতিহাসের দিকে তাকাই। যখন আমরা ঐক্যবদ্ধ থেকেছি তখন মহান জাতি হিসাবে আমাদের মর্যাদাও অক্ষুন্ন থেকেছে। যখনই জাতীয় জীবনে অনৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে তখনই আমাদের অবক্ষয় ও পতন ঘটেছে। যখন আমরা পরমত সহিষ্ণু ও অপরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন থেকেছি তখন আমাদের জাতীয় জীবনে নানাবিধ উন্নতি হয়েছে। আজ ভারতবর্ষ গণতন্ত্র ও সমাজবাদ প্রতিষ্ঠায় সঙ্কল্পবদ্ধ। এর অর্থ হ'ল এই যে, আমরা সমস্ত মানুষকে সমান অধিকার দিতে চাই। অথচ দুঃখের বিষয় এই যে আমরা সময় সময় এখানে ওখানে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও দ্বন্দ্ব, বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা এবং ভাষাগত বিরোধের বিশ্রী লক্ষণ দেখতে পাই। বলা বাহুল্য, এই সবই আমাদের অর্থনৈতিক এবং ভাবগত সংহতির পরিপন্থী। ভারতের ক্ষেত্রে জাতীয় সংহতির প্রশ্ন জাতীয় অস্তিত্বের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। আজ সারা পৃথিবীর দৃষ্টি যেভাবে আমাদের ওপর নিবদ্ধ অতীতে সেরকম কোন দিন ছিল না। আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের পরিবর্তন ঘটাতে পারি কিনা, দারিদ্র্য, যন্ত্রণা, ঘৃণা, ভয়, হতাশা ও অবিশ্বাসের পঙ্ক থেকে জন সমাজকে উদ্ধার ক'রে, জাতীয় জীবনে শান্তি, প্রগতি ও সমৃদ্ধির সৃষ্টি করতে পারি কি না সারা পৃথিবী আজ সে-কথা জানতে সমুৎসুক। মহাত্মা গান্ধীর জন্মভূমি, আমাদের এই দেশে, চরিত্রবল, গুণগত উৎকর্ষ এবং ন্যায়বোধের মাধ্যমে আমরা সত্য, সহিষ্ণুতা ও প্রেমের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারি কিনা, গোটা পৃথিবীর জন সমাজ সে কথা জানতে আগ্রহী।

সাম্প্রদায়িক প্রবনতা, বর্ণবৈষম্য, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত অনৈক্য দূর ক'রে এবং জন মানসে দেশপ্রেম ভিত্তিক জাতীয় অনুভূতি, সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবোধ ও সকল মানুষের সাধারণ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পারস্পরিক বোঝাপড়ার সৃষ্টি ক'রে জাতীয় সংহতি গড়ে তোলা সম্ভব। আমরা কি অতীতের বিদ্বেষ, ও মূঢ়তা মনে রেখে ভবিষ্যতের সকল আশা বিনষ্ট ক'রে দেব, কিংবা, আমাদের বর্তমানের ভূমিকা ও ভবিষ্যতের লক্ষ্য ঠিকভাবে বুঝে ও গ্রহণ ক'রে তদনুযায়ী কাজ ক'রে যাব। এর যথাযথ উত্তর নির্ণয়ের ওপর আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। ঋগ্বেদের শেষ শ্লোকে এর উত্তর মিলতে পারে :

সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্ সংবোমনাংসি জানতাম্
সমানি ব আকুতিঃ
সমানা হৃদয়ানি বঃ
সমানম্ অস্তু বো মনঃ
যথা বঃ সুসহাসতি

জয়হিন্দ

অর্থনীতি, উৎপাদন ও উন্নয়নের বিশেষক্ষেত্রগুলি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনা গান্ধী ভাবনারই প্রতিফলন

সর্বোদয়ের পথে

শ্রীমান নারায়ণ
গুজরাটের রাজ্যপাল

গান্ধীজীর দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রবাদ

বর্তমানে বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিভিন্ন গোষ্ঠী নানা অর্থে সমাজতন্ত্রবাদ শব্দটি প্রয়োগ করেন। ভারতে এই আদর্শবাদ সম্বন্ধে গান্ধীজীর চিন্তাধারা কি ছিল তা এই অবকাশে বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

গান্ধীজী নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলতেন এমন কি কখনও কখনও নিজেকে কমিউনিস্ট বলতেও দ্বিধা করতেন না। কিন্তু তাঁর সমাজতন্ত্রবাদে হিংসা, বিদ্বেষ ও শ্রেণী সংঘাতের স্থান ছিল না এ কথা তিনি স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন সমাজতন্ত্রবাদ হ'ল নিখুঁত স্বচ্ছ স্ফটিকের মত, যা উপলব্ধি করার উপায়ও নিখুঁত, স্বচ্ছ ও সহজ হওয়া প্রয়োজন। যে কোনোও সৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় সৎ হওয়া অপরিহার্য, এ কথার উপর তিনি বার বার জোর দিতেন। যে কোনোও উদ্দেশ্যসিদ্ধির পন্থা নিখাদ ও সৎ হওয়ার অপরিহার্যতা আমাদের আজ বিশেষ করে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। কারণ আজকের দিনে ভারতের জনজীবনে সত্য ও অহিংসার একান্ত অভাব মনকে পীড়িত করে। অতএব বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে অন্যায় থেকে মুক্ত করতে হবে এবং সেটা যত শীঘ্র সম্ভব করা উচিত।

সর্বপ্রকার ভোগ্যপণ্য ব্যবসায় বিকেন্দ্রীকৃত হওয়ার বাঞ্ছনীয়তা বিশেষ ক'রে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, পল্লী ও কুটীর শিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্র সৃষ্টি ক'রে লক্ষ লক্ষ নরনারীর কর্ম সংস্থান করার প্রয়োজনীয়তার তিনি ঘোর সমর্থক ছিলেন। কারণ তাহলে যাঁরা কাজ কর্মের অভাবে নিষ্ক্রিয় জীবন যাপনে বাধ্য হন তাঁরা নিষ্ফলা শক্তি ও সামর্থ্য ও সময়ের সৎ প্রয়োগ করতে পারতেন।

তিনি চাইতেন গ্রামের মানুষগুলি অন্ন বস্ত্র ও জীবন ধারণের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল হ'ক। তবে তিনি বলতেন যে জাতীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি ভারী শিল্পগুলি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত, সে সব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত নয়। অর্থাৎ গান্ধীজী গুরুত্বপূর্ণ আর্থনীতিক কর্মক্ষেত্রগুলি ও বৃহৎ শিল্পগুলির জাতীয়করণ সমর্থন করলেও সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শক্তির সর্বাধিক বিকেন্দ্রীকরণ সমর্থন করতেন। অতএব ব্যাঙ্ক সমেত অন্যান্য সংস্থার রাষ্ট্রীয়করণ ব্যবস্থাটিকে কমিউনিস্ট ব্যবস্থা বলে চিহ্নিত করা সমীচীন নয়। সার্বিক রাষ্ট্রীয়করণ অবশ্য উচিত নয় ও তার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু নির্দিষ্ট ও নির্বাচিত কয়েকটি ক্ষেত্রের পরিচালন ব্যবস্থা গান্ধী ভাবধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল এবং এ বিষয়ে আমাদের অযথা উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়।

তা ছাড়া আর একটা বিষয় নিঃসংশয়ে বোঝা উচিত যে, ভারতে সমাজতন্ত্রবাদ কখনও কমিউনিজম-এর সমার্থক গণ্য হতে পারে না। গান্ধীজী যে অহিংস সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী ছিলেন তাই হ'ল সর্বোদয়। তিনি এই আদর্শবাদকে অহিংস কমিউনিজম বলেও অভিহিত করতেন কিন্তু সেই সঙ্গে বার বার জোরের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সহিংস কার্যকলাপের নিন্দা করেছেন। মহাত্মাজীর অনুগামীদের অন্যতম আচার্য বিনোবা ভাবে যে ভূদান আন্দোলনের সূত্রপাত করেছেন তা গান্ধী-ভাবধারারই সোচ্চার রূপায়ণ। কারণ এর ভিত্তি হ'ল সহযোগিতা, সমঝোতা ও সম্প্রীতি। এই নীতি গচ্ছিত রক্ষা করার মনোভাব নিয়ে শহরাঞ্চলে সমবায় আন্দোলন প্রবর্তনে সার্থক হতে পারে।

এটা স্পষ্ট বোঝা দরকার যে সমাজতন্ত্রবাদের অর্থ ব্যক্তিগত উদ্যোগে অবাধ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার নয়। এমন কি যুক্তরাষ্ট্রের মত পুঁজিবাদী দেশেও অবাধ বাণিজ্য নীতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ভূমিকা চরম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক নিষেধবিধি এবং বাছা বাছা কয়েকটি ক্ষেত্র রাষ্ট্রাধীনে আসা অবশ্যম্ভাবী এবং সে কথাটা পূর্বাহ্নেই স্বীকার করে নেওয়া উচিত। কল্যাণকামী রাষ্ট্র বা উদার গণতন্ত্রী কোনোও রাষ্ট্রে বিশ্বাসী কোনোও আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য শোষণের হাত থেকে ব্যক্তি বিশেষদের রক্ষা করার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না।

মধ্যপন্থা

এই দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হয় ভারতীয় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি এবং সরকারের মধ্যে বর্তমানে যে সংঘাতের সম্পর্ক রয়েছে তার রূপান্তর ঘটানো প্রয়োজন, একটা সুস্থ

সহযোগিতা ও সমঝোতার মনোভাব গড়ে তোলা দরকার। ভারত সরকার মিশ্র অর্থনীতির পথ অনুসরণ করছেন এবং আশা করি ভবিষ্যতেও করবেন—এটিকে মধ্যপন্থা বলে গণ্য করা যেতে পারে। এই নীতি কমিউনিজম-এর চরম পর্যায় ও অবাধ ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যের যোগ সেতু।

মানুষের প্রকৃতিগত সততায় বিশ্বাসী ছিলেন বলে প্রত্যেক মানুষকে আত্ম জিজ্ঞাসার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের পথে আত্ম সংস্কারের সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন।

তিনি 'স্বত্ব' ও দখলদারী মনোভাবকে সব সময়ে পৃথক গণ্য করেছেন। তাই তিনি চেয়েছিলেন দেশের ব্যবসায়ী শিল্প পতিরা দখল করার মনোভাব বর্জন করে নিজেদের সম্পদকে জনসাধারণের 'গচ্ছিত' স্থানে ব্যবহার করুন। পক্ষান্তরে এর জন্য বিধি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন নি কারণ সে বিধি প্রণয়ন করবে গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত বিধান মণ্ডলী বা সংসদ। তবে যে কোনোও সংস্কারমূলক ব্যবস্থাকে বিধির মর্যাদা দেবার পূর্বে তার স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলা প্রয়োজন।

এখানে মনে পড়ছে যে, অছি হিসেবে গচ্ছিত রক্ষা করার নীতির একটা খসড়া গান্ধীজী অনুমোদন করেছিলেন। ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় আগা খাঁ প্রাসাদে গান্ধীজী দীর্ঘকালের জন্য আটক। সংশোধিত খসড়ায় বলা হয়েছিল।

১। জনসম্পত্তির অছি হবার অর্থ হ'ল বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় রূপায়িত করা। কারণ সে সমাজ ব্যবস্থায় পুঁজিবাদের স্থান নেই এবং সেই ব্যবস্থায় বর্তমানের মালিক শ্রেণীকে আত্ম সংস্কারের সুযোগ দেওয়া সম্ভব। প্রকৃতিগতভাবে মানুষ সংশোধনের বাইরে নয়—এই নীতিই হ'ল নতুন সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি।

২। সমাজের কল্যাণে, প্রয়োজন হলে অনুমোদন করা হলেও এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা অধিকার স্বীকার করা হয় না।

৩। এই ব্যবস্থায় বিধি বলে মালিকানা ও সম্পদ ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করার অবকাশ আছে।

৪। অতএব রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অছি ব্যবস্থায় কোনোও ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে সমাজের কল্যাণ উপেক্ষা করে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নিজের সম্পদ ব্যবহারের স্বাধীনতা ভোগের অধিকার নেই।

৫। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ন্যায্য মজুরী বা বেতন যেমন নির্ধারন করা উচিত, সমাজের যে কোনোও ব্যক্তির সর্বাধিক আয়ের পরিমাণও ধার্য করা উচিত। ন্যূনতম ও সর্বাধিক আয়ের ব্যবধান ন্যায্য, সঙ্গত ও সামঞ্জস্যশীল মাত্রায় নির্দিষ্ট করা আবশ্যক এবং সেই মাত্রার পরিমাপ নির্ধারণ সময়ান্তরে পরিবর্তন সাপেক্ষ হওয়া সঙ্গত যাতে আয়ের বৈষম্য ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হবার পথ খোলা থাকে।

৬। গান্ধীবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, উৎপাদনের বস্তু ও মাত্রা সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল হওয়া উচিত, ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল বা লোভের সঙ্গে তার কোনোও যোগসূত্র অবাঞ্ছিত।

সেই দিনের পর ২৫ বছর কেটে গেছে, এই বছর আমরা গান্ধী শতবার্ষিকী পালন করছি। সুতরাং ভারতীয় ব্যবসায়ী সমাজের জন্য গান্ধীজীর ঐ শেষ নির্দেশগুলি নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ আজ প্রয়োজন বলে গণ্য করি। গান্ধীজীর চিন্তাধারা বাস্তবানুগ নয় বলে মনে করলেও আমি স্থিরভাবে বিশ্বাস করি, যে বর্তমান যুগের পরিবেশ ও বাস্তবতার স্বার্থে গান্ধীজীর এই নীতির কিছু কিছু রদবদল করে তা প্রয়োগ করা যেতে পারে। এ কথা বরাবরের জন্য স্বীকার করে নিতে হবে যে সর্ব আকার ও প্রকারের পুঁজিবাদ ও অবাধ বাণিজ্যের ব্যক্তি স্বাধীনতা কালোপযোগী নয় এবং আমাদের সামাজিক ধারা ও অর্থনৈতিক রীতিনীতির আমূল পরিবর্তন দরকার। কিন্তু এই পরিবর্তন আনতে হবে আলোচনা বোঝাপড়া, শিক্ষণ ও সংখ্যা গরিষ্ঠ জনমতের সাহায্যে। শ্রেণী সংঘাত, পারস্পরিক বিদ্বেষ ও রক্ত ক্ষয়ের হিংস্র পন্থা গ্রহণ করলে মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে এবং সমগ্র দেশ জুড়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।

অর্থনীতি বিশেষ করে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রেও গান্ধীজী নৈতিক ও আদর্শগত মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিতেন। তিনি আশা করতেন যে, প্রত্যেক ব্যবসায়ী দক্ষতা ও সততার সঙ্গে সমাজের সেবা করবেন। নৈতিকতা ও ব্যবসায়িক সততার মনোভাব নিয়ে কাজ করলে সমাজ জীবনেও জনসেবাকে মর্যাদা ও সম্মানের আসনে বসাবার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব। এই প্রসঙ্গে সুখের সঙ্গে উল্লেখ করছি যে, বোম্বাইএ কয়েকজন প্রগতিশীল ব্যবসায়ী ন্যায্য ও সৎ ব্যবসায়িক ধারা প্রবর্তনে আগ্রহী হয়েছে এবং আশা করি যে, অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও এই পথ অনুসরণ করবেন ও এই মনোভাবে উৎসাহ দেবেন। কিন্তু এটি আরও বড় একটা লক্ষ্যসিদ্ধির একটা সোপান মাত্র আর সেই লক্ষ্য হ'ল গান্ধী উপলব্ধি। গচ্ছিত সম্পদের অছি হবার মনোভাবের ভিত্তিতে একটা অহিংস সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, যার আর এক নাম সর্বোদয়।

জীবন ধারণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির উৎপাদনের উপায় যদি জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণে থাকে তাহলে আমি মনে করি যে ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের জন্য একটা আদর্শ অর্থ নৈতিক সংগঠন গড়ে উঠবে। ভগবানের দেওয়া আলো, বাতাস যেমন সকলেই ভোগ করতে পারেন, এগুলিও তেমনি সকলের বিনা বাধায় পাওয়া উচিত। অন্যকে শোষণ করার জন্য এগুলি ব্যবহার করা উচিত নয়। এগুলির ওপর কোন দেশ, জাতি বা গোষ্ঠীর এক চেটিয়া অধিকার থাকা অন্যায় ও অযৌক্তিক।

—গান্ধী

সত্য বনাম সত্যাগ্রহ

জে. বি. কৃপালনী

"বল প্রয়োগে কোনও ব্যক্তি বা সমাজকে অহিংসায় দীক্ষিত করা সম্ভব নয়" —গান্ধী

গান্ধীজী প্রায়ই বলতেন যে বিশ্বকে দেওয়ার মতো তাঁর কাছে নতুন কিছু নেই। তাঁর, নিজস্ব কোন সম্প্রদায় গঠনের ইচ্ছা ছিল না। তাঁর নিজের কোন শিষ্য সম্প্রদায় ছিল না। সত্য এবং অহিংসা সম্পর্কে তিনি বলতেন যে এগুলি 'পর্বতের মতোই প্রাচীন।' তাহলে বিশ্বের চিন্তাধারায় এবং বিশ্ব সমস্যাগুলির সমাধান হিসেবে তাঁর বিশেষ অবদান কি ছিল?

সত্য এবং অহিংসা পর্বতের মতোই প্রাচীন এ কথা ঠিক। পয়গম্বর এবং ধর্ম সংস্কারকগণই শুধু সত্যবাদী ছিলেন না। লক্ষ লক্ষ সাধারণ লোকও সত্যবাদী। প্রকৃতপক্ষে বেশ কিছু সত্যের প্রলেপ না থাকলে অসত্যও জগতে স্থান পেতো না। সকলেই যদি মিথ্যাশ্রয়ী হতেন তাহলে পারস্পরিক সব রকম যোগাযোগই বন্ধ হয়ে যেতো। তাহলে কেউই কারুর কথা বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু যেহেতু মানুষ আশা করে যে, যাদের সঙ্গে সে কাজকর্ম করছে তারা তাদের কথা রাখবে, সেইজন্যই তার পক্ষে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়। এই রকম ভাবেই বিশ্বের সব রকম ব্যাপার চলছে এবং চলবেও।

এটা সকলেই জানেন যে জীবনের সবক্ষেত্রেই বহু শঠতা আছে। বিশেষ করে ব্যবসার জগতে এটা বেশী আছে। তবে এ কথাও সত্য যে কোন ব্যবসায়ী যখন অন্য ব্যবসায়ীকে কথা দেয় সে কথার সাধারণতঃ খেলাপ হয় না। তা না হলে ব্যবসার আদান প্রদানই সম্ভবপর হতো না। লক্ষ লক্ষ টাকা, পাউণ্ড, ডলার ইত্যাদির ব্যবসা কেবলমাত্র মুখের কথাতেই অনেক সময়ে নিষ্পন্ন হয়।

আন্তর্জাতিক কূটনীতির মতো কপটতা আর কিছুতে নেই। বলা হয় যে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হলে জাতিগুলি সেই সব চুক্তিকে ছেঁড়া কাগজ বলে মনে করে। তা সত্বেও প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন ধরণের সন্ধিপত্র ও চুক্তি বার বার স্বাক্ষরিত হচ্ছে। একটা চুক্তি ভঙ্গ হলে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে আর একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হচ্ছে। তা না হলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে কোন রকম যোগাযোগ রাখাই সম্ভবপর হতো না।

এই রকম পরিস্থিতিতে তাহলে গান্ধীজীর বিশেষ অবদান কি? সেটা হ'ল— সত্যকে সত্যাগ্রহে পরিণত করা এবং সত্যকে সত্যের প্রতি আগ্রহে পরিণত করা। অসত্য, অন্যায় ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য একে একটা অস্ত্রে পরিণত করা হয়েছিল। একে সক্রিয়, শক্তিশালী ও সংক্রামক তৈরি করা হয়েছিল। এখনও লক্ষ লক্ষ লোক সত্যাশ্রয়ী। কিন্তু তাঁরা কি অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন? আমরা জানি যে লক্ষ লক্ষ সত্যবাদী আছেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে খুব অল্প লোকই আছেন যাঁরা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজেদের আরাম, আয়েস এমন কি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে রাজি আছেন। তাঁরা যদি কেবলমাত্র সত্যাশ্রয়ী হন তাহলে তাঁরা সত্যবাদী, সত্যাগ্রহী নন। সত্যাগ্রহের জন্য তারা যে কোন কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। তাঁরা শুধু সত্যের সেবক কিন্তু তাঁরা সৈন্য নন। তাঁরা যখনই সত্যের জন্য সংগ্রাম করেছেন, তা করেছেন অসত্যের মাধ্যমে। দুটো অসত্য কি কোন যাদুর কাঠির স্পর্শে সত্যে পরিণত হতে পারে? গান্ধীজীর চিন্তাধারা অনুযায়ী সত্যের অনুসরণকারীকে, সত্যের প্রতিষ্ঠাকারী যোদ্ধা হতে হবে এবং অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার একটি মাত্র অস্ত্র আছে আর তা হ'ল সত্য। এতে সত্যের সঙ্গে সত্য যুক্ত হবে, অসত্যের সঙ্গে অসত্য নয়।

গান্ধীজীর অহিংসা সম্পর্কেও এই কথাই খাটে। সাধারণ কাজকর্মে খুব কম লোকই হিংসার আশ্রয় নেন। তাঁরা শান্তিতেই জীবন কাটান। তাঁরা প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব কমই মারামারি করেন এবং অশান্তির কারণ ঘটলেও তা প্রধানতঃ বাক্ যুদ্ধই হয়। তাঁদের যদি সব সময়েই প্রতিবেশীদের সঙ্গে মারামারি করতে হত, তাহলে কোন প্রতিবেশীই অবশিষ্ট থাকতো না। গান্ধীজীর সংজ্ঞা অনুযায়ী এই সব লক্ষ লক্ষ লোক সবাই কি অহিংস? নিশ্চয়ই নয়, তাহলে তাঁদের এই অহিংসার মধ্যে কিসের অভাব রয়েছে। আমার মতে এঁদের মধ্যে প্রতিরোধের অভাব। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন কেবলমাত্র ভদ্র ছিল না। এটা ছিল ভদ্রভাবে আইন অমান্য আন্দোলন।

তাহলে গান্ধীজী আবার অহিংস প্রতিরোধের কথা চিন্তা করলেন কেন? কারণ বিশ্বের বর্তমান ধারা অনুযায়ী একটি হত্যার বদলে সাধারণ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আর একটি হত্যা করা হয়। এর অর্থ হ'ল যাঁরা দ্বিতীয় হত্যার মত দিলেন, তাঁরাও এক দিক দিয়ে সেই হত্যার অস্ত্র হলেন। সাধারণের মত যদি দ্বিতীয় হত্যার বিরোধী হত তাহলে সেই হত্যা এড়ানো যেত। এতে পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায় হিংসা দিয়ে হিংসার উচ্ছেদ সম্ভব নয়। যীশু খৃষ্ট বহু পূর্বে বলেছিলেন 'শয়তান দিয়ে শয়তানের উচ্ছেদ সম্ভব নয়।'

তাহলে হিংসার উচ্ছেদ করার উপায় কি? অহিংসা দিয়ে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে, হিংসা দিয়ে নয়। অহিংসা দিয়ে প্রতিদিনই হিংসার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা হচ্ছে কিন্তু গান্ধীজী তার অহিংস প্রতিরোধকারীর কাছ থেকে যে অহিংস সংগ্রাম চাইতেন এটা তা নয়। ন্যায়ের আহ্বান যখন আসে আমরা তখন বিনয়ী প্রতিরোধকারী না হয়ে শুধুমাত্র বিনয়ী হই।

আন্তর্জাতিকতাবাদী গান্ধীজী

জি. এল. মেহতা

প্রায় ৫০ বছর পূর্বে গান্ধীজী এক সময়ে বলেছিলেন যে, 'আমার কাছে স্বদেশপ্রেম আর বিশ্বপ্রেম একই জিনিস। ভারতের সেবার মাধ্যমে আমি বিশ্ব মানবের সেবা করার চেষ্টা করছি।' এই কথাগুলি-তেই সমগ্র বিশ্ব সম্পর্কে গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন পাওয়া যায়—অর্থাৎ তা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ছিল না—তাঁর লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র মানবসেবা। তাঁর কাছে 'মানবতা' এবং 'মানব সমাজ' কেবলমাত্র কথার কথা ছিল না, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের সেবা করাই ছিল তার আদর্শ।

তিনি বিশ্বের সমস্ত মানুষকেই এক পরিবারভুক্ত মনে করতেন। সব মানুষই সমান—তিনিও তাদেরই একজন এই কথা তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। মানুষের মর্যাদা ক্ষুন্ন হতে দেখলেই তাঁর আত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠতো—যেমন তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার জাতি ও বর্ণভেদ প্রথার বিরুদ্ধে অথবা তাঁর নিজের দেশেই যেমন তিনি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ফিনিক্স, সবরমতী এবং সেবাগ্রামে তাঁর আশ্রমগুলি ছোট খাটো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

গান্ধীজী যখন জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সুরু করেন ও তার নেতৃত্ব করেন তখন ভারত মুক্ত ও স্বাধীন ছিল না। কাজেই ভারতীয় জনসাধারণ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কার্যকরী কোন অবদান যোগাতে পারেনি। সে যাই হোক, আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে সে সম্পর্কে অর্ধ শতাব্দি পূর্বেও গান্ধীজীর নিজস্ব কতকগুলি আদর্শ ছিল।

১৯২৫ সালে তিনি 'ইয়ং ইণ্ডিয়াতে' লেখেন যে 'জাতীয়তাবাদী না হলে কারুর পক্ষে আন্তর্জাতিকতাবাদী হওয়া অসম্ভব। জাতীয়তাবাদী হলেই আন্তর্জাতিকতাবাদী হওয়া সম্ভব অর্থাৎ জনগণ যখন নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ করে সম্পূর্ণ একতার সঙ্গে কাজ করতে পারে তখনই আন্তর্জাতিকতাবাদী হতে পারে।' তিনি মনে করতেন যে জাতীয়তাবাদ অপরাধ নয়। সংকীর্ণতা, স্বার্থবাদিতা এবং বিচ্ছিন্নতাব মনোভাবই আধুনিক জাতিগুলির মারাত্মক অপরাধ। তিনি চাইতেন না যে স্বাধীনতা অর্জন করার পর ভারত অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলুক। ১৯২৫ সালে তিনি লেখেন যে 'বিশ্বে মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্য একার স্বাধীনতা নয়, সেটা হল স্বেচ্ছামূলক পারস্পরিক অধীনতা। প্রকৃতপক্ষে এই উদ্দেশ্য নিয়েই রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠিত হয়। সভ্য পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার উপায় হ'ল আপস মীমাংসা ও সালিশী, হত্যা এবং ধ্বংসের উপায়ে নয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদের প্রতি আনুগত্য এবং আন্তর্জাতিক ন্যায় আদালতের রায় অকুণ্ঠিত চিত্তে মেনে নেওয়া, শান্তির প্রতি আগ্রহশীলতার সুস্পষ্ট প্রমাণ।'

অন্য কথায় বলতে গেলে শক্তি প্রয়োগের বিরুদ্ধে ন্যায়নীতি, হিংসার বিরুদ্ধে যুক্তি এবং ধর্মোন্মত্ততার বিরুদ্ধে পারস্পরিক শুভবুদ্ধি হিসেবে যে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হ'ক না কেন সেগুলির সঙ্গে গান্ধীজীর আদর্শের মিল রয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, যাদুমন্ত্রে বা সহজ কোন সূত্রে শান্তি অর্জন করা যায় না। ধৈর্য ও চেষ্টার, আপস মীমাংসা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে, জটিল ও স্বৈরতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক সমাজগুলিকে, শান্তির উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ করে শান্তি স্থাপন করা যেতে পারে।

গান্ধীজী মনে করতেন যে স্বাধীন ভারত নিজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এবং সাফল্য দেখিয়ে বিশ্বের জাতিগুলির মধ্যে একটা নৈতিক শুভবুদ্ধির সৃষ্টি করতে পারবে। ১৯২৪ সালে তিনি লিখেছিলেন যে, 'ভারতের প্রচেষ্টার আন্তর্জাতিক ব্যাপারগুলি একটা নৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হোক এই আমার আকাঙ্খা।' তিনি মনে করতেন যে রাষ্ট্রের তৈরি সীমান্ত অতিক্রম করে প্রতিবেশীর সেবা করায় কোন বাধা নেই বা তার সীমাও নেই। তিনি বলতেন 'ভগবান এই সব সীমান্ত তৈরি করেন নি।' কিন্তু হায়, ভারত উপ-মহাদেশেই স্বাধীনতা অর্জনের মূল্য স্বরূপ মানুষ আরও একটি সীমান্ত তৈরি করে নিয়েছে। মানব সমাজের উচ্চাকাঙ্খা, ঘৃণা এবং বিরোধ উচ্চ আদর্শগুলির পর্যন্ত কদর্থ করে। গান্ধীজী অবশ্য বলতেন যে, কোন একজন ব্যক্তি যেমন তার পরিবারের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করে এবং তার গ্রাম, জেলা, প্রদেশ এবং দেশের প্রতি তার আনুগত্য থাকে, 'তেমনি একটি দেশেরও স্বাধীনতা থাকা উচিত যাতে প্রয়োজন হলে বিশ্বের কল্যাণে সে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে।' তাঁর স্বদেশপ্রেমে বা তাঁর জাতীয়তাবাদে স্বার্থের স্থান ছিল না বা কোন জাতি বিদ্বেষ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তাঁর দৃষ্টি ছিল স্বাধীনতার চাইতেও উচ্চতর বিষয়ের দিকে। ভারতের মুক্তির মাধ্যমে তিনি বিশ্বের তথাকথিত দুর্বলতর জাতিগুলিকে, পাশ্চাত্যের শোষণ ও পেষণ থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। বলা যেতে পারে যে তাঁর এই আকাঙ্খা খানিকটা পূর্ণ হয়েছে। কারণ ভারত শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি ও পারস্পরিক শুভেচ্ছার ভিত্তিতে স্বাধীনতা অর্জন করায়, এশিয়া ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশের পক্ষে তা উৎসাহের সৃষ্টি করে।

অতি মূল্যবান অবদান

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গান্ধীজীর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অবদান হ'ল—অহিংস প্রতিরোধের বা অহিংস অসহযোগিতার পদ্ধতি। বিভিন্ন সময়ে আফ্রিকায় যে পদ্ধতিকে তিনি 'সত্যাগ্রহ' বা 'নিষ্ক্রীয় প্রতিরোধ' বলে বর্ণনা করেছেন অথবা ভারতে যে পদ্ধতিকে তিনি 'অসহযোগিতা' এবং 'আইন অমান্য' বলে বর্ণনা করেছেন, সেগুলিই একটা নীতি হিসেবে জাতীয় ভিত্তিতে এবং পরাধীন দেশ ও তার বিদেশী শাসকগণের মধ্যে সম্পর্কের সমস্যাগুলি সমাধানের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম প্রযুক্ত হয়।

(২০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

শিল্পোন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা

আর. ভেঙ্কটরমন
সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন

১৯৬৯ সালের ১০ই এবং ১১ই সেপ্টেম্বর, লেখক রাইট অনারেবল ভি. এস. শ্রীনিবাস শাস্ত্রী স্মৃতি বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত সার এখানে দেওয়া হল। স্মৃতি বক্তৃতার আয়োজন করে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক ভি. এস. শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ছিলেন বর্তমান শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এবং জনসেবাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তিনি ছিলেন একজন মহান সমাজ সংস্কারক এবং সার্ভেন্টস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটির প্রাণ। ইংরেজী ভাষার ওপর তাঁর দখল এবং বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতা উচ্চতম প্রশংসা অর্জন করে। সর্বোপরি তিনি ছিলেন এক নির্ভীক রাজনীতিক এবং আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে তিনি দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক উন্নতির জন্য জীবনব্যাপী সংগ্রাম চালিয়ে যান। দেশমাতার এই মহান সন্তানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা এবং তাঁকে স্মরণ করা আমাদের কর্তব্য।

স্বাধীনতা অর্জন করার কিছুদিন পরেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর করার অন্যতম উপায় হিসেবে আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করি তারপর থেকে আমরা তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং তার পর তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করেছি। কাজেই পরিকল্পনা সম্পর্কে এখন আমাদের ১৮ বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে শিল্পোন্নয়নে পরিকল্পনা কতখানি সাহায্য করেছে, দেশের উন্নয়নে কী ভূমিকা গ্রহণ করেছে অথবা ভবিষ্যতে করবে তা আমরা হিসেব করে দেখতে পারি।

পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে কোন কর্মসূচীতে শিল্পায়ণ একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। শিল্পায়ণ এবং আর্থিক উন্নয়ন পরস্পরের সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত যে, কোনও জাতির আর্থিক প্রগতি, প্রায়ই, কৃষি অর্থনীতিকে শিল্প অর্থনীতিতে পরিণত করার সাফল্যের মাত্রা দিয়ে পরিমাপ করা হয়। উৎপাদনের ক্ষমতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি হ'ল জাতীয় সম্পদ ও সমৃদ্ধির মাপকাঠি আর শিল্পায়ণ হ'ল আয় বৃদ্ধির, কর্মসংস্থানের, সম্পদ ও সমৃদ্ধির চাবিকাঠি।

প্রথম পরিকল্পনার সূচনাকালেই শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রেরও যে অংশ গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে এটা স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং মৌলিক ও প্রয়োজনীয় শিল্পগুলি সরকারি তরফে রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রীয়করণের কথাও তখনই চিন্তা করা হয়। তখনই বোঝা গিয়েছিল যে, সর্বাধিক উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণ করতে হলে এতো বিপুল কাজ করতে হবে যে সরকারী ও বেসরকারী উভয় তরফকেই এর জন্য চেষ্টা করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে একটা মিশ্র অর্থনীতি গ্রহণ করা হয় এবং সম ব্যবহারের ভিত্তিতে সরকারী ও বেসরকারী তরফ যাতে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়। কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প, বাণিজ্য ও নির্মাণসহ সুসংগঠিত শিল্পগুলিতেও যে ব্যক্তিগত চেষ্টা ও উৎসাহের প্রয়োজন আছে এবং তা থাকা বাঞ্ছনীয়, তাও স্বীকৃত হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুরুতে, ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে, শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব ঘোষণা করে মিশ্র অর্থনীতির রূপ দেওয়া হয়। এই প্রস্তাবই এখনও পর্যন্ত শিল্পনীতির কাঠামো হিসেবে কার্যকরী রয়েছে। নতুন নতুন ক্ষেত্রে কাজ সুরু করা এবং দেশের মৌলিক শিল্প কাঠামোকে শক্তিশালী করে দেশের আর্থিক উন্নয়নের ভিত্তি তৈরি করাই হ'ল ঐ প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য।

শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইনে, বেসরকারী তরফের শিল্পগুলির উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা রয়েছে। পরিকল্পিত অর্থনীতিতে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কারণ দুষ্প্রাপ্য সম্পদগুলি বাঞ্ছনীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্যই এই নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

যে পরিমাণ জিনিস বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয় তার মূল্য রপ্তানী দিয়ে পরিশোধ করা সম্ভব নয় বলে, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বৈদেশিক বিনিময়মুদ্রা বরাদ্দ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। কোন জিনিসের সরবরাহে ঘাটতি হলে বা ঘাটতি চলতে থাকলে সমাজের দুর্বল অংশ যাতে অসুবিধায় না পড়ে সেই জন্যই মূল্য ও বন্টন নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। ব্যবসায়ী বা উৎপাদকরা যাতে অযৌক্তিক লাভ না করতে পারেন সেটাও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার অন্য উদ্দেশ্য। এই সব

শ্রীভেঙ্কটরমন বলেছেন যে, তিনি যে সব অভিমত প্রকাশ করেছেন, সেগুলি হ'ল শিল্প ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা প্রসূত এবং তাতে পরিকল্পনা কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন নাও পাওয়া যেতে পারে।

নিয়ন্ত্রণ মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করে দেখা হয় এবং এগুলির প্রয়োজন অনুভূত না হলে তুলে নেওয়া হয়।

প্রথম পরিকল্পনার সুরুতে, দেশে চিরাচরিত কৃষি ও পল্লী শিল্পগুলির ওপর নির্ভর করেই বেশীর ভাগ লোক তাঁদের জীবিকা অর্জন করতেন। তুলা, পাট এবং আখের মতো কয়েকটি কৃষিভিত্তিক শিল্প ছাড়া দেশে আধুনিক শিল্প ছিল না বললেই হয়। শিল্পে উৎপাদিত প্রায় সব জিনিসই এমন কি নিত্য ব্যবহার্য অনেক জিনিসও আমদানী করতে হত।

দেশে মেসিন তৈরি করার শিল্প প্রায় ছিল না বলা যায়। শিল্পোন্নয়নের অন্যতম প্রধান উপাদান, ইস্পাতের উৎপাদনও ১০ লক্ষ টনের বেশী ছিল না।

গত ১৮ বছরের পরিকল্পনার ফলে দেশের অর্থনীতি তার চিরাচরিত জড়ত্ব থেকে উদ্ধার পেয়েছে। নগ্নীন চাষ এবং জাতীয় আয় ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৬৭-৬৮ সাল পর্যন্ত শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ বেড়েছে অর্থাৎ ৯,৬৫০ কোটি টাকা থেকে ১৭,৩০০ কোটি টাকা হয়েছে। ১৯৬৮-৬৯ সালে জাতীয় আয় আনুমানিক শতকরা আরও তিন ভাগ বেড়েছে।

তিনটি পরিকল্পনাকালে শিল্পোৎপাদন প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। এই প্রথমবার শিল্পে কতকগুলি অতি আধুনিক জিনিস উৎপাদন করার ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে কেবলমাত্র নিত্যব্যবহার্য সব রকম জিনিসই তৈরি হচ্ছে না উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসপত্র ও যন্ত্রপাতিও তৈরি হচ্ছে। ইস্পাত, মিশ্র ইস্পাত, লৌহ বর্জিত ধাতু, পেট্রোলিয়ামজাত সামগ্রী, নির্মাণ সামগ্রী, ওষুধপত্র, ভারি রাসায়নিক দ্রব্যাদির মতো মূল উপাদানগুলি সম্পর্কে আমাদের আমদানীর ওপর নির্ভরতা অনেকখানি কমেছে। কারণ মূলধনী সামগ্রী উৎপ্রাদনের ক্ষেত্রেও আমরা যথেষ্ট অগ্রগতি করেছি। পরিবহন, বিদ্যুৎশক্তি, সেচ, শিল্প ও খনিজ দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে যে উন্নতি হয়েছে তাতে আমরা এখন মূলধনী সাজ সরঞ্জামের জন্য দেশের উৎপাদনের ওপরেই অনেকখানি নির্ভর করতে পারি। ভূপাল, হরিদ্বার এবং রামচন্দ্রপুরমের ভারি বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জাম তৈরির কারখানাগুলি এবং বেসরকারী কারখানাগুলি মিলিতভাবে, বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন, সরবরাহ ও বন্টনের জন্য প্রয়োজনীয় বেশীর ভাগ সাজ সরঞ্জাম সরবরাহ করতে সক্ষম। বর্তমানে দেশেই রেলের ইঞ্জিন, ওয়াগন, ট্রাক, মোটর গাড়ী, জাহাজ ও এরোপ্লেন তৈরি হচ্ছে। বস্ত্র, সিমেন্ট এবং অন্যান্য চিরাচরিত শিল্প থেকে সুরু করে ইস্পাত ও রাসায়নিক সার তৈরির কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম দেশেই পাওয়া যাচ্ছে। শিল্প ক্ষেত্রে মোট উৎপাদন বৃদ্ধির চাইতেও বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠা অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছে।

এই সমস্ত সাফল্য ছাড়াও অন্য কতকগুলি ক্ষেত্রে, এই সময়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। প্রাচীন রীতিনীতিগুলি ভঙ্গ করতেও আমরা খানিকটা সক্ষম হয়েছি, জনসাধারণের একটা বড় অংশকে উন্নয়ন প্রয়াসের অংশীদার করতে সক্ষম হয়েছি। এই ক্ষেত্রে সব চাইতে বড় সাফল্য হল, দেশের কৃষকরা চিরাচরিত পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক কৃষি পদ্ধতি গ্রহণে ক্রমেই বেশী উৎসাহিত হচ্ছেন। প্রয়োজনীয় সার, উন্নততর বীজ ও কীট নাশক সরবরাহ করেই নয়, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আয় বৃদ্ধির জন্য আধুনিক কৃষি পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করার ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন হার শতকরা ৫ ভাগ বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে।

শিল্পের ক্ষেত্রেও মনোভাবের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শিল্প প্রয়াস যদিও বড় বড় কতকগুলি ব্যবসায়ী পরিবারের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তবুও নতুন এক উদ্যোক্তা শ্রেণী যে গড়ে উঠছে সে কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে যে উন্নয়ন হয়েছে তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্যোক্তাগণই এগুলির বেশীর ভাগের মালিক। কয়েক বছর পূর্বেও এঁরা হয়তো এই ধরনের উৎপাদন প্রচেষ্টায় হাত দিতে সাহস করতেন না। শিল্পগুলির পরিচালন ব্যবস্থা এখন অনেক সুষ্ঠু হয়েছে এবং পারিবারিক মালিকানা কমে আসছে। অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক কারিগরী জ্ঞান প্রযুক্ত হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী কাজ হচ্ছে। শিল্প সম্পর্কিত গবেষণা এবং পরামর্শ ব্যবস্থা অনেক বেশী সম্প্রসারিত হয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে এখন অল্প ব্যয়ে ভালো জিনিস তৈরি হচ্ছে। এর প্রমাণ হিসেবে বলা যায় যে, আধুনিক পদ্ধতিতে তৈরি অনেক রকম শিল্প সামগ্রী, বর্তমানে আমরা উন্নত দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রী করছি।

শিল্পনীতির প্রধান লক্ষ্যগুলির মধ্যে কয়েকটি হ'ল, বিভিন্ন রকমের শিল্প প্রতিষ্ঠা করা, আঞ্চলিক অসাম্য দূর করার জন্য বিভিন্ন স্থানে শিল্প গড়ে তোলা এবং ক্ষুদ্র শিল্পগুলির যথাযথ উন্নতি বিধান করা। এই লক্ষ্যগুলি পূরণ করার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত লাইসেন্স ব্যবস্থাটি অন্যতম প্রধান উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা যে শিল্পের কাঠামোর মধ্যে বৈচিত্র্য আনতে এবং নতুন নতুন ক্ষেত্রে অর্থ লগ্নী করতে সাহায্য করেছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। স্বাধীনতা লাভ করার সময়ে শিল্প প্রয়াস ছিল অতি সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ এবং শিল্প ক্ষেত্রে বহু অসামঞ্জস্য ছিল।

রাজ্যগুলিতে যে সব ক্ষুদ্রায়তন শিল্প রেজেষ্ট্রি করা হয়েছে, সেই তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে, ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে এগুলির সংখ্যা প্রায় ৩৫০০০ থেকে বেড়ে এক লক্ষেরও বেশী হয়, এবং ১৯৬৮ সালে এগুলির সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩১৪২২। বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থা অবলম্বন করায় এই উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।

যে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উন্নয়নের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে সেগুলির জন্য একটা সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অন্য কথায় বলতে গেলে, এই সব শিল্পের জন্য কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়তে দেওয়া হয় না অথবা পাছে ক্ষুদ্র শিল্পগুলির বিকাশে বিঘ্ন ঘটে তাই বড় শিল্পগুলিকে এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। লাইসেন্সের মাধ্যমে এই নীতি সাধারণতঃ কার্যকরী করা হয়। এ ছাড়া, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রী কেনার সময়ে মূল্যে সুবিধা দিয়ে, অর্থসাহায্য এবং কারিগরী পরামর্শ দিয়ে, বাজার জাত করা সম্পর্কে সাহায্য করে এগুলিকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করা হয়। কয়েক ধরনের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা এতোখানি বেড়েছে যে, সেগুলি কোন রকম সংরক্ষণ ছাড়াই এখন নিজেদের পায়ে

ভর দিয়ে দাঁড়াতে সক্ষম।

আঞ্চলিক শিল্পোন্নয়নের প্রয়াসের দিকে লক্ষ্য করলে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে পরিকল্পনাকালে যদিও বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্পগুলিকে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা কিছুটা সফল হয়েছে তবুও অবস্থাটা মোটেই সন্তোষজনক নয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, শিল্পোন্নয়নে রাজ্য সরকারগুলিরও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বিভিন্ন রাজ্য সরকার যদি সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেন তাহলেই তাঁরা তাঁদের রাজ্যে শিল্প গড়ে তুলতে পারেন। নানা রকমের সুবিধে যেমন বিদ্যুৎশক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ভূমি ও জল সরবরাহ করে, রাজ্যের অর্থ ও শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশনের মাধ্যমে অর্থ সাহায্য দিয়ে, বাধা নিষেধ দূর করে, লালফিতের জটিলতা হ্রাস করে রাজ্য সরকারগুলি তাঁদের এলাকায় শিল্প স্থাপনে উৎসাহ দিতে পারেন।

আংশিক ব্যর্থতার কারণ

আমাদের সাফল্য বেশ উল্লেখযোগ্য হলেও কিছু বিফলতাও রয়েছে। এখানে আমি কয়েকটি প্রধান ব্যর্থতার কথাই শুধু উল্লেখ করবো।

বেসরকারী লগ্নীর ক্ষেত্রে জটিল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে, দুর্বলতর সংস্থাগুলির পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত সুসংগঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিই পরোক্ষভাবে বেশী সুবিধে পেয়েছে বলে মনে হয়। লক্ষণ দেখে মনে হয় যে, সম্পদ বিকেন্দ্রীকৃত না হয়ে প্রকৃতপক্ষে তার উল্টোটাই হয়েছে। এমন কি মনে হয় কৃষিজাত আয়ের ক্ষেত্রেও, সমৃদ্ধ এবং ধনী কৃষকরাই সরকারী সাহায্য ও বিভিন্ন সরকারী ব্যবস্থা থেকে বেশী উপকৃত হয়েছেন। ছোট কৃষক এবং ভূমিহীন কৃষকরা তাঁদের অবস্থা ভাল করতে পারেন নি বলে মনে হয়। কাজেই পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য আয় ও সম্পদে বৈষম্য হ্রাস এবং অর্থনৈতিক শক্তির আরও সুষম বন্টন পূর্ণ হয়নি।

প্রস্তাব করা হয়েছে যে, যে সব শিল্প ইতিমধ্যেই যথেষ্ট উন্নতি করেছে, সেই রকম বড় বড় শিল্প সংস্থাগুলিকে আর সম্প্রসারণের অনুমতি দেওয়া হবে না, এই ক্ষেত্রগুলি প্রধানত: নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য রাখা হবে। ছোট কৃষক, ভূমিহীন কৃষক এবং নতুন উদ্যোক্তাদের সাহায্য করার জন্য চতুর্থ পরিকল্পনার কতকগুলি নীতিগত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

শিল্পের জন্য লাইসেন্সদান ব্যবস্থা এবং আমদানীর ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ শিল্প ব্যবস্থায় খানিকটা ওলোট পালোটের জন্য দায়ী। পরিকল্পনাগুলিতে পূর্ব থেকে যে সব লক্ষ্য স্থির করে দেওয়া হয় সেই অনুযায়ী লাইসেন্স দেওয়া হয়। এদিকে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তোলা হয়নি যাতে তার দ্বারা দেশের আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী এই সব লক্ষ্যের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখা যায়। ফলে কতকগুলি ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অধিক ক্ষমতা সৃষ্ট হয়েছে আবার কতকগুলিতে প্রয়োজন পূরণের উপযোগী ক্ষমতা সৃষ্ট হয়নি। এই সমস্ত ব্যাপারের ফলে দুষ্প্রাপ্য সম্পদগুলির সুষম বন্টন হয়নি। কাজেই শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা যাতে বাড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্পজাত সামগ্রীর উৎপাদন ব্যয়ও যাতে প্রতিযোগিতামূলক হয় সেই রকমভাবে এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে।

বাজারের প্রয়োজন অনুযায়ী যাতে শিল্পোন্নয়ন হয় সেইজন্য চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়ায়, বেসরকারী তরফের শিল্পগুলিকে তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে খানিকটা স্বাধীনতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মূলধনী সাজ সরঞ্জাম অথবা কাঁচা মাল বা যন্ত্রাংশ আমদানী করার ব্যাপারে যেখানে যথেষ্ট বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা সংশ্লিষ্ট সেই রকম ক্ষেত্রে ছাড়া শিল্পের লাইসেন্স দেওয়ার প্রয়োজন থাকা উচিত নয়। তবে কতকগুলি ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে বড় শিল্পগুলির অসম প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সেগুলির ক্ষেত্রে লাইসেন্স ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

গত কয়েক বছরে আমাদের যে আর্থিক উন্নয়ন হয়েছে, তার মূলে রয়েছে বেশ যথেষ্ট পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য। ১৯৬৮-৬৯ সালের শেষ পর্যন্ত আনুমানিক মোট ৮,৫০০ কোটি টাকা সাহায্য হিসেবে পাওয়া গেছে।

বৈদেশিক সাহায্য একেবারে সম্পূর্ণ আশীর্বাদ হিসেবে আসেনি। এখন দেখছি যে, রপ্তানী থেকে আমরা যে আয় করি তা দিয়ে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের একটা বড় রকমের দায় বহন করতে হচ্ছে।

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক ঋণের সুদ হিসেবে মোট আনুমানিক ২,২৮০ কোটি টাকা দিতে হবে। চতুর্থ পরিকল্পনায় রপ্তানী থেকে আমাদের আনুমানিক আয় ৮,৩০০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। কাজেই রপ্তানী থেকে আমাদের যে আয় হবে তার প্রায় এক তৃতীয়াংশ, কেবলমাত্র ঋণের সুদ ইত্যাদি দেওয়ার জন্যই আলাদা করে রাখতে হবে। এখন প্রকৃতপক্ষে দেশের আর্থিক ব্যবস্থা সচল রাখার জন্যও নতুন বৈদেশিক ঋণের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। সুতরাং বৈদেশিক ঋণ সম্পর্কে আমাদের নীতি সংশোধন করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। যাতে চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ নাগাদ বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ মোটামুটি অর্ধেকে কমিয়ে আনা যায় এবং পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে মোটামুটি কোন সাহায্যই যাতে না নিতে হয় সেই রকম ভাবেই চতুর্থ পরিকল্পনাটি তৈরি করা হয়েছে।

সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতা রোধ করা এবং আয়ের বৈষম্য হ্রাস করা পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য। জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিতে সরকারী তরফের সংস্থাগুলির সর্বাধিক প্রয়াসী হওয়া উচিত। এগুলিতে বিপুল পরিমাণ সরকারী অর্থ লগ্নী করা হয়েছে। অতএব এই অর্থ উপযুক্তভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে কিনা এবং সংস্থাগুলির কাজ দক্ষতার সঙ্গে চলছে কিনা তা দেখাও সংসদের একটা দায়িত্ব। তবে সংসদের কাছে দায়ী থাকলেও তা যেন এগুলির পরিচালনা ব্যবস্থা দুর্বল বা উৎসাহ স্তিমিত করে না দেয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে।

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাস করা সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। যে সব ক্ষেত্রে দেশের বিশেষজ্ঞরাই প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট সেই সব ক্ষেত্রে যাতে বৈদেশিক সাহায্য না নেওয়া হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। জাতীয় গবেষণাগার এবং অন্যান্য গবেষণাগারে

বর্তমানে যথেষ্ট কাজ হচ্ছে। গবেষণায় উদ্ভাবিত যে সব জিনিসের ব্যবসায়িক মূল্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে, সেই রকম ক্ষেত্রে বৈদেশিক সহযোগিতা না চেয়ে আমাদের দেশীয় উদ্ভাবনকেই উৎসাহিত করা উচিত। ঠিক তেমনিভাবে আমাদের ডিজাইন ও ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থাগুলিকে যথাসম্ভব বেশী সংখ্যায় পরামর্শদাতা হিসেবে নিযুক্ত করা উচিত।

এখন আমাদের আর্থিক ব্যবস্থা অনেক বেশী সম্প্রসারণশীল। অন্যান্য উন্নত দেশে যেমন সরকারী প্রচেষ্টা ছাড়াই অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটে আমরা যদি আমাদের আর্থিক ব্যবস্থাকে সেই পর্যায়ে না নিয়ে যেতে পারি তাহলে আমাদের আবার পিছিয়ে পড়তে হবে এমন কি ইতিমধ্যে আমরা উন্নয়নের যে স্তরে পেঁৗছেছি সেটাও আমরা রক্ষা করতে পারবো কিনা তাতে সন্দেহ রয়েছে।

শিল্পগুলি যাতে জায়গা বিশেষে কেন্দ্রীভূত না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম সুযোগ সুবিধের ব্যবস্থা করতে পারলে অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে শিল্প প্রতিষ্ঠান আকর্ষণ বাড়বে।

শিল্পগুলিকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া এবং অর্থনৈতিক বিকাশ যাতে অঞ্চল বিশেষে কেন্দ্রীভূত হতে না পারে তার জন্য আধুনিক ক্ষুদ্রায়তন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিতে সাধারণতঃ বেশী শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। কাজেই এগুলিতে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও বেশী থাকে এবং এই দিকটা বিবেচনা করে দেখার মতো। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে মূলধনের প্রয়োজনও অপেক্ষাকৃত কম। কাজেই চতুর্থ পরিকল্পনায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়নের ওপরেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেগুলির উৎপাদন ক্ষমতা বেশী সেই সব আধুনিক ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ওপরেই জোর দেওয়া হবে।

সরকারী ক্ষেত্রে শিল্পোদ্যোগ

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় থেকেই সরকারী তরফে সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলিতে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ৮০টিরও বেশী শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং এগুলিতে লগ্নীর পরিমাণ প্রায় ৩৫০০০ কোটি টাকা। সরকারী তরফের কাজে দক্ষতার অভাব, কাজেই এগুলির সংখ্যা আর বাড়ানো উচিত নয় এই বলে সরকারী তরফের সমালোচনা করা হয়। কিন্তু এগুলির ক্ষেত্রে কর্মকুশলতা একেবারে খারাপ নয়। সরকারী তরফের কতকগুলি প্রকল্প থেকে বেশ ভাল আয় হচ্ছে। ১৯৬৭-৬৮ সালে ৩১টি সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ৪৮ কোটি টাকারও বেশী আয় হয়েছে। অবশ্য হিন্দুস্তান স্টীল লিমিটেড, হেভি ইঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশন, ভারত হেভি ইলেক্ট্রিক্যালস, হেভি ইলেক্ট্রিক্যালস অব ইণ্ডিয়া এবং মাইনিং এ্যাণ্ড এ্যালায়েড মেসিনারি কর্পোরেশন এই প্রতিষ্ঠানগুলিতেই, প্রধানত ক্ষতি হয়েছে।

এই শিল্পগুলিতে একদিকে যেমন মূলধন লেগেছে বেশী অন্যদিকে তেমনি এগুলি থেকে ফল পেতেও দেরী আছে। যখনই সরকারী তরফের কথা উল্লেখ করা হয় তখন মোট লগ্নীর পরিমাণ এক সঙ্গে ধরা হয়। অনেক প্রকল্প এখনও নির্মাণের স্তরে রয়েছে এবং সেগুলি থেকে কোন রকম আয় হতে পারে না। নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে হলে, অর্থনীতির দিক থেকে এগুলির বিচার করতে হবে, ব্যবসাগত দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করা উচিত নয়।

বেসরকারী তরফে যে সব সময়েই আয় হয় তাও ঠিক নয়। ১৯৬৮ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর, শিল্পে, অর্থসাহায্যকারী কর্পোরেশন-এর বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশনে সভাপতি যে ভাষণ দেন তাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আমার মতে কোনও শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কোন তরফের, তার ওপর সেটির লাভ ক্ষতি নির্ভর করে না, যোগ্য পরিচালনা এবং সুষ্ঠু নীতির ওপরই তা নির্ভর করে। আমাদের মত একটি দেশে যেখানে বেসরকারী সঞ্চয় যথেষ্ট নয় এবং দ্রুতগতিতে আর্থিক উন্নয়ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেখানে সরকারী তরফকে স্বীকৃতি দিতেই হবে এবং সেগুলিকে তাদের ভূমিকা সম্পাদনের জন্য সক্রিয় রাখতেই হবে।

গান্ধী জীবন গাথা (৫ পৃষ্ঠার পর)

কৃষি খামারের দৃশ্যে দেখলাম শান্তির পরিবেশে সর্বশ্রমের সার্থক ফলশ্রুতি। ক্ষেতে হল চালনায় রত চাষা, হাপরের সামনে কামার ও কুমোরের চাক সব মিলিয়ে পল্লী পরিবেশ এমন প্রাণবন্ত যে, চকিতে মনে হল কোনোও গ্রামের মাঝখানে এসেছি।

এই ৬টি মণ্ডপ নিয়ে গান্ধী দর্শন। এ ছাড়া আছে বিভিন্ন রাজ্য ও কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্রেরও মণ্ডপ। পশ্চিমবাংলার মণ্ডপকে মণ্ডপ বলে মনে হয় না। সমস্ত জায়গা জুড়ে নোয়াখালির পরিবেশ। দেখানো হয়েছে নোয়াখালি, যেখানে ধর্মের দোহাই দিয়ে মনুষ্যত্বকে জলাঞ্জলি দিয়েছিল এক ভয়াবহ উন্মত্ততা। সেদিনের সেই দারুন দুর্দিনকে ভয় না ক'রে মহাত্মাজী দুর্বল ও অসহায়দের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

বৃটেনে গান্ধীজী জীবনের গোড়ার দিক অতিবাহিত করেন। বৃটেন তাঁর স্মরণে একটি ছোট অথচ আকর্ষণীয় মণ্ডপ তৈরি করেছে। সেখানে ছাত্র ও রাজনৈতিক সংগ্রামীরূপে গান্ধীজী যে ক'বছর বিলেতে কাটান তার ছবি তুলে ধরা হয়েছে। বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলেও তিনি তাদের সম্প্রীতির চোখে দেখতেন। তারাও গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা করতেন।

একেবারে শেষের দিকে আছে শিশু বিভাগ। সেখানে একটি কর্তিত বৃক্ষকাণ্ডের চক্রাকৃতি বয়ঃ বৃত্ত রেখা এঁকে দেখানো হয়েছে—মহীরুহের মত মহাত্মার জীবন। আর দেখানো হয়েছে সেই মহীরুহকে ধূলি লুণ্ঠিত অবস্থায়। এখানে গান্ধীজীর প্রিয় পশুপাখীগুলিকে ছোট চিড়িয়াখানায় রাখা হয়েছে। এ ছাড়া আছে খেলার ঘর, গ্রহশালা, একটি শিলালিপি যাতে যীশু, বুদ্ধ ও গান্ধীর বাণী উৎকীর্ণ আছে, গল্পবলার বিভাগ ও টিকিট বিভাগ। এর সবকটির সঙ্গে গান্ধী জীবন বা দর্শনের সম্পর্ক রয়েছে এবং প্রত্যেকটি অংশই শিক্ষামূলক। গল্প বিভাগে বিভিন্ন ভাষায় নানারকম প্রেরণাদায়ক গল্প শোনা যাবে।

এক মর্মান্তিক মুহূর্তে জওহরলাল হাহাকার ক'রে বলেছিলেন 'আমাদের জীবন থেকে আলো নিভে গেল।' গান্ধী দর্শনে সেই আলো আবার প্রজ্জ্বলিত হয়েছে, আলোকিত করেছে আমাদের সত্ত্বা, উদ্ভাসিত করেছে সকলের অন্তর, মন, প্রাণকে

অধিক ফলনশীল শস্যের চাষ ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ

সুভাষ রায়চৌধুরী

অধিক ফলনশীল শস্যের চাষে প্রকৃত সাফল্য অর্জন করতে হলে যে পরিমাণ রাসায়নিক সার ব্যবহার করা প্রয়োজন তা করা হচ্ছে কি? বিভিন্ন অধিকফলনশীল শস্য চাষের যে লক্ষ্য এবার ধার্য করা হয়েছে তা সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করতে হলে এ প্রশ্নের সমাধান দরকার।

কৃষিকাজে প্রধান সহায় হ'ল জল। জলের পর সারের স্থান। আধুনিক কৃষিতে জল-সেচ ও উন্নত জাতের বীজের ব্যবহার কৃষক সমাজের কাছে যতখানি সমাদৃত হয়েছে, আনুপাতিক হারে সুষম রাসায়নিক সারের ব্যবহার ঠিক ততটা গ্রহণযোগ্য হয়নি। গ্রাম বাংলার কৃষক সমাজ কি রাসায়নিক সার ব্যবহারে অনিচ্ছুক?

আগে কৃষিকাজে সার হিসাবে প্রচুর পরিমাণে গোবর জাতীয় সার, খইল এবং পুকুরের পাঁক ব্যবহার করা হ'ত। এ কথা ঠিক, তখনকার দিনে চাহিদা বা প্রয়োজন ছিল কম। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে জমির ওপর ক্রমশঃ চাপ বাড়তে থাকায় একই জমি থেকে একাধিক ফসল আহরণ করতে হচ্ছে দেশের কৃষক সমাজকে। ফলে ঘাটতি দেখা দিয়েছে গোবর প্রভৃতি জৈব সারের। একই জমিতে ক্রমাগত চাষের ফলে মাটিতে সঞ্চিত গাছের খাদ্য প্রায় নিঃশেষ হতে চলেছে। বিজ্ঞানীরা গাছের এই খাদ্য ঘাটতি পূরণ করার জন্য নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ ব্যবহার করার সুপারিশ করেছেন।

সরকারী তরফ থেকে প্রথম অবস্থায় কৃষকদের মধ্যে নাইট্রোজেন ঘটিত এ্যামোনিয়াম সালফেট সার ব্যবহারের উপকারিতা সম্বন্ধে প্রচার চালান হয়। দীর্ঘদিন প্রচারের ফলে নাইট্রোজেন ঘটিত সারের ব্যবহার যথেষ্ট বাড়লেও তার অপকারিতা এখন কৃষক সমাজকে রাসায়নিক সার ব্যবহারে বিমুখ করে তুলছে না তো?

রাসায়নিক সারের মধ্যে নাইট্রোজেন চারা গাছগুলিকে তাড়াতাড়ি বাড়তে সাহায্য করে। ডাঁটা ও পাতাকে করে তোলে ঘন সবুজ। ফসফেট সাহায্য করে শিকড় জন্মাতে ও গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্য সমূহ মাটি থেকে বেশী পরিমাণে তুলে নিতে। পটাশের কাজ হচ্ছে নাইট্রোজেনকে পুরোপুরি কাজে লাগানো, গাছের রোগ প্রতিরোধক শক্তি বাড়ানো এবং দানা পুষ্ট করা।

এ থেকে বোঝা যায় যে, ক্রমাগত ফসল তুলে নেবার ফলে এবং অধিক ফলনশীল শস্যের চাষ চালিয়ে যেতে থাকায় মাটিতে সঞ্চিত খাদ্য খুবই কমে গেছে। যার ফলে অনেক কৃষক আশানুরূপ ফলন পাচ্ছেন না। এর জন্য প্রয়োজন জৈব সারের সঙ্গে সুষম রাসায়নিক সারের ব্যবহার। সুষম রাসায়নিক সার বলতে বিশেষ কোনো ফসলের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশের কথা বোঝায়। সুষম রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা রক্ষা করা ও বিভিন্ন ফসলের প্রয়োজনীয় খাদ্যের পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়।

রাসায়নিক সার প্রয়োগের আগে মাটির অবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা থাকা দরকার। হাল্কা ধরণের মাটিতে প্রচুর পরিমাণে জৈব সার অর্থাৎ পচা গোবর ও কম্পোষ্ট ব্যবহার করতে হবে। এ মাটিতে রাসায়নিক সার বিশেষ ক'রে নাইট্রোজেন ও পটাশ দফায় দফায় প্রয়োগ করা উচিত।

দোঁয়াশ মাটি সব রকম ফসলের পক্ষে উপযোগী। এই মাটিতে জৈব সারের সঙ্গে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলে শস্যের পক্ষে তা গ্রহণ করা সহজ। ভারী বা এঁটেল মাটিতে জৈব সার বেশী পরিমাণে দিলে ভাল উপকার পাওয়া যায়। এরূপ মাটিতে জমি তৈরির শেষে রাসায়নিক সার একবারও ব্যবহার করা চলে। অবশ্য ধান চাষের ক্ষেত্রে অধিক নাইট্রোজেন, সম্পূর্ণ ফসফেট এবং পটাশ জমি তৈরির সময় ব্যবহার ক'রে বাকী নাইট্রোজেন সার চারা রোয়ার ৩০ দিন এবং ৪৫ দিন পর ব্যবহার করলে অধিক সুফল পাওয়া যায়।

আগেই বলা হয়েছে শুধুমাত্র নাইট্রোজেন ঘটিত এ্যামোনিয়াম সালফেট সার বছরের পর বছর ব্যবহার করার ফলে কোনো কোনো কৃষকের জমি অম্লাত্মক হতে সুরু করেছে। অম্ল মাটিতে ফসলের পক্ষে নাইট্রোজেন ও পটাশ সার গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ফলে সেই জমিতে বিশেষ কোনো একটি ফসল ছাড়া সব রকম ফসল ভাল হয় না। মাটি অনেক কারণেই অম্লাত্মক হতে পারে। তারমধ্যে মাটি ধুয়ে জমির ক্যালসিয়াম কমে যাবার ফলেও জমি অম্লভাবাপন্ন হতে পারে। অবশ্য মাটি পরীক্ষা করিয়েই তবে জানা যেতে পারে কতটা অম্ল মাটিতে সঞ্চিত আছে। এ মাটিকে ভাল করতে হলে একর প্রতি এক টন হিসাবে গুঁড়া চুণ অথবা কাঠ বা তুষের ছাই ব্যবহার করতে হবে। এক বছর এটা ব্যবহার করলে তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে আর দেবার দরকার হবে না।

এ কথা ঠিক, প্রচুর পরিমাণ জৈব সারের সঙ্গে নাইট্রোজেন ঘটিত সার হিসাব করে প্রয়োগ করতে পারলে জমির ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আদৌ থাকে না। গ্রাম বাংলার কৃষক সমাজকে রাসায়নিক সারের উপকারিতা ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে। অবশ্য প্রগতিশীল কৃষকরা ইতিমধ্যেই এর উপকারিতা বুঝে হিসাব ক'রে ব্যবহার করছেন। আজকাল যে সব শিক্ষিত তরুণ কৃষিকাজে এগিয়ে এসেছেন তাঁরাও রাসায়নিক সারের উপকারিতা সম্বন্ধে সচেতন। অবশ্য সাধারণ কৃষকরা এখনও অনেক পিছিয়ে আছেন। কৃষি বিভাগীয় সম্প্রসারণ কর্মীদের এ ব্যাপারে আরও সক্রিয়

ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। রাসায়নিক সারের জন্য দেওয়া ঋণ যাতে অন্যান্য কাজে ব্যয় না করে প্রকৃত পক্ষে চাষের কাজে ব্যবহৃত হয় সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। তার ফলে রাসায়নিক সারের ব্যবহার সম্বন্ধে সমস্ত ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হবে।

বিজ্ঞানীরা সাধারণভাবে কোন ফসলে কতটুকু রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হবে তার একটা মোটামুটি ধারণা দিয়েছেন। মাটি ও আবহাওয়া অনুসারে কৃষক নিজেই বুঝতে পারবেন তাঁর কোন শস্য কতটা রাসায়নিক সার গ্রহণে সাড়া দিচ্ছে। তা ছাড়া এ ব্যাপারে মাটি পরীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। যদিও মাটি পরীক্ষার সুযোগ প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের কমই আছে।

সাধারণ ধানে একর প্রতি ২০ কে.জি. নাইট্রোজেন, ১৫ কে.জি. ফসফেট ও ১৫ কে.জি. পটাশ ব্যবহার করা উচিত। উচ্চ ফলনশীল ধানে ২৭ কে.জি. নাইট্রোজেন, ১৮ কে.জি. ফসফেট ও ১৮ কেজি পটাশ ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। ঐ ধানে বোরো মরশুমের সুপারিশ হচ্ছে নাইট্রোজেন ৩৬ কেজি, ফসফেট ২৪ কেজি ও পটাশ ২৪ কেজি। অধিক ফলনশীল গমে নাইট্রোজেন ২৭ কেজি, ফসফেট ১৮ কেজি ও পটাশ ১৮ কেজি ব্যবহার করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। আলু চাষে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ মোটামুটি ৬০ কেজি হাবে ব্যবহার করা দরকার। পাট চাষে সর্বাধিক ফলন পেতে হলে নাইট্রোজেন ও পটাশ ১৫ কেজি মাত্রায় এবং ফসফেট ১২ কেজি মাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়। এই মাত্রাগুলি হ'ল একর হিসেবে। সাধারণ ধানে যে রাসায়নিক সার ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে তা পাওয়া যাবে ১০০ কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট অথবা ৪৫ কেজি ইউরিয়া থেকে নাইট্রোজেন, ৯৪ কেজি সুপার ফসফেট থেকে ফসফেট এবং ৩০ কেজি মিউরেট অব পটাশ থেকে পটাশ। বাজারে যে সব সার পাওয়া যায় কৃষকরা যদি একটু হিসেব করে ব্যবহার করতে পারেন তাহলে সম-আনুপাতিক হারের সার পাওয়া যাবে ৩৩ কেজি ডাই এ্যামোনিয়াম ফসফেট, ৩১ কেজি ইউরিয়া আর ৩০ কেজি পটাশ থেকে নীচের তালিকায় এটা দেখানো হ'ল :—

সারের নাম	নাইট্রোজেন	ফসফেট	পটাশ
এমোনিয়াম সালফেট	২০	—	—
ইউরিয়া	৪৪	—	—
এ্যামোনিয়াম ফসফেট	২০	২০	—
ডাই এ্যামোনিয়াম ফসফেট	১৮	৪৬	—
সুপার ফসফেট	—	১৬	—
মিউরেট অব পটাশ	—	—	৫০

এখানে উল্লেখ করা যায় যে সরকার নাইট্রোজেন ঘটিত সার সরবরাহ করেন। ফসফেট ও পটাশ সার সরবরাহের দায়িত্ব বেসরকারী সংস্থার। বাজারে বিভিন্ন আনুপাতিক হারের নাইট্রোজেন ঘটিত সার চালু থাকায় কৃষকদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কারণ, আগে একটিমাত্র নাইট্রোজেন ঘটিত সার যথা এ্যামোনিয়াম সালফেট ব্যবহারের কথা বলা হত। সাধারণ কৃষকের কাছে এটা নুন সার নামেই পরিচিত। এতে কতভাগ নাইট্রোজেন আছে সাধারণ কৃষক তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন নাইট্রোজেন ঘটিত সার বাজারে চালু থাকায় কৃষকের জানা প্রয়োজন কোন সারে গাছের খাদ্য উপাদানের আনুপাতিক হার কত? লেখা পড়া জানা কৃষকের পক্ষেও এটা বেশ শক্ত কাজ। সাধারণ কৃষক সমাজের জানা উচিত কোন রাসায়নিক সারে গাছের কোন কোন খাদ্য কত অংশ আছে। এটা জেনে নিলেই তবে কত কম খরচে সুষম রাসায়নিক সার ব্যবহার লাভজনক হবে তা বোঝা যাবে।

এগুলি ছাড়া আরও অনেক সার বাজারে চালু আছে। মিশ্রসার যদিও কৃষক সমাজের কাছে প্রিয়, তবুও তা নিয়ে নানা রকম দুর্নীতি ঘটায় সরকার ঐ সার বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। সরকারকে এখন চিন্তা করে দেখতে হবে রাসায়নিক সার মাত্র দুটি বা তিনটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় কি না। এ ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে বিজ্ঞানীদেরও। যে দেশে শতকরা ৭০ ভাগ লোক নিরক্ষর তাঁদের পক্ষে অত শত হিসাব নিকাশ কি সম্ভব?

তাই দেখা যায় পশ্চিম বাংলার কোনো একটি উন্নত ব্লকে যেখানে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক ও কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক উভয়েই কৃষি বিজ্ঞানের স্নাতক, কৃষকরাও মোটামুটি প্রগতিশীল, ব্লকের সেচ ব্যবস্থাও অন্যান্য ব্লকের তুলনায় উন্নত সেই ব্লকে ১৯৬৮-৬৯ সালে চাষ হয়েছে :—

গম ২৫০০.০০ একর
আউশ ১০০০.০০ একর
পাট ৮০০০.০০ একর
আখ ১৯৫০.০০ একর
তৈলবীজ ৪৫০০.০০ একর

ডাল জাতীয় শস্য ১৩৫০০.০০ একর জমিতে। ঐ ব্লকে ১৯৬৮-৬৯ সালে রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয়েছে :— এ্যামোনিয়াম সালফেট—৬৩ টন, সুপার ফসফেট ৯ টন এবং মিউরেট অব পটাশ ৬ টন; এ ছাড়া কিছু মিশ্র সার আছে যা নগণ্য। অথচ মাত্র ২৫০০ একর জমিতে অধিক ফলনশীল গমের চাষে রাসায়নিক সার দরকার হবে—

এ্যামোনিয়াম সালফেট ৩৩৭.৫ টন
অথবা
ইউরিয়া ১৩৯ টন
সুপার ফসফেট ২৪০ টন
মিউরেট অব পটাশ ৯০ টন

অবশ্য তার পাশের ব্লকে দেখা যায় সব মিলিয়ে ঐ বছর প্রায় ৩৫০০ টনের মতো রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হয়েছে। যে সব ব্লকের ঘটনা উল্লেখ করা হ'ল,

(২০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

রাজ্যগুলির কার্যকুশলতা দেখে কেন্দ্রীয় সাহায্য দেওয়া উচিত

চন্দ্র শেখর

সাম্প্রতিককালে রাজ্যগুলি কেন্দ্রের কাছে ক্রমশ: বেশী পরিমাণ আর্থিক সাহায্যের জন্য দাবি জানাচ্ছে। এই দাবির সমর্থনে তারা বলে যে, সমাজকল্যাণ-মূলক ব্যবস্থাগুলির জন্য তাদের ব্যয়ের হার অনেক বেড়ে গেছে। তা ছাড়া পরিকল্পনা সম্পর্কিত যে সব কর্মসূচী রাজ্যগুলির জন্য রাখা হয় তা এতো ব্যয় বহুল যে তারা নিজেদের সম্পদ থেকে এই ব্যয় নির্বাহ করতে সক্ষম নয়। সম্পদ সংহত করার ক্ষমতা কোন কোন রাজ্যের এতো কম যে তা সত্যিই আশ্চর্যজনক। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে, আসাম তার চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য আনুমানিক ব্যয় ধরেছে ২২৫ কোটি টাকা, কিন্তু নিজে যে সম্পদ সংহত করতে পারবে তার পরিমাণ হ'ল মাত্র ৫ কোটি টাকা। ওড়িশা তার ১৮০ কোটি টাকার পরিকল্পনার জন্য মাত্র ২০ কোটি টাকা সংগ্রহ করবে। রাজস্থান তার ২৪০ কোটি টাকার পরিকল্পনার জন্য ১৮ কোটি টাকা সংগ্রহ করতে পারবে। পশ্চিম বঙ্গ তার ৩২১ কোটি টাকার পরিকল্পনার জন্য ১০০ কোটি টাকার সংস্থান করতে পারবে এবং অন্ধ্র প্রদেশ তার ৩৬০ কোটি টাকার পরিকল্পনার জন্য ১২০ কোটি টাকা সংগ্রহ করবে। বিহার তার ৪৪১ কোটি টাকার পরিকল্পনার জন্য মাত্র ১০৩ কোটি টাকা দেবে। এই রাজ্যগুলি আশা করে যে, ব্যয়ের অবশিষ্ট অংশটা কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবেন। অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে কেরালা আশা করে যে, তারা ৮৩ কোটি টাকা তুলবে এবং কেন্দ্রের কাছ থেকে ১৭৫ কোটি টাকা পাবে। মধ্য-প্রদেশ ৯৩ কোটি টাকা সংগ্রহ করবে এবং আশা করে যে কেন্দ্রের কাছ থেকে ২৬২ কোটি টাকা সাহায্য পাবে। জম্মু কাশ্মীর এবং নাগাভূমি সম্পূর্ণভাবেই কেন্দ্রীয় সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল।

কাজেই এ থেকে বোঝা যায় যে, কয়েকটা রাজ্য বাদে, বিভিন্ন রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থায় কি বিরাট বৈষম্য রয়েছে। আরও বোঝা যায় যে এই বৈষম্য বেড়েই চলেছে। রাজ্যগুলির চলতি বাজেট প্রস্তাবে গড়পড়তা ঘাটতির মোট পরিমাণ হ'ল ৩০০ কোটি টাকার মতো। অর্থাৎ রাজ্যগুলি এমন একটা অবস্থায় পড়ে গেছে যে, ঘাটতি বাজেটের ঘূর্ণীপাক থেকে এদের উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

তা ছাড়া উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টায় রাজ্যগুলিকে খুব উৎসাহী বলে মনে হয় না। তাদের পরিকল্পনা-বহির্ভূত ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমশ: বাড়ছে। দেখা গেছে গত ৪ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব খাতে ব্যয় যেখানে গড়পড়তা শতকরা বার্ষিক ৫ থেকে ৭ ভাগ বেড়েছে সেই ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির বেড়েছে আন্দাজ শতকরা বার্ষিক ৯ থেকে ১২ ভাগ। তা ছাড়া রাজ্যগুলির ঋণের পরিমাণও বছরের পর বছর বাড়ছে। ১৯৭০ সালের মধ্যে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যগুলির মোট ঋণের পরিমাণ ৫,৭৩৭ কোটি টাকা দাঁড়াবে ব'লে অনুমান করা হচ্ছে। ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে এর পরিমাণ ছিল ৩৯৭০ কোটি টাকা।

ঘাটতি বাজেট পূরণ করার জন্য রাজ্যগুলি সাধারণত: যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা হ'ল, সংরক্ষিত তহবিলে অর্থ থাকলে তা'তে হাত দেওয়া এবং তা না থাকলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ঋণ করা অথবা খোলা বাজারে সংগ্রহ করা। কিন্তু রাজ্যগুলি এখন বুঝতে পেরেছে যে কেন্দ্রেরও সামর্থ্য সীমিত। কাজেই তারা এখন কেন্দ্রীয় রাজস্বের সমান অংশ দাবি করতে সুরু করেছে। যে রাজ্যগুলি বেশী অর্থের জন্য কেন্দ্রকে বেশী চাপ দিচ্ছে, প্রশাসনের ক্ষেত্রে তারা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় উন্নততর নয়। এতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই বেশী সাহায্যের জন্য দাবি জানানো হয় উন্নয়ন-মূলক উদ্দেশ্যের জন্য নয়।

কার্যকুশলতা উচ্চস্তরের নয়

এ কথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সমাজকল্যাণমূলক কাজের জন্য রাজ্যগুলির ব্যয় কিছুটা বেড়েছে। কিন্তু অপরপক্ষে, কেন্দ্রীয় রাজস্বের ভাগও তারা বেশী পাচ্ছে। তা সত্ত্বেও এই টাকাটা উন্নয়নের ক্ষেত্রে খাটানোর ব্যাপারে তারা ভাল ফল দেখাতে পারেনি।

নিজেদের দাবি মেটানোর জন্য রাজ্যগুলি কোথা থেকে অর্থের সংস্থান করবে অথবা অর্থ সংগ্রহ করার মতো কোন সূত্র বা উপায় আছে কিনা সেইটেই এখন প্রশ্ন। লক্ষ্যণীয় যে, মাত্র ৬টি রাজ্য নতুন উপায়ে সম্পদ সংগ্রহ করার জন্য চেষ্টা করেছে। অতএব রাজ্যগুলির সংগ্রহের পরিমাণ, মোট ঘাটতি ৩০০ কোটি টাকার শতকরা ৫ ভাগের মতো হবে। অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহে অক্ষমতার স্বপক্ষে, রাজ্যগুলি প্রায়ই এই যুক্তি দেখায় যে, তাদের আর নতুন কর বসানোর উপায় নেই। এই প্রশ্নটা যদি আপাতত: ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলেও রাজ্যগুলি এর আগে শিল্প ও ব্যবসায়মূলক ক্ষেত্রে যে অর্থ বিনিয়োগ করেছে সেগুলি লাভজনক হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে তাদের নিশ্চয়ই প্রশ্ন করা যায়। কেন্দ্র থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়ে যে লগ্নী করা হয়েছে তারই বা ফল কি হয়েছে। তারা হয়তো এই সম্পর্কে সন্তোষজনক কোন উত্তর দিতে পারবে না। স্পষ্টতঃই রাজ্যগুলির মালিকানায় যে সব শিল্প ও ব্যবসায় রয়েছে সেগুলির

কাজকর্ম কেন্দ্রীয় সরকারের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলির চাইতেও খারাপ।

স্পষ্টই বোঝা যায় যে, রাজ্যগুলি বিপুল পরিমাণ লগ্নী করেও কোন ফল লাভ করতে পারছে না আর তাতে বেশীর ভাগ মূলধন আটকে গেছে।

রাজ্যগুলির অর্থসংগ্রহের সূত্র সীমাবদ্ধ এ কথা বলাও ভুল হবে। সংবিধান অনুযায়ী রাজস্ব আদায়ের ৬৬টি সূত্র সম্পূর্ণভাবে রাজ্যগুলির হাতে দেওয়া হয়েছে এবং আরও ৪৭টি সূত্রে সংগৃহীত রাজস্বে রাজ্যগুলির ও কেন্দ্রের অংশ রয়েছে। কাজেই রাজ্যগুলি যদি অর্থ সংগ্রহে দৃঢ় সঙ্কল্প হয় এবং উন্নয়ন কর্মসূচীগুলি রূপায়িত করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে চায়, তাহলে নতুন কোন উপায় বের করা তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়।

কৃষি

রাজস্ব থেকে আয় বৃদ্ধি করা সম্পর্কে রাজ্যগুলির বিরাট একটা ক্ষেত্র হ'ল কৃষি। কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রের পুনর্গঠনে ও সেগুলি শক্তিশালী ক'রে তুলতে এবং এগুলির কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে রাজ্যগুলি সক্ষম হয়নি। গত ২০ বছরে তারা মোট আবাদি জমির শতকরা মাত্র ২০ ভাগে সেচের সুযোগ সুবিধে দিতে সক্ষম হয়েছে আর তাও কেন্দ্রের সাহায্য নিয়ে। এটাও সত্যি যে, তারা উপযুক্ত সময়ে কৃষকগণের জন্য উন্নত ধরনের বীজ, সার, কৃষি সাজ সরঞ্জাম এবং প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করতে পারেনি। সমবায় সমিতিগুলিকে যদি তারা কাজে লাগাবার চেষ্টা করতো তাহলেও যে তারা যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করতে পারতো তাতে কোন সন্দেহ নেই। তা ছাড়া লক্ষ লক্ষ হেক্টার পতিত জমি পড়ে আছে যেগুলি কাজে লাগানো হয়নি। রাজ্যগুলি যদি চাষযোগ্য জমির শতকরা ৪০ ভাগেও জলসেচ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারতো এবং আগাছায় পূর্ণ পতিত জমির শতকরা ১২ ভাগও পুনরুদ্ধার করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতো তাহলে তা শুধু কৃষকদের জনপ্রতি আয়ই বাড়াতো না রাজ্যগুলির রাজস্বখাতে আয় যথেষ্ট বাড়তো।

আবার কৃষি আয়করকে যদি জমির খাজনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হয় এবং রেহাইর সীমা আরও কমানো হয় তাহলেও রাজ্যগুলির যথেষ্ট আয় হতে পারে। বর্তমানে রাজ্যগুলিতে যে রেহাই সীমা আছে তাতে প্রয়োজনীয় সংশোধন বা পরিবর্তন করে কৃষি আয়কর থেকেই ২০০ কোটি টাকা আয় হতে পারে।

কাজেই এটা সহজে বোঝা যায় যে, রাজ্যগুলি কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেইসব শিল্প স্থাপন করতে পারে যাতে শ্রমিকের প্রয়োজন বেশী এবং যা সম্পদ সংহত করতে পারে। অতএব বলাই বাহুল্য যে রাজ্যগুলির সম্পদের অভাব নেই অভাব উৎসাহ ও আন্তরিক প্রচেষ্টার। অর্থনৈতিক লাভের প্রশ্নকে রাজনীতির ওপরে স্থান দিতে হবে। রাজ্যগুলির, নিজেদের আর্থিক সংস্থানের ওপরেই বেশী নির্ভর করতে হবে এবং তা যতটা সম্ভব বাড়াতে হবে। কেন্দ্রের নিজের কতগুলি দায়িত্ব রয়েছে এবং তার ক্ষমতারও একটা সীমা আছে। সংবিধানের ব্যবস্থা অনুযায়ী কেন্দ্রের কাজ হ'ল দেশের সমগ্র অর্থনীতি তত্ত্বাবধান, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা, সুসমন্বিত আঞ্চলিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা। কেন্দ্রের এই মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার জন্য কোন রকম চেষ্টা করা হ'লে আমাদের পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রচেষ্টায় বিশৃঙ্খলা আসবে। রাজ্যগুলির, কঠোর সঙ্কল্প নিয়ে, আয়, সঞ্চয় ও ঋণের ঘূর্ণাবর্ত থেকে নিজেদের মুক্ত করার সময় এসেছে। তাই বিনা দ্বিধায় বলা যায় কেন্দ্রীয় সাহায্য শুধু চাহিদা অনুযায়ী না দিয়ে কাজকর্মের ফলাফল দেখে দেওয়া উচিত।

সারা বিশ্বে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিরোধ রয়েছে এবং দরিদ্র ধনীকে হিংসা করে। যদি সকলেই তাদের অন্ন সংস্থানের জন্য কাজ করতেন তাহলে এই বিভেদ চলে যেত। এই রকম অবস্থাতেও ধনী থাকতেন কিন্তু তাঁরা নিজেদের, তাঁদের সম্পদের 'অছি' বলে মনে করতেন এবং প্রধানতঃ জনসাধারণের স্বার্থেই তা ব্যবহার করতেন।

—গান্ধী

পেনিউর ১ গোলমরীচ

দেশে গোলমরীচের উৎপাদন ও তার ফলে বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা অর্জন শীঘ্রই দ্বিগুণ হবে। অচিরে ব্যাপক অঞ্চলে সঙ্কর জাতীয় পেনিউর—১ মরীচের চাষ সুরু হবার কথা আছে বলে ঐ কথা এত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করা হ'ল।

এই প্রচুর ফলন দো-আঁশলা বীজের উৎকর্ষতার পেছনে রয়েছে শ্রী পি. কে বেনু গোপালন নাম্বিয়ারের তিন বছরের গবেষণা ও পরীক্ষা। শ্রীনাম্বিয়ার হলেন কান্নানোর জেলার তালিপারামবাতে গোলমরীচ গবেষণা কেন্দ্রে—কৃষি গবেষক (পেপার রিসার্চ অফিসার), আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিস্টিংশান পাওয়া ছাত্র। নিজের গবেষণার ফলাফলে ভদ্রলোক নিজেই গর্বিত। আর হওয়াটা অসঙ্গত নয় কারণ পৃথিবীর আর কোনোও দেশে গোলমরীচের সঙ্কর বীজ তৈরি করার চেষ্টা করা হয়নি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানা যায় যে, এই সঙ্কর বীজের উৎপাদন—অন্যান্য জাতের তুলনায় চার গুণ বেশী: যেমন মামুলী জাতের গোল মরীচের লতার একটা ডালে প্রায় ৫০টা দানা হয়। আর নতুন বীজে সেখানে দানা হয় ১২০ টার মত। তা ছাড়া আর একটা সুবিধা আছে। মামুলী দানার রস যদি শতকরা ৩০ ভাগ শুকোনো যায়, নতুন দানার ক্ষেত্রে তা দাঁড়াবে শতকরা ৩৩ ভাগের মত। ওজনেও তফাৎ আছে—যেমন মামুলী জাতের গোল মরীচের ১০০টি দানার ওজন সাধারণতঃ ১২ গ্রামের মত হয় কিন্তু নতুন জাতের ১০০টি দানার ওজন হবে ১৮ গ্রামের মত।

নতুন দিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের অর্থানুকূল্যে, এর্ণাকুলাম জেলার ভেরিয়ামঙ্গলমে জেলা কৃষি খামারে এই বীজ তৈরির জন্যে একটা পৃথক ক্ষেত্র রাখা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, ১৯৭১ সালের চাষ মরসুমে গোল মরীচের চাষীদের সরবরাহ করার জন্যে অন্ততঃ ৫০ হাজার কলম (শেকড়শুদ্ধ) তৈরি হয়ে যাবে। এই প্রথম, গুণের বিচারে ও উৎপাদনের দিক থেকে উৎকৃষ্ট গোল মরীচ পাওয়া যাবে। যোগান যে বছরে বছরে বেড়ে যাবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

পল্লী ঋণে সমবায় সমিতির ভূমিকা

অনেক সময়েই বলা হয় যে, ভারতের সমবায় আন্দোলন প্রধানতঃ সমবায় ঋণ আন্দোলন এবং এক হিসেবে কথাটা ঠিক। প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি প্রতিষ্ঠা করেই আমাদের দেশে সমবায় আন্দোলন সুরু হয় আর এগুলির সংখ্যাই আমাদের দেশে এখন সব চাইতে বেশী। বর্তমানে দেশের ২০০০ কোটি টাকা ক'রে বার্ষিক কৃষি ঋণের প্রয়োজন বলে অনুমান করা হয়। ১৯৭৩ সালের মধ্যে স্বল্প মেয়াদী ঋণের চাহিদা ২০০০ কোটি, মাঝারি মেয়াদীর ৫০০ কোটি এবং দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের চাহিদা ১৫০০ কোটি টাকায় পৌঁছুবে বলে মনে হয়। এতেই বোঝা যায় কৃষি ঋণের চাহিদা কি রকম দ্রুতগতিতে বাড়ছে।

এই সব প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা আমাদের দেশের কৃষি ঋণের উৎসের কথা পরীক্ষা করে দেখি তাহলে দেখা যাবে যে, এই বিরাট ক্ষেত্রটিতে প্রধানতঃ ঋণদাতা মহাজনরাই আধিপত্য করছেন। প্রয়োজনীয় ঋণের শতকরা মাত্র ৩.১ ভাগ সরবরাহ করছে সমবায় সমিতিগুলি। তবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির কাজ সুরু হওয়ার পর থেকেই কৃষি ঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে সমবায়ের ভূমিকা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। ১৯৬১-৬৩ সালে সমবায়গুলি. স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদী কৃষি ঋণের শতকরা ২৫ ভাগ সরবরাহ করে। দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ সরবরাহ করার জন্য সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক গঠন করা হয় এবং কৃষিতে অর্থ সাহায্য করা সম্পর্কে এগুলি বেশ গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি করেছে (তালিকাটি দেখুন)। চতুর্থপরিকল্পনায় সমবায়গুলির স্বল্পকালীন ও মাঝারি মেয়াদী ঋণদানের পরিমাণ ৪৫০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৭৫০ কোটি টাকায় এবং দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ ১০০ কোটি টাকা থেকে ৭০০ কোটি টাকায় পৌঁছুবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বিপুল সম্প্রসারণ

অখিল ভারত পল্লী ঋণ পর্যালোচনাকারী কমিটি তাঁদের বিবরণীতে বলেছেন যে, ১৯৫১ সাল থেকে সমবায় ঋণদান ব্যবস্থার বিপুল প্রসার ঘটলেও, চাহিদা বেড়েছে অনেক বেশী। তা ছাড়া কমিটি, সমবায় সমিতিগুলির গঠন ও কার্য পদ্ধতিতে কতকগুলি অসম্পূর্ণতার উল্লেখ করে বলেছেন যে, এগুলির সংশোধন প্রয়োজন। কমিটির কয়েকটি প্রধান সুপারিশ এখানে দেওয়া হ'ল :—

১। সমবায় ঋণদান সমিতির গঠন ব্যবস্থা এমনভাবে বদলাতে হবে যাতে ব্যাঙ্কগুলি, মূলধনের বেশী শেয়ার কিনতে পারে, দীর্ঘকালীন জমা এবং পরিচালনা ব্যবস্থায় সাহায্যের জন্য ব্যাঙ্কগুলির বোর্ডে রাজ্যগুলির উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব, ডিরেক্টার বোর্ডকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য বিশেষ কর্মচারী নিয়োগে রাজ্যগুলি যাতে আরও বেশী অংশ গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা উচিত।

২। প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতিগুলিকে আরও উন্নত করতে হবে যাতে এগুলি আরও বেশী ঋণ বন্টন করতে পারে এবং জমার পরিমাণ আরও বাড়াতে ও কাজকর্ম আরও সম্প্রসারিত করতে পারে।

৩। ছোট চাষীদের ঋণ দিয়ে সাহায্য করতে হবে এবং বড় চাষীদের তাদের নিজস্ব সম্পদ, উৎপাদন ও উন্নয়নখাতে ক্রমশঃ বেশী পরিমাণে নিয়োগ করা উচিত। ছোট চাষীদের সাহায্য করার জন্য কয়েকটি নির্বাচিত জেলায় ছোট চাষীদের উন্নয়নের জন্য একটি করে সংস্থা গঠন করা উচিত। উন্নত ধরনের কৃষি পদ্ধতি, বিশেষ ধরনের লগ্নী, শস্যচাষের নতুন ধারা এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির আধুনিক ব্যবস্থাদি অবলম্বনের ফলে যে চাষীরা বেকার বা অতিরিক্ত হয়ে পড়বেন তাঁদের সাহায্য করাই হবে এই সংস্থাগুলির কাজ।

৪। সমগ্র পল্লী ঋণ কাঠামো পুনর্গঠিত করা প্রয়োজন। কমিটি বলেছেন যে, সমবায়গুলির সঙ্গে সুস্থ প্রতিযোগিতা করার জন্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিও পল্লী ঋণের ক্ষেত্রে যাতে এগিয়ে আসে সেজন্য সেগুলিকেও উৎসাহিত করা উচিত। এই সম্পর্কে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলিসহ স্টেট ব্যাঙ্ক ও এর সহযোগী ব্যাঙ্কগুলিকেও বিশেষ ভূমিকা দেওয়া হয়েছে।

১৪টি ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ করার পূর্বেই যে কমিটি এই সব সুপারিশ করেছিলেন তা স্পষ্টতঃই বোঝা যায়। যাই হোক কমিটি ব্যাঙ্কগুলিকে যে বিশেষ ভূমিকা দিয়েছিলেন, রাষ্ট্রীয়করণের পর তা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

(পর পৃষ্ঠার দেখুন)

সমবায়ের তরফে কৃষিতে অর্থ সাহায্য

	সমবায় ব্যাঙ্ক (কোটি টাকায়)	ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (কোটি টাকায়)
১৯৫০-৫১	২২.৯	১.৩৮
১৯৫৫-৫৬	৪৯.৬	২.৮৬
১৯৬০-৬১	২০২.৭৫	১১.৬২
১৯৬৫-৬৬	৩৪১.৩৪	৫৮.২৪
১৯৬৬-৬৭	৩৬৫.৪৬	৫৮.৮৪
১৯৬৭-৬৮	৪০০.০০	৭৮.০০
১৯৬৮-৬৯	৪৫০.০০ (আনুমানিক)	১০০.০০ (আনুমানিক)

ধনধান্যে ১২ই অক্টোবর ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ২৯

গান্ধী ও বিশ্ব

(১০ পৃষ্ঠার পর)

পঁচিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে ভারত প্রধানত: এই নীতি অনুসরণ করেই স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম করে এবং শেষ পর্যন্ত তা অর্জনে এগুলি সাহায্য করে। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়।

এই নীতি, আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকার হাজার হাজার মানুষকে প্রভাবিত করেছে।

হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে যখন আণবিক বোমা ব্যবহার করা হয় তখন গান্ধীজী অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বলেন যে, 'নারী, পুরুষ, ও শিশু নির্বিশেষে সর্বাত্মক ধ্বংসের জন্য আণবিক বোমার ব্যবহার হ'ল—বিজ্ঞানের অতি পৈশাচিক ব্যবহার।' তিনি মনে করতেন যে শান্তির একমাত্র বিকল্প হ'ল সমগ্র মানবজাতির ধ্বংস। তাঁর দেহাবসানের পর, রাসায়নিক ও রোগ বীজাণুর যুদ্ধ ছাড়াও, অনেক বেশী ধ্বংসাত্মক পারমাণবিক অস্ত্রাদি, আন্ত: মহাদেশীয় প্রক্ষেপক অস্ত্রাদি আবিষ্কৃত হয়েছে, বিশ্ব বরং আরও বেশী ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। পারস্পরিক ভীতিই পারমাণবিক সংগ্রাম প্রতিরোধ করছে এবং বিপরীত স্বার্থের বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে একটা সাময়িক শান্তি বিরাজ করছে। এই রকম পরিস্থিতিতে গান্ধীজী হয়তো পরমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে চাইতেন এবং যে দেশ নৈতিক শক্তিতে বিশ্বাসী সেই রকম একটি দেশও যদি অন্যের অপেক্ষায় না থেকে নিরস্ত্রীকরণে এগিয়ে আসতো তাহলে তিনি সেই দেশকে উৎসাহিত করতেন।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গান্ধীজী প্রাচীন পন্থী ছিলেন এবং চাইতেন যে আমাদের দেশ আবার সেই প্রাচীন যুগে ফিরে যাক। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার সময় তিনি যে 'হিন্দস্বরাজ' লেখেন তাতে পশ্চিমী সভ্যতাকে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। ভারতে ফিরে এসে তিনি বহুবার বলেছেন যে, আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যতই অসম্পূর্ণ হোক সেগুলি আমাদের নিজস্ব এবং জীবন ধারণের ভিন্ন মানের, ভিন্ন রীতিনীতি বিশিষ্ট অন্যের অনুকরণ না করে নিজেদেরটা মাথায় করে রাখাই ভালো।

তবে তিনি যে কোন স্থান থেকে জ্ঞান আহরণ করার পক্ষে ছিলেন এবং প্রাচীন বলেই আদিম রীতিনীতির পক্ষপাতি ছিলেন না। তাঁর যে কথাগুলি এখন বিখ্যাত উক্তিতে পরিণত হয়েছে, তা হ'ল 'আমি আমার বাড়ীর চতুর্দিক দেওয়াল দিয়ে ঘিরে রাখতে চাই না এবং জানালাগুলি বন্ধ রাখতে চাই না। আমি চাই সব দেশের সংস্কৃতি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আমার ঘরে উড়ে বেড়াক, তবে এগুলি আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাক তা আমি চাই না। আমি অন্যের গৃহে অনাহূত প্রবেশকারী, ভিক্ষুক বা দাস হিসেবে বাস করতে চাই না।' সত্য সন্ধানী হিসেবে তিনি কোন জাতীয় সীমা মানতেন না।

পল্লী সমবায় সমিতি

(১৯ পৃষ্ঠার পর)

৫। সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির অসাফল্য সম্পর্কে কমিটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কমিটির মতে সমবায় ঋণদান ব্যবস্থার কাঠামো পুনর্গঠনের সময়ে এ কথাটা বোঝা গেছে যে, 'সমবায়গুলির কাজে রাজ্য ও স্থানীয় পর্যায়ে রাজনীতি অনুপ্রবেশ করেছে। প্রায়ই দেখা যায় যে, যাঁরা কোন বিশেষ রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে সমবায় ঋণের সুযোগ পান না। আর একটি অশোভনীয় ব্যাপার হ'ল সমবায় প্রতিষ্ঠানে, যেমন কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্মে, যাকে বলা যায়, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ রয়েছে। এই সমস্ত কারণেই, ঋণ পরিশোধে সক্ষম এই রকম সব কৃষকের ঋণের চাহিদা সমবায় সমিতি মেটাতে পারিবে, এই অনুমান ভুল বা আংশিক সত্য। এমন কি যেখানে সকলের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব সেখানেও রাজনৈতিক দিক থেকে কিছু লোকের উপকার হয়েছে।

যাই হোক আমরা আশা করতে পারি যে, কমিটির সুপারিশগুলি সরকার কার্যকরী করবেন এবং এই সুপারিশ অনুযায়ী সমবায় ঋণদান সমিতির কাঠামো পুনর্গঠিত করবেন। এই ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কেরও একটা ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত।

অধিক ফলনশীল শস্যের চাষ

(১৫ পৃষ্ঠার পর)

পশ্চিম বাংলার সর্বত্র যে একই রূপ চিত্র তা নয়। তবুও প্রয়োজনের তুলনায় রাসায়নিক সারের ব্যবহার আশাপ্রদ নয়।

পশ্চিম বাংলার কোনো একটি পশ্চাদপদ জেলায় যিনি অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন সেই মুখ্য কৃষি আধিকারিকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জানা যায় যে কৃষকগণ প্রগতিশীল, অধিক ফলনশীল শস্য চাষে আগ্রহী। গভীর নলকূপ আছে ৪৪৯টি, অগভীর নলকূপ বসানো হয়েছে ২৫০০টি এবং নদী সেচ প্রকল্প ২৪টি এই রকম জেলায় ১৯৬৮-৬৯ সালে রাসায়নিক সার প্রয়োগের হিসাব—

	লক্ষ্যসীমা	ব্যবহৃত হয়েছে
নাইট্রোজেন	৬০০০ টন	১৬০০ টন
ফস	৮০০০ টন	১৭০ টন
পটাশ	৯০০০ টন	৫০০ টন

অথচ কীটনাশক ওষুধের কথা বলতে তিনি জানালেন একমাত্র পাটের পরশুমেই সে জেলায় ৫ লক্ষাধিক টাকার ওষুধ বিক্রী হয়েছে। তিনি আশা করছেন, এ বছর হয়তো কৃষকদের পক্ষে সার ব্যবহারের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব।

এর থেকে বোঝা যায় যে, রাসায়নিক সার ব্যবহারের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদের গ্রাম বাংলার কৃষক সমাজ যথেষ্ট সচেতন নন। কৃষি বিভাগেরও যথেষ্ট তৎপর হওয়া প্রয়োজন। তা নাহলে অধিক ফলনশীল বীজের ব্যবহার বা সেচের সুবিধা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। খাদ্যে স্বয়ম্ভর হতে হলে রাসায়নিক সারের প্রতি কৃষক সমাজের এই বিমুখতাকে দূর করে খাদ্য সমস্যা সমাধানের পথকে সুগম করতে হবে।

গান্ধীজী তাঁর নম্র মধুর কণ্ঠে বলেছেন, 'মৃত্যুর মধ্যেই নিহিত রয়েছে জীবন, ঘন অন্ধকারের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে আলো, অসত্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সত্য।'

“প্রেরণার কণা”

আমি স্বীকার করি যে অর্থনীতি ও নৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য বা একেবারে কোন পার্থক্য আছে বলে আমি মনে করি না। যে অর্থনীতি কোন ব্যক্তি বা জাতির নৈতিক কল্যাণ ব্যাহত করে তা দুর্নীতি, সুতরাং তা পাপ নীতি। কাজেই যে অর্থনীতি এক দেশকে অন্য দেশ শোষণের সুযোগ করে দেয় তা দুর্নীতিপুর্ণ। ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত শ্রমিকের তৈরি কোন জিনিস কেনা বা ব্যবহার করা পাপ।

যে অর্থনীতি নৈতিক মূল্যগুলিকে উপেক্ষা করে; সেই রকম অর্থনীতি অসত্যপূর্ণ। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও অহিংসার নীতিগুলি সম্প্রসারিত করার অর্থ হল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও নৈতিক মূল্যবোধকে অন্যতম বিষয় বলে বিবেচনা করতে হবে।

অপর পক্ষে সত্যিকারের অর্থনীতির লক্ষ্য হ'ল সামাজিক ন্যায়বিচার, তা দুর্বলতম সহ সকলের কল্যাণ চায় এবং ভদ্র ও সুস্থ জীবনের জন্য তা অপরিহার্য্য।

আমরা যদি সকলেই আমাদের বাড়ী, প্রাসাদ এবং মন্দিরগুলি থেকে সম্পদের সব রকম চিহ্ন অপসারিত করে সেগুলি নৈতিক মূল্য দিয়ে সুসজ্জিত করি তাহলে আমরা বিপুল সেনা বাহিনীর বিরাট ভার বহন না করেও যে কোন আক্রমণকারী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারবো। আমাদের প্রথমে ভগবানের রাজ্য এবং তাঁর ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে তাহলে আমরা সবই পাবো। এগুলি হ'ল প্রকৃত অর্থনীতি। আসুন আমরা এই সম্পদ রক্ষা করে এগুলি আমাদের জীবনে প্রয়োগ করি।

কালের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জ্ঞান বুদ্ধি এবং এমন কি সুযোগ সুবিধেতেও অসাম্য থাকবে। যে ব্যক্তি জলবিহীন কোন শুষ্ক অঞ্চলে বাস করছেন তাঁর তুলনায় যে ব্যক্তি কোন নদীর তীরে বাস করছেন তিনি শস্য উৎপাদনের সুযোগ অনেক বেশী পান। কিন্তু অসাম্যগুলি যদি আমাদের ভয়ও দেখায়, তবুও সাম্যের লক্ষণগুলি উপেক্ষা করা উচিত নয়।

সমাজ সম্পর্কে আমার ধারণা হ'ল এই যে, সকলের ক্ষমতা এক না হলেও, সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সমান সুযোগ সুবিধে পাওয়া উচিত। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ীই সকলে সমান ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না। প্রত্যেকের যেমন একই উচ্চতা বা একই রং অথবা বুদ্ধি ইত্যাদি হয় না তেমনি স্বাভাবিকভাবেই কেউ বেশী রোজগার করতে পারেন, কেউ পারেন না।

আমার মতে অর্থনৈতিক সাম্যের অর্থ এই নয় যে প্রত্যেকেই সম পরিমাণ টাকা পাবেন। এর সোজা অর্থ হ'ল এই যে প্রত্যেকেরই তার প্রয়োজন মেটাবার মতো পাওয়া উচিত।......অর্থনৈতিক সাম্যের প্রকৃতঅর্থ হ'ল ‘প্রত্যেকেরই তার প্রয়োজন মেটাবার মতো আয় থাকা উচিত।’ কোন অবিবাহিত একক ব্যক্তি যদি, চারটি শিশু ও স্ত্রীসহ কোন ব্যক্তির সমান আয় দাবি করেন তাহলে সেই দাবির অর্থ হল, অর্থনৈতিক সাম্য লঙ্ঘন করা।

প্রত্যেকের সুষম আহার্য পাওয়া উচিত, বাস করার জন্য সুন্দর একটি বাড়ী, ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ সুবিধে এবং চিকিৎসার উপযুক্ত সুযোগ সুবিধে পাওয়া উচিত

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে এবং তথ্য ও বেতার মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত হ'লেও ‘ধনধান্যে’ শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করে না। পরিকল্পনার বাণী জনসাধারণেব কাছে পৌঁছে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী ক্ষেত্রে উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতটা অগ্রগতি হচ্ছে তার খবব দেওয়াই হ'ল ‘ধনধান্যে’র লক্ষ্য।

‘ধনধান্যে’ প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে প্রকাশিত হয়। ‘ধনধান্যে’র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

নিয়মাবলী

দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়।

অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পুনঃ প্রকাশকালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার করা হয়।

বচনা মনোনয়নের জন্যে আনুমানিক দেড় মাস সময়ের প্রয়োজন হয়।

মনোনীত রচনা সম্পাদক মণ্ডলীর অনুমোদনক্রমে প্রকাশ করা হয়।

তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয়। কোনোও রচনার প্রাপ্তি-স্বীকৃতি, পত্র মারফৎ জানানো হয় না।

নাম ঠিকানা লেখা ডাকটিকিট লাগানো খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

কোনো রচনা তিন মাসের বেশী রাখা হয়না।

শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাবেন।

গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেস ম্যানেজার, পাব্লিকেশন ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী-১। এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

“ধনধান্যে” পড়ুন
দেশকে জানুন

ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সোসাইটি লিঃ—করোলবাগ, দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত এবং ডিরেক্টার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃ প্রকাশিত।

ধনধান্যে

প্রথম বর্ষ ঃ ১১ ঃ ১৬শে অক্টোবর, ১৯৬৯
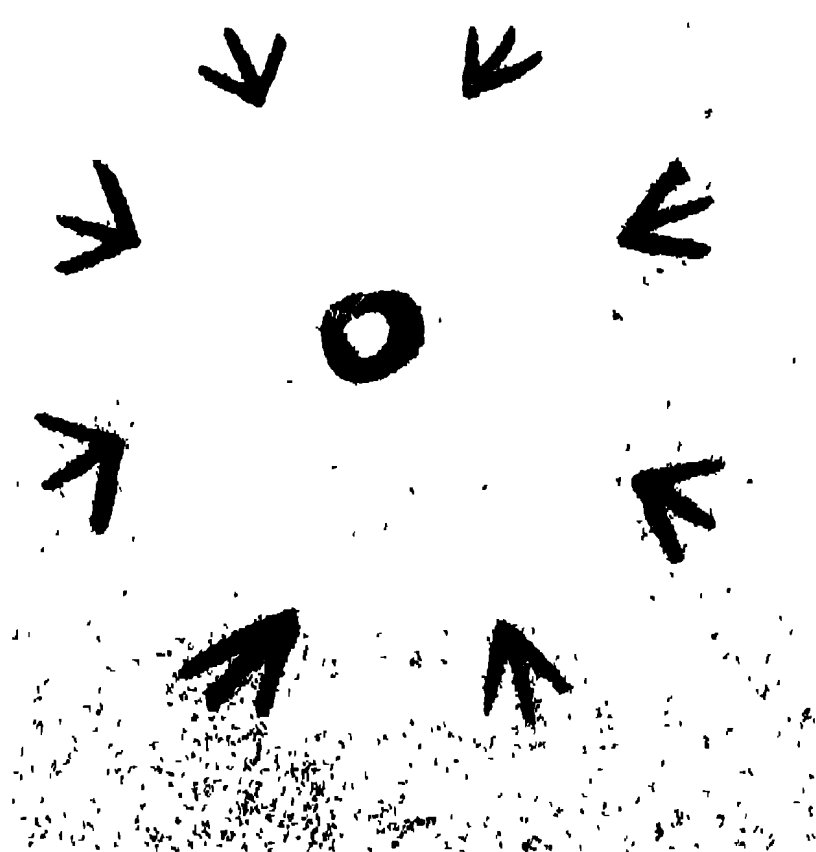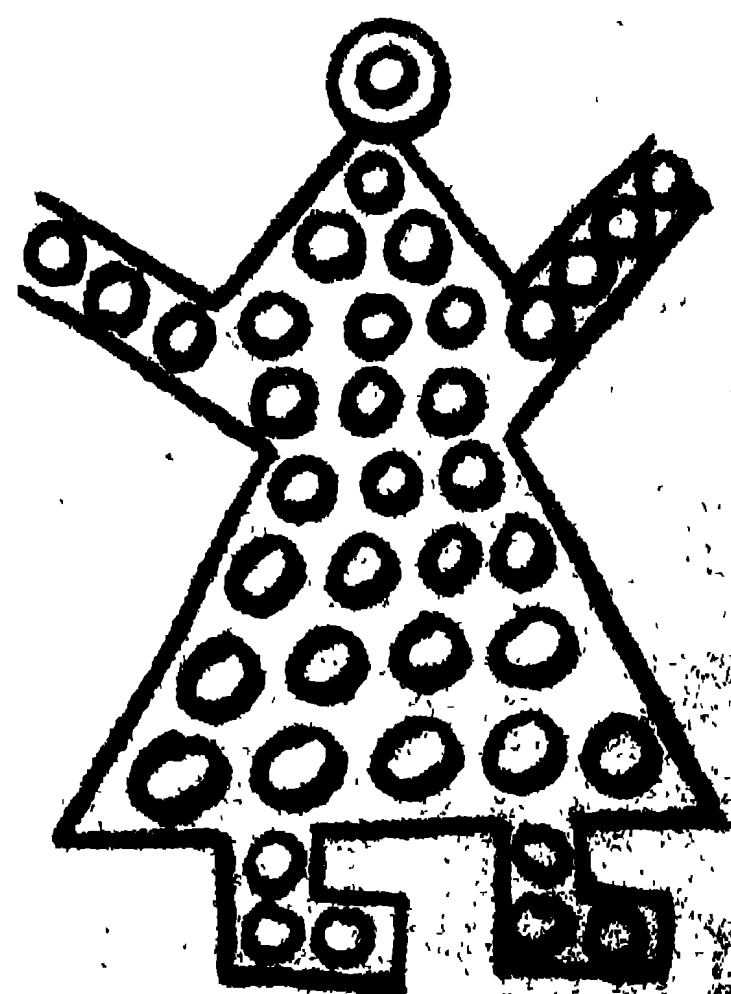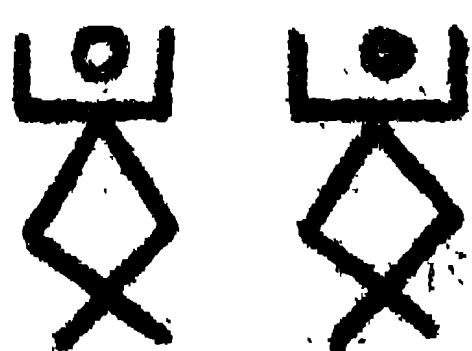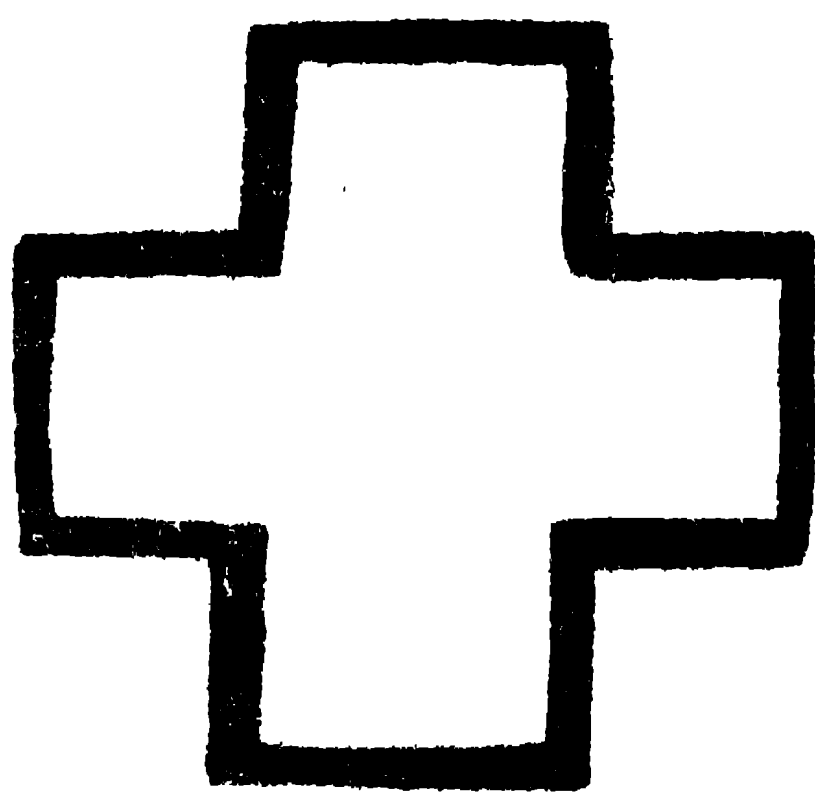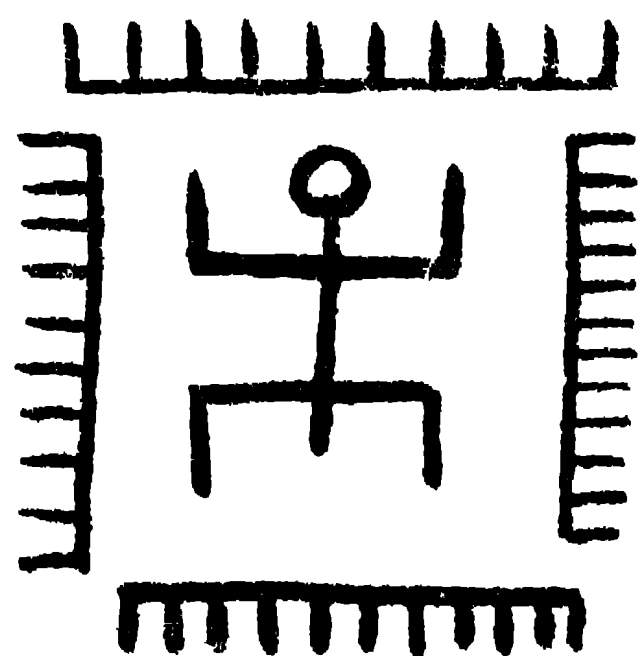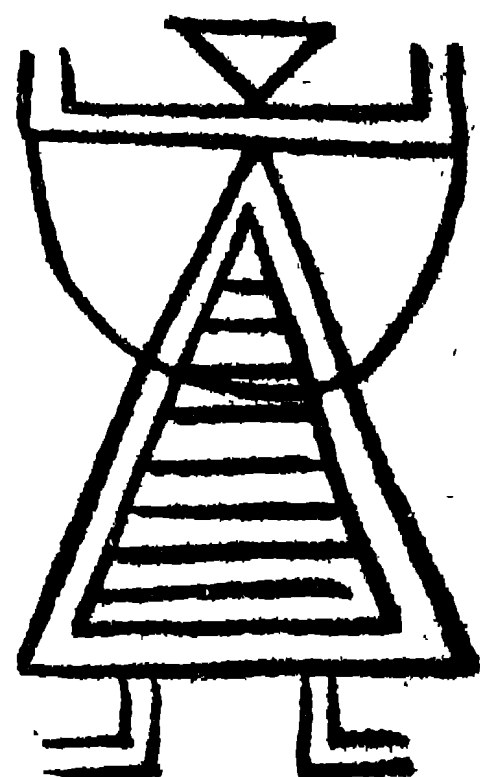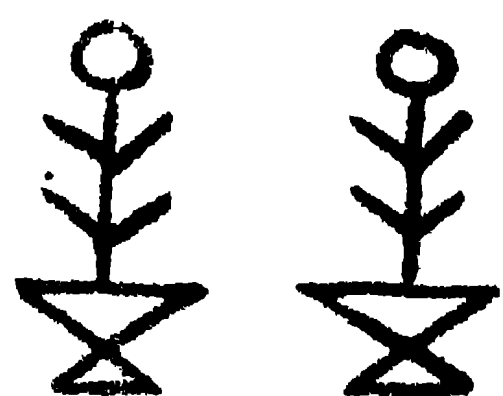
২৫ পয়সা

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত
পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

প্রথম বর্ষ একাদশ সংখ্যা
২৬শে অক্টোবর ১৯৬৯ : ৪ঠা কার্ত্তিক ১৮৯১
Vol. I : No 11 : October 26, 1969

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০

টেলিগ্রাফের ঠিকানা—যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা।

ভুলি নাই

পরহিতে ব্রতী হওয়াই সুখ। যিনি কেবল আত্মসুখের চিন্তাতেই বিভোর, তিনি বস্তুতঃপক্ষে কুমীরকে কাঠের ভেলা মনে ক'রে নদী পার হওয়ার চেষ্টা করেন।

—শঙ্করাচার্য্য

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়

দৃষ্টিহীনতার অভিশাপ

বিশ্বের মোট দৃষ্টিহীনদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশই ভারতীয়। এই বিপুল সংখ্যক স্ত্রী, পুরুষ ও শিশু যাঁরা অসহায় জীবন যাপনে বাধ্য হন তাঁদের সংখ্যা ৫০ লক্ষেরও বেশী। এঁদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন গ্রামে বাস করেন আর শতকরা ৫ জনকে (প্রায় ২৬০০০) বড় বড় সহরগুলিতে অন্যের দয়ার ওপর নির্ভর ক'রে জীবন ধারণ করতে হয়। কিন্তু তথ্যাদি সংগ্রহের পর যখন জানা যায় যে এই দুর্ভাগাদের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেকই বসন্ত, অপুষ্টি বা অজ্ঞানতার ফলে দৃষ্টিহীন হয়েছেন তখনই বুঝতে পারা যায় যে জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষা এবং পুষ্টি ও সামাজিক শিক্ষাদান সম্পর্কে একটা নিম্নতম মান গঠনে জাতীয় ব্যর্থতাই এর কারণ। বিপুল চেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের পল্লী সমাজের দুর্ব্বল স্তরগুলিতে সেই চেষ্টার ফল যে এখনও পর্য্যন্ত পৌঁচচ্ছেনা তা অস্বীকার করার উপায় নেই। সাতটি বড় বড় সহরে যে বিপুল সংখ্যক অন্ধ রয়েছেন তা-ও প্রমাণ করে যে সহর অঞ্চলেও স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা পর্য্যাপ্ত নয়।

গত সপ্তাহে নূতন দিল্লীতে আয়োজিত অন্ধগণের কল্যাণ সম্পর্কিত বিশ্ব পরিষদের চতুর্থ সাধারণ অধিবেশন, এই পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের দেশের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশের ৫০ লক্ষ অন্ধ ব্যক্তির কল্যাণের জন্য আমাদের সামাজিক পরিকল্পনায় বিশেষ কর্ম্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এই অধিবেশনে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন রকম পরিকল্পনা প্রচেষ্টায় এই রকম বিপুল সংখ্যক ব্যক্তির সমস্যাগুলি উপেক্ষা করা যায় না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্যার তিনটি দিক সবিশেষ দুঃখদায়ক। প্রথমতঃ এই সম্পর্কে প্রাপ্তিযোগ্য পরিসংখ্যান খুব স্পষ্ট নয়। দ্বিতীয়তঃ গত ২২ বছরে জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে যে রকম দ্রুতগতিতে উন্নতি হয়েছে, তার সঙ্গে অন্ধদের কল্যাণের জন্য যে সব চেষ্টা করা হয়েছে বা যেটুকু ফল পাওয়া গেছে তা' আদৌ তুলনীয় নয়। তৃতীয়তঃ এই ক্ষেত্রে যা কিছু সাফল্য অর্জ্জিত হয়েছে তার বেশীর ভাগই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির মাধ্যমে এবং বিদেশের এই ধরনের সংস্থা থেকে যে সাহায্য পাওয়া গেছে, তারই ফল হিসেবে। জনসংখ্যার একটা বিপুল অংশের যেখানে বিশেষ ধরণের চিকিৎসার প্রয়োজন, একটা সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের সেই প্রয়োজন মেটাবার যে দায়িত্ব রয়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কাজেই অসুস্থতা, অপুষ্টি এবং অন্যান্য যে সব কারণ দৃষ্টিহীনতার মূলে থাকে, তা প্রতিরোধ করার জন্য জাতীয় ভিত্তিতে ব্যাপক একটা কর্ম্মসূচী তৈরি করা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন তাঁদের পুনর্ব্বসতি ও দেখাশুনা করার জন্য যথেষ্ট সাহায্যের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

অন্ধদের কর্ম্মসংস্থানের জন্য পরিষদ যে সব পরামর্শ দিয়েছেন সেগুলিও বিশেষভাবে বিবেচনা ক'রে দেখার যোগ্য। যাঁকে লাঠি ঠুকে ঠুকে পথ চলতে হয় তাঁর কি প্রয়োজন সেটা জানা বিশেষ দরকার। অন্ধ ব্যক্তির যেমন তার জীবনকে সফল ক'রে তোলার জন্য সাহস, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও ঐকান্তিক ইচ্ছা প্রয়োজন, তেমনি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য পাশ্চাত্যে ইতিমধ্যেই যে সব নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে, রাষ্ট্রেরও সেগুলির সুযোগ গ্রহণ করার একটা দায়িত্ব রয়েছে।

"বিজ্ঞানের যুগে অন্ধ ব্যক্তি" এই বিষয়টিই ছিল পরিষদের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। পরিষদের অধিবেশনে বহু নতুন ধরনের ইলেকট্রোনিক কৌশল, যেমন পড়ার মেসিন (১০ হাজার শব্দ স্পর্শের সাহায্যে মনে রাখা), দূরের কোন লাইব্রেরি থেকে কম্পিউটার ড্রয়িং, তথ্য কারট্রিজ, ব্রেইল এবং সাধারণ আই. বি. এম টাইপ রাইটার, ক্লাসে পড়ানোর জন্য দূর থেকে নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্রেইল টাইপ রাইটার এবং রাস্তায় চলার জন্য অন্ধদের পক্ষে ব্যবহারযোগ্য রেডার যন্ত্রের কথা নিয়ে আলোচনা হয়। এই সব জিনিস কেবলমাত্র ধনীরাই ব্যবহার করতে পারেন এমন কথা এখন আর বলা যায় না। আমরা যে জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র গঠন করতে চাইছি, সেই রাষ্ট্রে, গ্রামাঞ্চলে যে শতকরা ৭০ ভাগ অন্ধ বাস করছেন, তাঁদের কাছেও এই সব নতুন পন্থাগুলি পৌঁছুনো উচিত। অন্ধ ব্যক্তিদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে দেশীয় সাজ সরঞ্জাম উদ্ভাবন করার জন্যও অবিরাম গবেষণা প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে রাস্তার মোড়ে লাঠির ঠুক ঠুক শুনলেও চক্ষুষ্মান তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে যান না। টেলিফোনে যেমন ঘন্টা বেজে ওঠে তেমনি সামনে কোন বাধা দেখলে ঘন্টা বাজিয়ে সতর্ক ক'রে দেয় এই ধরণের নতুন কোন ইলেকট্রোনিক যন্ত্র বিশিষ্ট লাঠি উদ্ভাবন করার চেষ্টাও করা যেতে পারে।

দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললেও মানুষ তার ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে পারে। যাঁরা এই রকম অসহায় জীবন যাপন করতে বাধ্য হন, তাঁদের সাহায্য করা সম্পর্কে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদেরও যে একটা দায়িত্ব আছে তা উপলব্ধি করার সময় এসেছে। অন্ধ ব্যক্তিরা যাতে বিশেষ ধরণের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে খানিকটা অন্ততঃ আত্মনির্ভরশীল হ'তে পারেন সেজন্য তাঁদের সাহায্য করা উচিত। দৃষ্টিহীন হওয়া যে শুধু দৈহিক একটা অক্ষমতা তাই নয়, এটা একটা ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষতি, এটা আমাদের ভোলা উচিত নয়। অন্ধ ব্যক্তির একটিমাত্র আলো হ'ল জীবনের আলো।

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা, 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

প্রথম বর্ষ একাদশ সংখ্যা

২৬শে অক্টোবর ১৯৬৯ : ৪ঠা কার্তিক ১৮৯১

Vol. 1 : No 11 : October 26, 1969

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

প্রধান সম্পাদক
শরদিন্দু সান্যাল

সহ সম্পাদক
নীরদ মুখোপাধ্যায়

সহকারিণী (সম্পাদনা)
গায়ত্রী দেবী

সংবাদদাতা (কলিকাতা)
বিবেকানন্দ রায়

সংবাদদাতা (মাদ্রাজ)
এস. ভি. রাঘবন

সংবাদদাতা (দিল্লী)
পুষ্করনাথ কৌল

ফোটো অফিসার
টি. এস নাগরাজন

প্রচ্ছদপট শিল্পী
জীবন আডালজা

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট স্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০

টেলিগ্রাফের ঠিকানা—যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা।

ভুলি নাই

পরহিতে ব্রতী হওয়াই সুখ। যিনি কেবল আত্মসুখের চিন্তাতেই বিভোর, তিনি বস্তুতঃপক্ষে কুমীরকে কাঠের ভেলা মনে ক'রে নদী পার হওয়ার চেষ্টা করেন।

—শঙ্করাচার্য্য

এই সংখ্যায়

দৃষ্টিহীনতার অভিশাপ

সম্পাদকীয়

বিশ্বের মোট দৃষ্টিহীনদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশই ভারতীয়। এই বিপুল সংখ্যক স্ত্রী, পুরুষ ও শিশু যাঁরা অসহায় জীবন যাপনে বাধ্য হন তাঁদের সংখ্যা ৫০ লক্ষেরও বেশী। এঁদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন গ্রামে বাস করেন আর শতকরা ৫ জনকে (প্রায় ২৬০০০) বড় বড় সহরগুলিতে অন্যের দয়ার ওপর নির্ভর ক'রে জীবন ধারণ করতে হয়। কিন্তু তথ্যাদি সংগ্রহের পর যখন জানা যায় যে এই দুর্ভাগাদের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেকই বসন্ত, অপুষ্টি বা অজ্ঞানতার ফলে দৃষ্টিহীন হয়েছেন তখনই বুঝতে পারা যায় যে জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষা এবং পুষ্টি ও সামাজিক শিক্ষাদান সম্পর্কে একটা নিম্নতম মান গঠনে জাতীয় ব্যর্থতাই এর কারণ। বিপুল চেষ্টা সত্বেও আমাদের পল্লী সমাজের দুর্ব্বল স্তরগুলিতে সেই চেষ্টার ফল যে এখনও পর্য্যন্ত পৌঁচচ্ছেনা তা অস্বীকার করার উপায় নেই। সাতটি বড় বড় সহরে যে বিপুল সংখ্যক অন্ধ রয়েছেন তা-ও প্রমাণ করে যে সহর অঞ্চলেও স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা পর্য্যাপ্ত নয়।

গত সপ্তাহে নূতন দিল্লীতে আয়োজিত অন্ধগণের কল্যাণ সম্পর্কিত বিশ্ব পরিষদের চতুর্থ সাধারণ অধিবেশন, এই পরি-প্রেক্ষিতে, আমাদের দেশের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশের ৫০ লক্ষ অন্ধ ব্যক্তির কল্যাণের জন্য আমাদের সামাজিক পরিকল্পনায় বিশেষ কর্ম্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এই অধি-বেশনে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন রকম পরিকল্পনা প্রচেষ্টায় এই রকম বিপুল সংখ্যক ব্যক্তির সমস্যাগুলি উপেক্ষা করা যায় না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্যার তিনটি দিক সবিশেষ দুঃখ-দায়ক। প্রথমতঃ এই সম্পর্কে প্রাপ্তিযোগ্য পরিসংখ্যান খুব স্পষ্ট নয়। দ্বিতীয়তঃ গত ২২ বছরে জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে যে রকম দ্রুতগতিতে উন্নতি হয়েছে, তার সঙ্গে অন্ধদের কল্যাণের জন্য যে সব চেষ্টা করা হয়েছে বা যেটুকু ফল পাওয়া গেছে তা' আদৌ তুলনীয় নয়। তৃতীয়তঃ এই ক্ষেত্রে যা কিছু সাফল্য অর্জ্জিত হয়েছে তার বেশীর ভাগই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা-গুলির মাধ্যমে এবং বিদেশের এই ধরনের সংস্থা থেকে যে সাহায্য পাওয়া গেছে, তারই ফল হিসেবে। জনসংখ্যার একটা বিপুল অংশের যেখানে বিশেষ ধরণের চিকিৎসার প্রয়োজন, একটা সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের সেই প্রয়োজন মেটাবার যে দায়িত্ব রয়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কাজেই অসুস্থতা, অপুষ্টি এবং অন্যান্য যে সব কারণ দৃষ্টিহীনতার মূলে থাকে, তা প্রতিরোধ করার জন্য জাতীয় ভিত্তিতে ব্যাপক একটা কর্ম্মসূচী তৈরি করা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন তাঁদের পুনর্ব্বসতি ও লেখাপড়া করার জন্য যথেষ্ট সাহায্যের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

অন্ধদের কর্ম্মসংস্থানের জন্য পরিষদ যে সব পরামর্শ দিয়েছেন সেগুলিও বিশেষভাবে বিবেচনা ক'রে দেখার যোগ্য। যাঁকে লাঠি ঠুকে ঠুকে পথ চলতে হয় তাঁর কি প্রয়োজন সেটা জানা বিশেষ দরকার। অন্ধ ব্যক্তির যেমন তার জীবনকে সফল ক'রে তোলার জন্য সাহস, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও ঐকান্তিক ইচ্ছা প্রয়োজন, তেমনি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য পাশ্চাত্যে ইতি-মধ্যেই যে সব নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে, রাষ্ট্রেরও সেগুলির সুযোগ গ্রহণ করার একটা দায়িত্ব রয়েছে।

"বিজ্ঞানের যুগে অন্ধ ব্যক্তি" এই বিষয়টিই ছিল পরিষদের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। পরিষদের অধিবেশনে বহু নতুন ধরনের ইলেকট্রোনিক কৌশল, যেমন পড়ার মেসিন (১০ হাজার শব্দ স্পর্শের সাহায্যে মনে রাখা), দূরের কোন লাইব্রেরি থেকে কম্পিউটার ড্রয়িং, তথ্য কারট্রিজ, ব্রেইল এবং সাধারণ আই. বি. এম টাইপ রাইটার, ক্লাসে পড়ানোর জন্য দূর থেকে নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্রেইল টাইপ রাইটার এবং রাস্তায় চলার জন্য অন্ধদের পক্ষে ব্যবহার-যোগ্য রেডার যন্ত্রের কথা নিয়ে আলোচনা হয়। এই সব জিনিস কেবলমাত্র ধনীরাই ব্যবহার করতে পারেন এমন কথা এখন আর বলা যায় না। আমরা যে জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র গঠন করতে চাইছি, সেই রাষ্ট্রে, গ্রামাঞ্চলে যে শতকরা ৭০ ভাগ অন্ধ বাস করছেন, তাঁদের কাছেও এই সব নতুন পন্থাগুলি পৌঁছুনো উচিত। অন্ধ ব্যক্তিদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে দেশীয় সাজ সরঞ্জাম উদ্ভাবন করার জন্যও অবিরাম গবেষণা প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে রাস্তার মোড়ে লাঠির ঠুক ঠুক শুনলেও চক্ষুষ্মান তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে যান না। টেলিফোনে যেমন ঘন্টা বেজে ওঠে তেমনি সামনে কোন বাধা দেখলে ঘন্টা বাজিয়ে সতর্ক ক'রে দেয় এই ধরণের নতুন কোন ইলেকট্রো-নিক যন্ত্র বিশিষ্ট লাঠি উদ্ভাবন করার চেষ্টাও করা যেতে পারে।

দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললেও মানুষ তার ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে পারে। যাঁরা এই রকম অসহায় জীবন যাপন করতে বাধ্য হন, তাঁদের সাহায্য করা সম্পর্কে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদেরও যে একটা দায়িত্ব আছে তা উপলব্ধি করার সময় এসেছে। অন্ধ ব্যক্তিরা যাতে বিশেষ ধরণের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে খানিকটা অন্ততঃ আত্মনির্ভরশীল হ'তে পারেন সেজন্য তাঁদের সাহায্য করা উচিত। দৃষ্টিহীন হওয়া যে শুধু দৈহিক একটা অক্ষমতা তাই নয়, এটা একটা ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষতি, এটা আমাদের ভোলা উচিত নয়। অন্ধ ব্যক্তির একটিমাত্র আলো হ'ল জীবনের আলো।

সেবাগ্রাম

গান্ধীজীও প্রাচীন ঋষিদের মতো সহজ অনাড়ম্বর আশ্রম জীবন পছন্দ করতেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র-বান্ধব এবং গ্রামের দরিদ্রের মতোই বাস করতে চাইতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন "আমার মন ভারতের গ্রামগুলিতে পড়ে থাকে।" তিনি যে দুটি প্রধান আশ্রমে বাস করেছেন সে দুটি হল সবরমতী ও সেবাগ্রাম।

১৯৩৬ সালে গান্ধীজী সেবাগাঁওতে যান এবং গ্রামটি দেখে সেখানেই বাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এর জন্যেও তিনি গ্রামবাসীদের সম্মতি নেন। তিনি ওদের বলেন যে, "আমি তোমাদের গ্রামের রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার ক'রে দিয়ে এবং আমার পক্ষে যতটুকু সাহায্য করা সম্ভব ততটুকু সাহায্য ক'রে আমি তোমাদের সেবা করার চেষ্টা করবো। গ্রামে যদি কারুর অসুখ হয় তাহলে তার সেবা শুশ্রূষা ক'রে, স্বাবলম্বী হতে সাহায্য ক'রে এবং গ্রামের হস্তশিল্পগুলি পুনরুজ্জীবিত ক'রে আমি গ্রামের সেবা করবো।"

ওয়ার্ধার ৮ কিঃ মীঃ পূর্ব্বে সেবাগ্রাম। এর পুরাণো নাম ছিল সেবাগাঁও। একই নামের দুটি জায়গা থাকায় যে গ্রামটিতে আশ্রম তৈরী করা হয় সেটির নাম বদলে সেবাগ্রাম রাখা হয়। গান্ধীজী যখন সেখানে যান তখন একটা ভালো রাস্তা পর্য্যন্ত ছিলনা। ঐ এলাকার আবহাওয়া ভালো ছিলনা, গ্রামগুলিতে ভীষণ ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হতো। গান্ধীজীসহ আশ্রমের সব অধিবাসী ম্যালেরিয়ায় ভুগতেন। গ্রামের ৬০০ জন অধিবাসীর

এই মাঠে গান্ধীজী যেখানে উপাসনা সভায় যোগ দিতেন, সেখানে এই কাঠটিতে হেলান দিয়ে তিনি বসতেন।

পরচুর কুটীর এইখানে বাস করতেন পরচুর শাস্ত্রী। তিনি কুষ্ঠরোগে ভুগছিলেন এবং গান্ধীজী প্রত্যেকদিন এই কুটীরে এসে তাঁর ঘা ধুয়ে ওষুধ লাগিয়ে দিতেন।

মধ্যে বেশীর ভাগই হরিজন ছিলেন বলে, অন্যের অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা ক'রে তিনি ঐ গ্রামেই বাস করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন।

প্রথমবার যখন গান্ধীজী এই গ্রামে আসেন তখন প্রায় ৬ মাইল পদব্রজে এবং প্রায় দুই মাইল গরুর গাড়ীতে চড়ে আসেন। তখন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। তাঁর জন্য একটি কুটীর তৈরী করার কাজ শেষ হওয়ার আগেই তিনি কাজ শুরু করে দেন। তিনি যতদিন সেবাগ্রামে ছিলেন ততদিন সুদূরের ঐ গ্রামটিকে ভারতের দ্বিতীয় রাজধানী বলে মনে হোত। বিদেশের বিখ্যাত ব্যক্তিরা, বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি-দল সেবাগ্রামে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। এমন কি কয়েকজন বিদেশীও আশ্রমে বসবাস করতে শুরু করেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে অনেক সিদ্ধান্ত এখানেই গৃহীত হয়।

আশ্রমে কয়েকটি বেশ সুন্দর সুন্দর কুটির আছে—যেমন বাপু কুঠী, আদি-নিবাস, বা কুঠী, অন্তনিবাস ইত্যাদি। অন্যান্য কুটিরগুলির মধ্যে পরচুর কুটীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কুটিরে থাকতেন পরচুর শাস্ত্রী নামক একজন কুষ্ঠ রোগী। গান্ধীজী প্রত্যেকদিন তার কুটীরে এসে তাঁর ঘা পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে দিতেন।

প্রাত:কালীন উপাসনা দিয়ে আশ্রমের কাজ শুরু হ'ত। খোলা মাঠে বসে উপাসনা করা হত। ঐ মাঠে ১৯৩৬ সালে গান্ধীজী একটি পিপুল বৃক্ষের চারা রোপন করেন এবং কস্তুরবা ১৯৪২ সালের ২রা আগষ্ট আর একটি বৃক্ষ রোপন করেন।

এই উপাসনায় সমস্ত ভাষায় প্রার্থনা সঙ্গীত গাওয়া হ'ত। এমন কি এখনও এই আশ্রমে তখনকার মতো সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করা হয়। আশ্রমের অধিবাসীরাই আশ্রমটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন। গান্ধীজী যে গঠনমূলক কাজের ওপরে গুরুত্ব দিতেন, এখনও তেমনি গঠনমূলক কাজের ওপরেই জোর দেওয়া হয়। আশ্রমের কাছেই রয়েছে হিন্দুস্তানী তালিমি সঙ্ঘের বাড়ী। এই সঙ্ঘ গান্ধীজীর অন্যতম প্রিয় বিষয় বুনিয়াদী শিক্ষা
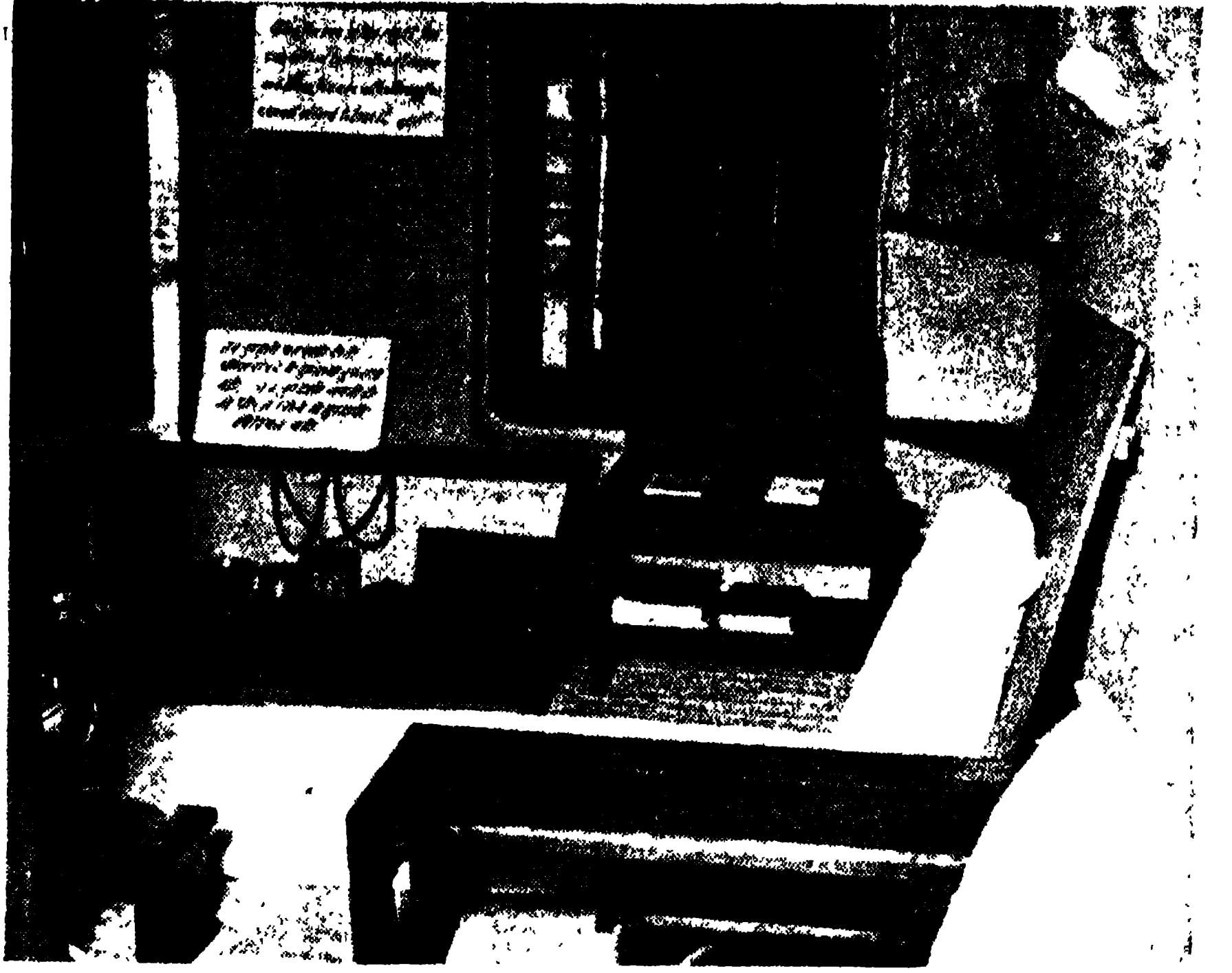
বাপু কুটিরের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য। তিনি যে সব জিনিস ব্যবহার করতেন যেমন রামায়ণ, গীতা, বাইবেল, ইত্যাদি এখানে সংরক্ষিত রয়েছে।

বিস্তারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সুতো কাটা, বয়ন এবং অন্যান্য হস্তশিল্প এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়।

সেবাগ্রামের কাছেই মহাত্মা গান্ধী মেডিকেল কলেজ এবং কস্তুরবা হাসপাতাল স্থাপন করা হচ্ছে। এখন গান্ধীজীর ভ্রাতুষ্পুত্রী নির্মলা বহেনের নেতৃত্বে গান্ধীজীর আদর্শ অনুযায়ী এই আশ্রমের কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে।

★ বোম্বাইর মাজাগাঁও ডকে, মাছ ধরার জন্য যে ২০টি ট্রলার শ্রেণীর জাহাজ তৈরি করা হচ্ছে, তার প্রথমটি, কেন্দ্রীয় সরকারের, গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা সম্পর্কিত সংস্থার হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। জাহাজটির নাম দেওয়া হয়েছে 'মীন খোজিনি' এবং এটি তৈরি করতে খরচ হয়েছে ৮.৭৫ লক্ষ টাকা। জাহাজ নির্মাণ সম্পর্কিত পশ্চিম উপকূলের নির্মাণকারী সংস্থা এই ট্রলারগুলি তৈরি করছেন।

যে দেশে ভূমির ওপর চাপ কম, সেই দেশের তুলনায় যে দেশে ভূমির ওপর জনসংখ্যার চাপ অত্যন্ত বেশী, সেই দেশের অর্থনীতি ও সভ্যতা ভিন্ন হতে বাধ্য এবং তাই হওয়া উচিত। অল্প জনসংখ্যা বিশিষ্ট আমেরিকার যন্ত্রের প্রয়োজন বেশী হতে পারে কিন্তু ভারতের সেগুলির কোন প্রয়োজনই থাকতে পারে না। যেখানে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক অলস জীবন যাপন করছে সেখানে শ্রম বাঁচানোর উপায় সম্পর্কে চিন্তা করার কোন অর্থ হয় না।

সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য পূরণে গান্ধীভাবধারার প্রয়োগ

নবকুমার শীল

বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজীর সামাজিক দৃষ্টি ভঙ্গী, তাঁর চিন্তাধারা ও জীবন দর্শন সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দিতে পারে। গান্ধীজীর ভাবনা ছিল বরাবরই বৈপ্লবিক। এই বৈপ্লবিক মনোভাবই সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পথকে বিশেষভাবে প্রশস্ত করেছে। গান্ধীজী তাঁর অহিংস আন্দোলন সুরু করেছিলেন সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে দিয়ে। অর্থনৈতিক সমতার মধ্য দিয়ে ধনী দরিদ্র, পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে যে সংঘাত রয়েছে তার অবসান করায় তিনি ছিলেন উদ্যোগী।

সমাজতন্ত্রী আদর্শের লক্ষ্য হ'ল অর্থ-নৈতিক সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা। এ বিষয়ে গান্ধীজীর বিশ্বাসবোধ ছিল স্বতন্ত্র। তিনি মনে করতেন—"নিম্নতম স্তর পর্যন্ত সামাজিক সুবিচারের প্রতিষ্ঠা বলপ্রয়োগের দ্বারা অসম্ভব। নিম্নতম স্তরের মানুষেরা যে অবিচার ভোগ করছে, অহিংসার পথে তারা নিজেরাই সে অবিচারের প্রতিকার করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। সে পথ হ'ল অহিংস অসহযোগ। নিজের সর্বনাশ ঘটে বা দাসত্ব স্বীকার করতে হয় তেমন ব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করতে কেউ বাধ্য নয়। পরের চেষ্টায় যে স্বাধিকার পাওয়া যায় তা যতই কল্যাণকর হোক না কেন, যখনই সে চেষ্টা প্রত্যাহৃত হবে তখনই আর সে স্বাধিকারকে রক্ষা করা যাবে না। কিন্তু যখনই অহিংস অসহযোগের দ্বারা এই স্বাধিকার অর্জনের কলাকৌশল আয়ত্ব করা যাবে তখনই তার উদ্দীপনা নিম্নতম স্তরের মানুষ অনুভব করতে পারবে।" তিনি মনে করতেন, যদি অহিংসার পথে এ কাজ করতে হয় তবে, দরিদ্র ও অর্থবান উভয়কেই সে বিষয়ে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। বাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গীই গান্ধী ভাবধারায় সত্যিকারের সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মূল উপজীব্য।

সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক সমতা আনতে হলে প্রচলিত অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন করে গান্ধীজীর নির্দেশিত শিক্ষা ও মতকে গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানের অর্থনীতিতে মানুষের অভাববোধ ও চাহিদা পূরণের বোধকে নির্দিষ্ট করে দেখানো হয়েছে। এই অভাববোধ বা অভাব সৃষ্টির অর্থনীতিকে গান্ধীজী সমর্থন করতেন না। কেন না তিনি বিশ্বাস করতেন যে, 'প্রকৃত অর্থে সভ্যতা অভাব বৃদ্ধির মধ্যে নিহিত নয়, বরং দৃঢ়তার সহিত এবং স্বেচ্ছায় অভাবের খর্বীকরণের মধ্যেই তা নিহিত।' সেজন্য তিনি অর্থনীতিকে প্রকৃত নৈতিকবোধের সঙ্গে যুক্ত করার কথা বলেছিলেন। প্রকৃত নৈতিক মূল্যবোধের অনুসরণে বৈষম্যের সৃষ্টি হয় না, তার ফলে সমাজে সমতা বিরাজ করে। তিনি বলেছিলেন, যে অর্থনীতি নৈতিক মূল্যকে অবহেলা করে অথবা তাকে অবজ্ঞা করে সেই অর্থনীতি ভুল। প্রকৃত অর্থনীতি কখনই উচ্চতম নৈতিকমানের বিরোধিতা করতে পারে না। যে অর্থনীতি ধনকুবেরের প্রশস্তি রচনা করে এবং দুর্বলের ক্ষতি ক'রে বলশালীকে সম্পদ সংগ্রহে সক্ষম ক'রে তোলে সেই অর্থনীতি মিথ্যা এবং তা মৃত্যুর সামিল।'

সুতরাং সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হলে আর্থিক সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য গান্ধী প্রচারিত অর্থনীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। সে অর্থনীতি দুর্বলতমসহ সকলের কল্যাণ সমানভাবে বর্ধন করে। বস্তুতঃ গান্ধীজী সমতার অর্থনীতির যে আদর্শ তুলে ধরেছিলেন তাতে একদিকে যেমন সমাজকে নতুন ধাঁচে গঠন করার কথা আছে তেমনি মানুষের জীবনকে অনুকূল আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করারও কথা আছে। আদর্শের মূল কথা—নির্লোভতা, অপরিগ্রহ, শারীরশ্রমের মর্যাদা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ।

গান্ধীজী তাঁর আদর্শ ও শিক্ষাকে অহিংসা ও সত্যের মধ্য দিয়ে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন ও সমাজতন্ত্রের মূল কাঠামো গঠন করার জন্য তাঁর চিন্তাধারা বার বার তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে প্রয়োগ করেছেন। সত্য ও অহিংসাকে তিনি একই মুদ্রার দুপিঠ বলে উল্লেখ করেছেন। সত্য ও অহিংসা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সত্যের দৃষ্টিতে সব মানুষ সমান, ছোট বড় কোন ভেদাভেদ নাই। 'অহিংসার বেলাতেও এ কথা সত্য। গান্ধীজী অহিংসা বলতে শুধুমাত্র হিংসা থেকে নিবৃত্ত থাকা বোঝাতেন না। তিনি বলতেন, অহিংসার মানে প্রেম। যিনি অহিংস তিনি সবাইকে ভালবাসবেন। কাউকে শোষণ করবেন না। শোষণই তো হিংসার মূল। সুতরাং শোষণই যদি না থাকে তবে আর অসাম্যের সম্ভাবনা কোথায়? চারিদিকের পরিবেশ, সমাজের ব্যবস্থা যদি এমন হয় যে মানুষের মনে ক্রমাগত হিংসার সঞ্চার ঘটতে থাকে তবে সাধারণ মানুষ আর কতদিন মুখের কথায় অহিংস থাকতে পারে? সেজন্য গান্ধীজী আর্থিক সমতার ভিত্তিতে প্রকৃত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অহিংস অর্থাৎ শোষণহীন সমাজগঠন করার কথা বলেছিলেন। কেন না সাধারণ মানুষ বেশিদিন ধরে পরিস্থিতি ও পরিবেশকে অগ্রাহ্য করে থাকতে পারে না। নীতিবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সাধারণ মানুষ কিছুদিন হয়তো আদর্শ অনুসারে জীবন যাপন করতে পারে বটে, কিন্তু বার বার সামাজিক পরিস্থিতি ও পরিবেশের চাপ তাকে দুর্বল ক'রে ফেলে এবং সে অবশেষে আদর্শচ্যুত হয়ে কালের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। গান্ধীজী সমাজ ব্যবস্থা তথা অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকৃত করতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজী যে গ্রামস্বরাজ ও পল্লীশিল্পের কথা বলতেন তা হোল বিকেন্দ্রীকৃত সমাজের রূপ। এই বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থায় সমাজ একটি বড় পরিবারের মত হবে। পরিবারের প্রত্যেকের কথা চিন্তা করে সমাজেও তেমনি সকলে সকলের সুখ দুঃখের অংশীদার হবে। আসলে সমাজের ব্যবস্থাই হবে এমন যাতে প্রত্যেকের কল্যাণ হবে, প্রত্যেকের স্বার্থ রক্ষা হবে। এই ব্যবস্থা

কখনই কেন্দ্রীভূত সমাজে সম্ভব নয়। সেজন্য গান্ধীজী বলেছিলেন 'যে লক্ষ্যের জন্য চেষ্টা করতে হবে তা হ'ল সুখ, যে সুখ পরিপূর্ণ মানসিক ও নৈতিক উন্নতির সঙ্গে যুক্ত। আমি নৈতিক কথাটি আধ্যাত্মিক কথার অর্থে ব্যবহার করেছি। বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থাতেই এই লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব। একটা ব্যবস্থা হিসেবে কেন্দ্রীকরণ অহিংস সমাজ কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন।' অহিংস সমাজের অর্থই—শোষণহীন সমাজ। অপরিগ্রহ সেই শোষণহীন সমাজ গঠনের অন্যতম সোপান।

সমাজকে বিকেন্দ্রীকৃত করার অর্থ—উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকৃত করা। বড় বড় শিল্প সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ বৃহৎ ও কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। উৎপাদনের সাধন ও ব্যবস্থার উপর সমাজের কাঠামো অনেকাংশে নির্ভর করে। সেজন্য গান্ধীজী শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য উৎপাদনের সাধনের আমূল পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন। উৎপাদনের বিশেষ কোন সাধনের প্রতি গান্ধীজীর কোন বিদ্বেষ বা আগ্রহ ছিল না। তিনি সেই সব সাধনগুলি স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন সেগুলি ব্যবহারের ফলে বেকার সৃষ্টি হবে না ও শোষণ বা আর্থিক বৈষম্য দেখা দেবে না। প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর এ ধরনের নজীর খুব কমই স্মরণে আসে। 'শ্রমের উপর আশ্রিত' স্বীকার করে নিলে বর্তমানের সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন হতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, বর্তমানে পুঁজীবাদ আশ্রয় করে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাকেই রচনা করা হয়েছে বলে পুঁজিপতি ও শ্রমিক নামেই যে দুটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে, তা নয়, উপরন্তু উৎপাদক ও ব্যবস্থাপক রূপেও দুটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। উৎপাদকেরা শ্রমের দ্বারা নানান জিনিস উৎপাদন করেন আর ব্যবস্থাপকেরা গায়ে না খেটে সেই সব উৎপাদিত জিনিস বিতরণ করেন। উৎপাদকেরা সংখ্যায় বেশী, তাঁরা নিজেদের জন্য পারিশ্রমিক পান কম আর ব্যবস্থাপক সংখ্যায় কম, তারা নিজেদের জন্য পারিশ্রমিক বেশী করে নেন। সুতরাং আর্থিক সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য যতদূর সম্ভব এই ব্যবস্থাপক শ্রেণীটিরও বিলোপ করতে হবে। তার জন্য কায়িক শ্রমকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে ও উৎপাদনের কাজে সকলকেই কোন না কোনভাবে যুক্ত হতে হবে। গান্ধীজীর সমাজতন্ত্রের ভাবধারার বৈশিষ্ট্য এইখানেই। বড় শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রের পরিচালনাধীনে রাখার স্বপক্ষে তিনি বলেছেন, 'অর্থনীতির বনিয়াদ সুদৃঢ় করতে হলে সব বড় বড় কারখানাগুলিকে জাতীয়করণ অথবা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা উচিত। সেখানে লোকেরা লাভের জন্য কাজ করবে না, কাজ করবে মানবতার কল্যাণের জন্য। লোভের জায়গায় ভালবাসাই হবে সেখানে কাজের প্রেরণা।' কিন্তু এই ধরণের কল কারখানার একটা সীমা আছে। প্রধানতঃ সমতার দিকে লক্ষ্য রেখে উৎপাদন ব্যবস্থা শ্রমকেন্দ্রিক করা উচিত।

গান্ধীজী তাঁর জীবনব্যাপী কর্মের মধ্য দিয়ে, সমাজের সকল স্তরের মানুষের সংস্পর্শে এসে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট, ভাব-অভাব, সুখ-দারিদ্র্য ও অনুভূতি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি সমাজের কল্যাণে মানুষের অন্তরকে গড়ে তোলার ব্রত নিয়েছিলেন। সমাজের কল্যাণ যেমন সমাজের মানুষের উপর নির্ভর করে তেমনি অর্থনৈতিক উন্নতির কাঠামোকে গড়ে তুলতে হলে চাই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজ গঠন। সমাজের চরম লক্ষ্যই তো হ'ল হিংসা থেকে মুক্তি লাভ। শোষণও হিংসার একটা রূপ, এই শোষণ থেকেই আর্থিক অসাম্য ও অন্যান্য সামাজিক ব্যাধির সৃষ্টি সুতরাং সমাজে যে যে ক্ষেত্রে হিংসা সৃষ্টি হয় সেগুলির পরিবর্তন সাধন করতে হবে তেমনি মানুষের অনুভব ও চিন্তাধারারও সংশোধন প্রয়োজন। গান্ধীজী এই হৃদয় পরিবর্তনের উপর খুবই জোর দিতেন।

গান্ধীদর্শনের অর্থ এবং তাৎপর্য দেশ ও কালের সীমানা ছাড়িয়েছে। কল্যাণব্রতী সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যই তাঁর অহিংস নীতি সর্বত্র গৃহীত হবে। এই পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে মানুষের মর্যাদা ও মূল্যকে তুলে ধরার জন্যই গান্ধীজী প্রথম প্রতিরোধ আন্দোলন সুরু করেছিলেন। এই আন্দোলনই 'সত্যাগ্রহ'। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন যে, সত্যরূপ অস্ত্রকে যদি ঠিকমত ব্যবহার করা যায় তাহলে হিংসার আশ্রয় না নিয়েও শান্তিপূর্ণ পথে পরিবর্তন সাধন করা যায়। এই পরিবর্তন সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুই ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য।

কোন সুস্থ ব্যক্তি যদি সদুপায়ে নিজের আহার্যের সংস্থান না করে, আমার 'অহিংসা' সেই রকম কোন ব্যক্তিকে বিনামূল্যে আহার্যদানের বিরোধী। আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকতো তাহলে বিনামূল্যে আহার্য বিতরণকারী সব সদাব্রত আমি বন্ধ করে দিতাম। এই বৃত্তি জাতির পক্ষে অবমাননাকর এবং তা অলসতা, কর্মবিমুখতা এমন কি অপরাধ প্রবৃত্তিকে পর্য্যন্ত উৎসাহিত করে।

প্রত্যেকেই যদি পরিশ্রম করে জীবন ধারণ করতেন, এই পৃথিবী তাহলে স্বর্গে পরিণত হত। বিশেষ গুণের ব্যবহার সম্পর্কিত প্রশ্নটি পৃথকভাবে বিবেচনা করার প্রয়োজনই হতো না। প্রত্যেকেই যদি পরিশ্রম করে জীবন ধারণ করেন তাহলে কবি, ডাক্তার আইন ব্যবসায়ী প্রত্যেককেই তাঁদের গুণগুলিকে সমাজের সেবায় প্রয়োগ করাকেই তাঁদের কর্তব্য বলে মনে করতেন।

—গান্ধী

পরিবার পরিকল্পনায় ধাত্রীর ভূমিকা

অমৃতলাল

পরিবার পরিকল্পনার সূত্রপাত হয়েছে অনেকদিন কিন্তু এখনও এই ক্ষেত্রে পুরোপুরি সাফল্য অর্জ্জন করা সম্ভব হয়নি। সরকারী আয়োজন, উদ্যোগ ও উৎসাহ প্রদানের অভাব নেই বটে কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তা'র প্রভাব প্রতিক্রিয়া সর্ব্বত্র সমান নয়। এই ধরণের প্রকল্পের পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে যে সমস্যাগুলির অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে সেগুলিকে ক্ষেত্র-সমস্যা (Field problems) আখ্যা দেওয়া চলে। লেখক এরই একটি সমস্যা নিয়ে, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, আলোচনা করেছেন।

গ্রামাঞ্চলের বধূদের মাতৃত্বের যন্ত্রণা উপশমের দায়িত্ব এযাবৎ নির্দ্বিধায় যাঁদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হ'ত, বা এখনও ক্ষেত্র বা অঞ্চলবিশেষে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাঁরা 'দাই' বা 'ধাই' নামে পরিচিতা। এঁদের সংখ্যা আজও কম নয়। বিশেষ ক'রে গ্রামাঞ্চলে আজও এঁদের প্রসার বেশ। গ্রামাঞ্চলে পরিবার পরিকল্পনার বহুল প্রচারে এঁদের কার্য্যকর ভূমিকার গুরুত্ব রয়েছে। নজফগড় ব্লকের ধাত্রী গোষ্ঠীর জন্য আয়োজিত একাধিক পরিবার-পরিকল্পনা-শিক্ষা-শিবিরে আলোচনার ফলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুন গিয়েছে যে পরিবার পরিকল্পনা গ্রামাঞ্চলে ফলপ্রসূ করতে ধাত্রীরা, ইচ্ছা করলে, অনেকখানি সহায়ক হ'তে পারেন।

আজকাল আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতাল ও প্রসূতিসদনগুলির সম্প্রসারণের আগে পর্য্যন্ত আবহমানকালের রীতি হিসেবে ধাইরাই প্রাক্-প্রসব ও প্রসবোত্তর পর্য্যায়ে সর্ব্বপ্রকার নির্দ্দেশ ও উপদেশ দিয়ে এসেছেন। আধুনিককালের ডাক্তার নার্সদের তুলনায় ধাই-দের কয়েকটা বিশেষ রকম সুবিধা আছে। যেমন ধাই-এর কর্ম্মক্ষেত্র ২/১টি গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় তাঁদের ডাকলেই পাওয়া যায়। দ্বিতীয়, স্থানীয় লোকেদের মধ্যে বসবাস করায়, তাঁদের মানসিকতার সঙ্গে ধাই-রা সুপরিচিত থাকেন। স্থানীয় ভাষায় কথা বলাও আর একটা মস্তবড় সুবিধা। এই কারণগুলির জন্যে পরিবার পরিকল্পনার কাজে তাঁদের ভালোভাবে লাগানো সম্ভব। তাঁরা পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য স্থানীয় ভাষায় বুঝিয়ে বলতে পারেন। অবশ্য তা'র আগে সাধারণতঃ স্বল্পশিক্ষিতা ধাই-দের পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে শিক্ষিত ক'রে তুলতে হবে এবং সেইসঙ্গে তাঁদের কয়েকটি ভুল ধারণা দূর করতে হ'বে।

নজফগড় ব্লকে যে শিক্ষা শিবিরের ব্যবস্থা করা হয় তা'র একটিতে ৪৫টি গ্রামের ৭৮ জন ধাই যোগ দেন। এঁদের মধ্যে ৬৩ জনকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সাধারণ ধাত্রীবিদ্যায় তালিম দেওয়া হয়। ঐ শিক্ষণ-ক্রমের উদ্যোক্তা হ'ল UNICEF সংস্থা। ঐ ৬৩ জনের মধ্যে শতকরা ৫৯ জনের বয়স ৫০এর ওপর। শতকরা ৯২ জন পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে জানেন এবং শতকরা ৭৫ জন, কার্য্যক্ষেত্রে, পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের অপারেশন, লুপ ব্যবহার ও মামুলী জন্মরোধের পদ্ধতি সম্বন্ধে নিজেদের মক্কেলদের উৎসাহিত করেন। শতকরা ৬০ জন গত দশ বছর ধরে স্ত্রীরোগের চিকিৎসার সঙ্গে ধাত্রীর দায়িত্ব পালন ক'রে আসছেন।

অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে যে, পল্লীঅঞ্চলের মেয়েদের ছোট ও সীমিত পরিবার সম্বন্ধে বীতরাগ নেই, বরং অনেকে তা বাঞ্ছনীয় ব'লে মনে করেন। কিন্তু সেই 'বাঞ্ছনীয়তা' সম্ভব ক'রে তুলতে তাঁদের আগ্রহ নেই। এর অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল জন্ম নিরোধের পদ্ধতি ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতা, বিশেষ ক'রে, ঐসব ব্যবস্থার তথাকথিত প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে ভিত্তিহীন আশঙ্কা; এছাড়া ক্ষেত্র বিশেষে জন্ম নিরোধের পরবর্ত্তী পর্য্যায়গুলি না মেনে চলা। শিক্ষাশিবিরে যোগদানকারী ধাইদের মুখে ভিত্তিহীন আশঙ্কা ও অজ্ঞতা সম্বন্ধে যা' শোনা গেল তা' হ'ল এইরকম:-

১। লুপ্ পরলে প্রবল রক্তমোক্ষনের সঙ্গে কোমরে যন্ত্রণা ও প্রদর হয়, ফলে, মেয়েরা দুর্ব্বল ও অসুস্থ বোধ করে এবং ক্ষেত খামারে কাজ করতে পারে না।

২। লুপ্ পরার পরেও অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং সেসব ক্ষেত্রে শিশু বিকলাঙ্গ হয়।

৩। ভ্যাসেকটমি করালে যন্ত্রণা হয়, শরীর দুর্ব্বল হয় ও দাম্পত্য সম্পর্ক রক্ষায় অক্ষমতা ঘটে।

৪। ভ্যাসেকটমির উপযুক্ত পরিবেশ গ্রামে নেই। যে ঐ অপারেশন করাবে সে গ্রামের অন্যান্য পুরুষের পরিহাসের লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়াবে।

৫। প্রজনন-ক্ষমতা-রোধ করার পর যদি সন্তান মারা যায়, তাহলে আর সন্তান পাওয়া যাবে না।

৬। পুত্রকামনার সঙ্গে, উপার্জ্জনের জন্যে সন্তান কামনা ও বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের বিরোধী মনোভাব পরিবার পরিকল্পনার প্রচারে প্রতিবন্ধক-স্বরূপ।

৭। ধাই-রাও (পসার নষ্ট হ'বার ভয়ে সম্ভবতঃ) এই পরিকল্পনার প্রচারে বাধা দেয়।

৮। লুপ্ পেটের মধ্যে চলে গিয়ে পেটে ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি।

শিক্ষা শিবিরে পুরুষ ও নারীদের অপারেশন পদ্ধতিতে প্রজনন ক্ষমতা রোধ এবং লুপ্ পরানো সম্বন্ধে হাতে কলমে দেখিয়ে এই বিষয়গুলি নিয়ে দীর্ঘকাল আলোচনা করা হয়।

(১১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বাংলার তাঁত শিল্প

সুরেশ দেব

তাঁত শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হ'ল সুতো। এই সুতো প্রধানত চার শ্রেণীর :-

(১) কার্পাস তুলোর সুতো, (২) রেশমের সুতো, (৩) পাট জাতীয় গাছের আঁশ থেকে তৈরি সুতো এবং (৪) পশমের সুতো।

ভারতে কার্পাস তুলোর সুতো সর্ব প্রথম ব্যবহৃত হয় আর্যদের আসবার আগে থেকেই। রেশমকে কাজে লাগিয়ে সুতো তৈরি ক'রে কাপড় বুনতে শেখে প্রথমে চীন দেশের লোকেরা। গাছের ছাল থেকে আচ্ছাদন তৈরি প্রথম আরম্ভ করে প্রাচীন মিশরীয়রা। আর পশুর লোম থেকে আবরণ বুনতে শেখে বোধ হয় সর্বপ্রথমে আরবেরা। আধুনিক যুগে নানাবিধ কৃত্রিম তন্তুর প্রচুর চল হয়েছে।

বলা যায় যে, এই গাত্রাবরণ তৈরি করা থেকেই সভ্যতার সূচনা হয়। এর আগে মানুষ আবরণ হিসাবে ব্যবহার করত পশুচর্ম বা গাছের ছাল ও পাতা। এই সবের ব্যবহারে কোনও বিশেষ উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ছিল না।

কিন্তু রেশম, পশম বা তুলো থেকে আবরণী তৈরি করা অত সোজা ছিল না। পশমকে যদিও জমিয়ে নামদা করা সোজা কিন্তু এই সব তন্তু জাতীয় জিনিস থেকে সুতো তৈরি করা বাস্তবিকই কঠিন কাজ ছিল। যাঁরা তুলোকে সুতোয় পরিণত করেছিলেন তাঁদের উদ্ভাবনী শক্তি ছিল সকলের সেরা, কারণ পশম বা রেশমের তুলনায় তুলোর আঁশ অনেক ছোট। আর এই অদ্ভুত উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছিল এই ভারতবর্ষের লোকেরাই। পরবর্তীকালে এই উদ্ভাবনী শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন বাংলার তাঁতীরা। তাঁরা এমন কাপড় বুনতেন যার নাম বিদেশীরা দিয়েছিল 'ওভন এয়ার' অর্থাৎ বুনন করা হাওয়া।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে তাকে বাংলা ক'রে বলতে হলে বলা যেতে পারে, যে, চাহিদার তাগিদই হ'ল সমস্ত উদ্ভাবনী শক্তির জননী স্বরূপ। ভারতবর্ষের জলবায়ু আর তার মাটির উর্বরা শক্তি এমন যে, স্বাভাবিক ভাবেই দেশের লোকেদের প্রয়োজন অল্পই ছিল। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে

সেই বিশ্ববিখ্যাত ঢাকাই মসলীন—একটি আংটির মধ্য দিয়েও যা সহজেই গলে যাচ্ছে।

আবরণের প্রয়োজন অতি অল্প বললেই চলে। তার ওপর উর্বরা দেশে খাদ্যের অভাবও সহজে মেটে। তাই উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ, যা প্রধানতঃ প্রকৃতির কঠোরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, তা স্বাভাবিক ভাবেই ততটা সম্ভব ছিল না। তা সত্ত্বেও এখানকার লোকেরা প্রাচীন কালেই যেভাবে বস্ত্র শিল্পের সূচনা করেছিলেন তা বাস্তবিকই প্রশংসার বিষয়।

আমাদের দেশে একটা কথা প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত আছে যে, গুণ আর কর্মের বিভাগ থেকে জাতি বিভাগের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বিভিন্ন কাজে দক্ষ ব্যক্তিরা এক একটা গোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ঐ ঐতিহ্য এই কাল পর্যন্ত চলে আসছে তন্তুবায় গোষ্ঠীর মধ্যে। ভারতবর্ষের অন্য অঞ্চলেও অবশ্য তন্তুবায় গোষ্ঠী ছিল ও এখনও আছে কিন্তু বাংলার তাঁতীরা এখনও যেমন নিত্য নতুনের উদ্ভাবক অন্য অঞ্চলের তাঁতীরা বোধ হয় ততটা নয়।

প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আছে যে জায়গাগুলি, বাংলা দেশ সেগুলির মধ্যে শুধু অন্যতম নয়, বোধহয় সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। বাংলা দেশের বস্ত্র শিল্পীদের একটা বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে তাঁরা শুধু নিত্য প্রয়োজনের চাহিদা মেটাবার জন্যই, সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন না বরং কেমন ক'রে শিল্পকে আরও উন্নত করে সূক্ষ্ম শিল্পে পরিণত করা যায় সে চেষ্টাও ছিল। বস্ত্র শিল্পকে সূক্ষ্ম শিল্পে পরিণত করার দুটি ধারা আছে বলা যায়। একটি হ'ল বস্ত্রের মধ্যে রঙের ব্যবহার, আর দ্বিতীয় হ'ল সূক্ষ্ম সুতো তৈরি আর বুননের কাজ আরও উন্নত করা। বাংলার তাঁত শিল্পীরা বিশেষ ক'রে এই দ্বিতীয় পথেই তাঁদের শিল্পকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তাঁরা চিরকাল দেখিয়ে এসেছেন কেমন ক'রে এমন সূক্ষ্ম বস্ত্র বোনা যায় যা অপর কেউ অনুকরণ করতে সমর্থ নয়।

বাংলার মসলিনের কথা তো ইতিহাস প্রসিদ্ধ। মসলিনের সুতো এত মিহি ছিল যে তাকে স্বচ্ছ বললেও অত্যুক্তি করা হত না। ঘাসের ওপর মসলিন বিছিয়ে দিলে মনে হত যেন ঘাসের ওপর শিশির পড়ে আছে। কালিদাসের যুগে অভিসারিকারা যে স্বচ্ছ বস্ত্র দিয়ে নিজেদের আবরিত ক'রে অভিসারে যেতেন সেই বস্ত্র বুনে দিতেন বাংলার তাঁতীরা। কারণ অতি প্রাচীন কাল থেকেই বাংলার তাঁতীদের সূক্ষ্ম আর স্বচ্ছ কাপড় বুনবার ক্ষমতার কথা দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলার মসলিনের স্বচ্ছতা আর সূক্ষ্মতার তুলনা করা হত বাতাসের সঙ্গে কিংবা ভোর বেলার শিশিরের সঙ্গে। বিদেশের ব্যবসায়ীরা এর নাম দিয়েছিল 'বাফ্‌ত হাওয়া' অর্থাৎ বুনন করা বাতাস, আর 'শাবনাম' অর্থাৎ ভোরের শিশির।

ভারতবর্ষের নানা জায়গাতেই অবশ্য বস্ত্র শিল্পীরা ছিলেন সন্দেহ নেই। আর তাঁরা শিল্পকে নতুন নতুন দিকে নিয়েও গেছেন তাও ঠিক। যেমন ধরা যাক রাজস্থানের বস্ত্র শিল্পীরা। রাজস্থানের বস্ত্র শিল্পীরা কাপড় রঙ করার একটা অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন যার নাম দেওয়া হয় 'বাঁধনী'। সাদা জমির ওপর রঙ্গীন বুটি দেওয়া সোজা, সকলেই দেয়। কিন্তু রঙীন জমির ওপর সাদা বুটি করা, উদ্ভাবনী প্রতিভার একটি অভাবনীয় বিকাশ। রাজস্থানের 'বাঁধনীতে' সারা কাপড়ে মোম লাগান সুতোতে ছোট ছোট গ্রন্থি দিয়ে খুব শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়। কাপড়কে রঙ করার সময় মোমের সুতোর গ্রন্থি ভেদ করে রঙ কাপড়কে স্পর্শ করতে পারে না। তারপরে কাপড়টা শুকিয়ে গেলে গ্রন্থিগুলো খুলে নেওয়া হয়। তখন দেখা যায় যে রঙ্গীন কাপড়ে সাদা বুটি ফুটে উঠেছে। গ্রন্থিগুলিকে প্যাটার্ণ ক'রে বাঁধলে, কাপড়ের সমস্ত জমিতেই প্যাটার্ণ মাফিক বুটি ফুটে ওঠে। 'বাঁধনীর' আর এক প্রকার ভেদ আছে। একে বলা হয় 'ইকাট' পদ্ধতি। এতে সুতোকেই জায়গায় জায়গায় হিসেব করে বেঁধে রেখে রং করা হয়। এতে সুতোটার রঙের মধ্যে জায়গায় জায়গায় সাদা থেকে যায়। তারপর বুনবার সময় একটু গুছিয়ে বুনলেই রঙীন জমিতে সাদা বুটির সারি ফুটে ওঠে। যদিও রাজস্থান আর তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল গুজরাটে এই পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল, পরবর্তীকালে কিন্তু তা প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু যব দ্বীপ, সুমাত্রা, বালি আদি দ্বীপে ভারতের শিল্পীরা এই শিল্প পুনরুজ্জীবিত করেন। এখন এই পদ্ধতি ভিনদেশী শিল্পীরা আবার আমাদের দেশে ফেরৎ পাঠিয়েছে। উড়িষ্যায় বর্তমানের রঙীন বস্ত্র শিল্পে এই শৈলী বিশিষ্ট স্থান নিয়েছে। বাংলা দেশের তাঁতীরা কিন্তু কোনও বিদেশী পদ্ধতি গ্রহণ করেননি।

রং ও নক্সার বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ বাংলার বালুচরী শাড়ী।

বাংলা দেশের তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য মসলিন তৈরির ঐতিহ্য ও বর্ণ বৈচিত্র্যের শিল্পে নয়, এমন কি যাকে বলা হয় সূচী শিল্প, তাতেও নয়। বাংলা দেশে সূচী শিল্পের প্রকাশ তার কাঁথা শিল্পে, কাপড়ের ওপর নয়। ভারতে 'এমব্রয়ডারী' এসেছে বোধহয় পারসীকদের কাছ থেকে। এর পরকাষ্ঠা দেখা যায় কাশীর বেনারসী জরীর কাজে। বাংলা দেশে নবাবী আমলে এর একটু আমদানী হয়েছিল মুর্শীদাবাদের 'বালুচরী কাপড়ে'। এই 'বালুচরী' এক সময়ে খুব প্রসিদ্ধ হয়েছিল। এখন 'বালুচরী' কাপড় আর বাংলায় কোথাও বোনা হয় না। এমন কি তার ভাল নমুনাও এখন পাওয়া ভার। তা শুধু কোনও কোনও শিল্প সংগ্রহালয়ের দ্রষ্টব্য বস্তু হয়েই আছে। আমার বাংলা দেশের তাঁত শিল্পের সঙ্গে কর্মসূত্রে কিছুদিন পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তখন অনেক চেষ্টা ক'রেও বালুচরী কাপড় বোনার তাঁতীদের সন্ধান করতে পারিনি। শুধু তাই নয় 'বালুচরী'র নমুনাও দেখেছিলাম অনেক সন্ধানের পরে। বাংলা দেশের পরিবর্তে দিল্লীতেই বোধহয় 'বালুচরী'র ভাল নমুনা দেখতে পাওয়া সম্ভব।

বালুচরী হ'ল কাশীর বেনারসী জাতীয় বস্ত্রের ওপর জরীর কাজ করা এক রকম খুব দামী কাপড়। কারুর কারুর মতে বাংলার তাঁতীরা এখানে কাশীর ঐতিহ্য সম্পন্ন কারিগরদের ওপরও টেক্কা দিয়েছিলেন শিল্প শৈলী ও শিল্প সৌকর্যে। কিন্তু বালুচরী, বাংলার মাটিতে শিকড় গজাতে পারে নি। আমি অনেক দিন ভেবেছি এর কারণ কী হতে পারে। বাংলা দেশে বেনারসী কাপড়ের কদর নেই —এ কথা বলা যায় না। বাংলা দেশে বেনারসী কাপড় বিক্রী হয়। তবে বালুচরী বাংলা দেশে হারিয়ে গেল কেন? অনেক ভেবে চিন্তে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলাম যে বাংলার তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য, বহরমপুরের সিল্কের কাপড় ধরেও, সিল্কের ওপর নয়, সূচীশিল্পের ওপর নয় এমন কি রঙের বাহারের ওপরও নয়। বাংলার তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য, সুতী কাপড় বুনবার ঐতিহ্যের দিকেই, বাংলার তাঁতীদের উদ্ভাবনী প্রতিভাকে বিকাশের দিকে নিয়ে চলেছে। এর ফল এই হয়েছে যে, বাংলা দেশের সুতী কাপড়ের তুলনা হয় না। দুর্ভাগ্য এই, যে, বাংলা দেশের তাঁতের কাপড়ের কোথাও তেমন প্রচার নেই। বাংলা দেশের বাইরে বাংলা দেশের তাঁতের কাপড় কিনতে চাইলে তো ঝকমারীর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন—ঢাকাই শাড়ী। ঢাকা অঞ্চল ছিল তাঁত শিল্পের একটি চিরকালের পীঠস্থান। খৃষ্টপূর্ব কালেও এখান থেকে রোম্ সাম্রাজ্যে সূক্ষ্ম সুতী বস্ত্র চালান যেত। কার্পাস শব্দটি সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত নয়। রোমানরা তুলোর কাপড়কে বলতো 'CARBASIA'। এই কার্বাসিয়া যেত ভারতবর্ষ থেকে। আর খুব সম্ভব ঢাকার তাঁতীরা এই 'কার্বাসিয়া' রোমে চালান করতেন। রোমের বাণিজ্য জাহাজ ভারতবর্ষে, দক্ষিণের নানান বন্দরে ভিড়ত। কিন্তু দক্ষিণের ভাষায় তুলোকে কার্পাস বলে না। তাই বলতে হয় যে বাংলাই ছিল রোমে কার্পাস বস্ত্রের প্রধান রপ্তানি কেন্দ্র। পরবর্তীকালে ঢাকা অঞ্চলে খুব মিহি সুতোর কাপড় 'মলমল খাস' নামে নবাব আর রাজা রাজড়াদের জন্য তৈরি হ'ত। ঢাকাই মসলিনের কথা তো আগেই উল্লেখ করেছি।

এই অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য সুতোও লাগতো সেই রকমেরই মিহি ধরনের। তাঁতীরা বাজার থেকে সুতো কিনতেন না। নিজেদের সুতো নিজেরাই কেটে নিতেন। এই কাজে মেয়েরাই ছিল পুরুষদের সহকর্মিনী। আমার ধারণায় সুতো কাটা ছিল সম্পূর্ণ মেয়েদের হাতেই আর বাংলা দেশের মেয়েরাই এই অদ্ভুত মাকড়সার জালের মত সূক্ষ্ম সুতো কাটতে পারদর্শিনী হয়েছিলেন। এতে যতটুকু বা যত বেশী উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োজন হয়েছিল তার সবটাই বলা যেতে পারে—এসেছিল মেয়েদের নিজস্ব প্রতিভা থেকে। বাংলার একটি প্রাচীন পুঁথি 'গোর্খ বিজয়ে' তাঁতীদের শিল্প সম্বন্ধে এক জায়গায় মজার উল্লেখ আছে। গোর্খ বিজয় বইটি প্রায় চারশো বছরের পুরোনো। তাই অন্ততঃ চারশো বছর আগের তাঁত শিল্প সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এক তাঁতীর

বাংলার একান্ত নিজস্ব তাঁতের কাপড়। বুনানীতে ও সৌন্দর্যে, আঁচলার বৈশিষ্ট্যে যে কোনও অঞ্চলের তাঁত বস্ত্রের ওপর টেক্কা দিতে পারে।

30 লক্ষ মহিলা ভুল করতে পারেন না

গত চার বছরে 30 লক্ষের চেয়েও বেশী স্ত্রীলোক লুপ্ নিয়েছেন। তাঁরা জানেন যে লুপ্ :

ফলপ্রদ—জন্ম নিরোধের সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য যে সমস্ত উপায় রয়েছে, তার মধ্যে একটি।

সরল—কয়েক মিনিটের মধ্যে ডাক্তারবাবু লুপ্ লাগিয়ে দিতে পারেন।

পরিবর্তনসাধ্য—আপনার যখনই আর একটি সন্তানের প্রয়োজন হবে, আপনি সহজেই এটিকে বের করে আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারেন।

সুবিধাজনক—লুপ্ নেওয়ার পরে সেটি যদি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়, তবে অন্য কোনও উপায় আপনাকে খুঁজতে হবে না। দাম্পত্য সুখের ক্ষেত্রে লুপ্ বাধা সৃষ্টি করে না।

ক্ষতিকারক নয়—লুপ্ নিলে কোনও রোগ হয় না। যদি কোনও উপসর্গ দেখা দেয়, সে সবের সহজেই চিকিৎসা হতে পারে।

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে ডাক্তারেরা মত দিয়েছেন যে অধিকাংশ স্ত্রীলোকের জন্যে লুপ্ একান্ত উপযুক্ত। লুপ যাঁদের সহ্য হয় না, তাঁরা সময়ের ব্যবধানে সন্তান জন্ম ও সন্তান সংখ্যা সীমিত করবার জন্যে অন্যান্য উপায়ের আশ্রয় নিতে পারেন। বাড়ীর সবচেয়ে কাছের পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে গিয়ে পরামর্শ করুন। পরিবার নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্তীয় নির্দেশ ও যাবতীয় সেবা-সহযোগ বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

গুজবে কাণ দেবেন না

আপনার ডাক্তারবাবুর কথা বিশ্বাস করুন

মেয়ের গোর্খ নাথকে দেখে এত ভাল লেগেছিল যে সে তাঁকে তাদের সঙ্গে বাস করতে নানাভাবে আকুতি জানায়। তার জন্য প্রলোভন দেখিয়ে তাঁতীদের এই মেয়েটি বলছে যে, সে গোর্খনাথকে খুব মিহি সুতো কেটে দেবে আর গোর্খনাথ তা দিয়ে কাপড় বুনবে। আমরা এই তথ্যটুকু পাই যে তাঁতী বাড়ীর মেয়েরাই কাপড় বুনবার সুতো কেটে দিত। আর পুরুষেরা সেই সুতো দিয়ে কাপড় বুনতো। আরও একটা তথ্যের ইঙ্গিত এই পাই যে, তাঁতীরা নিজেদের একটা গোষ্ঠী তৈরি ক'রে নিয়েছিল। আর এই গোষ্ঠীর মধ্যে স্থান পাওয়া একটা লোভনীয় ব্যাপার ছিল। তাঁতী মেয়েটি গোর্খনাথকে এই লোভই দেখিয়েছিল। পরে দেখা গিয়েছে যে বাংলার তাঁতীদের একটা বৃহৎ অংশ গোর্খনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

ঢাকাই শাড়ীর উদ্ভব এই ঐতিহ্যের ভিতর দিয়ে সম্ভব হয়েছে। ঢাকাই শাড়ীর সুতো বেশ মিহি হয়। কিন্তু বোনা একটু জাল জাল। আর এই জাল জাল বোনার সঙ্গে নানা রকম রঙের সুতো পরিয়ে নানা রকম ফুল তোলা হয়ে থাকে। সাদা সুতো দিয়েও বুটি করা হয়ে থাকে। কিন্তু কাপড় বোনার সঙ্গে সঙ্গে সুতো পরিয়ে বুটি তোলা খুব সহজ নয়। এই পদ্ধতি সূচীশিল্পের বুটির পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই বিশিষ্ট পদ্ধতি বোধ হয় খুব সহজও নয়। ঢাকাই কাপড় বোনার কায়দা অন্য কোনও তাঁত শিল্পের কেন্দ্র অনুকরণও করতে পারেনি। বাংলা দেশ দ্বিখণ্ডিত হবার পর কিছু কিছু চেষ্টা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু সেই চেষ্টার পিছনে ছিলেন কিছু ঢাকাই শাড়ীর তাঁতী যাঁরা পশ্চিম বঙ্গে চলে আসেন। তা সত্ত্বেও এই শিল্পটি ঠিক তেমনভাবে এখনও গড়ে উঠতে পারে নি। আর ঠিক সেই জিনিসটিও বোধহয় তৈরি হয় না।

বাংলা দেশে তাঁতের কাপড়ের বৈশিষ্ট্য বিশেষ ক'রে তার শাড়ীতে। পূর্বে এক-জায়গায় বলেছি যে প্রয়োজনই হ'ল উদ্ভাবনের জননীস্বরূপ। এই প্রয়োজনের অবশ্য নানা রূপ আছে। নবাব আর রাজ রাজড়াদের প্রয়োজন আর সাধারণ মানুষের প্রয়োজন সমস্তরের নয়। শিল্পের প্রয়োজন হয় সাধারণের প্রয়োজন মেটাতে। কিন্তু শিল্প সৃষ্টির প্রয়োজন হয় অসাধারণের প্রয়োজনে। বাংলার তাঁত শিল্পের মূলে রয়েছে এই অসাধারণের প্রয়োজন। শান্তি-পুরের তাঁত শিল্পীদের পিছনে ছিল নদীয়ার রাজা আর তাঁর ধনী অমাত্যদের প্রয়োজন। এখানেও দেখা যায় বাঙালী শিল্পীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। শান্তিপুরের ধুতি আর তার পাড়ের রকমারি বাহার গড়ে উঠেছিল রাজা আর বড় বড় জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায়। ডুরে সাড়ী আমার মনে হয় এই শান্তিপুরের তাঁতীদের অবদান। ভারতের অন্যত্র কোথাও তাঁত শিল্পের মধ্যে ডুরে কাপড় আমার চোখে পড়েনি। আমি অবশ্য আধুনিক কালের কথা বলছি না তা বলাই বাহুল্য। এখন রাজা রাজড়া তেমন আর নেই বটে কিন্তু তাঁদের স্থান নিয়েছেন বাংলার মেয়েরা আর মায়েরা। ভারতের সর্বত্র মেয়েরা মিলের কাপড়ই পরতে পছন্দ করেন। বাংলা দেশে ঠিক অন্য জিনিস। মিলের শাড়ী এখানে অপেক্ষাকৃত অচল। তাঁতের শাড়ীর চাহিদাই এখানে বেশী। কলকাতা সহরের সমস্ত বড় রাস্তায়, এমন কি ফুটপাথের ধারে, যে কোনও কাপড়ের দোকানে গিয়ে দেখলেই আমার কথার প্রমাণ মিলবে। অপর পক্ষে দিল্লী বা বোম্বাইয়ের কাপড়ের দোকানে থাকে মিলের কাপড়েরই প্রাধান্য। বাংলার তাঁত শিল্পকে আজ বাস্তবিক পক্ষে বাঁচিয়ে রেখেছেন বাংলার মায়েরা আর বোনেরা।

বাংলার তাঁত শিল্প বাংলারই মাটির জিনিস। বাংলা দেশের মেয়েরা আর বাংলার তাঁত শিল্পী উভয়েই উভয়ের 'মুড' বা মেজাজ চেনেন। এই মুডে চিরন্তনী ভাবও যেমন আছে তেমনি আছে 'নিত্য নূতনের চাহিদা। বাংলার তাঁতীরা এই চিরন্তন আর নূতনত্বের সমন্বয়, তাঁদের শিল্পে ধরে রেখেছেন। তাই তাঁদের শিল্প উপ-জাতীয় শিল্পে পর্যবসিত হয়নি। এই ধারাই বাংলার তাঁত শিল্পের মূল কথা। বাংলার তাঁত শিল্প তাই কোনও দিন বাঙা-লীর কাছে পুরোনো হয় না আর নূতন হয়েও চিরপরিচিত থাকে।

পরিবার পরিকল্পনায় ধাত্রী

(১১ পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু এর পরেও শিবিরে যোগদানকারী অনেকেই এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন, যে, পরিবার পরিকল্পনার জন্যে কাজ করার অর্থ হ'ল আয়ের পথ নিজের হাতে রুদ্ধ করা। কারণ ছেলে হওয়ার আগে ও পরে হাতে সামান্য যে ক'টি টাকা আসে তাই দিয়ে ধাইদের গ্রাসাচ্ছাদন করতে হয়। আয়ের, এই একটিমাত্র সূত্রও যদি বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকে তা'হলে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে আগ্রহ না দেখানো তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। অতএব সরকারকেই এই দিকটা বিবেচনা করতে হ'বে এবং উপার্জ্জনের অন্য পথ দেখাতে হ'বে। এই পরিস্থিতিতে লুপ পরানো বা 'স্টেরিলাইজেশান'-এ নারী ও পুরুষ, উভয়কেই, সম্মত করাতে পারলে, তাঁদের বেশী পারিশ্রমিক দেবার প্রতিশ্রুতি দিলে ধাত্রীরা উৎসাহিত হতে পারেন। এছাড়া জন্মনিরোধের ওষুধ ও অন্যান্য জিনিষ সরবরাহের জন্যে কেউ যদি 'স্টকিষ্ট' বা মজুতকারীর দায়িত্ব নেন্ এবং পরিবার পরিকল্পনার প্রচার-কর্ম্মী হিসেবে কাজ করেন ও তাঁদের মাসে মাসে মাহিনা বাবদ কিছু অর্থ দিলে, এদের উৎসাহিত করা সম্ভব হ'তে পারে। মোট কথা, গ্রামাঞ্চলে এই পরিকল্পনার ব্যাপক প্রচারে ধাত্রীদের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্যে অচিরে কার্য্যকর একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ঋণ নিতে উৎসাহিত করার প্রতিযোগিতা

রাজস্থানের দুঙ্গারপুর জেলার গ্রাম সেবক, পাটোয়ারী ও অন্যান্য জনসেবীদের উৎসাহিত করার জন্য একটি প্রতিযোগি-তার আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিযোগী গ্রামসেবক, পাটোয়ারী ও জনসেবীদের মধ্যে যিনি স্থানীয় কৃষকদের সেচ কূপ তৈরি ও মেরামত এবং সেচের জন্য পাম্পসেট বসানোর জন্য ঋণ গ্রহণে সর্বাধিক উৎসাহিত করতে পারবেন তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কারের অর্থ দেওয়া হবে পঞ্চায়েত সমিতিগুলির আয় তহবিল থেকে।
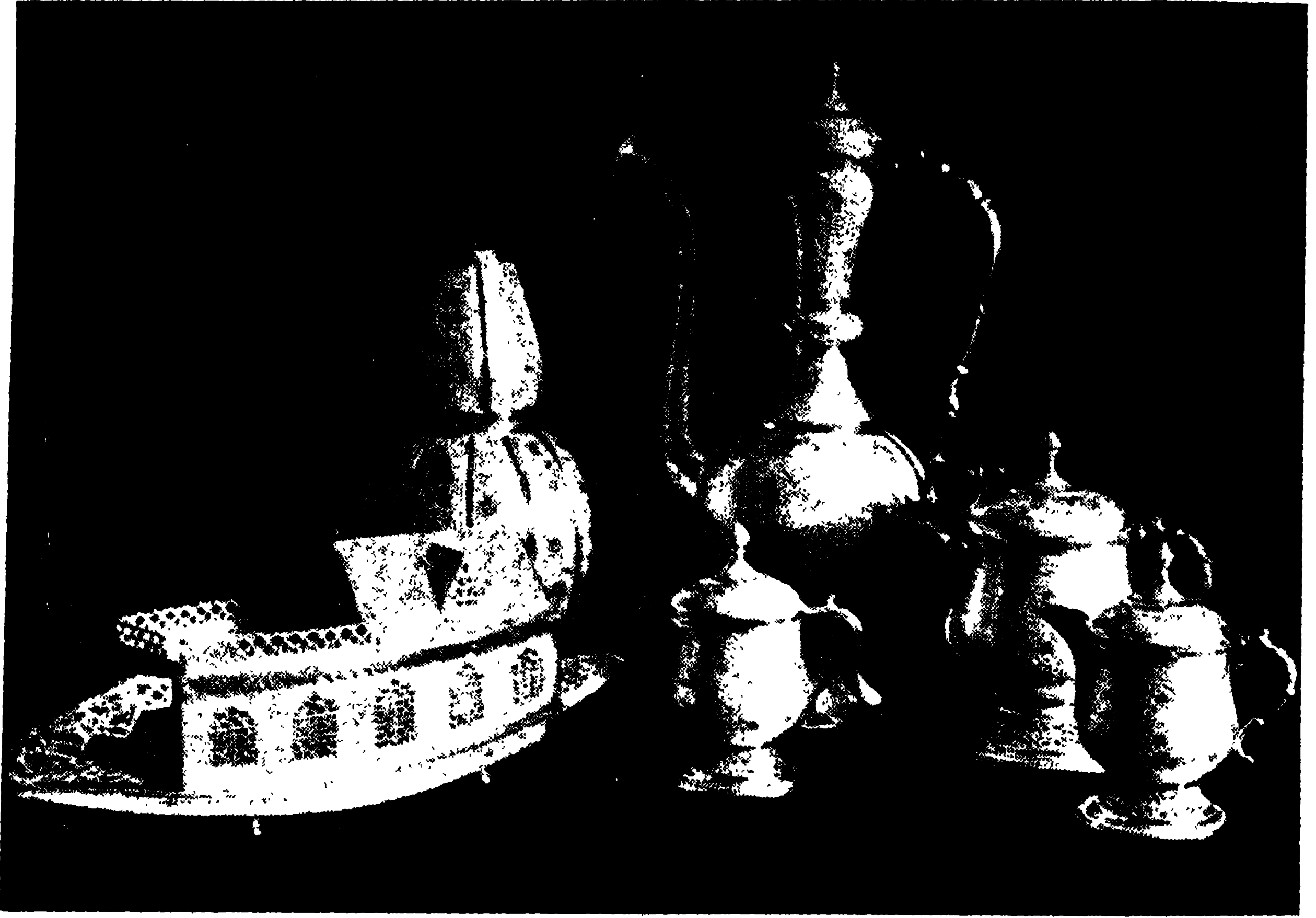
কাশ্মীরি হস্তশিল্পের জন্যে প্রচার অভিযান

সুরজ স্যারাফ

কাশ্মীরের খ্যাতি বিশ্বব্যাপী। কাশ্মীরি শাল, জামিয়ার, পশমিনা, নামদা, শালের কোট, কাঠে খোদাই করা নানান সামগ্রী কে না চেনে? আন্তর্জাতিক বাজারে শাল বা কার্পেটের চাহিদা আছে বটে কিন্তু এইসব শিল্পের বহুল প্রচার আছে কি? অথবা রপ্তানী বাণিজ্যের বিকাশে এর উপযুক্ত ভূমিকা গড়ে উঠেছে কি? লেখক এই নাতিদীর্ঘ রচনায় তা'র ইঙ্গিত দিয়েছেন।
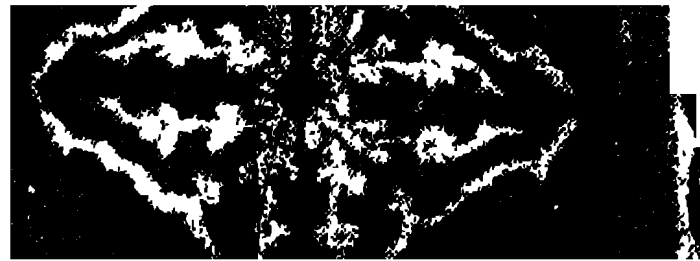
নদী, হ্রদ ও হিমবাহের রাজ্য কাশ্মীর শুধু পর্যটকদের আনন্দকেন্দ্র হিসেবেই বিখ্যাত নয়, কাশ্মীর তার হস্তশিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শনগুলির জন্যেও সুপরিচিত। বছরের পর বছর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এই স্বর্গে পর্যটকদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরি কারুশিল্প সামগ্রীর চাহিদাও ক্রমশঃ বাড়ছে। তাই রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসারে কাশ্মীরি জিনিষের আকর্ষণীয় ভূমিকা ক্রমশঃই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এখন এই সম্ভাবনাকে সম্ভাব্যতার পর্য্যায়ে আনতে পারলে অভীষ্ট সিদ্ধ হ'য়।

এই কথা বিবেচনা ক'রে জম্মু ও কাশ্মীর সরকার একটি বহুমুখী অভিযানের সূত্রপাত করেছেন। প্রধানতঃ চারটি লক্ষ্য সামনে রেখে এই কাজে হাত দেওয়া

হয়েছে, যথা (ক) কারুশিল্পীদের তালিম দেওয়া, (খ) আধুনিক নক্সা প্রবর্তন করা, (গ) গ্রামাঞ্চলের প্রতিভাবান শিল্পীদের সন্ধান করা, (ঘ) বিদেশের বাজার যাচাই করা ও বাজার গড়ে তোলা।

প্রথম লক্ষ্য পূরণের জন্যে যে প্রশিক্ষণ সূচী রচনা করা হয়েছে, তার মধ্যে আছে "কানী" শাল তৈরীর পদ্ধতি, খেলনা ও পুতুল তৈরী, কার্পেট বোনা, শিক্ষানবীশদের তালিম দেওয়ার শিক্ষাক্রম, সূতো কাটার কেন্দ্র, সোপোরের টুইড্ তৈরী-কেন্দ্রের সম্প্রসারণ, কার্পেট শিল্পের জন্যে নক্সাকারীদের তালিম দেওয়া এবং আরও কয়েকটি বিষয়।

কানী শাল বোনার উন্নয়ন ও প্রচারের জন্যে রাজ্যসরকার এই আর্থিক বছরে ৭০,০০০ টাকা ব্যয় করতে মনস্থ করেছেন। এই কানী শাল তৈরীর পদ্ধতি খুব কঠিন এবং এই বিশেষ ধরণের শাল বোনায় সিদ্ধহস্ত শিল্পীর সংখ্যা কমে যাওয়ায় এক সময়ে, এই সূক্ষ্মশিল্পটি লুপ্ত হবার উপক্রম ঘটেছিল। এই শিল্পকলা পুনরুজ্জীবিত করার জন্যে সরকার তাই কানীহামা নামের একটি জায়গায় একটি কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। এই কেন্দ্রে উপস্থিত ২০ জন শিক্ষার্থী আছেন; এঁদের সংখ্যা বাড়িয়ে ৫০ করা হ'বে।
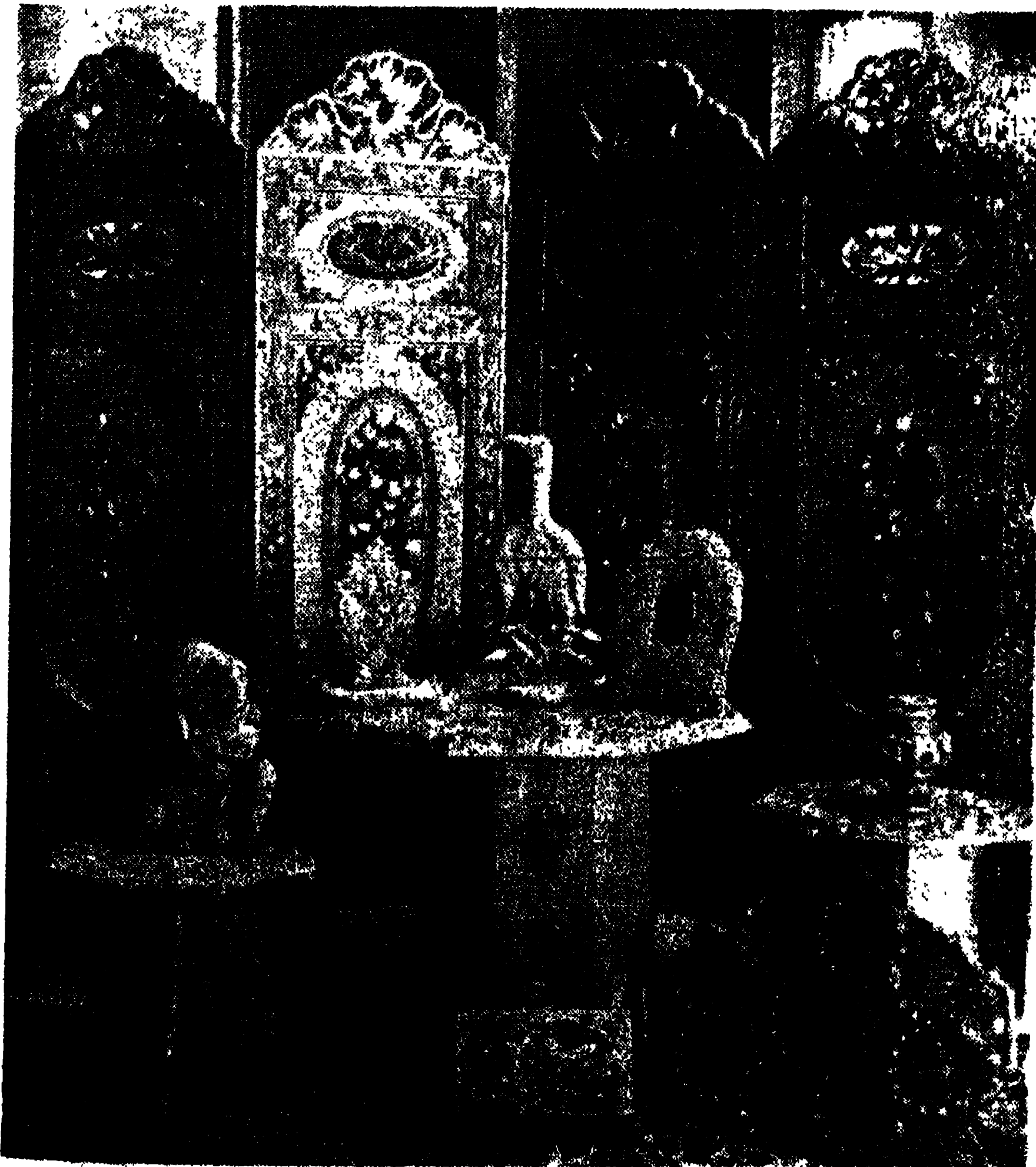
শ্রীনগরে খেলনা ও পুতুল তৈরীর যে শিল্পকেন্দ্র আছে সেটা ছাড়া জম্মুতে আর একটি কেন্দ্র খোলার সঙ্কল্প রয়েছে। ১৯৬৯-৭০এর আর্থিক বছরে, এই দুটি কেন্দ্রে ৪০ জন শিক্ষার্থীকে কাজ শেখানো হবে। খরচের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৪৫ হাজার টাকা।

ঐ একই সময়ে কাশ্মীর উপত্যকায় কাশ্মীরি শাল বোনার দুটি কেন্দ্র খোলা

ওপরে : কাশ্মীরের একজন কারুশিল্পী তামার পাত্র তৈরী করছেন। নীচে : কাঠের তৈরী পর্দা, টিপয়, আয়নার ফ্রেম ও অন্যান্য সাজাবার জিনিষ।

বাঁদিকের পৃষ্ঠায়, ওপরে : রূপোর তৈরী বাতিদান, কফিসেট, আতরদান ও হাউসবোটের ওপর কাশ্মীরি কারুশিল্পীদের সূক্ষ্ম শিল্পবোধের অপূর্ব নিদর্শন।

নীচে : ফুল তোলা কাশ্মীরি 'গাব্বা'।

হ'বে। বছর দুয়েক আগে কার্পেট বোনার তালিম দেবার জন্যে সোনাওয়ারি এলাকায় একটি কেন্দ্র খোলার পর, বান্দিপোর ও গান্দারবালেও কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কার্পেট-শিল্পের উন্নয়নের জন্যে বরাদ্দ ধরা হয়েছে (এই আর্থিক বছরে) ৪০,০০০ টাকা।

শিক্ষানবীশ-তালিম-সূচীর আওতায়, ১৯৬৯-৭০ সালে তালিম পাবেন ২০০ জন। এঁরা নানারকম হাতের কাজ শিখবেন যেমন ;—নানা রকমের সূচীশিল্প, কাঠ-খোদাই, কাগজের মণ্ড থেকে জিনিস তৈরী, ধাতুর ওপর খোদাই-এর কাজ, বেতের কাজ এবং ছাপাখানার জন্যে ব্লক তৈরীর কাজ। এই কার্যসূচীর জন্যে আনুমানিক খরচ হবে ১,১০,০০০ টাকা। পরে জম্মুতেও এই কার্য-সূচী সম্প্রসারিত করা হ'বে ব'লে স্থির করা হয়েছে।

সুতো কাটার শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্পটি চতুর্থ পরিকল্পনাকালেও চালু রাখা হ'বে। এর জন্যে ১৯৬৯-৭০ সালের খরচ ধরা হয়েছে ১৫,০০০ টাকা। বছরে ২০ জনকে হাতে কলমে কাজ শেখানো হবে।

সোপোরের উইভ্-সেন্টারটিও সম্প্রসারিত করা হবে ১১,০০০ টাকা খরচ ক'রে। বাজারে বিক্রীর সুযোগ সুবিধা ও অন্যান্য সুবিধার অভাবে সম্প্রসারণ-সূচীর কাজ তেমন এগোতে পারেনি; তবে প্রকল্পের কিছু রদবদল করার পর আবার ভালো কাজ হচ্ছে।

কার্পেটের নক্সাকারদের প্রশিক্ষণের প্রকল্পটি এই বছরেও চালু রাখা হচ্ছে। গত দু'বছরে ৫০ জনকে তালিম দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পটি চালু না রাখলে অর্থাৎ উপযুক্ত নক্সাকারদের অভাব ঘটলে, কার্পেট শিল্পের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকবে। এই প্রকল্পের জন্যে ১০,০০০ টাকার মত ব্যয় করার সম্ভাবনা রয়েছে।

শিল্পাঞ্চলের ধারায়, এখানেও কারু-শিল্পীদের কতকগুলি সাধারণ সুবিধা বিধানের জন্যে তিন লক্ষ টাকা 'বরাদ্দ' ধরা হয়েছে। এই টাকা দিয়ে অন্যান্য কাজের সঙ্গে কাঠ-খোদাই শিল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় কাঁচা কাঠ পাকানো এবং কার্পেট রং করার জন্য অথবা সূচের কাজ করার জন্যে কাপড় প্রভৃতি রাঙাতে বয়লার ও 'গাব্বা' (কম্বল) তৈরীর জন্যে "ড্রাই চেম্বার" চালু রাখা হ'বে।

এই হস্তশিল্প উন্নয়ন-অভিযানের অঙ্গ হিসেবে আরও দুটি প্রকল্প এ বছরেই হাতে নেওয়া হ'বে। এর একটি হ'ল আসল দামের শতকরা ৫০ ভাগ কম দামে কারু-শিল্পীদের উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সরবরাহ করা। দ্বিতীয়টি হ'ল বিদেশে চাহিদা ও বাজারের সমীক্ষা করা। প্রথমটি, উৎপাদনের পদ্ধতির বিকাশে অত্যাবশ্যক, আর দ্বিতীয়টির লক্ষ্য হ'ল, হস্ত শিল্প-সামগ্রীর রপ্তানী বাড়ানোর জন্যে বিদেশে ব্যবসায়ী ও প্রস্তুতকারকদের পাঠানো।

শ্রীনগরে যে নক্সা-বিদ্যালয় আছে সেটিকে চলতি বছরে আরও বাড়ানো হ'বে। আরও নতুন কয়েকটা হাতের কাজ শেখানো হবে। হাতে চালানো তাঁতে, বোনার পদ্ধতি নিয়েও চর্চা হবে। এই বিদ্যালয়টির জন্যে একটি নতুন বাড়ী তৈরী করার পরিকল্পনা আছে। এ ছাড়া দূর দূরাঞ্চলের কারিগরদের কাছে গিয়ে হাতে কলমে তাঁদের কাজ শেখাবার ব্যবস্থাও করা হবে। এ সমস্তর জন্যে খরচ খরচার হিসেব যা ধরা হয়েছে তা চলতি বছরে ১,২১,০০০ টাকার মত দাঁড়াবে ব'লে মনে হয়।

আঞ্চলিক শিল্প প্রসারে উৎসাহদান

সুষম শিল্প বিকাশের উদ্দেশ্যে মহারাষ্ট্র, শিল্পোদ্যোগগুলিকে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। বোম্বাই-পুণা শিল্প-এলাকার বাইরে শিল্প স্থাপন করলে শিল্পপতিদের ঋণ ও এককালীন অর্থ মঞ্জুরীর সুবিধা দেওয়া হবে। তা ছাড়া অনগ্রসর এলাকাগুলিতে কল-কারখানা স্থাপন করলে বৈদ্যুতিক করে রেহাই দেওয়া হবে। ঐ সব এলাকায় কলকারখানা বসানোর জন্য স্টেট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অফ মহারাষ্ট্র লিমিটেড টাকা লগ্নী করবে।

শিল্পকেন্দ্রিক শহর থেকে দূরে যাঁরা কলকারখানা বসাতে চাইবেন তাঁদের রেহাই হারে উন্নত জমি বা 'শেড' দেওয়া হবে।

অগ্রগতির সরিক

ভারত গত মাসে বার্লিনে সাগর পারের আমদানী পণ্য মেলায় অংশ গ্রহণ করে। এই নিয়ে, ভারত ছ'বার এই মেলায় যোগ দিল। এই মেলাটির নাম 'পার্টনার্স ইন প্রগ্রেস' অর্থাৎ অগ্রগতির সরিক। মেলা খোলা ছিল ২৮শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ভারতীয় মণ্ডপের আয়তন ছিল প্রায় ৪০০ বর্গ মিটারের মত, মেলায় এগারোটি ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও পশ্চিম জার্মাণীর পাঁচটি ভারতীয় পণ্য আমদানীকারক প্রতিষ্ঠান, যৌথভাবে হস্তশিল্প সামগ্রী, অলংকার, বস্ত্র, মূল্যবান পাথর, চা ও কফি সমেত বহুবিধ সামগ্রী উপস্থিত করে মেলাটি আকর্ষণীয় করে তোলে।

পাঠকদের প্রতি

ভারত পল্লীপ্রাণ। 'ধনধান্যে' পল্লীভারতের কথাই বলতে চায়, তাই শীঘ্রই "পল্লী-প্রাঙ্গন" নামে একটি নতুন বিভাগ খুলবে। গ্রামবাংলায় সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্খার কথা ; তার কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, শিল্পকলা ; তার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বার্ত্তা ; আর দেশোন্নয়নের পথে তা'র অগ্রগতির পরিচয়বাহী, অনধিক ২০০ শব্দের সংবাদ কণিকা পেলে 'ধনধান্যে' সাগ্রহে গ্রহণ করবে। প্রকাশিত প্রতিটি রচনার জন্যে ১০ টাকা দেওয়া হ'বে।

ব্যবহারিক সাক্ষরতা সম্পর্কে জাতীয় সম্মেলন

বিবরণী—বিবেকানন্দ রায়

'প্রত্যেক নরনারীর শিক্ষালাভের অধিকার আছে'— রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবিক অধিকার সক্রান্ত সনদে এই ঘোষণার (১৯৪৮ সাল) একুশ বছর পরেও বিশ্বের প্রায় ৮০ কোটি বয়স্ক নরনারী নিরক্ষর।

য়ুনেস্কোর এক হিসেবে প্রকাশ—১৯৫০ সালে ১৫৭.৯০ কোটি বয়স্ক নরনারীর মধ্যে ৭০ কোটি নিরক্ষর।

১৯৬০ সালে ১৮৮.১০ কোটি বয়স্ক নরনারীর মধ্যে ৭৪ কোটি নিরক্ষর।

১৯৭০ সালে ২৩৩ ৫০ কোটি বয়স্ক নরনারীর মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা দাঁড়াবে ৮১ কোটি, যদি নিরক্ষরতার হার হ্রাস পাওয়াটা মোটামুটি একই থাকে।

শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে নিরক্ষরতার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বিশ্বের বয়স্ক নরনারীদের মধ্যে সাক্ষরতার শতকরা হার ১৯৫১ সালে ৫৫.৭ থেকে বেড়ে ১৯৬০ সালে ৬০.৭ হলেও য়ুনেস্কোর উপরিলিখিত হিসেবেই দেখা যায় যে এই দশকে বয়স্ক নিরক্ষরদের সংখ্যা বেড়েছে ৪০ কোটি। কিন্তু অবস্থা যে আরও শোচনীয় হচ্ছে তাও এই হিসেবেই দেখা যাচ্ছে। কারণ ১৯৬০-৭০ এই দশকে বয়স্ক নিরক্ষরের সংখ্যা বেড়েছে ৭০ কোটি, অর্থাৎ আগের দশকের তুলনায় ৩০ কোটি বেশী। আমাদের দেশের ছবিটি এ ক্ষেত্রে আরও শোচনীয় সন্দেহ নেই। বিশ্বের সর্বাধিক নিরক্ষরের বাস ভারতেই।

এই শতকের গোড়া থেকে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি খুবই কম। পাশের তালিকা থেকে তা বোঝা যায় :—

বৎসর	সাক্ষরতার শতকরা হার		
	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
১৯০১	৬.২	১১.৫	১ ৭
১৯১১	৭ ৬	১২.৬	১.১১
১৯২১	৮.৩	১৪.২	১.৮
১৯৩১	৯.১	—	—
১৯৪১	১৪.৬	—	—
১৯৫১	১৬ ৬	২৪.৯	৭.৯
১৯৬১	২৪ ০	৩৪.৪	১২ ৯

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে সাক্ষরতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮.৬ এবং বর্তমানে হার হ'ল আনুমানিক ৩২%। ১৯৫১ থেকে ১৯৬১—এই দশকে সাক্ষরতার শতকরা হার ৭.৪ বাড়লেও নিরক্ষরের সংখ্যা ২৯ কোটি ৮০ লক্ষ থেকে বেড়ে ৩৩ কোটি ৪০ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ এই দশকেই নিরক্ষরের সংখ্যা বেড়েছে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ। ১৯৬১ সালে ১০ বৎসর ও উর্ধ বয়স্ক নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৬ কোটি ৩০ লক্ষ এবং ১৫-৪৪ বছর বয়সের মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল ১৩ কোটি ১০ লক্ষ। ১৯৬৬ সালে অর্থাৎ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে এক হিসেবে দেখা গেছে যে, নিরক্ষরের সংখ্যা ১৯৬১ সালের পরবর্তী পাঁচ বছরে বেড়েছে ২ কোটির মত।

১৯০১ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত পুরুষদের মধ্যে সাক্ষরতার শতকরা হার ১১.৫ থেকে বেড়ে ৩৪ হলেও মহিলাদের মধ্যে এই হার ১.৭ থেকে বেড়ে মাত্র ১২.৯ হয়েছে। ১৯০১ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে সাক্ষরতার হার শতকরা ৭.৪ বাড়লেও এই সময়ে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে এই বৃদ্ধির হার হ'ল ৯.৫ ও ৫। শহর ও গ্রামাঞ্চলেও এই পার্থক্য নজরে পড়ে।

তথ্যাবলী থেকে এটাও স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কার্যক্ষম বয়ঃসীমার মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা কি বিরাট। নিরক্ষরতার সমস্যা সমাধানের বিষয়টি তাই আরও জরুরী হয়ে পড়েছে।

দেশের এই বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের শিক্ষাহীনতার মূলে ছিল সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতি। এই নীতি, শিক্ষাকে আড়াল করে রেখেছিল সাধারণের কাছ থেকে। ১৯০১ থেকে ১৯৪৭—এই প্রায় চার যুগে সাক্ষরতার শতকরা হার ৬.২ থেকে বেড়ে মাত্র ১২ হয়েছিল।

দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ কিন্তু কম ছিল না এবং জনশিক্ষা প্রসারে উদ্যোগও এই সময়ের মধ্যেই বেশী হয়। উনিশ শতকের শেষ ভাগেই স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে নৈশ বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। হরিজন সম্প্রদায়ের মধ্যেও শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে নৈশ বিদ্যালয় গঠিত হয় প্রথম ১৯২০ সালে। বৃটিশ সরকার কখনও নিরক্ষরতা দূরীকরণের এই বেসরকারী প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানায় নি।

১৯৩৭ সালে বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে লোক-নির্ব্বাচিত সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে এই কর্মসূচীতে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু দু বছরের মধ্যেই এই প্রচেষ্টা বন্ধ হয় এই সব সরকারের পদত্যাগের ফলে। কিন্তু, এই অল্প সময়ের মধ্যেই যে উৎসাহ উদ্যমের সৃষ্টি হয়েছিল, তার মূল্য অপরিসীম। পরাধীন ভারতে ১৯৩১-৪১ এই দশকের মধ্যেই সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি সর্বাধিক, অর্থাৎ শতকরা ৫.৫। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য এই সময়ে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে অন্তরীন রাজবন্দী বাবুরাও শিক্ষা প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। জনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দেশবাসীর মধ্যে সচেতনতাও বেড়েছিল বহুলাংশে।

৬ই থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কলিকাতায় ব্যবহারিক সাক্ষরতা সম্পর্কে জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে নিরক্ষরতা সমস্যার ব্যাপকতা এবং এর প্রতিকারের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

স্বাধীনতার পরবর্তী বাইশ বছরে সাক্ষরতা বৃদ্ধির শতকরা হার প্রায় ২০। নিরক্ষরের সংখ্যাও বেড়েছে এবং এজন্য জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ওপরেই দায় চাপান হয়।

একটা হিসাবে দেখা যায়, ১৯২১ থেকে ১৯৬১—এই চার দশকের প্রতি বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে গড়ে শতকরা ২.৩। অর্থাৎ পরাধীন ভারতেও এই হার মোটামুটিভাবে একই থাকা সত্ত্বেও সীমিত সুযোগের মধ্যেই ১৯৩১-১৯৪১ পর্যন্ত সাক্ষরতার শতকরা হার বেড়েছিল ৫.৫। সুতরাং একটি স্বাধীন দেশে যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি ক'রে কেন এই হার বহুলাংশে বাড়ানো সম্ভব নয়? কেন নিরক্ষরের সংখ্যা হ্রাস করা সম্ভব নয়?

আসল কথা, দেশের রাজনৈতিক ও বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সমেত সর্বসাধারণকে দেশ গঠনে এবং জাতীয় অর্থনীতির উন্নতির স্বার্থে, সাক্ষরতার অগ্রাধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। শিক্ষিত জনসাধারণের এই উপলব্ধির প্রয়োজন যে দেশের ব্যাপক সংখ্যক নিরক্ষর মানুষকে শিক্ষিত করার দায়িত্ব তাঁদেরই। ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষকদের সংগঠনগুলিকে, নিরক্ষর সভ্যদের সাক্ষরতা দানের জন্য আন্দোলন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। কল কারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিকদের নিরক্ষর শ্রমিক কর্মচারীদের লেখাপড়া শেখার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সভাপতি ডক্টর দৌলত সিং কোঠারির সভাপতিত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে দেশের, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির স্বার্থে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যে সব যুক্তি উল্লেখ করা হয়েছে, আমরা সে সম্পর্কে এক মত। সুতরাং এ প্রসঙ্গের পুনরুল্লেখ বাহুল্য। এই রিপোর্টেই নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচী সম্পর্কে যে সব সুপারিশ করা হয়েছে, আমরা সে বিষয়ে মোটামুটি ঐক্যমত প্রকাশ করছি। অবশ্য যে সব শিশু শিক্ষালাভের বয়স হওয়া সত্ত্বেও অর্থনৈতিক কারণে নিরক্ষর থেকে যায়, তাদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য আমরা একটি সুপারিশ করছি। আমরা মনে করি এই সব শিশুর জন্য ব্যাপকভাবে সান্ধ্য ক্লাস চালু করা হোক। সারাদিন কাজ করলেও এই সান্ধ্য ক্লাশে তাদের পক্ষে লেখাপড়া শেখা সম্ভব। বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান করা হলে এই ক্লাশগুলিতে যোগদানে এদের আগ্রহ বহুলাংশে বাড়বে।

এটা অবশ্য প্রয়োজন, কারণ অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হওয়া সত্ত্বেও অসংখ্য শিশুই শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে না অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য। আমরা মনে করি, ডক্টর কোঠারি শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধি রোধের উদ্দেশ্যে অন্যান্য যে সব সুপারিশ করা হয়েছে এটি তার পরিপূরক হবে।

নিরক্ষতা দূরীকরণের কাজকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ফেলে রাখা যায় না—ডক্টর কোঠারি কমিশনের রিপোর্টে এ বিষয়টির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে একটা সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার প্রস্তাবও করা হয়েছিল। দুঃখের বিষয়, এই রিপোর্ট পেশের পর তিন বছর কেটে গেছে, কিন্তু এই সুপারিশগুলি কার্যকরী করার জন্য কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকার, নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য এই সময় সীমা বেঁধে দিয়ে আইনজারী করেছেন। আরব রাষ্ট্রসমূহে এই সময় সীমা কোথাও ১০ বৎসর, কোথাও বা ১৫ বৎসর। ফিলিপিন সরকার ১৯৬৬-৭২ সালের মধ্যে ৬ বৎসর ব্যাপী নিরবচ্ছিন্নভাবে সাক্ষরতা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন জারী করেছেন। ব্রহ্ম সরকার আরও অল্প সময় নির্দিষ্ট করেছেন এ সম্পর্কে। ইরাণ সরকার চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে (১৯৬৭-৭২) সাক্ষরতার শতকরা হার আরও ৩০ ভাগ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এক পরিকল্পনা চালু করেছেন। ইতালী, মেক্সিকো ও তুরস্কে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

সর্বসাধারণ	২৪.০ (১৬.৬)	১৯.০ (১১.৮)	৪৭.০ (৩৪.৬)
পুরুষ	৩৪.৪ (২৪.৯)	২৯.০ (১৯.০)	৫৭.৬ (৪৫.০)
মহিলা	১২.৯ (৭.৯)	৮.৫ (৪.৯)	৩৪.৬ (২২.৩)

১৯৬১ সালের আদমসুমারি বিশ্লেষণ করলে আরও দেখা যায়, নিরক্ষরতার হার বয়স্কদের মধ্যেই বেশী।

বয়স	জনসংখ্যা	সাক্ষরসংখ্যা	জনসংখ্যার শতকরা হার	সাক্ষরতার শতকরা হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৩-৪	৬৬১	—	১৫.০	—
৫-৯	৬৪৭	১১৮.৩	১৪.৭	১৯.৮
১০-১৪	৪৯৪	২০৮.৪	১১.২	৪২.২
১৬ ১৯	৩৫৯	১৩৭.৯	৮.৩	৩৮.৪
২০-২৪	৩৭৪	১২৫.৪	৮.৫	৩৩.৫
২৫-২৯	৩৬৭	১০৭.৩	৮.৫	২৯.২
৩০-৩৪	৩০৯	৮৫.১	৭.০	২৭.৫
৩৫-৪৪	৪৮৪	১২৩.০	১১.০	২৫.৪
৪৫-৫৯	৪৫০	৯৮.৩	১০.২	২১.৮
৬০ বৎসরের উর্ধ্বে	২৪৭	৪১.৪	৫.৬	১৬.৮
মোট	৪৩৯২	১০৫৫.১	১০০	১০০

আমরা মনে করি, সুনির্দিষ্টভাবে একটি সময় সীমা ভারত সরকারকে বাঁধতে হবে এবং এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নও করতে হবে।

লেখাপড়া শেখার কথা উঠলে অনেক নিরক্ষর ব্যক্তিই প্রায়শ: প্রশ্ন করেন—লেখাপড়া শিখে কি হবে? শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও নিরক্ষরতার সমস্যা সম্পর্কে অনীহা রয়েছে। কলকারখানার মালিকরা প্রায় সকলেই নিরক্ষর শ্রমিক কর্মচারীদের সাক্ষর করার ব্যাপারে আগ্রহ দেখান না।

এই সব বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন আছে যাতে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যেই তাগিদ সৃষ্টি হয়। আইন প্রণয়ন করতে হবে যাতে নিরক্ষর শ্রমিক কর্মচারীদের সাক্ষরতা দানের জন্য মালিকরা প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা দেন। সাক্ষরতা লাভ করার পর পদোন্নতি, সাক্ষরতা বোনাস বা অন্য ধরনের আর্থিক সুবিধা নিরক্ষর শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে তাগিদ সৃষ্টি করবে।

কাম্বোডিয়া, ইকুয়েডরে সম্প্রতি প্রণীত আইনে এক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিরক্ষরদের লেখাপড়ায় সাহায্য করতে হবে।

কিউবাতেও নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান পরিচালনাকালে প্রধানমন্ত্রী কাস্ত্রো ঘোষণা করেছিলেন—

নিরক্ষররা লেখাপড়া শিখুন, শিক্ষিতরা শিক্ষক হ'ন।

ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি কর্মীবাহিনী গঠনের উদ্যোগ নিয়েছেন। এই বাহিনীর অন্যতম মূল কাজ হবে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ। এই বাহিনী গঠনের কাজ সম্পূর্ণ করা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলনে এদের ব্রতী করা ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন।

এটা বলা বাহুল্য যে, শুধু আইন প্রণয়ন করে এই বিপুল সংখ্যক নিরক্ষরকে সাক্ষর করা যায় না। ডক্টর কোঠারি কমিশনের রিপোর্টে এই অভিযান সংগঠনের উদ্দেশ্যে যে দ্বিমুখী কর্মসূচীর প্রস্তাব করা হয়েছে আমরা তার সঙ্গে একমত। কলকারখানায় বিশেষ বয়:গোষ্ঠী বা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এবং ব্যাপকভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে গণউদ্যোগ গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই উদ্যোগের নজীররূপে সোভিয়েত ইউনিয়নে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের উল্লেখ করা হয়েছে। সম্প্রতি সংগঠিত মহারাষ্ট্র গ্রাম শিক্ষা মহিমণ্ড সীমাবদ্ধভাবে হলেও এ ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য নজীর।

আমরা মনে করি ডক্টর কোঠারি কমিশনের এই সুপারিশগুলি কার্যকরী করার উদ্যোগ নেওয়া হলে সাক্ষরতা আন্দোলনের পথ বহুলাংশে প্রসারিত হবে। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, দেশকে নিরক্ষরতা মুক্ত করার উদ্দেশ্যে এক ব্যাপক সংস্কার মুক্ত জাতীয় গণ উদ্যোগ গড়ে তোলা অপরিহার্য।

বয়স্ক ছাত্রদের শেখাবার পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে গেলে এটা উল্লেখযোগ্য যে বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। যার মধ্যে বাচ্চাদের শেখাবার সেই চিরাচরিত পদ্ধতিও আছে। কিন্তু আমরা মনে করি এই সমস্ত পদ্ধতির গুণাগুণ বিচার ও মূল্যায়ন করার সময় এখন হয়েছে এবং নতুন কোন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হবে যা আমাদের উদ্দেশ্যের পরিপূরক।

ইতিমধ্যে পুরোনো পদ্ধতিতেই কাজ চলতে পারে। তাই আমাদের প্রস্তাব, জাতীয় ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞদের এবং যাঁরা এ ব্যাপারে হাতে কলমে কাজ করছেন, তাঁদের নিয়ে একটি মূল্যায়ণ কমিটি নিয়োগ করা প্রয়োজন।

সাক্ষর হবার পর বয়স্কদের শিক্ষাদানের প্রশ্নটিই এই আন্দোলনের সার্থকতার মূল কথা। যদি যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে এই চিন্তাটির মোকাবিলা না করা যায়, তবে নবসাক্ষরদের নিরক্ষরতার অন্ধকারে ফিরে যেতে খুব বেশী সময় লাগবে না। যে সব বাচ্চারা প্রাথমিক স্তরে ক্লাস করেছে, অথচ আর্থিক বা অন্য কোন কারণে আর পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেনি, তাদের ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটা বিচিত্র নয়। সুতরাং সাক্ষরতা আন্দোলনের যে কোন পরিকল্পনা করতে গেলে এই পাঠাভ্যাস বজায় রাখার ব্যবস্থা করা সর্বাগ্রে দরকার।

নব সাক্ষরদের জন্য সাহিত্য, সাময়িক পত্র পত্রিকা বা জার্নাল ভ্রাম্যমান গ্রামীণ পাঠাগার, শ্রাব্যদৃশ্য ব্যবস্থা ইত্যাদিও এই সমস্যার অঙ্গীভূত।

এই গণউদ্যোগ সংগঠিত ও পরিচালনার জন্য উপযুক্ত সংস্থা প্রয়োজন। মহারাষ্ট্র গ্রাম শিক্ষা সম্পর্কে অনুষ্ঠিত জাতীয় সেমিনারে (১৯৬৫) এ সম্পর্কে সুপারিশ করা হয়েছিল যে একটি দ্বি-স্তর জাতীয় সংস্থা গঠন করতে হবে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিকে বয়স্ক সাক্ষরতা ও শিক্ষা নীতি সম্পর্কে পরামর্শদান, কর্মসূচী প্রণয়ন, সাক্ষরতা প্রকল্প সমূহের কাজ পর্যালোচনা ও সে সম্পর্কে ফলাফল গবেষণা করবে এই সংস্থা। এই সংস্থার কাঠামো কি হবে তা ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে রাখার জন্যই সম্ভবত: আজ পর্যন্ত এ সংস্থা গঠিত হয়নি।

এই জাতীয় সংস্থা অনতিবিলম্বে গঠন করা প্রয়োজন। এই সংস্থায় সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারী সংগঠনের প্রতিনিধি নিতে হবে। এই সংস্থার জাতীয় চরিত্র অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। নিরক্ষরতা দূরীকরণে জাতীয় উদ্যোগ গড়ে তোলা ও তা প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সব সুযোগ সুবিধা ও ক্ষমতা এই সংস্থাকে দিতে হবে।

আমাদের দেশে দারিদ্র্য ও অনশনের জ্বালা এতো তীব্র যে প্রতি বছর ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়ছে। এরা ক্ষুধার জ্বালায়, এক টুকরো রুটির আশায় নিজেদের আত্মসম্মান এবং সব রকম ভদ্রতাবোধ হারিয়ে ফেলে। আর আমাদের দেশের ধার্মিক ব্যক্তিরা তাদের জন্য কাজের ব্যবস্থা না করে এবং কাজ করে অন্ন সংস্থান করার ওপর জোর না দিয়ে, তাদের এক মুষ্টি ভিক্ষা দিয়ে পুণ্য অর্জন করেন।

—গান্ধীজী

দণ্ডকারণ্যে উপজাতি পুনর্বাসন

মধ্যপ্রদেশ সরকারের একটি প্রস্তাব অনুসারে, দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৩০০ ভূমিহীন উপজাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছেন। দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের পারালকোট এলাকার উপজাতি পরিবারগুলিসহ এবাও সম্প্রসারণ সূচীর অন্তর্ভুক্ত হবে। দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষ ইতিপূর্বে উপজাতি কল্যাণ সম্পর্কে যে সব কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন তা ছাড়াও এই অতিরিক্ত প্রকল্পটির কাজ হাতে নেওয়া হ'ল।

বস্তারের কালেক্টর (মধ্যপ্রদেশ) প্রথমে উত্তর ও দক্ষিণ পারালকোটের ১৫টি উপজাতি গ্রামের ৯৭টি ভূমিহীন উপজাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার কথা বলেন। এদের মধ্যে ৯টি পরিবার সম্ভবতঃ অন্য কোন জায়গায় চলে যান, ফলে এদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি এবং ১৪টি পরিবার বলে যে, তাদের যথেষ্ট চাষের জমি রয়েছে সুতরাং তারা অন্যত্র যেতে রাজী নয়। অবশিষ্ট ৭৪টি পরিবার এবং আরও তিনটি পরিবারকে দণ্ডকারণ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পুনর্বাসন দেওয়া হয়।

প্রকল্প থেকে এই পরিবারগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে সাহায্য দেওয়া হয়:—

পরিবার প্রতি এক জোড়া বলদ	৪৫০ টাকা
পরিবার প্রতি কৃষি সাজসরঞ্জাম এবং তিন একরের জন্য নির্বাচিত বীজ	১০০ টাকা
রাসায়নিক সার অনধিক	১০০ টাকা
পরিবার প্রতি তিন একর জমিতে আল বাঁধ দেওয়ার উদ্দেশ্যে একর প্রতি ১০০ টাকা	৩০০ টাকা
	৯৫০ টাকা

এই সব মোটা সাহায্য ছাড়াও, কর্মসূচীর প্রধান লক্ষ্য হ'ল এদের মধ্যে নিবিড় কৃষি সম্প্রসারণসূচীর প্রবর্তন। দণ্ডকারণ্যের জন্য কর্তৃপক্ষ যে শস্যসূচী উদ্ভাবন করেছেন এদের জমিতেও সেই অনুযায়ী চাষ করা হচ্ছে এবং চাষ পদ্ধতি দেখানোর ব্যবস্থাও করা হয়েছে। সম্প্রসারণের কাজ যাতে খানিকটা সহজ হয় সেজন্য বস্তার জেলার তিনজন গ্রামসেবক এখানে কাজ করছেন।

এই পরিবারগুলি ৪৩৬ একর জমি চাষ করছে। অবশ্য সরকারী জমিতে অনুপ্রবেশ করার ফলে, কয়েকটি পরিবারের হাতে ইতিমধ্যেই ২৪৩ একর জমি ছিল। দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের ভূমি পুনরুদ্ধার কর্মসূচী অনুযায়ী কয়েকটি পরিবার নিজেদের হাতে জঙ্গল পরিষ্কার করে অবশিষ্ট ১৯৩ একর জমি পুনরুদ্ধার করে।

যে সব বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয় এবারে ভালো ফসল পাওয়া যাবে এবং উপজাতি পরিবারগুলি ভবিষ্যতে স্বপুষ্ট থাকতে পারবে।

গ্রামে ব্যাঙ্ক স্থাপন

কয়েকটি পরামর্শ

জে. সি. বর্মা

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের কয়েকদিন পরেই ১৯৬৯ সালের ৩০শে জুলাই, অখিল ভারত পল্লী ঋণ পর্যালোচনাকারী কমিটির চূড়ান্ত সুপারিশগুলি প্রকাশিত হয়। কমিটির বিবরণীতে প্রধান প্রধান যে সব সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলি হ'ল—একটি কৃষি ঋণ বোর্ড গঠন ক'রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষি ব্যবস্থার পুনর্গঠন, নির্বাচিত কয়েকটি জেলায় ছোট চাষীদের জন্য একটি ক'রে উন্নয়ন সংস্থা স্থাপন, কৃষি অর্থসাহায্য কর্পোরেশনকে বৃহত্তর ভূমিকা দান, কৃষির পক্ষে সম্ভাবনাপূর্ণ অনুন্নত অঞ্চলগুলির উপকারের জন্য পল্লী বৈদ্যুতিকীকরণ কর্পোরেশন স্থাপন। তা ছাড়া কমিটি অবশ্য এই সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান পল্লীঋণের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকারও উল্লেখ করেছেন।

প্রধান প্রধান ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্বে এসে যাওয়ায় এবং পল্লী অঞ্চলে এগুলির শাখা স্থাপনের প্রস্তাব করার ফলে পল্লী ঋণের একটা স্থায়ী সমাধান হয়ে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এতে করে পল্লী অর্থনীতিকে অনগ্রসরতা থেকে উদ্ধার করে তাকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাওয়া যাবে বলেও আশা করা হচ্ছে।

এই উদ্দেশ্য পূরণ করা সহজ নয়। তবে ব্যাঙ্কগুলি এই চাহিদা ও সরবরাহ কতখানি দক্ষতার সঙ্গে মেটাতে পারে তার ওপরেই এই কর্মসূচীর সাফল্য নির্ভর করে। পল্লী ঋণের চাহিদা আসে নানা রকম লোকের কাছ থেকে, বিভিন্ন পরিমাণ অর্থের জন্য, বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন মেয়াদের জন্য। উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও গ্রামাঞ্চলে তিন রকম ঋণের চাহিদা রয়েছে, যেমন গরু মহিষের খাদ্য কেনার জন্য স্বল্প মেয়াদি ঋণ, বীজ, গরু মহিষ এবং সার কেনার জন্য মাঝারি মেয়াদি ঋণ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি, জমি ও বাড়ী তৈরি করার জন্য দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ। যাই হোক স্বল্পকালীন একটা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করে দেখলেও বোঝা যায় যে, পল্লী অঞ্চলের এই সব চাহিদা পল্লীর ব্যাঙ্কগুলিকে যথেষ্ট কাজ দিতে পারবে না। কাজেই পল্লী ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলির আশু সমস্যা হ'ল, তাদের হাতে লগ্নী করার মতো যে অর্থ আছে তার জন্য একটা কার্যকরী চাহিদা সৃষ্টি করতে হবে।

গ্রামে, ব্যাঙ্কের সুযোগ সুবিধে না থাকায়, এবং গ্রামবাসীদের ব্যাংকিং সম্পর্কে কোন অভ্যাস না থাকায় পল্লী অর্থনীতি এখনও আধুনিক হয়ে ওঠেনি। গ্রামের শিল্পগুলি এখনও আদিম। গ্রামগুলিতে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়ার চাহিদা বাড়বে বলে যে আশা করা হচ্ছে, সেই গ্রামের অধিবাসীরা উৎপাদনের আধুনিক উপায় ও পদ্ধতি সম্পর্কে এখনও অনভিজ্ঞ, কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং উপযুক্ত বিক্রয় ব্যবস্থা গ্রহণে অক্ষম। এগুলি হ'ল অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা এবং এই বাধাগুলি দূর করতে পারলে উন্নয়নমূলক আর্থিক চাহিদা সৃষ্টি করা যায়।

কার্যকরী চাহিদা

একটা কার্যকরী চাহিদা সৃষ্টি করার জন্য, গ্রামের সরকারী ব্যাঙ্ক স্থাপন করা সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অবিলম্বে ব্যাপক প্রচার কার্য সুরু করা উচিত এবং কৃষির সম্প্রসারণের জন্য আধুনিক কৃষি সরঞ্জাম, পাম্প ইত্যাদি কেনার জন্য কত টাকার ঋণের প্রয়োজন হতে পারে সে সম্পর্কে পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য গ্রামের চাষীদের উৎসাহিত করা উচিত। ব্যক্তিগত এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনে এবং অন্যান্য প্রয়োজনে তাদের কতটাকা ঋণের দরকার সে সম্বন্ধেও তাদের হিসেব তৈরি করতে বলা উচিত। টাকা জমা রাখা, মূল্যবান জিনিসপত্র গচ্ছিত রাখা ইত্যাদি যে সব সুযোগ সুবিধে গ্রামবাসীরা পেতে পারেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের, সেগুলিও গ্রামবাসীদের জানানো উচিত। এই সব কাজের ভার একদল শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের হাতে দেওয়া উচিত। তাঁরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে, গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাদের সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করবেন, সুযোগ সুবিধেগুলি বুঝিয়ে দেবেন এবং যথেষ্ট সময় থাকতেই গ্রামবাসীরা যাতে তাদের ঋণের প্রয়োজন সম্পর্কে পরিকল্পনা তৈরি করতে পারেন তাতে সাহায্য করবেন। ছোট ছোট উদ্যোক্তাগণ যাতে গ্রামের আশে পাশেই শিল্প গড়ে তোলেন সেজন্যে সরকারের, সম্ভবপর সব রকম উপায়ে তাঁদের সাহায্য করা উচিত।

ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণ করার এই রকম একটা কার্যকরী চাহিদা যদি গড়ে তোলা যায় এবং ব্যাঙ্ক থেকে গ্রামবাসীরা যদি ঋণ পেতে সুরু করেন তাহলে জাতীয় অর্থনীতিতে তার প্রতিক্রিয়া কি হবে? এর অত্যন্ত সম্ভবপর উত্তর হ'ল এই পরিবর্তনের ফলে ঋণের সম্প্রসারণ ঘটতে বাধ্য। কৃষি ও ছোট শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় নানা ধরনের জিনিসপত্রের এবং সঙ্গে সঙ্গে নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রীরও চাহিদা বেড়ে যাবে। তারপর যদি চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম হয় তাহলে তা মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করতে পারে।

সর্ব্ব ভারত পল্লীঋণ পর্যালোচনাকারী কমিটি যে উদ্দেশ্য নিয়ে ছোট চাষীগণের উন্নয়ন সংস্থা গঠনের প্রস্তাব করেছেন, ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এই রকম অবস্থায় এই সংস্থাগুলি ছোট চাষীদের সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারবে। ব্যাঙ্ক থেকে কৃষকদের যে ঋণ দেওয়া হবে তা দিয়ে কৃষি সাজসরঞ্জাম কেনার উদ্দেশ্যে সমবায় ঋণদান সমিতি গঠন ক'রে তার মাধ্যমে ব্যাঙ্ক যদি ঋণ দেয় তাহলে কৃষি সাজ সরঞ্জাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ সুনিশ্চিত করা না হলে সেগুলি সম্পর্কে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা প্রতিরোধ করা যাবে না। এই রকম অবস্থায় এমন সব ক্ষুদ্রায়তন শিল্প স্থাপনে উৎসাহ দেওয়া উচিত যেগুলি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির চাহিদা মেটাতে পারে। কৃষিতে যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়লে যারা বেকার হয়ে পড়তে পারেন,

এই সব ক্ষুদ্রায়তন শিল্প তাদের জন্য কর্মসংস্থানও করতে পারে।

প্রতিটি গ্রামে ব্যাঙ্কের শাখা খোলার কয়েকটা প্রধান অসুবিধে হ'ল, পরিবহন ও যোগাযোগের অভাব, সহরের সুযোগ সুবিধেগুলির অভাব, সন্তোষজনক ব্যবসার অনিশ্চয়তা, সহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গ্রামে গিয়ে বাস করতে কর্মচারীগণের অনিচ্ছা, ব্যাঙ্ক ও কর্মচারীগণের সম্পদ ও সম্পত্তি রক্ষা করার ব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি।

চলমান ব্যাঙ্ক

এই রকম পরিস্থিতিতে জেলার, তহশীল বা থানায় ব্যাঙ্কের সদর অফিস রেখে, ইন্দোনেশীয়ার মতো, গ্রামগুলিতে চলমান ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মহকুমা সদরে যেখানে ব্যাঙ্কের প্রধান অফিস থাকবে সেখানেই চলমান ব্যাঙ্ক রাখা হবে এবং সপ্তাহে দুই বার গ্রামগুলিতে পরিভ্রমণ করবে এবং প্রত্যেক গ্রামে দুই ঘন্টা করে থাকবে। এই রকমভাবে একটি চলমান ব্যাঙ্ক এক সপ্তাহে নয়টি গ্রাম অথবা একদিনে তিনটি গ্রাম পরিভ্রমণ করবে। প্রত্যেক চলমান ব্যাঙ্কে দুই জন কেরাণী, একজন সশস্ত্র রক্ষী এবং গাড়ীর চালক থাকবে। প্রতিটি গ্রামে সপ্তাহে দুইবার যাওয়ার উদ্দেশ্য হ'ল গ্রামবাসীদের টাকা জমা দেওয়া বা তোলার জন্য সর্বাধিক সুযোগ দেওয়া। প্রথম দিনে তারা টাকা জমা দেওয়া বা তোলা অথবা ঋণের জন্য আবেদন পত্র দাখিল করতে পারবে, দ্বিতীয় দিনে টাকাটা নিতে পারবে। চলমান ব্যাঙ্কের কাজ সন্তোষজনকভাবে চলছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য এবং গ্রামবাসীদের সঙ্গে ঋণের সুযোগ সুবিধে ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য, চলমান ব্যাঙ্কের প্রধান অফিসারের, মধ্যে মধ্যে গ্রামগুলিতে পরিভ্রমণ করা উচিত।

গ্রামবাসীদের মধ্যে বেশীরভাগই লেখাপড়া জানেন না বলে ব্যাঙ্কের কাজকর্মে বিশেষ করে জামানত অনুযায়ী যে টাকা দেওয়া হবে অথবা ঋণ হিসেবে দেওয়া হবে তা উৎপাদনের কাজে লাগানো হবে না কি অন্য কোন কাজে ব্যয় করা হবে তা স্থির করা কঠিন হবে। গ্রামবাসীরা যাতে সহজেই ব্যাঙ্কের সঙ্গে কাজকর্ম করতে পারেন সেজন্য জমাকারীর সনাক্তকরণের পক্ষে ফটোগ্রাফই যথেষ্ট হওয়া উচিত। যে কৃষকরা লেখাপড়া জানেন, কোন রকম ইতস্ততঃ না করে তাদের চেক বই দিয়ে দেওয়া উচিত। এই রকমভাবে স্বল্প মেয়াদের ঋণের জন্য সহজতম উপায় হবে, ঋণ গ্রহণকারীকে প্রয়োজনীয় আবেদনপত্র সম্পূর্ণ ক'রে, ব্যাঙ্কে যাদের হিসেব আছে এই রকম দুজনকে অথবা সমবায় ঋণদান সমিতির বা পঞ্চায়েতের দুই জন সদস্যকে সাক্ষী হিসেবে নাম স্বাক্ষর করিয়ে আবেদন করলেই ঋণ মঞ্জুর করা উচিত। মাঝারি বা দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের, ব্যাঙ্কের প্রধান অফিসে গিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে স্বাক্ষর ইত্যাদি দিতে হবে।

নিরাপত্তা

সেবার উদ্দেশ্য নিয়েই ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্ব করা হয়, লাভের উদ্দেশ্যে নয়, কাজেই নিরাপত্তার প্রশ্নটি প্রধান বিবেচ্য বিষয় করা উচিত নয়। জামিন বলতে কৃষকের সম্পদের মধ্যে হয়তো থাকবে তার গরু বাছুর, তার বাড়ী, তার গরুর গাড়ী আর মামুলি কৃষি যন্ত্রপাতি। ব্যবসার দিক থেকে এগুলি সাধারণভাবে ব্যাঙ্কের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয় না। কাজেই অন্য কোন ধরনের জামিনের ব্যবস্থা করতে হবে। স্বল্প বা মাঝারি মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাঙ্কগুলি গ্রামবাসীদের কাছ থেকে সোনা বা রূপোর গহনা জামিন হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। সোনা বা রূপোর গহনা যদি জামিন হিসেবে নেওয়া যায় তাহলে গ্রামবাসীরা তাঁদের জমি বা বাড়ী জামিন হিসেবে বন্ধক রাখার দায় এড়াতে পারেন।

কৃষকগণকে ঋণের সুযোগ সুবিধে দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্যই হ'ল, উৎপাদন পদ্ধতি উন্নততর করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি। এই দিকটা বিবেচনা করে, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষির আয়ের সঙ্গে সুদের হারের যোগ থাকা উচিত। যে ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ কম, মেয়াদও কম সেই ক্ষেত্রে সুদের হারও কম হওয়া উচিত আবার মেয়াদ ও ঋণের পরিমাণ বেশী হলে সুদের হারও বেশী হওয়া উচিত।

পল্লী অঞ্চলে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির সাফল্যের সঙ্গে কাজ করতে হলে, সমবায় সমিতিগুলির ভূমিকা বদলাতে হবে এবং ব্যাপকতর করতে হবে। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলি যদি ছোট ছোট কৃষকগণের সঙ্গে তাদের সমবায় সমিতির মাধ্যমে কাজ করে তাহলে সমবায় সমিতিগুলিও নতুন উৎসাহে কাজ করতে পারবে। এতে কৃষক এবং ব্যাঙ্ক উভয়েই লাভবান হবে এবং ঋণের আদান প্রদানে ঝুঁকির আশঙ্কা কমবে। এই রকম ক্ষেত্রে এক একটি সমবায় সমিতিতে ১৫/২০ জনের বেশী সদস্য না থাকলেই ভালো হয়, তাহলে কাজ অনেক সহজ হবে। সমিতির প্রত্যেক সদস্যের ব্যাঙ্কে হিসেব থাকবে, কিন্তু ঋণ নেওয়ার সময় তাঁরা তাঁদের সমবায় সমিতির মাধ্যমে ঋণ নেবেন।

পল্লী অঞ্চলে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্মের গতি পর্যালোচনা করার জন্য প্রতি বছরেই পল্লী ঋণ সম্পর্কে একটা সর্বভারতীয় অনুসন্ধান চালানো বাঞ্ছনীয়।

মাদ্রাজে জাতীয় বৃহত্তর পরীক্ষাকেন্দ্র

বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পরিষদ মাদ্রাজের কাছে, আদিয়ারে ছ'টি জাতীয় পরীক্ষাগার নিয়ে একটি বৃহত্তর পরীক্ষাগৃহ স্থাপনের সংকল্প করেছে। উদ্দেশ্য হ'ল, দক্ষিণাঞ্চলে বিভিন্ন শিল্পের প্রয়োজন পূরণে বিভিন্ন পরীক্ষাগারের কাজকর্মে সমন্বয়-বিধান করা এবং পরীক্ষাগারগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা।

এই প্রকল্প রূপায়ণে ব্যয় হবে আনুমানিক ৫০ লক্ষ টাকা এবং সময় লাগবে দু বছরের মতো। এর জন্য আদিয়ারে মোট ৫০ একর জমি জোগাড় করা হয়েছে এবং নির্মাণের কাজ পুরোদমে সুরু হয়ে গিয়েছে।

৬টি পরীক্ষাগার একত্রে স্থাপন করার ফলে আনুষঙ্গিক খরচ খরচা অনেক কম হবে, যেমন কাজ করার ঘর, গ্রন্থাগার, প্রশাসন ব্যবস্থা ও অপরাপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা প্রত্যেকটি পরীক্ষাগৃহই পেতে পারবে। তা ছাড়া বিভিন্ন পরীক্ষাগৃহ নাগালের মধ্যে থাকায় গবেষক বিজ্ঞানীরা প্রয়োজন হলে পরস্পরের সহযোগিতায় অনেক জটিল সমস্যার মীমাংসা সহজে করতে পারবেন।
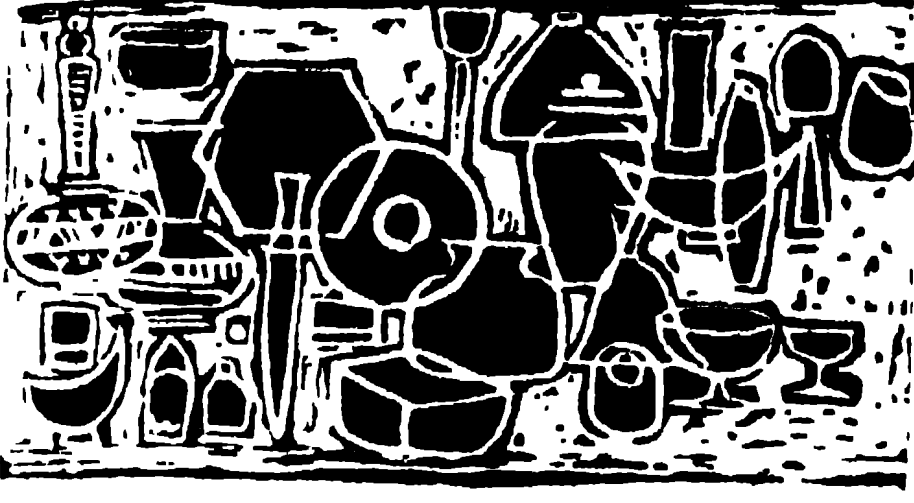
উন্নয়ন বার্তা

★ বিশাখাপতনমের জিঙ্ক স্মেলটার প্রকল্পের জন্য বিস্তারিত প্রকল্প বিবরণী সম্পূর্ণ তৈরি করা সম্পর্কে হিন্দুস্তান জিঙ্ক লিমিটেড এবং পোলাণ্ড সরকারের অন্যতম সংস্থা কন্ট্রোজ্যাপের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই প্রকল্পের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা হবে, ৩০,০০০ টন দস্তা, ৪০,০০০ টন সালফিউরিক অ্যাসিড এবং ৭০ থেকে ১০০ টন ক্যাডমিয়াম দস্তা ধাতু। এই কারখানা, দেশের জন্য বার্ষিক ২.২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রাও বাঁচাতে পারবে।

★ সেন্ট্রাল রেলপথের বোম্বাই বিভাগের, বোম্বাই-পুণা এবং বোম্বাই-ইগতপুরীর মধ্যে বহু লাইন বিশিষ্ট একটি মাইক্রোওয়েভ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এতে এই প্রথম বোম্বাই ও কল্যাণের মধ্যে বেতার টেলিফোনের ব্যবস্থা করা হ'ল, এতে গ্রাহকগণও সোজাসুজি টেলিফোন ডায়েল করে কথা বলতে পারবেন। এই ব্যবস্থা বিদ্যুৎচালিত ট্রেনের বৈদ্যুতিক সংযোগ রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র এবং অচল ট্রেণ ও বিভাগীয় মেরামতকারী ট্রেনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন সহজ হবে।

★ বর্তমানে আর্থিক বছরের প্রথম চার মাসে, পূর্ব বছরের এই সময়ের তুলনায় রেলপথে ৩০.৬৮ লক্ষ টন বেশী মাল বহন করা হয়েছে। যাত্রী চলাচলের ক্ষেত্রেও উন্নতি হয়েছে। এই সময়ে রেলওয়ে ৩১২ কোটি টাকা আয় করেছে এবং এটা হ'ল পূর্ব বছরের এই সময়ের আয়ের তুলনায় ১৬ কোটি টাকা বেশী।

★ ভারতের সূতীবস্ত্র রপ্তানী উন্নয়ন পরিষদ ৪০ লক্ষ টাকা মল্যের ভারতীয় সূতীবস্ত্র বিক্রয় করা সম্পর্কে টানজানিয়ার স্টেট কর্পোরেশনের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

★ সুদানের সঙ্গে স্বাক্ষরিত দুটি চুক্তি অনুযায়ী ভারত সুদানকে এক কোটি টাকা মূল্যের ২০০ রেল ওয়াগন সরবরাহ করবে।

★ গুজরাটের ব্রড গেজ লাইনে মালিয়া মালিয়ানা থেকে নতুন কাণ্ডলা পর্যন্ত ১০৪ কি. মী. দীর্ঘ নতুন রেলপথে মালগাড়ী চলাচল সুরু হয়েছে। এর ফলে ওয়েষ্টার্ণ রেলপথে ঝাণ্ড-নতুন কাণ্ডলা রেল সংযোগের ২৩৪ কি. মী দীর্ঘ রেলপথ তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হ'ল। নির্ধারিত সময়ের ৪ মাস পূর্বেই নির্মিত এই নতুন রেলপথটিতে এখন ট্রেণ চলাচল সুরু হওয়ায় আহমেদাবাদ থেকে কাণ্ডলার দূরত্ব ১৩৪ কি. মী. কমে গেল।

★ জম্মু ও কাশ্মীরের মানাওয়ার—তাওইর ওপর-৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৪১ মিটার দীর্ঘ যে সেতুটি তৈরি করা হয়েছে, সেটি যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এই সেতুটি রাজ্যের সমস্ত বিচ্ছিন্ন স্থানগুলিকে জাতীয় সড়কের সঙ্গে যুক্ত করবে।

★ নীলগিরি পাহাড়ের সানুদেশে, কোয়েম্বাটুর থেকে প্রায় ৮০ কি. মী. দূরে সিরুমুগাইতে বেসরকারী তরফে কাঠের মণ্ড তৈরি করার একটি কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। ইটালীর সাহায্য নিয়ে তৈরি কারখানাটি ডিসেম্বর মাসে সম্পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এখন এটি প্রতিদিন ৬০ টন করে রেয়ন শ্রেণীর মণ্ড তৈরি করবে এবং বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রায় বছরে ৩ কোটি টাকার সাশ্রয় করতে পারবে।

★ ছোট আন্দামান দ্বীপের হাট উপসাগরে ঢেউ প্রতিরোধকারী বাঁধ তৈরি করা সম্পর্কে ভারত সরকার একটি পরিকল্পনা মঞ্জুর করেছেন। এর জন্য ৮ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সহ আনুমানিক ২.২৮ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

★ হিমাচল প্রদেশের সিরমুর জেলার ধৌলাখানে যে কৃষি গবেষণা কেন্দ্রটি রয়েছে সেখানে, ১০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত স্থানে বছরে তিনটি শস্য ফলানো সম্পর্কে পরীক্ষা সফল হয়েছে। বছরে তিনটি শস্য উৎপাদন করতে পারলে কৃষকগণের আয় শতকরা ৫০ ভাগ বেড়ে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

★ নাগপুরের কাছে খোরাডিতে যে তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানাটি তৈরি হচ্ছে তার সাজ সরঞ্জামের প্রথম কিস্তিটি পোলাণ্ড থেকে এসে পেঁাচেছে। ২৫০ টন ওজনের এই সাজ সরঞ্জামের মূল্য হ'ল ৪০ লক্ষ টাকা এতে আছে সীড ওয়াটার পাম্প এবং কনডেনসারের অংশ। এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম এই কারখানা তিনটি পর্যায়ে সম্পূর্ণ করা হবে এবং এর জন্য ব্যয় হবে আনুমানিক ১৬০ কোটি টাকা।

★ রানীখেতের কাছে চৌবতিয়ায় যে উত্তর প্রদেশ ফল গবেষণা কেন্দ্রটি রয়েছে তাঁরা এমন ধরণের আপেল উৎপাদনে সক্ষম হয়েছেন সেগুলি, বাড়ীর বা ঘরের স্বাভাবিক উত্তাপে ২।৩ মাস রেখে দেওয়া যাবে কিন্তু সেগুলি নষ্ট হবে না। এই ধরনের আপেলের নাম দেওয়া হয়েছে 'চৌবাতিয়া এ্যান্রসিস'। এগুলির রঙ্ উজ্জ্বল লাল এবং বিদেশে রপ্তানী করলেও পথেই খারাপ হবে না।

★ ভারতের কয়েকটি কোম্পানীর একটি সংস্থা, পশ্চিম উগাণ্ডায় ৫,২০০ হেক্টর আয়তনের একটি আখের আবাদের উন্নয়ন করার ভার নিয়েছেন। উগাণ্ডা সরকারের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, উগাণ্ডা সরকার এর জন্য প্রায় ৭,৪৫ কোটি টাকা লগ্নী করবেন এবং সংস্থাটি প্রয়োজনীয় মেসিন ও সাজ সরঞ্জাম সরবরাহ করবেন এবং পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ করার স্থানীয় ব্যয়ও বহন করবেন।

★ উত্তর প্রদেশের ঝাঁসি জেলার ললিতপুর থেকে ৪৮ কি: মী: দূরে সোনবাই গ্রামে যথেষ্ট তামা আকরের সন্ধান পাওয়া গেছে।

REGD. NO. D-233

"প্রেরণার কণা"

প্রকৃত নৈতিক মূল্যগুলি যেমন সুসমঞ্জস অর্থনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত তেমনি সত্য অর্থনীতি কখনও উচ্চতম নৈতিক মানগুলির বিরোধিতা করে না। যে অর্থনীতি কেবলমাত্র অর্থ সম্পদের পূজারী হয় এবং যে আর্থিক নীতি দুর্বলকে বঞ্চিত করে বলবানকে সম্পদ সঞ্চয়ে সক্ষম করে তোলে সেই অর্থনীতি অসত্য, সেই বিজ্ঞান যুক্তি হীন। এর ফল মৃত্যু।

যাঁদের গুণ আছে তাঁরা বেশী আয় করবেন এবং এই উদ্দেশ্যে তাঁরা তাঁদের জ্ঞান বুদ্ধি নিয়োজিত করবেন। তাঁরা যদি সমাজের কল্যাণে তাঁদের এই জ্ঞান বুদ্ধি নিয়োজিত করেন তাহলে তাঁরা রাষ্ট্রেরই কল্যাণ সাধন করবেন।

আমার আদর্শ হ'ল সম বন্টন কিন্তু আমি যা দেখতে পাচ্ছি, এই উদ্দেশ্য সফল হবে না। আমি সেইজন্যই ন্যায়সঙ্গত বন্টনের জন্য কাজ করি।

এই আদর্শকে সফল করে তুলতে হলে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করতে হবে। অহিংসার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজের অন্য কোন আদর্শ থাকতে পারে না। আমরা হয়তো সেই লক্ষ্য অর্জন করতে পারবো না। তবে তার জন্য অবিরামভাবে চেষ্টা করতে হবে।

অহিংসার মাধ্যমে কি করে সমবন্টন সম্ভব হতে পারে এবারে তা বিবেচনা করা যাক। যিনি এই আদর্শকে তাঁর জীবন ধারার একটা অঙ্গ করে নিয়েছেন তাঁর পক্ষে প্রথম কাজই হবে, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন নিয়ে আসা। ভারতের দারিদ্র্যকে মনে রেখে তাঁর চাহিদাকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। কোন অসাধু উপায়ে তিনি অর্থোপার্জন করবেন না। ফাটকা বাজারির ইচ্ছা সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে। তাঁর বাসস্থান তাঁর এই নতুন জীবন ধারার উপযোগী করে নিতে হবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আত্ম সংযমী হতে হবে।

যাঁদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ আছে এই আদর্শ অনুযায়ী তাঁরা হবেন সেই অতিরিক্ত অর্থের রক্ষক মাত্র। কারণ এই আদর্শ যিনি অনুসরণ করবেন তাঁর, নিজের প্রতিবেশীর তুলনায় একটি টাকাও বেশী থাকা উচিত নয়।

যখন কোন ব্যক্তি নিজেকে সমাজের সেবক বলে মনে করেন, সমাজের জন্য অর্থউপার্জন করেন এবং সমাজের উপকারের জন্যই ব্যয় করেন তখন তাঁর উপার্জন পবিত্র হয় এবং তাঁর জীবন অহিংস হয়। তা ছাড়া মানুষের মন যদি এই ধরনের জীবনের দিকে ঝোঁকে তাহলে তা সমাজে কোন তিক্ততা সৃষ্টি না ক'রেই শান্তিপূর্ণ বিপ্লব নিয়ে আসবে।

অনেকে হয়তো জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে মানুষের স্বভাবে এই রকম পরিবর্তনের কোন ঘটনা ইতিহাসে পাওয়া যায় কি? ব্যক্তির জীবনে এই রকম পরিবর্তন অবশ্যই এসেছে। সমগ্র সমাজে সেই ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে দেখানো হয়তো সম্ভব নয়। তবে এর অর্থ হ'ল, এ পর্যন্ত অহিংসা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে কোন পরীক্ষা করা হয় নি।

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে এবং তথ্য ও বেতার মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত হ'লেও 'ধনধান্যে' শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করে না। পরিকল্পনার বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী ক্ষেত্রে উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতটা অগ্রগতি হচ্ছে তার খবর দেওয়াই হ'ল 'ধনধান্যে'র লক্ষ্য।

'ধনধান্যে' প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে প্রকাশিত হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

নিয়মাবলী

দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়।

অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পুনঃ প্রকাশকালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার করা হয়।

রচনা মনোনয়নের জন্যে আনুমানিক দেড় মাস সময়ের প্রয়োজন হয়।

মনোনীত রচনা সম্পাদক মণ্ডলীর অনুমোদনক্রমে প্রকাশ করা হয়।

তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয়। কোনোও রচনার প্রাপ্তি-স্বীকৃতি, পত্র মারফৎ জানানো হয় না।

নাম ঠিকানা লেখা ডাকটিকিট লাগানো খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

কোনো রচনা তিন মাসের বেশী রাখা হয়না।

শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাবেন।

গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেস ম্যানেজার, পাব্লিকেশন ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী-১। এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

"ধনধান্যে" পড়ুন
দেশকে জানুন

ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সোসাইটি লিঃ—করোলবাগ, দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত এবং ডিরেক্টার, পাব্লিকেশন্স পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত।

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত
পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

প্রথম বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা

৯ই নভেম্বর ১৯৬৯ : ১৮ই কার্তিক ১৮৯১
Vol. I : No 12 : November 9, 1969

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

প্রধান সম্পাদক
শরদিন্দু সান্যাল

সহ সম্পাদক
নীরদ মুখোপাধ্যায়

সহকারিণী (সম্পাদনা)
গায়ত্রী দেবী

সংবাদদাতা (কলিকাতা)
বিবেকানন্দ রায়

সংবাদদাতা (মাদ্রাজ)
এস. ভি. রাঘবন

সংবাদদাতা (দিল্লী)
পুস্করনাথ কৌল

সংবাদদাতা (শিলং)
ধীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী

ফোটো অফিসার
টি. এস নাগরাজন

প্রচ্ছদপট শিল্পী
জ্যোতিষ ভট্টাচার্য্য

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০

টেলিগ্রাফের ঠিকানা—যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা।

ভুলি নাই

যাঁরা হাসতে জানেন না তাঁদের কাছে এই বিপুলা পৃথিবী দিনের বেলাতেও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

—তিরু কুরাল

এই সংখ্যায়

কম দামের ছোট গাড়ী

গত প্রায় দশ বছর থেকে শোনা যাচ্ছে যে আমাদের দেশে শিগগীরই কম দামের ছোট গাড়ী তৈরি হবে। কিন্তু এই ছোট গাড়ী তৈরির প্রকল্পটি কোন সময়েই আলোচনার পর্য্যায় থেকে বেশী দূরে এগুতে পারেনি। ছোট গাড়ীর দাম যাই হোক না কেন তা সাধারণের নাগালের বাইরেই থাকবে। তবুও যাঁদের কিছুটা সঙ্গতি আছে তাঁরা অবশ্য বেশ ঔৎসুক্যের সঙ্গেই এইসব আলোচনার ফলাফল লক্ষ্য করছেন।

বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর শ্রী এল. কে. ঝার নেতৃত্বে, মোটর শিল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে পর্য্যালোচনা করার জন্য, যখন একটি কমিটি গঠিত হয় তখনই ১৯৫৯ সালে, সর্ব্বপ্রথম কম দামের মোটর গাড়ী তৈরি করার কথা উল্লেখ করা হয়। কমিটি বলেছিলেন যে যথেষ্ট সংখ্যায় বিক্রী হতে পারে এবং সম্পূর্ণ এক নতুন শ্রেণীর ব্যবহারকারীদের আকর্ষণ করা যেতে পারে, এই ধরনের কম দামের মোটর গাড়ী তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ৬০০০ টাকা বা এর কাছাকাছি দামে বছরে প্রায় ১০,০০০ গাড়ী বিক্রী করা যায় এই ধরনের গাড়ী তৈরি করার জন্য, কমিটি, মোটরগাড়ী নির্ম্মাতাদের কাছ থেকে প্রস্তাব আহ্বান করেন।

এই অনুসন্ধানের উত্তরে ১৩টি সংস্থা, ৪০০০ থেকে ৭০০০ টাকার মধ্যে ছোট গাড়ী উৎপাদন করা সম্পর্কে তাদের প্রস্তাব পাঠিয়ে দেয়। বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন রকমের মূল্যের উল্লেখ করায়, সমস্ত খরচসহ ৬,৫০০ টাকার মধ্যে গাড়ী তৈরি করা সম্ভবপর কিনা তা পরীক্ষা ক'রে দেখার জন্য সরকার ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করেন। তাছাড়া স্থির হয় যে বিশেষজ্ঞ কমিটি যদি প্রকল্পটিকে কার্য্যকরী করা সম্ভবপর বলে মনে করেন তাহলে সরকারি তরফে সেই কাজের ভার নেওয়া হবে।

বিশেষজ্ঞ কমিটি ১৯৬১ সালে তাঁদের বিবরণী দাখিল ক'রে বলেন যে ঐ দামের মধ্যে গাড়ী তৈরি করা সম্ভব। সরকার যদিও নীতিগতভাবে প্রকল্পটি অনুমোদন করেন তবুও অর্থ এবং সাজ সরঞ্জামের অভাবে তা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, যদি কোন সাজসরঞ্জাম আমদানী করতে না হয় অথবা বৈদেশিক মুদ্রার জন্য অনুরোধ না জানানো হয়, তাহলে দেশেই বেসরকারি তরফে মোটরগাড়ী তৈরির সম্ভাবনা পরীক্ষা ক'রে দেখা উচিত, তখন আবার এই প্রশ্নটি ওঠে।

এরপর যখন চতুর্থ পরিকল্পনা খসড়া তৈরি হচ্ছিল তখন ছোট মোটরগাড়ী উৎপাদন করা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় শিল্পোন্নয়ন মন্ত্রকের প্রস্তাবটি পরিকল্পনা কমিশন বিবেচনা ক'রে দেখেন। প্রস্তাবে ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছিল ২০ কোটি টাকা এবং বলা হয় প্রকল্পটির কাজ সম্পূর্ণ করতে কয়েক বছর লাগবে। কিন্তু অর্থাভাবে প্রস্তাবটি কার্য্যকরী করা সম্ভবপর হয়নি আর ছোট গাড়ী পূর্ব্ববৎ কল্পলোকের গাড়ীই থেকে যায়।

ছোট গাড়ীকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য সরকারের পক্ষে যথেষ্ট সম্পদ সংহত করা সম্ভবপর কিনা সেটা স্থির করা কঠিন সন্দেহ নেই কিন্তু এই রকম একটা প্রকল্প রূপায়িত করা সম্পর্কে সরকারের আন্তরিকতা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। যে প্রকল্প রূপায়িত করলে দেশের জনগণের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোকই উপকৃত হতে পারেন, সেই রকম একটা প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে কিনা এইটেই অবশ্য একটা মূল প্রশ্ন। কাজেই বিশেষ কোন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা বা দোষগুণের চাইতে অগ্রাধিকারের প্রশ্নটাই প্রথম বিবেচনা করতে হয়। প্রকল্পটি রূপায়িত করতে যে শুধু যথেষ্ট অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে তাই নয়, অন্যান্য জিনিস, যেমন বাড়ী তৈরি করার জিনিস-পত্র, ইস্পাত, বিদ্যুৎশক্তি, পরিবহন ইত্যাদি সবকিছুই যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজন হবে, আর এগুলির সরবরাহ কম। তাছাড়া যথেষ্ট পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রারও প্রয়োজন হবে। সমগ্রভাবে সমাজের উপকারে আসে, অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে সেই ধরনের প্রকল্প রূপায়িত করার প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে, ছোট গাড়ী তৈরি করার মতো সীমাবদ্ধ উপকারের কোন প্রকল্প হাতে নেওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

তবে অদূর ভবিষ্যতে এই প্রকল্পটি কেন বাস্তবে রূপ নেবেনা তারও অবশ্য কোন কারণ নেই। প্রকল্পটি রূপায়িত করবেন বলে সরকার কথা দিয়েছেন এবং ছোট গাড়ী উৎপাদনের দায়িত্ব বেসরকারি তরফকেই দেওয়া উচিত বলে তাঁরা মনে করছেন। তবে বর্তমানে উৎপাদকগণের হাতে যে সব সুযোগ সুবিধে আছে সেগুলি সম্প্রসারিত ক'রে অথবা নতুন কোন সংস্থাকে ছোট গাড়ী উৎপাদনের লাইসেন্স দিয়ে প্রকল্পটি রূপায়িত করা হবে কিনা তা অবশ্য বিতর্কের বিষয়। ঝা কমিটি বলেছেন যে এই উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ নতুন কোন সংস্থা গঠন করা উচিত নয়, অন্যদিকে ট্যারিফ কমিশন (১৯৬৮) সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাব প্রকাশ করেছেন। সরকার অবশ্য মনে করেন যে নতুন কোন সংস্থাকে লাইসেন্স দেওয়ার স্বাধীনতা তাঁদের থাকা উচিত। ছোট গাড়ী তৈরির প্রশ্নটি এই অবস্থাতে রয়েছে।

অনেকে হয়তো বলবেন যে ছোট গাড়ী তৈরির আর কোন সম্ভাবনা নেই; কিন্তু তা সত্যি নয়। অথবা এই প্রকল্পটি সরকারি দলিল দস্তাবেজের মধ্যে চাপা পড়ে থাকলো তাও সত্যি নয়। প্রকল্পটি বাতিল করা হয়নি, যখনই প্রয়োজনীয় সম্পদ পাওয়া যাবে এবং দেশের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয় কোন কাজ বাদ না দিয়ে এই প্রকল্পটির কাজ হাতে নেওয়া সম্ভবপর হবে তখনই সরকার এটি রূপায়িত করতে প্রস্তুত আছেন।

দক্ষিণ ভারতে খনিজদ্রব্যের অনুসন্ধান

তামিলনাড়ুতে বর্ত্তমানে খনিজদ্রব্যাদির জন্য বিশেষভাবে অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে। তিন বছরের একটি প্রকল্প অনুযায়ী আকাশ এবং স্থলপথে নিবিড় অনুসন্ধান চালিয়ে তামা, সীসা, দস্তা, দুষ্প্রাপ্য ধাতু এবং লৌহ আকরের মতো মূল্যবান ধাতুর অনুসন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই অনুসন্ধানের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ১০৫ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ভারত সরকার দেবেন ২৫,৮৭,৫০০ টাকা এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের উন্নয়ন কর্ম্মসূচী অনুযায়ী দেওয়া হবে ৭৬,৫৪,৫০০ টাকা।

খনিজ দ্রব্যাদির নতুন নতুন উৎস বের করার জন্য সরকার দেশের নানা জায়গায় যে অনুসন্ধান সুরু করেছেন এই প্রকল্পটি তারই একটা অংশ। অনুসন্ধান চালিয়ে যদি নতুন নতুন খনিজদ্রব্যের উৎস পাওয়া যায় এবং সেগুলি যদি সংগ্রহ করা যায় তাহলে একদিকে যেমন খনিজ দ্রব্যের আমদানী হ্রাস করা যাবে অন্যদিকে তেমনি বৈদেশিক মুদ্রাও সঞ্চয় করা যাবে।

কার্বনেটাইট খনিজ পদার্থ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ, সোভিয়েট রাশিয়ার এল. এস. বোরোদিন, এই প্রকল্পের অন্যতম পরামর্শ-দাতা হিসেবে এই বছরে দক্ষিণ ভারত পরিদর্শন করেন। তিনি যে সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন তার ফলে অনুমান করা হচ্ছে যে এই অঞ্চলে যে কার্বনেটাইট খনিজপদার্থ পাওয়া যাবে তা ভারতের শিল্পগুলিতে ব্যবহার করা যাবে।

ভারতের ভূতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠান, প্রকল্পের অধীন কয়েকটি জায়গায় ড্রিল ক'রে ভূ-নিম্নের যে সব নমুনা সংগ্রহ করেছেন সেগুলি পরীক্ষা ক'রে দেখার জন্য মাদ্রাজে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। গবেষণাগারে এগুলি নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে এ পর্য্যন্ত ক্যালসিয়াম এবং বেরিয়ামের এক নতুন ধরনের খনিজ কার্বনেট, মাইক্রোলাইট, গ্যাডোলিনাইট (একটি দুষ্প্রাপ্য খনিজ পদার্থ) পাওয়া গেছে। তাছাড়া ভারতে এই প্রথমবার বেরিয়াম-ইউরেনিয়াম পাইরোক্লোর আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্রকল্পটির কাজ দুই বছর হ'ল সুরু হয়েছে এবং তামিলনাড়ুতে খনিজ পদার্থের জন্য যে দীর্ঘকালীন অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে এটি হ'ল তার আধুনিকতম পর্য্যায়। এর পূর্ব্বে ১০০ বছরেরও বেশী প্রাচীন ভারতের জিওলজিক্যাল সার্ভে, খনিজ পদার্থ পাওয়ার সম্ভাবনাপূর্ণ এলাকাগুলির মানচিত্র তৈরী করেন, খনিজ পদার্থের পরিমাণ সম্পর্কে আনুমানিক হিসেব তৈরী করেন এবং রাজ্যের ভূতাত্ত্বিকগণ লৌহ আকরের গুণ ও পরিমাণ সম্পর্কে পরীক্ষা চালান। আধুনিক সাজসরঞ্জামের সাহায্যে আরও বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে এবং খনিজ দ্রব্যাদি সংগ্রহের আধুনিকতম কৌশল সম্পর্কে ভারতীয় কুশলীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের কাছে যে সাহায্য চাওয়া হয়েছিলো তার ফলেই বর্ত্তমানের এই অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে।

এই প্রকল্প অঞ্চল মাদ্রাজ সহরের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। উত্তরে ভেল্লোর থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে সালেম এবং পূর্ব্বে কুড্ডালোর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ত্রিভূজাকৃতি অঞ্চলটি এই প্রকল্পের অধীন।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও ভারতের বিশেষজ্ঞগণের যুক্তপ্রচেষ্টা

এই অনুসন্ধানের প্রথম ব্যবস্থা হিসেবে ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসেই আকাশ থেকে এই প্রকল্প অঞ্চলের ফটো তোলার কাজ সম্পূর্ণ করা হয়। তারপর দুই ইঞ্জিনের একটি বিমানের মাধ্যমে ইলেক-ট্রোনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে লাল মাটির পাহাড়, খাত ও জঙ্গলের ওপর থেকে পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুসন্ধান চালানো হয়। আকাশ থেকে যে সব অনুসন্ধান চালানো হয়েছে সেগুলি এখন পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজে লাগিয়ে ভূপৃষ্ঠে অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে। তাছাড়া তামিলনাড়ু এবং রাষ্ট্র-সঙ্ঘের পাঁচটি দেশ বালগেরিয়া, ক্যানাডা, সোভিয়েট ইউনিয়ন, বৃটেন এবং জার্মান ফেডারেল রিপাব্লিকের বিশেষজ্ঞগণ সম-বেতভাবে গবেষণাগারে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন।

এই বিমান থেকে বেতার যন্ত্রের সাহায্যে ভূপদার্থ পরীক্ষা করা হচ্ছে।
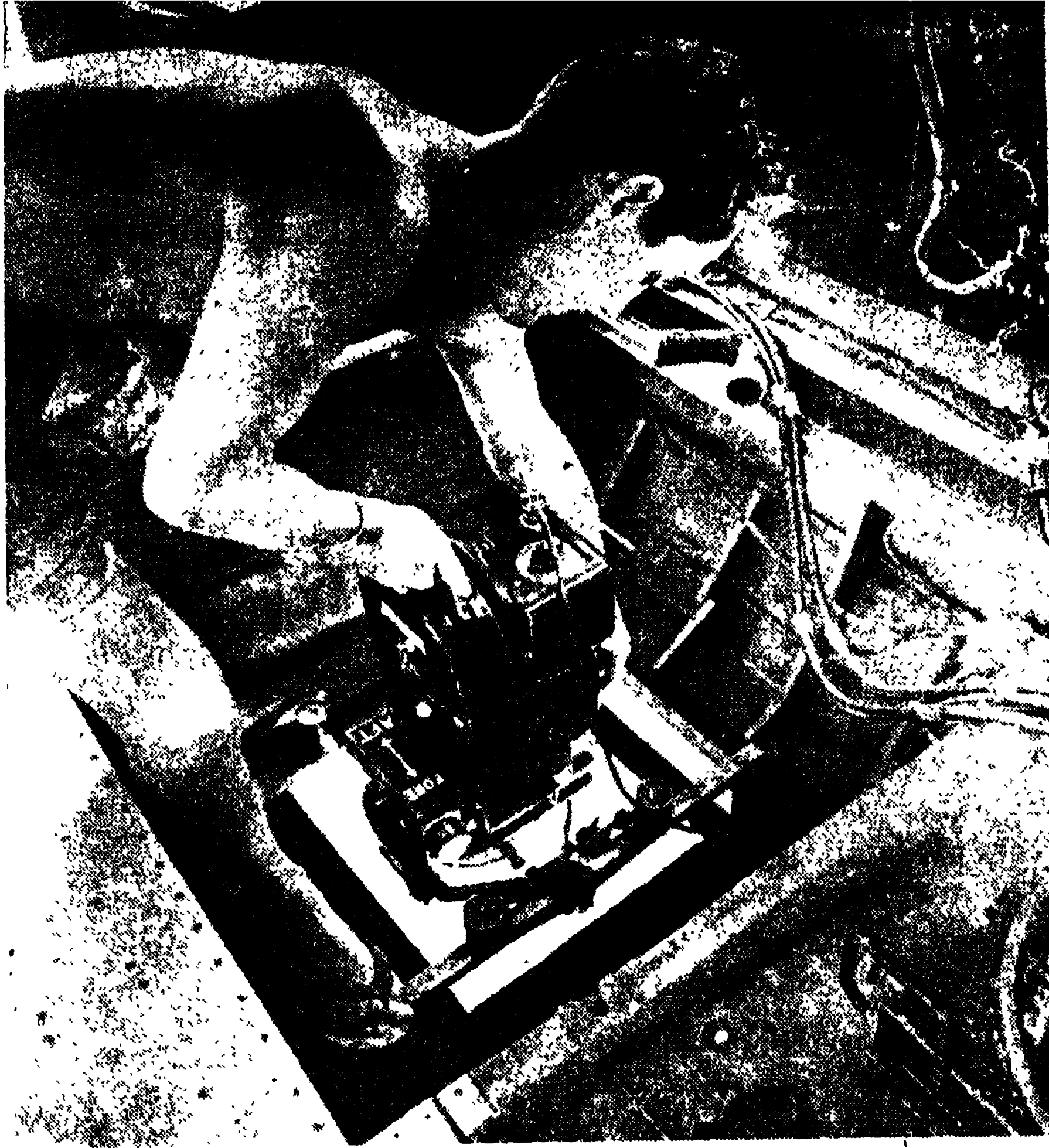
(এর তাপ প্রতিরোধক ক্ষমতার জন্য ব্লাষ্ট ফার্নেসের লাইনিংএর জন্য ব্যবহৃত হয়) এবং ভার্মিকুলাইটের (ইনস্যুলেটিং পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়) উৎস অনুসন্ধানে তামিলনাড়ুকে সাহায্য করবে।

এই প্রকল্পের সঙ্গে রাষ্ট্রসঙ্ঘের যে খনি ইঞ্জিনীয়ার কাজ করছেন তাঁর মতে এখানে যে সব খনিজদ্রব্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে সেগুলির ক্রম হ'ল এই রকম : তামা, সীসা এবং দস্তা ; ম্যাগনেটাইট লৌহ, ভার্মি-কুলেট এবং কার্বনেটাইট।

তামিলনাড়ুতে এ পর্য্যন্ত যে কাজ হয়েছে তার ভিত্তিতে বলা যায় যে এখানে বিভিন্ন ধাতু পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

আকাশপথে অনুসন্ধান

ধাতুর উৎসাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাবার দ্রুততম পদ্ধতি হ'ল আকাশপথে অনুসন্ধান। গাঁইতি শাবল বা অন্যান্য প্রচলিত পদ্ধতিতে ধাতুর অনুসন্ধান করতে যেখানে বছরের পর বছর লেগে যায়, সেখানে আকাশ পথে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ধাতু দ্রব্যাদির উৎসের খোঁজ পাওয়া যায়। একবার উৎসের খোঁজ পেলে তারপর স্থল বা জলপথে গিয়ে সঠিক জায়গা বের করা যায়।

১৯ পৃষ্ঠার দেখুন

একজন ইলেকট্রোনিক ইঞ্জিনীয়ার আকাশপথে যে সব ফটো তুলেছেন সেগুলি ক্যামেরা থেকে বের করে নিচ্ছেন। বিমানে করে উড়ে যাওয়ার পথে এই ক্যামেরায় প্রতি ৩০০ ফিটে একটি ক'রে ফটো ওঠে। ইলেকট্রোনিক যন্ত্রে ভূপদার্থ সম্পর্কে যে তথ্যাদি পাওয়া যায়, সেগুলির সঙ্গে পরে এই ফটোগুলি মিলিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়।

এই ডাকোটা বিমানে আকাশপথে ভূপদার্থের জরিপ করা হয়। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন ধরণের প্রস্তরাদি থেকে যে তেজস্ক্রিয়তা বিচ্ছুরিত হয়, এই যন্ত্রের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তার পরিমাণ গ্রাফে আঁকা হয়ে যায়।

অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খনিজদ্রব্য

সমগ্রভাবে ভারতে এবং তামিলনাড়ুতে খনিজ দ্রব্যাদির অনুসন্ধানে রত বহু কর্ম্ম-চারীকে সম্প্রতি জিজ্ঞাসা করা হয় যে—"শিল্প এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কোন ধরনের ধাতু পেলে আপনারা সব-চাইতে খুসী হন ?"

সকলেই একই উত্তর দেন : "তামা"।

বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জাম এবং বিদ্যুৎ পরিবহনের ক্ষেত্রে এবং শিল্পে, তামার একটা মৌলিক ভূমিকা রয়েছে। বর্ত্তমানে বহু পরিমাণ তামা বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়েছে।

কয়েকজন কর্ম্মচারী অন্যান্য ধাতু যেমন সীসা, দস্তা, নিকেল ও ক্রোমাইটের কথাও উল্লেখ করেন। তাঁরা বলেন যে বর্ত্তমানের এই প্রকল্পটি, ম্যাগনেসাইট
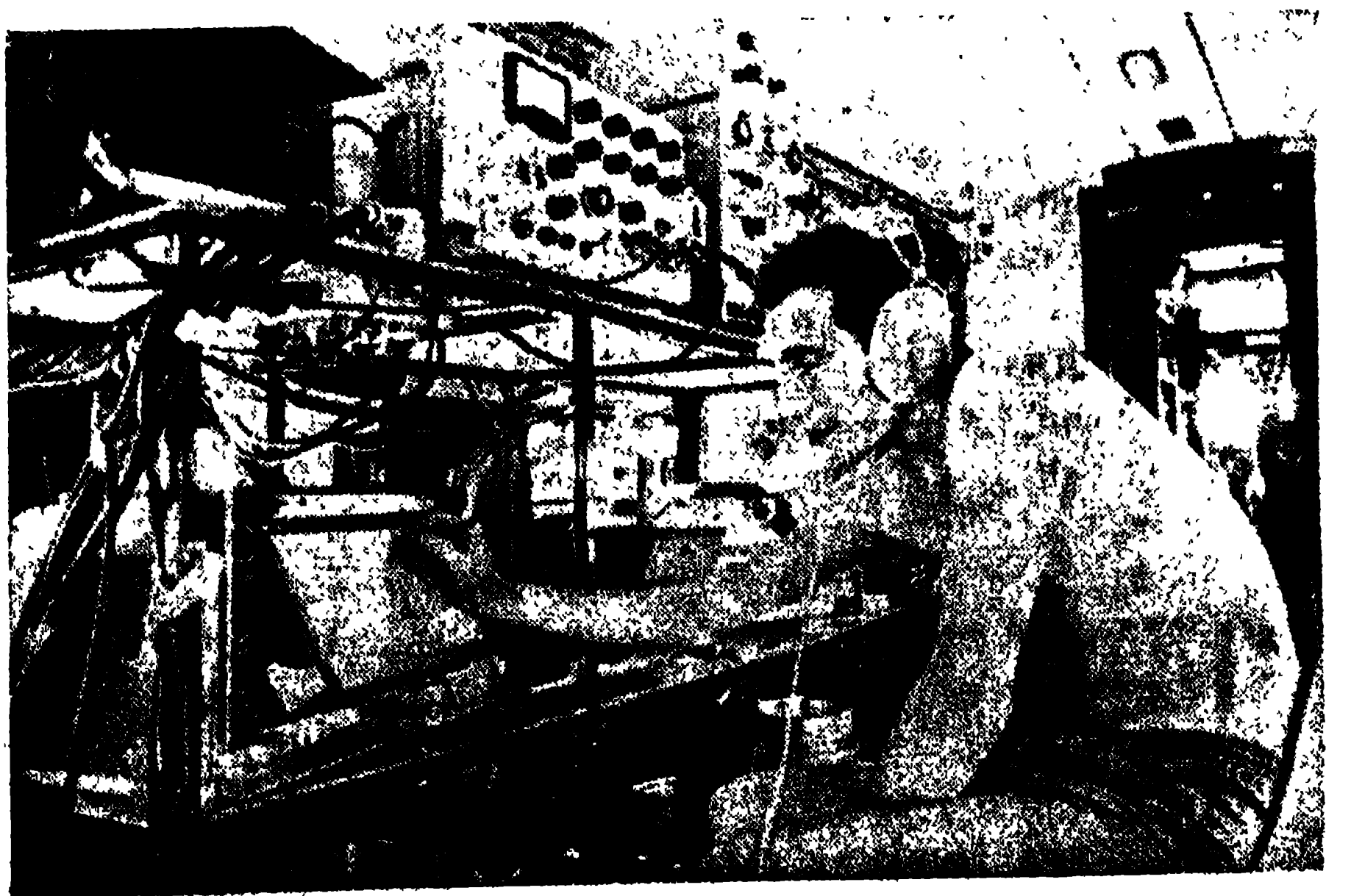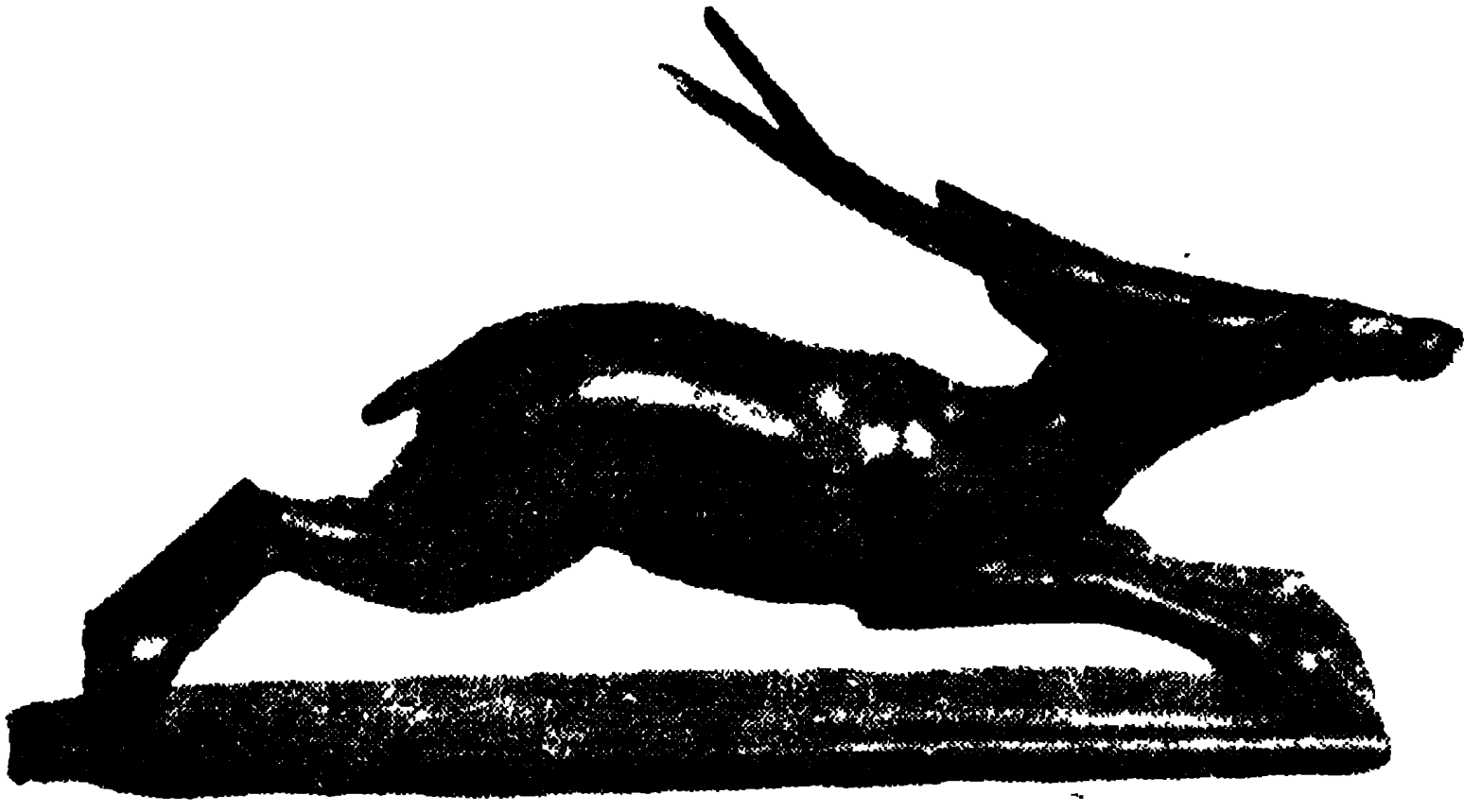
শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

রপ্তানী বাণিজ্যে বিষাণ শিল্পের সম্ভাবনা

শিংয়ের কাজ বাংলা দেশের কারুশিল্প ধারায় একটি প্রক্ষিপ্ত শিল্প। বাংলা দেশের নিজস্ব ভাবধারা ও সংস্কৃতির আবহাওয়ায় পুষ্ট যে সমস্ত প্রাচীন হস্তশিল্প যন্ত্র সভ্যতার প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা ক'রে বাংলার অন্তর আত্মাকে শিল্প রীতির মধ্যে ধরে রেখেছে, শিংয়ের কাজ কিন্তু সেই বিশেষ ধারার অন্তর্ভুক্ত নয়। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে ওড়িশায় স্থানীয় রাজন্যবর্গের সৌখীন জিনিসেব চাহিদা মেটাতে এই শিল্পের জন্য হয়েছিল। পরবর্তীকালে ইংরেজ বণিককুল, যাঁরা প্রায় সমস্ত দেশীয় হস্তশিল্পের উচ্ছেদের উপলক্ষ্য হয়েছিলেন তাঁরাই এনেছিলেন এই প্রাচীন শিল্পে পুনরুজ্জীবনের স্পর্শ। শোনা যায় নিজেদের দেশ থেকে পেঙ্গুইন প্রভৃতি পাখীর এবং অন্যান্য উন্নত ডিজাইন আনিয়ে, সেই ডিজাইন অনুযায়ী, তাঁরা শিল্পীদের নতুন নতুন জিনিস তৈরি করতে উৎসাহিত করেছিলেন। এই নিতান্ত গ্রামীণ শিল্পে তাঁরাই প্রথম এনেছিলেন আন্তর্জাতিকতার ছাপ। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের কাছাকাছি কোন সময়ে ওড়িশার সীমান্ত ছাড়িয়ে বৃটিশ ভারতের অন্যতম বাণিজ্যিক প্রাণ কেন্দ্র মেদিনীপুরে তাঁত, তসর, মাদুর প্রভৃতি শিল্পের পাশে

সরকারী প্রচেষ্টার কার্যকারিতা

শিংয়ের কাজের স্থান ক'রে নিতে কোনো অসুবিধা হয়নি। হুগলী, বাঁকুড়া এবং ২৪ পরগণায় দু' একটি ছোট ছোট সংস্থা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও মেদিনীপুরই বাংলা দেশে বিষাণ (শৃঙ্গ) শিল্পের প্রধান কেন্দ্র।

গোড়ায় শিংয়ের কাজ ছিল পুরোপুরি লাভজনক একটি কুটির শিল্প। তৈরি হত প্রধানতঃ চিরুনী, সিগারেট রাখার সুদৃশ্য বাক্স, ছড়ি, পাইপ ইত্যাদি। জিনিসের চাহিদা ছিল এবং বাজার ছিল সারা ভারত জুড়ে। কিন্তু বিজ্ঞান বয়ে নিয়ে এল অভিশাপ। সুদৃশ্য প্লাস্টিক অথবা সেলুলয়েডের চিরুণী ছেড়ে কে এখন ব্যবহার করবে হাড়ের চিরুণী? ইংরেজ দেশ ছেড়ে গেছে—সেই সঙ্গে গেছে পাইপ আর ছড়ির বাজার। মেদিনীপুরের জোধ-ঘনশ্যাম ও বৈষ্ণব চকে এক সময় প্রায় তিন হাজার শিল্পী ছিলেন। শিংয়ের বাজার ছিল জমজমাট। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের চাহিদা নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, বেঁচে থাকার স্বাভাবিক তাগিদে, এঁরা ঝুঁকলেন কারু শিল্পের দিকে। ওড়িশার সুদক্ষ কারিগরদের কাছ থেকে নিলেন প্রয়োজনীয় কৌশল ও শৈলী, যার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা যায় রূপ ও ছন্দের খেলা, তৃপ্ত হয় মানুষের সৌন্দর্য বোধ। কুটীর শিল্প থেকে কারু শিল্পে বিবর্তনের এই হল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। বর্তমানে উৎপাদিত দ্রব্যের শতকরা ৯০ ভাগই সৌখীন জিনিস। চিরুনী এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস অবশ্য এখনও কিছু কিছু তৈরি হয়।

ডাইস্, হ্যাক্-শ, উকো, হাতুড়ী, ড্রিল, বলপ্রেস ও বাটালি প্রভৃতি হাতিয়ার, শিল্পীর বংশানুক্রমে অর্জিত শিল্প কৌশল আর একটি নিটোল শিল্পী মন—এই তিনের সমন্বয়ে চলে রূপ সৃষ্টি। মৃত পশুর শিং শিল্পীর প্রতিভার স্পর্শে স্থান পায় রসিক সমাজে। ছুটন্ত হরিণের গতি স্তব্ধ হয়ে থাকে ম্যান্টলপিসের উপর, পাখী পাখা মেলে উড়তে গিয়েও আটকে থাকে পালিশ করা দেয়ালের গায়ে। শিল্পীর দরজায় গিয়ে দাঁড়ালে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের কোন কর্কশ শব্দ আপনার কানকে পীড়া দেবে না, বরং গ্রাম বাংলার মন্থর দ্বিপ্রহরে করাৎ দিয়ে শিং কাটার এক ঘেয়ে আওয়াজ আপনাকে তন্দ্রালু করে তুলবে। শিল্পীর যন্ত্রশালায়

পাবেন, ডাইস্. হ্যাক্-শ, উকো, হাতুড়ি, ড্রিল, বলপ্রেস আর বাটালি।

এই শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ বেশী নয়। এর প্রধান কাঁচা মাল মোষের শিং, সাদা এবং কালো। সাদা শিংয়ের ব্যবহারই বেশী, শতকরা ৬০ ভাগ। গরুর শিংয়ের ব্যবহার খুবই কম। হরিণের শিং লাগে চোখ তৈরির কাজে। কাঁচামাল আসে দক্ষিণ ভারতের ভিজিয়ানাগ্রাম, কাঁকিনাড়া, রাজমুন্দ্রি, বেজয়াড়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে। এই সব অঞ্চলের শিংই উৎকৃষ্ট। স্থানীয় শিল্পীরা কখনও সরাসরি ডিলারদের কাছ থেকে, কখনও নিজেদের সমবায়িকা মারফৎ শিং সংগ্রহ করেন। ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশনও কখনও কখনও কাঁচা মাল সরবরাহ ক'রে থাকেন। মহাজন প্রথার পুরোপুরি উচ্ছেদ সাধন এখনও সম্ভবপর হয়নি। আশ্রিত শিল্পীরা মহাজনদের কাছ থেকেই কাঁচা মাল পেয়ে থাকেন—এতে ক'রে কাঁচা মাল কেনার মূলধন সংগ্রহের চিন্তা থেকে শিল্পী যেমন একদিকে মুক্তি পান অন্যদিকে তাঁর পরিশ্রম বিকিয়ে যায় জলের দরে।

মোষের শিং-এ সাধারণত দুটি অংশ থাকে। একটি অংশ ফাঁপা অন্যটি নিরেট। ফাঁপা অংশ লাগে চিরুণী তৈরির কাজে আর নিরেট অংশে তৈরি হয় সৌখীন জিনিস। শিল্প পদ্ধতির মধ্যে কোন গুরুতর কৌশল নেই—সবই হাতের কাজ। যেমন চিরুণী তৈরি করতে গিয়ে শিল্পী প্রথমে শিংয়ের ফাঁপা অংশ জলে ভিজিয়ে নরম ক'রে, ভাল ক'রে ডাইস্ দিয়ে চেপে ধরে, করাৎ দিয়ে মাপ অনুযায়ী কেটে নেন। শিং বাঁকা থাকলে বল প্রেসে ফেলে, সোজা ক'রে নেওয়া হয়। এর পর উকো দিয়ে কেটে কেটে তৈরি করা হয় দাঁড়াগুলো। এরপর প্রতিটি জিনিস চকচকে করা হয় ঘষে ঘষে। কোন কোন অঞ্চলে এই কাজে এখনও এক রকম পাতার ব্যবহার দেখা যায়।

সৌখীন জিনিস তৈরির জন্য শিংয়ের নিরেট অংশ গরমে একটু গলিয়ে বল প্রেসে প্রয়োজনীয় আকৃতি দেওয়া হয়, তারপর 'ফিনিশ' করা হয় উকো দিয়ে। সমস্ত টুকরো অংশ জুড়ে জুড়ে তৈরি হয় পুরো জিনিসটা।

পুরো ব্যাপারটাই কিন্তু ভীষণ সময় সাপেক্ষ। অনুসন্ধানে জানা গেছে একটি তিন ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের খরগোস তৈরি করতে একজন শিল্পীর সময় লাগে পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা। একটি চার ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের হাতী তৈরি করতে লাগে ৮ থেকে ১০ ঘন্টা। প্রতিটি জিনিস তৈরির খরচ খরচায় শিল্পীর মজুরীই দখল ক'রে রয়েছে শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ। কিন্তু যেহেতু উৎপাদন খুবই কম সেই হেতু একজন শিল্পীর সারা মাসের উপার্জন খুব বেশী হলেও ৬০ থেকে ৭০ টাকা। ফলে সারা বিশ্বের শিল্প রস-বেত্তাদের হাত তালি এবং প্রশংসা শিরোধার্য ক'রেও শিল্পী-পরিবার অর্ধভুক্ত থাকেন।

অতীত ভারতে কারু ও চারু শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দেশের রাজা মহারাজারা। স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্র যন্ত্রই সেই ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বর্তমান শিল্পের পুনর্বিন্যাস ও উন্নয়ন এবং লুপ্ত শিল্পের উদ্ধারই হল সমস্ত কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য। রাজ্য সরকার এই কর্মসূচীরই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের বিষাণ শিল্পের সংস্কার সাধনের জন্য—বাংলা দেশের প্রধান দুটি কেন্দ্র জোধঘনশ্যাম ও বৈষ্ণব চকে সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। এই সাহায্য কেন্দ্র দুটির মূল লক্ষ্য শিল্পীদের উন্নত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা, উন্নত কৌশল ও কাঁচা মালের সুষ্ঠু ব্যবহার শেখানো, এছাড়া নতুন নতুন ডিজাইন উদ্ভাবন ক'রে, প্রস্তুত দ্রব্যের ব্যাপক বিপণনের ব্যবস্থা করা। এই কর্মসূচীর রূপায়ণে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনাকালে জোধঘনশ্যাম কেন্দ্রের জন্যে খরচ হয়েছে যথাক্রমে ৯১ হাজার টাকা এবং ৯৯ হাজার টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মোট ৩৫০ জন শিল্পী এই কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন সাহায্য পেয়েছেন। বৈষ্ণবচক কেন্দ্রের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনাকালে খরচ হয়েছে ২১ হাজার টাকা।

নতুন নতুন ডিজাইন উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের বারুইপুর হস্তশিল্প গবেষণা কেন্দ্রের অবদান উ[illegible]খের অপেক্ষা রাখে। এই কেন্দ্রের উদ্ভাবিত বহু ডিজাইনের মধ্যে ঝিনুক ও শিংয়ের সমন্বয়ে তৈরি বহু জিনিস জনপ্রিয় হয়েছে। এ ছাড়া অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্র্যাফট্স্ বোর্ড পরিচালিত কলকাতার ডিজাইন সেন্টার থেকে মোট ২৫৬টি ডিজাইন উদ্ভাবিত হয়েছে।

সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় প্রকাশ—রাজ্যের দুটি কেন্দ্রে বর্তমানে প্রায় ৬০ জন শিল্পী নিযুক্ত আছেন এবং এই কেন্দ্র দুটির আনুমানিক বাৎসরিক উৎপাদন—টাকার অঙ্কে প্রায় ৫০ হাজার।

শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীরা সাধারণতঃ সমবায় সমিতির মাধ্যমে শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। পরিকল্পনার এটিও একটি দিক। মেদিনীপুরে দুটি সমবায় সমিতি ছাড়া কিছু শিল্পী রাজ্য সরকারের বারুইপুর গবেষণা কেন্দ্রের কাছেই একটি সমবায় সমিতি স্থাপন করেছেন। উদ্দেশ্য, কলকাতার কাছাকাছি থেকে কলকাতার বৃহত্তর বাজারের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে, মোট ১৩টি সমবায় সমিতি হাড় ও শিংয়ের কাজের জন্য স্থাপন করা হয়েছে।

ভারতবর্ষের বাজারে শিংয়ের তৈরি জিনিসের চাহিদা কমছে বললে ভুল বলা হবে। তবে কারু শিল্পের আভ্যন্তরীণ চাহিদা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত। গত কয়েক বছরে মূল্যমানের দ্রুত উর্ধগতি অর্থনীতির উপর এক প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে। ফলে কারু শিল্পের চাহিদায় ভাঁটা পড়া কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু মানুষের রুচি পাল্টাচ্ছে। সাধ্যমত, সুযোগ মত, গৃহ সজ্জার উপকরণ সংগ্রহে উৎসাহ কারই বা কম। শিংয়ের সৌখীন জিনিসের বাজার দর মধ্যবিত্ত মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেই ওঠানামা করে। কলকাতা কেন? ভারতের যে কোন পর্যটন কেন্দ্রে শিংয়ের দোকানের অভাব নেই। রাজ্য সরকার ও স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন পরিচালিত বিভিন্ন দোকানের মাধ্যমে শিংয়ের বিভিন্ন কারু শিল্পের কেনা বেচা খুব খারাপ চলছে না। এ ছাড়া বিশ্বের বাজারেও এর চাহিদা বাড়ছে। গত জুন মাসেই আমরা রপ্তানী করেছি মোট এক লক্ষ আঠারো হাজার দুশো তেইশ টাকার বিভিন্ন জিনিস।

১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

ভারতে কৃষি ঋণের সুযোগ সুবিধে

হ্যারল্ড এ. মাইলস্

ভারতের কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে গত বছরের সবচাইতে বেশী তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা হল, কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির প্রবেশ। ব্যাঙ্কগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে এই ব্যবস্থা করা হলেও আমার মনে হয় পল্লী অঞ্চলেও কাজকর্ম্ম সম্প্রসারিত করার জন্য এরা সত্যিই আগ্রহী। তবে পল্লী অঞ্চলে তাদের কাজ সম্প্রসারিত করতে হলে, নিরাপদে এবং গঠনমূলক ভিত্তিতে কৃষি ঋণ দিতে সক্ষম এই রকম কর্মীদল ব্যাঙ্কগুলিকে গড়ে তুলতে হবে। সেই জন্যই ব্যাঙ্কগুলি কর্ম্মী নির্ব্বাচন ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে একটা কর্ম্মসূচী তৈরি করা সম্পর্কে বিভিন্ন সংস্থার সাহায্য চাইছে।

ঋণ এবং ব্যাঙ্কের কাজকর্ম্ম কোন পল্লী অঞ্চলে সম্প্রসারিত করার পূর্ব্বে প্রথমেই দেখতে হবে সেই অঞ্চলের কৃষির উন্নতির সম্ভাবনা কতটুকু। কাজেই এই দিক দিয়ে নিবিড় কৃষি উন্নয়ন কর্ম্মসূচীর অন্তভুক্ত জেলাগুলিই, কৃষি ঋণ সংক্রান্ত ব্যাঙ্কের কাজকর্ম্ম সুরু করার পক্ষে উপযুক্ত স্থান হবে বলে মনে হয়। তার কারণ হ'ল কৃষির উন্নতির সম্ভাবনা সম্পর্কে অন্যান্য জেলার তুলনায় এই জেলাগুলিতেই যে বেশী তথ্যাদি পাওয়া যাবে তাতে সন্দেহ নেই।

সুতরাং ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে প্রথম কাজ হবে উচ্চ পর্য্যায়ের একদল কর্ম্মী নির্ব্বাচিত ক'রে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। যে সব অঞ্চলে ব্যাঙ্কের শাখা খোলা হবে সেখানে যাঁরা কাজ করবেন তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ভার থাকবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই সব কর্ম্মীদের।

কো-অপারেটিভ নিউজ ডাইজেষ্টের

নিবিড় কৃষি উন্নয়ন কর্ম্মসূচীর অন্তভুক্ত জেলাগুলির প্রজেক্ট অফিসার ও তাঁর কর্ম্মচারীগণ, ব্যাঙ্কের কর্ম্মীগণের প্রশিক্ষণ ও কাজকর্ম্মের ব্যাপারে নানারকমভাবে সাহায্য করতে পারেন। জেলার কর্ম্মচারীগণ অবশ্য ব্যাঙ্কের প্রকৃত কাজকর্ম্মে সাহায্য করতে পারবেন না কিন্তু সেই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে কি পরিমাণ কৃষি সাজ সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয় বা উৎপাদনের হার কি রকম, অথবা কি কি কর্ম্মসূচী নিয়ে কাজ হচ্ছে বা ভবিষ্যতে হবে এই সম্পর্কে তথ্যাদি সরবরাহ করতে পারবেন এবং সেগুলিও ব্যাঙ্কের কাজে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীগণের প্রশিক্ষণ সূচীতে অন্ততঃপক্ষে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তভুক্ত হওয়া উচিত। (১) ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির ওপর সমাজতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ—ব্যাঙ্ক এবং ভারতের পক্ষে এই ব্যবস্থার অর্থ কি ; (২) ভারতের সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে কৃষির সম্পর্ক ; (৩) কৃষি-কাজ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান যেমন (ক) ভারতের ভূমি, (খ) কৃষি সাজ সরঞ্জাম ও উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক (গ) জলের উৎসসমূহ, এগুলির ব্যবহার ও পরিচালনা, (ঘ) কীটাদির নিয়ন্ত্রণ ; (৪) কৃষি সামগ্রী বাজারজাত করার কাঠামো (৫) কৃষি সাজ সরঞ্জাম সরবরাহ ব্যবস্থা, সেগুলির সংগঠন ও প্রয়োজনীয়তা; (৬) উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষি যন্ত্রপাতির অবদান ; (৭) ঋণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে কৃষকদের আবাদ পরীক্ষা; (৮) ঋণ আদায় করার পদ্ধতি; (৯) নিরাপত্তামূলক আইন ; (১) পল্লী অঞ্চলে ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখার জন্য উৎসাহ দেওয়ার উপায় ; (১১) কৃষি কর্ম্মচারী ও অন্যান্য কর্ম্মচারীগণের সংগঠন এবং (১২) প্রশিক্ষণ পদ্ধতি।

প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক পরিচালনা সম্পর্কিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাঙ্কগুলির অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিস্তারিত ও দীর্ঘকালীন প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত। খুব তাড়াতাড়িও যদি এই প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয় তাহলেও, পল্লী অঞ্চলের ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীদের, ২।৩ বছরের পূর্ব্বে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া যাবেনা এবং ব্যাঙ্কগুলি ততদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেনা।

ঋণ সমবায় সমিতি

আমার মতে ভারতে এখন পর্য্যন্ত শক্তিশালী ও কার্য্যকরী প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতি গড়ে ওঠেনি। অখিল ভারত পল্লীঋণ পর্য্যালোচনাকারী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে সব প্রস্তাব করেছেন তা, নীতি নির্দ্ধারণকারী মহলে ক্রমশঃ বেশী সমর্থন পাচ্ছে। তবে এ পর্য্যন্ত যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে তা যথেষ্ট নয়। মাদ্রাজ রাজ্যের তাঞ্জাউর জেলায় এই সম্পর্কে বেশ ভালো কাজ হয়েছে এবং তা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

আত্মনির্ভরশীল এবং সুপরিচালিত একটা সমাজ ব্যবস্থা ছাড়া, আধুনিক যন্ত্রসজ্জিত কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করা সমবায় সমিতিগুলির পক্ষে সম্ভবপর হবেনা। এটা একটা বিরাট কাজ আর সেজন্যই দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ সুরু করা প্রয়োজন।

কাজেই নির্ব্বাচিত অঞ্চলগুলিতে একটা সংহত কর্ম্মসূচী অনুযায়ী এই ধরনের সমবায় সমিতি গড়ে তোলার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এই সমিতিগুলি কাজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে এগুলির পরিচালক ও ম্যানেজারগণের জন্য একটা প্রশিক্ষণ সূচী স্থির করতে হবে যাতে একটা সুপরিচালিত ও কার্য্যকরী পরিচালনা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

সমিতিগুলি শক্তিশালী হয়ে উঠলে সেগুলিকে অধিকতর স্বাতন্ত্র্য ও দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। সমিতিগুলি তাহলে এখনকার মতো একটা সূত্র অনুযায়ী ঋণ

বন্টন না ক'রে প্রত্যেকটি আবেদনপত্র পরীক্ষা ক'রে প্রয়োজনীয় ঋণের ব্যবস্থা করতে পারবে। বর্ত্তমান অবস্থায় আমি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শস্যঋণ কর্ম্মসূচীতে কোন দোষ দেখিনা এবং এই ক্ষেত্রে বেশ ভালো কাজ হচ্ছে। কৃষিতে উৎপাদন বাড়তে থাকলে প্রত্যেকটি আবেদন পৃথকভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে।

যেহেতু ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক এবং কৃষির সাজ সরঞ্জাম সরবরাহকারী বেসরকারী সংস্থাগুলিও পল্লী অঞ্চলে কাজ সুরু করছে, সেজন্য সমবায় সমিতিগুলিকে আর কৃষি উন্নয়নের জন্য ঋণ সরবরাহ ও বাজারজাত করার পুরোপুরি দায়িত্ব বহন করতে হবেনা। এতোদিন সমবায় সমিতিগুলি যে চাপের মধ্যে কাজ করছিলো তা থেকে অনেকটা রেহাই পাবে এবং তখন এগুলি আরও সুষ্ঠুভাবে কাজ করার সুযোগ পাবে। এই নতুন পরিস্থিতিতে তাদের কর্ম্মসূচী নতুন করে পরীক্ষা করে নতুন উৎসাহে কাজ করার সুযোগ এসেছে।

ঋণদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি পল্লী অঞ্চলে ব্যাপকতর ভিত্তিতে কাজ সুরু করলে, সার ইত্যাদি কৃষি সাজ সরঞ্জাম বেসরকারী তরফ থেকে সরবরাহ করতে থাকলে এবং রাজ্য কৃষি ঋণ কর্পোরেশনও কাজ করতে থাকলে, দেশের বর্ত্তমান কৃষি ঋণের প্রয়োজন মেটাবার মতো যথেষ্ট প্রতিষ্ঠান হয়ে যাবে। তবে সুষ্ঠু ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এগুলি এবং পুরানো প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করানোই হল এখন প্রধান সমস্যা। কতকগুলি কেন্দ্রীয় জেলা ব্যাঙ্কে, ভূমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিতে বর্ত্তমানে কাজের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে সন্দেহ নেই। এগুলিতে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত হয়েছে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাজে আরও উন্নতি সাধনের জন্য তা কাজে লাগানো উচিত।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

কৃষিতে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্ম্ম বাড়তে থাকলে তাদের কৃষি ঋণ সম্পর্কিত কাজের জন্য কৃষিতে এবং ব্যবসায়ে মৌলিক শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্ম্মী সংগ্রহ করতে হবে। অন্যান্য কৃষি-ব্যবসায় সংক্রান্ত সংস্থাগুলি একই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। ভারতে কেবলমাত্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই ধরণের প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। কৃষি এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্পর্কে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যদি কৃষি অর্থনীতি সম্পর্কে উপযুক্ত শিক্ষাসূচীর ব্যবস্থা করা হয় তাহলে তাঁরা কৃষি ঋণ এবং কৃষি সম্পর্কিত ব্যবসায়ের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্ম্মীদল গড়ে তুলতে পারে।

তবে কৃষি অর্থনীতি সম্পর্কে কার্য্যকরী প্রশিক্ষণ দিতে হলে প্রথমতঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে উপযুক্ত সমীক্ষার মাধ্যমে জানতে হবে যে বর্ত্তমানে কৃষির কি পরিমাণ আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজন কি রকমভাবে কতটুকু মেটানো হচ্ছে। এই সমীক্ষা একদিকে যেমন শিক্ষণীয় বিষয়ের উপকরণ যোগাতে সাহায্য করবে তেমনি ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির নীতি ও কর্ম্ম পদ্ধতি পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করতেও যথেষ্ট সাহায্য করবে।

পল্লী সম্পদ সংহতিকরণ

সমবায় এবং ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক উভয় ক্ষেত্রেই জমা টাকার ওপর যে সুদ দেওয়া হয় তা ঋণের সুদের তুলনায় কম। সরকার যদি কৃষকগণকে তাদের কৃষি উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত মূল্যের আশ্বাস দেন, তাহলে ঋণের জন্য উচ্চহারে সুদ দিলেও, আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগ করে কৃষকরা বেশী লাভবান হবেন। পল্লী অঞ্চলে মোট যে ঋণ দেওয়া হয় তার শতকরা ৭০ ভাগ এখন পর্য্যন্ত মহাজনরাই সরবরাহ করেন এবং কৃষকদের সাধারণতঃ সেজন্য উচ্চহারে সুদ দিতে হয়। বলা হয় যে কয়েক বছর আগে মহাজনরা যে সুদ নিতেন এখন তার চাইতে কম নেন, তা হলেও এখন পর্য্যন্ত এই সুদের হার অপেক্ষাকৃত বেশী।

তবে জমা টাকার জন্য কি হারে সুদ দিলে কৃষকরা ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখতে উৎসাহী হবেন তা অবশ্য বলা কঠিন, যাই হোক ব্যাঙ্কগুলিকে, এই সম্পদ সংহত করার উপায় নির্দ্ধারণ করতে হবে। গচ্ছিত টাকার জন্য উচ্চহারে সুদ দিলে হয়তো জমার পরিমাণ বাড়বে। অবশ্য ঋণের জন্য সুদের হার বাড়ালেও কৃষকরা ঋণ নেবেনই।

চলমান ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা চালু ক'রে, পাতিয়ালা, রাজ্য গ্রামগুলিতে ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখার ব্যাপারে বেশ সফল হয়েছে। একটা ট্রাকে ব্যাঙ্কের অফিস ক'রে একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর পরিচালনায় সেটি গ্রামে গ্রামে ঘোরে। গাড়ীর সামনে ও পেছনে একজন ক'রে সশস্ত্র প্রহরী থাকে। নিরাপত্তার এই ব্যবস্থা থাকাতেই হয়তো বর্ত্তমান সুদের হারেও যথেষ্ট টাকা জমা রাখা হচ্ছে। আর একটা প্রস্তাব করা হয়েছে যে, বাজারজাত করার মরশুমের ঠিক পরেই দুই মাসে ব্যাঙ্কে সবচাইতে বেশী যে পরিমাণ টাকা জমা রাখা হয়, সেই পরিমাণ টাকা ঋণ দেওয়া যাবে। গ্রামের মহাজন ও ব্যবসায়ীগণের হাতে ব্যাঙ্কে জমা রাখার জন্যে কৃষকদের তুলনায় বেশী টাকা থাকে। তবে এঁরা কৃষকদের ঋণ দিয়ে যে সুদ পান, ব্যাঙ্কের কাছ থেকে সেই সুদ পাবেন না। কাজেই এদের টাকা ব্যাঙ্কে আকর্ষণ করতে হলে কোন একটা উপায় স্থির করতে হবে।

গ্রামে কি পরিমাণ অর্থসম্পদ আছে তার সঠিক হিসেব করা কঠিন, তবে সেটা যে বেশ অনেক তাতে সন্দেহ নেই এবং সংহত আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে তা যুক্ত হ'লে সেই সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করতো। গ্রামের সম্পদ সংহত করা যদি সম্ভব হয় তাহলে তাতে যথেষ্ট লাভ হবে। সমবায় সংস্থার তুলনায় ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির, পরিচালনা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দক্ষতা বেশী বলে এরা এই সম্পদ সংহত করার কাজের পক্ষে বেশী উপযোগী।
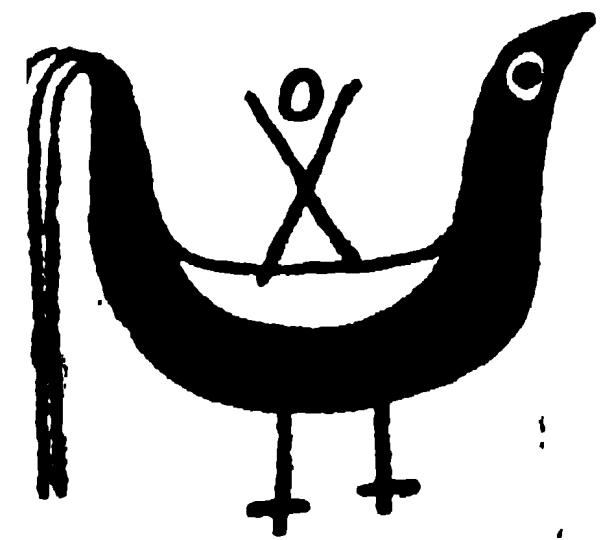
ধাতু শিল্পে প্রগতি

অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়

যদিও দেশের বিভিন্ন জায়গায় অনেক মূল্যবান খনিজ সম্পদ ছড়িয়ে রয়েছে কিন্তু এই সম্পদের অল্পই ব্যবহারে আনা হয়েছে। খনিজ সম্পদের বিকাশ মুখ্যত: শিল্প উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করার পূর্বে ধাতু শিল্পে অতি সামান্যই খনিজ সম্পদ ব্যবহৃত হয়েছে। সে সময় দেশে মাত্র তিনটি লোহার কারখানা, একটি তামার কারখানা, দুটি এ্যালুমিনিয়ম, একটি এন্টিমনি, একটি সোনা ও রূপা এবং একটি সীসা উৎপাদনের কারখানা ছিল। এ্যান্টিমনি ছাড়া বাকী সব ধাতুই ভারতে আকরিক অবস্থায় পাওয়া যায়। দেশে এ্যান্টিমনির আকর না থাকায়, বিদেশ থেকে এই আকর আমদানী করে ধাতু নিষ্কাশন করা হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ধাতু শিল্পের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করা হলেও মুখ্যত: দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে দেশে ধাতু শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন উৎসাহের সঞ্চার হয়। উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশকে সমৃদ্ধিশালী করা এবং অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করাই যে শুধু এর উদ্দেশ্য ছিল, তা নয়, বরং উদ্দেশ্য ছিল নূতন শিল্পগুলির মাধ্যমে অধিক কর্ম সংস্থান, দেশের খনিজ সম্পদের বিকাশ ও তার প্রয়োগ এবং ধাতু শিল্পে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সুযোগ সৃষ্টি করা। যাতে বিদেশী সাহায্য বন্ধ করে অদূর ভবিষ্যতে স্বোপার্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিজেদের চেষ্টায় নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। ১৯৫৬ সালে জাতীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী, সরকারী ক্ষেত্রে ভারী শিল্প স্থাপন এবং ধাতু নিষ্কাসনের ব্যবস্থাও করা হয়।

লোহা

ভারতের তিনটি লোহার কারখানায় (টাটা, হীরাপুর, ভদ্রাবতী) ১৯৫০ সালে মাত্র ১,৬৪৬ হাজার টন কাঁচা লোহা এবং ৯৭০ হাজার টন ইস্পাত তৈরি হয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে সরকারী উদ্যোগে তিনটি নতুন লোহার কারখানা স্থাপন করা হয় এবং পুরানো কারখানাগুলির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো হয়। নূতন তিনটি কারখানা হ'ল 'হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেড'এর ভিলাই, রাউরকেলা এবং দুর্গাপুর। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে সরকারী ক্ষেত্রে আর একটি লোহার কারখানা বোকারোতে স্থাপন করা হচ্ছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে দেশে ৭১ লক্ষ ২০ হাজার টন ইস্পাত এবং ১৯ লক্ষ ৫০ হাজার টন কাঁচা লোহার প্রয়োজন হতে পারে। এই চাহিদা মেটানোর জন্য ভিলাইএর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে ৩২ লক্ষ টন করা হচ্ছে এবং বোকারো কারখানার উৎপাদন হবে ১৭ লক্ষ টন। লক্ষ্য অনুযায়ী পরিশেষে বোকারো কারখানার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়াবে ৪০ লক্ষ টন। এ ছাড়া আসানসোল কারখানার বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা ১০ লক্ষ টন থেকে বাড়িয়ে ১৩ লক্ষ টন করা হবে। ইস্পাত তৈরির বর্তমান ক্ষমতা ৯০ লক্ষ টন থেকে বাড়িয়ে ১ কোটি ২০ লক্ষ টন করা হবে। ১৯৭৩-৭৪ সালে ১০ লক্ষ টন ইস্পাত এবং ১৫ লক্ষ টন কাঁচা লোহা রপ্তানী করা যাবে বলে আশা করা যায়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় লোহার কারখানাগুলির জন্য কেন্দ্রীয় খাতে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তার হিসেবে দেখা যায় :—

চালু কাজ

(লক্ষ টাকায়)

বোকারো	সম্প্রসারণ	প্রথম	পর্যায়	৫০,০০০
রাউরকেলা	,,	দ্বিতীয়	,,	৪৬৭
ভিলাই	,,	,,	,,	৮৪৮
দুর্গাপুর	,,	প্রথম	,,	৪২১
দুর্গাপুর	মিশ্র ধাতু এবং অন্যান্য			২১১
ভদ্রাবতী	মিশ্র ধাতু			৫০০

নতুন কাজ

ভিলাই : সম্প্রসারণ তৃতীয় পর্যায়	৩৬০০
বোকারো	১২২০০
প্লেট কারখানা	৭৫০০
অন্যান্য ব্যবস্থা	৬৫০০
মোট :	৮২২৪৭

তামা

দেশে মাত্র একটিই তামার কারখানা আছে, যেটির বর্তমান বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা মাত্র ৯,৫০০ টন। বিহারের মৌভাণ্ডারে 'ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশনের' এই কারখানায় মোসাবনী অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা আকরিক তামা গলিয়ে 'অগ্নি-শোধ' তামা উৎপাদন করা হয়। ইদানীং বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যেও সামান্য পরিমাণ তামা শোধন করা হচ্ছে। দেশের বহু শিল্পে, বিদ্যুৎ সরবরাহে, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের বহু জিনিস তৈরি করতে তামার প্রয়োজন হয়। এই চাহিদা মেটানো হচ্ছে বিদেশ থেকে তামা আমদানী করে। ১৯৬৮ সালে ৩৬,৪২৯ টন তামা আমদানী করতে ৩২.৬২ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা ব্যয় করা হয়েছে। অবশ্য বর্তমানে তামার পরিবর্তে এ্যালুমিনিয়ম ব্যবহার করার চেষ্টা হচ্ছে পূর্ণ মাত্রায়। তামা আমদানী কম করার জন্য পিতলের বাসন তৈরি করার উপর প্রতিবন্ধ (নিষেধবিধি) আরোপ করতে হয়েছে। হিসাব করে দেখা যায় যে, তামার চাহিদা ১৯৬৯-৭০ সালে ৮৫,০০০ টন থেকে বেড়ে ১৯৭৩-৭৪ সালে ১২৪,০০০ টন হতে পারে। তামার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মৌভাণ্ডার কারখানার ক্ষমতা বাড়িয়ে ১৬,৫০০ টন করা হচ্ছে। এর মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি-শোধিত ৮,৪০০ টন তামা সমস্ত রকম বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সরবরাহের যন্ত্রপাতিতে ব্যবহার করা যাবে। এ ছাড়া রাজস্থানের খেতরীতে 'হিন্দুস্তান কপার লিমিটেড'এর একটি তামার কারখানা স্থাপন করা হচ্ছে। খেতরী

এবং কাছের কোলিহান অঞ্চলে আকরিক তামার খনিতে খননের কাজও, দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এই খনিগুলি থেকে বছরে ৩২ লক্ষ টন আকর আহরণ করে, তার থেকে বছরে ৩১,০০০ টন তামা উৎপাদন করা হবে। আশা করা যাচ্ছে ১৯৭১-৭২ থেকে খেতরীর তামার কারখানা চালু হবে। এ ছাড়া বিহারের রাখা এবং রোম-সিধেশ্বর অঞ্চলে, রাজস্থানের দারিবো অঞ্চলে, এবং অন্ধ্র প্রদেশের নাল্লাকোণ্ডা অঞ্চলেও আকরিক তামা পাবার সম্ভাবনা আছে। খেতরী কারখানা থেকে তামা পাওয়া গেলেও দেশে এই ধাতুর চাহিদা মেটাতে ১৯৭৩-৭৪ সালে প্রায় ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার বিদেশী মুদ্রা ব্যয় করে তামা আমদানী করতে হবে। তামা এবং আনুসঙ্গিক জিনিস উৎপাদনের জন্য চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় খাতে ৭৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে।

দস্তা এবং সীসা

দস্তা এবং সীসা এই দুটি ধাতুর আকর একই সঙ্গে পাওয়া যায়। এ ছাড়া এই আকরের পরিশোধনের সময়ে রূপা এবং ক্যাডমিয়াম ধাতুও নিষ্কাশন করা হয়। রাজস্থানের 'জাওয়ার' অঞ্চলে এই আকর খনন করা হচ্ছে। তিন বছর আগেও ভারতে দস্তা নিষ্কাশনের কারখানা ছিল না। তখন দস্তামিশ্রিত আকর বিদেশে রপ্তানী করা হত এবং সীসা মিশ্রিত আকর বিহারে টুণ্ডু (ধানবাদ) কারখানায় নিষ্কাশন করা হত। এই সীসা কারখানার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা মাত্র ৫৪০০ টন। সীসা থেকে এই কারখানার রূপাও নিষ্কাশন করা হয়। রাজস্থানের 'দেবারী'তে দস্তা নিষ্কাশনের একটি কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। সরকারী 'হিন্দুস্থান জিংক লিমিটেড'এর এই কারখানার বর্তমান বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে ১৮,০০০ টন। এখানে বছরে ৭৫ থেকে ৮০ টন ক্যাডমিয়ম ধাতু নিষ্কাশনেরও ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া বিদেশ থেকে আমদানী করা দস্তাযুক্ত অশোধিত আকর থেকে ধাতু নিষ্কাশনের জন্য মেসার্স বিনানী কমিনকো কেরালা রাজ্যের 'আলউই' শহরে আর একটি কারখানা স্থাপন করেছে। এই দস্তা কারখানার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা হ'ল ২০,০০০ টন। এখানেও ক্যাডমিয়ম ধাতু উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে দেশে ১৪,২০০০ টন দস্তা এবং ৯৭,০০০ টন সীসা প্রয়োজন হতে পারে। এই চাহিদা মেটানোর জন্য দেবারী এবং আলউই-এর দুটি কারখানারই বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে যথাক্রমে ৩৬,০০০ টন এবং ৪০,০০০ টন করা হবে। তা ছাড়া আমদানী করা দস্তা যুক্ত অশোধিত আকর থেকে ধাতু নিষ্কাশনের জন্য বিশাখাপতনমে একটি কারখানা স্থাপন সম্ভব কি না সে সম্বন্ধে পোল্যাণ্ডের সহযোগিতায় একটি খসড়া তৈরির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সীসার ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যবশতঃ কোনও পরিকল্পনা সম্ভবপর হয়ে উঠছে না, কারণ দেশে আকরিক সীসার একান্ত অভাব। ১৯৭৩-৭৪ সালে দস্তা এবং সীসার চাহিদা মেটানোর জন্য প্রায় ৩১ কোটি টাকার ধাতু আমদানী করতে হতে পারে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় খাতে দস্তা উৎপাদনের

ধাতুসম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ তথ্য

(ক) উৎপাদন (হাজার টন)

বছর	ইস্পাত	তামা	দস্তা	এ্যালুমিনিয়ম	সীসা	এ্যান্টিমনি	সোণা	রূপা
১৯৬০	৩২৮৬	৮.৯	—	১৮.১	৩.৭	০.৮	৪৯৯৫	৪১২৮
১৯৬৬	৬৬০৮	৯.৪	—	৮৩.৮	২.৫	০.৯	৩৭৩৬	১২২০
১৯৬৭	৬৩৮৭	৮.৯	৩.০	৯৬.৫	২.৫	০.৯	৩৭৬১	৩৪৭১
১৯৬৮	৬৩৬২	৯.৩	২০.৭	১২০.০	১.৬	০.৮	৪৫৮৮	২৮০২
১৯৭৩-৭৪	১০৮০০	৩৫.৫	৭০.০	২২০.০	৫.৪	১.৫	—	—

(খ) আমদানী (টন)

বছর	জার্মানিয়ম গ্যালিয়ন	বিসমাথ	ক্যাডমিয়ম	ক্রোমিয়ম	কোবাল্ট	তামা	এ্যালুমিনিয়ম	সীসা	দস্তা
১৯৬৬	৯১	১৪	৮০	১৮	৫৪	২৭৪৯৮	২২৭৫৫	৩৮০৯৩	৩৭৯২৫
১৯৬৭	৮৬	২৬	১১৩	১৬	১১৯	৪৬৯০০	৪৮৪০১	৪১১৪৭	৭৪৩৫৬
১৯৬৮	৭৮	১১	৩৮	১৪	৭৫	৩৬৪২৯	১১৩০২	৩৫২২১	১০৬৬৬৩

বছর	ম্যাগনেসিয়ম	পারা	নিকেল	টিন	প্ল্যাটিনাম	রূপা	টাংস্টেন	মলিবডেনাম
১৯৬৬	২৭৫	৯১	১২১৯	৫৭৮৬	১১১	২০৬	৭০০০	৩
১৯৬৭	২৫৯	২৮৮	২৬৩৯	৭০৭৩	১৫২	৩০২	৭০৫৫	১৭
১৯৬৮	১৩৬	১৬০	২২৪১	৬২৭১	৭১	৫৯	৭২৪৪	১৬

শেষাংশ ২০ পৃষ্ঠায়
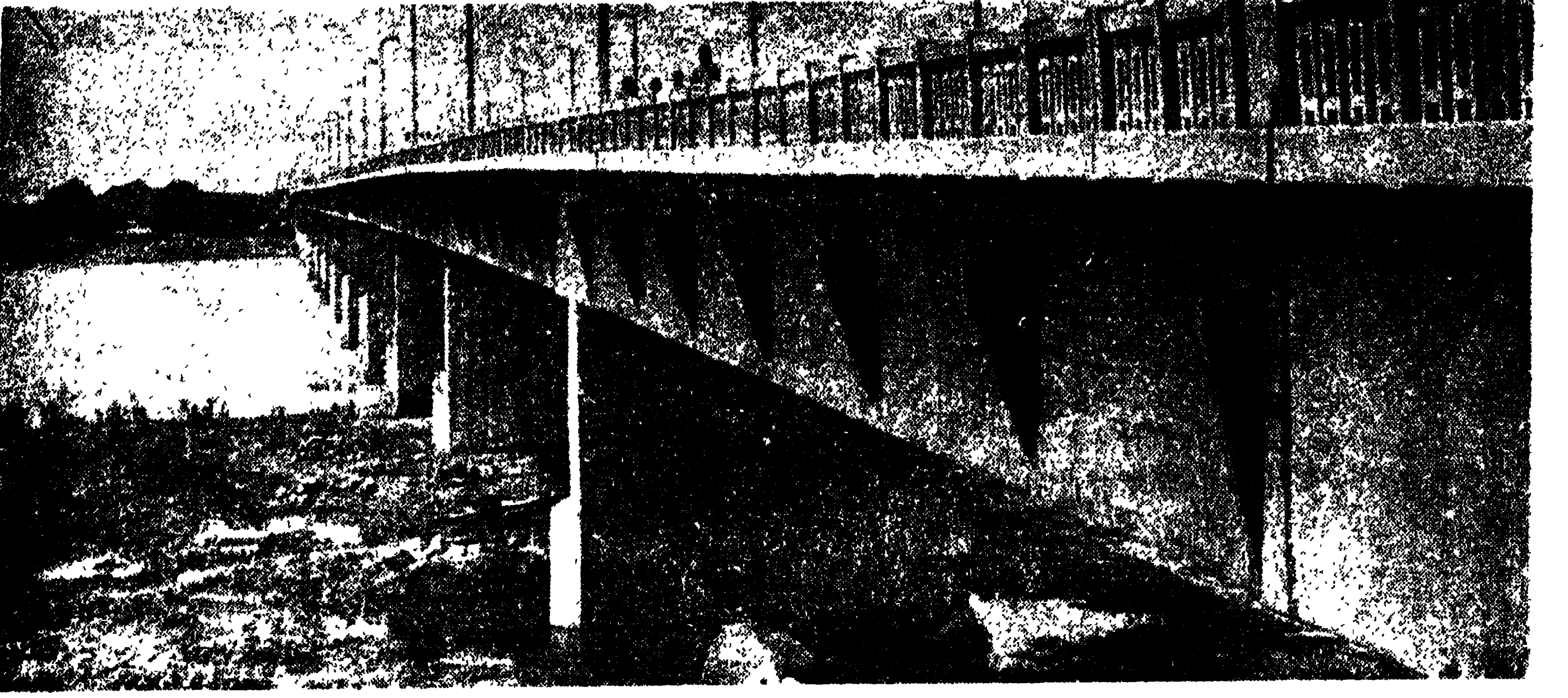
রূপনারায়ণের শরৎ সেতু

বিবেকানন্দ রায়

রূপনারায়ণ নদের ওপর তৈরি, রাজ্যের চারটি নদী-সড়ক-সেতুর সর্বশেষটির শিলান্যাস করে গিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়। ১৯৬৭ সালের ৩রা ডিসেম্বর এটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়। এ বছরের ১৭ই সেপ্টেম্বর রাজ্য সরকার রাজ্যের দীর্ঘতম এই সেতুপথটির নামকরণ করেছেন অদ্বিতীয় কথাশিল্পী বিদগ্ধের দরবারে জনসাহিত্যের প্রতিভূ শরৎচন্দ্রের নামে। শুদ্ধ সাহিত্য ও বাস্তবধর্মী আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে অন্তরের যোগস্থাপনকারী অমর জীবনশিল্পীর নামে সড়ক সেতুর এই নামকরণ যোগ্য হয়েছে সন্দেহ নেই।

এক কিলোমিটার দীর্ঘ শ্বেতবর্ণ 'শরৎ সেতু' কলকাতা বোম্বাই ৬নং রাজপথের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই সেতুটির উদ্বোধন বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যান্য সম্পর্ক স্থাপনের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। এই পথটি উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে মহানগরী কলকাতার মাধ্যমে কৃষি ও শিল্পজাত পণ্য চলাচল ও পর্যটকদের সুখ ভ্রমণ সহজসাধ্য হয়েছে। কলকাতা থেকে বিহার ও ওড়িশার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি এখন মোটরে সহজ-গম্য। সঙ্গে সঙ্গে পথের দুই পার্শ্বের গ্রাম্য জীবনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের স্পর্শ পড়েছে ও সমগ্র রাজ্যের সুসংহত উন্নয়নের সম্ভাবনা সার্থকতার পথে পৌঁছুচ্ছে।

কলকাতা থেকে ৫৮ কিলো মিটার দূরে এই সড়ক সেতুটি নিয়ে ৬নং রাজপথের পূর্ণ দৈর্ঘ্য হল ১৭০ কি. মিটার।

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সূচী অনুযায়ী বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছ থেকে যে ৪৫ কোটি টাকা (৬ কোটি ডলার) পাওয়া যায় তার কিছু অংশ দিয়ে শরৎ সেতুটি তৈরি। বাংলার ইঞ্জিনীয়ারদের অনন্য কারিগরী দক্ষতার নিদর্শন স্বরূপ এই সেতু নির্মাণে মোট ব্যয়
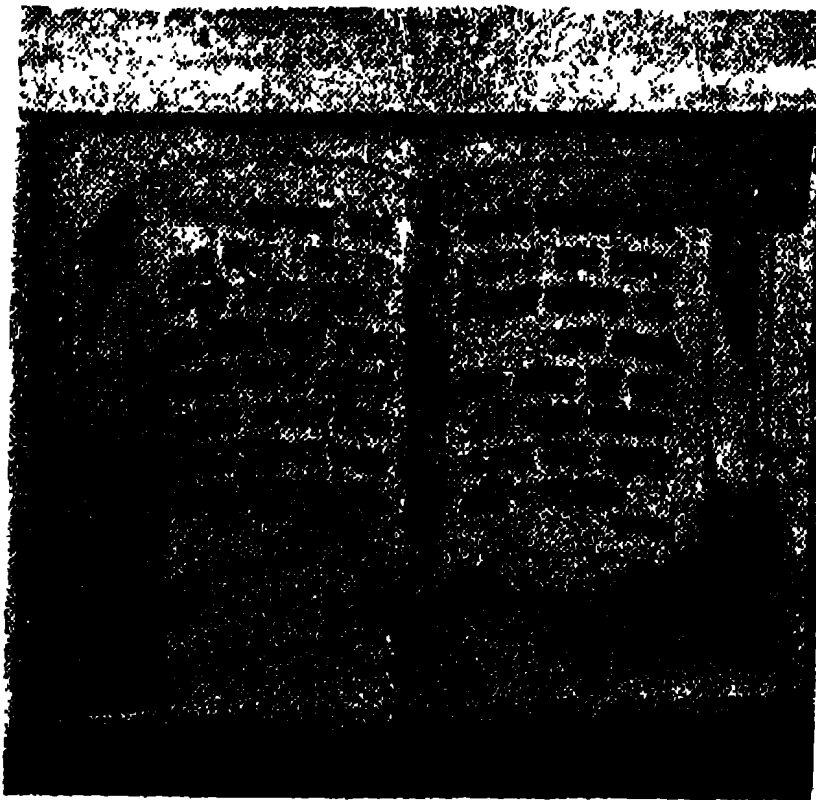
"সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলেনা কিছুই, যারা দুর্ব্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলেনা, নিরুপায়, দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলেনা, সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই............এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে, মানুষের নালিশ জানাতে।"

—শরৎচন্দ্র

শরৎ সেতুর যে প্রস্তর ফলকে কথাশিল্পীর ঐ অবিস্মরণীয় উক্তি বিধৃত হয়েছে, পাশে তারই ছবি দেখা যাচ্ছে।
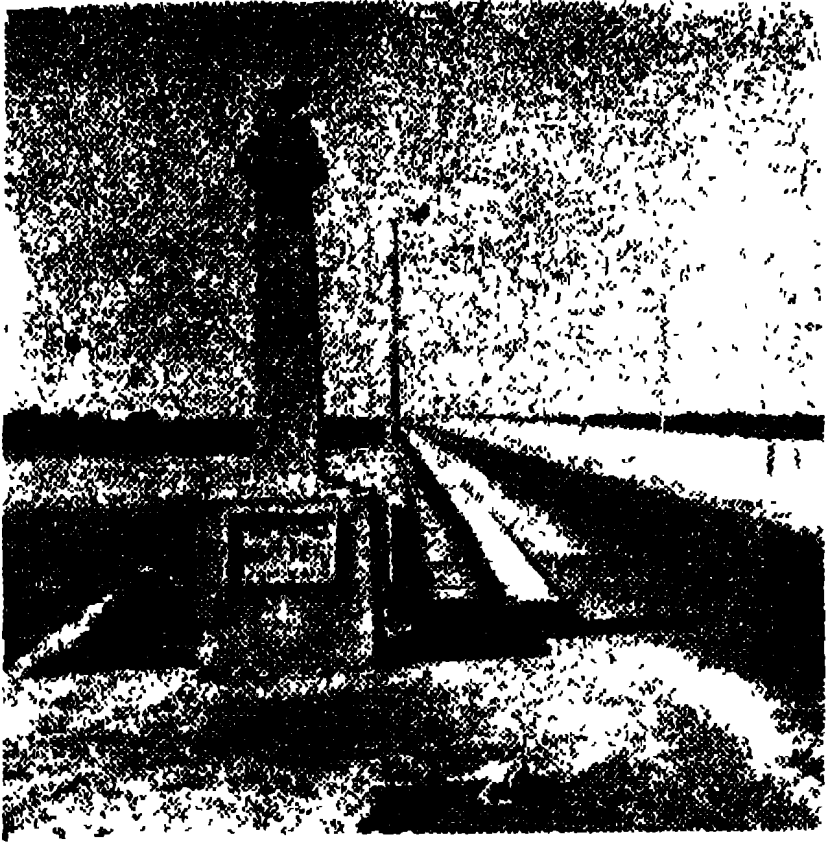
হয়েছে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার পরিমাণ হ'ল ৩ লক্ষ ২০ হাজার। এই সেতুর প্রয়োজন খুবই জরুরী ছিল। যদিও নদীর ২৬৭ মিটার ভাটির দিকে একটি রেলসেতু আছে তবুও কলকাতা থেকে মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে, সমুদ্র সৈকত দীঘা এবং ওড়িশা ও বিহারে যেতে হলে যাত্রীকে ফেরী নৌকোয় নদী পার হতে হ'ত। নদীর জল বাড়া কমার দরুন ফেরীতে যাতায়াতও অনিয়মিত ও অনিশ্চিত ছিল। এর ফলে সড়ক ব্যবহারকারীদের অনেকেই দুর্গাপুর ও বাঁকুড়া হয়ে ঘুরে যেতেন। হলদিয়া বন্দর ও তার আশে পাশের শিল্পএলাকায় যাবার প্রস্তাবিত পথটিও রূপনারায়ণ সেতুপথ থেকেই বেরোবে। এই পথটি বেরোবে সেতুর কোলাঘাটের দিক থেকে।

সেতুটির শক্তি ও বহন সামর্থ্যের পরিচয় দিতে হলে বলা যায় যে, ৭০ টন ওজনের একটি ট্যাঙ্ক অনায়াসে ও বিনা আশঙ্কায় ঐ সেতুটির ওপর দিয়ে যেতে পারে। সমগ্র সড়ক সেতুর প্রধান অংশের দৈর্ঘ্য হ'ল ৭৪৪ মিটার।

একটি পথ (লম্বায় ২৬৩ মিটার) কোলাঘাট যাবার বড় রাস্তার ওপর দিয়ে গিয়ে রেলওয়ে স্টেশন হয়ে রেলের গুড্স ইয়ার্ডে গিয়ে শেষ হয়েছে। দ্বারকেশ্বর ও মুক্তেশ্বরী থেকে ৫ লক্ষ ৬০ হাজার কিউসেক জল ছাড়ার জন্য দুটি জলপথ রয়েছে। প্রধান সেতুর প্রতিটি স্তম্ভ, ২৯ মিটার গভীর গোল কূপের মধ্যে কংক্রীট ফেলে তৈরি করা হয়েছে। স্তম্ভগুলির গা সমান নয়, প্রত্যেকটির গায়ে শিরার মত ৫টি খাঁজ আছে, যার প্রত্যেকটির ওপর সেতুর একটি করে গার্ডার বসানো হয়েছে। প্রত্যেক খাঁজের দুটি করে বাহু আছে— দৈর্ঘ্যে চার মিটার প্রধান গার্ডারগুলি ঐ বাহুগুলির ওপর রক্ষিত। সড়ক সেতুর সড়কটির প্রস্থ হ'ল ৭.৩২ মিটার ও তার দু ধারে ১.৫ মিটার করে চওড়া দুটি পায়ে চলার পথ। নদীর জল-স্তর থেকে সেতুর উচ্চতা ৬ মিটার। নৌকা প্রভৃতি চলাচলের পক্ষে পর্যাপ্ত। নোনা খালের ওপর একটা 'স্ক্যু' সেতু ও দেহাতী খালের ওপর বড় বাঁকা সেতু নিয়ে ৫/৬ কিলো মিটার দীর্ঘ কয়েকটি পথ তৈরি করা হয়েছে শরৎ সেতুতে সহজে পৌঁছুবার জন্য।

জোয়ার ভাঁটার প্রাবল্যের দরুন এবং মাটি উপযুক্ত না হওয়ার কারণে ভিৎ বসাবার সময়ে নানা রকম অসুবিধা হয়েছে। তা ছাড়া বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার প্রতীক্ষায় "শীট পাইল" কিনতে দেরী হওয়ায় ও জনমজুর সংক্রান্ত সমস্যার জন্য এক সময়ে কাজ থেমে পড়ার উপক্রম ঘটেছিল। সৌভাগ্য বশতঃ সমস্ত বাধাবিঘ্ন যথাসময়ে অতিক্রম ক'রে শরৎ সেতু বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়েছে।

শরৎসেতুর ফলকের আবরণ উন্মোচন করছেন ড. [illegible]। তাঁর পাশে যথাক্রমে [illegible] দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, রাজ্য [illegible] শ্রীমতী প্রতিভা মুখার্জী এবং [illegible] শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঁদিকে দেখা যাচ্ছে সেতুর নাম ফলক। ওপরে সেতুর [illegible] দৃশ্য।

পাঠক-পাঠিকা সমীপেষু—

ধনধান্যে-র উত্তরোত্তর উন্নতির জন্যে আপনাদের সক্রিয় সহযোগীতা অপরিহার্য। লেখা দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে ও বন্ধুমহলে ধনধান্যে-কে পরিচিত করিয়ে আমাদের উৎসাহিত করুন।

কোডাক্কারা ব্লকে সম্মিলিত প্রচেষ্টার অপূর্ব্ব সাফল্য

জেকব স্যামুয়েল

গ্রামাঞ্চলে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব চোখে পড়ার মত। অথচ নেতৃত্ব দিতে পারলে, সম্মিলিত উদ্যোগ, পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টার সঙ্গে স্থানীয় সম্পদ একত্রিত করতে পারলে শুধু কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিই সম্ভবপর নয়, সেই সঙ্গে শ্রম ও প্রয়োজনীয় মালমশলার অহেতুক ব্যয় ও অপব্যয় এড়ানো সম্ভব। এই নেতৃত্ব আসা উচিত সম্প্রসারণ-কর্ম্মীদের কাছ থেকে।

এই বিষয়টি চিন্তা ক'রে কোডাক্কারা ব্লকের কর্ম্মীরা চাষীদের নিয়ে একটি পরীক্ষা চালাতে প্রয়াসী হন। ব্লক এলাকার ধান-জমিগুলো আয়তনে ছোট ও সীমিত। স্থানীয় কৃষক ও মোড়লদের সহযোগিতায় ব্লক কর্ম্মীরা কুড়িটি কৃষক-সমিতি গড়ে তুলতে পেরেছেন। এই সমিতিগুলি যাতে সার্থকতার সঙ্গে কাজ করতে পারে তার জন্যে ব্লকের সম্প্রসারণ কর্ম্মীরা নেতৃত্ব দিয়ে ও পরামর্শ দিয়ে সর্ব্ব-প্রকারে সাহায্য করেছেন। গ্রামবাসীরা পুরুষানুক্রমে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন সহজে ও সাফল্যের সঙ্গে তার মীমাংসা করা সম্ভব হয়েছে।

পুদুকাড পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত উড়িন্‌জালপাদাম্ অঞ্চলে ১৫০ একর নীচু জমিতে এ পর্য্যন্ত ধানের একটামাত্র ফসল তোলা হ'ত কারণ বছরের অন্য সময় ঐ জমি জলে ডুবে থাকে। ঐ এলাকার কৃষকদের সংখ্যা ১১০/১১২-র মত। এঁরা ১৯৬৭ সাল পর্য্যন্ত ঐ জলাজমি থেকে জল বার করার কোনোও উপায় খুঁজে পাননি। শেষ পর্য্যন্ত ব্লক কর্ম্মীদের চেষ্টায় ঐ এলাকায় উড়িন্‌জালপাদাম কৃষক সমিতি স্থাপিত হ'ল। সমিতি স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় চাষীদের মধ্যে একটা ঐক্যবোধ জাগিয়ে তোলা যাতে তাঁরা মিলিতভাবে নিজেদের সহায় সম্পদের ভরসায় নিজেদের সমস্যার সুরাহা করতে সচেষ্ট হ'ন। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল। কৃষক-গোষ্ঠী ধানজমির একর প্রতি ১০০ টাকা হিসেবে সংগ্রহ করলেন। একটা ৫০ অশ্ব শক্তি বিশিষ্ট মোটরচালিত পাম্পসেট ভাড়া করা হ'ল। বিদ্যুৎ বিভাগ ঐ পাম্প চালাবার জন্যে তাদের 'কানেকশান' দিলেন। পাম্পটি দিনরাত চলতে লাগল। জল পুরো সেঁচে তুলে নেবার পর প্রচুর ফলন আই আর-৮ বীজধান বোনা হ'ল। উড়িন্‌জালপাদামের ইতিহাসে এক বছরে দুটো ফসলের পর্য্যায় শুরু হ'ল। ফলন হ'ল প্রচুর। আনন্দে আত্মহারা কৃষকরা 'বিজয়োৎসব' পালন করলেন।

চেঙ্গেনুরপাদাম-এর সমস্যা আবার আর এক রকম। উড়িন্‌জালপাদামে জলের আধিক্যের সমস্যা আর এই এলাকার সেচের জলের অভাবে ১০০ একর জমি প্রায় বরবাদ হবার জোগাড়। কিন্তু উড়িন্‌জালপাদামে সমবেত প্রয়াসে পরীক্ষা চালাবার পর, যৌথ প্রচেষ্টা ও সহযোগীতা সম্বন্ধে তাঁদের মনে স্থির প্রত্যয় জন্মেছে। এই এলাকার কৃষকরাও ব্লক আধিকারিক-দের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হলেন। নিজেদের টাকায় তাঁরা দুটি মোটরচালিত পাম্পসেট কিনলেন, অবশ্য ব্লক আধিকারিকদের সাহায্য নিয়ে। এর পর ক্ষেতে জলের অভাব ঘটল না। এঁরা জমি তৈরী ক'রে নিয়ে আই. আর-৮এর তাজা চারা এনে রোপন করলেন। পোকা মাকড় ও রোগ প্রতি-রোধের জন্যে সমস্ত জমিতে নানাপ্রকার ওষুধ ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল। ফসল যা উঠল তার পরিমাণ তাঁদের কল্পনার অতীত।

এইভাবে বিভিন্ন এলাকার সমস্যা সমাধানের জন্য ব্লকের বিভিন্ন অংশে কৃষক সমিতি স্থাপন করা হ'ল। সমবেত বিচার বিবেচনা, পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টায় সব সমস্যারই সহজে সমাধান করা সম্ভব হ'ল।

এই সব সমিতির সঙ্কল্প হ'ল প্রচুর ফলন ধানের চাষ চালিয়ে যাওয়া এবং আধুনিক ও উন্নত কৃষিপদ্ধতি গ্রহণ করা। এই সমিতিগুলি ব্যক্তিগতভাবে কৃষকদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। হিসেব ক'রে দেখা গেছে, যে, এই অঞ্চলের কৃষকরা বাইরের কারুর সাহায্য না নিয়েই গত দু'বছরের মধ্যে অতিরিক্ত ১,০০০ টন ধান উৎপাদন করেছেন। যাঁরা নিজেদের ক্ষেতখামারের কাজ করেন তাঁরাই হলেন ঐসব সমিতির সদস্য। এঁরা ধর্ম্মবিশ্বাসগত, আদর্শগত বা রাজনৈতিক মতভেদ ভুলে গিয়ে সাধা-রণের অভিন্ন স্বার্থে কাজ করেন। এ কথাটি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে, যে, উপযুক্ত নেতৃত্ব ও পরামর্শ পেলে গ্রাম-বাসীরা অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন।

সম্প্রতি ব্লক পর্য্যায়ে একটি কেন্দ্রীয় কৃষি উৎপাদন কমিটি স্থাপন করা হয়েছে। ব্লক এলাকার প্রত্যেকটি কৃষকসমিতির প্রতিনিধি হলেন ঐ কমিটির সভ্য। এছাড়া ঐ কমিটিতে আছেন স্থানীয় বিধান-সভা-সদস্য, পঞ্চায়েৎ-সভাপতি ও অন্যান্য নেতৃ-স্থানীয়রা। কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক, সমবায় সম্প্রসারণ আধিকারিক ও ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক কিন্তু ঐ কমিটির কার্য্যনির্ব্বাহক সভ্য নন্। কেন্দ্রীয় কমি-টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হ'ল সহযোগী কৃষক সমিতিগুলির কাজকর্ম্মের মধ্যে সমন্বয় বিধান করা। তাছাড়া কমিটি সমগ্র ব্লক এলাকার জন্যে একটি বৃহত্তর-উৎপাদন সূচী-প্রণয়ন করতে ইচ্ছুক। সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগগুলির সহায়তা নিয়ে সূচী কার্য্যকর করা হ'বে।

এই অভিনব পরীক্ষা নিরীক্ষার খবরে আশে পাশে, সর্ব্বত্র, তীব্র আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে।

ধনধান্যে-তে কেবল অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। প্রবন্ধাদি অনধিক পনের শত শব্দের হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট ও গোটা গোটা অক্ষরে লিখলে ভালো।

১৯৬৮ সালে পশমের উৎপাদন ও উন্নতি

১৯৫৬ সালেই প্রকৃতপক্ষে সংহতভাবে পশম শিল্পের ভিত্তি স্থাপিত হয়। সেই সময় থেকেই পশমের সূতো কাটার ও পশমজাত অন্যান্য জিনিস তৈরি করার মিলের সংখ্যা বাড়তে থাকে। বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের প্রয়োজন খুব বেশী হওয়ায় এবং নানা ধরণের পশমী জিনিসের আমদানী নিষিদ্ধ হওয়ায়, তা পরোক্ষে এই শিল্পটিকে এক দিক দিয়ে সংরক্ষিত করে। তবে একথাও বলা উচিত যে, এই সংরক্ষণ পেয়েও শিল্পটি উন্নয়নের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি। পশম শিল্পটির আধুনিকীকরণ সম্পর্কে বহু আলোচনা চললেও এখনও পর্য্যন্ত তেমন কিছু করা হয়নি। ভারতীয় পশম দিয়ে অবশ্য এখনও অসামরিক বা সামরিক প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে মেটানো সম্ভবপর হয়নি। ভারতীয় পশম দিয়ে খুব ভালো জিনিস তৈরি করা এখনও সম্ভব হয়নি। এগুলি কার্পেট ইত্যাদি তৈরী করার পক্ষেই ভালো।

নানা রকম অসুবিধা ও সমস্যা থাকা সত্ত্বেও দেশে, ১৯৬৮ সালে পশমশিল্পের ক্ষেত্রে কাজকর্ম সন্তোষজনক হয়েছে।

কাঁচা পশমের রপ্তানী কমিয়ে দেওয়ার ফলে, পশমী কাপড় ও হোসিয়ারী জিনিসের রপ্তানী ১৯৬৭ সালের তুলনায় অনেক বেশী হয়। পশম শিল্পে নানা প্রকার কৃত্রিম সুতো ব্যবহারের পরিমাণ এক রকম থাকে। ১৯৬৮ সালে প্রায় ৩০ লক্ষ কে.জি কৃত্রিম সুতো ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে পলিয়েস্টারের পরিমাণ হবে ১৬ লক্ষ কে.জির মতো। এ ছাড়া নাইলন সুতো ৩ লক্ষ কে.জি, এ্যাক্রিলিক আঁশ এক লক্ষ কে.জি ও ভিসকোজ এক লক্ষ কে.জি ব্যবহার করা হয়।

১৯৬৮-৬৯ সালে পশম ও পশমী জিনিসের রপ্তানী, রেকর্ড মাত্রায় অর্থাৎ ২৬ কোটি টাকার মত দাড়ায়। ১৯৬৭-৬৮ সালের তুলনায় এই পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগ বেশী। পক্ষান্তরে আমদানীর মোট পরিমাণ ছিল ১৩ কোটি টাকা।

পশম ও 'পশমী' পরিসংখ্যান

১। ভেড়ার সংখ্যা — ৪ কোটি ২৪ লক্ষ

২। কাঁচা পশমের পরিমাণ — ৩ কোটি ৫৬ লক্ষ কে.জি

৩। সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্প ক্ষেত্রে পশমের কারখানা

(ক) কম্পোজিট মিল — ৪৪

(খ) সুতো কাটার মিল — ৫২

৯৬

৪। পশম পরিষ্কার করার কারখানা (১৯৬৮)

(ক) টাকু

১। ওর্সটেড — ১,৪০,৬৮০

২। পশমী — ৬৩,০০৯

৩। শডি (মোটা ও মিশেল) — ২২,২৬৯

মোট — ২,২৬,৯০৮

(খ) বিদ্যুৎচালিত তাঁত — ১,৮০০

(গ) চিরুণী (পশমের জট ছাড়াবার)

১। নোবল — ৭৭

২। রেকটিলিনিয়া — ১২৩

মোট — ২০০

১৯৬৮ সালের হিসেব—

১। পশমী সুতোর মোট উৎপাদন ১ কোটি ৮৬ লক্ষ কে.জি.

২। পশমী/ওর্সটেড বস্ত্রের মোট উৎপাদন ১ কোটি ২০ লক্ষ কে.জি.

৩। পশম ও পশমী জিনিসের মোট আমদানী ১২ কোটি টাকা

৪। ঐ মোট রপ্তানী ২৬ কোটি টাকা

ওর্সটেড বস্ত্র শিল্পে ৬০ লক্ষ কে. জি. দিশী কাঁচা পশম ছাড়াও ১ কোটি ১২ লক্ষ কে. জি. আমদানী করা কাঁচা পশম ব্যবহার করা হয়েছে।

ওপরে ডানদিকে :

পশমের সুতো জড়ানো হচ্ছে

বাঁদিকে ওপরে :

গুলমার্গে ভেড়ার পাল

নীচের আনুপাতিক উৎপাদন তালিকায় পশম শিল্পের অবস্থার একটা আভাস পাওয়া যাবে

	১৯৬৭ (কিলোগ্রাম)	১৯৬৮ (কিলোগ্রাম)
১। সর্বশ্রেণীর ওর্সটেড পশমী সুতোর উৎপাদন	৪৫ লক্ষ	৫৫ লক্ষ
২। 'শাডি' ও পশমী সুতো	৪০ ,, (আনুমানিক)	৪০ ,, (আনুমানিক)
৩। কার্পেটের সুতো	৩৫ ,,	৪৫ ,,
৪। উল টপ (ভারতীয় ও আমদানী করা)	৯০ ,,	১ কোটি ২০ লক্ষ
৫। পশমী বস্ত্র	৯০ ,,	১ কোটি ২০ লক্ষ

সাধারণ অসাধারণ

নতুন ধরনের টেলিগ্রাফ পোস্ট

কেরালার ত্রিবান্দ্রামের শ্রী এ. আর. ফার্নানডেজ কয়েকটি আবিষ্কার পেটেন্ট করে বেশ নাম করে ফেলেছেন। ইতি-পূর্বে তাঁর আবিষ্কৃত অটোমেটিক ট্রেলার ব্রেক-এর খবর ছাপা হয়েছিল যোজনার ৪ঠা মে সংখ্যায়। শ্রীফার্নানডেজ যে পোস্টটি তৈরি করেছেন সেটি হ'ল কংক্রীটের প্রচলিত জমাট চৌকোনো কং-ক্রীটের পোস্টের মত নয়। এটি গোল নলের মতো, ফাঁপা এবং শক্ত কংক্রীটের তৈরি। ৯ মীটারের একটি পোস্ট তিনটি অংশে ভাগ করা, ফলে নিয়ে যাওয়া আসার অসুবিধা নেই। এগুলির রক্ষণা-বেক্ষণের খরচ খরচাও শতকরা ৩০ টাকা কম।

এই পোস্ট-এর ব্যাপক ব্যবহার হলে, কাঠের পোস্ট দরকার হবে না। ফলে যে কাঠ বাঁচবে তা রপ্তানী করে বিদেশী মুদ্রা আয় করা যাবে।

আবিষ্কারক এর তৈরিতে দিশী মাল মশলা লাগিয়েছেন। ডাক ও তার বিভা-গের জন্যে এই পোস্ট তৈরি করতে যদি কারখানা বসাতে হয় তাহলে বিদেশী সহযোগিতা বা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রত্যাশী না হয়েই তা করা সম্ভব হবে।

এঁরই আর একটি আবিষ্কার হ'ল জমানো চা বা কফি। এর আবিষ্কারের নতুনত্ব হচ্ছে এই যে, জমানো চা বা কফির সঙ্গে ঠাণ্ডা বা গরম জল মেশালেই যথেষ্ট। চিনি, দুধ আলাদা করে মেশাবার প্রয়োজন হবে না। এই বস্তুটির প্রচুর চাহিদা হওয়া স্বাভাবিক। একত্রে বহু লোকের চা বা কফি তৈরি সহজ করার জন্যে শ্রী ফার্নানডেজ এই সঙ্গে চা বা কফি মেশা-বার জন্য আলাদা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রও তৈরি করেছেন। বিদেশে শ্রীফার্নানডেজের শেষ আবিষ্কার তিনটির তৈরি বাজার আছে।

তরুণ পথিকৃৎ

কে. কে. নারায়ণন্ যখন কেরালার পুড়কাড় পঞ্চায়েতে নির্ব্বাচিত হ'লেন তখন স্থানীয় কৃষকরা মান্ধাতার আমলের কৃষিপদ্ধতি মেনে চলতেন এবং নতুন পন্থাপদ্ধতি গ্রহণে ইতস্ততঃবোধ করতেন। তাঁদের প্রধান সমস্যা ছিল জলের। কারণ ঐ এলাকায় মাত্র দুটি পাম্পসেট ছিল স্থানীয় দুই জমিদারের সম্পত্তি এবং পাম্প ব্যবহার করতে হলে, তাঁরা মোটা ভাড়া চাইতেন। নারায়ণন্ চেঙ্গাবুর এলাকার প্রতিনিধিত্ব করেন এবং বয়সে পঞ্চায়েৎ সদস্যদের মধ্যে সবচেয়ে কনিষ্ঠ। তিনি স্থানীয় কৃষকদের, আগামী মরসুম থেকে নিজেদের পাম্পসেট ব্যবহার করার ব্যাপারে রাজী করালেন। ফলে চেঙ্গাবুরে একটি কৃষক সমাজ গড়ে উঠল, তার কর্ম্মসচিব হ'লেন নারায়ণন্। তিনি উৎসাহভরে টাকা সংগ্রহের কাজে লেগে গেলেন। বুকের কাছ থেকে অর্থসাহায্য নিয়ে দুটি পাম্পসেট কেনা হ'ল, একটি ১৫ ও একটি ১০ অংশঃ সম্পন্ন। পাম্প দুটি দিনরাত চলতে লাগল। আর ভাবনা কী? পর্য্যাপ্ত জলের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ও উন্নত কৃষি পদ্ধতির মণিকাঞ্চন যোগ হওয়ায় অভাবিত পরিমাণ ফসল উঠল। তরুণ নারায়ণন্। এই একটি মানুষের উৎসাহ ও নেতৃত্বে, ঐ এলাকায় অতিরিক্ত ১,৭,৪,০০০ কেজি ধান উৎপন্ন হ'ল। জনকল্যাণ ও সহযোগীতার এক অপূর্ব্ব নিদর্শন হ'লেন কে. কে. নারায়ণন্।

একটি আশ্চর্য সমবায় প্রতিষ্ঠান

সারা ভারতের মধ্যে সুরাটের পাটানি সমবায় ঋণ সমিতি (লিঃ) হ'ল একটি আশ্চর্য প্রতিষ্ঠান। কারণ এই সমিতি আমানত হিসেবে যে টাকা পায় তার ওপর সুদ দেয় না। তার মানে এই নয় যে, ঐ সমিতির কাছে টাকা জমা দেওয়া হয় না। কারণ ঐ সমিতির ভাণ্ডারে অনেকের টাকা গচ্ছিত আছে। এই সমিতি [illegible] দেয় বিনাস্বুদে টাকা ধার দেয়। সমিতির অংশীদারদের কিন্তু লভ্যাংশ দেওয়া হয় না। সারা দেশের মধ্যে এইটি হ'ল একমাত্র সমিতি যেটি সমবায় বহির্ভুত সরকারী লিমিটেড কোম্পানীতে আমানত লগ্নী করতে পারে

এই সমিতি সমাজের দরিদ্র নারীদের জন্যে একটি শিল্প ভিত্তিক সমবায় সমিতি এবং দরিদ্র পরিবারগুলির জন্য একটি সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। ১,১০১ জন সদস্যদের কাছ থেকে ১,২৫,৫৫১ টাকার মূলধন আদায় করা হয়েছে। সমিতির নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ ৬ লক্ষ টাকারও বেশী।

অভূতপূর্ব্ব প্রতিবাদ

সরকারি কোন ব্যবস্থা বা নিষ্ক্রীয়তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর অধিকার, গণ-তান্ত্রিক ব্যবস্থার অঙ্গ। কতকগুলি পরিচিত পদ্ধতিতে এই প্রতিবাদ জানানো হয়, যা আমরা সকলেই জানি। সম্প্রতি কোচি-জনগণ অবশ্য, সেখানে একটি জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপনে ভারত সরকারের অসামর্থ্যের বিরুদ্ধে, এক নতুন উপায়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

প্রতিবাদ জানানোর দিন হিসেবে "১২ই অক্টোবার" তারিখটি বেছে নেওয়া হয়। প্রস্তাবিত কারখানাটি স্থাপন করার জন্য সেখানে যে জমি নেওয়া হয়, ঐ তারিখটি ছিল তার দশম বার্ষিকী দিবস। ১৯৫৯ সালে ঐ তারিখে ৫০০টির বেশী পরিবারকে বাস্তুচ্যুত ক'রে এর্ণাকুলামের উপকূলভাগে ১৩০ একর জমি অধিকার করা হয়। তারপর থেকে আজ পর্য্যন্ত আর কিছু হয়নি।

এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য কোচিনের জনগণ, কাঠ এবং কাপড় দিয়ে একটি জাহাজ তৈরী ক'রে সেটি শোভাযাত্রা ক'রে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যান। ৩০ ফিট লম্বা এই জাহাজটির নাম দেওয়া হয় "কোচিন রাণী"। মাস্তলে ছিল একটি কালো পতাকা এবং একটি ফুলের মালা।

মহারাষ্ট্রের-শর্করা-সমবায় পল্লী অঞ্চলে নতুন নেতৃত্ব দিচ্ছে

সি. দীনেশ

মহারাষ্ট্রের যে এলাকাতেই সমবায় চিনির কারখানা গড়ে উঠছে সেখানেই এগুলি অর্থনৈতিক সামাজিক উন্নয়নের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠছে। বর্তমানে মহারাষ্ট্রে ২২টি সমবায় চিনি শিল্পে নিয়মিতভাবে উৎপাদন সুরু হয়েছে এবং আরও ৮টি. নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এই রাজ্যে মোট যে চিনি উৎপাদিত হয় তার শতকরা ৬৬ ভাগ এবং সমগ্র দেশের মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ২৬ ভাগ এই সব সমবায় চিনি কারখানায় উৎপাদিত হয়। সমবায়গুলিতে উৎপাদক সদস্যদের সংখ্যা হল ৭৭০০০. আর এঁরাই প্রকৃতপক্ষে পল্লী অঞ্চলে নতুন নেতৃত্ব গড়ে তুলছেন।

চিনির কারখানাগুলি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মহারাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুরু হয়ে গেছে। যে সব ক্ষেত্রে উন্নয়ন পরিলক্ষিত হচ্ছে সেগুলি প্রধানতঃ হ'ল কৃষিতে কারিগরী উন্নয়ন, কৃষিতে পণ্য শস্য উৎপাদন, মূলধন গঠন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পল্লী অঞ্চলগুলিতে সহরের উদ্ভব, অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং সর্বোপরি পল্লী অঞ্চলে নতুন নেতৃত্বের উদ্ভব। এগুলি পল্লীর সমাজে নতুন একটা উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। নতুন এই কৃষক নেতাগণের সতর্ক দৃষ্টি মহারাষ্ট্রের চিরাচরিত ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে একটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাধা হিসেবে কাজ করছে।

শর্করা সমবায়গুলি গঠিত হওয়ার পর কৃষকদের ব্যক্তিগত আয় সম্পর্কে এ কথা বলা যায় যে সমবায়গুলির উৎপাদক সদস্যরা তাঁদের আখের জন্য উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছেন এবং গত মরসুমে তাঁরা সব চাইতে বেশী মূল্য পেয়েছেন। একজন উৎপাদক তাঁর আখের জন্য, টন প্রতি ১৬০ টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত মূল্য পেয়েছেন। পূর্বে প্রতি টনের মূল্য ছিল মাত্র ৫০ টাকা।

উৎপাদকগণ নিয়মিতভাবে চিনির কারখানাগুলিকে আখ সরবরাহ করায় কারখানাগুলিতে পূর্ণমাত্রায় কাজ চালানো সম্ভবপর হয়, ফলে তাঁরাও বেশী আয় করেন।

কৃষিতে আধুনিক সাজ সরঞ্জাম প্রয়োগ করার কাজে এই আয় নিয়োগ করা হচ্ছে। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদন ১০০ টন পর্যন্ত বেড়ে গেছে। প্রতি একরে মোটামুটি ৪০ থেকে ৫০ টন আখ উৎপাদিত হয়। আয় বেড়ে যাওয়াতে ট্র্যাক্টার, পাম্প, বাড়ী, কূয়ো হিসেবে মূলধনও বেড়ে গেছে। কৃষিতে আধুনিক পদ্ধতিগুলি প্রযুক্ত হওয়ার ফলে কৃষকদের দৃষ্টিভঙ্গীতেও একটা পরিবর্তন এসেছে। তাঁদের এখন একটা ব্যবসায়ীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী গঠিত হয়েছে। অর্থাৎ পূর্বে যেমন তাঁরা কতকগুলি চিরাচরিত পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন, সেটা এখন বদলে গেছে, তার পরিবর্তে তারা এখন ব্যয় ও উৎপাদনের ভিত্তিতে কৃষির মূল্যায়ন করতে সুরু করেছেন। এই সব অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তনগুলি পরিলক্ষিত হয়। এই সব জায়গায় অনেক নতুন নতুন রাস্তা হয়ে গেছে যার ফলে যোগাযোগের উন্নতি হয়েছে এবং কৃষি মূল্যায়নে যোগাযোগ ব্যবস্থাটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চিনির কারখানা চালানো সম্পর্কে যে সব সমস্যা দেখা দেয় সেগুলি পরীক্ষা করার জন্য এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য শর্করা সমবায়গুলি অন্যান্য রাজ্যে তাদের প্রতিনিধিদল পাঠায়। যে পল্লী অঞ্চলে এতদিন পর্যন্ত আধুনিক সুযোগ সুবিধে কিছুই পাওয়া যেতো না সেখানে এখন শিক্ষা, চিকিৎসা ও আমোদ প্রমোদের নতুন নতুন সুযোগ সুবিধে গড়ে উঠেছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, শর্করা সমবায়গুলিতে অতিরিক্ত কর্ম সংস্থানের সুযোগ বেড়েছে আর তার ফলে গ্রামগুলির অতিরিক্ত শ্রমিকরা এগুলিতে কাজ পাচ্ছেন। তা ছাড়া কোন কোন জায়গায় গুড় ও ছিবড়ে থেকে মদ ও কাগজ তৈরি করার জন্য উপজাত শিল্পও গড়ে উঠছে।

অন্যান্য পরিবর্তন

বহু চিনির কারখানা নিজেরাই জলসেচ দেওয়ার প্রকল্প হাতে নিয়েছে এবং উৎপাদক সদস্যদের শিক্ষাদান সম্পর্কে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। পঞ্চগঙ্গা চিনি কারখানা এলাকায়, ১৯৫৮-৫৯ ও ১৯৬৬-৬৭ সালের মধ্যে উৎপাদক সদস্যের সংখ্যা ১৫৬৮ থেকে ২৩০৪ হয়েছে আর এই সময়ের মধ্যে সদস্যরা মূলধনের যে অংশ কিনেছেন তার পরিমাণ হ'ল প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। ১৯৫৮-৫৯ থেকে ১৯৬৫-৬৬ সালের মধ্যে চিনির উৎপাদন ৩,৫৩০ বস্তা থেকে বেড়ে ২,৬৮০০০ বস্তা হয়েছে। কৃষকদের প্রতি টন আখের জন্য যে মূল্য দেওয়া হয়েছে তাও ১৯৫৮-৫৯ সালের ৪১ টাকা থেকে বেড়ে ১৯৬৮-৬৯ সালে ১৮৫ টাকা হয়েছে।

শিক্ষা কর্মসূচী

পল্লীগুলিতে নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য যে শিক্ষাসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্বে যেমন একজন বা দুজন বড় নেতা থাকতেন সেই পারম্পর্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে বহু সংখ্যক কৃষক নেতা তৈরি করাই হ'ল এই কর্মসূচীর লক্ষ্য। কারখানাগুলি, পরিচালনা ব্যবস্থার মধ্যেই, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাধাগুলি অপসারিত করার একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছে। চিনির কারখানাগুলি, সদস্যদের সম্পূর্ণ অনুগত থাকায় এগুলির নেতৃত্বের ওপর গ্রামবাসীদেরও সম্পূর্ণ আস্থা আছে। সমবায়গুলি ৩৯টি গ্রামে প্রায় ২৬,০০০ একর জমিতে জলসেচ দেওয়ার ব্যবস্থা করায় ঐ এলাকার পল্লী অঞ্চলের চেহারা সম্পূর্ণভাবে বদলে গেছে। এর জন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় ১.৫ কোটি টাকা।

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ ও তার তাৎপর্য

সুরেশ শ্রীভান্তে

ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি সামাজিক নিয়ন্ত্রণে চলে আসার পর কৃষি ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের হাতে প্রভূত ক্ষমতা এসে গেছে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি অবশ্য তাদের শাখা অফিস সম্প্রসারিত ক'রে এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও কৃষকদের জন্য যথেষ্ট ঋণের ব্যবস্থা করে তাদের নতুন দায়িত্ব পালন করেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৪টি প্রধান ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্বে আনা অত্যাবশ্যক ছিল না। এই রাষ্ট্রীয়করণ ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে বেসরকারী তরফে লগ্নীর গতি ব্যাহত করতে পারে এবং যে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর চতুর্থ পরিকল্পনার সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করছে সেই বৈদেশিক মূলধন হয়তো যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাবে না। ঋণকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটা লতার সঙ্গে তুলনা করা যায়। যে লাল ফিতের জটিল গ্রন্থী ও নিষ্ক্রীয়তা, সরকারী মালিকানার ব্যবসা ও শিল্পগুলির একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা হয়তো লতাটিকে শুকিয়ে ফেলবে।

ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্বে আনা হলেই তা নতুন লগ্নী সুনিশ্চিত করে না। এর অর্থ হ'ল লগ্নীর বেসরকারী মালিকানা সরকারী মালিকানায় হস্তান্তরিত হল। সুচিন্তিত আর্থিক নীতি এবং উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সেই অর্থ লগ্নী করে, সঞ্চয় সংহত করে দ্রুত আর্থিক উন্নতির ব্যবস্থা করেই শুধু অতিরিক্ত চাহিদা মেটানো যেতে পারে রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে নয়।

ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্বে আসায় হয়তো, যে সব সরকারী সংস্থায় আয় বা লাভ হয় না, সেগুলিতে ব্যাঙ্কের জমা টাকা বহু পরিমাণে লগ্নী করা হবে আর তার অর্থ দাঁড়াবে, অর্থনীতির উৎপাদনমূলক ক্ষেত্রগুলি হয়তো যথেষ্ট সাহায্য পাবে না। আমাদের দেশের সরকারী সংস্থাগুলির মোটামুটি কাজ বিশেষ উৎসাহজনক নয়। বেসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ব করার পর এর ব্যয় বেড়েছে এবং প্রতিযোগিতা না থাকায় উন্নয়নের পরিবর্তে যাত্রীদের হয়রানি বেড়েছে, বেশী ভাড়া দিতে হচ্ছে। জীবন বীমা ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্ব হওয়ায়, প্রিমিয়ামের রসিদ পেতে এবং বীমার টাকা পেতে দেরী হচ্ছে বলে বীমাকারীরা অভিযোগ করছেন।

স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন এবং মেটাল ও মিনারেল ট্রেডিং কর্পোরেশন গঠিত হওয়ায় সরকার বেশ বড় রকম বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন কিন্তু তা ব্যবসার পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করেনি। অপর পক্ষে তা প্রচলিত ব্যবসা সূত্রগুলিকে স্থানান্তরিত করেছে এবং দেশে বেকার সমস্যা বাড়িয়েছে।

১৪টি প্রধান ব্যাঙ্ক যখন রাষ্ট্রায়ত্বে আনা হয় তখন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ও এর সহযোগী ব্যাঙ্কগুলিসহ দেশের মোট ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রায় এক তৃতীয়াংশ সরকারী মালিকানায় সরকারের পরিচালনাধীনেই ছিল। কাজেই দেশে এমন একটা ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ছিল যেখানে সরকারী এবং বেসরকারী তরফের প্রতিষ্ঠানগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সঞ্চয় সংহত করার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা অভিনয় করতে পারতো। এগুলির শীর্ষে, সরকারী পরিচালনা ও মালিকানাধীনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমগ্র ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যথেষ্ট ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতো। কাজেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যখন সমস্ত ব্যাঙ্ককেই সাধারণ নির্দেশ দিতে পারতো অথবা কোন একটি বা কয়েকটি ব্যাঙ্কের নীতি সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশ দিতে পারতো তখন রাষ্ট্রীয়করণ করার কোন যুক্তিই ছিল না।

রাষ্ট্রায়ত্ব করার পক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে বলা হয়েছে যে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি প্রধানতঃ সহর এলাকায় কাজ করছিল, পল্লী অঞ্চলগুলি, কৃষক এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে উপেক্ষা করে বড় বড় শিল্পপতিদের অযৌক্তিক সুবিধে দিচ্ছিল। এরা সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার আদর্শ অনুযায়ী, অগ্রাধিকারের নীতি অনুসরণ করছিল না। কিন্তু, অগ্রাধিকার কাদের পাওয়া উচিত সেই রকমের কোন সুনির্দিষ্ট নীতি স্থির করে দেওয়ার মতো কেন্দ্রীয় কোন নির্দেশ না থাকাতেই এই অবস্থা ঘটেছে। এতে ব্যাঙ্কগুলির কোন দোষ ছিল না। তা ছাড়া ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি কৃষকদের সোজাসুজি ঋণ সরবরাহ করবে এই রকম কোন উদ্দেশ্য কারুরই ছিল না। কৃষকদের ঋণ সরবরাহ করার দায়িত্ব ছিল জেলা সমবায় ব্যাঙ্ক, সমবায় সমিতি এবং ভূমি বন্ধক ব্যাঙ্কগুলির ওপর। পল্লী অঞ্চলের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা অনুসন্ধানকারী কমিটি, পল্লী ঋণ পর্যালোচনকারী কমিটি এবং সমবায় সম্পর্কিত কমিটিগুলির বিবরণেই তা বুঝতে পারা যায়।

এই প্রসঙ্গে আরও বলা যায় যে, সেচের জন্য জল, সার, কীট নাশক এবং কারিগরী জ্ঞান যদি কৃষকদের কাছে সহজলভ্য হয় তাহলেই শুধু কৃষকরা ঋণ নিয়ে উপকৃত হতে পারেন। এই সব কৃষি সরঞ্জামের সরবরাহ না থাকলে, ঋণ, কৃষির উন্নয়ন না করে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা বাড়াবে। যাই হোক ব্যাঙ্কগুলিকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে আনার মাত্র দেড় বছরের মধ্যেই, ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলিকে কৃষি ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি সম্পর্কে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তা পালন করার জন্য তারা ইতিমধ্যেই নীতি, পদ্ধতি ও কর্মসূচী সম্পর্কে একটা সংগঠনমূলক কাঠামো তৈরি করে ফেলেছে।

ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ব করায় ৭৫ কোটিরও বেশী টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে হবে। তার অর্থ হ'ল বিপুল পরিমাণ সরকারী অর্থের অপব্যয়। দেশের অর্থনীতি ভীষণ একটা মন্দা কাটিয়ে সবে একটু তেজী হয়ে উঠছিল। এই ব্যবস্থা এখন একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, সরকারকে কোন দায়িত্ব ছাড়াই অবাধ ক্ষমতা দিয়েছিল কিন্তু রাষ্ট্রীয়করণ ব্যবস্থায়

১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

শিল্পাঞ্চল—কর্ম্মসংস্থান ও শিল্প বিকেন্দ্রীকরণের উপযুক্ত ক্ষেত্র

আর. কে. ভারতী

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প অধিকতর কর্ম্ম সংস্থানের পথ প্রশস্ত ক'রে, স্থানীয় সহায় সম্পদ সুসংহত করার সহায়ক হয় ও কয়েক শ্রেণীর অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্যের পর্য্যাপ্ত যোগান অব্যাহত রাখে, এ পরীক্ষিত সত্য।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পোদ্যোগগুলির সৃষ্টি ও বিকাশে শিল্পাঞ্চলগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য্য এবং আমাদের দেশে এই ব্যবস্থা কার্য্যকর পন্থা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। বিশেষ ক'রে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির প্রসার, বিকাশ এবং সেগুলিকে আঞ্চলিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে শিল্পাঞ্চল-পদ্ধতি খুবই কার্য্যকর কারণ তা'র মাধ্যমে শিল্প বিকেন্দ্রীকরণের পথে দ্রুত সুষম উন্নয়ন সম্ভব হ'তে পারে।

সারা বিশ্বের উন্নতিকামী দেশগুলির মধ্যে একমাত্র ভারতেই সর্ব্বাধিক ব্যাপক ভিত্তিতে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। সুসংহত ও সুসমন্বিত শিল্পবিকাশ এই পদ্ধতির লক্ষ্য হওয়ার দরুণ, অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর অঞ্চল ও দূর গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রগতি আনা সম্ভব হবে। তাছাড়া মাঝারী ও ছোট উদ্যোগীদের উৎসাহিত করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্য ও বিভিন্ন সংস্থাগুলির কারিগরী দক্ষতা, পরিচালন পটুতা প্রয়োগের সুযোগ পাওয়া যাবে এবং তাদের আর্থিক ক্ষমতা ও বাজারজাত করার ক্ষমতা কাজে লাগানো যাবে।

এইসব নানা কারণে শিল্প-বিকাশ-পরিকল্পনায় শিল্পাঞ্চল স্থাপন ব্যবস্থাকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। শিল্পাঞ্চল কার্য্যসূচী প্রবর্ত্তন করা হয় প্রথম পরিকল্পনাকালের শেষ নাগাদ। ১৯৫৫ সালে এই কার্য্যসূচী প্রণয়ন করে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প পর্ষৎ। প্রথম পরিকল্পনাকালের শেষ বছরে ১০টি শিল্পাঞ্চল-সূচী অনুমোদন করা হয় এবং শিল্পাঞ্চল স্থাপন ও পরিচালনভার রাজ্যসরকারগণের হাতে দেওয়া হয়। প্রথম পরিকল্পনাকালে এই কার্যসূচী তেমন সফল হয়নি। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ১৯৫৭ সালে, সরকার যখন ক্ষুদ্রায়তন শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ৪ কোটী ৪০ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ২০ কোটী করতে মনস্থ করলেন এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পপ্রসারের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে শিল্পাঞ্চল স্থাপনের কার্য্যসূচীকে স্বীকৃতি দিলেন তখন কাজ হ'তে লাগল। পরিকল্পনায় এই খাতে ১১.১২ কোটি টাকার সংস্থান করা হল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১২০টি শিল্পাঞ্চল স্থাপনের জন্যে। ১৯৬১র মার্চ্চ-শেষ পর্য্যন্ত এই বাবদ খরচ হয় ১০.৯৮ কোটী টাকা। প্রথম দুটি পরিকল্পনাকালে ১২০টি শিল্পাঞ্চল স্থাপন অনুমোদন করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এর জন্যে ৩০.২০ কোটী টাকা বরাদ্দ করা হয়। ৩০০টি শিল্পাঞ্চল স্থাপনের প্রস্তাবও গৃহীত হয়। শহর ও গ্রামাঞ্চলে শিল্পোন্নয়নে বৈষম্য দূর করার জন্যে ৫০০ থেকে ১০০০টি ক্ষুদ্রায়তন পল্লী শিল্পাঞ্চল স্থাপনের মনস্থ করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালের শেষ নাগাদ ৪৫৮টি শিল্পাঞ্চল স্থাপনে উৎসাহ দেওয়া হয়। এর মধ্যে ২০৮টি চালু হয়ে গেছে। ব্যয়ের আনুমানিক হিসেব ছিল ২,১৬২.১৬ লক্ষ টাকা।

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ২১৫টি নতুন শিল্পাঞ্চল স্থাপনের সঙ্কল্প রয়েছে। ১৯৬৭ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ ৪৯২টি শিল্পাঞ্চল স্থাপনের সুযোগ ক'রে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ২৮৯টি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ নাগাদ বিভিন্ন ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অধিকাংশই শিল্পাঞ্চলগুলির সাহায্যে সম্প্রসারিত হ'তে পারবে ব'লে আশা করা হচ্ছে।

বস্তুতঃ শিল্পাঞ্চল-কার্য্যসূচীর রেকর্ড প্রগতির রেকর্ড।

বাঙলার কারুশিল্পের শিৎ-এর কাজ

৫ পৃষ্ঠার পর

রপ্তানীর ক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক মেলায় অংশ গ্রহণ এবং রাজ্য সরকারের বাণিজ্য শাখার মাধ্যমে শিল্প ব্যবসায়ী ও শিল্পীকে সরাসরি বাণিজ্যিক খবরাখবর সরবরাহের ব্যবস্থা, রপ্তানীর সহায়ক হচ্ছে বলেই মনে হয়।

কারু শিল্পকে জনপ্রিয় ক'রে তোলার চেষ্টায় ত্রুটিও নেই। প্রতি বছর হস্তশিল্প সপ্তাহ পালিত হচ্ছে; সেই সপ্তাহে সমস্ত বিক্রয়ের উপর রিবেট দেওয়া হয়। এ ছাড়া প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ, পত্রপত্রিকার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন, ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে হস্তশিল্পকে দেশবাসীর কাছে নানা ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা চলছে। প্রতি বছর সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কারু শিল্প প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে জাতীয় সম্মানে ও পুরস্কারে ভূষিত করা হচ্ছে।

শিল্প বেঁচে থাকে শিল্পীকে আশ্রয় ক'রে। দারিদ্র্য এবং ব্যধির হাত থেকে শিল্পীকে রক্ষা করতে না পারলে, পরিকল্পনায় মস্ত একটা ত্রুটি থেকে যাবে। শ্রম অনুপাতে শিল্পী প্রতিদান পান না। এই শিল্পকে দ্রুত বৈদ্যুতিককিরণের সুপারিশ কোন কোন অভিজ্ঞ মহল করেছেন। উৎপাদন বাড়লে আয় বাড়বে—এই তাঁদের ধারণা। অথচ গ্রাম-বাংলার সনাতন পরিবেশে বিদ্যুতের আলো কবে হেসে উঠবে তা নির্ভর করছে অন্য বহুতর সমস্যার সমাধানের উপর। যেদিন সমস্ত পরিকল্পনার লক্ষ্য একমুখী হবে সেদিনই স্বপ্ন সার্থক হবে।

খনিজদ্রব্যের অনুসন্ধানে

৩ পৃষ্ঠার পর

এই প্রকল্পের প্রাথমিক পর্য্যায়ে ১৯৬৮ সালেই শূন্যপথে ১৪,০০০ বর্গ কিঃ মীঃ এলাকার ফটো নেওয়া হয়। বৃটেনের একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি ক'রে একটি "ডাভ" বিমান, চালক ও ফটোগ্রাফারকে নিয়ে এই কাজটি সম্পূর্ণ করা হয়। তারপর শূন্যপথে ভূপদার্থমূলক অনুসন্ধানের জন্য প্রতিষ্ঠানটি বোর্নিও থেকে তামিলনাড়ুতে একটি ডাকোটা বিমান পাঠিয়ে দেয়। এই কাজের জন্য যে সব যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তা বিমানযোগে বৃটেন থেকে আনানো হয়।

চৌম্বক আকর্ষণ-বিকর্ষণ এবং তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে সঠিক তথ্যাদি সুনিশ্চিত করার জন্য অনুসন্ধানকারী বিমানটিকে, পাহাড় ও গিরিবর্ত্ম অনুযায়ী ওপরে উঠে, নীচে নেমে সব সময়ে ১৫০ মীটার দূরত্ব বজায় রাখতে হয়েছে। কোন জায়গা যাতে বাদ না যায় সেজন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা হয়। রেডার, অল্টিমীটার, ইলেকট্রোনিক সাজ সরঞ্জাম এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে সঠিক অনুসন্ধান সম্ভবপর ক'রে তোলা হয়। শূন্যপথে ওড়ার সময় একটি ক্যামেরা প্রতি ৩০০ ফিটে একটি ক'রে ছবি নেয় এবং ভূপৃষ্ঠে অন্যান্য যন্ত্রে যে সব তথ্য সংগৃহীত হয় সেগুলির সঙ্গে পরে এই ছবি মিলিয়ে পরীক্ষা করা হয়।

শূন্যপথে অনুসন্ধান সম্পূর্ণ করার পর ফলাফলগুলি পরীক্ষা ক'রে আরও বিস্তারিত ফল পাওয়ার জন্য স্থলপথে অনুসন্ধান সুরু করা হয়। প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে নমুনা সংগ্রহ ক'রে ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরী হচ্ছে। স্থলপথে বর্ত্তমানে যে সব কাজ হচ্ছে সেগুলির পর্য্যায়গুলি হ'ল এই রকম : শূন্যপথে তোলা ফটোগ্রাফের সাহায্যে ভূস্তর পরীক্ষা করার জন্য ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরী করা হচ্ছে। প্রকল্প অঞ্চলের শতকরা ৮৫ ভাগেরও বেশী জায়গার ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরী হয়ে গেছে এবং সমগ্র এলাকার ভূস্তরের প্রাথমিক মানচিত্র তৈরী করা হয়েছে।

সম্ভাব্য এলাকাগুলি সম্পর্কে যাতে আরও বিস্তারিত অনুসন্ধান চালানো যায় সেজন্য নদীর পলিমাটি, মাটি এবং প্রস্তরাদি পরীক্ষা করা হচ্ছে। প্রকল্প অঞ্চলের ধাতব পদার্থ ও প্রস্তরাদির প্রাথমিক পরীক্ষা সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

গর্ত্ত ইত্যাদি খুঁড়ে সম্ভাবনাপূর্ণ অঞ্চলগুলির ভূস্তর পরীক্ষা করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের অধীনে মাদ্রাজ সহরে যে গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে, সেখানে, ভূস্তর থেকে সংগৃহীত নমুনাগুলি পরীক্ষা করা হচ্ছে। এই প্রকল্পে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অংশ হিসেবে গবেষণাগারে এবং সম্ভাব্য উৎস অঞ্চলে কাজ করার জন্য মাদ্রাজে সাজ সরঞ্জাম এসে পৌঁচুচ্ছে। এই সব সাজ সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং সেগুলি দিয়ে কাজকর্ম করার ব্যয় ভারত সরকার বহন করবেন।

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের পর

১৭ পৃষ্ঠার পর

সরকারকে যেমন বিপুল ক্ষতিপূরণের বোঝা বইতে হবে তেমনি আবার রাষ্ট্রাধীন প্রতিষ্ঠানগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্ব হওয়ায় সরকারের হাতে যে আর্থিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং এতে হয়তো রাজনৈতিক নেতা ও কর্মচারীদের হাতে, ব্যাঙ্কের কাজকর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তার করার যথেষ্ট ক্ষমতা থাকবে আর তা যে আর্থিক উন্নয়নের পরিপন্থি হবে তাতেও সন্দেহ নেই। কাজেই রাষ্ট্রায়করণ ব্যবস্থায় আদর্শের বেদীতে যেন বাস্তবকে বলি দেওয়া হয়েছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে উৎপাদনমূলক কাজে লগ্নী করার জন্য সঞ্চয় সংহত করার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। সরকারী সংস্থাগুলি দক্ষতা, উৎপাদন এবং এমন কি শ্রমিক পরিচালক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কোন আদর্শ স্থাপন করতে পারেনি। তা ছাড়া বর্মা, সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র এবং পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশ তাদের ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্ব করে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা ভারতের ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের সাফল্য সম্পর্কেও খুব বেশী আশার সঞ্চার করে না।

ভারতে তৈরি টায়ারের চাহিদা

সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের আসোয়ান বাঁধ ও যুগোশ্লোভিয়ার বোর তামার খনিতে মাটি তোলার জন্য দৈত্যাকার যে সব মোটর ট্রাক কাজ করছে, সেগুলিতে ভারতে তৈরি টায়ার ব্যবহার করা হচ্ছে। ভারতে তৈরি টায়ার ও টিউব এখন সমস্ত দেশে রপ্তানি করা হয়। বিমানে, মাটি তোলার মোটর ট্রাকে, বাসে, ট্রাকে, হালকা ট্রাক ও মোটরগাড়ীতে ব্যবহারযোগ্য সব ধরনের টায়ারই রপ্তানি করা হচ্ছে।

আমাদের দেশের রবার বাগানগুলিতে প্রায় ৬০,০০০ টন রবার তৈরি হয়। পুরানো রবার থেকেও প্রায় ১২০০০ টন নতুন রবার উৎপাদিত হয়। দেশে রবারের সমগ্র প্রয়োজন মেটাচ্ছে একটি বড় রাবার উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া কৃত্রিম পদ্ধতিতে রাবার উৎপাদন করার জন্যেও একটি কারখানা রয়েছে।

ভারতে যদিও ১৯২০ সাল থেকেই রাবার উৎপাদন সুরু হয় তবুও স্বাধীনতা লাভ করার পরই এই শিল্পটির দ্রুত উন্নতি হয়। ১৯৫০ সালে ভারতে মোটরগাড়ীর টায়ার তৈরি করার মাত্র দুটি কারখানা ছিল এবং এই দুটি কারখানায় প্রায় ৯০০,০০০ টায়ার তৈরি হ'ত। ১৯৬১ সালে এই উৎপাদন বেড়ে প্রায় ১০.৪৪ লক্ষ হয়। বর্ত্তমানে ১২টিরও বেশী আধুনিক ও সুসজ্জিত কারখানায় বছরে ৩০ লক্ষেরও বেশী টায়ার উৎপাদিত হচ্ছে।

ভারতের মোটর টায়ার তৈরি করার শিল্প বর্ত্তমানে, মোটর গাড়ী, ভারি ট্রাক, ট্র্যাক্টার, বিমান, স্কুটার, মোটরসাইকেলের জন্য প্রয়োজনীয় সব রকমের টায়ার তৈরি করছে।

সম্প্রতি মোটর গাড়ীর জন্য নতুন এক ধরণের টায়ার তৈরি করা হয়েছে। একে মোটর টায়ারের নক্সার আধুনিকতম সংস্করণ বলা যায়। এগুলি একদিকে যেমন বেশীদিন চলে তেমনি নিরাপত্তাও বাড়ায়।

ধাতুশিল্পে প্রগতি

১ পৃষ্ঠার পর

জন্য ২৩.৯৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে।

এ্যালুমিনিয়ম

সৌভাগ্যবশত ভারত এ্যালুমিনিয়ম নিষ্কাশনের ব্যাপারে অভূতপূর্ব প্রগতি করেছে। ১৯৫০ সালে দুটি কারখানা (আসানসোল এবং আলউই) মাত্র ১৫৯৪ টন উৎপাদন করেছিল। কারখানার সংখ্যা এখন পাঁচ। আসানসোল, আলউই, হীরাকুঁদ, মেটুর এবং রেনুকুট। ১৯৬৮ সালে এ্যালুমিনিয়ম উৎপাদিত হয়েছে ১২০,০০০ টন। শুধু তাই নয়, এখন আমদানীর পরিবর্তে এই ধাতু রপ্তানী করা হচ্ছে। বৈদ্যুতিক এবং অন্যান্য কাজে বহু পরিমাণে এ্যালুমিনিয়ম ব্যবহার করা হচ্ছে, তামা দস্তার পরিবর্তে। ১৯৭৩-৭৪ সালে দেশে ২২০,০০০ টন এ্যালুমিনিয়ম প্রয়োজন হতে পারে। তা ছাড়া হয়তো ৪০।৫০ হাজার টন ধাতু রপ্তানী করাও সম্ভব হতে পারে। এই চাহিদা মেটানোর জন্য তিনটি নূতন কারখানা তৈরি করার কাজ দ্রুতগতিতে চলেছে। কয়েকটি পুরানো কারখানাও তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াবার পরিকল্পনা করছে। নূতন কারখানাগুলি তৈরী হচ্ছে, ইণ্ডিয়ান এ্যালুমিনিয়ম কোম্পানীর "বেলগাঁওতে" (মহীশূর) প্রথমে ১০,০০০ টন পরে ৬০,০০০ টন এবং সরকারী প্রতিষ্ঠান ভারত এ্যালুমিনিয়ম কোম্পানীর 'কোরবা' ১০,০০০ টন মধ্যপ্রদেশ) এবং 'কোয়না' (৫০,০০০ টন-মহারাষ্ট্র)। ভারত এ্যালুমিনিয়ম কোম্পানীর জন্য চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে।

সোনা-রূপা

মহীশূর রাজ্যের 'কোলার' এবং 'হাটি' সোনার খনি থেকে এই দুটি ধাতু উৎপাদন করা হচ্ছে। এ ছাড়া সীসার কারখানা থেকেও সামান্য রূপা উৎপাদন করা হয়। আশা করা যাচ্ছে এই খনিগুলির উৎপাদন বাড়বে।

এণ্টিমনি

বিদেশ থেকে আমদানী করা আকর থেকে এণ্টিমনি ধাতু নিষ্কাশনের জন্য স্টার মেটাল রিফাইনিং কোম্পানীর কারখানা রয়েছে 'ভিক্রোলী'তে (বোম্বাই)। এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১০০০ টন এটাকে বাড়িয়ে ১৫০০ টন করা হবে। দেশের চাহিদা এই কারখানা মেটাতে পারবে।

অন্যান্য ধাতুর আকর দেশে নেই বললেই হয়। এই সব ধাতু আকরের জন্য বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে এবং আশা করা যাচ্ছে, হয়তো সামান্য নিকেল এবং ম্যাগনেসিয়াম ধাতু উৎপাদন করা সম্ভব হতে পারে। বিভিন্ন ধাতুর চাহিদা মেটাতে বিদেশী মুদ্রা খরচ করে ১৯৬৬, ১৯৬৭ এবং ১৯৬৮ সালে যথাক্রমে ১৪১.২ কোটি, ২২৭.৬ কোটি এবং ১৭০.১ কোটি টাকার ধাতু বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, বিভিন্ন ধাতু নিষ্কাশনের যে ব্যবস্থা চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় করা হচ্ছে তার ফলে আমদানী খাতে খরচ কমবে এবং মূল্যবান বিদেশী মুদ্রার সাশ্রয় করা যাবে।

উন্নয়ন বার্তা

★ কাশ্মীরে একটি পর্য্যটন উন্নয়ন কর্পোরেশন গঠিত হয়েছে। সরকারি তরফের যে সব হোটেল এবং পর্য্যটকগণের জন্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলির কাজকর্ম্ম ও পরিচালনা ব্যবস্থা সরল ও সহজ করার জন্য এই কর্পোরেশন চেষ্টা করবে। এই কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধন হবে ২ কোটি টাকা।

★ কাণ্ডলার অবাধ বাণিজ্য এলাকায় আরও কয়েকটি শিল্প স্থাপিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে একটি, জলরোধক ত্রিপল এবং আর একটি চশমার জন্য সেলুলয়েডের ফ্রেম তৈরি করছে।

★ বিশাখাপতনমের হিন্দুস্তান জাহাজ নির্মাণ কারখানায় নতুন একটি প্রশিক্ষণ জাহাজ তৈরী করার কাজ সুরু করা হয়েছে। এটি তৈরী করতে দুই কোটি টাকারও বেশী খরচ হবে।

★ পোল্লাচির চীনা বাদাম গবেষণা কেন্দ্র নতুন এক ধরণের চীনাবাদাম (পোলাচি-১) উদ্ভাবন করেছেন। এই নতুন জাতের চীনাবাদামের বীজ থেকে, টিণ্ডিবনমে উদ্ভাবিত টি. এম. ভি.-২ চীনাবাদামের তুলনায় শতকরা ৩০ থেকে ৩৬ ভাগ বেশী ফসল পাওয়া যাবে। এই নতুন জাতের চীনাবাদামে তেলের অংশও বেশী থাকে।

★ লুধিয়ানার পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গরু মহিষের জন্য নতুন এক ধরণের বেশী ফলনের খাদ্য উদ্ভাবিত করেছে। এন. বি-২১ নামক, এই সঙ্কর পশু খাদ্যটি, নেপিয়ার ঘাস ও বাজরার সংমিশ্রণে পাওয়া গেছে। এ পর্য্যন্ত যত রকমের সঙ্কর নেপিয়ার ঘাস চাষ করা হয়েছে, সেগুলির তুলনায় নতুন এই ঘাসটি অনেক গুণে ভালো।

★ মালয়েশিয়ার রেলবিভাগকে রেল সরবরাহ করা সম্পর্কে হিন্দুস্তান ষ্টীল, এই প্রথমবার ৩০ লক্ষ টাকার একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। মাদ্রাজের একটি ইঞ্জিনিয়ারীং প্রতিষ্ঠানও, মালয়েশিয়ার জাতীয় ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ডকে ট্রান্সফর্মার সরবরাহ করার বরাত পেয়েছে। কুয়ালালাম্পুর সহরের ওয়াটার ওয়ার্কসের জন্যে সাজ সরঞ্জাম সরবরাহ করা সম্পর্কে ভারতের একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কন্ট্রাক্ট পেয়েছে।

★ ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের কাছে, আমেরিকার একটি সংস্থা ৫০০০ কড়াই ও অন্য একটি সংস্থা সসপ্যান ইত্যাদিতে ব্যবহারযোগ্য ৩০০০ কাঠের হাতল সরবরাহ করার জন্য বরাত দিয়েছে।

★ মহীশূরে উদ্ভাবিত সঙ্কর ফুলের বীজ বিদেশে বিশেষ ক'রে আমেরিকার বাজারে বেশ বিক্রী হচ্ছে। মহীশূরের একজন কৃষি স্নাতক এ পর্য্যন্ত ৩,৭৫,০০০ টাকার ফুলের বীজ রপ্তানী করেছেন।

অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে, টিকিট লাগানো খামে নিজের নাম ঠিকানা লিখে, রচনার সঙ্গে পাঠাতে হ'বে।

এই সংখ্যাটি ভালো লেগে থাকলে, ধনধান্যে-র গ্রাহক হয়ে যান্। নিয়মাবলী দেখুন। কোনোও জিজ্ঞাস্য থাকলে সম্পাদকের কাছে লিখুন।

ধনধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে এবং তথ্য ও বেতার মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত হ'লেও 'ধনধান্যে' শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করে না। পরিকল্পনার বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী ক্ষেত্রে উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতটা অগ্রগতি হচ্ছে তার খবর দেওয়াই হ'ল 'ধনধান্যে'র লক্ষ্য।

'ধনধান্যে' প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে প্রকাশিত হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

নিয়মাবলী

দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়।

অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পুনঃ প্রকাশকালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার করা হয়।

রচনা মনোনয়নের জন্যে আনুমানিক দেড় মাস সময়ের প্রয়োজন হয়।

মনোনীত রচনা সম্পাদক মণ্ডলীর অনুমোদনক্রমে প্রকাশ করা হয়।

তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয়। কোনোও রচনার প্রাপ্তি-স্বীকৃতি, পত্র মারফৎ জানানো হয় না।

নাম ঠিকানা লেখা ডাকটিকিট লাগানো খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

কোনো রচনা তিন মাসের বেশী রাখা হয়না।

শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাবেন।

গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেস ম্যানেজার, পাব্লিকেশন ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী-১। এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

"ধনধান্যে" পড়ুন
দেশকে জানুন

REGD. NO. D-233

ইঞ্জিনিয়ারিং-এর টুকিটাকি খবর

ভারতের বৃহত্তম রজ্জুপথ

বার্ণপুর এবং জিৎপুর ও চাসনালার মধ্যে বছরে ২০ লক্ষ টন কয়লা বহনের উপযোগী সবচেয়ে বড় রজ্জুপথ চালু আছে। জিৎপুর ও চাসনালা থেকে বার্ণপুরে ধোয়া কয়লা পাঠাবার জন্যে, একটি উন্নয়নী সূচীর অঙ্গ হিসেবে ১৯৬৫ সালে প্রথম, ঐ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। ৯টি ভাগে বিভক্ত এই রজ্জুপথ চালু রাখা হয় বার্ণপুর থেকে। এর জন্যে যাবতীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের মোটা অংশ যুগিয়েছে জার্ম্মানীর সীমেন্‌স্ কোম্পানী।

ক্ষয়রোধের নতুন উপায়

পুণার ভ্যাকুয়াম প্লান্ট এ্যাণ্ড ইনস্ট্রুমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পামী লিমিটেডের সর্ব্বশ্রী টি. আর. কিরাদ ও জি. ভি সাথে মেশিনে ঢালাই করা ছাঁচের ছিদ্র বন্ধ করায় এমন একটা প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছেন, যা'তে, একটা জৈব উপাদান প্রয়োগ করা হয়। এই বস্তুটি উচ্চতাপে গ'লে ছড়িয়ে যায় এবং ঠাণ্ডায় জমে যায়, ছাঁচটি নিশ্ছিদ্র হয়ে যায় এবং অকেজো ব'লে কোনোও ছাঁচ ফেলে দিতে হয় না। এর ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে গেছে কারণ অব্যবহার্য্য ব'লে ছাঁচ ফেলে দেওয়ার মাত্রা শতকরা তিনভাগ কমে গেছে এবং প্রচুর সাশ্রয় হচ্ছে।

অফ্‌সেট মুদ্রণে এ্যালুমিনিয়াম প্লেট প্রবর্ত্তনের গুরুত্ব

দেরাদুনের দি ইনস্ট্রুমেন্ট রিসার্চ এ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট এসট্যাব্লিশমেন্ট, রোটারী অফ্‌সেট প্রিন্টিং মেশিনে দস্তার পাতের পরিবর্ত্তে এ্যালুমিনিয়াম প্লেট ব্যবহারের একটা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। ভারতে দস্তা ও দস্তার পাতের তীব্র অন টনের পরিপ্রেক্ষিতে এই নতুন উদ্ভাবনের গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে।

কাশ্মীরে নতুন সেতু

জম্মু ও কাশ্মীরের মানাওয়ার—তাওইর ওপর-৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৪১ মিটার দীর্ঘ যে সেতুটি তৈরি করা হয়েছে, সেটি যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এই সেতুটি রাজ্যের সমস্ত বিচ্ছিন্ন স্থানগুলিকে জাতীয় সড়কের সঙ্গে যুক্ত করবে।

পোল্যাণ্ডে ভারতীয় ভ্যাল্‌ভ

আগামী মাস ছয়েকের মধ্যে ভারতে তৈরি ৬,৮৬০ গ্লোব ভ্যাল্‌ভ পোল্যাণ্ডে চালান যাবে। এগুলি তৈরি করছে ভারত হেভী ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেডের তিরুচী কেন্দ্রে। পোল্যাণ্ডের সরকারী আমদানী-কারী সংস্থা মেসার্স ভ্যারিমেক্স ভারতীয় ভালভের গুণগত উৎকর্ষতার পঞ্চমুখ। এই ভ্যালভ চালানীর রপ্তানী মূল্য হবে ৪ লক্ষ টাকা। এটি হবে সরকারী তরফের আয়। ভালভ-এর পুরো চালান ১৯৭০ সালের মার্চ/এপ্রিল-এর মধ্যে পাঠাতে হবে। কোম্পানীর উর্ধতম থেকে কনিষ্ঠ-তম কর্মচারীরা প্রত্যেকে বিদেশী গ্রাহকের কাছে সুনাম অক্ষুণ্ন রেখে রপ্তানীর সম্ভাবনা বাড়াবার উদ্দেশ্যে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে চালান পুরো করার জন্য আপ্রাণ খাটছেন।

পোলিশ সংস্থাটির প্রধান, ইঙ্গিত দিয়েছেন যে ভারতীয় তরফ প্রতিশ্রুতি মত কাজ করলে ভবিষ্যতে দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে।

ডিরেক্টর, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাস্ট্রিয়েল সোসাইটি লিঃ—করোলবাগ।
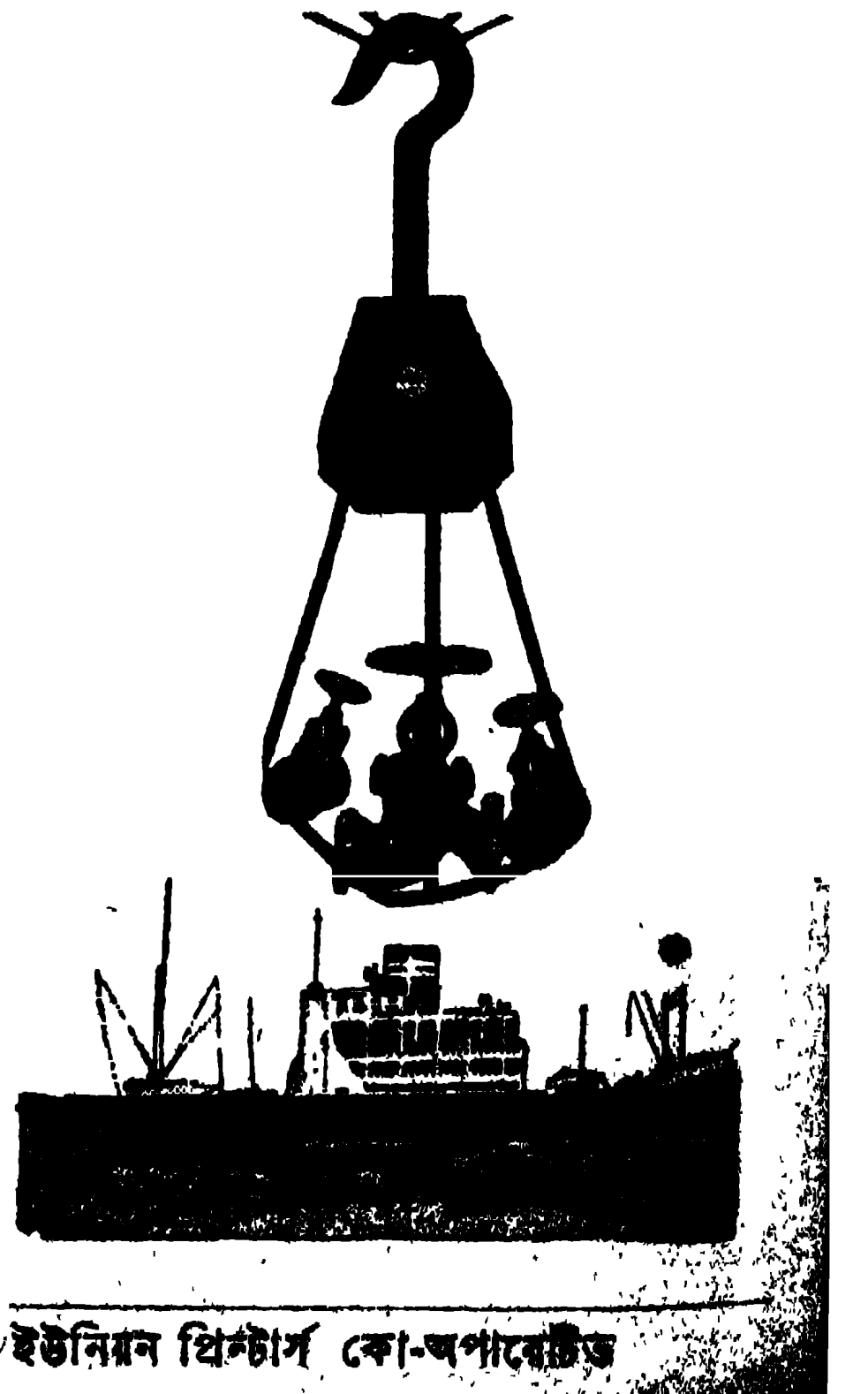
ধন ধান্য

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত
পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

প্রথম বর্ষ ত্রয়োদশ সংখ্যা

২৩শে নভেম্বর ১৯৬৯ : ২রা অগ্রহায়ণ ১৮৯১
Vol.1 : No 13: November 23, 1969

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য. তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

প্রধান সম্পাদক
শরদিন্দু সান্যাল

সহ সম্পাদক
নীরদ মুখোপাধ্যায়

সহকারিণী (সম্পাদনা)
গায়ত্রী দেবী

সংবাদদাতা (কলিকাতা)
বিবেকানন্দ রায়

সংবাদদাতা (মাদ্রাজ)
এস. ভি. রাঘবন

সংবাদদাতা (দিল্লী)
পুস্করনাথ কৌল

সংবাদদাতা (শিলং)
ধীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী

ফোটো অফিসার
টি.এস. নাগরাজন

প্রচ্ছদপট শিল্পী
জীবন আডালজা

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০

টেলিগ্রাফের ঠিকানা—যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা ।

ভুলি নাই

অরিকে দমন করে বিজয়ী না হলে, এক বিশাল রাজ্যের সমগ্র সম্পদ করতলগত না করতে পারলে নিজেকে 'রাজা' বলে জাহির করলেই সত্যিকারের রাজা হওয়া যায় না।

শঙ্করাচার্য

এই সংখ্যায়

নেহরু ও পরিকল্পনা

সম্পাদকীয়

ভারতে পরিকল্পনার জন্মদাতা শ্রীনেহরু অদৃষ্টবাদ মানতেন না। উদ্দেশ্য পূরণের জন্য শ্রীনেহরু সব সময়েই যুক্তিসিদ্ধ একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতেন। তাঁর সদাচঞ্চল অনুসন্ধিৎসু মন, বিশ্রাম নিতে জানতোনা এবং সর্কোৎকৃষ্ট ফল না পাওয়া পর্য্যন্ত তিনি সন্তুষ্ট হতেন না। তিনি তাঁর সুশৃঙ্খল ভাবুক মন নিয়ে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং দেশ স্বাধীনতা লাভ করার বহু পূর্ব্বেই তিনি সেই সম্পর্কে কংগ্রেসে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। কোন এক সময়ে তিনি মন্তব্য করেন যে, দেশের বিপুল সম্পদ কেন জনসাধারণের জীবন ধারণের মান উন্নত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছেনা এই সম্পর্কে তিনি যখনই ভাবতেন তখনই পরিকল্পনার কথা মনে হতো। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে সামাজিক কাঠামো বদলানো যে খুব শক্ত কাজ তাও তিনি বুঝতেন। তিনি জানতেন যে এর জন্য কোন সহজ পথ নেই। শ্রীনেহরু বিশ্বাস করতেন যে, দেশের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। জনগণের ওপর তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস এবং ভারতে যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিকল্পনা রূপায়িত করা সম্ভব সে বিষয়ে তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন। যাঁরা বলতেন যে উন্নয়নের গতি বড় মন্থর এবং নিরুৎসাহিত হওয়ার কারণ রয়েছে তাঁদের সঙ্গে তিনি একমত ছিলেননা।

বৃটিশ শাসনের অধীনেও ভারত, আধুনিকতার খানিকটা স্বাদ পেয়েছিল। বৃটিশ অর্থনীতির প্রয়োজন মেটাবার মতো প্রাথমিক জিনিসগুলি যদি ভারত উৎপাদন করতে পারতো তাহলেই তাকে খুব সন্তোষজনক অবস্থা বলা হতো। কিন্তু স্থানীয় সম্পদ যে ক্ষয়িত ও শোষিত হচ্ছে তা চিন্তাও করা হতোনা। কাজেই স্বাধীনতা লাভ করার পূর্ব্ব মূহূর্ত্তে উন্নতির সম্ভাবনাবিহীন ঔপনিবেশিক অর্থনীতি থেকে অব্যাহতি লাভ করার জন্য পরিকল্পনাসম্মত উন্নয়নসূচীর প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁর যে গভীর আস্থা ছিল তার ফল বর্তমানে সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করা হয়েছে। এগুলি নিয়ে অনেকে যেমন সমালোচনা করেছেন তেমনি ফলগুলিও উপেক্ষা করা যায়না। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে ১৯৫০-৫১ সালে দেশের খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ৫ কোটি ৮ লক্ষ টন। তা এখন দ্বিগুণ হয়েছে এবং ১৯৭৩-৭৪ সাল পর্য্যন্ত এই উৎপাদন ১২ কোটি ৭০ লক্ষ টন করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। পণ্যশস্যের উৎপাদনও প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ১৯৬৯-৭০ সালের শেষে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মোট ক্ষমতা ১ কোটি ৫৮ লক্ষ কিঃ ওয়াটে দাঁড়াবে বলে আশা করা যাচ্ছে। পরিকল্পনার প্রথম ১৫ বছরে শিল্পোৎপাদন প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। বিভিন্ন ধরনের শিল্প গড়ে ওঠায় আমাদের আমদানীর ওপর নির্ভরতা অনেকখানি কমে গেছে। কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় সার ইত্যাদির ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা, ১৯৬৯-৭০ সালে, অনেকখানি আভ্যন্তরীন উৎপাদন দিয়েই মেটানো যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী পরিকল্পনার ধারাও অনেকখানি বদলেছে। পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে জনগণের সহযোগিতা সুনিশ্চিত করেছে। আমরা যে বিপুল কাজের ভার নিয়েছি, জনগণও তাতে নিজেদের অংশীদার বলে মনে করতে পারবেন, আর সাফল্যলাভের জন্য সেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আমাদের মতো একটা বিরাট দেশে গ্রাম, জেলা ও বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন বোঝা দরকার। পরিকল্পনার সমস্যাও বিপুল এবং সেগুলি সমাধান করার জন্য একান্ত নিষ্ঠার প্রয়োজন। বিদেশের আর্থিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা ত্যাগ করতে হবে; ধনী ও গরীবের মধ্যে এখনও বিরাট পার্থক্য রয়েছে এই পার্থক্য এবং নিরক্ষরতা দূর করতে হবে। দেশ একদিকে বিভিন্ন সমস্যার ভারে প্রপীড়িত, অন্যদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সেই সমস্যাগুলিকে জটিলতর করে তুলছে এমন কি আমাদের অনেক প্রচেষ্টাকে বিফল করে তুলছে।

নানা উপলক্ষে হিংসামূলক আচরণ, প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, ভাষাবিরোধ, অর্থনৈতিক কারণের পরিবর্ত্তে রাজনৈতিক কারণ নিয়ে আঞ্চলিক দাবিদাওয়া, ধর্ম্মঘট, ঘেরাও ইত্যাদিও ভারতের পরিকল্পনার সাফল্যে বাধার সৃষ্টি করছে। দেশের পরিস্থিতি অনুকূল না থাকলে পরিকল্পনাসম্মত উন্নয়ন সম্ভব হয়না। যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণের, শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে মতামত প্রকাশ করার উপায় রয়েছে সেখানে হিংসা বা ধ্বংসমূলক কাজের কোন স্থান নেই। শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে পরিকল্পনাসম্মত উন্নয়ন এবং বিভিন্ন প্রশ্নে আন্দোলনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য সহজেই বোঝা যায় এবং এই দুটি পথের কোনটি অনুসরণ করলে কি ফল পাওয়া যায় তাও সহজবোধ্য। আমরা আমাদের লক্ষ্যের দিকে খানিকটা এগিয়ে এসেছি কিন্তু এখনও লক্ষ্যে পৌঁছুইনি। উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের আভাস পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু উজ্জ্বলতর এখনও দূরে। তবে আমরা শুধু এইটুকু আশা করতে পারি যে, দেশ ঐক্যবদ্ধ হলেই সমস্যাগুলির সম্মুখীন হবে।

পরিকল্পনা ও সমীক্ষা

শিল্প কেন্দ্রের কাছে থেকেও তুবাকুড়ি গ্রামটির ঘুম ভাঙেনি

তামিলনাড়ুর, তিরুচিপল্লী-তাঞ্জোর রাজপথের দক্ষিণে প্রায় এক মাইল দূরের একটি গ্রামের নাম হ'ল তুবাকুড়ি। ভারি বয়লার তৈরির কারখানাটির প্রায় পাশেই হ'ল এই গ্রামটি। শীতলক্ষ্মী রামস্বামী মহিলা কলেজের পরিকল্পনা সমীক্ষাকারী দল এই গ্রামটির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন বলে স্থির করেন। গ্রামটি, নতুন শিল্প কেন্দ্রের এবং সহরের কাছে বলেই তাঁরা এটিকেই পর্যবেক্ষণের জন্য বেছে নেন। তাঁরা, গ্রামটির প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতে গিয়ে প্রশ্নাদি করে দেখেন যে গত কয়েক বছরে গ্রামটির জীবন ধারায় সামান্য কিছু পরিবর্তন এলেও তা এতোই নগণ্য যে, উল্লেখ করার মতোই নয়।

তুবাকুড়ি গ্রামটি ছোট, বেশীরভাগ অধিবাসী হলেন তপশীলী এবং গ্রামে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশী। প্রত্যেকটি পরিবারে মোটামুটি জনসংখ্যা ৮। এঁরা প্রাচীন রীতিনীতিতে বিশ্বাসী এবং এখনও শিশুদের ভগবানের দান বলে মনে করেন। তাঁদের জীবনে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী প্রায় কোন রেখাপাতই করতে পারেনি।

বৃত্তি

গ্রামের বেশীরভাগ লোক চিরাচরিত প্রথায় চাষবাস করেন। গ্রামের অনেকেই অবশ্য কাছের ভারি বয়লার কারখানায় এবং অন্যান্য বৃত্তিতে অর্থোপার্জন করেন। যাঁরা সরকারী কাজ করেন তাঁরা হলেন শিক্ষক, রেলওয়ের কেরাণী, আর পি. ডবলিউ. ডির কর্মচারি। অন্যান্য কৃষি অঞ্চলের মতো মরসুম অনুযায়ী কিছু লোক বেকার থাকলেও, বেকার সমস্যা তেমন কিছু নেই।

গ্রামে একটি ভালো বাড়ীতে একটি, প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, তাতে ১০ জন শিক্ষক, এঁদের মধ্যে ৫ জন হলেন পুরুষ, ৫ জন মহিলা। স্কুলে যাওয়ার বয়সের বেশীরভাগ ছেলেমেয়ে স্কুলে গেলেও, গ্রামের বেশীর ভাগই মেয়েদের পড়াশুনা করার পক্ষে নন। গ্রামের শতকরা মাত্র ৩০ জন হলেন নিরক্ষর।

গ্রামে কোন হাসপাতাল নেই। চিকিৎসার প্রয়োজন হ'লে এঁদের, তিরু-ভেরুম্বুর বা তিরুচিরপল্লীতে যেতে হয়। একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল গ্রামের ৫০ জনই হলেন বধির।

গ্রামের রাস্তায় শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সময়ে জল পাওয়া যায়। অনেক বাড়ীর পেছনে কূয়ো আছে, গ্রামে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের কোন ব্যবস্থা নেই।

শতকরা প্রায় ৬০টি বাড়ী হ'ল টালির পাকা বাড়ী। কোন কোন বাড়ীতে উঠোন আছে। শতকরা ৮০টি বাড়ীতে মালিক-রাই থাকেন, ২০ ভাগ বাড়ী ভাড়া দেওয়া হয়। যাঁরা বয়লার কারখানায় কাজ করেন তাঁরাই সাধারণতঃ ভাড়া বাড়ীতে থাকেন। বাড়ীগুলি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, বড়সড় এবং আরামদায়ক। বাইরে থেকে দেখতে বাড়ীগুলিকে যদিও গেঁয়ো মনে হয়, ভেতরটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই অত্যন্ত আধুনিক এবং সহরের বাড়ীর মতো।

শিল্পের প্রভাব

গ্রামটির সামান্য কয়েকজন লোকই শুধু ভারি বয়লার কারখানায় কাজ করেন। গ্রামটির পাশে এই কারখানাটি স্থাপিত হওয়ায়, প্রধান প্রভাব যা লক্ষ্য করা যায় তা হ'ল, খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি। ফলে, দুধ, শাকসব্জি ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের দাম বেশ বেড়ে গেছে। যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। সিনেমাও রয়েছে।

চাষের জমির প্রায় অর্দ্ধেকে, জলসেচ দেওয়া হয়। গ্রামের বেশীর ভাগই নিজেদের জমি নিজেরা চাষ করেন। তবে কিছু জমি খাজনাতেও দেওয়া হয়। যে সব জমিতে জলসেচ দেওয়া হয় সেগুলির এক তৃতীয়াংশে বছরে দুটি শস্য উৎপাদন করা হয়। জলাজমিতে একটা ফসল হয়।

কৃষকরা প্রধানতঃ গোবর সার ব্যবহার করেন। তবে সম্প্রতি তাঁদের মধ্যে কিছু কিছু রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে সুরু করেছেন এবং তাঁরা মনে করেন যে এতে উৎপাদন বাড়ে। তবে রাসায়নিক সার যথেষ্ট পাওয়া যায়না বলে, পেতে দেরী হয় বলে এবং দাম বেশী বলে এগুলি ব্যবহার করা সম্পর্কে তাঁরা উৎসাহ পাননা। কৃষি মজুরি হ'ল প্রতিদিনে প্রতি লাঙ্গলে ৫ টাকা। অনেক ক্ষেত্রে এই মজুরির কিছুটা নগদ টাকায় ও কিছুটা অন্য জিনিস দিয়ে দেওয়া হয়।

গ্রামে একটি বহু উদ্দেশ্যমূলক সমবায় সমিতি আছে, এর সদস্য সংখ্যা হল ৭৫। এই সমিতি থেকে কৃষির উদ্দেশ্যে সদস্য-দের ঋণ দেওয়া হয় এবং নিয়ন্ত্রিত মূল্যের জিনিস যেমন চিনি, কেরোসিন ইত্যাদি এখান থেকে বিক্রী করা হয়। গ্রামবাসীদের ধারণা যে সমিতি লাভ করলেও, তাদের কোন লাভ হচ্ছেনা। গ্রামের লোকেরা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পর্কে সাধারণভাবে খবর রাখলেও এই পরিকল্পনাগুলি সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষ কোন মতামত নেই।

গ্রামের লোকেরা তাঁদের সঞ্চয়ের কথা প্রকাশ করতে কুণ্ঠা বোধ করেন। তবে তাঁরা যা কিছু সঞ্চয় করেন তা নগদ টাকা হিসেবে হাতে রাখেন, অন্যকে ধার দেন অথবা গ্রামে বা সহরে জমি কিনে রাখেন। গ্রামের মাত্র ১৭টি পরিবার স্থানীয় সমবায় সমিতি থেকে ঋণ নিয়েছেন।

আমার চোখে গান্ধী

সত্যবতী সাহু
লেডী ব্রেবোর্ণ মহাবিদ্যালয়

সুন্দর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ, আর তার শ্রেষ্ঠত্ব হ'ল তার সভ্যতায়। বর্তমান যুগে আমরা এভারেষ্ট চূড়ায় চড়ে বিজয়-নিশান ওড়াতে পেরেছি, মহাবেগবান রকেটে উড়ে গিয়ে চাঁদের গা থেকে ছিনিয়ে এনেছি কালো পাথর। সভ্যতাদর্পী আমরা, কয়েক ঘন্টার মধ্যে, পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর সব ভেঙ্গে চুরে তছনছ ক'রে ফেলতে পারি।

কিন্তু চিৎপ্রকর্ষের শুদ্ধতা উপহাসাস্পদ। তাই জড় বিজ্ঞানের উন্নতি আজ মানুষের ব্যবহারিক জীবনকে ভরে দিয়েছে আরাম আর বিলাসের প্রাচুর্যে। কিন্তু তার মনের শান্তি কোথায়? আমরা শিখেছি নিজেদের সৌরজগতের এই তৃতীয় গ্রহটির সুনিবিড় স্নেহবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অর্বাচীন দামাল ছেলের মতো মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াতে, কিন্তু আয়ত্ব করতে পারিনি হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থ, সংকীর্ণতার ওপরে থাকার বিদ্যা। শিখিনি অসত্যের আর ভণ্ডামীর অন্তর্দাহী জ্বালা এড়াবার কৌশল। আণবিক বোমার প্রলয়ঙ্কর আঘাতে ঘোষিত সভ্যতায় মহিমান্বিত মানুষের সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, পর্যুদস্ত।

গান্ধীজীকে আমি কি চোখে দেখি, আমার হৃদয় জুড়ে কতখানি রয়েছেন এই নাঙ্গা ফকির—আত্মানুসন্ধান করতে গিয়ে গোড়াতেই আলোড়ন সুরু করেছে এই সব চিন্তা আর প্রশ্ন। আমি বর্তমান যে যুগে বাস করছি এইগুলো তার কঠিন সমস্যা। গান্ধীজীর মধ্যেই আমি খুঁজে পাই এর একমাত্র সমাধান।

রাজনীতির ক্ষেত্রে গান্ধীজীর ছিল ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রতিবাদ পদ্ধতি ছিল অভিনব, তাঁর ন্যায় সঙ্গত দাবী আদায় করবার নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সক্রিয় কাঠিন্য পৃথিবীর বিস্ময়।

অনেকের মতে গান্ধীজীর নীতি আজকের দিনে অচল। যাঁরা এ কথা বলেন আমার ধারণায় তাঁরা হলেন 'ভগবানের চাবুক'। তাঁদের মতে ভগবান, মানুষকে ভীরু কাপুরুষে পরিণত করার একটা কাল্পনিক ধারণা মাত্র। ধর্ম একটা অনাবশ্যক প্রতিষ্ঠান, যার দ্বারা মানুষের স্বাধীন চিন্তা ব্যাহত হয়।

কিন্তু এরাই ভারতের সব নয়। অথচ এদের দাপট সব চেয়ে বেশী। গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব, অপরাজেয় পৌরুষ, সমস্ত ব্যক্তিগত তুচ্ছতার ওপরে এক প্রশান্ত মহিমায় বিকীর্ণ। কুটিল রাজনীতির ক্লেদাক্ত পাঁকে তিনি সত্য অহিংসা ও ঈশ্বর ভক্তির পঙ্কজ ফুটিয়েছেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হয়তো শুধুমাত্র তাঁর প্রচেষ্টাতেই আসেনি; এর পেছনে অন্যান্য কারণ কাজ করেছে তা সত্য। কিন্তু তিনি যে প্রত্যক্ষ কারণ তাতে সন্দেহ নেই।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এত মানসিক বল কোথায় খুঁজে পেলেন এই শীর্ণতনু সন্ন্যাসী? কোনও অসাধারণত্ব ছিল না তাঁর মধ্যে। আমাদেরই মতো স্খলন, পতন, ত্রুটিভরা তাঁর প্রাথমিক জীবন। অত্যন্ত লাজুক ছেলে, চুরিও করেছেন, নেশা করেছেন লুকিয়ে, জৈব নিয়মের বশীভূত হয়েছেন। ছাত্র হিসাবেও অনন্যসাধারণ ছিলেন না। এই মানুষই একদিন হলেন সমস্ত জাতির জনক, সবার আদরের বাপুজী। তাঁর এই অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের মূলে রয়েছে দীর্ঘ তপশ্চারণ। শীতের দিনে বরফ গলা জলে ডুবে আর গ্রীষ্মের দিনে চারপাশে আগুন জালিয়ে তিনি তপস্যা করেন নি। কিন্তু তাঁর মহত্ব তাঁর ব্রহ্মচর্যে, শুচিতায়, আত্মসংযমে আর সত্য ভাষণে। তাই রাজনীতিক গান্ধীর থেকেও ব্যক্তিমানব গান্ধী আমার কাছে অনেক বেশী স্মরণীয় ও শ্রদ্ধার্হ।

আজকের বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতায়, আত্ম সংযমের তৃপ্তি অকিঞ্চিৎকর। সত্ত্বার গভীর তল হতে উৎসারিত আত্মানুসন্ধানের অনাবিল আনন্দ এরা কোনদিন পেতে চায় নি। তাই বস্তুসর্বস্ব সভ্যতার সব প্রাচুর্যের আড়ালে রিক্ত নিঃস্ব হাহাকারের ছবি। কিন্তু ভারতের সভ্যতা বাইরের ঐশ্বর্যকে বড় ক'রে দেখেনি। গান্ধীজীর মধ্যেও মহান মানবিকতার পূর্ণবিকাশ। ক্রোধ আর হিংসাকে তিনি জয় করেছেন ক্ষমা দিয়ে। অসাধুকে জয় করেছেন সাধুতায়। মানুষের শুভ চিত্তবৃত্তির প্রতি তাঁর কুটিলতাহীন আত্মার গভীর বিশ্বাস। দ্বিতীয়বার আফ্রিকায় পদার্পণ করলে সেখানকার কতিপয় শ্বেতাঙ্গ তাঁর ওপর অকথ্য দৈহিক নির্যাতন করে। কিন্তু তাদের কারও বিরুদ্ধে তাঁর কোন অভিযোগ ছিল না।

গান্ধীজীর চরিত্র গঠনে তাঁর মা পুতুলীবাঈ-এর প্রভাব সুস্পষ্ট। এই প্রাণা আজন্ম ব্রতচারিনী মহিলার সংস্কার মুক্তির শুদ্ধতা ছিল, ব্রত প্রায়োপ-

যেমন তাঁর কাছে কেবল অন্ধ আচার সর্বস্বতা ছিল না। এর ফলজাত চিত্ত-শুদ্ধিই ছিল তার কাম্য। অনশনের সংযম মনকে একাগ্র করে। গান্ধীজীর অনশন তাঁর মায়ের কাছ থেকে পাওয়া।

গান্ধীজীর সত্যবাদিতা প্রবাদের মতো বিস্ময়কর হয়েও প্রত্যক্ষ সত্য। তাঁর জীবনের সকল ক্ষেত্রে নির্ভীক সত্যাচরণ। জীবিকার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন আইনজীবী ; যে জীবিকায় প্রতি ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ না করলে চলে না। সেখানেও তিনি অবিচলিত ছিলেন তাঁর সত্য নিষ্ঠায়।

গান্ধীজী প্রথম গীতা পাঠ করেন ইংরেজী ভাষাতে। এর প্রভাব তাঁর জীবনে গভীর। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তের যে লক্ষণ দেওয়া আছে সেই আদর্শেই গান্ধীজী নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন।

তিল তিল সাধনায় প্রাতিদিনকার সতর্ক আত্মসংযমে তাঁর অমর্ত্যসুলভ আত্মার স্ফুরণ। তাঁর সমস্ত জীবন ঘিরে এক সুকঠিন কৃচ্ছ্রসাধনের আলোক রশ্মি।

গান্ধীজীর এই চরিত্র গঠনে সামগ্রিক-ভাবে তাঁর পরিবারের প্রভাবও কিছুটা পড়েছে। বৈষ্ণব পরিবারে জন্ম। জীব হিংসা সেখানে নিষেধ, আমিষ ভক্ষণও নিষেধ। এই শুচিশুদ্ধ পরিমণ্ডলের কঠোরতার মধ্যেও তিনি পথ ভ্রষ্ট হয়ে-ছিলেন সমবয়স্ক এক বালকের প্ররোচনায়। কিন্তু বাল্য জীবনের এই স্খলনটুকুই গান্ধীজীর পবিত্রতাকে উজ্জ্বল দীপ্তি দিয়েছে। তিনি অবতার নন—তিনি মানুষ। তাই তিনি সুন্দর, তাই তিনি মহৎ, দেবলোকের নির্বিকারত্বমুক্ত বিজয়ী মানবতা। প্রাচ্যের প্রাণপ্রদীপ প্রতীচ্যের বিস্ময়। কবিগুরু তাই শ্রদ্ধাবিনম্র চিত্তে বলেছেন—

'সমগ্র প্রাচ্যের আত্মা আজ গান্ধীতে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে........মানুষের স্বর্গীয় সত্তায় ভারতের বিশ্বাস যে আজও বাঁচিয়া আছে, তাহা প্রমাণ করিবার সুযোগ তিনিই ভারতকে দিয়াছেন।' তিনি ভারত আত্মার মূর্ত প্রতীক। একজন ভারতবাসী হিসেবে আমি গান্ধীজীর এই মহনীয়তায় শ্রদ্ধান্বিত। অস্পৃশ্যতা নিবারণ তাঁর জীবনের এক মহান ব্রত। এর মূলে তাঁর সুগভীর মানবপ্রীতি ও ঈশ্বর ভক্তি। অব-মানিত মানবাত্মাকে তিনি মর্যাদা দিয়েছেন। 'মানুষের নারায়ণ'কে নমস্কার করেছেন বিনম্র শ্রদ্ধায়। গান্ধীজীর সাম্যবাদী বাস্তবানুগ সমাজ দর্শনও এর মূলে অনেক-খানি কাজ করেছে। তাঁর অসহযোগ আন্দোলন ও সত্যাগ্রহ অনেক বেশী সফল ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

রাজনীতি তাঁর কাছে তত বড় ছিল না ; বড় ছিল না দেশের স্বাধীনতাও ; তাঁর সাধনা আরও উচ্চতর লক্ষ্যে পৌঁছু-বার। তাঁর ভালবাসা দেশের মানুষকে ভালবাসা। বিশেষ ক'রে যারা দীন-হীন, যারা দুর্বল, যারা বিপন্ন, যারা আতুর, যারা অনাথ, সেই সব মানুষকে ভালবাসা। তাঁর ভালবাসা অহেতুক। বিনিময়ে তিনি কিছুই চান না, দেশের স্বাধীনতাও না।.... তিনি জনগণের লোক। তারা ও তিনি অভিন্ন। তেমনি তিনি অহিংসার পূজারী। অহিংসা ও তিনি অভিন্ন।

তাঁর অহিংসার উদ্ভবও অনাবিল মানব-প্রীতি থেকে। পৃথিবীর সবচেয়ে নিষ্ঠুর মানুষেরও মনে কমনীয় হৃদয়বৃত্তি বিকাশের পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। এর বড় সত্য আর কিছু নেই। গান্ধীজীর সংগ্রাম তাই পশুশক্তির মদগর্বী আস্ফালনে নয়, মানবিকতার দরবারে বিশ্বাসের দৃপ্ত আবেদন। সে আবেদন বিনয়ে নম্র, অথচ আত্মার অপরাজেয় পৌরুষে উদ্ভাসিত। তাঁর অস্পৃশ্যতা বিরোধী হরিজন আন্দোলনের মধ্যে শুধু এক মহৎ মানব প্রেমিকের দরদী চিত্তের প্রকাশ নয়, এর মধ্যে বাস্তব সমাজ চেতনার লক্ষণও রয়েছে। যে সাম্যবাদের বীজ গান্ধীজী বুনে গেছেন তার অঙ্কুরিত বৃক্ষের একটি শাখায় অন্তত ফল ধরেছে, স্বাধীন ভারতের ১৬ (২) অনুচ্ছেদ তার প্রমাণ।

গণতন্ত্রের একটি শক্তিশালী ভিত্তি তাঁর অহিংসানীতি। এটি গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। সরকার ও জনগণের বিরো-ধের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও পর-স্পরের মতের প্রতি সহিষ্ণুতা থাকা দরকার। আজকে সমাজে অবাঞ্ছিত বিক্ষোভ ও সামান্য কারণে জনসাধারনের হিংসাত্মক কার্যকলাপ এই অহিংসা নীতির প্রতি অবিশ্বাসের ফল। আর অহিংসার প্রতি অবিশ্বাসের অর্থ মানুষের শুভ বুদ্ধিতে বিশ্বাস হারানো।

অনেকে বলেন রাজনীতির মধ্যে ধর্ম এনে গান্ধীজী ধর্মের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে-ছেন, রাজনীতিকে দুর্বল করেছেন। কিন্তু এটি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, অসহযোগ আর সত্যাগ্রহই তার প্রমাণ। আসলে আমাদের চাই বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর অনাড়ম্বর মহিমা ভারতীয় আদর্শেরই প্রতীক। রেলে তিনি চিরকাল তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করেছেন। মদ্যপান ও জুয়া খেলার নিদারুণ বিরোধী। পরিমিত আহার ও প্রায়াশঃ অনশন তাঁর জীবনে এক শুচিতার দিব্য সৌন্দর্য এনেছিল।

ঘৃণার পরিবেশের মধ্যে তিনি প্রেমের প্রতীকরূপে, প্রতিহিংসার পরিবেশের মধ্যে ক্ষমার প্রতীক রূপে বাস করেছেন। মানুষের মধ্যে যে ঐশী শক্তি আছে, তা জগৎ জয় করতে পারে ; তিনি তাকেই সত্য নামে অভিহিত করতেন। নিজের জীবনে তিনি তা কার্যকরী ক'রে তুলে-ছিলেন। যদি আমরা বেঁচে থাকতে চাই তাহলে আমাদের এই সত্য স্বীকার ক'রে নিতে হবে।

জাপান-অধ্যয়ন-কেন্দ্র

জাপান সম্পর্কে অধ্যয়নের জন্যে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হ'বে। এ সম্পর্কে ভারত ও জাপানের মধ্যে ইতিমধ্যেই একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে। এই কেন্দ্র স্থাপনের মূল লক্ষ্য হ'ল জাপানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও যোগসূত্র স্থাপন এবং তার জন্যে জাপানী ভাষা শেখার এবং জাপানের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও অন্যান্য বিষয় অধ্যয়নে উৎ-সাহিত করা। যতদিন না স্থানীয় ব্যক্তিরা এই কেন্দ্রের পূর্ণদায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবেন অর্থাৎ দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য হবেন ততদিন এই কেন্দ্রের জন্যে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর ব্যবস্থা এবং শেখবার সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা জাপান।

জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র ও গান্ধীজীর আদর্শ

পি. সি. যোশী

বর্তমানে দেশে পরিবর্তনের একটা নতুন হাওয়া বইতে সুরু করেছে। কতকগুলি দিক দিয়ে এটা যেন জাতীয় সংগ্রামের দিনগুলিকে মনে করিয়ে দেয়। বর্তমানে ভারতে যে শক্তিগুলি কাজ করছে সেগুলিকেও যেন কতকগুলি দিক থেকে প্রাক স্বাধীনতার সময়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়। সাম্য এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কে যে প্রেরণা ও উৎসাহ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এগুলিই এক সময়ে বিপুল সংখ্যক জনতাকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলনে আকর্ষণ করে। যে সমাজে জনগণের অবস্থা উন্নতর হবে সেই রকম একটা সমাজ গড়ে তোলার সংগ্রামে, সেই শক্তিগুলিই বর্তমানে, এই প্রেরণার প্রধান উৎস।

এখানে এ কথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় নানা ধরনের চিন্তাধারা ও কাজের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেই এই প্রেরণার বীজ রোপিত হয়। কিন্তু ঐ সময়ে দেশে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব ছিল অপরিসীম। তিনি নিজে যেমন গণজাগরণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন তেমনি তিনিই এই গণজাগরণকে পরিচালিত করেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথমে দরিদ্র নারায়ণের মুক্তির ভিত্তিতে স্বরাজের কথা বলেন। এর ফলে তিনি অতি দ্রুতগতিতে ভারতের লক্ষ লক্ষ অর্ধভুক্ত, অসহায় মূক জনসাধারণের মুখপাত্র হয়ে গেলেন। বিশ্বাসের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে, নিজস্ব সাবল্যে তিনি তাঁর দেশবাসীকে বলেন যে :

'আমার স্বপ্নের স্বরাজ হ'ল, দরিদ্র জনসাধারণের স্বরাজ। রাজা এবং বিত্তবানরা, জীবন ধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি যেমন সহজে উপভোগ করেন, আপনাদেরও তেমনি সেগুলি উপভোগ করার সুযোগ থাকা উচিত। যে স্বরাজে, আপনাদের এই সুযোগ সুবিধেগুলি উপভোগ করার নিশ্চয়তা থাকবে না, সেই স্বরাজ যে পূর্ণ স্বরাজ নয় তাতে আমার সামান্যতম সন্দেহ নেই।'

এই সামান্য কটি কথায় আমাদের নতুন সমাজ বা জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের সার কথা পাই। এই মতবাদের তাৎপর্য তখনও যেমন দূরপ্রসারী ছিল এখনও তাই আছে। পাশ্চাত্যে জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র গঠনই ছিল শেষ কথা কিন্তু সেটা যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি মাত্র তা মনে করা হতো না। পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিকতা প্রকৃতপক্ষে যেমন ঐহিক উন্নয়নের ইঞ্জিন হিসেবে কাজ করতো, সেটা তেমনি জনসাধারণকে নির্যাতন করার ইঞ্জিন হিসেবেও কাজ করতো।

ঠিক এর বিপরীত দিকে, সমতা বা সামঞ্জস্য বিধান উন্নয়নের লক্ষ্য হওয়া উচিত গান্ধীজীর এই মতবাদ একটি চমৎকার নীতি, এতে পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতাকে ভারতের পক্ষে অনুপযুক্ত বলা হয়েছে। এর অর্থ হ'ল সাম্যকে অস্বীকার করা দূরে থাকুক, একমাত্র সাম্যের নীতিতেই উন্নয়ন হওয়া উচিত। গান্ধীজী মনে করতেন যে অন্য কোন পন্থা দেশে বিশৃঙ্খলা নিয়ে আসবে।

তাহলে জনকল্যাণকামী অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে গান্ধীজী কি উপায় অবলম্বন করতে বলেন। এখানে এ কথাটা মনে রাখা প্রয়োজন যে গান্ধীজী স্বাধীন ভারতের জন্য কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তৈরি করে যাননি। বিদেশী শাসনের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যেই তাঁকে কাজ করতে হয়। তাঁর রাজনৈতিক ও গঠনমূলক কর্মসূচীর লক্ষ্য ছিল একটি পরাধীন জাতির গঠনমূলক শক্তি ও উৎসাহকে মুক্তি দেওয়া, তিনি যদি আরও বেশীদিন বেঁচে থাকতেন তাহলে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য তিনি কি করতেন বা বলতেন তা নিয়ে অনর্থক আলোচনা করে লাভ নেই। স্বাধীনতা লাভ করার পূর্বে তিনি যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন তা যে স্বাধীন ভারতের পক্ষে পর্যাপ্ত হতো না তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে আবার এ কথাও ঠিক যে বর্তমানে যে কোন অর্থনৈতিক কর্মসূচীই হোক না কেন সেগুলির যদি কতকগুলি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে না থাকে তাহলে সেগুলিতে অসম্পূর্ণতা থাকতে বাধ্য।

যে কোন ব্যাপারে গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গীর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তিনি অন্য দেশের আদর্শ বা মতবাদ নির্বিচারে গ্রহণ করার পক্ষপাতি ছিলেন না। নতুন ভারতের পক্ষে যে পাশ্চাত্যের ধরনে শিল্পায়ণ উপযুক্ত নয় সেদিকে তিনি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইংলণ্ড বা ইটালীর মতো ছোট দেশ হয়তো নাগরিকিকরণ ব্যবস্থা লাভজনক বলে মনে করতে পারে। অতি অল্প সংখ্যক জনসংখ্যা বিশিষ্ট আমেরিকার মতো একটা বিরাট দেশের বোধ হয় যন্ত্রসজ্জিত করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু বিপুল জনসংখ্যা বিশিষ্ট কোন দেশের, পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসরণ করা ঠিক নয় এবং উচিত নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই তিনি যন্ত্রের বিরোধী ছিলেন। তিনি বলতেন, যে ক্ষেত্রে কাজের তুলনায় জনশক্তির পরিমাণ কম সেই ক্ষেত্রে যন্ত্র সজ্জা ভালো। ভারতের মতো দেশে যেখানে কাজের তুলনায় কর্মীর সংখ্যা বেশী সেখানে যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা পাপ।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে পাশ্চাত্য দেশগুলির দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র, ভারতের পক্ষে উপযুক্ত না হতেও পারে। সেখানে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বেশীর ভাগই হলেন বেতনভোগী। কাজেই পাশ্চাত্য দেশগুলির মতো বিশেষ পরিস্থিতিতে জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র গঠন করা যেতে পারে। তা ছাড়া এঁরা, শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়নে সংহত বলে সরকারের ওপর চাপ দিতে পারেন। সেখানে প্রধানত মূলধন ও শ্রমিকের মধ্যে আয় বন্টন করে রাষ্ট্র জনকল্যাণকামী সংস্থা হিসেবে কাজ করতে পারে। তবে ভারতের ক্ষেত্রে এই সঙ্ঘবদ্ধ ক্ষেত্রটি আর্থিক ব্যবস্থার একটা অংশ মাত্র এবং তাও বড় অংশ নয়। এখানে বেশীরভাগই বেতনভোগী নন। এঁদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ হলেন কৃষি ও চিরাচরিত শিল্পের

(৮ পৃষ্ঠায় দেখন)

মহীশূরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে কৃষকগণেরও আয়বৃদ্ধি

মহীশূরে কূয়া থেকে জলসেচ দেওয়ার সুযোগ সুবিধে বেড়ে যাওয়ায় একদিকে যেমন খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে অন্যদিকে তেমনি কৃষকদেরও আয় বেড়েছে। পল্লী এবং কৃষি উন্নয়নের অন্যতম ব্যবস্থা হিসেবে মহীশূর সরকার সেইজন্য জলসেচ দেওয়ার কূয়ো খোঁড়ার উদ্দেশ্যে কৃষকদের অর্থসাহায্য দিতে সুরু করেছেন। সরকারের পক্ষে, বাঙ্গালোরের মহীশূর কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড এই অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করেন। কৃষকদের খরার হাত থেকে বাঁচানো এবং তাঁরা যাতে বছরে অন্ততঃপক্ষে একটা ফসলও তুলতে পারে তা সুনিশ্চিত করা, (২) উৎপাদন বাড়ানো এবং নিবিড় কৃষি পদ্ধতি অবলম্বনের সুযোগ করে দেওয়া (৩) কৃষি উৎপাদন বিশেষ করে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানো (৪) কৃষকরা যাতে নিজেরাই কৃষি উৎপাদন বাড়াতে উৎসাহী হন সেই উদ্দেশ্যে প্রাথমিক মূলধন সরবরাহ ক'রে তাঁদের আত্মবিশ্বাসী ক'রে তোলাই হ'ল এই ব্যবস্থার লক্ষ্য।

মহীশূর কেন্দ্রীয় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের, অর্থসাহায্য নিয়ে ১৯৬৭ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত কতগুলি কূয়ো কাটা হয়েছে এবং কৃষি উৎপাদন কি রকম বেড়েছে সে সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে যে, এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনেকখানি সফল হয়েছে। কৃষকরা বছরে অন্ততঃপক্ষে একটা ফসল তুলতে পেরেছেন। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে, অন্যান্য উৎপাদনও বেড়েছে ফলে কৃষকদের আয়ও বেড়েছে।

খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন ১৪,৭৬৫ কুইন্ট্যাল থেকে বেড়ে ৬০,৩৩০ কুইন্ট্যাল হয়েছে এবং ধানের উৎপাদন ৪,১৩৫ কুইন্ট্যাল থেকে বেড়ে ১৮,২২০ কুইন্ট্যাল হয়েছে। রাগি এবং জওয়ার চাষের জমির পরিমাণ কমে যাওয়া স্বত্বেও এগুলির উৎপাদন বেড়েছে ১০,৩০০ থেকে ১৯,২৭০ কুইন্ট্যাল। সঙ্কর ভুট্টা ও জওয়ার ২১,৪৫০ কুইন্ট্যালেরও বেশী উৎপাদিত হয়।

প্রতি হেক্টারে খাদ্যশস্যের মোটামুটি উৎপাদন বেড়েছে ৭৭০ কেজি থেকে ২,২১৫ কেজি। কৃষকদের মোট আয় বেড়েছে ১৯৬৭-৬৮ সালের মূল্যমান অনুযায়ী ২২.৫ লক্ষ থেকে ১২০.৯ লক্ষ টাকা অর্থাৎ শতকরা ৪৩৮ ভাগ। একমাত্র সেচের জন্য জল পাওয়া গেছে বলেই যে উৎপাদন ও আয় এতো বেড়েছে তা নয়, কৃষকরা জলসেচের সঙ্গে সঙ্গে বেশী ফলনের বীজও ব্যবহার করেছেন। বেশী ফলনের বীজ ব্যবহার করা হয়েছে বলেই উৎপাদন বেড়েছে। কিন্তু কৃষকরা যদি সেচ দেওয়ার জন্য কূয়োর জল না পেতেন তাহলে বেশী ফলনের শস্য উৎপাদন করাও সম্ভব হতোনা।

কূয়ো থেকে জলসেচ দেওয়ার এই ব্যবস্থার একটা গুরুত্বপূর্ণ ফল হ'ল এই যে প্রতি হেক্টারে, শস্য উৎপাদনের ব্যয় যদিও ৪০০ টাকা থেকে বেড়ে ১,০১৫ টাকা দাঁড়িয়েছে, তবুও পূর্ব্বে যেখানে প্রতি হেক্টারে ৬০০ টাকা আয় হ'ত, এখন সেই তুলনায় আয় হচ্ছে ২১১০ টাকা।

বিভিন্ন অঞ্চলের আয়ের মধ্যে অসাম্য হ্রাস করাই হ'ল, পরিকল্পিত উন্নয়নের অন্যতম একটি লক্ষ্য। জলসেচ দেওয়ার কুয়ো কাটাতে অর্থসাহায্য করার এই প্রকল্প, কৃষকদের আয় বাড়াতে এবং আয় বৃদ্ধি বজায় রাখার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। সেই উদ্দেশ্য খানিকটা সফল হয়েছে। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে যেখানে বৃষ্টি কম হয়, সেখানে কৃষকরা শুক্‌নো চাষ করে ৪৮০ টাকা আয় করছিলেন, সেখানে জলসেচের ব্যবস্থা করতে পারায় তাঁদের আয় হয়েছে ৩,৫১০ টাকা, তেমনি মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাতের অঞ্চলে ৮৮৫ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৪,৯৪৫ টাকা আর বেশী বৃষ্টিপাতের অঞ্চলে ৯৬০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৩,৭২২ টাকা।

১৯৬৭ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত মোট ২,০৮৪ জন কৃষক তাঁদের কূয়ো তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করেন। এই সব কূয়ো তৈরির আগে তাঁদের চাষের জমির মোটামুটি পরিমাণ ছিল ২,২৫২ হেক্টার এবং কূয়ো থেকে সেচ দেওয়ার প্রকল্প চালু হওয়ার পর চাষের জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩,৮৮৫ হেক্টার। কূয়োর জল পাওয়ায় চাষের ক্ষেত্রেও পরিবর্ত্তন এসেছে। খাদ্য শস্য চাষের জমির পরিমাণ শতকরা ৮৫.০ ভাগ থেকে কমে ৭০.৩ হয়েছে আর পণ্যশস্যের জমির পরিমাণ শতকরা ৪.৩ ভাগ থেকে বেড়ে শতকরা ১১.০ ভাগ হয়েছে।

সেচের জল এবং বেশী ফলনের বীজের জন্য যত টাকা লগ্নী করা হয়েছে তাতে শতকরা ৩৮.৫ ভাগ আয় হয়েছে। যে সব কূয়োতে পাম্পসেট বসানো হয়নি সেগুলিতে আয় হয়েছে বেশী অর্থাৎ শতকরা ৪১.৯ ভাগ আর যেগুলিতে পাম্প বসানো হয়েছে সেগুলি থেকে আয় হয়েছে শতকরা ৩৬.৯ ভাগ। পাম্পসেট বসানোতে যে খরচ হয়, এক হেক্টারের কম জমিতে জল দিতে হ'লে তাতে বিশেষ লাভ হয়না। কিন্তু দেড় হেক্টারের বেশী জমিতে জলসেচ দেওয়ার পক্ষে পাম্পসেট খুব লাভজনক হয়।

যে সব এলাকায় বৃষ্টি কম হয় সেখানে প্রতি হেক্টারে শস্যের উৎপাদন বেড়েছে শতকরা ১৭৮.৫ ভাগ। মাঝারি এবং বেশী বৃষ্টিপাতের অঞ্চলে উৎপাদন বেড়েছে যথাক্রমে শতকরা ২৮৪.৪ এবং ১১৩.৩ ভাগ।

যে কৃষকরা এই সেচ কূয়োর জল পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করতে পারেননি, তাঁরা অন্যকেও তা ব্যবহার করতে দিতে তেমন ইচ্ছুক নন। কাজেই এই সমস্যার সমাধান করতে হ'লে সমষ্টির জন্য কূয়ো কাটতে হয়। তাহলে অবশ্য কূয়ো কাটা, পাম্পসেট বসানো, জলের সদ্ব্যবহার ইত্যাদি ব্যাপারে জনপ্রতি ব্যয় অনেক কম হয়।

পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

জনশক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার

জে. পি. সাক্সেনা

জনশক্তিসহ দেশের আহরণযোগ্য সম্পদের সর্ব্বোচ্চ প্রয়োগের ওপরেই, যে কোন দেশের সামগ্রিক আর্থিক উন্নয়ন নির্ভর ক'রে। তবে অন্যান্য সম্পদের তুলনায় জনসম্পদ অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পায়ণে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এটা বুঝতে পারা যাচ্ছে। মেসিনের সঙ্গে বিশেষ কুশলতা সংশ্লিষ্ট এবং জীবনধারণের বিভিন্ন চাহিদা মেটানোর জন্য এবং আরামদায়ক জীবন যাপনের জন্য আরও আধুনিক কলা কুশলতা প্রয়োজন। এই কুশলতা দুর্লভ হলেই বুঝতে পারা যায় যে, কেবলমাত্র কাঁচামাল, জল এবং বিদ্যুৎশক্তিই যথেষ্ট নয়, আরও কিছু প্রয়োজন। আধুনিক অর্থনৈতিক বিজ্ঞানে একে বলা হয় জনশক্তি সম্পদ।

জাপান এবং সুইটজারল্যাণ্ডের মতো কয়েকটি উন্নত দেশ যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছে তাতে দেখা যায় যে অত্যন্ত কুশলী জনশক্তি, প্রাকৃতিক সম্পদের আপেক্ষিক অভাবের সমস্যা মেটাতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়োজন হ'লে কয়লার ঘাটতি, জলশক্তি বা পারমাণবিক শক্তি দিয়ে মেটানো যায়। প্রাকৃতিক সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতাই কারিগরিও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি সম্ভব ক'রে তুলেছে। খাদ্যশস্যে ঘাটতি থাকাতেই, কৃষির ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে।

বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে সেটুকু শুধু রক্ষা করলেই চলেনা তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। মূল্য, কাঁচামালের সরবরাহ এবং নতুন নতুন উৎপাদন কৌশল বা পদ্ধতি, উৎপাদন ধারাকে বদলে দেয়। নতুন কোন উদ্ভাবন বা উৎপাদন কৌশল, পুরানো পদ্ধতিকে অচল ক'রে দেয়। এর ফলে জনশক্তির কুশলতাও নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হতে থাকে। বিশেষ কোন ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞানের মূল্য, সময়, অর্থনৈতিক কাঠামো এবং কারিগরি কুশলতার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলায়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে খুব কম ক্ষেত্রেই কর্ম্মসংস্থানের উন্নতি হয় বলে কখনও কখনও কুশলতার উন্নয়ন ও তার সম্পূর্ণ ব্যবহার সমান গতিতে হয়না।

উন্নততর কারিগরি জ্ঞান, উন্নততর জীবিকার অন্যতম উপায় বলে বাজারে প্রতিযোগিতা বেড়েছে এবং জ্ঞান ও কুশলতা বাড়ানোর জন্য বেশী সংখ্যক লোক শিক্ষা গ্রহণ করছেন। এর ফলে বাজারে, পর্য্যাপ্ত শিক্ষিত বা কুশলী নয় কিন্তু নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন, এই রকম সহরে কর্ম্মপ্রার্থীর ভিড় এবং তাঁরা যে ধরণের কাজ চান তা তাঁরা পান না। তাছাড়া বেশীরভাগ লোক অশিক্ষিত থেকে যান অথবা উন্নততর কুশলতা অর্জ্জন করতে পারেন না। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বেশী বলে এই অনুন্নত বা অর্দ্ধশিক্ষিত জনশক্তি উপযুক্ত কর্ম্মের সংস্থান করতে পারেন না।

জনশক্তি প্রয়োগ পরিকল্পনা

এই রকম অবস্থাতেই জনশক্তির উপযুক্ত প্রয়োগ সম্পর্কে পরিকল্পনার প্রশ্নটির সম্মুখীন হতে হয়। বেকার বা অর্দ্ধ বেকার জনশক্তির পূর্ণতম ব্যবহারের ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। প্রয়োজন এবং উপযুক্ত ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রেখে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনুযায়ী যথেষ্ট সংখ্যক কুশলী কর্ম্মী গড়ে তোলাই হ'ল জনশক্তি পরিকল্পনার লক্ষ্য। এতে যে কোন সময়েই কুশলী জনসম্পদের ঘাটতি পড়বেনা বা অতিরিক্তও হবেনা।

শ্রমের বাজারে যাতে ম্যাট্রিকুলেট, গ্র্যাজুয়েট বা পোষ্ট গ্র্যাজুয়েটের অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ আটকানো যায় সেজন্য প্রাথমিক স্তর থেকে স্নাতক স্তর পর্য্যন্ত একটা পর্য্যায়ক্রমিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। যদি কোন পর্য্যায়ে ছাত্র ভর্ত্তির সংখ্যা হ্রাস করতে হয় অথবা সম্প্রসারণ বন্ধ রাখতে হয় তাহলেও পরিকল্পনার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তা অযৌক্তিক হবেনা।

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা যতই বাড়ুকনা কেন, যাঁরা শিক্ষালাভ করতে চায় তাদের সেই অধিকার যে প্রত্যাখ্যান করা যায়না তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই ভর্ত্তির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হলে তা জনস্বার্থ এবং সংবিধানের বিরোধী হবে। সুতরাং শিক্ষাকে বৃত্তিমূলক এবং যাঁরা উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছে কেবলমাত্র তাঁদেরই ভর্ত্তি করার ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার পর এদের বিশেষ বিশেষ কাজ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। এতে দুটি ভালো ফল পাওয়া যাবে। প্রথমতঃ উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যয় কমবে। দ্বিতীয়তঃ চাকুরির জন্য বৃথা অন্বেষণ ক'রে, শিক্ষা ও কুশলতার অপব্যয় ক'রে তাদের মধ্যে যে হতাশা ও উৎসাহহীনতার সৃষ্টি হয় তা থেকে তাদের রক্ষা করা যাবে। তাছাড়া নিয়োগকারীর কাছে এরা একটা বোঝা না হ'য়ে বরং সম্পদ হবে।

অর্থনীতির প্রয়োজন অনুযায়ী বৃত্তিমূলক বিকল্প শিক্ষাসূচীর প্রবর্ত্তন করা যেতে পারে। কর্ম্মসংস্থানের বাজার পরীক্ষা ক'রে এই প্রয়োজনের পরিমাণ স্থির করা যায়। তবে ভবিষ্যতে, বিশেষ ক'রে দীর্ঘকালীন কোন ব্যবস্থায় কি পরিমাণ জনশক্তির প্রয়োজন হতে পারে সে সম্পর্কে

নির্ভরযোগ্য কোন অনমান করা সহজ নয়।

সব রকম অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার মধ্যে বেকার জনসম্পদ হ'ল সব চাইতে জটিল সমস্যা। জনশক্তির যথাযথ প্রয়োগ পরিকল্পনা ও অবিরাম চেষ্টাতেই শুধু এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে যেমন জনশক্তির সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং প্রশিক্ষণ ও সুসমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনীতির প্রয়োজন অনুযায়ী তা নিয়মিত করা যায়, তাহলে উপযুক্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে চাহিদাও নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

শ্রমিক এবং মূলধন

সাম্প্রতিক কালে উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে শ্রমিক ভিত্তিক বা মূলধন ভিত্তিক পদ্ধতি সম্পর্কে যে বাদানুবাদ শোনা যায় তার মূলে আছে শ্রমিক ও মূলধনের সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে অসাম্য। যেখানে প্রচুর শ্রমশক্তি রয়েছে সেখানে মূলধনের অভাব থাকায় আর্থিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। যদিও শ্রমশক্তি ও মূলধন একে অন্যের পরিপূরক নয় তবে দুইয়ের কোনটা কত লাগবে তা বিভিন্ন ব্যাপারের ওপর নির্ভরশীল। তবে কোন পদ্ধতি প্রয়োগে ব্যয় হ্রাস করা যাবে তার ওপরেই অবশ্য দুটির মধ্যে একটি পদ্ধতি গ্রহণ করা নির্ভর ক'রে। কাজেই রাষ্ট্র হয়তো পদ্ধতি দুটির মধ্যে যে কোনটি গ্রহণ নিয়ন্ত্রিত করতে পারে কিন্তু রাষ্ট্রও, দুইয়ের মধ্যে কোনটাতে ব্যয়ের হার বাড়ে বা কোনটা বেশী লাভজনক তা উপেক্ষা করতে পারেনা। এই যুক্তি অনুযায়ী, আমাদের দেশে প্রচুর জনসম্পদ অলস পড়ে থাকলেও শিল্পের সমস্ত ক্ষেত্রে শ্রমিক ভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়নি। কয়েকটি শিল্পে কায়িক শ্রমের পরিবর্তে, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদি চালু করা হচ্ছে। শিল্পগুলিতে কম্পিউটার ব্যবহার সুরু হয়েছে। নিয়োগকারীর দিক থেকে অবশ্য শ্রমিকের তুলনায় মেসিন অপেক্ষাকৃত ভালো। কারণ মেসিনের গৃহ সমস্যা, চিকিৎসা, বেতন, মজুরি, ধর্মঘট সমস্যা নেই।

মিশ্র অর্থনীতিতে সরকার আইনের সাহায্যে মজুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন কিন্তু কর্মসংস্থান নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননা। কারণ কর্মসংস্থান, নিয়োগকারীর ইচ্ছানুযায়ী হয়—এবং সেই ইচ্ছা কাজের চাপ, দক্ষতা এবং মজুরির হার ইত্যাদি নানা জিনিসের ওপর নির্ভর ক'রে।

সেইদিক থেকে সরকারি সংস্থাগুলি শ্রমিক ভিত্তিক করা যায়; কারণ এগুলিতে কেবল লাভের দিকেই নজর রাখা হয়না। কিন্তু এখানেও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ওপরেই জনশক্তির প্রয়োগ পরিকল্পনা নির্ভর ক'রে। উপযুক্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা-বিহীন জনশক্তির প্রয়োগ পরিকল্পনা সফল হবেনা। কাজেই বর্তমানের অলস জনশক্তি সমস্যা সমাধান করতে হলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে একটা সংহত জনশক্তি পরিকল্পনাও প্রয়োজন।

গান্ধীজীর আদর্শের রাষ্ট্র

(৫ পৃষ্ঠার পর)

ওপর নির্ভরশীল ছোট ছোট উৎপাদক এবং তাঁরা ভারতের ৫ লক্ষ গ্রামে ছড়িয়ে আছেন। এই বিশেষ ভারতীয় সমস্যার একটা ভারতীয় সমাধানই প্রয়োজন। গান্ধীজী বার বার বলেছেন যে সরকারী বা বেসরকারী ক্ষেত্রে বড় বড় শিল্পগুলির যত উন্নয়নই করা হোক না কেন, এই লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য তা বিশেষ কিছু অবদান জোগাতে পারবে না। জনকল্যাণকামী পাশ্চাত্য ব্যবস্থাও ভারতীয়গণের কল্যাণ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তারা বেতনভোগীদের মতো সঙ্ঘবদ্ধ নন অথবা দর কষাকষি করতে পারেন এমন ক্ষমতাও নেই। এই বিপুল সংখ্যক অধিবাসীর কল্যাণ প্রকৃতপক্ষে, উৎপাদন ও আয়মূলক নতুন আর্থিক সুযোগ সুবিধে সৃষ্টি করার ওপরেই নির্ভর করে। যে অর্থনৈতিক আদর্শ তাঁদের আর্থিক সমস্যার সমাধান করবে তা তাঁদের কল্যাণ সমস্যারও সমাধান করবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে গান্ধীজীর কর্মসূচী হয়তো যথেষ্ট নয়। এমন কি যুগোপযোগী নয়। কিন্তু গান্ধীজী কোটি কোটি ভারতীয়ের আর্থিক ও কল্যাণ সমস্যার যে প্রকৃতি নির্ণয় করে গেছেন তা বর্তমান পরিস্থিতিতেও সত্য।

কৃষি পণ্ডিত

অন্ধ্রপ্রদেশের যেল্লিগানুর গ্রামের চাষী পি-গগন্না ১৯৬৭-৬৮ সালের খারিফ মরসুমে সর্ব্ব ভারতীয়-শস্য-উৎপাদন প্রতিযোগীতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। অর্থাৎ গগন্না কৃষি-পণ্ডিত উপাধি পাবার সম্মান অর্জ্জন করলেন।

সফল প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রথম তিনজন হেক্টার প্রতি যে ধান ফলিয়েছেন তার পরিমাণ চমকপ্রদ। যথা গগন্না—১০,৫১৭ কে. জি., কেরালার কোড়ুভায়ুর গ্রামের কে. জি. সুকুমারন ৮,২৭৯ কে. জি.; এবং গুজরাটের পীপ্যলগ্যভান্ গ্রামের ডি. পি. প্যাটেল ৬,৬১২ কে. জি.।

১৯৬৮-৬৯ সালের খারিফ মরসুমের কৃষি-পণ্ডিত নির্ব্বাচিত হয়েছেন মহারাষ্ট্রের সাগনের এন্. এ. পাতিল। তাঁর উৎপাদনের পরিমাণ হ'ল হেক্টরপ্রতি ৯,০৯৫ কে.জি.। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী মহারাষ্ট্রেরই মহালাসোয়াদে-র আর. ডি. পাতিল এবং গুজরাটের দাভজে-এর এম্. এস. প্যাটেল ফলিয়েছেন যথাক্রমে ৮,২১০ কে. জি. ও ৮,১১১ কে.জি.।

১৯৬৭-৬৮ সালের রবি মরসুমে জোয়ার উৎপাদন প্রতিযোগীতায় প্রথম হয়েছেন মহারাষ্ট্রের কৌথালী গ্রামের এস. কে. ধুমাল। এঁর উৎপাদন হ'ল এক হেক্টরে ৭,৬০০ কে. জি.। এই পর্য্যায়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন তামিলনাড়ুর সিংহলান্দপুরম গ্রামের দুইজন চাষী কে.আর. গোণ্ডার (৬,৪৫১ কে.জি.) ও এ.পি.এস. গোণ্ডার (৫,১২৫ কে.জি.)

প্রথম পুরস্কারের মূল্য হ'ল ৩,০০০ টাকা, দ্বিতীয় ১,২০০ টাকা ও তৃতীয় ৮০০ টাকা।

নিরক্ষর বনাম সাক্ষর

আমাদের দেশে প্রতি বছরে নিরক্ষরের সংখ্যা বাড়ে ১,৬৫ কোটীর মত। গত ১৮ বছরে যদিও সাক্ষরের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে, অপরদিকে নিরক্ষরের সংখ্যা ১৯৫১ সালে ২৯.৬ কোটী থেকে বেড়ে ১৯৬৯ সালে দাঁড়িয়েছে ৩৪.৯ কোটী।

বিজ্ঞান অন্ধদের পর্য্যবেক্ষণ শক্তি বাড়াতে সাহায্য করছে

অন্ধগণও যাতে সমাজের সমস্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টায়, উৎপাদনে ও সাংস্কৃতিক জীবনে সম্পূর্ণভাবে যোগ দিতে পারেন সেজন্য, অন্ধগণের কল্যাণ সম্পর্কিত বিশ্ব পরিষদ সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করছেন।

এস. ধর্ম্মরাজন

খুব কম ক'রে ধরলেও সমগ্র বিশ্বে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ব্যক্তি দৃষ্টিহীন। প্রতি বছর এঁদের সংখ্যা ৫০ লক্ষ ক'রে বাড়ছে। দৃষ্টিহীনের সংখ্যা যদি এই রকম গতিতে বাড়তে থাকে তাহলে এই শতাব্দির শেষে হয়তো অন্ধদের সংখ্যা ৩ কোটিতে দাঁড়াবে।

এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলিতেই বেশীরভাগ অন্ধের বাস। একটা আনুমানিক হিসেবে বলা হয়েছে যে বিশ্বের মোট অন্ধগণের মধ্যে শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগই ভারতীয়। এঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই আবার শিশু, যারা নিয়মিত কোন শিক্ষার সুযোগ পায়না। তাছাড়া, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য লোক এমন একটা অবস্থায় পৌঁছান যখন ছানি, গ্লুকোমা অথবা কোন রোগ বীজাণুর বিলম্বিত প্রতিক্রিয়ার ফলে এঁদের অন্ধ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

সারা বিশ্বের বৈজ্ঞানিকগণ যে চেষ্টা

মানুষ হিসেবে গ্রহণ করবেন এবং সুন্দর স্বাভাবিক জীবন যাপনের অধিকার দেবেন।

বিশ্ব সংস্থা, নিরাময়যোগ্য অন্ধত্বকে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে একটা বিসদৃশ ব্যাপার বলে বর্ণনা করেন। এই সম্পর্কে আলোচনার সময় জানা যায় যে "দৃষ্টি-শক্তির বিকল্প" ব্যবস্থা উদ্ভাবনে গবেষকগণ, অতি আধুনিক কারিগরি বিজ্ঞান প্রয়োগ করে সাফল্য লাভ করতে পারবেন বলে আশা করছেন। কিন্তু এখনও এমন অনেক দেশ রয়েছে, যেখানকার অন্ধরা অর্থাভাবে, বহু পূর্ব্বে উদ্ভাবিত মৌলিক সাজ সরঞ্জাম-গুলিও কাজে লাগাতে পারেন না। অন্ধরাও যাতে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের স্থান পেতে পারেন এবং তাঁদের যাতে ব্যক্তি এবং নাগরিক হিসেবে শারীরিক, মানসিক বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কোন বাধার সম্মুখীন হতে না হয় তার জন্য বিশ্ব পরিষদ সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করবেন। পরিষদ এবং এর সহযোগী অন্যান্য আন্তর্জ্জাতিক সংস্থাগুলি আরও বলেছেন যে, অন্ধদের পক্ষে ব্যবহারযোগ্য মৌলিক সাজ সরঞ্জামগুলির দাম কমানোর জন্য এবং দারিদ্র্য বা আর্থিকশক্তির সীমাবদ্ধতার জন্য যে সব দেশের অন্ধরা এইসব মৌলিক সাজ সরঞ্জাম ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছেন করছেন তার ফলে দূর ভবিষ্যতে হয়তো দৃষ্টিহীনরা তাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। বিশ্বের দৃষ্টিহীনদের মধ্যে এমন হাজার হাজার অন্ধ আছেন যাঁরা সামান্য একটু অস্ত্রোপচার করিয়ে নিলে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে পারেন। বর্ত্তমানে এমন কতক-গুলি ইলেকট্রোনিক ও অন্যান্য সাজসর-ঞ্জাম উদ্ভাবিত হয়েছে যেগুলির সাহায্যে দৃষ্টিহীনরা তাঁদের পরিবেশ পর্য্যবেক্ষণ করতে পারেন।

অন্ধগণও যাতে স্বাভাবিক মতো চলতে পারেন সেই লক্ষ্য পূর্ণ করা এখন আর অসম্ভবের পর্য্যায়ে নেই। কারণ দৃষ্টিশক্তির বিকল্প হিসেবে কাজ করতে পারে এই রকম জিনিস বিজ্ঞানীদের প্রায় হাতের কাছে এসে গেছে বলা যায়।

সম্প্রতি নূতন দিল্লীতে অন্ধ সম্প-র্কিত বিশ্ব পরিষদের যে অধিবেশন হয়ে গেল তাতে, বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে অন্ধরা কি রকমভাবে পূর্ণতর জীবন উপভোগ করতে পারেন এবং বিজ্ঞান, দৃষ্টিহীনদের কতটুকু সেবা করতে পারে, তাই ছিল প্রধান আলোচনার বিষয়। বিজ্ঞানের এই যুগে অন্ধদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্ম্মসংস্থান ও আমোদ প্রমোদের মোটামুটি বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বিশ্বের দৃষ্টিহীনদের পক্ষে তাঁদের মুখপাত্র বলেন যে তাঁরা চক্ষুষ্মানদের কাছে কৃপা বা দয়া চান না। তাঁরা আশা করেন যে চক্ষুষ্মানরাও তাঁদের স্বাভাবিক

একজন অন্ধ শিক্ষার্থী প্লাষ্টিকের জিনিস তৈরির মেসিনে কাজ শিখছেন।

না সেখানে এগুলি বন্টনের সুযোগ সুবিধে বাড়ানোর জন্য তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।

সংক্রামক চক্ষুরোগ নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ সুবিধে যথেষ্ট বাড়া স্বত্বেও আফ্রিকা, এশিয়া, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে যেখানে এখনই অন্ধের সংখ্যা বিপুল, সেখানেও জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধের সংখ্যাও বাড়ছে। মানুষ দীর্ঘায়ু হওয়ার ফলে এবং শিশুমৃত্যুর সংখ্যা কমে যাওয়াতেও হয়তো অন্ধ শিশু ও বৃদ্ধের সংখ্যা বিপুল হারে বেড়ে চলেছে। যে সব দেশে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ সুবিধে সহজপ্রাপ্য সেখানেও অন্ধের সংখ্যা বাড়ছে।

নূতন দিল্লীর এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীগণ এই সব তথ্য পেয়ে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং বুঝতে পারেন যে সারা বিশ্ব ক্রমশঃই একটা বিপুল সামাজিক ও চিকিৎসামূলক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং এই সম্পর্কে জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক ভিত্তিতে ব্যবস্থা অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ছে। এর জন্যে কর্ম্মী ও সম্পদ সংহত করারও প্রয়োজন রয়েছে। বিশ্ব পরিষদ স্থির করেছেন যে তাঁরা অবিলম্বে এই সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্য পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন এবং নিরাময়যোগ্য দৃষ্টিহীনতা দূর করার জন্য তাঁরা যে সর্ব্বপ্রকারে বিশ্ব স্বাস্থ্য পরিষদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত তা জানিয়ে দেবেন।

বর্ত্তমানের এই বিজ্ঞানের যুগে অন্ধদের সাধারণ শিক্ষা দেওয়া ও কোন ধরনের হাতের কাজ শেখানো যে বিশেষ প্রয়োজন, সম্মেলন তা স্বীকার করে নেয়। একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে অন্ধদেরও একটা মৌলিক কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণের অধিকার রয়েছে এবং এই প্রশিক্ষণ গ্রহণের পথে তাঁরা হয়তো দৃষ্টিহীনতার বাধা অতিক্রম করার মতো জ্ঞান ও কুশলতা অর্জ্জন করতে পারবেন। অন্ধদেরও পূর্ণতম ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সম্ভবপর স্বাতন্ত্র্য দিতে হবে।

সম্মেলনে আরও বলা হয়েছে যে অন্ধদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পারিবারিক ও সামাজিক সাহায্য হিসেবে যে ব্যয় হয় তা, অন্ধদের প্রশিক্ষণ, পুনর্ব্বাসন ও

দেরাদুনে অবস্থিত, ভারতের প্রাপ্তবয়স্ক অন্ধগণের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে, টাইপ রাইটিং শেখার ক্লাশ

কর্ম্মসংস্থান সম্পর্কিত কর্ম্মসূচীর ব্যয়ের তুলনায় অনেক বেশী। কিন্তু এই কর্ম্মসূচী অনুযায়ী অন্ধরা উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে তাঁরা সমাজের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে বরং আয় করতে পারেন। অন্য আর একটা সমস্যা হল প্রায় সব দেশেই কর্ম্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অন্ধদের প্রায় অপাংক্তেয় ক'রে রাখা হয়। সেজন্য পরিষদ বলেছেন যে, যে সব অন্ধদের শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব তাদের শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ দিয়ে, কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ দিয়ে স্বাধীনভাবে বাস করার অধিকার দেওয়ার জন্য সব দেশগুলিকে অনুরোধ করা হবে।

পরিষদ আরও সুপারিশ করেছেন যে অন্ধদের সংরক্ষণ করা সম্পর্কে এখন পর্য্যন্ত যে সব দেশে উপযুক্ত আইন কানুন তৈরী হয়নি সেই সব দেশের পালিয়ামেন্টগুলিকে অন্ধদের সংরক্ষণমূলক আইন তৈরী করতে অনুরোধ করা হবে। অন্ধরা যাতে (১) বিনামূল্যে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্ব্বাসন (২) একটা ভাতা পান এবং (৩) বয়স বা বার্দ্ধক্যের জন্য আয়বিহীন অন্ধ ব্যক্তিগণ যাতে একটা ভাতা পান, এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন প্রণীত হলেই ভালো হয়।

বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম

এই সম্মেলনে, অন্ধদের জন্য বর্ত্তমানে নানাধরনের যে সব বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম উদ্ভাবিত হয়েছে তা আলোচনা করা হয়। কম্পুটার, লেক্সিফোন, টেপরেকর্ড, ইত্যাদি সাজসরঞ্জাম নিয়ে আলোচনা করা হয়। লেক্সিফোনে, ছাপানো বইয়ের পাতা শব্দে রূপান্তরিত হয়। টেপরেকর্ড সাধারণতঃ শিশুদের শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ভারতের প্রচেষ্টা

স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকেই ভারত সরকার অন্ধগণের কল্যাণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসেই শিক্ষা মন্ত্রক অন্ধগণের সমস্যাগুলি বিবেচনা ক'রে দেখার জন্য একটি সংস্থা গঠন করেন। পরে এই সংস্থার কাজ প্রায় সব রকমের বিকলাঙ্গ ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে পর্য্যস্ত সম্প্রসারিত করা হয়।

ভারতের অনুরোধে ইউনেস্কো, অন্ধগণের জন্য এক অভিন্ন বিশ্ব ব্রেইল পদ্ধতি উদ্ভাবনের সম্ভাবনা পরীক্ষা ক'রে দেখেন। ভারত, কয়েকটি আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করে এবং তাতে বিশ্ব ব্রেইল পদ্ধতি সম্পর্কে মৌলিক নীতিগুলি স্থির করা হয়। এই সব নীতি অনুযায়ী ভারতী ব্রেইল পদ্ধতি বর্ত্তমানে সমগ্র দেশেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

সরকারি পরিচালনায় দেরাদুনে অন্ধদের

১৪ পৃষ্ঠায় দেখন

ভারত ও থাইল্যাণ্ডের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক

থাইল্যাণ্ডের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে থাকা বৌদ্ধ প্যাগোডাগুলি যদিও ভারত ও থাইল্যাণ্ডের মধ্যে একসময়ে যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিলো সেকথা মনে করিয়ে দেয় তবুও অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মাত্র চার বছর পূর্ব্বেও লেনদেনের পরিমাণ তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য ছিলনা। বর্ত্তমান দশকের গোড়ার দিকেও এই দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ২ থেকে সাড়ে চার কোটি টাকার মধ্যে।

তবে ১৯৬৪-৬৫ সাল থেকে বাণিজ্যের পরিমাণ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। টাকার মূল্যমান হ্রাস করার আগে ১৯৬৪-৬৫ সালে আমরা থাইল্যাণ্ড থেকে ৪.৯ কোটি টাকার জিনিসপত্র আমদানি করি। সেই তুলনায় ১৯৬৮-৬৯ সালে ৩৫.১২ কোটি টাকার জিনিসপত্র আমদানি করা হয়। ১৯৬৪-৬৫ সালে থাইল্যাণ্ডে আমাদের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪.৫ কোটি টাকা, গত বছরে তা দাঁড়ায় ৭.৪৪ কোটি টাকায়। এই কয়েক বছর ধরে রপ্তানির তুলনায় আমদানির পরিমাণ বেশী চলছে।

তবে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়ানোর কোন বিশেষ প্রচেষ্টার ফলে আমদানির পরিমাণ বাড়েনি। আমাদের দেশে তৈরি কিছু কিছু ইঞ্জিনিয়ারীং দ্রব্যাদি ও কিছু নতুন জিনিস থাইল্যাণ্ডের বাজারে চলছে বটে, কিন্তু ভারত ও থাইল্যাণ্ডের মধ্যে যুগ যুগ ধরে বাণিজ্যের যে ধারা চলে আসছে তা প্রকৃতপক্ষে অপরিবর্ত্তিতই থেকে গেছে। আমরা এখনও থাইল্যাণ্ড থেকে তিনটি প্রধান জিনিস অর্থাৎ চাউল, কাঁচা পাট এবং কাঁচা চামড়া আমদানি করি। খরা এবং ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান বিরোধের ফলে দেশে এগুলির অভাব হওয়াতেই থাইল্যাণ্ড থেকে এগুলির আমদানি বাড়ার প্রধান কারণ। তাছাড়া দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার প্রধান সরবরাহকারী দেশ জাপানের সঙ্গে বাণিজ্যে বিপুল ঘাটতি থাকায়, অন্যদিকে সুয়েজখাল বন্ধ থাকাতেই হয়তো থাইল্যাণ্ডকে আমাদের দেশ থেকে, লোহা, ইস্পাত, পেট্রোলিয়ামজাত সামগ্রী, টায়ার টিউব, ইঞ্জিনিয়ারীং সামগ্রী ইত্যাদি নানা ধরণের উৎপাদিত জিনিস কিনতে হয়।

রপ্তানি

থাইল্যাণ্ড এবং আমাদের দেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য কিরকমভাবে বাড়তে পারে সে সম্পর্কে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতাও রয়েছে। কাজেই আরও দ্রুত গতিতে এই ব্যবসা বাণিজ্য কি করে আরও বাড়ানো যায় সে সম্পর্কে আমাদের বিশেষভাবে চেষ্টা করা উচিত। গত আগষ্ট মাসে থাইল্যাণ্ড থেকে যে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল এসেছিলেন তারফলে অবশ্য ভারত ও থাইল্যাণ্ডের মধ্যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে নতুন একটা অধ্যায় সুরু হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। থাইল্যাণ্ডে আমাদের রপ্তানি বাড়ানোর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এঁদের আর্থিক শক্তি দ্রুতগতিতে বাড়ছে। থাইল্যাণ্ড এখন তাঁদের দ্বিতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার মাঝামাঝিতে পৌঁচেছে। প্রথম উন্নয়ন পরিকল্পনায় এঁদের জাতীয় উৎপাদন শতকরা ৮ ভাগ বেড়ে যায়।

বর্ত্তমান পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়ন এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলির উন্নয়নের ওপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। কাজেই রেলওয়ে, পরিবহন, যোগাযোগ, বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ও পরিবহন সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম থাইল্যাণ্ডে, রপ্তানি করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। থাইল্যাণ্ডের অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল আমাদের দেশে এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে আলোচনার সময়ে প্রকৃতপক্ষে এই সব রপ্তানি করার সম্ভাবনা স্বীকৃত হয়।

থাইল্যাণ্ডের অধিবাসীদের জনপ্রতি আয় খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যাচ্ছে বলে, বৈদ্যুতিক জিনিসপত্র, বস্ত্র, কৃত্রিম সুতো, কৌটা বা প্যাকেটজাত খাদ্য, অঙ্গ সজ্জার সামগ্রী, ওষুধপত্র ইত্যাদির মতো গৃহপোকরণ থাইল্যাণ্ডে রপ্তানি করার সম্ভাবনাও বাড়া উচিত। তাছাড়া থাইল্যাণ্ডের আমদানির তালিকা দেখলে বুঝতে পারা যায় যে, এ্যালুমিনিয়াম, টায়ার টিউব, কাগজ এবং কাগজের বোর্ডজাত জিনিসপত্র, তামাকপাতা, বাইসাইকেল এবং বাইসাইকেলের অংশ ইত্যাদি আমরা পূর্ব্বের তুলনায় এখন অনেক বেশী পরিমাণে রপ্তানি করতে পারি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে থাইল্যাণ্ডের বাজারকে প্রায় অবাধ রপ্তানির বাজার বলা যায়। সেখানে স্থানীয় কয়েকটি শিল্পের স্বার্থ রক্ষার জন্য কয়েকটি মাত্র জিনিস সম্পর্কে আমদানি নিয়ন্ত্রণ আইন প্রযুক্ত হয়। কাজেই আমাদের শিল্পজাত জিনিসপত্রের সেখানে, উন্নত দেশগুলির শিল্পজাত সামগ্রীর সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা করতে হবে। সুতরাং থাইল্যাণ্ডে রপ্তানি বাণিজ্যে সাফল্য অর্জ্জন করতে হলে আমাদের দেশের শিল্পজাত জিনিসগুলিরও গুণ ও মূল্যের দিক থেকে প্রতিযোগিতামূলক হতে হবে।

আমরা থাইল্যাণ্ড থেকে যে সব জিনিস আমদানি করি, সেখানেও কিছুটা পরিবর্ত্তন প্রয়োজন বলে মনে হয়। কাঁচা পাট বা চাউলের মতো জিনিস সব সময়ে সম পরিমাণে পাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই ভারত ও থাইল্যাণ্ডের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য বাড়াতে হলে এই সব জিনিস আমদানির ক্ষেত্রেও একটা স্থিতিশীলতা প্রয়োজন।

থাইল্যাণ্ড এবং আমাদের দেশের মধ্যে আরও ব্যাপক আর্থিক সহযোগিতার সম্ভাবনার কথা বলতে গেলে বলা যায় যে যুক্ত প্রচেষ্টা গড়ে তোলার ভালো সুযোগ রয়েছে। আমাদের দেশের একটি শিল্প সংস্থার সহযোগিতায় থাইল্যাণ্ডে একটি ইস্পাত রিরোলিং মিল স্থাপন করার চুক্তিটি ইতিমধ্যেই অনুমোদিত হয়ে গেছে। আর

(১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ডি. ভি. সি এবং বিদ্যুৎশক্তি

এন. এন. ঘোষ

ডাঃ ভাবা বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিদ্যুৎশক্তি এবং তার উপযুক্ত ব্যবহারই উন্নত দেশগুলিকে উন্নত করেছে। ভারতের মতো একটা উন্নয়নকামী দেশকে যদি উন্নত দেশগুলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয় তাহলে তার, বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পর্কে একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা তৈরি করে নিতে হবে। আমাদের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, জাতীয় জীবনে বিদ্যুৎশক্তির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সে জন্যই তাঁর নেতৃত্বে গঠিত প্রথম জাতীয় সরকার বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ওপরেই বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি জানতেন যে ভারতের সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামের ৩৬ কোটি অধিবাসীর জীবন ধারণের মান উন্নত করা সহজ কাজ নয়। সেজন্যই তিনি বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের সমস্ত উৎস যেমন, জল, তাপ, রাসায়নিক, পরমানবিক এবং সম্ভব হলে সৌর শক্তি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

দেশের প্রধান প্রয়োজন উপলব্ধি করে, প্রধানত: দামোদর অববাহিকার সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য গঠিত দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশনকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ হাতে নিতে হয়। কর্পোরেশন অবশ্য ভালো করেই জানতেন যে, বহু উদ্দেশ্যমূলক কোন প্রকল্পে জলসেচের স্থান অন্তত: পক্ষে কয়েক দশকের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের ওপরে থাকা উচিত। তবে কর্পোরেশন পরে স্থির করে যে এই দুই ক্ষেত্রের কাজই এক সঙ্গে করতে হবে।

জলবিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কর্পোরেশন, জলাধারে জল জমিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে চারটি বাঁধ তৈরি করে। তিলাইয়া, পাঞ্চেৎ এবং মাইথনে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করা হয়।

এই অঞ্চলে কৃষি শিল্পের দ্রুত উন্নতি হতে পারে এবং তার ফলে বিদ্যুৎশক্তির চাহিদা বাড়তে পারে তা উপলব্ধি করে কর্পোরেশন, এই উপত্যকার সম্ভাব্য সম্পদ সম্পর্কে সতর্ক অনুসন্ধান সুরু করেন। অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেল যে, এই উপত্যকায় যথেষ্ট কয়লা পাওয়া যায় এবং তাপের সাহায্যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

১৯৫৩ সালে কর্পোরেশন, বোকারোতে তাদের প্রথম তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৯৫৫ সালে বোকারো এবং নতুন আর একটি জায়গা দুর্গাপুরে ২২৫ এম ডব্লিউ ইউনিট স্থাপন করবেন বলে স্থির করেন।

স্বাধীনতা অর্জন করার পর থেকে শিল্পের ক্ষেত্রে ভারত বিপুল উন্নতি করেছে আর তার ফলে বিদ্যুৎ শক্তির চাহিদাও ভীষণ বেড়ে চলেছে। উপত্যকা অঞ্চলে বিদ্যুৎশক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে ডি. ভি. সি চন্দ্রপুরায় আর একটি বড় তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর প্রথম তিনটি ১৪০ এম ডব্লিউ ইউনিট যথাক্রমে ১৯৬৪, ১৯৬৫ এবং ১৯৬৮ সালে চালু হয়। আরও তিনটি ইউনিট তৈরি করা হবে। বর্তমানে ডি. ভি. সিতে যে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদিত হয় তা দেশের মোট উৎপাদনের শতকরা ১১ ভাগ। ১৯৬৬-৬৭, ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে ডি. ভি. সি. যথাক্রমে ৩৭১ কোটি ৭০ লক্ষ, ৩৭১ কোটি ৬০ লক্ষ এবং ৩৬৮ কোটি ৯০ লক্ষ ইউনিট বিদ্যুৎশক্তি বিক্রী করে, এবং তা থেকে মোট ২১ কোটি, ২২.৬৫ কোটি এবং ২৩.২৫ কোটি টাকা পায়।

ভারতে আনুমানিক ৬২০০ কোটি টন কয়লা আছে কিন্তু এর সবটাই ওপরে তোলা সম্ভব নয়। অন্যদিকে একমাত্র ডি. ভি. সির তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতেই প্রতি বছর ২৩ লক্ষ টন কয়লা লাগে। এ ছাড়া দেশে এই রকম আরও অনেক তাপকেন্দ্র রয়েছে। যে কেন্দ্রগুলি চালু রয়েছে আর যেগুলি তৈরি হচ্ছে সেগুলির যদি এই হারে কয়লার প্রয়োজন হয় তাহলে ভূগর্ভে যত কয়লাই থাকুক না কেন তা একদিন নিঃশেষিত হবে। ভবিষ্যতে যদি বিকল্প কোন ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা সম্ভব না হয়, তাহলে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হবে। সুতরাং বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থার কথা চিন্তা করার সময় এসে গেছে।

জলবিদ্যুৎ সম্পূর্ণভাবে বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, ১৯৬৭ সালে যথেষ্ট পরিমাণে জল না থাকায় হীরাকুদ জলাধার থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা সম্ভব হয়নি। বোম্বাইর টাটা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রও মধ্যে মধ্যে এই অসুবিধে ভোগ করে। কাজেই ভারতে যে সব কাঁচামাল পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে পারমাণবিক কেন্দ্র স্থাপনের সময় এসে গেছে। এই দিক দিয়ে চিন্তা করাটাই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কেরালার উপকূলে এবং রাঁচির মালভূমিতে যে থোরিয়াম আছে তার পরিমাণ হ'ল আনুমানিক ১০ লক্ষ টন। বিহার, রাজস্থান ও তামিলনাডুতেও যথেষ্ট পরিমাণ আকরিক ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিহারে আনুমানিক ২০ লক্ষ ৮০ হাজার টন মিশ্রিত ইউরেনিয়াম আছে বলে অনুমান করা হয়।

বর্তমানে দেশে পরমানু শক্তিচালিত তিনটি বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন কেন্দ্র আছে। এগুলির মধ্যে, বোম্বাইর কাছে তারাপুরের কেন্দ্রটি বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করছে। অন্য যে দুটি কেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে তার একটি হ'ল তামিলনাডুর কালাপকামে, অন্যটি রাজস্থানের রাণাপ্রতাপ সাগরে। তারাপুরের কেন্দ্রটির উৎপাদন ক্ষমতা হ'ল ৩৮ কোটি ওয়াট আর অন্য দুটির হ'ল ৪০ কোটি ওয়াট। বিদেশ থেকে আমদানি করা ইউরেনিয়াম দিয়ে তারাপুরের কেন্দ্রটি চালানো হয় আর প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ব্যয় পড়ে ৩ পয়সা।

আমাদের দেশে তৈলশক্তি চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এক রকম নেই বললেই হয় আর জলশক্তি তো অনিশ্চিত। সেই অবস্থায় তাপশক্তির পরিবর্তে পারমাণবিক শক্তি চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আরও বেশী করে তৈরি করা উচিত নয় কি ? কয়লার উত্তাপে চালিত বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের তুলনায়, পরমাণু কেন্দ্র তৈরি করাটা এখন আর তেমন বেশী কঠিন নয়। পরমাণু কেন্দ্রের চাহিদা বাড়বে বলে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আরও বেশী পারমাণবিক কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে।

ডি. ভি. সিতে একটা বেশ সুসজ্জিত ডিজাইন অফিস এবং অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার ও যন্ত্রকুশলী রয়েছেন। পারমাণবিক শক্তি-কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য আধুনিক তাপশক্তিচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকা চাই। কাজেই দামোদর উপত্যকা অঞ্চলে পরমাণু শক্তি কেন্দ্র স্থাপন করাটা ডি. ভি. সির পক্ষে খুব কঠিন হবে না। জুডুগোড়ায় যে ইরেনিয়াম কারখানা স্থাপন করা হয়েছে সেখান থেকে এই কেন্দ্রে ইউরেনিয়াম সরবরাহ করা যেতে পারে। এই কারখানায় প্রতিদিন প্রায় ১০০০ টন ইউরেনিয়াম উৎপাদন করা যায়। ১৯৬৬ সালে টেনেসি উপত্যকা কর্তৃপক্ষ ১১০ কোটি ইউনিটের একটি পারমানবিক শক্তি কেন্দ্রের বরাত দেয়। এতে, কয়লার উত্তাপে চালিত বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ কম ব্যয়ে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা যাবে বলে আশা করা হয়। আর এটি এমন জায়গায় তৈরি করা হয় যেখানে কয়লা অত্যন্ত সস্তা।

ডি.ভি.সি. সমাচারের সৌজন্যে
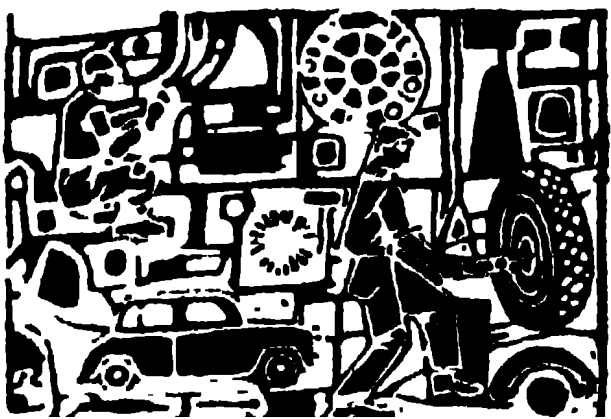
অন্ধজনে দেহ আলো

(১১ পৃষ্ঠার পর)

যে জাতীয় কেন্দ্রটি রয়েছে তার জন্য বার্ষিক বাজেটের পরিমাণ হ'ল ১২ লক্ষ টাকা। এখানে অন্ধ শিশুদের জন্য একটি মডেল স্কুল, প্রাপ্তবয়স্ক ও বয়স্কা অন্ধদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ব্রেইল সাজ সরঞ্জাম তৈরীর একটি কারখানা, একটি কেন্দ্রীয় ব্রেইল প্রেস এবং অন্ধদের জন্য একটি জাতীয় গ্রন্থাগার রয়েছে। গ্রন্থাগারে একটি সবাক পুস্তক বিভাগও খোলা হবে। আংশিকভাবে দৃষ্টিহীন শিশুদের জন্যও একটি স্কুল তৈরি করা হচ্ছে।

সরকার অন্ধছাত্রদের, সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য বৃত্তি দেন। গত পাঁচ বছরে অন্ধদের জন্য প্রায় ২০০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বিকলাঙ্গগণের জন্য ১টি কর্মসংস্থান কেন্দ্রও রয়েছে।

অন্ধদের পুনর্ব্বাসনের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলি একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে তবে সমস্যার বিপুলতায় তা খুবই কম।

শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং কর্ম্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান অন্ধদের সাহায্য ক'রে। কিন্তু অন্ধরা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক সাজ সরঞ্জামের সাহায্য নিয়ে বেঁচে থাকতে পারেন না। তাঁদের ও একটা সামাজিক জীবন প্রয়োজন।

ভারত তিন কোটী টাকার বরাত পেয়েছে

সাম্প্রতিক জাকার্তা-মেলায় অংশ গ্রহণ করার পর ভারত প্রায় তিন কোটি টাকার জিনিসপত্র সরবরাহ করার বরাত পেয়েছে। রপ্তানী করতে হবে বাইসাইকেল, মেশিন টুলস্, বস্ত্র শিল্পের যন্ত্রসরঞ্জাম, পরিবহনের উপযোগী বাস ও অন্যান্য জিনিষ। ৮.৫ কোটি টাকা মূল্যের আরও নানা ধরণের সামগ্রী রপ্তানীর বিষয়ে আলোচনা চলছে ব'লে জানা গেছে।

প্রধানমন্ত্রীর সংসদীয়-সদস্য-কমিটির বৈঠকে চতুর্থ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা

প্রধানমন্ত্রীর, পরিকল্পনা সংক্রান্ত সংসদ-সদস্য-কমিটির বৈঠকে, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়ার বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে শ্রীমতী গান্ধী সভাপতিত্ব করেন।

আলোচিত বিষয়ের মধ্যে ছিল ভূমি-সংস্কার ব্যবস্থা ও তা'র রূপায়ণ, আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার ব্যবস্থা এবং উন্নয়নের ব্যাপারে কেন্দ্র-রাজ্য-সম্পর্ক। তাছাড়া আরও যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়, তা'র মধ্যে ছিল সরকারী তরফের ভূমিকা ও পরিচালন ব্যবস্থা, মধ্যবর্ত্তী-কালীন প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ এবং দেশে বিজ্ঞানী ও কারিগরী বিদ্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাজে লাগানো। সরকারী পরিচালনাধীন ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকা, ঋণ সংক্রান্ত নীতি, সুসংহত লগ্নী—ব্যবস্থার সঙ্গে মূল্যমান স্থিতিশীল রাখার বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়।

আলোচনার পারম্পর্য্যের মধ্যে সামাজিক অসাম্য ও বৈষয়িক তারতম্যের হ্রাস ঘটানো, অনগ্রসর এলাকাগুলির উন্নতি-বিধানের সঙ্গে তপশীলী জাতি ও উপজাতি প্রভৃতি বিশেষ কয়টি গোষ্ঠীর জীবন ধারণের মান উন্নত করা এবং কর্ম্মসংস্থান, বিশেষ ক'রে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে বেকার ইঞ্জিনিয়ারদের জন্যে কর্ম্মক্ষেত্রের সম্প্রসারণ প্রভৃতি বিষয় ওঠে। তাছাড়া চতুর্থ পরিকল্পনাকালে কৃষি ও শিল্পোৎপাদন এবং রপ্তানীর লক্ষ্যমাত্রা খুঁটিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়।

চিনি শিল্প কি রাষ্ট্রায়ত্ব করা উচিত?

একজন শিল্পপতি এবং বিজ্ঞান সভার একজন সদস্য এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী অভিমত প্রকাশ করেছেন

রাষ্ট্রীয়করণ ব্যবস্থা প্রচণ্ড এক বাধা হয়ে দাঁড়াবে

ভারত সরকারের প্রকাশ্যে ঘোষিত নীতি হল এই যে ভারতের অর্থনীতি হবে মিশ্রিত যেখানে সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই সমৃদ্ধি অর্জ্জন করতে পারবে। কাজেই চিনি শিল্পকে যদি রাষ্ট্রায়ত্ব করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাহলে তা নীতিবহির্ভূত কাজ হবে। চিনিশিল্প হ'ল দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প এবং তা রাষ্ট্রায়ত্ব করা হলে, বেসরকারী শিল্পোৎসাহীদের সরকারের প্রতি আস্থা কমে যাবে এবং শিল্পোন্নয়নের পথে তা প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়াবে। উত্তরপ্রদেশ এখনই শিল্পের ক্ষেত্রে অনুন্নত একটি রাজ্য এবং রাষ্ট্রীকরণ সম্পর্কে এইসব আলোচনা রাজ্যটির পক্ষে মঙ্গলজনক হবেনা।

অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে সরকারী সংস্থাগুলির কাজ, সাধারণভাবে বলতে গেলে সন্তোষজনক নয়। বেসরকারী ক্ষেত্রের কাজে কোন ত্রুটি নেই এ কথা আমি বলতে চাইনা তবে লগ্নীর ক্ষেত্রে এগুলি ভালো কাজ ক'রে। সরকারী ক্ষেত্রে প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে কিন্তু লাভ বিশেষ কিছু হয়নি, অপরপক্ষে বেসরকারী ক্ষেত্রে লাভের পরিমাণ হ'ল শতকরা ১৯ ভাগ। চিনি শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ব করা হলে, আরও কালো বাজারের সৃষ্টি হবে এবং দেশের পক্ষে তা মোটেই মঙ্গলজনক হবে না।

অতীতেও চিনির কারখানা বিশেষ ক'রে উত্তর প্রদেশে, চিনির কারখানা সরকারী পরিচালনায় আনা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সরকার ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়েছেন এবং পরে সেগুলি আবার বেসরকারী পরিচালনায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। সরকারের পরিচালনায় থাকার সময় এগুলির অবস্থা যে আরও খারাপ হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। বেসরকারী ক্ষেত্রে প্রায় ১৬০টি কারখানা আছে, আর সরকার যদি কয়েকটা কারখানা চালাতেই অক্ষম হয়ে থাকেন তাহলে, আমার মনে হয়, তাঁরা ১৬০টি কারখানা চালাতে পারবেন না।

প্রদীপ নারাং
শিল্পপতি

প্রতিযোগিতা এবং ক্ষতির ফলে কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে বেসরকারী পরিচালকদের সব সময় সতর্ক থাকতে হয়, ফলে তাঁরা সব সময়েই সব দিক ভেবে চিন্তে কাজ করেন। সরকারী তরফের ইস্পাত শিল্পগুলির অবস্থা দেখলে দুঃখ হয়। প্রতি বছর এগুলিতে ক্ষতি হচ্ছে এবং সরকার টাকার জোগান দিয়ে এগুলিকে বাঁচিয়ে রাখছেন এবং তাঁদের লগ্নী থেকে কোন লাভ পাচ্ছেন না। এই শিল্পগুলি যদি বেসরকারী পরিচালনায় থাকতো তাহলে হয় সেগুলি থেকে লাভ হতো নয়তো বন্ধ হয়ে যেতো আর ব্যবহারকারীদের ক্ষতি বাড়তো না।

ভারতকে যদি শিল্পের দিক থেকে উন্নতি করতে হয় তাহলে সরকারকে, এই বাঁচিয়ে রাখার নীতি পরিত্যাগ করতে হবে। সরকারী এবং বেসরকারী তরফের সমস্ত সংস্থাগুলির মধ্যে যাতে তীব্র প্রতিযোগিতা থাকে সেই রকম অবস্থা সৃষ্টিতে উৎসাহ দিতে হবে। আমি অবশ্য স্বীকার করি যে দেশের অনেক জায়গায় বিশেষ করে উত্তর প্রদেশে এমন অনেক চিনির কারখানা আছে যেগুলির অবস্থা ভালো নয় এবং চিনি শিল্প যদি রাষ্ট্রায়ত্ব করা হয় তাহলেও সেগুলির অবস্থা তাই থাকবে। নানা কারণে এই রাজ্যে কয়েকটি কারখানার অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে। অনেক অঞ্চলে ভালো জলসেচের ব্যবস্থা নেই এবং বহু পরিমাণ আখে, গুড় ইত্যাদি তৈরী করা হয়। তাছাড়া পোকাতেও অনেক সময় আখের চাষের ক্ষতি করে। এই সব অসুবিধে দূর করতে না পারলে সরকারও এগুলিকে লাভজনক সংস্থায় পরিণত করতে পারবেননা। আখের উৎপাদন যাতে বাড়ে তা দেখাই হল সরকারের প্রধান কাজ। আখের উৎপাদন বাড়লে চাষীরাও আখের চাষ বাড়াতে উৎসাহী হবেন। কারখানাগুলি যদি

নিয়মিতভাবে আখের সরবরাহ পায় তাহলে চিনিশিল্পেরও উন্নতি হবে। আখের উৎপাদন বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে রাষ্ট্রীয়করণ সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করার মানে নেই। রাষ্ট্রায়ত্ব করা হোক বা না হোক, যথেষ্ট পরিমাণে কাঁচামালের সরবরাহ না থাকলে কোন শিল্পই সমৃদ্ধ হতে পারেনা।

গত কয়েক বছর যাবৎ চিনি শিল্প এত কঠোর সরকারী নিয়ন্ত্রণে রয়েছে যে, এটি রাষ্ট্রায়ত্ব করার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। রাষ্ট্রীয়করণ হল নিয়ন্ত্রণের চাইতেও এক ধাপ ওপরে আর সেই ব্যবস্থা শিল্পটির সর্ব্বনাশ ডেকে আনবে। ভারতে চিনি শিল্পের যে অবস্থা তাতে আমার মনে হয় যে এটি রাষ্ট্রায়ত্ব করা হলে সরকার ইচ্ছে করে আর একটি শিরঃপীড়া ডেকে আনবেন।

লক্ষ লক্ষ চাষী এই চিনিশিল্পের ওপর নির্ভরশীল এবং অবিবেচনামূলক কোন ব্যবস্থা আমাদের দেশের, বিশেষ করে, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, মাদ্রাজ ও মহীশূরের মতো রাজ্যের কৃষি অর্থনীতিকে বিরাট বিপদের সম্মুখীন করবে। উৎপাদকরা যত অযৌক্তিক দাবিই করুকনা কেন, তা প্রত্যাখ্যান করার দায়িত্ব এখন শিল্পপতিগণের। কিন্তু এটি যদি রাষ্ট্রায়ত্ব করা হয় তাহলে সরকারকে সোজাসুজি উৎপাদকদের সম্মুখীন হতে হবে। শিল্পপতিরা সরকার ও উৎপাদকদের মধ্যে একটা চাপরোধক শক্তি হিসেবে কাজ করেন।

এমন আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যেগুলির প্রতি সরকারের মনযোগ দেওয়া উচিত। আমার মনে হয় যে অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের বিফলতা থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে, চিনি শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ব করার কথা বলা হচ্ছে। দুর্ভাগ্যের কথা হল, সরকারের প্রত্যেকটি কাজের পেছনেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে। সরকার যদি রাজনীতিকে, অর্থনীতি থেকে পৃথক ক'রতে না পারেন তাহলে কোন দেশই এগিয়ে যেতে পারেনা। শিল্পায়নের মাধ্যমে সামাজিক লক্ষ্যগুলি পূরণ করা হবে বলে বর্ত্তমানে অনেক কথা শোনা যায়। আমি তার বিরোধী নই। তবে অর্থনৈতিক লক্ষ্যগুলিকে বলি দিয়ে সামাজিক লক্ষ্যগুলি অর্জ্জন করার চেষ্টা করা উচিত নয়। কিন্তু বর্ত্তমানে তাই করা হচ্ছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়করণের কোন স্থান নেই।

রাষ্ট্রীয়করণ নতুন জীবনের সঞ্চার করবে

জি. সিং
বিধান সভা সদস্য

আমি প্রায়ই দেখেছি যে আমার উত্তর প্রদেশের শিল্পপতি বন্ধুরা, রাষ্ট্রীয়করণের দাবির বিরুদ্ধে তিনটি খুব জোরালো যুক্তি দেখান।

তাঁদের প্রধান যুক্তিটি হ'ল, সরকার যদি কোন শিল্প তাঁদের আয়ত্বে আনেন তাহলে সেটির অগ্রগতি রুদ্ধ হতে বাধ্য। এর কারণ? এর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। একমাত্র কারণ হ'ল সকলেই ধরে নেন যে, সরকার হ'ল নিকর্ম্মা এবং দুর্নীতিপূর্ণ। সুতরাং তাঁরা যুক্তি দেখান যে, রাষ্ট্রীয়করণ, শিল্পের উন্নতিতে বাধা দেবে। তাঁদের দ্বিতীয় যুক্তি হ'ল—চিনি শিল্প হ'ল দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প—উত্তর প্রদেশে অবশ্য এটা হ'ল বৃহত্তম শিল্প। কাজেই এই শিল্পটি রাষ্ট্রায়ত্ব করা হলে অন্যান্য শিল্পগুলির উৎসাহে ভাটা পড়বে এবং তা দেশের অর্থনীতিকে ভীষণ বিপদে ফেলবে। তাদের অনুকূলে তৃতীয় যুক্তি হ'ল, সরকার যদি সত্যিই শিল্পটি রাষ্ট্রায়ত্ব করেন তাহলে তাঁদের বিপুল পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। জনসাধারণের এখন যে কর ভার রয়েছে তার ওপরে আরও কর চাপিয়ে সরকারকে এই ক্ষতিপূরণের অর্থ সংগ্রহ করতে হবে।

এবারে এই যুক্তিগুলি একে একে পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক।

এই শিল্পের উত্তর প্রদেশের প্রতিনিধিরা যখন বলেন যে সরকারি নিয়ন্ত্রণে এলে শিল্পগুলি তাদের দক্ষতা হারাবে তখন সত্যিকথা বলতে গেলে আমার অত্যন্ত হাসি পায়। উত্তর প্রদেশে সেখানে শতকরা ৯।। ভাগ চিনি নিষ্কাশিত হয় যেখানে মহারাষ্ট্রে হয় শতকরা ১১।। ভাগ। মহারাষ্ট্রের এই শতকরা ১১।। ভাগ হল মোটামুটি হিসেব। সমবায় ক্ষেত্রের কারখানাগুলিতে এর চাইতেও বেশী উৎপাদিত হয়। শতকরা ২ ভাগের পার্থক্য তেমন কিছু নয় এ কথা মনে করা উচিত নয়। কিন্তু এবস্থায় উত্তর প্রদেশের প্রতিনিধিরা কি শিল্পের দক্ষতা নিয়ে বড়াই করতে পারেন। চিনির উৎকর্ষতার ক্ষেত্র সম্পর্কেও বলা যায় যে চিনির মধ্যে চিনির পরিমাণেও যদি শতকরা মাত্র ৫ ভাগের পার্থক্য থাকে, তাহলেও চিনির উৎপাদনের পরিমাণের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ঘটানো যায়। এর অর্থ হ'ল আখ থেকে যদি শতকরা ২ ভাগ কম চিনি নিষ্কাশন করা হয় তাহলে লাভের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। কাজেই উত্তর প্রদেশের যে শিল্পগুলির অবস্থা এতো

চমৎকার, সেখানে এগুলি যদি সরকারী নিয়ন্ত্রণে চলে যায় তাহলে এগুলির উৎপাদন ব্যাহত হবে, এই "ধুয়া" তোলা তাঁদের পক্ষে উচিত নয়।

উত্তর প্রদেশের ১২টির চাইতেও বেশী চিনির কারখানার মালিক জানিয়েছেন যে এগুলি ভালো চলছে না এবং সরকারের কাছ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য না পেলে তাঁরা এগুলি চালু রাখতে পারবেন না। সরকার সেগুলির পরিচালনাভার নিয়ে নেন। সরকারের তথাকথিত অদক্ষ হাতে এমন যাদুমন্ত্র ছিলো যে এগুলি সরকারের সেবা-শুশ্রূষায় আবার স্বাস্থ্য ফিরে পেলো। তখন আবার মালিকরা সেগুলি ফিরে পাওয়ার জন্য আকাশ পাতাল তোলপাড় করতে সুরু করলেন। তারপর তাঁরা যখন সত্যিই সেগুলির মালিকানা আবার ফিরে পেলেন তখন কি হ'ল? বেশীরভাগ কারখানাই আবার প্রায় অচল হয়ে পড়লো। এই অবস্থা কি প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্রায়ত্ত করা হলে শিল্পটির ক্ষতি হবে?

চিনি শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করা হলে দেশের অন্যান্য শিল্পগুলির উৎসাহ কমে যাবে এই যুক্তির উত্তর এতেই রয়েছে। আমরা এখনই দেখলাম যে, রাষ্ট্রায়ত্ত করা হলে চিনি শিল্পের উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনাই বরং বেশী আর তাঁদের যুক্তি অনুসারেই বলা যায় চিনি শিল্পের উন্নতি হলে অন্যান্য শিল্পেরও উন্নতি হবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত করা হলে ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়ার জন্য সরকারকে আরও কর বসাতে হবে তাঁদের এই তৃতীয় যুক্তিটি এবারে বিবেচনা ক'রে দেখা যাক। এই যুক্তির একটা হাস্যকর দিকও রয়েছে। যখন তাঁরা বিপুল পরিমাণ সাহায্যের জন্য বা নানা ধরণের সংরক্ষণের জন্য সরকারের কাছে আসেন তখন তাঁরা এই শিল্পটির বিপদের গুরুত্ব বাড়াতে ইতস্ততঃ করেন না, কিন্তু তাঁরা যখন ক্ষতিপূরণের কথা বলেন তখন তাঁরা নিজেদের বিশ্বের সমৃদ্ধ-তম ব্যক্তি বলে মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে সব কিছু উপযুক্তভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখা হলে, সরকারকে হয়তো খুব বেশী ক্ষতি-পূরণ দিতে হবেনা। নাগুক, জাতির মঙ্গলের তা দেখেন তাতে সন্দেহ নেই। চাইতে বড় কথা হল দেশের লক্ষ আখ চাষীর স্বার্থ আর উপেক্ষা করা যায়না। আমাদের কাছে এখন দুটি পথ খোলা আছে। শিল্পটি যেমন চলছিলো, হয় তেমনি চলতে দিতে হবে নয়তো শিল্পটাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এবং কয়েকজনের টাকার থলে ভারি করতে না দিয়ে, সংশ্লিষ্ট লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য এটিকে সরকারী বা সমবায় ক্ষেত্রের অধীনে আনতে হবে।

চিনিশিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করার পেছনে যে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই তা আমি দৃঢ়কণ্ঠে প্রকাশ করতে চাই। প্রকৃতপক্ষে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করার বহু পূর্ব্বে দেশে, চিনি শিল্পটির রাষ্ট্রায়ত্ত করার দাবি জানানো হচ্ছে।

(আকাশবাণীর নিউজ সার্ভিসেস ডিভিসনের সৌজন্যে)

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশনের সাফল্য

গত বছরে স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের রপ্তানী শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। আগে যেখানে রপ্তানীর মূল্য ছিল ২৩.৬ কোটী টাকা, তা পরে গিয়ে দাঁড়ায়, ৪৮.৫ কোটীতে। ফলে ব্যবসায়িক লেনদেনের পরিমাণ ১৯৬৭-৬৮-র ১৪১.২ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৯৬৮-৬৯ সালে দাঁড়ায় ১৬৭.২ কোটীতে।

মুনাফার পরিমাণ ১৯৬৭-৬৮তে হয়েছিল ২.৩ কোটী টাকা আর ১৯৬৮-৬৯ সালে ৪ কোটী। ফলে লভ্যাংশের পরিমাণ গত বছরের শতকরা ১৫ টাকার চেয়ে বেশী দাঁড়িয়েছে। এখন থেকে লভ্যাংশ দেওয়া হবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে।

পরিচালনা-ব্যয় ও ব্যবসায়িক প্রয়োজনে খরচ খরচার পরিমাণ গতবছরের ৩.৮ কোটী টাকা থেকে ৩.৯ কোটীতে । ব্যয় ও বিক্রয়ের আনুপাতিক হিসেব ২.৭ শতাংশ থেকে কমে গিয়ে ২.৩ শতাংশ হয়েছে।

কর্পোরেশন হিসেবপত্র রাখা, তথ্য যোগান ও পরিচালনের ক্ষেত্রে অনেক আধুনিক পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করেছে, যা'র কয়েকটি, ভারতীয় ব্যবসাক্ষেত্রে এখনও পুরোপুরি চালু হয়নি।

বর্ত্তমানে বিদেশে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশনের ১৩টি অফিস আছে। এগুলি আছে মস্কো, পূর্ব্ব বার্লিন, বুডাপেশৎ, প্রাগ, রটারড্যাম, মন্ট্রীল, ব্যাঙ্কক্, কলম্বো, সিডনী, বেইরুট, তেহ্রান্, নাইরোবি ও লেগস-এ।

এ বছরের শ্রেষ্ঠ ধাতু বিশেষজ্ঞ

কেন্দ্রীয় ইস্পাত ও ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং মন্ত্রক ধাতুতত্ত্ব গবেষণায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকার জন্যে দেশের ৬জনকে, এ বছরের ১৪ই নভেম্বর, সপ্তম জাতীয় ধাতু বিশেষজ্ঞ দিবসে পুরস্কৃত করেছে। প্রত্যেকটি পুরস্কারের মূল্য হ'ল নগদ ৩,০০০ টাকা।

এঁরা হলেন—

শ্রী ভি.কে. ভাণ্ডারী—কলকাতার বে এ্যাণ্ড ওর্স্ কোম্পানীর, গুণ উৎকর্ষতা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন। প্রধান।

শ্রী পি. কে. জেনা—বারানসীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

শ্রী বি. কে. মজুমদার—ধানবাদের সেন্ট্রাল ফুয়েল রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্ট্ ডিরেক্টার।

ডাঃ জি. মুখার্জ্জী—দুর্গাপুরের স্টীল লিমিটেডের মিশ্র কারখানার চীফ্ মেটালার্জিষ্ট্।

শ্রী বলবন্ত সিং—জামসেদপুরের টাটা রন এ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানীর সুপারিন্টেণ্ডেন্ট্।

শ্রী এস. পি. প্রোধিয়া—ভিলাই-এ, স্থান স্টীল লিমিটেডের ইস্পাত কারখানার জেনারেল ফোরম্যান।

আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ

সব প্রাণীই তাদের, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পাবে। প্রাণীজগতের মধ্যে মানুষ আবার সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বলে তারা আরও সহজে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে।

গত দশ বছরে মানুষ আবহাওয়াকেও অনেকখানি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে। এই ক্ষেত্রে দুটি সাফল্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। একটি হ'ল বিমান বন্দরের আকাশ থেকে শীতের কুয়াশা সরিয়ে দেওয়া অন্যটি হ'ল, বর্ষণের সম্ভাবনা আছে এই রকম মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত করানো। এখন বেশ সুনিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে আগামী দশ বছরের মধ্যে মাঝারি ধরণের আবহাওয়া ব্যবস্থা কার্য্যকরী হবে।

তবে দুর্ভাগ্যের কথা হ'ল এই যে আবহাওয়াকে এই রকম স্ববশে নিয়ে এলে জীবমণ্ডলের ওপর তার কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তার এখনও হিসেব নেওয়া হয়নি।

জলচক্র অর্থাৎ জল থেকে বাষ্প, ঘনীভূত বাষ্প থেকে মেঘ বা কুয়াশা আবার মেঘ থেকে জল, জলের এই চক্রাকার আবর্ত্তনের দিকেই এখন লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। ভীষণ ঝড়কে নিয়ন্ত্রণ করা, জলের দুষ্পাপ্যতা হ্রাস করা এবং মরসুমের সময় ছাড়াও বৃষ্টিপাত করানো এইগুলিই হ'ল বর্ত্তমানের লক্ষ্য। এগুলি আবার জলচক্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনটি সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

প্রথমটি হল, কোন একটি অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়ালে তার অপর দিকের অন্য অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যথেষ্ট কমে যায়।

দ্বিতীয়টি হল, মোট বৃষ্টিপাতের পার্থক্য। মানুষ যদি ভীষণ ঝড়কে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে—তাহলে তাকে এর প্রতিক্রিয়াগুলি নিয়ন্ত্রণ করার কৌশলও শিখতে হবে। এই রকম ঝড় ক্ষতিকর হলেও, সেগুলিই আবার মরসুম অনুযায়ী বার্ষিক বৃষ্টিপাতের মূলে রয়েছে।

তৃতীয় সমস্যাটি হ'ল, বৃষ্টিপাত করানোর জন্য যে রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হয় সেগুলির খানিকটা বিষ-ক্রিয়া আছে (সিলভার আইওডিনের মতো)। কাজেই বহুদিন ধরে ব্যবহার করা হলে জীবমণ্ডলে বহু পরিমাণ বিষময় পদার্থ জমে যাবে। কাজেই প্রকৃতিকে আয়ত্বে আনার জন্য মানুষের হাতে এটা একটা অস্ত্র হলেও, আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটাই হয়তো মানবজাতির পক্ষে একটা বিপজ্জনক ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

বর্ষণের সম্ভাবনাপূর্ণ মেঘে বিমানযোগে রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ভারত-থাই বাণিজ্য সম্পর্ক

(১২ পৃষ্ঠার পর)

একটি যুক্ত প্রচেষ্টা কৃত্রিম তন্তু উৎপাদন করবে। এগুলি ছাড়াও, সিমেন্ট, কাঁচ, রাবার, রং, কাগজ, চিনি এবং বস্ত্রশিল্পে অদূর ভবিষ্যতে ভারত ও থাইল্যাণ্ডের যুক্ত প্রচেষ্টা সফল হয়ে উঠতে পারে। আমাদের দেশ এবং থাইল্যাণ্ড হ'ল বিশ্বের প্রধান লাক্ষা ও গালা উৎপাদনকারী দেশ। এগুলির পরিবর্ত্ত হিসেবে অন্যান্য জিনিস ব্যবহৃত হচ্ছে বলে বিশ্বের বাজারে এগুলির চাহিদা কমছে। কাজেই এই দুটি জিনিসের মূল্য বৃদ্ধিতেও দেশ দুটি পরস্পরের সহযোগিতা করতে পারে। পরস্পরের যাতে লাভ হতে পারে এই ধরনের একটা ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে দুই দেশের বিশেষজ্ঞগণ শিগগীরই একটি বৈঠকে মিলিত হবেন।
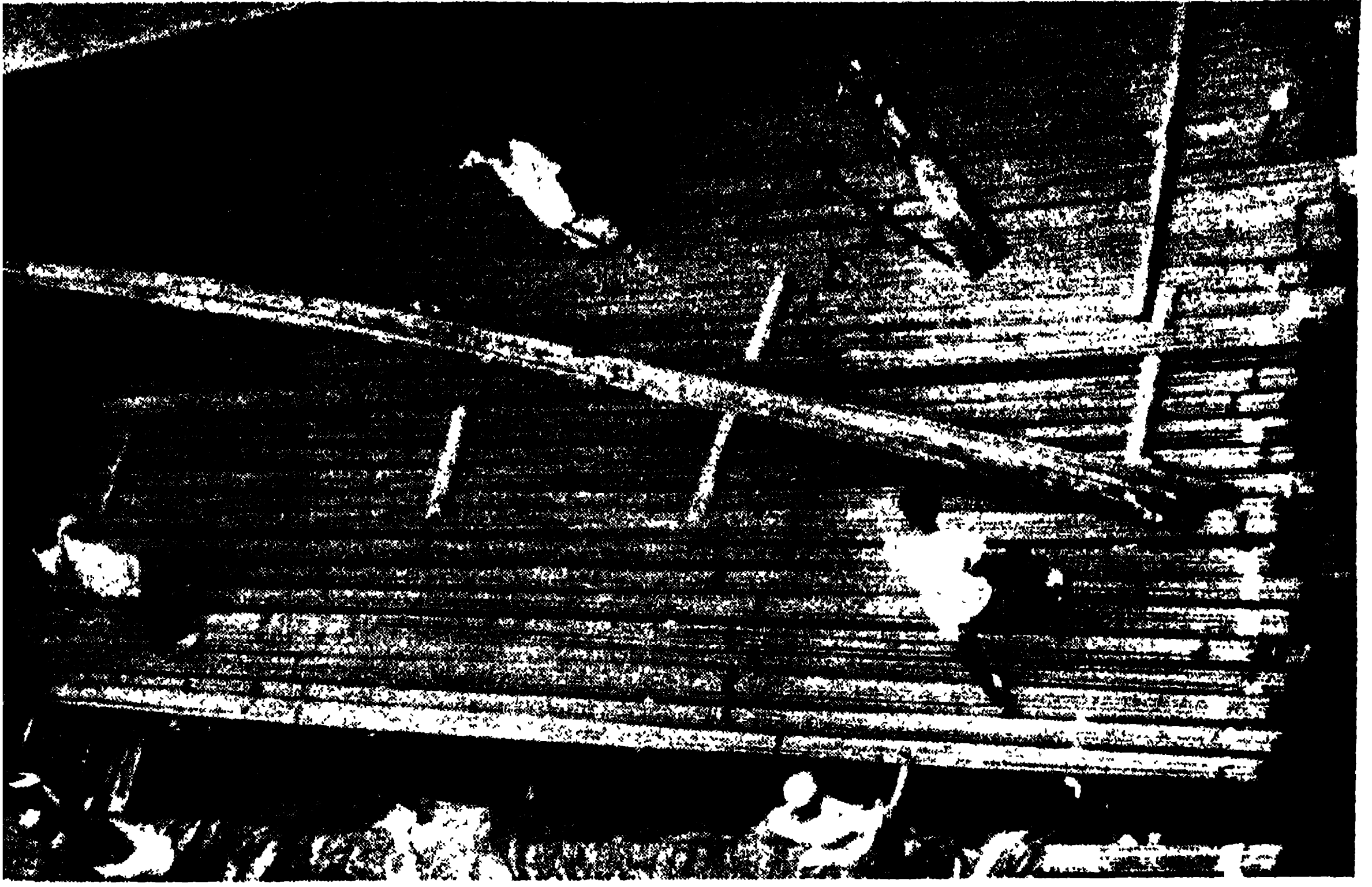
ওপরে : টাটার তৈরি রিব্‌ড বার।
নীচে : জাহাজে তোলা হচ্ছে।

রপ্তানীতে প্রশংসনীয় সাফল্য

টাটার কৃতিত্ব

এই প্রথম, টাটা এক্সপোর্ট্‌স্‌ লিমিটেড যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকায় 'রিব্‌ড্‌ রীইন্‌ফোর্সিং বার' (Ribbed reinforcing bar) রপ্তানী করেছে। সে আজকের কথা নয়। ৬১ বছর আগে, জামসেদপুরে ভারতের প্রথম ইস্পাত কারখানা 'টিসকো' (Tisco) প্রতিষ্ঠায় মার্কিন ইঞ্জিনিয়ারর‍া ভারতকে সাহায্য করতে এসেছিলেন। তা'রপর থেকে 'টিসকো' উন্নতির পথে এগিয়ে গেছে। আর ৬১ বছর পর, আমেরিকায় টিসকোর ইস্পাত রপ্তানীর সঙ্গে সঙ্গে প্রগতির চাকা পুরো ঘুরল।

'টিসকো-র' ইস্পাতের বার-এর জন্যে বরাত দিয়েছে টেক্‌সাসের কমার্সিয়াল মেটাল্‌স্‌ কোম্পানী। বরাতের মূল্য হ'ল ৭৫ লক্ষ টাকা; যোগানের পরিমাণ ১৭,৫০০ টন। অদূর ভবিষ্যতে এই জিনিষের জন্যে আরও বড় বরাত পাবার আশা আছে। এই বার তৈরী হয়েছে টাটার মার্চেন্ট মিল্‌-এ। সময়মত বরাতের যোগান পুরো করায় মিল-এর কর্ম্মীদের অনলস পরিশ্রম প্রশংসনীয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, বছরে, ১০ কোটি টন ইস্পাত তৈরী হয়। এই গড় হিসেব অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র, সারা বিশ্বের ইস্পাত উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে প্রথম। সেই কারণে যুক্তরাষ্ট্রে ইস্পাতের তৈরী জিনিষ পাঠাবার বরাত পাওয়া আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণ অসাধারণ
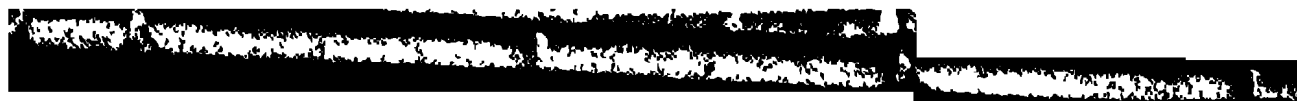
৪০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা

সামান্য এক টুকরো জমি আর কিছুটা পরিশ্রম অসামান্য ফল দিতে পারে। ত্রিপুরার একজন কৃষক যে সাফল্যলাভ করেছেন তা থেকেই এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

চাওমাইবাড়ী গ্রামের রাধাচরণ পাল, মাত্র ০.৪ একর জমিতে সব্জি চাষ ক'রে ১৫০০ টাকা উপার্জ্জন করেন। তিনি এই প্রথমবার কপির চাষ করে, সব্জি উৎপাদন প্রতিযোগিতায় বাঁধাকপিতে প্রথম পুরস্কার ও ফুলকপিতে তৃতীয় পুরস্কার পান। প্রথম পুরস্কারটির সঙ্গে, জাপানে তৈরি আগাছা পরিস্কার করার একটি যন্ত্রও দেওয়া হয়েছে।

শ্রীপালের জমির পরিমাণ বেশী নয়। তাঁর যে দুই একর জমি আছে তা থেকে কি ক'রে বেশী আয় করা যায় তাই ছিল তাঁর সমস্যা। তেলিয়ামুড়া ব্লকের সম্প্রসারণ অফিসার তাঁকে বাঁধাকপি ও ফুলকপির চাষ করতে বলেন এবং এগুলির চাষে তাঁকে সাহায্য করেন।

পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে শ্রীপাল ০.৪ একর জমিতে বাঁধাকপি ও ফুলকপি লাগাবেন বলে স্থির করলেন।

ত্রিপুরার কৃষি বিভাগ শ্রীপালকে উন্নতধরনের বীজ সরবরাহ করলেন।

প্রচুর গোবরসার, কাঠের ছাই এবং ২ কেজি সুপারফসফেট মাটিতে ভালো ক'রে মিশিয়ে তিনি চারা তৈরি করলেন। সারি সারি ক'রে বীজ পুঁতে তিনি তার ওপর মিহি মাটি ছড়িয়ে দেন। পনের দিন পর চারাগুলির ওপর 'ক্যান' সার ছড়িয়ে দিয়ে জল দিয়ে দেন। তিনি দুইবার আগাছা পরিস্কার ক'রে দেন এবং দুইবার জল দেন।

তিনি প্রধান ক্ষেতে ৬০ মণ পচা সার দিয়ে জমি তৈরী করেন। তারপর ৬০ সেঃ মীঃ দূরে দূরে, (১৫ সেঃ মীঃ × ১৫ সেঃ মীঃ) আকারের গর্ত্ত খুঁড়ে নেন। এই সব গর্ত্তের প্রত্যেকটিতে তারপর পচাসার, এক আউন্স ক'রে সুপার ফসফেট এবং ০.৫ গ্রাম প্যারাথীন দিয়ে ভালো ক'রে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেন।

ওদিকে চারাগুলি বেশ সতেজ হয়ে উঠছিল। সেগুলির বয়স যখন ২৫ দিন হ'ল, তখন সেগুলিকে এই সব গর্ত্তে লাগিয়ে দেওয়া হ'ল। এই রকমভাবে শ্রীপাল তাঁর জমিতে ২০০০ ফুলকপির চারা লাগিয়ে দেন।

১০।১২ দিন পর পর তিনি জমিতে জলসেচ দেন। শ্রীপাল প্রথমবারে ৪০ দিন পর এবং দ্বিতীয় বারে ৫৫ দিন পর চারাগুলির গোড়ার মাটি আলগা ক'রে দেন। মাটি খুঁড়ে দেওয়ার পর প্রত্যেকবারই জল দেওয়া হয় এবং সবশেষে এই দুই রকমের কপি থেকে শ্রীপাল ১৫০০ টাকা লাভ করেন।

কথায় কম কাজে দড়

নদীয়া জেলার, রাণাঘাটের কাছে পাটুলীতে আর পাঁচজন চাষীর মধ্যে জগৎ দাস হ'লেন একজন। স্বভাবে লাজুক, ভদ্র ও নম্র, জগৎ কথা বলেন কম কিন্তু কাজে অনেকের চাইতে পোক্ত। যেমন ধরুন গ্রামের কাছে ভারত-জাপান, কৃষি-খামার আছে, সেখানকার কাজকর্ম্ম ভাল ক'রে দেখার জন্যে যখন তিনি যেতেন, তখন তিনি কেন যেতেন, তা' কলিয়ে পাঁচজনের কাছে বলেননি। ঐ খামারে ধানচাষের যে পদ্ধতি তিনি দেখে আসেন, স্থানীয় এক্সটেনশান অফিসারদের সহায়তায় সেই পদ্ধতি অনুযায়ী তিনি নিজের ক্ষেতে ধানের চাষ করেন। তাঁর ১২ বিঘা জমির মধ্যে এক বিঘায় তিনি আই.আর-৮ বোনেন এবং গত মরসুমে ২০ মণ ধান তোলেন। ঐ এলাকায় বিঘাপ্রতি সাধারণতঃ ৮ থেকে ১০ মণ ধান হয়। শ্রীদাস দশ গাড়ী গোবর, আধ মণ খইল ও দুই কিলোগ্রাম যুরিয়া মাটিতে মিশিয়ে দেন এবং ধান না পাকা পর্য্যন্ত গাছগুলিকে তিন ইঞ্চি জলে ডুবিয়ে রাখেন।

দাসের পরিবারে সবশুদ্ধ ন'জন লোক। উনিই একমাত্র বড় ও উপার্জ্জনক্ষম। কিন্তু ঘরে-বাইরের দায়িত্ব তিনি সমান যোগ্যতার সঙ্গে পালন ক'রে যাচ্ছেন।

শিক্ষকের আবিষ্কার

মারাঠাওয়াড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার লেকচারার ডাঃ ভি. ভি. ইটাগী কার্ব্বন-ডায়োক্সাইড ইনফ্রা-রেড্ লেজার রশ্মি (LASER) তৈরী করতে এবং ল্যাবরেটারীর যন্ত্রপাতির সাহায্যে লেজার বীম বার করতে সফল হয়েছেন। সম্প্রতি ডাঃ ইটাগী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে দর্শকদের উপস্থিতিতে তাঁর আবিষ্কারের সাফল্য প্রমাণ করেছেন।

বিকীরণের মাধ্যমে আলোর তেজ বৃদ্ধি করার একটা প্রক্রিয়াকে লেজার বলা হয় এবং এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে হীরের মত শক্ত ও নিরেট জিনিষেও সূক্ষ্ম ছিদ্র করা যায়।

ফোটো কনডাকটিভ সেল্

পুণার জাতীয় রাসায়নিক গবেষণাগারে ফোটো সেনসিটিভ্ ক্যাডমিয়াম্ ক্রীস্টাল্ প্রয়োগ ক'রে চার রকমের সেল্ তৈরী করা হয়েছে, যা' ফোটো তোলার উপযুক্ত। ফোটো সেনসিটিভ সেল, স্বয়ংক্রিয় তাপনিয়ন্ত্রক যন্ত্রে, এক্স-রে-বিশ্লেষণে, স্বয়ংক্রিয় রাস্তার আলোর সুইচ-এ, কলকারখানায় নিরাপত্তামূলক যন্ত্রে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
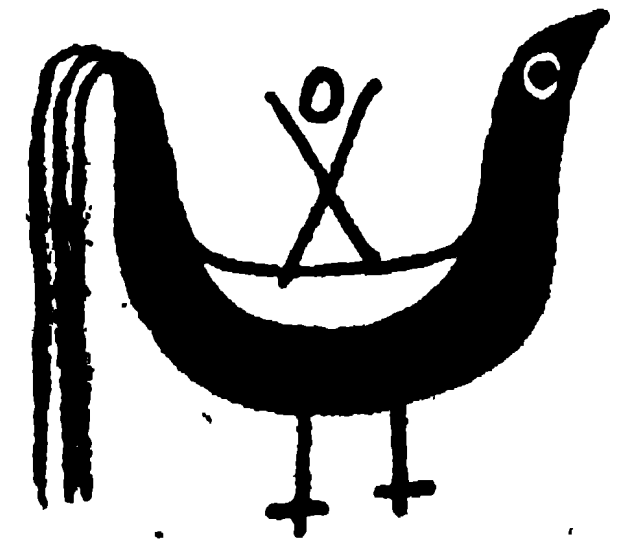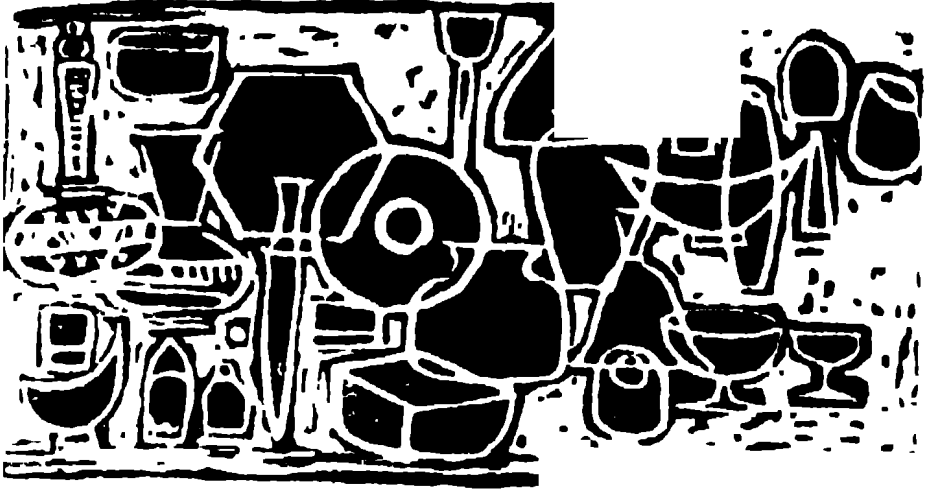
উন্নয়ন বার্তা

★ ভারতীয় তৈল কর্পোরেশন হলদিয়া থেকে সিংহলে মোটর স্পিরিটের প্রথম কিস্তী হিসেবে ৩,৫০০ টন স্পিরিট জাহাজে চালান দিয়েছে। ভারত ৫৩,০০০ টন মোটর স্পিরিট ও ৬১,০০০ টন হাই স্পীড্ ডীজেল রপ্তানী করবে ব'লে সিংহলের সঙ্গে যে চুক্তি করেছে এই চালান তারই অন্তর্ভুক্ত! এতে বৈদেশিক মুদ্রায় আয় হবে ১.৮০ কোটি টাকার মত।

★ পশ্চিম জার্ম্মানী ১৯৬৯-৭০ সালের জন্যে ভারতকে জার্ম্মান মুদ্রায় ৪৬.৮৮ কোটি টাকার সমান আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে। এই সাহায্যের মধ্যে পরিকল্পনার জন্যে, পরিকল্পনা বহির্ভূত কার্য্যসূচীর জন্যে এবং ঋণ পরিশোধের জন্যে অর্থ আছে।

★ রাজস্থানে, আলওয়ার জেলার সুনেল শহরে জল ফিলটার করার একটা যন্ত্র চালু হয়েছে। এটির জন্যে খরচ হয়েছে ৭৫,০০০ টাকা। এর সাহায্যে দৈনিক দু' লক্ষ গ্যালন জল পরিশুদ্ধ করা যাবে যার থেকে আন্দাজ ৮,০০০ লোক উপকৃত হবেন।

★ অন্ধ্র প্রদেশের নাগার্জ্জুন সাগর প্রকল্পের ডানদিক ও বাঁদিকের খালে জল ছাড়া হয়েছে। এতে প্রায় ৬ হাজার লক্ষ একর জমিতে জলসেচ দেওয়া যাবে।

★ গোয়ায় নতুন ধরণের ট্রলার (১৭.৫ মীটার লম্বা), নাম-'মৎস্যগন্ধা' তৈরী হয়েছে ও সেটিকে জলে ভাসানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রক যে ২০টি ট্রলারের বরাত দিয়েছে এটি তারই একটি।

★ হিসার থেকে জয়পুরে একটি ২২০ কিলো ওয়াট বিদ্যুৎ-এর লাইনের উদ্বোধন করা হয়েছে। ২৬০ কিলো মীটার লম্বা এই লাইন বসাতে খরচ হয়েছে ৫ কোটি টাকা। এখন রাজস্থান, এই লাইনের মাধ্যমে, ভাকরা-নাঙ্গাল থেকে বিদ্যুৎশক্তি পাবে।

★ চলতি বছরে কেরালায় চাউল উৎপন্ন হয়েছে ১৬ লক্ষ টন। গত বছরের তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ দু' লক্ষ টন বেশী।

★ একটি ভারতীয় ফার্ম্ম, এই প্রথম, পশ্চিম জার্ম্মানীতে ১২ লক্ষ টাকার ১,০০০টি মোটর রপ্তানী করেছে।

★ গত দু' বছরে ভারতে ট্র্যাক্টরের উৎপাদন দ্বিগুণ হয়েছে। ১৯৬৯ সালে মোট উৎপাদনের পরিমাণ ১৪ থেকে ১৫ হাজার হ'বে ব'লে আশা করা যায়।

★ ভারত, এ বছরে ৭০ কোটি টাকার হস্তশিল্পজাত জিনিষ রপ্তানী করেছে।

★ জাতীয় কয়লা উন্নয়ন কর্পোরেশন ১৯৬৮-৬৯ সালে ১.২২ কোটি টাকা নীট মুনাফা করেছে। ১৯৬৭-৬৮ সালে কিন্তু ৭৩ লক্ষ টাকার মত ক্ষতি হয়।

★ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্যে হেভি ওয়াটার তৈরী করার উদ্দেশ্যে ভারত একটি ফরাসী ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কনসোর্টিয়ামের সঙ্গে চুক্তি করেছে। এই কারখানায় বছরে ৬৭ টন হেভি ওয়াটার তৈরী হ'বে।

★ গত রবি মরসুমে উত্তর প্রদেশে যে গম হয়েছে, তা গতবছরের রেকর্ড উৎপাদনের চেয়েও তিন লক্ষ টন বেশী।

★ সরকারী প্রতিরক্ষা সংস্থার উৎপাদন বেশ বেড়ে গিয়েছে এবং গত দু' বছরে রেকর্ড পরিমাণ মুনাফা হয়েছে।

★ ক্যানাডা, ভারতের ১৪টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণে অর্থসাহায্য দিতে সম্মত হয়েছে। কেরালার ইড্ডীকি বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং কৃষি ও পরিবহনের জন্য ঐ অর্থ দেওয়া হ'বে।

★ কলকাতায় আকাশ বাণীর প্রথম সুপার মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমীটার স্থাপন করা হয়েছে। সোভিয়েট সহযোগীতায় এবং তিন কোটি টাকারও বেশী ব্যয়ে স্থাপিত এই ট্রান্সমীটারটির দরুণ দিনে ৫০০—৬০০ কিলো মীটার ও রাত্রে ২,০০০—২,৫০০ কিলো মীটার দূরত্বেও বেতার অনুষ্ঠান পরিস্কার শোনা যাবে। দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়া ও প্রতিবেশী দেশগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে এটি স্থাপন করা হয়েছে।

★ ভারত কাম্বোডিয়াকে, তার 'প্রেক নট' প্রকল্পের জন্যে ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ৫টি ফিক্সড্ হুইল যোগাতে সম্মত হয়েছে।

★ ভারত সুদানকে এক কোটি টাকা মূল্যের ২০০টি রেলওয়ে ওয়্যাগন সরবরাহ করবে

★ সরকারী তরফের পঞ্চম শোধনাগারটির উদ্বোধন করা হয়েছে। মাদ্রাজের কাছে মানালীতে ইরাণী ও মার্কিন সহযোগীতায় স্থাপিত এই শোধনাগারটি হ'ল দেশের মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক।

★ হিন্দুস্থান টেলিপ্রিন্টার সংস্থা বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগীতা ক'রে আরব দেশের টেলিপ্রিন্টার ব্যবস্থার জন্য ১৭ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সরবরাহের একটা বরাত যোগাড় করেছে।

★ নেইভেলী খনি থেকে লিগনাইট সংগ্রহের পরিমাণ ১৯৬৭-৬৮ সালের ৩৪ লক্ষ টন থেকে বেড়ে ১৯৬৮-৬৯ সালে দাঁড়িয়েছে ৪০ লক্ষ টনে।

★ বোম্বাই-এর আর্ট সিল্ক রিসার্চ এ্যাসোসিয়েশান প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্যে একটা নতুন ধরণের নাইলন কাপড় উদ্ভাবন করেছে। এর একপিঠ সাদা আর অন্য পিঠ সবুজ। এই কাপড় সহজে ছেঁড়ে না অথচ হালকা এবং এতে জল বসে না ব'লে অতি উচ্চতায় ব্যবহারের পক্ষে এই কাপড় খুব উপযোগী হ'বে।

REGD. NO. D-233

ইঞ্জিনিয়ারিং-এর টুকিটাকি খবর

ডীজেল ফোর্ক লিফ্‌ট ট্রাক

ভোলটাস (VOLTAS) সম্প্রতি একটা নতুন ধরণের ডীজেল ফোর্ক লিফ্‌ট্‌ ট্রাক্‌ তৈরী করতে শুরু করেছে। ভোলটার তৈরী বিদ্যুৎচালিত ফোর্ক লিফ্‌ট্‌ ট্রাক্‌ ইতিপূর্ব্বেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ঈটন ইয়েল এ্যাণ্ড টাউন ইনকর্পোরেটেড্‌ সংস্থার সহযোগীতায় এবং বহু গবেষণা-প্রসূত ইয়েল নক্সানুযায়ী, ভোলটার কারখানায় এই ট্রাক্‌ তৈরী হচ্ছে।

ডিজেল ট্রাকগুলি খুব দ্রুত চলে এবং বিশেষ ক'রে, এবড়ো খেবড়ো বা কাঁচা রাস্তায় কিংবা দূর ভ্রমণে ও চড়াই-রাস্তায় যাবার পক্ষে খুব উপযোগী। ইয়েল-ভোলটা ডিজেল ট্রাক্‌ এবং ব্যাটারী চালিত ফোর্ক লিফ্‌ট্‌ ট্রাকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও উপযোগীতা আছে। ক্রেতারা নিজেদের পছন্দ ও প্রয়োজন অনুযায়ী এর যে কোনোটা কিনতে পারেন।

ভোল্টার তৈরি নতুন ফোর্কলিফ্‌ট ট্রাক। এগুলির বহন ক্ষমতা হল ১৫০০ থেকে ৩৫০০ কিলোগ্রাম।

দিল্লী 'সি' এলাকার জন্যে হেভী ইলেক্ট্রিক্যাল্‌স্‌-এর টার্বাইন

রাষ্ট্রায়ত্ত হেভী ইলেকট্রিক্যাল্‌স্‌ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, যে, তাদের তৈরী ৬০,০০০ কিলো ওয়াট শক্তির বাষ্প-চালিত টার্বাইন, পরীক্ষায় উৎরে গেছে। দিল্লী 'সি'-তে যে ইন্দ্রপ্রস্থ থার্মাল স্টেশন আছে তা'র জন্যে দিল্লী বিদ্যুৎ পর্ষৎ ঐ টার্বাইনের বরাত দেয়। হেভী ইলেকট্রি-ক্যাল্‌স্‌-এর হায়দ্রাবাদ শাখা রেকর্ড সময়ে, বরাতমত, টার্বাইনটি তৈরী ক'রে দিয়েছে।

ধনধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে এবং তথ্য ও বেতার মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত হ'লেও 'ধনধান্যে' শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করে না। পরিকল্পনার বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী ক্ষেত্রে উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতটা অগ্রগতি হচ্ছে তার খবর দেওয়াই হ'ল 'ধনধান্যে'র লক্ষ্য।

'ধনধান্যে' প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে প্রকাশিত হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

নিয়মাবলী

দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়।

অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পুনঃ প্রকাশকালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার করা হয়।

রচনা মনোনয়নের জন্যে আনুমানিক দেড় মাস সময়ের প্রয়োজন হয়।

মনোনীত রচনা সম্পাদক মণ্ডলীর অনুমোদনক্রমে প্রকাশ করা হয়।

তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয়। কোনোও রচনার প্রাপ্তি-স্বীকৃতি, পত্র মারফৎ জানানো হয় না।

নাম ঠিকানা লেখা ডাকটিকিট লাগানো খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

কোনো রচনা তিন মাসের বেশী রাখা হয়না।

শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাবেন।

গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেস ম্যানেজার, পাব্লিকেশন ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী-১। এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

"ধনধান্যে" পড়ুন
দেশকে জানুন

ডিরেক্টর, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাস্ট্রিয়েল সোসাইটি লিঃ—করোলবাগ, দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত।

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

প্রথম বর্ষ চতুর্দ্দশ সংখ্যা

৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৯ : ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৮৯১

Vol.1 : No 14 : December 7, 1969

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০

টেলিগ্রাফের ঠিকানা—যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা।

ভুলি নাই

"বিজ্ঞান যদি সার্ব্বজনীন কল্যাণের উপাদান হয়ে উঠতে পারে, তাহলে আমি তার যে কোন আবিষ্কারকে শ্রেয় বলে স্বীকার করে নেব।"

—গান্ধী

এই সংখ্যায়

সংহত দৃষ্টিভঙ্গী

পল্লীভারতের ছবি দ্রুত পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। কৃষকরা তাঁদের অনাসক্তির মনোভাব পরিত্যাগ করে অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে উঠেছেন এবং সর্ব্বাধুনিক কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে খুব ঔৎসুক্যের সঙ্গে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন। প্রাক স্বাধীনতার যুগে যে কৃষি অর্থনীতিকে অত্যন্ত অবহেলা করা হ'ত, বিজ্ঞান এবং আধুনিক কৃষি পদ্ধতি তাকে একটা অর্থকরী বৃত্তিতে পরিণত করেছে। কৃষকদের যে কেবল সার, উন্নত বীজ এবং জলের মতো কৃষি সরঞ্জামের প্রয়োজন তাই নয়, উৎসাহজনক আরও কতকগুলি ব্যবস্থারও প্রয়োজন। সন্তোষজনক একটা ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা তার মধ্যে অন্যতম। বহু পূর্ব্ব থেকেই ভূমি স্বত্ব সংস্কারকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। কোন রকম অসন্তোষজনক কৃষি কাঠামো বিশেষ করে ভূমি স্বত্ব, এই উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে করা হ'ত।

প্রাক স্বাধীনতাকালে ভূমি স্বত্ব সংস্কার সম্পর্কে বেশ কিছু আইন তৈরি হয় এবং দেশে সেগুলি অংশতঃ প্রয়োগও করা হয় কিন্তু এখনও অনেক কিছু করার আছে। মধ্যস্বত্বভোগীদের উচ্ছেদ করার জন্যই রাজ্যগুলিতে আইন প্রণয়ন ক'রে সেগুলি সাধারণভাবে প্রয়োগ করা হয়। এতে প্রায় ২ কোটি প্রজা জমির মালিক হতে পেরেছেন এবং সোজাসুজি রাজ্যের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে প্রজাস্বত্ব সম্পূর্ণ নিরাপদ করা হয়েছে সেখানে জমিদার কোন জমি অধিকার করতে পারেন না। কেন্দ্রশাসিত দিল্লীতেও অনুরূপ সংরক্ষণ ব্যবস্থা রয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গে বর্গাদার ছাড়া বায়তি স্বত্ব সুনিশ্চিত করা হয়েছে। রাজস্থানে যাদের সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ জমি আছে অর্থাৎ মোট ১২০০ টাকা আয় হয় এই রকম জমির প্রজাদের স্থায়ী এবং উত্তরাধিকার স্বত্ব দেওয়া হয়েছে। গুজরাট, কেরালা, জম্মু ও কাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, ওড়িষ্যা, হিমাচল প্রদেশ এবং ত্রিপুরায় বিশেষ ক্ষেত্রে জমিদারের খাস চাষের সাপেক্ষে ভূমিস্বত্বের নিরাপত্তা নির্ভর করে। খাসচাষে নিয়ে আসার জন্য যে সময় নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হয়েছিল বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। মণিপুর এবং গোয়ায় উচ্ছেদকরণ সাময়িকভাবে রহিত করা হয়েছে। আসামে (আধিয়ারের ক্ষেত্রে), হরিয়ানা, পাঞ্জাব এবং পশ্চিমবঙ্গে (বর্গাদারদের ক্ষেত্রে) জমিদারদের খাসচাষে নিয়ে আসার অধিকার চলতে থাকার সাপেক্ষে ভূমিস্বত্বের নিরাপত্তা নির্ভরশীল। অন্ধ্র, বিহার, তামিলনাড়ু, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দাদরা, নগরহাভেলী এবং পণ্ডিচেরীর করাইকাল অঞ্চলে, জমিদারদের জমি খাস করার অধিকার নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। এই সব অঞ্চলের প্রজাদের এবং ভাগচাষীদের এখনও যথেষ্ট অধিকার দিতে হবে। প্রায় সব রাজ্যেই চাষী প্রজা বা ভাগচাষীর দেয় খাজনার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করা সম্পর্কে আইন তৈরি হয়ে গেছে। তবে এই খাজনার হারে অনেক পার্থক্য রয়েছে। সর্ব্বোচ্চ কি পরিমাণ জমি রাখা যাবে সেই সম্পর্কে, বেশীর ভাগ রাজ্যে আইন প্রণীত হয়েছে, তবে এই পরিমাণেও বিভিন্ন রাজ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে তেমনি রাজ্যের মধ্যেও জমির শ্রেণী অনুযায়ী অনেক পার্থক্য রয়েছে। তবে অতিরিক্ত জমি সংহত করার ক্ষেত্রে, হরিয়ানা ও পাঞ্জাবে তার কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে দুই তৃতীয়াংশ ভূমি সংহত করা হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যগুলি অবশ্য এখনও পেছনে পড়ে আছে।

কাজেই বিভিন্ন রাজ্যে আইনের ব্যবস্থাগুলিতে যেমন বড় বড় ফাঁকি আছে তেমনি সেগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও পার্থক্য রয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে ভূমিস্বত্ব সংস্কার ব্যবস্থা সম্পর্কে এই যে বিপুল পার্থক্য রয়েছে সেদিকে অবিলম্বে প্রশাসনের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে, বিভিন্ন রাজ্যে প্রজাদের হাত থেকে জমি খাসে নিয়ে নেওয়া সম্পর্কে জমিদারদের যে অধিকার রয়েছে তা প্রত্যাহার করা প্রয়োজন। "স্বেচ্ছায় প্রত্যর্পণ" এই ছদ্ম নামে বলপূর্ব্বক উৎখাত বন্ধ করতে হবে। কোন কোন অঞ্চলে জমিদারের খাজনা অথবা জমিদারকে দেয় শস্যের অংশের পরিমাণ এখনও বেশী। ভূমি স্বত্ব সংস্কার ব্যবস্থাগুলি তাড়াতাড়ি রূপায়িত করার পথে আর একটা বাধা হল, জমিদাররা কোন না কোন ছুতায় এগুলির বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় নেন। পল্লী অঞ্চলের কায়েমি স্বার্থবাদীরা কোন কোন সময়ে ভূমি স্বত্ব সংস্কারকে বিলম্বিত করার জন্যও এইসব পদ্ধতি গ্রহণ করেন। মামলার সংখ্যা হ্রাস করা এবং অন্যান্য বাধা অপসারিত করার জন্য সংবিধানের ধারাগুলি তিনবার সংশোধন করার পরও মামলা করার যথেষ্ট সুযোগ থেকে গেছে।

ভূমি হ'ল রাজ্যগুলির অধিকারভুক্ত বিষয় এবং ভূমিস্বত্ব সংস্কার সম্পর্কিত পরিকল্পনা ও সেগুলির রূপায়নের দায়িত্ব প্রধানতঃ রাজ্য সরকারগুলির। কিন্তু বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে এবং কৃষি উৎপাদনের আধুনিক ধারা অনুযায়ী ভূমিস্বত্ব সংস্কার কর্ম্মসূচী, সর্ব্ব ভারতীয় পর্য্যায়ে কৃষি উন্নয়নের কর্ম্মসূচীর সঙ্গে সংহত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। কাজেই এই সমস্যাটি সম্পর্কে একটা সংহত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা এখন বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

‘রেঙ্গুন’ হীরে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করতে পারে

একটি সমীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, ব্যাঙ্কের সাহায্য নিয়ে যে সব ছোট ছোট শিল্প এমন কি রপ্তানীর মাধ্যমেও, উন্নতি করতে পারে, তার মধ্যে অন্যতম হ’ল কৃত্রিম হীরা। তিরুচিরাপল্লীর সেন্ট যোসেফ্‌স কলেজের প্ল্যানিং ফোরাম সম্প্রতি তিরুচিরাপল্লী সিনথেটিক জেম-কাটার্স্ ইণ্ডাস্ট্রিয়্যাল কো অপারেটিভ সোসাইটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কৃত্রিম হীরা-উৎপাদন শিল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালায়। এই শিল্প প্রথম প্রবর্তন করেন বর্মা-প্রবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ীরা। সেই কারণেই বোধ হয় এই হীরের নাম হ’ল ‘রেঙ্গুন হীরা’।

বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে এই ব্যবসার পত্তন করা হয় অতি সামান্য আকারে। তারপর এই ব্যবসার বিকাশ ঘটে দ্রুত ; বিশেষ ক’রে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। ভারত উপমহাদেশ থেকে বর্মা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এবং বর্মা থেকে হীরের আমদানী কমে যাবার দরুন এ দেশে এই শিল্প প্রসারে কিছু উৎসাহ দেখা যায়। তাই বলা চলে, এই ব্যবসাটি খুব প্রাচীন নয়।

সমীক্ষার বিবরণে প্রকাশ যে, যে কটি য়ুনিটের কাজকর্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালানো হয় তার শতকরা ৬০টির নিজস্ব কারখানা নেই ; ঘরভাড়া নিয়ে কাজ চালাতে হয়। বাকী ৪০টি য়ুনিটের অবশ্য নিজস্ব বাড়ী আছে। এর মধ্যে শতকরা ২৪টির পাকা ছাদ, শতকরা ১৮টির টালির ছাদ আর শতকরা ৫৮টির খড় প্রভৃতি দিয়ে ছাওয়া ছাদ। বিভিন্ন য়ুনিটে, আকার আয়তন ও যন্ত্রপাতি অনুযায়ী, মূলধন লগ্নী করা হয়েছে। শুধু তিনটি য়ুনিটে ২০০ টাকার মূলধন লগ্নী করা হয়েছে। তা না হলে, মূলধনের পরিমাণ, ৫০০ টাকা থেকে ২৪০০০ টাকা পর্যন্ত হয়। শতকরা ২৫টি য়ুনিটের মূলধনের পরিমাণ এক হাজার টাকার কম। তবে এই তথ্যগুলি খুব নির্ভরযোগ্য বলা চলে না কারণ য়ুনিটের মালিকরাই প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক থাকেন।

এই শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হ’ল ‘ডেলাম’। এটি একটি কৃত্রিম বস্তু যা কিছুদিন আগে পর্যন্ত পুরোপুরি সুইটজারল্যাণ্ড থেকে আমদানী করতে হ’ত। তবে এখন সম্প্রতি সালেম জেলার মেট্টুপালায়াম থেকে এর মোটা অংশটা পাওয়া যায়। ডেলাম উৎপাদনের জন্য সুইটজারল্যাণ্ডের সহযোগিতায় একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। কাঁচা মালের প্রতি ৫৬ ক্যারেট থেকে ১২ ক্যারেট অর্থাৎ ২১.৪৩ শতাংশ হীরে পাওয়া যায়। এ থেকে আবার ২০ থেকে ২০০টি হীরে কেটে পালিশ করা হয়। অর্থাৎ ডেলামের শতকরা ৮৮ ভাগ নষ্ট হয়।

এই কৃত্রিম হীরে তৈরির জন্য যে সব যন্ত্রপাতি লাগে তার মধ্যে আছে কাটবার ও ঘষবার যন্ত্র। প্রথম যন্ত্রটি দিয়ে কৃত্রিম হীরেগুলি প্রয়োজনীয় আকারে কাটা হয় ও দ্বিতীয়টি দিয়ে হীরেগুলি ঘষে ঘষে ছুঁচোলো বা চকচকে করা হয়। ‘ডায়মণ্ড-কাটা পালিশ’ কথাটা স্যাকরা মহলের চলতি শব্দ।

জানা যায়, যে, কোন য়ুনিটের কাছেই কাটার কল নেই। সেগুলি পাইকারী ব্যবসায়ীদের কাছে থাকে। য়ুনিটগুলি নিজেদের কাছে কেবল ঘষবার যন্ত্র রাখে। শতকরা ৬৪টি য়ুনিটের কাছে হাতে চালানো যন্ত্র, শতকরা ১৮টির কাছে বিদ্যুৎ চালিত ও শতকরা ১৮টির কাছে ২ রকমেরই যন্ত্র।

সমীক্ষায় জানা গেছে যে, কর্মী সংখ্যা য়ুনিটের আকার ও আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী কোথাও দশ, কোথাও দশ থেকে কুড়ি আবার কোথাও কুড়ির বেশী। কোনোও য়ুনিটে স্ত্রীলোক কর্মী নেই তবে কয়েকটি য়ুনিট-এ ছেলেদের রাখা হয়েছে ছুটকো ছাটকা কাজের জন্য।

সমীক্ষাকারেরা জানতে পারেন যে, তিরুচিরাপল্লী সিনথেটিক জেম কাটার্স্ ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল কো অপারেটিভ সোসাইটি ঠিক সাধারণ কো অপারেটিভ সোসাইটি বা সমবায়িকার মত নয়। কারণ সাধারণতঃ অন্যান্য সমবায় প্রতিষ্ঠানে সংগঠন ব্যবস্থা, পরিচালন ব্যবস্থা, উৎপাদন ও বিপণন প্রভৃতির দায়িত্ব সমবায় সভ্যদের হাতে ন্যস্ত থাকে। কিন্তু এই সমবায়িকায়, সদস্যরা শুধু উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকেন। সমবায় বিভাগের সরকারী কর্মচারিরা বাকী কাজগুলি সম্পন্ন করেন।

সমীক্ষা থেকে জানা যায় এই শিল্পের সবচেয়ে বড় সমস্যা হ’ল মূলধন। সাধারণতঃ মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে কারবার সুরু করা হয়। ব্যাঙ্কের শরণাপন্ন কেউই প্রায় হয় না বলা চলে। ব্যবসায়িক বা সমবায় ব্যাঙ্কগুলি যদি উদার সর্তে ঋণ দেয় তাহলে এই ক্ষুদ্রায়তন শিল্পটির প্রভূত উপকার হবার সম্ভাবনা আছে। এ ছাড়া উৎপাদনের আধুনিক পন্থা পদ্ধতি ও যান্ত্রিক সরঞ্জাম ব্যাপকভাবে চালু করা হলে কৃত্রিম হীরের রপ্তানী যে সবিশেষ বৃদ্ধি পাবে এ বিষয়ে আদৌ কোনোও সন্দেহ নেই।

যক্ষ্মা হাসপাতাল ও শয্যা সংখ্যা

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ৬টি সরকারী ও ১১টি বেসরকারী যক্ষ্মা হাসপাতাল রয়েছে। সরকারী হাসপাতালগুলিতে মোট শয্যা সংখ্যা ১,৯৫৪। সরকারী যক্ষ্মা হাসপাতাল ও বেসরকারী হাসপাতালগুলিতে মোট শয্যা সংখ্যা ২,২৫৬। সরকারী যক্ষ্মা হাসপাতাল ও বেসরকারী হাসপাতালের সরকার সংরক্ষিত শয্যায় সিলেকসন কমিটির মারফৎ যক্ষ্মারোগীদের ভর্তি করা হয়। ভর্তির আগে যক্ষ্মা রোগীদের এক্সরে করা, রক্ত, থুতু ইত্যাদি পরীক্ষা করা ও বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহের ব্যবস্থা আছে।

দেশে ভূমিস্বত্ব সংস্কার সম্পর্কে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কে পর্য্যালোচনা করার জন্য গত ২৮শে এবং ২৯শে নভেম্বর নূতনদিল্লীতে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীগণের একটি সম্মেলন হয়। বর্ত্তমান কৃষি উৎপাদন নীতির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী নীতির লক্ষ্য এবং বিভিন্ন রাজ্যের প্রকৃত সাফল্যের মধ্যে কতখানি পার্থক্য আছে সেই প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই সংখ্যায়, আইনটির সাফল্য এবং এটি রূপায়িত করার ক্ষেত্রে সমস্যাগুলি সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ল।

ভূমি-স্বত্ব সংস্কার সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তি

হরেকৃষ্ণ কোঙার
ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

গত কুড়ি বছরে, প্রাক-স্বাধীন ভারতের অর্দ্ধ সামন্ততান্ত্রিক কৃষি কাঠামো ক্রমশঃ অনেকটা কৃষক অর্থনীতিতে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। তবে কতকগুলি রাজ্যে ভূমিস্বত্ব সম্পর্কিত আইন এখনও প্রণীত হয়নি এবং যে সব রাজ্যে আইন পাশ হয়েছে সেখানেও অনেক ক্ষেত্রে তা কার্য্যকরী করা হয়নি।

ভূমি সুত্ব সংস্কার সম্পর্কে আমাদের দেশে যত বাগ্মিতা ও বক্তৃতা করা হয়েছে অন্য কোন দেশে সম্ভবতঃ তা করা হয়নি আর এমন নৈরাশ্যজনক ফলও বোধ হয় আর কোন দেশে হয়নি। ভূমির সুত্ব সংস্কার সম্পর্কে এই বিফলতার গুরুত্ব যদি অস্বীকার করার বা হ্রাস করার চেষ্টা করা হয় তা'হলে তার একমাত্র অর্থ হবে, একটা বিস্বাদ বাস্তবকে চোখ বুজে অস্বীকার করা এবং ভবিষ্যত ইতিহাস তার জন্য কাউকেই ক্ষমা করবেনা। ভূমি সুত্ব সংস্কারের মতো একটা জটিল সমস্যাকে যে রকম তুচ্ছ বিষয় বলে মনে করা হচ্ছে তা আমাদের দেশের পল্লী অঞ্চলের কৃষি সম্পর্ক অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় নিয়ে এসেছে। কৃষি জমি ও মূলধন কয়েক জনের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় এবং নিঃস্ব চাষীর সংখ্যা বিপুল সংখ্যায় বাড়তে থাকায় আমাদের দেশে কৃষি অর্থনীতি সঙ্কটপূর্ণ হ'য়ে উঠছে। কৃষি উৎপাদনের প্রায় স্থিতিশীল অবস্থা, বিপুল সংখ্যক চাষীর ক্রমবর্ধমান নিঃস্বতা, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি, মূল্যে অসমতা এবং মজুতদারীর বিপদ এগুলি সবই সেই সঙ্কটের পরিচায়ক।

প্রধানতঃ সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্যই ভূমি স্বত্বের সংস্কার প্রয়োজন, কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে এর বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই, এই কথা প্রায় সব সময়েই প্রচার করা হয়। কিছু অর্থনীতিবিদ ও রাজনৈতিক নেতা এমন একটা মনোভাব তৈরি করারও চেষ্টা করেন যে, কৃষি উৎপাদনের সমস্যাটা হ'ল সাধারণ কারিগরী সমস্যা এবং উন্নত ধরনের বীজ ও সার প্রয়োগ করে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অবশ্য বলতে পারি যে, উন্নত ধরনের বীজ ও সার ব্যবহার করলে উৎপাদন বাড়ে এবং এটাও সত্যি কথা যে কিছু ধনী চাষী এবং ধনী ব্যক্তি এগুলি ব্যবহার ক'রে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন।

কিন্তু বর্ত্তমান ভূমিসুত্ব ব্যবস্থায়, যেখানে কয়েকজনের হাতে বেশীর ভাগ জমি কেন্দ্রীভূত এবং বিপুল সংখ্যক চাষী প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় এসে পৌঁচেছেন, সেখানে এই রকম অবস্থা হতে বাধ্য। বেশী ফলনের বীজ ব্যবহার করতে হলে বেশী জল, বেশী সার এবং বেশী টাকা

লাগে। একমাত্র বড় বড় জমিদার এবং ধনী চাষীরাই প্রয়োজনীয় মূলধন লগ্নি করতে পারেন। কিন্তু এঁদের বেশী মূলধন নিয়োগ করার ইচ্ছাও সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য, কারণ তাঁরা নিঃস্ব চাষীদের শোষণ ক'রে, বেশী সুদে টাকা ধার দিয়ে, মজুতদারী ও চোরাবাজারীর মাধ্যমে সহজে বেশী টাকা আয় করতে পারেন। ছোট চাষী অথবা প্রজা চাষী যাঁদের সংখ্যা আমাদের দেশে সব চাইতে বেশী তাঁরা কোন মূলধন নিয়োগ করতে পারেন না।

উৎপাদন বাড়েনি

সরকার এবং ব্যাঙ্কগুলি যে ঋণ মঞ্জুর করেন তার বেশীর ভাগই নিয়ে নেন বড় বড় জমিদার ও ধনী চাষীরা। কাজেই কৃষির উৎপাদন বেড়েছে কম, প্রায় বাড়েনি বল্লেই হয়। ১৯৬৪-৬৫ সালে যেখানে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ৮৮,৯৯৬,০০০ মেট্রিক টন সেখানে ১৯৬৮-৬৯ সালে তা ছিল ৯৪,০০৪,০০০ মেট্রিক টন। একমাত্র গমের উৎপাদন বেড়েছে ১২,২৯০, ০০০ থেকে ১৮,৬৫২,০০০ টন। অন্যান্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রায় একই থেকে গেছে। তাছাড়া এই রকম সীমাবদ্ধ উন্নয়ন, পল্লী অর্থনীতির বড় বড় মালিকদেরই পুষ্টি শক্ত করে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ব্যাপারও উল্লেখ করা প্রয়োজন। কয়েকটি ক্ষেত্রে বরং সামন্ততান্ত্রিক শোষণ আবার সুরু হয়েছে। প্রজাবিলির পরিবর্ত্তে ভাগচাষ প্রথাটা উল্লেখযোগ্য। উন্নতধরনের মূলধনমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে লাভ করার পরিবর্তে ভাগ চাষ এবং চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের মাধ্যমে বেশী লাভ করা যায়। কাজেই আমরা কিছুটা মূলধনমূলক উন্নয়ন এবং তার সঙ্গে পূর্ব্বের তুলনাতেও কঠোর সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের একটা অদ্ভুত সংযোগ দেখতে পাই। এর ফলে গরীব চাষী শ্রমিকদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে।

কেবলমাত্র চাষীদের স্বার্থের অনুকূলে যদি ভূমি স্বত্বের সংস্কার করা হয় তাহলেই শুধু কৃষি ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত হতে পারে এবং বিনা বাধায় কৃষির উন্নতি হতে পারে। জমি কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার ব্যবস্থা বিলুপ্ত হলে, বিপুল সংখ্যক চাষীর অবস্থা উন্নত হতে পারে। এর ফলে অনেক ভূমিহীন চাষীও জমি পেয়ে যেতে পারেন। এর ফলে হয়তো বহু সংখ্যক কৃষক, কৃষিতে বেশী লগ্নি করতে সক্ষম হবেন, মজুতদারী প্রতিরোধ করা যাবে এবং শিল্পজাত সামগ্রীর বাজার বাড়বে। এই ধরনের ভূমিস্বত্ব সংস্কারই শুধু জনগণের সৃষ্টিধর্ম্মী উদ্যমকে মুক্তি দিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে আমরা এর পরিচয় পেয়েছি। যুক্তফ্রন্ট সরকারের অধীনে গত আট মাসে ২॥ লক্ষ একরেরও বেশী জমি ভূমিহীন এবং এক টুকরো জমির জন্য লালায়িত চাষীর মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। এঁরা কি দিয়ে বীজ, সার ইত্যাদি কিনবে সে সম্পর্কে আমরা দুর্ভাবনায় পড়েছিলাম। কিন্তু চাষীরা নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করে নেন। সমস্ত জমিতে চাষ করা হয়। এই রকম সীমাবদ্ধ প্রচেষ্টা থেকেই আমাদের শিক্ষা লাভ করা উচিত।

ভূমিস্বত্ব সংস্কারের অন্ততঃপক্ষে সীমিত কর্ম্মসূচীরও এইটুকু লক্ষ্য হওয়া উচিত যে কৃষিজমির কেন্দ্রীভূত হওয়াটা ভেঙ্গে দিতে হবে, বিনামূল্যে জমি বন্টন করতে হবে এবং প্রজাদের স্বত্বের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু বহু আইন এবং বহু বক্তৃতা সত্ত্বেও এই লক্ষ্যটি পূরণ করা সম্ভব হয়নি।

আংশিক সাফল্যসমূহ

পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার ১৯৬৭ সালে এবং বর্ত্তমানে ১৯৬৯ সালে যে সামান্য সময়টুকু পেয়েছেন তার মধ্যেই, ভূমি স্বত্ব সংস্কার সম্পর্কিত বর্ত্তমান আইনটির সীমাবদ্ধ পরিসীমার মধ্যেই এগুলি কার্য্যকরী করার প্রশ্নটি বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে বিবেচনা করেন। আংশিকভাবে হলেও এতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জ্জিত হয়েছে এবং আমরা মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছি।

১৯৬৭ সালে প্রায় ২.৩২ লক্ষ একর জমি ২.৩৮ লক্ষ চাষীর মধ্যে বাৎসরিক লাইসেন্সের ভিত্তিতে বন্টন করা হয়। কোন জমি অন্যায়ভাবে বেনামী হস্তান্তর করা হয়েছে কিনা তা বের করার জন্য যে অভিযান চালানো হয় তাতে আরও ২.৭৫ লক্ষ একর জমি উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে প্রায় ১.২৫ লক্ষ একর জমি গত আট মাসে উদ্ধার করা হয়েছে। এর জন্য সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থাকে এই উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা হয়। জমির মালিকদের যোগ সাজস ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য সংহত কৃষক সংস্থাগুলির সহযোগিতা নেওয়া হয়। অফিসারগণকে, কৃষক সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে কাজ করার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। জমিদারগণ যাতে তাঁদের অন্যায়ভাবে সংগৃহীত জমি রক্ষা করার জন্য পুলিশের অপব্যবহার না করতে পারেন তারও ব্যবস্থা করা হয়।

এই সব ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে কম পক্ষে ২॥ লক্ষ একর জমি জমিদারদের হাত থেকে, সত্যিকারের গরীব চাষীর হাতে চলে গেছে। এতে গ্রামের দরিদ্রদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে। এই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে এবং সরকারের সাহায্যে অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা জমিদার ও ধনী চাষীদের খরার সময়ে শস্যাদি ধার দিতে বাধ্য করে। এটা মজুতদারী প্রতিরোধ করতেও সাহায্য করেছে।

গত ২৫ বছরের মধ্যে এইবারই প্রথম চাউলের দাম প্রায় সময়েই প্রকৃতপক্ষে স্থিতিশীল ছিল। সীমিত ভূমি স্বত্ব সংস্কার ব্যবস্থাতেও যদি এই রকম ফল পাওয়া যায় তাহলে ভূমি স্বত্ব আইন পুরোপুরি প্রযুক্ত হলে কি ফল পাওয়া যেতে পারে তা আমরা ভেবে নিতে পারি। এই রকম সংস্কার এখন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

বিফলতার কারণ

অন্যান্য দেশের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং পশ্চিমবঙ্গের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে আমি, ভূমি স্বত্ব সংস্কারের বিফলতার কয়েকটি প্রধান কারণ উল্লেখ করতে পারি। বেশীর ভাগ রাজ্যেই ভূমি আইন পাশ করা হয়েছে। এই আইনগুলিতে খানিকটা পার্থক্য থাকলেও সেগুলির ধারা এবং ত্রুটিসমূহ এক। এই ত্রুটিগুলি অপসারিত করতে হবে এবং ভূমি ও চাষীর মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি করতে হলে ভূমি স্বত্ব সংস্কার ব্যবস্থাগুলি কার্য্যকরী করার

জন্য আন্তরিকভাবে সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করতে হবে।

সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ জমি

সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ জমি সম্পর্কে যে সব ব্যবস্থা রয়েছে তা ত্রুটিপূর্ণ এবং তাতে অনেক ফাঁক আছে। মাছ চাষের পুকুর, ফলের বাগান, সুদক্ষভাবে পরিচালিত খামার এবং ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানগুলিকে আইনের ধারাগুলির বাইরে রাখা হয়েছে। জমি ভাগ করে, অন্যায়ভাবে হস্তান্তর করে এবং ভুয়া দলিল বানিয়ে জমিদাররা, সর্বোচ্চ পরিমাণ জমির ধারাগুলিকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য এগুলি নিজেদের ইচ্ছেমত কাজে লাগাচ্ছেন। তাঁদের নিরুৎসাহিত করার জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি। বাজে দলিল পরীক্ষা ক'রে সেগুলি নাকচ করার ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে যা অবশ্যম্ভাবী তাই হয়েছে। ধনীদের হাতে বেশীরভাগ চাষের জমি থেকে গেছে এবং তার সঙ্গে একচেটিয়া শক্তির সমস্ত পাপগুলিও থেকে গেছে। এর প্রতিবিধান করতে হলে সর্বোচ্চ পরিমাণ জমির ধারাগুলি এমনভাবে সংশোধন করতে হবে যাতে কোন ফাঁকি না থাকে। সর্বোচ্চ পরিমাণ জমি কম করা উচিত এবং কোন রকম রেহাই না দিয়ে পরিবারের ভিত্তিতে স্থির করা উচিত। বহু পরিমাণ জমির মালিকরা, জমি হস্তান্তর করে যে সব দলিল তৈরি করেছেন তার মধ্যে যেগুলি বেআইনি হয়েছে সেগুলি বাতিল করে, এই রকম হস্তান্তরের জন্য মালিকদের শাস্তি দেওয়া উচিত। ক্ষতিপূরণ এবং দখল করা সম্পর্কে সংবিধানের ধারাগুলি সংশোধন করা উচিত কিনা তাও বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখা উচিত। ৩১ (২) এবং ৩১ (খ) ধারাগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন।

প্রজাদের নিরাপত্তা

নিরাপত্তার ব্যবস্থাগুলি উল্লঙ্ঘন করেই সেগুলি রূপায়িত করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ প্রজাকে খুসিমত উচ্ছেদ করা হয়েছে। এগুলির সংশোধন হওয়া উচিত এবং তথাকথিত স্বেচ্ছামূলক প্রত্যর্পণসহ উচ্ছেদের ঘটনাগুলি পুনরায় পরীক্ষা ক'রে প্রয়োজন অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত। ভাগচাষীদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ এবং এদের অবস্থা বিশেষভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। অনেক রাজ্যে তাদের প্রজা বলেই গণ্য করা হয়না। অনেক ছোট ছোট জমির গরীব মালিকদের সমস্যা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে সমস্যাটি আরও জটিল করে তোলা হয়েছে। তাদের অন্য কোন বৃত্তিতে নিয়োগ করারও আশু সম্ভাবনা নেই। কাজেই বিভিন্ন রাজ্যের বিশেষ সমস্যা অনুযায়ী কার্য্যকরী ব্যবস্থাতেও বিভিন্নতা থাকতে বাধ্য। কিন্তু ভাগচাষীদেরও চাষ এবং ফসলকাটা সম্পর্কে স্থায়ী বংশানুক্রমিক অধিকার থাকা উচিত। ভূমিস্বত্ব সংস্কার আইন রূপায়িত করার সময় কৃষক সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের সহযোগিতা অবশ্যই নেওয়া উচিত।

অতিরিক্ত জমি এবং জমি বণ্টন

অতিরিক্ত জমি অধিকার এবং এই ধরণের জমি ও পতিত জমি ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বন্টন করার কাজ ভীষণভাবে অবহেলিত হয়েছে। যেটুকু অতিরিক্ত জমি সরকারের হাতে এসেছে অনেক ক্ষেত্রেই তা পুরানো জমিদারের হাতেই রাখা হয়েছে। অতিরিক্ত জমি বন্টন করা দূরে থাকুক, এমন কি সরকারের হাতে যে পতিত জমি পড়ে আছে তাও বিনামূল্যে তাড়াতাড়ি বন্টন করা হচ্ছেনা। এই সব ত্রুটি তাড়াতাড়ি সংশোধন করা প্রয়োজন।

আইনের অপব্যবহার প্রতিরোধ

ভূমি স্বত্বের সংস্কার সম্পর্কে যে কোন চেষ্টাকে প্রতিহত করার জন্য জমিদাররা খুসিমত আইনটির অপব্যবহার করেছেন এবং ভবিষ্যতে আরও করবেন। যখনই কোন অতিরিক্ত জমির অনুসন্ধান করার জন্য আইনসঙ্গত কোন চেষ্টা করা হয়, জমিদাররা তখনই আদালতের শরণাপন্ন হন এবং একদিকের বক্তব্যের ভিত্তিতে ইনজাংশন নিয়ে নেন। তারা এই ইনজাংশনের আড়ালে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেন। পশ্চিমবঙ্গে এই রকম দেওয়ানী আইন ও মামলা অনুযায়ী ২ লক্ষ একরেরও বেশী, অতিরিক্ত জমি আটকে আছে। কাজেই রাজ্যের আইনে ভূমি স্বত্ব আইনটিকে, দেওয়ানী আদালতের বহির্ভূত করা একান্ত প্রয়োজন। তাও তাই যথেষ্ট নয়। পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, দেওয়ানী আইন ও মামলার অন্তর্ভুক্ত বেশীরভাগ জমি সংবিধানের ২২৬ ধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। জমিদাররা তাদের বেআইনী কার্য্যকলাপ চালাবার জন্য এই ধারাটির অপব্যবহার করতে ইতস্তত: করেননা। এই অপব্যবহার প্রতিরোধ করার জন্য সংবিধান যথোপযুক্তভাবে সংশোধন করা উচিত।

দ্রুত রূপায়ণ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং জনসাধারণের সহযোগিতা

জমিদাররা যাতে কোন অসাধুতার আশ্রয় না নিতে পারে সেজন্য ভূমি স্বত্ব সংস্কার আইন খুব তাড়াতাড়ি কার্য্যকরী করা উচিত ছিল। কিন্তু তার উল্টোটাই করা হয়েছে। আমি এমন কোন দেশের কথা জানিনা যেখানে ১৫-২০ বছর ধরে ভূমি স্বত্বের সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা চালানো হয়েছে। জমিদাররা যাতে যা খুসি তাই করতে পারেন সেজন্য সর্বাধিক সুযোগ দেওয়া হচ্ছে ফলে আইনের ত্রুটিপূর্ণ ধারাগুলি থেকেও যেটুকু সুফল পাওয়া যেতো তাও হারাতে হয়েছে।

নতুন দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন প্রশাসন

দ্বিতীয়ত: প্রশাসন ব্যবস্থাও জমিদারদের পক্ষেই কাজ করেছেন। এটা এতো প্রকাশ্য যে কারুরই দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। এই ক্ষেত্রে অন্তত:পক্ষে কিছুটা পরিবর্ত্তন আনার জন্যও কিছু করা হয়নি। ফলে সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। প্রশাসন ব্যবস্থা যদি প্রয়োজনের পক্ষে উপযুক্ত না হয় এবং তাঁরা যদি একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ না করতে পারেন তাহলে কেবলমাত্র ভালো ভালো আইন, অবস্থার উন্নতি করতে পারেনা। বহু যুগের পুরানো প্রশাসনিক ব্যবস্থা, কায়েমি স্বার্থের সঙ্গে যাঁদের বিশেষ যোগ রয়েছে এবং দেশের বর্ত্তমান সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামোর মৌলিক সীমাবদ্ধতার কথা যদি বিবেচনা করা যায় তাহলে বাঞ্ছনীয় সব কিছুই সফল করে তোলা যাবে এমন অলীক আশা করা

১২ পৃষ্ঠায় দেখুন

ভূমিস্বত্ব সংস্কার আইনটি কার্য্যকরী করতে বাধা কোথায় ?

ডি. বন্দ্যোপাধ্যায়
ডাইরেক্টর অব ল্যাণ্ড রেকর্ডস্ এ্যাণ্ড সার্ভেস পশ্চিম বঙ্গ

একটি পরিবারের সবের্বাচ্চ পরিমাণ কতটুকু জমি থাকতে পারবে এই ব্যবস্থাগুলি কার্য্যকরী করাই হ'ল ভূমি স্বত্ব সংস্কার আইনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন রাজ্যে এই ক্ষেত্রের অবস্থা বিভিন্ন হলেও, সবের্বাচ্চ পরিমাণ জমি সম্পর্কিত ধারাগুলি কোথাও উপযুক্তভাবে কার্য্যকরী করা হচ্ছেনা বলে যে একটা সাধারণ মনোভাব রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পশ্চিমবঙ্গ ভূমি অধিকার আইন অনুযায়ী গত দুই বছর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গে, সবের্বাচ্চ পরিমাণ জমি সম্পর্কিত ধারাগুলি কার্য্যকরী করা সম্পর্কে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। এর ফলে কতকগুলি বড় বড় প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে যা সাধারণভাবে দেশের অন্যান্য স্থানেও প্রযোজ্য হতে পারে।

সার ফ্রান্সিস ফ্লাউডের সভাপতিত্বে ভূমি রাজস্ব কমিশনের বিবরণী প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে, বিশেষ করে, স্বাধীনতা লাভ করার পর সমগ্র দেশে যখন ভূমি স্বত্বের সংস্কারের জন্য সরব দাবি জানানো হচ্ছিল, তখন আশা করা গিয়েছিল যে পশ্চিম বঙ্গে প্রজা স্বত্ব সম্পর্কে দ্রুত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। ভবিষ্যতে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে পারে সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি যে বেশ ধারণা করতে পেরেছিলেন তা পরিস্কার বোঝা যায়। পূর্ব্বাহ্ণেই সতর্ক হয়ে তাঁরা, আইনটি পাশ হওয়ার আগেই, সেটিকে ফাঁকি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে থাকেন। ধনী এবং শক্তিশালী এই পক্ষের, তাঁদের স্বার্থ নিরাপদ করার জন্য সবচাইতে ভালো আইনজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া খুবই সহজ ছিল।

বহু পরিমাণ জমির মালিকরা আইনটির আঁচ পেয়েই তাঁদের হাতের অতিরিক্ত জমি, বন্ধু বা নিকট আত্মীয়দের মধ্যে, অর্থ দিয়ে বশীভূত ক'রে অন্যের নামে কি ভুয়া নামে ব্যাপকভাগে হস্তান্তর করতে সুরু করেন। আইনটি জারি হওয়ার পূবের্বই তাঁরা অনেক দলিল রেজেষ্ট্রী করে ফেলেন। যাঁরা অতটা সতর্ক ছিলেননা তাঁরা, অনেক আগের তারিখ দিয়ে অত্যন্ত পুরানো কাগজে হস্তান্তরের দলিল তৈরী করতে সুরু করেন। দলিলগুলির চেহারা এত পুরানো হ'ল যাতে মনে হয় যে এইসব হস্তান্তর বহু বছর পূবের্ব করা হয়েছে। এই রাজ্যে অরেজেষ্ট্রীকৃত এইসব দলিলকে তখনকার মত স্বীকৃতি দেওয়া হয় ফলে হস্তান্তরগুলিও খাঁটি এবং বৈধ বলে পাশ হয়ে যায়।

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

পশ্চিমবঙ্গ ভূমি অধিকার আইনে বলা হয়েছে যে একজন ব্যক্তি ২৫ একর কৃষি জমি, বাড়ী, বাগানসহ ২০ একর জমি এবং মাছ চাষের জন্য যতগুলি খুসি পুকুর রাখতে পারেন। একমাত্র দাতব্য এবং ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ন্যাসগুলি যে কোন পরিমাণ খাস জমি রাখতে পারে। কোন একজন ব্যক্তি কোন বনভূমি নিজের অধিকারে রাখতে পারবেননা। আইনে আরও বলা হয়েছে যে কলিকাতা গেজেটে যে তারিখে আইনের খসরাটি প্রকাশিত হয় এবং যে তারিখে এটি জারি করা হয় তার মধ্যে যদি কোন জমি হস্তান্তরিত হয়ে থাকে তাহলে কয়েক ধরণের হস্তান্তর পরীক্ষা করে দেখার ব্যবস্থাও আইনটিতে রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রতি ব্যক্তি হিসেবে জমির সবের্বাচ্চ পরিমাণ ধরা হয়েছে, প্রতি পরিবার হিসেবে নয়। কাজেই সবের্বাচ্চ পরিমাণ জমির ধারাগুলি কার্য্যকরীভাবে প্রয়োগ করতে হলে, একজন ব্যক্তির এই রাজ্যে কতখানি জমি আছে তা জানতে হবে। এখানেই প্রথম সমস্যার উদ্ভব হয়। পশ্চিমবঙ্গে মৌজা অনুযায়ী জমির নথীপত্র করা হয়। একজন জমির মালিকের সমগ্র রাজ্যে মোট কি পরিমাণ জমি আছে তার কোন রেজিষ্টার নেই। এই অসুবিধে দূর করার জন্য আইনে ব্যবস্থা রয়েছে যে, কোন ব্যক্তির সমগ্র রাজ্যে কি পরিমাণ জমি রয়েছে তার বিস্তারিত হিসেব দাখিল করার জন্য তাকে নির্দ্দেশ দেওয়া যাবে। কিন্তু কেউ যদি ইচ্ছে করে খবর চেপে যায় তাহলে হঠাৎ কোন কারণে ছাড়া তাঁর সেই হিসেব ঠিক কিনা তা যাচাই করার প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যবস্থা নেই। বিভিন্ন মৌজায় এমন কি বিভিন্ন জেলায় জমি থাকাটা পশ্চিমবঙ্গে অত্যন্ত সাধারণ আর তা কেবল বিখ্যাত বড় বড় জমিদারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

সত্যিকারের বুদ্ধিমান বেশী পরিমাণ জমির মালিকরা অবশ্য এইসব ব্যাপারে কোন ত্রুটি রাখেননি। তাঁরা তাঁদের সম্পত্তি, সবদিক হিসেব করে এমনভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন যে আইন তাঁদের কিছুই করতে পারবেনা। বাংলার প্রজাস্বত্ব আইন অনুযায়ী প্রজাবিলি বা খাজনাবিলির দলিল রেজেষ্ট্রী করতে হয়না। মৌখিক ঘোষণার ভিত্তিতে একজন রায়ত বা প্রজাকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং সমস্ত অধিকার দেওয়া, বাংলার প্রজাস্বত্ব আইনের একটা মস্তবড় প্রগতিশীল ব্যবস্থা। আর এই জন্যই বৃটিশ শাসনের সময় জমিদারদের বিরোধিতা সত্ত্বেও সেটেলমেন্টের আমলে বহু প্রজা, জমির ওপর তাঁদের অধিকার পেয়ে যান।

কি পরিমাণ কৃষি জমি খাসে রাখা যাবে তার একটা সীমা থাকবে বলে, অতিরিক্ত জমি, নিকট আত্মীয়ের নামে, ভুয়া নামে বা অধীনস্থ কোন ব্যক্তির নামে প্রজাবিলি করা কেবলমাত্র সুবিধেজনক নয় তা লাভজনকও হয়ে দাড়ায়। পশ্চিমবঙ্গ প্রজাস্বত্ব আইন অনুযায়ী এরা সোজাসুজি সরকারের প্রজা হয়ে যান। কাজেই

এর আগে যে জমিদাররা তাঁদের অধীনে প্রজা স্বষ্টির বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরাই, পশ্চিমবঙ্গ ভূমি অধিকার আইন অনুযায়ী বর্তমানের সেটেল্‌মেন্টের কাজ শুরু হলে ভুয়া দলিলের সাহায্যেও প্রজা স্বষ্টি করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এর ফলে বহু পরিমাণ খাস জমি বেনামীতে হস্তান্তরিত হয় আর জমির মালিকরা পূর্ব্বের মতোই সেগুলির মালিক থাকলেন আর সেগুলি ভোগ করতে লাগলেন।

রেহাই

সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ জমির ক্ষেত্রে আইনে কয়েক রকমের রেহাইয়ের ব্যবস্থা আছে। ফলের বাগান এবং মাছের চাষের পুকুরের কোন সীমা নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি। কেউ যদি ভালো কৃষি জমির এখানে ওখানে দুটো চারটে ফলের গাছ লাগিয়ে দিয়ে সমস্ত জমিটা ফলের বাগান হিসেবে নথিভুক্ত করিয়ে রেখে থাকেন তাহলে পুরো জমিটাই সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ জমির ধারাগুলির বাইরে চলে গেল। তেমনি, খানিকটা নীচু জমি যেখানে বর্ষায় বা বৃষ্টিতে কিছুটা জল জমে, সেটাও মাছ চাষের পুকুর বলে নথিভুক্ত করিয়ে নিয়ে নিজের অধিকারে রেখে সাধারণ কৃষি জমির মতো ব্যবহার করা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই রকম অনেক পুকুর, বাগান ধরা হয়েছে এবং সেগুলিকে কৃষি জমি বলে ধরা হয়েছে।

আইনে বলা হয়েছে, কেবলমাত্র ধর্ম্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলি যে কোন পরিমাণ জমি রাখতে পারে। যে কেউ একটা দাতব্য বা ধর্ম্মীয় ন্যাস গঠন করে অতিরিক্ত জমি সেটির নামে হস্তান্তরিত করতে পারে। এতে কেউ বাধা দিতে পারেনা। সাম্প্রতিক সেটল্‌মেন্টের সময় দেবোত্তর ও পীরোত্তর জমির সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে এই ধরণের প্রায় ১,৪৫,০০০ সম্পত্তি আছে। এতো বেশী সংখ্যক দেবোত্তর সম্পত্তি থাকার কারণ হল আইনে এর জন্য কোন সীমা নির্দ্দিষ্ট করা হয়নি, তাছাড়া এইসব জমি হয় নিষ্কর।

এই রেহাইর যখন এই রকম ব্যাপক অপব্যবহার হচ্ছে তখন এই রকম সম্পত্তির ক্ষেত্রেও সর্ব্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজায় কেউ আপত্তি করবেনা কিন্তু তার জন্য কোন খাস জমি রাখার প্রয়োজন নেই। পশ্চিমবঙ্গে এমন অনেক দেবোত্তর সম্পত্তি আছে যেগুলি থেকে কৃষিজাত শস্যাদি বিক্রী করে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় হয় কিন্তু বছরে সেখানে দুটো চারটে পূজায় কয়েক হাজার টাকার বেশী খরচ করা হয়না।

সর্ব্বোচ্চ সীমা ফাঁকি দেওয়া

কৌশলী মধ্যস্বত্বভোগীরা, দেওয়ানী আদালতের সুযোগ কি রকমভাবে নিচ্ছেন এই প্রসঙ্গে তা উল্লেখ করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি, হস্তান্তর, শ্রেণী পরিবর্ত্তন এবং অন্যান্য নানা ব্যাপারে আইনের অনুমোদন সংগ্রহ করার জন্য আদালতগুলিকে ব্যবহার করেছেন। সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ জমির বিধিগুলি এড়াবার পক্ষে একমাত্র দেওয়ানী আদালতের রায়ই যথেষ্ট নয় তবে ঐ বিধিগুলি এড়াবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এগুলির সুবিধে নেওয়া হচ্ছে। মধ্যস্বত্বভোগী এবং রাষ্ট্রের মধ্যে যে সব সোজাসুজি মামলা হচ্ছে, সেগুলির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকেই অসুবিধে ভোগ করতে হচ্ছে। অন্যপক্ষ টাকা দিয়ে, ধাপ্পা দিয়ে এবং অন্যান্য উপায়ে যে সব সাক্ষী যোগাড় করেছেন সেগুলির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের পক্ষে মামলা তদন্তকারী অফিসাররা নিজেদের অসহায় বোধ করেন। রাষ্ট্র এবং বেসরকারী কোন ব্যক্তির মধ্যে যখন কোন মামলা হয় তখন সাধারণের মধ্যে প্রায় কেউই সত্য সাক্ষ্য দেওয়াটা তাঁদের কর্ত্তব্য বলে মনে করেননা। এর ফলে রাষ্ট্র অনেক ভালো ভালো ক্ষেত্রে মামলায় হেরে গেছেন।

সংবিধানের অপব্যবহার

বহু পরিমাণ জমির কৌশলী মালিকদের শেষ আশ্রয় হচ্ছে দেওয়ানী মামলা এবং যোগ সাজসে সাজানো মামলা। রাজস্ব আদালতে যখন ফাঁকি দেওয়ার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয় তখন তাঁরা দেওয়ানী আদালতের শরণাপন্ন হন এবং সেখানে প্রায় সব সময়েই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হয়।

ভূমি স্বত্ব সংস্কারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তি সংযুক্ত হয়ে এই যে স্বৈরাচার চালিয়েছেন, তা সংযত করতে না পারলে এই ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি সম্ভব নয়। ভূমি স্বত্ব সংস্কার আইনটি বানচাল করার উদ্দেশ্যে কৌশলী পক্ষগুলি, সংবিধানের ২২৬ ধারা-টিরও যথেষ্ট অপব্যবহার করছেন। সংবিধানের এই ব্যবস্থাটির প্রয়োগ সীমাবদ্ধ করা সম্ভব কিনা তা বিশেষভাবে ভেবে দেখার সময় এসে গেছে।

বর্ত্তমান ভূমিস্বত্ব সংস্কার আইনের একটি ধারায় বলা হয়েছে যে, এই আইন-টির বিল গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে জারি করার সময়ের মধ্যে যত জমি হস্তান্তরিত করা হয়েছে, সেগুলি সম্বন্ধে তদন্ত করা যাবে। কিন্তু বেশীর ভাগ সন্দেহজনক হস্তান্তরেই দেখা যায় যে সেগুলি যেন রেজেষ্ট্রী না করেই এই আইন জারি হওয়ার বহুপূর্ব্বেই হস্তান্তরিত করা হয়েছে। কাজেই দেশে যে রীতি বা নিয়মই প্রচলিত থাকুক না কেন, সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ জমির ধারাগুলিকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য কোন দলিল তৈরী করা হয়েছে বলে যদি মনে হয় এবং সেগুলি যদি রেজেষ্ট্রী করা না হয় তাহলে সেগুলি বাতিল করে দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

সমস্ত বেনামী জমি বে-আইনী বলে ঘোষণা করাও বিশেষ প্রয়োজন। মাছ চাষের পুকুর, ফলের বাগান, ধর্ম্মীয় ন্যাস ইত্যাদি ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ জমির ধারাগুলিকে ফাঁকি দেওয়ার যে চেষ্টা করা হচ্ছে, সেই ব্যবস্থাগুলিরও সংশোধন করা প্রয়োজন। এই প্রশ্নটি মীমাংসা করার জন্য উচ্চ শক্তির প্রশাসনিক ট্রাইবুন্যাল গঠন করাও প্রয়োজন।

ওপরের এইসব ব্যাপার থেকে কেউ যেন মনে করেন না যে পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী অধিকার আইন অনুযায়ী সর্ব্বোচ্চ জমির ধারাগুলি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে কিছুই করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ষাট দশকের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত ৫ লক্ষ একরেরও বেশী জমি (বনভূমি ছাড়া) রাষ্ট্রের অধিকারে এসেছে। সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ জমির ধারাগুলি কেউ ফাঁকি দিয়েছেন কিনা তা বের করার জন্য ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি যখন জোর

১২ পৃষ্ঠায় দেখুন

ভূমিস্বত্ব সংস্কারের ধারাগুলি মালিকদের অনুকূলে কিন্তু ছোট প্রজাদের প্রতিকূলে

ভবানী সেন

স্বাধীনতা লাভ করার পর ভূমি স্বত্ব সংস্কার সম্পর্কে যতগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে সেগুলির ফলের মূল্যায়ণ না করে জমি এবং কৃষি সম্পর্ক সম্বন্ধে সর্বাধুনিক পরিস্থিতির যথোচিত হিসেব নিকেশ করা যায়না। ১৯৫৫ সালের পর থেকে কোন গুরুত্বপূর্ণ নতুন আইন জারি করা হয়নি বলে ঐ বছরের পর থেকে কৃষি সম্পর্কের পরিবর্তনগুলির মূল্যায়ণ করলেই যথেষ্ট হবে। কিন্তু কার কতটুকু জমি আছে সে সম্পর্কে ১৯৫৩-৫৪ সালের পর থেকে কোন পরিসংখ্যান করা হয়নি বলে, ভূমি স্বত্ব সংস্কারমূলক আইনগুলি জারি হওয়ার পর তার ফল কি হয়েছে অথবা কৃষি সম্পর্কের অবস্থা কি সে সম্বন্ধে প্রায় সঠিক কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। সকলেই বুঝতে পারেন যে এই রকম একটা সঠিক সিদ্ধান্ত ছাড়া কৃষি উন্নয়ন সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা তৈরী করা অসম্ভব। যত তাড়াতাড়ি এই সম্পর্কে পরিসংখ্যান করা হবে, তত ভালো কৃষি পরিকল্পনা তৈরি করা যাবে।

ভূমি স্বত্ব সংস্কারের একটা প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রজা স্বত্ব ব্যবস্থার পরিবর্তে, যাঁরা জমি চাষ করে ফসল উৎপাদন করছেন তাঁদেরই হাতে জমির মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তরিত করা। কৃষি শ্রমিকদের কথা অবশ্য আলাদা কারণ তারা হলেন একটা বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁদের প্রয়োজন ও চাহিদাও অন্য ধরণের। উপরে যে প্রজাদের কথা বলা হ'ল তাঁদের মধ্যে ভাগচাষীরাও অন্তর্ভুক্ত। তাঁরাও ভারতের সর্বত্র ভিন্ন ভিন্ন নামে চাষীদের মধ্যেই একটা গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী হিসেবে রয়েছেন। সমগ্র দেশে ভাগচাষের ভিত্তিতে কত জমি চাষ করা হয়, দুঃখের বিষয় তার কোন নির্ভরযোগ্য সরকারী তথ্য নেই। তবে কতকগুলি রাজ্যে, যেমন পশ্চিমবঙ্গে, বড় বড় জমির মালিকরা ভাগ চাষের ভিত্তিতে যত জমি বিলি করেন তা, মোট চাষের জমির শতকরা ২৫ ভাগের কম নয়।

কৃষিজমি সম্পর্কে নবমবার যে অনুসন্ধান চালানো হয় তাতে দেখা যায় যে সমগ্র ভারতের মোট কৃষি জমির শতকরা ২০.৩৪ ভাগ তখন প্রজাবিলি করা ছিল। এর মধ্যে অর্দ্ধেক ভাগে গরীব চাষীরা ভাগে চাষ করতেন। তার অর্থ হ'ল ১৯৫৩-৫৪ সালেও চাষের জমির শতকরা প্রায় ১০ ভাগ ভাগচাষে দেওয়া হত। অর্থাৎ তাঁদেরই উৎপাদনের সব ব্যয় বহন করতে হত আর জমির মালিকরা কোন রকম অর্থব্যয় না ক'রে, উৎপাদিত শস্যের একটা বড় ভাগ কম পক্ষে অর্দ্ধেক, নিয়ে নিতেন। আমাদের দেশের ভাগ চাষে এইটেই হ'ল প্রধান পদ্ধতি তবে স্থান বিশেষে ব্যতিক্রমও থাকতে পারে।

ভূমি স্বত্ব সংস্কার আইন জারি হওয়ার পর সরকার পাছে অতিরিক্ত জমি অধিকার করে ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে তা বন্টন করে দেন সেই ভয়ে, এবং খাজনার ভিত্তিতে যে সব জমি চাষীদের দেওয়া হয়েছে পাছে তারাই সেগুলির মালিকানা পেয়ে যায় সেই ভয়ে অনেক জমিদার প্রজাস্বত্ব গোপন করে ভাগচাষের চুক্তি করতে বাধ্য হন ফলে বেআইনী বা বেসরকারী ভাগচাষের পরিমাণ হয়তো অনেক বেড়ে গেছে। এই রকম বিভিন্ন উদ্দেশ্যমূলক জটিল অবস্থা, জমি ও চাষীর মধ্যে সম্পর্কের মূল্যায়ন করা কঠিন করে তুলেছে। উৎখাত করার ভয় দেখিয়েই যে অনেকক্ষেত্রে প্রজাস্বত্বের পরিবর্তে ভাগ চাষের চুক্তি করা হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কতকগুলি বেসরকারী বিবরণ থেকে উপরের এই সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়েছে। "হায়দরাবাদে জাগিরদারী উচ্ছেদের ফলে আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা" সম্পর্কে তাঁর বিবরণীতে ডঃ এ. এম. খুস্রো বলেন যে ১৯৫১ থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে শতকরা ৪২ ভাগ প্রজাকে উচ্ছেদ করা হয়। ডঃ ভি. এম. ডাণ্ডেকার তাঁর "বোম্বাই প্রজা আইনের কার্য্যকারিতা" নামক পুস্তকে বলেছেন যে, ১৯৫৩ সালে মহারাষ্ট্রের কয়েকটি জেলায় শতকরা ৫৭ জন প্রজা, ১৯৪৯ সালে যে জমি চাষ করতেন সেগুলি তাদের অধিকারে রেখেছিলেন। ভূমি স্বত্ব সংস্কার সম্পর্কিত কমিটি বলেছিলেন যে ১৯৪৮ এবং ১৯৫১ সালের মধ্যে প্রজাস্বত্বের অধিকারীদের মোট সংখ্যা শতকরা ২০ ভাগ কমে যায় এবং হায়দরাবাদে ১৯৫২ থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে তা শতকরা ৫৭ ভাগ কমে যায়। যে প্রজাদের উচ্ছেদ করা হয় তারা কৃষি শ্রমিক বা ভাগচাষী হয়ে যান। পশ্চিমবঙ্গে বহু সংখ্যক তথাকথিত কৃষি শ্রমিক আসলে ভাগচাষী, কারণ জমির মালিকরা "বর্গাদার আইন" এড়ানোর জন্য তাদের কৃষি শ্রমিক হিসেবে উল্লেখ করান।

ব্যবস্থাগুলি কার্য্যকরী নয়

এই রকম অবস্থার আর্থিক ফলাফল কি হচ্ছে? যদি ধরে নেওয়া যায় যে শতকরা ২৫ ভাগ জমি ভাগ-চাষীরা চাষ করছেন এবং জমির মালিকরা চাষের জন্য একটি পয়সাও খরচ না করে উৎপাদিত ফসলের অর্দ্ধেক অথবা চাষের জন্য সামান্য কিছু টাকা দিয়ে উৎপাদিত শস্যের অর্দ্ধেকেরও বেশী নিয়ে নেন তাহলে ফল কি দাঁড়ায়? যে প্রকৃতপক্ষে জমি চাষ ক'রে ফসল ফলাচ্ছে সে ভাগচাষী বা প্রজা যাই হোক না কেন, আইনতঃ বা বেআইনীভাবে তাকে যে খাজনা দিতে হচ্ছে, তাতে

জমিতে লগ্নি করার মতো টাকা থেকে সে বঞ্চিত হচ্ছে কিন্তু জমির মালিকরা সেই টাকাটা অতিরিক্ত পেয়ে যাচ্ছেন। কাজেই কৃষি উন্নয়ন সম্পর্কে সরকারী প্রচেষ্টাও সেই পরিমাণে কার্য্যকরী হচ্ছেনা। সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে এই ধরণের জমির পরিমাণ শতকরা ২০ বা ১০ ভাগ যাই হোক না কেন অন্তত:পক্ষে পূর্ব্ব ভারতে সমগ্রভাবে, এই ধরণের জমির পরিমাণ খুব বেশী এবং কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে তার অর্থও অনেকখানি। এই ধরণের জমিবিলি ব্যবস্থা কৃষি উন্নয়নের পথে বাধা স্বরূপ এবং খাদ্যশস্যের চোরাবাজারীতে তা উৎসাহ জোগায়।

এই ধরণের ভূমি স্বত্ব জাতীয় অর্থনীতিতেও একটা বড় চাপের সৃষ্টি করে। এই ধরণের কৃষি ব্যবস্থায় অল্প সংখ্যক, জমির মালিক অতিরিক্ত খাদ্যশস্য মজুত করে চোরাবাজারের শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে এবং ভূমিস্বত্ব সংস্কার সমস্যাকে জটিলতর করে তোলে।

সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ জমি আইনের অনেক ফাঁক, নিজেদের তদারকিতে চাষ করানোর ব্যবস্থার পুন:প্রবর্ত্তন এবং অন্যান্য আরও মৌলিক কারণে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ভূমি স্বত্ব সংস্কারের লক্ষ্যগুলি এই সব ব্যবস্থা ও আইন প্রকৃতপক্ষে নষ্ট করে দিয়েছে।

জটিল সমস্যা

এই সমস্যার সমাধান আপাত: দৃষ্টিতে সহজ মনে হলেও কার্য্যত: বেশ জটিল। এমনিতে হয়তো বলা যায় যে, ভাগচাষী যে জমি চাষ করছেন তিনিই সেই জমির মালিক এই মর্ম্মে সোজা একটি আইন জারি করলেই এই ব্যবস্থা লোপ পাবে। কিন্তু এই রকম অতি সহজদৃষ্টিভঙ্গী অনেক নতুন সমস্যার সৃষ্টি করবে। জমির যে মালিকরা ভাগ চাষে জমি চাষ করান তাঁদের আবার দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক হ'ল বড় বড় জমির মালিক যাঁরা শস্যের ব্যবসায়ের মাধ্যমে একচেটিয়া লাভ করেন। দ্বিতীয় হল, স্কুলের শিক্ষক, ছোট ছোট জমির মালিক, বিধবা এবং পিতৃমাতৃহীন শিশু যারা ছোট ছোট জমির টুকরো ভাগচাষে বিলি করেন এবং সেই চাষে উৎপাদিত শস্যের ওপরেই জীবন ধারণ করেন। এই দুই শ্রেণীর মালিক ছাড়াও, ভাগচাষীদের মধ্যেও দুটি শ্রেণী রয়েছে অর্থাৎ যাঁরা বহু বছর ধরে কোন জমি চাষ করছেন এবং যাঁরা মধ্যে মধ্যে কারুর জমি ভাগে চাষ করেন। এ ছাড়াও এমন কিছু ধনী চাষী আছেন যাঁরা ভাগচাষের ভিত্তিতে দরিদ্র চাষীদের জমিও চাষ করেন।

কিন্তু এত জটিলতা থাকলেও, ভাগ চাষীদের মধ্যে বেশীর ভাগই যে দরিদ্র চাষী এবং জমিদার বা ধনী চাষীদের জমি প্রায় স্থায়ীভাবেই চাষ করেন, এই কথাটা উপেক্ষা করা যায়না। এই ভাগচাষীদের অবিলম্বে জমির মালিকানা স্বত্ব অথবা অন্তত:পক্ষে বংশানুক্রমিক দখলী স্বত্ব দিতে হবে। ভাগচাষীদের জমির দখল সম্পর্কে কোন দলিল না থাকায় এবং আদালতে তাদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করার উপায় না থাকায়, জমির মালিকরা ইচ্ছে করলে তাদের উচ্ছেদ করে আইনকে ফাঁকি দিতে পারেন। এই রকম ফাঁকি কি করে প্রতিরোধ করা যায় তার উপায়, প্রশাসন এবং কৃষক সংস্থাগুলিকে যুক্তভাবে ভেবে দেখতে হবে।

আইনের ফাঁকগুলি বন্ধ করা

"নিজের তদারকিতে চাষের পুন: প্রবর্ত্তন" সম্পর্কে সে সব ধারা আছে সেগুলির ফাঁক বন্ধ করে কৃষি সম্পকিত আইনগুলি এড়ানোর উপায় বন্ধ করা যেতে পারে। খাস চাষের সূত্রটিই এমন ত্রুটিপূর্ণ যে, ভাগ চাষ ইত্যাদির পরিবর্ত্তে মালিকরা তাদের জমি খাসে নিয়ে এলেও ভূমিহীনের সংখ্যা কমেনি। প্রথমত: নিজের তদারকিতে চাষ বা খাস চাষের অর্থ যদি এই হয় যে, জমির মালিক এবং তার পরিবারই যে শুধু চাষ করবেন তাই নয় মজুর রেখেও জমি চাষ করানো যাবে তাহলে, ধনতান্ত্রিক ধাঁচে চাষ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য তা হবে ব্যাপকভাবে প্রজা উৎখাত করার একটা অস্ত্র। কাজেই ভাগচাষী বা প্রজাদের স্বার্থের জন্যই এই সূত্রটির সংশোধন প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত: ভিন্ন ভিন্ন নামে জমি না রেখে, খাস চাষে কতখানি জমি থাকবে তা সমগ্র পরিবারের হিসেবে সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে। কারণ ভিন্ন ভিন্ন নামে জমি থাকলে জমির মালিক পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তা এমন ভাবে ভাগ ক'রে দিতে পারেন যে খুব কম জমিই অতিরিক্ত থাকবে। তৃতীয়ত: কোন কোন জমি মালিক নিজে চাষ করবেন তা পছন্দ করে নেওয়ার অধিকার তাঁর রয়েছে। এর ফলে তিনি বন্টনের জন্য অতিরিক্ত জমি হিসেবে খারাপ জমিগুলিই দেওয়ার সুবিধে পান। চতুর্থত: বেনামীতে এতো ব্যাপকভাবে জমি হস্তান্তর করা হয়েছে যে, ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টনের জন্য অতিরিক্ত জমি প্রায় নেই বল্লেই হয়। এই সমস্ত সমস্যা কেবলমাত্র ভাগচাষী ইত্যাদিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় সমগ্রভাবে জমির মালিকানা এবং জমি বন্টনের সমস্যাগুলিও এগুলির মধ্যে সংশ্লিষ্ট।

ভূমিস্বত্ব সংস্কারের ধারাগুলি, খাস চাষের সূত্র এবং খাস চাষ ও বন্টনের জন্য অতিরিক্ত জমি সম্পকিত ধারাগুলি একটু ভালো করে পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারা যাবে যে এগুলি মালিকদেরই বেশী অনুকূলে এবং ভাগচাষী ইত্যাদিদের বিরোধী। যাঁরা ধনীকশ্রেণীর অনুকূলে উন্নয়ন চান তাঁদের পক্ষে এই ধরণের পক্ষপাতিত্ব স্বাভাবিক। আইনসভা, প্রশাসন ব্যবস্থা এবং বিচারবিভাগগুলি থেকে যদি এই পক্ষপাতিত্ব দূর করা না যায় তাহলে ভূমি সম্পকিত আইনগুলিকে সব সময়েই ফাঁকি দেওয়া যাবে।

মানুষ ও ভূমির মধ্যে সুষম সম্পর্ক থাকা উচিত

এস. কে. দে

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের যে সব মানব সমাজ এখনও সভ্য হয়ে উঠতে পারেনি, সেখানে, যারা জমিতে কাজ করে, তারাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জমিতে চাষ করবার এবং ফসল ভোগ করবার অধিকারী। কিন্তু যে সব সমাজ তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব্ব করে, সেখানে, যাদের হাতে এক কণা ধুলো লাগেনা তারাই হলেন জমির মালিক। যে সভ্যতা সংস্কৃতি যত প্রাচীন সেখানেই এই অদ্ভুত অবস্থাটা বেশী ব্যাপক ও দৃঢ়মূল। কাজেই ভারতেও মানুষ ও ভূমির মধ্যে শত শত শতাব্দির সম্পর্ক একটা, অস্বাভাবিক স্তরে স্থায়ী হওয়াটা অবশ্যম্ভাবী ছিল।

যখন জীবনের প্রয়োজন ছিল স্বল্প এবং লোকসংখ্যার তুলনায় জমি ছিল বেশী তখন জমির সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে জমিদারী করলেও বিশেষ কোন সমস্যার উদ্ভব হতো না। কিন্তু লোকসংখ্যা এবং জমির মধ্যে অনুপাত যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল তখনই সত্যিকারের সমস্যা দেখা দিতে লাগলো। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাগণ পূর্ব্বাহ্নেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্বাধীনতা লাভ করার পর জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা দিয়ে সত্যিকারের গণতন্ত্র স্থাপনই যদি রাজনৈতিক লক্ষ্য হয় তাহলে যে জমি চাষ করবে তারই জমির মালিক হওয়া উচিত, না হ'লে সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলি, গণতান্ত্রিক জীবনধারা গঠনের প্রচেষ্টা বানচাল করে দেবে।

স্বাধীনতা লাভ করার পূর্ব্বে চাষীকে জমি দেওয়া সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিলো, স্বাধীনতা লাভ করার পর তা রক্ষা করার জন্য একটা অভিযান সুরু করা হয়। সামাজিক ন্যায়বিচারই শুধু এর লক্ষ্য ছিলনা, অর্থনীতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য মূলধন গঠনও ছিল অন্যতম লক্ষ্য। অনুন্নত সমাজকে পুনর্গঠিত করতে হলে কৃষিকে ভিত্তি করেই তা করতে হবে। আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞান কৃষির উন্নতির পক্ষে নতুন একটা একটা পথ খুলে দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু ভূমি উন্নয়নের জন্য লগ্নিরও প্রয়োজন। কাজেই জাতীয় পরিকল্পনায় ভূমি স্বত্ব সংস্কার অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছে।

কায়েমি স্বার্থ

বড় বড় জমিদারদের কোন পৃষ্ঠপোষক ছিলনা বলে একদিনের মধ্যেই তাঁদের অধিকার হরণ করা সম্ভব হয়। কিন্তু ভূমি স্বত্ব সংস্কারের দ্বিতীয় পর্য্যায়টিই ভীষণ জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। রাজ্যের আইন সভাগুলিতে এবং সংসদে যাঁরা নির্ব্বাচিত হয়ে এলেন তাঁদের মধ্যে বেশীরভাগেরই জমির মালিকানায় প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ কায়েমি স্বার্থ ছিল। তাঁরা তাঁদেরই বিরুদ্ধে ভোট দেবেন, স্বভাবতঃই আশা করা যায়না। আইন সভাগুলিতে যাঁরা ভূমিহীন এবং ছোট জমির চাষীদের প্রতিনিধি ছিলেন তাঁদেরও সহজেই দলে টানা সম্ভব ছিল।

ওড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও রাজস্থানের মতো রাজ্যগুলিতে ভূমিস্বত্ব সংস্কারের আইনগুলি বাইরে থেকে খুব কঠোর দেখালেও ভেতরে ছিল ফাঁপা। কেরালা, তামিলনাড়ু, মহীশূর, গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যগুলিতে এই আইন অনেকখানি প্রগতিশীল হলেও তা পালন করার পরিবর্ত্তে ভঙ্গ করেই, আইনটিকে সম্মান দেখানো হয়। সাধারণতঃ রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারীদের ওপরেই এই আইনটি প্রয়োগ করার ভার দেওয়া হয় কিন্তু তাঁদের নিজেদের কায়েমি স্বার্থও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল, তাছাড়া বড় বড় জমির মালিকদের প্রতি তাদের একটা মানসিক আনুকূল্য ছিল। জমির মালিকরাও অবস্থাকে আরও জটিল করে তুললেন। কারণ কেন্দ্রে ও রাজ্যে যাঁরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁদের সঙ্গে এঁদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল, কাজেই যে সরকারী কর্ম্মচারী আইনসঙ্গত কাজ করতে উদ্যত হতেন তার ওপরেই অপ্রত্যক্ষ চাপ দিতে পারতেন। সুতরাং প্রধানতঃ অর্থনৈতিক এবং দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের জন্য যে ব্যবস্থা করা হল, তা ব্যর্থ হ'ল।

এমন কি যেখানে, যেমন উত্তরপ্রদেশে ভূমিস্বত্ব সংস্কার সম্পর্কে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা হয় সেখানেও মূল উদ্দেশ্যটি পূর্ণ হলোনা। কারণ যে প্রজা এবং অন্যান্যরা জমি পেলেন তাদের এখন অর্থ, বীজ, সার ইত্যাদির জন্য একজন জমিদারের কাছে দাঁড়ানোর পরিবর্ত্তে, বহু সরকারী কর্ম্মচারীর কাছে সাহায্যের জন্য যেতে হল। জমিদার অবশ্য তাঁর নিজের স্বার্থেই খানিকটা সাহায্য করতেন।

সরকারী কৃষিবিভাগের বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে কিছু উদ্ধার করাটাইতো একটা জটিল ব্যাপার, তার ওপরে জমিতে কি হ'ল অথবা যারা জমি চাষ করে তাদেরই বা কি হল, সে সম্পর্কে সরকারী কর্ম্মচারী সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতে পারেন, কিন্তু জমির মালিকরা তা পারেননা।

সরকারের দিক থেকে ভালো কোন কাজ পাওয়া সম্পর্কে জনগণ একবার যখন

কোন স্থানেই গ্রামের প্রশাসন ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য বিশেষভাবে কোন চেষ্টা করা হয়নি, যা অন্য গ্রামগুলির পক্ষে আদর্শ হিসেবে কাজ করতে পারে অথবা বিভিন্ন আইনগুলি রূপায়িত করা সম্পর্কে কোন চাপেরও সৃষ্টি করা হয়নি।

নতুন একটি পরিস্থিতি

ইতিমধ্যে দেশের অভ্যন্তরের অনেকে এবং বিদেশেরও কিছু কিছু ব্যক্তি "সবুজ বিপ্লবকে" অভিনন্দন জানাতে সুরু করেন। সবুজ বিপ্লব হ'ল কৃষি সাজসরঞ্জাম ব্যবহারের এবং উৎপাদনের পরিমাণের বিপ্লব। এখানেও বড় বড় জমির মালিক, যাঁদের সেচের সুবিধে ছিল, তাঁরাই, সরকারী অন্যান্য ক্ষেত্রের যুক্ত প্রচেষ্টায় যতটুকু কৃষি সরঞ্জাম সংগ্রহ করা যায় তার বেশীর ভাগই সংগ্রহ করেন। জমির দাম খুব বেড়ে গেছে এবং বড় বড় জমির মালিক এবং ছোট ছোট জমির মালিক ও কৃষির আয়ে কোন রকমে জীবন ধারণ করেন এই ধরণের মালিকদের মধ্যে পার্থক্য অনেক বেড়ে গেছে। এখন এমন একটা নতুন পরিস্থিতি গড়ে উঠছে যাতে ছোট চাষীরা বেশী দামে তাদের জমি এই সব বড় মালিকদের কাছে বিক্রী করে দিতে উৎসাহিত হচ্ছেন। সবেবাচচ পরিমাণ জমির আইন জারি হওয়ার পর যে বেনামী হস্তান্তর একটা সংক্রামক আকার নেয় তা এখন সবুজ বিপ্লবের উপজাত পদার্থ হিসেবে নতুন নতুন পথে প্রবাহিত হচ্ছে।

জমির ওপর ক্রমশঃ যাঁদের শক্তি এইরকমভাবে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে তাঁদের হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা ক'রে তাঁদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে হলে সহিংস পদ্ধতি প্রয়োজন বলে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা নতুন অবস্থাকে স্বাগত জানাচ্ছেন। তাঁদের মতে এই পরিস্থিতি শ্রেণী সংগ্রামকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। জমির আয়ে যাঁরা নতুন ধনী হয়েছেন তাঁরা তাঁদের অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠা আয়ের ওপর সরকারকে কোন কর দিতে চাননা। তাঁদের মাথার ওপর ডেমোক্লিসের যে খাড়া ঝুলছে তার জন্যই হয়তো জমিতে আর বেশী টাকা লগ্নি করতে চাইছেন না। সহরে ... তৈরি করে বা অথবা খরচ করে তাঁরা অতিরিক্ত আয় ব্যয় করছেন। এমন কি সংসদ ও বিধান সভার সদস্যরাও তাঁদের দলগত শৃঙ্খলা বা বৃত্তিকে উপেক্ষা করে কৃষি থেকে অর্জিত করবিহীন আয়ের ওপর সীমানির্দ্দেশমূলক কোন ব্যবস্থা সমর্থন করতে অনিচ্ছুক। কয়েক বছর পূর্বে লেডেজেনস্কি, আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমিস্বত্ব সংস্কারমূলক আইনগুলির এই সব ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু আমরা কঠোর সত্যের সম্মুখীন হতে রাজি নই।

কয়েকটি পরামর্শ

মানুষ ও ভূমির সম্পর্কের মধ্যে ক্রন্দনবিহীন একটা বিপ্লব আনার জন্য গত ২২ বছর ধরে যে ব্যর্থ চেষ্টা হচ্ছে, তারপর যে রক্তক্ষয়ী বিপ্লবকে একই সঙ্গে স্বাগত জানানো হয় আবার ভয়ও করা হয় তা যাতে প্রকাশ্যে ফেটে পড়ে পল্লী অঞ্চলেও বিরাট বিশৃঙ্খলা না নিয়ে আসতে পারে সেজন্য এখন কি করা উচিত তা ভেবে দেখার সময় এসে গেছে। বর্ত্তমানে সবেবাচচ পরিমাণ জমি এবং প্রজা আইন সম্পর্কে যে সব আইন রয়েছে সেগুলির ক্ষমতা যত সীমাবদ্ধই হোক সেগুলিকে দৃঢ় মনোভাব নিয়ে কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। জমিগুলিকে সংহত করার জন্য একটা দেশব্যাপি কর্ম্মসূচী তৈরি করতে হবে। নতুন যে সব জমি পুনরুদ্ধার করা হবে এবং সরকারের হাতে অতিরিক্ত যে জমি আসবে, সেগুলি সরকারী অংশীদারিত্বে সমবায়ের ভিত্তিতে চাষ করা উচিত। যাঁদের জমির পরিমাণ সামান্য অথবা যাঁরা ভূমিহীন তাঁরা এতে স্থায়ী ও অর্থকরী বৃত্তি পাবেন।

গ্রামের ভূমিহীন এবং অর্দ্ধবেকার জনশক্তিকে কাজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, ভূমি উন্নয়ন, যোগাযোগ এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে স্থানীয় কাজের একটা বড় ধরণের কর্ম্মসূচী নিয়ে কাজ সুরু করা উচিত। রাজনৈতিক দলগুলির কায়েমি স্বার্থের বিরোধিতা স্বত্বেও কৃষিশ্রমিকগণের জন্য একটা নিম্নতম মজুরি স্থির করে দিয়ে তা কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

গ্রামের অতিরিক্ত জনশক্তির কর্ম্ম-সংস্থানের জন্য, কৃষি উৎপাদনের উন্নততর বাজার ও সুযোগ সুবিধে সৃষ্টির জন্য কৃষি শিল্পগুলিকে সুষমভাবে দেশের চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। ভূমিহীন এবং জমির আয়ে কোন রকমে বেঁচে আছে এই রকম চাষীরা বর্ত্তমানে যে নিরাপত্তাবিহীন প্রজাস্বত্বে, সহজদাহ্য কুড়ে ঘরে বাস করছেন তাঁদের জমিদারদের শোষনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বাড়ী তৈরি করার জায়গা দিতে হবে। সহরাঞ্চলের আয়ের ওপর যদি কোন সীমা প্রয়োগ না করা যায় তাহলে গ্রামের আয় সম্পর্কেও কোন সীমা থাকা উচিত নয়। দুটি অর্থনৈতিক আইন অনুযায়ী দেশকে সহুরে এবং গ্রাম্য এই দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়না।

যে ভূমি থেকে আমাদের দেহ পুষ্টি-লাভ করে সেই ভূমির সঙ্গে যদি সুষম সম্পর্ক রাখতে হয় তাহলে উপরে উল্লিখিত মূল ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করতে হবে। একবার যদি কাজ সুরু হয় তাহলে সময়ের সঙ্গে তাল রাখার জন্য বর্ত্তমান আইন-গুলিতে কি সংশোধন করা প্রয়োজন তা তখন করে নেওয়া যাবে। যে সব রাজ্য এই আইনগুলি প্রয়োগ করতে উৎসাহী সেখানে, একদিকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার অন্যদিকে পঞ্চায়েতি রাজ ও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির সমর্থনের ভিত্তিতে এইদিক দিয়ে কাজ সুরু করা যায়। এই রকম কোন কর্ম্মসূচী রূপায়িত করতে হলে, "যে জমি চাষ করে সেই জমির মালিক" এবং "জনগণের হাতেই ক্ষমতা থাকা উচিত" এই আদর্শে যাঁরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী এই ধরণের সমাজকল্যাণ কর্ম্মীদের একটা তৃতীয় শক্তিরও প্রয়োজন। তবে প্রচেষ্টা যদি আন্তরিক ও সাধু হয় তাহলে তা অল্প সময়ের মধ্যেই এক নতুন অভিযানে পরিণত হয়ে সমগ্র পল্লী এলাকাতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়বে।
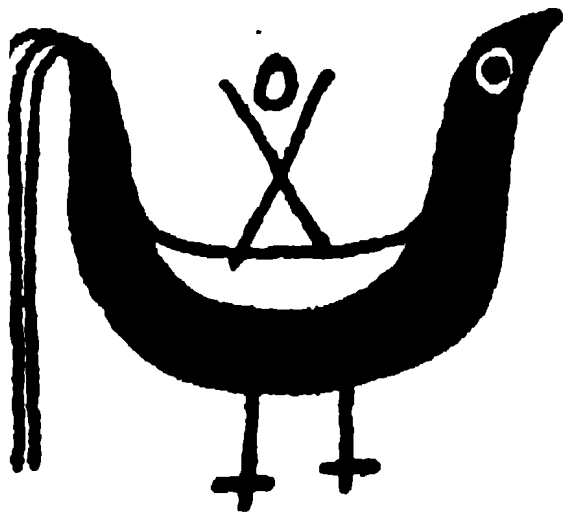
ভূমিসত্ত্ব সংস্কার

৫ পৃষ্ঠার পর

যায়না। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারগুলি যদি বিশেষভাবে চেষ্টা করেন তাহলেও খানিকটা পরিবর্ত্তন আনা যেতে পারে। কিন্তু তারই অভাব রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে আন্তরিক-ভাবে চেষ্টা করলে কিছুটা কাজ করা যায়।

তৃতীয়তঃ, কৃষক ও কৃষি শ্রমিকগণের সংস্থাগুলির সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া কেবলমাত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জমিদারদের যোগসাজস ভাঙ্গা সম্ভব নয়। প্রশাসনিক ব্যবস্থা কতটুকু পর্য্যন্ত কার্য্যোপযোগী করে তোলা যাবে তাও অবশ্য খানিকটা কৃষক সংস্থাগুলির সহযোগিতার ওপরেই নির্ভর করে। জমিদারদের সঙ্গে আলো-চনা করে ভূমি স্বত্ব সংস্কার ব্যবস্থা রূপায়িত করা যায়না। কিন্তু সব সময়েই কৃষক সংস্থাগুলির সহযোগিতার বিরোধিতা করা হয়েছে। ভূমি স্বত্বের সংস্কারের ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি করতে হলে এই মনো-ভাবের পরিবর্ত্তন করতে হবে। পশ্চিম-বঙ্গে যতটুকু ফল পাওয়া গেছে তার বেশীর ভাগই এই রকম সহযোগিতার জন্যই পাওয়া গেছে।

উপরে যে প্রধান ত্রুটিগুলির উল্লেখ করা হ'ল সেগুলি যদি ভালো করে ভেবে দেখা না হয় এবং প্রতিবিধানগুলি সময়-মতো রূপায়িত করা না হয় তাহলে আমার মনে হয় ভূমি স্বত্ব সংস্কার সম্পর্কে কথাবার্ত্তা কেবলমাত্র একটা শুভ ইচ্ছা হয়েই থাকবে।

ত্রুটি স্বীকার

আমাদের ৯ই নভেম্বর সংখ্যায় "ধাতুশিল্পে প্রগতি" প্রবন্ধটিতে ধাতু সম্বন্ধে বিশেষ তথ্যে (চার্টে) মুদ্রাকর প্রমাদ বশত: সোণা রূপার যে হিসেব হাজার টনে দেওয়া হয়েছে, তা কিলোগ্রামে হবে।

পশ্চিম বাংলায় ১৯৫৩ সালের ভূমিসত্ত্ব সংস্কার সংক্রান্ত বিধিতে মধ্যসত্ত্বভোগী সংস্থাগুলির বিলোপ সম্পূর্ণ হয়েছে। মধ্যসত্ত্বভোগী-দের হাতে অবশ্য কিছু কিছু জমি রাখা হয়েছে। রাজ্যসর-কার সম্প্রতি বর্গাদার সম্পর্কে সুসংহত বিধি প্রণয়নের সঙ্কল্প করেন। সেই বিধি বলবৎ না হওয়া পর্য্যন্ত জমি থেকে উচ্ছে-দের যাবতীয় প্রচেষ্টা স্থগিত রেখে একটি অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়েছে। ১৯৫৩-র বিধিতে কোনোও ব্যক্তির মালিকানাধীন জমির (তা' সে যে কোনোও শ্রেণীরই হ'ক) সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ধার্য্য করার বিষয়েও একটি ব্যবস্থা আছে।

ভূমি সংস্কার আইন

৭ পৃষ্ঠার পর

অভিযান চালানো হয় তখন ধরে নেওয়া হয় রাষ্ট্রের জমি অধিকারের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। যাইহোক এই অভি-যানের ফলে, ওপরে উল্লিখিত বাধাগুলি স্বত্বেও ২.৭৫ লক্ষ একর অতিরিক্ত জমি রাষ্ট্রের অধিকারে এসেছে। এই অভিযানে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত হয়েছে তাতে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে ঐ বাধাগুলি যদি অপসারিত করা যেতো এবং পূর্ব্বে-কার সিদ্ধান্তগুলি পুনরায় পরীক্ষা করতে পারা যেতো তাহলে আরও অনেক জমি রাষ্ট্রের অধিকারে আনা যেতো এবং এক টুকরো জমি পাওয়ার জন্য উদগ্রীব এই রকম চাষীদের মধ্যে তা বন্টন করা যেতো। এতে গ্রামাঞ্চলের বর্ত্তমান উত্তেজনা খানিকটা প্রশমিত হতো।

একটা ন্যায়সঙ্গত ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা

এম. এল. দান্তওয়ালা

এখনই কার্য্যকরী করা প্রয়োজন

* ভূমিস্বত্ব সংস্কার সম্পর্কিত আইনগুলি প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে শতকরা ৪০ ভাগেরও বেশী যে জমি জমিদার, জায়গীরদার ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগীদের আয়ত্বে ছিল তা তাঁদের হাত থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে, ফলে পূর্ব্বের মধ্যস্বত্বভোগীদের অধীনে যে ২ কোটি প্রজা ছিলেন, তাঁরা তাঁদের জমির মালিক হয়েছেন।
* প্রজাস্বত্ব সম্পর্কে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করায় প্রায় ৩০ লক্ষ প্রজা ও ভাগচাষী ৭০ লক্ষ একর জমির মালিকানা পেয়েছেন।
* শস্যের ভাগের নানা রকম সাময়িক ব্যবস্থার মাধ্যমে এই আইনগুলিকে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে।
* কৃষিকে নির্ব্বিচারে যন্ত্রসজ্জিত করার বিরুদ্ধে আমাদের সচেতন থাকতে হবে কারণ তা বৃহত্তর আবাদের পথ তৈরি করতে পারে।

যে সব অঞ্চলে ভূমিস্বত্ব সম্পর্কিত আইনগুলি প্রগতিশীল নয় সেখানেও কৃষির উৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছে।

আগামী ১৫।২০ বছরের মধ্যে ৬ থেকে ৯ কোটি অতিরিক্ত ব্যক্তি কৃষি শ্রমিকে পরিণত হবেন।

১৯৪০ সালে, ভূমিস্বত্ব সংস্কার সম্পর্কে ব্যাপক আইন প্রয়োগ করার পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগই আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ভূমি স্বত্ব সংস্কার ব্যবস্থা যে শুধুমাত্র কৃষি সম্পর্কের উন্নতি করে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করবে তাই নয়, কৃষি উৎপাদন এবং উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াবে। এ পর্য্যন্ত অবশ্য সব রাজ্যেই ভূমি স্বত্বের সব ক্ষেত্রেই যেমন জমিদারী, ভূমি স্বত্ব, সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ জমি ইত্যাদি সম্পর্কে আইন জারি করা হয়েছে। তবে অনেকেই ক্রমশঃ বিশ্বাস করছেন যে ভূমিস্বত্ব সংস্কার কর্ম্মসূচী বিফলতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে হলে এর কয়েকটা সাফল্যের কথাও উল্লেখ করতে হয়।

ভূমি স্বত্ব সংস্কারমূলক আইনগুলি জারি হওয়ার পূর্ব্বে জমিদার, বর্গাদার ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগীদের অধীনে শতকরা যে ৪০ ভাগ জমি ছিল, প্রকৃতপক্ষে সারা দেশেই এই ৪০ ভাগ জমির মধ্যস্বত্ব বিলোপ করা হয়েছে। এর ফলে পূর্ব্বেকার মধ্যস্বত্বভোগীদের অধীনস্থ প্রায় ২ কোটি প্রজা সোজাসুজি রাষ্ট্রের অধীনে এসেছেন এবং নিজেরাই নিজের জমির মালিক হয়েছেন। প্রজাস্বত্ব এবং রায়তি স্বত্বের নিরাপত্তা সম্পর্কে বিশেষ উন্নতি হয়েছে। অনুমান করা হয় যে প্রায় ৩০ লক্ষ প্রজা ও ভাগচাষী ৭০ লক্ষ একরেরও বেশী জমির মালিকানা পেয়েছেন।

তবে এটাও অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে দেশের অনেক জায়গাতেই ভূমি স্বত্ব এখনও নিরাপদ নয়। সর্ব্বোচ্চ কি পরিমাণ কৃষিজমি রাখা যেতে পারে সে সম্পর্কে সব রাজ্যেই আইন গৃহীত হয়েছে এগুলি যে অত্যন্ত শ্লথগতিতে রূপায়িত করা হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। তা স্বত্বেও সর্ব্বোচ্চ পরিমাণের বাইরে অতিরিক্ত ২০ লক্ষ একর জমি রাজ্য সরকারগুলি নিজেদের হাতে নিয়ে নিয়েছেন।

চাষীকে জমি দেওয়ার এই আইন কার্য্যকরী করার ক্ষেত্রে যদিও অনেক ভুল ত্রুটি রয়েছে তবুও প্রজা স্বত্বের জমির পরিমাণ অনেক কমে গেছে। ১৯৬১ সালের পরিসংখ্যাণ অনুযায়ী প্রতি ১০০ জন কৃষকের মধ্যে ৭৬ জন নিজেদের জমি চাষ করেন, ১৫ জন হলেন সত্যিকারের প্রজা চাষী। শস্যের ভাগ সম্পর্কে কতকগুলি অলিখিত ব্যবস্থার মাধ্যমে আইনকে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে। নানা রকম উপায়ে যেমন, স্বেচ্ছায় প্রত্যর্পণের মাধ্যমে প্রজাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে।

অসাম্য এখনও রয়েছে

এইসব সাফল্যের বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে কৃষি সম্পর্কের কতকগুলি মূল অন্যায় দূর করা হলেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও অনেক অসাম্য থেকে গেছে। তবে ভূমি স্বত্ব সংস্কারের ফলে কৃষি উৎপাদন কতখানি বেড়েছে সে সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য যথেষ্ট তথ্যাদি পাওয়া যায়নি।

তবে সাধারণভাবে দেখতে গেলে মনে হয় যে ভূমি স্বত্ব সংস্কার, উৎপাদনের ওপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে তথাকথিত সবুজ বিপ্লব যেখানে ঘটেছে অর্থাৎ পাঞ্জাব, তামিলাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশ, এই এলাকাগুলি অবশ্য ভূমিস্বত্ব সংস্কার সম্পর্কিত আইন সম্বন্ধে খুব প্রগতিশীল নয়। অন্যদিকে,

মহারাষ্ট্র ও গুজরাট, যেখানে অন্ততঃপক্ষে প্রজাস্বত্ব সম্পর্কিত ধারাগুলি বেশ প্রগতিশীল, সেখানে কৃষি উৎপাদন খুব বেশী বাড়েনি। ১৯৫২-৫৩ সাল থেকে ১৯৬৬-৬৭ সালের মধ্যে সব রকম দানাশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার পাঞ্জাবে ছিল ৪.১৬, তামিলনাড়ুতে ৩.৫৬, অন্ধ্রে ২.৯১ এবং মহারাষ্ট্রে ছিল ১.২৮ আর গুজরাটে ১.৩৩। কাজেই ভূমিস্বত্ব সংস্কারের সঙ্গে কৃষি উৎপাদন বাড়ার কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা বলা কঠিন। তবে কৃষি উৎপাদন বাড়াবার জন্য যে সব সরঞ্জাম দরকার, যেমন সার, সেচ, কীটনাশক ইত্যাদির জন্য বেশী মূলধনের প্রয়োজন, কাজেই বলা যেতে পারে যে কেবলমাত্র ধনী চাষীরাই কৃষি উৎপাদন বাড়াবার নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন। সুতরাং একথাও বলা যেতে পারে যে সর্বোচ্চ জমির পরিমাণ বেঁধে দিলে অথবা কঠোরভাবে এই আইন প্রয়োগ করলে তা বড় চাষীদের আঘাত করবে এবং সবুজ বিপ্লবের ক্ষেত্রেও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে।

কাজেই ওপরের আলোচনা অনুযায়ী, ভূমিস্বত্ব সংস্কার সম্পর্কে দ্বিতীয়বার ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে কিনা তা বিবেচনা করা যেতে পারে। কৃষি উন্নয়ন যে পর্য্যায়েই থাকুকনা কেন, এমন কোন ভূমিস্বত্ব সংস্কার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া উচিত নয় যা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। কেউ যদি বেশী জমির মালিক হন তাহলেই যেমন উৎপাদন বাড়েনা তেমনি আবাদের পরিমাণ বাড়ালেই উৎপাদন বাড়েনা। কৃষককে যদি নতুন কৃষি পদ্ধতিতে উৎপাদন বাড়াতে হয় তাহলে তার মূলধন প্রয়োজন। সুতরাং সুসংহত একটা ঋণদান ব্যবস্থারও প্রয়োজন। কিন্তু কৃষকেরও আবার ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা থাকা উচিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে জমির পুনর্বন্টন কর্মসূচী এমন হওয়া উচিত যাতে এই পরিশোধ ক্ষমতা, কৃষি লগ্নির পরিমাণের মধ্যে থাকে।

শিগগীরই হয়তো এমন একটা অবস্থার উদ্ভব হবে যখন শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা, ভূমির উৎপাদিকা শক্তির তুলনায় বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। তার অর্থ দাঁড়াবে প্রতি জন শ্রমিকের জন্য আরও বেশী মূলধনের প্রয়োজন হবে আর তার ফলে কৃষিতে ব্যাপকভাবে কৃষি যন্ত্রপাতির প্রয়োগ বাড়বে। কৃষিতে বিশেষ যন্ত্রের ব্যবহার হয়তো হ্রাস পাবেনা আর তাতে সমগ্র বছরে কর্মসংস্থানের পরিমাণ হয়তো বাড়তে পারে কিন্তু কৃষিকে নির্বিবচারে যন্ত্রসজ্জিত করার বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে কারণ তাতে বড় বড় আবাদ গঠনের সম্ভাবনা থাকবে।

উৎপাদন বৃদ্ধি যেমন ভূমিস্বত্ব সংস্কারের একটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য তেমনি কৃষি সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমাজ থেকেই যে ভূমি স্বত্ব সংস্কারের দাবি জানানো হচ্ছিলো এটাও মনে রাখা উচিত। সামাজিক ন্যায়বিচারের স্বার্থে, দেশের পক্ষে যদি সম্ভব হয় তাহলে উৎপাদনের দিক থেকে খানিকটা ক্ষতি স্বীকারও যুক্তিসঙ্গত হবে। এটা একদিকে যেমন মানবিক সমস্যা অন্যদিকে তেমনি রাজনৈতিক স্থায়ীত্বেরও সমস্যা। অর্থনৈতিক সংজ্ঞার দিক থেকে এটা আবার আয় বন্টনের সমস্যা।

সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সাম্যের ক্ষেত্রে ভূমি স্বত্ব সংস্কার সমস্যাটা, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত কঠোর একটা সমস্যা। আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রগতিশীল, একটা ভূমিস্বত্ব সংস্কারমূলক আইন প্রয়োগ করে এই সমস্যা সমাধান করার একটা সহজ উপায় বেছে নেওয়া এবং তা রূপায়িত করার সময় আন্তরিকতার অভাব বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পল্লী অঞ্চলের দারিদ্র্য সমস্যা দূর করার পক্ষে ভূমি স্বত্ব সংস্কার যে যথেষ্ট নয় সেটা স্বীকার করাই বোধ হয় ভালো উপায়। শোষণ একটা সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ফলাফল যাই হোক না কেন, ভূমি স্বত্ব সংস্কার ব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের তা কঠোরভাবে প্রতিরোধ করতে হবে।

কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৫।২০ বছরের মধ্যেই কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা আরও প্রায় ৬ থেকে ৯ কোটি বাড়বে। যে কৃষিতে এখনই প্রয়োজনের তুলনায় বেশী লোক রয়েছে সেখানে এই বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের স্থান করে দেওয়া আর একটা জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। অর্থনৈতিক দক্ষতা বা সামাজিক ন্যায়বিচারের আদর্শ অনুসারে জনমত একদিকে বা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তবে কম উৎপাদন, কম আয় এবং অসাম্য ইত্যাদির মতো সমস্ত সমস্যারই সমাধান কৃষির মধ্যে পাওয়া যাবে, তা বিশ্বাস করাটা অত্যন্ত অযৌক্তিক হবে। সবদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা কাঠামোর মধ্যেই ভূমি ব্যবস্থার একটা সার্থক এবং ন্যায়সঙ্গত পরিকল্পনা তৈরি করা যেতে পারে।

কিন্তু এখনই যে কিছু করা প্রয়োজন তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমার মতে অবিলম্বে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত তা এখানে উল্লেখ করছি।

প্রতি বছর মালিকানা এবং প্রজাস্বত্বের অধিকার সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করা উচিত; যে সব রাজ্যে নথীপত্র সম্পূর্ণ করা হয়নি অথবা সম্পূর্ণ করার পথে সেখানে অন্যায় প্রভাব প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় জনসেবী অথবা মালিক ও প্রজাদের প্রতিনিধিদের সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে। সম্প্রতি গত পাঁচ বছরে স্বত্বের যে সব পরিবর্তন হয়েছে সেগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করা উচিত।

দলিল ইত্যাদি সম্পূর্ণ করার পূর্বে, যে সব ব্যক্তি বা পরিবার যুক্তভাবে, রাজ্যের আইন বা অন্য ব্যবস্থা অনুযায়ী সর্বোচ্চ পরিমাণের বেশী জমি ভোগদখল করছেন তাঁরা ছয় মাসের মধ্যে রাজস্ব বিভাগে তা জানাতে বাধ্য থাকবেন।

খাস বা ব্যক্তিগত চাষের সংজ্ঞা অতি স্পষ্টভাবে করে দেওয়া উচিত। ১৯৪৮ সালের বোম্বাইর প্রজা এবং কৃষি জমি আইনটি (সংশোধিত আকারে) এই ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে কাজ করতে পারে।

অধিকারের নথীপত্র সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত সব রকম হস্তান্তর বা খাসকরণ নিষিদ্ধ করা উচিত।

যে সব রাজ্যে প্রজাদের রক্ষা করা সম্পর্কে এবং নীজের জমি বিক্রী করা জমিদারদের পক্ষে বাধ্যতামূলক করা সম্পর্কে আইন প্রণীত হয়নি, সেই রাজ্যগুলি যাতে এই ধরণের আইন প্রণয়নে বাধ্য হন সেজন্য জনমত গঠন করা উচিত।

ভূমি স্বত্ব সংস্কার আইন অনুযায়ী যে সব প্রজাবিলি অনুমোদন করা হয়েছে সেগুলি মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করে নতুনভাবে অনুমোদন করা উচিত। কোন সরকারী সংস্থার মাধ্যমে খাজনা আদায় করা এবং জমিদারের পক্ষে প্রজাবিলি করা সম্ভব কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা উচিত।

জমি খাসে নেওয়ার যে অধিকার গত তিন বছর যাবৎ অকার্য্যকরী করে রাখা হয়েছে সেই অধিকার তুলে নেওয়া উচিত।

ছোট চাষীর উপযুক্ত সংজ্ঞা দিয়ে, তাদের জমি বিক্রয়, রাজস্ব বিভাগের কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারি বা পঞ্চায়েতের পরীক্ষা ও অনুমোদন সাপেক্ষ করা উচিত।

স্বেচ্ছায় জমি প্রত্যর্পণ অথবা অকার্য্যকরী ক্রয়ের মাধ্যমে সংগৃহীত জমির মধ্যে, আইন অনুযায়ী জমিদারের যতটুকু পাওয়া উচিত তার বেশী তিনি রাখতে পারবেন না।

বর্ত্তমানের সর্বোচ্চ পরিমাণ জমির ধারাগুলি কার্য্যকরীভাবে প্রয়োগ করা উচিত এবং এই আইনকে ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা উচিত এবং বেআইনী হস্তান্তর সম্পর্কে মামলা দায়ের করা উচিত। পরিবারের সকলে মিলে মোট যে জমি ভোগ করছে তার ওপরেই সর্বোচ্চ পরিমাণ স্থির করা উচিত।

নতুন কৃষি পদ্ধতি অনুযায়ী জমির মালিকানার মতো জলের মালিকানাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই জলের উৎসগুলির ওপরেও সামাজিক আইন প্রযুক্ত হওয়া উচিত।

এগুলি হল মোটামুটি কতকগুলি পরামর্শ এবং এর মধ্যে যদি কোন ফাঁক থাকে তাও বন্ধ করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে কাপড়ের কল

পশ্চিমবঙ্গে মোট কাপড়ের কল ১০৮টি; চালু কাপড়ের কল মোট ৮৭টি; এর জন্য বছরে আনুমানিক ৫৫ লক্ষ গাঁট তুলার প্রয়োজন হয়, এগুলির জন্য বিদেশ থেকে যে তুলা আমদানী করতে হয় তার পরিমাণ ১৯৬৭ সালের হিসেবে—শতকরা ৭ ভাগের কিছু বেশি।

নতুন ধরনের সরষে দানা

গুজরাটের পাটানের তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রে একটা নতুন জাতের সরষের চাষ করা হয়েছে, যার ফলনও হয় বেশী এবং যার থেকে তেলও বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়।

এই নতুন সরষে বীজের নাম হ'ল পাটান সরষে-৬৭। স্থানীয় সরষের তুলনায় এর ফলন শতকরা ১৯ ভাগ বেশী এবং তেলের পরিমাণ শতকরা দু ভাগ বেশী।

পৌরাণিক অরণ্যেও পৌঁচেছে আধুনিকতার প্রবাহ

দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে
একটি বিবরণী
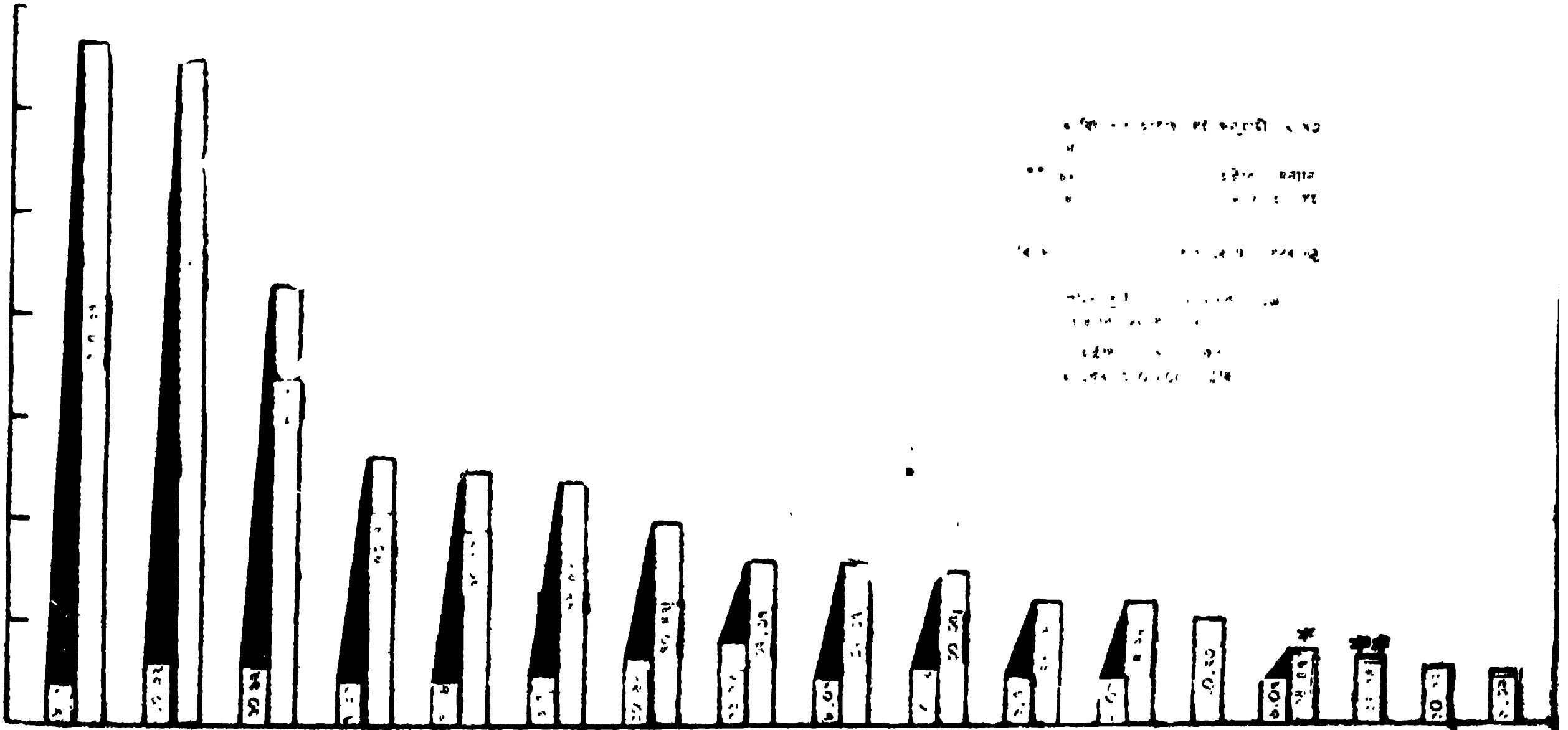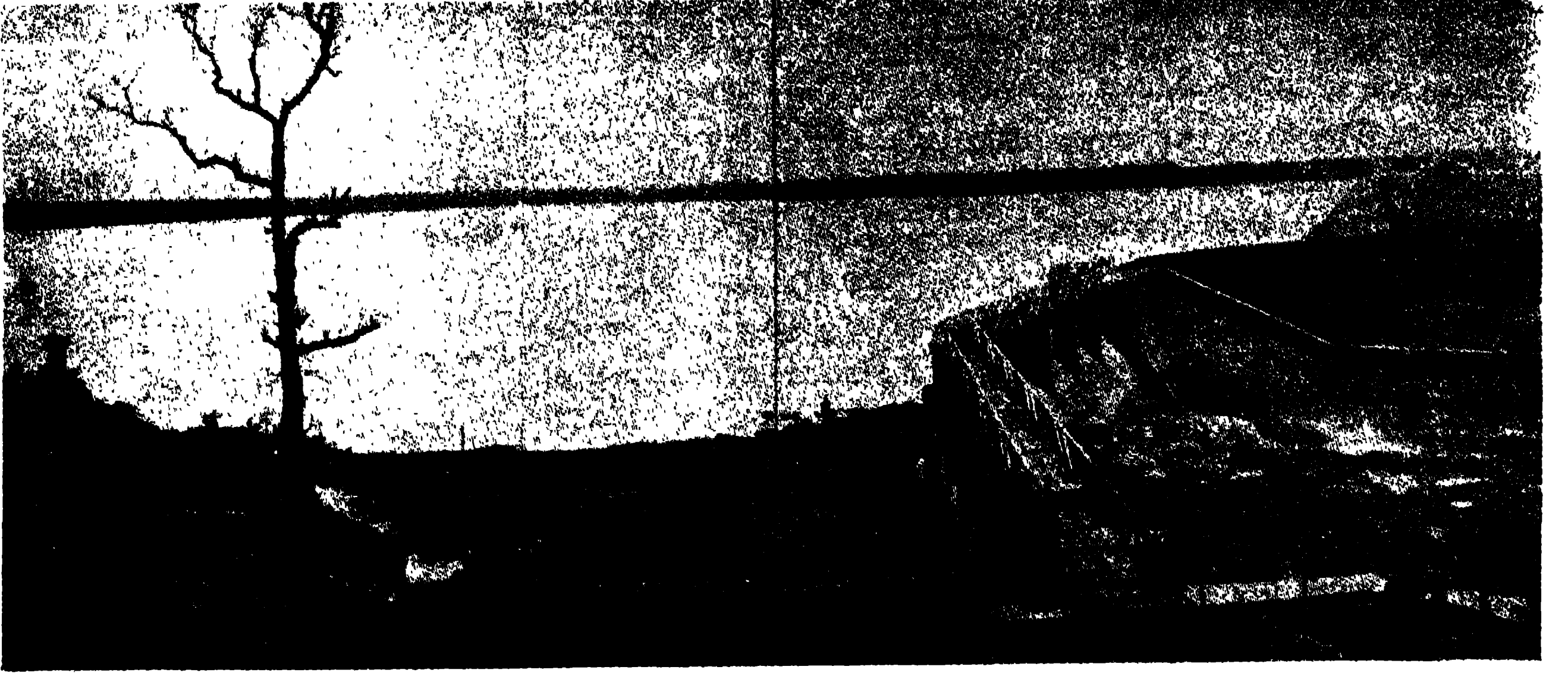
প্রাচীন ও পবিত্র অরণ্যানী দণ্ডকারণ্য, পিতৃসত্য রক্ষা করার জন্য রাম যেখানে স্বেচ্ছায় বনবাস দণ্ড যাপন করেছিলেন সেই অরণ্যভূমি আস্তে আস্তে তার যুগ যুগব্যাপি বিচ্ছিন্নতার খোলস থেকে বেরিয়ে আসছে। এই অঞ্চলটি ক্রমশ: আমাদের জাতীয় জীবন প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। দেশবিভাগের পর যে বিপুল সংখ্যক হিন্দু উদ্বাস্তু, দীর্ঘদিন ধরে পুর্ব্ব পাকিস্তান থেকে আসতে থাকেন তা একটা ভয়ানক সমস্যার সৃষ্টি করে। এই উদ্বাস্তদের দ্রুতগতিতে এবং সফলভাবে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থা গঠন করেন। ওড়িষ্যার কোরাপুট জেলা এবং মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলার ৬৫000 বর্গ কি: মী: জুড়ে এই দণ্ডকারণ্য মহাবন। গত দশ বছরে পূর্ব্ব বঙ্গের হাজার হাজার উদ্বাস্তু, এখানকার মনোরম বনভূমিতে, চতুর্দ্দিকে পাহাড় বেষ্টিত ঢেউয়ের মতো ছড়িয়ে থাকা সমতলভূমিতে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন।

গহহীন আদিবাসী এবং ভুমিহীন আদিবাসীদের পুনর্ব্বাসন দেওয়ার জন্য, গত মে মাস পর্য্যন্ত ওড়িষ্যা সরকার ৫৮৭৯২.৫ হেক্টার এবং মধ্যপ্রদেশ সরকার ৩৫৮৫৮ হেক্টার মোট প্রায় ৯৪৬৫০.৫ হেক্টার জমি দিয়েছেন। এই অঞ্চলটিকে —উমরকোট, মালকানগিরি, কোণ্ডাগাঁও এবং পারালকোট এই চারটি এলাকায় ভাগ করা হয়েছে। প্রথমোক্ত এলাকা দুটি হ'ল কোরাপুট জেলার, শেষোক্ত দুটি বস্তার জেলার। দণ্ডকারণ্য কর্ত্তৃপক্ষ এখানে ২৬0টি গ্রামের পত্তন করেছেন। এই দুটি রাজ্যসরকার আদিবাসীদের পুনর্ব্বাসনের জন্য আরও ৬১টি গ্রামের পত্তন করেছেন। এই দুটি রাজ্য যতখানি জায়গা দিয়েছেন তার মধ্যে ৫৫২৫৪.৫ হেক্টার জমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে বা জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪৭৪৬৪ হেক্টারেরও বেশী জমি থেকে আগাছা

ওপরে : দণ্ডকারণ্যের উমরকোট জলাধার।

নীচে : অম্বাগুড়ার শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা হাতে কলমে কাজ শিখছে। আদিবাসী ছেলেরাও এখানে কাজ শেখে।

ইত্যাদি পরিষ্কার করে, চাষের উপযুক্ত করা হয়েছে। যতখানি জমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে তার এক চতুর্থাংশ জমি ভূমিহীন আদিবাসীদের পুনর্ব্বাসনের জন্য দিয়ে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ওড়িষাকে ৭৭৬৫ হেক্টার এবং মধ্যপ্রদেশকে ২৫৮২ হেক্টার জমি দেওয়া হয়েছে। এই জমিতেই ৬১টি আদিবাসী গ্রামের পত্তন করা হয়েছে। বর্ত্তমান বছরের মে মাস পর্য্যন্ত ১৩ হাজারটিরও বেশী উদ্বাস্তু পরিবারকে এই চারটি অঞ্চলে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে এবং আরও ৫৫টি পরিবারকে এখানে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হবে।

দুটি নলকূপ, রাস্তাঘাট, একটি প্রাথমিক স্কুল, সাধারণতঃ একটি সমষ্টি কেন্দ্র আছে। প্রতিটি গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ, প্রত্যেকটির কাছাকাছি একটি চিকিৎসালয় আছে যেখানে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়। তাছাড়া আছে ভ্রাম্যমান একটি গ্রন্থাগার-তথ্য প্রচার সংস্থা, যাঁরা উদ্বাস্তু ও আদিবাসীদের সিনেমাও দেখান। দুই তিনটি গ্রামের জন্য একজন করে গ্রামসেবক আছেন এবং কয়েকটি গ্রামের জন্য একটি ঔষধালয় আছে। কর্ত্তৃপক্ষের উৎসাহে খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ গ্রামবাসীদের জীবনের একটা অঙ্গ হয়ে গেছে এবং কয়েক ধরণের খেলাধূলার সরঞ্জাম ও বাদ্যযন্ত্র বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়।

বাড়ী তৈরি করার জন্য ৬৭০ বর্গ মীটার জায়গা ছাড়াও চাষী পরিবারকে প্রায় ২.৪৩ হেক্টার কৃষি জমি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও পুনর্ব্বাসনপ্রাপ্ত প্রতিটি পরিবারকে, নিজেদের হাতে তৈরি একটি বাড়ী, ১০১৫ টাকা কৃষি ঋণ, ১৫০ টাকা সেচ ঋণ, প্রত্যেক কৃষি মরসুমে ক্রমশঃ কম হারে, ভরনপোষণ সাহায্য এবং কৃষি মরসুমের ঠিক পরেই আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। যে সব অকৃষক পরিবারকে এখানে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে, তাঁদের ০.৮১ হেক্টার কৃষি জমি, বাড়ী তৈরির জন্য প্রায় ৬৭০ বর্গ মীটার জমি, বাড়ী তৈরির জন্য ২000 টাকা পর্য্যন্ত ঋণ, ছোট ব্যবসার জন্য ১000 টাকা ঋণ, ৩00 টাকা কৃষি ঋণ এবং ব্যবসার জন্য যে ঋণ মঞ্জুর করা হয় তা পরিশোধ করার পর ৩ মাস পর্য্যন্ত ৩0 থেকে ৭0 টাকা মাসিক সাহায্য দেওয়া হয়। যাঁদের সহর বা আধাসহর অঞ্চলে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়, তাঁদের বাড়ীর জন্য প্রায় ৬৭০ বর্গমীটার জমি, বাড়ী তৈরির জন্য ২000 টাকা পর্য্যন্ত (বিশেষ ক্ষেত্রে আরও ৫00 টাকা) ঋণ এবং ব্যবসার জন্য ঋণ দেওয়ার পর তিন

উদ্বাস্তুদের উৎসাহ ও পরিশ্রম এবং দণ্ডকারণ্য কর্ত্তৃপক্ষের নির্ব্বাচিত বীজ ও সার গমের চাষকে সফল করে তুলেছে।

গ্রাম পরিকল্পনা

দণ্ডকারণ্যের প্রতিটি গ্রাম বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পিত এবং প্রত্যেক গ্রামে মোটামুটি 80 থেকে ৬0টি পরিবারের বাস। পুনর্ব্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম সুযোগ সুবিধে এই গ্রামগুলিতে সহজেই পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি গ্রামে একটি পুকুর, গভীর কুয়ো, অন্ততঃপক্ষে

মাস পর্য্যন্ত ভরনপোষণের জন্য মাসিক ৩০ থেকে ৭০ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়।

আদিবাসী কল্যাণ

সমগ্র ভারতে আদিবাসীর জনসংখ্যা হ'ল শতকরা ৬.৮ কিন্তু দণ্ডকারণ্যে তা হল শতকরা ৬৬ এবং কোরাপুটের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৬১ ভাগ আর বস্তার জেলায় শতকরা ৬২ ভাগ। সংশ্লিষ্ট দুটি রাজ্য অর্থাৎ ওড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে যে বোঝাপড়া হয়েছে সেই অনুযায়ী, দণ্ডকারণ্য কর্ত্তৃপক্ষ যতখানি জায়গা পুনরুদ্ধার করেছেন তার এক চতুর্থাংশ আদিবাসীদের পুনর্ব্বাসন করানোর জন্য রাজ্য সয়কার দুটির হাতে দিয়ে দিয়েছেন। ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য যে ব্যয় হয়েছে তা বহন করেছেন দণ্ডকারণ্য কর্ত্তৃপক্ষ, কিন্তু আদিবাসীদের পুনর্ব্বাসন দেওয়ার ব্যয় বহন করার দায়িত্ব রাজ্য সরকার দুটির। ওড়িষ্যা সরকারকে যে জমি দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ৪৮৬০ হেক্টারের বেশী জমি, ৪৫টি গ্রামে ১৯৩৬টি আদিবাসী পরিবারের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশ সরকার এ পর্য্যন্ত ৫৪০টিরও বেশী আদিবাসী পরিবারের মধ্যে ২২৭০ হেক্টার জমি বন্টন করেছেন এবং এই বছরের কাজের মরসুমে আরও ২৭৫৪ হেক্টার ভূমি পুনরুদ্ধার করা হবে। প্রতিটি আদিবাসী পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার জন্য দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্ত্তৃপক্ষ দুটি রাজ্য সরকারকে ২৬০০ টাকা ক'রে দেন তাছাড়া কাছাকাছি যদি জল না থাকে তাহলে, কমপক্ষে ৪০টি পরিবারের আদিবাসী গ্রামে একটি করে পুকুর কাটিয়ে দেন। উদ্বাস্তদের যেমন বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পৃথক পৃথক সাহায্য দেওয়া হয়, এদের কিন্তু সেই রকমভাবে না দিয়ে এক সঙ্গে পুরো টাকাটা অনুদান দেওয়া হয়। দণ্ডকারণ্য কর্ত্তৃপক্ষ ১৯৬১ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ওড়িষ্যা সরকারকে ৩৬ লক্ষ টাকা এবং মধ্যপ্রদেশ সরকারকে ১১.৯১ লক্ষ টাকা অগ্রিম হিসেবে দিয়েছে তার মধ্যে ১৯৬৮ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ৪.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যবহার করা হয়নি বলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১৯৬৮ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত আরও ২,০০,০০০ টাকা অগ্রিম দেওয়া যয়েছে। আদিবাসীগণের পুনর্ব্বাসনের উদ্দেশ্যে দণ্ডকারণ্য কর্ত্তৃপক্ষ এ পর্য্যন্ত জমি পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নের জন্য ১২২.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। কর্ত্তৃপক্ষ এ পর্য্যন্ত কোরাপুটে ১৩৭ কিলোমীটার এবং বস্তারে ১০৭.৮ কি: মীটার রাস্তা তৈরি করেছেন এবং আদিবাসীদের জন্য এই দুটি জেলায় পুকুর, কুয়ো, নলকূপ তৈরি করার জন্য ১৫ লক্ষ টাকারও বেশী ব্যয় করেছেন। আদিবাসীরাও উদ্বাস্তদের মতো সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধে পান। কর্ত্তৃপক্ষের অধীনে যে ৭টি হাসপাতাল, ৬টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৬টি ভ্রাম্যমান চিকিৎসা সংস্থা এবং বহু সংখ্যক ডিস্‌পেন্সারি রয়েছে, উদ্বাস্ত আদিবাসী সকলেই এগুলির সুবিধে পান এবং আদিবাসীরাই সম্ভবত: এগুলি থেকে বেশী উপকৃত হচ্ছেন। উদ্বাস্তদের ছেলেমেয়েদের মতো আদিবাসী ছেলেমেয়েরা খুব উৎসাহের সঙ্গে স্কুলে লেখাপড়া করে। স্কুলে সবাইকে বিনামূল্যে বই, শ্লেট ইত্যাদি দেওয়া হয়। মধ্য এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের এবং শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের হোষ্টেলে থেকে যে সব আদিবাসী ছেলেমেয়ে পড়াশুনা করে তাদের বৃত্তি দেওয়া হয়। উদ্বাস্তদের কল্যাণের জন্য যেখানে ১৭.১৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে সেখানে আদিবাসীদের কল্যাণের জন্য ব্যয় করা হয়েছে ৪.৬৬ কোটি টাকা। অন্য একটা বড় উপকার যা হয়েছে তা হ'ল আদিবাসীদের বিভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে সব বাধা ছিল তা খুব দ্রুত অপসারিত হচ্ছে এবং একে অপরের উৎসব, অনুষ্ঠানগুলিতে যোগ দিচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার দুটি কেবলমাত্র ভূমিহীন আদিবাসীদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং অবশিষ্ট উন্নয়নমূলক কাজগুলি করেছেন দণ্ডকারণ্য কর্ত্তৃপক্ষ।

দণ্ডকারণ্যের মাথিল বুকের রোগের হাসপাতাল ঐ অঞ্চলে একমাত্র আধুনিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান

কৃষি ও জলসেচ

এখানে যাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে, তারা এখানকার জমি বা আবহাওয়া সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিলেন বলে, প্রথম দিকে জমি থেকে ফসল পেতে তাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। পরিকল্পনা কর্ত্তৃপক্ষ বহু পরীক্ষা, নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পর একটি প্রধান শস্যের ফলন ভালো না হলেও যাতে সে ক্ষতি সামলানো যায় সেজন্য আবহাওয়া অনুযায়ী পর্য্যায়ক্রমিক একটা চাষ ও শস্য উৎপাদন ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন। ১৯৬৮ সালে যে বছর শেষ হয়েছে তার পূর্ব্বের চার বছরে ধানের উৎপাদন চারগুণ বেড়েছে তাছাড়া অন্যান্য শস্যের উৎপাদনও বেড়েছে। কয়েক ধরণের বেশী ফলনের ধানের চাষেও ভালো ফল পাওয়া গেছে। মাঝারি আকারের

২০ পৃষ্ঠার দেখুন

ভারতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা

ডি. পি. নায়ার

আমাদের দেশে ডাক্তার জনসংখ্যার অনুপাত হ'ল ঃ ৬০০০ অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই অনুপাত ১ঃ ১১০০ এবং সোভিয়েট রাশিয়ায় ১ঃ ৫৮০। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, আমাদের দেশের পল্লী অঞ্চলে, যেখানে জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ বাস করেন সেখানে শতকরা মাত্র ৩৪ জন চিকিৎসক রয়েছেন। তিনটি পর্য্যায়ে ব্যাপকভাবে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে শিক্ষা, দেশীয় এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য কেন্দ্রীয় হাসপাতাল স্থাপনের ভিত্তিতে চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারিত ক'রে পল্লী ও সহর অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য খানিকটা হ্রাস করা যায়।

জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের একটা মৌলিক দায়িত্ব এবং জনগণের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর অন্যতম ব্যবস্থা হিসেবে চিকিৎসা সেবার উন্নয়ন, ভারতের পরিকল্পনাসূচীর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেশের স্বাস্থ্য সমস্যা যেমন বিপুল তেমনি জটিল। কাজেই আপাত দৃষ্টিতে যে সব অসুবিধে দেখতে পাওয়া যায় কেবলমাত্র সেগুলির কথা না ভেবে সমগ্রভাবে সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে এই সমস্যা সমাধানের একটা উপায় বের করতে হবে।

এটা প্রায় সকলেই জানেন যে কেবলমাত্র এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে শিক্ষিত ডাক্তারের সাহায্যে সুষ্ঠুভাবে পল্লী অঞ্চলে চিকিৎসকের অভাব অদূর ভবিষ্যতেও মেটানো অসম্ভব। কাজেই কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে দেশীয় চিকিৎসক কোন্ ক্ষেত্রে শিক্ষিত চিকিৎসক এবং অনুরূপ শিক্ষিত চিকিৎসক কাজ করতে পারবেন তার একটা সংহত পরিকল্পনা তৈরী করা প্রয়োজন। এই দুটি ক্ষেত্রে কি সংখ্যক চিকিৎসকের প্রয়োজন তা স্থির করার পরই শুধু এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার সরবরাহের পরিকল্পনা তৈরি করা যেতে পারে।

আমাদের জনশক্তি সম্পর্কিত যে পরিকল্পনা ডাক্তার ও জনসংখ্যার আনুপাতিক ভিত্তিতে করা হয়েছে তা অত্যন্ত অবাস্তব এবং তার ফলও উৎসাহজনক নয়। তবে যে কোন দেশের তুলনায় ভারতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ খুব চমকপ্রদ।

মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৪ গুণ এবং ছাত্রভর্তির সংখ্যা ৭ গুণ বাড়লেও বর্ত্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী ডাক্তার জনসংখ্যার অনুপাত বাড়বে ১৯৪৬ সালের ১ : ৬০০০ অনুপাত থেকে ১৯৭৩ ৭৪ সালে মাত্র ১ : ৪৩০৭। এশিয়াতেও গড়পরতা অনুপাত হ'ল ১ : ৩৮০০। আমেরিকায় তা হ'ল ১ : ১১০০, ইউরোপে ১ : ৮৫০ আর সোভিয়েট রাশিয়ায় ১ : ৫৮০।

তাছাড়া রাজ্য এবং একই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল অনুযায়ী এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা এবং চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার সুযোগ সুবিধে সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত অসমতা রয়েছে। পল্লী এবং সহরঅঞ্চলের মধ্যে এই অসমতা আরও বেশী স্পষ্ট। দিল্লীতে যেখানে ডাক্তার ও জনসংখ্যার অনুপাত হ'ল ১ : ৬৮৮, হিমাচল প্রদেশে তা ১ : ১৩০০৮। সমগ্রভাবে দেশে, জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ যেখানে পল্লী অঞ্চলের অধিবাসী সেই পল্লী অঞ্চলে শতকরা ৩৪ জন ডাক্তার চিকিৎসায় নিযুক্ত আছেন। তেমনি আবার জনসংখ্যার অনুপাতে মেডিকেল কলেজের সংখ্যাও বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকমের। দিল্লীতে যেখানে জনসংখ্যার প্রতি ১৩ লক্ষে একটি মেডিকেল কলেজ, বিহারে সেখানে প্রতি ১ কোটি ৩৮ লক্ষে একটি।

রাজ্যগুলির আর্থিক সম্পদ, অগ্রাধিকার এবং অন্যান্য নানা অবস্থা এতো বিভিন্ন যে কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সাহায্য ও নির্দ্দেশে কতখানি ফল পাওয়া যাবে তা বলা কঠিন। তাছাড়া চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাটা রাজ্যগুলির অধীন বলে দীর্ঘকালীন কোন পর্য্যায়ক্রমিক কর্ম্মসূচী গ্রহণ করেই শুধু এই পার্থক্য দূর করা যেতে পারে।

চিকিৎসা সেবাকে তিনটি পর্য্যায়ের একটা ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করলে পল্লী ও সহর অঞ্চলের মধ্যে যে অসমতা রয়েছে তা খানিকটা দূর করা যেতে পারে। প্রথম পর্য্যায়টি হবে স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি শিক্ষা সম্পর্কে একটা ব্যাপক ব্যবস্থা। এর সঙ্গে থাকবে একটা গবেষণা বিভাগ। বিভিন্ন অঞ্চলের খাদ্যে যে পুষ্টির অভাব রয়েছে তা কি করে স্থানীয় জিনিস দিয়েই কম মূল্যে মেটানো যায় তা বের করতে চেষ্টা করাই হবে এই গবেষণা বিভাগের কাজ। দ্বিতীয় পর্য্যায়টি হবে সাধারণ রোগ নিরাময় করার জন্য দেশীয় ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যাপক প্রসার এবং মেডিকেল স্কুল বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষিত চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়ানো। তৃতীয় পর্য্যায়টি হবে কেন্দ্রীয় হাসপাতাল (এ্যালোপ্যাথিক বা দেশীয় চিকিৎসার)। এই হাসপাতালগুলিতে জটিল রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে। এইরকম ব্যবস্থায় অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে, দেশের সমগ্র অধিবাসীদের জন্য চিকিৎসার

সুযোগ সুবিধের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সম্প্রসারিত হওয়ায় অধ্যাপক, সাজসরঞ্জাম এবং পাঠসূচীর সমস্যাও বাড়িয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এতো দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে যে, এই সব সমস্যা সব সময়েই থাকবে। কারণ বলা হয় যে কোন শিক্ষার্থী যখন চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা সম্পূর্ণ ক'রে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসেন তখন তিনি যা শিখে আসেন তার অনেকটাই ইতিমধ্যে অচল হয়ে যায়।

গুণগত সমস্যা

উপযুক্তভাবে শিখিত যথেষ্ট সংখ্যক অধ্যাপক যাতে পাওয়া যায় সেজন্য স্নাতকোত্তর শিক্ষা সম্প্রসারিত করা উচিত এবং অধ্যাপকগণের বেতন হার চাকুরির সর্তাদির উন্নয়ন করা উচিত। নতুন মেডিকেল কলেজের জন্য অধ্যাপক শ্রেণী তৈরি করার উদ্দেশ্যে অভিজ্ঞ অধ্যাপকগণের সঙ্গে জুনিয়ার লেকচারার সংযুক্ত করা উচিত। স্নাতকোত্তর পড়াশুনায় এবং গবেষণায় নিযুক্ত ছাত্রছাত্রীদের অধ্যাপনার কাজে সাহায্য করতে উৎসাহ দেওয়া উচিত। ইণ্ডিয়া মেডিকেল এবং হেল্থ সার্ভিসে অধ্যাপকদের জন্য একটি পৃথক শাখা খোলা উচিত। অধ্যাপকগণ যাতে তাঁদের সমগ্র চাকুরির সময়ে পড়াশুনা করেন এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে পিছিয়ে না পড়েন সে সম্পর্কে তাঁদের সব রকম সুযোগ সুবিধে ও উৎসাহ দেওয়া উচিত।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে গবেষণার ক্ষেত্রটির উন্নয়নের জন্য, গবেষণা করার সুযোগ সুবিধে বাড়ানো, বিশেষ করে যাঁদের গবেষণা সম্পর্কে বিশেষ দক্ষতা আছে তাঁদের যথাসম্ভব এক জায়গাতেই রাখা উচিত। অধ্যাপকদের, বাইরে চিকিৎসা করতে দেওয়া উচিত নয় কারণ তাতেও গবেষণা ব্যাহত হয়।

বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির মতো চিকিৎসা বিজ্ঞানেও দ্রুত অগ্রগতি হচ্ছে বলে চিকিৎসকদের সারা জীবনই পড়াশুনা করা উচিত। অধ্যাপক, পরিচালক, এবং ব্যবসায়ী প্রত্যেকেই যাতে আধুনিক আবিষ্কার বা উদ্ভাবন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে পারেন, তার ব্যবস্থা করার ভার রাষ্ট্রেরই নেওয়া উচিত।

দণ্ডকারণ্যে আধুনিকতার স্পর্শ

১৮ পৃষ্ঠার পর

ভাস্কাল বাঁধ এবং পাখানজোর বাঁধ কৃষিভিত্তিক পল্লী অর্থনীতিকে অনেকখানি উন্নত করেছে। পারালকোট এবং সতীগুড়া বাঁধ দুটিও সম্পূর্ণপ্রায় এবং এই দুটি বাঁধ এখানকার কৃষিকে আরও উন্নত করে তুলবে। সার এবং কীটনাশক ব্যবহার সম্পর্কে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের যে কুণ্ঠা ছিল তা চলে গেছে এবং ১৯৬৪ সালে যেখানে মাত্র ২০ মেট্রিক টন সার ব্যবহৃত হয় এখন তার একশোগুণ বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে। ভাস্কাল এবং পাখানজোর প্রকল্প দুটির জন্য রবি শস্যের চাষ সম্ভবপর হয়েছে এবং দুটি ফসল ফলাতে পারায় কৃষি থেকে আয়ও অনেক বেড়ে গেছে। কৃষি থেকে ১৯৬৫ সালে যেখানে জনপ্রতি আয় ছিল ৪২৪ টাকা, ১৯৬৮ সালে তা বেড়ে হয়েছে ২০০০ টাকারও বেশী। দণ্ডকারণ্য এখন খাদ্যশস্যে স্বয়ম্ভর হয়ে গেছে।

স্বাস্থ্য

দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষ, উন্নয়নের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং পুষ্টিহীনতা দূর করা সম্পর্কেও বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। পূর্বে যে ম্যালেরিয়ায় বহু লোক মারা যেতো সেই ম্যালেরিয়া এখন সম্পূর্ণভাবে দূর করা হয়েছে এবং ম্যালেরিয়া নিরোধ ব্যবস্থাগুলি নিয়মিতভাবে গ্রহণ করা হয়। প্রতি তিনমাসে উদ্বাস্তু এবং আদিবাসীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং ব্যাপকভাবে টিকা দেওয়া হয়।

শিক্ষা

দণ্ডকারণ্যের প্রতিটি গ্রামে একটি প্রাথমিক স্কুল আছে এবং এগুলির সংখ্যা বর্তমানে ২১২। এ ছাড়া ১৩টি মধ্য এবং ৩টি উচচ বিদ্যালয় আছে। শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে এ পর্যন্ত ২০০ জন ছাত্র পাশ করে গেছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং এ পর্যন্ত প্রায় ১১৭৫ কিঃ মীটার পথ তৈরি করা হয়েছে।

১৯৬৯ সালের মে মাস পর্যন্ত এই প্রাচীন অরণ্যানীর উন্নয়নের জন্য দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষ মোট ৩৫.২৪ কোটি টাকা ব্যয় করেছেন। এর মধ্যে ১২.৭৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে সাধারণ উন্নয়নের জন্য এবং উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় ১৭.১৬ কোটি টাকা, এর থেকে অবশ্য উদ্বাস্তুদের ২.২৩ কোটি টাকা ঋণ হিসেবেও দেওয়া হয়েছে।

সবচাইতে বড় কথা হল পুনরুজ্জীবিত দণ্ডকারণ্যের অধিবাসীরা দেশের মূল জীবন প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এখানকার অধিবাসী প্রায় ১৩০০০ ভোটার গত সাধারণ নির্বাচনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

নতুন প্রক্রিয়ায় ধানের জমি তৈরি

উত্তর প্রদেশের পন্থ নগরের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, ধান চাষের জন্যে কাদা মাটির বদলে আধ শুকনো চাপ মাটি ভালো।

নতুন প্রক্রিয়া অনুযায়ী জমিতে ভাল করে লাঙল চালিয়ে মই দিয়ে নিতে হয় এবং হালের গায়ে মাটি লাগবেনা, এমন আর্দ্রতায় জমিতে রাসায়নিক সার মিশিয়ে দিতে হয়। তারপর টন দুই ওজনের একটা ভারী রোলার টেনে জমি সমান করতে হয়। অবশ্য এই কাজ ট্রাক্টরের সাহায্যেও করা চলে, শুধু ট্রাক্টরের কিছু ভারী ওজনের মাল থাকা দরকার। যাই হোক এইভাবে জমি তৈরি হয়ে গেল ধানের চারা তুলে এনে নতুন মাটিতে বসিয়ে দিতে হয়, প্রয়োজন হলে তীক্ষ্মমুখ কোনোও হাতিয়ার দিয়ে জমিতে গভীর গর্ত করেও চারা বসাতে পারা যায়।

এক ক্ষেত থেকে ধানের চারা তুলে এনে কাদা জমিতে বসাতে বেশ সময় লাগে। নতুন পদ্ধতিতে সময় ও পরিশ্রম দুই-ই বাঁচে।

উন্নয়ন বার্তা
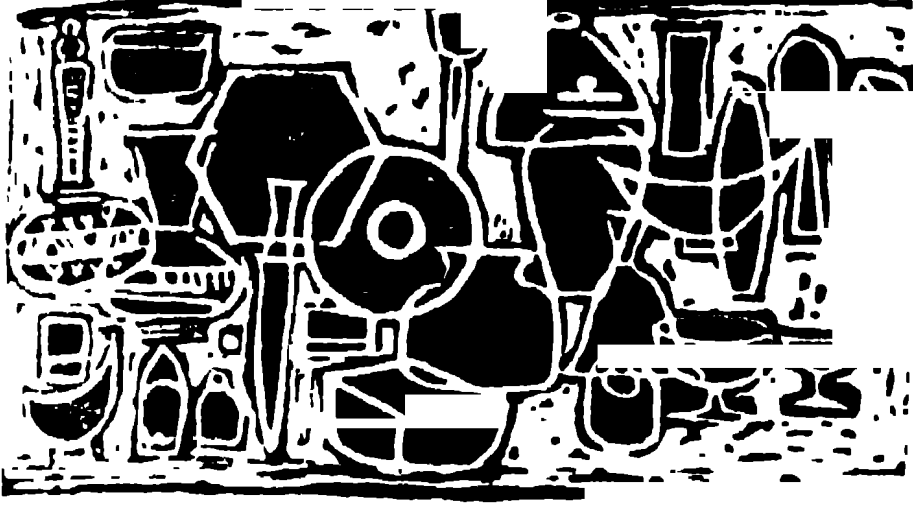
★ দিল্লী, বোম্বাই, কলকাতা ও মাদ্রাজে বর্তমানের তুলনায় তিনগুণ বেশী দুধ সরবরাহ করার একটা বৃহৎ প্রকল্প বিশ্ব খাদ্যসূচী সংক্রান্ত আন্তঃসরকার কমিটির অনুমোদন লাভ করেছে। প্রকল্প অনুযায়ী এক লক্ষ ২৬ হাজার মেট্রিক টন শুকনো দুধ (মাখন তোলা) ও ৪২ হাজার মেট্রিক টন ঘী পাঁচ বছর ধরে এই শহরগুলির সরকারী দুগ্ধ প্রকল্পে যোগানো হবে। এই দুধ বিক্রী করে ৯৫ কোটি টাকা পাওয়া যাবে।

★ জম্মু ও কাশ্মীরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৯৬৬-৬৭ সালের ৮৫.৪৬ লক্ষ কুইন্টাল থেকে ১৯৬৮-৬৯ সালে ৯২.৩১ লক্ষ কুইন্ট্যালে দাঁড়িয়েছে।

★ সম্প্রতি নতুন দিল্লীতে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তি অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে ২ কোটি ডলার ঋণ দিয়েছে।

★ ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জীবন বীমা কর্পোরেশন মোট ৬৯.৬৪ কোটি টাকার ১০৫৮৬৬টি পলিসি দেয়। এর মধ্যে বিদেশের কারবারের পরিমাণ ছিল ৮৬ লক্ষ টাকা।

★ বোম্বাই-এ টেরিন কাপড় তৈরির একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গত সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত, তিন বছরে ৮১ লক্ষ টাকার কৃত্রিম তন্তুবস্ত্র রপ্তানী করেছে। এই পরিমাণ হ'ল ১৯৬৫-৬৬ সালের (যখন এই বস্ত্র উৎপাদন সুরু হয়) তুলনায় শতকরা ৪০০ ভাগ বেশী।

★ এ বছরের প্রথম ছ' মাসে ২৩.৬০ কোটি টাকার কাঁচা ও পাকা চামড়া রপ্তানী করা হয়। গত বছরের ঐ সময়ের তুলনায় এই পরিমাণ ৪.৪০ কোটি টাকা বেশী।

★ এ বছরে ভারত থেকে ২১ কোটি টাকারও বেশী মূল্যের দামী পাথর ও গহনা রপ্তানী করা হয়েছে। ১৯৬৫-৬৬ সালের পরিমাণ ছিল ১০ কোটি টাকা।

★ ভারতের সার কর্পোরেশনের নাঙ্গাল ইউনিটে ১৯৬৮-৬৯ সালে ৭৭,৩১০ টন নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয়েছে। এই পরিমাণ হ'ল ঐ ইউনিটের পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৯৬.৬ ভাগ।

★ সেপ্টেম্বর মাসে মশলা রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৪,৪৬৮ টন এবং মূল্য ২.৫ কোটি টাকা। আগষ্টে রপ্তানী করা হয়েছে ১.০৬ কোটি টাকা মূল্যের ১.৮৪৫ টন মশলা।

★ ভিলাই ইস্পাত কারখানা ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বরে ২.৩৭ কোটি টাকার লৌহ পিণ্ড ও ইস্পাতের জিনিষ চালান দিয়েছে।

অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে, টিকিট লাগানো খামে নিজের নাম ঠিকানা লিখে, রচনার সঙ্গে পাঠাতে হ'বে।

এই সংখ্যাটি ভালো লেগে থাকলে, ধনধান্যে-র গ্রাহক হয়ে যান। নিয়মাবলী দেখুন। কোনোও জিজ্ঞাস্য থাকলে সম্পাদকের কাছে লিখুন।

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে এবং তথ্য ও বেতার মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত হ'লেও 'ধনধান্যে' শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করে না। পরিকল্পনার বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী ক্ষেত্রে উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতটা অগ্রগতি হচ্ছে তার খবর দেওয়াই হ'ল 'ধনধান্যে'র লক্ষ্য।

'ধনধান্যে' প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে প্রকাশিত হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

নিয়মাবলী

দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়।

অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পুন: প্রকাশকালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার করা হয়।

রচনা মনোনয়নের জন্যে আনুমানিক দেড় মাস সময়ের প্রয়োজন হয়।

মনোনীত রচনা সম্পাদক মণ্ডলীর অনুমোদনক্রমে প্রকাশ করা হয়।

তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয়। কোনোও রচনার প্রাপ্তি-স্বীকৃতি, পত্র মারফৎ জানানো হয় না।

নাম ঠিকানা লেখা ডাকটিকিট লাগানো খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

কোনো রচনা তিন মাসের বেশী রাখা হয়না।

শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাবেন।

গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেস ম্যানেজার, পাব্লিকেশন ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী-১। এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

**"ধনধান্যে" পড়ুন
দেশকে জানুন**

REGD. NO. D-233

ইঞ্জিনিয়ারিং-এর টুকিটাকি খবর

ইঁট কাটবার নতুন যন্ত্র

টাটা আয়রণ এ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী লিমিটেডের গ্রোথ শপ-এ ইঁট ঘষে সমান করবার যন্ত্র তৈরি হয়েছে। হাত দিয়ে ঘষে ঘষে ইঁটের মেঝে সমান করতে সময় লাগে, যন্ত্রে তার চেয়ে লাগে অনেক কম। তা ছাড়া কাজও এতে অনেক ভাল হয়, পালিশও হয় ভালো।

যন্ত্রটির উদ্ভাবক হলেন শ্রীলখবীর সিং। মেঝে বা 'ফরাশ' পালিশ করার জন্য তিন চাকার যে ট্রলি আছে তারই ধারায় এই যন্ত্রটি তিনি তৈরি করেছেন। শুধু, পালিশ যন্ত্রের সামনের চাকার জায়গায় ...টিং কারবাইড টিপ ফেস্ মিলকাটার' ... ঘর্ষণের যন্ত্রাংশ থাকে। এটি চলে বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে। যন্ত্রটি একটি লম্বা লোহার 'টি' (T) আকারের বড-এ আটকানো।

ব্লাস্ট ফার্নেসের চুল্লীর চারিধার কিংবা টুকরো টুকরো অংশ জুড়ে মেঝে তৈরি করার সময়ে কীভাবে অসমান অংশগুলি সমান করা যায় তাই ছিল সমস্যা। এই ধরনের একটি যন্ত্র তৈরি করার জন্য 'গ্রোথ শপ'-কে নির্দেশ দেওয়া হ'ল তখন টিসকোর প্রবীন ও সুদক্ষ কর্মী—শ্রীলখবীর সিং ঐ ভার নেন। 'গ্রোথ শপ'-এ এ পর্যন্ত চারটি ঐ ধরনের মেসিন তৈরি হয়েছে।

ওপরে : যন্ত্রটির উদ্ভাবক শ্রীলখবীর সিং।

নীচে : টাটার গ্রোথ শপে যন্ত্রটি চালিয়ে দেখানো হচ্ছে।

জুতোর ফিতের নতুন মান

ভারতীয় মানক সংস্থা জুতোর ফিতে কি রকম হওয়া উচিত তা স্থির করে দিয়েছে। নির্দেশে বলা হয়েছে যে জুতোর ফিতে তৈরির জন্যে দু'ধারী সুতো নিতে হবে। সেই সুতোয় ঠাসবোনা ফিতের দুটি প্রান্ত টিন বা প্লাস্টিকের পাত দিয়ে জুড়ে দিতে হবে। ফিতের রঙের সঙ্গে পাতের রং এক হওয়া দরকার।

ডিরেক্টার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সোসাইটি লি:—করোলবাগ, দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত।
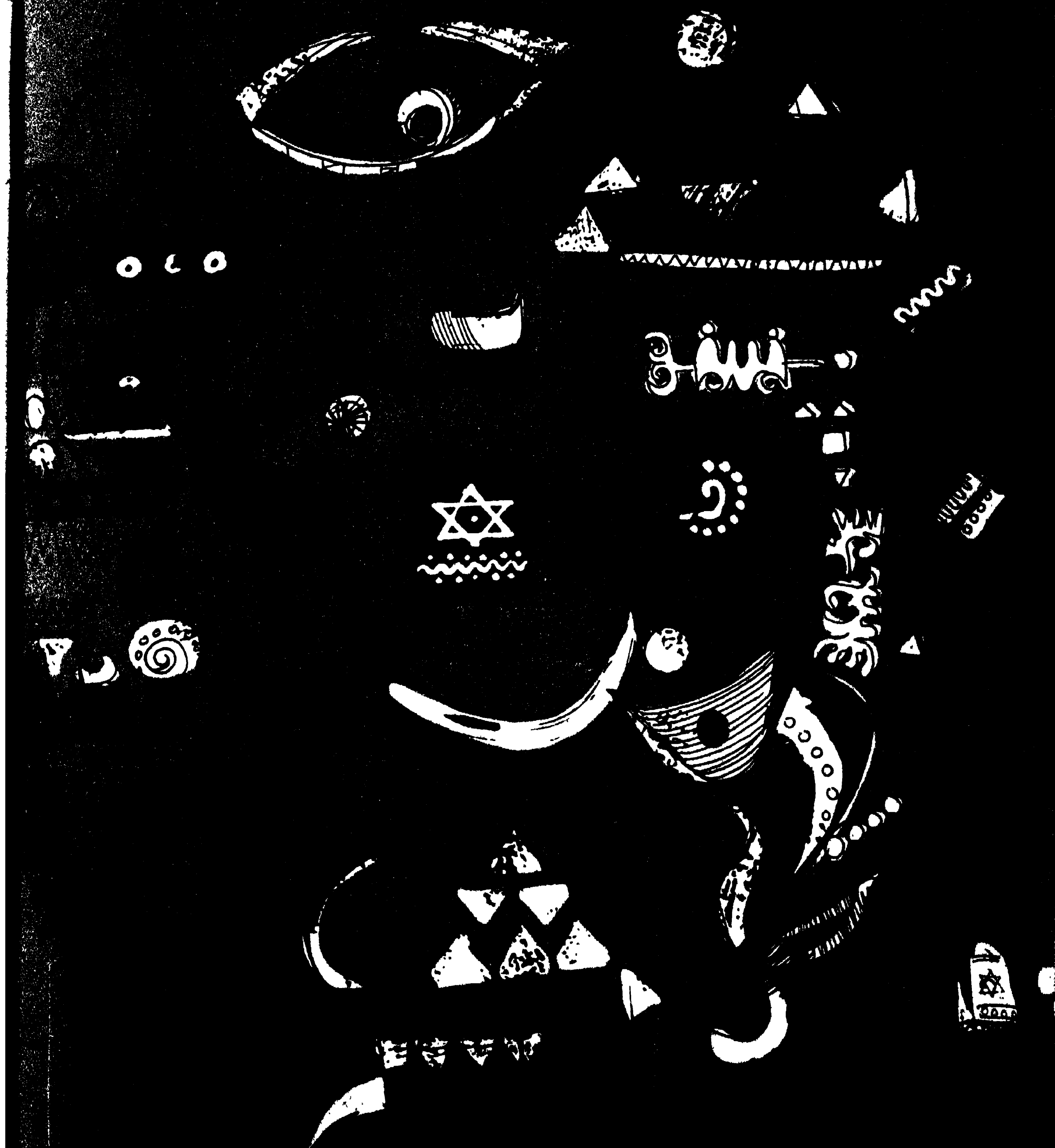
ধন ধান্য

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত
পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

প্রথম বর্ষ পঞ্চদশ সংখ্যা

২১শে ডিসেম্বর ১৯৬৯ : ৩০শে অগ্রহায়ণ ১৮৯১

Vol. 1 : No 15 : December 21, 1969

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য. তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০

টেলিগ্রাফের ঠিকানা—যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা।

ভুলি নাই

অন্যের বিচার করা উচিত নয়। নিজের সত্যকার বিচার করতে পারলে তবেই প্রকৃত সুখ পাওয়া সম্ভব।

-মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

এই সংখ্যায়

পৃষ্ঠা

রপ্তানী বৃদ্ধি

ভারত যখন ১৯৫১-৫২ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ সুরু করে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সঞ্চিত বিপুল পরিমাণ ষ্টার্লিং তার হাতে ছিল। কাজেই বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের কোন সমস্যা ছিলনা। প্রকৃতপক্ষে বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে খাদ্যশস্য আমদানির প্রয়োজন হতে পাবে বলে পরিকল্পনায় ঋণ পরিশোধের যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল তা শেষ পর্য্যন্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে পড়ে। কয়েক বছর পর্য্যন্ত দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন খুব ভালো হওয়ায় খাদ্যশস্য আমদানি করার প্রয়োজন হয়নি। তবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়ে অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যায় এবং ১৯৫৭ সালে দেশ, বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের একটা বড় সমস্যার সম্মুখীন হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাতেও বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা চলতে থাকে। বৈদেশিক সাহায্যের মাত্রা সাম্প্রতিক কালে কমের দিকে চলতে থাকে এবং সর্ত্তাদিও কঠোরতর হতে থাকে। পূর্ব্বের ঋণ সমস্যা দেশের পরিশোধ ক্ষমতাকে ক্ষীণতর করে তুলতে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই, বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ হ্রাস ক'রে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন করার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

বৈদেশিক ঋণের মাত্রা যাতে কম থাকে সেই উদ্দেশ্যে ভারত সরকার প্রথম পরিকল্পনার সময় থেকেই, বিদেশ থেকে যে সব জিনিস আমদানি করতে হয় সেগুলি দেশেই উৎপাদন করার নীতি গ্রহণ করেন এবং তারপর থেকে এই ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা হয়। উন্নয়নশীল একটা দেশ যখন দ্রুত শিল্পায়নের পদ্ধতিগ্রহণ করে তখন বিভিন্ন শিল্পসামগ্রী দেশেই উৎপাদন করাটা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তাছাড়া বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে এর ফলাফল প্রত্যক্ষ হয়ে পড়ে এবং সহজেই তার পরিমাপ করা যায়। এতে আমদানির পরিমাণ যেমন যথেষ্ট হ্রাস পায় এবং বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় করা যায় তেমনি দেশের শিল্পগুলিতে উৎপাদনও বাড়ে। কিন্তু একদিকে শিল্পজাত সামগ্রীর আমদানি কমে গেলেও অন্যদিকে আবার সেগুলি উৎপাদনের জন্য মেসিন ইত্যাদির আমদানি বেড়ে যায়। কাজেই যে সব জিনিস বিদেশ থেকে আমদানি করা হ'ত সেগুলি দেশেই উৎপাদিত হলে উপকারগুলি সহজেই বুঝতে পারা যায় বলে যে একটা সাধারণ ধারণা আছে তা একেবারে ঠিক নয়।

কাজেই বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়ে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ হ্রাস করতে হয়। এটা যে উৎপাদক ও ব্যবসায়ীগণের দায়িত্ব তা সহজেই বোঝা যায়। এখানেও সরবরাহ বাড়াবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা যেতে পারে কিন্তু রপ্তানী বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বিদেশের চাহিদা প্রভাবিত করা হয়তো সম্ভবপর নয়।

রপ্তানী বাড়ানোর জন্য সরকার যে নীতি গ্রহণ করেন তার ফলে, বিশেষ ক'রে তৃতীয় পরিকল্পনার সময়ে রপ্তানী অভিযান তীব্রতর করার ফলে, সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। এতে রপ্তানীর পরিমাণ প্রথম দুটি পরিকল্পনার সময়ে যেখানে বছরে মোটামুটি ৬০০ কোটি টাকার কিছু বেশী ছিল, তৃতীয় পরিকল্পনার সময়ে তা বেড়ে ৭৬০ কোটি টাকারও বেশী হয়ে যায়। কতকগুলি অভাবনীয় ঘটনা এবং পর পর দুই বছর খরার ফলে আবার বিপর্য্যয় দেখা দেয়। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে টাকার মূল্যমান হ্রাস করার ফলে তা আবার চরমে ওঠে এবং রপ্তানী উন্নয়ন সম্পর্কে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

বিদেশের বাজার বাড়াবার উদ্দেশ্যে রপ্তানীকারককে সাহায্য করার জন্য সরকার নতুন একটা রপ্তানী নীতি উদ্ভাবন করেন। সরলতা, অভিন্নতা, স্থায়িত্ব এবং নমনীয়তা হ'ল এই নীতির বৈশিষ্ট্য। এসব ছাড়াও সরকার বিদেশের বাজার সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাদি সরবরাহ ক'রে, বাজারজাত করা সম্পর্কে সাহায্য ইত্যাদি দিয়ে নানাভাবে রপ্তানী বৃদ্ধিতে সাহায্য করেন। ১৯৬৮-৬৯ সালে তার পূর্ব্ব বছরের তুলনায় রপ্তানীর পরিমাণ শতকরা ১৩.৬ ভাগ বেড়ে যাওয়ায় এই নতুন নীতির সাফল্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

এই সন্তোষজনক অবস্থা সৃষ্টির জন্য রপ্তানীকারকরা যে ভূমিকা অভিনয় করেন তার স্বীকৃতি হিসেবে সরকার, "রপ্তানী বৃদ্ধিতে বিশেষ নৈপুণ্য" সম্পর্কে একটি জাতীয় পুরস্কার ঘোষণা করেন এবং এ বছরেই সর্ব্বপ্রথম সেই পুরস্কার দেওয়া হয়। চতুর্থ পরিকল্পনার সময়ে রপ্তানীর পরিমাণ শতকরা ৭ ভাগ বাড়ানোর যে লক্ষ্য রাখা হয়েছে এই পুরস্কার তাতেও সাহায্য করবে। সরকার এবং জনসাধারণের সহযোগিতার মাধ্যমেই শুধু এই লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব।

এই ক্ষেত্রে জনসাধারণের কর্ত্তব্য হ'ল ভবিষ্যত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ভিত্তি স্থাপনের জন্য তাঁদের আরও বেশী উৎপাদন করতে হবে, কম খরচ করতে হবে এবং দ্রব্য মূল্যের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

কোন দেশই, বিশেষ করে উন্নয়নশীল কোন দেশ লেনদেনের ক্ষেত্রে একটা প্রতিকূল অবস্থা সহজে বরদাস্ত করতে পারেনা। এই বৈষম্য সম্পূর্ণভাবে দূর করার জন্য অবিরাম চেষ্টা ক'রে যেতে হয়। যে সব জিনিস আমদানি করতে হয় সেগুলি দেশেই তৈরি করা অবশ্য এই বৈষম্য দূর করার একটা উপায় তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু রপ্তানী বৃদ্ধি করাটা হ'ল আরও বেশী সক্রিয় একটা ব্যবস্থা। বিশ্বের বর্ত্তমান প্রতিযোগিতার বাজারে এটা অবশ্য সহজ নয় কিন্তু আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে চতুর্থ পরিকল্পনায় উন্নয়নের যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে তা কেন বাস্তবে পরিণত করা যাবেনা তার কোন কারণ নেই।

পশ্চিমবঙ্গে পরিবার পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে যথেষ্ট খবর রাখেন। পরিবারের আকার সীমিত রাখার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলি সত্যি সত্যি গ্রহণ করা এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে শুধুমাত্র অবগতির মধ্যে যে ফাঁক রয়েছে তা পূরণ করার উদ্দেশ্যে রাজ্যের পরিবার পরিকল্পনা সংস্থা কয়েকটি দূরপ্রসারী ব্যবস্থার কথা ভাবছেন।

১৯৬৯ সালের মার্চ্চ মাস পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে সন্তান জন্ম নিরোধমূলক ৪,৪৭,০০০টি অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। এই রাজ্যে সন্তান-উৎপাদনক্ষম আনুমানিক যে ৭৬ লক্ষ দম্পতি আছেন তার মধ্যে শতকরা প্রায় ৬ ভাগ এই অস্ত্রোপচার করিয়ে নিয়েছেন এবং আরও শতকরা প্রায় ৩.৭ ভাগ (২,৮১,০০০ হাজারের ও বেশী) লুপ ব্যবহার করছেন। এ ছাড়া সরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমেও এই রাজ্যে ব্যাপকভাবে নিরোধ বন্টন করা হয়েছে। এইসব ব্যবস্থার ফলে জন্মের হার কমের দিকে চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে জনবসতির হার হ'ল প্রতি বর্গমাইলে ১,০৮২ জন এবং সহরাঞ্চলে ৯,৫০০। এই রাজ্যের সহরগুলি অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ, তাছাড়া ঘনবসতির বস্তিও রয়েছে। রাজ্যটিতে নদীর সংখ্যা খুব বেশী এবং নানা রকম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকলেও বন্যা ইত্যাদির সমস্যা প্রায়ই দেখা দেয়। উত্তরবঙ্গকে ভৌগোলিক দিক থেকে প্রায় বিচ্ছিন্নই বলা যায়। কাজেই পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে কোন কর্ম্মসূচী ব্যাপক আকারে রূপায়িত করার পথে এই সব অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়।

পরিবার পরিকল্পনা কর্ম্মসূচী রূপায়িত করা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের সংহত প্রচেষ্টা বেশীদিন পূর্ব্বে সুরু হয়নি। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ে সাধারণতঃ চিকিৎসালয়ে, সন্তানজন্ম নিরোধমূলক সাধারণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হত। পরে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সহরাঞ্চলে মাত্র দুটি কেন্দ্রে, গ্রামাঞ্চলে ৭টি কেন্দ্রে এবং ৯টি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে কাজ সুরু করা হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ে অবস্থা প্রায় একই থাকে, তবে সহর ও গ্রামাঞ্চলে পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রগুলির সংখ্যা বাড়ে এবং পরিবার পরিকল্পনাকে মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণের কাজের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ঐ সময়ে একটি পল্লী পরিবার পরিকল্পনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও খোলা হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনার সময়েই কর্ম্ম-সূচীটি অত্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। ১৯৬৫ সালের মধ্যেই রাজ্যের সদর থেকে ব্লক পর্য্যায় পর্য্যন্ত একটা সংহত সংগঠন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে যায়। এর ফলে হুগলী জেলায় যখন পরীক্ষামূলক লুপ প্রকল্প নিয়ে কাজ সুরু করা হয় তখন রাজ্য সরকার এটা শুধু জনপ্রিয় করে তুলতেই সমর্থ হননি সমগ্র রাজ্যের চাহিদা মেটাতেও সক্ষম হন।

১৯৬৬-৬৭ সালে অবশ্য বন্ধ্যাকরণটাই বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে এবং ১৯৬৭-৬৮ সালের জন্য যে লক্ষ্য স্থির করা হয় তার শতকরা ১৩৭ ভাগ পূর্ণ হয়। এই অস্ত্রোপচার কর্ম্মসূচী নিয়ে ১৯৬৮-৬৯ সালেও কাজ চলতে থাকে এবং এই বছরের জন্য লক্ষ্যও অনেক বেশী রাখা হয়।

সন্তান জন্ম প্রতিরোধ করার অন্যতম উপায় হিসেবে সেব্য পিল জনগণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য ১৯৬৮ সালে কয়েকটি কেন্দ্র খোলা হয় এবং বর্ত্তমানে ৪৪টি বিভিন্ন কেন্দ্রে এই পরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই পরিবার পরিকল্পনা-কর্ম্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য কলিকাতা ও কল্যাণীতে দুটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। বর্ত্তমান বছরেই উত্তর বঙ্গে তৃতীয় আঞ্চলিক কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ সুরু করা হবে।

পশ্চিমবঙ্গে উচ্চতর শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধে রয়েছে। সুপ্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কলেজ ও স্নাতকোত্তর প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাড়াও বহু সংগঠিত ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, পরিবার পরিকল্পনা কর্ম্মসূচীকে সফল করে তোলার উদ্দেশ্যে সহযোগিতা করছে। বহু শিক্ষিত চিকিৎসক রয়েছেন এবং অনেক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে।

কাজেই রাজ্য পরিবার পরিকল্পনা সংস্থা আশা করেন যে, উপযুক্ত পরিমাণে জিনিসপত্র পাওয়া গেলে এই ক্ষেত্রে আরও বেশী সাফল্য অর্জ্জন করা সম্ভব।

গভীর জলে ধান-চাষের পরীক্ষা সাফল্যের পথে

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার অঞ্চল বিশেষে নীচু জমিতে জলের গভীরতার জন্য কোন চাষ হতে পারে না। অনেক সময় চাষ করলেও বন্যার জলে ডুবে গিয়ে তা পচে নষ্ট হয়ে যায়। এ ধরনের ক্ষতির হাত থেকে চাষীকে রক্ষা করা এবং ধানের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার মেদিনীপুর জেলার ময়না, তমলুক, পটাশপুর প্রভৃতি ব্লকের কয়েকটি নীচু জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে ধানের চাষ করেন। এ ধরনের পরীক্ষামূলক চাষ পশ্চিমবঙ্গে নতুন। রাজ্য সরকারের কৃষি বিভাগের উদ্যোগেই এই চাষ হচ্ছে। পরীক্ষামূলক এই চাষ সফল হলে আগামী বছরে রাজ্য সরকারের কৃষি বিভাগ নীচু অঞ্চলগুলিতে গভীর জলে ধান চাষের জন্য বিভিন্ন জাতের বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা করবেন। সাধারণভাবে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে জমিতে ধান বুনতে হয়, কার্তিক মাসে ধান পেকে যায় এবং অগ্রাণের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে তা কেটে তুলতে হয়। ধান গাছগুলি ১৩।১৪ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। এই ধানের ফলন বেশী হয়।

অধিক ফলনশীল ধান-চাষে অন্তরায়

সুভাষ রায়চৌধুরী
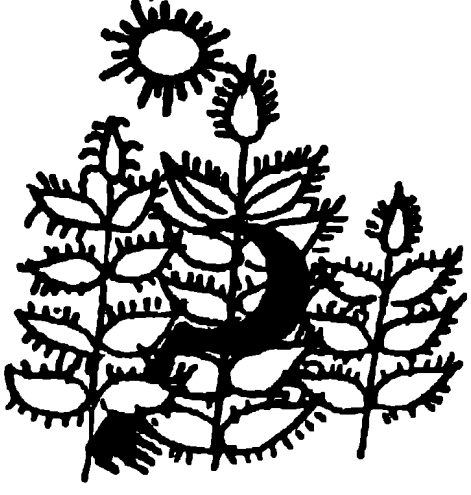
কয়েকদিন আগে বর্ধমান জেলার কালনার ১নং ব্লকের কয়েকজন কৃষকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে একজন তরুণ কৃষক প্রশ্ন করেছিলেন, কৃষি কর্মচারী ও রেডিও মারফত অধিক ফলনশীল ধানচাষের যে সাফল্যের কথা তাঁরা শুনে থাকেন, তাঁর নিজের জমিতে সেই পরিমাণ ধান ফলছে না কেন। তাঁর অভিযোগ ছিল জয়া-পদ্মা প্রভৃতি ধান সম্বন্ধে। সেই তরুণ কৃষকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাত্র তিন দিন আগে রেডিওতে কৃষি কথার আসরে একটা সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে বেলুড় মঠে জয়া ও পদ্মা ধানের ফলনের কথা প্রচারিত হয়। তাঁর নিজের জমিতে সেই পরিমাণ ফসল না ফলায় তরুণ কৃষকটি একটু বিরক্ত হয়েছেন। অবশ্য এ রকম কৃষকের সংখ্যা কম নয়,—যাঁরা অধিক ফলনশীল ধান চাষ করতে গিয়ে সাফল্য লাভ করতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়ছেন। এর কারণ কি? কেন তাঁরা উপযুক্ত ফলন পাচ্ছেন না?

পশ্চিমবাংলায় মোট এক কোটি পয়-ত্রিশ লক্ষ একর জমির ভেতর ধানচাষ হয় প্রায় এক কোটি পনের লক্ষ একর জমিতে। এ বছর পশ্চিম বাংলায় কুড়ি লক্ষ একর জমিতে অধিক ফলনশীল ধানচাষের লক্ষ্য-সীমা ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু সেই লক্ষ্যসীমায় পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। যে সব কৃষক, সম্প্রসারণ কর্মী, রেডিও ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকা মারফৎ প্রচার শুনে চাষ করেছেন তাঁদের মধ্যেও কম সংখ্যক কৃষক এই চাষে পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

অধিক ফলনশীল জাতের ধানচাষ করতে হলে যা একান্ত প্রয়োজনীয় তা হচ্ছে:—

(১) সেচ ও জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত,
(২) উন্নত মানের বীজ ব্যবহার,
(৩) উপযুক্ত পরিমাণ জৈব সারের সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণে রাসায়নিক সারের ব্যবহার,
(৪) চাষের কাজে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার,
(৫) শস্য সংরক্ষণের জন্য নিয়মিত প্রতি-ষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ,
(৬) বিপণন ব্যবস্থার উন্নতি ও ন্যায্য মূল্য,
(৭) আর্থিক সহায়তা এবং
(৮) শিক্ষা।

অধিক ফলনশীল শস্যের চাষে জলসেচ ও নিকাশের ভাল ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে সেচের সুযোগ যা আছে প্রয়োজনের তুলনায় তা অত্যন্ত কম। বড় বড় প্রকল্পগুলো থেকে যা সেচের জল পাওয়া যায় তাতে সাধারণ ধান চাষ করা যেতে পারে। অধিক ফলনশীল জাতের ধানচাষ খুব কম জমি-তেই করা যেতে পারে। কারণ এ সব জাতের ধানচাষে নিয়মিত সেচ ব্যবস্থার সুযোগ থাকা চাই। গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ, নদীসেচ প্রকল্প প্রভৃতির সাহায্যে নিয়মিত সেচ ব্যবস্থার সুযোগ পাওয়া যায়। সে ব্যবস্থা এত অপ্রতুল যে ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। আর জল নিকাশের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। উঁচু ও মাঝারি জমি-তেই অধিক ফলনশীল শস্যের চাষ করা হয়ে থাকে।

কিন্তু দেখা যায় সেচের ব্যবস্থা যাঁর আছে সেই কৃষকের হয়তো জলনিকাশের ব্যবস্থা নেই। তিনি হয়তো উন্নত মানের বীজ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে রাসায়নিক সার ব্যবহার করেন নি। আবার কোথায়ও দেখা যাচ্ছে এ সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেও নিয়মিত প্রতি-ষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ফলে আশানুরূপ ফলন পাচ্ছেন না। সেই সব কৃষক সাধারণত: ফসলের রোগ বা পোকার আক্রমণ চাক্ষুষ না দেখা পর্যন্ত কোনো রকম ওষুধ ব্যবহার করতে ইতস্তত: করেন। ফলে, রোগ ও পোকার আক্রমণে অনেকটা ফসল নষ্ট হয়ে যায়। অনেকে আবার পরিমিত ওষুধ ব্যবহার না করার ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণ ফসল ঘরে তুলতে সক্ষম হন না এবং ওষুধের কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়েন।

একটি মানব শিশুর জন্য যতখানি যত্ন পরিচর্যা দরকার, একটি চারা গছের জন্যও প্রায় অনুরূপ যত্ন পরির্যার আবশ্যক। যাঁরা নিজের হাতে বা তদারকীতে চাষ আবাদ করেন না, তাঁরা যে প্রচুর পরিমাণে ফসল ঘরে তুলবেন সেটা আশা করা বৃথা। কালনা ১নং ব্লকের সেই কৃষকটির কথাই ধরা যাক। তিনি প্রয়োজন মতো রাসায়-নিক সার জমিতে ব্যবহার করতে পারেন নি। মাত্র চাপান সার ব্যবহার করে তিনি যদি সর্বাধিক ফসল কাটতে সক্ষম হতেন তাহলে সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার হতো।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, অধিক ফলনশীল ধানচাষে প্রচুর পরিমাণে জৈব ও সুষম রাসায়নিক সার ব্যবহার করা দরকার। সঙ্গতিপন্ন অভিজ্ঞ কৃষক এবং লেখাপড়া জানা তরুণ কৃষক রাসায়নিক সার প্রয়োগে যতটা বেশী আগ্রহী, সাধারণ কৃষক ততোটা আগ্রহী নন। এমন কি সার প্রয়োগের সাফল্য চোখে দেখা সত্ত্বেও

অনেকে ভরসা করে জমিতে সার দিতে চান না। অনেকে আবার শুধুমাত্র নাইট্রোজেন ঘটিত সার জমিতে প্রয়োগ করে মনে করেন এতেই প্রচুর ফলন পাওয়া যাবে। আজকাল অনেকে নাইট্রোজেন ও ফসফেট ঘটিত সার ব্যবহার করছেন। কিন্তু সুষম রাসায়নিক সার বলতে নাইট্রোজেন ফসফেট ও পটাশ সারের সংমিশ্রণকে বোঝায়। এই তিনটি সার উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহার না করলে আশানুরূপ ফসল ফলানো সম্ভব নয় এ কথা অধিকাংশ কৃষক বুঝতে চান না। যাই হোক কালনা ১নং ব্লকের সেই তরুণ কৃষককে বেশ নিরুৎসাহিত হয়ে পড়তে দেখা গেল। কারণ, তাঁর জমিতে চারা রোয়া হয়েছিল আট দশ ইঞ্চি দূরে দূরে। অথচ অধিক ফলনশীল জাতের চারা রোয়া উচিত ৬"×৬" অথবা ৯"×৪" দূরে। তা না হলে চারার সংখ্যা কমে যাবার ফলে ফলনও কমে যেতে বাধ্য। হামেশাই দেখা যায় যাঁরা সব কিছু নিয়ম কানুন মেনে চাষ করেছেন বলে দাবী করেন তাঁরাও শুধু চারার সংখ্যা কম হওয়ার ফলে সর্বাধিক ফলন হতে বঞ্চিতঃ হচ্ছে। অনেক কৃষককেই দেখা যায় তাঁরা সাধারণ আমন ধানের মতো করে অধিক ফলনশীল জাতের ধানের চারা বুনেছেন। এও একটা অন্যতম কারণ যার দরুণ ফলন কম হচ্ছে।

অধিক ফলনশীল শস্যের চাষে যে পরিমাণ টাকা খরচ হয় সাধারণ আমন ধানে তার তুলনায় খরচ অনেক কম। যাঁদের আর্থিক সঙ্গতি নেই তাঁদের এ চাষে উৎসাহিত করতে হলে প্রয়োজনের সময় আর্থিক সাহায্য দেওয়া দরকার। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় ঋণ হিসাবে আর্থিক সাহায্য পেতে হলে কৃষককে যথেষ্ট হয়রাণ হতে হয়। অথচ কৃষিকাজে ঋণ পাবার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে পারে না। এমনও দেখা যায় যে, ফসলের জন্য কৃষক, ঋণের আবেদন করেন, সে ঋণ মঞ্জুরও হয়, তবে সেটা হয় তার পরের ফসল ঘরে তোলবার সময়। এটাও অন্যতম কারণ যার জন্য অনেকে ঠিকমতো চাষ করতে সক্ষম হন না।

এ কথা ঠিক চাষের ফসল ঘরে আটকে রাখার সামর্থ্য খুব কম কৃষকের আছে। ফসল বিক্রীর ব্যাপারটাও বেশ জটিল। কৃষককে ফসলের জন্য ন্যায্য দাম দিয়ে তার ফসল তুলে নেবার জন্য দরকার সৎ ও দরদী কর্মীর। এ বছর বর্ধমান জেলায় কোনো এক সময় ধান কেনার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। যাঁদের উপর সে দায়িত্ব ন্যস্ত তাঁদের আরও সক্রিয় হতে হবে এবং ধানের দাম সঙ্গে সঙ্গেই মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

বর্তমানে সেচের ব্যবস্থা বাড়াবার জন্য চেষ্টা চলছে। চেষ্টা চলছে নিবিড় চাষের কার্যক্রম অনুযায়ী কৃষককে সব রকমে সাহায্য করার। আজকাল বিজ্ঞান ভিত্তিক চাষের যে সুযোগ কৃষকদের সামনে এসেছে ব্যাপকভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা না করলে সাধারণ কৃষকদের পক্ষে সে সুযোগ গ্রহণ করে পুরো সাফল্য অর্জন করা সম্ভব কি?

নোনা মাছ প্রভৃতির রপ্তানী-সম্ভাবনা

দেশের কয়েকটি অঞ্চলে কিছুকাল ধরে মাছধরার নৌকোগুলি যন্ত্রসজ্জিত করা হচ্ছে। এর ফলে বিদেশে চালান দেওয়ার জন্য সমুদ্র থেকে ধরা মাছ সংরক্ষিত করার শিল্পের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে। মাছ ধরার পরিমাণ বেড়ে যাবার ফলে এখন আধুনিক পদ্ধতিতে ঠাণ্ডায় জমিয়ে সেগুলিকে সংরক্ষিত রাখা সম্ভব হয়েছে। ফলে এই বস্তুটির রপ্তানীর পরিমাণ গত দুই দশকে প্রচুর বেড়েছে। এখন দেশের নিয়মিত রপ্তানী পণ্য-তালিকায় এটির আসন স্থায়ী হয়ে গেছে। ১৯৬১-৬২ সালে মোট রপ্তানীর মূল্য ছিল ৩.৯ কোটি টাকা। এই পরিমাণ ১৯৬৮-৬৯ সালে বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২৪.৭ কোটি টাকায়। রপ্তানী বৃদ্ধির অধিকাংশ কৃতিত্ব দাবী করতে পারে পশ্চিম উপকূল অঞ্চল। এ যাবৎ ভারত, সিংহল বার্মায় নুণে জড়ানো শুঁটকী মাছ রপ্তানী করেছে। কিন্তু এখন অল্প সময়ে ঠাণ্ডায় জমিয়ে টিনে সীল করার সুযোগ থাকাতে, ব্যাঙ ও ছোট চিঙড়ীও পাশ্চাত্য দেশে রপ্তানী করা হচ্ছে। কেরালা, মহারাষ্ট্র ও মহীশূর উপকূলের ছোট চিংড়ীর খুব ভালো বাজার আছে যুক্তরাষ্ট্রে। সুখের বিষয় এই যে, উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পে উৎকর্ষতা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও ক্রমশ: চালু করা হচ্ছে। মহীশূরে সেন্ট্রাল ফুড টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং ম্যাঙ্গালোরে জাপানী সহযোগিতায় স্থাপিত প্রোসেসিং ট্রেনিং সেন্টার এ ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। যেমন, পশ্চিম উপকূলে, নোণা মাছ প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্যে এক এক ক'রে যে সব শিল্প গড়ে উঠছে, সেগুলির সুপরিচালনার জন্যে কর্মীদের যে প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার এবং নিত্য নিয়মিত গবেষণার মাধ্যমে এই শিল্পের যে ক্রম প্রসার ও উন্নতি দরকার তার জন্য ঐ দুটি প্রতিষ্ঠান শিক্ষণ ও গবেষণার ব্যবস্থা করতে পারে। পশ্চিম উপকূলের এই শিল্পের বিকাশের জন্য মাছ ধরার যান্ত্রিক সরঞ্জামে সজ্জিত নৌকার ব্যবস্থা করা ও মাছ প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্য ঠাণ্ডায় জমাবার ও টিনজাত করার যন্ত্রের যথোপযুক্ত প্রচলনের জন্য প্রচুর অর্থব্যয়ের প্রয়োজন। কিন্তু সে ব্যয় অযথা ব্যয় গণ্য করার কথা নয়। কারণ শুধু ঐ অঞ্চলটিই নয়; আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এলাকায় এই শিল্প প্রসারের সম্ভাবনা এত উজ্জ্বল যে এ ক্ষেত্রে অর্থলগ্নী সবিশেষ লাভদায়ক হওয়ারই কথা। বঙ্গোপসাগরের আহার যোগ্য মাছ প্রভৃতির পরিমাণ সম্বন্ধে এখনও ভালোভাবে অনুসন্ধান করা হয়নি বটে তবে পশ্চিম উপকূলে এই শিল্পের যে রকম অনুকূল অবস্থা পাওয়া গেছে, আন্দামানে তার ব্যতিক্রম হওয়া উচিত নয়।

বেশী ফলনের কর্ম্মসূচী

১৯৬৮-৬৯ সালের রবি মরসুমে উৎসাহজনক সাফল্য

১৯৬৮-৬৯ সালের রবি মরসুমে বেশী ফলনের গম, ধান ও জওয়ার থেকে ভালো ফসল পাওয়া গেলেও, বিশেষ ক'রে সম্প্রসারণ প্রচেষ্টা বাড়িয়ে গুণের ক্ষেত্রে আরও ভালো ফল পাওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে বলে মনে হয়। গম চাষের জমির পরিমাণ খুব বাড়লেও, যে পরিমাণ সার ইত্যাদি প্রয়োগ করা উচিত ছিল তা করা হয়নি। ১৯৬৮-৬৯ সালের রবি মরসুমের গম, ধান ও জওয়ার সম্পর্কিত কর্ম্মসূচীর মূল্যায়ন ক'রে, পরিকল্পনা কমিশনের, কর্ম্মসূচী মূল্যায়ণকারী সংস্থা উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন। এই সংস্থা ৩২টি উন্নয়ন ব্লুকের ৯৬টি গ্রামে গিয়ে এই সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। এতে যাঁদের প্রশ্নাদি করা হয় তাঁদের মধ্যে ৮৭৬ জন কৃষক বেশী ফলনের কর্ম্মসূচীর অন্তর্গত ছিলেন এবং ১৬০ জন ছিলেন এই কর্ম্মসূচীর বাইরের কৃষক।

কর্ম্মসুচী মূল্যায়ণকারী সংস্থা বলেছেন যে, বেশী ফলনের বীজের জন্য যে পরিমাণ সার ইত্যাদি ব্যবহার করা প্রয়োজন সেই সম্পর্কে প্রচার ও পরামর্শের মাত্রা আরও বেশী বাড়ানো উচিত।

গত তিন চার বছরে দেশে কৃষি সম্পর্কে গবেষণায় যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে তবুও যে সব অঞ্চলে কৃষি প্রধানতঃ বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল, সেখানকার শস্য সম্পর্কে গবেষণার গতি আরও বাড়ানো উচিত।

মূল্যায়ণকারী সংস্থা তাঁদের অনুসন্ধানে বলেছেন যে, পূর্ব্বেকার পরীক্ষায় যে সব মন্তব্য করা হয় এই বছরের রবি মরসুমেও তা সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন আই আর-৮ ও টিএন-১ ধান এবং সি এস এইচ-১ ও সি এস এইচ-২ গমের ফসল খারিফের তুলনায় রবি মরসুমেই ভালো হয়। ১৯৬৮-৬৯ সালের রবি মরসুমে কয়েকটি নতুন ধরণের ধানের বীজ যেমন জয়া, পদ্মা ও হামসা এবং সিআর ২৮-২৫ থেকে কেমন ফসল পাওয়া যায় তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য এগুলি তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশায় চাষ করা হয়।

আর একটি নতুন ধরণের জওয়ার বীজ "স্বর্ণও" পরীক্ষা করে দেখা হয়। এই মরসুমে গম উৎপাদনকারী সমস্ত রাজ্যেই এস-২২৭ এবং এস-২২৮ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এর আগে মেক্সিকোর যে গমের বীজ ব্যবহৃত হতো তা প্রকৃতপক্ষে কেউই এবারে ব্যবহার করেন নি। মহারাষ্ট্রে অবশ্য মেক্সিকোর গমের বীজ ব্যবহার করা হয়নি। স্থানীয়ভাবে যে গমের বীজে ফলন বেশী হয় সেগুলি এবং অন্যান্য বীজ ব্যবহার করা হয়।

অনুসন্ধানে আরও জানতে পারা যায় যে ১৯৬৮-৬৯ সালে গম ও ধানের চাষে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। যে সব রাজ্যে অনুসন্ধান চালানো হয় সেগুলিতে গমের উৎপাদন সম্পর্কে যে লক্ষ্য স্থির করা হয় তা গত বছরের (১৯৬৭-৬৮) রবি মরসুমের মতোই, ছাড়িয়ে যায়। ধানের উৎপাদন সম্পর্কে যে লক্ষ্য স্থির করা হয়, একমাত্র অন্ধ্রপ্রদেশ ছাড়া আর সব রাজ্যেই তা প্রায় অর্জ্জিত হয় কিন্তু জওয়ারের ক্ষেত্রে লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভবপর হয়নি।

ঋণের সুযোগ সুবিধে

ঋণের সুযোগ সুবিধে সম্পর্কে অনুসন্ধানে বলা হয়েছে যে, নির্ব্বাচিত ব্লুকগুলিতে গত বছরের রবি মরসুমের তুলনায় ১৯৬৮-৬৯ সালের রবি মরসুমে ঋণদানের পরিমাণ শতকরা ১২.৮ ভাগ বাড়ে। আলোচ্য বছরের রবি মরসুমে প্রায় ৫৩০ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয় তার মধ্যে সমবায়ের মাধ্যমে শতকরা ৮৮.৬ ভাগ বন্টন করা হয়। সরকারী বিভাগ ও সমবায়গুলির মাধ্যমে বরাদ্দের টাকা বন্টনেরও উন্নতি হয়। প্রধানতঃ ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় সমবায় থেকে জনপ্রতি ঋণ বন্টনের পরিমাণ কমে যায়, তবে সরকারী বিভাগ থেকে ঋণ বন্টনের মোটামুটি পরিমাণ খানিকটা বেড়ে যায়। অনুসন্ধানে আরও জানা গেছে যে, গমের তুলনায় ধান ও জওয়ার শস্যের জন্যই বেশী সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তবে যে সব গমের চাষ করা হয় সেগুলিতে সহজে রোগ ও পোকার আক্রমণ হয়না। এই তিনটি শস্যের জন্যই সব রকম সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় এবং তার ফলও ভালো হয়েছে। প্রধানতঃ খাল, নলকূপ এবং কূয়ো থেকে সেচের জল দেওয়া হয়। যাঁরা বেশী ফলনের শস্যের চাষ করেন তাঁদের মধ্যে শতকরা ২ ভাগের কম কৃষক জানিয়েছেন যে তাঁরা সেচের জন্য যথেষ্ট জল পাননি।

মোটামুটি ফলন ও ব্যয়

অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, নির্ব্বাচিত ব্লুকগুলিতে গমের মোটামুটি উৎপাদন হয়েছে প্রতি হেক্টারে ২৪.৬৩ কুইন্ট্যাল—গত রবি মরসুমের উৎপাদনের তুলনায় (২৬.৫৬ কুইন্ট্যাল) এটা অবশ্য কিছুটা কম। ধানের উৎপাদন অবশ্য এই মরসুমে ভালো হয়েছে অর্থাৎ প্রতি হেক্টারে ৪৪.৩৬ কুইন্ট্যাল ধান। গত রবি মরসুমে হয়েছিল প্রতি হেক্টারে ৪২.১৮ কুইন্ট্যাল। অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় নিবিড় কৃষি উন্নয়ন কর্ম্মসূচীর অধীনস্থ অঞ্চলগুলিতেই অবশ্য এই দুটি শস্যের উৎপাদন ভালো হয়েছে।

বেশী ফলনের এই চাষে সার ইত্যাদির জন্য খরচ জওয়ারের ক্ষেত্রেই সব চাইতে বেশী হয়েছে। প্রতি হেক্টারে যেখানে ধানের জন্য খরচ হয়েছে ১১৮৭ টাকা এবং গমের জন্য ৫৮০ টাকা, সেখানে জওয়ারের জন্য খরচ হয়েছে ১,৪৪৫ টাকা। এই তিনটি শস্যের জন্য রাসায়নিক সার ও শ্রমিকের মজুরির জন্যই খরচ বেশী হয়েছে।

সংসদ সদস্যগণের উপদেষ্টা কমিটির অধিবেশন

পরিকল্পনা কমিশন সম্পর্কিত সংসদ সদস্যগণের উপদেষ্টা কমিটি গত ২৯শে নভেম্বর নূতন দিল্লীতে একটি অধিবেশনে মিলিত হয়ে, চতুর্থ পরিকল্পনার (১৯৬৯-৭৪) নীতি, সম্পদ ও বরাদ্দ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সংসদের বর্ত্তমান অধিবেশন চলতে থাকার সময়ে এটা হ'ল তাঁদের দ্বিতীয় সম্মেলন।

সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কি লক্ষ্য হওয়া উচিত, সম্পদ সংহতিকরণ, বিশেষ করে সরকারী তরফের প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে এবং অপ্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে সম্পদ সংহত করা, কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধে, জনসাধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন বিশেষ করে অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে পানীয় জলের সরবরাহের আশু প্রয়োজন মেটানো এবং শিল্পের অব্যবহৃত ক্ষমতা কাজে লাগানো সম্পর্কেই প্রধানতঃ আলোচনা করা হয়। উন্নয়নের জন্য সম্পদের বেশীর ভাগ অংশ রাজ্যগুলির পাওয়া উচিত বলে আলোচনায় জোর দেওয়া হয়। বেতনে বৈষম্য হ্রাস করা, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা ব্যবস্থায় কর্ম্মীগণের অংশ গ্রহণ এবং উন্নয়ন কর্ম্মসূচী সম্পর্কে জনগণের সহযোগিতা অর্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও উল্লেখ করা হয়।

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে উপদেষ্টা কমিটিকে জানানো হয় যে মোট কি পরিমাণ সম্পদ সংহত করা যাবে তা বাস্তবতা ও যুক্তিসঙ্গত আশার ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। রাজ্যগুলির সঙ্গে আলোচনা ক'রে দেখা গেছে যে, সম্পদ সংহত করার ক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে অনুকূল সাড়া পাওয়া যাবে। আশা করা যায় যে চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকেও অনুরূপ সাড়া পাওয়া যাবে।

বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে বলা হয়, চতুর্থ পরিকল্পনার মোট বিনিয়োগের শতকরা ২০ ভাগেরও কম বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হবে। পূর্ব্বের পরিকল্পনাগুলিতে এই পরিমাণ ছিল শতকরা ৩০ ভাগ। বৈদেশিক সাহায্য ছাড়াই কাজ চালানো, যদিও একেবারে এখনই সম্ভব নয় তবে বর্ত্তমানের অবস্থা দেখে বলা যায় যে ১৯৭৪ সালের মধ্যে মোট বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা আমরা আরও কমাতে পারবো।

চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য ঘাটতি বাজেটের আনুমানিক পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৮৫০ কোটি টাকা এবং অর্থনীতিকে সজীব করে তোলার জন্য এটা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে বলা হয়েছে। যে আকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টার ওপর ভিত্তি ক'রে আনুমানিক ঘাটতি হিসেব করা হয়েছে তা ফাঁপা বাজারের সৃষ্টি করবে বলে মনে হয়না। ঘাটতি মেটানোর জন্য মজুদ যে খাদ্যশস্য থাকবে তা এবং পাট, তুলো, চিনি ও সরকারী বন্টন ব্যবস্থা, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা সুনিশ্চিত করবে।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষক

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকরা, রাজস্থানের কৃষি উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছেন। বর্ত্তমানে এঁদের সংখ্যা হ'ল প্রায় ৩০০০ এবং কৃষকদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্ম্মসূচী অনুযায়ী এঁরা উদয়পুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষালাভ করেছেন।

উদয়পুর থেকে ছয় মাইল দূরে বালগাঁওতে, বীজ উৎপাদনের জন্য যে খামার আছে, সেখানে এই প্রশিক্ষণের উপকার বুঝতে পারা যাচ্ছে। এখানে উদয়পুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬০ একর জমি ৩০ জন কৃষকের একটি দলকে দেওয়া হয়। এঁরা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই বীজ উৎপাদনের আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

বীজ উৎপাদন সম্পর্কিত কর্ম্মসূচী নিয়ে কাজ আরম্ভ করার আগে এই ৬০ একর জায়গাকে খামার বলেই মনে হতোনা। খানিকটা জায়গায় ছিল ফলের বাগান, যা থেকে কোন আয় হতোনা। এই জমিটাকে সমতল করে সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৬৬ সালে প্রথমতঃ তাঁরা মাত্র ৮ একর জমিতে ভুট্টার চাষ করেন। পরে তাঁরা বছরের পর বছর চাষের জমির পরিমাণ বাড়িয়ে যেতে থাকেন এবং গত বছরে খারিফ মরসুমে তাঁরা ৪০ একর জমিতে সঙ্কর ভুট্টার চাষ করেন এবং রবি মরসুমে ৬০ একর জমিতে সঙ্কর গমের চাষ করেন। এই জমি থেকে ১.৮ লক্ষ টাকার শস্য উৎপাদিত হয়।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকরা তারপর এটিকে একটি লাভজনক বীজ খামারে পরিণত করেন। তাঁরা এখন গঙ্গা ৩ সঙ্কর ভুট্টা এবং কল্যাণ সোণা ও এস-২২৭ গমের বীজ উৎপাদন করছেন। কৃষি বিভাগ তাঁদের সম্পূর্ণ বীজ কিনে নেন।

কেবলমাত্র পুরুষ কৃষকরাই শিক্ষা গ্রহণ করেননা। নারীরাও শিক্ষা গ্রহণ করেন।

ঐ গ্রামেরই একজন নারী শিক্ষার্থী দুর্গাবাই বলেন যে "আমাদের দেশে চাষআবাদে নারীরাই বরং পুরুষদের তুলনায় বেশী কাজ করেন। কাজেই তাঁরাও কি শিক্ষালাভ করার অধিকারী নন?"

দুর্গাবাই এবং তাঁর উৎসাহী মেয়ে হেমলতা, উদয়পুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করেন আর তার ফলে তাঁদের ৪ একরের জমি ঐ এলাকায় একটি লাভজনক আদর্শ আবাদে পরিণত হয়েছে।

কৃষকদের এই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্ম্মসূচীটির কাজ বহুদিন ধরে চলবে এবং আরও অনেক নারী ও পুরুষ কৃষক ভবিষ্যতে এই কর্ম্মসূচীটি থেকে লাভবান হতে পারবেন।

জেলা পর্য্যায়ে উন্নয়নমূলক কর্ম্মচারীদের সংখ্যাবৃদ্ধি

কর্ম্মসূচী-মূল্যায়ণ সংস্থার পরামর্শ

অনেকে মনে করেন যে পল্লী প্রশাসনের ক্ষেত্রে কর্ম্মচারীর সংখ্যা খুব বেশী এবং সেখানে সংহতি ও শৃঙ্খলার অভাব রয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের নির্দ্দেশে কর্ম্মসূচী মূল্যায়ন সংস্থা এই পরিপ্রেক্ষিতে, জেলাগুলির উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীদের সংগঠন সম্পর্কে একটা সঠিক তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা সুরু করেন। পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য বেসরকারী সংস্থা যেমন খাদি এবং গ্রামীন শিল্প কমিশন, হস্তচালিত তাঁত বোর্ড ইত্যাদিসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিভাগগুলিতে জেলা, ব্লক এবং গ্রাম পর্য্যায়ে কি সংখ্যক কর্ম্মচারী বর্ত্তমানে রয়েছেন তার হিসেব নেওয়াটাই ছিল এই অনুসন্ধানের প্রধান লক্ষ্য। সমন্বয়ের সমস্যা এবং একই বিভাগ অথবা বিভিন্ন বিভাগের একই ধরণের কাজের সমস্যাও তাঁরা অনুসন্ধান করেন। প্রত্যেক জেলার উন্নয়ন অফিসের উন্নয়নমূলক বাজেট এবং তার ব্যবহারও পরীক্ষা করে দেখা হয়।

১৬টি রাজ্যে এবং কেন্দ্রশাসিত একটি অঞ্চলে, ৪২টি জেলায় এবং প্রত্যেক জেলায় একটি ক'রে ৪২টি ব্লকে অনুসন্ধান চালানো হয়। রাজ্যগুলি হ'ল অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বিহার, গুজরাট, জম্মু ও কাশ্মীর, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চল হিমাচল প্রদেশ।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে অনুসন্ধানের অন্তর্ভুক্ত জেলাগুলিতে বর্ত্তমানে, গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত কর্ম্মচারীর সংখ্যায় বিপুল পার্থক্য রয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশপরগণায় যেখানে কর্ম্মচারীর সংখ্যা হ'ল ৩০৬৪ সেখানে রাজস্থানের যোধপুর এবং হিমাচল প্রদেশের বিলাসপুর জেলায় এই সংখ্যা হ'ল যথাক্রমে মাত্র ৫২২ এবং ৪২৩।

এমন কি কোন কোন রাজ্যে জেলায় জেলায় পর্য্যন্ত কারিগরী কর্ম্মচারীর সংখ্যায় পার্থক্য রয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে যে উত্তর প্রদেশের মীরাট ও বারানসী জেলায় নিবিড় কৃষি কর্ম্মসূচী অনুযায়ী কাজ হচ্ছে। অনুসন্ধানের অন্তর্ভুক্ত অন্য তিনটি জেলার তুলনায় ঐ জেলাদুটিতে প্রায় তিনগুণ বেশী কর্ম্মচারী রয়েছেন। মধ্যপ্রদেশে অনুসন্ধানের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য জেলাগুলির তুলনায় নিবিড় কৃষি কর্ম্মসূচীর অধীন বিলাসপুর জেলায় দ্বিগুণ কর্ম্মচারী রয়েছেন। এই পার্থক্য হয়তো জনসংখ্যা, জেলার বিস্তৃতি এবং অংশতঃ উন্নয়নমূলক কর্ম্মপ্রচেষ্টার ওপর নির্ভরশীল।

কর্ম্মচারীগণের বেতন থেকেও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রে কারিগরী কর্ম্মচারীর সংগঠনের কাঠামো খানিকটা বুঝতে পারা যায়। কর্ম্মচারীদের বেশীর ভাগ অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ সর্ব্বনিম্ন বেতন স্তরের মধ্যে পড়েন। এঁদের দুটি শ্রেণীর মধ্যে সমস্ত সম্প্রসারণ অফিসার, এবং গ্রামসেবক ও ক্ষেত্রকর্ম্মী ইত্যাদিরাও অন্তর্ভুক্ত। বিভাগগুলির জেলা প্রধান অথবা বিশেষ কর্ম্মসূচীর প্রধানরা সাধারণতঃ উচ্চতম বেতন পান আর এঁদের চাইতেও বেশী বেতন পান বিশেষ বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ এবং অতিরিক্ত জেলা বা মহকুমা অফিসারগণ।

পরিদর্শনকারী কর্ম্মচারী ও ক্ষেত্র কর্ম্মচারীদের মধ্যে অনুপাতও এক এক রাজ্যে এক এক রকম। অনুসন্ধানের অন্তর্ভুক্ত মহারাষ্ট্র ও বিহারের জেলাগুলিতে এই অনুপাত ছিল ১ : ২০ এবং অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা ও আসামের জেলাগুলিতে ১ : ৫। অন্যান্য রাজ্যে এই অনুপাত ছিল এই দুটির মাঝামাঝি।

বেশীরভাগ জেলায় মোট বাজেটের দুই তৃতীয়াংশ উন্নয়নমূলক বিষয়গুলির জন্য ব্যয় করা হয়েছে।

কৃষি প্রকল্প

উন্নয়নমূলক কর্ম্মসূচীর অবস্থা বিশ্লেষণ ক'রে অনুসন্ধানে বলা হয়েছে যে কৃষিতে, কর্ম্মচারী তথা কৃষকের অনুপাত হ'ল ৪২টি জেলার মধ্যে ২১টিতে ১ : ১৫০ এবং অবশিষ্ট জেলাগুলিতে এই অনুপাত ১ : ২০০ থেকে ১ : ৫০০ পর্য্যন্ত। রাজস্থানে অনুসন্ধানের অন্তর্ভুক্ত জেলাগুলিতে এই অনুপাত ছিল ১ : ১০০০।

একজন কর্ম্মচারীর পরিদর্শনাধীনে চাষের জমির মোটামুটি পরিমাণ ছিল ২০০০ একর। তবে মহীশূরের নিবিড় কৃষি উন্নয়ন কর্ম্মসূচীর অধীন মাণ্ড্যা জেলায় এই পরিমাণ ছিল ৬৭৫ একর আবার রাজস্থানের আজমেঢ় এবং যোধপুর জেলায় এবং অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর জেলায় এই পরিমাণ ছিল প্রায় ১৫০০০ একর।

কর্ম্মচারী-কৃষক এবং কর্ম্মচারী-চাষের জমির অনুপাত, নিবিড় কৃষি কর্ম্মসূচীর জেলাগুলিতে অনুকূল ছিল।

স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা

অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে সমাজ সেবা কর্ম্মসূচী অনুযায়ী, দেশের জনগণের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষার সুযোগ সুবিধেগুলি পাওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তিনটি পরিকল্পনার সময়ে অবশ্য এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে কিন্তু তবুও অনেক কিছু করার রয়েছে।

চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে জেলাগুলিতে যত সংখ্যক কর্ম্মচারী এখন রয়েছেন এবং এই সেবার জন্য বছরে যে অর্থ ব্যয় করা হয় তা উৎসাহজনক নয়। প্রতি ৩০০০ জনের জন্য একজন চিকিৎসক বা চিকিৎসার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তি

(নার্স, ধাত্রী এবং কম্পাউণ্ডার সহ) আছেন। অনুসন্ধানের অন্তর্ভুক্ত জেলা-গুলির মধ্যে শতকরা প্রায় ৩০টিতে চার হাজারেরও বেশী ব্যক্তির জন্য একজন চিকিৎসক ছিলেন।

এইসব সেবার জন্য প্রতি হাজার লোকসংখ্যার জন্য কত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তা দিয়েও উন্নয়নের পর্য্যায় স্থির করা যায়। পর্য্যালোচনায় বলা হয়েছে যে, শতকরা ৩০টি জেলায় প্রতি হাজার ব্যক্তির জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তা ১০০০ টাকার চাইতেও অনেক কম, আর শতকরা ৫০ ভাগ জেলায় এই ব্যয়ের পরিমাণ হ'ল প্রায় ২০০০ টাকা। পাঁচটি জেলায় প্রতি এক হাজার ব্যক্তির জন্য ৪০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনা কর্ম্মসূচী, রূপায়ণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাচ্ছে। দেখা গেছে যে দশ হাজার ব্যক্তির জন্য জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসে একজন করে কর্ম্মচারী আছেন। এই সংখ্যাতেও রাজ্য অনুযায়ী পার্থক্য রয়েছে। যেমন পাঞ্জাব ও হরি-য়ানায় অনুসন্ধানের অন্তর্ভুক্ত জেলাগুলিতে এই অনুপাত হ'ল ছয় হাজারে একজন, বিহারের জেলাগুলিতে তা হ'ল ১৪ হাজারে একজন। এই কর্ম্মসূচী রূপায়িত করার জন্য পাঞ্জাব হরিয়ানার জেলাগুলিতে সবচাইতে বেশী ব্যয় করা হয়েছে আর বিহারে সব চাইতে কম। অর্থাৎ পাঞ্জাব হরিয়ানায় প্রতি এক হাজার জনসংখ্যায় যেখানে খরচ করা হয়েছে ৫০০ টাকা, বিহারে তা হ'ল ১০০ টাকা।

চিকিৎসক ও অন্যান্য কর্ম্মচারী এবং টাকার দিক থেকে, পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় এই কর্ম্মসূচীটি সংহতভাবে রূপায়িত করা হয়েছে বলে মনে হয়। তবে বিহারের জেলাগুলিতে উপরে লিখিত দুটি বিষয় সম্পর্কেই যে কাজ হয়েছে তা উৎসাহজনক নয়।

ব্লকগুলিতে উন্নয়ন কর্ম্মী

সমষ্টি উন্নয়ন কর্ম্মসূচীগুলি পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে পৌঁছুলেও কোন রাজ্যেরই ব্লকের কর্ম্মচারী কাঠামোতে কোন পরিবর্ত্তন হয়নি যদিও সব জায়গাতেই বরাদ্দের টাকা যথেচ্ছভাবে ব্যয় করা হয়েছে।

তবে কেরালা ও মাদ্রাজে, দ্বিতীয় পর্য্যায়ে সংগঠনমূলক কাঠামোতে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় খানিকটা পরিবর্ত্তন আনা হয়েছে। কেরালায় মুখ্যসেবিকার পদ তুলে দিয়ে গ্রাম পর্য্যায়ের কর্ম্মীর সংখ্যা ১০ থেকে কমিয়ে পাঁচে এনে কর্ম্মচারীর কাঠামো সংশোধন করা হয়েছে। পশু-পালন এবং শিল্প সম্পর্কিত সম্প্রসারণ অফিসারের পদগুলি তুলে নেওয়া হয়েছে এবং জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ারের পরিবর্ত্তে ওভারসিয়ার নিযুক্ত করা হয়েছে। মাদ্রাজে, উভয় পর্য্যায়েই, কর্ম্মচারী, অর্থের বরাদ্দ এবং বিভাগীয় বরাদ্দগুলির ক্ষেত্রে সমস্ত ব্লক একই রকম সুযোগ সুবিধে পেয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশে সমষ্টি উন্নয়ন কর্ম্মসূচী অনুযায়ী কাজগুলিতে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। দেশের অন্যান্য জায়গায় যেমন ব্লকগুলিকে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়েছে এখানে তা না করে কর্ম্মচারীর সংখ্যা হ্রাস এবং অন্যান্য ব্যয় হ্রাস করার উদ্দেশ্যে বড় বড় ব্লক করা হয়েছে। সেগুলিকে আবার তাদের সাফল্যের পর্য্যায় ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রগতিশীল, সাধারণ, অনুন্নত এবং উপজাতি ব্লক হিসেবে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশে ব্লক উন্নয়ন অফিসারের পদগুলি ১৯৬৫ সাল থেকেই লোপ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসারগণের পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে জেলা কালেক্টার, মহকুমা অফিসার ও তহশীল-দারদের ওপর উন্নয়নমূলক কাজগুলির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মহকুমা অফি-সাররা রাজস্বের কাজ নিয়ে সাধারণতঃ ব্যস্ত থাকেন বলে, ব্লকের কাজকর্ম্ম দেখবার সময় খুব কম পান, ফলে কাজের গতি অনেকখানি কমে যায়।

গত দুই বছরে আর্থিক বরাদ্দ কম হয়ে যাওয়ায় কতকগুলি রাজ্যে ব্লকের কর্ম্মচারীর সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। মহীশূর, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এবং পশ্চিম-বঙ্গে সমাজ কল্যাণ শিক্ষার এবং পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এবং পশ্চিমবঙ্গে পল্লীশিল্পের কর্ম্মচারী সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে।

সমষ্টি উন্নয়নের ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস করা হলেও কর্ম্মচারীর সংখ্যা প্রায় একই থেকে গেছে। এই কর্ম্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত উন্নয়ন-মূলক কাজও ভীষণভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই বরাদ্দের সমগ্র অর্থই এখন কর্ম্মচারীদের বেতন ইত্যাদির জন্য ব্যয় করা হচ্ছে।

সংহত কর্ম্মপ্রচেষ্টা

অনুসন্ধানের পর কমিটি জোর দিয়ে বলেছেন যে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির সফল রূপায়ণের জন্য জেলার সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও সংস্থাগুলির কাজের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় প্রয়োজন। কৃষি উন্নয়ন কর্ম্মসূচীর অন্ত-র্ভুক্ত জলশক্তি এবং ছোট ছোট জলসেচের বিভাগের মধ্যে সমন্বয় আনাটা একটা সত্যিকারের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশে বীজ বোনার মরসুমে প্রায়ই নলকূপগুলি চালা-নোর জন্য বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করতে ভয়ানক দেরী করা করা হয় অথবা প্রায়ই তা পাওয়া যায়না।

কৃষি বিভাগেও বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ছিল। ভূমি সংরক্ষণ, ছোট ছোট জলসেচ, বৃক্ষাদি সংরক্ষণ সম্পর্কিত প্রতিটি কৃষি কর্ম্ম প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে একই কাজের জন্য বহু অফিস থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে সেগুলির কাজের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ছিল। বিভিন্ন বিভাগ একই ধরণের প্রকল্প নিয়ে কাজ করছিলেন ফলে একই কাজ দুবার ক'রে হচ্ছিল। পশ্চিমবঙ্গে, কৃষি, বন এবং সেচ বিভাগ সকলেই ভূমি সংরক্ষণের কাজ করছিলেন। কাজেই উপযুক্ত সমন্বয় না থাকায় একই এলাকায় একাধিক বিভাগ একই কাজ করেছেন।

পল্লী এবং খাদি শিল্প, পশুপালন, পশু উন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত কর্ম্মসূচীতে একই কাজ দুবার করার এবং বেশীর ভাগ রাজ্যে একই বিভাগে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মচারী নিয়োগের দৃষ্টান্ত রয়েছে।

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

কৃষিতে স্বয়ম্ভরতা এবং চাষী ও ভদ্রলোকের মধ্যে পার্থক্য

রায় বাহাদুর ডি. এন. মিত্র

বাংলার অবসরপ্রাপ্ত সহকারী কৃষি উন্নয়ন কমিশনার

বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নের পথে নানা রকম সমস্যা রয়েছে। সেচের জল, সার ইত্যাদি কৃষি সাজ-সরঞ্জামের অভাব ছাড়াও কৃষিকে অপেক্ষাকৃত হীনবৃত্তি বলে মনে করা হয়। ভদ্রলোকদের চোখে চাষারা হেয়। কিন্তু ভদ্রলোক ও অশিক্ষিত চাষার মধ্যে এই যে বিভেদ রয়েছে তা যদি ভেঙ্গে দেওয়া যেতে পারে তাহলে শিক্ষিত ছেলেরাও মাঠে গিয়ে চাষীদের সঙ্গে কাজ করতে ইতস্তত: করবেনা। কৃষিকে তখন ঘৃণার চোখে দেখা হবেনা এবং একে একমাত্র চাষার বৃত্তি বলেও মনে করা হবেনা।

এই বিভেদটা যদি অপসারিত করা যায় তাহলে বর্ত্তমানের যে সব অন্যায় কৃষকের মনকে পঙ্গু করে রেখেছে তা দূর হবে। কৃষির উন্নয়ন করতে হ'লে কৃষকদের সর্ব্বপ্রকারে উৎসাহিত করতে হবে. তাঁদের পথের সব বাধা দূর করতে হবে। নানা আকারে সমাজের তথাকথিত উচচশ্রেণীর যে শোষণ এখনও চলছে সেগুলি এবং আরও নানা রকম সামাজিক অন্যায় অপসারিত করতে হবে। আমার মনে হয় যে নবীন কৃষকদের জন্য নতুন ধরণের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত একটা শিক্ষাসূচী তৈরী করা এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবারের যুবকরা যাতে কৃষিকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে উৎসাহিত হন সেজন্য মাঝারি আকারের আবাদ গড়ে তোলাটা খুব কঠিন নয়। আমার বয়স এখন যদিও ৮০ বছর তবুও আমি এই সম্পর্কে হতাশ হইনি।

ছোট ছোট আবাদ

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেরাও যাতে কৃষির দিকে মনোনিবেশ করতে পারেন সে সম্বন্ধে আমি একটা মোটামুটি খসড়া এখানে দিচ্ছি। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে সব ছেলে কিছুটা লেখাপড়া শিখেছেন তাদের কৃষিকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করা উচিত। এদের কৃষির দিকে আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে ১০।১৫ একরের ছোট ছোট আবাদ গড়ে তোলা উচিত। এই জমিতে স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী উন্নত ধরণের পদ্ধতিতে উন্নত ধরণের শস্যাদি উৎপাদন করা হবে। এই ধরণের ছোট ছোট আবাদের আয় থেকে যে ছোট একটি পরিবারের জীবন ধারণের প্রয়োজন মেটানো যায় তা দেখানোর জন্য ৫।৬টি গ্রামের জন্য এই রকম এক একটি আবাদ গড়ে তোলা উচিত।

ঐ সব অঞ্চলের যুবকদের একটা যুক্তিসঙ্গত মাসিক ভাতায় শিক্ষানবীশ হিসেবে ঐ সব আবাদে কাজ করতে উৎসাহিত করা উচিত। আবাদের আয়, ব্যয়, লাভ, ক্ষতি ইত্যাদি সব কিছু সম্বন্ধে তাঁরা যাতে ওয়াকিবহাল হতে পারেন সেজন্য তাঁদের এই আবাদগুলিতে নিজেদের হাতে কাজ করতে হবে।

তিন বছর এই রকম শিক্ষানবীশ থাকার পর তাঁরা যদি দেখতে পান যে আবাদটি থেকে লাভ হচ্ছে তাহলে তাঁরা নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে কৃষিও একটা অর্থকরী বৃত্তি। তারপর সেই আবাদটি তাঁদের নিজেদের ব্যয়ে চালাবার জন্য তাঁদের হাতেই দিয়ে দেওয়া যেতে পারে। জমি ও সাজ সরঞ্জামের একটা উপযুক্ত মূল্য স্থির ক'রে তাঁদের দেওয়া যেতে পারে। একটা সহজ কিস্তিতে তাঁরা এই মূল্য পরিশোধ করতে পারেন অথবা মাসিক ভাড়াতেও তাঁদের সেগুলি দেওয়া যেতে পারে।

প্রদর্শনীমূলক আবাদ

গ্রামাঞ্চলে যদি এই রকম আবাদ গড়ে তোলা যায় তাহলে সেগুলি ছোট ছোট প্রদর্শনীমূলক আবাদের কাজ করবে এবং সেখানকার যুবসমাজকে, কৃষিকে জীবন ধারণের বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে উৎসাহিত করবে। ছোট ছোট জমিতে চাষ করেও যে আয় করা যায় সেই রকম কোন দৃষ্টান্ত বর্ত্তমানে গ্রামাঞ্চলগুলিতে নেই।

ভদ্রলোক ও চাষীদের মধ্যে যে বিভেদ আছে তা না ভাঙ্গা পর্য্যন্ত, খাদ্যশস্যে স্বয়ম্ভরতা সম্পর্কে যত কথাই বলা হোকনা কেন সেগুলি কোন কাজে আসবেনা। বর্ত্তমানের তথাকথিত ভদ্রলোকের সঙ্গে সমান মর্য্যাদায় যদি চাষীদের শিক্ষিত ছেলেরাও গ্রামে থেকে তাদের ন্যায়সঙ্গত ও উপযুক্ত অংশ গ্রহণ না করেন তাহলে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জ্জন করা যাবেনা।

(প্ল্যান্টার্স জার্ণালের সৌজন্যে)

ভ্রম সংশোধন

আমাদের ২৩শে নভেম্বর সংখ্যায়, লেডি ব্র্যাবোর্ণ কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী সত্যবতী সাহু রচিত "আমার চোখে গান্ধী" প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে। গান্ধী শতবার্ষিকী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয়োজিত একটি রচনা প্রতিযোগিতায় এটি প্রথম পুরস্কার পায়। ভ্রমবশত: এই তথ্যটি, প্রকাশিত রচনার সঙ্গে দেওয়া হয়নি।

পল্লীঅঞ্চলে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের নূতন ভূমিকা

যোজনা বিবরনী

ভাষা—হামীদুদ্দীন মাহমুদ

চিত্র—টি. এস. নাগরাজন

গ্রামে ব্যাঙ্কের কাজকারবার চালানোর ব্যাপারটা খুব সহজসাধ্য নয় বিশেষ ক'রে ভারতের মত দেশে। আর্থিক লেনদেনের নিগূঢ় পন্থা পদ্ধতির জটিলতম অঙ্গ, ব্যাঙ্কিং ব্যবসাকে গ্রামাঞ্চলে এতাবৎকাল একটা অজানা শহুরে কারবার বলে বোধ হয় গণ্য করে আসা হ'ত। 'ডিপজিট' 'ক্রেডিট', 'ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট্' ও 'চেক' আর 'আমানত', 'জামানত', 'লগ্নী', 'বিনিয়োগ', ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে নিত্যব্যবহার্য এই শব্দগুলি এখনও পর্যন্ত শহরের অনেকেরই কাছে বিশেষ দুর্বোধ্য তো গ্রামে। এই শব্দগুলির মধ্যে দিয়ে ব্যাঙ্ক ব্যবসার কাজ কারবারের সঙ্গে নিরক্ষর গ্রামবাসীদের পরিচিত করানো অতি কঠিন ব্যাপার। সেই ব্যাপারগুলি অতি সাধারণ চাষী শ্রমিকের বোঝবার পর্যায়ে নিয়ে আসাই বেশ বুদ্ধি বিবেচনা ও পরিশ্রম সাপেক্ষ। যে

চাষী নিজের ঐশ্চর্য্য মাটীর নীচে পুঁতে রাখতে কিংবা তা' গহনায় রূপান্তরিত ক'রে নিজের তত্ত্বাবধানে রাখতে অভ্যস্ত, সে কি ক'রে বিশ্বাস করবে, যে, চোখের আড়ালে দূরে কোথাও, ব্যাঙ্ক নামে অপরিচিত কোনোও জায়গায় তা'র ঐশ্বর্য্য নিরাপদ থাকবে? ব্যাঙ্কের পক্ষে ঋণ দেওয়ার ব্যাপারটার সমধিক গুরুত্ব আছে। সেই ঋণ দেওয়া হয় ঋণ গ্রহীতার পরিশোধ ক্ষমতার অনুপাতে। সেইদিক থেকে বর্ষার খামখেয়ালী ও মহাজনদের অনুগ্রহ ও

ওপরে : ব্যাঙ্কের কাউন্টারে সব নতুন মুখ : কিলা রায়পুরে ব্যাঙ্কের শাখা খোলায় এঁরা এঁদের আর্থিক সমস্যা সমাধানে সাহায্যের জন্য এসেছেন

নীচে : মালাউধে ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নতুন শাখা অফিসে একজন কৃষক টাকা জমা দেওয়ার জন্য গাড়ী থেকে নামছেন।

অনুকম্পার ওপর নির্ভরশীল কৃষকদের ঋণ দেওয়ার যোগ্য বলে গণ্য করার কথা ভাবতে পারাই কঠিন। সেই কারণেই বোধহয় গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কের প্রসার গোড়ায় ঘটেনি। তবে আজ নতুন যুগের বাতাবরণে ঠিক এই কারণগুলির জন্যই ব্যাঙ্কগুলি গ্রামে কারবার বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছে। এখন ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা ব্যাঙ্কঋণ নেবার মাপকাঠি নয়। এখন কৃষকদের প্রয়োজনই হ'ল সর্বাগ্রে বিবেচ্য। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ব্যাঙ্কগুলি গ্রামাঞ্চলে কারবার সুরু করেছে এবং গ্রামবাসীরাও ব্যাঙ্কে যেতে সুরু করেছেন। গ্রামে ব্যাঙ্কের ভূমিকা কত কার্যকর হতে পারে এবং হয়েছে তার একটা পুরো ছবি পেলাম আমরা কয়েকটি গ্রাম সফর করার সময়ে।

কিলা রায়পুর শাখায়, সর্দার নাহার সিং (৭২) সেভিং ব্যাঙ্কের হিসেব খোলার জন্য টিপসই দিচ্ছেন

গ্রামাঞ্চলে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপন কৃষকদের হতাশ জীবনে যেন আশার স্পন্দন, যেন অন্ধকারে আলোর ইশারা। এই আলোকশিখা কৃষকমনে সঞ্চার করেছে আশা ও বলভরসা। মহাজনের কবলে পড়ার আতঙ্ক আর তার জীবনে কালো ছায়া ফেলবে না। নিজের পরিশ্রমের সুফল নিজে ভোগ করার আশায় আজ চাষীভাইরা আস্থা নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে দৃপ্তমনে কাজ করতে পারেন।

লুধিয়ানা থেকে ২১ কি. মি. দূরে কিলা রায়পুর গ্রামটি হচ্ছে ২০০ বছরের পুরোনো একটি বসতি। এখানে প্রতি বছরে গরুর গাড়ীর দৌড় প্রতিযোগিতা হয়। তারই জন্য বোধ হয় এই গ্রামটির নাম ডাক আছে আশপাশের অঞ্চলে। এই গ্রামটিতে ২/৪ জন ছাড়া সকলেই কৃষিজীবী। অন্য ২/৪ জনের কলকাতায় গাড়ীর ব্যবসা আছে আর তার থেকে মাসে ৫০,০০০ টাকার মত আয় হয়। গ্রামে বাসিন্দার সংখ্যা ৮০০০। ব্যাঙ্কগুলির ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার সময়ে ১৯৬৮ সালের ২৭শে জুন ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া এই গ্রামে একটি শাখা খোলে। ব্যাঙ্কের রিজিওনাল বা আঞ্চলিক ম্যানেজারের মতে গ্রামে শাখা খোলার পূর্ব্বে তিনটি বিবেচ্য আছে :— (ক) ব্যবসায়ের সম্ভাবনা ; (খ) ব্যাঙ্কের বড় কোনোও শাখার কত কাছে হবে ; এবং (গ) যানবাহনের পর্যাপ্ত সুবিধা আছে কি না ? সেইদিক থেকে দেখতে গেলে, প্রথমতঃ, লুধিয়ানা-হোশিয়ারপুর লাইনের একটা অংশ শেষ হয়েছে কিলা রায়পুরের গায়ে। এ ছাড়া ঐ তল্লাটে নিয়মিত বাস চলে। একটা ডাকঘর আছে, একটা সমবায় ব্যাঙ্কও আছে। তবে কোনোও থানা নেই। এ ছাড়াও আর একটি বিষয় বিবেচনা ক'রে এখানে ব্যাঙ্কের শাখা খোলা হয়। সেটা হ'ল এখানকার মণ্ডী বা হাট। আশ-পাশের ১২টি গ্রামের (৬০,০০০ অধিবাসী) সমস্ত ফসল কেনাবেচা হয় এখানকার বাজারে। ব্যাঙ্কের শাখা খোলার ছ'মাসের মধ্যেই আমানতের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ৮৫.৭ ভাগে দাঁড়ায়।

গ্রামে ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপিত হওয়ায় নিজের ব্যবসা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও মালাউধের মহাজন বানারসী দাস আনন্দ প্রকাশ করছেন।
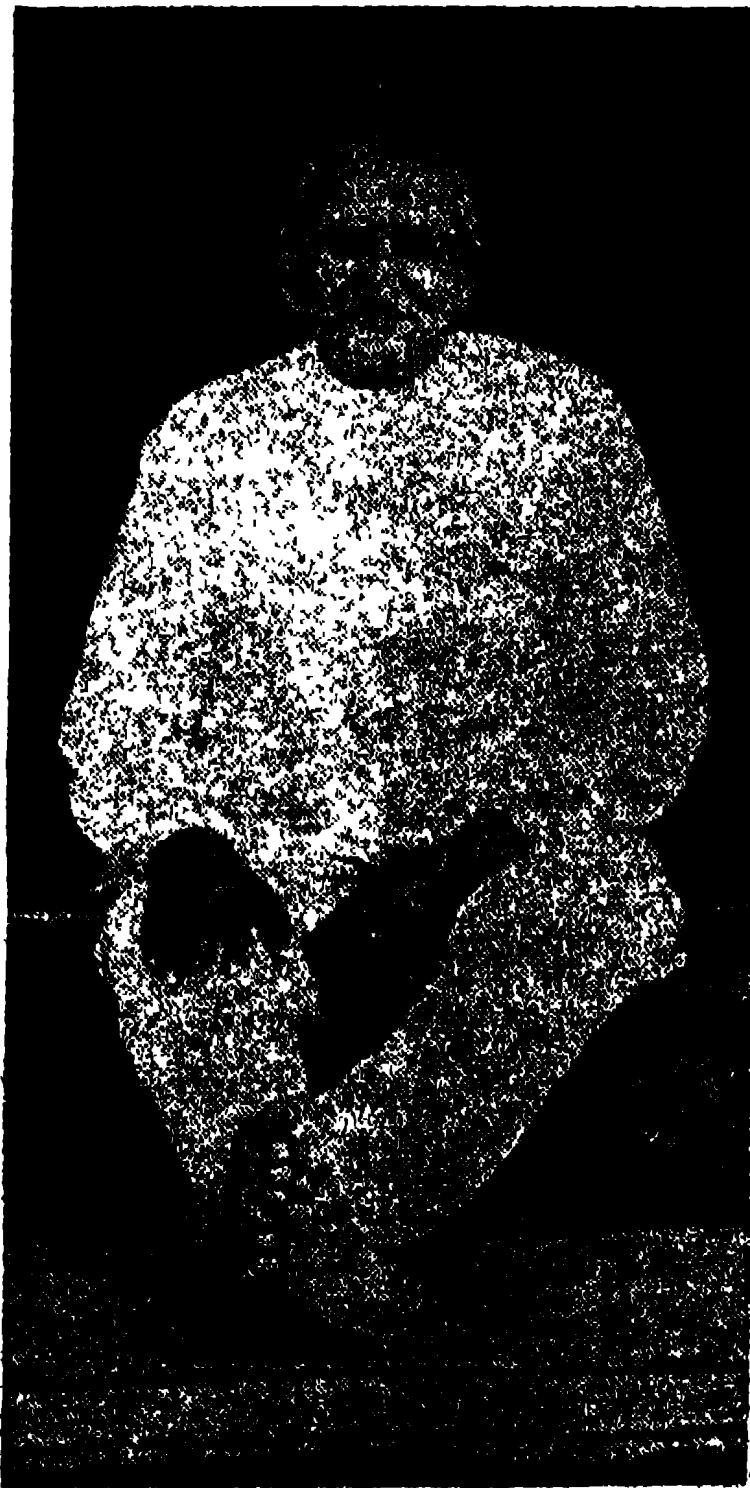
গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কের কাজ কারবার শহরের মত নয়। এখানে ব্যাঙ্কের কাজ চলে একটা ঘরোয়া আবহাওয়ায় প্রায় একটা আত্মীয়তার পরিবেশে। যেমন দেখলাম কিলারায়পুরে ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ এজেন্ট ভগবান সিং প্রত্যেক আমানতকারীকে ব্যক্তিগতভাবে জানেন। দিনে হয়তো একটা কি দুটো নতুন এ্যাকাউন্ট খোলা হয়, তাই নিয়ে মোট হয়তো ৩৫টি ভাউচার কাটা হয়। এই কারণে ভগবান সিং প্রত্যেক জমাকারীর সঙ্গে সুপরিচিত।

ব্রাঞ্চ এজেন্টের সঙ্গে সকলেরই আপন জনের সম্পর্ক। যেমন ঐ গ্রামের বা আশপাশের গ্রামের কেউ (অধিকাংশই কৃষক) ব্যাঙ্কে এসে জুতো খুলে ঢোকেন। কেউ কেউ কাউন্টারে একবার মাথা ঠ্যাকান্ (লক্ষ্মীর আসন তো)। কেউ বা ৫ টাকার নোট হাতে নিয়ে ঢুকে বলেন 'তোমার ব্যাঙ্কের সভ্য করে নাও।'

অর্থাৎ তাঁদের কাছে সমবায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যাঙ্কের কোনোও তফাৎ নেই ; ৫ টাকা দিলেই সদস্য হওয়া যায়।

পল্লী ব্যাঙ্কের আর একটি ব্যাপার বেশ মজার। কৃষকরা সাধারণতঃ ভোর বেলা ক্ষেতে চলে যান, অধিকাংশ সময়ে জল খাবারও না খেয়ে। বাড়ী ফেরেন সূর্যাস্তের সময়ে যখন শহরে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখন কারবার গুটিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু কিলারায়পুর অন্যরকম। কর্মক্লান্ত কৃষক ঘরে ফেরার পথে ব্যাঙ্কের দরজায় উঁকি মারেন, জিজ্ঞেস করেন এখন এ্যাকাউন্ট খোলা যাবে কিনা। ভগবান সিং হয়তো পাগড়ী খুলে তখন আরাম করছেন, উঠে হাসিমুখে তাঁকে ডেকে বলেন 'আসুন' 'আসুন'।

ভগবান সিং গ্রামে যান মাসে অন্ততঃ দুবার। গ্রামে পঞ্চায়েতের মোড়লের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর মাধ্যমে ভগবান সেখানেই গ্রামের লোকদের সঙ্গে একত্রে বা পৃথকভাবে কথা বলেন। গ্রাম গ্রামাঞ্চলে আসা যাওয়া করার জন্য ভগবানসিংকে ব্যাঙ্কের তরফ থেকে একটি মোটর বাইক দেওয়া হয়েছে। সেটির জ্বালানী, মেরামতী সবই চলে ব্যাঙ্কের টাকায়।

তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে সুবিধা হয়েছে কিছু। ভগবান মাথা নেড়ে জবাব দিলেন 'নিশ্চয়ই'। আমি বলি আমরা সরকারের লোক। বাস তাতেই তাঁরা খুশী। অবান্তর প্রশ্নের জবাব দিতে হয় না। জাতীয়করণের ফলে এইটে মস্তবড় সুবিধা হয়েছে।'

ব্যাঙ্কের গ্রাহক বাড়াবার জন্য এবং ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ জমা ও আগাম দেওয়ার মাধ্যমে কারবার চালু রাখার উদ্দেশ্যে অক্টোবরের গোড়ার দিকে একটি খামার মেলার ব্যবস্থা করা হয়। দূর দূরের গ্রাম থেকেও লোক এসেছিলেন। সেই সময়ে ব্যাঙ্কের অধীনস্থ এলাকার ২০ জনকে আগাম দেওয়া হয়। তা ছাড়া আরও ১০ জনকে ঋণ দেওয়া হয়। মেলায়, জালন্ধার, পাতিয়ালা, চণ্ডীগড় ও পাঠানকোট থেকেও অনেকে এসেছিলেন। এঁদের নিজ নিজ এলাকায় ব্যাঙ্কের শাখা-দপ্তরে যাবার পরামর্শ দেওয়া হয়।

আমরা সেখানে থাকতে থাকতে অমরসিং নামে এক যুবক কৃষক এলেন। তিনি বললেন, তাঁর ৬০ বিঘা জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য পাম্প সেট খরিদ করতে ৫০০০ টাকার দরকার এবং তিনি সেই টাকাটা ধার নিতে চান। অন্য কোথাও না গিয়ে তিনি ব্যাঙ্কে এলেন কেন? কারণ তাঁর ভাই এর আগে নিজের দরকারে এই ব্যাঙ্ক থেকেই ধার নিয়েছেন, দ্বিতীয়তঃ পঞ্চায়েৎও তাঁকে ব্যাঙ্কে আসতে বলে। তৃতীয়তঃ, ব্যাঙ্কে না এলে মহাজনের কাছ থেকে মাসে শতকরা ২.৫ টাকা হার সুদে কিংবা বছরে, ২৪.৪০ টাকা সুদে টাকা ধার নিতে হ'ত সে ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কে সুদের হার বছরে সাড়ে ৮ টাকা, সময়ে ধার শোধ করলে শতকরা ১/২ ভাগ রেহাই পাওয়া যায়। তা ছাড়া মহাজনদের সঙ্গে কারবার মুখে মুখে। তার ওপর পুরো জমিটা বন্ধক দিলে হয়তো তার কাছ থেকে টাকা ধার পাওয়া যাবে এবং সুদ শোধ করতে হয়তো জমির পুরো ফসলটাই মহাজনের ঘরে তুলে দিতে হবে। চতুর্থত কো-অপারেটিভের কাছ থেকে অত টাকা ধার পাওয়া কঠিন। পাওয়া গেলেও ধারের ব্যবস্থা করতে দু' আড়াই মাস সময় লেগে যাবে। অথচ গম বোনার সময় এসে গেছে, অমর সিং-এর টাকার দরকার এক সপ্তাহের মধ্যে। সুতরাং ব্যাঙ্ক ছাড়া এত সুবিধা আর কোথায় পাওয়া যাবে?

ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিতে অমর সিংকে শুধু জমির আয়ের একটা হিসেব দাখিল করতে হবে, পাটোয়ারী ও ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে এই সার্টিফিকেট নিতে হবে যে জমি বন্ধক দিয়ে ঐ সূত্রে সে টাকা ধার নেয়নি। তৃতীয়তঃ ১০০০ টাকা বিঘা দরের ভিত্তিতে দু'একর জমি ব্যাঙ্কের কাছে বাঁধা দিতে হবে। ৪/৫ দিনের মধ্যেই সব কাজ শেষ হয়ে যায়। এতে দুটি সুবিধা আছে। প্রথমতঃ ধারের টাকা অপব্যয় করা যায় না এবং দ্বিতীয়তঃ কৃষি সামগ্রী ও সরঞ্জাম বিক্রেতারা গ্রাম ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে সরাসরি কারবার করা লাভজনক মনে করেন। ফলে কৃষকদেরও ঐসবের জন্য শহর পর্য্যন্ত যেতে হয় না।

কিলা রায়পুর থেকে ২৮ কিলোমীটার ছাড়িয়ে আমরা গেলাম মালাউধ-এ। এখানেও ব্যাঙ্কের একটি শাখা আছে। মালাউধ কিলা রায়পুরের তুলনায় আয়তনে ছোট কিন্তু ব্যাঙ্কের কাজ কারবারের দিক থেকে আরও চালু। গ্রামে ৩৫,০০০ লোকের বাস এবং গ্রামটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। গ্রামে বিদ্যুৎ আছে কিন্তু টেলিফোন বা টেলিগ্রাফের সুবিধা নেই। আন্দাজ সাড়ে ৬ কি. মীটার দূরে রেল স্টেশন, থানা ১০ কি. মীটার দূরে। একটা পোস্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক আছে এবং লুধিয়ানা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের শাখা আছে এবং একটা হাই স্কুল, একটি প্রাইমারী স্কুল ও একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। টাকার লেনদেনের ব্যাপারে আরও দুজন আছেন চিরাচরিত মহাজন ও মধ্যস্বত্বভোগী।

মালাউধে আশপাশের ২৬টি গ্রামের ফসল কেনাবেচা হয়। এইটিই ছিল ব্যাঙ্কের কারবার খোলার অন্যতম প্রধান বিবেচ্য বিষয়। ইতিমধ্যে সারা গ্রামের চার ভাগের এক ভাগ লোক ঐ ব্যাঙ্কে এ্যাকাউন্ট খুলেছেন। ব্যবসার সম্ভাবনা কত উজ্জ্বল তা এতেই বোঝা যাবে যে, মালাউধ শাখা খোলার তিন মাসের মধ্যে আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,৪৯,২২০.৯০ টাকা সেভিংস এ্যাকাউন্টের সংখ্যা ২২২, ফিক্সড ডিপজিট এ্যাকাউন্ট ১৯টি। ব্যাঙ্ক আগাম স্বরূপ মোট দিয়েছে ১,১০,৪১৯.৯০। ১১ জনকে ধার দেওয়া হয়েছে। পি. সি. মিত্তাল একাধারে ক্যাশিয়ার ও ক্লার্ক, তুখোড় কাজের লোক। একবার রায়গড় সরদারন গ্রামে গিয়ে এক বেলার মধ্যে তিনি ৪৪ জনকে এ্যাকাউন্ট খোলাতে রাজী করান।

ব্যাঙ্ক ও পল্লী অর্থনীতির পারস্পরিক প্রভাব প্রতিক্রিয়ার এক অপূর্ব নিদর্শন হ'ল মালাউধ। পল্লী প্রাঙ্গনে ব্যাঙ্কের আবির্ভাবের পর মহাজনের ব্যবসাও অর্দ্ধেক পড়ে গেছে। সুদের হারও দারুন কমাতে হয়েছে। ওদিকে জোতদারের অবস্থাও শোচনীয়। আগে চাষীর ফসল জলের দরে কিনে চড়া দামে বেচে লাভের টাকা তারা আগাম দিয়ে খাটাত। কিন্তু এখন সে দিন গিয়েছে। সুদের হার মাসে শতকরা ৪/৫ টাকা থেকে কমে ২/১ টাকা হয়েছে। তার কাছে টাকা ধার নিতে কেউ কালে ভদ্রে আসে, তাও বিয়ে খাওয়ার মত কোনোও ব্যাপারে টাকার

দরকার পড়লে। কারণ এসব কারণে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ধার পাওয়া যাবে না। ১৯ ঘন্টায় ঝড়ের মত কয়েকটা জায়গা ঘুরে আসার পর যখন লুধিয়ানা ত্যাগ করলাম তখন মাঝরাত। আসতে আসতে যা দেখলাম, মনে মনে তা গুছিয়ে নিয়ে বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলাম। যে মানুষগুলিকে দেখে এলাম তাদের মুখ এক এক করে ভেসে উঠল। ভেসে উঠল চোখের সামনে গম, ভুট্টা, সরষে ও আখের ক্ষেত। দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের মাঝে মাথা তুলে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা টেলিগ্রাম লাইনের থামগুলোকে দেখে মনে হ'ল গ্রামের অপরিবর্তনীয় পরিবেশে আধুনিকতার প্রতীক ব্যাঙ্কের দ্বিধাগ্রস্ত পদক্ষেপ। একদিন গ্রাম গ্রামাঞ্চলের কত অমর সিংএর মুখে ফুটে উঠবে প্রাপ্তির ও সাফল্যের হাসি, আস্থা ও ভরসার স্বস্তি যা দেখে এলাম কিলা রায়পুরের অমর সিং-এর মুখে। দেখতে দেখতে সপ্তাহ কেটে যাবে। অমর সিং ব্যাঙ্কের ঋণের টাকায় পাম্প সেট কিনবে, ক্ষেতে সেচ দেবে ঘর ভরা ফসল তুলবে।

ভাবতে ভাবতে মনে হ'ল পল্লী অঞ্চলে ব্যাঙ্ক ব্যবসার আনুসঙ্গিক সমস্যার কথা। গ্রামে কাজ করার জন্য যে দরাজ ও পল্লী প্রেমী মন দরকার তা কতজনের আছে? চাকরীতে আখেরের সুবিধার কথা ভেবে যারা ব্যাঙ্কের গ্রামের শাখায় আসবে তাদের ক্ষেত্রে গ্রামের অভিজ্ঞতা কি শহরে, কাজে লাগবে? তা ছাড়া নিরক্ষর জনমতি লোক যেখানে টাকা জমা দিতে আসে সেখানে যে রকম সৎ ও বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন কর্মী দরকার সে রকম কি অনায়াসে পাওয়া যাবে? কারণ গ্রামের নিরক্ষর লোক যেখানে অকুণ্ঠ বিশ্বাসে টাকা তুলে দিচ্ছে সেখানে সহজে মোটা কিছু হাতিয়ে নেওয়ার প্রলোভন থাকবেই। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল কিলা রায়পুরের জমাকারীরা অধিকাংশই দস্তখত করতে জানেন না এবং চেক বই রাখতে চান না। ব্যাঙ্ক-ও তাই চেকবুক রাখায় উৎসাহ দিতেঅনিচ্ছুক। তাই ব্যাঙ্ক একটি অভিনব পন্থা চালু করেছে।

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রচুর ফসলের নিদর্শণ, মালাউধের গমের বাজার।

রজ্জুশিল্পের বিবর্তন সমস্যা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

দড়ি শিল্প ভারতবর্ষের প্রাচীনতম শিল্পগুলির অন্যতম। তাঁত, তসর, মসলীন প্রভৃতি যে সমস্ত শিল্প একদা বিশ্বের প্রায় প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল—দড়িশিল্প তাদেরই অনুগামী। মানুষের ব্যবহারিক জীবনে দড়ির চাহিদা বিভিন্ন এবং বিচিত্র রকমের। এই শিল্পের ইতিহাস সঠিক অনুসন্ধান করতে হলে, আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে ১৭৮০ সালে। ডব্লু. এইচ. হার্টন এ্যাণ্ড কোম্পানী ১৭৮০ সালে কলকাতায় প্রথম দড়ি তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। উদ্দেশ্য কলকাতার বাণিজ্যিক প্রাণ কেন্দ্রে বসে, বিশ্বের বাজারে বিভিন্ন মাপের বিভিন্ন ধরনের দড়ির চাহিদা পূরণ করা। অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে কলকাতায় যে শিল্পের প্রথম প্রতিষ্ঠা, সেই শিল্প পরবর্তীকালে ক্রমবর্ধমান চাহিদার মুক্ত পথে, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রসারিত, প্রতিষ্ঠিত এবং পরিবর্ধিত হয়েছে। শিল্প তার এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথে একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে, বিদেশী মুদ্রা উপার্জনের মাধ্যমে শিল্পের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ভবিষ্যৎ অর্থলগ্নীর পথটিকেও করেছে সুপ্রশস্ত। কারখানার সংখ্যা ক্রমশই বেড়েছে। স্বাধীনোত্তর যুগে ১৯৬৩ সালে রপ্তানী পৌঁছেছিল শীর্ষ মাত্রায় ৯ কোটি টাকার সীমারেখায়। এই শিল্প মূলতঃ রপ্তানী নির্ভর। উৎপাদনের শতকরা ৭০ ভাগই বিদেশে চলে যায়। শুধু তাই নয় কর্ম সংস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে এই শিল্প একটি আদর্শ ক্ষুদ্রশিল্প।

অগ্রগতি

পশ্চিমবঙ্গ শিল্পাধিকারের নথীভুক্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকায় যদিও রজ্জুশিল্পের মাত্র বারোটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান স্থান পেয়েছে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বহু অনথীভুক্ত ক্ষুদ্র সংস্থা কাজ করে চলেছে। যেখানে ছোবড়া সহজলভ্য, দক্ষ কারিগরের যেখানে অভাব নেই সেখানেই দড়ি শিল্প প্রকৃতির এই সম্পদকে মানুষের প্রয়োজনে রূপান্তরিত করে কর্মসংস্থানের পথ প্রশস্ত করেছে এবং বিদেশী মুদ্রা অর্জন করেছে। যন্ত্রচালিত শিল্পের ক্ষেত্রে রয়েছে মোট ১৩টি সংস্থা।

শিল্প প্রসারের আঞ্চলিকরূপ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই দড়িশিল্প বিশেষ বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। নারকেল গাছ এবং ছোবড়া যেখানে পাওয়া যায় না সেই সমস্ত অঞ্চলে এই শিল্প স্থাপন অর্থনৈতিক কারণেই সম্ভবপর নয়। এ ছাড়া আমরা আগেই উল্লেখ করেছি—এই শিল্পের আধুনিকীকরণের সঙ্গে বিভিন্ন নীতিগত প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। সরকারী সমস্ত নীতির মূল লক্ষ্য ছিল এই শিল্পের মাধ্যমে—বেশী সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান। বাংলা দেশের যে সমস্ত অঞ্চলে ছোবড়া পাওয়া যায় সেইখানে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে, প্রস্তুত প্রণালীর মহড়া দিয়ে স্থানীয় কর্মহীন মানুষদের এই প্রয়োজনীয় শিল্পে আকৃষ্ট করাই ছিল সমস্ত পরিকল্পনার লক্ষ্য। এ ছাড়া সরকার উৎপাদিত সামগ্রীর বিপণনের দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন। সম্প্রতি দড়ি ও ছোবড়া জাত সামগ্রী তৈরির তীর্থস্থান মহীশূরের অনুকরণে উৎপাদনের বিকেন্দ্রীকরণ এবং বিক্রয়কে কেন্দ্রীভূত করার সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। শিল্পের এই পুনর্বিন্যাসের প্রথম পরীক্ষা হবে—বাঙলা দেশে ছোবড়া শিল্পের অন্যতম প্রাণ কেন্দ্র হাওড়ায়।

শহর কলকাতায় রয়েছে মোট ছয়টি সংস্থা। শিল্পের সর্বাধিক প্রসারের সময়, অর্থাৎ ১৯৬৩-৬৪ সালে এই সংস্থাগুলির উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১২,৭০০ টন।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই রয়েছে ২৪ পরগণা এবং হাওড়ায়। জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহারেও এই শিল্পের প্রসার ঘটেছে এবং এই অঞ্চলের বেশীর ভাগ প্রতিষ্ঠানই পাট এবং মেস্তার আঁশ ব্যবহার করছে। মেদিনীপুর এবং হুগলী অঞ্চলেও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে শণ, মেস্তা এবং বাবুই ঘাসের আঁশ সাফল্যের সঙ্গে দড়ি তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

রাজ্যের পরিসংখ্যান শাখার এক অনুসন্ধানে প্রকাশ মেদিনীপুরে ছোট ছোট ১৩০টি প্রতিষ্ঠান এবং হুগলীতে ১৫৮টি প্রতিষ্ঠান কর্মনিরত। এগুলির মধ্যে হুগলীর সংস্থাগুলিই অধিকতর অগ্রবর্তী এবং পুরোপুরি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সংগঠিত। সেই কারণেই বোধ হয় শিল্পটি পরিবারের গণ্ডীর বাইরেও বেশ কিছু ব্যক্তির কর্ম সংস্থানে সক্ষম হয়েছে। হুগলী জেলার মোট উৎপাদনের শতকরা ৮৭ ভাগ শণের দড়ি ও টোয়াইন এবং বাকি ১৩ ভাগ পাটের পাকানো সুতো। হুগলী জেলার একক সংস্থাগুলির দড়ি ও টোয়াইনের মোট বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ টাকার অঙ্কে ১০,২৪৬ টাকার মত। দেশের বাজারে এবং বিদেশের বাজারে উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা এখনও স্তিমিত হয়নি। মেদিনীপুরে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে শতকরা ৯৮টিই কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহার করছে বাবুই ঘাস এবং বাকি প্রতিষ্ঠানগুলি তৈরি করছে শণ এবং পাটের দড়ি। বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ গড়ে, টাকার অঙ্কে ২,৪৭০ টাকা। সমস্ত দড়িই স্থানীয় বাজারে বিক্রয় হয়ে যায়।

এশিয়ায় প্রতিকূল পরিস্থিতি

ভারতবর্ষের দড়ির বাজার ছিল থাইল্যাণ্ড, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশে। সম্প্রতি থাইল্যাণ্ড ভারত থেকে দড়ি আমদানী বন্ধ করে নিজেরাই নিজেদের দেশে আধুনিক কারখানা স্থাপন করে দেশের চাহিদা পূরণ করছেন।

সিঙ্গাপুরেও ভারতীয় পণ্য জাপানের কাছে মার খেয়ে সরে আসছে। দামের দিক থেকে জাপানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারত হেরে যাচ্ছে।

এ ছাড়াও নতুন নতুন আবিষ্কার ছোবড়াজাত দড়ি শিল্পের সামনে হতাশার ছবি এঁকে চলেছে। নাইলন জাত বিভিন্ন মাপের বিভিন্ন ধরনের দড়ি বিশ্বের বাজারে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। জৈব আঁশ থেকে প্রস্তুত দড়ির তুলনায় এই জাতীয় দড়ি বাজার গুণে ভাল, দেখতে ভাল, টেঁকসই, ছেঁড়ে না। সুতরাং ছোবড়া জাত দড়ি শিল্পকে পথ খুঁজে নিতে হবে। প্রতিবেশী সিংহল অনেক আগেই ইউরোপে পাকানো দড়ি রপ্তানী করে সাফল্য লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে উৎপাদিত পণ্যের মান স্বীকৃতি লাভ করেছে।

আপৎকালীন ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক দিক

কাছি অথবা দড়ির রপ্তানী হ্রাস পাচ্ছে দেখে—শিল্পের সঙ্কট মোচনে ভারত সরকার আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। মোটা কাছির আমদানী বন্ধ করে জাহাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেশীয় পণ্য নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। এই ব্যবস্থা নিতান্ত সাময়িক। এই শিল্পকে অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচাতে হলে দীর্ঘ মেয়াদী ও অন্যান্য পরিকল্পনা চিন্তা করে দেখতে হবে। অর্থনৈতিক দিক থেকেও এই শিল্পের গুরুত্ব কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সমধিক। রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্পগুলির প্রত্যেকটিতে মোটামুটি ১০ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়। এই ১০ জনের মধ্যে ২ জন দক্ষ কারিগর বাকি ৮ জন সাধারণ শ্রমিক। যখন পুরোদমে কাজ চলে তখন একজন শ্রমিকের গড়ে মাসিক উপার্জন ১০০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা। এই শিল্পের ছোট ইউনিট-গুলি যদি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সংগঠিত করা যায় তাহলে কর্ম সংস্থানের পরিসর বৃদ্ধি অসম্ভব প্রতিপন্ন হবে না। বরং হাতে-কলমে কাজ করার অবকাশে শিক্ষণ ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ সুদক্ষ কারিগর, শিল্প প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারবেন।

কাঁচামালের মধ্যে শিসল বাজারে পাওয়া যায় না—প্রা সব সময়েই ঘাটতি লেগে আছে। শি[illegible]এর আমদানী নীতি কেবলমাত্র যাঁরা দড়ি রপ্তানী করেন তাঁদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। রপ্তানীতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য দড়ির রপ্তানীর উপর—শতকরা ৪৫ ভাগ কর রেহাই দেওয়া হয়। যে সব ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান এখনও রপ্তানীর ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারেনি সেগুলির সমস্যার শেষ নেই। এই সব প্রতি-ষ্ঠান আমদানী লাইসেন্স না পাওয়ার খোলা বাজার থেকে চড়া দামে শিসল কিনে থাকে। শিসলের আমদানী মূল্য ২ টাকা কিলো অথচ খোলা বাজারে দর দ্বিগুণ—এক কিলো ৪ টাকা।

সহ-অবস্থান

ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সুন্দর সহ-অবস্থান এই শিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। বৃহৎ প্রতিষ্ঠান তার আধুনিক যন্ত্রপাতি, উন্নত প্রয়োগ নৈপুণ্য, এবং বৃহত্তর পুঁজি নিয়ে যেমন স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক চাহিদা মেটাতে পারছে তেমনি আবার ক্ষুদ্র শিল্প এবং তার পাশেই একেবারে গ্রামীণ শিল্প তার নিজস্ব ভূমিকায় পশ্চাদপদ নয়। এর কারণ দড়ির প্রকারভেদ রয়েছে, রয়েছে বিভিন্ন বিচিত্র প্রয়োগ। বৃহৎ প্রতিষ্ঠান যখন উন্নততর, উচ্চ পর্য্যায়ের জিনিস তৈরিতে ব্যস্ত, ক্ষুদ্র এবং গ্রামীণ শিল্প তখন প্রয়োজনের অন্যতর

১৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

শুকনো আঁশ মেশিনে দেওয়া হচ্ছে।
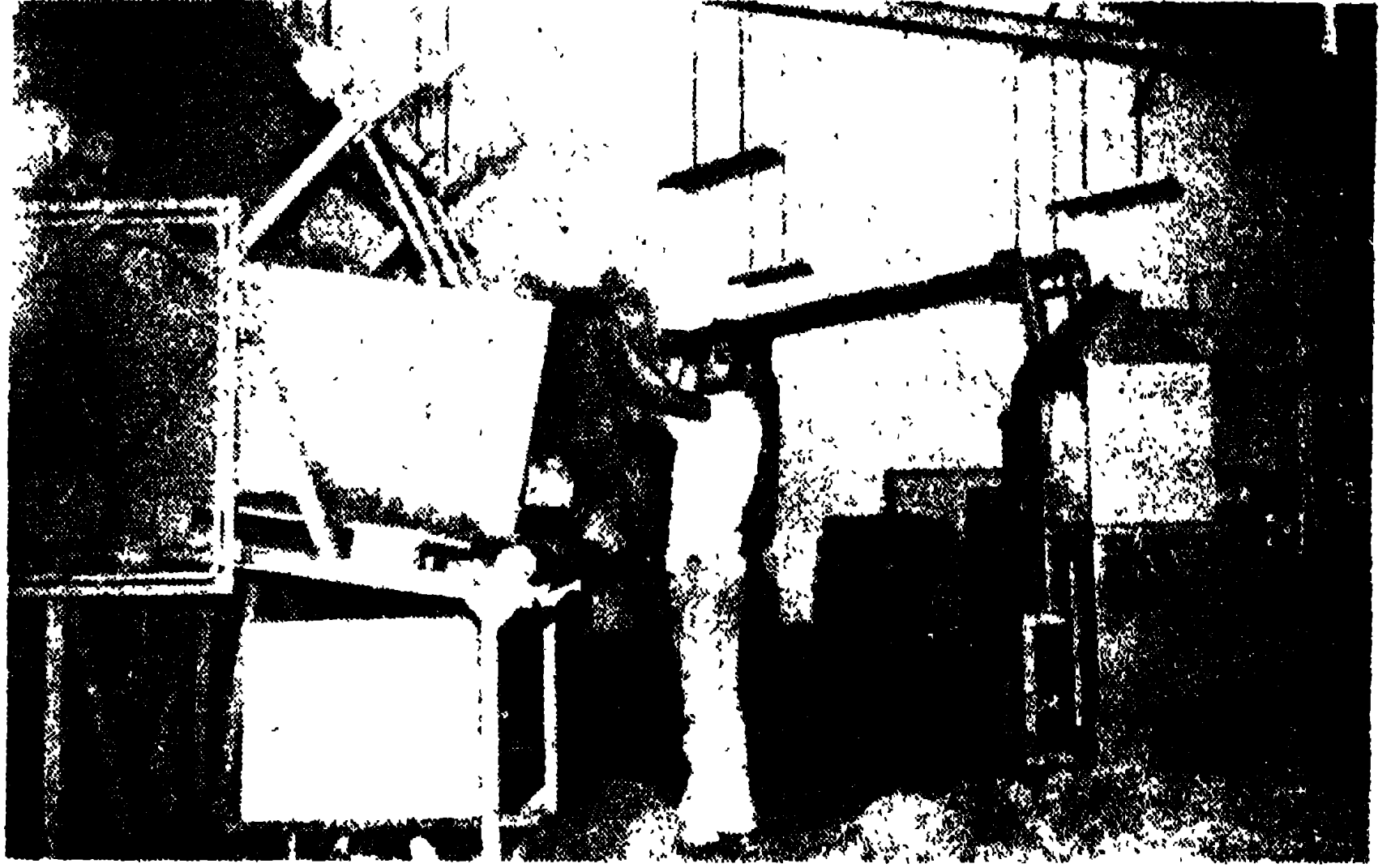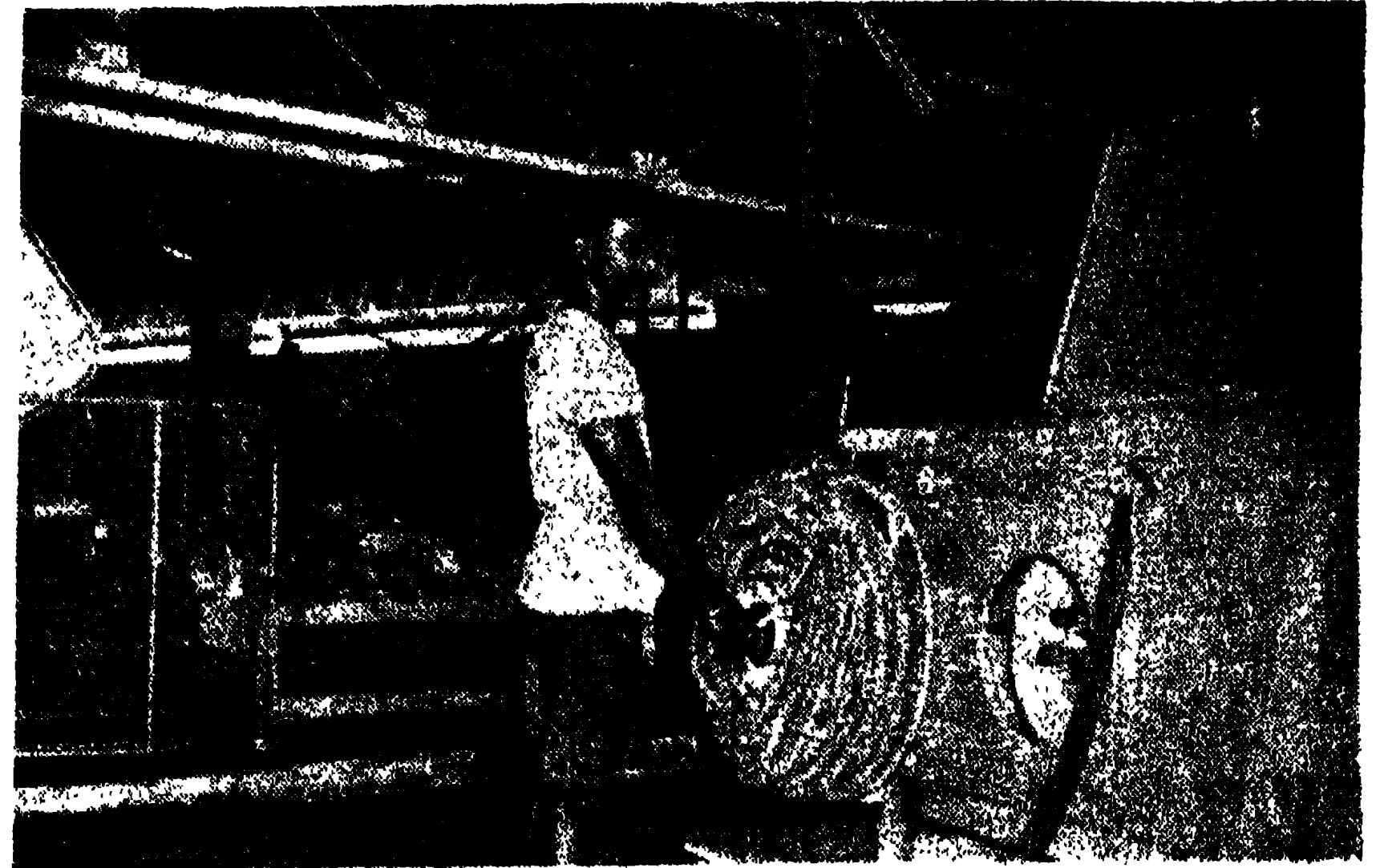
পাকানো দড়ি মেসিন থেকে বেরিয়ে আসছে।

পরিকল্পনা ও সমাজমন

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

আর্থিক কল্যাণের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সাধনই হ'ল পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। কাম্য ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদন, জাতীয় আয়ের সুষম বন্টন, অর্থনৈতিক অবস্থার সংরক্ষণ, উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ইত্যাদি সব কিছুই এর লক্ষ্য। কিন্তু পরিকল্পনার সুফল যদি গোটা সমাজের নাগালের বাইরে থাকে এবং কেবল মুষ্টিমেয়ের স্বার্থ সিদ্ধি করতে থাকে তবে পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। সমস্ত দেহকে উপেক্ষা করে কেবল মুখেই রক্ত সঞ্চারকে যেমন স্বাস্থ্য বলা যায় না তেমনি কোন পরিকল্পনার ফলে যদি সমাজের সকল স্তরের মানুষের উন্নয়ন না ঘটে তবে সে পরিকল্পনাকেও চিন্তা ও সংবেদনশীল মন কোনদিন স্বাগত জানাতে পারে না। সমাজের সকল স্তরের মানুষের জীবন ধারণের মান উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সকলের জন্য কর্মসংস্থান ক'রে দেওয়াই, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার স্থায়ী এবং সঞ্চারীভাব হওয়া উচিত। অর্থাৎ সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের পর্যাপ্ত অন্ন বস্ত্রসহ শিক্ষা ও অবসর বিনোদনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাবার মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া। ব্যক্তিগত লাভের স্পৃহাকে নিরুৎসাহিত ক'রে সমাজের সকল স্তরের লোকের জন্য সকল প্রকারের সুযোগ সুবিধা দানের দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি দিলে পরিকল্পনার কাজ ঠিক পথে অগ্রসর হতে থাকে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সুবিধা প্রধানতঃ সমাজের অপেক্ষাকৃত সুপ্ত সুযোগ ভোগী দরিদ্র জনগণের ওপরেই বর্তাবে। দেশের সহায় সম্পদ ও আর্থিক ক্ষমতা যাতে মুষ্টিমেয়ের কুক্ষিগত না হয় সেদিকে কড়া নজর না রাখলে সমষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত সমস্ত প্রচেষ্টা অকার্যকর হয়ে পড়বে।

মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হবে—(১) গড়পড়তা ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি এবং তার মধ্যে দিয়ে উন্নত বৈষয়িক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে উত্তরণ, (২) ভারী শিল্পের উন্নতিমুখী দ্রুত শিল্পায়ন, (৩) কৃষি কর্মে আধুনিক ধারা প্রবর্তন এবং (৪) সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্য দূরীকরণ।

পরিকল্পনার ইতিহাস আমাদের এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প যথা—যান বাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা যদি জনগণের হাতে না আসে, গণতান্ত্রিক আদর্শে সমাজ ব্যবস্থা গঠিত না হয়, ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে যদি ভূমি থেকে মহাজনী প্রথার উচ্ছেদ সম্ভব না হয় তবে পরিকল্পনা কোন দিনই বাস্তব রূপ লাভ করে না এবং সমাজমনের নাগাল পায় না। যে পরিকল্পনা সমগ্র সমাজকে সার্বিক প্রয়াসের ফলভোগের সুযোগ দিতে পারবেনা সে পরিকল্পনা হবে আত্মঘাতী, সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্র বিকল করার হাতিয়ার। আমাদের মত যে সব দেশে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত, সে সব দেশে পরিকল্পনার ফলাফল যদি জনগণ ও সমাজ মনের চিত্তপ্রান্তে পৌঁছে দিতে হয় তবে কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্কের সূত্রটিকে দৃঢ় করতে হবে, সারা দেশের জন্য রচিত সুপরিকল্পিত আর্থিক বুনিয়াদের উপর। লক্ষ্য রাখতে হবে দেশ থেকে দারিদ্র্য, অজ্ঞতা এবং মান্ধাতার আমলের সামাজিক ধারাবাহিকতা যা সমাজমনকে এতদিন জড় ও পঙ্গু ক'রে রেখেছে তা দূর হচ্ছে কি না। ভূমিসত্ত্ব সংক্রান্ত যে সব অবস্থার ফলে সামাজিক ন্যায় বিচার বিড়ম্বিত, সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত, তার সংস্কার হচ্ছে কি না। দেখতে হবে, অজ্ঞতা দূর করাই নয়, শুধু সাক্ষরতার পরিসংখ্যান বৃদ্ধিই নয়, সত্যকার শিক্ষা, যার মাধ্যমে শিক্ষা-বঞ্চিত কোটি কোটি নরনারী দেশোন্নয়নের প্রচেষ্টায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ ক'রে নিজেদের হাতে নিজেদের ভাগ্য গড়ে তুলতে পারে তার পথ প্রশস্ত হচ্ছে কি না।

এ কথা বলা বাহুল্য যে আমাদের দেশে যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিষয়গুলির অধিকাংশই যথার্থভাবে বাস্তবে রূপায়িত করা যায় নি। শিক্ষা, শ্রম এবং ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত কার্যসূচীগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যাবে যে এই সব ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিমাণ কী ভয়ঙ্কর। উদাহরণস্বরূপ ভূমি সত্ত্ব সংক্রান্ত অবস্থার উল্লেখ করা যায়। আজও ভূমি থেকে জোতদার ও মহাজনের উচ্ছেদ ঘটেনি। কৃষকের মৌলিক অধিকার ও ভূমি সত্ত্ব সংরক্ষিত হয়নি, দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত কৃষকের অধিকার সুরক্ষিত করা হয়নি, পতিত জমি উদ্ধার করা হয়নি। সমবায় প্রথায় চাষ প্রথাও উল্লেখযোগ্য মাত্রায় চালু করা যায় নি। কৃষি ক্ষেত্রে সংস্কার ও উন্নতির জন্য বহু প্রকল্প রচনা করা হয়েছে বটে কিন্তু একটি সুসমন্বিত পরিকল্পনার অভাবে তার কোনোটাই দীর্ঘকালের জন্য, বিস্তৃততর ক্ষেত্রের জন্য এবং অচিরে বহুল স্বার্থ পূর্ণ করার জন্য ফলদায়ক হতে পারছে না। আর এই সব অসাফল্যের দরুনই আমাদের খাদ্যের জন্য, স্বাধীনতার দুই দশক পরেও, পরমুখাপেক্ষী হতে হচ্ছে, উচ্ছেদ করা যাচ্ছে না দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির কারণ। খেদের বিষয় যে আজও গণতন্ত্রের বিকাশ পুরোপুরি সম্ভব হয়নি।

ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় যে, প্রায়ই মানুষের মনে পুঞ্জীভূত তীব্র অসন্তোষের অভিব্যক্তি ঘটে থাকে নানা প্রকারের সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপে। এ দেশে তার ব্যতিক্রম ঘটবে এই আশা নিয়ে আমরা দিনের পর দিন দেখছি, সমাজবিরোধী কার্যকলাপ কীভাবে বেড়ে চলেছে যে সমাজে একদল লোক চিরকালই সুবিধা পেয়ে থাকে এবং আরেকদল সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়—সেখানে কোন দিনই সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা যায় না। অথচ আমাদের দেশে তা হওয়া উচিত নয়।

কারণ এই দেশ গণতন্ত্রের আদর্শ ও কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র ব্যবস্থার নীতি গ্রহণ করেছে। এখন করণীয় কী? পরিকল্পনার সাহায্যে সমাজের প্রতিটি মানুষকে অভাব অনটনের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। মাথা পিছু আয় বাড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু মাথা পিছু আয় বাড়ালেই যে সমাজের প্রতিটি মানুষের অভাব দূর হবে, জীবন যাত্রার মান উন্নত হবে—এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। যেমন, দেশের লোকের মাথাপিছু আয় বেড়ে গেলেও বৈষম্যমূলক বন্টন ব্যবস্থার ফলে এবং মূল্যমানের উর্ধগতি অনিয়ন্ত্রিত থাকলে বর্ধিত আয়ের বেশীটা ধনীদের হাতে চলে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে ধনী ও দরিদ্রের মধ্য ব্যবধান আরও বেড়ে যাবে, ফলে দরিদ্র শ্রেণীর অভাব অনটনের মাত্রা বেড়ে যাবে। জাতীয় উন্নয়ন, জাতীয় উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির পরিসংখ্যান প্রকৃত 'জাতীয়' বৈষয়িক অবস্থার পঞ্জী নয়। পরিসংখ্যানের ঘূর্ণীতে প্রকৃত অবস্থা দৃষ্টি গোচর হয় না। যেমন, উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও বর্ধিত উৎপন্ন দ্রব্যাদি সাধারণ লোকের ভোগে নাও লাগতে পারে। আবার যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম বৃদ্ধির দরুণ যদি জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় তবে মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি পেলেও সাধারণ লোকের জীবন যাত্রার মানে কোন উন্নতি ঘটে না। আবার মাথা পিছু আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তবে অভাবগ্রস্ত লোকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। গড়পড়তা হিসেবে, গড়পড়তা অংশ কী 'হওয়া উচিত' তার নির্দেশ দেয় মাত্র।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে মাথাপিছু আয়বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে দেশের লোকের জীবন যাত্রার মান উন্নত হচ্ছে কিনা, বেকার সমস্যার সমাধান হচ্ছে কিনা, কার্যের সর্তাবলী উন্নততর হচ্ছে কিনা ইত্যাদিও দেখা প্রয়োজন। অর্থাৎ দেশে ছোট বড়, প্রতিক্ষেত্রে, প্রতি স্তরে, পরিকল্পনা কতটা কার্যকর হচ্ছে তার সুসমঞ্জস মূল্যায়ণ প্রয়োজন। যখন দেশের অধিকাংশ লোকেরই সাধারণ জীবনের উপকরণটুকু পর্যন্ত করতলগত হয়নি,—অগণিত শিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত নাগরিকের ওপর বেকারীর অভিশাপ চেপে আছে সর্বত্র অনড় জগদ্দলের মতন, তখন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এমনই হওয়া উচিত যাতে সমাজের সঠিক উন্নতি লাভ হয়।

এ অবস্থায় দূরলক্ষ্যস্থায়ী পরিকল্পনাগুলিতে অধিক উৎসাহ না দিয়ে আশু প্রয়োজনের উপযুক্ত কাজে গুরুত্ব দিতে হবে। এমনই ভোগ্যপণ্য উৎপন্ন করতে হবে যা সমাজের অধিকাংশ লোকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে পড়ে। কিংবা বিলাস পণ্যের উৎপাদন যদি বাড়াতেই হয় তার উপরে নির্দিষ্ট শুল্ক ধার্য ক'রে দিতে হবে। এর সঙ্গে বৃহদায়তন শিল্প পরিকল্পনার দিকে অবশ্যই দৃষ্টি দিতে হবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পকে উৎসাহিত ক'রে এবং কুটির শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে সমগ্র অর্থনীতিকে সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। হতাশজ্জর্র দরিদ্র জনসাধারণ যেন বিশ্বাস করতে পারেন যে তাঁরাও দেশের এই বৃহৎ বৃহৎ যোজনাগুলির ফলভোগী, তাঁরাও এই বিরাট কর্মযজ্ঞের অংশীদার। এর ফলে তাঁদের জীবন যাত্রা সুন্দর হবে, সার্থক হবে ও অর্থবহ হবে। শুভকামী রাষ্ট্রের সমস্ত অভিব্যক্তি তাঁদের জীবনকে আধার করে পরিপূর্ণতা লাভ করবে। এই পরিপূর্ণতার আস্বাদ সর্বাধিক অনুন্নত স্তরের নাগালেও পৌঁছুবে।

এ কথা পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয় না, যে, পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কোন বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর উন্নয়ন নয়, নয় তা কোন বিশেষ শ্রেণীর সৃজন পোষণ ও আত্মাধিকারের কিংবা ব্যক্তিগত উন্নতির সোপান, পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো গোটা দেশ ও সমাজেরই সার্বিক উন্নয়ন।

রজ্জু শিল্পের রপ্তানী সম্ভাবনা

১৫ পৃষ্ঠার পর

ক্ষেত্রে নিযুক্ত। তবে উভয় শিল্পই সমস্যা মুক্ত নয়। বৃহত্তর শিল্পের ক্ষেত্রে রয়েছে প্রযুক্তি বিদ্যার দ্রুত আধুনিকীকরণ জনিত সমস্যা। কাঁচামালের দিক থেকে ভারত যেহেতু প্রকৃতির করুণাধন্য সেই হেতু এ যাবৎ বিশ্বের বাজারে তার প্রতিষ্ঠা ছিল একচেটে। সম্প্রতি ভারতবর্ষ তার সম্মান হারিয়েছে। ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে অতি আধুনিক 'ভার্টিকাল টাইপ' মেশিন স্থাপিত হয়েছে এবং আফ্রিকা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ছোবড়া প্রভৃতি জৈব আঁশ আমদানী করে দড়ি তৈরি করা হচ্ছে। সুতরাং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ স্বভাবতঃই তার প্রাচীনতর প্রয়োগ পদ্ধতির বলি হয়েছে। অন্যদিকে ক্ষুদ্র এবং গ্রামীণ শিল্পে পুরোপুরি যন্ত্রের প্রয়োগ নীতিগত দিক থেকে, পরিহার করা হয়েছে।

আধুনিকীকরণের সমর্থনে

অতএব এই শিল্পের আধুনিকীকরণই বোধ হয় সর্বাগ্রে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। রপ্তানী বাড়াতে হলে দর কমাতে হবে, সেই সঙ্গে মান বাড়াতে হবে। যন্ত্র নির্ভর শিল্প ছাড়া এই দুটি চাহিদা পুরণ করা সম্ভবপর হবে না। সুতরাং দ্রুত আধুনিকীকরণ, সমস্যা সমাধানের একটি দিক। এ ছাড়া সমগ্র দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই শিল্পকে বিচার করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এক একটি এলাকার শিল্পের জন্য সীমিতভাবে এক এক ব্যবস্থা শিল্পের সমস্যা সমাধানে কোন সাহায্য করতে পারবে বলে মনে হয় না। বৃহত্তর শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন লাইসেন্স মঞ্জুর করার আগে কার্য নিরত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে তাদের পূর্ণক্ষমতা কাজে লাগাতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। ভারতবর্ষের দড়ি এক সময় ইউরোপের প্রায় প্রতিটি বাজারেই আদরণীয় ছিল। পরবর্তীকালে শুধু মাত্র এশিয়ার বাজারেই এই চাহিদা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে—বর্তমানে সে বাজারও আমরা হারাতে এসেছি। সুতরাং রপ্তানী বাড়াবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী খুবই ন্যায়সঙ্গত।

অগ্রগতির পথে সৌদি আরব

ভিনসেণ্ট শিয়ান

আয়তনের দিক থেকে সৌদি আরব একটা বিরাট দেশ, অর্থাৎ স্পেন ও পর্তুগাল বাদ দিয়ে সমগ্র ইউরোপের সমান। কিন্তু এর বেশীর ভাগই হ'ল বালি শুধু বালি। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে পারশ্য উপসাগর ও লোহিত সাগরের উপকূল বরাবর শুষ্ক এবং প্রায় শুষ্ক মরুভুমির মধ্যেও কিছুটা উর্বর স্থান আছে। এইসব মরুভূমির মধ্যে অবশ্য মরুদ্যানও রয়েছে। যেখানে জল পাওয়ার কথা ভাবা যায়না সেখানেও কুয়ো খুঁড়লে অনেকসময় জল পাওয়া যায়। পুরোপুরি বালির দেশে এগুলি অবশ্য আশার চিহ্ন। যুগ যুগ ধ'রে এই দেশটির বেশীর ভাগ জায়গা সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে পুড়ছে আর মরুভূমির আয়তন বাড়ছে।

সৌদি আরবের দক্ষিণ পশ্চিমভাগে এখন জিজান বাঁধ তৈরির কাজ চলেছে। এই বাঁধের কাছাকাছি অঞ্চলে একটি কৃষি পরীক্ষা কেন্দ্র এবং আদর্শ আবাদও গড়ে তোলা হবে। আরবদেশের মধ্যে এটাই হবে সর্বর্বৃহৎ বাঁধ এবং সম্ভবত: ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাঁধটি থেকে জলসেচ দেওয়া সুরু হবে।

এখানে কোন ছোট পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে যদি দক্ষিণ আরবের এই অঞ্চলটির দিকে তাকানো যায় তাহলে চারিদিকে দিগন্তব্যাপি মরুভূমির মধ্যে অবশ্য দুটো চারটে শুকনো নদীর খাত দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তখনই মনে সন্দেহ জাগে যে, বৃষ্টির মরসুমে এই খাতগুলিতে যেটুকু জল জ'মে কয়েকদিনের মধ্যেই শুকিয়ে যায় তাতে বাঁধে যথেষ্ট জল পাওয়া যাবে কি ? এই জিজান অঞ্চলের আগ্নেয়গিরি এলাকার পোড়া পাথরের একটা পাহাড়ের ওপর দাঁড়ালে জিজান নদীর খাত দেখতে পাওয়া যায়। খুব ভালো করে দেখলে দেখতে পাওয়া যায় যে অত্যন্ত সরু একটা জলের ধারা যেন পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে যাচ্ছে। কাছাকাছি আরও ৪টে নদীর খাতও এখান থেকে দেখতে পাওয়া যায় এবং স্থানীয় ইঞ্জিনীয়ারদের মতে এগুলিতে নাকি মধ্যে মধ্যে জল দেখা যায়। বালি আর আগ্নেয়গিরির এই রাজ্যের বেশীরভাগই মরুভূমি এবং শীতকালে কোথাও কোথাও খানিকটা কাঁটা ঘাস হয়। তখন যাযাবর আরবরা এখানে এসে তাঁবু ফেলে আর তাদের উট, ভেড়া এই কাঁটা ঘাস খেয়েই আবার পুষ্ট হয়ে ওঠে। বাঁধটির কাছাকাছি চতুর্দ্দিকের অবস্থা হ'ল এই। নীচে লোহিত সাগরের দিকে বালি ছাড়া আর কিছু নেই। এখানকার বালিতে আবার লবণ মেশানো, ফলে ঘাস, গাছপালা কিছুই জন্মায়না, সবুজের কোন চিহ্নই নেই। ভেড়া বা ছাগল এক টুকরো ঘাসও খুঁজে পাবেনা।

জিজান নদীর ক্ষণ জাগরণ

এই বালির রাজ্যেও জুলাই আগষ্ট মাসে বর্ষার সময় ইয়েমেনের পার্ব্বত্য এলাকার উৎস থেকে জিজান নদীটি বিপুল বেগে লোহিত সাগরের দিকে নেমে আসে, কিন্তু প্রায় কোন সময়েই লোহিত সাগর পর্য্যন্ত পৌঁছুতে পারেনা। আসার পথে পাহাড় পর্ব্বতের গুহা গহ্বর জলে ভরে দেয়, কিন্তু একদিন অর্থাৎ বারো ঘন্টার বেশী সেই জল থাকেনা। বর্ষার সেই জলস্রোত সীমাহীন বালির মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলে। তখন কিছু কিছু জায়গা অল্প সময়ের জন্য অর্দ্ধশুষ্ক থাকে তারপরেই, আবার ধূ ধূ বালি। চতুর্দ্দিকের বালি যেন হা করে জলটুকু শুষে নিতে থাকে, ফলে নোনাবালি পেরিয়ে জলের ধারাগুলির সমুদ্র পর্য্যন্ত পৌঁছুবার শক্তি থাকেনা। কাজেই আগষ্ট মাসের বন্যা যদিও প্রায়ই বেশ জোরালো বলে মনে হয় তবুও তা সমুদ্র পর্য্যন্ত গিয়ে তার যাত্রা সম্পূর্ণ করতে পারেনা। এখন এই নদীতে বাঁধ দিয়ে বালির হাত থেকে জলকে রক্ষা করাই হবে এই যুগের ইঞ্জিনীয়ারদের কাজ।

যে বাঁধটির কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হতে চলেছে তা তেমন বিরাট কিছু নয়। তবে এই বাঁধে ৭ কোটি ১০ লক্ষ কিউবিক মীটারের মত জল ধরে রাখা যাবে এবং তা থেকে স্থায়ীভাবে সেচের জল সরবরাহ করা যাবে। এই বাঁধে যে জল থাকবে এতো জল বোধ হয় আরব দেশের কোথাও, গত হাজার হাজার বছরের মধ্যে কেউ দেখেনি।

আরব দেশ জেগে উঠছে

আস্তে আস্তে, এখানে সেখানে একটু একটু করে যেন আরব দেশের ঘুম ভাঙ্গছে। যেন দূর থেকে বয়ে আসা একটা হাওয়ায় বহুদিনের এই সুপ্তি ভাঙ্গছে, কারুর ডাকে বা নির্দ্দেশে নয়। বর্ত্তমানে তার বহু লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামের স্কুলগুলিতে সমস্ত ছেলে ও বেশীর ভাগ মেয়ে অবৈতনিক শিক্ষালাভ করছে। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোটা একটা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার এবং আরব দেশের পক্ষে তো এটা একটা বৈপ্লবিক ঘটনা। কয়েক বছর পূর্ব্বেও আরবের ছোট ছোট সহরগুলিতে বা গ্রামে সরকারের পক্ষ থেকে মেয়েদের জন্য প্রাথমিক স্কুল খোলাটা পাগলামী বলে মনে করা হতো। প্রাচীনপন্থী কিছু আরবীয়ের কাছে এটা এখনও পাগলামী বলেই মনে হয়। আসল কথা হ'ল রাজা ফয়জল আট বছর পূর্ব্বে যখন পুরোপুরি সার্ব্বভৌমত্ব ছাড়াও পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ ক'রে প্রতি বছর ১০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলার নির্দ্দেশ দেন—সেই নির্দ্দেশ মানা হয় এবং ক্রমেই স্কুলের সংখ্যা বাড়ছে। অন্যান্য আরবী ভাষাভাষী দেশ থেকে এবং আরব থেকেই শিক্ষক সংগ্রহ করার সমস্যা ইত্যাদি নানা অসুবিধে স্বত্বেও শিক্ষাপ্রসার কর্ম্মসূচী এগিয়ে চলেছে।

নানা ধরণের যোগাযোগ ব্যবস্থা আর একটি আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার। এমন কি ১৯৬০ সাল থেকে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে পরিবর্ত্তন এসেছে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তা হয়েছে কিনা সন্দেহ। ১৯৬০ সালে কায়রো থেকে একজন আমেরিকান পাইলট মালবাহী ডগলাস বিমান নিয়ে এখানে যাতায়াত করতেন এবং যাত্রীদেরও তাতেই আসতে হ'ত। তাঁকে যে সব

নির্দ্দেশ দেওয়া হত তা তিনি বুঝতেন কিনা সন্দেহ। যাত্রীরাও তেমনি বিমান ভ্রমণ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিলেন এবং যে বিমানে তারা যাওয়া আসা করতেন সেটির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান ছিলনা। এখন সৌদী এয়ারলাইনের বড় বড় বোয়িং বিমানগুলি, বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম বিমানগুলির সমকক্ষ, নিরাপত্তা ও সময়ানুবর্ত্তিতা সম্পর্কে যে কোন এয়ারলাইনের সঙ্গে তুলনীয়। প্রতি বছর, বিশেষ করে, হজের মরসুমে এদের কাজ আরও বেড়ে যায়।

জেদ্দা, মক্কা এবং মদিনার আশেপাশে ছাড়া অন্যত্র, ১৯৬০ সাল পর্য্যন্তও ভালো রাস্তাঘাট ছিলনা। এখন সর্ব্বত্রই ভালো ভালো রাস্তা হয়ে গেছে। বর্ত্তমানে আরবের প্রায় সর্ব্বত্রই বিমান যোগে যাতায়াত করা যায়, এবং অনেক আরব বর্ত্তমানে উটের পরিবর্ত্তে বিমানেই যাতায়াত করেন। দেশের প্রধান প্রধান জায়গাগুলির সঙ্গে মোটর বাসেরও যোগাযোগ রয়েছে। হাসপাতালের সংখ্যা ও সাজ সরঞ্জাম বেড়েছে, প্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্যের সব জায়গা থেকেই চিকিৎসক এসেছেন। নার্স সংগ্রহ করা নিয়েও একটা সমস্যা ছিল তবে সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী যতটা সম্ভব ততটাই মেটানো হচ্ছে। হজের সময় মক্কায় যখন বিশ্বের চতুর্দ্দিক থেকে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয় তখন চিকিৎসা ইত্যাদির সুযোগ সুবিধে বাড়ানো হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে ও সাহায্যে বিশ্বের নানাপ্রান্তের চিকিৎসকরা তখন এখানে কাজ করেন। বিশ্বের নানা স্থান থেকে তখন এখানে এতো তীর্থযাত্রীর সমাগম হলেও সাধারণত: সংক্রামক আকারে কোন রোগ দেখা দেয়না। ১৯২৪ সালে যখন থেকে লোহিত সাগরের উপকূলভাগ সৌদি পরিবারের অধীনে আসে এবং ১৯৩২ সাল থেকে এই অঞ্চলটিকে সৌদি সাম্রাজ্য বলে ঘোষণা করার পর থেকে, হজের সময়ে এখানে চুরি, ডাকাতি, রোগ ও মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কমে গেছে এবং বর্ত্তমানে হজযাত্রা অনেক নিরাপদ হয়েছে। রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, রোগের আক্রমণ কম। তবে এই সময়টুকুকে অবশ্য আরব দেশের ইতিহাসের অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত বলা যায়।

বিপুল অর্থ

সকলেই জানেন যে বর্ত্তমান শতকের ত্রিশ দশকে সৌদি আরবে বিপুল পরিমাণ পেট্রোলের সন্ধান পাওয়া যায়। যুদ্ধের জন্য ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত পেট্রোল তোলার কাজ বন্ধ থাকে কিন্তু ১৯৫০ সাল থেকে এর কাজ পূর্ণগতিতে চলতে থাকে। তারপর থেকে তেল থেকে প্রাপ্য করের মাত্রা বেড়েছে বৈ কমেনি। তাছাড়া সৌদি আরবের প্রকৃতপক্ষে অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ আয়ের উৎস নেই। গুরুত্বপূর্ণ করের মধ্যে হল আমদানি, রপ্তানী শুল্ক এবং দরিদ্রের সাহায্যের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির ওপর দেয় কোরাণসম্মত শতকরা ২॥ ভাগ কর। এখানে কোন আয়কর নেই। লাভ কর, সম্পদ কর নেই। বর্ত্তমান বছরে তেল থেকে প্রাপ্য করের পরিমাণ দাঁড়াবে ১০০ কোটি ডলার এবং মোট বার্ষিক বাজেটের পরিমাণ দাঁড়াবে ১২০ কোটি ডলার। এই আয় থেকে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ব্যয় প্রতি বছরেই বাড়ছে। ১৯৬৪ সালে ফয়জল যখন রাজা হন সেই সময়ের তুলনায় বর্ত্তমানে উন্নয়নমূলক ব্যয়ের পরিমাণ আটগুণ বেড়েছে।

কোন পরিসংখ্যান নেই

আরব দেশের মোট লোকসংখ্যা সম্পর্কে সঠিক হিসেব পাওয়া কঠিন। তবে সৌদি আরবে মোটামুটি ৪৫ লক্ষ লোকের বাস বলে ধরে নেওয়া যায়। এর এক পঞ্চমাংশ অর্থাৎ শতকরা ২০ ভাগই হ'ল যাযাবর। এই যাযাবরদের স্থায়ীভাবে বসবাস করানোর জন্য সব রকমভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে যারা যুগ যুগ ধরে যাযাবর জীবন যাপন করে আসছে তাদের স্থায়ীভাবে বসবাস করানো বেশ কঠিন। পরলোকগত রাজা আবদুল আজিজ যখন মরুভূমির মধ্যে বেদুইনের মতো থাকতেন তখনই তিনি সবচাইতে আনন্দ পেতেন। তবে এখনও অনেকে অর্দ্ধ যাযাবরের জীবনই ভালোবাসেন। বছরের মধ্যে কয়েকমাস হয়তো কোন গ্রামে বা গ্রামের কাছাকাছি বাস করেন বাকি কয়েকমাসের জন্য আবার তাঁবু আর উট ভেড়া নিয়ে মরুভূমিতে চলে যান।

প্রকৃতি এবং ভাগ্য যেন যোগসাজসে আরবদের সাহায্য করেছে। আরবে যখন তেলের সন্ধান পাওয়া গেল প্রায় তখনই রাজা আবদুল আজিজের নেতৃত্বে আরবদেশের দক্ষিণাংশের বেশীরভাগ ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল। সৌদি বংশ লোহিত সাগরের উপকূলের দিকে আসার আগে পূর্ব্ব ও মধ্যভাগে প্রসিদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। পাশ্চাত্যে ইবন সৌদ নামে পরিচিত আবদুল আজিজ নিজে এক ধরণের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের অধিকারী ছিলেন। দেশের সম্পদ যখন হাতছানি দিচ্ছিল ঠিক সেই সময়েই তিনি, হজরত মোহাম্মদের পর প্রথম, দেশকে ঐক্যবদ্ধ করলেন। রাজনৈতিক স্থায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে আইন ও শৃঙ্খলার উন্নতি হ'ল, যাযাবর উপজাতিগুলি স্থায়ী বসবাস গড়ে তুললো এবং যুবকসম্প্রদায় বিশ্বের অন্যান্য অংশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হলেন।

সমস্ত অসুবিধে স্বত্বেও সৌদি আরব এগিয়ে চলেছে। হাজার হাজার যুবক বিদেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ ক'রে নিজের দেশে ফিরে এসে নানা কাজের ভার নিচ্ছেন। কাজেই একদিন এই আরব দেশও বিশ্বের দরবারে নিজেদের স্থান করে নেবে। অবিলম্বে না হলেও শিগ্গিরই হয়তো সেই দিন এসে যাবে।

★ ভারতের সঞ্চিত সোনা ও বৈদেশিক-মুদ্রার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৪৫.২১ কোটী টাকা অর্থাৎ এযাবৎকালের মধ্যে সর্ব্বোচ্চমাত্রায় দাঁড়িয়েছে।

★ স্টেট্ ট্রেডিং কর্পোরেশন ১০ কোটী টাকা মূল্যের ৩,০০০ থেকে ৪,০০০ রেলের ওয়্যাগণ সরবরাহের জন্য পূর্ব্বজার্ম্মানী থেকে বরাত পেয়েছে।

★ পাঞ্জাবে শিল্প সমবায়িকার সংখ্যা ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে ৩,৭৩১ থেকে ৩,১৯৩-এ দাঁড়িয়েছে।

জানবার কথা ঃ—

ত্রিপুরায় মধ্যস্বত্বভোগী-শ্রেণার বিলোপ ঘটেছে। সরকারের সঙ্গে প্রজা ও রায়ৎদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। মোট জমির মোটামুটি অৰ্দ্ধেক খাসজমি হিসেবে রেখে বাকী জমিতে প্রজাস্বত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ক'রে ব্যাপক বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। বৰ্ত্তমানে যার কাছে যেসব জমি আছে তা, কিংবা ভবিষ্যতের জন্যেও জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হয়েছে।

মণিপুরে মধ্যস্বত্বভোগী নামে কোনোও শ্রেণী নেই। মোট জমির অৰ্দ্ধেক খাস জমি হিসেবে রাখবার অধিকার দিয়ে অবশিষ্ট জমিতে প্রজাস্বত্ব অধিকার রক্ষা ক'রে ব্যাপক বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে প্রজার হাতে ন্যূনতম পরিমাণ জমি থাকবেই এবং সেই জমি থেকে প্রজাকে উচ্ছেদ করা চলবে না। ভূ-সম্পত্তির সর্বোচ্চ পরিমাণ সম্বন্ধে অবশ্য আইনে কোনোও সংস্থান নেই।

ধনধান্যে-তে কেবল অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। প্রবন্ধাদি অনধিক পনের শত শব্দের হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট ও গোটা গোটা অক্ষরে লিখলে ভালো।

গ্রামে ব্যাঙ্কের ভূমিকা

১৩ পৃষ্ঠার পর

প্রত্যেক জমাকারীর নামে একটা করে এ্যাকাউন্ট কার্ড খোলা হয়েছে। সেই কার্ডের ওপর সংশ্লিষ্ট জমাকারীর ছবি (ব্যাঙ্কের খরচে তোলা) আটকে দেওয়া হয়েছে এবং ঐ ছবির নীচে তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ নেওয়া হয়েছে। জমাকারীরা ন' মাসে ছ' মাসে টাকা তোলেন। যখন টাকা তুলতে আসেন তখন ক্যাশিয়ার ছবির সঙ্গে মানুষটিকে মিলিয়ে নেন।

যাঁরা ব্যাঙ্কের পল্লী শাখায় কাজ করতে যান, তাঁদের নানা রকম অসুবিধা ভোগ করতে হয়। শহরে জীবনের মনবিনোদনের উপকরণ এখানে থাকে না। শহরের সমাজ নেই যে, কথা কয়ে আরাম হবে, নেই সিনেমা থিয়েটারের হাতছানি। কিন্তু তার চেয়েও বড় সমস্যা হ'ল গ্রামের সকলেই চাষবাস করে, অতএব চাকর নেই, নিজের হাতে সব ক'রে নিতে হয়। যেমন কিলারায়পুরের ব্রাঞ্চ এজেন্ট ভগবান সিং। নানা অসুবিধার জন্য স্ত্রীও ছেলেমেয়ে তিনটিকে লুধিয়ানায় রাখতে হয়েছে।

কিন্তু ঐসব সত্বেও মনে হ'ল ভারত এগোচ্ছে। এক সময়ে কোনোও মন্দিরের জন্য কোনো গ্রাম খ্যাতি ও বৈশিষ্ট্য অৰ্জন করত। তারপর এলো স্কুল, ডাকঘর ও রেলপথের যুগ সে যুগও গতপ্রায়। এখন ব্যাঙ্কের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের গুরুত্ব অন্যরকমে বাড়ছে। এখন বড় গ্রাম বলতে বোঝাবে যে গ্রামে ব্যাঙ্ক আছে।

গভীর নলকূপের দ্বারা উপকৃত জমির পরিমাণ

কার্যকরী নলকূপগুলির সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গে মোট ২,১৮,৮০০ একর জমি সেচের আওতায় এসেছে। এ রাজ্যে এযাবৎ মোট ১,৫৪৩টি গভীর নলকূপ খনন করা হয়েছে। তার মধ্যে চালু হয়েও অকেজো অবস্থায় রয়েছে ১০টি। অকেজো হওয়ার কারণ নলকূপ থেকে জলের সঙ্গে প্রচুর নুড়ি ও বালি বেরুবার ফলে এবং যান্ত্রিক গোলযোগের দরুন এগুলি অকেজো হয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত পাম্পগুলি গ্রেভেল ট্রিটমেন্ট দ্বারা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হচ্ছে—যান্ত্রিক গোলযোগও দূর করার চেষ্টা চলছে।

বর্ষায় বাড়ন্ত তুলোর ক্ষেত

বর্ষার আগে আবহাওয়া শুকনো থাকতে থাকতে তুলোর বীজ বুনলে, তার ফলন ঢের ভাল হয়। মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে পেঁৗছনো গিয়েছে।

তুলোর চাষীরা সাধারণতঃ বর্ষার মুখে তুলোর বীজ বুনতেন। ফলে কোনোও বছরে বর্ষা দেরীতে নামলে, তুলোর চাষও সুরু করতেন দেরীতে। কিন্তু নতুন পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, বর্ষার সুরুতে রোয়া কিংবা মরসুমের যথাসময়ে বীজ না বুনে দেরীতে বোনার ফলে তুলোর ফলন মোটেও ভাল হয় না।

বর্ষা নামবার বেশ আগে হাওয়া শুকনো থাকতে থাকতে বীজ বুনলে অনেক ভাল ও বেশী ফলন হয়।

জেলা পর্যায়ে কর্ম্মচারী

৮ পৃষ্ঠার পর

যে কর্ম্মচারীকে যে কাজের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে তাকে দিয়ে অন্য কাজ করানোর দৃষ্টান্তও রয়েছে।

নির্দ্ধারিত কাজ এবং প্রকৃত কাজের মধ্যে এই পার্থক্যের কারণ হ'ল কারিগরী কর্ম্মচারীদের ওপর ন্যস্ত বিশেষ কাজের দায়িত্ব পালিত হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করার এবং উচ্চতর কর্ম্মচারীদের তা পরিদর্শন করার ব্যবস্থা ছিলনা।

সাধারণ অসাধারণ

ধানের নতুন বীজ

নজর থাকলে এবং খেয়াল ক'রে কোনোও কাজ করার চেষ্টা করলে কখনও কখনও অপ্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায়। কেরালার আলাভাড় ব্লকের শ্রী এ্যান্টনী মানবালান হচ্ছেন একজন তরুণ চাষী, বয়স মাত্র ২৪। ১৯৬৬ সালে যখন প্রচুর ফলনের তাইনান্ ৩-এর চাষ প্রবর্ত্তন করা হ'ল মানবালানও ঐ বীজ বুনলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন ফসলের পরিমাণ যতটা বাড়ানো সম্ভব বাড়াবই। তিনি তাঁর সাড়ে চার একর ধানী জমির আধ একর জমিতে তাইনান ৩-এর চাষ করলেন। মানবালানের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এড়াল না, যে, সারা জমিতে গোটা ২৫ ধানের চারা অন্য চারার থেকে একটু পৃথক। চারাগুলি বড় হ'লে তিনি নজর করলেন, ঐ ২৫টি গাছ অন্যগুলির তুলনায় খাটো কিন্তু এগুলিতে বীজের সংখ্যা অনেক বেশী। তাছাড়া ঐ বীজগুলি অন্য বীজের তুলনায় ১৫ দিন আগে পাকল। মানবালান্ ঐ ২৫টি গাছের ধান আলাদা ক'রে রাখলেন বীজধান হিসেবে। ধানের পরিমাণ হ'ল আধ কিলোগ্রাম। এবারে তিনি আড়াই একরের একটা জমিতে ঐ ধানগুলি বুনে বীজধানের পরিমাণ বাড়াতে মনস্থ করলেন। এইভাবে পরপর তিনবার বুনে '৬৮ সালে তিনি একরে মোট ধান পেলেন ২,০০০ কিলোগ্রাম। পরীক্ষা-নিরীক্ষার এই সময়টুকুতে তিনি কড়া নজর রাখলেন চারাগুলির প্রকৃতি ও গুণাগুণ নিরীক্ষণের দিকে।

শ্রীমানবালানের মতে এই নতুন বীজের (এখনও নামকরণ হয়নি) কতকগুলি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন—

১। ফসল আনুপাতিক হিসেবে কম দিনে পাকে।

২। সার কম লাগে।

৩। সমস্ত বীজ একসঙ্গে পাকে।

৪। ঝাড়াই ও মাড়াই করতে সুবিধা হয়।

৫। সব রকম মাটীতে ফলে এবং বছরের তিনটি মরসুমেই এর চাষ করা যায়।

শ্রীমানবালান এই বীজ ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করার জন্যে জোর সুপারিশ করেছেন। তিনি দাবী করেন তাঁর আবিষ্কৃত এই বীজ আই-আর-৮ ও কালচার-২৮কে'ও হারিয়ে দিয়েছে। কেরালায় তো ঐ দুটি বীজ তাইনান্-৩-এর জায়গা সম্পূর্ণ দখল ক'রে নিয়েছে। এখন অন্য দুটির জায়গাও গেল। এই নতুন ধানের গাছে পোকাও ধরে কম। পোকা ধরলেও কিন্তু কীটনাশক দিয়ে সহজেই তা' নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এই নতুন বীজের আর একটা বৈশিষ্ট্য হল একই পরিমাণের আই-আর-৮ ও এই নতুন বীজের ওজন নিয়ে দেখা গেছে এই নতুন বীজের ওজন বেশী। তাছাড়া ধানের অন্য বীজের ক্ষেত্রে ধানের একটা শীষে যেখানে ৫০টি দানা থাকে, এই নতুন জাতের চারায় থাকে ৬০ থেকে ৭০।

শ্রীমানবালানকে দেখে অন্যান্য চাষীরাও এই বীজ সম্বন্ধে আগ্রহী হয়েছেন এবং এখন আশপাশের এলাকায় ১০ জন চাষীর ২০ একর জমিতে এই ধানের চাষ হচ্ছে।

ধারাবাহিক চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের পুরস্কার

ভারত-পাক-সীমান্তের গায়ে লাগোয়া, কাছাড় জেলার সুপ্রাকান্দি গ্রাম। সেই গ্রামের চাষীভাইরা ক্ষেতখামারের উৎপাদন বাড়াবার উদ্দেশ্যে নিয়মবদ্ধভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাবার জন্যে একটি খামার পরিচালন-কমিটি স্থাপন করেছেন। সেই হ'ল তাঁদের সমষ্টিগত প্রচেষ্টার সূত্রপাত। কমিটি তৈরী হয়েছিল ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে। ১০০ বিঘা জমিতে আই-আর-৮এর চাষ দিয়ে সেই সমবেত সহযোগিতার প্রথম পদক্ষেপ। গ্রামের চাষীভাইরা এক্সটেনশান্ অফিসারদের নির্দ্দেশে, পর্য্যাপ্ত পরিমাণ রাসায়নিক সার প্রয়োগ ক'রে একর প্রতি উৎপাদন ১২ মণ বাড়াতে পারলেন। অর্থাৎ আগে যেখানে একরে ১০ মণ ধান হত এখন সেখানে ৩২ মণ ধান হল। প্রথম অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁরা তারপর থেকে যে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন তা'র সার্থক ফলশ্রুতি হ'ল এ বছরের উৎপাদন—একরে প্রায় ৯৮ মণ। প্রথম বছরে তাঁরা দুটি ধান বুনেছিলেন, শালী আর আউশ। এবছরে কমিটি বোরো ধানের চাষ প্রবর্ত্তন করেছে।

ক্ষেতের পাশ দিয়ে যে লোঙ্গাই নদী বয়ে যাচ্ছে, তা'রই জলে সেচ দেওয়া হয় জমিতে। এর জন্যে কমিটি নিজেদের তত্ত্বাবধানে ৫ অশ্ব শক্তির একটি পাম্প চালু রেখেছে। এখন কমিটি একটা কুবুটা ট্রাক্টর ও একটা ঝাড়াই-এর যন্ত্র (থ্র্যাশার) কেনার জল্পনা কল্পনা করছে।

উপজাতীয়দের চেষ্টা ও কৃতিত্ব

আসামে, গৌহাটি জেলার উদলাগিরি উপজাতি উন্নয়ন ব্লকের চাষীদের, প্রচুর ফলনের বীজ গ্রহণ করতে রাজী করানোর পেছনে আছে স্থানীয় এক্সটেনশন অফিসারদের নিরলস চেষ্টা। এ বছরে তাই ঐ ব্লকের চাষীরা প্রথম আই আর-৮ বুনেছেন। ২,০৭০ বিঘা জমিতে ঐ বীজ বোনা হয়। চাষীভাইদের মধ্যে যাঁরা এই বীজের চাষে আগ্রহ দেখিয়ে এগিয়ে আসেন তাঁদের অন্যতম হ'লেন শ্রী মোহম্মদ মনিরুদ্দীন আহমেদ। তিনি তাঁর ৩০ বিঘা জমিতে আই আর-৮এর চাষ করেন। '৬৯ সালের আগষ্টে ধান কাটার পর দেখা গেল বিঘা প্রতি ১,০৭০ কিলোগ্রাম ধান হয়েছে। এই খবর ছড়িয়ে যাওয়ায় ঐ এলাকায় চাষীদের মধ্যে এমন উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে যে, সেখানে, চাষীরা সকলেই ঐ বীজ জোগাড় করতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন।

REGD. NO. D-233

উন্নয়ন বার্ত্তা

★ ভারতের সার কর্পোরেশনের গোরখপুর শাখা যুরিয়া উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে।

★ কৃষিপদ্ধতির উন্নয়ন ও কীটদমন সংক্রান্ত গবেষণায় সাহায্য করার জন্যে ভাবা রিসার্চ সেন্টারের আইসোটোপ্‌স্ ডিভিশানে সার উৎপাদন শুরু হয়েছে। সঙ্গে বিদেশে তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ্‌স্ রপ্তানী অব্যাহত আছে।

★ পাঞ্জাবের ভাটিণ্ডায় ৪২ কোটী টাকা ব্যয়ে ২২০ মেগাওয়াট শক্তিবিশিষ্ট যে তাপ-বিদ্যুৎ-কেন্দ্র বসানো হ'বে তা'র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

★ আলিয়াবেটের কাছে উপকূলবর্ত্তী স্থানে ড্রিলিং সংক্রান্ত কার্য্যসূচীর প্রথম পর্য্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। কাম্বে উপসাগরের উপকূলবর্ত্তী স্থানে ড্রিলিং-এর জন্য কিক্স্ প্ল্যাটফর্ম্মে-এর প্রথম ইস্পাতের বুরুটি ভবনগরের কাছে জলে ভাসানো হয়েছে। এটির ওজন হ'বে ৯০ টন।

★এ বছরের প্রথম ৯ মাসে ভারত থেকে ৬'১২ লক্ষ টন পেট্রোলিয়ামজাত সামগ্রী চালান দেওয়া হয়েছে। এই বাবদ যে বৈদেশিক-বিনিময়-মুদ্রা আয় হয়েছে তা দাঁড়াবে ৮.৪২ কোটী টাকার সমান। ১৯৬৮ সালে ৮.১৬ কোটী টাকার মাল (৫.৫৭ লক্ষ টন) রপ্তানী করা হয়েছে।

★ লৌহযুক্ত ও লৌহবর্জ্জিত ধাতু শিল্পের জন্যে কেন্দ্রীয় নক্সা কেন্দ্রের উন্নয়নে সহযোগীতা করা সম্পর্কে ভারত ও সোভিয়েট যুনিয়ন একটি চুক্তিতে সই করেছে।

★ মার্কিণ কৃষি-বিভাগের দুটি পৃথক অনুমোদনক্রমে ভারত ২.১ কোটি ডলার মূল্যের চার লক্ষ টন মার্কিণ গম কিনবে। এই গম ১৪ই নভেম্বর ১৯৬৯ থেকে ৩১শে মার্চ্চ ১৯৭০ সালের মধ্যে চালান দেওয়া হ'বে।

★ রাজস্থান সরকার চুরু জেলার গো-চারণ ভূমির উন্নয়নের জন্যে ১.২৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন।

★ ভারতসরকার কন্যাকুমারী জেলায়, সিংহল প্রত্যাগত ভারতীয়দের জন্য সংরক্ষিত রবার বাগিচার উন্নয়নের জন্যে তামিলনাড়ু সরকারকে ৩.৭ লক্ষ টাকার ওপর ঋণ দেবার প্রস্তাব মঞ্জুর করেছেন।

★ ভারতীয় খনিগুলির ক্ষেত্রে (প্রাকৃতিক গ্যাস ও প্রেসক্রাইব্‌ড্ সাবস্‌ট্যান্স্ তালিকায় ঘোষিত খনিজপদার্থ বাদ দিয়ে) ১৯৬৮ সালে জাতীয় আয়ের মাত্রা (বর্ত্তমান মূল্যমানের অনুপাতে) ছিল ৩৩০ কোটী টাকা। আগের বছরের তুলনায় আয়ের মাত্রা ছিল শতকরা ১২ ভাগ বেশী।

★ রাজস্থান খাল এলাকার নোনা জমি (খাল) পুনরুদ্ধার করার জন্যে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছিল তার ফলাফল উৎসাহজনক প্রতিপন্ন হয়েছে।

★ ব্যাঙ্গালোরের সরকারী সংস্থা ইণ্ডিয়ান্ টেলিফোন ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ১৯৬৬ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৬৮ সালের মার্চ্চ মাসের মধ্যে টেলি কমিউনিকেশানের (দূর সংযোগ ব্যবস্থা) যন্ত্র সরঞ্জামের রপ্তানীবৃদ্ধিতে সবিশেষ সাফল্য দেখিয়ে প্রশংসাপত্র অর্জ্জন করেছে।

এই সংস্থা শুধু উন্নতশীল দেশগুলিতেই নয়, যুক্তরাজ্য (U.K.), বেলজিয়াম ও ব্রাজিলের মত শিল্লোন্নত দেশেও ঐসব যন্ত্রপাতি রপ্তানী করেছে।

★ বিহারে, হাজারীবাগ জেলায় ভারতের সর্ব্ববৃহৎ তাপবিদ্যুৎ-প্রকল্প—'পত্রাতু তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটির ৫০ মেগাওয়াট শক্তি-বিশিষ্ট চতুর্থ যুনিটটি চালু হয়েছে।

★ গুজরাটে মেহসানার কাছাকাছি, গবাদি পশুর খাদ্য তৈরীর দ্বিতীয় কারখানাটি চালু হয়ে গেছে। সমবায়ক্ষেত্রে স্থাপিত এই কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা হ'ল ঘন্টায় ৫ টন।

★ নৌবাহিনীর জন্যে গার্ডেন রীচ কারখানায় তৈরী জলযান—আই-এন-এস্ "অতুল"—কলকাতায় জলে ভাসানো হয়েছে।

★ চলতি আর্থিক বছরের প্রথম ৬ মাসে রেলওয়ের মোট আয়, গত বছরের ঐ সময়ের তুলনায়, ২৭.৮২ কোটী টাকার মত বেশী হয়েছে।

★ ভিলাই ইস্পাত কারখানায় এবছরের অক্টোবর মাসে ১,৬২,৫০০ টন ইস্পাত তৈরী হয়েছে। ১৯৬৮ সালের উৎপাদন ছিল ১,৩০,৮০০ টন। ভিলাই থেকে বিক্রয়যোগ্য যে ইস্পাত চালান দেওয়া হয়েছে, অক্টোবর মাসে তা'র পরিমাণ হয়েছিল ১,১৬,৯৯৬ টন অর্থাৎ আগের মাসের তুলনায় ৫,৬০০ টন বেশী।

★ ১৯৬৮-৬৯ সালে ইণ্ডিয়ান এয়ার-লাইন্‌স্ মোট যে বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা আয় করেছে, তার পরিমাণ হয়েছে এক কোটী টাকা অর্থাৎ তার আগের বছরের তুলনায় শতকরা ১০ ভাগ বেশী।

★ এ বছরের এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে ভারত থেকে মশলা রপ্তানী ক'রে ১৩.৩ কোটী টাকার সমান বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা অর্জ্জন করা গিয়েছে। ১৯৬৮ সালের ঐ সময়ে বৈদেশিক মুদ্রার আয় ছিল ১২.৮ কোটী টাকা। এ বছরের অক্টোবর মাসেই শুধু ৩.৩৩ কোটী টাকার মশলা রপ্তানী হয়েছে।

★ ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাছ ও মাছ মেশানো অন্যান্য আহার্য্য রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ২,২০৯ টন (২.৭৫ কোটী টাকার)। গত বছরে, ঐ মাসে, ১.৩৫ কোটী টাকার ১,৬৩৯ টন মাছ প্রভৃতি রপ্তানী করা হয়।

ডিরেক্টার, পাবলিকেশন্‌স্ ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সোসাইটি লিঃ—করোলবাগ, দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রথম বর্ষঃ ১৬
৪ঠা জানুয়ারী ১৯৭০
২৫ পয়সা

ধনধান্যে

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

প্রথম বর্ষ ষষ্ঠদশ সংখ্যা

৪ঠা জানুয়ারী ১৯৭০ : ১৪ই পৌষ ১৮৯১

Vol. I : No 16 : January 4, 1970

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০

টেলিগ্রাফের ঠিকানা—যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা।

তুলি নাই

কোন গণতন্ত্রই, অভাব, দারিদ্র্য ও অসাম্যের মধ্যে বেশী দিন টিকে থাকতে পারে না।

—জওহরলাল নেহরু

সংখ্যায়

পর্যটন উন্নয়ন

মানুষের দূর ও দুর্গমকে জয় করার নেশা সুপ্রাচীন। অন্য-দেশের অধিবাসীদের জীবন যাপনের ধারা, সেই সব দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ ইত্যাদি জানবার জন্য অতীতে রাজা মহারাজারা নানা দেশে দূত পাঠাতেন। দূরের জিনিসকে জানার এই ইচ্ছা যুগ যুগ ধরে বেড়েছে বই কমেনি! এই ঔৎসুক্যই বর্ত্তমানে বিভিন্ন দেশে পর্য্যটকের যাতায়াতের পরিমাণ বাড়িয়েছে। ফলে বর্ত্তমানে পর্য্যটনটা কেবলমাত্র একটা সখ বা অভিযানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, এটা এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে পরিণত হয়েছে—আর শুধু তাইবা কেন একে প্রকৃতপক্ষে এখন বৃহত্তম আন্তর্জ্জাতিক শিল্প বলা যায়। অনুমান করা হয় যে, ১৯৬৭ সালে সারা বিশ্বে ১৫ কোটি লোক বিভিন্ন দেশ পর্য্যটন করেন এবং এই আন্তর্জ্জাতিক পর্য্যটনের ফলে আয়ের পরিমাণ হ'ল ১১০০০ কোটি টাকারও বেশী। আন্তর্জ্জাতিক পর্য্যটনে এই বিপুল উন্নতি হলেও তাতে আমাদের উল্লসিত হওয়ার বিশেষ কোন কারণ নেই। তার কারণ হ'ল এই পর্য্যটকদের মধ্যে যারা আমাদের দেশে বেড়াতে এসেছেন তাঁদের সংখ্যা দুই লক্ষেরও কম আর এতে আমাদের দেশের আয় হয়েছে মাত্র ২৫ কোটি টাকা।

প্রকৃতিদেবী তাঁর সমস্ত সম্পদ উজাড় করে দিয়ে আমাদের দেশকে সাজিয়েছেন আর আমরা হাজার হাজার বছরের প্রাচীন সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকারী। আমাদের দেশের দর্শণ ও বিজ্ঞান সমগ্র বিশ্বের চিন্তানায়কদের চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। এই দেশের ঐশ্বর্য্য সম্পদের খ্যাতি বহু অভিযানকারীকে এখানে আকর্ষণ করেছে, এখানকার বর্ণাঢ্য উৎসব ইত্যাদি বহু বিদেশী পর্য্যটককে মোহিত করেছে। ঐতিহাসিক সৌধ, মন্দির, সমাধি, ভাস্কর্য্য, যাদুঘরে সংরক্ষিত বিভিন্ন যুগের শিল্পকলার নিদর্শন ইত্যাদি পণ্ডিতদের যেমন চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে তেমনি সাধারণ দর্শককে আনন্দ দিয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র আমাদের এই দেশ বর্ত্তমান যুগে নানা উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে নিজেদের গড়ে তোলার যে কাজে ব্যাপৃত রয়েছে, সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আহরণ করার জন্য বহু বিদেশী এদেশে আসেন। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই পর্য্যটন এবং পর্য্যটকদের যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিতেই হবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৬৯ সালে আমাদের দেশে বিদেশ থেকে যত পর্য্যটক এসেছেন তাঁদের সংখ্যা পূর্ব্ব বছরের তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ বেশী। ১৯৬৮ সালে আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশগুলি থেকে প্রায় দুই লক্ষ পর্য্যটক আমাদের দেশে আসেন এবং ১৯৬৭ সালের তুলনায় ঐ বছরে, বৈদেশিক মুদ্রায় শতকরা ৬ ভাগ বেশী আয় হয়। ১৯৬৮ সালের আয় ছিল ২৬.৫৪ কোটি টাকা। সরকারীভাবে নানা রকম উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করায় আয় কিছুটা বাড়ে। পর্য্যটকরা সাধারণতঃ যে সব জায়গায় বেড়াতে যান সেখানে বর্ত্তমানে যে সব সুযোগ সুবিধা আছে সেগুলি আরও উন্নত করে, সংহত ভিত্তিতে নতুন পর্য্যটন কেন্দ্র যেমন কোবালম, গুলমার্গ, গোয়া ইত্যাদির সুযোগ-সুবিধে বাড়িয়ে, বিমান বন্দরগুলিতে আরও বেশী সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, মোটরপথে ভ্রমণ করার জন্য পরিবহন ইত্যাদির ব্যবস্থা ক'রে, এবং হোটেলে থাকবার সুযোগ-সুবিধে বাড়িয়ে পর্য্যটনকে অনেকখানি আরামপ্রদ করা হয়েছে। ১৯৭৩-৭৪ সাল পর্য্যন্ত বছরে যাতে অন্ততঃপক্ষে ৬ লক্ষ পর্য্যটক আমাদের দেশে আসেন তাই হল এর লক্ষ্য। তখন তাহলে ১০৯ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা আয় হবে। চতুর্থ খসড়া পরিকল্পনায় (১৯৬৯-৭৪) পর্য্যটকদের সুযোগ সুবিধের উন্নয়নের জন্য ৩৪ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব রয়েছে। এই টাকার মধ্যে ২৫ কোটি হ'ল কেন্দ্রীয় কর্ম্মসূচীগুলির জন্য এবং ৯ কোটি টাকা হল কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল ও রাজ্যগুলির জন্য। কেন্দ্রীয় কর্ম্মসূচীর জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তার মধ্যে ১৪ কোটি টাকা হ'ল কেন্দ্রীয় পর্য্যটক বিভাগের জন্য এবং ১১ কোটি টাকা ভারতীয় পর্য্যটন উন্নয়ন কর্পোরেশনের কর্ম্মসূচীগুলির জন্য। কর্পোরেশন বর্ত্তমানে কয়েকটি হোটেল তৈরি করছেন এবং পর্য্যটকদের থাকবার বাংলোগুলির পরিচালনাভার নিজেদের হাতে নিচ্ছেন।

পর্য্যটন উন্নয়ন কর্ম্মসূচীতে, আরণ্য জীবন এবং শিকারের সুযোগ-সুবিধে বাড়ানোরও প্রস্তাব রয়েছে। এই উদ্দেশ্যে পর্য্যটন বিভাগে অরণ্যের জীবজন্তু সম্পর্কে একটি বিশেষ শাখা খোলা হচ্ছে। প্রধান প্রধান স্থানগুলিতে যুব হস্টেল তৈরি করা হবে। পর্য্যটকদের সাহায্য করার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একদল কর্ম্মীও গড়ে তোলা হবে। নতুন হোটেল তৈরি করার জন্য হোটেল উন্নয়ন ঋণ তহবিল থেকে ১.৮৬ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। ঋণ দেওয়ার রীতি পদ্ধতিগুলিও সরল করা হচ্ছে। বিদেশী পর্য্যটকদের জন্য, পুলিশে নাম রেজেষ্ট্রী করানো, মুদ্রা, বিনিময় নিয়ন্ত্রণ, শুল্ক, মদ এবং অবতরণ অনুমতি ইত্যাদি সম্পর্কিত আইনকানুনগুলি শিথিল করা হয়েছে।

আন্তর্জ্জাতিক পর্য্যটন যেমন অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে আদান প্রদান ও সংযোগ বাড়ায় এবং মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন করা ছাড়াও পারস্পরিক শুভেচ্ছা বাড়ায়, দেশের আভ্যন্তরীন পর্য্যটনেরও তেমনি নিজস্ব একটা গুরুত্ব আছে। পর্য্যটন হ'ল জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার একটা সুন্দর ও সক্রিয় ব্যবস্থা। যাইহোক পর্য্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য যে সব কর্ম্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তাতে যুক্তিসঙ্গতভাবেই আশা করা যায় যে, ১৯৭৩-৭৪ সালের মধ্যে বিদেশী পর্য্যটকের সংখ্যা তিনগুণ বাড়ানো সম্ভব হবে।

নির্মীয়মান হলদিয়া বন্দর

প্রশ চন্দ্র ভৌমিক
বার্তা সম্পাদক, আকাশবাণী, কলিকাতা

মেদিনীপুর জেলার তমলুকে হুগলী আর হলদী নদীর সঙ্গম স্থলে গড়ে উঠছে আমাদের দেশের আরও একটি নূতন বন্দর -হলদিয়া। সেই নির্মীয়মান হলদিয়ার শিলান্যাস দেখতে দেখতে বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠল কলকাতা বন্দরের ছবি।

আজকের যুগে, প্রতিযোগিতার বাজারে যে বন্দর বড় বড় জাহাজ ভেড়াবার সবচেয়ে বেশী সুযোগ সুবিধা দিতে পারবে, যে বন্দরে পণ্য পরিবহন দ্রুততর এবং কম ব্যয় সাধ্য হবে—সেই সব বন্দরই টিকে থাকবে। বন্দরে লাখটনী জাহাজ ভেড়াবার আর যান্ত্রিক পদ্ধতিতে মাল খালাসের দাবী বিশ্বের বহু দেশই মেনে নিয়েছে। এই অবস্থায় বর্তমানে কলকাতার স্থান কোথায় সেটা পর্যালোচনা করা সমীচীন।

স্বাধীনতার সময় পর্যন্তও কলকাতা, ভারতের এমন কি বিশ্বের অন্যতম বিশিষ্ট বন্দর ছিল। কিন্তু ভাগীরথীর জলধারা অংশতঃ বয়ে যেতে লাগল পদ্মা দিয়ে ফলে হুগলীর নাব্যতা কমে গেল। সেই সঙ্গে আরও অনেক কার্য কারণের ফলে কলকাতা বন্দরের পুরানো খ্যাতি বিড়ম্বনায় পরিণত হয়। অথচ এটা ঠিক কলকাতা টিকে না থাকলে শুধু পশ্চিম বাংলাই নয় সমস্ত পূর্বভারতের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। এদিকে কলকাতা বন্দরে বানিজ্যের পরিমাণ কিন্তু উত্তরোত্তর বেড়েই চলছিল। তাই ভাগীরথীর পারেই কলকাতার জন্যে একটি গভীর জলের পরিপূরক বন্দরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। চলল অনেক সমীক্ষা নিরীক্ষা। তারপর স্থান নির্বাচন করা হ'ল—এই হলদিয়ায়।

হলদিয়া বন্দর প্রকল্প যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা কিন্তু শুধু বর্তমানের প্রয়োজন নয়, ভবিষ্যতের প্রয়োজনের কথাও মনে রেখে বন্দরের কাঠামো নির্মাণ করেছেন।

প্রথমেই ধরা যাক জাহাজের কথা। ইদানীং কালে কলকাতা বন্দরে সবচেয়ে বড় যে জাহাজটি এসেছিল—তার গভীরতা ছিল মাত্র ৮.৫ মিটার। তাও এটি এসেছিল বর্ষাকালে ভরা জোয়ারের জলে, নদীর জল যখন কানায় কানায় উপচে পড়ছে। এটি বন্দর ছেড়েও গিয়েছিল ঠিক ঐ রকমই একটি মুহূর্তে। হলদিয়া বন্দরে কিন্তু এখনও ১০.৩০ মিটার গভীর জাহাজ সারা বছরে যে কোন সময়ে আসা যাওয়া করতে পারে। তারপর ১৯৭৫-৭৬ সাল নাগাদ, ফরাক্কার কাজ শেষ হলে—ভাগীরথীর জল যখন আবার হুগলী দিয়ে সাগরের দিকে বয়ে আসবে এবং হলদিয়া বন্দর যখন পুরোপুরী চালু হয়ে যাবে তখন ১৩.৪১ মিটার গভীর জাহাজগুলিও বন্দরে আসতে পারবে অতি সহজেই। বন্দর কর্তৃপক্ষের একটি হিসেবে দেখলাম বছরের মধ্যে তিন মাস ১৩.৬১ মিটার গভীর জাহাজগুলি সহজেই এখানে চলাচল করতে পারবে। প্রায় ৭ মাস পর্যন্ত ১২.৮ মিটার গভীর জাহাজ অনায়াসে চলবে। আর সারা বছর ধরে ১২.১৮ মিটার গভীর জাহাজগুলি বন্দরে আনাগোনা করবে অনায়াসে। কলকাতার পরিপূরক বন্দর হিসেবে হলদিয়া যখন কাজ করতে সুরু করবে—তখন ৮০ হাজার মেট্রিক টনের জাহাজ অনায়াসে হলদিয়ায় ভীড়বে, পণ্য তুলবে, পণ্য নামাবে। তখন মাল তোলা নামানোর জন্য এখানে কুলীদের লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাবে না। এই কাজ সম্পন্ন হবে বিপুলায়তন ক্রেনের সাহায্যে। কয়েক মিনিটে নামিয়ে দেবে কয়েক হাজার টন জিনিস, আবার ফিরতী পথে তুলে নিয়ে আসবে কয়েক হাজার টন। অর্থাৎ চালু হয়ে গেলে এই বন্দরে মাল পরিবহন হবে খুবই কম ব্যয় সাধ্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় জাহাজে এক সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে পণ্য তোলার যে সব ব্যবস্থা রয়েছে তার মধ্যে একটি পুরো ওয়াগন উপরে তুলে, উপুড় করে জাহাজের খোলে মাল ঢেলে দেওয়ার ব্যবস্থায় নূতনত্ব আছে।

এরপর ধরা যাক তেলের জেটির কথা। মাঝ নদী বরাবর রয়েছে তেলের জাহাজের জেটি। দেখে মনে হয় সেটি যেন নদী থেকেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। পাশেই ডক্ তৈরির কাজ চলছে। বিরাটকায় মেশিনগুলি অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে—ধোঁয়া আর শুড়কির গুঁড়ো মিশে যাচ্ছে আকাশে বাতাসে। শ্রমিকদের আনাগোনার গুঞ্জনে জায়গাটা মুখর। আরও একটু দূরে তেলের বিরাট বিরাট দুটি ট্যাঙ্ক। সোজা পাইপের মধ্যে দিয়ে হাজার হাজার টন অপরিশোধিত তেল বেরিয়ে আসবে জাহাজের ট্যাঙ্ক থেকে। আবার ট্যাঙ্ক ভর্তি করা হবে ডিজেল প্রভৃতি দিয়ে। জেটি যদিও বর্তমানে মাত্র একটি—কিন্তু ভবিষ্যতের জন্যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আরেকটি জেটির প্রয়োজন হবে হলদিয়া তৈল শোধনাগার পুরোপুরি চালু হয়ে গেলে।

এর পর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল পণ্য রক্ষণাবেক্ষণ। রপ্তানীর জিনিস বা আমদানী করা জিনিস যাতে বেশীদিন জাহাজে না রাখতে হয় তার জন্য বন্দরের গায়ে বড় বড় গুদাম ঘর তৈরির ব্যবস্থা হচ্ছে।

সবচেয়ে বড় কথা হ'ল শুধু এখন নয় আরও পরে যদি বন্দরের সব রকম ব্যবস্থার সম্প্রসারণের দরকার দেখা দেয়—তখন যাতে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয় তার জন্য পরিকল্পনা প্রণেতারা উপযুক্ত ব্যবস্থা রেখেছেন।

পুরোনো জেটিতে নেমেই চোখে পড়ল স্থানীয় জনগণের চোখে মুখে তৃপ্তি ও আশার আলো। তৈল শোধনাগার স্থাপিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে পশ্চিম বাংলার বিরাট শিল্প জগৎ হয়তো গড়ে উঠবে এই হলদিয়ায়। গোড়ায় একটা সন্দেহ বার বার জনগণকে নৈরাশ্যের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। এই বিরাট কর্মযজ্ঞে তাঁদের অংশ কি শুধু ত্যাগের, আগামী দিন কি শুধু হতাশা আর বিফলতায় ভরা থাকবে? না। সরকার এবং শিল্প কর্তৃপক্ষ এঁদের অগ্রাধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন।

১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

পরিকল্পনা রূপায়ণ সমস্যা

পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডি. আর. গাডগিল, শ্রীনগরে একটি বেতার সাক্ষাৎকারে যে ভাষণ দেন এখানে তা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হ'ল। এই সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক গাডগিল, পরিকল্পনার কতকগুলি সমস্যার উল্লেখ করেছেন।

ডি. আর. গাডগিল

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ, একদিক দিয়ে বলতে গেলে ইতিমধ্যেই সুরু হয়ে গেছে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বছর অর্থাৎ ১৯৬৯-৭০ সালের বার্ষিক পরিকল্পনার বাজেট, কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে এই বার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতকগুলি খুঁটিনাটি ব্যাপার এখনও ঠিক করা হয়নি, কাজেই সেই হিসেবে এটি এখনও সম্পূর্ণ নয় এ কথা বলা যায়। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ নির্দেশ দিয়েছেন যে, অর্থকমিশনের সুপারিশগুলি পাওয়া গেলেই, আমাদের রাজ্য পরিকল্পনাগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং সেগুলি কি পরিমাণে বাড়ানো যায় বা পূর্ণতর করা যায় তা ভেবে দেখতে হবে। পরিকল্পনা কমিশন সেই কাজটা অবিলম্বে হাতে নেন। আশা করা যাচ্ছে যে অন্যান্য সাধারণ সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে যাওয়ার পর অল্প সময়ের মধ্যেই জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের কাছে পরিকল্পনার চূড়ান্ত কর্মসূচী পেশ করা যাবে।

তবে এটা সত্যি কথা যে, অর্থকমিশনের সুপারিশগুলি আমাদের সম্পদ বাড়াবেনা। তাঁরা প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পদের সামঞ্জস্য বিধান করা ছাড়া আর কিছু করেন না। রাজ্যগুলিকে যত বেশী পরিমাণে অর্থসম্পদ দেওয়া হবে, কেন্দ্রের অংশ সেই পরিমাণে কমে যাবে। আমাদের প্রকৃতপক্ষে যা করতে হবে তা হ'ল, রাজ্যগুলিকে যে পরিমাণ সম্পদ বেশী দেওয়া হ'ল, তার কতটা অংশ সেই রাজ্যগুলি পরিকল্পনার জন্য বিনিয়োগ করতে পারবে তা দেখা। কয়েকটি রাজ্যকে যে অতিরিক্ত বরাদ্দ দেওয়া হবে তা সেই রাজ্যগুলির পরিকল্পনা বহির্ভূত ঘাটতি কতটা মেটাতে পারবে এবং পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নিয়োগ বাড়াবার উদ্দেশ্যে অথবা এর ভিত্তি দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে কর বসিয়ে বা অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের অতিরিক্ত সম্পদ সংহত করা সম্ভবপর কিনা তা দেখাও আমাদের একটা কাজ। কোন রাজ্য যদি মনে করে যে অর্থকমিশনের বরাদ্দ তাদের সম্পূর্ণ প্রয়োজন মেটাতে পারবেনা তাহলে অন্য কোন উপায়ে যেমন ঋণের তালিকা ইত্যাদি পরিবর্তন ক'রে, তা পারা যায় কিনা তাও আমাদের দেখতে হয়। এই সমস্ত সংশোধন পরিবর্তনের মাধ্যমে এবং রাজ্যগুলির নিজেদের চেষ্টায় আরও সম্পদ সংহত করা সম্ভবপর কিনা তা দেখাটাই হয় পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ চেষ্টা।

এর ফলে রাজ্যগুলির পরিকল্পনার মৌলিক কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়না কারণ আমরা মনে করি যে, রাজ্যগুলি তাদের পরিকল্পনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে অগ্রাধিকার স্থির করে দেন। যথেষ্ট সম্পদের অভাবে রাজ্যগুলির যে সব কর্মসূচী বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে, আর্থিক সঙ্গতি যদি কিছুটা বাড়ে তাহলে সেগুলি বাদ দেওয়ার প্রয়োজন নাও হতে পারে। পরিকল্পনা কমিশন নিজেরাই ভেবেছিলেন যে রাজ্যগুলির পরিকল্পনার মোট বিনিয়োগের পরিমাণ সাড়ে ছয় হাজার কোটি টাকার মত হওয়া উচিত। খসড়া পরিকল্পনাতে এর পরিমাণ রাখা হয়েছে ছয় হাজার দুশো কোটি টাকার কিছু কম। সংশোধন পরিবর্তন করে, পরিকল্পনাগুলির মোট বিনিয়োগের পরিমাণ, আমরা প্রথমে যা ভেবে রেখেছিলাম তা করা যায় কিনা তার জন্য চেষ্টা করাই হবে আমাদের কাজ।

ব্যাঙ্কের সম্পদ

অতিরিক্ত সম্পদের কথা চিন্তা করার সময়, ১৪টি প্রধান প্রধান ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করার ফলে যে সম্পদ পাওয়া যেতে পারে সে কথাও বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে এটা বেশ কঠিন প্রশ্ন। কারণ, এই ব্যাঙ্কগুলির পরিচালনা সম্পর্কে সরকারী নীতি কি হবে এবং ব্যাঙ্কের কার্য্যপদ্ধতি কি রকমভাবে বদলাবে অথবা এই পরিবর্তন অবিলম্বেই হবে কিনা তা এখনও পরিস্কারভাবে বোঝা যাচ্ছেনা। তবে এক দিক দিয়ে কিছুটা সঙ্কেত যে পাওয়া যাচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণের সঙ্গে আলোচনার সময় জানা গেছে যে, ব্যাঙ্কগুলি যখন সামাজিক নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল তখনই তাঁরা, তাঁদের রাজ্যের কতকগুলি ব্যাঙ্কের ম্যানেজারদের, ব্যক্তিবিশেষের, সংস্থার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলিতে বেশী অর্থ বিনিয়োগ করতে অনুরোধ করেন এবং ব্যাঙ্কগুলি সেই সব পরিকল্পনায় সাহায্য করতে স্বীকৃত হয়। এই প্রচেষ্টাকে অবশ্য আরও একটু সংহত করা যায়।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির সম্পদ এখন সরকার উন্নয়নমূলক কাজে বিনিয়োগ করতে পারবেন, সাধারণের এই ধারণাটা, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ প্রশ্নটির ভুল বোঝাবুঝির ফলেই সৃষ্ট হয়েছে। ব্যাঙ্কের সম্পদ প্রধানতঃ জমাকারীদেরই সম্পদ। এই সম্পদের

১২ পৃষ্ঠায় দেখুন

পশ্চিমবঙ্গে মেয়েদের কারিগরী শিক্ষা

অপর্ণা মৈত্র

বর্তমান যুগে এমন কোন কর্মক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন যেখানে মেয়েরা নেই বা তাদের পদার্পণ ঘটেনি। বর্তমানে আমরা মহিলাদের ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, পাইলট, আইন ব্যবসায়ী, শিক্ষয়িত্রী, নার্স, ক্যানভাসার এবং এমন আরও অজস্র ক্ষেত্রে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি যেখানে পূর্বে এঁদের দেখা যেতো না। এই দিকগুলি ছাড়াও, মেয়েদের উৎসাহ, আগ্রহ এবং সর্বোপরি কর্মদক্ষতা আরও অনেক নতুন কর্মের পথ খুলে দিচ্ছে। মেয়েদের জন্য এখন একটি নতুন কর্মক্ষেত্র হচ্ছে কারিগরী বিষয়। আমরা ইতিপূর্বে মহিলা ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে পরিচিত হলেও সম্পূর্ণভাবে কারিগরী ক্ষেত্রে মেয়েদের আসতে দেখিনি। কারণ এ ধরণের কারিগরী শিক্ষা পুরুষদের অধিকারভুক্ত বলে ধারণা ছিল। সেই ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করে এখন মেয়েরা কেবলমাত্র কারিগরী শিক্ষাই গ্রহণ করছে না, বাস্তবে সেটি প্রয়োগও করছে।

ভারতবর্ষে মেয়েদের মধ্যে কারিগরী শিক্ষার প্রচলন খুব বেশীদিন হয়নি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ে মেয়েদের মধ্যে ব্যাপকভাবে কারিগরী শিক্ষা প্রসারের জন্য ভারত সরকার আঞ্চলিক ভিত্তিতে কারিগরী বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারই ফলে বিভিন্ন প্রদেশে নারীদের জন্য পলিটেকনিক খোলা হয়। পূর্বাঞ্চলে সর্বপ্রথম ১৯৬৩ সালে কলকাতায় ২১, কনভেন্ট রোডে মেয়েদের একটি কারিগরী শিক্ষায়তন স্থাপন করা হয়। বর্তমানে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এটিই মেয়েদের একমাত্র পলিটেকনিক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই কেন্দ্রে বর্তমানে পাঠ্য বিষয় হ'ল ইলেক্ট্রোনিকস্ ও আর্কিটেকচার। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে নারীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত ভারতের সব কটি কারিগরী বিদ্যায়তনের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটিতেই সর্বপ্রথম ইঞ্জিনীয়ারীং বিষয় পাঠ্য হিসাবে নেওয়া হয়। এই দুটি বিষয়েই তিন বৎসরের ডিপ্লোমা কোর্স এবং কারিগরী শিক্ষা সম্পর্কিত রাজ্য পরিষদ, কৃতী ছাত্রীদের এই ডিপ্লোমা বিতরণ করেন।

ইলেক্ট্রোনিকস বিষয়ে পড়াশুনা করা ছাড়া হাতে-কলমে কাজ শিখতে হয়। রেডিও মেরামত, টেলিফোন, টেলিগ্রাফে সংবাদ আদান-প্রদানের কাজও শিখতে হয়। স্থাপত্য বিদ্যায় শিক্ষণীয় বিষয় হ'ল বাস্তু-গঠন শিল্প ও তার রূপায়ণ। প্রতিটির পাঠ্য বিষয় ছাড়াও হাতে কলমে যাতে বিশেষ শিক্ষা পায় সেদিকে দৃষ্টি রেখে পাঠ্যক্রম রচিত হয়েছে। সেইজন্য ছাত্রীরা প্রত্যেকটি বিষয়ের পুঁথিগত জ্ঞানের সঙ্গে সেটি তৈরি করতেও শেখে। তার ফলে নীরস ও কঠিন বিষয়ও তাদের কাছে আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে। ছাত্রীরা শুধু কাজই শেখেনা নিজেরা হাতে করে ট্রান্সিস্টার সেট, আভ্যন্তরীন যোগাযোগের সেট তৈরিও করে। সেইভাবে স্থাপত্য বিদ্যার ছাত্রীদের একই সঙ্গে পুরাতন ও আধুনিক উভয় যুগের স্থাপত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। কোন বিশেষ যুগের স্থাপত্যর সঙ্গে সেই সময়ের ইতিহাস কিছুটা যেমন জানতে হয়, তেমনি শেষ বর্ষের ছাত্রীদের একটি প্রেক্ষাগৃহ বা কলেজ গৃহের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা করে ব্লু প্রিন্ট তৈরি করে দিতে হয়। এইভাবে কাজ শেখার ফলে ছাত্রীদের বাস্তব কর্মক্ষেত্রে গিয়ে মোটেই অসুবিধায় পড়তে হয় না। আজ পর্যন্ত তিনটি দলে প্রায় ৫০ জন ছাত্রী এখান থেকে পাশ করেছেন। এর মধ্যে ইলেকট্রোনিক বিষয়ে যারা উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের ২০ জন এবং স্থাপত্যের ১৫ জন কাজ পেয়েছেন। তাঁরা

কলিকাতার পলিটেকনিকের পরীক্ষাগারে কর্মরত শিক্ষার্থিনীগণ

যোগ্যতার সঙ্গে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে, মিউজিয়ামে, প্লানেটোরিয়ামে, পি. ডব্লিউ. ডি এবং কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টে কাজও করছেন।

ইলেক্ট্রোনিকস এবং আর্কিটেকচার দুটিতেই প্রথম বৎসরে পড়ানো হয় ইংরেজী, স্থাপত্য, অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র এবং মূল দুটি বিষয়ের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। প্রথম বৎসরে পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হবার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে শিক্ষার্থিনী যে বিষয়টি নিয়েছেন সেটি পড়ানো হয়। তা ছাড়া প্রথম দুই বছর প্রত্যেক ছাত্রীকে পলিটেকনিকের কারখানায় কাঠ ও চামড়ার কাজ শিখতে হয়।

স্কুল ফাইনাল বা উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে ছাত্রীরা এখানে ভর্তি হয়। অবশ্য এই প্রতিষ্ঠানে বি. এস. সি পাশ ছাত্রীও আছে। ভর্তি হওয়ার পরীক্ষার মান বেশ উচু। অঙ্ক ও ড্রইং পরীক্ষা নেওয়া হয়। কারণ এই ধরণের কারিগরী শিক্ষায় এ দুটি বিষয়ে জ্ঞান একান্ত অপরিহার্য। শেষ পরীক্ষা হয় আগষ্ট মাসে। যাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসুবিধা না হয় সেজন্য বেতন সামান্য, মাসে চার টাকা। তা ছাড়া পলিটেকনিক থেকে ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় পুস্তক ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সরবরাহ করার জন্য দরিদ্র ফাণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যান্য ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের মতো এই নারী কারিগরী বিদ্যায়তনটির জন্যও কয়েকটি সরকারী বৃত্তি নির্দিষ্ট আছে।

পলিটেকনিকের ডিপ্লোমা প্রাপ্ত ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে টেলি কমিউনিকেশন শাখা খোলার চেষ্টা করছেন। বর্তমানে ছাত্রীরা এ. এম. ই. আই পরীক্ষা দিতে পারেন। এখানকার কৃতী ছাত্রীরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও বিদেশে কর্মে নিযুক্ত আছেন।

পশ্চিমবঙ্গের এই কারিগরী প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক মণ্ডলীতে আছেন ১৭ জন অধ্যাপক। প্রতিটি বিষয় পড়ানো ও শেখানোর জন্য আছেন সেই সেই বিষয়ে উচ্চ শিক্ষিত ও কৃতী অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা। এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষা শ্রীমতী ইলা ঘোষকে ভারতের মহিলা ইঞ্জিনীয়ারদের পথিকৃত বলা যায়।

সুষ্ঠু পরিচালনা, যোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী এবং উৎসাহী ছাত্রীরা থাকা সত্বেও কলিকাতা নারী কারিগরী শিক্ষায়তনটির আশানুরূপ উন্নতি ঘটেনি। তার কারণ হ'ল পলিটেকনিকটির কাজের সময় ও স্থানাভাব এবং অন্যটি হ'ল ছাত্রী সংখ্যার স্বল্পতা। মেয়েদের ক্লাস হয় সকাল ৬-৩০ থেকে ১০-৪৫ পযন্ত। এরপরে ছেলেদের বিভাগের ক্লাস সুরু হয়। এর ফলে মেয়েদের জন্য সময় থাকে মাত্র ৬টি পিরিয়ড। এই ধরণের কারিগরী শিক্ষার জন্য যতটা সময় বা সেমিনার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা দরকার তা সম্ভব হয় না। পলিটেকনিক কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যতে আভ্যন্তরীন সাজ সজ্জা ও বস্ত্রাদি অলঙ্করণ বিষয়ে কোর্স খোলার ইচ্ছে আছে। ওঁরা মনে করেন এ দুটি কোর্সে বহু সংখ্যক মেয়েকে আকৃষ্ট করা যাবে এবং তাদের ভবিষ্যৎ কর্ম সংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করবে। কিন্তু স্থানাভাবের জন্য তা সম্ভব হচ্ছে না। কলেজ ভবন, হোস্টেল ও প্রয়োজনীয় খরচ বাবদ সরকারী বরাদ্দ আছে ২১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা, কিন্তু সরকারী কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট প্রচেষ্টার অভাবে নির্দিষ্ট জমি থাকা সত্বেও পলিটেকনিকের নিজস্ব ভবন তৈরি হচ্ছে না।

কলেজটির উন্নতির পথে আর একটি অন্তরায় হোল যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্রীর অভাব। বর্তমানে পলিটেকনিকের ছাত্রী সংখ্যা হ'ল মাত্র ৫৮ জন। যথেষ্ট প্রচারের অভাবে আশানুরূপ ছাত্রী কারিগরী শিক্ষায়তনে আসে না। কারিগরী শিক্ষা সম্বন্ধে যথাযথ তথ্য না জানার ফলে বহু ছাত্রী ইচ্ছে থাকলেও পড়তে আসতে পারে না। দ্বিতীয়ত: আমাদের দেশের অভিভাবকেরা মেয়েদের টেকনিক্যাল শিক্ষা দেওয়া সম্পর্কে এখনও প্রস্তুত নন।

কিন্তু মনোভাবের পরিবর্তন হওয়া দরকার। ভারতবর্ষের মতো ক্রমোন্নতিশীল দেশে এই ধরণের মনোভাব দেশের উন্নতির পথে অন্তরায় স্বরূপ। তা ছাড়া দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে, যেখানে বেকার সমস্যা বিশেষ জটিল সেখানে কিছু সংখ্যক মেয়ে যদি কারিগরী শিক্ষা গ্রহণ করে কর্ম সংস্থানের সুযোগ পায় তাহলে তার থেকে আশার কথা আর কি হতে পারে?

শিল্পে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা

কয়েক বছর পূর্ব্বেও সরকার এবং শ্রমিক উভয় পক্ষই, পরিচালনা ব্যবস্থায় কর্মীদের অংশ গ্রহণের কথা খুব বলতেন। কিন্তু সম্প্রতি এই কথাটা বিশেষ শোনা যায়না। এর একটা কারণ হ'ল, এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্পর্কে সমগ্রভাবে ইউনিয়নগুলি এবং পরিচালকবর্গ, অনুকূল একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেনি। বর্ত্তমানে যখন শিল্প সম্পর্ক সন্তোষজনক এবং উৎপাদনও কমের দিকে তখন পরিচালনা ব্যবস্থায় কর্মীদের অংশ গ্রহণের প্রশ্নটি বেশীদিন উপেক্ষা করা যায়না। সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে বিচার করলে, শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া শিল্পে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। কতকগুলি প্রতিষ্ঠান এই সমস্যাটিকে অত্যন্ত লঘুভাবে গ্রহণ করছেন এবং এটাকে একটা আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবে মেনে নিয়েছেন।

ভারতের সংবিধানে বলা হয়েছে যে শ্রমিক আইনগুলিকে ক্রমশ: শ্রমিকদের অনুকূল করে তুলতে হবে। কাজেই পরিচালকদের যদি বেঁচে থাকতে হয় এবং সাফল্য লাভ করতে হয় তাহলে তাঁরা শ্রমিকদের আর, মেসিনের চাকার একটা স্ক্রু বলে মনে করতে পারেন না। আমরা যখন পরিচালনা ব্যবস্থায় শ্রমিকদের অংশ গ্রহণের কথা বলি তখন তার মানে শুধু এই নয় যে, সীমাবদ্ধ ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়ার্কস্ কমিটি বা যুক্ত পরিচালনা পরিষদ গঠন করলেই কাজ শেষ হয়ে গেল। প্রধান কথা হল, কর্মীরা পরিচালনা ব্যবস্থার প্রকৃত অংশীদার হবেন, প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্ম্মপ্রচেষ্টাগুলির পরিকল্পনা রচনায়, সংহতি করণে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কর্মীদের প্রতিনিধিদের মতামত দেওয়ার অধিকার থাকবে। তবে পরিচালনা ব্যবস্থায় কর্মীদের পূর্ণতর অংশ-গ্রহণ অবশ্য, ট্রেড ইউনিয়ন ব্যবস্থা, কর্মীদের শিক্ষাও অন্যান্য বিষয়ের ক্রমোন্নয়ন অনুযায়ী পর্য্যায়ক্রমিক হওয়া উচিত।

পরিচালক ও কর্মীদের মধ্যে বিশ্বাসের অভাব, সন্দেহ ও ভুলবোঝাবুঝির কথা আমরা বলে থাকি এবং এগুলিকেই শিল্প বিরোধের কারণ বলে থাকি; কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না কর্মীদের শিল্প ব্যবস্থার অংশীদার করে তোলা যাবে ততদিন পর্য্যন্ত এগুলি থাকবেই। কর্মীরাও এখন নিজেদের সুবিধে-অসুবিধে, অভাব-অভিযোগ জানাতে চান এবং স্বীকৃতি চান। কোন শক্তিই এই ইচ্ছাকে দমন করতে পারবেনা এবং তা বাঞ্ছনীয় নয়। আত্ম অভিব্যক্তির ও স্বীকৃতি পাওয়ার এই ইচ্ছাকে যদি উপযুক্তপথে পরিচালিত করা যায় তাহলে তা গঠনমূলক হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু একে যদি দমন করা হয় তাহলে ধ্বংসমূলক আকার গ্রহণ করতে এবং শিল্পের শান্তি নষ্ট করতে পারে।

পরিচালনায় কর্মীদের অংশগ্রহণ

পরিকল্পনার প্রথম দিকে পরিকল্পনা কমিশন এই নীতির গুরুত্ব স্বীকার করে নেন। ১৯৫৫ সালে কমিশনের শিল্প কর্মী সম্পর্কিত একটি কমিটি, কর্মীদের পরিচালনা ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করার ওপর বিশেষ জোর দেন। কমিটি বলেন "পরিকল্পনার সফল রূপায়ণের জন্য পরিচালনা ব্যবস্থায় কর্মীদের সংশ্লিষ্ট করা বিশেষ প্রয়োজন। এতে শিল্প সম্পর্ক উন্নততর হবে এবং উৎপাদনও বাড়বে। কাজেই প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে কর্মী ও পরিচালনা ব্যবস্থার সমান সংখ্যক প্রতিনিনিধি নিয়ে একটি করে পরিচালনা পরিষদ থাকা উচিত। পরিচালনা পরিষদকে সব বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্যাদি সরবরাহ করার দায়িত্ব থাকবে পরিচালকদের। এই পরিষদের একমাত্র আর্থিক ব্যাপার ছাড়া, প্রতিষ্ঠানের সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করার অধিকার থাকবে। শ্রমিক কল্যাণ সম্পর্কিত বিষয়গুলি প্রথমে ওয়ার্কস্ কমিটিতে আলোচিত হওয়ার পর প্রয়োজন হ'লে পরিচালনা পরিষদে আলোচিত হতে পারে।"

তুলনা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে

কেউ যখন অন্য দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের ব্যবস্থার তুলনা করেন, তখনই ভীষণ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। যাঁরা কর্মীদের পরিচালনা ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করার পক্ষপাতি তাঁরা যুগোশ্লোভিয়া ও পশ্চিম জার্মানীর দৃষ্টান্ত দেখান। ঐ দুটি দেশে পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্মীদের অংশগ্রহণ এখন একটা কার্য্যকরী ব্যবস্থা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যদিকে পরিচালকদের মধ্যে কেউ কেউ আমেরিকার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন। সেখানকার ইউনিয়নগুলি সাধারণত: চাকুরির নিরাপত্তা, ভালো পারিশ্রমিক এবং সুযোগ সুবিধেগুলির নিশ্চয়তার ওপর জোর দেন এবং কর্মীরা শিল্পের মালিক নন বলে অন্য সব ব্যাপারে পরিচালকগণের স্বাধীনতা থাকা উচিত বলে তারা মনে করেন। পরিচালনা ব্যবস্থায় কর্মীদের অংশ গ্রহণ সম্পর্কে অন্যান্য দেশের তথ্যাদি জানা ভালো, কিন্তু আমাদের দেশে সেই ব্যবস্থাটা কি রূপ গ্রহণ করবে তা এখানকার পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। আমরা সকলেই জানি যে কাজের সর্ত্তাদি, পারিশ্রমিকের হার, বোনাস, আধুনিকীকরণ ও যন্ত্রসজ্জা, কাজের মাত্রা এবং শ্রম আইনগুলি কার্য্যকরীকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়েই সাধারণত: পরিচালনা ব্যবস্থা ও শ্রমিকের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। ধর্ম্মঘট বা মামলা করে যে এই সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব নয় তাও আমরা জানি। দুই পক্ষ যদি পরস্পরের মধ্যে একটা শুভেচ্ছা ও বিশ্বাসের ভাব গড়ে তুলতে না পারে তাহলে অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠা সম্ভব

নয়। এই বিশ্বাস ও সদিচ্ছা গড়ে তোলার একমাত্র কার্য্যকরী উপায় হ'ল কর্মীদের অংশগ্রহণের একটা ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে হবে। অনেকে মনে করেন, কর্মীদের ভাগ্য সম্পর্কে যদি উপেক্ষার মনোভাব গ্রহণ করা হয় তাহলে তাঁরাও চাকরি রাখার জন্য যতটুকু কাজ করা প্রয়োজন তার বেশী কাজ করবেন না। ফলে তাঁদের মধ্যে দায়িত্ববোধ গড়ে ওঠেনা এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য তাঁরা যথাশক্তি কাজ করেন না।

উৎপত্তি

১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কোন সময়ে নাগপুরে যখন শ্রমিক কল্যাণ অফিসারগণের সর্ব্ব ভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তখনই উপযুক্ত পর্য্যায়ে কর্মীগণের পরিচালনা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ বা তাদের সংশ্লিষ্ট করার প্রশ্নটি প্রথম পরীক্ষা করা হয়। এই আলোচনায় বেশ কিছু সংখ্যক ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এবং পরিচালকগণের প্রতিনিধি যোগ দেন। যাইহোক, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়েই এই ব্যবস্থার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় এবং কয়েকজন অর্থনীতিবিদ, প্রত্যেক সংস্থায়, পরিচালনা পরিষদ গঠন করার পরামর্শ দেন। ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে নূতন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ ভারতীয় শ্রমিক সম্মেলনে স্থির হয় যে, দুই বছরের জন্য এই সম্পর্কে কোন আইনসঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবেনা বরং নিয়োগকারীগণেরই কয়েকটি শিল্পে স্বেচ্ছায় এই ব্যবস্থা চালু ক'রে পরীক্ষা করে দেখতে রাজি হওয়া উচিত।

১৯৫৮ সালের ৩১শে জানুয়ারি ও ১লা ফেব্রুয়ারিতে শ্রমিক-পরিচালক সহযোগিতা সম্পর্কে একটি আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হয়। এই সম্মেলন, যুক্ত পরিচালনা পরিষদের আকার, পরিষদে প্রতিনিধিত্ব, পরিষদের গঠনতন্ত্র, কর্মচারি নিয়োগ, সভার তালিকা, কর্মীদের তথ্যাদি সরবরাহ ইত্যাদি সম্পর্কে কতকগুলি সুপারিশ করেন। পরিচালনা পরিষদ গঠন সম্পর্কে একটি চুক্তির খসড়াও গৃহীত হয়। ১৯৬৭ সালের শেষ পর্য্যন্ত সরকারী তরফে ৪৭টি এবং বেসরকারী তরফে ৮৫টি মোট ১৩২টি যুক্ত পরিচালনা পরিষদ গঠিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু শিল্পসংস্থাগুলির পরিচালকরা তাঁদের ক্ষমতার কিছুটা অংশ পরিচালনা পরিষদকে দিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় এইদিকে কাজ বিশেষ অগ্রসর হয়নি।

বর্ত্তমান অবস্থা

পরিচালনায় কর্মীদের অংশগ্রহণ বা তাঁদের পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা সম্পর্কে বর্ত্তমান অবস্থা হল: ওয়ার্কস কমিটি, যুক্ত পরিচালনা পরিষদ, গঠন, পরামর্শদান পরিকল্পনা, এবং সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে পরিচালক বোর্ডে, ট্রেড ইউনিয়নের একজন প্রতিনিধিকে নিয়োগের মাধ্যমে তা সাফল্য বা অসাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষা ক'রে দেখা হচ্ছে। শ্রম সম্পর্কিত জাতীয় কমিশন, শ্রমিক-পরিচালক সম্পর্ক সম্বন্ধে যে অনুসন্ধানকারী কমিটি নিয়োগ করেন তাঁরা বলেছেন যে কয়েকটি ক্ষেত্রে ওয়ার্কস কমিটি বা যুক্ত পরিচালনা পরিষদ ভালো কাজ করেছে এবং শিল্পে শান্তি স্থাপনে সাহায্য করেছে, তবে সমগ্রভাবে এগুলি বিশেষ কার্য্যকরী হয়নি। জাতীয় শ্রম কমিশন উত্তরাঞ্চলের জন্য যে কমিটি নিয়োগ করেন, তাঁরা বলেছেন যে, শ্রমিক-পরিচালকের মধ্যে সম্পর্ক যথোপযুক্ত ছিলনা বলে ওয়ার্কস কমিটি এবং যুক্ত পরিচালনা পরিষদ বিফল হয়েছে। দক্ষিণাঞ্চল সম্পর্কিত অনুসন্ধানকারী কমিটি স্বীকার করেছেন ঐ অঞ্চলে ওয়ার্কস কমিটি সম্পূর্ণভাবে বিফল হয়েছে। তাঁরা অন্ধ্রপ্রদেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ ক'রে বলেন যে সেখানে ইউনিয়নগুলি ওয়ার্কস কমিটিগুলিকে সমর্থন পর্য্যন্ত করেনি।

মৌলিক এবং পরিচালনা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি, পরিষদের আলোচনার বহির্ভূত রেখে পরিচালকদের ভয় দূর করে সরকারী পক্ষ থেকে আন্তরিকতার পরিচয় দেওয়া সত্বেও, পরিচালকপক্ষ কমিটিগুলিকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেননি। এমন কি সরকারী সংস্থাগুলির পরিচালকপক্ষও কমিটিগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি।

বিভিন্ন শিল্পের অবস্থা বিভিন্ন বলে এবং প্রত্যেকটি রাজ্যের শ্রমিক আইন বিভিন্ন বলে এই সব পরিষদের কাজকর্ম্মের পর্য্যালোচনা করা বেশ কঠিন। তবে এই সম্পর্কে পরিচালক পক্ষের ভুল দৃষ্টিভঙ্গী, বিফলতার অন্যতম কারণ। তবে কতকগুলি ট্রেড ইউনিয়নের মনোভাব আরও বেশী আশ্চর্য্যজনক। কতকগুলি ইউনিয়ন মনে করে যে, যুক্ত পরিচালনা পরিষদ স্থাপিত হলে ইউনিয়নের নেতাদের অধিকার এবং তাদের গুরুত্ব খর্ব্ব হয়ে যাবে। ট্রেড ইউনিয়নগুলির মনোভাব দেখে মনে হয় যে কর্মীরা যদি সোজাসুজি পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত হয় তাহলে কর্মীদের ওপর তাদের প্রভাব কমে যাবে এবং ভবিষ্যতে হয়তো ইউনিয়নই থাকবেনা। তাছাড়া ইউনিয়নগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতাও এই কমিটিগুলির বিফলতার আর একটা কারণ। যখন কোন কারখানায় একটির বেশী ইউনিয়ন থাকে তখন পরিচালকপক্ষ প্রায়ই বলেন যে, এদের মধ্যে কোন একটিকে বেছে নেওয়া মুস্কিল। যাই হোক ইচ্ছা যদি আন্তরিক হয় তাহলে নানা অসুবিধে সত্বেও একটা উপায় বার করা যায়। কর্মীদের উপযুক্ত প্রাপ্য দেওয়া, উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব স্বীকার করে নেওয়া, তাদের কল্যাণ ও নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

এ পর্য্যন্ত যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত হয়েছে তাতে দেখা যায় এই পরিষদ ও কমিটিগুলি ভালো একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। দুই পক্ষের মধ্যে আন্তরিক সহযোগিতা ও বিশ্বাসের মনোভাব সৃষ্টি করাটাই হল প্রকৃত সমস্যা, আইন কানুন বা অন্যান্য রীতি পদ্ধতির সমস্যা নয়। যাঁরা কাজ করছেন তাঁরা যদি স্বেচ্ছায় সহযোগিতা না করেন, পারস্পরিক বিশ্বাস যদি না থাকে তাহলে কোন সংস্থার পক্ষেই কাজ করা সম্ভব নয়। সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যেতে হলে শিল্পে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বিশেষ প্রয়োজন।

পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন ব্লকে যে একটা পরিবর্ত্তন আসছে তা বেশ বুঝতে পারা যায়। এই ব্লকের গ্রামগুলি বিশেষ করে ধাঙ্গম-জয়পুর, জাম্বেদিয়া ও চাবকা এই তিনটি গ্রাম, নিঃসংশয়ে এই পরিবর্ত্তনে গতি সঞ্চার করছে। এরা প্রাচীন রীতি, সেকেলে চাষপদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করে নতুন পথে যাত্রা সুরু করেছে। এরা বেশী ফলনের ধান ও গম চাষ করে কৃষিতে সাফল্য অর্জন করতে চাইছে।

বাংলার গ্রামে অধিক ফলনের শস্যের চাষ

এই নতুনের আহ্বান সুদূরের গ্রামগুলিতেও গিয়ে পৌঁচেছে। কতকগুলি গ্রামের সমগ্র জনসাধারণ উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। সমস্ত রকম কুণ্ঠা ও সংশয় পরিত্যাগ ক'রে কৃষকরা ক্রমেই বেশী সংখ্যায় বেশী ফলনের নতুন বীজ ব্যবহার করছেন।

নতুন পথের দিশারী

ধাঙ্গম-জয়পুর হল এই দিক দিয়ে একটি আদর্শ গ্রাম। জমি থেকে তিন চার গুণ বেশী শস্য পাওয়ার জন্য গ্রামটি, বেশী ফলনের বীজ ব্যবহার করতে সুরু করেছে। তিন বছর পূর্ব্বেও যেখানে প্রতি একরে মাত্র দশ থেকে কুড়ি মণ ধান পাওয়া যেত সেখানে এখন প্রতি একরে ৫৫ থেকে ৬০ মণ ধান ফলছে। আই আর-৮ বীজ থেকে পাওয়া যাচ্ছে ৬০।৬৫ মণ আর এনসি ৬৭৮ থেকে ৫০।৫৫ মণ।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে ঘন জঙ্গল এই গ্রামটিকে অন্যান্য গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। গ্রামের ১৫০টি চাষী পরিবার, প্রকৃতির খামখেয়ালীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বদ্ধপরিকর হন। কাছাকাছি ছোট নদীটাতে যে বাঁধ ছিল, সেই বাঁধের জলটুকুই ছিল তাঁদের সম্বল। ১৯৫৭ সালে সেই বাঁধটি ভেঙ্গে যায়। তখন থেকেই এই চাষীদের দুঃখের দিন সুরু হয়। ১০ বছর থেকে তারা সুধু বাঁচার জন্যই সংগ্রাম করছেন। ১৯৬৭ সালের খরা এবং সেই বছরে আমনের ফসল প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তাঁদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে। এরপর বেঁচে থাকার জন্য তাঁরা যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তা ছিল একটা অতি উপযুক্ত ব্যবস্থা।

ঐ খরায় ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরই তাঁদের সাহায্য করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাতে গ্রামের সবাই যোগ দেন এবং কাছাকাছি রঙ্গী নদীতে ২৯৮ ফিট লম্বা বেশ টেকসই একটা মাটির বাঁধ তৈরি করেন। এতদিন পর্য্যন্ত এ নদীর জল বৃথাই কংসাবতীতে বয়ে যেত। এরপর গ্রামবাসীরা তাঁদের ধানের ক্ষেতগুলিতে জল নিয়ে যাওয়ার জন বাঁধ থেকে এক মাইল লম্বা একটি খাল কেটে নিয়েছেন।

এইবারে সেচের জল সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে, ধাঙ্গম-জয়পুরের কৃষকরা ১৯৬৮ সালের গোড়ার দিক থেকেই বেশী ফলনের বীজ দিয়ে চাষ সুরু করেন। ৬০ একর জমিতে তাইনান ৩ এবং আই আর-৮ বোরো ধানের চাষ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তারা সোনারা ৬৪ এবং লালমারোজো বীজ নিয়ে গমের চাষও সুরু করেন।

১৯৬৮-৬৯ সালের আমন চাষের সময় তাঁরা সমগ্র ২০০ একর জমিতেই আই আর ৮ ছাড়াও এন সি-৬৭৮ বীজ ব্যবহার করেন। বেশী ফলনের বীজের চাষে বেশী পরিমাণে রাসায়নিক সার দিতে হয় আর তার ফলে অনেক সময়ে ফলন ভালো হয়না এই রকম একটা ধারণা যে দেশের কৃষকদের রয়েছে, তাঁরা তাতে ভয় পাননি। তাঁরা পরিমাণ মত সার প্রয়োগ ক'রে যে ফল পেলেন তা বেশ উৎসাহজনক। ফলে এই বছরের প্রথম ভাগে শীতের মরসুমে একই পদ্ধতিতে ধান ও গমের চাষ করলেন এবং পরে আমন ধানেরও চাষ করলেন। এই আমনের ফসল এখন কাটা হচ্ছে।

যে বীজগুলি ব্যবহার করে ভালো ফসল পাওয়া গেছে তা ছাড়াও নূতনতর

বীজ জয়া ও পদ্মা জাতীয় ধানের বীজও চাষ করা হয় এবং পূর্ব্বেকার চাষে যে সব অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে, অধিকতর সাফল্যের জন্য সেই অভিজ্ঞতাগুলিও কাজে লাগানো হয়।

অন্য দুটি গ্রামও পদাঙ্ক অনুসরণ করলো

সমবেত চেষ্টায় কি ফল পাওয়া যায় এবং বেশী ফলনের বীজ ব্যবহারে ফলন কতখানি বাড়ে সে সম্পর্কে জাম্বেদিয়া গ্রামটির কাহিনীও একই রকম। ১৯৬৮ সালের প্রথম দিকে শীতকালে, মাত্র ১০ একর জমিতে আই আর ৮ ধানের চাষ করে এই গ্রামটি বেশী ফলনের বীজ নিয়ে পরীক্ষা সুরু করে। তারপর থেকে গ্রামটির ১৯টি চাষী পরিবার সমস্ত কুসংস্কার উপেক্ষা করে গ্রামের সমস্ত চাষের জমিতে অর্থাৎ ১২০ একর জমিতে বেশী ফলনের বীজের ব্যবহার সুরু করেন। এই বছরের আমন ফসল তাঁরা তুলছেন আই আর-৮ তাডাও, অঞ্জনা, জয়া, পদ্মা এবং এনসি ৬৭৮ ধানের বীজ থেকে।

এবারে ফসল খুব ভালো পাওয়া যাবে এই আশায় তাঁরা এখন থেকেই আরও নতুন নতুন চাষের পরিকল্পনা করছেন। আমন ফসল কাটার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা বেশী ফলনের সোনালিকা ও কল্যাণসোনা গমের চাষ করবেন বলে স্থির করেছেন। সেচের প্রয়োজন মেটানোর জন্য তাঁরা চম্পা নদীতে একটা বাঁধ দিয়েছেন এবং জমির খালগুলিতে জল আনার জন্য একটা পাম্পসেট সংগ্রহ করেছেন।

তৃতীয় গ্রাম চাবকাও বেশী পেছনে পড়ে নেই। ঐ গ্রামের শতকরা ৭৫ জন কৃষক ইতিমধ্যেই সজাগ হয়ে উঠেছেন এবং তাঁদের ধানের জমিগুলিতে এখন বেশী ফলনের বীজ ব্যবহার করছেন।

বেশী ফলনের ধানের মধ্যে আই আর-৮ এবং এন সি ৬৭৮ই অন্যগুলির তুলনায় বেশী জনপ্রিয়। তবে পদ্মা ধানও ক্রমশ: জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বহু কৃষক এই ধান চাষ করে লাভবান হয়েছেন। আই আর-৮ এবং পদ্মা ধানের ফসল পেতে মাত্র ১০৫ দিনের মতো সময় লাগে। এতে তিনবার ধানের চাষ করা সম্ভবপর হয়েছে। তাছাড়া প্রাচীন জাতের ধানের তুলনায় এগুলিতে তুষের পরিমাণ কম হয় বলে ওজনে চাউলের পরিমাণ বেশী হয়।

ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন ব্লকের অন্যান্য গ্রামগুলিতে কয়েকজন কৃষক যে সাফল্য অর্জন করেছেন তা সত্যিই উল্লেখযোগ্য। এই ব্লকে ক্রমেই বেশী পরিমাণ জমিতে বেশী ফলনের ধানের চাষ করা হচ্ছে। ১৯৬৭-৬৮ সালে সম্পূর্ণ ব্লকে যেখানে মাত্র ৪০০ একর জমিতে বেশী ফলনের আমন ধানের চাষ করা হয় সেখানে ১৯৬৮-৬৯ সালে এই রকম ধানের জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৯০০ একর। এ বছরে তা ৮০০০ একরে দাঁড়াবে বলে মনে হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে নিবিড় ধান চাষের অন্তর্ভুক্ত ৯টি জেলার অন্যতম পশ্চিম মেদিনীপুরে, উঁচু পতিত জমিতে ধান চাষ সুরু করা হয়েছে। কংসাবতী নদী থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী জল পাওয়া গেলে এই পরীক্ষা সফল হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গে তৈলবীজ উৎপাদন ও আমদানী

পশ্চিমবঙ্গে তৈলবীজের বাৎসরিক আমদানীর পরিমাণ আনুমানিক তিন লক্ষ মেট্রিক টন। চতুর্থ বার্ষিক পরিকল্পনায় এই রাজ্যে বিভিন্ন প্রকার তৈলবীজের উৎপাদন ৫৫ হাজার মেট্রিক টন থেকে বাড়িয়ে ৯৪ হাজার মেট্রিক টনের লক্ষ্য মাত্রায় নিয়ে আসতে মনস্থ করা হয়েছে। প্রকল্পগুলির মধ্যে আছে সরিষা চাষের প্যাকেজ কার্যসূচীর প্রবর্তন, সরিষা চাষকে বহু ফসলী চাষ কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা, তিলসহ দো ফসলী চাষের ব্যবস্থা, ব্যাপকভাবে বাদাম চাষের প্রবর্তন ইত্যাদি।

সুতাকল শ্রমিকের সংখ্যা

১৯৬৮ সালের ১লা জানুয়ারীর হিসেব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে সুতাকল শ্রমিকের মোট সংখ্যা হ'ল ৫০,৮০৬ জন। সুতাকল শ্রমিকদের সর্বোচ্চ বেতনের হার ৪৩১.০১ টাকা এবং সর্বনিম্ন বেতন হার ১৩৮.৯০ টাকা।

নেইভেলি এ বছরে লাভ করবে

নেইভেলি লিগনাইট কর্পোরেশন হ'ল সরকারী তরফের একমাত্র সংস্থা যেখানে খনি থেকে লিগনাইট উত্তোলন, বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন, সার ও লেকো উৎপাদন ইত্যাদি নানা ধরণের কাজ হয়। বর্ত্তমান বছরে এটি অনেকখানি অগ্রগতি করতে পারবে বলে আশা করা যায়। গত আর্থিক বছরে কর্পোরেশন যথেষ্ট উন্নতি করে এবং তা বেশ উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ গত বছরে কাজ এতো ভালো হয় যে পূর্ব্ব বছরের তুলনায় ক্ষতির পরিমাণ তিন কোটি টাকা কম হয়। কর্পোরেশনের এই চমৎকার সাফল্যের পেছনে রয়েছে এর কর্ম্মপ্রচেষ্টার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অধিকতর উৎপাদন।

কর্পোরেশনের এই লিগনাইট খনির মতো এত বড় খনি প্রাচ্যে আর নেই এবং নানারকম অসুবিধে স্বত্বেও এটির অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। অষ্ট্রেলিয়া, জার্মানীর মত লিগনাইট উৎপাদনকারী দেশগুলি সাধারণত: যে সব অসুবিধের সম্মুখীন হয়, নেইভেলির যদি কেবলমাত্র সেই অসুবিধেগুলিই থাকতো তাহলে এখানে উৎপাদনের পরিমাণ আরও অনেক বেশী হতো। কিন্তু নেইভেলির সমস্যাগুলি অন্য রকমের। যাই হোক, ডিজাইনে, গবেষণায়, উৎপাদনে অবিরামভাবে উন্নতিসাধন ক'রে নেইভেলির উৎপাদন বাড়ানো হচ্ছে।

কর্পোরেশনের যে তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র রয়েছে তা দেশের মধ্যে সবচাইতে বড় এবং তাঁরা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা সম্পর্কে বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন। অন্যান্য তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র সচল করার জন্য মধ্যে মধ্যে এই কর্পোরেশনের সাহায্য চাওয়া হয়। উন্নতি এবং ব্যয়হ্রাসের জন্য সব সময় চেষ্টা করার ফলে গত বছরে যেখানে কর্পোরেশনের বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন প্রকল্পের ৯১ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয় সেই তুলনায় বর্ত্তমান বছরে ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা লাভ হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে কর্পোরেশনের বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা ৬০ কোটি ওয়াটে দাঁড়াবে।

শিক্ষিত-বেকার সমস্যা

সুরেন্দ্র কুমার

কর্মসংস্থান কেন্দ্রগুলিতে যাঁরা কাজের জন্য নাম রেজেষ্ট্রী করান এবং কর্মপ্রার্থীর সংখ্যার অনুপাতে যতজনকে কাজের সন্ধান দেওয়া হয় তা তুলনা করলে হতাশ হতে হয়। তাছাড়া যাঁরা নাম রেজেষ্ট্রী করান তাঁদের তুলনায় কর্মপ্রার্থীর প্রকৃত সংখ্যা অনেক বেশী। বহুদিন কর্মহীন হয়ে থেকে অনেকে হতাশ হয়ে পড়েন। গত দুই বছরে এই সমস্যা বরং তীব্রতর হয়েছে। এটা শুধু একটা অর্থনৈতিক সমস্যা নয় এর একটা সামাজিক—রাজনৈতিক দিকও রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে পাশের সংখ্যা এবং শিক্ষার সুযোগ-সুবিধে বেড়ে যাওয়াটা, শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বাড়ার অন্যতম প্রধান কারণ। একটি হিসেব অনুযায়ী দেশে ১৯৮৬ সালের মধ্যে ৪০ লক্ষ "প্রয়োজনাতিরিক্ত" ম্যাট্রিকুলেট এবং ১৫ লক্ষ "প্রয়োজনাতিরিক্ত" গ্র্যাজেয়েট হয়ে যাবে। লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সের একদল বিশেষজ্ঞের সহযোগিতায় ভারতীয় পরিসংখ্যাণ প্রতিষ্ঠান এই সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করে একই অভিমত প্রকাশ করেছেন।

মেকলে যে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেন তা তার উদ্দেশ্য পূরণ করেছে। স্বাধীনতা লাভ করার পরও বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলায়নি। আমরা শিক্ষাকে জাতীয় বিনিয়োগ বা লগ্নি বলে মনে করিনা। কলেজের কোন ছাত্র যদি ভবিষ্যত জীবনে একজন বৈজ্ঞানিক বা পণ্ডিত ব্যক্তি হন তাহলে তার তুলনায় যদি কোন ছাত্র উচ্চ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হলে কলেজগুলি বেশী গর্ব্ব অনুভব করে।

আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে এই সমস্যার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু এর সমাধান করা সম্ভবপর হয়নি। তৃতীয় পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময়ে এই বিফলতার কথা স্বীকার ক'রে বলা হয় যে, "মোটামুটিভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, দেশে বেকার সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি।" সরকার কেবলমাত্র সাম্প্রতিক কালেই এই সমস্যার ব্যাপকতা স্বীকার করে নিয়েছেন। এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ১৪ দফার একটি পরিকল্পনা তৈরি করা হয় এবং রাজ্যগুলিকে তা রূপায়িত করতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু রাজ্যগুলি থেকে যে সব উত্তর পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয় যে তাঁরা এই সমস্যাটিকে তেমন জটিল মনে করছেন না। কয়েকটি রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এর জন্য আর্থিক সাহায্য চেয়েছে, কতকগুলি রাজ্য আবার তাদের এলাকায় এই সমস্যার অস্তিত্বই অস্বীকার করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে খসড়া চতুর্থ পরিকল্পনায় বেকার সমস্যা সমাধান করা সম্পর্কে তেমন কিছু ব্যবস্থা করা হয়নি; এতে শুধু এই সমস্যা সম্বন্ধে কি দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হবে তা সাধারণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা সম্পর্কে পরীক্ষা করার জন্য বর্ত্তমানে একটি উচ্চ পর্য্যায়ের কমিটি নিযুক্ত হয়েছে।

কয়েকটি পরামর্শ

এই সমস্যাটি সমাধান করা সম্পর্কে এখানে কয়েকটি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রথমত: লোকসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত:, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার সকলের জন্যই খোলা থাকা উচিত নয়। যারা পড়াশুনায় খুব ভালো এবং শিক্ষালাভের জন্য সত্যিই উদগ্রীব তাদেরই শুধু উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে দেওয়া উচিত। অন্যদের, কারিগরী শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় পাঠানো উচিত। উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করার পর অন্য কোন পথ না থাকাতেই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ভীষণ বাড়ছে। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা যায় যে, উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে যারা বেরুবে তাদের মধ্য থেকেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির, তাঁদের কর্মী বাছাই করে নেওয়া উচিত এবং ইচ্ছে করলে পরে তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

তৃতীয়ত: আর্থিক উন্নয়নের গতি দ্রুততর করতে হবে। উন্নয়নের শ্লথ গতি বেকার সমস্যা বৃদ্ধির একটা প্রধান কারণ। সরকারের আরও অনেক প্রকল্প হাতে নেওয়া উচিত এবং বেসরকারী লগ্নীতে উৎসাহ দেওয়া উচিত। চতুর্থত: জনশক্তির উপযুক্ত পরিকল্পনা তৈরি করা উচিত। এইরকম পরিকল্পনার অভাবে যে দেশে এতো করার আছে সেই দেশেই ইঞ্জিনীয়াররা পর্য্যন্ত বেকার রয়েছেন। কাজেই আমাদের শিক্ষাসূচীও নতুন ক'রে তৈরী করা উচিত।

তাছাড়া আত্মপ্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দেওয়া উচিত। প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভ করার পর বেকার ব'সে না থেকে নিজের চেষ্টায় একটা কিছু গড়ে তোলায় উৎসাহিত করতে হবে। বিশেষ করে ইঞ্জিনীয়াররা যাতে নিজেরাই আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেন, সেই জন্যে কেবলমাত্র অসুবিধেগুলি দূর করে নয় সক্রিয়ভাবে উৎসাহ দিয়ে একটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা সরকারের কর্ত্তব্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে, গুজরাট শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা প্রশংসার যোগ্য। পেট্রোল পাম্পের কাজ এবং পেট্রোলজাত অন্যান্য জিনিসের খুচরা কারবার সমবায় সমিতিগুলিকে এবং বেকার ইঞ্জিনীয়ার ও অন্যান্য স্নাতকগণের অংশীদারমূলক সংস্থাগুলিকে দেওয়া হবে বলে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তাও একটা ভালো ব্যবস্থা বলা যায়।

শিক্ষার অপচয় হচ্ছে এই কথা না বলে, বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলিতে আমাদের ইঞ্জিনীয়ার ও চিকিৎসকদের পাঠানোর সম্ভাবনা বিবেচনা ক'রে দেখা উচিত। বিদেশে ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার ও চিকিৎসকদের সম্ভাবনা কতটুকু তা পরীক্ষা ক'রে দেখার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে একটি বিশেষ শাখা খোলা যেতে পারে। তবে শিক্ষিত ব্যক্তিদের অপেক্ষাকৃত কম বেতন গ্রহণে প্রস্তুত থাকতে হবে। বৃটেনে শিক্ষিত বেকারদের যে সব সর্ত্তে কর্মের সংস্থান করে দেওয়া হচ্ছে এটা হ'ল সেগুলির মধ্যে অন্যতম সর্ত্ত।

মাদ্রাজ মানমন্দিরের বর্ত্তমান রূপ

মাদ্রাজ মান-মন্দিরের ইতিহাস

বিবরণ—এস. ভি. রাঘবন

(মাদ্রাজের সংবাদদাতা)

মাদ্রাজের আঞ্চলিক আবহ দপ্তর ১৭৭ বছরের প্রাচীন। ১৭৯২ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মাদ্রাজ শহরের মুঙ্গামবাককামে এই কেন্দ্রটি স্থাপন করে। উদ্দেশ্য ছিল ভারতে জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল ও নাব্য বিদ্যার বিকাশে সাহায্য করা। এই প্রকল্প সম্বন্ধে তৎকালীন গভর্ণর সার চার্লস্ ওকলের অসীম উৎসাহের ফলে মাদ্রাজ মান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রকল্পে তৎ-কালীন মাদ্রাজ সরকারের সদস্য মিঃ উইলিয়াম পেট্রি-র সহযোগিতাও প্রচুর পাওয়া গেল। মিঃ পেটি নিজের টাকা খরচ করে এর ৫ বছর আগেই একটি মানম-ন্দির তৈরি করিয়েছিলেন।

গ্র্যানাইটের তৈরি যে স্তম্ভের ওপর প্রথম ট্রানজিট যন্ত্র বসানো ছিল সেটি আজও সযত্নে রক্ষিত আছে। স্তম্ভের গায়ে স্থপতি মাইকেল টপিং আর্চ-এর নাম। তা ছাড়া তামিল ও তেলুগুতেও এই নাম খোদাই করা আছে।

প্রথম জ্যোতির্বিদ যিনি এই মান-মন্দিরে কাজ স্থুরু করেন, তিনি হলেন, মিঃ জে-গোল্ডিংহ্যাম এফ. আর. এস.। ১৭৯০ সালে তিনি যে সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন সেগুলির ও তাঁর অন্যান্য পর্যবেক্ষণের রেকর্ডের একটি খণ্ড আজও রাখা আছে। পাণ্ডুলিপি আকারে ১৮১২ থেকে ১৮২৫ সাল পর্য্যন্ত দুটি খণ্ডে, তাঁর পর্যবেক্ষণের সমস্ত বিবরণ রয়েছে। এ ছাড়া বিষুব রেখার কাছে এবং মাদ্রাজে, তিনি 'দোলক' (পেণ্ডুলাম) নিয়ে যে মূল্যবান পরীক্ষা চালিয়েছিলেন তার বিবরণও রয়েছে আর একটি খণ্ডে। তিনি ভারতের বিভিন্ন জায়গার ও অন্যান্য জায়গার লঘিমার দূরত্ব স্থির করেন এবং ফোর্ট ও মাউন্ট টাইম গানের সাহায্যে শব্দের গতি নিরূপণের পরীক্ষা চালান। ইনিই হলেন এ দেশে আবহ বার্তার ধারাক্রমিক বিবরণ রক্ষার পথিকৃত—ইনিই প্রথম ১৭৯৬ সালে আব-হাওয়ার পূর্বাভাষ সংক্রান্ত রেজিস্টার খোলেন।

তাঁর উত্তরসূরী মিঃ গ্র্যানভিল টেলর. এফ. আর. এস (১৮৩০-১৮৪৮) মান-মন্দিরে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আনালেন এবং নক্ষত্র রেজিস্টার তৈরির জন্যে তথ্য সংগ্রহ করতে স্থুরু করলেন। এই রেজিস্টারটি ১৮৪২ সালে ছাপানো হয়। এই রেজিস্টারে ১১,000 নক্ষত্রের অবস্থান রেকর্ড করা আছে। ১৮40 সালে ক্যাপেটেন এস. সি. ই. লুডলো প্রহরে প্রহরে আবহবার্তা সংগ্রহ ও চৌম্বক গতি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের ধারা স্থুরু করেন।

১৮৪৯ থেকে ১৮৬১ সালের মধ্যে মাদ্রাজ মান মন্দিরে তিনজন জ্যোতির্বিদ নিযুক্ত হন। এরপর আসেন মিঃ এন. আর. পগসন। পরে তাঁর স্ত্রী ও কন্যাও তাঁর কাজে সাহায্য করেন। ইনি ৩0 বছর পরে ১৮৯১ সালে মারা গেলে ওঁর স্ত্রী বহু বৎসর মাদ্রাজ সরকারের আবহ-বার্তার প্রতিবেদক হিসেবে কাজ করেন।

মানমন্দিরের অতীত রূপ

১৮৬১ সালের পর এই মানমন্দিরে আরও বহু আধুনিক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম আনানো হয়। এর মধ্যে প্রধান ছিল একটি ট্রানসিক সার্কল ও একটি ৮ ইঞ্চি পরিধির ইকুইটোরিয়েল। মি: পগসনের আমলে ট্রানসিক সার্কল দিয়ে ৫০০০টি নক্ষত্রের পঞ্জী তৈরি হয়। এই নক্ষত্রগুলির প্রত্যেকটিকে ৫ বার লক্ষ্যপথে ধরা হয়। ইকুইটোরিয়েলের সাহায্যে মি: পগসন ৬টি ছোট উপগ্রহ ও ৭টি স্থান পরিবর্তনকারী নক্ষত্র আবিষ্কার করেন। স্থান পরিবর্তনকারী নক্ষত্রের তালিকা সম্পূর্ণ হবার আগেই পগসন মারা যান। তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী মি: মিচিস্মিথ ঐ কাজ শেষ করেন। মি: পগসনের নামও একটা কারণে সবিশেষ স্মরণীয়। তিনি নক্ষত্রের উজ্জ্বলতার পরিমাপ নির্ধারণে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এমন কি আজকের দিনেও নক্ষত্রলোকের উজ্জ্বলতার পরিসীমা নির্ধারণ পদ্ধতি বোঝানো হয় পগসন স্কেল দিয়ে।

১৮৯৫ সালে, কোডাইকানালে সৌর মান-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। ১৮৯৯-এর এপ্রিল মাসে ভারতীয় মান-মন্দিরগুলির পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত প্রকল্পটি কার্যকরী হয়। সেই সময় মাদ্রাজ মান-মন্দির, মাদ্রাজ সরকারের কাছ থেকে ভারত সরকারের হাতে চলে যায় এবং মাদ্রাজের সরকারী জ্যোতির্বিদ কোডাইকানাল ও মাদ্রাজ মান-মন্দিরের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন।

১৯৩১ সাল পর্যন্ত মাদ্রাজ মান মন্দির তেমনি থাকে। ইতিমধ্যে কর্মচারী ছাঁটাই-এর ফলে মান-মন্দিরটি কোনোও প্রকারে টিঁকে থাকে। তখনও অবশ্য মাদ্রাজ মান-মন্দির ভারতীয় টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার জন্যে সময় সঙ্কেত পাঠাত। তা ছাড়া মাদ্রাজে দৈনিক আবহবার্তা প্রকাশ করত। এই আবহবার্তার সূত্রপাত করা হয় ১৮৯৩ সালের অক্টোবর মাসে।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতীয় আবহ দপ্তরগুলির পুনর্বিন্যাস ঘটে এবং সেই সময় দেশে ৫টি আঞ্চলিক আবহকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মাদ্রাজের কেন্দ্রটিতে কাজ সুরু হয় ১৯৪৫ সালের ১লা এপ্রিল। মাদ্রাজ কেন্দ্র তার পর্ববর্তী জায়গাতেই আছে তবে আধুনিক যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম ও অন্যান্য ব্যবস্থায় সজ্জিত ভবনটি নতুন। এই ভবনের নাম নক্ষত্র বাংলা।

আঞ্চলিক কেন্দ্রের কার্যক্রমের মধ্যে মান-মন্দিরগুলির পরিচালনা, আবহযন্ত্র সরঞ্জাম বসানো, যোগানো ও তার মান নিরূপণ এবং বিভিন্ন আবহ মান-মন্দির থেকে সংগৃহীত তথ্য পরীক্ষা ও পৃথকীকরণ, আবহাওয়ার পূর্বাভাস দপ্তরের কাজকর্ম তদারকী, আবহাওয়া সংক্রান্ত অনুসন্ধানের প্রত্যুত্তরগুলি ত্রুটি মুক্ত করা এবং রাজ্য সরকারগণ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সূত্রের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করা অন্তর্ভুক্ত।

সম্প্রতিকালে এই কেন্দ্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে কৃষকদের আবহবার্তা দেবার একটা সুসংহত কার্যসূচী। এর মধ্যে আছে আবহাওয়ার পূর্বাভাস, প্রতিকূল আবহাওয়া সম্বন্ধে সাবধানী সংকেত ও কৃষি মরসুমের আবহাওয়া সংক্রান্ত খবরাখবর জোগানো। কয়েক বছর আগে বায়ুর গতি প্রকৃতি ও শক্তির অনুসন্ধান এবং কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি তৈরির পরীক্ষা চালানোর ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে কারিগরী সাহায্য দেওয়া হয়। এই কেন্দ্রে আবহ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা চলতেই থাকে।

পরিকল্পনা রূপায়ণ সমস্যা

৩ পৃষ্ঠার পর

বেশীর ভাগই, উৎপাদন ব্যবস্থাগুলির কার্য্যকরী তহবিলে লগ্নি করা হয় অর্থাৎ শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এবং কিছু পরিমাণে কৃষকদের কার্য্যকরী মূলধন হিসেবে দেওয়া হয়। কাজেই ব্যাঙ্কগুলিকে তাদের এই কর্ত্তব্য সম্পাদন করতেই হবে। তবে যেটুকু হতে পারে তা হল খুব সতর্কভাবে পরীক্ষা করে কেউ হয়তো বলতে পারেন যে বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কগুলি অপেক্ষাকৃত অল্প অগ্রাধিকারমূলক কাজের জন্য যে টাকা দিচ্ছে, সেটা অপেক্ষাকৃত বেশী অগ্রাধিকারসম্পন্ন কাজে দেওয়া উচিত। ব্যাঙ্কের কার্য্যপদ্ধতিতে খানিকটা পরিবর্ত্তন, সংশোধন করে সমস্ত ব্যবস্থায় একটা সংহতি এনে, কিছুটা অর্থ সঞ্চয় করা যেতে পারে, অথবা সরকারী সংস্থাগুলিতে লগ্নির পরিমাণ বাড়তে পারে অথবা পূর্ব্বের তুলনায় সরকারী তরফের ঋণের পরিমাণ বাড়তে পারে। তবে এগুলিও খুব সতর্কতার সঙ্গে সামান্য সংশোধন পরিবর্ত্তনের ফলেই সম্ভবপর হতে পারে, ব্যাঙ্কগুলি থেকে মোটা টাকা অন্যত্র লগ্নি করা যাবে, সে রকম আশা না করাই ভালো।

সাধারণ ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি প্রকৃতপক্ষে লগ্নি ব্যাঙ্ক নয়, কেবলমাত্র সাময়িক প্রয়োজনের জন্য এগুলি থেকে স্বল্প সময়ের জন্য ঋণ দেওয়া হয়। ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি কাজ চালাবার জন্য মূলধন সরবরাহ করে দীর্ঘ মেয়াদী লগ্নির জন্য মলধন সরবরাহ করেনা। সমস্ত বেসরকারী উৎপাদক এবং ব্যবসায়ীর কাজ চালাবার জন্য মূলধনের দরকার হয় এবং যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের মিশ্রিত অর্থনীতি থাকবে, ততদিন পর্য্যন্ত এদের প্রয়োজন মেটাবার একটা ব্যবস্থাও রাখতে হবে। বর্ত্তমানে, অর্থের বৃহত্তর ব্যবহারের অংশটা আমরা উপেক্ষা করতে পারিনা, সে কথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে। তাছাড়া এটা অবিলম্বে সম্পূর্ণভাবে বদলানো সম্ভব ও নয়।

উচ্চ ফলনের ধান-চাষে সাফল্য

তমলুক কেন্দ্রের 'নাইকুড়ি গ্রামে শেখ আবুল রেজার জমি মাত্র দেড় বিঘে। আগে ঐ জমি থেকে ১০।১৫ মণ ধান তিনি পেতেন। এবার জেলার কৃষি দপ্তরের সহায়তায় দেড় বিঘে জমিতে পর্য্যায়ক্রমে তিনটে ধানের চাষ করেছেন। এতে ফলনের পরিমাণ ৬০।৬৫ মণ ধান। সংসারে তাঁর দশজন মানুষ। তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন, 'আগের বছরের মতো এবার কষ্ট হবে না।'

এই কারণে উচ্চ ফলনের ধানের বীজের চাহিদা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে।

চর্মশিল্প

শ্রীদিলীপ রায়

খাদি ও গ্রামশিল্পের বাণী হ'ল স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও আত্মনির্ভরশীলতার বাণী। প্রাচীনকালে গ্রামগুলি প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল অর্থাৎ গ্রামের প্রয়োজনগুলি গ্রাম থেকেই মেটানো হত। গ্রামের তাঁতি, কুমার, কামার, তখনকার গ্রামগুলির সীমিত প্রয়োজন মেটাতো। অর্দ্ধ শতাব্দির কিছু পূর্ব্বে গান্ধীজী যে কুটির শিল্প এবং চরকা প্রবর্ত্তনের দিকে জোর দিয়েছিলেন তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পল্লীসমাজকে ও বিলুপ্তপ্রায় কুটির শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে গ্রামগুলিকে স্বনির্ভর করে তোলা। আদর্শ পল্লীসমাজ বলতে গান্ধীজী বুঝতেন যে, গ্রামেই তাঁতি, কুমার, ছুতার, কামার, চামার থাকবে এবং এরাও সসম্মানে গ্রামে বাস ক'রে গ্রামের প্রয়োজন মেটাবে। পারস্পরিক লেনদেনের মাধ্যমে একে অপরের প্রয়োজন মেটাবে, সুখে দুঃখে পরস্পরের পাশাপাশি থাকবে। এরা যদি গ্রামের সাধারণ প্রয়োজনগুলি মেটাতে পারে তাহলে পল্লীবাসীদের সামান্য প্রয়োজনের জন্য সহরে ছুটাছুটি করতে হবেনা, সহরের অধিবাসীরাই বরং তাদের নিজেদের প্রয়োজনে গ্রামে আসবেন। অতি সামান্য জিনিস চামড়ার কথাই ধরা যাক। চামড়া যে বর্ত্তমান সভ্যজগতে অতি প্রয়োজনীয় একটা জিনিস তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হয়না। গ্রামগুলি থেকে হাজার হাজার মণ কাঁচা ও পাকা চামড়া সহরে যায়। এখানে গ্রামের চর্মশিল্প সম্পর্কেই দুই একটি কথা বলছি। গ্রামের তথাকথিত হরিজনরা ভারতকে বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জনে সাহায্য করছে।

মৃত মহিষ বা গরুর প্রতিটি জিনিসই কোন না কোন কাজে লাগে। পশুর মৃতদেহ যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উপযুক্তভাবে কাজে লাগানো যায় তাহলে একদিকে যেমন সার পাওয়া যায় অন্যদিকে আরও নানারকম রাসায়নিক বস্তুও পাওয়া যেতে পারে। একটি পশুর স্বাভাবিক মৃত্যুর পর যে দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে তা নিঃসংশয়ে করুণ। যে পশুটি সারাজীবন মানুষের জন্য খাটলো তার প্রতিদানে সে কিছুই পেলনা। কিন্তু মরে গিয়েও এই সব গরু, মহিষ আমাদের উপকার করে, আমাদের প্রয়োজন মেটায়।

যাই হোক প্রায় সব ক্ষেত্রেই মৃত পশুর চামড়াটা কাজে লাগানো হয়। চামড়ার ব্যবহার সহজেই অনুমেয় অবশিষ্ট অংশগুলি যেমন—হাড়, মাংস, চর্বি এগুলির রক্ষণও বিশেষ প্রয়োজনীয়। হাড় থেকে সাধারণত: যে সব জিনিস তৈরি হয় তা হল— বোন চারকোল (রিফাইনারীতে ব্যবহারের জন্য), বোন চায়না (ক্রকারির জন্য), বোন অয়েল (কেমিক্যাল রিএজেন্ট), বোন এ্যাস (ফারমাসিউটিক্যালস), বোন গ্লু (কার্পেন্টির জন্য), বোন মিল (পশুপক্ষীর খাদ্য)। হাড়ের মধ্যে যে ওসিন থাকে তা থেকে খুব উঁচু ধরনের জিলাটিন তৈরী হয়। এ ছাড়া হাড় থেকে ফসফেটযুক্ত সার পাওয়া যায়। মাংস থেকে নাইট্রোজেনযুক্ত সার, হাঁস-মুরগীর খাদ্য ও গ্লু তৈরি হতে পারে। চর্বিকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় (সাবান শিল্পের জন্য) ষ্টিয়ারিক এসিড, পামিটিক এসিড, ওলিক এসিড। এ ছাড়া ১০% গ্লিসারিনও পাওয়া যায়। এমন কি চর্বি থেকে মোমবাতি শিল্পের অনেকখানি প্রয়োজন মেটানো যায়। রক্ত থেকে তৈরি করা যায় হাঁস মুরগীর খাদ্য। এরপর শিং থেকে নানা রকম গৃহসজ্জার দ্রব্যাদি, অন্ত্রাদি থেকে সসেজ কেসিং তৈরি হয়। গরু মহিষের আর একটি প্রয়োজনীয় অংশ হল ক্ষুর। ক্ষুর থেকে এক রকম তেল নিষ্কাসন করা হয় যা সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি যেমন ঘড়ি, বন্দুক, সেলাইর কল, মেগার ইত্যাদির জন্য অপরিহার্য্য। মৃত পশুর কান ও গলার নলীও অপচয়যোগ্য নয়। এগুলি থেকে উঁচু ধরনের আঠা প্রস্তুত হয়। লেজের চুল থেকে ব্রাশ, তুলি ইত্যাদি তৈরী হয়। তবে বর্ত্তমানে নানা ধরনের কৃত্রিম আঁশ এগুলির চাহিদা কিছুটা কমিয়ে দিয়েছে। শিরদাঁড়ার ঠিক পাশটিতে যে তাঁত থাকে তা দিয়েও নিতান্ত কম জিনিস তৈরী হয়না। বিশেষ করে ধুনুরিদের হাতে তুলো ধোনার যে যন্ত্রটি থাকে তার টঙাস্ টঙাস্ শব্দ ঐ অবহেলিত বস্তুটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গোড়াতেই বলা উচিত ছিল যে, গরু মহিষের গোবরও আমাদের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় নয়। সার ছাড়াও এ থেকে আজকাল গ্যাস তৈরী হচ্ছে।

আবহমান কাল থেকেই আমরা জানি যে, চামড়ার কাজটা, একটা বিশিষ্ট শ্রেণীর লোকেরাই করে থাকে। সোজা কথায় তাদের চামার বলা হয়। এরা আমাদের সমাজে চিরকালই অস্পৃশ্য ছিল। শতাব্দির পর শতাব্দির একটা সামাজিক ব্যবধান এদের দূরে রেখেছে। এদের অস্পৃশ্যতার গ্লানি থেকে মুক্ত করার জন্য গান্ধীজী জীবনব্যাপি সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন। তথাকথিত হরিজনদের সামাজিক বাধার অক্টোপাস থেকে মুক্ত করার মন্ত্রগুরু গান্ধীজীর আত্মাহুতি আমাদের চোখের সামনে থেকে একটা কালো পর্দা সরিয়ে দিয়েছে। অস্পৃশ্যতার পাপ যখন দেশ থেকে দূর করা হয়েছে, কাউকে অস্পৃশ্য করে রাখা যখন আইনত: অপরাধ বলে ঘোষিত হয়েছে তখন চামার বলে কাউকে দূরে ঠেলে দেওয়া উচিত নয়। সুতরাং চর্মশিল্পকে রাজ্য জুড়ে এমন কি সারা দেশ জুড়ে এক ব্যাপক কর্ম্মসূচীর অধীনে এনে একে উন্নততর করে তোলা প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে ভারতে প্রতি বছর প্রায় তিন কোটি গরু মহিষ ইত্যাদি মারা যায়। কাজেই এই মৃতদেহগুলি থেকে যে বিপুল পরিমাণ চামড়া ও অন্যান্য জিনিস সংগৃহীত হয় তা সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানোর জন্য একটা ব্যাপক কর্ম্মসূচীর প্রয়োজন। চর্মশিল্পে কাঁচা-মালের অভাব আছে বলে মনে হয়না। সুতরাং যথাযথ একটা শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে লক্ষ হাতে কাজ দেওয়া যেতে পারে। গ্রামগুলি হ'ল অনাবিল জীবনযাত্রার প্রতীক। সুতরাং গ্রামীণ বা পল্লীভিত্তিক শিল্প গড়ে তুলতেই উৎসাহ দেওয়া উচিত।

পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে সয়াবীনের সম্ভাবনা

প্রোটিন সমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে সয়াবীন বহুকাল থেকেই পরিচিত এবং ভারতের কতকগুলি অঞ্চলে সহজেই সয়াবীনের চাষ করা যায়। তবে কিছুদিন পূর্ব পর্য্যন্তও আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে সয়াবীনের চাষ করা হতোনা। আমাদের দেশে সয়াবীনের চাষ সম্ভব কিনা সে সম্পর্কে বর্ত্তমান শতাব্দির গোড়ার দিকে যখন পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় তখন দেখা যায় যে এখানেও সয়াবীনের চাষ সম্ভব। তবে পরিকল্পনা সম্মত পদ্ধতিতে সয়াবীনের চাষ গত তিন বছর থেকে সুরু হয়েছে বলা যায়। ১৯৭০-১ সালের জন্য যে কৃষি উন্নয়ন সূচী তৈরি করা হয়েছে তাতে প্রায় ৫০,০০০ মেট্রিক টন সয়াবীন উৎপাদনের কর্মসূচী রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে আগামী পাঁচ বছরে এর উৎপাদন অনেকগুণ বেড়ে যাবে। তবে এগুলির উৎপাদন অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত চাহিদার ওপরেই নির্ভর করবে।

আমাদের দেশে অবশ্য প্রধানত: এ্যান্টিবায়োটিক শিল্পেই সয়াবীন ব্যবহৃত হয়। খাদ্যশিল্পে এগুলির ব্যবহার এখনও সুরু হয়নি। সয়াবীনের ময়দাকে অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে স্তন্যপায়ী শিশুদের খাদ্য উৎপাদন করা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য বিভাগ, কায়রা জেলা সমবায় দুগ্ধ উৎপাদনকারী ইউনিয়নের (আনন্দ) সঙ্গে একটি চুক্তি করছেন। এই শিল্পটির বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা হল ৬০০০ মেট্রিক টন। সয়াবীন থেকে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন করার উদ্দেশ্যে দুটি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে। বনস্পতি উৎপাদনের জন্য যে সয়াবীন তেল ব্যবহৃত হয় তা বর্ত্তমানে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

সয়াবীনের চাষে ভূমির উর্বরতা বরং বাড়ে। অন্যান্য শস্য যেখানে মাটি থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে, সেই জায়গায় সয়াবীন বাতাস থেকে নাইট্রোজেন নেয় এবং মাটিকে উর্ব্বর করে। যে কোন রকম মাটিতে সয়াবীনের চাষ করা যায়। এগুলির পক্ষে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়াই ভালো।

মগনবাড়ী আশ্রমের (ওয়ার্দ্ধা) আশ্রমিকরা যখন সয়াবীন নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন তখন গান্ধীজী লিখেছিলেন যে, "যাঁরা দরিদ্রদের দৃষ্টিভঙ্গীতে খাদ্য সংস্কার করতে উৎসাহী তাঁদের সয়াবীন নিয়ে পরীক্ষা করা উচিত। সয়াবীন যে অত্যন্ত পুষ্টিকর একটা খাদ্য তাতে কোন সন্দেহ নেই।" এতে কার্বোহাইড্রেটের অংশ খুব কম ব'লে এবং লবণ, প্রোটিন ও চর্ব্বির অংশ বেশী বলে একে খাদ্য হিসেবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা যায়। এর শক্তিমূল্য হল প্রতি পাউণ্ডে ২১০০ ক্যালরি, অপরপক্ষে গম ও ছোলার হল যথাক্রমে ১৭৫০ ও ১৫৩০ ক্যালরি। এতে শতকরা ৪০ ভাগ প্রোটিন এবং শতকরা ২০.৩ ভাগ চর্ব্বি আছে। অপরপক্ষে ছোলা ও ডিমে আছে যথাক্রমে ১৯ এবং ৪.৩ ভাগ আর ১৪.৮ ও ১০.৫ ভাগ। কাজেই প্রোটিন এবং চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য হিসেবে সাধারণত: যা গ্রহণ করা হয় তার ওপরে সয়াবীনের কোন খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নয়। কাজেই খাদ্যহিসেবে সয়াবীন গ্রহণ করলে গম ও ঘীর পরিমাণ কমানো উচিত এবং চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য একেবারেই গ্রহণ করা উচিত নয়।

গরুর দুধে পুষ্টিকর যে সব গুণ আছে সয়াবীনের দুধেও তাই রয়েছে। চীন, কোরিয়া এবং জাপানে যুগ যুগ ধরে সয়াবীনের দুধ ব্যবহৃত হচ্ছে। তাছাড়া শিল্পে, কৃষিতে ও ওষুধ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নানাভাবে সয়াবীন ব্যবহৃত হয়।

চীন ও জাপানে সয়াবীনের তেল দিয়ে রান্না করা হয়। মেসিনে দেওয়ার জন্যও এই তেল ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে সয়াবীনের প্রতিটি অংশ কাজে লাগে। এগুলির পাতা পচিয়ে সার হয়। শুকনো পাতা গরু মহিষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায় এবং তাতে দুধের পরিমাণ বাড়ে। আমেরিকায় দেখা গেছে যে, শূকরকে সয়াবীন খাদ্য দিলে সেগুলির ওজন বাড়ে।

সয়াবীনের তেল বের করে নেওয়ার পর যে খইল থাকে তাতে যথেষ্ট প্রোটিন ও খনিজ পদার্থ থাকে এবং সার হিসেবে, গরু মহিষের খাদ্য হিসেবে এমন কি এগুলি থেকে তৈরি ময়দা মানুষের খাদ্য হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

ঔষধী হিসেবেও সয়াবীন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মাংস, মাছ, ডিম, ডা'ল, রক্তে যে এ্যাসিড সৃষ্টি করে, সয়াবীন বরং তা প্রতিরোধ করে। বহুমূত্রের রোগীদের পক্ষে সয়াবীনের ময়দা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য। এতে যথেষ্ট ফসফেট থাকে বলে নার্ভের দুর্বলতাজনিত রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা যায়। মাংসের প্রোটিন শরীরে ইউরিক এসিডের পরিমাণ বাড়ায় ফলে বাত, কিডনীর দোষ হয়, কিন্তু সয়াবীনের প্রোটিন ইউরিক এ্যাসিডের প্রতিক্রিয়া নষ্ট করে এবং কোন রোগ সৃষ্টি করেনা। বলা হয় যে চীনে সয়াবীন ব্যবহৃত হয় বলে সেখানে বাত রোগই নেই।

সয়াবীন সাধারণত: প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়না তবে অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে অতিরিক্ত খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায়। সেই ক্ষেত্রে তখন খাদ্যে যথেষ্ট প্রোটিন, চর্ব্বি ও লবণ থাকে এবং নিরামিষাশীদের পক্ষে তা উপযুক্ত খাদ্য হয়।

ভারতে কাশ্মীর থেকে নাগাভূমি পর্য্যন্ত উত্তরাঞ্চলের পার্ব্বত্য এলাকাগুলিতে সাধারণত: স্থানীয় চাহিদা মেটানোর জন্য সয়াবীনের চাষ করা হয়। ১৯৫৮ সালে গৃহীত তথ্যে দেখা যায় যে প্রায় ৪৩,০০০ একর জমিতে প্রায় ৬০০০ মেট্রিক টন সয়াবীন উৎপাদিত হয়। সয়াবীন সম্পর্কে একটি সংহত গবেষণাসূচী অনুযায়ী ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদে নানা ধরণের দেশী বিদেশী সয়াবীন নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। জবলপুরের জওহরলাল নেহরু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় পন্থনগরে উত্তর প্রদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা কেন্দ্রে, সয়াবীনের উন্নয়ন সম্পর্কে একটি বিশেষ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এই সব পরীক্ষা নিরীক্ষার ফল হিসেবে, ক্লার্ক, ব্র্যাগ, লী এবং হিল জাতীয় বীজ নিয়ে ব্যাপকভাবে সয়াবীন উৎপাদনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে।

জাতীয় উন্নয়নে কয়লা শিল্পের অবদান

অনিল কুমার মুখোপাধ্যায়

কয়লার ব্যবহার দিয়ে দেশের শিল্পো-ন্নয়নের মাত্রা স্থির করা যায়। ভারতবর্ষে কাজে কয়লার প্রয়োজন সর্বোচ্চ, তা সে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য হোক, বাষ্পচালিত ইঞ্জিন হোক অথবা বাড়ীতে রান্নার জন্যই হোক। এ ছাড়া বিভিন্ন ধাতু নিষ্কাশনের জন্য, লোহা, তামা এবং অন্যান্য ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে, কয়লা ছাড়া কাজ চলতে পারে না। কয়লা থেকে শতাধিক রাসায়নিক এবং ভেষজ দ্রব্য তৈরি করা হয়ে থাকে, যা মানুষের দৈনন্দিন কাজে অপরিহার্য। কয়লা থেকে তৈরি নানা পদার্থ নতুন নতুন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে সুরু করেছে। ভারতে বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে কয়লা থেকে কৃষি সার, পেট্রোল এবং ডিজেল উৎপাদনের সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুসন্ধান চলছে, এবং আশা করা যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে এগুলির জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে।

কয়লা উৎপাদনের কাজ আরম্ভ হয় বাংলার বীরভূম জেলায়, ১৭৮৪ সালে

ওয়ারেণ হেস্টিংসের আমলে। তারপর প্রায় ১০০ বছর ধরে কয়লা খুব একটা ব্যবহারে আসেনি। ১৮৫৩ সালে বাষ্প-চালিত ইঞ্জিনের ব্যবহার আরম্ভ হওয়ার পর কয়লার প্রয়োজন বাড়তে থাকে এবং ১৮৮২ সালে প্রায় ১০ লক্ষ টন কয়লা উৎপাদন করা হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বার্ষিক উৎপাদন ছিল ৬০ লক্ষ টন। ১৮৮০ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত প্রতি দশকে কয়লার উৎপাদন দ্বিগুণ হতে থাকে, যদিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কয়লার উৎপাদনও কমে যায়। ১৯৪২ সালে উৎপাদন হয়েছিল ২৯০ লক্ষ টন এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রাক্কালে কয়লার উৎপাদন হয়েছিল ৩২০ লক্ষ টন। কয়লা শিল্পের এই ইতিহাসে দেখা যায় উৎপাদন ক্ষমতা ৩২০ লক্ষ টনে আনতে ১৬৭ বছর সময় লেগেছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৬)

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন শ্রমশিল্পের উন্নয়নের সংস্থান রাখা হয়। এগুলির সঙ্গে কয়লা শিল্পের প্রগতি অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত। ১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৫৫-৫৬ এই পাঁচ বছরে কয়লার উৎপাদন বার্ষিক ৩২০ লক্ষ টন থেকে ৩৮০ লক্ষ টনে আনা যাবে বলে আশা করা হয়। এই বাড়তি ৬০ লক্ষ টন প্রয়োজন ছিল ইঞ্জিনীয়ারিং, শ্রম শিল্প (৪০ লক্ষ টন), রেলওয়ে (১০ লক্ষ টন) এবং তাপজাত বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য প্রয়োজনে (১০ লক্ষ টন)। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আশা অনুযায়ী ১৯৫৫-৫৬ সালে কয়লার উৎপাদন হয়েছিল ৩৮২ লক্ষ টন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৫৬-৬১)

দ্বিতীয় পরিকল্পনা মুখ্যত: শ্রম শিল্পের উন্নতির পরিকল্পনা। তার পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করা হয়েছিল যে ১৯৬০-৬১ সালে কয়লার চাহিদা ৬০০ লক্ষ টন হবে। এই গুরু দায়িত্ব পূরণের জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠান 'ন্যাশনাল কোল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন' সৃষ্টি করা হয়। সরকারী উদ্যোগে কয়লা আহরণ করার পরিমাণ ১৬৫ লক্ষ টন ধরা হয়েছিল এবং বেসরকারী খনিগুলির উৎপাদন ধরা হয়েছিল ৪৩৫ লক্ষ টন। সরকারী তরফে বিহার, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশে কতকগুলি নতুন কয়লাখনি খননের কাজ আরম্ভ করা হয়। তাছাড়া ধাতু শিল্পে ব্যবহারের জন্য যে 'কোকিং' কয়লার প্রয়োজন তার চাহিদা মেটানোর জন্য চারটি কেন্দ্রীয় ওয়াসারি এবং দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার সঙ্গে আর একটি ওয়াসারি তৈরি করার ব্যবস্থা করা হয়। এই ওয়াসারিতে উৎপন্ন মধ্যম শ্রেণীর কয়লা ব্যবহারের জন্য বিহার-বাংলা কয়লা ক্ষেত্রে তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রত্যাশানুযায়ী, কয়লা উৎপাদনের ক্ষেত্রে, সাফল্য অর্জন করা গিয়েছিল। ১৯৬০-৬১ সালে মোট উৎপাদন হয় ৫৫৫ লক্ষ টন, এর মধ্যে বেসরকারী এবং সরকারী খনিগুলিতে যথাক্রমে ৪৪৮ এবং ১০৭ লক্ষ টন উৎপন্ন হয়েছিল।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬১-৬৬)

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে লোহা, ইস্পাত, অন্যান্য ধাতু এবং ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি শ্রম শিল্পগুলি সম্প্রসারণে এবং তাপ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন এবং রেল ইঞ্জিনের প্রয়োজনে কয়লার চাহিদা বাড়বে বলে অনুমান করা হয়। এই ধারণা অনুযায়ী ১৯৬৫-৬৬ সালে ৯৭০ লক্ষ টন কয়লা প্রয়োজন হবে বলে ধরা হয় (যার মধ্যে সরকারী এবং বেসরকারী খনিগুলির অংশ ধরা হয় যথাক্রমে ৩৬৫ এবং ৬০৫ লক্ষ টন)। নতুন কয়লা ওয়াসারি স্থাপনের সংস্থানও রাখা হয়। ইস্পাত কারখানা, রেলওয়ে এবং তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিকে কয়লা সরবরাহ করার জন্য কিন্তু তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে দেখা গেল কয়লার চাহিদা সেভাবে বাড়ছে না, কারণ শ্রমশিল্পগুলির কাজ বিভিন্ন কারণে ব্যাহত হচ্ছিল। কয়েকবার বিভিন্ন সমিতি এই বিষয়ে পর্যালোচনা করে। বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতে কয়লা উৎপাদন এবং সরবরাহ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করে এবং প্রায় ১৬ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা ঋণ হিসেবে দিতে স্বীকৃত হয় যাতে তৃতীয় পরিকল্পনায় কয়লা উৎপাদনের কাজ অব্যাহত থাকে। এই ঋণের বহুলাংশ ব্যয় হয় বেসরকারী খনিগুলির জন্য, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আমদানী করায় এবং উৎপাদন বাড়াবার কাজে। দুর্ভাগ্যবশত: পরিকল্পনার কাজগুলি সুসম্পন্ন হতে পারেনি এবং ১৯৬৪-৬৬ সালে মোট উৎপাদন হয় ৭০৩ লক্ষ টন। এর মধ্যে

বোকারো কয়লা ওয়াসারি

বেসরকারী এবং সরকারী কয়লা খনিগুলির অংশ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫৪১ এবং ১৬২ লক্ষ টন। এই পরিকল্পনাকালের একটি বিশেষ সাফল্য হচ্ছে তামিলনাড়ু রাজ্যের নেইভেলীতে লিগনাইট (ধূসর কয়লা) খনির কাজ সুরু হওয়া। ১৯৬৫-৬৬ সালে সরকারী 'নেইভেলী লিগনাইট কর্পোরেশন' ২৫,৬১,০০০ টন লিগনাইট উৎপাদন করে। লিগনাইট ব্যবহার করা হচ্ছে তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন ও কৃষি সার উৎপাদনের জন্য এবং ধূম্র বিহীন জ্বালানী হিসাবে।

অন্তবর্তীকালীন বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬৬-৬৯)

তৃতীয় পরিকল্পনার পর তিন বছর অন্তবর্তীকালীন বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই তিন বছর মুখ্যতঃ উদ্দেশ্য ছিল চালু কাজগুলি সম্পন্ন করা এবং খনিগুলি থেকে পর্যাপ্ত কয়লা উৎপাদন করা। শ্রমশিল্পে সাময়িক যে অবনতির ভাব দেখা গিয়েছিল সেটা এই তিন বছরে কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়। শ্রমশিল্পে আবার প্রগতির ফলে কয়লার চাহিদাও বাড়তে থাকে। ১৯৬৬-৬৭ এবং ১৯৬৭-৬৮ সালের প্রতি বছরই প্রায় ৭১০ লক্ষ টন কয়লা উৎপাদন করা হয়। যার মধ্যে বেসরকারী এবং সরকারী খনিগুলির অংশ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫৪৫ এবং ১৬৫ লক্ষ টন। ১৯৬৮-৬৯ সালে প্রায় ৭৫০ লক্ষ টন কয়লা উৎপন্ন হয় এবং সরকারী খনিগুলির উৎপাদনের অংশ দাঁড়ায় আনুমানিক ২০৫ লক্ষ টন।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬৯-৭৪)

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করার পূর্বে বিভিন্ন শ্রমশিল্পে কয়লার চাহিদা, খনিগুলির উৎপাদন ক্ষমতা, অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ অধ্যয়ন করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশে খনি এবং ধাতু মন্ত্রক একটি কয়লা পরিকল্পনা সমীক্ষা সমিতি গঠন করে। এই সমিতি আবার ৮টি বিভিন্ন গোষ্ঠি গঠন করে। এই বিশেষ সমীক্ষাগুলিতে শুধু সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিই অংশ গ্রহণ করেনি, বিভিন্ন বেসরকারী খনিমালিক, তাঁদের সংস্থা, ব্যবহারকারী সংস্থা ইত্যাদি তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন এবং পরিকল্পনা কার্যে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেন।

চতুর্থ পরিকল্পনার সর্বশেষ বৎসর অর্থাৎ ১৯৭৩-৭৪ সালে কয়লার চাহিদা মোট ৯৩৫ লক্ষ টন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এর মধ্যে লোহা এবং ইস্পাত কারখানাগুলির চাহিদা ২৫৪ লক্ষ টন (কোকিং কয়লা)। রেলের চাহিদা ১৯৬৯-৭০ সালে ১৬২ লক্ষ টন থেকে কমে ১৯৭৩-৭৪ সালে ১৩৪ লক্ষ টন হবে। অধিক বৈদ্যুতিক এবং ডিজেল ইঞ্জিন ব্যবহারের ফলে বাষ্পীয় ইঞ্জিনে কয়লার চাহিদা কমে যাবে। তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হবে ১৮০ লক্ষ টন (মধ্যম কয়লা ছাড়া)।

আশা করা যাচ্ছে ১৯৭৩-৭৪ সালে সরকারী এবং বেসরকারী খনিগুলি যথাক্রমে ২৭০ এবং ৬৬৫ লক্ষ টন কয়লা উৎপাদন করবে। এর মধ্যে বাংলা বিহার কয়লা ক্ষেত্র থেকে মোট প্রায় ৫৮৮ লক্ষ টন পাওয়া যাবে। এ ছাড়া নেইভেলীতে প্রায় ৬০ লক্ষ টন লিগনাইট উৎপাদন করা যাবে।

কয়লা পরিকল্পনা সমিতির হিসেব মত চতুর্থ পরিকল্পনার সময়ে কয়লার চাহিদা মেটাতে যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সরঞ্জামে প্রায় ১১৪ কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ করতে হবে।

সরকারী খনিগুলির সম্প্রসারণ এবং নতুন কয়লাখনি খোলার জন্য পরিকল্পনা কমিশন যে ব্যয় বরাদ্দ করেছেন তা হল :—

চালু কাজ

ন্যাশনাল কোল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন

	(লক্ষ টাকায়)
কোকিং কয়লাখনি, কয়লা ওয়াসারি, সাধারণ কয়লাখনি	২৯০০
নেইভেলী লিগনাইট কর্পোরেশন	২৪৫
কোল বোর্ডের তৃতীয় পরিকল্পনায় রোপওয়ে ব্যবস্থা	২৭৮

নতুন কাজ

ন্যাশনাল কোল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন

কোকিং কয়লাখনি—মনিডিহ কয়লা ওয়াসারি	১৫০০
অন্যান্য পরিকল্পনা —	৫০০

কোল বোর্ড

চতুর্থ পরিকল্পনায় কয়লা পরিবহন ব্যবস্থা	১০০০
মোট	৬৪২৩

এ ছাড়া আশা করা যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে কয়লা থেকে কৃষি সার উৎপাদনের জন্য ৩টি কারখানা হয়তো চতুর্থ পরিকল্পনাকালে স্থাপন করা সম্ভব হতে পারে।

কয়লা থেকে পেট্রোল বা ডিজেল তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই কৃত্রিম পেট্রোল তৈরি সম্ভব কিনা সে ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন। দেশে খনিজ তেলের একান্ত অভাব এবং বছরে প্রায় ১০০ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা ব্যয় করে খনিজ তেল আমদানী করতে হচ্ছে। কয়লা থেকে কৃত্রিম পেট্রোল তৈরি সম্ভব হলে প্রভূত বিদেশী মুদ্রার সাশ্রয় হবে এবং কয়লার উৎপাদনও বহুগুণ বেড়ে যাবে।

পশ্চিমবাংলার চতুর্থ পরিকল্পনা

পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখার্জী ও রাজ্যের উন্নয়নমন্ত্রী শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডি. আর. গাডগিলের সঙ্গে রাজ্যের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক পরিকল্পনা প্রসঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। সভায় রাজ্যের সম্পদ এবং সম্পদ সংগ্রহের সম্ভাবনা নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়।

উন্নয়নমন্ত্রী শ্রীলাহিড়ী কলকাতা মহানগরীর উন্নয়ন কর্মসূচী ও দ্বিতীয় হুগলী সেতু নির্মাণের জন্য অর্থের প্রয়োজনের কথাও তোলেন।

রাজ্য অনুসারে কয়লা উৎপাদন

(হাজার টন)

	১৯৬০	১৯৬৫	১৯৬৬	১৯৬৭	১৯৬৮
বিহার	২৫০০০	৩১০০০	৩১০০০	৩০০০০	৩২০০০
বাংলা	১৬৫০০	২০০০০	১৯৮০০	২০০০০	২০০০০
মধ্যপ্রদেশ	৬৩০০	৯১০০	৯৮০০	১০৮০০	১১৬০০
অন্ধ্রপ্রদেশ	২৫০০	৪০০০	৪১০০	৪১০০	৪০০০
উড়িষ্যা	৮০০	১২০০	১২০০	১২০০	১৩০০
আসাম	৭০০	৬০০	৫০০	৫০০	৫০০
রাজস্থান	৪২	১১	৭	২	৫
মহারাষ্ট্র	৮০০	১১০০	১২০০	১৩০০	১৬০০
কাশ্মীর	২৮	৩	৬	৯	১৫
তামিলনাড়ু	—	২৩০০	২৬০০	২৯০০	৪১০০
মোট	৫২৬৭০	৬৯৩১৪	৭০১১৩	৭০৯১১	৭৫১২০

মাছ

পূর্ব্ব বছরের তুলনায় ১৯৬৮ সালে বেশী মাছ ধরা হয়েছে

১৯৬৮ সালে সমগ্র বিশ্বে মোট ৬৪,০০০,০০০ মেট্রিক টন মাছ ধরা হয়েছে। পূর্ব বছরে এর পরিমাণ ছিল ৬০,৭০০,০০০ মেট্রিক টন। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার একটি বিবরণীতে বলা হয়েছে যে ১৯৬৮ সালে যত মাছ ধরা হয়েছে তার মধ্যে নদী, পুকুর, হ্রদ ইত্যাদি থেকে ৭,৪০০,০০০ মেট্রিক টন এবং সমুদ্র থেকে ৫৬,৬০০,০০০ মেট্রিক টন থেকে ধরা হয়েছে।

এর মধ্যে ভারতে ধরা হয়েছে ১,৫২৬,০০০ মেট্রিক টন এবং বিশ্বের মৎস্য শিকারী দেশগুলির মধ্যে ভারতের স্থান হ'ল নবম।

পেরু ১০,৫২০,৩০০ মেট্রিক টন ধরে আবারও প্রথম স্থান অধিকার করেছে। জাপান ৮,৬৬৯,৮০০ টন মাছ ধরে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। সোভিয়েট ইউনিয়ন ধরেছে ৬,০৮২,১০০ টন এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। ৫,৮০০,০০০ টন মাছ ধরে চীন চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে। চীন সম্পর্কে সাম্প্রতিক কোন তথ্য পাওয়া যায়নি তবে ১৯৬০ সালের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে এই পরিমাণ দেওয়া হয়েছে।

২,৮০০,১০০ টন মাছ ধরে নরওয়ে পঞ্চম স্থান অধিকার করে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ২,৪৪২,০০০ টন মাছ ধরে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে। এর পরের স্থান হ'ল দক্ষিণ আফ্রিকার এবং মাছ ধরার পরিমাণ ২,০০০,০০০ টন। অন্যান্য যে সব দেশে ২০ লক্ষ মেট্রিক টনের কম মাছ ধরা হয়েছে সেগুলি হ'ল ডেনমার্ক, ভারত, স্পেন, ক্যানাডা, চিলি, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড এবং বৃটেন।

সুতাকল শ্রমিকের সংখ্যা

১৯৬৮ সালের ১লা জানুয়ারীর হিসেব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে সুতাকল শ্রমিকের মোট সংখ্যা হ'ল ৫০,৮০৬ জন। সুতাকল শ্রমিকদের সর্বোচ্চ বেতনের হার ৪৩১.০১ টাকা এবং সর্বনিম্ন বেতন হার ১৩৮.৯০ টাকা।

গভীর জলে ধানের চাষ সম্ভব

পশ্চিমবঙ্গে গভীর জলে ধানচাষের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাফল্যের পথে। এ সম্পর্কে গত সংখ্যায় কিছু খবর দেওয়া হয়েছে। নীচু জমিতে জল জমাজনিত সমস্যা শুধু বাঙলারই সমস্যা নয়। অতএব দেশের অন্যত্র এই সমস্যা আছে কি না এবং থাকলে সে সম্পর্কে কী করা হয়েছে ও কোনোও বিশেষ পদ্ধতি প্রচলিত আছে কি না তা' জানা লাভজনক হ'তে পারে।

এই প্রসঙ্গে তামিলনাড়ুর তাঞ্জাউর জেলার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ধানপ্রধান অঞ্চল হলেও জেলার সর্বত্র ধান চাষের পদ্ধতি এক নয়। যেমন তিরুত্তুরাই-পুণ্ডি তালুকে বিশেষ করে, তালাইনায়ার মুথুপেট ব্লকে সহজেই বর্ষার জল জমে যায়; প্রবল বর্ষার সময় জলের গভীরতা দাঁড়ায় ৫ ফুট পর্যন্ত। অতএব ঐ সব জমিতে ধান বুনলে গাছের উচ্চতা ৫ ফুটের ওপর না হলে, ফসল ঘরে তোলা যায় না, পচে নষ্ট হয়। সম্প্রতি কৃষিবিভাগ সেখানে তালাইনায়ার ১ ও ২ নামের দুটি বীজ বিলি করেছে। ধানের বীজ বুনে, চারা বেরোলো সেগুলি সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ায় নীচু জমিতে বসিয়ে দেওয়া হয়। তারপর যেমন যেমন জল বাড়ে, চারাগুলিও জলের ওপর মাথা তুলে দাঁড়ায় এবং ধান পাকে ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে। ধান কাটার সময় হলে চাষীরা ছোট ছোট ডিঙা নৌকোতে চড়ে ধান কাটেন। ধানের আঁটিগুলি দড়ি দিয়ে বেঁধে জলের মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় উঁচু জমিতে। এই বীজের ধানের পরিমাণ নাকি একর প্রতি ৯০০ কিলোগ্রাম। মোট প্রায় ৩০,০০০ একর জমিতে, এই পদ্ধতিতে ধানের চাষ করা হয়। এ ছাড়াও যে সব জমিতে জল জমে দু'ফুট পর্যন্ত যে সব জমিতে দ্রুত ফলন ও দীর্ঘমেয়াদী—এই দুটি জাতের বীজ একত্রে বোনা হয়। দ্রুত ফলনের গাছে ফসল পাকতে পাকতে অন্য জাতের চারাগুলি মাথা তোলে। ফলে, এই জমিতে অল্প আয়াসে পর পর দুটি ফলন একই সময়ে পাওয়া যায়।

★

ডলার উপার্জ্জনে

ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রী

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রীর চাহিদা ক্রমশঃ বাড়ছে। ১৯৬৮-৬৯ সালে ৩৬৩.৩২ লক্ষ টাকা মূল্যের ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যাদি মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী করা হয়। পূর্ব্ব বছরে এই রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ২৫৩.৯৭ লক্ষ টাকা।

ভারতের মোট রপ্তানীর তুলনায় এই টাকাটা খুব সামান্য মনে হলেও, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো অত্যন্ত উন্নত দেশেও যে ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রী অনুপ্রবেশ করতে পেরেছে এইটেই হ'ল অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা। ১৯৬৮-৬৯ সালে ভারত প্রায় ৪০ রকমের ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রী মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী করে। এগুলির মধ্যে কয়েকটি প্রধান দ্রব্য হল—এম. এস. পাইপ ও টিউব, ইস্পাতের স্ট্রাকচারেল ইঞ্জিন, বিদ্যুৎবাহী তারের দড়ি, ঢালাই লোহার দ্রব্যাদি, মেসিন টুল, মোটরগাড়ীর অংশাদি, বাই-সাইকেলের অংশাদি, জিনিসপত্র ওপরে ওঠানোর মেসিন, লিফ্‌ট্, ক্রেণ, পিতলের জিনিসপত্র।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, বাই-সাইকেল এবং এর অংশাদির রপ্তানীর পরিমাণ ১৯৬৭-৬৮ সালের ৭.৪০ লক্ষ টাকার তুলনায় ১৯৬৮-৬৯ সালে তা দাঁড়ায় ১৯.১৬ লক্ষ টাকায়; মেসিন টুলের রপ্তানীর পরিমাণ ৬.৮৮ লক্ষ টাকা থেকে ১২.৯০ লক্ষ টাকায় এবং স্ক্রুর রপ্তানীর পরিমাণ ২.৭৯ লক্ষ টাকা থেকে ১৬.৮৩ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। আগামী কয়েক বছরেও এগুলির রপ্তানীর পরিমাণ বাড়বে বলে আশা করা যায়। অন্যান্য ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রীর রপ্তানীও বাড়বে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

মাকিন যুক্তরাষ্ট্র গত বছরে আমাদের দেশ থেকে যেমন নানা ধরণের ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রী আমদানি করেছে, তেমনি এই আমদানির পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়বে বলে মনে হয়। অন্যান্য দেশের প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়ায় এবং কৃত্রিম পদ্ধতিতে নানা রকম জিনিস তৈরী হচ্ছে বলে, ভারত চিরকাল যে সব জিনিস রপ্তানী করেছে সেগুলির পরিমাণ কমে যেতে পারে। সেইজন্যই ভারতের এখন অন্যান্য জিনিস রপ্তানী করার দিকে বেশী মনযোগ দিতে হবে এবং সেইদিক দিয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রীর রপ্তানী বাড়বার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এই দিক থেকে প্রধান বাধা হ'ল জাহাজ ভাড়া। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রীর রপ্তানী বাড়বার এই সম্ভাবনার দিকে আরও বেশী মনযোগ দেওয়া উচিত।

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রীর রপ্তানী বাড়ানোর জন্য ভারত সরকার অবশ্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন। ইস্পাত ও ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রীর রপ্তানী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকার বোষ্টনে একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শদাতা হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। ব্যবসা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে প্রচারকার্য্য, বাজার পর্য্যালোচনা, ব্যবসায়ীদের এদেশে আসতে আরও বেশী উৎসাহদান এবং আরও নানাভাবে ব্যবসা বৃদ্ধিতে উৎসাহদান ইত্যাদি নানা রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে।

ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পগুলি যাতে তাদের ক্ষমতা সম্পূর্ণ কাজে লাগিয়ে উৎপাদন যথেষ্ট বাড়িয়ে উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য হ্রাস করতে পারে তা সুনিশ্চিত করাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিছুদিন পূর্ব্বেও বেশীর ভাগ ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প সম্পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা কাজে লাগাতে পারছিল না, অনেক ক্ষেত্রে শতকরা ৪০ থেকে ৫০ ভাগ মেসিন অলস প'ড়ে ছিল। কিন্তু সম্প্রতি কাঁচামালের সরবরাহে উন্নতি হওয়ায় অবস্থারও উন্নতি হয়েছে এবং ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পও তাদের উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধি ও তা বিভিন্নমুখীন করার উদ্দেশ্যে এই শিল্পকে আর্থিক সাহায্য ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধে দেওয়াও এখন বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে, ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রীর প্রধান প্রতিযোগী দেশগুলি হ'ল জাপান, পশ্চিম জার্মানী এবং বৃটেন। এই সব দেশের মতো ভারতের ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পকেও সমান দক্ষ ও আধুনিক করা প্রয়োজন। রপ্তানীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সরকার উভয়েই যদি উভয়ের সহযোগিতায় আরও বেশী সচেষ্ট হন তাহলে ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রী থেকে ভারত আরও বেশী ডলার উপার্জ্জন করতে সক্ষম হবে।

হলদিয়া বন্দর

২ পৃষ্ঠার পর

তমলুক হ'ল—ইতিহাস প্রসিদ্ধ তাম্রলিপ্ত বন্দরের আধুনিক রূপ। এককালে ভারতীয় পণ্য নিয়ে পালতোলা ভারতীয় জাহাজ এই তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে ভেসে যেত দেশ বিদেশের বন্দরে, বাজারে। কালস্রোতে একদা তাম্রলিপ্ত ইতিহাসে পরিণত হয়। কিন্তু কালের চক্র অবিরত চলছে। হলদিয়া আবার গড়ে উঠছে—পুরানো তাম্রলিপ্তের উত্তর সাধক হিসেবে।

হলদিয়া বন্দর ঘিরে যে সব নূতন নূতন শিল্প গড়ে উঠবে তৈল শোধনাগার স্থাপন তার প্রথম পদক্ষেপ। শোধনাগারের পর বসবে সারের কারখানা। এ ছাড়া সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে বহু কল কারখানা গড়ে ওঠার সুযোগ রাখা হয়েছে। এই শিল্পগুলি কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে জনবসতি। ধীরে ধীরে নূতন শিল্প নগরীর পত্তন হবে হলদিয়ার মাটিতে। চারপাশ থেকে নানা রকমের পণ্য আসবে রেল, সড়ক, নদী পথে। কিছু লাগবে এখানকার শিল্পের কাজে বাকী চলে যাবে বিদেশের বাজারে, বন্দর থেকে জাহাজে করে। এই নূতন তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকেই আবার সেই বিস্মৃত প্রায় যুগের মত, ভারতীয় জাহাজ, ভারতের পণ্য নিয়ে বিদেশের বন্দরে বাজারে ভিড়বে—ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছার প্রতীক হিসেবে।

ম্যাঙ্গালোর বন্দর

মহীশূর রাজ্যের ১৯টি বন্দরের অন্যতম ম্যাঙ্গালোর বন্দর দিয়ে ১৯৫৭ ৫৮ সালে মাল চলাচল করে প্রায় ২,৯৯,০০০ টন এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে তা দাঁড়ায় ৪,৮৮,২৪৮ টনে। ঐ বন্দর মারফৎ লৌহ আকর পাঠাবার ব্যবস্থা সুরু করার পরে মাল পরিবহনের পরিমাণ বেড়ে যায়। পানাম্বুরে (ম্যাঙ্গালোরে) বড় বন্দরটির সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে ছোট খাটো বন্দরে অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা বিধানের প্রয়োজনীয়তা নেই বলে গণ্য করা হয়। বিগত পরিকল্পনাগুলির সময়েও এই কারণেই ছোট বন্দরগুলির প্রতি বেশী মনোযোগ দেওয়া হয়নি। অবশ্য এখন জাহাজ স্টীমার ও মাছধরা নৌকা প্রভৃতির জন্য এই বন্দরটি খুলে রাখা বাঞ্ছনীয় হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

উপস্থিত এই বন্দর দিয়ে বছরে প্রায় ১০ লক্ষ টন মাল চলাচল করে। পানাম্বুরের বড় বন্দরটির সম্প্রসারণের ভার নিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার। প্রথম পর্যায়ে ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয় ২৪ কোটি টাকা। এ পর্যন্ত এই কার্যসূচীর রূপায়ণে ব্যয় হয়েছে মোট ৬ কোটি টাকা।

রকেট প্রপেলেণ্ট

কেরালার থুম্বায় রকেট প্রপেলেন্ট তৈরির কারখানা সাউণ্ডিং রকেটের জন্য কম্পোজিট শ্রেণীর সলিড রকেট তৈরি সুরু করেছে। ভাবা পারমাণবিক কেন্দ্রের রাসায়নিক ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের অধীনে এই কারখানাটি চালু হয়েছে। ভাবা আণবিক গবেষণা কেন্দ্র ফ্রান্সের একটি সংস্থার কারিগরী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সুবিধা নিয়ে এটি তৈরির কাজ সুরু করার উদ্যোগ আয়োজন করছে। এ ছাড়া থুম্বায় মহাকাশ বিজ্ঞান ও কারিগরী কেন্দ্রের নক্সানুযায়ী তৈরি রকেটের জন্য দেশেই প্রয়োজনীয় প্রপেলেন্ট তৈরির কাজ সুরু করার সঙ্কল্পও রয়েছে।

ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন ১৯৬৮-৬৯-এ আবার আশাতিরিক্ত আয় করেছে। আয়ের পরিমাণ হবে ৫২৬ কোটি টাকা। মোট মুনাফার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২.৪১ কোটি টাকা। সুদ ও ব্যয় বাদ দিলে নীট মুনাফার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮.৪৬ কোটি টাকা।

সার বিতরণ ব্যবস্থা সহজীকরণ

চাষীদের মধ্যে সার বিতরণের ব্যবস্থায় সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার সার—বিক্রয় সংক্রান্ত আইনগত নিয়মকানুন যথেষ্ট শিথিল করেছেন। নতুন নিয়ম অনুযায়ী যে কোন ব্যবসায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে নাম রেজিষ্ট্রি করে সার বিক্রী করতে পারেন। অসাধু ব্যবসায়ীরা যাতে এই উদার নীতির অপব্যবহার না করতে পারে সেজন্য রাজ্য সরকারদের সজাগ ও সচেষ্ট থাকতে হবে।

গত ৯ বছরে দেশের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরির কারখানাগুলিতে ১০০ কোটি টাকা মূল্যের ট্রাক ও ভ্যান তৈরি হয়েছে। কারখানাগুলির অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতার সুপ্রয়োগের জন্য অতিরিক্ত মূলধন হিসেবে মাত্র ৫ কোটি টাকা লগ্নী করা হয়। কারখানাগুলিতে ৩ টনী শক্তিমান ট্রাক, ১ টনী নিশান ট্রাক ও নিশান যান তৈরি হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ৪০,০০০ গাড়ী তৈরি হয়েছে।

উন্নয়ন বার্তা

★ হলদিয়া তৈলশোধনাগারের নির্ম্মাণ-কার্য্য আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। ফ্রান্স ও রুমানিয়ার সহযোগিতায় ৫৫ কোটি টাকায় নির্ম্মীয়মান এই শোধনাগারের নির্দ্ধারিত শোধন ক্ষমতা হ'ল ৩৫ লক্ষ টন।

★ কানপুরে, পান্‌কিতে, ইণ্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভস্ লিমিটেডের কানপুর-সার-কারখানায় কাজ শুরু হয়েছে। কারখানার জন্য ব্যয় হয়েছে ৬২ কোটি টাকা।

★ চেকোস্লোভাকিয়ার সহযোগিতায়, ৮.২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে আজমীরে তৈরী গ্রাইণ্ডিং মেশিন টুল প্লান্টে পরীক্ষামূলক-ভাবে উৎপাদনের কাজ শুরু করা হয়েছে। এ পর্য্যন্ত ৮৫ লক্ষ টাকার মাল উৎপন্ন হয়েছে।

★ তামিলনাড়ুতে যান্ত্রিক সরঞ্জামের একটি কারখানা, নলকূপ খননের উপযোগী একটি ড্রিল তৈরী করেছে। দিশী ড্রিল-টির দাম আমদানী-করা ড্রিলের দামের অর্দ্ধেক।

★ একটি ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান বরাতমত সংযুক্ত-আরব-সাধারণতন্ত্রে একটি ডিমিনারেলাইজিং প্লান্ট সরবরাহ করেছে। এটির দাম হচ্ছে ২০ লক্ষ টাকা। শিল্প প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে ঐ বরাত আদায় করে।

★ মাদ্রাজে, সরকার পরিচালিত হিন্দুস্তান টেলিপ্রিন্টার সংস্থা আরবীক ভাষায় টেলিপ্রিন্টার রপ্তানী করার জন্যে কুয়ায়েৎ-এর কাছ থেকে বরাত পেয়েছে।

★ তামিলনাড়ুতে, সালেম থেকে ১৩ কিলোমীটার দূরে কাঞ্জামালাই-তে একটি নতুন খনি কাটার প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। কাঞ্জামালাই-এর পাহাড়ের ঢালুগুলির গভীরে লোহার স্তরের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় যে চৌম্বক পাথর আছে সেগুলিকে পৃথকভাবে কেটে বার করার সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি উদ্ভাবনই হ'ল এই নতুন খনি খোলার উদ্দেশ্য।

★ জাপানের ইস্পাতের কারখানাগুলি আসছে বছরে প্রায় ৬০ কোটি টাকা মূল্যের ৯০ লক্ষ টন ভারতীয় লৌহ আকর খরিদ করতে সম্মত হয়েছে।

★ ১৯৬৯ সালের অক্টোবর মাসে ভারতীয় রেলব্যবস্থা মোট আয় করে ৭৮.২৫ কোটি টাকা। গত বছরের অক্টোবরের তুলনায় এই পরিমাণ প্রায় ৭.৫৯ কোটি টাকা বেশী।

★ ১৯৬৯-৭০ সালে গুজরাট, কেরালা ও মধ্যপ্রদেশে গৃহনির্ম্মাণসূচী রূপায়ণের ব্যয় হিসেবে কেন্দ্রীয় পূর্ত্ত, গৃহনির্ম্মাণ ও নগর উন্নয়ন বিভাগ ঐ রাজ্যগুলিকে ১.৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

★ ভারতসরকার কলকাতার রিহ্যাবিলিটেশান ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড্‌কে, কার্য্যকরী মূলধন বাবদ ১৫ লক্ষ টাকার ঋণ মঞ্জুর করেছেন।

★ পালি-সিরোহী রাজপথের মধ্যে (পালি থেকে ৪০ মাইল দূরে) মিঠরী নদীর ওপর একটি সেতু তৈরীর জন্যে শিলান্যাস করা হয়েছে। ৫৬৮ ফুট দীর্ঘ এই সেতুর জন্যে ৮ লক্ষ টাকা খরচ হবে। এই সেতু শেষ হ'তে ৮ মাস সময় লাগবে। এটির নির্ম্মাণকালে ৭০০ জনের কর্মসংস্থান হবে।

★ বিদেশে, ভারতীয় রেশমী বস্ত্রের রপ্তানী খুব বেড়ে গেছে। বর্ত্তমান বছরের প্রথম আট মাসে, ভারত ৭.২৫ কোটি টাকার রেশমী বিদেশে রপ্তানী করে। এই তুলনায় ১৯৬৮ সালের মোট রপ্তানীর পরিমাণ ছিলো ৫.৫০ কোটি টাকা।

পশ্চিমবঙ্গে সরকারী ফিসারী

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মোট সরকারী ফিসারী ৩২টি। তা ছাড়া মেদিনীপুর জেলার আলমপুরের আরও ১৪টি সরকার-পরিচালিত পুষ্করিণী স্টেট ফিসারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডকে, উন্নয়নের জন্য, ১৯৬৮ সালের আগস্ট মাসে হস্তান্তরিত করা হয়েছে। ১৯৬৮-৬৯ সালে সরকারী ফিসারীগুলো থেকে বাজারে ৭৮,৩৩৫ কে. জি. মাছ সরবরাহ করা হয়েছিল।

সংরক্ষণের কাজ আরম্ভ

সমগ্র পশ্চিম বাংলায় মোট কত মন্দির, মসজিদ এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ আছে তার তালিকা প্রস্তুত করবার জন্য রাজ্যের পূর্ত্ত দপ্তর কাজ আরম্ভ করেছেন। এই সম্পর্কে কোন তালিকা গত বিশ বছরে প্রস্তুত হয় নি। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দীকালের যে সমস্ত মন্দির, মসজিদ ও অন্যান্য স্মৃতিসৌধ পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে সেগুলির সংরক্ষণের জন্য রাজ্য-সরকারের পূর্ত্ত দপ্তর এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ১৯৭০ সালের মধ্যেই কুড়ি থেকে ত্রিশটি মন্দির, মসজিদ প্রভৃতি সংরক্ষণের কাজ শেষ হ'বে।

ধনধান্যে-তে কেবল অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। প্রবন্ধাদি অনধিক পনের শত শব্দের হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট ও গোটা গোটা অক্ষরে লিখলে ভালো।

REGD. NO. D-233

ইঞ্জিনীয়ারিং-এর টুকিটাকি

মাদ্রাজে পোর্ট ট্রাস্ট নিজেদের কারখানায় তৈরি একটি পাইলট লঞ্চ জলে ভাসিয়েছে। সম্পূর্ণ দেশীয় যন্ত্রপাতি দিয়ে তৈরি এই লঞ্চটি অগ্রগতির পথে দ্রুত গতিশীল, মাদ্রাজ বন্দরের একটি বিশেষ সম্পদ।

ইঞ্জিনীয়ার ও কারিগরদের দক্ষতার ওপর পোর্ট ট্রাস্টের শক্ত বনিয়াদ খাড়া রয়েছে। এই সব কুশলী যন্ত্র বিজ্ঞানীদের নৈপুণ্যের স্বাক্ষর বহন করছে এই লঞ্চটি। দেশের জলপথে চলাচলের উপযোগী দ্রুতগতিশীল যান তৈরির যে ঐতিহ্য আমাদের দেশে চলে আসছে তাতে আধুনিকতার স্পর্শ এনেছে এই নতুন নির্মাণকৃতিত্ব।

একদা বোম্বাই-এর একটি লঞ্চ তৈরি প্রতিষ্ঠানকে একটি লঞ্চ তৈরির বরাত

অশোক লেল্যাণ্ড ইঞ্জিন

দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটি বরাত নিলেও পরে জলযান তৈরির কাজ কোনোও কারণে বন্ধ করে দেয়। তখনই এই কাজের ভার দেওয়া হয় পোর্ট ট্রাস্টকে। প্রায় গোল আকারের এই লঞ্চটির দৈর্ঘ্য ১৫ মিটার, প্রস্থ ৩.৭৫ মিটার এবং ১.৭২৫ মিটার গভীর। এর ড্রাফট ১.২৭৫ মিটার এবং গতি ১২ নট।

লঞ্চটির পুরো কাঠামো শক্ত ইস্পাতের। জোড়গুলো ঝালাই করা। লঞ্চ-এর হালটির সম্পূর্ণ অংশে জিঙ্ক-এর আস্তরণ দেওয়া হয়েছে যাতে তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে না যায়। লঞ্চটির ওপরে চারধার ঢাকা একটা ইঞ্জিন ঘর। এটি পুরোপুরি এ্যালুমিনিয়ামের, ভেতরের দিক প্লাস্টিকের পাতে মোড়া। স্টার্ন গীয়ারটি একটি প্রসিদ্ধ জাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের নক্সার আধারে দেশীয় জিনিস দিয়ে তৈরি।

মাদ্রাজ বন্দর কর্তৃপক্ষে তৈরি পাইট লঞ্চ

লঞ্চ-এ দুটি নাব্য ডিজেল ইঞ্জিন আছে। এই মডেলটি অশোক লে-ল্যাণ্ড প্রতিষ্ঠানের সাম্প্রতিক একটি উদ্ভাবন। লঞ্চটির ইঞ্জিন ৬ ভোল্ট শক্তির ব্যাটারী দিয়ে চালু করা হয়। আগে লঞ্চ চালাবার জন্য ব্যাটারীর ব্যবহার ছিল না, হাওয়ায় চাপ সৃষ্টি করে লঞ্চ স্টার্ট করা হ'তো।

টার্বোসেট

চিনিকলগুলির জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে ভারত হেভী ইলেকট্রিক্যালস (হায়দ্রাবাদ) সংস্থা ১৫০০ কিলোওয়াট শক্তির ১২টি ব্যাক প্রেশার টার্বোসেট তৈরির বরাত পেয়েছে। এর আগে আরও চারটির বরাত দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের বিদ্যুৎ পর্ষৎ-এর পাওয়ার স্টেশনগুলির জন্য যন্ত্র, সরঞ্জাম সরবরাহই হ'ল হায়দ্রাবাদ শাখার প্রধান কাজ। এই সঙ্গে এই কারখানা এখন চিনি, কাগজ, পেট্রোলিয়াম ও সিমেন্ট বসাবার জন্য প্রয়োজনীয় স্বল্প ক্ষমতার টার্বো সেটও তৈরি করছে। এ ছাড়া হায়দ্রাবাদের কারখানায় সার ও ইস্পাত শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় 'ব্লোয়ার' ও কমপ্রেসার'ও তৈরি হয়।

অর্থাৎ এখন ১.৫ মেগাওয়াট থেকে নিয়ে ১১০ মেগাওয়াট শক্তির সব রকম টার্বোসেটের চাহিদা মেটানোতে এই কারখানা সাহায্য করতে পারবে।

ডিরেক্টার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সোসাইটি লিঃ—করোলবাগ, দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রথম বর্ষঃ ১৬
৪ঠা জানুয়ারী ১৯৭০
২৫ পয়সা

সম্পাদকীয়

ভুলি নাই

ইঞ্জিনীয়ারিং-এর টুকিটাকি

মিটার গভীর। এর ড্রাফট ১.২৭৫ এবং গতি ১২ নট।

লঞ্চটির পুরো কাঠামো শক্ত ইস্পাতের ... জোড়গুলো ঝালাই করা।

তন্ত্রই, অভাব, দারিদ্র্য ও অসাম্যের মধ্যে ... থাকতে পারে না।

—জওহরলাল নেহরু

প্রথম বর্ষ ষষ্ঠদশ সংখ্যা

৪ঠা জানুয়ারী ১৯৭০ : ১৪ই পৌষ ১৮৯১

Vol. 1 : No 16 : January 4, 1970

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০

টেলিগ্রাফের ঠিকানা—যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা।

এই সংখ্যায়

পর্যটন উন্নয়ন

মানুষের দূর ও দুর্গমকে জয় করার নেশা সুপ্রাচীন। অন্য-দেশের অধিবাসীদের জীবন যাপনের ধারা, সেই সব দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ ইত্যাদি জানবার জন্য অতীতে রাজা মহারাজারা নানা দেশে দূত পাঠাতেন। দূরের জিনিসকে জানার এই ইচ্ছা যুগ যুগ ধরে বেড়েছে বই কমেনি। এই ঔৎসুক্যই বর্ত্তমানে বিভিন্ন দেশে পর্য্যটকের যাতায়াতের পরিমাণ বাড়িয়েছে। ফলে বর্ত্তমানে পর্য্যটনটা কেবলমাত্র একটা সখ বা অভিযানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, এটা এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে পরিণত হয়েছে—আর শুধু তাইবা কেন একে প্রকৃতপক্ষে এখন বৃহত্তম আন্তর্জ্জাতিক শিল্প বলা যায়। অনুমান করা হয় যে, ১৯৬৭ সালে সারা বিশ্বে ১০ কোটি লোক বিভিন্ন দেশ পর্য্যটন করেন এবং এই আন্তর্জ্জাতিক পর্য্যটনের ফলে আয়ের পরিমাণ হ'ল ১১০০০ কোটি টাকারও বেশী। আন্তর্জ্জাতিক পর্য্যটনে এই বিপুল উন্নতি হলেও তাতে আমাদের উল্লসিত হওয়ার বিশেষ কোন কারণ নেই। তার কারণ হ'ল এই পর্য্যটকদের মধ্যে যারা আমাদের দেশে বেড়াতে এসেছেন তাঁদের সংখ্যা দুই লক্ষেরও কম আর এতে আমাদের দেশের আয় হয়েছে মাত্র ২৫ কোটি টাকা।

প্রকৃতিদেবী তাঁর সমস্ত সম্পদ উজাড় করে দিয়ে আমাদের দেশকে সাজিয়েছেন আর আমরা হাজার হাজার বছরের প্রাচীন সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকারী। আমাদের দেশের দর্শন ও বিজ্ঞান সমগ্র বিশ্বের চিন্তানায়কদের চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। এই দেশের ঐশ্বর্য্য সম্পদের খ্যাতি বহু অভিযানকারীকে এখানে আকর্ষণ করেছে, এখানকার বর্ণাঢ্য উৎসব ইত্যাদি বহু বিদেশী পর্য্যটককে মোহিত করেছে। ঐতিহাসিক সৌধ, মন্দির, সমাধি, ভাস্কর্য্য, যাদুঘরে সংরক্ষিত বিভিন্ন যুগের শিল্পকলার নিদর্শন ইত্যাদি পণ্ডিতদের যেমন চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে তেমনি সাধারণ দর্শককে আনন্দ দিয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র আমাদের এই দেশ বর্ত্তমান যুগে নানা উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে নিজেদের গড়ে তোলার যে কাজে ব্যাপৃত রয়েছে, সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আহরণ করার জন্য বহু বিদেশী এদেশে আসেন। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই পর্য্যটন এবং পর্য্যটকদের যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিতেই হবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৬৯ সালে আমাদের দেশে বিদেশ থেকে যত পর্য্যটক এসেছেন তাঁদের সংখ্যা পূর্ব্ব বছরের তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ বেশী। ১৯৬৮ সালে আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশগুলি থেকে প্রায় দুই লক্ষ পর্য্যটক আমাদের দেশে আসেন এবং ১৯৬৭ সালের তুলনায় ঐ বছরে, বৈদেশিক মুদ্রায় শতকরা ৬ ভাগ বেশী আয় হয়। ১৯৬৮ সালের আয় ছিল ২৬.৫৪ কোটি টাকা। সরকারীভাবে নানা রকম উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করায় আয় কিছুটা বাড়ে। পর্য্যটকেরা সাধারণতঃ যে সব জায়গায় বেড়াতে যান সেখানে বর্ত্তমানে যে সব সুযোগ সুবিধা আছে সেগুলি আরও উন্নত করে, সংহত ভিত্তিতে নতুন পর্য্যটন কেন্দ্র যেমন কোবালম, গুলমার্গ, গোয়া ইত্যাদির সুযোগ-সুবিধে বাড়িয়ে, বিমান বন্দরগুলিতে আরও বেশী সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, মোটরপথে ভ্রমণ করার জন্য পরিবহন ইত্যাদির ব্যবস্থা ক'রে, এবং হোটেলে থাকবার সুযোগ-সুবিধে বাড়িয়ে পর্য্যটনকে অনেকখানি আরামপ্রদ করা হয়েছে। ১৯৭৩-৭৪ সাল পর্য্যন্ত বছরে যাতে অন্ততঃপক্ষে ৬ লক্ষ পর্য্যটক আমাদের দেশে আসেন তাই হল এর লক্ষ্য। তখন তাহলে ১০৯ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা আয় হবে। চতুর্থ খসড়া পরিকল্পনায় (১৯৬৯-৭৪) পর্য্যটকদের সুযোগ সুবিধের উন্নয়নের জন্য ৩৪ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব রয়েছে। এই টাকার মধ্যে ২৫ কোটি হ'ল কেন্দ্রীয় কর্ম্মসূচীগুলির জন্য এবং ৯ কোটি টাকা হল কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল ও রাজ্যগুলির জন্য। কেন্দ্রীয় কর্ম্মসূচীর জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তার মধ্যে ১৪ কোটি টাকা হ'ল কেন্দ্রীয় পর্য্যটক বিভাগের জন্য এবং ১১ কোটি টাকা ভারতীয় পর্য্যটন উন্নয়ন কর্পোরেশনের কর্ম্মসূচীগুলির জন্য। কর্পোরেশন বর্ত্তমানে কয়েকটি হোটেল তৈরি করছেন এবং পর্য্যটকদের থাকবার বাংলোগুলির পরিচালনাভার নিজেদের হাতে নিচ্ছেন।

পর্য্যটন উন্নয়ন কর্ম্মসূচীতে, আরণ্য জীবন এবং শিকারের সুযোগ-সুবিধে বাড়ানোরও প্রস্তাব রয়েছে। এই উদ্দেশ্যে পর্য্যটন বিভাগে অরণ্যের জীবজন্তু সম্পর্কে একটি বিশেষ শাখা খোলা হচ্ছে। প্রধান প্রধান স্থানগুলিতে যুব হস্টেল তৈরি করা হবে। পর্য্যটকদের সাহায্য করার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একদল কর্ম্মীও গড়ে তোলা হবে। নতুন হোটেল তৈরি করার জন্য হোটেল উন্নয়ন ঋণ তহবিল থেকে ১.৮৬ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। ঋণ দেওয়ার রীতি পদ্ধতিগুলিও সরল করা হচ্ছে। বিদেশী পর্য্যটকদের জন্য, পুলিশে নাম রেজেষ্ট্রী করানো, মুদ্রা, বিনিময়, নিয়ন্ত্রণ, শুল্ক, মদ এবং অবতরণ অনুমতি ইত্যাদি সম্পর্কিত আইনকানুনগুলি শিথিল করা হয়েছে।

আন্তর্জ্জাতিক পর্য্যটন যেমন অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে আদান প্রদান ও সংযোগ বাড়ায় এবং মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন করা ছাড়াও পারস্পরিক শুভেচ্ছা বাড়ায়, দেশের আভ্যন্তরীন পর্য্যটনেরও তেমনি নিজস্ব একটা গুরুত্ব আছে। পর্য্যটন হ'ল জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার একটা সুন্দর ও সক্রিয় ব্যবস্থা। যাইহোক পর্য্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য যে সব কর্ম্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তাতে যুক্তিসঙ্গতভাবেই আশা করা যায় যে, ১৯৭৩-৭৪ সালের মধ্যে বিদেশী পর্য্যটকের সংখ্যা তিনগুণ বাড়ানো সম্ভব হবে।

নির্মীয়মান হলদিয়া বন্দর

শ্রীদ্বীপেশ চন্দ্র ভৌমিক
বার্তা সম্পাদক, আকাশবাণী, কলিকাতা

মেদিনীপুর জেলার তমলুকে হুগলী আর হলদী নদীর সঙ্গম স্থলে গড়ে উঠছে আমাদের দেশের আরও একটি নূতন বন্দর -হলদিয়া। সেই নির্মীয়মান হলদিয়ার শিলান্যাস দেখতে দেখতে বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠল কলকাতা বন্দরের ছবি।

আজকের যুগে, প্রতিযোগিতার বাজারে যে বন্দর বড় বড় জাহাজ ভেড়াবার সবচেয়ে বেশী সুযোগ সুবিধা দিতে পারবে, যে বন্দরে পণ্য পরিবহন দ্রুততর এবং কম ব্যয় সাধ্য হবে—সেই সব বন্দরই টিকে থাকবে। বন্দরে লাখটনী জাহাজ ভেড়াবার আর যান্ত্রিক পদ্ধতিতে মাল খালাসের দাবী বিশ্বের বহু দেশই মেনে নিয়েছে। এই অবস্থায় বর্তমানে কলকাতার স্থান কোথায় সেটা পর্যালোচনা করা সমীচীন।

স্বাধীনতার সময় পর্যন্তও কলকাতা, ভারতের এমন কি বিশ্বের অন্যতম বিশিষ্ট বন্দর ছিল। কিন্তু ভাগীরথীর জলধারা অংশতঃ বয়ে যেতে লাগল পদ্মা দিয়ে ফলে হুগলীর নাব্যতা কমে গেল। সেই সঙ্গে আরও অনেক কার্য কারণের ফলে কলকাতা বন্দরের পুরানো খ্যাতি বিড়ম্বনায় পরিণত হয়। অথচ এটা ঠিক কলকাতা টিকে না থাকলে শুধু পশ্চিম বাংলাই নয় সমস্ত পূর্বভারতের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। এদিকে কলকাতা বন্দরে বানিজ্যের পরিমাণ কিন্তু উত্তরোত্তর বেড়েই চলছিল। তাই ভাগীরথীর পারেই কলকাতার জন্যে একটি গভীর জলের পরিপূরক বন্দরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। চলল অনেক সমীক্ষা নিরীক্ষা। তারপর স্থান নির্বাচন করা হ'ল—এই হলদিয়ায়।

হলদিয়া বন্দর প্রকল্প যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা কিন্তু শুধু বর্তমানের প্রয়োজন নয়, ভবিষ্যতের প্রয়োজনের কথাও মনে রেখে বন্দরের কাঠামো নির্মাণ করেছেন।

প্রথমেই ধরা যাক জাহাজের কথা। ইদানীং কালে কলকাতা বন্দরে সবচেয়ে বড় যে জাহাজটি এসেছিল—তার গভীরতা ছিল মাত্র ৮.৫ মিটার। তাও এটি এসেছিল বর্ষাকালে ভরা জোয়ারের জলে, নদীর জল যখন কানায় কানায় উপচে পড়ছে। এটি বন্দর ছেড়েও গিয়েছিল ঠিক ঐ রকমই একটি মুহূর্তে। হলদিয়া বন্দরে কিন্তু এখনও ১০.৩০ মিটার গভীর জাহাজ সারা বছরে যে কোন সময়ে আসা যাওয়া করতে পারে। তারপর ১৯৭৫-৭৬ সাল নাগাদ, ফরাক্কার কাজ শেষ হলে—ভাগীরথীর জল যখন আবার হুগলী দিয়ে সাগরের দিকে বয়ে আসবে এবং হলদিয়া বন্দর যখন পুরোপুরী চালু হয়ে যাবে তখন ১৩.৪১ মিটার গভীর জাহাজগুলিও বন্দরে আসতে পারবে অতি সহজেই। বন্দর কর্তৃপক্ষের একটি হিসেবে দেখলাম বছরের মধ্যে তিন মাস ১৩.৪১ মিটার গভীর জাহাজগুলি সহজেই এখানে চলাচল করতে পারবে। প্রায় ৭ মাস পর্যন্ত ১২.৮ মিটার গভীর জাহাজ অনায়াসে চলবে। আর সারা বছর ধরে ১২.১৮ মিটার গভীর জাহাজগুলি বন্দরে আনাগোনা করবে অনায়াসে। কলকাতার পরিপূরক বন্দর হিসেবে হলদিয়া যখন কাজ করতে সুরু করবে—তখন ৮০ হাজার মেট্রিক টনের জাহাজ অনায়াসে হলদিয়ায় ভীড়বে, পণ্য তুলবে, পণ্য নামাবে। তখন মাল তোলা নামানোর জন্য এখানে কুলীদের লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাবে না। এই কাজ সম্পন্ন হবে বিপুলায়তন ক্রেনের সাহায্যে। কয়েক মিনিটে নামিয়ে দেবে কয়েক হাজার টন জিনিস, আবার ফিরতী পথে তুলে নিয়ে আসবে কয়েক হাজার টন। অর্থাৎ চালু হয়ে গেলে এই বন্দরে মাল পরিবহন হবে খুবই কম ব্যয় সাধ্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় জাহাজে এক সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে পণ্য তোলার যে সব ব্যবস্থা রয়েছে তার মধ্যে একটি পুরো ওয়াগন উপরে তুলে, উপুড় করে জাহাজের খোলে মাল ঢেলে দেওয়ার ব্যবস্থায় নূতনত্ব আছে।

এরপর ধরা যাক তেলের জেটির কথা। মাঝ নদী বরাবর রয়েছে তেলের জাহাজের জেটি। দেখে মনে হয় সেটি যেন নদী থেকেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। পাশেই ডক্ তৈরির কাজ চলছে। বিরাটকায় মেশিনগুলি অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে—ধোঁয়া আর শুড়কির গুঁড়ো মিশে যাচ্ছে আকাশে বাতাসে। শ্রমিকদের আনাগোনার গুঞ্জনে জায়গাটা মুখর। আরও একটু দূরে তেলের বিরাট বিরাট দুটি ট্যাঙ্ক। সোজা পাইপের মধ্যে দিয়ে হাজার হাজার টন অপরিশোধিত তেল বেরিয়ে আসবে জাহাজের ট্যাঙ্ক থেকে। আবার ট্যাঙ্ক ভর্তি করা হবে ডিজেল প্রভৃতি দিয়ে। জেটি যদিও বর্তমানে মাত্র একটি—কিন্তু ভবিষ্যতের জন্যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আরেকটি জেটির প্রয়োজন হবে হলদিয়া তৈল শোধনাগার পুরোপুরি চালু হয়ে গেলে।

এর পর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল পণ্য রক্ষণাবেক্ষণ। রপ্তানীর জিনিস বা আমদানী করা জিনিস যাতে বেশীদিন জাহাজে না রাখতে হয় তার জন্য বন্দরের গায়ে বড় বড় গুদাম ঘর তৈরির ব্যবস্থা হচ্ছে।

সবচেয়ে বড় কথা হ'ল শুধু এখন নয় আরও পরে যদি বন্দরের সব রকম ব্যবস্থার সম্প্রসারণের দরকার দেখা দেয়—তখন যাতে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয় তার জন্য পরিকল্পনা প্রণেতারা উপযুক্ত ব্যবস্থা রেখেছেন।

পুরোনো জেটিতে নেমেই চোখে পড়ল স্থানীয় জনগণের চোখে মুখে তৃপ্তি ও আশার আলো। তৈল শোধনাগার স্থাপিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে পশ্চিম বাংলার বিরাট শিল্প জগৎ হয়তো গড়ে উঠবে এই হলদিয়ায়। গোড়ায় একটা সন্দেহ বার বার জনগণকে নৈরাশ্যের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। এই বিরাট কর্মযজ্ঞে তাঁদের অংশ কি শুধু ত্যাগের, আগামী দিন কি শুধু হতাশা আর বিফলতায় ভরা থাকবে? না। সরকার এবং শিল্প কর্তৃপক্ষ এঁদের অগ্রাধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন।

১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

পরিকল্পনা পায় সমস্যা

পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডি. আর. গাডগিল, শ্রীনগরে একটি বেতার সাক্ষাৎকারে যে ভাষণ দেন এখানে তা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হ'ল। এই সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক গাডগিল, পরিকল্পনার কতকগুলি সমস্যার উল্লেখ করেছেন।

ডি. আর. গাডগিল

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ, একদিক দিয়ে বলতে গেলে ইতিমধ্যেই সুরু হয়ে গেছে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বছর অর্থাৎ ১৯৬৯-৭০ সালের বার্ষিক পরিকল্পনার বাজেট, কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে এই বার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতকগুলি খুঁটিনাটি ব্যাপার এখনও ঠিক করা হয়নি, কাজেই সেই হিসেবে এটি এখনও সম্পূর্ণ নয় এ কথা বলা যায়। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ নির্দেশ দিয়েছেন যে, অর্থকমিশনের সুপারিশগুলি পাওয়া গেলেই, আমাদের রাজ্য পরিকল্পনাগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং সেগুলি কি পরিমাণে বাড়ানো যায় বা পূর্ণতর করা যায় তা ভেবে দেখতে হবে। পরিকল্পনা কমিশন সেই কাজটা অবিলম্বে হাতে নেন। আশা করা যাচ্ছে যে অন্যান্য সাধারণ সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে যাওয়ার পর অল্প সময়ের মধ্যেই জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের কাছে পরিকল্পনার চূড়ান্ত কর্ম্মসূচী পেশ করা যাবে।

তবে এটা সত্যি কথা যে, অর্থকমিশনের সুপারিশগুলি আমাদের সম্পদ বাড়াবেনা। তাঁরা প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পদের সামঞ্জস্য বিধান করা ছাড়া আর কিছু করেন না। রাজ্যগুলিকে যত বেশী পরিমাণে. অর্থসম্পদ দেওয়া হবে, কেন্দ্রের অংশ সেই পরিমাণে কমে যাবে। আমাদের প্রকৃতপক্ষে যা করতে হবে তা হ'ল, রাজ্যগুলিকে যে পরিমাণ সম্পদ বেশী দেওয়া হ'ল, তার কতটা অংশ সেই রাজ্যগুলি পরিকল্পনার জন্য বিনিয়োগ করতে পারবে তা দেখা। কয়েকটি রাজ্যকে যে অতিরিক্ত বরাদ্দ দেওয়া হবে তা সেই রাজ্যগুলির পরিকল্পনা বহির্ভূত ঘাটতি কতটা মেটাতে পারবে এবং পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নিয়োগ বাড়াবার উদ্দেশ্যে অথবা এর ভিত্তি দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে কর বসিয়ে বা অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের অতিরিক্ত সম্পদ সংহত করা সম্ভবপর কিনা তা দেখাও আমাদের একটা কাজ। কোন রাজ্য যদি মনে করে যে অর্থকমিশনের বরাদ্দ তাদের সম্পূর্ণ প্রয়োজন মেটাতে পারবেনা তাহলে অন্য কোন উপায়ে যেমন ঋণের তালিকা ইত্যাদি পরিবর্ত্তন ক'রে, তা পারা যায় কিনা তাও আমাদের দেখতে হয়। এই সমস্ত সংশোধন পরিবর্ত্তনের মাধ্যমে এবং রাজ্যগুলির নিজেদের চেষ্টায় আরও সম্পদ সংহত করা সম্ভবপর কিনা তা দেখাটাই হয় পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ চেষ্টা।

এর ফলে রাজ্যগুলির পরিকল্পনার মৌলিক কোন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়না কারণ আমরা মনে করি যে, রাজ্যগুলি তাদের পরিকল্পনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে অগ্রাধিকার স্থির করে দেন। যথেষ্ট সম্পদের অভাবে রাজ্যগুলির যে সব কর্ম্মসূচী বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে, আর্থিক সঙ্গতি যদি কিছুটা বাড়ে তাহলে সেগুলি বাদ দেওয়ার প্রয়োজন নাও হতে পারে। পরিকল্পনা কমিশন নিজেরাই ভেবেছিলেন যে রাজ্যগুলির পরিকল্পনার মোট বিনিয়োগের পরিমাণ সাড়ে ছয় হাজার কোটি টাকার মত হওয়া উচিত। খসড়া পরিকল্পনাতে এর পরিমাণ রাখা হয়েছে ছয় হাজার দুশো কোটি টাকার কিছু কম। সংশোধন পরিবর্ত্তন করে, পরিকল্পনাগুলির মোট বিনিয়োগের পরিমাণ, আমরা প্রথমে যা ভেবে রেখেছিলাম তা করা যায় কিনা তার জন্য চেষ্টা করাই হবে আমাদের কাজ।

ব্যাঙ্কের সম্পদ

অতিরিক্ত সম্পদের কথা চিন্তা করার সময়, ১৪টি প্রধান প্রধান ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করার ফলে যে সম্পদ পাওয়া যেতে পারে সে কথাও বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে এটা বেশ কঠিন প্রশ্ন। কারণ, এই ব্যাঙ্কগুলির পরিচালনা সম্পর্কে সরকারী নীতি কি হবে এবং ব্যাঙ্কের কার্য্যপদ্ধতি কি রকমভাবে বদলাবে অথবা এই পরিবর্ত্তন অবিলম্বেই হবে কিনা তা এখনও পরিস্কারভাবে বোঝা যাচ্ছেনা। তবে এক দিক দিয়ে কিছুটা সঙ্কেত যে পাওয়া যাচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণের সঙ্গে আলোচনার সময় জানা গেছে যে, ব্যাঙ্কগুলি যখন সামাজিক নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল তখনই তাঁরা, তাঁদের রাজ্যের কতকগুলি ব্যাঙ্কের ম্যানেজারদের, ব্যক্তিবিশেষের, সংস্থার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলিতে বেশী অর্থ বিনিয়োগ করতে অনুরোধ করেন এবং ব্যাঙ্কগুলি সেই সব পরিকল্পনায় সাহায্য করতে স্বীকৃত হয়। এই প্রচেষ্টাকে অবশ্য আরও একটু সংহত করা যায়।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির সম্পদ এখন সরকার উন্নয়নমূলক কাজে বিনিয়োগ করতে পারবেন, সাধারণের এই ধারণাটা, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ প্রণ্টির ভুল বোঝাবুঝির ফলেই সৃষ্ট হয়েছে। ব্যাঙ্কের সম্পদ প্রধানতঃ জমাকারীদেরই সম্পদ। এই সম্পদের

১২ পৃষ্ঠায় দেখুন

পশ্চিমবঙ্গে মেয়েদের কারিগরী শিক্ষা

অপর্ণা মৈত্র

বর্তমান যুগে এমন কোন কর্মক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন যেখানে মেয়েরা নেই বা তাদের পদার্পণ ঘটেনি। বর্তমানে আমরা মহিলাদের ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, পাইলট, আইন ব্যবসায়ী, শিক্ষয়িত্রী, নার্স, ক্যানভাসার এবং এমন আরও অজস্র ক্ষেত্রে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি যেখানে পূর্বে এঁদের দেখা যেতো না। এই দিকগুলি ছাড়াও, মেয়েদের উৎসাহ, আগ্রহ এবং সর্বোপরি কর্মদক্ষতা আরও অনেক নতুন কর্মের পথ খুলে দিচ্ছে। মেয়েদের জন্য এখন একটি নতুন কর্মক্ষেত্র হচ্ছে কারিগরী বিষয়। আমরা ইতিপূর্বে মহিলা ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে পরিচিত হলেও সম্পূর্ণভাবে কারিগরী ক্ষেত্রে মেয়েদের আসতে দেখিনি। কারণ এ ধরণের কারিগরী শিক্ষা পুরুষদের অধিকারভুক্ত বলে ধারণা ছিল। সেই ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করে এখন মেয়েরা কেবলমাত্র কারিগরী শিক্ষাই গ্রহণ করছে না, বাস্তবে সেটি প্রয়োগও করছে।

ভারতবর্ষে মেয়েদের মধ্যে কারিগরী শিক্ষার প্রচলন খুব বেশীদিন হয়নি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ে মেয়েদের মধ্যে ব্যাপকভাবে কারিগরী শিক্ষা প্রসারের জন্য ভারত সরকার আঞ্চলিক ভিত্তিতে কারিগরী বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারই ফলে বিভিন্ন প্রদেশে নারীদের জন্য পলিটেক-নিক খোলা হয়। পূর্বাঞ্চলে সর্বপ্রথম ১৯৬৩ সালে কলকাতায় ২১, কনভেন্ট রোডে মেয়েদের একটি কারিগরী শিক্ষায়তন স্থাপন করা হয়। বর্তমানে সমগ্র পশ্চিম-বঙ্গে এটিই মেয়েদের একমাত্র পলি-টেকনিক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে প্রতি-ষ্ঠিত এই কেন্দ্রে বর্তমানে পাঠ্য বিষয় হ'ল ইলেক্‌ট্রোনিকস্‌ ও আর্কিটেকচার। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে নারীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত ভারতের সব কটি কারিগরী বিদ্যায়তনের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটিতেই সর্বপ্রথম ইঞ্জিনীয়ারীং বিষয় পাঠ্য হিসাবে নেওয়া হয়। এই দুটি বিষয়ই তিন বৎ-সরের ডিপ্লোমা কোর্স এবং কারিগরী শিক্ষা সম্পর্কিত রাজ্য পরিষদ, কৃতী ছাত্রীদের এই ডিপ্লোমা বিতরণ করেন।

ইলেক্‌ট্রোনিকস বিষয়ে পড়াশুনা করা ছাড়া হাতে-কলমে কাজ শিখতে হয়। রেডিও মেরামত, টেলিফোন, টেলিগ্রাফে সংবাদ আদান-প্রদানের কাজও শিখতে হয়। স্থাপত্য বিদ্যায় শিক্ষণীয় বিষয় হ'ল বাস্তু গঠন শিল্প ও তার রূপায়ণ। প্রতিটির পাঠ্য বিষয় ছাড়াও হাতে কলমে যাতে বিশেষ শিক্ষা পায় সেদিকে দৃষ্টি রেখে পাঠ্যক্রম রচিত হয়েছে। সেইজন্য ছাত্রীরা প্রত্যেকটি বিষয়ের পুঁথিগত জ্ঞানের সঙ্গে সেটি তৈরি করতেও শেখে। তার ফলে নীরস ও কঠিন বিষয়ও তাদের কাছে আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে। ছাত্রীরা শুধু কাজই শেখেনা নিজেরা হাতে করে ট্রান্সসিস্টার সেট, আভ্যন্তরীন যোগা-যোগের সেট তৈরিও করে। সেইভাবে স্থাপত্য বিদ্যার ছাত্রীদের একই সঙ্গে পুরাতন ও আধুনিক উভয় যুগের স্থাপত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। কোন বিশেষ যুগের স্থাপত্যর সঙ্গে সেই সময়ের ইতিহাস কিছুটা যেমন জানতে হয়, তেমনি শেষ বর্ষের ছাত্রীদের একটি প্রেক্ষাগৃহ বা কলেজ গৃহের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা করে ব্লু প্রিন্ট তৈরি করে দিতে হয়। এইভাবে কাজ শেখার ফলে ছাত্রীদের বাস্তব কর্ম-ক্ষেত্রে গিয়ে মোটেই অসুবিধায় পড়তে হয় না। আজ পর্যন্ত তিনটি দলে প্রায় ৫০ জন ছাত্রী এখান থেকে পাশ করে-ছেন। এর মধ্যে ইলেকট্রোনিক বিষয়ে যারা উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের ২০ জন এবং স্থাপত্যের ১৫ জন কাজ পেয়েছেন। তাঁরা

কলিকাতার পলিটেকনিকের পরীক্ষাগারে কর্মরত শিক্ষার্থিণীগণ

যোগ্যতার সঙ্গে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে, মিউজিয়ামে, প্লানেটোরিয়ামে. পি. ডব্লিউ. ডি এবং কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টে কাজও করছেন।

ইলেকট্রোনিকস এবং আর্কিটেকচার দুটিতেই প্রথম বৎসরে পড়ানো হয় ইংরেজী, স্থাপত্য, অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র এবং মূল দুটি বিষয়ের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। প্রথম বৎসরে পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হবার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে শিক্ষার্থিণী যে বিষয়টি নিয়েছেন সেটি পড়ানো হয়। তা ছাড়া প্রথম দুই বছর প্রত্যেক ছাত্রীকে পলিটেকনিকের কারখানায় কাঠ ও চামড়ার কাজ শিখতে হয়।

স্কুল ফাইনাল বা উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে ছাত্রীরা এখানে ভর্তি হয়। অবশ্য এই প্রতিষ্ঠানে বি. এস. সি পাশ ছাত্রীও আছে। ভর্তি হওয়ার পরীক্ষার মান বেশ উঁচু। অঙ্ক ও ড্রইং পরীক্ষা নেওয়া হয়। কারণ এই ধরণের কারিগরী শিক্ষায় এ দুটি বিষয়ে জ্ঞান একান্ত অপরিহার্য। শেষ পরীক্ষা হয় আগষ্ট মাসে। যাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসুবিধা না হয় সেজন্য বেতন সামান্য, মাসে চার টাকা। তা ছাড়া পলিটেকনিক থেকে ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় পুস্তক ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সরবরাহ করার জন্য দরিদ্র ফাণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যান্য ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের মতো এই নারী কারিগরী বিদ্যায়তনটির জন্যও কয়েকটি সরকারী বৃত্তি নির্দিষ্ট আছে।

পলিটেকনিকের ডিপ্লোমা প্রাপ্ত ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে টেলি কমিউনিকেশন শাখা খোলার চেষ্টা করছেন। বর্তমানে ছাত্রীরা এ. এম. ই. আই পরীক্ষা দিতে পারেন। এখানকার কৃতী ছাত্রীরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও বিদেশে কর্মে নিযুক্ত আছেন।

পশ্চিমবঙ্গের এই কারিগরী প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক মণ্ডলীতে আছেন ১৭ জন অধ্যাপক। প্রতিটি বিষয় পড়ানো ও শেখানোর জন্য আছেন সেই সেই বিষয়ে উচ্চ শিক্ষিত ও কৃতী অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা। এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষা শ্রীমতী ইলা ঘোষকে ভারতের মহিলা ইঞ্জিনীয়ারদের পথিকৃত বলা যায়।

সুষ্ঠু পরিচালনা, যোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী এবং উৎসাহী ছাত্রীরা থাকা সত্ত্বেও কলিকাতা নারী কারিগরী শিক্ষায়তনটির আশানুরূপ উন্নতি ঘটেনি। তার কারণ হ'ল পলিটেকনিকটির কাজের সময় ও স্থানাভাব এবং অন্যটি হ'ল ছাত্রী সংখ্যার স্বল্পতা। মেয়েদের ক্লাস হয় সকাল ৬-৩০ থেকে ১০-৪৫ পর্যন্ত। এরপরে ছেলেদের বিভাগের ক্লাস সুরু হয়। এর ফলে মেয়েদের জন্য সময় থাকে মাত্র ৬টি পিরিয়ড। এই ধরণের কারিগরী শিক্ষার জন্য যতটা সময় বা সেমিনার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা দরকার তা সম্ভব হয় না। পলিটেকনিক কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যতে আভ্যন্তরীন সাজ সজ্জা ও বস্ত্রাদি অলঙ্করণ বিষয়ে কোর্স খোলার ইচ্ছে আছে। ওঁরা মনে করেন এ দুটি কোর্সে বহু সংখ্যক মেয়েকে আকৃষ্ট করা যাবে এবং তাদের ভবিষ্যৎ কর্ম সংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করবে। কিন্তু স্থানাভাবের জন্য তা সম্ভব হচ্ছে না। কলেজ ভবন, হোস্টেল ও প্রয়োজনীয় খরচ বাবদ সরকারী বরাদ্দ আছে ২১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা, কিন্তু সরকারী কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট প্রচেষ্টার অভাবে নির্দিষ্ট জমি থাকা সত্ত্বেও পলিটেকনিকের নিজস্ব ভবন তৈরি হচ্ছে না।

কলেজটির উন্নতির পথে আর একটি অন্তরায় হোল যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্রীর অভাব। বর্তমানে পলিটেকনিকের ছাত্রী সংখ্যা হ'ল মাত্র ৫৮ জন। যথেষ্ট প্রচারের অভাবে আশানুরূপ ছাত্রী কারিগরী শিক্ষায়তনে আসে না। কারিগরী শিক্ষা সম্বন্ধে যথাযথ তথ্য না জানার ফলে বহু ছাত্রী ইচ্ছে থাকলেও পড়তে আসতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশের অভিভাবকেরা মেয়েদের টেকনিক্যাল শিক্ষা দেওয়া সম্পর্কে এখনও প্রস্তুত নন।

কিন্তু মনোভাবের পরিবর্তন হওয়া দরকার। ভারতবর্ষের মতো ক্রমোন্নতিশীল দেশে এই ধরণের মনোভাব দেশের উন্নতির পথে অন্তরায় স্বরূপ। তা ছাড়া দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে, যেখানে বেকার সমস্যা বিশেষ জটিল সেখানে কিছু সংখ্যক মেয়ে যদি কারিগরী শিক্ষা গ্রহণ করে কর্ম সংস্থানের সুযোগ পায় তাহলে তার থেকে আশার কথা আর কি হতে পারে?

শিল্পে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা

পরিচালনায় কর্মীদের অংশগ্রহণ

কয়েক বছর পূর্ব্বেও সরকার এবং শ্রমিক উভয় পক্ষই, পরিচালনা ব্যবস্থায় কর্মীদের অংশ গ্রহণের কথা খুব বলতেন। কিন্তু সম্প্রতি এই কথাটা বিশেষ শোনা যায়না। এর একটা কারণ হ'ল, এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্পর্কে সমগ্রভাবে ইউনিয়নগুলি এবং পরিচালকবর্গ, অনুকূল একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেনি। বর্ত্তমানে যখন শিল্প সম্পর্ক সন্তোষজনক এবং উৎপাদনও কমের দিকে তখন, পরিচালনা ব্যবস্থায় কর্ম্মীদের অংশ গ্রহণের প্রশ্নটি বেশীদিন উপেক্ষা করা যায়না। সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে বিচার করলে, শিল্পে নিযুক্ত কর্ম্মীদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া শিল্পে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। কতকগুলি প্রতিষ্ঠান এই সমস্যাটিকে অত্যন্ত লঘুভাবে গ্রহণ করছেন এবং এটাকে একটা আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবে মেনে নিয়েছেন।

ভারতের সংবিধানে বলা হয়েছে যে শ্রমিক আইনগুলিকে ক্রমশ: শ্রমিকদের অনুকূল করে তুলতে হবে। কাজেই পরিচালকদের যদি বেঁচে থাকতে হয় এবং সাফল্য লাভ করতে হয় তাহলে তাঁরা শ্রমিকদের আর, মেসিনের চাকার একটা স্ক্রু বলে মনে করতে পারেন না। আমরা যখন পরিচালনা ব্যবস্থায় শ্রমিকদের অংশ গ্রহণের কথা বলি তখন তার মানে শুধু এই নয় যে, সীমাবদ্ধ ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়ার্কস্ কমিটি বা যুক্ত পরিচালনা পরিষদ গঠন করলেই কাজ শেষ হয়ে গেল। প্রধান কথা হল, কর্মীরা পরিচালনা ব্যবস্থার প্রকৃত অংশীদার হবেন, প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্ম্মপ্রচেষ্টাগুলির পরিকল্পনা রচনায়, সংহতি করণে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কর্মীদের প্রতিনিধিদের মতামত দেওয়ার অধিকার থাকবে। তবে পরিচালনা ব্যবস্থায় কর্মীদের পূর্ণতর অংশগ্রহণ অবশ্য, ট্রেড ইউনিয়ন ব্যবস্থা, কর্মীদের শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ের ক্রমোন্নয়ন অনুযায়ী পর্য্যায়ক্রমিক হওয়া উচিত।

পরিচালক ও কর্মীদের মধ্যে বিশ্বাসের অভাব, সন্দেহ ও ভুলবোঝাবুঝির কথা আমরা বলে থাকি এবং এগুলিকেই শিল্প বিরোধের কারণ বলে থাকি; কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না কর্মীদের শিল্প ব্যবস্থার অংশীদার করে তোলা যাবে ততদিন পর্য্যন্ত এগুলি থাকবেই। কর্মীরাও এখন নিজেদের সুবিধে-অসুবিধে, অভাব-অভিযোগ জানাতে চান এবং স্বীকৃতি চান। কোন শক্তিই এই ইচ্ছাকে দমন করতে পারবেনা এবং তা বাঞ্ছনীয় নয়। আত্ম অভিব্যক্তির ও স্বীকৃতি পাওয়ার এই ইচ্ছাকে যদি উপযুক্তপথে পরিচালিত করা যায় তাহলে তা গঠনমূলক হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু একে যদি দমন করা হয় তাহলে ধ্বংসমূলক আকার গ্রহণ করতে এবং শিল্পের শান্তি নষ্ট করতে পারে।

পরিকল্পনার প্রথম দিকে পরিকল্পনা কমিশন এই নীতির গুরুত্ব স্বীকার করে নেন। ১৯৫৫ সালে কমিশনের শিল্প কর্মী সম্পর্কিত একটি কমিটি, কর্মীদের পরিচালনা ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করার ওপর বিশেষ জোর দেন। কমিটি বলেন "পরিকল্পনার সফল রূপায়ণের জন্য পরিচালনা ব্যবস্থায় কর্মীদের সংশ্লিষ্ট করা বিশেষ প্রয়োজন। এতে শিল্প সম্পর্ক উন্নততর হবে এবং উৎপাদনও বাড়বে। কাজেই প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে কর্মী ও পরিচালনা ব্যবস্থার সমান সংখ্যক প্রতিনিনিধি নিয়ে একটি করে পরিচালনা পরিষদ থাকা উচিত। পরিচালনা পরিষদকে সব বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্যাদি সরবরাহ করার দায়িত্ব থাকবে পরিচালকদের। এই পরিষদের একমাত্র আর্থিক ব্যাপার ছাড়া, প্রতিষ্ঠানের সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করার অধিকার থাকবে। শ্রমিক কল্যাণ সম্পর্কিত বিষয়গুলি প্রথমে ওয়ার্কস্ কমিটিতে আলোচিত হওয়ার পর প্রয়োজন হ'লে পরিচালনা পরিষদে আলোচিত হতে পারে।"

তুলনা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে

কেউ যখন অন্য দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের ব্যবস্থার তুলনা করেন, তখনই ভীষণ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। যাঁরা কর্মীদের পরিচালনা ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করার পক্ষপাতি তাঁরা যুগোশ্লোভিয়া ও পশ্চিম জার্মানীর দৃষ্টান্ত দেখান। ঐ দুটি দেশে পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্মীদের অংশগ্রহণ এখন একটা কার্য্যকরী ব্যবস্থা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যদিকে পরিচালকদের মধ্যে কেউ কেউ আমেরিকার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন। সেখানকার ইউনিয়নগুলি সাধারণত: চাকুরির নিরাপত্তা, ভালো পারিশ্রমিক এবং সুযোগ সুবিধেগুলির নিশ্চয়তার ওপর জোর দেন এবং কর্মীরা শিল্পের মালিক নন বলে অন্য সব ব্যাপারে পরিচালকগণের স্বাধীনতা থাকা উচিত বলে তারা মনে করেন। পরিচালনা ব্যবস্থায় কর্মীদের অংশ গ্রহণ সম্পর্কে অন্যান্য দেশের তথ্যাদি জানা ভালো, কিন্তু আমাদের দেশে সেই ব্যবস্থাটা কি রূপ গ্রহণ করবে তা এখানকার পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। আমরা সকলেই জানি যে কাজের সর্ত্তাদি, পারিশ্রমিকের হার, বোনাস, আধুনিকীকরণ ও যন্ত্রসজ্জা, কাজের মাত্রা এবং শ্রম আইনগুলি কার্য্যকরীকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়েই সাধারণত: পরিচালনা ব্যবস্থা ও শ্রমিকের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। ধর্ম্মঘট বা মামলা করে যে এই সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব নয় তাও আমরা জানি। দুই পক্ষ যদি পরস্পরের মধ্যে একটা শুভেচ্ছা ও বিশ্বাসের ভাব গড়ে তুলতে না পারে তাহলে অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠা সম্ভব

নয়। এই বিশ্বাস ও সদিচ্ছা গড়ে তোলার একমাত্র কার্য্যকরী উপায় হ'ল কর্মীদের অংশগ্রহণের একটা ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে হবে। অনেকে মনে করেন, কর্মীদের ভাগ্য সম্পর্কে যদি উপেক্ষার মনোভাব গ্রহণ করা হয় তাহলে তাঁরাও চাকরি রাখার জন্য যতটুকু কাজ করা প্রয়োজন তার বেশী কাজ করবেন না। ফলে তাঁদের মধ্যে দায়িত্ববোধ গড়ে ওঠেনা এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য তাঁরা যথাশক্তি কাজ করেন না।

উৎপত্তি

১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কোন সময়ে নাগপুরে যখন শ্রমিক কল্যাণ অফিসারগণের সর্ব্ব ভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তখনই উপযুক্ত পর্য্যায়ে কর্মীগণের পরিচালনা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ বা তাদের সংশ্লিষ্ট করার প্রশ্নটি প্রথম পরীক্ষা করা হয়। এই আলোচনায় বেশ কিছু সংখ্যক ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এবং পরিচালকগণের প্রতিনিধি যোগ দেন। যাইহোক, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়েই এই ব্যবস্থার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় এবং কয়েকজন অর্থনীতিবিদ, প্রত্যেক সংস্থায়, পরিচালনা পরিষদ গঠন করার পরামর্শ দেন। ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে নূতন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ ভারতীয় শ্রমিক সম্মেলনে স্থির হয় যে, দুই বছরের জন্য এই সম্পর্কে কোন আইনসঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবেনা বরং নিয়োগকারীগণেরই কয়েকটি শিল্পে স্বেচ্ছায় এই ব্যবস্থা চালু ক'রে পরীক্ষা করে দেখতে রাজি হওয়া উচিত।

১৯৫৮ সালের ৩১শে জানুয়ারি ও ১লা ফেব্রুয়ারিতে শ্রমিক-পরিচালক সহযোগিতা সম্পর্কে একটি আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হয়। এই সম্মেলন, যুক্ত পরিচালনা পরিষদের আকার, পরিষদে প্রতিনিধিত্ব, পরিষদের গঠনতন্ত্র, কর্মচারি নিয়োগ, সভার তালিকা, কর্মীদের তথ্যাদি সরবরাহ ইত্যাদি সম্পর্কে কতকগুলি সুপারিশ করেন। পরিচালনা পরিষদ গঠন সম্পর্কে একটি চুক্তির খসড়াও গৃহীত হয়। ১৯৬৭ সালের শেষ পর্য্যন্ত সরকারী তরফে ৪৭টি এবং বেসরকারী তরফে ৮৫টি মোট ১৩২টি যুক্ত পরিচালনা পরিষদ গঠিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু শিল্পসংস্থাগুলির পরিচালকরা তাঁদের ক্ষমতার কিছুটা অংশ পরিচালনা পরিষদকে দিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় এইদিকে কাজ বিশেষ অগ্রসর হয়নি।

বর্ত্তমান অবস্থা

পরিচালনায় কর্মীদের অংশগ্রহণ বা তাঁদের পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা সম্পর্কে বর্ত্তমান অবস্থা হল: ওয়ার্কস কমিটি, যুক্ত পরিচালনা পরিষদ, গঠন, পরামর্শদান পরিকল্পনা, এবং সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে পরিচালক বোর্ডে, ট্রেড ইউনিয়নের একজন প্রতিনিধিকে নিয়োগের মাধ্যমে তা সাফল্য বা অসাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষা ক'রে দেখা হচ্ছে। শ্রম সম্পর্কিত জাতীয় কমিশন, শ্রমিক-পরিচালক সম্পর্ক সম্বন্ধে যে অনুসন্ধানকারী কমিটি নিয়োগ করেন তাঁরা বলেছেন যে কয়েকটি ক্ষেত্রে ওয়ার্কস কমিটি বা যুক্ত পরিচালনা পরিষদ ভালো কাজ করেছে এবং শিল্পে শান্তি স্থাপনে সাহায্য করেছে, তবে সমগ্রভাবে এগুলি বিশেষ কার্য্যকরী হয়নি। জাতীয় শ্রম কমিশন উত্তরাঞ্চলের জন্য যে কমিটি নিয়োগ করেন, তাঁরা বলেছেন যে, শ্রমিক-পরিচালকের মধ্যে সম্পর্ক যথোপযুক্ত ছিলনা বলে ওয়ার্কস কমিটি এবং যুক্ত পরিচালনা পরিষদ বিফল হয়েছে। দক্ষিণাঞ্চল সম্পর্কিত অনুসন্ধানকারী কমিটি স্বীকার করেছেন ঐ অঞ্চলে ওয়ার্কস কমিটি সম্পূর্ণভাবে বিফল হয়েছে। তাঁরা অন্ধ্রপ্রদেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ ক'রে বলেন যে সেখানে ইউনিয়নগুলি ওয়ার্কস কমিটিগুলিকে সমর্থন পর্য্যন্ত করেনি।

মৌলিক এবং পরিচালনা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি, পরিষদের আলোচনার বহির্ভূত রেখে পরিচালকদের ভয় দূর করে সরকারী পক্ষ থেকে আন্তরিকতার পরিচয় দেওয়া সত্বেও, পরিচালকপক্ষ কমিটিগুলিকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেননি। এমন কি সরকারী সংস্থাগুলির পরিচালকপক্ষও কমিটিগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি।

বিভিন্ন শিল্পের অবস্থা বিভিন্ন বলে এবং প্রত্যেকটি রাজ্যের শ্রমিক আইন বিভিন্ন বলে এই সব পরিষদের কাজকর্মের পর্য্যালোচনা করা বেশ কঠিন। তবে এই সম্পর্কে পরিচালক পক্ষের ভুল দৃষ্টিভঙ্গী, বিফলতার অন্যতম কারণ। তবে কতকগুলি ট্রেড ইউনিয়নের মনোভাব আরও বেশী আশ্চর্য্যজনক। কতকগুলি ইউনিয়ন মনে করে যে, যুক্ত পরিচালনা পরিষদ স্থাপিত হলে ইউনিয়নের নেতাদের অধিকার এবং তাদের গুরুত্ব খর্ব্ব হয়ে যাবে। ট্রেড ইউনিয়নগুলির মনোভাব দেখে মনে হয় যে কর্মীরা যদি সোজাসুজি পরিচালনায় সঙ্গে যুক্ত হয় তাহলে কর্মীদের ওপর তাদের প্রভাব কমে যাবে এবং ভবিষ্যতে হয়তো ইউনিয়নই থাকবেনা। তাছাড়া ইউনিয়নগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতাও এই কমিটিগুলির বিফলতার আর একটা কারণ। যখন কোন কারখানায় একটির বেশী ইউনিয়ন থাকে তখন পরিচালকপক্ষ প্রায়ই বলেন যে, এদের মধ্যে কোন একটিকে বেছে নেওয়া মুস্কিল। যাই হোক ইচ্ছা যদি আন্তরিক হয় তাহলে নানা অসুবিধে সত্বেও একটা উপায় বার করা যায়। কর্মীদের উপযুক্ত প্রাপ্য দেওয়া, উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব স্বীকার করে নেওয়া, তাদের কল্যাণ ও নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

এ পর্য্যন্ত যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত হয়েছে তাতে দেখা যায় এই পরিষদ ও কমিটিগুলি ভালো একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। দুই পক্ষের মধ্যে আন্তরিক সহযোগিতা ও বিশ্বাসের মনোভাব সৃষ্টি করাটাই হল প্রকৃত সমস্যা, আইন কানুন বা অন্যান্য রীতি পদ্ধতির সমস্যা নয়। যাঁরা কাজ করছেন তাঁরা যদি স্বেচ্ছায় সহযোগিতা না করেন, পারস্পরিক বিশ্বাস যদি না থাকে তাহলে কোন সংস্থার পক্ষেই কাজ করা সম্ভব নয়। সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যেতে হলে শিল্পে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বিশেষ প্রয়োজন।

পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন ব্লকে যে একটা পরিবর্ত্তন আসছে তা বেশ বুঝতে পারা যায়। এই ব্লকের গ্রামগুলি বিশেষ করে ধাঙ্গম-জয়পুর, জাম্বেদিয়া ও চাবকা এই তিনটি গ্রাম, নিঃসংশয়ে এই পরিবর্ত্তনে গতি সঞ্চার করছে। এরা প্রাচীন রীতি, সেকেলে চাষপদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করে নতুন পথে যাত্রা সুরু করেছে। এরা বেশী ফলনের ধান ও গম চাষ করে কৃষিতে সাফল্য অর্জন করতে চাইছে।

বাংলার গ্রামে অধিক ফলনের শস্যের চাষ

এই নতুনের আহ্বান সুদূরের গ্রামগুলিতেও গিয়ে পৌঁচেছে। কতকগুলি গ্রামের সমগ্র জনসাধারণ উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। সমস্ত রকম কুণ্ঠা ও সংশয় পরিত্যাগ ক'রে কৃষকরা ক্রমেই বেশী সংখ্যায় বেশী ফলনের নতুন বীজ ব্যবহার করছেন।

নতুন পথের দিশারী

ধাঙ্গম-জয়পুর হল এই দিক দিয়ে একটি আদর্শ গ্রাম। জমি থেকে তিন চার গুণ বেশী শস্য পাওয়ার জন্য গ্রামটি, বেশী ফলনের বীজ ব্যবহার করতে সুরু করেছে। তিন বছর পূর্ব্বেও যেখানে প্রতি একরে মাত্র দশ থেকে কুড়ি মণ ধান পাওয়া যেত সেখানে এখন প্রতি একরে ৫৫ থেকে ৬০ মণ ধান ফলছে। আই আর-৮ বীজ থেকে পাওয়া যাচ্ছে ৬০।৬৫ মণ আর এনসি ৬৭৮ থেকে ৫০।৫৫ মণ।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে ঘন জঙ্গল এই গ্রামটিকে অন্যান্য গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। গ্রামের ১৫০টি চাষী পরিবার, প্রকৃতির খামখেয়ালীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বদ্ধপরিকর হন। কাছাকাছি ছোট নদীটাতে যে বাঁধ ছিল, সেই বাঁধের জলটুকুই ছিল তাঁদের সম্বল। ১৯৫৭ সালে সেই বাঁধটি ভেঙ্গে যায়। তখন থেকেই এই চাষীদের দুঃখের দিন সুরু হয়। ১০ বছর থেকে তারা সুধু বাঁচার জন্যই সংগ্রাম করছেন। ১৯৬৭ সালের খরা এবং সেই বছরে আমনের ফসল প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তাঁদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে। এরপর বেঁচে থাকার জন্য তাঁরা যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তা ছিল একটা অতি উপযুক্ত ব্যবস্থা।

ঐ খরায় ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরই তাঁদের সাহায্য করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাতে গ্রামের সবাই যোগ দেন এবং কাছাকাছি রঙ্গী নদীতে ২৯৮ ফিট লম্বা বেশ টেকসই একটা মাটির বাঁধ তৈরি করেন। এতদিন পর্য্যন্ত এ নদীর জল বৃথাই কংসাবতীতে বয়ে যেত। এরপর গ্রামবাসীরা তাঁদের ধানের ক্ষেতগুলিতে জল নিয়ে যাওয়ার জন বাঁধ থেকে এক মাইল লম্বা একটি খাল কেটে নিয়েছেন।

এইবারে সেচের জল সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে, ধাঙ্গম-জয়পুরের কৃষকরা ১৯৬৮ সালের গোড়ার দিক থেকেই বেশী ফলনের বীজ দিয়ে চাষ সুরু করেন। ৬০ একর জমিতে তাইনান ৩ এবং আই আর-৮ বোরো ধানের চাষ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তারা সোনারা ৬৪ এবং লালমারোজো বীজ নিয়ে গমের চাষও সুরু করেন।

১৯৬৮-৬৯ সালের আমন চাষের সময় তাঁরা সমগ্র ২০০ একর জমিতেই আই আর ৮ ছাড়াও এন সি-৬৭৮ বীজ ব্যবহার করেন। বেশী ফলনের বীজের চাষে বেশী পরিমাণে রাসায়নিক সার দিতে হয় আর তার ফলে অনেক সময়ে ফলন ভালো হয়না এই রকম একটা ধারণা যে দেশের কৃষকদের রয়েছে, তাঁরা তাতে ভয় পাননি। তাঁরা পরিমাণ মত সার প্রয়োগ ক'রে যে ফল পেলেন তা বেশ উৎসাহজনক। ফলে এই বছরের প্রথম ভাগে শীতের মরসুমে একই পদ্ধতিতে ধান ও গমের চাষ করলেন এবং পরে আমন ধানেরও চাষ করলেন। এই আমনের ফসল এখন কাটা হচ্ছে।

যে বীজগুলি ব্যবহার করে ভালো ফসল পাওয়া গেছে তা ছাড়াও নুতনতর

বীজ জয়া ও পদ্মা জাতীয় ধানের বীজও চাষ করা হয় এবং পূর্ব্বেকার চাষে যে সব অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে, অধিকতর সাফল্যের জন্য সেই অভিজ্ঞতাগুলিও কাজে লাগানো হয়।

অন্যদুটি গ্রামও পদাঙ্ক অনুসরণ করলো

সমবেত চেষ্টায় কি ফল পাওয়া যায় এবং বেশী ফলনের বীজ ব্যবহারে ফলন কতখানি বাড়ে সে সম্পর্কে জাম্বেদিয়া গ্রামটির কাহিনীও একই রকম। ১৯৬৮ সালের প্রথম দিকে শীতকালে, মাত্র ১০ একর জমিতে আই আর ৮ ধানের চাষ করে এই গ্রামটি বেশী ফলনের বীজ নিয়ে পরীক্ষা সুরু করে। তারপর থেকে গ্রামটির ১৯টি চাষী পরিবার সমস্ত কুসংস্কার উপেক্ষা করে গ্রামের সমস্ত চাষের জমিতে অর্থাৎ ১২০ একর জমিতে বেশী ফলনের বীজের ব্যবহার সুরু করেন। এই বছরের আমন ফসল তাঁরা তুলছেন আই আর-৮ ছাড়াও, অঞ্জনা, জয়া, পদ্মা এবং এনসি ৬৭৮ ধানের বীজ থেকে।

এবারে ফসল খুব ভালো পাওয়া যাবে এই আশায় তাঁরা এখন থেকেই আরও নতুন নতুন চাষের পরিকল্পনা করছেন। আমন ফসল কাটার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা বেশী ফলনের সোনালিকা ও কল্যাণসোনা গমের চাষ করবেন বলে স্থির করেছেন। সেচের প্রয়োজন মেটানোর জন্য তাঁরা চম্পা নদীতে একটা বাঁধ দিয়েছেন এবং জমির খালগুলিতে জল আনার জন্য একটা পাম্পসেট সংগ্রহ করেছেন।

তৃতীয় গ্রাম চাবকাও বেশী পেছনে পড়ে নেই। ঐ গ্রামের শতকরা ৭৫ জন কৃষক ইতিমধ্যেই সজাগ হয়ে উঠেছেন এবং তাঁদের ধানের জমিগুলিতে এখন বেশী ফলনের বীজ ব্যবহার করছেন।

বেশী ফলনের ধানের মধ্যে আই আর-৮ এবং এন সি ৬৭৮ই অন্যগুলির তুলনায় বেশী জনপ্রিয়। তবে পদ্মা ধানও ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বহু কৃষক এই ধান চাষ করে লাভবান হয়েছেন। আই আর-৮ এবং পদ্মা ধানের ফসল পেতে মাত্র ১০৫ দিনের মতো সময় লাগে। এতে তিনবার ধানের চাষ করা সম্ভবপর হয়েছে। তাছাড়া প্রাচীন জাতের ধানের তুলনায় এগুলিতে তুষের পরিমাণ কম হয় বলে ওজনে চাউলের পরিমাণ বেশী হয়।

ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন ব্লকের অন্যান্য গ্রামগুলিতে কয়েকজন কৃষক যে সাফল্য অর্জন করেছেন তা সত্যিই উল্লেখযোগ্য। এই ব্লকে ক্রমেই বেশী পরিমাণ জমিতে বেশী ফলনের ধানের চাষ করা হচ্ছে। ১৯৬৭-৬৮ সালে সম্পূর্ণ ব্লকে যেখানে মাত্র ৪০০ একর জমিতে বেশী ফলনের আমন ধানের চাষ করা হয় সেখানে ১৯৬৮-৬৯ সালে এই রকম ধানের জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৯০০ একর। এ বছরে তা ৮০০০ একরে দাঁড়াবে বলে মনে হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে নিবিড় ধান চাষের অন্তর্ভুক্ত ৯টি জেলার অন্যতম পশ্চিম মেদিনীপুরে, উঁচ পতিত জমিতে ধান চাষ সুরু করা হয়েছে। কংসাবতী নদী থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী জল পাওয়া গেলে এই পরীক্ষা সফল হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গে তৈলবীজ উৎপাদন ও আমদানী

পশ্চিমবঙ্গে তৈলবীজের বাৎসরিক আমদানীর পরিমাণ আনুমানিক তিন লক্ষ মেট্রিক টন। চতুর্থ বার্ষিক পরিকল্পনায় এই রাজ্যে বিভিন্ন প্রকার তৈলবীজের উৎপাদন ৫৫ হাজার মেট্রিক টন থেকে বাড়িয়ে ৯৪ হাজার মেট্রিক টনের লক্ষ্য মাত্রায় নিয়ে আসতে মনস্থ করা হয়েছে। প্রকল্পগুলির মধ্যে আছে সরিষা চাষের প্যাকেজ কার্যসূচীর প্রবর্তন, সরিষা চাষকে বহু ফসলী চাষ কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা, তিলসহ দো ফসলী চাষের ব্যবস্থা, ব্যাপকভাবে বাদাম চাষের প্রবর্তন ইত্যাদি।

সুতাকল শ্রমিকের সংখ্যা

১৯৬৮ সালের ১লা জানুয়ারীর হিসেব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে সুতাকল শ্রমিকের মোট সংখ্যা হ'ল ৫০,৮০৬ জন। সুতাকল শ্রমিকদের সর্বোচ্চ বেতনের হার ৪৩১.০১ টাকা এবং সর্বনিম্ন বেতন হার ১৩৮.৯০ টাকা।

নেইভেলি এ বছরে লাভ করবে

নেইভেলি লিগনাইট কর্পোরেশন হ'ল সরকারী তরফের একমাত্র সংস্থা যেখানে খনি থেকে লিগনাইট উত্তোলন, বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন, সার ও লেকো উৎপাদন ইত্যাদি নানা ধরণের কাজ হয়। বর্ত্তমান বছরে এটি অনেকখানি অগ্রগতি করতে পারবে বলে আশা করা যায়। গত আর্থিক বছরে কর্পোরেশন যথেষ্ট উন্নতি করে এবং তা বেশ উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ গত বছরে কাজ এতো ভালো হয় যে পূর্ব্ব বছরের তুলনায় ক্ষতির পরিমাণ তিন কোটি টাকা কম হয়। কর্পোরেশনের এই চমৎকার সাফল্যের পেছনে রয়েছে এর কর্ম্মপ্রচেষ্টার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অধিকতর উৎপাদন।

কর্পোরেশনের এই লিগনাইট খনির মতো এত বড় খনি প্রাচ্যে আর নেই এবং নানারকম অসুবিধে স্বত্বেও এটির অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। অষ্ট্রেলিয়া, জার্মানীর মত লিগনাইট উৎপাদনকারী দেশগুলি সাধারণতঃ যে সব অসুবিধের সম্মুখীন হয়, নেইভেলির যদি কেবলমাত্র সেই অসুবিধেগুলিই থাকতো তাহলে এখানে উৎপাদনের পরিমাণ আরও অনেক বেশী হতো। কিন্তু নেইভেলির সমস্যাগুলি অন্য রকমের। যাই হোক, ডিজাইনে, গবেষণায়, উৎপাদনে অবিরামভাবে উন্নতিসাধন ক'রে নেইভেলির উৎপাদন বাড়ানো হচ্ছে।

কর্পোরেশনের যে তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র রয়েছে তা দেশের মধ্যে সবচাইতে বড় এবং তাঁরা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা সম্পর্কে বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন। অন্যান্য তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র সচল করার জন্য মধ্যে মধ্যে এই কর্পোরেশনের সাহায্য চাওয়া হয়। উন্নতি এবং ব্যয়হ্রাসের জন্য সব সময় চেষ্টা করার ফলে গত বছরে যেখানে কর্পোরেশনের বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন প্রকল্পের ৯১ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয় সেই তুলনায় বর্ত্তমান বছরে ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা লাভ হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে কর্পোরেশনের বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা ৬০ কোটি ওয়াটে দাঁড়াবে।

শিক্ষিত-বেকার সমস্যা

সুরেন্দ্র কুমার

কর্মসংস্থান কেন্দ্রগুলিতে যাঁরা কাজের জন্য নাম রেজেষ্ট্রী করান এবং কর্মপ্রার্থীর সংখ্যার অনুপাতে যতজনকে কাজের সন্ধান দেওয়া হয় তা তুলনা করলে হতাশ হতে হয়। তাছাড়া যাঁরা নাম রেজেষ্ট্রী করান তাঁদের তুলনায় কর্মপ্রার্থীর প্রকৃত সংখ্যা অনেক বেশী। বহুদিন কর্মহীন হয়ে থেকে অনেকে হতাশ হয়ে পড়েন। গত দুই বছরে এই সমস্যা বরং তীব্রতর হয়েছে। এটা শুধু একটা অর্থনৈতিক সমস্যা নয় এর একটা সামাজিক—রাজনৈতিক দিকও রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে পাশের সংখ্যা এবং শিক্ষার সুযোগ-সুবিধে বেড়ে যাওয়াটা, শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বাড়ার অন্যতম প্রধান কারণ। একটি হিসেব অনুযায়ী দেশে ১৯৮৬ সালের মধ্যে ৪০ লক্ষ "প্রয়োজনাতিরিক্ত" ম্যাট্রিকুলেট এবং ১৫ লক্ষ "প্রয়োজনাতিরিক্ত" গ্র্যাজেয়েট হয়ে যাবে। লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সের একদল বিশেষজ্ঞের সহযোগিতায় ভারতীয় পরিসংখ্যাণ প্রতিষ্ঠান এই সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করে একই অভিমত প্রকাশ করেছেন।

মেকলে যে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেন তা তার উদ্দেশ্য পূরণ করেছে। স্বাধীনতা লাভ করার পরও বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলায়নি। আমরা শিক্ষাকে জাতীয় বিনিয়োগ বা লগ্নি বলে মনে করিনা। কলেজের কোন ছাত্র যদি ভবিষ্যত জীবনে একজন বৈজ্ঞানিক বা পণ্ডিত ব্যক্তি হন তাহলে তার তুলনায় যদি কোন ছাত্র উচ্চ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হলে কলেজগুলি বেশী গর্ব্ব অনুভব করে।

আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে এই সমস্যার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু এর সমাধান করা সম্ভবপর হয়নি। তৃতীয় পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময়ে এই বিফলতার কথা স্বীকার ক'রে বলা হয় যে, "মোটামুটিভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, দেশে বেকার সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি।" সরকার কেবলমাত্র সাম্প্রতিক কালেই এই সমস্যার ব্যাপকতা স্বীকার করে নিয়েছেন। এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ১৪ দফার একটি পরিকল্পনা তৈরি করা হয় এবং রাজ্যগুলিকে তা রূপায়িত করতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু রাজ্যগুলি থেকে যে সব উত্তর পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয় যে তাঁরা এই সমস্যাটিকে তেমন জটিল মনে করছেন না। কয়েকটি রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এর জন্য আর্থিক সাহায্য চেয়েছে, কতকগুলি রাজ্য আবার তাদের এলাকায় এই সমস্যার অস্তিত্বই অস্বীকার করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে খসড়া চতুর্থ পরিকল্পনায় বেকার সমস্যা সমাধান করা সম্পর্কে তেমন কিছু ব্যবস্থা করা হয়নি; এতে শুধু এই সমস্যা সম্বন্ধে কি দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হবে তা সাধারণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা সম্পর্কে পরীক্ষা করার জন্য বর্তমানে একটি উচ্চ পর্য্যায়ের কমিটি নিযুক্ত হয়েছে।

কয়েকটি পরামর্শ

এই সমস্যাটি সমাধান করা সম্পর্কে এখানে কয়েকটি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রথমতঃ লোকসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার সকলের জন্যই খোলা থাকা উচিত নয়। যারা পড়াশুনায় খুব ভালো এবং শিক্ষালাভের জন্য সত্যিই উদগ্রীব তাদেরই শুধু উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে দেওয়া উচিত। অন্যদের, কারিগরী শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় পাঠানো উচিত। উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করার পর অন্য কোন পথ না থাকাতেই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ভীষণ বাড়ছে। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা যায় যে, উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে যারা বেরুবে তাদের মধ্য থেকেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির, তাঁদের কর্মী বাছাই করে নেওয়া উচিত এবং ইচ্ছে করলে পরে তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

তৃতীয়তঃ আর্থিক উন্নয়নের গতি দ্রুততর করতে হবে। উন্নয়নের শ্লথ গতি বেকার সমস্যা বৃদ্ধির একটা প্রধান কারণ। সরকারের আরও অনেক প্রকল্প হাতে নেওয়া উচিত এবং বেসরকারী লগ্নীতে উৎসাহ দেওয়া উচিত। চতুর্থতঃ জনশক্তির উপযুক্ত পরিকল্পনা তৈরি করা উচিত। এইরকম পরিকল্পনার অভাবে যে দেশে এতো করার আছে সেই দেশেই ইঞ্জিনীয়াররা পর্য্যন্ত বেকার রয়েছেন। কাজেই আমাদের শিক্ষাসূচীও নতুন ক'রে তৈরী করা উচিত।

তাছাড়া আত্মপ্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দেওয়া উচিত। প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভ করার পর বেকার ব'সে না থেকে নিজের চেষ্টায় একটা কিছু গড়ে তোলায় উৎসাহিত করতে হবে। বিশেষ করে ইঞ্জিনীয়াররা যাতে নিজেরাই আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেন, সেই জন্যে কেবলমাত্র অসুবিধেগুলি দূর করে নয় সক্রিয়ভাবে উৎসাহ দিয়ে একটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা সরকারের কর্ত্তব্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে, গুজরাট শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা প্রশংসার যোগ্য। পেট্রোল পাম্পের কাজ এবং পেট্রোলজাত অন্যান্য জিনিসের খুচরা কারবার সমবায় সমিতিগুলিকে এবং বেকার ইঞ্জিনীয়ার ও অন্যান্য স্নাতকগণের অংশীদারমূলক সংস্থাগুলিকে দেওয়া হবে বলে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তাও একটা ভালো ব্যবস্থা বলা যায়।

শিক্ষার অপচয় হচ্ছে এই কথা না বলে, বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলিতে আমাদের ইঞ্জিনীয়ার ও চিকিৎসকদের পাঠানোর সম্ভাবনা বিবেচনা ক'রে দেখা উচিত। বিদেশে ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার ও চিকিৎসকদের সম্ভাবনা কতটুকু তা পরীক্ষা ক'রে দেখার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে একটি বিশেষ শাখা খোলা যেতে পারে। তবে শিক্ষিত ব্যক্তিদের অপেক্ষাকৃত কম বেতন গ্রহণে প্রস্তুত থাকতে হবে। বৃটেনে শিক্ষিত বেকারদের যে সব সর্ত্তে কর্মের সংস্থান করে দেওয়া হচ্ছে এটা হ'ল সেগুলির মধ্যে অন্যতম সর্ত্ত।

মাদ্রাজ মানমন্দিরের বর্ত্তমান রূপ

মাদ্রাজ মান-মন্দিরের ইতিহাস

বিবরণ—এস. ভি. রাঘবন

(মাদ্রাজের সংবাদদাতা)

মাদ্রাজের আঞ্চলিক আবহ দপ্তর ১৭৭ বছরের প্রাচীন। ১৭৯২ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মাদ্রাজ শহরের মুঙ্গামবাককামে এই কেন্দ্রটি স্থাপন করে। উদ্দেশ্য ছিল ভারতে জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল ও নাব্য বিদ্যার বিকাশে সাহায্য করা। এই প্রকল্প সম্বন্ধে তৎকালীন গভর্ণর সার চার্লস্ ওকলের অসীম উৎসাহের ফলে মাদ্রাজ মান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রকল্পে তৎ-কালীন মাদ্রাজ সরকারের সদস্য মিঃ উইলিয়াম পেট্রি-র সহযোগিতাও প্রচুর পাওয়া গেল। মিঃ পেট্রি নিজের টাকা খরচ করে এর ৫ বছর আগেই একটি মানম-ন্দির তৈরি করিয়েছিলেন।

গ্র্যানাইটের তৈরি যে স্তম্ভের ওপর প্রথম ট্রানজিট যন্ত্র বসানো ছিল সেটি আজও সযত্নে রক্ষিত আছে। স্তম্ভের গায়ে স্থপতি মাইকেল টপিং আর্চ-এর নাম। তা ছাড়া তামিল ও তেলুগুতেও এই নাম খোদাই করা আছে।

প্রথম জ্যোতির্বিদ যিনি এই মান-মন্দিরে কাজ সুরু করেন, তিনি হলেন, মিঃ জে-গোল্ডিংহ্যাম এফ. আর. এস.। ১৭৯০ সালে তিনি যে সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন সেগুলির ও তাঁর অন্যান্য পর্যবেক্ষণের রেকর্ডের একটি খণ্ড আজও রাখা আছে। পাণ্ডুলিপি আকারে ১৮১২ থেকে ১৮২৫ সাল পর্য্যন্ত দুটি খণ্ডে, তাঁর পর্যবেক্ষণের সমস্ত বিবরণ রয়েছে। এ ছাড়া বিষুব রেখার কাছে এবং মাদ্রাজে, তিনি দোলক (পেণ্ডুলাম) নিয়ে যে মূল্যবান পরীক্ষা চালিয়েছিলেন তার বিবরণও রয়েছে আর একটি খণ্ডে। তিনি ভারতের বিভিন্ন জায়গার ও অন্যান্য জায়গার দ্রাঘিমার দূরত্ব স্থির করেন এবং ফোর্ট ও মাউন্ট টাইম গানের সাহায্যে শব্দের গতি নিরূপণের পরীক্ষা চালান। ইনিই হলেন এ দেশে আবহ বার্তার ধারাক্রমিক বিবরণ রক্ষার পথিকৃত—ইনিই প্রথম ১৭৯৬ সালে আব-হাওয়ার পূর্বাভাষ সংক্রান্ত রেজিস্টার খোলেন।

তাঁর উত্তরসূরী মিঃ গ্র্যানভিল টেলর. এফ. আর. এস (১৮৩০-১৮৪৮) মান-মন্দিরে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আনালেন এবং নক্ষত্র রেজিস্টার তৈরির জন্যে তথ্য সংগ্রহ করতে সুরু করলেন। এই রেজিস্টারটি ১৮৪২ সালে ছাপানো হয়। এই রেজিস্টারে ১১,০০০ নক্ষত্রের অবস্থান রেকর্ড করা আছে। ১৮৪০ সালে ক্যাপ্টেন এস. সি. ই. লুডলো প্রহরে প্রহরে আবহবার্তা সংগ্রহ ও চৌম্বক গতি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের ধারা সুরু করেন।

১৮৪৯ থেকে ১৮৬১ সালের মধ্যে মাদ্রাজ মান মন্দিরে তিনজন জ্যোতির্বিদ নিযুক্ত হন। এরপর আসেন মিঃ এন. আর. পগসন। পরে তাঁর স্ত্রী ও কন্যাও তাঁর কাজে সাহায্য করেন। ইনি ৩০ বছর পরে ১৮৯১ সালে মারা গেলে ওঁর স্ত্রী বহু বৎসর মাদ্রাজ সরকারের আবহ-বার্তার প্রতিবেদক হিসেবে কাজ করেন।

মানমন্দিরের অতীত রূপ

১৮৬১ সালের পর এই মানমন্দিরে আরও বহু আধুনিক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম আনানো হয়। এর মধ্যে প্রধান ছিল একটি ট্রানসিক সার্কল ও একটি ৮ ইঞ্চি পবিধির ইকুইটোরিয়েল। মি: পগসনের আমলে ট্রানসিক সার্কল দিয়ে ৫০০০টি নক্ষত্রের পঞ্জী তৈরি হয়। এই নক্ষত্রগুলির প্রত্যেকটিকে ৫ বার লক্ষ্যপথে ধরা হয়। ইকুইটোরিয়েলের সাহায্যে মি: পগসন ৬টি ছোট উপগ্রহ ও ৭টি স্থান পরিবর্ত্তনকারী নক্ষত্র আবিষ্কার করেন। স্থান পরিবর্ত্তনকারী নক্ষত্রের তালিকা সম্পূর্ণ হবার আগেই পগসন মারা যান। তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী মি: মিচিস্মিথ ঐ কাজ শেষ করেন। মি: পগসনের নামও একটা কারণে সবিশেষ স্মরণীয়। তিনি নক্ষত্রের উজ্জ্বলতার পরিমাপ নির্ধারণে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এমন কি আজকের দিনেও নক্ষত্রলোকের উজ্জ্বলতার পরিসীমা নির্ধারণ পদ্ধতি বোঝানো হয় পগসন স্কেল দিয়ে।

১৮৯৫ সালে, কোডাইকানালে সৌর মান-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। ১৮৯৯-এর এপ্রিল মাসে ভারতীয় মান-মন্দিরগুলির পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত প্রকল্পটি কার্যকরী হয়। সেই সময় মাদ্রাজ মান-মন্দির, মাদ্রাজ সরকারের কাছ থেকে ভারত সরকারের হাতে চলে যায় এবং মাদ্রাজের সরকারী জ্যোতির্বিদ কোডাইকানাল ও মাদ্রাজ মান-মন্দিরের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন।

১৯৩১ সাল পর্যন্ত মাদ্রাজ মান মন্দির তেমনি থাকে। ইতিমধ্যে কর্মচারী ছাঁটাই-এর ফলে মান-মন্দিরটি কোনোও প্রকারে টিকে থাকে। তখনও অবশ্য মাদ্রাজ মান-মন্দির ভারতীয় টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার জন্যে সময় সঙ্কেত পাঠাত। তা ছাড়া মাদ্রাজে দৈনিক আবহবার্তা প্রকাশ করত। এই আবহবার্তার সূত্রপাত করা হয় ১৮৯৩ সালের অক্টোবর মাসে।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতীয় আবহ দপ্তরগুলির পুনর্বিন্যাস ঘটে এবং সেই সময় দেশে ৫টি আঞ্চলিক আবহকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মাদ্রাজের কেন্দ্রটিতে কাজ সুরু হয় ১৯৪৫ সালের ১লা এপ্রিল। মাদ্রাজ কেন্দ্র তার পর্ববর্তী জায়গাতেই আছে তবে আধুনিক যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম ও অন্যান্য ব্যবস্থায় সজ্জিত ভবনটি নতুন। এই ভবনের নাম নক্ষত্র বাংলা।

আঞ্চলিক কেন্দ্রের কার্যক্রমের মধ্যে মান-মন্দিরগুলির পরিচালনা, আবহযন্ত্র সরঞ্জাম বসানো, যোগানো ও তার মান নিরূপণ এবং বিভিন্ন আবহ মান-মন্দির থেকে সংগৃহীত তথ্য পরীক্ষা ও পৃথকীকরণ, আবহাওয়ার পূর্বাভাস দপ্তরের কাজকর্ম তদারকী, আবহাওয়া সংক্রান্ত অনুসন্ধানের প্রত্যুত্তরগুলি ত্রুটি মুক্ত করা এবং রাজ্য সরকারগণ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সূত্রের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করা অন্তর্ভুক্ত।

সম্প্রতিকালে এই কেন্দ্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে কৃষকদের আবহবার্তা দেবার একটা সুসংহত কার্যসূচী। এর মধ্যে আছে আবহাওয়ার পূর্বাভাস, প্রতিকূল আবহাওয়া সম্বন্ধে সাবধানী সংকেত ও কৃষি মরসুমের আবহাওয়া সংক্রান্ত খবরাখবর জোগানো। কয়েক বছর আগে বায়ুর গতি প্রকৃতি ও শক্তির অনুসন্ধান এবং কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি তৈরির পরীক্ষা চালানোর ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে কারিগরী সাহায্য দেওয়া হয়। এই কেন্দ্রে আবহ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা চলতেই থাকে।

পরিকল্পনা রূপায়ণ সমস্যা

৩ পৃষ্ঠার পর

বেশীর ভাগই, উৎপাদন ব্যবস্থাগুলির কার্য্যকরী তহবিলে লগ্নি করা হয় অর্থাৎ শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এবং কিছু পরিমাণে কৃষকদের কার্য্যকরী মূলধন হিসেবে দেওয়া হয়। কাজেই ব্যাঙ্কগুলিকে তাদের এই কর্ত্তব্য সম্পাদন করতেই হবে। তবে যেটুকু হতে পারে তা হল খুব সতর্কভাবে পরীক্ষা করে কেউ হয়তো বলতে পারেন যে বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কগুলি অপেক্ষাকৃত অল্প অগ্রাধিকারমূলক কাজের জন্য যে টাকা দিচ্ছে, সেটা অপেক্ষাকৃত বেশী অগ্রাধিকারসম্পন্ন কাজে দেওয়া উচিত। ব্যাঙ্কের কার্য্যপদ্ধতিতে খানিকটা পরিবর্তন, সংশোধন করে সমস্ত ব্যবস্থায় একটা সংহতি এনে, কিছুটা অর্থ সঞ্চয় করা যেতে পারে, অথবা সরকারী সংস্থাগুলিতে লগ্নির পরিমাণ বাড়তে পারে অথবা পূর্ব্বের তুলনায় সরকারী তরফের ঋণের পরিমাণ বাড়তে পারে। তবে এগুলিও খুব সতর্কতার সঙ্গে সামান্য সংশোধন পরিবর্ত্তনের ফলেই সম্ভবপর হতে পারে, ব্যাঙ্কগুলি থেকে মোটা টাকা অন্যত্র লগ্নি করা যাবে, সে রকম আশা না করাই ভালো।

সাধারণ ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি প্রকৃতপক্ষে লগ্নি ব্যাঙ্ক নয়, কেবলমাত্র সাময়িক প্রয়োজনের জন্য এগুলি থেকে স্বল্প সময়ের জন্য ঋণ দেওয়া হয়। ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি কাজ চালাবার জন্য মূলধন সরবরাহ করে দীর্ঘ মেয়াদী লগ্নির জন্য ঋণ সরবরাহ করেনা। সমস্ত বেসরকারী উৎপাদক এবং ব্যবসায়ীর কাজ চালাবার জন্য মূলধনের দরকার হয় এবং যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের মিশ্রিত অর্থনীতি থাকবে, ততদিন পর্য্যন্ত এদের প্রয়োজন মেটাবার একটা ব্যবস্থাও রাখতে হবে। বর্ত্তমানে, অর্থের বৃহত্তর ব্যবহারের অংশটা আমরা উপেক্ষা করতে পারিনা, সে কথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে। তাছাড়া এটা অবিলম্বে সম্পূর্ণভাবে বদলানো সম্ভব ও নয়।

উচ্চ ফলনের ধান-চাষে সাফল্য

তমলুক কেন্দ্রের 'নাইকুড়ি গ্রামে শেখ আবুল রেজার জমি মাত্র দেড় বিঘে। আগে ঐ জমি থেকে ১০।১৫ মণ ধান তিনি পেতেন। এবার জেলার কৃষি দপ্তরের সহায়তায় দেড় বিঘে জমিতে পর্যায়ক্রমে তিনটে ধানের চাষ করেছেন। এতে ফলনের পরিমাণ ৬০।৬৫ মণ ধান। সংসারে তাঁর দশজন মানুষ। তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন, 'আগের বছরের মতো এবার কষ্ট হবে না।'

এই কারণে উচ্চ ফলনের ধানের বীজের চাহিদা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে।

চর্মশিল্প

শ্রীদিলীপ রায়

খাদি ও গ্রামশিল্পের বাণী হ'ল স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও আত্মনির্ভরশীলতার বাণী। প্রাচীনকালে গ্রামগুলি প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল অর্থাৎ গ্রামের প্রয়োজনগুলি গ্রাম থেকেই মেটানো হত। গ্রামের তাঁতি, কুমার, কামার, তখনকার গ্রামগুলির সীমিত প্রয়োজন মেটাতো। অর্দ্ধ শতাব্দির কিছু পূর্ব্বে গান্ধীজী যে কুটির শিল্প এবং চরকা প্রবর্ত্তনের দিকে জোর দিয়েছিলেন তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পল্লীসমাজকে ও বিলুপ্তপ্রায় কুটির শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে গ্রামগুলিকে স্বনির্ভর করে তোলা। আদর্শ পল্লীসমাজ বলতে গান্ধীজী বুঝতেন যে, গ্রামেই তাঁতি, কুমার, ছুতার, কামার, চামার থাকবে এবং এরাও সসম্মানে গ্রামে বাস ক'রে গ্রামের প্রয়োজন মেটাবে। পারস্পরিক লেনদেনের মাধ্যমে একে অপরের প্রয়োজন মেটাবে, সুখে দুঃখে পরস্পরের পাশাপাশি থাকবে। এরা যদি গ্রামের সাধারণ প্রয়োজনগুলি মেটাতে পারে তাহলে পল্লীবাসীদের সামান্য প্রয়োজনের জন্য সহরে ছুটাছুটি করতে হবেনা, সহরের অধিবাসীরাই বরং তাদের নিজেদের প্রয়োজনে গ্রামে আসবেন। অতি সামান্য জিনিস চামড়ার কথাই ধরা যাক। চামড়া যে বর্ত্তমান সভ্যজগতে অতি প্রয়োজনীয় একটা জিনিস তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হয়না। গ্রামগুলি থেকে হাজার হাজার মণ কাঁচা ও পাকা চামড়া সহরে যায়। এখানে গ্রামের চর্মশিল্প সম্পর্কেই দুই একটি কথা বলছি। গ্রামের তথাকথিত হরিজনরা ভারতকে বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জনে সাহায্য করছে।

মৃত মহিষ বা গরুর প্রতিটি জিনিসই কোন না কোন কাজে লাগে। পশুর মৃতদেহ যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উপযুক্তভাবে কাজে লাগানো যায় তাহলে একদিকে যেমন সার পাওয়া যায় অন্যদিকে আরও নানারকম রাসায়নিক বস্তুও পাওয়া যেতে পারে। একটি পশুর স্বাভাবিক মৃত্যুর পর যে দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে তা নিঃসংশয়ে করুণ। যে পশুটি সারাজীবন মানুষের জন্য খাটলো তার প্রতিদানে সে কিছুই পেলনা। কিন্তু মরে গিয়েও এই সব গরু, মহিষ আমাদের উপকার করে, আমাদের প্রয়োজন মেটায়।

যাই হোক প্রায় সব ক্ষেত্রেই মৃত পশুর চামড়াটা কাজে লাগানো হয়। চামড়ার ব্যবহার সহজেই অনুমেয় অবশিষ্ট অংশগুলি যেমন—হাড়, মাংস, চর্বি এগুলির রক্ষণও বিশেষ প্রয়োজনীয়। হাড় থেকে সাধারণতঃ যে সব জিনিস তৈরি হয় তা হল— বোন চারকোল (রিফাইনারীতে ব্যবহারের জন্য), বোন চায়না (ক্রকারির জন্য), বোন অয়েল (কেমিক্যাল রিএজেন্ট), বোন এ্যাস (ফারমাসিউটিক্যালস), বোন গ্লু (কাপেন্ট্রির জন্য), বোন মিল (পশুপক্ষীর খাদ্য)। হাড়ের মধ্যে যে ওসিন থাকে তা থেকে খুব উঁচু ধরনের জিলাটিন তৈরী হয়। এ ছাড়া হাড় থেকে ফসফেটযুক্ত সার পাওয়া যায়। মাংস থেকে নাইট্রোজেনযুক্ত সার, হাঁস-মুরগীর খাদ্য ও গ্লু তৈরি হতে পারে। চর্বিকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় (সাবান শিল্পের জন্য) ষ্টিয়ারিক এসিড, পামিটিক এসিড, ওলিক এসিড। এ ছাড়া ১০% গ্লিসারিনও পাওয়া যায়। এমন কি চর্বি থেকে মোমবাতি শিল্পের অনেকখানি প্রয়োজন মেটানো যায়। রক্ত থেকে তৈরি করা যায় হাঁস মুরগীর খাদ্য। এরপর শিং থেকে নানা রকম গৃহসজ্জার দ্রব্যাদি, অন্ত্রাদি থেকে সসেজ কেসিং তৈরি হয়। গরু মহিষের আর একটি প্রয়োজনীয় অংশ হল ক্ষুর। ক্ষুর থেকে এক রকম তেল নিষ্কাসন করা হয় যা সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি যেমন ঘড়ি, বন্দুক, সেলাইর কল, মেশিন ইত্যাদির জন্য অপরিহার্য্য। মৃত পশুর কান ও গলার নলীও অপচয়যোগ্য নয়। এগুলি থেকে উঁচু ধরনের আঠা প্রস্তুত হয়। লেজের চুল থেকে ব্রাশ, তুলি ইত্যাদি তৈরী হয়। তবে বর্ত্তমানে নানা ধরনের কৃত্রিম আঁশ এগুলির চাহিদা অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে। শিরদাঁড়ার ঠিক পাশটিতে যে তাঁত থাকে তা দিয়েও নিতান্ত কম জিনিস তৈরী হয়না। বিশেষ করে ধুনুরিদের হাতে তুলো ধোনার যে যন্ত্রটি থাকে তার টঙাস্ টঙাস্ শব্দ ঐ অবহেলিত বস্তুটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গোড়াতেই বলা উচিত ছিল যে, গরু মহিষের গোবরও আমাদের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় নয়। সার ছাড়াও এ থেকে আজকাল গ্যাস তৈরী হচ্ছে।

আবহমান কাল থেকেই আমরা জানি যে, চামড়ার কাজটা, একটা বিশিষ্ট শ্রেণীর লোকেরাই করে থাকে। সোজা কথায় তাদের চামার বলা হয়। এরা আমাদের সমাজে চিরকালই অস্পৃশ্য ছিল। শতাব্দির পর শতাব্দির একটা সামাজিক ব্যবধান এদের দূরে রেখেছে। এদের অস্পৃশ্যতার গ্লানি থেকে মুক্ত করার জন্য গান্ধীজী জীবনব্যাপি সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন। তথাকথিত হরিজনদের সামাজিক বাধার অক্টোপাস থেকে মুক্ত করার মন্ত্রগুরু গান্ধীজীর আত্মাহুতি আমাদের চোখের সামনে থেকে একটা কালো পর্দা সরিয়ে দিয়েছে। অস্পৃশ্যতার পাপ যখন দেশ থেকে দূর করা হয়েছে, কাউকে অস্পৃশ্য করে রাখা যখন আইনতঃ অপরাধ বলে ঘোষিত হয়েছে তখন চামার বলে কাউকে দূরে ঠেলে দেওয়া উচিত নয়। সুতরাং চর্মশিল্পকে রাজ্য জুড়ে এমন কি সারা দেশ জুড়ে এক ব্যাপক কর্ম্মসূচীর অধীনে এনে একে উন্নততর করে তোলা প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে ভারতে প্রতি বছর প্রায় তিন কোটি গরু মহিষ ইত্যাদি মারা যায়। কাজেই এই মৃতদেহগুলি থেকে যে বিপুল পরিমাণ চামড়া ও অন্যান্য জিনিস সংগৃহীত হয় তা সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানোর জন্য একটা ব্যাপক কর্ম্মসূচীর প্রয়োজন। চর্মশিল্পে কাঁচা-মালের অভাব আছে বলে মনে হয়না। সুতরাং যথাযথ একটা শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে লক্ষ হাতে কাজ দেওয়া যেতে পারে। গ্রামগুলি হ'ল অনাবিল জীবনযাত্রার প্রতীক। সুতরাং গ্রামীণ বা পল্লীভিত্তিক শিল্প গড়ে তুলতেই উৎসাহ দেওয়া উচিত।

পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে সয়াবীনের সম্ভাবনা

প্রোটিন সমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে সয়াবীন বহুকাল থেকেই পরিচিত এবং ভারতের কতকগুলি অঞ্চলে সহজেই সয়াবীনের চাষ করা যায়। তবে কিছুদিন পূর্ব পর্য্যন্তও আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে সয়াবীনের চাষ করা হতোনা। আমাদের দেশে সয়াবীনের চাষ সম্ভব কিনা সে সম্পর্কে বর্ত্তমান শতাব্দির গোড়ার দিকে যখন পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় তখন দেখা যায় যে এখানেও সয়াবীনের চাষ সম্ভব। তবে পরিকল্পনা সম্মত পদ্ধতিতে সয়াবীনের চাষ গত তিন বছর থেকে সুরু হয়েছে বলা যায়। ১৯৭০৭-১ সালের জন্য যে কৃষি উন্নয়ন সূচী তৈরি করা হয়েছে তাতে প্রায় ৫০,০০০ মেট্রিক টন সয়াবীন উৎপাদনের কর্মসূচী রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে আগামী পাঁচ বছরে এর উৎপাদন অনেকগুণ বেড়ে যাবে। তবে এগুলির উৎপাদন অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত চাহিদার ওপরেই নির্ভর করবে।

আমাদের দেশে অবশ্য প্রধানত: এ্যান্টিবায়োটিক শিল্পেই সয়াবীন ব্যবহৃত হয়। খাদ্যশিল্পে এগুলির ব্যবহার এখনও সুরু হয়নি। সয়াবীনের ময়দাকে অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে স্তন্যপায়ী শিশুদের খাদ্য উৎপাদন করা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য বিভাগ, কায়রা জেলা সমবায় দুগ্ধ উৎপাদনকারী ইউনিয়নের (আনন্দ) সঙ্গে একটি চুক্তি করছেন। এই শিল্পটির বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা হল ৬০০০ মেট্রিক টন। সয়াবীন থেকে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন করার উদ্দেশ্যে দুটি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে। বনস্পতি উৎপাদনের জন্য যে সয়াবীন তেল ব্যবহৃত হয় তা বর্ত্তমানে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

সয়াবীনের চাষে ভূমির উর্বরতা বরং বাড়ে। অন্যান্য শস্য যেখানে মাটি থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে, সেই জায়গায় সয়াবীন বাতাস থেকে নাইট্রোজেন নেয় এবং মাটিকে উর্ব্বর করে। যে কোন রকম মাটিতে সয়াবীনের চাষ করা যায়। এগুলির পক্ষে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়াই ভালো।

মগনবাড়ী আশ্রমের (ওয়ার্দ্ধা) আশ্রমিকরা যখন সয়াবীন নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন তখন গান্ধীজী লিখেছিলেন যে, "যাঁরা দরিদ্রদের দৃষ্টিভঙ্গীতে খাদ্য সংস্কার করতে উৎসাহী তাঁদের সয়াবীন নিয়ে পরীক্ষা করা উচিত। সয়াবীন যে অত্যন্ত পুষ্টিকর একটা খাদ্য তাতে কোন সন্দেহ নেই।" এতে কার্বোহাইড্রেটের অংশ খুব কম ব'লে এবং লবণ, প্রোটিন ও চর্ব্বির অংশ বেশী বলে একে খাদ্য হিসেবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা যায়। এর শক্তিমূল্য হল প্রতি পাউণ্ডে ২১০০ ক্যালরি, অপরপক্ষে গম ও ছোলার হল যথাক্রমে ১৭৫০ ও ১৫৩০ ক্যালরি। এতে শতকরা ৪০ ভাগ প্রোটিন এবং শতকরা ২০.৩ ভাগ চর্ব্বি আছে। অপরপক্ষে ছোলা ও ডিমে আছে যথাক্রমে ১৯ এবং ৪.৩ ভাগ আর ১৪.৮ ও ১০.৫ ভাগ। কাজেই প্রোটিন এবং চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য হিসেবে সাধারণত: যা গ্রহণ করা হয় তার ওপরে সয়াবীনের কোন খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নয়। কাজেই খাদ্যহিসেবে সয়াবীন গ্রহণ করলে গম ও ঘীর পরিমাণ কমানো উচিত এবং চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য একেবারেই গ্রহণ করা উচিত নয়।

গরুর দুধে পুষ্টিকর যে সব গুণ আছে সয়াবীনের দুধেও তাই রয়েছে। চীন, কোরিয়া এবং জাপানে যুগ যুগ ধরে সয়াবীনের দুধ ব্যবহৃত হচ্ছে। তাছাড়া শিল্পে, কৃষিতে ও ওষুধ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নানাভাবে সয়াবীন ব্যবহৃত হয়।

চীন ও জাপানে সয়াবীনের তেল দিয়ে রান্না করা হয়। মেসিনে দেওয়ার জন্যও এই তেল ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে সয়াবীনের প্রতিটি অংশ কাজে লাগে। এগুলির পাতা পচিয়ে সার হয়। শুকনো পাতা গরু মহিষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায় এবং তাতে দুধের পরিমাণ বাড়ে। আমেরিকায় দেখা গেছে যে, শুকরকে সয়াবীন খাদ্য দিলে সেগুলির ওজন বাড়ে।

সয়াবীনের তেল বের করে নেওয়ার পর যে খইল থাকে তাতে যথেষ্ট প্রোটিন ও খনিজ পদার্থ থাকে এবং সার হিসেবে, গরু মহিষের খাদ্য হিসেবে এমন কি এগুলি থেকে তৈরি ময়দা মানুষের খাদ্য হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

ঔষধী হিসেবেও সয়াবীন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মাংস, মাছ, ডিম, ড'াল, রক্তে যে এ্যাসিড সৃষ্টি করে, সয়াবীন বরং তা প্রতিরোধ করে। বহুমূত্রের রোগীদের পক্ষে সয়াবীনের ময়দা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য। এতে যথেষ্ট ফসফেট থাকে বলে নার্ভের দুর্বলতাজনিত রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা যায়। মাংসের প্রোটিন শরীরে ইউরিক এসিডের পরিমাণ বাড়ায় ফলে বাত, কিডনীর দোষ হয়, কিন্তু সয়াবীনের প্রোটিন ইউরিক এ্যাসিডের প্রতিক্রিয়া নষ্ট করে এবং কোন রোগ সৃষ্টি করেনা। বলা হয় যে চীনে সয়াবীন ব্যবহৃত হয় বলে সেখানে বাত রোগই নেই।

সয়াবীন সাধারণত: প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়না তবে অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে অতিরিক্ত খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায়। সেই ক্ষেত্রে তখন খাদ্যে যথেষ্ট প্রোটিন, চর্ব্বি ও লবণ থাকে এবং নিরামিষাশীদের পক্ষে তা উপযুক্ত খাদ্য হয়।

ভারতে কাশ্মীর থেকে নাগাভূমি পর্য্যন্ত উত্তরাঞ্চলের পার্ব্বত্য এলাকাগুলিতে সাধারণত: স্থানীয় চাহিদা মেটানোর জন্য সয়াবীনের চাষ করা হয়। ১৯৫৮ সালে গৃহীত তথ্যে দেখা যায় যে প্রায় ৪৩,০০০ একর জমিতে প্রায় ৬০০০ মেট্রিক টন সয়াবীন উৎপাদিত হয়। সয়াবীন সম্পর্কে একটি সংহত গবেষণাসূচী অনুযায়ী ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদে নানা ধরণের দেশী বিদেশী সয়াবীন নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। জবলপুরের জওহরলাল নেহরু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় পন্থনগরে উত্তর প্রদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা কেন্দ্রে, সয়াবীনের উন্নয়ন সম্পর্কে একটি বিশেষ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এই সব পরীক্ষা নিরীক্ষার ফল হিসেবে, ক্লার্ক, ব্র্যাগ, লী এবং হিল জাতীয় বীজ নিয়ে ব্যাপকভাবে সয়াবীন উৎপাদনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে।

—

জাতীয় উন্নয়নে কয়লা শিল্পের অবদান

অনিল কুমার মুখোপাধ্যায়

কয়লার ব্যবহার দিয়ে দেশের শিল্পোন্নয়নের মাত্রা স্থির করা যায়। ভারতবর্ষে শক্তি উৎপাদনের কাজে কয়লার প্রয়োজন সর্বোচ্চ, তা সে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য হোক, বাষ্পচালিত ইঞ্জিন হোক অথবা বাড়ীতে রান্নার জন্যই হোক। এ ছাড়া বিভিন্ন ধাতু নিষ্কাশনের জন্য, লোহা, তামা এবং অন্যান্য ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে, কয়লা ছাড়া কাজ চলতে পারে না। কয়লা থেকে শতাধিক রাসায়নিক এবং ভেষজ দ্রব্য তৈরি করা হয়ে থাকে, যা মানুষের দৈনন্দিন কাজে অপরিহার্য। কয়লা থেকে তৈরি নানা পদার্থ নতুন নতুন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে সুরু করেছে। ভারতে বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে কয়লা থেকে কৃষি সার, পেট্রোল এবং ডিজেল উৎপাদনের সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুসন্ধান চলছে, এবং আশা করা যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে এগুলির জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে।

কয়লা উৎপাদনের কাজ আরম্ভ হয় বাংলার বীরভম জেলায়, ১৭৮৪ সালে

ওয়ারেণ হেস্টিংসের আমলে। তারপর প্রায় ১০০ বছর ধরে কয়লা খুব একটা ব্যবহারে আসেনি। ১৮৫৩ সালে বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের ব্যবহার আরম্ভ হওয়ার পর কয়লার প্রয়োজন বাড়তে থাকে এবং ১৮৮২ সালে প্রায় ১০ লক্ষ টন কয়লা উৎপাদন করা হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বার্ষিক উৎপাদন ছিল ৬০ লক্ষ টন। ১৮৮০ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত প্রতি দশকে কয়লার উৎপাদন দ্বিগুণ হতে থাকে, যদিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কয়লার উৎপাদনও কমে যায়। ১৯৪২ সালে উৎপাদন হয়েছিল ২৯০ লক্ষ টন এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিক পবিকল্পনার প্রাক্কালে কয়লার উৎপাদন হয়েছিল ৩২০ লক্ষ টন। কয়লা শিল্পের এই ইতিহাসে দেখা যায় উৎপাদন ক্ষমতা ৩২০ লক্ষ টনে আনতে ১৬৭ বছর সময় লেগেছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৬)

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন শ্রমশিল্পের উন্নয়নের সংস্থান রাখা হয়। এগুলির সঙ্গে কয়লা শিল্পের প্রগতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৫৫-৫৬ এই পাঁচ বছরে কয়লার উৎপাদন বার্ষিক ৩২০ লক্ষ টন থেকে ৩৮০ লক্ষ টনে আনা যাবে বলে আশা করা হয়। এই বাড়তি ৬০ লক্ষ টন প্রয়োজন ছিল ইঞ্জিনীয়ারিং, শ্রম শিল্প (৪০ লক্ষ টন), রেলওয়ে (১০ লক্ষ টন) এবং তাপজাত বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য প্রয়োজনে (১০ লক্ষ টন)। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আশা অনুযায়ী ১৯৫৫-৫৬ সালে কয়লার উৎপাদন হয়েছিল ৩৮২ লক্ষ টন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৫৬-৬১)

দ্বিতীয় পরিকল্পনা মুখ্যত: শ্রম শিল্পের উন্নতির পরিকল্পনা। তার পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করা হয়েছিল যে ১৯৬০-৬১ সালে কয়লার চাহিদা ৬০০ লক্ষ টন হবে। এই গুরু দায়িত্ব পূরণের জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠান 'ন্যাশনাল কোল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন' সৃষ্টি করা হয়। সরকারী উদ্যোগে কয়লা আহরণ করার পরিমাণ ১৬৫ লক্ষ টন ধরা হয়েছিল এবং বেসরকারী খনিগুলির উৎপাদন ধরা হয়েছিল ৪৩৫ লক্ষ টন। সরকারী তরফে বিহার, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশে কতকগুলি নতুন কয়লাখনি খননের কাজ আরম্ভ করা হয়। তাছাড়া ধাতুশিল্পে ব্যবহারের জন্য যে 'কোকিং' কয়লার প্রয়োজন তার চাহিদা মেটানোর জন্য চারটি কেন্দ্রীয় ওয়াসারি এবং দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার সঙ্গে আর একটি ওয়াসারি তৈরি করার ব্যবস্থা করা হয়। এই ওয়াসারিতে উৎপন্ন মধ্যম শ্রেণীর কয়লা ব্যবহারের জন্য বিহার-বাংলা কয়লা ক্ষেত্রে তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রত্যাশানুযায়ী, কয়লা উৎপাদনের ক্ষেত্রে, সাফল্য অর্জন করা গিয়েছিল। ১৯৬০-৬১ সালে মোট উৎপাদন হয় ৫৫৫ লক্ষ টন, এর মধ্যে বেসরকারী এবং সরকারী খনিগুলিতে যথাক্রমে ৪৪৮ এবং ১০৭ লক্ষ টন উৎপন্ন হয়েছিল।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬১-৬৬)

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে লোহা, ইস্পাত, অন্যান্য ধাতু এবং ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি শ্রম শিল্পগুলি সম্প্রসারণে এবং তাপ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন এবং রেল ইঞ্জিনের প্রয়োজনে কয়লার চাহিদা বাড়বে বলে অনুমান করা হয়। এই ধারণা অনুযায়ী ১৯৬৫-৬৬ সালে ৯৭০ লক্ষ টন কয়লা প্রয়োজন হবে বলে ধরা হয় (যার মধ্যে সরকারী এবং বেসরকারী খনিগুলির অংশ ধরা হয় যথাক্রমে ৩৬৫ এবং ৬০৫ লক্ষ টন)। নতুন কয়লা ওয়াসারি স্থাপনের সংস্থানও রাখা হয়। ইস্পাত কারখানা, রেলওয়ে এবং তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিকে কয়লা সরবরাহ করার জন্য কিন্তু তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে দেখা গেল কয়লার চাহিদা সেভাবে বাড়ছে না, কারণ শ্রমশিল্পগুলির কাজ বিভিন্ন কারণে ব্যাহত হচ্ছিল। কয়েকবার বিভিন্ন সমিতি এই বিষয়ে পর্যালোচনা করে। বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতে কয়লা উৎপাদন এবং সরবরাহ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করে এবং প্রায় ১৬ কোটি টাকাব বিদেশী মুদ্রা ঋণ হিসেবে দিতে স্বীকৃত হয় যাতে তৃতীয় পরিকল্পনায় কয়লা উৎপাদনের কাজ অব্যাহত থাকে। এই ঋণের বহুলাংশ ব্যয় হয় বেসরকারী খনিগুলির জন্য, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আমদানী করায় এবং উৎপাদন বাড়াবার কাজে। দুর্ভাগ্যবশত: পরিকল্পনার কাজগুলি সুসম্পন্ন হতে পারেনি এবং ১৯৬৪-৬৬ সালে মোট উৎপাদন হয় ৭০৩ লক্ষ টন। এর মধ্যে

বোকারো কয়লা ওয়াসারি

বেসরকারী এবং সরকারী কয়লা খনিগুলির অংশ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫৪১ এবং ১৬২ লক্ষ টন। এই পরিকল্পনাকালের একটি বিশেষ সাফল্য হচ্ছে তামিলনাড়ু রাজ্যের নেইভেলীতে লিগনাইট (ধূসর কয়লা) খনির কাজ সুরু হওয়া। ১৯৬৫-৬৬ সালে সরকারী 'নেইভেলী লিগনাইট কর্পোরেশন' ২৫,৬৩,০০০ টন লিগনাইট উৎপাদন করে। লিগনাইট ব্যবহার করা হচ্ছে তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন ও কৃষি সার উৎপাদনের জন্য এবং ধূম্র বিহীন জালানী হিসাবে।

অন্তবর্তীকালীন বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬৬-৬৯)

তৃতীয় পরিকল্পনার পর তিন বছর অন্তবর্তীকালীন বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই তিন বছর মুখ্যত: উদ্দেশ্য ছিল চালু কাজগুলি সম্পন্ন করা এবং খনিগুলি থেকে পর্যাপ্ত কয়লা উৎপাদন করা। শ্রমশিল্পে সাময়িক যে অবনতির ভাব দেখা গিয়েছিল সেটা এই তিন বছরে কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়। শ্রমশিল্পে আবার প্রগতির ফলে কয়লার চাহিদাও বাড়তে থাকে। ১৯৬৬-৬৭ এবং ১৯৬৭-৬৮ সালের প্রতি বছরই প্রায় ৭১০ লক্ষ টন কয়লা উৎপাদন করা হয়। যার মধ্যে বেসরকারী এবং সরকারী খনিগুলির অংশ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫৪৫ এবং ১৬৫ লক্ষ টন। ১৯৬৮-৬৯ সালে প্রায় ৭৫০ লক্ষ টন কয়লা উৎপন্ন হয় এবং সরকারী খনিগুলির উৎপাদনের অংশ দাঁড়ায় আনুমানিক ২০৫ লক্ষ টন।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬৯-৭৪)

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করার পূর্বে বিভিন্ন শ্রমশিল্পে কয়লার চাহিদা, খনিগুলির উৎপাদন ক্ষমতা, অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ অধ্যয়ন করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশে খনি এবং ধাতু মন্ত্রক একটি কয়লা পরিকল্পনা সমীক্ষা সমিতি গঠন করে। এই সমিতি আবার ৮টি বিভিন্ন গোষ্ঠি গঠন করে। এই বিশেষ সমীক্ষাগুলিতে শুধু সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিই অংশ গ্রহণ করেনি, বিভিন্ন বেসরকারী খনিমালিক, তাঁদের সংস্থা, ব্যবহারকারী সংস্থা ইত্যাদি তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন এবং পরিকল্পনা কার্যে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেন।

চতুর্থ পরিকল্পনার সর্বশেষ বৎসর অর্থাৎ ১৯৭৩-৭৪ সালে কয়লার চাহিদা মোট ৯৩৫ লক্ষ টন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এর মধ্যে লোহা এবং ইস্পাত কারখানাগুলির চাহিদা ২৫৪ লক্ষ টন (কোকিং কয়লা)। রেলের চাহিদা ১৯৬৯-৭০ সালে ১৬২ লক্ষ টন থেকে কমে ১৯৭৩-৭৪ সালে ১৩৪ লক্ষ টন হবে। অধিক বৈদ্যুতিক এবং ডিজেল ইঞ্জিন ব্যবহারের ফলে বাষ্পীয় ইঞ্জিনে কয়লার চাহিদা কমে যাবে। তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হবে ১৮০ লক্ষ টন (মধ্যম কয়লা ছাড়া)।

আশা করা যাচ্ছে ১৯৭৩-৭৪ সালে সরকারী এবং বেসরকারী খনিগুলি যথাক্রমে ২৭০ এবং ৬৬৫ লক্ষ টন কয়লা উৎপাদন করবে। এর মধ্যে বাংলা বিহার কয়লা ক্ষেত্র থেকে মোট প্রায় ৫৮৮ লক্ষ টন পাওয়া যাবে। এ ছাড়া নেইভেলীতে প্রায় ৬০ লক্ষ টন লিগনাইট উৎপাদন করা যাবে।

কয়লা পরিকল্পনা সমিতির হিসেব মত চতুর্থ পরিকল্পনার সময়ে কয়লার চাহিদা মেটাতে যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সরঞ্জামে প্রায় ১১৪ কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ করতে হবে।

সরকারী খনিগুলির সম্প্রসারণ এবং নতুন কয়লাখনি খোলার জন্য পরিকল্পনা কমিশন যে ব্যয় বরাদ্দ করেছেন তা হল :—

চালু কাজ

ন্যাশনাল কোল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন

(লক্ষ টাকায়)

কোকিং কয়লাখনি কয়লা ওয়াসারি সাধারণ কয়লাখনি	২৯০০
নেইভেলী লিগনাইট কর্পোরেশন	২৪৫
কোল বোর্ডের তৃতীয় পরিকল্পনায় রোপওয়ে ব্যবস্থা	২৭৮

নতুন কাজ

ন্যাশনাল কোল ডেভেলপমেন্ট কর্পো

কোকিং কয়লাখনি—মনিডিহ কয়লা ওয়াসারি	১৫০০
অন্যান্য পরিকল্পনা —	৫০০

কোল বোর্ড

চতুর্থ পরিকল্পনায় কয়লা পরিবহন ব্যবস্থা	১০০০
মোট	৬৪২৩

এ ছাড়া আশা করা যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে কয়লা থেকে কৃষি সার উৎপাদনের জন্য ৩টি কারখানা হয়তো চতুর্থ পরিকল্পনাকালে স্থাপন করা সম্ভব হতে পারে।

কয়লা থেকে পেট্রোল বা ডিজেল তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই কৃত্রিম পেট্রোল তৈরি সম্ভব কিনা সে ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন। দেশে খনিজ তেলের একান্ত অভাব এবং বছরে প্রায় ১০০ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা ব্যয় করে খনিজ তেল আমদানী করতে হচ্ছে। কয়লা থেকে কৃত্রিম পেট্রোল তৈরি সম্ভব হলে প্রভূত বিদেশী মুদ্রার সাশ্রয় হবে এবং কয়লার উৎপাদনও বহুগুণ বেড়ে যাবে।

পশ্চিমবাংলার চতুর্থ পরিকল্পনা

পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখার্জী ও রাজ্যের উন্নয়নমন্ত্রী শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডি. আর. গাডগিলের সঙ্গে রাজ্যের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক পরিকল্পনা প্রসঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। সভায় রাজ্যের সম্পদ এবং সম্পদ সংগ্রহের সম্ভাবনা নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়।

উন্নয়নমন্ত্রী শ্রীলাহিড়ী কলকাতা মহানগরীর উন্নয়ন কর্মসূচী ও দ্বিতীয় হুগলী সেতু নির্মাণের জন্য অর্থের প্রয়োজনের কথাও তোলেন।

রাজ্য অনুসারে কয়লা উৎপাদন

(হাজার টন)

	১৯৬০	১৯৬৫	১৯৬৬	১৯৬৭	১৯৬৮
বিহার	২৫০০০	৩১০০০	৩১০০০	৩০০০০	৩২০০০
বাংলা	১৬৫০০	২০০০০	১৯৮০০	২০০০০	২০০০০
মধ্যপ্রদেশ	৬৩০০	৯১০০	৯৮০০	১০৮০০	১১৬০০
অন্ধ্রপ্রদেশ	২৫০০	৪০০০	৪১০০	৪১০০	৪০০০
উড়িষ্যা	৮০০	১২০০	১২০০	১২০০	১৩০০
আসাম	৭০০	৬০০	৫০০	৫০০	৫০০
রাজস্থান	৪২	১১	৭	২	৫
মহারাষ্ট্র	৮০০	১১০০	১২০০	১৩০০	১৬০০
কাশ্মীর	২৮	৩	৬	৯	১৫
তামিলনাড়ু	—	২৩০০	২৬০০	২৯০০	৪১০০
মোট	৫২৬৭০	৬৯৩১৪	৭০১১৩	৭০৯১১	৭৫১২০

মাছ

পূর্ব্ব বছরের তুলনায় ১৯৬৮ সালে বেশী মাছ ধরা হয়েছে

১৯৬৮ সালে সমগ্র বিশ্বে মোট ৬৪,০০০,০০০ মেট্রিক টন মাছ ধরা হয়েছে। পূর্ব্ব বছরে এর পরিমাণ ছিল ৬০,৭০০,০০০ মেট্রিক টন। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার একটি বিবরণীতে বলা হয়েছে যে ১৯৬৮ সালে যত মাছ ধরা হয়েছে তার মধ্যে নদী, পুকুর, হ্রদ ইত্যাদি থেকে ৭,৪০০,০০০ মেট্রিক টন এবং সমুদ্র থেকে ৫৬,৬০০,০০০ মেট্রিক টন থেকে ধরা হয়েছে।

এর মধ্যে ভারতে ধরা হয়েছে ১,৫২৬,০০০ মেট্রিক টন এবং বিশ্বের মৎস্য শিকারী দেশগুলির মধ্যে ভারতের স্থান হ'ল নবম।

পেরু ১০.৫২০,৩০০ মেট্রিক টন ধরে আবারও প্রথম স্থান অধিকার করেছে। জাপান ৮,৬৬৯,৮০০ টন মাছ ধরে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। সোভিয়েট ইউনিয়ন ধরেছে ৬,০৮২,১০০ টন এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। ৫,৮০০,০০০ টন মাছ ধরে চীন চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে। চীন সম্পর্কে সাম্প্রতিক কোন তথ্য পাওয়া যায়নি তবে ১৯৬০ সালের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে এই পরিমাণ দেওয়া হয়েছে।

২,৮০০,১০০ টন মাছ ধরে নরওয়ে পঞ্চম স্থান অধিকার করে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ২,৪৪২,০০০ টন মাছ ধরে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে। এর পরের স্থান হ'ল দক্ষিণ আফ্রিকার এবং মাছ ধরার পরিমাণ ২,০০০,০০০ টন। অন্যান্য যে সব দেশে ২০ লক্ষ মেট্রিক টনের কম মাছ ধরা হয়েছে সেগুলি হ'ল ডেনমার্ক, ভারত, স্পেন, ক্যানাডা, চিলি, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড এবং বৃটেন।

সূতাকল শ্রমিকের সংখ্যা

১৯৬৮ সালের ১লা জানুয়ারীর হিসেব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে সূতাকল শ্রমিকের মোট সংখ্যা হ'ল ৫০,৮০৬ জন। সূতাকল শ্রমিকদের সর্বোচ্চ বেতনের হার ৪৩১.০১ টাকা এবং সর্বনিম্ন বেতন হার ১৩৮.৯০ টাকা।

জলে ধানের চাষ সম্ভব

পশ্চিমবঙ্গে গভীর জলে ধানচাষের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাফল্যের পথে। এ সম্পর্কে গত সংখ্যায় কিছু খবর দেওয়া হয়েছে। নীচু জমিতে জল জমাজনিত সমস্যা শুধু বাঙলারই সমস্যা নয়। অতএব দেশের অন্যত্র এই সমস্যা আছে কি না এবং থাকলে সে সম্পর্কে কী করা হয়েছে ও কোনোও বিশেষ পদ্ধতি প্রচলিত আছে কি না তা' জানা লাভজনক হ'তে পারে।

এই প্রসঙ্গে তামিলনাড়ুর তাঞ্জাউর জেলার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ধানপ্রধান অঞ্চল হলেও জেলার সর্বত্র ধান চাষের পদ্ধতি এক নয়। যেমন তিরুরাই-পুণ্ডি তালুকে বিশেষ করে, তালাইনায়ার মুখপেট বুকে সহজেই বর্ষার জল জমে যায়; প্রবল বর্ষার সময় জলের গভীরতা দাঁড়ায় ৫ ফুট পর্যন্ত। অতএব ঐ সব জমিতে ধান বুনলে গাছের উচ্চতা ৫ ফুটের ওপর না হলে, ফসল ঘরে তোলা যায় না, পচে নষ্ট হয়। সম্প্রতি কৃষিবিভাগ সেখানে তালাইনায়ার ১ ও ২ নামের দুটি বীজ বিলি করেছে। ধানের বীজ বুনে, চারা বেরোলো সেগুলি সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ায় নীচু জমিতে বসিয়ে দেওয়া হয়। তারপর যেমন যেমন জল বাড়ে, চারাগুলিও জলের ওপর মাথা তুলে দাঁড়ায় এবং ধান পাকে ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে। ধান কাটার সময় হলে চাষীরা ছোট ছোট ডিঙা নৌকোতে চড়ে ধান কাটেন। ধানের আঁটিগুলি দড়ি দিয়ে বেঁধে জলের মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় উঁচু জমিতে। এই বীজের ধানের পরিমাণ নাকি একর প্রতি ৯০০ কিলোগ্রাম। মোট প্রায় ৩০,০০০ একর জমিতে, এই পদ্ধতিতে ধানের চাষ করা হয়। এ ছাড়াও যে সব জমিতে জল জমে দু'ফুট পর্যন্ত যে সব জমিতে দ্রুত ফলন ও দীর্ঘমেয়াদী—এই দুটি জাতের বীজ একত্রে বোনা হয়। দ্রুত ফলনের গাছে ফসল পাকতে পাকতে অন্য জাতের চারাগুলি মাথা তোলে। ফলে, এই জমিতে অল্প আয়াসে পর পর দুটি ফলন একই সময়ে পাওয়া যায়।

★

ডলার উপার্জ্জনে

ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রীর চাহিদা ক্রমশঃ বাড়ছে। ১৯৬৮-৬৯ সালে ৩৬৩.৩২ লক্ষ টাকা মূল্যের ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যাদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী করা হয়। পূর্ব্ব বছরে এই রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ২৫৩.৯৭ লক্ষ টাকা।

ভারতের মোট রপ্তানীর তুলনায় এই টাকাটা খুব সামান্য মনে হলেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো অত্যন্ত উন্নত দেশেও যে ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রী অনুপ্রবেশ করতে পেরেছে এইটেই হ'ল অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা। ১৯৬৮-৬৯ সালে ভারত প্রায় ৪০ রকমের ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী করে। এগুলির মধ্যে কয়েকটি প্রধান দ্রব্য হল—এম এস. পাইপ ও টিউব, ইস্পাতের ষ্ট্রাক্‌চারেল ইঞ্জিন, বিদ্যুৎবাহী তারের টাওয়ার, ঢালাই লোহার দ্রব্যাদি, মেসিন টুল, মোটরগাড়ীর অংশাদি, বাই-সাইকেলের অংশাদি, জিনিসপত্র ওপরে ওঠানোর মেসিন, লিফট্, ক্রেণ, পিতলের জিনিসপত্র।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, বাই-সাইকেল এবং এর অংশাদির রপ্তানীর পরিমাণ ১৯৬৭-৬৮ সালের ৭.৪০ লক্ষ টাকার তুলনায় ১৯৬৮-৬৯ সালে তা দাঁড়ায় ১৯.১৬ লক্ষ টাকায়; মেসিন টুলের রপ্তানীর পরিমাণ ৬.৮৮ লক্ষ টাকা থেকে ১২.৯০ লক্ষ টাকায় এবং স্ক্রুর রপ্তানীর পরিমাণ ২.৭৯ লক্ষ টাকা থেকে ১৬.৮০ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। আগামী কয়েক বছরেও এগুলির রপ্তানীর পরিমাণ বাড়বে বলে আশা করা যায়। অন্যান্য ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রীর রপ্তানীও বাড়বে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত বছরে আমাদের দেশ থেকে যেমন নানা ধরণের ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রী আমদানি করেছে, তেমনি এই আমদানির পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়বে বলে মনে হয়। অন্যান্য দেশের প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়ায় এবং কৃত্রিম পদ্ধতিতে নানা রকম জিনিস তৈরী হচ্ছে বলে, ভারত চিরকাল যে সব জিনিস রপ্তানী করেছে সেগুলির পরিমাণ কমে যেতে পারে। সেইজন্যই ভারতের এখন অন্যান্য জিনিস রপ্তানী করার দিকে বেশী মনযোগ দিতে হবে এবং সেইদিক দিয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রীর রপ্তানী বাড়বার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এই দিক থেকে প্রধান বাধা হ'ল জাহাজ ভাড়া। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রীর রপ্তানী বাড়বার এই সম্ভাবনার দিকে আরও বেশী মনযোগ দেওয়া উচিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রীর রপ্তানী বাড়ানোর জন্য ভারত সরকার অবশ্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন। ইস্পাত ও ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রীর রপ্তানী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকার বোষ্টনে একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শদাতা হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। ব্যবসা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে প্রচারকার্য্য, বাজার পর্য্যালোচনা, ব্যবসায়ীদের এদেশে আসতে আরও বেশী উৎসাহদান এবং আরও নানাভাবে ব্যবসা বৃদ্ধিতে উৎসাহদান ইত্যাদি নানা রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে।

ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পগুলি যাতে তাদের ক্ষমতা সম্পূর্ণ কাজে লাগিয়ে উৎপাদন যথেষ্ট বাড়িয়ে উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য হ্রাস করতে পারে তা সুনিশ্চিত করাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিছুদিন পূর্ব্বেও বেশীর ভাগ ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প সম্পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা কাজে লাগাতে পারছিল না, অনেক ক্ষেত্রে শতকরা ৪০ থেকে ৫০ ভাগ মেসিন অলস প'ড়ে ছিল। কিন্তু সম্প্রতি কাঁচামালের সরবরাহে উন্নতি হওয়ায় অবস্থারও উন্নতি হয়েছে এবং ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পও তাদের উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধি ও তা বিভিন্নমুখীন করার উদ্দেশ্যে এই শিল্পকে আর্থিক সাহায্য ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধে দেওয়াও এখন বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রীর প্রধান প্রতিযোগী দেশগুলি হ'ল জাপান, পশ্চিম জার্মানী এবং বৃটেন। এই সব দেশের মতো ভারতের ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পকেও সমান দক্ষ ও আধুনিক করা প্রয়োজন। রপ্তানীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সরকার উভয়েই যদি উভয়ের সহযোগিতায় আরও বেশী সচেষ্ট হন তাহলে ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রী থেকে ভারত আরও বেশী ডলার উপার্জ্জন করতে সক্ষম হবে।

হলদিয়া বন্দর

২ পৃষ্ঠার পর

তমলুক হ'ল—ইতিহাস প্রসিদ্ধ তাম্রলিপ্ত বন্দরের আধুনিক রূপ। এককালে ভারতীয় পণ্য নিয়ে পালতোলা ভারতীয় জাহাজ এই তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে ভেসে যেত দেশ বিদেশের বন্দরে, বাজারে। কালস্রোতে একদা তাম্রলিপ্ত ইতিহাসে পরিণত হয়। কিন্তু কালের চক্র অবিরত চলছে। হলদিয়া আবার গড়ে উঠছে—পুরানো তাম্রলিপ্তের উত্তর সাধক হিসেবে।

হলদিয়া বন্দর ঘিরে যে সব নূতন নূতন শিল্প গড়ে উঠবে তৈল শোধনাগার স্থাপন তার প্রথম পদক্ষেপ। শোধনাগারের পর বসবে সারের কারখানা। এ ছাড়া সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে বহু কল কারখানা গড়ে ওঠার সুযোগ রাখা হয়েছে। এই শিল্পগুলি কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে জনবসতি। ধীরে ধীরে নূতন শিল্প নগরীর পত্তন হবে হলদিয়ার মাটিতে। চারপাশ থেকে নানা রকমের পণ্য আসবে রেল, সড়ক, নদী পথে। কিছু লাগবে এখানকার শিল্পের কাজে বাকী চলে যাবে বিদেশের বাজারে, বন্দর থেকে জাহাজে করে। এই নূতন তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকেই আবার সেই বিস্মৃত প্রায় যুগের মত, ভারতীয় জাহাজ, ভারতের, পণ্য নিয়ে বিদেশের বন্দরে বাজারে ভিড়বে—ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছার প্রতীক হিসেবে।

ম্যাঙ্গালোর বন্দর

মহীশূর রাজ্যের ১৯টি বন্দরের অন্যতম ম্যাঙ্গালোর বন্দর দিয়ে ১৯৫৭-৫৮ সালে মাল চলাচল করে প্রায় ২,৯৯,০০০ টন এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে তা দাঁড়ায় ৪,৮৮,২৪৮ টনে। ঐ বন্দর মারফৎ লৌহ আকর পাঠাবার ব্যবস্থা সুরু করার পরে মাল পরিবহনের পরিমাণ বেড়ে যায়। পানাম্বুরে (ম্যাঙ্গালোরে) বড় বন্দরটির সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে ছোট খাটো বন্দরে অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা বিধানের প্রয়োজনীয়তা নেই বলে গণ্য করা হয়। বিগত পরিকল্পনাগুলির সময়েও এই কারণেই ছোট বন্দরগুলির প্রতি বেশী মনোযোগ দেওয়া হয়নি। অবশ্য এখন জাহাজ স্টীমার ও মাছধরা নৌকা প্রভৃতির জন্য এই বন্দরটি খুলে রাখা বাঞ্ছনীয় হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

উপস্থিত এই বন্দর দিয়ে বছরে প্রায় ১০ লক্ষ টন মাল চলাচল করে। পানাম্বুরের বড় বন্দরটির সম্প্রসারণের ভার নিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার। প্রথম পর্যায়ে ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয় ২৪ কোটি টাকা। এ পর্যন্ত এই কার্যসূচীর রূপায়ণে ব্যয় হয়েছে মোট ৬ কোটি টাকা।

রকেট প্রপেলেণ্ট

কেরালার থুম্বায় রকেট প্রপেলেন্ট তৈরির কারখানা সাউণ্ডিং রকেটের জন্য কম্পোজিট শ্রেণীর সলিড রকেট তৈরি সুরু করেছে। ভাবা পারমাণবিক কেন্দ্রের রাসায়নিক ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের অধীনে এই কারখানাটি চালু হয়েছে। ভাবা আণবিক গবেষণা কেন্দ্র ফ্রান্সের একটি সংস্থার কারিগরী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সুবিধা নিয়ে এটি তৈরির কাজ সুরু করার উদ্যোগ আয়োজন করছে। এ ছাড়া থুম্বায় মহাকাশ বিজ্ঞান ও কারিগরী কেন্দ্রের নক্সানুযায়ী তৈরি রকেটের জন্য দেশেই প্রয়োজনীয় প্রপেলেন্ট তৈরির কাজ সুরু করার সঙ্কল্পও রয়েছে।

ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন ১৯৬৮-৬৯-এ আবার আশাতিরিক্ত আয় করেছে। আয়ের পরিমাণ হবে ৫২৬ কোটি টাকা। মোট মুনাফার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২.৪১ কোটি টাকা। সুদ ও ব্যয় বাদ দিলে নীট মুনাফার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮.৪৬ কোটি টাকা।

সার বিতরণ ব্যবস্থা সহজীকরণ

চাষীদের মধ্যে সার বিতরণের ব্যবস্থায় সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার সার—বিক্রয় সংক্রান্ত আইনগত নিয়মকানুন যথেষ্ট শিথিল করেছেন। নতুন নিয়ম অনুযায়ী যে কোন ব্যবসায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে নাম রেজিষ্ট্রি করে সার বিক্রী করতে পারেন। অসাধু ব্যবসায়ীরা যাতে এই উদার নীতির অপব্যবহার না করতে পারে সেজন্য রাজ্য সরকারদের সজাগ ও সচেষ্ট থাকতে হবে।

গত ৯ বছরে দেশের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরির কারখানাগুলিতে ১০০ কোটি টাকা মূল্যের ট্রাক ও ভ্যান তৈরি হয়েছে। কারখানাগুলির অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতার সুপ্রয়োগের জন্য অতিরিক্ত মূলধন হিসেবে মাত্র ৫ কোটি টাকা লগ্নী করা হয়। কারখানাগুলিতে ৩ টনী শক্তিমান ট্রাক, ১ টনী নিশান ট্রাক ও নিশান যান তৈরি হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ৪০,০০০ গাড়ী তৈরি হয়েছে।

★

উন্নয়ন বার্ত্তা

★ হলদিয়া তৈলশোধনাগারের নির্ম্মাণ-কার্য্য আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। ফ্রান্স ও রুমানিয়ার সহযোগিতায় ৫৫ কোটী টাকায় নির্ম্মীয়মান এই শোধনাগারের নির্দ্ধারিত শোধন ক্ষমতা হ'ল ৩৫ লক্ষ টন।

★ কানপুরে, পান্‌কিতে, ইণ্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভস্ লিমিটেডের কানপুর-সার-কারখানায় কাজ শুরু হয়েছে। কারখানার জন্য ব্যয় হয়েছে ৬২ কোটী টাকা।

★ চেকোস্লোভাকিয়ার সহযোগিতায়, ৮.২৯ কোটী টাকা ব্যয়ে আজমীরে তৈরী গ্রাইণ্ডিং মেশিন টুল প্লান্টে পরীক্ষামূলক-ভাবে উৎপাদনের কাজ শুরু করা হয়েছে। এ পর্য্যন্ত ৮৫ লক্ষ টাকার মাল উৎপন্ন হয়েছে।

★ তামিলনাড়ুতে যান্ত্রিক সরঞ্জামের একটি কারখানা, নলকূপ খননের উপযোগী একটি ড্রিল তৈরী করেছে। দিশী ড্রিল-টির দাম আমদানী-করা ড্রিলের দামের অর্দ্ধেক।

★ একটি ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান বরাতমত সংযুক্ত-আরব-সাধারণতন্ত্রে একটি ডিমিনারেলাইজিং প্লান্ট সরবরাহ করেছে। এটির দাম হচ্ছে ২০ লক্ষ টাকা। শিল্প প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে ঐ বরাত আদায় করে।

★ মাদ্রাজে, সরকার পরিচালিত হিন্দুস্তান টেলিপ্রিন্টার সংস্থা আরবীক ভাষায় টেলিপ্রিন্টার রপ্তানী করার জন্যে কুয়ায়েৎ-এর কাছ থেকে বরাত পেয়েছে।

★ তামিলনাড়ুতে, সালেম থেকে ১৩ কিলোমীটার দূরে কাঞ্জামালাই-তে একটি নতুন খনি কাটার প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। কাঞ্জামালাই-এর পাহাড়ের ঢালুগুলির গভীরে লোহার স্তরের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় যে চৌম্বক পাথর আছে সেগুলিকে পৃথকভাবে কেটে বার করার সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি উদ্ভাবনই হ'ল এই নতুন খনি খোলার উদ্দেশ্য।

★ জাপানের ইস্পাতের কারখানাগুলি আসছে বছরে প্রায় ৬০ কোটী টাকা মূল্যের ৯০ লক্ষ টন ভারতীয় লৌহ আকর খরিদ করতে সম্মত হয়েছে।

★ ১৯৬৯ সালের অক্টোবর মাসে ভারতীয় রেলব্যবস্থা মোট আয় করে ৭৮.২৫ কোটী টাকা। গত বছরের অক্টোবরের তুলনায় এই পরিমাণ প্রায় ৭.৫৯ কোটী টাকা বেশী।

★ ১৯৬৯-৭০ সালে গুজরাট, কেরালা ও মধ্যপ্রদেশে গৃহনির্ম্মাণসূচী রূপায়ণের ব্যয় হিসেবে কেন্দ্রীয় পূর্ত্ত, গৃহনির্ম্মাণ ও নগর উন্নয়ন বিভাগ ঐ রাজ্যগুলিকে ১.৮০ কোটী টাকা বরাদ্দ করেছে।

★ ভারতসরকার কলকাতার রিহ্যাবিলিটেশান ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড্‌কে, কার্য্যকরী মূলধন বাবদ ১৫ লক্ষ টাকার ঋণ মঞ্জুর করেছেন।

★ পালি-সিরোহী রাজপথের মধ্যে (পালি থেকে ৪০ মাইল দূরে) মিঠরী নদীর ওপর একটি সেতু তৈরীর জন্যে শিলান্যাস করা হয়েছে। ৫৬৮ ফুট দীর্ঘ এই সেতুর জন্যে ৮ লক্ষ টাকা খরচ হবে। এই সেতু শেষ হ'তে ৮ মাস সময় লাগবে। এটির নির্ম্মাণকালে ৭০০ জনের কর্মসংস্থান হবে।

★ বিদেশে, ভারতীয় রেশমী বস্ত্রের রপ্তানী খুব বেড়ে গেছে। বর্ত্তমান বছরের প্রথম আট মাসে, ভারত ৭.২৫ কোটি টাকার রেশমী বিদেশে রপ্তানী করে। এই তুলনায় ১৯৬৮ সালের মোট রপ্তানীর পরিমাণ ছিলো ৫.৫০ কোটি টাকা।

পশ্চিমবঙ্গে সরকারী ফিসারী

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মোট সরকারী ফিসারী ৩২টি। তা ছাড়া মেদিনীপুর জেলার আলমপুরের আরও ১৪টি সরকার-পরিচালিত পুষ্করিণী স্টেট ফিসারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডকে, উন্নয়নের জন্য, ১৯৬৮ সালের আগস্ট মাসে হস্তান্তরিত করা হয়েছে। ১৯৬৮-৬৯ সালে সরকারী ফিসারীগুলো থেকে বাজারে ৭৮,৩৩৫ কে. জি. মাছ সরবরাহ করা হয়েছিল।

সংরক্ষণের কাজ আরম্ভ

সমগ্র পশ্চিম বাংলায় মোট কত মন্দির, মসজিদ এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক স্মৃতি সৌধ আছে তার তালিকা প্রস্তুত করবার জন্য রাজ্যের পূর্ত্ত দপ্তর কাজ আরম্ভ করেছেন। এই সম্পর্কে কোন তালিকা গত বিশ বছরে প্রস্তুত হয় নি। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দীকালের যে সমস্ত মন্দির, মসজিদ ও অন্যান্য স্মৃতিসৌধ পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে সেগুলির সংরক্ষণের জন্য রাজ্য-সরকারের পূর্ত্ত দপ্তর এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ১৯৭০ সালের মধ্যেই কুড়ি থেকে ত্রিশটি মন্দির, মসজিদ প্রভৃতি সংরক্ষণের কাজ শেষ হ'বে।

ধনধান্যে-তে কেবল অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। প্রবন্ধাদি অনধিক পনের শত শব্দের হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট ও গোটা গোটা অক্ষরে লিখলে ভালো।

REGD. NO. D-233

ইঞ্জিনীয়ারিং-এর টুকিটাকি

মাদ্রাজে পোর্ট ট্রাস্ট নিজেদের কারখানায় তৈরি একটি পাইলট লঞ্চ জলে ভাসিয়েছে। সম্পূর্ণ দেশীয় যন্ত্রপাতি দিয়ে তৈরি এই লঞ্চটি অগ্রগতির পথে দ্রুত গতিশীল, মাদ্রাজ বন্দরের একটি বিশেষ সম্পদ।

ইঞ্জিনীয়ার ও কারিগরদের দক্ষতার ওপর পোর্ট ট্রাস্টের শক্ত বনিয়াদ খাড়া রয়েছে। এই সব কুশলী যন্ত্র বিজ্ঞানীদের নৈপুণ্যের স্বাক্ষর বহন করছে এই লঞ্চটি। দেশের জলপথে চলাচলের উপযোগী দ্রুতগতিশীল যান তৈরির যে ঐতিহ্য আমাদের দেশে চলে আসছে তাতে আধুনিকতার স্পর্শ এনেছে এই নতুন নির্মাণকৃতিত্ব।

একদা বোম্বাই-এর একটি লঞ্চ তৈরি প্রতিষ্ঠানকে একটি লঞ্চ তৈরির বরাত

অশোক লেল্যাণ্ড ইঞ্জিন

দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটি বরাত নিলেও পরে জলযান তৈরির কাজ কোনোও কারণে বন্ধ করে দেয়। তখনই এই কাজের ভার দেওয়া হয় পোর্ট ট্রাস্টকে। প্রায় গোল আকারের এই লঞ্চটির দৈর্ঘ্য ১৫ মিটার, প্রস্থ ৩.৭৫ মিটার এবং ১.৭২৫ মিটার গভীর। এর ড্রাফট ১.২৭৫ মিটার এবং গতি ১২ নট।

লঞ্চটির পুরো কাঠামো শক্ত ইস্পাতের। জোড়গুলো ঝালাই করা। লঞ্চ-এর হালটির সম্পূর্ণ অংশে জিঙ্ক-এর আস্তরণ দেওয়া হয়েছে যাতে তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে না যায়। লঞ্চটির ওপরে চারধার ঢাকা একটা ইঞ্জিন ঘর। এটি পুরোপুরি

মাদ্রাজ বন্দর কর্তৃপক্ষে তৈরি পাইট লঞ্চ

এ্যালুমিনিয়ামের, ভেতরের দিক প্লাস্টিকের পাতে মোড়া। স্টার্ন গীয়ারটি একটি প্রসিদ্ধ জাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের নক্সার আধারে দেশীয় জিনিস দিয়ে তৈরি।

লঞ্চ-এ দুটি নাব্য ডিজেল ইঞ্জিন আছে। এই মডেলটি অশোক লে-ল্যাণ্ড প্রতিষ্ঠানের সাম্প্রতিক একটি উদ্ভাবন। লঞ্চটির ইঞ্জিন ৬ ভোল্ট শক্তির ব্যাটারী দিয়ে চালু করা হয়। আগে লঞ্চ চালাবার জন্য ব্যাটারীর ব্যবহার ছিল না, হাওয়ায় চাপ সৃষ্টি করে লঞ্চ স্টার্ট করা হ'তো।

টার্বোসেট

চিনিকলগুলির জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে ভারত হেভী ইলেকট্রিক্যালস (হায়দ্রাবাদ) সংস্থা ১৫০০ কিলোওয়াট শক্তির ১২টি ব্যাক প্রেশার টার্বোসেট তৈরির বরাত পেয়েছে। এর আগে আরও চারটির বরাত দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের বিদ্যুৎ পর্ষৎ-এর পাওয়ার স্টেশনগুলির জন্য যন্ত্র, সরঞ্জাম সরবরাহই হ'ল হায়দ্রাবাদ শাখার প্রধান কাজ। এই সঙ্গে এই কারখানা এখন চিনি, কাগজ, পেট্রোলিয়াম ও সিমেন্ট বসাবার জন্য প্রয়োজনীয় স্বল্প ক্ষমতার টার্বো সেটও তৈরি করছে। এ ছাড়া হায়দ্রাবাদের কারখানায় সার ও ইস্পাত শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় 'ব্লোয়ার' ও কমপ্রেসার'ও তৈরি হয়।

অর্থাৎ এখন ১.৫ মেগাওয়াট থেকে নিয়ে ১১০ মেগাওয়াট শক্তির সব রকম টার্বোসেটের চাহিদা মেটানোতে এই কারখানা সাহায্য করতে পারবে।

ডিরেক্টার, পাব্লিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাস্ট্রিয়েল সোসাইটি লিঃ—করোলবাগ, দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রথম বর্ষ ঃ ১৭
২৬শে জানুয়ারী, ১৯৭০
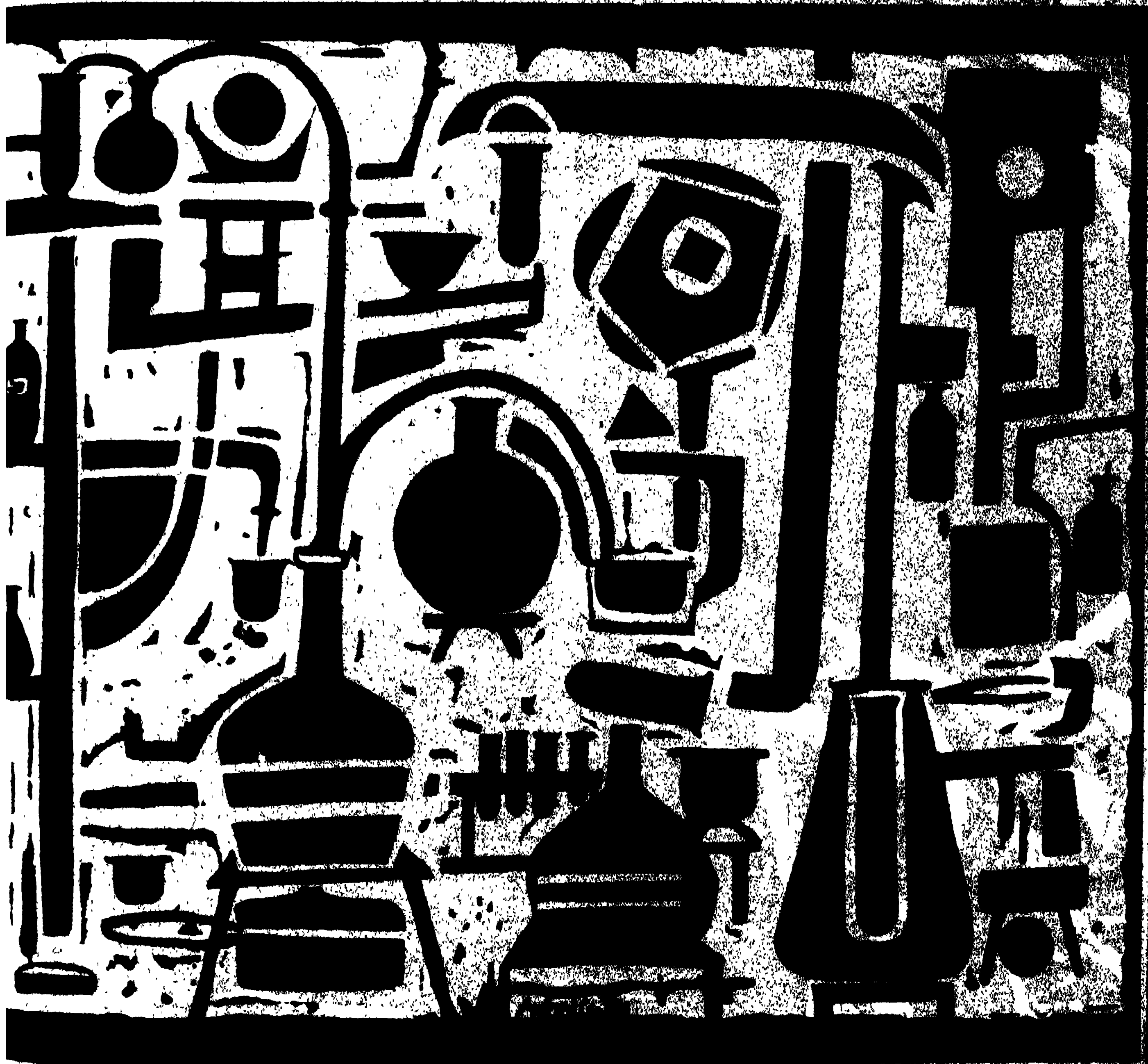
সাধারণতন্ত্র দিবস ঃ বিশেষ সংখ্যা

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

প্রথম বর্ষ সপ্তদশ সংখ্যা

২৬শে জানুয়ারী ১৯৭০ : ৬ই মাঘ ১৮৯১

Vol. 1 : No 17 : January 26, 1970

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০

টেলিগ্রাফের ঠিকানা : যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

ভুলি নাই

চূড়ান্ত বিশ্লেষণের পর দেখা যাবে, পরিকল্পনা রূপায়ণের সবচেয়ে বড় সমস্যা হ'ল জনসাধারণের সঙ্গে অন্তরের যোগ স্থাপন করা। আর সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায় হ'ল শিক্ষা ও বিশেষ শিক্ষণ।

—জওহরলাল নেহরু

এই সংখ্যায়

ক্লান্তিকর দীর্ঘপথ

পরাধীন একটা জাতির পক্ষে স্বাধীনতা হল জীবনের পরম সম্পদ ; কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতাবিহীন রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিশেষ কোন মূল্য নেই। যুগ যুগ ধ'রে দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ভারতের জনগণের পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন করাটা ছিল, সুখ ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌঁছুবার দীর্ঘ যাত্রাপথের প্রথম পর্য্যায় মাত্র। নিজেদের মুক্তির জন্য জনগণ তখন থেকেই শুধু কাজ করার সুযোগ পেলেন। তখন থেকে সকলেই জানতেন যে শত শত শতাব্দির অনগ্রসরতা কাটিয়ে ওঠার জন্য, দারিদ্র্য ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে যে বিপুল পার্থক্য রয়েছে তা দূর করার জন্য এবং আমাদের দেশের সর্ব্বাধিক পরিমাণ অধিবাসী যে পল্লী অঞ্চলে বাস করেন, সেই পল্লীবাসীদের জীবন উন্নত করার জন্য আমাদের বছরের পর বছর ধ'রে অবিরামভাবে বিপুল পরিশ্রম করতে হবে।

অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়েই ভারত, ১৯৫১ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ সুরু করে। কৃষি ও শিল্পে উৎপাদন বাড়ানো এবং সম্পদের সম বন্টনই শুধু এই পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিলনা, দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতে একটা পরিবর্ত্তন এনে শেষ পর্য্যন্ত মানুষের ব্যক্তিত্বের উন্নয়নও ছিল এই পরিকল্পনার লক্ষ্য। দ্রুত বর্ধমান জনগণের প্রয়োজন মেটানো, সমস্যার বিপুলতা এবং আরও নানা প্রয়োজন মেটানোর জন্য পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ অপরিহার্য্য বলে বিবেচিত হয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে, প্রথম পরিকল্পনাটি ছিল, "দেশের কৃষি, শিল্প, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্ত বিষয়গুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে ভারতের প্রথম সংহত চিন্তার একটা কাঠামো।"

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি খুব বড় ছিলনা, কিন্তু কাজ সুরু করার পথে প্রথম ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হয়। অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের পথে যাত্রা করাই ছিল প্রধান কথা এবং প্রথম পরিকল্পনাটি দেশ ও জাতিকে সচল করে তোলে। এটা খুব সহজ কাজ ছিলনা। লক্ষ লক্ষ মানুষের কল্যাণের জন্য, মানব প্রচেষ্টার প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে এবং মিশ্রিত অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের মধ্যে একটা মীমাংসা করে, গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা রচয়িতাদের কর্মসূচী তৈরি করতে হয়েছে।

তারপর কৃষি ও শিল্পের মধ্যে একটা সমতা রাখারও প্রয়োজন ছিল। আমাদের দেশের যে বিপুল সংখ্যক অধিবাসী দারিদ্র্য ও অন্ধকারে বাস করতে বাধ্য হচ্ছিলেন, তাদের জন্য খাদ্য, আশ্রয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজন ছিল। এইসব আশু লক্ষ্য ছাড়াও, যে অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর স্থায়ী সমৃদ্ধি গড়ে উঠতে পারে, পরিকল্পনা রচয়িতাদের, তার ভিত্তিও তৈরি করতে হয়। দেশে যতটুকু সম্পদ পাওয়া যেতে পারে এবং বিদেশ থেকে যতটুকু সাহায্য পাওয়া সম্ভব সেই সীমিত সম্পদ দিয়েই এই সব নানা রকমের কাজ করতে হয়েছে।

প্রথম পরিকল্পনার পর দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনার কাজ শেষ হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ প্রকৃতপক্ষে গত এপ্রিল মাস থেকে সুরু হয়েছে এবং এখন পর্য্যন্ত এর চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়নি। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে আমরা ১৮ বছরের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি এবং এখন আমরা আমাদের লাভ ও ক্ষতির হিসেব করতে পারি। ভারতের পরিকল্পনার রেকর্ড যে সব ক্ষেত্রেই ভালো নয় একথা সত্যি অথবা আমরা যতগুলি লক্ষ্য স্থির করেছিলাম তার সবগুলিতেই যে আমরা সাফল্য লাভ করেছি এমন কথাও বলতে পারিনা। অর্থনীতির অনেক ক্ষেত্রে আমরা বিফল হয়েছি বা আমাদের লক্ষ্য সম্পূর্ণ সফল হয়নি। যে ভুল এড়ানো যেতো সেই রকম ভুলও হয়েছে সত্যি কথা এবং তা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এই সব মানবিক ভুলভ্রান্তি ছাড়াও, মানুষের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত আরও অনেকগুলি জিনিস, আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি কমিয়ে দিয়েছে। যে দেশ, সময় এবং ইতিহাসের সীমা অতিক্রম করতে চেয়েছিল তার পক্ষে এগুলি সম্ভবত: অবশ্যম্ভাবী ও নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ছিল।

যাই হোক দেশ যে অনেক দিকে বিশেষ করে কৃষিতে, শিল্পে, শিক্ষায়, কারিগরী বিদ্যায়, স্বাস্থ্যে ও গৃহনির্মাণে বিপুল অগ্রগতি করেছে তা অস্বীকার করা যায়না। বেকার সমস্যা এবং নিরক্ষতার মতো দুটি বড় সমস্যা আমাদের এখনও সামাধান করতে হবে। দেশের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর কাছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যে এখনও স্বপ্ন এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। পরিকল্পনা রচয়িতাগণ এবং সরকার উভয়েই এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। তাই, ভারতের প্রতিটি নাগরিক যতদিন পর্য্যন্ত না সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে পারেন ততদিন পর্য্যন্ত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে তাঁরাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

পরিকল্পনা এবং জনসাধারণের সহিষ্ণুতা

হীরেন মুখোপাধ্যায়
সংসদ সদস্য

কথায় আছে সাধুতার ভান করার জন্য পাপি কাপট্যের আশ্রয় নেয়। প্রায় সেই রকমভাবেই বলা যায় যে, ধনতন্ত্র-বাদ, বিশৃঙ্খলার মধ্যে পথ হারিয়ে অনিচ্ছুকভাবে সমাজতন্ত্র-বাদকে যে সম্মান দেখায় তাই হ'ল পরিকল্পনা।

অনেকেই জানেন যে ফন মিসেসের মতো ধনতন্ত্রবাদের সমর্থক পণ্ডিতেরা বহু বছর ধ'রে বেশ জোর দিয়ে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করছিলেন। কিন্তু তাঁরা অবশ্য বেশীদিন সামাজিক বিবর্ত্তনের হাওয়ার বিরুদ্ধে লড়তে পারেননি। ১৯২৯-৩৩ সালের, বিশ্বের অর্থনৈতিক সঙ্কট যখন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মৌলিক দুর্ব্বলতাগুলি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিলো এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য সেই পটভূমিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তখনই তাঁরা প্রথম ধাক্কা খেলেন। ঐ সময়ে সোভিয়েট বিরোধী বিপুল প্রচার চলতে থাকা সত্ত্বেও, অর্থ-নৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া দেশ-গুলিকে যদি এগিয়ে যেতে হয় তাহলে তাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে তা না হলে তাদের ধ্বংস হয়ে যেতে হবে, বিশ্বব্যাপি এই ক্রমবর্ধমান ধারণা, প্রতিরোধ করা গেলনা। তবে, পরিকল্প-নাকে তখন অবশ্য একটা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে মনে করা হ'ত এবং সেই জন্যই আমাদের দেশের অনেকে এখনও একে সহজভাবে নিতে পারেননি এবং তাঁরা যখন পরিকল্পনার কথা বলেন তখন তার মধ্যে কিছু কাপট্য থাকে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার নীতির প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না হারিয়েও, ভারতে পরিকল্পনা সম্পর্কে গভীর চিন্তাশীলদের অগ্রনায়ক পরলোকগত ডঃ বিশ্বেশ্বরায়াও, সোভিয়েট পরিকল্পনার সাফল্যের মূলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক শৃঙ্খলাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তবে হরিপুরা অধি-বেশনের পর (জানুয়ারি ১৯৩৮) তখনকার কংগ্রেস সভাপতি সুভাষ চন্দ্র বসু যখন জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন ক'রে জওহরলাল নেহেরুকে তার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে বলেন তখনই সোভিয়েট পরি-কল্পনার সাফল্যকে প্রকৃতভাবে প্রশংসা জানানো হয়।

আদর্শবিহীন পরিকল্পনা

আমাদের পরিকল্পনা নানা রকম ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসেছে। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত "পরিকল্পনা" দেরাজের মধ্যে ছিল। একে দেরাজ থেকে মধ্যে মধ্যে নামিয়ে, ঝেড়ে, মুছে আমাদের অর্থনীতির উপযোগী করে তোলার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু জন-সাধারণের প্রয়োজন অনুযায়ী কোন সময়েই এর প্রকৃত সংশোধন করা হয়নি। পঞ্চায়েত থেকে সংসদ পর্য্যন্ত জনসাধারণের প্রতি-নিধিদের সঙ্গেও প্রকৃত আলোচনা করা হয়নি (কর্ত্তব্যের খাতিরে কেবলমাত্র দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনার সময় সংসদে আলোচনা করা হয়)। যে কর্মচারিতন্ত্রের হাতে রূপায়ণের কর্ত্তব্য প্রধানতঃ ন্যস্ত রয়েছে, তাঁরা এবং জন-নেতাগণও এই মতবাদে বিশ্বাসী যে, কোন চিন্তাধারার প্রতি অনুগত না থেকেও পরিকল্পনার কাজ করা যায় এবং তাই করা উচিত। আর এই জন্যই এই সব ব্যাপার ঘটেছে। তবে আমরা যদি এই সম্পর্কে একটু ভালো করে চিন্তা করি তাহলে অবশ্য সহজেই বোঝা যায় যে কোন আদর্শবিহীন পরিকল্পনা হাস্যকর। ই. এম. এস নাম্বুদ্রীপাদ ১৯৬৮ সালে বলে-ছিলেন যে "যাঁরা কোন রকম মতবাদ থেকে মুক্তির পক্ষে ওকালতি করেন তাঁদেরও নিজস্ব মতবাদ রয়েছে। বড় বড় জমিদারের জমিদারি রক্ষা করাটা মতবাদ নয় কিন্তু তাঁদের জমিদারি বাজে-য়াপ্ত করাটা (বা ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিলোপ সাধন) হল মতবাদ। বিদেশী একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের মালিকানায় কারখানা, ব্যাঙ্ক, চাবাগান ইত্যাদি রক্ষা করাটা মতবাদ নয় কিন্তু সেগুলি রাষ্ট্রায়ত্ব করাটা হ'ল মতবাদ।" এ কথাটা মনে রাখা বিশেষ দরকার যে, বিশ্বব্যাপি বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে সংগ্রামের সময়ে, সমাজতন্ত্রবাদ জয়ী হয়, পরিকল্পনার ধারণা তখনই ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হতে থাকে।

দুঃখজনক কাহিনী

জনগণের সংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের দেশে স্বাধীনতা আসেনি। পারস্পরিক

আলোচনা এবং দেশবিভাগের বিপুল মূল্যের মাধ্যমে স্বাধীনতা এসেছে। বৃটিশ সরকার অত্যন্ত কৌশলে এই মূল্য আদায় করেছেন। আমরা সাম্রাজ্যবাদ থেকে ক্ষমতা হস্তগত করিনি; বরং আমাদের বিহ্বল জনসাধারণ যে রক্ত ও অশ্রু পাত করেছেন তা লুকিয়ে রেখে একটা নাটকীয় অভিনয়ের মাধ্যমে—অত্যন্ত ফলাও করে প্রচারিত, ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের নাটকীয় অভিনয়ের মাধ্যমে, স্বাধীনতা লাভ করি। এই ঘটনাটি পরের সমস্ত ইতিহাস রঞ্জিত করেছে। যে স্বাধীনতার আলোর কথা জওহরলাল নেহেরু প্রায়ই বলতেন (১৯৪৫-৪৭) সেই আলো ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসের পর থেকে এ পর্য্যন্ত খুব কম ভারতীয়ের হৃদয়েই জ্বলেছে। পুন অল্প কথায় এতেই আমাদের পরিকল্পনাগুলির দুঃখজনক কাহিনী এবং আমাদের জনগণের ইচ্ছা ও স্বপ্নের সঙ্গে সেগুলির মৌলিক অসামঞ্জস্য বুঝতে পারা যায়।

স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে সব কাজ করা হয়েছে তা ছোট করে দেখানোর উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি বলা হলোনা। বরং একদিক দিয়ে বলা যায় যে পূর্ব্বে যা ধারণা করা যায়নি তাই এখন বাস্তবে রূপায়িত করা হয়েছে। ভারতের নানা জায়গায় এখন রয়েছে জওহরলাল বর্ণিত "নতুন মন্দিরসমূহ অর্থাৎ ভাকরা বা বোকারো, দুর্গাপুর বা বাঙ্গালোর বা তারাপুর বা ভিলাই অথবা বারাউনি ইত্যাদি। অনেক উন্নয়ন হয়েছে এটা সত্যি কথা—যেমন সাধারণ মানুষের আয়ু বেড়েছে, শিক্ষার সুযোগ সুবিধে অনেক বেড়েছে, যদিও আমাদের প্রয়োজন এবং জনগণের আশা অনুসারে তা এখনও অনেক কম। এটাও দাবি করা যেতে পারে যে স্বাধীন ভারত খাদ্যঘাটতি এবং এমন কি দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তিলাভ করতে না পারলেও, ১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষের মতো অবর্ণনীয় কোন বিপদ প্রতিরোধ করতে পারে। এ কথাও নিশ্চয়ই বলা যায়, জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ভারত, সমাজতন্ত্রী দেশগুলির কাছ থেকে সেই ধরণের সাহায্য নিতে ইতস্তত: করেনি, যা সত্যিই সাহায্য করে এবং আমাদের দেশের মূল স্বার্থ ব্যাহত করেনা।

এই ক্ষেত্রে আরও অনেক কথা বলা যায় কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। কিন্তু একথাটা সত্যি যে ভারত যতটুকু অগ্রগতিই করুকনা কেন, সে এখনও অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্থ ও বঞ্চিত। ভি. এস. নাইপাল দুঃখের সঙ্গে বলেছেন "আমরা অন্ধকার একটি অঞ্চলে বাস করি"। তারপর একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডা: চন্দ্রশেখর বলতে বাধ্য হয়েছেন যে "অন্ততঃপক্ষে ছয় কোটি ভারতীয় পেটে খিদে নিয়ে রাত্রিবেলায় একটু ঘুমুবার চেষ্টা করেন।" এতেই বোঝা যায় আমরা কোথায় আছি। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ ছেলেমেয়ে উপযুক্ত পুষ্টিকর আহার পায়না, যে প্রোটিন খাদ্যের অভাবে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির উপযুক্ত বিকাশ হয়না শিশুরা সেই প্রোটিন খাদ্য পায়না, এতেই বোঝা যায় আমরা কোথায় আছি। ১৯২১ সালে যখন মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সুতো কাটার জন্য এবং অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান করেন তখন বলেছিলেন যে, রাত্রিবেলায় পাখিরা তাদের পাখায় শক্তি সঞ্চয় করতে পারে বলেই ভোরের আকাশে গান গাইতে গাইতে উড়তে পারে, কিন্তু ভারতের মানুষ পাখি সবসময়েই এতো দুর্ব্বল যে রাত্রির তুলনায় দুর্ব্বলতর হয়ে তার ভোরের ঘুম ভাঙ্গে। সেই ১৯২১ সাল থেকে এই পর্য্যন্ত খুব একটা পরিবর্ত্তন হয়েছে কি?

আমাদের দেশের জনগণের মধ্যে যে ১ কোটি লোকের দৈনিক আয় ২৭ পয়সা, এর ঠিক ওপরের শ্রেণীর ৫ কোটি লোকের দৈনিক আয় ৩২ এবং পরবর্তী শ্রেণীর ৫ কোটি লোকের দৈনিক আয় ৪২ পয়সা, সে কথাটা বার বার মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়না। ফলিত অর্থনৈতিক গবেষণা সম্পর্কিত জাতীয় পরিষদ এই সংখ্যাগুলি প্রকাশ করেছেন। এমন কি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীচাবানও কি কিছুদিন আগে অত্যন্ত বিজ্ঞাপিত "সবুজ বিপ্লবের" বিবরণী সম্পর্কে বলেন নি যে একটু খোঁচাতেই তা লাল হয়ে যেতে পারে? তিনি এই লাল রঙটিকে খুব ভালোবাসেন বলেই যে এ কথা বলেছেন তা নয়। সাধারণভাবে দেশের প্রায় সমগ্র কৃষক শ্রেণীই যেখানে দরিদ্র এবং ভূমিহীন শ্রমিক, এই সবুজ বিপ্লবের ফলে তারা বিশেষ কিছুই পাননি এবং তারা যদি নিজেদের জন্য জমি দখল করে সমগ্র কৃষি ব্যবস্থায় পরিবর্ত্তন না আনতে পারেন তাহলে তাদের জীবনেও কোন পরিবর্ত্তন আসবেনা, এই কথাটা তিনি নিজে বাস্তববাদী বলে ভুলতে পারেননি।

"আত্মনির্ভরতা" এই কথাটা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি, এবং ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালেও আমরা শুনেছি যে আমাদের দেশ স্বয়ম্ভরতা অর্জন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং তা অর্জন করতে পারবে। তবুও দেখা যায় যে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসেও ভারতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট যে টাকা জমা রয়েছে (পি. এল ৪৮০ এবং অন্যান্য দানের দৌলতে) তা হ'ল ভারতের মোট অর্থের শতকরা ৫০ ভাগের কিছু কম এবং ভারতে মোট যে টাকার নোট চালু রয়েছে তার দুই তৃতীয়াংশেরও বেশী। আমাদের বিদেশী ঋণের পরিমাণ হ'ল প্রায় ৬০০০ কোটি টাকা এবং রপ্তানীতে খানিকটা উন্নতি হলেও আমাদের দেনাপাওনার অবস্থা ভয়াবহ। কাজেই আত্মনির্ভরতার যদি কিছুটাও অর্জন করতে হয় তাহলেও আমাদের পক্ষে তা কবে সম্ভব হবে? আমাদের জীবনে যে অসহনীয় অসাম্য রয়েছে—আমাদের দেশের সহরগুলির সামান্য কিছু লোক ঐশ্বর্য্যের যে জাঁকজমকপূর্ণ জীবন ভোগ করছেন এবং অন্যত্র প্রায় সবখানে যে হতাশা ও বঞ্চিত জীবনের গভীর অন্ধকার রয়েছে এই অসাম্য দূর করার এবং তাড়াতাড়ি দূর করার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে? যাদের পরিশ্রমে দেশ বেঁচে আছে আমাদের এই মহান দেশের সেই জনসাধারণ কবে আলোতে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হবে এবং জীবনে সার্থক হয়ে ওঠবার জন্য প্রকৃত সুযোগ সুবিধেগুলি ভোগ করতে পারবে?

পেকিংএর পিপলস্ ডেইলীর সাম্প্রতিক একটি সম্পাদকীয়তে মাও নীতির যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে কারুরই ইতস্তত: করা উচিত নয়। তা হল—"নদী পার হওয়াই যদি আমাদের লক্ষ্য হয় তাহলে নৌকা বা সেতু ছাড়া আমরা তা পার হতে পারিনা। কাজেই যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সেতু বা নৌকার সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে ততক্ষণ

১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

মুদ্রাস্ফীতি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন

এল. কে. ঝা
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর

বর্তমানে ভারতীয় অর্থনীতিতে এমন কতকগুলি সুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে যাতে আমি মনে করি যে আগামী কয়েক বছর ধরে আমরা উন্নয়নের উচ্চ হার বজায় রাখতে পারবো। আমি যে যে কারণে এই আশা পোষণ করছি সেগুলি হল: (ক) কৃষিতে সাফল্য, (খ) মূলধনী এবং নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী এই উভয় ক্ষেত্রেই শিল্পোৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি, (গ) কারিগরী, পরিচালনা এবং নতুন নতুন ক্ষেত্রে উদ্যম ও কৌশলের ক্রমোন্নতি, (ঘ) রপ্তানীতে যথেষ্ট উন্নতি।

তবে মূল্যের স্থিতিশীলতা নষ্ট না করে যাতে উন্নয়নের উচ্চ হার অর্জন করা যায় তা সুনিশ্চিত করাটাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ষাট দশকের মাঝামাঝি সময়ে মূল্যের গতি হঠাৎ যে রকম উপরের দিকে উঠতে থাকে সেই রকম উর্দ্ধগতি দেশের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। কিন্তু মূল্যের স্থিতিশীলতা কি ক'রে অর্জন করা যায় সেইটেই হ'ল প্রশ্ন।

উচ্চ উন্নয়নহার সম্পন্ন অনেক শিল্পোন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ, মূল্যের উর্দ্ধগতির সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, ফলে তারা বৈদেশিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করতে পারেনি এবং তাতে বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষেত্রে ও সংরক্ষিত স্বর্ণের ক্ষেত্রে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। উন্নয়নের কাজ চলার সময়ে যদি দেশের সঞ্চয়ের তুলনায় লগ্নির হার বেড়ে যায় তাহলে ফাঁপা বাজারের সৃষ্টি হয়। ভারতের মত দেশে যেখানে সঞ্চয়ের হার কম, সেখানে যদি লগ্নির উদ্দেশ্যে দেশের সম্পদ সংহত করার পরিবর্তে, সৃষ্ট অর্থের ওপর বেশী নির্ভর করা হয় সেখানে এই রকম একটা অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ঘটলেই মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হবে। উন্নয়নের জন্য ঘাটতি বাজেট বা অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে কিছুটা আর্থিক সম্প্রসারণ প্রয়োজন এবং তাতে স্থিতিশীলতাও বজায় রাখা যায়। উৎপাদিত সামগ্রীর ক্রমবর্ধমান হার বজায় রাখার জন্য উৎপাদন যখন বাড়ে, তখন অর্থের সরবরাহও বাড়তে থাকে। অর্থ সরবরাহের এই উন্নয়নের জন্য উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে কিছুটা ঘাটতি বাজেটের প্রয়োজন। এর প্রতিক্রিয়াটা অবশ্য, বিভিন্ন সামগ্রীর বর্দ্ধিত সরবরাহ এবং জনসাধারণের অর্থসঞ্চয়ের প্রবণতার ফলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অর্থের এই সরবরাহ যদি না বাড়ে তাহলে মুদ্রা সঙ্কোচের অবস্থা সৃষ্ট হতে পারে এবং উন্নয়নের পক্ষে তা মুদ্রাস্ফীতির মতোই বিপজ্জনক হয়ে পড়তে পারে।

কাজেই বিভিন্ন সামগ্রী ও সেবা পাওয়ার হার যে পরিমাণে বাড়বে অথবা প্রকৃত আয় যে হারে বাড়বে, অর্থের সরবরাহ যাতে সেই তুলনায় খুব বেশী না বাড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দেশের অর্থনীতি অনুসারে যে আর্থিক সম্প্রসারণ হয় তার ওপরেও আবার ব্যাঙ্কের ঋণের মাধ্যমে আর্থিক সম্প্রসারণ ঘটে। কর্তৃপক্ষ হিসেবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অবশ্য ব্যাঙ্কগুলি নিয়ন্ত্রণ করে। ফাঁপা বা মন্দা উভয় বাজারকেই এড়াতে হলে উপরে আলোচিত সব ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি রেখে অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থা উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

উন্নয়নের জন্য যদি অর্থনৈতিক সম্প্রসারণকে অন্যতম উৎস হিসেবে ব্যবহার করতে হয়, তাহলে আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সব জিনিসের চাহিদা বাড়ে, সেগুলির সরবরাহ তাড়াতাড়ি যাতে বাড়ে সেজন্য সেগুলির উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিতে, বেশী অর্থ নিয়োগ করা উচিত। ভারতে সেই প্রধান চাহিদাটি যে খাদ্যশস্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। ... সাধারণভাবে কায়িক পরিশ্রমকারী শ্রেণী যে সব জিনিস কেনেন সেগুলির যথেষ্ট সরবরাহ থাকা বিশেষ প্রয়োজন। ভারতীয় চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে চাউল, গম, এবং তৈলবীজ, তুলো ইত্যাদির মতো কৃষিজাত সামগ্রীর উৎপাদন যথেষ্ট বাড়ানো উচিত।

১৯৬২-৬৩ সাল পর্যন্ত ভারতে জিনিসপত্রের দাম তেমন কিছু বাড়েনি। ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৬২-৬৩ সাল পর্য্যন্ত সময় সময়ে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির হার বার্ষিক শতকরা মোটামুটি ২ থেকে ৩ ভাগ ছিল। তবে ১৯৬২-৬৩ সালের পর অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হয়। প্রতিরক্ষা এবং উন্নয়ন উভয় ক্ষেত্রেই সরকারি ব্যয় খুব বেড়ে যায়। আয় অনুযায়ী করের অনুপাত বাড়ানো হয় কিন্তু তা প্রয়োজনের অনুপাতে বাড়েনি। তাছাড়া খাদ্যশস্যের সরবরাহে ঘাটতি চলতে থাকে এবং বহু পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করে সেই ঘাটতি কিছুটা মোটানো হয়। জীবন ধারণের ব্যয়ের সঙ্গে বেতন ও পারিশ্রমিকের হার বাড়তে থাকায় শিল্পোৎপাদনের ব্যয়ও বাড়তে থাকে। জাতীয় আয়ের হার পূর্ব্বের বছরগুলিতে যে অনুপাতে বেড়েছে ১৯৬৪-৬৫ সাল পর্য্যন্ত কেবল সেইটুকুই রক্ষা করা হয় কিন্তু ১৯৬৬-৬৭ সালে সেই হার বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। এর ফলে মূল্য বৃদ্ধির গতি দ্রুততর হয়। ১৯৬২-৬৩ থেকে ১৯৬৫-৬৬ সাল পর্য্যন্ত দ্রব্যমূল্য শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ বেড়েছে। ১৯৬৬-৬৭ এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে তা যথাক্রমে শতকরা আরও ১৬ ভাগ ও ১১ ভাগ বাড়ে।

এই অবস্থাটা আয়ত্বে আনার জন্য ১৯৬৫-৬৬ সালে সরকারি লগ্নির পরিমাণ হ্রাস করা হয় এবং তার পর থেকে তা

কমই আছে। বেসরকারি তরফের লগ্নিতেও এর প্রভাব পড়ে এবং শিল্পগুলিতে উৎপাদন হ্রাস পায়। উৎপাদন ক্ষমতার সম্পূর্ণ ব্যবহার ক্রমশঃ কমে যেতে থাকায় কর্মসংস্থানের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে এবং লগ্নির অবস্থাও খারাপ হয়। তার ওপর, খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমতে থাকায় ১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে ফাঁপা বাজার অব্যাহত থাকে। কেবলমাত্র ১৯৬৮ সালে এবং তার পরের বছর ফসল ভালো হাওয়ায় এবং বেশী পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানি হওয়ায় মূল্যের এই উর্দ্ধগতি কিছুটা হ্রাস পায়। সম্প্রতি অবশ্য খাদ্যশস্যের মূল্যে খানিকটা স্থিতিশীলতা এসেছে। মন্দার ভাব খানিকটা কমেছে। আর্থিক অবস্থা পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে ঋণদান নীতি উদার করা হয়েছে এবং কৃষি, ক্ষুদ্র-শিল্প ও রপ্তানী বৃদ্ধির মত অগ্রাধিকার সম্পন্ন ক্ষেত্রগুলির প্রয়োজন মেটাবার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও একটা যেন অভাববোধ রয়েছে। লগ্নির হার অপেক্ষাকৃত কম। শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতা এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হচ্ছেনা।

সঞ্চয়ের তুলনায় লগ্নি বেশী হওয়ায় এবং বৈদেশিক সাহায্য আসতে থাকায় ১৯৬২-৬৩ থেকে ১৯৬৭-৬৮ সাল পর্য্যন্ত মুদ্রাস্ফীতি চলতে থাকে। কিন্তু খাদ্য-শস্যের সরবরাহ হ্রাস না পেলে এই অতিরিক্ত চাহিদা ফাঁপা বাজারে পর্য্যবসিত হতোনা। তাছাড়া বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রায় যদি ঘাটতি না থাকতো তাহলে আমদানি দিয়ে এই অতিরিক্ত চাহিদা খানিকটা মেটানো যেতো এবং মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা যেতো। দ্রব্য মূল্যের বৃদ্ধি যেমন রপ্তানীকে প্রভাবিত করে তেমনি আমদানির জন্য চাহিদাও বাড়ায়। বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি যেমন বাড়তে থাকে তেমনি আমদানি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় এবং কাঁচামাল ও অন্যান্য জিনিসের আমদানির ওপরেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এর ফলে শিল্পের উৎপাদন হ্রাস পায়, দ্রব্যমূল্য আরও বাড়ে।

এইসব থেকে আমরা মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি যে আমাদের দেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য ও অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রীর সরবরাহ যদি প্রচুর পরিমাণে থাকে তাহলে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ছাড়াও অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ সম্ভবপর। অন্য কথায় বলতে গেলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের যদি অভাব থাকে তাহলে কোন রকম আর্থিক নিয়ন্ত্রণই মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে পারবেনা। আমাদের এটা স্বীকার করতেই হবে যে, মূল ভোগ্য দ্রব্যের যদি হঠাৎ ঘাটতি দেখা দেয় সেই ঘাটতি অথবা খরা বা বন্যা অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, লগ্নির অগ্রাধিকারে কোন ভুলের জন্য নয়। তেমনি উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন কতকগুলি ব্যাপার যেমন, বৈদেশিক সাহায্য হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া, কোন আক্রমণ আশঙ্কায় হঠাৎ যদি প্রতিরক্ষামূলক ব্যয় হঠাৎ অত্যন্ত বেড়ে যায় অথবা এই রকম অন্য কোন কারণেও ফাঁপা বাজারের সৃষ্টি হতে পারে।

সাময়িক ঘাটতি দেখা দিলে সুপরিকল্পিত একটা মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় অবশ্য সুফল পাওয়া যেতে পারে। তবে একই সঙ্গে মূল্য, বন্টনব্যবস্থা এবং চাহিদাপূরণ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। এই জন্যেই সম্ভবতঃ মূল্যনিয়ন্ত্রণ আরোপ করার সময় নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায় বেছে নেওয়া হয়। এই ধরণের নিয়ন্ত্রণ প্রায়ই উৎপাদকের পর্য্যায়ে কার্য্যকরী হয় বলে, সাধু উৎপাদক শাস্তি পান, কালোবাজারী পুরস্কৃত হন, দালাল বা মধ্যবর্ত্তীরা বেশী আয় করেন এবং দরিদ্র ক্রেতা কোন উপকারই পাননা।

মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হ'ল, যে পর্য্যায়ে মূল্য নিয়ন্ত্রিত হয় তা অযৌক্তিকভাবে নিম্নস্তরে হওয়া উচিত নয়। মূল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য বেশী লাভ না করতে দেওয়ার এবং অপেক্ষাকৃত অল্প প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন মুক্ত রাখার যে প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায় তা অল্প প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন শিল্পে, অর্থ বিনিয়োগে উৎসাহিত করে। মূল শিল্পগুলি যদি ভালো লাভ করতে পারে তাহলে তাতে লগ্নির পরিমাণ যেমন বাড়বে তেমনি ঘাটতিও চলে যাবে। গত কয়েক বছরে আমরা দেখেছি যে কৃষিজাত সামগ্রীর মূল্য কম না রেখে উৎপাদককে লাভজনক মূল্য দেওয়ায়, কৃষিতে যেমন লগ্নি বেড়েছে তেমনি উৎপাদনও বেড়েছে। শিল্পের ক্ষেত্রেও এটা সত্যি। তবে এ কথাটাও মনে রাখতে হবে যে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমেই প্রকৃত আয় বাড়ে আর মূল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একটা আনুপাতিক ফল পাওয়া যায়।

নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও খোলা বাজারের ব্যবস্থা অনেকখানি সাহায্য করতে পারে। মরসুমের সময় যে সব জিনিসের সরবরাহ খুব বাড়ে বিশেষ করে তখন সেগুলি মজুদ করে ঘাটতির সময়ে তা ছাড়া যায়। খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে অবশ্য এটা করা হচ্ছে।

তবে মজুদ ভাণ্ডার গড়ে তোলার ব্যয় খুব বেশী। এতে টাকা আটকে যায়, সংরক্ষণ ব্যয় থাকে কিন্তু কোন লাভ নেই। মজুদ করার জন্য যথেষ্ট জায়গার প্রয়োজন এবং বেশী সময়ের জন্য মজুদ ক'রে রাখতে হলে ক্ষতিরও সম্ভাবনা থাকে। এই ক্ষতি এড়ানোর একটা সম্ভাব্য বিকল্প ব্যবস্থা হল মজুদ অতিরিক্ত সামগ্রী রপ্তানী করে, হঠাৎ সাময়িক কোন ঘাটতি মেটানোর উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মুদ্রার আকারে একটা মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা। প্রায়ই দেখা যায় যে, আমাদের দেশে যখন কোন জিনিসের ঘাটতি দেখা দেয় তা সে খাদ্য-শস্য, ইস্পাত বা অন্য যে কোন কিছুরই ঘাটতি হোক, বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে আমাদের সেগুলির আমদানি নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। অবস্থা যখন সত্যিই খারাপ হয়ে ওঠে তখনই শুধু বৈদেশিক মুদ্রা দেওয়া হতে থাকে। ইত্যবসরে দাম বেড়ে যায় এবং তখন মূল্য নামিয়ে আনা কঠিন হয়ে পড়ে। যে বৈদেশিক মুদ্রা শেষ পর্য্যন্ত দেওয়া হয় তা যদি সময় মতো দেওয়া হত তাহলে ক্ষতিটা এড়ানো যেতো। এই রকম ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার একটা জাতীয় ভাণ্ডার সাহায্য করতে পারে।

মূল্য যত বেশীই হোক না কেন, দেশেই শিল্প প্রতিষ্ঠা ক'রে দেশেই সব জিনিস উৎপাদন করার জন্য উৎসাহ

১২ পৃষ্ঠায় দেখুন

পরিকল্পনা ভুলপথে গিয়েছে

এইচ. ভি. কামাথ
প্রশাসন সংস্কার কমিশনের সদস্য

লেখকের মতে নেতাজীই হলেন আমাদের দেশের পরিকল্পনার জনক। কিন্তু পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে জাতীয় সম্পদ যো কিছুটা বাড়লেও সাধারণ মানুষের জীবন ধারণের মান বাড়েনি অথবা তাঁদের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যও আসেনি।

আমাদের দেশের জন্য কি ধরণের পরিকল্পনা প্রয়োজন এবং সেগুলি কি রকমভাবে রূপায়িত করতে হবে তা, স্বাধীনতা সংগ্রাম চলতে থাকার সময়েই ভাবা হয়েছিল। কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু বিশেষভাবে পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেন। এর পূর্ব্বে ফেব্রুয়ারি মাসে কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি বলেন যে "একটি পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শ অনুযায়ী, উৎপাদন ও বন্টনের ক্ষেত্রে আমাদের সমগ্র কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থাকে আস্তে আস্তে সমাজতান্ত্রিক নীতির অন্তর্ভূক্ত করা সম্পর্কে রাষ্ট্রকে বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।"

কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে সুভাষবাবু, ১৯৩৮ সালের ২রা অক্টোবর দিল্লীতে কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলির শিল্প মন্ত্রীগণের একটি সভা আহ্বান করেন। জাতীয় পুনর্গঠন এবং সামাজিক পরিকল্পনার জন্য কোন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হলে জরুরী ও প্রয়োজনীয় যে বিষয়গুলির সমাধান প্রয়োজন, সেগুলি আলোচনা করাই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। এই সম্মেলন উদ্বোধন করতে গিয়ে সুভাষ বসু স্বাধীন ভারতের জাতীয় পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ ক'রে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন যে "কৃষির যতই উন্নয়ন করা হোকনা কেন, দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা সমাধানের প্রকৃত উপায় হল পরিকল্পিত শিল্পোন্নয়ন। একমাত্র শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমেই, উন্নততর আর্থিক অবস্থা এবং জীবন ধারণের উচ্চতর মান অর্জন করা যেতে পারে। শিল্প বিপ্লব হয়তো দেশের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে একটা অন্যায়—কিন্তু এটা প্রয়োজনীয় অন্যায় এবং অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে এই অন্যায় আমাদের মেনে নিতে হবে।"

জাতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি পরিস্কারভাবে কতকগুলি নীতি স্থির করে দেন। সেগুলি ছিল :—

১। আমাদের প্রধান প্রয়োজনগুলির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব,

২। আমাদের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার, ধাতু উৎপাদন, মেসিন ও যন্ত্রপাতি, অতি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি, যোগাযোগ ও পরিবহণ শিল্প ইত্যাদির উন্নয়ন,

৩। কারিগরী শিক্ষা ও কারিগরী গবেষণা,

৪। একটি স্থায়ী জাতীয় গবেষণা পরিষদ,

৫। বর্ত্তমান শিল্প পরিস্থিতির আর্থিক পর্য্যবেক্ষণ।

এইসব মূল নীতিগুলির ভিত্তিতে তিনি সংক্ষিপ্তভাবে কর্মসূচী ও কর্ম পরিচালনারও উল্লেখ করেন।

১। প্রত্যেকটি প্রদেশের আর্থিক অবস্থা পরীক্ষা করে দেখতে হবে,

২। দুই তরফেই যাতে একই রকম কাজ না হয় তা প্রতিরোধ করার জন্য কুটির শিল্প ও বৃহদায়তন শিল্পের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় রাখতে হবে ;

৩। শিল্পগুলিকে আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

৪। ভারতে এবং বিদেশে পাঠিয়ে ছাত্রদের কারিগরী শিক্ষা দিতে হবে।

৫। কারিগরী গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। শিল্পায়ণের সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞগণের একটি কমিটি গঠন করতে হবে।

সুতরাং সুভাষ চন্দ্র বসুকেই প্রকৃতপক্ষে ভারতের পরিকল্পনার জনক বলা উচিত। শিগগীরই পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয় এবং জওহর লাল নেহেরুকে এর সভাপতি হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়। সেই আমন্ত্রণ তিনি সাদরে গ্রহণ করেন। আমি কয়েক মাসের জন্য এই কমিশনের সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করি কিন্তু পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে পদত্যাগ করি।

এর পরে পরলোকগত অধ্যাপক কে. টি. শাহ ছয় বছরের বেশী সময় ধরে পরিকল্পনা কমিটির সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেন। ২০টি বা তার বেশী গ্রন্থে, অবিভক্ত ভারতের জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে তিনি যে সব বিবরণী তৈরী করে গেছেন তা সকলেই জানেন। এই সব বিবরণী দিয়ে অবশ্য জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং তাৎপর্য্য পরিমাপ করা যায়না। তবে জীবন ধারণের মান দ্রুত উন্নতির পথে নিয়ে যেতে, দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্ত্তন করা যে অত্যন্ত প্রয়োজন এবং পরিকল্পনার মাধ্যমে তাতে কৃতকার্য্য হওয়া যে সম্ভব, সে সম্পর্কে এই বিবরণীগুলি সমগ্র দেশে ব্যাপক উৎসাহ ও ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করে।

কাজেই স্বাধীনতা অর্জনের পর নেহরু সরকার যে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন, জাতীয় পরিকল্পনা কমিটিকে তার পূর্বসূরী বলা যায়। এখানে হয়তো এ কথাটাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯৩৮ সালে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন এবং ১৯৫০

সালে পরিকল্পনা কমিশন গঠনের মধ্যে, বৃটিশ সরকারের অধীনস্থ ভারত সরকার, ১৯৪৪ সালের জুন মাসে, বড়লাটের কার্য্যনির্বাহক পরিষদের একজন পৃথক সদস্যের অধীনে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের সৃষ্টি করেন। ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের নেতৃত্বে, ভারত সরকার, (অন্তর্বর্ত্তীকালীন যে সরকারে জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস প্রতিনিধিগণ এবং মুসলীম লীগ যোগ দেন) একটি পরামর্শদাতা পরিকল্পনা বোর্ড নিযুক্ত করেন। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ এই দুটি দলই মৌলিক বিষয়গুলি সম্পর্কে অত্যন্ত পরস্পর বিরোধী মনোভাব অবলম্বন করায়, পরামর্শদাতা বোর্ড বিশেষ কিছু কাজ করতে পারেনি।

দেশের সম্পদ উপযুক্তভাবে ব্যবহার ক'রে, উৎপাদন বাড়িয়ে এবং সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সকলকে কর্মসংস্থানের সুযোগ দিয়ে জনগণের জীবন ধারণের মান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উন্নততর করা সম্পর্কে ভারতের সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করার পর, সরকার ঘোষিত লক্ষ্য পূরণ করার উদ্দেশ্যে, দুই মাস পরেই ভারত সরকারের একটি প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৫০ সালের ১৫ই মার্চ পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়।

সাধারণ মানুষের ওপর বিপুল বোঝা চাপিয়ে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত করার পর জাতির মোটামুটি সম্পদ কিছুটা পরিমাণে বেড়েছে। কিন্তু খেটে খাওয়া বিপুল জনসংখ্যার জীবন ধারণের মান হয়েছে নিম্নাভিমুখীন এবং তাদের জীবনে রয়েছে নিরাপত্তাবোধের অভাব। পরিকল্পনার আকার বড় হতে থাকলেও, সাধারণ মানুষ সেই অনুযায়ী লাভবান হননি। প্রথম পরিকল্পনায় জনপ্রতি আয় বেড়েছে শতকরা ২ ভাগ, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শতকরা ১॥ ভাগ এবং তৃতীয় পরিকল্পনার সময়ে তাই থেকে গেছে।

ভূমি স্বত্ব সংস্কার সম্পর্কিত আইনগুলি একদিকে যেমন অস্পষ্ট তেমনি রূপায়ণেও ফাঁকি থাকায় গ্রামের দরিদ্র অধিবাসীরা সামান্য ন্যায়বিচার পেয়েছে। জমি যে চাষ করবে তারই জমির মালিক হওয়া উচিত, এই উদ্দেশ্যে যে প্রজাস্বত্ব আইনগুলি প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলি বাঞ্ছিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি। তেমনি ভূমির সমবন্টণের উদ্দেশ্য নিয়ে সর্বোচ্চ পরিমাণ জমির যে আইন তৈরি করা হয় তাও লক্ষ্য পূরণ করতে পারেনি। সম্পত্তি ও মর্যাদার ওপর জোর দিয়ে যে সাহায্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় সেগুলি ধনী শ্রেণীরই বেশী উপকারে এসেছে তেমনি প্রশাসনিক বিলম্ব ও জটিলতা, সমাজের উচ্চশ্রেণীরই সুযোগ বাড়িয়েছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার সময়ে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি এবং সরকারের আশ্বাস সত্ত্বেও টাকার মূল্যমান হ্রাস করার পর এই বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় সাধারণ মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগ সারানোর পরিবর্ত্তে উপশমের মতো ছিটেফোঁটা, আংশিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং কয়েকটি বড় বড় সহরে সুপার বাজার স্থাপন, সরকারের দুর্বল নীতি প্রকাশ করে দিয়েছে। একটা সংহত মূল্য নীতির অভাবের প্রত্যক্ষ ফল হ'ল মূল্যের এই উর্দ্ধগতি। অত্যাবশ্যকীয় জিনিস, বিশেষ করে শিল্পজাত জিনিসগুলির বাজার দরের সঙ্গে উৎপাদন ব্যয়ের কোন সম্পর্ক নেই। ব্যবসায়ীদের বিপুল লাভ এবং অত্যাবশ্যকীয় জিনিসগুলির ওপর বিপুল কর অবস্থাকে আরও খারাপ করে তুলেছে।

কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি, পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হলেও কার্য্যক্ষেত্রে, সহর ও গ্রামাঞ্চলে বেকারের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বেড়েছে।

যদি অর্থনৈতিক পরিকল্পনাই সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা স্থাপনের উপায় বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে পরিকল্পনায় শীর্ষের পরিবর্ত্তে প্রধানতঃ মূলে জোর দিতে হয়। যে জেলা প্রশাসন জনসাধারণের খুব কাছাকাছি থাকে এবং যার একটা গণতান্ত্রিক ভিত্তি আছে, তাকেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মূল সংস্থা হিসেবে ধরতে হবে। এদের নির্দেশ অনুযায়ী, নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ভূমি স্বত্ব সংস্কার সম্পর্কিত কর্মসূচীগুলি রূপায়িত করা উচিত। উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে এর নিকট সম্পর্ক থাকা উচিত যাতে ভূমি স্বত্ব সংস্কারের সঙ্গে পুনর্গঠনের কাজের কার্য্যকরী সমন্বয় থাকে। ঋণ ও কারিগরী সাহায্য একই সঙ্গে চলা উচিত। মর্য্যাদা ও সম্পত্তির মাপকাঠির পরিবর্ত্তে প্রয়োজন এবং সম্প্রসারিত ব্যবহার ক্ষমতার মাপকাঠি অনুযায়ী ঋণ দেওয়া উচিত। সাহায্য দেওয়ার সময় অবহেলিত ও নিপীড়িত শ্রেণীগুলির পুনর্ব্বাসনের প্রশ্নটিই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত। উন্নয়নমূলক কর্মপ্রচেষ্টায় গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির একটা তাৎপর্য্যপূর্ণ ভূমিকা থাকা উচিত এবং সেগুলির ওপরেই সেবা ও কর্তৃত্বের ভার দেওয়া উচিত।

অন্য আর একটি ক্ষেত্র, যেটি সম্পর্কে চতুর্থ পরিকল্পনায় বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত তা হ'ল সরকারি তরফ। সামান্য কয়েকটি সংস্থা ছাড়া সরকারি তরফের শিল্পগুলির পরিচালনা সম্পর্কে এতো বদনাম রয়েছে যে তা, রাষ্ট্রীয়করণের ধারণাকেই উপহাসাস্পদ করে তুলেছে। সরকারি তরফ বলতে অনেকে সেগুলিকে দুর্নীতি, স্বজনতোষণ, করদাতাদের অর্থের অপব্যয়, অযোগ্যতা ও বিশৃঙ্খলার কেন্দ্র বলে মনে করেন। রাষ্ট্রীয়করণের অর্থ যদি সরকারিকরণ ও কর্মচারীতন্ত্র হয় তাহলে তা সমাজতন্ত্রের প্রহসন হয়ে দাঁড়াবে।

বর্ত্তমানে দেশে যে সামাজিক অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা রয়েছে তাতে সরকারি তরফের সংস্থাগুলির সংশোধন কষ্টসাধ্য একথা, জনগণের ওপর বিশ্বাস রেখে, অসঙ্কোচে প্রকাশ করা বা না করা পরিকল্পনা রচয়িতাদের ওপরেই নির্ভর করছে। তাঁরা যদি মনে করেন যে ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব নয় অথবা অদূর ভবিষ্যতে অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়ার সম্ভাবনা নেই তাহলে জাতির স্বার্থেই পরিকল্পনা কমিশনের, সরকারি তরফের ভবিষ্যত সম্প্রসারণ বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এতে বিনিয়োগের পরিমাণ অত্যন্ত বিপুল বলে সম্মান রক্ষার খাতিরেই শুধু এগুলোর সম্প্রসারণ করা উচিত নয়। তবে সংশোধনের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা

১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

চতুর্থ পঞ্চবর্ষীয় পরিকল্পনায় অর্থসংস্থানের কয়েকটি দিক

সুব্রত গুপ্ত
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

চতুর্থ পরিকল্পনার অর্থ সংস্থানের জন্য কর ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ও বিভিন্ন করের সুসংহত ও সুসমঞ্জস প্রয়োগ প্রয়োজন। যাতে বিত্তহীন এবং নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর ওপর করের বেশী বোঝা না চাপিয়েও রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হয়।

খসড়া চতুর্থ পঞ্চবর্ষীয় পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে মোট ১৪,৩৯৮ কোটি টাকা এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে মোট ১০,০০০ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। আর্থিক ভারসাম্য না থাকলে কোনোও পরিকল্পনার সাফল্য সুনিশ্চিত হয় না। পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান অধ্যাপক গাডগিল চতুর্থ পরিকল্পনার যে খসড়া প্রস্তুত করেন তাতে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সুষ্ঠু কাজকর্ম, ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি (বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে), অতিরিক্ত কর ধার্য (বিশেষ করে গ্রামীণ আয় এবং শহরাঞ্চলের সম্পত্তির উপর) প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনা প্রণয়ন করার প্রস্তুতিপর্বেই বৈদেশিক সাহায্যের প্রাপ্তি যোগ্যতা এবং ঘাটতি অর্থসংস্থানের গুরুত্বের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা বিশেষভাবে অনুভব করা গিয়েছিল তৃতীয় পঞ্চবর্ষীয় পরিকল্পনার শেষ বছরে। তৃতীয় পরিকল্পনার পর চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম খসড়াটি যে পরিত্যক্ত হয়েছিল তারও অন্যতম কারণ ছিল বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে অনিশ্চয়তা। এই অনিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও চতুর্থ পরিকল্পনায় ২,৫১৪ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাবে বলে ধরা হয়েছে। রেলওয়ে সমেত সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ১,৭৩০ কোটি টাকা, চলতি কর ব্যবস্থা থেকে ২,৪৫৫ কোটি টাকা বাজারে ঋণপত্র ছেড়ে ১,১৬৬ কোটি টাকা, ক্ষুদ্র সঞ্চয় বাবদ ৮০০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য নীট মূলধনী আয় বাবদ ১,১৩০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে বলে ধরা হয়েছে। এই ব্যবস্থাগুলি পর্যাপ্ত বিবেচিত না হওয়ায় অতিরিক্ত রাজস্বের মাধ্যমে ২,৭০৯ কোটি টাকা সংগ্রহ করার কার্যসূচী গৃহীত হয়েছে এবং তার পরেও ৮৫০ কোটি টাকার ঘাটতি অর্থসংস্থান ধরা হয়েছে।

প্রথমেই অতিরিক্ত কর ধার্য করে আরও কতটা রাজস্ব সংগ্রহ করা সম্ভব, দেখা যাক। ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সূত্রে সমগ্রভাবে কর ব্যবস্থা থেকে যে রাজস্ব আদায় হয় তার শতকরা ৭৫ ভাগই আসে পরোক্ষ কর থেকে। এদিকে প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় এখনও অনেক পরিবর্তনের অবকাশ আছে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে আরও রাজস্ব আদায় করার যে যথেষ্ট সুযোগ আছে সে সম্পর্কে কোন দ্বিমত থাকা উচিত নয়। বর্তমানে আমাদের জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে কৃষিগত আয় শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি। কিন্তু মোট রাজস্বে কৃষির অংশ মাত্র শতকরা ২৭ ভাগ। ভারতে কৃষিক্ষেত্রে এবং অ-কৃষি ক্ষেত্রে করের বোঝা সমান নয়। জনপ্রতি পরোক্ষ করের বোঝা কৃষি ক্ষেত্রের তুলনায় অ-কৃষিক্ষেত্রে অনেক বেশি। ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা সাম্প্রতিককালে হয়েছে। ১৯৬৯-৭০ সালের বাজেটে সম্পদ কর কিছু পরিমাণে কৃষিগত সম্পদের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হয়েছে বটে তবুও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে ভূমি রাজস্ব বাবদ যে অর্থ সংগৃহীত হওয়া উচিত ছিল, অথবা গ্রামীণ আয়ের যতটা করের মাধ্যমে, সংগ্রহ করা উচিত ছিল ততটা করা সম্ভব হয়নি। ১৯৬৭-৬৮ সালে ভারতের জাতীয় আয় যে শতকরা ৯ ভাগ বেড়েছিল, তার মধ্যে শতকরা ৭ ভাগ ছিল কৃষিসূত্রে। গ্রামাঞ্চলে এমন সঙ্গতিসম্পন্ন জোতদার এখনও আছেন যাঁদের উপর যতটা কর ধার্য করা উচিত ছিল ততটা করা হয়নি। আমাদের দেশে কৃষিগত আয় কর ভালোভাবে কার্যকর হয়নি এবং ঐ ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করার জন্যই প্রগতিশীল হারে ভূমি কর ধার্য করা উচিত। পক্ষান্তরে বলা চলে সম্পদ কর আরও সম্প্রসারিত ক'রে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাটি তার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। যেমন বাণিজ্যিক বা অর্থকরী শস্য উৎপাদন করা হয় এই জাতীয় জমি যদি কেউ পাঁচ একরের বেশি হাতে রাখেন তবে তার জন্য অতিরিক্ত কর ('সারচার্জ') ধার্য করেও কিছু রাজস্ব আদায় করা যেতে পারে। কৃষিক্ষেত্রে বেশি করে কর ধার্য করার রাজনৈতিক দিকটি অনেকেই উপেক্ষা করতে পারেন না। কোন কোন রাজ্যে দেখা গেছে দলীয় স্বার্থে ভূমি রাজস্বের পরিমাণ বাড়াবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা চালানো হয়নি। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এবং আর্থিক ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা দলীয় স্বার্থ বজায় রাখার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তা উপেক্ষা করলে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির হার দ্রুত হবে না।

মোট কথা চতুর্থ পরিকল্পনায় ২,৭০৯ কোটি টাকার অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়। কিন্তু সেজন্য চাই একটি বলিষ্ঠ কর নীতি। কালো টাকা জমানো এবং কর ফাঁকি বন্ধ করে রাজস্বের পরিমাণ আরও বাড়ানোর জন্য কর ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস এবং বিভিন্ন করের সুসংহত ও সুসমঞ্জস প্রয়োগ প্রয়োজন। বিত্তহীন এবং নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর ওপর বেশি বোঝা না চাপিয়েও রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব। গ্রামাঞ্চলে কৃষকরা সবাই যে একেবারে দুঃস্থ তা নয়; এবং শহরাঞ্চলে করদাতাদের মধ্যে যাঁরা চাকুরীজীবী তাঁদের

তুলনায় গ্রামের সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষকদের আনুপাতিক কর প্রদান-ক্ষমতা (গড়পড়তা) অপেক্ষাকৃত বেশি বলেই অনেকে মনে করেন। শহরাঞ্চলে যাঁরা প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী তাঁদের উপরে আরও কর ধার্য করা যায় কি না তাও বিচার্য।

সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির 'না লাভ না ক্ষতির নীতি' এখন পরিত্যক্ত হয়েছে। আশা করা যায় সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্বৃত্তের পরিমাণ চতুর্থ পরিকল্পনাকালে বাড়বে। রেল চলাচল ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের কাজ বহুদূর এগিয়ে গেছে। এখন রেল কর্তৃপক্ষের দেখা উচিত অনুৎপাদনমূলক ব্যয়ের পরিমাণ যতদূর সম্ভব কমিয়ে উদ্বৃত্তের পরিমাণ বাড়ানো। গত তিন বছর ধরে ভারতীয় রেল ব্যবস্থার আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল যায় নি। চতুর্থ পরিকল্পনায় উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর জন্য বরাদ্দ রেখেও যাতে রেলও যথ উদ্বৃত্তের পরিমাণ বাড়ানো যায় তার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। জীবনবীমা কর্পোরেশনের মুনাফার পরিমাণ বেড়েছে এটাও নিঃসন্দেহে আশার কথা। কিন্তু জীবনবীমা কর্পোরেশনের মুনাফা যাতে ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে এবং কর্ম সংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিকারী প্রকল্পগুলিতে আরও বেশী ক'রে বিনিয়োজিত হয়, সেজন্য বিনিয়োগ নীতির প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। জাতীয়করণের পর সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলির আমানত বেড়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনার অর্থসংস্থানে এই ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি থেকে ১৫০০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে বলে ধরা হয়েছে এবং তার মধ্যে ৫০০ কোটি টাকা কৃষির উন্নতির জন্য বিনিয়োগ করা হবে বলে স্থির হয়েছে। স্টেট ব্যাঙ্কের ভূমিকাও এ ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক। 'সবুজ বিপ্লবের' পরিপ্রেক্ষিতে কৃষিক্ষেত্রে, বিশেষ করে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করার পথে এগিয়ে চলতে গেলে গ্রামীণ অর্থনীতির বুনিয়াদ আরও সুদৃঢ় করতে হবে এবং সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির দায়িত্ব অপরিসীম। এই ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে গ্রামাঞ্চলে আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণের মাধ্যমে গ্রামীণ সঞ্চয় সুসংহত করা সম্ভব।

বৈদেশিক সাহায্যের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা বিদেশ থেকে বিভিন্ন ধরণের মূলধন পেয়ে থাকি। ঋণ ('লোন') এবং মঞ্জুরী সাহায্য ('গ্রান্ট') এক জিনিস নয়। আবার এক ধরণের বৈদেশিক ঋণ আছে যা শোধ করতে হবে ভারতীয় মুদ্রায় (যেমন পি. এল. ৪৮০ অনুযায়ী পাওয়া বৈদেশিক ঋণ)। আবার অনেক ঋণ আছে যেগুলি বিশেষ বিশেষ প্রকল্পের জন্য (প্রজেক্ট লোন) সুনির্দিষ্ট করা থাকে। বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যা হচ্ছে একাধিক। প্রথম সমস্যা হচ্ছে, যে ঋণ অথবা সাহায্য গ্রহণ করা হচ্ছে তার সদ্ব্যবহার করা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত ঋণ, সাহায্য, পি. এল ৪৮০ অনুযায়ী ঋণ সব মিলিয়ে বিদেশ থেকে মোট ৬,১১৯ মিলিয়ন ডলার পাবার অনুমোদন পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যে ভারত মাত্র ৩,৪২৮ মিলিয়ন ডলার গ্রহণ এবং ব্যবহার করতে পেরেছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় অনুরূপ ৬১৬৮ মিলিয়ন ডলার অনুমোদিত হয়েছিল এবং তার মধ্যে ৬০২৪ মিলিয়ন ডলার ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৯৬৬-৬৭ সালে মোট বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ অনুমোদিত হয়েছিল ২,১৩২ মিলিয়ন ডলার, তার মধ্যে গৃহীত এবং ব্যবহৃত হয়েছিল ১৫০৬ মিলিয়ন ডলার। অবশ্য ১৯৬৬-৬৭ সালের অনুমোদিত মূলধনের কিছুটা ১৯৬৭-৬৮ সালে ব্যবহৃত হয়েছিল, তাই ১৯৬৭-৬৮ সালে ৯৪৮ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ বাবদ অনুমোদিত হলেও ব্যবহৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ১৫৪৮ মিলিয়ন ডলার।

চতুর্থ পরিকল্পনায় নীট বৈদেশিক সাহায্য এবং ঋণের পরিমাণ ২,৫১৪ কোটি টাকা হবে কিনা এখনই বলা সম্ভব নয়। হয়ত বা তা সম্ভবও হতে পারে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, সদস্য দেশগুলিকে বৈদেশিক মুদ্রা তুলে নেওয়ার বিশেষ অধিকার (Special Drawing Rights) দেবার যে নীতি গ্রহণ করেছে সেই অনুযায়ী আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারে ভারতের কোটার পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ বেড়ে গেছে। এই বিশেষ অধিকার অনুযায়ী সম্প্রতি ভারতের জন্য অতিরিক্ত ১২৬ মিলিয়ন ডলার (৯৪.৫ কোটি টাকা) বরাদ্দ করা হয়েছে। ভারতকে সাহায্য প্রদানকারী সংস্থাও (ইড্ ইণ্ডিয়া ক্লাব) চতুর্থ পরিকল্পনাকালে সঠিক কতটা সাহায্য দিতে পারবে সে সম্পর্কে এখনও কোন সুনিশ্চিত আশ্বাস পাওয়া যায় নি। তবুও আশা করা যায় শেষ পর্যন্ত হয়ত আড়াই হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য পাওয়া যাবে। বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করার দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে সেই ঋণ পরিশোধ করা সম্পর্কে উপযুক্ত পরিমাণ রপ্তানি না বাড়াতে পারলে বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় করার প্রচেষ্টা সফল হতে পারবে না। হাতে উপযুক্ত পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চিত তহবিল না থাকলে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হবে না। তা ছাড়া পি. এল. ৪৮০ অনুযায়ী ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে সাহায্য পেয়ে থাকে তা ভারতীয় মুদ্রায় শোধ করতে হয় এবং সেই মুদ্রা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফে ভারতেই ব্যয় করার সংস্থান আছে। ফলে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সম্প্রতি খুসরু কমিটিও অনুরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তাই বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে দিয়ে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধির উপর আরও বেশি গুরুত্ব আরোপ করা সমীচীন।

চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য অনুযায়ী জাতীয় আয়ের শতকরা ১২ ভাগ সঞ্চয় করা আমাদের পক্ষে এখনও সম্ভব হয়নি। জাতীয় আয়ের শতকরা ৮ ভাগ থেকে ৯ ভাগ সঞ্চয় করেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। কর ব্যবস্থা থেকে যে রাজস্ব পাওয়া যাচ্ছে এবং বিদেশ থেকে যে ঋণ ও সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে তাও পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। তাই শেষ পর্যন্ত ঘাটতি অর্থ সংস্থানের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের কাছে বিকল্প পথ ছিল না।

প্রথম পরিকল্পনার প্রথম আড়াই বছর ঘাটতি অর্থসংস্থানের আশ্রয় নেওয়া হয়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রথম পরিকল্পনায় মুদ্রার পরিমাণ বেড়েছিল শতকরা ১৪ ভাগ। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট মুদ্রার পরিমাণ বেড়েছিল যথাক্রমে শতকরা

৩১ পৃষ্ঠায় দেখুন

নগরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ নীতি

আশীষ বসু

ইনস্টিটিউট অফ ইকনমিক গ্রোথ, নূতন দিল্লী

একটি জাতীয় সমীক্ষা অনুযায়ী, ভারতে, শহরবাসী জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ জন তাঁদের মোট আয়ের ৭০ শতাংশ ব্যয় করেন আহারের সংস্থানে। অতএব আবাসের ব্যবস্থা করতে হয় আয়ের অবশিষ্ট ৩০ শতাংশ থেকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দিল্লী নগরীতে যে ব্যক্তির মাসিক উপার্জন ২০০ টাকা, তাঁকে আহার ও বাসস্থান বাবদ ব্যয় করতে হয় ১৪০ টাকা। অর্থাৎ ব্যয়ের লাগাম টানতে হয় বাড়ীর ব্যাপারে, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণামস্বরূপ, সেই ব্যক্তিকে অননুমোদিত কলোনীর আজেবাজে বাড়ী বা বস্তীতে আশ্রয় নিতে হয়।

১৯৬৪-৬৫ সালের মিউনিসিপ্যাল রেকর্ড আধার ক'রে ১৯৬৭ সালে দিল্লীতে বাড়ীভাড়ার হার সম্পর্কে এক সমীক্ষা নেওয়া হয়। তার থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হল—দিল্লী এককালে ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শহর আর এই শ্রেণী আজ বিলুপ্তপ্রায়। গত ১৫ বছরে প্রাসাদ ও বস্তীর ব্যবধান ক্রমশঃ প্রশস্ত হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যময়। কারণ বিলাসগৃহ বহুল কলোনী ও ক্রমশঃ বিস্তারশীল অননুমোদিত কলোনী, আবাস গৃহের মধ্যবর্তী পর্যায়টি, নির্মূল ক'রে বৈষম্য আরও বাড়িয়ে তুলবে। তবে, তারই মধ্যে, আমাদের "সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার" সমাধিস্থলটুকু অবশ্যই "সংরক্ষিত" থাকবে।'

এই সমীক্ষায় আর একটি তথ্য লক্ষণীয়। (নগর ভারতের প্রতীক হিসেবে দিল্লীর উদাহরণ দিচ্ছি) দিল্লীর সমৃদ্ধ কলোনীগুলির বিলাস গৃহগুলির গড়পড়তা ভাড়া হ'ল মাসে এক হাজার টাকার ওপর। এই সব আবাসগৃহের অধিকাংশ যখন অর্থবান ভাড়াটিয়ার প্রতীক্ষায় তালাবদ্ধ, তখন লক্ষ লক্ষ লোক ছোট বা মাঝারি, নানান বেসরকারী কলোনীর অস্বাস্থ্যকর বাড়ীর কোনোও এক অংশে মাথা গোঁজবার ঠাঁই পেলেই তৃপ্ত। এই সব কলোনীতে বাড়ী তৈরি করার সময়ে পৌরকর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেওয়া দূরের কথা, বহুক্ষেত্রে, বাড়ী তৈরির সময়ে পৌরগৃহনির্মাণের নীতিনিয়ম বা নির্দিষ্ট মানও অগ্রাহ্য করা হয়।

মোট কথা, পরিকল্পনা প্রণেতারা মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ভোগী জনগণের গৃহসমস্যার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিবেচনা করেন নি, যদিও প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে গৃহনির্মাণ সমস্যার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। পরিকল্পনাগুলির মূলে যে মনোভাব আছে তা হ'ল, 'জনসাধারণের নিজস্ব বাড়ী থাকা দরকার এবং নিম্নআয়ভোগীদের স্বগৃহ নির্মাণে সরকারী অর্থসাহায্যের সংস্থান রাখা দরকার।' নিম্নবিত্তদের কাছে বাড়ীর জন্য জমি বা (কম খরচে তৈরি) বাড়ী বিক্রী ক'রে গৃহসমস্যার সমাধান সম্ভব, এটা অবাস্তব কথা। গৃহনির্মাণ সমস্যার সঙ্গে জড়িত অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট, যে, বর্তমান অবস্থায় নিম্নআয়সম্পন্ন জনগণের কাছে জমি বা বাড়ী বিক্রীর প্রস্তাব কার্যকর হতে পারে না। যেটা কার্যত: সম্ভব এবং বাস্তবানুগ, তা হ'ল সরকারী তরফে গৃহ নির্মাণ ব্যবসার সূত্রপাত করা এবং এক কামরা বা দুই কামরা বিশিষ্ট বহুতল বাড়ী তৈরি করে সেগুলি নিম্নবিত্তদের, কম ভাড়ায় দেওয়া।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়ায় বলা হয়েছে যে, 'সরকারী তরফে গৃহনির্মাণ প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এ যাবৎ যেটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করা গিয়েছে তা হ'ল এককভাবে, প্রত্যেকটি গৃহনির্মাণের জন্য, যে ব্যয় হয় তার পরিমাণ অত্যধিক এবং সরকারী প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ সমস্যার অংশ মাত্রের সমাধানও সাধ্য নয়।' তা ছাড়া আরও বলা হয়েছে যে, 'গৃহ নির্মাণের উপকরণগুলি নির্দিষ্ট নক্সার ছকে ফেলে, ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সেগুলির উৎপাদনে বেসরকারী তরফের উদ্যোগী হওয়া উচিত।' আমি এ প্রস্তাব অনুমোদন করি না। সরকার যদি হোটেল ব্যবসা খুলতে পারেন কিংবা কেক বিস্কুট রুটি তৈরির ব্যবসায়ে নামতে পারেন, তাহলে সাধারণ নরনারীর গৃহসমস্যার মত একটা মৌল প্রয়োজন উপেক্ষা ক'রে বেসরকারী তরফের অনুকম্পা বা দাক্ষিণ্যের প্রত্যাশায় তাঁদের ফেলে রাখবেন এটা অযৌক্তিক। নগরবাসীর আয়ের সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়ার প্রস্তাব সঙ্গত হতে পারে, যদি, (ক) সরকার ব্যাপক-গৃহ-নির্মাণ-প্রকল্প রূপায়ণে প্রবৃত্ত হন, (খ) আবাসিক বিলাস গৃহ নির্মাণ নিষিদ্ধ ক'রে দেন, (গ) মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের সুলভ ভাড়ায় বাড়ী দেবার উদ্দেশ্যে বহু সংখ্যায় সাধারণ বাড়ী তৈরি করেন এবং (ঘ) ইস্পাত, সিমেন্ট, কাঠ, কাঁচ ও ইঁট প্রভৃতি সম্পদের সবকটি উপকরণ তৃতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সদ্ব্যবহার করেন। এই প্রস্তাবের বাস্তবতার উদাহরণ ছড়িয়ে আছে হংকং, সিঙ্গাপুর ও অন্যান্য শহরে। অর্থাৎ সাদা কথায় বলতে গেলে, সর্বাগ্রে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ভোগীদের জন্য গৃহনির্মাণ নীতির যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে তা সংক্ষেপে বিবেচনা করে দেখা যাক। ১৯৪৯ সালে শিল্পশ্রমিক গৃহনির্মাণ সূচী প্রণয়ন করা হয়। তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারগণকে অথবা রাজ্য সরকারগণের অনুমোদন সাপেক্ষে বেসরকারী নিয়োগকারী বা মালিকদের সুদবিহীন ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়। বেসরকারী হাতে ঋণ দেওয়ার প্রাক সর্তে বলা হয়েছে' যে, ঋণের অর্থ দিয়ে তৈরি বাড়ীর ভাড়া, মূলধনী ব্যয়ের শতকরা সাড়ে বারো ভাগের বেশী হওয়া চলবে না অর্থাৎ শ্রমিকের মজুরীর দশ শতাংশের বেশী হওয়া চলবে

না এবং সে ক্ষেত্রে বাড়ী তৈরির মোট ব্যয়ে মালিকের অংশ হবে তিন শতাংশ। ১৯৫২ সালে, একটা নতুন নীতি ঘোষণা করা হয় তাতে বলা হয় যে, কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিকদের জন্য গৃহ নির্মাণসূচী রূপায়ণে জমির দাম সমেত বাড়ী তৈরির পুরো খরচের শতকরা ২০ ভাগের সমান অর্থ সাহায্য দিতে প্রস্তুত, যদি, মালিকরা খরচের বাকিটা বহন করেন এবং পূর্ববর্তী প্রকল্পে, প্রস্তাবিত হারে, প্রকৃত শ্রমিকদের কাছে ঐ বাড়ীগুলি ভাড়া দেন।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সুপারিশ করা হয় যে, ঐ ধরনের প্রকল্পের জন্য জমির দাম সমেত বাড়ী তৈরির পুরো খরচের অর্ধেক কেন্দ্রীয় তরফ থেকে সরকারকে দেওয়া উচিত। পরিকল্পনায় এ কথাও স্বীকার করা হয় যে, এখনও বহুকাল গৃহনির্মাণের অধিকাংশ দায়িত্ব বেসরকারী তরফের ওপর ন্যস্ত থাকবে। ১৯৫৪ সালে নিম্ন-আয়ভোগীদের গৃহনির্মাণ প্রকল্পের অবতারণা করা হয়, যাতে, বছরের মোট উপার্জন যাঁদের ৬ হাজার টাকার মধ্যে, তাঁদের ন্যায় সঙ্গত সুদে দীর্ঘমেয়াদী গৃহনির্মাণ ঋণ দেবার সংস্থান রাখা হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়, বাড়ী তৈরিতে আগ্রহী নিম্নবিত্তদের বিক্রীবাবদ জমি তৈরি করার জন্য রাজ্য সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের অর্থ সাহায্য দেবার নীতি গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে জীবন বীমা কর্পোরেশন নিজেরা থাকবার বাড়ী তৈরির জন্য মধ্যবিত্তদের এবং অল্প বেতনভোগী কর্মচারীদের ভাড়া দেবার উপযোগী বাড়ী তৈরির জন্য রাজ্য সরকারদের ঋণ দিতে সুরু করে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়, নগরাঞ্চলে জমির দাম নিয়ন্ত্রণের সমস্যার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মৌরসীসত্ব জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে 'ক্যাপিট্যাল ট্যাক্স' আরোপ, নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে (জল ও বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা আছে এমন তৈরি জমিতে) বাড়ী না করলে খালি জমির জন্য খাজনা আদায় এবং প্রত্যেক জমি বা প্লটের সর্বোচ্চ আয়তন স্থির করা এবং কোনোও এক ব্যক্তি বা পক্ষকে সর্বাধিক কটি 'প্লট' দেওয়া যেতে পারে তার সংখ্যা নির্দিষ্ট করার কথা উল্লেখ করা হয়।

সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ হিসেবে কিংবা অন্য কথায় সমাজতান্ত্রিক ভাবনার চরম লক্ষ্য হ'ল শহরে আয় ও সম্পদের সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া।

যদি জমির দাম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রস্তাবগুলি যথাযথভাবে কাজে পরিণত করা হত তাহলে গৃহসমস্যা আজকের দিনের মত উৎকট হয়ে উঠত না।

বর্তমানে জমি সংক্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হ'ল বাড়ীর জন্য জমি তৈরি করলেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে এই ভাবটা। বাড়ী তৈরির প্রশ্নটা তোলাই রইল। উদাহরণত: উল্লেখ করা যায় ডি. ডি. এ. (দিল্লী ডেভেলাপমেন্ট অথরিটি) অর্থাৎ দিল্লী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সংস্থার কথা। এদের গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনাটি রাজধানীর প্রয়োজনোপযোগী বাস্তবসম্মত গৃহনির্মাণ সূচীর ধারে কাছে আসে না। অবশ্য তর্কের খাতিরে বলা যায় যে, ডি. ডি. এ. বাড়ীর জন্য জমি তৈরি করার দায়িত্ব নেয়। বাড়ী তৈরি করার নয়। কিন্তু এই নীতিটাই তো ভুল। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, বাড়ীতে ভাড়া খাটানোর তুলনায় জমিতে টাকা লগী করা ঢের লাভজনক। কারণ ইঁট, সিমেন্ট প্রভৃতি যে সব উপকরণের পরিমাণ সীমিত, সেইগুলি বড়লোকের 'প্রাসাদ' তৈরিতে লাগে বলে গৃহনির্মাণ উপকরণের দর ক্রমশ: উর্ধমুখী হয়েছে। তাছাড়াও ডি. ডি. এ. উচ্চ মূল্যে জমি নীলাম করে দিল্লীতে বিলাসবহুল গৃহ নির্মাণের সুযোগ বাড়িয়েছে। বস্তুত:পক্ষে এ কথা পুনরাবৃত্তির অপেক্ষা রাখে না যে সাধারণের জন্য আবাস গৃহের স্থানই যদি প্রকৃত লক্ষ্য হয়, তাহলে জমির দাম, বাড়ী তৈরির খরচ, জমি থেকে আয় এবং বাড়ী থেকে ভাড়া আদায়ের প্রশ্নগুলি, এখনকার মত পৃথকভাবে না ধরে, একত্রে বিচার বিবেচনা করা উচিত।

এল. কে. ঝা

৬ পৃষ্ঠার পর

দেওয়াই যদি শিল্পোন্নয়নের নীতি বলে গ্রহণ করা যায় তাহলে মূল্যস্তর অনেকদিন পর্যন্ত ওপরের দিকেই চলতে থাকে। আমদানি করার পরিবর্তে দেশেই সব জিনিস তৈরি করার চরম নীতি গ্রহণ করা উচিত নয়। রপ্তানীযোগ্য সামগ্রী উৎপাদনকারী শিল্পগুলি মূল্যের স্থিতিশীলতা স্থাপনে অত্যন্ত সাহায্য করে। অন্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার জন্য তাদের, উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য কম রাখতে হয় এবং তারা যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে তা দেশের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন জিনিস আমদানি করার প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়।

সংক্ষেপে বলা যায় যে; উন্নয়নের প্রতিক্রিয়া মূলত: মুদ্রাস্ফীতির বা ফাঁপা-বাজারের বিরোধী। তবে উন্নয়নের ফলে কোন কোন অবস্থায় ফাঁপাবাজারের সৃষ্টি হতে পারে। প্রকৃত উন্নয়নের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণও প্রয়োজন এবং মূল্যের স্থিতিশীলতার জন্য তা আবশ্যক। সৃষ্ট অর্থের ফলে যদি মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায় তাহলে তা প্রতিরোধ করার উপায় হ'ল যথেষ্ট পরিমাণ মূল ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদন। যে সব প্রকল্প থেকে অল্প সময়ের মধ্যে ফল পাওয়া যেতে পারে, যে কোন পরিকল্পনায় সেই ধরণের যথেষ্ট সংখ্যক প্রকল্প থাকা উচিত। কাজেই বিনিয়োগের সমগ্র কাঠামোটাই সতর্কতার সঙ্গে তৈরি করতে হয়। মূল্য নিয়ন্ত্রণ একটা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হতে পারে, কিন্তু নিম্ন মূল্যস্তর নতুন লগ্নি আকর্ষণ করেনা। মজুদ ভাণ্ডার অন্যতম একটা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বটে, কিন্তু তার সুযোগ সুবিধেও সীমিত। যথেষ্ট পরিমাণ সংরক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রা অর্থাৎ সাধারণ একটা মজুদ অর্থ ভাণ্ডার অনেক-দিক দিয়ে সুবিধেজনক। এই পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্য রপ্তানী যথাসম্ভব বাড়ানোই যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পরিকল্পনার আদর্শচ্যুতি ঘটার পথে যেসব কারণ রয়েছে সেগুলির মূলোচ্ছেদ প্রথম কর্তব্য

এ বিষয়ে বোধহয় কোনো দ্বিমত নেই যে যে-ধরণের আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলবার জন্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির সূত্রপাত হয়েছিল তার চেয়ে অনেকাংশে ভিন্ন ধরণের একটা পরিমণ্ডল এখন এ-দেশে গড়ে উঠেছে। উৎপাদন ও বন্টনের ক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য নিয়েই আর্থিক পরিকল্পনার উদ্ভব। বাস্তবে উৎপাদনের দায়িত্ব যার হাতেই থাক না কেন,—চাষী, মজুর, শিল্পপতি, রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানার পরিচালক, এঁরা সকলেই নিজের নিজের সামাজিক দায়িত্বের কথা মনে রেখে আর্থিক ব্যবস্থাকে শুধু সীমিত লাভের উদ্দেশ্যে নয়, সামাজিক শ্রীবৃদ্ধির স্বার্থে পরিচালিত করবেন এই কানুনের ফলে শিল্পের শক্তিকেন্দ্র সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের অধিকারে চলে এসেছে এমন দাবি করা শক্ত। ব্যক্তিগত মালিকানার শক্ত ঘাঁটিগুলি যে এখনও আগের মতই শক্ত, এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আগের চেয়েও বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন, নানাভাবে অনুসন্ধানের ফলে, তা' এখন সুস্পষ্ট। শিল্পের জন্য লাইসেন্স দেবার ব্যবস্থা যে ঘোষিত নীতি ও উদ্দেশ্য থেকে অনেকাংশে বিচ্যুত, শিল্পক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বহু মধ্যবিত্ত শিল্পমালিকের হাতে ছড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টা যে বড় বড় কয়েকটি শিল্পগোষ্ঠীর ছলাকলায় সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়েছে, এই তথ্য এখন অবিসংবাদিত। একদিকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের মত নয়, একথা জেনেও কর্মীদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি হতে দেখা যায় না। নূতন কোনো ভাবাদর্শের প্রেরণা তাঁদের মধ্যে যে উৎসাহ সঞ্চার করে না এর নিশ্চয়ই বিশেষ তাৎপর্য্য রয়েছে। পরিচালকদের দক্ষতা ও সততার প্রতি কর্মীদের আস্থার অভাব, পরিচালনার নীতিনির্দ্ধারণে কর্মীদের সম্পূর্ণ দায়িত্বহীনতা, এবং সাধারণভাবে আর্থিক বৈষম্যের জন্যে ক্রমশঃ পুঞ্জীভূত ক্ষোভ প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতেও সামাজিক শ্রীবৃদ্ধির আদর্শটি ঠিকভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যাচ্ছে না। পরিকল্পনাপর্বের গোড়ার দিকে মনে করা হয়েছিল রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তথা সমাজ-

পরিকল্পনার সঙ্কট ও তার স্বরূপ

ছিল পরিকল্পনার মূল কথা। চারদিকে তাকিয়ে দেখলে কিন্তু এখন মনে হবে যে সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদ প্রায় কোনো স্তরে কোনো অনুভূতি জাগায় না। বৃহত্তর উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে পরিকল্পনার অংশবিশেষে নিজেদের ভাগ দাবি করাই এখন সব শ্রেণীর মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিকল্পনার সাফল্যের জন্যে যে ঐক্যবোধের প্রয়োজন তার বদলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর আত্মপরতাই এখনও সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আর্থিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুগুলিকে রাষ্ট্রীয় অধিকারে আনবার চেষ্টা করা হয়েছে। বৃহৎ শিল্পের উপর ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতিভূরা যাতে প্রভুত্ব করতে না পারে, তার জন্যে নানারকমের বিধিনিষেধ আরোপ ক'রে শিল্পে মূলধন বিনিয়োগের অবাধ অধিকার খর্ব্ব করা হয়েছে। কিন্তু এই ধরণের আইন-সেই নিয়ন্ত্রণের বেড়া নানাভাবে এড়িয়ে যাবার প্রয়াস—এই টানাপোড়েনের মধ্যে দেশের শিল্পব্যবস্থা সামাজিক স্বার্থের অভিমুখী হয়ে গড়ে উঠবে এমন আশা করা নিরর্থক। সুতরাং গোষ্ঠীগত স্বার্থের

ধীরেশ ভট্টাচার্য্য

প্রেরণায় শিল্পব্যবস্থা যে-দিকে এবং যে-গতিতে অগ্রসর হচ্ছে তাই নিয়েই আমাদের আপাততঃ সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

শুধু শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করেও এই সমস্যার সমাধান পাওয়া যাচ্ছে না। গত দুই দশকে যে-সব শিল্প রাষ্ট্রের মালিকানায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সেগুলির কর্মী ও পরিচালকদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই বোঝাপড়ার একান্ত অভাব। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জীবনে এক নূতন গতিবেগ সৃষ্টি করবে এবং গোষ্ঠীগত বা ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রতি দৃক্‌পাত না করে সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে কাজ করবে। কিন্তু নানা স্বার্থের সংঘাতে এই রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিতে আশানুরূপ অগ্রগতি হতে দেখা যাচ্ছে না। এর মধ্যে শুধু রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানার কর্মী ও পরিচালকদের বিরোধই শুধু নয়, কারখানার স্থানীয় কর্ণধার এবং কেন্দ্রের আমলাতন্ত্রের বিরোধও জড়িত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে চলার পথে নানা বাধার উদ্ভব হচ্ছে। অন্যান্য দেশে শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিচালন-ব্যবস্থা মজবুত করার চেষ্টা হয়ে থাকে; আমাদের দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের পরিচালনার ধরণধারণ অন্যান্য শিল্পের তুলনায় প্রায় কোনো অংশেই পৃথক্ নয়। এগুলি পরিকল্পনার সঙ্কট।

এই সঙ্কটের জন্যে অনেকসময়েই দায়ী করা হয়ে থাকে এর বিভিন্ন স্তরে নিযুক্ত নানা শ্রেণীর সরকারী আমলাদের। বলা হয়ে থাকে যে পরিকল্পনার রূপায়ণে যে-সমস্ত ত্রুটি দেখা যাচ্ছে তা এই আমলা-তন্ত্রের গাফিলতির জন্যে ; পরিকল্পনার মূল নীতির কোনো দুর্ব্বলতা এর জন্যে দায়ী নয়। কিন্তু যদি আমলাতান্ত্রিক রীতিনীতির জন্যেই পরিকল্পনার আদর্শচ্যুতি ঘটতে থাকে, তাহলে সর্ব্বাগ্রে সেই রীতিনীতির গলদগুলিকেই পরীক্ষা করে তার সংস্কার করবার চেষ্টা কি গোড়ার কথা হওয়া উচিত নয় ? অনুপযুক্ত শাসনযন্ত্র নিয়ে কিছু গালভরা আদর্শের প্রশস্তি গেয়ে পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্রতী হওয়া কি পরিকল্পনা-বিশারদদের পক্ষে সমীচীন হচ্ছে ? বস্তুত:পক্ষে শাসনযন্ত্রের যে ত্রুটি আজ পর্য্যন্ত একেবারেই শোধরা-বার চেষ্টা করা হয় নি তা হল উচ্চবর্গের প্রশাসকগোষ্ঠি এবং শাসনবিভাগীয় সাধারণ কর্মীর মধ্যে ব্যবধানকে কমিয়ে আনা। অথচ এই সাধারণ কর্মীর দায়িত্ববোধকে জাগাতে না পারলে পরিকল্পনার অনেক ক্ষেত্রেই সাফল্যের নাগাল পাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠবে। সাধারণ কর্মীর ভাল-মন্দ বোধকে একেবারে অবহেলা ক'রে বোধহয় এই অবস্থার অবসান ঘটানো যায় না। পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তরের কাজকর্মে যাঁরাই অংশগ্রহণ করবেন, তাঁদের সুচিন্তিত মতামত, তাঁদের ন্যায্য সুবিধা-অসুবিধার কথা যাতে উচ্চবর্গের শাসকগোষ্ঠীর বিচার-বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করতে পারে তার ব্যবস্থা পরিকল্পনাযন্ত্রের মধ্যেই থাকা দরকার। যেমন ধরুন, পরিকল্পনাকে যদি কনিষ্ঠ কর্মচারীরা, উপরের স্তরের কর্ত্তৃ-পক্ষের কল্পনা-বিলাস বলে মনে করতে অভ্যস্ত হয়ে যান, তবে পরিকল্পনার সাফ-ল্যের জন্যে কোনো দায়িত্বের অংশীদার হতে তাঁরা স্বভাবত: অস্বীকৃত হবেন। তখন তাঁদের গাফিলতিকে দোষ দিয়ে কারও কোনো লাভ হবে কি ?

অতএব দেখা যাচ্ছে, পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্যে দরকার সব শ্রেণীর সরকারী কর্মীর মধ্যে পরিকল্পনার প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য জাগিয়ে তোলা। প্রধানতঃ দুটি পরিবর্ত্তন আনা এর জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। প্রথমত: পরিকল্পনা যাতে কোনো সরকারী স্তরেই সম্পূর্ণ উপরওয়ালার আদেশ বলে গণ্য না হয়, তার জন্যে প্রত্যেক স্তরে পরিকল্পনা-কেন্দ্র (প্ল্যানিং সেল) থাকা বাঞ্ছনীয় যাতে এই কেন্দ্রগুলিতে সংশ্লিষ্ট সকলেই যাতে নিজেদের ধারণাকে রূপ দেবার চেষ্টা করতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে পারে। দ্বিতীয়ত: সরকারী কর্মীদের বেতন ও মর্য্যাদার বৈষম্যের পুর্ণমূল্যায়ন ও পুণ-বিন্যাস দরকার। যোগ্যতা ও দায়িত্বের তারতম্য অনুযায়ী স্তরবিন্যাস নিশ্চয়ই থাকবে, কিন্তু নীচের স্তরে যাঁরা থাকবেন তাঁরা নিজেদের মত প্রকাশে সম্পূর্ণ বিরত থাকবেন এবং মুখ বুজে সমাজগঠনের কাজ করে যাবেন এমন আশা করা অনুচিত। সুতরাং শাসনব্যবস্থার নীচের স্তরেও যাতে দায়িত্ববোধের সঞ্চার হয় তার জন্যেই মতামত প্রকাশের সুনির্দিষ্ট কতকগুলি পথ খুলে দিয়ে দেখতে হবে প্রশাসনব্যবস্থার উপর ও নীচের স্তরের মধ্যে ব্যবধান ঘোচানো সম্ভব কিনা।

আর্থিক ব্যবধান গত দুই দশকে বেড়েছে কি কমেছে তার নিঃসংশয়ে খতিয়ান করা সহজ নয়। কিন্তু পরিকল্প-নার সঙ্কটকালে এ প্রশ্ন সব মানুষের মনেই জাগবে যে বর্ত্তমানে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে আহার বিহারের যে তারতম্য রয়েছে দুই দশক আগে কেউ কি ভেবেছিল যে তিনটি পঞ্চবার্ষিকী যোজনার পরও অবস্থা ঠিক এই থাকবে ? আমরা ধনীকে উচ্ছেদ করার কথা কখ-নোই ভাবি নি, কিন্তু স্বল্পবিত্ত ও দুস্থদের অশন-বসন কিছুটা উন্নত হবে এমন আশা নিশ্চয়ই করেছিলাম। আজও আমরা ভিক্ষাকে উপজীবিকা হিসাবে বাতিল করার কল্পনাও করতে পারি না, সবচেয়ে দুর্দ্দশাগ্রস্ত বেকারদের আর্থিক সহায়তা করবার কোনো ব্যবস্থাও আমাদের নেই, সামান্য কিছু ভাতা দিয়ে নিঃসম্বল বৃদ্ধদের পোষণ করার শক্তি আমরা আজও অর্জ্জন করতে পারি নি। সেই অবস্থাতেও দেশে নানা ধরণের বিলাসদ্রব্য কেনাবেচা হতে বিন্দুমাত্র বাধা নেই, যা কিছু বাধানিষেধ শুধু বাইরের আমদানির উপর। অবস্থার পরিবর্ত্তনে সাধারণ মধ্যবিত্তের জীবিকার উপরও আঘাত পড়েছে, শুধু মুষ্টিমেয় কিছু লোকের ভোগলিপ্সা আইনসঙ্গত কিংবা আইনবিরুদ্ধ নানা উপায়ে প্রশ্রয় পাচ্ছে। যে কোনো পরিকল্পিত আর্থিক ব্যবস্থায় এই অসঙ্গতি নিতান্তই দৃষ্টিকটু। পরি-কল্পনার গোড়ার দিকে বাড়তি আয়, সঞ্চয়ের পথে পরিচালিত করার কথা বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছিল, অথচ সেই বাড়তি আয় যে ভোগের জন্যে ব্যয়িত হচ্ছে তার বহু নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করার সামান্যই চেষ্টা হয়েছে। ভোগের এই তারতম্য সাধারণ লোকের মধ্যেও উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে এবং সকলেই নিজের নিজের ভোগের অংশ বাড়াবার জন্যে চেষ্টা করে চলেছে বলে বৃহত্তর কল্যাণসাধনের সামগ্রিক লক্ষ্য সিদ্ধির প্রতি কারো তেমন দৃষ্টি পড়ছে না।

দেশের দারিদ্র্য এই অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ দুরীভূত হবে কিংবা বেকারত্বের উচ্ছেদ ঘটবে, এমন আশা কেউ কখনও করেছেন কিনা জানি না। পরিকল্পনার উদ্যোক্তারা অবশ্যই জানতেন যে, তিন-চারটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের সব সমস্যা মোচন হ'বে না। দারিদ্র্য কিংবা বেকারত্ব ঘুচে যাবে, এমন আশাও কাউকে তাঁরা দেন নি। সুতরাং আমাদের আর্থিক উন্নতি অন্যান্য দেশের মত হয় নি কিংবা বেকারের সংখ্যা এখনও বেড়ে চলেছে, এই সমস্যাগুলি, আমাদের পরিকল্পনার সঙ্কটের কারণ নয়। সঙ্কটের প্রকৃত কারণ হল এই যে আমাদের ব্যক্তি-গত, গোষ্ঠীগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থবৃদ্ধি বিপরীত মুখে চলেছে অর্থাৎ পরিকল্পনার সঙ্গে আমরা সাযুজ্য লাভ করতে পারি নি। আমরা সামাজিক স্বার্থকে দলিত ক'রে ব্যক্তিস্বার্থকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দিয়েছি, ভোগকে সংযত করার আন্তরিক প্রয়াস করিনি, শাসনব্যবস্থাকে পরিকল্পনার স্বার্থে সংস্কার করতে উদ্যোগী হই নি। ফলে পরিকল্পনার দ্বারা আমাদের স্বার্থ-বোধের কোনো সংস্কার হয় নি—আমরা নিজেদের ভোগতৃপ্তির জন্যে নানা জিনিষ চাইতে শিখেছি কিন্তু কোন পথে গেলে দেশের ভবিষ্যতের বনিয়াদ শক্ত ক'রে গড়া যেতে পারে সেই ভাবনার অংশীদার হতে শিখি নি। এমন কি শিক্ষাবিস্তারের ফলও হয়েছে আমাদের দেশে বিপরীত। শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে স্বনির্ভরতা সৃষ্টি

শেষাংশ ৩১ পৃষ্ঠায়

ভারতে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার সাফল্য

বিশ্বনাথ লাহিড়ী
অধ্যাপক, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

লেখকের মতে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা সাধারণের সর্বনিম্ন আবশ্যকতা পূর্ণ করতে পারেনি অথবা সামাজিক ন্যায়ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সমাজের ধনী শ্রেণীই আরও বেশী ধনশালী হয়েছেন।

প্রফেসার ববিন্সের মতে প্রত্যেক অর্থনৈতিক কার্যসূচীর মূলে থাকে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা ; ভাষান্তরে বলতে গেলে একটি পরিকল্পনাকে আধার করে যে কোনোও অর্থনৈতিক কর্মসূচী সুসম্পন্ন হ'তে পারে। বর্তমান যুগে প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ রূপায়িত হয় পরিকল্পনার আধারে। স্বাধীনোত্তর ভারতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে, সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য পূরণের আদর্শ নিয়ে গণতান্ত্রিক ধারায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য, একটা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলেছে। দেশ সমাজতন্ত্রের যে আদর্শ গ্রহণ করেছে তা বাস্তবে রূপায়িত করার সোপান হ'ল এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি। শুধু তাই নয়, এই আদর্শ, দেশোন্নয়নের কর্মযজ্ঞের প্রতি ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত বলে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উচচাশা পূর্ণ হওয়া সম্ভব। এই আদর্শ সমাজ ব্যবস্থায় প্রতি মানুষের নৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা ও মূল্য অক্ষুন্ন থাকবে। আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পথ প্রশস্ত করা। প্রথম পরিকল্পনার ভূমিকায় 'কল্যাণকামী রাষ্ট্র' স্থাপনের আদর্শের উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে, আমাদের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নীতি 'ব্যক্তিগত লাভের' জন্য নয় পরন্তু 'সামাজিক লাভের' জন্য। যেখানে সম্পদ, আয ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয়র হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার সম্ভাবনা রোধ করা হবে। তৃতীয় পরিকল্পনার ভূমিকায়, লক্ষ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়েছে যে সমাজ ব্যবস্থায় সমাজের প্রতি শ্রেণীর কল্যাণ বিধান এবং জাতীয় আয় ও সম্পদ বন্টনে সমতা প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এ অবধি তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হয়েছে এবং বর্তমানে আমরা চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। এই অবস্থায় বিচার করা যাক আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির ঘোষিত উদ্দেশ্যগুলির কতটা পূর্ণ হয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক নীতির আধারে বাঞ্ছিত অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটানোর প্রচেষ্টা কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে। অর্থাৎ দেশের সার্বজনীন উন্নয়ন প্রয়াসের একটা মূল্যায়ন করা দরকার। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতির মাত্রা দ্রুত হওয়া প্রয়োজন। এ যাবৎ আর্থিক ক্ষেত্রে প্রগতি আশানুরূপ হয়নি। একশো জনের মধ্যে প্রতি ৭০ জনের জীবিকা নির্বাহের মূল ক্ষেত্র হ'ল কৃষি এবং জাতীয় আযের শতকরা ৫০ ভাগ আসে কৃষি সূত্রে। এই ক্ষেত্রে উন্নতি পর্যাপ্ত ও আশানুরূপ হয়নি। বস্তুতঃ পক্ষে ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৬৪-৬৫ পর্যন্ত কৃষি উৎপাদন শতকরা ৩.৯ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি উৎপাদন কম হওয়ার জন্যই বিদেশ থেকে খাদ্য সামগ্রী আমদানি করতে হয়েছে। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে খাদ্য সামগ্রীর আমদানি ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতার অভাবের দরুণ মূল্যস্তরে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। উচচমূল্যের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সর্বসাধারণ বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত শ্রেণীকে বিপর্যস্ত করে। পরিকল্পনার আওতায় ১৫ বছরের উন্নয়ন প্রয়াসের পরও দ্রব্যমূল্য শতকরা ৫৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পক্ষেত্রেও উন্নতির পরিমাণ, পরিকল্পনার বছরগুলিতে খুব একটা উৎসাহজনক হয়নি। এই ক্ষেত্রে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। আনুপাতিক হিসেবে দেখতে গেলে প্রথম পরিকল্পনাকালে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন ৬.৩ শতাংশ হারে, বেড়েছে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ৮.৩ শতাংশ হারে এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ৮.৬ শতাংশ হারে বেড়েছে। শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার পরিমাণও দ্বিগুণভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে ফলে মূল্যের ঊর্ধগতি অব্যাহত থাকে। আয় ও সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে অবস্থা আশাপ্রদ নয়। পরিকল্পনার বছরগুলিতে আয় ও সম্পদ বন্টনে বৈষম্য ব্যাপকভাবে বেড়েছে এবং সম্পদ কিছু সংখ্যকের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতাও বেড়েছে। মহলানবীশ কমিটির ১৯৬৪ সালের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে উচচ আয় সম্পন্ন গোষ্ঠীর শতকরা ১০ জন ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর শতকরা ১০ জনের মধ্যে বৈষয়িক অবস্থার ব্যবধান বৃহত্তর হচ্ছে। উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেশের আর্থিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার মাত্রাও বেড়েছে। ফলিত অর্থনৈতিক গবেষণা সংক্রান্ত জাতীয় পরিষদের (ন্যাশানাল কাউন্সিল অফ এ্যাপ্লাইড ইকনমিক রিসার্চ) এক সমীক্ষায় (১৯৬১-৬২) বলা হয়েছে যে, দেশের পরিকল্পনার এগার বছর অতিবাহিত হবার পরেও সম্পদ ও আয়ের ব্যবধান সঙ্কুচিত হয়নি এবং আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের তুলনায় এই ব্যবধান অনেক বেশী। এই সমীক্ষায় আরও বলা হয়েছে যে, দেশের শতকরা ১৫টি পরিবার জাতীয় আয়ের শতকরা ৪ ভাগ ভোগ করেন। অর্থাৎ স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, পরিকল্পনার বছরগুলিতে উচচ আয়ভোগী শ্রেণী, নিজেদের অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করেছে এবং জাতীয় আয়ের অধিকাংশ ভোগ করেছে।

শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজতান্ত্রিক

নীতির আওতার মধ্যে আসেনি, ফলে সেগুলি স্বাধীনভাবে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের স্থান মজবুত করে নিয়েছে। একটি সমীক্ষা অনুসারে, ভারতের প্রথম শ্রেণীর ১০০টি কোম্পানীকে ভারতের অর্থনীতির প্রাণ কেন্দ্র বলা চলে। এর মধ্যে ১৯টি সরকারী ক্ষেত্রে ও বাকী ৮৯টি ব্যক্তিগত মালিকানায় আছে। অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংস্থার মতে দেশের প্রধান ২০০টি কোম্পানীর মধ্যে প্রথম ১০টি, দেশের উৎপাদনের ২০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। পরিকল্পনা কমিশনের অন্য একটি সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৬২-৬৩তেও দেশের মোট উৎপাদনের মধ্যে সরকারী তরফের অংশ ছিল ১৮,৪০০ কোটি টাকার এবং বেসরকারী তরফের অংশ ছিল ১৫৪,৮০০ কোটি টাকার সমান। অন্য কথায় বেসরকারী ক্ষেত্রে আর্থিক শক্তির এই বৃদ্ধিকে সার্বজনীন উন্নতি বলে গণ্য করা যায় না। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সম্পদ বৃদ্ধি ও শক্তির কেন্দ্রীকরণ দেশের সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরিপন্থী হয়ে পড়বে। তা ছাড়া কৃষি জমি এবং সহরাঞ্চলের সম্পত্তি কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হলে সামাজিক বৈষম্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

দেশে বেকার সমস্যা উত্তরোত্তর জটিল হয়ে উঠছে। প্রথম পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত বেকারের আনুমানিক সংখ্যা ছিল ৫৩ লক্ষ এবং তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে সেই সংখ্যা এক কোটিরও বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে তিনটি পরিকল্পনার শেষেও দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা স্থাপনের চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয়নি। দেশ কৃষি ও শিল্পে কিছু অগ্রগতি করেছে বটে কিন্তু দ্রব্য মূল্যের বৃদ্ধি সাধারণ মানুষকে বিহ্বল করে তুলেছে। সর্বোপরি বিভিন্ন পরিকল্পনা রচনাকালে সামাজিক যে সব লক্ষ্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে নিষ্ফল হয়েছে। এ পর্যন্ত সাধারণ মানুষ সর্বনিম্ন আবশ্যকতা পূর্ণ করতে পারে নি অথবা সামাজিক ন্যায়ও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। অপরপক্ষে সমাজে প্রতিষ্ঠিত শ্রেণী তাদের প্রতিপত্তি আরও বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। অতএব ভারতে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা এ পর্যন্ত বাস্তব হয়ে ওঠেনি এবং কতদিনে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে তা বলা কঠিন।

এইচ. ডি. কামাথ

৮ পৃষ্ঠার পর

না করে হঠাৎ এই রকম ভীষণ একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত নয়। উচ্চপদগুলির জন্য যদি উপযুক্ত ধরণের ব্যক্তিদের নির্ব্বাচিত করা হয়, তাদের যদি যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং মন্ত্রীদের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করা হয় এবং তাঁদের অধীনস্থ কোন প্রকল্পের বিফলতার জবাবদিহি তাদেরই দিতে হয় তাহলে আমি এখনও আশা করি যে সরকারি সংস্থাগুলি আবার কর্মচঞ্চল হয়ে উঠবে। প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন তাঁদের বিবরণীতে সরকারি তরফের সংস্থাগুলি সম্পর্কে যে সব পরামর্শ দিয়েছিলেন সেগুলির কয়েকটি প্রধান পরামর্শ সরকার গ্রহণ করেননি অথবা এ পর্য্যন্ত সংসদেও তা আলোচিত হয়নি, এটা দুঃখের কথা।

তাছাড়া প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, পরিকল্পনা কমিশনের, পরিকল্পনার কাজ কর্ম সম্পর্কে বার্ষিক অগ্রগতি এবং তাদের মূল্যায়ণ বিবরণীগুলি সংসদে পেশ করা উচিত। সংসদ এগুলি আলোচনা করতে নিশ্চয়ই আগ্রহী হবে।

সর্বশেষে, অত্যন্ত সদিচ্ছাপূর্ণ এবং কাগজে কলমে দেখতে অতি চমৎকার পরিকল্পনার মূলে যদি সৎ, নিঃস্বার্থ ও দক্ষ প্রশাসণ ব্যবস্থা না থাকে তা হলে তা বিফলতায় পর্য্যবসিত হয়। প্রায় দশ বছর পূর্ব থেকে বিশেষ করে ১৯৬৭ সাল থেকে নেতৃত্বের ও প্রশাসনের মান ও নীতিজ্ঞানের দ্রুত অবনতি ঘটেছে। এই নীতিজ্ঞানের মূল্যমান হ্রাস, টাকার মূল্যমান হ্রাসের চাইতেও বেশী বিপজ্জনক। কাজেই প্রশাসন ব্যবস্থা যদি পরিশোধিত ও সহজ সরল না করা যায় এবং সপ্তম দশকের সামাজিক অর্থনৈতিক প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের উপযুক্ত করে না তোলা যায় তাহলে ১৯৮০ সালে পরিকল্পনাও থাকবেনা বা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হবেনা, তার পরিবর্তে আসবে বিশৃঙ্খলা বা এক নায়কত্ব। এই রকম একটা সঙ্কটকে প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের সকলেরই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা উচিত।

হীরেন মুখোপাধ্যায়

৩ পৃষ্ঠার পর

পর্য্যন্ত নদী পার হওয়ার কথা বলে কোন লাভ হয়না। পদ্ধতির সমস্যা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সমাধান করা হচ্ছে, ততক্ষণ কাজের কথা বলার কোন মানে হয়না।"

আমাদের দেশকে মনস্থির করতে হবে এবং তাড়াতাড়ি স্থির করতে হবে। পরিকল্পনাগুলি যাতে অর্দ্ধ প্রয়াসের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় পরিণত না হয় সেজন্য সেগুলিকে জনগণের প্রয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করতে হবে এবং সেগুলি রূপায়িত করার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। সৈনিকোচিত শৃঙ্খলা অনেকে হয়তো পছন্দ করেননা, সেই ক্ষেত্রে আমাদের অন্ততঃপক্ষে সামাজিক শৃঙ্খলা প্রয়োজন। কিন্তু এটা অর্ডারমাফিক হয়না। তাছাড়া আমাদের দেশে কোন বিপ্লব হয়নি বলে, ধরুন গত দশকে কিউবায় জনগণের মধ্যে যে ধরণের আনন্দোল্লাস দেখা গেছে তা আমাদের দেশে আশা করা যায়না। তবে বর্ত্তমানে সমাজতান্ত্রিক কথায় যাকে "অধনতন্ত্রী পথ" বলা হয় আমরা অন্ততঃপক্ষে সেই সম্পর্কে আমাদের মনঃস্থির করে নিতে পারি। আমরা যদি তাড়াতাড়ি সেই পথ অবলম্বন করতে না পারি এবং তার জন্য সব রকম রাজনৈতিক, অথনৈতিক ও সামাজিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করতে না পারি তাহলে আমাদের দেশের সহিষ্ণু জনগণ যে আক্রোশ এখনও চেপে রেখেছেন, মেঘ গর্জনের মতো সেই আক্রোশের সম্মুখীন হওয়ার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।

ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

সাধারণ মানুষ কতটুকু লাভবান হয়েছেন

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

গত তিনটি পরিকল্পনা দেশের যে অংশকে স্পর্শ করতে পারেনি সেই অংশ সম্পর্কে তলিয়ে ভাববার সময় অনেকদিন হয়েছে। আমাদের পরিকল্পনার লক্ষ্যই ছিল ভারতবর্ষের বিপর্যস্ত অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে ঢেলে সাজানো।

পরিকল্পনার পথে ভারত তার অভীষ্টে পোঁছুতে পেরেছে কিনা প্রতিটি মানুষ এই দেশে সমান অধিকার, সমান সুযোগ এবং জীবন ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে পারছে কিনা এ সম্পর্কে আজ সারা দেশে একটা প্রচণ্ড সংশয় দেখা দিয়েছে।

এই সংশয়ের পটভূমিকায় চতুর্থ পরিকল্পনার যবনিকা উত্তোলিত হতে চলেছে। চতুর্থ পরিকল্পনার অভীষ্ট বর্ণনা প্রসঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের জন্য যে সব সুন্দর প্রতিশ্রুতি রয়েছে, কৃষি শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষার জন্য যে সমস্ত লক্ষ্য মাত্রা নির্দিষ্ট হয়েছে, সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে কিনা অথবা ইপ্সিত লক্ষ্য মাত্রায় আমরা পোঁছুতে পারবো কিনা অথবা কোন অভাবনীয় ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্যকে অনিশ্চয়তার পথে ঠেলে দেবে কি না, তা এখনই বলা কঠিন.

তৃতীয় পরিকল্পনার সুরুতেই প্রাকৃতিক দুর্যোগসমেত অনেক বাধাবিঘ্নের উদ্ভব হয়েছে। প্রচণ্ড খরায় কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। এর পর শত্রুর আক্রমণে অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়েছে। এ কথা আরও নিঃসন্দেহে বলা চলে যে আমাদের দেশে কৃষি এখনও সম্পূর্ণ প্রকৃতি নির্ভর। এ কথা প্রমাণিত হয়েছে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর পরিকল্পনা, বিদেশী শত্রুর আক্রমণে সহজেই পর্যুদস্ত হতে পারে। সুতরাং চতুর্থ পরিকল্পনা রচনাকালে, রচয়িতারা স্বভাবতই পরিকল্পনার দুটি দুর্বলতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন যথা—(১) কৃষি নির্ভর অর্থনীতি কৃষির ব্যর্থতায় বিপর্যস্ত হ'তে পারে এবং (২) বিদেশী সাহায্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল পরিকল্পনা সাধারণ মানুষের কল্যাণের সূত্র সুনিশ্চিত না করে এক অনিবার্য অর্থনৈতিক দাসত্বের পথ উন্মুক্ত করতে পারে।

> 'দেশের যে অতিক্ষুদ্র অংশে বুদ্ধি বিদ্যা, ধনমান, সেই শতকরা পাঁচ পরিমাণ লোকের সঙ্গে পঁচানব্বই পরিমাণ লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রের ব্যবধানের চেয়ে বেশী। আমরা এক দেশে আছি, অথচ আমাদের এক দেশ নয়।'
>
> —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম পরিকল্পনায় যে অর্থ বিনিয়োজিত হয়েছিল তার শতকরা ৬ ভাগ ছিল বৈদেশিক সাহায্য। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল যথাক্রমে শতকরা ২১ এবং ২৮ ভাগে। ১৯৬৬-৬৭ এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে বার্ষিক পরিকল্পনাকালে সমগ্র ব্যয়ের শতকরা ৩৮ ভাগ এবং ৩৬ ভাগ ছিল বৈদেশিক সাহায্য। অর্থাৎ চতুর্থ পরিকল্পনাকালে সুদে এবং আসলে আমাদের ঋণদাতাদের দিতে হবে আনুমানিক ২০৮০ কোটি টাকা। ১৯৬৯-৭০ সালে রপ্তানীর মাধ্যমে অর্জিত বিদেশী মুদ্রার আনুমানিক শতকরা ২৯ ভাগ ঋণ পরিশোধেই ব্যয় হবে। ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসের শেষে আমাদের ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫,৭৫১ কোটি টাকা। টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে এই পরিমাণ স্বভাবতই আরো বেড়েছে। এই ঋণ পরিশোধের জন্য প্রত্যেক ভারতীয়কে দিতে হবে ১০৯ টাকা করে। সুতরাং সমস্ত প্রকার অনিশ্চয়তার ঝুঁকি এড়ানোই প্রথম লক্ষ্য। তাই চতুর্থ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হবে বিদেশী সাহায্যের কম ব্যবহার এবং ১৯৭০-৭১ সালের মধ্যে পি. এল. ৪৮০ অনুসারে আমদানী সম্পূর্ণ বন্ধ করা, অন্যান্য আমদানীও যথাসম্ভব হ্রাস করা এবং রপ্তানী বার্ষিক সাত শতাংশের হারে বাড়ানো।

পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা সমাজ জীবনের প্রতিটি স্তরে দেশের প্রতিটি প্রান্তে প্রাণের সাড়া জাগাতে চেয়েছিলাম। আমাদের লক্ষ্য ছিল ১৯৭৭-৭৮ সালের মধ্যে মানুষের মাথা পিছু আয় দ্বিগুণ করা। অর্থাৎ জাতীয় আয় সর্বদিক থেকে বেড়ে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছুবে যার ফলে ভারতের কল কারখানায়, ক্ষেত খামারে, যে সমস্ত মানুষ দীর্ঘকাল ধরে কায়ক্লেশে বেঁচে থাকার সঙ্গে আপোস করে চলছিলেন সেই সমস্ত মানুষ স্বাস্থ্যে প্রাচুর্যে, কর্মোদ্যমে দেশকে জোর কদমে এগিয়ে নিয়ে চলবে। কিন্তু সেই লক্ষ্য পূর্ণ হয়নি, আমরা যা চেয়েছিলাম তা হয়নি। বৃটিশ শোষণের প্রখর মধ্যাহ্নে রবীন্দ্রনাথ একই দেশে দুই শ্রেণীর দুটি দেশ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। একটির গাঢ় ছায়া অন্যটিকে অন্ধকার করে তুলেছিল। ১৯৩৩ সালের জন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এক সমীক্ষায় বলা হয়েছিল, সেই সময় দেশের শতকরা ৩৯ জন মানুষ ছিলেন হৃষ্টপুষ্ট, শতকরা ৪১ ভাগ কৃশ এবং ২০ ভাগ কঙ্কালসার অর্থাৎ তৎকালীন জনসংখ্যার তিন এর দু অংশে ছিল অনাহার, ক্ষীণ স্বাস্থ্য আর ব্যাধিগ্রস্ততা। এর পর দীর্ঘ সময়ের স্রোত পেরিয়ে এসেছি আমরা। অথচ এগিয়ে চলার সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে আমরা যেখানে ছিলাম প্রায় সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছি। অচল রেলগাড়ীর বন্ধ কামরায়

বসে শুধু দেখছি বিশ্বের রঙীন চিত্তচঞ্চল-কারী দ্রুত ধাবমান ছবি। ভারতবর্ষ যেন সময়ের সাক্ষী, অতীতকে যেন এখানে সযত্নে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

আজ দেশের সব পেয়েছি ও 'সর্বহারাদের' দুটি জগৎ মুখোমুখী থমকে দাঁড়িয়েছে। একদিকে সেই স্বল্প সংখ্যক মানুষ যাদের সব আছে আর এক দিকে সেই বিপুল জনসমষ্টি যাদের কিছুই নেই। কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে এত চেষ্টা সত্বেও আমরা বিপর্যয় এড়াতে পারিনি। ১৯৬৮ সাল—যে বছরকে আমরা সবুজ বিপ্লবের বছর বলে চিহ্নিত করেছি সেই বছরেও আমরা প্রতিটি মানুষকে ১৬৬.৬ কিলোর বেশী আহার্য যোগাতে পারিনি, এই পরিমাণ ১৯৬৫ সালের চেয়ে শতকরা ৩.৭ ভাগ কম। ১৯৬৫ সালে এই পরিমাণ ছিল ১৭৩.০ কিলো। সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা দিন দিন কমে আসছে, তার প্রমাণ কাপড়ের ব্যবহার কমেছে শতকরা ১১ ভাগ, খাবার তেলের কমেছে শতকরা ১৪ ভাগ আর চিনির ব্যবহার কমেছে শতকরা ১৭ ভাগ। ১৯৬৭-৬৮ সাল আর ১৯৬৪-৬৫ সালের এই হল তুলনামূলক ছবি।

উপরের ছবিটি হ'ল সেই অন্ধকার জগতের ছবি, পরিকল্পনার ঢেউ যেখানে এখনও দাগ কাটতে পারেনি। অন্যদিকে আলোকিত জগতের আপ্যায়নে রয়েছে মহার্ঘ বিলাস সামগ্রীর ছড়াছড়ি। ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে মোটর গাড়ীর উৎপাদন বেড়েছে শতকরা ২৭ ভাগ, শীততাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের উৎপাদন বেড়েছে শতকরা ৪৪ ভাগ, রেফ্রিজারেটার শতকরা ২৯২ ভাগ, নানা জাতীয় সুস্বাদু মিষ্টান্ন শতকরা ৫২ ভাগ, আর্ট সিল্ক শতকরা ৫১ ভাগ।

এর পাশে দেখা যাক ভোগ্য পণ্যের ঊর্ধ্বমুখী বাজার দর। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য পণ্যের দর বেড়েছে। সাধারণ বৃত্তিজীবী মানুষের সীমিত আয় এই বাজার দরের ঊর্ধ্বগতির পিছনে ছুটতে গিয়ে বিপর্যস্ত। অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতিতে ১৯৬০-৬১ আর ১৯৬৭-৬৮ সালের মধ্যে বাজার দর বেড়ে গেছে শতকরা ৫৮ ভাগ, ফলে টাকার প্রকৃত মূল্য কমে গেছে শতকরা ৩৭ ভাগ। সমাজের যে অংশে এসেছে প্রাচুর্যের স্ফীতি তার ভারে সমাজের কাঠামোর বুনিয়াদ ভেঙে পড়তে চাইছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অসন্তোষ মাথা তুলেছে। এই সত্য আজ এত প্রকট যে সমীক্ষার অবতারণা ক'রে, বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় না।

কোথায় যেন একটা গোলমাল দানা বেঁধে উঠেছে। ভারতবর্ষ মূলত: ছিল ক্ষুদ্র কৃষি প্রকল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্প প্রকল্পের দেশ। ছোট ছোট ভূখণ্ডে চিরাচরিত প্রথায় কৃষক ফসল ফলাতো আর নানা বৃত্তিজীবি মানুষ গ্রামে গ্রামে তার নিজস্ব শিল্প সংস্থায় আপন খেয়ালে উৎপাদন করতো জনপদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের নানা দ্রব্য সামগ্রী। শিল্প নগরীগুলির বিশাল চিমনীর আকর্ষণে মানুষ তখন গ্রাম ছেড়ে জীবিকার সন্ধানে ছুটে আসত না। গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ, গ্রামীণ অর্থনীতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আজ তপোবনের সভ্যতাকে শিল্প জাগরণের চড়া, চোখ ধাঁধানো আলো থেকে দূরে রাখা সম্ভব নয়। জীবনযাত্রায় আধুনিকতার অনুপ্রবেশ ঘটবেই। আর পরিবর্তনের মুখে একটা ওলট পালট একটা তছনছ হবেই। এই সত্য স্বীকার করে পরিকল্পনায় আমরা দ্রুত শিল্পায়ণের মাধ্যমে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যেতে চাইলাম। মিশ্রিত অর্থনীতিকে মেনে নিলাম। কৃষির উপর জোর দেওয়া হল। আজকে পৃথিবীর সমস্ত উন্নত দেশ একটি সত্য উপলব্ধি করেছে—কৃষি এবং শিল্প গাঁটছড়ায় বাঁধা। জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট প্রাচুর্যের জলাশয় নয় দেশজোড়া প্লাবনই যদি প্রকৃত লক্ষ্য হয় তাহলে শিল্প আর কৃষিকে শ্রমিক ও কৃষককে এগোতে হবে পা মিলিয়ে। রাশিয়ার উদাহরণই অনুধাবন করে দেখা যেতে পারে। ১৯২০ সাল থেকে সে দেশে শিল্প, বিশেষত ভারী শিল্পের অগ্রগতি হয়েছে কৃষিকে উপেক্ষা করে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে খাদ্য সঙ্কট। ১৯৫৩ সালে কৃষির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হলেও খাদ্য সঙ্কট এখনও কাটেনি। কৃষির ব্যর্থতা শিল্পেও সঙ্কট এনেছিল—কাঁচামালের অভাবে উৎপাদন যন্ত্র অলস হয়ে পড়েছিল। তুলো প্রভৃতি অন্যান্য কৃষি জাত কাঁচামালের অভাবে শিল্পোৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল। চীন (প্রধান ভূখণ্ড), আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশেও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

ভারতবর্ষের জাতীয় আয়ের অর্ধাংশ সংগৃহীত হয় কৃষিপণ্য থেকে। ১৯৬০-৬১ সাল থেকে কৃষি উৎপাদনের মাত্রা প্রায় একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে। ১৯৪৯-৫০ সালের ভিত্তিতে এই মান মাত্র ১৪৫। স্বভাবতই শিল্পের ক্ষেত্রেও সুরু হল এর প্রতিক্রিয়া। ১৯৬৫-৬৭ সালের মধ্যে শিল্প উৎপাদনের মাত্রা (১৯৬০-সালের ভিত্তিতে) ১৫১-৫৪-র মধ্যে ওঠা নামা করল। কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে আমরা পেলাম স্বপ্ন ভঙ্গের ব্যর্থতা, ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা ও দিকে দিকে বিস্ফোরিত অসন্তোষ।

তিনটি পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল কর্মযজ্ঞের বিভিন্ন অংশে দেশের কর্মক্ষম মানুষকে যুক্ত করা। কিন্তু সে লক্ষ্য সুদূরেই রয়ে গেছে। কর্মহীন মানুষের সংখ্যা স্ফীত হয়েছে। বর্তমানে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬০ লক্ষের মত। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা ঘটনা স্রোত যে খাতে প্রবাহিত হচ্ছে সেই খাতেই প্রবাহিত হলে এই সংখ্যা চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে দাঁড়াবে ২ কোটির মাত্রায়, শিক্ষিত কর্মহীন মানুষের সংখ্যা ১৯৬৭ সালের জুন মাসের শেষে ছিল ১০ লক্ষ। ১৯৬৮ সালের শেষে দেশের মোট ৩,২২,০০০ গ্রাজুয়েট ও ডিপ্লোমা প্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ারদের ১৭.১ শতাংশই কর্মহীন ছিলেন। এই কর্মহীন সক্ষম কুশলী মানুষরাই পরিকল্পনার ব্যর্থতার সাক্ষ্য বহন করছেন। অর্থনীতিবিদগণ বলছেন—আমরা বহু সঙ্কল্প গ্রহণ করেছি কিন্তু কোনোও পর্যায়েই কর্ম সৃষ্টি ও কর্ম সংস্থানের সূত্রগুলি উন্মুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে, পরিকল্পনা রচনা করিনি।

অথচ পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র শিল্পের উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছিল। ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারেই কর্মহীন মানুষ বৃত্তির সন্ধান পাবেন। ভারি শিল্পে একটি মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য যে ব্যয় হবে তা পর্যালোচনা করে দেখা হয়েছে। ইস্পাত কারখানায় লাগবে ১,৬০,০০০ টাকা, কয়লার খনিতে ৬০,০০০ টাকা, সার তৈরির কারখানায় ৪০,০০০ টাকা, যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানায় ২৫,০০০ টাকা।

এর পর ৩১ পৃষ্ঠায়

ভারতে কৃষি পরিকল্পনার খতিয়ান

গৌতম কুমার সরকার

আমাদের দেশে পরিকল্পনার মাধ্যমে এক নতুন যুগের সূচনাকালে কৃষিতে সাফল্যের মাত্রা যে ইপ্সিত পর্যায়ে পৌঁছোয়নি এটা প্রমাণ করার জন্য অঙ্ক কষে দেখার প্রয়োজন হয় না। প্রথম দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে খাদ্যশস্যের জনপ্রতি উৎপাদনের পরিমাণ ঊর্ধ্বমুখী ছিল কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এই ঊর্ধগতি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য পরবর্তীকালে সে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। অনুরূপ সময়সীমার মধ্যে তাইওয়ান ও মেক্সিকোর মত স্বল্পোন্নত দেশ কৃষিরক্ষেত্রে যে অগ্রগতি করতে পেরেছে তার সঙ্গে তুলনা করলে অবশ্য ভারতের ভূমিকা প্রশংনীয় বলা চলে না। আমাদের দেশে অভাবিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে এ কথা অস্বীকার করার নয় কিন্তু বিকাশবাদী অর্থনীতিকদের কাছে এ অবস্থা অপ্রত্যাশিতও নয়। কারণ উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে এ অবস্থার সঙ্গে অনেক দেশকেই মোকাবিলা করতে হয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে বলা চলে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির কথা, যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার হ'ল শতকরা ৩, ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় অনেক বেশী। তাইওয়ানেও বছরে জনসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৩.৫ হারে।

যাই হোক তাইওয়ান কিংবা মেক্সিকো ও ভেনেজুয়েলার মত ল্যাটিন আমেরিকার কয়েকটি দেশে কৃষি উৎপাদনের হার আমাদের দেশের তুলনায় অনেক দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট কথা হ'ল ভারতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা রচনার সময় জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি সমস্যাটিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে তবেই নীতি নির্ধারণ করতে হবে।

ভবিষ্যতে খাদ্যের সম্ভাব্য চাহিদা বৃদ্ধির মাত্রা নিরূপণ করার সময়ে চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ধর্ম, আয়, বন্টন ব্যবস্থার প্রত্যাশিত পুনর্বিন্যাস ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সংক্রান্ত বিষয়গুলি অনুধাবন করতে হবে। সমগ্রভাবে সারা দেশে খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধির যে হিসেব করা হয় তার মাত্রা ০.৪ শতাংশ থেকে একের মধ্যে ওঠানামা করে। ন্যূনতম উৎপাদনের মাত্রা নির্ধারণের জন্যও ক্ষেত খামারের উৎপাদনের বহুল বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক। বস্তুতঃপক্ষে চতুর্থ পরিকল্পনার প্রাক পর্যায়ে রচিত পরিকল্পনা কমিশনের এক সমীক্ষায় কৃষি উৎপাদনের যে বার্ষিক হার বৃদ্ধির উল্লেখ করা হয়েছে তার মাত্রা ৫ শতাংশের অঙ্কে স্থিতিশীল রাখার বাঞ্ছনীয়তা কেউই অস্বীকার করবেন না। অবশ্য পরিকল্পনা কমিশনের ঐ সমীক্ষায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার সুনিশ্চিত করার জন্য এমন কোনোও নির্দিষ্ট প্রকল্পের উল্লেখ নেই যার থেকে আভাষ পাওয়া যেতে পারে কোন পথে গেলে ইপ্সিত ফল লাভ করা যেতে পারে।

আমাদের পরিকল্পনা যন্ত্রের একটা মস্ত ত্রুটি হ'ল এই যে, অর্থ বিনিয়োগের যে আদর্শ পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করা হচ্ছে তাতে কৃষি ব্যবস্থার সামগ্রিক রূপ ধারণা করার উপযোগী খুঁটিনাটি তথ্যের অভাব রয়েছে। অতএব অন্যান্য ক্ষেত্রের চাহিদার স্বরূপ নির্ধারণ করার পর প্রত্যেকটি প্রয়োজনের মাত্রা বিস্তারিতভাবে স্থির করে সামগ্রিক ভিত্তিতে একটা সুসমন্বিত পরিকল্পনার কাঠামো প্রস্তুত করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

কৃষি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কারিগরী প্রগতি কৃষি বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করেছে। কিন্তু এই প্রগতি লক্ষ্য মাত্রার কিনারায় সুনিশ্চিতভাবে পৌঁছে দেবে কি না কিংবা উৎপাদনের মাত্রা আশানুরূপ পর্যায়ে স্থিতিশীল করতে পারবে কিনা এ কথা নিঃসংশয়ে বলা শক্ত। বহু আলোচিত 'সবুজ বিপ্লবের' দুটি অপরিহার্য অঙ্গ হ'ল—(১) প্রচুর ফলনশীল বীজ ও নিবিড় কৃষি সূচীর আধারে উন্নত কৃষি পদ্ধতি প্রয়োগ। এই দুটির সাফল্য, ব্যাপক সুযোগ-সুবিধার অভাবে এবং আমাদের কৃষকগোষ্ঠীর আগ্রহ ও গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে বিঘ্নিত ও সীমাবদ্ধ হ'তে পারে।

তাইওয়ানে কৃষি ভূমির আয়তন বৃদ্ধির পরিবর্তে একর প্রতি ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাফল্য বহু অর্থনীতিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, ভারতে রাসায়নিক সার প্রয়োগের মাত্রা একরে ৩ পাউণ্ড থেকে চট করে ১৭৫ পাউণ্ড করে কিংবা কীট নাশকের ব্যবহার একর প্রতি মাত্রা ৩.৫ পাউণ্ড থেকে ১৫ পাউণ্ড করে অদূর ভবিষ্যতেই তাইওয়ানের মত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হবে এই রকম ধারণা পোষণ করা ভুল। জলের পরিমাণ কম দিয়েও যদি ভারতে ধান উৎপাদনের মাত্রা তাইওয়ানের উৎপাদন মাত্রার অর্ধেক হতে পারে তাহলে আমাদের দেশে তাইওয়ানে অনুসৃত কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ করার পক্ষে যথেষ্ট জোরালো যুক্তি আছে। তা ছাড়া বর্মা, কাম্বোডিয়া ও ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে, সেচযুক্ত ভূমির পরিমাণ অথবা রাসায়নিক সার প্রয়োগের পরিমাণ ভারতের তুলনায় কম হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদনের পরিমাণ যদি বেশী হয় তাহলে ঐ সব প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কৃষি পদ্ধতিগুলি আমাদের অনুধাবন করে দেখা দরকার।

অনেকের আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী হ'ল অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের ন্যূনতম উৎপাদনের মান অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়ার ফলে কৃষি বিপ্লব সফল হবার সম্ভাবনা অনেক বেশী। কিন্তু তাইওয়ান বা সমকৃতিত্বের অধিকারী অন্য সব দেশে গত দুই দশকে যে প্রভূত উন্নতি হয়েছে সেই সব দেশে ন্যূনতম উৎপাদনের মাত্রা ভারতের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। সুতরাং সেই সব দেশের ন্যূনতম মাত্রা ভারতের ন্যূনতম মাত্রার চেয়ে বেশী হওয়া সত্ত্বেও যদি সেখানে উৎপাদন বৃদ্ধির গতি একটা নির্ধারিত মাত্রায় এগিয়ে থাকে তাহলে ভারতের ন্যূনতম উৎপাদন মাত্রা আশাতীতের পর্যায়ে পৌঁছবে এমন আশা

নিরর্থক। অতএব পরিকল্পনার প্রণেতাগণ এবং প্রশাসন বিভাগ—উভয় ক্ষেত্রেই যাঁরা অযথা উচ্চ আশা পোষণ করেন তাঁদের বিষয়টি দ্বিতীয়বার চিন্তা করে দেখা উচিত।

এর পরিপ্রেক্ষিতে বহু বিঘোষিত উৎসাহবর্ধক মূল্য প্রদান নীতির গুণাগুণ বিচার করে দেখা যাক। কৃষিজ পণ্যের মূল্য বাড়ালে উৎপাদন খানিকটা বাড়বে সন্দেহ নেই, ফলে সঞ্চয়ের পরিমাণ এবং কৃষিক্ষেত্রে অর্থবিনিয়োগের পরিমাণ স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই মূলত: কৃষি প্রধান একটা দেশে এই ধরণের প্রতিক্রিয়া হবে সীমিত। তা ছাড়া খাদ্যদ্রব্যের উচ্চ মূল্য, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক বা ছোট ছোট চাষীদের আয়ের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, কারণ নিজের ক্ষেতের ফসল না থাকায় এঁদের খাদ্যশস্য কিনে খেতে হয়। সেইজন্য ভারতের মত দেশে কৃষির বিকাশ এবং কৃষি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করতে হলে কৃষি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি না করে কারিগরী উন্নতির সুযোগ নিয়ে অযথা ব্যয় এড়িয়ে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত।

দ্বিতীয়ত: এ কথা স্বীকার করা কঠিন যে ভূমি স্বত্ব ব্যবস্থার ওপর কৃষির বিকাশ সামান্যমাত্র নির্ভরশীল। কৃষি ক্ষেত্রে অনগ্রসর দেশে সার প্রভৃতির ব্যবহার বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুত:পক্ষে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা সংস্কারের মাধ্যমে তাইওয়ান ও দক্ষিণ কোরিয়া যে অগ্রগতি করেছে তা অভূতপূর্ব বলা চলে। আর এই ভূমিস্বত্ব সংস্কারের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি প্রকৃত চাষীর হাতে আসা, প্রজাস্বত্ব অধিকার সংরক্ষণ খাজনার হার কমানো এবং ভূমি একীকরণ প্রভৃতি সব কটি ব্যবস্থাই গুরুত্বপূর্ণ।

অবশেষে আরও একটা কথা বলার আছে। বিনিয়োগ যোগ্য সম্পদের অভাবে কৃষি ক্ষেত্রে অগ্রগতি হচ্ছে না, এ কথা ঠিক নয়। কারণ বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে খামারে উৎপাদন বৃদ্ধির মাত্রার আনুপাতিক হিসেব মেলে না। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে কৃষিক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি না হওয়ার জন্য টাকার অভাব কোনোও কারণ নয়। উপযুক্ত সময়ে একটা সবল সিদ্ধান্ত না নেওয়ার জন্য এবং প্রশাসন ব্যবস্থার দুর্বলতা এর জন্য দায়ী।

সর্বশেষে, বলাই বাহুল্য যে, আত্মতুষ্টির অবকাশ আমাদের আদৌ নেই। কিন্তু তারই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, অতীতের ব্যর্থতা সত্ত্বেও কৃষিগত অর্থনীতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংশয়পোষণেরও কোনো কারণ নেই। কারণ অতীতে যে সব ক্ষেত্রে আমরা এগোতে পারিনি, সেই সব ব্যর্থতা আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা আরও ত্রুটিহীন করতে পারবে। এমন কি, কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা যে আসন্ন এ কথা জোর করে বলাও অসঙ্গত নয়। অর্থাৎ বছরের উৎপাদনের হার শতকরা ৫ ভাগ পর্যন্ত বাড়ানো কার্যত: অসম্ভব নয়, বরং এই হারকে ন্যূনতম মাত্রা গণ্য করে নিষ্ঠাভরে এই লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য কাজ করা উচিত। কারণ এ ছাড়া আমাদের কোনোও গত্যন্তর নেই।

চারটি পরিকল্পনার কর্মসূচীর ছক

সুনির্দিষ্ট সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্যবিন্দুতে উপনীত হওয়ার জন্য সহায় সম্পদের সর্বাধিক সদ্ব্যবহারই হ'ল অর্থনৈতিক পরিকল্পনার আর একটি নাম। ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সূচনা হয় ১৯৫১ সালে; লক্ষ্য ছিল দেশের জনসাধারণের জীবনধারণের মান উন্নত করা।

প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল (১৯৫১-৫৬)

(ক) মুদ্রাস্ফীতির প্রতিক্রিয়া হ্রাস ও খাদ্যাভাব দূর করা।

(খ) উৎপাদনবৃদ্ধির মাধ্যমে সাধারণের জীবনধারণের মান উন্নীত করা।

(গ) কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র বিস্তার করা।

(ঘ) আয় ও সম্পদের ব্যবধান হ্রাস করা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার সুসম বন্টনে প্রয়াসী হওয়া।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল (১৯৫৬-৬১)

(ক) জাতীয় অর্থনীতির দ্রুত বিকাশসাধন।

(খ) মূল ও ভারী শিল্পের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে শিল্পায়ণের গতি বৃদ্ধি করা।

তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল (১৯৬১-৬৬)

(ক) জাতীয় আয়ের মাত্রা বছরে ৫ শতাংশের বেশী পর্য্যন্ত বাড়ানো। (পরবর্ত্তী পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণকালে উন্নতির এই মাত্রা বজায় রাখার জন্য লগ্নীর রীতিপদ্ধতিগুলি পূর্ব্বাহ্নেই স্থির করা হয়ে গিয়েছে)।

(খ) খাদ্যে স্বয়ম্ভর হওয়া ও কৃষি উৎপাদনবৃদ্ধি করা।

(গ) মৌল শিল্পগুলি সম্প্রসারিত করা এবং মেসিন-তৈরীর ক্ষমতা অর্জন করা।

(ঘ) কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা যথাসাধ্য বৃদ্ধি করা।

(ঙ) সমান সুযোগ-সুবিধা লাভের ক্ষেত্র প্রসারিত করা এবং আয়ের বৈষম্য হ্রাস করা।

চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য:

(ক) অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি অব্যাহতি রাখা।

(খ) অধিকতর আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন।

(গ) অনিশ্চয়তার সমস্ত সম্ভাব্য পথ রুদ্ধ করা।

(ঘ) সমাজের দুর্ব্বলতর শ্রেণীর প্রতি ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ব করার প্রবণতা রুদ্ধ করা।

(ঙ) কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পোন্নয়ন

প্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ দ্রুতগতিতে শিল্পায়ণের পথে এগিয়ে চলেছে। সমগ্র দেশে পশ্চিমবঙ্গেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ ক'রে দ্রুতগতিতে শিল্পোন্নয়নের চেষ্টা করা হচ্ছে।

ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের প্রথম ঢেউ যেদিন থেকে সমুদ্র পেরিয়ে গঙ্গার তটে এসে লাগলো সেদিন থেকেই পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অর্থনৈতিক মানচিত্রে একটা প্রধান স্থান অধিকার করে রয়েছে। লোহা ও কয়লা অঞ্চলগুলি কাছাকাছি থাকায়, রেলপথে যাতায়াতের সুবিধে বেড়ে যাওয়ায়, কলিকাতা বন্দরের সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরভাগের সঙ্গে ব্যাপক যোগাযোগ থাকায় বাংলাদেশ, বর্ত্তমানের পশ্চিমবঙ্গ, ভারতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান শিল্পসমৃদ্ধ রাজ্যে পরিণত হয়েছে। তবে এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হ'ল, পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়ন, কলিকাতা-হাওড়ার চতুর্দ্দিকে, আসানসোল, রাণীগঞ্জ, দুর্গাপুরের কয়লাখনি অঞ্চলে এবং উত্তরবঙ্গে চা-বাগান অঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত হয়।

এই রাজ্যের প্রধান শিল্পগুলি হল: পাট, তুলা, বস্ত্র, চা, লোহা-ইস্পাত, কয়লা, রাসায়নিক পদার্থ মোটরগাড়ী এবং ইঞ্জিনীয়ারিং। পশ্চিমবঙ্গ, সমগ্র দেশের জন্য শতকরা ৪০ ভাগেরও বেশী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে এবং কলিকাতা বন্দর থেকে, ভারতের মোট রপ্তানীর শতকরা ৪০ ভাগ চালান দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রধানত: চা, পাট এবং ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রী রপ্তানী করা হয়।

পাটজাত জিনিস রপ্তানী ক'রে ভারত ১৯৬৮ সালে ২১২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে এবং এর প্রায় সম্পূর্ণটাই পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত হয়। এই রাজ্যে প্রায় ১০০টি পাটকল আছে এবং এগুলি থেকে বছরে ১০ লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশী পাটজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয়।

এ ছাড়া আমাদের দেশ থেকে যে পরিমাণ চা রপ্তানী করা হয় তার শতকরা ৩০ ভাগ পশ্চিমবঙ্গ থেকে যায়। এখানকার ২৯৭টি চা বাগান ৮৩৬১৫৪৯ হেক্টার জমিতে চায়ের চাষ করে। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর প্রায় ৯ কোটি ৫০ লক্ষ কি: গ্রাম চা উৎপাদিত হয়—দার্জিলিং চা তার চমৎকার সুগন্ধের জন্য সমগ্র বিশ্বে বিখ্যাত।

এই রাজ্যে যে সব ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রী তৈরী হয় সেগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটি হ'ল রেলের ওয়াগন, বস্ত্রশিল্পের যন্ত্রপাতি, পাটশিল্পের যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ী, চা-শিল্পের যন্ত্রপাতি, বাই-সাইকেল, ব্লেড, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম, ইস্পাত, এ্যালুমিনিয়াম ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি।

এই রাজ্যের প্রধান খনিজ পদার্থ হল কয়লা এবং এই কয়লা রাজ্যের শিল্পোন্নয়নে প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। ১০৮৮ বর্গ কিলোমীটার ব্যাপি রাণীগঞ্জ-আসানসোল কয়লাখনি অঞ্চল থেকে প্রতি বছর ২ কোটি টন কয়লা উৎপাদিত হয়। কি পরিমাণ কয়লা উৎপাদিত হবে তার ওপরে ভিত্তি করেই রাজ্যের নতুন শিল্পনীতি স্থির করা হয়।

স্বাধীনতা লাভ করার ফলে বাংলাদেশ ভাগ হয়ে যাওয়ায়, প্রথম দিকে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক ব্যবস্থায় যে ভীষণ একটা ধাক্কা লাগে তাতে সন্দেহ নেই এবং শিল্পক্ষেত্রেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কিন্তু পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে শিল্পোন্নয়নের যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তাতে রাজ্যের শিল্প কর্মপ্রচেষ্টা আস্তে আস্তে উন্নত হতে থাকে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির সময়ে রাজ্যে সরকারী ও বেসরকারী তরফে নানা ধরণের ছোট বড় শিল্প গড়ে ওঠে। তবে উল্লেখযোগ্য যে পরিবর্ত্তন হয়েছে তা হ'ল, মৌলিক ও ভারি শিল্পগুলির ওপর গুরুত্ব দিয়ে শিল্পায়নে বৈচিত্র্য আনা হয়েছে।

স্বাধীনোত্তর যুগে দুর্গাপুর-আসানসোল এলাকাতেই প্রধানত: শিল্পগুলি কেন্দ্রীভূত হয়। সরকারী তরফে পশ্চিমবঙ্গে বড় আকারে প্রথম যে দুটি শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়—তা হল, চিত্তরঞ্জনের রেলইঞ্জিন তৈরির কারখানা আর রূপনারায়ণপুরের হিন্দুস্থান কেবল্‌স কারখানা।

দুর্গাপুর শিল্পকেন্দ্র

বর্ধমান জেলার জঙ্গলে ঘেরা অর্দ্ধসুপ্ত দুর্গাপুর গ্রামটির, একটি প্রধান শিল্পসহরে বা ভারতের "রূরে" পরিণতি, গত কুড়ি বছরে এই রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের কাহিনী বিবৃত করে। ১৯৫৫ সালে ডি. ভি. সি. যখন জলসেচের জন্য দামোদরে বাঁধ তৈরি করে তখন থেকেই এই অভূতপূর্ব পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়। পশ্চিমবঙ্গের তখনকার মুখ্যমন্ত্রী ডা: বিধান চন্দ্র রায়, দামোদরের বাঁধের ধারে রাণীগঞ্জ এলাকার বিপুল কয়লা সম্পদের কাছে শিল্পকেন্দ্র গঠন করার যে স্বপ্ন দেখতেন, তাঁরই চেষ্টায় সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোক ওভেন কারখানা এবং তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পকে, শিল্পোন্নয়নের ভবিষ্যত ভিত্তির প্রথম নগ্নি

বলা যেতে পারে। তারপর যখন সরকারী তরফের একটি ইস্পাত কারখানা এখানে স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তখনই দুর্গাপুর ভারতের শিল্প মানচিত্রে স্থান পেয়ে গেল। ডি. ভি. সি. দুর্গাপুরে আর একটি তাপ বিদ্যুৎ কারখানা স্থাপন করলেন। এই এলাকায় জল ও বিদ্যুৎশক্তি সহজলভ্য হওয়ায় সরকারী ও বেসরকারী তরফে অনেক বড় বড় শিল্প স্থাপিত হয়।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হওয়ার পর আরও দুটি ভারি শিল্প অর্থাৎ একটি হ'ল প্রেসার ভেসেল, বয়লার ও সিমেন্ট কারখানার যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানা এবং অন্যটি খনির কাজ সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানা স্থাপিত হয়। পরে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার অন্যান্য যে সব বড় শিল্প সংস্থা স্থাপন করেন সেগুলি হ'ল—মিশ্রিত ইস্পাত কারখানা, চশমার কাঁচ তৈরির কারখানা, দুর্গাপুর রাসায়নিক কারখানা। আর একটি বড় শিল্প—দুর্গাপুর সার কারখানা স্থাপনের কাজও সমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে।

এই সব বড় বড় শিল্প ছাড়াও, কার্বন ব্ল্যাক মোটরের চাকা, গ্র্যাফাইট ইলেকট্রোড, এনামেলের আবরণ দেওয়া তামার তার, রিফ্র্যাক্টরি ইত্যাদি নানা রকমের জিনিস তৈরী করার জন্য ১২।১৪টির ও বেশী মাঝারি আকারের শিল্প স্থাপিত হয়েছে। হালকা ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রী তৈরি করার জন্যও অনেক ক্ষুদ্রায়তন শিল্প গড়ে উঠেছে।

সমগ্রভাবে এই শিল্পগুলিতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হ'ল প্রায় ৭০০ কোটি টাকা—আর দুর্গাপুরের চতুর্দিকে ছোট একটি জায়গায় সামান্য ১৫।২০ বছরের মধ্যে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে। সমগ্র দেশে অন্য আর কোথাও এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে এতো দ্রুত শিল্পোন্নতি হয়েছে কিনা সন্দেহ।

কলিকাতার শিল্পাঞ্চল থেকে প্রায় ৭৫ মাইল দূরে হলদিয়াতেও আর একটি শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠছে। সম্প্রতি ৫৫ কোটি টাকার হলদিয়া তৈল পরিশোধন প্রকল্প এবং হলদিয়ার পেট্রো-রসায়ন শিল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ক'রে, পেট্রোলিয়াম ও রসায়নের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন এই প্রকল্পকে "বিপুল শিল্পসমষ্টির কেন্দ্রবিন্দু এবং রাজ্যের কৃষি ও শিল্পসহ সমস্ত ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নয়নের অগ্রদূত বলে বর্ণনা করেন"। হলদিয়াতে সার তৈরি করার জন্যও একটি নতুন কারখানা স্থাপনের সম্ভাবনা আছে। হলদিয়ার গভীর সমুদ্রের ডক প্রকল্প, সমৃদ্ধির নতুন নতুন পথ খুলে দেবে।

ফারাক্কা বাঁধের কাজও প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে আসছে। এই বাঁধের কাজ সম্পূর্ণ হ'লে শুধুমাত্র গঙ্গায় জলপ্রবাহের পরিমাণই বাড়বেনা, উত্তরবঙ্গে যাওয়ার পথে বর্ত্তমানে যে সব অসুবিধে আছে তাও দূর হবে। এতে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প বাণিজ্যেরও উন্নতি হবে।

কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গের স্থান, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখানকার প্রায় ৪ লক্ষ সংস্থায় প্রায় ১০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে এবং প্রতি বছর এগুলি থেকে ১৩০ কোটি টাকা মূল্যের জিনিস উৎপাদিত হচ্ছে। এগুলির মধ্যে প্রধান কুটির শিল্প হল—হাতের তাঁত এবং বৃহত্তর কলিকাতায় কেন্দ্রীভূত ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থাগুলি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উন্নতি সাধনের জন্য রাজ্য সরকার বারুইপুর, কল্যাণী, শক্তিগড়, হাওড়া এবং শিলিগুড়ীতে শিল্পাঞ্চল স্থাপন করেছেন। মানিকতলায় আর একটি শিল্পাঞ্চল গঠনের কাজও শিগ্‌গীরই সম্পূর্ণ হবে। হাতের তাঁত শিল্প, লাক্ষার জিনিস তৈরির শিল্প, ছোবড়াশিল্প ইত্যাদি অন্যান্য পল্লীশিল্পগুলির উন্নয়ন সম্পর্কে রাজ্য সরকার কর্মসূচী তৈরি করেছেন।

রাজ্যে শিল্প সমৃদ্ধির এই রকম উজ্জ্বল পটভূমি সত্বেও শিল্পগুলি নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তবে সেই সমস্যাগুলি প্রধানতঃ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক নয়। গত তিন বছরের মন্দার ফলে রাজ্যের ইঞ্জিনীয়ারিং ভিত্তিক শিল্পগুলি অত্যন্ত সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। শিল্পগুলির উৎপাদন ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার না করা সত্বেও উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে অসমতা বেড়ে যেতে থাকায়, মজুদ জিনিসের পরিমাণ বেড়ে যেতে থাকে। উৎপাদন ক্ষমতা, উৎপাদন ও বাজারের চাহিদার মধ্যে এই ক্রমবর্দ্ধমান অসমতা শিল্পগুলিতে একটা সঙ্কটের সৃষ্টি করে। মন্দার প্রতিক্রিয়া যদিও আস্তে আস্তে কমছে, তা সত্বেও বিশেষ করে দেশী ও বিদেশী কাঁচা মালের সরবরাহ না থাকায় ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থাগুলির অসুবিধে এখনও দূর হয়নি।

রাজ্যের ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পগুলির আর একটা অন্তরায় হ'ল, এগুলি বহুকাল পূর্বে স্থাপিত হওয়ায় এগুলির যন্ত্রপাতি অত্যন্ত পুরাণো হয়ে গেছে এবং এখনকার যুগে সেগুলি প্রায় অচল। অন্যান্য জায়গায় স্থাপিত ক্ষুদ্রায়তন আধুনিক সংস্থাগুলির সঙ্গে এগুলি প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছেনা। এগুলির অবস্থা ভালো ক'রে তুলতে হলে, এই ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পগুলির যন্ত্রপাতির আধুনিকিকরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

রাজ্যসরকার অবশ্য এই পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন এবং রাজ্যের শিল্পগুলির সমস্যা সমাধান করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করছেন। কেউ কেউ মনে করেন যে, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন হওয়ায় শ্রমিক অসন্তোষের জন্য পশ্চিমবঙ্গের শিল্পগুলিতে উৎপাদন কমে গেছে। কিন্তু এ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার্সের প্রেসিডেন্ট শ্রী জে. এম. পারসন্‌স এই ধারণা ভুল বলে ব্যক্ত করেছেন। সম্প্রতি দিল্লীতে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন যে, কতকগুলি শিল্পের উন্নয়ন প্রতিরুদ্ধ হওয়ার মূলে রয়েছে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কারণ, রাজনৈতিক কারণ নয়। তথাকথিত রাজনৈতিক গোলমাল সত্বেও রাজ্যের কতকগুলি শিল্প ক্রমোন্নতি করে যাচ্ছে।

চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষি

গায়ত্রী মুখোপাধ্যায়

কৃষি হ'ল ভারতের সুপ্রাচীন শিল্প এবং জাতীয় আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ এই কৃষি থেকে আসে। কাজেই প্রথম ও তৃতীয় পরিকল্পনায় যে কৃষির ওপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল তাতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। কৃষির উন্নয়নের জন্য চিরাচরিত পদ্ধতি এবং সার ইত্যাদির ওপরেই জোর দেওয়া হয় ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ে। ১৯৫০-৫১ সালে যেখানে ৬৯০.২২ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয় ১৯৫৫-৫৬ সালে সেই পরিমাণ দাঁড়ায় ৮২০.০২ লক্ষ টন।

১৯৫১-৫২ সাল থেকে ১৯৬৫-৬৬ সাল পর্য্যন্ত কৃষি উৎপাদন মোটামুটি বাড়ে শতকরা ৩৭.৮ ভাগ। এর মধ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ে শতকরা ২৪.১ ভাগ। এই ১৫ বছরে কৃষির ক্ষেত্রে মোট বার্ষিক উন্নয়নের হার হ'ল শতকরা ৩.৫ এবং খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নয়নের হার হ'ল শতকরা ২.৬ ভাগ। এদিকে অবশ্য খুব চমকপ্রদ অগ্রগতি বলা যায়না, তবুও এই উন্নয়ন ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যা ও কৃষি উৎপাদনের মধ্যে মোটামুটি একটা ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে কৃষি উৎপাদনের গতি বজায় না থাকায় খাদ্যশস্যের দাম বাড়তে থাকে, ফাঁপা বাজারের সৃষ্টি হয় এবং জনসাধারণের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করতে গিয়ে আমদানি ও বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। কাজেই অন্ততঃপক্ষে খাদ্যশস্যের দিক থেকে তৃতীয় পরিকল্পনা, একটা হতাশার ভাব সৃষ্টি করে সম্পূর্ণ হয়।

এই রকম একটা হতাশার পরিবেশের মধ্যে ১৯৬৬ সালে বেশী ফলনের শস্যের কর্মসূচী গৃহীত হয়। তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনার পর এখন অবস্থাটা আবার অন্য রকম। বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ এখন আবিষ্কার করেছেন যে ভারতের মাটি তাঁরা যতটা অনুর্ব্বর ভেবেছিলেন ততটা নয় এবং ভারতের কৃষকদের যতটা ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল বা পরিবর্ত্তনবিমুখ ভেবেছিলেন তাঁরা তা নন। যে কৃষকরা ১৯৬৪ সালে শস্যের বীজ কেনায় এতটুকু উৎসাহ দেখাননি তাঁরা এখন বেশী ফলনের বীজ কেনার জন্য বেশী দাম দিতেও রাজী আছেন। শস্যের ফলন বেশী হয় বলে এবং খাদ্যশস্যের চাষ থেকে যথেষ্ট আয় করা যায় বলে কৃষকরা একেবারে এক নতুন ধরণের কৃষি পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত হন। শিল্পে যদি শতকরা ১০ বা ২০ ভাগ উৎপাদন বাড়তো তাহলে শিল্পের পক্ষে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও কৃষকরা তাতে উৎসাহিত হতেন না। কাজেই নতুন ধরণের বীজ উৎপাদন করার সময় আশা করা হচ্ছিল যে পূর্বের বীজের তুলনায় শতকরা ১০০ ভাগের বেশী ফলনের বীজ উৎপাদন করতে পারলে কৃষকদের মধ্যে বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি করা যাবে এবং কৃষি পদ্ধতিতে বিরাট একটা পরিবর্ত্তন আনা যাবে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও তামিলনাড়ুতে তাই ঘটেছে। একই জমিতে কয়েকটি ফসল উৎপাদন, সেচের জল সম্পর্কে নিশ্চয়তা ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে এখন নতুন কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচী তৈরি করা হয়েছে।

চতুর্থ পরিকল্পনার সম্ভাবনা

পরিবর্ত্তনের জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি তৈরি করার পর, আমরা যেটুকু সাফল্য লাভ করেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এখন দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে। চতুর্থ পরিকল্পনায় গবেষণার জন্য একটা দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন, প্রশিক্ষণ, সার ইত্যাদি উৎপাদন এবং সরবরাহের ওপর বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। সেচবিহীন ভূমি থেকেও যাতে যথেষ্ট শস্য উৎপাদন করা যায় সেজন্য নতুন কৃষি পদ্ধতি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। অর্থাৎ সেচযুক্ত জমির কৃষক এবং সেচবিহীন জমির কৃষকের মধ্যে আয়ের পার্থক্যটা কমিয়ে আনা উচিত। "নিবিড় কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচীর" পরিবর্ত্তে যদি "সংহত কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচী" গ্রহণ করা যায় তাহলেই শুধু এতে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। এতে কৃষক, তার পশুসম্পদ, শস্য সব কিছু একটা নতুন ভারসাম্যে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারবে। সরকার যে সব যন্ত্রসজ্জিত কৃষি আবাদ গঠন করছেন সেগুলিতে সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। যে সম্প্রসারণ কর্মী নিজে প্রতি হেক্টারে ২ টন গম উৎপাদন করেননি তিনি, কৃষককে কি করে শেখাবেন যে প্রতি হেক্টারে ২ টন গম উৎপাদন করা যায়।

সেচ, জলনিকাশ এবং শস্যোৎপাদন এগুলির উন্নয়ন পৃথক পৃথকভাবে করা সম্ভব নয়। তাছাড়া নানা ধরণের আধুনিক কারিগরী সাহায্যের মধ্যেও একটা সমতা আনা প্রয়োজন যাতে একের অভাবে অন্যটার কাজ বন্ধ না থাকে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৬৯ সালে দেখা গেল যে খারিফ মরসুমে সারের চাহিদা বাড়লেও বছরের শেষের দিকে এই চাহিদা অনুমানের চাইতেও কমে গেল। প্রধানতঃ তামিলনাড়ুতে এবং কিছুটা মহীশূরে এই চাহিদা কমে যায়। আসামে একমাত্র চা বাগানগুলি ছাড়া অন্যত্র সারের কোন চাহিদাই ছিলনা, পশ্চিমবঙ্গে চাহিদার পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ কমে যায়। পরিকল্পনা কমিশন স্থির করেছেন যে, ১৯৭৩-৭৪ সাল পর্য্যন্ত ১২ কোটি ৯০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে তা বজায় রেখে চতুর্থ পরিকল্পনায় সারের চাহিদার লক্ষ্য শতকরা ১৭ ভাগ হ্রাস করা হবে। কেউ কেউ মনে করেন যে সার শিল্পের উন্নয়ন এবং বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে সরকারের স্থির সিদ্ধান্তের অভাবেই এগুলি ঘটছে।

আমাদের দেশের জলসম্পদের শতকরা ৪৫ ভাগই ধান চাষের জন্য ব্যয় করা হয় কাজেই এই শস্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। জাপান বা তাইওয়ানে মোটামুটি যে পরিমাণ ধান উৎপাদিত হয় আমরা এখন পর্য্যন্ত তার শতকরা ৩০ ভাগ পর্য্যন্ত পৌঁছুতে পারিনি।

ছোট কৃষক

ভারতের কৃষকদের মধ্যে বেশীর ভাগই হলেন ছোট ছোট জমির মালিক কিন্তু তারা এখন পর্য্যন্ত নিজেদের ভাগ্য ফেরাতে পারেননি। বেশী ফলনের বীজের চাষ এবং কৃষি উৎপাদন বাড়াতে ধনী কৃষকরা বেশী ধনী হয়েছেন, গরীব চাষীরা আরও গরীব হয়েছেন। চতুর্থ পরিকল্পনায় এই সম্পর্কে যে দুটি প্রধান কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তা শুধু সমস্যাটির কিনারা ছুঁয়ে যাবে, সমস্যার কোন সমাধান হবেনা। ছোট কৃষকের উন্নয়ন সংস্থা নামক প্রধান কর্মসূচী অনুযায়ী আগামী ৫ বছরে ৩০টি জেলার সাড়ে দশ লক্ষ কৃষক উপকৃত হতে পারেন।

চতুর্থ পরিকল্পনায় অন্য যে কর্মসূচীটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে পুকুর কাটা নলকূপ বসানো এবং নদী থেকে জল তোলার পাম্প বসানোর জন্য রাজ্যগুলি ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করবে। কিন্তু প্রয়োজনের অনুপাতে এই প্রচেষ্টা এতই ক্ষুদ্র যে দেখে মনে হয় ছোট কৃষকরা সংখ্যায় গরিষ্ঠ নন, বরং অতি সংখ্যালঘু একটি শ্রেণী বিশেষ। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ এই কৃষকদের বহু সমস্যা। এদের জমির পরিমাণ অল্প বলে অতিরিক্ত আয় করতে পারেন না; বেশীর ভাগকে খাজনার জমির ওপর নির্ভর করতে হয়, ছোট জলসেচ প্রকল্প এবং ভূমির উন্নয়নমূলক অন্যান্য প্রকল্পের জন্য ভূমি উন্নয়ন ঋণ সংগ্রহে অধিকারী হতে পারেন না; সমবায় থেকে উচ্চতর ঋণ সীমা লাভজনক উপায়ে ব্যবহার করতে পারেন না; আধুনিক কৃষি পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করতে পারেন না বলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হারও অল্প এবং যদিও কিছুটা আয় বাড়ে তাকে যৎসামান্য বলা যায়। কৃষিকে আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে এই সমস্ত সমস্যা সাধারণ কৃষককে সব সময়েই পেছনে টেনে রাখে।

বিক্রী এবং বাজারজাত করার উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধে না থাকলে, নতুন ধরণের বেশী ফলনের শস্যের চাষ ক'রে কৃষকরা প্রায়ই হতাশ হয়ে পড়েন। অন্ধ্রপ্রদেশ ও কেরালায় যথাক্রমে আই আর-৮ ও তাইচুং নেটিভ-১ ধানের চাষে তা প্রমাণিত হয়েছে। সবুজ বিপ্লবকে যদি সত্যিই সবুজ ও বৈপ্লবিক রাখতে হয় তাহলে গুদামজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও মূল্য এই তিনটির প্রতিই সমান মনোযোগ দিতে হবে।

পরিকল্পনা রূপায়ণ

পরিকল্পনা কি রকমভাবে রূপায়িত করা হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে স্থির করার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রত্যেক বছরেই একটা বিস্তারিত কর্মসূচী তৈরি করতে হয়। এই বার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হবে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্দ্ধারিত নীতি অনুসারে সেই বছরের উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। বিনিয়োগের আকার, গুরুত্ব ও আর্থিক পরিস্থিতি অনুসারে এই বার্ষিক পরিকল্পনা প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করা যেতে পারে। যে সব কাজ করা হয়েছে তার ফল, আর্থিক সম্পদ এবং অন্যান্য যে সম্পদ হাতে রয়েছে সেই অনুসারে সেই বছরের জন্য বিশদ কর্মসূচী তৈরি করা যায়।

প্রত্যেক রাজ্যকে বিভিন্ন স্তরে আর্থিক এবং পরিচালনামূলক নীতি, প্রশাসনীয় সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে হয়। এর জন্য রাজ্যের পরিকল্পনা সম্পর্কিত সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

নিম্ন থেকে পরিকল্পনা

কাজেই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিম্ন থেকে পরিকল্পনা তৈরি করার অর্থ হ'ল এটা বাইরে থেকে বা ওপর থেকে আসে-না। প্রত্যেকটি রাজ্য, জেলা, স্থানীয় অঞ্চল এবং জনসমষ্টি নিজেদের সম্পদ ও সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য যে কর্মসূচী গ্রহণ করে তাই হ'ল পরিকল্পনা। এর অর্থ হল, কর্মপ্রচেষ্টা, উৎসাহ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অংশ গ্রহণকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া। অন্য অর্থে বলা যায় যে, সকলকেই দায়িত্ব বহন করতে হবে।

প্রশাসনিক দক্ষতা

উন্নততর সংগঠন এবং সাধারণ প্রশাসনিক ব্যবস্থার কর্মদক্ষতা, পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য দুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল—(১) সরকারি তরফের সংস্থাগুলি সহ প্রশাসনিক ব্যবস্থায়, উপযুক্ত পদ্ধতিতে কারিগরী বিষয়ে শিক্ষিত কর্মী ও বিশেষজ্ঞদের সংশ্লিষ্ট করা প্রয়োজন এবং (২) তাঁরা যে সব কাজ করছেন সেগুলি সম্পর্কে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলি যাতে তাঁরা উপযুক্তভাবে বিবেচনা করতে পারেন তা দেখা প্রয়োজন।

সরকারি তরফের সংস্থাগুলি সাধারণ যে সব নীতি অনুসরণ করছে সেগুলি জাতীয় লক্ষ্য এবং ঘোষিত নীতির অনুকূল হচ্ছে কিনা তা সুনিশ্চিত করা যেমন সরকারের কর্ত্তব্য তেমনি সংস্থাগুলির পরিচালকগণ যাতে ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে সংস্থাগুলির কাজ চালাতে পারেন সেইজন্য তাদের দৈনন্দিন কাজে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়াও প্রয়োজন। এটা তাদের দক্ষতা এবং লাভজনক উপায়ে কাজ করার ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে যে সব কর্মী বিভিন্ন স্তরে পরিকল্পনা রচনা, রূপায়ণ এবং মূল্যায়ণের কাজ করছেন তাঁদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য, প্রশিক্ষণ কর্মসূচীও উপযুক্তভাবে শক্তিশালী, উন্নত ও সংহত করতে হয়। কর্মীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা এবং বিচারশক্তির উন্নয়নই হল এই রকম প্রশিক্ষণের লক্ষ্য। পরিকল্পনা রচনার বিভিন্ন স্তরে যাঁরা কাজ করছেন কেবলমাত্র তাঁরাই নন, কর্মসূচী ও প্রকল্পগুলি রূপায়ণের কাজে যাঁরা নিযুক্ত রয়েছেন, সমস্ত স্তরের পরিচালক, কারিগরী বিশেষজ্ঞ ও প্রশাসনিক কর্মীদেরও এই প্রশিক্ষণ সূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

মাত্র
5টি পয়সা
করে
আপনার
পরিবার
সীমিত রাখুন

পুরুষের জন্যে, নিরাপদ, সরল ও উন্নতধরণের
রবারের জন্মনিরোধক নিরোধ ব্যবহার করুন।
সারা দেশে হাটে-বাজারে এখন পাওয়া যাচ্ছে।
জন্ম নিয়ন্ত্রণ করুন ও পরিকল্পিত পরিবারের
আনন্দ উপভোগ করুন।

জন্ম প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আপনাদের
হাতের মুঠোয় এসে গেছে।

NIRODH
FOR FAMILY PLANNING
SUBSIDISED PRICE
15 PAISE FOR 3

এখন দেশময়
পাওয়া যাচ্ছে
15 পয়সায় 3টি
সরকারী সাহায্যে হ্রাস মূল্যে

নিরোধ
ব্যবহার করুন

পরিবার পরিকল্পনার জন্য
পুরুষের ব্যবহার উপযোগী
উন্নত ধরণের রবারের জন্মনিরোধক
মুদীর দোকান, ওষুধের দোকান, সাধারণ বিপণী,
সিগারেটের দোকান— সর্বত্র কিনতে পাওয়া যায়।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমশিল্প

অনিল কুমার মুখোপাধ্যায়

শিল্প স্থাপনের জন্য কাঁচামাল এবং অন্যান্য আরও যে সব উপকরণের প্রয়োজন, পশ্চিমবঙ্গে এবং তার নিকটবর্তী এলাকায় এ সবের কোন অভাব নেই। শ্রমশিল্প-বিকাশের বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি বিশেষ তথ্য জানা দরকার। পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৮৮.৫২ লক্ষ হেক্টার (কলকাতার আয়তন ১০ হেক্টর) এবং এর ১৫টি জেলার মধ্যে, আয়তনে ২৪ পরগণা বৃহত্তম এবং হাওড়া ক্ষুদ্রতম। ১৯৬১ সালের আদম সুমারীতে রাজ্যের লোক সংখ্যা ছিল ৩৪৯.৩ লক্ষ, যার মধ্যে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা যথাক্রমে ১৮৫.৯৯ এবং ১৬৩.২৭ লক্ষ। অনুমান করা হয় যে, এই জনসংখ্যা বেড়ে ১৯৭১,৭৬ এবং ১৯৮১ সালে যথাক্রমে ৪৫৮.০১, ৫২২.৫১ এবং ৫৮৩.২৪ লক্ষ হবে। এর মধ্যে শ্রমজীবীর সংখ্যা ১৯৬১ সালের ১১৯.৫৭ লক্ষ থেকে বেড়ে ১৯৭৪ সালে ১৫১.৬১ লক্ষে দাঁড়াবে। নীচে ১৯৫১-৫২ সালের মূল্যমানের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ এবং সারা ভারতের আয়ের তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হল।

বছর	পশ্চিমবঙ্গের আয় কোটি টাকায়	পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু আয়	সারা ভারতে মাথাপিছু আয়
১৯৫১-৫২	৭৩১	২৮৯	২৭৪
১৯৫৫-৫৬	৮৪৪	২৯৬	২৯৪
১৯৬০-৬১	১১০৭	৩২১	৩২১
১৯৬৫-৬৬	১২৮৭	৩৩২	—

পশ্চিমবঙ্গ এবং সারা ভারতে মাথাপিছু আয় প্রায় সমান সমানই বেড়েছে। আয় বৃদ্ধির মাত্রা, জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে, অর্থনৈতিক জীবনে খুব একটা ছাপ ফেলতে পারে নি। শিল্পের একটি বিশেষ উপকরণ হচ্ছে বিদ্যুৎশক্তি। পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৯৫১ সালে ৫৪৬ মেগাওয়াট থেকে বেড়ে ১৯৬৮ সালে ১১২৩ মেগাওয়াট হয়েছে। এর মধ্যে দুটি (ময়ূরাক্ষী এবং জলঢাকা) জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের মোট উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে মাত্র ২২ মেগাওয়াট। অবশ্য উপরের হিসাবে ডি. ভি. সি এবং বেসরকারী ছোট ছোট বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পগুলি ধরা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন পরিকল্পনাকালে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা মাত্র ১২১ ভাগ এবং বিভিন্ন রাজ্যগুলির তুলনায় এটা প্রায় সর্বনিম্ন। সেই ক্ষেত্রে রাজ্যে মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের হার কিন্তু খুবই বেশী।

শ্রমশিল্প পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় প্রাক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালেই অনেক এগিয়ে ছিল, বিশেষ করে চটকল, লোহা এবং ইঞ্জিনীয়ারিং, চা বাগান, জাহাজী কারবার বনস্পতি, ধানকল ইত্যাদিতে। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে পশ্চিমবঙ্গে শ্রমশিল্পের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি যথেষ্ট অর্থ বিনিয়োগ করে। প্রত্যেকটি শ্রমশিল্পে লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি হয়। এর আভাস পাওয়া যাবে নীচে দেওয়া তথ্য থেকে।

পশ্চিমবঙ্গ

কোটি টাকায়

	১৯৫৯	১৯৬৩	১৯৬৫
উৎপাদনমলক মূলধন	৩৭৭	৮৭১	১২১৯
উৎপাদনের দ্বারা বর্ধিত আয়ের মাত্রা	১৮৮	২৯৬	৩৬৫

সারাভারত

কোটি টাকায়

	১৯৫৯	১৯৬২	১৯৬৫
উৎপাদনমূলক মূলধন	১৭৩৭	৪০৭৫	৬৩০০
	৮১৩	১২৯৬	১৬৮৭

রাজ্যে লোহা এবং ইস্পাত, ইঞ্জিনীয়ারিং, পরিবহন ইত্যাদির মত শিল্পে উৎপাদনের তুলনায় মূলধনের পরিমাণ অনেক বেশী দাঁড়িয়েছে। ফলে শ্রমশিল্প থেকে রাজ্যের মোট আয় তুলনামূলকভাবে অন্যান্য অনেক রাজ্য থেকে কম। অবশ্য এই সব শ্রমশিল্পগুলির উৎপাদন ক্ষমতা যদি পুরোপুরি কার্যকর হ'ত তাহলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা অন্য রকম হ'ত।

তবে আনন্দের কথা যে রাজ্যে আজ বহু শ্রমশিল্প গড়ে উঠেছে এবং এরজন্য আর আমাদের পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। অবশ্য নানাবিধ কারণে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানই সেগুলির বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারছে না।

তবে দুঃখের বিষয় যে, পশ্চিমবঙ্গে কুটির শিল্পের প্রগতি সে রকম হতে পারেনি। এর কারণ হয়তো বা বিক্রয় কেন্দ্রের অভাব এবং পুরোনো কর্মপদ্ধতি। অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলিতে এখনও বিদ্যুৎশক্তি পৌঁছয়নি। কুটির শিল্পের বিকাশের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে কারণ কুটির শিল্পের প্রগতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে গ্রামীণ অর্থনৈতিক পরিবর্তন।

রাজ্যে কেন্দ্রীয় উদ্যোগে যে শিল্পগুলি স্থাপন করা হয়েছে সেগুলির তালিকা নীচে দেওয়া হ'ল :

এ ছাড়া হলদিয়াতে কেন্দ্রীয় ব্যয়ে বর্তমানে একটি বিরাট শিল্প সমষ্টি (কমপ্লেক্স) গড়ে উঠছে যেখানে পেট্রোলিয়ম শোধনাগার এবং কৃষি সার কারখানা তৈরি হবে।

রাজ্যসরকার তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে শ্রমশিল্পের সম্প্রসারণে মোট ২৭২৮.৯৬ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আশা করা হচ্ছে রাজ্যসরকার এর জন্য আরও প্রায় ১৯৭০ লক্ষ টাকা খরচ করবেন।

কেন্দ্রীয় খাতে, পশ্চিমবঙ্গের শ্রমশিল্পের জন্য চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে যে ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে তা হ'ল নিম্নরূপ :

	লক্ষ টাকায়
দুর্গাপুর সম্প্রসারণ	৪২১
দুর্গাপুর মিশ্র ধাতুর কারখানা	২১১
দুর্গাপুর মাইনিং এণ্ড এলায়েড মেশিনারী	২৪৯
হিন্দুস্থান কেবলস্-রূপনারায়ণপুর	৬০৩.২৫
ন্যাশনাল ইনস্ট্রুমেন্টস-যাদবপুর	৫৫
দুর্গাপুর কৃষি সার কারখানা	২২৩২
দুর্গাপুর অপথ্যালমিক গ্লাস	৪৫.৩৮
পেট্রোলিয়ম শোধনাগার-হলদিয়া	৫৫০০
মোট	৯৩১৮.৬৩

রাজ্যে কেন্দ্রীয় উদ্যোগে স্থাপিত শিল্প

(ব্যয়-কোটি টাকায়)

	স্থান	প্রথম পরিকল্পনা	দ্বিতীয় পরিকল্পনা	তৃতীয় পরিকল্পনা	১৯৬৬-৬৮ (আনুমানিক)	মোট ১৯৫১-৬৮
লৌহ এবং ইস্পাত	দুর্গাপুর		১৭৮.৭	১৮.০	১.৯	১৯৮.৬
লৌহ সম্প্রসারণ	দুর্গাপুর			৫০.০	১৯.৭	৬৯.৭
ন্যাশনাল ইনস্ট্রুমেন্ট অপথ্যালমিক গ্লাস	যাদবপুর দুর্গাপুর	১.০	০.৪	১.৮	২.৭	৫.৯
লোকোমোটিভ	চিত্তরঞ্জন	৩.৬	১.৮	+		৫.৪
হিন্দুস্থান কেবল্স	রূপনারায়ণপুর	১.৩	০.৮	৩.৩	১.৯	৭.৩
মাইনিং এণ্ড এলায়েড মেশিনারী প্রোজেক্ট	দুর্গাপুর		১.২	২৮.০	১৫.৪	৪৫.০
অ্যালয় স্টীল	দুর্গাপুর			৩৩.৩	৩৩.৩	৬৬.৬
কৃষি সার	দুর্গাপুর			০.৬		৯.৭
	মোট	৫.৯	১৮২.৯	১৩৫.০	৮৪.৪	৪০৮.২

+ পরিবহন খাতে যা দেখানো হয়েছে

ভারতে পরিকল্পিত উন্নয়নের প্রতিচ্ছবি

পরিকল্পনার পথ গ্রহণ করার ফলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেসব রূপান্তর ঘটেছে, অঙ্কের হিসেব থেকেই কেবল তার আভাষ পাওয়া যায়, তা' নয়। পরিকল্পনার নির্দ্ধারিত মেয়াদের কোনোও স্তরে সাফল্যের মাত্রা যদি লক্ষ্য থেকে দূরে থেকে থাকে তা'র মূলে রয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়, উন্নয়নের সাময়িক মন্থরগতি ও অন্যান্য কারণ।

কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে রূপান্তর

পরিকল্পনার বছরগুলিতে অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রসার শুধু আয়তনের দিকেই ঘটেনি, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। এই বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কৃষির ক্ষেত্রে। প্রচুর ফলনশীল বীজ ও উন্নত কৃষিপদ্ধতি হাতিয়ার ক'রে আমরা এই প্রথম, উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করতে সফল হয়েছি। আমাদের কৃষকগোষ্ঠী যেরকম উৎসাহের সঙ্গে নতুন নতুন কৃষিপদ্ধতি গ্রহণ করেছেন এবং কৃত্রিম সার ও কীটনাশক প্রভৃতি কৃষির আধুনিক উপকরণ প্রয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তাতে তাঁদের অজ্ঞতা, অনগ্রসরতা ও আধুনিকীকরণে বিমুখতার অপবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। এমন কি কৃষি ব্যবস্থার রূপান্তর অন্যবৃত্তিধারীদেরও কৃষিতে ও কৃষিবৃত্তি গ্রহণে উৎসাহিত করেছে।

সামাজিক 'মূলধন' সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও সংহত করার ব্যাপারে ভারত এখন অনেক অগ্রসর। এই মূলধনের তালিকায় শিক্ষা, পরিবহন, চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি বিষয়গুলি পড়ে। পরিকল্পনার প্রভাবেই দেশে শিল্পোন্নয়নের শক্ত বনিয়াদ তৈরী হয়েছে। পাট, তুলো, চা প্রভৃতি চিরাচরিত পণ্য শস্যের উৎপাদনই যে শুধু বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নয়, কতকগুলি নতুন শিল্প যেমন ইস্পাত, মৌলিক ধাতু, মেশিন টুল, ভারী যন্ত্র তৈরীর সাজসরঞ্জাম, রেলের কোচ; বিদ্যুৎ, ডিজেল ও বাষ্প চালিত রেল ইঞ্জিনের উৎপাদনও ঊর্দ্ধমুখী হয়েছে। ভারী ও হালকা বিদ্যুৎ সরঞ্জাম উৎপাদনে দেশ স্বয়ম্ভর হয়েছে। মৌলিক ও ভারী রাসায়নিক উপাদান, ওষুধ, কৃত্রিম সুতো ও প্লাস্টিক শিল্পে ভারতের অগ্রগতি প্রশংসনীয়।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে দেশ যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে। কেবল তাই নয়, দেশে কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যাও যথেষ্ট বেড়েছে।

বৈদেশিক ঋণপরিশোধের সমস্যা সত্ত্বেও আমদানী ও রপ্তানী পণ্য তালিকার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। অতীতে ভারত যেখানে শুধু কাঁচামাল রপ্তানী করতো, এখন সেখানে, এ দেশ থেকে, নতুন নতুন তৈরী মাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সামগ্রী বিদেশে চালান যাচ্ছে।

		প্রথম পরিকল্পনার শেষে	দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে	তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে	
	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৭-৬৮
১৯৬০-'৬১ সালের মূল্যমানে মাথাপিছু আয়	২৬৯ টাকা	২৯১ টাকা	৩০৯ টাকা	৩১৫ টাকা	৩৩৬ টাকা
খাদ্য (লক্ষ টনে)	৫০৮	৬৬৮	৮২০	৭২০	৯৮০ (১৯৬৮-৬৯)
সেচযুক্ত এলাকা	৫৫৭	৬৩৩	৭৩৭	৮৮৭	৯৮৩

শিল্পোৎপাদনের মাত্রা

	১৯৫১	১৯৫৫	১৯৬৫	১৯৬৭
১৯৬০ সালের ভিত্তিতে সচক মাত্রা—১০০	৫৪.	৭২.৭	১৫৩.৯	১৫০.৭

ধনধান্যে ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ২৯

সামাজিক মূলধন

সাল	সাধারণ শিক্ষা (স্কুলের ছাত্রছাত্রী)	হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা (হাজারে)	পরিবহন
১৯৫০-৫১	২.৩৫ কোটী	১১৩	৬,৬৫ কোটী প্যাসেঞ্জার কি. মী
১৯৬৮-৬৯	৭.৫২	২৫৫.৫৪	১,০৬১

কয়েকটি প্রধান শিল্পক্ষেত্রে অর্থনৈতিক রূপান্তরের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাবে নীচের তালিকায়

সাল	সূতী বস্ত্র	সিমেন্ট	ইস্পাত	মেশিনটুল	টার্বো। জেনারেটর	বিদ্যুৎ	ধাতব ভারী সরঞ্জাম	নাইট্রোজেনযুক্ত সার ব্যবহারের মাত্রা
	কোটি মীটারে	কোটী টনে	কোটি টনে	কোটি টাকায়	কিলোওয়াট	কিলোওয়াট	হাজার টনে	হাজার টনে
১৯৫০-৫১	৪২১.৫	.২৭	.১৫	.৩৪	—	৭৮০ কোটি	—	৫৫
১৯৬৭-৬৮	৭৪০.০	১.১৫	.৬৪	২.৫	১০ হাজার	৪১০০ "	১৫	১৪০০ (১৯৬৮-৬৯)

১৭ বছরের পরিকল্পনার ফলশ্রুতি হিসেবে অর্থনীতির প্রধান ক্ষেত্রগুলিতে কতো সাফল্য অর্জন করা গিয়েছে তার সামগ্রিক ধারণা দেবার জন্যে উল্লেখ করা যায়, যে, ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৬৭-৬৮-র মধ্যে জাতীয় আয় শতকরা ৮০ ভাগ, শস্যোৎপাদনের মাত্রা শতকরা ৭০ ভাগ এবং শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ১৭০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিকল্পনাগুলির জন্য অর্থসংস্থান

(বর্তমান মূল্যমান অনুযায়ী লক্ষ টাকায়)

	প্রথম পরিকল্পনা	দ্বিতীয় পরিকল্পনা	তৃতীয় পরিকল্পনা	বার্ষিক (তিনটি) পরিকল্পনা	চতুর্থ পরিকল্পনা
বর্তমান প্রকল্পগুলি থেকে অবশিষ্ট	৬৩,৯০০	১০৬,৩০০	২২৪,০০০	১১২,৫০০	৫০২,১০০
সরকারী সংস্থাগুলির উদ্বৃত্ত	১১,৫০০	১৬,৭০০	৬৭,০০০	৩৮,৯০০	৯১,৫০০
দেশে সংগৃহীত ঋণ	১০১,৭০০	২৩৯,৩০০	৩৩০,২০০	২৪৬,৬০০	
মোট আভ্যন্তরীন সম্পদ ঘাটতি	১৭৭,১০০	৩৬২,৩০০	৬২১,২০০	৩৯৭,৪০০	২৮৯,২০০
বহির্সাহায্য	১৮,৯০০	১০৪,৯০০	২৪১,৬০০	২৮১,৮০০	২৪২,৩০০
ঘাটতি অর্থসংস্থানের ধার্য্য পরিমাণ	৫৩,২০০	৯৪,৮০০	১১,৩৩০		৮৫,০০০

সজীব চট্টোপাধ্যায়

১৮ পৃষ্ঠার পর

অথচ ৫০০০ টাকার বিনিময়ে ক্ষুদ্রশিল্পে একটি মানুষ তার কর্মসংস্থান করে নিতে পারে। গ্রামীণ শিল্প ও কারু শিল্পে এই বিনিয়োগ আরো কম ১ হাজার থেকে দেড় হাজারের মধ্যে। বৃহৎ শিল্পের প্রসার স্তিমিত নানা কারণে, ক্ষুদ্র শিল্পেও বিভিন্ন সঙ্কট সমস্যাপীড়িত মানুষকে একেবারে এক অন্তহীন প্রাচীরের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

পরিকল্পনায় অর্থ বিনিয়োগের প্রশ্ন মুখ্য হলেও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর গুরুত্বও অস্বীকার করার নয়। পরিকল্পনার সর্বস্তরে সাফল্য সুনিশ্চিত করার জন্য প্রত্যেক শরীকের মূল্যবোধ এবং পরিকল্পনার সার্থকতায় আন্তরিক আস্থা রাখা আজ জরুরী বলে গণ্য করতে হবে। প্রতিটি মানুষকে যদি জায়গা করে দিতে হয় এই সমাজতন্ত্রে, তা হলে কথার জাল কেটে বেরিয়ে আসতে হবে বাস্তবের রৌদ্রোজ্জ্বল জগতে, যেখানে আজ অপ্রাচুর্য অপুষ্টি, অশিক্ষা, কুসংস্কার আর ক্রম বর্ধমান জনসংখ্যার চাপে মানুষের জীবনের সমস্ত মূল্যবোধ শুকিয়ে আসছে। কৃষিতে স্বয়ম্ভর হওয়াই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে আধুনিক কৃষি বিজ্ঞানের আশ্রয় নিতে হবে পুরোপুরি। কর্মহীন মানুষের মুখে যদি সেই কৃষির উৎপাদন তুলে দিতে হয় তাহলে শিল্প, বিশেষত ক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে তার গাঁট ছড়া বাঁধতে হবে। অপুষ্টির হাত থেকে মানুষকে যদি কর্মচঞ্চলতায় প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তাহলে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি যেমন করেই হোক রোধ করতে হবে।

পরিশেষে এই কথাই বলা যেতে পারে ভারতবর্ষ যুগ যুগ ধরে যে বাণী বিশ্বে প্রচার করেছে তা হল—আত্মার ঐশ্বর্যে প্রতিটি মানুষের প্রতিষ্ঠা। অর্থনৈতিক ঐশ্বর্য দৈনন্দিন চাওয়া পাওয়ার স্থূল চাহিদাকে স্পর্শ করে যায় মাত্র এবং দারিদ্র্য থেকে মুক্তির মাধ্যমেই ফিরে আসে মানুষের প্রকৃত মূল্যবোধ। আমাদের পরিকল্পনা সেই দিনই সার্থক হবে যেদিন প্রতিটি মানুষ আরও সচেতন হয়ে উঠবে তার মূল্যবোধ নিয়ে। মানব-সংসারের এই বিরাট পঙ্‌ক্তিভোজে কোন মানুষই যেন নিজেকে অপাঙ্‌ক্তেয় মনে না করেন।

সুব্রত গুপ্ত

১০ পৃষ্ঠার পর

...ভাগ এবং শতকরা ৬০ ভাগ। দ্বিতীয় ...কল্পনায় যদিও ১২০০ কোটি টাকার ...তি অর্থসংস্থানের কর্মসূচী গৃহীত হয়ে-..., নতুন মুদ্রার পরিমাণ শেষ পর্যন্ত ...ড়িয়েছিল ৯৪৮ কোটি টাকা। তৃতীয় ...কল্পনায় যেখানে ঘাটতি অর্থসংস্থানের ...মাণ ধরা হয়েছিল ৫৫০ কোটি টাকা, ...নে প্রকৃত ঘাটতি অর্থসংস্থানের পরি-...হয়েছিল ১১৫০ কোটি টাকা। গত ...বছরের ঘাটতি অর্থসংস্থানের ধারা ...থ বলা চলে চতুর্থ পরিকল্পনায় ঘাটতি ...সংস্থানের পরিমাণ ৮৫০ কোটি টাকায় ...ত থাকবে না। নতুন মুদ্রার পরিমাণ ...ই বাড়বে মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা ততই ...ে যদি না বর্ধিত মুদ্রা, উৎপাদন ...বার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ভাবে ব্যবহৃত ...য়। নতুন মুদ্রার সবটাই যে উৎপাদন ...গে দেবে এমন কোন সুনিশ্চিত ধারণা ...ণ করা সম্ভব নয় বলেই অনেকের ...া। দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় মৃদু ...ফীতি অনেক ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা বেড়ে গেলে ...র অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হয় সেই অবস্থায় দেশের অর্থনৈতিক ...তির হারও ব্যাহত হয়। চতুর্থ ...কল্পনার প্রথম বছরের অভিজ্ঞতা থেকে ...যায় কোন কোন খাদ্য সামগ্রীর দাম কমের দিকে গেলেও অধিকাংশ ভোগ্য ...র দাম এখন উর্ধমুখী। কোন কোন সামগ্রীর দাম কমের দিকে যাবার ...। কারণ হচ্ছে 'সবুজ বিপ্লব' বা কৃষি ...দনের অভাবনীয় বৃদ্ধি। চতুর্থ ...কল্পনাকালে ঘাটতি অর্থসংস্থানের পরি-...যদি শেষ পর্যন্ত ৮৫০ কোটি টাকার বেশী হয় তবে মুদ্রাস্ফীতি হয়ত পর্যন্ত আর 'মৃদু' থাকবে না। যদি ...ফীতি চরমে উঠে তবে অর্থনৈতিক ...র অগ্রগতি হবে বিঘ্নিত, মন্থর। কিন্তু ...দের বর্তমান আর্থিক অবস্থার পরি-...তে বলা চলে যে ঘাটতি অর্থসংস্থানের নির্ভর না করে চতুর্থ পরিকল্পনার ...ক আর্থিক প্রয়োজন মেটানো অসম্ভব। ...তু ঘাটতি অর্থসংস্থানের উপর আমা-...নির্ভর করতেই হবে সেজন্য আমাদের একটি সুনির্দিষ্ট মূল্য অনুসরণ করা উচিত। তা ছাড়া বর্ধিত মুদ্রা যাতে দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধিকারী প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগ করা হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

ভারতকে যদি অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার পথে দ্রুত অগ্রসর হতে হয় তবে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে। জাতীয় আয়ের শতকরা ১২ ভাগ যাতে সঞ্চয় করা সম্ভব হয় সেজন্য সম্ভাব্য সব ব্যবস্থাই গ্রহণ করা উচিত। আমাদের জাতীয় আয়ের প্রায় শতকরা ১৪ ভাগ, কর হিসাবে আদায় করা হয়। অল্প বিত্তদের উপর আরও বোঝা না চাপিয়ে এবং কালো টাকা সঞ্চয়ের প্রবণতা রোধ করার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে জাতীয় আয়ের আরও বেশী অংশ রাজস্ব হিসাবে আদায় করার (অন্ততঃ শতকরা আঠারো ভাগ) চেষ্টা চালানো উচিত। কালো টাকা খুঁজে বের করার ব্যবস্থা যদি খুব কঠোর হয় এবং কর ফাঁকি বন্ধ করার ব্যবস্থা যদি ফলপ্রসূ হয় তবে এই লক্ষ্যে পৌঁছনো অসম্ভব নয়।

ধীরেশ ভট্টাচার্য্য

১৪ পৃষ্ঠার পর

হবে, তারা সমাজে নেতৃত্ব দেবে, এই যেখানে স্বাভাবিক প্রত্যাশা, আমরা সেখানে আগের চেয়েও বেশি পরনির্ভর এক বিপুল আশাহত যুবকশ্রেণী সৃষ্টি ক'রে চলেছি।

পরিকল্পনাকে এই সঙ্কট থেকে মুক্ত করার জন্যে যে সবল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের প্রয়োজন তার প্রধান কর্তব্য হবে পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে দিয়ে সব শ্রেণীর মানুষের মনকে সেই লক্ষ্যের অনুবর্তী করা। এর জন্যে যে বাদানুবাদ, যে ঘাত-প্রতিঘাতই প্রয়োজন হ'ক তা' যত দিন ধরেই চলুক না কেন, পরিকল্পনার প্রতি আস্থা ও অনুরক্তি জাগিয়ে রাখার জন্যে যে-সব সংস্কারের প্রয়োজন তার দিকে প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হবে। পরিকল্পনার আদর্শবাদ ও রূপায়ণের চাবিকাঠি সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে রেখে দিলে কিংবা তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষার দিকে সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখতে অবহেলা করলে সাধারণ মানুষও পরিকল্পনা থেকে শুধু পাওয়ার হিসাব কষতেই শিখবে, পরিকল্পনার সামগ্রিক সার্থকতার দিকে তাঁদের মন ফেরানো আর সম্ভব হবে না।

12 বছর মেয়াদী
জাতীয়
প্রতিরক্ষা
সার্টিফিকেট

100 টাকা 180 টাকাতে এসে দাঁড়ায়। করমুক্ত সুদ। মেয়াদ ফুরোলে, বছরে 6.66% সরল সুদ কিম্বা বছরে 5% চক্রবৃদ্ধি সুদ.

10 বছর মেয়াদী
প্রতিরক্ষা
সঞ্চয়
সার্টিফিকেট

100 টাকায় বছরে 4.5% কর-মুক্ত সুদ পাবেন। মূলধন ঠিকই থাকে। মেয়াদ ফুরোলে 100 টাকায় 5 টাকা অতিরিক্ত সুদ দেওয়া হয়। এম্নিভাবেই, মেয়াদ ফুরোলে বছর সুদের হার দাঁড়ায় 5%

10 বছর মেয়াদী
জাতীয়
সঞ্চয়
সার্টিফিকেট

100 টাকা 180 টাকা হয়। বছরে সরল সুদ 8% ও চক্রবৃদ্ধি সুদ 6.5% খুব কম্ হারে কর দিতে হয়।

নিরাপদে সঞ্চয় করুন

বেশ ভালো লাভ আছে। আর এই লাভ কর-মুক্ত

আরও বেশী জানতে হলে দয়া করে সবচেয়ে কাছের ডাকঘরে খোঁজখবর নিন্

ভারতীয় সঞ্চয় সংস্থা

davp 69/160

পরিকল্পনাগুলিতে প্রতিফলিত দেশের আনন্দ ও বেদনা

।রিকল্পনাগুলির লক্ষ্য ও উন্নয়ন সমস্যা

প্রথম পারকল্পনাটির লক্ষ্য ছিল পরিমিত ; গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল কৃষি এবং ।সেচের ওপরেই বেশী। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অর্থনীতির মূলধনী ভিত্তিকে ঢ়র করাই ছিল লক্ষ্য। তাছাড়া কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধে বাড়ানো এবং ।য়তন ও ভারি শিল্পগুলির উন্নয়নের ওপরেও জোর দেওয়া হয়। তৃতীয় বিকল্পনায় কৃষি ও শিল্প উভয়ের উন্নয়নের ওপরেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। ীয় পরিকল্পনার পর তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল, পূর্ব্ব পরিকল্পনা-লিতে অর্জিত সাফল্যগুলিকে সংহত করা। চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়ায় আত্ম-র্ভরতার প্রয়োজনের ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে উপকার-ি যাতে সমভাবে বন্টিত হয় তাই হবে এই পরিকল্পনার লক্ষ্য। চতুর্থ বিকল্পনায় কৃষিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত কর্ম্মসূচীগুলির জন্য র্থ সংস্থান, রূপায়ণের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা এবং জনগণের আন্তরিক সহযোগি-র ওপরেই পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে।

পরিকল্পিত উন্নয়নের আদর্শ নিয়ে সমাজ কল্যাণে ব্র হওয়ার সমস্যা অনেক, একথা বললে আশ্চর্য্য হওয়ার ক কিন্তু কথাটা মিথ্যা নয়। মৃত্যুর হার হ্রাস, আয়ুর সীমাবৃ ব্যাধি-মহামারী শাসনের ফলে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি দরুণ যে সুন্দর পরিমণ্ডল সৃষ্টি হ'তে পারত জনসংখ্যার অভাবনী বৃদ্ধিতে তা' বিপর্য্যস্ত হয়ে গেছে। জনসংখ্যাবৃদ্ধির সমস্যা পরিকল্পনার সব সুফলকে অকিঞ্চিৎকর ক'রে দিচ্ছে ১৯৫০-৫১-র মোট জনসংখ্যা ৩৫.৯ কোটি থেকে '৬০-৭০'। দাঁড়িয়েছে ৫৩ কোটিতে।

তবু, পরিকল্পনার সুফল মাথাপিছু আয়ের আকারে এ ভোগ্যপণ্য ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারের মাত্রাবৃদ্ধিতে প্রতিফলিত হবে, এইটাই পরিকল্পনা প্রণেতাদের লক্ষ্য। সমাজ তন্ত্রের আদর্শের ওপর পুনরায় গুরুত্ব আরোপ ক'রে, ঐ লক্ষ্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

পরিকল্পনায় বিনিয়োগ এবং সরকারি তরফের লগ্নি

(বর্ত্তমান মূল্যমান অনুযায়ী ১০ লক্ষ টাকায়)

	প্রথম পরিকল্পনা	দ্বিতীয় পরিকল্পনা	তৃতীয় পরিকল্পনা	তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬৬-৬৯)	চতুর্থ পরিকল্পনা
প্রথমে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ	২০৯০	৪৮০০০	৭৫০০০	৬৭৫৬০	১৪৩৯৮০
সরকারি তরফে পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগ	১৯৬০০	৪৬৭২০	৮৬২৮২	৬৭৯১৯	১৪৩৯৮০
লগ্নি (মোট)					
সরকারি তরফ :	১৯৬০০	৩৪৫০০	৭১৮০০	৫৮১৭০	
বেসরকারি তরফ :	১৯০০০	৩১০০০	৪১৯০০	৩৬৪০০	
কৃষি ও সেচ	৭২৪০	৯৭৯০	১৭৬০৫	১৪৮০৬	২২১৭৫ +৯৬৩৮
বিদ্যুৎ শক্তি	১৪৮৮	৪৫২০	১২৬২৯	১১২৬৬	২০৮৪৫
খনি এবং উৎপাদন	৯৬৮	১১২৫০	১৯৫৯০	১৭২১৯	৩০৮৯৯
পরিবহণ এবং যোগাযোগ	৫১৭৮	১২৬১০	২১১২৯	১৩০২৫	৩১৭৩১
শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সমাজকল্যাণ সেবা	৪৭৭২	৮৫৫০	১৫৩৩৯	১১৬০৩	২৩৯১৩

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত হ'লেও 'ধনধান্যে' শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই ব্যক্ত করে না। পরিকল্পনার বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী ক্ষেত্রে উন্নয়ন [illegible] অনুযায়ী কতটা অগ্রগতি হচ্ছে তার খবর দেওয়াই হ'ল 'ধনধান্যে'র লক্ষ্য।

'ধনধান্যে' প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে প্রকাশিত হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

নিয়মাবলী

দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়।

অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পুনঃ প্রকাশকালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার করা হয়।

রচনা মনোনয়নের জন্যে আনুমানিক দেড় মাস সময়ের প্রয়োজন হয়।

মনোনীত রচনা সম্পাদক মণ্ডলীর অনুমোদনক্রমে প্রকাশ করা হয়।

তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয়। কোনোও রচনার প্রাপ্তি-স্বীকৃতি, পত্র মারফৎ জানানো হয় না।

নাম ঠিকানা লেখা, ডাকটিকিট লাগানো, খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

কোনো রচনা তিন মাসের বেশী রাখা হয়না।

শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাবেন।

গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেস ম্যানেজার, পাব্লিকেশন্স্ ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী-১ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

"ধনধান্যে" পড়ুন
দেশকে জানুন

উন্নয়ন বার্তা

★ ট্রম্বের ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণযোগ্য রেডিওগ্রাফিক ক্যামেরা তৈরী হয়েছে। ফলে, ভারত এখন, আইসোটোপ রেডিওগ্রাফির সাহায্যে বোয়িং জেটের ইঞ্জিন পরীক্ষা করতে পারবে। রেডিওগ্রাফি পদ্ধতিতে যন্ত্রের নির্মানত্রুটী ধরা পড়ে। এই পদ্ধতিতে জাম্বো জেটের ইঞ্জিনও পরীক্ষা করা যাবে। এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রার যথেষ্ট সাশ্রয় হবে।

★ হরিদ্বারে ভারত হেভী ইলেকট্রিক্যাল্স্ কারখানায় ১০০ মেগাওয়াটের বাষ্পীয় টার্বাইন তৈরী হয়েছে। সম্পূর্ণ দেশীয় উপকরণ দিয়ে, ভারতীয় ইঞ্জিনিয়াররা সোভিয়েৎ বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঐ টার্ব্বাইন তৈরী করতে সমর্থ হয়েছেন। টার্ব্বাইনটি উত্তরপ্রদেশের ওবরা থার্মাল পাওয়ার স্টেশনকে দেওয়া হবে।

★ মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ বিভাগে অমরাবতীতে, দানাদার কৃত্রিম মিশ্র সারের কারখানা চালু হয়েছে। কারখানার নির্ম্মাতা হ'ল বিদর্ভ-সমবায়-বিক্রয়কারী সমিতি। এই কারখানায় বছরে ৬০,০০০ টন দানাদার সার তৈরী হ'তে পারে।

★ কাণ্ডলা বন্দর ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলগুলির মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী ২৩০ কি. মী. দীর্ঘ ব্রড গেজ রেলপথ যাত্রী চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। রেলপথ নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১৬ কোটী টাকা।

★ কোয়েম্বাটুর থেকে ৪০ কি. মী. দূরে সিরামুগাই নামক একটি জায়গায় কাঠের মণ্ড তৈরীর একটি কারখানা চালু করা হয়েছে। এটি তৈরী করতে ব্যয় হয়েছে ১২.৫ কোটী টাকা।

★ পোল্যাণ্ড ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি বাণিজ্য-চুক্তি অনুযায়ী ১৯৭০ সালে দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন হ'বে ৮০ কোটী টাকার মত। চিরাচরিত রপ্তানী পণ্য ছাড়াও ভারত পোল্যাণ্ডে রেলের ওয়্যাগণ, সুতী বস্ত্র, সুতো ও ইঞ্জিনিয়ারিং সামগ্রী রপ্তানী করবে এবং আমদানি করবে গন্ধক, য়ুরিয়া, কৃষির জন্য ট্র্যাক্টার, জাহাজ, জাহাজী সরঞ্জাম, জৈব ও অজৈব রাসায়নিক দ্রব্য, জিঙ্ক, নিউজপ্রিন্ট প্রভৃতি।

★ মিশ্র ইস্পাতের অন্যতম উপাদান সিলিকো ক্রোম এই প্রথম আমাদের রপ্তানী তালিকায় স্থান পেল। মহারাষ্ট্রের একটি কারখানা জাপানে রপ্তানীর প্রথম কিস্তী হিসেবে সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা মূল্যের সিলিকো ক্রোম পাঠিয়েছে।

★ ভারত ও সোভিয়েট য়ুনিয়ন ১৯৭০ সালে ৩০০ কোটী টাকার জিনিস লেনদেন করার জন্যে একটি চুক্তিতে সই করেছে। ভারত, চিরাচরিত জিনিস ছাড়াও, চামড়ার জুতো এবং জামাকাপড়ের মতো একান্ত প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য রপ্তানী করবে। ১৯৭০ সালে ভারত মোট ২০০ কোটী টাকার জিনিষ রপ্তানী করতে পারবে ব'লে আশা করে।

★ চিতোরগড় জেলায় বিজাইপুর নদীর ওপর ১৬৫ ফুট লম্বা ও ২৪ ফুট চওড়া সেতুর শিলান্যাস করা হয়েছে। সেতু নির্মাণের আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ হবে এক লক্ষ টাকা।

★ গত তিন বছরে উত্তর প্রদেশে, বন্যা নিয়ন্ত্রণের অঙ্গ হিসেবে, প্রায় ৬৭,০০০ একর জমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

★ এবছর পাঞ্জাবে ৯৭২টি গ্রামে বিদ্যুৎ শক্তি পৌঁচেছে। সারা বছরের জন্য নির্দ্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫০০টি গ্রামের বৈদ্যুতিকীকরণ।

ডিরেক্টার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সোসাইটি লিঃ—করোলবাগ, দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রথম বর্ষ ঃ ১৭
[illegible]শে জানুয়ারী, ১৯৭০

ধনধান্যে

সাধারণতন্ত্র দিবস ঃ বিশেষ সংখ্যা

৫ পয়সা

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত
পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

প্রথম বর্ষ সপ্তদশ সংখ্যা
২৬শে জানুয়ারী ১৯৭০ : ৬ই মাঘ ১৮৯১
Vol. 1 : No 17 : January 26, 1970

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০

টেলিগ্রাফের ঠিকানা : যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

ভুলি নাই

চূড়ান্ত বিশ্লেষণের পর দেখা যাবে, পরিকল্পনা রূপায়ণের সবচেয়ে বড় সমস্যা হ'ল জনসাধারণের সঙ্গে অন্তরের যোগ স্থাপন করা। আর সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায় হ'ল শিক্ষা ও বিশেষ শিক্ষণ।

-জওহরলাল নেহরু

এই সংখ্যায়

ক্লান্তিকর দীর্ঘপথ

পরাধীন একটা জাতির পক্ষে স্বাধীনতা হল জীবনের পরম সম্পদ ; কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতাবিহীন রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিশেষ কোন মূল্য নেই। যুগ যুগ ধ'রে দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ভারতের জনগণের পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন করাটা ছিল, সুখ ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌঁছুবার দীর্ঘ যাত্রাপথের প্রথম পর্যায় মাত্র। নিজেদের মুক্তির জন্য জনগণ তখন থেকেই শুধু কাজ করার সুযোগ পেলেন। তখন থেকে সকলেই জানতেন যে শত শত শতাব্দির অনগ্রসরতা কাটিয়ে ওঠার জন্য, দারিদ্র্য ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে যে বিপুল পার্থক্য রয়েছে তা দূর করার জন্য এবং আমাদের দেশের সর্ব্বাধিক পরিমাণ অধিবাসী যে পল্লী অঞ্চলে বাস করেন, সেই পল্লীবাসীদের জীবন উন্নত করার জন্য আমাদের বছরের পর বছর ধ'রে অবিরামভাবে বিপুল পরিশ্রম করতে হবে।

অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়েই ভারত, ১৯৫১ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ সুরু করে। কৃষি ও শিল্পে উৎপাদন বাড়ানো এবং সম্পদের সম বন্টনই শুধু এই পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিলনা, দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতে একটা পরিবর্ত্তন এনে শেষ পর্যন্ত মানুষের ব্যক্তিত্বের উন্নয়নও ছিল এই পরিকল্পনার লক্ষ্য। দ্রুত বর্ধমান জনগণের প্রয়োজন মেটানো, সমস্যার বিপুলতা এবং আরও নানা প্রয়োজন মেটানোর জন্য পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ অপরিহার্য্য বলে বিবেচিত হয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে, প্রথম পরিকল্পনাটি ছিল, "দেশের কৃষি, শিল্প, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্ত বিষয়গুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে ভারতের প্রথম সংহত চিন্তার একটা কাঠামো।"

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি খুব বড় ছিলনা, কিন্তু কাজ সুরু করার পথে প্রথম ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হয়। অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের পথে যাত্রা করাই ছিল প্রধান কথা এবং প্রথম পরিকল্পনাটি দেশ ও জাতিকে সচল করে তোলে। এটা খুব সহজ কাজ ছিলনা। লক্ষ লক্ষ মানুষের কল্যাণের জন্য, মানব প্রচেষ্টার প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে এবং মিশ্রিত অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের মধ্যে একটা মীমাংসা করে, গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা রচয়িতাদের কর্মসূচী তৈরি করতে হয়েছে।

তারপর কৃষি ও শিল্পের মধ্যে একটা সমতা রাখারও প্রয়োজন ছিল। আমাদের দেশের যে বিপুল সংখ্যক অধিবাসী দারিদ্র্য ও অন্ধকারে বাস করতে বাধ্য হচ্ছিলেন, তাদের জন্য খাদ্য, আশ্রয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজন ছিল। এইসব আশু লক্ষ্য ছাড়াও, যে অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর স্থায়ী সমৃদ্ধি গড়ে উঠতে পারে, পরিকল্পনা রচয়িতাদের, তার ভিত্তিও তৈরি করতে হয়। দেশে যতটুকু সম্পদ পাওয়া যেতে পারে এবং বিদেশ থেকে যতটুকু সাহায্য পাওয়া সম্ভব সেই সীমিত সম্পদ দিয়েই এই সব নানা রকমের কাজ করতে হয়েছে।

প্রথম পরিকল্পনার পর দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনার কাজ শেষ হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ প্রকৃতপক্ষে গত এপ্রিল মাস থেকে সুরু হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত এর চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়নি। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে আমরা ১৮ বছরের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি এবং এখন আমরা আমাদের লাভ ও ক্ষতির হিসেব করতে পারি। ভারতের পরিকল্পনার রেকর্ড যে সব ক্ষেত্রেই ভালো নয় একথা সত্যি অথবা আমরা যতগুলি লক্ষ্য স্থির করেছিলাম তার সবগুলিতেই যে আমরা সাফল্য লাভ করেছি এমন কথাও বলতে পারিনা। অর্থনীতির অনেক ক্ষেত্রে আমরা বিফল হয়েছি বা আমাদের লক্ষ্য সম্পূর্ণ সফল হয়নি। যে ভুল এড়ানো যেতো সেই রকম ভুলও হয়েছে সত্যি কথা এবং তা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এই সব মানবিক ভুলভ্রান্তি ছাড়াও, মানুষের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত আরও অনেকগুলি জিনিস, আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি কমিয়ে দিয়েছে। যে দেশ, সময় এবং ইতিহাসের সীমা অতিক্রম করতে চেয়েছিল তার পক্ষে এগুলি সম্ভবত: অবশ্যম্ভাবী ও নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ছিল।

যাই হোক দেশ যে অনেক দিকে বিশেষ করে কৃষিতে, শিল্পে, শিক্ষায়, কারিগরী বিদ্যায়, স্বাস্থ্যে ও গৃহনির্মাণে বিপুল অগ্রগতি করেছে তা অস্বীকার করা যায়না। বেকার সমস্যা এবং নিরক্ষতার মতো দুটি বড় সমস্যা আমাদের এখনও সামাধান করতে হবে। দেশের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর কাছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যে এখনও স্বপ্ন এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। পরিকল্পনা রচয়িতাগণ এবং সরকার উভয়েই এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। তাই, ভারতের প্রতিটি নাগরিক যতদিন পর্য্যন্ত না সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে পারেন ততদিন পর্য্যন্ত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে তাঁরাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

যেখানে চাইবেন সেখানেই জল পাবেন

ভিলিয়ার্স ইঞ্জিন পাম্পসেট দিয়ে

● ভিলিয়ার্স ইঞ্জিন পাম্পসেট সহজেই এক জায়গা থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া যায়। কাজেই চাষীরা যেখানে দরকার হয় সেখানেই জল পেতে পারেন। ● ভিলিয়ার্স ইঞ্জিন পাম্পসেট কিনতে কম পুঁজি লাগে; অথচ বেশী ফসল তুলে অধিক লাভবান হওয়া যায়। ● ভিলিয়ার্স ইঞ্জিনের প্রয়োগ পাওয়ার থেশার্স, যন্ত্রচালিত হাল, টিলার্স, জেনারেটার সেট্স ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিতে করা চলে।

● সারাদেশ জুড়ে গ্রীভস এর বিক্রির পরে সার্ভিসের ব্যবস্থা রয়েছে। ● ভিলিয়ার্স ইঞ্জিন স্পেয়ার পার্টস সর্বত্র পাওয়া যায়।

মডেল ২৫ এস. পি. কে. ● ১২ এস. পি. কে,
পেট্রোল ও কেরাসিন তেলে চলে।

বিক্রয় ও দেখাশুনা করেন:
গ্রীভস কটন এণ্ড কোং লিঃ

GREAVES

AAA. GV. 48 BN

পরিকল্পনা এবং জনসাধারণের সহিষ্ণুতা

হীরেন মুখোপাধ্যায়
সংসদ সদস্য

কথায় আছে সাধুতার ভান করার জন্য পাপি কাপট্যের আশ্রয় নেয়। প্রায় সেই রকমভাবেই বলা যায় যে, ধনতন্ত্রবাদ, বিশৃঙ্খলার মধ্যে পথ হারিয়ে অনিচ্ছুকভাবে সমাজতন্ত্রবাদকে যে সম্মান দেখায় তাই হ'ল পরিকল্পনা।

অনেকেই জানেন যে কম দিনের মধ্যে ধনতন্ত্রবাদের সমর্থক পণ্ডিতেরা বহু বছর ধ'রে বেশ জোর দিয়ে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করছিলেন। কিন্তু তাঁরা অবশ্য বেশীদিন সামাজিক বিবর্তনের হাওয়ার বিরুদ্ধে লড়তে পারেননি। ১৯২৯-৩৩ সালের, বিশ্বের অর্থনৈতিক সঙ্কট যখন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মৌলিক দুর্বলতাগুলি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিলো এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য সেই পটভূমিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তখনই তাঁরা প্রথম ধাক্কা খেলেন। ঐ সময়ে সোভিয়েট বিরোধী বিপুল প্রচার চলতে থাকা সত্ত্বেও, অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া দেশগুলিকে যদি এগিয়ে যেতে হয় তাহলে তাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে তা না হলে তাদের ধ্বংস হয়ে যেতে হবে, বিশ্বব্যাপি এই ক্রমবর্ধমান ধারণা, প্রতিরোধ করা গেলনা। তবে, পরিকল্পনাকে তখন অবশ্য একটা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে মনে করা হ'ত এবং সেই জন্যই আমাদের দেশের অনেকে এখনও একে সহজভাবে নিতে পারেননি এবং তাঁরা যখন পরিকল্পনার কথা বলেন তখন তার মধ্যে কিছু কাপট্য থাকে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার নীতির প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না হারিয়েও, ভারতে পরিকল্পনা সম্পর্কে গভীর চিন্তাশীলদের অগ্রনায়ক পরলোকগত ডঃ বিশ্বেশ্বরায়াও, সোভিয়েট পরিকল্পনার সাফল্যের মূলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক শৃঙ্খলাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তবে হরিপুরা অধিবেশনের পর (জানুয়ারি ১৯৩৮) তখনকার কংগ্রেস সভাপতি সুভাষ চন্দ্র বসু যখন জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন ক'রে জওহরলাল নেহেরুকে তার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে বলেন তখনই সোভিয়েট পরিকল্পনার সাফল্যকে প্রকৃতভাবে প্রশংসা জানানো হয়।

আদর্শবিহীন পরিকল্পনা

আমাদের পরিকল্পনা নানা রকম ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসেছে। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত "পরিকল্পনা" দেরাজের মধ্যে ছিল। একে দেরাজ থেকে মধ্যে মধ্যে নামিয়ে, ঝেড়ে, মুছে আমাদের অর্থনীতির উপযোগী করে তোলার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু জনসাধারণের প্রয়োজন অনুযায়ী কোন সময়েই এর প্রকৃত সংশোধন করা হয়নি। পঞ্চায়েত থেকে সংসদ পর্য্যন্ত জনসাধারণের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও প্রকৃত আলোচনা করা হয়নি (কর্ত্তব্যের খাতিরে কেবলমাত্র দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনার সময় সংসদে আলোচনা করা হয়)। যে কর্মচারিতন্ত্রের হাতে রূপায়ণের কর্ত্তব্য প্রধানত: ন্যস্ত রয়েছে, তাঁরা এবং জননেতাগণও এই মতবাদে বিশ্বাসী যে, কোন চিন্তাধারার প্রতি অনুগত না থেকেও পরিকল্পনার কাজ করা যায় এবং তাই করা উচিত। আর এই জন্যই এই সব ব্যাপার ঘটেছে। তবে আমরা যদি এই সম্পর্কে একটু ভালো করে চিন্তা করি তাহলে অবশ্য সহজেই বোঝা যায় যে কোন আদর্শবিহীন পরিকল্পনা হাস্যকর। ই. এম. এস নাম্বুদ্রীপাদ ১৯৬৮ সালে বলেছিলেন যে "যাঁরা কোন রকম মতবাদ থেকে মুক্তির পক্ষে ওকালতি করেন তাঁদেরও নিজস্ব মতবাদ রয়েছে। বড় বড় জমিদারের জমিদারি রক্ষা করাটা মতবাদ নয় কিন্তু তাঁদের জমিদারি বাজেয়াপ্ত করাটা (বা ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিলোপ সাধন) হল মতবাদ। বিদেশী একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের মালিকানায় কারখানা, ব্যাঙ্ক, চাবাগান ইত্যাদি রক্ষা করাটা মতবাদ নয় কিন্তু সেগুলি রাষ্ট্রায়ত্ব করাটা হ'ল মতবাদ।" এ কথাটা মনে রাখা বিশেষ দরকার যে, বিশ্বব্যাপি বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে সংগ্রামের সময়ে, সমাজতন্ত্রবাদ জয়ী হয়, পরিকল্পনার ধারণা তখনই ক্রমশ: সুস্পষ্ট হতে থাকে।

দুঃখজনক কাহিনী

জনগণের সংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের দেশে স্বাধীনতা আসেনি। পারস্পরিক

আলোচনা এবং দেশবিভাগের বিপুল মূল্যের মাধ্যমে স্বাধীনতা এসেছে। বৃটিশ সরকার অত্যন্ত কৌশলে এই মূল্য আদায় করেছেন। আমরা সাম্রাজ্যবাদ থেকে ক্ষমতা হস্তগত করিনি ; বরং আমাদের বিহ্বল জনসাধারণ যে রক্ত ও অশ্রু পাত করেছেন তা লুকিয়ে রেখে একটা নাটকীয় অভিনয়ের মাধ্যমে—অত্যন্ত ফলাও করে প্রচারিত, ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের নাটকীয় অভিনয়ের মাধ্যমে, স্বাধীনতা লাভ করি। এই ঘটনাটি পরের সমস্ত ইতিহাস রঞ্জিত করেছে। যে স্বাধীনতার আলোর কথা জওহরলাল নেহেরু প্রায়ই বলতেন (১৯৪৫-৪৭) সেই আলো ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসের পর থেকে এ পর্য্যন্ত খুব কম ভারতীয়ের হৃদয়েই জ্বলেছে। খুব অল্প কথায় এতেই আমাদের পরিকল্পনাগুলির দুঃখজনক কাহিনী এবং আমাদের জনগণের ইচ্ছা ও স্বপ্নের সঙ্গে সেগুলির মৌলিক অসামঞ্জস্য বুঝতে পারা যায়।

স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে সব কাজ করা হয়েছে তা ছোট করে দেখানোর উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি বলা হলোনা। বরং একদিক দিয়ে বলা যায় যে পূর্ব্বে যা ধারণা করা যায়নি তাই এখন বাস্তবে রূপায়িত করা হয়েছে। ভারতের নানা জায়গায় এখন রয়েছে জওহরলাল বর্ণিত "নতুন মন্দিরসমূহ অর্থাৎ ভাকরা বা বোকারো, দুর্গাপুর বা বাঙ্গালোর বা তারাপুর বা ভিলাই অথবা বারাউনি ইত্যাদি। অনেক উন্নয়ন হয়েছে এটা সত্যি কথা—যেমন সাধারণ মানুষের আয়ু বেড়েছে, শিক্ষার সুযোগ সুবিধে অনেক বেড়েছে, যদিও আমাদের প্রয়োজন এবং জনগণের আশা অনুসারে তা এখনও অনেক কম। এটাও দাবি করা যেতে পারে যে স্বাধীন ভারত খাদ্যঘাটতি এবং এমন কি দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তিলাভ করতে না পারলেও, ১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষের মতো অবর্ণনীয় কোন বিপদ প্রতিরোধ করতে পারে। এ কথাও নিশ্চয়ই বলা যায়, জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ভারত, সমাজতন্ত্রী দেশগুলির কাছ থেকে সেই ধরণের সাহায্য নিতে ইতস্তত: করেনি, যা সত্যিই সাহায্য করে এবং আমাদের দেশের মূল স্বার্থ ব্যাহত করেনা।

এই ক্ষেত্রে আরও অনেক কথা বলা যায় কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। কিন্তু একথাটা সত্যি যে ভারত যতটুকু অগ্রগতিই করুকনা কেন, সে এখনও অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্থ ও বঞ্চিত। ভি. এস. নাইপাল দুঃখের সঙ্গে বলেছেন "আমরা অন্ধকার একটি অঞ্চলে বাস করি"। তারপর একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ চন্দ্রশেখর বলতে বাধ্য হয়েছেন যে "অন্ততঃপক্ষে ছয় কোটি ভারতীয় পেটে ক্ষিদে নিয়ে রাত্রিবেলায় একটু ঘুমুবার চেষ্টা করেন।" এতেই বোঝা যায় আমরা কোথায় আছি। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ ছেলেমেয়ে উপযুক্ত পুষ্টিকর আহার পায়না, যে প্রোটিন খাদ্যের অভাবে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির উপযুক্ত বিকাশ হয়না শিশুরা সেই প্রোটিন খাদ্য পায়না, এতেই বোঝা যায় আমরা কোথায় আছি। ১৯২১ সালে যখন মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সুতো কাটার জন্য এবং অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান করেন তখন বলেছিলেন যে, রাত্রিবেলায় পাখিরা তাদের পাখায় শক্তি সঞ্চয় করতে পারে বলেই ভোরের আকাশে গান গাইতে গাইতে উড়তে পারে, কিন্তু ভারতের মানুষ পাখি সবসময়েই এতো দুর্ব্বল যে রাত্রির তুলনায় দুর্ব্বলতর হয়ে তার ভোরের ঘুম ভাঙ্গে। সেই ১৯২১ সাল থেকে এই পর্য্যন্ত খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে কি ?

আমাদের দেশের জনগণের মধ্যে যে ১ কোটি লোকের দৈনিক আয় ২৭ পয়সা, এর ঠিক ওপরের শ্রেণীর ৫ কোটি লোকের দৈনিক আয় ৩২ এবং পরবর্ত্তী শ্রেণীর ৫ কোটি লোকের দৈনিক আয় ৪২ পয়সা, সে কথাটা বার বার মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়না। ফলিত অর্থনৈতিক গবেষণা সম্পর্কিত জাতীয় পরিষদ এই সংখ্যাগুলি প্রকাশ করেছেন। এমন কি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীচাবানও কি কিছুদিন আগে অত্যন্ত বিজ্ঞাপিত "সবুজ বিপ্লবের" বিবরণী সম্পর্কে বলেন নি যে একটু খোঁচাতেই তা লাল হয়ে যেতে পারে ? তিনি এই লাল রঙটিকে খুব ভালোবাসেন বলেই যে এ কথা বলেছেন তা নয়। সাধারণভাবে দেশের প্রায় সমগ্র কৃষক শ্রেণীই যেখানে দরিদ্র এবং ভূমিহীন শ্রমিক, এই সবুজ বিপ্লবের ফলে তারা বিশেষ কিছুই পাননি এবং তারা যদি নিজেদের জন্য জমি দখল করে সমগ্র কৃষি ব্যবস্থায় পরিবর্ত্তন না আনতে পারেন তাহলে তাদের জীবনেও কোন পরিবর্ত্তন আসবেনা, এই কথাটা তিনি নিজে বাস্তববাদী বলে ভুলতে পারেননি।

"আত্মনির্ভরতা" এই কথাটা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি, এবং ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালেও আমরা শুনেছি যে আমাদের দেশ স্বয়ম্ভরতা অর্জন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং তা অর্জন করতে পারবে। তবুও দেখা যায় যে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসেও ভারতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট যে টাকা জমা রয়েছে (পি. এল ৪৮০ এবং অন্যান্য দানের দৌলতে) তা হ'ল ভারতের মোট অর্থের শতকরা ৫০ ভাগের কিছু কম এবং ভারতে মোট যে টাকার নোট চালু রয়েছে তার দুই তৃতীয়াংশেরও বেশী। আমাদের বিদেশী ঋণের পরিমাণ হ'ল প্রায় ৬০০০ কোটি টাকা এবং রপ্তানীতে খানিকটা উন্নতি হলেও আমাদের দেনাপাওনার অবস্থা ভয়াবহ। কাজেই আত্মনির্ভরতার যদি কিছুটাও অর্জন করতে হয় তাহলেও আমাদের পক্ষে তা কবে সম্ভব হবে? আমাদের জীবনে যে অসহনীয় অসাম্য রয়েছে—আমাদের দেশের সহরগুলির সামান্য কিছু লোক ঐশ্বর্য্যের যে জাঁকজমকপূর্ণ জীবন ভোগ করছেন এবং অন্যত্র প্রায় সবখানে যে হতাশা ও বঞ্চিত জীবনের গভীর অন্ধকার রয়েছে এই অসাম্য দূর করার এবং তাড়াতাড়ি দূর করার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে ? যাদের পরিশ্রমে দেশ বেঁচে আছে আমাদের এই মহান দেশের সেই জনসাধারণ কবে আলোতে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হবে এবং জীবনে সার্থক হয়ে ওঠবার জন্য প্রকৃত সুযোগ সুবিধেগুলি ভোগ করতে পারবে?

পেকিংএর পিপলস্ ডেইলীর সাম্প্রতিক একটি সম্পাদকীয়তে মাও নীতির যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে কারুরই ইতস্তত: করা উচিত নয়। তা হল—"নদী পার হওয়াই যদি আমাদের লক্ষ্য হয় তাহলে নৌকা বা সেতু ছাড়া আমরা তা পার হতে পারিনা। কাজেই যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সেতু বা নৌকার সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে ততক্ষণ

১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

মুদ্রাস্ফীতি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন

এল. কে. ঝা
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর

বর্ত্তমানে ভারতীয় অর্থনীতিতে এমন কতকগুলি সুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে যাতে আমি মনে করি যে আগামী কয়েক বছর ধরে আমরা উন্নয়নের উচ্চ হার বজায় রাখতে পারবো। আমি যে যে কারণে এই আশা পোষণ করছি সেগুলি হল: (ক) কৃষিতে সাফল্য, (খ) মূলধনী এবং নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী এই উভয় ক্ষেত্রেই শিল্পোৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি, (গ) কারিগরী পরিচালনা এবং নতুন নতুন ক্ষেত্রে উদ্যম ও কৌশলের ক্রমোন্নতি, (ঘ) রপ্তানীতে যথেষ্ট উন্নতি।

তবে মূল্যের স্থিতিশীলতা নষ্ট না করে যাতে উন্নয়নের উচ্চ হার অর্জন করা যায় তা সুনিশ্চিত করাটাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ষাট দশকের মাঝামাঝি সময়ে মূল্যের গতি হঠাৎ যে রকম উপরের দিকে উঠতে থাকে সেই রকম উর্দ্ধগতি দেশের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। কিন্তু মূল্যের স্থিতিশীলতা কি ক'রে অর্জন করা যায় সেইটেই হ'ল প্রশ্ন।

উচ্চ উন্নয়নহার সম্পন্ন অনেক শিল্পোন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ, মূল্যের উর্দ্ধগতির সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, ফলে তারা বৈদেশিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করতে পারেনি এবং তাতে বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষেত্রে ও সংরক্ষিত স্বর্ণের ক্ষেত্রে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। উন্নয়নের কাজ চলার সময়ে যদি দেশের সঞ্চয়ের তুলনায় লগ্নির হার বেড়ে যায় তাহলে ফাঁপা বাজারের সৃষ্টি হয়। ভারতের মত দেশে যেখানে সঞ্চয়ের হার কম, সেখানে যদি লগ্নির উদ্দেশ্যে দেশের সম্পদ সংহত করার পরিবর্ত্তে, সৃষ্ট অর্থের ওপর বেশী নির্ভর করা হয় সেখানে এই রকম একটা অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ঘটলেই মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হবে। উন্নয়নের জন্য ঘাটতি বাজেট বা অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে কিছুটা আর্থিক সম্প্রসারণ প্রয়োজন এবং তাতে স্থিতিশীলতাও বজায় রাখা যায়। উৎপাদিত সামগ্রীর ক্রমবর্ধমান হার বজায় রাখার জন্য উৎপাদন যখন বাড়ে, তখন অর্থের সরবরাহও বাড়তে থাকে। অর্থ সরবরাহের এই উন্নয়নের জন্য উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে কিছুটা ঘাটতি বাজেটের প্রয়োজন। এর প্রতিক্রিয়াটা অবশ্য, বিভিন্ন সামগ্রীর বর্দ্ধিত সরবরাহ এবং জনসাধারণের অর্থসঞ্চয়ের প্রবণতার ফলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অর্থের এই সরবরাহ যদি না বাড়ে তাহলে মুদ্রা সঙ্কোচের অবস্থা সৃষ্ট হতে পারে এবং উন্নয়নের পক্ষে তা মুদ্রাস্ফীতির মতোই বিপজ্জনক হয়ে পড়তে পারে।

কাজেই বিভিন্ন সামগ্রী ও সেবা পাওয়ার হার যে পরিমাণে বাড়বে অথবা প্রকৃত আয় যে হারে বাড়বে, অর্থের সরবরাহ যাতে সেই তুলনায় খুব বেশী না বাড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দেশের অর্থনীতি অনুসারে যে আর্থিক সম্প্রসারণ হয় তার ওপরেও আবার ব্যাঙ্কের ঋণের মাধ্যমে আর্থিক সম্প্রসারণ ঘটে। কর্ত্তৃপক্ষ হিসেবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অবশ্য ব্যাঙ্কগুলি নিয়ন্ত্রণ করে। ফাঁপা বা মন্দা উভয় বাজারকেই এড়াতে হলে উপরে আলোচিত সব ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি রেখে অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থা উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

উন্নয়নের জন্য যদি অর্থনৈতিক সম্প্রসারণকে অন্যতম উৎস হিসেবে ব্যবহার করতে হয়, তাহলে আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সব জিনিসের চাহিদা বাড়ে, সেগুলির সরবরাহ তাড়াতাড়ি যাতে বাড়ে সেজন্য সেগুলির উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিতে, বেশী অর্থ নিয়োগ করা উচিত। ভারতে সেই প্রধান চাহিদাটি যে খাদ্যশস্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। সাধারণভাবে কায়িক পরিশ্রমকারী শ্রেণী যে সব জিনিস কেনেন সেগুলির যথেষ্ট সরবরাহ থাকা বিশেষ প্রয়োজন। ভারতীয় চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে চাউল, গম, এবং তৈলবীজ, তুলো ইত্যাদির মতো কৃষিজাত সামগ্রীর উৎপাদন যথেষ্ট বাড়ানো উচিত।

১৯৬২-৬৩ সাল পর্য্যন্ত ভারতে জিনিসপত্রের দাম তেমন কিছু বাড়েনি। ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৬২-৬৩ সাল পর্য্যন্ত সমগ্র সময়ে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির হার বার্ষিক শতকরা মোটামুটি ২ থেকে ৩ ভাগ ছিল। তবে ১৯৬২-৬৩ সালের পর অবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তন হয়। প্রতিরক্ষা এবং উন্নয়ন উভয় ক্ষেত্রেই সরকারি ব্যয় খুব বেড়ে যায়। আয় অনুযায়ী করের অনুপাত বাড়ানো হয় কিন্তু তা প্রয়োজনের অনুপাতে বাড়েনি। তাছাড়া খাদ্যশস্যের সরবরাহে ঘাটতি চলতে থাকে এবং বহু পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করে সেই ঘাটতি কিছুটা মোটানো হয়। জীবন ধারণের ব্যয়ের সঙ্গে বেতন ও পারিশ্রমিকের হার বাড়তে থাকায় শিল্পোৎপাদনের ব্যয়ও বাড়তে থাকে। জাতীয় আয়ের হার পূর্ব্বের বছরগুলিতে যে অনুপাতে বেড়েছে ১৯৬৪-৬৫ সাল পর্য্যন্ত কেবল সেইটুকুই রক্ষা করা হয় কিন্তু ১৯৬৬-৬৭ সালে সেই হার বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। এর ফলে মূল্য বৃদ্ধির গতি দ্রুততর হয়। ১৯৬২-৬৩ থেকে ১৯৬৫-৬৬ সাল পর্য্যন্ত দ্রব্যমূল্য শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ বেড়েছে। ১৯৬৬-৬৭ এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে তা যথাক্রমে শতকরা আরও ১৬ ভাগ ও ১১ ভাগ বাড়ে।

এই অবস্থাটা আয়ত্বে আনার জন্য ১৯৬৫-৬৬ সালে সরকারি লগ্নির পরিমাণ হ্রাস করা হয় এবং তার পর থেকে তা

কমই আছে। বেসরকারি তরফের লগ্নি-তেও এর প্রভাব পড়ে এবং শিল্পগুলিতে উৎপাদন হ্রাস পায়। উৎপাদন ক্ষমতার সম্পূর্ণ ব্যবহার ক্রমশ: কমে যেতে থাকায় কর্মসংস্থানের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে এবং লগ্নির অবস্থাও খারাপ হয়। তার ওপর, খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমতে থাকায় ১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে ফাঁপা বাজার অব্যাহত থাকে। কেবলমাত্র ১৯৬৮ সালে এবং তার পরের বছর ফসল ভালো হাওয়ায় এবং বেশী পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানি হওয়ায় মূল্যের এই উর্দ্ধগতি কিছুটা হ্রাস পায়। সম্প্রতি অবশ্য খাদ্যশস্যের মূল্যে খানিকটা স্থিতিশীলতা এসেছে। মন্দার ভাব খানিকটা কমেছে। আর্থিক অবস্থা পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে ঋণদান নীতি উদার করা হয়েছে এবং কৃষি, ক্ষুদ্র-শিল্প ও রপ্তানী বৃদ্ধির মত অগ্রাধিকার সম্পন্ন ক্ষেত্রগুলির প্রয়োজন মেটাবার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা যেন অভাববোধ রয়েছে। লগ্নির হার অপেক্ষাকৃত কম। শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতা এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হচ্ছেনা।

সঞ্চয়ের তুলনায় লগ্নি বেশী হওয়ায় এবং বৈদেশিক সাহায্য আসতে থাকায় ১৯৬২-৬৩ থেকে ১৯৬৭-৬৮ সাল পর্য্যন্ত মুদ্রাস্ফীতি চলতে থাকে। কিন্তু খাদ্য-শস্যের সরবরাহ হ্রাস না পেলে এই অতিরিক্ত চাহিদা ফাঁপা বাজারে পর্য্যবসিত হতোনা। তাছাড়া বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রায় যদি ঘাটতি না থাকতো তাহলে আমদানি দিয়ে এই অতিরিক্ত চাহিদা খানিকটা মেটানো যেতো এবং মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা যেতো। দ্রব্য মূল্যের বৃদ্ধি যেমন রপ্তানীকে প্রভাবিত করে তেমনি আমদানির জন্য চাহিদাও বাড়ায়। বৈদে-শিক মুদ্রার ঘাটতি যেমন বাড়তে থাকে তেমনি আমদানি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় এবং কাঁচামাল ও অন্যান্য জিনিসের আমদানির ওপরেও তার প্রতি-ক্রিয়া দেখা দেয়। এর ফলে শিল্পের উৎপাদন হ্রাস পায়, দ্রব্যমূল্য আরও বাড়ে।

এইসব থেকে আমরা মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি যে আমাদের দেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট পরি-মাণ খাদ্যশস্য ও অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রীর সরবরাহ যদি প্রচুর পরিমাণে থাকে তাহলে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ছাড়াও অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ সম্ভবপর। অন্য কথায় বলতে গেলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের যদি অভাব থাকে তাহলে কোন রকম আর্থিক নিয়ন্ত্রণই মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে পারবেনা। আমাদের এটা স্বীকার করতেই হবে যে, মূল ভোগ্য দ্রব্যের যদি হঠাৎ ঘাটতি দেখা দেয় সেই ঘাটতি অথবা খরা বা বন্যা অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতি-ক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, লগ্নির অগ্রাধি-কারে কোন ভুলের জন্য নয়। তেমনি উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন কতকগুলি ব্যাপার যেমন, বৈদেশিক সাহায্য হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া, কোন আক্রমণ আশঙ্কায় হঠাৎ যদি প্রতিরক্ষামূলক ব্যয় হঠাৎ অত্যন্ত বেড়ে যায় অথবা এই রকম অন্য কোন কারণেও ফাঁপা বাজারের সৃষ্টি হতে পারে।

সাময়িক ঘাটতি দেখা দিলে সুপরি-কল্পিত একটা মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় অবশ্য সুফল পাওয়া যেতে পারে। তবে একই সঙ্গে মূল্য, বন্টনব্যবস্থা এবং চাহিদাপূরণ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। এই জন্যেই সম্ভবত: মূল্যনিয়ন্ত্রণ আরোপ করবার সময় নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায় বেছে নেওয়া হয়। এই ধরণের নিয়ন্ত্রণ প্রায়ই উৎপাদকের পর্য্যায়ে কার্য্য-করী হয় বলে, সাধু উৎপাদক শাস্তি পান, কালোবাজারী পুরস্কৃত হন, দালাল বা মধ্যবর্তীরা বেশী আয় করেন এবং দরিদ্র ক্রেতা কোন উপকারই পাননা।

মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হ'ল, যে পর্য্যায়ে মূল্য নিয়ন্ত্রিত হয় তা অযৌক্তিকভাবে নিম্নস্তরে হওয়া উচিত নয়। মূল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য বেশী লাভ না করতে দেওয়ার এবং অপেক্ষাকৃত অল্প প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন মুক্ত রাখার যে প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায় তা অল্প প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন শিল্পে, অর্থ বিনিয়োগে উৎসাহিত করে। মূল শিল্প-গুলি যদি ভালো লাভ করতে পারে তাহলে তাতে লগ্নির পরিমাণ যেমন বাড়বে তেমনি ঘাটতিও চলে যাবে। গত কয়েক বছরে আমরা দেখেছি যে কৃষিজাত সামগ্রীর মূল্য কম না রেখে উৎপাদককে লাভজনক মূল্য দেওয়ায়, কৃষিতে যেমন লগ্নি বেড়েছে তেমনি উৎপাদনও বেড়েছে। শিল্পের ক্ষেত্রেও এটা সত্যি। তবে এ কথাটাও মনে রাখতে হবে যে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমেই প্রকৃত আয় বাড়ে আর মূল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একটা আনুপাতিক ফল পাওয়া যায়।

নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও খোলা বাজারের ব্যবস্থা অনেকখানি সাহায্য করতে পারে। মরসুমের সময় যে সব জিনিসের সরবরাহ খুব বাড়ে বিশেষ করে তখন সেগুলি মজুদ করে ঘাটতির সময়ে তা ছাড়া যায়। খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে অবশ্য এটা করা হচ্ছে।

তবে মজুদ ভাণ্ডার গড়ে তোলার ব্যয় খুব বেশী। এতে টাকা আটকে যায়, সংরক্ষণ ব্যয় থাকে কিন্তু কোন লাভ নেই। মজুদ করবার জন্য যথেষ্ট জায়গার প্রয়োজন এবং বেশী সময়ের জন্য মজুদ ক'রে রাখতে হলে ক্ষতিরও সম্ভাবনা থাকে। এই ক্ষতি এড়ানোর একটা সম্ভাব্য বিকল্প ব্যবস্থা হল মজুদ অতিরিক্ত সামগ্রী রপ্তানী করে, হঠাৎ সাময়িক কোন ঘাটতি মেটা-নোর উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মুদ্রার আকারে একটা মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা। প্রায়ই দেখা যায় যে, আমাদের দেশে যখন কোন জিনিসের ঘাটতি দেখা দেয় তা সে খাদ্য-শস্য, ইস্পাত বা অন্য যে কোন কিছুরই ঘাটতি হোক, বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে আমাদের সেগুলির আমদানি নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। অবস্থা যখন সত্যিই খারাপ হয়ে ওঠে তখনই শুধু বৈদেশিক মুদ্রা দেওয়া হতে থাকে। ইত্যবসরে দাম বেড়ে যায় এবং তখন মূল্য নামিয়ে আনা কঠিন হয়ে পড়ে। যে বৈদেশিক মুদ্রা শেষ পর্য্যন্ত দেওয়া হয় তা যদি সময় মতো দেওয়া হত তাহলে ক্ষতিটা এড়ানো যেতো। এই রকম ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার একটা জাতীয় ভাণ্ডার সাহায্য করতে পারে।

মূল্য যত বেশীই হোক না কেন, দেশেই শিল্প প্রতিষ্ঠা ক'রে দেশেই সব জিনিস উৎপাদন করার জন্য উৎসাহ

১২ পৃষ্ঠায় দেখুন

পরিকল্পনা ভুলপথে গিয়েছে

এইচ. ভি. কামাথ
প্রশাসন সংস্কার কমিশনের সদস্য

লেখকের মতে নেতাজীই হলেন আমাদের দেশের পরিকল্পনার জনক। কিন্তু পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে জাতীয় সম্পদ মোটামুটি কিছুটা বাড়লেও সাধারণ মানুষের জীবন ধারণের মান বাড়েনি অথবা তাঁদের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যও আসেনি।

আমাদের দেশের জন্য কি ধরণের পরিকল্পনা প্রয়োজন এবং সেগুলি কি রকমভাবে রূপায়িত করতে হবে তা, স্বাধীনতা সংগ্রাম চলতে থাকার সময়েই ভাবা হয়েছিল। কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু বিশেষভাবে পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেন। এর পূর্ব্বে ফেব্রুয়ারি মাসে কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি বলেন যে "একটি পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শ অনুযায়ী, উৎপাদন ও বন্টনের ক্ষেত্রে আমাদের সমগ্র কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থাকে আস্তে আস্তে সমাজতান্ত্রিক নীতির অন্তর্ভুক্ত করা সম্পর্কে রাষ্ট্রকে বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।"

কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে সুভাষবাবু, ১৯৩৮ সালের ২রা অক্টোবর দিল্লীতে কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলির শিল্প মন্ত্রীগণের একটি সভা আহ্বান করেন। জাতীয় পুনর্গঠন এবং সামাজিক পরিকল্পনার জন্য কোন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হলে জরুরী ও প্রয়োজনীয় যে বিষয়গুলির সমাধান প্রয়োজন, সেগুলি আলোচনা করাই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। এই সম্মেলন উদ্বোধন করতে গিয়ে সুভাষ বসু স্বাধীন ভারতের জাতীয় পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ ক'রে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন যে "কৃষির যতই উন্নয়ন করা হোকনা কেন, দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা সমাধানের প্রকৃত উপায় হল পরিকল্পিত শিল্পোন্নয়ন। একমাত্র শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমেই, উন্নততর আর্থিক অবস্থা এবং জীবন ধারণের উচ্চতর মান অর্জন করা যেতে পারে। শিল্প বিপ্লব হয়তো দেশের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে একটা অন্যায়—কিন্তু এটা প্রয়োজনীয় অন্যায় এবং অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে এই অন্যায় আমাদের মেনে নিতে হবে।"

জাতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি পরিস্কারভাবে কতকগুলি নীতি স্থির করে দেন। সেগুলি ছিল :—

১। আমাদের প্রধান প্রয়োজনগুলির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব,

২। আমাদের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার, ধাতু উৎপাদন, মেসিন ও যন্ত্রপাতি, অতি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি, যোগাযোগ ও পরিবহণ শিল্প ইত্যাদির উন্নয়ন,

৩। কারিগরী শিক্ষা ও কারিগরী গবেষণা,

৪। একটি স্থায়ী জাতীয় গবেষণা পরিষদ,

৫। বর্ত্তমান শিল্প পরিস্থিতির আর্থিক পর্য্যবেক্ষণ।

এইসব মূল নীতিগুলির ভিত্তিতে তিনি সংক্ষিপ্তভাবে কর্মসূচী ও কর্ম পরিচালনারও উল্লেখ করেন।

১। প্রত্যেকটি প্রদেশের আর্থিক অবস্থা পরীক্ষা করে দেখতে হবে,

২। দুই তরফেই যাতে একই রকম কাজ না হয় তা প্রতিরোধ করার জন্য কুটির শিল্প ও বৃহদায়তন শিল্পের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় রাখতে হবে ;

৩। শিল্পগুলিকে আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

৪। ভারতে এবং বিদেশে পাঠিয়ে ছাত্রদের কারিগরী শিক্ষা দিতে হবে।

৫। কারিগরী গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। শিল্পায়ণের সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞগণের একটি কমিটি গঠন করতে হবে।

সুতরাং সুভাষ চন্দ্র বসুকেই প্রকৃতপক্ষে ভারতের পরিকল্পনার জনক বলা উচিত। শিগগীরই পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয় এবং জওহর লাল নেহেরুকে এর সভাপতি হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়। সেই আমন্ত্রণ তিনি সাদরে গ্রহণ করেন। আমি কয়েক মাসের জন্য এই কমিশনের সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করি কিন্তু পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে পদত্যাগ করি।

এর পরে পরলোকগত অধ্যাপক কে. টি. শাহ ছয় বছরের বেশী সময় ধরে পরিকল্পনা কমিটির সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেন। ২০টি বা তার বেশী গ্রন্থে, অবিভক্ত ভারতের জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে তিনি যে সব বিবরণী তৈরী করে গেছেন তা সকলেই জানেন। এই সব বিবরণী দিয়ে অবশ্য জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং তাৎপর্য্য পরিমাপ করা যায়না। তবে জীবন ধারণের মান দ্রুত উন্নতির পথে নিয়ে যেতে, দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্ত্তন করা যে অত্যন্ত প্রয়োজন এবং পরিকল্পনার মাধ্যমে তাতে কৃতকার্য্য হওয়া যে সম্ভব, সে সম্পর্কে এই বিবরণীগুলি সমগ্র দেশে ব্যাপক উৎসাহ ও ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করে।

কাজেই স্বাধীনতা অর্জনের পর নেহরু সরকার যে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন, জাতীয় পরিকল্পনা কমিটিকে তার পূর্বসূরী বলা যায়। এখানে হয়তো এ কথাটাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯৩৮ সালে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন এবং ১৯৫০

সালে পরিকল্পনা কমিশন গঠনের মধ্যে, বৃটিশ সরকারের অধীনস্থ ভারত সরকার, ১৯৪৪ সালের জুন মাসে, বড়লাটের কার্য্যনির্বাহক পরিষদের একজন পৃথক সদস্যের অধীনে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের সৃষ্টি করেন। ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের নেতৃত্বে, ভারত সরকার, (অন্তর্বর্ত্তীকালীন যে সরকারে জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস প্রতিনিধিগণ এবং মুসলীম লীগ যোগ দেন) একটি পরামর্শদাতা পরিকল্পনা বোর্ড নিযুক্ত করেন। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ এই দুটি দলই মৌলিক বিষয়গুলি সম্পর্কে অত্যন্ত পরস্পর বিরোধী মনোভাব অবলম্বন করায়, পরামর্শদাতা বোর্ড বিশেষ কিছু কাজ করতে পারেনি।

দেশের সম্পদ উপযুক্তভাবে ব্যবহার ক'রে, উৎপাদন বাড়িয়ে এবং সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সকলকে, কর্মসংস্থানের সুযোগ দিয়ে জনগণের জীবন ধারণের মান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উন্নততর করা সম্পর্কে ভারতের সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করার পর, সরকার ঘোষিত লক্ষ্য পূরণ করার উদ্দেশ্যে, দুই মাস পরেই ভারত সরকারের একটি প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৫০ সালের ১৫ই মার্চ পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়।

সাধারণ মানুষের ওপর বিপুল বোঝা চাপিয়ে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত করার পর জাতির মোটামুটি সম্পদ কিছুটা পরিমাণে বেড়েছে। কিন্তু খেটে খাওয়া বিপুল জনসংখ্যার জীবন ধারণের মান হয়েছে নিম্নাভিমুখীন এবং তাদের জীবনে রয়েছে নিরাপত্তাবোধের অভাব। পরিকল্পনার আকার বড় হতে থাকলেও, সাধারণ মানুষ সেই অনুযায়ী লাভবান হননি। প্রথম পরিকল্পনায় জনপ্রতি আয় বেড়েছে শতকরা ২ ভাগ, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শতকরা ১।। ভাগ এবং তৃতীয় পরিকল্পনার সময়ে তাই থেকে গেছে।

ভূমি স্বত্ব সংস্কার সম্পর্কিত আইনগুলি একদিকে যেমন অস্পষ্ট তেমনি রূপায়ণেও ফাঁকি থাকায় গ্রামের দরিদ্র অধিবাসীরা সামান্য ন্যায়বিচার পেয়েছে। জমি যে চাষ করবে তারই জমির মালিক হওয়া উচিত, এই উদ্দেশ্যে যে, প্রজাস্বত্ব আইনগুলি প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলি বাঞ্ছিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি। তেমনি ভূমির সমবন্টণের উদ্দেশ্য নিয়ে সর্বোচ্চ পরিমাণ জমির যে আইন তৈরি করা হয় তাও লক্ষ্য পূরণ করতে পারেনি। সম্পত্তি ও মর্যাদার ওপর জোর দিয়ে যে সাহায্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় সেগুলি ধনী শ্রেণীরই বেশী উপকারে এসেছে তেমনি প্রশাসনিক বিলম্ব ও জটিলতা, সমাজের উচ্চশ্রেণীরই সুযোগ বাড়িয়েছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার সময়ে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি এবং সরকারের আশ্বাস সত্ত্বেও টাকার মূল্যমান হ্রাস করার পর এই বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় সাধারণ মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগ সারানোর পরিবর্তে উপশমের মতো ছিটেফোঁটা, আংশিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং কয়েকটি বড় বড় সহরে সুপার বাজার স্থাপন, সরকারের দুর্বল নীতি প্রকাশ করে দিয়েছে। একটা সংহত মূল্য নীতির অভাবের প্রত্যক্ষ ফল হ'ল মূল্যের এই উর্দ্ধগতি। অত্যাবশ্যকীয় জিনিস, বিশেষ করে শিল্পজাত জিনিসগুলির বাজার দরের সঙ্গে উৎপাদন ব্যয়ের কোন সম্পর্ক নেই। ব্যবসায়ীদের বিপুল লাভ এবং অত্যাবশ্যকীয় জিনিসগুলির ওপর বিপুল কর অবস্থাকে আরও খারাপ করে তুলেছে।

কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি, পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হলেও কার্য্যক্ষেত্রে, সহর ও গ্রামাঞ্চলে বেকারের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বেড়েছে।

যদি অর্থনৈতিক পরিকল্পনাই সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা স্থাপনের উপায় বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে পরিকল্পনায় শীর্ষের পরিবর্তে প্রধানত: মূলে জোর দিতে হয়। যে জেলা প্রশাসন জনসাধারণের খুব কাছাকাছি থাকে এবং যার একটা গণতান্ত্রিক ভিত্তি আছে, তাকেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মূল সংস্থা হিসেবে ধরতে হবে। এদের নির্দেশ অনুযায়ী,-নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ভূমি স্বত্ব সংস্কার সম্পর্কিত কর্মসূচীগুলি রূপায়িত করা উচিত। উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে এর নিকট সম্পর্ক থাকা উচিত যাতে ভূমি স্বত্ব সংস্কারের সঙ্গে পুনর্গঠনের কাজের কার্য্যকরী সমন্বয় থাকে। ঋণ ও কারিগরী সাহায্য একই সঙ্গে চলা উচিত। মর্য্যাদা ও সম্পত্তির মাপকাঠির পরিবর্তে প্রয়োজন এবং সম্প্রসারিত ব্যবহার ক্ষমতার মাপকাঠি অনুযায়ী ঋণ দেওয়া উচিত। সাহায্য দেওয়ার সময় অবহেলিত ও নিপীড়িত শ্রেণীগুলির পুনর্ব্বাসনের প্রশ্নটিই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত। উন্নয়নমূলক কর্মপ্রচেষ্টায় গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির একটা তাৎপর্য্যপূর্ণ ভূমিকা থাকা উচিত এবং সেগুলির ওপরেই সেবা ও কর্তৃত্বের ভার দেওয়া উচিত।

অন্য আর একটি ক্ষেত্র, যেটি সম্পর্কে চতুর্থ পরিকল্পনায় বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত তাহ'ল সরকারি তরফ। সামান্য কয়েকটি সংস্থা ছাড়া সরকারি তরফের শিল্পগুলির পরিচালনা সম্পর্কে এতো বদনাম রয়েছে যে তা, রাষ্ট্রীয়করণের ধারণাকেই উপহাসাস্পদ করে তুলেছে। সরকারি তরফ বলতে অনেকে সেগুলিকে দুর্নীতি, স্বজনতোষণ, করদাতাদের অর্থের অপব্যয়, অযোগ্যতা ও বিশৃঙ্খলার কেন্দ্র বলে মনে করেন। রাষ্ট্রীয়করণের অর্থ যদি সরকারিকরণ ও কর্মচারীতন্ত্র হয় তাহলে তা সমাজতন্ত্রের প্রহসন হয়ে দাঁড়াবে।

বর্ত্তমানে দেশে যে সামাজিক অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা রয়েছে তাতে সরকারি তরফের সংস্থাগুলির সংশোধন কষ্টসাধ্য একথা, জনগণের ওপর বিশ্বাস রেখে, অসঙ্কোচে প্রকাশ করা বা না করা পরিকল্পনা রচয়িতাদের ওপরেই নির্ভর করছে। তাঁরা যদি মনে করেন যে ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব নয় অথবা অদূর ভবিষ্যতে অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়ার সম্ভাবনা নেই তাহলে জাতির স্বার্থেই পরিকল্পনা কমিশনের, সরকারি তরফের ভবিষ্যত সম্প্রসারণ বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এতে বিনিয়োগের পরিমাণ অত্যন্ত বিপুল বলে সম্মান রক্ষার খাতিরেই শুধু এগুলোর সম্প্রসারণ করা উচিত নয়। তবে সংশোধনের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা

১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

চতুর্থ পঞ্চবর্ষীয় পরিকল্পনায় অর্থসংস্থানের কয়েকটি দিক

সুব্রত গুপ্ত
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

চতুর্থ পরিকল্পনার অর্থ সংস্থানের জন্য কর ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ও বিভিন্ন করের সুসংহত ও সুসমঞ্জস প্রয়োগ প্রয়োজন। যাতে বিত্তহীন এবং নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর ওপর করের বেশী বোঝা না চাপিয়েও রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হয়।

খসড়া চতুর্থ পঞ্চবর্ষীয় পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে মোট ১৪,৩৯৮ কোটি টাকা এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে মোট ১০,০০০ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। আর্থিক ভারসাম্য না থাকলে কোনোও পরিকল্পনার সাফল্য সুনিশ্চিত হয় না। পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান অধ্যাপক গাডগিল চতুর্থ পরিকল্পনার যে খসড়া প্রস্তুত করেন তাতে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সুষ্ঠু কাজকর্ম, ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি (বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে), অতিরিক্ত কর ধার্য (বিশেষ করে গ্রামীণ আয় এবং শহরাঞ্চলের সম্পত্তির উপর) প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনা প্রণয়ন করার প্রস্তুতিপর্বেই বৈদেশিক সাহায্যের প্রাপ্তি যোগ্যতা এবং ঘাটতি অর্থসংস্থানের গুরুত্বের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা বিশেষভাবে অনুভব করা গিয়েছিল তৃতীয় পঞ্চবর্ষীয় পরিকল্পনার শেষ বছরে। তৃতীয় পরিকল্পনার পর চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম খসড়াটি যে পরিত্যক্ত হয়েছিল তারও অন্যতম কারণ ছিল বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে অনিশ্চয়তা। এই অনিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও চতুর্থ পরিকল্পনায় ২,৫১৪ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাবে বলে ধরা হয়েছে। রেলওয়ে সমেত সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ১,৭৩০ কোটি টাকা, চলতি কর ব্যবস্থা থেকে ২,৪৫৫ কোটি টাকা বাজারে ঋণপত্র ছেড়ে ১,১৬৬ কোটি টাকা, ক্ষুদ্র সঞ্চয় বাবদ ৮০০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য নীট মূলধনী আয় বাবদ ১,১৩০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে বলে ধরা হয়েছে। এই ব্যবস্থাগুলি পর্যাপ্ত বিবেচিত না হওয়ায় অতিরিক্ত রাজস্বের মাধ্যমে ২,৭০৯ কোটি টাকা সংগ্রহ করার কার্যসূচী গৃহীত হয়েছে এবং তার পরেও ৮৫০ কোটি টাকার ঘাটতি অর্থসংস্থান ধরা হয়েছে।

প্রথমেই অতিরিক্ত কর ধার্য করে আরও কতটা রাজস্ব সংগ্রহ করা সম্ভব, দেখা যাক। ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সূত্রে সমগ্রভাবে কর ব্যবস্থা থেকে যে রাজস্ব আদায় হয় তার শতকরা ৭৫ ভাগই আসে পরোক্ষ কর থেকে। এদিকে প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় এখনও অনেক পরিবর্তনের অবকাশ আছে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে আরও রাজস্ব আদায় করার যে যথেষ্ট সুযোগ আছে সে সম্পর্কে কোন দ্বিমত থাকা উচিত নয়। বর্তমানে আমাদের জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে কৃষিগত আয় শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি। কিন্তু মোট রাজস্বে কৃষির অংশ মাত্র শতকরা ২৭ ভাগ। ভারতে কৃষিক্ষেত্রে এবং অ-কৃষি ক্ষেত্রে করের বোঝা সমান নয়। জনপ্রতি পরোক্ষ করের বোঝা কৃষি ক্ষেত্রের তুলনায় অ-কৃষিক্ষেত্রে অনেক বেশি। ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা সাম্প্রতিককালে হয়েছে। ১৯৬৯-৭০ সালের বাজেটে সম্পদ কর কিছু পরিমাণে কৃষিগত সম্পদের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত। তবুও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে ভূমি রাজস্ব বাবদ যে অর্থ সংগৃহীত হওয়া উচিত ছিল, অথবা গ্রামীণ আয়ের যতটা করের মাধ্যমে, সংগ্রহ করা উচিত ছিল ততটা করা সম্ভব হয়নি। ১৯৬৭-৬৮ সালে ভারতের জাতীয় আয় যে শতকরা ৯ ভাগ বেড়েছিল, তার মধ্যে শতকরা ৭ ভাগ ছিল কৃষিসূত্রে। গ্রামাঞ্চলে এমন সঙ্গতিসম্পন্ন জোতদার এখনও আছেন যাঁদের উপর যতটা কর ধার্য করা উচিত ছিল ততটা করা হয়নি। আমাদের দেশে কৃষিগত আয় কর ভালোভাবে কার্যকর হয়নি এবং ঐ ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করার জন্যই প্রগতিশীল হারে ভূমি কর ধার্য করা উচিত। পক্ষান্তরে বলা চলে সম্পদ কর আরও সম্প্রসারিত ক'রে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাটি তার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। যেমন বাণিজ্যিক বা অর্থকরী শস্য উৎপাদন করা হয় এই জাতীয় জমি যদি কেউ পাঁচ একরের বেশি হাতে রাখেন তবে তার জন্য অতিরিক্ত কর ('সারচার্জ') ধার্য করেও কিছু রাজস্ব আদায় করা যেতে পারে। কৃষিক্ষেত্রে বেশি করে কর ধার্য করার রাজনৈতিক দিকটি অনেকেই উপেক্ষা করতে পারেন না। কোন কোন রাজ্যে দেখা গেছে দলীয় স্বার্থে ভূমি রাজস্বের পরিমাণ বাড়াবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা চালানো হয়নি। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এবং আর্থিক ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা দলীয় স্বার্থ বজায় রাখার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তা উপেক্ষা করলে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির হার দ্রুত হবে না।

মোট কথা চতুর্থ পরিকল্পনায় ২,৭০৯ কোটি টাকার অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়। কিন্তু সেজন্য চাই একটি বলিষ্ঠ কর নীতি। কালো টাকা জমানো এবং কর ফাঁকি বন্ধ করে রাজস্বের পরিমাণ আরও বাড়ানোর জন্য কর ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস এবং বিভিন্ন করের সুসংহত ও সুসমঞ্জস প্রয়োগ প্রয়োজন। বিত্তহীন এবং নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর ওপর বেশি বোঝা না চাপিয়েও রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব। গ্রামাঞ্চলে কৃষকরা সবাই যে একেবারে দুঃস্থ তা নয়; এবং শহরাঞ্চলে করদাতাদের মধ্যে যাঁরা চাকুরীজীবী তাঁদের

তুলনায় গ্রামের সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষকদের আনুপাতিক কর প্রদান-ক্ষমতা (গড়পড়তা) অপেক্ষাকৃত বেশি বলেই অনেকে মনে করেন। শহরাঞ্চলে যাঁরা প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী তাঁদের উপরে আরও কর ধার্য করা যায় কি না তাও বিচার্য।

সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির 'না লাভ না ক্ষতির নীতি' এখন পরিত্যক্ত হয়েছে। আশা করা যায় সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্বৃত্তের পরিমাণ চতুর্থ পরিকল্পনাকালে বাড়বে। রেল চলাচল ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের কাজ বহুদূর এগিয়ে গেছে। এখন রেল কর্তৃপক্ষের দেখা উচিত অনুৎপাদনমূলক ব্যয়ের পরিমাণ যতদূর সম্ভব কমিয়ে উদ্বৃত্তের পরিমাণ বাড়ানো। গত তিন বছর ধরে ভারতীয় রেল ব্যবস্থার আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল যায় নি। চতুর্থ পরিকল্পনায় উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর জন্য বরাদ্দ রেখেও যাতে রেলও বর উদ্বৃত্তের পরিমাণ বাড়ানো যায় তার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। জীবনবীমা কর্পোরেশনের মুনাফার পরিমাণ বেড়েছে এটাও নিঃসন্দেহে আশার কথা। কিন্তু জীবনবীমা কর্পোরেশনের মুনাফা যাতে ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে এবং কর্ম সংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিকারী প্রকল্পগুলিতে আরও বেশী ক'রে বিনিয়োজিত হয়, সেজন্য বিনিয়োগ নীতির প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। জাতীয়করণের পর সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলির আমানত বেড়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনার অর্থসংস্থানে এই ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি থেকে ১৫০০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে বলে ধরা হয়েছে এবং তার মধ্যে ৫০০ কোটি টাকা কৃষির উন্নতির জন্য বিনিয়োগ করা হবে বলে স্থির হয়েছে। স্টেট ব্যাঙ্কের ভূমিকাও এ ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক। 'সবুজ বিপ্লবের' পরিপ্রেক্ষিতে কৃষিক্ষেত্রে, বিশেষ করে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করার পথে এগিয়ে চলতে গেলে গ্রামীণ অর্থনীতির বুনিয়াদ আরও সুদৃঢ় করতে হবে এবং সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির দায়িত্ব অপরিসীম। এই ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে গ্রামাঞ্চলে আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণের মাধ্যমে গ্রামীণ সঞ্চয় সুসংহত করা সম্ভব।

বৈদেশিক সাহায্যের অনিশ্চয়তা

সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা বিদেশ থেকে বিভিন্ন ধরণের মূলধন পেয়ে থাকি। ঋণ ('লোন') এবং মঞ্জুরী সাহায্য ('গ্রান্ট') এক জিনিস নয়। আবার এক ধরণের বৈদেশিক ঋণ আছে যা শোধ করতে হবে ভারতীয় মুদ্রায় (যেমন পি. এল. ৪৮০ অনুযায়ী পাওয়া বৈদেশিক ঋণ)। আবার অনেক ঋণ আছে যেগুলি বিশেষ বিশেষ প্রকল্পের জন্য (প্রজেক্ট লোন) সুনির্দিষ্ট করা থাকে। বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যা হচ্ছে একাধিক। প্রথম সমস্যা হচ্ছে, যে ঋণ অথবা সাহায্য গ্রহণ করা হচ্ছে তার সদ্ব্যবহার করা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত ঋণ, সাহায্য, পি এল. ৪৮০ অনুযায়ী ঋণ সব মিলিয়ে বিদেশ থেকে মোট ৬,১১৯ মিলিয়ন ডলার পাবার অনুমোদন পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যে ভারত মাত্র ৩,৪২৮ মিলিয়ন ডলার গ্রহণ এবং ব্যবহার করতে পেরেছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় অনুরূপ ৬১৬৮ মিলিয়ন ডলার অনুমোদিত হয়েছিল এবং তার মধ্যে ৬০২৪ মিলিয়ন ডলার ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৯৬৬-৬৭ সালে মোট বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ অনুমোদিত হয়েছিল ২,১৩২ মিলিয়ন ডলার, তার মধ্যে গৃহীত এবং ব্যবহৃত হয়েছিল ১৫০৬ মিলিয়ন ডলার। অবশ্য ১৯৬৬-৬৭ সালের অনুমোদিত মূলধনের কিছুটা ১৯৬৭-৬৮ সালে ব্যবহৃত হয়েছিল, তাই ১৯৬৭-৬৮ সালে ৯৪৮ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ বাবদ অনুমোদিত হলেও ব্যবহৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ১৫৪৮ মিলিয়ন ডলার।•

চতুর্থ পরিকল্পনায় নীট বৈদেশিক সাহায্য এবং ঋণের পরিমাণ ২,৫১৪ কোটি টাকা হবে কিনা এখনই বলা সম্ভব নয়। হয়ত বা তা সম্ভবও হতে পারে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, সদস্য দেশগুলিকে বৈদেশিক মুদ্রা তুলে নেওয়ার বিশেষ অধিকার (Special Drawing Rights) দেবার যে নীতি গ্রহণ করেছে সেই অনুযায়ী আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারে ভারতের কোটার পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ বেড়ে গেছে। এই বিশেষ অধিকার অনুযায়ী সম্প্রতি ভারতের জন্য অতিরিক্ত ১২৬ মিলিয়ন ডলার (৯৪.৫ কোটি টাকা) বরাদ্দ করা হয়েছে। ভারতকে সাহায্য প্রদানকারী সংস্থাও (ইড্ ইণ্ডিয়া ক্লাব) চতুর্থ পরিকল্পনাকালে সঠিক কতটা সাহায্য দিতে পারবে সে সম্পর্কে এখনও কোন সুনিশ্চিত আশ্বাস পাওয়া যায় নি। তবুও আশা করা যায় শেষ পর্যন্ত হয়ত আড়াই হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য পাওয়া যাবে। বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করার দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে সেই ঋণ পরিশোধ করা সম্পর্কে। উপযুক্ত পরিমাণ রপ্তানি না বাড়াতে পারলে বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় করার প্রচেষ্টা সফল হতে পারবে না। হাতে উপযুক্ত পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চিত তহবিল না থাকলে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হবে না। তা ছাড়া পি. এল. ৪৮০ অনুযায়ী ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে সাহায্য পেয়ে থাকে তা ভারতীয় মুদ্রায় শোধ করতে হয় এবং সেই মুদ্রা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফে ভারতেই ব্যয় করার সংস্থান আছে। ফলে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সম্প্রতি খুসরু কমিটিও অনুরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তাই বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে দিয়ে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধির উপর আরও বেশি গুরুত্ব আরোপ করা সমীচীন।

চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য অনুযায়ী জাতীয় আয়ের শতকরা ১২ ভাগ সঞ্চয় করা আমাদের পক্ষে এখনও সম্ভব হয়নি। জাতীয় আয়ের শতকরা ৮ ভাগ থেকে ৯ ভাগ সঞ্চয় করেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। কর ব্যবস্থা থেকে যে রাজস্ব পাওয়া যাচ্ছে এবং বিদেশ থেকে যে ঋণ ও সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে তাও পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। তাই শেষ পর্যন্ত ঘাটতি অর্থ সংস্থানের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের কাছে বিকল্প পন্থা ছিল না।

প্রথম পরিকল্পনার প্রথম আড়াই বছর ঘাটতি অর্থসংস্থানের আশ্রয় নেওয়া হয়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রথম পরিকল্পনায় মুদ্রার পরিমাণ বেড়েছিল শতকরা ১৪ ভাগ। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট মুদ্রার পরিমাণ বেড়েছিল যথাক্রমে শতকরা

৩১ পৃষ্ঠায় দেখুন

নগরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ নীতি

আশীষ বসু
ইনস্টিটিউট অফ ইকনমিক গ্রোথ, নূতন দিল্লী

একটি জাতীয় সমীক্ষা অনুযায়ী, ভারতে, শহরবাসী জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ জন তাঁদের মোট আয়ের ৭০ শতাংশ ব্যয় করেন আহারের সংস্থানে। অতএব আবাসের ব্যবস্থা করতে হয় আয়ের অবশিষ্ট ৩০ শতাংশ থেকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দিল্লী নগরীতে যে ব্যক্তির মাসিক উপার্জন ২০০ টাকা, তাঁকে আহার ও বাসস্থান বাবদ ব্যয় করতে হয় ১৪০ টাকা। অর্থাৎ ব্যয়ের লাগাম টানতে হয় বাড়ীর ব্যাপারে, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণামস্বরূপ, সেই ব্যক্তিকে অননুমোদিত কলোনীর বাজেবাজে বাড়ী বা বস্তীতে আশ্রয় নিতে হয়।

১৯৬৪-৬৫ সালের মিউনিসিপ্যাল রেকর্ড আধার ক'রে ১৯৬৭ সালে দিল্লীতে বাড়ীভাড়ার হার সম্পর্কে এক সমীক্ষা নেওয়া হয়। তার থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হল—দিল্লী এককালে ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শহর আর এই শ্রেণী আজ বিলুপ্তপ্রায়। গত ১৫ বছরে প্রাসাদ ও বস্তীর ব্যবধান ক্রমশ: প্রশস্ত হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যময়। কারণ বিলাসগৃহ বহুল কলোনী ও ক্রমশ: বিস্তারশীল অননুমোদিত কলোনী, আবাস গৃহের মধ্যবর্তী পর্যায়টি, নির্মূল ক'রে বৈষম্য আরও বাড়িয়ে তুলবে। তবে, তারই মধ্যে, আমাদের "সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার" সমাধিস্থলটুকু অবশ্যই "সংরক্ষিত" থাকবে।'

এই সমীক্ষায় আর একটি তথ্য লক্ষণীয়। (নগর ভারতের প্রতীক হিসেবে দিল্লীর উদাহরণ দিচ্ছি) দিল্লীর সমৃদ্ধ কলোনীগুলির বিলাস গৃহগুলির গড়পড়তা ভাড়া হ'ল মাসে এক হাজার টাকার ওপর। এই সব আবাসগৃহের অধিকাংশ যখন অর্থবান ভাড়াটিয়ার প্রতীক্ষায় তালাবদ্ধ, তখন লক্ষ লক্ষ লোক ছোট বা মাঝারি, নানান বেসরকারী কলোনীর অস্বাস্থ্যকর বাড়ীর কোনোও এক অংশে মাথা গোঁজবার ঠাঁই পেলেই তৃপ্ত। এই সব কলোনীতে বাড়ী তৈরি করার সময়ে পৌরকর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেওয়া দূরের কথা, বহুক্ষেত্রে, বাড়ী তৈরির সময়ে পৌরগৃহনির্মাণের নীতিনিয়ম বা নির্দিষ্ট মানও অগ্রাহ্য করা হয়।

মোট কথা, পরিকল্পনা প্রণেতারা মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ভোগী জনগণের গৃহসমস্যার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিবেচনা করেন নি, যদিও প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে গৃহনির্মাণ সমস্যার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। পরিকল্পনাগুলির মূলে যে মনোভাব আছে তা হ'ল, 'জনসাধারণের নিজস্ব বাড়ী থাকা দরকার এবং নিম্নআয়ভোগীদের স্বগৃহ নির্মাণে সরকারী অর্থসাহায্যের সংস্থান রাখা দরকার।' নিম্নবিত্তদের কাছে বাড়ীর জন্য জমি বা (কম খরচে তৈরি) বাড়ী বিক্রী ক'রে গৃহসমস্যার সমাধান সম্ভব, এটা অবাস্তব কথা। গৃহনির্মাণ সমস্যার সঙ্গে জড়িত অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট, যে, বর্তমান অবস্থায় নিম্নআয়সম্পন্ন জনগণের কাছে জমি বা বাড়ী বিক্রীর প্রস্তাব কার্যকর হতে পারে না। যেটা কার্যত: সম্ভব এবং বাস্তবানুগ, তা হ'ল সরকারী তরফে গৃহ নির্মাণ ব্যবসার সূত্রপাত করা এবং এক কামরা বা দুই কামরা বিশিষ্ট বহুতল বাড়ী তৈরি করে সেগুলি নিম্নবিত্তদের, কম ভাড়ায় দেওয়া।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়ায় বলা হয়েছে যে, 'সরকারী তরফে গৃহনির্মাণ প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এ যাবৎ যেটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করা গিয়েছে তা হ'ল এককভাবে, প্রত্যেকটি গৃহনির্মাণের জন্য, যে ব্যয় হয় তার পরিমাণ অত্যধিক এবং সরকারী প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ সমস্যার অংশ মাত্রের সমাধানও সাধ্য নয়।' তা ছাড়া আরও বলা হয়েছে যে, 'গৃহ নির্মাণের উপকরণগুলি নির্দিষ্ট নক্সার ছকে ফেলে, ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সেগুলির উৎপাদনে বেসরকারী তরফের উদ্যোগী হওয়া উচিত।' আমি এ প্রস্তাব অনুমোদন করি না। সরকার যদি হোটেল ব্যবসা খুলতে পারেন কিংবা কেক বিস্কুট রুটি তৈরির ব্যবসায়ে নামতে পারেন, তাহলে সাধারণ নরনারীর গৃহসমস্যার মত একটা মৌল প্রয়োজন উপেক্ষা ক'রে বেসরকারী তরফের অনুকম্পা বা দাক্ষিণ্যের প্রত্যাশায় তাঁদের ফেলে রাখবেন এটা অযৌক্তিক। নগরবাসীর আয়ের সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়ার প্রস্তাব সঙ্গত হতে পারে, যদি, (ক) সরকার ব্যাপক-গৃহ-নির্মাণ-প্রকল্প রূপায়ণে প্রবৃত্ত হন, (খ) আবাসিক বিলাস গৃহ নির্মাণ নিষিদ্ধ ক'রে দেন, (গ) মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের সুলভ ভাড়ায় বাড়ী দেবার উদ্দেশ্যে বহু সংখ্যায় সাধারণ বাড়ী তৈরি করেন এবং (ঘ) ইস্পাত, সিমেন্ট, কাঠ, কাঁচ ও ইঁট প্রভৃতি সম্পদের সবকটি উপকরণ তৃতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সদ্ব্যবহার করেন। এই প্রস্তাবের বাস্তবতার উদাহরণ ছড়িয়ে আছে হংকং, সিঙ্গাপুর ও অন্যান্য শহরে। অর্থাৎ সাদা কথায় বলতে গেলে, সর্বাগ্রে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ভোগীদের জন্য গৃহনির্মাণ নীতির যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে তা সংক্ষেপে বিবেচনা করে দেখা যাক। ১৯৪৯ সালে শিল্পশ্রমিক গৃহনির্মাণ সূচী প্রণয়ন করা হয়। তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারগণকে অথবা রাজ্য সরকারগণের অনুমোদন সাপেক্ষে বেসরকারী নিয়োগকারী বা মালিকদের সুদবিহীন ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়। বেসরকারী হাতে ঋণ দেওয়ার প্রাক সর্তে বলা হয়েছে' যে, ঋণের অর্থ দিয়ে তৈরি বাড়ীর ভাড়া, মূলধনী ব্যয়ের শতকরা সাড়ে বারো ভাগের বেশী হওয়া চলবে না অর্থাৎ শ্রমিকের মজুরীর দশ শতাংশের বেশী হওয়া চলবে

না এবং সে ক্ষেত্রে বাড়ী তৈরির মোট ব্যয়ে মালিকের অংশ হবে তিন শতাংশ। ১৯৫২ সালে, একটা নতুন নীতি ঘোষণা করা হয় তাতে বলা হয় যে, কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিকদের জন্য গৃহ নির্মাণসূচী রূপায়ণে জমির দাম সমেত বাড়ী তৈরির পুরো খরচের শতকরা ২০ ভাগের সমান অর্থ সাহায্য দিতে প্রস্তুত, যদি, মালিকরা খরচের বাকিটা বহন করেন এবং পূর্ববর্তী প্রকল্পে, প্রস্তাবিত হারে, প্রকৃত শ্রমিকদের কাছে ঐ বাড়ীগুলি ভাড়া দেন।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সুপারিশ করা হয় যে, ঐ ধরনের প্রকল্পের জন্য জমির দাম সমেত বাড়ী তৈরির পুরো খরচের অর্ধেক কেন্দ্রীয় তরফ থেকে সরকারকে দেওয়া উচিত। পরিকল্পনায় এ কথাও স্বীকার করা হয় যে, এখনও বহুকাল গৃহনির্মাণের অধিকাংশ দায়িত্ব বেসরকারী তরফের ওপর ন্যস্ত থাকবে। ১৯৫৪ সালে নিম্ন-আয়ভোগীদের গৃহনির্মাণ প্রকল্পের অবতারণা করা হয়, যাতে, বছরের মোট উপার্জন যাঁদের ৬ হাজার টাকার মধ্যে, তাঁদের ন্যায় সঙ্গত সুদে দীর্ঘমেয়াদী গৃহনির্মাণ ঋণ দেবার সংস্থান রাখা হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়, বাড়ী তৈরিতে আগ্রহী নিম্নবিত্তদের বিক্রীবাবদ জমি তৈরি করার জন্য রাজ্য সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের অর্থ সাহায্য দেবার নীতি গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে জীবন বীমা কর্পোরেশন নিজেরা থাকবার বাড়ী তৈরির জন্য মধ্যবিত্তদের এবং অল্প বেতনভোগী কর্মচারীদের ভাড়া দেবার উপযোগী বাড়ী তৈরির জন্য রাজ্য সরকারদের ঋণ দিতে সুরু করে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়, নগরাঞ্চলে জমির দাম নিয়ন্ত্রণের সমস্যার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মৌরসীসত্ব জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে 'ক্যাপিট্যাল ট্যাক্স' আরোপ, নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে (জল ও বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা আছে এমন তৈরি জমিতে) বাড়ী না করলে খালি জমির জন্য খাজনা আদায় এবং প্রত্যেক জমি বা প্লটের সর্বোচ্চ আয়তন স্থির করা এবং কোনোও এক ব্যক্তি বা পক্ষকে সর্বাধিক কটি 'প্লট' দেওয়া যেতে পারে তার সংখ্যা নির্দিষ্ট করার কথা উল্লেখ করা হয়।

সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ হিসেবে কিংবা অন্য কথায় সমাজতান্ত্রিক ভাবনার চরম লক্ষ্য হ'ল শহরে আয় ও সম্পদের সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া।

যদি জমির দাম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রস্তাবগুলি যথাযথভাবে কাজে পরিণত করা হত তাহলে গৃহসমস্যা আজকের দিনের মত উৎকট হয়ে উঠত না।

বর্তমানে জমি সংক্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হ'ল বাড়ীর জন্য জমি তৈরি করলেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে এই ভাবটা। বাড়ী তৈরির প্রশ্নটা তোলাই রইল। উদাহরণতঃ উল্লেখ করা যায় ডি. ডি. এ. (দিল্লী ডেভেলাপমেন্ট অথরিটি) অর্থাৎ দিল্লী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সংস্থার কথা। এদের গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনাটি রাজধানীর প্রয়োজনোপযোগী বাস্তবসম্মত গৃহনির্মাণ সূচীর ধারে কাছে আসে না। অবশ্য তর্কের খাতিরে বলা যায় যে, ডি. ডি. এ. বাড়ীর জন্য জমি তৈরি করার দায়িত্ব নেয়। বাড়ী তৈরি করার নয়। কিন্তু এই নীতিটাই তো ভুল। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, বাড়ীতে ভাড়া খাটানোর তুলনায় জমিতে টাকা লগ্নী করা ঢের লাভজনক। কারণ ইঁট, সিমেন্ট প্রভৃতি যে সব উপকরণের পরিমাণ সীমিত, সেইগুলি বড়লোকের 'প্রাসাদ' তৈরিতে লাগে বলে গৃহনির্মাণ উপকরণের দর ক্রমশঃ ঊর্ধমুখী হয়েছে। তাছাড়াও ডি. ডি. এ. উচ্চ মূল্যে জমি নীলাম করে দিল্লীতে বিলাসবহুল গৃহ নির্মাণের সুযোগ বাড়িয়েছে। বস্তুতঃপক্ষে এ কথা পুনরাবৃত্তির অপেক্ষা রাখে না যে সাধারণের জন্য আবাস গৃহের স্থানই যদি প্রকৃত লক্ষ্য হয়, তাহলে জমির দাম, বাড়ী তৈরির খরচ, জমি থেকে আয় এবং বাড়ী থেকে ভাড়া আদায়ের প্রশ্নগুলি, এখনকার মত পৃথকভাবে না ধরে, একত্রে বিচার বিবেচনা করা উচিত।

এল. কে. ঝা

৬ পৃষ্ঠার পর

দেওয়াই যদি শিল্পোন্নয়নের নীতি বলে গ্রহণ করা যায় তাহলে মূল্যস্তর অনেকদিন পর্য্যন্ত ওপরের দিকেই চলতে থাকে। আমদানি করার পরিবর্তে দেশেই সব জিনিস তৈরি করার চরম নীতি গ্রহণ করা উচিত নয়। রপ্তানীযোগ্য সামগ্রী উৎপাদনকারী শিল্পগুলি মূল্যের স্থিতিশীলতা স্থাপনে অত্যন্ত সাহায্য করে। অন্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার জন্য তাদের, উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য কম রাখতে হয় এবং তারা যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে তা দেশের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন জিনিস আমদানি করার প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়।

সংক্ষেপে বলা যায় যে; উন্নয়নের প্রতিক্রিয়া মূলতঃ মুদ্রাস্ফীতির বা ফাঁপাবাজারের বিরোধী। তবে উন্নয়নের ফলে কোন কোন অবস্থায় ফাঁপাবাজারের সৃষ্টি হতে পারে। প্রকৃত উন্নয়নের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণও প্রয়োজন এবং মূল্যের স্থিতিশীলতার জন্য তা আবশ্যক। সৃষ্ট অর্থের ফলে যদি মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায় তাহলে তা প্রতিরোধ করার উপায় হ'ল যথেষ্ট পরিমাণ মূল ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদন। যে সব প্রকল্প থেকে অল্প সময়ের মধ্যে ফল পাওয়া যেতে পারে, যে কোন পরিকল্পনায় সেই ধরণের যথেষ্ট সংখ্যক প্রকল্প থাকা উচিত। কাজেই বিনিয়োগের সমগ্র কাঠামোটাই সতর্কতার সঙ্গে তৈরি করতে হয়। মূল্য নিয়ন্ত্রণ একটা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হতে পারে, কিন্তু নিম্ন মূল্যস্তর নতুন লগ্নি আকর্ষণ করেনা। মজুদ ভাণ্ডার অন্যতম একটা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বটে, কিন্তু তার সুযোগ সুবিধেও সীমিত। যথেষ্ট পরিমাণ সংরক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রা অর্থাৎ সাধারণ একটা মজুদ অর্থ ভাণ্ডার অনেকদিক দিয়ে সুবিধেজনক। এই পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্য রপ্তানী যথাসম্ভব বাড়ানোই যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পরিকল্পনার আদর্শচ্যুতি ঘটার পথে যেসব কারণ রয়েছে সেগুলির মূলোচ্ছেদ প্রথম কর্তব্য

পরিকল্পনার সঙ্কট ও তার স্বরূপ

ধীরেশ ভট্টাচার্য্য

এ বিষয়ে বোধহয় কোনো দ্বিমত নেই যে যে-ধরণের আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলবার জন্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির সূত্রপাত হয়েছিল তার চেয়ে অনেকাংশে ভিন্ন ধরণের একটা পরিমণ্ডল এখন এ-দেশে গড়ে উঠেছে। উৎপাদন ও বন্টনের ক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য নিয়েই আর্থিক পরিকল্পনার উদ্ভব। বাস্তবে উৎপাদনের দায়িত্ব যার হাতেই থাক না কেন,—চাষী, মজুর, শিল্পপতি, রাষ্ট্রায়ত্ব কারখানার পরিচালক, এঁরা সকলেই নিজের নিজের সামাজিক দায়িত্বের কথা মনে রেখে আর্থিক ব্যবস্থাকে শুধু সীমিত লাভের উদ্দেশ্যে নয়, সামাজিক শ্রীবৃদ্ধির স্বার্থে পরিচালিত করবেন এই ছিল পরিকল্পনার মূল কথা। চারদিকে তাকিয়ে দেখলে কিন্তু এখন মনে হবে যে সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদ প্রায় কোনো স্তরে কোনো অনুভূতি জাগায় না। বৃহত্তর উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে পরিকল্পনার অংশবিশেষে নিজেদের ভাগ দাবি করাই এখন সব শ্রেণীর মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিকল্পনার সাফল্যের জন্যে যে ঐক্যবোধের প্রয়োজন তার বদলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর আত্মপরতাই এখনও সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আর্থিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুগুলিকে রাষ্ট্রীয় অধিকারে আনবার চেষ্টা করা হয়েছে। বৃহৎ শিল্পের উপর ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতিভূরা যাতে প্রভুত্ব করতে না পারে, তার জন্যে নানারকমের বিধিনিষেধ আরোপ ক'রে শিল্পে মূলধন বিনিয়োগের অবাধ অধিকার খর্ব্ব করা হয়েছে। কিন্তু এই ধরণের আইন-কানুনের ফলে শিল্পের শক্তিকেন্দ্র সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের অধিকারে চলে এসেছে এমন দাবি করা শক্ত। ব্যক্তিগত মালিকানার শক্ত ঘাঁটিগুলি যে এখনও আগের মতই শক্ত, এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আগের চেয়েও বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন, নানাভাবে অনুসন্ধানের ফলে, তা' এখন সুস্পষ্ট। শিল্পের জন্য লাইসেন্স দেবার ব্যবস্থা যে ঘোষিত নীতি ও উদ্দেশ্য থেকে অনেকাংশে বিচ্যুত, শিল্পক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বহু মধ্যবিত্ত শিল্পমালিকের হাতে ছড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টা যে বড় বড় কয়েকটি শিল্পগোষ্ঠীর ছলাকলায় সম্পূর্ণ পর্য্যদুস্ত হয়েছে, এই তথ্য এখন অবিসংবাদিত। একদিকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যদিকে সেই নিয়ন্ত্রণের বেড়া নানাভাবে এড়িয়ে যাবার প্রয়াস—এই টানাপোড়েনের মধ্যে দেশের শিল্পব্যবস্থা সামাজিক স্বার্থের অভিমুখী হয়ে গড়ে উঠবে এমন আশা করা নিরর্থক। সুতরাং গোষ্ঠীগত স্বার্থের প্রেরণায় শিল্পব্যবস্থা যে-দিকে এবং যে-গতিতে অগ্রসর হচ্ছে তাই নিয়েই আমাদের আপাততঃ সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

শুধু শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করেও এই সমস্যার সমাধান পাওয়া যাচ্ছে না। গত দুই দশকে যে-সব শিল্প রাষ্ট্রের মালিকানায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সেগুলির কর্মী ও পরিচালকদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই বোঝাপড়ার একান্ত অভাব। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের মত নয়, একথা জেনেও কর্মীদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি হতে দেখা যায় না। নূতন কোনো ভাবাদর্শের প্রেরণা তাঁদের মধ্যে যে উৎসাহ সঞ্চার করে না এর নিশ্চয়ই বিশেষ তাৎপর্য্য রয়েছে। পরিচালকদের দক্ষতা ও সততার প্রতি কর্মীদের আস্থার অভাব, পরিচালনার নীতিনির্দ্ধারণে কর্মীদের সম্পূর্ণ দায়িত্বহীনতা, এবং সাধারণভাবে আর্থিক বৈষম্যের জন্যে ক্রমশঃ পুঞ্জীভূত ক্ষোভ প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতেও সামাজিক শ্রীবৃদ্ধির আদর্শটি ঠিকভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যাচ্ছে না। পরিকল্পনাপর্বের গোড়ার দিকে মনে করা হয়েছিল রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তথা সমাজজীবনে এক নূতন গতিবেগ সৃষ্টি করবে এবং গোষ্ঠীগত বা ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রতি দৃক্‌পাত না করে সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে কাজ করবে। কিন্তু নানা স্বার্থের সংঘাতে এই রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিতে আশানুরূপ অগ্রগতি হতে দেখা যাচ্ছে না। এর মধ্যে শুধু রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানার কর্মী ও পরিচালকদের বিরোধই শুধু নয়, কারখানার স্থানীয় কর্ণধার এবং কেন্দ্রের আমলাতন্ত্রের বিরোধও জড়িত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে চলার পথে নানা বাধার উদ্ভব হচ্ছে। অন্যান্য দেশে শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিচালন-ব্যবস্থা মজবুত করার চেষ্টা হয়ে থাকে; আমাদের দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের পরিচালনার ধরণধারণ অন্যান্য শিল্পের তুলনায় প্রায় কোনো অংশেই পৃথক্ নয়। এগুলি পরিকল্পনার সঙ্কট।

এই সঙ্কটের জন্যে অনেকসময়েই দায়ী করা হয়ে থাকে এর বিভিন্ন স্তরে নিযুক্ত নানা শ্রেণীর সরকারী আমলাদের। বলা হয়ে থাকে যে পরিকল্পনার রূপায়ণে যে-সমস্ত ক্রটি দেখা যাচ্ছে তা এই আমলাতন্ত্রের গাফিলতির জন্যে; পরিকল্পনার মূল নীতির কোনো দুর্ব্বলতা এর জন্যে দায়ী নয়। কিন্তু যদি আমলাতান্ত্রিক রীতিনীতির জন্যেই পরিকল্পনার আদর্শচ্যুতি ঘটতে থাকে, তাহলে সর্ব্বাগ্রে সেই রীতিনীতির গলদগুলিকেই পরীক্ষা করে তার সংস্কার করবার চেষ্টা কি গোড়ার কথা হওয়া উচিত নয়? অনুপযুক্ত শাসনযন্ত্র নিয়ে কিছু গালভরা আদর্শের প্রশস্তি গেয়ে পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্রতী হওয়া কি পরিকল্পনা-বিশারদদের পক্ষে সমীচীন হচ্ছে? বস্তুত:পক্ষে শাসনযন্ত্রের যে ক্রটি আজ পর্য্যন্ত একেবারেই শোধরাবার চেষ্টা করা হয় নি তা হল উচ্চবর্গের প্রশাসকগোষ্ঠি এবং শাসনবিভাগীয় সাধারণ কর্মীর মধ্যে ব্যবধানকে কমিয়ে আনা। অথচ এই সাধারণ কর্মীর দায়িত্ববোধকে জাগাতে না পারলে পরিকল্পনার অনেক ক্ষেত্রেই সাফল্যের নাগাল পাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠবে। সাধারণ কর্মীর ভাল-মন্দ বোধকে একেবারে অবহেলা ক'রে বোধহয় এই অবস্থার অবসান ঘটানো যায় না। পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তরের কাজকর্মে যাঁরাই অংশগ্রহণ করবেন, তাঁদের সুচিন্তিত মতামত, তাঁদের ন্যায্য সুবিধা-অসুবিধার কথা যাতে উচ্চবর্গের শাসকগোষ্ঠির বিচার-বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করতে পারে তার ব্যবস্থা পরিকল্পনাযন্ত্রের মধ্যেই থাকা দরকার। যেমন ধরুন, পরিকল্পনাকে যদি কনিষ্ঠ কর্মচারীরা উপরের স্তরের কর্তৃপক্ষের কল্পনা-বিলাস বলে মনে করতে অভ্যস্ত হয়ে যান, তবে পরিকল্পনার সাফল্যের জন্যে কোনো দায়িত্বের অংশীদার হতে তাঁরা স্বভাবত: অস্বীকৃত হবেন। তখন তাঁদের গাফিলতিকে দোষ দিয়ে কারও কোনো লাভ হবে কি?

অতএব দেখা যাচ্ছে, পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্যে দরকার সব শ্রেণীর সরকারী কর্মীর মধ্যে পরিকল্পনার প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য জাগিয়ে তোলা। প্রধানত: দুটি পরিবর্ত্তন আনা এর জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। প্রথমত: পরিকল্পনা যাতে কোনো সরকারী স্তরেই সম্পূর্ণ উপরওয়ালার আদেশ বলে গণ্য না হয়, তার জন্যে প্রত্যেক স্তরে পরিকল্পনা-কেন্দ্র (প্ল্যানিং সেল) থাকা বাঞ্ছনীয় যাতে এই কেন্দ্রগুলিতে সংশ্লিষ্ট সকলেই যাতে নিজেদের ধারণাকে রূপ দেবার চেষ্টা করতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে পারে। দ্বিতীয়ত: সরকারী কর্মীদের বেতন ও মর্য্যাদার বৈষম্যের পুর্ণমূল্যায়ন ও পুণ-র্বিন্যাস দরকার। যোগ্যতা ও দায়িত্বের তারতম্য অনুযায়ী স্তরবিন্যাস নিশ্চয়ই থাকবে, কিন্তু নীচের স্তরে যাঁরা থাকবেন তাঁরা নিজেদের মত প্রকাশে সম্পূর্ণ বিরত থাকবেন এবং মুখ বুজে সমাজগঠনের কাজ করে যাবেন এমন আশা করা অনুচিত। সুতরাং শাসনব্যবস্থার নীচের স্তরেও যাতে দায়িত্ববোধের সঞ্চার হয় তার জন্যেই মতামত প্রকাশের সুনির্দিষ্ট কতকগুলি পথ খুলে দিয়ে দেখতে হবে প্রশাসনব্যবস্থার উপর ও নীচের স্তরের মধ্যে ব্যবধান ঘোচানো সম্ভব কিনা।

আর্থিক ব্যবধান গত দুই দশকে বেড়েছে কি কমেছে তার নি:সংশয়ে খতিয়ান করা সহজ নয়। কিন্তু পরিকল্পনার সঙ্কটকালে এ প্রশ্ন সব মানুষের মনেই জাগবে যে বর্ত্তমানে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে আহার বিহারের যে তারতম্য রয়েছে দুই দশক আগে কেউ কি ভেবেছিল যে তিনটি পঞ্চবার্ষিকী যোজনার পরও অবস্থা ঠিক এই থাকবে? আমরা ধনীকে উচ্ছেদ করার কথা কখনোই ভাবি নি, কিন্তু স্বল্পবিত্ত ও দুস্থদের অশন-বসন কিছুটা উন্নত হবে এমন আশা নিশ্চয়ই করেছিলাম। আজও আমরা ভিক্ষাকে উপজীবিকা হিসাবে বাতিল করার কল্পনাও করতে পারি না, সবচেয়ে দুর্দ্দশাগ্রস্ত বেকারদের আর্থিক সহায়তা করবার কোনো ব্যবস্থাও আমাদের নেই, সামান্য কিছু ভাতা দিয়ে নি:সম্বল বৃদ্ধদের পোষণ করার শক্তি আমরা আজও অর্জন করতে পারি নি। সেই অবস্থাতেও দেশে নানা ধরণের বিলাসদ্রব্য কেনাবেচা হতে বিন্দুমাত্র বাধা নেই, যা কিছু বাধানিষেধ শুধু বাইরের আমদানির উপর। অবস্থার পরিবর্ত্তনে সাধারণ মধ্যবিত্তের জীবিকার উপরও আঘাত পড়েছে, শুধু মুষ্টিমেয় কিছু লোকের ভোগলিপ্সা আইনসঙ্গত কিংবা আইনবিরুদ্ধ নানা উপায়ে প্রশ্রয় পাচ্ছে। যে কোনো পরিকল্পিত আর্থিক ব্যবস্থায় এই অসঙ্গতি নিতান্তই দৃষ্টিকটু। পরিকল্পনার গোড়ার দিকে বাড়তি আয়, সঞ্চয়ের পথে পরিচালিত করার কথা বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছিল, অথচ সেই বাড়তি আয় যে ভোগের জন্যে ব্যয়িত হচ্ছে তার বহু নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করার সামান্যই চেষ্টা হয়েছে। ভোগের এই তারতম্য সাধারণ লোকের মধ্যেও উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে এবং সকলেই নিজের নিজের ভোগের অংশ বাড়াবার জন্যে চেষ্টা করে চলেছে বলে বৃহত্তর কল্যাণসাধনের সামগ্রিক লক্ষ্য সিদ্ধির প্রতি কারো তেমন দৃষ্টি পড়ছে না।

দেশের দারিদ্র্য এই অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ দূরীভূত হবে কিংবা বেকারত্বের উচ্ছেদ ঘটবে, এমন আশা কেউ কখনও করেছেন কিনা জানি না। পরিকল্পনার উদ্যোক্তারা অবশ্যই জানতেন যে, তিন-চারটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের সব সমস্যা মোচন হ'বে না। দারিদ্র্য কিংবা বেকারত্ব ঘুচে যাবে, এমন আশাও কাউকে তাঁরা দেন নি। সুতরাং আমাদের আর্থিক উন্নতি অন্যান্য দেশের মত হয় নি কিংবা বেকারের সংখ্যা এখনও বেড়ে চলেছে, এই সমস্যাগুলি, আমাদের পরিকল্পনার সঙ্কটের কারণ নয়। সঙ্কটের প্রকৃত কারণ হল এই যে আমাদের ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি বিপরীত মুখে চলেছে অর্থাৎ পরিকল্পনার সঙ্গে আমরা সাযুজ্য লাভ করতে পারি নি। আমরা সামাজিক স্বার্থকে দলিত ক'রে ব্যক্তিস্বার্থকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দিয়েছি, ভোগকে সংযত করার আন্তরিক প্রয়াস করিনি, শাসনব্যবস্থাকে পরিকল্পনার স্বার্থে সংস্কার করতে উদ্যোগী হই নি। ফলে পরিকল্পনার দ্বারা আমাদের স্বার্থ-বোধের কোনো সংস্কার হয় নি—আমরা নিজেদের ভোগতৃপ্তির জন্যে নানা জিনিষ চাইতে শিখেছি কিন্তু কোন পথে গেলে দেশের ভবিষ্যতের বনিয়াদ শক্ত ক'রে গড়া যেতে পারে সেই ভাবনার অংশীদার হতে শিখি নি। এমন কি শিক্ষাবিস্তারের ফলও হয়েছে আমাদের দেশে বিপরীত। শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে স্বনির্ভরতা সৃষ্টি

শেষাংশ ৩১ পৃষ্ঠায়

ভারতে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার সাফল্য

বিশ্বনাথ লাহিড়ী
অধ্যাপক, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

লেখকের মতে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা সাধারণের সর্বনিম্ন আবশ্যকতা পূর্ণ করতে পারেনি অথবা সামাজিক ন্যায়ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সমাজের ধনী শ্রেণীই আরও বেশী ধনশালী হয়েছেন।

প্রফেসার রবিন্সের মতে প্রত্যেক অর্থনৈতিক কার্যসূচীর মূলে থাকে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা; ভাষান্তরে বলতে গেলে একটি পরিকল্পনাকে আধার করে যে কোনোও অর্থনৈতিক কর্মসূচী সুসম্পন্ন হ'তে পারে। বর্তমান যুগে প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ রূপায়িত হয় পরিকল্পনার আধারে। স্বাধীনোত্তর ভারতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে, সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য পূরণের আদর্শ নিয়ে গণতান্ত্রিক ধারায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য, একটা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলেছে। দেশ সমাজতন্ত্রের যে আদর্শ গ্রহণ করেছে তা বাস্তবে রূপায়িত করার সোপান হ'ল এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি। শুধু তাই নয়, এই আদর্শ, দেশোন্নয়নের কর্মযজ্ঞের প্রতি ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত বলে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উচচাশা পূর্ণ হওয়া সম্ভব। এই আদর্শ সমাজ ব্যবস্থায় প্রতি মানুষের নৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা ও মূল্য অক্ষুন্ন থাকবে। আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পথ প্রশস্ত করা। প্রথম পরিকল্পনার ভূমিকায় 'কল্যাণকামী রাষ্ট্র' স্থাপনের আদর্শের উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে, আমাদের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নীতি 'ব্যক্তিগত লাভের' জন্য নয় পরন্তু 'সামাজিক লাভের' জন্য। যেখানে সম্পদ, আয় ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয়র হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার সম্ভাবনা রোধ করা হবে। তৃতীয় পরিকল্পনার ভূমিকায়, লক্ষ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়েছে যে সমাজ ব্যবস্থায় সমাজের প্রতি শ্রেণীর কল্যাণ বিধান এবং জাতীয় আয় ও সম্পদ বন্টনে সমতা প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এ অবধি তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হয়েছে এবং বর্তমানে আমরা চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। এই অবস্থায় বিচার করা যাক আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির ঘোষিত উদ্দেশ্যগুলির কতটা পূর্ণ হয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক নীতির আধারে বাঞ্ছিত অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটানোর প্রচেষ্টা কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে। অর্থাৎ দেশের সার্বজনীন উন্নয়ন প্রয়াসের একটা মূল্যায়ন করা দরকার। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতির মাত্রা দ্রুত হওয়া প্রয়োজন। এ যাবৎ আর্থিক ক্ষেত্রে প্রগতি আশানুরূপ হয়নি। একশো জনের মধ্যে প্রতি ৭০ জনের জীবিকা নির্বাহের মূল ক্ষেত্র হ'ল কৃষি এবং জাতীয় আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ আসে কৃষি সূত্রে। এই ক্ষেত্রে উন্নতি পর্যাপ্ত ও আশানুরূপ হয়নি। বস্তুত: পক্ষে ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৬৪-৬৫ পর্যন্ত কৃষি উৎপাদন শতকরা ৩.৯ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি উৎপাদন কম হওয়ার জন্যই বিদেশ থেকে খাদ্য সামগ্রী আমদানি করতে হয়েছে। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে খাদ্য সামগ্রীর আমদানি ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতার অভাবের দরুণ মূল্যস্তরে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। উচচমূল্যের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সর্বসাধারণ বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত শ্রেণীকে বিপর্যস্ত করে। পরিকল্পনার আওতায় ১৫ বছরের উন্নয়ন প্রয়াসের পরও দ্রব্যমূল্য শতকরা ৫৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পক্ষেত্রেও উন্নতির পরিমাণ, পরিকল্পনার বছরগুলিতে খুব একটা উৎসাহজনক হয়নি। এই ক্ষেত্রে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। আনুপাতিক হিসেবে দেখতে গেলে প্রথম পরিকল্পনাকালে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন ৬.৩ শতাংশ হারে, বেড়েছে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ৮.৩ শতাংশ হারে এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ৮.৬ শতাংশ হারে বেড়েছে। শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার পরিমাণও দ্বিগুণভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে ফলে মূল্যের উর্ধগতি অব্যাহত থাকে। আয় ও সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে অবস্থা আশাপ্রদ নয়। পরিকল্পনার বছরগুলিতে আয় ও সম্পদ বন্টনে বৈষম্য ব্যাপকভাবে বেড়েছে এবং সম্পদ কিছু সংখ্যকের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতাও বেড়েছে। মহলানবীশ কমিটির ১৯৬৪ সালের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে উচচ আয় সম্পন্ন গোষ্ঠীর শতকরা ১০ জন ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর শতকরা ১০ জনের মধ্যে বৈষয়িক অবস্থার ব্যবধান বৃহত্তর হচ্ছে। উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেশের আর্থিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার মাত্রাও বেড়েছে। ফলিত অর্থনৈতিক গবেষণা সংক্রান্ত জাতীয় পরিষদের (ন্যাশানাল কাউন্সিল অফ এ্যাপ্লাইড ইকনমিক রিসার্চ) এক সমীক্ষায় (১৯৬১-৬২) বলা হয়েছে যে, দেশের পরিকল্পনার এগার বছর অতিবাহিত হবার পরেও সম্পদ ও আয়ের ব্যবধান সঙ্কুচিত হয়নি এবং আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের তুলনায় এই ব্যবধান অনেক বেশী। এই সমীক্ষায় আরও বলা হয়েছে যে, দেশের শতকরা ১৫টি পরিবার জাতীয় আয়ের শতকরা ৪ ভাগ ভোগ করেন। অর্থাৎ স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, পরিকল্পনার বছরগুলিতে উচচ আয়ভোগী শ্রেণী, নিজেদের অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করেছে এবং জাতীয় আয়ের অধিকাংশ ভোগ করেছে।

শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজতান্ত্রিক

নীতির আওতার মধ্যে আসেনি, ফলে সেগুলি স্বাধীনভাবে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের স্থান মজবুত করে নিয়েছে। একটি সমীক্ষা অনুসারে, ভারতের প্রথম শ্রেণীর ১০০টি কোম্পানীকে ভারতের অর্থনীতির প্রাণ কেন্দ্র বলা চলে। এর মধ্যে ১৯টি সরকারী ক্ষেত্রে ও বাকী ৮৯টি ব্যক্তিগত মালিকানায় আছে। অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংস্থার মতে দেশের প্রধান ২০০টি কোম্পানীর মধ্যে প্রথম ১০টি, দেশের উৎপাদনের ২০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। পরিকল্পনা কমিশনের অন্য একটি সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৬২-৬৩তেও দেশের মোট উৎপাদনের মধ্যে সরকারী তরফের অংশ ছিল ১৮,৪০০ কোটি টাকার এবং বেসরকারী তরফের অংশ ছিল ১৫৪,৮০০ কোটি টাকার সমান। অন্য কথায় বেসরকারী ক্ষেত্রে আর্থিক শক্তির এই বৃদ্ধিকে সার্বজনীন উন্নতি বলে গণ্য করা যায় না। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সম্পদ বৃদ্ধি ও শক্তির কেন্দ্রীকরণ দেশের সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরিপন্থী হয়ে পড়বে। তা ছাড়া কৃষি জমি এবং সহরাঞ্চলের সম্পত্তি কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হলে সামাজিক বৈষম্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

দেশে বেকার সমস্যা উত্তরোত্তর জটিল হয়ে উঠছে। প্রথম পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত বেকারের আনুমানিক সংখ্যা ছিল ৫৩ লক্ষ এবং তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে সেই সংখ্যা এক কোটিরও বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে তিনটি পরিকল্পনার শেষেও দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা স্থাপনের চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয়নি। দেশ কৃষি ও শিল্পে কিছু অগ্রগতি করেছে বটে কিন্তু দ্রব্য মূল্যের বৃদ্ধি সাধারণ মানুষকে বিহ্বল করে তুলেছে। সর্বোপরি বিভিন্ন পরিকল্পনা রচনাকালে সামাজিক যে সব লক্ষ্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে নিষ্ফল হয়েছে। এ পর্যন্ত সাধারণ মানুষ সর্বনিম্ন আবশ্যকতা পূর্ণ করতে পারে নি অথবা সামাজিক ন্যায়ও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। অপরপক্ষে সমাজে প্রতিষ্ঠিত শ্রেণী তাদের প্রতিপত্তি আরও বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। অতএব ভারতে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা এ পর্যন্ত বাস্তব হয়ে ওঠেনি এবং কতদিনে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে তা বলা কঠিন।

হীরেন মুখোপাধ্যায়

৩ পৃষ্ঠার পর

পর্যান্ত নদী পার হওয়ার কথা বলে কোন লাভ হয়না। পদ্ধতির সমস্যা যতক্ষণ পর্য্যান্ত না সমাধান করা হচ্ছে, ততক্ষণ কাজের কথা বলার কোন মানে হয়না।"

আমাদের দেশকে মনস্থির করতে হবে এবং তাড়াতাড়ি স্থির করতে হবে। পরিকল্পনাগুলি যাতে অর্দ্ধ প্রয়াসের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় পরিণত না হয় সেজন্য সেগুলিকে জনগণের প্রয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করতে হবে এবং সেগুলি রূপায়িত করার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। সৈনিকোচিত শৃঙ্খলা অনেকে হয়তো পছন্দ করেননা, সেই ক্ষেত্রে আমাদের অন্ততঃপক্ষে সামাজিক শৃঙ্খলা প্রয়োজন। কিন্তু এটা অর্ডারমাফিক হয়না। তাছাড়া আমাদের দেশে কোন বিপ্লব হয়নি বলে, ধরুন গত দশকে কিউবায় জনগণের মধ্যে যে ধরণের আনন্দোল্লাস দেখা গেছে তা আমাদের দেশে আশা করা যায়না। তবে বর্ত্তমানে সমাজতান্ত্রিক কথায় যাকে "অধনতন্ত্রী পথ" বলা হয় আমরা অন্ততঃপক্ষে সেই সম্পর্কে আমাদের মনঃস্থির করে নিতে পারি। আমরা যদি তাড়াতাড়ি সেই পথ অবলম্বন করতে না পারি এবং তার জন্য সব রকম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করতে না পারি তাহলে আমাদের দেশের সহিষ্ণু জনগণ যে আক্রোশ এখনও চেপে রেখেছেন, মেঘ গর্জনের মতো সেই আক্রোশের সম্মুখীন হওয়ার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।

এইচ. ভি. কামাথ

৮ পৃষ্ঠার পর

না করে হঠাৎ এই রকম ভীষণ একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত নয়। উচ্চপদগুলির জন্য যদি উপযুক্ত ধরণের ব্যক্তিদের নির্ব্বাচিত করা হয়, তাদের যদি যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং মন্ত্রীদের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করা হয় এবং তাঁদের অধীনস্থ কোন প্রকল্পের বিফলতার জবাবদিহি তাদেরই দিতে হয় তাহলে আমি এখনও আশা করি যে সরকারি সংস্থাগুলি আবার কর্মচঞ্চল হয়ে উঠবে। প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন তাঁদের বিবরণীতে সরকারি তরফের সংস্থাগুলি সম্পর্কে যে সব পরামর্শ দিয়েছিলেন সেগুলির কয়েকটি প্রধান পরামর্শ সরকার গ্রহণ করেননি অথবা এ পর্য্যন্ত সংসদেও তা আলোচিত হয়নি, এটা দুঃখের কথা।

তাছাড়া প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, পরিকল্পনা কমিশনের পরিকল্পনার কাজ কর্ম সম্পর্কে বার্ষিক অগ্রগতি এবং তাদের মূল্যায়ণ বিবরণীগুলি সংসদে পেশ করা উচিত। সংসদ এগুলি আলোচনা করতে নিশ্চয়ই আগ্রহী হবে।

সর্বশেষে, অত্যন্ত সদিচ্ছাপূর্ণ এবং কাগজে কলমে দেখতে অতি চমৎকার পরিকল্পনার মূলে যদি সৎ, নিঃস্বার্থ ও দক্ষ প্রশাসণ ব্যবস্থা না থাকে তা হলে তা বিফলতায় পর্য্যবসিত হয়। প্রায় দশ বছর পূর্ব থেকে বিশেষ করে ১৯৬৭ সাল থেকে নেতৃত্বের ও প্রশাসনের মান ও নীতিজ্ঞানের দ্রুত অবনতি ঘটেছে। এই নীতিজ্ঞানের মূল্যমান হ্রাস, টাকার মূল্যমান হ্রাসের চাইতেও বেশী বিপজ্জনক। কাজেই প্রশাসন ব্যবস্থা যদি পরিশোধিত ও সহজ সরল না করা যায় এবং সপ্তম দশকের সামাজিক অর্থনৈতিক প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের উপযুক্ত করে না তোলা যায় তাহলে ১৯৮০ সালে পরিকল্পনাও থাকবেনা বা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হবেনা, তার পরিবর্ত্তে আসবে বিশৃঙ্খলা বা এক নায়কত্ব। এই রকম একটা সঙ্কটকে প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের সকলেরই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা উচিত।

ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

সাধারণ মানুষ কতটুকু লাভবান হয়েছেন

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

গত তিনটি পরিকল্পনা দেশের যে অংশকে স্পর্শ করতে পারেনি সেই অংশ সম্পর্কে তলিয়ে ভাববার সময় অনেকদিন হয়েছে। আমাদের পরিকল্পনার লক্ষ্যই ছিল ভারতবর্ষের বিপর্যস্ত অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে ঢেলে সাজানো।

পরিকল্পনার পথে ভারত তার অভীষ্টে পৌঁছুতে পেরেছে কিনা প্রতিটি মানুষ এই দেশে সমান অধিকার, সমান সুযোগ এবং জীবন ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে পারছে কিনা এ সম্পর্কে আজ সারা দেশে একটা প্রচণ্ড সংশয় দেখা দিয়েছে।

এই সংশয়ের পটভূমিকায় চতুর্থ পরিকল্পনার যবনিকা উত্তোলিত হতে চলেছে। চতুর্থ পরিকল্পনার অভীষ্ট বর্ণনা প্রসঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের জন্য যে সব সুন্দর প্রতিশ্রুতি রয়েছে, কৃষি শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষার জন্য যে সমস্ত লক্ষ্য মাত্রা নির্দিষ্ট হয়েছে, সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে কিনা অথবা ইপ্সিত লক্ষ্য মাত্রায় আমরা পৌঁছুতে পারবো কিনা অথবা কোন অভাবনীয় ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্যকে অনিশ্চয়তার পথে ঠেলে দেবে কি না, তা এখনই বলা কঠিন।

তৃতীয় পরিকল্পনার সুরুতেই প্রাকৃতিক দুর্যোগসমেত অনেক বাধাবিঘ্নের উদ্ভব হয়েছে। প্রচণ্ড খরায় কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। এর পর শত্রুর আক্রমণে অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়েছে। এ কথা আরও নিঃসন্দেহে বলা চলে যে আমাদের দেশে কৃষি এখনও সম্পূর্ণ প্রকৃতি নির্ভর। এ কথা প্রমাণিত হয়েছে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর পরিকল্পনা, বিদেশী শত্রুর আক্রমণে সহজেই পর্যুদস্ত হতে পারে। সুতরাং চতুর্থ পরিকল্পনা রচনাকালে, রচয়িতারা স্বভাবতই পরিকল্পনার দুটি দুর্বলতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, যথা—(১) কৃষি নির্ভর অর্থনীতি কৃষির ব্যর্থতায় বিপর্যস্ত হ'তে পারে এবং (২) বিদেশী সাহায্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল পরিকল্পনা সাধারণ মানুষের কল্যাণের সূত্র সুনিশ্চিত না করে এক অনিবার্য অর্থনৈতিক দাসত্বের পথ উন্মুক্ত করতে পারে।

> 'দেশের যে অতিক্ষুদ্র অংশে বুদ্ধি বিদ্যা, ধনমান, সেই শতকরা পাঁচ পরিমাণ লোকের সঙ্গে পঁচানব্বই পরিমাণ লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রের ব্যবধানের চেয়ে বেশী। আমরা এক দেশে আছি, অথচ আমাদের এক দেশ নয়।'
>
> —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম পরিকল্পনায় যে অর্থ বিনিয়োজিত হয়েছিল তার শতকরা ৬ ভাগ ছিল বৈদেশিক সাহায্য। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল যথাক্রমে শতকরা ২১ এবং ২৮ ভাগে। ১৯৬৬-৬৭ এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে বার্ষিক পরিকল্পনাকালে সমগ্র ব্যয়ের শতকরা ৩৮ ভাগ এবং ৩৬· ভাগ ছিল বৈদেশিক সাহায্য। অর্থাৎ চতুর্থ পরিকনাকালে সুদে এবং আসলে আমাদের ঋণদাতাদের দিতে হবে আনুমানিক ২০৮০ কোটি টাকা। ১৯৬৯-৭০ সালে রপ্তানীর মাধ্যমে অর্জিত বিদেশী মুদ্রার আনুমানিক শতকরা ২৯ ভাগ ঋণ পরিশোধেই ব্যয় হবে। ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসের শেষে আমাদের ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫,৭৫১ কোটি টাকা। টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে এই পরিমাণ স্বভাবতই আরো বেড়েছে। এই ঋণ পরিশোধের জন্য প্রত্যেক ভারতীয়কে দিতে হবে ১০৯ টাকা করে। সুতরাং সমস্ত প্রকার অনিশ্চয়তার ঝুঁকি এড়ানোই প্রথম লক্ষ্য। তাই চতুর্থ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হবে বিদেশী সাহায্যের কম ব্যবহার এবং ১৯৭০-৭১ সালের মধ্যে পি. এল. ৪৮০ অনুসারে আমদানী সম্পূর্ণ বন্ধ করা, অন্যান্য আমদানীও যথাসম্ভব হ্রাস করা এবং রপ্তানী বার্ষিক সাত শতাংশের হারে বাড়ানো।

পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা সমাজ জীবনের প্রতিটি স্তরে দেশের প্রতিটি প্রান্তে প্রাণের সাড়া জাগাতে চেয়েছিলাম। আমাদের লক্ষ্য ছিল ১৯৭৭-৭৮ সালের মধ্যে মানুষের মাথা পিছু আয় দ্বিগুণ করা। অর্থাৎ জাতীয় আয় সর্বদিক থেকে বেড়ে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছুবে যার ফলে ভারতের কল কারখানায়, ক্ষেত খামারে, যে সমস্ত মানুষ দীর্ঘকাল ধরে কায়ক্লেশে বেঁচে থাকার সঙ্গে আপোস করে চলছিলেন সেই সমস্ত মানুষ স্বাস্থ্যে প্রাচুর্যে, কর্মোদ্যমে দেশকে জোর কদমে এগিয়ে নিয়ে চলবে। কিন্তু সেই লক্ষ্য পূর্ণ হয়নি, আমরা যা চেয়েছিলাম তা হয়নি। বৃটিশ শোষণের প্রখর মধ্যাহ্নে রবীন্দ্রনাথ একই দেশে দুই শ্রেণীর দুটি দেশ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। একটির গাঢ় ছায়া অন্যটিকে অন্ধকার করে তুলেছিল। ১৯৩৩ সালের জন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এক সমীক্ষায় বলা হয়েছিল, সেই সময় দেশের শতকরা ৩৯ জন মানুষ ছিলেন হৃষ্টপুষ্ট, শতকরা ৪১ ভাগ কৃশ এবং ২০ ভাগ কঙ্কালসার। অর্থাৎ তৎকালীন জনসংখ্যার তিন এর দু অংশে ছিল অনাহার, ক্ষীণ স্বাস্থ্য আর ব্যাধিগ্রস্ততা। এর পর দীর্ঘ সময়ের স্রোত পেরিয়ে এসেছি আমরা। অথচ এগিয়ে চলার সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে আমরা যেখানে ছিলাম প্রায় সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছি। অচল রেলগাড়ীর বন্ধ কামরায়

বসে শুধু দেখছি বিশ্বের রঙীন চিত্তচঞ্চলকারী দ্রুত ধাবমান ছবি। ভারতবর্ষ যেন সময়ের সাক্ষী, অতীতকে যেন এখানে সযত্নে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

আজ দেশের সব পেয়েছি ও 'সর্বহারাদের' দুটি জগৎ মুখোমুখী থমকে দাঁড়িয়েছে। একদিকে সেই স্বল্প সংখ্যক মানুষ যাদের সব আছে আর এক দিকে সেই বিপুল জনসমষ্টি যাদের কিছুই নেই। কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে এত চেষ্টা সত্বেও আমরা বিপর্যয় এড়াতে পারিনি। ১৯৬৮ সাল—যে বছরকে আমরা সবুজ বিপ্লবের বছর বলে চিহ্নিত করেছি সেই বছরেও আমরা প্রতিটি মানুষকে ১৬৬.৬ কিলোর বেশী আহার্য যোগাতে পারিনি, এই পরিমাণ ১৯৬৫ সালের চেয়ে শতকরা ৩.৭ ভাগ কম। ১৯৬৫ সালে এই পরিমাণ ছিল ১৭৩.০ কিলো। সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা দিন দিন কমে আসছে, তার প্রমাণ কাপড়ের ব্যবহার কমেছে শতকরা ১১ ভাগ, খাবার তেলের কমেছে শতকরা ১৪ ভাগ আর চিনির ব্যবহার কমেছে শতকরা ১৭ ভাগ। ১৯৬৭-৬৮ সাল আর ১৯৬৪-৬৫ সালের এই হল তুলনামূলক ছবি।

উপরের ছবিটি হ'ল সেই অন্ধকার জগতের ছবি, পরিকল্পনার ঢেউ যেখানে এখনও দাগ কাটতে পারেনি। অন্যদিকে আলোকিত জগতের আপ্যায়নে রয়েছে মহার্ঘ বিলাস সামগ্রীর ছড়াছড়ি। ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে মোটর গাড়ীর উৎপাদন বেড়েছে শতকরা ২৭ ভাগ, শীততাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের উৎপাদন বেড়েছে শতকরা ৪৪ ভাগ, রেফ্রিজারেটার শতকরা ২৯২ ভাগ, নানা জাতীয় সুস্বাদু মিষ্টান্ন শতকরা ৫২ ভাগ, আর্ট সিল্ক শতকরা ৫১ ভাগ।

এর পাশে দেখা যাক ভোগ্য পণ্যের উর্ধমুখী বাজার দর। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য পণ্যের দর বেড়েছে। সাধারণ বৃত্তিজীবী মানুষের সীমিত আয় এই বাজার দরের উর্ধগতির পিছনে ছুটতে গিয়ে বিপর্যস্ত। অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতিতে ১৯৬০-৬১ আর ১৯৬৭-৬৮ সালের মধ্যে বাজার দর বেড়ে গেছে শতকরা ৫৮ ভাগ, ফলে টাকার প্রকৃত মূল্য কমে গেছে শতকরা ৩৭ ভাগ। সমাজের যে অংশে এসেছে প্রাচুর্যের স্ফীতি তার ভারে সমাজের কাঠামোর বুনিয়াদ ভেঙে পড়তে চাইছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অসন্তোষ মাথা তুলেছে। এই সত্য আজ এত প্রকট যে সমীক্ষার অবতারণা ক'রে, বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় না।

কোথায় যেন একটা গোলমাল দানা বেঁধে উঠেছে। ভারতবর্ষ মূলতঃ ছিল ক্ষুদ্র কৃষি প্রকল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্প প্রকল্পের দেশ। ছোট ছোট ভূখণ্ডে চিরাচরিত প্রথায় কৃষক ফসল ফলাতো আর নানা বৃত্তিজীবি মানুষ গ্রামে গ্রামে তার নিজস্ব শিল্প সংস্থায় আপন খেয়ালে উৎপাদন করতো জনপদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের নানা দ্রব্য সামগ্রী। শিল্প নগরীগুলির বিশাল চিমনীর আকর্ষণে মানুষ তখন গ্রাম ছেড়ে জীবিকার সন্ধানে ছুটে আসত না। গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ, গ্রামীণ অর্থনীতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আজ তপোবনের সভ্যতাকে শিল্প জাগরণের চড়া, চোখ ধাঁধানো আলো থেকে দূরে রাখা সম্ভব নয়। জীবনযাত্রায় আধুনিকতার অনুপ্রবেশ ঘটবেই। আর পরিবর্তনের মুখে একটা ওলট পালট একটা তছনছ হবেই। এই সত্য স্বীকার করে পরিকল্পনায় আমরা দ্রুত শিল্পায়ণের মাধ্যমে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যেতে চাইলাম। মিশ্রিত অর্থনীতিকে মেনে নিলাম। কৃষির উপর জোর দেওয়া হল। আজকে পৃথিবীর সমস্ত উন্নত দেশ একটি সত্য উপলব্ধি করেছে—কৃষি এবং শিল্প গাঁটছড়ায় বাঁধা। জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট প্রাচুর্যের জলাশয় নয় দেশজোড়া প্লাবনই যদি প্রকৃত লক্ষ্য হয় তাহলে শিল্প আর কৃষিকে শ্রমিক ও কৃষককে এগোতে হবে পা মিলিয়ে। রাশিয়ার উদাহরণই অনুধাবন করে দেখা যেতে পারে। ১৯২০ সাল থেকে সে দেশে শিল্প, বিশেষত ভারী শিল্পের অগ্রগতি হয়েছে কৃষিকে উপেক্ষা করে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে খাদ্য সঙ্কট। ১৯৫৩ সালে কৃষির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হলেও খাদ্য সঙ্কট এখনও কাটেনি। কৃষির ব্যর্থতা শিল্পেও সঙ্কট এনেছিল—কাঁচামালের অভাবে উৎপাদন যন্ত্র অলস হয়ে পড়েছিল। তুলো প্রভৃতি অন্যান্য কৃষি জাত কাঁচামালের অভাবে শিল্পোৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল। চীন (প্রধান ভূখণ্ড), আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশেও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

ভারতবর্ষের জাতীয় আয়ের অর্ধাংশ সংগৃহীত হয় কৃষিপণ্য থেকে। ১৯৬০-৬১ সাল থেকে কৃষি উৎপাদনের মাত্রা প্রায় একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে। ১৯৪৯-৫০ সালের ভিত্তিতে এই মান মাত্র ১৪৫। স্বভাবতই শিল্পের ক্ষেত্রেও সুরু হল এর প্রতিক্রিয়া। ১৯৬৫-৬৭ সালের মধ্যে শিল্প উৎপাদনের মাত্রা (১৯৬০-সালের ভিত্তিতে) ১৫১-৫৪-র মধ্যে ওঠা নামা করল। কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে আমরা পেলাম স্বপ্ন ভঙ্গের ব্যর্থতা, ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা ও দিকে দিকে বিস্ফোরিত অসন্তোষ।

তিনটি পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল কর্মযজ্ঞের বিভিন্ন অংশে দেশের কর্মক্ষম মানুষকে যুক্ত করা। কিন্তু সে লক্ষ্য সুদূরই রয়ে গেছে। কর্মহীন মানুষের সংখ্যা স্ফীত হয়েছে। বর্তমানে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬০ লক্ষের মত। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা ঘটনা স্রোত যে খাতে প্রবাহিত হচ্ছে সেই খাতেই প্রবাহিত হলে এই সংখ্যা চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে দাঁড়াবে ২ কোটির মাত্রায়, শিক্ষিত কর্মহীন মানুষের সংখ্যা ১৯৬৭ সালের জুন মাসের শেষে ছিল ১০ লক্ষ। ১৯৬৮ সালের শেষে দেশের মোট ৩,২২,০০০ গ্রাজুয়েট ও ডিপ্লোমা প্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ারদের ১৭.১ শতাংশই কর্মহীন ছিলেন। এই কর্মহীন সক্ষম কুশলী মানুষরাই পরিকল্পনার ব্যর্থতার সাক্ষ্য বহন করছেন। অর্থনীতিবিদগণ বলছেন—আমরা বহু সঙ্কল্প গ্রহণ করেছি কিন্তু কোনোও পর্যায়েই কর্ম সৃষ্টি ও কর্ম সংস্থানের সূত্রগুলি উন্মুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে, পরিকল্পনা রচনা করিনি।

অথচ পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র শিল্পের উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছিল। ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারেই কর্মহীন মানুষ বৃত্তির সন্ধান পাবেন। ভারি শিল্পে একটি মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য যে ব্যয় হবে তা পর্যালোচনা করে দেখা হয়েছে। ইস্পাত কারখানায় লাগবে ১,৬০,০০০ টাকা, কয়লার খনিতে ৬০,০০০ টাকা, সার তৈরির কারখানায় ৪০,০০০ টাকা, যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানায় ২৫,০০০ টাকা।

এর পর ৩১ পৃষ্ঠায়

ভারতে কৃষি পরিকল্পনার খতিয়ান

গৌতম কুমার সরকার

আমাদের দেশে পরিকল্পনার মাধ্যমে এক নতুন যুগের সূচনাকালে কৃষিতে সাফল্যের মাত্রা যে ইপ্সিত পর্যায়ে পৌঁছোয়নি এটা প্রমাণ করার জন্য অঙ্ক কষে দেখার প্রয়োজন হয় না। প্রথম দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে খাদ্যশস্যের জনপ্রতি উৎপাদনের পরিমাণ ঊর্ধ্বমুখী ছিল কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এই ঊর্ধগতি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য পরবর্তীকালে সে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। অনুরূপ সময়সীমার মধ্যে তাইওয়ান ও মেক্সিকোর মত স্বল্পোন্নত দেশ কৃষিরক্ষেত্রে যে অগ্রগতি করতে পেরেছে তার সঙ্গে তুলনা করলে অবশ্য ভারতের ভূমিকা প্রশংনীয় বলা চলে না। আমাদের দেশে অভাবিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে এ কথা অস্বীকার করার নয় কিন্তু বিকাশবাদী অর্থনীতিকদের কাছে এ অবস্থা অপ্রত্যাশিতও নয়। কারণ উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে এ অবস্থার সঙ্গে অনেক দেশকেই মোকাবিলা করতে হয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে বলা চলে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির কথা, যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার হ'ল শতকরা ৩, ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় অনেক বেশী। তাইওয়ানেও বছরে জনসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৩.৫ হারে।

যাই হোক তাইওয়ান কিংবা মেক্সিকো ও ভেনেজুয়েলার মত ল্যাটিন আমেরিকার কয়েকটি দেশে কৃষি উৎপাদনের হার আমাদের দেশের তুলনায় অনেক দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট কথা হ'ল ভারতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা রচনার সময় জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি সমস্যাটিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে তবেই নীতি নির্ধারণ করতে হবে।

ভবিষ্যতে খাদ্যের সম্ভাব্য চাহিদা বৃদ্ধির মাত্রা নিরূপণ করার সময়ে চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ধর্ম, আয়, বন্টন ব্যবস্থার প্রত্যাশিত পুনর্বিন্যাস ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সংক্রান্ত বিষয়গুলি অনুধাবন করতে হবে। সমগ্রভাবে সারা দেশে খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধির যে হিসেব করা হয় তার মাত্রা ০.৪ শতাংশ থেকে একের মধ্যে ওঠানামা করে। ন্যূনতম উৎপাদনের মাত্রা নির্ধারণের জন্যও ক্ষেত খামারের উৎপাদনের বহুল বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক। বস্তুতঃপক্ষে চতুর্থ পরিকল্পনার প্রাক পর্যায়ে রচিত পরিকল্পনা কমিশনের এক সমীক্ষায় কৃষি উৎপাদনের যে বার্ষিক হার বৃদ্ধির উল্লেখ করা হয়েছে তার মাত্রা ৫ শতাংশের অঙ্কে স্থিতিশীল রাখার বাঞ্ছনীয়তা কেউই অস্বীকার করবেন না। অবশ্য পরিকল্পনা কমিশনের ঐ সমীক্ষায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার সুনিশ্চিত করার জন্য এমন কোনোও নির্দিষ্ট প্রকল্পের উল্লেখ নেই যার থেকে আভাষ পাওয়া যেতে পারে কোন পথে গেলে ইপ্সিত ফল লাভ করা যেতে পারে।

আমাদের পরিকল্পনা যন্ত্রের একটা মস্ত ত্রুটি হ'ল এই যে, অর্থ বিনিয়োগের যে আদর্শ পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করা হচ্ছে তাতে কৃষি ব্যবস্থার সামগ্রিক রূপ ধারণা করার উপযোগী খুঁটিনাটি তথ্যের অভাব রয়েছে। অতএব অন্যান্য ক্ষেত্রের চাহিদার স্বরূপ নির্ধারণ করার পর প্রত্যেকটি প্রয়োজনের মাত্রা বিস্তারিতভাবে স্থির করে সামগ্রিক ভিত্তিতে একটা সুসমন্বিত পরিকল্পনার কাঠামো প্রস্তুত করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

কৃষি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কারিগরী প্রগতি কৃষি বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করেছে। কিন্তু এই প্রগতি লক্ষ্য মাত্রার কিনারায় সুনিশ্চিতভাবে পৌঁছে দেবে কি না কিংবা উৎপাদনের মাত্রা আশানুরূপ পর্যায়ে স্থিতিশীল করতে পারবে কিনা এ কথা নিঃসংশয়ে বলা শক্ত। বহু আলোচিত 'সবুজ বিপ্লবের' দুটি অপরিহার্য অঙ্গ হ'ল—(১) প্রচুর ফলনশীল বীজ ও নিবিড় কৃষি সূচীর আধারে উন্নত কৃষি পদ্ধতি প্রয়োগ। এই দুটির সাফল্য, ব্যাপক সুযোগ-সুবিধার অভাবে এবং আমাদের কৃষকগোষ্ঠীর আগ্রহ ও 'গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে বিঘ্নিত ও সীমাবদ্ধ হ'তে পারে।

তাইওয়ানে কৃষি ভূমির আয়তন বৃদ্ধির পরিবর্তে একর প্রতি ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাফল্য বহু অর্থনীতিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, ভারতে রাসায়নিক সার প্রয়োগের মাত্রা একরে ৩ পাউণ্ড থেকে চট করে ১৭৫ পাউণ্ড করে কিংবা কীট নাশকের ব্যবহার একর প্রতি মাত্রা ০.৫ পাউণ্ড থেকে ১৫ পাউণ্ড করে অদূর ভবিষ্যতেই তাইওয়ানের মত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হবে এই রকম ধারণা পোষণ করা ভুল। জলের পরিমাণ কম দিয়েও যদি ভারতে ধান উৎপাদনের মাত্রা তাইওয়ানের উৎপাদন মাত্রার অর্ধেক হতে পারে তাহলে আমাদের দেশে তাইওয়ানে অনুসৃত কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ করার পক্ষে যথেষ্ট জোরালো যুক্তি আছে। তা ছাড়া বর্মা, কাম্বোডিয়া ও ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে, সেচযুক্ত ভূমির পরিমাণ অথবা রাসায়নিক সার প্রয়োগের পরিমাণ ভারতের তুলনায় কম হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদনের পরিমাণ যদি বেশী হয় তাহলে ঐ সব প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কৃষি পদ্ধতিগুলি আমাদের অনুধাবন করে দেখা দরকার।

অনেকের আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী হ'ল অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের ন্যূনতম উৎপাদনের মান অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়ার ফলে কৃষি বিপ্লব সফল হবার সম্ভাবনা অনেক বেশী। কিন্তু তাইওয়ান বা সমকৃতিত্বের অধিকারী অন্য সব দেশে গত দুই দশকে যে প্রভূত উন্নতি হয়েছে সেই সব দেশে ন্যূনতম উৎপাদনের মাত্রা ভারতের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। সুতরাং সেই সব দেশের ন্যূনতম মাত্রা ভারতের ন্যূনতম মাত্রার চেয়ে বেশী হওয়া সত্ত্বেও যদি সেখানে উৎপাদন বৃদ্ধির গতি একটা নির্ধারিত মাত্রায় এগিয়ে থাকে তাহলে ভারতের ন্যূনতম উৎপাদন মাত্রা আশাতীতের পর্যায়ে পৌঁছবে এমন আশা

নিরর্থক। অতএব পরিকল্পনার প্রণেতা-গণ এবং প্রশাসন বিভাগ—উভয় ক্ষেত্রেই যাঁরা অযথা উচ্চ আশা পোষণ করেন তাঁদের বিষয়টি দ্বিতীয়বার চিন্তা করে দেখা উচিত।

এর পরিপ্রেক্ষিতে বহু বিঘোষিত উৎসাহবর্ধক মূল্য প্রদান নীতির গুণাগুণ বিচার করে দেখা যাক। কৃষিজ পণ্যের মূল্য বাড়ালে উৎপাদন খানিকটা বাড়বে সন্দেহ নেই, ফলে সঞ্চয়ের পরিমাণ এবং কৃষিক্ষেত্রে অর্থবিনিয়োগের পরিমাণ স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই মূলত: কৃষি প্রধান একটা দেশে এই ধরণের প্রতিক্রিয়া হবে সীমিত। তা ছাড়া খাদ্যদ্রব্যের উচ্চ মূল্য, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক বা ছোট ছোট চাষীদের আয়ের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, কারণ নিজের ক্ষেতের ফসল না থাকায় এঁদের খাদ্যশস্য কিনে খেতে হয়। সেইজন্য ভারতের মত দেশে কৃষির বিকাশ এবং কৃষি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করতে হলে কৃষি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি না করে কারিগরী উন্নতির সুযোগ নিয়ে অযথা ব্যয় এড়িয়ে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত।

দ্বিতীয়ত: এ কথা স্বীকার করা কঠিন যে ভূমি স্বত্ব ব্যবস্থার ওপর কৃষির বিকাশ সামান্যমাত্র নির্ভরশীল। কৃষি ক্ষেত্রে অনগ্রসর দেশে সার প্রভৃতির ব্যবহার বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়টির গুরুত্ব অপরি-সীম। বস্তুত:পক্ষে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা সংস্কারের মাধ্যমে তাইওয়ান ও দক্ষিণ কোরিয়া যে অগ্রগতি করেছে তা অভূতপূর্ব বলা চলে। আর এই ভূমিস্বত্ব সংস্কারের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি প্রকৃত চাষীর হাতে আসা, প্রজাস্বত্ব অধিকার সংরক্ষণ খাজনার হার কমানো এবং ভূমি একীকরণ প্রভৃতি সব কটি ব্যবস্থাই গুরুত্বপূর্ণ।

অবশেষে আরও একটা কথা বলার আছে। বিনিয়োগ যোগ্য সম্পদের অভাবে কৃষি ক্ষেত্রে অগ্রগতি হচ্ছে না, এ কথা ঠিক নয়। কারণ বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে খামারে উৎপাদন বৃদ্ধির মাত্রার আনুপাতিক হিসেব মেলে না। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে কৃষিক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি না হওয়ার জন্য টাকার অভাব কোনোও কারণ নয়। উপযুক্ত সময়ে একটা সবল সিদ্ধান্ত না নেওয়ার জন্য এবং প্রশাসন ব্যবস্থার দুর্বলতা এর জন্য দায়ী।

সর্বশেষে, বলাই বাহুল্য যে, আত্মতুষ্টির অবকাশ আমাদের আদৌ নেই। কিন্তু তারই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, অতীতের ব্যর্থতা সত্বেও কৃষিগত অর্থনীতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংশয়পোষ-ণেরও কোনো কারণ নেই। কারণ অতীতে যে সব ক্ষেত্রে আমরা এগোতে পারিনি, সেই সব ব্যর্থতা আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা আরও ত্রুটিহীন করতে পারবে। এমন কি, কৃষিরক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা যে আসন্ন এ কথা জোর করে বলাও অসঙ্গত নয়। অর্থাৎ বছরের উৎপাদনের হার শতকরা ৫ ভাগ পর্যন্ত বাড়ানো কার্যত: অসম্ভব নয়, বরং এই হারকে ন্যূনতম মাত্রা গণ্য করে নিষ্ঠাভরে এই লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য কাজ করা উচিত। কারণ এ ছাড়া আমাদের কোনোও গত্যন্তর নেই।

চারটি পরিকল্পনার কর্মসূচীর ছক

সুনির্দিষ্ট সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্য-বিন্দুতে উপনীত হওয়ার জন্য সহায় সম্পদের সর্বাধিক সদ্ব্যবহারই হ'ল অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনার আর একটি নাম। ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সূচনা হয় ১৯৫১ সালে; লক্ষ্য ছিল দেশের জনসাধারণের জীবনধারণের মান উন্নত করা।

প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল (১৯৫১-৫৬)

(ক) মুদ্রাস্ফীতির প্রতিক্রিয়া হ্রাস ও খাদ্যাভাব দূর করা।

(খ) উৎপাদনবৃদ্ধির মাধ্যমে সাধারণের জীবনধারণের মান উন্নীত করা।

(গ) কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র বিস্তার করা।

(ঘ) আয় ও সম্পদের ব্যবধান হ্রাস করা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার সুসম বন্টনে প্রয়াসী হওয়া।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল (১৯৫৬-৬১)

(ক) জাতীয় অর্থনীতির দ্রুত বিকাশ-সাধন।

(খ) মূল ও ভারী শিল্পের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে শিল্পায়ণের গতি বৃদ্ধি করা।

তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল (১৯৬১-৬৬)

(ক) জাতীয় আয়ের মাত্রা বছরে ৫ শতাংশের বেশী পর্য্যন্ত বাড়ানো। (পরবর্ত্তী পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণকালে উন্নতির এই মাত্রা বজায় রাখার জন্য লগ্নীর রীতিপদ্ধতিগুলি পূর্ব্বাহ্নেই স্থির করা হয়ে গিয়েছে)।

(খ) খাদ্যে স্বয়ম্ভর হওয়া ও কৃষি উৎপাদনবৃদ্ধি করা।

(গ) মৌল শিল্পগুলি সম্প্রসারিত করা এবং মেসিন-তৈরীর ক্ষমতা অর্জন করা।

(ঘ) কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা যথা-সাধ্য বৃদ্ধি করা।

(ঙ) সমান সুযোগ-সুবিধা লাভের ক্ষেত্র প্রসারিত করা এবং আয়ের বৈষম্য হ্রাস করা।

চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য:

(ক) অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি অব্যাহতি রাখা।

(খ) অধিকতর আত্মনির্ভরশীলতা

(গ) অনিশ্চয়তার সমস্ত সম্ভাব্য পথ রুদ্ধ করা।

(ঘ) সমাজের দুর্ব্বলতর শ্রেণীর প্রতি ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করা এবং অর্থ-নৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করার প্রবণতা রুদ্ধ করা।

(ঙ) কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পোন্নয়ন

প্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ দ্রুতগতিতে শিল্পায়ণের পথে এগিয়ে চলেছে। সমগ্র দেশে পশ্চিমবঙ্গেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ ক'রে দ্রুতগতিতে শিল্পোন্নয়নের চেষ্টা করা হচ্ছে।

ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের প্রথম ঢেউ যেদিন থেকে সমুদ্র পেরিয়ে গঙ্গার তটে এসে লাগলো সেদিন থেকেই পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অর্থনৈতিক মানচিত্রে একটা প্রধান স্থান অধিকার করে রয়েছে। লোহা ও কয়লা অঞ্চলগুলি কাছাকাছি থাকায়, রেলপথে যাতায়াতের সুবিধে বেড়ে যাওয়ায়, কলিকাতা বন্দরের সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরভাগের সঙ্গে ব্যাপক যোগাযোগ থাকায় বাংলাদেশ, বর্ত্তমানের পশ্চিমবঙ্গ, ভারতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান শিল্পসমৃদ্ধ রাজ্যে পরিণত হয়েছে। তবে এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হ'ল, পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়ন, কলিকাতা-হাওড়ার চতুর্দ্দিকে, আসানসোল, রাণীগঞ্জ, দুর্গাপুরের কয়লাখনি অঞ্চলে এবং উত্তরবঙ্গে চা-বাগান অঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত হয়।

এই রাজ্যের প্রধান শিল্পগুলি হল: পাট, তুলা, বস্ত্র, চা, লোহা-ইস্পাত, কয়লা, রাসায়নিক পদার্থ মোটরগাড়ী এবং ইঞ্জিনীয়ারিং। পশ্চিমবঙ্গ, সমগ্র দেশের জন্য শতকরা ৪০ ভাগেরও বেশী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন করে এবং কলিকাতা বন্দর থেকে, ভারতের মোট রপ্তানীর শতকরা ৯০ ভাগ চালান দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রধানতঃ চা, পাট এবং ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রী রপ্তানী করা হয়।

পাটজাত জিনিস রপ্তানী ক'রে ভারত ১৯৬৮ সালে ২১২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন করে এবং এর প্রায় সম্পূর্ণটাই পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত হয়। এই রাজ্যে প্রায় ১০০টি পাটকল আছে এবং এগুলি থেকে বছরে ১০ লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশী পাটজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয়।

এ ছাড়া আমাদের দেশ থেকে যে পরিমাণ চা রপ্তানী করা হয় তার শতকরা ৩০ ভাগ পশ্চিমবঙ্গ থেকে যায়। এখানকার ২৯৯টি চা বাগান ৮৩৬১৫৪৯ হেক্টার জমিতে চায়ের চাষ করে। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর প্রায় ৯ কোটি ৫০ লক্ষ কিঃ গ্রাম চা উৎপাদিত হয়—দার্জিলিং চা তার চমৎকার সুগন্ধের জন্য সমগ্র বিশ্বে বিখ্যাত।

এই রাজ্যে যে সব ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রী তৈরী হয় সেগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটি হ'ল রেলের ওয়াগন, বস্ত্রশিল্পের যন্ত্রপাতি, পাটশিল্পের যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ী, চা-শিল্পের যন্ত্রপাতি, বাই-সাইকেল, ব্লেড, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম, ইস্পাত, এ্যালুমিনিয়াম ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি।

এই রাজ্যের প্রধান খনিজ পদার্থ হল কয়লা এবং এই কয়লা রাজ্যের শিল্পোন্নয়নে প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। ১০৮৮ বর্গ কিলোমীটার ব্যাপি রাণীগঞ্জ-আসানসোল কয়লাখনি অঞ্চল থেকে প্রতি বছর ২ কোটি টন কয়লা উৎপাদিত হয়। কি পরিমাণ কয়লা উৎপাদিত হবে তার ওপরে ভিত্তি করেই রাজ্যের নতুন শিল্পনীতি স্থির করা হয়।

স্বাধীনতা লাভ করার ফলে বাংলাদেশ ভাগ হয়ে যাওয়ায়, প্রথম দিকে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক ব্যবস্থায় যে ভীষণ একটা ধাক্কা লাগে তাতে সন্দেহ নেই এবং শিল্পক্ষেত্রেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কিন্তু পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে শিল্পোন্নয়নের যে কর্ম্মসূচী গ্রহণ করা হয় তাতে রাজ্যের শিল্প কর্মপ্রচেষ্টা আস্তে আস্তে উন্নত হতে থাকে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির সময়ে রাজ্যে সরকারী ও বেসরকারী তরফে নানা ধরণের ছোট বড় শিল্প গড়ে ওঠে। তবে উল্লেখযোগ্য যে পরিবর্ত্তন হয়েছে তা হ'ল, মৌলিক ও ভারি শিল্পগুলির ওপর গুরুত্ব দিয়ে শিল্পায়নে বৈচিত্র্য আনা হয়েছে।

স্বাধীনোত্তর যুগে দুর্গাপুর-আসানসোল এলাকাতেই প্রধানতঃ শিল্পগুলি কেন্দ্রীভূত হয়। সরকারী তরফে পশ্চিমবঙ্গে বড় আকারে প্রথম যে দুটি শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়—তা হল, চিত্তরঞ্জনের রেলইঞ্জিন তৈরির কারখানা আর রূপনারায়ণপুরের হিন্দুস্থান কেবল্‌স কারখানা।

দুর্গাপুর শিল্পকেন্দ্র

বর্ধমান জেলার জঙ্গলে ঘেরা অর্দ্ধসুপ্ত দুর্গাপুর গ্রামটির, একটি প্রধান শিল্পসহরে বা ভারতের "রুরে" পরিণতি, গত কুড়ি বছরে এই রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের কাহিনী বিবৃত করে। ১৯৫৫ সালে ডি. ভি. সি. যখন জলসেচের জন্য দামোদরে বাঁধ তৈরি করে তখন থেকেই এই অভূতপূর্ব পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়। পশ্চিমবঙ্গের তখনকার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, দামোদরের বাঁধের ধারে রাণীগঞ্জ এলাকার বিপুল কয়লা সম্পদের কাছে শিল্পকেন্দ্র গঠন করার যে স্বপ্ন দেখতেন, তাঁরই চেষ্টায় সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোক ওভেন কারখানা এবং তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পকে, শিল্পোন্নয়নের ভবিষ্যত ভিত্তির প্রথম লগ্নি

বলা যেতে পারে। তারপর যখন সরকারী তরফের একটি ইস্পাত কারখানা এখানে স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তখনই দুর্গাপুর ভারতের শিল্প মানচিত্রে স্থান পেয়ে গেল। ডি. ভি. সি. দুর্গাপুরে আর একটি তাপ বিদ্যুৎ কারখানা স্থাপন করলেন। এই এলাকায় জল ও বিদ্যুৎ-শক্তি সহজলভ্য হওয়ায় সরকারী ও বেসরকারী তরফে অনেক বড় বড় শিল্প স্থাপিত হয়।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হওয়ার পর আরও দুটি ভারি শিল্প অর্থাৎ একটি হ'ল প্রেসার ভেসেল, বয়লার ও সিমেন্ট কারখানার যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানা এবং অন্যটি খনির কাজ সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানা স্থাপিত হয়। পরে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার অন্যান্য যে সব বড় শিল্প সংস্থা স্থাপন করেন সেগুলি হ'ল—মিশ্রিত ইস্পাত কারখানা, চশমার কাঁচ তৈরির কারখানা, দুর্গাপুর রাসায়নিক কারখানা। আর একটি বড় শিল্প—দুর্গাপুর সার কারখানা স্থাপনের কাজও সমাপ্তির দিগে এগিয়ে চলেছে।

এই সব বড় বড় শিল্প ছাড়াও, কার্বন ব্ল্যাক মোটরের চাকা, গ্র্যাফাইট ইলেক-ট্রোড, এনামেলের আবরণ দেওয়া তামার তার, রিফ্র্যাক্টরি ইত্যাদি নানা রকমের জিনিস তৈরী করার জন্য ১২।১৪টির ও বেশী মাঝারি আকারের শিল্প স্থাপিত হয়েছে। হালকা ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রী তৈরি করার জন্যও অনেক ক্ষুদ্রায়তন শিল্প গড়ে উঠেছে।

সমগ্রভাবে এই শিল্পগুলিতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হ'ল প্রায় ৭০০ কোটি টাকা—আর দুর্গাপুরের চতুর্দিকে ছোট একটি জায়গায় সামান্য ১৫।২০ বছরের মধ্যে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে। সমগ্র দেশে অন্য আর কোথাও এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে এতো দ্রুত শিল্পোন্নতি হয়েছে কিনা সন্দেহ।

কলিকাতার শিল্পাঞ্চল থেকে প্রায় ৭৫ মাইল দূরে হলদিয়াতেও আর একটি শিল্প-কেন্দ্র গড়ে উঠছে। সম্প্রতি ৫৫ কোটি টাকার হলদিয়া তৈল পরিশোধন প্রকল্প এবং হলদিয়ার পেট্রো-রসায়ন শিল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ক'রে, পেট্রোলিয়াম ও রসায়নের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন এই প্রকল্পকে "বিপুল শিল্পসমষ্টির কেন্দ্রবিন্দু এবং রাজ্যের কৃষি ও শিল্পসহ সমস্ত ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নয়নের অগ্রদূত বলে বর্ণনা করেন"। হলদিয়াতে সার তৈরি করার জন্যও একটি নতুন কারখানা স্থাপনের সম্ভাবনা আছে। হলদিয়ার গভীর সমুদ্রের ডক প্রকল্প, সমৃদ্ধির নতুন নতুন পথ খুলে দেবে।

ফারাক্কা বাঁধের কাজও প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে আসছে। এই বাঁধের কাজ সম্পূর্ণ হ'লে শুধুমাত্র গঙ্গায় জলপ্রবাহের পরিমাণই বাড়বেনা, উত্তরবঙ্গে যাওয়ার পথে বর্ত্তমানে যে সব অসুবিধে আছে তাও দূর হবে। এতে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প বাণিজ্যেরও উন্নতি হবে।

কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গের স্থান, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখানকার প্রায় ৪ লক্ষ সংস্থায় প্রায় ১০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে এবং প্রতি বছর এগুলি থেকে ১৩০ কোটি টাকা মূল্যের জিনিস উৎপাদিত হচ্ছে। এগুলির মধ্যে প্রধান কুটির শিল্প হল—হাতের তাঁত এবং বৃহত্তর কলিকাতায় কেন্দ্রীভূত ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থাগুলি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উন্নতি সাধনের জন্য রাজ্য সরকার বারুইপুর, কল্যাণী, শক্তিগড়, হাওড়া এবং শিলিগুড়ীতে শিল্পাঞ্চল স্থাপন করেছেন। মানিকতলায় আর একটি শিল্পাঞ্চল গঠনের কাজও শিগ্‌গীরই সম্পূর্ণ হবে। হাতের তাঁত শিল্প, লাক্ষার জিনিস তৈরির শিল্প, ছোবড়াশিল্প ইত্যাদি অন্যান্য পল্লীশিল্পগুলির উন্নয়ন সম্পর্কে রাজ্য সরকার কর্মসূচী তৈরি করেছেন।

রাজ্যে শিল্প সমৃদ্ধির এই রকম উজ্জ্বল পটভূমি সত্ত্বেও শিল্পগুলি নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তবে সেই সমস্যাগুলি প্রধানতঃ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক নয়। গত তিন বছরের মন্দার ফলে রাজ্যের ইঞ্জিনীয়ারিং ভিত্তিক শিল্পগুলি অত্যন্ত সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। শিল্পগুলির উৎপাদন ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার না করা সত্ত্বেও উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে অসমতা বেড়ে যেতে থাকায়, মজুদ জিনিসের পরিমাণ বেড়ে যেতে থাকে। উৎপাদন ক্ষমতা, উৎপাদন ও বাজারের চাহিদার মধ্যে এই ক্রমবর্দ্ধমান অসমতা শিল্পগুলিতে একটা সঙ্কটের সৃষ্টি করে। মন্দার প্রতিক্রিয়া যদিও আস্তে আস্তে কমছে, তা সত্ত্বেও বিশেষ করে দেশী ও বিদেশী কাঁচা মালের সরবরাহ না থাকায় ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থাগুলির অসুবিধে এখনও দূর হয়নি।

রাজ্যের ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পগুলির আর একটা অন্তরায় হ'ল, এগুলি বহুকাল পূর্বে স্থাপিত হওয়ায় এগুলির যন্ত্রপাতি অত্যন্ত পুরাণো হয়ে গেছে এবং এখনকার যুগে সেগুলি প্রায় অচল। অন্যান্য জায়গায় স্থাপিত ক্ষুদ্রায়তন আধুনিক সংস্থাগুলির সঙ্গে এগুলি প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছেনা। এগুলির অবস্থা ভালো ক'রে তুলতে হলে, এই ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পগুলির যন্ত্রপাতির আধুনিকিকরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

রাজ্যসরকার অবশ্য এই পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন এবং রাজ্যের শিল্পগুলির সমস্যা সমাধান করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করছেন। কেউ কেউ মনে করেন যে, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন হওয়ায় শ্রমিক অসন্তোষের জন্য পশ্চিমবঙ্গের শিল্পগুলিতে উৎপাদন কমে গেছে। কিন্তু এ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার্সের প্রেসিডেন্ট শ্রী জে. এম. পারসন্স এই ধারণা ভুল বলে ব্যক্ত করেছেন। সম্প্রতি দিল্লীতে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন যে, কতকগুলি শিল্পের উন্নয়ন প্রতিরুদ্ধ হওয়ার মূলে রয়েছে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কারণ, রাজনৈতিক কারণ নয়। তথাকথিত রাজনৈতিক গোলমাল সত্ত্বেও রাজ্যের কতকগুলি শিল্প ক্রমোন্নতি করে যাচ্ছে।

চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষি

গায়ত্রী মুখোপাধ্যায়

কৃষি হ'ল ভারতের সুপ্রাচীন শিল্প এবং জাতীয় আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ এই কৃষি থেকে আসে। কাজেই প্রথম ও তৃতীয় পরিকল্পনায় যে কৃষির ওপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল তাতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। কৃষির উন্নয়নের জন্য চিরাচরিত পদ্ধতি এবং সার ইত্যাদির ওপরেই জোর দেওয়া হয় ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ে। ১৯৫০-৫১ সালে যেখানে ৬৯০.২২ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয় ১৯৫৫-৫৬ সালে সেই পরিমাণ দাঁড়ায় ৮২০.০২ লক্ষ টনে।

১৯৫১-৫২ সাল থেকে ১৯৬৫-৬৬ সাল পর্য্যন্ত কৃষি উৎপাদন মোটামুটি বাড়ে শতকরা ৩৭.৮ ভাগ। এর মধ্যে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বাড়ে শতকরা ২৪.১ ভাগ। এই ১৫ বছরে কৃষির ক্ষেত্রে মোট বার্ষিক উন্নয়নের হার হ'ল শতকরা ২.৫ এবং খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নয়নের হার হ'ল শতকরা ২.৬ ভাগ। একে অবশ্য খুব চমকপ্রদ অগ্রগতি বলা যায়না, তবুও এই উন্নয়ন ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যা ও কৃষি উৎপাদনের মধ্যে মোটামুটি একটা ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে কৃষি উৎপাদনের গতি বজায় না থাকায় খাদ্যশস্যের দাম বাড়তে থাকে, ফাঁপা বাজারের সৃষ্টি হয় এবং জনসাধারণের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করতে গিয়ে আমদানি ও বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। কাজেই অন্ততঃপক্ষে খাদ্যশস্যের দিক থেকে তৃতীয় পরিকল্পনা একটা হতাশার ভাব সৃষ্টি করে সম্পূর্ণ হয়।

এই রকম একটা হতাশার পরিবেশের মধ্যে ১৯৬৬ সালে বেশী ফলনের শস্যের কর্মসূচী গৃহীত হয়। তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনার পর এখন অবস্থাটা আবার অন্য রকম। বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ এখন আবিষ্কার করেছেন যে ভারতের মাটি তাঁরা যতটা অনুর্ব্বর ভেবেছিলেন ততটা নয় এবং ভারতের কৃষকদের যতটা ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল বা পরিবর্ত্তনবিমুখ ভেবেছিলেন তাঁরা তা নন। যে কৃষকরা ১৯৬৪ সালে শস্যের বীজ কেনায় এতটুকু উৎসাহ দেখাননি তাঁরা এখন বেশী ফলনের বীজ কেনার জন্য বেশী দাম দিতেও রাজী আছেন। শস্যের ফলন বেশী হয় বলে এবং খাদ্যশস্যের চাষ থেকে যথেষ্ট আয় করা যায় বলে কৃষকরা একেবারে এক নতুন ধরণের কৃষি পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত হন। শিল্পে যদি শতকরা ১০ বা ২০ ভাগ উৎপাদন বাড়তো তাহলে শিল্পের পক্ষে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও কৃষকরা তাতে উৎসাহিত হতেন না। কাজেই নতুন ধরণের বীজ উৎপাদন করার সময় আশা করা হচ্ছিল যে পূর্বের বীজের তুলনায় শতকরা ১০০ ভাগের বেশী ফলনের বীজ উৎপাদন করতে পারলে কৃষকদের মধ্যে বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি করা যাবে এবং কৃষি পদ্ধতিতে বিরাট একটা পরিবর্ত্তন আনা যাবে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও তামিলনাড়ুতে তাই ঘটেছে। একই জমিতে কয়েকটি ফসল উৎপাদন, সেচের জল সম্পর্কে নিশ্চয়তা ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে এখন নতুন কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচী তৈরি করা হয়েছে।

চতুর্থ পরিকল্পনার সম্ভাবনা

পরিবর্ত্তনের জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি তৈরি করার পর, আমরা যেটুকু সাফল্য লাভ করেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এখন দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে। চতুর্থ পরিকল্পনায় গবেষণার জন্য একটা দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন, প্রশিক্ষণ, সার ইত্যাদি উৎপাদন এবং সরবরাহের ওপর বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। সেচবিহীন ভূমি থেকেও যাতে যথেষ্ট শস্য উৎপাদন করা যায় সেজন্য নতুন কৃষি পদ্ধতি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। অর্থাৎ সেচযুক্ত জমির কৃষক এবং সেচবিহীন জমির কৃষকের মধ্যে আয়ের পার্থক্যটা কমিয়ে আনা উচিত। "নিবিড় কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচীর" পরিবর্ত্তে যদি "সংহত কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচী" গ্রহণ করা যায় তাহলেই শুধু এতে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। এতে কৃষক, তার পশুসম্পদ, শস্য সব কিছু একটা নতুন ভারসাম্যে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারবে। সরকার যে সব যন্ত্রসজ্জিত কৃষি আবাদ গঠন করছেন সেগুলিতে সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। যে সম্প্রসারণ কর্মী নিজে প্রতি হেক্টারে ২ টন গম উৎপাদন করেননি তিনি, কৃষককে কি করে শেখাবেন যে প্রতি হেক্টারে ২ টন গম উৎপাদন করা যায়।

সেচ, জলনিকাশ এবং শস্যোৎপাদন এগুলির উন্নয়ন পৃথক পৃথকভাবে করা সম্ভব নয়। তাছাড়া নানা ধরণের আধুনিক কারিগরী সাহায্যের মধ্যেও একটা সমতা আনা প্রয়োজন যাতে একের অভাবে অন্যটার কাজ বন্ধ না থাকে অথবা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ১৯৬৯ সালে দেখা গেল যে খারিফ মরসুমে সারের চাহিদা বাড়লেও বছরের শেষের দিকে এই চাহিদা অনুমানের চাইতেও কমে গেল। প্রধানতঃ তামিলনাড়ুতে এবং কিছুটা মহীশূরে এই চাহিদা কমে যায়। আসামে একমাত্র চা বাগানগুলি ছাড়া অন্যত্র সারের কোন চাহিদাই ছিলনা, পশ্চিমবঙ্গে চাহিদার পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ কমে যায়। পরিকল্পনা কমিশন স্থির করেছেন যে, ১৯৭৩-৭৪ সাল পর্য্যন্ত ১২ কোটি ৯০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে তা বজায় রেখে চতুর্থ পরিকল্পনায় সারের চাহিদার লক্ষ্য শতকরা ১৭ ভাগ হ্রাস করা হবে। কেউ কেউ মনে করেন যে সার শিল্পের উন্নয়ন এবং বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে সরকারের স্থির সিদ্ধান্তের অভাবেই এগুলি ঘটছে।

আমাদের দেশের জলসম্পদের শতকরা ৪৫ ভাগই ধান চাষের জন্য ব্যয় করা হয় কাজেই এই শস্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। জাপান বা তাইওয়ানে মোটামুটি যে পরিমাণ ধান উৎপাদিত হয় আমরা এখন পর্য্যন্ত তার শতকরা ৩০ ভাগ পর্য্যন্ত পৌঁছুতে পারিনি।

ধনধান্যে ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ২৩.

ছোট কৃষক

ভারতের কৃষকদের মধ্যে বেশীর ভাগই হলেন ছোট ছোট জমির মালিক কিন্তু তারা এখন পর্য্যন্ত নিজেদের ভাগ্য ফেরাতে পারেননি। বেশী ফলনের বীজের চাষ এবং কৃষি উৎপাদন বাড়াতে ধনী কৃষকরা বেশী ধনী হয়েছেন, গরীব চাষীরা আরও গরীব হয়েছেন। চতুর্থ পরিকল্পনায় এই সম্পর্কে যে দুটি প্রধান কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তা শুধু সমস্যাটির কিনারা ছুঁয়ে যাবে, সমস্যার কোন সমাধান হবেনা। ছোট কৃষকের উন্নয়ন সংস্থা নামক প্রধান কর্মসূচী অনুযায়ী আগামী ৫ বছরে ৩০টি জেলার সাড়ে দশ লক্ষ কৃষক উপকৃত হতে পারেন।

চতুর্থ পরিকল্পনায় অন্য যে কর্মসূচীটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে পুকুর কাটা নলকূপ বসানো এবং নদী থেকে জল তোলার পাম্প বসানোর জন্য রাজ্যগুলি ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করবে। কিন্তু প্রয়োজনের অনুপাতে এই প্রচেষ্টা এতই ক্ষুদ্র যে দেখে মনে হয় ছোট কৃষকরা সংখ্যায় গরিষ্ঠ নন, বরং অতি সংখ্যালঘু একটি শ্রেণী বিশেষ। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ এই কৃষকদের বহু সমস্যা। এদের জমির পরিমাণ অল্প বলে অতিরিক্ত আয় করতে পারেন না; বেশীর ভাগকে খাজনার জমির ওপর নির্ভর করতে হয়, ছোট জলসেচ প্রকল্প এবং ভূমির উন্নয়নমূলক অন্যান্য প্রকল্পের জন্য ভূমি উন্নয়ন ঋণ সংগ্রহে অধিকারী হতে পারেন না; সমবায় থেকে উচ্চতর ঋণ সীমা লাভজনক উপায়ে ব্যবহার করতে পারেন না; আধুনিক কৃষি পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করতে পারেন না বলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হারও অল্প এবং যদিও কিছুটা আয় বাড়ে তাকে যৎসামান্য বলা যায়। কৃষিকে আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে এই সমস্ত সমস্যা সাধারণ কৃষককে সব সময়েই পেছনে টেনে রাখে।

বিক্রী এবং বাজারজাত করার উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধে না থাকলে, নতুন ধরণের বেশী ফলনের শস্যের চাষ ক'রে কৃষকরা প্রায়ই হতাশ হয়ে পড়েন। অন্ধ্রপ্রদেশ ও কেরালায় যথাক্রমে আই আর-৮ ও তাইচুং নেটিভ-১ ধানের চাষে তা প্রমাণিত হয়েছে। সবুজ বিপ্লবকে যদি সত্যিই সবুজ ও বৈপ্লবিক রাখতে হয় তাহলে গুদামজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও মূল্য এই তিনটির প্রতিই সমান মনোযোগ দিতে হবে।

পরিকল্পনা রূপায়ণ

পরিকল্পনা কি রকমভাবে রূপায়িত করা হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে স্থির করার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রত্যেক বছরেই একটা বিস্তারিত কর্মসূচী তৈরি করতে হয়। এই বার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হবে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্দ্ধারিত নীতি অনুসারে সেই বছরের উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। বিনিয়োগের আকার, গুরুত্ব ও আর্থিক পরিস্থিতি অনুসারে এই বার্ষিক পরিকল্পনা প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন ও পরিবর্তন করা যেতে পারে। যে সব কাজ করা হয়েছে তার ফল, আর্থিক সম্পদ এবং অন্যান্য যে সম্পদ হাতে রয়েছে সেই অনুসারে সেই বছরের জন্য বিশদ কর্মসূচী তৈরি করা যায়।

প্রত্যেক রাজ্যকে বিভিন্ন স্তরে আর্থিক এবং পরিচালনামূলক নীতি, প্রশাসনীয় সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে হয়। এর জন্য রাজ্যের পরিকল্পনা সম্পর্কিত সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

নিম্ন থেকে পরিকল্পনা

কাজেই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিম্ন স্তরক পরিকল্পনা তৈরি করার অর্থ হ'ল এটা বাইরে থেকে বা ওপর থেকে আসে-না। প্রত্যেকটি রাজ্য, জেলা, স্থানীয় অঞ্চল এবং জনসমষ্টি নিজেদের সম্পদ ও সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য যে কর্মসূচী গ্রহণ করে তাই হ'ল পরিকল্পনা। এর অর্থ হল, কর্মপ্রচেষ্টা, উৎসাহ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অংশ গ্রহণকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া। অন্য অর্থে বলা যায় যে, সকলকেই দায়িত্ব বহন করতে হবে।

প্রশাসনিক দক্ষতা

উন্নততর সংগঠন এবং সাধারণ প্রশাসনিক ব্যবস্থার কর্মদক্ষতা, পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পরিকল্পনা 'রূপায়ণের জন্য দুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল—(১) সরকারি তরফের সংস্থাগুলি সহ প্রশাসনিক ব্যবস্থায়, উপযুক্ত পদ্ধতিতে কারিগরী বিষয়ে শিক্ষিত কর্মী ও বিশেষজ্ঞদের সংশ্লিষ্ট করা প্রয়োজন এবং (২) তাঁরা যে সব কাজ করছেন সেগুলি সম্পর্কে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলি যাতে তাঁরা উপযুক্তভাবে বিবেচনা করতে পারেন তা দেখা প্রয়োজন।

সরকারি তরফের সংস্থাগুলি সাধারণ যে সব নীতি অনুসরণ করছে সেগুলি জাতীয় লক্ষ্য এবং ঘোষিত নীতির অনুকূল হচ্ছে কিনা তা সুনিশ্চিত করা যেমন সরকারের কর্ত্তব্য তেমনি সংস্থাগুলির পরিচালকগণ যাতে ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে সংস্থাগুলির কাজ চালাতে পারেন সেইজন্য তাদের দৈনন্দিন কাজে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়াও প্রয়োজন। এটা তাদের দক্ষতা এবং লাভজনক উপায়ে কাজ করার ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে যে সব কর্মী বিভিন্ন স্তরে পরিকল্পনা রচনা, রূপায়ণ এবং মূল্যায়নের কাজ করছেন তাঁদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য, প্রশিক্ষণ কর্মসূচীও উপযুক্তভাবে শক্তিশালী, উন্নত ও সংহত করতে হয়। কর্মীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা এবং বিচারশক্তির উন্নয়নই হল এই রকম প্রশিক্ষণের লক্ষ্য। পরিকল্পনা রচনার বিভিন্ন স্তরে যাঁরা কাজ করছেন কেবলমাত্র তাঁরাই নন, কর্মসূচী ও প্রকল্পগুলি রূপায়ণের কাজে যাঁরা নিযুক্ত রয়েছেন, সমস্ত স্তরের পরিচালক, কারিগরী বিশেষজ্ঞ ও প্রশাসনিক কর্মীদেরও এই প্রশিক্ষণ সূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমশিল্প

অনিল কুমার মুখোপাধ্যায়

শিল্প স্থাপনের জন্য কাঁচামাল এবং অন্যান্য আরও যে সব উপকরণের প্রয়োজন, পশ্চিমবঙ্গে এবং তার নিকটবর্তী এলাকায় এ সবের কোন অভাব নেই। শ্রমশিল্প-বিকাশের বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি বিশেষ তথ্য জানা দরকার। পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৮৮.৫২ লক্ষ হেক্টার (কলকাতার আয়তন ১০ হেক্টর) এবং এর ১৫টি জেলার মধ্যে, আয়তনে ২৪ পরগণা বৃহত্তম এবং হাওড়া ক্ষুদ্রতম। ১৯৬১ সালের আদম সুমারীতে রাজ্যের লোক সংখ্যা ছিল ৩৪৯.৩ লক্ষ, যার মধ্যে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা যথাক্রমে ১৮৫.৯৯ এবং ১৬৩.২৭ লক্ষ। অনুমান করা হয় যে, এই জনসংখ্যা বেড়ে ১৯৭১,৭৬ এবং ১৯৮১ সালে যথাক্রমে ৪৫৮.০১, ৫২২.৫১ এবং ৫৮৩.২৪ লক্ষ হবে। এর মধ্যে শ্রমজীবীর সংখ্যা ১৯৬১ সালের ১১৯.৫৭ লক্ষ থেকে বেড়ে ১৯৭৪ সালে ১৫১.৬১ লক্ষে দাঁড়াবে। নীচে ১৯৫১-৫২ সালের মূল্যমানের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ এবং সারা ভারতের আয়ের তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হল।

বছর	পশ্চিমবঙ্গের আয় কোটি টাকায়	পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু আয়	সারা ভারতে মাথাপিছু আয়
১৯৫১-৫২	৭৩১	২৮৯	২৭৪
১৯৫৫-৫৬	৮৪৮	২৯৬	২৯৪
১৯৬০-৬১	১১০৭	৩২১	৩২১
১৯৬৫-৬৬	১২৮৭	৩৩২	—

পশ্চিমবঙ্গ এবং সারা ভারতে মাথাপিছু আয় প্রায় সমান সমানই বেড়েছে। আয় বৃদ্ধির মাত্রা, জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে. অর্থনৈতিক জীবনে খুব একটা ছাপ ফেলতে পারে নি। শিল্পের একটি বিশেষ উপকরণ হচ্ছে বিদ্যুৎশক্তি। পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৯৫১ সালে ৫৪৬ মেগাওয়াট থেকে বেড়ে ১৯৬৮ সালে ১১২৩ মেগাওয়াট হয়েছে। এর মধ্যে দুটি (ময়ূরাক্ষী এবং জলঢাকা) জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের মোট উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে মাত্র ২২ মেগাওয়াট। অবশ্য উপরের হিসাবে ডি. ভি. সি এবং বেসরকারী ছোট ছোট বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পগুলি ধরা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন পরিকল্পনাকালে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা মাত্র ১২১ ভাগ এবং বিভিন্ন রাজ্যগুলির তুলনায় এটা প্রায় সর্বনিম্ন। সেই ক্ষেত্রে রাজ্যে মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের হার কিন্তু খুবই বেশী।

শ্রমশিল্প পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় প্রাক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালেই অনেক এগিয়ে ছিল, বিশেষ করে চটকল, লোহা এবং ইঞ্জিনীয়ারিং, চা বাগান, জাহাজী কারবার বনস্পতি, ধানকল ইত্যাদিতে। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে পশ্চিমবঙ্গে শ্রমশিল্পের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি যথেষ্ট অর্থ বিনিয়োগ করে। প্রত্যেকটি শ্রমশিল্পেই লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি হয়। এর আভাস পাওয়া যাবে নীচে দেওয়া তথ্য থেকে।

পশ্চিমবঙ্গ

কোটি টাকায়

	১৯৫৯	১৯৬৩	১৯৬৫
উৎপাদনমলক মূলধন	৩৭৭	৮৭১	১২১৯
উৎপাদনের দ্বারা বর্ধিত আয়ের মাত্রা	১৮৮	২৯৬	৩৬৫

সারাভারত

কোটি টাকায়

	১৯৫৯	১৯৬২	১৯৬৫
উৎপাদনমূলক মূলধন	১৭৩৭	৪০৭৫	৬৩০০
	৮১৩	১২৯৬	১৬৮৭

রাজ্যে লোহা এবং ইস্পাত, ইঞ্জিনীয়ারিং, পরিবহন ইত্যাদির মত শিল্পে উৎপাদনের তুলনায় মূলধনের পরিমাণ অনেক বেশী দাঁড়িয়েছে। ফলে শ্রমশিল্প থেকে রাজ্যের মোট আয় তুলনামূলকভাবে অন্যান্য অনেক রাজ্য থেকে কম। অবশ্য এই সব শ্রমশিল্পগুলির উৎপাদন ক্ষমতা যদি পুরোপুরি কার্যকর হ'ত তাহলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা অন্য রকম হ'ত।

...র আনন্দের কথা যে রাজ্যে আজ বহু শিল্প গড়ে উঠেছে এবং এরজন্য আর আমাদের পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। অবশ্য নানাবিধ কারণে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানই সেগুলির বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারছে না।

তবে দুঃখের বিষয় যে, পশ্চিমবঙ্গে কুটির শিল্পের প্রগতি সে রকম হতে পারেনি। এর কারণ হয়তো বা বিক্রয় কেন্দ্রের অভাব এবং পুরোনো কর্মপদ্ধতি। অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলিতে এখনও বিদ্যুৎশক্তি পৌঁছয়নি। কুটির শিল্পের বিকাশের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে কারণ কুটির শিল্পের প্রগতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে গ্রামীণ অর্থনৈতিক পরিবর্তন।

রাজ্যে কেন্দ্রীয় উদ্যোগে যে শিল্পগুলি স্থাপন করা হয়েছে সেগুলির তালিকা নীচে দেওয়া হ'ল:

এ ছাড়া হলদিয়াতে কেন্দ্রীয় ব্যয়ে বর্তমানে একটি বিরাট শিল্প সমষ্টি (কমপ্লেক্স) গড়ে উঠছে যেখানে পেট্রোলিয়ম শোধনাগার এবং কৃষি সার কারখানা তৈরি হবে।

রাজ্যসরকার তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে শ্রমশিল্পের সম্প্রসারণে মোট ২৭২৮.৯৬ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আশা করা হচ্ছে রাজ্যসরকার এর জন্য আরও প্রায় ১৯৭০ লক্ষ টাকা খরচ করবেন।

কেন্দ্রীয় খাতে, পশ্চিমবঙ্গের শ্রমশিল্পের জন্য চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে যে ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে তা হ'ল নিম্নরূপ:

	লক্ষ টাকায়
দুর্গাপুর সম্প্রসারণ	৪২১
দুর্গাপুর মিশ্র ধাতুর কারখানা	২১১
দুর্গাপুর মাইনিং এণ্ড এলায়েড মেশিনারী	২৪৯
হিন্দুস্তান কেবলস্-রূপনারায়ণপুর	৬০৫.২৫
ন্যাশনাল ইন্স্ট্রুমেন্টস-যাদবপুর	৫৫
দুর্গাপুর কৃষি সার কারখানা	২২৩২
দুর্গাপুর অপথ্যালমিক গ্লাস	৪৫.৩৮
পেট্রোলিয়ম শোধনাগার-হলদিয়া	৫৫০০
মোট	৯৩১৮.৬৩

রাজ্যে কেন্দ্রীয় উদ্যোগে স্থাপিত শিল্প

(ব্যয়-কোটি টাকায়)

	স্থান	প্রথম পরিকল্পনা	দ্বিতীয় পরিকল্পনা	তৃতীয় পরিকল্পনা	১৯৬৬-৬৮ (আনুমানিক)	মোট ১৯৫১-৬৮
লোহ এবং ইস্পাত	দুর্গাপুর	—	১৭৮.৭	১৮.০	১.৯	১৯৮.৬
লোহ সম্প্রসারণ	দুর্গাপুর	—	—	৫০.০	১৯.৭	৬৯.৭
ন্যাশনাল ইন্সট্রুমেন্ট অপথ্যালমিক গ্লাস	যাদবপুর দুর্গাপুর	১.০	০.৪	১.৮	২.৭	৫.৯
লোকোমোটিভ	চিত্তরঞ্জন	৩.৬	১.৮	+		৫.৪
হিন্দুস্তান কেবল্স	রূপনারায়ণপুর	১.৩	০.৮	৩.৩	১.৯	৭.৩
মাইনিং এণ্ড এলায়েড মেশিনারী প্রোজেক্ট	দুর্গাপুর	—	১.২	২৮.০	১৫.৮	৪৫.০
এলয় স্টীল	দুর্গাপুর	—	—	৩৩.৩	৩৩.৩	৬৬.৬
কৃষি সার	দুর্গাপুর	—	—	০.৬	৯.১	৯.৭
	মোট	৫.৯	১৮২.৯	১৩৫.০	৮৪.৪	৪০৮.২

পরিবহন খাতে যা দেখানো হয়েছে

ভারতে পরিকল্পিত উন্নয়নের প্রতিচ্ছবি

পরিকল্পনার পথ গ্রহণ করার ফলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেসব রূপান্তর ঘটেছে, অঙ্কের হিসেব থেকেই কেবল তার আভাষ পাওয়া যায়, তা' নয়। পরিকল্পনার নির্দ্ধারিত মেয়াদের কোনোও স্তরে সাফল্যের মাত্রা যদি লক্ষ্য থেকে দূরে থেকে থাকে তা'র মূলে রয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়, উন্নয়নের সাময়িক মন্থরগতি ও অন্যান্য কারণ।

কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে রূপান্তর

পরিকল্পনার বছরগুলিতে অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রসার শুধু আয়তনের দিকেই ঘটেনি, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। এই বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কৃষির ক্ষেত্রে। প্রচুর ফলনশীল বীজ ও উন্নত কৃষিপদ্ধতি হাতিয়ার ক'রে আমরা এই প্রথম, উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করতে সফল হয়েছি। আমাদের কৃষকগোষ্ঠী যেরকম উৎসাহের সঙ্গে নতুন নতুন কৃষিপদ্ধতি গ্রহণ করেছেন এবং কৃত্রিম সার ও কীটনাশক প্রভৃতি কৃষির আধুনিক উপকরণ প্রয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তা'তে তাঁদের অজ্ঞতা, অনগ্রসরতা ও আধুনিকীকরণে বিমুখতার অপবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। এমন কি কৃষি ব্যবস্থার রূপান্তর অন্যবৃত্তিধারীদেরও কৃষিতে ও কৃষিবৃত্তি গ্রহণে উৎসাহিত করেছে।

সামাজিক 'মূলধন' সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও সংহত করার ব্যাপারে ভারত এখন অনেক অগ্রসর। এই মূলধনের তালিকায় শিক্ষা, পরিবহন, চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি বিষয়গুলি পড়ে। পরিকল্পনার প্রভাবেই দেশে শিল্পোন্নয়নের শক্ত বনিয়াদ তৈরী হয়েছে। পাট, তুলো, চা প্রভৃতি চিরাচরিত পণ্য শস্যের উৎপাদনই যে শুধু বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নয়, কতকগুলি নতুন শিল্প যেমন ইস্পাত, মৌলিক ধাতু, মেশিন টুল, ভারী যন্ত্র তৈরীর সাজসরঞ্জাম, রেলের কোচ ; বিদ্যুৎ, ডিজেল ও বাষ্প চালিত রেল ইঞ্জিনের উৎপাদনও উর্দ্ধমুখী হয়েছে। ভারী ও হালকা বিদ্যুৎ সরঞ্জাম উৎপাদনে দেশ স্বয়ম্ভর হয়েছে। মৌলিক ও ভারী রাসায়নিক উপাদান, ওষুধ, কৃত্রিম সুতো ও প্লাস্টিক শিল্পে ভারতের অগ্রগতি প্রশংসনীয়।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে দেশ যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে। কেবল তাই নয়, দেশে কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যাও যথেষ্ট বেড়েছে।

বৈদেশিক ঋণপরিশোধের সমস্যা সত্ত্বেও আমদানী ও রপ্তানী পণ্যতালিকার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। অতীতে ভারত যেখানে শুধু কাঁচামাল রপ্তানী করতো, এখন সেখানে, এ দেশ থেকে, নতুন নতুন তৈরী মাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সামগ্রী বিদেশে চালান যাচ্ছে।

		প্রথম পরিকল্পনার শেষে	দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে	তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে	
	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৭-৬৮
১৯৬০-'৬১ সালের মূল্যমানে মাথাপিছু আয়	২৬৯ টাকা	২৯১ টাকা	৩০৯ টাকা	৩১৫ টাকা	৩৩৬ টাকা
খাদ্য (লক্ষ টনে)	৫০৮	৬৬৮	৮২০	৭২০	৯৮০ (১৯৬৮-৬৯)
সেচযুক্ত এলাকা	৫৫৭	৬৩৩	৭৩৭	৮৮৭	৯৮৩

শিল্পোৎপাদনের মাত্রা

	১৯৫১	১৯৫৫	১৯৬৫	১৯৬৭
১৯৬০ সালের ভিত্তিতে সচক মাত্রা—১০০	৫৪.	৭২.৭	১৫০.৯	১৫০.৭

সামাজিক মূলধন

সাল	সাধারণ শিক্ষা (স্কুলের ছাত্রছাত্রী)	হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা (হাজারে)	পরিবহন
১৯৫০-৫১	২.৩৫ কোটি	১১৩	৬,৬৫ কোটি প্যাসেঞ্জার কি. মী.
১৯৬৮-৬৯	৭.৫২	২৫৫.৫৪	১,০৬৩ " " " "

কয়েকটি প্রধান শিল্পক্ষেত্রে অর্থনৈতিক রূপান্তরের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাবে নীচের তালিকায়।

সাল	সূতী বস্ত্র	সিমেন্ট	ইস্পাত	মেশিনটুল	টার্ব্বো জেনারেটর	বিদ্যুৎ	ধাতব ভারী সরঞ্জাম	নাইট্রোজেনযুক্ত সার ব্যবহারের মাত্রা
	কোটি মীটারে	কোটি টনে	কোটি টনে	কোটি টাকায়	কিলোওয়াট	কিলোওয়াট	হাজার টনে	হাজার টনে
১৯৫০-৫১	৪২১.৫	.২৭	.১৫	.৩৪	—	৭৮০ কোটি	—	৫৫
১৯৬৭-৬৮	৭৪০.০	১.১৫	.৬৪	২৫	৯০ হাজার	৪৩০০ "	১৫	১৪০০ (১৯৬৮-৬৯)

১৭ বছরের পরিকল্পনার ফলশ্রুতি হিসেবে অর্থনীতির প্রধান ক্ষেত্রগুলিতে কতটা সাফল্য অর্জন করা গিয়েছে তার সামগ্রিক ধারণা দেবার জন্যে উল্লেখ করা যায়, যে, ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৬৭-৬৮-র মধ্যে জাতীয় আয় শতকরা ৮০ ভাগ, শস্যোৎপাদনের মাত্রা শতকরা ৭০ ভাগ এবং শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ১৭০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিকল্পনাগুলির জন্য অর্থসংস্থান

(বর্তমান মূল্যমান অনুযায়ী লক্ষ টাকায়)

	প্রথম পরিকল্পনা	দ্বিতীয় পরিকল্পনা	তৃতীয় পরিকল্পনা	বার্ষিক (তিনটি) পরিকল্পনা	চতুর্থ পরিকল্পনা
বর্তমান প্রকল্পগুলি থেকে অবশিষ্ট	৬৩,৯০০	১০৬,৩০০	২২৪,০০০	১১২,৫০০	৫০২,১০০
সরকারী সংস্থাগুলির উদ্বৃত্ত	১১,৫০০	১৬,৭০০	৬৭,০০০	৩৮,৯০০	৯৩,৫০০
দেশে সংগৃহীত ঋণ	১০১,৭০০	২৩৯,৩০০	৩৩০,২০০	২৪৬,৬০০	
মোট আভ্যন্তরীন সম্পদ ঘাটতি	১৭৭,১০০	৩৬২,৩০০	৬২১,২০০	৩৯৭,৪০০	২৮৯,২০০
বহির্সাহায্য	১৮,৯০০	১০৪,৯০০	২৪১,৬০০	২৮১,৮০০	২৪২,৩০০
ঘাটতি অর্থসংস্থানের ধার্য্য পরিমাণ	৫৩,২০০	৯৪,৮০০	১১,৩৩০		৮৫,০০০

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

১৮ পৃষ্ঠার পর

অথচ ৫০০০ টাকার বিনিময়ে ক্ষুদ্রশিল্পে একটি মানুষ তার কর্মসংস্থান করে নিতে পারে। গ্রামীণ শিল্প ও কারু শিল্পে এই বিনিয়োগ আরো কম ১ হাজার থেকে দেড় হাজারের মধ্যে। বৃহৎ শিল্পের প্রসার স্তিমিত নানা কারণে, ক্ষুদ্র শিল্পেও বিভিন্ন সঙ্কট সমস্যাপীড়িত মানুষকে একেবারে এক অন্তহীন প্রাচীরের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

পরিকল্পনায় অর্থ বিনিয়োগের প্রশ্ন মুখ্য হলেও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর গুরুত্বও অস্বীকার করার নয়। পরিকল্পনার সর্বস্তরে সাফল্য সুনিশ্চিত করার জন্য প্রত্যেক শরীকের মূল্যবোধ এবং পরিকল্পনার সার্থকতায় আন্তরিক আস্থা রাখা আজ জরুরী বলে গণ্য করতে হবে। প্রতিটি মানুষকে যদি জায়গা করে দিতে হয় এই সমাজতন্ত্রে, তা হলে কথার জাল কেটে বেরিয়ে আসতে হবে বাস্তবের রৌদ্রোজ্জ্বল জগতে, যেখানে আজ অপ্রাচুর্য অপুষ্টি, অশিক্ষা, কুসংস্কার আর ক্রম বর্ধমান জনসংখ্যার চাপে মানুষের জীবনের সমস্ত মূল্যবোধ শুকিয়ে আসছে। কৃষিতে স্বয়ম্ভর হওয়াই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে আধুনিক কৃষি বিজ্ঞানের আশ্রয় নিতে হবে পুরোপুরি। কর্মহীন মানুষের মুখে যদি সেই কৃষির উৎপাদন তুলে দিতে হয় তাহলে শিল্প, বিশেষত ক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে তার গাঁট ছড়া বাঁধতে হবে। অপুষ্টির হাত থেকে মানুষকে যদি কর্মচঞ্চলতায় প্রতিষ্টিত করতে হয় তাহলে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি যেমন করেই হোক রোধ করতে হবে।

পরিশেষে এই কথাই বলা যেতে পারে ভারতবর্ষ যুগ যুগ ধরে যে বাণী বিশ্বে প্রচার করেছে তা হল—আত্মার ঐশ্বর্যে প্রতিটি মানুষের প্রতিষ্ঠা। অর্থনৈতিক ঐশ্বর্য দৈনন্দিন চাওয়া পাওয়ার স্থূল চাহিদাকে স্পর্শ করে যায় মাত্র এবং দারিদ্র্য থেকে মুক্তির মাধ্যমেই ফিরে আসে মানুষের প্রকৃত মূল্যবোধ। আমাদের পরিকল্পনা সেই দিনই সার্থক হবে যেদিন প্রতিটি মানুষ আরও সচেতন হয়ে উঠবে তার মূল্যবোধ নিয়ে। মানব-সংসারের এই বিরাট পঙ্‌ক্তিভোজে কোন মানুষই যেন নিজেকে অপাঙ্‌ক্তেয় মনে না করেন।

সুব্রত গুপ্ত

১০ পৃষ্ঠার পর

৪৪ ভাগ এবং শতকরা ৬০ ভাগ। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যদিও ১২০০ কোটি টাকার ঘাটতি অর্থসংস্থানের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল, নতুন মুদ্রার পরিমাণ শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিল ৯৪৮ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় যেখানে ঘাটতি অর্থসংস্থানের পরিমাণ ধরা হয়েছিল ৫৫০ কোটি টাকা, সেখানে প্রকৃত ঘাটতি অর্থসংস্থানের পরিমাণ হয়েছিল ১১৫০ কোটি টাকা। গত চার বছরের ঘাটতি অর্থসংস্থানের ধারা দেখে বলা চলে চতুর্থ পরিকল্পনায় ঘাটতি অর্থ সংস্থানের পরিমাণ ৮৫০ কোটি টাকায় সীমিত থাকবে না। নতুন মুদ্রার পরিমাণ যতই বাড়বে মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা ততই বাড়বে যদি না বর্ধিত মুদ্রা, উৎপাদন বাড়াবার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ভাবে ব্যবহৃত না হয়। নতুন মুদ্রার সবটাই যে উৎপাদন বাড়িয়ে দেবে এমন কোন সুনিশ্চিত ধারণা পোষণ করা সম্ভব নয় বলেই অনেকের ধারণা। দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় মৃদু মুদ্রাস্ফীতি অনেক ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা বেড়ে গেলে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হয় এবং সেই অবস্থায় দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির হারও ব্যাহত হয়। চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় কোন কোন খাদ্য সামগ্রীর দাম কিছু কমের দিকে গেলেও অধিকাংশ ভোগ্য পণ্যের দাম এখন উর্ধমুখী। কোন কোন খাদ্য সামগ্রীর দাম কমের দিকে যাবার প্রধান কারণ হচ্ছে 'সবুজ বিপ্লব' বা কৃষি উৎপাদনের অভাবনীয় বৃদ্ধি। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ঘাটতি অর্থসংস্থানের পরিমাণ যদি শেষ পর্যন্ত ৮৫০ কোটি টাকার চেয়ে বেশী হয় তবে মুদ্রাস্ফীতি হয়ত য পর্যন্ত আর 'মৃদু' থাকবে না। যদি মুদ্রাস্ফীতি চরমে উঠে তবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি হবে বিঘ্নিত, মন্থর। কিন্তু আমাদের বর্তমান আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে যে ঘাটতি অর্থসংস্থানের উপর নির্ভর না করে চতুর্থ পরিকল্পনার সামগ্রিক আর্থিক প্রয়োজন মেটানো অসম্ভব। যেহেতু ঘাটতি অর্থসংস্থানের উপর আমাদের নির্ভর করতেই হবে সেজন্য আমাদের একটি সুনির্দিষ্ট মূল্য অনুসরণ করা উচিত। তা ছাড়া বর্ধিত মুদ্রা যাতে দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধিকারী প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগ করা হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

ভারতকে যদি অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার পথে দ্রুত অগ্রসর হতে হয় তবে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে। জাতীয় আয়ের শতকরা ১২ ভাগ যাতে সঞ্চয় করা সম্ভব হয় সেজন্য সম্ভাব্য সব ব্যবস্থাই গ্রহণ করা উচিত। আমাদের জাতীয় আয়ের প্রায় শতকরা ১৪ ভাগ, কর হিসাবে আদায় করা হয়। অল্প বিত্তদের উপর আরও বোঝা না চাপিয়ে এবং কালো টাকা সঞ্চয়ের প্রবণতা রোধ করার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে জাতীয় আয়ের আরও বেশী অংশ রাজস্ব হিসাবে আদায় করার (অন্তত: শতকরা আঠারো ভাগ) চেষ্টা চালানো উচিত। কালো টাকা খুঁজে বের করার ব্যবস্থা যদি খুব কঠোর হয় এবং কর ফাঁকি বন্ধ করার ব্যবস্থা যদি ফলপ্রসূ হয় তবে এই লক্ষ্যে পৌঁছানো অসম্ভব নয়।

ধীরেশ ভট্টাচার্য্য

১৪ পৃষ্ঠার পর

হবে, তারা সমাজে নেতৃত্ব দেবে, এই যেখানে স্বাভাবিক প্রত্যাশা, আমরা সেখানে আগের চেয়েও বেশি পরনির্ভর এক বিপুল আশাহত যুবকশ্রেণী সৃষ্টি ক'রে চলেছি।

পরিকল্পনাকে এই সঙ্কট থেকে মুক্ত করার জন্যে যে সবল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের প্রয়োজন তার প্রধান কর্তব্য হবে পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে দিয়ে সব শ্রেণীর মানুষের মনকে সেই লক্ষ্যের অনুবর্তী করা। এর জন্যে যে বাদানুবাদ, যে ঘাত-প্রতিঘাতই প্রয়োজন হ'ক তা' যত দিন ধরেই চলুক না কেন, পরিকল্পনার প্রতি আস্থা ও অনুরক্তি জাগিয়ে রাখার জন্যে যে-সব সংস্কারের প্রয়োজন তার দিকে প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হবে। পরিকল্পনার আদর্শবাদ ও রূপায়ণের চাবিকাঠি সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে রেখে দিলে কিংবা তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষার দিকে সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখতে অবহেলা করলে সাধারণ মানুষও পরিকল্পনা থেকে শুধু পাওয়ার হিসাব কষতেই শিখবে, পরিকল্পনার সামগ্রিক সার্থকতার দিকে তাঁদের মন ফেরানো আর সম্ভব হবে না।

পরিকল্পনাগুলিতে প্রতিফলিত দেশের আনন্দ ও বেদনা

রিকল্পনাগুলির লক্ষ্য ও উন্নয়ন সমস্যা

প্রথম পারকল্পনাটির লক্ষ্য ছিল পরিমিত ; গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল কৃষি এবং লসেচের ওপরেই বেশী। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অর্থনীতির মূলধনী ভিত্তিকে ঢ়ত্র করাই ছিল লক্ষ্য। তাছাড়া কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধে বাড়ানো এবং াায়তন ও ভারি শিল্পগুলির উন্নয়নের ওপরেও জোর দেওয়া হয়। তৃতীয় বিকল্পনায় কৃষি ও শিল্প উভয়ের উন্নয়নের ওপরেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। তীয় পরিকল্পনার পর তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল, পুর্ব্ব পরিকল্পনা-লিতে অর্জিত সাফল্যগুলিকে সংহত করা। চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়ায় আত্ম-র্ভরতার প্রয়োজনের ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে উপকার্-ি যাতে সমভাবে বণ্টিত হয় তাই হবে এই পরিকল্পনার লক্ষ্য। চতুর্থ বিকল্পনায় কৃষিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত কর্ম্মসূচীগুলির জন্য র্থের সংস্থান, রূপায়ণের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা এবং জনগণের আন্তরিক সহযোগি-ার ওপরেই পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে।

পরিকল্পিত উন্নয়নের আদর্শ নিয়ে সমাজ কল্যাণে বৃৎ হওয়ার সমস্যা অনেক, একথা বললে আশ্চর্য্য হওয়ার কথা। কিন্তু কথাটা মিথ্যা নয়। মৃত্যুর হার হ্রাস, আয়ুর ব্যাধি-মহামারী শাসনের ফলে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের দরুণ যে সুন্দর পরিমণ্ডল সৃষ্টি হ'তে পারত জনসংখ্যার অভাবনী বৃদ্ধিতে তা' বিপর্য্যস্ত হয়ে গেছে। জনসংখ্যাবৃদ্ধির পরিকল্পনার সব সুফলকে অকিঞ্চিৎকর ক'রে দিচ্ছে। ১৯৫০-৫১-র মোট জনসংখ্যা ৩৫.৯ কোটি থেকে '৬০-৭০'এ দাঁড়িয়েছে ৫৩ কোটীতে।

তবু, পরিকল্পনার সুফল মাথাপিছু আয়ের আকারে এব ভোগ্যপণ্য ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারের মাত্রাবৃদ্ধিতে প্রতিফলিত হবে, এইটাই পরিকল্পনা প্রণেতাদের লক্ষ্য। সমা তন্ত্রের আদর্শের ওপর পুনরায় গুরুত্ব আরোপ ক'রে, ঐ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

পরিকল্পনায় বিনিয়োগ এবং সরকারি তরফের লগ্নি

(বর্ত্তমান মূল্যমান অনুযায়ী ১০ লক্ষ টাকায়)

	প্রথম পরিকল্পনা	দ্বিতীয় পরিকল্পনা	তৃতীয় পরিকল্পনা	তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬৬-৬৯)	চতুর্থ পরিকল্পনা
প্রথমে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ	২০৯০	৪৮০০০	৭৫০০০	৬৭৫৬০	১৪৩৯৮০
সরকারি তরফে পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগ	১৯৬০০	৪৬৭২০	৮৬২৮২	৬৭৯১৯	১৪৩৯৮০
লগ্নি (মোট)					
সরকারি তরফ :	১৯৬০০	৩৪৫০০	৭১৮০০	৫৮১৭০	
বেসরকারি তরফ :	১৯৩০০	৩৩০০০	৪১৯০০	৩৬৪০০	
কৃষি ও সেচ	৭২৪০	৯৭৯০	১৭৬০৫	১৪৮০৬	২২১৭৫ +৯৬৩৮
বিদ্যুৎ শক্তি	১৪৮৮	৪৫২০	১২৬২৯	১১২৬৬	২০৮৪৫
খনি এবং উৎপাদন	৯৬৮	১১২৫০	১৯৫৯০	১৭২১৯	৩০৮৯৯
পরিবহণ এবং যোগাযোগ	৫১৭৮	১২৬১০	২১১২৯	১৩০২৫	৩১৭৩১
শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সমাজকল্যাণ সেবা	৪৭৭২	৮৫৫০	১৫৩৩৯	১১৬০৩	২৩৯১৩

REGD. NO. D-233

ধনধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত হ'লেও 'ধনধান্যে' শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই ব্যক্ত করে না। পরিকল্পনার বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী ক্ষেত্রে উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতটা অগ্রগতি হচ্ছে তার খবর দেওয়াই হ'ল 'ধনধান্যে'র লক্ষ্য।

'ধনধান্যে' প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে প্রকাশিত হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

নিয়মাবলী

দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়।

অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পুন: প্রকাশকালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার করা হয়।

রচনা মনোনয়নের জন্যে আনুমানিক দেড় মাস সময়ের প্রয়োজন হয়।

মনোনীত রচনা সম্পাদক মণ্ডলীর অনুমোদনক্রমে প্রকাশ করা হয়।

তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয়। কোনোও রচনার প্রাপ্তি-স্বীকৃতি, পত্র মারফৎ জানানো হয় না।

নাম ঠিকানা লেখা, ডাকটিকিট লাগানো, খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

কোনো রচনা তিন মাসের বেশী রাখা হয়না।

শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাবেন।

গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেস ম্যানেজার, পাব্লিকেশন্‌স্ ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী-১ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

"ধনধান্যে" পড়ুন দেশকে জানুন

উন্নয়ন বার্তা

★ ট্রম্বের ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণযোগ্য রেডিওগ্রাফিক ক্যামেরা তৈরী হয়েছে। ফলে, ভারত এখন, আইসোটোপ রেডিওগ্রাফির সাহায্যে বোয়িং জেটের ইঞ্জিন পরীক্ষা করতে পারবে। রেডিওগ্রাফি পদ্ধতিতে যন্ত্রের নির্মানত্রুটী ধরা পড়ে। এই পদ্ধতিতে জাম্বো জেটের ইঞ্জিনও পরীক্ষা করা যাবে। এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রার যথেষ্ট সাশ্রয় হবে।

★ হরিদ্বারে ভারত হেভী ইলেকট্রিক্যাল্‌স্ কারখানায় ১০০ মেগাওয়াটের বাষ্পীয় টার্বাইন তৈরী হয়েছে। সম্পূর্ণ দেশীয় উপকরণ দিয়ে, ভারতীয় ইঞ্জিনয়াররা সোভিয়েৎ বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঐ টার্ব্বাইন তৈরী করতে সমর্থ হয়েছেন। টার্ব্বাইনটি উত্তরপ্রদেশের ওবরা থার্মাল পাওয়ার স্টেশনকে দেওয়া হবে।

★ মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ বিভাগে অমরাবতীতে, দানাদার কৃত্রিম মিশ্র সারের কারখানা চালু হয়েছে। কারখানার নির্মাতা হ'ল বিদর্ভ-সমবায়-বিক্রয়কারী সমিতি। এই কারখানায় বছরে ৬০,০০০ টন দানাদার সার তৈরী হ'তে পারে।

★ কাণ্ডলা বন্দর ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলগুলির মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী ২৩০ কি. মী. দীর্ঘ ব্রড গেজ রেলপথ যাত্রী চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। রেলপথ নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১৬ কোটী টাকা।

★ কোয়েম্বাটুর থেকে ৪০ কি. মী. দূরে সিরামুগাই নামক একটি জায়গায় কাঠের মণ্ড তৈরীর একটি কারখানা চালু করা হয়েছে। এটি তৈরী করতে ব্যয় হয়েছে ১২.৫ কোটী টাকা।

★ পোল্যাণ্ড ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি বাণিজ্য-চুক্তি অনুযায়ী ১৯৭০ সালে দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন হ'বে ৮০ কোটী টাকার মত। চিরাচরিত রপ্তানী পণ্য ছাড়াও ভারত পোল্যাণ্ডে রেলের ওয়্যাগণ, সুতী বস্ত্র, সুতো ও ইঞ্জিনিয়ারিং সামগ্রী রপ্তানী করবে এবং আমদানি করবে গন্ধক, য়ুরিয়া, কৃষির জন্য ট্র্যাক্টার, জাহাজ, জাহাজী সরঞ্জাম, জৈব ও অজৈব রাসায়নিক দ্রব্য, জিঙ্ক, নিউজপ্রিন্ট প্রভৃতি।

★ মিশ্র ইস্পাতের অন্যতম উপাদান সিলিকো ক্রোম এই প্রথম আমাদের রপ্তানী তালিকায় স্থান পেল। মহারাষ্ট্রের একটি কারখানা জাপানে রপ্তানীর প্রথম কিস্তী হিসেবে সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা মূল্যের সিলিকো ক্রোম পাঠিয়েছে।

★ ভারত ও সোভিয়েট য়ুনিয়ন ১৯৭০ সালে ৩০০ কোটী টাকার জিনিস লেনদেন করার জন্যে একটি চুক্তিতে সই করেছে। ভারত, চিরাচরিত জিনিস ছাড়াও, চামড়ার জুতো এবং জামাকাপড়ের মতো একান্ত প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য রপ্তানী করবে। ১৯৭০ সালে ভারত মোট ২০০ কোটী টাকার জিনিস রপ্তানী করতে পারবে ব'লে আশা করে।

★ চিতোরগড় জেলায় বিজাইপুর নদীর ওপর ১৬৫ ফুট লম্বা ও ২৪ ফুট চওড়া সেতুর শিলান্যাস করা হয়েছে। সেতু নির্মাণের আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ হবে এক লক্ষ টাকা।

★ গত তিন বছরে উত্তর প্রদেশে, বন্যা নিয়ন্ত্রণের অঙ্গ হিসেবে, প্রায় ৬৭,০০০ একর জমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

★ এবছর পাঞ্জাবে ৯৭২টি গ্রামে বিদ্যুৎ শক্তি পৌঁচেছে। সারা বছরের জন্য নির্দ্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫০০টি গ্রামের বৈদ্যুতিকীকরণ।

ডিরেক্টার, পাবলিকেশন্‌স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সোসাইটি লি:—করোলবাগ, দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত।

ধনধান্যে

প্রথম বর্ষ ঃ ১৮
৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত
পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

প্রথম বর্ষ অষ্টাদশ সংখ্যা

৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ : ১৯শে মাঘ ১৮৯১
Vol. 1 : No 18 : February 8, 1970

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

প্রধান সম্পাদক
শরদিন্দু সান্যাল

সহ সম্পাদক
নীরদ মুখোপাধ্যায়

সহকারিণী (সম্পাদনা)
গায়ত্রী দেবী

সংবাদদাতা (কলিকাতা)
বিবেকানন্দ রায়

সংবাদদাতা (মাদ্রাজ)
এস. ভি. রাঘবন

সংবাদদাতা (শিলং)
ধীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী

সংবাদদাতা (দিল্লী)
প্রতিমা ঘোষ

ফোটো অফিসার
টি.এস নাগরাজন

প্রচ্ছদপট শিল্পী
জীবন আডালজা

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০

টেলিগ্রাফের ঠিকানা : যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

ভুলি নাই

নিজেদের বিশ্বাসে অটল থাকা নিজেদের হাতে, কিন্তু তা বলে পরের বিশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করার কোন অধিকার আমাদের নেই

-রবীন্দ্রনাথ

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়

ভারত সোভিয়েট সহযোগিতা

ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে স্বাক্ষরিত প্রথম অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্পর্কিত চুক্তিটির পঞ্চদশ বার্ষিকী গত সপ্তাহে পালিত হয়। যে কোন জাতির ইতিহাসে ১৫ বছর সময় বিশেষ কিছুই নয় কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই এই দুটি দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও কারিগরী সহযোগিতা ক্রমশঃ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে। এই সম্পর্ক অন্যান্য ক্ষেত্রেও দুটি দেশের উপকার করেছে এবং বিশ্ব শান্তি ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার উদ্দেশ্য সাধনে দুটি দেশের প্রচেষ্টায় বিশেষ অবদান জুগিয়েছে।

স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকেই আমরা ভারতে দারিদ্র্য নির্মূল করা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জ্জন করার উদ্দেশ্যে, পরিকল্পিত উন্নয়নের পথ অনুসরণ ক'রে চলেছি। এর লক্ষ্য হ'ল সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থা স্থাপন, যেখানে দীনতম ব্যক্তিও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভাবতে পারবেন। এই লক্ষ্য পূরণ করতে হলে দেশকে নিজের জনবল ও সম্পদের ওপরেই নির্ভর করতে হয়। কিন্তু যে দেশ অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে চায়, তাকে সাহায্যের জন্য বিশ্বের উন্নততর দেশগুলির মুখাপেক্ষী হতে হয়। আমাদের সৌভাগ্য যে পুনর্গঠনের এই বিপুল অভিযানে আমরা বিভিন্ন দেশ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। ভারতের যদিও প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তির অভাব নেই, তবুও এই দেশ, কারিগরী জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক সর্ত্ত বিহীন সাহায্যকে স্বাগত জানিয়েছে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতবাদ এমন কি পরস্পর-বিরোধী আদর্শবাদসম্পন্ন দেশগুলিও, সাম্প্রতিককালে ভারতের নিরপেক্ষ নীতিতে আকৃষ্ট হয়ে বন্ধুর মতো এই দেশকে সাহায্য করার জন্য যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রয়োজনের সময় যে সব দেশ বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করেছে সেগুলির মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন হল অন্যতম। এই সাহায্যের পেছনেও কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। দুটি দেশই তাদের বন্ধুত্বের জন্য গর্ব্ব অনুভব করে এবং পুনরাবৃত্তির মতো মনে হলেও এই বন্ধুত্ব কোন শক্তি গোষ্ঠির বিরোধী নয়। এটার ভিত্তি প্রকৃতপক্ষে স্থায়ী বন্ধুত্বের নীতির ওপরেই প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের পক্ষে ভারত-সোভিয়েট সহযোগিতা সব সময়েই ফলপ্রসূ হয়েছে। আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ক'রে ইস্পাত, তৈল অনুসন্ধান, ভারি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি, ওষুধপত্র এবং কৃষির ক্ষেত্রে এই বন্ধুত্ব যথেষ্ট অবদান জুগিয়েছে এবং ভাবী শিল্পের ভিত্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। ভিলাই ইস্পাত কারখানা, রাঁচির ভারি মেসিন তৈরীর কারখানা, হরিদ্বারের ভারী বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম তৈরির কারখানা এবং হৃষিকেশের এ্যান্টিবায়োটিক তৈরীর কারখানা হল সোভিয়েট ইউনিয়নের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত প্রায় ৬০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের অন্যতম।

ভারতে যে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিশেষজ্ঞদের একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে তা হল ভারত-সোভিয়েট সহযোগিতার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের যে ব্যবসা-সম্পর্ক গড়ে উঠছে সেখানে ভারত একটা প্রধান স্থান অধিকার ক'রে আছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন বর্ত্তমানে ভারতীয় দ্রব্যাদির প্রধান আমদানিকারক। আগামী বছর থেকে পাঁচ বছরের জন্য একটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন সম্পর্কে যে আলোচনা চলেছে তার প্রথম বৈঠকেই দুটি দেশ বার্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ শতকরা ৭ ভাগ বাড়াতে স্বীকৃত হয়েছে। ভারত তার চিরাচরিত ও অন্যান্য সামগ্রী রপ্তানীর পরিমাণ বাড়াবে। তাছাড়া সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে ভারতে যে সব জিনিস রপ্তানী করা হয় তাতেও বৈচিত্র্য আনা হবে।

ভারতের অর্থনীতি বছরের পর বছর ধরে নানা সমস্যার জন্য বিড়ম্বিত হ'লেও বর্ত্তমানে তা আস্তে আস্তে উন্নতি লাভ করছে। এখন চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রারম্ভে দেশের অর্থনীতির ভিত্তি দৃঢ়তর হয়েছে। পরিকল্পনাকে সফল ক'রে তোলার জন্য যে জনগণ আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছেন তাঁরাই এর জন্য প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। ভবিষ্যতেও জনগণের কাছ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ সাহায্য পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায় কারণ এই সহযোগিতা যদি না থাকে তাহলে, বিশ্বের বৃহত্তম শক্তিও যদি সর্ব্বতোভাবে আমাদের সাহায্য করতে আসে তাহলেও বাঞ্ছিত উন্নয়ন সম্ভব হবে না। নানা দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ এই বিশ্বে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা কাম্য হলেও দেশের জনসাধারণই প্রকৃতপক্ষে নিজেদের ভবিষ্যত গড়ে তুলতে পারেন, বাইরের কেউ নয়।

পরিকল্পনা সমীক্ষা

বোটাডের কৃষিশ্রমিক

'সবুজ বিপ্লব' বা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি অভিযানের অন্যতম নেতা হলেন কৃষি শ্রমিক। এই অভিযান অব্যাহত রাখার জন্য কৃষি শ্রমিকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি অত্যাবশ্যক। কৃষক গোষ্ঠীর মধ্যে এই একটি শ্রেণী, যাঁদের জীবন ধারণের মান উন্নত করার দিকে তেমনভাবে মনোনিবেশ করা হয়নি। শিল্প শ্রমিকদের মজুরীর ন্যূনতম হার নির্দিষ্ট ক'রে দিয়ে আইন তৈরি হয়েছে বটে, কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে তাঁদের সমগোত্রীয়দের জন্য তার কিছুই করা হয়নি। এ বিষয়ে গভীরভাবে তেমন কোনো অনুসন্ধানও চালানো হয়নি। যাই হোক, কে. বি. আর্টস এ্যাণ্ড কমার্স কলেজের প্ল্যানিং ফোরাম, গুজরাটের বোটাড তালুকের, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে সমীক্ষা চালান। বিগত আঠারো বছরে, পরিকল্পনার আওতায় এবং ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার ফলশ্রুতি হিসেবে এই গোষ্ঠী অর্থনৈতিক দিক থেকে কতটা উপকৃত হয়েছেন এবং তাঁদের সামাজিক জীবন কতটা প্রভাবিত হয়েছে তা নিরূপণ করাই ছিল ঐ সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

১৯৬১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী তালুকে কৃষিশ্রমিক গোষ্ঠীর জনসংখ্যা ছিল ৫,৫৯৪ যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ২,৮৩২ ও স্ত্রীলোকের ২,৭৬২। কৃষি শ্রমিক পারবারের মধ্যে শতকরা ৭২টি পরিবার সম্পূর্ণভাবে ক্ষেত খামারের কাজেই ব্যাপৃত থাকেন; ঐ তাঁদের জীবিকা। শতকরা ১৮টি পরিবারের ২।১ একর জমি থাকলেও খরার সময়ে তাঁদের অন্যের জমিতে কাজ করতে হয়। অবশিষ্ট ১০টি পরিবার আশপাশের গ্রামে বা শহরে ভালো মজুরীর ভরসায় কাজ করেন। এঁদের শতকরা ৯০ জন নিরক্ষর। অক্ষর পরিচয় সম্পন্নদের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত পড়েছেন, এমন লোকের সংখ্যা (স্ত্রী পুরুষ মিলিয়ে) ২৭৩ এবং 'সাক্ষরের' সংখ্যা (স্ত্রী পুরুষ মিলিয়ে) ৪২৩।

কৃষি শ্রমিকদের শতকরা ৯৫ জন নিজেদের তৈরি মাটির ঘরেতে থাকেন, বাকী ভাড়া করা বাড়ীতে। প্রায় সব কটি পরিবারই আয়ের শতকরা ৭০ ভাগ ব্যয় করেন খাওয়ার জন্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও এঁরা অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্যহীনতায় ক্ষীণ এবং প্রায়ই সংক্রামক ব্যাধিতে ভোগেন।

১৯৫১ সাল থেকে এঁদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলে মনে হয়। অংশতঃ ভূমিসংস্কার এবং অংশতঃ চাষবাসের চিরাচরিত রীতির রদবদলের ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। এই তালুকে পণ্যশস্যের চাষ প্রবর্তনের পর থেকে তুলো ও চীনা বাদামের উৎপাদন শতকরা সাড়ে চার ভাগের মত বেড়েছে। এই উন্নতির পর ক্ষেত খামারে কাজ করার জন্য নগদ টাকায় মজুরীর দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হয়। ইতিপূর্বে মজুরীর অর্ধেক দেওয়া হ'ত শস্য দিয়ে।

১৯৫১ সালের আগে কৃষিশ্রমিকদের অর্ধেক দিনের মজুরী দেওয়া হত ৩৫ পয়সা হারে এবং তাঁদের কাজের মেয়াদ হ'ত চার ঘন্টার মত। তারপর এই হার বেড়ে গেছে। অবশ্য অঞ্চল বিশেষে, মজুরীর হারে তারতম্য আছে। যেমন পালিয়াদ হ'ল একটা জায়গা যেটা আধা শহর আধা গ্রাম। সেখানে কৃষি শ্রমিকদের মজুরীর হার পুরুষের ক্ষেত্রে দৈনিক ২ টাকা, স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে ১ টাকা ৫০ পয়সা এবং বালকবালিকার ক্ষেত্রে এক ১ টাকা ক'রে। আবার রোহিশালা গ্রামে পুরুষের মজুরীর হার দিনে ১ টাকা ৫০ পয়সা, স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে ১ টাকা ২৫ পয়সা এবং বালকবালিকার ক্ষেত্রে ৭৫ পয়সা।

বোটাডের শহর এলাকায় মজুরীর হার অপেক্ষাকৃত বেশী। সেখানে পুরুষ-স্ত্রী ও বালক-বালিকার মজুরীর হার হ'ল যথাক্রমে ২ টাকা ৫০ পয়সা, ১ টাকা ৫০ পয়সা ও ৭৫ পয়সা। এ ছাড়া মরসুম অনুসারে মজুরীর হার বদলায়।

ঐ শহরের আশেপাশে গ্রামাঞ্চলগুলিতে সময় বিশেষে শ্রমিকদের অভাব প্রকট হয়ে ওঠে। গ্রীষ্মকালে শ্রমিকদের কাজ থাকে না বলে শ্রমিক পরিবারগুলি জুনাগড় তালুকে চলে যায় বেশী মজুরীর আশায়। পালিয়াদ, তুর্বা ও সাম্বালির মত গ্রামগুলিতে ফসল কাটার মরসুমে কৃষি শ্রমিকদের চাহিদা অনেক বেড়ে যায়।

বর্ম্মায় টায়ার রপ্তানী

ডানলপ ইণ্ডিয়া লিমিটেড বর্ম্মায় টায়ার রপ্তানী করা সম্পর্কে সম্প্রতি যে অর্ডার পেয়েছে, ভারতের কোন টায়ার কোম্পানি কোনদিন এত বড় অর্ডার পায়নি। বর্ম্মা ইউনিয়ন সরকার ৭০ লক্ষ টাকারও বেশী মূল্যের, ট্রাকের টায়ার ও টিউবের অর্ডার দিয়েছেন। তীব্র আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে, কোম্পানি এই অর্ডার সংগ্রহ করেছেন।

১৯৬৮ সালে এই কোম্পানির রপ্তানীর পরিমাণ ২.৫১ কোটি টাকারও বেশী ছিল। ভারতের আর কোন টায়ার কোম্পানি এত টাকার টায়ার রপ্তানী করতে পারেনি। ডানলপ কোম্পানি বর্ত্তমানে ৭০টিরও বেশী দেশে টায়ার টিউব রপ্তানী করে। এই বছরে কোম্পানির তালিকায় নতুন ১২টি দেশ যুক্ত হয়েছে। সেগুলি হল অষ্ট্রিয়া, জর্ডান, আইসল্যাণ্ড, সোমালি রিপাব্লিক, উগাণ্ডা, কিউবা, মালোয়াই, প্যারাগুয়ে, কোষ্টারিকা, নিকারাগুয়া, দুবাই এবং ডেনমার্ক। যে সব জিনিস রপ্তানী করা হয় তা হল : ট্রাকের টায়ার, সাইকেল ও বিমানের টায়ার, মোটর গাড়ীর ও ট্র্যাক্টারের টায়ার, মাটি কাটার ট্রাকের টায়ার, ব্যারো টায়ার, রাবার সলিউসন ও এ্যাডহেসিভ, ট্রান্সমিশন বেলটিং, ব্রেডেড হোজ, ফ্যান ও ভী-বেল্ট, সাইকেলের রিম, শক এ্যাব্‌সরবার এবং মোটরগাড়ীর চাকা।

পরিকল্পনা রূপায়ণে বেসরকারী তরফের ভূমিকা

জে. আর. ডি. টাটা

আমরা এখন উন্নয়নের দ্বিতীয় দশকের সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁচেছি। বর্ত্তমানে ভারতের সরকারী ও বেসরকারী তরফের শিল্পগুলি এক বিপুল কর্ত্তব্যের সম্মুখীন হয়েছে। তবে বেসরকারী তরফের ওপর যদি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরও কঠোর করা হয় তাহলে তার পক্ষে এই বিপুল কর্ত্তব্যভার বহন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

চতুর্থ পরিকল্পনায়, বাৎসরিক শতকরা ৬ ভাগ আর্থিক উন্নয়নের যে লক্ষ্য রাখা হয়েছে তা পূরণ করতে হলে এই দশকের শেষ পর্যন্ত আমাদের জাতীয় আয় ২৭,০০০ কোটি থেকে ৫৮,০০০ কোটি করতে হবে। আমাদের জনসংখ্যার সম্ভাব্য বৃদ্ধির হিসেব অনুযায়ী আমাদের জনপ্রতি বার্ষিক আয় শতকরা প্রায় ৪.৩ ভাগ বাড়া উচিত (পূর্ব্বের দশ বছরে এই হার ছিল শতকরা ১ ভাগেরও কম) এবং এই দশকের শেষে জনপ্রতি বার্ষিক আয় ৮৪৪ টাকা হওয়া উচিত। বর্ত্তমান মূল্যমান অনুযায়ী এই সংখ্যাগুলি হিসেব করা হয়েছে। এই সবের অর্থ হ'ল, পূর্ব্বের দশ বছরের তুলনায় এই দশকে, দ্বিগুণ হারে আর্থিক উন্নয়ন করতে হবে।

আর্থিক ক্ষেত্রে শিল্পগুলিকে কতখানি চেষ্টা করতে হবে তা এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ থেকে খানিকটা আন্দাজ করা যায়। শিল্পক্ষেত্রে ১২,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে বলে আশা করা হয়েছে। এর মধ্যে বেসরকারী তরফের অংশ হল প্রায় ৫,০০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ বর্ত্তমানের মূলধন বিনিয়োগের তুলনায় ৪ গুণ বেশী মূলধন বিনিয়োগ করতে হবে।

অতীতের কর্ম্মপ্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে, অনেকে মনে করতে পারেন যে এটা একটা স্বপ্নই থেকে যাবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা এমন একটা অসম্ভব কাজ নয় যা পূরণ করা সাধ্যের বাইরে।

নানা রকম সমস্যা ও অসুবিধে থাকলেও এই লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব, তবে যুদ্ধকালীন সর্ব্বাঙ্গীন প্রচেষ্টার মতো সরকার, সরকারী ও বেসরকারী তরফের শিল্প, দেশের প্রত্যেকটি সংস্থা এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে সামান্যতম ভূমিকা নিতে পারেন এই রকম প্রত্যেকটি ব্যক্তির ঐক্যবদ্ধ সহযোগিতার ভিত্তিতেই শুধু এই কর্ত্তব্য পালন করা সম্ভব। বেশীর ভাগ অশিক্ষিত লক্ষ লক্ষ কৃষক প্রথম কয়েক বছরে যে চমৎকার কাজ দেখিয়েছেন তাতে বোঝা যায় দেশে উন্নয়নের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সমগ্র বিশ্বের শুভেচ্ছা নিয়েও এবং যে পরিমাণ অর্থ, সম্পদ, জনশক্তি ও দৃঢ় ইচ্ছাই আমরা সংহত করতে পারিনা কেন, গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনশীল ক্ষেত্রগুলিকে উৎসাহ দেওয়ার পরিবর্তে যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হতে থাকে এবং লালফিতার জটিল পাকের বাধা দূর করা না হয় তাহলে এই রকম বিপুল একটা কর্ম্মসূচী কিছুতেই সফল হতে পারেনা। সোজা কথায় বলতে গেলে বর্ত্তমানের নিয়ন্ত্রণ, পর্য্যবেক্ষণ, নিষেধবিধি ইত্যাদির বন্ধনে যদি বেসরকারী তরফকে প্রায় অচল ক'রে রাখা হয় তাহলে, চতুর্থ পরিকল্পনায় দেশের শিল্পোন্নয়নের শতকরা ৪০ ভাগের যে ভার বেসরকারী তরফকে দেওয়া হয়েছে তা বহন করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের অত্যন্ত দুঃখজনক একটা বিষয় হ'ল এই যে, দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী, শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে মিশ্র অর্থনীতি গ্রহণ করা হলেও, আমাদের শাসন কর্ত্তাগণ এবং আইন পরিষদের সদস্যগণ বছরের পর বছর ধরে, শিল্পের দুটি বাহুর মধ্যে একটির সহজ কর্ম্মধারায় বাধা সৃষ্টি করার জন্য, সমাজতন্ত্রের নামে নানা রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। বেসরকারী তরফ বর্ত্তমানে উন্নয়ন ও অভিজ্ঞতার এমন একটা পর্য্যায় এসে গেছে যে তারা দেশের অধিকতর আর্থিক উন্নয়নে বিপুল অবদান যোগাতে পারে। ভারতের ছোট বড় শিল্প উদ্যোক্তাদের বেশীর ভাগই স্বদেশভক্ত, সমাজ সচেতন, তাঁরা বিশেষ কোন অনুগ্রহ বা বেশী লাভ চাননা অথবা একচেটিয়া অধিকার বা সম্পদ ও ক্ষমতা করতলগত করতে চাননা। তাঁরা শুধু, দেশের এবং তাঁদের অংশীদার, শ্রমিক ও গ্রাহকদের উপকারের জন্য নিজেদের উৎসাহ ও বুদ্ধি স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করার সুবিধে চান এবং তাঁরা চান তাঁদের কাজ শেষ করার ভার তাঁদের ওপরেই থাকুক।

তাছাড়া বেসরকারী তরফ, বিশেষ ক'রে, বড় ধরণের শিল্পগুলি সম্পর্কে এমন একটা অবিশ্বাসের ভাব রয়েছে যা ষষ্ঠ দশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ বাধার সৃষ্টি করে এবং বর্ত্তমানে তা বেসরকারী তরফের চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য পূরণ করা প্রায় অসম্ভব ক'রে তুলতে পারে।

যাই হোক, আগামী দশকে আমাদের বেসরকারী তরফকে যদি যুক্তিসঙ্গত ভূমিকা গ্রহণ করতে হয় তাহলে আমি পরিষ্কারভাবেই বলতে চাই যে, বর্ত্তমানের তুলনায় আমাদের কাজে যদি আরও বেশী স্বাধীনতা, সুযোগ সুবিধে দেওয়া হয় তাহলে আমরা যে সেগুলির যোগ্য, তা আমাদের সরকারের কাছে, সংসদ ও জনসাধারণের

কাছে প্রমাণ করতে হবে। তাছাড়া আমরা যে বিশ্বাস ও সমর্থনের যোগ্য, অতীতে তা আমরা কেন পাইনি তারও কারণ অনুসন্ধান করতে হবে।

বেসরকারী তরফ সম্পর্কে এই সন্দেহ ও বিরূপতার প্রধান কারণগুলি কি? যাঁরা মনে করেন যে বেসরকারী শিল্পগুলি বিলোপ করাই তাদের আদর্শ, তাঁদের বিরোধিতা অবশ্য থাকবেই। তাছাড়া ভারতীয় সমাজতন্ত্রীরা মনে করেন যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করাই যেখানে লক্ষ্য, সেখানে বেসরকারী তরফ থাকতে পারেনা, তার ওপর তাঁদের মতে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ ঐ সব লক্ষ্যে বিশ্বাসী নন অথবা প্রয়োজনীয় ত্যাগ স্বীকার করতে চাননা।

এইসব ধারণা অযৌক্তিক। কারণ বর্তমানে বিভিন্ন দেশে যে সমাজতন্ত্র রয়েছে সেখানে উৎপাদনের উপায়গুলি এবং বন্টন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে আসার জন্য আদর্শগত কোন পীড়াপীড়ি নেই। তার পরিবর্তে বরং সরকারী, বেসরকারী এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে উচ্চতম উৎপাদন এবং উচ্চ কর এবং ব্যাপক সমাজ কল্যাণ ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে সুষম বন্টনের ওপরেই বেশী জোর দেওয়া হয়। ভারতের বেসরকারী শিল্পের মুখপাত্রগণ বার বার সন্দেহাতীতভাবে জানিয়েছেন যে সমাজ কল্যাণ সম্পর্কিত প্রগতিশীল ব্যবস্থাগুলি সম্বন্ধে তাঁরা একমত।

অনেকে আবার মনে করেন যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির লক্ষ্য লাভের দিকে থাকে বলে শ্রমিকরা শোষিত হন এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে ব্যবহারকারীদের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়। আমরা সকলেই জানি যে এটা সত্যি নয়। উন্নয়নের জন্য অর্থ আকর্ষণ করার এবং দক্ষতা ও কর্মকুশলতা বাড়ানোর অন্যতম ব্যবস্থা হিসেবে সরকারি ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই লাভের একটা অতি প্রয়োজনীয় ভূমিকা রয়েছে। তবে, বেসরকারী তরফের একমাত্র লক্ষ্যই হ'ল লাভ, এই ধরণের যে একটা সাধারণ মনোভাব আছে, তারও হয়তো একটা ভিত্তি আছে। তবে এ কথাটা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে বেসরকারী তরফের বেশীরভাগ ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান, নিজেদের জিনিস উৎপাদন ও বিক্রী করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব ও লক্ষ্য ছাড়া অন্য কোন কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে বলে মনে করেনা। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই মনে করেন যে তারা যদি ভালো জিনিস তৈরি ক'রে উপযুক্ত মূল্যে তা বিক্রী করতে পারেন, প্রাপ্য কর এবং ভালো পারিশ্রমিক দিয়ে দেন, তাহলেই সমাজের প্রতি তাঁদের কর্তব্য সম্পূর্ণ হয়ে গেল।

আর্থিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়বে এই ভয়ে বড় ব্যবসারও বিরোধিতা করা হয়। বর্তমানে এটা ভারতের অন্যতম প্রিয় শ্লোগান হলেও অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে, সমস্ত আর্থিক ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত। অতীতে আমাদের দেশের কিছু কিছু শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীর নীতি জ্ঞান, যতখানি উচ্চ হওয়া উচিত ততখানি ছিলনা, ফলে তাঁরাই বেসরকারী তরফ সম্পর্কে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি করেছেন। গত ২৫ বছরে কতকগুলি বড় বড় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তিরা আরও সম্পদশালী এবং আরও লাভ করার উদ্দেশ্যে যে সব কাজ ক'রে গেছেন তাতেই বেসরকারী তরফের ভীষণ ক্ষতি ক'রে গেছেন। এইসব সমাজবিরোধী ব্যক্তিরা কর ফাঁকি, কালো বাজারী, বেআইনী বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়, ঘুষ, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তিগত লাভ করতে চেয়েছেন।

নানা কারণে দেশে এই সব অসামাজিক কাজ হচ্ছে। আমাদের দেশের ব্যাপক দারিদ্র্য, চিরকালীন ঘাটতি, ভবিষ্যত অনিশ্চয়তা এবং আত্মরক্ষার অতিরিক্ত উদ্যম এগুলি সবই, যে কোন উপায়ে অন্যের ক্ষতি করেও সম্পদ ও নিরাপত্তা অর্জনের জন্য যে, কিছু লোককে যে কোন সুযোগ গ্রহণে উৎসাহিত করে তাতে সন্দেহ নেই। তবে এটাও সত্যি যে এই স্বার্থপরতা, লোভ, আত্মসর্বস্বতা একমাত্র প্রকৃত শিক্ষা ও শাস্তির ভয়েই দমিত হ'তে পারে। অন্যের ক্ষতি হতে পারে এই বিবেচনা বা সত্যিকারের সদবুদ্ধি এগুলিকে খুব কম ক্ষেত্রেই দমন করতে পারে।

সরকারের আর্থিক নীতিও এই দুঃখজনক ব্যাপারের জন্য খানিকটা দায়ী। আমাদের দেশে জীবতকালের ব্যক্তিগত কর এবং মৃত্যুর পর মৃত্যুকর এতো কঠোর যে, অসাধুতার জন্যই পুরস্কৃত হওয়া যায় এবং সাধুতার জন্য শাস্তি পেতে হয়। যাঁরা কর ফাঁকি দিচ্ছেন তাঁদের ধরা সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থাগুলি যথেষ্ট নয়। তাছাড়া কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা না থাকায়, কর ফাঁকি দেওয়াকেই উৎসাহিত করা হচ্ছে।

সরকারের নিয়ন্ত্রণমূলক অর্থনীতিই অনেক ক্ষেত্রে আমাদের দেশে মজুতদারী ও কালোবাজারীর ক্ষেত্র তৈরি করছে। অন্যদিকে টাকার মূল্যহ্রাস, বিশ্বাসের অভাব এবং সর্বগ্রাসী কর আইনগুলি, বেআইনীভাবে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করে বিদেশে মূলধন পাচারে উৎসাহিত করছে।

যাঁরা আন্তরিকভাবে সমাজের সেবা করছেন এবং যাঁরা সমাজকে শোষণ করছেন, সরকার এবং রাজনৈতিক নেতাগণ এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য মেনে নিতে অস্বীকৃত হয়ে তাঁরাই বরং আমাদের কাজকে আরও কঠিন করে তুলছেন। এর ফলে যাঁদের বদনাম আছে এমন লোক বছরের পর ধ'রে, জাতীয় সম্মেলনে এবং সরকার নিয়োজিত পরিষদগুলোতে স্থান পাচ্ছেন। আমরাও তাঁদের আমাদের সমাজে স্থান দিচ্ছি এবং ব্যবসা ও শিল্পের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার দিচ্ছি। আমি মনে করি যে আমাদের মধ্যে যাঁরা নিষ্কলঙ্ক, সৎ ও সমাজকল্যাণকামী তাঁদের প্রত্যেকের যে কোন সুযোগে এই সৎপ্রবৃত্তিগুলির প্রমাণ দেওয়া উচিত এবং অসামাজিক ব্যক্তিদের সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত।

শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের স্বাভাবিক কাজকর্মের ক্ষেত্র ছাড়াও নানা উপায়ে জনকল্যাণমূলক কাজে অবদান যোগাতে পারেন। প্রত্যেক ছোট, বড়, সহর, নগর ও গ্রামে, সবসময়েই উন্নয়নের প্রয়োজন থাকে, সাহায্য, নেতৃত্ব ও পরিচালনার প্রয়োজন থাকে।

১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

পরিকল্পনা কি সমাজতন্ত্রের পথে ?

প্রতিমা ঘোষ

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই হ'ল আমাদের পরিকল্পনাগুলির লক্ষ্য। নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম ক'রে আমরা এই পথে অগ্রসর হতে চেষ্টা করছি। ভবিষ্যতের ভারত কি ভাবে গড়ে উঠবে তার চিহ্ন আজ সর্ব্বক্ষেত্রে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে।

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দুটি। প্রথমটি হ'ল, জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। তার জন্য প্রয়োজন কৃষি, শিল্প ও পরিবহণ প্রভৃতি সামাজিক মূলধনের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় আয়বৃদ্ধি, দ্বিতীয়তঃ পরিকল্পনার মাধ্যমে আর্থিক সমতা প্রতিষ্ঠা। শুধুমাত্র জাতীয় আয়বৃদ্ধি ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়, পরিকল্পনার ফলে যাতে সমাজের প্রত্যেক স্তরের লোক লাভবান হয় সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

বৃহত্তর পটভূমিতে বিচার করলে উন্নত দেশগুলি ও উন্নতিকামী অনগ্রসর দেশগুলির মধ্যে একটা বড় যে তফাৎ চোখে পড়বে—সেটা হচ্ছে, উন্নত দেশগুলিতে শিল্প-বিপ্লব এসে গেছে এক শতাব্দী কি দু' শতাব্দী আগে। বৃটেনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুরু হয়েছে ১৭৬০ সাল থেকে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শিল্পোন্নয়নের সূচনা হয় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ও জাপানে। রাশিয়ার শিল্পোন্নয়ন সুরু হয় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে। দীর্ঘকালীন পরাধীনতার দরুণ ভারত ও অন্যান্য অর্ধ-উন্নত রাষ্ট্রগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগোতে পারে নি। বিদেশী শাসকেরা এই দেশের কাঁচামাল ও প্রাকৃতিক সম্পদ নিজেদের কাজে লাগিয়েছে—ফলে উন্নয়নের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্ট হতে পারেনি।

আর একটি বিশেষ তফাৎ হচ্ছে, উন্নত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল্য দিতে হয়েছে বিশেষ একটি শ্রেণীকে—যেমন বৃটেনে, শ্রমিককে। তাকে শ্রমের উপযুক্ত মূল্য থেকে বঞ্চিত ক'রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সোপান করা হয়েছে। তাছাড়া বৃটেন, জাপান প্রভৃতি দেশের উপনিবেশগুলিই ছিল তাদের কাঁচামাল জোগানোর ও উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয়ের কেন্দ্র স্বরূপ। আমেরিকা তার দাসপ্রথার মাধ্যমে প্রথম দিকে কৃষির যথেষ্ট উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়—সাম্যবাদী রাশিয়াতেও পরিকল্পনার চাপ প্রধানতঃ বহন করেছে কৃষিক্ষেত্র অর্থাৎ কৃষক গোষ্ঠী।

সেইদিক দিয়ে ভাবতে কোন বিশেষ শ্রেণীর ওপরে শিল্পোন্নয়নের মূল্যভার চাপানো হয়নি। কেন না স্বাধীন ভারতে যেমন 'শিল্প ও কারিগরী ক্ষেত্রে বিপ্লব' সুরু হয়েছে, তেমনি দেশ একই সঙ্গে রাজনৈতিক সামাজিক ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। অন্যান্য দেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও শ্রমিকের অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা অর্থনৈতিক বিপ্লবের অনেক পরে এসেছে।

কাজেই অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আমরা বিচার করছি শুধু উৎপাদন বৃদ্ধির মাপ কাঠি দিয়ে নয়, তার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে আরও কতকগুলি মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধ। সেইজন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি মূল লক্ষ্য হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার নীতি। পণ্ডিত নেহরু এই সমাজতান্ত্রিক আদর্শবাদকে একমাত্র 'বৈজ্ঞানিক পথ' বলে মনে করতেন। এই আদর্শ অনুযায়ী দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বার বার 'সামগ্রিক সামাজিক কল্যাণ ও জাতীয় আয় ও সম্পদ বন্টনে অধিকতর সাম্য আনার সঙ্কল্প ঘোষণা করা হয়েছে।' চতুর্থ পরিকল্পনায় বিশেষভাবে এই লক্ষ্যটিকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাই যে সামাজিক ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অসাম্য দূর ক'রে সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা, সমাজের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বলতর সম্প্রদায় ও শ্রেণীগুলিকে অধিকতর সুযোগ দানের কথা চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়ায় বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ভূমিহীন কৃষকের সমস্যা ও তাঁদের জন্য ভূমির ব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

এখন এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন। 'সমাজতন্ত্র' কথাটিকে আমরা একটি শ্লোগান হিসেব ব্যবহার করছি না। সমাজতন্ত্র বলতে বুঝতে হবে জনগণের সমগ্র অংশের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভ, আর্থিক অনিশ্চয়তার সম্ভাবনা রোধ ও প্রকৃত অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। এখন দেখা যাক পরিকল্পনার মাধ্যমে সেই লক্ষ্যে আমরা মোটামুটি কতদূর পৌঁছুতে পেরেছি।

প্রাক পরিকল্পনাকালের তুলনায় ১৯ বছরের পরিকল্পনার পর মোট জাতীয় আয়সহ কৃষি, শিল্প, পরিবহণ প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য উৎপাদন-বৃদ্ধি হয়েছে। ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায়

মোট জাতীয় আয় শতকরা ৬৯ ভাগ বেড়েছে। মাথাপিছু জাতীয় আয় বেড়েছে শতকরা ২৮ ভাগের মত। এখন জাতীয় আয় বন্টনের ক্ষেত্রে কী ঘটেছে লক্ষ্য করা যাক। এই সম্পর্কে পরিসংখ্যাণ ও উপযুক্ত তথ্যের অভাব রয়েছে। যাই হোক ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত মহলানবীশ কমিটির রিপোর্টে দেখা যায়, উচ্চ আয় বিশিষ্ট শ্রেণীর ওপর প্রচুর কর আরোপ করা সত্ত্বেও জাতীয় আয় বন্টনে যথেষ্ট অসাম্য রয়েছে। ফলে অর্থনৈতিক ক্ষমতাও কেন্দ্রীভূত হয়েছে মুষ্টিমেয়ের হাতে। শিল্পে একচেটিয়া ক্ষমতার প্রসার সম্পর্কে অনুসন্ধানকারী কমিটির বিবরণী-তেও এই ধারণা দৃঢ়মূল হয়।

অগ্রাধিকার ও ব্যক্তিগত ভোগের দিক দিয়েও দেখা গেছে যে, উচ্চ আয় বিশিষ্ট শ্রেণীই তুলনায় বেশী লাভবান হয়েছেন। বি. ভি. কৃষ্ণমূর্তির মতে পরিকল্পনায় উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া সত্ত্বেও উচ্চ আয় বিশিষ্ট শ্রেণীর আয়, ভোগ ও ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সীমিত সংস্থানের একটা মোটা অংশ অবাঞ্ছিত খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যেখানে সিমেন্ট, ইস্পাত, কারিগরী নৈপুণ্যের অধিকতর প্রয়োজন, সেখানে জাতীয় মূল-ধনের একটা অংশ চলে যাচ্ছে উচ্চ আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভোগের প্রয়োজনে. বিলাসদ্রব্যপূর্ণ গৃহ ও আসবাব, রেফ্রি-জারেটর ইত্যাদি উৎপাদনে। সেইদিক দিয়ে 'পরিকল্পনার অগ্রাধিকার' নির্ধারণের বিষয়টিও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। অন্যান্য কয়েকজন অর্থনীতিবিদ এই যুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে, পরিকল্পনার পর জাতীয় আয়ের অংশ হিসেবে শ্রমিকের উপার্জনের আনুপাতিক ভাগ কমে গিয়েছে।

এই সমস্ত দিক দিয়ে বিচার করলে সময় সময় এমন একটা সংশয় মনে আসে যে, 'ভারত সত্যিই সমাজতন্ত্রের পথে চলেছে কি না।' বিষয়টিকে আর একটু তলিয়ে দেখা যাক। এক সময়ে চিরা-চরিত মনোভাব নিয়ে প্রাচীন অর্থনীতি বিদরা মনে করতেন অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে ধনীর আরও ধনবৃদ্ধি ও দরিদ্রের দারিদ্র্য বৃদ্ধি হয়। কার্ল মার্ক্স তাঁর Doctrine of Increasing Misery -তে এই ধারণাটিকেই বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু সুমপিটার, কুজনেট্স প্রমুখ আধুনিক অর্থনীতিবিদরা মনে করেন যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফল হিসেবে আয় বন্টনের ক্ষেত্রে আরও বেশী সমতা আসে। কুজনেট্স দেখিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণীই বেশী লাভবান হয়েছেন। কুজনেট্সের মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ে অবশ্য জাতীয় আয় বন্টনে অধিকতর অসাম্য দেখা দেওয়া স্বাভাবিক তথাপি অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রয়াস যখন মোটামুটি একটা পরিণত স্তরে পৌঁছবে তখন আয়বন্টনে অধিকতর সমতা আসবে। এই ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের আদর্শগত গঠনতন্ত্রের এই পার্থক্যকে অর্থনীতিবিদরা স্বীকার করতে চান নি। বরং বার্গসন প্রভৃতি অর্থনীতিবিদদের মতে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় যুক্ত-রাষ্ট্র আমেরিকায় মজুরীর পার্থক্য কম। অবশ্য এই আয়ের মধ্যে তাঁরা লভ্যাংশের হিসেবটাকে বাদ দিয়েছেন।

অতএব ভারতে আয় বন্টনের বর্তমান ছবি অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি বিশেষ স্তরেরও নির্দেশ দেয়। দেশ, উন্নয়নের পরিণত স্তরে পৌঁছুলে, আয়ের পার্থক্য কমে আসবে আপনা থেকেই, অনেক অর্থনীতিবিদ এই রকম মনে করেন।

ইতিমধ্যে এ ছাড়াও নানা রকম ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষমতার সুষম বন্টনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ভূমি স্বত্ব সংস্কারের ক্ষেত্রে জমিদারী প্রথার বিলোপ একটি প্রথম স্তর। সম্প্রতি জমির মালিকানা সম্পর্কে আরও প্রগতিশীল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

কর নির্ধারণ নীতির মাধ্যমে অর্থ-নৈতিক বৈষম্য দূর করার প্রতিও সরকার দৃষ্টি দিয়েছেন। ভারতে যে প্রগতিশীল হারে আয়কর, লাভকর ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ কর আরোপ করা হয়, তা সর্বোচ্চ হার-গুলির অন্যতম। বিভিন্ন আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান ও মুষ্টিমেয়ের করায়ত্ত শিল্পক্ষেত্রের অর্থনৈতিক ক্ষমতা হ্রাসের চেষ্টা করা হচ্ছে। বিচার করলে দেখা যাবে, জাপানও 'জাইবাৎসু' নামক একচেটিয়া গোষ্ঠীর ওপর দেশের শিল্পো-ন্নয়নের ভার ছেড়ে দিয়েছিল, সেই তুলনায় ভারতের একচেটিয়া ক্ষমতা প্রসারের ক্ষেত্র অনেক সঙ্কুচিত।

শিল্পক্ষেত্রে সরকারী নীতি হচ্ছে—সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র ক্রমশ আরও প্রসারিত ও বিস্তৃত করা। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও সরকারী উদ্যোগের ভূমিকা প্রতিযোগিতার নয় বরং সহযোগি-তার। তবে জাতীয় স্বার্থে, সরকার, শিল্প বা প্রতিষ্ঠান বিশেষ রাষ্ট্রিয় তত্ত্বাবধানে আনতে পারেন। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ তারই একটা দৃষ্টান্ত।

বর্তমানে অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসকল্পে নগরাঞ্চল সম্পদের উচ্চ সীমা নির্ধারণের কথা চলছে। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য দূর করার জন্য সুষম উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণের প্রতি সরকার মনোযোগী হচ্ছেন।

এ ছাড়া গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার প্রভৃতির মাধ্যমে বৃহত্তর জনসাধারণ যাতে পরিকল্পনার সুফল ভোগ করতে পারেন তার দিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে।

পরিশেষে এটি মনে রাখা দরকার যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যতীত সার্বজনীন কল্যাণ সম্ভব নয়। জহরলাল নেহরু এই সত্য উপলব্ধি করে বলেছিলেন 'যদি হঠাৎ একটি অনগ্রসর দেশ সমাজতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ করে তবে সেটা হবে দরিদ্র ও অনগ্রসর দেশের সমাজতন্ত্র—সেইজন্য সবচেয়ে আগে দরকার সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ এবং সুপরি-কল্পিত কার্যসূচীর সুষ্ঠু রূপায়ণ। এই পথে চলতে পারলে আজকের ভারতের অর্থনৈতিক গতিই বলে দেবে ভবিষ্যতের ভারত কোন পথে যাবে।'

ভূমি সংহতি কর্মসূচী

"ছোট ছোট আকারের জমির ক্ষেত্রে জরিপের শতকরা হার অনেক কমে গেছে। মাঝারি আকারের ক্ষেত্রে এই হ্রাসের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম কিন্তু বড় আকারের ক্ষেত্রে তার গতি উর্দ্ধাভিমুখী। তবে ভূমি সংহতিকরণের ফলে রাজ্যগুলিতে জমির মোট মালিকের সংখ্যা কমে গেছে।" ভূমি সংহতিকরণ কর্মসূচীর মূল্যায়ণ করে পরিকল্পনা কমিশনের কর্মসূচী মূল্যায়ণ সংস্থা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশ, যেখানে ১০ লক্ষ একরেরও বেশী জমি সংহত করা হয়েছে, কর্মসূচী মূল্যায়ণ সংস্থা এই রাজ্যগুলির কয়েকটি স্থানেই তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। এই রাজ্যগুলির ১৮টি জেলা, ৩৬টি তহশীল তালুক, ১০৬টি গ্রাম এবং প্রায় ১১০০ জন কৃষক এই অনুসন্ধানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

কর্মসূচী মূল্যায়ণ সংস্থা আরও বলেছেন যে গ্রামের জরিপ সংখ্যা সমস্ত রাজ্যেই হ্রাস পেয়েছে এবং সংহতিকরণের পূর্ব্বের তুলনায় আকার বড় হয়েছে। সংহতিকরণের পর ১৯৬৬-৬৭ সালে খণ্ড খণ্ড জমির সংখ্যাগুলির সঙ্গে তুলনা করে দেখা যায় যে, রাজ্যগুলিতে এই সমস্যা তেমন বড় কিছু নয়। পাঞ্জাবের অমৃতসর ও গুরুদাসপুর জেলায় এবং উত্তরপ্রদেশের এটাওয়া ও বাহারাইচ জেলায় খণ্ড খণ্ড জমির মালিকের সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে।

কৃষির ওপর প্রতিক্রিয়া

কৃষি-উন্নয়নমূলক জিনিসগুলির ব্যবহার সম্পর্কে অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে নির্ব্বাচিত স্থানগুলিতে সংহতিকরণের পর উন্নত ধরণের বীজ, সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, বেড়েছে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশে এগুলির ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে। ভূমি সংহতিকরণ, কৃষির ওপরে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তা স্থির করা খুব কঠিন হলেও, অনুসন্ধানের ফলে এটুকু জানা গেছে যে সংহতিকরণের পর উন্নত ধরণের বীজ, সার ইত্যাদির ব্যবহার অংশতঃ বেড়েছে এবং উৎপাদনও বেড়েছে। অমৃতসর, হিসার, কর্ণাল, গুড়গাঁও, এটাওয়া এবং বাহারাইচ জেলায় যাঁদের প্রশ্ন করা হয় তাঁদের মধ্যে শতকরা ৫০ জন এবং তারও বেশী বলেন যে সংহতিকরণের ফলেই কৃষিতে উৎপাদন বেড়েছে।

মহীশূরের বিজাপুর এবং গুজরাটের আহ্‌মেদাবাদ জেলায় যাঁদের প্রশ্ন করা হয় তাঁদের মধ্যে শতকরা ৯৫ এবং ৮০ জন বলেন যে সংহতিকরণের কোন প্রয়োজন ছিলনা। নির্ব্বাচিত জেলাগুলিতে যাঁদের প্রশ্ন করা হয় তাঁদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক লোক ছিলেন যাঁরা সংহতিকরণের প্রয়োজন অনুভব করেননি।

দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রচারের প্রয়োজনীয়তা

ছোট কৃষকদের মধ্যে একটা দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে যাঁদের জমির পরিমাণ বেশী, সেই শ্রেণীর কৃষকরা, সিদ্ধান্ত যাতে তাঁদের অনুকূলে হয় সেই সম্পর্কে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন। যে জমি বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকারীরা পেয়ে আসছেন তার ওপরে যে আন্তরিক একটা টান থাকে সেই মাটির টান, সংহতিকরণ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী প্রভাবিত করছে।

সংহতিকরণের প্রয়োজনীয়তা এবং এর সুবিধেগুলি সম্পর্কে কৃষকদের মনোভাব গড়ে তোলার জন্য উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটে কোন সরকারী ব্যবস্থা নেই। রাজস্থান, মহীশূর ও মধ্যপ্রদেশে সজ্ঞবদ্ধ প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ভূমির মূল্যায়নে সতর্কতা প্রয়োজন

গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে ভূমি ব্যবস্থা সংহত করা সম্পর্কে অনুন্নত অঞ্চলগুলিকে লক্ষ্যস্থল করায় এই কর্মসূচীর ওপর তা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তার ফলে অপেক্ষাকৃত উন্নত অঞ্চলে অর্থাৎ বড় এবং মাঝারি সেচ ব্যবস্থার অধীন অঞ্চল এবং নিবিড় কৃষি কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলিকে এই কর্মসূচীর লক্ষ্যস্থলে পরিবর্তিত করতে হয়।

রূপায়ণে অসুবিধে

যে সব অঞ্চলে তথ্য সংগ্রহ করা হয় সেগুলির বেশীর ভাগ কর্ম্মী বলেছেন যে জমির মালিকানার নথীপত্র অত্যন্ত পুরানো এবং সেগুলিকে কালোপযোগী করাটা একটা বিপুল কাজ। উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে সেই অনুযায়ী বলা যায় যে এই কাজের জন্য যে টাকার বরাদ্দ করা হয় তা যথেষ্ট ছিলনা এবং কাজের বিপুলতার দিক থেকে এর জন্য নির্দ্ধারিত সময়ও ছিল খুব কম। কাজেই এমন সব সংক্ষিপ্ত পন্থা অবলম্বন করা হয় যা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয়।

হরিয়ানা এবং পাঞ্জাবের সমস্যা ছিল আবার অন্য ধরণের। ১৯৪৭ সালের গণ্ডগোলের সময় সেখানকার কতকগুলি উদ্বাস্তু গ্রামের রাজস্বের নথীপত্র হয় হারিয়ে যায় না হয়তো নষ্ট হয়ে যায়। সেই সব নথীপত্র ঠিক করতে বহু সময় লেগে যায়।

ভূমি সংহতিকরণের এই পরিকল্পনার ফলে আরও একটা বড় সমস্যা দেখা দেয়। সাধারণের উদ্দেশ্যে যে জমি দেওয়া হয়েছে তা বিভিন্ন কাজে লাগানো হচ্ছে। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় যে সংহতিকরণের পরিকল্পনা তৈরী করার সময় গ্রামের ভবিষ্যত উন্নয়নের প্রয়োজনকে ভেবে দেখা হয়নি। দ্বিতীয় সমস্যা হ'ল জমির মূল্যায়ণ। এটা অত্যন্ত জটিল একটা সমস্যা। কারণ, জমির সঠিক মূল্যায়ণের ওপরেই জমির পুনর্বিভাজনের যুক্তিযুক্ততা নির্ভর করে। বলা হয়েছে

৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

মূল্যের স্থিতিশীলতা আনার অন্যতম উপায়

গ্রাহকগণের জন্য সমবায় স্থাপন

বিশ্বনাথ লাহিড়ী

সব রকম আর্থিক ব্যবস্থাতেই এমন একটা অনুকূল মূল্যনীতি থাকা উচিত যাতে অর্থনীতি সহজে অগ্রগতি করতে পারে; কারণ দ্রুত আর্থিক উন্নয়ন করতে হ'লে আর্থিক স্থিতিশীলতা অত্যন্ত প্রয়োজন। অস্থিরতা বা অসমতার মধ্যে, বিশেষ করে ভারতের মতো উন্নয়নশীল কোন দেশের পক্ষে, যেখানে মিশ্রিত অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে সেখানে অস্থির কোন অর্থনীতির মধ্যে সমৃদ্ধি লাভ করা সম্ভব নয়। সম্প্রতি কয়েক বছরে জিনিসপত্রের দাম এতো বেড়ে গেছে যে তা অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বন্টন ব্যবস্থাতেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। এই বিরূপ অবস্থা আয়ত্বে আনার জন্য এখন স্থির করা হয়েছে যে জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্য একটা নির্দিষ্ট মানে নিয়ে আসার অন্যতম উপায় হল ব্যবহারকারীদের জন্য সুসংবদ্ধ কতকগুলি সমবায় সমিতি স্থাপন। উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের গতি দ্রুত হতে থাকলে জিনিসপত্রের দাম কিছুটা বাড়বেই এবং সামান্য ফাঁপা বাজারকে সেই ক্ষেত্রে উন্নয়নেরই একটা অঙ্গ বলে ধরা হয়। কিন্তু মূল্যকে যদি অবাধগতিতে বাড়তে দেওয়া হয় তাহলে তা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে কাজেই মূল্যের উদ্ধগতি প্রতিরোধ করা বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। অন্যদিকে বন্টন ব্যবস্থাগুলি যদি উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ না করা যায় তাহলে মূল্যের উর্দ্ধগতি রোধ করার সব প্রচেষ্টা বিফল হয়ে যায়। কারণ যে কারণগুলির জন্য মূল্য বাড়ে সেগুলি সমস্ত নিত্যব্যবহার্য্য জিনিসের দামেও প্রভাব বিস্তার করে।

অসম্ভব বৃদ্ধি

গত কয়েক বছরে জিনিসপত্রের দাম বিশেষ করে খাদ্যসামগ্রীর দাম অত্যন্ত বেড়েছে এবং এর ফলে সাধারণ মানুষের কষ্ট বেড়েছে এবং আয় বাড়লেও সেই হিসেবে তাদের জীবন ধারণের মান উন্নত হয়নি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ে খাদ্যসামগ্রীর দাম শতকরা প্রায় ৩৯ ভাগ বেড়েছে এবং তৃতীয় পরিকল্পনার সময়ে বেড়েছে শতকরা ৪১ ভাগ, কিন্তু ১৯৬৬-৬৭ সালে দাম বেড়েছে তার পূর্ব্ব বছরের চাইতেও শতকরা ১৮ ভাগ বেশী। ১৯৬৩-৬৪ সাল থেকে পরের চার বছরে খাদ্য সামগ্রীর মূল্য শতকরা ৭৬ ভাগ বেড়েছে। এর তুলনায়, অন্যদিকে, খাদ্যশস্যের উৎপাদনের হার পরিকল্পনার সময়ে তেমন দ্রুত বাড়েনি আর তার ফলে ১৯৫১ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্য্যন্ত খাদ্যশস্যের আমদানী চারগুণ বেড়েছে। কাজেই এই রকম অবস্থায়, ব্যবহারকারীগণের সমবায় স্থাপন করলেই তা যাদুমন্ত্রের মতো সমস্ত রকম আর্থিক অসমতা দূর করবে তেমন কথা মনে করা উচিত নয়।

কার্য্যকারিতা

গত কয়েক বছরে ভারতে, ব্যবহারকারীগণের সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে যে উন্নতি হয় তা প্রশংসার যোগ্য। ১৯৬২-৬৩ সালে সমবায় ষ্টোরের সংখ্যা ছিল ৮৪০৭, এগুলির সদস্য সংখ্যা ছিল ১৬ লক্ষ এবং ব্যবসার পরিমাণ ছিল ৩৮.২০ কোটি টাকা। ১৯৬৬-৬৭ সালে সমবায় ষ্টোরের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৫৯১তে। এগুলির মোট সদস্যের সংখ্যা ছিল ৬৬.৬৭ লক্ষ এবং ব্যবসার পরিমাণ ছিল ৮৮.৩১ কোটি টাকা। এতেই বোঝা যায় সমবায় ষ্টোর স্থাপনের আন্দোলন কতখানি জনপ্রিয় হয়েছে। সহরগুলির মোট সংখ্যার ১৪ ভাগ অর্থাৎ ২৫ লক্ষ পরিবার এইসব ষ্টোরের সুবিধে ভোগ করছে। তাছাড়া অনুমান করা হচ্ছে যে ১৯৬৬-৬৭ সালের মধ্যে সহরের খুচরা ব্যবসায়ের শতকরা অন্ততঃপক্ষে ৭ ভাগ এই সব সমবায় ষ্টোরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির সাহায্যেই এই রকম দ্রুত উন্নয়ন সম্ভবপর হয়। কিন্তু সমবায় ষ্টোরের সংখ্যা বাড়লেও তা বাজারের মূল্যমানের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি বা সাধারণভাবে ব্যবহারকারীদের উপকার করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে এই সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল।

মূল্য নীতি

ব্যবসায়ের অন্যতম একটা বিশেষ অঙ্গ হিসেবে সঠিক মূল্যনীতিই শুধু সমবায় ষ্টোরগুলির দক্ষ পরিচালনায় সাহায্য করতে পারে। কিন্তু এই ষ্টোরগুলিও নিজেদের জন্য একটা মূল্যনীতি স্থির করে নিতে পারেনি। ষ্টোরগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রে, প্রধানতঃ যে সব জিনিসের সরবরাহ কম এবং যেগুলি সহজে বিক্রী হয় সেগুলিই কেনাবেচা করে। উচিত মূল্যের আকারে হয় সরকার সেগুলির মূল্য বেঁধে দেন অথবা বেসরকারি ব্যবসায়ীরা যে দরে ষ্টোরগুলিকে জিনিসপত্র সরবরাহ করতে স্বীকৃত হন সেই দরেই বিক্রী করা হয়। এই দর পূর্ব্বেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় বলে ষ্টোরগুলি সেই দরে বিক্রী করতে বাধ্য হয় কাজেই জিনিসপত্রের দাম প্রতিযোগিতামূলক বা কম হয়না বলে অথবা খুব ভালো জিনিস পাওয়া যায়না বলে ক্রেতারা এই সব ষ্টোর থেকে জিনিসপত্র কিনতে খুব উৎসাহ পাননা। একটি বিবরণীতে দেখতে পাওয়া যায় যে ৪৩টি ষ্টোরের ২৫টিতে চাউলের মূল্য এবং ৩৭টি ষ্টোরের ১৬টিতে গমের মূল্য বাজার দরের তুলনায় শতকরা ৫ ভাগ কম ছিল, এবং এই ষ্টোরগুলির এক চতুর্থাংশের ক্ষেত্রে বাজার দরের তুলনায় শতকরা ১০ ভাগেরও বেশী, মূল্যের পার্থক্য ছিল। আর একটা

উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হ'ল ৪৩টি ষ্টোরের মধ্যে ২৪টিতে বনস্পতির মূল্য এবং ৪৮টি ষ্টোরের ২৪টিতে কাপড় কাচার সাবানের মূল্য বাজার দরের সমান ছিল। সরকারের ন্যায্য মূল্য-নীতির জন্য প্রথমে উল্লিখিত জিনিসগুলির মূল্য অপেক্ষাকৃত কম ছিল এবং উৎপাদকগণের পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত মূল্য অনুযায়ী পরের জিনিসগুলির মূল্য একই রকম ছিল। বিবরণীতে আরও বলা হয়েছে যে ষ্টোরগুলির সদস্যদের মধ্যে বেশ বড় একটা অংশ অর্থাৎ শতকরা ৩৪ থেকে ৩৯ ভাগ, ষ্টোর থেকে তাঁদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য কেনেন নি এবং ষ্টোর থেকে সদস্যরা যে সব জিনিস কেনেন তার শতকরা ৪১ থেকে ৬৫ ভাগই ছিল নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত দ্রব্যাদি। ক্ষতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও বাজার দরের চাইতে কম মূল্যে জিনিসপত্র বিক্রী করাই হ'ল ষ্টোরগুলির মোটামুটি নীতি। একটি বিবরণীতে দেখা যায় যে ১৯৬৭-৬৮ সালে ৩১৭টি পাইকারি সমবায় ষ্টোরের মধ্যে ১৮৫টির লোকসান হয়। তবে এটাও সত্যি কথা যে রেশনের জিনিস পাওয়া যায় এবং অন্যান্য জিনিস সস্তায় পাওয়া যায় বলেই বেশীরভাগ লোক সমবায় ষ্টোরের সদস্য হন।

ব্যবহারকারীদের সমবায় আন্দোলন যে ভারতে দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করতে পারেনি তা পরিস্কার বোঝা যায়। তাছাড়া মূল্যের স্থিতিশীলতা অর্জনে এগুলি বিশেষ কোন সাহায্য করতে পারছেনা। কিন্তু অর্থনীতিতে মূল্যের স্থিতিশীলতা অর্জনে ইংল্যাণ্ড ও সুইডেনের ব্যবহারকারীদের সমবায় আন্দোলন প্রশংসনীয় কাজ করেছে। ঐ দুটি দেশে সমবায় আন্দোলনের এই সাফল্যের প্রধান কারণ হ'ল, ব্যবহারকারী-দের চাহিদার দুই তৃতীয়াংশই পাইকারি ষ্টোরগুলি উৎপাদন করে। এর ফলে তারা বাজার দরের তুলনায় কিছুটা কমে তাদের মূল্যমান স্থির করতে পারে। দ্বিতীয়ত: এই দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে মোট খুচরা ব্যবসায়ের শত-করা ১০ থেকে ২০ ভাগ, সমবায় ষ্টোর-গুলির মাধ্যমে হয় বলে ব্যবহারকারীদের সমবায়গুলি অর্থনীতিতে, বিশেষ ক'রে মূল্যের স্থায়ীত্ব বিধানে, একটা ভালো প্রভাব বিস্তার করতে এবং করছে।

ব্যবহারকারীদের সমবায় ষ্টোরগুলির জন্য একটা সঠিক মূল্য নীতি স্থির করতে কতকগুলি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হয়। এগুলি হল (১) সম্ভাব্য মোট ব্যয় (ক্ষয়ক্ষতি এবং পরিচালনা ব্যয় সহ) এবং মূলধনের ওপর সুদ এবং লভ্যাংশ বিতরণ করার পরও মূলধনের যথেষ্ট সংস্থান। বাজার দর অনুযায়ী যদি মূল্যনীতি স্থির করা হয় তাহলে তা ব্যবহারকারীদের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনা। সুইডেনের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে তাঁরা সক্রিয় একটা মূল্যনীতি গ্রহণ করায়, গৃহস্থালীর জন্য প্রয়োজনীয় তিন চতুর্থাংশেরও বেশী সামগ্রী ষ্টোরগুলির মাধ্যমে বিক্রী করতে পারেন। ইংলণ্ডে এর পরিমাণ হল শতকরা ৪৫ থেকে ৫৫ ভাগ। ভারতে সমবায় ষ্টোরের সংখ্যা কম, এগুলি আর্থিক ক্ষমতার দিক থেকে দুর্ব্বল, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র উৎপাদনে অক্ষম এবং মোট জাতীয় ব্যবসা বাণিজ্যের লেনদেনে এগুলির অংশ যৎসামান্য। তাছাড়া এগুলিকে নিয়ন্ত্রিত জিনিসপত্রের ওপরেই খুব বেশী পরিমাণে নির্ভর করতে হয়। কাজেই এই রকম অবস্থায় সমবায় ষ্টোর-গুলির সুদক্ষ পরিচালনার জন্য কোন মূল্যনীতি স্থির করার সময় বাজার দরের নীতি এবং সক্রিয় মূল্যনীতির মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা বেছে নিতে হয়। যাই হোক, অর্থনীতির ওপর একটা শুভ ফলের জন্য বিশেষ করে মূল্য স্থিতিশীল করার জন্য ব্যবহারকারীদের সমবায় ষ্টোরগুলিকে শেষ পর্যন্ত একটা সক্রিয় মূল্যনীতি স্থির করে নিতে হবে। এই রকম মূল্যনীতির মাধ্যমে আমাদের দেশে সমবায় আন্দোলন সফল হয়ে উঠতে পারে।

(ইংরেজী যোজনায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ থেকে অনূদিত।)

যোজনা ভবন থেকে

৭ পৃষ্ঠার পর

যে ভূমির বিনিময় করে যাতে লাভবান হওয়া যায় সেজন্য খারাপ জমির দাম বাড়ানোর জন্য কতকগুলি ক্ষেত্রে ইচ্ছে করে চেষ্টা করা হয়েছে আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে সেই চেষ্টা সফলও হয়েছে। আর একটা ব্যাপার যা জমির সঠিক মূল্যায়ণে বাধার সৃষ্টি করেছে তা হল, ভূমির মূল্যায়ণ করার সময় ভূমির উর্ব্বরতাও বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এই উর্ব্বরতার মূল্যায়ণ করা হয় কয়েক বছর পূর্ব্বে এবং তাইই নথীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় বলে ভূমির সঠিক মূল্যায়ণ সম্ভব হয়নি। যে সব উন্নয়নের ফলে ভূমির উৎপাদন সম্ভাবনা বেড়েছে সেগুলি সম্পর্কে কোন রকম বিবেচনা করা হয়নি।

সমগ্র সংহতিকরণ কর্মসূচীর মূলে ছিল ভূমির মূল্যায়ণ এবং এই মূল্যায়ণ যাতে সঠিক হয় তা সুনিশ্চিত করার জন্য সর্ব্ব-প্রকারে চেষ্টা করতে হবে। তা না হলে সংহতিকরণ কর্মসূচী সন্তোষজনকভাবে সম্পূর্ণ করা কঠিন হবে।

বিবরণীতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে রাজস্ব বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কোন উচ্চ-পদস্থ কর্মচারি এবং দুই জন জননেতার একটি উচ্চশক্তি-সম্পন্ন কমিটির হাতে এই মূল্যায়ণের ভার দেওয়া উচিত।

যে কর্মচারীদের ওপর এই কাজের ভার দেওয়া হয় সে কাজ ছিল তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, কাজেই সময়মতো কাজ শেষ করার জন্য তাঁদের সংক্ষিপ্ত পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিলনা। সুতরাং এই কাজের জন্য যতখানি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা প্রয়োজন ছিল ততটা সম্ভব হয়নি। কর্মচারীর সংখ্যার ওপরই কেবল কাজের দক্ষতা নির্ভর করেনা, সেই কাজের জন্য কর্মচারীরা কতখানি এবং কী ধরণের প্রশিক্ষণ পেয়ে-ছেন তার ওপরেই তা নির্ভর করে। বলা হয়েছে যে মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর ও গুজরাটে এই ধরণের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি।

ভারতে মোটরগাড়ী শিল্প

অশোক মুখোপাধ্যায়

যে সব প্রগতিশীল কর্মপ্রচেষ্টা বিদেশী মূলধন ও বিশেষজ্ঞের সহায়তায় ক্রমশ: স্বনির্ভর হয়ে উঠছে, ভারতের মোটর গাড়ী শিল্প হ'ল সেগুলির অন্যতম।

ভারতে মোটর গাড়ী শিল্প সম্প্রতি গড়ে উঠেছে। এই শিল্পে মোটরের বিভিন্ন অংশ একত্রীকরণের আধুনিকতম পন্থা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। তবে ভারতে মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশ উৎপাদনের অনুপাত ক্রমশ:ই বৃদ্ধি পাচ্ছে। একজন উৎপাদক হিসেব ক'রে দেখেছেন যে, এখন গাড়ীগুলির শতকরা ৯৮ ভাগ অংশ দেশে নির্মিত হয়। নি:সন্দেহে, এটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব, কারণ প্রায় ৬০০০টি অংশ সংযোজিত ক'রে একটি মোটর গাড়ীর সম্পূর্ণ আকার দেওয়া হয়।

বর্তমানে, ভারতে বছরে প্রায় ৩৬,০০০ যাত্রীবাহী গাড়ী ও সমসংখ্যক লরি, ট্রাক ইত্যাদি তৈরি করা হয়, এবং নানা ধরণের দশ লক্ষেরও বেশী গাড়ী রাস্তায় চলাচল করে। পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে তুলনায় অবশ্য এই সংখ্যা কম, তবু ভারতীয় মোটর গাড়ীর বাজার এশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় অর্থাৎ জাপানের পরেই ভারতের স্থান।

একটি আধুনিক মোটর গাড়ীর কারখানায়, নানা জটিল যান্ত্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি গাড়ী তৈরি করা হয়। স্টীলের পাতগুলি প্রয়োজনীয় বিভিন্ন আকার অনুযায়ী কেটে নেওয়া হয় ও সেগুলি গাড়ীর 'বডি'র নানা অংশের রূপ নেয়। যেমন ছাদ, মেঝে, দরজা 'বনেট' 'ফেণ্ডার' ইত্যাদি। এই অংশগুলি ওয়েল্ডিং (বা ঝালাই) ক'রে সংযুক্ত করার পর সম্পূর্ণভাবে গাড়ীর 'বডি' তৈরি হয়ে যায়। কারখানার একটি অপরিহার্য অঙ্গ ইঞ্জিন নির্মাণ বিভাগ। এখানে পিস্টন, সিলিণ্ডার প্রভৃতি ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ নির্মিত হয়। ইঞ্জিনগুলি একেবারে তৈরি হয়ে গেলে পর একটি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে এটির দোষ ত্রুটী পরীক্ষা করে দেখা হয়। আর একটি প্রয়োজনীয় যন্ত্রের সাহায্যে গাড়ীর পিছনের 'অ্যাক্সিল' ও সামনের 'গিয়ার বক্স' ও স্টিয়ারিং উৎপাদন করা হয়। যন্ত্রপাতির পরীক্ষা নিরীক্ষা ও উৎপাদিত দ্রব্যের গুণাগুণ নির্ণয়ের জন্য গবেষণাগার—আধুনিক মোটর গাড়ীর কারখানার একটি অত্যাবশ্যক বিভাগ। ভারতে চারটি আধুনিক মোটর গাড়ীর কারখানা আছে। কলকাতার কাছে উত্তর পাড়ায়, জামসেদপুর, বোম্বাই ও মাদ্রাজে। উত্তরপাড়ায় অ্যামব্যাসাডার ও হিন্দুস্থান ট্রাকগুলি তৈরি হয়।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবন যাত্রার মানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীবাহী গাড়ীর চাহিদা এতই বেড়ে গেছে যে, উৎপাদনের মাত্রা সেই তালে পা ফেলে এগোতে পারছে না। বিদেশী আমদানী অথচ এখনও নিয়ন্ত্রিত। প্রায় ১ লক্ষ ক্রেতা গাড়ীর প্রত্যাশায় নাম তালিকাভুক্ত ক'রে রেখেছেন। অবশ্য ব্যবসায়িক গাড়ীর

হিন্দুস্থান মোটরস এ গাড়ীর বডি তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ করা হচ্ছে।

ক্ষেত্রে অবস্থা অন্য রকম, ভারতীয় উৎপাদকরা তো স্থানীয় চাহিদা মেটাচ্ছেনই, উপরন্তু কিছু সংখ্যক গাড়ী বিদেশেও রপ্তানী করছেন।

ভারতেও বিশালাকার ট্রাক, লরীর চাহিদা বাড়ছে। হিন্দুস্থান মোটর আমেরিকার একটি সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে বেডফোর্ড ট্রাক নির্মাণ সুরু করে দিয়েছে। নতুন ইঞ্জিন উৎপাদক যন্ত্রের সাহায্যে একবারেই সাড়ে সাত টন ওজনের একটি ট্রাকের ইঞ্জিন তৈরি হয়ে যায়, এবং এই রকম ভারী ইঞ্জিন বছরে ১৫,০০০টি তৈরি করা সম্ভব হবে।

দেশীয় তেল

আসাম ও গুজরাটের তৈলক্ষেত্র থেকে বর্তমানে প্রায় ৬০.৫ লক্ষ টন অশোধিত তেল পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। প্রায় ১২০.৩৬ লক্ষ টন অশোধিত তেল আমদানি করতে হবে। এই আমদানির জন্য ব্যয় হবে ১০৯ কোটি টাকা।

চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে দেশের তৈলক্ষেত্রগুলি থেকে প্রায় ৯০.৮৫ লক্ষ টন তেল উৎপাদিত হবে। ১৯৬৯-৭০ সালে ৭০.১৫ লক্ষ টন হারে তেল উৎপাদিত হবে।

গৃহ সমস্যার সমাধানে সমবায়িকার ভূমিকা

কে. কে. সরকার

গত বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীতে যখন আবার শিল্পায়ণ স্বরু হ'ল, তখন গ্রাম থেকে বহু লোক কাজের সন্ধানে সহরে আসতে শুরু করলেন আর তার সঙ্গে দেখা দিল গৃহ সমস্যা। যুদ্ধের ফলে বেশীর ভাগ বাড়ী নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এঁদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে সমবায়িকার মাধ্যমে বাসগৃহ তৈরি করতে স্বরু করা হয়। তার পর থেকে সমবায়িকাগুলি এই সমস্যা সমাধানে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে।

১৮৬২ সালে হামবুর্গে প্রথম গৃহনির্মাণ সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৮ সালের মধ্যে এই ধরণের সমিতির সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮টি। কিন্তু ১৮৮৯ সালের পর যখন সমবায় আইন অনুযায়ী সীমাবদ্ধ দায়িত্ব চালু করা হয় তখন থেকেই এগুলি দ্রুত অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলতে থাকে। এই শতাব্দির প্রথম দিকে সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতির সংখ্যা ৩৮৫তে দাঁড়ায়। সামাজিক বীমা প্রতিষ্ঠানগুলিই এগুলির জন্য প্রধান ঋণদাতা হয়ে দাঁড়ায়। সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতিগুলির সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, সেগুলি, প্রুশিয়া সরকার কর্তৃক স্থাপিত গৃহনির্মাণ সাহায্য তহবিল থেকে আরও সাহায্য পায়। রেলওয়ে বোর্ডগুলিও সমবায় সমিতিগুলিকে সাহায্য করে। কিন্তু ১৯৩৩ সালের পর নাজি শাসনের সময় সমবায়গুলির উন্নয়নে বাধা পড়ে। কারণ নাজি শাসন, সমবায়ভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থার পক্ষে ছিলনা।

১৯৩৮ সালের শেষভাগে, বর্ত্তমানের জার্মান ফেডারেল রিপাব্লিক এবং পশ্চিম বার্লিনের অধীনস্থ অঞ্চলগুলিতে, সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতিগুলি, সদস্যদের পক্ষ থেকে প্রায় ২৮৫,০০০টি ফ্ল্যাট নিয়ন্ত্রণ করত। ১৯৫০ সালের শেষে এই সংখ্যা বেড়ে ৩২০,০০০তে দাঁড়ায়।

১৯৪৭ সালের পর থেকে সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতিগুলির সংখ্যা ও এগুলির সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে। তবে ১৯৫৪ সালের পর আবার এগুলির সংখ্যা কমে যায়। নানা কারণে এগুলির সংখ্যা কমেছে। আর্থিক বাজারে মন্দা দেখা দেওয়ায় ১৯৫৩ সালে ঋণ সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। এই নিয়ন্ত্রণের ফলে গৃহনির্মাণের কাজ কমে যায়। তাছাড়া ১৯৫৬ সাল থেকে ব্যক্তিগতভাবে বাড়ী তৈরি করার ওপর বেশী জোর দেওয়া হতে থাকে। ১৯৫৯ সালে শতকরা ৪৫টি গৃহনির্মাণ সমিতির সদস্য সংখ্যা ২৫০ জনেরও কম ছিল। কেবলমাত্র শতকরা ২০টি সমিতির সদস্য সংখ্যা ২৫১ থেকে ৫০০ এবং শতকরা ১৭টি সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫০০ থেকে ১০০০ পর্য্যন্ত ছিল। খুব কমসংখ্যক সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতির সংখ্যা পাঁচ হাজারের বেশী ছিল।

লাভবিহীন গৃহনির্মাণ আইন

এইসব সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতিগুলির প্রধান কাজ ছিল স্বল্প আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য গৃহনির্মাণ। এই ক্ষেত্রে সরকার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে কর রেহাইয়ের মতো কয়েকটি স্থবিধে দেন। সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতিগুলিকেই যে শুধু এই স্থবিধে দেওয়া হয় তাই নয়, জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী, সীমাবদ্ধ দায়িত্ব সম্পন্ন কোম্পানীগুলিও যদি লাভবিহীন ব্যবসা সম্পর্কে কতকগুলি আইনকানুন মেনে চলেন তাহলে তাদেরও এইসব স্থবিধে দেওয়া হয়।

১৯৩০ সালে সর্ব্ব প্রথম লাভবিহীন গৃহনির্মাণ সম্পর্কিত নীতিগুলি আইনে পরিণত করা হয়। এই আইনে সংস্থাগুলির লাভবিহীন কর্মপ্রচেষ্টা স্থরক্ষিত করা সম্পর্কে এবং ছোট ছোট ফ্ল্যাট বানানো সম্পর্কে ব্যবস্থা রাখা হয়। আইনের সর্ত্তগুলি হ'ল : (ক) ছোট ছোট ফ্ল্যাট বানাতে হবে এবং এই কাজ বন্ধ রাখা যাবেন। এর অর্থ হ'ল ক্রমাগত ফ্ল্যাট বানিয়ে যেতে হবে এবং একমাত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই শুধু এই কাজ বন্ধ রাখা যেতে পারে। (খ) সরকারী নীতি অনুযায়ী এই সব ফ্ল্যাট বা বাড়ী উপযুক্ত মূল্যে বিক্রী করতে হবে বা ভাড়া দিতে হবে। (গ) গৃহ নির্মাণ সমিতির যে লাভ হবে বা সেগুলির যে সম্পদ গড়ে উঠবে তা বন্টন করারও কয়েকটি সর্ত্ত রয়েছে। এই সমিতিগুলি, অংশীদারদের মধ্যে অনুর্দ্ধ শতকরা ৪ ভাগ সম্পদ বন্টন করতে পারবে। লাভ বন্টন না করার ফলে যে সম্পদ গড়ে উঠবে তা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠানেরই থাকবে। কোন অংশীদার পদত্যাগ করলেও তাতে হাত দেওয়া যাবেনা। কোন প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে দেওয়া হলে তার সম্পদ লাভবিহীন কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে। ফ্ল্যাটগুলির আকার একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখতে হবে যাতে সেগুলির মূল্য সাধারণের আয়ত্বের মধ্যে থাকে।

এই সব সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতিগুলির কর্মপ্রচেষ্টা থেকে যাতে কেউ ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হতে না পারেন আইনে তারও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যে সব সংস্থা গৃহনির্মাণের কাজে ব্যাপৃত আছে সেগুলির মধ্যে শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগই, সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি। কিন্তু বিপুল সংখ্যক সমবায় সমিতি থাকলেও, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় এগুলির নিয়ন্ত্রণাধীন ফ্ল্যাটের সংখ্যা কম। তার প্রধান কারণ হ'ল সমবায় সমিতিগুলি সাধারণত: স্থানীয় ছোট ছোট অঞ্চলে বা পল্লী অঞ্চলে কাজ করে এবং এগুলির মূলধনও কম।

সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতিগুলির কাজ হল : জমি কিনে পরিকল্পনা তৈরি করা এবং বাড়ী তৈরির কাজ পরিদর্শন করা। ফ্ল্যাটগুলি তৈরি হয়ে গেলে সমিতিগুলি সদস্যদের এগুলি ভাড়া দেয়।

১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

চিত্র : বি. সরকার

মৃৎশিল্পীদের সেবায় ব্যাঙ্ক

কলকাতার কুমারটুলি এলাকার মৃৎশিল্পীরা সারা বছরই পুতুল, খেলনা বা মূর্তি প্রভৃতি তৈরীর কাজে ব্যাপৃত থাকেন। তবে জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে সরস্বতী পূজোর সময়ে, আগষ্ট-সেপ্টেম্বর নাগাদ বিশ্বকর্মা পূজো ও সেপ্টেম্বরে-অক্টোবরে দুর্গাপূজোর মরশুমে এবং অক্টোবর-নভেম্বর নাগাদ কালীপূজোর সময়ে এঁদের হাতে কাজ থাকে সবচেয়ে বেশী। কুমারটুলি এলাকা হচ্ছে মূর্তি তৈরির পীঠস্থান। কুমারটুলিতে তৈরি মূর্তির সবচেয়ে বড় বাজার হ'ল কলকাতা এই সব মূর্তি শুধু বাংলা দেশেই নয়, বাংলার বাইরেও বিক্রী হয়। একটা সমীক্ষায় জানা গিয়েছে যে, কুমারটুলিতে সবশুদ্ধ ২০০ ঘর মৃৎশিল্পী রয়েছেন, আর তাদের পরিবারভুক্ত কর্মীরা ছাড়া আরও প্রায় হাজার খানেক লোক মূর্তি ইত্যাদি তৈরি করেন। ব্যবসার মালিক এঁরা নিজেরাই। এই এলাকায় মূর্তিগড়ার ব্যবসা থেকে মোট আয় হয় বছরে ৪০ লক্ষ টাকার মতো। প্রত্যেক শিল্পী পরিবার গড়ে বছরে ২০,০০০ টাকার মত মূর্তি বিক্রী করে থাকেন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশ ভাড়া বাড়ীতে থেকে ব্যবসা চালান।

বছরে চারটে বড় বড় পূজোর মরশুমে মৃৎশিল্পীদের টাকার দরকার পড়ে সবচেয়ে বেশী। প্রত্যেক দিনের খুচরো কেনা-কাটা ছাড়াও একটা বড় খরচ হ'ল কাঁচামাল কেনা। যেমন হিসেব ক'রে দেখা গিয়েছে যে মাটি, ঘাস, তুষ, বাঁশ, দড়ি, রঙ, সাজসজ্জা ইত্যাদি জিনিস কিনতে মোট খরচের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ লেগে যায়।

এর জন্য অনেক সময় শতকরা ৯০ ভাগ মৃৎশিল্পীর ঋণের প্রয়োজন হয় এবং সেই প্রয়োজন মেটাতে হয় মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার ক'রে। সুদের হার কখনও শতকরা ৩৬ ভাগ কখনও বা শতকরা ৭২ ভাগ। এত চড়া হারে সুদ দিয়ে তাঁদের হাতে লাভ থাকে অতি সামান্য। অবশ্য কোন কোন সময় লাভের পরিমাণ শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগের মতও দাঁড়ায় (এর মধ্যে কারিগরদের মজুরিও

১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

অভাব ও অপরাধ ঃ সামাজিক সমস্যা

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

অভাব ও অপরাধ একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরাধের মূল কারণ—অভাব। অভাবের তাড়নায় মানুষ বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে দিনের পর দিন নানা অন্যায় কাজে রত হয়ে ক্রমশ: স্বভাব অপরাধীতে পরিণত হয়। এমন অনেক সৎ লোক আছেন যাঁরা হঠাৎ কোন কঠিন অভাবের চাপে একান্ত নিরু-পায় হয়ে অপরাধে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই ধরণের লোকদের জেলে পাঠালে, তারা ঘৃণা ও অপমানে মরিয়া হয়ে ওঠে এবং জেল থেকে বেরিয়ে যখন দেখে সমাজের কেউ আর তাদের সঙ্গে আগেকার মত স্বাভাবিক ব্যবহার করছেনা, তখন ধীরে ধীরে তারা স্বভাব অপরাধী হয়ে ওঠে।

অভাবের তাড়নায়, খরা, বন্যা বা দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে অপরাধ ব্যাপক আকার ধারণ করে। আবার আর্থিক অবস্থার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের সংখ্যা কমতে থাকে। এ থেকে বেশ বোঝা যায় মানুষ স্বভাবত: অপরাধ প্রবণ নয়।

মানুষ পেটের জ্বালায় যদি চুরি ডাকাতি করে বা কোন হীন কর্মে রত হয়, তখন সমাজের কর্তব্য তার অভাব দূর করা—অপরাধটাকে বড় করে না দেখা। কারণ শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় অপরাধীর অনুশোচনা বৃত্তি নষ্ট হয়ে গিয়ে সে মরীয়া হয়ে যায়।

দেখা যায় সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটিতেই অভাব এবং অভাবজনিত অপরাধের জন্ম হয়। পরিবারে একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তির হঠাৎ বেকার অবস্থা ঘটলে অথবা আকস্মিক মৃত্যু হলে—সেই সংসারে দারিদ্র্যের কালো ছায়া নেমে আসে। সংসার ছিন্ন ভিন্ন হয়ে সকল মাধুর্য ও পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভিক্ষা করতে শেখে, সমাজে পরগাছার সংখ্যা বাড়িয়ে চলে এবং ক্রমে সমাজবিরোধী হয়ে ওঠে। রূপ গুণ নেই বলে বিয়ে হচ্ছে না এমন অনেক মেয়ে অথবা অল্প বয়স্ক বিধবারা অভাবের তাড়নায় একটা লোক দেখান শুচিতা রক্ষা করে চলে বটে কিন্তু চক্ষুর অন্তরালে তারা সমাজ বিরোধী জীবন যাপনে হয়তো প্রলুব্ধ হয় বা বাধ্য হয়ে পাপাচারে লিপ্ত হয়।

অভাব ও অপরাধ সমাধানের মূলসূত্র নিহিত রয়েছে সুস্থ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামোর মধ্যে। আজ যে নারী গণিকা বলে অবহেলিত, জীবনের সুরুতে সে যদি সমাজের সহানুভূতি পেত, তাহলে হয়ত সে সমাজে মর্যাদার আসন পেতে পারত। অথবা কোন মনীষীর জননীরূপে পূজিতা হতে পারত। কিন্তু তাই বলে নৈতিক দৃষ্টিতে পাপকে কখনও সমর্থন করা যায় না।

কোন অপরাধীকে জেলে পাঠাতে হলে দেখতে হবে তার উপর নির্ভরশীল পরিবার বর্গের কি হবে ? বাঁচাতে তাদের হবেই, তানাহলে তাদের ছেলেরা হয়ত কেপমারির দলে ঢুকবে আর মেয়েরা অন্যায় বৃত্তি গ্রহণ করবে। অর্থাৎ একটি অপরাধীকে শাস্তি দিতে গিয়ে আরও দশটি অপরাধীর সৃষ্টি যাতে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখাও কর্তব্য। অপরাধীর কারাগারে থাকার সময়ে তার পরিবারের লোকেরা যাতে পরিশ্রমের বিনিময়ে সৎভাবে উপার্জনের সুযোগ পায় সে ব্যবস্থা রাষ্ট্রের তরফ থেকেই করা দরকার।

মহাত্মা গান্ধী বলেছেন—'কয়েদখানাকে কয়েদীরা যেন হাসপাতাল বলে মনে করেন।' জেলখানায় 'শাস্তি পাচ্ছি' মনে না ক'রে বিভিন্ন শিক্ষার মাধ্যমে 'সংশোধিত হচ্ছি' এই রকম মনে করতে হবে। অসুস্থ লোককে যেমন হাসপাতালে পাঠালে, সুচিকিৎসার মাধ্যমে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে স্বাভাবিকভাবে ঘরে ফিরে আসে তেমনি অপরাধীর সকল প্রকার 'অপরাধজনিত রোগ' ও জেলখানার নিয়ম শৃঙ্খলা, সুশিক্ষার ব্যবস্থার মাধ্যমে অপরাধীকে নিরাময় করে তুলতে হবে। অপরাধী মুক্তি পেয়ে ঘরে ফিরে এলে সমাজের উচিত তাকে পূর্ণ মর্যাদায় সমাজে গ্রহণ করা এবং তাঁরা যাতে সরকারী চাকুরিও পেতে পারেন তারও সুযোগ দেওয়া উচিত। আত্ম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর পাঁচ জনের মত সহজ সরল সামাজিক জীবন যাপনের সুযোগ না দিতে পারলে সমাজের এই সব ব্যক্তিকে স্বাভাবিক করে তোলা সম্ভব নয়।

কে. কে' সরকার

১১ পৃষ্ঠার পর

বাড়ীগুলি রক্ষনাবেক্ষণ ও এগুলির উন্নয়ন ইত্যাদির দায়িত্বও তাদেরই। কেউ যদি নিজে বাড়ী তৈরি করতে চান তাহলে সমিতি বাড়ীর নক্সা তৈরি করে নির্মাণ করার ভারও নেন। এরা সদস্যদের কাছে বিক্রী করার জন্য একটি পরিবারের বাসোপযোগী বাড়ী তৈরি করে দেন। ১৯৫৬ সালে এই সমিতিগুলি একটি পরিবারের বাসোপযোগী দশ হাজারেরও বেশী বাড়ী তৈরি করেছেন।

সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতির সদস্যরা নিজেরা সমিতির কাজকর্ম চালান না। একটি নির্বাচিত কার্য্যনির্বাহক কমিটি এবং একটি নির্বাচিত পরিচালনাকারী কমিটি সমিতির কাজকর্ম দেখেন বাড়ী তৈরির কাজ পরিদর্শন করেন। সাধারণত: সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতির কার্যানির্বাহক কমিটিতে তিন জন সদস্য থাকেন। সমিতির আইন অনুযায়ী তাঁরা নির্বাচিত ও নিযুক্ত হন। সদস্যদের সাধারণ সভায় পরিদর্শনকারী বোর্ডের অন্তত:পক্ষে তিনজন সদস্য নির্বাচিত হন।

(ইংরেজী যোজনায় প্রকাশিত মূল প্রবন্ধের অনুবাদ)

সংবাদ অসাধারণ

বাংলার ... য়ার

ভারতে ও পাশ্চাত্ত্যে দীর্ঘকাল গবেষণা করার পর ইঞ্জিনীয়ার শ্রীডি.কে. ব্যানার্জী প্লাস্টিক ও পলিথিনের সাহায্যে নলকূপের স্ট্রেনার ও পাইপ তৈরির এক অভিনব কৌশল আবিষ্কার করেছেন। বর্তমানে নলকূপের জন্য যে পিতলের স্ট্রেনার ও ধাতব শ্রেণীর জি. আই. পাইপ ব্যবহার করা হয়, শ্রী ব্যানার্জীর আবিষ্কৃত স্ট্রেনার ও পাইপ তার তুলনায় অনেক বেশী শক্তিসম্পন্ন ও দীর্ঘস্থায়ী। দ্বিতীয়ত: শ্রীব্যানার্জীর আবিষ্কৃত স্ট্রেনার ও পাইপের দামও অপেক্ষাকৃত আরও কম। সুখের বিষয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রথম এই আবিষ্কারকে স্বাগত জানিয়েছে। শ্রীব্যানার্জীর আবিষ্কৃত পদ্ধতি ঐদেশে গ্রহণও করা হয়েছে।

বর্তমানে নলকূপের জন্য পিতলের স্ট্রেনার ও জি. আই. পাইপের ব্যবহার প্রচলিত এবং ৭৫ মীটার গভীর নলকূপ বসাবার জন্য আনুমানিক ব্যয় হয় ১,৩১৬ টাকা। কিন্তু পিতলের স্ট্রেনার দীর্ঘস্থায়ী নয়। রাসায়নিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে ঐ স্ট্রেনার তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় এবং সেগুলি ৫/৬ বছর অন্তর বদলাতে হয়। তা ছাড়া ইদানীং ধাতুর দাম ঊর্ধমুখী হওয়ায় জি. আই. পাইপের দামও বাড়তির দিকে।

শ্রীব্যানার্জী তাঁর পদ্ধতিতে প্লাস্টিকের স্ট্রেনার এবং বেশ টেঁকসই প্লাস্টিক ও পলিথিনের পাইপ ব্যবহার করেছেন। তাঁর তৈরী স্ট্রেনারটি জালের আবরণে ঢাকা। ধাতব না হওয়ার দরুণ কোনোও প্রকার রাসায়নিক সংমিশ্রণ বা লবণাক্ত জলে ঐ নতুন স্ট্রেনার বা পাইপের ক্ষতি হবে না। এই নতুন আবিষ্কারের একাধিক গুণ আছে। যথা—পরিষ্কার জল উঠবে, জল তোলার জন্য বেশী জোর দিতে হবে না। ৫/৬ বছর অন্তর এগুলি বদলাবার প্রয়োজন হবে না। ধাতব স্ট্রেনার ও জি. আই. পাইপের তুলনায় প্লাস্টিকের বিকল্প অনেক বেশী শক্তিসম্পন্ন ও দীর্ঘস্থায়ী। কেন্দ্রীয় সরকারের টেস্ট হাউসের রিপোর্টেও এই দাবীর সত্যতা সমর্থন করা হয়েছে।

গত ২১শে ডিসেম্বর ২৪ পরগণা জেলার রাজপুর পৌরসভা এলাকায় সর্বসাধারণের জন্য শ্রীব্যানার্জী নিজের খরচে ঐ নতুন ধরনের একটি নলকূপ বসিয়েছেন।

শ্রীব্যানার্জী জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর নতুন ধরনের স্ট্রেনার ও পাইপ তৈরির একটি কারখানা চালু করতে চান।

আত্মনির্ভরশীলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

মহারাষ্ট্রের একটি গণ্ডগ্রামের কাহিনী। সেখানে পানীয় জল সরবরাহের একটি প্রকল্পকে কেন্দ্র ক'রে গ্রামের মানুষ কেমন ক'রে অন্যের সাহায্যপ্রার্থী না হয়ে নিজেদের সমস্যার সুরাহা নিজেরাই করেছেন তা'র ইতিবৃত্ত জানলে অনেকেই উৎসাহিত বোধ করবেন।

ধাপেওয়াড়া-কলেরজল প্রকল্পটিকে তাই অধ্যবসায় ও স্বনির্ভরতার প্রকল্প ব'লে অনেকে বর্ণনা করেছেন।

নাগপুর জেলার প্রায় একশো গ্রামের মধ্যে ধাপেওয়াড়া হ'ল একটা ছোট গ্রাম; মোট বাসিন্দার সংখ্যা তিনহাজারের বেশী হ'বে না। ধাপেওয়াড়ায় খাবার জলের বড় অনটন ছিল। গ্রামের মানুষগুলির দুর্দ্দশা দেখে শিবরামপ্যন্ত টিডকের প্রাণ কেঁদে উঠত। অশীতিপর বৃদ্ধ টিড়কে অবসর নেবার আগে পর্য্যন্ত শিক্ষকতা ক'রে এসেছেন। তাই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জলের কষ্ট দেখে তাঁর মনটা অস্থির হয়ে উঠত। শেষপর্য্যন্ত তিনি তাঁর সারাজীবনের সঞ্চয় এদের সেবায় দিতে মনস্থ করলেন এবং একটি জল-সরবরাহ প্রকল্পের সূত্রপাত করার জন্যে ১৫,০০০ টাকা দান করলেন। অচিরে মহারাষ্ট্র সরকার এই প্রকল্পের জন্যে সওয়া দু' লক্ষ টাকা মঞ্জুর করলেন। মহৎ কাজ মহত্তর কাজে প্রেরণা দেয়; অতএব ধাপেওয়াড়া গ্রাম পঞ্চায়েৎও ১০,০০০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ ক'রে ঐ প্রকল্পে দান করল। প্রকল্প চালু হ'ল। এখন জলের কোনোও কষ্ট নেই। গ্রামের প্রত্যেকে মাথাপিছু দিনে ১৫ গ্যালন পানীয় জল পান। তাছাড়া জল পেতে দূরেও কোথাও যেতে হয় না। শ্রী টিডকে অগ্রণী না হ'লে এই প্রকল্প কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত হ'ত কি না সন্দেহ।

মাথার ঘাম ফ্যালো ক্ষেতের ফসল তোল

এই মন্ত্র হ'ল সর্দার তেজাসিং-এর সাফল্যের চাবীকাঠি। অমৃতসর জেলার ভালিনাপুর ডোগবাওঁ অঞ্চলের বাসিন্দা তেজা সিং বলেন, "ফিরোজপুরের গম আর গুরদাসপুরের ধান সমগ্র পাঞ্জাবের পক্ষে পর্যাপ্ত। পাঞ্জাবে এর বাইরে যে গম ও ধান ফলানো হয় তা'তে দেশের বাকী রাজ্যগুলির চাহিদা মেটানো যায়।" তবে তিনি হুঁশিয়ার ক'রে দিয়েছেন, যে, নতুন ও উৎকৃষ্ট বীজ এবং আধুনিক কৃষিপদ্ধতি গ্রহণ না করলে এ আশা কাজে ফলবে না! আধুনিক কৃষিপদ্ধতি ও নবউদ্ভাবিত বীজগুলির প্রচুর সম্ভাবনা সম্বন্ধে এঁর গভীর আস্থা দেখে জাতীয় বীজ কর্পোরেশন দোআঁশলা ভুট্টাবীজ 'গঙ্গা-১০১' চাষের জন্যে তেজা সিংকে মনোনীত করেন।

তেজাসিং ১০ একর জমি বেছে নিলেন এই বীজের জন্য। বিধিমত চাষ ক'রে একর প্রতি তিনি নীট লাভ করলেন ৫২৫ টাকা। এটা একটা মস্তবড় কৃতিত্ব কারণ ভুট্টার ফসল তোলা হয় তিনমাসের মধ্যে; বছরও ঘুরতে লাগে না।

তেজাসিং বছরে তিনটি ফসল বোনেন এই ক্রমে—ভুট্টা-গম-ভুট্টা।

পল্লী অঞ্চল থেকে উন্নয়নের জন্য সম্পদ

ভি. করুণাকরণ

ভারতীয় অর্থনীতিতে পল্লী অঞ্চল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। কারণ ভারতের জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ আসে কৃষি থেকে। কাজেই প্রত্যক্ষভাবে পল্লীগুলিরই অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা মোটা ব্যয় বহন করতে হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থের সংস্থান করার উদ্দেশ্যে পল্লীগুলিকে বিশেষ করভার বহনে বাধ্য করে রাশিয়া ও জাপান ইতিহাসে নতুন নজির সৃষ্টি করেছে। অধ্যাপক এন কালডোরের মতে, "অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর করার ক্ষেত্রে কৃষিকরের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ কৃষির ওপর বাধ্যতামূলক কর ধার্য্য করা হলে কেবল-মাত্র সেই ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ে।"

তবে দেখা যায় যে, অকৃষি তরফের তুলনায় কৃষি তরফটিতে করের পরিমাণ খুব কম। ডঃ বেদ গান্ধীর হিসেব অনুযায়ী ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৬০-৬১ সাল পর্য্যন্ত সময়ে কৃষি তরফে ১৭১৭ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হয়েছে। কিন্তু অতিরিক্ত করের পরিমাণ ছিল মাত্র ৯৮ কোটি টাকা। অপরপক্ষে ঐ একই সময়ে অকৃষি তরফে অতিরিক্ত আয়ের পরিমাণ ছিল ২,৪২০ কোটি টাকা, কিন্তু অতিরিক্ত করের পরিমাণ ছিল ৪৯৯ কোটি টাকা। ১৯৫৩ সালে ডঃ জন মাথাইর সভাপতিত্বে করব্যবস্থা অনুসন্ধান-কারী কমিটি বলেন যে, "পল্লী অঞ্চলের করের তুলনায়, সহর অঞ্চলে আয়ের সমস্ত স্তরে করের পরিমাণ মোটামুটি বেশী। সহরাঞ্চলে অপ্রত্যক্ষ কর গ্রামাঞ্চলের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী। সহরাঞ্চলের আয়ের তুলনায় পল্লী অঞ্চলের উচ্চতর আয়ের ক্ষেত্রে কর বৃদ্ধির বেশী সুযোগ রয়েছে।"

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বিগত অধিবেশনে প্রধান মন্ত্রী, দেশের ভেতর থেকেই প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ করার ওপর জোর দেন। প্রতি বছর জাতীয় আয় যতটুকু বাড়ে তার একটা বড় অংশ গ্রামগুলি পায় এবং উন্নয়নমূলক কর্মপ্রচেষ্টার ফলে প্রগতিশীল যে কৃষকরা উপকৃত হয়েছেন, বিশেষ করে, তাঁদের আয় দ্রুত গতিতে বাড়ছে। এই অতিরিক্ত আয় সংগ্রহ করার কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা না থাকায়, এর বেশীর ভাগই অযথা ব্যয় করা হয় কিংবা তাঁরা সোনা রূপা কিনে টাকাটা আটকে রাখেন। মূল্যবান ধাতুর চোরা চালান, কালোবাজার, ফাঁপা বাজার ইত্যাদি অসামাজিক কাজকর্মে তাঁরা অপ্রত্যক্ষভাবে উৎসাহ দেন। কাজেই কৃষিকে অধিকতর ভার বহন করতে আহ্বান জানানো উচিত। সুতরাং কৃষকদের এই অতিরিক্ত আয়ের কিছুটা অংশ কেটে দেওয়ার জন্য, পরিকল্পনা কমিশন যে আয়-কর ধার্য্য করার পরামর্শ দিয়েছেন, তা একটা সৎ পরামর্শ।

পরিকল্পনাকালে নানাধরণের পল্লী অর্থসাহায্য সমবায় সমিতি, সমষ্টি উন্নয়ন, জলসেচ প্রকল্প ইত্যাদিতে অর্থ বিনিয়োগের ফলে পল্লীগুলিই মোটামুটিভাবে বেশী উপকৃত হয়েছে। শস্যের উচ্চমূল্যও কৃষকদেরই অনুকূল হয়েছে। এর ফলে কৃষি থেকে আয় ক্রমাগত বেড়েছে। কৃষিজাত সামগ্রীর পাইকারি দর, ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে, শতকরা ৯৩ ভাগ বেড়েছে অপরপক্ষে শিল্পজাত সামগ্রীর দর বেড়েছে শতকরা ৬২ ভাগ।

১৯৬০-৬১ সালে কৃষি আয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ৬,৯৫৪ কোটি টাকা। সাত বছরে কৃষি আয় বেড়ে ১২,০৫১ কোটি টাকা হলেও, প্রকৃত কর কমে গিয়ে ১০১ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এতেই বুঝতে পারা যায় পল্লী অঞ্চলে আয় এতো বাড়লেও তার ওপর কোন কর আরোপ করা হয়নি। ভারতে যে ৫১০ লক্ষ কৃষি আবাদ আছে সেগুলির শতকরা ২ ভাগের ওপরেও যদি কর আদায় করা হয় তাহলে তা থেকে বছরে ১৫০ কোটি টাকা আয় হতে পাবে। দেশের পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য সরকার এখানে রাজস্বের একটা ভালো উৎস পেতে পারেন এবং এতে পল্লীগুলিও পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতন হবে।

রাষ্ট্রপতির শাসনাধীন বিহার সরকার কৃষি আয়ের ওপর কর নিদ্ধারণ সম্পর্কে সর্ব্বপ্রথম আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন। ব্যবসা কর সম্পর্কিত কমিশনের একটি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, কৃষি থেকে বার্ষিক ১,০০০ টাকার বেশী আয়ের ওপর আয়কর ধার্য্য করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুনিশ্চিত জলসেচ সম্পন্ন তিন একর, অর্দ্ধ নিশ্চিত জলসেচ সম্পন্ন ১০ একর এবং জলসেচ-বিহীন ১৫ একর পর্য্যন্ত জমি করবহির্ভূত রাখা হয়েছে। এই সম্পর্কে মূলনীতি হ'ল, যে কৃষক বেশী ফলনের শস্য উৎপাদন করেন, তিনি সুনিশ্চিত জলসেচ-সম্পন্ন প্রতি একর জমি থেকে বছরে মোটামুটি ২০০০ টাকা আয় করেন। শতকরা ৫০ ভাগ উৎপাদন ব্যয় ইত্যাদি বাবদ বাদ দিলে তাঁর নীট আয় থাকবে ১,০০০ টাকা। তবে বিহার সরকার এই কর থেকে প্রকৃতপক্ষে কি পরিমাণ অতিরিক্ত আয় করতে পারবেন তার হিসেব করা হয়নি। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো রাজস্বের পরিমাণ বেশী হবেনা কিন্তু কৃষি থেকে বছরের পর বছর যেমন আয় বাড়তে থাকবে তেমনি রাজস্বের পরিমাণও বাড়বে।

অন্য কয়েকটি রাজ্যও কৃষিজাত আয়ের ওপর কর ধার্য্য করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে পরিমাণ রাজস্ব সংগৃহীত হয়েছে তা খুবই অল্প। বর্ত্তমান আর্থিক বছরে কৃষি আয়কর থেকে আনুমানিক মোট যে রাজস্ব সংগৃহীত হবে তা ⋅১২ কোটি টাকার বেশী হবেনা ; দেশের মোট রাজস্ব যেখানে ১,৬৯৮ কোটি টাকা সেখানে এটা অতি ক্ষুদ্র একটা অংশ।

এর পর ২০ পৃষ্ঠায়

পরিবহন ব্যবস্থার বিকাশের সম্ভাবনা ও তার দু' একটি দিক

মোহিত কুমার গাঙ্গুলী

দেশের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সহজ, সুলভ ও সাধারণের উপযোগী পরিবহণ ব্যবস্থার প্রসার হচ্ছে, ততদিন পর্য্যন্ত, জনসাধারণের বৃহৎ একটি অংশ জাতীয় জীবনের কর্ম্মস্রোত থেকে অনেকখানি বিচ্ছিন্ন থেকে যাবে। পরিবহণ ও যোগাযোগের বিভিন্ন সাধনগুলির মধ্যে সমন্বয় বিধানের দ্বারাই কেবল এই বিচ্ছিন্নতার ব্যবধান দূর করা সম্ভব।

যে কোন দেশের জাতীয় উৎপাদনের সুষম বন্টন কেবলমাত্র উপযুক্ত পরিবহণ ব্যবস্থার মাধ্যমেই সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারে। তাছাড়া অর্থনৈতিক কাঠামো মজবুত ক'রে তোলার জন্যও উপযুক্ত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রয়োজন। কিন্তু পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপযুক্ত বিকাশের জন্য যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন এবং তা বেশ ব্যয়সাধ্য।

কতকগুলি ক্ষেত্র আছে যেখানে বিশেষ ধরণের পরিবহণের বিকাশ অত্যন্ত জরুরী অথচ এমন জায়গাও দেখা যায় যেখানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিবহণের ব্যবস্থা রয়েছে। অতএব পরিবহণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে দূরদৃষ্টি প্রয়োজন।

যানবাহন মূলত: কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট পথেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চলাচল করে। হিসেব ক'রে দেখা গেছে যে আমাদের দেশে যত রাস্তা এবং রেলপথ আছে তার মধ্যে শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ রাস্তা বা রেলপথেই শতকরা ৭০ ভাগ মালপত্র বাহিত হয়। সুতরাং এতেই বোঝা যায় যে সামান্য ১৫ থেকে ২০ ভাগ রাস্তা বা রেলপথ সবচাইতে বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এই ব্যবহার ক্রমশ: বেড়ে চলেছে। পরিবহণ বিকাশের খরচ এই সমস্ত পথে মাইল অনুপাতে অনেক বেশী। আপাতদৃষ্টিতে অনেক সময় অনেকের কাছে মাত্র এই কয়েকটি 'রুটে' পরিবহণের পর্য্যাপ্ত বিকাশ নিরর্থক মনে হতে পারে কিন্তু দেশ ও দশের চাহিদার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে গেলে এই ধরণের বিকাশের অপরিহার্য্যতা অবজ্ঞা করা চলেনা বা করা উচিত নয়। পরিবহণ বিকাশের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা অনেকেই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন যে পরিবহণ-পরিকল্পনায় "স্থানীয়" প্রয়োজনের সঙ্গে "জাতীয়" প্রয়োজনের ওপরেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে একটি রাজ্য থেকে মালপত্র দূরের অন্য একটি রাজ্যে নিয়ে যেতে হলে হয়তো অন্য আর একটি রাজ্যের ওপর দিয়ে যেতে হয়। এই রাজ্যটিতে হয়তো যাত্রী বা মালপত্র পরিবহণ করার জন্য উপযুক্ত রাস্তা ঘাট নেই। কিন্তু সেই রাজ্যের মধ্য দিয়েও যাতে অন্য রাজ্যের যাত্রী ও মালপত্র সোজাসুজি চলে যেতে পারে তার জন্য রাস্তাঘাট সংরক্ষণ করা ইত্যাদির দায়িত্ব সেই রাজ্যের ওপরেই থাকে। সেখানে স্থানীয় স্বার্থের পরিবর্ত্তে জাতীয় স্বার্থের বিশেষ দাবি স্বীকৃত।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবহণের চাহিদার রূপও বদ্‌লে যাচ্ছে। অতীতে বিদেশী শাসন দেশের পরিবহণ ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। সে সময়ে দেশ থেকে কাঁচামাল রপ্তানী হত এবং বিদেশ থেকে তৈরি মাল আমদানি করা হত। ফলে বিভিন্ন বন্দরকে কেন্দ্র ক'রে ব্যবসা বাণিজ্যের পরিসীমা ক্রমশ: বিস্তৃত হয়েছে। বহির্বাণিজ্যের প্রাধান্য পরিবহণের ওপর তার ছাপ ফেলবে সেটা স্বাভাবিক, কারণ সেই সময়ে আন্তর্বাণিজ্যকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার কোন জোরালো প্রচেষ্টা ছিলনা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে বিহার ও ওড়িষ্যার খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি অনেক ক্ষেত্রেই বাংলা ও সন্নিকটবর্ত্তী শিল্পাঞ্চলগুলির সঙ্গে যথোপযুক্তভাবে সংযুক্ত নয়। এ যাবৎ ঐ অঞ্চলগুলি পৃথকভাবে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু এখন ধীরে ধীরে বাংলা বিহার ও ওড়িষ্যা একটা সুসংবদ্ধ ও স্থায়ী পরিবহণ কাঠামোর মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে যোগসূত্র সুদৃঢ় ক'রে তুলছে। এই রকমভাবে দেশের অন্যত্রও আন্তর্বাণিজ্যের বিকাশ পরিবহণের মানচিত্রে নতুন নতুন শাখা প্রশাখা বিস্তার করছে। পরিবহণের এই বিকাশের মাধ্যমে আমরা পরস্পরকে চেনবার ভালোভাবে জানবারও সুযোগ পাচ্ছি।

বর্ত্তমানে আরও একটা সুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে একটা সামগ্রিক বা সর্ব্ব ভারতীয় পরিবহণ ব্যবস্থার চাহিদা ক্রমশ: সোচ্চার হয়ে উঠছে। উদাহরণ হিসেবে প্রথমে রাস্তা তৈরির কথাই ধরা যাক। কিছুদিন পূর্ব পর্য্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী রাস্তাগুলি ঠিকমত সংযুক্ত ছিলনা। একটি রাজ্য যদি নিজেদের অংশের রাস্তা মজবুত ও সুদৃঢ়ভাবে গড়ে তোলে তো পাশের রাজ্যটি বোঝাপড়ার অভাবে হয়তো নিজেদের অংশ যথোপযুক্তভাবে তৈরি করলনা। বোঝাপড়ার অভাবে অর্থের অপচয়ের দিকটা ধীরে ধীরে যত পরিস্কার হয়ে উঠতে লাগলো ততই সামগ্রিক পরি-

বহণ পরিকল্পনার দাবী সুদৃঢ় হতে লাগল। যাঁরা কোন বন্দরের বিকাশ পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত তাঁরা অনেকেই জানেন যে এক সময়ে ভারতের প্রায় প্রতিটি বড় বন্দর দাবি করেছিল যে তারা প্রত্যেকেই লৌহ আকর রপ্তানীর ব্যবস্থা করতে পারে, তবে, সেইজন্যে বন্দরগুলির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন প্রয়োজন।

আঞ্চলিক প্রয়োজন ছাড়াও যে সর্বভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই কাজটা বিচার করা প্রয়োজন তা ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগলো। পরস্পরের দাবির মধ্যে বোঝাপড়ার প্রয়োজন অনুভূত হল এবং ধীরে ধীরে একটি সর্বভারতীয় পরিকল্পনার চাহিদা বাড়তে লাগলো। শুধু বন্দরের মধ্যেই এই সমস্যা সীমাবদ্ধ নয়। রেলপথ মোটরপথ, জলপথ সর্বক্ষেত্রে দূরদৃষ্টি প্রয়োজন। যেমন, যেখানে রেললাইন তৈরি করা প্রয়োজন সেখানে সড়ক তৈরির বড় প্রকল্প অপ্রয়োজনীয়। কিংবা জলপথে পরিবহণ যেখানে অল্পব্যয়সাধ্য সেখানে অন্য ব্যবস্থা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। অনেক জায়গায় রেললাইন তুলে নিয়ে, ভালো রাস্তা তৈরি ক'রে দেওয়া যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হচ্ছে।

অনেক সময় দেখা গেছে, স্থানীয় স্বার্থে, একই রাজ্যে পরিবহণ ও যোগাযোগের এত কর্মসূচী এক সঙ্গে নেওয়া হয়েছে যে কোনটিই আর শেষ হতে চায়না। আমাদের সামর্থ্য সীমিত এবং সেই সামর্থ্যটুকুও যদি আমরা অধিকাংশকে খুসি করার জন্য নিয়োগ করতে ইতস্তত: করি তাহলে তা অনুচিত হবে। এই সহজ সত্যটি যত তাড়াতাড়ি আমরা মেনে নিতে পারবো, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল।

একটু অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে পরিবহণের অভাব ছিল প্রচুর এবং অর্থের সামর্থ্য সে তুলনায় ছিল খুবই অল্প। অভাব এত প্রকট ছিল যে অনেক সময় ওপর ওপর মানচিত্র দেখেই বলে দেওয়া যেতো যে প্রধান পরিবহণ ব্যবস্থার কোথায় কোথায় বিশেষ রকমের দুর্বলতা রয়েছে। অনেক সময় এমনও দেখা গেছে যে, প্রয়োজন হলে বড় বড় রাজপথগুলির উপর সেতু তৈরি করার মত পর্য্যাপ্ত অর্থের সংকুলান ছিল না। তার ফলে তৈরি হয়ে আছে এমন রাস্তা, সেতুর অভাবে ঠিকমত কার্যকরী হতে পারছে না। যোগাযোগের বা পরিবহণের কাঠামোর ক্ষেত্রে এক জায়গার উদ্বৃত্ত, অন্য জায়গার প্রয়োজনে সহজে লাগানো যায় না। উদ্বৃত্ত অর্থ জমিয়ে রাখবার ও উপায় নেই। ক্রমশ: অবশ্য এই ধরনের অতি প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলির অনেকখানি সমাধান হয়েছে। এখন সমস্যার রূপ অন্যরকম দাঁড়িয়েছে। সবদেশেই পরিবহণের অর্থনৈতিক দিকের পরিপ্রেক্ষিতে লরী, মালগাড়ী, জাহাজ ও বিমানের আকার বেড়ে চলেছে। অতএব, বহু বছর পূর্বের তৈরি বন্দর, রাস্তা ইত্যাদি সামঞ্জস্য রাখতে পারছে না। সেগুলির যথেষ্ট উন্নতি প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোন বন্দরটির আয়তন বড় করা উচিত, কোন রেলওয়ে লাইনগুলির বৈদ্যুতিকীকরণ বা ডিজেলীকরণ জরুরী, কোন রাস্তাগুলি বেশী মজবুত ও চওড়া করার বিশেষ প্রয়োজন তা স্থির করতে হবে। অর্থাৎ 'আপেক্ষিক গুরুত্ব বিচার' পরিকল্পনার একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্বে, না হলেই নয় গোছের অনেক দাবী তোলা হত যা প্রমাণ করার জন্য বিশেষ কোন অনুশীলনের প্রয়োজন হতো না। এখন দাবীর রূপ ঠিক সে রকম নেই। এখন অর্থের বিনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে কী ধরনের সুযোগ সুবিধা কোন পরিবহণের মাধ্যমে কী ভাবে পাওয়া যাবে, কী ক'রে সুলভে ও অল্প আয়াসে পরিবহণের কোন মাধ্যমকে সর্বাধিক উপকারে আনা যাবে তা বিচার ক'রে দেখতে হচ্ছে।

পরিবহণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলেই আজকাল একটা বিষয় এসে পড়ে—সেটা হ'ল 'পরিবহণ প্রতিযোগিতা।' বিষয়টি জটিল। পরিবহণের বিভিন্ন সাধনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দেশ ও জাতির সেবায় সেগুলি নিয়োজিত। সাধারণের মনে যে প্রশ্নটা জাগে সেটা হ'ল দাবী বা চাহিদা অনুযায়ী পরিবহণের বিকাশ সাধন হবে সেটাই ত স্বাভাবিক, এতে করার কি আছে? মাথা ঘামাবার সত্যিই হয়ত কিছু থাকতো না যদি না বিশেষ কোন পরিবহণের ওপরে কোন রকম বিশেষ দায়িত্ব না থাকতো। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে উপযুক্ত ভাড়া দিলে রেল কর্তৃপক্ষ মাল বা যাত্রী নিয়ে যেতে বাধ্য। উপযুক্ত ভাড়ার হারও তাঁরা সর্ব সাধারণকে জানাতে বাধ্য। লরির বেলায় এ ধরণের দায়িত্ব নেই। এই রকম আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে, যা থেকে সহজেই বোঝা যায়, যে জাতীয় স্বার্থে আমরা সব কটি মাধ্যমকে ঠিক সমান দায়িত্ব দিই নি। আর এই অসমতাকে কেন্দ্র ক'রে পরিবহণের বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে সমন্বয় আনার সমস্যা ক্রমশ: জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। বিভিন্ন দেশ বিভিন্নভাবে এই সমস্যা সমাধানের পথে এগিয়ে চলেছে। কেউ পরিবহণের বিশেষ ক্ষেত্রের ওপর কোন রকম বিশেষ দায়িত্বের বোঝা চাপাতে চাইছেন না এবং পরিবহণের সব কটি সাধনকে সমান পর্য্যায়ে এনে প্রত্যেকটিকে সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করছেন। আবার কেউ কেউ বলছেন যে পরিবহণের সব কটি মাধ্যমকে বিশেষ দায়িত্ব থেকে মুক্ত করা সমীচীন হবে না। তবে সেই অজুহাতে অন্য পরিবহণগুলির ওপর যে অন্যায় বাধা নিষেধ আরোপ ক'রে তার পালটা নিতে হবে সেটাও যুক্তিযুক্ত নয়।

ছোট খাটো দেশগুলিতে এই সমস্যা অনেক সময় বেশ জোরালোভাবে দেখা দিয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দেশ বিশাল এবং এখানে পরিবহণের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের সুযোগ সুবিধা এখনও পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে।

পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম সামগ্রী

ভারতে পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম সামগ্রী আমদানি করার জন্য গত তিন বছরে যে ব্যয় করা হয়েছে তা হল: ১৯৬৬: ৫১.৩১ কোটি টাকা; ১৯৬৭: ৩৯.৬৭ কোটি টাকা; ১৯৬৮: ৪০.৭৩ কোটি টাকা এবং ১৯৬৯ (জানুয়ারি-এপ্রিল): ৯.১৪ কোটি টাকা।

বেসরকারী তরফের ভূমিকা

৯ পৃষ্ঠার পর

সংহত শিল্পগুলি, স্থানীয় সমাজের জনগণের জীবন ও সমস্যার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে, তাঁদের সেবা ও সাহায্য করার জন্য নিজেদের সম্পদ, জ্ঞানবুদ্ধি যথাসম্ভব নিয়োজিত ক'রে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান যোগাতে পারে। যে সব সরকারী বা বেসরকারী কারখানা গ্রামে স্থাপন করা হয়েছে, সেগুলি, তাদের চতুর্দিকে ছড়ানো গ্রামগুলির অধিবাসীদের জীবনযাত্রা উন্নততর করা সম্পর্কে, যেখানে দুঃখ দুর্দ্দশা আছে তা দূর করার জন্য, বেকারদের কর্ম্মসংস্থানের জন্য এবং যাদের সাহায্যের প্রয়োজন তাদের সাহায্য করার জন্য অনেক কিছু করতে পারে। আমাদের দেশে এমন কোন গ্রাম নেই যার কোন না কোন উন্নয়নের প্রয়োজন নেই। একটা স্কুল, একটা হাসপাতাল, ভালো একটা রাস্তা, আরও কয়েকটা কুয়ো, পাম্প, পাইপ, সিমেন্ট এবং সবের্বাপরি চাকরীর সুযোগ, কোন না কোন কিছুর প্রয়োজন আছেই। একটা কারখানায় যে শ্রমিক বা কর্ম্মীরা কাজ করেন তাঁদের ও তাঁদের পরিবারের পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাইরে থেকে না এনে আশপাশের গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা যায়। গ্রামের ছুতোর, কামার, মিস্ত্রীদের দিয়ে তৈরি করিয়ে নানা রকম জিনিস কারখানায় ব্যবহার করা যায়। গ্রামে যে সব শিল্প স্থাপিত হয়েছে সেগুলিই তাদের চতুর্দ্দিকের গ্রামগুলির উন্নয়নের ভার নিক। কারখানার ম্যানেজার, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞগণ গ্রামবাসীদের সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য এবং গ্রামবাসী ও কারখানার মিলিত উদ্যোগে যে সব উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নেওয়া হবে সেগুলি পরিদর্শন করার জন্য, তাঁদের কিছুটা সময় ব্যয় করুন। এগুলির কোনটাই অবশ্য দান বা খয়রাত হিসেবে ধরা উচিত নয়। কোন সময়ে বিনামূল্যের সেবা বা আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন হলেও এই সব কর্ম্মপ্রচেষ্টা পল্লীবাসী ও কারখানার সমবায়মূলক প্রচেষ্টা হিসেবে ধরা উচিত এবং তাই হওয়া উচিত। এই রকম যুক্ত প্রচেষ্টার প্রাথমিক উপকারগুলি পল্লীবাসীরাই ভোগ করবেন সন্দেহ নেই কিন্তু চতুর্দ্দিকের পরিবেশ যদি সুস্থ থাকে, পল্লীবাসীরা যদি সুখে ও শান্তিতে থাকেন, তাঁরা যদি সমৃদ্ধ হন তাহলে তাতে কারখানারই লাভ।

আমার যৌবনে আমি স্বপ্ন দেখতাম যে দ্রুত উন্নয়নশীল ভারত, আমার জীবনকালেই দারিদ্র্য, দুঃখ ও অজ্ঞতা থেকে ব্যাপক সমৃদ্ধির যুগে পৌঁছুতে পারবে, সেই স্বপ্ন ক্রমশঃ ম্লান হয়ে আসছে। তবে আমরা যতই হতাশা অনুভব করিনা কেন, এমন একদিন নিশ্চয়ই আসবে যেদিন ভারত তার বহু শতাব্দী ব্যাপি পরিশ্রম, ধৈর্য ও ত্যাগের সুফল ভোগ করতে পারবে।

(১৯৬৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর, মাদ্রাজ পরিচালনা সমিতির ব্যবসায়ে নেতৃত্বমূলক শিক্ষাক্রমের পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে অনন্তরামকৃষ্ণ স্মারক বক্তৃতা। যোজনায় প্রকাশিত মূল প্রবন্ধের অনুবাদ।)

চারটি নতুন ধানের বীজ

কটকের কেন্দ্রীয় চাউল গবেষণাসংস্থায় ১৫০ ধরণের ধান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এর মধ্যে কয়েক ধরণের ধান প্রচুর ফলনশীল হতে পারে বলে আভাষ পাওয়া গেছে।

এগুলির মধ্যে একটি জাত তাড়াতাড়ি পেকে ওঠে। খারিফ মরসুমে ৮৫ দিনে ফসল পেকে ওঠে এবং রবি মরসুমে ৯৫ দিনে। সেই তুলনায় পদ্মার বীজ পাকতে ১০০ দিন, তাই নান-১ এর বীজ পাকতে ১১৫-১২০ দিন এবং আই আর-৮ এর বীজ পাকতে লাগে ১২৫ দিন।

এই নতুন জাতের বীজটিতে চট করে পোকা লাগে না অথবা কোনোও রোগ ধরে না। এই জাতের ধানও সরু, তাই-নান-১ বা আই আর-৮ এর মত নয়। তা ছাড়া তাই নান-১ এর উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৪ টন হলে নতুন বীজের পরিমাণ হেক্টর প্রতি দাঁড়ায় ৫-৬ টন।

কুমারটুলীর শিল্পী

১৮ পৃষ্ঠার পর

ধরা হয়েছে)। শতকরা ২৫ ভাগ মৃৎশিল্পী একটু সম্পন্ন অবস্থার; তাঁরা ধার না ক'রে নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে পারেন।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক মৃৎশিল্পীদের ঋণের প্রয়োজন মেটাবার যে পরিকল্পনা নিয়েছে তা আগামী সরস্বতী পূজার মরসুম থেকে কার্যকরী হবে। যে সব মূর্তি এখন গড়া হবে সেগুলির আনুমানিক মোট বিক্রয়-মূল্যের শতকরা ৭৫ ভাগ পর্যন্ত মৃৎশিল্পীদের ধার দেওয়া হবে।

গত কয়েক মরসুমে কত টাকার মূর্তি বিক্রী হয়েছে সে সম্বন্ধে মৃৎশিল্পী সংস্কৃতি সমিতির সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে এ বছরের মোট সম্ভাব্য বিক্রীর আনুমানিক পরিমাণ স্থির করা হয়েছে। নতুন পরিকল্পনাতে এই সমিতির গ্যারান্টি অনুযায়ী এবং কাঁচা মাল ও তৈরি মূর্তির মোট মূল্যের অংশ-বিশেষ জামীন রেখে তিন মাসের মেয়াদে অল্প সুদে মৃৎশিল্পীদের টাকা ধার দেওয়া হবে।

ঋণের সর্ত্তাদি নিরূপণ, অনুমোদন ও ঋণ প্রদানের সমস্ত কাজ তদারক করে কুমারটুলির কাছাকাছি ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের হাটখোলা শাখা। এ পর্যন্ত ঐ শাখা এক লক্ষ টাকার ৮১টি ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে মৃৎশিল্পী সমাজের কাছ থেকে বেশ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

★ দুর্গাপুরের সেন্ট্রাল মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে একটা নতুন কীট-নাশক স্প্রেয়ার তৈরী হয়েছে। এটি 'ন্যাপ স্যাক্' শ্রেণীর কিংবা হালকা পেট্রোল চালিত স্প্রেয়ার থেকে আলাদা। এটি তৈরী করতে খরচ পড়ে ৫০০ টাকার মত। এটি পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয়। এই যন্ত্রটি গুদামঘরে, নানাপ্রকার খাদ্য উৎপাদনের কারখানায়, অফিসে, শাকসব্জীর বাগানে এবং চা, তামাক, পাট ও আখের ক্ষেতে ভালোভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে।

ভি. করুণাকরণ

১৬ পৃষ্ঠার পর

তাছাড়া এই রাজস্বেরও বেশীর ভাগই চা বাগান ইত্যাদি যৌথ প্রতিষ্ঠান থেকে আসে। আস্তে আস্তে বেশী হারে যদি কৃষি আয়কর বাড়ানো যায় তাহলে রাজ্যগুলি যে বেশ কিছু পরিমাণ অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারবে তাতে সন্দেহ নেই।

চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী ভূমি রাজস্বই হল সব রকম করের মধ্যে প্রাচীনতম এবং কৃষি জমির ওপর তাই হ'ল সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কর। ১৯৫১-৫২ সালে রাজ্যগুলির বাজেটে আয়ের ক্ষেত্রে ভূমি রাজস্বেরই পরিমাণ ছিল শতকরা ১২ ভাগ। তার পর থেকে এই আয় ক্রমানুসে হ্রাস পেয়ে ১৯৬৮-৬৯ সালে রাজ্যগুলির বাজেটে তার পরিমাণ দাঁড়ায় শতকরা মাত্র ৪.২ ভাগ। বিহার এবং কেরালার মতো কয়েকটি রাজ্য সম্পূর্ণভাবে বা অংশতঃ ভূমি রাজস্ব বিলোপ করছে বলে এই সূত্র থেকে আয় আরও কমে যেতে পারে। কাজেই কৃষকদের যে জলকর দিতে হয় তা সংশোধন করার যথেষ্ট যুক্তি আছে। এই সম্পর্কে নিজলিঙ্গাপ্পা কমিটির সুপারিশগুলি বিশেষভাবে বিবেচনা ক'রে দেখার যোগ্য।

মোটামুটিভাবে দেখতে গেলে কৃষকরা প্রত্যক্ষভাবে যে কর দেন সেইটেই শুধু কৃষি কর নয়, তারা অপ্রত্যক্ষভাবে যে সব করের ভার বহন করেন সেগুলিও কৃষি করের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কৃষকদের ওপর অপ্রত্যক্ষ যে কর ভার রয়েছে সেগুলির মধ্যে ষ্ট্যাম্প এবং রেজিষ্ট্রেশনের ব্যয়টা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। আবগারি কর কেন্দ্রীয় সরকার আরোপ করেন এবং তাঁরাই সংগ্রহ করেন। রাজ্যগুলিও কতকগুলি আবগারি কর সংগ্রহ করেন। রাজ্যের অর্থভাণ্ডারে সাধারণ বিক্রয় কর একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে। আমদানী কর এবং মোটর গাড়ীর করও অপ্রত্যক্ষভাবে পল্লীর জনসাধারণকে খানিকটা বহন করতে হয়।

অনেকেই মনে করেন যে পল্লীবাসীরা তাঁদের সঞ্চয়ের বেশীর ভাগই উৎপাদনবিহীন সম্পদে পরিণত করেন। ব্যাঙ্কে খুব কম টাকাই রাখা হয়। উপযুক্ত ব্যবস্থাদির মাধ্যমে এই সঞ্চয়টা আকর্ষণ করার যথেষ্ট সুযোগ ব্যাঙ্কগুলির রয়েছে।

পল্লীঅঞ্চল থেকে সম্পদ সংগ্রহ করাটা অবশ্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ওপরেই নির্ভর করবে। কিছু সংখ্যক অর্থনীতিক অবশ্য বিশ্বাস করেন যে কৃষি উৎপাদন যে হারে বাড়ছে তাতে পল্লী অঞ্চলের সম্পদ সংগ্রহ করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। একথা অবশ্য সত্য যে বেশী ফলনের শস্যের চাষ বেড়ে যাওয়াতে উৎপাদন বেড়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষি জমির বেশীর ভাগই এখনও বর্ষার খামখেয়ালীর ওপর নির্ভরশীল। আধুনিক কৃষি সরঞ্জাম, সার, বীজ ইত্যাদি, কৃষকদের সরবরাহ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পল্লী অঞ্চল থেকে অবিলম্বে যথেষ্ট সম্পদ সংগ্রহ করা সম্ভব না হলেও, সরকারী সাহায্যে কিছু পরিমাণ ধনী কৃষক যে বিপুল আয় করছেন উপযুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে তার কিছুটা অংশ সংগ্রহ করা যেতে পারে।

চালকবিহীন ট্র্যাক্টার

যুক্তরাজ্য অর্থাৎ সাধারণের ভাষায় বিলেতের, ফার্ণবোরোর এটোট্রাক সীসটেম লিমিটেড বিশ্বের প্রথম চালকবিহীন ট্র্যাক্টর উদ্ভাবন করেছে।

এই ট্র্যাক্টর চালনার মূলে যে পদ্ধতি আছে তা হ'ল এই রকম। একটা সাধারণ ট্র্যাক্টারে একটি বিশেষ ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্র বসানো হয় যেটি ট্র্যাক্টরটিকে ঠিক পথে চালাবার জন্য চালক যন্ত্রটিকে নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশ আসে ভূগর্ভে প্রোথিত তারের একটি 'গ্রীড' থেকে। মাটির তলায় পাতা আর একটা তার, সংকেতে ট্র্যাক্টরের নানান যন্ত্রাংশ তোলা ও নামানোর নির্দেশ দেয়। এমন কি ট্র্যাক্টর ক্ষেতের সীমানায় পৌছুলে, তারের মাধ্যমে প্রেরিত সঙ্কেতে ট্র্যাক্টরটি থেমে যায়। তাই কোনোও ব্যক্তিগত তদারকি ব্যতিরেকেই ট্র্যাক্টরের কাজ পুরোপুরি হয়ে যায়।

★ ১৯৬৯-৭০ সালের মূলধনী বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তর দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশনকে এক কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। এই নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এ পর্যন্ত কর্পোরেশনকে মোট ৫৫·০৯ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন।

★ রপ্তানী বাড়ানো ও আমদানী কমানোর ফলে, এ বছরের শুরুতে ভারতের, সোনা নিয়ে মোট ৬০০ কোটি টাকার সমান বৈদেশিক মুদ্রা জমা রয়েছে। গত দশকের মধ্যে এই প্রথম বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারে এত অর্থ জমেছে। আন্তর্জ্জাতিক অর্থ তহবিল থেকে টাকা তোলার নতুন যে প্রকল্প ১লা জানুয়ারী থেকে চালু হয়েছে, সেই অনুযায়ী ভারত তার বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারে ৯৭·৫ কোটি টাকার সমান জমা দিয়েছে। এর শতকরা ৭৫ ভাগ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে ব্যয় করা যেতে পারে। বাকীটা তুলে নিলে সেটা ফেরৎ দিতে হবে জমার খাতায়।

পাঠক-পাঠিকা সমীপেষু—

ধনধান্যে-র উত্তরোত্তর উন্নতির জন্যে আপনাদের সক্রিয় সহযোগীতা অপরিহার্য্য। লেখা দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে ও বন্ধুমহলে ধনধান্যে-কে পরিচিত করিয়ে আমাদের উৎসাহিত করুন।

ইঞ্জিনীয়ারিং-এর টুকিটাকি

হাইড্রলিক প্রেস ব্রেক

আজকাল আমাদের দেশে ৫০০ মেট্রিক টন পর্য্যন্ত শক্তির হাইড্রলিক প্রেস ব্রেক বহু পরিমাণে তৈরি হচ্ছে। ভারতে প্লেট এবং বার ওয়ার্কিং মেসিনের প্রধান উৎপাদক স্কটিশ ইণ্ডিয়ান মেসিন টুলস্ লিঃ (সিম-টুলস্) এখন, ৫০০ মেট্রিক টন পর্য্যন্ত শক্তির এই ব্রেক সরবরাহ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এঁরাই সর্ব্বপ্রথম এই দেশে এই ধরণের ব্রেক উৎপাদন করেছেন।

সিমটুলস্ বিভিন্ন শক্তির মেকানিক্যাল ও হাইড্রলিক প্রেস ব্রেক তৈরি করেন। তাঁরা এই ধরণের প্রেস ব্রেকের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজ সরঞ্জামও উৎপাদন করেন।

মেসিনে যাতে বেশী লোড না হয়ে যায় তা প্রতিরোধ করার ব্যবস্থাও এই প্রেস ব্রেকে রয়েছে কাজেই কোথাও কোন ভুল হলেও এই প্রেস সেই ভুল সংশোধন করে নিতে পারে। সিলিণ্ডারের মধ্যে পজিটিভ ষ্টপ এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে, বটম্ ষ্ট্রোকেও যাতে বীম, ডেস্কের সমান্তরালে থাকে তা সুনিশ্চিত করে। বীম যখন নীচের দিকে নামে তখন বীমের সমান্তরাল অবস্থান সঠিক রাখার জন্যও একটা হাইড্রলিক ব্যবস্থা আছে।

এই ব্রেকগুলি খুব অল্প আয়াসে রক্ষনা-বেক্ষণ করা যায়, এগুলি নিরাপদ এবং চালাতেও কোন অসুবিধে নেই। সিম-টুলস নানা ধরণের মেসিন তৈরি করে, যেমন, মেকানিক্যাল এবং হাইড্রলিক গিলোটিন শিয়ার, প্লেট বেণ্ডিং রোলস্, পাঞ্চিং, ক্রপিং, শিয়ারিং এবং নচিংএর সংযুক্ত মেসিন ইত্যাদি।

টাটার ব্লুমিং মিলের জন্য

প্রথম ভারতীয় কণ্ট্রোল প্যানেল

সম্প্রতি ভূপালের হেভি ইলেকট্রি-ক্যালস (ইণ্ডিয়া) লিমিটেডে, টাটা আয়রন এ্যাণ্ড ষ্টিল কোম্পানীর ব্লুমিং মিলের জন্য অত্যন্ত উচ্চ শক্তির কন্ট্রোল প্যানেল তৈরি করা হয়েছে। এই যন্ত্রটিতে ৩.২ মীটার লম্বা এবং ২.৩ মীটার উঁচু একটি কন্ট্রোল প্যানেল আছে এবং দাঁড়িয়ে কাজ করার জন্য চালকের জন্য একটা ডেস্ক রয়েছে। এটি দিয়ে চারটি রোলার টেবল্ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

মোটর কক্ষটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বলে প্যানেলটি অনাবৃত রাখা হয়েছে। একটি ইস্পাতের কাঠামোর ভেতরের দিকটা, আর্দ্রতা উত্তাপ ইত্যাদি নিরোধক বেকে-লাইট দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কন্টাক্টার, রিলে, টাইমার, সুইচ, ফিউজ ইত্যাদি নানা ধরণের নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থাগুলি বসানো হয়েছে। নিরাপত্তা এবং কাজ করার সুবিধের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে এগুলি সাজানো হয়েছে। প্যানেলের পেছনের দিকে রাখা হয়েছে, রেসিস্টেন্স, তামার তারের সংযোজক এবং নিয়ন্ত্রণ করার তারসমূহ।

এতে যে সব ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক কন্টাক্টার ও রিলে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলির বেশীর ভাগই বর্ত্তমানে এই কারখানায় তৈরি হচ্ছে। কন্টাক্টারগুলি হল, একটি পোলের ডি. সির ৩০০ থেকে ৬০০ এ্যাম্পিয়ারের এবং সঠিক সংযোজনের জন্য এতে সাহায্যকারী কতগুলি সুইচও রয়েছে। কন্ট্যাক্ট সুইচের অংশগুলি বেশ শক্ত এবং ইস্পাত শিল্পের কাজ চালাবার মত টেঁকসই।

এই ক্লোজ্‌ড লুপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় একটি ক'রে মোটর জেনারেটার সেট রয়েছে এবং তা প্রতিটি টেবল্ ড্রাইভ মোটরকে শক্তি যোগায়। আমাদের ইঞ্জিনীয়াররা যে বিশেষ ধরণের স্বাবফার ডেস্ক তৈর করেছেন তার ওপরে মাষ্টার কন্ট্রোলারগুলি বসানো রয়েছে। প্রত্যেকটি মোটরের সম্মুখ ও পশ্চাৎগতি অত্যন্ত দ্রুত হারে বাড়ানো বা কমানো যায় (প্রায় তিন সেকেণ্ডে পূর্ণ সম্মুখ গতি থেকে পূর্ণ পশ্চাৎগতিতে আনা যায়)। প্রত্যেকটি সেটে ৪.২ কি. ওয়াটের রিভার্সিবল্-থাইট্রর এ্যাম্‌প্লিফায়ার দিয়ে এই উচ্চ গতি আনা সম্ভব হয়েছে।

★ ভারতের দ্বিতীয় বৃহৎ তৈলবাহী জাহাজটি (৮৮,০০০ D.W.T) যুগো-স্লাভিয়ার স্প্লিটে জলে ভাসানো হয়েছে। স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর নামে চিহ্নিত এই জাহাজটিতে ক'রে অশোধিত তেল পাঠানো হবে শোধনাগারগুলিতে। জাহাজটি পুরোপুরি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এবং সর্ব্বাধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত। তৈলবাহী জাহাজটিতে ৫,০০০ টন তেল ভরা যাবে এবং খালাস করা যাবে ৩,৫০০ টন।

★ রাজস্থানের সিরোহী ও জালোরে ত্রাণ-ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে ২০.৮২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যে চারটি সেতু তৈরী হবে সেগুলির শিলান্যাস সম্পন্ন হয়ে গেছে।

★ জম্মুর আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্রে, জম্মু ও কাশ্মীরে সংরক্ষণের জন্যে ফল টিনে ভর্ত্তি করার সুলভ অথচ ভালো পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

REGD. NO. D-233

উন্নয়ন বার্ত্তা

★ উত্তর প্রদেশের দোবালাতে বীজ ঝাড়াই ও সাফ প্রভৃতি করার একটি যন্ত্র চালু করা হয়েছে। বছরে ১০,০০০ কুইন্টাল বীজ ধোয়া, শুকোনো বাছাই, ও দানা হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ ক'রে বস্তাবন্দী করার সমস্ত কাজ ভালভাবে করা যায় এই যন্ত্রের সাহায্যে। এর দ্বারা উত্তর প্রদেশের সমগ্র পশ্চিমাঞ্চলের বীজের চাহিদা মেটানো সম্ভব।

★ ১৯৭০ সালে ৪০ কোটি টাকার পরিবর্ত্তে ৫০ কোটি টাকার ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পর্কে ভারত ও যুগোস্লাভিয়ার মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছে। এবার ভারত চিরাচরিত পণ্য ছাড়াও জীপ, বাস, লরী প্রভৃতি, রেলের ওয়্যাগন, টায়ার-টিউব, ওষুধ তৈরির উপাদান ও উপকরণ ইত্যাদি রপ্তানী করবে। ভারত যুগোস্লাভিয়া থেকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে মেশিনে দেওয়ার তেল (লুব্রিকান্ট) আমদানী করবে।

★ মাইসোর আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল ওয়ার্ক্‌স্ এর 'বার' ও 'রড' তৈরীর বিভাগটি চালু হয়েছে। ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত এই বিভাগে সর্ব্বোচ্চ ৭৭,০০০ টন মিশ্র ও বিশেষ ধরণের ইস্পাত ব্যবহৃত হ'তে পারে। এই বিভাগটিকে বিশ্বের সর্ব্বাধুনিক রোলিং মিলের সমকক্ষ ব'লে দাবী জানানো হয়।

★ উত্তর প্রদেশের বাদাউন জেলার দেহামুতে বনস্পতি সমষ্টি শিল্প স্থাপন করা হয়েছে। উত্তর প্রদেশ সমবায় সঙ্ঘ ২·৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে এটি স্থাপন করেছে। এ মাসেই উৎপাদনের কাজ শুরু হবার কথা। সমবায় ক্ষেত্রে স্থাপিত এই শিল্পটির দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ধরা হয়েছে ২৫ টন। আশা করা যাচ্ছে, যে, তৈলমুক্ত খইল রপ্তানী ক'রে আমরা এক কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন করতে পারব।

★ হৃষিকেশের সরকারী অ্যান্টিবায়োটিক কারখানায় ১৯৬৯ সালে ৬টি ওষুধের উৎপাদন রেকর্ড মাত্রায় পৌঁচেছে।

★ চিত্তরঞ্জনের রিসার্চ ডিজাইন এ্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ডস্ অর্গ্যানাইজেশান্ ইঞ্জিন ও অন্যান্য চালক যন্ত্রের গতি নিরূপণ করার উপযোগী এক বিশেষ ধরণের কাগজ তৈরির প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছে। এপর্য্যন্ত দেশে এই জিনিষটি উৎপাদন করা হয়নি ব'লে এই কাগজ কেনার জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হত।

★ কানপুরে ডিফেন্স রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে (মেটিরিয়াল) মানুষের চুল থেকে পশম তৈরীর একটি প্রক্রিয়া আবিস্কৃত হয়েছে। প্রক্রিয়াটি সরল। গবেষণার জন্যে ল্যাবরেটরীতে ৮ ঘন্টার শিফ্‌ট্-এ এক কে. জি. পর্য্যন্ত পশম তৈরী করা যায়। দৈনিক ১০০ কে. জি. পশম তৈরী করার মূলধনী ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে ২৭ লক্ষ টাকার মত।

★ নেপালের সঙ্গে এক চুক্তি অনুযায়ী ভারত নেপালকে তিন বছর (চলতি বছর নিয়ে) ৫৫,০০০ টন ক'রে নুন যোগাবে।

★ ভিলাই ইস্পাত কারখানায় ১৯৬৯ সালে, কোক্, ইনগট্ বোল ও বিলেট প্রভৃতি উৎপাদনের মাত্রা আগের সমস্ত মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

★ হায়দ্রাবাদের আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্রে ধূসর ব্যারাইট্ থেকে ধবধবে সাদা ব্যারাইট তৈরী করার একটা প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়েছে।

★ লুধিয়ানার কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে চীনেবাদামের গাছ উপড়ে ঝেড়ে তোলার একটা যন্ত্র তৈরী করা হয়েছে। এটি ট্র্যাক্টরের সঙ্গে জোড়া যায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে দিনে ৬—৮ একর পরিমিত জমির ফসল তোলা যায় এবং তার জন্য খরচ পড়ে একর প্রতি ১৮ টাকা। যন্ত্রটি তৈরী করতে খরচ পড়ে আন্দাজ ২,০০০ টাকা।

ধনধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রক কর্ত্তৃক প্রকাশিত হ'লেও 'ধনধান্যে' শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই ব্যক্ত করে না। পরিকল্পনার বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী ক্ষেত্রে উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতটা অগ্রগতি হচ্ছে- তার খবর দেওয়াই হ'ল 'ধনধান্যে'র লক্ষ্য।

'ধনধান্যে' প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে প্রকাশিত হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত, তাঁদের নিজস্ব।

নিয়মাবলী

দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়।

অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পুনঃ প্রকাশকালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার করা হয়।

রচনা মনোনয়নের জন্যে আনুমানিক দেড় মাস সময়ের প্রয়োজন হয়।

মনোনীত রচনা সম্পাদক মণ্ডলীর অনুমোদনক্রমে প্রকাশ করা হয়।

তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয়। কোনোও রচনার প্রাপ্তি-স্বীকৃতি, পত্র মারফৎ জানানো হয় না।

নাম ঠিকানা লেখা, ডাকটিকিট লাগানো, খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

কোনো রচনা তিন মাসের বেশী রাখা হয়না।

শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাবেন।

গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেস ম্যানেজার, পাব্লিকেশন্স্ ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী-১ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

"ধনধান্যে" পড়ুন
দেশকে জানুন

ডিরেক্টর, পাব্লিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ—করোলবাগ দিল্লী-৫ দ্বারা মুদ্রিত।

ধন

প্রথম বর্ষ ঃ ১৮
২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০

ধনধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

প্রথম বর্ষ অষ্টাদশ সংখ্যা

৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ : ১৯শে মাঘ ১৮৯১

Vol. 1 : No 18 : February 8, 1970

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০

টেলিগ্রাফের ঠিকানা : যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

ভুলি নাই

নিজেদের বিশ্বাসে অটল থাকা নিজেদের হাতে, কিন্তু তা বলে পরের বিশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করার কোন অধিকার আমাদের নেই

—রবীন্দ্রনাথ

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়

ভারত সোভিয়েট সহযোগিতা

ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে স্বাক্ষরিত প্রথম অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্পর্কিত চুক্তিটির পঞ্চদশ বার্ষিকী গত সপ্তাহে পালিত হয়। যে কোন জাতির ইতিহাসে ১৫ বছর সময় বিশেষ কিছুই নয় কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই এই দুটি দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও কারিগরী সহযোগিতা ক্রমশঃ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে। এই সম্পর্ক অন্যান্য ক্ষেত্রেও দুটি দেশের বিস্তার করেছে এবং বিশ্ব শান্তি ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার উন্নতি সাধনে দুটি দেশের প্রচেষ্টায় বিশেষ অবদান জুগিয়েছে।

স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকেই আমরা ভারতে দারিদ্র্য নির্মূল করা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জ্জন করার উদ্দেশ্যে, পরিকল্পিত উন্নয়নের পথ অনুসরণ ক'রে চলেছি। এর লক্ষ্য হ'ল সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থা স্থাপন, যেখানে দীনতম ব্যক্তিও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভাবতে পারবেন। এই লক্ষ্য পূরণ করতে হলে দেশকে নিজের জনবল ও সম্পদের ওপরেই নির্ভর করতে হয়। কিন্তু যে দেশ অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে চায়, তাকে সাহায্যের জন্য বিশ্বের উন্নততর দেশগুলির মুখাপেক্ষী হতে হয়। আমাদের সৌভাগ্য যে পুনর্গঠনের এই বিপুল অভিযানে আমরা বিভিন্ন দেশ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। ভারতের যদিও প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তির অভাব নেই, তবুও এই দেশ, কারিগরী জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক-সর্ত্ত বিহীন সাহায্যকে স্বাগত জানিয়েছে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতবাদ এমন কি পরস্পর-বিরোধী আদর্শবাদসম্পন্ন দেশগুলিও, সাম্প্রতিককালে ভারতের নিরপেক্ষ নীতিতে আকৃষ্ট হয়ে বন্ধুর মতো এই দেশকে সাহায্য করার জন্য যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রয়োজনের সময় যে সব দেশ বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করেছে সেগুলির মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন হল অন্যতম। এই সাহায্যের পেছনেও কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। দুটি দেশই তাদের বন্ধুত্বের জন্য গর্ব্ব অনুভব করে এবং পুনরাবৃত্তির মতো মনে হলেও এই বন্ধুত্ব কোন শক্তি গোষ্ঠির বিরোধী নয়। এটার ভিত্তি প্রকৃতপক্ষে স্থায়ী বন্ধুত্বের নীতির ওপরেই প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের পক্ষে ভারত-সোভিয়েট সহযোগিতা সব সময়েই ফলপ্রসূ হয়েছে। আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ক'রে ইস্পাত, তৈল অনুসন্ধান, ভারি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি, ওষুধপত্র এবং কৃষির ক্ষেত্রে এই বন্ধুত্ব যথেষ্ট অবদান জুগিয়েছে এবং ভারী শিল্পের ভিত্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। ভিলাই ইস্পাত কারখানা, রাঁচির ভারি মেসিন তৈরীর কারখানা, হরিদ্বারের ভারী বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম তৈরির কারখানা এবং হৃষিকেশের এ্যান্টিবায়োটিক তৈরীর কারখানা হল সোভিয়েট ইউনিয়নের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত প্রায় ৬০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের অন্যতম।

ভারতে যে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিশেষজ্ঞদের একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে তা হল ভারত-সোভিয়েট সহযোগিতার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের যে ব্যবসা-সম্পর্ক গড়ে উঠছে সেখানে ভারত একটা প্রধান স্থান অধিকার ক'রে আছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন বর্ত্তমানে ভারতীয় দ্রব্যাদির প্রধান আমদানিকারক। আগামী বছর থেকে পাঁচ বছরের জন্য একটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন সম্পর্কে যে আলোচনা চলেছে তার প্রথম বৈঠকেই দুটি দেশ বার্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ শতকরা ৭ ভাগ বাড়াতে স্বীকৃত হয়েছে। ভারত তার চিরাচরিত ও অন্যান্য সামগ্রী রপ্তানীর পরিমাণ বাড়াবে। তাছাড়া সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে ভারতে যে সব জিনিস রপ্তানী করা হয় তাতেও বৈচিত্র্য আনা হবে।

ভারতের অর্থনীতি বছরের পর বছর ধরে নানা সমস্যার জন্য বিড়ম্বিত হ'লেও বর্ত্তমানে তা আস্তে আস্তে উন্নতি লাভ করছে। এখন চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রারম্ভে দেশের অর্থনীতির ভিত্তি দৃঢ়তর হয়েছে। পরিকল্পনাকে সফল ক'রে তোলার জন্য যে জনগণ আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছেন তাঁরাই এর জন্য প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। ভবিষ্যতেও জনগণের কাছ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ সাহায্য পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায় কারণ এই সহযোগিতা যদি না থাকে তাহলে, বিশ্বের বৃহত্তম শক্তিও যদি সর্ব্বতোভাবে আমাদের সাহায্য করতে আসে তাহলেও বাঞ্ছিত উন্নয়ন সম্ভব হবে না। নানা দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ এই বিশ্বে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা কাম্য হলেও দেশের জনসাধারণই প্রকৃতপক্ষে নিজেদের ভবিষ্যত গড়ে তুলতে পারেন, বাইরের কেউ নয়।

পরিকল্পনা ও সমীক্ষা

বোটাডের কৃষিশ্রমিক

'সবুজ বিপ্লব' বা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি অভিযানের অন্যতম নেতা হলেন কৃষি শ্রমিক। এই অভিযান অব্যাহত রাখার জন্য কৃষি শ্রমিকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি অত্যাবশ্যক। কৃষক গোষ্ঠীর মধ্যে এই একটি শ্রেণী, যাঁদের জীবন ধারণের মান উন্নত করার দিকে তেমনভাবে মনোনিবেশ করা হয়নি। শিল্প শ্রমিকদের মজুরীর ন্যূনতম হার নির্দিষ্ট ক'রে দিয়ে আইন তৈরি হয়েছে বটে, কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে তাঁদের সমগোত্রীয়দের জন্য তার কিছুই করা হয়নি। এ বিষয়ে গভীরভাবে তেমন কোনো অনুসন্ধানও চালানো হয়নি। যাই হোক, কে. বি. আর্টস এ্যাণ্ড কমার্স কলেজের প্ল্যানিং ফোরাম, গুজরাটের বোটাড তালুকের, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে সমীক্ষা চালান। বিগত আঠারো বছরে, পরিকল্পনার আওতায় এবং ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার ফলশ্রুতি হিসেবে এই গোষ্ঠি অর্থনৈতিক দিক থেকে কতটা উপকৃত হয়েছেন এবং তাঁদের সামাজিক জীবন কতটা প্রভাবিত হয়েছে তা নিরূপণ করাই ছিল ঐ সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

১৯৬১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী তালুকে কৃষিশ্রমিক গোষ্ঠীর জনসংখ্যা ছিল ৫,৫৯৪ যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ২,৮৩২ ও স্ত্রীলোকের ২,৭৬২। কৃষি শ্রমিক পরিবারের মধ্যে শতকরা ৭২টি পরিবার সম্পূর্ণভাবে ক্ষেত খামারের কাজেই ব্যাপৃত থাকেন; ঐ তাঁদের জীবিকা। শতকরা ১৮টি পরিবারের ২।১ একর জমি থাকলেও খরার সময়ে তাঁদের অন্যের জমিতে কাজ করতে হয়। অবশিষ্ট ১০টি পরিবার আশপাশের গ্রামে বা শহরে ভালো মজুরীর ভরসায় কাজ করেন। এঁদের শতকরা ৯০ জন নিরক্ষর। অক্ষর পরিচয় সম্পন্নদের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত পড়েছেন, এমন লোকের সংখ্যা (স্ত্রী পুরুষ মিলিয়ে) ২৭৩ এবং 'সাক্ষরের' সংখ্যা (স্ত্রী পুরুষ মিলিয়ে) ৪২৩।

কৃষি শ্রমিকদের শতকরা ৯৫ জন নিজেদের তৈরি মাটির ঘরেতে থাকেন, বাকী ভাড়া করা বাড়ীতে। প্রায় সব কটি পরিবারই আয়ের শতকরা ৭০ ভাগ ব্যয় করেন খাওয়ার জন্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও এঁরা অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্যহীনতায় ক্ষীণ এবং প্রায়ই সংক্রামক ব্যাধিতে ভোগেন।

১৯৫১ সাল থেকে এঁদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলে মনে হয়। অংশত: ভূমিসংস্কার এবং অংশত: চাষবাসের চিরাচরিত রীতির রদবদলের ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। এই তালুকে পণ্যশস্যের চাষ প্রবর্তনের পর থেকে তুলো ও চীনা বাদামের উৎপাদন শতকরা সাড়ে চার ভাগের মত বেড়েছে। এই উন্নতির পর ক্ষেত খামারে কাজ করার জন্য নগদ টাকায় মজুরীর দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হয়। ইতিপূর্বে মজুরীর অর্ধেক দেওয়া হ'ত শস্য দিয়ে।

১৯৫১ সালের আগে কৃষিশ্রমিকদের অর্ধেক দিনের মজুরী দেওয়া হত৩৫ পয়সা হারে এবং তাঁদের কাজের মেয়াদ হ'ত চার ঘন্টার মত। তারপর এই হার বেড়ে গেছে। অবশ্য অঞ্চল বিশেষে, মজুরীর হারে তারতম্য আছে। যেমন পালিয়াদ হ'ল একটা জায়গা যেটা আধা শহর আধা গ্রাম। সেখানে কৃষি শ্রমিকদের মজুরীর হার পুরুষের ক্ষেত্রে দৈনিক ২ টাকা, স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে ১ টাকা ৫০ পয়সা এবং বালকবালিকার ক্ষেত্রে এক ১ টাকা ক'রে। আবার রোহিশালা গ্রামে পুরুষের মজুরীর হার দিনে ১ টাকা ৫০ পয়সা, স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে ১ টাকা ২৫ পয়সা এবং বালকবালিকার ক্ষেত্রে ৭৫ পয়সা।

বোটাডের শহর এলাকায় মজুরীর হার অপেক্ষাকৃত বেশী। সেখানে পুরুষ-স্ত্রী ও বালক-বালিকার মজুরীর হার হ'ল যথাক্রমে ২ টাকা ৫০ পয়সা, ১ টাকা ৫০ পয়সা ও ৭৫ পয়সা। এ ছাড়া মরসুম অনুসারে মজুরীর হার বদলায়।

ঐ শহরের আশেপাশে গ্রামাঞ্চলগুলিতে সময় বিশেষে শ্রমিকদের অভাব প্রকট হয়ে ওঠে। গ্রীষ্মকালে শ্রমিকদের কাজ থাকে না বলে শ্রমিক পরিবারগুলি জুনাগড তালুকে চলে যায় বেশী মজুরীর আশায়। পালিয়াদ, তুর্ধা ও সাম্বালির মত গ্রামগুলিতে ফসল কাটার মরসুমে কৃষি শ্রমিকদের চাহিদা অনেক বেড়ে যায়।

বর্মায় টায়ার রপ্তানী

ডানলপ ইণ্ডিয়া লিমিটেড বর্মায় টায়ার রপ্তানী করা সম্পর্কে সম্প্রতি যে অর্ডার পেয়েছে, ভারতের কোন টায়ার কোম্পানি কোনদিন এত বড় অর্ডার পায়নি। বর্মা ইউনিয়ন সরকার ৭০ লক্ষ টাকারও বেশী মূল্যের, ট্রাকের টায়ার ও টিউবের অর্ডার দিয়েছেন। তীব্র আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে, কোম্পানি এই অর্ডার সংগ্রহ করেছেন।

১৯৬৮ সালে এই কোম্পানির রপ্তানীর পরিমাণ ২.৫১ কোটি টাকারও বেশী ছিল। ভারতের আর কোন টায়ার কোম্পানি এত টাকার টায়ার রপ্তানী করতে পারেনি। ডানলপ কোম্পানি বর্তমানে ৭০টিরও বেশী দেশে টায়ার টিউব রপ্তানী করে। এই বছরে কোম্পানির তালিকায় নতুন ১২টি দেশ যুক্ত হয়েছে। সেগুলি হল অষ্ট্রিয়া, জর্ডান, আইসল্যাণ্ড, সোমালি রিপাব্লিক, উগাণ্ডা, কিউবা, মালোয়াই, প্যারাগুয়ে, কোষ্টারিকা, নিকারাগুয়া, দুবাই এবং ডেনমার্ক। যে সব জিনিস রপ্তানী করা হয় তা হল: ট্রাকের টায়ার, সাইকেল ও বিমানের টায়ার, মোটরগাড়ীর ও ট্র্যাক্টারের টায়ার, মাটি কাটার ট্রাকের টায়ার, ব্যারো টায়ার, রাবার সলিউসন ও এ্যাডহেসিভ, ট্রান্সমিশন বেলটিং, ব্রেডেড হোজ, ফ্যান ও ভী-বেল্ট, সাইকেলের রিম, শক এ্যাব্‌সরবার এবং মোটরগাড়ীর চাকা।

পরিকল্পনা রূপায়ণে বেসরকারী তরফের ভূমিকা

জে. আর. ডি. টাটা

আমরা এখন উন্নয়নের দ্বিতীয় দশকের সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁচেছি। বর্ত্তমানে ভারতের সরকারী ও বেসরকারী তরফের শিল্পগুলি এক বিপুল কর্ত্তব্যের সম্মুখীন হয়েছে। তবে বেসরকারী তরফের ওপর যদি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরও কঠোর করা হয় তাহলে তার পক্ষে এই বিপুল কর্ত্তব্যভার বহন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

চতুর্থ পরিকল্পনায়, বাৎসরিক শতকরা ৬ ভাগ আর্থিক উন্নয়নের যে লক্ষ্য রাখা হয়েছে তা পূরণ করতে হলে এই দশকের শেষপর্যন্ত আমাদের জাতীয় আয় ২৭,০০০ কোটি থেকে ৫৮,০০০ কোটি করতে হবে। আমাদের জনসংখ্যার সম্ভাব্য বৃদ্ধির হিসেব অনুযায়ী আমাদের জনপ্রতি বার্ষিক আয় শতকরা প্রায় ৪.৩ ভাগ বাড়া উচিত (পূর্ব্বের দশ বছরে এই হার ছিল শতকরা ২ ভাগেরও কম) এবং এই দশকের শেষে জনপ্রতি বার্ষিক আয় ৮৪৪ টাকা হওয়া উচিত। বর্ত্তমান মূল্যমান অনুযায়ী এই সংখ্যাগুলি হিসেব করা হয়েছে। এই সবের অর্থ হ'ল, পূর্ব্বের দশ বছরের তুলনায় এই দশকে, দ্বিগুণ হারে আর্থিক উন্নয়ন করতে হবে।

আর্থিক ক্ষেত্রে শিল্পগুলিকে কতখানি চেষ্টা করতে হবে তা এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ থেকে খানিকটা আন্দাজ করা যায়। শিল্পক্ষেত্রে ১২,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে বলে আশা করা হয়েছে। এর মধ্যে বেসরকারী তরফের অংশ হল প্রায় ৫,০০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ বর্ত্তমানের মূলধন বিনিয়োগের তুলনায় ৪ গুণ বেশী মূলধন বিনিয়োগ করতে হবে।

অতীতের কর্ম্মপ্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে, অনেকে মনে করতে পারেন যে এটা একটা স্বপ্নই থেকে যাবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা এমন একটা অসম্ভব কাজ নয় যা পূরণ করা সাধ্যের বাইরে।

নানা রকম সমস্যা ও অসুবিধে থাকলেও এই লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব, তবে যুদ্ধকালীন সর্ব্বাঙ্গীন প্রচেষ্টার মতো সরকার, সরকারী ও বেসরকারী তরফের শিল্প, দেশের প্রত্যেকটি সংস্থা এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে সামান্যতম ভূমিকা নিতে পারেন এই রকম প্রত্যেকটি ব্যক্তির ঐক্যবদ্ধ সহযোগিতার ভিত্তিতেই শুধু এই কর্ত্তব্য পালন করা সম্ভব। বেশীর ভাগ অশিক্ষিত লক্ষ লক্ষ কৃষক প্রথম কয়েক বছরে যে চমৎকার কাজ দেখিয়েছেন তাতে বোঝা যায় দেশে উন্নয়নের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সমগ্র বিশ্বের শুভেচ্ছা নিয়েও এবং যে পরিমাণ অর্থ, সম্পদ, জনশক্তি ও দৃঢ় ইচ্ছাই আমরা সংহত করতে পারিনা কেন, গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনশীল ক্ষেত্রগুলিকে উৎসাহ দেওয়ার পরিবর্ত্তে যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হতে থাকে এবং লালফিতার জটিল পাকের বাধা দূর করা না হয় তাহলে এই রকম বিপুল একটা কর্ম্মসূচী কিছুতেই সফল হতে পারবেনা। সোজা কথায় বলতে গেলে বর্ত্তমানের নিয়ন্ত্রণ, পর্য্যবেক্ষণ, নিষেধবিধি ইত্যাদির বন্ধনে যদি বেসরকারী তরফকে প্রায় অচল ক'রে রাখা হয় তাহলে, চতুর্থ পরিকল্পনায় দেশের শিল্পোন্নয়নের শতকরা ৪০ ভাগের যে ভার বেসরকারী তরফকে দেওয়া হয়েছে তা বহন করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের অত্যন্ত দুঃখজনক একটা বিষয় হ'ল এই যে, দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী, শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে মিশ্র অর্থনীতি গ্রহণ করা হলেও, আমাদের শাসন কর্ত্তাগণ এবং আইন পরিষদের সদস্যগণ বছরের পর বছর ধরে, শিল্পের দুটি বাহুর মধ্যে একটির সহজ কর্ম্মধারায় বাধা সৃষ্টি করার জন্য, সমাজতন্ত্রের নামে নানা রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। বেসরকারী তরফ বর্ত্তমানে উন্নয়ন ও অভিজ্ঞতার এমন একটা পর্য্যায় এসে গেছে যে তারা দেশের অধিকতর আর্থিক উন্নয়নে বিপুল অবদান যোগাতে পারে। ভারতের ছোট বড় শিল্প উদ্যোক্তাদের বেশীর ভাগই স্বদেশভক্ত, সমাজ সচেতন, তাঁরা বিশেষ কোন অনুগ্রহ বা বেশী লাভ চাননা অথবা একচেটিয়া অধিকার বা সম্পদ ও ক্ষমতা করতলগত করতে চাননা। তাঁরা শুধু, দেশের এবং তাঁদের অংশীদার, শ্রমিক ও গ্রাহকদের উপকারের জন্য নিজেদের উৎসাহ ও বুদ্ধি স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করার সুবিধে চান এবং তাঁরা চান তাঁদের কাজ শেষ করার ভার তাঁদের ওপরেই থাকুক।

তাছাড়া বেসরকারী তরফ, বিশেষ ক'রে, বড় ধরণের শিল্পগুলি সম্পর্কে এমন একটা অবিশ্বাসের ভাব রয়েছে যা ষষ্ঠ দশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ বাধার সৃষ্টি করে এবং বর্ত্তমানে তা বেসরকারী তরফের চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য পূরণ করা প্রায় অসম্ভব ক'রে তুলতে পারে।

যাই হোক, আগামী দশকে আমাদের বেসরকারী তরফকে যদি যুক্তিসঙ্গত ভূমিকা গ্রহণ করতে হয় তাহলে আমি পরিষ্কারভাবেই বলতে চাই যে, বর্ত্তমানের তুলনায় আমাদের কাজে যদি আরও বেশী স্বাধীনতা, সুযোগ সুবিধে দেওয়া হয় তাহলে আমরা যে সেগুলির যোগ্য, তা আমাদের সরকারের কাছে, সংসদ ও জনসাধারণের

কাছে প্রমাণ করতে হবে। তাছাড়া আমরা যে বিশ্বাস ও সমর্থনের যোগ্য, অতীতে তা আমরা কেন পাইনি তারও কারণ অনুসন্ধান করতে হবে।

বেসরকারী তরফ সম্পর্কে এই সন্দেহ ও বিরূপতার প্রধান কারণগুলি কি? যাঁরা মনে করেন যে বেসরকারী শিল্পগুলি বিলোপ করাই তাঁদের আদর্শ, তাঁদের বিরোধিতা অবশ্য থাকবেই। তাছাড়া ভারতীয় সমাজতন্ত্রীরা মনে করেন যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করাই যেখানে লক্ষ্য, সেখানে বেসরকারী তরফ থাকতে পারেনা, তার ওপর তাঁদের মতে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ ঐ সব লক্ষ্যে বিশ্বাসী নন অথবা প্রয়োজনীয় ত্যাগ স্বীকার করতে চাননা।

এইসব ধারণা অযৌক্তিক। কারণ বর্ত্তমানে বিভিন্ন দেশে যে সমাজতন্ত্র রয়েছে সেখানে উৎপাদনের উপায়গুলি এবং বন্টন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে আসার জন্য আদর্শগত কোন পীড়াপীড়ি নেই। তার পরিবর্ত্তে বরং সরকারী, বেসরকারী এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে উচ্চতম উৎপাদন এবং উচ্চ কর এবং ব্যাপক সমাজ কল্যাণ ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে সুষম বন্টনের ওপরেই বেশী জোর দেওয়া হয়। ভারতের বেসরকারী শিল্পের মুখপাত্রগণ বার বার সন্দেহাতীতভাবে জানিয়েছেন যে সমাজ কল্যাণ সম্পর্কিত প্রগতিশীল ব্যবস্থাগুলি সম্বন্ধে তাঁরা একমত।

অনেকে আবার মনে করেন যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির লক্ষ্য লাভের দিকে থাকে বলে শ্রমিকরা শোষিত হন এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে ব্যবহারকারীদের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়। আমরা সকলেই জানি যে এটা সত্যি নয়। উন্নয়নের জন্য অর্থ আকর্ষণ করার এবং দক্ষতা ও কর্ম্মকুশলতা বাড়ানোর অন্যতম ব্যবস্থা হিসেবে সরকারি ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই লাভের একটা অতি প্রয়োজনীয় ভূমিকা রয়েছে। তবে, বেসরকারী তরফের একমাত্র লক্ষ্যই হ'ল লাভ, এই ধরণের যে একটা সাধারণ মনোভাব আছে, তারও হয়তো একটা ভিত্তি আছে। তবে এ কথাটা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে বেসরকারী তরফের বেশীরভাগ ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান, নিজেদের জিনিস উৎপাদন ও বিক্রী করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব ও লক্ষ্য ছাড়া অন্য কোন কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব আছে বলে মনে করেনা। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই মনে করেন যে তারা যদি ভালো জিনিস তৈরি ক'রে উপযুক্ত মূল্যে তা বিক্রী করতে পারেন, প্রাপ্য কর এবং ভালো পারিশ্রমিক দিয়ে দেন, তাহলেই সমাজের প্রতি তাঁদের কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ হয়ে গেল।

আর্থিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়বে এই ভয়ে বড় ব্যবসারও বিরোধিতা করা হয়। বর্ত্তমানে এটা ভারতের অন্যতম প্রিয় শ্লোগান হলেও অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে, সমস্ত আর্থিক ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত। অতীতে আমাদের দেশের কিছু কিছু শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীর নীতি জ্ঞান, যতখানি উচ্চ হওয়া উচিত ততখানি ছিলনা, ফলে তাঁরাই বেসরকারী তরফ সম্পর্কে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি করেছেন। গত ২৫ বছরে কতকগুলি বড় বড় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তিরা আরও সম্পদশালী এবং আরও লাভ করার উদ্দেশ্যে যে সব কাজ ক'রে গেছেন তাতেই বেসরকারী তরফের ভীষণ ক্ষতি ক'রে গেছেন। এইসব সমাজবিরোধী ব্যক্তিরা কর ফাঁকি, কালো বাজারী, বেআইনী বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়, ঘুষ, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তিগত লাভ করতে চেয়েছেন।

নানা কারণে দেশে এই সব অসামাজিক কাজ হচ্ছে। আমাদের দেশের ব্যাপক দারিদ্র্য, চিরকালীন ঘাটতি, ভবিষ্যত অনিশ্চয়তা এবং আত্মরক্ষার অতিরিক্ত উদ্যম এগুলি সবই, যে কোন উপায়ে অন্যের ক্ষতি করেও সম্পদ ও নিরাপত্তা অর্জনের জন্য যে, কিছু লোককে যে কোন সুযোগ গ্রহণে উৎসাহিত করে তাতে সন্দেহ নেই। তবে এটাও সত্যি যে এই স্বার্থপরতা, লোভ, আত্মসর্ব্বস্বতা একমাত্র প্রকৃত শিক্ষা ও শাস্তির ভয়েই দমিত হ'তে পারে। অন্যের ক্ষতি হতে পারে এই বিবেচনা বা সত্যিকারের সদবুদ্ধি এগুলিকে খুব কম ক্ষেত্রেই দমন করতে পারে।

সরকারের আর্থিক নীতিও এই দুঃখজনক ব্যাপারের জন্য খানিকটা দায়ী। আমাদের দেশে জীবতকালের ব্যক্তিগত কর এবং মৃত্যুর পর মৃত্যুকর এতো কঠোর যে, অসাধুতার জন্যই পুরস্কৃত হওয়া যায় এবং সাধুতার জন্য শাস্তি পেতে হয়। যাঁরা কর ফাঁকি দিচ্ছেন তাঁদের ধরা সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থাগুলি যথেষ্ট নয়। তাছাড়া কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা না থাকায়, কর ফাঁকি দেওয়াকেই উৎসাহিত করা হচ্ছে।

সরকারের নিয়ন্ত্রণমূলক অর্থনীতিই অনেক ক্ষেত্রে আমাদের দেশে মজুতদারী ও কালোবাজারীর ক্ষেত্র তৈরি করছে। অন্যদিকে টাকার মূল্যহ্রাস, বিশ্বাসের অভাব এবং সর্ব্বগ্রাসী কর আইনগুলি, বেআইনীভাবে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করে বিদেশে মূলধন পাচারে উৎসাহিত করছে।

যাঁরা আন্তরিকভাবে সমাজের সেবা করছেন এবং যাঁরা সমাজকে শোষণ করছেন, সরকার এবং রাজনৈতিক নেতাগণ এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য মেনে নিতে অস্বীকৃত হয়ে তাঁরাই বরং আমাদের কাজকে আরও কঠিন করে তুলছেন। এর ফলে যাঁদের বদনাম আছে এমন লোক বছরের পর ধ'রে, জাতীয় সম্মেলনে এবং সরকার নিয়োজিত পরিষদগুলিতে স্থান পাচ্ছেন। আমরাও তাঁদের আমাদের সমাজে স্থান দিচ্ছি এবং ব্যবসা ও শিল্পের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার দিচ্ছি। আমি মনে করি যে আমাদের মধ্যে যাঁরা নিষ্কলঙ্ক, সৎ ও সমাজকল্যাণকামী তাঁদের প্রত্যেকের যে কোন সুযোগে এই সৎপ্রবৃত্তিগুলির প্রমাণ দেওয়া উচিত এবং অসামাজিক ব্যক্তিদের সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত।

শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম্মের ক্ষেত্র ছাড়াও নানা উপায়ে জনকল্যাণমূলক কাজে অবদান যোগাতে পারেন। প্রত্যেক ছোট, বড়, সহর, নগর ও গ্রামে, সবসময়েই উন্নয়নের প্রয়োজন থাকে, সাহায্য, নেতৃত্ব ও পরিচালনার প্রয়োজন থাকে।

১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

পরিকল্পনা কি সমাজতন্ত্রের পথে ?

প্রতিমা ঘোষ

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই হ'ল আমাদের পরিকল্পনাগুলির লক্ষ্য। নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম ক'রে আমরা এই পথে অগ্রসর হতে চেষ্টা করছি। ভবিষ্যতের ভারত কি ভাবে গড়ে উঠবে তার চিহ্ন আজ সর্ব্বক্ষেত্রে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে।

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দুটি। প্রথমটি হ'ল, জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। তার জন্য প্রয়োজন কৃষি, শিল্প ও পরিবহণ প্রভৃতি সামাজিক মূলধনের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় আয়বৃদ্ধি, দ্বিতীয়তঃ পরিকল্পনার মাধ্যমে আর্থিক সমতা প্রতিষ্ঠা। শুধুমাত্র জাতীয় আয়বৃদ্ধি ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়, পরিকল্পনার ফলে যাতে সমাজের প্রত্যেক স্তরের লোক লাভবান হয় সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

বৃহত্তর পটভূমিতে বিচার করলে উন্নত দেশগুলি ও উন্নতিকামী অনগ্রসর দেশগুলির মধ্যে একটা বড় যে তফাৎ চোখে পড়বে—সেটা হচ্ছে, উন্নত দেশগুলিতে শিল্প-বিপ্লব এসে গেছে এক শতাব্দী কি দু' শতাব্দী আগে। বৃটেনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুরু হয়েছে ১৭৬০ সাল থেকে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শিল্পোন্নয়নের সূচনা হয় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ও জাপানে। রাশিয়ার শিল্পোন্নয়ন সুরু হয় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে। দীর্ঘকালীন পরাধীনতার দরুণ ভারত ও অন্যান্য অর্ধ-উন্নত রাষ্ট্রগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগোতে পারে নি। বিদেশী শাসকেরা এই দেশের কাঁচামাল ও প্রাকৃতিক সম্পদ নিজেদের কাজে লাগিয়েছে—ফলে উন্নয়নের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্ট হতে পারেনি।

আর একটি বিশেষ তফাৎ হচ্ছে, উন্নত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল্য দিতে হয়েছে বিশেষ একটি শ্রেণীকে—যেমন বৃটেনে, শ্রমিককে। তাকে শ্রমের উপযুক্ত মূল্য থেকে বঞ্চিত ক'রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সোপান করা হয়েছে। তাছাড়া বৃটেন, জাপান প্রভৃতি দেশের উপনিবেশগুলিই ছিল তাদের কাঁচামাল জোগানোর ও উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয়ের কেন্দ্র স্বরূপ। আমেরিকা তার দাসপ্রথার মাধ্যমে প্রথম দিকে কৃষির যথেষ্ট উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়—সাম্যবাদী রাশিয়াতেও পরিকল্পনার চাপ প্রধানতঃ বহন করেছে কৃষিক্ষেত্র অর্থাৎ কৃষক গোষ্ঠী।

সেইদিক দিয়ে ভারতে কোন বিশেষ শ্রেণীর ওপরে শিল্পোন্নয়নের মূল্যভার চাপানো হয়নি। কেন না স্বাধীন ভারতে যেমন 'শিল্প ও কারিগরী ক্ষেত্রে বিপ্লব' সুরু হয়েছে, তেমনি দেশ একই সঙ্গে রাজনৈতিক সামাজিক ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। অন্যান্য দেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও শ্রমিকের অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা অর্থনৈতিক বিপ্লবের অনেক পরে এসেছে।

কাজেই অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আমরা বিচার করছি শুধু উৎপাদন বৃদ্ধির মাপ কাঠি দিয়ে নয়, তার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে আরও কতকগুলি মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধ। সেইজন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি মূল লক্ষ্য হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার নীতি। পণ্ডিত নেহরু এই সমাজতান্ত্রিক আদর্শবাদকে একমাত্র 'বৈজ্ঞানিক পথ' বলে মনে করতেন। এই আদর্শ অনুযায়ী দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বার বার 'সামগ্রিক সামাজিক কল্যাণ ও জাতীয় আয় ও সম্পদ বন্টনে অধিকতর সাম্য আনার সঙ্কল্প ঘোষণা করা হয়েছে।' চতুর্থ পরিকল্পনায় বিশেষভাবে এই লক্ষ্যটিকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাই যে সামাজিক ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অসাম্য দূর ক'রে সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা, সমাজের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বলতর সম্প্রদায় ও শ্রেণীগুলিকে অধিকতর সুযোগ দানের কথা চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়ায় বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ভূমিহীন কৃষকের সমস্যা ও তাঁদের জন্য ভূমির ব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

এখন এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন। 'সমাজতন্ত্র' কথাটিকে আমরা একটি শ্লোগান হিসেব ব্যবহার করছি না। সমাজতন্ত্র বলতে বুঝতে হবে জনগণের সমগ্র অংশের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভ, আর্থিক অনিশ্চয়তার সম্ভাবনা রোধ ও প্রকৃত অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। এখন দেখা যাক পরিকল্পনার মাধ্যমে সেই লক্ষ্যে আমরা মোটামুটি কতদূর পৌঁছুতে পেরেছি।

প্রাক পরিকল্পনাকালের তুলনায় ১৯ বছরের পরিকল্পনার পর মোট জাতীয় আয়সহ কৃষি, শিল্প, পরিবহণ প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য উৎপাদন-বৃদ্ধি হয়েছে। ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায়

মোট জাতীয় আয় শতকরা ৬৯ ভাগ বেড়েছে। মাথাপিছু জাতীয় আয় বেড়েছে শতকরা ২৮ ভাগের মত। এখন জাতীয় আয় বন্টনের ক্ষেত্রে কী ঘটেছে লক্ষ্য করা যাক। এই সম্পর্কে পরিসংখ্যান ও উপযুক্ত তথ্যের অভাব রয়েছে। যাই হোক ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত মহলানবীশ কমিটির রিপোর্টে দেখা যায়, উচ্চ আয় বিশিষ্ট শ্রেণীর ওপর প্রচুর কর আরোপ করা সত্ত্বেও জাতীয় আয় বন্টনে যথেষ্ট অসাম্য রয়েছে। ফলে অর্থনৈতিক ক্ষমতাও কেন্দ্রীভূত হয়েছে মুষ্টিমেয়ের হাতে। শিল্পে একচেটিয়া ক্ষমতার প্রসার সম্পর্কে অনুসন্ধানকারী কমিটির বিবরণী-তেও এই ধারণা দৃঢ়মূল হয়।

অগ্রাধিকার ও ব্যক্তিগত ভোগের দিক দিয়েও দেখা গেছে যে, উচ্চ আয় বিশিষ্ট শ্রেণীই তুলনায় বেশী লাভবান হয়েছেন। বি. ভি. কৃষ্ণমূর্তির মতে পরিকল্পনায় উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া সত্ত্বেও উচ্চ আয় বিশিষ্ট শ্রেণীর আয়, ভোগ ও ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সীমিত সংস্থানের একটা মোটা অংশ অবাঞ্ছিত খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যেখানে সিমেন্ট, ইস্পাত, কারিগরী নৈপুণ্যের অধিকতর প্রয়োজন, সেখানে জাতীয় মূল-ধনের একটা অংশ চলে যাচ্ছে উচ্চ আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভোগের প্রয়োজনে, বিলাসদ্রব্যপূর্ণ গৃহ ও আসবাব, রেফ্রি-জারেটর ইত্যাদি উৎপাদনে। সেইদিক দিয়ে 'পরিকল্পনার অগ্রাধিকার' নির্ধারণের বিষয়টিও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। অন্যান্য কয়েকজন অর্থনীতিবিদ এই যুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে, পরিকল্পনার পর জাতীয় আয়ের অংশ হিসেবে শ্রমিকের উপার্জনের আনুপাতিক ভাগ কমে গিয়েছে।

এই সমস্ত দিক দিয়ে বিচার করলে সময় সময় এমন একটা সংশয় মনে আসে যে, 'ভারত সত্যিই সমাজতন্ত্রের পথে চলেছে কি না।' বিষয়টিকে আর একটু তলিয়ে দেখা যাক। এক সময়ে চিরা-চরিত মনোভাব নিয়ে প্রাচীন অর্থনীতি বিদরা মনে করতেন অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে ধনীর আরও ধনবৃদ্ধি ও দরিদ্রের দারিদ্র্য বৃদ্ধি হয়। কার্ল মার্কস তাঁর Doctrine of Increasing Misery -তে এই ধারণাটিকেই বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু সুমপিটার, কুজনেট্‌স প্রমুখ আধুনিক অর্থনীতিবিদরা মনে করেন যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফল হিসেবে আয় বন্টনের ক্ষেত্রে আরও বেশী সমতা আসে। কুজনেট্‌স দেখিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণীই বেশী লাভবান হয়েছেন। কুজনেট্‌সের মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ে অবশ্য জাতীয় আয় বন্টনে অধিকতর অসাম্য দেখা দেওয়া স্বাভাবিক তথাপি অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রয়াস যখন মোটামুটি একটা পরিণত স্তরে পৌঁছবে তখন আয়বন্টনে অধিকতর সমতা আসবে। এই ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের আদর্শগত গঠনতন্ত্রের এই পার্থক্যকে অর্থনীতিবিদরা স্বীকার করতে চান নি। বরং বার্গসন প্রভৃতি অর্থনীতিবিদদের মতে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় যুক্ত-রাষ্ট্র আমেরিকার মজুরীর পার্থক্য কম। অবশ্য এই আয়ের মধ্যে তাঁরা লভ্যাংশের হিসেবটাকে বাদ দিয়েছেন।

অতএব ভারতে আয় বন্টনের বর্তমান ছবি অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি বিশেষ স্তরেরও নির্দেশ দেয়। দেশ, উন্নয়নের পরিণত স্তরে পৌঁছুলে, আয়ের পার্থক্য কমে আসবে আপনা থেকেই, অনেক অর্থনীতিবিদ এই রকম মনে করেন।

ইতিমধ্যে এ ছাড়াও নানা রকম ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষমতার সুষম বন্টনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ভূমি স্বত্ব সংস্কারের ক্ষেত্রে জমিদারী প্রথার বিলোপ একটি প্রথম স্তর। সম্প্রতি জমির মালিকানা সম্পর্কে আরও প্রগতিশীল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

কর নির্ধারণ নীতির মাধ্যমে অর্থ-নৈতিক বৈষম্য দূর করার প্রতিও সরকার দৃষ্টি দিয়েছেন। ভারতে যে প্রগতিশীল হারে আয়কর, লাভকর ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ কর আরোপ করা হয়, তা সর্বোচ্চ হার-গুলির অন্যতম। বিভিন্ন আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান ও মুষ্টিমেয়ের করায়ত্ত শিল্পক্ষেত্রের অর্থনৈতিক ক্ষমতা হ্রাসের চেষ্টা করা হচ্ছে। বিচার করলে দেখা যাবে, জাপানও 'জাইবাৎসু' নামক একচেটিয়া গোষ্ঠীর ওপর দেশের শিল্পো-ন্নয়নের ভার ছেড়ে দিয়েছিল, সেই তুলনায় ভারতের একচেটিয়া ক্ষমতা প্রসারের ক্ষেত্র অনেক সঙ্কুচিত।

শিল্পক্ষেত্রে সরকারী নীতি হচ্ছে—সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র ক্রমশ আরও প্রসারিত ও বিস্তৃত করা। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও সরকারী উদ্যোগের ভূমিকা প্রতিযোগিতার নয় বরং সহযোগি-তার। তবে জাতীয় স্বার্থে, সরকার, শিল্প বা প্রতিষ্ঠান বিশেষ রাষ্ট্রিয় তত্ত্বাবধানে আনতে পারেন। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ তারই একটা দৃষ্টান্ত।

বর্তমানে অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসকল্পে নগরাঞ্চল সম্পদের উচ্চ সীমা নির্ধারণের কথা চলছে। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য দূর করার জন্য সুষম উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণের প্রতি সরকার মনোযোগী হচ্ছেন।

এ ছাড়া গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার প্রভৃতির মাধ্যমে বৃহত্তর জনসাধারণ যাতে পরিকল্পনার সুফল ভোগ করতে পারেন তার দিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে।

পরিশেষে এটি মনে রাখা দরকার যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যতীত সার্বজনীন কল্যাণ সম্ভব নয়। জহরলাল নেহরু এই সত্য উপলব্ধি করে বলেছিলেন 'যদি হঠাৎ একটি অনগ্রসর দেশ সমাজতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ করে তবে সেটা হবে দরিদ্র ও অনগ্রসর দেশের সমাজতন্ত্র—সেইজন্য সবচেয়ে আগে দরকার সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ এবং সুপরি-কল্পিত কার্যসূচীর সুষ্ঠু রূপায়ণ। এই পথে চলতে পারলে আজকের ভারতের অর্থনৈতিক গতিই বলে দেবে ভবিষ্যতের ভারত কোন পথে যাবে।'

ভূমি সংহতি কর্মসূচী

"ছোট ছোট আকারের জমির ক্ষেত্রে জরিপের শতকরা হার অনেক কমে গেছে। মাঝারি আকারের ক্ষেত্রে এই হ্রাসের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম কিন্তু বড় আকারের ক্ষেত্রে তার গতি উর্দ্ধাভিমুখী। তবে ভূমি সংহতিকরণের ফলে রাজ্যগুলিতে জমির মোট মালিকের সংখ্যা কমে গেছে।" ভূমি সংহতিকরণ কর্মসূচীর মূল্যায়ণ করে পরিকল্পনা কমিশনের কর্মসূচী মূল্যায়ণ সংস্থা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশ, যেখানে ১০ লক্ষ একরেরও বেশী জমি সংহত করা হয়েছে, কর্মসূচী মূল্যায়ণ সংস্থা এই রাজ্যগুলির কয়েকটি স্থানেই তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। এই রাজ্যগুলির ১৮টি জেলা, ৩৬টি তহশীল তালুক, ১০৬টি গ্রাম এবং প্রায় ১১০০ জন কৃষক এই অনুসন্ধানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

কর্মসূচী মূল্যায়ণ সংস্থা আরও বলেছেন যে গ্রামের জরিপ সংখ্যা সমস্ত রাজ্যেই হ্রাস পেয়েছে এবং সংহতিকরণের পূর্ব্বের তুলনায় আকার বড় হয়েছে। সংহতিকরণের পর ১৯৬৬-৬৭ সালে খণ্ড খণ্ড জমির সংখ্যাগুলির সঙ্গে তুলনা করে দেখা যায় যে, রাজ্যগুলিতে এই সমস্যা তেমন বড় কিছু নয়। পাঞ্জাবের অমৃতসর ও গুরুদাসপুর জেলায় এবং উত্তরপ্রদেশের এটাওয়া ও বাহারাইচ জেলায় খণ্ড খণ্ড জমির মালিকের সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে।

কৃষির ওপর প্রতিক্রিয়া

কৃষি-উন্নয়নমূলক জিনিসগুলির ব্যবহার সম্পর্কে অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে নির্ব্বাচিত স্থানগুলিতে সংহতিকরণের পর উন্নত ধরণের বীজ, সার ও কীটনাশকের ব্যবহার বেড়েছে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশে এগুলির ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে। ভূমি সংহতিকরণ, কৃষির ওপরে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তা স্থির করা খুব কঠিন হলেও, অনুসন্ধানের ফলে এটুকু জানা গেছে যে সংহতিকরণের পর উন্নত ধরণের বীজ, সার ইত্যাদির ব্যবহার অংশতঃ বেড়েছে এবং উৎপাদনও বেড়েছে। অমৃতসর, হিসার, কর্ণাল, গুড়গাঁও, এটাওয়া এবং বাহারাইচ জেলায় যাঁদের প্রশ্ন করা হয় তাঁদের মধ্যে শতকরা ৫০ জন এবং তারও বেশী বলেন যে সংহতিকরণের ফলেই কৃষিতে উৎপাদন বেড়েছে।

মহীশূরের বিজাপুর এবং গুজরাটের আহ্‌মেদাবাদ জেলায় যাঁদের প্রশ্ন করা হয় তাঁদের মধ্যে শতকরা ৯৫ এবং ৮০ জন বলেন যে সংহতিকরণের কোন প্রয়োজন ছিলনা। নির্ব্বাচিত জেলাগুলিতে যাঁদের প্রশ্ন করা হয় তাঁদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক লোক ছিলেন যাঁরা সংহতিকরণের প্রয়োজন অনুভব করেননি।

দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রচারের প্রয়োজনীয়তা

ছোট কৃষকদের মধ্যে একটা দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে যাঁদের জমির পরিমাণ বেশী, সেই শ্রেণীর কৃষকরা, সিদ্ধান্ত যাতে তাঁদের অনুকূলে হয় সেই সম্পর্কে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন। যে জমি বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকারীরা পেয়ে আসছেন তার ওপরে যে আন্তরিক একটা টান থাকে সেই মাটির টান, সংহতিকরণ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী প্রভাবিত করছে।

সংহতিকরণের প্রয়োজনীয়তা এবং এর সুবিধেগুলি সম্পর্কে কৃষকদের মনোভাব গড়ে তোলার জন্য উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটে কোন সরকারী ব্যবস্থা নেই। রাজস্থান, মহীশূর ও মধ্যপ্রদেশে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ভূমির মূল্যায়ণে সতর্কতা প্রয়োজন

গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে ভূমি ব্যবস্থা সংহত করা সম্পর্কে অনুন্নত অঞ্চলগুলিকে লক্ষ্যস্থল করায় এই কর্মসূচীর ওপর তা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তার ফলে অপেক্ষাকৃত উন্নত অঞ্চলে অর্থাৎ বড় এবং মাঝারি সেচ ব্যবস্থার অধীন অঞ্চল এবং নিবিড় কৃষি কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলিকে এই কর্মসূচীর লক্ষ্যস্থলে পরিবর্ত্তিত করতে হয়।

রূপায়ণে অসুবিধে

যে সব অঞ্চলে তথ্য সংগ্রহ করা হয় সেগুলির বেশীর ভাগ কর্মী বলেছেন যে জমির মালিকানার নথীপত্র অত্যন্ত পুরানো এবং সেগুলিকে কালোপযোগী করাটা একটা বিপুল কাজ। উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে সেই অনুযায়ী বলা যায় যে এই কাজের জন্য যে টাকার বরাদ্দ করা হয় তা যথেষ্ট ছিলনা এবং কাজের বিপুলতার দিক থেকে, এর জন্য নির্দ্ধারিত সময়ও ছিল খুব কম। কাজেই এমন সব সংক্ষিপ্ত পন্থা অবলম্বন করা হয় যা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয়।

হরিয়ানা এবং পাঞ্জাবের সমস্যা ছিল আবার অন্য ধরণের। ১৯৪৭ সালের গণ্ডগোলের সময় সেখানকার কতকগুলি উদ্বাস্তু গ্রামের রাজস্বের নথীপত্র হয় হারিয়ে যায় না হয়তো নষ্ট হয়ে যায়। সেই সব নথীপত্র ঠিক করতে বহু সময় লেগে যায়।

ভূমি সংহতিকরণের এই পরিকল্পনার ফলে আরও একটা বড় সমস্যা দেখা দেয়। সাধারণের উদ্দেশ্যে যে জমি দেওয়া হয়েছে তা বিভিন্ন কাজে লাগানো হচ্ছে। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় যে সংহতিকরণের পরিকল্পনা তৈরী করার সময় গ্রামের ভবিষ্যত উন্নয়নের প্রয়োজনকে ভেবে দেখা হয়নি। দ্বিতীয় সমস্যা হ'ল জমির মূল্যায়ণ। এটা অত্যন্ত জটিল একটা সমস্যা। কারণ, জমির সঠিক মূল্যায়ণের ওপরেই জমির পুনর্বিভাজনের যুক্তিযুক্ততা নির্ভর করে। বলা হয়েছে

৯ পৃষ্ঠার দেখুন

মূল্যের স্থিতিশীলতা আনার অন্যতম উপায়

গ্রাহকগণের জন্য সমবায় স্থাপন

বিশ্বনাথ লাহিড়ী

সব রকম আর্থিক ব্যবস্থাতেই এমন একটা অনুকূল মূল্যনীতি থাকা উচিত যাতে অর্থনীতি সহজে অগ্রগতি করতে পারে; কারণ দ্রুত আর্থিক উন্নয়ন করতে হ'লে আর্থিক স্থিতিশীলতা অত্যন্ত প্রয়োজন। অস্থিরতা বা অসমতার মধ্যে, বিশেষ করে ভারতের মতো উন্নয়নশীল কোন দেশের পক্ষে, যেখানে মিশ্রিত অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে সেখানে অস্থির কোন অর্থনীতির মধ্যে সমৃদ্ধি লাভ করা সম্ভব নয়। সম্প্রতি কয়েক বছরে জিনিসপত্রের দাম এতো বেড়ে গেছে যে তা অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বন্টন ব্যবস্থাতেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। এই বিরূপ অবস্থা আয়ত্বে আনার জন্য এখন স্থির করা হয়েছে যে জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্য একটা নির্দিষ্ট মানে নিয়ে আসার অন্যতম উপায় হল ব্যবহারকারীদের জন্য সুসংবদ্ধ কতকগুলি সমবায় সমিতি স্থাপন। উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের গতি দ্রুত হতে থাকলে জিনিসপত্রের দাম কিছুটা বাড়বেই এবং সামান্য ফাঁপা বাজারকে সেই ক্ষেত্রে উন্নয়নেরই একটা অঙ্গ বলে ধরা হয়। কিন্তু মূল্যকে যদি অবাধগতিতে বাড়তে দেওয়া হয় তাহলে তা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে কাজেই মূল্যের উর্দ্ধগতি প্রতিরোধ করা বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। অন্যদিকে বন্টন ব্যবস্থাগুলি যদি উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ না করা যায় তাহলে মূল্যের উর্দ্ধগতি রোধ করার সব প্রচেষ্টা বিফল হয়ে যায়। কারণ যে কারণগুলির জন্য মূল্য বাড়ে সেগুলি সমস্ত নিত্যব্যবহার্য্য জিনিসের দামেও প্রভাব বিস্তার করে।

অসম্ভব বৃদ্ধি

গত কয়েক বছরে জিনিসপত্রের দাম বিশেষ করে খাদ্যসামগ্রীর দাম অত্যন্ত বেড়েছে এবং এর ফলে সাধারণ মানুষের কষ্ট বেড়েছে এবং আয় বাড়লেও সেই হিসেবে তাদের জীবন ধারণের মান উন্নত হয়নি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ে খাদ্যসামগ্রীর দাম শতকরা প্রায় ৩১ ভাগ বেড়েছে এবং তৃতীয় পরিকল্পনার সময়ে বেড়েছে শতকরা ৪১ ভাগ, কিন্তু ১৯৬৬-৬৭ সালে দাম বেড়েছে তার পূর্ব্ব বছরের চাইতেও শতকরা ১৮ ভাগ বেশী। ১৯৬৩-৬৪ সাল থেকে পরের চার বছরে খাদ্য সামগ্রীর মূল্য শতকরা ৭৬ ভাগ বেড়েছে। এর তুলনায়, অন্যদিকে, খাদ্যশস্যের উৎপাদনের হার পরিকল্পনার সময়ে তেমন দ্রুত বাড়েনি আর তার ফলে ১৯৫১ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্য্যন্ত খাদ্যশস্যের আমদানী চারগুণ বেড়েছে। কাজেই এই রকম অবস্থায়, ব্যবহারকারীগণের সমবায় স্থাপন করলেই তা যাদুমন্ত্রের মতো সমস্ত রকম আর্থিক অসমতা দূর করবে তেমন কথা মনে করা উচিত নয়।

কার্য্যকারিতা

গত কয়েক বছরে ভারতে, ব্যবহারকারীগণের সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে যে উন্নতি হয় তা প্রশংসার যোগ্য। ১৯৬২-৬৩ সালে সমবায় ষ্টোরের সংখ্যা ছিল ৮৪০৭, এগুলির সদস্য সংখ্যা ছিল ১৬ লক্ষ এবং ব্যবসার পরিমাণ ছিল ৩৮.২০ কোটি টাকা। ১৯৬৬-৬৭ সালে সমবায় ষ্টোরের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৫৯১তে। এগুলির মোট সদস্যের সংখ্যা ছিল ৬৬.৬৭ লক্ষ এবং ব্যবসার পরিমাণ ছিল ৮৮.৩১ কোটি টাকা। এতেই বোঝা যায় সমবায় ষ্টোর স্থাপনের আন্দোলন কতখানি জনপ্রিয় হয়েছে। সহরগুলির মোট সংখ্যার ১৪ ভাগ অর্থাৎ ২৫ লক্ষ পরিবার এইসব ষ্টোরের সুবিধে ভোগ করছে। তাছাড়া অনুমান করা হচ্ছে যে ১৯৬৬-৬৭ সালের মধ্যে সহরের খুচরা ব্যবসায়ের শতকরা অন্ততঃপক্ষে ৭ ভাগ এই সব সমবায় ষ্টোরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারগুলির সাহায্যেই এই রকম দ্রুত উন্নয়ন সম্ভবপর হয়। কিন্তু সমবায় ষ্টোরের সংখ্যা বাড়লেও তা বাজারের মূল্যমানের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি বা সাধারণভাবে ব্যবহারকারীদের উপকার করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে এই সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল।

মূল্য নীতি

ব্যবসায়ের অন্যতম একটা বিশেষ অঙ্গ হিসেবে সঠিক মূল্যনীতিই শুধু সমবায় ষ্টোরগুলির দক্ষ পরিচালনায় সাহায্য করতে পারে। কিন্তু এই ষ্টোরগুলিও নিজেদের জন্য একটা মূল্যনীতি স্থির করে নিতে পারেনি। ষ্টোরগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রে, প্রধানতঃ যে সব জিনিসের সরবরাহ কম এবং যেগুলি সহজে বিক্রী হয় সে-গুলিই কেনাবেচা করে। উচিত মূল্যের আকারে হয় সরকার সেগুলির মূল্য বেঁধে দেন অথবা বেসরকারি ব্যবসায়ীরা যে দরে ষ্টোরগুলিকে জিনিসপত্র সরবরাহ করতে স্বীকৃত হন সেই দরেই বিক্রী করা হয়। এই দর পূর্ব্বেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় বলে ষ্টোরগুলি সেই দরে বিক্রী করতে বাধ্য হয় কাজেই জিনিসপত্রের দাম প্রতিযোগিতামূলক বা কম হয়না বলে অথবা খুব ভালো জিনিস পাওয়া যায়না বলে ক্রেতারা এই সব ষ্টোর থেকে জিনিসপত্র কিনতে খুব উৎসাহ পাননা। একটি বিবরণীতে দেখতে পাওয়া যায় যে ৪৩টি ষ্টোরের ২৫টিতে চাউলের মূল্য এবং ৩৭টি ষ্টোরের ১৬টিতে গমের মূল্য বাজার দরের তুলনায় শতকরা ৫ ভাগ কম ছিল, এবং এই ষ্টোরগুলির এক চতুর্থাংশের ক্ষেত্রে বাজার দরের তুলনায় শতকরা ১০ ভাগেরও বেশী মূল্যের পার্থক্য ছিল। আর একটা

উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হ'ল ৪৩টি ষ্টোরের মধ্যে ২৪টিতে বনস্পতির মূল্য এবং ৪৮টি ষ্টোরের ২৪টিতে কাপড় কাচার সাবানের মূল্য বাজার দরের সমান ছিল। সরকারের ন্যায্য মূল্য-নীতির জন্য প্রথমে উল্লিখিত জিনিসগুলির মূল্য অপেক্ষাকৃত কম ছিল এবং উৎপাদকগণের পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত মূল্য অনুযায়ী পরের জিনিসগুলির মূল্য একই রকম ছিল। বিবরণীতে আরও বলা হয়েছে যে ষ্টোরগুলির সদস্যদের মধ্যে বেশ বড় একটা অংশ অর্থাৎ শতকরা ৩৪ থেকে ৩৯ ভাগ, ষ্টোর থেকে তাঁদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য কেনেন নি এবং ষ্টোর থেকে সদস্যরা যে সব জিনিস কেনেন তার শতকরা ৪১ থেকে ৬৫ ভাগই ছিল নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত দ্রব্যাদি। ক্ষতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও বাজার দরের চাইতে কম মূল্যে জিনিসপত্র বিক্রী করাই হ'ল ষ্টোরগুলির মোটামুটি নীতি। একটি বিবরণীতে দেখা যায় যে ১৯৬৭-৬৮ সালে ৩১৭টি পাইকারি সমবায় ষ্টোরের মধ্যে ১৮৫টির লোকসান হয়। তবে এটাও সত্যি কথা যে রেশনের জিনিস পাওয়া যায় এবং অন্যান্য জিনিস সস্তায় পাওয়া যায় বলেই বেশীরভাগ লোক সমবায় ষ্টোরের সদস্য হন।

ব্যবহারকারীদের সমবায় আন্দোলন যে ভারতে দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করতে পারেনি তা পরিস্কার বোঝা যায়। তাছাড়া মূল্যের স্থিতিশীলতা অর্জনে এগুলি বিশেষ কোন সাহায্য করতে পারছেনা। কিন্তু অর্থনীতিতে মূল্যের স্থিতিশীলতা অর্জনে ইংল্যাণ্ড ও সুইডেনের ব্যবহারকারীদের সমবায় আন্দোলন প্রশংসনীয় কাজ করেছে। ঐ দুটি দেশে সমবায় আন্দোলনের এই সাফল্যের প্রধান কারণ হ'ল, ব্যবহারকারীদের চাহিদার দুই তৃতীয়াংশই পাইকারি ষ্টোরগুলি উৎপাদন করে। এর ফলে তারা বাজার দরের তুলনায় কিছুটা কমে তাদের মূল্যমান স্থির করতে পারে। দ্বিতীয়ত: এই দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে মোট খুচরা ব্যবসায়ের শতকরা ১০ থেকে ২০ ভাগ, সমবায় ষ্টোরগুলির মাধ্যমে হয় বলে ব্যবহারকারীদের সমবায়গুলি অর্থনীতিতে, বিশেষ ক'রে মূল্যের স্থায়ীত্ব বিধানে, একটা ভালো প্রভাব বিস্তার করতে এবং করছে।

ব্যবহারকারীদের সমবায় ষ্টোরগুলির জন্য একটা সঠিক মূল্য নীতি স্থির করতে কতকগুলি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হয়। এগুলি হল (১) সম্ভাব্য মোট ব্যয় (ক্ষয়ক্ষতি এবং পরিচালনা ব্যয় সহ) এবং মূলধনের ওপর সুদ এবং লভ্যাংশ বিতরণ করার পরও মূলধনের যথেষ্ট সংস্থান। বাজার দর অনুযায়ী যদি মূল্যনীতি স্থির করা হয় তাহলে তা ব্যবহারকারীদের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনা। সুইডেনের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে তাঁরা সক্রিয় একটা মূল্যনীতি গ্রহণ করায়, গৃহস্থালীর জন্য প্রয়োজনীয় তিন চতুর্থাংশেরও বেশী সামগ্রী ষ্টোরগুলির মাধ্যমে বিক্রী করতে পারেন। ইংলণ্ডে এর পরিমাণ হল শতকরা ৪৫ থেকে ৫৫ ভাগ। ভারতে সমবায় ষ্টোরের সংখ্যা কম, এগুলি আর্থিক ক্ষমতার দিক থেকে দুর্ব্বল, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র উৎপাদনে অক্ষম এবং মোট জাতীয় ব্যবসা বাণিজ্যের লেনদেনে এগুলির অংশ যৎসামান্য। তাছাড়া এগুলিকে নিয়ন্ত্রিত জিনিসপত্রের ওপরেই খুব বেশী পরিমাণে নির্ভর করতে হয়। কাজেই এই রকম অবস্থায় সমবায় ষ্টোরগুলির সুদক্ষ পরিচালনার জন্য কোন মূল্যনীতি স্থির করার সময় বাজার দরের নীতি এবং সক্রিয় মূল্যনীতির মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা বেছে নিতে হয়। যাই হোক, অর্থনীতির ওপর একটা শুভ ফলের জন্য বিশেষ করে মূল্য স্থিতিশীল করার জন্য ব্যবহারকারীদের সমবায় ষ্টোরগুলিকে শেষ পর্য্যন্ত একটা সক্রিয় মূল্যনীতি স্থির করে নিতে হবে। এই রকম মূল্যনীতির মাধ্যমে আমাদের দেশে সমবায় আন্দোলন সফল হয়ে উঠতে পারে।

(ইংরেজী যোজনায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ থেকে অনূদিত।)

যোজনা ভবন থেকে

৭ পৃষ্ঠার পর

যে ভূমির বিনিময় করে যাতে লাভবান হওয়া যায় সেজন্য খারাপ জমির দাম বাড়ানোর জন্য কতকগুলি ক্ষেত্রে ইচ্ছে করে চেষ্টা করা হয়েছে আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে সেই চেষ্টা সফলও হয়েছে। আর একটা ব্যাপার যা জমির সঠিক মূল্যায়ণে বাধার সৃষ্টি করেছে তা হল, ভূমির মূল্যায়ণ করার সময় ভূমির উর্ব্বরতাও বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এই উর্ব্বরতার মূল্যায়ণ করা হয় কয়েক বছর পূর্ব্বে এবং তাইই নথীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় বলে ভূমির সঠিক মূল্যায়ণ সম্ভব হয়নি। যে সব উন্নয়নের ফলে ভূমির উৎপাদন সম্ভাবনা বেড়েছে সেগুলি সম্পর্কে কোন রকম বিবেচনা করা হয়নি।

সমগ্র সংহতিকরণ কর্মসূচীর মূলে ছিল ভূমির মূল্যায়ণ এবং এই মূল্যায়ণ যাতে সঠিক হয় তা সুনিশ্চিত করার জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করতে হবে। তা না হলে সংহতিকরণ কর্মসূচী সন্তোষজনকভাবে সম্পূর্ণ করা কঠিন হবে।

বিবরণীতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে রাজস্ব বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারি এবং দুই জন জননেতার একটি উচ্চশক্তি-সম্পন্ন কমিটির হাতে এই মূল্যায়ণের ভার দেওয়া উচিত।

যে কর্মচারীদের ওপর এই কাজের ভার দেওয়া হয় সে কাজ ছিল তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, কাজেই সময়মতো কাজ শেষ করার জন্য তাঁদের সংক্ষিপ্ত পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিলনা। সুতরাং এই কাজের জন্য যতখানি পুখানুপুঙ্খ পরীক্ষা প্রয়োজন ছিল ততটা সম্ভব হয়নি। কর্মচারীর সংখ্যার ওপরই কেবল কাজের দক্ষতা নির্ভর করেনা, সেই কাজের জন্য কর্মচারীরা কতখানি এবং কী ধরণের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তার ওপরেই তা নির্ভর করে। বলা হয়েছে যে মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর ও গুজরাটে এই ধরণের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি।

ভারতে মোটরগাড়ী শিল্প

অশোক মুখোপাধ্যায়

হিন্দুস্থান মোটরস্‌এ গাড়ীর বডি তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ করা হচ্ছে।

যে সব প্রগতিশীল কর্মপ্রচেষ্টা বিদেশী মূলধন ও বিশেষজ্ঞের সহায়তায় ক্রমশঃ স্বনির্ভর হয়ে উঠছে, ভারতের মোটর গাড়ী শিল্প হ'ল সেগুলির অন্যতম।

ভারতে মোটর গাড়ী শিল্প সম্প্রতি গড়ে উঠেছে। এই শিল্পে মোটরের বিভিন্ন অংশ একত্রীকরণের আধুনিকতম পন্থা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। তবে ভারতে মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশ উৎপাদনের অনুপাত ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে। একজন উৎপাদক হিসেব ক'রে দেখেছেন যে, এখন গাড়ীগুলির শতকরা ৯৮ ভাগ অংশ দেশে নির্মিত হয়। নিঃসন্দেহে, এটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব, কারণ প্রায় ৬০০০টি অংশ সংযোজিত ক'রে একটি মোটর গাড়ীর সম্পূর্ণ আকার দেওয়া হয়।

বর্তমানে, ভারতে বছরে প্রায় ৩৬,০০০ যাত্রীবাহী গাড়ী ও সমসংখ্যক লরি, ট্রাক ইত্যাদি তৈরি করা হয়, এবং নানা ধরণের দশ লক্ষেরও বেশী গাড়ী রাস্তায় চলাচল করে। পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে তুলনায় অবশ্য এই সংখ্যা কম, তবু ভারতীয় মোটর গাড়ীর বাজার এশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় অর্থাৎ জাপানের পরেই ভারতের স্থান।

একটি আধুনিক মোটর গাড়ীর কারখানায়, নানা জটিল যান্ত্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি গাড়ী তৈরি করা হয়। স্টীলের পাতগুলি প্রয়োজনীয় বিভিন্ন আকার অনুযায়ী কেটে নেওয়া হয় ও সেগুলি গাড়ীর 'বডি'র নানা অংশের রূপ নেয়। যেমন ছাদ, মেঝে, দরজা 'বনেট' 'ফেণ্ডার' ইত্যাদি। এই অংশগুলি ওয়েল্‌ডিং (বা ঝালাই) ক'রে সংযুক্ত করার পর সম্পূর্ণভাবে গাড়ীর 'বডি' তৈরি হয়ে যায়। কারখানার একটি অপরিহার্য অঙ্গ ইঞ্জিন নির্মাণ বিভাগ। এখানে পিষ্টন, সিলিণ্ডার প্রভৃতি ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ নির্মিত হয়। ইঞ্জিনগুলি একেবারে তৈরি হয়ে গেলে পর একটি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে এটির দোষ ত্রুটী পরীক্ষা করে দেখা হয়। আর একটি প্রয়োজনীয় যন্ত্রের সাহায্যে গাড়ীর পিছনের 'অ্যাক্সিল' ও সামনের 'গিয়ার বক্স' ও স্টিয়ারিং উৎপাদন করা হয়। যন্ত্রপাতির পরীক্ষা নিরীক্ষা ও উৎপাদিত দ্রব্যের গুণাগুণ নির্ণয়ের জন্য গবেষণাগার—আধুনিক মোটর গাড়ীর কারখানার একটি অত্যাবশ্যক বিভাগ। ভারতে চারটি আধুনিক মোটর গাড়ীর কারখানা আছে। কলকাতার কাছে উত্তর পাড়ায়, জামসেদপুর, বোম্বাই ও মাদ্রাজে। উত্তরপাড়ায় অ্যামব্যাসাডার ও হিন্দুস্থান ট্রাকগুলি তৈরি হয়।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবন যাত্রার মানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীবাহী গাড়ীর চাহিদা এতই বেড়ে গেছে যে, উৎপাদনের মাত্রা সেই তালে পা ফেলে এগোতে পারছে না। বিদেশী আমদানী অথচ এখনও নিয়ন্ত্রিত। প্রায় ১ লক্ষ ক্রেতা গাড়ীর প্রত্যাশায় নাম তালিকাভুক্ত ক'রে রেখেছেন। অবশ্য ব্যবসায়িক গাড়ীর ক্ষেত্রে অবস্থা অন্য রকম, ভারতীয় উৎপাদকরা তো স্থানীয় চাহিদা মেটাচ্ছেনই, উপরন্তু কিছু সংখ্যক গাড়ী বিদেশেও রপ্তানী করছেন।

ভারতেও বিশালাকার ট্রাক, লরীর চাহিদা বাড়ছে। হিন্দুস্থান মোটর আমেরিকার একটি সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে বেডফোর্ড ট্রাক নির্মাণ সুরু করে দিয়েছে। নতুন ইঞ্জিন উৎপাদক যন্ত্রের সাহায্যে একবারেই সাড়ে সাত টন ওজনের একটি ট্রাকের ইঞ্জিন তৈরি হয়ে যায়, এবং এই রকম ভারী ইঞ্জিন বছরে ১৫,০০০টি তৈরি করা সম্ভব হবে।

দেশীয় তেল

আসাম ও গুজরাটের তৈলক্ষেত্র থেকে বর্তমানে প্রায় ৬০.৫ লক্ষ টন অশোধিত তেল পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। প্রায় ১২০.৩৬ লক্ষ টন অশোধিত তেল আমদানি করতে হবে। এই আমদানির জন্য ব্যয় হবে ১০৯ কোটি টাকা।

চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে দেশের তৈলক্ষেত্রগুলি থেকে প্রায় ৯০.৮৫ লক্ষ টন তেল উৎপাদিত হবে। ১৯৬৯-৭০ সালে ৭০.১৫ লক্ষ টন হারে তেল উৎপাদিত হবে।

গৃহ সমস্যার সমাধানে সমবায়িকার ভূমিকা

কে. কে. সরকার

গত বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীতে যখন আবার শিল্পায়ণ সুরু হ'ল, তখন গ্রাম থেকে বহু লোক কাজের সন্ধানে সহরে আসতে শুরু করলেন আর তার সঙ্গে দেখা দিল গৃহ সমস্যা। যুদ্ধের ফলে বেশীর ভাগ বাড়ী নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এঁদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে সমবায়িকার মাধ্যমে বাসগৃহ তৈরি করতে সুরু করা হয়। তার পর থেকে সমবায়িকাগুলি এই সমস্যা সমাধানে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে।

১৮৬২ সালে হামবুর্গে প্রথম গৃহনির্মাণ সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৮ সালের মধ্যে এই ধরণের সমিতির সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮টি। কিন্তু ১৮৮৯ সালের পর যখন সমবায় আইন অনুযায়ী সীমাবদ্ধ দায়িত্ব চালু করা হয় তখন থেকেই এগুলি দ্রুত অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলতে থাকে। এই শতাব্দির প্রথম দিকে সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতির সংখ্যা ৩৮৫তে দাঁড়ায়। সামাজিক বীমা প্রতিষ্ঠানগুলিই এগুলির জন্য প্রধান ঋণদাতা হয়ে দাঁড়ায়। সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতিগুলির সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, সেগুলি, প্রুশিয়া সরকার কর্ত্তৃক স্থাপিত গৃহনির্মাণ সাহায্য তহবিল থেকে আরও সাহায্য পায়। রেলওয়ে বোর্ডগুলিও সমবায় সমিতিগুলিকে সাহায্য করে। কিন্তু ১৯৩৩ সালের পর নাজি শাসনের সময় সমবায়গুলির উন্নয়নে বাধা পড়ে। কারণ নাজি শাসন, সমবায়ভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থার পক্ষে ছিলনা।

১৯৩৮ সালের শেষভাগে, বর্ত্তমানের জার্মান ফেডারেল রিপাব্লিক এবং পশ্চিম বার্লিনের অধীনস্থ অঞ্চলগুলিতে, সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতিগুলি, সদস্যদের পক্ষ থেকে প্রায় ২৮৫,০০০টি ফ্ল্যাট নিয়ন্ত্রণ করত। ১৯৫০ সালের শেষে এই সংখ্যা বেড়ে ৩২০,০০০তে দাঁড়ায়।

১৯৪৭ সালের পর থেকে সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতিগুলির সংখ্যা ও এগুলির সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে। তবে ১৯৫৪ সালের পর আবার এগুলির সংখ্যা কমে যায়। নানা কারণে এগুলির সংখ্যা কমেছে। আর্থিক বাজারে মন্দা দেখা দেওয়ায় ১৯৫৩ সালে ঋণ সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। এই নিয়ন্ত্রণের ফলে গৃহনির্মাণের কাজ কমে যায়। তাছাড়া ১৯৫৬ সাল থেকে ব্যক্তিগতভাবে বাড়ী তৈরি করার ওপর বেশী জোর দেওয়া হতে থাকে। ১৯৫৯ সালে শতকরা ৪৫টি গৃহনির্মাণ সমিতির সদস্য সংখ্যা ২৫০ জনেরও কম ছিল। কেবলমাত্র শতকরা ২০টি সমিতির সদস্য সংখ্যা ২৫১ থেকে ৫০০ এবং শতকরা ১৭টি সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫০০ থেকে ১০০০ পর্য্যন্ত ছিল। খুব কমসংখ্যক সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতির সংখ্যা পাঁচ হাজারের বেশী ছিল।

লাভবিহীন গৃহনির্মাণ আইন

এইসব সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতিগুলির প্রধান কাজ ছিল স্বল্প আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য গৃহনির্মাণ। এই ক্ষেত্রে সরকার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে কর রেহাইয়ের মতো কয়েকটি সুবিধে দেন। সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতিগুলিকেই যে শুধু এই সুবিধে দেওয়া হয় তাই নয়, জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী, সীমাবদ্ধ দায়িত্ব সম্পন্ন কোম্পানীগুলিও যদি লাভবিহীন ব্যবসা সম্পর্কে কতকগুলি আইনকানুন মেনে চলেন তাহলে তাদেরও এইসব সুবিধে দেওয়া হয়।

১৯৩০ সালে সর্ব্ব প্রথম লাভবিহীন গৃহনির্মাণ সম্পর্কিত নীতিগুলি আইনে পরিণত করা হয়। এই আইনে সংস্থাগুলির লাভবিহীন কর্মপ্রচেষ্টা সুরক্ষিত করা সম্পর্কে এবং ছোট ছোট ফ্ল্যাট বানানো সম্পর্কে ব্যবস্থা রাখা হয়। আইনের সর্ত্তগুলি হ'ল: (ক) ছোট ছোট ফ্ল্যাট বানাতে হবে এবং এই কাজ বন্ধ রাখা যাবেন। এর অর্থ হ'ল ক্রমাগত ফ্ল্যাট বানিয়ে যেতে হবে এবং একমাত্র উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের নির্দেশেই শুধু এই কাজ বন্ধ রাখা যেতে পারে। (খ) সরকারী নীতি অনুযায়ী এই সব ফ্ল্যাট বা বাড়ী উপযুক্ত মূল্যে বিক্রী করতে হবে বা ভাড়া দিতে হবে। (গ) গৃহ নির্মাণ সমিতির যে লাভ হবে বা সেগুলির যে সম্পদ গড়ে উঠবে তা বন্টন করারও কয়েকটি সর্ত্ত রয়েছে। এই সমিতিগুলি, অংশীদারদের মধ্যে অনূর্দ্ধ শতকরা ৪ ভাগ সম্পদ বন্টন করতে পারবে। লাভ বন্টন না করার ফলে যে সম্পদ গড়ে উঠবে তা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠানেরই থাকবে। কোন অংশীদার পদত্যাগ করলেও তাতে হাত দেওয়া যাবেনা। কোন প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে দেওয়া হলে তার সম্পদ লাভবিহীন কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে। ফ্ল্যাটগুলির আকার একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখতে হবে যাতে সেগুলির মূল্য সাধারণের আয়ত্বের মধ্যে থাকে।

এই সব সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতিগুলির কর্মপ্রচেষ্টা থেকে যাতে কেউ ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হতে না পারেন আইনে তারও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যে সব সংস্থা গৃহনির্মাণের কাজে ব্যাপৃত আছে সেগুলির মধ্যে শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগই, সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি। কিন্তু বিপুল সংখ্যক সমবায় সমিতি থাকলেও, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় এগুলির নিয়ন্ত্রণাধীন ফ্ল্যাটের সংখ্যা কম। তার প্রধান কারণ হ'ল সমবায় সমিতিগুলি সাধারণত: স্থানীয় ছোট ছোট অঞ্চলে বা পল্লী অঞ্চলে কাজ করে এবং এগুলির মূলধনও কম।

সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতিগুলির কাজ হল: জমি কিনে পরিকল্পনা তৈরি করা এবং বাড়ী তৈরির কাজ পরিদর্শন করা। ফ্ল্যাটগুলি তৈরি হয়ে গেলে সমিতিগুলি সদস্যদের এগুলি ভাড়া দেয়।

১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

মাত্র
5টি পয়সা
খরচ করে
আপনার
পরিবার
সীমিত রাখুন

NIRODH
SUBSIDISED PRICE
15 PAISE FOR 3

পুরুষের জন্যে, নিরাপদ, সরল ও উন্নতধরণের রবারের জন্মনিরোধক নিরোধ ব্যবহার করুন। সারা দেশে হাটে-বাজারে এখন পাওয়া যাচ্ছে। জন্ম নিয়ন্ত্রণ করুন ও পরিকল্পিত পরিবারের আনন্দ উপভোগ করুন।

জন্ম প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আপনাদের হাতের মুঠোয় এসে গেছে।

এখন দেশময়
পাওয়া যাচ্ছে
15 পয়সায় 3টি
সরকারী সাহায্যে হ্রাস মূল্যে

নিরোধ
ব্যবহার করুন

পরিবার পরিকল্পনার জন্য
পুরুষের ব্যবহার উপযোগী
উন্নত ধরণের রবারের জন্মনিরোধক
মুদীর দোকান, ওষুধের দোকান, সাধারণ বিপণী, সিগারেটের দোকান— সর্বত্র বিক্রীতে পাওয়া যায়।

চিত্র : বি. সরকার

মৃৎশিল্পীদের সেবায় ব্যাঙ্ক

কলকাতার কুমারটুলি এলাকার মৃৎশিল্পীরা সারা বছরই পুতুল, খেলনা বা মূর্ত্তি প্রভৃতি তৈরীর কাজে ব্যাপৃত থাকেন। তবে জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে সরস্বতী পূজোর সময়ে, আগষ্ট-সেপ্টেম্বর নাগাদ বিশ্বকর্মা পূজো ও সেপ্টেম্বরে-অক্টোবরে দুর্গাপূজোর মরশুমে এবং অক্টোবর-নভেম্বর নাগাদ কালীপূজোর সময়ে এঁদের হাতে কাজ থাকে সবচেয়ে বেশী। কুমারটুলি এলাকা হচ্ছে মূর্তি তৈরির পীঠস্থান। কুমারটুলিতে তৈরি মূর্তির সবচেয়ে বড় বাজার হ'ল কলকাতা এই সব মূর্তি শুধু বাংলা দেশেই নয়, বাংলার বাইরেও বিক্রী হয়। একটা সমীক্ষায় জানা গিয়েছে যে, কুমারটুলিতে সবশুদ্ধ ২০০ ঘর মৃৎশিল্পী রয়েছেন, আর তাদের পরিবাভুক্ত কর্মীরা ছাড়া আরও প্রায় হাজার খানেক লোক মূর্ত্তি ইত্যাদি তৈরি করেন। ব্যবসার মালিক এঁরা নিজেরাই। এই এলাকায় মূর্ত্তিগড়ার ব্যবসা থেকে মোট আয় হয় বছরে ৪০ লক্ষ টাকার মতো। প্রত্যেক শিল্পী পরিবার গড়ে বছরে ২০,০০০ টাকার মত মূর্ত্তি বিক্রী করে থাকেন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশ ভাড়া বাড়ীতে থেকে ব্যবসা চালান।

বছরে চারটে বড় বড় পূজোর মরশুমে মৃৎশিল্পীদের টাকার দরকার পড়ে সবচেয়ে বেশী। প্রত্যেক দিনের খুচরো কেনা-কাটা ছাড়াও একটা বড় খরচ হ'ল কাঁচা-মাল কেনা। যেমন হিসেব ক'রে দেখা গিয়েছে যে মাটি, ঘাস, তুষ, বাঁশ, দড়ি, রঙ, সাজসজ্জা ইত্যাদি জিনিস কিনতে মোট খরচের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ লেগে যায়।

এর জন্য অনেক সময় শতকরা ৯০ ভাগ মৃৎশিল্পীর ঋণের প্রয়োজন হয় এবং সেই প্রয়োজন মেটাতে হয় মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার ক'রে। সুদের হার কখনও শতকরা ৩৬ ভাগ কখনও বা শতকরা ৭২ ভাগ। এত চড়া হারে সুদ দিয়ে তাঁদের হাতে লাভ থাকে অতি সামান্য। অবশ্য কোন কোন সময় লাভের পরিমাণ শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগের মতও দাঁড়ায় (এর মধ্যে কারিগরদের মজুরিও

১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

অভাব ও অপরাধঃ সামাজিক সমস্যা

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

অভাব ও অপরাধ একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরাধের মূল কারণ—অভাব। অভাবের তাড়নায় মানুষ বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে দিনের পর দিন নানা অন্যায় কাজে রত হয়ে ক্রমশ: স্বভাব অপরাধীতে পরিণত হয়। এমন অনেক সৎ লোক আছেন যাঁরা হঠাৎ কোন কঠিন অভাবের চাপে একান্ত নিরুপায় হয়ে অপরাধে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই ধরণের লোকদের জেলে পাঠালে, তারা ঘৃণা ও অপমানে মরিয়া হয়ে ওঠে এবং জেল থেকে বেরিয়ে যখন দেখে সমাজের কেউ আর তাদের সঙ্গে আগেকার মত স্বাভাবিক ব্যবহার করছেনা, তখন ধীরে ধীরে তারা স্বভাব অপরাধী হয়ে ওঠে।

অভাবের তাড়নায়, খরা, বন্যা বা দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে অপরাধ ব্যাপক আকার ধারণ করে। আবার আর্থিক অবস্থার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের সংখ্যা কমতে থাকে। এ থেকে বেশ বোঝা যায় মানুষ স্বভাবত: অপরাধ প্রবণ নয়।

মানুষ পেটের জ্বালায় যদি চুরি ডাকাতি করে বা কোন হীন কর্মে রত হয়, তখন সমাজের কর্তব্য তার অভাব দূর করা—অপরাধটাকে বড় করে না দেখা। কারণ শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় অপরাধীর অনুশোচনা বৃত্তি নষ্ট হয়ে গিয়ে সে মরীয়া হয়ে যায়।

দেখা যায় সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটিতেই অভাব এবং অভাবজনিত অপরাধের জন্ম হয়। পরিবারে একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তির হঠাৎ বেকার অবস্থা ঘটলে অথবা আকস্মিক মৃত্যু হলে—সেই সংসারে দারিদ্র্যের কালো ছায়া নেমে আসে। সংসার ছিন্ন ভিন্ন হয়ে সকল মাধুর্য ও পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভিক্ষা করতে শেখে, সমাজে পরগাছার সংখ্যা বাড়িয়ে চলে এবং ক্রমে সমাজবিরোধী হয়ে ওঠে। রূপ গুণ নেই বলে বিয়ে হচ্ছে না এমন অনেক মেয়ে অথবা অল্প বয়স্ক বিধবারা অভাবের তাড়নায় একটা লোক দেখান শুচিতা রক্ষা করে চলে বটে কিন্তু চক্ষুর অন্তরালে তারা সমাজ বিরোধী জীবন যাপনে হয়তো প্রলুব্ধ হয় বা বাধ্য হয়ে পাপাচারে লিপ্ত হয়।

অভাব ও অপরাধ সমাধানের মূলসূত্র নিহিত রয়েছে সুস্থ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামোর মধ্যে। আজ যে নারী গণিকা বলে অবহেলিত, জীবনের সুরুতে সে যদি সমাজের সহানুভূতি পেত, তাহলে হয়ত সে সমাজে মর্যাদার আসন পেতে পারত। অথবা কোন মনীষীর জননীরূপে পূজিতা হতে পারত। কিন্তু তাই বলে নৈতিক দৃষ্টিতে পাপকে কখনও সমর্থন করা যায় না।

কোন অপরাধীকে জেলে পাঠাতে হলে দেখতে হবে তার উপর নির্ভরশীল পরিবার বর্গের কি হবে? বাঁচাতে তাদের হবেই, তানাহলে তাদের ছেলেরা হয়ত কেপমারির দলে ঢুকবে আর মেয়েরা অন্যায় বৃত্তি গ্রহণ করবে। অর্থাৎ একটি অপরাধীকে শাস্তি দিতে গিয়ে আরও দশটি অপরাধীর সৃষ্টি যাতে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখাও কর্তব্য। অপরাধীর কারাগারে থাকার সময়ে তার পরিবারের লোকেরা যাতে পরিশ্রমের বিনিময়ে সৎভাবে উপার্জনের সুযোগ পায় সে ব্যবস্থা রাষ্ট্রের তরফ থেকেই করা দরকার।

মহাত্মা গান্ধী বলেছেন—'কয়েদখানাকে কয়েদীরা যেন হাসপাতাল বলে মনে করেন।' জেলখানায় 'শাস্তি পাচ্ছি' মনে না ক'রে বিভিন্ন শিক্ষার মাধ্যমে 'সংশোধিত হচ্ছি' এই রকম মনে করতে হবে। অসুস্থ লোককে যেমন হাসপাতালে পাঠালে, সুচিকিৎসার মাধ্যমে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে স্বাভাবিকভাবে ঘরে ফিরে আসে তেমনি অপরাধীর সকল প্রকার 'অপরাধজনিত রোগ' ও জেলখানার নিয়ম শৃঙ্খলা, সুশিক্ষার ব্যবস্থার মাধ্যমে অপরাধীকে নিরাময় করে তুলতে হবে। অপরাধী মুক্তি পেয়ে ঘরে ফিরে এলে সমাজের উচিত তাকে পূর্ণ মর্যাদায় সমাজে গ্রহণ করা এবং তাঁরা যাতে সরকারী চাকুরিও পেতে পারেন তারও সুযোগ দেওয়া উচিত। আত্ম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর পাঁচ জনের মত সহজ সরল সামাজিক জীবন যাপনের সুযোগ না দিতে পারলে সমাজের এই সব ব্যক্তিকে স্বাভাবিক করে তোলা সম্ভব নয়।

কে. কে. সরকার

১১ পৃষ্ঠার পর

বাড়ীগুলি রক্ষনাবেক্ষণ ও এগুলির উন্নয়ন ইত্যাদির দায়িত্বও তাদেরই। কেউ যদি নিজে বাড়ী তৈরি করতে চান তাহলে সমিতি বাড়ীর নক্সা তৈরি করে নির্মাণ করার ভারও নেন। এরা সদস্যদের কাছে বিক্রী করার জন্য একটি পরিবারের বাসোপযোগী বাড়ী তৈরি করে দেন। ১৯৫৬ সালে এই সমিতিগুলি একটি পরিবারের বাসোপযোগী দশ হাজারেরও বেশী বাড়ী তৈরি করেছেন।

সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতির সদস্যরা নিজেরা সমিতির কাজকর্ম চালান না। একটি নির্বাচিত কার্য্যনির্বাহক কমিটি এবং একটি নির্বাচিত পরিচালনাকারী কমিটি সমিতির কাজকর্ম দেখেন বাড়ী তৈরির কাজ পরিদর্শন করেন। সাধারণত: সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতির কার্য্যনির্বাহক কমিটিতে তিন জন সদস্য থাকেন। সমিতির আইন অনুযায়ী তাঁরা নির্বাচিত ও নিযুক্ত হন। সদস্যদের সাধারণ সভায় পরিদর্শনকারী বোর্ডের অন্ততঃপক্ষে তিনজন সদস্য নির্বাচিত হন।

(ইংরেজী যোজনায় প্রকাশিত মূল প্রবন্ধের অনুবাদ)

সাধারণ অসাধারণ

বাংলার কৃতী ইঞ্জিনীয়ার

ভারতে ও পাশ্চাত্যে দীর্ঘকাল গবেষণা করার পর ইঞ্জিনীয়ার শ্রীডি. কে. ব্যানার্জী প্লাস্টিক ও পলিথিনের সাহায্যে নলকূপের স্ট্রেনার ও পাইপ তৈরির এক অভিনব কৌশল আবিষ্কার করেছেন। বর্তমানে নলকূপের জন্য যে পিতলের স্ট্রেনার ও ধাতব শ্রেণীর জি. আই. পাইপ ব্যবহার করা হয়, শ্রী ব্যানার্জীর আবিষ্কৃত স্ট্রেনার ও পাইপ তার তুলনায় অনেক বেশী শক্তিসম্পন্ন ও দীর্ঘস্থায়ী। দ্বিতীয়তঃ শ্রীব্যানার্জীর আবিষ্কৃত স্ট্রেনার ও পাইপের দামও অপেক্ষাকৃত আরও কম। সুখের বিষয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রথম এই আবিষ্কারকে স্বাগত জানিয়েছে। শ্রীব্যানার্জীর আবিষ্কৃত পদ্ধতি ঐদেশে গ্রহণও করা হয়েছে।

বর্তমানে নলকূপের জন্য পিতলের স্ট্রেনার ও জি. আই. পাইপের ব্যবহার প্রচলিত এবং ৭৫ মীটার গভীর নলকূপ বসাবার জন্য আনুমানিক ব্যয় হয় ১,৩১৬ টাকা। কিন্তু পিতলের স্ট্রেনার দীর্ঘস্থায়ী নয়। রাসায়নিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে ঐ স্ট্রেনার তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় এবং সেগুলি ৫/৬ বছর অন্তর বদলাতে হয়। তা ছাড়া ইদানীং ধাতুর দাম ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় জি. আই. পাইপের দামও বাড়তির দিকে।

শ্রীব্যানার্জী তাঁর পদ্ধতিতে প্লাস্টিকের স্ট্রেনার এবং বেশ টেঁকসই প্লাস্টিক ও পলিথিনের পাইপ ব্যবহার করেছেন। তাঁর তৈরী স্ট্রেনারটি জালের আবরণে ঢাকা। ধাতব না হওয়ার দরুণ কোনোও প্রকার রাসায়নিক সংমিশ্রণ বা লবণাক্ত জলে ঐ নতুন স্ট্রেনার বা পাইপের ক্ষতি হবে না। এই নতুন আবিষ্কারের একাধিক গুণ আছে। যথা—পরিষ্কার জল উঠবে, জল তোলার জন্য বেশী জোর দিতে হবে না। ৫/৬ বছর অন্তর এগুলি বদলাবার প্রয়োজন হবে না। ধাতব স্ট্রেনার ও জি. আই. পাইপের তুলনায় প্লাস্টিকের বিকল্প অনেক বেশী শক্তিসম্পন্ন ও দীর্ঘস্থায়ী। কেন্দ্রীয় সরকারের টেস্টিং হাউসের রিপোর্টেও এই দাবীর সত্যতা সমর্থন করা হয়েছে।

গত ২১শে ডিসেম্বর ২৪ পরগণা জেলার রাজপুর পৌরসভা এলাকায় সর্বসাধারণের জন্য শ্রীব্যানার্জী নিজের খরচে ঐ নতুন ধরনের একটি নলকূপ বসিয়েছেন।

শ্রীব্যানার্জী জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর নতুন ধরনের স্ট্রেনার ও পাইপ তৈরির একটি কারখানা চালু করতে চান।

আত্মনির্ভরশীলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

মহারাষ্ট্রের একটি গণ্ডগ্রামের কাহিনী। সেখানে পানীয় জল সরবরাহের একটি প্রকল্পকে কেন্দ্র ক'রে গ্রামের মানুষ কেমন ক'রে অন্যের সাহায্যপ্রার্থী না হয়ে নিজেদের সমস্যার সুরাহা নিজেরাই করেছেন তা'র ইতিবৃত্ত জানলে অনেকেই উৎসাহিত বোধ করবেন।

ধাপেওয়াড়া-কলেরজল প্রকল্পটিকে তাই অধ্যবসায় ও স্বনির্ভরতার প্রকল্প ব'লে অনেকে বর্ণনা করেছেন।

নাগপুর জেলার প্রায় একশো গ্রামের মধ্যে ধাপেওয়াড়া হ'ল একটা ছোট গ্রাম; মোট বাসিন্দার সংখ্যা তিনহাজারের বেশী হ'বে না। ধাপেওয়াড়ায় খাবার জলের বড় অনটন ছিল। গ্রামের মানুষগুলির দুর্দশা দেখে শিবরামপন্থ টিডকের প্রাণ কেঁদে উঠত। অশীতিপর বৃদ্ধ টিড়কে অবসর নেবার আগে পর্য্যন্ত শিক্ষকতা ক'রে এসেছেন। তাই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জলের কষ্ট দেখে তাঁর মনটা অস্থির হয়ে উঠত। শেষপর্য্যন্ত তিনি তাঁর সারাজীবনের সঞ্চয় এদের সেবায় দিতে মনস্থ করলেন এবং একটি জল-সরবরাহ প্রকল্পের সূত্রপাত করার জন্যে ১৫,০০০ টাকা দান করলেন। অচিরে মহারাষ্ট্র সরকার এই প্রকল্পের জন্যে সওয়া দু' লক্ষ টাকা মঞ্জুর করলেন। মহৎ কাজ মহত্তর কাজে প্রেরণা দেয়; অতএব ধাপেওয়াড়া গ্রাম পঞ্চায়েৎও ১০,০০০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ ক'রে ঐ প্রকল্পে দান করল। প্রকল্প চালু হ'ল। এখন জলের কোনোও কষ্ট নেই। গ্রামের প্রত্যেকে মাথাপিছু দিনে ১৫ গ্যালন পানীয় জল পান। তাছাড়া জল পেতে দূরেও কোথাও যেতে হয় না। শ্রী টিডকে অগ্রণী না হ'লে এই প্রকল্প বাস্তবক্ষেত্রে রূপায়িত হ'ত কি না সন্দেহ।

মাথার ঘাম ফ্যালো ক্ষেতের ফসল তোল

এই মন্ত্র হ'ল সর্দার তেজাসিং-এর সাফল্যের চাবীকাঠি। অমৃতসর জেলার ভানিনাপুর ডোগরাই অঞ্চলের বাসিন্দা তেজা সিং বলেন, "ফিরোজপুরের গম আর গুরদাসপুরের ধান সমগ্র পাঞ্জাবের পক্ষে পর্য্যাপ্ত। পাঞ্জাবে, এর বাইরে, যে গম ও ধান ফলানো হয় তা'তে দেশের বাকী রাজ্যগুলির চাহিদা মেটানো যায়।" তবে তিনি হুঁশিয়ার ক'রে দিয়েছেন, যে, নতুন ও উৎকৃষ্ট বীজ এবং আধুনিক কৃষিপদ্ধতি গ্রহণ না করলে এ আশা কাজে ফলবে না। আধুনিক কৃষিপদ্ধতি ও নবউদ্ভাবিত বীজগুলির প্রচুর সম্ভাবনা সম্বন্ধে এঁর গভীর আস্থা দেখে জাতীয় বীজ কর্পোরেশন দোআঁশলা ভুট্টাবীজ 'গঙ্গা-১০১' চাষের জন্যে তেজা সিংকে মনোনীত করেন।

তেজাসিং ১০ একর জমি বেছে নিলেন এই বীজের জন্য। বিধিমত চাষ ক'রে একর প্রতি তিনি নীট লাভ করলেন ৫২৫ টাকা। এটা একটা মস্তবড় কৃতিত্ব কারণ ভুট্টার ফসল তোলা হয় তিনমাসের মধ্যে; বছরও ঘুরতে লাগে না।

তেজাসিং বছরে তিনটি ফসল বোনেন এই ক্রমে—ভুট্টা-গম-ভুট্টা।

পল্লী অঞ্চল থেকে উন্নয়নের জন্য সম্পদ

ভি. করুণাকরণ

ভারতীয় অর্থনীতিতে পল্লী অঞ্চল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে আছে। কারণ ভারতের জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ আসে কৃষি থেকে। কাজেই প্রত্যক্ষভাবে পল্লীগুলিরই অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা মোটা ব্যয় বহন করতে হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থের সংস্থান করার উদ্দেশ্যে পল্লীগুলিকে বিশেষ করভার বহনে বাধ্য ক'রে রাশিয়া ও জাপান ইতিহাসে নতুন নজির সৃষ্টি করেছে। অধ্যাপক এন কালডারের মতে, "অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর করার ক্ষেত্রে কৃষিকরের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ কৃষির ওপর বাধ্যতামূলক কর ধার্য্য করা হলে কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ে।"

তবে দেখা যায় যে, অকৃষি তরফের তুলনায় কৃষি তরফটিতে করের পরিমাণ খুব কম। ডঃ বেদ গান্ধীর হিসেব অনুযায়ী ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৬০-৬১ সাল পর্য্যন্ত সময়ে কৃষি তরফে ১৭১৭ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হয়েছে। কিন্তু অতিরিক্ত করের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৯৮ কোটি টাকা। অপরপক্ষে ঐ একই সময়ে অকৃষি তরফে অতিরিক্ত আয়ের পরিমাণ ছিল ২,৪২০ কোটি টাকা, কিন্তু অতিরিক্ত করের পরিমাণ ছিল ৪৯৯ কোটি টাকা। ১৯৫৩ সালে ডঃ জন মাথাইর সভাপতিত্বে করব্যবস্থা অনুসন্ধানকারী কমিটি বলেন যে, "পল্লী অঞ্চলের করের তুলনায়, সহর অঞ্চলে আয়ের সমস্ত স্তরে করের পরিমাণ মোটামুটি বেশী। সহরাঞ্চলে অপ্রত্যক্ষ কর গ্রামাঞ্চলের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী। সহরাঞ্চলের আয়ের তুলনায় পল্লী অঞ্চলের উচ্চতর আয়ের ক্ষেত্রে কর বৃদ্ধির বেশী সুযোগ রয়েছে।"

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বিগত অধিবেশনে প্রধান মন্ত্রী, দেশের ভেতর থেকেই প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ করার ওপর জোর দেন। প্রতি বছর জাতীয় আয় যতটুকু বাড়ে তার একটা বড় অংশ গ্রামগুলি পায় এবং উন্নয়নমূলক কর্মপ্রচেষ্টার ফলে প্রগতিশীল যে কৃষকরা উপকৃত হচ্ছেন, বিশেষ ক'রে, তাঁদের আয় দ্রুত গতিতে বাড়ছে। এই অতিরিক্ত আয় সংহত করার কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা না থাকায়, এর বেশীর ভাগই অযথা ব্যয় করা হয় কিংবা তাঁরা সোনা রূপা কিনে টাকাটা আটকে রাখেন। মূল্যবান ধাতুর চোরা চালান, কালোবাজার, ফাঁপা বাজার ইত্যাদি অসামাজিক কাজকর্মেও তাঁরা অপ্রত্যক্ষভাবে উৎসাহ দেন। কাজেই কৃষিকে অধিকতর ভার বহন করতে আহ্বান জানানো উচিত। সুতরাং কৃষকদের এই অতিরিক্ত আয়ের কিছুটা অংশ কেটে দেওয়ার জন্য, পরিকল্পনা কমিশন যে আয়কর ধার্য্য করার পরামর্শ দিয়েছেন, তা একটা সৎ পরামর্শ।

পরিকল্পনাকালে নানাধরণের পল্লী অর্থসাহায্য সমবায় সমিতি, সমষ্টি উন্নয়ন, জলসেচ প্রকল্প ইত্যাদিতে অর্থ বিনিয়োগের ফলে পল্লীগুলিই মোটামুটিভাবে বেশী উপকৃত হয়েছে। শস্যের উচ্চমূল্যও কৃষকদেরই অনুকূল হয়েছে। এর ফলে কৃষি থেকে আয় ক্রমাগত বেড়েছে। কৃষিজাত সামগ্রীর পাইকারি দর, ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে, শতকরা ৯৩ ভাগ বেড়েছে অপরপক্ষে শিল্পজাত সামগ্রীর দর বেড়েছে শতকরা ৬২ ভাগ।

১৯৬০-৬১ সালে কৃষি আয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ৬,৯৫৪ কোটি টাকা। সাত বছরে কৃষি আয় বেড়ে ১২,০৫১ কোটি টাকা হলেও, প্রকৃত কর কমে গিয়ে ১০১ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এতেই বুঝতে পারা যায় পল্লী অঞ্চলে আয় এতো বাড়লেও তার ওপর কোন কর আরোপ করা হয়নি। ভারতে যে ৫১০ লক্ষ কৃষি আবাদ আছে সেগুলির শতকরা ২ ভাগের ওপরেও যদি কর আদায় করা হয় তাহলে তা থেকে বছরে ১৫০ কোটি টাকা আয় হতে পারে। দেশের পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য সরকার এখানে রাজস্বের একটা ভালো উৎস পেতে পারেন এবং এতে পল্লীগুলিও পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতন হবে।

রাষ্ট্রপতির শাসনাধীন বিহার সরকার কৃষি আয়ের ওপর কর নির্দ্ধারণ সম্পর্কে সর্ব্বপ্রথম আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন। ব্যবসা কর সম্পর্কিত কমিশনের একটি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, কৃষি থেকে বার্ষিক ৩,০০০ টাকার বেশী আয়ের ওপর আয়কর ধার্য্য করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুনিশ্চিত জলসেচ সম্পন্ন তিন একর, অর্দ্ধনিশ্চিত জলসেচ সম্পন্ন ১০ একর এবং জলসেচবিহীন ১৫ একর পর্য্যন্ত জমি করবহির্ভূত রাখা হয়েছে। এই সম্পর্কে মূলনীতি হ'ল, যে কৃষক বেশী ফলনের শস্য উৎপাদন করেন, তিনি সুনিশ্চিত জলসেচসম্পন্ন প্রতি একর জমি থেকে বছরে মোটামুটি ২০০০ টাকা আয় করেন। শতকরা ৫০ ভাগ উৎপাদন ব্যয় ইত্যাদি বাবদ বাদ দিলে তাঁর নীট আয় থাকবে ১,০০০ টাকা। তবে বিহার সরকার এই কর থেকে প্রকৃতপক্ষে কি পরিমাণ অতিরিক্ত আয় করতে পারবেন তার হিসেব করা হয়নি। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো রাজস্বের পরিমাণ বেশী হবেনা কিন্তু কৃষি থেকে বছরের পর বছর যেমন আয় বাড়তে থাকবে তেমনি রাজস্বের পরিমাণও বাড়বে।

অন্য কয়েকটি রাজ্যও কৃষিজাত আয়ের ওপর কর ধার্য্য করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে পরিমাণ রাজস্ব সংগৃহীত হয়েছে তা খুবই অল্প। বর্ত্তমান আর্থিক বছরে কৃষি আয়কর থেকে আনুমানিক মোট যে রাজস্ব সংগৃহীত হবে তা ১২ কোটি টাকার বেশী হবেনা, দেশের মোট রাজস্ব যেখানে ১,৬৯৮ কোটি টাকা সেখানে এটা অতি ক্ষুদ্র একটা অংশ।

এর পর ২০ পৃষ্ঠায়

পরিবহন ব্যবস্থার বিকাশের সম্ভাবনা ও তার দু' একটি দিক

মোহিত কুমার গাঙ্গুলী

দেশের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সহজ, সুলভ ও সাধারণের উপযোগী পরিবহণ ব্যবস্থার প্রসার হচ্ছে, ততদিন পর্য্যন্ত, জনসাধারণের বৃহৎ একটি অংশ জাতীয় জীবনের কর্ম্মস্রোত থেকে অনেকখানি বিচ্ছিন্ন থেকে যাবে। পরিবহণ ও যোগাযোগের বিভিন্ন সাধনগুলির মধ্যে সমন্বয় বিধানের দ্বারাই কেবল এই বিচ্ছিন্নতার ব্যবধান দূর করা সম্ভব।

যে কোন দেশের জাতীয় উৎপাদনের সুষম বন্টন কেবলমাত্র উপযুক্ত পরিবহণ ব্যবস্থার মাধ্যমেই সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারে। তাছাড়া অর্থনৈতিক কাঠামো মজবুত ক'রে তোলার জন্যও উপযুক্ত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রয়োজন। কিন্তু পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপযুক্ত বিকাশের জন্য যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন এবং তা বেশ ব্যয়সাধ্য।

কতকগুলি ক্ষেত্র আছে যেখানে বিশেষ ধরণের পরিবহণের বিকাশ অত্যন্ত জরুরী অথচ এমন জায়গাও দেখা যায় যেখানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিবহণের ব্যবস্থা রয়েছে। অতএব পরিবহণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে দূরদৃষ্টি প্রয়োজন।

যানবাহন মূলত: কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট পথেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চলাচল করে। হিসেব ক'রে দেখা গেছে যে আমাদের দেশে যত রাস্তা এবং রেলপথ আছে তার মধ্যে শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ রাস্তা বা রেলপথেই শতকরা ৭০ ভাগ মালপত্র বাহিত হয়। সুতরাং এতেই বোঝা যায় যে সামান্য ১৫ থেকে ২০ ভাগ রাস্তা বা রেলপথ সবচাইতে বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এই ব্যবহার ক্রমশ: বেড়ে চলেছে। পরিবহণ বিকাশের খরচ এই সমস্ত পথে মাইল অনুপাতে অনেক বেশী। আপাতদৃষ্টিতে অনেক সময় অনেকের কাছে মাত্র এই কয়েকটি 'রুটে' পরিবহণের পর্য্যাপ্ত বিকাশ নিরর্থক মনে হতে পারে কিন্তু দেশ ও দশের চাহিদার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে গেলে এই ধরণের বিকাশের অপরিহার্য্যতা অবজ্ঞা করা চলেনা বা করা উচিত নয়। পরিবহণ বিকাশের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা অনেকেই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন যে পরিবহণ-পরিকল্পনায় "স্থানীয়" প্রয়োজনের সঙ্গে "জাতীয়" প্রয়োজনের ওপরেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে একটি রাজ্য থেকে মালপত্র দূরের অন্য একটি রাজ্যে নিয়ে যেতে হলে হয়তো অন্য আর একটি রাজ্যের ওপর দিয়ে যেতে হয়। এই রাজ্যটিতে হয়তো যাত্রী বা মালপত্র পরিবহণ করার জন্য উপযুক্ত রাস্তা ঘাট নেই। কিন্তু সেই রাজ্যের মধ্য দিয়েও যাতে অন্য রাজ্যের যাত্রী ও মালপত্র সোজাসুজি চলে যেতে পারে তার জন্য রাস্তাঘাট সংরক্ষণ করা ইত্যাদির দায়িত্ব সেই রাজ্যের ওপরেই থাকে। সেখানে স্থানীয় স্বার্থের পরিবর্ত্তে জাতীয় স্বার্থের বিশেষ দাবি স্বীকৃত।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবহণের চাহিদার রূপও বদলে যাচ্ছে। অতীতে বিদেশী শাসন দেশের পরিবহণ ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। সে সময়ে দেশ থেকে কাঁচামাল রপ্তানী হত এবং বিদেশ থেকে তৈরি মাল আমদানি করা হত। ফলে বিভিন্ন বন্দরকে কেন্দ্র ক'রে ব্যবসা বাণিজ্যের পরিসীমা ক্রমশ: বিস্তৃত হয়েছে। বহির্বাণিজ্যের প্রাধান্য পরিবহণের ওপর তার ছাপ ফেলবে সেটা স্বাভাবিক, কারণ সেই সময়ে আন্তর্বাণিজ্যকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার কোন জোরালো প্রচেষ্টা ছিলনা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে বিহার ও ওড়িষ্যার খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি অনেক ক্ষেত্রেই বাংলা ও সন্নিকটবর্ত্তী শিল্পাঞ্চলগুলির সঙ্গে যথোপযুক্তভাবে সংযুক্ত নয়। এ যাবৎ ঐ অঞ্চলগুলি পৃথকভাবে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু এখন ধীরে ধীরে বাংলা বিহার ও ওড়িষ্যা একটা সুসংবদ্ধ ও স্থায়ী পরিবহণ কাঠামোর মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে যোগসূত্র সুদৃঢ় ক'রে তুলছে। এই রকমভাবে দেশের অন্যত্রও আন্তর্বাণিজ্যের বিকাশ পরিবহণের মানচিত্রে নতুন নতুন শাখা প্রশাখা বিস্তার করছে। পরিবহণের এই বিকাশের মাধ্যমে আমরা পরস্পরকে চেনবার ভালোভাবে জানবারও সুযোগ পাচ্ছি।

বর্ত্তমানে আরও একটা সুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে একটা সামগ্রিক বা সর্ব্ব ভারতীয় পরিবহণ ব্যবস্থার চাহিদা ক্রমশ: সোচ্চার হয়ে উঠছে। উদাহরণ হিসেবে প্রথমে রাস্তা তৈরির কথাই ধরা যাক। কিছুদিন পূর্ব পর্য্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী রাস্তাগুলি ঠিকমত সংযুক্ত ছিলনা। একটি রাজ্য যদি নিজেদের অংশের রাস্তা মজবুত ও সুদৃঢ়ভাবে গড়ে তোলে তো পাশের রাজ্যটি বোঝাপড়ার অভাবে হয়তো নিজেদের অংশ যথোপযুক্তভাবে তৈরি করলনা। বোঝাপড়ার অভাবে অর্থের অপচয়ের দিকটা ধীরে ধীরে যত পরিষ্কার হয়ে উঠতে লাগলো ততই সামগ্রিক পরি-

বহণ পরিকল্পনার দাবী সুদৃঢ় হতে লাগল। যাঁরা কোন বন্দরের বিকাশ পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত তাঁরা অনেকেই জানেন যে এক সময়ে ভারতের প্রায় প্রতিটি বড় বন্দর দাবি করেছিল যে তারা প্রত্যেকেই লৌহ আকর রপ্তানীর ব্যবস্থা করতে পারে. তবে, সেইজন্যে বন্দরগুলির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন প্রয়োজন।

আঞ্চলিক প্রয়োজন ছাড়াও যে সর্বভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই কাজটা বিচার করা প্রয়োজন তা ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগলো। পরস্পরের দাবির মধ্যে বোঝাপড়ার প্রয়োজন অনুভূত হল এবং ধীরে ধীরে একটি সর্বভারতীয় পরিকল্পনার চাহিদা বাড়তে লাগলো। শুধু বন্দরের মধ্যেই এই সমস্যা সীমাবদ্ধ নয়। রেলপথ মোটরপথ, জলপথ সবক্ষেত্রে দূরদৃষ্টি প্রয়োজন। যেমন, যেখানে রেললাইন তৈরি করা প্রয়োজন সেখানে সড়ক তৈরির বড় প্রকল্প অপ্রয়োজনীয়। কিংবা জলপথে পরিবহণ যেখানে অল্পব্যয়সাধ্য সেখানে অন্য ব্যবস্থা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। অনেক জায়গায় রেললাইন তুলে নিয়ে, ভালো রাস্তা তৈরি ক'রে দেওয়া যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হচ্ছে।

অনেক সময় দেখা গেছে, স্থানীয় স্বার্থে, একই রাজ্যে পরিবহণ ও যোগাযোগের এত কর্মসূচী এক সঙ্গে নেওয়া হয়েছে যে কোনটিই আর শেষ হতে চায়না। আমাদের সামর্থ্য সীমিত এবং সেই সামর্থ্যটুকুও যদি আমরা অধিকাংশকে খুসি করার জন্য নিয়োগ করতে ইতস্তত: করি তাহলে তা অনুচিত হবে। এই সহজ সত্যটি যত তাড়াতাড়ি আমরা মেনে নিতে পারবো, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল।

একটু অনুধাবন করলে বোঝা যাবে যে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে পরিবহণের অভাব ছিল প্রচুর এবং অর্থের সামর্থ্য সে তুলনায় ছিল খুবই অল্প। অভাব এত প্রকট ছিল যে অনেক সময় ওপর ওপর মানচিত্র দেখেই বলে দেওয়া যেতো যে প্রধান পরিবহণ ব্যবস্থার কোথায় কোথায় বিশেষ রকমের দুর্বলতা রয়েছে। অনেক সময় এমনও দেখা গেছে যে, প্রয়োজন হলে বড় বড় রাজপথগুলির উপর সেতু তৈরি করার মত পর্যাপ্ত অর্থের সংকুলান ছিল না। তার ফলে তৈরি হয়ে আছে এমন রাস্তা, সেতুর অভাবে ঠিকমত কার্যকরী হতে পারছে না। যোগাযোগের বা পরিবহণের কাঠামোর ক্ষেত্রে এক জায়গার উদ্বৃত্ত, অন্য জায়গার প্রয়োজনে সহজে লাগানো যায় না। উদ্বৃত্ত অর্থ জমিয়ে রাখবার ও উপায় নেই। ক্রমশ: অবশ্য এই ধরনের অতি প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলির অনেকখানি সমাধান হয়েছে। এখন সমস্যার রূপ অন্যরকম দাঁড়িয়েছে। সব-দেশেই পরিবহণের অর্থনৈতিক দিকের পরিপ্রেক্ষিতে লরী, মালগাড়ী, জাহাজ ও বিমানের আকার বেড়ে চলেছে। অতএব, বহু বছর পূর্বের তৈরি বন্দর, রাস্তা ইত্যাদি সামঞ্জস্য রাখতে পারছে না। সেগুলির যথেষ্ট উন্নতি প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোন বন্দরটির আয়তন বড় করা উচিত, কোন রেলওয়ে লাইনগুলির বৈদ্যুতিকীকরণ বা ডিজেলীকরণ জরুরী, কোন রাস্তাগুলি বেশী মজবুত ও চওড়া করার বিশেষ প্রয়োজন তা স্থির করতে হবে। অর্থাৎ 'আপেক্ষিক গুরুত্ব বিচার' পরিকল্পনার একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্বে, না হলেই নয় গোছের অনেক দাবী তোলা হত যা প্রমাণ করার জন্য বিশেষ কোন অনুশীলনের প্রয়োজন হতো না। এখন দাবীর রূপ ঠিক সে রকম নেই। এখন অর্থের বিনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে কী ধরনের সুযোগ সুবিধা কোন পরিবহণের মাধ্যমে কী ভাবে পাওয়া যাবে, কী ক'রে সুলভে ও অল্প আয়াসে পরিবহণের কোন মাধ্যমকে সর্বাধিক উপকারে আনা যাবে তা বিচার ক'রে দেখতে হচ্ছে।

পরিবহণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলেই আজকাল একটা বিষয় এসে পড়ে—সেটা হ'ল 'পরিবহণ প্রতিযোগিতা।' বিষয়টি জটিল। পরিবহণের বিভিন্ন সাধনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দেশ ও জাতির সেবায় সেগুলি নিয়োজিত। সাধারণের মনে যে প্রশ্নটা জাগে সেটা হ'ল দাবী বা চাহিদা অনুযায়ী পরিবহণের বিকাশ সাধন হবে সেটাই ত স্বাভাবিক, এতে করার কি আছে? মাথা ঘামাবার সত্যিই হয়ত কিছু থাকতো না যদি না বিশেষ কোন পরিবহণের ওপরে কোন রকম বিশেষ দায়িত্ব না থাকতো। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে উপযুক্ত ভাড়া দিলে রেল কর্তৃপক্ষ মাল বা যাত্রী নিয়ে যেতে বাধ্য। উপযুক্ত ভাড়ার হারও তাঁরা সর্ব সাধারণকে জানাতে বাধ্য। লরির বেলায় এ ধরণের দায়িত্ব নেই। এই রকম আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে, যা থেকে সহজেই বোঝা যায়, যে জাতীয় স্বার্থে আমরা সব কটি মাধ্যমকে ঠিক সমান দায়িত্ব দিই নি। আর এই অসমতাকে কেন্দ্র ক'রে পরিবহণের বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে সমন্বয় আনার সমস্যা ক্রমশ: জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। বিভিন্ন দেশ বিভিন্নভাবে এই সমস্যা সমাধানের পথে এগিয়ে চলেছে। কেউ পরিবহণের বিশেষ ক্ষেত্রের ওপর কোন রকম বিশেষ দায়িত্বের বোঝা চাপাতে চাইছেন না এবং পরিবহণের সব কটি সাধনকে সমান পর্য্যায়ে এনে প্রত্যেকটিকে সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করছেন। আবার কেউ কেউ বলছেন যে পরিবহণের সব কটি মাধ্যমকে বিশেষ দায়িত্ব থেকে মুক্ত করা সমীচীন হবে না। তবে সেই অজুহাতে অন্য পরিবহণগুলির ওপর যে অন্যায় বাধা নিষেধ আরোপ ক'রে তার পালটা নিতে হবে সেটাও যুক্তিযুক্ত নয়।

ছোট খাটো দেশগুলিতে এই সমস্যা অনেক সময় বেশ জোরালোভাবে দেখা দিয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দেশ বিশাল এবং এখানে পরিবহণের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের সুযোগ সুবিধা এখনও পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে।

পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম সামগ্রী

ভারতে পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম সামগ্রী আমদানি করার জন্য গত তিন বছরে যে ব্যয় করা হয়েছে তা হল: ১৯৬৬: ৫১.৩১ কোটি টাকা; ১৯৬৭: ৩৯.৬৭ কোটি টাকা; ১৯৬৮: ৪০.৭৩ কোটি টাকা এবং ১৯৬৯ (জানুয়ারি-এপ্রিল): ৯.১৪ কোটি টাকা।

বেসরকারী তরফের ভূমিকা

৯ পৃষ্ঠার পর

সংহত শিল্পগুলি, স্থানীয় সমাজের জনগণের জীবন ও সমস্যার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে, তাঁদের সেবা ও সাহায্য করার জন্য নিজেদের সম্পদ, জ্ঞানবুদ্ধি যথাসম্ভব নিয়োজিত ক'রে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান যোগাতে পারে। যে সব সরকারী বা বেসরকারী কারখানা গ্রামে স্থাপন করা হয়েছে, সেগুলি, তাদের চতুর্দিকে ছড়ানো গ্রামগুলির অধিবাসীদের জীবনযাত্রা উন্নততর করা সম্পর্কে, যেখানে দুঃখ দুর্দ্দশা আছে তা দূর করার জন্য, বেকারদের কর্ম্মসংস্থানের জন্য এবং যাদের সাহায্যের প্রয়োজন তাদের সাহায্য করার জন্য অনেক কিছু করতে পারে। আমাদের দেশে এমন কোন গ্রাম নেই যার কোন না কোন উন্নয়নের প্রয়োজন নেই। একটা স্কুল, একটা হাসপাতাল, ভালো একটা রাস্তা, আরও কয়েকটা কুয়ো, পাম্প, পাইপ, সিমেন্ট এবং সর্ব্বোপরি চাকরীর সুযোগ, কোন না কোন কিছুর প্রয়োজন আছেই। একটা কারখানায় যে শ্রমিক বা কর্ম্মীরা কাজ করেন তাঁদের ও তাঁদের পরিবারের পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাইরে থেকে না এনে আশ-পাশের গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা যায়। গ্রামের ছুতোর, কামার, মিস্ত্রীদের দিয়ে তৈরি করিয়ে নানা রকম জিনিস কার-খানায় ব্যবহার করা যায়। গ্রামে যে সব শিল্প স্থাপিত হয়েছে সেগুলিই তাদের চতুর্দ্দিকের গ্রামগুলির উন্নয়নের ভার নিক। কারখানার ম্যানেজার, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞগণ গ্রামবাসীদের সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য এবং গ্রামবাসী ও কারখানার মিলিত উদ্যোগে যে সব উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নেওয়া হবে সেগুলি পরিদর্শন করার জন্য, তাঁদের কিছুটা সময় ব্যয় করুন। এগুলির কোনটাই অবশ্য দান বা খয়রাত হিসেবে ধরা উচিত নয়। কোন সময়ে বিনামূল্যের সেবা বা আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন হলেও এই সব কর্ম্মপ্রচেষ্টা পল্লীবাসী ও কারখানার সমবায়মূলক প্রচেষ্টা হিসেবে ধরা উচিত এবং তাই হওয়া উচিত। এই রকম যুক্ত প্রচেষ্টার প্রাথমিক উপকারগুলি পল্লীবাসীরাই ভোগ করবেন সন্দেহ নেই কিন্তু চতুর্দ্দিকের পরিবেশ যদি সুস্থ থাকে, পল্লীবাসীরা যদি সুখে ও শান্তিতে থাকেন, তাঁরা যদি সমৃদ্ধ হন তাহলে তাতে কারখানারই লাভ।

আমার যৌবনে আমি স্বপ্ন দেখতাম যে দ্রুত উন্নয়নশীল ভারত, আমার জীবন-কালেই দারিদ্র্য, দুঃখ ও অজ্ঞতা থেকে ব্যাপক সমৃদ্ধির যুগে পৌঁছুতে পারবে, সেই স্বপ্ন ক্রমশঃ ম্লান হয়ে আসছে। তবে আমরা যতই হতাশা অনুভব করিনা কেন, এমন একদিন নিশ্চয়ই আসবে যেদিন ভারত তার বহু শতাব্দী ব্যাপি পরিশ্রম, ধৈর্য ও ত্যাগের সুফল ভোগ করতে পারবে।

(১৯৬৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর, মাদ্রাজ পরিচালনা সমিতির, ব্যবসায়ে নেতৃত্বমূলক শিক্ষাক্রমের পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে অনন্তরামকৃষ্ণ স্মারক বক্তৃতা। যোজনায় প্রকাশিত মূল প্রবন্ধের অনুবাদ।)

চারটি নতুন ধানের বীজ

কটকের কেন্দ্রীয় চাউল গবেষণাসংস্থায় ১৫০ ধরণের ধান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এর মধ্যে কয়েক ধরণের ধান প্রচুর ফলনশীল হতে পারে বলে আভাষ পাওয়া গেছে।

এগুলির মধ্যে একটি জাত তাড়াতাড়ি পেকে ওঠে। খারিফ মরসুমে ৮৫ দিনে ফসল পেকে ওঠে এবং রবি মরসুমে ৯৫ দিনে। সেই তুলনায় পদ্মার বীজ পাকতে ১০০ দিন, তাই নান-১ এর বীজ পাকতে ১১৫-১২০ দিন এবং আই আর-৮ এর বীজ পাকতে লাগে ১২৫ দিন।

এই নতুন জাতের বীজটিতে চট করে পোকা লাগে না অথবা কোনোও রোগ ধরে না। এই জাতের ধানও সরু, তাই-নান-১ বা আই আর-৮ এর মত নয়। তা ছাড়া তাই নান-১ এর উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৪ টন হলে নতুন বীজের পরিমাণ হেক্টর প্রতি দাঁড়ায় ৫-৬ টন।

কুমারটুলীর শিল্পী

১৮ পৃষ্ঠার পর

ধরা হয়েছে)। শতকরা ২৫ ভাগ মৃৎ-শিল্পী একটু সম্পন্ন অবস্থার; তাঁরা ধার না ক'রে নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে পারেন।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক মৃৎশিল্পীদের ঋণের প্রয়োজন মেটাবার যে পরিকল্পনা নিয়েছে তা আগামী সরস্বতী পূজার মরসুম থেকে কার্যকরী হবে। যে সব মূর্ত্তি এখন গড়া হবে সেগুলির আনুমানিক মোট বিক্রয়-মূল্যের শতকরা ৭৫ ভাগ পর্যন্ত মৃৎশিল্পী-দের ধার দেওয়া হবে।

গত কয়েক মরসুমে কত টাকার মূর্ত্তি বিক্রী হয়েছে সে সম্বন্ধে মৃৎশিল্পী সংস্কৃতি সমিতির সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে এ বছরের মোট সম্ভাব্য বিক্রীর আনুমানিক পরিমাণ স্থির করা হয়েছে। নতুন পরিকল্পনাতে এই সমিতির গ্যারান্টি অনুযায়ী এবং কাঁচা মাল ও তৈরি মূর্ত্তির মোট মূল্যের অংশ-বিশেষ জামীন রেখে তিন মাসের মেয়াদে অল্প সুদে মৃৎশিল্পীদের টাকা ধার দেওয়া হবে।

ঋণের সর্ত্তাদি নিরূপণ, অনুমোদন ও ঋণ প্রদানের সমস্ত কাজ তদারক করে কুমারটুলির কাছাকাছি ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের হাটখোলা শাখা। এ পর্যন্ত ঐ শাখা এক লক্ষ টাকার ৮১টি ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে মৃৎশিল্পী সমাজের কাছ থেকে বেশ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

★ দুর্গাপুরের সেন্ট্রাল মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে একটা নতুন কীট-নাশক স্প্রেয়ার তৈরী হয়েছে। এটি 'ন্যাপ স্যাক্' শ্রেণীর কিংবা হালকা পেট্রোল চালিত স্প্রেয়ার থেকে আলাদা। এটি তৈরী করতে খরচ পড়ে ৫০০ টাকার মত। এটি পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয়। এই যন্ত্রটি গুদামঘরে, নানাপ্রকার খাদ্য উৎপাদনের কারখানায়, অফিসে, শাকশব্জীর বাগানে এবং চা, তামাক, পাট ও আখের ক্ষেতে ভালোভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে।

ভি. করুণাকরণ

১৬ পৃষ্ঠার পর

তাছাড়া এই রাজস্বেরও বেশীর ভাগই চা বাগান ইত্যাদি যৌথ প্রতিষ্ঠান থেকে আসে। আস্তে আস্তে বেশী হারে যদি কৃষি আয়কর বাড়ানো যায় তাহলে রাজ্যগুলি যে বেশ কিছু পরিমাণ অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারবে তাতে সন্দেহ নেই।

চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী ভূমি রাজস্বই হল সব রকম করের মধ্যে প্রাচীনতম এবং কৃষি জমির ওপর তাই হ'ল সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কর। ১৯৫১-৫২ সালে, রাজ্যগুলির বাজেটে আয়ের ক্ষেত্রে ভূমি রাজস্বেরই পরিমাণ ছিল শতকরা ১২ ভাগ। তার পর থেকে এই আয় ক্রমানুয়ে হ্রাস পেয়ে ১৯৬৮-৬৯ সালে রাজ্যগুলির বাজেটে তার পরিমাণ দাঁড়ায় শতকরা মাত্র ৪.২ ভাগ। বিহার এবং কেরালার মতো কয়েকটি রাজ্য সম্পূর্ণভাবে বা অংশত: ভূমি রাজস্ব বিলোপ করছে বলে এই সূত্র থেকে আয় আরও কমে যেতে পারে। কাজেই কৃষকদের যে জলকর দিতে হয় তা সংশোধন করার যথেষ্ট যুক্তি আছে। এই সম্পর্কে নিজলিঙ্গাপ্পা কমিটির সুপারিশগুলি বিশেষভাবে বিবেচনা ক'রে দেখার যোগ্য।

মোটামুটিভাবে দেখতে গেলে কৃষকরা প্রত্যক্ষভাবে যে কর দেন সেইটেই শুধু কৃষি কর নয়, তারা অপ্রত্যক্ষভাবে যে সব করের ভার বহন করেন সেগুলিও কৃষি করের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কৃষকদের ওপর অপ্রত্যক্ষ যে কর ভার রয়েছে সেগুলির মধ্যে ষ্ট্যাম্প এবং রেজিষ্ট্রেসনের ব্যয়টা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। আবগারি কর কেন্দ্রীয় সরকার আরোপ করেন এবং তাঁরাই সংগ্রহ করেন। রাজ্যগুলিও কতকগুলি আবগারি কর সংগ্রহ করেন। রাজ্যের অর্থভাণ্ডারে সাধারণ বিক্রয় কর একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে। আমদানী কর এবং মোটর গাড়ীর করও অপ্রত্যক্ষভাবে পল্লীর জনসাধারণকে খানিকটা বহন করতে হয়।

অনেকেই মনে করেন যে পল্লীবাসীরা তাঁদের সঞ্চয়ের বেশীর ভাগই উৎপাদনবিহীন সম্পদে পরিণত করেন। ব্যাঙ্কে খুব কম টাকাই রাখা হয়। উপযুক্ত ব্যবস্থাদির মাধ্যমে এই সঞ্চয়টা আকর্ষণ করার যথেষ্ট সুযোগ ব্যাঙ্কগুলির রয়েছে।

পল্লীঅঞ্চল থেকে সম্পদ সংগ্রহ করাটা অবশ্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ওপরেই নির্ভর করবে। কিছু সংখ্যক অর্থনীতিক অবশ্য বিশ্বাস করেন যে কৃষি উৎপাদন যে হারে বাড়ছে তাতে পল্লী অঞ্চলের সম্পদ সংগ্রহ করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। একথা অবশ্য সত্য যে বেশী ফলনের শস্যের চাষ বেড়ে যাওয়াতে উৎপাদন বেড়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষি জমির বেশীর ভাগই এখনও বর্ষার খামখেয়ালীর ওপর নির্ভরশীল। আধুনিক কৃষি সরঞ্জাম, সার, বীজ ইত্যাদি, কৃষকদের সরবরাহ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পল্লী অঞ্চল থেকে অবিলম্বে যথেষ্ট সম্পদ সংগ্রহ করা সম্ভব না হলেও, সরকারী সাহায্যে কিছু পরিমাণ ধনী কৃষক যে বিপুল আয় করছেন উপযুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে তার কিছুটা অংশ সংগ্রহ করা যেতে পারে।

চালকবিহীন ট্র্যাক্টার

যুক্তরাজ্য অর্থাৎ সাধারণের ভাগার বিলেতের, ফার্ণবোরোর অটোট্রাক সীসটেম লিমিটেড বিশ্বের প্রথম চালকবিহীন ট্র্যাক্টর উদ্ভাবন করেছে।

এই ট্র্যাক্টর চালনার মূলে যে পদ্ধতি আছে তা হ'ল এই রকম। একটা সাধারণ ট্র্যাক্টারে একটি বিশেষ ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্র বসানো হয় যেটি ট্র্যাক্টরটিকে ঠিক পথে চালাবার জন্য চালক যন্ত্রটিকে নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশ আসে ভূগর্ভে প্রোথিত তারের একটি 'গ্রীড' থেকে। মাটির তলায় পাতা আর একটা তার, সংকেতে ট্র্যাক্টরের নানান যন্ত্রাংশ তোলা ও নামানোর নির্দেশ দেয়। এমন কি ট্র্যাক্টর ক্ষেতের সীমানায় পৌঁছুলে, তারের মাধ্যমে প্রেরিত সঙ্কেতে ট্র্যাক্টরটি থেমে যায়। তাই কোনোও ব্যক্তিগত তদারকি ব্যতিরেকেই ট্র্যাক্টরের কাজ পুরোপুরি হয়ে যায়।

★ ১৯৬৯-৭০ সালের মূলধনী বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তর দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশনকে এক কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। এই নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এ পর্যন্ত কর্পোরেশনকে মোট ৫৫'০৯ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন।

★ রপ্তানী বাড়ানো ও আমদানী কমানোর ফলে, এ বছরের শুরুতে ভারতের, সোনা নিয়ে, মোট ৬০০ কোটি টাকার সমান বৈদেশিক মুদ্রা জমা রয়েছে। গত দশকের মধ্যে এই প্রথম বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারে এত অর্থ জমেছে। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল থেকে টাকা তোলার নতুন যে প্রকল্প ১লা জানুয়ারী থেকে চালু হয়েছে, সেই অনুযায়ী ভারত তার বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারে ৯৭'৫ কোটি টাকার সমান জমা দিয়েছে। এর শতকরা ৭৫ ভাগ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে ব্যয় করা যেতে পারে। বাকীটা তুলে নিলে সেটা ফেরৎ দিতে হবে জমার খাতায়।

পাঠক-পাঠিকা সমীপেষু—

ধনধান্যে-র উত্তরোত্তর উন্নতির জন্যে আপনাদের সক্রিয় সহযোগীতা অপরিহার্য্য। লেখা দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে ও বন্ধুমহলে ধনধান্যে-কে পরিচিত করিয়ে আমাদের উৎসাহিত করুন।

ইঞ্জিনীয়ারিং-এর টুকিটাকি

হাইড্রলিক প্রেস ব্রেক

আজকাল আমাদের দেশে ৫০০ মেট্রিক টন পর্য্যন্ত শক্তির হাইড্রলিক প্রেস ব্রেক বহু পরিমাণে তৈরি হচ্ছে। ভারতে প্লেট এবং বার ওয়ার্কিং মেসিনের প্রধান উৎপাদক স্কটিশ ইণ্ডিয়ান মেসিন টুলস্ লিঃ (সিম-টুলস্) এখন, ৫০০ মেট্রিক টন পর্য্যন্ত শক্তির এই ব্রেক সরবরাহ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এঁরাই সর্ব্বপ্রথম এই দেশে এই ধরণের ব্রেক উৎপাদন করেছেন।

সিমটুলস্ বিভিন্ন শক্তির মেকানিক্যাল ও হাইড্রলিক প্রেস ব্রেক তৈরি করেন। তারা এই ধরণের প্রেস ব্রেকের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজ সরঞ্জামও উৎপাদন করেন।

মেসিনে যাতে বেশী লোড না হয়ে যায় তা প্রতিরোধ করার ব্যবস্থাও এই প্রেস ব্রেকে রয়েছে কাজেই কোথাও কোন ভুল হলেও এই প্রেস সেই ভুল সংশোধন করে নিতে পারে। সিলিণ্ডারের মধ্যে পজিটিভ ষ্টপ এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে, বটম্ ষ্ট্রোকেও যাতে বীম ডেস্কের সমান্তরালে থাকে তা সুনিশ্চিত করে। বীম যখন নীচের দিকে নামে তখন বীমের সমান্তরাল অবস্থান সঠিক রাখার জন্যও একটা হাইড্রলিক ব্যবস্থা আছে।

এই ব্রেকগুলি খুব অল্প আয়াসে রক্ষনাবেক্ষণ করা যায়, এগুলি নিরাপদ এবং চালাতেও কোন অসুবিধে নেই। সিম-টুলস নানা ধরণের মেসিন তৈরি করে, যেমন, মেকানিক্যাল এবং হাইড্রলিক গিলোটিন শিয়ার, প্লেট বেণ্ডিং রোলস্, পাঞ্চিং, ক্রপিং, শিয়ারিং এবং নচিংএর সংযুক্ত মেসিন ইত্যাদি।

টাটার ব্লুমিং মিলের জন্য প্রথম ভারতীয় কন্ট্রোল প্যানেল

সম্প্রতি ভূপালের হেভি ইলেকট্রিক্যালস (ইণ্ডিয়া) লিমিটেডে, টাটা আয়রন এ্যাণ্ড ষ্টিল কোম্পানীর ব্লুমিং মিলের জন্য অত্যন্ত উচ্চ শক্তির কন্ট্রোল প্যানেল তৈরি করা হয়েছে। এই যন্ত্রটিতে ৩.২ মীটার লম্বা এবং ২.৩ মীটার উঁচু একটি কন্ট্রোল প্যানেল আছে এবং দাঁড়িয়ে কাজ করার জন্য চালকের জন্য একটা ডেস্ক রয়েছে। এটি দিয়ে চারটি রোলার টেবল্ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

মোটর কক্ষটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বলে প্যানেলটি অনাবৃত রাখা হয়েছে। একটি ইস্পাতের কাঠামোর ভেতরের দিকটা, আর্দ্রতা উত্তাপ ইত্যাদি নিরোধক বেকেলাইট দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কন্টাক্টার, রিলে, টাইমার, সুইচ, ফিউজ ইত্যাদি নানা ধরণের নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থাগুলি বসানো হয়েছে। নিরাপত্তা এবং কাজ করার সুবিধের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে এগুলি সাজানো হয়েছে। প্যানেলের পেছনের দিকে রাখা হয়েছে, রেসিসটেন্স, তামার তারের সংযোজক এবং নিয়ন্ত্রণ করার তারসমূহ।

এতে যে সব ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক কন্টাক্টার ও রিলে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলির বেশীর ভাগই বর্ত্তমানে এই কারখানায় তৈরি হচ্ছে। কন্টাক্টারগুলি হল, একটি পোলের ডি. সির ৩০০ থেকে ৬০০ এ্যাম্পিয়ারের এবং সঠিক সংযোজনের জন্য এতে সাহায্যকারী কতগুলি সুইচও রয়েছে। কন্ট্যাক্ট সুইচের অংশগুলি বেশ শক্ত এবং ইস্পাত শিল্পের কাজ চালাবার মত টেঁকসই।

এই ক্লোজড লুপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় একটি ক'রে মোটর জেনারেটার সেট রয়েছে এবং তা প্রতিটি টেবল্ ড্রাইভ মোটরকে শক্তি যোগায়। আমাদের ইঞ্জিনীয়াররা যে বিশেষ ধরণের স্কারফার ডেস্ক তৈরি করেছেন তার ওপরে মাষ্টার কন্ট্রোলারগুলি বসানো রয়েছে। প্রত্যেকটি মোটরের সম্মুখ ও পশ্চাৎগতি অত্যন্ত দ্রুত হারে বাড়ানো বা কমানো যায় (প্রায় তিন সেকেণ্ডে পূর্ণ সম্মুখ গতি থেকে পূর্ণ পশ্চাৎগতিতে আনা যায়)। প্রত্যেকটি সেটে ৪.২ কি. ওয়াটের রিভার্সিবল্-থাইষ্টর এ্যামপ্লিফায়ার দিয়ে এই উচ্চ গতি আনা সম্ভব হয়েছে।

★ ভারতের দ্বিতীয় বৃহৎ তৈলবাহী জাহাজটি (৮৮,০০০ D.W.T) যুগোস্লাভিয়ার স্প্লিটে জলে ভাসানো হয়েছে। স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর নামে চিহ্নিত এই জাহাজটিতে ক'রে অশোধিত তেল পাঠানো হবে শোধনাগারগুলিতে। জাহাজটি পুরোপুরি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এবং সর্ব্বাধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত। তৈলবাহী জাহাজটিতে ৫,০০০ টন তেল ভরা যাবে এবং খালাস করা যাবে ৩,৫০০ টন।

★ রাজস্থানের সিরোহী ও জালোরে ত্রাণ-ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে ২০.৮২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যে চারটি সেতু তৈরী হবে সেগুলির শিলান্যাস সম্পন্ন হয়ে গেছে।

★ জম্মুর আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্রে, জম্মু ও কাশ্মীরে সংরক্ষণের জন্যে ফল টিনে ভর্ত্তি করার সুলভ অথচ ভালো পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

REGD. NO. D-233

উন্নয়ন বার্তা

★ উত্তর প্রদেশের দৌরালাতে বীজ ঝাড়াই ও সাফ প্রভৃতি করার একটি যন্ত্র চালু করা হয়েছে। বছরে ১০,০০০ কুইন্টাল বীজ ধোয়া, শুকোনো বাছাই, ও দানা হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ ক'রে বস্তাবন্দী করার সমস্ত কাজ ভালভাবে করা যায় এই যন্ত্রের সাহায্যে। এর দ্বারা উত্তর প্রদেশের সমগ্র পশ্চিমাঞ্চলের বীজের চাহিদা মেটানো সম্ভব।

★ ১৯৭০ সালে ৪০ কোটি টাকার পরিবর্তে ৫০ কোটি টাকার ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পর্কে ভারত ও যুগোস্লাভিয়ার মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছে। এবার ভারত চিরাচরিত পণ্য ছাড়াও জীপ, বাস, লরী প্রভৃতি, রেলের ওয়াগন, টায়ার-টিউব, ওষুধ তৈরির উপাদান ও উপকরণ ইত্যাদি রপ্তানী করবে। ভারত যুগোস্লাভিয়া থেকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে মেশিনে দেওয়ার তেল (লুব্রিক্যান্ট) আমদানী করবে।

★ মাইসোর আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল ওয়ার্ক্‌স্‌ এর 'বার' ও 'রড' তৈরীর বিভাগটি চালু হয়েছে। ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই বিভাগে সর্ব্বোচ্চ ৭৭,০০০ টন মিশ্র ও বিশেষ ধরণের ইস্পাত ব্যবহৃত হ'তে পারে। এই বিভাগটিকে বিশ্বের সর্ব্বাধুনিক রোলিং মিলের সমকক্ষ ব'লে দাবী জানানো হয়।

★ উত্তর প্রদেশের বাদাউন জেলার দেহামুতে বনস্পতি সমষ্টি শিল্প স্থাপন করা হয়েছে। উত্তর প্রদেশ সমবায় সঙ্ঘ ২·৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে এটি স্থাপন করেছে। এ মাসেই উৎপাদনের কাজ শুরু হবার কথা। সমবায় ক্ষেত্রে স্থাপিত এই শিল্পটির দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ধরা হয়েছে ২৫ টন। আশা করা যাচ্ছে, যে, তৈলমুক্ত খইল রপ্তানী ক'রে আমরা এক কোটী টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন করতে পারব।

★ হৃষিকেশের সরকারী অ্যান্টিবায়োটিক কারখানায় ১৯৬৯ সালে ৬টি ওষুধের উৎপাদন, রেকর্ড মাত্রার পৌঁচেছে।

★ চিত্তরঞ্জনের রিসার্চ ডিজাইন এ্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড্‌স্‌ অর্গ্যানাইজেশান্‌ ইঞ্জিন ও অন্যান্য চালক যন্ত্রের গতি নিরূপণ করার উপযোগী এক বিশেষ ধরণের কাগজ তৈরির প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছে। এপর্য্যন্ত দেশে এই জিনিষটি উৎপাদন করা হয়নি ব'লে এই কাগজ কেনার জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হত।

★ কানপুরে ডিফেন্স রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে (মেটিরিয়াল) মানুষের চুল থেকে পশম তৈরীর একটি প্রক্রিয়া আবিস্কৃত হয়েছে। প্রক্রিয়াটি সরল। গবেষণার জন্যে ল্যাবরেটরীতে ৮ ঘন্টার শিফ্‌ট্‌-এ এক কে. জি. পর্য্যন্ত পশম তৈরী করা যায়। দৈনিক ১০০ কে. জি. পশম তৈরী করার মূলধনী ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে ২৭ লক্ষ টাকার মত।

★ নেপালের সঙ্গে এক চুক্তি অনুযায়ী ভারত নেপালকে তিন বছর (চলতি বছর নিয়ে) ৫৫,০০০ টন ক'রে নূন যোগাবে।

★ ভিলাই ইস্পাত কারখানায় ১৯৬৯ সালে, কোক্‌, ইনগট্‌ রোল ও বিলেট প্রভৃতি উৎপাদনের মাত্রা আগের সমস্ত মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

★ হায়দ্রাবাদের আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্রে ধূসর ব্যারাইট্‌ থেকে ধবধবে সাদা ব্যারাইট তৈরী করার একটা প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়েছে।

★ লুধিয়ানার কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে চীনেবাদামের গাছ উপড়ে ঝেড়ে তোলার একটা যন্ত্র তৈরী করা হয়েছে। এটি ট্র্যাক্টরের সঙ্গে জোড়া যায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে দিনে ৬—৮ একর পরিমিত জমির ফসল তোলা যায় এবং তার জন্য খরচ পড়ে একর প্রতি ১৮ টাকা। যন্ত্রটি তৈরী করতে খরচ পড়ে আন্দাজ ২,০০০ টাকা।

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত হ'লেও 'ধনধান্যে' শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই ব্যক্ত করে না। পরিকল্পনার বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী ক্ষেত্রে উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতটা অগ্রগতি হচ্ছে তার খবর দেওয়াই হ'ল 'ধনধান্যে'র লক্ষ্য।

'ধনধান্যে' প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে প্রকাশিত হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত, তাঁদের নিজস্ব।

নিয়মাবলী

দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়।

অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পুনঃ প্রকাশকালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার করা হয়।

রচনা মনোনয়নের জন্যে আনুমানিক দেড় মাস সময়ের প্রয়োজন হয়।

মনোনীত রচনা সম্পাদক মণ্ডলীর অনুমোদনক্রমে প্রকাশ করা হয়।

তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয়। কোনোও রচনার প্রাপ্তি-স্বীকৃতি, পত্র মারফৎ জানানো হয় না।

নাম ঠিকানা লেখা, ডাকটিকিট লাগানো, খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

কোনো রচনা তিন মাসের বেশী রাখা হয়না।

শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাবেন।

গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেস ম্যানেজার, পাব্লিকেশন্‌স্‌ ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী-১ ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

"ধনধান্যে" পড়ুন
দেশকে জানুন

ডিরেক্টার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ—করোলবাগ, দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রথম বর্ষ : ১৯
২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০

ধনধান্যে

ধনধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত
পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

প্রথম বর্ষ উনবিংশ সংখ্যা

২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ : ১০ই ফাল্গুন ১৮৯১
Vol. 1 : No 19 : February 22, 1970

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

প্রধান সম্পাদক
শরদিন্দু সান্যাল

সহ সম্পাদক
নীরদ মুখোপাধ্যায়

সহকারিণী (সম্পাদনা)
গায়ত্রী দেবী

সংবাদদাতা (মাদ্রাজ)
এস. ভি. রাঘবন

সংবাদদাতা (শিলং)
ধীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী

সংবাদদাত্রী (দিল্লী)
প্রতিমা ঘোষ

ফোটো অফিসার
টি. এস নাগরাজন

প্রচ্ছদপট শিল্পী
জীবন আডালজা

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০

টেলিগ্রাফের ঠিকানা : যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

ভুলি নাই

"ঈশ্বর যে এখনও মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাননি তারই আশ্বাসরূপে শিশুর আবির্ভাব।"

—রবীন্দ্রনাথ

এই সংখ্যায়

পৃষ্ঠা

একচেটিয়া ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী ভারত সরকার শিল্পের লাইসেন্স দেওয়া সম্পর্কে যে নতুন নীতি ঘোষণা করেছেন, তা দেশের শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারী নীতি সম্পর্কে সন্দেহ দূর করতে সাহায্য করবে। শিল্পের লাইসেন্স দেওয়ার নীতির ক্ষেত্রে কতকগুলি যে বিশেষ পরিবর্ত্তন করা হয়েছে, সরকারী অর্থসাহায্যকারী সংস্থাগুলি থেকে শিল্পগুলিকে সাহায্য দেওয়া সম্পর্কে নতুন যে নীতি স্থির করা হয়েছে এবং সরকারী ক্ষেত্রের উন্নয়ন সম্পর্কে যে নীতিসমূহ গঠন করা হয়েছে সেগুলি যে ভালো হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

দেশের পরিবর্ত্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই নীতিগুলির, সমাজতন্ত্রের মৌলিক নীতিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রয়েছে। নীতিগুলিতে যে সব ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে তা অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকৃত করতে এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির জন্য এবং নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য সুযোগ সুবিধে বাড়াতে সাহায্য করবে। এই নীতি অনুসারে সরকারী ক্ষেত্রগুলির সম্প্রসারণের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে এবং তাদের ওপরেই সমগ্র শিল্প ক্ষেত্রের প্রধান দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিপুল আর্থিক ক্ষতি অথবা লগ্নি থেকে স্বল্প আয় এবং কর্ম্মচারি তন্ত্র ইত্যাদি নানা অভিযোগের ভিত্তিতে সরকারী তরফ অনেক সময়েই বিপুল সমালোচনার সম্মুখীন হয়। সরকারী তরফে যে সব শিল্প গড়ে তোলা হয়েছে সেগুলির বৈচিত্র্যের দিকে বিশেষ মনযোগ না দিয়েই অনেক সময়ে এই সব সমালোচনা করা হয়।

সরকারী তরফের লগ্নি থেকে তাড়াতাড়ি যথেষ্ট লাভ পাওয়া যাচ্ছেনা এইটেই হ'ল তাঁদের সমালোচনার প্রধান কারণ। সরকারী তরফকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে এবং একে লাভজনক সত্যিকারের ব্যবসায়মূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার উদ্দেশ্য নতুন নীতিতে দ্রুত লাভদায়ক প্রকল্প গ্রহণ করার সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রস্তাব করা হয়েছে।

সম্প্রসারিত সরকারী তরফের জন্য অতিরিক্ত যে সম্পদের প্রয়োজন হবে তা এখন সরবরাহ করবে, ইউনিট ট্রাষ্ট, ভারতীয় অর্থ কমিশন, উন্নয়ন ব্যাঙ্ক এবং ভারতীয় জীবন বীমা কর্পোরেশনের মত সরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি এবং বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে প্রযোজ্য একই রকম সর্ত্তে এই অর্থ সাহায্য দেওয়া হবে।

"মূল" শিল্প হিসেবে কতকগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ মৌল শিল্প গড়ে তোলা সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তাতে সুশৃঙ্খল শিল্পোন্নয়ন সুনিশ্চিত করা হয়েছে। কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় সার ইত্যাদি তৈরি করার শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত, অলৌহ ধাতু, কয়লা ও তৈল, ভারী যন্ত্রপাতি, জাহাজ, ড্রেজার, সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ এবং ইলেকট্রোনিকস্ শিল্প ইত্যাদি এই মৌল শিল্পগুলির অন্তর্গত। যে উন্নয়নশীল অর্থনীতি আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য চেষ্টা করছে তার পক্ষে এই সব শিল্পের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

নীতিগতভাবে "যুক্ত তরফের" যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হয়েছে তাতে সরকারের বিজ্ঞতা ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি প্রতিফলিত হয়েছে। এই নীতি অনুযায়ী, যে মৌলিক শিল্পগুলি সম্পূর্ণভাবে সরকারী তরফের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে সেগুলি ছাড়া ৫কোটি টাকার অধিক লগ্নিমূলক নতুন শিল্প স্থাপনের সমস্ত ক্ষেত্রগুলি সরকারী ও বেসরকারী উভয় তরফের জন্যই মুক্ত রাখা হয়েছে। এর ফলে বড় বড় একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি, বেসরকারী তরফের কুশলতা ও দক্ষতার প্রমাণ দেওয়ার, সুযোগ পাবে। তাছাড়া এই নীতি বেসরকারী তরফকে, শিল্প প্রকল্পে তাদের যোগ্যতা ও সম্পদ নিয়োগ করার সুযোগ দেবে এবং তা দেশের সুষম উন্নয়নেই সাহায্য করবে।

মাত্র ২০ টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হাতে যে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে তাতেই বোঝা যায় দেশে একচেটিয়া ব্যবসায় গড়ে উঠেছে এবং গড়ে উঠছে এবং এটা কেউ অস্বীকার করতে পারেনা। এই অবস্থাটা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। সমাজতন্ত্রের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে চলতে হলে প্রথমেই আর্থিক শক্তির এই বৃদ্ধি রোধ করতে হবে। একটু দেরীতে হলেও সরকার এখন এই প্রয়োজন বুঝতে পেরেছেন।

ইস্পাতের আসবাবপত্র, সাইকেলের টায়ার টিউব, এ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র, ফাউন্টেন পেন, টুথ পেষ্ট এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পের মতো কতকগুলি নিত্যাব্যবহার্য দ্রব্যাদির শিল্প, ক্ষুদ্রায়তন ও সমবায় তরফের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। এই শ্রেণীতে রেহাইয়ের সীমা ১ কোটি টাকা পর্যন্ত যে বাড়ানো হয়েছে এবং ১ কোটি থেকে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত লগ্নিমূলক মাঝারি ধরণের শিল্পের জন্য এই দুটি তরফ সম্পর্কে বিশেষভাবে বিবেচনা করার যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তাতে মনে হয় যে সরকার লগ্নি সম্পর্কে চিরাচরিত শিল্প নীতিতে অর্থপূর্ণ পরিবর্ত্তন আনতে চাইছেন। লক্ষ্য স্থির করে এবং অব্যর্থ লক্ষ্যে সেই দিকে অগ্রসর হতে পারলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে যে ন্যায়সঙ্গত ও সুষম অর্থনীতি গড়ে উঠবে তাতে কোন কোন সন্দেহ নেই।

সাধারণ অসাধারণ

বন্ধ্যা নও বসুন্ধরা— রত্নগর্ভা তুমি

বাঁকুড়া জেলার গোগড়া গ্রামের একটি উষর অঞ্চল সম্পূর্ণ বেসরকারী প্রচেষ্টায় স্বর্ণখনিতে পরিণত হয়েছে। এই সাফল্যের কৃতিত্ব ঐ গ্রামের খাদি আশ্রমের কৃষি রিসার্চ ফার্মের কর্মীদের।

গ্রামের উচুঁ পাথুরে ডাঙা জমি, বাইদ, নামে পরিচিত। জমির নীচে কখনও জল পাওয়া যেতনা এবং আবহমান কাল থেকেই সেখানে চাষবাস হত না। কিন্তু সকলের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে ফার্মের পরিচালক শ্রীদাশগুপ্তের নেতৃত্বে কর্মীরা খনন কার্য চালান এবং ডিনামাইটের সাহায্যে ভূস্তরে শক্ত পাথরের চাঁই ফাঁটিয়ে মাটির ৩৩ ফুট নীচে প্রচুর জলের সন্ধান পান। এইভাবে খুঁড়ে সেখানে ইতিমধ্যে পুকুরও তৈরী করা হয়েছে।

দ্বিতীয় আর একটি প্রধান সমস্যারও সমাধান করা হয়েছে অভিনব উপায়ে। জমির ওপরের অংশটা পাথর ও কাঁকরে ভর্তি ছিল। তাই বোধ হয় সেখানে চাষ করা অসম্ভব ব'লে গণ্য হ'তো। কিন্তু ফার্মের কর্মীরা জমির ওপর থেকে পাথর ও নুড়িগুলি হাতে ক'রে তুলে ফেলেন। তারপরেও দেখা গেল, নীচের জমিটা কাঁকরে ভরা, জল দাঁড়াতে পারে না। তাই চালুনির মত ঐ মুরাম জমির মধ্যে দিয়ে যাতে জল চুঁইয়ে বেরিয়ে না যায় সেজন্য বলদের সাহায্যে জলের সঙ্গে কাদা মিশিয়ে সেই ঘোলা জল জমিতে ঢেলে দেওয়া হয়। এইভাবে তৈরি জমিতে আই—আর ৮ ও এন—সি—৬৭৬ ধান এবং পদ্মা ধানের চাষ হয়েছে। তা ছাড়া, আলু, কপি, পেঁয়াজ, বরবটি, কলা, পেয়ারা, কুমড়ো, আখ ও পাট জন্মাচ্ছে। বিঘা প্রতি ১৮ মন পদ্মা ধান পাওয়া গেছে। ১১৮ দিনের মধ্যেই এই ধান উঠছে।

শ্রীদাশগুপ্তের মতে, উল্লিখিত পদ্ধতিতে চাষের জন্য, ১০০ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করলে, বছরে প্রায় ২৮৮ কোটি টাকা মূল্যের ৪১ লক্ষ টন শস্য উৎপাদন করা যেতে পারে।

স্বল্প সঞ্চয় অকালের আশ্রয়

ক্ষুদ্রসঞ্চয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা বিশেষ অঙ্গ। এই কার্যসূচীর বহুলপ্রচার, আরের ভাণ্ডার বাড়াতে পারে। কথাটা মনে হয়েছিল কোট্টায়াম জেলার শ্রী এস. এল. জেকবের। চা চেখে গুণ নির্ণয় করা এঁর পেশা। থাকেন মুন্নার হাই রেঞ্জে। চেন্দুভারাই চা বাগিচার নিজস্ব 'টি টেস্টার', বাগিচা কর্মীদের সঙ্গে হামেশাই দেখা সাক্ষাৎ। এই সব বাগিচা কর্মীকে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে উৎসাহিত করার কৃতিত্ব শ্রীজেকবের।

১৯৬৫-৬৬ সালের কথা। জাতীয় সঞ্চয় কার্যসূচীর অধিকর্তারা তখন সঞ্চয়ের প্রচারে নেমেছেন। জেকবও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন এবং বাগিচা কর্মীদের, সঞ্চয়ের লাভ ও গুরুত্ব বোঝালেন। তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল না। ঐ বছরেই তাঁর বাগিচার ৫০০ কর্মীকে সি. টি. ডিপোজিট স্কীমের সদস্য করে ফেললেন। পুরস্কার পেলেন ৫০০ টাকা রোটারী ক্লাবের কাছ থেকে সর্বাধিক সংখ্যক অর্থাৎ বাগিচার মোট কর্মীর শতকরা ৬৫ জনকে এ' প্রকল্পের আওতায় আনার জন্য। এর তিন বছর পরে অর্থাৎ ১৯৬৮-৬৯ সালে শ্রীজেকব মোট ৯৩১ জন কর্মীকে দিয়ে ৯৪৫টি অ্যাকাউন্ট খোলানোর ফলে দ্বিতীয়বার রোটারী ক্লাবের পুরস্কার লাভ করলেন।

এই সাফল্যের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন সদিচ্ছার মনোভাব নিয়ে কর্মীদের সঙ্গে মনেপ্রাণে একাত্ম হয়ে যাওয়াই হচ্ছে এর একমাত্র কারণ। কর্মীরা তাঁকে ঘরের লোক, আপনজন মনে করেন। শ্রীজেকব আরও বলেন আমি সামরিক বাহিনীতে সাড়ে পাঁচ বছর ছিলাম, কাজ করেছি য়ুরোপীয়ানদের সঙ্গে এতে আমার অনেক লাভ হয়েছিল। আমি দেশকে ভালবাসতে শিখেছিলাম, নিয়মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাবোধের আদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলাম আর য়ুরোপীয়ানদের কাছে শিখেছিলাম কঠোর পরিশ্রমের মর্যাদা দিতে।'

পাঁচটি সন্তানের পিতা জেকব সঞ্চয়ের অসীম উপকার ব্যাখ্যা করার সময় বার বার কর্মীদের মনে করিয়ে দেন, সন্তানদের ভবিষ্যতের সংস্থানের জন্য সঞ্চয়ের গুরুত্ব কতখানি।

জেকব অর্থ পুরস্কারকেই শুধু পুরস্কার বলে গণ্য করেন না। তাঁর ওপর তাঁর সহকর্মী ও বাগিচা কর্মীদের আস্থা ও প্রীতির মূল্য অর্থের চেয়েও বেশী। শ্রী জেকব এখন মুন্নার হিল রেঞ্জ-এর গ্রুপ লীডার ফোরামের (৩৪ জন গ্রুপ লীডার ও ৩০,০০০ বাগিচা কর্মী এর সদস্য) প্রেসিডেন্ট।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানে বাঙালী বৈজ্ঞানিকের অবদান

একটিমাত্র পরাগরেণু থেকে কৃত্রিম পদ্ধতিতে একটি সম্পূর্ণ উদ্ভিদ সৃষ্টি করার অভিনব আবিষ্কারের সঙ্গে যে বৈজ্ঞানিকের নাম জড়িত তিনি বাঙালী ললনা ডাঃ শিপ্রা মুখার্জ্জী। রাজধানীর ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরতা এই বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার বিশ্বের প্রধান ধানউৎপাদনকারী দেশগুলির বিশেষজ্ঞদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। তাঁরা এই আবিষ্কারকে উদ্ভিদকোষের বিবর্ত্তন বিজ্ঞানে এক আশ্চর্য্য অবদান ব'লে অভিনন্দিত করেছেন। সম্প্রতি নতুনদিল্লীতে এঁদের একটি সম্মেলন বসে। সেই সম্মেলনে ডাঃ মুখার্জ্জী সমবেত বিশেষজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিকদের দেখান, কীভাবে কৃত্রিম উপায়ে, নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে, একটি পরাগ রেণু থেকে সম্পূর্ণ একটি গাছ সৃষ্টি করা সম্ভব এবং পৃথকভাবে প্রত্যেক উদ্ভিদকোষ থেকে পৃথক প্রজাতি সৃষ্টি করা সম্ভব। গবেষণাকালে ডাঃ মুখার্জ্জী, সর্ব্বপ্রথম একটি পরাগ রেণু থেকে একটি সম্পূর্ণ আকারের ধানের গাছ সৃষ্টি ক'রে তাঁর আবিষ্কারের মৌলিকতা ও বিপুল সম্ভাবনা প্রতিষ্ঠিত করেন।

পরিকল্পনার সাফল্য ও অসাফল্য

ডি. এস. গাঙ্গুলী

ভারতের পরিকল্পনা সম্পর্কে, বিশেষ ক'রে, পরিকল্পনা রচয়িতাদের অত্যন্ত উচ্চাশা সম্পর্কে বহু সমালোচনা শোনা যায়। যে দেশ সবেমাত্র স্বাধীন হয়েছে, সেই দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে, উন্নয়নের গতি বাড়ানো প্রয়োজন, একথা সত্যি। কিন্তু পরিকল্পনাগুলিতে যদি সম্পদের পরিমাণ, লগ্নি ও উন্নয়নের হার সম্পর্কে একটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা না হয়, তাহলে, নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তিনটি পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই রূপায়িত করা হয়েছে এবং তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনার পর এখন চতুর্থ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ সুরু করা হবে। কাজেই জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে পরিকল্পনার অবদান এবং রূপায়নের পথে পরিকল্পনাগুলি যে বাদানুবাদের সৃষ্টি করেছে তার মূল্যায়ণ করার সময় এখন এসেছে।

উন্নয়নের গতি

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিকাশশীল অর্থনীতির ভিত্তি রচনা করা হয় এবং ১৯৬০-৬১ সালের মূল্যমান অনুযায়ী মোট জাতীয় উৎপাদন ১৯৬২-৬৩ এবং ১৯৬৪-৬৫তে যথাক্রমে ১৪৩.২ কোটি এবং ১৫২.১৯ কোটি টাকা বাড়ে এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে তা দাঁড়ায় ১৬৬.০ কোটি টাকায়। ১৯৫৬ সালকে যদি মূল বছর ধরা হয় তাহলে সেই অনুপাতে শিল্পোৎপাদন, ১৯৬০ সালে ১৩০.২, ১৯৬৫ সালে ১৮৭.৭ এবং ১৯৬৭ সালে ১৯৪.৭ হারে বাড়ে। পরিসংখ্যানের দিক থেকে আর্থিক অবস্থা ক্রমশ: উন্নতির দিকে গেছে, কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনায় জাতীয় আয় শতকরা প্রায় ৬ ভাগ হারে বাড়বে বলে যে অনুমান করা হয়েছিল তা সফল হয়নি। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বছরে (১৯৬১-৬৩) সালে) জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা মাত্র ২.৫ ভাগ। তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকারি তরফে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ যদিও ৬,৩০০ কোটি টাকা রাখা হয়েছিল তবুও তা বেড়ে প্রায় ৮,৫০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৯ পর্য্যন্ত তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারি তরফে ৬,৮০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়। গত ১৮ বছরে শিল্পক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৭,৩০০ কোটি টাকা, যার মধ্যে, সরকারি তরফে ৪,২৪৫ কোটি এবং বেসরকারী তরফে ৩,০৫৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়। এতে ১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্য অনুপাতে জাতীয় আয় বেড়েছে প্রায় ১,২০০ কোটি টাকা। যে হারে লগ্নি করা হয়েছে সেই অনুপাতে তিনটি পরিকল্পনাকালে উন্নয়নের হার খুব উৎসাহজনক নয়। জাতীয় অর্থনীতিতে উন্নয়নের হার বজায় থাকলেও, বিফলতার জন্য কৃষির অনিশ্চয়তা, শিল্প বিরোধ এবং বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অনুকূল অবস্থার অভাব প্রভৃতি কারণকে দায়ী করা হয়েছে।

বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের প্রধান

দুই দিক

ভারতে শিল্প পরিকল্পনার দুটি প্রধান দিক রয়েছে; একটি হ'ল, আঞ্চলিক অসাম্য দূর করার উদ্দেশ্যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির সম বন্টন, অন্যটি হ'ল উন্নয়নের হার বৃদ্ধি। শিল্পের ক্ষেত্রে এই দুটি দিকে কতটুকু সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা এবারে দেখা যাক। ১৯৫৬ সালের শিল্প নীতি প্রস্তাবে সরকারী ও বেসরকারী তরফের এক্তিয়ার মূলত: স্থির ক'রে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আঞ্চলিক বৈষম্যের সমস্যা এবং অনেক ক্ষেত্রে শিল্পক্ষেত্রের দাবিগুলিতে রাজনৈতিক প্রভাব দেওয়ার প্রয়াস শিল্পক্ষেত্রে অর্থনীতির গতিপথকে প্রভাবান্বিত করতে চেষ্টা করেছে। যাই হোক কার্য্যত: যে সব রাজ্য পূর্ব্ব থেকেই কিছুটা শিল্পসমৃদ্ধ ছিল, সেইগুলিই শিল্প সম্প্রসারণের বৃহত্তর অংশ লাভ করলো এবং এর ফলে বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে অনেক শিল্প কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়লো। এই অবস্থাই আবার উন্নত এবং অপেক্ষাকৃত অনুন্নত রাজ্যগুলির মধ্যে একটা মনকষাকষির ভাব সৃষ্টি করলো এবং জাতীয় ঐক্যে বিভেদ সৃষ্টির একটা কারণ হয়ে দাঁড়ালো।

যে প্রকল্পগুলি নিয়ে কাজ সুরু করা হয় তা থেকে যদি আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় তাহলে বিপুল মূলধন বিনিয়োগমূলক শিল্পনীতিও জাতির পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে পারে কিন্তু এই রকম প্রকল্পগুলি থেকে যদি আশানুরূপ ফল না পাওয়া যায় এবং কাজ চালু রাখার জন্য যদি আরও জাতীয় অর্থ বিনিয়োগ করতে হয় তাহলে তা অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে। সরকারি তরফের অনেক সংস্থাই এর উদাহরণ।

১৯৬৯ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৮৬টি সরকারি সংস্থায় প্রায় ৩৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। ১৯৬৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই সব সংস্থার মোট ক্ষতির পরিমাণ হ'ল প্রায় ৪৪ কোটি টাকা, তার মধ্যে কেবলমাত্র হিন্দুস্থান ষ্টীলের ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৪০ কোটি টাকা। কাজেই সরকারি তরফের ভিত্তি দৃঢ় না ক'রে সরকারি সংস্থার সম্প্রসারণকে 'ত্রুটিযুক্ত অর্থনীতি' বলা যায়।

ভারতের বর্ত্তমান সরকারি সংস্থাগুলির কাঠামো অবশ্য শিল্প রাষ্ট্রীয়করণ নীতির সঙ্গে মোটামুটি খাপ খায়। যেমন, মূল শিল্পসংগঠন, কর্ম্মসংস্থান এবং গ্রাহকগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা ইত্যাদি নীতিগুলির সঙ্গে খাপ খায়। কিন্তু পূর্ব্বেই যে সব প্রকল্প স্থাপন করা হয়েছে সেগুলিকে সংহত এবং সেগুলির ভিত্তি শক্তিশালী না করেই অন্য ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ করাটা হ'ল সরকারি তরফের প্রধান ত্রুটি। বরং সমাজের পক্ষে কল্যাণকর অর্থনৈতিক ও কল্যাণমূলক ক্ষেত্র যেমন, খাদ্য সংগ্রহ ও বন্টন, এবং অল্পমূল্যে ওষুধপত্রও অত্যাবশ্যক সামগ্রীর সরবরাহ ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের এই কর্ম্মপ্রচেষ্টা ঢের বেশী বাঞ্ছনীয় হ'ত।

বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় বিধান

রাজনৈতিক সর্ত্ত এবং পারস্পরিক অর্থনৈতিক দায়সহ বৈদেশিক সাহায্যের ভিত্তিতে ভারি শিল্প স্থাপনের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করাই হ'ল ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রধান দুর্ব্বলতা।

যে প্রকল্পগুলির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে সেগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠার আগেই নতুন নতুন প্রকল্পে হাত দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পগুলির সাফল্য এবং উন্নয়নের গতি বৃদ্ধির ব্যাপারে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিতে কি রকম কাজ হচ্ছে সেদিকে যদি যথেষ্ট মনযোগ দেওয়া না হয় তাহলে কেবলমাত্র বিনিয়োগের শক্তিতেই যে উৎপাদন ক্ষমতা এবং জাতীয় আয় বাড়বেনা, তা মনে রাখতে হবে। শিল্পক্ষেত্রের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাবে সরকারি তরফের ভারি শিল্পগুলির পূর্ণ ক্ষমতা কাজে লাগানো যায়না। যে অর্থ বিনিয়োগ করা হয় তা থেকে যে বিশেষ লাভ হতে পারেনা এই অবস্থাটিই তা প্রমাণ করে। কাজেই চতুর্থ পরিকল্পনায় যে, "অনিশ্চয়তা হ্রাস ক'রে স্থিতিশীলতার মধ্যে উন্নয়নের গতি বাড়ানোর এবং কেবলমাত্র অতি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই নতুন প্রকল্পের কাজ" হাতে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে তা খুবই সঙ্গত হয়েছে। পরিকল্পনার খসড়ায় খোলাখুলিভাবে স্বীকার করা হয়েছে যে "সরকারি তরফে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেষ্ট অর্থ বিনিয়োগ করা হলেও, সরকারি তরফের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলির কাজের মধ্যে উপযুক্ত সামঞ্জস্য নেই এবং "কার্য্যকরী সমন্বয়ের জন্য একটি উপযুক্ত ব্যবস্থা" গ্রহণ করে এই ত্রুটি দূর করার কথা বলা হয়েছে। কতকগুলি মৌলিক ও অগ্রাধিকারসম্পন্ন শিল্প সরকারি ও বেসরকারি তরফের যুক্ত প্রচেষ্টায় রাখা হলে উন্নয়নশীল অর্থনীতির পক্ষে তা অনুকূল হয়। আভ্যন্তরীন সম্পদের ওপর আস্থা না রেখে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর বেশীরভাগ নির্ভর করে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তৈরি করা হলে তা নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে বাধ্য। এগুলির মধ্যে সবচাইতে বড় সমস্যা হল মুদ্রাস্ফীতির চাপ। ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব এড়ানো যায়না বলে তখন দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়িয়ে বা করের বোঝা বাড়িয়ে সেই দায়িত্ব পালন করতে হয়। যথেষ্ট অর্থ লগ্নি করা সত্বেও তার থেকে সম্পদ সৃষ্টি না হলে, আরও লগ্নি করা বন্ধ ক'রে অর্থনীতি সুদৃঢ় ক'রে তোলার জন্য রূপায়ণের দুর্বল স্থানগুলি এবং বিফলতাগুলির কারণ নির্ণয় ক'রে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। পরিকল্পনার কাজ সম্পর্কে একটা ইঙ্গিত দিয়ে নীতি সম্পর্কে মোটামুটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটাই যথেষ্ট নয়।

ভারতের পরিকল্পনাগুলি অত্যন্ত বেশী আশাবাদের দোষে দুষ্ট। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় চাহিদা ও ভোগের ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিগত ব্যয়ের ধারায় সম্ভাব্য পরিবর্তন, মুদ্রাস্ফীতির চাপে ব্যক্তিগত আয় হ্রাসের সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়গুলি উপযুক্তভাবে বিবেচনা না করেই ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের অনুপাত বেশী ধরা হয়েছে। শিল্পক্ষেত্রের আভ্যন্তরীন সম্পদ সম্পর্কে ও পরিকল্পনাগুলিতে, শিল্পোন্নয়নের পথে যে সব বাধা এবং আভ্যন্তরীন বিরোধ আসতে পারে অথবা বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে যে সব সমস্যা দেখা দিতে পারে তার উপযুক্ত পরিমাপ করা হয়নি। তার ফলে আনুমানিক বিনিয়োগের পরিমাণ অনেক ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে গেছে এবং বৈদেশিক সাহায্যের ওপর বেশী নির্ভর করতে হয়েছে। মূলধন এবং সম্পদ সম্পর্কে চতুর্থ পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গী অনেকখানি বাস্তবানুগ।

ব্যাঙ্ক পুনঃ রাষ্ট্রীয়করণ অর্ডিন্যান্স

দেশের ১৪ টি প্রধান ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রীয়করণ বিধিবহির্ভূত বলে সর্বোচ্চ আদালতের একটি রায় বেরোবার ৪ দিন পর, ১৪ই ফেব্রুয়ারি, রাষ্ট্রপতি একটি অর্ডিন্যান্স জারি ক'রে সেগুলি আবার রাষ্ট্রায়ত্ব করেছেন। ১৯৬৯ সালের ১৯শে জুলাই ব্যাঙ্কগুলি যখন রাষ্ট্রাধীন করা হয় পুনঃ রাষ্ট্রীয়করণ অর্ডিন্যান্স সেইদিন থেকেই কার্য্যকরী হবে এবং রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির চেয়ারম্যান সেই তারিখ থেকেই আবার কাস্টোডিয়ান নিযুক্ত হয়েছেন।

রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির কাজ নিয়ে নেওয়ার জন্য সেগুলিকে ৮৭.৩০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা এই অর্ডিন্যান্সে রয়েছে।

ব্যাঙ্কগুলি তাদের ইচ্ছানুযায়ী এই ক্ষতিপূরণ নগদ টাকায় বা কেন্দ্রীয় সরকারের সিকিউরিটিতে নিতে পারে। ব্যাঙ্ক যদি নগদ টাকায় ক্ষতিপূরণ চায় তাহলে তিনটি বার্ষিক কিস্তিতে এই টাকা দেওয়া হবে এবং প্রতিটি কিস্তির জন্য ১৯৬৯ সালের ১৯শে জুলাই থেকে শতকরা ৪ টাকা হারে সুদ দেওয়া হবে। ব্যাঙ্ক যদি সিকিউরিটিতে ক্ষতিপূরণ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে সে বার্ষিক শতকরা ৪।। টাকা সুদসহ ১০ বছরের সিকিউরিটিতে অথবা বার্ষিক শতকরা ৫।। টাকা সুদসহ ৩০ বছরের সিকিউরিটিতে তা নিতে পারে এবং উভয় ক্ষেত্রেই ১৯৬৯ সালের ১৯শে জুলাই থেকে সুদ দেওয়া হবে। ব্যাঙ্ক অবশ্য ইচ্ছে করলে যে কোন অনুপাতে আংশিকভাবে নগদ টাকায় এবং আংশিকভাবে সিকিউরিটিতে এই ক্ষতিপূরণ নিতে পারে। অর্ডিন্যান্স জারি হওয়ার তিন মাসের মধ্যেই এই সম্পর্কে মতামত জানাতে হবে। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে যে কোন ব্যাঙ্ক সম্পর্কে সরকার, এই মতামত জানানোর সময় তিন মাস পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দিতে পারবেন। ব্যাঙ্কের মতামত জানাবার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সরকার, ক্ষতিপূরণের নগদ টাকার অংশের প্রথম কিস্তি এবং সিকিউরিটির আকারে, ক্ষতিপূরণের সমগ্র অংশ দিয়ে দেবেন। যদি কোন ব্যাঙ্ক থেকে কোন মতামত না পাওয়া যায় তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে ব্যাঙ্কগুলি শতকরা ৪।। টাকা সুদের ১০ বছরের সিকিউরিটিতেই ক্ষতিপূরণ চায় এবং মতামত জানাবার নির্দিষ্ট তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সেই টাকা দিয়ে দেওয়া হবে।

যদি কোন ব্যাঙ্ক চায়, তাহলে আদায়ীকৃত মূলধনের শতকরা ৭৫ ভাগ পর্য্যন্ত, মধ্যবর্তীকালীন ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও ব্যবস্থা রয়েছে। মধ্যবর্তীকালীন এই ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রেও নগদ টাকায় বা সিকিউরিটিতে তা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। মতামত জানাবার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে এই মধ্যবর্তীকালীন ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেওয়া হবে।

ঋণদান নীতির পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ থেকে রাষ্ট্রীয়করণ

অলক ঘোষ

ব্যাঙ্ক ব্যবসা সংক্রান্ত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ মূলক আইনে দুটি প্রধান ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়। তা হল (ক) ঋণদান নীতি স্থির করা ও সেগুলি সংহত করা এবং (খ) প্রতিটি ব্যাঙ্কের পরিচালন পর্ষতের সংগঠনে পরিবর্ত্তন আনা। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে ভারত সরকার সর্ব্ব ভারতীয় পর্যায়ে জাতীয় ঋণ পরিষদ গঠন করেন। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যেই ব্যাঙ্কগুলি তাদের পরিচালন পর্ষৎ পুনর্গঠন করে। যাঁদের কৃষি, পল্লী অর্থনীতি, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, সমবায়, ব্যাঙ্ক ব্যবসা এবং অর্থনীতি, সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা আছে তাদের মধ্য থেকেই এই পর্ষতের জন্য বেশীর ভাগ সদস্য নির্ব্বাচন করা হয়।

ঋণ পরিষদ, বিভিন্ন ক্ষেত্রের ঋণের দাবির আনুপাতিক যোগ্যতা আলোচনা করছেন এবং অগ্রাধিকার স্থির করছেন। এটা সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে, পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং ব্যাঙ্কগুলির ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আরোপের উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিল রেখে, বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিকে, ঋণ বন্টন করতে সাহায্য করবে। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং জাতীয় ঋণ পরিষদ যদি যুক্তভাবে ঋণ মঞ্জুরী পরিকল্পনা স্থির করেন তাহলে ব্যাঙ্কের কর্মসূচীর সঙ্গে জাতীয় নীতির মিল রেখে তা করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ঋণ পরিষদের প্রধান কাজ হল (ক) বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে ব্যাঙ্কের কাছে যে ঋণের দাবি জানানো হয় তা মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করে দেখা, (খ) অগ্রাধিকার সম্পন্ন ক্ষেত্রসমূহ বিশেষ করে কৃষি, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প এবং রপ্তানীর প্রয়োজন এবং অর্থসম্পদ সরবরাহের সম্ভাবনা বিবেচনা করে লগ্নির উদ্দেশ্যে ঋণ মঞ্জুর করার জন্য অগ্রাধিকার স্থির করে দেওয়া, (গ) মোট সম্পদ যাতে পুরোপুরি সুষ্ঠু ভাবে ব্যবহৃত হতে পারে সেজন্য ব্যবসায়ী ও সমবায় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য বিশেষ সংস্থাগুলির ঋণদান ও লগ্নি নীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং (ঘ) চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান যদি সংশ্লিষ্ট কোন প্রশ্ন তাঁদের কাছে উল্লেখ করেন তাহলে তা বিবেচনা করা। প্রতি বছরে অন্ততঃ পক্ষে দুবার এই পরিষদ, অধিবেশনে মিলিত হবে।

ঋণ পরিষদের সদস্য সংখ্যা ২৫ এর বেশী হওয়া উচিত নয় বলে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এই পরিষদের চেয়ারম্যান হবেন অর্থমন্ত্রী এবং ভাইস চেয়ার ম্যান হবেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর। এঁরা ছাড়া পরিষদের তিনজন স্থায়ী সদস্য হলেন পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের অর্থনৈতিক বিভাগের সেক্রেটারী এবং কৃষি রিফাইন্যান্স কর্পোরেশনের চেয়ার ম্যান। অবশিষ্ট ২০ জন সদস্য হলেন ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক, সমবায় ক্ষেত্র, বড়, মাঝারি ও ক্ষুদ্রশিল্প, কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিনিধি। এঁরা সর্বাধিক তিন বছরের জন্য সদস্য থাকতে পারবেন।

জাতীয় ঋণ পরিষদ, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ঋণ বন্টন করা সম্পর্কেই প্রধানতঃ সংশ্লিষ্ট। কিন্তু ঋণ বন্টন এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ এক কথা নয়। পরিষদ যদি ঋণ বন্টন ব্যবস্থার দিকেই অযৌক্তিক গুরুত্ব আরোপ করেন তাহলে তা শেষপর্য্যন্ত হয়তো অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের কাজ ব্যাহত করবে এবং তা হয়তো রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বহু ঘোষিত নিয়ন্ত্রিত সম্প্রসারণের নীতিও ব্যাহত করবে।

জাতীয় ঋণ পরিষদ বছরে একবার বা দুইবার অধিবেশনে মিলিত হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রের ঋণের প্রয়োজন সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারবেন কিনা সেটাও সন্দেহজনক। কারণ উন্নয়নের গতিপথে এই ক্ষেত্রগুলির প্রয়োজন দ্রুত পরিবর্ত্তিত হতে পারে। আবার এই পরিষদ যদি ঘন ঘন অধিবেশনে মিলিত হন তাহলে তা প্রকৃতপক্ষে অন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় পরিণত হয়ে যেতে পারে। কাজেই ক্ষেত্র অনুযায়ী ঋণ মঞ্জুর করা সম্পর্কে আরও ছোট ছোট বিশেষ সংস্থা গঠন করা উচিত। এই সংস্থাগুলি আরও ঘন ঘন অধিবেশনে মিলিত হ'য়ে অর্থ ও ঋণের পরিস্থিতি বিবেচনা ক'রে তাদের সুপারিশ পরিষদের কাছে পেশ করবেন।

জাতীয় ঋণ পরিষদের কেবলমাত্র অগ্রাধিকার সম্পন্ন তিনটি ক্ষেত্র অর্থাৎ কৃষি, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প এবং রপ্তানীর জন্য অর্থ বন্টন সম্পর্কেই নিজেদের সংশ্লিষ্ট রাখা উচিত নয়, সুদের হার ভিন্ন ভিন্ন রাখা যায় কিনা সে সম্পর্কে একটা কার্যকরি পরীক্ষা করে দেখা উচিত। অগ্রাধিকার সম্পন্ন ক্ষেত্রগুলিরও শ্রেণী বিভাগ করে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদিতে বিভক্ত করা যেতে পারে। অগ্রাধিকারের প্রথম শ্রেণীর শিল্প ও ব্যবসাগুলিকে, দ্বিতীয় শ্রেণীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম সুদের হারে ঋণ মঞ্জুর করা যেতে পারে। অগ্রাধিকারের শ্রেণীর ভিত্তিতে ঋণ মঞ্জুরির এই ব্যবস্থা যদি চালু করা যায় তাহলে ব্যাঙ্কগুলিও, শিল্প ব্যবসাগুলিকে অপেক্ষাকৃত উন্নততর পদ্ধতিতে অর্থ বরাদ্দ করতে পারবে।

ব্যাঙ্কের পূর্ব্বতন ডাইরেক্টররা যেমন ব্যাঙ্কের শেয়ার মূলধনের একটা বেশ বড় অংশের মালিক ছিলেন তেমনি তাঁদের একটা বড় আর্থিক ঝুঁকি নিতে হত। কিন্তু ব্যাঙ্কের নবগঠিত বোর্ডের ডাইরেক্টারদের সেই রকম কোন ঝুঁকি নেই। এখন বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন কিন্তু আর্থিক ঝুঁকিবিহীন নতুন ডাইরেক্টররা, পুরানো ডাইরেক্টরদের তুলনায় ব্যাঙ্কের উন্নয়নে কতখানি সাফল্য লাভ করতে পারেন তা দেখা যাক।

ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণ মঞ্জুরীর ব্যাপারটা যে সরকারের লাইসেন্স বা অন্যান্য

১২ পৃষ্ঠায় দেখুন

অর্থনীতির রীডার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

হার্ডিলিয়া—পেট্রোকেমিক্যাল কারখানা পাঁচ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করছে

অনিল সোম

বোম্বাইতে পেট্রোকেমিক্যাল উৎপাদনের যে কটি কারখানা আছে তার তালিকায়, বোম্বাই-এর উত্তরে থানা—বালাপুর শিল্প এলাকার হার্ডিলিয়া—পেট্রোকেমিক্যাল হ'ল একটি নতুন সংযোজন।

১৯৬৮ সালে এই কারখানার উদ্বোধন করা হয়। এটির বার্ষিক নির্ধারিত উৎপাদন ক্ষমতা হ'ল ৪১,৪০০ টন। এই কারখানায় বিভিন্ন প্রকারের ভারী রাসায়নিক দ্রব্য উৎপন্ন হয়।

কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্য পাঠাবার জন্য কয়েক মাইল দীর্ঘ যে পাইপ লাইন বসানো হয়েছে, তাতে তিনটি শিল্প সংস্থা সহযোগিতা করেছে। সংস্থাগুলি হ'ল যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের হারকিউলিস ইনকর্পোরেটেড, গ্রেট বৃটেনের বি. পি. কেমিক্যালস লিমিটেড এবং মাদ্রাজের ই—আই—ডি—প্যারি লিমিটেড। যুক্তরাষ্ট্রে, শীর্ষস্থানীয়, যে ১০টি কেমিক্যাল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আছে হারকিউলিস কর্পোরেটেড তার অন্যতম। এই প্রতিষ্ঠানটি সহস্রাধিক মৌলিক রাসায়নিক বস্তু উৎপাদন করে। সারা পৃথিবীতে সে সব দ্রব্য বিক্রী করে যে অর্থ পাওয়া যায় তার পরিমাণ ৬৫ কোটি ডলারেরও বেশী। এই বিরাট কারখানায় যে সব মৌলিক রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয় সেগুলি কাগজ, প্লাস্টিক, রং, বস্ত্র, কৃত্রিম তন্তু, খাদ্যবস্তু প্রস্তুতে এমন কি কৃষি সংশ্লিষ্ট শিল্পেও ব্যবহৃত হয়।

গ্রেট বৃটেনের বি. পি. কেমিক্যালস দীর্ঘদিন ধরে ভারতের রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে নানা প্রকার জৈব রাসায়নিক দ্রব্য, দ্রাবক, কৃত্রিম রজন, রবার প্রভৃতি সরবরাহ করে আসছে। গত ২০ বছর ধরে হারাকিউলিসের সঙ্গে তাদের ব্যবসার সম্পর্কও রয়েছে।

তৃতীয় সহযোগী প্রতিষ্ঠানটি হল ভারতের ই—আই—ডি—প্যারি। এটি রাসায়নিক দ্রব্যাদি, সিরামিক, চিনি, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য এবং ভেষজ দ্রব্য উৎপাদন ক'রে আসছে। অন্ধ্র প্রদেশের বিশাখাপত্তনমে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করমণ্ডল সারপ্রকল্পের প্রধান উদ্যোক্তা হ'ল এই প্রতিষ্ঠানটি।

এই প্রকল্পের জন্য মোট যে অর্থ ব্যয় হয়েছে তার শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ পাওয়া গিয়েছে আমেরিকার কাছ থেকে ঋণ হিসেবে।

এর মধ্যে ৩৩ লক্ষ ডলার ঋণ পাওয়া গিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের এক্সপোর্ট ব্যাঙ্ক থেকে। আরও ২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার ঋণ পাওয়া গিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার মারফতে ভারতে মার্কিন খাদ্যশস্য বিক্রীর মূল্য থেকে।

হার্ডিলিয়া কারখানায় পাঁচ রকমের রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ইউনিট আছে। এই রাসায়নিক দ্রব্যগুলির মধ্যে আছে ফেনল এসিটোন ডায়াসিটেন অ্যালকোহল, থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইড এবং থ্যালেটস প্রভৃতি।

ভেষজ, রবার, কেমিক্যাল, লুব্রিকেটিং-তেল, রঙের উপকরণ এবং বিভিন্ন রকমের উৎকৃষ্ট রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতে কাঁচামাল হিসেবে ফেনল (কার্বলিক এসিড) ব্যবহৃত হয়। পেট্রোল শোধন করা এবং কীটঘ্ন প্রস্তুতেও এই বস্তুটি ব্যবহৃত হয়।

অ্যাসিটোন একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্রাবক বস্তু, বিভিন্ন রকমের শ্রমশিল্পে যার বহুল ব্যবহার আছে। বিভিন্ন রকমের ওষুধ তৈরির জন্য সুরুতেই এই বস্তুটির প্রয়োজন হয়। ক্লোরোফর্ম ও আয়োডোফর্ম থেকে সুরু করে ভিটামিন 'সি'র মত জটিল ওষুধ তৈরিতেও এটির প্রয়োজন হয়। এবং শিলাজত শোধনে এবং প্রাকৃতিক তেল ও চর্বি নিষ্কাশনে অ্যাসিটোন কাজে লাগে।

ব্রেক ফ্লুইডের প্রধান উপকরণ হচ্ছে ডায়াসিটোন অ্যালকোহল।

থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইড প্রধানত: ব্যবহৃত হয় রঙ, আস্তরণ দেবার উপাদান এবং প্লাস্টিক প্রস্তুতে।

ভিনিল ও সেলুলোজ প্লাস্টিকের আস্তরন তৈরীর প্রধান উপকরণরূপে থ্যালেটস ব্যবহৃত হয়।

বিভিন্ন রকমের রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য হার্ডিলিয়ার কারখানায় যে সব কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় সেগুলির শতকরা ৯০ ভাগ দেশীয়। বাদবাকী যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেন থেকে আমদানি করা হয়।

হার্ডিলিয়াতে রাসায়নিক দ্রব্যাদি উৎপাদিত হওয়ার ফলে ভারতের প্রতি বছর পাঁচ কোটি টাকার অধিক বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে। এ ছাড়া, সমগোত্রীয় যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান আমদানী করা রাসায়নিক দ্রব্যের অভাবে কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারত না, সেগুলি এখন সেই ক্ষমতা পুরাপুরি কাজে লাগাচ্ছে।

সংরক্ষিত জল সরবরাহ কর্মসূচী

দেশে সংরক্ষিত জল সরবরাহ প্রকল্প এবং পুষ্টি কর্মসূচীতে ইউনিসেফের (UNICEF) সাহায্য পাওয়া গেছে। দেশের যে সব এলাকায় ভূস্তরে কঠিন শিলা রয়েছে বিশেষভাবে সেই সব এলাকায় জল উত্তোলনের সাজ সরঞ্জাম কেনার জন্য ১৯৬৯-৭৪ সালের মধ্যে ৪৫ লক্ষ মার্কিণ ডলার সাহায্য পাওয়া যাবে বলে ইউনিসেফ ইঙ্গিত দিয়েছে। প্রকল্প প্রতি এই সাহায্য এক লক্ষ মার্কিণ ডলারের বেশী ছিল না। এ পর্যন্ত এই সব প্রকল্পে ১০ লক্ষ ৩০ হাজারের মত মার্কিণ ডলার পাওয়া গেছে।

আরও দ্রুত আর্থিক উন্নয়ন প্রয়োজন

শান্তি কুমার ঘোষ

বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাহিদার হিসেব ক'রে এবং সীমিত সম্পদের ওপর ভিত্তি ক'রে একটা অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলাই হল ভারতের পারকল্পনার ভূমিকা। দ্বিতীয় পারকল্পনা থেকে, ভাবি শিল্পগুলির ওপর ভিত্তি করেই উন্নয়নের কর্মসূচী তৈরি করা হচ্ছে। প্রথম দিকে দেশে যখন শিল্পের ভিত্তি গড়ে তোলা হচ্ছিল তখন ব্যবহারের মাত্রা, অন্ততঃপক্ষে ব্যবহার বৃদ্ধির মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম রাখা হয়েছিল। এর জন্য সঞ্চয়ের মাত্রা বেশী রাখা হয়েছিল তা না হলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হয়ে পড়তো। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়ে এবং তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম কয়েক বছর এই ব্যবস্থাগুলি কার্যকরী হয়।

বিদেশ থেকে যে সব জিনিস আমদানি করতে হয় সেগুলি যাতে দেশেই তৈরি করা যায় সেই উদ্দেশ্যে সেই ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠা করাই হ'ল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির লক্ষ্য। যে সব যন্ত্রপাতি দিয়ে মেসিন তৈরি করা যায় সেই সব যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানাসহ, মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠার ওপরেই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়। কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যও যে কারিগরী উন্নয়নের প্রয়োজন, তার ওপরে সাম্প্রতিক কাল পর্য্যন্ত তেমন গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় নতুন সাজসরঞ্জাম, রাসায়নিক সার ইত্যাদির যথেষ্ট সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হয়নি।

বড় বড় যে সব সরকারি সংস্থায় পরিকল্পনা অনুযায়ী যথেষ্ট অর্থ লগ্নি করা হয়েছে সেগুলি থেকে আশানুরূপ লাভ পাওয়া যায়নি। যে অর্থ লগ্নি করা হয়েছে তা থেকে উপযুক্ত পরিমাণ লাভ করাটাই হল এখন সরকারি তরফের আশু সমস্যা। তাছাড়া কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় নতুন প্রয়োজন বিশেষ করে কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যের অনুপাতে কতকগুলি প্রয়োজনও মেটাতে হবে। আর্থিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয়, কতকগুলি জিনিসের উৎপাদন, বিশেষ করে সার, পেট্রো-কেমিকেল এবং কয়েক ধরণের মেসিনারি উৎপাদনের জন্যও সরকারি তরফ থেকে অর্থলগ্নি করতে হয়। এই সব ক্ষেত্রে আমাদের মোট প্রয়োজনের বেশ কিছুটা অংশ বর্তমানে বিদেশ থেকে আমদানি করে মেটাতে হয়।

পরিবর্ত্তিত নীতি

আমদানির পরিবর্ত্ত তৈরী করার দিকেই সরকার বেশী দৃষ্টি দেওয়ায়, রপ্তানীর দিকটা অবহেলিত হয় এবং বৈদেশিক মুদ্রায় ঘাটতি পড়ায়, কঠোর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। টাকার মূল্যমান হ্রাসের বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া, আভ্যন্তরীণ মন্দা যা রপ্তানীর পরিমাণ বাড়াতে উৎসাহিত করে এবং রপ্তানী বাড়াবার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে উৎসাহ জনক সুযোগ সুবিধে ও সাহায্য, সম্প্রতি রপ্তানী বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। ভারত বহু দেশে মেসিন টুল, বস্ত্র ও চিনি তৈরীর যন্ত্র পাতি এবং হাল্কা ইঞ্জিনিয়ারীং সামগ্রী রপ্তানী করতে সুরু করেছে। তবে রপ্তানী-যোগ্য জিনিসপত্রের দাম প্রতিযোগিতা-মূলক অর্থাৎ অন্যদেশের তুলনায় কিছুটা সস্তা রাখার ওপরেই রপ্তানী বৃদ্ধির সাফল্য নির্ভর করবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাজ শেষ হওয়ার পর, তৃতীয় পরিকল্পনায় পূর্ব্বের উন্নয়ন ধারাই অনুসরণ করা হবে অথবা এই ধারায় মৌলিক কোন পরিবর্ত্তন আনা হবে সেই প্রশ্ন দেখা দেয়। তখনই আত্মনির্ভরশীল উন্নয়নের নীতি গ্রহণ করা হল এবং পরিকল্পনা রূপায়ণের কৌশলে নতুন একটা জিনিস সংযুক্ত হল। অর্থাৎ বৈদেশিক সাহায্যের ওপর বেশী করে নির্ভরতার নীতি গ্রহণ করা হল। যাই হোক বাধাবিহীন ভাবে যথেষ্ট বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার কল্পনা বেশীদিন স্থায়ী হলোনা।

১৯৫৪-৫৫ থেকে ১৯৬৩-৬৪ সাল পর্যন্ত জাতীয় আয়ের অংশ হিসেবে মোটামুটি সঞ্চয় ওঠা নামা করলেও তা উঠতির দিকে থাকে এবং ১৯৬৩-৬৪ সালে তা শীর্ষ স্তরে পৌঁছায়। কিন্তু কৃষি উৎপাদন, অন্যান্য ক্ষেত্রের উৎপাদনের মত না বাড়ায় এই সঞ্চয়ের হার কমে যায়। সরকারি তরফে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২৯,০০ কোটি টাকা এবং তৃতীয় পরিকল্পনার সময়ে ৪,৮০০ কোটি টাকা ঘাটতি হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যাঙ্কগুলিই বেশীর ভাগ অর্থ সরবরাহ করে এবং দ্বিতীয় স্থান গ্রহণ করে বৈদেশিক সাহায্য। তৃতীয় পরিকল্পনায় অবশ্য অবস্থাটা একেবারে বদলে যায়। মোট ঘাটতির শতকরা ৫০ ভাগ বৈদেশিক সাহায্য থেকে মেটানো হয় এবং ব্যাঙ্কগুলি থেকে শতকরা ৩৩ ভাগ মেটানো হয়।

বিফলতা

দেশে লগ্নির ক্ষেত্রে অগ্রগতি ভীষণভাবে ব্যাহত হয়েছে। ১৯৬৮-৬৯ সালে আর্থিক লগ্নির হার ছিল শতকরা ১১.৩ ভাগ। সম্পদ হ্রাস পাওয়ার চাপ প্রধানতঃ এই লগ্নি দিয়ে প্রতিরোধ করা হয়। সরকারি তরফের ব্যয়ে, ভোগ্য শ্রেণীর দ্রব্যাদির পরিমাণ বাড়ে, ফলে সরকারি তরফের বিনিয়োগও হ্রাস পায়। সুতরাং মন্দার সৃষ্টি করে এই সমস্যা সমাধান করার চিরাচরিত উপায় গ্রহণ করা হয়। তিন বছরের জন্য প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পনার কাজে মন্দার ভাব রাখা হয়।

অতীতে যেখানে দীর্ঘকালীন মেয়াদের পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা তৈরী করা হত তার পরিবর্ত্তে অন্ততঃপক্ষে সাময়িকভাবে স্বল্পকালীন নীতি গ্রহণ করা হয়। এতে সম্পদ ব্যবহারের ওপর হয়তো কম চাপ পড়েছে কিন্তু আর্থিক উন্নয়নের হারও কম হয়েছে। সম্প্রতি কয়েক বছরে উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হয়েছে তা হিসেবের মধ্যে ধরেও, মোট জাতীয়

১৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

সাক্ষরের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি

অন্য দেশে কী ঘটছে.........

মালি

আফ্রিকার মালিতে ২০০০ জনের ও বেশী স্বেচ্ছাকর্মী গত আট বছর থেকে শিক্ষা বিস্তারের কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন শিক্ষক, কিশোর কিশোরী, মহিলা, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী এবং সৈন্য। বর্তমানে এঁরা ৬২০ টি শিক্ষা-কেন্দ্র পরিচালনা করছেন এবং শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কে দেশটি এই রকম ব্যাপক একটা কর্মসূচী গ্রহণ করায় ইউনেস্কো এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশেষ তহবিল, দেশটির জাতীয় অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রধান ক্ষেত্রগুলির উন্নয়নের সঙ্গে যোগ রেখে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে একটি পরীক্ষা-মূলক প্রকল্প নিয়ে মালিতে কাজ সুরু করেছেন।

এই প্রকল্পটিকে সহর ও পল্লী অঞ্চল অনুযায়ী বিভক্ত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হ'ল মালির সরকারী কারখানাগুলির প্রায় ১০,০০০ কর্মীর উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো এবং প্রায় এক লক্ষ কৃষক যাঁরা সেগু অঞ্চলে তুলো ও ধানের চাস করেন তাঁদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো। কৃষিক্ষেত্রে এবং কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে কি কি পদ্ধতি মালির কৃষক বা কর্মীদের পক্ষে বিশেষ সুবিধেজনক হতে পারে, তা নির্দ্ধারণ করাই হ'ল এই কর্মসূচীর লক্ষ্য। আধুনিক অর্থনীতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে হলে যে জ্ঞান দরকার তা সরবরাহ করে, এঁরা যাতে আস্তে আস্তে নিজেদের কাজ বিশ্লেষণ করে আধুনিক পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করতে শেখেন তাতে সাহায্য করাটাও অন্যতম উদ্দেশ্য।

কৃষি ক্ষেত্রে

প্রকল্পের কর্মীরা পল্লী অঞ্চলে কৃষকদের আস্থা অর্জ্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। বাগুইনেডার সোকামো আবাদের কৃষি শ্রমিকরা প্রতিদিন দুই ঘন্টা ক'রে প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষাসূচী অনুযায়ী পাঠ গ্রহণ করেন এবং তার উপকারগুলি সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগান। কারণ তাঁরা আধুনিক কৃষি সম্পর্কে যে সব পদ্ধতি ও কৌশল শেখেন সেগুলি নিজেদের ক্ষেতে এবং সরকারী খামারে কাজে লাগান। সেগুতে একটি কাপড়ের কলের একজন কর্মচারী বলেন যে "এই শিক্ষা বিস্তারের ফলে আমরা অনেকখানি লাভবান হয়েছি কারণ তুলোর চাষীরা এখন আমাদের প্রয়োজনের স্বরূপ পূর্ব্বের তুলনায় ভাল বোঝেন। বর্তমানে তাঁরা মালির প্রধান ভাষা বাম্বারা পড়তে পারেন বলে, আমরা তাঁদের জন্য যে সব চাষ পদ্ধতি তৈরী করে দেই তা তাঁরা বুঝতে পারেন। তেমনি কিটা অঞ্চলে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীরা, কৃষকদের চীনা বাদামের কৃষিতে আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করাতে সক্ষম হয়েছেন। এর ফলে ১৯৬৬-৬৭ সালে যেখানে ২৫,০০০ মেট্রিক টন চীনাবাদাম উৎপাদিত হয় সেই তুলনায় ১৯৬৮-৬৯ সালে উৎপাদিত হয় ৩৩,০০০ মেট্রিক টন। প্রাপ্তবয়স্কদের এই শিক্ষা-সূচী অনুযায়ী চাষীদের সামান্য কিছু অঙ্ক ও অন্যান্য বিষয় শেখানো হলেও তারা তাতেই সন্তুষ্ট নন। তাঁরা এখন সংখ্যার মারপ্যাচ বুঝতে শেখায় মনে করেন ক্রেতারা এখন আর তাদের ঠকাতে পারবেনা।

গিনি সীমান্তের কাছাকাছি একটি জায়গায় একজন চাষী একটা ব্ল্যাকবোর্ডে বড় বড় করে লিখে রেখেছিলেন, "বালা এখন চীনা বাদাম ওজনে ব্যস্ত।" তা দেখে আর একজন শিক্ষার্থী চাষী তার নীচে লিখে দেন যে "বিক্রী করার সময় ও আরও সতর্ক হয়ে ওজন করবে।" এদের কাছে সঠিক ভাবে ওজন করাটা একটা বড় সমস্যা তবে আজকাল এদের মধ্যে অনেকেই, এখানকার বাজারে প্রচলিত ফরাসী ও চীনা তৌলযন্ত্রের ব্যবহার এখন শিখে ফেলেছেন। তাঁদের কাছে মাপবার যন্ত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি যন্ত্র, কারণ এটি উপযুক্তভাবে ব্যবহার করলে ক্রেতারা তাঁদের ঠকাতে পারবেনা।

কারখানায়

প্রাপ্তবয়স্কদের এই শিক্ষা বিস্তার কর্ম-সূচী গ্রামে যতটা ফলপ্রদ হয়েছে, সহরে তেমন নয়। সহরের শিক্ষার্থীরাই এই শিক্ষাসূচী থেকে বিশেষ করে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ থেকে বেশী উপকৃত হচ্ছেন। কারখানার কাজকর্ম সম্পর্কে বয়স্করা তাদের অভিজ্ঞতা বেশী কাজে লাগাতে পারেন। জাতীয় বিদ্যুৎ পর্ষতের একজন কর্মচারী বলেন যে প্রাপ্তবয়স্কদের এই শিক্ষাসূচী যে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া যারা শিক্ষা গ্রহণ করছেন তারা কাজের বিভিন্ন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারছেন বলে তাদের মধ্যে একটা সংহতি ও গড়ে উঠছে। তিনি বলেন যে "এক বছর পূর্ব্বেও কোন শিক্ষানবীশকে কোন একটা যন্ত্রপাতি আনতে বললে, নামগুলি, পড়তে পারে এমন একজন লোককেও তার সঙ্গে পাঠাতে হত। কিন্তু এখন এরাই স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। ওরা এখন পড়তে শিখছে এবং আমরা কি চাই তা সঠিকভাবে বুঝতে শিখেছে।"

বিদ্যুৎ পর্ষত যখন শিক্ষিত কর্মীর অভাব অনুভব করছিলেন ঠিক তখনই ইউনেস্কোর প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রশিক্ষণ প্রকল্প সম্পূর্ণ অশিক্ষিতকে সাক্ষর করে তোলায় এখন তাদের মধ্য থেকেও, দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য লোক পাওয়া যায়।

মালির কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রের সর্ব্বত্র এখন জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য যে আগ্রহ দেখা

যায়, তা যে শুধু ভালো চাকরি পাওয়ার জন্য তাই নয়। সম্প্রতি একটা অনুশীলনে কর্মীদের কাছ থেকে যে উত্তর পাওয়া যায় তাতেই তা বোঝা যাবে। এখানে কর্মীদের কতকগুলি উত্তর দেওয়া হচ্ছে :

"আমাকে যখন বলা হ'ত এত বস্তা সার নিয়ে এসো ; তখন আমার প্রায়ই ভুল হত. কারণ, হয়তো বস্তার সংখ্যা ভুলে যেতাম না হয়তো সারের নাম ভুলে যেতাম। এখন আমাকে যা করতে বলা হয় তা আমি লিখে নিয়ে যেতে পারি এবং লেবেলগুলিও পড়তে পারি। কাজেই এখন আর ভুল করিনা।—" একজন কৃষি কর্মী।

—"এখানকার আবাদে আমাদের খুব সঠিকভাবে কাজ করতে হয়। বাগানের কোন অংশে চাষে কোন গোলমাল হলে, কে তার জন্য দায়ী তা নিয়ে আমাদের মধ্যে বাদানুবাদের সৃষ্টি হতো। এখন যে, যে জমিটুকু চাষ করে সেখানে সে তার নাম লিখে রাখে—"।—একটি সরকারী আবাদের একজন কর্ম্মী।

—"দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে আমার স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করেছেন। আমার প্রথম দুটি সন্তানের জন্ম তারিখ এখন আর আমার মনে নেই। কিন্তু এই নতুন সন্তানটির জন্ম তারিখ আমি লিখে রেখেছি।"—একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের একজন কর্ম্মী।

—"প্রাপ্ত বয়স্কদের এই শিক্ষা-সূচী অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করার পূর্ব্ব পর্যন্ত পরিবারে আমার কোন কর্ত্তৃত্ব ছিলোনা। আমার নিজের ছেলেমেয়ে ভাইপো ভাইঝিরা স্কুলে যায় এবং লিখতে পড়তে পারে। এখন আমিও প্রায় তাদের মতই লিখতে পড়তে পারি এবং স্কুল থেকে যে সব অঙ্ক দেয় সেগুলি আমি করতে পারি, তার ফলে তারা—আমাকে সন্মান দেখায় এমন কি আমার প্রশংসা ও করে।"—
একজন কারখানার কর্ম্মী।

(ইউনেস্কোর একটি প্রবন্ধ থেকে)

মীরগুণ্ডে রেশম গুটীর চাষ

রেশম গুটীর চাষের জন্য কাশ্মীরের মীরগুণ্ডে ১৩ বছর আগে একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। ২০০ একর জমি নিয়ে ঐ কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। কেন্দ্রের মোট জমির চার ভাগের তিনভাগে তুঁতের চাষ করা হয়। এই কেন্দ্রটিতে তিনটি অংশ আছে।

এখানে পী. থ্রী. ও পী. টু. জাতের গুটীর চাষ হয়, নতুন প্রজাতি সৃষ্টি ও লালন করা হয় এবং গুটী চাষের সঙ্গে সঙ্গে তুঁতের চাষও করা হয়। রেশম পোকার বংশবৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় পরিমাণে গুটী যোগান দেওয়া কেন্দ্রের প্রধান কাজ।

১৯৬৯ সালে পী. টু. জাতির ডিম সংগ্রহের লক্ষ্য মাত্রা ধার্য করা হয় ১৫,০০০ কিন্তু ডিমের প্রকৃত সংখ্যা শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়ায় ২৪,০০০। এক আউন্স পরিমাণ ডিম থেকে ১৯৬৫ সালে ৬০ কে জি. ও ১৯৬৯ সালে ৯৩ ২৫৭ কে. জি. গুটী পাওয়া যায়। এ ছাড়া মীরগুণ্ড কেন্দ্র ব্যবসায়িক দিক থেকে, উন্নত শ্রেণীর ৯টি প্রজাতিকে সর্ব প্রকার আবহাওয়ায় সহনশীল ক'রে তোলে। ঐ প্রজাতি-গুলি যাতে গবেষণাগারে বিশ্লেষণের প্রতিক্রিয়া সমেত সর্বপ্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে সেই রকমভাবে তৈরি করা হয়। যে সব রাজ্যে গুটীপোকার চাষ হয়, সেই সব রাজ্যে, সেন্ট্রাল সিল্ক বোর্ডের মাধ্যমে, এই ৯টি প্রজাতির মধ্যে চার রকমের রেশম কীট পাঠানো হয়।

পী. ওয়ান স্টেশন স্থাপিত. হয় ১৯৬২-তে। এই কেন্দ্রে পী. টু. (গ্র্যাণ্ড পেরেন্ট জাতের অর্থাৎ যে পোকা থেকে গুটী চাষের জন্য ডিম সংগ্রহ করা হয়) ডিম লালন ক'রে তার থেকে পী. ওয়ান. শ্রেণীর ডিম চাষ করা হয়। স্টেশনটি ছোট ছোট আরও চারটি ইউনিটে ভাগ করা। এর তিনটি মীরগুণ্ডায়, চতুর্থটি তাংমার্গে। ১৯৬৮ সালে এই স্টেশনে ৪৭৭২ আউন্স পী. ওয়ান. জাতের ডিম নিয়ে কাজ শুরু করা হয়। ঐ বছরে এক আউন্স ডিম থেকে যে গুটী পাওয়া যেত, তার পরিমাণ ছিল ৩০.৫০০।

মীরগুণ্ড স্টেশনের তৃতীয় ইউনিটটি হ'ল তুঁতের বাগান। বাগানের আয়তন হবে ১৫০ একর। এখন এইটি দেশের উন্নত তুঁত বাগিচার মধ্যে অন্যতম। গত পাঁচ বছরে তুঁত পাতার ফলনের পরিমাণ ৭০ গুণ বেড়েছে। একর প্রতি পাতার উৎপাদন ১১৭.৬০ পাউণ্ড থেকে বেড়ে ৮২৩২ পাউণ্ড হয়েছে। গাছের নতুন পরিচর্যা পদ্ধতি এবং সার প্রভৃতি ব্যবহারের ফলে এখন একর প্রতি পাতা পাওয়া যাবে ২৫০০০ পাউণ্ডের মত।

বাইরে থেকে আমদানী করা রেশম কীটের ডিমের ওপর জম্মু ও কাশ্মীরকে যাতে নির্ভর ক'রে বসে থাকতে না হয় সেজন্য ঐ কেন্দ্রটির স্থাপনা। মীরগুণ্ড কেন্দ্র ও সমশ্রেণীভুক্ত অন্যান্য কেন্দ্রগুলির উন্নতি বিধানের ফলে জম্মু কাশ্মীরের রেশম শিল্প আবার অতীত গৌরব ফিরে পাবে বলে আশা করা অযৌক্তিক হবে না।

পরিকল্পনা ও সমীক্ষা

হীরাকুদ বাঁধ সম্বলপুরকে প্রথম সারির ধানউৎপাদনকারী জেলায় পরিণত করেছে

ওড়িশার হাজার হাজার কৃষক একদা মহানদীর খামখেয়ালীতে উত্যক্ত হয়ে ভাবতেন একে কি শাসন করা যায়না? একটি শান্ত স্রোতস্বিনীতে পরিণত করা যায়না? সেই মহানদীকে একটি সুখ সমৃদ্ধিদায়িনী স্রোতস্বিনীতে পরিণত করার স্বপ্ন আজ সফল করে তোলা হয়েছে হীরাকুদ বাঁধ তৈরী ক'রে। (নীচে ছবি)

এই স্বপ্ন সফল হয়ে ওঠায় সম্বলপুর জেলাটি এখন নতুন রূপ নিয়েছে। জেলার সর্ব্বত্র দেখতে পাওয়া যায় সবুজ ধানের ক্ষেত। পূর্ব্বের তুলনায় এখন কৃষকরা অনেক বেশী ফসল তুলছেন। পূর্ব্বে যেখানে বর্ষার অনিশ্চয়তার ওপর নির্ভর ক'রে কৃষকরা কেবলমাত্র একটি ধানের ফসল পেতেন এখন হীরাকুদ খাল ও তাঁর বহু শাখা থেকে সারা বছর ধরে সেচের জল পাচ্ছেন ব'লে বছরে দুটো এমন কি তিনটে পর্য্যন্ত ফসল পাচ্ছেন।

যে সব জায়গা একসময়ে ছিল উষর ও পতিত সেখানে এখন প্রচুর ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। সম্বলপুর জেলাকে ভারতের প্রথম সারির ধান উৎপাদনকারী জেলাগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অসংখ্য ছোট বড় কৃষক ও সম্প্রসারণ কর্মী হাতে হাত মিলিয়ে যে বিপুল পরিশ্রম করেছেন তাঁরাও এই সাফল্যের অংশীদার, তাঁরাও প্রশংসা পাবার অধিকারী।

সাফল্যের অগ্রগতি নিরূপণের মাপকাঠি অনেক রকম হ'তে পারে। যেমন কী পরিমাণ সার ব্যবহৃত হয়েছে তা দিয়ে কৃষির অগ্রগতির হার নিরূপণ করা যায়। ১৯৬০-৬১ সালে যেখানে মাত্র এক হাজার মেট্রিক টন রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হয়েছিল, গত বছর পর্য্যন্ত সেই পরিমাণ ৪০ গুণ বেড়ে ৪০,০০০ টনে দাঁড়ায়।

এ্যামোনিয়াম ফসফেট, ডায়ামোনিয়াম ফসফেট, ট্রিপল্ সুপার ফসফেট এবং ইউরিয়ার মত মিশ্রিত সারও সাধারণ কৃষকরা যে পরিমাণে ব্যবহার করেছেন তাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। আর একটা বিষয়ও সম্বলপুরের সাধারণ কৃষকদের কারিগরী যোগ্যতার প্রমাণ দেয়। তা হল; নাইট্রোজেন ও ফসফেটযুক্ত সার প্রায় সমান অনুপাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

এরই সঙ্গে নিয়মিতভাবে শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কৃষিভূমির পরিমাণ দ্বিগুণ বেড়ে ১,১০,০০০ একরে দাঁড়িয়েছে, শোধিত বীজের ব্যবহার ৪৪ মেট্রিক টন থেকে বহু গুণ বেড়ে, ২,০০০ টনে দাঁড়িয়েছে, কৃষির জন্য ঋণ মঞ্জুরির পরিমাণ ৫১ লক্ষ টাকা থেকে তিনগুণ বেড়ে ১৬৬ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায় এবং মাটির নমুনা পরীক্ষার সংখ্যাও দ্বিগুণ বেড়ে গিয়ে ১৪ হাজারে দাঁড়িয়েছে।

এই পরিসংখ্যানগুলি খুবই উৎসাহজনক সন্দেহ নেই কিন্তু শুধু এগুলি থেকে সম্পূর্ণ অবস্থা জানা সম্ভবপর নয়।

অনেকেই হয়তো জানেন না যে দেশের মধ্যে সম্বলপুর জেলাতেই সর্ব্বপ্রথম ব্যাপক ভিত্তিতে নব উদ্ভাবিত অধিক ফলনের তাইচুং-নেটিভ-১ ধানের চাষ করা হয়। তারপর থেকে এই ধানের চাষের পরিমাণ বেড়েই চলেছে।

বর্ত্তমানে সম্বলপুর জেলার কৃষকরা অন্ততঃপক্ষে ধান চাষের ক্ষেত্রে পদ্মা, আই আর-৮ এবং তাইচুং নেটিভ-১এর মতো পরীক্ষিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধানবীজ ছাড়া অন্য ধানের চাষ করতে রাজি নন।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে কমলসিঙ্গা গ্রামের রামচন্দ্র রাও তাঁর সমগ্র ২০ একর জমিতেই দুটি ধানের ফসল ফলান, আর তার চাইতেও বড় কথা হ'ল তিনি কেবলমাত্র পদ্মা, তাইচুং এবং আই আর-৮ এই তিনটি, বেশী ফলনের ধানেরই চাষ করেন।

এই তিন রকমের ধান থেকেই তিনি একর প্রতি ১৪৮০ কিঃ গ্রাম ক'রে ফসল পান বলে তাতেই তিনি সন্তুষ্ট। তাছাড়া তিনি নিয়মিতভাবে কীটনাশক ছড়ান বলে তাঁর শস্যক্ষেত্রে পোকা মাকড়েরও উপদ্রব নেই।

১২ পৃষ্ঠার দেখুন

উৎপাদক ও ব্যবহারকারী উভয়কেই সাহায্য করে

নিম্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষণ

অনুমান করা হয় যে আমাদের দেশে ফল, শাক, সব্জি মাছ, দুধ এবং ডিমসহ পচনশীল পদার্থগুলির শতকরা ১৫ থেকে ২৫ ভাগ নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া ফল শাক সব্জি মরসুম অনুযায়ী হয় বলে এবং সহজেই নষ্ট হয় বলে উৎপাদকরা অনেক সময় অল্প মূল্যে বিক্রী করতে বাধ্য হন। পচনশীল জিনিসগুলির মূল্যের কোন স্থিরতা থাকেনা বলে উৎপাদক এবং ব্যবহারকারী উভয়েই অসুবিধে ভোগ করেন। কিন্তু দেশের অনেক জায়গাতেই এখন ঠাণ্ডা গুদামের সুবিধে পাওয়া যায় এবং এই রকম গুদামে ফল শাকসব্জি ইত্যাদি রেখে, বাজার দেখে বিক্রী করাটা যে বেশ লাভজনক তা প্রমাণিত হয়েছে।

জাতীয় অর্থনীতিতে ঠাণ্ডা গুদামে সংরক্ষণ ব্যবস্থাটা এত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান হয়ে দাঁড়িয়েছে যে সরকার ব্যাঙ্কগুলিকে একটা নির্দ্দেশ দিতে বাধ্য হয়েছেন। এর ফলে ভারতের ষ্টেট ব্যাঙ্কের মতো বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি, ঠাণ্ডা গুদামে ফল, শাকসব্জি ইত্যাদি সংরক্ষণে উৎসাহী ব্যক্তিদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ঋণের সুযোগ সুবিধেগুলি বাড়িয়ে দিয়েছে।

আলু

গত কয়েকবছর যাবৎ উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের আলু উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলিতে বীজ আলু সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে ঠাণ্ডা গুদামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে ১৯৪৫ সালেই ভোলটাস্, উত্তর প্রদেশে, বীজ আলুর জন্য সর্ব্ব প্রথম ঠাণ্ডা গুদাম তৈরী করেন। মরসুমের সময় প্রতি কুইনট্যাল বীজ আলুর দাম যেখানে থাকে ৪ টাকা অন্য সময়ে তার দাম হয় প্রতি কুইনট্যাল ২০ টাকা। কাজেই ঠাণ্ডা গুদামে আলু সংরক্ষণ করা বিশেষ লাভজনক একটা ব্যবসায়। এর চাইতে বড় কথা হ'ল গুদাম তৈরী করা ইত্যাদির ব্যয় দুই তিন বছরের মধ্যেই উঠে আসে।

২০ সেন্টিগ্রেডে আলু সংরক্ষণ করা যায় এবং এই রকমভাবে ছয়মাস পর্যন্ত রাখা যায়। পশ্চিমবঙ্গ গুদাম নির্ম্মাণ কর্পোরেশনের, আলুর ঠাণ্ডা গুদামের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের সবর-প্রধান আলু উৎপাদনকারী অঞ্চল তারকেশ্বরে এই গুদামটি তৈরী করা হয়েছে। ২,৭০১ মেট্রিক টন বীজ আলু যাতে সংরক্ষণ করে কৃষকদের উপকার করা যায় সেই উদ্দেশ্যেই এটি তৈরি করা হয়। এখন একটি ভারতের অন্যতম বিখ্যাত গুদাম।

শতকরা ৮৫ থেকে ৯০ ভাগ আর্দ্রতায় এবং ০° থেকে ১১° তাপমাত্রায় এই রকম ঠাণ্ডা গুদামে ফল ও শাক সব্জি ২২ থেকে ৭০ দিন পর্যন্ত টাট্‌কা রাখা হয়।

দুধ

প্রতিদিন যত দুধ আমাদের দেশে উৎপাদিত হয় তার শতকরা দশভাগই নষ্ট হয়ে যায়।

১০° সেন্টিগ্রেডের বেশী তাপমাত্রায় দুধ যদি বেশীক্ষণ রেখে দেওয়া যায় তাহলে দুধের মধ্যে যে বীজানু থাকে তা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। নানা জায়গা থেকে দুধ সংগ্রহ করে, সেগুলি বীজানুমুক্ত করে অন্যান্য জিনিস তৈরী করার জন্য কোন কেন্দ্রে পাঠাতে যথেষ্ট সময় লাগে বলে, বেশী সময়েরবর জন্য দুধ টাট্‌কা রাখার উদ্দেশ্যে গরু বা মহিষের দুধ দুইয়ে নিয়েই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা ঠাণ্ডা করা করা উচিত। তখনই দুধকে ৪.৪° সেন্টিগ্রেড বা তারও কম মাত্রায় ঠাণ্ডা করে ব্যবহারের পূর্ব্ব পর্যন্ত ঐ রকম ঠাণ্ডাই রাখতে হয়।

দুধ যদিও অত্যন্ত তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যায়, তবুও যদি উপযুক্তভাবে তা ঠাণ্ডা রাখা যায় তাহলে দুধ দুইয়ে তা ১৫ দিন বা তার বেশী সময় পর্যন্ত টাটকা রাখা যায়।

এই শতাব্দির চল্লিশ দশকের গোড়া থেকেই ভোলটাস্ এই দেশে দুধকে বীজানুমুক্ত করার কাজ এবং ঠাণ্ডা গুদাম ইত্যাদ তৈরি করার কাজ সুরু করেন। তার পর থেকে তাঁরা মাখন, পনীর, দুধ এবং বিস্কুট ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য অনেক ঠাণ্ডা গুদাম স্থাপন করেছেন।

নানা ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে নানা রকম পদ্ধতিতে জমাট খাদ্য তৈরি করা হয়। তবে স্বল্পতম ব্যয়ে ও স্বল্পতম সময়ে যে সব পদ্ধতিতে কোন জিনিস প্রয়োজনীয় তাপমাত্রায় সংরক্ষিত করা যায়, সেই পদ্ধতিটিই সাধারণতঃ সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়।

দৃষ্টান্ত হিসেবে প্লেট ফ্রিজারের কথা উল্লেখ করা যায়। এটা হল ইনসুলেট করা সাধারণ একটি আলমারির মত জিনিস। এতে সোজা সোজা কতকগুলি খোপ আছে। এই খোপে প্লেটগুলির ওপরে জিনিস রেখে ঠাণ্ডা করা যায়। জিনিসগুলি বের করতে বা রাখতে যাতে সুবিধে হয় সেজন্য সেগুলি সামনে টেনে এনে আবার বন্ধ করা যায়।

শেষাংশ অপর পৃষ্ঠায়

তাড়াতাড়ি জমাট করার অর্থ হল পচনশীল পদার্থগুলিকে দ্রুতগতিতে ৪০° থেকে ৪৫° সেন্টিগ্রেডে জমানো। এই রকমভাবে ঠাণ্ডা করা হ'লে সেগুলি যখন আবার রান্না করে খাওয়া হয় তখন তা টাটকা জিনিসের মতোই মনে হয়। এই-রকমভাবে ঠাণ্ডা করা খাওয়ার জিনিস পরে আবার ২৫ থেকে ১৮° সেন্টিগ্রেড তাপ মাত্রায় সংরক্ষণ করা যায়।

বর্তমান শতাব্দির চল্লিশ দশকের শেষের দিকে বিভিন্ন জিনিস তাড়াতাড়ি জমাট বাধানোর জন্য বোম্বাইতে পরীক্ষামূলক যে কারখানা স্থাপন করা হয় তাই হল মাছ জমাট করার ভারতের প্রথম কারখানা।

সমুদ্রজাত খাদ্য খুব তাড়াতাড়ি জমাট করার ব্যবস্থা করায়, বিশেষ করে কেরালার সমুদ্রজাত খাদ্য দ্রব্যাদির রপ্তানী, বেড়ে গিয়ে ১৯৬৮ সালে তা ২২.০৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। সমুদ্রজাত খাদ্য রপ্তানী করার জন্য আমাদের দেশে ৮২টি রপ্তানীকারী প্রতিষ্ঠান আছে তার মধ্যে শতকরা ৯০ টিই হ'ল কেরালায়।

এরপর বাঙ্গালোর, কালিকট এবং কোচিনে এই রকম তিনটি প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়। এগুলিতে ৪ ইঞ্চি পুরু পর্যন্ত মাছের টুকরো জমাট বাধানো যায়।

মাংস এই রকমভাবে ঠাণ্ডা করার জন্য বোম্বাইতে, ভারতীয় সৈন্য বিভাগের গ্যারিসন ইঞ্জিনীয়ারের জন্য সর্ব্ব প্রথম বড় ধরণের (২০০০ টন ক্ষমতার) প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়। ১৯৪৩-৪৪ সাল থেকে এটি এখন পর্যন্ত চালু রয়েছে।

হলদিয়া বন্দরে নতুন ডক

কলকাতা বন্দরের উন্নয়নের জন্য হলদিয়ায় একটি পরিপূরক ডক তৈরী হচ্ছে। ১৯৭১ সাল নাগাদ হলদিয়ার নতুন ডকটি চালু হবে বলে আশা করা যায়। এই ডকের জন্য লৌহ আকর এবং কয়লা বোঝাইয়ের প্ল্যান্ট সরবরাহের বরাত দেওয়া হয়েছে। নদীর মোহানার গভীরতা ও প্রস্থ বাড়াবার উদ্দেশ্যে মাটি কাটার জন্য একটি নতুন ড্রেজার কেনার প্রস্তাব বিবেচনাধীন রয়েছে। তৈলবাহী ট্যাঙ্ক ভেড়বার উপযোগী একটি 'অয়েল জেটি' ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে।

পরিকল্পনা ও সমীক্ষা

১০ পৃষ্ঠার পর

পদ্মা ধানের চাষে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন তাতে তিনি দেখেছেন যে এই ধান যে কেবল তাইচুং নেটিভ-১ এবং আই আর-৮ থেকে তাড়াতাড়ি পাকে তাই নয় এগুলি থেকে অনেক বেশী পরিমাণ মাঝারি সরু চাল পাওয়া যায়।

গত বছরেই তিনি সর্ব্বপ্রথম পদ্মা ধানের বীজ ব্যবহার করেন এবং দেখতে পান যে এগুলি তাইচুং থেকে ৮।১০ দিন আগে এবং আই আর-৮ থেকে ১৫ দিন আগে পাকে। তিনি এই বছর থেকে তাঁর সমস্ত জমিতেই পদ্মা ধানের চাষ করবেন বলে স্থির করেছেন।

বড়গড় তালুকের আনন্দ রাও, ইতিমধ্যেই বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছেন। জানুয়ারি থেকে মে মাসের খন্দে তিনি তাঁর সমগ্র ৬০ একর জমিতেই পদ্মা ধানের চাষ করছেন। সম্বলপুর জেলায়, এমন কি সমগ্র ওড়িষ্যাতেও বোধ হয় আর কেউ তাঁর সম্পূর্ণ জমিতে এই রকমভাবে পদ্মা ধানের চাষ করেননি।

ধান-উৎপাদন যদিও আমাদের মনোযোগ বেশী আকর্ষণ করে তবুও কেবলমাত্র ধানের ক্ষেত্রেই অগ্রগতি সীমাবদ্ধ নয় (ওড়িষ্যা ধানের আদি বাসভূমি বলেই অবশ্য ওড়িষ্যাতে ধানচাষের অগ্রগতি সম্পর্কে আমরা বেশী আগ্রহশীল)। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় গোবিন্দপুর ব্লকের বামফাই গ্রামের প্যাটেল ভ্রাতৃত্রয়, আলুচাষে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেছেন। ২১ বছর বয়স্ক কাহিতান প্যাটেল, তাঁর কুফরি আলুর ক্ষেত থেকে প্রতি একরে ১৮৮ কুইন্ট্যাল আলু পান এবং তাতে তিনি গত বছরে ঐ ব্লক থেকে প্রথম পুরস্কার পান। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা ৩০ বছর বয়স্ক অর্জ্জন মোহন প্যাটেল প্রতি একরে ১৪৮ কুইন্ট্যাল আলু ফলিয়ে দ্বিতীয় পুরস্কার পান। তৃতীয় ভ্রাতা ভীমশেঠ প্যাটেল, তার পূর্ব্ববছরে, রাজ্যের রাজধানী ভুবনেশ্বরে উৎকল ফুল ও শাকসব্জি প্রদর্শণীতে দ্বিতীয় পুরস্কার পান।

কিন্তু আলু উৎপাদনে পুরস্কার লাভ করাটাই তাঁদের একমাত্র সাফল্য নয়। অবশ্য এই পুরস্কারগুলি পাওয়ায় প্যাটেল ভ্রাতারা একটি নতুন মোটর সাইকেল কিনেছেন এবং বেশ বড় একখানা বাড়ী তৈরী করছেন (সম্ভবতঃ আলুর গুদাম করার জন্য)।

অর্জ্জন মোহন দুই একর জমিতে মেক্সিকো গম ''সফেদ লার্মার'' চাষ ক'রে প্রতি একরে ২৪ কুইন্ট্যাল ক'রে ফসল পান। লুধিয়ানার গম চাষীও এই রকম ফসল পেলে আনন্দে উৎফুল্ল হতেন।

এঁরা এবং এঁদের মতো আরও অনেকে, পনেরো বছরের কম সময়ের মধ্যেই সম্বলপুরের কৃষক সমাজের বহুদিনের এক স্বপ্ন সফল ক'রে তুলতে সাহায্য করছেন।

অলক ঘোষ

৫ পৃষ্ঠার পর

মঞ্জুরীর মতোই এ কথাটা মনে রাখতে হবে। ব্যাঙ্কগুলির সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটা ব্যাপকতর পরিপ্রেক্ষিতে দেখা উচিত। এটার অর্থ কেবলমাত্র ''বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলির নিয়ন্ত্রণ'' হওয়া উচিত নয়। বড় বড় বেসরকারী ব্যবসাগুলিও প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ষ্টেট ব্যাঙ্ক, এবং সমবায় ব্যাঙ্কগুলিও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত। আস্তে আস্তে ব্যাঙ্ক বহির্ভূত অন্তর্বর্ত্তী আর্থিক সংস্থাগুলিও একটা ব্যাপক ঋণ নিয়ন্ত্রণ ও ঋণ পরিকল্পনা ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত করা উচিত। সম্পূর্ণভাবে 'রাষ্ট্রীয়করণের কোন কর্ম্মসূচী ছাড়া এগুলি করা সম্ভব নয়।

ভারতের ঋণ মঞ্জুরির সুষ্ঠু ব্যবস্থা এবং ব্যাঙ্কগুলির ওপর প্রকৃত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অর্জ্জন করতে হলে, তার প্রথম সর্ত্ত হওয়া উচিত ঋণদানকারী সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির রাষ্ট্রীয়করণ। কিন্তু ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা অবিলম্বে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রায়ত্ব করা হয়তো সম্ভবপর নয়। সুতরাং বেছে বেছে কতকগুলি ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ব করার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি কোন কর্মসূচী গ্রহণ করার পরিবর্ত্তে আমাদের একটু অপেক্ষা করে তার জন্য উপযুক্ত ভিত্তি তৈরী করা উচিত।

সংরক্ষণের জন্যে

কাঁচা শাকসব্জী ও ফলমূল শুকোবার ঘরোয়া পদ্ধতি

ফলমূল শাকসব্জী সংরক্ষণের নানা পদ্ধতি আছে, যার মধ্যে আচার, চাটনী, মোরব্বা প্রভৃতি বাঙালী গৃহস্থ বধূদের কাছে খুবই পরিচিত। কিন্তু এইসব পদ্ধতিতে কাঁচা ফলমূল বা শাকসব্জী এমনভাবে রাখা যায় না যাতে সেগুলি কাঁচা বা রেঁধে খাওয়া যায়। কাঁচা শাকসব্জী যদি শুকনো ফলের মত সংরক্ষিত অবস্থায় রাখা যায় তাহলে বছরের সব সময়েই সেগুলি রাঁধা যেতে পারে। বছরের এক একটা সময়ে এক একটা সব্জী খুব পাওয়া যায় আবার অন্য সময়ে সেগুলো বাজারে থাকে না। দ্বিতীয়তঃ গ্রীষ্মের সময়ে শাকসব্জীর বাজার খালিই থাকে। সে সময়ে রান্নার জন্য পদ স্থির করা গৃহস্থ বধূদের পক্ষে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্যার সুরাহা হিসেবে পশ্চিম বঙ্গের কৃষি বিভাগের বিপণি শাখা, শাকসব্জী ও ফল সংরক্ষণের একটা সহজ পদ্ধতির বহুল প্রচারে উদ্যোগী হয়েছে। এই পদ্ধতি আর কিছুই নয়; টাটকা শাকসব্জী ও পাকা ফল শুকিয়ে রাখা। ঠিকমত শুকিয়ে নিতে পারলে শাকসব্জীর গুণ নষ্ট হবে না এমন কি কাঁচা অবস্থার চেহারা ও স্বাদও থাকবে।

ফল মূল সব্জী প্রভৃতি শুকোবার তিনটি, পদ্ধতি আছে, (১) রোদে শুকোনো, (২) তাপে শুকোনো ও (৩) যন্ত্রের সাহায্য শুকোনো। এই তিনটির যে কোনোটি থেকে সম্পূর্ণ ফল পেতে হ'লে কয়েকটি নিয়ম অবশ্যই মেনে চলা দরকার। সেই নিয়মগুলি হ'ল (১) শুকোবার আগে সব্জী বা ফল ধুয়ে পরিষ্কার করে জল শুকিয়ে নেওয়া উচিত। (২) সব্জী বা ফল সুপুষ্ট অথচ শক্ত হওয়া দরকার। (৩) ফল বা শাকসব্জী সকালের দিকে পেড়ে বা তুলে, ধুয়ে, ৬ ঘন্টার মধ্যে শুকিয়ে নেওয়া উচিত।

কিছু কিছু সব্জী বা ফল আস্ত শুকোনো হয়; শাক আস্তই শুকোতে হয়। সব্জী বা ফল আকারে বড় হ'লে তার খোসা ছাড়িয়ে, বীচি ফেলে, কেটে বা নুন মাখিয়ে নিতে হয়। কাটা টুকরো পাৎলা (১/৮ ইঞ্চি—১/৪ ইঞ্চি পুরু), লম্বা, ফালা ফালা হ'লে তাড়াতাড়ি শুকোয় এবং তাড়াতাড়ি শুকোলে তার নিজস্ব স্বাদ গন্ধ বেশী বজায় থাকে।

সব্জী বা ফল কাটার সময়ে, অনেক ক্ষেত্রে কষের দাগ পড়ে যায়। গৃহস্থ পরিবারের বঁটিতে কাটার দরুণ এ ব্যাপারটা প্রায়ই নজরে পড়ে। এটা এড়াবার উপায় যে (নুন মেশানো জলে সেরখানেক জলে বড় চামচের তিন চামচ নুন) এগুলি ধুয়ে নেওয়া এ সব বাঙ্গালী বধুই জানেন। তবে ষ্টেনলেস ষ্টিলের ছুরীতে কাটলে দাগ পড়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকে।

শাকসব্জী শুকোবার আগে একটু ভাপিয়ে নিতে হয় এবং ফলমূলে গন্ধকের ধোঁয়া খাওয়াতে হয়। ভাপানোর সবচেয়ে সহজ পন্থা, ফুটন্ত অবস্থায় বেশ খানিকটা জলে সব্জীর টুকরো গুলো নেড়ে চেড়ে নেওয়া আর তা না হ'লে উনুনে রাখা ফুটন্ত জলের পাত্রের ওপর সব্জীর টুকরোগুলি কাপড়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা।

ভাপিয়ে নেওয়ার পর সেগুলিকে কাঠের কানাঅলা তারের ট্রেতে ঢেলে দিতে হবে। ট্রের ওপরে একটা মশারীর কাপড়ের মত জালী কাপড়ের ঢাকা থাকলে ভালো। ট্রেটি মেঝে থেকে অন্ততঃ চার ইঞ্চি উচুতে রাখা দরকার, তাহলে জল সহজে ঝরে বেড়িয়ে যেতে পারবে।

ফলমূলে গন্ধকের ধোঁয়া লাগানোর পদ্ধতিও কঠিন নয়। ধোঁয়া লাগানোর জন্য একঠা বন্ধ বাক্সই সবচেয়ে ভালো। তা নয় তো একটা বন্ধ ঘরেও এটা সম্ভব হ'তে পারে। প্রক্রিয়াটি হল সামান্য একটি টিনের পাত্রে গন্ধক জ্বালিয়ে তার ওপর ফলের ট্রেগুলি রাখতে হবে। ফলে, গন্ধকের ধোঁয়া আধঘন্টা এক ঘন্টা লাগা দরকার। তারপর ভালো করে নাক ঢেকে ট্রেগুলো সরিয়ে নিতে হবে। ট্রে সরাবার সময়ে খুব সাবধান হওয়া দরকার। গন্ধকের ধোঁয়া বিষাক্ত, নিশ্বাসের সঙ্গে চলে যাওয়া মারাত্মক। দ্বিতীয় কথা, গন্ধকের ধোঁয়া লাগাবার সময়ে কাঠের ট্রে ছাড়া অন্য ধাতব কোনও পাত্র যেন একেবারে ব্যবহার করা না হয়।

এর পরের পর্যায় হ'ল শুকানো। রোদে শুকানো সবচেয়ে সহজ, সরল ও সুলভ পদ্ধতি। রোদে শুকোতে হ'লে ভাপানো বা গন্ধক লাগানো সব্জী বা ফল একটা কাঠের ট্রেতে অল্প পরিমাণ ছড়িয়ে দিতে হ'বে। যাতে গায়ে গায়ে বা একটার ওপর একটা লেগে না থাকে। এই ট্রেগুলি প্রথম দিনে ভোরের দিকেই রোদে দিতে হবে এবং প্রতি দু'ঘন্টা অন্তর কাটা টুকরোগুলো উলটে দিতে হবে। দ্বিতীয় দিন থেকে দিনে দু'বার উলটে দেওয়াই যথেষ্ট হ'বে। পুরো শুকোতে দুই থেকে পাঁচদিন সময় লাগে। ট্রেগুলি সূর্য্যাস্তের ঠিক আগে ঘরে তুলে আনতে হয়।

উনুনে শুকোনোর পদ্ধতি দ্রুত শুকোবার পক্ষে প্রকৃষ্ট। এই পদ্ধতিতে ফল বা সব্জীর টুকরোগুলি ট্রেতে বা পেটে রেখে ১৪০°—১৫০ ডিগ্রী ফাঃ তাপে পাঁচ মিনিট সেঁকে নিয়ে ১৫ মিনিট ফ্যানের হাওয়ায় ঠাণ্ডা করে নিতে হ'বে। কাটা ফল বা সব্জী উনুনের তাপে শুকোবার সময় একটা স্তর বা 'লেয়ারে' শুকোতে হ'বে। এই প্রক্রিয়ায় বারবার সেঁকে ও ঠাণ্ডা করে অতি অল্প সময়ে এগুলি শুকিয়ে নেওয়া যায়। উনুনের তাপে শুকোবার সময়েও সেদিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি না রাখলে ফল বা সব্জী পুড়ে যেতে পারে। তৃতীয় পদ্ধতি হ'ল যন্ত্রের সাহায্যে শুকানো। তা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

শুকোনো হয়ে গেলে, শুকনো ফল বা সব্জী ঘরের তাপে ঠাণ্ডা করে খটখটে শুকনো ও পরিষ্কার পাত্রে ভরে রাখতে হ'বে।

সংরক্ষণ পরিকল্পনা সমাজ বিকাশের অপরিহার্য অঙ্গ

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

একটা দেশের গোটা অর্থনৈতিক অবস্থাকে সুদৃঢ় করে তোলবার জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা সফল করে তোলা অত্যাবশক, সন্দেহ নেই। স্বল্পোন্নত দেশসমূহের উন্নতির পথে উত্তরণের একমাত্র উপায় হ'ল এই পরিকল্পনা। কিন্তু কি ধরণের পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে একটি স্বল্পোন্নত দেশের সমাজ, বিকাশ লাভ করতে পারে, সে কথা সুস্থভাবে চিন্তা না করে বৃহত্তর পরিকল্পনার ঝুঁকি নিয়ে প্রভূত শ্রম ও অর্থ বিনিয়োগ অনুচিত বলেই মনে হয়। যদিও আমরা মনে করি যে স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সব সময়ই উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপ লাভ করে তথাপি তার ফলাফল সবসময়েই সমাজের অনুকূলে হয় না। পরিকল্পনার লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক হলেও সমাজের একটি অংশ হয়তো বেশী লাভবান হয়, অন্য অংশ পূর্ববাবস্থাতেই থেকে যায়। কর্তব্য কি?

কর্তব্য অনুমান করা শক্ত নয়। কাছের বস্তুকে সর্বাগ্রে বিবেচনা করে তবেই দূরলক্ষ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত এবং তাও হঠাৎ নয়। ধীরে ধীরে ধাপে ধাপেই লক্ষ্যে পৌছুনোর জন্য চেষ্টা করতে হবে। এবং সংরক্ষণ পরিকল্পনাই উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রাথমিক স্তর হওয়া উচিত।

অবশ্য এ কথা শুনলে পৃথিবীর ধনতন্ত্রী সমাজ হয়তো উপহাস করবেন। অবশ্যই এ ধরণের মতবাদের মধ্যে কোন রকম যথার্থ খুঁজে পাবেন না। ১৯২৯—এর সোভিয়েত পরিকল্পনা এই কারণেই ধনতন্ত্রী অর্থনীতিবিদদের সমালোচনার লক্ষ্য হয়েছিল।

ধনতন্ত্রী পরিকল্পনা আপাতদৃষ্টিতে সার্থক মনে হলেও আসলে তা অপচয়েরই পরিকল্পনা কিন্তু যে পরিকল্পনায় গোটা সমাজ লাভবান হয়—ধনী দরিদ্রের বৈষম্য নষ্ট হয় তাই—ই হ'ল সত্যিকারের সৃষ্টিমূলক পরিকল্পনা। এতে সমাজের আভ্যন্তরীন বিরোধ অপসারিত হয় এবং বিকাশ তরান্বিত হয়।

পরিকল্পনাকে যদি প্রকৃতই সৃষ্টিমূলক পরিকল্পনায় রূপ দিতে হয় তাহলে উন্নয়ন পরিকল্পনার আগে সংরক্ষণ পরিকল্পনার বিষয়েই সচেতন হতে হবে বলে আমার মনে হয়। কেননা কেবল সৃষ্টি করলেই তো চলবে না সৃষ্ট বস্তুকে সংরক্ষণ অর্থাৎ পালন না করলে সৃষ্টির কার্যকারিতা কি থাকবে? সৃজনীশক্তির সঙ্গে পালন শক্তিও সুদৃঢ় হলে গোটা সমাজে একটি সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমার ধারণা।

এতদিনকার পঙ্গু আর্থিকজীবনকে পরিকল্পনার সাহায্য পুনরুজ্জীবিত করে তুলবার প্রচেষ্টা, ভারতবর্ষের গোটা অর্থনৈতিক চেহারা বদলে দেবে আশা করা যেতে পারে। কিন্তু কি ভাবে? বলা বাহুল্য, মিশ্র আর্থিক ব্যবস্থা ও আর্থিক পরিকল্পনায় শ্রেণীস্বার্থ ও প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকছে বলেই আমাদের দেশের শিল্পপতিরা উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় এত উৎসাহবোধ করেন।

কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করছে যে, শুধুমাত্র উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা কখনও একটি দেশের গোটা সমাজকে স্পর্শ করতে পারে না। যদিও অঙ্ক ও তথ্য দ্বারা পরিকল্পনার আয়তন ও আয়োজন বুঝতে হয় তথাপি পরিকল্পনার রূপ বুঝতে হলে সেই অঙ্কের অরণ্যের পথ না হারিয়ে, তার মূল সত্যকে বুঝবার চেষ্টা করতে হয়। পরিসংখ্যাণ ছাপা হতেই তা বদলাতে পারে—কিন্তু পরিস্থিতি তত বদলায় না। সমাজেই পরিকল্পনার ফলাফল প্রতিফলিত হয়।

আমরা তো ইতিমধ্যে তিন তিনটি পরিকল্পনার কাজ শেষ করলাম। চতুর্থ পরিকল্পনাও এগিয়ে চলবে উজ্জ্বল সম্ভাবনার পথে। কিন্তু এতদিন পরেও সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জাগছে এই সব পরিকল্পনার ফলে আমরা বাস্তবিকই কি পেলাম? কিছুই যে সাধারণ মানুষ পায়নি—এমন কথা বলবো না। তবু এই সব পরিকল্পনার ফলে সমাজের একটি বিশেষ অংশই লাভবান হয়েছে আর অধিকাংশই, যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আরও গভীরভাবে নিমজ্জিত হয়েছে তাতে আমার কোন রকম সংশয় নেই। কিন্তু আমাদের পরিকল্পনার খসড়া যখন তৈরি করা হয়েছিল তখন তার রচয়িতারা কিন্তু অনেক উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন—কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন, সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তির প্রসার, শিল্প ও খনিজ দ্রব্যের উন্নতি ও যথার্থ ব্যবহার, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি, খাদ্যশস্যেস্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ দেশের জনশক্তির সদ্ব্যবহার, কর্ম সংস্থানের সুযোগ সুবিধা, আর্থিক বৈষম্য দূরীকরণ ও সমাজতন্ত্রের দিকে দ্রুত পদচারণ—এ সব অনেক মধুর কথাই শুনেছিলুম আমরা। কিন্তু আজ চতুর্থ পরিকল্পনার কাজে হাত দিয়েও আমাদের মন থেকে সন্দেহ দূর হচ্ছেনা কেন?

প্রথম পরিকল্পনাতে কৃষির যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার গোড়া থেকেই দেখা দেয় বৈদেশিক মুদ্রা সমস্যা এবং তারই মধ্যে জনসংখ্যার অভাবনীয় বৃদ্ধি। দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ১ কোটি লোকের জন্য কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা, কিন্তু কার্যত ৮০ লক্ষ লোকের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একে অবশ্য প্রশংসনীয় সাফল্য বলা যায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়ে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা আরও বেড়ে যায় এবং পরিকল্পনার শেষে ৯০ লক্ষ লোক বেকার থেকে যায়। তারপর এই সময় আবার দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি পেতে থাকে। তারপর তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ও চতুর্থ পরিকল্পনার প্রারম্ভে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, খাদ্যাভাব, শিল্পে অশান্তি, বেকার সমস্যা ইত্যাদি মাত্রাতিরিক্তভাবে দেখা দেয় এবং সাধারণ মানুষের জীবন অসহনীয় করে তোলে। এই সমস্ত বিশৃঙ্খলা কেন দেখা দিল তার মূলে কি রয়েছে সে আলোচনায় আমরা এখন যাচ্ছি না। তবে এ সবের হাত থেকে উত্তরণের পথ হিসেবে সংরক্ষণ পরিকল্পনার কথাই আপাততঃ উল্লেখ করছি।

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

কৃষিকর্মে সংগঠন ও নেতৃত্ব

অরুণ মুখোপাধ্যায়

এ কথা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় কৃষি ও শিল্পের সুষম উন্নতিবিধানই অন্যতম প্রধান নীতি হওয়া উচিত। অর্থনৈতিক অবস্থার অনুন্নত পর্যায়ে, কৃষির ওপর প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকতে হয়। কিন্তু কৃষি ও শিল্প এই দ্বিবিধ ক্ষেত্রে উন্নয়নের মাধ্যমে এবং আর্থিক অবস্থার ক্রমোন্নতির ফলে, সেই নির্ভরতা ক্রমশঃ হ্রাস পায়। তাতে কৃষির ওপর নির্ভরশীল যাঁদের বছরে কয়েক মাস বেকার থাকতে হয় তাঁরাও বিভিন্ন শিল্পে কাজ সংগ্রহ ক'রে, জমির ওপর নির্ভরশীল হবার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। জমির সংস্কার ও উন্নত ধরনের কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ এবং চাষে যন্ত্রের ব্যবহারে ফলন বেড়ে যাবার ফলে একর ও মাথাপিছু উৎপাদন হার বাড়ে, জাতীয় আয়ে কৃষির অংশও বেড়ে যায়। তবে এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই, শিল্প সম্প্রসারণের ও তার আয়ের তুলনায় কৃষি উন্নয়নের গতি অপেক্ষাকৃত কম হয়, কেননা শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়নের গতি যতটা দ্রুত হওয়া সম্ভব কৃষিক্ষেত্রে তা নয়।

কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন পরস্পর নির্ভরশীল হলেও কৃষির সমস্যা অপেক্ষাকৃত জটিল এবং জটিলতার গ্রন্থিগুলি কৃষি অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিহিত। অনুন্নত দেশগুলিতে এই জটিলতার বড় কারণ এই যে, এখানে কৃষিকর্ম শুধুমাত্র জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম নয়, জীবনের মূল অবলম্বন। তাই এ দেশে 'মাটির টানে' জমি থেকে মাথাপিছু আয় কমে এবং কৃষকরা অভাব অভিযোগের হাত থেকে মুক্তি পান না। তা ছাড়া বৈষম্যমূলক মালিকানা স্বত্ব, চাষ জমির ক্রম খণ্ডীকরণ, চাষের পুরনো পদ্ধতি, বিভিন্ন মূলধনী উপাদানের অভাব, সমবায় ব্যবস্থার অনগ্রসরতা, কৃষিতে উদ্বৃত্ত ব্যক্তিদের জন্য কর্মসংস্থানের উপযুক্ত কুটির শিল্পের অভাব এবং উপযুক্ত মূল্যে বিপণন ব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি এগুলি হ'ল কৃষি সমস্যার বিভিন্ন দিক। তার ওপরে কৃষিপণ্যের দামের তুলনায় সাধারণের জন্য ব্যবহারযোগ্য শিল্পদ্রব্যের দাম বেশী বাড়লে কৃষির সমস্যা আরও জটিল হয়।

শিল্প ক্ষেত্রে, একক উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে বর্তমান যুগে এগুলি সংযুক্ত আমানতী কারবারে পরিণত হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রেও এমন সংগঠনগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সকল দেশেই পরিবার ভিত্তিক কৃষিকর্ম ছিল কৃষি সংগঠনের প্রাথমিক পর্যায়। ক্রমশঃ দেশের বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে পরিবার ভিত্তিক কৃষি সংগঠনের রূপান্তর ঘটেছে অনেক দেশে। ফলে তা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ নিয়েছে, যেমন, সংগঠিত কৃষি, সরকার নিয়ন্ত্রিত কৃষি আবাদ এবং সংযুক্ত আমানতী কৃষি সংগঠন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, পৃথিবীর অনুন্নত কৃষি প্রধান দেশে পরিবার ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থার রূপান্তরের গতি প্রকৃতি অত্যন্ত মন্থর। অথচ কৃষির উন্নতির জন্য পরিবার ভিত্তিক কৃষি কাঠামোর পরিবর্তন অপরিহার্য। এর সবচেয়ে বড় যুক্তি হ'ল এই যে, পারিবারিক, বিশেষ করে যৌথ পরিবার ব্যবস্থার ভাঙনের ফলে জমির ক্রম বিভাজনে কৃষি ক্রমশঃ স্বল্প আয়মূলক বৃত্তিতে পরিণত হতে চলেছে। একমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সম্মিলিত চাষই হ'ল তার সমাধান। তাই বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিতে বিজ্ঞানের ভূমিকাকে প্রশস্তর করে তুলতে হলে কৃষি ব্যবস্থার কাঠামো পারিবারিক থেকে সমষ্টিমূলক ভিত্তিতে রূপান্তরিত করা একান্ত দরকার। কাজটি অত্যন্ত কঠিন বলে ভারতে এর অগ্রগতি খুব আশাপ্রদ হয়নি।

চাষ পদ্ধতির পরিবর্তনের জন্য দুইটি কর্মধারা মেনে নেওয়া প্রয়োজন : প্রথমটি সরকারী ভূমিকা এবং দ্বিতীয়টি স্থানীয় নেতৃত্ব। সরকার কর্তৃক সমাজতান্ত্রিক ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কৃষককে, জমির মালিক করে দিয়ে জমির মালিকানা সম্পর্কে প্রথমেই তাকে নিশ্চিন্ত করা দরকার। তার পরের পর্যায়ে সমষ্টিগত চাষের জন্য সমবায় নীতির ব্যাপক প্রয়োগ ও চাষের বিভিন্ন খাতে প্রয়োজনীয় সরকারী সাহায্য দিয়ে সেচ, সার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা অবিলম্বে প্রয়োজনীয়। কৃষি বিভাগে স্থানীয় নেতৃত্বের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এ কথা অনস্বীকার্য যে, শিল্প বা কৃষি—যে কোন প্রকার উদ্যোগের জন্য প্রগতিশীল নেতৃত্ব একান্ত দরকার—তা সে নেতৃত্ব যেখান থেকেই আসুক। তবে এ নেতৃত্বের স্বরূপ নির্ভর করে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক নীতি ও আদর্শের ওপর। কৃষিক্ষেত্রে সে নেতৃত্বের প্রধানতঃ চারটি রূপ হতে পারে।

প্রায় সব দেশের ইতিহাসেই দেখা গেছে সামাজিক বিবর্তনের ফলে সংখ্যায় অতি অল্প এক শ্রেণীর লোক প্রচুর জমির মালিক হয়ে জমিদারী ও সামন্ততন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছে। কোন কোন দেশে এই জমিদার শ্রেণী থেকেই কৃষি নেতৃত্ব এসেছে। বিশেষ করে গ্রেট বৃটেন ও এশিয়ার জমিদারগণ সে ভূমিকা নিয়েছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের কৃষি বিমুখ, গ্রামে অনুপস্থিত জমিদারদের দিয়ে তেমন কোনোও নেতৃত্বের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই অবস্থাই ভূমি স্বত্ব সংস্কারের উদ্দেশ্যে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের অন্যতম কারণ।

দুই : কৃষি নেতৃত্ব গঠিত হতে পারে সরকারী ব্যবস্থায়। যেমন সোভিয়েত রাশিয়ায় 'কালেকটিভ ফার্মিং' যৌথ কৃষি সরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত। অবশ্য এ ব্যবস্থা সকল দেশে গ্রহণীয় নয়, কারণ পুরোপুরি সমাজতন্ত্রের দীক্ষা না থাকলে তা সম্ভব নয়।

তিন : গ্রাম্য সমবায় সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রভৃতি স্থানীয় সংগঠন কৃষিকর্মে নেতৃত্ব দিতে পারে। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতে এই শ্রেণীর কৃষি নেতৃত্ব খুবই

ফলপ্রসূ হয়েছে। ভারতীয় গ্রাম্য জীবনেও সমবায় সমিতি ও ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি স্থানীয় সংগঠনের ঐতিহ্য রয়েছে, জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত করে কৃষকদের জমির মালিক করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের আদর্শ নিয়ে গ্রামে 'পঞ্চায়েতী রাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সর্বোপরি কৃষিকে সরকারী স্তুনজরে এনে কৃষির উন্নতির চেষ্টা চলছে ব্লক ভিত্তিতে। কিন্তু সত্যিকারের কৃষি নেতৃত্ব সাম্প্রতিককালের সংগঠনগুলির মধ্যে এখনও লক্ষ্য করা যায় না। যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যেও আমেরিকার "ফোর এইচ ক্লাবের" অনুরূপ কোন উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। ভারতে যুবকগণ গ্রামের অসংখ্য অশিক্ষিতের মধ্যে কৃষিকর্মকে সম্মানজনক বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ না করে কৃষির বাইরে কর্মস্থানে বেশী তৎপর হন। আর যে ... উৎসাহ, শিক্ষা, দৃষ্টিভঙ্গীর প্রগতিশীলতা, স্থানীয় সমস্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও সমাধানে সক্ষম এবং সাংগঠনিক ক্ষমতা, সবল কৃষি নেতৃত্বের উপাদান, পঞ্চায়েতী রাজ পরিকল্পনার অধীনস্থ কর্মী ও নেতাগণের মধ্যে তার একান্ত অভাব দেখা যায়। তাদের ক্ষমতা গঠনমূলক কাজে আশানুরূপভাবে নিয়োজিত হয় না। ... ভারত সরকারের সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এঁদের মধ্য থেকেই সত্যিকারের কৃষি নেতৃত্ব গড়ে তুলবার অভিপ্রায় ছিল।

চার: জাপানে কৃষি নেতৃত্বের ধারাটি একটু বিচিত্র। মিৎসুবিশি শ্রেণীর ... প্রগতিশীল পরিবার যেমন, জাপানের ... আন্দোলনে উপযুক্ত নেতৃত্ব দিয়েছিল, তেমনি কিছু সংখ্যক 'আলোক প্রাপ্ত' সামুরাই পরিবার জাপানের গ্রামে ফিরে ... যোগ্য কৃষি নেতৃত্ব গড়ে তুলেছিল। আমেরিকার প্রগতিশীল যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে ... উৎসাহ উদ্দীপনার জোয়ার এনে দিয়েছিল। আর আমাদের দেশে বহুকাল ... থেকে উচ্চারিত "গ্রামে ফিরে যাও" ... কারুর কানে তেমন পৌঁছয়নি। কারণ এ দেশের গ্রামে আকর্ষণীয় বিষয় এত কম, গ্রামে প্রাত্যহিক জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা এত অল্প, যে ... শিক্ষিত মানুষও গ্রামে পড়ে থাকতে চায় না। তা ছাড়া কৃষিতে বিজ্ঞানের ভূমিকা এত কম যে কৃষিতে উৎসাহী ব্যক্তিকেও তা নিরাশ করছে।

সরকারী দিক থেকেও এতকাল কৃষিতে অর্থবিনিয়োগকে ত্রাণ মূলক ব্যয় মনে করা হয়েছে, ব্যয়িত টাকার অঙ্ক দিয়ে ফলাফল বিচার করার চেষ্টা হয়েছে, মৌলিক সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়নি। তাই কৃষি উন্নয়নের জন্য কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন সাড়া জাগাবার জন্য চাই দুটি মৌলিক ব্যবস্থা: সত্যিকারের কৃষকের মধ্যে জমির দ্রুত বন্টন এবং পল্লীতে শিক্ষা সম্প্রসারণ, কৃষি অনুগ শিক্ষা সম্প্রসারণ ও তদনুযায়ী কর্মসংস্থান। আজ প্রায় দেড় দশক আগে থেকে ভূমি স্বত্ব সংস্কার সম্পর্কে কাজ চললেও আজ পর্যন্ত তার ফলাফল সন্তোষজনক পর্যায়ে আসেনি আর শিক্ষার বিস্তারও আশানুরূপ হয়নি। তাই কৃষির নেতৃত্ব, ব্যক্তি অথবা পঞ্চায়েত সমিতি যে কেন্দ্রেই বর্তাক, এবং ব্যক্তি অথবা সমবায় উদ্যোগ যে পদ্ধতিতেই চাষের কাজ হোক না কেন, তার জন্য প্রথমেই চাই উপযুক্ত সমাজতান্ত্রিক ভূমি স্বত্ব সংস্কার ও ব্যাপক গণতান্ত্রিক শিক্ষা—এই দুই শর্ত অপরিহার্য। নতুবা কৃষির উন্নতির যে কোন চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

কোচিন পরিশোধনাগারের লাভ

কোচিন পরিশোধনাগার লিমিটেডের চেয়ারম্যান শ্রী সি. আর পট্টভিরমণ বলেছেন যে ২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই পরিশোধনাগারটি এমনভাবে সম্প্রসারিত করা হচ্ছে যাতে এখান থেকে বর্তমানে যে ২০.৫ লক্ষ টন তেল পরিশোধন করা যায় সেই ক্ষমতা বেড়ে ১৯৭২ সালের মধ্যে ৩০.৫ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। পরিশোধনাগারটি অংশীদারদের জন্য করসহ শতকরা ২১ টাকা লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। সরকার পাবেন ৭৭.১৬ লক্ষ টাকা; ফিলিপস্ পেট্রোলিয়াম পাবে করবিহীন ৩৮.৮৫ লক্ষ টাকা এবং কেরালা সরকার পাবেন ১০.৫০ লক্ষ টাকা।

শান্তি কুমার ঘোষ

৭ পৃষ্ঠার পর

সম্পদের বার্ষিক শতকরা ৬ ভাগ উন্নয়ন বজায় রাখা সম্ভব। মূল্যের স্থিতিশীলতা, রপ্তানী বৃদ্ধি এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদন এগুলি সবই এই উন্নয়ন হার বজায় রাখতে সাহায্য করে।

সাধারণ এবং অর্থনৈতিক পটভূমি ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হতে থাকায়, উৎপাদন ও বন্টনের এবং উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের দাবির মধ্যে বিরোধ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। আয় এবং সম্পদ বন্টনের মধ্যে অসাম্য হ্রাস করার দুটি প্রধান উপায় আছে। তা হল ক্রমোচ্চ হারে কর আরোপ এবং সরকারি তরফের সম্প্রসারণ। জাতীয় আয়ে, রাজস্ব বাবদ আয়ের অনুপাত ১৯৫০-৫১ সালের শতকরা ৬.৬ ভাগ থেকে বেড়ে ১৯৬০-৬১ সালে শতকরা ৯.৬ ভাগ হয়, ১৯৬৫-৬৬ সালে তা শতকরা ১৪ ভাগেরও বেশী বাড়ে (১৯৬৮-৬৯ সালে অবশ্য এই অনুপাত কমে গিয়ে শতকরা ১২.৮ ভাগে দাঁড়ায়)। সরকারি ক্ষেত্রে পুনরায় উৎপাদন যোগ্য সম্পদের পরিমাণ ১৯৫০-৫১ সালের শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ থেকে বেড়ে ১৯৬৫-৬৬ সালে শতকরা ৩৫ ভাগে দাঁড়ায়। তবে জনগণের বিভিন্ন শ্রেণীর জীবন ধারণের মানে যে অসমতা ছিল তা হ্রাস পেয়েছে কিনা তার কোন স্পষ্ট লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়না। স্বল্প আয়, বেকারত্ব, অর্দ্ধ বেকারত্ব ইত্যাদি সমস্যাগুলির এখন পর্যন্ত সমাধান করা সম্ভবপর হয়নি। লগ্নির পরিমাণ না বাড়লে, কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধে বিপুল ভাবে বাড়ানো সম্ভব নয়।

কাজেই অর্থনীতির দ্রুত উন্নয়নের মাধ্যমে, উৎপাদনমূলক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকানা সম্প্রসারণের মাধ্যমে, দক্ষ নূতন সংস্থাগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ফলপ্রদ কাজের সুযোগ সুবিধে সম্প্রসারণের মাধ্যমে, সাধারণ লোকের কর্মসংস্থান বিশেষ করে সমাজের দুর্ব্বল শ্রেণীর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য আমরা এখনও সফল করে তুলতে পারিনি।

ভারত সরকারের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রস্তাব

ডঃ বনবিহারী ঘোষ

বর্তমানকালে যে কোন দেশের সামগ্রিক উন্নতির মূলে রয়েছে বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ ফলাফলের প্রভাব ও তার প্রয়োগ। স্বাধীনতা পাওয়ার দশ বছরের মধ্যে ভারত সরকার এ বিষয়ে সজাগ হয়েছিলেন। সেই কারণে, ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে এ বিষয়ে লোকসভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এই প্রস্তাব অনুযায়ী কি করে দেশের মধ্যে মূল এবং ফলিত বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সর্বপ্রকার শিক্ষা, আলোচনা, গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিকাশ সুষ্ঠু ভাবে করা সম্ভব হয় তার বিশদ বিবরণ দিয়ে একটি ছয় দফা কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করা হয়। বিজ্ঞানীরা যাতে সকল রকম বৈজ্ঞানিক কাজ ও গবেষণা করার সুযোগ সুবিধা পান এবং সমাজে তাঁদের মর্যাদার স্থান অক্ষুন্ন থাকে তার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করা হয়। বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলির সুষম উন্নতি বিধানের জন্য দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য কার্যক্ষেত্র সম্বন্ধে যে সব নীতি প্রণয়নের প্রযোজন হবে, সেখানেও বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের মতামত দিয়ে সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপ দিতে পারেন বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। কিন্তু সরকারের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরি করে তোলার জন্য তখন বা তার পরেও বিশেষ কোনও কার্যক্রম ঠিকমত গড়ে তোলা হয় নি।

ভারতীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সাধনা ও গবেষণায় অথবা বৈজ্ঞানিক কিংবা বিজ্ঞান কর্মীদের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে বা এ বিষয়ে কতখানি অগ্রসর হওয়া গেছে সে সম্বন্ধে হিসাব রাখা বা সমালোচনা করা বা ক্ষেত্র বিশেষে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার কোনও উপায়, সময় মত স্থির করা তখন সম্ভব হয়নি। সাধারণ ভাবে এ সব দিকে নজর দেওয়ার জন্য ভারত সরকার নির্ভর করেছেন দেশে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিযুক্ত সুপ্রতিষ্ঠিত নানান বিজ্ঞান সংস্থার ওপরে। এগুলির মধ্যে এ্যাটমিক এনার্জি কমিশন, ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন, কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল রিসার্চ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

হয়তো এ ধরণের ব্যবস্থা আরও কিছুদিন চলতো, কিন্তু এর পাঁচ বছর পরে, ১৯৬৩ সালে যখন ভারতের সীমানায় চীনা হানা দিল তখন এ বিষয়ে যে খুব বেশী কিছু করা হয় নাই সে সম্বন্ধে অনেকে সচেতন হয়ে পড়েন। এমন কি তখন দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, কোন কোন বিষয়ে কতজন অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক কি ধরণের কাজকর্মে নিযুক্ত আছেন তাও জানার উপায় ছিল না। গবেষণা ও অন্যান্য শ্রেণীর বিজ্ঞান চর্চার জন্য সরকার কী পরিমাণ অর্থ নিয়োগ করেছেন, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির অর্থ সংস্থানের দ্বারা দেখে সে সম্বন্ধে কিছুটা আভাস পাওয়া গেলেও দেশে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কী ধরণের কাজ হচ্ছে কি কি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে পারা গেছে তার কোনও মোটামুটি হিসাব পাওয়া সম্ভব ছিলনা। সব চাইতে বড় রকমের ফাঁক দেখা গেল—বিজ্ঞানীদের সুযোগ সুবিধা বা পদমর্যাদা দেওয়ার বিষয়ে সরকারের প্রতিশ্রুতি এবং যে অবস্থা বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে এই দুয়ের মধ্যে। আরো একটা বড় ত্রুটি দেখা গেল—প্রবীণ বিজ্ঞানীদের প্রতিভা সঙ্কুচিত হয়ে যাওয়া।

এই সকল দোষ ত্রুটি থেকে মুক্ত হয়ে বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণা যাতে উপযুক্ত পথে পরিচালিত হয় এবং বিজ্ঞানীরা তাঁদের কাজকর্মে, গবেষণায় উপযুক্ত মর্যাদা পান, তার জন্য কিছুদিন আগে ভারত সরকার "সায়েন্টিফিক এ্যাডভাইসারি কমিটি টু দি ক্যাবিনেট" নামে এক পরিষদ গঠন করেন। দেশের নামকরা বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়াও আরও কয়েকজন মনীষীকে ব্যক্তিগত ভাবে এই পরিষদে নেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভাকে, দেশের বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম কীভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে পরিচালিত করা সঙ্গত এবং এ সম্বন্ধে অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য বিষয়ে কি কি নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়াই হ'ল এই পরিষদের প্রধান কর্তব্য। এই পরিষদের কোনও স্থায়ী নিজস্ব সহাকরণ ছিল না হয়তো সেই কারণেই মতামত কী ভাবে গৃহীত ও কার্যকরী হয়েছে সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় নি।

কয়েক মাস পূর্বে সঠিক ভাবে বলতে গেলে গত আগষ্ট মাসে এই পরিষদের পুনর্বিন্যাস করা হয়। নতুন রূপে এই পরিষদের নতুন নামকরণ হয়েছে, "কমিটি অন সাইন্স এ্যাণ্ড টেকনোলজি"। এটি এখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভার একটি বিশেষ বিভাগ হিসাবে কাজ করবে। পরিকল্পনা কমিশনের বিজ্ঞান বিভাগের সদস্য এই বিভাগের প্রধান হিসাবে কাজ করবেন। ইনি ছাড়া অন্যান্য সদস্যের সংখ্যা, কম-সচিব বা সেক্রেটারীকে নিয়ে পনের। এই পরিষদে ৫টি বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থার প্রধান, দুজন উপাচার্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সভাপতি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বিজ্ঞান উপদেষ্টা, তিনটি শিল্প সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের একজন সদস্য এবং ক্যাবিনেট সেক্রেটারী আছেন।

বর্তমান কালের গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সায়েন্স পলিসি বা বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধীয় নীতি সারা বিশ্বে একটা নূতন চিন্তাধারা এনে দিয়েছে। এটি দেশের অন্যান্য সব কর্মক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। আজ সারা বিশ্বে এমন কি যে সকল দেশ—সকল বিষয়েই প্রায় সমৃদ্ধ, তারাও এই 'সায়েন্স পলিসি' সম্বন্ধে খুবই চিন্তাশীল হয়ে উঠেছে। অনুন্নত বা উন্নত সকল দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য এই বৈজ্ঞানিক নীতি সম্বন্ধে সচেতনতা ও গঠনমূলক কর্ম ক্ষেত্রে সেই নীতির যথাযথ প্রয়োগ প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজন। সুখের বিষয় ভারত সরকার এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে বিলম্ব করেন নি।

এই পরিষদ যে সব দিকে তাঁদের

চিন্তাধারা পরিচালিত করেছেন বা করবেন তার মধ্যে কয়েকটা বিষয়ের প্রতি বিশেষ করে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন আছে। যথা দেশে সরকারী ও বেসরকারী এমন অনেক কর্ম সংস্থা আছে যেখানে একাধিক যোগ্য কিন্তু উপেক্ষিত বৈজ্ঞানিক আছেন। এঁদের সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ ক'রে তাঁদের প্রতিভা বিকাশের অনুকূল সুযোগ দেওয়া উচিত। ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক নীতির অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি প্রধান কর্তব্য কর্ম্মের মধ্যে অন্যতম হ'ল কোনও বিজ্ঞানীকে উপেক্ষা না করা ও তাঁর মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার ব্যবস্থা করা; আশা করা যায়—পরিষদ এ বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন। দ্বিতীয়তঃ দেশের জনসাধারণের মনে, এমন কি অনেক শিক্ষিত এবং উচ্চ পদস্থ নাগরিকের মনে একটা ধারণা গড়ে উঠেছে যে ভারতে বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য সরকার বৃথা অর্থ নষ্ট করে যাচ্ছেন। ঐ ধারণা নির্মূল করার জন্য প্রয়োজন, দেশের সবক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতির মূলে যে বিজ্ঞানীদের সাধনা ও গবেষণা রয়েছে সেই সম্বন্ধে সাধারণ্যে প্রচার করা এবং বিজ্ঞানীদের মর্যাদা সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলা। বিজ্ঞানের বিকাশের জন্য ভারত সরকার যে অর্থ ব্যয় করছেন তা অন্যান্য যে কোনও দেশের তুলনায় খুবই কম। অথচ বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণা প্রসূত সুফলের অংশভোগী হবে দেশের প্রত্যেক নাগরিক। এই কথা বিবেচনা করে বিজ্ঞান গবেষণার জন্য আরও অর্থের সংস্থান করা উচিত। ভারতের বিজ্ঞানীরা কোনও বিষয়ে কোনও দেশের এমন কি অতি উন্নত দেশগুলির তুলনায়ও নিকৃষ্ট নয়। বরং তাঁরা অনেক কষ্ট সহিষ্ণু, অধ্যবসায়ী, প্রতিভাবান। অতএব বর্ত্তমানে কর্তব্য হ'ল এই যে, সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষিত বিজ্ঞান সংক্রান্ত নীতিতে যে সব কর্মসূচীর উল্লেখ আছে সেগুলিকে কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত করা। সেগুলি কার্যে রূপায়িত হলে দেশে সুষম উন্নতির পদক্ষেপ শোনা যাবে।

সুখরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

১৫ পৃষ্ঠার পর

আগেই বলেছি স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে বৃহত্তর উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার ঝুঁকি না নেওয়াই শ্রেয়ঃ। তাতে গোটা সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশ দ্রুত প্রসার লাভ করে না। অবশ্য আমার এই সিদ্ধান্তকে অর্থনীতির পণ্ডিতেরা হয়তো সমর্থন করবেন না। তাঁরা বলবেন উন্নত দেশের পক্ষেই সংরক্ষণ পরিকল্পনা প্রয়োজন। আমাদের মত স্বল্পোন্নত দেশের পরিকল্পনা হবে উন্নয়ন পরিকল্পনা।

কিন্তু গৃহীত পরিকল্পনার সৃষ্টিশীল বা সৃষ্ট কার্যাবলী থেকে সুফল পেতে হলে গোড়া থেকেই সংরক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। অর্থাৎ আমি বলতে চাই এক একটি পরিকল্পনাতে আমরা যে সব কর্ম্মসূচী গ্রহণ করেছি যেমন—কৃষি উন্নয়ন, শিল্পোন্নয়ন, আর্থিক অসমতা দূরীকরণ ইত্যাদি কর্মপ্রয়াসগুলি যেন মাঝ পথে বন্ধ হয়ে গিয়ে এক বিশাল অচলায়তনের সৃষ্টি না করে। কৃষি উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে গেলে দরকার কৃষককুলের সংরক্ষণ, —ভূমি স্বত্ব সংস্কার ও জমিদার-জোতদার প্রথার উচ্ছেদ, পতিত জমির উদ্ধার ও কৃষি ঋণ ও সমবায় প্রথার গুরুত্ব সম্বন্ধে কৃষক সমাজকে সচেতন করে তোলা। শিল্পে অশান্তি দূরীকরণ—শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পর্ক সহানুভূতিশীল ও সৌহার্দমূলক করা, শ্রমিকদের ন্যায্য প্রাপ্য দেওয়া, কর্তৃপক্ষের সংরক্ষণশীল মনোভাবের পরিবর্তন—'শক্তি প্রয়োগ ও রক্তচক্ষুর সাবেকনীতি' বর্জন দ্বারা শিল্পে অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখাও সংরক্ষণ পরিকল্পনার একটা প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

এর সঙ্গে আরও একটি কথা মনে রাখা উচিত। স্বল্পোন্নত দেশে একটি বৃহৎ সংখ্যক জনতা, কৃষির পরেই কুটিরশিল্পের ওপর নির্ভরশীল। বৃহত্তর পরিকল্পনার চাপে যদি সেই শিল্পের ক্ষতি হয় তাহলে বহু লোকই বেকার হয়ে পড়ে। সংরক্ষণ পরিকল্পনার মাধ্যমে যদি কুটিরশিল্পকে রক্ষা করা হয় তাহলে সমাজ বিকাশ আরও স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হয়।

সংরক্ষণ পরিকল্পনার মাধ্যমে সুস্থভাবে, শক্ত হাতে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করলে সমাজে সুস্থতা ফিরে আসে।

কলা রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন

গত বছর মহারাষ্ট্রের জলগাঁও জেলা থেকে প্রায় ৪,৫০০ মেট্রিক টন কলা, আরব সাগরের কুয়াইৎ, বাহেরিন, দোহা দুবাই বন্দরগুলিতে রপ্তানী করা হয়। এ থেকে ৪০ লক্ষ টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জিত হয়। এই রপ্তানীর পরিমাণ ৫,৪০০ মেট্রিক টন পর্যন্ত বাড়ানো হ'বে ব'লে স্থির হয়েছে। জাপানেও কলা রপ্তানী করা লাভজনক হ'বে কিনা, এবং সেখানকার বাজার কেমন প্রভৃতি নিরূপণ করার চেষ্টা করা হ'বে (জলগাঁও জেলায় ৫০,০০০ একর জমিতে শুধু কলারই চাষ হয়)। জলগাঁও, ৪.৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ২০০ মেট্রিক টন আম, ৪০০ কি. গ্রাম কাঁচা লঙ্কা এবং ৬ মেট্রিক টন আনারস রপ্তানী ক'রেও এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

জলগাঁও জেলার ক্রয়বিক্রয়কারী সমবায় সমিতিগুলির ফেডারেশন, এইসব ফল রপ্তানী ক'রে গতবছরে ৪৫ লক্ষ টাকার সমান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। এই ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত ১৯টি সদস্য সমিতি ফল ও শাকসব্জীর ব্যবসায়ে নিযুক্ত। এই ফেডারেশন, রপ্তানী করা ছাড়াও একমাত্র বোম্বাই-এ ৩১,০০০ টাকা মূল্যের ৯০ টন কলা বিক্রী করেছে

ইঞ্জিনীয়ারিং-এর টুকিটাকি

উচ্চ ভোল্টেজের রেক্টিফায়ার

সকল দেশের পক্ষেই জনস্বাস্থ্য রক্ষার প্রশ্নটি একটি প্রধান সমস্যা। উচ্চ চাপের বয়লারকে ইলেক্ট্রোষ্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটারের সাহায্য ধুলিমুক্ত রাখা, বিশেষ করে যেখানে সহরের কাছাকাছি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে, সেখানকার বয়লারগুলিকে ধূলিমুক্ত রাখা বিশেষ প্রয়োজনীয়। তিরুচিরপল্লীর ভারত হেভী ইলেকট্রিক্যালস্ লিমিটেডের উচ্চ চাপের বয়লার তৈরির কারখানায় ইলেক্ট্রোষ্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটার তৈরী হয়। ধূলো থিতিয়ে দেওয়ার জন্য একমুখীন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত করার স্বয়ংনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা-সহ উচ্চ ভোল্টেজের রেক্টিফায়ার বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশে রেক্টিফায়ার তৈরী হতোনা বলে, ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালসের প্রথম কয়েকটি বয়লারের জন্য বহু বৈদেশিক মুদ্রা বায়ে বিদেশ থেকে রেক্টিফায়ার আমদানী করতে হয়।

ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস্ যে সব নক্সা, তথ্য, কারিগরী পরামর্শ দেয় তার ওপর ভিত্তি করে বোম্বাইর হিন্দ রেক্টিফায়ারস্ লিমিটেড খুব যত্ন নিয়ে একটি রেক্টিফায়ার তৈরি করে। রেক্টিফায়ারের অংশগুলি তৈরী করার সময় দুইটি সংস্থার মধ্যে অত্যন্ত নিকট যোগাযোগ রাখা হয়। এটি তৈরি করার সময় কারিগরী ও নক্সামূলক এমন কতকগুলি সমস্যা দেখা দেয় যেগুলি এক সময়ে সমাধানের অতীত বলে মনে হয়। যাই হোক আস্তে আস্তে সেই সমস্যাগুলিরও সমাধান করা হয় এবং দুটি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় দেশেই একটি মূল্যবান সরঞ্জাম তৈরি করা সম্ভবপর হয়।

বিদেশ থেকে আমদানী করা যে সব রেক্টিফায়ার তখন পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হ'ত সেগুলির তুলনায় দেশে তৈরি এই রেকটিফায়ার থেকে অনেক ভালো ফল পাওয়া গেছে।

ভারতের প্রথম বীট চিনির কারখানা

শ্রীগঙ্গানগরে রাজস্থান সরকারের চিনির কারখানায় ভারতে সর্ব্বপ্রথম ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বীট চিনি উৎপাদন করা হবে। রাজ্য সরকার, এই কারখানার জন্য বীট—তথা —আখ থেকে চিনি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম কিনছেন। পুনঃ সজ্জিত এই কারখানায় যেমন আখ থেকে বেশী চিনি সংগ্রহ করা যাবে তেমনি আখের মরসুম শেষ হয়ে গেলে বীট চিনি তৈরি করা যাবে। এই সুবিধের ফলে কারখানাটি বছরে আরও ৫০।৬০ দিন বেশী কাজ করতে পারবে।

বীট থেকে চিনি তৈরি করার উদ্দেশ্যে ইউরোপ ও আমেরিকায় বহু পূর্ব্ব থেকেই ডিফিউজার ব্যবহৃত হচ্ছে। শ্রীগঙ্গানগরের এই কারখানার জন্য লারসেন এ্যাণ্ড টুবরো লিমিটেড যে ডিফিউজার সরবরাহ করছে তা এমনভাবে তৈরি যে তা দিয়ে আখ এবং বীট দুটি জিনিস থেকেই চিনি উৎপাদন করা যাবে। আখ থেকে চিনি উৎপাদন করার জন্য ভারতের তিনটি কারখানায় বর্ত্তমানে এই ধরণের ডিফিউজার ব্যবহৃত হচ্ছে। এর পূর্ব্বে অবশ্য এই মিলগুলিতে চিরাচরিতভাবে পেশাই করে চিনি তৈরী করা হত। সংশোধিত ডি ডি এস ব্যবস্থায় পেশাই-তথা-প্রসারণ একই সঙ্গে হয়। এই পদ্ধতিতে বেশী রস নিষ্কাশিত হয় ফলে চিনিও বেশী পাওয়া যায়।

ডিমাপুরে একটি নতুন চিনি কারখানায় আখ থেকে চিনি তৈরী করার উদ্দেশ্যে নাগাল্যাণ্ড সরকারও এই ধরণের একটি ডিফিউজারের অর্ডার দিয়েছেন। পেশাই এবং প্রসারণ উভয় ব্যবস্থাযুক্ত এইটেই হবে দেশের প্রথম নতুন চিনির কারখানা।

ডিফিউজার ব্যবহার করলে যে শুধু বেশী রস এবং বেশী চিনি পাওয়া যায় তাই নয়, কারখানার যোগ্যতা অনুযায়ী শতকরা ৩০।৪০ ভাগ বেশী আখ পেশাই করা যায়। এতে যে অতিরিক্ত আয় করা যায় তাতে ২।৪টে মরসুমের মধ্যেই ডিফিউজারের দাম উঠে আসে।

এই ব্যবস্থায় সবচাইতে বড় সুবিধে হল এগুলি বসানো এবং এগুলি দিয়ে কাজ করা খুব সহজ। যে অংশগুলি রসের সংস্পর্শে আসে সেগুলি ষ্টেইনলেস ইস্পাতে তৈরি। এতে মর্চেপড়ার সমস্যা থাকেনা।

পাঠক-পাঠিকা সমীপেষু—

ধনধান্যে-র উত্তরোত্তর উন্নতির জন্যে আপনাদের সক্রিয় সহযোগীতা অপরিহার্য্য। লেখা দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে ও বন্ধুমহলে ধনধান্যে-কে পরিচিত করিয়ে আমাদের উৎসাহিত করুন।

REGD. NO. D-233

উন্নয়ন বার্তা

★ তিরুচিরপল্লীস্থিত ভারত হেভী ইলেকট্রিক্যাল সংস্থা মালয়ের কাছ থেকে ২.২৫ কোটি টাকা মূল্যের দুইটি বয়লার যোগানোর বরাত পেয়েছে। বয়লার দুইটি খাজু জাফর পাওয়ার ষ্টেশনে বসানো হবে।

★ বরোদার কাছে জওহরনগরে গুজরাট অ্যারোম্যাটিকস কারখানার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। গুজরাট পেট্রো-কেমিক্যাল কমপ্লেক্সের এই প্রথম য়ুনিটের নির্মাণে খরচ হবে ১৮ কোটি টাকা। এখানে ২১,০০০ টন অর্থোক্সাইলীন, ২৪,০০০ টন ডি. এম. টি এবং ২,৫০০ টন ফিক্সড ক্সাইলীন উৎপাদিত হবে।

★ ১৯৭০ সালে ৫৯ কোটি টাকার পণ্য লেন-দেনের জন্য ভারত, হাঙ্গারীর সঙ্গে একটি বাণিজ্য চুক্তিতে সই করেছে। ভারত হাঙ্গেরীতে রপ্তানী করবে প্রধানত: রেলের ওয়াগন, অ্যাসবেটস কন্‌ক্রীটের জিনিস, তারের দড়ি, মোটর গাড়ীর অংশ, ইস্পাতের টিউব, ফিটিং ও বস্ত্রশিল্পে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। পক্ষান্তরে হাঙ্গারী থেকে ভারত আনাবে ইস্পাত ও ইস্পাতের জিনিস, ট্র্যাক্টার, টায়ার, বিভিন্ন গাড়ীর অ্যাক্সেল, এয়ার ব্রেক এবং রেলের ওয়্যাগন সংযোজিত করার যন্ত্রপাতি।

★ গুজরাট রাজ্যে, আহ্‌মেদাবাদ-কাণ্ডলা জাতীয় রাজপথের মাঝামাঝি সুরজবারিতে কচ্ছের ছোট রাণের ওপর দিয়ে নতুন একটি সড়ক সেতু গেছে। ১.৬ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি, ১২০০ মিটার দীর্ঘ, এই সেতুটি যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। এখন এই পথে, দ্রুতগতি সম্পন্ন ও ভারী যানবাহন সারা বছর ধরে অবাধে চলাচল করতে পারবে।

★ কলকাতায় স্থাপিত দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট টার্মিন্যালটি শক্তিশালী বৃহৎ বিমান ও শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী বিমান ওঠানামার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। দু কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি এই টার্মিন্যালটি বহুতল বিশিষ্ট। বিমানগুলির প্রতীক্ষা ও প্রস্থানের জন্য পৃথক পৃথক তিনটি অংশ আছে।

★ রাজস্থানের পালি জেলায় ২০ লক্ষ টাকা খরচ ক'রে সিন্দ্রু বাঁধ তৈরি হচ্ছে। বাঁধটির উচ্চতা হবে আনুমানিক ৬০ মিটার। এই বাঁধটি তৈরি হয়ে গেলে, বাঁধটির কোলে আরাবল্লী পাহাড়ের পশ্চিম অংশ থেকে বৃষ্টির জল গড়িয়ে এসে জমে একটি দীঘি তৈরি হবে। এর জলে ৯৩০ হেক্টার জমিতে সরাসরি জলসেচ দেওয়া যাবে, জাওয়াই নদীতে জলের পরিমাণ বাড়বে এবং যোধপুরে খাবার-জল সরবরাহ ব্যবস্থারও উন্নতি হবে।

★ রুশ ইঞ্জিনীয়াররা ভারতের লোয়ার সিলেরু পাওয়ার স্টেশনের জন্য ১১৯,০০০ কিলোওয়াট শক্তির টার্বাইনের নক্সা তৈরি ক'রে ফেলেছেন। এইটি নিয়ে, ভারতের পাঁচটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র রুশদের তৈরি যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত হ'ল।

★ তালচর সারের কারখানার (সরকারী ক্ষেত্রে) ভিত্তিপ্রস্তর ন্যস্ত করা হয়েছে। এই কারখানা স্থাপনে খরচ পড়বে ৭০ কোটি টাকা।

★ রাজস্থান সরকার, রাজ্যের একমাত্র শৈলাবাস, মাউন্ট আবু এবং সিরোহীর মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী একটা নতুন সড়কপথ তৈরির কাজে হাত দিয়েছেন। এর জন্য ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। এই পথ, দুটি জায়গার দূরত্ব ২৫ মাইল পর্যন্ত কমিয়ে দেবে।

★ জাতীয় ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কর্পোরেশন, হায়ার পার্চেজ নীতি অনুসারে, বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্পকে এ পর্যন্ত ২০,৩৪৯টি মেসিন সরবরাহ করেছে।

★ গুজরাট শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক স্থাপিত ভাপি শিল্পাঞ্চলের ৩২ টি য়ুনিটে উৎপাদন সুরু হয়েছে।

ধনধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত হ'লেও 'ধনধান্যে' শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই ব্যক্ত করে না। পরিকল্পনার বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী ক্ষেত্রে উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতটা অগ্রগতি হচ্ছে তার খবর দেওয়াই হ'ল 'ধনধান্যে'র লক্ষ্য।

'ধনধান্যে' প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে প্রকাশিত হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত, তাঁদের নিজস্ব।

নিয়মাবলী

দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়।

অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পুন: প্রকাশকালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার করা হয়।

রচনা মনোনয়নের জন্যে আনুমানিক দেড় মাস সময়ের প্রয়োজন হয়।

মনোনীত রচনা সম্পাদক মণ্ডলীর অনুমোদনক্রমে প্রকাশ করা হয়।

তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয়। কোনোও রচনার প্রাপ্তি-স্বীকৃতি, পত্র মারফৎ জানানো হয় না।

নাম ঠিকানা লেখা, ডাকটিকিট লাগানো, খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

কোনো রচনা তিন মাসের বেশী রাখা হয়না।

শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাবেন।

গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেস ম্যানেজার, পাব্লিকেশন্স্ ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী-১ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

"ধনধান্যে" পড়ুন
দেশকে জানুন

ডিরেক্টার, পাব্লিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটি ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সোসাইটি লি:—করোলবাগ, দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত।

ধন ধা

প্রথম বর্ষ ঃ ১৯
২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

প্রথম বর্ষ উনবিংশ সংখ্যা

২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ : ১০ই ফাল্গুন ১৮৯১

Vol. 1 : No 19 : February 22, 1970

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০

টেলিগ্রাফের ঠিকানা : যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

ভুলি নাই

"ঈশ্বর যে এখনও মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাননি তারই আশ্বাসরূপে শিশুর আবির্ভাব।"

—রবীন্দ্রনাথ

এই সংখ্যায়

পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয়

একচেটিয়া ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী ভারত সরকার শিল্পের লাইসেন্স দেওয়া সম্পর্কে যে নতুন নীতি ঘোষণা করেছেন, তা দেশের শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারী নীতি সম্পর্কে সন্দেহ দূর করতে সাহায্য করবে। শিল্পের লাইসেন্স দেওয়ার নীতির ক্ষেত্রে কতকগুলি যে বিশেষ পরিবর্তন করা হয়েছে, সরকারী অর্থসাহায্যকারী সংস্থাগুলি থেকে শিল্পগুলিকে সাহায্য দেওয়া সম্পর্কে নতুন যে নীতি স্থির করা হয়েছে এবং সরকারী ক্ষেত্রের উন্নয়ন সম্পর্কে যে নীতিসমূহ গঠন করা হয়েছে সেগুলি যে ভালো হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

দেশের পরিবর্ত্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই নীতিগুলির, সমাজতন্ত্রের মৌলিক নীতিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রয়েছে। নীতিগুলিতে যে সব ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে তা অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকৃত করতে এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির জন্য এবং নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য সুযোগ সুবিধে বাড়াতে সাহায্য করবে। এই নীতি অনুসারে সরকারী ক্ষেত্রগুলির সম্প্রসারণের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে এবং তাদের ওপরেই সমগ্র শিল্প ক্ষেত্রের প্রধান দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিপুল আর্থিক ক্ষতি অথবা লগ্নি থেকে স্বল্প আয় এবং কর্ম্মচারি তন্ত্র ইত্যাদি নানা অভিযোগের ভিত্তিতে সরকারী তরফ অনেক সময়েই বিপুল সমালোচনার সম্মুখীন হয়। সরকারী তরফে যে সব শিল্প গড়ে তোলা হয়েছে সেগুলির বৈচিত্র্যের দিকে বিশেষ মনযোগ না দিয়েই অনেক সময়ে এই সব সমালোচনা করা হয়।

সরকারী তরফের লগ্নি থেকে তাড়াতাড়ি যথেষ্ট লাভ পাওয়া যাচ্ছেনা এইটেই হ'ল তাঁদের সমালোচনার প্রধান কারণ। সরকারী তরফকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে এবং একে লাভজনক সত্যিকারের ব্যবসায়মূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার উদ্দেশ্য নতুন নীতিতে দ্রুত লাভদায়ক প্রকল্প গ্রহণ করার সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রস্তাব করা হয়েছে।

সম্প্রসারিত সরকারী তরফের জন্য অতিরিক্ত যে সম্পদের প্রয়োজন হবে তা এখন সরবরাহ করবে, ইউনিট ট্রাষ্ট, ভারতীয় অর্থ কমিশন, উন্নয়ন ব্যাঙ্ক এবং ভারতীয় জীবন বীমা কর্পোরেশনের মত সরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি এবং বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে প্রযোজ্য একই রকম সর্ত্তে এই অর্থ সাহায্য দেওয়া হবে।

"মূল" শিল্প হিসেবে কতকগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ মৌল শিল্প গড়ে তোলা সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তাতে সুশৃঙ্খল শিল্পোন্নয়ন সুনিশ্চিত করা হয়েছে। কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় সার ইত্যাদি তৈরি করার শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত, অলৌহ ধাতু, কয়লা ও তৈল, ভারী যন্ত্রপাতি, জাহাজ, ড্রেজার, সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ এবং ইলেকট্রোনিকস্ শিল্প ইত্যাদি এই মৌল শিল্পগুলির অন্তর্গত। যে উন্নয়নশীল অর্থনীতি আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য চেষ্টা করছে তার পক্ষে এই সব শিল্পের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

নীতিগতভাবে "যুক্ত তরফের" যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হয়েছে তাতে সরকারের বিজ্ঞতা ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি প্রতিফলিত হয়েছে। এই নীতি অনুযায়ী, যে মৌলিক শিল্পগুলি সম্পূর্ণভাবে সরকারী তরফের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে সেগুলি ছাড়া ৫কোটি টাকার অধিক লগ্নিমূলক নতুন শিল্প স্থাপনের সমস্ত ক্ষেত্রগুলি সরকারী ও বেসরকারী উভয় তরফের জন্যই মুক্ত রাখা হয়েছে। এর ফলে বড় বড় একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি, বেসরকারী তরফের কুশলতা ও দক্ষতার প্রমাণ দেওয়ার, সুযোগ পাবে। তাছাড়া এই নীতি বেসরকারী তরফকে, শিল্প প্রকল্পে তাদের যোগ্যতা ও সম্পদ নিয়োগ করার সুযোগ দেবে এবং দেশের সুষম উন্নয়নেই সাহায্য করবে।

মাত্র ২০ টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হাতে যে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে তাতেই বোঝা যায় দেশে একচেটিয়া ব্যবসায় গড়ে উঠেছে এবং গড়ে উঠছে এবং এটা কেউ অস্বীকার করতে পারেনা। এই অবস্থাটা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। সমাজতন্ত্রের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে চলতে হলে প্রথমেই আর্থিক শক্তির এই বৃদ্ধি রোধ করতে হবে। একটু দেরীতে হলেও সরকার এখন এই প্রয়োজন বুঝতে পেরেছেন।

ইস্পাতের আসবাবপত্র, সাইকেলের টায়ার টিউব, এ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র, ফাউন্টেন পেন, টুথ পেষ্ট এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পের মতো কতকগুলি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির শিল্প, ক্ষুদ্রায়তন ও সমবায় তরফের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। এই শ্রেণীতে রেহাইয়ের সীমা ১ কোটি টাকা পর্যন্ত যে বাড়ানো হয়েছে এবং ১ কোটি থেকে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত লগ্নিমূলক মাঝারি ধরণের শিল্পের জন্য এই দুটি তরফ সম্পর্কে বিশেষভাবে বিবেচনা করার যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তাতে মনে হয় যে সরকার লগ্নি সম্পর্কে চিরাচরিত শিল্প নীতিতে অর্থপূর্ণ পরিবর্ত্তন আনতে চাইছেন। লক্ষ্য স্থির করে এবং অব্যর্থ লক্ষ্যে সেই দিকে অগ্রসর হতে পারলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে যে ন্যায়সঙ্গত ও সুষম অর্থনীতি গড়ে উঠবে তাতে কোন কোন সন্দেহ নেই।

সাধারণ অসাধারণ

বন্ধ্যা নও বসুন্ধরা— রত্নগর্ভা তুমি

বাঁকুড়া জেলার গোগড়া গ্রামের একটি উষর অঞ্চল সম্পূর্ণ বেসরকারী প্রচেষ্টায় স্বর্ণখনিতে পরিণত হয়েছে। এই সাফল্যের কৃতিত্ব ঐ গ্রামের খাদি আশ্রমের কৃষি রিসার্চ ফার্মের কর্মীদের।

গ্রামের উচুঁ পাথুরে ডাঙা জমি, বাইদ, নামে পরিচিত। জমির নীচে কখনও জল পাওয়া যেতনা এবং আবহমান কাল থেকেই সেখানে চাষবাস হত না। কিন্তু সকলের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে ফার্মের পরিচালক শ্রীদাশগুপ্তের নেতৃত্বে কর্মীরা খনন কার্য চালান এবং ডিনামাইটের সাহায্যে ভূস্তরে শক্ত পাথরের চাঁই ফাঁটিয়ে মাটির ৩১ ফুট নীচে প্রচুর জলের সন্ধান পান। এইভাবে খুঁড়ে সেখানে ইতিমধ্যে পুকুরও তৈরী করা হয়েছে।

দ্বিতীয় আর একটি প্রধান সমস্যাও সমাধান করা হয়েছে অভিনব উপায়ে। জমির ওপরের অংশটা পাথর ও কাঁকরে ভর্তি ছিল। তাই বোধ হয় সেখানে চাষ করা অসম্ভব ব'লে গণ্য হ'তো। কিন্তু ফার্মের কর্মীরা জমির ওপর থেকে পাথর ও নুড়িগুলি হাতে ক'রে তুলে ফেলেন। তারপরেও দেখা গেল, নীচের জমিটা কাঁকরে ভরা, জল দাঁড়াতে পারে না। তাই চালুনির মত ঐ নুরাম জমির মধ্যে দিয়ে যাতে জল চুঁইয়ে বেরিয়ে না যায় সেজন্য বলদের সাহায্যে জলের সঙ্গে কাদা মিশিয়ে সেই ঘোলা জল জমিতে ঢেলে দেওয়া হয়। এইভাবে তৈরি জমিতে আই—আর ৮ ও এন—সি—৬৭৬ ধান এবং পদ্মা ধানের চাষ হয়েছে। তা ছাড়া, আলু, কপি, পেঁয়াজ, বরবটি, কলা, পেয়ারা, কুমড়ো, আখ ও পাট জন্মাচ্ছে। বিঘা প্রতি ১৮ মন পদ্মা ধান পাওয়া গেছে। ১১৮ দিনের মধ্যেই এই ধান উঠছে।

শ্রীদাশগুপ্তের মতে, উল্লিখিত পদ্ধতিতে চাষের জন্য, ৩০০ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করলে, বছরে প্রায় ২৮৮ কোটি টাকা মূল্যের ৪১ লক্ষ টন শস্য উৎপাদন করা যেতে পারে।

স্বল্প সঞ্চয় অকালের আশ্রয়

ক্ষুদ্রসঞ্চয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা বিশেষ অঙ্গ। এই কার্যসূচীর বহুলপ্রচার, আবের ভাণ্ডার বাড়াতে পারে। কথাটা মনে হয়েছিল কোট্টায়াম জেলার শ্রী এস. এল. জেকবের। চা চেখে গুণ নির্ণয় করা এর পেশা। থাকেন মুন্নার হাই রেঞ্জে। চেন্দুভারাই চা বাগিচার নিজস্ব 'টি টেসটার', বাগিচা কর্মীদের সঙ্গে হামেশাই দেখা সাক্ষাৎ। এই সব বাগিচা কর্মীকে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে উৎসাহিত করার কৃতিত্ব শ্রীজেকবের।

১৯৬৫-৬৬ সালের কথা। জাতীয় সঞ্চয় কার্যসূচীর অধিকর্তারা তখন সঞ্চয়ের প্রচারে নেমেছেন। জেকবও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন এবং বাগিচা কর্মীদের, সঞ্চয়ের লাভ ও গুরুত্ব বোঝালেন। তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল না। ঐ বছরেই তাঁর বাগিচার ৫০০ কর্মীকে সি. টি. ডিপোজিট স্কীমের সদস্য করে ফেললেন। পুরস্কার পেলেন ৫০০ টাকা রোটারী ক্লাবের কাছ থেকে সর্বাধিক সংখ্যক অর্থাৎ বাগিচার মোট কর্মীর শতকরা ৬৫ জনকে এ' প্রকল্পের আওতায় আনার জন্য। এর তিন বছর পরে অর্থাৎ ১৯৬৮-৬৯ সালে শ্রীজেকব মোট ৯৩১ জন কর্মীকে দিয়ে ৯৪৫টি অ্যাকাউন্ট খোলানোর ফলে দ্বিতীয়বার রোটারী ক্লাবের পুরস্কার লাভ করলেন।

এই সাফল্যের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন সদিচ্ছার মনোভাব নিয়ে কর্মীদের সঙ্গে মনেপ্রাণে একাত্ম হয়ে যাওয়াই হচ্ছে এর একমাত্র কারণ। কর্মীরা তাঁকে ঘরের লোক, আপনজন মনে করেন। শ্রীজেকব আরও বলেন আমি সামরিক বাহিনীতে সাড়ে পাঁচ বছর ছিলাম, কাজ করেছি য়ুরোপীয়ানদের সঙ্গে এতে আমার অনেক লাভ হয়েছিল। আমি দেশকে ভালবাসতে শিখেছিলাম, নিয়মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাবোধের আদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলাম আর য়ুরোপীয়ানদের কাছে শিখেছিলাম কঠোর পরিশ্রমের মর্যাদা দিতে।'

পাঁচটি সন্তানের পিতা জেকব সঞ্চয়ের অসীম উপকার ব্যাখ্যা করার সময় বার বার কর্মীদের মনে করিয়ে দেন, সন্তানদের ভবিষ্যতের সংস্থানের জন্য সঞ্চয়ের গুরুত্ব কতখানি।

জেকব অর্থ পুরস্কারকেই শুধু পুরস্কার বলে গণ্য করেন না। তাঁর ওপর তাঁর সহকর্মী ও বাগিচা কর্মীদের আস্থা ও প্রীতির মূল্য অর্থের চেয়েও বেশী। শ্রী জেকব এখন মুন্নার হিল রেঞ্জ-এর গ্রুপ লীডার ফোরামের (৩৪ জন গ্রুপ লীডার ও ৩০,০০০ বাগিচা কর্মী এর সদস্য) প্রেসিডেন্ট।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানে বাঙালী বৈজ্ঞানিকের অবদান

একটিমাত্র পরাগরেণু থেকে কৃত্রিম পদ্ধতিতে একটি সম্পূর্ণ উদ্ভিদ সৃষ্টি করার অভিনব আবিষ্কারের সঙ্গে যে বৈজ্ঞানিকের নাম জড়িত তিনি বাঙালী ললনা ডাঃ শিপ্রা মুখার্জ্জী। রাজধানীর ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরতা এই বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার বিশ্বের প্রধান ধানউৎপাদনকারী দেশগুলির বিশেষজ্ঞদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। তাঁরা এই আবিষ্কারকে উদ্ভিদকোষের বিবর্তন বিজ্ঞানে এক আশ্চর্য্য অবদান ব'লে অভিনন্দিত করেছেন। সম্প্রতি নতুনদিল্লীতে এঁদের একটি সম্মেলন বসে। সেই সম্মেলনে ডাঃ মুখার্জ্জী সমবেত বিশেষজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিকদের দেখান, কীভাবে কৃত্রিম উপায়ে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে, একটি পরাগ রেণু থেকে সম্পূর্ণ একটি গাছ সৃষ্টি করা সম্ভব এবং পৃথকভাবে প্রত্যেক উদ্ভিদকোষ থেকে পৃথক প্রজাতি সৃষ্টি করা সম্ভব। গবেষণাকালে ডাঃ মুখার্জ্জী, সর্ব্বপ্রথম একটি পরাগ রেণু থেকে একটি সম্পূর্ণ আকারের ধানের গাছ সৃষ্টি ক'রে তাঁর আবিষ্কারের মৌলিকতা ও বিপুল সম্ভাবনা প্রতিষ্ঠিত করেন।

পরিকল্পনার সাফল্য ও অসাফল্য

ডি. এস. গাঙ্গুলী

ভারতের পরিকল্পনা সম্পর্কে, বিশেষ ক'রে, পরিকল্পনা রচয়িতাদের অত্যন্ত উচ্চাশা সম্পর্কে বহু সমালোচনা শোনা যায়। যে দেশ সবেমাত্র স্বাধীন হয়েছে, সেই দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে, উন্নয়নের গতি বাড়ানো প্রয়োজন, একথা সত্যি। কিন্তু পরিকল্পনাগুলিতে যদি সম্পদের পরিমাণ, লগ্নি ও উন্নয়নের হার সম্পর্কে একটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা না হয়, তাহলে, নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তিনটি পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই রূপায়িত করা হয়েছে এবং তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনার পর এখন চতুর্থ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ সুরু করা হবে। কাজেই জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে পরিকল্পনার অবদান এবং রূপায়নের পথে পরিকল্পনাগুলি যে বাদানুবাদের সৃষ্টি করেছে তার মূল্যায়ণ করার সময় এখন এসেছে।

উন্নয়নের গতি

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিকাশশীল অর্থনীতির ভিত্তি রচনা করা হয় এবং ১৯৬০-৬১ সালের মূল্যমান অনুযায়ী মোট জাতীয় উৎপাদন ১৯৬২-৬৩ এবং ১৯৬৪-৬৫তে যথাক্রমে ১৪৩.২ কোটি এবং ১৫২.১৯ কোটি টাকা বাড়ে এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে তা দাঁড়ায় ১৬৬ ০ কোটি টাকায়। ১৯৫৬ সালকে যদি মূল বছর ধরা হয় তাহলে সেই অনুপাতে শিল্পোৎপাদন ১৯৬০ সালে ১৩০.২, ১৯৬৫ সালে ১৮৭.৭ এবং ১৯৬৭ সালে ১৯৪.৭ হারে বাড়ে। পরিসংখ্যানের দিক থেকে আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতির দিকে গেছে, কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনায় জাতীয় আয় শতকরা প্রায় ৬ ভাগ হারে বাড়বে বলে যে অনুমান করা হয়েছিল তা সফল হয়নি। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বছরে (১৯৬১-৬৩) সালে) জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা মাত্র ২.৫ ভাগ। তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকারি তরফে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ যদিও ৬,৩০০ কোটি টাকা রাখা হয়েছিল তবুও তা বেড়ে প্রায় ৮,৫০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৯ পর্য্যন্ত তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারি তরফে ৬,৮০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়। গত ১৮ বছরে শিল্পক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৭,৩০০ কোটি টাকা, যার মধ্যে, সরকারি তরফে ৪,২৪৫ কোটি এবং বেসরকারী তরফে ৩,০৫৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়। এতে ১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্য অনুপাতে জাতীয় আয় বেড়েছে প্রায় ১,২০০ কোটি টাকা। যে হারে লগ্নি করা হয়েছে সেই অনুপাতে তিনটি পরিকল্পনাকালে উন্নয়নের হার খুব উৎসাহজনক নয়। জাতীয় অর্থনীতিতে উন্নয়নের হার বজায় থাকলেও বিফলতার জন্য কৃষির অনিশ্চয়তা, শিল্প বিরোধ এবং বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অনুকূল অবস্থার অভাব প্রভৃতি কারণকে দায়ী করা হয়েছে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের প্রধান

দুই দিক

ভারতে শিল্প পরিকল্পনার দুটি প্রধান দিক রয়েছে; একটি হ'ল, আঞ্চলিক অসাম্য দূর করার উদ্দেশ্যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির সম বন্টন, অন্যটি হ'ল উন্নয়নের হার বৃদ্ধি। শিল্পের ক্ষেত্রে এই দুটি দিকে কতটুকু সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা এবারে দেখা যাক। ১৯৫৬ সালের শিল্প নীতি প্রস্তাবে সরকারী ও বেসরকারী তরফের এক্তিয়ার মূলতঃ স্থির ক'রে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আঞ্চলিক বৈষম্যের সমস্যা এবং অনেক ক্ষেত্রে শিল্পক্ষেত্রের দাবিগুলিতে রাজনৈতিক প্রভাব দেওয়ার প্রয়াস শিল্পক্ষেত্রে অর্থনীতির গতিপথকে প্রভাবান্বিত করতে চেষ্টা করেছে। যাই হোক কার্যতঃ যে সব রাজ্য পূর্ব্ব থেকেই কিছুটা শিল্পসমৃদ্ধ ছিল, সেইগুলিই শিল্প সম্প্রসারণের বৃহত্তর অংশ লাভ করলো এবং এর ফলে বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে অনেক শিল্প কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়লো। এই অবস্থাই আবার উন্নত এবং অপেক্ষাকৃত অনুন্নত রাজ্যগুলির মধ্যে একটা মনকষাকষির ভাব সৃষ্টি করলো এবং জাতীয় ঐক্যে বিভেদ সৃষ্টির একটা কারণ হয়ে দাঁড়ালো।

যে প্রকল্পগুলি নিয়ে কাজ সুরু করা হয় তা থেকে যদি আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় তাহলে বিপুল মূলধন বিনিয়োগমূলক শিল্পনীতিও জাতির পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে পারে কিন্তু এই রকম প্রকল্পগুলি থেকে যদি আশানুরূপ ফল না পাওয়া যায় এবং কাজ চালু রাখার জন্য যদি আরও জাতীয় অর্থ বিনিয়োগ করতে হয় তাহলে তা অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে। সরকারি তরফের অনেক সংস্থাই এর উদাহরণ।

১৯৬৯ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৮৬টি সরকারি সংস্থায় প্রায় ৩৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। ১৯৬৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই সব সংস্থার মোট ক্ষতির পরিমাণ হ'ল প্রায় ৪৪ কোটি টাকা, তার মধ্যে কেবলমাত্র হিন্দুস্তান ষ্টীলের ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৪০ কোটি টাকা। কাজেই সরকারি তরফের ভিত্তি দৃঢ় না ক'রে সরকারি সংস্থার সম্প্রসারণকে 'ত্রুটিযুক্ত অর্থনীতি' বলা যায়।

ভারতের বর্ত্তমান সরকারি সংস্থাগুলির কাঠামো অবশ্য শিল্প রাষ্ট্রীয়করণ নীতির সঙ্গে মোটামুটি খাপ খায়। যেমন, মূল শিল্পসংগঠন, কর্ম্মসংস্থান এবং গ্রাহকগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা ইত্যাদি নীতিগুলির সঙ্গে খাপ খায়। কিন্তু পূর্ব্বেই যে সব প্রকল্প স্থাপন করা হয়েছে সেগুলিকে সংহত এবং সেগুলির ভিত্তি শক্তিশালী না করেই অন্য ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ করাটা হ'ল সরকারি তরফের প্রধান ত্রুটি। বরং সমাজের পক্ষে কল্যাণকর অর্থনৈতিক ও কল্যাণমূলক ক্ষেত্র যেমন, খাদ্য সংগ্রহ ও বন্টন, এবং অল্পমূল্যে ওষুধপত্র ও অত্যাবশ্যক সামগ্রীর সরবরাহ ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের এই কর্ম্মপ্রচেষ্টা ঢের বেশী বাঞ্ছনীয় হ'ত।

বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় বিধান

রাজনৈতিক সর্ত্ত এবং পারস্পরিক অর্থনৈতিক দায়সহ বৈদেশিক সাহায্যের ভিত্তিতে ভারি শিল্প স্থাপনের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করাই হ'ল ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রধান দুর্ব্বলতা।

যে প্রকল্পগুলির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে সেগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠার আগেই নতুন নতুন প্রকল্পে হাত দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পগুলির সাফল্য এবং উন্নয়নের গতি বৃদ্ধির ব্যাপারে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র-গুলিতে কি রকম কাজ হচ্ছে সেদিকে যদি যথেষ্ট মনযোগ দেওয়া না হয় তাহলে কেবলমাত্র বিনিয়োগের শক্তিতেই যে উৎপাদন ক্ষমতা এবং জাতীয় আয় বাড়বেনা, তা মনে রাখতে হবে। শিল্প-ক্ষেত্রের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাবে সরকারি তরফের ভারি শিল্পগুলির পূর্ণ ক্ষমতা কাজে লাগানো যায়না। যে অর্থ বিনিয়োগ করা হয় তা থেকে যে বিশেষ লাভ হতে পারেনা এই অবস্থাটিই তা প্রমাণ করে। কাজেই চতুর্থ পরিকল্প-নায় যে, "অনিশ্চয়তা হ্রাস ক'রে স্থিতি-শীলতার মধ্যে উন্নয়নের গতি বাড়ানোর এবং কেবলমাত্র অতি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই নতুন প্রকল্পের কাজ" হাতে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে তা খুবই সঙ্গত হয়েছে। পরিকল্পনার খসড়ায় খোলাখুলিভাবে স্বীকার করা হয়েছে যে "সরকারি তরফে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেষ্ট অর্থ বিনিয়োগ করা হলেও, সরকারি তরফের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলির কাজের মধ্যে উপযুক্ত সামঞ্জস্য নেই এবং "কার্য্যকরী সমন্বয়ের জন্য একটি উপযুক্ত ব্যবস্থা" গ্রহণ করে এই ত্রুটি দূর করার কথা বলা হয়েছে। কতকগুলি মৌলিক ও অগ্রাধিকারসম্পন্ন শিল্প সরকারি ও বেসরকারি তরফের যুক্ত প্রচেষ্টায় রাখা হলে উন্নয়নশীল অর্থনীতির পক্ষে তা অনুকূল হয়। আভ্যন্তরীন সম্পদের ওপর আস্থা না রেখে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর বেশীরভাগ নির্ভর করে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তৈরি করা হলে তা নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে বাধ্য। এগুলির মধ্যে সবচাইতে বড় সমস্যা হল মুদ্রাস্ফীতির চাপ। ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব এড়ানো যায়না বলে তখন দ্রব্য-মূল্যের দাম বাড়িয়ে বা করের বোঝা বাড়িয়ে সেই দায়িত্ব পালন করতে হয়। যথেষ্ট অর্থ লগ্নি করা সত্ত্বেও তার থেকে সম্পদ সৃষ্টি না হলে, আরও লগ্নি করা বন্ধ ক'রে অর্থনীতি সুদৃঢ় ক'রে তোলার জন্য রূপায়ণের দুর্বল স্থানগুলি এবং বিফলতাগুলির কারণ নির্ণয় ক'রে সংশো-ধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। পরিকল্পনার কাজ সম্পর্কে একটা ইঙ্গিত দিয়ে নীতি সম্পর্কে মোটামুটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটাই যথেষ্ট নয়।

ভারতের পরিকল্পনাগুলি অত্যন্ত বেশী আশাবাদের দোষে দুষ্ট। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় চাহিদা ও ভোগের ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিগত ব্যয়ের ধারায় সম্ভাব্য পরি-বর্তন, মুদ্রাস্ফীতির চাপে ব্যক্তিগত আয় হ্রাসের সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়গুলি উপযুক্ত-ভাবে বিবেচনা না করেই ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের অনুপাত বেশী ধরা হয়েছে। শিল্পক্ষেত্রের আভ্যন্তরীন সম্পদ সম্পর্কে ও পরিকল্পনা-গুলিতে, শিল্পোন্নয়নের পথে যে সব বাধা এবং আভ্যন্তরীন বিরোধ আসতে পারে অথবা বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে যে সব সমস্যা দেখা দিতে পারে তার উপযুক্ত পরিমাপ করা হয়নি। তার ফলে আনুমানিক বিনিয়োগের পরিমাণ অনেক ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে গেছে এবং বৈদে-শিক সাহায্যের ওপর বেশী নির্ভর করতে হয়েছে। মূলধন এবং সম্পদ সম্পর্কে চতুর্থ পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গী অনেকখানি বাস্তবানুগ।

ব্যাঙ্ক পুনঃ রাষ্ট্রীয়করণ অর্ডিন্যান্স

দেশের ১৪ টি প্রধান ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রীয়ক-রণ বিধিবহির্ভূত বলে সর্ব্বোচ্চ আদালতের একটি রায় বেরোবার ৪ দিন পর, ১৪ই ফেব্রুয়ারি, রাষ্ট্রপতি একটি অর্ডিন্যান্স জারি ক'রে সেগুলি আবার রাষ্ট্রায়ত্ত করে-ছেন। ১৯৬৯ সালের ১৯শে জুলাই ব্যাঙ্কগুলি যখন রাষ্ট্রাধীন করা হয় পুনঃ রাষ্ট্রীয়করণ অর্ডিন্যান্স সেইদিন থেকেই কার্য্যকরী হবে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির চেয়ারম্যান সেই তারিখ থেকেই আবার কাস্টোডিয়ান নিযুক্ত হয়েছেন।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির কাজ নিয়ে নেওয়ার জন্য সেগুলিকে ৮৭.৩০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা এই অর্ডিন্যান্সে রয়েছে।

ব্যাঙ্কগুলি তাদের ইচ্ছানুযায়ী এই ক্ষতিপূরণ নগদ টাকায় বা কেন্দ্রীয় সরকা-রের সিকিউরিটিতে নিতে পারে। ব্যাঙ্ক যদি নগদ টাকায় ক্ষতিপূরণ চায় তাহলে তিনটি বার্ষিক কিস্তিতে এই টাকা দেওয়া হবে এবং প্রতিটি কিস্তির জন্য ১৯৬৯ সালের ১৯শে জুলাই থেকে শতকরা ৪ টাকা হারে সুদ দেওয়া হবে। ব্যাঙ্ক যদি সিকিউরিটিতে ক্ষতিপূরণ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে সে বার্ষিক শতকরা ৪।। টাকা সুদসহ ১০ বছরের সিকিউরিটিতে অথবা বার্ষিক শত-করা ৫।। টাকা সুদসহ ৩০ বছরের সিকিউ-রিটিতে তা নিতে পারে এবং উভয় ক্ষেত্রেই ১৯৬৯ সালের ১৯শে জুলাই থেকে সুদ দেওয়া হবে। ব্যাঙ্ক অবশ্য ইচ্ছে করলে যে কোন অনুপাতে আংশিকভাবে নগদ টাকায় এবং আংশিকভাবে সিকিউরিটিতে এই ক্ষতিপূরণ নিতে পারে। অর্ডিন্যান্স জারি হওয়ার তিন মাসের মধ্যেই এই সম্পর্কে মতামত জানাতে হবে। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে যে কোন ব্যাঙ্ক সম্পর্কে সরকার, এই মতামত জানানোর সময় তিন মাস পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দিতে পারবেন। ব্যাঙ্কের মতামত জানাবার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সরকার, ক্ষতিপূরণের নগদ টাকার অংশের প্রথম কিস্তি এবং সিকিউরিটির আকারে, ক্ষতি-পূরণের সমগ্র অংশ দিয়ে দেবেন। যদি কোন ব্যাঙ্ক থেকে কোন মতামত না পাওয়া যায় তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে ব্যাঙ্কগুলি শতকরা ৪।। টাকা সুদের ১০ বছরের সিকিউরিটিতেই ক্ষতিপূরণ চায় এবং মতা-মত জানাবার নির্দ্দিষ্ট তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সেই টাকা দিয়ে দেওয়া হবে।

যদি কোন ব্যাঙ্ক চায়, তাহলে আদায়ী-কৃত মূলধনের শতকরা ৭৫ ভাগ পর্য্যন্ত, মধ্যবর্ত্তীকালীন ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও ব্যবস্থা রয়েছে। মধ্যবর্ত্তীকালীন এই ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রেও নগদ টাকায় বা সিকিউরিটিতে তা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। মতামত জানাবার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে এই মধ্য-বর্ত্তীকালীন ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেওয়া হবে।

ঋণদান নীতির পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ থেকে রাষ্ট্রীয়করণ

অলক ঘোষ

ব্যাঙ্ক ব্যবসা সংক্রান্ত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ মূলক আইনে দুটি প্রধান ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়। তা হল (ক) ঋণদান নীতি স্থির করা ও সেগুলি সংহত করা এবং (খ) প্রতিটি ব্যাঙ্কের পরিচালন পর্ষতের সংগঠনে পরিবর্ত্তন আনা। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে ভারত সরকার সর্ব্ব ভারতীয় পর্যায়ে জাতীয় ঋণ পরিষদ গঠন করেন। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যেই ব্যাঙ্কগুলি তাদের পরিচালন পর্ষৎ পুনর্গঠন করে। যাঁদের কৃষি, পল্লী অর্থনীতি, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, সমবায়, ব্যাঙ্ক ব্যবসা এবং অর্থনীতি, সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা আছে তাঁদের মধ্য থেকেই এই পর্ষতের জন্য বেশীর ভাগ সদস্য নির্ব্বাচন করা হয়।

ঋণ পরিষদ, বিভিন্ন ক্ষেত্রের ঋণের দাবির আনুপাতিক যোগ্যতা আলোচনা করছেন এবং অগ্রাধিকার স্থির করছেন। এটা সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে, পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং ব্যাঙ্কগুলির ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আরোপের উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিল রেখে, বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিকে, ঋণ বন্টন করতে সাহায্য করবে। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং জাতীয় ঋণ পরিষদ যদি যুক্তভাবে ঋণ মঞ্জুরী পরিকল্পনা স্থির করেন তাহলে ব্যাঙ্কের কর্মসূচীর সঙ্গে জাতীয় নীতির মিল রেখে তা করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ঋণ পরিষদের প্রধান কাজ হল (ক) বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে ব্যাঙ্কের কাছে যে ঋণের দাবি জানানো হয় তা মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করে দেখা, (খ) অগ্রাধিকার সম্পন্ন ক্ষেত্রসমূহ বিশেষ করে কৃষি, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প এবং রপ্তানীর প্রয়োজন এবং অর্থসম্পদ সরবরাহের সম্ভাবনা বিবেচনা করে লগ্নির উদ্দেশ্যে ঋণ মঞ্জুর করার জন্য অগ্রাধিকার স্থির করে দেওয়া, (গ) মোট সম্পদ যাতে পুরোপুরি সুষ্ঠুভাবে ব্যবহৃত হতে পারে সেজন্য ব্যবসায়ী ও সমবায় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য বিশেষ সংস্থাগুলির ঋণদান ও লগ্নি নীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং (ঘ) চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান যদি সংশ্লিষ্ট কোন প্রশ্ন তাঁদের কাছে উল্লেখ করেন তাহলে তা বিবেচনা করা। প্রতি বছরে অন্ততঃ পক্ষে দুবার এই পরিষদ, অধিবেশনে মিলিত হবে।

ঋণ পরিষদের সদস্য সংখ্যা ২৫ এর বেশী হওয়া উচিত নয় বলে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এই পরিষদের চেয়ারম্যান হবেন অর্থমন্ত্রী এবং ভাইস চেয়ার ম্যান হবেন রিজাভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর। এঁরা ছাড়া পরিষদের তিনজন স্থায়ী সদস্য হলেন পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের অর্থনৈতিক বিভাগের সেক্রেটারী এবং কৃষি রিফাইন্যান্স কর্পোরেশনের চেয়ার ম্যান। অবশিষ্ট ২০ জন সদস্য হলেন ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক, সমবায় ক্ষেত্র, বড়, মাঝারি ও ক্ষুদ্রশিল্প, কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিনিধি। এঁরা সর্বাধিক তিন বছরের জন্য সদস্য থাকতে পারবেন।

জাতীয় ঋণ পরিষদ, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ঋণ বন্টন করা সম্পর্কেই প্রধানতঃ সংশ্লিষ্ট। কিন্তু ঋণ বন্টন এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ এক কথা নয়। পরিষদ যদি ঋণ বন্টন ব্যবস্থার দিকেই অযৌক্তিক গুরুত্ব আরোপ করেন তাহলে তা শেষপর্য্যন্ত হয়তো অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের কাজ ব্যাহত করবে এবং তা হয়তো রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বহু ঘোষিত নিয়ন্ত্রিত সম্প্রসারণের নীতিও ব্যাহত করবে।

জাতীয় ঋণ পরিষদ বছরে একবার বা দুইবার অধিবেশনে মিলিত হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রের ঋণের প্রয়োজন সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারবেন কিনা সেটাও সন্দেহজনক। কারণ উন্নয়নের গতিপথে এই ক্ষেত্রগুলির প্রয়োজন দ্রুত পরিবর্ত্তিত হতে পারে। আবার এই পরিষদ যদি ঘন ঘন অধিবেশনে মিলিত হন তাহলে তা প্রকৃতপক্ষে অন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় পরিণত হয়ে যেতে পারে। কাজেই ক্ষেত্র অনুযায়ী ঋণ মঞ্জুর করা সম্পর্কে আরও ছোট ছোট বিশেষ সংস্থা গঠন করা উচিত। এই সংস্থাগুলি আরও ঘন ঘন অধিবেশনে মিলিত হ'য়ে অর্থ ও ঋণের পরিস্থিতি বিবেচনা ক'রে তাদের সুপারিশ পরিষদের কাছে পেশ করবেন।

জাতীয় ঋণ পরিষদের কেবলমাত্র অগ্রাধিকার সম্পন্ন তিনটি ক্ষেত্র অর্থাৎ কৃষি, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প এবং রপ্তানীর জন্য অর্থ বন্টন সম্পর্কেই নিজেদের সংশ্লিষ্ট রাখা উচিত নয়, সুদের হার ভিন্ন ভিন্ন রাখা যায় কিনা সে সম্পর্কে একটা কার্যকরি পরীক্ষা করে দেখা উচিত। অগ্রাধিকার সম্পন্ন ক্ষেত্রগুলিরও শ্রেণী বিভাগ করে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদিতে বিভক্ত করা যেতে পারে। অগ্রাধিকারের প্রথম শ্রেণীর শিল্প ও ব্যবসাগুলিকে, দ্বিতীয় শ্রেণীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম সুদের হারে ঋণ মঞ্জুর করা যেতে পারে। অগ্রাধিকারের শ্রেণীর ভিত্তিতে ঋণ মঞ্জুরির এই ব্যবস্থা যদি চালু করা যায় তাহলে ব্যাঙ্কগুলিও, শিল্প ব্যবসাগুলিকে অপেক্ষাকৃত উন্নততর পদ্ধতিতে অর্থ বরাদ্দ করতে পারবে।

ব্যাঙ্কের পূর্ব্বতন ডাইরেক্টররা যেমন ব্যাঙ্কের শেয়ার মূলধনের একটা বেশ বড় অংশের মালিক ছিলেন তেমনি তাঁদের একটা বড় আর্থিক ঝুঁকি নিতে হত। কিন্তু ব্যাঙ্কের নবগঠিত বোর্ডের ডাইরেক্টারদের সেই রকম কোন ঝুঁকি নেই। এখন বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন কিন্তু আর্থিক ঝুঁকিবিহীন নতুন ডাইরেক্টররা, পুরানো ডাইরেক্টরদের তুলনায় ব্যাঙ্কের উন্নয়নে কতখানি সাফল্য লাভ করতে পারেন তা দেখা যাক।

ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণ মঞ্জুরীর ব্যাপারটা যে সরকারের লাইসেন্স বা অন্যান্য

১২ পৃষ্ঠায় দেখুন

অর্থনীতির রীডার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

হার্ডিলিয়া—পেট্রোকেমিক্যাল কারখানা পাঁচ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করছে

অনিল সোম

বোম্বাইতে পেট্রোকেমিক্যাল উৎপাদনের যে কটি কারখানা আছে তার তালিকায়, বোম্বাই-এর উত্তরে থানা—বালাপুর শিল্প এলাকার হার্ডিলিয়া—পেট্রোকেমিক্যাল হ'ল একটি নতুন সংযোজন।

১৯৬৮ সালে এই কারখানার উদ্বোধন করা হয়। এটির বার্ষিক নির্ধারিত উৎপাদন ক্ষমতা হ'ল ৪১,৪০০ টন। এই কারখানায় বিভিন্ন প্রকারের ভারী রাসায়নিক দ্রব্য উৎপন্ন হয়।

কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্য পাঠাবার জন্য কয়েক মাইল দীর্ঘ যে পাইপ লাইন বসানো হয়েছে, তাতে তিনটি শিল্প সংস্থা সহযোগিতা করেছে। সংস্থাগুলি হ'ল যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের হারকিউলিস ইনকর্পোরেটেড, গ্রেট বৃটেনের বি. পি. কেমিক্যালস লিমিটেড এবং মাদ্রাজের ই—আই—ডি—প্যারি লিমিটেড। যুক্তরাষ্ট্রে, শীর্ষস্থানীয়, যে ১০টি কেমিক্যাল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আছে হারকিউলিস কর্পোরেটেড তার অন্যতম। এই প্রতিষ্ঠানটি সহস্রাধিক মৌলিক রাসায়নিক বস্তু উৎপাদন করে। সারা পৃথিবীতে সে সব দ্রব্য বিক্রী করে যে অর্থ পাওয়া যায় তার পরিমাণ ৬৫ কোটি ডলারেরও বেশী। এই বিরাট কারখানায় যে সব মৌলিক রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয় সেগুলি কাগজ, প্লাস্টিক, রং, বস্ত্র, কৃত্রিম তন্তু, খাদ্যবস্তু প্রস্তুতে এমন কি কৃষি সংশ্লিষ্ট শিল্পেও ব্যবহৃত হয়।

গ্রেট বৃটেনের বি. পি. কেমিক্যালস দীর্ঘদিন ধরে ভারতের রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে নানা প্রকার জৈব রাসায়নিক দ্রব্য, দ্রাবক, কৃত্রিম রঞ্জন, রবার প্রভৃতি সরবরাহ করে আসছে। গত ২০ বছর ধরে হারকিউলিসের সঙ্গে তাদের ব্যবসার সম্পর্কও রয়েছে।

তৃতীয় সহযোগী প্রতিষ্ঠানটি হল ভারতের ই—আর—ডি—প্যারি। এটি রাসায়নিক দ্রব্যাদি, সিরামিক, চিনি, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য এবং ভেষজ দ্রব্য উৎপাদন ক'রে আসছে। অন্ধ্র প্রদেশের বিশাখাপত্তনমে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করমণ্ডল সারপ্রকল্পের প্রধান উদ্যোক্তা হ'ল এই প্রতিষ্ঠানটি।

এই প্রকল্পের জন্য মোট যে অর্থ ব্যয় হয়েছে তার শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ পাওয়া গিয়েছে আমেরিকার কাছ থেকে ঋণ হিসেবে।

এর মধ্যে ৩৩ লক্ষ ডলার ঋণ পাওয়া গিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের এক্সপোর্ট ব্যাঙ্ক থেকে। আরও ২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার ঋণ পাওয়া গিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার মারফতে ভারতে মার্কিন খাদ্যশস্য বিক্রীর মূল্য থেকে।

হার্ডিলিয়া কারখানায় পাঁচ রকমের রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ইউনিট আছে। এই রাসায়নিক দ্রব্যগুলির মধ্যে আছে ফেনল এসিটোন ডায়াসিটেন অ্যালকোহল, থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইড এবং থ্যালেটস প্রভৃতি।

ভেষজ, রবার, কেমিক্যাল, লুব্রিকেটিং-তেল, রঙের উপকরণ এবং বিভিন্ন রকমের উৎকৃষ্ট রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতে কাঁচামাল হিসেবে ফেনল (কার্বলিক এসিড) ব্যবহৃত হয়। পেট্রোল শোধন করা এবং কীটঘ্ন প্রস্তুতেও এই বস্তুটি ব্যবহৃত হয়।

অ্যাসিটোন একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্রাবক বস্তু, বিভিন্ন রকমের শুল্পশিল্পে যার বহুল ব্যবহার আছে। বিভিন্ন রকমের ওষুধ তৈরির জন্য সুরুতেই এই বস্তুটির প্রয়োজন হয়। ক্লোরোফর্ম ও আয়োডোফর্ম থেকে সুরু করে ভিটামিন'সি'র মত জটিল ওষুধ তৈরিতেও এটির প্রয়োজন হয়। এবং শিলাজত শোধনে এবং প্রাকৃতিক তেল ও চর্বি নিষ্কাশনে অ্যাসিটোন কাজে লাগে।

ব্রেক ফ্লুইডের প্রধান উপকরণ হচ্ছে ডায়াসিটোন অ্যালকোহল।

থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইড প্রধানত: ব্যবহৃত হয় রঙ, আস্তরণ দেবার উপাদান এবং প্লাস্টিক প্রস্তুতে।

ভিনিল ও সেলুলোজ প্লাস্টিকের আস্তরন তৈরীর প্রধান উপকরণরূপে থ্যালেটস ব্যবহৃত হয়।

বিভিন্ন রকমের রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য হার্ডিলিয়ার কারখানায় যে সব কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় সেগুলির শতকরা ৯০ ভাগ দেশীয়। বাদবাকী যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেন থেকে আমদানি করা হয়।

হার্ডিলিয়াতে রাসায়নিক দ্রব্যাদি উৎপাদিত হওয়ার ফলে ভারতের প্রতি বছর পাঁচ কোটি টাকার অধিক বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে। এ ছাড়া, সমগোত্রীয় যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান আমদানী করা রাসায়নিক দ্রব্যের অভাবে কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারত না, সেগুলি এখন সেই ক্ষমতা পুরাপুরি কাজে লাগাচ্ছে।

সংরক্ষিত জল সরবরাহ কর্মসূচী

দেশে সংরক্ষিত জল সরবরাহ প্রকল্প এবং পুষ্টি কর্মসূচীতে ইউনিসেফের (UNICEF) সাহায্য পাওয়া গেছে। দেশের যে সব এলাকায় ভূস্তরে কঠিন শিলা রয়েছে বিশেষভাবে সেই সব এলাকায় জল উত্তোলনের সাজ সরঞ্জাম কেনার জন্য ১৯৬৯-৭৪ সালের মধ্যে ৪৫ লক্ষ মার্কিণ ডলার সাহায্য পাওয়া যাবে বলে ইউনিসেফ ইঙ্গিত দিয়েছে। প্রকল্প প্রতি এই সাহায্য এক লক্ষ মার্কিণ ডলারের বেশী ছিল না। এ পর্য্যন্ত এই সব প্রকল্পে ১০ লক্ষ ৩০ হাজারের মত মার্কিণ ডলার পাওয়া গেছে।

আরও দ্রুত আর্থিক উন্নয়ন প্রয়োজন

শান্তি কুমার ঘোষ

বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাহিদার হিসেব ক'রে এবং সীমিত সম্পদের ওপর ভিত্তি ক'রে একটা অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলাই হল ভারতের পারকল্পনার ভূমিকা। দ্বিতীয় পারকল্পনা থেকে, ভারি শিল্পগুলির ওপর ভিত্তি করেই উন্নয়নের কর্মসূচী তৈরি করা হচ্ছে। প্রথম দিকে দেশে যখন শিল্পের ভিত্তি গড়ে তোলা হচ্ছিল তখন ব্যবহারের মাত্রা, অন্ততঃপক্ষে ব্যবহার বৃদ্ধির মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম রাখা হয়েছিল। এর জন্য সঞ্চয়ের মাত্রা বেশী রাখা হয়েছিল তা না হলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হয়ে পড়তো। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়ে এবং তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম কয়েক বছর এই ব্যবস্থাগুলি কার্যকরী হয়।

বিদেশ থেকে যে সব জিনিস আমদানি করতে হয় সেগুলি যাতে দেশেই তৈরি করা যায় সেই উদ্দেশ্যে সেই ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠা করাই হ'ল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির লক্ষ্য। যে সব যন্ত্রপাতি দিয়ে মেসিন তৈরি করা যায় সেই সব যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানাসহ, মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠার ওপরেই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়। কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যও যে কারিগরী উন্নয়নের প্রয়োজন, তার ওপরে সাম্প্রতিক কাল পর্য্যন্ত তেমন গুরুত্ব অরোপ করা হয়নি এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় নতুন সাজসরঞ্জাম, রাসায়নিক সার ইত্যাদির যথেষ্ট সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হয়নি।

বড় বড় যে সব সরকারি সংস্থায় পরিকল্পনা অনুযায়ী যথেষ্ট অর্থ লগ্নি করা হয়েছে সেগুলি থেকে আশানুরূপ লাভ পাওয়া যায়নি। যে অর্থ লগ্নি করা হয়েছে তা থেকে উপযুক্ত পরিমাণ লাভ করাটাই হল এখন সরকারি তরফের আশু সমস্যা। তাছাড়া কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় নতুন প্রয়োজন বিশেষ করে কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যের অনুপাতে কতকগুলি প্রয়োজনও মেটাতে হবে। আর্থিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি জিনিসের উৎপাদন, বিশেষ করে সার, পেট্রো-কেমিকেল এবং কয়েক ধরণের মেসিনারি উৎপাদনের জন্যও সরকারি তরফ থেকে অর্থলগ্নি করতে হয়। এই সব ক্ষেত্রে আমাদের মোট প্রয়োজনের বেশ কিছুটা অংশ বর্তমানে বিদেশ থেকে আমদানি করে মেটাতে হয়।

পরিবর্ত্তিত নীতি

আমদানির পরিবর্ত তৈরী করার দিকেই সরকার বেশী দৃষ্টি দেওয়ায়, রপ্তানীর দিকটা অবহেলিত হয় এবং বৈদেশিক মুদ্রায় ঘাটতি পড়ায়, কঠোর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। টাকার মূল্যমান হ্রাসের বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া, আভ্যন্তরীন মন্দা যা রপ্তানীর পরিমাণ বাড়াতে উৎসাহিত করে এবং রপ্তানী বাড়াবার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে উৎসাহ জনক সুযোগ সুবিধে ও সাহায্য, সম্প্রতি রপ্তানী বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। ভারত বহু দেশে মেসিন টুল, বস্ত্র ও চিনি তৈরীর যন্ত্র পাতি এবং হাল্কা ইঞ্জিনিয়ারীং সামগ্রী রপ্তানী করতে সুরু করেছে। তবে রপ্তানীযোগ্য জিনিসপত্রের দাম প্রতিযোগিতামূলক অর্থাৎ অন্যদেশের তুলনায় কিছুটা সস্তা রাখার ওপরেই রপ্তানী বৃদ্ধির সাফল্য নির্ভর করবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাজ শেষ হওয়ার পর, তৃতীয় পরিকল্পনায় পূর্ব্বের উন্নয়ন ধারাই অনুসরণ করা হবে অথবা এই ধারায় মৌলিক কোন পরিবর্ত্তন আনা হবে সেই প্রশ্ন দেখা দেয়। তখনই আত্মনির্ভরশীল উন্নয়নের নীতি গ্রহণ করা হল এবং পরিকল্পনা রূপায়ণের কৌশলে নতুন একটা জিনিস সংযুক্ত হল। অর্থাৎ বৈদেশিক সাহায্যের ওপর বেশী করে নির্ভরতার নীতি গ্রহণ করা হল। যাই হোক বাধাবিহীন ভাবে যথেষ্ট বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার কল্পনা বেশীদিন স্থায়ী হলোনা।

১৯৫৪-৫৫ থেকে ১৯৬৩-৬৪ সাল পর্যন্ত জাতীয় আয়ের অংশ হিসেবে মোটামুটি সঞ্চয় ওঠা নামা করলেও তা উঠতির দিকে থাকে এবং ১৯৬৩-৬৪ সালে তা শীর্ষ স্তরে পৌঁছায়। কিন্তু কৃষি উৎপাদন, অন্যান্য ক্ষেত্রের উৎপাদনের মত না বাড়ায় এই সঞ্চয়ের হার কমে যায়। সরকারি তরফে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২৯,০০ কোটি টাকা এবং তৃতীয় পরিকল্পনার সময়ে ৪,৪০০ কোটি টাকা ঘাটতি হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যাঙ্কগুলিই বেশীর ভাগ অর্থ সরবরাহ করে এবং দ্বিতীয় স্থান গ্রহণ করে বৈদেশিক সাহায্য। তৃতীয় পরিকল্পনায় অবশ্য অবস্থাটা একেবারে বদ্‌লে যায়। মোট ঘাটতির শতকরা ৫০ ভাগ বৈদেশিক সাহায্য থেকে মেটানো হয় এবং ব্যাঙ্কগুলি থেকে শতকরা ৩৩ ভাগ মেটানো হয়।

বিফলতা

দেশে লগ্নির ক্ষেত্রে অগ্রগতি ভীষণভাবে ব্যাহত হয়েছে। ১৯৬৮-৬৯ সালে আর্থিক লগ্নির হার ছিল শতকরা ১১.৩ ভাগ। সম্পদ হ্রাস পাওয়ার চাপ প্রধানতঃ এই লগ্নি দিয়ে প্রতিরোধ করা হয়। সরকারি তরফের ব্যয়ে, ভোগ্য শ্রেণীর দ্রব্যাদির পরিমাণ বাড়ে, ফলে সরকারি তরফের বিনিয়োগও হ্রাস পায়। সুতরাং মন্দার সৃষ্টি করে এই সমস্যা সমাধান করার চিরাচরিত উপায় গ্রহণ করা হয়। তিন বছরের জন্য প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পনার কাজে মন্দার ভাব রাখা হয়।

অতীতে যেখানে দীর্ঘকালীন মেয়াদের পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা তৈরী করা হত- তার পরিবর্তে অন্ততঃপক্ষে সাময়িকভাবে স্বল্পকালীন নীতি গ্রহণ করা হয়। এতে সম্পদ ব্যবহারের ওপর হয়তো কম চাপ পড়েছে কিন্তু আর্থিক উন্নয়নের হারও কম হয়েছে। সম্প্রতি কয়েক বছরে উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হয়েছে তা হিসেবের মধ্যে ধরেও, মোট জাতীয়

১৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

সাক্ষরের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি

অন্য দেশে কা ঘটছে………

মালি

আফ্রিকার মালিতে ২000 জনের ও বেশী স্বেচ্ছাকর্ম্মী গত আট বছর থেকে শিক্ষা বিস্তারের কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন শিক্ষক, কিশোর কিশোরী, মহিলা, ট্রেড ইউনিয়ন কর্ম্মী এবং সৈন্য। বর্ত্তমানে এঁরা ৬২0 টি শিক্ষা-কেন্দ্র পরিচালনা করছেন এবং শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কে দেশটি এই রকম ব্যাপক একটা কর্মসূচী গ্রহণ করায় ইউনেস্কো এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশেষ তহবিল, দেশটির জাতীয় অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রধান ক্ষেত্রগুলির উন্নয়নের সঙ্গে যোগ রেখে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে একটি পরীক্ষা-মূলক প্রকল্প নিয়ে মালিতে কাজ সুরু করেছেন।

এই প্রকল্পটিকে সহর ও পল্লী অঞ্চল অনুযায়ী বিভক্ত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হ'ল মালির সরকারী কারখানাগুলির প্রায় ১0,000 কর্মীর উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো এবং প্রায় এক লক্ষ কৃষক যাঁরা সেগু অঞ্চলে তুলো ও ধানের চাষ করেন তাঁদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো। কৃষিক্ষেত্রে এবং কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে কি কি পদ্ধতি মালির কৃষক বা কর্ম্মীদের পক্ষে বিশেষ সুবিধেজনক হতে পারে, তা নির্দ্ধারণ করাই হ'ল এই কর্ম্মসূচীর লক্ষ্য। আধুনিক অর্থনীতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে হলে যে জ্ঞান দরকার তা সরবরাহ করে, এঁরা যাতে আস্তে আস্তে নিজেদের কাজ বিশ্লেষণ করে আধুনিক পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করতে শেখেন তাতে সাহায্য করাটাও অন্যতম উদ্দেশ্য।

কৃষি ক্ষেত্রে

প্রকল্পের কর্ম্মীরা পল্লী অঞ্চলে কৃষকদের আস্থা অর্জ্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। বাগুইনেডার সোকামো আবাদের কৃষি শ্রমিকরা প্রতিদিন দুই ঘন্টা ক'রে প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষাসূচী অনুযায়ী পাঠ গ্রহণ করেন এবং তার উপকারগুলি সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগান। কারণ তাঁরা আধুনিক কৃষি সম্পর্কে যে সব পদ্ধতি ও কৌশল শেখেন সেগুলি নিজেদের ক্ষেতে এবং সরকারী খামারে কাজে লাগান। সেগুতে একটি কাপড়ের কলের একজন কর্ম্মচারী বলেন যে "এই শিক্ষা বিস্তারের ফলে আমরা অনেকখানি লাভবান হয়েছি কারণ তুলোর চাষীরা এখন আমাদের প্রয়োজনের স্বরূপ পূর্ব্বের তুলনায় ভাল বোঝেন। বর্ত্তমানে তাঁরা মালির প্রধান ভাষা বাম্বারা পড়তে পারেন বলে, আমরা তাঁদের জন্য যে সব চাষ পদ্ধতি তৈরী করে দেই তা তাঁরা বুঝতে পারেন। তেমনি কিটা অঞ্চলে কৃষি সম্প্রসারণ কর্ম্মীরা, কৃষকদের চীনা বাদামের কৃষিতে আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করাতে সক্ষম হয়েছেন। এর ফলে ১৯৬৬-৬৭ সালে যেখানে ২৫,000 মেট্রিক টন চীনাবাদাম উৎপাদিত হয় সেই তুলনায় ১৯৬৮-৬৯ সালে উৎপাদিত হয় ৩৩,000 মেট্রিক টন। প্রাপ্তবয়স্কদের এই শিক্ষা-সূচী অনুযায়ী চাষীদের সামান্য কিছু অঙ্ক ও অন্যান্য বিষয় শেখানো হলেও তারা তাতেই সন্তুষ্ট নন। তাঁরা এখন সংখ্যার মারপ্যাচ বুঝতে শেখায় মনে করেন ক্রেতারা এখন আর তাদের ঠকাতে পারবেনা।

গিনি সীমান্তের কাছাকাছি একটি জায়গায় একজন চাষী একটা ব্ল্যাকবোর্ডে বড় বড় করে লিখে রেখেছিলেন, "বালা এখন চীনা বাদাম ওজনে ব্যস্ত।" তা দেখে আর একজন শিক্ষার্থী চাষী তার নীচে লিখে দেন যে "বিক্রী করার সময় ও আরও সতর্ক হয়ে ওজন করবে।" এদের কাছে সঠিক ভাবে ওজন করাটা একটা বড় সমস্যা তবে আজকাল এদের মধ্যে অনেকেই, এখানকার বাজারে প্রচলিত ফরাসী ও চীনা তৌলযন্ত্রের ব্যবহার এখন শিখে ফেলেছেন। তাঁদের কাছে মাপবার যন্ত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি যন্ত্র, কারণ এটি উপযুক্তভাবে ব্যবহার করলে ক্রেতারা তাঁদের ঠকাতে পারবেনা।

কারখানায়

প্রাপ্তবয়স্কদের এই শিক্ষা বিস্তার কর্ম-সূচী গ্রামে যতটা ফলপ্রদ হয়েছে, সহরে তেমন নয়। সহরের শিক্ষার্থীরাই এই শিক্ষাসূচী থেকে বিশেষ করে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ থেকে বেশী উপকৃত হচ্ছেন। কারখানার কাজকর্ম্ম সম্পর্কে বয়স্করা তাদের অভিজ্ঞতা বেশী কাজে লাগাতে পারেন। জাতীয় বিদ্যুৎ পর্ষতের একজন কর্ম্মচারী বলেন যে প্রাপ্তবয়স্কদের এই শিক্ষাসূচী যে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া যারা শিক্ষা গ্রহণ করছেন তারা কাজের বিভিন্ন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারছেন বলে তাদের মধ্যে একটা সংহতি ও গড়ে উঠছে। তিনি বলেন যে "এক বছর পূর্ব্বেও কোন শিক্ষানবীশকে কোন একটা যন্ত্রপাতি আনতে বললে, নামগুলি, পড়তে পারে এমন একজন লোককেও তার সঙ্গে পাঠাতে হত। কিন্তু এখন এরাই স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। ওরা এখন পড়তে শিখছে এবং আমরা কি চাই তা সঠিকভাবে বুঝতে শিখেছে।"

বিদ্যুৎ পর্ষত যখন শিক্ষিত কর্ম্মীর অভাব অনুভব করছিলেন ঠিক তখনই ইউনেস্কোর প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রশিক্ষণ প্রকল্প সম্পূর্ণ অশিক্ষিতকে সাক্ষর করে তোলায় এখন তাদের মধ্য থেকেও, দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য লোক পাওয়া যায়।

মালির কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রের সর্ব্বত্র এখন জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য যে আগ্রহ দেখা

যায়, তা যে শুধু ভালো চাকরি পাওয়ার জন্য তাই নয়। সম্প্রতি একটা অনুশীলনে কর্ম্মীদের কাছ থেকে যে উত্তর পাওয়া যায় তাতেই তা বোঝা যাবে। এখানে কর্ম্মীদের কতকগুলি উত্তর দেওয়া হচ্ছে :

"আমাকে যখন বলা হ'ত এত বস্তা সার নিয়ে এসো ; তখন আমার প্রায়ই ভুল হত, কারণ, হয়তো বস্তার সংখ্যা ভুলে যেতাম না হয়তো সারের নাম ভুলে যেতাম। এখন আমাকে যা করতে বলা হয় তা আমি লিখে নিয়ে যেতে পারি এবং লেবেলগুলিও পড়তে পারি। কাজেই এখন আর ভুল করিনা।—" একজন কৃষি কর্ম্মী।

—"এখানকার আবাদে আমাদের খুব সঠিকভাবে কাজ করতে হয়। বাগানের কোন অংশে চাষে কোন গোলমাল হলে, কে তার জন্য দায়ী তা নিয়ে আমাদের মধ্যে বাদানুবাদের সৃষ্টি হতো। এখন যে, যে জমিটুকু চাষ করে সেখানে সে তার নাম লিখে রাখে—"।—একটি সরকারী আবাদের একজন কর্ম্মী।

—"দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে আমার স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করেছেন। আমার প্রথম দুটি সন্তানের জন্ম তারিখ এখন আর আমার মনে নেই। কিন্তু এই নতুন সন্তানটির জন্ম তারিখ আমি লিখে রেখেছি।"—একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের একজন কর্ম্মী।

—"প্রাপ্ত বয়স্কদের এই শিক্ষা-সূচী অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পরিবারে আমার কোন কর্ত্তৃত্ব ছিলোনা। আমার নিজের ছেলেমেয়ে ভাইপো ভাইঝিরা স্কুলে যায় এবং লিখতে পড়তে পারে। এখন আমিও প্রায় তাদের মতই লিখতে পড়তে পারি এবং স্কুল থেকে যে সব অঙ্ক দেয় সেগুলি আমি করতে পারি, তার ফলে তারা—আমাকে সম্মান দেখায় এমন কি আমার প্রশংসা ও করে।"—একজন কারখানার কর্ম্মী।

(ইউনেস্কোর একটি প্রবন্ধ থেকে)

মীরগুণ্ডে রেশম গুটীর চাষ

রেশম গুটীর চাষের জন্য কাশ্মীরের মীরগুণ্ডে ১৩ বছর আগে একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। ২০০ একর জমি নিয়ে ঐ কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। কেন্দ্রের মোট জমির চার ভাগের তিনভাগে তুঁতের চাষ করা হয়। এই কেন্দ্রটিতে তিনটি অংশ আছে।

এখানে পী. থ্রী. ও পী. টু. জাতের গুটীর চাষ হয়, নতুন প্রজাতি সৃষ্টি ও লালন করা হয় এবং গুটী চাষের সঙ্গে সঙ্গে তুঁতের চাষও করা হয়। রেশম পোকার বংশবৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় পরিমাণে গুটী যোগান দেওয়া কেন্দ্রের প্রধান কাজ।

১৯৬৯ সালে পী. টু. জাতির ডিম সংগ্রহের লক্ষ্য মাত্রা ধার্য করা হয় ১৫,০০০ কিন্তু ডিমের প্রকৃত সংখ্যা শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়ায় ২৪,০০০। এক আউন্স পরিমাণ ডিম থেকে ১৯৬৫ সালে ৬০ কে. জি. ও ১৯৬৯ সালে ৯৩.২৫৭ কে. জি. গুটী পাওয়া যায়। এ ছাড়া মীরগুণ্ড কেন্দ্র ব্যবসায়িক দিক থেকে, উন্নত শ্রেণীর ৯টি প্রজাতিকে সর্ব প্রকার আবহাওয়ায় সহনশীল ক'রে তোলে। ঐ প্রজাতি-গুলি যাতে গবেষণাগারে বিশ্লেষণের প্রতিক্রিয়া সমেত সর্বপ্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে সেই রকমভাবে তৈরি করা হয়। যে সব রাজ্যে গুটীপোকার চাষ হয়, সেই সব রাজ্যে, সেন্ট্রাল সিল্ক বোর্ডের মাধ্যমে, এই ৯টি প্রজাতির মধ্যে চার রকমের রেশম কীট পাঠানো হয়।

পী. ওয়ান. স্টেশন স্থাপিত হয় ১৯৬২-তে। এই কেন্দ্রে পী. টু. (গ্র্যাণ্ড পেরেন্ট জাতের অর্থাৎ যে পোকা থেকে গুটী চাষের জন্য ডিম সংগ্রহ করা হয়) ডিম লালন ক'রে তার থেকে পী. ওয়ান. শ্রেণীর ডিম চাষ করা হয়। স্টেশনটি ছোট ছোট আরও চারটি ইউনিটে ভাগ করা। এর তিনটি মীরগুণ্ডায়, চতুর্থটি টাংমার্গে। ১৯৬৮ সালে এই স্টেশনে ৪৭৭২ আউন্স পী. ওয়ান. জাতের ডিম নিয়ে কাজ শুরু করা হয়। ঐ বছরে এক আউন্স ডিম থেকে যে গুটী পাওয়া যেত, তার পরিমাণ ছিল ৩০.৫০০।

মীরগুণ্ড স্টেশনের তৃতীয় ইউনিটটি হ'ল তুঁতের বাগান। বাগানের আয়তন হবে ১৫০ একর। এখন এইটি দেশের উন্নত তুঁত বাগিচার মধ্যে অন্যতম। গত পাঁচ বছরে তুঁত পাতার ফলনের পরিমাণ ৭০ গুণ বেড়েছে। একর প্রতি পাতার উৎপাদন ১১৭.৬০ পাউণ্ড থেকে বেড়ে ৮২৩২ পাউণ্ড হয়েছে। গাছের নতুন পরিচর্যা পদ্ধতি এবং সার প্রভৃতি ব্যবহারের ফলে এখন একর প্রতি পাতা পাওয়া যাবে ২৫০০০ পাউণ্ডের মত।

বাইরে থেকে আমদানী করা রেশম কীটের ডিমের ওপর জম্মু ও কাশ্মীরকে যাতে নির্ভর ক'রে বসে থাকতে না হয় সেজন্য ঐ কেন্দ্রটির স্থাপনা। মীরগুণ্ড কেন্দ্র ও সমশ্রেণীভুক্ত অন্যান্য কেন্দ্রগুলির উন্নতি বিধানের ফলে জম্মু কাশ্মীরের রেশম শিল্প আবার অতীত গৌরব ফিরে পাবে বলে আশা করা অযৌক্তিক হবে না।

পরিকল্পনা ও সম

হীরাকুদ বাঁধ সম্বলপুরকে প্রথম সারির ধানউৎপাদনকারী জেলায় পরিণত করেছে

ওড়িষ্যার হাজার হাজার কৃষক একদা মহানদীর খামখেয়ালীতে উত্যক্ত হয়ে ভাবতেন একে কি শাসন করা যাবনা? একটি শান্ত স্রোতস্বিনীতে পরিণত করা যাবনা? সেই মহানদীকে একটি সুখ সমৃদ্ধিদায়িনী স্রোতস্বিনীতে পরিণত করার স্বপ্ন আজ সফল করে তোলা হয়েছে হীরাকুদ বাঁধ তৈরী ক'রে। (নীচে ছবি)

এই স্বপ্ন সফল হয়ে ওঠায় সম্বলপুর জেলাটি এখন নতুন রূপ নিয়েছে। জেলার সর্ব্বত্র দেখতে পাওয়া যায় সবুজ ধানের ক্ষেত। পূর্ব্বের তুলনায় এখন কৃষকরা অনেক বেশী ফসল তুলছেন। পূর্ব্বে যেখানে বর্ষার অনিশ্চয়তার ওপর নির্ভর ক'রে কৃষকরা কেবলমাত্র একটি ধানের ফসল পেতেন এখন হীরাকুদ খাল ও তার বহু শাখা থেকে সারা বছর ধরে সেচের জল পাচ্ছেন ব'লে বছরে দুটো এমন কি তিনটে পর্য্যন্ত ফসল পাচ্ছেন।

যে সব জায়গা একসময়ে ছিল ঊষর ও পতিত সেখানে এখন প্রচুর ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। সম্বলপুর জেলাকে ভারতের প্রথম সারির ধান উৎপাদনকারী জেলাগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অসংখ্য ছোট বড় কৃষক ও সম্প্রসারণ কর্মী হাতে হাত মিলিয়ে যে বিপুল পরিশ্রম করেছেন তাঁরাও এই সাফল্যের অংশীদার, তাঁরাও প্রশংসা পাবার অধিকারী।

সাফল্যের অগ্রগতি নিরূপণের মাপকাঠি অনেক রকম হ'তে পারে। যেমন কী পরিমাণ সার ব্যবহৃত হয়েছে তা দিয়ে কৃষির অগ্রগতির হার নিরূপণ করা যায়। ১৯৬০-৬১ সালে যেখানে মাত্র এক হাজার মেট্রিক টন রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হয়েছিল, গত বছর পর্য্যন্ত সেই পরিমাণ ৪০ গুণ বেড়ে ৪০,০০০ টনে দাঁড়ায়।

এ্যামোনিয়াম ফসফেট, ডায়ামোনিয়াম ফসফেট, ট্রিপল্ সুপার ফসফেট এবং ইউরিয়ার মত মিশ্রিত সারও সাধারণ কৃষকরা যে পরিমাণে ব্যবহার করেছেন তাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। আর একটা বিষয়ও সম্বলপুরের সাধারণ কৃষকদের কারিগরী যোগ্যতার প্রমাণ দেয়। তা হল; নাইট্রোজেন ও ফসফেটযুক্ত সার প্রায় সমান অনুপাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

এরই সঙ্গে নিয়মিতভাবে শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কৃষিভূমির পরিমাণ দ্বিগুণ বেড়ে ১,১০,০০০ একরে দাঁড়িয়েছে, শোধিত বীজের ব্যবহার ৪৪ মেট্রিক টন থেকে বহু গুণ বেড়ে, ২,০০০ টনে দাঁড়িয়েছে, কৃষির জন্য ঋণ মঞ্জুরির পরিমাণ ৫১ লক্ষ টাকা থেকে তিনগুণ বেড়ে ১৬৬ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায় এবং মাটির নমুনা পরীক্ষার সংখ্যাও দ্বিগুণ বেড়ে গিয়ে ১৪ হাজারে দাঁড়িয়েছে।

এই পরিসংখ্যাণগুলি খুবই উৎসাহজনক সন্দেহ নেই কিন্তু শুধু এগুলি থেকে সম্পূর্ণ অবস্থা জানা সম্ভবপর নয়।

অনেকেই হয়তো জানেন না যে দেশের মধ্যে সম্বলপুর জেলাতেই সর্ব্বপ্রথম ব্যাপক ভিত্তিতে নব উদ্ভাবিত অধিক ফলনের তাইচুং-নেটিভ-১ ধানের চাষ করা হয়। তারপর থেকে এই ধানের চাষের পরিমাণ বেড়েই চলেছে।

বর্ত্তমানে সম্বলপুর জেলার কৃষকরা অন্ততঃপক্ষে ধান চাষের ক্ষেত্রে পদ্মা, আই আর-৮ এবং তাইচুং নেটিভ-১এর মতো পরীক্ষিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধানবীজ ছাড়া অন্য ধানের চাষ করতে রাজি নন।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে কমলসিঙ্গা গ্রামের রামচন্দ্র রাও তাঁর সমগ্র ২০ একর জমিতেই দুটি ধানের ফসল ফলান, আর তার চাইতেও বড় কথা হ'ল তিনি কেবলমাত্র পদ্মা, তাইচুং এবং আই আর-৮ এই তিনটি, বেশী ফলনের ধানেরই চাষ করেন।

এই তিন রকমের ধান থেকেই তিনি একর প্রতি ১৪৮০ কি: গ্রাম ক'রে ফসল পান বলে তাতেই তিনি সন্তুষ্ট। তাছাড়া তিনি নিয়মিতভাবে কীটনাশক ছড়ান বলে তাঁর শস্যক্ষেত্রে পোকা মাকড়েরও উপদ্রব নেই।

১২ পৃষ্ঠায় দেখুন

উৎপাদক ও ব্যবহারকারী উভয়কেই সাহায্য করে

নিম্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষণ

অনুমান করা হয় যে আমাদের দেশে ফল, শাক, সব্জি মাছ, দুধ এবং ডিমসহ পচনশীল পদার্থগুলির শতকরা ১৫ থেকে ২৫ ভাগ নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া ফল শাক সব্জি মরসুম অনুযায়ী হয় বলে এবং সহজেই নষ্ট হয় বলে উৎপাদকরা অনেক সময় অল্প মূল্যে বিক্রী করতে বাধ্য হন। পচনশীল জিনিসগুলির মূল্যের কোন স্থিরতা থাকেনা বলে উৎপাদক এবং ব্যবহারকারী উভয়েই অসুবিধে ভোগ করেন। কিন্তু দেশের অনেক জায়গাতেই এখন ঠাণ্ডা গুদামের সুবিধে পাওয়া যায় এবং এই রকম গুদামে ফল শাকসব্জি ইত্যাদি রেখে, বাজার দেখে বিক্রী করাটা যে বেশ লাভজনক তা প্রমাণিত হয়েছে।

জাতীয় অর্থনীতিতে ঠাণ্ডা গুদামে সংরক্ষণ ব্যবস্থাটা এত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান হয়ে দাঁড়িয়েছে যে সরকার ব্যাঙ্কগুলিকে একটা নির্দ্দেশ দিতে বাধ্য হয়েছেন। এর ফলে ভারতের ষ্টেট ব্যাঙ্কের মতো বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি, ঠাণ্ডা গুদামে ফল, শাকসব্জি ইত্যাদি সংরক্ষণে উৎসাহী ব্যক্তিদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ঋণের সুযোগ সুবিধেগুলি বাড়িয়ে দিয়েছে।

আলু

গত কয়েকবছর যাবৎ উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের আলু উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলিতে বীজ আলু সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে ঠাণ্ডা গুদামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে ১৯৪৫ সালেই ভোলটাস্, উত্তরপ্রদেশে, বীজ আলুর জন্য সর্ব্বপ্রথম ঠাণ্ডা গুদাম তৈরী করেন। মরসুমের সময় প্রতি কুইন্টাল বীজ আলুর দাম যেখানে থাকে ৪ টাকা অন্য সময়ে তার দাম হয় প্রতি কুইনট্যাল ২০ টাকা। কাজেই ঠাণ্ডা গুদামে আলু সংরক্ষণ করা বিশেষ লাভজনক একটা ব্যবসায়। এর চাইতে বড় কথা হ'ল গুদাম তৈরী করা ইত্যাদির ব্যয় দুই তিন বছরের মধ্যেই উঠে আসে।

২০ সেন্টিগ্রেডে আলু সংরক্ষণ করা যায় এবং এই রকমভাবে ছয়মাস পর্যন্ত রাখা যায়। পশ্চিমবঙ্গ গুদাম নির্ম্মাণ কর্পোরেশনের, আলুর ঠাণ্ডা গুদামের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বপ্রধান আলু উৎপাদনকারী অঞ্চল তারকেশ্বরে এই গুদামটি তৈরী করা হয়েছে। ২,৭০১ মেট্রিক টন বীজ আলু যাতে সংরক্ষণ করে কৃষকদের উপকার করা যায় সেই উদ্দেশ্যেই এটি তৈরি করা হয়। এখন একটি ভারতের অন্যতম বিখ্যাত গুদাম।

শতকরা ৮৫ থেকে ৯০ ভাগ আর্দ্রতায় এবং ০° থেকে ১১° তাপমাত্রায় এই রকম ঠাণ্ডা গুদামে ফল ও শাক সব্জি ২২ থেকে ৭০ দিন পর্যন্ত টাটকা রাখা হয়।

দুধ

প্রতিদিন দুধ আমাদের দেশে উৎপাদিত হয় তার শতকরা দশভাগই নষ্ট হয়ে যায়।

১০° সেন্টিগ্রেডের বেশী তাপমাত্রায় দুধ যদি বেশীক্ষণ রেখে দেওয়া যায় তাহলে দুধের মধ্যে যে বীজানু থাকে তা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। নানা জায়গা থেকে দুধ সংগ্রহ করে, সেগুলি বীজানুমুক্ত করে অন্যান্য জিনিস তৈরী করার জন্য কোন কেন্দ্রে পাঠাতে যথেষ্ট সময় লাগে বলে, বেশী সময়েরর জন্য দুধ টাট্কা রাখার উদ্দেশ্যে গরু বা মহিষের দুধ দুইয়ে নিয়েই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা ঠাণ্ডা করা উচিত। তখনই দুধকে ৪.৪° সেন্টিগ্রেড বা তারও কম মাত্রায় ঠাণ্ডা করে ব্যবহারের পূর্ব্ব পর্যন্ত ঐ রকম ঠাণ্ডাই রাখতে হয়।

দুধ যদিও অত্যন্ত তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যায়, তবুও যদি উপযুক্তভাবে তা ঠাণ্ডা রাখা যায় তাহলে দুধ দুইয়ে তা ১৫ দিন বা তার বেশী সময় পর্যন্ত টাটকা রাখা যায়।

এই শতাব্দির চল্লিশ দশকের গোড়া থেকেই ভোলটাস্ এই দেশে দুধকে বীজানুমুক্ত করার কাজ এবং ঠাণ্ডা গুদাম ইত্যাদি তৈরি করার কাজ সুরু করেন। তার পর থেকে তাঁরা মাখন, পনীর, দুধ এবং বিস্কুট ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য অনেক ঠাণ্ডা গুদাম স্থাপন করেছেন।

নানা ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে নানা রকম পদ্ধতিতে জমাট খাদ্য তৈরি করা হয়। তবে স্বল্পতম ব্যয়ে ও স্বল্পতম সময়ে যে সব পদ্ধতিতে কোন জিনিস প্রয়োজনীয় তাপমাত্রায় সংরক্ষিত করা যায়, সেই পদ্ধতিটাই সাধারণতঃ সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়।

দৃষ্টান্ত হিসেবে প্লেট ফ্রিজারের কথা উল্লেখ করা যায়। এটা হল ইনসুলেট করা সাধারণ একটি আলমারির মত জিনিস। এতে সোজা সোজা কতকগুলি খোপ আছে। এই খোপে প্লেটগুলির ওপরে জিনিস রেখে ঠাণ্ডা করা যায়। জিনিসগুলি বের করতে বা রাখতে যাতে সুবিধে হয় সেজন্য সেগুলি সামনে টেনে এনে আবার বন্ধ করা যায়।

শেষাংশ অপর পৃষ্ঠায়

তাড়াতাড়ি জমাট করার অর্থ হল পচনশীল পদার্থগুলিকে দ্রুতগতিতে ৪০° থেকে ৪৫° সেন্টিগ্রেডে জমানো। এই রকমভাবে ঠাণ্ডা করা হ'লে সেগুলি যখন আবার রান্না করে খাওয়া হয় তখন তা টাটকা জিনসের মতোই মনে হয়। এই-রকমভাবে ঠাণ্ডা করা খাওয়ার জিনিস পরে আবার ২৫ থেকে ১৮° সেন্টিগ্রেড তাপ মাত্রায় সংরক্ষণ করা যায়।

বর্ত্তমান শতাব্দির চল্লিশ দশকের শেষের দিকে বিভিন্ন জিনিস তাড়াতাড়ি জমাট বাধানোর জন্য বোম্বাইতে পরীক্ষামূলক যে কারখানা স্থাপন করা হয় তাই হল মাছ জমাট করার ভারতের প্রথম কারখানা।

সমুদ্রজাত খাদ্য খুব তাড়াতাড়ি জমাট করার ব্যবস্থা করায়, বিশেষ করে কেরালার সমুদ্রজাত খাদ্য দ্রব্যাদির রপ্তানী, বেড়ে গিয়ে ১৯৬৮ সালে তা ২২.০৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। সমুদ্রজাত খাদ্য রপ্তানী করার জন্য আমাদের দেশে ৮২টি রপ্তানীকারী প্রতিষ্ঠান আছে তার মধ্যে শতকরা ৯০ টিই হ'ল কেরালায়।

এরপর বাঙ্গালোর, কালিকট এবং কোচিনে এই রকম তিনটি প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়। এগুলিতে ৪ ইঞ্চি পুরু পর্যন্ত মাছের টুকরো জমাট বাধানো যায়।

মাংস এই রকমভাবে ঠাণ্ডা করার জন্য বোম্বাইতে, ভারতীয় সৈন্য বিভাগের গ্যারিসন ইঞ্জিনীয়ারের জন্য সর্ব্ব প্রথম বড় ধরণের (২০০০ টন ক্ষমতার) প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়। ১৯৪৩-৪৪ সাল থেকে এটি এখন পর্যন্ত চালু রয়েছে।

হলদিয়া বন্দরে নতুন ডক

কলকাতা বন্দরের উন্নয়নের জন্য হলদিয়ায় একটি পরিপূরক ডক তৈরী হচ্ছে। ১৯৭১ সাল নাগাদ হলদিয়ার নতুন ডকটি চালু হবে বলে আশা করা যায়। এই ডকের জন্য লৌহ আকর এবং কয়লা বোম্বাইয়ের প্ল্যান্ট সরবরাহের বরাত দেওয়া হয়েছে। নদীর মোহানার গভীরতা ও প্রস্থ বাড়াবার উদ্দেশ্যে মাটি কাটার জন্য একটি নতুন ড্রেজার কেনার প্রস্তাব বিবেচনাধীন রয়েছে। তৈলবাহী ট্যাঙ্ক ভেড়বার উপযোগী একটি 'অয়েল জেটি' ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে।

পরিকল্পনা ও সমীক্ষা

১০ পৃষ্ঠার পর

পদ্মা ধানের চাষে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন তাতে তিনি দেখেছেন যে এই ধান যে কেবল তাইচুং নেটিভ-১ এবং আই. আর-৮ থেকে তাড়াতাড়ি পাকে তাই নয় এগুলি থেকে অনেক বেশী পরিমাণ মাঝারি সরু চাল পাওয়া যায়।

গত বছরেই তিনি সর্ব্বপ্রথম পদ্মা ধানের বীজ ব্যবহার করেন এবং দেখতে পান যে এগুলি তাইচুং থেকে ৮।১০ দিন আগে এবং আই আর-৮ থেকে ১৫ দিন আগে পাকে। তিনি এই বছর থেকে তাঁর সমস্ত জমিতেই পদ্মা ধানের চাষ করবেন বলে স্থির করেছেন।

বড়গড় তালুকের আনন্দ রাও, ইতিমধ্যেই বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছেন। জানুয়ারি থেকে মে মাসের খন্দে তিনি তাঁর সমগ্র ৬০ একর জমিতেই পদ্মা ধানের চাষ করছেন। সম্বলপুর জেলায়, এমন কি সমগ্র ওড়িষ্যাতেও বোধ হয় আর কেউ তাঁর সম্পূর্ণ জমিতে এই রকমভাবে পদ্মা ধানের চাষ করেননি।

ধান-উৎপাদন যদিও আমাদের মনোযোগ বেশী আকর্ষণ করে তবুও কেবলমাত্র ধানের ক্ষেত্রেই অগ্রগতি সীমাবদ্ধ নয় (ওড়িষ্যা ধানের আদি বাসভূমি বলেই অবশ্য ওড়িষ্যাতে ধানচাষের অগ্রগতি সম্পর্কে আমরা বেশী আগ্রহশীল)। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় গোবিন্দপুর ব্লকের বামফাই গ্রামের প্যাটেল ভ্রাতৃত্রয়, আলুচাষে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেছেন। ২১ বছর বয়স্ক কাহিতান প্যাটেল, তাঁর কুফরি আলুর ক্ষেত থেকে প্রতি একরে ১৮৮ কুইন্ট্যাল আলু পান এবং তাতে তিনি গত বছরে ঐ ব্লক থেকে প্রথম পুরস্কার পান। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা ৩০ বছর বয়স্ক অর্জ্জন মোহন প্যাটেল প্রতি একরে ১৪৮ কুইন্ট্যাল আলু ফলিয়ে দ্বিতীয় পুরস্কার পান। তৃতীয় ভ্রাতা ভীমশেঠ প্যাটেল, তার পূর্ব্ববছরে, রাজ্যের রাজধানী ভুবনেশ্বরে উৎকল ফুল ও শাকসব্জি প্রদর্শনীতে দ্বিতীয় পুরস্কার পান।

কিন্তু আলু উৎপাদনে পুরস্কার লাভ করাটাই তাঁদের একমাত্র সাফল্য নয়। অবশ্য এই পুরস্কারগুলি পাওয়ায় প্যাটেল ভ্রাতারা একটি নতুন মোটর সাইকেল কিনেছেন এবং বেশ বড় একখানা বাড়ী তৈরী করছেন (সম্ভবতঃ আলুর গুদাম করার জন্য)।

অর্জ্জন মোহন দুই একর জমিতে মেক্সিকো গম "সফেদ লার্মার" চাষ ক'রে প্রতি একরে ২৪ কুইন্ট্যাল ক'রে ফসল পান। লুধিয়ানার গম চাষীও এই রকম ফসল পেলে আনন্দে উৎফুল্ল হতেন।

এঁরা এবং এঁদের মতো আরও অনেকে, পনেরো বছরের কম সময়ের মধ্যেই সম্বলপুরের কৃষক সমাজের বহুদিনের এক স্বপ্ন সফল ক'রে তুলতে সাহায্য করছেন।

অলক ঘোষ

৫ পৃষ্ঠার পর

মঞ্জুরীর মতোই এ কথাটা মনে রাখতে হবে। ব্যাঙ্কগুলির সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটা ব্যাপকতর পরিপ্রেক্ষিতে দেখা উচিত। এটার অর্থ কেবলমাত্র "বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলির নিয়ন্ত্রণ" হওয়া উচিত নয়। বড় বড় বেসরকারী ব্যবসাগুলিও প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ষ্টেট ব্যাঙ্ক, এবং সমবায় ব্যাঙ্কগুলিও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত। আস্তে আস্তে ব্যাঙ্ক বহির্ভূত অন্তর্বর্তী আর্থিক সংস্থাগুলিও একটা ব্যাপক ঋণ নিয়ন্ত্রণ ও ঋণ পরিকল্পনা ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত করা উচিত। সম্পূর্ণভাবে 'রাষ্ট্রীয়করণের কোন কর্ম্মসূচী ছাড়া এগুলি করা সম্ভব নয়।

ভারতের ঋণ মঞ্জুরির সুষ্ঠু ব্যবস্থা এবং ব্যাঙ্কগুলির ওপর প্রকৃত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অর্জ্জন করতে হলে, তার প্রথম সর্ত হওয়া উচিত ঋণদানকারী সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির রাষ্ট্রীয়করণ। কিন্তু ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা অবিলম্বে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়তো সম্ভবপর নয়। সুতরাং বেছে বেছে কতকগুলি ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি কোন কর্মসূচী গ্রহণ করার পরিবর্ত্তে আমাদের একটু অপেক্ষা করে তার জন্য উপযুক্ত ভিত্তি তৈরী করা উচিত।

সংরক্ষণের জন্যে

কাঁচা শাকসব্জী ও ফলমূল শুকোবার ঘরোয়া পদ্ধতি

ফলমূল শাকসব্জী সংরক্ষণের নানা পদ্ধতি আছে, যার মধ্যে আচার, চাটনী, মোরব্বা প্রভৃতি বাঙালী গৃহস্থ বধূদের কাছে খুবই পরিচিত। কিন্তু এইসব পদ্ধতিতে কাঁচা ফলমূল বা শাকসব্জী এমনভাবে রাখা যায় না যাতে সেগুলি কাঁচা বা রেঁধে খাওয়া যায়। কাঁচা শাকসব্জী যদি শুকনো ফলের মত সংরক্ষিত অবস্থায় রাখা যায় তাহলে বছরের সব সময়েই সেগুলি রাঁধা যেতে পারে। বছরের এক একটা সময়ে এক একটা সব্জী খুব পাওয়া যায় আবার অন্য সময়ে সেগুলো বাজারে থাকে না। দ্বিতীয়তঃ গ্রীষ্মের সময়ে শাকসব্জীর বাজার খালিই থাকে। সে সময়ে রান্নার জন্য পদ স্থির করা গৃহস্থ বধূদের পক্ষে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্যার সুরাহা হিসেবে পশ্চিম বঙ্গের কৃষি বিভাগের বিপণি শাখা, শাকসব্জী ও ফল সংরক্ষণের একটা সহজ পদ্ধতির বহুল প্রচারে উদ্যোগী হয়েছে। এই পদ্ধতি আর কিছুই নয়; টাটকা শাকসব্জী ও পাকা ফল শুকিয়ে রাখা। ঠিকমত শুকিয়ে নিতে পারলে শাকসব্জীর গুণ নষ্ট হবে না এমন কি কাঁচা অবস্থার চেহারা ও স্বাদও থাকবে।

ফল মূল সব্জী প্রভৃতি শুকোবার তিনটি, পদ্ধতি আছে, (১) রোদে শুকোনো, (২) তাপে শুকোনো ও (৩) যন্ত্রের সাহায্য শুকোনো। এই তিনটির যে কোনোটি থেকে সম্পূর্ণ ফল পেতে হ'লে কয়েকটি নিয়ম অবশ্যই মেনে চলা দরকার। সেই নিয়মগুলি হ'ল (১) শুকোবার আগে সব্জী বা ফল ধুয়ে পরিষ্কার করে জল শুকিয়ে নেওয়া উচিত। (২) সব্জী বা ফল সুপুষ্ট অথচ শক্ত হওয়া দরকার। (৩) ফল বা শাকসব্জী সকালের দিকে পেড়ে বা তুলে, ধুয়ে, ৬ ঘন্টার মধ্যে শুকিয়ে নেওয়া উচিত।

কিছু কিছু সব্জী বা ফল আস্ত শুকোনো হয়; শাক আস্তই শুকোতে হয়। সব্জী বা ফল আকারে বড় হ'লে তার খোসা ছাড়িয়ে, বীচি ফেলে, কেটে বা নুন মাখিয়ে নিতে হয়। কাটা টুকরো পাৎলা (১/৮ ইঞ্চি—১/৪ ইঞ্চি পুরু), লম্বা, ফালা ফালা হ'লে তাড়াতাড়ি শুকোয় এবং তাড়াতাড়ি শুকোলে তার নিজস্ব স্বাদ গন্ধ বেশী বজায় থাকে।

সব্জী বা ফল কাটার সময়ে, অনেক ক্ষেত্রে কষের দাগ পড়ে যায়। গৃহস্থ পরিবারের বঁটিতে কাটার দরুণ এ ব্যাপারটা প্রায়ই নজরে পড়ে। এটা এড়াবার উপায় যে (নুন মেশানো জলে সেরখানেক জলে ব৬ চামচের তিন চামচ নুন) এগুলি ধুয়ে নেওয়া এ সব বাঙ্গালী বধুই জানেন। তবে স্টেনলেস ষ্টিলের ছুরীতে কাটলে দাগ পড়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকে।

শাকসব্জী শুকোবার আগে একটু ভাপিয়ে নিতে হয় এবং ফলমূলে গন্ধকের ধোঁয়া খাওয়াতে হয়। ভাপানোর সবচেয়ে সহজ পন্থা, ফুটন্ত অবস্থায় বেশ খানিকটা জলে সব্জীর টুকরো গুলো নেড়ে চেড়ে নেওয়া আর তা না হ'লে উনুনে রাখা ফুটন্ত জলের পাত্রের ওপর সব্জীর টুকরোগুলি কাপড়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা।

ভাপিয়ে নেওয়ার পর সেগুলিকে কাঠের কানাঅলা তারের ট্রেতে ঢেলে দিতে হবে। ট্রের ওপরে একটা মশারীর কাপড়ের মত জালী কাপড়ের ঢাকা থাকলে ভালো। ট্রেটি মেঝে থেকে অন্ততঃ চার ইঞ্চি উচুতে রাখা দরকার, তাহলে জল সহজে ঝরে বেড়িয়ে যেতে পারবে।

ফলমূলে গন্ধকের ধোঁয়া লাগানোর পদ্ধতিও কঠিন নয়। ধোঁয়া লাগানোর জন্য একটা বন্ধ বাক্সই সবচেয়ে ভালো। তা নয় তো একটা বন্ধ ঘরেও এটা সম্ভব হ'তে পারে। প্রক্রিয়াটি হল সামান্য একটি টিনের পাত্রে গন্ধক জ্বালিয়ে তার ওপর ফলের ট্রেগুলি রাখতে হবে। ফলে, গন্ধকের ধোঁয়া আধঘন্টা এক ঘন্টা লাগা দরকার। তারপর ভালো করে নাক ঢেকে ট্রেগুলো সরিয়ে নিতে হবে। ট্রে সরাবার সময়ে খুব সাবধান হওয়া দরকার। গন্ধকের ধোঁয়া বিষাক্ত, নিশ্বাসের সঙ্গে চলে যাওয়া মারাত্মক। দ্বিতীয় কথা, গন্ধকের ধোঁয়া লাগাবার সময়ে কাঠের ট্রে ছাড়া অন্য ধাতব কোনও পাত্র যেন একেবারে ব্যবহার করা না হয়।

এর পরের পর্যায় হ'ল শুকানো। রোদে শুকানো সবচেয়ে সহজ, সরল ও সুলভ পদ্ধতি। রোদে শুকোতে হ'লে ভাপানো বা গন্ধক লাগানো সব্জী বা ফল একটা কাঠের ট্রেতে অল্প পরিমাণ ছড়িয়ে দিতে হ'বে। যাতে গায়ে গায়ে বা একটার ওপর একটা লেগে না থাকে। এই ট্রেগুলি প্রথম দিনে ভোরের দিকেই রোদে দিতে হবে এবং প্রতি দু'ঘন্টা অন্তর কাটা টুকরোগুলো উলটে দিতে হবে। দ্বিতীয় দিন থেকে দিনে দু'বার উলটে দেওয়াই যথেষ্ট হ'বে। পুরো শুকোতে দুই থেকে পাঁচদিন সময় লাগে। ট্রেগুলি সূর্য্যাস্তের ঠিক আগে ঘরে তুলে আনতে হয়।

উনুনে শুকোনোর পদ্ধতি দ্রুত শুকোবার পক্ষে প্রকৃষ্ট। এই পদ্ধতিতে ফল বা সব্জীর টুকরোগুলি ট্রেতে বা পেটে রেখে ১৪০°—১৫০ ডিগ্রী ফাঃ তাপে পাঁচ মিনিট সেঁকে নিয়ে ১৫ মিনিট ফ্যানের হাওয়ায় ঠাণ্ডা করে নিতে হ'বে। কাটা ফল বা সব্জী উনুনের তাপে শুকোবার সময় একটা স্তর বা 'লেয়ারে' শুকোতে হ'বে। এই প্রক্রিয়ায় বারবার সেঁকে ও ঠাণ্ডা করে অতি অল্প সময়ে এগুলি শুকিয়ে নেওয়া যায়। উনুনের তাপে শুকোবার সময়েও সেদিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি না রাখলে ফল বা সব্জী পুড়ে যেতে পারে। তৃতীয় পদ্ধতি হ'ল যন্ত্রের সাহায্যে শুকানো। তা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

শুকোনো হয়ে গেলে, শুকনো ফল বা সব্জী ঘরের তাপে ঠাণ্ডা করে খটখটে শুকনো ও পরিষ্কার পাত্রে ভরে রাখতে হ'বে।

সংরক্ষণ পরিকল্পনা সমাজ বিকাশের অপরিহার্য অঙ্গ

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

একটা দেশের গোটা অর্থনৈতিক অবস্থাকে সুদৃঢ় করে তোলবার জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা সফল করে তোলা অত্যাবশক, সন্দেহ নেই। স্বল্পোন্নত দেশসমূহের, উন্নতির পথে উত্তরণের একমাত্র উপায় হ'ল এই পরিকল্পনা। কিন্তু কি ধরণের পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে একটি স্বল্পোন্নত দেশের সমাজ, বিকাশ লাভ করতে পারে, সে কথা সুস্থভাবে চিন্তা না করে বৃহত্তর পরিকল্পনার ঝুঁকি নিয়ে প্রভূত শ্রম ও অর্থ বিনিয়োগ অনুচিত বলেই মনে হয়। যদিও আমরা মনে করি যে স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সব সময়ই উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপ লাভ করে তথাপি তার ফলাফল সবসময়েই সমাজের অনুকূলে হয় না। পরিকল্পনার লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক হলেও সমাজের একটি অংশ হয়তো বেশী লাভবান হয়, অন্য অংশ পূর্ব্বাবস্থাতেই থেকে যায়। কর্তব্য কি ?

কর্তব্য অনুমান করা শক্ত নয়। কাছের বস্তুকে সর্বাগ্রে বিবেচনা করে তবেই দূরলক্ষ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত এবং তাও হঠাৎ নয়। ধীরে ধীরে ধাপে ধাপেই লক্ষ্যে পৌছুনোর জন্য চেষ্টা করতে হবে। এবং সংরক্ষণ পরিকল্পনাই উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রাথমিক স্তর হওয়া উচিত।

অবশ্য এ কথা শুনলে পৃথিবীর ধনতন্ত্রী সমাজ হয়তো উপহাস করবেন। অবশ্যই এ ধরণের মতবাদের মধ্যে কোন রকম যথার্থ খুঁজে পাবেন না। ১৯২৯—এর সোভিয়েত পরিকল্পনা এই কারণেই ধনতন্ত্রী অর্থনীতিবিদদের সমালোচনার লক্ষ্য হয়েছিল।

ধনতন্ত্রী পরিকল্পনা আপাতদৃষ্টিতে সার্থক মনে হলেও আসলে তা অপচয়েরই পরিকল্পনা কিন্তু যে পরিকল্পনায় গোটা সমাজ লাভবান হয়—ধনী দরিদ্রের বৈষম্য নষ্ট হয় তাই—ই হ'ল সত্যিকারের সৃষ্টিমূলক পরিকল্পনা। এতে সমাজের আভ্যন্তরীন বিরোধ অপসারিত হয় এবং বিকাশ তরান্বিত হয়।

পরিকল্পনাকে যদি প্রকৃতই সৃষ্টিমূলক পরিকল্পনায় রূপ দিতে হয় তাহলে উন্নয়ন পরিকল্পনার আগে সংরক্ষণ পরিকল্পনার বিষয়েই সচেতন হতে হবে বলে আমার মনে হয়। কেননা কেবল সৃষ্টি করলেই তো চলবে না সৃষ্ট বস্তুকে সংরক্ষণ অর্থাৎ পালন না করলে সৃষ্টির কার্যকারিতা কি থাকবে ? সৃজনীশক্তির সঙ্গে পালন শক্তিও সুদৃঢ় হলে গোটা সমাজে একটি সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমার ধারণা।

এতদিনকার পঙ্গু আর্থিকজীবনকে পরিকল্পনার সাহায্য পুনরুজ্জীবিত করে তুলবার প্রচেষ্টা, ভারতবর্ষের গোটা অর্থনৈতিক চেহারা বদলে দেবে আশা করা যেতে পারে। কিন্তু কি ভাবে? বলা বাহুল্য, মিশ আর্থিক ব্যবস্থা ও আর্থিক পরিকল্পনায়, শ্রেণীস্বার্থ ও প্রাধান্য অক্ষুন্ন থাকছে বলেই আমাদের দেশের শিল্পপতিরা উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় এত উৎসাহবোধ করেন।

কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করছে যে, শুধুমাত্র উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা কখনও একটি দেশের গোটা সমাজকে স্পর্শ করতে পারে না। যদিও অঙ্ক ও তথ্য দ্বারা পরিকল্পনার আয়তন ও আয়োজন বুঝতে হয় তথাপি পরিকল্পনার রূপ বুঝতে হলে সেই অঙ্কের অরণ্যের পথ না হারিয়ে, তার মূল সত্যকে বুঝবার চেষ্টা করতে হয়। পরিসংখ্যাণ ছাপা হতেই তা বদলাতে পারে—কিন্তু পরিস্থিতি তত বদলায় না। সমাজেই পরিকল্পনার ফলাফল প্রতিফলিত হয়।

আমরা তো ইতিমধ্যে তিন তিনটি পরিকল্পনার কাজ শেষ করলাম। চতুর্থ পরিকল্পনাও এগিয়ে চলবে উজ্জ্বল সম্ভাবনার পথে। কিন্তু এতদিন পরেও সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জাগছে এই সব পরিকল্পনার ফলে আমরা বাস্তবিকই কি পেলাম ? কিছুই যে সাধারণ মানুষ পায়নি—এমন কথা বলবো না। তবু এই সব পরিকল্পনার ফলে সমাজের একটি বিশেষ অংশই লাভবান হয়েছে আর অধিকাংশই, যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আরও গভীরভাবে নিমজ্জিত হয়েছে তাতে আমার কোন রকম সংশয় নেই। কিন্তু আমাদের পরিকল্পনার খসড়া যখন তৈরি করা হয়েছিল তখন তার রচয়িতারা কিন্তু অনেক উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন—কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন, সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তির প্রসার, শিল্প ও খনিজ দ্রব্যের উন্নতি ও যথার্থ ব্যবহার, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি, খাদ্যশস্যেস্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ দেশের জনশক্তির সদ্ব্যবহার, কর্ম সংস্থানের সুযোগ সুবিধা, আর্থিক বৈষম্য দূরীকরণ ও সমাজতন্ত্রের দিকে দ্রুত পদচারণ—এ সব অনেক মধুর কথাই শুনেছিলুম আমরা। কিন্তু আজ চতুর্থ পরিকল্পনার কাজে হাত দিয়েও আমাদের মন থেকে সন্দেহ দূর হচ্ছেনা কেন ?

প্রথম পরিকল্পনাতে কৃষির যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার গোড়া থেকেই দেখা দেয় বৈদেশিক মুদ্রা সমস্যা এবং তারই মধ্যে জনসংখ্যার অভাবনীয় বৃদ্ধি। দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ১ কোটি লোকের জন্য কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা, কিন্তু কার্যত ৮০ লক্ষ লোকের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একে অবশ্য প্রশংসনীয় সাফল্য বলা যায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়ে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা আরও বেড়ে যায় এবং পরিকল্পনার শেষে ৯০ লক্ষ লোক বেকার থেকে যায়। তারপর এই সময় আবার দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি পেতে থাকে। তারপর তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ও চতুর্থ পরিকল্পনার প্রারম্ভে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, খাদ্যাভাব, শিল্পে অশান্তি, বেকার সমস্যা ইত্যাদি মাত্রাতিরিক্তভাবে দেখা দেয় এবং সাধারণ মানুষের জীবন অসহনীয় করে তোলে। এই সমস্ত বিশৃঙ্খলা কেন দেখা দিল' তার মূলে কি রয়েছে সে আলোচনায় আমরা এখন যাচ্ছি না। তবে এ সবের হাত থেকে উত্তরণের পথ হিসেবে সংরক্ষণ পরিকল্পনার কথাই আপাততঃ উল্লেখ করছি।

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

কৃষিকর্মে সংগঠন ও নেতৃত্ব

অরুণ মুখোপাধ্যায়

এ কথা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় কৃষি ও শিল্পের সুষম উন্নতিবিধানই অন্যতম প্রধান নীতি হওয়া উচিত। অর্থনৈতিক অবস্থার অনুন্নত পর্যায়ে, কৃষির ওপর প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকতে হয়। কিন্তু কৃষি ও শিল্প এই দ্বিবিধ ক্ষেত্রে উন্নয়নের মাধ্যমে এবং আর্থিক অবস্থার ক্রমোন্নতির ফলে, সেই নির্ভরতা ক্রমশঃ হ্রাস পায়। তাতে কৃষির ওপর নির্ভরশীল যাঁদের বছরে কয়েক মাস বেকার থাকতে হয় তাঁরাও বিভিন্ন শিল্পে কাজ সংগ্রহ ক'রে, জমির ওপর নির্ভরশীল হবার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। জমির সংস্কার ও উন্নত ধরনের কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ এবং চাষে যন্ত্রের ব্যবহারে ফলন বেড়ে যাবার ফলে একর ও মাথাপিছু উৎপাদন হার বাড়ে, জাতীয় আয়ে কৃষির অংশও বেড়ে যায়। তবে এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই, শিল্প সম্প্রসারণের ও তার আয়ের তুলনায় কৃষি উন্নয়নের গতি অপেক্ষাকৃত কম হয়, কেননা শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়নের গতি যতটা দ্রুত হওয়া সম্ভব কৃষিক্ষেত্রে তা নয়।

কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন পরস্পর নির্ভরশীল হলেও কৃষির সমস্যা অপেক্ষাকৃত জটিল এবং জটিলতার গ্রন্থিগুলি কৃষি অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিহিত। অনুন্নত দেশগুলিতে এই জটিলতার বড় কারণ এই যে, এখানে কৃষিকর্ম শুধুমাত্র জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম নয়, জীবনের মূল অবলম্বন। তাই এ দেশে 'মাটির টানে' জমি থেকে মাথাপিছু আয় কমে এবং কৃষকরা অভাব অভিযোগের হাত থেকে মুক্তি পাননা। তা ছাড়া বৈষম্যমূলক মালিকানা স্বত্ব, চাষ জমির ক্রম খণ্ডীকরণ, চাষের পুরনো পদ্ধতি, বিভিন্ন মূলধনী উপাদানের অভাব, সমবায় ব্যবস্থার অনগ্রসরতা, কৃষিতে উদ্বৃত্ত ব্যক্তিদের জন্য কর্মসংস্থানের উপযুক্ত কুটির শিল্পের অভাব এবং উপযুক্ত মূল্যে বিপণন ব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি এগুলি হ'ল কৃষি সমস্যার বিভিন্ন দিক। তার ওপরে কৃষিপণ্যের দামের তুলনায় সাধারণের জন্য ব্যবহারযোগ্য শিল্পদ্রব্যের দাম বেশী বাড়লে কৃষির সমস্যা আরও জটিল হয়।

শিল্প ক্ষেত্রে, একক উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে বর্তমান যুগে এগুলি সংযুক্ত আমানতী কারবারে পরিণত হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রেও এমন সংগঠনগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সকল দেশেই পরিবার ভিত্তিক কৃষিকর্ম ছিল কৃষি সংগঠনের প্রাথমিক পর্যায়। ক্রমশঃ দেশের বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে পরিবার ভিত্তিক কৃষি সংগঠনের রূপান্তর ঘটেছে অনেক দেশে। ফলে তা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ নিয়েছে, যেমন, সংগঠিত কৃষি, সরকার নিয়ন্ত্রিত কৃষি আবাদ এবং সংযুক্ত আমানতী কৃষি সংগঠন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, পৃথিবীর অনুন্নত কৃষি প্রধান দেশে পরিবার ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থার রূপান্তরের গতি প্রকৃতি অত্যন্ত মন্থর। অথচ কৃষির উন্নতির জন্য পরিবার ভিত্তিক কৃষি কাঠামোর পরিবর্তন অপরিহার্য। এর সবচেয়ে বড় যুক্তি হ'ল এই যে, পারিবারিক, বিশেষ করে যৌথ পরিবার ব্যবস্থার ভাঙনের ফলে জমির ক্রম বিভাজনে কৃষি ক্রমশঃ স্বল্প আয়মূলক বৃত্তিতে পরিণত হতে চলেছে। একমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সম্মিলিত চাষই হ'ল তার সমাধান। তাই বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিতে বিজ্ঞানের ভূমিকাকে প্রশস্ততর করে তুলতে হলে কৃষি ব্যবস্থার কাঠামো পারিবারিক থেকে সমষ্টিমূলক ভিত্তিতে রূপান্তরিত করা একান্ত দরকার। কাজটি অত্যন্ত কঠিন বলে ভারতে এর অগ্রগতি খুব আশাপ্রদ হয়নি।

চাষ পদ্ধতির পরিবর্তনের জন্য দুইটি কর্মধারা মেনে নেওয়া প্রয়োজন: প্রথমটি সরকারী ভূমিকা এবং দ্বিতীয়টি স্থানীয় নেতৃত্ব। সরকার কর্তৃক সমাজতান্ত্রিক ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কৃষককে, জমির মালিক করে দিয়ে জমির মালিকানা সম্পর্কে প্রথমেই তাকে নিশ্চিন্ত করা দরকার। তার পরের পর্যায়ে সমষ্টিগত চাষের জন্য সমবায় নীতির ব্যাপক প্রয়োগ ও চাষের বিভিন্ন খাতে প্রয়োজনীয় সরকারী সাহায্য দিয়ে সেচ, সার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা অবিলম্বে প্রয়োজনীয়। কৃষি বিভাগে স্থানীয় নেতৃত্বের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এ কথা অনস্বীকার্য যে, শিল্প বা কৃষি—যে কোন প্রকার উদ্যোগের জন্য প্রগতিশীল নেতৃত্ব একান্ত দরকার—তা সে নেতৃত্ব যেখান থেকেই আসুক। তবে এ নেতৃত্বের স্বরূপ নির্ভর করে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক নীতি ও আদর্শের ওপর। কৃষিক্ষেত্রে সে নেতৃত্বের প্রধানতঃ চারটি রূপ হতে পারে।

প্রায় সব দেশের ইতিহাসেই দেখা গেছে সামাজিক বিবর্তনের ফলে সংখ্যায় অতি অল্প এক শ্রেণীর লোক প্রচুর জমির মালিক হয়ে জমিদারী ও সামন্ততন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছে। কোন কোন দেশে এই জমিদার শ্রেণী থেকেই কৃষি নেতৃত্ব এসেছে। বিশেষ করে গ্রেট বৃটেন ও এশিয়ার জমিদারগণ সে ভূমিকা নিয়েছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের কৃষি বিমুখ, গ্রামে অনুপস্থিত, জমিদারদের দিয়ে তেমন কোনোও নেতৃত্বের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই অবস্থাই ভূমি স্বত্ব সংস্কারের উদ্দেশ্যে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের অন্যতম কারণ।

দুই: কৃষি নেতৃত্ব গঠিত হতে পারে সরকারী ব্যবস্থায়। যেমন সোভিয়েত রাশিয়ায় 'কালেকটিভ ফার্মিং' যৌথ কৃষি, সরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত। অবশ্য এ ব্যবস্থা সকল দেশে গ্রহণীয় নয়, কারণ পুরোপুরি সমাজতন্ত্রের দীক্ষা না থাকলে তা সম্ভব নয়।

তিন: গ্রাম্য সমবায় সমিতি, গ্রাম্য পঞ্চায়েত প্রভৃতি স্থানীয় সংগঠন কৃষিকর্মে নেতৃত্ব দিতে পারে। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতে এই শ্রেণীর কৃষি নেতৃত্ব খুবই

ফলপ্রসূ হয়েছে। ভারতীয় গ্রাম্য জীবনেও সমবায় সমিতি ও ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি স্থানীয় সংগঠনের ঐতিহ্য রয়েছে, জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত করে কৃষকদের জমির মালিক করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের আদর্শ নিয়ে গ্রামে 'পঞ্চায়েতী রাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সর্বোপরি কৃষিকে সরকারী সুনজরে এনে কৃষির উন্নতির চেষ্টা চলছে ব্লক ভিত্তিতে। কিন্তু সত্যিকারের কৃষি নেতৃত্ব সাম্প্রতিককালের সংগঠনগুলির মধ্যে এখনও লক্ষ্য করা যায় না। যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যেও আমেরিকার "ফোর এইচ ক্লাবের" অনুরূপ কোন উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। শিক্ষিত যুবকগণ গ্রামের অসংখ্য অশিক্ষিতের মধ্যে কৃষিকর্মকে সম্মানজনক বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ না করে কৃষির বাইরে কর্মসংস্থানে বেশী তৎপর হন। আর যে উদ্যম উৎসাহ, শিক্ষা, দৃষ্টিভঙ্গীর প্রগতিশীলতা, স্থানীয় সমস্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও সমাধানে সক্ষম এবং সাংগঠনিক যে ক্ষমতা, সবল কৃষি নেতৃত্বের উপাদান, পঞ্চায়েতী রাজ পরিকল্পনার অধীনস্থ কর্মী ও নেতাগণের মধ্যে তার একান্ত অভাব দেখা যায়। তাদের ক্ষমতা গঠনমূলক কাজে আশানুরূপভাবে নিয়োজিত হয় না। অথচ ভারত সরকারের সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এঁদের মধ্য থেকেই সত্যিকারের কৃষি নেতৃত্ব গড়ে তুলবার অভিপ্রায় ছিল।

চার: জাপানে কৃষি নেতৃত্বের ধারাটি একটু বিচিত্র। মিৎসুবিশি শ্রেণীর কিছু প্রগতিশীল পরিবার যেমন, জাপানের শিল্প আন্দোলনে উপযুক্ত নেতৃত্ব দিয়েছিল, তেমনি কিছু সংখ্যক 'আলোক প্রাপ্ত' সামুরাই পরিবার জাপানের গ্রামে ফিরে গিয়ে যোগ্য কৃষি নেতৃত্ব গড়ে তুলেছিল। গ্রামের প্রগতিশীল যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন উৎসাহ উদ্দীপনার জোয়ার এনে দিয়েছিল। আর আমাদের দেশে বহুকাল আগে থেকে উচ্চারিত "গ্রামে ফিরে যাও" ডাক কারুর কানে তেমন পৌঁছয়নি। কারণ এ দেশের গ্রামে আকর্ষণীয় বিষয় এত কম, গ্রামে প্রাত্যহিক জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা এত অল্প, যে গ্রামের শিক্ষিত মানুষও গ্রামে পড়ে থাকতে চায় না। তা ছাড়া কৃষিতে বিজ্ঞানের ভূমিকা এত কম যে কৃষিতে উৎসাহী ব্যক্তিকেও তা নিরাশ করছে।

সরকারী দিক থেকেও এতকাল কৃষিতে অর্থবিনিয়োগকে ত্রাণ মূলক ব্যয় মনে করা হয়েছে, ব্যয়িত টাকার অঙ্ক দিয়ে ফলাফল বিচার করার চেষ্টা হয়েছে, মৌলিক সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়নি। তাই কৃষি উন্নয়নের জন্য কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন সাড়া জাগাবার জন্য চাই দুটি মৌলিক ব্যবস্থা: সত্যিকারের কৃষকের মধ্যে জমির দ্রুত বন্টন এবং পল্লীতে শিক্ষা সম্প্রসারণ, কৃষি অনুগ শিক্ষা সম্প্রসারণ ও তদনুযায়ী কর্মসংস্থান। আজ প্রায় দেড় দশক আগে থেকে ভূমি স্বত্ব সংস্কার সম্পর্কে কাজ চললেও আজ পর্যন্ত তার ফলাফল সন্তোষজনক পর্যায়ে আসেনি আর শিক্ষার বিস্তারও আশানুরূপ হয়নি। তাই কৃষির নেতৃত্ব, ব্যক্তি অথবা পঞ্চায়েত সমিতি যে কেন্দ্রেই বর্তাক, এবং ব্যক্তি অথবা সমবায় উদ্যোগ যে পদ্ধতিতেই চাষের কাজ হোক না কেন, তার জন্য প্রথমেই চাই উপযুক্ত সমাজতান্ত্রিক ভূমি স্বত্ব সংস্কার ও ব্যাপক গণতান্ত্রিক শিক্ষা—এই দুই শর্ত অপরিহার্য। নতুবা কৃষির উন্নতির যে কোন চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

কোচিন পরিশোধনাগারের লাভ

কোচিন পরিশোধনাগার লিমিটেডের চেয়ারম্যান শ্রী সি আর. পট্টভিরমণ বলেছেন যে ২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই পরিশোধনাগারটি এমনভাবে সম্প্রসারিত করা হচ্ছে যাতে এখান থেকে বর্তমানে যে ২০.৫ লক্ষ টন তেল পরিশোধন করা যায় সেই ক্ষমতা বেড়ে ১৯৭২ সালের মধ্যে ৩০.৫ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। পরিশোধনাগারটি অংশীদারদের জন্য করসহ শতকরা ২১ টাকা লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। সরকার পাবেন ৭৭.১৬ লক্ষ টাকা; ফিলিপস্ পেট্রোলিয়াম পাবে করবিহীন ৩৮.৮৫ লক্ষ টাকা এবং কেরালা সরকার পাবেন ১০.৫০ লক্ষ টাকা।

শান্তি কুমার ঘোষ

৭ পৃষ্ঠার পর

সম্পদের বার্ষিক শতকরা ৬ ভাগ উন্নয়ন বজায় রাখা সম্ভব। মূল্যের স্থিতিশীলতা, রপ্তানী বৃদ্ধি এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদন এগুলি সবই এই উন্নয়ন হার বজায় রাখতে সাহায্য করে।

সাধারণ এবং অর্থনৈতিক পটভূমি ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হতে থাকায়, উৎপাদন ও বন্টনের এবং উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের দাবির মধ্যে বিরোধ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। আয় এবং সম্পদ বন্টনের মধ্যে অসাম্য হ্রাস করার দুটি প্রধান উপায় আছে। তা হল ক্রমোচ্চ হারে কর আরোপ এবং সরকারি তরফের সম্প্রসারণ। জাতীয় আয়ে, রাজস্ব বাবদ আয়ের অনুপাত ১৯৫০-৫১ সালের শতকরা ৬.৬ ভাগ থেকে বেড়ে ১৯৬০-৬১ সালে শতকরা ৯.৬ ভাগ হয়, ১৯৬৫-৬৬ সালে তা শতকরা ১৪ ভাগেরও বেশী বাড়ে (১৯৬৮-৬৯ সালে অবশ্য এই অনুপাত কমে গিয়ে শতকরা ১২.৮ ভাগে দাঁড়ায়)। সরকারি ক্ষেত্রে পুনরায় উৎপাদন যোগ্য সম্পদের পরিমাণ ১৯৫০-৫১ সালের শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ থেকে বেড়ে ১৯৬৫-৬৬ সালে শতকরা ৩৫ ভাগে দাঁড়ায়। তবে জনগণের বিভিন্ন শ্রেণীর জীবন ধারণের মানে যে অসমতা ছিল তা হ্রাস পেয়েছে কিনা তার কোন স্পষ্ট লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়না। স্বল্প আয়, বেকারত্ব, অর্দ্ধ বেকারত্ব ইত্যাদি সমস্যাগুলির এখন পর্যন্ত সমাধান করা সম্ভবপর হয়নি। লগ্নির পরিমাণ না বাড়লে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধে বিপুল ভাবে বাড়ানো সম্ভব নয়।

কাজেই অর্থনীতির দ্রুত উন্নয়নের মাধ্যমে, উৎপাদনমূলক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকানা সম্প্রসারণের মাধ্যমে, দুর্ব্বলতর সংস্থাগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ফলপ্রদ কাজের সুযোগ সুবিধে সম্প্রসারণের মাধ্যমে, সাধারণ লোকের কর্মসংস্থান বিশেষ করে সমাজের দুর্ব্বল শ্রেণীর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য আমরা এখনও সফল করে তুলতে পারিনি।

ভারত সরকারের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রস্তাব

ডঃ বনবিহারী ঘোষ

বর্তমানকালে যে কোন দেশের সামগ্রিক উন্নতির মূলে রয়েছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা লব্ধ ফলাফলের প্রভাব ও তার প্রয়োগ। স্বাধীনতা পাওয়ার দশ বছরের মধ্যে ভারত সরকার এ বিষয়ে সজাগ হয়েছিলেন। সেই কারণে, ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে এ বিষয়ে লোকসভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এই প্রস্তাব অনুযায়ী কি করে দেশের মধ্যে মূল এবং ফলিত বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সর্ব প্রকার শিক্ষা, আলোচনা, গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিকাশ সুষ্ঠ ভাবে করা সম্ভব হয় তার বিশদ বিবরণ দিয়ে একটি ছয় দফা কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করা হয়। বিজ্ঞানীরা যাতে সকল রকম বৈজ্ঞানিক কাজ ও গবেষণা করার সুযোগ সুবিধা পান এবং সমাজে তাঁদের মর্যাদার স্থান অক্ষুন্ন থাকে তার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করা হয়। বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলির সুষম উন্নতি বিধানের জন্য দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য কার্যক্ষেত্র সম্বন্ধে যে সব নীতি প্রণয়নের প্রয়োজন হবে, সেখানেও বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের মতামত দিয়ে সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপ দিতে পারেন বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। কিন্তু সরকারের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরি করে তোলার জন্য তখন বা তার পরেও বিশেষ কোনও কার্যক্রম ঠিকমত গড়ে তোলা হয় নি।

ভারতীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সাধনা ও গবেষণায় অথবা বৈজ্ঞানিক কিংবা বিজ্ঞান কর্মীদের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে বা এ বিষয়ে কতখানি অগ্রসর হওয়া গেছে সে সম্বন্ধে হিসাব রাখা বা সমালোচনা করা বা ক্ষেত্র বিশেষে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার কোনও উপায়, সময় মত স্থির করা তখন সম্ভব হয়নি। সাধারণ ভাবে এ সব দিকে নজর দেওয়ার জন্য ভারত সরকার নির্ভর করেছেন দেশে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিযুক্ত সুপ্রতিষ্ঠিত নানান বিজ্ঞান সংস্থার ওপরে। এগুলির মধ্যে এ্যাটমিক এনার্জি কমিশন, ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন, কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল রিসার্চ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

হয়তো এ ধরণের ব্যবস্থা আরও কিছুদিন চলতো, কিন্তু এর পাঁচ বছর পরে, ১৯৬৩ সালে যখন ভারতের সীমানায় চীনা হানা দিল তখন এ বিষয়ে যে খুব বেশী কিছু করা হয় নাই সে সম্বন্ধে অনেকে সচেতন হয়ে পড়েন। এমন কি তখন দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, কোন কোন বিষয়ে কতজন অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক কি ধরণের কাজকর্মে নিযুক্ত আছেন তাও জানার উপায় ছিল না। গবেষণা ও অন্যান্য শ্রেণীর বিজ্ঞান চর্চার জন্য সরকার কী পরিমাণ অর্থ নিয়োগ করেছেন, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির অর্থ সংস্থানের ধারা দেখে সে সম্বন্ধে কিছুটা আভাস পাওয়া গেলেও দেশে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কী ধরণের কাজ হচ্ছে কি কি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে পারা গেছে তার কোনও মোটামুটি হিসাব পাওয়া সম্ভব ছিলনা। সব চাইতে বড় রকমের ফাঁক দেখা গেল—বিজ্ঞানীদের সুযোগ সুবিধা বা পদমর্যাদা দেওয়ার বিষয়ে সরকারের প্রতিশ্রুতি এবং যে অবস্থা বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে এই দুয়ের মধ্যে। আরো একটা বড় ত্রুটি দেখা গেল—প্রবীণ বিজ্ঞানীদের প্রতিভা সঙ্কুচিত হয়ে যাওয়া।

এই সকল দোষ ত্রুটি থেকে মুক্ত হয়ে বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণা যাতে উপযুক্ত পথে পরিচালিত হয় এবং বিজ্ঞানীরা তাঁদের কাজকর্মে, গবেষণায় উপযুক্ত মর্যাদা পান, তার জন্য কিছুদিন আগে ভারত সরকার "সায়েন্টিফিক এ্যাডভাইসারি কমিটি টু দি ক্যাবিনেট" নামে এক পরিষদ গঠন করেন। দেশের নামকরা বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়াও আরও কয়েকজন মনীষীকে ব্যক্তিগত ভাবে এই পরিষদে নেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভাকে, দেশের বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম কীভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে পরিচালিত করা সঙ্গত এবং এ সম্বন্ধে অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য বিষয়ে কি কি নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়াই হ'ল এই পরিষদের প্রধান কর্তব্য। এই পরিষদের কোনও স্থায়ী নিজস্ব মহাকরণ ছিল না হয়তো সেই কারণেই মতামত কী ভাবে গৃহীত ও কার্যকরী হয়েছে সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় নি।

কয়েক মাস পূর্বে সঠিক ভাবে বলতে গেলে গত আগষ্ট মাসে এই পরিষদের পুনর্বিন্যাস করা হয়। নতুন রূপে এই পরিষদের নতুন নামকরণ হয়েছে, "কমিটি অন সাইন্স এ্যাণ্ড টেকনোলজি"। এটি এখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভার একটি বিশেষ বিভাগ হিসাবে কাজ করবে। পরিকল্পনা কমিশনের বিজ্ঞান বিভাগের সদস্য এই বিভাগের প্রধান হিসাবে কাজ করবেন। ইনি ছাড়া অন্যান্য সদস্যের সংখ্যা, কর্মসচিব বা সেক্রেটারীকে নিয়ে পনের। এই পরিষদে ৫টি বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থার প্রধান, দুজন উপাচার্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সভাপতি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বিজ্ঞান উপদেষ্টা, তিনটি শিল্প সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের একজন সদস্য এবং ক্যাবিনেট সেক্রেটারী আছেন।

বর্তমান কালের গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সায়েন্স পলিসি বা বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধীয় নীতি সারা বিশ্বে একটা নূতন চিন্তাধারা এনে দিয়েছে। এটি দেশের অন্যান্য সব কর্মক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। আজ সারা বিশ্বে এমন কি যে সকল দেশ—সকল বিষয়েই প্রায় সমৃদ্ধ, তারাও এই 'সায়েন্স পলিসি' সম্বন্ধে খুবই চিন্তাশীল হয়ে উঠেছে। অনুন্নত বা উন্নত সকল দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য এই বৈজ্ঞানিক নীতি সম্বন্ধে সচেতনতা ও গঠনমূলক কর্ম ক্ষেত্রে সেই নীতির যথাযথ প্রয়োগ প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজন। সুখের বিষয় ভারত সরকার এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে বিলম্ব করেন নি।

এই পরিষদ যে সব দিকে তাঁদের

চিন্তাধারা পরিচালিত করেছেন বা করবেন তার মধ্যে কয়েকটা বিষয়ের প্রতি বিশেষ করে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন আছে। যথা দেশে সরকারী ও বেসরকারী এমন অনেক কর্ম সংস্থা আছে যেখানে একাধিক যোগ্য কিন্তু উপেক্ষিত বৈজ্ঞানিক আছেন। এঁদের সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ ক'রে তাঁদের প্রতিভা বিকাশের অনুকূল সুযোগ দেওয়া উচিত। ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক নীতির অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি প্রধান কর্তব্য কর্মের মধ্যে অন্যতম হ'ল কোনও বিজ্ঞানীকে উপেক্ষা না করা ও তাঁর মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার ব্যবস্থা করা; আশা করা যায়—পরিষদ এ বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন। দ্বিতীয়তঃ দেশের জনসাধারণের মনে, এমন কি অনেক শিক্ষিত এবং উচ্চ পদস্থ নাগরিকের মনে একটা ধারণা গড়ে উঠেছে যে ভারতে বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য সরকার বৃথা অর্থ নষ্ট করে যাচ্ছেন। ঐ ধারণা নির্মূল করার জন্য প্রয়োজন, দেশের সবক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতির মূলে যে বিজ্ঞানীদের সাধনা ও গবেষণা রয়েছে সেই সম্বন্ধে সাধারণ্যে প্রচার করা এবং বিজ্ঞানীদের মর্যাদা সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলা। বিজ্ঞানের বিকাশের জন্য ভারত সরকার যে অর্থ ব্যয় করছেন তা অন্যান্য যে কোনও দেশের তুলনায় খুবই কম। অথচ বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণা প্রসূত সুফলের অংশভোগী হবে দেশের প্রত্যেক নাগরিক। এই কথা বিবেচনা করে বিজ্ঞান গবেষণার জন্য আরও অর্থের সংস্থান করা উচিত। ভারতের বিজ্ঞানীরা কোনও বিষয়ে কোনও দেশের এমন কি অতি উন্নত দেশগুলির তুলনায়ও নিকৃষ্ট নয়। বরং তাঁরা অনেক কষ্ট সহিষ্ণু, অধ্যবসায়ী, প্রতিভাবান। অতএব বর্তমানে কর্তব্য হ'ল এই যে, সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষিত বিজ্ঞান সংক্রান্ত নীতিতে যে সব কর্মসূচীর উল্লেখ আছে সেগুলিকে কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত করা। সেগুলি কার্যে রূপায়িত হলে দেশে সুষম উন্নতির পদক্ষেপ শোনা যাবে।

সুখরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

১৫ পৃষ্ঠার পর

আগেই বলেছি স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে বৃহত্তর উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার ঝুঁকি না নেওয়াই শ্রেয়ঃ। তাতে গোটা সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশ দ্রুত প্রসার লাভ করে না। অবশ্য আমার এই সিদ্ধান্তকে অর্থনীতির পণ্ডিতেরা হয়তো সমর্থন করবেন না। তাঁরা বলবেন উন্নত দেশের পক্ষেই সংরক্ষণ পরিকল্পনা প্রয়োজন। আমাদের মত স্বল্পোন্নত দেশের পরিকল্পনা হবে উন্নয়ন পরিকল্পনা।

কিন্তু গৃহীত পরিকল্পনার সৃষ্টিশীল বা সৃষ্ট কার্যাবলী থেকে সুফল পেতে হলে অচিরেই সংরক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। অর্থাৎ আমি বলতে চাই এক একটি পরিকল্পনাতে আমরা যে সব কর্মসূচী গ্রহণ করেছি যেমন—কৃষি উন্নয়ন, শিল্পোন্নয়ন, আর্থিক অসমতা দূরীকরণ ইত্যাদি কর্মপ্রয়াসগুলি যেন মাঝ পথে বন্ধ হয়ে গিয়ে এক বিশাল অচলায়তনের সৃষ্টি না করে। কৃষি উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে গেলে দরকার কৃষককুলের সংরক্ষণ, —ভূমি স্বত্ব সংস্কার ও জমিদার-জোতদার প্রথার উচ্ছেদ, পতিত জমির উদ্ধার ও কৃষি ঋণ ও সমবায় প্রথার গুরুত্ব সম্বন্ধে কৃষক সমাজকে সচেতন করে তোলা। শিল্পে অশান্তি দূরীকরণ—শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পর্ক সহানুভূতিশীল ও সৌহার্দমূলক করা, শ্রমিকদের ন্যায্য প্রাপ্য দেওয়া, কর্তৃপক্ষের সংরক্ষণশীল মনোভাবের পরিবর্তন—'শক্তি প্রয়োগ ও রক্তচক্ষুর সাবেকনীতি' বর্জন দ্বারা শিল্পে অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখাও সংরক্ষণ পরিকল্পনার একটা প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

এর সঙ্গে আরও একটি কথা মনে রাখা উচিত। স্বল্পোন্নত দেশে একটি বৃহৎ সংখ্যক জনতা, কৃষির পরেই কুটিরশিল্পের ওপর নির্ভরশীল। বৃহত্তর পরিকল্পনার চাপে যদি সেই শিল্পের ক্ষতি হয় তাহলে বহু লোকই বেকার হয়ে পড়ে। সংরক্ষণ পরিকল্পনার মাধ্যমে যদি কুটিরশিল্পকে রক্ষা করা হয় তাহলে সমাজ বিকাশ আরও স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হয়।

সংরক্ষণ পরিকল্পনার মাধ্যমে সুস্থভাবে, শক্ত হাতে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করলে সমাজে সুস্থতা ফিরে আসে।

কলা রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন

গত বছর মহারাষ্ট্রের জলগাঁও জেলা থেকে প্রায় ৪,৫০০ মেট্রিক টন কলা, আরব সাগরের কুয়াইৎ, বাহেরিন, দোহা দুবাই বন্দরগুলিতে রপ্তানী করা হয়। এ থেকে ৪০ লক্ষ টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। এই রপ্তানীর পরিমাণ ৫,৪০০ মেট্রিক টন পর্যন্ত বাড়ানো হ'বে ব'লে স্থির হয়েছে। জাপানেও কলা রপ্তানী করা লাভজনক হ'বে কিনা, এবং সেখানকার বাজার কেমন প্রভৃতি নিরূপণ করার চেষ্টা করা হ'বে (জলগাঁও জেলায় ৫০,০০০ একর জমিতে শুধু কলারই চাষ হয়)। জলগাঁও, ৪.৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ২০০ মেট্রিক টন আম, ৪০০ কি. গ্রাম কাঁচা লঙ্কা এবং ৬ মেট্রিক টন আনারস রপ্তানী ক'রেও এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

জলগাঁও জেলার ক্রয়বিক্রয়কারী সমবায় সমিতিগুলির ফেডারেশন, এইসব ফল রপ্তানী ক'রে গতবছরে ৪৫ লক্ষ টাকার সমান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। এই ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত ১৯টি সদস্য সমিতি ফল ও শাকসব্জীর ব্যবসায়ে নিযুক্ত। এই ফেডারেশন, রপ্তানী করা ছাড়াও একমাত্র বোম্বাই-এ ৩১,০০০ টাকা মূল্যের ৯০ টন কলা বিক্রী করেছে

ইঞ্জিনীয়ারিং-এর টুকিটাকি

উচ্চ ভোল্টেজের রেক্টিফায়ার

সকল দেশের পক্ষেই জনস্বাস্থ্য রক্ষার প্রশ্নটি একটি প্রধান সমস্যা। উচ্চ চাপের বয়লারকে ইলেক্ট্রোষ্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটারের সাহায্য ধুলিমুক্ত রাখা, বিশেষ করে যেখানে সহরের কাছাকাছি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে, সেখানকার বয়লারগুলিকে ধূলিমুক্ত রাখা বিশেষ প্রয়োজনীয়। তিরুচিরপল্লীর ভারত হেভী ইলেকট্রিক্যালস্ লিমিটেডের উচ্চ চাপের বয়লার তৈরির কারখানায় ইলেট্রোষ্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটার তৈরী হয়। ধূলো থিতিয়ে দেওয়ার জন্য একমুখীন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত করার স্বয়ংনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাসহ উচ্চ ভোল্টেজের রেক্টিফায়ার বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশে রেক্টিফায়ার তৈরী হতোনা বলে, ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালসের প্রথম কয়েকটি বয়লারের জন্য বহু বৈদেশিক মুদ্রা বায়ে বিদেশ থেকে রেক্টিফায়ার আমদানী করতে হয়।

ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস্ যে সব নক্সা, তথ্য, কারিগরী পরামর্শ দেয় তার ওপর ভিত্তি করে বোম্বাইর হিন্দ রেক্টিফায়ারস্ লিমিটেড খুব যত্ন নিয়ে একটি রেক্টিফায়ার তৈরি করে। রেক্টিফায়ারের অংশগুলি তৈরী করার সময় দুইটি সংস্থার মধ্যে অত্যন্ত নিকট যোগাযোগ রাখা হয়। এটি তৈরি করার সময় কারিগরী ও নক্সামূলক এমন কতকগুলি সমস্যা দেখা দেয় যেগুলি এক সময়ে সমাধানের অতীত বলে মনে হয়। যাই হোক আস্তে আস্তে সেই সমস্যাগুলিরও সমাধান করা হয় এবং দুটি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় দেশেই একটি মূল্যবান সরঞ্জাম তৈরি করা সম্ভবপর হয়।

বিদেশ থেকে আমদানী করা যে সব রেক্টিফায়ার তখন পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হত সেগুলির তুলনায় দেশে তৈরি এই রেকটিফায়ার থেকে অনেক ভালো ফল পাওয়া গেছে।

ভারতের প্রথম বীট চিনির কারখানা

শ্রীগঙ্গানগরে রাজস্থান সরকারের চিনির কারখানায় ভারতে সর্বপ্রথম ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বীট চিনি উৎপাদন করা হবে। রাজ্য সরকার, এই কারখানার জন্য বীট—তথা —আখ থেকে চিনি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম কিনছেন। পুন: সজ্জিত এই কারখানায় যেমন আখ থেকে বেশী চিনি সংগ্রহ করা যাবে তেমনি আখের মরসুম শেষ হয়ে গেলে বীট চিনি তৈরি করা যাবে। এই সুবিধের ফলে কারখানাটি বছরে আরও ৫০।৬০ দিন বেশী কাজ করতে পারবে।

বীট থেকে চিনি তৈরি করার উদ্দেশ্যে ইউরোপ ও আমেরিকায় বহু পূর্ব্ব থেকেই ডিফিউজার ব্যবহৃত হচ্ছে। শ্রীগঙ্গানগরের এই কারখানার জন্য লারসেন এ্যাণ্ড টুবরো লিমিটেড যে ডিফিউজার সরবরাহ করছে তা এমনভাবে তৈরি যে তা দিয়ে আখ এবং বীট দুটি জিনিস থেকেই চিনি উৎপাদন করা যাবে। আখ থেকে চিনি উৎপাদন করার জন্য ভারতের তিনটি কারখানায় বর্ত্তমানে এই ধরণের ডিফিউজার ব্যবহৃত হচ্চে। এর পূর্ব্বে অবশ্য এই মিলগুলিতে চিরাচরিতভাবে পেশাই করে চিনি তৈরী করা হত। সংশোধিত ডি ডি এস ব্যবস্থায় পেশাই-তথা-প্রসারণ একই সঙ্গে হয়। এই পদ্ধতিতে বেশী রস নিষ্কাশিত হয় ফলে চিনিও বেশী পাওয়া যায়।

ডিমাপুরে একটি নতুন চিনি কারখানায় আখ থেকে চিনি তৈরী করার উদ্দেশ্যে নাগাল্যাণ্ড সরকারও এই ধরণের একটি ডিফিউজারের অর্ডার দিয়েছেন। পেশাই এবং প্রসারণ উভয় ব্যবস্থাযুক্ত এইটেই হবে দেশের প্রথম নতুন চিনির কারখানা।

ডিফিউজার ব্যবহার করলে যে শুধু বেশী রস এবং বেশী চিনি পাওয়া যায় তাই নয়, কারখানার যোগ্যতা অনুযায়ী শতকরা ৩০।৪০ ভাগ বেশী আখ পেশাই করা যায়। এতে যে অতিরিক্ত আয় করা যায় তাতে ৩।৪টে মরসুমের মধ্যেই ডিফিউজারের দাম উঠে আসে।

এই ব্যবস্থায় সবচাইতে বড় সুবিধে হল এগুলি বসানো এবং এগুলি দিয়ে কাজ করা খুব সহজ। যে অংশগুলি রসের সংস্পর্শে আসে সেগুলি ষ্টেইনলেস ইস্পাতে তৈরি। এতে মর্চেপড়ার সমস্যা থাকেনা।

পাঠক-পাঠিকা সমীপেষু—

ধনধান্যে-র উত্তরোত্তর উন্নতির জন্যে আপনাদের সক্রিয় সহযোগীতা অপরিহার্য্য। লেখা দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে ও বন্ধুমহলে ধনধান্যে-কে পরিচিত করিয়ে আমাদের উৎসাহিত করুন।

REGD. NO. D-233

উন্নয়ন কর্ম

★ তিরুচিরপল্লীস্থিত ভারত হেভী ইলেকট্রিক্যাল সংস্থা মালয়ের কাছ থেকে ২.২৫ কোটি টাকা মূল্যের দুইটি বয়লার যোগানোর বরাত পেয়েছে। বয়লার দুইটি থাঙ্কু জাফর পাওয়ার ষ্টেশনে বসানো হবে।

★ বরোদার কাছে জওহরনগরে গুজরাট অ্যারোম্যাটিকস কারখানার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। গুজরাট পেট্রো-কেমিক্যাল কমপ্লেক্সের এই প্রথম য়ুনিটের নির্মাণে খরচ হবে ১৮ কোটি টাকা। এখানে ২১,০০০ টন অর্থোক্সাইলীন, ২৪,০০০ টন ডি. এম. টি এবং ২,৫০০ টন ফিক্সড ক্সাইলীন উৎপাদিত হবে।

★ ১৯৭০ সালে ৫৯ কোটি টাকার পণ্য লেন-দেনের জন্য ভারত, হাঙ্গারীর সঙ্গে একটি বাণিজ্য চুক্তিতে সই করেছে। ভারত হাঙ্গেরীতে রপ্তানী করবে প্রধানত: রেলের ওয়াগন, অ্যাসবেটস কন্‌ক্রীটের জিনিস, তারের দড়ি, মোটর গাড়ীর অংশ, ইস্পাতের টিউব, ফিটিং ও বস্ত্রশিল্পে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। পক্ষান্তরে হাঙ্গারী থেকে ভারত আনাবে ইস্পাত ও ইস্পাতের জিনিস, ট্র্যাক্টার, টায়ার, বিভিন্ন গাড়ীর অ্যাক্সেল, এয়ার ব্রেক এবং রেলের ওয়াগন সংযোজিত করার যন্ত্রপাতি।

★ গুজরাট রাজ্যে, আহ্‌মেদাবাদ-কাণ্ডলা জাতীয় রাজপথের মাঝামাঝি সুরজবারিতে কচ্ছের ছোট রাণের ওপর দিয়ে নতুন একটি সড়ক সেতু গেছে। ১.৬ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি, ১২০০ মিটার দীর্ঘ, এই সেতুটি যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। এখন এই পথে, দ্রুতগতি সম্পন্ন ও ভারী যানবাহন সারা বছর ধরে অবাধে চলাচল করতে পারবে।

★ কলকাতায় স্থাপিত দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট টার্মিন্যালটি শক্তিশালী বৃহৎ বিমান ও শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী বিমান ওঠানামার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। দু কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি এই টার্মিন্যালটি বহুতল বিশিষ্ট। বিমানগুলির প্রতীক্ষা ও প্রস্থানের জন্য পৃথক পৃথক তিনটি অংশ আছে।

★ রাজস্থানের পালি জেলায় ২০ লক্ষ টাকা খরচ ক'রে সিন্দ্রু বাঁধ তৈরি হচ্ছে। বাঁধটির উচ্চতা হবে আনুমানিক ৬০ মিটার। এই বাঁধটি তৈরি হয়ে গেলে, বাঁধটির কোলে আরাবল্লী পাহাড়ের পশ্চিম অংশ থেকে বৃষ্টির জল গড়িয়ে এসে জমে একটি দীঘি তৈরি হবে। এর জলে ৯৩০ হেক্টার জমিতে সরাসরি জলসেচ দেওয়া যাবে, জাওয়াই নদীতে জলের পরিমাণ বাড়বে এবং যোধপুরে খাবার-জল সরবরাহ ব্যবস্থারও উন্নতি হবে।

★ রুশ ইঞ্জিনীয়ররা ভারতের লোয়ার সিলেরু পাওয়ার স্টেশনের জন্য ১১৯,০০০ কিলোওয়াট শক্তির টার্বাইনের নক্সা তৈরি ক'রে ফেলেছেন। এইটি নিয়ে, ভারতের পাঁচটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র রুশদের তৈরি যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত হ'ল।

★ তালচর সারের কারখানার (সরকারী ক্ষেত্রে) ভিত্তিপ্রস্তর ন্যস্ত করা হয়েছে। এই কারখানা স্থাপনে খরচ পড়বে ৭০ কোটি টাকা।

★ রাজস্থান সরকার, রাজ্যের একমাত্র শৈলাবাস, মাউন্ট আবু এবং সিরোহীর মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী একটা নতুন সড়কপথ তৈরির কাজে হাত দিয়েছেন। এর জন্য ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। এই পথ, দুটি জায়গার দূরত্ব ২৫০ মাইল পর্যন্ত কমিয়ে দেবে।

★ জাতীয় ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কর্পোরেশন, হায়ার পার্চেজ নীতি অনুসারে, বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্পকে এ পর্যন্ত ২০,৩৪৯টি মেসিন সরবরাহ করেছে।

★ গুজরাট শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক স্থাপিত ভাপি শিল্পাঞ্চলের ৩২ টি য়ুনিটে উৎপাদন সুরু হয়েছে।

ধনধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত হ'লেও 'ধনধান্যে' শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই ব্যক্ত করে না। পরিকল্পনার বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী ক্ষেত্রে উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতটা অগ্রগতি হচ্ছে তার খবর দেওয়াই হ'ল 'ধনধান্যে'র লক্ষ্য।

'ধনধান্যে' প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে প্রকাশিত হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

নিয়মাবলী

দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়।

অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পুন: প্রকাশকালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার করা হয়।

রচনা মনোনয়নের জন্যে আনুমানিক দেড় মাস সময়ের প্রয়োজন হয়।

মনোনীত রচনা সম্পাদক মণ্ডলীর অনুমোদনক্রমে প্রকাশ করা হয়।

তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয়। কোনোও রচনার প্রাপ্তি-স্বীকৃতি, পত্র মারফৎ জানানো হয় না।

নাম ঠিকানা লেখা, ডাকটিকিট লাগানো, খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

কোনো রচনা তিন মাসের বেশী রাখা হয়না।

শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাবেন।

গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেস ম্যানেজার, পাব্লিকেশন্‌স্ ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী-১ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

"ধনধান্যে" পড়ুন
দেশকে জানুন

ডিরেক্টার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি:—করোলবাগ, দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত।

ধন ধান্যে

ধনধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

প্রথম বর্ষ বিংশতি সংখ্যা

৮ই মার্চ ১৯৭০ : ১৭ই ফাল্গুন ১৮৯১

Vol. 1 : No 20 : March 8, 1970

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট স্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০

টেলিগ্রাফের ঠিকানা : যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

ভুলি নাই

সঙ্গীতের মধ্যে দিয়েই মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে, বেসুর সৃষ্টি করে নয়।

—রবীন্দ্রনাথ

এই সংখ্যায়

পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয়

নতুন বাজেটের সম্ভাবনা

অতীতের অবলুপ্ত আমলাতন্ত্রী ধারা থেকে সম্পূর্ণ একটি নতুন ধারায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই বছরের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেন। তিনি নিজেই বলেছেন যে, "এতে, খুব সাবধানে সামান্য একটু এগুবার বা খুব বেশী কিছুর জন্য চেষ্টা করার, দুটি ঝুঁকিই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।" সামাজিক ন্যায়বিচারের সঙ্গে আত্মবিশ্বাস অর্জ্জন করার উদ্দেশ্যে এই প্রথমবার বাজেটকে, আর্থিক ব্যাপারে কেবলমাত্র একটা সুষ্ঠু পরিচালনা ব্যবস্থা না করে, কার্য্যকরী একটা যন্ত্রে পরিণত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। দেশের রাজনীতিতে পরিবর্ত্তনের যে একটা ধারা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে তার সঙ্গে তাল রেখে এতেও নতুন ধারা আনা হয়েছে এবং সমাজের সাধারণ শ্রেণীর কল্যাণের উদ্দেশ্যে কতকগুলি ব্যবস্থার গুরুত্ব সম্পর্কে নতুন মনোভাব গ্রহণ করা হয়েছে।

বাজেটে যে সব প্রস্তাব করা হয় তা প্রায়ই সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর পক্ষে আনন্দ দায়ক হয়না। তবে বাজেট পেশ করার পর যখন এর বিরুদ্ধে তীব্র ও সোচ্চার প্রতিবাদ ওঠেনি তাতেই প্রমাণিত হয় যে এই বাজেটে কারুর স্বার্থেরই ক্ষতিকর কিছু নেই। অপর পক্ষে, পরিবর্ত্তনকামী এবং ব্যবসায়ী শ্রেণীর বিভিন্ন প্রতিনিধিমূলক বিভাগগুলির মধ্যে যাঁরা সবচাইতে বেশী সোচ্চার, তাঁরা মোটামুটিভাবে খুসীই হয়েছেন। বাজেটে, দেশের উন্নয়নের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মেটানোর জন্য যতটা সম্ভব সম্পদ সংহত করার পদ্ধতিতে কোন পরিবর্ত্তন করা হয়নি। তবে যে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণী এখনই দারিদ্র্যভারে ন্যুব্জ তাদের ওপর করের ভার না চাপিয়ে, যাঁরা বছরে 40,000 টাকারও বেশী আয় করেন এবং যাঁদের সহরে বহু সম্পদ ও বাড়ী আছে, বাজেটে তাঁদের টাকার থলির বাঁধন খানিকটা আলগা করার চেষ্টা করা হয়েছে। আয় ও সম্পদের মধ্যে অধিকতর সমতা বিধানের জন্য এবং 'সঞ্চয় বৃদ্ধি ও অপব্যয় হ্রাস করার জন্য পর্য্যায়ক্রমিক কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ ক'রে একটা আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই করব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা হবে।

সরকার যদিও সাধারণ মানুষের অবস্থা উন্নততর করতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তবুও যে দেশে কেন্দ্রীয় রাজস্বের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ, পরোক্ষ কর থেকে, অর্থাৎ আগম ও আবগারি শুল্ক থেকে সংগৃহীত হয়, সেখানে সরকার, সাধারণের ব্যবহার্য জিনিষগুলি করের আওতার বাইরে রাখতে পারেন না এবং নতুন আমদানীর কিছুটা ভার সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর ওপর না চাপিয়েও পারেন না। যাই হোক বর্ত্তমান বাজেটে যেখানেই সাধারণের, ভোগ্যপণ্য, যেমন চিনি, চা, কেরোসিন, সিগারেট, কৃত্রিম তন্তু ইত্যাদির ওপর কর বাড়ানোর প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে সেখানেই দরিদ্রতর শ্রেণীর চাহিদা যথাসম্ভব নিরাপদ করার জন্যও চেষ্টা করা হয়েছে।

বাজেটে যে প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে কিছুটা রেহাই দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে নিম্ন আয়ভুক্ত শ্রেণী, সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন। আয় করের রেহাই সীমা বার্ষিক 5000 টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, তাতে যাদের আয় এই সীমার নীচে রয়েছে তাঁরা সকলেই উপকৃত হবেন, তা তাঁরা, বিবাহিতই হোন বা তাঁদের কোন সন্তান থাকুক বা নাই থাকুক। যাঁরা এর চাইতে বেশী আয় করেন বিশেষ করে যাঁদের আয় 40,000 টাকার বেশী তাঁদের ক্ষেত্রে আয়কর, এবং সম্পদ ও দান কর এবং সৌখিন জিনিসের ওপর আযকর যথেষ্ট বাড়ানো হয়েছে। এগুলিকে জনকল্যাণ মূলক ব্যবস্থা বলা যায়, কারণ অধিকতর সমতা, অপব্যয় প্রতিরোধ এবং সৌখিন জিনিসের জন্য ব্যয় হ্রাস করানোটা যে বিশেষ প্রয়োজন তাতে সন্দেহ নেই।

সহরাঞ্চলের জমি ও বাড়ীর ওপর কর বৃদ্ধিটা যদিও সহরের সম্পত্তির সীমা নির্দ্দিষ্ট করার কাজ করবেনা তবুও এটা সেই উদ্দেশ্যে পূরণ সম্পর্কে খানিকটা সাহায্য করবে।

যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে মোটামুটিভাবে করবৃদ্ধির আওতার বাইরে রাখা হয়েছে তাই হল বাজেটের একমাত্র বৈশিষ্ট যা সরকারের সমাজতান্ত্রিক মনোভাব সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু যে সময়ে দেশ শিল্পক্ষেত্রে সবেমাত্র প্রায় সম্পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সুরু করেছে সেখানে স্থায়িত্ব ও উন্নয়নের একটা আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য উৎপাদন শক্তিকে যে গতি দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন তা স্বীকার করতেই হবে।

তবে আশা করা যেতে পারে যে ব্যবসায়ীগণও দেশের অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে সাহায্য করবেন এবং উন্নয়নমূলক কর্ম্মপ্রচেষ্টার মূলধারাকে আরও সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে সক্রিয় অবদান যোগাবেন।

বাজেটের অত্যন্ত উৎসাহজনক বিষয় হ'ল যে পরিকল্পনায় বিনিয়োগের পরিমাণ 400 কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে এবং পল্লীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপকারগুলি যাতে পল্লীর দরিদ্র জনসাধারণও ভোগ করতে পারেন সেজন্য সমাজকল্যাণমূলক কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই সমাজকল্যাণমূলক ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হয়েছে।

বাজেটে কোন আদর্শের প্রতি পক্ষপাত দেখানো হয়েছে একথা যদিও কেউ দাবি করতে পারবেননা তবুও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য রেখে উন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখার যে আদর্শ গ্রহণ করা হয়েছে তা, দেশের সর্ব্বাধিক জনসংখ্যার আশা আকাঙ্খা পূরণ করার পথে দেশকে পরিচালিত করবে।

পশ্চিম বঙ্গের শিল্পাঞ্চল

একটি মূল্যায়ণ

(রাজ্যের মূল্যায়ন অধিকার, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগের সমীক্ষার আধারে)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার, হাওড়া, কল্যাণী, বারুইপুর ও শক্তিগড়ে, ১৯৫৭ থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে চারটি শিল্প এলাকা স্থাপন করেছেন। এই শিল্প এলাকাগুলির কাজ কর্ম্মের মূল্যায়ণ করার সময়ে এর সঙ্গে ভারত সরকারের পুনর্ব্বাসন শিল্প কর্পোরেশনের দুটি শিল্প এলাকা এবং বেসরকারী তরফের দুটি শিল্প এলাকাও এই পর্যবেক্ষণের অন্তর্ভূক্ত করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করা হয়।

শিল্প এলাকা স্থাপন সম্পর্কিত, কর্ম্মসূচীর, সাধারণ লক্ষ্যের অন্তর্ভূক্ত যে বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করা হয় তা হল, স্থান নির্ব্বাচনের পদ্ধতি, শিল্প নির্ব্বাচন, কি ধরণের শেড তৈরী করা হয়েছে এবং সেগুলির জন্য কত ভাড়া নেওয়া হয়, বিদ্যুৎ-শক্তি, জল ইত্যাদির ব্যবস্থা, নির্ম্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে বিলম্ব এবং শেড বন্টন, সাধারণ সুযোগ সুবিধে, কাঁচামাল ক্রয় এবং বাজারজাতকরণ, কর্ম্মীদের বাসগৃহ, প্রশিক্ষণ, ছোট শিল্পগুলিকে ঋণ সরবরাহ, কাঁচামাল এবং কাজ চালাবার মূলধন সংগ্রহে অসুবিধে, উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি যে বাজারজাত করার ও অন্যান্য অসুবিধের কথা বলেন তা এবং শিল্প এলাকাগুলির কাজ চালানো সম্পর্কে সংগঠনগত অসুবিধে ইত্যাদি।

এর জন্য দুই রকমের প্রশ্নাদি তৈরী করা হয়। এগুলির একটিকে পূরণ করতে দেওয়া হয় শিল্প এলাকার ব্যবস্থাপকদের এবং অন্যটি দেওয়া হয় ঐ এলাকার শিল্প সংস্থাগুলিকে।

পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ

আকারে এবং কাজকর্ম্মে, পরীক্ষাধীন চারটি শিল্প এলাকার মধ্যেই যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। পুনর্ব্বাসন শিল্প কর্পোরেশন কর্ত্তৃক পরিচালিত দুটি শিল্প এলাকাই অনেক বেশী সুগঠিত এবং দুটির আকারও প্রায় সমান। শিল্প এলাকাগুলিতে মূলধন নিয়োগের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। শিল্প এলাকাগুলিতে একমাত্র শক্তিগড় ছাড়া অন্যত্র ইঞ্জিনিয়ারীং শিল্পেরই প্রাধান্য বেশী। শক্তিগড়ে কাপড়ের কলের প্রাধান্য বেশী।

এলাকাগুলি, স্থাপিত হওয়ার পর থেকে মাত্র দুটি শিল্প এলাকা, আরও শেড তৈরি ক'রে, সম্প্রসারিত করা হয়েছে। পুনর্ব্বাসন শিল্প কর্পোরেশন দুর্গাপুরে যে শেড তৈরি করেছে সেগুলির জন্য বেশী ভাড়া চাওয়া হচ্ছে বলে নাকি সেগুলি এখনও খালি পড়ে আছে।

শেডগুলি বন্টন করার সময় কি ধরণের শিল্প স্থাপনে উৎসাহ দেওয়া হবে সে সম্পর্কে যথেষ্ট পরিকল্পনা করা হয়নি এবং ঘিঞ্জি অঞ্চল থেকে শিল্প সংস্থাগুলি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার জন্যও কোন চেষ্টা করা হয়নি। যথেষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা ক'রে কোন্ অঞ্চলে কোন্ ধরণের শিল্পস্থাপন করা উচিত সে সম্পর্কে একটা শিল্পনীতির অভাবই হ'ল প্রধান সমস্যা। সেইজন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে রাজ্যের কোন্ অঞ্চলে কি ধরণের শিল্প স্থাপন করতে উৎসাহ দেওয়া উচিত সে সম্পর্কে আঞ্চলিক পরিকল্পনা অধিকার এবং কুটীর ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প অধিকারের যুক্তভাবে এই প্রশ্নটি পরীক্ষা করে একটা সুষ্ঠু নীতি স্থির করা উচিত।

শিল্পগুলির প্রয়োজন অনুযায়ী শেডগুলি তৈরি করা হয়নি। কোন ক্ষেত্রে নক্সা অনুপযুক্ত হয়েছে, আবার কোন ক্ষেত্রে ভিত্তি, মেসিন বসানোর মতো শক্ত করে করা হয়নি। সেই জন্যই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, সরকারের অনুমোদন অনুসারে শিল্প সংস্থাগুলিকেই তাদের শেড তৈরি করে নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া উচিত।

শেড পাওয়ার জন্য প্রথম আবেদন পত্র দেওয়ার পর এবং শেড পাওয়ার পর বিদ্যুৎশক্তির সরবরাহ পেতে কোন কোন ক্ষেত্রে ২।৩ বছর সময় লেগেছে। এরপর যদি আর কোনও শিল্প এলাকা স্থাপন করা হয় তাহলে কেবলমাত্র সংগঠনমূলক কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেই শুধু এই ধরণের বিলম্ব ও এই রকম পরিস্থিতি এড়ানো যেতে পারে।

কল্যাণী শিল্প এলাকার শতকরা ৬৯ ভাগ এবং বনহুগলী শিল্প এলাকার শতকরা ৪৮ ভাগ কর্ম্মীই তাঁদের কাজের জায়গা থেকে ৫ মাইলেরও বেশী দূরে থাকেন। কল্যাণীতে ছোট একটি প্রকল্প ছাড়া এই শিল্প এলাকাগুলিতে কর্ম্মীদের জন্য গৃহনির্ম্মাণের কোন প্রকল্প নেই। এটা একটা ভয়ানক ভুল হয়েছে। স্বল্প আয় বিশিষ্ট শ্রেণীর জন্য গৃহনির্ম্মাণের মত সরকারের যে গৃহনির্ম্মাণ কর্ম্মসূচী রয়েছে তা এবং শিল্প ও সমবায় গৃহনির্ম্মাণ প্রকল্পগুলির সঙ্গে এই সব শিল্প এলাকার কর্ম্মীদের প্রয়োজনও সংশ্লিষ্ট করা উচিত।

সরকার যে সব গৃহনির্ম্মাণ প্রকল্প রূপায়িত করছেন সেগুলির সঙ্গে শিল্প এলাকার কর্ম্মীদের প্রয়োজনের সঙ্গে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। শিল্প এলাকার ছোট ছোট শিল্পগুলি যে অগ্রগতি করতে পারছেনা তার অন্যতম কারণ হ'ল এগুলির প্রয়োজন সম্পর্কে কোন সংহত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হয়নি। বর্ত্তমানে যে সব কর্ম্মসূচী রয়েছে সেগুলির মধ্যে এদের প্রয়োজন অন্তর্ভূক্ত করে অথবা এদের জন্য আলাদা সুযোগ সুবিধের ব্যবস্থা করে এদের প্রয়োজন মেটানো যায় কিনা, সরকার তা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

শিল্প সংস্থাগুলি কাঁচামাল পেতেও যথেষ্ট অসুবিধে ভোগ করে। তাদের প্রয়োজন মেটাবার উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা নেই। এদের চাহিদাগুলি, মোট কোটার অন্তর্ভূক্ত না করে এরা যাতে এদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সম্পর্কে বিশেষ সুবিধে পায় সরকারের তা দেখা উচিত। বিদেশ থেকে আমদানী করা জিনিসের ক্ষেত্রে এটা আরও বেশী প্রয়োজনীয়। রাজ্যের সাধারণ কোটা থেকে এদের জন্য আলাদা করে কিছু দেওয়ার কথা সরকার বিবেচনা করে দেখতে পারেন।

১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

ভারতে সয়াবীন চাষের গুরুত্ব

মহম্মদ আব্দুর রকীব
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

টমেটো, আলু প্রভৃতির মত সয়াবীনও বিদেশ থেকে এসেছে। চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে বহু প্রাচীনকাল থেকে আমিষ জাতীয় খাদ্য হিসাবে এর চলন আছে। এর চাষ আমাদের দেশে গত শতাব্দীর শেষের দিকে সুরু হয়। এখন আমাদের দেশে ধীরে ধীরে এর চাষ জনপ্রিয় হ'য়ে উঠছে। আমাদের দেশের পাহাড়ী অঞ্চলে সয়াবীনের চাষ হয়ে থাকে। সয়াবীন শিম্বি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। ডাল জাতীয় শস্যের মধ্যে এটি ধরা হয় আবার তৈলবীজ হিসাবেও এর চাষ করা হয়।

সব রকমের ডালেই যথেষ্ট পরিমাণে আমিষ জাতীয় উপাদান আছে, কিন্তু সয়াবীনে এই উপাদানের মাত্রা অন্যান্য ডালের চেয়ে অনেক বেশী। শরীরের পুষ্টির জন্যে এই খাদ্য উপাদানটির প্রয়োজন অত্যধিক। আমরা এটি প্রধানত: জৈব খাদ্য থেকে পেয়ে থাকি। জৈব আমিষ খাদ্যে দেহের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় যে উপাদানগুলি (অ্যামিনোএ্যাসিডগুলি) বর্তমান থাকে, উদ্ভিদজাত খাদ্যে সাধারণত: তা থাকে না। একমাত্র সয়াবীন এর ব্যতিক্রম। এতে প্রয়োজনীয় প্রায় সব 'অ্যামিনো এ্যাসিড'-গুলি বর্তমান থাকায় এটি আমিষের বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

আমিষজাতীয় খাদ্য উপাদান সয়াবীনে প্রায় ৪০-৪৫ ভাগ আছে। সয়াবীনে এই উপাদানটি প্রায় প্রত্যেকটি ডালের দ্বিগুণ, মাংসের দ্বিগুণ, ডিমের তিনগুণ ও দুধের এগার গুণ বেশী থাকে।

সয়াবীনের আরও অনেক বিশেষ গুণ আছে। সয়াবীনে শতকরা যেমন ৪০-৪৫ ভাগ আমিষ জাতীয় উপাদান আছে, তেমনি শর্করা জাতীয় খাদ্য উপাদান আছে মাত্র শতকরা ২০ ভাগ; সেক্ষেত্রে যে কোন ডাল বা তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যে তা'র মাত্রা প্রায় শতকরা ৬০-৮০ ভাগ। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় শর্করা জাতীয় খাদ্য উপাদানের প্রাচুর্য অনেক বেশী। সেদিক থেকে বিচার করে, খাদ্য তালিকায় নানানভাবে সয়াবীনের স্থান ক'রে দিতে পারলে, খাদ্যের পুষ্টিকারিতা অনেক বেড়ে যাবে।

সয়াবীনের সম্ভাবনা

মটর শুঁটি বা সীমের মত সয়াবীনকেও সব্জী হিসেবে খাওয়া হয়। এর অপরিপক্ক সবুজ দানায় শতকরা মাত্র ৬ ভাগ শর্করা জাতীয় খাদ্য উপাদান থাকে, ফলে এটি কম শর্করা ও বেশী আমিষ উপাদান-যুক্ত খাদ্য হিসেবে বিশেষ উপকারী। যব বা ছোলার ছাতুর মত সয়াবীনের ছাতুও পুষ্টিকারক খাবার হতে পারে। তা ছাড়া গমের আটার সঙ্গে সয়াবীনের আটা মেশালে রুটির পুষ্টিকারিতা অনেক বাড়ানো যেতে পারে। সয়াবীনের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এর থেকে তৈরি দুধ ও সেই দুধের তৈরি খাবার। আমাদের দেশে অন্যান্য খাবারের মত গরুর দুধের উৎপাদনও খুব কম। দুধের বিকল্প হিসাবে সয়াবীনের দুধ চালু করার সম্ভাবনা বিশেষভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখা যেতে পারে। আমেরিকাতে 'জমান দুধ' বা 'গুঁড়ো দুধ' হিসাবে সয়াবীনের দুধ বিক্রী হয়। এমন কি নবজাত শিশুর জন্য মায়ের দুধের অথবা গরুর দুধের বিকল্প হিসাবে সয়াবীনের দুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।

সয়াবীনের ডাল শস্যের মধ্যে পড়লেও, এতে, তেলের পরিমাণ নেহাৎ কম নয়। এর থেকে শতকরা প্রায় ২০ ভাগ তেল পাওয়া যায়। সয়াবীনের তেল, সরিষার তেলের চেয়ে একটু পাতলা হলেও, খেতে খারাপ নয়। অন্যান্য তৈলবীজ, যেমন রাই, সরিষা, তিষি, প্রভৃতির তুলনায় সয়াবীনে, তেলের পরিমাণ, প্রায় অর্ধেক। কিন্তু এর ফলনের দিক বিচার করলে আমরা এ কথা নি:সন্দেহে বলতে পারি যে প্রতি একর জমিতে অন্যান্য তৈল বীজের চেয়ে প্রায় ৩ গুণ তেল এবং ডালের চেয়ে প্রায় ৫-৬ গুণ আমিষজাতীয় খাদ্য উপাদান, লাভ করা সম্ভব।

শিল্পে দ্রব্যের উপাদান

আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত হৃষিকেশ ও পিম্পরীর 'অ্যান্টি বায়োটিক' কারখানায় অ্যান্টিবায়োটিক তৈরির কাজেই শুধু সয়াবীন প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু আমেরিকাতে সয়াবীন থেকে অনধিক দেড়শ রকমের শিল্পজাত দ্রব্য তৈরি করা হয়। এই ফসলের ছোট ছোট দানাগুলি শিল্পক্ষেত্রে কি ব্যাপক আলোড়ণ সৃষ্টি করেছে তা দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। তাই আমেরিকাতে বর্তমানে গম ও ভূট্টার পরই তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ফসল হ'ল সয়াবীন। সয়াবীন থেকে যে সব শিল্পজাত দ্রব্য তৈরি হয়ে থাকে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—সয়াবীনের ময়দা, পাঁউরুটীর উপকরণ, প্রাত:ভোজের সামগ্রী, মূত্ররোগগ্রস্ত রোগীর খাদ্য ও শিশুখাদ্য, সয়াবীনের দুধ ও সেই দুধের খাবার, মিষ্টান্ন বা মোরব্বা, প্লাইউড গ্লু (তিন পীস কাঠ জোড়া দেবার শিরিষ), আঠালো তরল পদার্থ, কাগজ, ছাপার কালি, রঙ, চাকচিক্য করবার অনুলেপন-দ্রব্য, সাবান, পিচ্ছিল কারক পদার্থ, 'অ্যান্টিবাইওটিক' দ্রব্য তৈরি করার জন্য কালচারাল মিডিয়াম, ইলেক্ট্রিক ইনসুলেসন, লাবণ্যবর্ধক দ্রব্য, লেসিথিন, গ্লীসারিন, ওয়াটার প্রুফ কাপড় ইত্যাদি।

চাষের জমি ও পদ্ধতি

ভালভাবে সয়াবীনের চাষ করলে একর প্রতি ৩০-৪০ মণ ফলন পাওয়া যায়। তবে সাধারণত: ২৪।২৫ মণ ফলন হয়ে থাকে। পশ্চিমবাংলায় ব্র্যাগ, নন্দা উন্নত জাতের পেটিকান প্রভৃতি কয়েকটি বীজ বেশ ভাল ফলন দেয়। এই সব বীজ রোয়ার পর সাধারণত ১১০ থেকে ১২০ দিনের মধ্যে ফসল কাটার উপযোগী হয়।

শেষাংশ ১৮ পৃষ্ঠায়

রেলওয়ে বাজেট ১৯৭০-৭১ সাল

উদ্বৃত্তের পরিমাণ ২২.৩৮ কোটী টাকা

১৯৭০-৭১ সালের কেন্দ্রীয় রেলওয়ে বাজেটে ২২.৩৮ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত দেখানো হয়েছে। যাত্রী ও মালের ভাড়ার কাঠামোতে পরিবর্ত্তন এনে এই উদ্বৃত্ত অর্জ্জন করা যাবে। যাত্রী ও মালের ভাড়া বৃদ্ধির হার হবে এই রকম।

মাল পরিবহণের ভাড়ার হার পরিবর্ত্তনের ফলে ২৫.৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হবে। মালেরও শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। বর্ত্তমানের 'ক' পর্য্যায়ভূক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত বৃদ্ধির হার হবে শতকরা ২ থেকে ৭ ভাগ পর্যন্ত। তবে দূরগামী পণ্যের ক্ষেত্রে ভাড়ার হার হবে অপেক্ষাকৃত বেশী। 'খ' পর্যায়ের পণ্যের ক্ষেত্রে তা হবে অপেক্ষাকৃত কম। পরিবহণের ব্যয় সম্পূর্ণভাবে মেটানোর জন্য কয়লা পরিবহণের ভাড়ার হার সংশোধন করা হবে। পার্শেলের ভাড়ার হার সংশোধন করা হলে তা থেকে অতিরিক্ত ২ কোটি টাকা আয় হবে।

বর্ত্তমান রেলওয়ে বাজেটের একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল যাত্রী ভাড়া থেকে অতিরিক্ত ১১.২৫ কোটি টাকা আয় হবে। তৃতীয় ও প্রথম শ্রেণীর ভাড়া বাড়ানোর যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা থেকে যথাক্রমে ৮.২৫ কোটি এবং ২ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হবে এবং তা হ'ল রাজস্বের শতকরা যথাক্রমে ৩.৭ ভাগ ও ৭ ভাগ। তৃতীয় শ্রেণীতে সাধারণ ভ্রমণের জন্য ২০ কি: মী: পর্য্যন্ত, প্রতি টিকেটে অতিরিক্ত ৫ পয়সা এবং ৫০ কি: মী: পর্য্যন্ত অতিরিক্ত ১০ পয়সা লাগবে। এক্সপ্রেস বা মেইল ট্রেনে ভ্রমণের জন্য কমপক্ষে ১ টাকা বেশী লাগবে। স্লিপারের ভাড়া বাড়ানোরও প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রথম এবং শীততাপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীতে স্লিপারের জন্য শতকরা প্রায় ৯ ভাগ ভাড়া বাড়িয়ে ১.৭০ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হবে। রাজধানী এক্সপ্রেসের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ীর জন্য ২০ টাকা এবং চেয়ার গাড়ীর জন্য ১০ টাকা বেশী ভাড়া দিতে হবে।

উপকন্ঠ অঞ্চলে ত্রৈমাসিক সিজন টিকেট এবং সাধারণ সিজন টিকেটের ভাড়া বাড়িয়েও ৮০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আয় হবে।

প্লাটফর্ম টিকেটে ৫ পয়সা বৃদ্ধিসহ যাত্রী গাড়ী থেকেই ২.২৫ কোটি টাকা বেশী আয় হবে।

প্রস্তাবিত বাজেট

নিম্নলিখিত তালিকায় ১৯৭০-৭১ সলের জন্য প্রস্তাবিত

সংক্ষিপ্ত বাজেট

(কোটি টাকায়)

	প্রকৃত ১৯৬৮-৬৯	প্রস্তাবিত বাজেট ১৯৬৯-৭০	সংশোধিত বাজেট ১৯৬৯-৭০	প্রস্তাবিত বাজেট ১৯৭০-৭১
মোট আয়	৮৯৮.৮৪	৯৪৬.৮০	৯৫০.৫৫	৯৮৩.০০ +৩৯.০০ (প্রস্তাবিত বাজেটের ফলে)
সাধারণ ব্যয়	৬৩৬.৭৮	৬৬৫.৩৫	৬৮৩.০৫	৭০০.৯৯
রাজস্ব থেকে ক্ষয়ক্ষতিপূরণ তহবিলে জমা	৯৫.০০	৯৫.০০	৯৫.০০	১০০.০০
পেন্সন তহবিলের জন্য	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১৫.০০
অন্যান্য ব্যয় (রাজস্ব থেকে অন্যান্য কাজে)	১৪.২৫	১৫.৫৩	১৬.৬২	১৬.৫৪
মোট	৭৫৬.০৩	৭৮৫.৮৮	৮০৪.৬৭	৮৩২.৫২
রেলওয়ে থেকে নীট রাজস্ব	১৪২.৮১	১৬০.৯২	১৪৫.৮৮	১৮৯.৪৭
সাধারণ রাজস্ব তহবিলে ডিভিডেন্ট	১৫০.৬৭	১৫৯.০১	১৫৮.৪৩	১৬৭.০৯
নীট উদ্বৃত্ত (+) ঘাটতি (—)	(—) ৭.৮৬	(+) ১.৯১	(—) ১২.৫৫	(+) ২২.৩৮
আয় ব্যয়ের অনুপাত	৮২.৫%	৮১.৩%	৮২.৯%	৭৯.৮%

বাজেট এবং ১৯৬৯-৭০ সালের সংশোধিত বাজেট দেওয়া হল।

যাত্রী এবং অন্যান্য গাড়ীর জন্য যথাক্রমে শতকরা ৩ ভাগ এবং ২ ভাগ স্বাভাবিক বৃদ্ধি ধ'রে এবং মাল বহনের ক্ষেত্রে ৭০.৬ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধি ধরে, রেলওয়ে থেকে মোট ৯৮৩ কোটি টাকা আয় হবে অর্থাৎ চলতি বছরের তুলনায় প্রায় ৩২.৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হবে। এর সঙ্গে স্বাভাবিক কাজকর্মের ব্যয় বাড়বে ১৭.৯৪ কোটি টাকা, ক্ষয় ক্ষতিপূরণ তহবিল এবং পেন্সন তহবিলের প্রত্যেকটির জন্য অতিরিক্ত ৫ কোটি টাকা ব্যয় বাড়বে এবং সাধারণ রাজস্ব খাতে ৮.৬৬ কোটি টাকা দেওয়া হবে। চলতি বছরে অন্যান্য ব্যয়ের খাতে ১৬.৬২ টাকা ধরা হয়েছে কিন্তু ১৯৭০-৭১ সালে তা কিছু কমে ১৬.৫৪ কোটি টাকায় দাড়াবে বলে আশা করা যাচ্ছে। রেলওয়ে থেকে নীট যে ১৮৯.৪৭ কোটি টাকা আয় হবে তা থেকে ১৬৭.০৯ কোটি টাকা সাধারণ রাজস্ব খাতে দিয়েও ২২.৩৮ কোটি টাকা বহৃত্ত থাকবে।

কর্ম্মচারীদের মাইনে বাড়ার জন্য বার্ষিক ৫.৩৩ কোটি টাকা এবং অতিরিক্ত কর্ম্মচারীর জন্য বার্ষিক ৪.৮১ কোটি টাকা, রেলের বগী ইত্যাদি মেরামতের জন্য ৪.২৯ কোটি টাকা, জ্বালানীর জন্য ৩.৪১ কোটি টাকা, ইস্পাতের মূল্য বৃদ্ধির জন্য ৮০ লক্ষ টাকা, অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নয়নের হার বজায় না থাকায় তার জন্য ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় বাড়বে বলে স্বাভাবিক কাজ কর্ম্মের ব্যয় বেড়ে যাবে।

প্রস্তাবিত কর্ম্মসূচী

১৯৭০-৭১ সালের স্বাভাবিক কাজকর্ম্মের জন্য যে ২৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তা চলতি বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের চাইতে ৩৭ কোটি টাকা বেশী। রেলের বগী ইত্যাদির জন্য ১২৪ কোটি টাকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল এবং ১৯৭০-৭১ সালের কর্মসূচী অনুযায়ী পনেরো হাজারেরও বেশী বগীর জন্য অর্ডার দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে।

ইয়োরনাগালু থেকে মাদুকুলাপাণ্ডা পর্যন্ত একটি নতুন বড় গেজ লাইন এবং ওয়ালটেয়ার থেকে কিরিবুরু পর্যন্ত রেলপথ বৈদ্যুতিকিরণ, এই দুটি নতুন নির্ম্মাণকার্য হাতে নেওয়া হবে। এই দুটি প্রকল্পই, রপ্তানীর জন্য লৌহ আকর পরিবহণ করা সম্পর্কে রেলওয়ের ক্ষমতা বাড়াবে।

কর্ম্মচারীদের জন্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থা

যে সব কর্ম্মচারী দুই বছর বা তার বেশী সময় যাবৎ তাঁদের বেতন হারের সর্ব্বোচচ সীমায় পৌঁছে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সমস্ত গ্রেডের কর্ম্মচারীরা তাঁদের বেতন হারের শেষ সীমায় যত টাকা মাইনে বাড়ে সেই পরিমাণ টাকা ব্যক্তিগত মাইনে হিসেবে অতিরিক্ত পাবেন। এই সম্পর্কে অর্ডার দেওয়া হচ্ছে।

এই সমস্ত সুবিধে ছাড়াও রেলওয়ের কর্ম্মচারীরা চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে উন্নততর সুযোগ সুবিধে পাচ্ছেন।

অতীতের-সাফল্য ও অসাফল্য

১৯৬৯-৭০ সালের সংশোধিত বাজেটে কয়েকটি বিফলতা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। মাল পরিবহণের খাতে যেখানে ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন মাল পরিবহণ করা হবে বলে অনুমান করা হয়েছিল সেই ক্ষেত্রে মাত্র ৫২.৭ লক্ষ টন মাল বহন করা হয়। মাল পরিবহণ খাতে যেখানে বাজেটে ৬০০ কোটি টাকা আয় ধরা হয় সেই ক্ষেত্রে তা ১০ কোটি টাকা কম হয়।

যাই হোক যাত্রী বহনের খাতে ২৭৩ কোটি টাকা আয় হবে বলে যে অনুমান করা হয়েছিল তা থেকে ৯.২৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। বগী এবং অন্যান্য খাতে আনুমানিক আয় থেকে যথাক্রমে প্রায় ১.৫ কোটি এবং ২ কোটি টাকা বেশী আয় হবে। যে আয় আদায়ের অপেক্ষায় রয়েছে বাজেটে তা ৪.২ কোটি টাকা ধরা হয়েছিল কিন্তু তা এক কোটি টাকা

আমাদের পত্রিকাটি ছাপতে দেবার পর গত ৪ঠা মার্চ্চ, রেলমন্ত্রী লোকসভায় ঘোষণা করেন যে সাধারণ প্যাসেঞ্জার, মেইল্ বা এক্সপ্রেস ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর ও স্লীপারের ভাড়া বাড়ানো হবেনা। প্ল্যাটফর্ম টিকেট, মাসিক ও ত্রৈমাসিক সিজন্ টিকিটের ভাড়াও বাড়ানো হবেনা।

রেলযোগে দানাশস্য পাঠানোর ভাড়া এবং দুধের জন্য পার্শেল ভাড়া বাড়ানোর যে প্রস্তাব করা হয়েছিল, তাও বাড়বেনা।

এর ফলে রেলওয়ের অতিরিক্ত আয় ১৩ কোটি টাকা কম হবে।

কম হবে। কিন্তু বর্ত্তমান সংশোধিত বাজেটে রেলওয়ে থেকে মোট যে ৯৫৫ কোটি টাকা আয় ধরা হয়েছে তাতে ৩.৭৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হচ্ছে এবং স্বাভাবিক কাজ কর্ম্মের জন্য ১৭.১৭ কোটি টাকা ব্যয় বাড়লেও তা মেটানো যাবে। প্রস্তাবিত বাজেটের আয় ব্যয় এবং ডিভিডেন্ট হিসেবে যে ৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে তা ধ'রে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ১২.৫৫ কোটি টাকা আর তাতে যে ১.৯১ কোটি টাকা উদ্বৃত ধরা হয়েছিল তাও থাকবে না। কাজেই রেলওয়েকে তার দায়িত্ব মেটাবার জন্য সেই ক্ষেত্রে সাধারণ রাজস্ব থেকে ৯.৮৫ কোটি টাকা ধার করতে হবে।

চতুর্থ পরিকল্পনা ও অন্যান্য সম্ভাবনা

১৯৬৯-৭০ সালের রেলওয়ে বাজেট থেকে যে সব তথ্যাদি পাওয়া যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে যে ক্ষয় ক্ষতিপূরণ তহবিলে দেয় অর্থ ছাড়া রেলওয়ে, পরিকল্পনাগুলির জন্য ২৬৫ কোটির জায়গায় মাত্র ৮৬ কোটি টাকা দিতে পারবে। এই পার্থক্যটা হ'ল ১৭৯ কোটি টাকা এবং এর সঙ্গে আরও ১৫০ কোটি টাকা যুক্ত হবে, যে টাকাটা যাত্রী ও মাল বহনের ভাড়া বাড়িয়ে পাওয়ার কথা ছিল। কাজেই পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার জন্য রেলওয়ের ৩২৯ কোটি টাকা সংগ্রহ করতে হবে আর সেটা হয়তো বেশ বড় একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।

ভারতীয় রেলপথ

১৯৬৮-৬৯ সালে অগ্রগতির খতিয়ান

★ ১৯৬৮-৬৯ সালে যাত্রী ও মাল পরিবহণ বাবদ মোট আয় দাঁড়ায় ৮৯৮.৮৪ কোটী টাকা (তার আগের বছরের পরিমাণ ছিল ৮১৮.১৪ কোটী টাকা)। ক্ষয়ক্ষতিপূরণ ও সংরক্ষিত তহবিলে জমা দেওয়া ৯৫ কোটী টাকা ধরে এবং যাবতীয় ব্যয় বাদ দিয়ে যে পরিমাণ অবশিষ্ট ছিল তা' সাধারণ রাজস্ব ভাণ্ডারে দেয় ১৫০.৬৭ কোটী টাকার চেয়ে ৭.৮৬ কোটী টাকা কম।

★ গত ১৬ বছরের মধ্যে গতবছরে প্রথম যাত্রীর সংখ্যা শতকরা ১.৯৮ ভাগ কম হয়। মোট মাল পরিবহণের পরিমাণ (২০.৪ কোটী মেট্রিক টন) অবশ্য ১৯৬৭-৬৮-র তুলনায় শতকরা ৩.৭৯ ভাগ বেশী দাঁড়ায়। গতবছরে অতিরিক্ত ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন মাল চলাচল করবে বলে অনুমান ছিল ; কার্য্যতঃ তার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫২.৭ লক্ষ মেট্রিক টন।

★ মোট ৭৪০ রুট (Route K. m.) কি.মী. দীর্ঘ নতুন রেলপথে ট্রেনচলাচল শুরু করে। ৩১ কি. মী. লাইন, মীটার গেজ থেকে ব্রড্ গেজে পরিণত করা হয়। পুরোনো লাইনে ২৬০ কি. মী. রেলপথ ডবল করা হয়। ৩৫০ "রুট" কি. মী. পথের বৈদ্যুতিকীকরণ (২৫ কি. ভোল্ট এ.সি) সম্পন্ন হয়।

★ যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধি ও রেলপথ ব্যবহারকারী অন্যান্যদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য রেলকর্তৃপক্ষ ২.৮১ কোটী টাকা ব্যয় করেন।

★ বিনা টিকিটে বা ঠিক টিকিট না নিয়ে ভ্রমণের জন্যে মোট ৮৪.৭ লক্ষ যাত্রী ধরা পড়ে এবং তাদের কাছ থেকে ভাড়া বা জরিমানাবাবদ আদায় হয় তিন কোটী টাকা। বিনা টিকিটে ভ্রমণের জন্যে দণ্ডিত করা হয় ৩.২০ লক্ষ যাত্রীকে।

★ সিগন্যাল দেবার স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হয় ৬১.১৫ "ট্র্যাক" (Track) কিলোমীটার রেলপথে। এছাড়া অনেকগুলি মাল্টি-চ্যানেল-মাইক্রো-ওয়েভ লিঙ্ক চালু করা হয়।

★ ১৯৬৮-৬৯ সালে রেল কর্তৃপক্ষ সাজ সরঞ্জাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনার জন্য ৩২২ কোটী টাকা ব্যয় করেন। এর মধ্যে দেশীয় সামগ্রীর পরিমাণ ছিল শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ (৮৯.৯৪%)।

★ মোট সাড়ে ১৩ লক্ষ রেল কর্ম্মচারীর বেতন প্রভৃতি বাবদ ব্যয় হয় ৩৯২.৮৭ কোটী টাকা। স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসা খাতে মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৭.৩০ টাকা (১৯৬৭-৬৮-র মাত্রা ছিল ১১১.৯৮ টাকা)। কর্ম্মচারীদের জন্যে তৈরী হয় মোট ৬৩২০টি কোয়ার্টার।

গ্যাস পরিশোধনের নতুন পদ্ধতি

গ্যাস পরিশোধনের রেক্টিসল পদ্ধতি ব্যবহার করা সম্পর্কে ভারতের ফার্টি-লাইজার কর্পোরেশন সম্প্রতি, পশ্চিম জার্মাণীর মেসার্স লুরগির সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। কয়লা থেকে যে গ্যাস পাওয়া যায়, মেথানলের সাহায্যে সেই কাঁচা গ্যাসগুলি পরিশোধন করা যায়।

এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে যে চুক্তি করা হয়েছে তার একটা অতিরিক্ত সুবিধে হ'ল তাঁরা দ্বিতীয় কারখানাটির জন্য লাইসেন্স ফী শতকরা ৫০ ভাগ, এবং ভবিষ্যতে যে সব কারখানা গড়ে উঠবে সেগুলির ক্ষেত্রে শতকরা ৭০ ভাগ লাইসেন্স ফী হ্রাস করবেন। পরস্পরের মধ্যে স্বীকৃত শর্ত অনুসারে ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন দেশের ভেতরে ও বাইরে, এই পদ্ধতি ব্যবহার ক'রে কারখানার নক্সা তৈরি করতে, নির্ম্মাণ করতে বা বিক্রী করতে পারবেন। এই ধরণের কারখানার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নক্সা ইত্যাদি তৈরি করা সম্পর্কে জার্মানীতে যে কাজ হবে, মেসার্স লুরগি, তাতে ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের ইঞ্জিনীয়ারদের ও সংযুক্ত করবেন।

কপার্স-টটজেক পদ্ধতিতে কয়লাকে সোজাসুজি গ্যাসে পরিণত করা সম্পর্কে ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন মেসার্স হেইনরিক কপার্স লিমিটেডের সঙ্গে ইতিমধ্যেই একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। এই রকমভাবে যে গ্যাস পাওয়া যাবে তা রেক্টিসল পদ্ধতিতে পরিশোধন করে, দেশে কয়লা-ভিত্তিক যে নতুন সার কারখানা স্থাপন করা হবে, তাতে ব্যবহার করা হবে। কয়লা ভিত্তিক তিনটি কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব, সরকার ইতিমধ্যেই অনুমোদন করেছেন।

ধানের সার

প্রতি হেক্টারে ১০ টন ধান উৎপাদন করাটা পূর্ব্বে দিবাস্বপ্ন বলে মনে হ'ত। কিন্তু আজকাল জয়া, আই আর-৮ ইত্যাদি অধিক ফলনের বীজের কল্যাণে প্রতি হেক্টারে ১০ টন ধান উৎপাদন করা সম্ভবপর হয়েছে।

এই জাতের ধান, স্থানীয় ধানের তুলনায় অনেক বেশী নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে এবং তার পরিবর্ত্তে প্রচুর ফসল দিতে পারে। অনুমান করা হয় যে ১০ টন শস্য এক হেক্টার থেকে ১৮০ কি: গ্রাম নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে। মাটি উর্ব্বর হলে প্রতি হেক্টার জমি ১০০ কি: গ্রাম নাইট্রোজেন সরবরাহ করতে পারে এবং বাকিটা রাসায়নিক সার দিয়ে পূরণ করতে হয়।

ওড়িষ্যার কটকে অবস্থিত কেন্দ্রীয় চাউল গবেষণা প্রতিষ্ঠানে, বিভিন্ন ধরণের নাইট্রোজেনযুক্ত সারের কুশলতা পরীক্ষা করা হয়। এই সব পরীক্ষা নীরিক্ষার সময়, সার দেওয়ার পদ্ধতিও পর্যবেক্ষণ করা হয়। দেখা গেছে যে জমি তৈরি করার সময়ে এবং ধানের চারা বেরিয়ে যাওয়ার পর মাটির ওপরে সার ছড়িয়ে না দিয়ে যদি মাটির ঠিক নীচে তা দেওয়া যায় তাহলে গাছের পক্ষে তা গ্রহণ করা অনেক সহজ হয়।

ভারী মাটিতে দুইভাগে দুইবারে নাইট্রোজেনযুক্ত সার ব্যবহার করা উচিত। যে পরিমাণ সার ব্যবহার করা হবে তার তিন চতুর্থাংশ জমি তৈরি করার সময় এবং এক চতুর্থাংশ ফুল ফোটার সময় দেওয়া উচিত। হালকা মাটিতে তিন বারে সার দেওয়া উচিত। অর্দ্ধেক সার জমি তৈরি করার সময়; ধানের চারা লাগানোর দুই সপ্তাহ পরে এক চতুর্থাংশ এবং অবশিষ্ট এক চতুর্থাংশ ধান ফোলবার সময়ে দেওয়া উচিত। কটকে প্রতি হেক্টারে ৮০ থেকে ১০০ কি: গ্রা: নাইট্রোজেন এই রকমভাবে ব্যবহার করে ভালো ফল পাওয়া গেছে।

এই প্রতিষ্ঠানে ধানের ক্ষেতে ইউরিয়া ছড়িয়ে দিয়ে তার প্রতিক্রিয়াও পরীক্ষা করে দেখা হয়। এই পরীক্ষায় দেখা গেছে যে জমিতে যে পরিমাণ নাইট্রোজেনযুক্ত সার দেওয়া উচিত তা দেওয়ার পর যদি, চারা লাগানোর তিন সপ্তাহ পর থেকে ২ বার বা তারও বেশী বার প্রতি হেক্টারে শতকরা ২ ভাগ ইউরিয়া মিশ্রণ দিয়ে ২৫ কি: গ্রাম পর্যন্ত নাইট্রোজেন দেওয়া যায় অথবা জমিতে সার দেওয়ার সময় এ্যামোনিয়াম সালফেট বা ইউরিয়ার সঙ্গে ২৫ কি: গ্রাম নাইট্রোজেন ব্যবহার করা যায় তাহলে ফলন শতকরা ৩০ ভাগ বাড়ে।
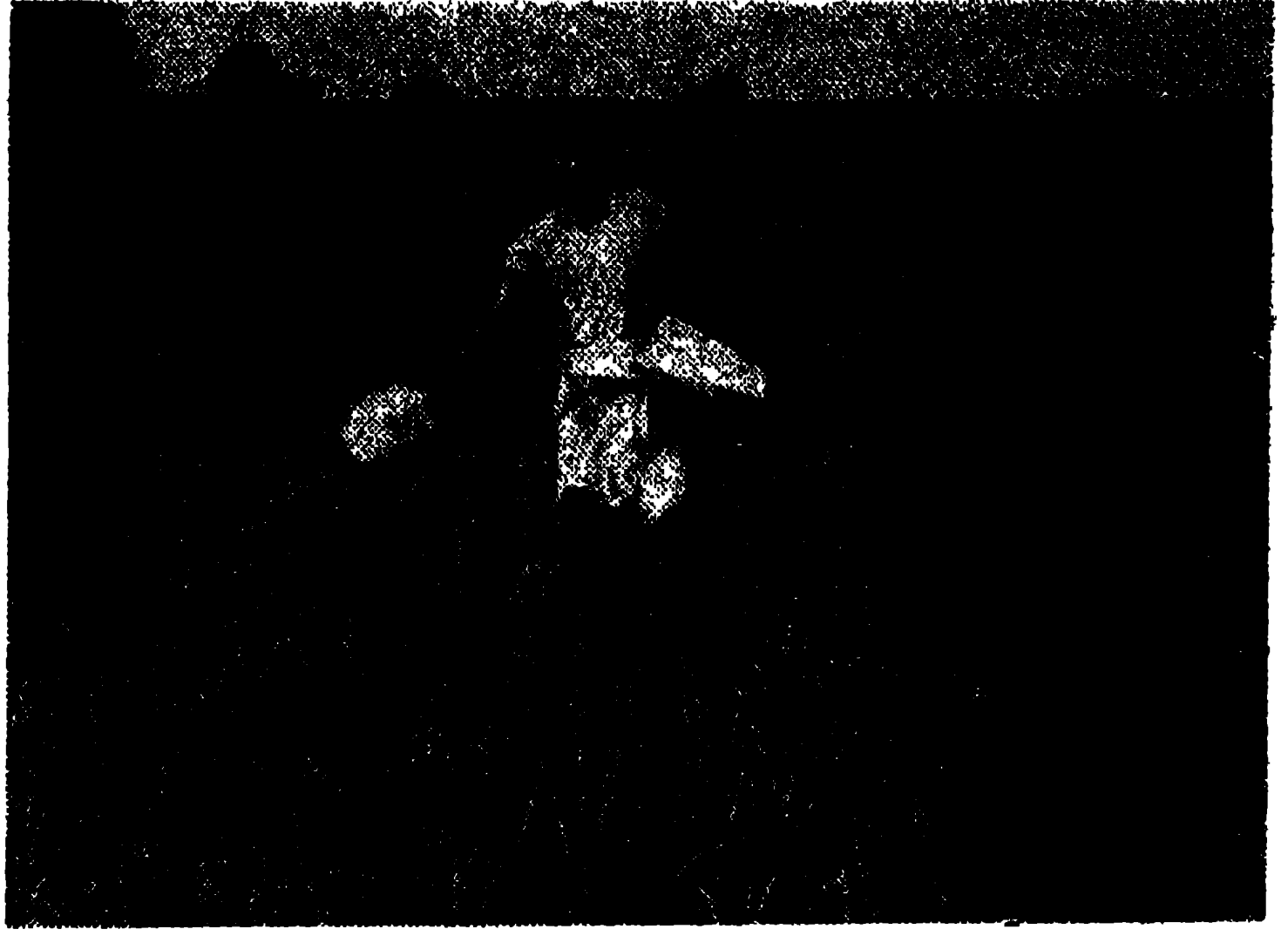
এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে অধিক ফলনের বীজ ব্যবহার করার পূর্ব্ব পর্যন্ত, ফসফেটযুক্ত সার ব্যবহার করে ধানের ফলন বিশেষ কিছু বাড়েনি। সম্প্রতি পরীক্ষা করে আরও দেখা গেছে যে প্রতি হেক্টারে ০ থেকে ২৪০ কি: গ্রাম পর্যন্ত নাইট্রোজেন ব্যবহারের পরিমাণ বাড়ানোর ফলে অধিক ফলনের ধানের পরিমাণ বেড়েছে এবং এগুলি প্রতি হেক্টারে ১২০ কি: গ্রাম পর্যন্ত ফসফোরিক এসিড গ্রহণ করেছে।

ধানক্ষেতে সার ছড়ানো হচ্ছে

পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে অগ্রগতি

মাদ্রাজের কাছে কালপাকমে ৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে যে পারমাণবিক কেন্দ্র তৈরী হচ্ছে তা থেকে দুটো বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে শক্তি সরবরাহ করা যাবে। এর প্রত্যেকটিতে ২০০ এম.ওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা যাবে। প্রথম কেন্দ্রটি ৬ মাস পূর্ব্বেই তৈরি হয়ে যাবে এবং ১৯৭৪ সাল থেকে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করতে পারবে বলে আশা করা যাচ্ছে। বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করাটাই যদিও মাদ্রাজের এই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য, তবুও এটা দেশের পারমাণবিক ক্ষমতার একটা উদাহরণ হিসেবেও কাজ করবে। বৈদেশিক কোন সাহায্য ছাড়াই এটিকে রূপায়িত করা হচ্ছে এবং তার অর্থ হল পারমাণবিক কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় জটিল ও সূক্ষ্ম অংশও এখন দেশেই তৈরি হচ্ছে।

মাদ্রাজের পারমাণবিক শক্তি প্রকল্পে প্রকৃতপক্ষে দুটি প্রকল্প রয়েছে। প্রথমটি হ'ল বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন কেন্দ্র, দ্বিতীয়টি হ'ল রিএ্যাক্টার গবেষণা কেন্দ্র। ১৯৭১ সালের জুন মাস নাগাদ এটির কাজ সুরু হবে। গবেষণা কেন্দ্রটির কাজ আগামী ৩/৪ বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়ে যাবে এবং এখানে সব রকমের রিএ্যাক্টার সম্পর্কে পরীক্ষা নীরিক্ষা করা যাবে।

চোে বদলে চোখ

এ. ভ্যাণ্ডারহাম

যাঁদের দৃষ্টিশক্তি খারাপ, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই চোখে হয়তো প্রতিফলনের ত্রুটি আছে এবং উপযুক্ত শক্তির চশমা নিলেই ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু চশমা ব্যবহার করতেও অনেকের আপত্তি থাকে। কারণ চশমার ফ্রেম যত সুন্দরই হোক না কেন, চশমা ছাড়া মুখই সাধারণতঃ দেখতে বেশী সুন্দর।

কখনও আবার চোখের দৃষ্টিশক্তি বজায় রাখার জনই কন্ট্যাক্ট লেন্স অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এমন অনেক লোক আছেন যাঁদের চোখের ছানি কাটাবার পর একমাত্র কন্ট্যাক্ট লেন্সের সাহায্যেই দূরে দেখার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে পারেন। তাছাড়া এমন অনেক রোগী আছেন, যাঁদের চোখের মণির ওপরের পাৎলা আচ্ছাদক কেরা টোকোনাস, ট্র্যাকোমা বা ঘায়ের জন্য এতো খারাপ হয়ে যায় যে, তাঁদের দৃষ্টির এই ত্রুটি, সাধারণ কোন ধরণের কাঁচ ব্যবহার ক'রে সারানো সম্ভব নয়। চোখের এমন কতকগুলি রোগ আছে, যেগুলির ক্ষেত্রে রোগীদের কন্ট্যাক্ট লেন্স দেওয়া না হলে তাঁদের দৃষ্টিহীন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এই ধরণের রোগ ও রোগীদের জন্য একটি কন্ট্যাক্ট লেন্স চিকিৎসাগার ও পরীক্ষাগার খোলার উদ্দেশ্যে আমি ভারতে এসেছিলাম। এতে রোগীদের প্রয়োজন মিটবে তেমনি এই কাজ করতে পারেন এই রকম কিছু কুশলী কর্মীও তৈরী হয়ে যাবেন। আমরা বেশীর ভাগ দেশীয়জিনিসপত্র ব্যবহার করতে চেয়েছি। কতকগুলি সাজ সরঞ্জাম যেমন, রেডিয়োস্কোপ, ১/১০০ মিঃ মীঃ সূক্ষ্মতার উপযোগী একটি লেদ এবং ঐ সূক্ষতার গজ অবশ্য এই কাজের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। যাই হোক বেশীর ভাগ যন্ত্রপাতি দেশেই তৈরী করা হয়, যাতে আমাদের কাছে কাজ শেখার জন্য এলে তাঁরা নিজেরাই এই কাজ সুরু করতে উৎসাহিত হন। আমরা ইতিমধ্যেই চার জন শিক্ষার্থী গ্রহণ করেছি এবং আশা করি যে তিন বছর পর তাঁরা এই বিভাগের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবেন।

বেশীর ভাগ রোগী নিরাময়মূলক লেন্সের জন্য আসেন। ডাক্তাররাই বরং রোগীদের আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেন কারণ এই ধরণের লেন্স এখনও সহজপ্রাপ্য নয়। এমন কি সমগ্র বিশ্বে এতো প্রয়োজনীয় একটা চিকিৎসার জন্য খুব কম হাসপাতালেই এই ধরণের নিরাময়মূলক লেন্স সরবরাহ করার ব্যবস্থা আছে।

এই লেন্স তৈরীর পদ্ধতি হ'ল এইরকম : এ্যানেসথেসিয়া দিয়ে রোগীর চোখের সংলগ্নটুকু অংশ অসাড় ক'রে দিয়ে চোখের একটা ছাপ নিয়ে নেওয়া হয় এবং ছাপের ওপর একটা প্লাস্টিকের পাত চেপে ধরা হয়। এই অবস্থায় সম্ভব হ'লে আমরা মাপ নেওয়ার লেন্সের মধ্যে একটা ছিদ্র রাখার চেষ্টা করি যা'তে ছাপ নেওয়ার জন্যে ব্যবহৃত গ্যাস বেরিয়ে যেতে পারে এবং চোখ বাইরের খোলা হাওয়ার স্পর্শ পায়। কিন্তু ছিদ্র রাখলে হাওয়ার বুদবুদ ভেতরে চলে যায়। এই বুদবুদ মণির ওপরে গিয়ে পড়লে দৃষ্টি ব্যাহত হয়। মণিগোলকের আচ্ছাদক ও লেন্সের মধ্যে দূরত্ব রাখা হয় ২/১০০ মি. মীটারের মত। ছাপ নেওয়ার প্লাস্টিকে ঐ ছোট্ট টুকরোটি প্রয়োজনমত ঘষে সমান করার জন্যে "wax tool" ও পালিশের "মশলা" ব্যবহার করি। প্লাস্টিকের অংশটির সমস্ত অংশের মাপ ঠিক আছে কি না দেখার জন্য যে মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করা হয় তা'তে পরীক্ষাধীন বস্তুটিকে ১০০ গুণ বড় ক'রে দেখানো সম্ভব। ফ্লুয়োরোসীন ও আলট্রা ভায়োলেট রশ্মির সাহায্যে লেন্সের "ফিট" (যথাযথ মাপ) পরীক্ষা ক'রে দেখা যায়। এই ধরণের লেন্স "ফিট" করা দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ। কারণ চোখের পাতার চাপে লেন্সের শক্ত অংশটা হয়তো সামান্য মুড়ে যাবে কিন্তু তাতেই চোখ ও লেন্সের মধ্যেকার দূরত্ব কম বেশী হয়ে জটীলতা সৃষ্টি করে। অতএব লেন্স পরিয়ে দেবার পরও রোগীকে বারবার এসে দেখিয়ে যাওয়া দরকার। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের দরুণ তাই আমাদের কাজ অনেক সময় পুরোপুরি সফল হ'তে পারে না। লেন্স

১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

দেশ বিদেশের শস্যোৎসব

গোপাল চন্দ্র দাস

নতুন ফসল আহরণ ও গ্রহণের দিনটি সকল দেশেই শুভদিন বলে গণ্য করা হয়। বলা বাহুল্য আমাদের প্রধান খাদ্য অন্ন। ধান থেকে এই অন্ন আহরিত হয়। পশ্চিম বাংলার প্রধান ফসল হ'ল খারিফ খন্দের আমন ধান। আমন ফসল ওঠে হেমন্তের শেষ ভাগে অগ্রহায়ণ মাসে। আমনের নতুন চালের অন্ন গ্রহণের প্রথম আনন্দময় উৎসব নবান্ন। নবান্ন বলতে নবীন বা নতুন অন্ন বুঝায়। পশ্চিম বাংলায় অগ্রহায়ণ থেকে সুরু করে মকর-সংক্রান্তি অর্থাৎ পৌষ মাসের শেষ দিনটি নবান্ন উৎসবের শেষ তিথিলগ্ন। নবান্ন গ্রাম বাংলার লোক উৎসব। নবান্ন সম্বন্ধে অনেক গ্রাম্য গাঁথা ও ছড়া গ্রামের লোকের মধ্যে উৎসাহ জাগায়।

উৎসবের তুলনায় তার প্রস্তুতি পর্ব্বটাই বেশী আনন্দের। নবান্ন উপলক্ষ্যে অনেক কৃষকের বাড়ী ও ধানের গোলায় মাঙ্গলিক আলপনা ও সিঁদুরের টিপ দেওয়া হয়, শঙ্খরব ও উলুধ্বনি উৎসবের পূর্ণতা ঘোষণা করে। আজকাল কৃষক সমাজে নব জাগরণ, সবুজ বিপ্লব ও রাজনৈতিক চেতনা ইত্যাদির মধ্যেও বাংলার গ্রামীণ কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য ঠিকই আছে।

নবান্নের দিনে নতুন চালের রকমারি পিঠে, পায়েস, সিন্নি, খিচুড়ি, ও আতপের ফেণা-ভাতের স্বাদ ও তৃপ্তি গ্রাম বাংলার পরিবারগুলিকে এখনও আনন্দ মুখর করে তোলে। কৃষি ও শস্য উৎপাদনে সাফল্যের উৎসব হ'ল নবান্ন উৎসব।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও বিভিন্ন-ভাবে নবান্ন বা নতুন ফসল তোলার উৎসব পালন করা হয়। পুরুলিয়া জেলার আদিবাসীরা আমনের ফসল ঘরে তোলার পর [illegible] 'টুসুর' পূজা করেন। সারা পৌষ মাস ধরে টুসুর মূর্তি পূজা, নাচ,গান পান ভোজ ইত্যাদি অবিরাম উৎসবের আনন্দ বন্যায় পাহাড়ী অঞ্চল যেন রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে। 'টুসু' পূজা আদিবাসীদের কেবল পারিবারিক উৎসব নয়। কৃষি সম্পদের দেবীর পূজা, সমাজের গোষ্ঠীগত উৎসবের সামিল, নতুন আমন ফসল ঘরে উঠলে কৃতজ্ঞ চাষীর দল নানাভাবে নাচ, গান ও উপাসনার মধ্য দিয়ে শস্যদেবীকে খুসী করে।

'টুসুর' পরব এসেছে ঘরে,
এসো পৌষ যেও না
জন্মো জন্মো ছেড়ো না।

এধরনের ছড়ার মধ্যে আদিবাসীদের মধ্যে কতই না কাকুতি দেখা যায়।

'বিহু' নতুন ফসল তোলারই উৎসব। যদিও আজকাল ত্রিপুরা রাজ্যের আচার ব্যবহার, সভ্যতা কৃষ্টি, ভাষা ইত্যাদি বাংলার সঙ্গে ক্রমশ: যুক্ত হয়ে আসছে, কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলের শস্য তোলার উৎসবটির মধ্যে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। অঞ্চলটির ভৌগলিক অবস্থান, জলবায়ুর প্রভাব ইত্যাদি এর মূল কারণ মনে হয়। সেখানকার ধান অনেকটা লাল ও বিভিন্ন জাতের। পাহাড়ী অঞ্চলের এই ধান পুষ্ট হয় অনেক আগে এবং বাংলা দেশের আগুতি ফসলের সঙ্গে এর তুলনা করা যায়। ওখানকার ধান কাটা হয় ভাদ্র আশ্বিনে। এঁদের শস্যোৎসবটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ। সভ্য জগতে আহারের পরেই প্রয়োজন বস্ত্রের। সেজন্য তাঁরা শস্যোৎসবের সময় কচি কলাপাতার উপর জোড়াঘট বসিয়ে পূজার ব্যবস্থা করেন শস্যদেবী 'মাইলুমার', আর তন্তু দেবী 'মলুমার'। আবার 'অচাই' অর্থাৎ পুরোহিত মশাই গৃহদেবী, 'নকছুমতাই' এর পূজাদি করেও গৃহস্থ পরিবারের শান্তি কামনা করে থাকেন।

বর্ত্তমান তামিলনাড়ু ও আশেপাশের পল্লীঅঞ্চলে 'মকর সংক্রান্তি' ও 'উত্তরায়ণ' উপলক্ষ্যে ২।৩ দিন ধরে চলবে শস্য উৎপাদনের সহায়ক রোদ, জল ইত্যাদি দেব দেবীর পূজা। পল্লী অঞ্চলের কৃষক, পূজা শেষে 'পঙ্গল' অর্থাৎ চাল, গুড়, [illegible] ও অন্যান্য মশলা মিশ্রিত ভোগ, দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত প্রসাদী ও অন্যান্য উপকরণ নিয়ে ভূস্বামীকে জানাবে বাৎসরিক সম্মান। আর প্রজাবৎসল ভূস্বামীও অনুগত কৃষক প্রজাকে নববস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে করবেন আপ্যায়ন। 'পঙ্গল' দক্ষিণ ভারতের অতি পবিত্র বৈদিক ও সামাজিক উৎসব। বাংলার নবান্নের মত দক্ষিণ ভারতের 'পঙ্গল' শস্যোৎসব। তবে উৎসবটির আচার অনুষ্ঠান অনুসারে ভূস্বামী ও কৃষকপ্রজার মিলন উৎসব বললেও অত্যুক্তি হবে না।

শস্য রোপণ, ফসল সংগ্রহ ও নতুন ফসলে তৈরি সামগ্রী গ্রহণ সারা পৃথিবীর সেরা ও প্রাচীন উৎসব। দেশ বিদেশেও এ উৎসবের আন্তরিকতা ও ব্যাপকতা কম নয়। জীবন ধারণের প্রধান বস্তু খাদ্য। খাদ্য সম্ভার আহরিত হয় প্রধানত: শস্য থেকে। প্রকৃতি এবং আধুনিককালে বিজ্ঞান ও মানুষের প্রচেষ্টা, ফসল উৎপা-দনের মুখ্য সহায়ক, সকল দেশে, সকল যুগে। এই ফসলকে আবাহন জানানো মানব সভ্যতার পরিচায়ক। তাই দেশে ও বিদেশে শস্য উৎসবের এই ব্যাপকতা।

ক্ষুদ্র দেশ জাপান নানা বিড়ম্বনার মধ্যেও অল্প কয়েক বছরের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ম্ভর তো হয়েছেই আবার ধান উৎপা-দনে পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থান লাভ করেছে। এই উদ্বৃত্ত ফসল তাঁদের স্বাবলম্বন ও শ্রমের দান। ফসল উৎপাদনের সাফল্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদা-পূর্ণ। জাপানের শস্যোৎসব 'মৌচি' জাতীয় উৎসব হিসেবে পালন করা হয়।

বিলাসী আধুনিক ফ্রান্সের প্রধান ফসল হ'ল আঙ্গুর। যথাসময়ে পরিপক্ক আঙ্গুর আহরণ শেষ হ'লে সবার সেরা ফসলটির সাফল্য-উৎসবের ঢেউ গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে।

পর্য্যাপ্ত কৃষিসম্পদ শিল্পোন্নতির সাফল্যের সহায়ক। কৃষি সম্প্রসারণ ও নিবিড়চাষ পদ্ধতি শস্য উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করে ও গড়ফলন বাড়ায়। উন্নত বীজ, প্রয়োজনমত রাসায়-নিক সার ও তার প্রয়োগ, পরিমিত সেচ, শস্যের কীট ও রোগ নাশক ঔষুধ ব্যবহার

এর পর ১২ পৃষ্ঠায়

দৃষ্টিহীনরাও স্বাভাবিক মানুষের সারিতে এসে দাঁড়াচ্ছেন

মানিক লাল দাস

আজকের কর্মব্যস্ত পৃথিবীতে স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে পা মিলিয়ে পা ফেলার জন্য মূক, বধির, অন্ধ অক্ষম মানুষেরাও এগিয়ে এসেছেন। স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় সীমিত সামর্থ্য নিয়ে, এমন কি অক্ষম হয়েও, এঁরা আজ আর পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে রাজী নন। এঁদের অনেকে নিজেদের চেষ্টায় বেশ খানিকটা স্বাবলম্বী হয়েছেন। এমন কি কলকারখানায় স্বাভাবিক মানুষের মত পুরোপুরি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন।

এঁদের মধ্যে দৃষ্টিহীনদের কথাই ধরা যাক। শরীরের ঐ ত্রুটির জন্য একদা এঁদের অন্যের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকতে হ'ত। এঁরা উপার্জন করতে পারেন বা স্বাবলম্বী হয়ে নিজেদের দায় নিজেরা বইতে পারেন এ কথা এই অল্পকাল আগেও কেউ ভাবতে পারতো না। কিন্তু ধীরে ধীরে পরিবেশ বদলেছে। দৃষ্টি-হীনদের অভিশাপ দূর করার জন্য বিজ্ঞানের কল্যাণ হস্ত প্রসারিত হয়েছে।

মেটালবক্স, এসোসিয়েটেড ব্যাটারী মেকার্স (ইস্টার্ণ) লিমিটেড, হিন্দুস্তান স্মল টুলস্‌, ন্যাশনাল কার্বণ কোম্পানী, ন্যাশনাল টোবাকো কোম্পানী, বেণী ইঞ্জি-নীয়ারিং লিমিটেড, ফিলিপস্‌ ইণ্ডিয়া লিমি-টেড, ডানলপ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, বৃটানিয়া বিস্কুট কোম্পানী প্রভৃতি কারখানার কাজে প্রায় ৩১ জনেরও বেশী দৃষ্টিহীনকে নিযুক্ত করা হয়েছে। এরা মাসে প্রায় ১০০ টাকা থেকে ৩৫০ টাকার মত উপার্জন করছেন। কারখানাগুলির কর্তৃপক্ষ নিশ্চ-য়ই এঁদের কাছ থেকে তাঁদের প্রয়োজনীয় কাজ ঠিক ঠিক পেয়ে যাচ্ছেন। অবশ্য ভারতের প্রায় ৪ লক্ষ দৃষ্টিহীনের (পশ্চিম-বঙ্গে দৃষ্টিহীনদের সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ) মধ্যে এই সামান্য অংশের কর্ম যোগাতা অসীম সাগরে একটা কুটোর মত। তবুও তাঁদের মধ্যে কিছু লোক তো স্বাবলম্বী? কারখানাতেই যে, শুধু তাঁরা কাজ করছেন তা নয়। লেখা পড়া, গান বাজনা, খেলাধূলা সব ক্ষেত্রেই দৃষ্টিহীনরা আজ এগিয়ে গেছেন।

কলকাতার গড়িয়া থেকে একটু দূরে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে দৃষ্টিহীনদের জন্য একটি বিদ্যায়তন রয়েছে। সেখানে গিয়ে চোখের সামনে তাঁদের কাজকর্ম, চলাফেরা দেখে নিশ্চিত হলাম। তাঁরা আমাদের থেকে কোন অংশেই কম নন। এই বিদ্যায়তনে ১০০ জনের শিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে ৮৯ জন ছাত্র কৃতিত্বের সঙ্গে তাঁদের শিক্ষা ও শিক্ষণ শেষ করেছে। ১৯৬৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে স্নাতক সাম্মানিক হয়েছেন একজন, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় দুজন প্রথম বিভাগে ও একজন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তাঁরা পিছিয়ে নেই। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে ডিস্টিংশন নিয়ে এই বছরে তিনজন ছাত্র উত্তীর্ণ হয়েছেন। এমন কি তাঁদের বার্ষিকী উৎসবে তাঁরা গান, বাজনা, লাঠি খেলা, নাটক প্রভৃতি বিষয়ে নিজেরাই অংশ গ্রহণ করে চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

এই বছরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন দৃষ্টিহীন ছাত্র সাংবাদিকতা পড়ার জন্য ভর্তি হয়েছেন। দৃষ্টিহীন সাংবাদিক ভারতে তথা অন্য কোনও দেশে কেউ আছেন কি না জানি না। এ ছাড়া সংসদীয় ক্ষেত্রেও এঁরা অনুপস্থিত নন।

বিদ্যায়তনের দৃষ্টিহীন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দাঁ কথায় কথায় জানালেন, আমরা সকলেই চেষ্টা করছি কিভাবে ছেলেদের উন্নতির পথ উন্মুক্ত করতে পারি। প্রতিষ্ঠানের শ্রীমদনমোহন কুণ্ডু অচিরে তিনজন মহিলার সঙ্গে আমেরিকায় যাচ্ছেন দৃষ্টিহীনদের সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে।

মিলিং মেসিনে কর্মরত একজন দৃষ্টিহীন

আমরা যাঁরা শারীরিক ত্রুটি থেকে মুক্ত, সেই আমরা যদি এগিয়ে গিয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়াই দৃষ্টিহীনদের মনে আরও আস্থা আসবে। তাঁদের মনোবল বৃদ্ধি পাবে তাঁরা আরও উন্নতি করতে পারবে। অবশ্য তার জন্য সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন অত্যাবশ্যক।

বাংলার গ্রাম রাধানগর

শৈলেশ চট্টোপাধ্যায়

যে মহান সমাজ সংস্কারকের অক্লান্ত প্রয়াসের ফলে ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা বেআইনী বলে ঘোষিত হয়, তাঁর নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। আজ থেকে প্রায় পৌনে দু'শো বছর আগে বাংলার রঘুনাথপুর গ্রামে একটি সদ্যবিধবা কিশোরীকে সতীদাহ প্রথা অনুযায়ী জীবন্ত চিতায় তুলে দেওয়া হচ্ছিল। ঢাক ঢোলের প্রমত্ত রোলের মধ্যেও সেই অভাগীর যন্ত্রণাবিদ্ধ কন্ঠস্বর গিয়ে পৌঁছয় একটি বালকের শ্রবণে। সেই বালকটি কিশোরীর দেবর। সেই-খানে দাঁড়িয়ে সেই বালক সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের সংকল্প গ্রহণ করেন এবং সেই ব্রত উদ্‌যাপন করতে সক্ষম হন, উইলিয়াম কেরী, রাম রাম বসু ও লর্ডবেন্টিঙ্কের সাহায্যে।

এই যুগ প্রবর্তক রামমোহন রায় জন্মেছিলেন খানাকুল কৃষ্ণ নগরের সীমার মধ্যে, রাধানগর গ্রামে, রামকান্ত রায়ের ঘরে। সেই শুভদিনটি ছিল ১৭৭৪ খৃঃ ১০ই মে। তাই রাধানগর একটা নগণ্য সাধারণ গ্রাম হলেও রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান হিসেবে স্থানটি প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

রাধানগর, হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত খানাকুল থানা এবং খানাকুল ১নং ব্লকের অধীন খানাকুল কৃষ্ণ নগরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই গ্রামটিই পশ্চিম রাধানগর নামে পরিচিত। রাধানগরের তিন মাইল দূরে ছত্র-শাল রাধানগর নামেও আর একটি গ্রাম আছে বর্তমানে রাধানগর গ্রামটি কানা দ্বারকেশ্বর নদীর পূর্ব তীরে এবং এর পশ্চিমে কৃষ্ণ নগর অবস্থিত। এককালে এই কানা দ্বারকেশ্বর দিয়ে যাতায়াত করত ছোট-বড় বাণিজ্য বহর। অবশ্য কানা দ্বারকেশ্বর নদীর সে রূপ আজ আর নেই। এখন সেটি একটি ছোট খালের আকার ধারণ করেছে। সেকালে রাধানগরে যাওয়া আসারও খুবই কষ্ট ছিল। রাধানগর থেকে তারকেশ্বরের দূরত্ব প্রায় ২৪ মাইলের মত। সেই তারকেশ্বর থেকে দামোদর পেরিয়ে পুড়শুড়া এবং সেখান থেকে সামন্তরোড দিয়ে, কাঁচা রাস্তা পায়ে হেঁটে বা গরুর গাড়ীতে পেরোতে হত। বর্ষাকালে তো কোন কথাই নেই। সাউথ ইস্টার্ণ রেলপথে হাওড়া থেকে কোলঘাট। সেখান থেকে স্টীমারে রাণীচক এবং রাণীচক থেকে আবার নৌকায় গড়ের ঘাট। এখান থেকে আট মাইল হাঁটা পথে (কাঁচা রাস্তা) রাধানগর যাওয়া আসা করতে হতো এবং সময়ও লেগে যেত প্রায় এক-দিনের মত। সাধারণ লোকের পক্ষে যাতায়ত খুবই কষ্টকর এবং ব্যয়সাধ্য ছিল। এ ছাড়া পথে ঘাটে অজস্র বিষধর সাপ, বন জঙ্গলের ঝোপে ঝাড়ে নেকড়ে ও হায়েনার উৎপাত এবং ঠগী ও ঠ্যাঙাড়েদের উপদ্রবে পথিককে সশংকিত থাকতে হ'তো।

ওপরে : রামমোহন রায়ের স্মৃতিমন্দির : রাধানগর

পাশে : রাধাবল্লভ জীউর মন্দির : কৃষ্ণনগর—খানাকুল

নীচে : গোপীনাথ জীউর মন্দির : কৃষ্ণনগর খানাকুল

যে যুগ পাল্‌টেছে, এখন রাধানগরে যাওয়া আসার কোন কষ্ট নেই। বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তির সঙ্গে যে দামোদরের নাম আজও জড়িত, সেই দামোদর আজ সহজেই পার হয়ে যাওয়া যায়। সরকারী পরিকল্পনায় এর ওপর তৈরি হয়েছে সুন্দর পাকা সেতু নাম বিদ্যাসাগর সেতু। এ ছাড়া হরিণখোলায় মুণ্ডেশ্বরী নদীর ওপর রয়েছে কাঠের সেতু। কলকাতা থেকে তারকেশ্বর মাত্র ৩৫ মাইল এবং তারকেশ্বর থেকে রাধানগর ও ২৪ মাইল। মুণ্ডেশ্বরী পার হয়ে মায়াপুর, সেখান থেকে রামনগর, তার পর রামনগর থেকে রিক্সা বা পায়ে হেঁটে রাধানগর গ্রাম প্রায় দু' মাইল। সরকারী পরিকল্পনায় তৈরি হয়েছে তারকেশ্বর থেকে পাকা রাস্তা। মুণ্ডেশ্বরীর ওপর রামমোহন সেতু নির্মাণের কাজ চলছে। এ ছাড়া আছে দ্বারকেশ্বর নদীর ওপর রামকৃষ্ণ সেতু।

এখানে রাজা রামমোহন রায় স্মৃতি মন্দির হ'ল রাজা রামমোহন মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার। রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি সংরক্ষণ করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানও আছে। রাধানগরে রামমোহন রায় যে ঘরে জন্মেছিলেন সেই ঘর আজ আর নেই বটে, তবে, সেখানে একটি উচুঁ বেদী তৈরি করে তাঁর জন্মস্থান চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। একই কিছু দূরে তৈরি হয়েছে রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয় এবং ছাত্রাবাস। সরকার পরিচালিত বুনিয়াদি শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রও রয়েছে।

আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চল দিয়ে বিভিন্নদিকে পাকা পিচের রাস্তাঘাট তৈরি হওয়ায় ঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুর, পাঠান রাজত্বের ঐতিহ্যময় গড় মান্দারণ এবং তার কাছেই দুর্গেশনন্দিনীর মধুমিলন তীর্থ শৈলেশ্বরের শিব মন্দির, সারদা মায়ের জন্মস্থান জয়রাম বাটী, বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া, ঘাটাল, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও দীঘায় যাতায়াত সুগম হয়েছে।

এক সময়ে খানাকুল কৃষ্ণনগর সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বাংলা দেশে প্রসিদ্ধ ছিল। দক্ষিণ রাঢ়ের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও এখানকার বিদ্যৎসমাজের প্রতিপত্তি ছিল তখনকার দিনে খুব বেশী। বিদ্যাসাগরের পিতৃকুল ও মাতৃকুল এই খানাকুল বিদ্যৎসমাজের পরিবেশের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছিল।

কৃষ্ণনগরে অভিরাম গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ জীউ ও তাঁর মন্দির একটি দর্শনীয় জিনিস। এই রূপ সুবৃহৎ মন্দির বাংলা দেশে খুব অল্পই আছে। এ ছাড়া কৃষ্ণনগরে যাদবেন্দু রায় প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভ জীউর মন্দির প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। বর্তমান মন্দিরটি ১৬১৮ শকাব্দে মাধবপুরের রায় বংশীয়গণ করে দেন। শোনা যায় এঁর পুরাতন মন্দিরটি নসীরাম সিংহ করে দিয়েছিলেন। আজও সেখানে রয়েছে রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ। এখানকার রাসপূর্ণিমা, স্নানযাত্রা, জন্মাস্টমী ও রথযাত্রার মেলার বেশ নাম আছে। এখানকার অন্নকূট মহোৎসব খুব সুপ্রসিদ্ধ।

রাধানগর এবং খানাকুল কৃষ্ণনগরের দেড় মাইল দূরে রঘুনাথপুরের কানা দ্বারকেশ্বর শ্মশানে রামমোহনের ভ্রাতৃজায়াকে তাঁরই চোখের সামনে সতীদাহের প্রথা অনুযায়ী চিতায় তুলে দেওয়া হয়েছিল। বেদনায় অভিভূত হয়ে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের ব্রত গ্রহণ করলেন রামমোহন। পাশে এসে দাঁড়ালেন উইলিয়ম কেরী, এগিয়ে এলেন রাম রাম বসু ও সাহায্য করলেন লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেণ্টিঙ্ক এই প্রথা আইন বিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন। নারী জাতীর মুক্তির জন্য রাজা রামমোহন রায়ের অসাধারণ পরিশ্রম সার্থক হ'ল। তিনি প্রচলিত সমাজের সংকীর্ণ বিধান ভেঙ্গে কুল লক্ষ্মীদের দেখালেন মুক্তির আলো।

গোপাল চন্দ্র দাস

৯ পৃষ্ঠার পর

ইত্যাদি উচ্চ ফলনশীল শস্য চাষের সম্পূরক। তা ছাড়া প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সদ্ব্যবহার করে যে দেশটি আজ কৃষি শিল্প ও ধন সম্পদে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেই দেশটি হ'ল আমেরিকা। অগুলি অনুষ্ঠান (THANKS GIVING) তাদের একটি বিশেষ জাতীয় উৎসব। অঞ্জলী অনুষ্ঠান' আমেরিকার ফসল তোলার উৎসব। আমাদের দেশে সাধারণতঃ পাড়াগাঁয়ের কৃষক পরিবারের মধ্যেই নবান্ন বেশী প্রচলিত। কিন্তু নভেম্বর মাসের ৪র্থ বৃহস্পতিবার' দিনটি আমেরিকার প্রতি পরিবারে 'ফসল তোলার উৎসব' হিসেবে পালন করা হয়। এই জাতীয় উৎসব উপলক্ষ্যে আমেরিকার সকল সরকারী অফিস, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি ছুটি থাকে।

সব রকম দুর্যোগ উপেক্ষা করে বহু পরিশ্রমে দেশ বিদেশের চাষী ভাইরা ফসল ফলান। এভাবে ফসল আহরণ বা গ্রহণের শুভদিনটি সকল দেশেই চিরদিন পবিত্র থাকবে। ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আয়র্ল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশেও খাদ্যশস্য তোলা হলে সেখানকার চাষী ভাইরা শস্য মজুরী দিয়ে যে মূর্তি তৈরী করেন, পবিত্র খৃষ্ট মাসের সকাল পর্যন্ত তা সযত্নে তুলে রাখেন তাঁদের ঘরে। ইংল্যাণ্ডের অনেক গৃহস্থ পরিবার নতুন ফসলের পবিত্র রুটি দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করে থাকেন। প্রাচীন সভ্যদেশ গ্রীস ও রোমে 'ফসল কাটা' উপলক্ষে আনন্দ উৎসব করা প্রচলিত। সে কালের রোম্যানরা তাঁদের নতুন ফসল উৎসব "সিরিয়ালিয়া" উপলক্ষে দেবতা সিবেসের সম্মানে ভোজ সভার ব্যবস্থা করতেন।

গ্রীকরা শস্যেরলক্ষ্মী ডেমিটা ও তাঁরকন্যা পারসিফোনএর নিকট সমবেত উপাসনা করতেন সুফসল লাভের জন্য।

রুটি বা অন্ন মানব জীবনের ক্ষুধার সুধা। মেহনতের ফসল মুখে তোলার আগে দেশ বিদেশে জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মনেই শস্যের দেবতাকে শ্রদ্ধা জানানোর আকুতি জেগে ওঠে।

অবিরাম চাষ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য সমস্যার সুরাহা করার জন্য এবং দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য সুষম খাদ্যের সংস্থান করার উদ্দেশ্যে সীমিত আয়তনের জমিতে কতভাবে এবং কত বেশী পরিমাণে খাদ্যোৎপাদন করা যায়, পৃথিবী জুড়ে আজ তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। আমাদের দেশেও বিভিন্ন অঞ্চলে সেই পরীক্ষা চলেছে। এই পরীক্ষার একটা অঙ্গ হ'ল 'রিলে ক্রপিং'। একই জমিতে একাধিক ফসল ফলাবার পরিকল্পনা কার্যকর করার পদ্ধতি আজ কৃষক সমাজে বেশ সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। তারমধ্যে 'রিলে ক্রপিং-এর বৈশিষ্ট্য একটু অন্যরকম। 'রিলে রেসে' একজন দৌড় দেবার আগেই যেমন অন্যজন দৌড় সুরু ক'রে দেন তেমনি একটি ফসল ক্ষেত থেকে ওঠার আগেই আরেকটি শস্যের চাষ সুরু হয়ে যায়। একটি ফসল শেষ হবার পরে মাটি তৈরি করে নতুন করে চাষবাসের ব্যবস্থা করার জন্য যে সময়ের দরকাব, এই ধরণের চাষে তার প্রয়োজন নেই। এই ফসল বস্তুত: পক্ষে 'রিলে' করছে অন্য ফসলকে। এরই বাংলা নাম কেউ কেউ দিয়েছেন 'অবিরাম চাষ'।

তাইনাং, তাইচুং চাষের মত এই অবিরাম চাষ পরীক্ষাও আমাদের দেশে প্রধানত আমদানী করা একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতির চাষে সফল হবার ওপর সবুজ বিপ্লবের অগ্রগতি নির্ভর করছে।

জনসাধারণকে পরীক্ষামূলক ভাবে ব্যাপকভাবে, 'অবিরাম চাষে' নামানোর উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ সরকারী খামারে এই পরীক্ষা সুরু করেছেন। হুগলী জেলার সিঙ্গুরে, ধনিয়াখালী ও আদি সপ্তগ্রামে অবিরাম চাষ প্রকল্প অনুযায়ী মটরশুঁটি, সরিষা, কপি, মুসুরী, রাঙা আলু, টোমাটো ও ছোলা প্রভৃতি চাষের পরীক্ষা প্রায় সাফল্যমণ্ডিত বলা চলে।

একান্তভাবে কৃষিনির্ভর ভারতে, এ যাবৎ কৃষির দুটি মরসুম ছিল। একটি খারিফ বা বর্ষার মরসুমী চাষ অন্যটি রবি বা শীতকালীন চাষ। এই দুটি মরসুমের বৃত্ত ভেঙ্গে আরও দুটি অর্থাৎ মোট চারটি বৃত্ত তৈরি হয়েছে। খারিফ বা আমন ধানের মরসুম শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আরও একটি মরসুম সুরু হয়ে শীতের রবি মরসুমের মাঝামাঝি শেষ হচ্ছে। অন্যটি রবি মরসুম শেষ হবার আগেই সুরু হয়ে খারিফ মরসুমের প্রারম্ভে শেষ হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ একই জমিতে চার ধরণের শস্য উৎপাদন করা যাচ্ছে। এই পরীক্ষায় পূর্ণ সাফল্য অর্জন করে কৃষক গোষ্ঠিকে এই নতুন কৃষি পদ্ধতিতে ঠিক মত দীক্ষিত করতে পারলে ফসল ফলানোর চিরাচরিত ধারা একেবারে ওলোট পালোট হয়ে যাবে। বর্তমানে সরকারী খামারে, খারিফ ও রবির মধ্যবর্তী নূতন মরসুমটিতে চাষ করে কৃষি বিভাগ আশাতিরিক্ত সাফল্য অর্জন করেছে।

'অবিরাম চাষ' সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞান ভিত্তিক ও উন্নততর কৃষি পরিকল্পনা। যেমন ট্র্যাডিশন অনুযায়ী আমন চাষে ধানের চারা যে ভাবে রোপণ করা হয় সেভাবে করলে অবিরাম চাষ হবে না। লাইন করে ধান রোয়া এই চাষের একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ। আমনের ফসল কেটে ঘরে তুলতে সাধারণত অগ্রহায়ণ মাস শেষ হয়ে যায়। সেই ধান কাটার পরে অন্য ফসলের জন্য জমি তৈরি করতে সাধারণত: আরও মাস খানেক সময় লেগে যায়। কিন্তু ততদিনে মাটির প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা থাকে না। ফলে চাষ করা যায় না। কিন্তু লাইন করে ধান রোপণ করলে দুটি লাইনের মাঝে মাঝে আশ্বিনের শেষ বা কার্তিকে পাশি বা ছোট কোদালের সাহায্য মাটি কুপিয়ে সেখানে কপি, মটরশুঁটি সরিষা, মুসুরী, টম্যাটো-সবই লাগানো যায়। ফলে ধান কাটার আগেই ঐ সমস্ত গাছ বেড়ে ওঠে। তারপর ধান কাটা, তোলা, শেষ করে সমস্ত জমিকে কুপিয়ে টম্যাটো বা কপি গাছের গোড়ায় মাটি ধরিয়ে দিয়ে ভাল ফলনের আশা করা যেতে পারে। এটা গেল খারিফ ও রবি মরসুমের মাঝামাঝি বাড়তি ফলন নেওয়া। আবার রবি ও খারিফের মধ্যেও একটি মধ্যবর্তী মরসুম সৃষ্টির চেষ্টা চলেছে আদিসপ্তগ্রামের খামারে। সেখানকার খামারে বিস্তীর্ণ আলুর জমিতে (আলু চাষ লাইনেই হয়) সয়াবীনের গাছ চমৎকার তৈরি হয়ে উঠছে। আলু তোলার পরে সয়াবীনের পরিচর্যা নতুনভাবে করা হবে। এর পর খারিফে, ঐ জমিতে উচ্চ ফলনশীল জয়া, বা আই আর-৮ প্রভৃতি লাগান হবে, তবে তার আগেই সয়াবীনের ফসল উঠে যাবে ঘরে।

এই খামারে এই সঙ্গে আর একটি বিষয় নিয়ে পরীক্ষা সুরু হচ্ছে। সেই অনুযায়ী আলাদা আলাদা জমিতে পরীক্ষা করা হচ্ছে যে, অবিরাম চাষে সেচ ও অসেচ জমির কার্যকারিতার পার্থক্য কি? এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, যে জমিতে সেচ দেওয়া হয়েছে তার ফসলের সঙ্গে কোনও ক্রমেই অসেচ জমির ফসল পাল্লা দিতে পারবে না।

দ্বিতীয়ত: সব আমনের জমিতে অবিরাম চাষ হবে না। ক্ষেত্র বিশেষে ধান থাকাকালীন চাষ হবে না। কারণ ধান থাকাকালীন অন্য ফসলের চাষে হাত দিলে ধান গাছ পড়ে গেলে অন্য ফসলের ক্ষতি হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বেঁটে সাইজের আই-আর-৮ জাতীয় ধানের চাষ করলে ধান গাছ পড়ে গিয়ে ক্ষেত ঢেকে ফেলার সম্ভাবনা থাকে না, অতএব সেখানে অবিরাম চাষ সম্ভব। পশ্চিম বাংলার সাধারণ ধান ঝিঙসাল, ঝলমা, নাগরা প্রভৃতি ধানের গাছ লম্বা হয় ও পড়ে যায় সাধারণত: আশ্বিনের শেষে। সে জন্যই সাধারণ চাষের ক্ষেতে অবিরাম চাষ চলবে না। সুতরাং অবিরাম চাষে সাফল্য পেতে হলে আমাদের দেশের প্রচলিত ধারা ভাঙতে হবে।

পল্লীর দারিদ্র্য থেকে সহরের দুঃখ দুর্দ্দশার মুখোমুখি

সহরেও নেই নিশ্চিত আশ্বাসের সম্ভাবনা

অনেক উন্নয়নশীল দেশেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে, অত্যধিক জনসংখ্যা, অন্যতম প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ার গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ব্যাপক কর্মহীনতার সৃষ্টি করেছে। পল্লী অঞ্চলে চাষের জমির অভাব এবং কৃষি ছাড়া আয়ের অন্য কোন উপায় না থাকাতে, কৃষক ও কৃষি শ্রমিকরা তাদের গ্রামের বাস ছেড়ে সহরের বস্তি অঞ্চলে এসে বাস করতে বাধ্য হন।

বর্ত্তমানে এশিয়ার বড় বড় সহরগুলি যে দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে তার একটা প্রধান কারণ হ'ল গ্রামাঞ্চলের অতিরিক্ত জনসংখ্যা সহরে এসে আশ্রয় খুঁজছে। সহরের সামাজিক সংস্থাগুলি অত্যন্ত উন্নত বলে পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীরা সেগুলির আকর্ষণে সহরের দিকে ছুটে আসেন এই মতবাদ যুক্তিসহ নয়। অনেক ক্ষেত্রেই পল্লীর দারিদ্র্যের জন্য বাধ্য হয়ে পল্লীবাসীরা সহরে ছোটেন, নাগরিক জীবনের জাঁকজমকে আকৃষ্ট হয়ে নয়।

পুরানো বড় বড় সহরগুলিতে, পল্লী অঞ্চল থেকে অবিরামগতিতে জনাগম হতে থাকায় সহরগুলি অত্যন্ত জনবহুল হয়ে পড়েছে। সহরগুলির অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে সেগুলি, পল্লী অঞ্চলের অকুশলী শ্রমিকদের জন্য আর জায়গা করে দিতে পারছেনা। আর সেইজন্যই সহরগুলির চারদিকে এবং ভেতরেও বস্তির সংখ্যা বাড়ছে। যাঁরা গ্রাম থেকে সহরে এসে ভীড় করছেন তাঁরাও এখানে এসে খুব লাভবান হচ্ছেন না। তাঁদের পল্লীর দারিদ্র্য বরং সহরের দুঃখ দুর্দ্দশায় পরিণত হয়েছে।

পশ্চিম জার্মানীর হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া ইনষ্টিটিউটের তুলনামূলক নগর উন্নয়নমূলক নীতি এবং পল্লী সমাজ বিভাগ, হাইডেলবার্গের, নগর কাঠামো এবং পল্লী সমবায় গবেষণা কেন্দ্রের সহযোগিতায় ভারতে যে পরীক্ষা চালান তার ভিত্তিতেই এই বিবরণী তৈরী করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িষ্যা ও বিহারে এই পরীক্ষা চালানো হয়। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম থেকেই পল্লী অঞ্চলে লোকসংখ্যা বাড়তে থাকায় এই সব জায়গা থেকে বিশেষ ক'রে ছোট নাগপুরের পাহাড়ী অঞ্চলের শাখাজাতিগুলি আর্থিক কারণে অন্যত্র যেতে বাধ্য হয়। এরা হাজারে হাজারে আসামের চা বাগানগুলিতে শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত হন এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে কাঠ কাটার কাজ নেন।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর আসামে জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় শ্রমিকের চাহিদা কমে যায় এবং ছোটনাগপুর থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকায় জনসমাগম বাড়তে থাকে। বিশেষ করে কলিকাতাই পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান লক্ষ্য স্থল হয়ে দাঁড়ায়। এই সঙ্গে পূর্ব্ব বঙ্গের উদ্বাস্তরাও কলিকাতায় আসতে থাকেন। ফলে কয়েক বছরের মধ্যে এই পুরাণো রাজধানীটিতে জনসংখ্যা ভীষণ বেড়ে গেল আর তাতে বস্তির সংখ্যাও যেমন বাড়তে লাগলো, তেমনি বেকার সমস্যা ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা নাগরিক জীবনের শান্তি নষ্ট করতে লাগলো।

এই সব জনবহুল অঞ্চলগুলিকে সাহায্য করার জন্য পরিকল্পনা কমিশন চেষ্টা করেন। আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্পর্কে যে সব প্রকল্প গ্রহণ করা হয় সেগুলিকে সম্প্রসারিত ক'রে, স্থানীয় পর্য্যায়ে ভারী শিল্পের প্রয়োজন মেটানো এবং পূর্ব্ব ভারতের বিপুল পরিমাণ কয়লা ও ধাতু আকর ব্যবহার করার ব্যবস্থা করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন তাঁদের এই প্রচেষ্টা থেকে দুই ধরনের লাভ পাবেন বলে আশা করেছিলেন। একটা হ'ল, ভারতের ইস্পাতের আমদানির ওপর নির্ভরতা হ্রাস পাবে এবং জনবহুল অঞ্চলের গ্রামবাসীরা কৃষি ছাড়া অন্য আর একটা আয়ের পথ পাবেন। দশ বছরের মধ্যেই (১৯৫৫-৬৬), বছরে ৪০ লক্ষ টন অশোধিত লৌহ উৎপাদনে সক্ষম এই রকম তিনটি ইস্পাত কারখানা, কয়েকটি ভারী ইঞ্জিনিয়ারীং কারখানা এবং আরও অনেক শিল্প গড়ে তোলা হয় এবং সেগুলিতে কাজ সুরু হয়ে যায়।

দেশে যখন চিরকালীন খাদ্যাভাব সেই অবস্থায় আঞ্চলিক শিল্পায়ণ যুক্তিসঙ্গত কিনা সে সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। সংবাদপত্রে এমন কি সংসদেও বলা হয় যে কৃষিকে উপেক্ষা ক'রে ভারতে শিল্পোন্নয়ন করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই দেশে খাদ্যাভাব দেখা দেয় বলে সরকারের সমালোচনা করা হয়। ভবিষ্যতে যাতে শিল্পের পরিবর্ত্তে লগ্নির ক্ষেত্রে কৃষিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয় সেই সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হয়। ভারতে কৃষকরা উপেক্ষিত হচ্ছেন বলে রব তোলা হয়।

এই মতবিভেদকে একটা প্রকৃত তথ্যমূলক আলোচনায় রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে ভারী শিল্পের নতুন কেন্দ্রে দক্ষিণ বিহার ও ওড়িষ্যায় একটা গবেষণামূলক অনুসন্ধান চালানো হয়। এখানে ছোট নাগপুরের অত্যন্ত জনবহুল পাহাড়গুলির মধ্যে অবস্থিত রাউরকেলায় পশ্চিম জার্মানীর বৈদেশিক সাহায্য কর্মসূচী অনুযায়ী নতুন একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়েছে। কারখানাটির সঙ্গে এখানে প্রায় দেড় লক্ষ অধিবাসীর একটি সহর এবং চতুর্দ্দিকে আরও কতকগুলি সাহায্যকারী শিল্প সংস্থা গড়ে ওঠে। এখানেই এত বড় একটা ইস্পাত কারখানা স্থাপনের কারণ হল, এর চারদিকে প্রায় ১০০ কিলোমীটারের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ কয়লা, লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ আকর এবং চুনাপাথর রয়েছে। তাছাড়া ভারতের দুটি প্রধান বন্দর কলিকাতা ও বোম্বাই যে রেলপথে যুক্ত, কারখানাটি সেই রেলপথেরই ধারে স্থাপন করা হয়েছে।

এখানকার অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক

অবস্থা যদিও ভারী শিল্পস্থাপনের পক্ষে অনুকূল ছিল, কিন্তু সামাজিক ও অন্যান্য পরিস্থিতি ছিল জটিল এবং শিল্পের পক্ষে প্রতিকূল। সমগ্র জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ হ'ল আদিবাসী এবং এরা কোন রকম শিল্পোয়ন, সহজমনে নেবেন কিনা সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তবে পরিকল্পনা কমিশন এতে সায় না দিয়ে রাউরকেলাতেই ভারী শিল্পের নুতুন কেন্দ্র স্থাপন করতে বলেন। তাঁরা বলেন যে, যে সব জিনিস অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী সমাজ ব্যবস্থাতেও, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব ক'রে তুলতে পারে সেগুলির মধ্যে শিল্প হল অন্যতম।

এই শিল্পায়ণের ফলে গ্রামগুলির সমাজে এবং কৃষি অর্থনীতিতে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে তাই ছিল পরীক্ষার প্রধান দুটি বিষয়। ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এই পরীক্ষা চালানো হয়।

এই পরীক্ষায় প্রথম যে আশ্চর্য্যজনক ব্যাপারটা জানা গেছে তা হ'ল, কারখানার কর্ম্মীদের মধ্যে আদিবাসীদের অনুপাত। বর্ত্তমানে স্থায়ী পদগুলিতে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের মধ্যে শতকরা ১২ জন হলেন আদিবাসী এবং শতকরা ১৮ জন স্থানীয় অধিবাসী। অস্থায়ী কর্ম্মচারী হিসেবে এবং সহরাঞ্চলের অন্যান্য কাজে যাঁরা ব্যাপৃত আছেন তাঁদের মধ্যে তিন চতুর্থাংশই হলেন স্থানীয় গ্রামগুলির অধিবাসী। তাছাড়া পল্লীর অধিবাসীরা বিনা দ্বিধায় কারখানাগুলিতে কাজ করছেন। এঁরা মাসিক মোটামুটি ১৮১ টাকা আয় করছেন। ইস্পাত কারখানায় অকুশলী কর্ম্মীদের মাইনের হার হল মাসিক ৮০ টাকা থেকে ১৭৫ টাকা। এতেই বোঝা যায় যে বেশীর ভাগ ইস্পাত কর্ম্মী শিক্ষানবীশের পর্য্যায় ইতিমধ্যেই পেরিয়ে গিয়ে কুশলী কর্ম্মীতে পরিণত হয়েছেন। এর অর্থ হল কয়েক বছরের মধ্যেই হাজার হাজার অশিক্ষিত বা সামান্য শিক্ষিত পল্লীবাসীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং তাঁরা আধুনিক একটা ইস্পাত কারখানায় আধুনিক কায়দায় কাজ করতে শিখে গেছেন।

প্রধান খাদ্যের (চাউল) ক্ষেত্রে কৃষক পরিবারগুলি কতখানি স্বয়ম্ভর সেই হিসেবে এখানকার জনবাহুল্য পরীক্ষা করে দেখা হয়। যে কৃষকরা তাঁদের জমি থেকে সারা বছরের জন্য প্রয়োজনীয় চাউল পেয়ে যান তাঁরা গ্রামে, আয়বৃদ্ধির অন্য উপায় আছে কিনা সে সম্পর্কে চিন্তা করেননা অথবা গ্রামের বাইরে গিয়েও আয় বাড়াবার চেষ্টা করেন না। রাউরকেলার আশে পাশে ভেতরের দিকের গ্রামগুলিতে শতকরা মাত্র ১২ টি পরিবার, তাদের জমি থেকে সারা বছরের ধান পান আর শতকরা ৫০ টি পরিবারের ৬ মাসের প্রয়োজনের মতো ধানও ঘরে আসেনা। এই থেকেই এই অঞ্চলের জনবাহুল্য প্রমাণিত হয়।

পরীক্ষা নীরিক্ষার পর দেখা গেছে যে, জনবহুল অঞ্চলগুলিতে কেবলমাত্র কৃষি উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনাই যথেষ্ট নয়। যাঁদের যথেষ্ট জমি আছে তাঁরাই শুধু এই ধরণের পরিকল্পনাগুলির ফলে উপকৃত হন, দরিদ্র চাষীদের লাভ হয়না। এর ফলে পল্লীর সমাজগুলিতেই আয়ের অসমতা বাড়ে। ধনীরা বেশী ধনী হন, দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হন। কাজেই জন বহুল অঞ্চলগুলির আর্থিক উন্নয়নের জন্য যুক্ত কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করা উচিত।

এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামগুলির জনসংখ্যা বর্ত্তমানে এমন একটা পর্য্যায় ছাড়িয়ে গেছে যে কেবলমাত্র কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতি সম্ভব নয়। এর একটা বিকল্প ব্যবস্থা হ'ল আঞ্চলিক শিল্পায়ণ। এই ব্যবস্থা তিন দিক দিয়ে পল্লীর দারিদ্র্য প্রতিরোধ করতে পারে। প্রথমতঃ ভূমিহীন কৃষকরা এগুলি থেকে অতিরিক্ত আয় করতে পারেন, দ্বিতীয়তঃ কৃষি উৎপাদন বাড়াবার জন্য অতিরিক্ত মূলধন লগ্নি করা যায়, তৃতীয়তঃ কৃষি সামগ্রীর জন্য ভালো একটা বাজারও সৃষ্ট হয়। এতে দূরের গ্রামগুলির কৃষকরাও তাদের কৃষির ওপর কোন রকমে নির্ভরশীল হয়ে থাকবেন না। শিল্পকেন্দ্রের পক্ষে উপযোগী শস্যাদি উৎপাদন করে নিজেদের আয় বাড়াতে পারবেন। কৃষি থেকে যদি যথেষ্ট আয় হয় তাহলে গ্রামগুলি থেকে সহরের দিকে জনাগমের পরিমাণও কমবে। গ্রামের দারিদ্র্যকে এড়াতে গিয়ে তাঁরা সহরের দুর্দ্দশার সম্মুখীন হবেন না।

(ইংরাজী যোজনায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের অনুসরণে)

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোয়ন

২ পৃষ্ঠার পর

অনেক সংস্থাই দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ পাওয়ার অসুবিধের কথা উল্লেখ করেছে। এরাও যাতে পশ্চিম বঙ্গ অর্থ কর্পোরেশন থেকে ঋণ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা উচিত এমন কি এরা কোন বিশেষ সুবিধে পেতে পারে কিনা তাও বিবেচনা করে দেখা উচিত। শিল্প আইন অনুযায়ী রাজ্য থেকে মূলধনের জন্য যে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে তা যদি কোন একটি সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত করা যায় তাহলে রাজ্যের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির প্রয়োজন সম্পর্কে মোটামুটি আভাস পাওয়া যেতে পারে।

শিল্প সংস্থাগুলির সমস্যা ও অসুবিধেগুলি যথাসময়ে যথাস্থানে পৌছে দেওয়ার জন্য এবং এগুলির সঙ্গে সংযোগ রাখার উদ্দেশ্যে সর্ব্ব সময়ের জন্য শিল্প এলাকাগুলিতে একজন ম্যানেজার থাকা উচিত। শিল্প এলাকাগুলির সমস্যা সমাধান করার জন্য এদের কাঁচামালের, আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন ইত্যাদি মধ্যে মধ্যে পর্য্যালোচনা করার জন্য সদর দপ্তর পর্য্যায়ে, সর্ব্বক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে অন্ততঃপক্ষে একজন করে ডেপুটি ডাইরেক্টার থাকা উচিত।

শিল্প এলাকাগুলির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যখন অন্যান্য সংস্থা রয়েছে তখন এগুলির দৈনন্দিন পরিচালনার ভার সরকারের নেওয়ার প্রয়োজন নেই। অনেক সংস্থা নিজেদের নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন করতে ইচ্ছুক, কতকগুলি আবার পশ্চিম বঙ্গ শিল্পোয়ন কর্পোরেশনের মত সংস্থা পছন্দ করে। এই দুটির মধ্যে কোনটা শিল্প সংস্থাগুলির পক্ষে গ্রহণযোগ্য তা সরকার পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

ইঞ্জিনীয়ারিং-এর টুকিটাকি

ভারতের বৃহত্তম ট্রান্সফর্মার

ভূপালের হেভি ইলেকট্রিক্যালস দেশের বৃহত্তম জেনারেটার ট্রান্সফর্মার তৈরি করে তাদের অগ্রগতির আর একটা প্রমাণ দিয়েছে। ২৫০,০০০ কেভিএ, ২৩০।২১ কেভি ওএফ ডবুিউর এই বিরাট আকারের প্রথম জেনারেটার-ট্রান্সফর্মারটি, কোটাস্থিত রাজস্থান পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

ট্রান্সফর্মারের কোরটির ব্যাসার্দ্ধ হ'ল এক মীটারেরও বেশী এবং ক্ল্যাম্প করার জিনিসপত্রসহ ওজন হল প্রায় ১০০ মেট্রিক টন। এটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৭ মীটার এবং উচ্চতা ৩.৫ মীটার। তৈরী করার পর এটিকে সোজা অবস্থায় রাখার জন্য বিশেষ ধরণের যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করতে হয়।

এই ট্রান্সফর্মারটি তৈরি করার সমস্ত প্রশংসা দেশের এঞ্জিনীয়ার ও যন্ত্রকুশলীদেরই প্রাপ্য। ১ এম ভিএ, ৩৩ কেভি শ্রেণীর ট্রান্সফর্মার তৈরী করার জন্য ১৯৬১ সালে হেভি ইলেকট্রিক্যালস কারখানায় প্রথম কাজ সুরু করা হয়। মাত্র আট বছরের মধ্যেই এখানকার কর্ম্মীরা যে বৃহত্তম আকারের ও ভোল্টেজের ট্রান্সফর্মারের নক্সা তৈরি ক'রে সেটি নির্মাণ করতে সক্ষম হলেন তা তাঁদের কুশলতারই পরিচয় দেয়।

এই রকম বিরাট আকারের ট্রান্সফর্মারের নক্সা তৈরি করার সময় প্রথমেই পরিবহণের সমস্যার কথা চিন্তা করতে হয়। ট্রান্সফর্মারটির পরিবহণ ওজন ১৬৭ মেট্রিক টন হবে বলে এমন একটা ওয়াগান খুঁজতে হয় যাতে এটি বহন করা যায়। এর জন্য দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের ১৮০ টনের ওয়েল ওয়াগনটিই একমাত্র উপযুক্ত ওয়াগন বলে বিবেচিত হয় এবং ভূপাল থেকে যাতে কোটায় পাঠানো যায় সেই রকম ভাবে, ওয়াগনের মাপ অনুযায়ী এটির নক্সা তৈরি করা হয়।

ফ্লাক্সো প্যাকার প্রথম রপ্তানী করা হচ্ছে

সর্ব্বপ্রথম যে ফ্লাক্সো প্যাকারটি বিদেশে রপ্তানী করা হয়েছে সেটি সম্প্রতি ইটালীতে পাঠানো হয়েছে।

ফ্লাক্সো প্যাকার হ'ল সিমেন্ট প্যাক করার একটি রোটারি মেসিন। এটি অত্যন্ত জটিল একটি মেসিন এবং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তৈরি করতে হয়। ফ্লাক্সো প্যাকারের স্বয়ংচালিত ব্যবস্থার মাধ্যমে সিমেন্ট ওজন করা, ব্যাগে ভরা এবং বন্ধ করার কাজ সম্পূর্ণ হয়। একজন মেসিন চালক একলা প্রতি ঘন্টায় প্রায় ২০০০ ব্যাগ সিমেন্ট ভরতে পারেন। সিমেন্টের হিসেবে, প্রতিটি ব্যাগে সঠিক ওজনে প্রতি ঘন্টায় ১০০ টন সিমেন্ট ভরা যায়।

কোপেনহেগেনের স্মিথ এ্যাণ্ড কো: এই মেসিনের মূল নক্সা তৈরি করে। এই বিখ্যাত সিমেন্ট কারখানাটির সহযোগীতায়, লারসেন এ্যাণ্ড টুবরো লিমিটেড তাঁদের পাওয়াই কারখানায় দেশেই এই মেসিনটি তৈরী করে।

দেশে বাড়ী ইত্যাদি তৈরির কাজ বেড়ে যাওয়ায় এবং সিমেন্ট কারখানাগুলির আকার বেড়ে যেতে থাকায় বর্ত্তমানে এই ফ্লাক্সো প্যাকারের চাহিদা বেড়ে চলেছে। প্যাক করার জন্যে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্যাকিং মেসিনের প্রয়োজনীয়তা বেশী বেড়ে যাওয়ায় দেশের বড় বড় সিমেন্ট কারখানাগুলিতে ফ্লাক্সো প্যাকার বসানো হয়েছে।

ভবিষ্যতে যে এই মেসিনের চাহিদা আরও বাড়বে তার প্রমাণ হ'ল মেক্সিকোতে শিগগীরাই আরও তিনটি এই মেসিন রপ্তানী করা হচ্ছে।

এল. পি. জি. বুলেট

বারসেইন, ইনডেইন এবং ক্যালগ্যাস ব'লে পরিচিত তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এল পি জি) জ্বালানী হিসেবে গৃহস্থদের বাড়ীতে যেমন জনপ্রিয় উঠছে তেমনি শিল্পের ক্ষেত্রেও এই গ্যাস ক্রমশ: বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে।

ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস্ লিমিটেডের, উচ্চ চাপের বয়লার তৈরির কারখানা, এল পি জি বুলেট অর্থাৎ তরল গ্যাস রাখার বয়লার তৈরি করেছে। ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের (গুজরাট শোধনাগার) ১৩২ কিউবিক মীটার তরল পেট্রোলিয়াম এগুলিতে রাখা যাবে।

এই রকম প্রতিটি বুলেটের ওজন হল প্রায় ৪০ টন। বিদেশ থেকে বয়লারের জন্য যে ইস্পাতের পাত আমদানি করা হয় তা থেকে ইস্পাতের পাত বেছে নিয়ে তা দিয়ে এই বুলেটের আকারের আধার তৈরি করা হয়েছে।
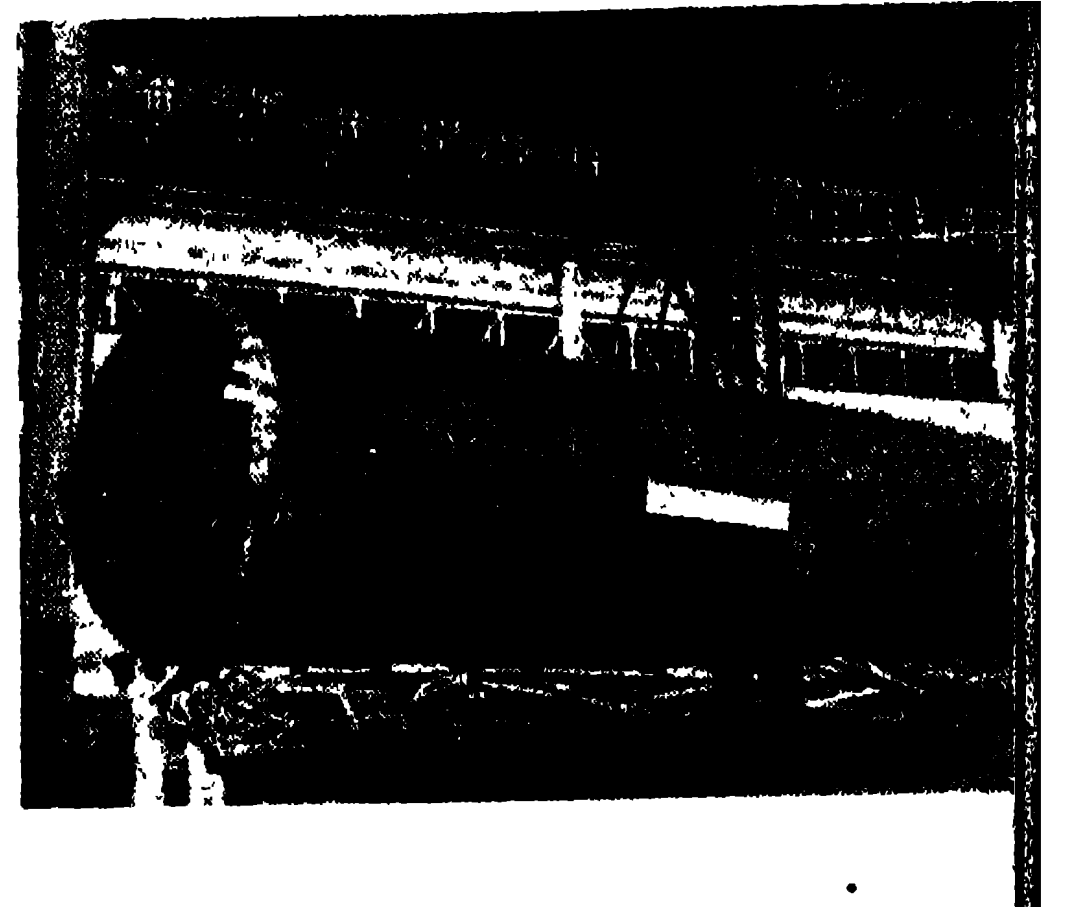
ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যাল্‌সের কারখানায় যেখানে মাঝারি ও হালকা ধরনের জিনিসপত্র তৈরী করা হয় সেখানে এটি তৈরী করা হয়েছে। এগুলিকে পাঠানোর সময় যাতে নড়াচড়ায় কোন ক্ষতি না হয় সে জন্য ওয়েল-ওয়াগনে এটি রাখার জন্য একটা বিশেষ ধরনের কাঠামো তৈরী করতে হয়।

চোখের বদলে চোখ

৮ পৃষ্ঠার পর

পরিয়ে দেবার পর কোনোও দূরের বাসিন্দা, দরিদ্র রোগীর পক্ষে, বারবার এসে লেন্স পরীক্ষা করিয়ে যাওয়া প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার।

কৃত্রিম অক্ষিগোলক

আমরা কন্ট্যাক্ট্ লেন্স ছাড়াও কৃত্রিম চোখ তৈরী করি। আমাদের কাছে বহু রোগী এসেছেন যাঁদের অক্ষিগোলক অপসারিত করা হয়েছে বহুকাল আগে। দেরীতে চোখ নিতে যখন তাঁরা এলেন তখন অক্ষিকোটর এত সঙ্কুচিত হয়েছে, যে, হয় চোখের পাশের চামড়া কেটে অথবা অবস্থা মারাত্মক না হ'লে, চোখের পাতা টেনে টেনে অক্ষিকোটর বড় করতে হয়েছে। আমাদের কাছে তৈরী "মণি" থাকে। সাধারণতঃ নকল যেসব চোখের মণি পাওয়া যায় সেগুলি তেমন সন্তোষজনক হয় না। তাই আমরা রোগীর প্রয়োজনমত উন্নততর পদ্ধতিতে তৈরী "মণি" যোগান দিই। এর জন্যে আমরা অক্ষিকোটরের একটা ছাপ নিয়ে—তা'তে মোম্ ঢেলে একটা ছাঁচ তৈরী করি। এরপর নরম মোমের ঐ ছাঁচটা অক্ষিকোটরে ভরে হালকা চাপ দিয়ে অক্ষিকোটরের যথাসম্ভব নিখুঁত চাপ নেওয়া হয়। এর ফলে কৃত্রিম চোখের-মণির অনেক ত্রুটী চলে যায়। যদিও এই পদ্ধতিতে কৃত্রিম চোখের মণি তৈরী করা অসীম ধৈর্য্য ও সময়সাপেক্ষ তথাপি এর স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি হ'ল এই, যে, এই পদ্ধতিতে তৈরী চোখের-মণি অক্ষিকোটরে সর্ব্বাধিক অংশ স্পর্শ করে ব'লে এই নকল চোখ পরে আরাম পাওয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ অক্ষিকোটর থেকে যে রস বেরোয়, সেটাও সহজে বেরিয়ে যেতে পারে এবং চোখের পাতায় সবদিকে সমান টান থাকায় 'মণি'টির ওপর চোখের পাতা নাড়াবার স্নেহজাতীয় উপাদানটি বেশীসময় থাকে। এই শেষ বিষয়টি শিশুদের ক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ চোখের পাতার টান যদি সমান থাকে এবং পাতার সঙ্কোচন প্রসারণ সহজে হ'লে সমস্ত মুখটা স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠে।

মহম্মদ আব্দুর রকীব

৩ পৃষ্ঠার পর

সব রকম মাটিতেই এর চাষ করা যায়, তবে মাটিতে অম্লের ভাগ বেশী থাকলে চুন ব্যবহারে ফলন বেশী পাওয়া যায়। দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটিই এ ফসলের বিশেষ উপযোগী।

সয়াবীন বীজ বোনার আগে জমিতে ২।৩ বার লাঙল ও একবার মই দিতে হবে, যাতে মাটি ঝুর ঝুরে হয়। জমি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে জমিতে জল জমার ভয় না থাকে অর্থাৎ জল নিকাশের ভাল ব্যবস্থা রাখতে হবে। সয়াবীন আমাদের দেশে খারিফ খন্দে চাষ করা হয়। আষাঢ় মাসই সয়াবীন বোনার উপযুক্ত সময়। বৃষ্টি হলে জ্যৈষ্ঠের শেষের দিকেও লাগান যায়।

এ ফসল ছিটিয়ে না বুনে, সারি ক'রে বুনতে হয়। ৩০—৪৫ সেঃ মিঃ বা এক দেড় ফুট দূরে দূরে, সারি বেঁধে দিতে হ'বে। এ সারির মধ্যে মধ্যে সার ছিটিয়ে, সার খুব ভাল করে মাটির সঙ্গে মেশাতে হবে। কারণ বীজ যদি সারের সংস্পর্শে আসে তা হলে ঐ বীজ থেকে গাছ বেরুবে না। প্রত্যেক সারিতে ৫ সে. মি. বা ২ ইঞ্চি দূরে দূরে বীজ বুনতে হবে। বীজ লাগাবার সময়ে জমিতে রস থাকা চাই, নইলে বীজ থেকে গাছ বেরুবে না। সয়াবীনের ভাল ফলন পেতে হলে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ ঘটিত সারের দরকার, তবে নাইট্রোজেন সার খুব বেশী দরকার হয় না। মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে, জমি তৈরি করার সময় একর প্রতি ৪০ কে. জি. অ্যামোনিয়াম সালফেট, ১৫০—২০০ কে. জি. সুপার ফসফেট ও ৩০—৪০ কে. জি. মিউরেট অব পটাশ দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

এখন এ দেশে সয়াবীনের চাষ জৈষ্ঠ—আষাঢ় মাসে করা হচ্ছে। আমাদের দেশে সয়াবীনের রোগ বা চারার ওপর কীট পতঙ্গের উপদ্রব খুব বেশী দেখা যায় না। রোগের মধ্যে 'সয়াবীন মোজেক ভাইরাস' আর কীট পতঙ্গের মধ্যে সয়াবীনের' বিছা পোকা'র উপদ্রব বেশ কিছুটা হতে দেখা-যায়। এ রোগের হাত থেকে রেহাই পাবার নির্ভরযোগ্য উপায় হচ্ছে বীজ রাখার সময় রোগমুক্ত গাছের বীজ রাখা। আর বিছা—পোকাকে দমন করতে হলে, গাছে ঐ পোকার ডিম দেখার সঙ্গে সঙ্গে দমনের ব্যবস্থা করা।

যখন সয়াবীনের শুঁটি ঠিক মত পেকে যায় এবং পাতা ঝরে পড়তে সুরু করে, তখনই এ ফসল তোলবার উপযুক্ত সময়। দ্রুত ফলনশীল জাতের সয়াবীন বোনার ৭৫ থেকে ১১০ দিনের মধ্যে, মধ্যম জাতের গুলি ১১০ থেকে ১৩০ দিনের মধ্যে এবং নাবি জাতের গুলি ১৩০ থেকে ২০০ দিনের মধ্যে তোলবার উপযোগী হয়।

সয়াবীনের ডালগুলো কাটার পর ভাল করে শুকিয়ে নিয়ে, লাঠি দিয়ে পিটিয়ে কিংবা গরু দিয়ে মাড়িয়ে নিয়ে শুঁটি থেকে বীজ আলাদা করা যায়। তবে যে বীজগুলি পরের বছর লাগানোর জন্য রাখতে হবে সেগুলি ছাড়াবার সময় যাতে বেশী আঘাত না পায় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, নচেৎ ঐ বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা কমে যায়। তাছাড়া ঐ বীজগুলি গুদামজাত করার আগে খুব ভাল করে শুকিয়ে রাখতে হবে।

যে জমিতে সয়াবীন চাষ করা হয় তার উর্বরা শক্তি কমে না বরং কিছুটা বেড়ে যায়। সয়াবীনের গাছের শেকড়ের মধ্যে অসংখ্য গুটি বের হয়। ঐ গুটির মধ্যে এক রকম 'ব্যাকটিরিয়া' থাকে। এরা বাতাস থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে মাটিতে জমা রাখে। সয়াবীন গাছ প্রধানতঃ ঐ নাইট্রোজেন থেকেই নিজের প্রয়োজন মেটায়। ফসল কাটার পর, কিছু নাইট্রোজেন জমিতে পড়েও থাকে। তা ছাড়া আগেই বলেছি ফসল কাটার সময় গাছের প্রায় সব পাতাই ঝড়ে পড়ে। এ সব মিলিয়ে জমির উৎপাদন ক্ষমতা ও উর্ব্বরতা বেশ কিছু বেড়ে যায়। আবার সয়াবীন যে জমিতে চাষ করা হয় ফসল তোলার পর সে জমির মাটি অল্প চাষেই ঝুরঝুরে হয়ে পড়ে, তার ফলে ফসল তোলার পর ঐ জমিতে গমের চাষ করলে, বেশ লাভ জনক ফল পাওয়া যেতে পারে।

যাঁদের পাবার কথা

ছোট ব্যবসায়ীরাও এখন বড় ব্যাঙ্কের সাহায্য পেতে পারেন

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের ফলে স্বল্পবিত্ত লোকেরা আজকাল ব্যবসায়ে নামার কথা অনায়াসে চিন্তা করতে পারছেন। আগে তাঁরা ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ পাবার কথা চিন্তাও করতে পারতেন না; কারণ সে সুযোগ পাবার সম্ভাবনা তখন ছিল না। আজ পরিবেশ বদলেছে।

এখন বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি গোয়ালা, মুদি, দর্জি, মুচি, দপ্তরি, পোষাক বিক্রেতার মত ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য ঋণ দিচ্ছে।

যেমন হাওড়ার বৃন্দাবন মল্লিক লেনের শ্রীমদন মোহন খাঁ। বছর কয়েক আগে ছোট একটি মুদিখানা খোলেন। গোড়ায় দোকান ভালই চলছিল। ক্রমে আশে পাশে বড় বড় দোকান খুলল। তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে মদন মোহনের পক্ষে দোকান চালু রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো।

গত নভেম্বর মাসে তিনি এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের স্থানীয় শাখায় গিয়েছিলেন। প্রাথমিক খোঁজ খবর নেওয়ার পর ব্যাঙ্ক তাঁকে পাঁচ হাজার টাকা ধার দিল। এর জন্য তাঁকে কিছু বাঁধাও রাখতে হল না। এই শর্তে ঋণ দেওয়া হল যে, তিন বছরে ধার শোধ করতে হবে এবং আসলের উপর সাড়ে ৯ শতাংশ সুদ দিতে হবে।

মদন মোহন নগদ দামে মাল কিনে বেচতে আরম্ভ করলেন। পুরোনো খদ্দেররা ক্রমে ফিরে এলেন, দোকানের অবস্থাও ফিরে গেল। মদন মোহনের ব্যবসা এর মধ্যে বেড়েছে তিনি এই সঙ্গে একটি গম পেষার কলও চালু করেছেন।

মেঠাইওয়ালা রামাধার রায়ের দোকানও হাওড়ায়। তিনিও ঐ ব্যাঙ্কের কাছেই ঋণ পেয়েছেন ২,০০০ টাকা। ইতিমধ্যে তাঁর দোকানের বিক্রী বেড়েছে দ্বিগুণ। তিনি এখন বোকারোয় আর একটি দোকান খোলার জন্যে জমি কেনার কথা ভাবছেন।

ছোট চাষীদের সাহায্য নতুন উন্নয়নব্রতী সংস্থা

ক্ষুদ্র চাষীদের কল্যাণমূলক পরীক্ষাধীন প্রকল্পের অঙ্গ হিসাবে, বিহারের পুর্ণিয়াতে ও পশ্চিমবাংলার দার্জিলিং-এ একটি ক্ষুদ্র চাষী উন্নয়ন সংস্থা স্থাপন করা হচ্ছে।

দেশের অন্যান্য অঞ্চলের জন্যও অনুরূপ সংস্থা গঠনের কার্যসূচী প্রণয়ন করা হচ্ছে। এই সব সংস্থার প্রধান কর্তব্য হবে উৎপাদক হিসেবে ছোট চাষীদের বিভিন্ন সমস্যা কী,তা চিহ্নিত করা এবং চাষের জন্য তাঁরা যাতে প্রয়োজনীয় সেচ, সার, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও ঋণ পান তা দেখা। সমবায় ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ সংগ্রহ করবার দায়িত্বও নেবে ঐ উন্নয়ন সংস্থা। এই কাজে উৎসাহিত করার জন্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে উৎসাহ-বর্ধক অর্থ মঞ্জুর করা হবে।

ভাগ চাষীদের মধ্যে যাঁরা সেচ সার প্রভৃতি পাবার অধিকারী নন তাঁদের সমবায় বা ব্যবসায়ি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা পাওয়া কঠিন। তাঁদের ক্ষেত্রে কয়েক-জনের যৌথ 'বণ্ড'-এর ভিত্তিতে রাজ্য সরকার তাঁদের সরাসরি তকাভি ঋণ দেবেন।

জমি সমতল করা এবং পুনরুদ্ধারের জন্য ছোট চাষীদের যে খরচ হবে তার অর্ধেক অর্থ, সাহায্য হিসেবে ঐ উন্নয়নী সংস্থা দিয়ে দিতে পারে এবং বাকী অর্ধেকটা ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের তরফ থেকে ঋণ হিসেবে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই সংস্থা গো-মহিষ বা হাঁস মুরগী পালন, দুগ্ধশালা স্থাপন প্রভৃতি অতিরিক্ত বৃত্তি গ্রহণে চাষীদের উৎসাহিত করবে। এছাড়া শাকসব্জি সংরক্ষণ, রেশম উৎপাদন প্রভৃতি কৃষিভিত্তিক শিল্প-গুলির উন্নয়নের জন্য রচিত একটি কার্য-সূচী পাহাড়ী অঞ্চলের ছোট চাষীদের জন্য বিশেষ করে চালু করা হবে।

মুগের চাষ

আমাদের দৈনিক আহার্যের তালিকায় কাঁচা মুগকে যদি একটু প্রাধান্য দিই, তাহলে শরীরে প্রোটিনের অভাব অনেকটা পূরণ হ'তে পারে।

কাঁচা মুগের চাষ একদিকে দিয়ে খুব লাভজনক। কারণ এর ফসল পেতে দেরী হয় না। তা ছাড়া মুগের চাষের পর জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণ ভারতের রাঙা মাটি থেকে নিয়ে মধ্য ভারতের কার্পাস চাষের উপযোগী কালো মাটি কিংবা রাজস্থানের বেলে মাটিতেও এর ফলন ভাল হয়।

বিভিন্ন রাজ্যে এই মুগ চাষের সময় ও পালা বিভিন্ন রকম। যেমন অন্ধ্র প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও ওড়িশ্যায় রবি খন্দে ধান কাটার পর মুগের চাষ হয়। পশ্চিম বাংলায় আউশ ধান কাটার পর এই বীজ বোনা হয়, কিছুটা ডালের জন্য, আর কিছুটা সবুজ সার হিসেবে ব্যবহারের জন্য। বিহারে মে মাসে মুগ বুনে, জুন মাসে, বর্ষা নামবার আগে, ফসল তুলে নেওয়া যেতে পারে। আবার পাঞ্জাবে বর্ষার অর্থাৎ জুনের মাঝামাঝি থেকে জুলাই এর শেষ ভাগ পর্যন্ত যে কোনও সময়ে মুগ বোনা চলবে।

বিভিন্ন অঞ্চলে মুগের যে সব বীজ ব্যবহার করা হয় সেগুলির তুলনায় দ্বিগুন ফলনশীল ও উৎকৃষ্ট আরও নানা রকম বীজ আছে। ঠিকমত চাষ করতে পারলে, মুগের চাষে সাফল্যের এবং আর্থিক লাভের সম্ভাবনা প্রচুর।

দুর্গাপুরের খামারে গমের নতুন সঙ্কর বীজ

রাজস্থানে, জয়পুরের কাছে দুর্গাপুরের সরকারী কৃষি খামারে মেক্সিকোর 'বামন' জাতের গমের সংমিশ্রণে একটি নতুন সঙ্কর বীজ উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই জাতের গমের উৎপাদন হবে একরে ৮.৭ মণ। এই বীজটির নামকরণ হয়েছে 'লাল-বাহাদুর।'

ছিদ্রবিহীন নমনীয় কণ্ডুইট

হেভি ইলেকট্রিক্যালস্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ বর্তমানে ভারতীয় রেলওয়ের বৈদ্যুতিকীকরণ কর্মসূচীর জন্য ইলেকট্রিক ট্র্যাকসনের সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করতে সুরু করেছে। ভূপালের কারখানার ইঞ্জিনীয়াররা, ট্র্যাকসন যন্ত্রপাতিতে ব্যবহারযোগ্য নমনীয় কণ্ডুইট সম্পূর্ণভাবে ছিদ্রবিহীন করতে সক্ষম হয়েছেন। এর ফলে বর্ষাকালেও ইলেকট্রিক ট্র্যাকসনের কাজ নির্বিঘ্নে চলতে পারবে। ভারতীয় রেলওয়ের বোম্বাই শহরতলী অঞ্চলে ১৫০০ ডি. সি. কন্ট্রোল যন্ত্রপাতির এমজি সেট ও কম্প্রেসার মোটরে যে তারের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা হয় সেই তারগুলি নমনীয় কণ্ডুইটের মধ্যে রাখা হয়। এমজি সেট এবং কম্প্রেসার মোটর সেট এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি রেলগাড়ীর নীচের ফ্রেমে বসিয়ে দেওয়া হয় এবং তাতে জল লাগলেও কোন অনিষ্ট হয়না।

বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর হেভি ইলেট্রিক্যালস কারখানার ইঞ্জিনীয়াররা এমন একটা উপায় বের করেছেন যাতে একটা পি. ভি. সি. স্লিভ, ঐ নমনীয় কণ্ডুইটের ওপরে বসিয়ে দুই দিকে বেশ শক্ত করে আটকে দেওয়া যায়। এতে গাড়ী চলার সময় ঝাঁকুনিতে এই স্লিভিং ঢিলে হয়ে যায়না এবং পি. ভি. সি. আবরণীর জন্য তাতে জলও ঢুকতে পারেনা। এই নমনীয় কণ্ডুইট ব্যবস্থা কতখানি ঘাতসহ তাও বিশেষভাবে পরীক্ষা করার একটা উপায় স্থির করা হয়েছে।

দেশেই যখন এই ধরণের ছিদ্রবিহীন নমনীয় কণ্ডুইট উৎপাদন সুরু হবে তখন বহু পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় করা সম্ভব হবে।

উন্নয়ন বার্তা

★ সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রে (মিশরে) আলেকজান্দ্রিয়া অঞ্চলে বৈদ্যুতিকীকরণের জন্য একটি ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান ৩০ লক্ষ টাকার ৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ বিদ্যুৎ-বাহী (৩৩ কিলোভোল্ট) তার যোগান দিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান ঐ তার পাতবার কাজ তদারক করেছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীদের শিক্ষণের ব্যাপারে সাহায্য করেছে।

★ ১৯৬৯ সালে পেট্রোলজাত জিনিসের রপ্তানী ১৯৬৮ সালের তুলনায় শতকরা ৩২ ভাগ বেড়ে যায়। এই সূত্রে, বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রায় আয় হয়, ১৬.২ কোটি টাকা: ১৯৬৮ সালের তুলনায় তা ১৫.৬ শতাংশ বেশী।

★ চলতি মরসুমে প্রচুর ফলনশীল ধান চাষের কার্যসূচী রূপায়ণের উদ্দেশ্যে, পল্লী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য, কেন্দ্রীয় সরকার তামিলনাড়ু সরকারকে ১.২৪ কোটি টাকা ঋণস্বরূপ মঞ্জুর করেছেন। রাজ্যে, এই কার্যসূচীর আওতায়, ৯.৯ লক্ষ একর প্রচুর ফলনশীল বীজের চাষ হবে।

★ নর্মদা নদীর ওপর দু কোটি টাকা ব্যয়ে একটি সেতু তৈরির জন্য শিলান্যাস পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। সেতুটি তৈরি হয়ে গেলে আগের সংকীর্ণ 'গোল্ডার ব্রীজটি' পরিত্যক্ত হবে। এটি ইণ্ডিয়ান রোড কংগ্রেস ব্রীজ কোডের মাল বহনের উপযোগী হবে।

★ মাদ্রাজের সেন্ট্রাল লেদার রিসার্চ ইনস্টিটিউটে কাঁচা চামড়া তৈরীর জন্যে "ফিলিং" নামক নতুন একটা উপাদান তৈরী হয়েছে।

★ কানপুরে ডিফেন্স রিসার্চ ল্যাবরেটারীতে ভি. এফ. আই শ্রেণীর বিশেষ ধরণের কাগজ তৈরির একটি প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করা হয়েছে। যে সব জিনিসে চট ক'রে ছাতা লাগার সম্ভাবনা রয়েছে, সেই সব জিনিস প্যাক করার জন্য ভি. এফ. আই কাগজ ব্যবহৃত হয়। এই কাগজ তৈরির জন্য, যে রাসায়নিক জিনিসগুলি দরকার, সেগুলি আমাদের দেশে সহজলভ্য।

★ ১৯৬৯ সালে মোট ১ কোটি ৭৫.১ লক্ষ টন অশোধিত তেলের শতকরা ৫৪.৪ ভাগ পরিশোধিত হয় সরকারী শোধনাগারে। এই প্রথম সরকারী শোধনাগার, তৈল শোধনে, বেসরকারী তরফকে ছাড়িয়ে গেল।

★ ডেনমার্ক ও ভারতের দুই সরকারের মধ্যে একটি সাধারণ কারিগরী-সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তিন বছর মেয়াদি এই চুক্তি অনুযায়ী, দিনেমার সরকারের কাছ থেকে উন্নয়নী প্রকল্পের জন্য সাহায্য, দিনেমার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও পরিপূরক সাজসরঞ্জাম এবং ডেনমার্কে শিক্ষণের জন্য নির্বাচিত ভারতীয়দের শিক্ষণভাতা পাওয়া যাবে। দেশে নিযুক্ত ভারতীয় কর্মচারীদের বেতন প্রভৃতি বাবদ এবং ভারতে প্রস্তুত জিনিসপত্র ও যন্ত্রপাতি কেনার ব্যয় বহন করবেন ভারত সরকার।

★ স্টেট্ ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া দু কোটি টাকা মূল্যের ১,৫০০ সোভিয়েট ট্র্যাক্টর আমদানীর জন্য মস্কোর মেসার্স ভি. ও. ট্র্যাক্টোরো এক্সপোর্ট-এর সঙ্গে একটা চুক্তি করেছে।

★ ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থা অনুকূল ছিল। রপ্তানী ও পুনঃ রপ্তানী বাবদ ১১৮.৩২ কোটি টাকা আয় হয় এবং সেই অনুপাতে আমদানীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৫.০৭ কোটি টাকা।

★ যুগোস্লাভিয়ায় তৈরি সর্বঋতুর উপযোগী, যাত্রীবাহী জাহাজ এম. ভি. 'আমিনডিভি', শিপিং কর্পোরেশনের হস্তগত হয়েছে। এর জন্য ব্যয় হয়েছে ২ কোটি টাকা। জাহাজটি কোচিন ও লাক্ষাদ্বীপের মধ্যে চলাচল করবে।

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত হ'লেও 'ধনধান্যে' শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই ব্যক্ত করে না। পরিকল্পনার বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী ক্ষেত্রে উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতটা অগ্রগতি হচ্ছে তার খবর দেওয়াই হ'ল 'ধনধান্যে'র লক্ষ্য।

'ধনধান্যে' প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে প্রকাশিত হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত, তাঁদের নিজস্ব।

নিয়মাবলী

দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়।

অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পুনঃ প্রকাশকালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার করা হয়।

রচনা মনোনয়নের জন্যে আনুমানিক দেড় মাস সময়ের প্রয়োজন হয়।

মনোনীত রচনা সম্পাদক মণ্ডলীর অনুমোদনক্রমে প্রকাশ করা হয়।

তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয়। কোনোও রচনার প্রাপ্তি-স্বীকৃতি, পত্র মারফৎ জানানো হয় না।

নাম ঠিকানা লেখা, ডাকটিকিট লাগানো, খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

কোনো রচনা তিন মাসের বেশী রাখা হয়না।

শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাবেন।

গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেস ম্যানেজার, পাব্লিকেশন্স্ ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী-১ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

"ধনধান্যে" পড়ুন
দেশকে জানুন

REGD. NO. D-1

বালিয়াড়াতে ধান চাষ কি সম্ভব ?

তামিলাড়ুর তিরুনেলভেলী জেলার তিরুচান্দুর তালুকে, উপকূল অঞ্চলের বালিয়াড়ীতে ব্যাপকভাবে ধানচাষের জন্য 'সিমেন্ট কংক্রীট' পদ্ধতি পরীক্ষার সংকল্প করা হয়েছে। এর জন্য কৃষি-ঋণ প্রদানকারী সংস্থা (এ, ই. সি. এল.) রাজ্য সরকারের গ্যারান্টির ভিত্তিতে অর্থ সাহায্য দিচ্ছে। যে কোনও স্থায়ী ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার জন্য ঋণ পাওয়া গেলে রাজ্যসরকার তার গ্যারান্টির হতে রাজী আছেন। সিমেন্ট ও কংক্রীট পদ্ধতি হল, বালিয়াড়ীর বালি যথাসম্ভব সরিয়ে দিয়ে সিমেন্ট ও কংক্রীটের একটা আস্তরণ দিয়ে দেওয়া হবে যাতে, জল চুঁইয়ে বেরিয়ে যেতে না পারে এবং ধানের চারা প্রচুর জল পায়।

৪৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রী রপ্তানী

মাদ্রাজের একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ইয়াস্থন ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী লিমিটেড, মোট ৪৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রী রপ্তানী করা সম্পর্কে দুটি অর্ডার পেয়েছে। একটি পেয়েছে নাইজার বাঁধ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অন্যটি, মালয়েশিয়ার জাতীয় বিদ্যুৎ বোর্ড থেকে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ইয়াস্থন কোম্পানি ইতিপূর্ব্বে টানজানিয়া, কুওয়াইৎ, সুদান ও অন্যান্য দেশে হাক-ব্রিজ হিউয়িটিক ইয়াস্থন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের ট্রান্সফর্মার, মালয়েশিয়ায় ইয়াস্থন অটারমিল সুইচগিয়ার রপ্তানী করেছে। বর্ত্তমানে তারা কুওয়াইতে বিদ্যুত সরবরাহের লাইন বসানোর কাজ করছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রী প্রচলিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে ইয়াস্থন কোম্পানি, রপ্তানী সম্পর্কেই বেশী জোর দিচ্ছেন।

ডিরেক্টার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাস্ট্রিয়েল সোসাইটি লি:—করোলবাগ, দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত।

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত
পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

প্রথম বর্ষ একবিংশ সংখ্যা

২২শে মার্চ ১৯৭০ : ১লা চৈত্র ১৮৯২

Vol. 1 : No 21 : March 22, 1970

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

প্রধান সম্পাদক
শরদিন্দু সান্যাল

সহ সম্পাদক
নীরদ মুখোপাধ্যায়

সহকারিণী (সম্পাদনা)
গায়ত্রী দেবী

সংবাদদাতা (মাদ্রাজ)
এস. ভি. রাঘবন

সংবাদদাতা (শিলং)
ধীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী

সংবাদদাত্রী (দিল্লী)
প্রতিমা ঘোষ

ফোটো অফিসার
টি. এস. নাগরাজন

প্রচ্ছদপট শিল্পী
আর. সারঙ্গন

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট স্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০

টেলিগ্রাফের ঠিকানা : যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

ভুলি নাই

নিঃস্বার্থ হওয়া বেশি লাভের। তবে নিঃস্বার্থ আচরণ অভ্যাস করবার ধৈর্য অনেকের থাকে না।

—স্বামী বিবেকানন্দ

সংখ্যায়

পৃষ্ঠা

একটি সুসংবদ্ধ বিজ্ঞান নীতি

সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ক্রমশঃ বেশী মাত্রায়, সাধারণের সমালোচনার বিষয় হয়ে উঠছে। আমাদের বৈজ্ঞানিকরা অত্যন্ত প্রশংসনীয় কোন সাফল্য লাভ করেছেন বলেই যে এটি সাধারণের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে তা নয়, বরং আমাদের কয়েকটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানে যে দলাদলির ভাব রয়েছে তা, এই বিষয়টি সম্পর্কে জনসাধারণকে আরও সজাগ করে তুলেছে।

বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পর্ষতের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয় সরকার কমিটি তা অনুসন্ধান করেন। দুই বছর ধ'রে অনুসন্ধান করার পর কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁরা যে বিবরণী প্রকাশ করেছেন তাতে সকলকেই নির্দ্দোষ বলা হয়েছে। যে সব সংস্থা বহু বছরের চেষ্টায় গড়ে উঠেছে সেগুলির যাতে কোন ক্ষতি না হয় তার জন্য কমিটির উৎকণ্ঠাই সম্ভবতঃ বিবরণীতে প্রতিফলিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই রকম একটা সংস্থার কাজকর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে খণ্ড খণ্ড ভাবে তদন্ত ক'রে প্রকৃত কোন ফল লাভ করা যায়না।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে এ পর্য্যন্ত কি কাজ হয়েছে তার একটা পুরোপুরি হিসেব নিয়ে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বে যে পরিবর্ত্তন এসেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটা বিস্তারিত ও সুসংবদ্ধ বিজ্ঞান নীতি গঠন করেই শুধু দেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতি করা যেতে পারে।

"একমাত্র বিজ্ঞান ও কারিগরী ক্ষেত্রে অগ্রগতির মাধ্যমেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব" এই কথা যিনি বিশ্বাস করতেন, দেশের সৌভাগ্য যে স্বাধীনতা লাভ করার সময় এবং তার পরেও অনেকদিন, ভারতে এমনি একজন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে "বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানীদের ওপরেই ভবিষ্যত নির্ভর করছে।" ১৯৫৮ সালেই তিনি প্রথম বিজ্ঞান নীতি গঠন করেন। এতে বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয় যে "বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও পদ্ধতি প্রয়োগ করেই শুধু দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত সুযোগ সুবিধের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।" কারিগরী ক্ষেত্রে প্রগতিশীল একটা সমাজ গঠন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সাধারণভাবে এই রকম ব্যক্তিগণের হাতেই যে এখন পর্য্যন্ত দেশের নেতৃত্ব রয়েছে, এটা দেশের পক্ষে সৌভাগ্য। স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকেই সরকারের সংহত প্রচেষ্টার ফলে বর্ত্তমানে আমাদের দেশে, খাদ্যশস্য উৎপাদন, শিল্পোন্নয়ন, বিদ্যুৎশক্তি, যোগাযোগ ও পরিবহণ সম্পর্কে সত্যিকারের সমস্যাগুলি সমাধান করার উপযোগী অতি চমৎকার একদল বৈজ্ঞানিক ও কর্ম্মী তৈরি হয়েছেন। গত ১১ বছরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য আমাদের ব্যয়, ২৭ কোটি টাকা থেকে পাঁচগুণেরও বেশী বেড়ে গত বছরে ১৩৬ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে এবং আমাদের বৈজ্ঞানিক জনশক্তিও সাড়ে তিনগুণ বেড়েছে। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে দশ লক্ষেরও বেশী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তি রয়েছেন।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংস্থা থাকা স্বত্বেও গত কয়েক বছরে এই লাভগুলি ফলপ্রসূ হয়নি এবং কিছুটা কর্ম্মচারিতন্ত্রের অধীন হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞান নীতিতে যে জাতীয় লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে তা পূরণ করার জন্য সরকার কয়েক বছরের মধ্যে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষৎ, পারমাণবিক শক্তি সংস্থা, প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার মতো কতকগুলি সংস্থা গঠন করেন। এই সংস্থাগুলিও সরকারের কর্ম্মচারীতন্ত্রই অনুসরণ করছে বলে মনে হয়।

বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার ক্ষেত্রে আমরা কতটুকু লাভ করেছি, বর্ত্তমানে তার একটা সঠিক হিসেব করা প্রয়োজন এবং বিজ্ঞান নীতির নতুন একটা সংজ্ঞা স্থির ক'রে আধুনিক মহাকাশ বিজ্ঞান ও কম্পুটারের যুগের উপযোগী একটা কারিগরী নীতি স্থির করা প্রয়োজন। এর জন্য গবেষণা, উন্নয়ন, উৎপাদন এবং সরকারের মধ্যে একটু সুষ্ঠু সম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে যে জনশক্তি গড়ে তোলা হয়েছে তার সম্ভবপর সর্ব্বোচচ ব্যবহারের জন্য এমন একটা নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন যা এই সম্পর্কগুলিকে সুসংবদ্ধভাবে ব্যবহার করতে পারবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সমাজের দুর্ব্বলতর শ্রেণীর কল্যাণের ওপর গুরুত্ব

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী প্রধানমন্ত্রী ১৯৭০-৭১ সালের জন্য সংসদে যে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেন তাতে অতিরিক্ত করের মাধ্যমে ১৭০ কোটি টাকা আয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রত্যক্ষ কর বাবদ ১৩৪ কোটি টাকা এবং পরোক্ষ কর বাবদ ৩৬ কোটি টাকা আয় হবে। তবে মোটামুটি ২২৫ কোটি টাকা ঘাটতিও থাকবে। নতুন করগুলি থেকে যে ১৭০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে তা থেকে কেন্দ্রের খাতে যাবে ১২৫ কোটি এবং রাজ্যগুলি পাবে ৪৫ কোটি টাকা। করের বর্ত্তমান হার অনুযায়ী রাজস্ব থেকে ১৯৭০-৭১ সালে মোট আয় হবে ৩৮৬৭ কোটি টাকা, চলতি বছরে এই ক্ষেত্রে আয় ধরা হয়েছে ৩৫৮৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে রাজ্যগুলির অংশ হবে ৭০০ কোটি টাকা, চলতি বছরে এর পরিমাণ ধরা হয়েছে ৬২২ কোটি টাকা। সুতরাং নীট আয় হবে ৩১৬৬.৯৭ কোটি টাকা।

মূলধনী খাতে আয় হবে ১৮২৩.৭১ কোটি টাকা যার ফলে মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫১১৫.৪০ কোটি টাকা।

মোট ৫৩৪০.৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ের মধ্যে রাজস্ব ও মূলধনী খাতে ব্যয়ের পরিমাণ হল যথাক্রমে ৩১৫২.১৮ কোটি এবং ২১৮৮.৪৬ কোটি টাকা।

যে সব জিনিসে কর আরোপ করার প্রস্তাব করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল :—

কেন্দ্রীয় বাজেট ১৯৭০-৭১

পরোক্ষ কর

সিগারেটের ওপর কর : মূল্যের ওপর শতকরা ৩ থেকে ২২ ভাগ (আনুমানিক রাজস্ব ১৩.৫০ কোটি টাকা)।

ফনোগ্রাম এবং অভিনন্দন মূলক টেলিগ্রামের জন্যও বেশী মাশুল দিতে হবে : পোষ্টকার্ড বা ইনল্যাণ্ড পত্রের দাম বাড়ানো হয়নি। মানি অর্ডারে ১০০ টাকা পর্যন্ত বেশী মাশুল দিতে হবেনা।

পোষ্টাল, টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোনের মাশুল সংশোধন করে বাড়ানো হবে। পার্শেল, রেজেষ্ট্রি করার মাশুল, ভি. পি পার্শেল ইত্যাদির ক্ষেত্রেই মাশুল বাড়ানো হবে। (এগুলি থেকে বার্ষিক মোট ৫.৪৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হবে)।

খোলা বাজারে চিনির মূল্যের ওপর বর্ত্তমানে শতকরা যে ২৩ ভাগ কর রয়েছে তা বাড়িয়ে ৩৭.৫ ভাগ করা হবে। "লেভি চিনির" ওপর বর্ত্তমানের শতকরা ২৩ ভাগ লেভি সামান্য বাড়িয়ে শতকরা ২৫ ভাগ করা হবে। খাণ্ডসারি চিনির ওপর করের হার শতকরা ১২.৫ ভাগ থেকে বাড়িয়ে ১৭.৫ ভাগ করা হয়েছে। (এই দুটি জিনিস থেকে অতিরিক্ত ২৮.৫০ কোটি টাকা আয় হবে)।

মোটর স্পিরিটের ওপর কর, প্রতি লীটারে ১০ পয়সা বাড়ানো হয়েছে। ভালো কেরোসিনে প্রতি লীটারে ২ পয়সা এবং ফার-নেস তেলে প্রতি লীটারে ২ পয়সা কর বৃদ্ধি করা হয়েছে। খারাপ কেরোসিনের ওপর করে কোন পরিবর্ত্তন করা হয়নি। এগুলি থেকে অতিরিক্ত রাজস্ব পাওয়া যাবে ৩৯.৫ কোটি টাকা)।

শিশুদের খাদ্য ও দেশী ঘির ওপর কর সম্পূর্ণ রহিত করা হয়েছে।

সব রকম শস্যের নির্য্যাস, সাংশ্লেষিক সিরাপ ও সরবৎ, শুষ্ক মটর, সদ্য কফি, চা, জেলি, কৃষ্টাল, কাষ্টার্ড এবং আইস ক্রীম পাউডার, বিস্কুট, কোকো পাউডার, পানীয় চকোলেট, বীজানু মুক্ত মাখন, পনীর, সোডা লেমনেড ইত্যাদি, গ্লুকোজ ও ডেক্স্ট্রোজের মত তৈরি ও সংরক্ষিত খাদ্যের মূল্যের ওপর শতকরা ১০ ভাগ কর। (এগুলি থেকে নীট ৮.৬৮ কোটি টাকা পাওয়া যাবে)।

দুই ডেনিয়ার বা তার কম পলিয়েষ্টার তন্তুর ওপর মূল শুল্ক প্রতি কি: গ্রামে ২১ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫ টাকা করা হয়েছে এবং বিশেষ আবগারি শুল্কও বাড়ানো হয়েছে। অল্প মূল্যের তন্তু সম্পর্কে খানিকটা রেহাইয়ের প্রস্তাবও রয়েছে। (কৃত্রিম তন্তু ও রেশমী বস্ত্রের ওপর এই কর বৃদ্ধির ফলে ১৩.৭৮ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হবে)।

এ্যালুমিনিয়ামের ওপর করগুলির সমন্বয়ের ফলে ৪.৭০ কোটি টাকা আয় হবে।

স্যানিটারির জিনিসপত্র এবং পোর্সিলেনের চকচকে টালির ওপর শতকরা যথাক্রমে যে ১৫ ভাগ ও ১০ ভাগ কর ছিল তা বাড়িয়ে শতকরা ২৫ ভাগ করা হয়েছে।

এয়ার কণ্ডিসনার এবং ১৬৫ লীটারেরও বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন বড় রেফ্রিজারেটারের ওপর কর শতকরা ৪০ ভাগ থেকে বাড়িয়ে ৫৩ ৩/৪ করা হয়েছে। রেফ্রিজারেটারও শীততাপ নিয়ন্ত্রণের মেসিন ইত্যাদির অংশের ওপর কর শতকরা ৫৩ ৩/৪ ভাগ থেকে বাড়িয়ে ৬৬ ৩/৪ ভাগ করা হয়েছে। (মোট আয় ২.২৪ কোটি টাকা)।

অফিসগুলিতে ব্যবহৃত মেসিন, ধাতুনির্ম্মিত আধার, স্পার্কিং প্লাগ, ষ্টেইনলেস্ ইস্পাতের ব্লেড, স্লটেড এ্যাঙ্গল্, লোহার সিন্দুক, সেফ ডিপোজিট ভল্ট, টাইপরাইটার, হিসেব করার মেসিন ও কম্পিউটার ও আভ্যন্তরীন যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলি করের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। (এগুলি থেকে ১০.৪০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে)।

যে সব মেসিনারি আমদানী করা হবে সেগুলির ওপর মূল্য অনুযায়ী শুল্ক শতকরা ২৭.৫ ভাগ থেকে বাড়িয়ে ৩৫ ভাগ করা হয়েছে।

হুইস্কী, ব্রাণ্ডি, জিন এবং অন্যান্য মদের ওপর কর বৃদ্ধি করা হয়েছে। (আমদানী শুল্ক থেকে আনুমানিক ২৯.৭৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হবে।)

প্রত্যক্ষ কর

২ লক্ষ টাকার বেশী ব্যক্তিগত আয়ের ক্ষেত্রে শতকরা ১০ টাকা অতিরিক্ত সারচার্জ্জ আরোপ করে সর্ব্বোচ্চ শতকরা ৯৩.৫ ভাগে পরিণত করা হবে। ২,৫ লক্ষ টাকার ওপরের স্তরে বর্ত্তমান করহার হল শতকরা ৮২.৫ ভাগ।

বার্ষিক ৪০,০০০ টাকার বেশী সমস্ত ব্যক্তিগত আয়ের ওপর ক্রম অনুযায়ী আয়কর বাড়বে।

সম্পদ কর বর্ত্তমানের শতকরা ০.৫ ভাগ ও ৩ ভাগের স্তর বাড়িয়ে সর্ব্বনিম্ন স্তর শতকরা ৫ ভাগ ও সর্ব্বোচ্চ স্তর শতকরা ১ ভাগ করা হয়েছে।

দান করের রেহাই সীমা ১০,০০০ টাকা থেকে কমিয়ে ৫০০০ টাকা করা হয়েছে।

এক নজরে বাজেট

রাজস্ব বাজেট

কোটি টাকায়

রাজস্ববাবদ আয়	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট
	১৯৬৯-৭০	১৯৬৯-৭০	১৯৭০-৭১
কর রাজস্ব	২,৭১৪.১৫	২,৭৩২.০৪	২,৯৬৬.৯৭ * ১৭০.০৬
কর বহির্ভূত রাজস্ব	৭৯৯.৭৪	৮৫৫.১১	৮৯৯.৭৫
মোট রাজস্ব	৩,৫১৩.৮৯	৩,৫৮৭.১৫	৩,৮৬৬.৭২ * ১৭০.০৬
রাজ্যগুলির অংশ বাদে	৫১৭.৬০	৬২১.৬৭	৬৯৯.৭৯ * ৪৫.৩০
কেন্দ্রের নীট রাজস্ব	২,৯৯৬.২৯	২,৯৬৫.৪৮	৩,১৬৬.৭৯ * ১২৪.৭৬
রাজস্বের ব্যয়			
বেসামরিক ব্যয়	১,৩৭৭.৯৭	১,৪০৫.০৪	১,৪৯৮.২৪
প্রতিরক্ষা ব্যয়	৯৮৫.৭৮	৯৭৯.৩২	১,০১৭.৮৪
আইনসভাসহ রাজ্যও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে এককালীন সাহায্য	৫৯৬.১৮	৫৯২.০৬	৬৩৬.১০
মোট	২,৯৫৯.৯৩	২,৯৭৬.৪২	৩,১৫২.১৮
উদ্বৃত্ত রাজস্ব (+) ঘাটতি (—)	(+) ৩৬.৩৬	(—) ১০.৯৪	+ ১৪.৭৫
বাজেট প্রস্তাবের ফলে (*)			+ ১২৪.৭৬

সহরের সম্পদের ওপর একটা উচ্চসীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়ার লক্ষ্য অর্জ্জন করার উদ্দেশ্যে সহরের জমি ও বাড়ীর ওপর অতিরিক্ত সম্পদ কর বাড়াবার প্রস্তাব করা হয়েছে। সম্পদের মূল্য যদি পাঁচ লক্ষ টাকার বেশী হয় তাহলে দেয় করের পরিমাণ হবে শতকরা ৫ টাকা এবং ১০ লক্ষ টাকার বেশী হলে শতকরা ৭ টাকা দিতে হবে। সহরাঞ্চলের সংজ্ঞারও পরিবর্ত্তন করা হচ্ছে। তাতে যে সব মিউনিসিপ্যালিটির জনসংখ্যা ১০ হাজার বা তার বেশী সেই সব মিউনিসিপ্যালিটির অধীন এলাকাগুলিও সহর এলাকার অন্তর্ভুক্ত হবে।

অবিবাহিত বা সন্তানবিহীন সব আয়কর দাতার ক্ষেত্রে আয়করের রেহাইসীমা বাড়িয়ে ৫০০০ টাকা করা হয়েছে। চাকুরীজীবী ব্যাক্তিগণের ক্ষেত্রে যাতায়াত ব্যয় বাবদ মাসিক নিম্নতম ২০ টাকা রেহাই দেবারও প্রস্তাব রয়েছে।

আয় এবং সম্পদ কর

বর্ত্তমানের সম্পদ করের হারও বাড়ানো হচ্ছে। সহরাঞ্চলে কৃষি জমি বিক্রী বা হস্তান্তর করা হলে তা থেকে যে মূলধনগত লাভ হবে তার ওপরেও দিতে হবে। কর এড়ানোর জন্য যে সব বেসরকারী ন্যাস গঠন করা হয় সেই ফাঁকও বন্ধ করা হচ্ছে। কয়েকটি ছাড়া এই সব ন্যাসের আয়ের ওপর সোজাসুজি হারে শতকরা ৬৫ ভাগ এবং সম্পদের ওপর শতকরা ১.৫ ভাগ কর আদায় করা হবে। শিল্প এবং ব্যবসায়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জ্জন করার জন্য দাতব্য ও ধর্ম্মীয় ন্যাসগুলির টাকা যাতে ব্যবহার না করা যায় তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সঞ্চয়ে উৎসাহ দেওয়ার জন্য, ইউনিট ট্রাষ্ট, বা ভারতীয় কোম্পানীগুলির শেয়ার অথবা অনুমোদিত পল্লী ঋণপত্রের ও স্বল্পসঞ্চয়ের পরিকল্পনাগুলির লগ্নি থেকে তিন হাজার টাকা পর্য্যন্ত আয়কে, আয়কর থেকে রেহাই দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। অনেক রকমের নতুন সঞ্চয় পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়েছে। অনুমোদিত রাষ্ট্রীয়-উদ্যোগে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ থেকে একটি ঋণপত্র প্রকল্পও এগুলির অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য প্রকল্পগুলি হ'ল শতকরা ৫।। টাকা থেকে ৬৸ টাকা সুদের, ১, ৩ ও ৫ বছর মেয়াদী জমা পরিকল্পনা; নতুন আর একটি সঞ্চয়পত্র হ'ল, প্রায় ৬। টাকা সুদের ৫ বছর মেয়াদী পৌন:পুনিক জমা পরিকল্পনা এবং ৭। টাকা সুদের ৭ বছর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয়পত্র। এই নতুন সঞ্চয় পরিকল্পনাগুলিতে করে কোন বিশেষ রেহাই পাওয়া যাবেনা। সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডসহ কতকগুলি স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পনায় সুদের হার বাড়ানো হচ্ছে।

লগ্নি সম্পর্কে একটা স্থিতিশীল আবহাওয়া বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সমিতিবদ্ধ কোম্পানিগুলি সম্বন্ধে বর্ত্তমান কর কাঠামোতে কোন রকম হস্তক্ষেপ করা হয়নি।

চায়ের ওপর আবগারি শুল্ক বাড়ানো হচ্ছে। তবে কয়েক ধরণের খোলা চায়ের ক্ষেত্রে শুল্ক বাড়ানো হয়নি। চায়ের রপ্তানী যাতে বাড়ে সেজন্য চায়ের ওপর রপ্তানী শুল্ক একেবারে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

কল্যাণ মূলক প্রকল্পসমূহ

৪৫ টি জেলার ছোট ছোট কৃষকগণের জন্য বিশেষ প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে, পল্লীর যে সব অঞ্চলে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় সেখানে পল্লী উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ২৫ কোটি টাকা, বস্তি পরিষ্কার, গৃহনির্ম্মাণ ও ভূমি উন্নয়ন সম্পর্কে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে একটি নগর উন্নয়ন কর্পোরেশন গঠন, পানীয় জল সরবরাহ সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা এবং শিল্পকর্ম্মীদের জন্য পেন্সনের সুবিধে ইত্যাদি কল্যাণমূলক প্রকল্পসমূহ গ্রহণ করা হবে। নিম্নতম পেন্সন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম্মচারীদের জন্য পারিবারিক পেন্সন বাড়িয়ে ৪০ টাকা করা হবে। শিল্প কর্ম্মীদের ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে। সহরের বস্তি অঞ্চলের এবং জনজাতির উন্নয়ন ব্লকগুলির শিশুদের পুষ্টির প্রয়োজন মেটানোর জন্য ৪ কোটি টাকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

১৯৭০-৭১ সালে পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ
(কেন্দ্রীয় তরফ)

		পরিকল্পনায় বিনিয়োগ	
		বাজেট	বাজেট
		১৯৬৯-৭০	১৯৭০-৭১
		কোটি টাকায়	
১।	কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কর্ম্মসূচী	৮৬	১২৫
২।	জলসেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ	২	৫
৩।	বিদ্যুৎ শক্তি	৪৮	৭৯
৪।	শিল্প ও ধাতু	৫৪৬	৫৪৮
৫।	পরিবহণ ও যোগাযোগ	৩৭১	৪৫৫
৬।	সমাজসেবা	১৫৫	১৮৩
৭।	অন্যান্য কর্ম্মসূচী	১৫	১৬
	মোট	১,২২৩	১,৪১১

কেলেঘাই খনন পরিকল্পনা

মেদিনীপুর জেলার নদী কেলেঘাই। ঝাড়গ্রাম থানার দুধকুণ্ডীর কাছাকাছি একটি উঁচু জায়গা থেকে বেরিয়ে বাঘাই নামে স্রোতস্বিনীর সঙ্গে মিলে, ঢেউভাঙ্গায় কোশী নদীতে পড়েছে। সেখান থেকে সুরু হয়েছে হলদী নদী যার মোহানার কাছে তৈরি হচ্ছে হলদিয়া বন্দর।

এই কান্নার নদী, খৃষ্টীয় ১৮৮৫ সাল থেকে প্রায় প্রতি বছরই কূল ছাপিয়ে পড়ে এবং দুপাশের মাঠ ও গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আনে বন্যার ভয়ঙ্কর প্লাবন। ফলে সবং, পিংলা, ময়না, নারায়ণগড়, পটাশপুর ও ভগবানপুরের প্রায় তিনশ বর্গমাইল এলাকায় শস্যহানি হয়। বন্যার এই করাল গ্রাস থেকে মানুষ, পশু, গৃহস্থের কুটীর, সরকারী ঘরবাড়ী কিছুই নিস্তার পায় না। কেবল গত দু বছরে কেলেঘাই নদীতে বন্যাজনিত ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় তের কোটি টাকার মত। আশ-পাশের প্রায় ১৮৯৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা থেকে বর্ষার জল এই মজা নদীতে পড়ার ফলে বন্যা হয় এবং গত ২৫ বছর ধ'রে প্রতি বছর নিদারুণ বন্যার ফলে দুদিকের বাঁধগুলি থেকে মাটি গড়িয়ে নদীর গভীরতা নষ্ট করে দেওয়ায় নদীর প্রবাহ-পথ সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে এবং নদীর নাব্যতা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে।

এই ভয়ঙ্করী নদী খনন করে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ করার একটি পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনক্রমে এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করেছেন এবং ইতিমধ্যেই এর প্রাথমিক কাজকর্ম সুরু হয়ে গেছে। এই প্রকল্প পুরোপুরি রূপায়িত হতে লাগবে তিন বছর এবং এর জন্য তিন কোটি টাকার ব্যয় মঞ্জুর হয়েছে।

প্রায় ৯৭ কিলোমিটার লম্বা কেলেঘাই নদীতে, ঢেউভাঙা থেকে লাঙলকাটা পর্যন্ত মোট ২১ কিলোমিটারে মাত্র জোয়ার ভাটা হয়। বাকী অংশে বার মাস জল বন্ধ ও স্থির থাকে। জোয়ারের জলস্রোতে এই ২১ কিলোমিটারে প্রচুর পলি এসে জমে; এবং বছরে প্রায় ৮ মাস বৃষ্টি না হওয়ায় এই পলি ধুয়ে যেতে পারে না। শুধু তাই নয় বর্ষায় সুবর্ণরেখা নদীর জল উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোড ছাপিয়ে বাঘাই নামে স্রোতস্বিনীতে এসে পড়ে। ফলে বন্যার প্রকোপ আরও বেড়ে যায়। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে পলি জমার ফলে লাঙ্গলকাটা পর্যন্ত নদীতলের উচ্চতা এবং দুদিকের বাঁধগুলির ক্রমবর্ধমান সঙ্কীর্ণতার ফলে বিধ্বংসী বন্যার তাণ্ডব প্রতি বছরই তীব্রতর হচ্ছে।

বর্তমান খনন প্রকল্প অনুসারে প্রথম বছরে কপালেশ্বরী চণ্ডিয়ার কিছু অংশ এবং কেলেঘাই নদীর ঢেউভাঙা থেকে তালডিহা পর্যন্ত খনন করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার শুধু এই অংশের জন্য ৯৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। এতে নদীর গভীরতা সাড়ে ৫ মিটার ও বিস্তার প্রায় ৯১.৫ মিটার বাড়বে। দুই তীরের বকচর ধরলে এই বিস্তার হবে ৩৬৬ মিটারের মত। বাকরা-বাদ থেকে মোহানা পর্যন্ত কেলেঘাই নদীর প্রায় ৬০ কিলোমিটার জুড়ে এই খনন কার্য শেষ হলে আশেপাশের অঞ্চলগুলি প্রতি বছরের বন্যার প্রকোপ থেকে শুধু যে মুক্তি পাবে তাই নয়, এতে চাষবাসেরও প্রভূত সুবিধা হবে। যদি পরিকল্পিত পুনরু-জ্জীবনের পরেও এই নদী বর্ষায় উঁচু

জায়গার জলের তোড় সামলাতে না পারে, তাহলে উদ্বৃত্ত জলস্রোত বাগদার কাছে নিষ্কাশনী খাল দিয়ে বার করে দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।

খননের ফলে দুদিকের বাঁধগুলি নতুন করে গড়ে উঠবে, এবং এই নবনির্মিত বাঁধের আড়ালে আশেপাশের জমিতে ফসল ফলানোর কোনো সঙ্কট থাকবে না। এ ছাড়াও যে সব অঞ্চলে জল' উপচে পড়ত উদ্ধারের ফলে সেগুলোকে আবার ব্যবহার-যোগ্য করে তোলা হবে। জোয়ারের জল এখন নদীর দীর্ঘতর অংশে আসতে পারবে। ফলে সেচের জলের অভাব আর হবে না। বন্যাব পরে যে অনিবার্য সংক্রামক রোগ ও মড়কের প্রাদুর্ভাব দেখা দিত তারও আর কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। তা ছাড়া এই অঞ্চল উপকূলবর্তী হওয়ায় এখানে নৌকা ছাড়া যাতায়াতের কোন বিকল্প ব্যবস্থা নাই। তাই খনন-কার্য সমাপ্ত হলে নদীর নাব্যতাও বেড়ে যাবে। প্রকল্পটি রূপায়ণের জন্য দুদিকের বাঁধের পাশে গড়ে ওঠা কিছু ঘরবাড়ী ও জমি দখল করতে হতে পারে। উচ্ছেদ বা দখলের আগে এরজন্য ক্ষতিপুরণের শতকরা ৮০ ভাগ টাকা দিয়ে দেওয়া হবে। এ ছাড়া নদী উদ্ধারের কাজে যে প্রায় ২৫ হাজার লোক লাগবে তার জন্য স্থানীয় কর্মহীনদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং এই ব্যাপারে যাতে কোনো অবিচার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য আঞ্চলিক জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হচ্ছে। পরিকল্পনাটি রূপায়িত হলে ৮১,০০০ হেক্টর জমি সম্পূর্ণ ও আংশিক-ভাবে উদ্ধার করা যাবে এবং প্রায় ১২১০ হেক্টর জমিতে একাধিক ফসল তোলা সম্ভব হবে। এর ফলে প্রায় ১১,৭৫,০০০ কুইন্টাল অতিরিক্ত ধান এই অঞ্চল থেকে পাওয়া যাবে। এই খনন প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে লাগবে ২২৬ লক্ষ টাকার মত এবং প্রায় ৮০৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকার বাসিন্দা এর দ্বারা উপকৃত হবেন।

অন্য দেশের কৃষি

ফরাসী কৃষি ব্যবস্থায় বৈচিত্র্যটাই হ'ল তার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। সেখানে অঞ্চল অনুযায়ী কৃষিতেও বিভিন্নতা দেখতে পাওয়া যায়। তবে ফ্রান্সে, কৃষিতে যে বিবর্তন এসেছে সাধারণভাবে তা বিবেচনা করা যেতে পারে।

ফ্রান্সে ১৯২৫ থেকে ১৯৫৪ সালের মধ্যে কৃষিতে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা শতকরা ৩০ ভাগ কমে যায়। গত ১৫ বছর থেকে এই হার বেড়ে চলেছে। ১৯৩৬ সালে কৃষিতে নিযুক্ত মোট পুরুষ কর্মীর সংখ্যা যেখানে ছিল শতকরা ৩২.৬ ভাগ সেই সেই তুলনায় ১৯৬২ সালে তার সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ২০ ভাগে।

সাধারণত: বৃদ্ধরাই কৃষিতে নিযুক্ত আছেন। কৃষি উন্নয়নের দিক থেকে এটা যে মোটেই সুলক্ষণ নয় তা সহজেই বলা যায়। কারণ, বৃদ্ধ কৃষকরা অন্ততঃপক্ষে কর্মক্ষমতার দিক থেকে, আধুনিক কৃষি পদ্ধতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম নন। তাছাড়া কৃষিতে যন্ত্রসজ্জার ফলে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশ: কমে যাচ্ছে। তবে উত্তর ফ্রান্সে, প্যারিস অববাহিকায় এবং ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে এঁদের সংখ্যা এখন ও কমেনি।

স্বল্প আয়

ফ্রান্সে, অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় কৃষি থেকে আয়ের পরিমাণ কম। ১৯৩৮ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে কৃষির ক্ষেত্রে আয় বেড়েছে শতকরা মাত্র ২৫ ভাগ অথচ ঐ সময়েই কৃষি বহির্ভূত ক্ষেত্রগুলিতে নিযুক্ত কর্মীদের আয় বেড়েছে শতকরা ৬০ ভাগ। কিন্তু ১৯৫২ সাল থেকে ফরাসী সরকার যে কৃষি নীতি গ্রহণ করেছেন তা কৃষি-আয় বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করেছে এবং তা অন্যান্য বৃত্তির সমান। ফরাসী কৃষি ব্যবস্থার একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ফ্রান্সের কৃষি জমি ছোট ছোট টুকরায় বিভক্ত। মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে প্রতি কৃষক পরিবারের জমির আয়তন হল ১৪.৫০ হেক্টার। তবে এই পরিমাণটাও পশ্চিম ইউরোপে অন্যান্য দেশের তুলনায় মোটামুটি ভাবে বেশী।

আধুনিক কৃষি পদ্ধতির কারিগরি প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে জমির মালি-কানা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ বর্তমানে কতক-গুলি নীতি গ্রহণ করেছেন। কৃষি জমি বড় আকারে সংগঠিত করার জন্য বর্তমানে বিশেষভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ ১৯৫৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রতি বছর ৫ লক্ষ হেক্টার ক'রে জমি পুনর্গঠন করছেন ১৯৫১ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে কৃষি উৎপাদন বেড়েছে শতকরা ৩০ ভাগ আর ঐ সময়ে কৃষকের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে শতকরা ১৩ ভাগ। যুদ্ধোত্তর সময়ে কৃষিতে যন্ত্রসজ্জার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ১৯৫০ থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে কৃষির জন্য ব্যবহৃত ট্র্যাক্টারের সংখ্যা ১২০,০০০ থেকে বেড়ে ৯৫০,০০০, এবং যন্ত্রচালিত সংযুক্ত ফসল সংগ্রহের মেসিনের সংখ্যা ৩৮০০ থেকে বেড়ে ৮৫,০০০ হয়েছে।

কৃষিতে যন্ত্রসজ্জা

কৃষি যন্ত্রপাতি, ফরাসী কৃষি ব্যবস্থার ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে, ফলে কর্তৃপক্ষ এখন এই সব নতুন কৃষি যন্ত্রপাতির উপযোগী ক'রে ভূমি ব্যবস্থা পুনর্গঠন করার কথা চিন্তা করছেন। কৃষির জন্য রাসায়নিক সার ব্যবহারের মাত্রাও অনেক বেড়ে গেছে (প্রতি হেক্টারে ৮০ কি: গ্রা:)। রাসায়নিক সার ব্যবহার জনপ্রিয় করে তোলার জন্য যে চেষ্টা করা হয় তার ফলেই এগুলির প্রচলন বেড়েছে।

কৃষি থেকে সর্ব্বোচ্চ ফল পেতে হলে শিক্ষা এবং কারিগরি প্রগতি পাশাপাশি চলতে হয়। কৃষকদের মধ্যে যেমন শিক্ষার সম্প্রসারণ দরকার তেমনি কৃষির উন্নততর পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করাও দরকার। ফ্রান্সের কৃষক ও কৃষি শ্রমিক-দের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শতকরা মাত্র ১৩ ভাগ সাধারণ শিক্ষা অর্জ্জন করার জন্য কলেজে যায়।

ফ্রান্সে কৃষি বিষয়ে শিক্ষার উন্নয়ন তেমন দ্রুত নয় আর এতেই বোঝা যায় যে বহু সংখ্যক ফরাসী কৃষক এখন পর্যন্ত, আধুনিক কৃষি পদ্ধতি প্রয়োগ করার মতো জ্ঞান অর্জ্জন করতে পারেন নি।

নারীহিতে ব্রতী সমাজ সংস্থা

অপর্ণা মৈত্র

মানুষ মাত্রেই ভুল করে। কিন্তু ক্ষণিকের সামান্য ভুল বা পদস্খলনের মূল্য অনেককে বিশেষতঃ মেয়েদের দিতে হয় সারা জীবন ধরে। মেয়েদের অন্যায় সমাজ সহজে ক্ষমা করে না। এর ফলে এরা অনেক সময়ে বিপথে যেতে বাধ্য হয়। সাধারণ মানুষ এদের ভুলে যায়, সেই বিস্মরণের পথে একদিন এরা সমাজের ঘৃণা ও ভ্রূকুটি মাথায় করে চিরদিনের জন্যে হারিয়ে যায়। এদেরই জীবনে নব অরুণোদয় আনতে এগিয়ে এলো নারী সমাজ। ১৯৩২ সালে বাংলা প্রেসিডেন্সী কাউন্সিল ও সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পতিতাবৃত্তি নিবারণের জন্য নিখিল বঙ্গ নারী নিকেতন নামে একটি স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন শ্রীমতী চারুলতা মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধকুমারী রায়, রমলা সিন্‌হা প্রভৃতি বিশিষ্ট মহিলারা। ১৯৩৩ সালে এই ইউনিয়ন দমদমে, আইনের বলে উদ্ধারপ্রাপ্ত মেয়েদের আশ্রয়, পড়াশুনা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য একটি হোম বা কল্যাণসদন খোলেন। ১৯৪২ সালের মধ্যে এদের অধিকাংশের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। ইউনিয়ন-এর চলার পথে বাধা আসেনি এমন নয়, কিন্তু কোনটিই এর কল্যাণমূলক কাজের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়নি। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় স্থানাভাবের দরুণ কল্যাণগৃহ বন্ধ হলেও ১৯৪৩ সালে বাংলা দেশে দুর্ভিক্ষ এবং ১৯৪৬-৪৭ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে এই সদন পুনর্গঠিত হয় এবং অসংখ্য মেয়েকে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত আশ্রয় দেয়।

ইউনিয়ন-এর বিভিন্ন কল্যাণ প্রকল্প ছিল, কিন্তু নিজস্ব স্থায়ী কেন্দ্রের অভাবে এর কোনোটিতে হাত দেওয়া কঠিন ছিল। ১৯৪৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ইউনিয়নকে কলকাতায় ৮৯নং এলিয়ট রোডে একটি স্থায়ী জায়গা দেন। জায়গা পাওয়ার পর ইউনিয়ন-এর পরিকল্পিত কাজগুলি বাস্তবে রূপায়িত করতে দেরী হ'ল না। এক এক করে তৈরি হ'ল অল বেঙ্গল উইমেনস্ ওয়েলফেয়ার হোম, অল বেঙ্গল উইমেনস্ ইউনিয়ন ইণ্ডাস্টীয়েল ডিপার্টমেন্ট, অল বেঙ্গল উইমেনস্ ইউনিয়ন চিলড্রেনস ওয়েলফেয়ার হোম এবং অল বেঙ্গল উইমেনস্ ইউনিয়ন চিলড্রেনস্ ওয়েলফেয়ার ও প্রাইমারী স্কুল এগুলির প্রত্যেকটির জন্য পৃথক বিভাগীয় পরিচালন ব্যবস্থা আছে। অভিভাবক সংস্থারূপে সব কটি বিভাগের কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করে অল বেঙ্গল উইমেনস্ ইউনিয়ন।

এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠান সুপরিচালনার জন্য ইউনিয়নের সাধারণ ও কার্যনির্বাহক দুটি কমিটি আছে। এ ছাড়া ইউনিয়ন-এর প্রচারের জন্য শিল্পোৎপাদন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এবং অন্যান্য অসংখ্য খুঁটিনাটি কাজের জন্য কয়েকটি সাব-কমিটি আছে।

ইউনিয়নের কল্যাণ প্রচেষ্টার অন্যতম বাস্তব রূপায়ণ হ'ল এখানকার নারী কল্যাণ সদনটি। ১৮ বছরের উর্দ্ধবয়স্ক মেয়েরা যারা আত্মীয়স্বজন দ্বারা পরিত্যক্ত বা তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্নেহ ভালোবাসাহীন বঞ্চিত জীবন কাটাচ্ছে, তাদের জন্যই স্থাপন করা হয়েছে এই সদনটি। শুধু আশ্রয় দেওয়াই নয়, সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার দ্বারা এদের স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করাই এই নারী কল্যাণ সদনের উদ্দেশ্য।

এই সংস্থাটির কাজকর্ম দেখার জন্য আছেন একটি পরিচালক মণ্ডলী। উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য একটি কমিটি ও কারিগরী শিক্ষার ক্লাসগুলি পরিচালনার জন্য একটি সাব-কমিটি আছে। নারীকল্যাণ সদনে লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা আছে। মেয়েরা তাদের যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী পড়াশুনো করার সুযোগ পায়। তাই প্রতি বছরই এখান থেকে কিছু সংখ্যক মেয়ে প্রাইমারী, মাধ্যমিক ও স্নাতক এমন কি স্নাতকোত্তর শ্রেণীতেও যায়। পড়াশুনা ছাড়াও চারটি কারিগরী শিক্ষা ক্রমের ব্যবস্থা আছে। হোমে পুনর্বাসনের জন্য আনীত মেয়েদের এই বৃত্তিমূলক শিক্ষাগুলির যে কোন একটিতে যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক।

কারিগরী শিক্ষণের চারটি শিক্ষাক্রম আছে—

(১) সূচী শিল্প ও কাটছাঁটের কাজে ৩ বৎসরের লেডী ব্র্যাবোর্ণ ডিপ্লোমা কোর্স। এই কোর্সে ৩টি—প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বার্ষিক পরীক্ষা হয়। প্রত্যেকটি পরীক্ষাতেই পাশের হার বেশ ভালো। সেলাই শেখানোর জন্য আছেন দুজন উপযুক্ত শিক্ষণ প্রাপ্তা শিক্ষিকা।

(২) দুই বৎসরের বুনন কোর্স। কোর্সটি দুই বৎসরে ভাগ করা হয়েছে—পুঁথিগত বিদ্যা ও হাতে কলমে কাজ শেখা। বুনন চাতুর্য পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট দেয় শ্রীরামপুরের সরকারী বুনন প্রযুক্তি বিদ্যালয়। এই বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্য আছেন বুননে ডিপ্লোমাপ্রাপ্তা অভিজ্ঞা শিক্ষিকা।

(৩) ১৯৬৪ সাল থেকে একটি ব্লক প্রিন্টিং বিভাগ খোলা হয়েছে; এখানে ব্লক দিয়ে মেয়েরা কাজ শেখে।

(৪) সম্প্রতি এই সদনে দুই বৎসরের কেটারিং ও ক্যান্টিন পরিচালনা কোর্স খোলা হয়েছে। এর জন্য শিক্ষান্তে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

বৃত্তিমূলক শিক্ষায় উত্তীর্ণ হলে মেয়েরা বাইরে কাজ পেতে পারে এবং হোম এ ব্যাপারে তাদের সাহায্য করে। তা ছাড়া প্রতি বৎসর ১২।১৩ জনকে কল্যাণসদনের শিল্প উৎপাদন কেন্দ্রেই কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়। বাইরের মেয়েদেরও এখানে বুনন, সেলাই, ব্লক প্রিন্টিংএর কাজ শেখার ও উৎপাদন কেন্দ্রে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়। শিল্প উৎপাদন কেন্দ্রে মেয়েরা কাজ করে ও কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পায়।

শিল্প কেন্দ্রে তৈরি জিনিষগুলি বিক্রীর জন্য একটি বিক্রয়কেন্দ্র আছে। এখানে মেয়েদের হাতে তৈরি টেবিল ক্লথ, স্কার্ফ, কভার, ডাস্টার, টি কোজী লাঞ্চ সেট এবং ছোট ছেলেমেয়েদের পোষাক, বিক্রীর জন্য রাখা হয়। এ ছাড়া এই সব জিনিসের জন্য বাইরের থেকে অর্ডার আসে। ব্লক প্রিন্টিং এর শাড়ী অর্ডার অনুযায়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

সম্প্রতি নারী কল্যাণ সদনের আর একটী উল্লেখযোগ্য অবদান হ'ল 'সুরুচি' নামে একটি ভোজনালয় স্থাপন। এখানকার পরিবেশিত খাদ্যতালিকা এবং ভোজনালয়টির সাজ সজ্জা 'সুরুচি' নামটি সার্থক করে তুলেছে। ইউনিয়ন-এর কেটারিং বিভাগের মেয়েরাই রান্না ও পরিবেশন করে। বাঙালীর রুচি ও পছন্দমত মধ্যাহ্নের আহার ও জল খাবার এখানে পাওয়া যায়। 'সুরুচি' থেকে প্রাপ্ত অর্থ ক্যান্টিনের মেয়েদের মধ্যে সমবায় ভিত্তিতে ভাগ করে দেওয়া হয়।

হোমের অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল এখানকার মেয়েদের পুনর্বাসন দেওয়া। সাধারণত: বছরে ১০।১১ জন মেয়ে এখান থেকে বাইরে কর্ম সংস্থানের সুযোগ পায়। অনেক জায়গায় এই ধরনের কল্যাণ সদনের আবাসিকও. বাইরে হয়তো ভাল কাজ পেতে পারেন কিন্তু থাকার জায়গা পান না বলে এবং পেলেও তা ব্যয় বহুল হওয়ায় কাজ নিতে পারেন না। কিন্তু এই সদনের মেয়েরা বাইরে কাজ পাবার পরেও সামান্য অর্থের বিনিময়ে হোমে থাকতে পারেন। কাজ ছাড়াও হোমের উদ্যোগে ও সাহায্যে অনেক মেয়ে বিবাহ করে স্বাভাবিক জীবন যাপনে সমর্থ হয়েছে। বিবাহ দিয়ে সমাজ জীবনে সম্মানের স্থান করে দিয়ে ভাঙা জীবন গড়ার কাজে হোমের অবদান প্রশংসনীয়। কারণ হোম দায়িত্ব শীল অভিভাবকের মত হিতৈষী বন্ধুর মত পাত্রের যথাযোগ্য খবরাখবর নিয়ে বিবাহ স্থির করেন। প্রতি বৎসর গড়ে ৪।৫ টি মেয়ের বিবাহ দেওয়া হয়।

১৯৫০-৫১ সালে হোম ক্যাম্প থেকে ২০০ জন উদ্বাস্তু মেয়ের ট্রেনিং ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। এ পর্যন্ত হোমের সাহায্যে মেয়েরা, স্কুল শিক্ষিকা, শিল্প শিক্ষিকা, গ্রাম সেবিকা নার্স এবং গৃহস্থের সাহায্য কারিণীর কাজ পেয়েছে।

কল্যাণগৃহের মেয়েদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য আছে গার্ল গাইড স্পোর্টস, ফিল্ম শো, শিক্ষামূলক বক্তৃতা, গান শেখার ব্যবস্থা এবং বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব। বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটিকে পুনর্মিলন উৎসবও বলা যায়। হোমের প্রাক্তন মেয়েরা ঐ দিন তাঁদের স্বামী, সন্তান ও আত্মীয় পরিজনদের নিয়ে বেড়াতে আসেন। কল্যাণগৃহের মেয়েরাও বেড়াতে যায়। যে সব মেয়ের অভিভাবক আছে ছুটিতে তারা বাড়ী যায়।

মেয়েদের খাদ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। প্রয়োজনে অসুস্থদের জন্য সর্বপ্রকার চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা করা হয়। কল্যাণ সদনের একজন করে আবাসিক নার্স, মেট্রন ও মহিলা ডাক্তার আছেন। হোমে বসবাসকারী স্ত্রীলোকদের শিশু সন্তানদের ৩ বৎসর পর্যন্ত রাখার জন্য একটি নার্সারী আছে। ৪ বৎসর বয়সে এই শিশুদের ইউনিয়নের অন্তর্গত শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে পাঠান হয়।

ইউনিয়ন-এ দুজন সমাজ কর্মী আছেন। এঁরা হোমে নবাগত মেয়েদের পূর্ববর্তী জীবনের ঘটনা, বর্তমান মানসিক অবস্থা, কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতা বিচার করে তদনুযায়ী তাদের প্রতি ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেন। এ ছাড়া অতীতের ভয়াবহ ও বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার আবেগ জনিত ভার সাম্য লুপ্ত হয়েছে এমন মেয়েদের জন্য হোমে মনঃসমীক্ষা ও তার উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। এখানকার আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল যে, পুনর্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। সমাজকর্মীরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন ও প্রয়োজনমত সাহায্য করেন।

অদূর ভবিষ্যতে অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা হলে এই সদনের কর্মরত মেয়েদের জন্য একটি হোস্টেল খোলবার ইচ্ছা আছে। এই বৃহৎ নারী কল্যাণ সংস্থার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সমাজ কল্যাণ সংস্থা ও পৌর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এঁরা নির্দিষ্ট একটা সাহায্য পান। আর বাকিটা আসে চাঁদা ও দেশ বিদেশের সাহায্য থেকে। অখিল বঙ্গ নারী ইউনিয়ন-এর কোন শাখা নেই। কিন্তু জনহিতকর কাজের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটির নাম দেশে বিদেশে সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। প্রাপ্ত বয়স্করাও ইউনিয়নের সদস্য হতে পারেন। এই প্রতিষ্ঠান নারী সমাজের কল্যাণে সরকার এবং অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। এঁদের উদার হৃদয় ও অকৃত্রিম সহানুভতির অম্লান স্পর্শ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক নারীর জন্য প্রসারিত।

কৃষকদের সেবায় রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়

উদয়পুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রকল্প অনুযায়ী ১২০০ কৃষককে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে এবং আরও ৮০০০ কৃষককে তাদের গ্রামে, অধিক ফলনের শস্যের চাষ ও পুষ্টি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ঐ সব এলাকায় চাষবাস সম্পর্কে যে সব পুস্তিকা ইত্যাদি বিতরণ করা হয় এবং এবং শস্যাদি পোকামাকড় থেকে রক্ষা করা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ, কৃষকদের জমিতে গিয়ে যে সব পরামর্শ দেন তাতে কৃষকরা খুব উৎসাহ বোধ করেছেন।

ভারতস্থিত, ক্ষুধা থেকে মুক্তি অভিযান কমিটির ১,১৬৩১৬ডলার প্রকল্পটির সাহায্য নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে যুব ক্লাব সংগঠনেরও ব্যবস্থা করছে। পল্লী অঞ্চলে গঠিত ৬১ টি যুব ক্লাবের প্রায় ১০০০ যুবক, অধিকতর শস্য উৎপাদন, ফল ও শাকসব্জী উৎপাদন ও হাঁস মুরগী পালন সম্পর্কে যুবা কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেবেন।'

★ কৃষির যান্ত্রিক সাজ সরঞ্জাম তৈরি ক'রে ম্যাসে ফার্গুসান ট্র্যাক্টার্সকে যোগাবার জন্য, জয়পুরে, রাজস্থান ইম্প্লিমেন্টস সংস্থা স্থাপন করা হয়েছে।

উন্নয়ন প্রচেষ্টা সম্পর্কে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী

প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ

অর্থমন্ত্রী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭০-৭১ সালের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট পেশ ক'রে, সংক্ষেপে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর কয়েকটা দিক উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে পরিকল্পনার জন্য যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা রেখেও বাজেটে, ভবিষ্যৎ উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণমূলক কয়েকটি প্রকল্পের জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তিনি বুঝিয়ে বলেন যে উৎপাদনমূলক শক্তিগুলির উন্নয়ন এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি ছাড়া অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থায়িত্ব অর্জ্জন করা সম্ভব নয়। তেমনি সমাজের দুর্ব্বলতর শ্রেণীর কল্যাণের দিকে উপযুক্ত লক্ষ্য না রাখলে এই স্থায়িত্বও বজায় রাখা সম্ভব নয়। শ্রীমতী গান্ধী আরও বলেন যে উন্নয়নের প্রয়োজন এবং ন্যায়সঙ্গত বন্টনের মধ্যে যে সংযোগ সূত্রটা আছে তা যদি নষ্ট হয় তাহলে তা অচলাবস্থা বা অস্থায়ীত্বের সৃষ্টি করবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে আমাদের সম্পদ সীমিত এবং তা দিয়ে সমাজের সমস্ত জরুরী প্রয়োজন মেটানো সম্ভব নয়; সেই ক্ষেত্রে এমন একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে অবিলম্বে ফলপ্রদ বিনিয়োগ এবং ভবিষ্যতে উন্নয়নের পথ সুগম করে তুলতে পারে এই রকম একটা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ এই দুইয়ের মধ্যে সমতা আনতে পারে।

দেশে মোটামুটি আর্থিক উন্নয়নের ফলে যে আশার সৃষ্টি হয়েছে তার বিবরণ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে উন্নয়নের গতি দ্রুততর করার জন্য বর্ত্তমান অবস্থায় আরও বেশী চেষ্টা করা উচিত। বর্ত্তমানে উন্নয়নের জন্য যে সব সুযোগ সুবিধে পাওয়া যাচ্ছে তা সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হবে এবং আগামী বছরের উন্নয়নমূলক বিনিয়োগের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা রাখতে হবে।

পরিকল্পনায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি

এই প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে প্রধান মন্ত্রী, কেন্দ্রের উদ্যোগে গৃহীত প্রকল্পগুলিসহ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাগুলির বিনিয়োগের পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগ বাড়ানোর প্রস্তাব করেছেন অর্থাৎ বর্ত্তমান বছরের ১২২৩ কোটি থেকে বাড়িয়ে আগামী বছরে ১৪১১·কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব করেছেন। কেন্দ্র, রাজ্যসমূহ এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সব মিলিয়ে পরিকল্পনায় বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৪০০ কোটি টাকা বাড়বে অর্থাৎ ১৯৬৯-৭০ সালের ২২৩৯ কোটি টাকা থেকে তা বেড়ে ১৯৭০-৭১ সালে ২৬৩৭ কোটি টাকা হবে। প্রধান মন্ত্রী বলেন যে উন্নয়নের গতি দ্রুততর করার পথে একে বেশ বড় একটা প্রচেষ্টা বলা যায়। পরিকল্পনার জন্য এই ব্যবস্থা ছাড়াও শিল্প ও কৃষিকে সাহায্য করার জন্য আগামী বছরে আরও ব্যাপকভাবে সম্পদ সংহত করা হবে।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে সংশোধিত চতুর্থ পরিকল্পনায়, শুষ্ক অঞ্চলে চাষের জন্য উপযুক্ত একটা পদ্ধতি, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের কর্ম্মসংস্থানের জন্য আরও বেশী সুযোগ সুবিধে, যথেষ্ট পানীয় জল সরবরাহ, সহরাঞ্চলের বস্তি এলাকাগুলির পরিবেশ উন্নততর করার মতো কতকগুলি সামাজিক অর্থনৈতিক জরুরী প্রয়োজন মেটানো সম্পর্কে বিশেষভাবে চেষ্টা করা হবে।

আরও কর্ম্মসংস্থান

পরিকল্পনায় বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে আগামী বছরে কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ যথেষ্ট বাড়বে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রধান মন্ত্রী বলেন যে কেবলমাত্র একটা কল্যাণমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো হচ্ছেনা, গরীব একটা দেশের পক্ষে এটা, উন্নয়ন কৌশলের একটা প্রয়োজনীয় অংশ; কারণ সে কোন সম্পদই অব্যবহৃত বা আংশিক ব্যবহৃত রাখতে পারেনা।

যে সব রাজ্যের যথেষ্ট সম্পদ নেই তাদের জন্য প্রধান মন্ত্রী বাজেটে ১৭৫ কোটি রাখার প্রস্তাব করেছেন। আশা করা যায় যে এর ফলে রাজ্যগুলি উপযুক্ত পরিকল্পনা কর্ম্মসূচী গ্রহণ করতে পারবে।

শ্রীমতী গান্ধী উল্লেখ করেন যে জাতীয় আয়ের তুলনায় ভারতের করের আনুপাতিক হার বিশ্বের মধ্যে সর্ব্বনিম্ন এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে যে অনুপাতিক হার শতকরা ১৪ ভাগের কিছু বেশী ছিল, গত কয়েক বছরে তা সেই পর্যায় থেকেও কমে গেছে। তিনি সেজন্য উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণের বর্দ্ধমান প্রয়োজন উপযুক্তভাবে মেটানোর জন্য কর ব্যবস্থার ভিত্তিকে সম্প্রসারিত করার ওপর জোর দিয়েছেন। আয় ও সম্পদের মধ্যে অধিকতর সমতা অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে আমাদের প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থা যাতে বড় একটা যন্ত্র হিসেবে কাজ করতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই কর প্রস্তাব তৈরী করা হয়। সুতরাং এই উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য উচ্চতর পর্যায়ে আয়কর এবং সম্পদ ও দানের ওপর করের বর্ত্তমান হার যথেষ্ট বাড়ানো হয়।

ফাঁকি বন্ধ করা

আমাদের কর ব্যবস্থায় প্রধান যে ফাঁকগুলি ছিল সেগুলি বন্ধ করা এবং যে সব সুবিধের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে সেইরকম কতকগুলি সুবিধে প্রত্যাহার করা সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী কতকগুলি ব্যবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। সহরের জমি ও বাড়ীর মূল্য

নিয়ে ক্রমবর্ধমান ফাটকাবাজারী সংহত করার উদ্দেশ্যে সহরের জমি ও বাড়ীর কর যথেষ্ট বাড়ানো হয়েছে। যৌথ সংস্থার কর সম্পর্কে বিশেষ প্রস্তাব করা হয়নি। আশা করা যাচ্ছে যে এটা লগ্নিবৃদ্ধিতে উৎসাহ জোগাবে।

পরোক্ষ করের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, দেশকে ক্রমশঃ আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে পারে সেই রকমভাবে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ করা এবং অর্থনৈতিক বা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যে সব জিনিসের ব্যবহার সংযত করা প্রয়োজন প্রধানতঃ সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই পরোক্ষ করের প্রস্তাবগুলি করা হয়েছে।

চলতি বছরের সংশোধিত হিসেব অনুযায়ী ২৯০ কোটি টাকার পরিবর্তে আগামী বছরে যে ২২৫ কোটি টাকা ঘাটতি দেখানো হয়েছে তার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে অনুকূল অবস্থা দেখা যাচ্ছে তাতে এই ঘাটতি উদ্বেগের সৃষ্টি করবেনা এবং মূল্যের সাধারণ স্থায়ীত্বের পক্ষে কোন আশঙ্কাও সৃষ্টি করবেনা। এই বাজেট প্রস্তাবে "সাবধানে সামান্য একটু এগুবার অথবা বিরাট কিছুর জন্য চেষ্টা করা এই দুটি বিপরীত ঝুঁকি এড়ানো হয়েছে" এই আশা প্রকাশ করে প্রধান মন্ত্রী তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

মূলধনী বাজেট

মূলধনী আয়,			
বাজারে ঋণ (নীট)	১০৬.০০	১৪১.৩১	১৬১.৭০
বৈদেশিক সাহায্য (নীট) (পি. এল ৪৮০ ছাড়া)	৪৬৭.৪০	৪০০.৪৬	৩৯৯.৭৫
+ পি. এল ৪৮০ সাহায্য	২১৫.১১	২০৫.৯৩	১৩২.২৭
ঋণ পরিশোধ	৭৪৫.০০	৮৮০.০০	৮২৫.০০
অন্যান্য আয়	১৯৬.৩৭	৩৪৭.৮১	৩০৪.৯৯
মোট	১.৭২৯.৮৮	১,৯৭৫.৫১	১,৮২৩.৭১
মূলধনী ব্যয়			
অসামরিক ব্যয়	৪৭৮.৬০	৪৮৬.২৪	৫২৪.৩৫
প্রতিরক্ষা ব্যয়	১২৪.২২	১২৫.৪২	১৩৩.৬৭
রেলওয়েতে মূলধন বিনিয়োগ	১৩২.৬০	১২৪.৮৬	১৫০.০০
ডাক ও তার বিভাগে মূলধন বিনিয়োগ	৩৪.১৬	৩৫.৯৬	৩৫.০০
ঋণ ও অগ্রিম			
(১) রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল	৭৯৩.৭৪	১,০৫৭.৯৭	৮৭৮.২৫
(২) অন্যান্য	৪৫৬.৬০	৪২৪.২৩	৪৬৭.১৯
মোট	২,০১৯.৯২	২,২৫৪.৬৮	২,১৮৮.৪৬
মূলধনী খাতে ঘাটতি	২৯০.০৪	২৭৯.৭	৩৬৪.৭৫
মোট ঘাটতি	২৫৩.৬৮	২৯০.১১ (—) ১২৪.৭৬	৩৫০.০০

(+) রাজস্ব খাতে পি. এল ৪৮০ ও অন্যান্য খাদ্য সাহায্য সহ সংশোধিত হিসেবে হবে ৩৩ কোটি টাকা এবং প্রস্তাবিত বাজেটে ২৯ কোটি টাকা।

(*) বাজেট প্রস্তাবের ফলে

প্রকৃত মানুষ কই যে দেশ এগিয়ে যাবে ?

সুধাময় মুখোপাধ্যায়

পরিকল্পিত অর্থনীতি সব দুঃখদুর্দ্দশা দূর করবে এ আশা করা অবাস্তব। আজ জীবনের মূল্যবোধ বিলীয়মান, জীবিকা ও জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। মনুষ্যত্বের জাগরণ ছাড়া কোনোও পরিবর্তন আশা করা অর্থহীন।

স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যে ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখবরণ অপরিহার্য ছিল, তার জন্য দেশে সার্বিক গণ-প্রস্তুতির অভাব যদিও ঘটেনি তবু, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, আমাদের লক্ষ্য আজও অপূর্ণই রয়ে গেছে। পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ যে কোনও স্বাধীন দেশেব মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিত। ব্যক্তিত্ব যেখানে যোগ ভ্রষ্ট, চেতনা যেখানে বিকারগ্রস্থ, উচ্চাভিলাষ যেখানে দৈনন্দিনের কাছে পদানত, সেখানে 'সত্য'কার মনুষ্যত্বের আবির্ভাব আশা করা চলে না। অজস্র পবিকল্পনা আমরা তৈরি করতে পারি কিন্তু মনুষ্যত্বের জাগ-রণ ছাড়া কোনও পরিকল্পনাই পরিপূর্ণভাবে সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। আজ জীবিকা আর জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। পুরাতন মূল্যবোধগুলি আজ অপসৃয়মান। পরিকল্পিত অর্থনীতি চালু হলেই সব দুর্দশা ঘুচে যাবে, এমন আশা যাঁরা করেন, তাঁরা আসলে বাস্তব সত্য-টাকেই দেখতে পান না, তাই বলছিলাম, দেশে নামেই শুধু পরিকল্পনা হচ্ছে, মানুষ গড়ে উঠছে না। অথচ এমন অবস্থা তো ববাবরই চলতে দেওয়া যায় না।

মানুষ গড়তে হলে হাত লাগাতে হবে সেইখানে যেখানে মনুষ্যত্বের অঙ্কুর সবে দেখা দিয়েছে অর্থাৎ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তরে। শুধু পুঁথিগত শিক্ষার যথার্থ মানুষ গড়া যাবে না। পুঁথির ভারে যে মন ভারাক্রান্ত, চোখা বুলি মুখস্থ ক'রে যে পড়ুয়ার গ্রহণ ক্ষমতা অতিক্রান্ত, উপযুক্ত প্রকাশের প্রতীক্ষায় স্বাস্থ্য যেখানে অব্যবহারে অবলুপ্ত সেখানে আর যাই হোক সুস্থ মানসিকতার বিকাশ আশা করা যায় না। পুঁথিগত পাঠের পাশাপাশি তাই চাই দেহেরও বিকাশ। যে উদ্বৃত্ত শক্তি, প্রকাশের সহজ পথ না পেয়ে বিকৃত পথে নামা উদ্ভ্রান্তির জন্য দিচ্ছে তা নির্দিষ্ট পথে পরিচালনার জন্য সুসংগঠিত কার্যক্রম চাই। সমগ্র ভারতের জনশক্তি আজ উম্মার্গ গামী। বিশেষ করে যুব শক্তি আজ বিভ্রান্ত, বিশ্লিষ্ট ও বিপর্যস্ত। কৈশোর বা যৌবনেই যারা বিশৃঙ্খল, বড়দের সম্পর্কে বেপরোয়া, তারা বড় হ'য়ে দেশ বা সমা-জের শান্তি বিঘ্নিত করবেই। শিক্ষার চাহিদা আছে, আবার চাপও রয়েছে। কিন্তু শিক্ষান্তে দাঁড়াবার মত পায়ের তলায় কঠিন জমি কোথায় ? চাকরীর নিশ্চয়তা নেই, বাঁচার নিরাপত্তা নেই। এমন নিরালম্ব নিশ্চেষ্ট অবস্থায় যা অবশ্যম্ভাবী, তাই ঘটছে। জীবনের সমস্ত বাধা বিঘ্নের চ্যালেঞ্জ শক্ত মুঠোয় প্রতিরোধ করার মত দুর্মদ পৌরুষ বা দুর্জয় ব্যক্তিত্ব না থাকায় পদে পদে হেরে যাচ্ছি আমরা। অথচ এই পরাজয়, পদে পদে এই বিড়ম্বনা কোনও স্বাধীন দেশের নাগরিকের ঈপ্সিত হতে পারে না। এই করুণ ও মর্মান্তিক বিপর্যয় থেকে দেশের কৈশোর ও যৌবনকে রক্ষা করতে হলে সবার আগে চাই স-নিষ্ঠ সাধনা আর সপ্রাণ সহযোগিতা। মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করে সকলকে সমান বোধে উদ্বুদ্ধ করার কৃত সংকল্পে আজ স্থির হতে হবে। এ কাজে প্রথমেই চাই মানুষ হয়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ। চাই স্বাস্থ্য, চাই আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু। কোথায় আছে স্বাস্থ্যের মৃত সঞ্জীবনী ? কোথায় পরমায়ুর অকুণ্ঠ আশীর্বাদ যেখানে শক্তির জোয়ার আসবে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে। এই আকাঙ্খিত পরিবেশ পাওয়া যাবে খেলার মাঠে। খেলার মাঠেই নিতে হবে মেলা-মেশার পাঠ। সকলের সঙ্গে এক সাথে খেলবার সুযোগ তো ঐ খেলার মাঠেই।

খেলাকে জীবন গঠনের অঙ্গ করে নিতে হলে বিদ্যালয় স্তর থেকেই কাজ সুরু করতে হবে। বাংলা দেশের সব বিদ্যাল-য়ের নিজস্ব খেলাব মাঠ নেই। অনেক ক্ষেত্রে একটি খেলার মাঠ কয়েকটি বিদ্যালয়কে ভাগাভাগি করে নিতে হয়। খেলাব মাঠ না থাকায় পাড়ায় পাড়ায় ছেলেরা রকে বসে আড্ডা দেয় বা উত্তেজক কোন ঘটনার আভাস পেলেই তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবক্ষয়ের পোকা ওদের মনুষ্যত্ব কুরে কুরে খায়। অথচ খেলা দেখার জন্য যারা ভীড়ের চাপে প্রাণ দেয়, তাদের খেলার জন্য উপযুক্ত মাঠ বা ব্যবস্থা থাকলে অবশ্যই তারা সংহত, সংযত, সংঘবদ্ধ হবে, প্রবুদ্ধ হবে সামগ্রিক বোধে। বিদ্যালয়ে খেলার অবকাশ ক্রমেই সকুচিত হয়ে আসছে। সিলেবাসের ঠাস বুনোনীর মধ্যে খেলার মুক্তি কোথায় ? যেটুকু ছিঁটে ফোঁটা হয় তাতে মন ভরে না। ক্লাবের ব্যবস্থা কোথাও কোথাও আছে, কিন্তু ছোটদের জন্য তালাও ব্যবস্থা সেখানে নেই। দেশে ক্রীড়া পরিষদ আছে, বা সরকারের ক্রীড়া দপ্তর আছে। সর্বোপরি বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু ছাত্রদের শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত ধারা-বাহিকভাবে দৈহিক বিকাশের কোনও সুবন্দোবস্ত কোথাও নেই। তাই বিদ্যা-লয়ের দিকেই নজর দেওয়া বেশী করে প্রয়োজন। খেলাধুলাকে শিক্ষার সহযোগী পাঠক্রম হিসেবে রাখা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু তার গুরুত্ব অন্যান্য শিক্ষা সূচীর সমান নয়। ক্রীড়া শিক্ষকও বিদ্যালয়ে অন্যান্য শিক্ষকদের মত বিশেষ স্বীকৃতি

১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন

কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে গতবছরের কর্ম্মপ্রচেষ্টা

অর্থনৈতিক নবজাগরণ ও প্রত্যেক ক্ষেত্রে উন্নয়নের গতিবৃদ্ধি

গত বছর দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে এবং নতুন আর্থিক বছরে উন্নয়নের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সেই গতি দ্রুততর হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে। গত ২৪শে ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সংসদে, ১৯৬৯-৭০ সালের যে আর্থিক পর্যালোচনা পেশ করেন তাতেই দেশের এই উৎসাহ জনক অবস্থাটা প্রকাশ পায়। এই বছরে শতকরা মোটামুটি ৫ থেকে ৫।। ভাগ উন্নয়ন হার অর্জন করার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের বিভিন্ন অংশে প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য ১৯৬৮-৬৯ সালে কৃষি উৎপাদন আশানুরূপ হয়নি তবে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষণ আবার সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এবং তার ফলে মোটামুটি উৎপাদন বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ১৯৬৭-৬৮ সালে মোট ৯ কোটি ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়। এই বছরে উৎপাদন যথেষ্ট বাড়বে। পণ্যশস্যের উৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছে; গত বছর আখের উৎপাদন যে উচ্চ সীমায় পৌছায়, এই বছরে সেই সীমাও অতিক্রম করবে। চীনাবাদাম ও তুলোর উৎপাদনও গত বছরের তুলনায় বেশী হবে। পাটও যথেষ্ট উৎপাদিত হয়েছে।

শিল্প-ক্ষেত্রেও উৎপাদন বেশ বেড়েছে। ১৯৬৮ সালে এই বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৬.৪ ভাগ এবং ১৯৬৯ সালে তা শতকরা আরও ৭.৫ ভাগ বাড়বে বলে আশা করা যাচ্ছে। তবে এই বছরে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে, বিভিন্ন ক্ষেত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির সুফল গুলি সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করা যায়নি। ১৯৬৮ সালের তুলনায় দ্রব্য-মূল্যের হার শতকরা ২.১ ভাগ বেশী ছিল। ১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকৃতপক্ষে দ্রব্যমূল্য আবার ওপরের দিকে যেতে থাকে এবং এক বছর পূর্ব্বে যা ছিল, পাইকারি মূল্য তা থেকে শতকরা ৬.৮ ভাগ বেড়ে যায়।

সরকারী এবং বেসরকারী উভয় তরফেরই লগ্নির পরিমাণ বেড়েছে, বিশেষ করে কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প ও নির্মাণ কার্য্যে লগ্নির পরিমাণ বেড়েছে। সংগঠিত শিল্পে বেসরকারী লগ্নির পরিমাণ বেড়েছে কিনা সে সম্পর্কে পরিষ্কার কোন লক্ষণ না পাওয়া গেলেও লগ্নির ক্ষেত্রে উৎসাহ আবার বেড়েছে। করের মাধ্যমে, দীর্ঘ-কালীন মেয়াদের ঋণ এবং কেন্দ্র থেকে অধিকতর সাহায্যের মাধ্যমে, এই বছরে রাজ্যসরকারগুলিরও সম্পদ বেড়েছে। জাতীয় আয়ে কর ও রাজস্বের অনুপাত ১৯৬৫-৬৬ সালে যেখানে ছিল শতকরা ১৪.২ ভাগ, ১৯৬৭-৬৮ সালে তা ক'মে গিয়ে শতকরা ১২.৪ ভাগে দাঁড়ায়, ১৯৬৮-৬৯ সালে তা কিছুটা বেড়ে ১২.৮ ভাগে আসে এবং চলতি বছরে তা শতকরা ১৩ ভাগে দাঁড়িয়েছে বলে আশা করা যাচ্ছে।

দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ১৯৬৯-৭০ সালটি অত্যন্ত সাফল্যের বছর ছিল বলা যায়। ১৯৬৮-৬৯ সালে দেশের বাণিজ্য ঘাটতি ৮০৯ কোটি টাকা থেকে কমে ৫০২ কোটিতে দাঁড়ায়। রপ্তানী শতকরা ১৩.৬ ভাগ বেড়ে যাওয়ায় এবং আমদানী শতকরা ৭.৩ ভাগ কমে যাওয়ায় এই সুফল পাওয়া যায়। সংরক্ষিত বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার পরিমাণ ৩৮.১ কোটি টাকা বেড়ে যায়। চলতি বছরে রপ্তানী তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে না বাড়লেও, আমদানী আরও কমে যাওয়ায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঘাটতি আরও কমে যায় এবং বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার তহবিলের পরিমাণও ৫০ থেকে ৭৫ কোটি টাকা হয়। শিল্পে লগ্নির পরিমাণ বাড়লে মেসিনপত্র, মেসিনের অংশাদি ও কাঁচা-মালের চাহিদাও বাড়বে, ফলে আমদানির পরিমাণও বাড়বে আর তাতে বাণিজ্যে ঘাটতিও হয়তো বাড়বে। অর্থনৈতিক পর্যালোচনায় বলা হয়েছে যে আমদানির এই বর্দ্ধিত চাহিদা মেটানোর জন্য রপ্তানীও যাতে বাড়ানো যায় তার জন্য চেষ্টা ক'রে যেতে হবে। তাছাড়া ঋণ পরিশোধ এবং স্বাবলম্বী হওয়ার পথে অগ্রসরমান অর্থনীতির প্রয়োজন মেটানোর জন্যও রপ্তানীর পরি-মাণ বাড়ানো প্রয়োজন।

উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলি দেখিয়ে অর্থ-নৈতিক পর্যালোচনায় কতকগুলি ক্ষেত্র সম্পর্কে এ কথাও বলা হয়েছে যে উপযুক্ত সময়ে যদি এগুলির জন্য প্রতিবিধান মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয় তাহলে অবস্থা হয়তো সমাধানের বাইরে চলে যাবে। দৃষ্টান্ত হিসেবে কৃষির কথা বলা যায়। প্রধানত: অধিক ফলনের নতুন ধরণের বীজের ব্যবহার এবং উন্নত কৃষি পদ্ধতির ফলেই কৃষিতে অগ্রগতি সম্ভবপর হয়েছে। ১৯৬৯-৭০ সালে কৃষি উৎপাদন আরও বাড়বে বলে আশা করা যায়। গত বছরের তুলনায় চলতি বছরে খারিফ ফসল ভাল পাওয়া যাবে; রবি ফসলও অতীতের মতোই ভালোর দিকে চলেছে। খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন গত বছরের ৯৪০ লক্ষ টনের চাইতেও বেশী হবে বলে মনে হয়। ১০৯ লক্ষ হেক্টারে অধিক ফলনের শস্যের চাষ করা সম্পর্কে যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল ১৯৬৯-৭০ সালে সেই লক্ষ্য পূরণ হবে বলে আশা করা যায়। ১৯৬৮-৬৯ সালে এই জমির পরিমাণ ছিল ৯৩ লক্ষ হেক্টার। ১৯৬৮-৬৯ সালে ৬০ লক্ষ হেক্টার জমি নিবিড় চাষের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, চলতি বছরে তার পরিমাণ ৮০ লক্ষ হেক্টারে পৌঁছুবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

১৯৬৮-৬৯ সালে যেখানে ৫৪১,০০০ মেট্রিক টন রাসায়নিক সার উৎপাদিত হয় সেই ক্ষেত্রে চলতি বছরে ৮৫০,০০০ মেট্রিক টন উৎপাদিত হলেও চাহিদা, আশা অনু-যায়ী বাড়েনি, ফলে এগুলি উদ্বৃত্ত হয়ে পড়েছে। কৃষকরা যাতে যথেষ্ট পরিমাণে রাসায়নিক সার পেতে পারেন তার সুযোগ সুবিধে বাড়ানোর জন্য রাসায়নিক সারের ব্যবসা লাইসেন্স বহির্ভুত করা হয়েছে এবং ছোট কৃষকরাও যাতে প্রয়োজনীয় ঋণ

পেতে পারেন সেজন্য রাষ্ট্রীকৃত ব্যাঙ্কগুলি তার ব্যবস্থা করেছেন। ১৯৬৫ সালের মার্চ্চ মাস থেকেই ভারতের খাদ্য কর্পোরেশনকে খাদ্যশস্য মজুদ করা ও তা চলাচল করানো ইত্যাদির ভার দিয়ে দেওয়া হয়েছে। চলতি বছরে কর্পোরেশন ১০ কোটি মেট্রিক টন খাদ্যশস্য কেনাবেচা করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে অবস্থা ভালো হওয়ায়, ১৯৬৬ সালে যেখানে ১০৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয় সেই জায়গায় ১৯৬৯ সালে আমদানি করা হয় মাত্র ৩৯ লক্ষ টন এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির হাতে মোট মজুদ খাদ্যশস্যের পরিমাণ ৪৯ লক্ষ টনে পৌঁছুবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তাছাড়া দেশের বহু জায়গায় অবাধে খাদ্যশস্য চলাচল করেছে।

শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি

১৯৬৭-৬৮ সালে কৃষিতে অপূর্ব্ব সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে যে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি সুরু হয় তা সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে গেছে। ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় ১৯৬৮ সালের ঐ সময়ের তুলনায় উন্নয়ন হার শতকরা ৭.৩ ভাগ বেশী ছিল। কৃষিতে আয় বেশী হওয়ায় চিনি, রেডিও, বৈদ্যুতিক বাতি, মোটর সাইকেল ও স্কুটারের চাহিদা বাড়ে, ফলে ১৯৬৮ সালের মতো এই সব জিনিস উৎপাদনকারী শিল্পগুলির উৎপাদন অব্যাহত থাকে।

উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার

বহু শিল্পেরই বর্ত্তমান উৎপাদন ক্ষমতা বহু ক্ষেত্রে অধিকতর পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ, টায়ার, টিউব, রাবার ও চামড়ার জুতো, কষ্টিক সোডা, সোডা এ্যাশ, রং, কৃত্রিম তন্তু, প্লাষ্টিকের জিনিস তৈরির পাউডার, এ্যালুমিনিয়াম, ডিজেল ইঞ্জিন, ব্যাটারি, বৈদ্যুতিক বাতি, রেডিও ও মোটরগাড়ী তৈরির শিল্পগুলির পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়েছে। এমন কি যে ক্ষেত্রে বর্ত্তমানের পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়নি যেমন কাগজ, কাগজের বোর্ড, পাত কাঁচ, সিমেন্ট, ট্রাক্টার, বাইসাইকেল, মুদ্রার কল, রাসায়নিক সার ইত্যাদি, সেগুলির উৎপাদন ক্ষমতাও ১৯৬৮ সালের তুলনায় চলতি বছরে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে।

লগ্নির অবস্থারও অনেক উন্নতি হয়েছে। শিল্পের লাইসেন্সের জন্য ১৯৬৯ সালে যত আবেদন পাওয়া গিয়েছে তার সংখ্যা ১৯৬৮ সালের তুলনায় অনেক বেশী। ১৯৬৯ সালে যত অনুমতি দেওয়া হয় সেগুলির সংখ্যা ১৯৬৮ সালের দ্বিগুণ।

মোট শিল্পোৎপাদনে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অবদান বেশ উল্লেখযোগ্য এবং এগুলির অগ্রগতিও প্রশংসনীয়।

অর্থনৈতিক অবস্থা

কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চম অর্থ কমিশনের সুপারিশগুলি চলতি বছরের একটা প্রধান ঘটনা। এর অর্থ হল পাঁচ বছরে মোট ৪২৬৬ কোটি টাকা রাজ্যগুলিকে দেওয়া হবে। তবে রাজ্যগুলি হয়তো প্রকৃতপক্ষে এর চাইতেও বেশী টাকা পাবে।

অর্থ কমিশনের সুপারিশগুলি গ্রহণ করার ফলে এবং ১৪ টি প্রধান ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়াত্ব হওয়ার ফলে, চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়ার তুলনায়, রাজ্যগুলির পরিকল্পনার আকার আরও বেড়ে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম বছরে ১৯৬৯-৭০ সালের শেষে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি অনুকূল। আগামী বছরে সরবরাহ ও চাহিদা উভয়ই যে যথেষ্ট বাড়বে তারও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৭০-৭১ সালে স্থায়িত্বের সঙ্গে উন্নয়নের গতি যে বজায় রাখা যাবে তার যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রকৃত মানুষ কই যে দেশ এগিয়ে যাবে ?

১১ পৃষ্ঠার পর

পান না। অথচ ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জাগাতে ক্রীড়া শিক্ষকের মত যোগ্যব্যক্তি আর কেউ নেই। সমস্ত শিক্ষক যদি তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন, তবে সমস্যার সমাধান সহজ হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের একত্র মেলামেশার ব্যবস্থাও খেলার মাধ্যমেই হতে পারে। জিলা বা মহকুমা স্তরে এই মেলামেশা সম্ভব করে তুলতে পারলে ক্রমে সমগ্র রাজ্যে ছাত্রদের একটি অখণ্ড ও সুসংহত সম্মেলন গড়ে তোলা কঠিন হবে না। খেলার মাঠের ব্যবস্থাও চাই। এজন্য সরকারী সাহায্য ও প্রশাসনিক সহযোগিতা প্রয়োজন। সমবায় ভিত্তিতে খেলার মাঠের জন্য জমি সংগ্রহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মোট কথা অসংবদ্ধ বিশৃঙ্খল যুব শক্তিকে ক্রীড়ার সুস্থ আঙ্গিনায় টেনে আনতে হবে। খেলার সঙ্গে সুষম খাদ্য বন্টনের সুযোগ সুবিধার প্রসার দরকার। সরকারী স্তরে প্রযত্ন থাকলে সুষম খাদ্য যোগানোর ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা আদৌ কঠিন হবে না। খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি গড়ে উঠলে জীবনটাকেও খেলোয়াড়ের মন নিয়ে গ্রহণ করা সহজ হবে।

বঞ্চিত জীবন-আস্বাদ ও নৈরাশ্যের শীতার্ত অনুভূতি আর শিলীভূত চেতনা আজ নতুন আলোর স্পর্শে সব জড়তা ঝেড়ে ফেলে সত্তার সুন্দরতর পরিচয়কে উন্মোচিত করতে চাইছে। এই তো প্রশস্ত সময়। পুরাতন মূল্যবোধকে নতুন যুগের আলোকে পরিশুদ্ধ করে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে ভবিষ্যতের পথে। সমস্ত তুচ্ছতার ওপরে স্থান দিতে হবে, অমৃতের অধিকারে অধিকারী যে মানুষ, সেই মানুষের মনুষ্যত্বের মহৎ মর্যাদাকে। আজ যারা কচি কাঁচা আজ যারা কিশোর ও অরুণ, তাদের মধ্যে দিয়েই মূর্ত হয়ে উঠবে আমাদের স্বপ্নের বাংলা দেশ, তাদের মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশে দেশের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত হবে। খেলাধুলার মাধ্যমেই এই আকাঙ্খা পূর্ণতা পেতে পারে। সেদিনের মানুষের ইস্পাত কঠিন বাহুতে জাতির আকাঙ্খা কথা বলবে, বুদ্ধিদীপ্ত চোখের তারায় জলবে বিশ্বাসের মনি দীপ, শিরায় শিরায় প্রাণের প্রাচুর্য, ক্লৈব্যকে পরাভূত করবে।

ছোট পরিবার-সুখী পরিবার, বড় হ'লেই বিপত্তি

পরিবার পরিকল্পনা তারই নিষ্পত্তি

কেরালার আলেপ্পি জেলাটি সম্প্রতি পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট স্থান অর্জ্জন করেছে। এই জেলার মেডিক্যাল অফিসারদের মতে, আলেপ্পির এই বৈশিষ্ট্যের মূলে রয়েছে, সাধারণ শাখা ও পরিকল্পনা শাখার মধ্যে সর্ব্বস্তরে সমন্বয়।

যে সব অঞ্চল পরিবার পরিকল্পনার বিরোধী ছিল, পরিবার পরিকল্পনা সংস্থার কর্ম্মীরা সেখানে সাধারণত: যেতে চাইতেন না, সেখানে এখন তাঁরা অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতায় বিনা দ্বিধায় কাজ করছেন।' প্রচলিত কতকগুলি সংস্কারের বশবর্ত্তী হয়ে জনগণ পরিবার পরিকল্পনার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু কর্ম্মীরা ব্যক্তিগতভাবে বুঝিয়ে সুঝিয়ে, গণসংযোগ বিভাগের কর্ম্মীদের সহযোগিতায় জনসাধারণের সেই সংস্কার ভেঙ্গে দিতে অনকখানি সক্ষম হয়েছেন। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা যদি বর্ত্তমান হারে বাড়তে থাকে তাহলে আলেপ্পি জেলাটি যে বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করেছে তা তো রক্ষিত হবেই, তাছাড়া হয়তো আরও রেকর্ড স্থাপন করতে পারবে।

আলেপ্পি জেলার নাল্লাপালির প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের প্রধান, ডাঃ (কুমারী) মারিয়াম্মা স্যামুয়েল মনে করেন যে, জনসংখ্যার অতি বৃদ্ধির মতো একটা জাতীয় সমস্যার সমাধান করতে হলে সমস্ত চিকিৎসকদের বিশেষ করে তাঁদের মত অল্পবয়স্কদের কিছুটা ত্যাগ স্বীকারের জন্য তৈরি হতে হবে।

এখানকার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি ১২৫,০০০ জনের প্রয়োজন মেটায়। ১৯৬৬ সালে এই কেন্দ্রটির ভার নেওয়ার পর থেকে তিনি পরিবার পরিকল্পনার কাজ সম্পর্কেই বেশী মনযোগ দিচ্ছেন। গত তিন বছর থেকে তিনি সন্তান জন্ম প্রতিরোধ মূলক অস্ত্রোপচারও করছেন।

১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসের পরিবার পরিকল্পনা পক্ষে এবং এর পূর্ব্বের তিন মাসে তিনি জেলা পর্য্যায়ে, আই ইউ সি ডি তে এবং পরিবার পরিকল্পনার কাজে উভয় বিষয়েই প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৬৮ সালের জুন মাসের পূর্ব্বের তিন মাসে, পরিবার পরিকল্পনার কাজে তিনি জেলা পর্য্যায়ে প্রথম পুরস্কার পান।

এই কেন্দ্রটি আলেপ্পি জেলার বড় একটি অঞ্চলে কাজ করে এবং তাঁদের ধর্ম্মীয় ও অন্যান্য ভিত্তিতে প্রতিরোধমূলক নানা অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়।

ডাঃ স্যামুয়েল কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট দিনে ১২ টি শাখা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং তখন তিনি পরিবার পরিকল্পনার সঙ্গে মাতৃমঙ্গল ও শিশু কল্যাণের কাজও করেন। তিনি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের খুব কাছে থাকেন বলে, অফিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ের বাইরেও পল্লীবাসীদের সেবা করেন। যাঁরা পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত কোন কাজে আসেন তাঁদের তিনি কখনও অপেক্ষা করতে বলেননা।

তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে পরিবার পরিকল্পনার মত বিষয়ে অস্ত্রোপচারের পরেই চিকিৎসকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়না। অস্ত্রোপচারের পর রোগীকে দেখাশুনা করা আরও বেশী প্রয়োজন। এই বিষয়টিকে তিনি সব সময়ে অগ্রাধিকার দেন।

সেনারাও পিছিয়ে নেই

বাঙ্গালোরের বিমান বাহিনীর হাসপাতালের কমাণ্ডার, গ্রুপ ক্যাপ্টেন বসু বলেন যে "প্রতিরক্ষা বিভাগে সেনাদের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে, কাজেই পরিকল্পিত পরিবারের সুবিধে অসুবিধে তাদের বোঝানো অপেক্ষাকৃত সহজ।"

বড় বড় গাছের ছায়ার নীচে, চারিদিকের মনোরম পরিবেশের মধ্যে ৬১২ টি বেডের এই হাসপাতালে বেশ বড় বড় হল এবং আলোবাতাসযুক্ত কক্ষ রয়েছে। তাছাড়া মহিলা ও শিশুদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড রয়েছে।

এই হাসপাতালের প্রসূতি ওয়ার্ডে প্রতি মাসে মোটামুটি ৭০ থেকে ৭৫ টি প্রসব, ১২ টি লুপ পরানো এবং ৭ থেকে ৮ টি সন্তান জন্ম প্রতিরোধক অস্ত্রোপচার হয়ে থাকে।

জনসাধারণকে যদি উপযুক্তভাবে পরিবার পরিকল্পনার উপকারগুলি বোঝাতে পারা যায় তাহলে তাঁরা স্বেচ্ছায় অস্ত্রোপচার করিয়ে নেন। পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের বোঝান সহজ। যাঁরা উপকৃত হন তাঁরাই পরিবার পরিকল্পনাকে বরং বেশী জনপ্রিয় করে তোলেন।

মহিলারাই যে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে বেশী উৎসাহী, অর্থনৈতিক অবস্থাই তার প্রধান কারণ। স্বাস্থ্য খারাপ হওয়া অথবা বেশী সন্তানের জননী হওয়াটা হল অন্যান্য কারণ। তবে পুরুষরাও বর্ত্তমানে পরিবার পরিকল্পনায় উৎসাহী হয়ে উঠছেন

মধ্যপ্রদেশের রায়সাইন জেলার গৌতমপুর গ্রামের শতকরা ৮০ জনই পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি অনুসরণ করছেন। ওবেইদুল্লাগঞ্জ থেকে ৯ কি: মী: দূরের এই গ্রামটিতে ২৪ টি হরিজন ও ১১টি আদিবাসী পরিবার আছে। ১৯৬১ সালে তাঁদের এখানে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক পরিবারকে ১৫ একর করে জমি দেওয়া হয়।

এই ছোট গ্রামটির ১২ জন পুরুষ অস্ত্রোপচার করিয়ে নিয়েছেন এবং ১৪ জন নারী লুপ নিয়েছেন। প্রথম যে অস্ত্রোপচারের জন্য আসেন তাঁর নাম লালু (৪৫) এবং তাঁর ৭টি জীবিত সন্তান আছে। ৪টি সন্তান শৈশবেই মারা যায়। লালুর পরে তাঁদের সমাজের অনেকেই অস্ত্রোপচার করিয়ে নেন।

গম চাষের উন্নত প্রণালী

শ্রীবিষ্ণু পদ দাস

ডেপুটী প্রজেক্ট অফিসার,
আই.এ ডি. পি., বর্দ্ধমান

গমের চাষের জন্য দোআঁশ, বেলে দোআঁশ, পলি দোআঁশ ও এটেল দোআঁশ প্রভৃতি মাটি উপযোগী তবে অতিরিক্ত বেলে বা এঁটেল বা অম্ল বা লবনাক্ত বা ক্ষারযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। অধিক ফলন পেতে হ'লে জমিতে অবশ্যই সেচের বন্দোবস্ত ও জল নিকাশের সুবিধা থাকা দরকার। তবে গঙ্গার পলি মাটির চরে বিনা সেচেও এই ফসলের চাষ হ'য়ে থাকে।

সেচযুক্ত এলাকায় কল্যান সোনা, সোনালিকা, সরবতি সোনোরা, সফেদ লার্মা, ছোটিলার্মা, লার্মারোহো, সোনোরা-৬৪ প্রভৃতি অধিক ফলনশীল জাতগুলির চাষ লাভদায়ক। সোনালিকা, সর্বতি সোনোরা এবং সোনোরা-৬৪, সাধারণ আমন ধানের চাষের পরও আবাদ করা যায়। যে সব এলাকায় সেচের বিশেষ সুবিধা নাই সেখানে দেশি এন-পি-গম যেমন এন-পি, ৮২৪, এন-পি, ৭৯৮, এচ-পি, ৮৩৫ ইত্যাদি জাতের গম চাষ করা প্রশস্ত।

জমিতে জো থাকতে ২-৩ বার আড়াআড়ি লাঙ্গল দিতে হ'বে। মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণ রস না থাকলে বোনার আগে সেচ দিয়ে জমিতে আবার ২-৩ বার লাঙ্গল, বিদা ও মই দিয়ে নিয়ে ঝুরঝুরে মাটি তৈরী ক'রে নেওয়া দরকার। সেচের জল যাতে সুষ্ঠুভাবে এবং সমানভাবে দেওয়া যায় সে জন্য কাঠের পাটা বা মই চালিয়ে জমি সমতল ক'রে নিতে হ'বে। সেচ ও নিকাশের জন্য ১০-১২ হাত অন্তর নালা এবং ছোট আল তৈরী ক'রতে হ'বে।

সার ও কীটনাশকের প্রয়োগ

প্রথম চাষের সময় একর প্রতি ৯-১০ গোবর সার জমিতে ছড়িয়ে দিতে হ'বে যাতে লাঙ্গল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা মাটির সঙ্গে মিশে যায়।

বেশী ফলনের জন্য মাটিতে ফসলের খাবার অর্থাৎ সার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে যোগান দিতে হ'বে। নাইট্রোজেন, ফস্‌ফেট এবং পটাশ এই তিনটি সারের মাধ্যমে ফসলের খাদ্য সরবরাহ করা হ'য়ে থাকে। গাছের সর্বাঙ্গীন বৃদ্ধি, ভাল শিকড়, শক্ত ও সতেজ ঝাড়, বড় শীষ এবং পরিপুষ্ট দানা পেতে হ'লে সুষম সারের ব্যবহার ছাড়া কোনোও গত্যন্তর নেই।

অধিক ফলনশীল জাতের জন্য জমির উর্বরতা অনুযায়ী প্রাথমিক মাত্রার সার হিসাবে নাইট্রোজেন, ফসফেট এবং পটাশ

১ কেজি নাইট্রোজেন এবং ১ কেজি ফস্‌ফেট, একত্রে ৫ কেজি (২০-২০ হারে) অ্যামোফস্‌ বা নাইট্রোফস্‌ দানাদার সার থেকে পাওয়া যাবে।

১ কেজি নাইট্রোজেন, ১ কেজি ফস্‌ফেট এবং ১ কেজি পটাশ একত্রে ৬.৬৬০ কেজি (১৫ : ১৫ : ১৫ হারে) দানাদার সার থেকে পাওয়া যাবে।

এই তথ্যটুকু জানা থাকলে কতটা ফসলের জন্যে কতটা সার লাগবে সে হিসেব করা সহজ পাবে।

শেষ চাষের আগে সারের প্রাথমিক মাত্রার সঙ্গে একর পিছু ১৫ কেজি অলড্রিন ৫% বা হেপ্টাক্লোর ৫% বা ক্লোরডেন ৫% গুঁড়ো প্রয়োগ করতে হ'বে। এতে উই, কাটুই পোকা প্রভৃতি মাটির নীচের পোকার আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা হ'বে।

গম, রবি খন্দের একটি প্রধান ফসল। খাদ্য শস্য হিসাবে ধানের পরেই গমের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা সব চেয়ে বেশী। এক মাপ গম প্রায় দেড় মাপ ধানের সমান। আবার আগে যে সব জমি থেকে একর প্রতি ১০ থেকে ২০ মণ গম পাওয়া যেত উন্নত প্রণালীতে অধিক ফলনশীল জাতের গমের চাষ ক'রে সে জমি থেকেই ৪০ থেকে ৫০ মণ শস্য পাওয়া সম্ভব।

প্রত্যেকটি একর পিছু ১৮ থেকে ২৪ কেজি প্রয়োগ করা দরকার। অবশ্য এন-পি জাতের জন্যে লাগে এর অর্ধেক পরিমাণ, তাছাড়া এন-পি জাতের জন্য পটাশ প্রয়োগের প্রয়োজন নাও হ'তে পারে। আসল কথা মাটি পরীক্ষা ক'রে সার প্রয়োগ করলে সব থেকে ভাল। ১ কেজি নাইট্রোজেন, ৫ কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট বা ক্যালসিয়াম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট অথবা ২.২০০ কেজি ইউরিয়া থেকে পাওয়া যাবে।

১ কেজি ফসফেট—৬.২৫০ কেজি সুপার ফস্‌ফেট থেকে পাওয়া যাবে।

১ কেজি পটাশ—২ কেজি মিউরিয়েট্‌ অব্‌ পটাশ থেকে পাওয়া যাবে।

জমি তৈরী হয়ে গেলে বীজ বোনার আগে, সর্ব্বাগ্রে দোষমুক্ত ভালো বীজ শোধন করতে হবে।

একর প্রতি ৪০-৫০ কেজি বীজ যথেষ্ট। প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম ১% পারদ ঘটিত ঔষধ যেমন অ্যাগ্রোসান জি-এন্‌ বা সেরেসান মিশিয়ে শোধন ক'রে নিতে হ'বে। ক্যাপটান ৭৫% দিয়েও বীজ শোধন করা যায়। সেক্ষেত্রে প্রতি কেজি বীজে ২ গ্রাম ঔষধ মেশাতে হ'বে।

কয়েকটি জাতের বীজ বোনার কয়েকটি বিশেষ সময় আছে। যেমন সোনোরা-৬৪, সোনালিকা ও সর্বতি সোনোরা সমস্ত অগ্রহায়ন মাসে বোনা চলে। অন্যান্য জাত ১৫ই কার্ত্তিক থেকে ১৫ই অগ্রহায়ণ

পর্য্যন্ত। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম ১৫ দিন সব রকম গম চাষের পক্ষে প্রশস্ত। বীজ বোনার সময়ে মই দিয়ে জমি সমান করে নিয়ে ৬-৮ ইঞ্চি দূরে দূরে, সারিতে বীজ বুনতে হ'বে। সারির মধ্যে বীজের দূরত্ব থাকবে এক ইঞ্চির মত।

মাটির ভাল জো অবস্থায় ১॥ ইঞ্চি ২ ইঞ্চি গভীবে বীজ বুনলে ভাল অঙ্কুরোদ-গম হ'বে। এ জন্য বীজ বোনার যন্ত্র (সীডড্রিল) ব্যবহার করাই ভাল। যেসব মাটি খুব ঝুরঝুরে করা সম্ভব নয় সেখানে সরু লাঙ্গলের সাহায্যে বা খুপি ক'রেও বীজ বুনতে পারা যায়। বোনার আগে যদি মাটিতে পর্য্যাপ্ত রস না থাকে তাহ'লে বোনার ৬-৭ দিন আগে একবার ভাল ক'রে সেচ দিতে হ'বে। এতে গমের অঙ্কুর ঠিকমত বেরুতে পারবে। বোনার তিন সপ্তাহ পরে প্রথমবার সেচ দিতে হ'বে। অবশ্য ঢেলা মাটিতে বোনার ৬-৭ দিন পরেই একটি ঝাপটা সেচ লাগতে পারে। পরে মাটিতে রসের এবং ফসলের অবস্থা বুঝে ১৫-২০ দিন অন্তর সেচ দিতে হ'বে। আবহাওয়া ও মাটি বিশেষে মোটামুটি ৫-৬ বার সেচের প্রয়োজন হ'বে। লক্ষ্য রাখতে হ'বে, ফুল আসার সময় থেকে দানা পুষ্ট হওয়ার সময় পর্য্যন্ত যেন মাটিতে রসের অভাব না হয়। রসের অভাব হ'লে দানা ছোট হ'য়ে যাবে এবং ফলন বেশ কমে যাবে। অধিক ফলনশীল বেঁটে জাতের গমের ক্ষেত্রে শেষের দিকে সেচ দিলেও গাছ হেলে পড়ার বেশী ভয় নাই। আবার অতিরিক্ত সেচও গমের পক্ষে ক্ষতিকর। এতে গম জলবসা ধরে লাল হ'য়ে যায়। বোনার ৩ সপ্তাহ পরে যখন সেচ দেওয়া হ'বে তার আগেই চাপান সার প্রয়োগ করা প্রশস্ত। এই সময় গমের চারার গোড়া থেকে প্রচুর গুচ্ছমূল বের হয়। এ সময় জল ও সার কোনটাই কম পড়া উচিত নয়। এই জল ও সার সতেজ ঝাড় হ'তে বিশেষ সাহায্য ক'রবে ও ফলন বেশী হ'বে।

অধিক ফলনশীল জাতের জন্য একর পিছু ১২ থেকে ১৮ কেজি এবং এন্-পি জাতের জন্য ৯ থেকে ১২ কেজি কেবল নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রয়োগ ক'রে নিড়ানোর সময় চাকা বিদা চালিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হ'বে। বেলে মাটিতে এই সার, তিন সপ্তাহ অন্তর, দুবারে প্রয়োগ করা ভাল।

আগাছা দমনের জন্য এবং মাটি সরস রাখার জন্য, বোনার ১০-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার জমির মাটি নিড়িয়ে দিতে হ'বে। বীজ, সারিতে বোনা থাকলে, চাকাবিদার সাহায্যে খুব কম খরচেই এই নিড়ানোর কাজ করা যায়।

বীজ বোনার ১ মাস পরে একর প্রতি ৫০০ মিলি লিটার লিনডেন ২০% ই-সি বা থায়োডান ৩৫% ই-সি বা ১॥ কেজি বি-এইচ-সি ৫০%, ৩০০ লিটার জলে মিশিয়ে ছিটিয়ে দিলে গাছে রোগ পোকার আক্রমণ ঘটবে না।

শস্য রক্ষার জন্য কীটঘ্ন প্রয়োগ

বোনার ১ মাস পরে একর প্রতি ৫০০ মিলি লিটার লিনডেন বা থায়োডান ও চিটা ও মরিচা রোগ প্রতিরোধের জন্য ১ কেজি ডায়াথেন জেড-৭৮, লোনাকল, জাইরাইড বা জিনেব বা ক্যাপটান-৮৩, ৩০০ লিটার জলে মিশিয়ে ছিটিয়ে দিতে হ'বে। ঔষধ ছিটাবার আগে ভূষা রোগাক্রান্ত শীষ তুলে পুড়িয়ে না ফেললে কীটঘ্ন প্রয়োগ ক'রে পুরো ফল পাওয়া যাবে না।

জাব পোকার আক্রমণ ঘটলে একর প্রতি ৮০ মিলি লিটার ডেমিক্রন ১০০% ই-সি বা ২০০ মিলি লিটার মেটাসিড বা ৩০০ মিলি লিটার রোগর ৩০% ই-সি ৩০০ লিটার জলে মিশিয়ে ছিটিয়ে দিলে চারা সুস্থ থাকবে।

এ জাতের দানা মোটামুটি এক সঙ্গেই পেকে যায়। দানা পাকার সঙ্গে সঙ্গে ফসল কেটে নেওয়া উচিত। ফসল কাটতে দেরী হলে ইঁদুর ও পাখীর উৎ-পাতে শস্যহানি ঘটতে পারে।

উন্নত প্রণালী অনুসরণ ক'রে গমের চাষ ঠিক মত করলে অধিক ফলনশীল জাতে একর প্রতি ৪০-৫০ মণ এবং এন-পি জাতে ২০-২৫ মণ ফলন পাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

যোজনা ভবন থেকে....

রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সাহায্য পেয়েছে ১৮ লক্ষ টাকা

উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির মূল্যায়ণ সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্যে যে সব সংস্থা রয়েছে সেগুলি শক্তিশালী করা বা নতুন সংস্থা স্থাপনের জন্য, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য-গুলিকে গত ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত এককালীন সাহায্য হিসেবে ১৮ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। পরিকল্পনা কমিশনের কর্মসূচী মূল্যায়ন সংস্থার একটি বিবরণীতে এটা জানা গিয়েছে।

রাজ্যের মূল্যায়ণ সংস্থাগুলি, পরিকল্পনা বিভাগের অঙ্গ হিসেবে কাজ করছে কিংবা যেমন, মহারাষ্ট্রের, অর্থ দপ্তরের পরিকল্পনা বিভাগের অংশ হিসেবে কাজ করেছে। অনেক রাজ্যে যেমন বিহার, পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও তামিল নাড়ুতে এগুলি অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান অধিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

রাজ্যগুলির পরিকল্পনা সমীক্ষার জন্য, ১৯৬৪ সালে গঠিত মূল্যায়ন সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যনির্বাহকারী সংস্থার সুপারিশক্রমে, পরিকল্পনার ব্যয়ের মধ্যে মূল্যায়ণ সম্পর্কিত কাজের ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর জন্য রাজ্য-গুলিকে কেন্দ্রীয় সাহায্য দেওয়ার এবং মূল্যায়ণকারী কমিটিসমূহ গঠন করার ব্যবস্থা করা হয়।

এই মূল্যায়ণ সংস্থাগুলি, কৃষি, গ্রামো-ন্নয়ন, পঞ্চায়েতী রাজ, শিল্পোন্নয়ন, পরিবহণ, মজুরী ও কর্মসংস্থান, সামাজিক কল্যাণ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন সম্পর্কে সমীক্ষা করেছে। এ ছাড়া কতকগুলি রাজ্যের সংশ্লিষ্ট বিভাগ সেচ ও বিদ্যুতশক্তি, সিমেন্ট ও ইস্পাত শিল্প প্রভৃতি সংগঠিত ক্ষেত্র-গুলিতেও ব্যয় ও লাভ সংক্রান্ত সমীক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে।

১৯৬৯ সালে খনিজ পদার্থের উৎপাদন ক্রমশঃ বেড়েছে

১৯৬৯ সালে ভারতের খনিজ পদার্থের উৎপাদন ৪০০ কোটি টাকা পর্যন্ত পৌঁছবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এই ক্ষেত্র থেকে যে জাতীয় আয় হয়েছে ১৯৬০ সালের তুলনায় তা শতকরা ১৫০ ভাগ বেশী। পরমাণু সম্পর্কিত খনিজ পদার্থ ও অন্যান্য অপ্রধান খনিজপদার্থের উৎপাদন এর মধ্যে ধরা হয়নি।

দেশে, খনিজপদার্থ ভিত্তিক যে সব প্রধান প্রধান শিল্প রয়েছে, এই সময়ের মধ্য সেগুলির উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুন বেড়েছে।

ধাতব খনিজপদার্থ

যে সব হালকা প্রধান শিল্প থেকে শতকরা ১২ ভাগ জাতীয় আয় হয় সেগুলিই, প্রধান ধাতব ও অধাতব খনিজ পদার্থের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ ব্যবহার করেছে। এই শিল্পগুলি হ'ল-লৌহ, ইস্পাত, এল্যুমিনিয়াম, তামা, সার, রং, সিমেন্ট কাঁচ এবং কাগজ।

বক্সাইটের উৎপাদন ১০ লক্ষ মেট্রিক টনে দাঁড়ায় অর্থাৎ ১৯৬০ সালের তুলনায় এই বৃদ্ধি হল শতকরা ১৫০ ভাগ বেশী। এল্যুমিনিয়াম শিল্প, উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ ব্যবহার করে। ঐ সময়ের মধ্যে এল্যুমিনিয়াম শিল্পটিও প্রায় ৪ গুণ সম্প্রসারিত হয়।

১৯৬০ সালের তুলনায় চুণাপাথরের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৭০ শতাংশ এবং তার পরিমাণ হল আনুমানিক ২ কোটি ২০ লক্ষ মেট্রিক টন। এই খনিজপদার্থটির প্রধান ব্যবহারকারী হল, সিমেন্ট শিল্প। মোট উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগই এই শিল্পটি ব্যবহার করে এবং এটিও ইতিমধ্যে তার আকার শতকরা ৫০ ভাগ বাড়িয়েছে।

কয়লা উৎপাদন

কয়লার উৎপাদন হয়েছে ৭ কোটি ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন অর্থাৎ ১৯৬০ সালের তুলনায় ৪০ শতাংশ উৎপাদন বেড়েছে।

মোট যে কয়লা উৎপাদিত হয় তার প্রায় ৩০ শতাংশ ব্যবহার করে রেলওয়ে, ২০ শতাংশ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং ১২ শতাংশ ব্যবহৃত হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য।

এই বছরে প্রায় ৪৩ লক্ষ মেট্রিক টন লিগনাইট উৎপাদিত হয়। এই পরিমাণ হল ১৯৬০ সালের তুলনায় ৯০ গুণ বেশী।

পেট্রোলিয়াম

বর্তমান বছরে, ১৯৬০ সালের তুলনায় ১৫ গুণ বেশী পেট্রোলিয়াম উৎপাদিত হয়েছে। ১৯৬০ সালে ৬৭ লক্ষ মেট্রিক টন পেট্রোলিয়াম উৎপাদিত হয়। তেমনি ৭২ কোটি ২০ লক্ষ বর্গমীটার প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদিত হয়, ১৯৬০ সালের তুলনায় এই উৎপাদন হ'ল ৫ গুণ বেশী।

খনিজ পদার্থের রপ্তানী

ভারতের মোট রপ্তানীর মধ্যে খনিজ ও ধাতব পদার্থের পরিমাণ হ'ল শতকরা প্রায় ২০ ভাগ। এর মধ্যে খনিজ পদার্থের অংশ হ'ল ১২ শতাংশ এবং ধাতুর ৭ শতাংশ।

গত দশ বছরে খনিজ পদার্থের রপ্তানী ১৯৬০ সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। রপ্তানীর মধ্যে লৌহ আকর রপ্তানীর পরিমাণ হল শতকরা ৫৪ ভাগ। ১৯৬০ সালের তুলনায় এই বৃদ্ধি হ'ল প্রায় ৮০ শতাংশ বেশী।

১৯৬০ সালে যেখানে মোট রপ্তানী মুল্যের শতকরা ২২ এবং ১৬ ভাগ ছিল যথাক্রমে ম্যাঙ্গানীজ আকর ও অভ্র সেখানে গত দশ বছরে তা কমে গিয়ে যথাক্রমে ১০ ও ৩০ শতাংশ দাঁড়ায়। বর্তমানে এই দুটিরই অংশ হল প্রায় ১০ শতাংশ।

পরিমাণের দিক থেকে ধাতব পদার্থের রপ্তানী গত দশ বছরে প্রায় চারগুণ বেড়েছে। বর্তমানে এই ক্ষেত্রে লৌহ ও ইস্পাতের অংশ হল প্রায় ৬০ শতাংশ এবং অশোধিত ও ঢালাই লোহার অংশ হল প্রায় ২০ ভাগ।

রপ্তানী মুল্য বৃদ্ধি

খননস্থলেই খনিজ পদার্থগুলির মূল্য ১৯৬০ সালের তুলনায় প্রায় ৬০ শতাংশ বেড়ে গেছে; ১৯৬০ সালের তুলনায় অশোধিত পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম বেড়েছে প্রায় ৯০ শতাংশ, কয়লার বেড়েছে প্রায় ৫০ শতাংশ লৌহ আকরের প্রায় ২০ শতাংশ, চুণাপাথরের প্রায় ৭৫ শতাংশ এবং অভ্রের বেড়েছে প্রায় ৩৪ শতাংশ। ম্যাঙ্গানীজের মূল্য সাধারণভাবে কিছুটা কমেছে।

খনিজ দ্রব্যাদির রপ্তানী মূল্য প্রায় ২৭ শতাংশ বেড়েছে। লৌহ আকরের বেড়েছে প্রায় ৫০ শতাংশ এবং অভ্রের প্রায় ৮৫ শতাংশ। ম্যাঙ্গানীজের রপ্তানীমূল্য অবশ্য শতকরা প্রায় ১০ ভাগ কমেছে।

ধাতব দ্রব্যাদির রপ্তানীমূল্য বেড়েছে প্রায় ৫৬ শতাংশ।

★ জামসেদপুরের কাছে আদিত্যপুরে, ইস্পাতের রোল তৈরির করার একটি কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। এটি তৈরি করতে ৬.৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। একটি ভারতীয় এবং একটি জাপানী প্রতিষ্ঠানের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত এই এই কারখানাটি হ'ল বেসরকারী তরফের বৃহত্তম কারখানা। এখানে বছরে ৭০০০ মেট্রিক টন ইস্পাতের রোল তৈরি করা যাবে আর তার মূল্য হবে প্রায় তিন কোটি টাকা। এর ফলে ভারত বছরে প্রায় ২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করতে পারবে।

★ বুন্দি জেলার কেশোরায়পাটনে, সমবায় পদ্ধতিতে স্থাপিত রাজস্থানের প্রথম চিনি কারখানাটিতে উৎপাদন সুরু হয়েছে।

ভারত রেলের বগী রপ্তানী করছে—আমাদের মাদ্রাজের সংবাদাতা

ভারত এই প্রথমবার রেলের সাজ সরঞ্জাম রপ্তানীর বাজারে প্রবেশ করলো। উন্নত দেশগুলির সঙ্গেও প্রতিযোগিতা ক'রে তাইওয়ান রেল কর্তৃপক্ষের জন্য ১00 টি রেলের বগী সরবরাহের অর্ডার সংগ্রহ করেছে। ২১ লক্ষ টাকা মুল্যের এই অর্ডারটির জন্য জাপানের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা হয়। মাদ্রাজের পেরাম্বুরে রেলের বগী তৈরী করার যে কারখানা আছে সেখান থেকে গত মাসের শেষ থেকে এই বগী পাঠানো স্নুরু হয়ে গেছে।

তাইওয়ান রেলওয়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় সব রকম সাজ সরঞ্জাম এ পর্যন্ত একমাত্র জাপানই সরবরাহ করে আসছে এবং সেইদিক থেকে বিচার করলে এই অর্ডার সংগ্রহ করাটা বেশ তাৎপর্য্যপূর্ণ।

এই অর্ডারটি পাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, থাইল্যাণ্ড থেকে ৪৫ টি বগী সরবরাহের অর্ডার পাওয়া গেছে। এগুলির মূল্য হ'ল ১১ লক্ষ টাকা। এই বগীও শিগগীরই জাহাজে করে পাঠানো স্নুরু হবে।

তাইওয়ান থেকে যে অর্ডার সংগ্রহ করা হয় তা ভারতের পক্ষে, নক্সা তৈরি ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন একটা পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমটা হ'ল গেজ। এগুলিকে ১,0৬৭ মি: মী: গেজের জন্য তৈরি করতে হয় এবং তা ভারতে প্রচলিত নয়। বগীগুলি ছিল অত্যন্ত আধুনিক ধরণের। এগুলি সর্ব্বোচ্চ গতি অর্থাৎ ঘন্টায় ১১0 কি: মি: গতিতেও যদি চালানো হয় তাহলেও যাতে ধাক্কা না লাগে সেজন্য রেলপথ সম্পর্কিত অতি আধুনিক সাজ সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হয়। মোটামুটিভাবে আমাদের দেশের জিনিষপত্র দিয়েই এগুলি তৈরি করা হয়েছে। কতকগুলি যন্ত্রাংশ আমদানি করতে হলেও, চুক্তি স্বাক্ষর করার পর সাত মাসের মধ্যেই এগুলি তৈরি ক'রে দেওয়া হয়।

এগুলি তৈরি করতে মোট যে ব্যয় হয়েছে তা থেকে, আমদানি করা জিনিসগুলির মূল্য বাদ দিয়ে এই অর্ডার থেকে প্রায় ১৭ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জিত হয়েছে।

এই রকম কার্যকুশলতায় সন্তুষ্ট হয়ে তাইওয়ান রেলওয়ে এখন আরও ৫0 টি বগী ও ২১৩ টি কোচের জন্য কোটেশন আহ্বান করেছে। এ ছাড়া নিউজীল্যাণ্ডে ৩৮ টি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কোচ এবং ইরাকে ৩৮ টি বগী সরবরাহ করা সম্পর্কেও পেরাম্বুর কারখানা কোটেশন পাঠিয়েছে।

দ্বিতীয় রাজধানী এক্সপ্রেস

বর্ত্তমানে নতুন দিল্লী ও কলিকাতার মধ্যে যে রাজধানী এক্সপ্রেস যাতায়াত করছে, সেই রকম একটি এক্সপ্রেস ট্রেন দিল্লী ও বোম্বাইর মধ্যেও যাতায়াত করবে। পেরাম্বুরের কারখানাতেই এই এক্সপ্রেস ট্রেনটি তৈরি হবে।

বালাজি তিরুপতি ভেঙ্কটেশ্বর মন্দির

অন্ধ্র প্রদেশের চিত্তুর জেলার তিরুমলে (তিরুপতি) পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালার সবুজ পাহাড়গুলির মধ্যে ৩00 ফুট উঁচু একটি পাহাড়ে 'বালাজি' ভগবান ভেঙ্কটেশ্বরের পবিত্র মন্দিরটি অবস্থিত।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই রাজা ও মহারাজাদের দ্বারা সংরক্ষিত ও তাঁদের সম্পদে সমৃদ্ধ, বহু মুনি ঋষির তপশ্চর্য্যায় পবিত্র, কবিদের রচিত প্রশস্তিতে গৌরবান্বিত এই দেবস্থানটি এখনও ধর্ম্মপিপাসুদের একটি মিলনকেন্দ্র। এর ধার্ম্মিক পরিবেশ, মনোরম আবহাওয়া, সুন্দর দৃশ্যাবলী এবং আধুনিক সুযোগ সুবিধে প্রতিদিন বহু তীর্থযাত্রীকে এখানে আকর্ষণ করে।

মন্দিরটির প্রাঙ্গণে প্রতিদিনই কোন না কোন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন অন্তত: পক্ষে ১0।১৫ হাজার তীর্থযাত্রী এখানে সমবেত হন। দুপুরে ১টা থেকে ২টা এই একঘন্টা বাদে সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বিনা দর্শনীতে মন্দির ও মূর্ত্তি দর্শন করা যায়।

তিরুপতি সহর থেকে তিরুমলের দূরত্ব হ'ল ১২ মাইল। তীর্থযাত্রীরা যাতে সহজে এই মন্দিরে পৌঁছুতে পারেন সেজন্য দেবস্থান বাস সার্ভিসের বাসসমূহ ভোর পাঁচটা থেকে রাত্রি ৯ টা পর্যন্ত অল্প সময়ের ব্যবধানে এই দুটি জায়গার মধ্যে যাতায়াত করে। মাদ্রাজ থেকে তিরুপতির দূরত্ব প্রায় ১00 মাইল এবং এই দুটি জায়গাও মোটর ও রেলপথে যুক্ত।

তীর্থযাত্রীদের সুবিধের জন্য দেবস্থান কর্তৃপক্ষের পরিচালনাধীনে, বিনাভাড়ার কক্ষসহ বহু ধর্ম্মশালা রয়েছে। তা ছাড়া সুসজ্জিত কটেজও ভাড়া পাওয়া যায়। তীর্থযাত্রীরা মন্দিরের তহবিলে যে দান করেন, সেই বিপুল অর্থ থেকে দেবস্থান কর্তৃপক্ষ তিরুমল, তিরুপতি ও ভারতের অন্যান্য স্থানে অনেক দাতব্য প্রতিষ্ঠান শিক্ষা ও সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরটি ছাড়াও তিরুমল ও তিরুপতিতে আরও কয়েকটি পবিত্র স্থান রয়েছে। সেগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটি হ'ল গোবিন্দরাজ, কপিলেশ্বর, পদ্মাবতী ও কোদণ্ড রামস্বামীর মন্দির।

প্রত্যেক ধর্ম্মপিপাসুর এই পবিত্র স্থানটি দর্শন করা উচিত। মন্দির দর্শনকারীরা যে শান্তি ও আনন্দ পাবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই পবিত্র স্থানটি দর্শন করে ভগবান ভেঙ্কটেশ্বরের আশীর্ব্বাদ নিন।

বিস্তরিত তথ্যাদির জন্য লিখুন:—

দি এক্সিকিউটিভ অফিসার, তিরুমল তিরুপতি দেবস্থানম্,
তিরুপতি, চিত্তুর জেলা, অন্ধ্রপ্রদেশ।

ধানের চাষে ট্র্যাক্টার ব্যবহারের উপযোগিতা

আমাদের দেশে হালচাষ দেখতে অভ্যস্ত চোখেও ট্র্যাক্টার এখন আর বিস্ময়ের বস্তু নয়। ট্র্যাক্টারের ব্যবহার ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা সুখের বিষয়। কারণ কৃষি ক্ষেত্রে যান্ত্রিক সরঞ্জামের ব্যাপক প্রবর্তন, কৃষি পদ্ধতির উন্নতি ও উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করবে। এই বিশ্বাসের কোনোও ভিত্তি আছে কি না তা নিরূপণ করার জন্য কেরালার পাট্টাম্বিতে, কেন্দ্রীয় চাউল গবেষণা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সমীক্ষা চালানো হয়।

প্রায় ৪০ বছর পূর্ব্বে এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই কেন্দ্রে বলদের সাহায্যে চিরাচরিত প্রথায় চাষ করা হ'ত। কিন্তু ট্র্যাক্টার ও শক্তিচালিত লাঙ্গলের প্রবর্তনে চাষের খরচ খরচা যথেষ্ট কমে গিয়েছে এবং সময় কম লাগে বলে এই অবসর সময়টুকু অন্যান্য কাজে নিয়োজিত করা যায়।

পুরোনো ও নতুন পদ্ধতির পার্থক্য বিচার করার সময়ে দেখা গেছে যে, বলদের সাহায্যে ধানের জমি তৈরি করতে যেখানে ১৪২ ঘন্টা সময় লাগত সেখানে ১০ অশ্ব শক্তির একটি ট্র্যাক্টারের সাহায্যে ঐ কাজ শেষ করতে মাত্র ৭১৮ ঘন্টা লাগে। ফলে যে সময় উদ্বৃত্ত থাকে, সেই সময়টা শস্যের পরিচর্যায়, যথাসময়ে ধানের চারা রোপনে এবং দুটি ফসলের চাষে ব্যয় করা যাবে। অতএব একই জমি থেকে দুটি বা তিনটি ফসল পাওয়া যাবে। যেহেতু একই জমিতে দুটি বা তিনটি ফসল তোলা যাবে সেহেতু কৃষকদের জন্য সারা বছর কাজ থাকবে, কাউকেই বছরের কোনোও সময়ে বেকার থাকতে হবে না।

খরচের দিক থেকেও এই পার্থক্য লক্ষণীয় হবে। যেখানে হাল বলদ নিয়ে এক একর চাষ করতে ৬৩.৬৮ টাকা খরচ হয় সেখানে ট্র্যাক্টারের সাহায্যে সেই কাজ শেষ করতে লেগেছে ২৫ টাকা।

ট্র্যাক্টরের আর একটা মস্ত সুবিধা হ'ল এই যে, শুধু মাটি চষের জন্যই নয়, অন্যান্য বহু কাজে ট্র্যাক্টার সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগানো যায়। যেমন গবেষণা কেন্দ্রে পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, ধানের জমির ঠিক ৫ সেন্টিমিটার নীচে এ্যামোনিয়াম সালফেট ও সুপার ফসফেটের মিশ্রিত সারের যদি এক পরত ছড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে ধানের ফলন সবচেয়ে ভালো হয়। সাধারণত: মাপামাপি করে এইভাবে সার ছড়ানো সম্ভব নয় কিন্তু বীজ ও সার ছড়াবার একটা বিশেষ যন্ত্রাংশ ট্র্যাক্টারের সঙ্গে যুক্ত করে এই কাজ অতি অল্প আয়াসে অল্প সময়ে ও অল্প ব্যয়ে সুসম্পন্ন হতে পারে।

ট্র্যাক্টারে আর একটি বিশেষ যন্ত্রাংশ জুড়ে শুকনো এ্যামোনিয়া যদি গ্যাসের আকারে প্রয়োগ করা হয় তাহলে এ্যামোনিয়াম সালফেটের তুলনায় ৪ গুণ বেশী নাইট্রোজেন যোগায়। এই সার অপেক্ষাকৃত সুলভ এবং কৃষিক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলিতে এই সারের বহুল ব্যবহার আছে।

সেচের কাজেও ট্র্যাক্টার খুব কাজে আসে। যে সব অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নেই সে সব অঞ্চলে ট্র্যাক্টারের সাহায্যে পাম্পসেট চালানো যেতে পারে। ফসলের মধ্যে ধান চাষের জন্য সেচের যে রকম প্রয়োজনীয়তা এমন বোধ হয় আর কোনোও ফসলের জন্য নয়। সেচের মামুলী প্রণালীর সাহায্যে ঘন্টায় যদি ১৫০০-১৮০০ গ্যালন জল তোলা যায় তো ৫ অশ্ব শক্তির মোটর কিংবা তৈল চালিত ইঞ্জিন-এর সাহায্যে ৯০০০-১২০০০ গ্যালন জল তোলা সম্ভব হবে।

ধান মাড়াই-এর কাজেও ট্র্যাক্টারের উপযোগীতা প্রতিপন্ন হয়েছে। তাঞ্জাভুর ও পশ্চিম গোদাবরী জেলায় ট্র্যাক্টারের সাহায্যে ধান মাড়াই-এর কাজ বেশ চল হয়ে গেছে।

ধান চাষের ব্যাপারে যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে। যেমন উদ্ভিদ রক্ষার জন্য অল্প সময়ে অল্প আয়াসে দ্রুত কীট নাশক ছড়ানো। হাতে চালাবার স্প্রেয়ার দিয়ে যেখানে দিনে খুব বেশী দেড় একর পরিমাণ জমিতে কীটঘ্ন ছড়ানো যায়, সেখানে 'মাইক্রোনাইজার' বা 'পাওয়ার স্প্রেয়ারের' সাহায্যে দিনে ৫ একর জমিতে ওষুধ ছড়ানো যায়।

বর্ষায় বা আর্দ্র আবহাওয়ায় ক্ষেতের ফসল শুকানো একটা সমস্যা বিশেষ। একাজটা যত দ্রুত সম্পন্ন হবে, ততই ফসলের ক্ষতি হওয়ার বা ফসল নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম। সে সব ক্ষেত্রে যন্ত্রের সাহায্যে অভীষ্ট সিদ্ধ হতে পারে।

একটা মস্ত বড় সমস্যা হ'ল এই যে ছোট চাষীদের যান্ত্রিক সরঞ্জাম কেনার মত আর্থিক সঙ্গতি নেই। এ সব ক্ষেত্রে কোনোও আর্থিক সংস্থা বা রাজ্যের অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে তাঁদের পক্ষে অগ্রসর হওয়া কঠিন। বিভিন্ন রাজ্যে যে সব কৃষি শিল্প কর্পোরেশন স্থাপিত হয়েছে, সেগুলি অগ্রণী হয়ে চাষীদের ট্র্যাক্টর ও অন্যান্য সরঞ্জাম যোগাবে বলে আশা করা যেতে পারে।

পাঠকদের প্রতি

পরিকল্পনার রূপ ও রূপায়ণ, দেশের উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা এবং পরিকল্পনা কমিশনের কর্মপ্রণালী দেখোনোই হল আমাদের লক্ষ্য। এই পত্রটিতে যেমন জাতীয় প্রচেষ্টার খবর দেওয়া হয়, তেমনি সেই প্রচেষ্টার অংশীদার হিসেবে পশ্চিম বাংলা, জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রচেষ্টায় কতটা সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারছে তাও দেখানো হয়।

এই বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য রেখে মৌলিক রচনা পাঠাবার জন্য পাঠকগণকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। প্রকাশিত রচনার জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

ভারত থেকে মশলা রপ্তানী

১৯৬৮-৬৯ সালে ভারত থেকে ২৫ কোটি টাকার ৫১৮৮০ মেট্রিক টন মশলা রপ্তানী করা হয়। ১৯৬৭-৬৮ সালে রপ্তানী করা হয় ২৭.১৭ কোটি টাকার ৫২১৯৫ মেট্রিক টন মশলা, অর্থাৎ গত বছর, পরিমাণের দিক থেকে শতকরা প্রায় ৬ ভাগ এবং মূল্যের দিক থেকে শতকরা ৭.৮ ভাগ কম রপ্তানী হয়। গোলমরিচ, আদা এবং দারচিনির রপ্তানীই সবচাইতে কম হয়েছে। তবে তেতুঁল, তরকারির মশলার এবং অন্যান্য মশলার রপ্তানী ১৯৬৮-৬৯ সালে বেশ বেড়েছে।

১৯৬৮-৬৯ সালেও পূর্ব্বের মতই মশলা রপ্তানীর ক্ষেত্রে গোলমরিচের স্থান ছিল প্রধান অর্থাৎ মশলা রপ্তানী ক'রে যা আয় হয়েছে তার মধ্যে শতকরা ৩৮.৭ ভাগই এসেছে এই মশলাটির রপ্তানী থেকে। ১৯৬৮-৬৯ সালের মশলা রপ্তানীতে দারচিনির অংশ ছিল শতকরা ২৭.৪ ভাগ, ১৯৬৭-৬৮ সালে এর পরিমাণ ছিল শতকরা ২৬.২ ভাগ। লঙ্কার অংশও ১৯৬৭-৬৮ সালের ৭.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৬৮-৬৯ সালে ৯ শতাংশে দাঁড়ায়। আদার রপ্তানী ১৯৬৭-৬৮ সালে ৪.৮ শতাংশ থেকে কমে ১৯৬৮-৬৯ সালে ৩.৬ শতাংশ দাঁড়ায়। তেঁতুল এবং তরকারির মশলা রপ্তানী ১৯৬৭-৬৮ সালের যথাক্রমে ৫.১ শতাংশ এবং ২ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮.৪ শতাংশ ও ২.৯ শতাংশ হয়। মশলার রপ্তানী থেকে মোট যে আয় হয় তাতে উপরে লিখিত মশলাগুলি ছাড়া অন্যান্য মশলার অংশ ১৯৬৭-৬৮ সালে ছিল ৬ শতাংশ এবং গত বছরে তা বেড়ে ১০ শতাংশ হয়।

পূর্ব্বের মত পূর্ব্ব ইউরোপের দেশগুলিতেই ভারতের মশলা বেশী রপ্তানী হয়। মশলার রপ্তানী থেকে মোট যে আমদানী হয় তার শতকরা ৩১.৩ ভাগই আসে পূর্ব্ব ইউরোপের দেশগুলি থেকে কিন্তু এই আয়ও গত বছরের তুলনায় ৫.৭ শতাংশ কম। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি, ভারতীয় মশলার দ্বিতীয় বৃহৎ আমদানীকারী। তাঁদের অংশ হল শতকরা ২৯.৭ ভাগ, ১৯৬৭-৬৮ সালে এর পরিমাণ ছিল ২৭.৩ শতাংশ। পূর্ব্ব এশিয়া অঞ্চল হল তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ক্রেতা অর্থাৎ ঐ সব দেশ থেকে আয় হয় ১৫.৭ শতাংশ। আমেরিকা অঞ্চল থেকে আয় হয় ৯.৩ শতাংশ। ১৯৬৭-৬৮ সালে এই আয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২.১ শতাংশ এবং ৮.৩ শতাংশ। মোট রপ্তানীর ১৪ শতাংশ যায় যুক্তসাম্রাজ্য, ইউরোপীয় কমন মার্কেটের দেশ ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ, অষ্ট্রেলিয়া, ওসেনিকা অঞ্চল ও আফ্রিকার দেশগুলিতে। গতবছরে এর পরিমাণ ছিল ১৫.৩ শতাংশ।

বিমানযোগে ধানক্ষেতে ইউরিয়া ছড়িয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি

মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর ও রায়পুর জেলায় সম্প্রতি ৪৮০০ হেক্টার জমিতে একটি পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে বিমান যোগে ইউরিয়া মিশ্রণ ছড়ানোর ফলে সেচবিহীন প্রতি হেক্টার ধানের জমি থেকে ১১৪.৫২ টাকা অতিরিক্ত লাভ হয়েছে।

যেখানে শুধু বৃষ্টির ওপর নির্ভর ক'রে ধান চাষ করতে হয় সেখানে ধানগাছ বাড়ার সময়ে জমিতে ইউরিয়া ছাড়িয়ে বিশেষ লাভ হয়না। ইউরিয়ার উপযুক্ত মিশ্রন তৈরি ক'রে তা ধানগাছে ছড়িয়ে দিয়ে এই অসুবিধে দূর করা হয়। বিমানযোগে এই মিশ্রন ছড়ালে ঠিক কি পরিমাণ লাভ ক্ষতি হতে পারে তার একটা সঠিক মূল্যায়ণ করার জন্য এই পরীক্ষা চালানো হয়।

১৯৬৯ সালের অক্টোবর মাসে ধান বোনার ৫৫-৬০ দিন পর বিমানযোগে সার ছড়াবার কাজ হাতে নেওয়া হয়। প্রতি হেক্টারে ৮৯ লীটারে ১৭.৮ কি: গ্রা: ইউরিয়া মিশ্রণ ছড়ানোর জন্য বীভার বিমান ব্যবহৃত হয়। এই মিশ্রণে শতকরা কুড়ি ভাগ ইউরিয়া ছিল। এক সপ্তাহ পরে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে এই মিশ্রণ ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে ধান গাছের পাতা নষ্ট হয়নি।

বিলাসপুর জেলার ভোপকা গ্রামের কাছে একটা অঞ্চল ঠিক করে, কিছু জমি ছেড়ে কিছু জমিতে ইউরিয়া মিশ্রণ ছড়ানো হয়। ফসল কাটার সময় ইতস্তত: ভাবে ৪৪ টি জমি বেছে নেওয়া হয়। ধান মাড়াই করার পর দেখা যায় যেসব জমিতে ইউরিয়া ছড়ানো হয় সেগুলিতে প্রতি হেক্টারে ২৩.২৮ কুইন্ট্যাল ধান পাওয়া গেছে আর যে জমিগুলিতে ছড়ানো হয়নি সেগুলিতে হয়েছে প্রতি হেক্টারে ২০.৬৮ কুইন্ট্যাল। কাজেই বিমানযোগে ইউরিয়া ছড়ানোর ফলে প্রতি হেক্টারে ২.৬০ কুইন্টাল অর্থাৎ শতকরা ১২.৫ শতাংশ উৎপাদন বেড়েছে।

প্রতি কুইন্ট্যাল ৬০ টাকা হিসাবে ২.৬০ কুইন্ট্যালের মূল্য দাঁড়ায় প্রতি হেক্টারে ১৫৬ টাকা। ব্যয়ের দিকে হ'ল, বিমানযোগে সার ছড়ানোর জন্য প্রতি হেক্টারে ২৪.৭০ টাকা এবং ১৭.৮ কি: গ্রা: ইউরিয়ার (প্রতি হেক্টারে) মূল্য, প্রতি মেট্রিক টন ৯৪৩ টাকা হিসেবে ১৬.৭৮ টাকা। কাজেই প্রতি হেক্টারে মোট অতিরিক্ত ব্যয় হয় ৪১.৪৮ টাকা।

তুলা উৎপাদন বৃদ্ধি

গত কয়েক বছর যাবৎ ভারতে প্রতি হেক্টারে তুলার উৎপাদন ক্রমশ: বেড়ে চলেছে। কি: গ্রাম হিসেবে প্রতি হেক্টারে তুলার উৎপাদন ১৯৬৫-৬৬ সালে ছিল ১০৮, ১৯৬৬-৬৭ সালে ১১৪, ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে ১২৩। অর্থাৎ ১৯৬৫-৬৬ সালের তুলনায় ১৯৬৮-৬৯ সালে, উৎপাদন শতকরা ১৩.৯ ভাগ বেড়েছে।

ভারতে প্রায় ৮০ লক্ষ হেক্টার জমিতে তুলোর চাষ হয়। এর মধ্যে শতকরা প্রায় ৮৪ ভাগ জমিতে সেচের কোন ব্যবস্থা নেই এবং শতকরা কেবলমাত্র ১৬ ভাগ জমিতে সেচ দেওয়া হয়। জমির আর্দ্রতার ওপরেই তুলোর উৎপাদন নির্ভর করে।

তুলোর উৎপাদন বাড়াবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। যে সব অঞ্চলে সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে সেখানে প্রতি হেক্টারে ৩১৪ কি: গ্রাম পর্য্যন্ত তুলা উৎপাদিত হয়েছে। যেমন ১৯৬৮-৬৯ সালে পাঞ্জাবে এই পরিমাণ তুলা উৎপাদিত হয়।

ইঞ্জিনীয়ারিং-এর টুকিটাকি

সহজে বহনযোগ্য ভ্যাকুয়াম প্ল্যাণ্ট

হেভি ইলেকট্রিক্যালস (ভারত) লিমিটেডের ভূপালের কারখানায় পাওয়ার ট্রান্সফর্ম্মারের কাজের জন্য, সহজে বহনযোগ্য ভ্যাকুয়াম প্ল্যান্ট তৈরি ক'রে কাজে লাগানো হচ্ছে।

এই প্ল্যান্টটিতে কাজ সুরু হওয়ার পর, ট্রান্সফর্ম্মার তৈরির কাজও অনেক ভালো হচ্ছে এবং ০.৫ পারার সূক্ষ্ম ভ্যাকুয়াম অর্জন করা এখন সম্ভবপর হয়েছে।

ভূপালের এই কারখানায়, সমস্ত ভ্যাকুয়াম প্ল্যান্ট পূর্ণমাত্রায় চালু রেখেও, উপযুক্ত ভ্যাকুয়ামের সুযোগ সুবিধের অভাবে ট্রান্সফর্ম্মার বিভাগ, ট্রান্সফর্ম্মার তৈরি করতে অসুবিধে ভোগ করছিল। অত্যন্ত বেশী ক্ষমতার ট্রান্সফর্ম্মারের জন্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভ্যাকুয়াম প্রয়োজন। ভ্যাকুয়াম তৈরির যে সব ব্যবস্থা ছিল তাতে সর্ব্বোচ্চ ২ থেকে ৩ মিলি মীটার পারার ভ্যাকুয়াম পাওয়া যেতো। এতে সময়ও যেমন বেশী লাগতো তেমনি উৎপাদন কম হত।

পাওয়ার ট্রান্সফর্ম্মার উৎপাদনের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম ভ্যাকুয়াম অত্যন্ত প্রয়োজন এবং সেটা না পাওয়ায় উৎপাদনও ব্যাহত হচ্ছিল। তখন ট্রান্সফর্ম্মার বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট পরামর্শ দেন যে, উৎপাদনের আশু অসুবিধেগুলি দূর করার জন্য ইমপ্রেগনেটিং প্ল্যান্টের ভ্যাকুয়াম পাম্পগুলি দিয়ে, সহজে বহনযোগ্য একটা ভ্যাকুয়াম প্ল্যান্ট তৈরি করা যেতে পারে। ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ, এই রকম একটা প্ল্যান্ট তৈরি করে তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে রাজী হয়। এর জন্য খুব সতর্কভাবে নক্সা ইত্যাদি তৈরি করে, ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ, সেই অনুযায়ী প্ল্যান্টটি তৈরি করে তা কাজে লাগান।

পাইপের কাজ, ভ্যাকুয়াম, জল ও বায়ু নিয়ে কাজ করাটা অত্যন্ত জটিল ছিল তবুও সেই কাজ অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা হয়। ট্রান্সফর্ম্মার বিভাগের নিকট সহযোগিতায় এই কাজটা অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে অর্থাৎ মাত্র ছয় সপ্তাহের মধ্যে শেষ করা হয়।

মালয়ের জন্য বয়লার

তিরুচিতে সরকারী তরফের যে বয়লার কারখানা আছে, সেটি, মালয়ের পোর্ট ডিকসনের টুয়াঙ্কু জাফর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য দুটি ৬০ এম ওয়াটের বয়লার তৈরি ও স্থাপনের বড় একটা কনট্রাক্ট পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভারত হেভি ইঞ্জিনীয়ারিং লিমিটেডের তিরুচি কারখানা, যুক্ত সাম্রাজ্য, জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রিয়া ও জাপানের প্রধান বয়লার উৎপাদকগণের সঙ্গে বিশ্বব্যাপি একটি প্রতিযোগিতায় এই কনট্রাক্টটি পায়।

কনট্রাক্টটির মোট মূল্য ২২৫ লক্ষ টাকারও বেশী। ৬০ এম ওয়াটের প্রথম বয়লারটি আগামী বছরের নভেম্বর মাসের মধ্যে চালু করতে হবে। মালয়ের পোর্ট ডিকসনে এই বয়লারটি বসানো ও চালু করার জন্য কারখানার বিশেষজ্ঞরা সেখানে যাবেন। বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের সরঞ্জাম হিসেবে ভারত যে অন্যতম বৃহৎ একটা অর্ডার সংগ্রহ করলো তাই নয়, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য ভারতীয় সরঞ্জাম রপ্তানীর এটাই হ'ল প্রথম অর্ডার।

অর্ডার দেওয়ার আগে মালয়ের জাতীয় বিদ্যুৎ বোর্ডের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এবং বৃটেনের একটি পরামর্শদাতা ইঞ্জিনীয়ার প্রতিষ্ঠান, ভারতের এই বয়লার কারখানার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য তিরুচি কারখানায় এসেছিলেন।

হিন্দুস্তান জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা

কেন্দ্রীয় পরিবহণ মন্ত্রকের জন্য হিন্দুস্তান জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা "ডাফরিনের" মত আর একটি প্রশিক্ষণ জাহাজ তৈরি করছে। এই জাহাজটিতে কোন প্রপেলার থাকবে না। বাণিজ্য বছরের ২৫০ জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য এটি ব্যবহার করা হবে।

জাহাজটি তৈরি হয়ে গেলে, টেনে বোম্বাইতে নিয়ে গিয়ে ব্যালার্ড পিয়ারে নোঙ্গড় করে রাখা হবে।

১৯৫২ সালে রাষ্ট্রায়ত্ব হওয়ার পর থেকে হিন্দুস্তান জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা এ পর্য্যন্ত ৩,৫৬,০০০ টনের ৪১ টি জাহাজসহ ৪, ১২,০০০ টনের ৪৯ টি জাহাজ তৈরি করেছে। এগুলির মধ্যে ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য জল পরীক্ষাকারী একটি জাহাজসহ অন্যান্য জাহাজ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জন্য একটি যাত্রী জাহাজ, সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী লিমিটেড, ভারত লাইন, দি গ্রেট ইষ্টার্ণ শিপিং কোম্পানী, নিউ ধোলেরা ষ্টিমশিপ এবং শিপিং কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের জন্য মালবাহী জাহাজও রয়েছে। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগ ও মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাষ্টের জন্য কয়েকটি ছোট ছোট জাহাজও তৈরি করেছে।

মহারাষ্ট্রে গরু মহিষের খাদ্য তৈরির কারখানা

বোম্বাইর আরে দুগ্ধ কেন্দ্রে গরু মহিষের খাদ্য তৈরির একটি কারখানা তৈরি করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রে এই রকম কারখানা এটিই প্রথম। এখানে প্রতি ঘন্টায় ৫ টন করে খইল জাতীয় তরল খাদ্য তৈরি করা যাবে এবং তার অর্দ্ধেক পিঠের মতো শক্তও করা যাবে। লারসেন এ্যাণ্ড টুবরো কোম্পানী এই কারখানাটি তৈরি করে। এতে বছরে ৩০,০০০ টন খাদ্য উৎপাদিত হবে এবং ২০,০০০ দুগ্ধবতী মহিষের পক্ষে তা পর্য্যাপ্ত।

আরের এই কারখানায় গরু মহিষের জন্য যে খাদ্য উৎপাদিত হবে তা অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং তাতে দুধের উৎপাদনও বাড়বে। আংশিকভাবে খারাপ দানাশস্য, খৈল, গুড়, খনিজপদার্থ, ভিটামিন ইত্যাদি মিশিয়ে এই খাদ্য তৈরি হবে। মরসুম অনুযায়ী এই কাঁচামালে পরিবর্ত্তনও করা যাবে।

REGD. NO. D-23[illegible]

উন্নয়ন বার্তা

★ রাজস্ব অর্জ্জনের এবং আমদানী রপ্তানীর ক্ষেত্রে বিশাখাপতনম বন্দরটি ১৯৬৮-৬৯ সালে যথেষ্ট অগ্রগতি করেছে। এই বছরে এই বন্দরটি থেকে ৬.৬৪ কোটি টাকা রাজস্ব পাওয়া গেছে, পূর্ব্ব বছরে এর পরিমাণ ছিল ৫.৭৫ কোটি টাকা।

★ পুষ্টিকর পদার্থসহ গমের আটা সরবরাহ করা সম্পর্কে দেশে কয়েকটি আটার কল স্থাপন করার প্রকল্প রয়েছে। অধিক পুষ্টিমূল্য সম্পন্ন আটা তৈরির প্রথম কলটি বোম্বাইতে স্থাপন করা হয়েছে।

★ কেন্দ্রীয় সরকার, কলিকাতার পুনর্ব্বাসন শিল্প কর্পোরেশনের কার্য্যনির্ব্বাহকারী তহবিলের জন্য ১৫ লক্ষ টাকার ঋণ মঞ্জুর করেছেন। পূর্ব্ব পাকিস্থানের উদ্বাস্তুদের কর্ম্মসংস্থান করার উদ্দেশ্যে শিল্প সংস্থা স্থাপন এবং বেসরকারী শিল্পপতিদের আর্থিক সাহায্য দিয়ে কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৯ সালে পুনর্ব্বাসন শিল্প কর্পোরেশন লিমিটেড গঠন করা হয়।

★ ভারত ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে জাহাজ চলাচল সম্পর্কে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য দুটি দেশই তাদের মধ্যে জাহাজ চলাচলের মাত্রা বাড়াতে রাজি হয়েছে।

★ ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন, নরওয়ের একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, নরওয়েতে ভারতীয় সামগ্রীর রপ্তানী বাড়ানো সম্পর্কে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

★ রক্সৌলের সঙ্গে, দক্ষিণ মধ্য নেপালের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প সহর হিতুরাকে যুক্ত করার জন্য, ভারত ও নেপালের একটি যুক্ত বিশেষজ্ঞদল, নেপালের প্রথম ব্রডগেজ রেলপথটি তৈরি করা সম্পর্কে জরীপের কাজ সুরু করেছেন।

★ ৭০ কি: মি: উচ্চতার বায়ুপ্রবাহ ও উত্তাপ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করার জন্য থুম্বা থেকে নতন কতকগুলি রকেট ছোঁড়া হয়েছে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা এবং বৃটিশ আবহাওয়া অফিসের কর্ম্মসূচী অনুযায়ী এই পরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

★ ভিলাই ইস্পাত কারখানা গত মাসে ৫০ লক্ষ টাকা লাভ করেছে। এই কারখানার তিনটী ইউনিটে তাদের নির্দিষ্ট ক্ষমতারও বেশী কাজ হয়েছে।

★ ভারত, বিশ্ব খাদ্য কর্ম্মসূচীর সঙ্গে ৫ বছর মেয়াদী একটি ডেয়ারী প্রকল্প সম্পর্কে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এর ফলে ভারতের চারটি প্রধান সহর-বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজে, উপযুক্ত গুণসম্পন্ন দুধের সরবরাহ অবিলম্বে বেড়ে যাবে। বর্ত্তমানে এই চারটি সহরে দুধের সরবরাহ হ'ল প্রতিদিন ১০ লক্ষ লীটার; তখন এই সরবরাহ বেড়ে গিয়ে প্রতিদিনের পরিমাণ দাঁড়াবে ২৭.৫ লক্ষ লীটার।

★ রাজস্থানের কোটাতে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরির যে কারখানা আছে তাতে আরও নানা ধরণের জিনিস তৈরি করা সম্পর্কে ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়ন একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

★ ভারতকে আরও ইয়েন ঋণ দেওয়া সম্পর্কে জাপানী ব্যাঙ্কগুলি একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই ঋণের পরিমাণ হ'ল ১৯ কোটি টাকারও বেশী এবং ১৯৫৮ সাল থেকে ভারতকে যতবার ইয়েন ঋণ দেওয়া হয়েছে এটা হবে তার নবম ঋণ।

★ বিশ্বব্যাপি টেঁওয়ারের মাধ্যমে, কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী বোম্বাই-এর একটি প্রধান কারখানা, মিশরের কাছ থেকে ৫১ লক্ষ টাকার একটি রপ্তানীর অর্ডার সংগ্রহ করেছে।

ধনধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত হ'লেও 'ধনধান্যে' শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই ব্যক্ত করে না। পরিকল্পনার বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী ক্ষেত্রে উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতটা অগ্রগতি হচ্ছে তার খবর দেওয়াই হ'ল 'ধনধান্যে'র লক্ষ্য।

'ধনধান্যে' প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে প্রকাশিত হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত, তাঁদের নিজস্ব।

নিয়মাবলী

দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়।

অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পুন: প্রকাশকালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার করা হয়।

রচনা মনোনয়নের জন্যে আনুমানিক দেড় মাস সময়ের প্রয়োজন হয়।

মনোনীত রচনা সম্পাদক মণ্ডলীর অনুমোদনক্রমে প্রকাশ করা হয়।

তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয়। কোনোও রচনার প্রাপ্তি-স্বীকৃতি, পত্র মারফৎ জানানো হয় না।

নাম ঠিকানা লেখা, ডাকটিকিট লাগানো, খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

কোনো রচনা তিন মাসের বেশী রাখা হয়না।

শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাবেন।

গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেস ম্যানেজার, পাব্লিকেশন্স্ ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী-১ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

"ধনধান্যে" পড়ুন
দেশকে জানুন

, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাস্ট্রিয়েল সোসাইটি [illegible]

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত
পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

প্রথম বর্ষ এক বিংশ সংখ্যা

২২শে মার্চ ১৯৭০ : ১লা চৈত্র ১৮৯২
Vol. 1 : No 21 : March 22, 1970

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

প্রধান সম্পাদক
শরদিন্দু সান্যাল

সহ সম্পাদক
নীরদ মুখোপাধ্যায়

সহকারিণী (সম্পাদনা)
গায়ত্রী দেবী

সংবাদদাতা (মাদ্রাজ)
এস. ভি. রাঘবন

সংবাদদাতা (শিলং)
ধীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী

সংবাদদাত্রী (দিল্লী)
প্রতিমা ঘোষ

ফোটো অফিসার
টি.এস. নাগরাজন

প্রচ্ছদপট শিল্পী
আর. সারঙ্গন

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০

টেলিগ্রাফের ঠিকানা : যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

নিঃস্বার্থ হওয়া বেশি লাভের। তবে নিঃস্বার্থ আচরণ অভ্যাস করবার ধৈর্য অনেকের থাকে না।

-স্বামী বিবেকানন্দ

এই সংখ্যায়

পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয়

একটি সুসংবদ্ধ বিজ্ঞান নীতি

সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ক্রমশ: বেশী মাত্রায়, সাধারণের সমালোচনার বিষয় হয়ে উঠছে। আমাদের বৈজ্ঞানিকরা অত্যন্ত প্রশংসনীয় কোন সাফল্য লাভ করেছেন বলেই যে এটি সাধারণের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে তা নয়, বরং আমাদের কয়েকটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানে যে দলাদলির ভাব রয়েছে তা, এই বিষয়টি সম্পর্কে জনসাধারণকে আরও সজাগ করে তুলেছে।

বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পর্ষতের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয় সরকার কমিটি তা অনুসন্ধান করেন। দুই বছর ধ'রে অনুসন্ধান করার পর কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁরা যে বিবরণী প্রকাশ করেছেন তাতে সকলকেই নির্দোষ বলা হয়েছে। যে সব সংস্থা বহু বছরের চেষ্টায় গড়ে উঠেছে সেগুলির যাতে কোন ক্ষতি না হয় তার জন্য কমিটির উৎকণ্ঠাই সম্ভবত: বিবরণীতে প্রতিফলিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই রকম একটা সংস্থার কাজকর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে খণ্ড খণ্ড ভাবে তদন্ত ক'রে প্রকৃত কোন ফল লাভ করা যায়না।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে এ পর্য্যন্ত কি কাজ হয়েছে তার একটা পুরোপুরি হিসেব নিয়ে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বে যে পরিবর্ত্তন এসেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটা বিস্তারিত ও সুসংবদ্ধ বিজ্ঞান নীতি গঠন করেই শুধু দেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতি করা যেতে পারে।

"একমাত্র বিজ্ঞান ও কারিগরী ক্ষেত্রে অগ্রগতির মাধ্যমেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব" এই কথা যিনি বিশ্বাস করতেন, দেশের সৌভাগ্য যে স্বাধীনতা লাভ করার সময় এবং তার পরেও অনেকদিন, ভারতে এমনি একজন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে "বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানীদের ওপরেই ভবিষ্যত নির্ভর করছে।" ১৯৫৮ সালেই তিনি প্রথম বিজ্ঞান নীতি গঠন করেন। এতে বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয় যে "বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও পদ্ধতি প্রয়োগ করেই শুধু দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত সুযোগ সুবিধের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।" কারিগরী ক্ষেত্রে প্রগতিশীল একটা সমাজ গঠন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সাধারণভাবে এই রকম ব্যক্তিগণের হাতেই যে এখন পর্য্যন্ত দেশের নেতৃত্ব রয়েছে, এটা দেশের পক্ষে সৌভাগ্য। স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকেই সরকারের সংহত প্রচেষ্টার ফলে বর্ত্তমানে আমাদের দেশে, খাদ্যশস্য উৎপাদন, শিল্পোন্নয়ন, বিদ্যুৎশক্তি, যোগাযোগ ও পরিবহণ সম্পর্কে সত্যিকারের সমস্যাগুলি সমাধান করার উপযোগী অতি চমৎকার একদল বৈজ্ঞানিক ও কর্ম্মী তৈরি হয়েছেন। গত ১১ বছরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য আমাদের ব্যয়, ২৭ কোটি টাকা থেকে পাঁচগুণেরও বেশী বেড়ে গত বছরে ১৩৬ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে এবং আমাদের বৈজ্ঞানিক জনশক্তিও সাড়ে তিনগুণ বেড়েছে। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে দশ লক্ষেরও বেশী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তি রয়েছেন।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংস্থা থাকা স্বত্বেও গত কয়েক বছরে এই লাভগুলি ফলপ্রসূ হয়নি এবং কিছুটা কর্ম্মচারিতন্ত্রের অধীন হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞান নীতিতে যে জাতীয় লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে তা পূরণ করার জন্য সরকার কয়েক বছরের মধ্যে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষৎ, পারমাণবিক শক্তি সংস্থা, প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার মতো কতকগুলি সংস্থা গঠন করেন। এই সংস্থাগুলিও সরকারের কর্ম্মচারীতন্ত্রই অনুসরণ করছে বলে মনে হয়।

বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার ক্ষেত্রে আমরা কতটুকু লাভ করেছি, বর্ত্তমানে তার একটা সঠিক হিসেব করা প্রয়োজন এবং বিজ্ঞান নীতির নতুন একটা সংজ্ঞা স্থির ক'রে আধুনিক মহাকাশ বিজ্ঞান ও কম্পুটারের যুগের উপযোগী একটা কারিগরী নীতি স্থির করা প্রয়োজন। এর জন্য গবেষণা, উন্নয়ন, উৎপাদন এবং সরকারের মধ্যে একটু সুষ্ঠু সম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে যে জনশক্তি গড়ে তোলা হয়েছে, তার সম্ভবপর সর্ব্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য এমন একটা নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন যা এই সম্পর্কগুলিকে সুসংবদ্ধভাবে ব্যবহার করতে পারবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সমাজের দুর্ব্বলতর শ্রেণীর কল্যাণের ওপর গুরুত্ব

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী প্রধানমন্ত্রী ১৯৭০-৭১ সালের জন্য সংসদে যে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেন তাতে অতিরিক্ত করের মাধ্যমে ১৭০ কোটি টাকা আয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রত্যক্ষ কর বাবদ ১৩৪ কোটি টাকা এবং পরোক্ষ কর বাবদ ৩৬ কোটি টাকা আয় হবে। তবে মোটামুটি ২২৫ কোটি টাকা ঘাটতিও থাকবে। নতুন করগুলি থেকে যে ১৭০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে তা থেকে কেন্দ্রের খাতে যাবে ১২৫ কোটি এবং রাজ্যগুলি পাবে ৪৫ কোটি টাকা। করের বর্ত্তমান হার অনুযায়ী রাজস্ব থেকে ১৯৭০-৭১ সালে মোট আয় হবে ৩৮৬৭ কোটি টাকা, চলতি বছরে এই ক্ষেত্রে আয় ধরা হয়েছে ৩৫৮৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে রাজ্যগুলির অংশ হবে ৭০০ কোটি টাকা, পার্শেল ইত্যাদির ক্ষেত্রেই মাশুল বাড়ানো হবে। (এগুলি থেকে বার্ষিক মোট ৫.৪৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হবে)।

খোলা বাজারে চিনির মূল্যের ওপর বর্ত্তমানে শতকরা যে ২৩ ভাগ কর রয়েছে তা বাড়িয়ে ৩৭.৫ ভাগ করা হবে। "লেভি চিনির" ওপর বর্ত্তমানের শতকরা ২৩ ভাগ লেভি সামান্য বাড়িয়ে শতকরা ২৫ ভাগ করা হবে। খাণ্ডসারি চিনির ওপর করের হার শতকরা ১২.৫ ভাগ থেকে বাড়িয়ে ১৭.৫ ভাগ করা হয়েছে। (এই দুটি জিনিস থেকে অতিরিক্ত ২৮.৫০ কোটি টাকা আয় হবে)।

মোটর স্পিরিটের ওপর কর, প্রতি লীটারে ১০ পয়সা বাড়ানো হয়েছে। ভালো কেরোসিনে প্রতি লীটারে ২ পয়সা এবং ফার-

কেন্দ্রীয় বাজেট ১৯৭০-৭১

চলতি বছরে এর পরিমাণ ধরা হয়েছে ৬২২ কোটি টাকা। সুতরাং নীট আয় হবে ৩১৬৬.৯৭ কোটি টাকা।

মূলধনী খাতে আয় হবে ১৮২৩.৭১ কোটি টাকা যার ফলে মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫১১৫.৪০ কোটি টাকা।

মোট ৫৩৪০.৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ের মধ্যে রাজস্ব ও মূলধনী খাতে ব্যয়ের পরিমাণ হল যথাক্রমে ৩১৫২.১৮ কোটি এবং ২১৮৮.৪৬ কোটি টাকা।

যে সব জিনিসে কর আরোপ করার প্রস্তাব করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল :—

পরোক্ষ কর

সিগারেটের ওপর কর : মূল্যের ওপর শতকরা ৩ থেকে ২২ ভাগ (আনুমানিক রাজস্ব ১৩.৫০ কোটি টাকা)।

ফনোগ্রাম এবং অভিনন্দন মূলক টেলিগ্রামের জন্যও বেশী মাশুল দিতে হবে: পোষ্টকার্ড বা ইনল্যাণ্ড পত্রের দাম বাড়ানো হয়নি। মানি অর্ডারে ১০০ টাকা পর্যন্ত বেশী মাশুল দিতে হবেনা।

পোষ্টাল, টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোনের মাশুল সংশোধন করে বাড়ানো হবে। পার্শেল, রেজেষ্ট্রি করার মাশুল, ভি. পি নেস তেলে প্রতি লীটারে ২ পয়সা কর বৃদ্ধি করা হয়েছে। খারাপ কেরোসিনের ওপর করে কোন পরিবর্ত্তন করা হয়নি। এগুলি থেকে অতিরিক্ত রাজস্ব পাওয়া যাবে ৩৯.৫ কোটি টাকা)।

শিশুদের খাদ্য ও দেশী ঘির ওপর কর সম্পূর্ণ রহিত করা হয়েছে।

সব রকম শস্যের নির্য্যাস, সাংশ্লেষিক সিরাপ ও সরবৎ, শুষ্ক মটর, সদ্য কফি, চা, জেলি, কৃষ্টাল, কাষ্টার্ড এবং আইস ক্রীম পাউডার, বিস্কুট, কোকো পাউডার, পানীয় চকোলেট, বীজানু মুক্ত মাখন, পনীর, সোডা লেমনেড ইত্যাদি, গ্লুকোজ ও ডেক্স্ট্রোজের মত তৈরি ও সংরক্ষিত খাদ্যের মূল্যের ওপর শতকরা ১০ ভাগ কর। (এগুলি থেকে নীট ৮.৬৮ কোটি টাকা পাওয়া যাবে)।

দুই ডেনিয়ার বা তার কম পলিয়েষ্টার তন্তুর ওপর মূল শুল্ক প্রতি কি: গ্রামে ২১ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫ টাকা করা হয়েছে এবং বিশেষ আবগারি শুল্কও বাড়ানো হয়েছে। অল্প মূল্যের তন্ত সম্পর্কে খানিকটা রেহাইয়ের প্রস্তাবও রয়েছে। (কৃত্রিম তন্ত ও রেশমী বস্ত্রের ওপর এই কর বৃদ্ধির ফলে ১৩.৭৮ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হবে)।

এ্যালুমিনিয়ামের ওপর করগুলির সমন্বয়ের ফলে ৪.৭০ কোটি টাকা আয় হবে।

স্যানিটারির জিনিসপত্র এবং পোর্সিলেনের চকচকে টালির ওপর শতকরা যথাক্রমে যে ১৫ ভাগ ও ১০ ভাগ কর ছিল তা বাড়িয়ে শতকরা ২৫ ভাগ করা হয়েছে।

এয়ার কণ্ডিসনার এবং ১৬৫ লীটারেরও বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন বড় রেফ্রিজারেটারের ওপর কর শতকরা ৪০ ভাগ থেকে বাড়িয়ে ৫৩ ৩/৪ করা হয়েছে। রেফ্রিজারেটারও শীততাপ নিয়ন্ত্রণের মেসিন ইত্যাদির অংশের ওপর কর শতকরা ৫৩ ৩/৪ ভাগ থেকে বাড়িয়ে ৬৬ ৩/৪ ভাগ করা হয়েছে। (মোট আয় ২.২৪ কোটি টাকা)।

অফিসগুলিতে ব্যবহৃত মেসিন, ধাতুনির্ম্মিত আধার, স্পার্কিং প্লাগ, ষ্টেইনলেস্ ইস্পাতের ব্লেড, স্লটেড এ্যাঙ্গল্, লোহার সিন্দুক, সেফ ডিপোজিট ভল্ট, টাইপরাইটার, হিসেব করার মেসিন ও কম্পিউটার ও আভ্যন্তরীন যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলি করের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। (এগুলি থেকে ১০.৪০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে)।

যে সব মেসিনারি আমদানী করা হবে সেগুলির ওপর মূল্য অনুযায়ী শুল্ক শতকরা ২৭.৫ ভাগ থেকে বাড়িয়ে ৩৫ ভাগ করা হয়েছে।

হুইস্কী, ব্রাণ্ডি, জিন এবং অন্যান্য মদের ওপর কর বৃদ্ধি করা হয়েছে। (আমদানী শুল্ক থেকে আনুমানিক ২৯.৭৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হবে।)

প্রত্যক্ষ কর

২ লক্ষ টাকার বেশী ব্যক্তিগত আয়ের ক্ষেত্রে শতকরা ১০ টাকা অতিরিক্ত সারচার্জ্জ আরোপ করে সর্ব্বোচ্চ শতকরা ৯৩.৫ ভাগে পরিণত করা হবে। ২.৫ লক্ষ টাকার ওপরের স্তরে বর্ত্তমান করহার হল শতকরা ৮২.৫ ভাগ।

বার্ষিক ৪০,০০০ টাকার বেশী সমস্ত ব্যক্তিগত আয়ের ওপর ক্রম অনুযায়ী আয়কর বাড়বে।

সম্পদ কর বর্ত্তমানের শতকরা ০.৫ ভাগ ও ৩ ভাগের স্তর বাড়িয়ে সর্ব্বনিম্ন স্তর শতকরা ৫ ভাগ ও সর্ব্বোচ্চ স্তর শতকরা ১ ভাগ করা হয়েছে।

দান করের রেহাই সীমা ১০,০০০ টাকা থেকে কমিয়ে ৫০০০ টাকা করা হয়েছে।

এক নজরে বাজেট

রাজস্ব বাজেট

কোটি টাকায়

রাজস্ববাবদ আয়	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট
	১৯৬৯-৭০	১৯৬৯-৭০	১৯৭০-৭১
কর রাজস্ব	২,৭১৪.১৫	২,৭৩২.০৪	২,৯৬৬.৯৭ * ১৭০.০৬
কর বহির্ভূত রাজস্ব	৭৯৯.৭৪	৮৫৫.১১	৮৯৯.৭৫
মোট রাজস্ব	৩,৫১৩.৮৯	৩,৫৮৭.১৫	৩,৮৬৬.৭২ * ১৭০.০৬
রাজ্যগুলির অংশ বাদে	৫১৭.৬০	৬২১.৬৭	৬৯৯.৭৯ * ৪৫.৩০
কেন্দ্রের নীট রাজস্ব	২,৯৯৬.২৯	২,৯৬৫.৪৮	৩,১৬৬.৭৯ * ১২৪.৭৬
রাজস্বের ব্যয়			
বেসামরিক ব্যয়	১,৩৭৭.৯৭	১,৪০৫.০৪	১,৪৯৮.২৪
প্রতিরক্ষা ব্যয়	৯৮৫.৭৮	৯৭৯.৩২	১,০১৭.৮৪
আইনসভাসহ রাজ্যও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে এককালীন সাহায্য	৫৯৬.১৮	৫৯২.০৬	৬৩৬.১০
মোট	২,৯৫৯.৯৩	২.৯৭৬.৪২	৩,১৫২.১৮
উদ্বৃত্ত রাজস্ব (+) ঘাটতি (—)	(+) ৩৬.৩৬	(—) ১০.৯৪	+ ১৪.৭৫
বাজেট প্রস্তাবের ফলে (*)			+ ১২৪.৭৬

সহরের সম্পদের ওপর একটা উচ্চসীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়ার লক্ষ্য অর্জ্জন করার উদ্দেশ্যে সহরের জমি ও বাড়ীর ওপর অতিরিক্ত সম্পদ কর বাড়াবার প্রস্তাব করা হয়েছে। সম্পদের মূল্য যদি পাঁচ লক্ষ টাকার বেশী হয় তাহলে দেয় করের পরিমাণ হবে শতকরা ৫ টাকা এবং ১০ লক্ষ টাকার বেশী হলে শতকরা ৭ টাকা দিতে হবে। সহরাঞ্চলের সংজ্ঞারও পরিবর্তন করা হচ্ছে। তাতে যে সব মিউনিসিপ্যালিটির জনসংখ্যা ১০ হাজার বা তার বেশী সেই সব মিউনিসিপ্যালিটির অধীন এলাকাগুলিও সহর এলাকার অন্তর্ভুক্ত হবে।

অবিবাহিত বা সন্তানবিহীন সব আয়কর দাতার ক্ষেত্রে আয়করের রেহাইসীমা বাড়িয়ে ৫০০০ টাকা করা হয়েছে। চাকুরীজীবী ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে যাতায়াত ব্যয় বাবদ মাসিক নিম্নতম ২০ টাকা রেহাই দেবারও প্রস্তাব রয়েছে।

আয় এবং সম্পদ কর

বর্ত্তমানের সম্পদ করের হারও বাড়ানো হচ্ছে। সহরাঞ্চলে কৃষি জমি বিক্রী বা হস্তান্তর করা হলে তা থেকে যে মূলধনগত লাভ হবে তার ওপরেও দিতে হবে। কর এড়ানোর জন্য যে সব বেসরকারী ন্যাস গঠন করা হয় সেই ফাঁকও বন্ধ করা হচ্ছে। কয়েকটি ছাড়া এই সব ন্যাসের আয়ের ওপর সোজাসুজি হারে শতকরা ৬৫ ভাগ এবং সম্পদের ওপর শতকরা ১.৫ ভাগ কর আদায় করা হবে। শিল্প এবং ব্যবসায়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জ্জন করার জন্য দাতব্য ও ধর্ম্মীয় ন্যাসগুলির টাকা যাতে ব্যবহার না করা যায় তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সঞ্চয়ে উৎসাহ দেওয়ার জন্য, ইউনিট ট্রাষ্ট, বা ভারতীয় কোম্পানীগুলির শেয়ার অথবা অনুমোদিত পল্লী ঋণপত্রের ও স্বল্পসঞ্চয়ের পরিকল্পনাগুলির লগ্নি থেকে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত আয়কে, আয়কর থেকে রেহাই দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। অনেক রকমের নতুন সঞ্চয় পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়েছে। অনুমোদিত রাষ্ট্রীয়-উদ্যোগে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ থেকে একটি ঋণপত্র প্রকল্পও এগুলির অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য প্রকল্পগুলি হ'ল শতকরা ৫॥ টাকা থেকে ৬৸ টাকা সুদের, ১, ৩ ও ৫ বছর মেয়াদী জমা পরিকল্পনা ; নতুন আর একটি সঞ্চয়পত্র হ'ল, প্রায় ৬৷ টাকা সুদের ৫ বছর মেয়াদী পৌনঃপুনিক জমা পরিকল্পনা এবং ৭৷ টাকা সুদের ৭ বছর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয়পত্র। এই নতুন সঞ্চয় পরিকল্পনাগুলিতে করে কোন বিশেষ রেহাই পাওয়া যাবেনা। সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডসহ কতকগুলি স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পনায় সুদের হার বাড়ানো হচ্ছে।

লগ্নি সম্পর্কে একটা স্থিতিশীল আবহাওয়া বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সমিতিবদ্ধ কোম্পানিগুলি সম্বন্ধে বর্ত্তমান কর কাঠামোতে কোন রকম হস্তক্ষেপ করা হয়নি।

চায়ের ওপর আবগারি শুল্ক বাড়ানো হচ্ছে। তবে কয়েক ধরণের খোলা চায়ের ক্ষেত্রে শুল্ক বাড়ানো হয়নি। চায়ের রপ্তানী যাতে বাড়ে সেজন্য চায়ের ওপর রপ্তানী শুল্ক একেবারে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

কল্যাণ মূলক প্রকল্পসমূহ

৪৫ টি জেলার ছোট ছোট কৃষকগণের জন্য বিশেষ প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে, পল্লীর যে সব অঞ্চলে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় সেখানে পল্লী উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ২৫ কোটি টাকা, বস্তি পরিস্কার, গৃহনির্ম্মাণ ও ভূমি উন্নয়ন সম্পর্কে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে একটি নগর উন্নয়ন কর্পোরেশন গঠন, পানীয় জল সরবরাহ সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা এবং শিল্পকর্ম্মীদের জন্য পেন্সনের সুবিধে ইত্যাদি কল্যাণমূলক প্রকল্পসমূহ গ্রহণ করা হবে। নিম্নতম পেন্সন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম্মচারীদের জন্য পারিবারিক পেন্সন বাড়িয়ে ৪০ টাকা করা হবে। শিল্প কর্ম্মীদের ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে। সহরের বস্তি অঞ্চলের এবং জনজাতির উন্নয়ন ব্লকগুলির শিশুদের পুষ্টির প্রয়োজন মেটানোর জন্য ৪ কোটি টাকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

১৯৭০-৭১ সালে পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ (কেন্দ্রীয় তরফ)

		পরিকল্পনায় বিনিয়োগ	
		বাজেট ১৯৬৯-৭০	বাজেট ১৯৭০-৭১
		কোটি টাকায়	
১।	কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কর্ম্মসূচী	৮৬	১২৫
২।	জলসেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ	২	৫
৩।	বিদ্যুৎ শক্তি	৪৮	৭৯
৪।	শিল্প ও ধাতু	৫৪৬	৫৪৮
৫।	পরিবহণ ও যোগাযোগ	৩৭১	৪৫৫
৬।	সমাজসেবা	১৫৫	১৮৩
৭।	অন্যান্য কর্ম্মসূচী	১৫	১৬
	মোট	১,২২৩	১,৪১১

কেলেঘাই খনন পরিকল্পনা

মেদিনীপুর জেলার নদী কেলেঘাই। ঝাড়গ্রাম থানার দুধকুণ্ডীর কাছাকাছি একটি উঁচু জায়গা থেকে বেরিয়ে বাঘাই নামে স্রোতস্বিনীর সঙ্গে মিলে, ঢেউভাঙায় কোশী নদীতে পড়েছে। সেখান থেকে সুরু হয়েছে হলদী নদী যার মোহানার কাছে তৈরি হচ্ছে হলদিয়া বন্দর।

এই কান্নার নদী, খৃষ্টীয় ১৮৮৫ সাল থেকে প্রায় প্রতি বছরই কূল ছাপিয়ে পড়ে এবং দুপাশের মাঠ ও গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আনে বন্যার ভয়ঙ্কর প্লাবন। ফলে সবং, পিংলা, ময়না, নারায়ণগড়, পটাশপুর ও ভগবানপুরের প্রায় তিনশ বর্গমাইল এলাকায় শস্যহানি হয়। বন্যার এই কবল গ্রাস থেকে মানুষ, পশু, গৃহস্থের কুটির, সরকারী ঘরবাড়ী কিছুই নিস্তার পায় না। কেবল গত দু বছরে কেলেঘাই নদীতে বন্যাজনিত ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় তের কোটি টাকার মত। আশপাশের প্রায় ১৮৯৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা থেকে বর্ষার জল এই মজা নদীতে পড়ার ফলে বন্যা হয় এবং গত ২৫ বছর ধরে প্রতি বছর নিদারুণ বন্যার ফলে দুদিকের বাঁধগুলি থেকে মাটি গড়িয়ে নদীর গভীরতা নষ্ট করে দেওয়ায় নদীর প্রবাহ-পথ সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে এবং নদীর নাব্যতা ক্রমশ: কমে যাচ্ছে।

এই ভয়ঙ্করী নদী খনন করে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ করার একটি পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনক্রমে এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করেছেন এবং ইতিমধ্যেই এর প্রাথমিক কাজকর্ম সুরু হয়ে গেছে। এই প্রকল্প পুরোপুরি রূপায়িত হতে লাগবে তিন বছর এবং এর জন্য তিন কোটি টাকার ব্যয় মঞ্জুর হয়েছে।

প্রায় ৯৭ কিলোমিটার লম্বা কেলেঘাই নদীতে, ঢেউভাঙা থেকে লাঙলকাটা পর্যন্ত মোট ২১ কিলোমিটারে মাত্র জোয়ার ভাটা হয়। বাকী অংশে বার মাস জল বদ্ধ ও স্থির থাকে। জোয়ারের জলস্রোতে এই ২১ কিলোমিটারে প্রচুর পলি এসে জমে; এবং বছরে প্রায় ৮ মাস বৃষ্টি না হওয়ায় এই পলি ধুয়ে যেতে পারে না। শুধু তাই নয় বর্ষায় সুবর্ণরেখা নদীর জল উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোড ছাপিয়ে বাঘাই নামে স্রোতস্বিনীতে এসে পড়ে। ফলে বন্যার প্রকোপ আরও বেড়ে যায়। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে পলি জমার ফলে লাঙলকাটা পর্যন্ত নদীতলের উচ্চতা এবং দুদিকের বাঁধগুলির ক্রমবর্ধমান সঙ্কীর্ণতার ফলে বিধ্বংসী বন্যার তাণ্ডব প্রতি বছরই তীব্রতর হচ্ছে।

বর্তমান খনন প্রকল্প অনুসারে প্রথম বছরে কপালেশ্বরী চণ্ডিয়ার কিছু অংশ এবং কেলেঘাই নদীর ঢেউভাঙা থেকে তালডিহা পর্যন্ত খনন করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার শুধু এই অংশের জন্য ৯৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। এতে নদীর গভীরতা সাড়ে ৫ মিটার ও বিস্তার প্রায় ৯১.৫ মিটার বাড়বে। দুই তীরের বকচর ধরলে এই বিস্তার হবে ৩৬৬ মিটারের মত। বাকরাবাদ থেকে মোহানা পর্যন্ত কেলেঘাই নদীর প্রায় ৬০ কিলোমিটার জুড়ে এই খনন কার্য শেষ হলে আশেপাশের অঞ্চলগুলি প্রতি বছরের বন্যার প্রকোপ থেকে শুধু যে মুক্তি পাবে তাই নয়, এতে চাষবাসেরও প্রভূত সুবিধা হবে। যদি পরিকল্পিত পুনরুজ্জীবনের পরেও এই নদী বর্ষায় উঁচু

কেলেঘাই পরিকল্পনা

সাঙ্কেতিক চিহ্ন

উপকৃত অঞ্চল

নদী

রাস্তা

রেলপথ

০ ৪ ৮ ১২ ১৬

স্কেল

জায়গায় জলের তোড় সামলাতে না পারে, তাহলে উদ্বৃত্ত জলস্রোত বাগদার কাছে নিষ্কাশনী খাল দিয়ে বার করে দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।

খননের ফলে দুদিকের বাঁধগুলি নতুন করে গড়ে উঠবে, এবং এই নবনির্মিত বাঁধের আড়ালে আশেপাশের জমিতে ফসল ফলানোর কোনো সঙ্কট থাকবে না। এ ছাড়াও যে সব অঞ্চলে জল উপচে পড়ত উদ্ধারের ফলে সেগুলোকে আবার ব্যবহার-যোগ্য করে তোলা হবে। জোয়ারের জল এখন নদীর দীর্ঘতর অংশে আসতে পারবে। ফলে সেচের জলের অভাব আর হবে না। বন্যার পরে যে অনিবার্য সংক্রামক রোগ ও মড়কের প্রাদুর্ভাব দেখা দিত তারও আর কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। তা ছাড়া এই অঞ্চল উপকূলবর্তী হওয়ায় এখানে নৌকা ছাড়া যাতায়াতের কোন বিকল্প ব্যবস্থা নাই। তাই খনন-কার্য সমাপ্ত হলে নদীর নাব্যতাও বেড়ে যাবে। প্রকল্পটি রূপায়ণের জন্য দুদিকের বাঁধের পাশে গড়ে ওঠা কিছু ঘরবাড়ী ও জমি দখল করতে হতে পারে। উচ্ছেদ বা দখলের আগে এরজন্য ক্ষতিপুরণের শতকরা ৮০ ভাগ টাকা দিয়ে দেওয়া হবে। এ ছাড়া নদী উদ্ধারের কাজে যে প্রায় ২৫ হাজার লোক লাগবে তার জন্য স্থানীয় কর্মহীনদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং এই ব্যাপারে যাতে কোনো অবিচার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য আঞ্চলিক জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হচ্ছে। পরিকল্পনাটি রূপায়িত হলে ৮১,০০০ হেক্টর জমি সম্পূর্ণ ও আংশিক-ভাবে উদ্ধার করা যাবে এবং প্রায় ১২১০ হেক্টর জমিতে একাধিক ফসল তোলা সম্ভব হবে। এর ফলে প্রায় ১১,৭৫,০০০ কুইন্টাল অতিরিক্ত ধান এই অঞ্চল থেকে পাওয়া যাবে। এই খনন প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে লাগবে ২২৬ লক্ষ টাকার মত এবং প্রায় ৮০৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকার বাসিন্দা এর দ্বারা উপকৃত হবেন।

অন্য দেশের কৃষি

ফরাসী কৃষি ব্যবস্থায় বৈচিত্র্যটাই হ'ল তার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। সেখানে অঞ্চল অনুযায়ী কৃষিতেও বিভিন্নতা দেখতে পাওয়া যায়। তবে ফ্রান্সে, কৃষিতে যে বিবর্ত্তন এসেছে সাধারণভাবে তা বিবেচনা করা যেতে পারে।

ফ্রান্সে ১৯২৫ থেকে ১৯৫৪ সালের মধ্যে কৃষিতে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা শতকরা ৩০ ভাগ কমে যায়। গত ১৫ বছর থেকে এই হার বেড়ে চলেছে। ১৯৩৬ সালে কৃষিতে নিযুক্ত মোট পুরুষ কর্মীর সংখ্যা যেখানে ছিল শতকরা ৩২.৬ ভাগ সেই সেই তুলনায় ১৯৬২ সালে তার সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ২০ ভাগে।

সাধারণতঃ বৃদ্ধরাই কৃষিতে নিযুক্ত আছেন। কৃষি উন্নয়নের দিক থেকে এটা যে মোটেই সুলক্ষণ নয় তা সহজেই বলা যায়। কারণ, বৃদ্ধ কৃষকরা অন্ততঃপক্ষে কর্মক্ষমতার দিক থেকে, আধুনিক কৃষি পদ্ধতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম নন। তাছাড়া কৃষিতে যন্ত্রসজ্জার ফলে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। তবে উত্তর ফ্রান্সে, প্যারিস অববাহিকায় এবং ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে এঁদের সংখ্যা এখন ও কমেনি।

স্বল্প আয়

ফ্রান্সে, অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় কৃষি থেকে আয়ের পরিমাণ কম। ১৯৩৮ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে কৃষির ক্ষেত্রে আয় বেড়েছে শতকরা মাত্র ২৫ ভাগ অথচ ঐ সময়েই কৃষি বহির্ভূত ক্ষেত্রগুলিতে নিযুক্ত কর্মীদের আয় বেড়েছে শতকরা ৬০ ভাগ। কিন্তু ১৯৫২ সাল থেকে ফরাসী সরকার যে কৃষি নীতি গ্রহণ করেছেন তা কৃষি-আয় বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করেছে এবং তা অন্যান্য বৃত্তির সমান। ফরাসী কৃষি ব্যবস্থার একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ফ্রান্সের কৃষি জমি ছোট ছোট টুকরায় বিভক্ত। মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে প্রতি কৃষক পরিবারের জমির আয়তন হল ১৪.৫০ হেক্টার। তবে এই পরিমাণটাও পশ্চিম ইউরোপে অন্যান্য দেশের তুলনায় মোটামুটি ভাবে বেশী।

আধুনিক কৃষি পদ্ধতির কারিগরি প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে জমির মালিকানা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ বর্ত্তমানে কতকগুলি নীতি গ্রহণ করেছেন। কৃষি জমি বড় আকারে সংগঠিত করার জন্য বর্ত্তমানে বিশেষভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ ১৯৫৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রতি বছর ৫ লক্ষ হেক্টার ক'রে জমি পুনর্গঠন করছেন। ১৯৫১ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে কৃষি উৎপাদন বেড়েছে শতকরা ৩০ ভাগ আর ঐ সময়ে কৃষকের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে শতকরা ১৩ ভাগ। যুদ্ধোত্তর সময়ে কৃষিতে যন্ত্রসজ্জার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ১৯৫০ থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে কৃষির জন্য ব্যবহৃত ট্র্যাক্টারের সংখ্যা ১২০,০০০ থেকে বেড়ে ৯৫০,০০০, এবং যন্ত্রচালিত সংযুক্ত ফসল সংগ্রহের মেসিনের সংখ্যা ৩৮০০ থেকে বেড়ে ৮৫,০০০ হয়েছে।

কৃষিতে যন্ত্রসজ্জা

কৃষি যন্ত্রপাতি, ফরাসী কৃষি ব্যবস্থার ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে, ফলে কর্তৃপক্ষ এখন এই সব নতুন কৃষি যন্ত্রপাতির উপযোগী ক'রে ভূমি ব্যবস্থা পুনর্গঠন করার কথা চিন্তা করছেন। কৃষির জন্য রাসায়নিক সার ব্যবহারের মাত্রাও অনেক বেড়ে গেছে (প্রতি হেক্টারে ৮০ কিঃ গ্রাঃ)। রাসায়নিক সার ব্যবহার জনপ্রিয় করে তোলার জন্য যে চেষ্টা করা হয় তার ফলেই এগুলির প্রচলন বেড়েছে।

কৃষি থেকে সর্ব্বোচ্চ ফল পেতে হলে শিক্ষা এবং কারিগরি প্রগতি পাশাপাশি চলতে হয়। কৃষকদের মধ্যে যেমন শিক্ষার সম্প্রসারণ দরকার তেমনি কৃষির উন্নততর পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করাও দরকার। ফ্রান্সের কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শতকরা মাত্র ১৩ ভাগ সাধারণ শিক্ষা অর্জ্জন করার জন্য কলেজে যায়।

ফ্রান্সে কৃষি বিষয়ে শিক্ষার উন্নয়ন তেমন দ্রুত নয় আর এতেই বোঝা যায় যে বহু সংখ্যক ফরাসী কৃষক এখন পর্যন্ত, আধুনিক কৃষি পদ্ধতি প্রয়োগ করার মতো জ্ঞান অর্জ্জন করতে পারেন নি।

নারীহিতে ব্রতী সমাজ সংস্থা

অপর্ণা মৈত্র

মানুষ মাত্রেই ভুল করে। কিন্তু ক্ষণিকের সামান্য ভুল বা পদস্খলনের মূল্য অনেককে বিশেষতঃ মেয়েদের দিতে হয় সারা জীবন ধরে। মেয়েদের অন্যায় সমাজ সহজে ক্ষমা করে না। এর ফলে এরা অনেক সময়ে বিপথে যেতে বাধ্য হয়। সাধারণ মানুষ এদের ভুলে যায়, সেই বিস্মরণের পথে একদিন এরা সমাজের ঘৃণা ও ভ্রূকুটি মাথায় করে চিরদিনের জন্যে হারিয়ে যায়। এদেরই জীবনে নব অরুণোদয় আনতে এগিয়ে এলো নারী সমাজ। ১৯৩২ সালে বাংলা প্রেসিডেন্সী কাউন্সিল ও সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পতিতাবৃত্তি নিবারণের জন্য নিখিল বঙ্গ নারী নিকেতন নামে একটি স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের প্রচেষ্টায় উল্লেখ-যোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন শ্রীমতী চারুলতা মুখোপাধ্যায়, বৃন্দকুমারী রায়, রমলা সিন্‌হা প্রভৃতি বিশিষ্ট মহিলারা। ১৯৩৩ সালে এই ইউনিয়ন দমদমে, আইনের বলে উদ্ধারপ্রাপ্ত মেয়েদের আশ্রয়, পড়াশুনা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য একটি হোম বা কল্যাণসদন খোলেন। ১৯৪২ সালের মধ্যে এদের অধিকাংশের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। ইউনিয়ন-এর চলার পথে বাধা আসেনি এমন নয়, কিন্তু কোন-টিই এর কল্যাণমূলক কাজের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়নি। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় স্থানাভাবের দরুণ কল্যাণ-গৃহ বন্ধ হলেও ১৯৪৩ সালে বাংলা দেশে দুর্ভিক্ষ এবং ১৯৪৬-৪৭ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে এই সদন পুনর্গঠিত হয় এবং অসংখ্য মেয়েকে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত আশ্রয় দেয়।

ইউনিয়ন-এর বিভিন্ন কল্যাণ প্রকল্প ছিল, কিন্তু নিজস্ব স্থায়ী কেন্দ্রের অভাবে এর কোনোটিতে হাত দেওয়া কঠিন ছিল। ১৯৪৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ইউ-নিয়নকে কলকাতায় ৮৯নং এলিয়ট রোডে একটি স্থায়ী জায়গা দেন। জায়গা পাওয়ার পর ইউনিয়ন-এর পরিকল্পিত কাজগুলি বাস্তবে রূপায়িত করতে দেরী হ'ল না। এক এক করে তৈরি হ'ল অল বেঙ্গল উইমেনস্ ওয়েলফেয়ার হোম, অল বেঙ্গল উইমেনস্ ইউনিয়ন ইণ্ডাস্টীয়েল ডিপার্টমেন্ট, অল বেঙ্গল উইমেনস্ ইউ-নিয়ন চিলড্রেনস ওয়েলফেয়ার হোম এবং অল বেঙ্গল উইমেনস্ ইউনিয়ন চিলড্রেনস্ ওয়েলফেয়ার ও প্রাইমারী স্কুল এগুলির প্রত্যেকটির জন্য পৃথক বিভাগীয় পরিচালন ব্যবস্থা আছে। অভিভাবক সংস্থারূপে সব কটি বিভাগের কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করে অল বেঙ্গল উইমেনস্ ইউনিয়ন।

এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠান সুপরিচালনার জন্য ইউনিয়নের সাধারণ ও কার্যনির্বাহক দুটি কমিটি আছে। এ ছাড়া ইউনিয়ন-এর প্রচারের জন্য শিল্পোৎপাদন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এবং অন্যান্য অসংখ্য খুঁটিনাটি কাজের জন্য কয়েকটি সাব-কমিটি আছে।

ইউনিয়নের কল্যাণ প্রচেষ্টার অন্যতম বাস্তব রূপায়ণ হ'ল এখানকার নারী কল্যাণ সদনটি। ১৮ বছরের উর্দ্ধবয়স্ক মেয়েরা যারা আত্মীয়স্বজন দ্বারা পরিত্যক্ত বা তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্নেহ ভালোবাসা-হীন বঞ্চিত জীবন কাটাচ্ছে, তাদের জন্যই স্থাপন করা হয়েছে এই সদনটি। শুধু আশ্রয় দেওয়াই নয়, সাধারণ শিক্ষা ও কারি-গরী শিক্ষার দ্বারা এদের স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করাই এই নারী কল্যাণ সদনের উদ্দেশ্য।

এই সংস্থাটির কাজকর্ম দেখার জন্য আছেন একটি পরিচালক মণ্ডলী। উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য একটি কমিটি ও কারিগরী শিক্ষার ক্লাসগুলি পরিচালনার জন্য একটি সাব-কমিটি আছে। নারীকল্যাণ সদনে লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা আছে। মেয়েরা তাদের যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী পড়া-শুনো করার সুযোগ পায়। তাই প্রতি বছরই এখান থেকে কিছু সংখ্যক মেয়ে প্রাইমারী, মাধ্যমিক ও স্নাতক এমন কি স্নাতকোত্তর শ্রেণীতেও যায়। পড়াশুনা ছাড়াও চারটি কারিগরী শিক্ষা ক্রমের ব্যবস্থা আছে। হোমে পুনর্বাসনের জন্য আনীত মেয়েদের এই বৃত্তিমূলক শিক্ষাগুলির যে কোন একটিতে যোগ দেওয়া বাধ্যতা-মূলক।

কারিগরী শিক্ষণের চারটি শিক্ষাক্রম আছে—

(১) সূচী শিল্প ও কাটছাঁটের কাজে ৩ বৎসরের লেডী ব্র্যাবোর্ণ ডিপ্লোমা কোর্স। এই কোর্সে ৩টি—প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বাৎসরিক পরীক্ষা হয়। প্রত্যেকটি পরীক্ষাতেই পাশের হার বেশ ভালো। সেলাই শেখানোর জন্য আছেন দুজন উপযুক্ত শিক্ষণ প্রাপ্তা শিক্ষিকা।

(২) দুই বৎসরের বুনন কোর্স। কোর্সটি দুই বৎসরে ভাগ করা হয়েছে—পুঁথিগত বিদ্যা ও হাতে কলমে কাজ শেখা। বুনন চাতুর্য পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট দেয় শ্রীরামপুরের সরকারী বুনন প্রযুক্তি বিদ্যালয়। এই বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্য আছেন বুননে ডিপ্লোমাপ্রাপ্তা অভিজ্ঞা শিক্ষিকা।

(৩) ১৯৬৪ সাল থেকে একটি ব্লক প্রিন্টিং বিভাগ খোলা হয়েছে। এখানে ব্লক দিয়ে মেয়েরা কাজ শেখে।

(৪) সম্প্রতি এই সদনে দুই বৎসরের কেটারিং ও ক্যান্টিন পরিচালনা কোর্স খোলা হয়েছে। এর জন্য শিক্ষান্তে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

বৃত্তিমূলক শিক্ষায় উত্তীর্ণ হলে মেয়েরা বাইরে কাজ পেতে পারে এবং হোম এ ব্যাপারে তাদের সাহায্য করে। তা ছাড়া প্রতি বৎসর ১২।১৩ জনকে কল্যাণসদনের শিল্প উৎপাদন কেন্দ্রেই কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়। বাইরের মেয়েদেরও এখানে বুনন, সেলাই, ব্লক প্রিন্টিংএর কাজ শেখার ও উৎপাদন কেন্দ্রে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়। শিল্প উৎপাদন কেন্দ্রে মেয়েরা কাজ করে ও কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পায়।

শিল্প কেন্দ্রে তৈরি জিনিষগুলি বিক্রীর জন্য একটি বিক্রয়কেন্দ্র আছে। এখানে মেয়েদের হাতে তৈরি টেবিল ক্লথ, স্কার্ফ, কভার, ডাস্টার, টি কোজী লাঞ্চ সেট এবং ছোট ছেলেমেয়েদের পোষাক, বিক্রীর জন্য রাখা হয়। এ ছাড়া এই সব জিনিসের জন্য বাইরের থেকে অর্ডার আসে। ব্লক প্রিন্টিং এর শাড়ী অর্ডার অনুযায়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

সম্প্রতি নারী কল্যাণ সদনের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হ'ল 'সুরুচি' নামে একটি ভোজনালয় স্থাপন। এখানকার পরিবেশিত খাদ্যতালিকা এবং ভোজনালয়টির সাজ সজ্জা 'সুরুচি' নামটি সার্থক করে তুলেছে। ইউনিয়ন-এর কেটারিং বিভাগের মেয়েরাই রান্না ও পরিবেশন করে। বাঙালীর রুচি ও পছন্দমত মধ্যাহ্নের আহার ও জল খাবার এখানে পাওয়া যায়। 'সুরুচি' থেকে প্রাপ্ত অর্থ ক্যান্টিনের মেয়েদের মধ্যে সমবায় ভিত্তিতে ভাগ করে দেওয়া হয়।

হোমের অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল এখানকার মেয়েদের পুনর্বাসন দেওয়া। সাধারণতঃ বছরে ১০।১১ জন মেয়ে এখান থেকে বাইরে কর্ম সংস্থানের সুযোগ পায়। অনেক জায়গায় এই ধরনের কল্যাণ সদনের আবাসিকও, বাইরে হয়তো ভাল কাজ পেতে পারেন কিন্তু থাকার জায়গা পান না বলে এবং পেলেও তা ব্যয় বহুল হওয়ায় কাজ নিতে পারেন না। কিন্তু এই সদনের মেয়েরা বাইরে কাজ পাবার পরেও সামান্য অর্থের বিনিময়ে হোমে থাকতে পারেন। কাজ ছাড়াও হোমের উদ্যোগে ও সাহায্যে অনেক মেয়ে বিবাহ করে স্বাভাবিক জীবন যাপনে সমর্থ হয়েছে। বিবাহ দিয়ে সমাজ জীবনে সম্মানের স্থান করে দিয়ে ভাঙা জীবন গড়ার কাজে হোমের অবদান প্রশংসনীয়। কারণ হোম দায়িত্বশীল অভিভাবকের মত হিতৈষী বন্ধুর মত পাত্রের যথাযোগ্য খবরাখবর নিয়ে বিবাহ স্থির করেন। প্রতি বৎসর গড়ে ৪।৫ টি মেয়ের বিবাহ দেওয়া হয়।

১৯৫০-৫১ সালে হোম ক্যাম্প থেকে ২০০ জন উদ্বাস্তু মেয়ের ট্রেনিং ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। এ পর্যন্ত হোমের সাহায্যে মেয়েরা, স্কুল শিক্ষিকা, শিল্প শিক্ষিকা, গ্রাম সেবিকা নার্স এবং গৃহস্থের সাহায্য কারিণীর কাজ পেয়েছে।

কল্যাণগৃহের মেয়েদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য আছে গার্ল গাইড স্পোর্টস, ফিল্ম শো, শিক্ষামূলক বক্তৃতা, গান শেখার ব্যবস্থা এবং বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব। বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটিকে পুনর্মিলন উৎসবও বলা যায়। হোমের প্রাক্তন মেয়েরা ঐ দিন তাঁদের স্বামী, সন্তান ও আত্মীয় পরিজনদের নিয়ে বেড়াতে আসেন। কল্যাণগৃহের মেয়েরাও বেড়াতে যায়। যে সব মেয়ের অভিভাবক আছে ছুটিতে তারা বাড়ী যায়।

মেয়েদের খাদ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। প্রয়োজনে অসুস্থদের জন্য সর্বপ্রকার চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা করা হয়। কল্যাণ সদনের একজন করে আবাসিক নার্স, মেট্রন ও মহিলা ডাক্তার আছেন। হোমে বসবাসকারী স্ত্রীলোকদের শিশু সন্তানদের ৩ বৎসর পর্যন্ত রাখার জন্য একটি নার্সারী আছে। ৪ বৎসর বয়সে এই শিশুদের ইউনিয়নের অন্তর্গত শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে পাঠান হয়।

ইউনিয়ন-এ দুজন সমাজ কর্মী আছেন। এঁরা হোমে নবাগত মেয়েদের পূর্ববর্তী জীবনের ঘটনা, বর্তমান মানসিক অবস্থা, কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতা বিচার করে তদনুযায়ী তাদের প্রতি ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেন। এ ছাড়া অতীতের ভয়াবহ ও বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার আবেগ জনিত ভার সাম্য লুপ্ত হয়েছে এমন মেয়েদের জন্য হোমে মনঃসমীক্ষা ও তার উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। এখানকার আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল যে, পুনর্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। সমাজকর্মীরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন ও প্রয়োজনমত সাহায্য করেন।

অদূর ভবিষ্যতে অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা হলে এই সদনের কর্মরত মেয়েদের জন্য একটি হোস্টেল খোলবার ইচ্ছা আছে। এই বৃহৎ নারী কল্যাণ সংস্থার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সমাজ কল্যাণ সংস্থা ও পৌর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এঁরা নির্দিষ্ট একটা সাহায্য পান। আর বাকিটা আসে চাঁদা ও দেশ বিদেশের সাহায্য থেকে। অখিল বঙ্গ নারী ইউনিয়ন-এর কোন শাখা নেই। কিন্তু জনহিতকর কাজের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটির নাম দেশে বিদেশে সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। প্রাপ্ত বয়স্করাও ইউনিয়নের সদস্য হতে পারেন। এই প্রতিষ্ঠান নারী সমাজের কল্যাণে সরকার এবং অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। এঁদের উদার হৃদয় ও অকৃত্রিম সহানুভতির অম্লান স্পর্শ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক নারীর জন্য প্রসারিত।

কৃষকদের সেবায় রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়

উদয়পুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রকল্প অনুযায়ী ১২০০ কৃষককে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে এবং আরও ৮০০০ কৃষককে তাদের গ্রামে, অধিক ফলনের শস্যের চাষ ও পুষ্টি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ঐ সব এলাকায় চাষবাস সম্পর্কে যে সব পুস্তিকা ইত্যাদি বিতরণ করা হয় এবং এবং শস্যাদি পোকামাকড় থেকে রক্ষা করা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ, কৃষকদের জমিতে গিয়ে যে সব পরামর্শ দেন তাতে কৃষকরা খুব উৎসাহ বোধ করেছেন।

ভারতস্থিত, ক্ষুধা থেকে মুক্তি অভিযান কমিটির ১,১৬৩১৬ডলার প্রকল্পটির সাহায্য নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে যুব ক্লাব সংগঠনেরও ব্যবস্থা করছে। পল্লী অঞ্চলে গঠিত ৬১ টি যুব ক্লাবের প্রায় ১০০০ যুবক, অধিকতর শস্য উৎপাদন, ফল ও শাকসব্জী উৎপাদন ও হাঁস মুরগী পালন সম্পর্কে যুবা কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেবেন।

★ কৃষির যান্ত্রিক সাজ সরঞ্জাম তৈরি ক'রে ম্যাসে ফার্গুসান ট্র্যাক্টারকে যোগাবার জন্য, জয়পুরে, রাজস্থান ইম্প্লিমেন্টস সংস্থা স্থাপন করা হয়েছে।

উন্নয়ন প্রচেষ্টা সম্পর্কে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী

প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ

অর্থমন্ত্রী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭০-৭১ সালের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট পেশ ক'রে, সংক্ষেপে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর কয়েকটা দিক উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে পরিকল্পনার জন্য যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা রেখেও বাজেটে, ভবিষ্যৎ উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণমূলক কয়েকটি প্রকল্পের জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তিনি বুঝিয়ে বলেন যে উৎপাদনমূলক শক্তিগুলির উন্নয়ন এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি ছাড়া অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থায়িত্ব অর্জ্জন করা সম্ভব নয়। তেমনি সমাজের দুর্ব্বলতর শ্রেণীর কল্যাণের দিকে উপযুক্ত লক্ষ্য না রাখলে এই স্থায়িত্বও বজায় রাখা সম্ভব নয়। শ্রীমতী গান্ধী আরও বলেন যে উন্নয়নের প্রয়োজন এবং ন্যায়সঙ্গত বন্টনের মধ্যে যে সংযোগ সূত্রটা আছে তা যদি নষ্ট হয় তাহলে তা অচলাবস্থা বা অস্থায়ীত্বের সৃষ্টি করবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে আমাদের সম্পদ সীমিত এবং তা দিয়ে সমাজের সমস্ত জরুরী প্রয়োজন মেটানো সম্ভব নয়; সেই ক্ষেত্রে এমন একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে অবিলম্বে ফলপ্রদ বিনিয়োগ এবং ভবিষ্যতে উন্নয়নের পথ সুগম করে তুলতে পারে এই রকম একটা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ এই দুইয়ের মধ্যে সমতা আনতে পারে।

দেশে মোটামুটি আর্থিক উন্নয়নের ফলে যে আশার সৃষ্টি হয়েছে তার বিবরণ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে উন্নয়নের গতি দ্রুততর করার জন্য বর্ত্তমান অবস্থায় আরও বেশী চেষ্টা করা উচিত। বর্ত্তমানে উন্নয়নের জন্য যে সব সুযোগ সুবিধে পাওয়া যাচ্ছে তা সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হবে এবং আগামী বছরের উন্নয়নমূলক বিনিয়োগের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা রাখতে হবে।

পরিকল্পনায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি

এই প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে প্রধান মন্ত্রী, কেন্দ্রের উদ্যোগে গৃহীত প্রকল্পগুলিসহ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাগুলির বিনিয়োগের পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগ বাড়ানোর প্রস্তাব করেছেন অর্থাৎ বর্ত্তমান বছরের ১২২৩ কোটি থেকে বাড়িয়ে আগামী বছরে ১৪১১ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব করেছেন। কেন্দ্র, রাজ্যসমূহ এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সব মিলিয়ে পরিকল্পনায় বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৪০০ কোটি টাকা বাড়বে অর্থাৎ ১৯৬৯-৭০ সালের ২২৩৯ কোটি টাকা থেকে তা বেড়ে ১৯৭০-৭১ সালে ২৬৩৭ কোটি টাকা হবে। প্রধান মন্ত্রী বলেন যে উন্নয়নের গতি দ্রুততর করার পথে একে বেশ বড় একটা প্রচেষ্টা বলা যায়। পরিকল্পনার জন্য এই ব্যবস্থা ছাড়াও শিল্প ও কৃষিকে সাহায্য করার জন্য আগামী বছরে আরও ব্যাপকভাবে সম্পদ সংহত করা হবে।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে সংশোধিত চতুর্থ পরিকল্পনায়, শুষ্ক অঞ্চলে চাষের জন্য উপযুক্ত একটা পদ্ধতি, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের কর্ম্মসংস্থানের জন্য আরও বেশী সুযোগ সুবিধে, যথেষ্ট পানীয় জল সরবরাহ, সহরাঞ্চলের ঘিঞ্জি এলাকাগুলির পরিবেশ উন্নততর করার মতো কতকগুলি সামাজিক অর্থনৈতিক জরুরী প্রয়োজন মেটানো সম্পর্কে বিশেষভাবে চেষ্টা করা হবে।

আরও কর্ম্মসংস্থান

পরিকল্পনায় বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে আগামী বছরে কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ যথেষ্ট বাড়বে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রধান মন্ত্রী বলেন যে কেবলমাত্র একটা কল্যাণমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো হচ্ছেনা, গরীব একটা দেশের পক্ষে এটা, উন্নয়ন কৌশলের একটা প্রয়োজনীয় অংশ; কারণ সে কোন সম্পদই অব্যবহৃত বা আংশিক ব্যবহৃত রাখতে পারেনা।

যে সব রাজ্যের যথেষ্ট সম্পদ নেই তাদের জন্য প্রধান মন্ত্রী বাজেটে ১৭৫ কোটি রাখার প্রস্তাব করেছেন। আশা করা যায় যে এর ফলে রাজ্যগুলি উপযুক্ত পরিকল্পনা কর্ম্মসূচী গ্রহণ করতে পারবে।

শ্রীমতী গান্ধী উল্লেখ করেন যে জাতীয় আয়ের তুলনায় ভারতের করের আনুপাতিক হার বিশ্বের মধ্যে সর্ব্বনিম্ন এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে যে অনুপাতিক হার শতকরা ১৪ ভাগের কিছু বেশী ছিল, গত কয়েক বছরে তা সেই পর্য্যায় থেকেও কমে গেছে। তিনি সেজন্য উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণের বর্দ্ধমান প্রয়োজন উপযুক্তভাবে মেটানোর জন্য কর ব্যবস্থার ভিত্তিকে সম্প্রসারিত করার ওপর জোর দিয়েছেন। আয় ও সম্পদের মধ্যে অধিকতর সমতা অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে আমাদের প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থা যাতে বড় একটা যন্ত্র হিসেবে কাজ করতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই কর প্রস্তাব তৈরী করা হয়। সুতরাং এই উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য উচ্চতর পর্য্যায়ে আয়কর এবং সম্পদ ও দানের ওপর করের বর্ত্তমান হার যথেষ্ট বাড়ানো হয়।

ফাঁকি বন্ধ করা

আমাদের কর ব্যবস্থায় প্রধান যে ফাঁকগুলি ছিল সেগুলি বন্ধ করা এবং যে সব সুবিধের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে সেইরকম কতকগুলি সুবিধে প্রত্যাহার করা সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী কতকগুলি ব্যবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। সহরের জমি ও বাড়ীর মূল্য

নিয়ে ক্রমবর্ধমান ফাটকাবাজারী সংযত করার উদ্দেশ্যে সহরের জমি ও বাড়ীর কর যথেষ্ট বাড়ানো হয়েছে। যৌথ সংস্থার কর সম্পর্কে বিশেষ প্রস্তাব করা হয়নি। আশা করা যাচ্ছে যে এটা লগ্নিবৃদ্ধিতে উৎসাহ জোগাবে।

পরোক্ষ করের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, দেশকে ক্রমশঃ আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে পারে সেই রকমভাবে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ করা এবং অর্থনৈতিক বা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যে সব জিনিসের ব্যবহার সংযত করা প্রয়োজন প্রধানতঃ সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই পরোক্ষ করের প্রস্তাবগুলি করা হয়েছে।

চলতি বছরের সংশোধিত হিসেব অনুযায়ী ২৯০ কোটি টাকার পরিবর্তে আগামী বছরে যে ২২৫ কোটি টাকা ঘাটতি দেখানো হয়েছে তার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে অনুকূল অবস্থা দেখা যাচ্ছে তাতে এই ঘাটতি উদ্বেগের সৃষ্টি করবেনা এবং মূল্যের সাধারণ স্থায়ীত্বের পক্ষে কোন আশঙ্কাও সৃষ্টি করবেনা। এই বাজেট প্রস্তাবে "সাবধানে সামান্য একটু এগুবার অথবা বিরাট কিছুর জন্য চেষ্টা করা এই দুটি বিপরীত ঝুঁকি এড়ানো হয়েছে" এই আশা প্রকাশ করে প্রধান মন্ত্রী তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

মূলধনী বাজেট

মূলধনী আয়			
বাজারের ঋণ (নীট)	১০৬.০০	১৪১.৩১	১৬১.৭০
বৈদেশিক সাহায্য (নীট) (পি. এল ৪৮০ ছাড়া)	৪৬৭.৪০	৪০০.৪৬	৩৯৯.৭৫
পি. এল ৪৮০ সাহায্য	২১৫.১১	২০৫.৯৩	১৩২.২৭
ঋণ পরিশোধ	৭৪৫.০০	৮৮০.০০	৮২৫.০০
অন্যান্য আয়	১৯৬.৩৭	৩৪৭.৮১	৩০৪.৯৯
মোট	১,৭২৯.৮৮	১,৯৭৫.৫১	১,৮২৩.৭১
মূলধনী ব্যয়			
অসামরিক ব্যয়	৪৭৮.৬০	৪৮৬.২৪	৫২৪.৩৫
প্রতিরক্ষা ব্যয়	১২৪.২২	১২০.৪২	১৩৩.৬৭
রেলওয়েতে মূলধন বিনিয়োগ	১৩২.৬০	১২৪.৮৬	১৫০.০০
ডাক ও তার বিভাগে মূলধন বিনিয়োগ	১৪.১৬	৩৫.৯৬	৩৫.০০
ঋণ ও অগ্রিম			
(১) রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল	৭৯৩.৭৪	১,০৫৭.৯৭	৮৭৮.২৫
(২) অন্যান্য	৪৫৬.৬০	৪২৪.২৩	৪৬৭.১৯
মোট	২,০১১.১২	২,২৫৪.৬৮	২,১৮৮.৪৬
মুলধনী খাতে ঘাটতি	২৯০.০৪	২৭৯.৭	৩৬৪.৭৫
মোট ঘাটতি	২৫৩.৬৮	২৯০.১১	৩৫০.০০
		(—) ১২৪.৭৬	

(+) রাজস্ব খাতে পি. এল ৪৮০ ও অন্যান্য খাদ্য সাহায্য সহ সংশোধিত হিসেবে হবে ৩৩ কোটি টাকা এবং প্রস্তাবিত বাজেটে ২৯ কোটি টাকা।

(*) বাজেট প্রস্তাবের ফলে

প্রকৃত মানুষ কই যে দেশ এগিয়ে যাবে ?

সুধাময় মুখোপাধ্যায়

পরিকল্পিত অর্থনীতি সব দুঃখদুর্দ্দশা দূর করবে এ আশা করা অবাস্তব। আজ জীবনের মূল্যবোধ বিলীয়মান, জীবিকা ও জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। মনুষ্যত্বের জাগরণ ছাড়া কোনোও পরিবর্তন আশা করা অর্থহীন।

স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যে ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখবরণ অপরিহার্য ছিল, তার জন্য দেশে সার্বিক গণ-প্রস্তুতির অভাব যদিও ঘটেনি তবু, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, আমাদের লক্ষ্য আজও অপূর্ণই রয়ে গেছে। পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ যে কোনও স্বাধীন দেশের মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিত। ব্যক্তিত্ব যেখানে গৌণ নয়, চেতনা যেখানে বিকারগ্রস্ত উচ্চাভিলাষ সেখানে দৈনন্দিনের কাছে পদানত, সেখানে সত্যকার মনুষ্যত্বের আবির্ভাব আশা করা চলে না। অজস্র পরিকল্পনা আমরা তৈরি করতে পারি কিন্তু মনুষ্যত্বের জাগরণ ছাড়া কোনও পরিকল্পনাই পরিপূর্ণভাবে সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। আজ জীবিকা আর জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। পুরাতন মূল্যবোধগুলি আজ অপসৃয়মান। পরিকল্পিত অর্থনীতি চালু হলেই সব দুর্দশা ঘুচে যাবে, এমন আশা যারা করেন, তাঁরা আসলে বাস্তব সত্যটাকেই দেখতে পান না, তাই বলছিলাম, দেশে নামেই শুধু পরিকল্পনা হচ্ছে, মানুষ গড়ে উঠছে না। অথচ এমন অবস্থা তো বরাবরই চলতে দেওয়া যায় না।

মানুষ গড়তে হলে হাত লাগাতে হবে সেইখানে যেখানে মনুষ্যত্বের অঙ্কুর সবে দেখা দিয়েছে অর্থাৎ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তরে। শুধু পুঁথিগত শিক্ষায় যথার্থ মানুষ গড়া যাবে না। পুঁথির ভারে যে মন ভারাক্রান্ত, চোখা বুলি মুখস্থ ক'রে যে পড়ুয়ার গ্রহণ ক্ষমতা অতিক্রান্ত, উপযুক্ত প্রকাশের প্রতীক্ষায় স্বাস্থ্য যেখানে অব্যবহারে অবলুপ্ত সেখানে আর যাই হোক সুস্থ মানসিকতার বিকাশ আশা করা যায় না। পুঁথিগত পাঠের পাশাপাশি তাই চাই দেহেরও বিকাশ। যে উদ্বৃত্ত শক্তি, প্রকাশের সহজ পথ না পেয়ে বিকৃত পথে নানা উদ্ভ্রান্তির জন্ম দিচ্ছে তা নির্দিষ্ট পথে পরিচালনার জন্য সুসংগঠিত কার্যক্রম চাই। সমগ্র ভারতের জনশক্তি আজ উন্মার্গগামী। বিশেষ করে যুব শক্তি আজ বিভ্রান্ত, বিশৃঙ্খল ও বিপর্যস্ত। কৈশোর বা যৌবনেই নানা বিশৃঙ্খলা, বড়দের সম্পর্কে বেপরোয়া [illegible] দেশ বা সমাজের শান্তি ও [illegible]। শিক্ষার চাহিদা বাড়ছে, আমার চাপও বেড়েছে। কিন্তু শিক্ষান্তে দাঁড়াবার মত পায়ের তলায় কঠিন জমি কোথায় ? চাকরীর নিশ্চয়তা নেই, বাঁচার নিরাপত্তা নেই। এমন নিরালম্ব নিশ্চেষ্ট অবস্থায় যা অবশ্যম্ভাবী, তাই ঘটছে। জীবনের সমস্ত বাধা বিঘ্নের চ্যালেঞ্জ শক্ত মুঠোয় প্রতিরোধ করবার মত দুর্মদ পৌরুষ বা দুর্জয় ব্যক্তিত্ব না থাকায় পদে পদে হেরে যাচ্ছি আমরা। অথচ এই পরাজয়, পদে পদে এই বিড়ম্বনা কোনও স্বাধীন দেশের নাগরিকের ঈপ্সিত হতে পারে না। এই করুণ ও মর্মান্তিক বিপর্যয় থেকে দেশের কৈশোর ও যৌবনকে রক্ষা করতে হলে সবার আগে চাই স-নিষ্ঠ সাধনা আর সপ্রাণ সহযোগিতা। মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করে সকলকে সমান বোধে উদ্বুদ্ধ করার কৃত সংকল্পে আজ স্থির হতে হবে। এ কাজে প্রথমেই চাই মানুষ হয়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ। চাই স্বাস্থ্য, চাই আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু। কোথায় আছে স্বাস্থ্যের মৃত সঞ্জীবনী ? কোথায় পরমায়ুর অকুণ্ঠ আশীর্বাদ যেখানে শক্তির জোয়ার আসবে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে। এই আকাঙ্খিত পরিবেশ পাওয়া যাবে খেলার মাঠে। খেলার মাঠেই নিতে হবে মেলা-মেশার পাঠ। সকলের সঙ্গে এক সাথে মেলবার সুযোগ তো ঐ খেলার মাঠেই।

খেলাকে জীবন গঠনের অঙ্গ করে নিতে হলে বিদ্যালয় স্তর থেকেই কাজ সুরু করতে হবে। বাংলা দেশের সব বিদ্যালয়ের নিজস্ব খেলার মাঠ নেই। অনেক ক্ষেত্রে একটি খেলার মাঠ কয়েকটি বিদ্যালয়কে ভাগাভাগি করে নিতে হয়। খেলার মাঠ না থাকায় পাড়ায় পাড়ায় ছেলেরা রকে বসে আড্ডা দেয় বা উত্তেজক কোন পলিটিক্সের আভাস পেলেই তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবক্ষয়ের পোকা ওদের মনুষ্যত্ব কুরে কুরে খায়। অথচ খেলা দেখার জন্য যারা ভীড়ের চাপে প্রাণ দেয়, তাদের খেলার জন্য উপযুক্ত মাঠ বা ব্যবস্থা থাকলে অবশ্যই তারা সংহত, সংযত, সংবেদনশীল হবে, প্রবুদ্ধ হবে সামগ্রিক বোধে। বিদ্যালয়ে খেলার অবকাশ ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। সিলেবাসের ঠাস বুনোনীর মধ্যে খেলার মুক্তি কোথায় ? যেটুকু ছিঁটে ফোঁটা হয় তাতে মন ভরে না। ক্লাবের ব্যবস্থা কোথাও কোথাও আছে, কিন্তু ছোটদের জন্য ঢালাও ব্যবস্থা সেখানে নেই। দেশে ক্রীড়া পরিষদ আছে, বা সরকারের ক্রীড়া দপ্তর আছে। সর্বোপরি বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু ছাত্রদের শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে দৈহিক বিকাশের কোনও সুবন্দোবস্ত কোথাও নেই। তাই বিদ্যালয়ের দিকেই নজর দেওয়া বেশী করে প্রয়োজন। খেলাধূলাকে শিক্ষার সহযোগী পাঠক্রম হিসেবে রাখা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু তার গুরুত্ব অন্যান্য শিক্ষা সূচীর সমান নয়। ক্রীড়া শিক্ষকও বিদ্যালয়ে অন্যান্য শিক্ষকদের মত বিশেষ স্বীকৃতি

১৩ পৃষ্ঠায় দেখন

কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে গতবছরের কর্ম্মপ্রচেষ্টা

অর্থনৈতিক নবজাগরণ ও প্রত্যেক ক্ষেত্রে উন্নয়নের গতিবৃদ্ধি

গত বছর দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে এবং নতুন আর্থিক বছরে উন্নয়নের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সেই গতি দ্রুততর হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে। গত ২৪শে ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সংসদে, ১৯৬৯.৭০ সালের যে আর্থিক পর্যালোচনা পেশ করেন তাতেই দেশের এই উৎসাহ জনক অবস্থাটা প্রকাশ পায়। এই বছরে শতকরা মোটামুটি ৫ থেকে ৫।। ভাগ উন্নয়ন হার অর্জন করার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের বিভিন্ন অংশে প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য ১৯৬৮-৬৯ সালে কৃষি উৎপাদন আশানুরূপ হয়নি তবে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষণ আবার সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এবং তার ফলে মোটামুটি উৎপাদন বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ১৯৬৭-৬৮ সালে মোট ৯ কোটি ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়। এই বছরে উৎপাদন যথেষ্ট বাড়বে। পণ্যশস্যের উৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছে; গত বছর আখের উৎপাদন যে উচ্চ সীমায় পৌছায়, এই বছরে সেই সীমাও অতিক্রম করবে। চীনাবাদাম ও তুলোর উৎপাদনও গত বছরের তুলনায় বেশী হবে। পাটও যথেষ্ট উৎপাদিত হয়েছে।

শিল্প-ক্ষেত্রেও উৎপাদন বেশ বেড়েছে। ১৯৬৮ সালে এই বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৬.৪ ভাগ এবং ১৯৬৯ সালে তা শতকরা আরও ৭.৫ ভাগ বাড়বে বলে আশা করা যাচ্ছে। তবে এই বছরে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে, বিভিন্ন ক্ষেত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির সুফল গুলি সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করা যায়নি। ১৯৬৮ সালের তুলনায় দ্রব্য-মূল্যের হার শতকরা ২ ১ ভাগ বেশী ছিল। ১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকৃতপক্ষে দ্রব্যমূল্য আবার ওপরের দিকে যেতে থাকে এবং এক বছর পূর্ব্বে যা ছিল, পাইকারি মূল্য তা থেকে শতকরা ৬.৮ ভাগ বেড়ে যায়।

সরকারী এবং বেসরকারী উভয় তরফেরই লগ্নির পরিমাণ বেড়েছে, বিশেষ করে কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প ও নির্ম্মাণ কার্য্যে লগ্নির পরিমাণ বেড়েছে। সংগঠিত শিল্পে বেসরকারী লগ্নির পরিমাণ বেড়েছে কিনা সে সম্পর্কে পরিষ্কার কোন লক্ষণ না পাওয়া গেলেও লগ্নির ক্ষেত্রে উৎসাহ আবার বেড়েছে। করের মাধ্যমে, দীর্ঘ-কালীন মেয়াদের ঋণ এবং কেন্দ্র থেকে অধিকতর সাহায্যের মাধ্যমে. এই বছরে রাজ্যসরকারগুলিরও সম্পদ বেড়েছে। জাতীয় আয়ে কর ও রাজস্বের অনুপাত ১৯৬৫-৬৬ সালে যেখানে ছিল শতকরা ১৪.২ ভাগ, ১৯৬৭-৬৮ সালে তা ক'মে গিয়ে শতকরা ১২.৪ ভাগে দাঁড়ায়, ১৯৬৮-৬৯ সালে তা কিছুটা বেড়ে ১২.৮ ভাগে আসে এবং চলতি বছরে তা শতকরা ১৩ ভাগে দাঁড়িয়েছে বলে আশা করা যাচ্ছে।

দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ১৯৬৯-৭০ সালটি অত্যন্ত সাফল্যের বছর ছিল বলা যায়। ১৯৬৮-৬৯ সালে দেশের বাণিজ্য ঘাটতি ৮০৯ কোটি টাকা থেকে কমে ৫০২ কোটিতে দাঁড়ায়। রপ্তানী শতকরা ১৩.৬ ভাগ বেড়ে যাওয়ায় এবং আমদানী শতকরা ৭.৩ ভাগ কমে যাওয়ায় এই সুফল পাওয়া যায়। সংরক্ষিত বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার পরিমাণ ৩৮.১ কোটি টাকা বেড়ে যায়। চলতি বছরে রপ্তানী তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে না বাড়লেও, আমদানী আরও কমে যাওয়ায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঘাটতি আরও কমে যায় এবং বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার তহবিলের পরিমাণও ৫০ থেকে ৭৫ কোটি টাকা হয়। শিল্পে লগ্নির পরিমাণ বাড়লে মেসিনপত্র, মেসিনের অংশাদি ও কাঁচা-মালের চাহিদাও বাড়বে, ফলে আমদানির পরিমাণও বাড়বে আর তাতে বাণিজ্যে ঘাটতিও হয়তো বাড়বে। অর্থনৈতিক পর্যালোচনায় বলা হয়েছে যে আমদানির এই বর্দ্ধিত চাহিদা মেটানোর জন্য রপ্তানীও যাতে বাড়ানো যায় তার জন্য চেষ্টা ক'রে যেতে হবে। তাছাড়া ঋণ পরিশোধ এবং স্বাবলম্বী হওয়ার পথে অগ্রসরমান অর্থনীতির প্রয়োজন মেটানোর জন্যও রপ্তানীর পরি-মাণ বাড়ানো প্রয়োজন।

উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলি দেখিয়ে অর্থ-নৈতিক পর্যালোচনায় কতকগুলি ক্ষেত্র সম্পর্কে এ কথাও বলা হয়েছে যে উপযুক্ত সময়ে যদি এগুলির জন্য প্রতিবিধান মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয় তাহলে অবস্থা হয়তো সমাধানের বাইরে চলে যাবে। দৃষ্টান্ত হিসেবে কৃষির কথা বলা যায়। প্রধানতঃ অধিক ফলনের নতুন ধরণের বীজের ব্যবহার এবং উন্নত কৃষি পদ্ধতির ফলেই কৃষিতে অগ্রগতি সম্ভবপর হয়েছে। ১৯৬৯-৭০ সালে কৃষি উৎপাদন আরও বাড়বে বলে আশা করা যায়। গত বছরের তুলনায় চলতি বছরে খারিফ ফসল ভাল পাওয়া যাবে; রবি ফসলও অতীতের মতোই ভালোর দিকে চলেছে। খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন গত বছরের ৯৪০ লক্ষ টনের চাইতেও বেশী হবে বলে মনে হয়। ১০৯ লক্ষ হেক্টারে অধিক ফলনের শস্যের চাষ করা সম্পর্কে যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল ১৯৬৯-৭০ সালে সেই লক্ষ্য পূরণ হবে বলে আশা করা যায়। ১৯৬৮-৬৯ সালে এই জমির পরিমাণ ছিল ৯৩ লক্ষ হেক্টার। ১৯৬৮-৬৯ সালে ৬০ লক্ষ হেক্টার জমি নিবিড় চাষের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, চলতি বছরে তার পরিমাণ ৮০ লক্ষ হেক্টারে পৌঁছুবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

১৯৬৮-৬৯ সালে যেখানে ৫৪১,০০০ মেট্রিক টন রাসায়নিক সার উৎপাদিত হয় সেই ক্ষেত্রে চলতি বছরে ৮৫০,০০০ মেট্রিক টন উৎপাদিত হলেও চাহিদা, আশা অনু-যায়ী বাড়েনি, ফলে এগুলি উদ্বৃত্ত হয়ে পড়েছে। কৃষকরা যাতে যথেষ্ট পরিমাণে রাসায়নিক সার পেতে পারেন তার সুযোগ সুবিধে বাড়ানোর জন্য রাসায়নিক সারের ব্যবসা লাইসেন্স বহির্ভুত করা হয়েছে এবং ছোট কৃষকরাও যাতে প্রয়োজনীয় ঋণ

পেতে পারেন সেজন্য রাষ্ট্রীকৃত ব্যাঙ্কগুলি তার ব্যবস্থা করেছেন। ১৯৬৫ সালের মার্চ্চ মাস থেকেই ভারতের খাদ্য কর্পোরেশনকে খাদ্যশস্য মজুদ করা ও তা চলাচল করানো ইত্যাদির ভার দিয়ে দেওয়া হয়েছে। চলতি বছরে কর্পোরেশন ১০ কোটি মেট্রিক টন খাদ্যশস্য কেনাবেচা করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে অবস্থা ভালো হওয়ায়, ১৯৬৬ সালে যেখানে ১০৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয় সেই জায়গায় ১৯৬৯ সালে আমদানি করা হয় মাত্র ৩৯ লক্ষ টন এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির হাতে মোট মজুদ খাদ্যশস্যের পরিমাণ ৪৯ লক্ষ টনে পৌঁছুবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তাছাড়া দেশের বহু জায়গায় অবাধে খাদ্যশস্য চলাচল করেছে।

শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি

১৯৬৭-৬৮ সালে কৃষিতে অপূর্ব্ব সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে যে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি সুরু হয় তা সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে গেছে। ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় ১৯৬৮ সালের ঐ সময়ের তুলনায় উন্নয়ন হার শতকরা ৭.৩ ভাগ বেশী ছিল। কৃষিতে আয় বেশী হওয়ায় চিনি, রেডিও, বৈদ্যুতিক বাতি, মোটর সাইকেল ও স্কুটারের চাহিদা বাড়ে, ফলে ১৯৬৮ সালের মতো এই সব জিনিস উৎপাদনকারী শিল্পগুলির উৎপাদন অব্যাহত থাকে।

উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার

বহু শিল্পেরই বর্ত্তমান উৎপাদন ক্ষমতা বহু ক্ষেত্রে অধিকতর পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ, টায়ার, টিউব, রাবার ও চামড়ার জুতো, কষ্টিক সোডা, সোডা এ্যাশ, রং, কৃত্রিম তন্তু, প্লাষ্টিকের জিনিস তৈরির পাউডার, এ্যালুমিনিয়াম, ডিজেল ইঞ্জিন, ব্যাটারি, বৈদ্যুতিক বাতি, রেডিও ও মোটরগাড়ী তৈরির শিল্পগুলির পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়েছে। এমন কি যে ক্ষেত্রে বর্ত্তমানের পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়নি যেমন কাগজ, কাগজের বোর্ড, পাত কাঁচ, সিমেন্ট, ট্রাক্টার, বাইসাইকেল, ময়দার কল, রাসায়নিক সার ইত্যাদি, সেগুলির উৎপাদন ক্ষমতাও ১৯৬৮ সালের তুলনায় চলতি বছরে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে।

লগ্নির অবস্থারও অনেক উন্নতি হয়েছে। শিল্পের লাইসেন্সের জন্য ১৯৬৯ সালে যত আবেদন পাওয়া গিয়েছে তার সংখ্যা ১৯৬৮ সালের তুলনায় অনেক বেশী। ১৯৬৯ সালে যত অনুমতি দেওয়া হয় সেগুলির সংখ্যা ১৯৬৮ সালের দ্বিগুণ।

মোট শিল্পোৎপাদনে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অবদান বেশ উল্লেখযোগ্য এবং এগুলির অগ্রগতিও প্রশংসনীয়।

অর্থনৈতিক অবস্থা

কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চম অর্থ কমিশনের সুপারিশগুলি চলতি বছরের একটা প্রধান ঘটনা। এর অর্থ হল পাঁচ বছরে মোট ৪২৬৬ কোটি টাকা রাজ্যগুলিকে দেওয়া হবে। তবে রাজ্যগুলি হয়তো প্রকৃতপক্ষে এর চাইতেও বেশী টাকা পাবে।

অর্থ কমিশনের সুপারিশগুলি গ্রহণ করার ফলে এবং ১৪ টি প্রধান ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার ফলে, চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়ার তুলনায়, রাজ্যগুলির পরিকল্পনার আকার আরও বেড়ে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম বছরে ১৯৬৯-৭০ সালের শেষে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি অনুকূল। আগামী বছরে সরবরাহ ও চাহিদা উভয়ই যে যথেষ্ট বাড়বে তারও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৭০-৭১ সালে স্থায়িত্বের সঙ্গে উন্নয়নের গতি যে বজায় রাখা যাবে তার যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রকৃত মানুষ কই যে দেশ এগিয়ে যাবে ?

১১ পৃষ্ঠার পর

পান না। অথচ ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জাগাতে ক্রীড়া শিক্ষকের মত যোগ্যব্যক্তি আর কেউ নেই। সমস্ত শিক্ষক যদি তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন, তবে সমস্যার সমাধান সহজ হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের একত্র মেলামেশার ব্যবস্থাও খেলার মাধ্যমেই হতে পারে। জিলা বা মহকুমা স্তরে এই মেলামেশা সম্ভব করে তুলতে পারলে ক্রমে সমগ্র রাজ্যে ছাত্রদের একটি অখণ্ড ও সুসংহত সম্মেলন গড়ে তোলা কঠিন হবে না। খেলার মাঠের ব্যবস্থাও চাই। এজন্য সরকারী সাহায্য ও প্রশাসনিক সহযোগিতা প্রয়োজন। সমবায় ভিত্তিতে খেলার মাঠের জন্য জমি সংগ্রহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মোট কথা অসংবদ্ধ বিশৃঙ্খল যুব শক্তিকে ক্রীড়ার সুস্থ আঙ্গিনায় টেনে আনতে হবে। খেলার সঙ্গে সুষম খাদ্য বন্টনের সুযোগ সুবিধার প্রসার দরকার। সরকারী স্তরে প্রযত্ন থাকলে সুষম খাদ্য যোগানোর ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা আদৌ কঠিন হবে না। খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি গড়ে উঠলে জীবনটাকেও খেলোয়াড়ের মন নিয়ে গ্রহণ করা সহজ হবে।

বঞ্চিত জীবন-আস্বাদ ও নৈরাশ্যের শীতার্ত অনুভূতি আর শিলীভূত চেতনা আজ নতুন আলোর স্পর্শে সব জড়তা ঝেড়ে ফেলে সত্তার সুন্দরতর পরিচয়কে উন্মোচিত করতে চাইছে। এই তো প্রশস্ত সময়। পুরাতন মূল্যবোধকে নতুন যুগের আলোকে পরিশুদ্ধ করে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে ভবিষ্যতের পথে। সমস্ত তুচ্ছতার ওপরে স্থান দিতে হবে, অমৃতের অধিকারে অধিকারী যে মানুষ, সেই মানুষের মনুষ্যত্বের মহৎ মর্যাদাকে। আজ যারা কচি কাঁচা আজ যারা কিশোর ও অরুণ, তাদের মধ্যে দিয়েই মূর্ত হয়ে উঠবে আমাদের স্বপ্নের বাংলা দেশ, তাদের মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশে দেশের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত হবে। খেলাধুলার মাধ্যমেই এই আকাঙ্খা পূর্ণতা পেতে পারে। সেদিনের মানুষের ইস্পাত কঠিন বাহুতে জাতির আকাঙ্খা কথা বলবে, বুদ্ধিদীপ্ত চোখের তারায় জ্বলবে বিশ্বাসের মনি দীপ, শিরায় শিরায় প্রাণের প্রাচুর্য, ক্লৈব্যকে পরাভূত করবে।

ছোট পরিবার-সুখী পরিবার, বড় হ'লেই বিপত্তি

পরিবার পরিকল্পনা তারই নিষ্পত্তি

কেরালার আলেপ্পি জেলাটি সম্প্রতি পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট স্থান অর্জ্জন করেছে। এই জেলার মেডিক্যাল অফিসারদের মতে, আলেপ্পির এই বৈশিষ্ট্যের মূলে রয়েছে, সাধারণ শাখা ও পরিকল্পনা শাখার মধ্যে সর্ব্বস্তরে সমন্বয়।

যে সব অঞ্চল, পরিবার পরিকল্পনার বিরোধী ছিল, পরিবার পরিকল্পনা সংস্থার কর্ম্মীরা সেখানে সাধারণত: যেতে চাইতেন-না, সেখানে এখন তাঁরা অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতায় বিনা দ্বিধায় কাজ করছেন। প্রচলিত কতকগুলি সংস্কারের বশবর্ত্তী হয়ে জনগণ পরিবার পরিকল্পনার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু কর্ম্মীরা ব্যক্তিগতভাবে বুঝিয়ে সুঝিয়ে, গণসংযোগ বিভাগের কর্ম্মীদের সহযোগিতায় জনসাধারণের সেই সংস্কার ভেঙ্গে দিতে অনকখানি সক্ষম হয়েছেন। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা যদি বর্ত্তমান হারে বাড়তে থাকে তাহলে আলেপ্পি জেলাটি যে বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করেছে তা তো রক্ষিত হবেই, তাছাড়া হয়তো আরও রেকর্ড স্থাপন করতে পারবে।

আলেপ্পি জেলার নাল্লাপালির প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের প্রধান, ডা: (কুমারী) মারিয়াম্মা স্যামুয়েল মনে করেন যে, জনসংখ্যার অতি বৃদ্ধির মতো একটা জাতীয় সমস্যার সমাধান করতে হলে সমস্ত চিকিৎসকদের বিশেষ করে তাঁদের মত অল্পবয়স্কদের কিছুটা ত্যাগ স্বীকারের জন্য তৈরি হতে হবে।

এখানকার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি ১২৫,০০০ জনের প্রয়োজন মেটায়। ১৯৬৬ সালে এই কেন্দ্রটির ভার নেওয়ার পর থেকে তিনি পরিবার পরিকল্পনার কাজ সম্পর্কেই বেশী মনযোগ দিচ্ছেন। গত তিন বছর থেকে তিনি সন্তান জন্ম প্রতিরোধ মূলক অস্ত্রোপচারও করছেন।

১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসের পরিবার পরিকল্পনা পক্ষে এবং এর পূর্ব্বের তিন মাসে তিনি জেলা পর্য্যায়ে, আই ইউ সি ডি তে এবং পরিবার পরিকল্পনার কাজে উভয় বিষয়েই প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৬৮ সালের জুন মাসের পূর্ব্বের তিন মাসে, পরিবার পরিকল্পনার কাজে তিনি জেলা পর্য্যায়ে প্রথম পুরস্কার পান।

এই কেন্দ্রটি আলেপ্পি জেলার বড় একটি অঞ্চলে কাজ করে এবং তাঁদের ধর্ম্মীয় ও অন্যান্য ভিত্তিতে প্রতিরোধমূলক নানা অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়।

ডা: স্যামুয়েল কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট দিনে ১২ টি শাখা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং তখন তিনি পরিবার পরিকল্পনার সঙ্গে মাতৃমঙ্গল ও শিশু কল্যাণের কাজও করেন। তিনি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের খুব কাছে থাকেন বলে, অফিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ের বাইরেও পল্লীবাসীদের সেবা করেন। যাঁরা পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত কোন কাজে আসেন তাঁদের তিনি কখনও অপেক্ষা করতে বলেননা।

তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে পরিবার পরিকল্পনার মত বিষয়ে অস্ত্রোপচারের পরেই চিকিৎসকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়না। অস্ত্রোপচারের পর রোগীকে দেখাশুনা করা আরও বেশী প্রয়োজন। এই বিষয়টিকে তিনি সব সময়ে অগ্রাধিকার দেন।

সেনারাও পিছিয়ে নেই

বাঙ্গালোরের বিমান বাহিনীর হাসপাতালের কমাণ্ডার, গ্রুপ ক্যাপ্টেন বসু বলেন যে "প্রতিরক্ষা বিভাগে সেনাদের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে, কাজেই পরিকল্পিত পরিবারের সুবিধে অসুবিধে তাদের বোঝানো অপেক্ষাকৃত সহজ।"

বড় বড় গাছের ছায়ার নীচে, চারিদিকের মনোরম পরিবেশের মধ্যে ৬১২ টি বেডের এই হাসপাতালে বেশ বড় বড় হল এবং আলোবাতাসযুক্ত কক্ষ রয়েছে। তাছাড়া মহিলা ও শিশুদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড রয়েছে।

এই হাসপাতালের প্রসূতি ওয়ার্ডে প্রতি মাসে মোটামুটি ৭০ থেকে ৭৫ টি প্রসব, ১২ টি লুপ পরানো এবং ৭ থেকে ৮ টি সন্তান জন্ম প্রতিরোধক অস্ত্রোপচার হয়ে থাকে।

জনসাধারণকে যদি উপযুক্তভাবে পরিবার পরিকল্পনার উপকারগুলি বোঝাতে পারা যায় তাহলে তাঁরা স্বেচ্ছায় অস্ত্রোপচার করিয়ে নেন। পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের বোঝান সহজ। যাঁরা উপকৃত হন তাঁরাই পরিবার পরিকল্পনাকে বরং বেশী জনপ্রিয় করে তোলেন।

মহিলারাই যে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে বেশী উৎসাহী, অর্থনৈতিক অবস্থাই তার প্রধান কারণ। স্বাস্থ্য খারাপ হওয়া অথবা বেশী সন্তানের জননী হওয়াটা হল অন্যান্য কারণ। তবে পুরুষরাও বর্ত্তমানে পরিবার পরিকল্পনায় উৎসাহী হয়ে উঠছেন

মধ্যপ্রদেশের রায়সাইন জেলার গৌতমপুর গ্রামের শতকরা ৮০ জনই পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি অনুসরণ করছেন। ওবেইদুল্লাগঞ্জ থেকে ৯ কি: মী: দূরের এই গ্রামটিতে ২৪ টি হরিজন ও ১১টি আদিবাসী পরিবার আছে। ১৯৬১ সালে তাঁদের এখানে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক পরিবারকে ১৫ একর করে জমি দেওয়া হয়।

এই ছোট গ্রামটির ১২ জন পুরুষ অস্ত্রোপচার করিয়ে নিয়েছেন এবং ১৪ জন নারী লুপ নিয়েছেন। প্রথম যে অস্ত্রোপচারের জন্য আসেন তাঁর নাম নালু (৪৫) এবং তাঁর ৭টি জীবিত সন্তান আছে। ৪টি সন্তান শৈশবেই মারা যায়। নালুর পরে তাঁদের সমাজের অনেকেই অস্ত্রোপচার করিয়ে নেন।

গম চাষের উন্নত প্রণালী

শ্রীবিষ্ণু পদ দাস

ডেপুটী প্রজেক্ট অফিসার,
আই. এ ডি. পি., বর্দ্ধমান

গম, রবি খন্দের একটি প্রধান ফসল। খাদ্য শস্য হিসাবে ধানের পরেই গমের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা সব চেয়ে বেশী। এক মাপ গম প্রায় দেড় মাপ ধানের সমান। আবার আগে যে সব জমি থেকে একর প্রতি ১০ থেকে ২০ মণ গম পাওয়া যেত উন্নত প্রণালীতে অধিক ফলনশীল জাতের গমের চাষ ক'রে সে জমি থেকেই ৪০ থেকে ৫০ মণ শস্য পাওয়া সম্ভব।

গমের চাষের জন্য দোআঁশ, বেলে দোআঁশ, পলি দোআঁশ ও এটেল দোআঁশ প্রভৃতি মাটি উপযোগী তবে অতিরিক্ত বেলে বা এঁটেল বা অম্ল বা লবনাক্ত বা ক্ষারযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। অধিক ফলন পেতে হ'লে জমিতে অবশ্যই সেচের বন্দোবস্ত ও জল নিকাশের সুবিধা থাকা দরকার। তবে গঙ্গার পলি মাটির চরে বিনা সেচেও এই ফসলের চাষ হ'য়ে থাকে।

সেচযুক্ত এলাকায় কল্যান সোনা, সোনালিকা, সরবতি সোনোরা, সফেদ লার্মা, ছোটিলার্মা, লার্মারোহো, সোনোরা-৬৪ প্রভৃতি অধিক ফলনশীল জাতগুলির চাষ লাভদায়ক। সোনালিকা, সর্বতি সোনোরা এবং সোনোরা-৬৪, সাধারণ আমন ধানের চাষের পরও আবাদ করা যায়। যে সব এলাকায় সেচের বিশেষ সুবিধা নাই সেখানে দেশি এন-পি-গম যেমন এন-পি, ৮২৪, এন-পি, ৭৯৮, এচ-পি, ৮৩৫ ইত্যাদি জাতের গম চাষ করা প্রশস্ত।

জমিতে জো থাকতে ২-৩ বার আড়াআড়ি লাঙ্গল দিতে হ'বে। মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণ রস না থাকলে বোনার আগে সেচ দিয়ে জমিতে আবার ২-৩ বার লাঙ্গল, বিদা ও মই দিয়ে নিয়ে ঝুরঝুরে মাটি তৈরী ক'রে নেওয়া দরকার। সেচের জল যাতে সুষ্ঠুভাবে এবং সমানভাবে দেওয়া যায় সে জন্য কাঠের পাটা বা মই চালিয়ে জমি সমতল ক'রে নিতে হ'বে। সেচ ও নিকাশের জন্য ১০-১২ হাত অন্তর নালা এবং ছোট আল তৈরী ক'রতে হ'বে।

সার ও কীটনাশকের প্রয়োগ

প্রথম চাষের সময় একর প্রতি ৯-১০ গাড়ী গোবর সার জমিতে ছড়িয়ে দিতে হ'বে যাতে লাঙ্গল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা মাটির সঙ্গে মিশে যায়।

বেশী ফলনের জন্য মাটিতে ফসলের খাবার অর্থাৎ সার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে যোগান দিতে হ'বে। নাইট্রোজেন, ফস্‌ফেট এবং পটাশ এই তিনটি সারের মাধ্যমে ফসলের খাদ্য সরবরাহ করা হ'য়ে থাকে। গাছের সর্বাঙ্গীন বৃদ্ধি, ভাল শিকড়, শক্ত ও সতেজ ঝাড়, বড় শীষ এবং পরিপুষ্ট দানা পেতে হ'লে সুষম সারের ব্যবহার ছাড়া কোনোও গত্যন্তর নেই।

অধিক ফলনশীল জাতের জন্য জমির উর্বরতা অনুযায়ী প্রাথমিক মাত্রার সার হিসাবে নাইট্রোজেন, ফসফেট এবং পটাশ প্রত্যেকটি একর পিছু ১৮ থেকে ২৪ কেজি প্রয়োগ করা দরকার। অবশ্য এন-পি জাতের জন্যে লাগে এর অর্ধেক পরিমাণ, তাছাড়া এন-পি জাতের জন্য পটাশ প্রয়োগের প্রয়োজন নাও হ'তে পারে। আসল কথা মাটি পরীক্ষা ক'রে সার প্রয়োগ করলে সব থেকে ভাল। ১ কেজি নাইট্রোজেন, ৫ কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট বা ক্যালসিয়াম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট অথবা ২.২০০ কেজি ইউরিয়া থেকে পাওয়া যাবে।

১ কেজি ফসফেট—৬.২৫০ কেজি সুপার ফস্‌ফেট থেকে পাওয়া যাবে।

১ কেজি পটাশ—২ কেজি মিউরিয়েট্ অব্ পটাশ থেকে পাওয়া যাবে।

১ কেজি নাইট্রোজেন এবং ১ কেজি ফস্‌ফেট, একত্রে ৫ কেজি (২০-২০ হারে) অ্যামোফস্ বা নাইট্রোফস্ দানাদার সার থেকে পাওয়া যাবে।

১ কেজি নাইট্রোজেন, ১ কেজি ফস্‌ফেট এবং ১ কেজি পটাশ একত্রে ৬.৬৬০ কেজি (১৫ : ১৫ : ১৫ হারে) দানাদার সার থেকে পাওয়া যাবে।

এই তথ্যটুকু জানা থাকলে কতটা ফসলের জন্যে কতটা সার লাগবে সে হিসেব করা সহজ পাবে।

শেষ চাষের আগে সারের প্রাথমিক মাত্রার সঙ্গে একর পিছু ১৫ কেজি অলড্রিন ৫% বা হেপ্টাক্লোর ৫% বা ক্লোরডেন ৫% গুঁড়ো প্রয়োগ করতে হ'বে। এতে উই, কাটুই পোকা প্রভৃতি মাটির নীচের পোকার আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা হ'বে।

জমি তৈরী হয়ে গেলে বীজ বোনার আগে, সর্ব্বাগ্রে দোষমুক্ত ভালো বীজ শোধন করতে হবে।

একর প্রতি ৪০-৫০ কেজি বীজ যথেষ্ট। প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম ১% পারদ ঘটিত ঔষধ যেমন অ্যাগ্রোসান জি-এন্ বা সেরেসান মিশিয়ে শোধন ক'রে নিতে হ'বে। ক্যাপ্টান ৭৫% দিয়েও বীজ শোধন করা যায়। সেক্ষেত্রে প্রতি কেজি বীজে ২ গ্রাম ঔষধ মেশাতে হ'বে।

কয়েকটি জাতের বীজ বোনার কয়েকটি বিশেষ সময় আছে। যেমন সোনোরা-৬৪, সোনালিকা ও সর্বতি সোনোরা সমস্ত অগ্রহায়ন মাসে বোনা চলে। অন্যান্য জাত ১৫ই কার্ত্তিক থেকে ১৫ই অগ্রহায়ণ

পর্য্যন্ত। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম ১৫ দিন সব রকম গম চাষের পক্ষে প্রশস্ত। বীজ বোনার সময়ে মই দিয়ে জমি সমান করে নিয়ে ৬-৮ ইঞ্চি দূরে দূরে, সারিতে বীজ বুনতে হ'বে। সারির মধ্যে বীজের দূরত্ব থাকবে এক ইঞ্চির মত।

মাটির ভাল জো অবস্থায় ১॥ ইঞ্চি ২ ইঞ্চি গভীরে বীজ বুনলে ভাল অঙ্কুরোদ-গম হ'বে। এ জন্য বীজ বোনার যন্ত্র (সীডড্রিল) ব্যবহার করাই ভাল। যেসব মাটি খুব ঝুরঝুরে করা সম্ভব নয় সেখানে সরু লাঙ্গলের সাহায্যে বা খুপি ক'রেও বীজ বুনতে পারা যায়। বোনার আগে যদি মাটিতে পর্য্যাপ্ত রস না থাকে তাহ'লে বোনার ৬-৭ দিন আগে একবার ভাল ক'রে সেচ দিতে হ'বে। এতে গমের অঙ্কুর ঠিকমত বেরুতে পারবে। বোনার তিন সপ্তাহ পরে প্রথমবার সেচ দিতে হ'বে। অবশ্য ঢেলা মাটিতে বোনার ৬-৭ দিন পরেই একটি ঝাপটা সেচ লাগতে পারে। পরে মাটিতে রসের এবং ফসলের অবস্থা বুঝে ১৫-২০ দিন অন্তর সেচ দিতে হ'বে। আবহাওয়া ও মাটি বিশেষে মোটামুটি ৫-৬ বার সেচের প্রয়োজন হ'বে। লক্ষ্য রাখতে হ'বে, ফুল আসার সময় থেকে দানা পুষ্ট হওয়ার সময় পর্য্যন্ত যেন মাটিতে রসের অভাব না হয়। রসের অভাব হ'লে দানা ছোট হ'য়ে যাবে এবং ফলন বেশ কমে যাবে। অধিক ফলনশীল বেঁটে জাতের গমের ক্ষেত্রে শেষের দিকে সেচ দিলেও গাছ হেলে পড়ার বেশী ভয় নাই। আবার অতিরিক্ত সেচও গমের পক্ষে ক্ষতিকর। এতে গম জলবসা ধরে লাল হ'য়ে যায়। বোনার ৩ সপ্তাহ পরে যখন সেচ দেওয়া হ'বে তার আগেই চাপান সার প্রয়োগ করা প্রশস্ত। এই সময় গমের চারার গোড়া থেকে প্রচুর গুচ্ছমূল বের হয়। এ সময় জল ও সার কোনটাই কম পড়া উচিত নয়। এই জল ও সার সতেজ ঝাড় হ'তে বিশেষ সাহায্য ক'রবে ও ফলন বেশী হ'বে।

অধিক ফলনশীল জাতের জন্য একর পিছু ১২ থেকে ১৮ কেজি এবং এন্‌-পি জাতের জন্য ৯ থেকে ১২ কেজি কেবল নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রয়োগ ক'রে নিড়ানোর সময় চাকা বিদা চালিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হ'বে। বেলে মাটিতে এই সার, তিন সপ্তাহ অন্তর, দুবারে প্রয়োগ করা ভাল।

আগাছা দমনের জন্য এবং মাটি সরস রাখার জন্য, বোনার ১০-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার জমির মাটি নিড়িয়ে দিতে হ'বে। বীজ, সারিতে বোনা থাকলে, চাকাবিদার সাহায্যে খুব কম খরচেই এই নিড়ানোর কাজ করা যায়।

বীজ বোনার ১ মাস পরে একর প্রতি ৫০০ মিলি লিটার লিনডেন ২০% ই-সি বা থায়োডান ৩৫% ই-সি বা ১॥ কেজি বি-এইচ-সি ৫০%, ৩০০ লিটার জলে মিশিয়ে ছিটিয়ে দিলে গাছে রোগ পোকার আক্রমণ ঘটবে না।

শস্য রক্ষার জন্য কীটঘ্ন প্রয়োগ

বোনার ১ মাস পরে একর প্রতি ৫০০ মিলি লিটার লিনডেন বা থায়োডান ও চিটা ও মরিচা রোগ প্রতিরোধের জন্য ১ কেজি ডায়াথেন জেড-৭৮, লোনাকল, জাইরাইড বা জিনেব বা ক্যাপটান-৮৩, ৩০০ লিটার জলে মিশিয়ে ছিটিয়ে দিতে হ'বে। ঔষধ ছিটাবার আগে ভুষা রোগাক্রান্ত শীষ তুলে পুড়িয়ে না ফেললে কীটঘ্ন প্রয়োগ ক'রে পুরো ফল পাওয়া যাবে না।

জাব পোকার আক্রমণ ঘটলে একর প্রতি ৮০ মিলি লিটার ডেমিক্রন ১০০% ই-সি বা ২০০ মিলি লিটার মেটাসিড বা ৩০০ মিলি লিটার রোগর ৩০% ই-সি ৩০০ লিটার জলে মিশিয়ে ছিটিয়ে দিলে চারা সুস্থ থাকবে।

এ জাতের দানা মোটামুটি এক সঙ্গেই পেকে যায়। দানা পাকার সঙ্গে সঙ্গে ফসল কেটে নেওয়া উচিত। ফসল কাটতে দেরী হলে ইঁদুর ও পাখীর উৎ-পাতে শস্যহানি ঘটতে পারে।

উন্নত প্রণালী অনুসরণ ক'রে গমের চাষ ঠিক মত করলে অধিক ফলনশীল জাতে একর প্রতি ৪০-৫০ মণ এবং এন-পি জাতে ২০-২৫ মণ ফলন পাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

যোজনা ভবন থেকে...

রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সাহায্য পেয়েছে ১৮ লক্ষ টাকা

উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির মূল্যায়ণ সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্যে যে সব সংস্থা রয়েছে সেগুলি শক্তিশালী করা বা নতুন সংস্থা স্থাপনের জন্য, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য-গুলিকে গত ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত এককালীন সাহায্য হিসেবে ১৮ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। পরিকল্পনা কমিশনের কর্মসূচী মূল্যায়ন সংস্থার একটি বিবরণীতে এটা জানা গিয়েছে।

রাজ্যের মূল্যায়ণ সংস্থাগুলি, পরিকল্পনা বিভাগের অঙ্গ হিসেবে কাজ করছে কিংবা যেমন, মহারাষ্ট্রের, অর্থ দপ্তরের পরিকল্পনা বিভাগের অংশ হিসেবে কাজ করেছে। অনেক রাজ্যে যেমন বিহার, পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও তামিল নাডুতে এগুলি অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান অধিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

রাজ্যগুলির পরিকল্পনা সমীক্ষার জন্য, ১৯৬৪ সালে গঠিত মূল্যায়ন সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যনির্বাহকারী সংস্থার সুপারিশক্রমে, পরিকল্পনার ব্যয়ের মধ্যে মূল্যায়ণ সম্পর্কিত কাজের ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর জন্য রাজ্য-গুলিকে কেন্দ্রীয় সাহায্য দেওয়ার এবং মূল্যায়ণকারী কমিটিসমূহ গঠন করার ব্যবস্থা করা হয়।

এই মূল্যায়ণ সংস্থাগুলি, কৃষি, গ্রামো-ন্নয়ন, পঞ্চায়েতী রাজ, শিল্পোন্নয়ন, পরিবহণ, মজুরী ও কর্মসংস্থান, সামাজিক কল্যাণ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন সম্পর্কে সমীক্ষা করেছে। এ ছাড়া কতকগুলি রাজ্যের সংশ্লিষ্ট বিভাগ সেচ ও বিদ্যুতশক্তি, সিমেন্ট ও ইস্পাত শিল্প প্রভৃতি সংগঠিত ক্ষেত্র-গুলিতেও ব্যয় ও লাভ সংক্রান্ত সমীক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে।

১৯৬৯ সালে খনিজ পদার্থের উৎপাদন ক্রমশঃ বেড়েছে

১৯৬৯ সালে ভারতের খনিজ পদার্থের উৎপাদন ৪০০ কোটি টাকা পর্যন্ত পৌঁছবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এই ক্ষেত্র থেকে যে জাতীয় আয় হয়েছে ১৯৬০ সালের তুলনায় তা শতকরা ১৫০ ভাগ বেশী। পরমাণু সম্পর্কিত খনিজ পদার্থ ও অন্যান্য অপ্রধান খনিজপদার্থের উৎপাদন এর মধ্যে ধরা হয়নি।

দেশে খনিজপদার্থ ভিত্তিক যে সব প্রধান প্রধান শিল্প রয়েছে, এই সময়ের মধ্য সেগুলির উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুন বেড়েছে।

ধাতব খনিজপদার্থ

যে সব হালকা প্রধান শিল্প থেকে শতকরা ১২ ভাগ জাতীয় আয় হয় সেগুলিই, প্রধান ধাতব ও অধাতব খনিজ পদার্থের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ ব্যবহার করেছে। এই শিল্পগুলি হ'ল-লৌহ, ইস্পাত, এল্যুমিনিয়াম, তামা, সার, রং, সিমেন্ট কাঁচ এবং কাগজ।

বক্সাইটের উৎপাদন ১০ লক্ষ মেট্রিক টনে দাঁড়ায় অর্থাৎ ১৯৬০ সালের তুলনায় এই বৃদ্ধি হল শতকরা ১৫০ ভাগ বেশী। এল্যুমিনিয়াম শিল্প, উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ ব্যবহার করে। ঐ সময়ের মধ্যে এল্যুমিনিয়াম শিল্পটিও প্রায় ৪ গুণ সম্প্রসারিত হয়।

১৯৬০ সালের তুলনায় চুণাপাথরের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৭০ শতাংশ এবং তার পরিমাণ হল আনুমানিক ২ কোটি ২০ লক্ষ মেট্রিক টন। এই খনিজপদার্থটির প্রধান ব্যবহারকারী হল, সিমেন্ট শিল্প। মোট উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগই এই শিল্পটি ব্যবহার করে এবং এটিও ইতিমধ্যে তার আকার শতকরা ৫০ ভাগ বাড়িয়েছে।

কয়লা উৎপাদন

কয়লার উৎপাদন হয়েছে ৭ কোটি ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন অর্থাৎ ১৯৬০ সালের তুলনায় ৪০ শতাংশ উৎপাদন বেড়েছে।

মোট যে কয়লা উৎপাদিত হয় তার প্রায় ৩০ শতাংশ ব্যবহার করে রেলওয়ে, ২০ শতাংশ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং ১২ শতাংশ ব্যবহৃত হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য।

এই বছরে প্রায় ৪৩ লক্ষ মেট্রিক টন লিগনাইট উৎপাদিত হয়। এই পরিমাণ হল ১৯৬০ সালের তুলনায় ৯০ গুণ বেশী।

পেট্রোলিয়াম

বর্ত্তমান বছরে, ১৯৬০ সালের তুলনায় ১৫ গুণ বেশী পেট্রোলিয়াম উৎপাদিত হয়েছে। ১৯৬০ সালে ৬৭ লক্ষ মেট্রিক টন পেট্রোলিয়াম উৎপাদিত হয়। তেমনি ৭২ কোটি ২০ লক্ষ বর্গমীটার প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদিত হয়, ১৯৬০ সালের তুলনায় এই উৎপাদন হ'ল ৫ গুণ বেশী।

খনিজ পদার্থের রপ্তানী

ভারতের মোট রপ্তানীর মধ্যে খনিজ ও ধাতব পদার্থের পরিমাণ হ'ল শতকরা প্রায় ২০ ভাগ। এর মধ্যে খনিজ পদার্থের অংশ হ'ল ১২ শতাংশ এবং ধাতুর ৭ শতাংশ।

গত দশ বছরে খনিজ পদার্থের রপ্তানী ১৯৬০ সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। রপ্তানীর মধ্যে লৌহ আকর রপ্তানীর পরিমাণ হল শতকরা ৫৪ ভাগ। ১৯৬০ সালের তুলনায় এই বৃদ্ধি হ'ল প্রায় ৮০ শতাংশ বেশী।

১৯৬০ সালে যেখানে মোট রপ্তানী মূল্যের শতকরা ২২ এবং ১৬ ভাগ ছিল যথাক্রমে ম্যাঙ্গানীজ আকর ও অভ্র সেখানে গত দশ বছরে তা কমে গিয়ে যথাক্রমে ১০ ও ৩০ শতাংশ দাঁড়ায়। বর্ত্তমানে এই দুটিরই অংশ হল প্রায় ১০ শতাংশ।

পরিমাণের দিক থেকে ধাতব পদার্থের রপ্তানী গত দশ বছরে প্রায় চারগুণ বেড়েছে। বর্ত্তমানে এই ক্ষেত্রে লৌহ ও ইস্পাতের অংশ হল প্রায় ৬০ শতাংশ এবং অশোধিত ও ঢালাই লোহার অংশ হল প্রায় ২০ ভাগ।

রপ্তানী মূল্য বৃদ্ধি

খননস্থলেই খনিজ পদার্থগুলির মূল্য ১৯৬০ সালের তুলনায় প্রায় ৬০ শতাংশ বেড়ে গেছে; ১৯৬০ সালের তুলনায় অশোধিত পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম বেড়েছে প্রায় ৯০ শতাংশ, কয়লার বেড়েছে প্রায় ৫০ শতাংশ লৌহ আকরের প্রায় ২০ শতাংশ, চুণাপাথরের প্রায় ৭৫ শতাংশ এবং অভ্রের বেড়েছে প্রায় ৩৪ শতাংশ। ম্যাঙ্গানীজের মূল্য সাধারণভাবে কিছুটা কমেছে।

খনিজ দ্রব্যাদির রপ্তানী মূল্য প্রায় ২৭ শতাংশ বেড়েছে। লৌহ আকরের বেড়েছে প্রায় ৫০ শতাংশ এবং অভ্রের প্রায় ৮৫ শতাংশ। ম্যাঙ্গানীজের রপ্তানীমূল্য অবশ্য শতকরা প্রায় ১০ ভাগ কমেছে।

ধাতব দ্রব্যাদির রপ্তানীমূল্য বেড়েছে প্রায় ৫৬ শতাংশ।

★ জামসেদপুরের কাছে আদিত্যপুরে, ইস্পাতের রোল তৈরির করার একটি কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। এটি তৈরি করতে ৬.৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। একটি ভারতীয় এবং একটি জাপানী প্রতিষ্ঠানের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত এই এই কারখানাটি হ'ল বেসরকারী তরফের বৃহত্তম কারখানা। এখানে বছরে ৭০০০ মেট্রিক টন ইস্পাতের রোল তৈরি করা যাবে আর তার মূল্য হবে প্রায় তিন কোটি টাকা। এর ফলে ভারত বছরে প্রায় ২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করতে পারবে।

★ বুন্দি জেলার কেশোরায়পাটনে, সমবায় পদ্ধতিতে স্থাপিত রাজস্থানের প্রথম চিনি কারখানাটিতে উৎপাদন সুরু হয়েছে।

ভারত রেলের বগী রপ্তানী করছে—আমাদের মাদ্রাজের সংবাদদাতা

ভারত এই প্রথমবার রেলের সাজ সরঞ্জাম রপ্তানীর বাজারে প্রবেশ করলো। উন্নত দেশগুলির সঙ্গেও প্রতিযোগিতা ক'রে তাইওয়ান রেল কর্তৃপক্ষের জন্য ১০০ টি রেলের বগী সরবরাহের অর্ডার সংগ্রহ করেছে। ২১ লক্ষ টাকা মূল্যের এই অর্ডারটির জন্য জাপানের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা হয়। মাদ্রাজের পেরাম্বুরে রেলের বগী তৈরী করার যে কারখানা আছে সেখান থেকে গত মাসের শেষ থেকে এই বগী পাঠানো সুরু হয়ে গেছে।

তাইওয়ান রেলওয়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় সব রকম সাজ সরঞ্জাম এ পর্যন্ত একমাত্র জাপানই সরবরাহ করে আসছে এবং সেইদিক থেকে বিচার করলে এই অর্ডার সংগ্রহ করাটা বেশ তাৎপর্য্যপূর্ণ।

এই অর্ডারটি পাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, থাইল্যাণ্ড থেকে ৪৫ টি বগী সরবরাহের অর্ডার পাওয়া গেছে। এগুলির মূল্য হ'ল ১১ লক্ষ টাকা। এই বগীও শিগগীরই জাহাজে করে পাঠানো সুরু হবে।

তাইওয়ান থেকে যে অর্ডার সংগ্রহ করা হয় তা ভারতের পক্ষে, নক্সা তৈরি ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন একটা পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমটা হ'ল গেজ। এগুলিকে ১,০৬৭ মি: মী: গেজের জন্য তৈরি করতে হয় এবং তা ভারতে প্রচলিত নয়। বগীগুলি ছিল অত্যন্ত আধুনিক ধরণের। এগুলি সর্ব্বোচ্চ গতি অর্থাৎ ঘন্টায় ১১০ কি: মি: গতিতেও যদি চালানো হয় তাহলেও যাতে ধাক্কা না লাগে সেজন্য রেলপথ সম্পর্কিত অতি আধুনিক সাজ সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হয়। মোটামুটিভাবে আমাদের দেশের জিনিষপত্র দিয়েই এগুলি তৈরি করা হয়েছে। কতকগুলি যন্ত্রাংশ আমদানি করতে হলেও, চুক্তি স্বাক্ষর করার পর সাত মাসের মধ্যেই এগুলি তৈরি ক'রে দেওয়া হয়।

এগুলি তৈরি করতে মোট যে ব্যয় হয়েছে তা থেকে, আমদানি করা জিনিসগুলির মূল্য বাদ দিয়ে এই অর্ডার থেকে প্রায় ১৭ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জিত হয়েছে।

এই রকম কার্যকুশলতায় সন্তুষ্ট হয়ে তাইওয়ান রেলওয়ে এখন আরও ৫০ টি বগী ও ২১৩ টি কোচের জন্য কোটেশন আহ্বান করেছে। এ ছাড়া নিউজীল্যাণ্ডে ৩৮ টি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কোচ এবং ইরাকে ৩৮ টি বগী সরবরাহ করা সম্পর্কেও পেরাম্বুর কারখানা কোটেশন পাঠিয়েছে।

দ্বিতীয় রাজধানী এক্সপ্রেস

বর্ত্তমানে নতুন দিল্লী ও কলিকাতার মধ্যে যে রাজধানী এক্সপ্রেস যাতায়াত করছে, সেই রকম একটি এক্সপ্রেস ট্রেন দিল্লী ও বোম্বাইর মধ্যেও যাতায়াত করবে। পেরাম্বুরের কারখানাতেই এই এক্সপ্রেস ট্রেনটি তৈরি হবে।

ধানের চাষে ট্র্যাক্টার ব্যবহারের উপযোগিতা

আমাদের দেশে হালচাষ দেখতে অভ্যস্ত চোখেও ট্র্যাক্টার এখন আর বিস্ময়ের বস্তু নয়। ট্র্যাক্টারের ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা সুখের বিষয়। কারণ কৃষি ক্ষেত্রে যান্ত্রিক সরঞ্জামের ব্যাপক প্রবর্তন, কৃষি পদ্ধতির উন্নতি ও উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করবে। এই বিশ্বাসের কোনোও ভিত্তি আছে কি না তা নিরূপণ করার জন্য কেরালার পাট্টাম্বিতে, কেন্দ্রীয় চাউল গবেষণা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সমীক্ষা চালানো হয়।

প্রায ৪০ বছর পূর্ব্বে এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই কেন্দ্রে বলদের সাহায্যে চিরাচরিত প্রথায় চাষ করা হ'ত। কিন্তু ট্র্যাক্টার ও শক্তি-চালিত লাঙ্গলের প্রবর্তনে চাষের খরচ খরচা যথেষ্ট কমে গিয়েছে এবং সময় কম লাগে বলে এই অবসর সময়টুকু অন্যান্য কাজে নিয়োজিত করা যায়।

পুরোনো ও নতুন পদ্ধতির পার্থক্য বিচার করার সময়ে দেখা গেছে যে, বলদের সাহায্যে ধানের জমি তৈরি করতে যেখানে ১৪২ ঘন্টা সময় লাগত সেখানে ১০ অশ্ব শক্তির একটি ট্র্যাক্টারের সাহায্যে ঐ কাজ শেষ করতে মাত্র ৭/৮ ঘন্টা লাগে। ফলে যে সময় উদ্বৃত্ত থাকে, সেই সময়টা শস্যের পরিচর্য্যায়, যথাসময়ে ধানের চারা রোপনে এবং দুটি ফসলের চাষে ব্যয় করা যাবে। অতএব একই জমি থেকে দুটি বা 'তিনটি ফসল পাওয়া যাবে। যেহেতু একই জমিতে দুটি বা তিনটি ফসল তোলা যাবে সেহেতু কৃষকদের জন্য সারা বছর কাজ থাকবে, কাউকেই বছরের কোনোও সময়ে বেকার থাকতে হবে না।

খরচের দিক থেকেও এই পার্থক্য লক্ষণীয় হবে। যেখানে হাল বলদ নিয়ে এক একর চাষ করতে ৬৩.৬৮ টাকা খরচ হয় সেখানে ট্র্যাক্টারের সাহায্যে সেই কাজ শেষ করতে লেগেছে ২৫ টাকা।

ট্র্যাক্টরের আর একটা মস্ত সুবিধা হ'ল এই যে, শুধু মাটি চষের জন্যই নয়, অন্যান্য বহু কাজে ট্র্যাক্টার সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগানো যায়। যেমন গবেষণা কেন্দ্রে পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, ধানের জমির ঠিক ৫ সেন্টিমিটার নীচে এ্যামোনিয়াম সালফেট ও সুপার ফসফেটের মিশ্রিত সারের যদি এক পরত ছড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে ধানের ফলন সবচেয়ে ভালো হয়। সাধারণতঃ মাপামাপি করে এইভাবে সার ছড়ানো সম্ভব নয় কিন্তু বীজ ও সার ছড়াবার একটা বিশেষ যন্ত্রাংশ ট্র্যাক্টারের সঙ্গে যুক্ত করে এই কাজ অতি অল্প আয়াসে অল্প সময়ে ও অল্প ব্যয়ে সুসম্পন্ন হতে পারে।

ট্র্যাক্টারে আর একটি বিশেষ যন্ত্রাংশ জুড়ে শুকনো এ্যামোনিয়া যদি গ্যাসের আকারে প্রয়োগ করা হয় তাহলে এ্যামোনিয়াম সালফেটের তুলনায় ৪ গুণ বেশী নাইট্রোজেন যোগায়। এই সার অপেক্ষাকৃত সুলভ এবং কৃষিক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলিতে এই সারের বহুল ব্যবহার আছে।

সেচের কাজেও ট্র্যাক্টার খুব কাজে আসে। যে সব অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নেই সে সব অঞ্চলে ট্র্যাক্টারের সাহায্যে পাম্পসেট চালানো যেতে পারে। ফসলের মধ্যে ধান চাষের জন্য সেচের যে রকম প্রয়োজনীয়তা এমন বোধ হয় আর কোনোও ফসলের জন্য নয়। সেচের মামুলী প্রণালীর সাহায্যে ঘন্টায় যদি ১৫০০-১৮০০ গ্যালন জল তোলা যায় তো ৫ অশ্ব শক্তির মোটর কিংবা তৈল চালিত ইঞ্জিন-এর সাহায্যে ৯০০০-১২০০০ গ্যালন জল তোলা সম্ভব হবে।

ধান মাড়াই-এর কাজেও ট্র্যাক্টারের উপযোগীতা প্রতিপন্ন হয়েছে। তাঞ্জাভুর ও পশ্চিম গোদাবরী জেলায় ট্র্যাক্টারের সাহায্যে ধান মাড়াই-এর কাজ বেশ চলু হয়ে গেছে।

ধান চাষের ব্যাপারে যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে। যেমন উদ্ভিদ রক্ষার জন্য অল্প সময়ে অল্প আয়াসে দ্রুত কীট নাশক ছড়ানো। হাতে চালাবার স্প্রেয়ার দিয়ে যেখানে দিনে খুব বেশী দেড় একর পরিমাণ জমিতে কীটঘ্ন ছড়ানো যায়, সেখানে 'মাইক্রোনাইজার' বা 'পাওয়ার স্প্রেয়ারের' সাহায্যে দিনে ৫ একর জমিতে ওষুধ ছড়ানো যায়।

বর্ষায় বা আর্দ্র আবহাওয়ায় ক্ষেতের ফসল শুকানো একটা সমস্যা বিশেষ। একাজটা যত দ্রুত সম্পন্ন হবে, ততই ফসলের ক্ষতি হওয়ার বা ফসল নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম। সে সব ক্ষেত্রে যন্ত্রের সাহায্যে অভীষ্ট সিদ্ধ হতে পারে।

একটা মস্ত বড় সমস্যা হ'ল এই যে ছোট চাষীদের যান্ত্রিক সরঞ্জাম কেনার মত আর্থিক সঙ্গতি নেই। এ সব ক্ষেত্রে কোনোও আর্থিক সংস্থা বা রাজ্যের অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে তাঁদের পক্ষে অগ্রসর হওয়া কঠিন। বিভিন্ন রাজ্যে যে সব কৃষি শিল্প কর্পোরেশন স্থাপিত হয়েছে, সেগুলি অগ্রণী হয়ে চাষীদের ট্র্যাক্টর ও অন্যান্য সরঞ্জাম যোগাবে বলে আশা করা যেতে পারে।

পাঠকদের প্রতি

পরিকল্পনার রূপ ও রূপায়ণ, দেশের উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা এবং পরিকল্পনা কমিশনের কর্মপ্রণালী দেখানোই হল আমাদের লক্ষ্য। এই পত্রটিতে যেমন জাতীয় প্রচেষ্টার খবর দেওয়া হয়, তেমনি সেই প্রচেষ্টার অংশীদার হিসেবে পশ্চিম বাংলা, জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রচেষ্টায় কতটা সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারছে দেখানো হয়।

এই বিষয়গুলির [illegible]
মৌলিক রচনা [illegible]
অনুরোধ [illegible]
রচনার [illegible]

[illegible] বলে, গুড়, [illegible]ত্যাদি মিশিয়ে এই [illegible] মরসুম অনুযায়ী এই [illegible] পরিবর্ত্তনও করা যাবে।

ভারত থেকে মশলা রপ্তানী

১৯৬৮-৬৯ সালে ভারত থেকে ২৫ কোটি টাকার ৫১৮৮০ মেট্রিক টন মশলা রপ্তানী করা হয়। ১৯৬৭-৬৮ সালে রপ্তানী করা হয় ২৭.১৭ কোটি টাকার ৫২১৯৫ মেট্রিক টন মশলা, অর্থাৎ গত বছর, পরিমাণের দিক থেকে শতকরা প্রায় ৬ ভাগ এবং মূল্যের দিক থেকে শতকরা ৭.৮ ভাগ কম রপ্তানী হয়। গোলমরিচ, আদা এবং দারচিনির রপ্তানীই সবচাইতে কম হয়েছে। তবে তেতুঁল, তরকারির মশলার এবং অন্যান্য মশলার রপ্তানী ১৯৬৮-৬৯ সালে বেশ বেড়েছে।

১৯৬৮-৬৯ সালেও পূর্ব্বের মতই মশলা রপ্তানীর ক্ষেত্রে গোলমরিচের স্থান ছিল প্রধান অর্থাৎ মশলা রপ্তানী ক'রে যা আয় হয়েছে তার মধ্যে শতকরা ৩৮.৭ ভাগই এসেছে এই মশলাটির রপ্তানী থেকে। ১৯৬৮-৬৯ সালের মশলা রপ্তানীতে দারচিনির অংশ ছিল শতকরা ২৭.৪ ভাগ, ১৯৬৭-৬৮ সালে এর পরিমাণ ছিল শতকরা ২৬.২ ভাগ। লঙ্কার অংশও ১৯৬৭-৬৮ সালের ৭.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৬৮-৬৯ সালে ৯ শতাংশে দাঁড়ায়। আদার রপ্তানী ১৯৬৭-৬৮ সালে ৪.৮ শতাংশ থেকে কমে ১৯৬৮-৬৯ সালে ৩.৬ শতাংশ দাঁড়ায়। তেঁতুল এবং তরকারির মশলা রপ্তানী ১৯৬৭-৬৮ সালের যথাক্রমে ৫.১ শতাংশ এবং ২ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮.৪ শতাংশ ও ২.৯ শতাংশ হয়। মশলার রপ্তানী থেকে মোট যে আয় হয় তাতে উপরে লিখিত মশলাগুলি ছাড়া অন্যান্য মশলার অংশ ১৯৬৭-৬৮ সালে ছিল ৬ শতাংশ এবং গত বছরে তা বেড়ে ১০ শতাংশ হয়।

পূর্ব্বের মত পূর্ব্ব ইউরোপের দেশগুলিতেই ভারতের মশলা বেশী রপ্তানী হয়। মশলার রপ্তানী থেকে মোট যে আমদানী হয় তার শতকরা ৩১.৩ ভাগই আসে পূর্ব্ব ইউরোপের দেশগুলি থেকে কিন্তু এই আয়ও গত বছরের তুলনায় ৫.৭ শতাংশ কম। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি, ভারতীয় মশলার দ্বিতীয় বৃহৎ আমদানীকারী। দের অংশ হল শতকরা ২৯.৭ ভাগ, ১৯৬৭-৬৮ সালে এর পরিমাণ ছিল ২৭.৩ শতাংশ। পূর্ব্ব এশিয়া অঞ্চল হল তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ক্রেতা অর্থাৎ ঐ সব দেশ থেকে আয় হয় ১৫.৭ শতাংশ। আমেরিকা অঞ্চল থেকে আয় হয় ৯.৩ শতাংশ। ১৯৬৭-৬৮ সালে এই আয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২.১ শতাংশ এবং ৮.৩ শতাংশ। মোট রপ্তানীর ১৪ শতাংশ যায় যুক্তসাম্রাজ্য, ইউরোপীয় কমন মার্কেটের দেশ ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ, অষ্ট্রেলিয়া, ওসেনিকা অঞ্চল ও আফ্রিকার দেশগুলিতে। গতবছরে এর পরিমাণ ছিল ১৫.৩ শতাংশ।

বিমানযোগে ধানক্ষেতে ইউরিয়া ছড়িয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি

মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর ও রায়পুর জেলায় সম্প্রতি ৪৮০০ হেক্টার জমিতে একটি পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে বিমান যোগে ইউরিয়া মিশ্রণ ছড়ানোর ফলে সেচবিহীন প্রতি হেক্টার ধানের জমি থেকে ১১৪.৫২ টাকা অতিরিক্ত লাভ হয়েছে।

যেখানে শুধু বৃষ্টির ওপর নির্ভর ক'রে ধান চাষ করতে হয় সেখানে ধানগাছ বাড়ার সময়ে জমিতে ইউরিয়া ছাড়িয়ে বিশেষ লাভ হয়না। ইউরিয়ার উপযুক্ত মিশ্রন তৈরি ক'রে তা ধানগাছে ছড়িয়ে দিয়ে এই অসুবিধে দূর করা হয়। বিমানযোগে এই মিশ্রন ছড়ালে ঠিক কি পরিমাণ লাভ ক্ষতি হতে পারে তার একটা সঠিক মূল্যায়ণ করার জন্য এই পরীক্ষা চালানো হয়।

১৯৬৯ সালের অক্টোবর মাসে ধান বোনার ৫৫-৬০ দিন পর বিমানযোগে সার ছড়াবার কাজ হাতে নেওয়া হয়। প্রতি হেক্টারে ৮৯ লীটারে ১৭.৮ কি: গ্রা: ইউরিয়া মিশ্রণ ছড়ানোর জন্য বীভার বিমান ব্যবহৃত হয়। এই মিশ্রণে শতকরা কুড়ি ভাগ ইউরিয়া ছিল। এক সপ্তাহ পরে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে এই মিশ্রণ ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে ধান গাছের পাতা নষ্ট হয়নি।

বিলাসপুর জেলার ভোপকা গ্রামের কাছে একটা অঞ্চল ঠিক করে, কিছু জমি ছেড়ে কিছু জমিতে ইউরিয়া মিশ্রণ ছড়ানো হয়। ফসল কাটার সময় ইতস্তত: ভাবে ৪৪ টি জমি বেছে নেওয়া হয়। ধান মাড়াই করার পর দেখা যায় যেসব জমিতে ইউরিয়া ছড়ানো হয় সেগুলিতে প্রতি হেক্টারে ২৩.২৮ কুইন্টাল ধান পাওয়া গেছে আর যে জমিগুলিতে ছড়ানো হয়নি সেগুলিতে হয়েছে প্রতি হেক্টারে ২০.৬৮ কুইন্টাল। কাজেই বিমানযোগে ইউরিয়া ছড়ানোর ফলে প্রতি হেক্টারে ২.৬০ কুইন্টাল অর্থাৎ শতকরা ১২.৫ শতাংশ উৎপাদন বেড়েছে।

প্রতি কুইন্ট্যাল ৬০ টাকা হিসাবে ২.৬০ কুইন্ট্যালের মূল্য দাঁড়ায় প্রতি হেক্টারে ১৬৫ টাকা। ব্যয়ের দিকে হ'ল, বিমানযোগে সার ছড়ানোর জন্য প্রতি হেক্টারে ২৪.৭০ টাকা এবং ১৭.৮ কি: গ্রা: ইউরিয়ার (প্রতি হেক্টারে) মূল্য, প্রতি মেট্রিক টন ৯৪৩ টাকা হিসেবে ১৬.৭৮ টাকা। কাজেই প্রতি হেক্টারে মোট অতিরিক্ত ব্যয় হয় ৪১.৪৮ টাকা।

তুলা উৎপাদন বৃদ্ধি

গত কয়েক বছর যাবৎ ভারতে প্রতি হেক্টারে তুলার উৎপাদন ক্রমশ: বেড়ে চলেছে। কি: গ্রাম হিসেবে প্রতি হেক্টারে তুলার উৎপাদন ১৯৬৫-৬৬ সালে ছিল ১০৮, ১৯৬৬-৬৭ সালে ১১৪, ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে ১২৩। অর্থাৎ ১৯৬৫-৬৬ সালের তুলনায় ১৯৬৮-৬৯ সালে, উৎপাদন শতকরা ১৩.৯ ভাগ বেড়েছে।

ভারতে প্রায় ৮০ লক্ষ হেক্টার জমিতে তুলোর চাষ হয়। এর মধ্যে শতকরা প্রায় ৮৪ ভাগ জমিতে সেচের কোন ব্যবস্থা নেই এবং শতকরা কেবলমাত্র ১৬ ভাগ জমিতে সেচ দেওয়া হয়। জমির আর্দ্রতার ওপরেই তুলোর উৎপাদন নির্ভর করে।

তুলোর উৎপাদন বাড়াবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। যে সব অঞ্চলে সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে সেখানে প্রতি হেক্টারে ৩১৪ কি: গ্রাম পর্যন্ত তুলা উৎপাদিত হয়েছে। যেমন ১৯৬৮-৬৯ সালে পাঞ্জাবে এই পরিমাণ তুলা উৎপাদিত হয়।

ইঞ্জিনীয়ারিং-এর টুকিটাকি

সহজে বহনযোগ্য ভ্যাকুয়াম প্ল্যাণ্ট

হেভি ইলেকট্রিক্যালস (ভারত) লিমিটেডের ভূপালের কারখানায় পাওয়ার ট্রান্সফর্ম্মারের কাজের জন্য, সহজে বহনযোগ্য ভ্যাকুয়াম প্ল্যান্ট তৈরি ক'রে কাজে লাগানো হচ্ছে।

এই প্ল্যান্টটিতে কাজ সুরু হওয়ার পর, ট্রান্সফর্ম্মার তৈরির কাজও অনেক ভালো হচ্ছে এবং ০.৫ পারার সূক্ষ্ম ভ্যাকুয়াম অর্জ্জন করা এখন সম্ভবপর হয়েছে।

ভূপালের এই কারখানায়, সমস্ত ভ্যাকুয়াম প্ল্যান্ট পূর্ণমাত্রায় চালু রেখেও, উপযুক্ত ভ্যাকুয়ামের সুযোগ সুবিধের অভাবে ট্রান্সফর্ম্মার বিভাগ, ট্রান্সফর্ম্মার তৈরি করতে অসুবিধে ভোগ করছিল। অত্যন্ত বেশী ক্ষমতার ট্রান্সফর্ম্মারের জন্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভ্যাকুয়াম প্রয়োজন। ভ্যাকুয়াম তৈরির যে সব ব্যবস্থা ছিল তাতে সর্ব্বোচ্চ ২ থেকে ৩ মিলি মীটার পারার ভ্যাকুয়াম পাওয়া যেতো। এতে সময়ও যেমন বেশী লাগতো তেমনি উৎপাদন কম হত।

পাওয়ার ট্রান্সফর্ম্মার উৎপাদনের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম ভ্যাকুয়াম অত্যন্ত প্রয়োজন এবং সেটা না পাওয়ায় উৎপাদনও ব্যাহত হচ্ছিল। তখন ট্রান্সফর্ম্মার বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট পরামর্শ দেন যে, উৎপাদনের আশু অসুবিধেগুলি দূর করার জন্য ইমপ্রেগনেটিং প্ল্যান্টের ভ্যাকুয়াম পাম্পগুলি দিয়ে, সহজে বহনযোগ্য একটা ভ্যাকুয়াম প্ল্যান্ট তৈরি করা যেতে পারে। ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ, এই রকম একটা প্ল্যান্ট তৈরি করে তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে রাজী হয়। এর জন্য খুব সতর্কভাবে নক্সা ইত্যাদি তৈরি করে ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ, সেই অনুযায়ী প্ল্যানটটি তৈরি করে তা কাজে লাগান।

পাইপের কাজ, ভ্যাকুয়াম, জল ও বায়ু নিয়ে কাজ করাটা অত্যন্ত জটিল ছিল তবুও সেই কাজ অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা হয়। ট্রান্সফর্ম্মার বিভাগের নিকট সহযোগিতায় এই কাজটা অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে অর্থাৎ মাত্র ছয় সপ্তাহের মধ্যে শেষ করা হয়।

মালয়ের জন্য বয়লার

তিরুচিতে সরকারী তরফের যে বয়লার কারখানা আছে, সেটি, মালয়ের পোর্ট ডিকসনের টুয়াঙ্কু জাফর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য দুটি ৬০ এম ওয়াটের বয়লার তৈরি ও স্থাপনের বড় একটা কনট্রাক্ট পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভারত হেভি ইঞ্জিনীয়ারিং লিমিটেডের তিরুচি কারখানা, যুক্ত সাম্রাজ্য, জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রিয়া ও জাপানের প্রধান বয়লার উৎপাদকগণের সঙ্গে বিশ্বব্যাপি একটি প্রতিযোগিতায় এই কন্ট্রাক্টটি পায়।

কন্ট্রাক্টটির মোট মূল্য ২২৫ লক্ষ টাকারও বেশী। ৬০ এম ওয়াটের প্রথম বয়লারটি আগামী বছরের নভেম্বর মাসের মধ্যে চালু করতে হবে। মালয়ের পোর্ট ডিকসনে এই বয়লারটি বসানো ও চালু করার জন্য কারখানার বিশেষজ্ঞরা সেখানে যাবেন। বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের সরঞ্জাম হিসেবে ভারত যে অন্যতম বৃহৎ একটা অর্ডার সংগ্রহ করলো তাই নয়, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য ভারতীয় সরঞ্জাম রপ্তানীর এটাই হ'ল প্রথম অর্ডার।

অর্ডার দেওয়ার আগে মালয়ের জাতীয় বিদ্যুৎ বোর্ডের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এবং বৃটেনের একটি পরামর্শদাতা ইঞ্জিনীয়ার প্রতিষ্ঠান, ভারতের এই বয়লার কারখানার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য তিরুচি কারখানায় এসেছিলেন।

হিন্দুস্তান জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা

কেন্দ্রীয় পরিবহণ মন্ত্রকের জন্য হিন্দুস্তান জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা "ডাফরিনের" মত আর একটি প্রশিক্ষণ জাহাজ তৈরি করছে। এই জাহাজটিতে কোন প্রপেলার থাকবে না। বাণিজ্য বহরের ২৫০ জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য এটি ব্যবহার করা হবে।

জাহাজটি তৈরি হয়ে গেলে, টেনে বোম্বাইতে নিয়ে গিয়ে ব্যালার্ড পিয়ারে নোঙ্গড় করে রাখা হবে।

১৯৫২ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার পর থেকে হিন্দুস্তান জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা এ পর্য্যন্ত ৩,৫৬,০০০ টনের ৪১ টি জাহাজ-সহ ৪, ১২,০০০ টনের ৪৯ টি জাহাজ তৈরি করেছে। এগুলির মধ্যে ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য জল পরীক্ষাকারী একটি জাহাজসহ অন্যান্য জাহাজ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জন্য একটি যাত্রী জাহাজ, সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী লিমিটেড, ভারত লাইন, দি গ্রেট ইষ্টার্ণ শিপিং কোম্পানী, নিউ ধোলেরা ষ্টিমশিপ এবং শিপিং কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের জন্য মালবাহী জাহাজও রয়েছে। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগ ও মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাষ্টের জন্য কয়েকটি ছোট ছোট জাহাজও তৈরি করেছে।

মহারাষ্ট্রে গরু মহিষের খাদ্য তৈরির কারখানা

বোম্বাইর আরে দুগ্ধ কেন্দ্রে গরু মহিষের খাদ্য তৈরির একটি কারখানা তৈরি করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রে এই রকম কারখানা এটিই প্রথম। এখানে প্রতি ঘন্টায় ৫ টন করে খইল জাতীয় তরল খাদ্য তৈরি করা যাবে এবং তার অর্ধেক পিঠের মতো শক্তও করা যাবে। লারসেন এ্যাণ্ড টুবরো কোম্পানী এই কারখানাটি তৈরি করে। এতে বছরে ৩০,০০০ টন খাদ্য উৎপাদিত হবে এবং ২০,০০০ দুগ্ধবতী মহিষের পক্ষে তা পর্য্যাপ্ত।

আরের এই কারখানায় গরু মহিষের জন্য যে খাদ্য উৎপাদিত হবে তা অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং তাতে দুধের উৎপাদনও বাড়বে। আংশিকভাবে খারাপ দানাশস্য, খৈল, গুড়, খনিজপদার্থ, ভিটামিন ইত্যাদি মিশিয়ে এই খাদ্য তৈরি হবে। মরসুম অনুযায়ী এই কাঁচামালে পরিবর্ত্তনও করা যাবে।

REGD. NO. D-233

উন্নয়ন বার্ত্তা

★ রাজস্ব অর্জ্জনের এবং আমদানী রপ্তানীর ক্ষেত্রে বিশাখাপতনম বন্দরটি ১৯৬৮-৬৯ সালে যথেষ্ট অগ্রগতি করেছে। এই বছরে এই বন্দরটি থেকে ৬.৬৪ কোটি টাকা রাজস্ব পাওয়া গেছে, পূর্ব্ব বছরে এর পরিমাণ ছিল ৫.৭৫ কোটি টাকা।

★ পুষ্টিকর পদার্থসহ গমের আটা সরবরাহ করা সম্পর্কে দেশে কয়েকটি আটার কল স্থাপন করার প্রকল্প রয়েছে। অধিক পুষ্টিমূল্য সম্পন্ন আটা তৈরির প্রথম কলটি বোম্বাইতে স্থাপন করা হয়েছে।

★ কেন্দ্রীয় সরকার, কলিকাতার পুনর্ব্বাসন শিল্প কর্পোরেশনের কার্য্যনির্ব্বাহকারী তহবিলের জন্য ১৫ লক্ষ টাকার ঋণ মঞ্জুর করেছেন। পূর্ব্ব পাকিস্থানের উদ্বাস্তদের কর্ম্মসংস্থান করার উদ্দেশ্যে শিল্প সংস্থা স্থাপন এবং বেসরকারী শিল্পপতিদের আর্থিক সাহায্য দিয়ে কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৯ সালে পুনর্ব্বাসন শিল্প কর্পোরেশন লিমিটেড গঠন করা হয়।

★ ভারত ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে জাহাজ চলাচল সম্পর্কে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য দুটি দেশই তাদের মধ্যে জাহাজ চলাচলের মাত্রা বাড়াতে রাজি হয়েছে।

★ ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন, নরওয়ের একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, নরওয়েতে ভারতীয় সামগ্রীর রপ্তানী বাড়ানো সম্পর্কে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

★ রক্সৌলের সঙ্গে, দক্ষিণ মধ্য নেপালের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প সহর হিতুরাকে যুক্ত করার জন্য, ভারত ও নেপালের একটি যুক্ত বিশেষজ্ঞদল, নেপালের প্রথম ব্রডগেজ রেলপথটি তৈরি করা সম্পর্কে জরীপের কাজ সুরু করেছেন।

★ ৭০ কি: মি: উচ্চতার বায়ুপ্রবাহ ও উত্তাপ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করার জন্য থুম্বা থেকে নতন কতকগুলি রকেট ছোঁড়া হয়েছে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা এবং বৃটিশ আবহাওয়া অফিসের কর্ম্মসূচী অনুযায়ী এই পরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

★ ভিলাই ইস্পাত কারখানা গত মাসে ৫০ লক্ষ টাকা লাভ করেছে। এই কারখানার তিনটী ইউনিটে তাদের নির্দিষ্ট ক্ষমতারও বেশী কাজ হয়েছে।

★ ভারত, বিশ্ব খাদ্য কর্ম্মসূচীর সঙ্গে ৫ বছর মেয়াদী একটি ডেয়ারী প্রকল্প সম্পর্কে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এর ফলে ভারতের চারটি প্রধান সহর-বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজে, উপযুক্ত গুণসম্পন্ন দুধের সরবরাহ অবিলম্বে বেড়ে যাবে। বর্ত্তমানে এই চারটি সহরে দুধের সরবরাহ হ'ল প্রতিদিন ১০ লক্ষ লীটার; তখন এই সরবরাহ বেড়ে গিয়ে প্রতিদিনের পরিমাণ দাঁড়াবে ২৭.৫ লক্ষ লীটার।

★ রাজস্থানের কোটাতে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরির যে কারখানা আছে তাতে আরও নানা ধরণের জিনিস তৈরি করা সম্পর্কে ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়ন একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

★ ভারতকে আরও ইয়েন ঋণ দেওয়া সম্পর্কে জাপানী ব্যাঙ্কগুলি একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই ঋণের পরিমাণ হ'ল ১৯ কোটি টাকারও বেশী এবং ১৯৫৮ সাল থেকে ভারতকে যতবার ইয়েন ঋণ দেওয়া হয়েছে এটা হবে তার নবম ঋণ।

★ বিশ্বব্যাপি টেণ্ডারের মাধ্যমে, কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী বোম্বাই-এর একটি প্রধান কারখানা, মিশরের কাছ থেকে ৫১ লক্ষ টাকার একটি রপ্তানীর অর্ডার সংগ্রহ করেছে।

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত হ'লেও 'ধনধান্যে' শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই ব্যক্ত করে না। পরিকল্পনার বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী ক্ষেত্রে উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতটা অগ্রগতি হচ্ছে তার খবর দেওয়াই হ'ল 'ধনধান্যে'র লক্ষ্য।

'ধনধান্যে' প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে প্রকাশিত হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত, তাঁদের নিজস্ব।

নিয়মাবলী

দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়।

অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পুন: প্রকাশকালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার করা হয়।

রচনা মনোনয়নের জন্যে আনুমানিক দেড় মাস সময়ের প্রয়োজন হয়।

মনোনীত রচনা সম্পাদক মণ্ডলীর অনুমোদনক্রমে প্রকাশ করা হয়।

তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয়। কোনোও রচনার প্রাপ্তি-স্বীকৃতি, পত্র মারফৎ জানানো হয় না।

নাম ঠিকানা লেখা, ডাকটিকিট লাগানো, খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

কোনো রচনা তিন মাসের বেশী রাখা হয়না।

শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাবেন।

গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেস ম্যানেজার, পাব্লিকেশন্স্ ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী-১ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

"ধনধান্যে" পড়ুন
দেশকে জানুন

ডিরেক্টর, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সোসাইটি লিঃ, করোলবাগ, দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত।

ধনধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত
পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

প্রথম বর্ষ দ্বাবিংশতি সংখ্যা

৫ই এপ্রিল ১৯৭০ : ১৫ই চৈত্র ১৮৯২
Vol. 1 : No 22 : April 5, 1970

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

প্রধান সম্পাদক
রবিন্দ্র সান্যাল

সহ সম্পাদক
নীরদ মুখোপাধ্যায়

সহকারিণী (সম্পাদনা
গায়ত্রী দেবী

সংবাদদাতা (মাদ্রাজ)
এস. ভি. রাঘবন

সংবাদদাতা (শিলং)
ধীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী

সংবাদদাতা (কলিকাতা)
সুভাষ বসু

সংবাদদাত্রী (দিল্লী)
প্রতিমা ঘোষ

ফোটো অফিসার
টি. এস. নাগরাজন

প্রচ্ছদপট শিল্পী
আর. সারঙ্গন

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০

টেলিগ্রাফের ঠিকানা : যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

ভুলি নাই

কেবল স্বাধীন হলেই মুক্ত হওয়া যায়না। মুক্তি বলতে যেখানে শুধু স্বাধীনতা বোঝায়, সেখানে মুক্তি অবাস্তব, অর্থহীন এক শব্দ মাত্র।

—রবীন্দ্রনাথ

এই সংখ্যায়

পৃষ্ঠা

সংশোধিত জাতীয় পরিকল্পনা

চতুর্থ পরিকল্পনা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় এখন, আগামী চার বছরে ভারতের আর্থিক রূপ কি দাঁড়াতে পারে তার প্রায় সঠিক একটা ধারণা করা যায়। ১৯৬৯-সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্য্যন্ত, এই পাঁচ বছরের জন্য জাতির আর্থিক উন্নয়ন সম্পর্কিত খসড়া কর্ম্মসূচীটি শেষ পর্য্যন্ত জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের অনুমোদন লাভ করেছে এবং এখন এটি সংসদে পেশ করা হয়েছে।

এতে অবশ্য আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই বরং এই খসড়া কর্ম্মসূচী যে শেষ পর্য্যন্ত অনুমোদন লাভ করলো তা একটা স্বস্তির কারণ হল। কারণ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে এক বছর সময় লাগলেও, পরিকল্পনা পদ্ধতির বিরোধী, সন্দেহবাদী এবং সর্ব্বক্ষেত্রে দোষ অনুসন্ধানকারী সমলোচকদের সম্মুখ আক্রমণের বিরুদ্ধেও কর্ম্মসূচীগুলি অক্ষতভাবে গৃহীত হওয়ায়, তা, দেশের অগণিত জনসাধারণের পরিকল্পনার ওপর আস্থা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছে। কারণ এই পরিকল্পনা যদি বাতিল হয়ে যেতো তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ এই অগণিত জনসাধারণকে অবাধ অর্থনীতির হাতে ফেলে দিতে হতো। এই বিলম্ব কেন হ'ল তা নিয়ে চুলচেরা তর্কবিতর্ক ক'রে কোন লাভ নেই তবে অন্ততঃপক্ষে এই টুকু বলা যায় যে দুটি যুদ্ধ, ভীষণ খরা এবং মুদ্রামূল্য হ্রাস ও মন্দা, পরিকল্পনা তৈরির পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

তবে এক বছর পূর্ব্বে যে খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করা হয় অথবা তিন বছর পূর্ব্বে যে খসড়া তৈরি করা হয়েছিল, তার তুলনায় বর্ত্তমানে অনুমোদিত পরিকল্পনাটি সব দিক দিয়েই ভালো হয়েছে। কাজেই চূড়ান্ত রূপ দিতে যে বিলম্ব হয়েছে সেই ত্রুটি এতে পূরণ হয়ে গেছে। বিনিয়োগের পরিমাণ, খসড়া পরিকল্পনার চাইতে ৪৮৪ কোটি টাকা বেশী ধ'রে ২৪,৮৮২ কোটি টাকা করা হয়েছে। সামাজিক ন্যায়বিচারের ওপরেও সমান গুরুত্ব দিয়ে একই সঙ্গে স্বায়িত্ব অর্জ্জন ও উন্নয়নের, পরিবর্ত্তিত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হয়েছে।

সংশোধিত পরিকল্পনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীও উল্লেখ করেছেন তা হ'ল, অর্থনীতির ক্ষেত্রে কয়েক বছর পূর্ব্বে সরকারী তরফ যে প্রধান স্থানটি অধিকার করে ছিল তা আবার এই তরফটি ফিরে পেয়েছে। বলা হয়েছে যে "বিনিয়োগের আনুপাতিক ক্ষেত্রে এবং বিনিয়োগের ধরণে, চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ ভাগ পর্য্যন্ত সরকারী তরফ শিল্পের ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করবে।" সরকারী তরফের মোট ১,৫০৪ কোটি কোটি টাকার বিনিয়োগে একমাত্র শিল্পের অংশই হল ২৪৮ কোটি টাকা। আনুমানিক ব্যয় বাড়লেও এই বিনিয়োগ সরকারী তরফের বাধাবিহীন উন্নয়নের পক্ষে যথেষ্ট বলে আশা করা যায়।

সাধারণের কল্যাণ এবং উন্নয়নের সুযোগ সুবিধের ক্ষেত্রে অধিকতর সাম্য অর্জ্জন করার কতকগুলি বিশেষ প্রকল্প নিয়ে চতুর্থ পরিকল্পনায় যে কাজ সুরু করা হয়েছে তা যুক্তিসঙ্গতই হয়েছে। অতীতের অবহেলার ফলে যে সব এলাকা অনুন্নত থেকে গেছে সেখানে এই প্রকল্পগুলি কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধে আরও বাড়াবে বলে আশা করা যায়।

আগামী চার বছরে অনুন্নত রাজ্যগুলিকে ৮৮০ কোটি টাকা বিশেষ সাহায্য হিসেবে দেওয়ার যে ব্যবস্থা পরিকল্পনায় রয়েছে, কতকগুলি রাজ্য, বিশেষ করে উন্নত রাজ্যগুলি তার ভীষণ বিরোধীতা করে এবং তাঁরা বলে যে এই ব্যবস্থার পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। যাইহোক পরে যখন অধ্যাপক গাডগিল জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের অধিবেশনে এই বরাদ্দের উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেন তখন সেই রাজ্যগুলি তা বাহ্যতঃ মেনে নেয়। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের ডেপুটি চেয়ারম্যান একে পরিকল্পনামূলক ও পরিকল্পনা বহির্ভুত আর্থিক ব্যবস্থা সংহত করার অন্যতম একটি ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেন।

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের অনুমোদন পাওয়ার ফলে পরিকল্পনাটির সাধারণের অনুমোদন লাভ করার মৌলিক কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেল। কারণ রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়েই এই পরিষদটি গঠিত এবং তাঁরাই দেশের জনগণের সমবেত ইচ্ছার প্রতীক। কাজেই এখন সম্পদ সংগ্রহ এবং পরিকল্পনাটির দ্রুত ও কার্য্যকরি রূপায়ণের দিকেই সমগ্র মনযোগ নিবদ্ধ করতে হবে। এর দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রের তুলনায় রাজ্যগুলির বেশি। দেশকে যদি যুক্তিসঙ্গত সামাজিক ন্যায়বিচার ও স্থায়ীত্বের আবহাওয়ায় উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছুতে হয় তাহলে গ্রাম ও সহর, কৃষিক্ষেত্র ও কারখানার সর্ব্বক্ষেত্রে অর্থাৎ জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে প্রত্যেককে সর্ব্বাধিক অবদান যোগাতে হবে।

চতুর্থ পরিকল্পনা

সমৃদ্ধি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের রেখাচিত্র

সামাজিক ন্যায়বিচার এবং স্বাধীনতার সঙ্গে দেশের অগ্রগতি অব্যাহত রাখাই হল সংশোধিত চতুর্থ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। দেশে যে কারিগরী ও আর্থিক সম্পদ রয়েছে তা দিয়েই উন্নয়নের হার যাতে যতটা সম্ভব বাড়ানো যায়, সেই রকম ভাবেই পরিকল্পনাটি তৈরি করা হয়েছে। জাতীয় আয় মোটামুটি বার্ষিক ৫.৫ শতাংশ বাড়বে বলে পরিকল্পনায় অনুমান করে নেওয়া হয়েছে। জনসংখ্যা শতকরা আনুমানিক ২.৫ ভাগ বাড়লে জনপ্রতি আয় শতকরা ৩ ভাগ বাড়বে বলে মনে হয়। জাতীয় আয় বার্ষিক ৫.৫ শতাংশ বৃদ্ধির এই লক্ষ্য পূরণ করার জন্য পরিকল্পনায় ২৪,৮৮২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। খসড়া পরিকল্পনায় যে ২৪,৩৯৮ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছিল তা থেকেও ৪৮৪ কোটি টাকা বেশী বিনিয়োগ করা হচ্ছে। সরকারী তরফে ১৫.৯০২ কোটি টাকা লগ্নি করা হবে এবং বেসরকারী তরফের লগ্নির পরিমাণ ধরা হয়েছে ৮৯৮০ কোটি টাকা। কাজেই সরকারী তরফে লগ্নির মোট পরিমাণ বাড়বে ১৫০৪ কোটি টাকা।

মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা সৃষ্টি না করে সম্পদ সংগ্রহ

২৪,৮৮২ কোটি টাকা ব্যয় করতে হলে দেশের জনসাধারণকে আরও বেশী সঞ্চয় করতে হবে এবং লগ্নি বাড়াতে হবে। বর্তমানে দেশের জাতীয় আয়ে আভ্যন্তরীন সঞ্চয়ের অংশ হল শতকরা ৮.৮ ভাগ। এই সঞ্চয়ের হারও চতুর্থ পরিকল্পনার শেষভাগ অবধি শতকরা ১৩.২ ভাগ পর্যন্ত বাড়াতে হবে। উৎপাদন বাড়িয়ে, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে এবং আর ও আড়ম্বরপূর্ণ ব্যয়ের ওপর করের হার বাড়িয়ে, সঞ্চয়ের হার বাড়ানো হবে। লগ্নির হার বর্তমানের ১১.৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৪.৫ শতাংশ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

কৃষি উৎপাদন বার্ষিক মোটামুটি ৫ শতাংশ এবং শিল্পের উৎপাদন ৮ থেকে ১০ শতাংশ বাড়িয়ে; বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা হ্রাস করে আর্থিক ব্যবস্থার পরিচালনা উন্নততর ক'রে, রপ্তানী বার্ষিক ৭ শতাংশ বাড়িয়ে এবং খাদ্যশস্য, উৎপাদিত সামগ্রী এবং কাঁচামালের উৎপাদন বাড়িয়ে আমদানী আরও হ্রাস করে; খাদ্যশস্যের সরবরাহ উন্নততর করে বিশেষ করে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুদ ক'রে মূল্যে স্থিতিশীলতা এনে ৫.৫ শতাংশ উন্নয়ন হার অর্জ্জন করা যাবে বলে অনুমান করা হয়েছে।

মূল্যের স্থিতিশীলতার জন্য কৃষির উন্নয়ন হার বজায় রাখা বিশেষ প্রয়োজন

চতুর্থ পরিকল্পনায় সাফল্য লাভ করতে হলে কৃষিতে বার্ষিক ৫ শতাংশ উন্নয়ন হার বজায় রাখতে হবে। আয় বৃদ্ধির মোটামুটি লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে যেমন এই উন্নয়ন হার বজায় রাখা প্রয়োজন তেমনি মূল্যে স্থিতিশীলতা অর্জ্জনের পক্ষেও এটা বিশেষ প্রয়োজন।

প্রধানতঃ অধিক ফলনের বীজ, সার, কীটনাশক, কৃষি সাজসরঞ্জাম, উন্নততর কৃষিপদ্ধতি এবং জলসেচের সুযোগ সুবিধে ইত্যাদিসহ আধুনিক কৃষিপদ্ধতি যথাসম্ভব বেশী প্রয়োগ করে কৃষিতে ৫ শতাংশ উন্নয়ন হার বজায় রাখার চেষ্টা করা হবে। চাষীরা বিশেষ করে ছোট চাষীরা যাতে সময়মত প্রয়োজন অনুযায়ী সার পেতে পারেন সে জন্য পরিকল্পনায় একটি সার ঋণ গ্যারান্টি কর্পোরেশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

কৃষিতে যে টাকা বিনিয়োগ করা হবে তার বেশীর ভাগই জলসেচের সুযোগ সুবিধে উন্নততর করা ও বাড়ানোর জন্য ব্যয় করা হবে। ছোট ছোট জলসেচযুক্ত এলাকার পরিমাণ বাড়ানো হবে। এর জন্য পরিকল্পনায় ২০০০ কোটি টাকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং তা পূর্ব্বের পরিকল্পনাগুলি থেকে অনেক বেশী। জলসেচবিহীন অঞ্চলে উৎপাদন বাড়াবার জন্য প্রধানতঃ ভূমি সংরক্ষণ এলাকার কর্মসূচীর ওপরেই জোর দেওয়া হবে। তাছাড়া যে সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম এই রকম কতকগুলি ঘনসংবদ্ধ এলাকায় কৃষি উন্নয়নের জন্য একটা সংহত কর্ম্মসূচী গ্রহণ করা হবে। পরিকল্পনায় এর জন্য ২০ কোটি টাকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সারের সরবরাহ তিনগুণেরও বেশী বাড়ানো সম্পর্কে পরিকল্পনায় ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, অর্থাৎ ১৯৬৮-৬৯ সালে যেখানে মোটামুটি ২০ লক্ষ টন সার উৎপাদিত হয়, ১৯৭৩-৭৪ সালে সেখানে ৬০.৬ লক্ষ টন উৎপাদিত হবে বলে আশা করা যায়। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে অধিক ফলনের বীজের ব্যবহার যথেষ্ট বাড়ানো হবে। এই পরিকল্পনার শেষ পর্য্যন্ত ২ কোটি ৪০ লক্ষ একর জমিতে অধিক ফলনের বীজের চাষ করা হবে

শিল্প

পরিকল্পনায়, শিল্পের উৎপাদন (খনি এবং নির্ম্মাণ শিল্পসহ) বৃদ্ধির হার বার্ষিক ৮.৭ শতাংশ রাখা হয়েছে। সরকারী তরফে শিল্পে যে অর্থ বিনিয়োগ করা হবে, তার বেশীর ভাগই, ধাতু, সার, তৈল সংশোধন এবং মেসিন তৈরির শিল্পে নিয়োগ করা হবে। ব্যক্তিগত আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিনি, বস্ত্রাদি, বাইসাইকেল এবং স্কুটারের চাহিদা বাড়ার যে সম্ভাবনা আছে তার চাইতেও এগুলির উৎপাদন যাতে কিছুটা বেশী হয় তার জন্য সরকারী ও বেসরকারী তরফে যথেষ্ট ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এগুলির দাম বাড়বে না বলেই আশা করা যাচ্ছে।

পরিকল্পনায় বেসরকারী তরফের লগ্নির

পরিমাণ ধরা হয়েছে ২১০০ কোটি টাকা। সরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে বেসরকারী তরফকে ৩০০ কোটি টাকা সাহায্য করা হবে এবং অতিরিক্ত যে সম্পদের প্রয়োজন হতে পারে, এটাই তার পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করা হয়।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির জন্য সরকারী তরফ থেকে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। এগুলির আর্থিক স্বায়িত্ব এবং উৎপাদন ক্রমশ: বাড়িয়ে তোলার ওপরেই গুরুত্ব দেওয়া হবে। চিরাচরিত গ্রাম্য ও কুটির শিল্পগুলির উন্নয়ন এবং আর্থিক সম্ভাব্যতাসম্পন্ন কার্য্যকরী প্রকল্পগুলির ওপরেই বেশী জোর দেওয়া হবে।

বিদ্যুৎশক্তি

বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন সম্পর্কিত যে সব প্রকল্প নিয়ে কাজ হচ্ছে সেগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য ৯০৯ কোটি টাকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নতুন প্রকল্পগুলির জন্য ১৫২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। এবং এগুলি থেকে ২০.৯ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হবে। এগুলি অবশ্য পঞ্চম পরিকল্পনার সময়ে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করতে সুরু করবে। যে সব পুরোনো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র প্রায় অচল হয়ে গেছে সেগুলি যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলেও অতিরিক্ত কেন্দ্রগুলি থেকে ৭০.৫ লক্ষ কি: ওয়াট শক্তি পাওয়া যাবে আর তাতে ১৯৭৩-৭৪ সাল পর্যন্ত মোট ২ কোটি ২০ লক্ষ কি: ওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদিত হবে। তবে ১৯৬৮-৬৯ সালের তুলনায় ১৯৭৩-৭৪ সাল পর্যন্ত দেশে বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন ও ব্যবহার প্রায় দ্বিগুণ বাড়বে বলে আশা করা যাচ্ছে।

পরিবহণ

১৯৭৩-৭৪ সাল পর্য্যন্ত রেলওয়েগুলি মোট ২৮ কোটি ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন মাল বহন করবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ১৯৬৮-৬৯ সালে এর পরিমাণ ছিল ২০ কোটি ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন। যাত্রী বহনের পরিমাণও ১১১ বিলিয়ন যাত্রী কিলোমীটার থেকে বেড়ে ১৩৮ বিলিয়ন যাত্রী কিলোমীটার হবে বলে অনুমান করা হয়। রেলওয়ের জন্য যে বিনিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে (রেলওয়ের নিজস্ব অবদানসহ ১৫৭৫ কোটি টাকা) তা, ১৯৭৩-৭৪ সাল পর্য্যন্ত, প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত ক্ষমতা সঞ্চার করার পক্ষে যথেষ্ট হবে এবং সেই সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী লগ্নির পক্ষেও যথেষ্ট হবে। তবে এই বিনিয়োগের লাভগুলি পরে পাওয়া যাবে।

বাণিজ্য এবং সাহায্য

বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা হ্রাস করা হ'ল পরিকল্পনাটির একটি প্রধান উদ্দেশ্যে। সেই জন্য বার্ষিক ৭ শতাংশ রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্য রাখা হয়েছে। রপ্তানীযোগ্য দ্রব্যাদির উৎপাদনকারী শিল্পগুলিতে আরও অর্থ বিনিয়োগ করা হবে এবং এগুলিকে এদের প্রয়োজনীয় উপযুক্ত দ্রব্যাদি সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হবে। বহুকাল থেকে ভারত যে সব জিনিস রপ্তানী করে আসছে সেগুলির জন্য নতুন বাজার খোঁজা হবে এবং এগুলিকে অন্য কোনভাবে ব্যবহার করা যায় কিনা তাও পরীক্ষা করে দেখা হবে।

অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিশেষ করে খাদ্যশস্যের মত অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্ষেত্রে সরকারী ব্যবসায় সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য কাঁচামালের একটা বড় পরিমাণের সরকারী মজুদ ভাণ্ডার গড়ে তোলার ওপর পরিকল্পনায় জোর দেওয়া হয়েছে এবং এগুলি মজুদ করার জন্য গুদাম ইত্যাদি তৈরি করারও ব্যাপক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অতি প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে সমবায় বিপণন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সমবায় বন্টন ব্যবস্থা আরও সম্প্রসারিত করা হবে।

কর্ম্মসংস্থান

পল্লী অঞ্চলে, ছোট জলসেচ, ভূমি সংরক্ষণ, বিশেষ অঞ্চল উন্নয়ন, ব্যক্তিগত গৃহ নির্ম্মাণ, সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, পল্লী অঞ্চল বৈদ্যুতিকীকরণ এবং নিবিড় চাষ, নতুন কৃষি পদ্ধতি সম্প্রসারণ ইত্যাদির মতো প্রকল্পগুলি রূপায়িত করলে শ্রমিকের চাহিদা যথেষ্ট বাড়বে বলে আশা করা যাচ্ছে। শিল্প ও ধাতুদ্রব্য, পরিবহণ, যোগাযোগ এবং বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করার প্রস্তাব রয়েছে তা সংগঠিত শিল্পগুলিতে শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ বাড়াবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তরুণ ইঞ্জিনীয়াররা এবং অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তিরা যাতে ছোট ধরণের শিল্প অথবা নিজেদের কর্ম্মসংস্থানের উপযুক্ত কোন বৃত্তি গড়ে তুলতে পারেন সেজন্য রাষ্ট্রাধীন ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলিসহ. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় শিল্পোন্নয়ন ও কোম্পানী ব্যাপার সম্পর্কিত মন্ত্রক নানা ধরণের প্রকল্প চালু করবেন। কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে কাজের গতি বাড়লে, সড়ক পরিবহণ, যোগাযোগ ও বাণিজ্যে কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়বে বলে আশা করা যাচ্ছে।

আন্তঃ আঞ্চলিক অসাম্য

জনপ্রতি আয়ের ক্ষেত্রে যে সব রাজ্যের জনপ্রতি আয় জাতীয় হারের তুলনায় কম, সাহায্য বন্টনের সময়, কেন্দ্রীয় সরকার সেই রাজ্যগুলিকে উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অনুন্নত এলাকাগুলিতে শিল্প স্থাপনে আর্থিক সাহায্য করার ব্যাপারে আর্থিক ও ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি কিছুটা বেশী সুযোগ সুবিধে দেবে। বিভিন্ন স্থানে শিল্প স্থাপন করে, ছোট কৃষক এবং ভূমিহীন শ্রমিকদের জন্য পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ করে, শুষ্ক, মরুভূমি এবং গভীর খাদযুক্ত বিশেষ অঞ্চলগুলির উন্নয়নের জন্য যে সব প্রকল্প গ্রহণ করা হবে তা বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অসমতা দূর করতে সাহায্য করবে।

সমাজকল্যাণ সেবা

অনুন্নত অঞ্চল ও সম্প্রদায়সমূহের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে এবং নারী শিক্ষার সুযোগ সুবিধে বাড়ানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে, শিক্ষা কর্ম্মসূচীতে, প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। অশিক্ষিত যুব সম্প্রদায় এবং যুবসেবা সম্পর্কে যে পরীক্ষামূলক কর্ম্মসূচী রয়েছে তা নিয়ে

কাজ সুরু করা হবে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্ম্মসূচীর মধ্যে আছে বিজ্ঞান শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিল্পগুলির প্রয়োজন ও কারিগরী শিক্ষার মধ্যে নিকটতর সম্পর্ক স্থাপন।

অনুন্নত শ্রেণীগুলির কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য যে সব কর্ম্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলির লক্ষ্য হ'ল উন্নয়ন সম্পর্কিত সুযোগ সুবিধের ক্ষেত্রে অধিকতর সমতা অর্জ্জন। ভূমি বনটন এবং বসতিস্থাপন, ছোট জলসেচ এবং কৃষি ও পশুপালনের জন্য আর্থিক সাহায্য দিয়ে অনুন্নত শ্রেণীগুলির আর্থিক উন্নয়ন করার জন্য যে সব কর্ম্মসূচী রয়েছে তা ছাড়াও বৃত্তি, বই কেনার জন্য আর্থিক সাহায্য, হোষ্টেলে থাকার সুযোগ সুবিধে ক'রে দিয়ে এবং পরীক্ষার ফী মকুব করে শিক্ষা বিস্তারের জন্য চেষ্টা করা হবে।

স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা

প্রত্যেকটি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে একটি করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ক'রে সেগুলির মাধ্যমে স্বাস্থ্য রক্ষার সুযোগ সুবিধে সম্প্রসারিত করা বিশেষ ক'রে পরিবার পরিকল্পনা কর্ম্মসূচীগুলি রূপায়িত করাই হ'ল এই ক্ষেত্রের মোটামুটি লক্ষ্য। এই কেন্দ্রগুলি যেমন রোগ প্রতিরোধমূলক এবং চিকিৎসার সুযোগ সুবিধের ব্যবস্থা করবে তেমনি সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা সম্পর্কেও দায়ী থাকবে। মহকুমা এবং জেলার হাসপাতালগুলি আরও শক্তিশালী করা হবে এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে শক্ত রোগীদের এই সব কেন্দ্রে পাঠানো যাবে।

আগামী দশ বছরের জন্যে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত কর্ম্মসূচী কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকবে। পরিবার পরিকল্পনা কর্ম্মসূচীগুলির জন্য পরিকল্পনায় ৩০০ কোটি টাকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এর জন্য মাত্র ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। বর্ত্তমানে জাতীয় জন্মহার হ'ল প্রতি হাজারে ৩৯। ১৯৭৩-৭৪ সালের মধ্যে এই জন্মহার প্রতি হাজারে ৩২ করা এবং ১৯৮০-৮১ সাল পর্য্যন্ত তা আরও কমিয়ে হাজার প্রতি ২৫ করাই হ'ল এই কর্ম্মসূচীগুলির লক্ষ্য। সুযোগ সুবিধে, সরবরাহ এবং সেবাব্যবস্থা খুব তাড়াতাড়ি সম্প্রসারিত করে এবং ব্যক্তিগত আলোচনা ও পরামর্শ ইত্যাদির মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য পূরণ করার চেষ্টা করা হবে। এর সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থাগুলিও উন্নততর করা হবে।

প্রগতিশীল কৃষি পদ্ধতির সাফল্য

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির অভিযানে দেশের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে আসামও দৃঢ় পদক্ষেপে এগোচ্ছে, ফলে আসামের বিভিন্ন এলাকায় প্রগতিশীল কৃষি পদ্ধতি এমন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে যে তার তুলনা দিতে একটা দুটো নয় অনেক ব্লকের নাম করা চলে।

এই প্রসঙ্গে কাছাড় জেলার ব্লক 'লালা'র নাম করা যায়। লালা ব্লকের প্রগতিশীল কৃষক অমৃতমোহন নাথ কীভাবে চাষবাসের পুরোনো ধারা উল্টে দিয়ে নতুন কৃষি পদ্ধতি, প্রচুর ফলন শস্যের চাষ ও ফসল চাষের নতুন ক্রম প্রচলিত করেছেন তা জানলেই সমগ্র রাজ্যে কৃষি ব্যবস্থায় কি রূপান্তর ঘটেছে ও ঘটছে তার আন্দাজ পাওয়া যায়। শ্রীনাথের জমিতে আই-আর ৮ ধানের বীজ বোনা হয়। জমিতে হাল দেওয়া, মই দেওয়া বীজ বোনার সময় নির্দিষ্ট ফাঁক রাখা, সেচ-সার প্রভৃতি সব ব্যাপারেই আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। ১৯৬৯-৭০ সালে শ্রীনাথের জমি থেকে একর প্রতি ১৫১ মণ ফসল পাওয়া যায় (যদিও ইতিপূর্বে সরকারী পরীক্ষাধীন জমিতেই ফসল সাড়ে ৬ মণের মত কম হয়েছিল)।

শ্রীনাথের কাছে গোড়ায় এক একর মাত্র জমি ছিল। তাতে ফসল যা হ'ত তাতে পরিবারের মুখে অন্ন জোগানো দায় ছিল। ঐ জমিতে স্থানীয় বীজের চাষ করে বছরে ফসল পাওয়া যেত তিরিশ মণের মত।

১৯৬৬-৬৭ সালের বোরো মরসুমে শ্রীনাথ তাইচুং দেশী-১ বুনেছিলেন। চাষবাস, সেচ সারের আধুনিক পন্থা পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে ফসল পেয়েছিলেন ৮৪ মণ ঐ বছরের রেকর্ড।

তারপর ১৯৬৭-৬৮ সালে নিজের জমিতে দুটি ফসল ফলাবেন বলে শ্রীনাথ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন; আই আর-৮-এর সঙ্গে আরও একটি বীজ বুনবেন বলে স্থির করলেন। জমি তৈরি করে নিয়ে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে বীজ বোনা থেকে রাসায়নিক সার ও কীট নাশক প্রয়োগ করা, পাম্প সেটের সাহায্যে সেচ দেওয়া প্রভৃতি সবেতেই এলাকার এক্সটেনশান অফিসাররা এবং গ্রামসেবক প্রশিক্ষন কেন্দ্রগুলি শ্রীনাথকে সাহায্য করলেন। ফলে প্রচুর ফসল পাওয়া গেল। এই সব পরীক্ষা নীরিক্ষার ফলে শ্রীনাথের উৎসাহে যেন জোয়ার এল। যে জমিতে বছরে ৩০ মণ ধান হত সে জমিতে ১৫১ মণ অর্থাৎ পাঁচ গুণেরও ওপর ধান হয়েছে, এ কি কম কথা।

পরের বছর তিনি নিজেই নিজের চেষ্টায় দুটি ফসল তোলার জন্য তৈরি হলেন। আউশ ও বোরো বুনে ফসল পেলেন ১৮১ মণ। এরপর শ্রীনাথ স্থির করলেন যে, আসছে মরসুমে (১৯৬৯-৭০) পালা ক'রে তিনটি ফসল ফলাবেন—প্রথমে শালী, তারপর আউশ ও তারপর রবি। শ্রীনাথের চেষ্টা কতদুর ফলবতী হয়েছে তা এখনও জানা যায়নি কিন্তু দুটি ফলনে ফসলের পরিমাণ যদি ১৮১ মণ হয়ে থাকে—তিনটি ফলনে তার পরিমাণ আরও বাড়বে এতে সন্দেহ কী? অর্থাৎ শ্রীনাথ এই কথাটা প্রমাণ করলেন সে যথাযথভাবে পরিচর্যা করলে ভূমিলক্ষ্মী অকৃপণ হাতে তাঁর প্রসাদ ঢেলে দেন।

যোজনার অসমীয়া সংস্করণ

গত ১৪ই মার্চ্চ গৌহাটিতে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, যোজনার অসমীয়া সংস্করণ "পয়োভরার" প্রথম সংখ্যাটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটি প্রতি পক্ষে প্রকাশিত হবে। এটি নিয়ে যোজনার হিন্দি, বাংলা, তামিল, অসমীয়াসহ পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হল।

যথেষ্ট বিনিয়োগ বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর করবে

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ

জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের দুইদিন ব্যাপি অধিবেশনে চতুর্থ পরিকল্পনায় বিনিয়োগ সম্পর্কে সংশোধিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়। দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে, এই পরিকল্পনায় সরকারী তরফে যে ১৫,৯০২ কোটি টাকা বিনিয়োগ অনুমোদিত হয়েছে তাকে লগ্নির ক্ষেত্রে বেশ যথেষ্ট বৃদ্ধি বলা যায় এবং ৫ থেকে ৬ শতাংশ উন্নয়ন হার অর্জ্জন করার জন্য চেষ্টাকেও, আর্থিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট দ্রুতগতি বলা যায়। তবে তিনি একথাও বলেন যে এগুলির ফলেই যে উৎপাদন বেড়ে যাবে অথবা জনসাধারণের জন্যে আরও বেশী সুযোগ সুবিধের ব্যবস্থা করা যাবে তা একেবারে স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেওয়া যায় না।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন যে জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদে অনেক কথা বলা হলেও, চতুর্থ পরিকল্পনায় বিনিয়োগের যে পরিমাণ ধরা হয়েছে তা সম্ভবপর নয়, এমন কথা কেউ বলেন নি।

তবে পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত এই কথার ওপরে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ জোর দেন। কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ করতে স্বীকৃত হয়েছেন।

পরিকল্পনার কতকগুলি দিকের ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে করের মাধ্যম ছাড়া ঋণের মাধ্যমেও সম্পদ সংহত করতে হবে। পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যাপারে ও অন্যান্য ব্যাপারে ব্যয়ের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যে কয়েকটি রাজ্যে বর্ত্তমানে ঘাটতি চলেছে সেগুলির জন্যই যে শুধু উন্নততর আর্থিক পরিচালনা ব্যবস্থা দরকার তাই নয় অন্যান্য রাজ্য এবং কেন্দ্রের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য।

প্রধান মন্ত্রী বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের কোন জায়গাতেই উন্নয়নের গতি হ্রাস করতে ইচ্ছুক নন। সরকার অবশ্য অনুন্নত অঞ্চলগুলির উন্নয়নের গতি বাড়াতে চান কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে অন্যান্য রাজ্যগুলির উন্নয়নের গতি কমাতে হবে।

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীকরণের কথা উল্লেখ করে, প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, এই আইনটি কার্য্যকরী করার পর গোড়ার দিক থেকেই ভাল ফল দিতে সুরু করে। গত বছরের তুলনায় এবারে সরকারী ঋণের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যায়। রাষ্ট্র যখন আনুমাণিক ৫০.৭ কোটি টাকা ঋণ সংগ্রহ করতে চান তখন প্রকৃতপক্ষে ৭৮.৬৮ কোটি টাকা পাওয়া যায়। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য যখন আনুমাণিক ১৯.২০ কোটি টাকা ঋণ সংগ্রহ করতে চাওয়া হয় তখন আসলে পাওয়া যায় ৮০ কোটি টাকা। এত বেশী টাকা পাওয়ার অন্যতম কারণ হল ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীকরণ। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এমন কি একটি রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যে অসমতা রয়েছে আমাদের সীমাবদ্ধ সম্পদ নিয়ে সেই বৈষম্য আস্তে আস্তে দূর করে অগ্রগতি বজায় রাখতে হবে।

এর পূর্ব্বে উদ্বোধনী ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধান মন্ত্রী বলেন, "আমাদের ন্যূনতম যে সব কাজ করতে হবে তা এই চতুর্থ পরিকল্পনায় বলা হয়েছে। প্রকৃত ইচ্ছা নিয়ে সুরু করলে এই কাজগুলি সম্পূর্ণ করা আমাদের ক্ষমতা বহির্ভূত নয়। এই পরিকল্পনায় উল্লিখিত কর্ত্তব্যগুলি যদি আমরা সুদৃঢ় মনোভাব নিয়ে রূপায়িত করতে অগ্রসর না হই তাহলে আমরা জনসাধারণের কাছে আমাদের দায়িত্ব পালনে বিফল হবো। আমরা যদি সমগ্রভাবে আমাদের দেশকে উন্নততর করে তুলতে পারি এবং অগ্রগতি করার জন্য একটা দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলতে পারি তাহলেই শুধু আমরা আমাদের স্থানীয় অসুবিধে সমাধান করতে পারবো।

অধ্যাপক গাডগিলের মন্তব্য

এর পূর্ব্বে জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান অধ্যাপক গাডগিল বলেন যে, পর্ষদের বিগত অধিবেশনে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সেই অনুযায়ী এবং ১৯৬৯-৭৪ সালের জন্য অর্থ কমিশনের সুপারিশগুলি সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ার পর পরিকল্পনা কমিশন প্রতিটি রাজ্যের আর্থিক অবস্থা পুনরায় পরীক্ষা ক'রে দেখেন। তাতে দেখা যায় যে, অর্থ-কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় অর্থের কিছু অংশ রাজ্যগুলিকে দেওয়া হলেও চতুর্থ পরিকল্পনার সময়ে অনেকগুলি রাজ্যেরই পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে মোটামুটি ঘাটতি থাকবে।

অধ্যাপক গাডগিল বলেন যে, একটা অভিন্ন মানদণ্ড বা নীতির মাধ্যমে এই পরিস্থিতি আয়ত্বে আনা কঠিন। পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় কি রকমভাবে হ্রাস করা যেতে পারে, রাজ্যগুলি পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য কি করে যথাসম্ভব বেশী লগ্নি করার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ করতে পারে সে সম্পর্কে ব্যবস্থাদি অবলম্বন করতে পরিকল্পনা কমিশন খুবই উৎসুক। এই রকম ক্ষেত্রে এমন একটা নীতি স্থির করা উচিত যাতে অতিরিক্ত সম্পদ সংহত করা সম্পর্কে রাজ্যগুলির প্রচেষ্টা বজায় থাকে এবং এই অতিরিক্ত সম্পদ, পরিকল্পনা বহির্ভূত কাজে খরচ না হয়ে যাতে রাজ্যগুলির পরিকল্পনা রূপায়নেই খরচ হয় তা সুনিশ্চিত করা যায়।

অধ্যাপক গাডগিল বলেন যে, অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুসারেই কিছু কেন্দ্রীয় কর রাজ্যগুলিকে হস্তান্তর করা

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

ক্ষুদ্র শিল্পে উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

অর্থনীতির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের যেমন গুরুত্ব রয়েছে তেমনি দেশের শিল্পোন্নয়নকে সম্পূর্ণ করার মূলে রয়েছে, সমবায়ের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। বৃহত্তর শিল্পের রয়েছে নিজস্ব সংগঠন, নিজস্ব পুঁজির জোর। কিন্তু ক্ষুদ্র শিল্পের নিজস্ব সংগঠন প্রায়ই অত্যন্ত দুর্ব্বল সুতরাং একক শক্তিতে সমস্ত সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু সমবায়ের মধ্যে রয়েছে সেই সংগঠনী শক্তি। ক্ষুদ্র শিল্পের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে মূলধন অথবা পুঁজির সমস্যা প্রধান। সমবায় ঋণ সংস্থার সুষ্ঠু বিন্যাসের ওপর এই মৌল সমস্যার সমাধান অনেকটা নির্ভর করছে। সমবায় ঋণদান সংস্থার শিল্প ঋণদান পদ্ধতিও খুব সরল আর সুদের হার নিতান্তই স্বল্প, শতকরা মাত্র আড়াই টাকা। সমস্ত শ্রেণীর লোক ঋণের সুবিধা পেতে পারে।

সমবায় ঋণ সংস্থা

সমবায় ঋণ সংস্থার গঠন শৈলী অনেকটা ত্রিতল ব্যবস্থার মত। শীর্ষে রয়েছে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক—বাংলা দেশে যার সংখ্যা একুশ, শাখা প্রশাখা মিলিয়ে মোট ৫৪। এর পরেই রয়েছে দুটি রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক। কৃষি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে রয়েছে তেরো হাজার আটশো ছেচল্লিশটি প্রাথমিক সমবায় ঋণ সংস্থা। এই বিরাট সংগঠনের জাল অর্থনীতির প্রায় প্রতিটি স্তরকেই স্পর্শ করেছে। বাংলা দেশের মোট ৩৮ হাজার পাঁচশো ত্রিশটি গ্রামের মধ্যে ৩০৮৬৪ টি গ্রাম সমবায় ঋণ সংস্থার সুযোগ পাচ্ছে। আমাদের দেশে তাঁত, কারু শিল্প ও গ্রামীণ শিল্পের ক্ষেত্র অতিক্রম করে সমবায় ঋণ সংস্থার পরিধি ক্রমশই বিস্তৃত হচ্ছে। বোম্বাই, মহীশূর, উত্তর প্রদেশে শুধু মাত্র ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনেই বিশেষ সমবায় ঋণ সংস্থা স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৬৫-৬৬ সালের সমীক্ষায় প্রকাশ প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক, শিল্পের স্বল্প মেয়াদী চাহিদা পুরণের জন্য মোট ২৪ হাজার টাকার ঋণ মঞ্জুর করেছিলেন, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক মঞ্জুর করেছিলেন ৬ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা।

ক্ষুদ্রশিল্পের বিপণন সমবায় বিপণন সংস্থা

সমবায় ঋণ সংস্থা কোন কোন সময় সমবায় বিপণন সংস্থায় পরিণত হতে পারে। ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে বিপণনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাও সময় সময় সমস্যার আকার ধারণ করে। বিপণনের একটি দিক হল প্রস্তুতকারী সংস্থাকে সময়মত ন্যায্য মূল্যে কাঁচামালের যোগান দেওয়া, অন্যটি, উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে ব্যাপক বিপণন। অর্থ সাহায্য এবং কাঁচামাল সরবরাহ একই উদ্দেশ্যের দুটি ভিন্নরূপ। ক্ষুদ্র সংস্থার

পশ্চিম বাংলার চিত্র

কাঁচামাল সংগ্রহের সমস্যা ভারতবর্ষের শিল্প ইতিহাসে একটি পুরাতন উপসর্গ। অর্থের অভাবে, পাইকারি বাজার থেকে এককালীন কাঁচা মাল সংগ্রহ অনেক সংস্থার পক্ষেই সম্ভবপর হয় না। এই সমস্ত সংস্থা সাধারণত খুচরো বাজার থেকে কাঁচা মাল সংগ্রহ করে পাইকারি বাজারে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ে বাধ্য হয়। এই বিচিত্র পদ্ধতি অনুসরণের ফলে এই সমস্ত সংস্থার অর্থনৈতিক কাঠামো ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ে। সমবায় বিপণন সংস্থা এই সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম। তাঁত শিল্পের ক্ষেত্রে সমবায় বিপণন সংস্থা একটি পরীক্ষিত সাফল্য। এই শিল্পের ক্ষেত্রে ঋণ সমবায়গুলিই পরবর্ত্তীকালে বিপণন সংস্থায় রূপান্তরিত হয়ে তন্তুজীবীদের সুতো, রঙ প্রভৃতি কাঁচা মাল সরবরাহ শুরু করে। এই শিল্প সমবায়গুলির শীর্ষে রয়েছে 'এ্যাপেক্স সোসাইটি'। এ্যাপেক্স সোসাইটি, প্রাথমিক সমিতিগুলিকে সুবিধাজনক মূল্যে কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যাপারে সাহায্য করে থাকে। কাঁচামাল সরবরাহের পাশাপাশিই রয়েছে উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যাপক বিপণন সমস্যা। সমবায় বিপণন সংস্থা এই দায়িত্ব বহনের প্রতিশ্রুতি দিতে পারে।

বিপণন সমবায়গুলির কর্মপদ্ধতি

সমবায় বিপণন সংস্থা উপযুক্ত সময়ে, সভ্যসংস্থাগুলির উৎপাদিত পণ্য বিপণন ক'রে শিল্পসংস্থার স্বার্থ সংরক্ষিত করছে। বাজারে দালাল অথবা ঐ জাতীয় একদল পরাশ্রিত মানুষের হাত থেকে ক্ষুদ্র শিল্পকে রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সমবায় বিপণনের কর্মসূচীতে প্রতিফলিত। তাঁত এবং হস্ত শিল্পের ক্ষেত্রে সমবায় বিপণনের ভূমিকা পরীক্ষিত হয়েছে। তন্তুজাত জিনিসের সমবায় বিপণন সমিতিগুলির শীর্ষে যে এ্যাপেক্স সোসাইটি রয়েছে সেই সোসাইটি তন্তুজ সামগ্রীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচার চালাচ্ছে। প্রধান, প্রধান উৎসবের প্রাক্কালে তন্তুজ সামগ্রী সংগ্রহ করে সমিতি পরিচালিত বিভিন্ন বিপণীর মাধ্যমে বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করে থাকে। রাজ্য সরকার প্রাথমিক সমিতিগুলিকে অর্থ সাহায্যের পাশাপাশি সরবরাহ করছেন আধুনিক সাজসরঞ্জাম ও উন্নত নমুনা। কারুশিল্পের ক্ষেত্রেও বিপণনের সমবায় ভিত্তিক ব্যবস্থা প্রাচীন প্রচেষ্টাগুলির অন্যতম। ক্ষুদ্র শিল্পের অন্যান্য বিভাগে, যেমন—চামড়া পাকা করা, পটারি, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, তাল গুড়, আখের গুড়, খান্দসারি, ফল ও সব্জি সংরক্ষণ, সৌখীন চর্মশিল্প, পূর্ত সামগ্রী, ছোবড়া শিল্প, গ্রামীণ শিল্প এবং অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও সমবায় বিপণন সমিতিগুলি দৃঢ়পদক্ষেপ এগিয়ে চলেছে। ১৯৬৭ সালের এক সমীক্ষায় জানা যায় বাংলা দেশে তাঁত ছাড়া অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও ৪০২টি প্রসেসিং তথা বিপণন সমিতি রয়েছে। এই সমিতিগুলি মোট একলক্ষ তিরানব্বই হাজার টাকার কাঁচা মাল সরবরাহ করেছে। সমিতির সভ্য শিল্প সংস্থাগুলির উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করেছে মোট কুড়ি লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকার। এই সমস্ত সমিতির পরিচালনায়

রয়েছে ৪৪টি বিক্রয় কেন্দ্র।

এমন বহু ক্ষুদ্র শিল্প রয়েছে যেখানে কাঁচামালকে উৎপাদনের পর্যায়ে আনা ব্যয় সাপেক্ষ, বিজ্ঞান সম্মত কতকগুলি প্রয়োগ বিধির মাধ্যমে—যেমন মৃৎশিল্পে যে ক্লে ব্যবহার করা হয়, অথবা চামড়া শিল্পের চামড়া, বা রাবার শিল্পের রাবার। ঠিক অনুরূপভাবে উৎপাদনের শেষেও কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উচ্চতর প্রসেসিংএর প্রয়োজন হয়। ক্ষুদ্রশিল্পের একক প্রচেষ্টায় ব্যয় সাপেক্ষ এই সব প্রসেসিংএর যন্ত্রপাতি কেনা সম্ভব হয় না, ফলে সমবায় প্রসেসিং সোসাইটিকে এগিয়ে আসতে হয় আধুনিক ক্ষুদ্র শিল্পের সাহায্যে। সমবায় পরিচালিত আধুনিক কারখানায় উচ্চতর প্রয়োগ বিধির সাহায্যে এই সব জটিল প্রসেসিংগুলি শেষ করা হয়। জাপানে এই জাতীয় সমবায়গুলি শিল্পে উচ্চতর প্রয়োগ কৌশলের পথ সুপ্রশস্ত করেছে এবং উৎপাদনের মান-উন্নয়নে এক অপরিহার্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

বহুমুখী সমবায় সমিতি

রাজ্যের গ্রামীণ শিল্প উন্নয়ন প্রকল্পে শিল্পসেবা তথা বিপণন ইউনিয়নের সাফল্য রাজ্যের সমবায় চিন্তায় এক নতুন প্রতিফলন এনেছে। এই ধরণের বহুমুখী সমিতি শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে। বারাসতে, তমলুক, দার্জিলিং ও দুর্গাপুরে একটি করে এই জাতীয় সমবায় সমিতি স্থানীয় ক্ষুদ্রশিল্পগুলিকে অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে নিয়ে চলেছে। জাপানের সমবায়গুলির আদর্শে এই সমিতিগুলি বৃহৎ শিল্প সংস্থা এবং বিভিন্ন প্রকল্পের বহু অর্ডার সভ্য সংস্থাগুলির মধ্যে বিতরণ করে দিচ্ছেন, সরবরাহ করছেন কাঁচামাল, অর্থ, প্রযুক্তি বিদ্যা। কৃষি এবং ক্ষুদ্রশিল্পের সহ-অবস্থান এঁরা মেনে নিয়েছেন। সেই কারণে এঁদের সভ্য সংস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে, ডেয়ারি, পোলট্রি, কাঠ চেরাই থেকে শুরু করে দেশলাই এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প। আলোচ্য বৎসরে এই সমবায়গুলির ক্রয়ের পরিমাণ ১,১২,৬৯৮,৯৩ টাকা, বিক্রয়ের পরিমাণ ১.৬৬;১৬৩,১৮ টাকা। '৬৯-৭০ সালে লাভের অঙ্ক দাঁড়াবে আনুমানিক দশ হাজার টাকা।

ভবিষ্যৎ কর্মসূচী

চতুর্থ পরিকল্পনায় শিল্প সমবায়গুলির জন্য অন্যান্য আরো দায়িত্ব চিহ্নিত হয়েছে। সিংহল, বুহ্মদেশ অথবা ডেনমার্কের অনুকরণে সমবায় শিল্পনগরী স্থাপিত হবে। বর্তমানে যে শিল্পনগরগুলি রয়েছে সেগুলিকে সমবায়ের [illegible] ক্ষুদ্র শিল্প, বিশেষত দার্জিলিং [illegible] আন্দোলন আরো তীব্র হবে। [illegible] লক্ষ্য মাত্রা স্থির হয়েছে ৬৮ [illegible] সমিতি, ৬৫ লক্ষ সভ্য সংখ্যা এবং [illegible] গ্রাম।

ধূপ রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন

আমাদের দেশে ধূপ ও ধূপকাঠি তৈরির প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র হ'ল মহীশূর, তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্র। এই তিনটি রাজ্যে মোট সাড়ে তিন কোটি টাকার ধূপ প্রভৃতি তৈরি হয়। এরমধ্যে মহীশূরের অংশই হ'ল আড়াই কোটি টাকার ওপর। ১৯৬৭-৬৮ সালে মোট ধূপ রপ্তানী করা হয়েছে ৫৯.৪১ লক্ষ টাকার। সরাসরি মহীশূর রাজ্য থেকে ৩০ লক্ষ টাকার ধূপ চালান যায়। এ ছাড়া বোম্বাই-এর ব্যবসায়ীদের মারফৎ মহীশূরে তৈরি প্রচুর ধূপ বাইরে চালান দেওয়া হয়।

পৃথিবীর অন্তত: ৮০ টি দেশে ভারতীয় ধূপ গিয়ে পৌঁচেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশ হ'ল ভারতীয় ধূপের প্রধান গ্রাহক।

নির্বাচিত তথ্য

বায়গুলির সংখ্যা, সভ্যসংখ্যা এবং অন্যান্য তথ্য নিম্নে তালিকার আকারে দেওয়া হল :

সময়—'৬৭ সালের জুন মাসের শেষে

শিল্প	সমিতির সংখ্যা	কার্যরত সমিতি	সভ্যসংখ্যা	উৎপাদন টাকার অঙ্কে	বিক্রয় টাকার অঙ্কে	কার্যকরী মূলধন
চামড়া সংগ্রহ ও পাকা করা	১৬	৬	২৮৭	১০,০০০	৮,০০০	১,৯৯,০০০
মৃৎশিল্প	৪৮	২৪	৮৫২	২,০,৩০০০	১,২৬,০০০	১,৮৯,০০০
তৈল উৎপাদন	৫৭	৩১	৬'৬	২,১০,০০০	১,০,৪০০০	—
সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	৯৮	১৭	১২৫০	৩৮,৬৮,০০০	৩০,০,৮১০০০	—
কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং	২					
চামড়ার কাজ	১৭					
পূর্ত্ত সামগ্রী	১০		৪০৯			
ছোবড়া শিল্প	৭		১২৫			
রেশম শিল্প	৯		৪২০			
অন্যান্য গ্রামীণ শিল্প	৩৯		৩৪২৭			
কারু শিল্প	১০০		৫৬১৭			
অন্যান্য শিল্প	১০৫		৩৭৮৭			

(ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রকাশিত)

সবে মিলি করি কাজ

চন্দ্র—বিজয়—তারপর আবার পৃথিবীর বুকে ফিরে আসা ! দারুণ সাফল্য, নয় কি ? হ্যাঁ, তাতো বটেই কিন্তু এই সাফল্যের চাবিকাঠি হলো সহযোগিতা। নীচে গ্রাউণ্ড কংট্রোলে বসে বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামাচ্ছেন আর অনন্ত আকাশে রয়েছেন নভোচারীর দল—যাঁদের রয়েছে শৃঙ্খলাজ্ঞান, যাঁরা সব সময়ে সপ্রতিভ... এই সহযোগিতার ফলেই চাঁদে মানুষেরপা পড়লো।

অতদূরে যেতে হবে কেন ? বাড়ীর পাশের ঘটনার কথাই নিন না ! অন্ধ্র প্রদেশের নাগার্জুন সাগরের জল যে সমস্ত চাষের জমিতে জুগিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই সব জমিতে হয়েছে প্রচুর ফলন। কিন্তু এই ফলনের পেছনেও রয়েছে সহযোগিতা ! আজ আমরা বিজ্ঞানের যুগে বাস করছি। নাগার্জুন সাগরে আজ যা হয়েছে, কাল তা অন্যত্র হতে পারে। অবশ্য যদি উপায় ঐ একই থাকে অর্থাৎ সহযোগিতা।

এক্ষেত্রে সমবায়ের পাঁচটি উপায় ছিলো

- সেচ—বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রচুর জলের ব্যবস্থা
- কোন্ ফসলের জন্যে কি ধরণের মাটী উপযুক্ত তা স্থির করবার জন্যে মাটী পরীক্ষা
- বেশী ফসল পাওয়া যায় ও রোগের হাত থেকে বাঁচতে পারে—এমন ধরণের উন্নত বীজ।
- মাটী উর্বর করবার জন্যে আবশ্যকীয় পরিমাণে রাসায়নিক সার ও জৈবিক সারের প্রয়োগ
- কৃষিকে আধুনিক শিল্পরূপে গড়ে তোলবার জন্যে সমবায় সমিতি থেকে ঋণ পাওয়ার সুযোগ সুবিধে

সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় অধিক কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন।

[illegible]-69/ 571

ভারতের বন্দর উন্নয়ন

জাতীয় বাণিজ্যে বৃহৎ তৈলবাহী জাহাজগুলির বৃহত্তর ভূমিকা

অরুণ কুমার রায়

ভারত মহাসাগরের দিকে ৫,৭০০ কিঃ মীঃ দীর্ঘ উপকূলসহ ভারতের ৮টি প্রধান ও ২২৬ টি মাঝারি ও ছোট বন্দর, ভবিষ্যতে বিশ্বের বাণিজ্যে একটা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করবে।

১৯৬৭-৬৮ সালের শেষ পর্যন্ত দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দরগুলির মাধ্যমে মোট সাড়ে পাঁচ কোটি মেট্রিক টন মাল চলাচল করে, আর এই পরিমাণটা হ'ল প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুরুর সময়কার তুলনায় তিনগুণ বেশী।

বন্দর উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণও ক্রমশঃ বেড়েছে। প্রথম পরিকল্পনায় এর পরিমাণ ছিল ২৬.৩২ কোটি টাকা, তৃতীয় পরিকল্পনায় ৯২.৭৫ কোটি টাকা।

চতুর্থ পরিকল্পনায় আনুমানিক ২৯৬ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে এবং ১৯৭৩-৭৪ সালের শেষ পর্যন্ত মাল চলাচলের লক্ষ্য রাখা হয়েছে ১০ কোটি মেট্রিক টন।

বিশ্বের সামুদ্রিক বাণিজ্যের দুটি প্রধান লক্ষণ, ভারতের বন্দর উন্নয়ন কর্ম্মসূচীকে একটা বিশেষ দিকে প্রভাবিত করেছে। দুটির মধ্যে প্রধান লক্ষণটি হ'ল, সাধারণ খুচরো জিনিষের পরিবর্তে জাহাজে ক'রে বিপুল পরিমাণে একটা জিনিস পরিবহণ

(ওপরে) মাঙ্গালোর বন্দরে
(বাঁদিকে) কাণ্ডলা বন্দরে
(ডানদিকে) কোচিন বন্দরে
(নীচে) শোধিত এবং
পাইপ লাইন ; বোম্বাই

করা হচ্ছে। দ্বিতীয়টি হ'ল সমুদ্রে বাণিজ্যেপথের দূরত্ব বৃদ্ধি। এর ফলে বিমান পথে জাম্বো জেটের মত সমুদ্রপথে চলার জন্য বিপুল আকারের ট্যাঙ্কার তৈরি হচ্ছে। ভারতের বাণিজ্য বহর এশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম। কাজেই ভারতের বন্দরগুলিতে এই সব বিরাট আকারের ট্যাঙ্কারগুলির জন্য সুযোগ সুবিধের ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন। ১৯৬৬-৬৭ সালে ভারতের প্রধান বন্দরগুলির মাধ্যমে ৪ কোটি ২০ লক্ষ টন অশোধিত তেল ইত্যাদির মতো, মোটা আকারের মাল চলাচল করেছে। ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় এই পরিমাণটা হ'ল ৪ গুণ বেশী।

আগামী পাঁচ বছরে, বন্দর উন্নয়ন কর্ম্মসূচীর লক্ষ্য হবে, প্রধানতঃ ১ থেকে ১॥ লক্ষ টনের মালবাহী জাহাজে বাহিত, ১০ কোটি মেট্রিক টন মাল যাতে ভারতের বন্দরগুলির মাধ্যমে চলাচল করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

বর্ত্তমানে পশ্চিম উপকূলের চারটি বন্দর কাণ্ডলা, বোম্বাই, মর্মুগাও, এবং কোচিন ও পূর্ব্ব উপকূলের চারটি-মাদ্রাজ, বিশাখাপতনম, পরাদীপ এবং কলিকাতা এই আটটি প্রধান বন্দর এবং পশ্চিম উপকূলের মাঙ্গালোর ও পূর্ব্ব উপকূলের তুতিকোরিন এই দুটি মাঝারি বন্দরকে সর্ব্ব ঋতুর

ভারতের

। চলেছে

হাষ্যে গম খালাস করা হচ্ছে

নোর জন্য অপেক্ষমান জাহাজসমূহ

জাহাজে বোঝাই ও খালাস করার

ঞল · বন্দরসমূহ

পক্ষে উপযোগী প্রধান বন্দরে পরিণত করা হবে।

উপবন্দর

বর্ত্তমানের কলিকাতা বন্দরে ৫৬৫ ফিটের চাইতে বড় জাহাজ ভিড়তে পারেনা। কাজেই বেশী পরিমাণ মাল চলাচলের উপ-যোগী একটা উপবন্দর হলদিয়াতে তৈরি করা হচ্ছে। আগামী বছরে এখানকার কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বোম্বাই বন্দর থেকে ১১ কিঃ মীঃ দূরে নবশিবতেও একটি উপবন্দর তৈরি হবে। ৭০ বর্গমাইল বিস্তৃত বোম্বাই বন্দর মারফত দেশের একটা বিরাট অংশের মাল চলাচল করে। তাছাড়া বোম্বাইতে বহু শিল্পও রয়েছে। সেই জন্য এটির আরও উন্নয়নের জন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় ৪৮.১৪ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। জাহাজ ভেড়ার জন্য আরও ৪ টি বার্থ যুক্ত করে বার্থের সংখ্যা ২১ টি করা হচ্ছে। এল অক্ষরের আকারে একটি ফেরি জেটি তৈরি করা হয়েছে। সেসুন ডকের কাছে মাছ ওঠানো নামানোর জন্য একটি বন্দর তৈরি করা হবে। বর্ত্তমান বন্দরটির মাধ্যমে বার্ষিক ১২০০ টন মাছ ওঠা নামা করতে পারে। এটির ক্ষমতা বাড়িয়ে ৪০,০০০ মেট্রিক টন করা হবে। বড় তৈলবাহী জাহাজ ভিড়তে পারে এই রকম বার্থ তৈরি করারও পরিকল্পনা করা হয়েছে।

১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

পরিকল্পনা ও সমীক্ষা

তাঞ্জাউর জেলার মন্নুরম ব্লকে নিবিড় কৃষি কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ হচ্ছে। প্রয়োজনীয় সার ইত্যাদি প্রয়োগ ক'রে কৃষি উৎপাদন যথাসম্ভব বাড়ানোই হ'ল এই কর্মসূচীর লক্ষ্য।

এই কর্মসূচী অনুযায়ী কেমন কাজ হচ্ছে তার মূল্যায়ণ করার জন্য তিরুচির-পল্লীর সেন্ট জোসেফ কলেজের, পরিকল্পনা সমীক্ষাকারী দল সেখানে যান।

এই অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে যে, এই কর্মসূচী ঐ এলাকায় কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা পরিবর্ত্তন এনেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। একর প্রতি কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট বেড়েছে। তবে এই কর্ম্মসূচী সম্পর্কে কৃষকদের উৎসাহী ক'রে তোলার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে কর্ম্মচারীতন্ত্রের জটিলতা কমাতে হবে।

এই ব্লকটির অধীনে ৫৮টি গ্রাম আছে এবং কৃষি জমির পরিমাণ হ'ল ৫৭৪৯৪ একর। কাবেরী নদীর বদ্বীপ এলাকার পলিমাটি রয়েছে বলে এখানকার জমি বেশ উর্ব্বর। সমগ্র অঞ্চলটির উর্ব্বরতা মোটা-মুটি এক রকম হলেও স্থানীয় কতকগুলি বৈচিত্র্য রয়েছে। স্থানীয় এই রকম বৈচিত্র্য-গুলি পরীক্ষা ক'রে যাতে অভিন্ন একটা চাষ পদ্ধতির মাধ্যমে সর্ব্বোচ্চ ফল পাওয়া যায় সেই জন্য নিবিড় চাষের অন্তর্ভুক্ত এই এলাকাটিতে একটি মাটি পরীক্ষাকারী দলও কাজ করছেন। কাবেরী নদী থেকে খালের সাহায্যেই প্রধানত: এই ব্লকের সেচের জলের চাহিদা মেটানো হয় তবে মেট্টুর জলাধারের জলও সেচের জন্য ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া কুয়ো, ব্যব-হৃত হয়না।

সাধারণভাবে বলতে গেলে এই এলা-কার জল সরবরাহের অবস্থা সন্তোষজনক হলেও, বর্ষা, বন্যা, ঝড়ের মতো প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়গুলি থেকে কৃষকরা রেহাই পান না। বিশেষজ্ঞগণ অবশ্য মনে করেন যে বর্ত্তমানে এই ব্লকে যে জল পাওয়া যায় তার সবটার উপযুক্ত ব্যবহার হয়না বরং অপচয় হয়। সরকারী বীজ আবাদ থেকে অধিক ফলনের যে সব বীজ সরবরাহ করা হয়, কৃষকরা ক্রমশ: তা বেশী পরিমাণে ব্যবহার করছেন।

এখানকার কৃষকরা রাসায়নিক সার সম্পর্কেও সচেতন হয়ে উঠছেন এবং এগুলি তাঁরা বেশী পরিমাণে ব্যবহার করতে সুরু করেছেন। তবে এঁরা তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী সার পাচ্ছেন না। এই এলাকার জন্য বরাদ্দ সারের পরিমাণ, তাঁদের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। কৃষকদের প্রধান অভিযোগ হ'ল যেটুকু সার এখানকার জন্য বরাদ্দ করা হয় তাও উপযুক্তভাবে বন্টন করা হয়না তাছাড়া এগুলি নাকি উপযুক্ত গুণসম্পন্ন নয়। নিম্নস্তরের সারও কোন কোন সময়ে উচ্চ স্তরের বলে চালিয়ে দেওয়া হয় আর এতে ভেজাল থাকাটা খুবই সাধারণ ব্যাপার। সর্ব্বশেষে খোলাবাজারে সারের যে দাম চাওয়া হয় তা কৃষকদের পক্ষে বেশ বেশী।

চিরাচরিত সার আর রাসায়নিক সার এই দুটোর মধ্যে কোনটার কি গুণ তা কৃষকরা স্থির করতে পারেন না। নিবিড় চাষের অন্তর্ভুক্ত এলাকার সরকারী সংস্থা-গুলি রাসায়নিক সারের ওপর এত বেশী গুরুত্ব দিয়েছে যে কৃষকরা চিরাচরিত সারের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়ে রাসায়নিক সারই ব্যবহার করছেন। অন্যদিকে আবার আর একদল কৃষক সরকারি প্রচারে সন্দেহ করে, তাদের চিরাচরিত সার অর্থাৎ গোবর ইত্যাদির ব্যবহার করে চলেছেন। কৃষকদের পক্ষে আর একটা প্রধান অসুবিধে হল, তাঁরা উপযুক্ত সময়ে যথেষ্ট পরিমাণ কীটনাশক পান না।

এই ব্লকে যে সব কৃষি সাজ সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয় সেগুলির বেশীর ভাগই পুরানো ধরণের। নতুন যে সব সরঞ্জাম ব্যবহার করা হচ্ছে, সেগুলি হ'ল কয়েক রকমের লোহার লাঙ্গল। কৃষি শ্রমিকের অভাব, ক্রমবর্ধমান মজুরি এবং ভূমিস্বত্ব ও কৃষিশ্রমিকের মধ্যে সম্পর্কের ক্রমাবনতির ফলে, এই এলাকার কৃষকরা ক্রমশ: ট্রাক্টার ও অন্যান্য কৃষি সরঞ্জামের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন। যাই হোক, কৃষি যন্ত্রসজ্জিত হতে এখনও অনেক দিন লাগবে।

নিবিড় কৃষি কর্ম্মসূচীকে সফল করে তুলতে হলে প্রয়োজনীয় সার ইত্যাদি কেনার জন্য কৃষকদের বেশী অর্থের প্রয়োজন বলে, সমবায় সমিতিগুলি তাদের কিছুটা টাকায় এবং কিছুটা জিনিসে বিশেষ ঋণ দেয়। তবে গরীব চাষীদের যে ঋণ দেওয়া হয় তা সব সময়ে তাঁদের প্রয়ো-জনের উপযুক্ত হয়না। তাছাড়া ঋণের টাকা পেতে অনেক সময় এত দেরী হয় যে তখন সেই টাকার প্রয়োজনীয়তা অনেক-খানি কমে যায়। তাছাড়া ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থাটাও সর্ব্বক্ষেত্রে কৃষকদের পক্ষে সুবিধেজনক নয়। তবে এই ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সমবায় সমিতিগুলিই দোষী নয়। এমন অনেক কৃষক আছেন যাঁরা ঋণ পরি-শোধে আগ্রহী নন। ফসল ভাল হয়নি বলেই যে তাঁরা ঋণ পরিশোধ করেন না তা নয়, ভালো ফসল হলেও তাঁরা অনেক সময়ে ঋণ পরিশোধ করেন না। এটা অবশ্য একটা অদ্ভুত মনোভাব এবং এই ধরণের মানোভাব সমগ্র পল্লী ঋণ ব্যবস্থাতেই একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

জোয়ারের মত পুষ্টিকর জাব

রুক্ষ অঞ্চলে মানুষের খাদ্যের মত গবাদি পশুর খাদ্যের জন্যও চাষবাস কষ্টসাধ্য। রুক্ষ জায়গায় বেশ ভালো-ভাবে জন্মায় এক ধরনের ঘাস—তার নাম জনসন ঘাস। দেখতে জোয়ারের মত। রাজস্থানের মালপুরাস্থ কেন্দ্রীয় মেষ ও উল গবেষণা প্রতিষ্ঠান এই খবরটি দিয়েছে।

যে বছর মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হয় সে বছরে হেক্টার প্রতি ঘাসের উৎপাদন ৪০০ থেকে ৫০০ কুইন্টাল পর্যন্ত হয়। এই ঘাস জোয়ারের মত পুষ্টিকর এবং সর্বশ্রেণীর জন্তু জানোয়ারের প্রিয়। এই ঘাস সবুজ অবস্থায় এবং শুকনো জাব হিসেবে দেওয়া যেতে পারে।

রুক্ষ অঞ্চলে বর্ষার মরশুমে এই ঘাস জন্মানো হয়।
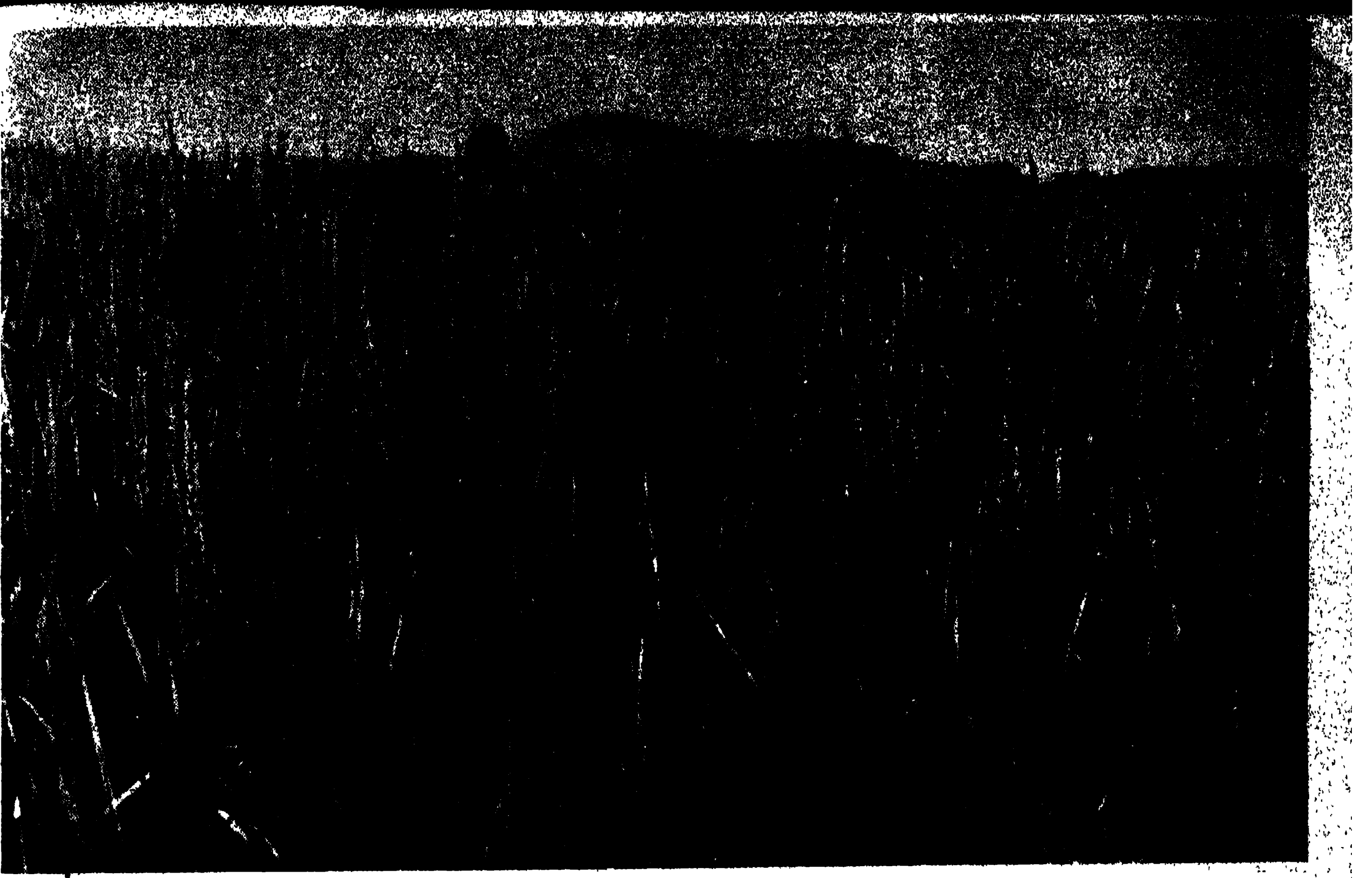
আসামের কৃষিক্ষেত্রে আলোড়ন

ধীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী

কিছুদিন পূর্ব্বে সমগ্র আসাম মাঘ বিহু উৎসবে মেতে উঠেছিল। ফসল তোলার সর্ব্বজনপ্রিয় উৎসবই হল মাঘ বিহু বা ভোগালি বিহু। আসামের লক্ষ লক্ষ কুটিরে ও প্রাসাদে এই উপলক্ষে পিঠে পায়েস তৈরি হয়েছে, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন একে অপরকে এই উৎসব উপলক্ষে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এবারে এই উৎসবে ধনী দরিদ্র সবাই যেমন আনন্দে মেতে উঠেছিলেন গত কয়েক বছরের মধ্যে তেমনটি দেখা যায়নি। ফসল ভালো হ'লে আমরা বলি মা লক্ষ্মী এবারে দুহাতে ঢেলে দিয়েছেন।

কিন্তু ফসল বাড়ার পেছনে কেবলমাত্র ভগবানের আশীর্ব্বাদই ছিলোনা মানুষের পরিশ্রমও ছিল। ব্রহ্মপুত্র-বরাক নদীর উপত্যকায় ও সবুজ পাহাড়গুলির শস্যক্ষেত্রগুলিতে নিঃশব্দে একটা চমকপ্রদ আলোড়ন চলেছে। চিরাচরিত কৃষি পদ্ধতির সঙ্গে বিজ্ঞানকে যুক্ত করার জন্য গত কয়েক বছর থেকে যে পরিকল্পনা চলছিল, তা থেকে বেশ লাভ আসতে সুরু করেছে। উন্নত ধরণের কৃষি পদ্ধতি, বেশী জলসেচ ও বিদ্যুৎশক্তি, উন্নততর বীজ, কৃষি যন্ত্রাদি ও সারের ব্যবহার এখন আর কৃষকদের কাছে নতুন কিছু নয়। এগুলি এখন বর্ত্তমানের প্রয়োজন বলে মনে করা হচ্ছে।

আসামের মোট আয়তন ৩০১.৪ লক্ষ একরের মধ্যে ৮৮ লক্ষ একর হল বনভূমি এবং প্রায় ৬৮।। লক্ষ একর জমিতে চাষ করা হয়। এই রাজ্যটির অর্থনীতি সাধারণভাবে কৃষি ভিত্তিক। বর্ত্তমান লোকসংখ্যা হল প্রায় ১৫০ লক্ষ এবং এর মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগ কৃষির ওপর নির্ভরশীল ব'লে রাজ্যটির সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোও খুব বেশী পরিমাণে কৃষি ভিত্তিক। আসামের ভূমি উর্ব্বর, আবহাওয়া কৃষির অনুকূল এবং স্বাভাবিকভাবে জলের প্রচুর সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক নানা বিপর্য্যয়ের জন্য এই সুবিধেগুলি এ পর্যন্ত পুরোপুরি কাজে লাগানো যেতোনা।

অমিতবিক্রম ব্রহ্মপুত্রের মতোই, শস্য ক্ষেত্রের সাফল্যও অনিশ্চিত ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয় জনসংখ্যা। এর ফলে খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে আসাম বহু বছর ধরে কোন রকমে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জ্জন করে আসছিল। স্বাধীনতা লাভ করার পূর্ব্বে যখন জনসংখ্যার চাপ বর্ত্তমানের মতো এতো ভীষণ ছিলনা তখনও আসাম খাদ্যশস্যে উদ্বৃত্ত রাজ্য ছিল কিনা তা তথ্যাদি দিয়ে প্রমাণ করা কঠিন। ঐ সময়ে আসাম যদি বাংলা বা অন্যান্য রাজ্যে চাউল সরবরাহ করেও থাকে তাহলেও উদ্বৃত্ত ছিল বলেই রপ্তানী করতে পেরেছে

কিনা তা বলা যায়না, কারণ তখন প্রায় প্রতি বছরেই বর্ম্মা থেকে চাউল আমদানী করা হত। বিশেষ করে ১৯৫০ সালের ভীষণ ভূমিকম্প এবং তার পরে পর্য্যায়-ক্রমিক বন্যা, অবস্থাকে জটিল ক'রে তোলে। যাই হোক এগুলি হল বিগত ঘটনা।

বর্ত্তমানে আসামের অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরকম। রাজ্যটি এখন পাঞ্জাবের মতই খাদ্যশস্যে উদ্বৃত্ত হতে চলেছে। এটি এখন নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েও প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে খাদ্যশস্য সরবরাহ করতে সক্ষম।

আসামের প্রধান খাদ্য চাউল, কাজেই ধানের চাষে কুশলতার ওপরেই কৃষি কর্ম্ম-সূচীর সাফল্য পরিমাপ করা যায়। পূর্ব্বের কথা বলতে, স্বাধীনতা লাভ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আসামে চাউলের উৎপাদন বার্ষিক প্রায় ১৪ লক্ষ টন ছিল। প্রথম পরিকল্পনার সুরুতে ১৬.৬০ লক্ষ হেক্টার জমিতে ১৪.৯৪ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হয়। কিন্তু ১৯৬৮-৬৯ সালে ২১.৩৭ লক্ষ টন চাউল উৎপাদিত হয়। এর পূর্ব্বে এই রাজ্যে আর কখনও এতো চাউল উৎপন্ন হয়নি। প্রধান মরসুমের ফসল এই বছরে যা পাওয়া গেছে তাতে সকলেই উৎসাহ বোধ করছেন। ১৯৬৯-৭০ সালে ২২.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন চাউল উৎপাদিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। বর্ত্তমানে এই রাজ্যে ২২ লক্ষ হেক্টার জমিতে ধানের চাষ হচ্ছে।

অন্যদিকে আসাম হ'ল ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী রাজ্য এবং এই পণ্যশস্যটির উৎপাদনে আসাম যে প্রধান স্থান অধিকার করবে তার লক্ষণও সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। আসামের প্রধান পাট উৎপাদনকারী জেলা নগাওঁ, গোয়ালপাড়া, কামরূপ ও কাছাড়ে এখন চিরাচরিত কৃষি পদ্ধতির পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ নতুন কৃষি পদ্ধতি প্রচলিত হচ্ছে।

এই সাফল্যের কাহিনীতে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল আসামের নতুন গমের ক্ষেত্রগুলি।

আসামে কোন সময়েই গম চাষের তেমন কোন প্রচলন ছিলনা। এর যতটুকু গমের প্রয়োজন হ'ত তা বাইরে থেকেই আসতো। কিন্তু এখানে এখন ৮৫০০ হেক্টার জমিতে গমের চাষ হয় এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে ৪৭১৮ মেট্রিক টন গম উৎপাদিত হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে ১৭৫৯ হেক্টার জমিতে মাত্র ৮৮৩ টন গম উৎপন্ন হয়েছিল চলতি বছরে ৭০০০ টন গম পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

আর একটি প্রধান পণ্যশস্য আখের উৎপাদনও বেড়ে চলেছে। গত বছরে মোট ৩১০০০ হেক্টার জমিতে ১২১১৯৯ মেট্রিক টন আখ উৎপাদিত হয়। ১৯৫৬ সালে আখের উৎপাদন এবং আখ চাষের জমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৬৮৭৯ মেট্রিক টন এবং ২৫৬২৭ একর। চলতি বছরে আরও ১০ হাজার টন বেশী আখ উৎপন্ন হবে।

স্থানীয় অধিবাসীদের অন্যতম প্রধান খাদ্য গোলআলুর উৎপাদন সাফল্যও কম আশাপ্রদ নয়। আসামে বর্ত্তমানে ২.৩০ লক্ষ মেট্রিক টন আলু উৎপন্ন হয় এবং এই উৎপাদন হ'ল ১৯৫৬ সালের তুলনায় শতকরা ৭২ ভাগ বেশী।

কিন্তু এই সাফল্য একদিনে অর্জ্জিত হয়নি। কেবলমাত্র চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি বা অনুকূল আবহাওয়ার জন্যই যে আসাম বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁচেছে তা নয়। আসামের বর্ত্তমান সাফল্যের মূলে রয়েছে বিভিন্ন কারণ। এই অগ্রগতির মূলে যে সব ব্যবস্থা রয়েছে সেগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান ব্যবস্থাটি হ'ল জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ সহ ভূমি স্বত্ব সংস্কার। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে, চিরকাল-বঞ্চিত সরল কৃষক যখন দেখতে পাবেন যে এতকাল যে জমির জন্য তিনি প্রাণপণ পরিশ্রম করেছেন তিনিই সেই জমির মালিক, তখন সেইটেই হবে নীরবতম যুগান্তকারী বিপ্লব।

কৃষির এই অগ্রগতিতে অন্য যে আর একটি জিনিস গুরুত্বপূর্ণ অবদান জুগিয়েছে তা হল রাসায়নিক সার প্রয়োগ। কৃষি সম্প্রসারণ সেবার মাধ্যমে কৃষকরা যখন রাসায়নিক সারের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রচলিত সারের প্রয়োগ পদ্ধতি বুঝতে পার-লেন তখনই তাঁরা ক্রমশঃ বেশী পরিমাণে রাসায়নিক সার ব্যবহারে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। ১৯৬১-৬২ সালে আসামে মাত্র ১১২০ টন রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হয়, সেই তুলনায় ১৯৬৮ সালে ৩৯০০০ টন সার ব্যবহৃত হয়। চলতি বছরে ৬৫০০০ টন ব্যবহৃত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

পঙ্গপাল ইত্যাদি কীটাদির আক্রমণ থেকে শস্য রক্ষারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কামরূপ এবং উত্তর আসামে বিমানযোগে কীটনাশক ছড়িয়ে ভাল ফল পাওয়া গেছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ছোট সেচ প্রকল্পগুলিও উল্লেখযোগ্য অবদান জুগি-য়েছে। ৮ হাজার ছোট সেচ প্রকল্প ছাড়াও, অনেকগুলি গভীর নলকূপ এবং বিদ্যুৎশক্তি

শেষাংশ ১৬ পৃষ্ঠায়

হলদিয়ায় পেট্রো রসায়ন শিল্প নির্ভর ক্ষুদ্র শিল্প

সুরেশ দেব

প্রত্যেক বড় শিল্পের সঙ্গে নানানভাবে স্বাভাবিক ক্রমেই অনেক ছোট ছোট শিল্প গড়ে ওঠে। সেইদিক থেকে আধুনিক কালে রাসায়নিক শিল্পের ক্ষেত্রে পেট্রো-রাসায়নিক শিল্পের পরিধি আর পরস্পর নির্ভরতা এত বেশী যে একে একটি মাত্র শিল্প বলা হয় না, বলা হয় শিল্প সংহতি। আশা করা যায় যে হলদিয়াতে যে শোধনাগার স্থাপিত হতে চলেছে, তার অনুসঙ্গ হিসেবে, হলদিয়ার চার পাশে অনেক ছোট ছোট শিল্প, কাল ক্রমে গড়ে উঠবে। এই ছোট ছোট শিল্পগুলির গড়ে ওঠবার পথে কি কি অন্তরায় হতে পারে আর অন্যপক্ষে কি কি অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে তাই আমাদের আলোচ্য।

হলদিয়া বন্দর আর তৈল শোধনাগারকে কেন্দ্র করে অচিরে ওখানে যে একটা সমৃদ্ধ জনপদ গড়ে উঠবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এমন একটা সমৃদ্ধ জনপদের চাহিদার মান যেমন উঁচু হবার কথা তেমনি তার পরিমাণ ও বিস্তৃতিও প্রচুর হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে এই সমৃদ্ধ জনপদের চাহিদার তালিকায় থাকবে এয়ার কণ্ডিশনার, কুলার, রেফ্রিজারেটার মোটর পার্টস বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নানান যন্ত্রাংশ, কাঠের ও ইস্পাতের আসবাব, ছাপাখানার সুবিধা, নানা সাইজের কার্ডবোর্ডের বাক্স, ডিম, মাংস, দর্জীর দোকান দৈনন্দিন প্রয়োজনের সামগ্রী প্রভৃতি। এগুলির প্রত্যেকটি হাতের কাছে পাওয়ার সুযোগ সুবিধা থাকা দরকার। অর্থাৎ এই ভোগ্য পণ্যগুলির চাহিদা কেন্দ্র করে বিভিন্ন শিল্প গড়ে ওঠার প্রচুর অবকাশ করেছে। কি কি শিল্প এখানে সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠতে পারে তার একটি সমীক্ষা নিয়ে সেই ভাবে কর্মহীন অথচ শিল্প কুশলী বাঙালী ছেলেদের এনে সব রকম সাহায্য দিয়ে তাদের কৃতী করে তুলতে পারলে বোধ হয় একটা সত্যিকারের কাজ হবে।

যদিও ভূতত্ত্বের দিক দিয়ে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে পশ্চিম বঙ্গের দক্ষিণ ভাগে মাটির নীচে তৈল থাকার সম্ভাবনা আছে আর এই তৈল পাবার জন্য কিছু কিছু পরীক্ষা নীরিক্ষাও হয়েছে কিন্তু এখনও কোথাও তৈলের সন্ধান পাওয়া যায় নি। তাই হলদিয়াতে শোধনাগারের জন্য বাইরে থেকে ক্রুড অর্থাৎ অপরিশোধিত তেল আমদানী করতে হবে। খনি থেকে যে তেল ওঠে তা মোটামুটি ভাবে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম হ'ল প্যারাফিন বেসড ক্রুড অর্থাৎ প্যারাফিন ভিত্তিক অশোধিত তেল। দ্বিতীয় হ'ল অ্যাশফল্ট ভিত্তিক আর তৃতীয় হল এই দুটির মিশ্রণ। প্যারাফিন ক্রুডে থাকে প্যারাফিন ওয়াক্স কিন্তু অ্যাশফল্ট বা ঘন টার এতে থাকে না। এ থেকে প্যারাফিন ওয়াক্স আর উৎকৃষ্ট লুব্রিকেটিং তেল বার করতে পারা যায়।

অপর পক্ষে অ্যাশফাল্ট ভিত্তিক ক্রুডএ প্যারাফিন ওয়্যাক্স প্রায় থাকেই না, এতে থাকে অ্যাশফল্ট। এতে যে হাইড্রো কার্বন থাকে তরে মধ্যে ন্যাপথা লিন ইত্যাদিই বেশী।

মিশিত ক্রুড তেলের মধ্যে এই দুই রকমের ক্রুডই থাকে। হলদিয়াতে যে ক্রুড নিয়ে কাজ করা হবে তা এই দ্বিতীয় ধরণের অর্থাৎ অ্যাশফল্ট ভিত্তিক। এ থেকে প্রচুর ন্যাপথা পাওয়া যাবে আর এই ন্যাপথা ভেঙ্গে পেট্রোরাসায়নিক শিল্পের ভিত্তি গড়া হবে।

মাটির নীচে থেকে অপরিশ্রুত তেল যা তোলা হয় তার দশ ভাগের প্রায় এক ভাগ মাত্র পেট্রোল বা কেরোসিন রূপে পাওয়া যায়। প্রথম প্রথম পেট্রোল আর কেরোসিন নিয়ে এই অবশিষ্ট অংশ ফেলে দেওয়া হত। ক্র্যাকিং প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হবার পরে এই ফেলে দেওয়া অংশ থেকে আরও পেট্রোল, কেরোসিন পাওয়া গেল। আবার নতুন জিনিষ— মোটা বা ভারী তেল (হেভী অয়েল) বেরিয়ে এল আর বেরিয়ে এল পীচ। এর সব কিছুই এখন কাজে লাগান হয়। এক দম বাকী যা পড়ে থাকে, যাকে বলা হয় অ্যাশফল্ট তাও কাজে লাগান হয় রাস্তা তৈরি করতে। এখন কোনও জিনিসই আর ফেলে দেওয়া হয় না। পেট্রো রাসায়নিক ইঞ্জিনীয়ারদের, আজ কালকার পরিশোধনাগারে, প্রতিটি ব্যবস্থার ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয় যাতে কোনও কিছুরই অপচয় না হয়। এই প্রক্রিয়াটির তাই এতদূর উন্নতি হয়েছে যে, যে রকম চান ঠিক সেই রকম তেল বা অপর জিনিস তাঁদের ক্র্যাকিং প্রসেস দিয়ে তৈরি করতে পারেন।

ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের একটি পরিকল্পনাকারী দল ভারতের পেট্রো রাসায়নিক শিল্প কোথায় কি কি রকমভাবে গড়ে ওঠা উচিত সে বিষয়ে একটা রিপোর্ট দেন। এই রিপোর্ট অনুযায়ী হলদিয়ায় কি কি পেট্রো রাসায়নিক জিনিস তৈরি হওয়া উচিত তা নিচের তালিকায় দেখানো হয়েছে। তবে তার আগে বলা দরকার যে হলদিয়ায় যে পরিশোধনাগার হচ্ছে তা থেকে উপজাত সামগ্রী হিসেবে প্রচুর ন্যাপথা পাওয়া যাবে আর এই ন্যাপথাই হবে এখানকার পেট্রো রাসায়নিক শিল্পের প্রধান কাঁচামাল।

পদার্থ	পরিমাণ (টন)
ইথিলীন	১১০,০০০
পলি ইথিলীন	৫০,০০০
পলি ভিনাইল ক্লোরাইড	২০,০০০
বেনজিন	২৩,০০০
প্রপিলিন অক্সাইড	৬,০০০
পলি প্রপিলীন	১৫,০০০
পলি বিউটেন	৭,০০০
বিউটাডিন	১২,০০০
এন বিউটালিন	১৪,০০০

ইথানল	২০,০০০
ই.পি.টি রবার	২০,০০০
ইথিলীন অক্সাইড	২০,০০০
মিথাইল ইথাইল	১০,০০০

পরিকল্পনাকারী দল আরও বলেছেন যে হলদিয়ায় যে ১২০০০ হাজার টন পি জাইলীন তৈরি হবে তা নিয়ে আর একটা রাসায়নিক দ্রব্য ডাই মিথাইল টার্পি থালেট—এর সঙ্গে যুক্ত করে ৩০০০ টন ম্যালেইক অ্যান হাড্রাইড আর পলি এসটার রেসিন ৩০০০ টন তৈরি হতে পারবে। এই পলি এসটার রেসিন থেকে, পলি এসটার তন্তু অর্থাৎ আজকালকার পরিচিত টেরিলীন ফাইবার বা তন্তু তৈরি করা চলবে। এই কারখানাটি অবশ্য পরিকল্পনাকারী দলটি হলদিয়ার পরিবর্তে কলকাতায় স্থাপনার পরামর্শ দিয়েছেন।

ওপরে যে পেট্রো কেমিক্যাল গুলির বিবরণ দেওয়া হ'ল সেগুলি তৈরি করতে যন্ত্রপাতি ও আনুসঙ্গিক হিসাবে অন্তত: পক্ষে ১০০ কোটি টাকার মত প্রয়োজন হবে। উৎপাদন হবে বছরে প্রায় সব মিলিয়ে চার লক্ষ টন। যার দাম ধরা যেতে পারে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা। এই ১৫০ কোটি টাকার কাঁচা মাল সমস্ত যাবে নানান্ শিল্পে হাজারো রকমের জিনিসের উৎপাদনে। একটু চেষ্টা করলেই বুঝতে কষ্ট হবে না যে এর মধ্যে কি অভাবনীয় সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে, শিল্প গড়ে তোলার দিক দিয়ে।

ভারতের কয়েক জায়গাতেই এখন পেট্রো রাসায়নিক শিল্প সংহতি স্থাপিত হয়েছে। বোম্বাই সহরের উপকন্ঠ ট্রম্বেতে, গুজরাতের কোলীতে আর রাজস্থানের কোটায় এখন পুরো দমে পেট্রোরাসায়নিক শিল্প চালু হয়ে গিয়েছে। ন্যাশনাল অরগ্যানিক কেমিক্যাল লিমিটেড বোম্বাইতে ৬০ হাজার টনের ইথিলীন আর ৩৫ হাজার টনের প্রপিলীন—এর কারখানা বসিয়ে পলিথীন আর পলি প্রেপিলীন তৈরি করছে। এই কারখানার যা কিছু উৎপাদন তা কিন্ত প্রায় সবটাই চলে যায় এর সহযোগী সংস্থা হয়েষ্ট ডাইজ এণ্ড কেমিকেল লি: আর পলিও লেটিন ইণ্ডাষ্ট্রিজ—এর কাছে। শুধু অল্প কিছু জৈব দ্রাবক আর পিভিসি বিক্রীর জন্য থাকে। ট্রম্বেতে য়ুনিয়ন কারবাইড ইণ্ডিয়া লিমিটেডের কারখানায় বা কয়ালি শিল্প সংহতির মধ্যেও সেই একই রকমের ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ এই ক্র্যাকারগুলি যে সব কোম্পানী বানিয়েছেন তাঁদেরই জন্য বিভিন্ন সংস্থাতে এর সব কাঁচা মালগুলি চলে যাচ্ছে। তারা নিজেরা যে জিনিসগুলি লাভজনক ভাবে পান না শুধু সেগুলিই বাজারে ছাড়া হয়। বাজারে এলেই যে তারা ছোট শিল্প গড়ে উঠতে কাজে লাগে—তাও না। কিছু দিন আগে একটি একচেটিয়া ব্যবসায় অনুসন্ধান কমিশন সরকার থেকে বসান হয়েছিল। তাদের রিপোর্টে প্রমাণ করেছে যে, 'কাঁচা মাল যাঁরা আমাদের দেশে উৎপাদন করছেন তাঁরা নিজেরাই নানান ভাবে সেইগুলিকে ব্যবহার করছেন।'

ভারতবর্ষেই কেন এই রকম সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার ঘটছে তার কারণ সত্যিই অনুসন্ধানের বিষয়। আমি এই সম্বন্ধে সাধারণভাবে দু চারটি কথা বলব। আমাদের দেশে যে বিরাট পেট্রোরাসায়নিক সংহতি গড়ে উঠছে ছোট শিল্পগুলি তা থেকে উপকার আহরণ করতে পারছে না। ভবিষ্যতের এই সব সংস্থার পরিকল্পনার মধ্যেই এমন কিছু থাকা দরকার যাতে এই অবস্থা আর না ঘটতে পারে।

যাঁরা বাংলা দেশে ছোট শিল্পের উন্নতির জন্য চেষ্টা করছেন তাঁরা এমন একটা শিল্প পরিবেশ তৈরি করুন যাতে পেট্রো রাসায়নিক শিল্পের ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যায় বাঙালী শিক্ষিত ছেলে এসে তাদের সময় আর সুযোগ বিনিয়োগ করার সুবিধে পায় এবং ভারতের শিল্প জগতে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

আসামের কৃষি

১৩ পৃষ্ঠার পর

চালিত প্রায় এক হাজার পাম্প, উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। ৩.৮ লক্ষ হেক্টার জমিতে এখন নিয়মিত জলসেচ দেওয়া যায়। কৃষকরা এখন উন্নত ধরণের বীজ পান। উন্নত ধরণের বীজ সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য গৌহাটিতে একটি বীজ পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে।

কৃষকরাও এখন বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটি ফসল তুলেই সন্তুষ্ট থাকেন না। বর্ত্তমানে ১৫ লক্ষ একরেরও বেশী জমিতে কয়েকটি শস্যের চাষ করা হয়। টি. এন-১ এবং আই আর ৮ এর মতো অধিক ফলনের বীজ ক্রমশ: জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তবে স্থানীয় মনোহর শালি ধানের বীজই বেশী জনপ্রিয়। লার্মা রাজো, সোনালিকা, এস ৩০৮ এর মতো অধিক ফলনের গমের বীজ ব্যবহৃত হচ্ছে। নগাওঁ জেলার গমের ফলন, ভারতের যে কোন জায়গার সঙ্গে তুলনীয়। বর্ত্তমানে ১১ হাজার একর জমিতে অধিক ফলনের গমের চাষ হয়।

খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ এবং নতুন কৃষি পদ্ধতি অনুসারে কি পরিমাণ জমিতে চাষ করা হচ্ছে কেবল মাত্র তার হিসেব নিয়ে সাফল্যের মূল্যায়ণ করা উচিত নয়। যাঁরা জমি চাষ করে ফসল ফলাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও নতুন উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে সেইটেই হল সাফল্যের চাবিকাঠি। এঁরা প্রাচীন রীতি নীতি অনুসারে বড় হয়েছেন, দারিদ্র্য ও অন্যায় সহ্য করেছেন। কিন্ত এখন তাঁরা কেবলমাত্র ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে থাকতে চান না।

ভারতপুরে গুঁড়ো দুধ তৈরি করার একটি কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এর জন্য আনুমানিক ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। আগামী বছরের জানুয়ারি মাস থেকে এই কারখানায় উৎপাদন শুরু হয়ে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এখানে বছরে ১,১০০ টন গুঁড়ো দুধ ও ৫০০ টন ঘি উৎপাদিত হবে।

চম্বল

রাজস্থানের সমৃদ্ধির উৎস

রাজস্থানের যে চম্বল এলাকা, দুই বছর পূর্ব্বেও কুখ্যাত ডাকাতদের বিহার-ভূমি ছিল, সেটিই এখন রাজ্যটির জন্য এক নতুন সমৃদ্ধির যুগের সূচনা করবে। ২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত রাণা প্রতাপ সাগর বাঁধটি, গত ৯ই ফেব্রুয়ারি প্রধান-মন্ত্রী, জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। চম্বল নদীতে ৪টি বাঁধ দিয়ে সেচের জল ও বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন বাড়ানো হচ্ছে। অন্য তিনটি বাঁধ হল গান্ধী সাগর বাঁধ, জওহর সাগর বাঁধ এবং কোটা বাঁধ। এই বাঁধগুলি চম্বল উপত্যকা উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। রাণা প্রতাপ সাগর বাঁধটি সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে এই প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কাজ সম্পূর্ণ হল।

চম্বল নদীটি রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের মধ্য দিয়ে ৭২০ কি: মী: পথ অতিক্রম ক'রে উত্তর প্রদেশের এটাওয়ার কাছে যমুনা নদীতে এসে মিলিত হয়েছে। আনুমানিক ১১০ কোটি টাকা ব্যয়ের চম্বল উপত্যকা উন্নয়ন প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে। এর পূর্ব্বে চম্বল নদীর জলপ্রবাহকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানোর কোন চেষ্টা করা হয়নি। এই প্রকল্পটি রূপায়িত হ'লে দুটি রাজ্যের লক্ষ লক্ষ একর শুষ্ক জমিতে সব সময়ে সেচ দেওয়া যাবে।

চম্বল প্রকল্পের কাজ সুরু হওয়ার সময় ১৯৬০-৬১ সালে যেখানে ৩৭,০০০ একর জমিতে সেচ দেওয়া যেত, সেখানে ১৯৬৭-৬৮ সালে সেই রকম জমির পরিমাণ ২ লক্ষ একরে দাঁড়ায়। প্রকল্পটির প্রথম পর্য্যায়ে গান্ধী সাগর বাঁধ, কোটা বাঁধ এবং জল সরবরাহের জন্য কতকগুলি খাল কাটার কাজ সম্পূর্ণ হয়। রাণা প্রতাপ সাগরে ৪২ মীটার উঁচু একটি পাকা বাঁধ তৈরি হওয়ায় এখানে ২০.৩৫ লক্ষ একর ফিট জল সঞ্চয় ক'রে রাখা যায়। এর ফলে সেচের সম্ভাবনা ১০.১ লক্ষ একর থেকে বেড়ে ১০.৪ লক্ষ একরে দাঁড়িয়েছে।

চুলিয়া প্রপাত থেকে ৯ মীটার উজানে রানা প্রতাপ সাগর বাঁধ তৈরি করা হবে বলে স্থির করা হয়। কারণ এখানে স্বাভাবিক ভাবেই বেশ উঁচু থেকে জল গড়িয়ে পড়ে বলে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করাটা বেশ সহজ হবে। চুলিয়া প্রপাতের জলকে আরও সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানোর জন্য ১২ মীটার ব্যাসের ১,৪৫০ মীটার লম্বা একটি সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে তা, প্রপাতটি থেকে খানিকটা দূরে প্রধান নদীতে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১১২৫ মীটার দীর্ঘ বাঁধটির ঠিক পেছনে প্রধান নদীর খাতে ২৪ মীটার গভীর একটি গর্ত্ত ক'রে সেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি তৈরি করা হয়েছে।

এই কেন্দ্রটিতে ৪টি বিদ্যুৎ উৎপাদন-কারী জেনারেটার আছে এবং প্রত্যেকটি ৪৩ মি: ওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করতে পারে। ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৬৯ সালের মে মাস পর্য্যন্ত এই চারটি জেনারেটারই চালু করা হয় এবং ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করতে সুরু

রাণা প্রতাপসাগর বাঁধ—সম্মুখভাগে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র
(নীচে) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটির একটি অংশ

করে। বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন কেন্দ্রটি সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা ৪২০৪.৮ লক্ষ ইউনিট থেকে বেড়ে ৮৯৩৫.২ লক্ষ ইউনিট হয়েছে।

৪৭.১ মীটার লম্বা একটি কনক্রিটের বাঁধ তৈরি হয়ে গেলেই চম্বল উপত্যকার উন্নয়ন কর্ম্মসূচীর তৃতীয় ও শেষ পর্য্যায় সম্পূর্ণ হবে। বাঁধটি থেকে প্রায় ২১ কিঃ মীঃ উজানে হ'ল জওহর সাগর বাঁধ। এটি থেকে প্রধানত: বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা হবে এবং এর কাজ ১৯৭১-৭২ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এখানে প্রত্যেকটি ৩৩ মিঃ ওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে সক্ষম ৩টি জেনারেটার থাকবে।

ভারতের বন্দর উন্নয়ন

১১ পৃষ্ঠার পর

মাদ্রাজের জন্য বেশ বড় একটা উন্নয়নসূচী তৈরি করা হচ্ছে। ১৯৬৭-৬৮ সালে মাদ্রাজ বন্দরের মাধ্যমে ৫৮,৬২,৮১৯ মেট্রিক টন মাল চলাচল করে। ঐ সময়ে ১৩১৫টি জাহাজ বন্দরে আসে। দৈত্যাকার ট্যাঙ্কারগুলিও যাতে মাদ্রাজে ভিড়তে পারে তার জন্য বেশ বড় আকারে চেষ্টা করা হচ্ছে।

কোচিন তৈল শোধানাগারের ক্রমবর্দ্ধমান প্রয়োজন মেটানোর জন্য এখানে একটা গভীর বার্থ তৈরি করা হচ্ছে। এখানেও মাল চলাচলের পরিমাণ ১৯৫০-৫১ সালের ১৪ লক্ষ টন থেকে বেড়ে ১৯৬৫-৬৬ সালে ২৮ লক্ষ মেট্রিক টন হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে এই পরিমাণ ৭৭ লক্ষ মেট্রিক টনে দাঁড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে। মাল চলাচলের এই বৃদ্ধির জন্য দুটি নতুন বার্থও তৈরি করা হবে।

বন্দরের কাছাকাছি প্রায় ৩৫০ একর জমি পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে। সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের জন্য ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

আকর রপ্তানী

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে আকর রপ্তানী হল একটা প্রধান বিষয়। আকর রপ্তানীর বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখেই ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলির উন্নয়ন করা হচ্ছে। ভারতের লৌহ আকরের আমদানী ১৯৬৪-৬৫ সালের ১ কোটি টন থেকে বেড়ে ১৯৬৮-৬৯ সালে দেড় কোটি মেট্রিক টনে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে ভারত, বিশ্বের প্রধান লৌহ আকর রপ্তানীকারীদের সারিতে স্থান পেয়েছে। বিশাখাপতনম, মোরমুগাও ও ম্যাঙ্গালোর বন্দরের মাধ্যমেই বেশীর ভাগ লৌহ আকর রপ্তানী করা হয়।

গত ১৭ বছরে বিশাখাপতনম বন্দরের মাধ্যমে মাল চলাচল ১২৮ শতাংশ বেড়েছে অর্থাৎ এই বন্দর মারফত যত জিনিষ রপ্তানী হয় তার তিন চতুর্থাংশই হ'ল খনিজ আকর। এর মধ্যে একমাত্র লৌহ আকারের পরিমাণই হল ৬০ শতাংশ। আগামী কয়েক বছরে জাপানে লৌহ আকরের রপ্তানী আরও বাড়বে বলে বিশাখাপতনম বন্দরের মাধ্যমে মাল চলাচলের ক্ষমতা অনেকগুণ বাড়ানো হচ্ছে। এক লক্ষ টনেরও বেশী পরিমাণের মালবাহী জাহাজ যাতে ভিড়তে পারে সেজন্য বাইরের দিকেও একটা বন্দর তৈরি করা হচ্ছে।

লৌহ আকর গোয়ার প্রধান খনিজ সম্পদ বলে পশ্চিম উপকূলের মোরমুগাও হল আর একটি প্রধান আকর রপ্তানীকারী বন্দর। জাপানে লৌহ আকর রপ্তানী করে গত বছর ৩৯ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জিত হয়। এই বন্দরটির উন্নয়নসূচীর মধ্যে বিরাট আকারের মালবাহী জাহাজ ভেড়াবার সুযোগ সুবিধে বাড়ানোর এবং জাহাজে মাল বোঝাই করার জন্য সর্ব্বাধুনিক কনভেয়ার বেল্ট ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত। যন্ত্রের সাহায্যে জাহাজে আকর বোঝাই করার জন্য, এই বন্দরে প্রতি ঘন্টায় ৬০০০ টন পর্য্যন্ত বোঝাই করার ক্ষমতাসম্পন্ন একটি যন্ত্র বসানো হবে।

ম্যাঙ্গালোর বন্দর দিয়েও লৌহ আকর রপ্তানী করার সম্ভাবনা বেড়ে যাওয়ায়, বর্ত্তমানে এটিরও উন্নয়ন করা হচ্ছে। পশ্চিম উপকূলে কোচিন ও মোরমুগাওর মধ্যে ম্যাঙ্গালোর হল বর্ত্তমানে একটি মাঝারি বন্দর। এটিকে একটি বড় বন্দরে পরিণত করতে হ'লে ব্যাপক ড্রেজিং প্রয়োজন। যাই হোক আগামী দুই বছরের মধ্যে এর উন্নয়নের কাজ সম্পূর্ণ হলে মহীশূরের মধ্যে দিয়ে হাসানের সঙ্গে এটিকে রেলপথে যুক্ত করা হবে। ১৯৭৫-৭৬ সাল পর্য্যন্ত এই বন্দর মারফত ৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন মাল চলাচল করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তার মধ্যে রাসায়নিক সার আমদানী করা যাবে প্রায় পৌনে পাঁচলক্ষ টন আর ৫ লক্ষ টন লৌহ আকর রপ্তানী করা যাবে। বর্ত্তমানে বন্দরটি বছরে চার মাস বন্ধ থাকে। সমুদ্র থেকে লম্বা খালের সংযোগ রেখে একে একটি জলাভূমি বন্দর হিসেবে তৈরি করা হবে।

৬৪ কিঃ মীঃ দূরে ম্যাগনেটাইট আকরের স্তর আবিষ্কৃত হওয়ায় বন্দরটির উন্নয়নের জন্য বড় একটা কর্ম্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৭৪ সালের শেষ পর্য্যন্ত বন্দরটির মাধ্যমে ২০ লক্ষ টন এই আকর রপ্তানী করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। উন্নয়নের প্রথম পর্য্যায়ের জন্য ২৪.৩০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে।

ভারতের প্রধান বন্দরগুলির মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ হল গুজরাটের কাণ্ডলা বন্দর। ১৯৫৫ সালে কাণ্ডলাকে একটি প্রধান বন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ৪ টি জাহাজ যাতে ভিড়তে পারে সেজন্য ১৯৫৭ সালে ৮১০ মীটার লম্বা জেটি তৈরি করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে এই এই বন্দর মারফত ৩৯ লক্ষ মেট্রিক টন মাল চলাচল করতে পারবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এই বন্দরটির উন্নয়নের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় ২০.৭৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনার সময় এটির উন্নয়নের জন্য আরও ১২ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। ৫ টা বার্থ ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে এবং ৬ষ্ঠ বার্থটি তৈরি করার কাজও এগিয়ে চলেছে। ভারতের উপকূল ভাগের প্রধান বন্দরগুলি এই রকমভাবেই এখন উন্নয়নের কর্ম্মসূচীগুলি রূপায়িত করতে ব্যস্ত।

যৌথ সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়ন

গঠনমূলক প্রয়াসের মাধ্যমে ভারত, বিগত কয়েক বছরের মধ্যে দেশে মোটামুটি একটা মজবুত অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে পেরেছে, শিল্পের প্রসার ঘটেছে এবং উৎপাদন ও কারিগরী জ্ঞানের ক্ষেত্রেও ঘটেছে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। আজ ভারত বৈষয়িক অগ্রগতির এমন একটা স্তরে পৌঁছেছে যেখানে সে নিজের যোগ্যতাবলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অংশীদার হতে পেরেছে।

শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে অবস্থা অনুকূল। ইঞ্জিনীয়ারিং, বস্ত্র, ধাতু ও রাসায়নিক শিল্পে এবং বেশ কিছু ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনে ভারতের সহযোগিতা লাভে উন্নতিকামী দেশগুলির আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে কোনোও যৌথ উদ্যোগ, সহযোগিতাকামী এবং সহযোগিতাকারী উভয়ের পক্ষেই সুবিধাজনক। ভারত ইতিমধ্যে উন্নতিশীল ও শিল্পোন্নত দেশগুলির সঙ্গে একাধিক যৌথ উদ্যোগে অংশ নিয়েছে। ভারতীয় সহযোগিতায় বিদেশে এরকম প্রায় ৮০টি যৌথ শিল্পোদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন করেছেন।

এর মধ্যে ৩২টি শিল্পোদ্যোগ স্থাপিত হবে আফ্রিকায়—ছটি ইথিওপিয়ায়, একটি ঘানায়, ন'টি কেনিয়ায়, দুটি লিবিয়ায় একটি মরিশাসে, ৬টি নাইজিরিয়ায়, তিনটি জাম্বিয়ায়, দুটি উগাণ্ডায় এবং তানজানিয়া ও টোগোতে একটি ক'রে। ইথিওপিয়ায় যৌথ উদ্যোগে গড়ে উঠবে বস্ত্র, সাবান, পশম, প্লাষ্টিক এবং ঘড়ি শিল্প। ঘানায় ছোট কৃষি ট্র্যাক্টর তৈরির শিল্পে ভারত সহযোগিতা করছে।

ইতিমধ্যে কেনিয়ায় ভারতীয় সহযোগিতায় তৈরি হচ্ছে বস্ত্র শিল্প, গ্রাইপ ওয়াটার, ওষুধপত্র, ছাপার কালি, পশমীবস্ত্র, হালকা ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য, কর্ক, কাগজ এবং কাগজের মণ্ড তৈরির কারখানা। লিবিয়ায় পাইপ, অ্যাসবেসটস, সিমেন্ট শিল্পে ভারত সহযোগিতা করছে। আর মরিশাসে ভারতীয় সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে মোজায়েক টালি এবং রোলিং শাটার কারখানা।

ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য, বস্ত্র, ব্লেড এবং পেনসিল উৎপাদনের ব্যাপারে ভারত নাইজিরিয়াকে কারিগরী সাহায্য দিচ্ছে। ভারতীয় উৎপাদকদের এক কনসোর্টিয়াম উগাণ্ডায় একটি চিনির কল স্থাপন করছেন। একটি বিশিষ্ট ভারতীয় শিল্প সংস্থা সেখানে একটি পাটকল স্থাপনে সাহায্য করছেন। একটি কনসট্রাকশান কোম্পানী, একটি কারখানা এবং একটি লুব্রিক্যান্টের শোধনাগার স্থাপনের জন্য জাম্বিয়া ভারতের সাহায্য চেয়েছে। তানজানিয়া এবং টোগোতে যথাক্রমে একটি ঔষধ এবং রেডিও তৈরির কারখানা স্থাপন করা হবে।

দক্ষিণ এশিয়ায় সিংহল যৌথ উদ্যোগে শিল্প কারখানা স্থাপনে ভারতের কারিগরী সাহায্য নিচ্ছে। যৌথ উদ্যোগে সেখানে সেলাই কল, চা-তৈরির যন্ত্রপাতি, কাঁচ, বস্ত্র, ঔষধপত্র, এয়ার কণ্ডিশনার, রুম কুলার, কণ্ডাকটর প্রভৃতি শিল্প গড়ে উঠছে। আফগানিস্থানও বাই-সাইকেল প্রভৃতি শিল্পে ভারতীয় সহযোগিতাকে স্বাগত জানিয়েছে।

পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়ায় ইস্পাতের আসবাবপত্র, জিংক অক্সাইড, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, সূতীবস্ত্র, কাঁচের বোতল, ইনস্যুলেটিং কনডাকটর, ইলেক্ট্রিক মোটর, পাম্প এবং ডিজেল ইঞ্জিন তৈরির ব্যাপারে ভারত সাহায্য করছে। যৌথ উদ্যোগে সিংগাপুরে একটি ইলেকট্রোডস কারখানা এবং থাইল্যাণ্ডে একটি ইস্পাতকল, একটি সুতার কারখানা এবং একটি নিউজপ্রিন্ট কারখানা স্থাপনে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে।

ইরাণে ভারত ইতিমধ্যে কয়েকটি কারখানা স্থাপন করেছে। ইলেকট্রিক মোটর এবং ট্রান্সফর্মার তৈরির আর একটি কারখানা স্থাপনের প্রস্তুতি চলছে।

পশ্চিম এশিয়ায়, ইরাকে ঠাণ্ডা পানীয় তৈরির একটি কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব ভারত সরকার অনুমোদন করেছেন। এছাড়া লেবাননে একটি কীটনাশক দ্রব্য তৈরির কারখানা এবং সৌদি আরবে রেফ্রিজারেটর, এয়ার কণ্ডিশনার, অ্যাসবেসটস সিমেন্ট এবং বনস্পতির কারখানা স্থাপনের প্রস্তাবেও ভারত সম্মত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যৌথ উদ্যোগেও ভারত পিছিয়ে নেই এ কথা আগেই বলা হয়েছে। যেমন আয়ার্ল্যাণ্ডে ভারতীয় সহযোগিতায় যে নাইলনের কুঁচি এবং কার্পেটের সুতা তৈরির দুটি কারখানা স্থাপন করা হয়েছে সেগুলিতে শীঘ্রই কাজ সুরু হবে। উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে অ্যাসবেসটস সিমেন্ট দ্রব্য এবং হাল্কা ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য উৎপাদনের কারখানা স্থাপনের ব্যাপারে ভারতের কারিগরী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সুবিধা চাওয়া হয়েছে।

বৃটেনে ভারতীয় সহযোগিতায় স্থাপিত একটি অ্যাসবেসটস সিমেন্ট কারখানা রয়েছে, আমেরিকায় ভারতীয় সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে শক্ত ও পুরু কাগজ তৈরীর একটি কারখানা যে রকম কারখানা ইতিপূর্বে ক্যানাডায় স্থাপিত হয়েছে। শীগগিরই এখানে শ্বেতসার এবং তরল গ্লুকোজ তৈরীর একটি কারখানা গড়ে উঠবে।

দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়ায় টুইস্ট ড্রিল তৈরির একটি প্রকল্প স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে।

বৈষয়িক সহযোগিতার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে, যখন ভারত, সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র এবং যুগোশ্লাভিয়া আন্তর্মহাদেশীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতার এক নতুন পর্বের সূচনা করে। এই তিন দেশের মধ্যে সম্পাদিত ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সম্প্রসারণের জন্য সুদূরপ্রসারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বাণিজ্য এবং শুল্ক অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে তিন দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার চুক্তিটি ১৯৬৮ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে কার্যকর হয়।

এই চুক্তির একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এই তিন দেশের মধ্যে যে কোনো একটি দেশ অন্য দুটি দেশকে যে সব পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক —অগ্রাধিকার দেবে সে সব পণ্যের কোনো স্বতন্ত্র তালিকা নেই কারণ সে সব সাধারণ তালিকায় সন্নিবেশিত।

শিল্পগত সহযোগিতা ইতিমধ্যে সম্প্রসারিত হয়েছে হুইল ট্রাক্টর, ক্রলার ট্রাক্টর, টেলিভিসন, গ্লাস বালব, টিভি. পিকচার টিউব যাত্রীবাহী গাড়ী, স্কুটার বাইসাইকেলের ছোট ইঞ্জিন, সুইচগিয়ার তৈরীর ক্ষেত্রে।

সম্প্রতি কায়রোতে এই তিন দেশের এক বৈঠক হয়। বৈঠকে তিনটি দেশ পরস্পরকে বাণিজ্য শুল্ক থেকে অব্যাহতি, শিল্প লাইসেন্স দান এবং কাঁচা মাল পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে এবং যৌথ উদ্যোগে উৎপন্ন পণ্য বিক্রির ব্যাপারে সুযোগ সুবিধা দিতে সম্মত হয়েছে। এই ধরনের ত্রিপক্ষীয় চুক্তির ক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তৃত হবে এবং সহযোগিতার বিরাট অঙ্গনে এক এক করে বিশ্বের সব কটি দেশই মিলিত হবে বলে আশা করা অযৌক্তিক হবে না।

ডি. ডি. টি—তে অপকারের তুলনায় উপকারের মাত্রা অনেক বেশী

ডি. ডি. টি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় কৃষিক্ষেত্রে, অরণ্য রক্ষায় এবং জনস্বাস্থ্যরক্ষার জন্য। বিশেষ করে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য যে পরিমাণ ডি.ডি. টি ব্যবহৃত হয় তার মাত্রা হ'ল মোট উৎপাদনের শতকরা ১৫ ভাগের মত। প্লেগ, স্লিপিং সিকনেস ও অন্যান্য কীটবাহিত রোগ দমনে ডি. ডি. টি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়।

ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ অভিযানে ঘরবাড়ীর ভেতরে, দেওয়ালে ও ছাদে ডি. ডি. টি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই অভিযানে নিযুক্ত প্রায় দু লক্ষ কর্মী গত ২০ বছরে ডি. ডি. টির কোনও প্রতিক্রিয়া থেকে ভোগেনি। যতগুলি বাড়ীতে প্রতি বছর নিয়মিত ভাবে ডি. ডি. টি ছড়ানো হয় সেগুলির বাসিন্দার সংখ্যা হবে ৬০ থেকে ১০০ কোটির মত। সেই সব বাড়ীর বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যের কোনও ক্ষতি হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রে ডিডিটি—র কারখানায় গত ১৯ বছরে নিয়মিত খোঁজ খবর রেখে দেখা গেছে যে, কারুর স্বাস্থ্যেরই ক্ষতি হয়নি। যারা ঘটনাক্রমে ডিডিটি খেয়ে ফেলেছেন তাদের শরীর খারাপ হলেও কেউ মরেন নি।

কোনোও বন্য প্রাণীর ওপর ডিডিটির প্রতিক্রিয়া মারাত্মক হওয়ায় কয়েকটি দেশে সম্প্রতি ডিডিটির ব্যবহার সীমিত করা হয়েছে। তবে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়নি। সব দেশেই এ কথা স্বীকৃত যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ডিডিটি ব্যবহার করা প্রয়োজন। যে সব অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কম সে সব অঞ্চলে ডিডিটির ব্যবহার হয়তো গৌণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু বৃষ্টি প্রধান অঞ্চলে ম্যালিরিয়ার সম্ভাবনা ও প্রকোপ এত বেশী যে, রোগ নিয়ন্ত্রণের সুলভ কোনও ব্যবস্থা উদ্ভাবিত না হওয়া পর্যন্ত, ডি. ডি. টি ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ ম্যালেরিয়া দমনের ওষুধ এমন হওয়া উচিত যা কীটের পক্ষে হবে মারাত্মক কিন্তু মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর হবে না।

ডিডিটির জন্য ইঁদুরের শরীরে কর্কট রোগের বিষ সৃষ্টি হয়—এ অভিযোগ এখনও প্রমাণিত হয়নি।

সুষম সার ফলন বাড়ায়

মহারাষ্ট্রের অমরাবতী জেলায় বিভিন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, নাইট্রোজেন, ফসফোরিক অ্যাসিড ও পটাশের সুষম সার প্রয়োগ করলে চীনা বাদামের ফলন এত বেশী হয় যে, কৃষকরা হেক্টারে দু হাজার টাকার ওপর নীট আয় করতে পারেন। এই রাসায়নিক সারের সবটাই মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। প্রতি হেক্টারে উৎপাদন হয় ২,৬৩৩ কে. জি. র মত।

টোম্যাটোর সার

টোম্যাটোর চাষের সময় যতটা সারের প্রয়োজন হয় তার সবটাই জমিতে মা মিশিয়ে, খানিকটা যদি গাছের ওপর ছড়িয়ে (স্প্রে) দেওয়া হয় তাহলে হেক্টারে ৫.৬ টন বেশী ফলন হয়। নতুন দিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা করার সময়ে নাইট্রোজেন ও ফসফোরিক অ্যাসিডের জন্য য়ুরিয়া ও সুপার—ফসফেট সার হিসেবে দেওয়া হয়। প্রতি হেক্টারে নোট নাইট্রোজেনের অর্ধেক (৬০ কে. জি) ও ফসফোরিক অ্যাসিডের অর্ধেক (৩০ কে. জি) জমিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়। বাকীটা ফসলের ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

টোম্যাটোর চারা জমিতে বসাবার ৩৫ দিন অন্তর সার ছড়ানো হয়। মোট ছ'বার স্প্রে করা হয়।

প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ

৫ পৃষ্ঠার পর

হচ্ছে। পরিকল্পনা সম্পর্কে কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে যে সাহায্য করছে তাও জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের অনুমোদিত সূত্র অনুযায়ী করা হচ্ছে। সম্পদ কি রকমভাবে ভাগ করা হবে সেই সম্পর্কে যদি সাধারণ নীতি স্থির হয়ে যায় তাহলে কেন্দ্রও রাজ্যগুলির মধ্যে অবশিষ্ট দেনা পাওনার ব্যাপারগুলি অবস্থা অনুযায়ী সমাধান ক'রে নেওয়া সম্ভব। কতকগুলি রাজ্যের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং তা পরিকল্পনা মূলক বিনিয়োগের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

এই সব রাজ্য যাতে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ ও সংহত করতে পারে তাই হ'ল এই বিশেষ ব্যবস্থার লক্ষ্য। এই অতিরিক্ত সম্পদ পরিকল্পনামূলক উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। তাছাড়া রাজ্যগুলি যাতে তাদের পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় যতটা সম্ভব ১৯৬৮-৬৯ সালের পর্যায়ে আনতে পারে এবং খসড়া পরিকল্পনার বিনিয়োগের যে পরিমাণ দেওয়া হয়েছে, এই রাজ্যগুলির মোট পরিকল্পনামূলক বিনিয়োগ যাতে কোন ক্রমেই তার কম না হয় তা সুনিশ্চিত করাও উপরে উক্ত ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য।

ইঞ্জিনীয়ারিং-এর টুকিটাকি

হেভি ইলেকট্রিক্যালসের কারখানায় পারমাণবিক রি-এ্যাক্টারের এণ্ড শীল্ড

ভারতে, পারমাণবিক রি-এ্যাক্টারের এণ্ড শীল্ড তৈরি করার জন্য প্রচুর লাগ ফোর্জিং আমদানী করতে হত। কিন্তু ভূপালস্থিত হেভি ইলেকট্রিক্যালস কারখানার তরুণ ইঞ্জিনীয়ারদের উৎসাহে ও চেষ্টায় এগুলি এখন দেশেই তৈরি হচ্ছে এবং যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রারও সাশ্রয় হচ্ছে।

প্রতিটি লাগ ফোর্জিং (ওজন প্রায় ৩ টন) আমদানী করতে প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় হত। নতুন লাগ ফোর্জিং আমদানী করতে যে শুধু মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রাই ব্যয় হ'ত তাই নয়, এণ্ড শীল্ড তৈরি করতে অনেক সময় যথেষ্ট দেরী হত। এই রকম দেরীতে বিব্রত হয়ে ইঞ্জিনীয়াররা ব্যবহৃত লাগ ফোর্জিং বাঁচিয়ে মিশ্রিত ইস্পাতের টুকরো দিয়ে এণ্ড শীল্ড তৈরি করতে বদ্ধপরিকর হন। মাত্র ১০ সপ্তাহের মধ্যেই এই কর্মসূচীটি রূপায়িত করা হয়।

মিশ্রিত ইস্পাতের টুকরো দিয়ে যে বিরাট আকারের কামানের গোলার মত এণ্ড শীল্ড তৈরি করা হল, সেটির ওজন ছিল ২০ টন এবং ব্যাস ৫.১ মীটার এবং মাত্র ১০ সপ্তাহের মধ্যে এটি তৈরি করা হয়। এই কাজের জন্য প্রতিটি পদে রেডিওগ্রাফি, বুদ্ধি, কুশলতা, ধৈর্য্য, নিপুণতা এবং নিয়ন্ত্রিত ওয়েল্ডিঙের প্রয়োজন হয়। যাতে কোন খুঁত না দেখা দেয় সেজন্য চারটি জোড়ের জায়গায় একসঙ্গে ১৪৯° ফারেনহিট উত্তাপে ওয়েল্ড করতে হয়। কারখানার ওয়েল্ডাররা চারটি জোড়ের কাজ একসঙ্গে সুচারুভাবে সম্পন্ন করেন। ৫.১ মীটার উঁচুতেও যাতে সহজে ওয়েল্ড করে জোড়া লাগানো যায় সেজন্য এই কারখানার প্রধান শিল্পী-কারিগর শ্রীএম, কে, দেব একটি বহনযোগ্য চাতাল তৈরি করেন।

রাজস্থানের কোটাতে ২০০ এম. ওয়াটের যে পারমাণবিক রি-এ্যাক্টার আছে তার এণ্ড শীল্ড তৈরি করার জটিল কাজটির ভার কিছুদিন পূর্ব্বে এই কারখানাকে দেওয়া হয়েছে।

রাঁচিতে, হেভি ইঞ্জিনিয়ারীং কর্পোরেশনের কারখানাগুলির কাছে, ভারত সরকারের গার্ডেনরীচ কারখানার যে ওয়ার্কশপ তৈরি হচ্ছে সেখানে শিগগীরই জাহাজের জন্য ডিজেল ইঞ্জিন তৈরি হবে। পশ্চিম জার্ম্মানীর একটি ইঞ্জিনিয়ারীং সংস্থা এম. এ. এনের সহযোগিতায় এই ওয়ার্কশপটি তৈরি হচ্ছে।

এখানে প্রথম পর্য্যায়ে প্রতি বছরে ৬০০-১৯০০ বি. এইচ. পি এবং ৫০০ আর. এম. পির ২৪টি ইঞ্জিন তৈরি করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কাজ ১৯৭১ সালের প্রথম তিনমাসের মধ্যে সুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তখন রাঁচির কারখানায় এম. এ. এনের "ই" পর্য্যায়ের ১০,৫০০ বি. এইচ. পি এবং ১২২ আর. এন. পির এবং আর ভি ১৬।১৮ পর্য্যায়ের ২৫০-৮০০ বি. এইচ. পি ও ১৬০০ আর. এম. পির-৬ সিলিণ্ডারের বড় ইঞ্জিন তৈরি করা হবে। বর্ত্তমানে দুইজন জার্মান বিশেষজ্ঞ রাঁচিতে নির্ম্মাণ কার্য পরিদর্শন করছেন এবং এই বছরের জুলাই মাস থেকে কারখানায় উৎপাদন সুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

গার্ডেন রীচ ওয়ার্কশপের এম. এ. এনের ২০০ থেকে ৪০,০০০ বি. এইচ. পির, জাহাজের ডিজেল ইঞ্জিন তৈরি করার লাইসেন্স রয়েছে। শক্তিমান ট্র্যাক্টর তৈরি করা সম্পর্কেও এম. এ. এন প্রতিরক্ষা মন্ত্রককে কারিগরি সাহায্য সরবরাহ করে। সম্প্রতি এম. এ. এন, ভারতের তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনকে, তৈল উত্তোলনকারী তিনটি রীগ সরবরাহ করেছে। এগুলি আসামের শিবসাগরে বসানো হচ্ছে।

রাউরকেলা ইস্পাত কারখানায় আর একটি নতুন জিনিস উৎপাদন করা হবে বলে স্থির করা হয়েছে। ডায়নামোর মতো বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জাম তৈরি করার জন্য অত্যন্ত উচ্চস্তরের যে ইস্পাতের পাত দরকার হয় সেগুলি এই কারখানায় তৈরি করা হবে।

রাউরকেলাতে অবশ্য ইলেক্ট্রোলিটিক টিনপ্লেট, ইলেট্রিক্যাল শীট ও আরমারড্ প্লেট্ তৈরি হয় এবং এগুলির যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ "নিলগিরি" তৈরি করার সময় যে ধরণের ইস্পাতের পাত চাওয়া হয়েছিল, এই কারখানা থেকে ঠিক সেই ধরণের ইস্পাতের পাত সরবরাহ করা হয়।

১৯৬৮-৬৯ সালে রাউকেলা থেকে যে সব জিনিস রপ্তানী করা হয় তা হল, জাপানে—১০১,৮০০ টন অশোধিত লোহা; অষ্ট্রেলিয়ায়-৪৫০ টন পাইপ; নিউজীল্যাণ্ডে ১০০ টন পাইপ। (নিউজীল্যাণ্ড থেকে মোট ১৪৫০০ টন পাইপের অর্ডার দেওয়া হয় এবং এই ১০০ টন পাইপ পাঠিয়ে তা সম্পূর্ণ করা হয়।)

গোয়ায়, বেসরকারী ক্ষেত্রে, মার্কিন সহায়তায় যে সার প্রকল্প রূপায়ণের সংকল্প করা হয়েছে তার জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্কের ইন্টারন্যাশনাল ফাইনান্স কর্পোরেশন প্রতিশ্রুত অর্থ সাহায্যের পরিমাণ ১.৫৯৪ কোটি ডলার থেকে বাড়িয়ে ১.৮৯৪ কোটি ডলার করবে ব'লে ঘোষণা করেছে। পুরো প্রকল্পের জন্য ৭.৫ কোটি ডলার ব্যয় হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

REGD. NO. D-

উন্নয়ন বার্তা

★ গুজরাটের জুনাগড় জেলায়, তুলোর বীজ থেকে তেল খইল ইত্যাদি উৎপাদন করার জন্যে সমবায়ের ভিত্তিতে একটি কারখানা স্থাপন করা হয়েছে।

★ ১৯৬৮-৬৯ সালে ওড়িষ্যা, বিভিন্ন দেশে ১৪.৮৫ কোটি টাকার ধাতু আকর রপ্তানী করেছে। জাপান, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, পশ্চিম জার্মানী, বেলজিয়াম এবং রুমানিয়ায় যে লৌহ আকর রপ্তানী করা হয়েছে তাও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

★ পূর্ব্ব জার্মানীতে তৈরি, সবরকম আবহাওয়ায় চলার এবং গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার উপযোগী ১৫০ টনের একটি জাহাজ বোম্বাইতে এসে পৌঁচেছে। বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার জন্য এটি ব্যবহার করা হবে। আধুনিক সাজ সরঞ্জামে সজ্জিত এই জাহাজটি ৬০০ মীটার গভীর জলেও মাছের ঝাঁকের অনুসন্ধান করতে পারবে।

★ ১৯৬৯ সালে ব্যাঙ্কগুলি, সমবায় সমিতি এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে অন্যান্য বছরের তুলনায় যথাক্রমে ৪২ কোটি টাকা এবং ১২২ কোটি টাকা বেশী ঋণ দিয়েছে। নতুন একটি কর্ম্মসূচী অনুযায়ী, পল্লী অঞ্চলের ছোট ছোট শিল্প সংস্থাগুলিকে ৫০০০ টাকা পর্য্যন্ত ঋণ দেওয়া হচ্চে।

★ কৃষির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট পরিমাণ আর্থিক সাহায্য দেওয়ার একটি প্রকল্প অনুসারে রাজস্থানের বহু সংখ্যক কৃষককে ঋণ দেওয়া হয়েছে। রাজস্থান সরকার এবং পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের যুক্ত উদ্যোগে উদয়পুর জেলার সৌভাগ্যপুরায় এই কর্ম্ম সূচী অনুযায়ী কাজ সুরু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের একটা বিশেষ বৈচিত্র্য হল, যাঁদের ৩ থেকে ৬ একর জমি আছে কেবলমাত্র সেই রকম ছোট কৃষকরাই এই সাহায্য পাওয়ার যোগ্য। যে ঋণ দেওয়া হয় তা তিন থেকে সাত বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

★ কালিকাট এবং কোয়েম্বাটুরের মধ্যে মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন এর কার্য্যকুশলতা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

★ দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা অঞ্চল এখন খাদ্যশস্যের ব্যাপারে স্বয়ম্ভরতা অর্জ্জন করেছে। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৬৫-৬৬ সালে যেখানে মাত্র ৮০ একর জমিতে রবি শস্যের চাষ করা হয় সেখানে ১৯৬৮-৬৯ সালে সেই জমির পরিমাণ বেড়ে ১১০০ একর হয়েছে।

★ ভবনগরের কাছে কাম্বে উপসাগরের কাছে ভারতের প্রথম তৈলকূপটির উদ্বোধন করা হয়েছে।

★ নাসার বিজ্ঞানীরা দুই পর্য্যায়ের যে মার্কিন নিকিপচি রকেট এনেছিলেন তা থুম্বা রকেট ক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে সাফল্যের সঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা এবং মার্কিন জাতীয় বিমানও মহাকাশ সংস্থার যুক্ত কর্ম্মসূচী অনুযায়ী দিনের বেলায় মহাকাশ সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য এই রকেট ক্ষেপণ করা হয়।

★ ভারতীয় এয়ারলাইনস এর জন্য সাতটি বোয়িং ৭৩৭ বিমান কেনা সম্পর্কে ভারত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ১১৫টি আসনের এই বিমানগুলি নভেম্বর মাস থেকে সরবরাহ করা সুরু হবে।

★ বিশাখাপতনমে একটি নৌপ্রকল্প নিয়ে যে কাজ সুরু করা হয়েছে তা আগামী ছয় বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্চে। একটি ড্রাই ডক, জাহাজ মেরামতের একটি কারখানা এবং যুদ্ধ জাহাজ তৈরির জন্য একটি জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা স্থাপন এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করতে আনুমানিক ১০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

★ ১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাসে ভারত সবচাইতে বেশী অর্থাৎ ১৪৫.০৪ কোটি টাকার জিনিস রপ্তানী করেছে। এর পূর্ব্ব মাসে ১১৮.৩ কোটি টাকার জিনিস রপ্তানী করা হয়। গতবছর জানুয়ারি মাসের রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ১১৫.৭ কোটি টাকা। বর্ত্তমান বছরের জানুয়ারি আমদানীর তুলনায় ১৬ কোটি টাকার বেশী মূল্যের জিনিস রপ্তানী করা হয়। চলতি বছরে এই চতুর্থবার আমদানী তুলনায় রপ্তানী বেশী হ'ল।

★ পি. এল ৪৮০ কর্ম্মসূচী অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই বছরে ১২৫.০০[illegible] গাঁইট অতিরিক্ত তুলা সরবরাহ করবে এর ফলে, বর্ত্তমানে সুতোর যে চাহিদ[illegible] বেড়েছে তা মেটানো এবং এগুলির মূল[illegible] বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা যাবে বলে আশ[illegible] করা যাচ্ছে।

★ রাঁচির ভারি ইঞ্জিনিয়ারীং কর্পোরে[illegible]শনের বিভিন্ন বিভাগে উৎপাদনের মাত্র[illegible] বেশ বেড়েছে। এই বছরের জানুয়ারি[illegible] এবং ফেব্রুয়ারি মাসে, ভারি মেসিন নির্ম্মা[illegible] কারখানায় মোট ৪৩০০ টন ওজনের মেসি[illegible] ইত্যাদি তৈরি হয়।

★ বিশাখাপতনমের হিন্দুস্তান জাহা[illegible] নির্ম্মাণ কারখানার সংহত উন্নয়নের জ[illegible] ৭.৫৭ কোটি টাকার একটি পরিকল্প[illegible] তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে এখা[illegible] বর্ত্তমানের তিনটির তুলনায় বছরে ৬[illegible] জাহাজ তৈরি করা যাবে। জাহাজ তৈরি[illegible] একটি ডক এবং জলের একটি বেসিন [illegible] তৈরি করা হবে।

★ বিদেশ থেকে যে সব যন্ত্রপাতি [illegible] যন্ত্রাংশ আমদানী করা হয়, সেগুলির বিক[illegible] দেশেই তৈরি করে, তৈল ও প্রাকৃতি[illegible] গ্যাস কমিশন ৪ কোটি টাকার বৈদেশি[illegible] মুদ্রা সাশ্রয় করেছে। জটিল ইলেকট্রোনি[illegible] সাজ সরঞ্জাম, ক্রেন, পরিবহণের সাজ স[illegible]রঞ্জাম, বায়ু কম্প্রেসার এবং তারের দড়ি[illegible] মতো কতকগুলি সাজ সরঞ্জাম দেশেই তৈ[illegible] করে নেওয়া হচ্ছে।

★ একটি সাহায্য কর্ম্মসূচী অনুযা[illegible] ভারত, অষ্ট্রেলিয়া থেকে প্রায় ২ ল[illegible] কিলোগ্রাম মেরিনো পশম পাবে। ২ লক্ষ কিলোগ্রাম পশমের একটা মজু[illegible] ভাণ্ডার গড়ে তুলতে এই চুক্তি ভারত[illegible] সাহায্য করবে এবং ভারতের পশম কা[illegible]রখানাগুলি তাদের রপ্তানী বাড়াতে পারবে।

ডিরেক্টার, পাব্লিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সোসাইটি লিঃ, করোলবাগ, দিল্লী-৫ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

প্রথম বর্ষ দ্বাবিংশতি সংখ্যা

৫ই এপ্রিল ১৯৭০ : ১৫ই চৈত্র ১৮৯২

Vol. 1 : No 22 : April 5, 1970

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

প্রধান সম্পাদক
শরদিন্দু সান্যাল

সহ সম্পাদক
নীরদ মুখোপাধ্যায়

সহকারিণী (সম্পাদনা)
গায়ত্রী দেবী

সংবাদদাতা (মাদ্রাজ)
এস. ভি. রাঘবন

সংবাদদাতা (শিলং)
ধীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী

সংবাদদাতা (কলিকাতা)
সুভাষ বসু

সংবাদদাত্রী (দিল্লী)
প্রতিমা ঘোষ

ফোটো অফিসার
টি.এস. নাগরাজন

প্রচ্ছদপট শিল্পী
আর. সারঙ্গন

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০

টেলিগ্রাফের ঠিকানা : যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

ভুলি নাই

কেবল স্বাধীন হলেই মুক্ত হওয়া যায়না। মুক্তি বলতে যেখানে শুধু স্বাধীনতা বোঝায়, সেখানে মুক্তি অবাস্তব, অর্থহীন এক শব্দ মাত্র।

—রবীন্দ্রনাথ

এই সংখ্যায়

সংশোধিত জাতীয় পরিকল্পনা

চতুর্থ পরিকল্পনা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় এখন, আগামী চার বছরে ভারতের আর্থিক রূপ কি দাঁড়াতে পারে তার প্রায় সঠিক একটা ধারণা করা যায়। ১৯৬৯-সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্য্যন্ত, এই পাঁচ বছরের জন্য জাতির আর্থিক উন্নয়ন সম্পর্কিত খসড়া কর্মসূচীটি শেষ পর্য্যন্ত জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের অনুমোদন লাভ করেছে এবং এখন এটি সংসদে পেশ করা হয়েছে।

এতে অবশ্য আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই বরং এই খসড়া কর্ম্মসূচী যে শেষ পর্য্যন্ত অনুমোদন লাভ করলো তা একটা স্বস্তির কারণ হল। কারণ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে এক বছর সময় লাগলেও, পরিকল্পনা পদ্ধতির বিরোধী, সন্দেহবাদী এবং সর্ব্বক্ষেত্রে দোষ অনুসন্ধানকারী সমলোচকদের সম্মুখ আক্রমণের বিরুদ্ধেও কর্ম্মসূচীগুলি অক্ষতভাবে গৃহীত হওয়ায়, তা, দেশের অগণিত জনসাধারণের পরিকল্পনার ওপর আস্থা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছে। কারণ এই পরিকল্পনা যদি বাতিল হয়ে যেতো তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ এই অগণিত জনসাধারণকে অবাধ অর্থনীতির হাতে ফেলে দিতে হতো। এই বিলম্ব কেন হ'ল তা নিয়ে চুলচেরা তর্কবিতর্ক ক'রে কোন লাভ নেই তবে অন্ততঃপক্ষে এই টুকু বলা যায় যে দুটি যুদ্ধ, ভীষণ খরা এবং মুদ্রামূল্য হ্রাস ও মন্দা, পরিকল্পনা তৈরির পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

তবে এক বছর পূর্ব্বে যে খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করা হয় অথবা তিন বছর পূর্ব্বে যে খসড়া তৈরি করা হয়েছিল, তার তুলনায় বর্ত্তমানে অনুমোদিত পরিকল্পনাটি সব দিক দিয়েই ভালো হয়েছে। কাজেই চূড়ান্ত রূপ দিতে যে বিলম্ব হয়েছে সেই ত্রুটি এতে পূরণ হয়ে গেছে। বিনিয়োগের পরিমাণ, খসড়া পরিকল্পনার চাইতে ৪৮৪ কোটি টাকা বেশী ধ'রে ২৪,৮৮২ কোটি টাকা করা হয়েছে। সামাজিক ন্যায়বিচারের ওপরেও সমান গুরুত্ব দিয়ে একই সঙ্গে স্থায়িত্ব অর্জ্জন ও উন্নয়নের, পরিবর্ত্তিত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হয়েছে।

সংশোধিত পরিকল্পনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীও উল্লেখ করেছেন তা হ'ল, অর্থনীতির ক্ষেত্রে কয়েক বছর পূর্ব্বে সরকারী তরফ যে প্রধান স্থানটি অধিকার করে ছিল তা আবার এই তরফটি ফিরে পেয়েছে। বলা হয়েছে যে "বিনিয়োগের আনুপাতিক ক্ষেত্রে এবং বিনিয়োগের ধরণে, চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ ভাগ পর্য্যন্ত সরকারী তরফ শিল্পের ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করবে।" সরকারী তরফের মোট ১,৫০৪ কোটি কোটি টাকার বিনিয়োগে একমাত্র শিল্পের অংশই হল ২৪৮ কোটি টাকা। আনুমানিক ব্যয় বাড়লেও এই বিনিয়োগ সরকারী তরফের বাধাবিহীন উন্নয়নের পক্ষে যথেষ্ট বলে আশা করা যায়।

সাধারণের কল্যাণ এবং উন্নয়নের সুযোগ সুবিধের ক্ষেত্রে অধিকতর সাম্য অর্জ্জন করার কতকগুলি বিশেষ প্রকল্প নিয়ে চতুর্থ পরিকল্পনায় যে কাজ সুরু করা হয়েছে তা যুক্তিসঙ্গতই হয়েছে। অতীতের অবহেলার ফলে যে সব এলাকা অনুন্নত থেকে গেছে সেখানে এই প্রকল্পগুলি কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধে আরও বাড়াবে বলে আশা করা যায়।

আগামী চার বছরে অনুন্নত রাজ্যগুলিকে ৮৮০ কোটি টাকা বিশেষ সাহায্য হিসেবে দেওয়ার যে ব্যবস্থা পরিকল্পনায় রয়েছে, কতকগুলি রাজ্য, বিশেষ করে উন্নত রাজ্যগুলি তার ভীষণ বিরোধীতা করে এবং তাঁরা বলে যে এই ব্যবস্থার পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। যাইহোক পরে যখন অধ্যাপক গাডগিল জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের অধিবেশনে এই বরাদ্দের উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেন তখন সেই রাজ্যগুলি তা বাহ্যতঃ মেনে নেয়। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের ডেপুটি চেয়ারম্যান একে পরিকল্পনামূলক ও পরিকল্পনা বহির্ভূত আর্থিক ব্যবস্থা সংহত করার অন্যতম একটি ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেন।

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের অনুমোদন পাওয়ার ফলে পরিকল্পনাটির সাধারণের অনুমোদন লাভ করার মৌলিক কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেল। কারণ রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়েই এই পরিষদটি গঠিত এবং তাঁরাই দেশের জনগণের সমবেত ইচ্ছার প্রতীক। কাজেই এখন সম্পদ সংগ্রহ এবং পরিকল্পনাটির দ্রুত ও কার্য্যকরি রূপায়নের দিকেই সমগ্র মনযোগ নিবদ্ধ করতে হবে। এর দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রের তুলনায় রাজ্যগুলির বেশি। দেশকে যদি যুক্তিসঙ্গত সামাজিক ন্যায়বিচার ও স্থায়ীত্বের আবহাওয়ায় উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছুতে হয় তাহলে গ্রাম ও সহর, কৃষিক্ষেত্র ও কারখানার সর্ব্বক্ষেত্রে অর্থাৎ জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে প্রত্যেককে সর্ব্বাধিক অবদান যোগাতে হবে।

চতুর্থ পরিকল্পনা

সমৃদ্ধি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের রেখাচিত্র

সামাজিক ন্যায়বিচার এবং স্বাধীনতার সঙ্গে দেশের অগ্রগতি অব্যাহত রাখাই হল সংশোধিত চতুর্থ পরিকল্পনার মূল্য লক্ষ্য। দেশে যে কারিগরী ও আর্থিক সম্পদ রয়েছে তা দিয়েই উন্নয়নের হার যাতে যতটা সম্ভব বাড়ানো যায়, সেই রকম ভাবেই পরিকল্পনাটি তৈরি করা হয়েছে। জাতীয় আয় মোটামুটি বার্ষিক ৫.৫ শতাংশ বাড়বে বলে পরিকল্পনায় অনুমান করে নেওয়া হয়েছে। জনসংখ্যা শতকরা আনুমানিক ২.৫ ভাগ বাড়লে জনপ্রতি আয় শতকরা ৩ ভাগ বাড়বে বলে মনে হয়। জাতীয় আয় বার্ষিক ৫.৫ শতাংশ বৃদ্ধির এই লক্ষ্য পূরণ করার জন্য পরিকল্পনায় ২৪,৮৮২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। খসড়া পরিকল্পনায় যে ২৪,৩৯৮ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছিল তা থেকেও ৪৮৪ কোটি টাকা বেশী বিনিয়োগ করা হচ্ছে। সরকারী তরফে ১৫,৯০২ কোটি টাকা লগ্নি করা হবে এবং বেসরকারী তরফের লগ্নির পরিমাণ ধরা হয়েছে ৮৯৮০ কোটি টাকা। কাজেই সরকারী তরফে লগ্নির মোট পরিমাণ বাড়বে ১৫০৪ কোটি টাকা।

মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা সৃষ্টি না করে সম্পদ সংগ্রহ

২৪,৮৮২ কোটি টাকা ব্যয় করতে হলে দেশের জনসাধারণকে আরও বেশী সঞ্চয় করতে হবে এবং লগ্নি বাড়াতে হবে। বর্ত্তমানে দেশের জাতীয় আয়ে আভ্যন্তরীন সঞ্চয়ের অংশ হল শতকরা ৮.৮ ভাগ। এই সঞ্চয়ের হারও চতুর্থ পরিকল্পনার শেষভাগ অবধি শতকরা ১৩.২ ভাগ পর্যন্ত বাড়াতে হবে। উৎপাদন বাড়িয়ে, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে এবং আর ও আড়ম্বরপূর্ণ ব্যয়ের ওপর করের হার বাড়িয়ে, সঞ্চয়ের হার বাড়ানো হবে। লগ্নির হার বর্ত্তমানের ১১.৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৪.৫ শতাংশ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

কৃষি উৎপাদন বার্ষিক মোটামুটি ৫ শতাংশ এবং শিল্পের উৎপাদন ৮ থেকে ১০ শতাংশ বাড়িয়ে; বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা হ্রাস করে আর্থিক ব্যবস্থার পরিচালনা উন্নততর ক'রে, রপ্তানী বার্ষিক ৭ শতাংশ বাড়িয়ে এবং খাদ্যশস্য, উৎপাদিত সামগ্রী এবং কাঁচামালের উৎপাদন বাড়িয়ে আমদানী আরও হ্রাস করে; খাদ্যশস্যের সরবরাহ উন্নততর করে বিশেষ করে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুদ ক'রে মূল্যে স্থিতিশীলতা এনে ৫.৫ শতাংশ উন্নয়ন হার অর্জ্জন করা যাবে বলে অনুমান করা হয়েছে।

মূল্যের স্থিতিশীলতার জন্য কৃষির উন্নয়ন হার বজায় রাখা বিশেষ প্রয়োজন

চতুর্থ পরিকল্পনায় সাফল্য লাভ করতে হলে কৃষিতে বার্ষিক ৫ শতাংশ উন্নয়ন হার বজায় রাখতে হবে। আয় বৃদ্ধির মোটামুটি লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে যেমন এই উন্নয়ন হার বজায় রাখা প্রয়োজন তেমনি মূল্যে স্থিতিশীলতা অর্জ্জনের পক্ষেও এটা বিশেষ প্রয়োজন।

প্রধানতঃ অধিক ফলনের বীজ, সার, কীটনাশক, কৃষি সাজসরঞ্জাম, উন্নততর কৃষিপদ্ধতি এবং জলসেচের সুযোগ সুবিধে ইত্যাদিসহ আধুনিক কৃষিপদ্ধতি যথাসম্ভব বেশী প্রয়োগ করে কৃষিতে ৫ শতাংশ উন্নয়ন হার বজায় রাখার চেষ্টা করা হবে। চাষীরা বিশেষ করে ছোট চাষীরা যাতে সময়মত প্রয়োজন অনুযায়ী সার পেতে পারেন সে জন্য পরিকল্পনায় একটি সার ঋণ গ্যারান্টি কর্পোরেশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

কৃষিতে যে টাকা বিনিয়োগ করা হবে তার বেশীর ভাগই জলসেচের সুযোগ সুবিধে উন্নততর করা ও বাড়ানোর জন্য ব্যয় করা হবে। ছোট ছোট জলসেচযুক্ত এলাকার পরিমাণ বাড়ানো হবে। এর জন্য পরিকল্পনায় ২০০০ কোটি টাকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং তা পূর্ব্বের পরিকল্পনাগুলি থেকে অনেক বেশী। জলসেচবিহীন অঞ্চলে উৎপাদন বাড়াবার জন্য প্রধানতঃ ভূমি সংরক্ষণ এলাকার কর্মসূচীর ওপরেই জোর দেওয়া হবে। তাছাড়া যে সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম এই রকম কতকগুলি ঘনসংবদ্ধ এলাকায় কৃষি উন্নয়নের জন্য একটা সংহত কর্ম্মসূচী গ্রহণ করা হবে। পরিকল্পনায় এর জন্য ২০ কোটি টাকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সারের সরবরাহ তিনগুণেরও বেশী বাড়ানো সম্পর্কে পরিকল্পনায় ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, অর্থাৎ ১৯৬৮-৬৯ সালে যেখানে মোটামুটি ২০ লক্ষ টন সার উৎপাদিত হয়, ১৯৭৩-৭৪ সালে সেখানে ৬০.৬ লক্ষ টন উৎপাদিত হবে বলে আশা করা যায়। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে অধিক ফলনের বীজের ব্যবহার যথেষ্ট বাড়ানো হবে। এই পরিকল্পনার শেষ পর্য্যন্ত ২ কোটি ৪০ লক্ষ একর জমিতে অধিক ফলনের বীজের চাষ করা হবে

শিল্প

পরিকল্পনায়, শিল্পের উৎপাদন (খনি এবং নির্ম্মাণ শিল্পসহ) বৃদ্ধির হার বার্ষিক ৮.৭ শতাংশ রাখা হয়েছে। সরকারী তরফে শিল্পে যে অর্থ বিনিয়োগ করা হবে, তার বেশীর ভাগই, ধাতু, সার, তৈল সংশোধন এবং মেসিন তৈরির শিল্পে নিয়োগ করা হবে। ব্যক্তিগত আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিনি, বস্ত্রাদি, বাইসাইকেল এবং স্কুটারের চাহিদা বাড়ার যে সম্ভাবনা আছে তার চাইতেও এগুলির উৎপাদন যাতে কিছুটা বেশী হয় তার জন্য সরকারী ও বেসরকারী তরফে যথেষ্ট ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এগুলির দাম বাড়বে না বলেই আশা করা যাচ্ছে।

পরিকল্পনায় বেসরকারী তরফের লগ্নির

পরিমাণ ধরা হয়েছে ২১০০ কোটি টাকা। সরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে বেসরকারী তরফকে ৩০০ কোটি টাকা সাহায্য করা হবে এবং অতিরিক্ত যে সম্পদের প্রয়োজন হতে পারে, এটাই তার পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করা হয়।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির জন্য সরকারী তরফ থেকে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। এগুলির আর্থিক স্থায়িত্ব এবং উৎপাদন ক্রমশ: বাড়িয়ে তোলার ওপরেই গুরুত্ব দেওয়া হবে। চিরাচরিত গ্রাম্য ও কুটির শিল্পগুলির উন্নয়ন এবং আর্থিক সম্ভাব্যতাসম্পন্ন কার্য্যকরী প্রকল্পগুলির ওপরেই বেশী জোর দেওয়া হবে।

বিদ্যুৎশক্তি

বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন সম্পর্কিত যে সব প্রকল্প নিয়ে কাজ হচ্ছে সেগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য ৯০৯ কোটি টাকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নতুন প্রকল্পগুলির জন্য ১৫২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। এবং এগুলি থেকে ২০.৯ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হবে। এগুলি অবশ্য পঞ্চম পরিকল্পনার সময়ে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করতে সুরু করবে। যে সব পুরোনো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র প্রায় অচল হয়ে গেছে সেগুলি যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলেও অতিরিক্ত কেন্দ্রগুলি থেকে ৭০.৫ লক্ষ কি: ওয়াট শক্তি পাওয়া যাবে আর তাতে ১৯৭৩-৭৪ সাল পর্যন্ত মোট ২ কোটি ২০ লক্ষ কি: ওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদিত হবে। তবে ১৯৬৮-৬৯ সালের তুলনায় ১৯৭৩-৭৪ সাল পর্যন্ত দেশে বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন ও ব্যবহার প্রায় দ্বিগুণ বাড়বে বলে আশা করা যাচ্ছে।

পরিবহণ

১৯৭৩-৭৪ সাল পর্য্যন্ত রেলওয়েগুলি মোট ২৮ কোটি ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন মাল বহন করবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ১৯৬৮-৬৯ সালে এর পরিমাণ ছিল ২০ কোটি ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন। যাত্রী বহনের পরিমাণও ১১১ বিলিয়ন যাত্রী কিলোমীটার থেকে বেড়ে ১৩৮ বিলিয়ন যাত্রী কিলোমীটার হবে বলে অনুমান করা হয়। রেলওয়ের জন্য যে বিনিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে (রেলওয়ের নিজস্ব অবদানসহ ১৫৭৫ কোটি টাকা) তা, ১৯৭৩-৭৪ সাল পর্য্যন্ত, প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত ক্ষমতা সঞ্চার করার পক্ষে যথেষ্ট হবে এবং সেই সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী লগ্নির পক্ষেও যথেষ্ট হবে। তবে এই বিনিয়োগের লাভগুলি পরে পাওয়া যাবে।

বাণিজ্য এবং সাহায্য

বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা হ্রাস করা হ'ল পরিকল্পনাটির একটি প্রধান উদ্দেশ্য। সেই জন্য বার্ষিক ৭ শতাংশ রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্য রাখা হয়েছে। রপ্তানীযোগ্য দ্রব্যাদির উৎপাদনকারী শিল্পগুলিতে আরও অর্থ বিনিয়োগ করা হবে এবং এগুলিকে এদের প্রয়োজনীয় উপযুক্ত দ্রব্যাদি সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হবে। বহুকাল থেকে ভারত যে সব জিনিস রপ্তানী করে আসছে সেগুলির জন্য নতুন বাজার খোঁজা হবে এবং এগুলিকে অন্য কোনভাবে ব্যবহার করা যায় কিনা তাও পরীক্ষা করে দেখা হবে।

অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিশেষ করে খাদ্যশস্যের মত অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্ষেত্রে সরকারী ব্যবসায় সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য কাঁচামালের একটা বড় পরিমাণের সরকারী মজুদ ভাণ্ডার গড়ে তোলার ওপর পরিকল্পনায় জোর দেওয়া হয়েছে এবং এগুলি মজুদ করার জন্য গুদাম ইত্যাদি তৈরি করারও ব্যাপক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অতি প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে সমবায় বিপণন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সমবায় বন্টন ব্যবস্থা আরও সম্প্রসারিত করা হবে।

কর্ম্মসংস্থান

পল্লী অঞ্চলে, ছোট জলসেচ, ভূমি সংরক্ষণ, বিশেষ অঞ্চল উন্নয়ন, ব্যক্তিগত গৃহ নির্ম্মাণ, সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, পল্লী অঞ্চল বৈদ্যুতিকীকরণ এবং নিবিড় চাষ, নতুন কৃষি পদ্ধতি সম্প্রসারণ ইত্যাদির মতো প্রকল্পগুলি রূপায়িত করলে শ্রমিকের চাহিদা যথেষ্ট বাড়বে বলে আশা করা যাচ্ছে। শিল্প ও ধাতুদ্রব্য, পরিবহণ, যোগাযোগ এবং বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করার প্রস্তাব রয়েছে তা সংগঠিত শিল্পগুলিতে শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ বাড়াবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তরুণ ইঞ্জিনীয়ররা এবং অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তিরা যাতে ছোট ধরণের শিল্প অথবা নিজেদের কর্ম্মসংস্থানের উপযুক্ত কোন বৃত্তি গড়ে তুলতে পারেন সেজন্য রাষ্ট্রাধীন ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলিসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় শিল্পোন্নয়ন ও কোম্পানী ব্যাপার সম্পর্কিত মন্ত্রক নানা ধরণের প্রকল্প চালু করবেন। কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে কাজের গতি বাড়লে, সড়ক পরিবহণ, যোগাযোগ ও বাণিজ্যে কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়বে বলে আশা করা যাচ্ছে।

আন্তঃ আঞ্চলিক অসাম্য

জনপ্রতি আয়ের ক্ষেত্রে যে সব রাজ্যের জনপ্রতি আয় জাতীয় হারের তুলনায় কম, সাহায্য বন্টনের সময়, কেন্দ্রীয় সরকার সেই রাজ্যগুলিকে উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অনুন্নত এলাকাগুলিতে শিল্প স্থাপনে আর্থিক সাহায্য করার ব্যাপারে আর্থিক ও ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি কিছুটা বেশী সুযোগ সুবিধে দেবে। বিভিন্ন স্থানে শিল্প স্থাপন করে, ছোট কৃষক এবং ভূমিহীন শ্রমিকদের জন্য পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ করে, শুষ্ক, মরুভূমি এবং গভীর খাদযুক্ত বিশেষ অঞ্চলগুলির উন্নয়নের জন্য যে সব প্রকল্প গ্রহণ করা হবে তা বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অসমতা দূর করতে সাহায্য করবে।

সমাজকল্যাণ সেবা

অনুন্নত অঞ্চল ও সম্প্রদায়সমূহের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে এবং নারী শিক্ষার সুযোগ সুবিধে বাড়ানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে, শিক্ষা কর্ম্মসূচীতে, প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। অশিক্ষিত যুব সম্প্রদায় এবং যুবসেবা সম্পর্কে যে পরীক্ষামূলক কর্ম্মসূচী রয়েছে তা নিয়ে

কাজ সুরু করা হবে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্ম্মসূচীর মধ্যে আছে বিজ্ঞান শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিল্পগুলির প্রয়োজন ও কারিগরী শিক্ষার মধ্যে নিকটতর সম্পর্ক স্থাপন।

অনুন্নত শ্রেণীগুলির কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য যে সব কর্ম্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলির লক্ষ্য হ'ল 'উন্নয়ন' সম্পর্কিত সুযোগ সুবিধের ক্ষেত্রে অধিকতর সমতা অর্জ্জন। ভূমি বন্টন এবং বসতিস্থাপন, ছোট জলসেচ এবং কৃষি ও পশুপালনের জন্য আর্থিক সাহায্য দিয়ে অনুন্নত শ্রেণী-গুলির আর্থিক উন্নয়ন করার জন্য যে সব কর্ম্মসূচী রয়েছে তা ছাড়াও বৃত্তি, বই কেনার জন্য আর্থিক সাহায্য, হোষ্টেলে থাকার সুযোগ সুবিধে ক'রে দিয়ে এবং পরীক্ষার ফী মকুব করে শিক্ষা বিস্তারের জন্য চেষ্টা করা হবে।

স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা

প্রত্যেকটি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে একটি করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ক'রে সেগুলির মাধ্যমে স্বাস্থ্য রক্ষার সুযোগ সুবিধে সম্প্রসারিত করা বিশেষ ক'রে পরিবার পরিকল্পনা কর্ম্মসূচীগুলি রূপায়িত করাই হ'ল এই ক্ষেত্রের মোটামুটি লক্ষ্য। এই কেন্দ্রগুলি যেমন রোগ প্রতিরোধমূলক এবং চিকিৎসার সুযোগ সুবিধের ব্যবস্থা করবে তেমনি সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা সম্পর্কেও দায়ী থাকবে। মহকুমা এবং জেলার হাসপাতালগুলি আরও শক্তিশালী করা হবে এবং প্রাথমিক সাস্থ্য কেন্দ্র থেকে শক্ত রোগীদের এই সব কেন্দ্রে পাঠানো যাবে।

আগামী দশ বছরের জন্যে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত কর্ম্মসূচী কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকবে। পরিবার পরিকল্পনা কর্ম্মসূচীগুলির জন্য পরিকল্পনায় ৩০০ কোটি টাকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এর জন্য মাত্র ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। বর্ত্তমানে জাতীয় জন্মহার হ'ল প্রতি হাজারে ৩৯। ১৯৭৩-৭৪ সালের মধ্যে এই জন্মহার প্রতি হাজারে ৩২ করা এবং ১৯৮০-৮১ সাল পর্য্যন্ত তা আরও কমিয়ে হাজার প্রতি ২৫ করাই হ'ল এই কর্ম্মসূচীগুলির লক্ষ্য। সুযোগ সুবিধে, সরবরাহ এবং সেবাব্যবস্থা খুব তাড়াতাড়ি সম্প্রসারিত করে এবং ব্যক্তিগত আলোচনা ও পরামর্শ ইত্যাদির মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য পূরণ করার চেষ্টা করা হবে। এর সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থাগুলিও উন্নততর করা হবে।

প্রগতিশীল কৃষি পদ্ধতির সাফল্য

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির অভিযানে দেশের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে আসামও দৃঢ় পদক্ষেপে এগোচ্ছে, ফলে আসামের বিভিন্ন এলাকায় প্রগতিশীল কৃষি পদ্ধতি এমন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে যে তার তুলনা দিতে একটা দুটো নয় অনেক ব্লকের নাম করা চলে।

এই প্রসঙ্গে কাছাড় জেলার ব্লক 'লালা'র নাম করা যায়। লালা ব্লকের প্রগতিশীল কৃষক অমৃতমোহন নাথ কীভাবে চাষবাসের পুরোনো ধারা উল্টে দিয়ে নতুন কৃষি পদ্ধতি, প্রচুর ফলন শস্যের চাষ ও ফসল চাষের নতুন ক্রম প্রচলিত করেছেন তা জানলেই সমগ্র রাজ্যে কৃষি ব্যবস্থায় কি রূপান্তর ঘটেছে ও ঘটছে তার আন্দাজ পাওয়া যায়। শ্রীনাথের জমিতে আই-আর ৮ ধানের বীজ বোনা হয়। জমিতে হাল দেওয়া, মই দেওয়া বীজ বোনার সময় নির্দিষ্ট ফাঁক রাখা, সেচ-সার প্রভৃতি সব ব্যাপারেই আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। ১৯৬৯-৭০ সালে শ্রীনাথের জমি থেকে একর প্রতি ১৫১ মণ ফসল পাওয়া যায় (যদিও ইতিপূর্বে সরকারী পরীক্ষাধীন জমিতেই ফসল সাড়ে ৬ মণের মত কম হয়েছিল)।

শ্রীনাথের কাছে গোড়ায় এক একর মাত্র জমি ছিল। তাতে ফসল যা হ'ত তাতে পরিবারের মুখে অন্ন জোগানো দায় ছিল। ঐ জমিতে স্থানীয় বীজের চাষ করে বছরে ফসল পাওয়া যেত তিরিশ মণের মত।

১৯৬৬-৬৭ সালের বোরো মরসুমে শ্রীনাথ তাইচুং দেশী-১ বুনেছিলেন। চাষবাস, সেচ সারের আধুনিক পন্থা পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে ফসল পেয়েছিলেন ৮৪ মণ ঐ বছরের রেকর্ড।

তারপর ১৯৬৭-৬৮ সালে নিজের জমিতে দুটি ফসল ফলাবেন বলে শ্রীনাথ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন; আই আর-৮-এর সঙ্গে আরও একটি বীজ বুনবেন বলে স্থির করলেন। জমি তৈরি করে নিয়ে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে বীজ রোয়া থেকে রাসায়নিক সার ও কীট নাশক প্রয়োগ করা, পাম্প সেটের সাহায্যে সেচ দেওয়া প্রভৃতি সবেতেই এলাকার এক্সটেনশান অফিসাররা এবং গ্রামসেবক প্রশিক্ষন কেন্দ্রগুলি শ্রীনাথকে সাহায্য করলেন। ফলে প্রচুর ফসল পাওয়া গেল। এই সব পরীক্ষা নীরিক্ষার ফলে শ্রীনাথের উৎসাহে যেন জোয়ার এল। যে জমিতে বছরে ৩০ মণ ধান হত সে জমিতে ১৫১ মণ অর্থাৎ পাঁচ গুণেরও ওপর ধান হয়েছে, এ কি কম কথা।

পরের বছর তিনি নিজেই নিজের চেষ্টায় দুটি ফসল তোলার জন্য তৈরি হলেন। আউশ ও বোরো বুনে ফসল পেলেন ১৮১ মণ। এরপর শ্রীনাথ স্থির করলেন যে, আসছে মরসুমে (১৯৬৯-৭০) পালা ক'রে তিনটি ফসল ফলাবেন—প্রথমে শালী, তারপর আউশ ও তারপর রবি।

শ্রীনাথের চেষ্টা কতদূর ফলবতী হয়েছে তা এখনও জানা যায়নি কিন্তু দুটি ফলনে ফসলের পরিমাণ যদি ১৮১ মণ হয়ে থাকে—তিনটি ফলনে তার পরিমাণ আরও বাড়বে এতে সন্দেহ কী? অর্থাৎ শ্রীনাথ এই কথাটা প্রমাণ করলেন সে যথাযথভাবে পরিচর্যা করলে ভূমিলক্ষ্মী অকৃপণ হাতে তাঁর প্রসাদ ঢেলে দেন।

যোজনার অসমীয়া সংস্করণ

গত ১৪ই মার্চ্চ গৌহাটিতে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, যোজনার অসমীয়া সংস্করণ "পয়োভরার" প্রথম সংখ্যাটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটি প্রতি পক্ষে প্রকাশিত হবে। এটি নিয়ে যোজনার হিন্দি, বাংলা, তামিল, অসমীয়াসহ পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হল।

যথেষ্ট বিনিয়োগ বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর করবে

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ

জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের দুইদিন ব্যাপি অধিবেশনে চতুর্থ পরিকল্পনায় বিনিয়োগ সম্পর্কে সংশোধিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়। দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে, এই পরিকল্পনায় সরকারী তরফে যে ১৫,৯০২ কোটি টাকা বিনিয়োগ অনুমোদিত হয়েছে তাকে লগ্নির ক্ষেত্রে বেশ যথেষ্ট বৃদ্ধি বলা যায় এবং ৫ থেকে ৬ শতাংশ উন্নয়ন হার অর্জ্জন করার জন্য চেষ্টাকেও, আর্থিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট দ্রুতগতি বলা যায়। তবে তিনি একথাও বলেন যে এগুলির ফলেই যে উৎপাদন বেড়ে যাবে অথবা জনসাধারণের জন্যে আরও বেশী সুযোগ সুবিধের ব্যবস্থা করা যাবে তা একেবারে স্বত:সিদ্ধভাবে ধরে নেওয়া যায় না।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন যে জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদে অনেক কথা বলা হলেও, চতুর্থ পরিকল্পনায় বিনিয়োগের যে পরিমাণ ধরা হয়েছে তা সম্ভবপর নয়, এমন কথা কেউ বলেন নি।

তবে পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত এই কথার ওপরে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ জোর দেন। কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ করতে স্বীকৃত হয়েছেন।

পরিকল্পনার কতকগুলি দিকের ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে করের মাধ্যম ছাড়া ঋণের মাধ্যমেও সম্পদ সংহত করতে হবে। পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যাপারে ও অন্যান্য ব্যাপারে ব্যয়ের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যে কয়েকটি রাজ্যে বর্ত্তমানে ঘাটতি চলেছে সেগুলির জন্যই যে শুধু উন্নততর আর্থিক পরিচালনা ব্যবস্থা দরকার তাই নয় অন্যান্য রাজ্য এবং কেন্দ্রের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য।

প্রধান মন্ত্রী বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের কোন জায়গাতেই উন্নয়নের গতি হ্রাস করতে ইচ্ছুক নন। সরকার অবশ্য অনুন্নত অঞ্চলগুলির উন্নয়নের গতি বাড়াতে চান কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে অন্যান্য রাজ্যগুলির উন্নয়নের গতি কমাতে হবে।

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীকরণের কথা উল্লেখ করে, প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, এই আইনটি কার্য্যকরী করার পর গোড়ার দিক থেকেই ভাল ফল দিতে সুরু করে। গত বছরের তুলনায় এবারে সরকারী ঋণের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যায়। রাষ্ট্র যখন আনুমানিক ৫০.৭ কোটি টাকা ঋণ সংগ্রহ করতে চান তখন প্রকৃতপক্ষে ৭৮.৬৮ কোটি টাকা পাওয়া যায়। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য যখন আনুমাণিক ১৯.২০ কোটি টাকা ঋণ সংগ্রহ করতে চাওয়া হয় তখন আসলে পাওয়া যায় ৮০ কোটি টাকা। এত বেশী টাকা পাওয়ার অন্যতম কারণ হল ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীকরণ। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এমন কি একটি রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যে অসমতা রয়েছে আমাদের সীমাবদ্ধ সম্পদ নিয়ে সেই বৈষম্য আস্তে আস্তে দূর করে অগ্রগতি বজায় রাখতে হবে।

এর পূর্ব্বে উদ্বোধনী ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধান মন্ত্রী বলেন, "আমাদের ন্যূনতম যে সব কাজ করতে হবে তা এই চতুর্থ পরিকল্পনায় বলা হয়েছে। প্রকৃত ইচ্ছা নিয়ে সুরু করলে এই কাজগুলি সম্পূর্ণ করা আমাদের ক্ষমতা বহির্ভূত নয়। এই পরিকল্পনায় উল্লিখিত কর্ত্তব্যগুলি যদি আমরা সুদৃঢ় মনোভাব নিয়ে রূপায়িত করতে অগ্রসর না হই তাহলে আমরা জনসাধারণের কাছে আমাদের দায়িত্ব পালনে বিফল হবো। আমরা যদি সমগ্রভাবে আমাদের দেশকে উন্নততর করে তুলতে পারি এবং অগ্রগতি করার জন্য একটা দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলতে পারি তাহলেই শুধু আমরা আমাদের স্থানীয় অসুবিধে সমাধান করতে পারবো।

অধ্যাপক গাডগিলের মন্তব্য

এর পূর্ব্বে জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান অধ্যাপক গাডগিল বলেন যে, পর্ষদের বিগত অধিবেশনে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সেই অনুযায়ী এবং ১৯৬৯-৭৪ সালের জন্য অর্থ কমিশনের সুপারিশগুলি সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ার পর পরিকল্পনা কমিশন প্রতিটি রাজ্যের আর্থিক অবস্থা পুনরায় পরীক্ষা ক'রে দেখেন। তাতে দেখা যায় যে, অর্থ-কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় অর্থের কিছু অংশ রাজ্যগুলিকে দেওয়া হলেও চতুর্থ পরিকল্পনার সময়ে অনেকগুলি রাজ্যেরই পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে মোটামুটি ঘাটতি থাকবে।

অধ্যাপক গাডগিল বলেন যে, একটা অভিন্ন মানদণ্ড বা নীতির মাধ্যমে এই পরিস্থিতি আয়ত্বে আনা কঠিন। পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় কি রকমভাবে হ্রাস করা যেতে পারে, রাজ্যগুলি পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য কি করে যথাসম্ভব বেশী লগ্নি করার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ করতে পারে সে সম্পর্কে ব্যবস্থাদি অবলম্বন করতে পরিকল্পনা কমিশন খুবই উৎসুক। এই রকম ক্ষেত্রে এমন একটা নীতি স্থির করা উচিত যাতে অতিরিক্ত সম্পদ সংহত করা সম্পর্কে রাজ্যগুলির প্রচেষ্টা বজায় থাকে এবং এই অতিরিক্ত সম্পদ, পরিকল্পনা বহির্ভূত কাজে খরচ না হয়ে যাতে রাজ্যগুলির পরিকল্পনা রূপায়নেই খরচ হয় তা সুনিশ্চিত করা যায়।

অধ্যাপক গাডগিল বলেন যে, অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুসারেই কিছু কেন্দ্রীয় কর রাজ্যগুলিকে হস্তান্তর করা

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

অর্থনীতির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের যেমন গুরুত্ব রয়েছে তেমনি দেশের শিল্পোন্নয়নকে সম্পূর্ণ করার মূলে রয়েছে, সমবায়ের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। বৃহত্তর শিল্পের রয়েছে নিজস্ব সংগঠন, নিজস্ব পুঁজির জোর। কিন্তু ক্ষুদ্র শিল্পের নিজস্ব সংগঠন প্রায়ই অত্যন্ত দুর্ব্বল সুতরাং একক শক্তিতে সমস্ত সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু সমবায়ের মধ্যে রয়েছে সেই সংগঠনী শক্তি। ক্ষুদ্র শিল্পের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে মূলধন অথবা পুঁজির সমস্যা প্রধান। সমবায় ঋণ সংস্থার সুষ্ঠু বিন্যাসের ওপর এই মৌল সমস্যার সমাধান অনেকটা নির্ভর করছে। সমবায় ঋণদান সংস্থার শিল্প ঋণদান পদ্ধতিও খুব সরল আর সুদের হার নিতান্তই স্বল্প, শতকরা মাত্র আড়াই টাকা। সমস্ত শ্রেণীর লোক ঋণের সুবিধা পেতে পারে।

সমবায় ঋণ সংস্থা

সমবায় ঋণ সংস্থার গঠন শৈলী অনেকটা ত্রিতল ব্যবস্থার মত। শীর্ষে রয়েছে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক—বাংলা দেশে যার সংখ্যা একুশ, শাখা প্রশাখা মিলিয়ে মোট ৫৪। এর পরেই রয়েছে দুটি রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক। কৃষি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে রয়েছে তেরো হাজার আটশো ছেচল্লিশটি প্রাথমিক সমবায় ঋণ সংস্থা। এই বিরাট সংগঠনের জাল অর্থনীতির প্রায় প্রতিটি স্তরকেই স্পর্শ করেছে। বাংলা দেশের মোট ৩৮ হাজার পাঁচশো ত্রিশটি গ্রামের মধ্যে ৩০৮৬৪ টি গ্রাম সমবায় ঋণ সংস্থার সুযোগ পাচ্ছে। আমাদের দেশে তাঁত, কারু শিল্প ও গ্রামীণ শিল্পের ক্ষেত্র অতিক্রম করে সমবায় ঋণ সংস্থার পরিধি ক্রমশই বিস্তৃত হচ্ছে। বোম্বাই, মহীশূর, উত্তর প্রদেশে শুধু মাত্র ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনেই বিশেষ সমবায় ঋণ সংস্থা স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৬৫-৬৬ সালের সমীক্ষায় প্রকাশ প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক, শিল্পের স্বল্প মেয়াদী চাহিদা পূরণের জন্য মোট ২৪ হাজার টাকার ঋণ মঞ্জুর করেছিলেন, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক মঞ্জুর করেছিলেন ৬ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা।

ক্ষুদ্রশিল্পের বিপণন সমবায় বিপণন সংস্থা

সমবায় ঋণ সংস্থা কোন কোন সময় সমবায় বিপণন সংস্থায় পরিণত হতে পারে। ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে বিপণনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাও সময় সময় সমস্যার আকার ধারণ করে। বিপণনের একটি দিক হল প্রস্তুতকারী সংস্থাকে সময়মত ন্যায্য মূল্যে কাঁচামালের যোগান দেওয়া, অন্যটি, উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে ব্যাপক বিপণন। অর্থ সাহায্য এবং কাঁচামাল সরবরাহ একই উদ্দেশ্যের দুটি ভিন্নরূপ। ক্ষুদ্র সংস্থার

পশ্চিম বাংলার চিত্র

কাঁচামাল সংগ্রহের সমস্যা ভারতবর্ষের শিল্প ইতিহাসে একটি পুরাতন উপসর্গ। অর্থের অভাবে, পাইকারি বাজার থেকে এককালীন কাঁচা মাল সংগ্রহ অনেক সংস্থার পক্ষেই সম্ভবপর হয় না। এই সমস্ত সংস্থা সাধারণত খুচরো বাজার থেকে কাঁচা মাল সংগ্রহ করে পাইকারি বাজারে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ে বাধ্য হয়। এই বিচিত্র পদ্ধতি অনুসরণের ফলে এই সমস্ত সংস্থার অর্থনৈতিক কাঠামো ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ে। সমবায় বিপণন সংস্থা এই সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম। তাঁত শিল্পের ক্ষেত্রে সমবায় বিপণন সংস্থা একটি পরীক্ষিত সাফল্য। এই শিল্পের ক্ষেত্রে ঋণ সমবায়গুলিই পরবর্ত্তীকালে বিপণন সংস্থায় রূপান্তরিত হয়ে তন্তুজীবীদের সুতো, রঙ প্রভৃতি কাঁচা মাল সরবরাহ শুরু করে। এই শিল্প সমবায়গুলির শীর্ষে রয়েছে 'এ্যাপেক্স সোসাইটি'। এ্যাপেক্স সোসাইটি, প্রাথমিক সমিতিগুলিকে সুবিধাজনক মূল্যে কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যাপারে সাহায্য করে থাকে। কাঁচামাল সরবরাহের পাশাপাশিই রয়েছে উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যাপক বিপণন সমস্যা। সমবায় বিপণন সংস্থা এই দায়িত্ব বহনের প্রতিশ্রুতি দিতে পারে।

বিপণন সমবায়গুলির কর্মপদ্ধতি

সমবায় বিপণন সংস্থা উপযুক্ত সময়ে, সভাসংস্থাগুলির উৎপাদিত পণ্য বিপণন ক'রে শিল্পসংস্থার স্বার্থ সংরক্ষিত করছে। বাজারে দালাল অথবা ঐ জাতীয় একদল পরাশ্রিত মানুষের হাত থেকে ক্ষুদ্র শিল্পকে রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সমবায় বিপণনের কর্মসূচীতে প্রতিফলিত। তাঁত এবং হস্ত শিল্পের ক্ষেত্রে সমবায় বিপণনের ভূমিকা পরীক্ষিত হয়েছে। তন্তুজাত জিনিসের সমবায় বিপণন সমিতিগুলির শীর্ষে যে এ্যাপেক্স সোসাইটি রয়েছে সেই সোসাইটি তন্তুজ সামগ্রীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচার চালাচ্ছে। প্রধান, প্রধান উৎসবের প্রাক্কালে তন্তুজ সামগ্রী সংগ্রহ করে সমিতি পরিচালিত বিভিন্ন বিপণীর মাধ্যমে বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করে থাকে। রাজ্য সরকার প্রাথমিক সমিতিগুলিকে অর্থ সাহায্যের পাশাপাশি সরবরাহ করছেন আধুনিক সাজসরঞ্জাম ও উন্নত নমুনা। কারুশিল্পের ক্ষেত্রেও বিপণনের সমবায় ভিত্তিক ব্যবস্থা প্রাচীন প্রচেষ্টাগুলির অন্যতম। ক্ষুদ্র শিল্পের অন্যান্য বিভাগে, যেমন—চামড়া পাকা করা, পটারি, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, তাল গুড়, আখের গুড়, খান্দসারি, ফল ও সব্জি সংরক্ষণ, সৌখীন চর্মশিল্প, পূর্ত সামগ্রী, ছোবড়া শিল্প, গ্রামীণ শিল্প এবং অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও সমবায় বিপণন সমিতিগুলি দৃঢ়পদক্ষেপ এগিয়ে চলেছে। ১৯৬৭ সালের এক সমীক্ষায় জানা যায় বাংলা দেশে তাঁত ছাড়া অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও ৪০২টি প্রসেসিং তথা বিপণন সমিতি রয়েছে। এই সমিতিগুলি মোট একলক্ষ তিরানব্বই হাজার টাকার কাঁচা মাল সরবরাহ করেছে। সমিতির সভ্য শিল্প সংস্থাগুলির উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করেছে মোট কুড়ি লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকার। এই সমস্ত সমিতির পরিচালনায়

রয়েছে ৪৪টি বিক্রয় কেন্দ্র।

এমন বহু ক্ষুদ্র শিল্প রয়েছে যেখানে কাঁচামালকে উৎপাদনের পর্যায়ে আনা ব্যয় সাপেক্ষ, বিজ্ঞান সম্মত কতকগুলি প্রয়োগ বিধির মাধ্যমে—যেমন মৃৎশিল্পে যে ক্লে ব্যবহার্য করা হয়, অথবা চামড়া শিল্পের চামড়া, বা রাবার শিল্পের রাবার। ঠিক অনুরূপভাবে উৎপাদনের শেষেও কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উচ্চতর প্রসেসিংএর প্রয়োজন হয়। ক্ষুদ্রশিল্পের একক প্রচেষ্টায় ব্যয় সাপেক্ষ এই সব প্রসেসিংএর যন্ত্রপাতি কেনা সম্ভব হয় না, ফলে সমবায় প্রসেসিং সোসাইটিকে এগিয়ে আসতে হয় আধুনিক ক্ষুদ্র শিল্পের সাহায্যে। সমবায় পরিচালিত আধুনিক কারখানায় উচ্চতর প্রয়োগ বিধির সাহায্যে এই সব জটিল প্রসেসিংগুলি শেষ করা হয়। জাপানে এই জাতীয় সমবায়গুলি শিল্পে উচ্চতর প্রয়োগ কৌশলের পথ সুপ্রশস্ত করেছে এবং উৎপাদনের মান-উন্নয়নে এক অপরিহার্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

বহুমুখী সমবায় সমিতি

রাজ্যের গ্রামীণ শিল্প উন্নয়ন প্রকল্পে শিল্পসেবা তথা বিপণন ইউনিয়নের সাফল্য রাজ্যের সমবায় চিন্তায় এক নতুন প্রতিফলন এনেছে। এই ধরণের বহুমুখী সমিতি শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে। বারাসত, তমলুক, দার্জিলিং ও দুর্গাপুরে একটি করে এই জাতীয় সমবায় সমিতি স্থানীয় ক্ষুদ্রশিল্পগুলিকে অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে নিয়ে চলেছে। জাপানের সমবায়গুলির আদর্শে এই সমিতিগুলি বৃহৎ শিল্প সংস্থা এবং বিভিন্ন প্রকল্পের বহু অর্ডার সভ্য সংস্থাগুলির মধ্যে বিতরণ করে দিচ্ছেন, সরবরাহ করছেন কাঁচামাল, অর্থ, প্রযুক্তি বিদ্যা। কৃষি এবং ক্ষুদ্রশিল্পের সহ অবস্থান এঁরা মেনে নিয়েছেন। সেই কারণে এঁদের সভ্য সংস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে, ডেয়ারি, পোলট্রি, কাঠ চেরাই থেকে শুরু করে দেশলাই এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প। আলোচ্য বৎসরে এই সমবায়গুলির ক্রয়ের পরিমাণ ১,১২,৬৯৮,৯৩ টাকা, বিক্রয়ের পরিমাণ ১,৬৬,১৬৩,১৮ টাকা। '৬৯-৭০ সালে লাভের অঙ্ক দাঁড়াবে আনুমানিক দশ হাজার টাকা।

ভবিষ্যৎ কর্মসূচী

চতুর্থ পরিকল্পনায় শিল্প সমবায়গুলির জন্য অন্যান্য আরো দায়িত্ব চিহ্নিত হয়েছে। সিংহল, ব্রহ্মদেশ অথবা ডেনমার্কের অনুকরণে সমবায় শিল্পনগরী স্থাপিত হবে। বর্তমানে যে শিল্পনগরগুলি রয়েছে সেগুলিকে সমবায়ের পূর্ণব্যবস্থা বলা চলে। ক্ষুদ্র শিল্প, বিশেষত সার্ভিসিং শিল্পের ক্ষেত্রে আন্দোলন আরো তীক্ষ্ণ হবে। সমবায়ের লক্ষ্য মাত্রা স্থির হয়েছে ৬৮ হাজার সমিতি, ৬৫ লক্ষ সভ্য সংখ্যা এবং প্রতিটি গ্রাম।

ধূপ রপ্তানী করে বৈদেশিক

আমাদের দেশে ধূপ ও ধূপকাঠি তৈরির প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র হ'ল মহীশূর, তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্র। এই তিনটি রাজ্যে মোট সাড়ে তিন কোটি টাকার ধূপ প্রভৃতি তৈরি হয়। এরমধ্যে মহীশূরের অংশই হ'ল আড়াই কোটি টাকার ওপর। ১৯৬৭-৬৮ সালে মোট ধূপ রপ্তানী করা হয়েছে ৫৯.৪১ লক্ষ টাকার। সরাসরি মহীশূর রাজ্য থেকে ৩০ লক্ষ টাকার ধূপ চালান যায়। এ ছাড়া বোম্বাই-এর ব্যবসায়ীদের মারফৎ মহীশূরে তৈরি প্রচুর ধূপ বাইরে চালান দেওয়া হয়।

পৃথিবীর অন্ততঃ ৮০ টি দেশে ভারতীয় ধূপ গিয়ে পৌঁচেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশ হ'ল ভারতীয় ধূপের প্রধান গ্রাহক।

নির্বাচিত তথ্য

সমবায়গুলির সংখ্যা, সভ্যসংখ্যা এবং অন্যান্য তথ্য নিম্নে তালিকার আকারে দেওয়া হল :

সময়—'৬৭ সালের জুন মাসের শেষে

শিল্প	সমিতির সংখ্যা	কার্যরত সমিতি	সভ্যসংখ্যা	উৎপাদন টাকার অঙ্কে	বিক্রয় টাকার অঙ্কে	কার্যকরী মূলধন
চামড়া সংগ্রহ ও পাকা করা	১৬	৬	২৮৭	১০,০০০	৮,০০০	১,৯৯,০০০
মৃৎশিল্প	৪৮	২৪	৮৫২	২,০,৩০০০	১,২৬,০০০	১,৮৯,০০০
তৈল উৎপাদন	৫৭	৩১	৬৫৬	২,১০,০০০	১,০,৪০০০	—
সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	৭৮	১৭	১২৫০	৩৮,৬৮,০০০	৩০,০,৮১০০০	—
কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং	২					
চামড়ার কাজ	১৭					
পূর্ত্ত সামগ্রী	১০		৪০৯			
ছোবড়া শিল্প	৭		১২৫			
রেশম শিল্প	৯		৪২০			
অন্যান্য গ্রামীণ শিল্প	৩৯		৩৪২৭			
কারু শিল্প	১০০		৫৬১৭			
অন্যান্য শিল্প	১০৫		৩৭৮৭			

(ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রকাশিত)

সবে মিলি করি কাজ

চন্দ্র—বিজয়—তারপর আবার পৃথিবীর বুকে ফিরে আসা! দারুণ সাফল্য, নয় কি? হাঁ, তাতো বটেই কিন্তু এই সাফল্যের চাবিকাঠি হলো সহযোগিতা। নীচে গ্রাউণ্ড কংট্রোলে বসে বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামাচ্ছেন আর অনন্ত আকাশে রয়েছেন নভোচারীর দল—যাঁদের রয়েছে শৃঙ্খলাজ্ঞান, যাঁরা সব সময়ে সপ্রতিভ... এই সহযোগিতার ফলেই চাঁদে মানুষেরপা পড়লো। অতদূরে যেতে হবে কেন? বাড়ীর পাশের ঘটনার কথাই নিন না! অন্ধ্র প্রদেশের নাগার্জুন সাগরের জল যে সমস্ত চাষের জমিতে জুগিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই সব জমিতে হয়েছে প্রচুর ফলন। কিন্তু এই ফলনের পেছনেও রয়েছে সহযোগিতা! আজ আমরা বিজ্ঞানের যুগে বাস করছি। নাগার্জুন সাগরে আজ যা হয়েছে, কাল তা অন্যত্র হতে পারে। অবশ্য যদি উপায় ঐ একই থাকে অর্থাৎ সহযোগিতা।

এক্ষেত্রে সমবায়ের পাঁচটি উপায় ছিলো

- সেচ—বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রচুর জলের ব্যবস্থা
- কোন্ ফসলের জন্যে কি ধরণের মাটী উপযুক্ত তা স্থির করবার জন্যে মাটী পরীক্ষা
- বেশী ফসল পাওয়া যায় ও রোগের হাত থেকে বাঁচতে পারে—এমন ধরণের উন্নত বীজ।
- মাটী উর্বর করবার জন্যে আবশ্যকীয় পরিমাণে রাসায়নিক সার ও জৈবিক সারের প্রয়োগ
- কৃষিকে আধুনিক শিল্পরূপে গড়ে তোলবার জন্যে সমবায় সমিতি থেকে ঋণ পাওয়ার সুযোগ সুবিধে

সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় অধিক কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন।

[illegible]-69/ 571

ভারতের বন্দর উন্নয়ন

জাতীয় বাণিজ্যে বৃহৎ তৈলবাহী জাহাজগুলির বৃহত্তর ভূমিকা

অরুণ কুমার রায়

১৯৬৭-৬৮ সালের শেষ পর্যন্ত দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দরগুলির মাধ্যমে মোট সাড়ে পাঁচ কোটি মেট্রিক টন মাল চলাচল করে, আর এই পরিমাণটা হ'ল প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শুরুর সময়কার তুলনায় তিনগুণ বেশী।

বন্দর উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণও ক্রমশঃ বেড়েছে। প্রথম পরিকল্পনায় এর পরিমাণ ছিল ২৬.৩২ কোটি টাকা, তৃতীয় পরিকল্পনায় ৯২.৭৫ কোটি টাকা।

চতুর্থ পরিকল্পনায় আনুমানিক ২৯৬ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে এবং ১৯৭৩-৭৪ সালের শেষ পর্যন্ত মাল চলাচলের লক্ষ্য রাখা হয়েছে ১০ কোটি মেট্রিক টন।

বিশ্বের সামুদ্রিক বাণিজ্যের দুটি প্রধান লক্ষণ, ভারতের বন্দর উন্নয়ন কর্ম্মসূচীকে একটা বিশেষ দিকে প্রভাবিত করেছে। দুটির মধ্যে প্রধান লক্ষণটি হ'ল, সাধারণ খুচরো জিনিষের পরিবর্তে জাহাজে ক'রে বিপুল পরিমাণে একটা জিনিস পরিবহণ

ভারত মহাসাগরের দিকে ৫,৭০০ কিঃ মীঃ দীর্ঘ উপকূলসহ ভারতের ৮টি প্রধান ও ২২৬ টি মাঝারি ও ছোট বন্দর, ভবিষ্যতে বিশ্বের বাণিজ্যে একটা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করবে।

(ওপরে) মাঙ্গালোর বন্দরে
(বাঁদিকে) কাণ্ডলা বন্দরে
(ডানদিকে) কোচিন বন্দরে
(নীচে) শোধিত এবং অশো
পাইপ লাইন ; বোম্বাই বন্দ

ভারতের কর্ম

করা হচ্ছে। দ্বিতীয়টি হ'ল সমুদ্রে বাণিজ্যেপথের দুরন্ত বৃদ্ধি। এর ফলে বিমান পথে জাম্বো জেটের মত সমুদ্রপথে চলার জন্য বিপুল আকারের ট্যাঙ্কার তৈরি হচ্ছে। ভারতের বাণিজ্য বহর এশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম। কাজেই ভারতের বন্দরগুলিতে এই সব বিরাট আকারের ট্যাঙ্কারগুলির জন্য সুযোগ সুবিধের ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন। ১৯৬৬-৬৭ সালে ভারতের প্রধান বন্দরগুলির মাধ্যমে ৪ কোটি ২০ লক্ষ টন অশোধিত তেল ইত্যাদির মতো, মোটা আকারের মাল চলাচল করেছে। ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় এই পরিমাণটা হ'ল ৪ গুণ বেশী।

আগামী পাঁচ বছরে, বন্দর উন্নয়ন কর্ম্মসূচীর লক্ষ্য হবে, প্রধানতঃ ১ থেকে ১॥ লক্ষ টনের মালবাহী জাহাজে বাহিত, ১০ কোটি মেট্রিক টন মাল যাতে ভারতের বন্দরগুলির মাধ্যমে চলাচল করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

বর্ত্তমানে পশ্চিম উপকূলের চারটি বন্দর কাণ্ডলা, বোম্বাই, মর্মুগাও, এবং কোচিন ও পূর্ব্ব উপকূলের চারটি-মাদ্রাজ, বিশাখাপতনম, পরাদীপ এবং কলিকাতা এই আটটি প্রধান বন্দর এবং পশ্চিম উপকূলের মাঙ্গালোর ও পূর্ব্ব উপকূলের তুতিকোরিন এই দুটি মাঝারি বন্দরকে সর্ব্ব ঋতুর

..লেছে
...য়ে গম খালাস করা হচ্ছে
...র জন্য অপেক্ষমান জাহাজসমূহ
...াহাজে বোঝাই ও খালাস কবার

...ল· বন্দরসমূহ

পক্ষে উপযোগী প্রধান বন্দরে পরিণত করা হবে।

উপবন্দর

বর্ত্তমানের কলিকাতা বন্দরে ৫৬৫ ফিটের চাইতে বড় জাহাজ ভিড়তে পারেনা। কাজেই বেশী পরিমাণ মাল চলাচলের উপযোগী একটা উপবন্দর হলদিয়াতে তৈরি করা হচ্ছে। আগামী বছরে এখানকার কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বোম্বাই বন্দর থেকে ১১ কি: মী: দূরে নবশিবতেও একটি উপবন্দর তৈরি হবে। ৭০ বর্গমাইল বিস্তৃত বোম্বাই বন্দর মারফত দেশের একটা বিরাট অংশের মাল চলাচল করে। তাছাড়া বোম্বাইতে বহু শিল্পও রয়েছে। সেই জন্য এটির আরও উন্নয়নের জন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় ৪৮.১৪ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। জাহাজ ভেড়ার জন্য আরও ৪ টি বার্থ যুক্ত করে বার্থের সংখ্যা ২১ টি করা হচ্ছে। এল অক্ষরের আকারে একটি ফেরি জেটি তৈরি করা হয়েছে। সেস্যুন ডকের কাছে মাছ ওঠানো নামানোর জন্য একটি বন্দর তৈরি করা হবে। বর্ত্তমান বন্দরটির মাধ্যমে বার্ষিক ১২০০ টন মাছ ওঠা নামা করতে পারে। এটির ক্ষমতা বাড়িয়ে ৪০,০০০ মেট্রিক টন করা হবে। বড় তৈলবাহী জাহাজ ভিড়তে পারে এই রকম বার্থ তৈরি করারও পরিকল্পনা করা হয়েছে।

১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

পরিকল্পনা ও সমীক্ষা

তাঞ্জাউর জেলার ময়ুরম ব্লকে নিবিড় কৃষি কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ হচ্ছে। প্রয়োজনীয় সার ইত্যাদি প্রয়োগ ক'রে কৃষি উৎপাদন যথাসম্ভব বাড়ানোই হ'ল এই কর্মসূচীর লক্ষ্য।

এই কর্মসূচী অনুযায়ী কেমন কাজ হচ্ছে তার মূল্যায়ণ করার জন্য তিরুচির-পল্লীর সেন্ট জোসেফ কলেজের, পরিকল্পনা সমীক্ষাকারী দল সেখানে যান।

এই অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে যে, এই কর্মসূচী ঐ এলাকায় কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা পরিবর্ত্তন এনেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। একর প্রতি কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট বেড়েছে। তবে এই কর্ম্মসূচী সম্পর্কে কৃষকদের উৎসাহী ক'রে তোলার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে কর্ম্মচারীতন্ত্রের জটিলতা কমাতে হবে।

এই ব্লকটির অধীনে ৫৮টি গ্রাম আছে এবং কৃষি জমির পরিমাণ হ'ল ৫৭৪৯৪ একর। কাবেরী নদীর বদ্বীপ এলাকার পলিমাটি রয়েছে বলে এখানকার জমি বেশ উর্ব্বর। সমগ্র অঞ্চলটির উর্ব্বরতা মোটা-মুটি এক রকম হলেও স্থানীয় কতকগুলি বৈচিত্র্য রয়েছে। স্থানীয় এই রকম বৈচিত্র্য-গুলি পরীক্ষা ক'রে যাতে অভিন্ন একটা চাষ পদ্ধতির মাধ্যমে সর্ব্বোচচ ফল পাওয়া যায় সেই জন্য নিবিড় চাষের অন্তর্ভূক্ত এই এলাকাটিতে একটি মাটি পরীক্ষাকারী দলও কাজ করছেন। কাবেরী নদী থেকে খালের সাহায্যেই প্রধানত: এই ব্লকের সেচের জলের চাহিদা মেটানো হয় তবে মেট্টুর জলাধারের জলও সেচের জন্য ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া কুয়ো, ব্যব-হৃত হয়না।

সাধারণভাবে বলতে গেলে এই এলা-কার জল সরবরাহের অবস্থা সন্তোষজনক হলেও, বর্ষা, বন্যা, ঝড়ের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলি থেকে কৃষকরা রেহাই পান না। বিশেষজ্ঞগণ অবশ্য মনে করেন যে বর্ত্তমানে এই ব্লকে যে জল পাওয়া যায় তার সবটার উপযুক্ত ব্যবহার হয়না বরং অপচয় হয়। সরকারী বীজ আবাদ থেকে অধিক ফলনের যে সব বীজ সরবরাহ করা হয়, কৃষকরা ক্রমশ: তা বেশী পরিমাণে ব্যবহার করছেন।

এখানকার কৃষকরা রাসায়নিক সার সম্পর্কেও সচেতন হয়ে উঠছেন এবং এগুলি তাঁরা বেশী পরিমাণে ব্যবহার করতে সুরু করেছেন। তবে এঁরা তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী সার পাচ্ছেন না। এই এলাকার জন্য বরাদ্দ সারের পরিমাণ, তাঁদের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। কৃষকদের প্রধান অভিযোগ হ'ল যেটুকু সার এখানকার জন্য বরাদ্দ করা হয় তাও উপযুক্তভাবে বন্টন করা হয়না তাছাড়া এগুলি নাকি উপযুক্ত গুণসম্পন্ন নয়। নিম্নস্তরের সারও কোন কোন সময়ে উচচ স্তরের বলে চালিয়ে দেওয়া হয় আর এতে ভেজাল থাকাটা খুবই সাধারণ ব্যাপার। সর্ব্বশেষে খোলাবাজারে সারের যে দাম চাওয়া হয় তা কৃষকদের পক্ষে বেশ বেশী।

চিরাচরিত সার আর রাসায়নিক সার এই দুটোর মধ্যে কোনটার কি গুণ তা কৃষকরা স্থির করতে পারেন না। নিবিড় চাষের অন্তর্ভুক্ত এলাকার সরকারী সংস্থা-গুলি রাসায়নিক সারের ওপর এত বেশী গুরুত্ব দিয়েছে যে কৃষকরা চিরাচরিত সারের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়ে রাসায়নিক সারই ব্যবহার করছেন। অন্যদিকে আবার আর একদল কৃষক সরকারি প্রচারে সন্দেহ করে, তাদের চিরাচরিত সার অর্থাৎ গোবর ইত্যাদির ব্যবহার করে চলেছেন। কৃষকদের পক্ষে আর একটা প্রধান অসুবিধে হল, তাঁরা উপযুক্ত সময়ে যথেষ্ট পরিমাণ কীটনাশক পান না।

এই ব্লকে যে সব কৃষি সাজ সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয় সেগুলির বেশীর ভাগই পুরানো ধরণের। নতুন যে সব সরঞ্জাম ব্যবহার করা হচ্ছে, সেগুলি হ'ল কয়েক রকমের লোহার লাঙল। কৃষি শ্রমিকের অভাব, ক্রমবর্ধমান মজুরি এবং ভূমিস্বত্ব ও কৃষিশ্রমিকের মধ্যে সম্পর্কের ক্রমাবনতির ফলে, এই এলাকার কৃষকরা ক্রমশ: ট্র্যাক্টার ও অন্যান্য কৃষি সরঞ্জামের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন। যাই হোক, কৃষি যন্ত্রসজ্জিত হতে এখনও অনেক দিন লাগবে।

নিবিড় কৃষি কর্ম্মসূচীকে সফল করে তুলতে হলে প্রয়োজনীয় সার ইত্যাদি কেনার জন্য কৃষকদের বেশী অর্থের প্রয়োজন বলে, সমবায় সমিতিগুলি তাদের, কিছুটা টাকায় এবং কিছুটা জিনিসে বিশেষ ঋণ দেয়। তবে গরীব চাষীদের যে ঋণ দেওয়া হয় তা সব সময়ে তাঁদের প্রয়ো-জনের উপযুক্ত হয়না। তাছাড়া ঋণের টাকা পেতে অনেক সময় এত দেরী হয় যে তখন সেই টাকার প্রয়োজনীয়তা অনেক-খানি কমে যায়। তাছাড়া ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থাটাও সর্ব্বক্ষেত্রে কৃষকদের পক্ষে সুবিধেজনক নয়। তবে এই ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সমবায় সমিতিগুলিই দোষী নয়। এমন অনেক কৃষক আছেন যাঁরা ঋণ পরি-শোধে আগ্রহী নন। ফসল ভাল হয়নি বলেই যে তাঁরা ঋণ পরিশোধ করেন না তা নয়, ভালো ফসল হলেও তাঁরা অনেক সময়ে ঋণ পরিশোধ করেন না। এটা অবশ্য একটা অদ্ভুত মনোভাব এবং এই ধরণের মানোভাব সমগ্র পল্লী ঋণ ব্যবস্থাতেই একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

জোয়ারের মত পুষ্টিকর জাব

রুক্ষ অঞ্চলে মানুষের খাদ্যের মত গবাদি পশুর খাদ্যের জন্যও চাষবাস কষ্টসাধ্য। রুক্ষ জায়গায় বেশ ভালো-ভাবে জন্মায় এক ধরনের ঘাস—তার নাম জনসন ঘাস। দেখতে জোয়ারের মত। রাজস্থানের মালপুরাতে কেন্দ্রীয় মেষ ও উল গবেষণা প্রতিষ্ঠান এই খবরটি দিয়েছে।

যে বছর মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হয় সে বছরে হেক্টার প্রতি ঘাসের উৎপাদন ৪৫০ থেকে ৫০০ কুইন্টাল পর্যন্ত হয়। এই ঘাস জোয়ারের মত পুষ্টিকর এবং সর্বশ্রেণীর জন্তু জানোয়ারের প্রিয়। এই ঘাস সবুজ অবস্থায় এবং শুকনো জাব হিসেবে দেওয়া যেতে পারে।

রুক্ষ অঞ্চলে বর্ষার মরসুমে এই ঘাস জন্মানো হয়।

আসামের কৃষিক্ষেত্রে আলোড়ন

ধীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী

কিছুদিন পূর্ব্বে সমগ্র আসাম মাঘ বিহু উৎসবে মেতে উঠেছিল। ফসল তোলার সর্ব্বজনপ্রিয় উৎসবই হল মাঘ বিহু বা ভোগালি বিহু। আসামের লক্ষ লক্ষ কুটিরে ও প্রাসাদে এই উপলক্ষে পিঠে পায়েস তৈরি হয়েছে, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন একে অপরকে এই উৎসব উপলক্ষে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এবারে এই উৎসবে ধনী দরিদ্র সবাই যেমন আনন্দে মেতে উঠেছিলেন গত কয়েক বছরের মধ্যে তেমনটি দেখা যায়নি। ফসল ভালো হ'লে আমরা বলি মা লক্ষ্মী এবারে দুহাতে ঢেলে দিয়েছেন।

কিন্তু ফসল বাড়ার পেছনে কেবলমাত্র ভগবানের আশীর্ব্বাদই ছিলোনা মানুষের ছিল। ব্রহ্মপুত্র-বরাক নদীর তীর ও সবুজ পাহাড়গুলির শস্য-গুলিতে নিঃশব্দে একটা চমকপ্রদ ন চলেছে। চিরাচরিত কৃষি পদ্ধতির সঙ্গে বিজ্ঞানকে যুক্ত করার জন্য গত কয়েক বছর থেকে যে পরিকল্পনা চলছিল, তা থেকে বেশ লাভ আসতে সুরু করেছে। উন্নত ধরণের কৃষি পদ্ধতি, বেশী জলসেচ ও বিদ্যুৎশক্তি, উন্নততর বীজ, কৃষি যন্ত্রাদি ও সারের ব্যবহার এখন আর কৃষকদের কাছে নতুন কিছু নয়। এগুলি এখন বর্ত্তমানের প্রয়োজন বলে মনে করা হচ্ছে।

আসামের মোট আয়তন ৩০১.৪ লক্ষ একরের মধ্যে ৮৮ লক্ষ একর হল বনভূমি এবং প্রায় ৬৮।। লক্ষ একর জমিতে চাষ করা হয়। এই রাজ্যটির অর্থনীতি সাধারণভাবে কৃষি ভিত্তিক। বর্ত্তমান লোকসংখ্যা হল প্রায় ১৫০ লক্ষ এবং এর মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগ কৃষির ওপর নির্ভরশীল ব'লে রাজ্যটির সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোও খুব বেশী পরিমাণে কৃষি ভিত্তিক। আসামের ভূমি উর্ব্বর, আবহাওয়া কৃষির অনুকূল এবং স্বাভাবিকভাবে জলের প্রচুর সরবরাহ থাকা সত্বেও প্রাকৃতিক নানা বিপর্য্যয়ের জন্য এই সুবিধেগুলি এ পর্যন্ত পুরোপুরি কাজে লাগানো যেতোনা।

অমিতবিক্রম ব্রহ্মপুত্রের মতোই, শস্য ক্ষেত্রের সাফল্যও অনিশ্চিত ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয় জনসংখ্যা। এর ফলে খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে আসাম বহু বছর ধরে কোন রকমে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জ্জন করে আসছিল। স্বাধীনতা লাভ করার পূর্ব্বে যখন জনসংখ্যার চাপ বর্ত্তমানের মতো এতো ভীষণ ছিলনা তখনও আসাম খাদ্যশস্যে উদ্বৃত্ত রাজ্য ছিল কিনা তা তথ্যাদি দিয়ে প্রমাণ করা কঠিন। ঐ সময়ে আসাম যদি বাংলা বা অন্যান্য রাজ্যে চাউল সরবরাহ করেও থাকে তাহলেও উদ্বৃত্ত ছিল বলেই রপ্তানী করতে পেরেছে

কিনা তা বলা যায়না, কারণ তখন প্রায় প্রতি বছরেই বর্ম্মা থেকে চাউল আমদানী করা হত। বিশেষ করে ১৯৫০ সালের ভীষণ ভূমিকম্প এবং তার পরে পর্য্যায়-ক্রমিক বন্যা, অবস্থাকে জটিল ক'রে তোলে। যাই হোক এগুলি হল বিগত ঘটনা।

বর্ত্তমানে আসামের অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরকম। রাজ্যটি এখন পাঞ্জাবের মতই খাদ্যশস্যে উদ্বৃত্ত হতে চলেছে। এটি এখন নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েও প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে খাদ্যশস্য সরবরাহ করতে সক্ষম।

আসামের প্রধান খাদ্য চাউল, কাজেই ধানের চাষে কুশলতার ওপরেই কৃষি কর্ম্মসূচীর সাফল্য পরিমাপ করা যায়। পূর্ব্বের কথা বলতে, স্বাধীনতা লাভ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আসামে চাউলের উৎপাদন বার্ষিক প্রায় ১৪ লক্ষ টন ছিল। প্রথম পরিকল্পনার সুরুতে ১৬.৬০ লক্ষ হেক্টার জমিতে ১৪.৯৪ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হয়। কিন্তু ১৯৬৮-৬৯ সালে ২১.৩৭ লক্ষ টন চাউল উৎপাদিত হয়। এর পূর্ব্বে এই রাজ্যে আর কখনও এতো চাউল উৎপন্ন হয়নি। প্রধান মরসুমের ফসল এই বছরে যা পাওয়া গেছে তাতে সকলেই উৎসাহ বোধ করছেন। ১৯৬৯-৭০ সালে ২২.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন চাউল উৎপাদিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। বর্ত্তমানে এই রাজ্যে ২২ লক্ষ হেক্টার জমিতে ধানের চাষ হচ্ছে।

অন্যদিকে আসাম হ'ল ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী রাজ্য এবং এই পণ্যশস্যটির উৎপাদনে আসাম যে প্রধান স্থান অধিকার করবে তার লক্ষণও সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। আসামের প্রধান পাট উৎপাদনকারী জেলা নগাওঁ, গোয়ালপাড়া, কামরূপ ও কাছাড়ে এখন চিরাচরিত কৃষি পদ্ধতির পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ নতুত কৃষি পদ্ধতি প্রচলিত হচ্ছে।

এই সাফল্যের কাহিনীতে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল আসামের নতুন গমের ক্ষেত্রগুলি।

আসামে কোন সময়েই গম চাষের তেমন কোন প্রচলন ছিলনা। এর যতটুকু গমের প্রয়োজন হ'ত তা বাইরে থেকেই আসতো। কিন্তু এখানে এখন ৮৫০০ হেক্টার জমিতে গমের চাষ হয় এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে ৪৭১৮ মেট্রিক টন গম উৎপাদিত হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে ১৭৫৯ হেক্টার জমিতে মাত্র ৮৮৩ টন গম উৎপন্ন হয়েছিল চলতি বছরে ৭০০০ টন গম পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

আর একটি প্রধান পণ্যশস্য আখের উৎপাদনও বেড়ে চলেছে। গত বছরে মোট ৩১০০০ হেক্টার জমিতে ১২১১৯৯ মেট্রিক টন আখ উৎপাদিত হয়। ১৯৫৬ সালে আখের উৎপাদন এবং আখ চাষের জমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৬৮৭৯ মেট্রিক টন এবং ২৫৬২৭ একর। চলতি বছরে আরও ১০ হাজার টন বেশী আখ উৎপন্ন হবে।

স্থানীয় অধিবাসীদের অন্যতম প্রধান খাদ্য গোলআলুর উৎপাদন সাফল্যও কম আশাপ্রদ নয়। আসামে বর্ত্তমানে ২.৩০ লক্ষ মেট্রিক টন আলু উৎপন্ন হয় এবং এই উৎপাদন হ'ল ১৯৫৬ সালের তুলনায় শতকরা ৭২ ভাগ বেশী।

কিন্তু এই সাফল্য একদিনে অর্জ্জিত হয়নি। কেবলমাত্র চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি বা অনুকূল আবহাওয়ার জন্যই যে আসাম বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁচেছে তা নয়। আসামের বর্ত্তমান সাফল্যের মূলে রয়েছে বিভিন্ন কারণ। এই অগ্রগতির মূলে যে সব ব্যবস্থা রয়েছে সেগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান ব্যবস্থাটি হ'ল জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ সহ ভূমি স্বত্ব সংস্কার। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে, চিরকাল-বঞ্চিত সরল কৃষক যখন দেখতে পাবেন যে এতকাল যে জমির জন্য তিনি প্রাণপণ পরিশ্রম করেছেন তিনিই সেই জমির মালিক, তখন সেইটেই হবে নীরবতম যুগান্তকারী বিপ্লব।

কৃষির এই অগ্রগতিতে অন্য যে আর একটি জিনিস গুরুত্বপূর্ণ অবদান জুগিয়েছে তা হল রাসায়নিক সার প্রয়োগ। কৃষি সম্প্রসারণ সেবার মাধ্যমে কৃষকরা যখন রাসায়নিক সারের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রচলিত সারের প্রয়োগ পদ্ধতি বুঝতে পারলেন তখনই তাঁরা ক্রমশঃ বেশী পরিমাণে রাসায়নিক সার ব্যবহারে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। ১৯৬১-৬২ সালে আসামে মাত্র ১১২০ টন রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হয়, সেই তুলনায় ১৯৬৮ সালে ৩৯০০০ টন সার ব্যবহৃত হয়। চলতি বছরে ৬৫০০০ টন ব্যবহৃত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

পঙ্গপাল ইত্যাদি কীটাদির আক্রমণ থেকে শস্য রক্ষারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কামরূপ এবং উত্তর আসামে বিমানযোগে কীটনাশক ছড়িয়ে ভাল ফল পাওয়া গেছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ছোট সেচ প্রকল্পগুলিও উল্লেখযোগ্য অবদান জুগিয়েছে। ৮ হাজার ছোট সেচ প্রকল্প ছাড়াও, অনেকগুলি গভীর নলকূপ এবং বিদ্যুৎশক্তি

শেষাংশ ১৬ পৃষ্ঠায়

হলদিয়ায় পেট্রো রসায়ন শিল্প নির্ভর ক্ষুদ্র শিল্প

সুরেশ দেব

প্রত্যেক বড় শিল্পের সঙ্গে নানানভাবে স্বাভাবিক ক্রমেই অনেক ছোট ছোট শিল্প গড়ে ওঠে। সেইদিক থেকে আধুনিক কালে রাসায়নিক শিল্পের ক্ষেত্রে পেট্রো-রাসায়নিক শিল্পের পরিধি আর পরস্পর নির্ভরতা এত বেশী যে একে একটি মাত্র শিল্প বলা হয় না, বলা হয় শিল্প সংহতি। আশা করা যায় যে হলদিয়াতে যে শোধনাগার স্থাপিত হতে চলেছে, তার অনুসঙ্গ হিসেবে, হলদিয়ার চার পাশে অনেক ছোট ছোট শিল্প, কাল ক্রমে গড়ে উঠবে। এই ছোট ছোট শিল্পগুলির গড়ে ওঠবার পথে কি কি অন্তরায় হতে পারে আর অন্যপক্ষে কি কি অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে তাই আমাদের আলোচ্য।

হলদিয়া বন্দর আর তৈল শোধনাগারকে কেন্দ্র করে অচিরে ওখানে যে একটা সমৃদ্ধ জনপদ গড়ে উঠবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এমন একটা সমৃদ্ধ জনপদের চাহিদার মান যেমন উঁচু হবার কথা তেমনি তার পরিমাণ ও বিস্তৃতিও প্রচুর হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে এই সমৃদ্ধ জনপদের চাহিদার তালিকায় থাকবে এয়ার কণ্ডিশনার, কুলার, রেফ্রিজারেটার মোটর পার্টস বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নানান যন্ত্রাংশ, কাঠের ও ইস্পাতের আসবাব, ছাপাখানার সুবিধা, নানা সাইজের কার্ডবোর্ডের বাক্স, ডিম, মাংস, দর্জীর দোকান দৈনন্দিন প্রয়োজনের সামগ্রী প্রভৃতি। এগুলির প্রত্যেকটি হাতের কাছে পাওয়ার সুযোগ সুবিধা থাকা দরকার। অর্থাৎ এই ভোগ্য পণ্যগুলির চাহিদা কেন্দ্র করে বিভিন্ন শিল্প গড়ে ওঠার প্রচুর অবকাশ করেছে। কি কি শিল্প এখানে সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠতে পারে তার একটি সমীক্ষা নিয়ে সেই ভাবে কর্মহীন অথচ শিল্প কুশলী বাঙালী ছেলেদের এনে সব রকম সাহায্য দিয়ে তাদের কৃতী করে তুলতে পারলে বোধ হয় একটা সত্যকারের কাজ হবে।

যদিও ভূতত্ত্বের দিক দিয়ে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে পশ্চিম বঙ্গের দক্ষিণ ভাগে মাটির নীচে তৈল থাকার সম্ভাবনা আছে আর এই তৈল পাবার জন্য কিছু কিছু পরীক্ষা নীরিক্ষাও হয়েছে কিন্তু এখনও কোথাও তৈলের সন্ধান পাওয়া যায় নি। তাই হলদিয়াতে শোধনাগারের জন্য বাইরে থেকে ক্রুড অর্থাৎ অপরিশোধিত তেল আমদানী করতে হবে। খনি থেকে যে তেল ওঠে তা মোটামুটি ভাবে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম হ'ল প্যারাফিন বেসড ক্রুড অর্থাৎ প্যারাফিন ভিত্তিক অশোধিত তেল। দ্বিতীয় হ'ল অ্যাশফল্ট ভিত্তিক আর তৃতীয় হল এই দুটির মিশ্রণ। প্যারাফিন ক্রুডে থাকে প্যারাফিন ওয়াক্স কিন্তু অ্যাশফল্ট বা ঘন টার এতে থাকে না। এ থেকে প্যারাফিন ওয়াক্স আর উৎকৃষ্ট লুব্রিকেটিং তেল বার করতে পারা যায়।

অপর পক্ষে অ্যাশফাল্ট ভিত্তিক ক্রুডএ প্যারাফিন ওয়্যাক্স প্রায় থাকেই না, এতে থাকে অ্যাশফল্ট। এতে যে হাইড্রো কার্বন থাকে তরে মধ্যে ন্যাপথা লিন ইত্যাদিই বেশী।

মিশিত ক্রুড তেলের মধ্যে এই দুই রকমের ক্রুডই থাকে। হলদিয়াতে যে ক্রুড নিয়ে কাজ করা হবে তা এই দ্বিতীয় ধরণের অর্থাৎ অ্যাশফল্ট ভিত্তিক। এ থেকে প্রচুর ন্যাপথা পাওয়া যাবে আর এই ন্যাপথা ভেঙ্গে পেট্রোরাসায়নিক শিল্পের ভিত্তি গড়া হবে।

মাটির নীচে থেকে অপরিশ্রুত তেল যা তোলা হয় তার দশ ভাগের প্রায় এক ভাগ মাত্র পেট্রোল বা কেরোসিন রূপে পাওয়া যায়। প্রথম প্রথম পেট্রোল আর কেরোসিন নিয়ে এই অবশিষ্ট অংশ ফেলে দেওয়া হত। ক্র্যাকিং প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হবার পরে এই ফেলে দেওয়া অংশ থেকে আরও পেট্রোল, কেরোসিন পাওয়া গেল। আবার নতুন জিনিষ—মোটা বা ভারী তেল (হেভী অয়েল) বেরিয়ে এল আর বেরিয়ে এল পীচ। এর সব কিছুই এখন কাজে লাগান হয়। এক দম বাকী যা পড়ে থাকে, যাকে বলা হয় অ্যাশফল্ট তাও কাজে লাগান হয় রাস্তা তৈরি করতে। এখন কোনও জিনিসই আর ফেলে দেওয়া হয় না। পেট্রো রাসায়নিক ইঞ্জিনীয়ারদের, আজ কালকার পরিশোধনাগারে, প্রতিটি ব্যবস্থার ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয় যাতে কোনও কিছুরই অপচয় না হয়। এই প্রক্রিয়াটির তাই এতদূর উন্নতি হয়েছে যে, যে রকম চান ঠিক সেই রকম তেল বা অপর জিনিস তাঁদের ক্র্যাকিং প্রসেস দিয়ে তৈরি করতে পারেন।

ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের একটি পরিকল্পনাকারী দল ভারতের পেট্রো রাসায়নিক শিল্প কোথায় কি কি রকমভাবে গড়ে ওঠা উচিত সে বিষয়ে একটা রিপোর্ট দেন। এই রিপোর্ট অনুযায়ী হলদিয়ায় কি কি পেট্রো রাসায়নিক জিনিস তৈরি হওয়া উচিত তা নিচের তালিকায় দেখানো হয়েছে। তবে তার আগে বলা দরকার যে হলদিয়ায় যে পরিশোধনাগার হচ্ছে তা থেকে উপজাত সামগ্রী হিসেবে প্রচুর ন্যাপথা পাওয়া যাবে আর এই ন্যাপথাই হবে এখানকার পেট্রো রাসায়নিক শিল্পের প্রধান কাঁচামাল।

পদার্থ	পরিমাণ (টন)
ইথিলীন	১১০,০০০
পলি ইথিলীন	৫০,০০০
পলি ভিনাইল ক্লোরাইড	২০,০০০
বেনজিন	২৩,০০০
প্রপিলিন অক্সাইড	৬,০০০
পলি প্রপিলীন	১৫,০০০
পলি বিউটেন	৭,০০০
বিউটাডিন	১২,০০০
এন বিউটাডিন	১৪,০০০

ইথানল	২০,০০০
ই.পি.টি রবার	২০,০০০
ইথিলীন অক্সাইড	২০,০০০
মিথাইল ইথাইল	১০,০০০

পরিকল্পনাকারী দল আরও বলেছেন যে হলদিয়ায় যে ১২০০০ হাজার টন পি জাইলীন তৈরি হবে তা নিয়ে আর একটা রাসায়নিক দ্রব্য ডাই মিথাইল টাপি থালেট—এর সঙ্গে যুক্ত করে ৩০০০ টন ম্যালেইক অ্যান হাড্রাইড আর পলি এসটার রেসিন ৩০০০ টন তৈরি হতে পারবে। এই পলি এসটার রেসিন থেকে, পলি এসটার তন্তু অর্থাৎ আজকালকার পরিচিত টেরিলীন ফাইবার বা তন্তু তৈরি করা চলবে। এই কারখানাটি অবশ্য পরিকল্পনাকারী দলটি হলদিয়ার পরিবর্ত্তে কলকাতায় স্থাপনার পরামর্শ দিয়েছেন।

ওপরে যে পেট্রো কেমিক্যাল গুলির বিবরণ দেওয়া হ'ল সেগুলি তৈরি করতে যন্ত্রপাতি ও আনুসঙ্গিক হিসাবে অন্ততঃ পক্ষে ১০০ কোটি টাকার মত প্রয়োজন হবে। উৎপাদন হবে বছরে প্রায় সব মিলিয়ে চার লক্ষ টন। যার দাম ধরা যেতে পারে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা। এই ১৫০ কোটি টাকার কাঁচা মাল সমস্ত যাবে নানান্ শিল্পে হাজারো রকমের জিনিসের উৎপাদনে। একটু চেষ্টা করলেই বুঝতে কষ্ট হবে না যে এর মধ্যে কি অভাবনীয় সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে, শিল্প গড়ে তোলার দিক দিয়ে।

ভারতের কয়েক জায়গাতেই এখন পেট্রো রাসায়নিক শিল্প সংহতি স্থাপিত হয়েছে। বোম্বাই সহরের উপকন্ঠ ট্রম্বেতে, গুজরাতের কোলীতে আর রাজস্থানের কোটায় এখন পুরো দমে পেট্রোরাসায়নিক শিল্প চালু হয়ে গিয়েছে। ন্যাশনাল অরগ্যানিক কেমিক্যাল লিমিটেড বোম্বাইতে ৬০ হাজার টনের ইথিলীন আর ৩৫ হাজার টনের প্রপিলীন—এর কারখানা বসিয়ে পলি-থীন আর পলি প্রেপিলীন তৈরি করছে। এই কারখানার যা কিছু উৎপাদন তা কিন্তু প্রায় সবটাই চলে যায় এর সহযোগী সংস্থা হয়েষ্ট ডাইজ এণ্ড কেমিকেল লিঃ আর পলিও লেটিন ইণ্ডাষ্ট্রিজ—এর কাছে। শুধু অল্প কিছু জৈব দ্রাবক আর পিভিসি বিক্রীর জন্য থাকে। ট্রম্বেতে য়ুনিয়ন কারবাইড ইণ্ডিয়া লিমিটেডের কারখানায় বা কয়ালি শিল্প সংহতির মধ্যেও সেই একই রকমের ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। অথাৎ এই ক্র্যাকারগুলি যে সব কোম্পানী বানিয়েছেন তাঁদেরই জন্য বিভিন্ন সংস্থাতে এর সব কাঁচা মালগুলি চলে যাচ্ছে। তারা নিজেরা যে জিনিসগুলি লাভজনক ভাবে পান না শুধু সেগুলিই বাজারে ছাড়া হয়। বাজারে এলেই যে তারা ছোট শিল্প গড়ে উঠতে কাজে লাগে—তাও না। কিছু দিন আগে একটি একচেটিয়া ব্যবসায় অনু-সন্ধান কমিশন সরকার থেকে বসান হয়েছিল। তাদের রির্পোট প্রমাণ করেছে যে, 'কাঁচা মাল যাঁরা আমাদের দেশে উৎপাদন করছেন তাঁরা নিজেরাই নানান ভাবে সেইগুলিকে ব্যবহার করছেন।'

ভারতবর্ষেই কেন এই রকম সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার ঘটছে তার কারণ সত্যিই অনু-সন্ধানের বিষয়। আমি এই সম্বন্ধে সাধা-রণভাবে দু চারটি কথা বলব। আমাদের দেশে যে বিরাট পেট্রোরাসায়নিক সংহতি গড়ে উঠছে ছোট শিল্পগুলি তা থেকে উপ-কার আহরণ করতে পারছে না। ভবিষ্য-তের এই সব সংস্থার পরিকল্পনার মধ্যেই এমন কিছু থাকা দরকার যাতে এই অবস্থা আর না ঘটতে পারে।

যাঁরা বাংলা দেশে ছোট শিল্পের উন্ন-তির জন্য চেষ্টা করছেন তাঁরা এমন একটা শিল্প পরিবেশ তৈরি করুন যাতে পেট্রো রাসায়নিক শিল্পের ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যায় বাঙালী শিক্ষিত ছেলে এসে তাদের সময় আর সুযোগ বিনিয়োগ করার সুবিধে পায় এবং ভারতের শিল্প জগতে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

আসামের কৃষি

১৩ পৃষ্ঠার পর

চালিত প্রায় এক হাজার পাম্প, উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। ৩.৮ লক্ষ হেক্টার জমিতে এখন নিয়মিত জলসেচ দেওয়া যায়। কৃষকরা এখন উন্নত ধর-ণের বীজ পান। উন্নত ধরণের বীজ সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য গৌহাটিতে একটি বীজ পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে।

কৃষকরাও এখন বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটি ফসল তুলেই সন্তুষ্ট থাকেন না। বর্ত্তমানে ১৫ লক্ষ একরেরও বেশী জমিতে কয়েকটি শস্যের চাষ করা হয়। টি. এন-১ এবং আই আর ৮ এর মতো অধিক ফলনের বীজ ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তবে স্থানীয় মনোহর শালি ধানের বীজই বেশী জনপ্রিয়। লার্মা রাজো, সোনালিকা, এস ৩০৮ এর মতো অধিক ফলনের গমের বীজ ব্যবহৃত হচ্ছে। নগাওঁ জেলার গমের ফলন, ভারতের যে কোন জায়গার সঙ্গে তুলনীয়। বর্ত্তমানে ১১ হাজার একর জমিতে অধিক ফলনের গমের চাষ হয়।

খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ এবং নতুন কৃষি পদ্ধতি অনুসারে কি পরিমাণ জমিতে চাষ করা হচ্ছে কেবল মাত্র তার হিসেব নিয়ে সাফল্যের মূল্যায়ণ করা উচিত নয়। যাঁরা জমি চাষ করে ফসল ফলাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও নতুন উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে সেইটেই হল সাফল্যের চাবিকাঠি। এঁরা প্রাচীন রীতি নীতি অনুসারে বড় হয়েছেন, দারিদ্র্য ও অন্যায় সহ্য করেছেন। কিন্তু এখন তাঁরা কেবলমাত্র ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে থাকতে চান না।

ভারতপুরে গুঁড়ো দুধ তৈরি করার একটি কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এর জন্য আনুমানিক ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। আগামী বছরের জানু-য়ারি মাস থেকে এই কারখানায় উৎপাদন সুরু হয়ে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এখানে বছরে ১,১০০ টন গুঁড়ো দুধ ও ৫০০ টন ঘি উৎপাদিত হবে।

চম্বল

রাজস্থানের সমৃদ্ধির উৎস

রাজস্থানের যে চম্বল এলাকা, দুই বছর পূর্ব্বেও কুখ্যাত ডাকাতদের বিহার-ভূমি ছিল, সেটিই এখন রাজ্যটির জন্য এক নতুন সমৃদ্ধির যুগের সূচনা করবে। ২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত রাণা প্রতাপ সাগর বাঁধটি, গত ৯ই ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী, জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। চম্বল নদীতে ৪টি বাঁধ দিয়ে সেচের জল ও বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন বাড়ানো হচ্ছে। অন্য তিনটি বাঁধ হল গান্ধী সাগর বাঁধ, জওহর সাগর বাঁধ এবং কোটা বাঁধ। এই বাঁধগুলি চম্বল উপত্যকা উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত। রাণা প্রতাপ সাগর বাঁধটি সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে এই প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ সম্পূর্ণ হল।

চম্বল নদীটি রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের মধ্য দিয়ে ৭২০ কিঃ মীঃ পথ অতিক্রম ক'রে উত্তর প্রদেশের এটাওয়ার কাছে যমুনা নদীতে এসে মিলিত হয়েছে। আনুমানিক ১১০ কোটি টাকা ব্যয়ের চম্বল উপত্যকা উন্নয়ন প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে। এর পূর্ব্বে চম্বল নদীর জলপ্রবাহকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানোর কোন চেষ্টা করা হয়নি। এই প্রকল্পটি রূপায়িত হ'লে দুটি রাজ্যের লক্ষ লক্ষ একর শুষ্ক জমিতে সব সময়ে সেচ দেওয়া যাবে।

চম্বল প্রকল্পের কাজ সুরু হওয়ার সময় ১৯৬০-৬১ সালে যেখানে ৩৭,০০০ একর জমিতে সেচ দেওয়া যেত, সেখানে ১৯৬৭-৬৮ সালে সেই রকম জমির পরিমাণ ২ লক্ষ একরে দাঁড়ায়। প্রকল্পটির প্রথম পর্যায়ে গান্ধী সাগর বাঁধ, কোটা বাঁধ এবং জল সরবরাহের জন্য কতকগুলি খাল কাটার কাজ সম্পূর্ণ হয়। রাণা প্রতাপ সাগরে ৪২ মীটার উঁচু একটি পাকা বাঁধ তৈরি হওয়ায় এখানে ২০.৩৫ লক্ষ একর ফিট জল সঞ্চয় ক'রে রাখা যায়। এর ফলে সেচের সম্ভাবনা ১০.১ লক্ষ একর থেকে বেড়ে ১০.৪ লক্ষ একরে দাঁড়িয়েছে।

চুলিয়া প্রপাত থেকে ৯ মীটার উজানে রানা প্রতাপ সাগর বাঁধ তৈরি করা হবে বলে স্থির করা হয়। কারণ এখানে স্বাভাবিক ভাবেই বেশ উঁচু থেকে জল গড়িয়ে পড়ে বলে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করাটা বেশ সহজ হবে। চুলিয়া প্রপাতের জলকে আরও সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানোর জন্য ১২ মীটার ব্যাসের ১,৪৫০ মীটার লম্বা একটি সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে তা, প্রপাতটি থেকে খানিকটা দূরে প্রধান নদীতে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১১২৫ মীটার দীর্ঘ বাঁধটির ঠিক পেছনে প্রধান নদীর খাতে ২৪ মীটার গভীর একটি গর্ত্ত ক'রে সেখানে বিদুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি তৈরি করা হয়েছে।

রাণা প্রতাপসাগর বাঁধ—সম্মুখভাগে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র
(নীচে) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটির একটি অংশ

এই কেন্দ্রটিতে ৪টি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী জেনারেটার আছে এবং প্রত্যেকটি ৪৩ মিঃ ওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করতে পারে। ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৬৯ সালের মে মাস পর্যন্ত এই চারটি জেনারেটারই চালু করা হয় এবং ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করতে সুরু

করে। বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন কেন্দ্রটি সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা ৪২০৪.৮ লক্ষ ইউনিট থেকে বেড়ে ৮৯৩৫.২ লক্ষ ইউনিট হয়েছে।

৪৭.১ মীটার লম্বা একটি কনক্রিটের বাঁধ তৈরি হয়ে গেলেই চম্বল উপত্যকার উন্নয়ন কর্মসূচীর তৃতীয় ও শেষ পর্য্যায় সম্পূর্ণ হবে। বাঁধটি থেকে প্রায় ২১ কি: মী: উজানে হ'ল জওহর সাগর বাঁধ। এটি থেকে প্রধানত: বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা হবে এবং এর কাজ ১৯৭১-৭২ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এখানে প্রত্যেকটি ৩৩ মি: ওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে সক্ষম ৩টি জেনারেটার থাকবে।

ভারতের বন্দর উন্নয়ন

১১ পৃষ্ঠার পর

মাদ্রাজের জন্য বেশ বড় একটা উন্নয়নসূচী তৈরি করা হচ্ছে। ১৯৬৭-৬৮ সালে মাদ্রাজ বন্দরের মাধ্যমে ৫৮,৬২,৮১৯ মেট্রিক টন মাল চলাচল করে। ঐ সময়ে ১৩১৫টি জাহাজ বন্দরে আসে। দৈত্যাকার ট্যাঙ্কারগুলিও যাতে মাদ্রাজে ভিড়তে পারে তার জন্য বেশ বড় আকারে চেষ্টা করা হচ্ছে।

কোচিন তৈল শোধনাগারের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মেটানোর জন্য এখানে একটা গভীর বার্থ তৈরি করা হচ্ছে। এখানেও মাল চলাচলের পরিমাণ ১৯৫০-৫১ সালের ১৪ লক্ষ টন থেকে বেড়ে ১৯৬৫-৬৬ সালে ২৮ লক্ষ মেট্রিক টন হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে এই পরিমাণ ৭৭ লক্ষ মেট্রিক টনে দাঁড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে। মাল চলাচলের এই বৃদ্ধির জন্য দুটি নতুন বার্থও তৈরি করা হবে।

বন্দরের কাছাকাছি প্রায় ৩৫০ একর জমি পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে। সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের জন্য ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

আকর রপ্তানী

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে আকর রপ্তানী হল একটা প্রধান বিষয়। আকর রপ্তানীর বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখেই ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলির উন্নয়ন করা হচ্ছে। ভারতের লৌহ আকরের আমদানী ১৯৬৪-৬৫ সালের ১ কোটি টন থেকে বেড়ে ১৯৬৮-৬৯ সালে দেড় কোটি মেট্রিক টনে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে ভারত, বিশ্বের প্রধান লৌহ আকর রপ্তানীকারীদের সারিতে স্থান পেয়েছে। বিশাখাপতনম, মোরমুগাও ও মাঙ্গালোর বন্দরের মাধ্যমেই বেশীর ভাগ লৌহ আকর রপ্তানী করা হয়।

গত ১৭ বছরে বিশাখাপতনম বন্দরের মাধ্যমে মাল চলাচল ১২৮ শতাংশ বেড়েছে অর্থাৎ এই বন্দর মারফত যত জিনিষ রপ্তানী হয় তার তিন চতুর্থাংশই হ'ল খনিজ আকর। এর মধ্যে একমাত্র লৌহ আকারের পরিমাণই হল ৬০ শতাংশ। আগামী কয়েক বছরে জাপানে লৌহ আকরের রপ্তানী আরও বাড়বে বলে বিশাখাপতনম বন্দরের মাধ্যমে মাল চলাচলের ক্ষমতা অনেকগুণ বাড়ানো হচ্ছে। এক লক্ষ টনেরও বেশী পরিমাণের মালবাহী জাহাজ যাতে ভিড়তে পারে সেজন্য বাইরের দিকেও একটা বন্দর তৈরি করা হচ্ছে।

লৌহ আকর গোয়ার প্রধান খনিজ সম্পদ বলে পশ্চিম উপকূলের মোরমুগাও হল আর একটি প্রধান আকর রপ্তানীকারী বন্দর। জাপানে লৌহ আকর রপ্তানী করে গত বছর ৩৯ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জিত হয়। এই বন্দরটির উন্নয়নসূচীর মধ্যে বিরাট আকারের মালবাহী জাহাজ ভেড়াবার সুযোগ সুবিধে বাড়ানোর এবং জাহাজে মাল বোঝাই করার জন্য সর্ব্বাধুনিক কনভেয়ার বেল্ট ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত। যন্ত্রের সাহায্যে জাহাজে আকর বোঝাই করার জন্য, এই বন্দরে প্রতি ঘন্টায় ৬০০০ টন পর্য্যন্ত বোঝাই করার ক্ষমতাসম্পন্ন একটি যন্ত্র বসানো হবে।

মাঙ্গালোর বন্দর দিয়েও লৌহ আকর রপ্তানী করার সম্ভাবনা বেড়ে যাওয়ায়, বর্ত্তমানে এটিরও উন্নয়ন করা হচ্ছে। পশ্চিম উপকূলে কোচিন ও মোরমুগাওর মধ্যে মাঙ্গালোর হল বর্ত্তমানে একটি মাঝারি বন্দর। এটিকে একটি বড় বন্দরে পরিণত করতে হ'লে ব্যাপক ড্রেজিং প্রয়োজন। যাই হোক আগামী দুই বছরের মধ্যে এর উন্নয়নের কাজ সম্পূর্ণ হলে মহীশূরের মধ্যে দিয়ে হাসানের সঙ্গে এটিকে রেলপথে যুক্ত করা হবে। ১৯৭৫-৭৬ সাল পর্য্যন্ত এই বন্দর মারফত ৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন মাল চলাচল করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তার মধ্যে রাসায়নিক সার আমদানী করা যাবে প্রায় পৌনে পাঁচলক্ষ টন আর ৫ লক্ষ টন লৌহ আকর রপ্তানী করা যাবে। বর্ত্তমানে বন্দরটি বছরে চার মাস বন্ধ থাকে। সমুদ্র থেকে লম্বা খালের সংযোগ রেখে একে একটি জলাভূমি বন্দর হিসেবে তৈরি করা হবে।

৬৪ কি: মী: দূরে ম্যাগনেটাইট আকরের স্তর আবিষ্কৃত হওয়ায় বন্দরটির উন্নয়নের জন্য বড় একটা কর্ম্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৭৪ সালের শেষ পর্যন্ত বন্দরটির মাধ্যমে ২০ লক্ষ টন এই আকর রপ্তানী করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। উন্নয়নের প্রথম পর্য্যায়ের জন্য ২৪.৩০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে।

ভারতের প্রধান বন্দরগুলির মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ হল গুজরাটের কাণ্ডলা বন্দর। ১৯৫৫ সালে কাণ্ডলাকে একটি প্রধান বন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ৪ টি জাহাজ যাতে ভিড়তে পারে সেজন্য ১৯৫৭ সালে ৮১০ মীটার লম্বা জেটি তৈরি করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে এই এই বন্দর মারফত ৩৯ লক্ষ মেট্রিক টন মাল চলাচল করতে পারবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এই বন্দরটির উন্নয়নের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় ২০.৭৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনার সময় এটির উন্নয়নের জন্য আরও ১২ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। ৫ টা বার্থ ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে এবং ৬ষ্ঠ বার্থটি তৈরি করার কাজও এগিয়ে চলেছে। ভারতের উপকূল ভাগের প্রধান বন্দরগুলি এই রকমভাবেই এখন উন্নয়নের কর্ম্মসূচীগুলি রূপায়িত করতে ব্যস্ত।

যৌথ সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়ন

গঠনমূলক প্রয়াসের মাধ্যমে ভারত, বিগত কয়েক বছরের মধ্যে দেশে মোটামুটি একটা মজবুত অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে পেরেছে, শিল্পের প্রসার ঘটেছে এবং উৎপাদন ও কারিগরী জ্ঞানের ক্ষেত্রেও ঘটেছে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। আজ ভারত বৈষয়িক অগ্রগতির এমন একটা স্তরে পৌঁচেছে যেখানে সে নিজের যোগ্যতাবলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অংশীদার হতে পেরেছে।

শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে অবস্থা অনুকূল। ইঞ্জিনীয়ারিং, বস্ত্র, ধাতু ও রাসায়নিক শিল্পে এবং বেশ কিছু ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনে ভারতের সহযোগিতা লাভে উন্নতিকামী দেশগুলির আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে কোনোও যৌথ উদ্যোগ, সহযোগিতাকামী ও সহযোগিতাকারী উভয়ের পক্ষেই লাভজনক। ভারত ইতিমধ্যে উন্নতিশীল ও শিল্পোন্নত দেশগুলির সঙ্গে একাধিক যৌথ উদ্যোগে অংশ নিয়েছে। ভারতীয় সহযোগিতায় বিদেশে এরকম প্রায় ৮০টি যৌথ শিল্পোদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন করেছেন।

এর মধ্যে ৩২টি শিল্পোদ্যোগ স্থাপিত হবে আফ্রিকায়—ছটি ইথিওপিয়ায়, একটি ঘানায়, ন'টি কেনিয়ায়, দুটি লিবিয়ায় একটি মরিশাসে, ৬টি নাইজিরিয়ায়, তিনটি জাম্বিয়ায়, দুটি উগাণ্ডায় এবং তানজানিয়া ও টোগোতে একটি ক'রে। ইথিওপিয়ায় যৌথ উদ্যোগে গড়ে উঠবে বস্ত্র, সাবান, পশম, প্লাষ্টিক এবং ঘড়ি শিল্প। ঘানায় ছোট কৃষি ট্র্যাক্টর তৈরির শিল্পে ভারত সহযোগিতা করছে।

ইতিমধ্যে কেনিয়ায় ভারতীয় সহযোগিতায় তৈরি হচ্ছে বস্ত্র শিল্প, গ্রাইপ ওয়াটার, ওষুধপত্র; ছাপার কালি, পশমীবস্ত্র, হালকা ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য, কর্ক, কাগজ এবং কাগজের মণ্ড তৈরির কারখানা। লিবিয়ায় পাইপ, অ্যাসবেসটস, সিমেন্ট শিল্পে ভারত সহযোগিতা করছে। আর মরিশাসে ভারতীয় সহযোগিতায় উঠেছে মোজায়েক টালি এবং রোলিং শাটার কারখানা।

ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য, বস্ত্র, ব্লেড এবং পেনসিল উৎপাদনের ব্যাপারে ভারত নাইজিরিয়াকে কারিগরী সাহায্য দিচ্ছে। ভারতীয় উৎপাদকদের এক কনসোর্টিয়াম উগাণ্ডায় একটি চিনির কল স্থাপন করছেন। একটি বিশিষ্ট ভারতীয় শিল্প সংস্থা সেখানে একটি পাটকল স্থাপনে সাহায্য করছেন। একটি কনস্ট্রাকশান কোম্পানী, একটি কারখানা এবং একটি লুব্রিক্যান্টের শোধনাগার স্থাপনের জন্য জাম্বিয়া ভারতের সাহায্য চেয়েছে। তানজানিয়া এবং টোগোতে যথাক্রমে একটি ঔষধ এবং রেডিও তৈরির কারখানা স্থাপন করা হবে।

দক্ষিণ এশিয়ায় সিংহল, যৌথ উদ্যোগে শিল্প কারখানা স্থাপনে, ভারতের কারিগরী সাহায্য নিচ্ছে। যৌথ উদ্যোগে সেখানে সেলাই কল, চা-তৈরির যন্ত্রপাতি, কাঁচ, বস্ত্র, ঔষধপত্র, এয়ার কণ্ডিশনার, রুম কুলার, কণ্ডাকটর প্রভৃতি শিল্প গড়ে উঠছে। আফগানিস্থানও বাই-সাইকেল প্রভৃতি শিল্পে ভারতীয় সহযোগিতাকে স্বাগত জানিয়েছে।

পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়ায় ইস্পাতের আসবাবপত্র, জিংক অক্সাইড, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, সূতীবস্ত্র, কাঁচের বোতল, ইনসুলেটিং কনডাকটর, ইলেক্ট্রিক মোটর, পাম্প এবং ডিজেল ইঞ্জিন তৈরির ব্যাপারে ভারত সাহায্য করছে। যৌথ উদ্যোগে সিংগাপুরে একটি ইলেকট্রোডস কারখানা এবং থাইল্যাণ্ডে একটি ইস্পাতকল, একটি সূতার কারখানা এবং একটি নিউজপ্রিন্ট কারখানা স্থাপনে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে।

ইরাণে ভারত ইতিমধ্যে কয়েকটি কারখানা স্থাপন করেছে। ইলেকট্রিক মোটর এবং ট্রানসফর্মার তৈরির আর একটি কারখানা স্থাপনের প্রস্তুতি চলছে।

পশ্চিম এশিয়ায়, ইরাকে ঠাণ্ডা পানীয় তৈরির একটি কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব ভারত সরকার অনুমোদন করেছেন।

এছাড়া লেবাননে একটি কীটনাশক দ্রব্য তৈরির কারখানা এবং লৌহ আরেটর, এয়ার কণ্ডিশনার, অ্যাসবেসটস সিমেন্ট এবং বনস্পতির কারখানা স্থাপনের প্রস্তাবেও ভারত সম্মত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যৌথ উদ্যোগেও ভারত পিছিয়ে নেই এ কথা আগেই বলা হয়েছে। যেমন আয়ার্ল্যাণ্ডে ভারতীয় সহযোগিতায় যে নাইলনের কুঁচি এবং কার্পেটের সূতা তৈরির দুটি কারখানা স্থাপন করা হয়েছে সেগুলিতে শীঘ্রই কাজ সুরু হবে। উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে অ্যাসবেসটস সিমেন্ট দ্রব্য এবং হাল্কা ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য উৎপাদনের কারখানা স্থাপনের ব্যাপারে ভারতের কারিগরী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সুবিধা চাওয়া হয়েছে।

বৃটেনে ভারতীয় সহযোগিতায় স্থাপিত একটি অ্যাসবেসটস সিমেন্ট কারখানা রয়েছে, আমেরিকায় ভারতীয় সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে শক্ত ও পুরু কাগজ তৈরীর একটি কারখানা যে রকম কারখানা ইতিপূর্বে ক্যানাডায় স্থাপিত হয়েছে। শীগগিরই এখানে শ্বেতসার এবং তরল গ্লুকোজ তৈরীর একটি কারখানা গড়ে উঠবে।

দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়ায় টুইস্ট ড্রিল তৈরির একটি প্রকল্প স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে।

বৈষয়িক সহযোগিতার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে, যখন ভারত, সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র এবং যুগোশ্লাভিয়া আন্তর্মহাদেশীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতার এক নতুন পর্বের সূচনা করে। এই তিন দেশের মধ্যে সম্পাদিত ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সম্প্রসারণের জন্য সুদূরপ্রসারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বাণিজ্য এবং শুল্ক অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে তিন দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার চুক্তিটি ১৯৬৮ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে কার্যকর হয়।

এই চুক্তির একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এই তিন দেশের মধ্যে যে কোনো একটি দেশ অন্য দুটি দেশকে যে সব পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক —অগ্রাধিকার দেবে সে সব পণ্যের কোনো স্বতন্ত্র তালিকা নেই কারণ সে সব সাধারণ তালিকায় সন্নিবেশিত।

শিল্পগত সহযোগিতা ইতিমধ্যে সম্প্রসারিত হয়েছে হুইল ট্রাক্টর, ক্রলার ট্রাক্টর, টেলিভিসন, গ্লাস বালব, টিভি. পিকচার টিউব যাত্রীবাহী গাড়ী, স্কুটার বাইসাইকেলের ছোট ইঞ্জিন, সুইচগিয়ার তৈরীর ক্ষেত্রে।

সম্প্রতি কায়রোতে এই তিন দেশের এক বৈঠক হয়। বৈঠকে তিনটি দেশ পরস্পরকে বাণিজ্য শুল্ক থেকে অব্যাহতি, শিল্প লাইসেন্স দান এবং কাঁচা মাল পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে এবং যৌথ উদ্যোগে উৎপন্ন পণ্য বিক্রির ব্যাপারে সুযোগ সুবিধা দিতে সম্মত হয়েছে। এই ধরনের ত্রিপক্ষীয় চুক্তির ক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তৃত হবে এবং সহযোগিতার বিরাট অঙ্গনে এক এক করে বিশ্বের সব কটি দেশই মিলিত হবে বলে আশা করা অযৌক্তিক হবে না।

ডি. ডি. টি—তে অপকারের তুলনায় উপকারের মাত্রা অনেক বেশী

ডি. ডি. টি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় কৃষিক্ষেত্রে, অরণ্য রক্ষায় এবং জনস্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য। বিশেষ করে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য যে পরিমাণ ডি.ডি. টি ব্যবহৃত হয় তার মাত্রা হ'ল মোট উৎপাদনের শতকরা ১৫ ভাগের মত। প্লেগ, স্লিপিং সিকনেস ও অন্যান্য কীটবাহিত রোগ দমনে ডি. ডি. টি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়।

ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ অভিযানে ঘরবাড়ীর ভেতরে, দেওয়ালে ও ছাদে ডি. ডি. টি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই অভিযানে নিযুক্ত প্রায় দু লক্ষ কর্মী গত ২০ বছরে ডি. ডি. টির কোনও প্রতিক্রিয়া থেকে ভোগেনি। যতগুলি বাড়ীতে প্রতি বছর নিয়মিত ভাবে ডি. ডি. টি ছড়ানো হয় সেগুলির বাসিন্দার সংখ্যা হবে ৬০ থেকে ১০০ কোটির মত। সেই সব বাড়ীর বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যের কোনও ক্ষতি হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রে ডিডিটি—র কারখানায় গত ১৯ বছরে নিয়মিত খোঁজ খবর রেখে দেখা গেছে যে, কারুর স্বাস্থ্যেরই ক্ষতি হয়নি। যারা ঘটনাক্রমে ডিডিটি খেয়ে ফেলেছেন তাদের শরীর খারাপ হলেও কেউ মরেন নি।

কোনোও বন্য প্রাণীর ওপর ডিডিটির প্রতিক্রিয়া মারাত্মক হওয়ায় কয়েকটি দেশে সম্প্রতি ডিডিটির ব্যবহার সীমিত করা হয়েছে। তবে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়নি। সব দেশেই এ কথা স্বীকৃত যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ডিডিটি ব্যবহার করা প্রয়োজন। যে সব অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কম সে সব অঞ্চলে ডিডিটির ব্যবহার হয়তো গৌণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু বৃষ্টি প্রধান অঞ্চলে ম্যালিরিয়ার সম্ভাবনা ও প্রকোপ এত বেশী যে, রোগ নিয়ন্ত্রণের সুলভ কোনও ব্যবস্থা উদ্ভাবিত না হওয়া পর্যন্ত, ডি. ডি. টি ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ ম্যালেরিয়া দমনের ওষুধ এমন হওয়া উচিত যা কীটের পক্ষে হবে মারাত্মক কিন্তু মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর হবে না।

ডিডিটির জন্য ইঁদুরের শরীরে কর্কট রোগের বিষ সৃষ্টি হয়—এ অভিযোগ এখনও প্রমাণিত হয়নি।

সুষম সার ফলন বাড়ায়

মহারাষ্ট্রের অমরাবতী জেলায় বিভিন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, নাইট্রোজেন, ফসফোরিক অ্যাসিড ও পটাশের সুসম সার প্রয়োগ করলে চীনা বাদামের ফলন এত বেশী হয় যে, কৃষকরা হেক্টারে দু হাজার টাকার ওপর নীট আয় করতে পারেন। এই রাসায়নিক সারের সবটাই মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। প্রতি হেক্টারে উৎপাদন হয় ২,৬৩৩ কে. জি. র মত।

টোম্যাটোর সার

টোম্যাটোর চাষের সময় যতটা সারের প্রয়োজন হয় তার সবটাই জমিতে না মিশিয়ে, খানিকটা যদি গাছের ওপর ছড়িয়ে (স্প্রে) দেওয়া হয় তাহলে হেক্টারে ৫.৬ টন বেশী ফলন হয়। নতুন দিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা করার সময়ে নাইট্রোজেন ও ফসফোরিক অ্যাসিডের জন্য য়ুরিয়া ও সুপার—ফসফেট সার হিসেবে দেওয়া হয়। প্রতি হেক্টারে মোট নাইট্রোজেনের অর্ধেক (৬০ কে. জি) ও ফসফোরিক অ্যাসিডের অর্ধেক (৩০ কে. জি) জমিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়। বাকীটা ফসলের ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

টোম্যাটোর চারা জমিতে বসাবার ৩৫ দিন অন্তর সার ছড়ানো হয়। মোট ছ'বার স্প্রে করা হয়।

প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ

৫ পৃষ্ঠার পর

হচ্ছে। পরিকল্পনা সম্পর্কে কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে যে সাহায্য করছে তাও জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের অনুমোদিত সূত্র অনুযায়ী করা হচ্ছে। সম্পদ কি রকমভাবে ভাগ করা হবে সেই সম্পর্কে যদি সাধারণ নীতি স্থির হয়ে যায় তাহলে কেন্দ্রও রাজ্যগুলির মধ্যে অবশিষ্ট দেনা পাওনার ব্যাপারগুলি অবস্থা অনুযায়ী সমাধান ক'রে নেওয়া সম্ভব। কতকগুলি রাজ্যের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং তা পরিকল্পনা মূলক বিনিয়োগের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

এই সব রাজ্য যাতে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ ও সংহত করতে পারে তাই হ'ল এই বিশেষ ব্যবস্থার লক্ষ্য। এই অতিরিক্ত সম্পদ পরিকল্পনামূলক উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। তাছাড়া রাজ্যগুলি যাতে তাদের পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় যতটা সম্ভব ১৯৬৮-৬৯ সালের পর্যায়ে আনতে পারে এবং খসড়া পরিকল্পনায় বিনিয়োগের যে পরিমাণ দেওয়া হয়েছে, এই রাজ্যগুলির মোট পরিকল্পনামূলক বিনিয়োগ যাতে কোন ক্রমেই তার কম না হয় তা সুনিশ্চিত করাও উপরে উক্ত ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য।

ইঞ্জিনীয়ারিং-এর টুকিটাকি

হেভি ইলেকট্রিক্যালসের কারখানায় পারমাণবিক রি-এ্যাক্টারের এণ্ড শীল্ড

ভারতে, পারমাণবিক রি-এ্যাক্টারের এণ্ড শীল্ড তৈরি করার জন্য প্রচুর লাগ ফোর্জিং আমদানী করতে হত। কিন্তু ভূপালস্থিত হেভি ইলেকট্রিক্যালস কারখানার তরুণ ইঞ্জিনীয়ারদের উৎসাহে ও চেষ্টায় এগুলি এখন দেশেই তৈরি হচ্ছে এবং যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রারও সাশ্রয় হচ্ছে।

প্রতিটি লাগ ফোর্জিং (ওজন প্রায় ৩ টন) আমদানী করতে প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় হত। নতুন লাগ ফোর্জিং আমদানী করতে যে শুধু মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রাই ব্যয় হ'ত তাই নয়, এণ্ড শীল্ড তৈরি করতে অনেক সময় যথেষ্ট দেরী হত। এই রকম দেরীতে বিব্রত হয়ে ইঞ্জিনীয়াররা ব্যবহৃত লাগ ফোর্জিং বাঁচিয়ে মিশ্রিত ইস্পাতের টুকরো দিয়ে এণ্ড শীল্ড তৈরি করতে বদ্ধপরিকর হন। মাত্র ১০ সপ্তাহের মধ্যেই এই কর্মসূচীটি রূপায়িত করা হয়।

মিশ্রিত ইস্পাতের টুকরো দিয়ে যে বিরাট আকারের কামানের গোলার মত এণ্ড শীল্ড তৈরি করা হল, সেটির ওজন ছিল ২০ টন এবং ব্যাস ৫.১ মীটার এবং মাত্র ১০ সপ্তাহের মধ্যে এটি তৈরি করা হয়। এই কাজের জন্য প্রতিটি পদে রেডিওগ্রাফি, বুদ্ধি, কুশলতা, ধৈর্য্য, নিপুণতা এবং নিয়ন্ত্রিত ওয়েল্ডিঙের প্রয়োজন হয়। যাতে কোন খুঁত না দেখা দেয় সেজন্য চারটি জোড়ের জায়গায় একসঙ্গে ১৪৯° ফারেনহিট উত্তাপে ওয়েল্ড করতে হয়। কারখানার ওয়েল্ডাররা চারটি জোড়ের কাজ একসঙ্গে সুচারুভাবে সম্পন্ন করেন। ৫.১ মীটার উঁচুতেও যাতে সহজে ওয়েল্ড করে জোড়া লাগানো যায় সেজন্য এই কারখানার প্রধান শিল্পী-কারিগর শ্রীএম. কে. দেব একটি বহনযোগ্য চাতাল তৈরি করেন।

রাজস্থানের কোটাতে ২০০ এম. ওয়াটের যে পারমাণবিক রি-এ্যাক্টার আছে তার এণ্ড শীল্ড তৈরি করার জটিল কাজটির ভার কিছুদিন পূর্ব্বে এই কারখানাকে দেওয়া হয়েছে।

রাঁচিতে, হেভি ইঞ্জিনিয়ারীং কর্পোরেশনের কারখানাগুলির কাছে, ভারত সরকারের গার্ডেনরীচ কারখানার যে ওয়ার্কশপ তৈরি হচ্ছে সেখানে শিগগীরই জাহাজের জন্য ডিজেল ইঞ্জিন তৈরি হবে। পশ্চিম জার্মানীর একটি ইঞ্জিনিয়ারীং সংস্থা এম. এ. এনের সহযোগিতায় এই ওয়ার্কশপটি তৈরি হচ্ছে।

এখানে প্রথম পর্য্যায়ে প্রতি বছরে ৬০০-১৯০০ বি. এইচ. পি এবং ৫০০ আর. এম. পির ২৪টি ইঞ্জিন তৈরি করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কাজ ১৯৭১ সালের প্রথম তিন-মাসের মধ্যে সুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তখন রাঁচির কারখানায় এম. এ. এনের "ই" পর্য্যায়ের ১০,৫০০ বি. এইচ. পি এবং ১২২ আর. এন. পির এবং আর ভি ১৬৷১৮ পর্য্যায়ের ২৫০-৮০০ বি. এইচ. পি ও ১৬০০ আর. এম. পির-৬ সিলিণ্ডারের বড় ইঞ্জিন তৈরি করা হবে। বর্ত্তমানে দুইজন জার্মান বিশেষজ্ঞ রাঁচিতে নির্ম্মাণ কার্য পরিদর্শন করছেন এবং এই বছরের জুলাই মাস থেকে কারখানায় উৎপাদন সুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

গার্ডেন রীচ ওয়ার্কশপের এম. এ. এনের ২০০ থেকে ৪০,০০০ বি. এইচ. পির, জাহাজের ডিজেল ইঞ্জিন তৈরি করার লাইসেন্স রয়েছে। শক্তিমান ট্র্যাক্টর তৈরি করা সম্পর্কেও এম. এ. এন প্রতিরক্ষা মন্ত্রককে কারিগরি সাহায্য সরবরাহ করে।

সম্প্রতি এম. এ. এন, ভারতের তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনকে, তৈল উত্তোলনকারী তিনটি রীগ সরবরাহ করেছে। এগুলি আসামের শিবসাগরে বসানো হচ্ছে।

রাউরকেলা ইস্পাত কারখানায় আর একটি নতুন জিনিস উৎপাদন করা হবে বলে স্থির করা হয়েছে। ডায়নামোর মতো বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জাম তৈরি করার জন্য অত্যন্ত উচ্চস্তরের যে ইস্পাতের পাত দরকার হয় সেগুলি এই কারখানায় তৈরি করা হবে।

রাউরকেলাতে অবশ্য ইলেক্ট্রোলিটিক টিনপ্লেট, ইলেট্রিক্যাল শীট ও আরমারড্ প্লেট্ তৈরি হয় এবং এগুলির যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ "নিলগিরি" তৈরি করার সময় যে ধরণের ইস্পাতের পাত চাওয়া হয়েছিল, এই কারখানা থেকে ঠিক সেই ধরণের ইস্পাতের পাত সরবরাহ করা হয়।

১৯৬৮-৬৯ সালে রাউকেলা থেকে যে সব জিনিস রপ্তানী করা হয় তা হল, জাপানে—১০১,৮০০ টন অশোধিত লোহা; অষ্ট্রেলিয়ায়-৪৫০ টন পাইপ; নিউজীল্যাণ্ডে ১০০ টন পাইপ। (নিউজীল্যাণ্ড থেকে মোট ১৪৫০০ টন পাইপের অর্ডার দেওয়া হয় এবং এই ১০০ টন পাইপ পাঠিয়ে তা সম্পূর্ণ করা হয়।)

গোয়ায়, বেসরকারী ক্ষেত্রে, মার্কিন সহায়তায় যে সার প্রকল্প রূপায়ণের সংকল্প করা হয়েছে তার জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্কের ইন্টার ন্যাশনাল ফাইনান্স কর্পোরেশন প্রতিশ্রুত অর্থ সাহায্যের পরিমাণ ১.৫৯৪ কোটি ডলার থেকে বাড়িয়ে ১.৮৯৪ কোটি ডলার করবে ব'লে ঘোষণা করেছে। পুরো প্রকল্পের জন্য ৭.৫ কোটি ডলার ব্যয় হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

REGD. NO. D-233

উন্নয়ন বার্ত্তা

★ গুজরাটের জুনাগড় জেলায়, তুলোর বীজ থেকে তেল খইল ইত্যাদি উৎপাদন করার জন্যে সমবায়ের ভিত্তিতে একটি কারখানা স্থাপন করা হয়েছে।

★ ১৯৬৮-৬৯ সালে ওড়িষ্যা, বিভিন্ন দেশে ১৪.৮৫ কোটি টাকার ধাতু আকর রপ্তানী করেছে। জাপান, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, পশ্চিম জার্মানী, বেলজিয়াম এবং রুমানিয়ায় যে লৌহ আকর রপ্তানী করা হয়েছে তাও এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

★ পূর্ব্ব জার্মানীতে তৈরি, সবরকম আবহাওয়ায় চলার এবং গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার উপযোগী ১৫০ টনের একটি জাহাজ বোম্বাইতে এসে পৌঁচেছে। বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার জন্য এটি ব্যবহার করা হবে। আধুনিক সাজ সরঞ্জামে সজ্জিত এই জাহাজটি ৬০০ মীটার গভীর জলেও মাছের ঝাঁকের অনুসন্ধান করতে পারবে।

★ ১৯৬৯ সালে ব্যাঙ্কগুলি, সমবায় সমিতি এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে অন্যান্য বছরের তুলনায় যথাক্রমে ৪২ কোটি টাকা এবং ১২২ কোটি টাকা বেশী ঋণ দিয়েছে। নতুন একটি কর্ম্মসূচী অনুযায়ী, পল্লী অঞ্চলের ছোট ছোট শিল্প সংস্থাগুলিকে ৫০০০ টাকা পর্য্যন্ত ঋণ দেওয়া হচ্ছে।

★ কৃষির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট পরিমাণ আর্থিক সাহায্য দেওয়ার একটি প্রকল্প অনুসারে রাজস্থানের বহু সংখ্যক কৃষককে ঋণ দেওয়া হয়েছে। রাজস্থান সরকার এবং পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের যুক্ত উদ্যোগে উদয়পুর জেলার সৌভাগ্যপুরায় এই কর্ম্মসূচী অনুযায়ী কাজ সুরু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের একটা বিশেষ বৈচিত্র্য হল, যাদের ৩ থেকে ৬ একর জমি আছে কেবলমাত্র সেই রকম ছোট কৃষকরাই এই সাহায্য পাওয়ার যোগ্য। যে ঋণ দেওয়া হয় তা তিন থেকে সাত বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

★ কালিকাট এবং কোয়েম্বাটুরের মধ্যে মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন এর কার্য্যকুশলতা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

★ দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা অঞ্চল এখন খাদ্যশস্যের ব্যাপারে স্বয়ম্ভরতা অর্জ্জন করেছে। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৬৫-৬৬ সালে যেখানে মাত্র ৮০ একর জমিতে রবি শস্যের চাষ করা হয় সেখানে ১৯৬৮-৬৯ সালে সেই জমির পরিমাণ বেড়ে ১১০০ একর হয়েছে।

★ ভবনগরের কাছে কাম্বে উপসাগরের কাছে ভারতের প্রথম তৈলকূপটির উদ্বোধন করা হয়েছে।

★ নাসার বিজ্ঞানীরা দুই পর্য্যায়ের যে মার্কিন নিকিপচি রকেট এনেছিলেন তা থুম্বা রকেট ক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে সাফল্যের সঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা এবং মার্কিন জাতীয় বিমানও মহাকাশ সংস্থার যুক্ত কর্ম্মসূচী অনুযায়ী দিনের বেলায় মহাকাশ সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য ঐ রকেট ক্ষেপণ করা হয়।

★ ভারতীয় এয়ারলাইন্স এর জন্য সাতটি বোয়িং ৭৩৭ বিমান কেনা সম্পর্কে ভারত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ১১৫টি আসনের এই বিমানগুলি নভেম্বর মাস থেকে সরবরাহ করা সুরু হবে।

★ বিশাখাপতনমে একটি নৌপ্রকল্প নিয়ে যে কাজ সুরু করা হয়েছে তা আগামী ছয় বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। একটি ড্রাই ডক, জাহাজ মেরামতের একটি কারখানা এবং যুদ্ধ জাহাজ তৈরির জন্য একটি জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা স্থাপন এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করতে আনুমানিক ১০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

★ ১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাসে ভারত সবচাইতে বেশী অর্থাৎ ১৪৫.০৪ কোটি টাকার জিনিস রপ্তানী করেছে। এর পূর্ব্ব মাসে ১১৮.৩ কোটি টাকার জিনিস রপ্তানী করা হয়। গতবছর জানুয়ারি মাসের রপ্তানীর পরিমাণ ১১৫.৭ কোটি টাকা। বর্ত্তমান বছরের জানুয়ারি মাসে আমদানীর তুলনায় ১৬ কোটি টাকার বেশী মূল্যের জিনিস রপ্তানী করা হয়। চলতি বছরে এই চতুর্থবার আমদানীর তুলনায় রপ্তানী বেশী হ'ল।

★ পি. এল ৪৮০ কর্ম্মসূচী অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই বছরে ১২৫.০০০ গাঁইট অতিরিক্ত তুলা সরবরাহ করবে। এর ফলে, বর্ত্তমানে সূতোর যে চাহিদা বেড়েছে তা মেটানো এবং এগুলির মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

★ রাঁচির ভারি ইঞ্জিনিয়ারীং কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগে উৎপাদনের মাত্রা বেশ বেড়েছে। এই বছরের জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে, ভারি মেসিন নির্ম্মাণ কারখানায় মোট ৪৩০০ টন ওজনের মেসিন ইত্যাদি তৈরি হয়।

★ বিশাখাপতনমের হিন্দুস্থান জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানার সংহত উন্নয়নের জন্য ৭.৫৭ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে এখানে বর্ত্তমানের তিনটির তুলনায় বছরে ৬টি জাহাজ তৈরি করা যাবে। জাহাজ তৈরির একটি ডক এবং জলের একটি বেসিনও তৈরি করা হবে।

★ বিদেশ থেকে যে সব যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানী করা হয়, সেগুলির বিকল্প দেশেই তৈরি করে, তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন ৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করেছে। জটিল ইলেকট্রোনিক সাজ সরঞ্জাম, ক্রেন, পরিবহণের সাজ সরঞ্জাম, বায়ু কম্প্রেসার এবং তারের দড়ির মতো কতকগুলি সাজ সরঞ্জাম দেশেই তৈরি করে নেওয়া হচ্ছে।

★ একটি সাহায্য কর্ম্মসূচী অনুযায়ী ভারত, অষ্ট্রেলিয়া থেকে প্রায় ২ লক্ষ কিলোগ্রাম মেরিনো পশম পাবে। ২ লক্ষ কিলোগ্রাম পশমের একটা মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলতে এই চুক্তি ভারতকে সাহায্য করবে এবং ভারতের পশম কারখানাগুলি তাদের রপ্তানী বাড়াতে পারবে।

ডিরেক্টার, পাব্লিকেশনস্ ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সোসাইটি লিঃ—করোলবাগ, দিল্লী-৫ দ্বারা মুদ্রিত।